কার্তিক

১৩৬০

প্রবাসী, ৫৩শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬০

সূচীপত্র

কার্ত্তিক—চৈত্র

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্র-সূচী

রঙীন চিত্র

একবর্ণ চিত্র

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

নৌকা-বাচ

শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শিল্পকলা প্রদর্শনী, কলিকাতা

মা ও মেয়ে [শিল্পী— য়িস্‌সুও কুনিয়োসি

সংবাদপত্র-পাঠ (জল রং) শিল্পী—চিয়াং চাও-হো

। শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৩শ ভাগ
২য় খণ্ড
কার্ত্তিক, ১৩৬০
১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বেকার-সমস্যার মূল

অধিকাংশ লোকেরই ধারণা বেকার-সমস্যার একটিমাত্র মূল কারণ—চাকরির অভাব। "চাকরি" শব্দের উৎপত্তি "চাকর" হইতে ইহা বোধ হয় আমরা ভুলিয়াই গিয়াছি—এমনি ভাবেই দাস-মনোবৃত্তি আমাদের অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে আমরা দেখি আজিকার দিনে যাঁহারা চাকরি করেন অথচ দাসত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদের অধিকাংশই কায়িক পরিশ্রমে বা শিল্প-কৌশলে অন্নের সংস্থান করেন। তাঁহাদের অশন-বসন হয়ত অল্প চাকুরে অপেক্ষা অমার্জ্জিত বা অসংস্কৃত কিন্তু তাঁহাদের অবস্থা এক হিসাবে ঢের সচ্ছল। যাঁহারা পরিষ্কার খাওয়া-পরার সহিত চাকরির মর্য্যাদা বুঝেন তাঁহাদেরই অধিকাংশের আজ দুই দিক সামলান প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। হয় পূর্ব্ব-পুরুষের সঞ্চিত সম্পত্তির বিক্রয় বা বিনিময় নচেৎ ঋণভার স্কন্ধে লওয়া, ইহা ভিন্ন তাঁহাদের গত্যন্তর নাই। কিন্তু তথাপি চাকরি চাই।

বাস্তবপক্ষে বাঙালী মধ্যবিত্তের "ভদ্রস্থ রক্ষা"ই তাহার অন্যতম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ছেলেকে স্কুল-কলেজে পরিষ্কার কাপড়-জামা পরাইয়া পাঠাইতে হইবে নচেৎ মানইজ্জৎ যায়; সেখানে তাহার যে শিক্ষা বর্ত্তমানে হইতেছে তাহাতে সে—অন্ততঃপক্ষে অধিকাংশক্ষেত্রে—অবিনয়ী, অশিষ্ট ও উদ্দাম স্বভাবযুক্ত হইয়া বেকার ও নিষ্কর্ম্মা হইতে বাধ্য, যদি না সংসারের আগুনে পুড়িয়া তাহার মতিগতি ফিরে। কিন্তু তাহা হইলেও সে যতবার হোঁচট খাইয়াই পাসের ছাপ আদায় করুক না কেন, তাহার বংশের ভদ্রস্থের খ্যাতি তো রহিল। সে খ্যাতি ধুইয়া খাইলে শরীর বা মনের পুষ্টি হয় কিনা একথা আমরা কয় জনে ভাবি?

তাহার পর আছে সামাজিকতার চাপ। সামাজিক কাজে-কর্ম্মে, ভূতভোজনের পর্ব্বে এবং নানা অবান্তর ব্যাপারে বাঙালী মধ্য-বিত্তের যে অপব্যয় হয় অন্য কোনও প্রদেশের তুল্য অবস্থার লোকের তাহার এক-চতুর্থাংশও হয় না নিশ্চয়। ফলে বাঙালীর ব্যয়ের খাতে অঙ্ক বাড়িয়াই চলে, ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের চিহ্নমাত্র থাকে না।

মাদ্রাজী, হিন্দুস্থানী বা মহারাষ্ট্রীয় চাকুরে তাহার আয়ের বেশ একটা অংশ সঞ্চয় করে। সুতরাং পুত্রের শিক্ষা শেষ হইলে যদি চাকুরি না জোটে তবে ব্যবসায়ে, কৃষিতে বা শিল্পে তাহাকে বসাইয়া দিবার কিছু জোগাড় সে করিতে পারে। বাঙালীর ক্ষেত্রে পুত্র ত বাপের ধার শোধ করিবারই চেষ্টা আগে করিত—এখন তাহাও করিতে সে অপারগ ও অসম্মত। বাঙালী এমনই সম্বিৎহীন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে বন্ধক রাখিয়াও যে ব্যবসায় করিবে তাহার উপায় নাই, অথচ ভদ্রস্থতা রাখিতেই হইবে।

মুসলমান দরজী পরিবার দিনে পাঁচ সাত টাকা উপার্জ্জন করে, বিহারী বা হিন্দুস্থানী মুচি দিনে চার হইতে ছয় টাকা উপার্জ্জন করে। হিন্দুস্থানী পানওয়ালা দিনে পনের-কুড়ি টাকা উপার্জ্জন করে। দিন-মজুর যে সেও মাসে ১০০ টাকা উপার্জ্জন করেই। হিন্দুস্থানী দরওয়ান পঞ্চাশ-ষাট টাকায় চাকরি করে, তৎসঙ্গে সকাল-বিকাল ও ছুটির দিনে অন্য কাজ করে। শেষজীবনে কয়েক হাজার টাকা ও জমিজমার ব্যবস্থা করিয়া দেশে যায়। বাঙালী মধ্যবিত্তের ছেলে ওসকল কাজে পটুও নয় ইচ্ছুকও নয়—কেননা তাহাতে ভদ্রস্থতা থাকে না, যায়।

বাঙালী মিস্ত্রী এককালে সমস্ত ভারতে প্রসিদ্ধ ছিল—কার্য্য-কুশলতায় এবং বিশ্বস্ততায়। তাহার সে কার্য্যকৌশল আজও আছে, কিন্তু ফাঁকির চোটে তাহার সুখ্যাতি লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। বাঙালী এখন কর্ম্মবিমুখ ও ফাঁকিবাজ বলিয়া লোকের বিশ্বাস হারাইতে বসিয়াছে। উপরন্তু সে নিয়ম মানিতে চাহে না, শৃঙ্খলার বা সময়মত কাজের ধার ধারে না। সুতরাং কলকারখানাতেও তাহার স্থান ক্রমেই সঙ্কুচিত হইতেছে।

বাকি রহিল জমিজমা ও ব্যবসায়। জমার কোটায় ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শূন্য, জমিতে হাত দিলে জাত যায় বর্ণহিন্দুর—অবশ্য এটা কোন শাস্ত্রমতে তাহা জানা যায় নাই। উত্তরপ্রদেশে, বিহারে, রাজপুতানায় ও মধ্যপ্রদেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজপুত প্রভৃতি উচ্চবর্ণের চাষী অসংখ্য এবং এই কারণে সে সকল দেশে চাষের অবস্থা-ব্যবস্থাও উন্নতির পথেই চলিয়াছে। বাংলায় শুধু পরভোজী (parasite) শ্রেণীরই বংশবৃদ্ধি হইতেছে।

তাহার পর ব্যবসায়। বিনা পুঁজিতে ব্যবসায় কি করিয়া হয়? আমাদের পুঁজির অবস্থা এমনিই দাঁড়াইয়াছে যে, "পুঁজিপতির ধ্বংস হউক" শুনিলে সাধারণ ভাবে আমরা সকলেই আনন্দিত হই। পুঁজিহীনকে অর্থসম্বল যোগাইবে কে? ছিল কতকগুলি বাঙালী ব্যাঙ্ক, তাহারা তবুও কিছু করিত। কিন্তু বাঙালীর অন্তঃকলহ, দলাদলি ও দৌর্ব্বল্যের কারণে সেগুলিরও ধ্বংস হইতেছে।

বেকার-সমস্যা ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

ভারত সরকার কি ভাবে এই সমস্যা পূরণ করিবেন তাহার পূর্ণ পরিকল্পনা বোধ হয় এখনও রচিত হয় নাই। এদিকে কিন্তু বড় বড় টাকার অঙ্ক দেখা দিয়াছে এবং তাহার খরচের জন্য পরোক্ষ ব্যবস্থাও বোধ হয় নিভৃতে তৈয়ারি হইতেছে। যাহা হউক, সরকার যে এ বিষয়ে চেষ্টিত সেটুকু সুসংবাদও নিম্নস্থ বার্ত্তায় পাওয়া যায়:

"৭ই অক্টোবর—আজ নয়াদিল্লীতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের দুই দিনব্যাপী অধিবেশনের সমাপ্তিতে অধিক-সংখ্যকের কর্ম্ম-সংস্থানের সাহায্যে বেকার-সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রসার বাবদে আরও দেড় শত হইতে পৌনে দুই শত কোটি টাকা ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। নূতন নূতন পরিকল্পনার সাহায্যে এই কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হইবে।"

এই পরিবর্দ্ধিত কর্ম্মসূচীতে যে সকল পরিকল্পনা স্থান পাইবার যোগ্য তাহার কথা জানাইয়া একখানি পত্র শীঘ্রই রাজ্য সরকার-সমূহের নিকট প্রেরিত হইবে। এখন পরিকল্পনা বাবদে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইল ২২১৯ হইতে ২২৪৪ কোটি টাকার মত। আজ সরকারীভাবে জানান হইয়াছে যে, দুই দিনের আলোচনার ফলাফল বর্ণনা প্রসঙ্গে পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান উপরোক্ত সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।

আলোচনায় এক সময়ে বাধা দিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন, "পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কতকগুলি বিষয় যেরূপ সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা ও স্থানীয় জনকল্যাণমূলক কার্য্যে জনগণ যেভাবে সাড়া দিয়াছে তাহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইবার কারণ রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এতটা সাফল্য অনেকটা আশ্চর্য্যের বিষয়। গণতন্ত্র শুধু সরকারের কাঁধে ভর করিয়া চলিতে পারে না। অতএব পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজে সর্ব্বদা সাধারণের সহিত সংযোগের কথা মনে রাখিতে হইবে। পল্লীবাসীকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অংশীদার করিয়া তুলিতে হইবে।"

শ্রীনেহরু বিশেষ জোর দিয়া জানান, "ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা জনগণের পরিকল্পনা, এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার সময়ে সকলের মনে এই ভাব জাগ্রত করিতে হইবে যে, দেশের প্রতিটি নরনারী ও শিশু আজ ভারত লিমিটেডের অংশীদার। নূতন ভারত গড়িবার মহান্ দায়িত্ব নির্ব্বাহে আমরা সকলেই একযোগে ব্রতী হইয়াছি।"

সহ-সভাপতি শ্রী ভি. টি. কৃষ্ণমাচারী বেকার-সমস্যা নিরসনে এই অতিরিক্ত পরিকল্পনার কথা ঘোষণার সময় অর্থ-সচিব শ্রী সি. ডি. দেশমুখের পার্লামেন্টের গত অধিবেশনে প্রদত্ত বিবৃতির কথা উল্লেখ করেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সম্প্রসারণ সম্পর্কে যে সকল নূতন পরিকল্পনার কথা বলা হইয়াছে তাহা হইল: (১) বাস্তুহারাদের পুনর্ব্বাসন পরিকল্পনার সম্প্রসারণ—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তিন বৎসর অর্থাৎ ১৯৫৩-৫৪ সন পর্য্যন্ত এই বাবদে ব্যয় নির্দ্দিষ্ট ছিল। এখন স্থির করা হইয়াছে যে, ইহার পরেও পুনর্ব্বাসনের কাজ চলিবে। অর্থাৎ, পুরাপুরি পাঁচ বৎসরই এই পরিকল্পনা চালু থাকিবে। (২) রাজ্যসরকারবৃন্দ কর্তৃক শিল্প-উন্নয়ন সংস্থা ও শিল্প-অর্থসাহায্য সংস্থা গঠন। (৩) অভাবগ্রস্ত অঞ্চলের জন্য স্থায়ী সাহায্য পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্যে সাহায্য দান। (৪) রাস্তা নির্ম্মাণ ও স্বল্প শক্তিসম্পন্ন শিল্প-সংস্থাদের সাহায্যদান। (৫) কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা। (৬) কতকগুলি সাধারণ শ্রেণীর কার্য্যকলাপ।

রাজ্যসরকারসমূহের পরিকল্পনার অর্থ-সংস্থান সম্পর্কে পরিষদ সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই মর্ম্মে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উন্নয়ন "লেভী" ধার্য্য করাই সর্ব্বোত্তম পন্থা। এতৎ সম্পর্কে রাজ্যসরকারবৃন্দকে অনুরোধ জানান হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন সত্বর প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করেন। বর্ত্তমান জলকর যেখানেই কম রহিয়াছে, সেখানেই উহাকে বাড়াইয়া দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে।

সাধারণ ঋণ সংগ্রহের সাহায্যে অর্থ-সংস্থান করাকে সর্ব্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

বেকার-সমস্যা ও ভূদান

ভূদান যজ্ঞে যে শুধু ভূমিহীনের ভূস্বত্ব লাভ হইবে তাহাই নয়, এরূপ অসংখ্য লোকের কার্য্যের সংস্থান হইবে যাহারা বৎসরের অধিকাংশ সময়ই কর্ম্মহীন ও অন্নহীন অবস্থায় কাটায়। সুতরাং ভূদানে যজ্ঞের অংশ হোতা দাতা ও গ্রহীতা সকলেরই প্রাপ্য, যদি তাঁহারা সকলেই সমান শ্রদ্ধাবান হন। ২৬শে সেপ্টেম্বরের 'হরিজন পত্রিকা' হইতে আচার্য্য বিনোবার বাক্যাংশ আমরা নিম্নে দিলাম। ইহাতে ভূমিতে কায়িক পরিশ্রম সম্বন্ধেও যাহা আছে তাহা প্রত্যেক বঙ্গ-সন্তানের প্রণিধান যোগ্য:

"১৯৫৭ সন পর্য্যন্ত পাঁচ কোটি একর জমি হস্তান্তর হইয়া যাইবে—এইরূপ আশা আমরা রাখিয়াছি, পরন্তু ভূমিদান যজ্ঞের যে প্রকৃত রূপ আছে, উহা কেবলমাত্র এক ধর্ম্মবিচারের প্রবর্ত্তন দ্বারাই সম্ভব হইবে, ইহাই আমি বারংবার বলিয়াছি। কোনও একজন আমাকে ভূমিদান করিয়াছেন। ধরিয়া লউন যে হুমকির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া তিনি উহা দান করেন নাই, শ্রদ্ধার বশেই উহা দান করিয়াছেন। কিন্তু ঐ দান দ্বারা তাঁহার আপন জীবনযাত্রা পরিচালনা করিবার চিন্তার মধ্যে এখন পর্য্যন্ত কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। এইরূপ অবস্থায় ঐ দানকে ক্ষণিকের পুণ্যদান বলিয়া মানিতে হইবে। এইরূপ ক্ষণস্থায়ী পুণ্যও মানুষকে সমাধানের পথ প্রদর্শন করে, কিছু সদ্‌ভাবনাও উৎপন্ন করে। কিন্তু ঐটুকুতেই আমার কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। আমি কাল পালকোটে বলিয়াছিলাম যে, দান করিলে হৃদয় পরিবর্ত্তন হইবে। তবে উহাকে চিরস্থায়ী পরিবর্ত্তন তখনই বলা যাইবে, যখন সেই আদর্শ অনুযায়ী দাতার জীবনের পরিবর্ত্তন সাধন হইবে। এইভাবে কতিপয় লোকের জীবনধারার পরিবর্ত্তন হইতেছে। এইরূপ লোক অল্পসংখ্যকই আছেন। তথাপি তাঁহারাই আমাদের যজ্ঞের মুখ্য সংগ্রহ। এইরূপ জীবন পরিবর্ত্তন তখনই হইবে, যখন আমরা সাধনার দ্বারা হৃদয়ের মধ্য হইতে অধিক সংশোধন সঞ্চার করিতে

থাকিব এবং আমরা আমাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে, দৈনন্দিন আচরণের মধ্যে, আমাদের মনের সূক্ষ্ম অনুভূতির মধ্যে এই সকল পূর্ণ সংশোধন সঞ্চারিত করিব। তখন আমরা আশা করিতে পারিব যে, দাতার হৃদয় পরিবর্ত্তন চিরস্থায়ী হইবে। পরিবর্ত্তন ক্ষণস্থায়ী যেন না হয় এবং এই দানের মধ্য দিয়া তাঁহার জীবনের মধ্যে কিছু পরিবর্ত্তন যেন আসিয়া যায়।

এই দৃষ্টিতে আমরা কোদাল চালানোর যে কার্য্য শুরু করিয়াছি, ইহার সম্বন্ধেও আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। ক্ষেতের মধ্যে মাটি গোড়ার কাজ আমি এক প্রকার ভগবৎ উপাসনার মত কয়েক বৎসর যাবৎ করিয়া আসিতেছি। এবং সেই নিষ্ঠা এতই গভীর যে উহার দ্বারাই এক জনশক্তি নির্ম্মাণ করা যাইবে, এইরূপ আশা আমার রহিয়াছে। আমরা পদব্রজে দশ-বার মাইল চলিয়া থাকি। ইহার পর আর কোদাল চালাইবার মতন খুব বেশী শক্তি অবশিষ্ট থাকে না, তবুও কয়েক ঘণ্টার জন্য কেন আমরা কোদাল না চালাইব? কিন্তু বিলম্ব হইলেও আমরা কোদাল চালাই। প্রত্যহ কোদাল চালাইয়া গেলেও কোন সঙ্গবদ্ধ কার্য্যক্রম থাকা উচিত নহে। শরীরশ্রমের মধ্যে নিষ্ঠা রাখিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি না করিলে ভূদান যজ্ঞের কাজ সফল হইবে না, এবং বর্ত্তমান দরিদ্র শ্রেণীর উন্নতি হইবে না। দরিদ্র এবং ধনীর মধ্যে ভেদাভেদ জ্ঞান ঘুচিবে না ও সর্ব্বোদয় সমাজের প্রতিষ্ঠাও হইবে না। এই সকল কথা বুঝিয়া আমাদের কোদাল চালাইয়া শ্রমদান যজ্ঞ সার্থক করিতে হইবে। ইহা আমি কেবলমাত্র নিজের কোদাল চালাইবার কার্য্যক্রম সম্বন্ধেই বলিতেছি না। আরও অনেক কথা আমি চিন্তা করিতে থাকিব। এইরূপ ভাবে আমরা গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকিব।

স্বাধীনতার পথ

পণ্ডিত নেহরু এত দিনে বুঝিতেছেন, আমরা স্বাধীনতার পথে কতটুকু অগ্রসর হইয়াছি। এতদিন তো একদিকে আনন্দোল্লাস এবং অন্য দিকে আর্ত্তনাদ ও হিংসার চিৎকারেই দিন কাটিয়াছে। ভারতে দাসত্বের শৃঙ্খলও সর্ব্বত্র দূর হয় নাই। নিম্নের সংবাদে তাহাই জানা যায়:

"কোয়েম্বাটুর, ৪ঠা অক্টোবর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ প্রাতে এখান হইতে বত্রিশ মাইল দূরে পালঘাটে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে জোরের সহিত বলেন যে, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অন্যান্য সমস্ত দিক হইতে বিবেচনা করিতে গেলে এদেশে আর বৈদেশিক উপনিবেশ থাকিতে পারে না। তিনি বলেন যে, ভারতীয় ইউনিয়নে মাহে প্রভৃতি বৈদেশিক উপনিবেশের অবস্থিতি সম্পর্কে জনগণের উত্তেজনার কারণ তিনি বুঝিতে পারেন, তবে এই প্রশ্নটি বৃহৎ দেশগুলির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইহার সমাধান করিতে হইবে।

'ঐক্য কেরালা'র দাবির কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু বলেন যে, বর্ত্তমানে তিনি এখন 'ঐক্য ভারত' ও 'ঐক্য ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি বড় বড় প্রশ্ন সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন, সুতরাং ছোট ছোট বিষয়ে তিনি আদৌ মনোনিবেশ করেন না। তবে তিনি বলেন যে, সমগ্র প্রশ্নটি সম্পর্কে বিবেচনার জন্য শীঘ্রই একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি নিযুক্ত হইবে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ এখানে বলেন যে, স্বাধীনতা লাভ করিয়া তাঁহারা শুধু তাঁহাদের পথ-পর্যটনের একাংশ সমাপ্ত করিয়াছেন; কিন্তু এখনও দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে হইবে।

আজ সন্ধ্যায় স্থানীয় চিদাম্বরম পার্কে এক লক্ষ নর-নারীর এক সমাবেশে বক্তৃতাদান-প্রসঙ্গে শ্রীনেহরু বলেন, "স্বাধীনতা প্রাপ্তির দ্বারা আমি, তুমি এবং এই দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ শুধু ইতিহাস সৃষ্টি করে নাই; পরন্তু, উহা দ্বারা এশিয়ার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে।'"

তীর্থস্থল ও তীর্থগুরু

বৈদ্যনাথধামে যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে দেশের লোকের চক্ষু কতকটা খুলিয়াছে। পুণ্যতীর্থসমূহে যে কিরূপ অনাচার হয় তাহা কাহারও অবিদিত নহে। সুতরাং নিম্নলিখিত সংবাদটি সময়োপযোগি এবং বিবেচনাযোগ্য:

"পাটনা, ৭ই অক্টোবর—বিহার বিধানসভার সদস্য শ্রীবৈজনাথ সিংহ (কংগ্রেস) বৈদ্যনাথধাম মন্দির বিল (১৯৫৩) বিহার বিধানসভায় উত্থাপনের নোটিশ দিয়াছেন। বৈদ্যনাথধাম মন্দির ও তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সুপরিচালনার জন্য এই বিলে বিধান রহিয়াছে।

এই বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে: বহু শতাব্দীর প্রাচীন ও পুণ্যতীর্থসমূহের মধ্যে বৈদ্যনাথধাম অন্যতম হইলেও দীর্ঘকাল যাবৎ সেখানে পাণ্ডাদের রাজত্ব চলিতেছে। এই পাণ্ডাদের পেশা কালক্রমে যাত্রীপীড়নে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও ধর্ম্মে রক্ষণশীলতা দেওঘরের পাণ্ডাদের মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্যমান। নানাভাবে তাহাদের অত্যাচার চলিয়া থাকে। কিন্তু সংবাদপত্রে তাহা অল্পই প্রকাশিত হয়। প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে হরিজনদের বৈদ্যনাথ মন্দির প্রবেশ সমর্থন করিতে গিয়া মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত দেওঘরের পাণ্ডাগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

ভারতীয় সংবিধানে অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণ উচ্ছেদের বিধান রহিয়াছে। সংবিধানে অস্পৃশ্যতা কেবল নিষিদ্ধই হয় না, ইহার প্রয়োগও আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয়। বিহার হরিজন (সামাজিক অযোগ্যতা নিবারণ) আইন ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রবর্ত্তিত হয়। উহার প্রয়োগ আরও জোরালো করার জন্য ১৯৫১ সালে উক্ত আইন সংশোধিত হয়। কিন্তু সম্প্রতি দেওঘরে অনুষ্ঠিত কয়েকটি ব্যাপারে উক্ত আইনের ব্যর্থতা প্রমাণিত হইয়াছে।

এমন কি সন্ত বিনোবা ভাবেও এই কথা বলেন, 'আমার মতে এই সকল পূজার স্থান পরিচালনার ভার সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেও অন্যায় হইবে না বরং তাহাতে সুপরিচালনাই হইতে পারে।'"

খাদ্যসঙ্কট

ভারতের খাদ্য-পরিস্থিতি হেঁয়ালির ব্যাপার, সত্যিকার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা কিংবা বুঝান কষ্টকর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে খাদ্যসরবরাহে শতকরা ১০ ভাগ ঘাটতি থাকিত এবং ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী করিয়া ঘাটতি পূরণ করা হইত। বর্ত্তমানেও খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ প্রায় শতকরা ৮ হইতে ১০ ভাগ। অবশ্য এখন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু সেই তুলনায় খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই। গত তিন বৎসরের খাদ্য-পরিস্থিতির হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :

(লক্ষ টনের হিসাবে)

বৎসর	জমা	সংগ্রহ	আমদানী	সরকারী জমা হইতে খরচ	খরচের শতকরা হিসাবে সংগ্রহ	খরচের শতকরা হিসাবে আমদানী	উদ্বৃত্ত
১৯৫০	১৫.৮১	৪৬.১৭	২৮.৭০	৭৫.৯৪	৬১.১২	৩৭.৯৯	৭.২৯
১৯৫১	৭.২৯	৩৭.৬৬	৪৮.৪৯	৭৮.৬৭	৪৭.৮৮	৬১.৬৪	১৩.০৭
১৯৫২	১৩.০৭	৩৪.১৬	৩৯.৩২	৬৬.৯৬	৫১.০২	৫৮.৭২	১৫.০১

চলতি বৎসরে খারিফ শস্যের কৃষিজমি শতকরা ৪.৭ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদন-পরিমাণ শতকরা ১২.৪ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ বৎসরে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা ভাল থাকায় মাত্র ২০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী করা হইবে। আন্তর্জাতিক গম চুক্তি অনুসারে ভারতবর্ষ বৎসরে ৪৫ লক্ষ টন পর্য্যন্ত গম আমদানী করিতে পারে। ১৯৫১ সনে ব্রহ্মের সহিত চুক্তি অনুসারে, ভারতবর্ষ আগামী চার বৎসর ধরিয়া প্রতি বৎসর সাড়ে তিন লক্ষ টন চাউল আমদানী করিতে পারে। এ বৎসরে চুক্তি অনুসারে ভারতবর্ষ অতিরিক্ত আরও দেড় লক্ষ টন চাউল বৎসরে ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানী করিবে।

কিদোয়াই সাহেবের হিসাব অনুসারে এবারে বাংলাদেশে গত বৎসর হইতে শতকরা ৩০ হইতে ৪০ ভাগ হারে অধিক চাউল উৎপন্ন হইবে। প্রদেশের বাহিরে চাউল রপ্তানী নিষিদ্ধ হওয়ায়, এবারে বাংলাদেশের চাউল এই প্রদেশেই থাকিয়া যাইবে। গত বৎসর উড়িষ্যা কেন্দ্রীয় সরকারকে তিন লক্ষ টন চাউল দিয়াছে এবং মধ্যপ্রদেশ দিয়াছে আড়াই লক্ষ টন। এই বৎসর এই দুইটি প্রদেশ মিলিতভাবে অন্ততঃ নয় লক্ষ টন চাউল ঘাটতি প্রদেশগুলিকে দিবে। উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ এবং বিন্ধ্যপ্রদেশ হইতে চাউল সরবরাহ কলিকাতা ও বাংলাদেশের রেশনিং ভুক্ত অন্যান্য জেলাগুলির জন্য পাওয়া যাইবে।

লেভী প্রথা আশানুরূপ সাফল্যলাভ করে নাই। এই অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট ১৪ই অক্টোবর হইতে চাউল সংগ্রহ করা বন্ধ করিয়া দিতেছেন। গত বারের তুলনায় যেখানে চাউলের মূল্য অতিরিক্তভাবে হ্রাস পাইবে, সেখানে চাষীরা যদি চাউল বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সমস্ত চাউল ক্রয় করিয়া লইবেন। এ বৎসর বাংলাদেশে নাকি অত্যধিক চাউল উৎপাদন হইতেছে—৪২ লক্ষ টন। গত দশ বৎসরের তুলনায় ইহা রেকর্ড।

লেভী প্রথা লোপ করা যদিও বিলম্বিত হইয়াছে, তথাপি ইহা সুবিবেচনার কাজ হইয়াছে। রেশনিং ও নিয়ন্ত্রণ প্রথা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। এত খাদ্য উৎপাদন ও আমদানী সত্ত্বেও খাদ্যসঙ্কট ঘুচিতেছে না। নিয়ন্ত্রণ প্রথা বজায় থাকিতে এ সঙ্কট ঘুচিবার আশাও নাই। যেমন চিনির ব্যাপারে হইয়াছে—চিনি দেশে অতিরিক্ত উৎপাদন হইতেছে, অথচ লোকে চিনি পাইতেছিল না, তেমনি হইতেছে চাউলের ব্যাপারে।

ব্রহ্ম, চীন, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশগুলি হইতে অবাধে চাউল আমদানী করিবার বন্দোবস্ত করা উচিত—তাহা হইলে দেশের গুপ্ত চাউল বেকায়দায় পড়িবে। গবর্ণমেণ্টের ছয় মাসের জন্য গম ও চাউলের কিছু ষ্টক রাখিয়া, চাউল বিনিয়ন্ত্রণ করিয়া দেওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে চাউল আমদানীও যেন চলিতে থাকে।

কেন্দ্রীয় সরকার ও পল্লীশিল্প

গত ৬ই আগষ্ট লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী বলেন যে, পরিকল্পনা কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন : "তৈলশিল্পের ক্ষেত্রে এই কর্মনীতি অবলম্বিত হইতে পারে যে, পল্লীর ঘানির দ্বারা খাদ্য তৈল উৎপাদন প্রসারিত করা হইবে এবং তৈল-কলগুলিতে অ-খাদ্য তৈলসমূহ উৎপাদন করা হইবে।" মন্ত্রীমহোদয় আরও জানান যে, পরিকল্পনা কমিশনের উক্ত সুপারিশ সরকারের বিবেচনাধীন আছে। আর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, পরিকল্পনা কমিশন পল্লীর ঘানি-শিল্পের উন্নয়নকল্পে মিলজাত তৈলের উপর কিছু শুল্ক ধার্য্য করিবার জন্য যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহাও সরকারের বিবেচনাধীন আছে। তবে সরকার কোন বিষয়েই এখন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

ঐ দিনই আর এক প্রশ্নের উত্তরে পূর্ত্ত ও সরবরাহ মন্ত্রী সর্দ্দার শরণ সিং বলেন, সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের সমগ্র আধাসরকারী চিঠিপত্রের জন্য তুলোট কাগজ ক্রয় করা হইবে। ১৯৫১-৫২ সালে ক্রীত প্রায় ৪৷ কোটি টাকা মূল্যের কাগজের মধ্যে প্রায় ৯০,৫০০ টাকা মূল্যের তুলোট কাগজ ক্রয় করা হইয়াছিল। ১৯৫২-৫৩ সালে প্রায় ৫ কোটি টাকা মূল্যের কাগজ ক্রয় করা হইলেও কোন তুলোট কাগজ ক্রয় করা হয় নাই, কারণ পূর্ব্ব বৎসরের ক্রীত তুলোট কাগজ বৎসরান্তে যথেষ্ট পরিমাণে মজুত ছিল।

১২ই সেপ্টেম্বর "হরিজন" পত্রিকায় এক প্রবন্ধে শ্রীমগনভাই দেশাই লিখিতেছেন, এই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে "বেশ খোলাখুলি

ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, পল্লীশিল্পের প্রসার ও উৎসাহদান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের যে দায়িত্ব আছে তাহাকে মন্ত্রীমণ্ডলী কিরূপ লঘু দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। উত্তরে অবহেলার ভাব সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু তাহা অপেক্ষা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হইল এই যে, টি. টি. কৃষ্ণমাচারী মহাশয় বলিতেছেন যে প্ল্যানিং কমিশনের সুপারিশসমূহের বিবেচনা এখনও রাজ্যসরকার করিয়া উঠিতে পারেন নাই। প্ল্যানিং কমিশনটি কেন্দ্রীয় সরকারের বৃহৎ কর্মনীতির একটি মুখ্য অঙ্গ। গত কয়েক বৎসর যাবৎ কেন্দ্রীয় সরকার এবং লোকসাধারণ ভারতীয় অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য প্ল্যানিং কমিশন প্রধান অবলম্বন বলিয়া ধরিয়া আসিতেছেন···উল্লিখিত প্রশ্নোত্তরগুলিতে যে অবহেলা ও দীর্ঘসূত্রিতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে প্ল্যান থাকিতেও দেশে বেকার সমস্যা বাড়িতেছে কেন তাহার হদিশ খুঁজিয়া পাওয়া যায়।···" শ্রীযুত দেশাই সরকারকে অবিলম্বে নিজেদের স্বীকৃত কর্মসূচীকে কর্মে রূপায়িত করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

কুটীরশিল্পের অর্থনীতি

"সাপ্তাহিক পশ্চিমবঙ্গ" পত্রিকায় লোকসভার সদস্য শ্রীচণ্ডলাল পারিখ লিখিতেছেন, যেহেতু আমরা যন্ত্রযুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং আমাদের জীবনও কাটিতেছে যন্ত্রযুগে, সেইজন্য যন্ত্রের উপর আমাদের মোহ জন্মিয়াছে। অনেকেই দ্রব্যের অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্য এবং উন্নততর প্রকৃতির কথা বলিয়া যান্ত্রিকতার সমর্থন করেন। অবশ্য একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, বহু শিল্পেই যন্ত্রের প্রয়োজন আছে এবং সকল শিল্প কুটীরশিল্পের ভিত্তিতে চলিতে পারে না; আমাদের দেশে বৃহৎ শিল্পের বৃদ্ধি এখনও আতঙ্কের কারণ হয় নাই। আমাদের দেশের শিল্পায়নের দ্রুত গতিতে আমাদের সংগঠন হওয়া উচিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শহরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও গ্রামগুলির ক্রমশঃ ক্ষয় ঘটিতেছে; ক্রমশঃই অধিকতর সংখ্যায় গ্রামবাসী শহরবাসী উপার্জ্জনকারীর উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইতেছে এবং আমাদের চক্ষের সম্মুখে এক নিরানন্দ ও হতাশাব্যঞ্জক দৃশ্যের অবতারণা ঘটিতেছে। বিরাট লোকসংখ্যা এবং বেকার সমস্যা আমাদের যে বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন করিয়াছে তাহাকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দেশের অবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া চলে।

যন্ত্রশিল্প বর্ত্তমানে ত্রিশ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করিতেছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী তিন বৎসর পরে ঐ শিল্পে আরও চার লক্ষ লোকের কর্ম জুটিতে পারে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমানে ২৫ কোটি লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। এই শ্রেণীর লোকেরা বৎসরে মাত্র দৈনিক তিন ঘণ্টার কাজ পায়। ইহাদের মধ্যে ৪ কোটি ৪৭ লক্ষ ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের অবস্থা আরও খারাপ। আমাদের বর্ত্তমান শিল্প ও কৃষি উন্নয়নে এইরূপে বহুসংখ্যক লোক বেকার বা আংশিক বেকার থাকিয়া যাইবে। প্রতি বৎসর অন্যূন ১৫ লক্ষ করিয়া নূতন কর্মপ্রার্থী দেখা দিবে। আজিকার দিনে বেকার সমস্যাকে শহরের সমস্যা বলা বৃথা; শহর ও গ্রাম উভয় স্থানেই আজ এই সমস্যা দেখা দিয়াছে। লোকেরা শহরে আসিয়া ভিড় করে কাজের আশায়; ইহাকে প্রতিরোধ করিতে হইবে। শহরের বেকারেরা ক্রমশঃ মুখর হইয়া উঠিতেছে, সেইহেতু তাহাদের প্রভাব অনুভূত হইতেছে। গ্রামের বেকারগণও ক্রমশঃই রাজনৈতিক সচেতনতা লাভ করিতেছে এবং তাহারা একবার মুখর হইলে তাহাদিগকে নিরস্ত করা অসম্ভব হইবে। ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ ত্রিশ বৎসর নাগরিকেরা গ্রামবাসীদের শোষণ করিয়া উন্নতি করিয়াছে। বিস্ফোরণের পূর্ব্বেই গণতান্ত্রিক সরকারকে এই বিচ্ছিন্নতার মনোভাবকে সাহস এবং মননশীলতার সহিত সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে।

ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্পের জন্য অনেক দরদ দেখান হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক কৃষিদ্রব্যও এখন যন্ত্রের সাহায্যে ব্যবহারযোগ্য করা হইতেছে। বর্তমানে যে-কোন কুটীরশিল্পকেই যন্ত্র স্থানচ্যুত করিতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে অবিলম্বে প্রতিহত করিতে হইবে। কুটীরশিল্প বক্তৃতার দ্বারা গড়িয়া উঠিতে পারে না। যন্ত্রশিল্পকে শুল্ক সংরক্ষণনীতির দ্বারা যে ভাবে সাহায্য করা হইয়াছিল কুটীরশিল্পকেও তদনুরূপ সাহায্য করিতে হইবে। কুটীরশিল্পকে বেকার সমস্যা দূরীকরণের অন্যতম উপায়রূপে দেখিতে হইবে। কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যের বর্দ্ধিত উৎপাদন-খরচ এবং নিম্নমানের উপর জোর দিতে থাকিলে কুটীরশিল্প কখনও স্থায়িত্বলাভ করিতে পারিবে না। বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম উপায় হইল প্রত্যেক দ্রব্যের উৎপাদনক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া। বৃহৎ, ক্ষুদ্র এবং কুটীর এই তিনভাগে উৎপাদনক্ষেত্রকে বিভক্ত করিতে হইবে, যাহাতে সুষ্ঠু বিকাশের স্বার্থে প্রত্যেক দ্রব্যের জন্য একটি করিয়া স্বতন্ত্র উৎপাদনক্ষেত্র সংরক্ষিত থাকে। এইভাবে বিভাগ করিয়া যন্ত্রশিল্পের আক্রমণকে প্রতিহত করিলে মোটামুটি হিসাবে প্রায় ৮০ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান হইতে পারে। অবস্থা, সময় এবং বিবেচনামত এই সীমানানির্দ্ধারণের পরিবর্ত্তনসাধন সহজেই হইতে পারে।

কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য যন্ত্রশিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা প্রায় শতকরা ২০ হইতে ৩০ ভাগ বেশী। যুক্তিসঙ্গত মূল্যে সন্তোষজনক দ্রব্য উৎপন্ন করিতে কুটীরশিল্পের কয়েক বৎসর সময় লাগিবে। সেইজন্য প্রয়োজন যাহাতে কোন বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য নির্দিষ্ট দ্রব্য উন্নততর যান্ত্রিক ক্ষেত্রে উৎপন্ন না হয় সে ব্যবস্থা করা। কিন্তু ক্ষেত্রবিভাগের পরও দেখা যাইবে। বিশেষ বিশেষ দ্রব্য তাহাদের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের বাহিরেও উৎপন্ন হইতেছে; সুতরাং তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ঐ সকল দ্রব্য উৎপাদনের নিমিত্ত নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইবে। যাহাতে উভয় ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য সমান হয় সেইজন্য হয়ত সুপ্রতিষ্ঠিত

যে সকল শিল্প যান্ত্রিকতার সাহায্যে প্রতিযোগিতায় অনুকূল অবস্থায় রহিয়াছে তাহাদের উপর কোন কর (cess) আরোপ করা যাইতে পারে। এমনও হয়ত স্থির হইতে পারে—প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানটিকে তাহার বর্ত্তমান উৎপাদন আর বৃদ্ধি করিতে দেওয়া হইবে না। হয়ত বর্ত্তমানের কোন কোন ধরণের উৎপাদন সঙ্কুচিত করিবার প্রয়োজনও দেখা দিতে পারে। এই উপায়ে নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ইহাতে রপ্তানী বাণিজ্যের কোন ক্ষতি হইবে না, কারণ পণ্য রপ্তানী হইলে কর ফেরত দেওয়া হয়।

বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন সম্পদের পর্য্যালোচনা করিয়া সুপরিকল্পিত নির্দ্দেশ দিলে কুটীরশিল্পের উন্নয়ন-নীতি খুব সহজেই কার্য্যকরী করা যায়। বিশেষ বিশেষ রাজ্যে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য কুটীরশিল্পের মাধ্যমে উৎপাদন করিলে অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে সন্তোষজনক মানের জিনিষ পাওয়া যাইতে পারে। বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনের কোন কোন অংশ কুটীরশিল্পের জন্য সংরক্ষিত করিয়া রাখিলেও উপকার পাওয়া যাইতে পারে।

নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রের অন্তর্গত শিল্পজাত দ্রব্যকে যাহাতে অবৈধ উপায়ে কেহ স্থানচ্যুত করিতে না পারে সেইজন্য যান্ত্রিক এবং বৈজ্ঞানিক শক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা কায়েম করিতে হইবে। বর্ত্তমানে রাজ্যসরকার কর্ত্তৃক স্বদেশী দ্রব্য ক্রয়ের যে নীতি অবলম্বিত হইতেছে তাহা মোটেই সন্তোষজনক নহে। এই নীতি পরিত্যাগ করিয়া পুরাপুরিভাবে স্বদেশী দ্রব্য ক্রয়ের নীতি গ্রহণ করিতে হইবে—এবং সেইজন্য দ্রব্যের মূল্য ও মান সম্পর্কে বিচারের কড়াকড়ি অনেকাংশে হ্রাস করিতে হইবে।

পল্লীশিল্প বোর্ড, তাঁত বোর্ড এবং হস্তশিল্প বোর্ড (handicrafts board) প্রভৃতি বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইগুলিকে বিধিবদ্ধ (statutory) প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইবে।

গ্রাম্য কারিগরদের বংশানুক্রমিক দক্ষতা প্রয়োগের অভাবে নষ্ট হইতে বসিয়াছে এবং নিরন্তর কর্ম্মাভাবের ফলে তাহাদের মূলধনও ক্রমশঃ নিঃশেষিত হইতেছে। যাহাতে অল্প প্রতিভাবান ছাত্ররা উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে পারে সেইজন্য দেশের প্রত্যেক তালুক বা তহশিলে একটি করিয়া কৃষি ও কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

কারিগর এবং শ্রমিককে যথোপযুক্ত অর্থসাহায্য দিতে হইবে। যাহাতে তাহারা মধ্যস্বত্বভোগীদের কবলে না পড়ে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। সরকার হইতে কতকগুলি খুচরা বিক্রয়ের দোকান খুলিতে হইবে যেখানে নির্দ্দিষ্ট মানের দ্রব্যের বিনিময়ে কারিগর তাহার কাজ চালাইয়া যাইবার জন্য কিছু টাকা অগ্রিম পাইতে পারে। স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান, সমিতি বা রাজ্য অর্থসংস্থার (finace corporation) মাধ্যমে সহজ উপায়ে ঋণদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে—যাহাতে কোন সং কারিগরকে অর্থাভাবে কাজ বন্ধ করিয়া দিতে না হয়। সমবায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রারম্ভে বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মারফত সরকারকে সাহায্য এবং নির্দ্দেশ দিতে হইবে এবং সমিতিগুলি শক্তিশালী হইয়া উঠিলে সরকার সরিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন। অল্প সময়ে বহুসংখ্যক সমবায় প্রতিষ্ঠান আপনিই গড়িয়া উঠিবে—একথা চিন্তা করা আকাশকুসুম রচনা মাত্র।

দেশের আমদানী-বাণিজ্যের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে বিদেশ হইতে যে সকল দ্রব্য এদেশে আমদানী করা হয় তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই এদেশে প্রস্তুত হইতে পারে। শুল্ক কমিশন এবং শুল্ক বোর্ডও কয়েকটি দ্রব্যের আমদানী বন্ধ করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের সুপরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব।

সর্ব্বোপরি জীবনধারণের ব্যয় কমাইতে হইবে। জীবনধারণের ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে বেকার সমস্যার তীব্রতাও বৃদ্ধি পায়। জীবনধারণের ব্যয় হ্রাস ব্যতীত কোন পরিকল্পনাই সার্থক হইবে না।

লেখকের মতে, বেকার-সমস্যা সমাধানের প্রকৃত ইচ্ছা থাকিলে জাতীয় সম্প্রসারণ কৃত্যের (National Extension Service) ন্যায় একটি বিধিবদ্ধ স্বতন্ত্র সামাজিক সংস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যবৃন্দ এবং প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের কার্য্যকরী সমিতির নেতৃবৃন্দ সহজেই এই প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যের পথে লইয়া যাইতে পারিবেন। এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার শিক্ষিতের কর্ম্মসংস্থান হইবে। প্রত্যেক তালুক এবং তহশিলে এই সংগঠনের নির্দ্দেশে কার্য্য চলিলে দেশের উৎপাদন এবং ভোগ (consumption) দুই-ই নিশ্চিত বৃদ্ধি পাইবে।

মুর্শিদাবাদে বেকার-সমস্যা

মুর্শিদাবাদের ক্রমবর্দ্ধমান বেকার-সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক "মুর্শিদাবাদ সমাচার" লিখিতেছেন, "সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনায় মুর্শিদাবাদ জেলায় বেকার-সমস্যা ক্রমশঃ কিরূপ গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে তাহা জানা যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর ও লালবাগ মহকুমায় এণ্টি-ম্যালেরিয়া অভিযানের জন্য শ্রমিক ও 'মেট' গ্রহণ করা হয়। বহরমপুর মহকুমার জন্য মোট ছত্রিশ জন যুবককে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং এই সাময়িক চাকুরির জন্য মোট ২৩০০ জন দরখাস্ত করেন। তন্মধ্যে কয়েক শত লোককে ইনটারভিউ দেওয়া হয়, এবং প্রায় আঠারো ঘণ্টা ধরিয়া ইনটারভিউ চলে।...আরও শুনিয়াছি জেলা জজকোর্টে চার জন কেরানী লওয়া হইলে দ্বিশতাধিক নরনারী চাকুরীর আবেদন করেন।..."

পত্রিকাটি লিখিতেছেন যে, শিক্ষিত বেকারদের কর্ম্মসংস্থানের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলার সরকারী পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে কিছু শিক্ষিত বেকারের কর্ম্মসংস্থান হইবে বটে, কিন্তু শিক্ষকদিগকে সুষ্ঠুভাবে বাঁচিয়া থাকিবার উপযোগী বেতন দিতে হইবে।

তবে জেলায় শিক্ষিত বেকারের পাশে পাশে অশিক্ষিত চাষী, ক্ষেতমজুর এবং ছোট ছোট কুটীরশিল্পী কারিগরদেরও কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। "মুর্শিদাবাদ জেলার সুপ্রসিদ্ধ রেশমশিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট বসনি সম্প্রদায় হইতে তন্তুবায় পর্য্যন্ত সকলেই বর্ত্তমানে বেকার অবস্থায় পড়িয়াছে। জেলাতে রেশম-শিল্পীদের মত অন্যান্য কুটীরশিল্পের কারিগরদেরও বর্ত্তমানে যে শোচনীয় অর্থ-নৈতিক দুরবস্থায় পতিত হইতে হইয়াছে তাহাতে তাহাদেরও বেকার বলিলে অন্যায় হয় না।"

কুটীরশিল্পের রক্ষার কাজ তো অগ্রসর হইতেছে না। কবে উহার পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবে?

বর্দ্ধমানে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবী

"দামোদর" পত্রিকার এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে বর্দ্ধমানে একটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবী করা হইয়াছে। কলিকাতাস্থিত বর্দ্ধমানবাসিগণের প্রতিষ্ঠান বর্দ্ধমান সম্মিলনীর কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনেও অনুরূপ দাবি তোলা হইয়াছে। বর্দ্ধমানের অধিবাসী-দের সম্মিলিত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া সরকার বর্দ্ধমানের মেডিক্যাল স্কুলটি তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করেন। তাহার পরে সর্ব্বশ্রেণীর বর্দ্ধমানবাসী বর্দ্ধমানে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার যে দাবি করেন সরকার তাহাতে কর্ণপাত করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। এই দাবির সমর্থনে আন্দোলনের প্রচণ্ডতা অনুধাবন করিয়া "বর্দ্ধমানের কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন এবং কিছু টাকা তুলিয়া দিলে সরকার বর্দ্ধমানে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া মিথ্যা প্রচার করিয়া বিক্ষোভকে শান্ত করিবার প্রয়াস পাইলেন।" সাধারণ নির্ব্বাচনেও কংগ্রেস মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু নির্ব্বাচন-পরবর্ত্তী-কালে বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এই দাবির বিরোধিতা করেন।

ডাঃ রায় উপযুক্ত চিকিৎসক এবং অর্থাভাবকে কলেজ প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধক বলিয়া যে যুক্তি দেখান তাহার উত্তরে "দামোদর" লিখিতেছেন যে, বর্দ্ধমানে উপযুক্ত চিকিৎসকের কোন অভাব হইবে না। কারণ "এখানকার ডাক্তারগণকেই অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপনার জন্য গ্রহণ করা হইতেছে।" সরকারের আন্তরিকতা থাকিলেই অর্থ-সমস্যার সমাধান সহজ হইবে। বর্দ্ধমানের বিরাট ও বিখ্যাত রাজবাটী ক্রয় করিয়া সেখানে সরকারী দপ্তরখানা স্থাপনের আয়োজন চলিতেছে। "দামোদরে"র মতে ঐ বাটীতে দপ্তরখানা স্থানান্তরিত না করিয়া উহাকে কলেজ-ভবনে রূপান্তরিত করিলে সকল দিক হইতেই তাহা সুষ্ঠু হইবে।

বর্দ্ধমান বর্দ্ধিষ্ণু জেলা। সেখানকার স্থানীয় লোকেরা যদি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনে নিজেরা কিছু দূর অগ্রসর হইতেন তবে ঐরূপ মন্তব্যের পিছনে অনেক জোর আসিত এবং কলেজও হইয়া যাইত। দেশের লোক জড়ভরত হইয়া বসিয়া থাকিবে এবং সকল ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষী হইবে ইহা কোনও হিসাবেই যথাযথ নয়। রাজবাটী ক্রয়ের জন্য স্থানীয় লোকে কি সাহায্য করিতে পারেন তাহা দেখা উচিত।

সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসায় অযত্ন

২২শে সেপ্টেম্বর তারিখের "মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকায় 'প্রসাদ' লিখিতেছেন যে, মালদহ সদর হাসপাতালে মালদহের মোক্তার শ্রীশঙ্করপ্রসাদ দাস তাঁহার চার বৎসর বয়স্কা কন্যার ভাঙ্গা হাত সারাইবার জন্য হাসপাতালে যাইলে বালিকার হাত ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিয়া হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাহাকে গৃহে লইয়া যাইবার নির্দ্দেশ দেন। প্রসাদের ভাষায়, "মেয়েটি হাতে যন্ত্রণার কথা বলিলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন না। তৃতীয় দিনে বালিকার যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিলে হাসপাতালে তাহাকে আনা হয় এবং ব্যাণ্ডেজ খুলিলে দেখা যায় যে ক্ষতস্থানে পচন ধরিয়াছে। অনতিবিলম্বে মেয়েটিকে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইলে মেয়েটি বাঁচে। কিন্তু শুনা যায় তাহার কয়েকটি আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিতে হয়। অতঃপর বালিকার পিতা মালদহের তৎকালীন সিভিল সার্জ্জন ডাঃ চিত্তরঞ্জন দত্ত, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ডাঃ মুখার্জী ও জনৈক কম্পাউণ্ডারের বিরুদ্ধে এক ক্ষতিপূরণের মামলা আনয়ন করেন। গত ১২ই সেপ্টেম্বর তিনি উক্ত মামলায় বিবাদী পক্ষের উপর মায় খরচ মোট ৫১০০৲ টাকার ডিগ্রী পাইয়াছেন।"

'প্রসাদ' লিখিতেছেন, "মফঃস্বলের সদর হাসপাতালের ট্রাডি-শন মালদহ বজায় রাখিয়াছে। বহরমপুর হাসপাতাল সম্বন্ধেও বহু অভিযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু বহরমপুরে শশাঙ্কবাবুর মত জেদী লোক কোথায়?"

দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকবর্গের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কলিকাতায়ও হাসপাতালে রোগীর অবহেলা সম্পর্কে অনেক অভিযোগ শুনা যায়। হইতে পারে তাহার কতকটা অনিবার্য্যকারণে হয়, যথা— স্থানের অভাবে ও অর্থের অভাবে। কিন্তু বেশীর ভাগই তত্ত্বাবধায়ক ও চিকিৎসকবর্গের এবং নার্সদিগের কর্ত্তব্যে অবহেলার কারণে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কলিকাতার বাহিরের কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল।

কান্দী মহকুমায় বাঁধ-সংস্কার

২৯শে ভাদ্রের "মুর্শিদাবাদ-সমাচার" এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন, প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কান্দী মহকুমার বড়োঞা থানার ইউনিয়নে অবস্থিত জজানমাটিয়ারা, কুজুরা প্রভৃতি অঞ্চলের চাষীরা জলাভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে হাতীশালা গ্রামের নিকট হইতে চারি হাত প্রশস্ত একটি খাল ময়ূরাক্ষী নদী হইতে খনন করে। জলাভাবের সময় চাষের জন্য উক্ত অঞ্চলের কৃষক খালপথে জল লইত এবং প্রয়োজন ফুরাইলে খালের মুখ বন্ধ করিয়া দিত। খালের জল নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন স্লুইস-গেট ছিল না বা এখনও নাই। "ক্রমে

প্রতি বর্ষায় উক্ত খালের পরিসর বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী ময়ুরাক্ষী নদীর বাঁধটি ভাঙ্গিতে থাকে।" প্রতি বর্ষায় নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত আবাদী জমিগুলি প্লাবিত হইতেছে, কিন্তু জল নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী ব্যবস্থা-স্বরূপ একটি স্লুইস-গেট আজও নির্মাণ সম্ভব হয় নাই। "প্রতি বৎসর কিছু আবাদী জমি বন্যার প্লাবনে ডুবিয়া যায়; বন্যা অধিক হইলে বেশী পরিমাণ জমি জলপ্লাবিত হয়। আবার বন্যার জল নামিয়া গেলে নদীর বালুকা জমির উপর নামিয়া যায় এবং জমির উপর হইতে বালুকার স্তর তুলিয়া না ফেলা পর্য্যন্ত জমি অনাবাদী থাকে। বালি তোলার কাজ ব্যয়বহুল বলিয়া কৃষকেরা সে কাজ দ্রুত শেষ করিতে পারে না। এই বৎসরে সরকারের দৃষ্টি বহু বার আকর্ষণ করা হইলেও হাতীশালার বাঁধ বা নসীনালা সম্বন্ধে কোন সুব্যবস্থা হয় নাই।"

উক্ত পত্রিকা আরও লিখিতেছেন, "হাতীশালার বাঁধ ভাঙার ফলে নসীনালাতে ময়ুরাক্ষীর জল প্লাবিত হওয়ায় কালক্রমে নদীখাত পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা আছে। এই ক্ষুদ্রাকৃতি নালাটি ময়ুরাক্ষীর যে স্থান হইতে বহির্গত হইয়াছে, সেই স্থানে নালার খাত হইতে ক্রমশঃ ঢালু হওয়ায় এবং নদীগর্ভে বালুস্তর সুউচ্চ হইয়া উঠায় নসীনালাই প্রবলাকার ধারণ করিতেছে এবং মূল নদীখাত বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। সামান্য জলবৃদ্ধি হইলেই মূল নদী অপেক্ষা নসীনালাতে বেশী জল প্রবাহিত হয় এবং সেই প্লাবন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নালার উভয় তীরস্থ বহু আবাদী জমি জলমগ্ন হইয়া যায়।"

সম্পাদকীয় মন্তব্যে সরকারকে অবিলম্বে এই বিষয়ে তৎপর হইবার জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছে, কিন্তু ঐ অঞ্চলের কৃষক-সাধারণ এ বিষয়ে কতটা কাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করিতে প্রস্তুত তাহার কোনও ইঙ্গিত উহাতে নাই। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহারা খাল খনন করিয়াছিল তাহারা সরকারী সাহায্যের মুখ চাহিয়া বসিয়া-ছিল কি? তাহাদের বংশধরেরা নিজেরা কিছুদূর অগ্রসর হইলে সরকার বাকিটা করিতে বাধ্য হইবেন।

ভাঙ্গনবিধ্বস্ত ধুলিয়ান

ধুলিয়ান উত্তর মুর্শিদাবাদের একটি প্রখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। মুর্শিদাবাদ জেলায় পাট ব্যবসায়ের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ধুলিয়ান। গত চার বৎসরে পদ্মার ভাঙ্গনের ফলে পুরাতন ধুলিয়ানের চার ভাগের তিন ভাগ গঙ্গাগর্ভে গিয়াছে। অধিবাসীরা পুরাতন শহরের ঘর-বাড়ী নষ্ট হইবার পর নদী হইতে যথাসম্ভব দূরে ঘর বাঁধিয়াছিল, কিন্তু তাহাও এখন ভাঙ্গনের মুখে। "মুর্শিদাবাদ সমাচার" লিখিতে-ছেন, "নূতন শহর নব ধুলিয়ান ভাঙ্গনের মুখে পড়িয়াছে। মাত্র তাহাই নয় ধুলিয়ান রেলষ্টেশন ও মালগুদাম বিপন্ন হইয়াছে, ধুলিয়ান ষ্টেশনে এঞ্জিনে জল দেওয়ার জন্য যে পাম্পিং ষ্টেশন ছিল তাহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। রেলওয়ের পি. ডব্লু. ইন্‌স্পেক্টরের আপিস সম্প্রতি ধুলিয়ান হইতে আজিমগঞ্জে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং উক্ত আপিস গঙ্গার ভাঙ্গনের সন্নিকটবর্ত্তী হওয়ায় আপিস ভাঙ্গিয়া মালপত্র সরানো হইতেছে। গত বৎসর ধুলিয়ান ও পরবর্ত্তী রেলষ্টেশন তিলডাঙ্গার মধ্যে রেল-লাইনের বাঁধ গঙ্গার ভাঙ্গনে স্থানে স্থানে লুপ্ত হওয়ায় উক্ত অংশে ট্রেন চলাচল বন্ধ হইয়া যায় এবং পরে নূতন রেলপথ নির্ম্মাণের দ্বারা উক্ত দুই ষ্টেশনের মধ্যে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করা হয়। এই বৎসরে সেই নূতন রেলওয়ে বাঁধও গঙ্গার ভাঙ্গনের মুখে পড়িয়াছে।...

"গঙ্গা বর্ত্তমানে ধুলিয়ান ষ্টেশনের মালগুদামের অতি সন্নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। মালগুদাম হইতে গঙ্গা আনুমানিক ৬০ গজ মাত্র দূরে এবং রেলষ্টেশন ২০০ গজের মধ্যে পড়িয়াছে, যে-কোন সপ্তাহে ভাঙ্গনের মুখে মালগুদাম পড়িয়া গঙ্গাগর্ভে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। গত বৎসর মালগুদাম হইতে বাগমারী সাঁকো পর্য্যন্ত যে রেলপথ ছিল, ইতিমধ্যেই তাহা ভাঙ্গনে লোপ পাইয়াছে। গঙ্গা ক্রমশঃ নূতন কলোনীর বাসগৃহ ও আড়তগুলির দিকে আগাই-তেছে, অনুপনগর অঞ্চলও আক্রান্ত হইয়াছে। ধুলিয়ানের নূতন বাজারটিও যে কোন সময় ভাঙ্গনের মুখে পড়িতে পারে। ধুলিয়ান পৌরসভার জনৈক কমিশনারের মতে ধুলিয়ান পৌরসভার অর্দ্ধেকের বেশী জমি, আনুমানিক ৬০০ একর, গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। চারটি ওয়ার্ডের মধ্যে তিনটি গঙ্গার ভাঙ্গনে নিঃশেষ হইয়াছে।"

গত আগষ্ট মাসের শেষ দিকে লালপুরে গঙ্গার প্লাবনের ফলে শত শত গৃহের অধিবাসীকে বাস্তুচ্যুত অবস্থায় রেলওয়ের বাঁধের উপর আশ্রয় লইতে হয়। প্রতি বৎসর বন্যার উপদ্রবে তাহাদের দুর্দ্দশা চরমে পৌঁছিয়াছে। অবিলম্বে তাহাদের সাহায্য প্রয়োজন।

ধুলিয়ানবাসীর বিশ্বাস যে, ফরাক্কা গঙ্গাবাঁধ নির্ম্মিত হইলে গঙ্গার ভাঙ্গনে শহর বিধ্বস্ত হইত না। সেই কারণে বাঁধ সম্পর্কে তাহাদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাঁধ নির্ম্মাণের কথা স্থগিত রহিয়া গেল। "মুর্শিদাবাদ সমাচার" লিখিতেছেন, "পুরাতন ব্যবসাকেন্দ্র ধুলিয়ানকে গঙ্গার ভাঙ্গন হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে করিতেই হইবে এবং সম্ভব হইলে ফরাক্কায় গঙ্গার বাঁধ নির্ম্মাণের কাজ অবিলম্বে আরম্ভ করিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করিতে হইবে।"

ফরাক্কা বাঁধই শুধু নহে, তাহার পর সমস্ত নদীপথ, নদী সঞ্চালন-ব্যবস্থা (River training) না হইলে উপায় নাই। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করিবে কে? বাঙালী ত এখন দলাদলিতে মত্ত এবং বাংলার সংবাদপত্রগুলি এখন মাদক পরিবেশনে ব্যস্ত। কেন্দ্রীয় লোকসভায় বাংলার বিষয় মাত্র দুই জন তেজস্বিতার সহিত ব্যক্ত করিতেন শ্যামাপ্রসাদ এবং লক্ষ্মীকান্ত। তাঁহাদের মৃত্যুর পর লোকসভায় বাংলার প্রতিনিধিদল প্রায় সকলেই মূকবধির।

জনসাধারণের মুখপাত্র যদি সংবাদপত্রগুলিকে চেতনা দান করিতে পারে তবে ইহার একটা কিনারা হয়, নচেৎ এরূপ লেখা অরণ্যে রোদন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষমতা ক্রমেই সীমাবদ্ধ হইতেছে এবং বাঙালীর স্থান ভারতে অত্যন্ত নীচে নামিয়া যাই-তেছে। ইহার উপায় কি?

১২ লক্ষ বিপন্ন মেদিনীপুরবাসী

'মেদিনীপুর পত্রিকা' (১লা আশ্বিন) এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে মেদিনীপুরের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন, "বাংলার গর্ব্ব, ভারতের গর্ব্ব মেদিনীপুর জেলা। এই জেলার প্রায় ৩৫ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে আজ বন্যা, বেকারী ও আর্থিক মানের অবনতির জন্য সরকারী ও বেসরকারী সংগৃহীত তথ্য হইতে দেখা যায় যে, প্রায় ১২ লক্ষ লোক ভীষণভাবে বিপন্ন। বিরাট ঐতিহ্যের অধিকারী, স্বাধীনতা-সংগ্রামের পুরোভাগে অবস্থানকারী, জনগণের এক অতি বৃহৎ অংশ আজ মৃত্যুপথ-যাত্রী। যদি সমগ্র ভারত এই বিপন্ন মানবতাকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া না আসেন এবং সুব্যবস্থার অভাবে যদি এই বার লক্ষ অধিবাসীর বিলুপ্তি ঘটে, সেই কলঙ্ক স্বাধীন ভারতের ইতিহাসকে চিরকালের জন্য মসীলিপ্ত করিয়া রাখিবে।"

সরকার বার লক্ষ বিপন্ন অধিবাসীর জন্য খয়রাৎ ঋণ ও অন্যান্য খাতে ছত্রিশ লক্ষ টাকার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহার স্বল্পতার উল্লেখ করিয়া পত্রিকাটি লিখিতেছেন যে, উপরন্তু "সেই অর্থ যদি রাজনৈতিক শক্তিসংগ্রহের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্যয়িত হয় এবং প্রকৃত সাহায্যের জন্য কোন সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা না থাকে তাহা হইলে ইহা দ্বারা জাতীয় অর্থের কেবলমাত্র অপচয়ই ঘটিবে।"

দলমতনির্বিশেষে সকল সহৃদয় দেশপ্রেমিক মানুষের সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি সামগ্রিক ও সর্ব্বভারতীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে মেদিনীপুরবাসীর দুর্দ্দশার অবসানের জন্য পত্রিকাটি আবেদন করিয়াছেন।

নারীর সম্মান

নারীর প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার, অভদ্র ইঙ্গিত, অশ্লীল ঠাট্টা ইত্যাদি বন্ধ করিবার জন্য পাকিস্থান গণপরিষদের জনৈক সদস্য ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের যে সংশোধন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাকে অভিনন্দন করিয়া সাপ্তাহিক "যুগশক্তি" এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন, "নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শ। বর্ত্তমান সভ্যজগতে নারীর প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান যে জাতি দিতে অক্ষম সে জাতি কোনই শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করিতে পারে না। তবে পাকিস্থানেই যে শুধু নারীর অবমাননা ও অমর্য্যাদা প্রদর্শিত হয় এমন নয়। সেখানে হয়ত বেশী; কিন্তু আমাদের দেশেও এইরূপ ঘটনা একেবারে বিরল নহে। ভারতের বড় বড় শহরগুলির কথা আমরা নাই-বা বলিলাম; করিমগঞ্জের ন্যায় ছোট শহরের যে সমস্ত ব্যাপার আমাদের চোখে পড়িয়া থাকে তাহাতে লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া পড়ে।..." সাধারণতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়েরা এই কুশ্রী ব্যবহার সহ্য করিতে বাধ্য হন; কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবাদ ও শায়েস্তা না করেন এমন নহে, তবে তাহা বিরল। আমাদের সমাজ এই কদর্য্য ব্যাপার বন্ধ করিবার কোন সার্থক প্রয়াস করে নাই। এ ব্যাপারে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উদাসীনতা ও অবহেলাই বেশী করিয়া চোখে পড়ে। সেইজন্য আজ সরকারকেই এই অসামাজিক বৃত্তি দমনের জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। "যুগশক্তি" লিখিতেছেন: "পাকিস্থানে এই সম্পর্কিত আইন গৃহীত হউক ইহাই আমরা কামনা করি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাজ্যের বিধান-সভার সদস্যদের দৃষ্টিও এদিকে আকর্ষণ করিয়া যাহাতে অনতিবিলম্বে এতদ্দেশেও অনুরূপ আইন প্রণীত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতেছি।"

কলিকাতার পথে ঘাটে ট্রামে বাসে এক শ্রেণীর জীব দেখা যায় যাহারা মনে করে নারীর অপমান একটা কৌতুকপ্রদ বিষয় বা বীরত্বের পরিচয়। মাঝে ইহার খুবই বৃদ্ধি হইয়াছিল, সম্প্রতি কিছু কমিয়াছে। দেশের তরুণ সন্তানদিগের বুঝা উচিত যে, এইরূপ ব্যাপার তাঁহাদের পৌরুষের অপমান। তাঁহাদের মা-বোনকে পথে ঘাটে যদি কোনও লোকে বিনা বাধায় অপমান করিতে সাহস পায় তবে তাহা তাঁহাদেরই কাপুরুষতার কারণে।

গ্রন্থাগার আন্দোলন সপ্তাহ

সাপ্তাহিক "ভারতী" পত্রিকা বিগত ৩১শে আগষ্ট হইতে ৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া যে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার আন্দোলন ও পুস্তক সংগ্রহ সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয় তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া লিখিতেছেন, এই অনুষ্ঠান প্রমাণ করিতেছে যে, দেশবাসী দেশ ও জাতির প্রকৃত কল্যাণকর অনুষ্ঠানে প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে পারে। এই সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানে যথেষ্ট আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে পত্রিকাটি মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার গ্রন্থাগার সম্পর্কে আলোচনা করিয়া লিখিতেছে যে, গ্রন্থাগারের সংখ্যার দিক দিয়া জঙ্গীপুর মহকুমার অবস্থা তেমন আশাপ্রদ না হইলেও একেবারে হতাশ হইবার মত কিছু নহে। অধিকাংশ গ্রন্থাগারই অল্পকাল পূর্ব্বে স্থাপিত হইলেও পঁচিশ বা পঞ্চাশ বৎসরের পুরাতন গ্রন্থাগারও দুই-একটি রহিয়া গিয়াছে। তবে প্রাচীনতার তুলনায় সেই সকল গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। এদিকে পরিচালকবৃন্দের অবহেলারই পরিচয় পাওয়া যায়। পরিচালকবৃন্দ পুস্তক সংগ্রহ ব্যাপারে সচেষ্ট হইয়া প্রতি মাসে একখানি করিয়া নূতন পুস্তকও যদি পাঠাগারে সংযোগ করিতেন তাহা হইলেও প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলিতে কম-বেশী পাঁচ সহস্র পুস্তক সঞ্চিত হইতে পারিত।

আজ যুবক-সমাজ এই সকল ব্যাপারে প্রায় উদাসীন। মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার দিক দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অনগ্রসর জেলা। "ভারতী" সেই হেতু জেলার তরুণদিগকে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য ব্রতী হইতে আবেদন করিয়াছেন।

বাঙালীর এককালে বিদ্যা-বুদ্ধির বিষয়ে খ্যাতি ছিল। এই খ্যাতির মূলে ছিল অধ্যয়ন এবং ফলে হইয়াছিল বাঙালীর কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার, আসমুদ্র-হিমাচল সমগ্র ভারতে। তাহার পর আসে আলস্য ও ফাঁকির যুগ, যখন ছলে-বলে-কৌশলে "পাস করা" ছাপ যোগাড়ের

ব্যবস্থা আরম্ভ হয়। শিক্ষার নূতন অর্থ বাহির হয় এবং বিদ্যার্জ্জন একটা আয়ের পথ হইয়া দাঁড়ায়। সেই ফাঁকির যুগ এখন চরমে আসিয়াছে। এখন বাংলাদেশে পড়াশুনার সমাদর নাই, আছে শুধু পরোক্ষভাবে ভোগ বিলাস, ঈর্ষা ও হিংসার ইন্ধন সংগ্রহের চেষ্টা।

ভাল গ্রন্থাগারে তথ্যপূর্ণ সুচিন্তিত ভাবে লিখিত পুস্তক যাহা থাকে তাহার চাহিদা এদেশে নাই। ফলে ঐরূপ পুস্তকের বিক্রয় মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে যাহা হয় বাংলায় তাহার এক চতুর্থাংশও হয় না। জাতির অবনতি হয় এইরূপে।

চিনির রাজনীতি

রাজনৈতিক বেড়াজালে বেষ্টিত ভারত সরকারের শর্করা নীতি সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ঘোষিত হইয়াছে। প্রায় এক মাস পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদে রফি আহমেদ কিদোয়াই সাহেব বলিয়াছিলেন যে, আখের মূল্য বৃদ্ধি করা হইবে না। কিন্তু পনর দিন পরেই আখের মূল্য ১৯৫৩-৫৪ সনের জন্য দুই আনা বৃদ্ধি করা হইয়াছে, অর্থাৎ মণ প্রতি এক টাকা পাঁচ আনা হইতে এক টাকা সাত আনায় বৃদ্ধি করা হইয়াছে। উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের চাপে কিদোয়াই সাহেব তাঁহার কথা রাখিতে পারেন নাই।

উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের প্রধান কৃষি ফসল হইতেছে আখ এবং এই দুই প্রদেশের চাষীদের সমর্থনের উপর কংগ্রেস দলের ভবিষ্যৎ সাধারণ নির্ব্বাচন নির্ভর করে। ভারতে অন্যান্য কোন কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয় না। কিন্তু আখের বেলায় তার ব্যতিক্রম হয় কেন? ইহার কারণ বিহার ও উত্তরপ্রদেশের রাজনীতি। গত বৎসর আখের মূল্য ১৷৵০ হইতে ১।৴০ আনায় হ্রাস করায় এবং চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কংগ্রেসী সরকার এই দুই প্রদেশে অত্যন্ত বিব্রত হইয়াছিলেন—বিপক্ষ দল এই দুইটি অবস্থার যথোচিত সুযোগ লইয়াছিলেন। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, পর পর দুই বৎসর আখের মূল্যের পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ সরকারী নীতিবিরুদ্ধ। কেন্দ্রীয় সরকার বিবৃতি দিয়াছেন, ইক্ষুচাষীদের বহুদিনকার দাবি মানিয়া লওয়ার জন্য এবং "পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত মূল্য ইক্ষুচাষের সুবিধা করিবে" বলিয়া আখের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এ কথা মনে রাখা দরকার যে, ১৯৫৬-৫৭ সনের সাধারণ নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত আখের মূল্য আর হ্রাস করা সম্ভবপর হইবে না—কারণ নির্ব্বাচনের আগে চাষীদের বিরুদ্ধভাবাপন্ন করিতে এই দুই প্রদেশের কংগ্রেসী সরকার ভরসা পাইবেন না। ইহার ফল হইবে এই যে আগামী চার বৎসরের মধ্যে জনসাধারণ অধিকতর অল্প মূল্যে চিনি পাইবে না। আখের মূল্য হ্রাস না পাইলে চিনির মূল্যও হ্রাস পাইবে না। বিহার এবং উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসী সরকারকে গদীতে কায়েমী রাখার জন্য জনসাধারণকে চিনির জন্য এই অধিক মূল্য দিতে হইবে—চিনি আজ রাজনৈতিক সামগ্রী।

ভারতের সর্ব্বত্র যখন কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাইতেছে, তখন আখের মূল্য বৃদ্ধি করা এবং পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত করা অতীব অন্যায় হইয়াছে। অন্য কোন কৃষিজাত দ্রব্য এ সুবিধা পায় না। আখের মূল্য একেবারে বিনিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়াই সুবিবেচনার কাজ ছিল। ইহাতে চাষীরা অধিকতর পরিমাণে উৎকৃষ্টতর আখের চাষ করিবার উৎসাহ পাইত। দেশে চিনির এবং গুড়ের চাহিদা দিন দিন যে ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে আখের মূল্য বিনিয়ন্ত্রণ করিলে ইহার উৎপাদন হ্রাস পাইত না।

মূল্য বিনিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর না হইলে, তৎপরিবর্ত্তে আখের নিম্নতম মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া উচিত, যেমন তুলার বেলায় করা হইয়াছে। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে আখের মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়ায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আখের চাষ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আখের নিম্নতম মূল্য নির্দ্ধারণ করিলে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাইবে এবং উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আখের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। উৎকৃষ্টতর এবং নিকৃষ্টতর আখের জন্য একই মূল্য নির্দ্ধারণ করা সর্ব্বনীতিবিরুদ্ধ—একথা কিদোয়াই সাহেব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু উপায় কি? বিহার ও উত্তরপ্রদেশের হুমকির কাছে তিনি ন্যায্য নীতিকে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইলেন। ইদানীং দেখা যাইতেছে যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের জিদের নিকট দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। মাদ্রাজের তাঁতিদের সাহায্য করিবার জন্য মিল বস্ত্রের উপর সেস্ বসানো একটি বড় নিদর্শন এবং আখের মূল্য নির্দ্ধারণ দ্বিতীয় নিদর্শন।

মণ প্রতি শতকরা এক টাকা হারে চিনির অতিরিক্ত উৎপাদন-শুল্ক রহিত করিয়া দিয়া কেন্দ্রীয় সরকার সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। আখের মূল্য বৃদ্ধির জন্য চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং উৎপাদন-শুল্ক রহিত হওয়ায় চিনির মূল্য বৃদ্ধির হার প্রায় সমান থাকিয়া যাইবে, যদি অবশ্য চিনির মূল্য অধিক পরিমাণে না বৃদ্ধি পায়। আমদানী চিনি সরকার বন্দর হইতে মণ প্রতি উনত্রিশ বা ত্রিশ টাকা হারে বিক্রয় করিয়া দিতেছেন, ইহাতে দেশের অভ্যন্তরে চিনির মূল্য যথেষ্ট হ্রাস পাইবে না এবং চিনির আমদানী ব্যাহত হইলে মূল্য বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। অতিরিক্ত উৎপাদন-শুল্ক হ্রাস করিয়া দেওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের কোন ক্ষতি হয় নাই, কারণ চিনির উপর আমদানী শুল্ক হিসাবে প্রায় ৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা তাঁহারা পাইবেন—অবশ্য এই লাভের বেশ মোটা অংশ আমদানী চিনির ব্যবসায়-লাভ হিসাবেও আসিবে। সোজা কথা, সস্তা বিদেশী চিনি আমদানী করিবার সুবিধা পরোক্ষভাবে ইক্ষুচাষীরাই পাইবে—জনসাধারণ নহে।

যদিও চিনির মূল্যের উপর এবং বিতরণের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নাই, তথাপি সরকার বাজারে চিনি ছাড়ার পরিমাণের উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করিতেছেন এবং প্রত্যেক বৎসরের উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ করিয়া জমা হিসাবে রাখিবেন। যদি চিনির মূল্য কোন সময়ে বাড়তির দিকে যায়, তাহা হইলে এই জমা চিনি বাজারে ছাড়া হইবে। অতীতে কিন্তু এই জমা চিনি বাজারে ঠিক সময়ে ছাড়িবার ব্যাপার লইয়া বহু গণ্ডগোল হইয়াছে এবং মূল্য অযথা

বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমাদের দেশের সরকার অতীতের ভুল হইতে কিছু শিক্ষা করেন না এবং জিদ অবশ্যই বজায় রাখেন। ফলে চিনির শতকরা ২৫ ভাগ জমা রাখা হয় মূল্য কমানোর জন্য নয় —মূল্য যাহাতে অযথা কমিয়া না যায় তাহার জন্য।

সম্পত্তি-শুল্ক আইন

গত মাসে ভারতীয় আইন-পরিষদে সম্পত্তি-শুল্ক বিলটি গৃহীত হইয়াছে। এই আইন অনুসারে মিতাক্ষরা-সংসারে যদি মৃত ব্যক্তি ৫০ হাজার টাকার উপর মোট সম্পত্তি রাখিয়া যান তাহা হইলে তাহার উপর সম্পত্তি-শুল্ক আরোপিত হইবে। আর দায়ভাগ-সংসারে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যদি এক লক্ষ টাকার উপর থাকে তাহা হইলে তাহার উপর এই শুল্ক বসিবে। অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশে সম্পত্তি-শুল্কের হার অত্যন্ত কম হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে প্রতীয়মান হইবে :

সম্পত্তির মূল্য	ভারতবর্ষে	ইংলণ্ডে	অষ্ট্রেলিয়ায়	সিংহলে	পাকিস্থানে
	শতকরা হার	শতকরা হার	শতকরা হার	শতকরা হার	শতকরা হার
টাঃ ১.৫ লক্ষ	২.৫	৬.০	৩.৯	৫.০	৬ ০
টাঃ ২.০ লক্ষ	৪.৩৮	৮.০	৫.২	৭.০	৬.০
টাঃ ৩ ০ লক্ষ	৭.০৮	১৫.০	৭.১	৮.০	৮.০
টাঃ ৫.০ লক্ষ	১০.২৫	২৪.০	১০.৩	১০.০	১২.০
টাঃ ২০.০ লক্ষ	২০.০	৫০.০	২৬.১	১৬.০	৩০.০

ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে শুল্কের হার বিভিন্ন ধরণের—ইংলণ্ডে সমস্ত সম্পত্তির উপর একই হারে শুল্ক আদায় করা হয়, ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন রকম শুল্কের হার। যেমন, ইংলণ্ডে ২০ লক্ষ টাকার মূল্যের সম্পত্তি হইলে সমস্ত সম্পত্তির উপর শতকরা ৫০ টাকা হিসাবে সম্পত্তি-শুল্ক বসিবে। ভারতবর্ষে দায়ভাগ-সংসারে, প্রথম এক লক্ষ টাকা বাদ যাইবে এবং তারপর প্রত্যেক ধাপে ভিন্ন রকম শুল্কের হার—যেমন, ২ লক্ষ টাকার সম্পত্তি হইলে প্রথম এক লক্ষ টাকা বাদ দিয়া, পরের এক লক্ষ টাকার উপর শতকরা ৪.৩৮ হারে শুল্ক বসিবে; ৩ লক্ষ টাকার মূল্যের সম্পত্তি হইলে, প্রথম এক লক্ষ বাদ, দ্বিতীয় এক লক্ষে শতকরা ৪.৩৮ হারে শুল্ক বসিবে এবং তৃতীয় এক লক্ষে শতকরা ৭.০৮ হারে শুল্ক দিতে হইবে। সুতরাং এ দেশের নিয়ম অনুসারে সম্পত্তি-শুল্কের সত্যকার হার অনেক কম হইবে।

যে সকল মৃত ব্যক্তির জমিদারীর মূল্য দুই লক্ষ টাকার অনধিক, তাহাদের সম্পত্তি নিম্নলিখিতভাবে রিবেট পাইবে : (ক) যদি সমস্ত সম্পত্তি কৃষিজমি হয় তাহা হইলে মোট শুল্কের শতকরা এক-চতুর্থাংশ রিবেট; (খ) আর যদি সম্পত্তি আংশিকভাবে কৃষিজমি হয়, তাহা হইলে এই কৃষিজমির উপর যে পরিমাণ শুল্ক দেয়, তাহার এক-চতুর্থাংশ।

মেয়েদের বিবাহের জন্য পিতা পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত দান করিয়া যাইতে পারেন—ইহা সম্পত্তি-শুল্কের আওতায় পড়িবে না।

ইংলণ্ডে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর হইতে চার রকম শুল্ক আদায় করা হয়—সম্পত্তি-শুল্ক, উত্তরাধিকার শুল্ক, অস্থাবর সম্পত্তির উপর শুল্ক এবং শেষকালে বাকী সম্পত্তির উপর। ভারতবর্ষে একরকম শুল্ক আরোপিত হইবে, শুধু সম্পত্তি-শুল্ক।

সিংভূমে বনিয়াদী শিক্ষা

"নবজাগরণ" পত্রিকা এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে বিহার সরকারের বনিয়াদী শিক্ষানীতির সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিতেছেন, "যদিও প্রায় পাঁচ বৎসর হইল সিংভূমে বনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং প্রায় পঁচিশটিরও অধিক বনিয়াদী বিদ্যালয় ঐ জেলায় রহিয়াছে তবুও জেলায় বনিয়াদী শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে। এই বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার জন্য বিহার সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু সেই ব্যয় নিরর্থক হইয়াছে। কারণ গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত বনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য বিহার সরকার পরিত্যাগ করিয়াছেন। কাজকে শিক্ষার মাধ্যম করা এবং এইভাবে শিক্ষাদান কার্য্যকে স্বাবলম্বী করিয়া দেশের প্রতিটি ব্যক্তিকে দেহ ও বুদ্ধির দিক হইতে সক্ষম করিয়া গড়িয়া তোলাই ছিল গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত শিক্ষার উদ্দেশ্য।" কিন্তু 'নবজাগরণে'র কথায় "সিংভূমে বনিয়াদী শিক্ষার নামে যাহা চলিতেছে তাহা গান্ধীজীর আদর্শের সম্পূর্ণ বিকৃতি ছাড়া আর কিছু নহে।"

পত্রিকাটির মতে সিংভূমে বনিয়াদী শিক্ষা ব্যর্থ হইবার অন্যতম কারণ বিহার সরকারের ভাষা-সম্বন্ধীয় নীতি। "বিহারে বাংলা ও উড়িয়া ভাষার বিরুদ্ধে সরকার কয়েক বৎসর যাবৎ যে সুপরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত নগ্নভাবে বনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়াছে এবং ইহার ফলে স্থানীয় জনসাধারণ বনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিকে হিন্দী প্রচারের আখড়া ছাড়া আর কিছু মনে করে না। প্রথমে ধলভূমের উদাহরণই লওয়া যাউক। বহড়াগোড়া থানার কৈমা, ঘাটশীলা থানার শ্যামসুন্দরপুর, পটকা থানার ডুরকাসাই এবং জুগশালাই থানার গোবিন্দপুর গ্রামে এ জেলায় প্রথম চোটে বনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য স্থানীয় জনসাধারণ পাঁচ একর জমি এবং যথাসাধ্য সহযোগিতা দিলেও বনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার বদলে ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া এক হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে।..." কারণ এখানকার বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। "কৈমাতে উড়িয়া ও বাংলাভাষী ছাত্রদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লইতে না দেওয়ায় এত সরকারী অর্থব্যয় সত্ত্বেও ছাত্রদের সংখ্যা নগণ্য; এমনকি জেলাবোর্ড কর্ত্তৃক সামান্য সাহায্য প্রাপ্ত পাঠশালার ছাত্রসংখ্যাও অনেক ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষা অধিক।"

সিংভূমের লোকের উচিত এই বিষয়ে হাজার হাজার লোকের স্বাক্ষর বা টিপসহিযুক্ত আবেদন প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্রবাবু ও কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন প্রান্তের সংবাদপত্রে দেওয়া। বাংলার সংবাদপত্রগুলিরও এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত।

আসামে বাংলা ভাষার সঙ্কট

"যুগশক্তি" ৮ই আশ্বিন এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন, "আসাম বিধান সভার বিগত অধিবেশনে কংগ্রেসী সদস্য শ্রীসন্তোষ কুমার বড়ুয়ার এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী প্রকাশ করেন যে, ধুবড়ী মহকুমায় ১৯৪৭-৪৮ সালে ১২৫০টি প্রাথমিক স্কুলে বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইত ; কিন্তু তিন বৎসর পর এই সংখ্যা ১২৪৭টি হ্রাস পাইয়া মাত্র তিনটিতে দাঁড়াইয়াছে। উক্ত সময়ের মধ্যে অসমীয়া ভাষায় পরিচালিত প্রাথমিক স্কুল ৩৪৮টির স্থলে বৃদ্ধি পাইয়া ৮৩৩টি হইয়াছে। আরও জানা যায় যে, ধুবড়ী প্রাথমিক শিক্ষাবোর্ড ১৯৪৭-৪৮ সালে অসমীয়া ভাষা শিক্ষার জন্য ৯৬১৩৫৲ টাকা গ্রাণ্ট দিতেন, ১৯৫০-৫১ সালে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৫৮৯৯০৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। পক্ষান্তরে যে স্থলে বাংলা প্রাথমিক স্কুলগুলিকে ১৯৪৭-৪৮ সালে ৬৬০০০৲ টাকা মঞ্জুরী দিতেন সে স্থলে তাহা কমাইয়া ১৯৫০-৫১ সালে মাত্র ৪৬৭৪৲ টাকায় পরিণত হইয়াছে।"

উক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যে ধুবড়ীর কর্তৃপক্ষ তিন বৎসরের মধ্যে বাংলা ভাষার উচ্ছেদের জন্য আরও যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা হইয়াছে, ঐ এলাকার শিক্ষাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ অসমীয়া ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় প্রচলিত কোন প্রাইমারী বিদ্যালয়কে বোর্ড হইতে মঞ্জুরী দেওয়া হইবে না বলিয়া লিখিতভাবে শাসাইয়া দিয়াছেন।

"যুগশক্তি" লিখিতেছেন, "ধুবড়ীর এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া আসামের বাংলাভাষাভাষী জনগণের মনে উদ্বেগ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ বঙ্গভাষাভাষী কাছাড় জেলার স্কুলসমূহে অসমীয়া ভাষা ঐচ্ছিক বিষয়রূপে প্রবর্তিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে যে এই ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে প্রবর্তিত হইবে না বা ক্রমে ক্রমে কৌশলে বাংলাভাষার স্থান গ্রহণ করিবে না তাহা কে বলিতে পারে।"

সরকারী কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পুস্তিকা অসমীয়া ও ইংরেজী ভাষায় প্রচার করিলেও পুনঃ পুনঃ আবেদন সত্ত্বে রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসীর ভাষা বাংলায় তাহা ছাপাইবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। পরিশেষে সম্পাদকীয় মন্তব্যে আসাম সরকারের প্রতি আবেদন করিয়া বলা হইয়াছে যে, "সরকার যদি এখনও বাংলা ভাষাভাষীদের প্রতি সুবিচার করিয়া অতীতের সমস্ত অন্যায় ও অযৌক্তিক ব্যবস্থাদি সংশোধন করেন তবে শুধু আসামের বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের নহে—সমগ্র রাজ্যেরই কল্যাণ সাধিত হইবে।"

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উক্ত প্রশ্নোত্তরের সময়ই শিক্ষামন্ত্রী শ্রীঅমিয়কুমার দাস জানান যে, ১৯৫০-৫১ সন পর্য্যন্ত হিন্দী ও গারো ভাষায় প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে দুই এবং এক ("যুগের আলো"— ৪ঠা আশ্বিন)

বাংলা ভাষার স্থান বাঙা স্থান অপেক্ষা উচ্চে যাইতে পারে না। বাঙালী যদি তাহার সম্বিৎ হারাইয়া ভিখারী হইয়া দাঁড়ায় বা পরস্পরের অপকারের চেষ্টায় উন্মাদের মত কার্য্যকলাপ চালায়, তবে তাহার মাতৃভাষার সম্মান করিবে কে? বাংলায় বসিয়াই বাঙালী তাহার সর্ব্বস্ব খোয়াইতে বসিয়াছে কেন তাহা কি চিন্তা করারও অবসর আমাদের আছে?

অনুন্নত সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানে ভারতের প্রচেষ্টা

ওয়াল্‌ডওভার প্রেস লিখিতেছেন, ভারতে বর্ত্তমানে জনসাধারণের চিন্তাধারায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ; তবে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই পরিকল্পনার পরিবর্ত্তনের কথা উঠিয়াছে। জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জনের জীবনধারণের মানের উন্নয়নের উদ্দেশ্য লইয়া পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল ; বর্ত্তমানে শিক্ষিতদের মধ্যে বেকার-সমস্যা বৃদ্ধির বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইতেছে।

যদিও শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি খুবই আশঙ্কার কথা তবুও ৭ কোটি অনুন্নতশ্রেণীর লোকের অবস্থার তুলনায় তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এবং আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা ও অস্পৃশ্য জাতিরা অনুন্নতশ্রেণীর মধ্যে পড়ে। নানারূপ অভাব-অভিযোগের মধ্যেও ধর্ম্মীয় গোঁড়ামি এবং প্রাচীন প্রথার প্রভাবে ইহারা এতকাল মূক হইয়া ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে গণতান্ত্রিক উন্মাদনা এবং আধুনিক চিন্তাধারা তাহাদের মনকে আলোড়িত করিতেছে। সংখ্যাগুরু হিন্দুদের মধ্যে অনেক ধর্ম্মগুরুও তাঁহাদের লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর প্রতি এই অন্যায় ব্যবহারে লজ্জিত বোধ করেন।

অনুন্নতশ্রেণীর জন্য গান্ধীজীর কাজের কথা স্মরণ রাখিয়া এবং অধুনা এই সমস্যার প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ দেখিয়া সরকার কাকাসাহেব কালেলকারের নেতৃত্বে ১১ জন সদস্য লইয়া অনুন্নত সম্প্রদায় কমিশন গঠন করিয়াছেন। এই কার্য্যে কাকাসাহেব কালেলকার গান্ধীজীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহযোগী। কমিশনের কাজ হইতেছে—দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া অনুন্নত শ্রেণীর অবস্থার পর্য্যবেক্ষণ করা এবং সরকারের নিকট প্রতিকারের উপায় পেশ করা।

সম্প্রতি দেওঘরে একজন হরিজনকে লইয়া মন্দিরে প্রবেশকালে আচার্য্য বিনোবা ভাবের উপর পাণ্ডাগণ আক্রমণ চালায় এবং সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্ব্বসাধারণের প্রতিবাদের ফলে ব্রাহ্মণ-পরিচালিত উক্ত মন্দিরের রুদ্ধ দ্বার হরিজনদের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই ঘটনা সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকা লিখিতেছেন, "দুইটি কারণে এই ঘটনা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। প্রথমতঃ, অস্পৃশ্যদের অধিকার প্রতিষ্ঠার অর্থই মানুষের অধিকার ও মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা। ভারতীয় সংবিধানে দেখা যায়, ভারত-সরকার যে-কোন প্রকার অস্পৃশ্যতা স্বীকার না করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভারতীয় নেতৃবৃন্দও এ বিষয়ে কোন আপোষ-রফা করেন নাই। তবে তাঁহাদের জনগণের সমর্থন লাভ করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, এই ঘটনা পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দিতেছে যে, একমাত্র আইনের দ্বারা এই প্রকার সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সমাজ-

চেতনা হইতেই তাহা সম্ভব। তাহাদের অক্ষমতার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন ভারতে যে নূতন নয় তাহা ভারতের হতভাগ্যদের সম্পর্কে অনেক সংবেদনশীল আমেরিকাবাসী জানেন না।"

সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে, গান্ধীজী বলিয়াছিলেন কেবল মাত্র আইনদ্বারা অস্পৃশ্যদের অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। যে সমাজ তাহাদের অধিকার হরণ করিয়াছিল সেই সমাজকেই অধিকার পুনরায় ফিরাইয়া দিতে হইবে। সুতরাং অস্পৃশ্যদের রক্ষা করিলেই যথেষ্ট হইবে না, তাহাদিগকে ভালবাসিতে হইবে। পত্রিকার মতে "যে ঘটনা ঘটিয়া গেল তাহাও মহাত্মাজীর এই মত সমর্থন করিতেছে। একমাত্র আইন দ্বারা যাহা সম্ভব হইত না, জনগণ তাহা সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। যে শিক্ষা আমরা এই ঘটনা হইতে লাভ করিয়াছি সেই শিক্ষা বিশ্বের এই খণ্ডে এবং ভারতেও সকল দুঃখপূর্ণ বৈষম্যমূলক সমস্যার ক্ষেত্রে যে প্রয়োগ করা যাইতে পারে তাহা বলা বাহুল্য।"

আমরা এ বিষয়ে একমত, কিন্তু সত্যের খাতিরে প্রকৃত ঘটনার সকল দিকই দেখা উচিত। এই ব্যাপারে আচার্য্য বিনোবা প্রমুখ হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারী মহলও অবহিত হন। তাহার ফলে বিহার সরকার সচেষ্ট হইয়া হরিজনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। জনগণের মতামত যদি সত্যই ঐরূপ দৃঢ় হইত তাহা হইলে পাণ্ডাগণ আক্রমণ করিতেও সাহস পাইত না। ভারতে জনমত দৃঢ় হইলে, ভারতীয়দিগের দুঃখ-দুর্দ্দশা অতি শীঘ্রই দূর হইয়া যাইত।

কাশ্মীর সমস্যার সমাধান

২১শে আগষ্ট "প্রাভদা"য় এক প্রবন্ধে ও. ওরেস্তোফ গত আগষ্ট মাসে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারত-পাক প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের বৈঠক সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে লিখিতেছেন, "কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের পথে এই সাফল্য সম্ভবপর হইয়াছে একমাত্র এই কারণে যে, ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের গবর্মেণ্ট তাঁহাদের নিজ নিজ দেশের জনসাধারণের অসংখ্য দাবিতে কর্ণপাত করিয়া সরাসরি আলোচনা চালাইবার পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই আলোচনা অনুষ্ঠিত হইয়াছে বিদেশী 'সালিশী', 'মধ্যস্থ' ও 'পর্য্যবেক্ষকদের' অংশ গ্রহণ ব্যতিরেকেই। কাশ্মীরের সাম্প্রতিক আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, রণলিপ্সু বৈদেশিক শক্তিগুলি কাশ্মীর প্রশ্নের একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসা বানচাল করার জন্য এখনও আশা পোষণ করে। এই বিদেশী চক্রান্তকারীরা কাশ্মীরকে এক সামরিক রণনৈতিক কেন্দ্র ঘাটিতে পরিণত করিতে চাহে। ওয়াশিংটনের সামরিক রণনীতি-বিশারদরা বহু আগেই কাশ্মীরের 'স্বাধীনতা' ঘোষণা করিয়া কাশ্মীর লইয়া ভারত ও পাকিস্থানের বিরোধ-বিসংবাদের 'মীমাংসা'র কথা প্রচার করিয়াছেন। নানা অপকৌশলের আশ্রয় লইয়া আমেরিকান চক্রান্তকারীরা সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের পতাকার আড়ালে কাশ্মীরে নিজেদের মার্কিন সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করার সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। কতিপয় স্বার্থান্বেষী বৈদেশিক শক্তি কাশ্মীরকে ভুয়া 'স্বাধীনতা' দিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।"

কাশ্মীরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এবং মার্কিন অফিসারদের ক্ষতিকারক কার্য্যকলাপের উল্লেখ করিবার পর ওরেস্তোফ লিখিতেছেন, "ভারত ও পাকিস্থানের প্রধান-মন্ত্রীদ্বয়ের আলোচনা জটিল কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের একটা পথ নির্দ্দেশ করিতেছে। এই আলোচনার প্রাথমিক সাফল্য বিদেশী যুদ্ধবাদী শক্তিগুলির চক্রান্ত ও পরিকল্পনার উপর এক প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছে।"

বিশ্ব-পরিস্থিতিতে ভারতের ভূমিকা

"বিশ্ব-পরিস্থিতিতে ভারতের ভূমিকা" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 'দি বালটিমোর সান' পত্রিকা লিখিতেছেন, ভারত যে আন্তর্জাতিক সমস্যার প্রকৃতি এবং সমাধান সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত একমত নহে তাহা বহুদিন পূর্ব্বেই জানা গিয়াছে। পত্রিকার মতে ভারতীয় প্রতিনিধি ভি. কে. কৃষ্ণমেনন জাতিপুঞ্জের সাধারণ অধিবেশনে যে বক্তৃতা দেন তাঁহার "কোন কোন অংশ সোভিয়েটের বাঁধা যুক্তিরই প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হইয়াছে।"

কিন্তু ভারত প্রকৃতপক্ষেই নিরপেক্ষ; সে আপন নীতিই অনুসরণ করে। "বালটিমোর সানে"র ভাষায় "ভারতীয় নীতির সহিত আমাদের যতই মতানৈক্য ঘটুক না কেন উহা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। উহা আমাদের সম্পর্কেও নিরপেক্ষ, সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কেও নিরপেক্ষ।"

ভারত আন্তরিকভাবে আপোষ-রফা চাহে বলিয়াই শ্রীমেনন বৃহৎ শক্তিসমূহের উচ্চ পর্য্যায়ের এক সম্মেলন আহ্বানের জন্য আবেদন জানান। স্যর উইনষ্টন চার্চ্চিল এবং রাষ্ট্রসংঘের সদস্য ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্রগুলিও এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। পত্রিকার মতে ভারতের এই নীতি অবাস্তব।

ভারত সদ্য স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে তাহার লক্ষ্য একটি সুদৃঢ় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ গঠন করা। ভারতের ভৌগোলিক অবস্থিতি ও জনসংখ্যার জন্য ভারত এশিয়ার নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। এই নেতৃত্ব জটিল—শক্তি ও দুর্ব্বলতা লইয়াই ইহার সৃষ্টি।

পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রবাসীরা সকল সময় ভারতের বলিবার ভঙ্গী পছন্দ করি না। আমাদের পছন্দ না করার অন্যতম কারণ এই যে, উহা প্রায়ই আমাদের সেই ব্রিটিশ ফেবিয়ানিজমের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, যাহা হইতে বহু ভারতীয় নেতা প্রথম রাজনৈতিক প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। তথাপি এই বিষয়টি সম্পর্কে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, গত ছয় বৎসরে ভারতের প্রধান-মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সমাজতান্ত্রিক মতবাদের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, যেহেতু তিনি কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হইয়াছেন।"

পাকিস্থানে সরকারী কর্ম্মচারীদের দুর্নীতি-

শেখ সাদিক হাসান পাকিস্থান গণপরিষদে নিম্নোক্ত মর্ম্মে এক প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলেন, "সরকারী কর্ম্মচারীদের ক্রমবর্দ্ধমান

অযোগ্যতার অবসান ঘটান এবং শাসনবিভাগের বিভিন্নক্ষেত্রে যে গলদ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে দূর করিবার জন্ম সরকারের পক্ষে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত বলিয়া এই পরিষদ বিবেচনা করেন।"

"সোনার বাংলা"র সংবাদে প্রকাশ, উক্ত প্রস্তাবের আলোচনা প্রসঙ্গে মোসলেম লীগের সভ্য সর্দ্দার আমীর খান বলেন, "শাসন বিভাগের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গলদ ও দুর্নীতি গভীরভাবে প্রবেশ করিয়াছে। দেশের পক্ষে ইহা লজ্জাকর ব্যাপার। এমন এক সময় ছিল যখন অসাধু কর্ম্মচারীর সংখ্যা ছিল নগণ্য, কিন্তু আজ অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আজ সাধু প্রকৃতির সরকারী কর্ম্মচারীদের সংখ্যা এত কম যে, সহজেই তাহাদের গণনা করা যায়। অসাধু ও দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্ম্মচারীরা আজ তাহাদের দুর্নীতি বেসাতিকে নিখুঁতভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে। অবস্থা এইরূপ জঘন্য হইয়া উঠিয়াছে যে, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি প্রভৃতির অস্তিত্বকে সরকারী কর্ম্মচারীরা অনাচার বলিয়াই স্বীকার করিতে চাহেন না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দুর্নীতিকে দুর্নীতি বলিয়া উপলব্ধি করা যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহাকে দূর করা সহজ। কিন্তু দুর্নীতি সম্পর্কে যখন মানুষের সচেতনতা লোপ পায়, তখন উহাকে দূর করা কঠিন ব্যাপার।"

অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্ত্তী প্রস্তাবটির সমর্থনে বলেন যে, দুর্নীতি দূরীকরণের আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে সরকারী কর্ম্মচারী এবং জনসাধারণের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার ব্যবস্থা করা দরকার। সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারীই অবশ্য দুর্নীতিপরায়ণ নহেন, তবে মুশকিল এই যে, জনসাধারণের প্রতি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের মনোভাব আশাপ্রদ নহে।

আলোচনার পর জনাব সাদিক হাসানের প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ভারতের রাজকর্ম্মচারীদিগের বিষয়ে কিছু বলিলেই উচ্চতম অধিকারীবর্গ লম্বা লম্বা কথা বলিয়া তর্ক শেষ করেন। কংগ্রেসের দল ত তাঁহাদেরই মুখাপেক্ষী। সুতরাং শোধন ও বহিষ্কারের পথ দুর্গম। উপরন্তু ভারতীয় সংবিধান এতই কাঁচা ও জটিল যে, অপরাধীর জয় প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অনিবার্য্য। বিচারকদিগের মনোবৃত্তিও সুবিধার নহে। সেই সকল দিক বিচার করিয়া আমাদের বলিতেই হইবে যে, পাকিস্থানের মুসলীম লীগ এ বিষয়ে অধিক সজাগ। আমাদের দেশে "দক্ষিণ-বাম" ইত্যাদি নানা নাম ও গালভরা শ্লোগান আছে। দেশের কথা বা দশের সেবায় কাহারও বিশেষ লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

জনাব তমিজুদ্দীনের পূর্ব্ববঙ্গ সফর

পাকিস্থান গণপরিষদের সভাপতি জনাব তমিজুদ্দীন খান পূর্ব্ববঙ্গ সফর করিয়া করাচীতে তাঁহার সফর সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা বিবৃত করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, পূর্ব্ববঙ্গের জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। জর্জ্জরিত পূর্ব্ববঙ্গবাসীর মনে এই ধারণাই জন্মিয়াছে যে, করাচীর কর্ত্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের দুঃখ-কষ্ট অনুভব করিতেছেন না। পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র আজও পর্য্যন্ত রচিত না হওয়ায় পূর্ব্ববঙ্গের রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন শিক্ষিত সমাজের মধ্যে গভীর ক্ষোভ রহিয়াছে। জনাব তমিজুদ্দীন স্বীকার করেন, শাসনতন্ত্র রচনায় এই বিলম্বের কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই।

ব্রহ্মে চিয়াং-বাহিনী

১৯৫০ সনে পরাভূত কুয়োমিণ্টাং সেনাপতি লি মি'র বাহিনীর অবশিষ্টাংশ উত্তর-পূর্ব্ব ব্রহ্মদেশে পলাইয়া আসিয়া সেখানে এক ঘাঁটি গাড়িয়া বসে। সেখান হইতে তাহারা চীনা ভূখণ্ডে আক্রমণ চালায় এবং অবশিষ্ট সময় দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মবাসীদের জীবন ধন-মান বিপন্ন করিয়া তোলে। ব্রহ্ম-সরকারের সকল অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া গত তিন বৎসরেরও অধিককাল যাবৎ কুয়োমিণ্টাং-বাহিনী তাহাদের এই ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপ চালাইতে থাকে। ফলে গত ২৫শে মার্চ ব্রহ্ম-সরকার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে চিয়াং-বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁহাদের অভিযোগ উপস্থাপিত করেন। উল্লেখযোগ্য যে জাতিপুঞ্জে অভিযোগ উপস্থাপিত করিবার পূর্ব্বে ব্রহ্ম-সরকার সকল প্রকার মার্কিন সাহায্য গ্রহণ বন্ধ করিয়া দেন এই কারণে যে, ব্রহ্ম-সরকারের মতে মার্কিন সাহায্য গ্রহণ করিতে থাকিলে জাতিপুঞ্জে তাঁহাদের পক্ষে স্বাধীন পন্থা অবলম্বন করা অসম্ভব হইবে।

যাহা হউক, ১৯৫৩ সনের ২৩শে এপ্রিল জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ ব্রহ্মে চিয়াং-বাহিনীর অপরাধ স্বীকার করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ব্রহ্মদেশের ভূখণ্ড হইতে ঐ আক্রমণকারী বাহিনীর অপসারণ ও অনতিবিলম্বে নিরস্ত্রীকরণ সম্পাদন করাইবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করেন।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত চতুঃশক্তি কমিশন গত ২২শে মে হইতে ব্যাঙ্ককে এই সম্পর্কে আলোচনা চালাইতেছিলেন। এই কমিশনের সভ্য হইতেছেন, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিয়াং-সরকার। কিন্তু সকল আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে, কারণ চিয়াং-সরকার এবং তাহার সমর্থনপুষ্ট জেনারেল লি মি কোন যুক্তিসঙ্গত সমাধানে অস্বীকৃত হয়। ব্রহ্মের প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন যে, ব্রহ্মদেশ হইতে কুয়োমিণ্টাং বাহিনীর অপসারণের একটি নির্দ্দিষ্ট দিন ঠিক করা হউক, কিন্তু কুয়োমিণ্টাং প্রতিনিধি তাহাতে অসম্মত হয়। প্রতিবাদে ব্রহ্ম প্রতিনিধিদল সভা ত্যাগ করেন এবং চতুঃশক্তি বৈঠক ভাঙ্গিয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে এক মন্তব্যে ইজভেস্তিয়া লিখিতেছেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্ত খুঁটি পিছনে আছে বলিয়াই কুয়োমিণ্টাং-পন্থীরা ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিতে রাজী হইতেছে না। মার্কিন শাসকচক্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এশিয়া খণ্ডে গোলমাল জিয়াইয়া রাখিতেই চায়, অশান্তি বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক। সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্রহ্ম হইতে সৈন্যদল সরাইয়া লইয়া যাইতে কুয়োমিণ্টাং-চক্রের অসম্মতি এবং এই প্রশ্নে ব্যাঙ্কক আলোচনা বৈঠক বানচাল হইয়া যাওয়া সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের মানমর্য্যাদার উপর এক মারাত্মক আঘাতের সামিল।"

"হিন্দু" পত্রিকা এই সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন, ব্রহ্মে চিয়াং-বাহিনীর উপস্থিতি ব্রহ্মদেশের সার্ব্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করিতেছে। ব্রহ্ম-সরকার কুয়োমিণ্টাং বাহিনীর ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে এবং তাহাদের অপমানের জন্য জাতিপুঞ্জে পুনরায় যে আবেদন করিয়াছেন পত্রিকার অভিমতে ভারত সে বিষয়ে সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করিবে, কারণ ব্রহ্মের ঘটনার প্রতি পার্শ্ববর্ত্তী ভারত উদাসীন থাকিতে পারে না।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ধ্বংসলীলা

"ওয়ার্ল্ড ওভার প্রেসে"র ২১শে আগষ্ট সংখ্যায় এক প্রবন্ধে ডিভিয়ার অ্যালেন লিখিতেছেন যে, পূর্ব্ব প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ইষ্টার দ্বীপে যে সকল বিচিত্র রেখাচিত্র (ideograph) এবং অদ্ভুত, বিশালকায় প্রতিমূর্ত্তিগুলি রহিয়াছে কেহই সেগুলির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। কেন ইতিহাসের এই তাৎপর্য্যময় দিক সম্পর্কে কোন সফল গবেষণা চালান এত শক্ত তাহার কারণ এই যে, ইষ্টার দ্বীপের অধিবাসীরা তাঁহাদের উৎপত্তি, রূপকথা অথবা ঐতিহ্যের সকল জ্ঞান হারাইয়াছেন। শ্বেতকায় মানুষের নির্বুদ্ধিতা এবং বর্ব্বরতাই এই প্রচণ্ড ক্ষতির জন্য দায়ী।

১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজ নৌসেনাপতি রোগেভীন দৈবাৎ ঐ দ্বীপে আসিয়া পৌঁছেন। তাহার পরে দুর্ভাগ্যক্রমে অন্যেরা আসিতে থাকে। আমেরিকান, রাশিয়ান, পেরুভিয়ান এবং বৃটিশরা এই কৌতূহলোদ্দীপক দেশে আসে এবং দ্বীপের অধিবাসীদের প্রতি তাহাদের অবহেলার চিহ্ন রাখিয়া যায়। প্রায়ই তাহারা ঘৃণ্য রোগ রাখিয়া যাইত। কিন্তু তাহাদের অপরাপর ক্ষতির তুলনায় এই রোগের ক্ষতি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। উদাহরণ স্বরূপ লণ্ডনের জাহাজ জান্সী দ্বীপবাসীদের উপর আক্রমণ চালাইয়া ১২ জন পুরুষ ও ১০ জন রমণীকে লইয়া যায়। কয়েক বৎসর পর ১৮১৬ সালে একটি রুশ জাহাজ বহু দ্বীপবাসীকে হত্যা করে।

১৮৬২ সালে আটটি পেরুদেশীয় জাহাজ দ্বীপবাসীদিগকে নানারূপ উপহারের দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া প্রায় এক সহস্র লোককে কোণঠাসা করিয়া বন্দী করে। ইহাদের মধ্যে রাজা ও তাঁহার পুত্র এবং প্রায় সকল জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিই ছিলেন। এই সকল জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞ ব্যক্তিই দ্বীপের লিখিত ও মৌখিক ইতিহাসের ধারক ও বাহক ছিলেন। তাঁহাদের সকলকে জাহাজে করিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় পাঠান হয় এবং সেখানে তাঁহাদিগকে সামুদ্রিক পক্ষী বিশেষের নিক্ষিপ্ত সার (guano) সংগ্রহের কার্য্যে নিয়োগ করা হয়। তাঁহাদের প্রতি এরূপ খারাপ ব্যবহার করা হয় যে কিছুকাল পরে এক দল পেরুবাসী তাহার প্রতিবাদ করেন, কিন্তু তত দিনে মাত্র এক শত লোক ব্যতীত প্রায় আর সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। যে কয়েকজন তখনও জীবিত ছিলেন তাঁহাদিগকে দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইল—তাঁহাদের মধ্যে একজন সঙ্গে বসন্ত লইয়া গেলেন, ফলে দ্বীপবাসীরা উজাড় হইয়া গেলেন।

এদিকে ব্রিটিশ এবং ফরাসী অভিযাত্রীর দল ঐ দ্বীপের বিরাট প্রস্তর মূর্ত্তিগুলিকে প্রাচীন পাথরের খোদাইয়ের "নিদর্শন" হিসাবে অপসারিত করিতে আরম্ভ করিল। এই কার্য্যের জন্য কোন প্রতিমূর্ত্তিকে গুরুভার মনে হইলে মূর্ত্তির মাথা কাটিয়া ফেলিতেও তাহারা দ্বিধা করিত না। পলিকার্পো তোরো নামে চিলিদেশীয় এক যুবক এই দ্বীপটিকে চিলির অধীনে আনয়ন করেন। পূর্ব্ববর্ত্তীদের তুলনায় তাঁহাকে সহৃদয় ব্যক্তিই বলা চলে। দ্বীপের উন্নতির জন্য নানারূপ পরিকল্পনা করা হইলেও আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব দেখা দিল। ১৯০৩ সনে উৎকৃষ্ট মেরিনো পশম উৎপাদনের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। কোম্পানীটি একটি বায়ুচালিত যন্ত্র (windmill) এবং স্বাস্থ্যরক্ষার যে সকল ব্যবস্থা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল তাহার কোনটিই প্রতিপালিত হয় নাই অথবা নিতান্ত উদাসীনতার সহিত পালিত হইয়াছে। চিলির রাষ্ট্রপতি ইবানেজ ক্ষমতা গ্রহণের পর সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্যের মধ্যে কোম্পানীর সুযোগ-সুবিধা নাকচ করিয়াছেন এবং শীঘ্রই কোম্পানী সেখান হইতে উঠিয়া যাইবে।

চিলি সরকার মৃত্তিকা পরীক্ষা এবং সম্ভব হইলে আধুনিক কৃষিপদ্ধতির প্রচলনের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ দ্বীপবাসী এক ডাক্তারের মতে দ্বীপ হইতে কুষ্ঠ-ব্যাধি দূর করা সম্ভব। কিন্তু দ্বীপবাসীদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নাই।

ডিভিয়ার অ্যালেন লিখিতেছেন যে, অনেক আশ্চর্য্য জিনিষের সন্ধান আজ নষ্ট হইয়াছে শ্বেতকায় জলদস্যুদের বর্ব্বরতার জন্য। তাহারা ইষ্টার দ্বীপবাসিগণকে পশুর ন্যায় মনে করিত—তাহাদিগকে শোষণ করা বা ধ্বংস করা ছাড়া তাহারা অন্য কিছু ভাবিতে পারিত না। বর্ত্তমানে সেখানকার অধিবাসীবৃন্দ দ্বীপের উৎপত্তির ইতিহাস বা নানারূপ স্মৃতিসৌধের ইতিকথা বিস্মৃত হইয়াছেন। কিন্তু শ্বেত বর্ব্বরতার কথা তাঁহারা বিস্মৃত হন নাই। এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরের সকল স্থানেই কি ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটে নাই?

জাপান ও দূরপ্রাচ্য

১৭ই আগষ্ট সংখ্যায় আমেরিকার "নিউজউইক" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, যুদ্ধবিশারদের দৃষ্টি লইয়া দেখিলে বুঝা যায়, শুধু কোরিয়ার জন্য কোরিয়ার লড়াই হয় নাই। যাহাতে কোরিয়া হইতে জাপানের উপর কোন আক্রমণ না হইতে পারে সেইজন্যই এই যুদ্ধ। কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতির পর জাপানকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য এখন নূতন রূপে সংগ্রাম সুরু হইবে। অপ্রিয় এবং বিস্ময়কর হইলেও বাস্তবিকপক্ষে জাপানের ন্যায় অপর কোন দেশেই আমেরিকার মর্য্যাদা এত ক্ষীণ নহে।

আমেরিকাবাসীর চিন্তাধারায় এককালের যুদ্ধাপরাধী জাপান এখন গণতন্ত্রের ঘাঁটি হিসাবেই গণ্য হয়। যাহারা জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আজ দূরপ্রাচ্যে মার্কিনবাহিনীর কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য একটি শক্তিশালী জাপানী সামরিক বাহিনী কামনা করেন। [illegible]

নহে। সামরিক শক্তি হিসাবে জাপানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অবধারিত। জাপানের দায়িত্বশীল নেতারা—প্রধানমন্ত্রী শিগেরু যোশিদা এবং প্রগতিশীল দলের নেতা শিগেমিৎসু আমেরিকার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। ইচিরো হাতোয়ামার ন্যায় বিচক্ষণ এবং চিন্তাশীল রাজনীতিবিদের মতে জাপান এক ঐতিহাসিক যুগসন্ধিতে উপস্থিত হইয়াছে এবং জাপানের মৌলিক স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে পাশ্চাত্যের সহিত সহযোগিতায়—এশিয়ার নহে। জাপানের সম্রাটও আমেরিকার প্রতি গভীর সহানুভূতিসম্পন্ন।

বর্ত্তমানে জাপানের প্রতিরক্ষাভার প্রায় সম্পূর্ণভাবেই মার্কিন সামরিক বাহিনীর হস্তে। নিরাপত্তা চুক্তি অনুযায়ী এই সৈন্যদল জাপানে অবস্থান করিতেছে। গত সপ্তাহে জাপান হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, এই চুক্তির পরিপূরক হিসাবে আর একটি পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকা জাপানে নির্দ্দিষ্টমানের রকেট কামান, মর্টার এবং ক্ষুদ্র অস্ত্রের অর্ডার দিবে। পরে জাপানে ভারী যুদ্ধযন্ত্রাদিও প্রস্তুত হইতে পারিবে। জাপানের সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন সুরু হইয়াছে। জাতীয় রক্ষীবাহিনী (National Safety Force) সেনাবাহিনীর অঙ্কুর হিসাবে গণ্য হয়, এবং উহার মোট সভ্যসংখ্যা এক লক্ষ দশ হাজার। ইহারা রাইফেল মেশিনগান ৬০ এবং ৮০ মিলিমিটার মর্টার প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত। একটি গোলন্দাজ-বাহিনীও আছে। বিমান-বাহিনীতে ৪৪টি বিমান আছে এবং আরও ১০০টি নূতন বিমান যুক্ত হইবার কথা আছে। নৌবাহিনীও এইরূপে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে।

এই সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া সাড়ে তিন লক্ষ করিবার জন্য মার্কিন পরিকল্পনাগুলি জোর দিতেছে; কিন্তু জাপানীরা অনুমান করেন যে বর্ত্তমান অবস্থায় ২ লক্ষ লোকের বেশী পাওয়া সম্ভব নহে। ইহাতেই বুঝা যাইবে যে বর্ত্তমান জাপানে সামরিক বৃত্তি জনসাধারণের নিকট কত অপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে। তাহা ছাড়া ম্যাক আর্থারের যুগে যে সংবিধান রচিত হইয়াছিল তাহার পরিবর্ত্তন ব্যতীত বাধ্যতামূলক সৈন্যতালিকাভুক্তি বে-আইনী।

জাপানী সামরিক বাহিনীর যুদ্ধের ইচ্ছা আছে কি? "নিউজ-উইকে"র টোকিও ব্যুরোর প্রধান কম্পটন প্যাকেনহাম লিখিতেছেন: "ভূতপূর্ব্ব জাপানী অফিসারবৃন্দ নানা কারণে সন্দিহান।" সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরা জাতীয় সংরক্ষণ বাহিনীকে আমেরিকার বেতনভোগী বলিয়া ঘৃণা করে। অপরপক্ষে ঊর্দ্ধতন বেসামরিক অফিসারগণ মনে করেন যে সংরক্ষণ বাহিনীর ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল।

জাপানের সৈন্যবাহিনীর সম্প্রসারণের প্রধান বাধা জনসাধারণের মনোবল। পরাজয় এবং বিদেশীয় অধিকারের মাধ্যমে জাপানীরা বুঝিয়াছেন যুদ্ধে লাভ হয় না। মার্কিন দখল তাহা আরও পরিষ্কার করিয়াছে। অনেকে মনে করেন কোন ভাবী যুদ্ধে জড়িত হইলে ফলাফল যাহাই হউক না কেন জাপানের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। হিরোসিমা এবং নাগাসাকির অভিজ্ঞতার পর এরূপ চিন্তাধারা অস্বাভাবিক নহে।

জাপানের চিরাচরিত সামাজিক কাঠামোর ভাঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গে নিরপেক্ষতা এবং শান্তিবাদী মনোভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। রাজনীতিবিদদের প্রতি জনসাধারণের মনে অশ্রদ্ধার ভাব দেখা দিয়াছে। যুদ্ধোত্তর যুগে জাপানী রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং দুর্নীতি এই মনোভাব সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছে।

গত এপ্রিলের নির্ব্বাচনে প্রধানমন্ত্রী যোশিদার উদারনৈতিক দল পার্লামেণ্টের ৪৬৬টি আসনের মধ্যে মাত্র ২০২টি আসন লাভ করায় তাঁহাকে শিগেমিৎসুর ৭৬ জন প্রগতিবাদীর উপর বা হাতোয়ামার ৩৫ জন উদারনৈতিক সমর্থকের উপর নির্ভর করিতে হয়। ফলে গোলমালের সৃষ্টি হয় এবং নানারূপ আপোষ মানিয়া লইতে হয়। এই অবস্থার ফলে যোশিদা জাপানের পুনরস্ত্রীকরণ ত্বরান্বিত করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন।

জাপানে এখন প্রবল মুদ্রাস্ফীতি। বিলাস-ব্যসনের অন্ত নাই। মুদ্রাস্ফীতির ফলে ১৯৫২ সালে জাপানের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৭২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার। ১৯৫৩ সালে ঘাটতির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইবে। এত দিন পর্য্যন্ত মার্কিন ডলারের সাহায্যে অবস্থাকে আয়ত্তে রাখা হইয়াছে। কিন্তু ইহা দ্বারা কোন স্থায়ী সমাধান অসম্ভব। চীনের সহিত বাণিজ্যের প্রসারের জন্য ব্যবসায়ী মহল একমত। ইহার ফলে উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানী এবং সস্তায় কাঁচা মাল পাইবার ব্যবস্থা হইবে (১ টন কয়লার দাম চীনে ৯ ডলার, আমেরিকায় ৩২ ডলার)।

জাপানের অর্থনীতির দুর্ব্বলতার কয়েকটি প্রধান কারণের অন্যতম মুদ্রাস্ফীতি। জাপানের শিল্পগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে প্রধানতঃ ব্যাঙ্ক হইতে প্রাপ্ত ঋণের সাহায্যে। ঋণ এবং বাট্টার পরিমাণ আমানতের পরিমাণ অপেক্ষাও বেশী। আমেরিকায় তাহা আমানতের শতকরা ৫০ ভাগের বেশী হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদন-পদ্ধতি অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। তৃতীয়তঃ চিরাচরিত নিয়োগ ব্যবস্থায় অযোগ্য লোককেও পদচ্যুত করা যায় না এবং চতুর্থতঃ, বেতনের স্বল্পতা। বড় বড় ব্যবসায়ীদেরও ব্যক্তিগত আয়ের পরিমাণ কম হইলেও প্রায় সকল উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এবং ব্যবসায়ীরা সরকারী বা প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ে গাড়ী, বাড়ী এবং বিলাস-ব্যসনের অফুরন্ত সুযোগ-সুবিধা পান। প্যাকেনহাম লিখিতেছেন যে, কোন পদস্থ লোক সেখানে বাড়ীতে খাওয়া অসম্মানজনক মনে করেন।

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রবাসী কার্য্যালয় ২৭শে আশ্বিন (১৪ই অক্টোবর) হইতে ১০ই কার্ত্তিক (২৭শে অক্টোবর) পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা খুলিবার পর করা হইবে।

এই সূত্রে জানানো যাইতেছে যে, গ্রাহক, বিজ্ঞাপন, ঠিকানা-পরিবর্ত্তন, প্রবাসী-অপ্রাপ্তি এতদ্বিষয়ক চিঠিপত্র "ম্যানেজার প্রবাসী" এই নামে প্রেরিতব্য। কর্ম্মাধ্যক্ষ, প্রবাসী

শাহজাদা দারাশুকো

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

পিতা-পুত্রের ভাগ্যবিপর্য্যয়

১

সামুগড়ে সূর্য্যাস্তের পর মোগল সাম্রাজ্য তথা ভারতবর্ষের বুকে যে কালরাত্রির সূচনা হইয়াছিল, পূর্ণ দুই শতাব্দী পরে 'সিপাহী'-যুদ্ধের প্রলয়ঙ্করী ঝঞ্ঝা লইয়াই উহার অবসান এবং নব-ভারতের প্রথম প্রভাত—ঐতিহাসিকগণ এইরূপ কাল-গণনা করিয়া থাকেন। এই মহানিশার প্রথম প্রহরে দারা-শাহজাহান, দ্বিতীয় প্রহরে আওরঙ্গজেব, তৃতীয়ে সিরাজ বালাজী বাজীরাও এবং শেষ প্রহরে দ্বিতীয় শাহ আলম ও দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের বিয়োগান্ত জীবন নাট্যের যবনিকাপাত হইয়াছিল। এই দীর্ঘ দুর্যোগময়ী রজনীতে ভারতের ভাগ্যাকাশে তখন শিবাজী-বাজীরাও, আলীবর্দী-হায়দর, নানাফড়নবীশ-মাহাদ্‌জী এবং রণজিৎ সিংহের কীর্ত্তিপুঞ্জ-সমুজ্জ্বল দ্বিতীয় সপ্তর্ষিমণ্ডল দিশাহারা ভারত-সন্তানকে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে, কিন্তু কেহ উর্দ্ধদিকে চাহিয়া দেখে নাই, কালচক্রে ঘুরিয়া মরিয়াছে, আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়াছে।

২

[১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ ২৯শে মে রাত্রি আনুমানিক ১০।১১টা]

আগ্রা শহরে আমীর গরীব কাহারও চোখে ঘুম নাই; লড়াই হইতে সিপাহী সওয়ার যাহারা পলাইয়া আসিয়াছে তাহারাই কেবল মড়ার মত পড়িয়া আছে। দুর্গে শাহী-মহলে বাহিরে অলিগলিতে কান্নার রোল। যে বাড়ীতে কেহ মরে নাই সেখানেও রাত্রি প্রভাতের আশঙ্কায় স্ত্রী-পুরুষ মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে, কাঁধের উপর মাথা ও স্ত্রী কন্যার ইজ্জত কতক্ষণ থাকিবে নিশ্চয়তা নাই। এই সময়ে আগ্রা-দুর্গ হইতে সম্রাটের বিশ্বস্ত খোজা ফাহিম প্রভুর জরুরি আদেশ বহন করিয়া দারার হাবেলীর দিকে গোপনে চলিয়াছে।

ঘোড়া হইতে নামিয়াই আধমরা অবস্থায় দারা ফরাশের উপর শয্যা লইয়াছিলেন, সাধ্য থাকিলে যেন মাটির নীচেই মুখ লুকাইতেন। কোমর-ভাঙ্গা অজগরের মত অপমান ও অনুশোচনায় এপাশ-ওপাশ করিতে করিতে তিনি ক্রমশঃ অসাড় হইয়া পড়িতেছিলেন, এমন সময় খোজা ফাহিম আসিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক সম্রাটের মৌখিক সংবাদ পুনরাবৃত্তি করিল—"যাহা ঘটিয়াছে উহা তক্‌দীরের ফের। আমাকে একবার দেখা দিয়া এবং আমার বক্তব্য শুনিয়া তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার, নিরাশ হওয়ার কারণ নাই।" দারা ইহাতে আরও অভিভূত হইয়া পড়িলেন, অনেকক্ষণ তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না; দুর্গে যাইবার জন্য ফাহিমের অনুনয়-বিনয় বিফল হইল। অবশেষে তিনি পিতাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "শাহান্‌শাহকে মুখ দেখাইবার সাহস আমার নাই; আমার সামনে লম্বা সফর, হতভাগ্য মুসাফিরকে দোয়া করিয়া ফাতেহা পাঠ করিবেন।"

আগ্রায় সম্রাট শাহজাহান সারাদিন দারার বিজয় অথচ মোরাদ-আওরঙ্গজেবের অক্ষত শরীরে পলায়নের সংবাদ শুনিবার জন্য জুয়াড়ীর উৎকণ্ঠা লইয়া কালক্ষেপ করিতে-ছিলেন; সন্ধ্যার পূর্ব্বে দারার পরাজয়ের কানাঘুষা শুনিয়াও তিনি উহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। এই জন্য দুঃসংবাদের প্রথম ধাক্কায় তিনিও মুহ্যমান হইয়াছিলেন। দারার দুর্ভাগ্য এবং আওরঙ্গজেবের জয়লাভ, ভাল মন্দ উভয়ই খোদার মর্জ্জি কিংবা নিয়তির বিধান বলিয়া স্থিরচিত্তে গ্রহণ করিবার মত কন্যা জাহানারার অপক্ষপাত ঈশ্বর-নির্ভরতা ও আধ্যাত্মিক শক্তি শাহজাহানের ছিল না। জাহানারার সান্ত্বনাবাক্যে তিনি কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াও দারাকে শুধু আর একবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, দারার এই প্রত্যাখ্যান ও শোচনীয় দশা তাঁহার প্রাণে দ্বিগুণ আঘাত হানিল, তাঁহাকে ছাড়িয়া অসহায় দারা কোথায় যাইবে? এই ভাবনায় ক্রমশঃ কঠোর হইয়া সম্রাটের সুপ্ত পুরুষকার জাগিয়া উঠিল, বুদ্ধি মোহমুক্ত হইল। তিনি বুঝিলেন তাঁহার কপালে যাহাই থাকুক, দারাকে বাঁচাইতে হইবে, আগ্রায় আর একদণ্ড অপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে নিরাপদ নয়। মনকে শক্ত করিয়া সম্রাট ও জাহানারা হতভাগ্য দারার পথের সম্বল যোগাইবার জন্য কর্ম্মতৎপর হইলেন, দুর্গের গুপ্ত ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত হইল, আশরফী ও দামী জহরত বোঝাই কাতারে কাতারে খচ্চর দারার হাবেলীর দিকে চলিল। নিজ তহবিলে নগদ যাহা কিছু ছিল এবং অলঙ্কারাদির প্রাপ্য অংশ হইতে অন্যান্য ভ্রাতাকে বঞ্চিত না করিয়া দারাকে যাহা দিবার ছিল জাহানারা বেগম উহা দারার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। সম্রাট দারাকে লিখিলেন, "অবিলম্বে তুমি আগ্রা ত্যাগ কর, দিল্লীতে সুলেমানের ফৌজের জন্য অপেক্ষা করিবে, দিল্লীর দুর্গ তোমাকে সমর্পণ করিবার জন্য শাহী ফরমান যাইতেছে।" সেই রাত্রে সম্রাটের কলম বোধ হয় চিঠি লিখিয়াই চলিয়া-ছিল, ভোরের পূর্ব্বেই বিশ্বস্ত খোজাগণ সুবা আগ্রা-দিল্লীর

ফৌজদার, জমিদার জায়গীরদারগণের নামে শাহী ফরমান্ লইয়া শহর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

৩

পিতার নির্দেশ অনুসারে দারা পলায়নের জন্য প্রস্তুত হইলেন; পত্নী নাদিরা বানু মূর্তিমতী প্রজ্ঞার ন্যায় তখন তাঁহার বিভ্রান্তচিত্তের একমাত্র আশ্রয়, আঁধারের মধ্যে আশার প্রদীপ। পুত্রকন্যা, পুত্রবধূ ও পৌত্র-পৌত্রী (সুলেমানের পরিবার) লইয়া নাদিরা বানু হাতীর পিঠে অবগুণ্ঠনাবৃত হাওদার মধ্যে স্থান গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে মাত্র কয়েকজন মুখ্য ক্রীতদাসী চলিল; বাদবাকী পরিচারিকা ও ভৃত্যগণ আশ্রয়ার্থ দুর্গে প্রেরিত হইল। উটের পিঠে নগদ টাকা আশরফী; বহনযোগ্য দামী কয়েকটি জিনিষ দারার পাথেয় হিসাবে সঙ্গে চলিল। হস্তীপৃষ্ঠে দারা ও সিপহর শুকো রাত্রি ৩টার সময় গৃহ হইতে চিরবিদায় লইলেন, শাহজাদার বিরাট সংসারের বিলাসোপকরণ যেখানে সাজানো ছিল সেইখানে পড়িয়া রহিল; কিন্তু মালিক অদৃশ্য হইতে না হইতে রাতারাতি হাতী-ঘোড়া সাজ-সরঞ্জাম সব লুঠ হইয়া গেল। চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে অর্দ্ধলক্ষ অশ্বারোহী যাঁহার আদেশের অপেক্ষা করিতেছিল এখন তাঁহার শেষ যাত্রার সাথী হইল মাত্র বার জন সওয়ার।

৩০শে মে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দারা বাদশাহী রাস্তা ধরিয়া আগ্রা হইতে অনেকদুর আসিয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে শহরে তাঁহার পলায়নের সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র শুধু প্রাণের টানে কয়েক শত অনুচর আগ্রা হইতে দারার সঙ্গ লইবার জন্য ছুটিয়া পড়িল। বেলা ৯টার সময় ম্যানুসী সাহেবও তল্পীতল্পা লইয়া বাহির হইয়াছিলেন, তখন শত্রুসেনা শহরের বাহিরে দিল্লীর রাস্তায় মোতায়েন হইয়াছে; উহাদের সেনাধ্যক্ষের কৃপায় কোনরকমে রক্ষা পাইয়া তিনি ভগ্ন হৃদয়ে ফিরিয়া আসিলেন। যাহা হউক, দুই-একজন করিয়া বিভিন্ন দিক হইতে পাঁচ শত অশ্বারোহী একমঞ্জিল পার হইবার পূর্ব্বেই দারার দলে আসিয়া জুটিল;—অন্ততঃ ডাকাতের হাতে সর্ব্বস্ব লুঠ হইবার আশঙ্কা রহিল না। দুই দিন পর্য্যন্ত ছোটখাটো দলে বিভক্ত হইয়া দারার অনুচরবর্গ আগ্রা হইতে কোনক্রমে পলাইতেছিল, বাদশাহী ভৃত্যগণ শত্রুর দৃষ্টি এড়াইয়া আরও কিছু অর্থ দারার কাছে পৌঁছাইল; শত্রুসৈন্য তখন পর্য্যন্ত দারাকে ধরিবার জন্য ধাবিত হয় নাই। এই-ভাবে দিল্লী পৌঁছিবার পূর্ব্বে দারার সৈন্যসংখ্যা বার জন হইতে বাড়িয়া পাঁচ হাজার হইল। পাঁচ দিন কুচ করিয়া দারা ৫ই জুন (১৬৫৮ খ্রীঃ) দিল্লী পৌঁছিয়া শাহজাহানবাদ দিল্লীর বাহিরে পুরাতন দিল্লীতে (যাহার বর্ত্তমান নিদর্শন শেরশাহ-নির্ম্মিত অন্তর্দুর্গ, শেরমঞ্জিল ও শেরশাহী মসজিদ) তাঁবু ফেলিলেন। এইখানে নূতন ফৌজ ভর্ত্তি আরম্ভ হইল এবং সাত দিনে সাত হাজার নূতন অশ্বারোহী সংগৃহীত হইল। যুদ্ধের প্রয়োজনে তিনি শাহী খাজানাখানা, হাতী, ঘোড়া ইত্যাদি দখল করিলেন এবং কোন কোন আমীরের ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপরও হস্তক্ষেপ করিতে ইতস্ততঃ করিলেন না। কুমার সুলেমানকে আগ্রার পথ ছাড়িয়া যমুনার পূর্ব্বতীরের পথে দিল্লী আসিবার জন্য দারা জরুরি চিঠি লিখিয়াছিলেন। তাঁহার ভরসা ছিল আওরঙ্গজেব সহজে আগ্রাদুর্গ অধিকার করিতে পারিবেন না এবং ইতিমধ্যে সুলেমানের ফৌজ নিশ্চয়ই আসিয়া পড়িবে।

৪

সামুগড়ে দারার পৃষ্ঠপ্রদর্শনের পর বিজয়ী আওরঙ্গজেব দুই দুই বার হাতী হইতে নামিয়া পরম ভক্তিভরে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া খোদাতালাকেই জয়ের কৃতিত্ব নিবেদন করি-লেন। উহার পর দারার শিবির অধিকার করিয়া শাহজাদার সাজানো তাঁবুতেই রাত্রিবাস করিবার অভিপ্রায় করিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সাহস করিলেন না। কোথায়ও মাটির নীচে চোরা সুড়ঙ্গে বারুদ পুরিয়া তাঁহাকে উড়াইয়া দিবার জন্য হয়ত কোন ফাঁদ রাখিয়া গিয়াছে সন্দেহ করিয়া মাটি খুঁড়িবার হুকুম দিলেন। এত বুদ্ধি মগজে থাকিলে দারার তাজ ও মাথা দুইটাই কি এই ভাবে বিপন্ন হইত?

অতঃপর ঐখানে নিজ তাঁবুর নীচেই তিনি সেনাধ্যক্ষ-গণের মোবারকবাদ গ্রহণ করিলেন। মোরাদ বক্শ "হজরত-জীউ"-কে বিজয়-সম্বর্দ্ধনা জানাইবার জন্য উপস্থিত হইলে আওরঙ্গজেব প্রথমেই "বাদশাহজীউ! ফতে মোবারক-বাদ!" বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন এবং দরবারে ঘোষণা করিলেন, "অদ্য তারিখ হইতে মোরাদশাহী হুকুমৎ হিন্দুস্থানে কায়েম হইল আপনারা জানিবেন"; মোরাদের বুকের ছাতি কথাতেই পাঁচ হাত চওড়া হইয়া গেল। মোরাদের শরীরের অবস্থা দেখিয়া আওরঙ্গজেব ভাইকে ভিতরে লইয়া গেলেন এবং শল্যচিকিৎসকগণকে তলব করিলেন। মোরাদের মুখে গায়ে বহু আহত স্থান হইতে তখনও রক্ত পড়িতেছিল, তাঁহার মাথা নিজের কোলে রাখিয়া আওরঙ্গজেব হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং নিজের জামার আস্তীন দিয়া রক্ত মুছিতে লাগিলেন; বাহিরে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল, সকলেই ভাবিল শাহজাদা ভ্রাতৃপ্রেমে দ্বিতীয় রামচন্দ্র।

যাহা হউক, বিজেতা-শিবিরে সারারাত্রি আওরঙ্গজেব ব্যতীত বাদবাকী মুসলমান আমীর সিপাহী খিদমতগার স্থানে

স্থানে মজলিস জমাইয়া বিজয়লব্ধ নাচওয়ালীগণের নাচগান ও শরাবে মশগুল হইয়া রহিল; হিন্দুরা কেবল মড়া পোড়াইয়া মরিতেছিল ;—কেননা মুসলমানের মুর্দা বাসি হইলে জাঁক-জমক বেশী হয়, কিন্তু বাসি মড়া হইলে হিন্দুর ঠিক সদগতি হয় না। রাজপুত মারাঠা বুন্দেলা স্বপক্ষ-বিপক্ষ নির্ব্বিচারে স্ব স্ব গোত্রের নিহত যোদ্ধাদের মৃতদেহ যথাসাধ্য একত্র করিয়া শবদাহ করিতে লাগিল, দূরে প্রজ্বলিত অসংখ্য চিতার অগ্নিশিখায় যুদ্ধভূমি মহাশ্মশানের উদাস-গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিল। রাও ছত্রসাল হাড়ার পুত্র ভগবন্ত সিংহ সারাদিন আওরঙ্গজেবের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া রাত্রিতে পিতার মুখাগ্নি এবং নিহত হাড়াগণের অগ্নি-সৎকার সমাধা করিলেন— এই ভাবে বিজয়ী পক্ষের রাঠোর গৌর কচ্ছবাহ স্ব স্ব কুলের শেষকৃত্য সম্পন্ন করিয়া জ্ঞাতিঋণমুক্ত হইলেন। মৃত শত্রুর শবের উপর জঘন্য প্রতিশোধ লইবার একাধিক বিশদ বিবরণ মধ্যযুগে মুসলমান ও খ্রীষ্টানের ইতিহাসে পাওয়া যায় যাহা হিন্দুর পক্ষে কল্পনার অতীত। হিন্দুর জ্ঞাতিবাৎসল্য, স্বজাতিপ্রেম জীবিত অপেক্ষা মৃতের উপরই বেশী প্রকট ;* শ্মশানে, পিতৃপক্ষের তর্পণ-স্নানে উদার আর্য্যসন্তানের মনের দুয়ার আদিকাল হইতেই খোলা ছিল, সম্প্রতি মাত্র বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে।

৫

অতঃপর আগ্রায় পবিত্র রমজান মাসে পিতাপুত্রের শেষ বুঝাপড়া আরম্ভ হইল ; আওরঙ্গজেব রোজা ও কূটনৈতিক মিথ্যার বেসাতি এক সঙ্গেই চালাইলেন। চম্বল নদী পার হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চিঠিপত্রে দারার শাঠ্য, তাঁহার একনিষ্ঠ পিতৃভক্তি ও শ্রীচরণচুম্বনের প্রার্থনা ব্যতীত আওরঙ্গজেবের অন্য কোন মতলব ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পায় নাই। শাহজাহান এই সমস্ত সরল প্রাণে বিশ্বাস করিয়া আপোশ-মীমাংসার আশায় পিছন হইতে যথাসাধ্য দারার রাশ টানিয়া রাখিয়াছিলেন। যুদ্ধের পর ৩০শে মে (১৬৫৮ খ্রীঃ) তিনি পিতার কাছে স্বকৃত কার্য্যের জন্য ক্ষমা চাহিয়া এক চিঠি লিখিলেন। ইহার উত্তরে ১লা জুন সম্রাট নিজের হাতে একখানা চিঠি লিখিয়া আওরঙ্গজেবকে দুর্গে আসিবার জন্য সাগ্রহ আমন্ত্রণ জানাইলেন এবং সম্রাটের দূত মারফত তিনিও সম্মতি জানাইলেন। উহার পরের দিন (২রা জুন) সম্রাট অত্যন্ত আশান্বিত হইয়া প্রধান কাজী সৈয়দ হিদায়েৎ উল্লা এবং বৃদ্ধ ফাজেল খাঁকে-তাঁহার "আলমগীর" (ভুবনবিজয়ী) তরবারি এবং অন্যান্য বহুমূল্য রত্ন-উপহার সহ পুত্রের কাছে পাঠাইলেন। আওরঙ্গজেব উপহার গ্রহণ করিয়া আলমগিরী মেজাজে কড়া জবাব দিলেন, সম্রাট এখনও দারার পক্ষে কারসাজি করিতেছেন ; এই আমন্ত্রণ আমাকে সরাইবার কপট ষড়যন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নয়। আওরঙ্গজেবের এইরূপ মতপরিবর্ত্তনের কারণ সম্রাটের দূতদ্বয় বুঝিতে পারিলেন না।

বকধর্ম্মী শায়েস্তা খাঁ ও খলিলুল্লা খাঁ তখন পর্য্যন্ত স্ব স্ব পদে বহাল থাকিয়া সম্রাটের নিতান্ত অনুগত শুভচিন্তক ও শান্তির দূত সাজিয়া দু'দিকেই আনাগোনা করিতেছিলেন। ১লা জুন সন্ধ্যাবেলা মাতুল শায়েস্তা খাঁ আসিয়া বলিলেন, "ভাগিনা! সাবধান! ফাঁদে পা দিও না, শাহানশাহর মতলব ভাল নয়।" ভাগিনা মামাকে তিন হাটে বেচিবার বুদ্ধি রাখিতেন, তিনি এই সংবাদে বিস্মিত হইলেন না। পিতার সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা তাঁহার আদৌ ছিল না, চিঠিপত্র, মৌখিক কথা শুধু ভাঁওতা মাত্র। যাহা হউক, এই রকম সাক্ষী পাইয়া বাহিরে দশ জনের কাছে পিতার দুরভিসন্ধি পাকাপাকি সাব্যস্ত করিবার পক্ষে তাঁহার খুব সুবিধা হইল। পুত্রের এই অভিযোগ শুনিয়া শাহজাহান হতভম্ব হইলেন, কি করিবেন দুই দিন পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারিলেন না, উভয় পক্ষে মনকষাকষি চলিল। শেষবারের মত পুত্রকে বুঝাইবার জন্য তিনি ৫ই জুন ফাজেল খাঁর সহিত তাঁহার পরমপ্রিয় ভায়রাভাই খলিলুল্লা খাঁকে পাঠাইয়া দিলেন ; কারণ খলিলুল্লা দুই পক্ষেরই বিশ্বাস-ভাজন, মেসোর কথা হয়ত আওরঙ্গজেব অবিশ্বাস করিবে না। ফাজেল খাঁর ধর্ম্মের কাহিনী শাহজাদা কানেই লইলেন না, কিছুক্ষণ পরে খলিলুল্লাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। কয়েকটি কথার পর তিনি বাহিরে আসিয়া ফাজেল খাঁকে সরাসরি জবাব দিলেন, বক্শী-উল-মুলুক মহামান্য খলিলুল্লা খাঁ আপাততঃ এইখানেই বন্দী, আপনি ফিরিয়া যাইতে পারেন।

ইহা আগাগোড়া নাটকীয় ব্যাপার ; খলিলুল্লার খেলা শাহীমহলে শেষ হইয়াছিল।

৬

ঐ রাত্রিতে (৫ই জুন, ১৬৫৮ খ্রীঃ) আওরঙ্গজেবের মুখোশ খুলিল ; শত্রুতায় তখন শাহজাহান মুখ্য, দারা গৌণ ইহা তাঁহার নিকট অজানা ছিল না। তিনি সসৈন্যে আগ্রা

* গোঁসাই ওমরাহগীর ও অনুপগীর নবাব শুজাউদ্দৌলার অধীনে নাগাফৌজ লইয়া পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আবদালীর পক্ষে লড়াই করিয়াছিলেন। যুদ্ধের পর আবদালীর নিকট হইতে তাঁহারা অন্য অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করিয়া কেবলমাত্র যুদ্ধস্থলে নিহত মারাঠাগণের শব অগ্নিসাৎ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন!

শহরে প্রবেশ করিয়া দুর্গ অবরোধ করিলেন, সম্রাটও উহার জন্য অপ্রস্তুত ছিলেন না। দুর্গের ফিরিঙ্গী গোলন্দাজ, সম্রাটের দেহরক্ষী বন্দুকধারী পদাতিক, এবং ১৫০০ শত হাবসী, রুমী ও জর্জীয় দৃঢ়যোদ্ধা (কসাক) ক্রীতদাসের পল্টন আসদ খাঁর (?) নেতৃত্বে শত্রুপক্ষের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিল। কোন পক্ষের তোপখানা বিশেষ কার্য্যকরী হইল না, দুর্গ-প্রাচীর হইতে তোপ দাগিলে আধা শহর উজাড় হইয়া যায়, দুর্গপ্রাচীরের তিন দিকে অতি নিকটে বড় বড় বাড়ী, তোপের গোলা ঐ গুলির আড়ালে লুক্কায়িত শত্রুর কোন ক্ষতি করিতে পারিল না; অপর পক্ষে দুর্গের উপর গোলা দাগিয়া আওরঙ্গজেবও কোন সুবিধা করিতে পারিলেন না, কামান বসাইয়া শুধু জুম্মা মসজিদ (বর্ত্তমান Jahanera Mosopue) অপবিত্র করিলেন মাত্র, তবে কামানের পাল্লার ভিতর মসজিদ ও পাকাবাড়ী উঠাইবার অনুমতি দেওয়াই বাদশাহী বেকুবী।

যাহা হউক, আওরঙ্গজেবের নৃশংস সামরিক প্রতিভা সম্রাটের আয়োজন ও দুর্গরক্ষিগণের বীরত্ব তিন দিনেই পণ্ড করিয়া দিল। যমুনার উপর ভরসা করিয়া আকবর বাদশাহ দুর্গের পূর্ব্বদিক কিঞ্চিৎ কম মজবুত করিয়াছিলেন। এই দিকেই হঠাৎ আক্রমণ করিয়া আওরঙ্গজেবের ফৌজ খিজরী দরওয়াজার বহির্ভাগ দখল করিয়া বসিল, দুর্গে প্রবেশ অসাধ্য হইলেও যমুনা হইতে দুর্গের পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ হইল। দুর্গের ভিতরে যে সমস্ত কূয়া ছিল ঐগুলির নোনতা জল পানীয় হিসাবে কেহ ব্যবহার করিত না, যমুনা হইতে জল আনিবার ব্যবস্থা ছিল। নদীর জলের অভাবে দুর্গবাসী-দের জীবন একদিনেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। যিনি রাজ-ধানীতে যমুনার জল, সফরে উষ্ট্রবাহিত মটকা-ভরা গড়মুক্তে-শ্বরের গঙ্গাম্বু, গ্রীষ্মে হিমাচল হইতে যমুনার স্রোতে ভেলা-বাহিত বরফে ঠাণ্ডা করা জল ব্যতীত ত্রিশ বৎসর অন্য জল মুখে দেন নাই তাঁহার কাছে অবস্থার ফেরে কূয়ার দুর্গন্ধ খারা পানি (brackish water) "স্বাদু সুগন্ধি স্বদতে তুষারা" মনে হইল। সম্রাটের দৃঢ়তা পানীয় জলের কষ্টে দুই দিন পরেই টুটিয়া গেল, তিনি পুত্রের কাছে তিতিক্ষা ও তৃষ্ণায় জল ভিক্ষা করিয়া চিঠিতে লিখিলেন,—হিন্দু মরা বাপের জন্য পানি খয়রাত করে। আর মোছলমানের ছাওয়াল তুমি, বুড়া বাপ জিন্দা থাকিতে সাঁঝের বেলা রোজা "এপ্তার" (breaking the day's fast) করিবার জন্য এক চুমুক মিঠা পানি তোমার কাছে পাইবে না?" পুত্র জবাবে লিখিলেন, "যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল। যিনি আপনার আধা বড়ভাই খসরুর গলা টিপিয়া মারিয়াছেন, দাওয়ার বখশ (খসরুর পুত্র) প্রভৃতি সাতাশ জন শাহ-জাদাকে কোর্‌বানী করিয়া খুন্‌রেজ (bloody) তক্তে বসিয়াছেন তিনি ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পুত্রের নিকট কি প্রত্যাশা করিতে পারেন?"

সন্তানের মুখে সাম্রাজ্যলালসা-দৃপ্ত যৌবনের দুষ্কর্ম্ম ব্যাখ্যা শুনিয়া শাহজাহানের জল ও জীবনের তৃষ্ণা মিটিয়া গেল, তবুও দুর্জ্জয় পণ—প্রাণ থাকিতে পাষণ্ডকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দিবেন না। এইদিকে আওরঙ্গজেবও অস্থির হইয়া উঠিলেন; ভাই মোরাদের মতিগতি ভাল নয়, দিল্লীতে দারা আবার মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছে, সুলেমান যে-কোন মুহূর্ত্তে হয়ত পলাইয়া বাপের কাছে পৌঁছিবে; এইদিকে দুর্গে খাদ্যের অভাব নাই, নোনতা জল খাইয়া শাহানশাহর কাবু হওয়ার লক্ষণও বিশেষ দেখা যাইতেছে না; সুতরাং কৌশলে কার্য্যোদ্ধার ছাড়া উপায় নাই। তিনি সম্রাটকে লিখিলেন, "পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য আমি হাজির হইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম; কিন্তু অসুখে পড়িয়াছি। আপনার হুকুম পাইলে কুমার মহম্মদ সুলতান কদমবোসী করিবার জন্য দরবারে উপস্থিত হইতে পারে।" পিঁপড়ার পেটকামড়ি সম্রাট ঠিক ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন, তবুও মোহ কাটিল না। পুত্রের হয়ত সুমতি হইয়াছে ভাবিয়া সম্রাট শান্তির আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, কোনপ্রকার সন্দেহ না করিয়া কুমার মহম্মদ সুলতানকে শাহী-মহলে আসিবার হুকুম দিলেন। আওরঙ্গজেব বিশ্বস্ত ও বেপরোয়া জঙ্গী ফৌজ বাছিয়া বাছিয়া পুত্রের সঙ্গে দেহরক্ষী হিসাবে প্রেরণ করিলেন এবং গোপনে তাহাকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন। বিরাট সমারোহে কুমার দুর্গে অভ্যর্থিত হইলেন, দুর্গরক্ষিগণ যুদ্ধ শেষ হইয়াছে মনে করিয়া অসতর্ক হইয়া পড়িয়াছিল; কেবল শাহী-মহলে যথারীতি কড়া পাহাড়া। দুর্গের শেষ ফটক পার হইয়াই কুমারের দেহরক্ষিগণ ভিতর হইতে প্রাচীররক্ষী সেনাগণকে হঠাৎ আক্রমণ করিল, বাহির হইতে তাঁহার সাহায্যার্থ আরও ফৌজ ঢুকিয়া পড়িল, শাহী-মহলে সম্রাট শাহজাহান অবরুদ্ধ হইলেন (৮ই জুন, ১৬৫৮)।

দুই দিন পরে জাহানারা বেগম সন্ধিপ্রার্থিনী হইয়া আওরঙ্গজেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। আওরঙ্গজেব প্রথমে পরিষ্কার জবাব দিলেন, "ইসলামের পরম শত্রু দারাকে শেষ না করিয়া সম্রাটের সহিত আমি দেখা করিব না।" পরে সুর কিঞ্চিৎ নরম হইল, জাহানারাকে কথা দিলেন পরদিন তিনি শাহ-বুরুজে পিতার পদবন্দনা করিবেন।

৭

জাহানারার সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে ১০ই জুন আওরঙ্গ-জেব আগ্রার উপকণ্ঠে মহাধুমধামে প্রকাণ্ড দরবারে সিংহাসনে

বসিয়া সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; পরের দিন রাজধানীতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করিয়া তিনি পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শহরে তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন হইল, সর্ব্বত্র গতানুগতিক লোকারণ্য ও উৎসব। আওরঙ্গজেবের বিরাট সামরিক মিছিল দুর্গ-তোরণের দিকে চলিল, মোরাদ ও তাঁহার অনুচরবর্গ কেহই আওরঙ্গজেবের অনুগামী হয় নাই। আওরঙ্গজেব প্রায় ফটকে প্রবেশ করিবেন এমন সময়ে ভিড় ঠেলিয়া সেনাধ্যক্ষ শেখমীর ও শায়েস্তা খাঁ জরুরি সংবাদ লইয়া আসিলেন,—ভীষণ ষড়যন্ত্র। শায়েস্তা খাঁর মুখে শুনা গেল শাহবুরুজে প্রবেশ করিবার সময় তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য অতি হিংস্র বলিষ্ঠা তাতার ক্রীতদাসীগণ সম্রাট কর্ত্তৃক গুপ্তস্থানে স্থাপিত হইয়াছে। আওরঙ্গজেব আর অগ্রসর হইলেন না; ঐখানেই প্রায় একই সময়ে শাহী অন্দরমহলের নাহর-দিল নামক খোজা সম্রাটের এক গুপ্ত লিপি দারার নিকট পৌঁছাইবার জন্য বাহিরে যাইতেছিল, সামনে আওরঙ্গজেবকে দেখিয়া যে-কোন কারণে সে ঐ চিঠি তাঁহার হাতেই দিল, চিঠি পড়িয়াই আওরঙ্গজেবের চক্ষু স্থির। উহাতে নাকি লেখা ছিল—

'দারাশুকো! তুমি দিল্লীতেই কদম জমাইয়া থাক; ঐখানে টাকা ও সিপাহীর অভাব নাই। সাবধান! ঐ স্থান ছাড়িয়া এক পা-ও দূরে যাইও না; আমি স্বয়ং এই জায়গার মামলা খতম করিব।

সকলেই বুঝিল মতিচ্ছন্ন সম্রাট দারার নিমিত্ত আওরঙ্গজেবকেই খতম করিবার জন্য বসিয়া আছেন। আওরঙ্গজেবের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইল; তিনি পিতাকে কড়াকড়ি জেলে পুরিবার যে অজুহাত খুঁজিতেছিলেন উহাই নাটকীয়ভাবে প্রকাশ্য সদর রাস্তায় তাঁহাকেই খুঁজিয়া লইল, অধিকন্তু ভগ্নী জাহানারার কাছে পূর্ব্বসন্ধ্যায় যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন উহার মর্য্যাদাও রক্ষা করা হইল।

শাহজাহানের পক্ষে কোন ওকালত-নামা না লইয়াও বলা যাইতে পারে ঐ ধরণের চিঠি এবং রাশি রাশি টাকা আগ্রাদুর্গ হইতে দিল্লী পৌঁছিয়াছিল—এই বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু নহর-দিল বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যে চিঠি আওরঙ্গজেবের কাছে সন্দেহজনক পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে উপস্থিত করিয়াছিল, সে চিঠির সঙ্গে শাহজাহানের কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা বলা যায় না। ঐ চিঠি আসল কি জাল উহা একমাত্র আওরঙ্গজেব এবং তাঁহার দরবারী স্তাবকগণই জানিতেন। যে বাজারে আওরঙ্গজেব বড় বড় আমীর রাজা মহারাজাকে কিনিয়া লইয়াছিলেন সে বাজারে একটি ক্রীতদাসের সততা ও প্রভুভক্তি অতি সামান্য জিনিষ; তাহার মত একটা পুলিসী "রাজসাক্ষী" হাজির করার মত আওরঙ্গজেবের হিতৈষী ১০ই জুন তারিখে আগ্রাদুর্গে অনেক ছিল। ইহাও সত্য, ভারতবর্ষের ইতিহাসে আওরঙ্গজেব সর্ব্বপ্রথম রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রচারকার্য্যের কদর বুঝিয়াছিলেন।

৮

এক খাসীকৃত বাঙ্গালী মুসলমানকে "এতেবার্ খাঁ" উপাধির দ্বারা সম্মানিত করিয়া আওরঙ্গজেব আগ্রাদুর্গে বৃদ্ধ শাহজাহানের প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। এতদিন তিনি দারা ও সুলেমান শুকোর বিরুদ্ধে কোন সেনা পাঠাইতে পারেন নাই, চিঠিপত্র লিখিয়া রাজা জয়সিংহ ও দেলের খাঁকে হাত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৩ই জুন আগ্রায় একদল সৈন্য মোতায়েন রাখিয়া অবশিষ্ট ফৌজসহ আওরঙ্গজেব দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন;—ম্যানুসী সাহেবও ছোক্রা দরবেশ সাজিয়া দারার কাছে পৌঁছিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ৫০।৬০ মাইল দূরে মথুরা পৌঁছিতে আওরঙ্গজেবের দশ দিন লাগিয়া গেল। ইহার কারণ সামনে দারা অপেক্ষা পিছনে মোরাদই তাঁহার পক্ষে তখন অধিক বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সামুগড়ের ঘা শুকাইবার সঙ্গে সঙ্গে ভাই মোরাদের উপর আওরঙ্গজেবের দরদ কমিতে কমিতে দারুণ বিদ্বেষ ও দুশ্চিন্তায় পরিণত হইয়াছিল। মোরাদের উচ্ছৃঙ্খল সেনাদল আগ্রাশহরে লুঠতরাজ আরম্ভ করিয়াছিল। এইজন্য আওরঙ্গজেব রাজধানী রক্ষার ভার কুমার মহম্মদ সুলতানকে দিয়াছিলেন এবং পরে সম্রাটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনে মোরাদের সঙ্গে কোন পরামর্শ করেন নাই। মোরাদকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য আগ্রা পর্য্যন্ত আনিয়া ১১ই জুন তিনিই মহাসমারোহে তক্তে বসিয়া পড়িলেন। ভাইদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মোরাদ আহমদাবাদে সিংহাসনে আরোহণ ও রাজছত্র ধারণ করিয়াছিলেন, পরে আওরঙ্গজেবের কথা শুনিয়া ঐ ছাতা গুটাইয়া বাক্সবন্দী করিয়াছিলেন এবং শাহী তক্ত উটের উপর চাপাইয়া ভবিষ্যতের আশায় আগ্রা পর্য্যন্ত আনিয়াছিলেন। মোরাদের মোসাহেবগণ সুযোগ পাইয়া আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে তাঁহাকে উস্কানি দিতে লাগিল, কিন্তু দাদার কথা শুনিলেই তিনি গলিয়া যাইতেন। আওরঙ্গজেব বোধ হয় তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, তিনি কেবল শাসন-ব্যবস্থা দৃঢ় করিবার জন্য দরবার ই-আম ডাকিয়াছিলেন, ১১ই জুনের ব্যাপারটা কিছুই নহে; আসল দার-উল্-খেলাকত্ হইল দিল্লী; দারাকে তাড়াইয়া ঐখানেই তিনি তাহাকে তক্তে বসাইয়া তবে বিদায় লইবেন। দোটানা স্রোতে পড়িয়া মোরাদ দাদার কাছে যাওয়াই বন্ধ করিলেন,

নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নিজের সেনাবল দ্বিগুণ করিলেন ; আওরঙ্গজেব টের পাইলেন কথায় চিঁড়া আর ভিজিবে না।

আওরঙ্গজেব পিতার যে দুর্দ্দশা করিয়াছেন সুযোগ পাইলে তাঁহারও ঐ দশা করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না—এই আশঙ্কা মোরাদের মনে ক্রমে বদ্ধমূল হইল। তাঁহার রণদুর্ম্মদ বিশ হাজার অশ্বারোহী আওরঙ্গজেবের সহিত বলপরীক্ষার জন্য উৎসুক, পরামর্শদাতারা বুঝাইলেন সিধা আঙ্গুলে ঘি উঠিবার নয়। ১৩ই জুন আওরঙ্গজেবের দিল্লীযাত্রার সময় মোরাদ অছিলা করিয়া আগ্রাতেই থাকিয়া গেলেন, আওরঙ্গজেবের দুর্ভাবনা চরমে উঠিল। এক দিন পরে মোরাদের ভাবনা হইল দাদা যদি একাই দিল্লী দখল করিয়া ঐখানেও তক্তে বসিয়া পড়েন তাহা হইলে উপায় কি ? তিনিও সমস্ত ফৌজ লইয়া মথুরার দিকে চলিলেন, কিন্তু দুই ভাইয়ের ফৌজের মধ্যে বরাবর এক-মঞ্জিল ব্যবধান। আগ্রা হইতে দুই-মঞ্জিল কুচ করিবার পর আওরঙ্গজেব মোরাদকে সৈন্যগণের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য নগদ বিশ লাখ টাকা পাঠাইলেন এবং পরে লুঠের এক-তৃতীয়াংশ দেওয়া হইবে বলিয়া জানাইলেন। ২৩শে জুন আওরঙ্গজেব মথুরা পৌঁছিলেন, মোরাদের তাঁবু পড়িল শহরের বাহিরে। মোরাদের আরোগ্য-লাভ উপলক্ষে ভোজের আয়োজন করিয়া আওরঙ্গজেব ভাইকে দুই দিন নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু মোরাদ আসিলেন না। ইতিমধ্যে আওরঙ্গজেব মোরাদের বিশ্বস্ত খাবাস্ (গোলাম) নূরউদ্দীন এবং আরও কয়েকজনকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া হাত করিয়াছিলেন। ২৫শে তারিখ সন্ধ্যাবেলা শিকার হইতে ফিরিবার সময় নূরউদ্দীন কৌশল করিয়া আওরঙ্গজেবের শিবিরে মোরাদকে লইয়া আসিল। আওরঙ্গজেব আহ্লাদে আটখানা হইয়া এক সার্ব্বজনীন ভোজের আয়োজন করিলেন, এবং তাঁহার সেনাধ্যক্ষগণ প্রত্যেকেই সমপদস্থ মোরাদের এক এক অফিসারকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। সেই রাত্রিতে আওরঙ্গজেবের শিবির নাচ-গান ও শরাবে মশগুল, কেহ ফিরিবার গরজ দেখাইবার ফাঁকও পাইল না।

এই দিকে নিজ তাঁবুতে দস্তার-খানে বসিয়া আওরঙ্গজেব পরম স্নেহে মোরাদকে 'এটা-খাও, সেটা খাও' বলিয়া আপ্যায়িত করিতেছিলেন। খানার পরে সেরা শিরাজী আসিল, মোরাদ তকল্লুক [সৌজন্যসূচক সঙ্কোচ] করিয়া মাথা নীচু করিয়া ভাবিলেন, "হজরতজী"-র দস্তার-খানে হারাম ? মোরাদের সঙ্কোচ কাটাইবার জন্য আওরঙ্গজেব বলিলেন, এতে আর দোষ কি ? মেহেনতের পর জঙ্গী জোয়ানের এটা না হইলে চলে না। এই বলিয়া তিনি নিজ হাতে পেয়ালা তুলিয়া ভাইকে দিলেন ; অগত্যা মোরাদ সেলাম ঠুকিয়া পরম কৃতজ্ঞতাভরে দাদার দস্ত-মোবারক হইতে মহব্বতের পিয়ালা লইয়া এক চুমুকে নিঃশেষ করিলেন, আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িল। শরাবীর পেটে এক পেয়ালা গেলেই 'আবার খাবো' অবস্থাটুকু অন্ততঃ আওরঙ্গজেবের অজানা ছিল না। তিনি পেয়ালার পর পেয়ালা ভরিয়া দিতে লাগিলেন। প্রথম যৌবনে একবার তিনি প্রেমের তুফানে নর্ত্তকী হীরাবাঈয়ের আবদারে এক পেয়ালা মুখের কাছে তুলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু চটুলা প্রেয়সী হাত চাপিয়া ধরিয়া সেই বার তাঁহার ইমান বাঁচাইয়াছিল। এইবার মনে মনে খোদাতালার কাছে গুনাহ্‌গারী মাফ চাহিয়া তিনি গোঁয়ার মোরাদের নাচার সাকী সাজিলেন, কি করিবেন ? দুনিয়া-দারীর জরুরত বড় পাজি !

ভরা পেটে আকণ্ঠ পান করিয়া মোরাদের যখন হাই তুলিয়া দস্তার-খানের উপর ঢলিয়া পড়িবার অবস্থা, তখন আওরঙ্গজেব পাশের কামরায় মোরাদকে একটু ঘুমাইয়া লইতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন পরে দারার বিরুদ্ধে যুদ্ধপরিচালনার সলা-পরামর্শ হইবে। মোরাদের গায়ে তখনও শিকারের পোশাক, কোমরে তলোয়ার খঞ্জর (dagger) বাঁধা ! ঐগুলি বালিশের নীচে রাখিয়া তিনি বিছানার উপর লম্বা হইয়া পড়িলেন, প্রহরীস্বরূপ বিশ্বস্ত খাবাস্ বশরত জাগিয়া রহিল এবং প্রভুর হাত-পা টিপিতে লাগিল। মোরাদের যখন একটু তন্দ্রার ভাব তখন এক সুন্দরী ক্রীতদাসী শাহজাদার সেবার জন্য শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, বশরত কায়দামাফিক মাথা নীচু করিয়া নিঃশব্দে বাহিরে আসিল। বাহিরে পা দেওয়ামাত্র কয়েকজন যণ্ডাকৃতি লোক চিলের মত ছোঁ মারিয়া শ্বাসরুদ্ধ বশরতকে ভবপারে লইয়া গেল। ভিতরে সুন্দরীর কোমল অঙ্গসংবাহনে মোরাদের ঘুম দারুণ গভীর হইতে লাগিল, সময় বুঝিয়া মায়াবিনী ত্বরিত-পদক্ষেপে অন্তর্হিতা হইল।

মুহূর্ত্তমধ্যে আওরঙ্গজেবের ক্ষিপ্রকর্ম্মা সেনানী শেখ মীর দশ-বার জন সশস্ত্র ঘাতকসহ ঘরে ঢুকিয়া মোরাদকে ঘিরিয়া ফেলিল, তবুও তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল না, অবশেষে তলোয়ারের ঝন্‌ঝনানি হাতকড়ি-পা-বেড়ীর টকটকানি শুনিয়া মোরাদ জাগিয়া উঠিলেন, বালিশ হাতড়াইয়া দেখিলেন অস্ত্র নাই।

শত্রুগণের উপর তীব্র ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সিংহ-বিক্রান্ত মোরাদ স্থিরভাবে বন্ধনদশা স্বীকার করিলেন। বাহিরে তাঁহার পানোন্মত্ত সেনাধ্যক্ষগণও অনুরূপ অতিথি-সৎকার লাভ করিলেন। ভোরের দিকে সুরক্ষিত হাওদা-বাহী এক একটা হাতী পাঁচ শত অশ্বারোহী পরিবেষ্টিত হইয়া শিবিরের উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব্ব-পশ্চিম দিকে অজ্ঞাত স্থান অভিমুখে যাত্রা করিল। নায়কশূন্য মোরাদের বিশ হাজার অশ্বারোহীর অর্দ্ধাংশ ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল, অর্দ্ধেক আওরঙ্গজেবের চাকরী গ্রহণ করিল। ক্রমশঃ

১

সেবাসঙ্ঘ গড়েছে ছেলেরা। আরও পাঁচটা খুচরা কাজ আছে, হাতে সেরকম এসে পড়ে, তবে আসল কাজ রোগীর সেবা আর দাহ। চমৎকার কাজ করছে, হীরের টুকরো ছেলে সব। বেশী দূর না গিয়ে আর বৎসরের কথাই ধরা যাক, ক'ঘরই বা বাঙালী শহরের মধ্যে, তবু জন ছয়েককে কালের কবলে তুলে দিতে হ'ল। বলতে নেই, তবে এবারে তো যাচ্ছে সামলে এখন পর্যন্ত ভগবানের দয়ায়।

অবশ্য ভগবানের দয়াই সব, তবু সুখ্যাতি না করে পারা যায়? অন্ততঃ এটুকুও তো বলতে হয়, ভগবানের সবচেয়ে বড় দয়া এই সব ছেলে দিয়েছেন। বিপদ-আপদ আছেই মানুষের সংসারে, তবে কতটা ভরসা, যত বড়ই বিপদ হোক বুক দিয়ে পড়বে সবই; মদন আছে, অনিল আছে, যুগোল আছে, বলাই আছে, যজ্ঞেশ্বর আছে, আরও সবাই আছে—সোনার চাঁদ সব, বুঝতে দেবে না যে বিপদটা তোমার।

কিন্তু টিকল না। তার কারণ, যে ভাবের একটু উৎসাহ আশা করেছিল বেচারিরা তার কিছুই পেলে না। ছেলেমানুষ সব, নূতন আশা, নূতন উদ্যোগ; কিন্তু আস্তে আস্তে মনমরা হয়ে পড়তে লাগল ভেতরে ভেতরে, তারপর যেদিন সবচেয়ে শক্ত কেসটাকে সারিয়ে তুলে প্রায় একরকম অসাধ্যসাধনই করলে বলতে হয়, মুখে মুখে 'বাহবা' রটে গেল চারিদিকে, সেদিন সবাই একেবারে ভেঙে পড়ল।... এই মুখের 'বাহবা'র জন্যই কি এরকম করে প্রাণপণ করেছে বেচারিরা? জীবনে 'বাহবা'টাই কি সবকিছু?

টাকাকড়ি যুগিয়ে উৎসাহ দেওয়ার কথা হচ্ছে না, তার অকুলান হয়নি, গোড়া থেকেই পেয়ে গেছে, চাঁদা হিসেবেও, আবার অন্যভাবেও।

ভগবতীবাবু অসুখে পড়লেন। সেবাসঙ্ঘের সূত্রপাত ঐখান থেকেই। একা মানুষ ভগবতীচরণ, ছেলে নেই, মেয়ে নেই, স্ত্রী নেই, দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয় পরিজন নেই। বাইরের সঙ্গে সম্বন্ধও খুব কম। কালেকটরিতে মোটা মাইনের চাকরি করতেন, অবসর নিয়ে বসে আছেন। মোটা মানুষ, তার এই প্রায় চৌদ্দ-পনের বৎসরের অবসরপ্রাপ্ত অলস জীবনে শুধু মেদ সঞ্চয় হয়েছে, বাইরে বড় একটা বেরোন না, বা পারেনই না বেরুতে।

অসুখে পড়লেন।

ডিসেম্বর মাস, সবার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। থার্ড মাষ্টারের ছেলে বনোয়ারীলালকে অঙ্কের নম্বর জানতে পাঠিয়ে সবাই বলাইদের খাবারের দোকানে একত্র হয়েছে; অনিল এসে খবরটা দিলে। অনিল খবরটা দিলে অন্যভাবে—তার কাছে সমস্যাটা যেভাবে দেখা দিয়েছে—অর্থাৎ অত মোটা মানুষ, নিয়ে যাবে কি করে, কত জন লাগবে?

যজ্ঞেশ্বর বললে, "তুই যে একেবারে যাবার ভাবনা ভাবছিস, হয়েছে কি?"

"নিমোনিয়া। সূয্যিকাকা দেখছেন, বললেন আশা খুবই কম। আরও মুশকিল হয়েছে, সেবা করবার কেউ নেই কিনা তেমন—ভরসা তো চাকর আর ঠাকুর।"

বলাই বললে, "হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন না কেন?"

অনিল বললে, "নড়াবার উপায় নেই এখন, বড্ড দেরিতে খবর পেয়েছেন কিনা। তা ভিন্ন বড্ড গলিঘুঁজির মধ্যে তো? পঞ্চাশটা বাঁক।"

বনোয়ারীলাল এল। বললে, "সবাই পাস করেছে, শুধু অনিল আর যজ্ঞেশ্বরের এক আর আড়াই নম্বর কম ছিল, চার-পাঁচ জায়গায় আধ আধ করে বসিয়ে এসেছে। বাবা এখনও টোটাল দেয় নি। সবার নম্বরও বলে দিলে।

বলাইয়ের কাছ থেকে কড়ার মত চারখানা ডবল অমৃতী নিয়ে চলে গেল।

যজ্ঞেশ্বর বললে, "অথচ নিমোনিয়া যাদের ধরা দরকার তাদের ধরে না। আড়াইটে নম্বর নিজের হাতে দিয়ে দিতে পারত না ? এতে চুরি শেখানো হচ্ছে না বুঝি ?"

বোধ হয় এই থেকেই নিরপরাধ যাকে ধরেছে নিমোনিয়া তার প্রতি সহানুভূতিটা ভাল করে উঠল জেগে। যজ্ঞেশ্বরই বললে, "মরুক গে। আমি বলছিলাম, লোকটা বেঘোরে মারা যাবে শেষকালে ? কেউ যদি আমার সঙ্গে যোগ দেয় ত চেষ্টা করে দেখি একবার।"

সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠল। অঙ্কের ফাঁড়াটা কেটে গিয়ে মনটা সবার হাল্‌কা হয়েছে, হাতে তেমন কিছু কাজও নেই। আর, কাজটাও তো ভাল ; পরসেবা। শুধু যুগোল বললে, "একটা কথা কিন্তু ভাই। ভগবতীবাবু বেঁচে উঠুন, আহা !...কিন্তু গীতায় কি যেন লেখা আছে, বাবা সেদিন মাকে বলছিলেন—যত চেষ্টা করবে ততই তার ফল ভগবানের হাতে। অবশ্য তবু আমরা প্রাণপণেই করব চেষ্টা। শেষকালে কিন্তু...অবিশ্যি বলতে নেই—বেঁচেই উঠুন, আহা !...কিন্তু শেষে ভগবান গীতায় যা বলেছেন যদি তাই হয়ে পড়ে তখন বড়রা এসে যে মুরুব্বিয়ানা করে..."

বলতে হ'ল না, সবাই বুঝলে। বলাই বললে, "অবিশ্যি বলতে নেই, কিন্তু আবার ওদিকটাও তো দেখতে হবে ভেবে।...ধরো এল না বড়রা, বললে ওরাই যা করছে করুক ; কিন্তু..."

যজ্ঞেশ্বর এগিয়ে এল।

"ভারী বলছিস ? নেঃ, অমন ঢের ভারী লাস দেখেছি। আমি আছি, যুগোল আছে, মদন আছে, সত্যেন আছে, মণি নাপিত, বাগদি..."

দলের আরও শক্তসমর্থ কয়েক জনের নাম করলে।

বলাই বললে, "তার চেয়ে এক কাজ করো, আমি যা বুঝি। এরকম এলেমেলো কাজ আমার পছন্দ নয় দস্তুরমত নিয়ম-কানুন করে ফেল, একটা নাম দাও—যেমন বড়দের ক্লাব রয়েছে—থিয়েটার আর আড্ডা, আরে ছিঃ !...আমরা মশাই, ওসব বুঝি না, এক পাশটিতে পড়ে থেকে সমাজের একটু সেবা করব। কিন্তু এই আমাদের নিয়ম—ডাকতে চান, ঘাড় পেতে নিচ্ছি, না চান, বহুত আচ্ছা।"

সবার মনঃপূত হ'ল। বলাইয়ের দোকান থেকে সত্যেনের বাসার দিকে চলল সবাই। সত্যেন থাকে সব তাতেই, তবে একটু মোটা আর আয়েসী বলে বসে বসে যতটা হয়। বন্ধু-মহলে নাম পেয়েছে 'মোহান্ত'।

মিটিং হ'ল, নিয়ম-কানুন করা হ'ল। নাম-করণও হ'ল।

সুষ্যিবাবুর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল সবাই, একেবারে দশ-বার জন। ঢোকবার আগে সকলেই একবার আর সবার মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে নিজের মুখটাও যথাসাধ্য বিষণ্ণ করে নিলে।

বলাই সেক্রেটারী হয়েছে, এগিয়েছিল, বললে, "ভগবতী দাদামশাইয়ের নাকি বড্ড শক্ত ব্যামো হয়েছে কাকা ?"

সুষ্যিবাবু একবার দলটির উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন, বললেন, "হ্যাঁ, নিমোনিয়া।"

"শুনলাম। শুনে পর্য্যন্ত আমাদের সেবা-সঙ্ঘের সবার মন এত খারাপ হয়ে রয়েছে...কোন উপায় নেই আর ?"

যুগোল বললে, "বলাই সেক্রেটারী সঙ্ঘের। গিয়ে বলবে সত্যিই আমাদের মনটা এত খারাপ হয়ে গেছে।"

সুষ্যিবাবু আর একবার চোখ দুটো ঘুরিয়ে নিয়ে এসে বললেন, "তোমরা সেবা করতে চাও ? তা, অনেকগুলি ত রয়েছও। উপায়—চেষ্টা, আমিও ত দিচ্ছি ওষুধ..."

যজ্ঞেশ্বর বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, চেষ্টায় কি না হয় ?"

একটু হেসে যুগোলের দিকে চেয়ে বললে, "এই ত আমাদের অঙ্কের পেপারটা অত শক্ত ছিল..."

"ও, তোমাদের পরীক্ষাও ত হয়ে গেছে ! তা, দেখ না করে চেষ্টা, ভালই ত। সমাজের সেবা এ বয়স থেকে একটু করা ত উচিত, তোমরাই ত করবে। ওঁর আবার শুধু চাকরবাকরের ওপর ভরসা।"

অনিল বললে, "কিন্তু প্রেসিডেণ্ট সত্যেন একটা কড়া নিয়ম করে ফেলেছে, কাকা,

মানে, যে কেস্‌টা আমরা হাতে নোব..."

যুগোল চিমটি কেটে দিতে থেমে গেল।

সুষ্যিবাবু বললেন, "বেশ, তা হলে তোমরা এগোও। আমায় আবার একবার যেতে হবে এখুনি, তোমাদের সব ওখানেই বুঝিয়ে সুঝিয়ে দোব।...তবে, এতগুলি যাচ্ছ, যেন গোলমাল না হয় বাপু ওখানে।"

বলাই বললে, "আজ্ঞে, গোলমাল কি ?—শুনে পর্য্যন্ত আমাদের কারুর মুখে রা বেরুচ্ছে না—এমনি হয়েছে !"

সত্যিই, কি মেহনতটা যে করলে সবাই ! রাত্রি নেই, দিন নেই, পালা করে দু'তিন জন রয়েছেই বসে। ওষুধপত্র, শুশ্রূষা, কিছুতেই এতটুকু খুঁত নেই, যেমন যেমনটি বলে দিয়ে যাচ্ছেন ডাক্তার, অক্ষরে অক্ষরে পালন হয়ে যাচ্ছে।

প্রাণপণ চেষ্টা আর কাকে বলে ? গীতায় ভগবানের সেই উক্তিটা নিয়ে সবার যে ভয়টা ছিল সেটা কিন্তু আর ফলল না, ফলাফলটা তিনি আর নিজের হাতে তুলে নিলেন না। ভগবতীবাবু সেরে উঠলেন।

শহরে একটা বেশ সাড়া পড়ে গেল।

কেই-বা চিনত কাকে? স্কুলের ছেলে, পাস করছে, ফেল করছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে, খেলে বেড়াচ্ছে কেই-বা তাদের খোঁজ রাখে—ভগবতীবাবুর ব্যাপারটাতে সবার নাম বেরিয়ে গেল। সবারই মনে একটা উৎসাহ এসেছে—এক দিন আমোদ-আহ্লাদ করে খাওয়া-দাওয়া করবার জন্যে যে টাকাটা পেলে, সঙ্ঘেই ঢাললে। সত্যেনের বাসায় একটা আলাদা ঘর নিয়ে বেশ ফলাও করে সঙ্ঘটিকে গড়তে লেগে গেল সবাই, ফার্স্ট এড অর্থাৎ প্রাথমিক চিকিৎসার ওষুধ-পত্র, সাজ-সরঞ্জাম কিনে নিয়ে এল, একটা এম্বুলেন্সের খাট করিয়ে নিলে, একটা সাইন বোর্ডও দিলে টাঙিয়ে; অনিল বললে কিছু বাঁশ খড় দড়িও কিনে রাখা ভাল।—অতটা আর করলে না, আপাততঃ কিছু পয়সা হাতে থাকাও ত দরকার। চাঁদার খাতা খোলা হ'ল একটা।

একদিন সুধিবাবুকে ডেকে নিয়ে এল। দেখে-শুনে খুবই উৎসাহ দিলেন—"বাঃ, তোমরা যদি এই করে দেশের কথা, দশের কথা না ভাবো এখন থেকে তো চলবে কি করে?"

দু'একটা পরামর্শও দিলেন ওঁদের শাস্ত্র অনুযায়ী, বললেন—"আমার দ্বারা যদি কোনও সাহায্য হয় তো জানাবে। বাঃ, দিব্যি কাজ হচ্ছে!"

উৎসাহে অভিভূত হয়ে পড়েছে সবাই, যজ্ঞেশ্বর বললে, "আপনি শুধু আমাদের খবরটা দিয়ে দেবেন কাকা, আমরা সঙ্গে সঙ্গে হাজির হব গিয়ে…"

একেবারেই অত বড় কেসটা সামলে দিয়েছে, সেক্রেটারি বলাইয়ের একটা মর্য্যাদাজ্ঞান হয়েছে, যজ্ঞেশ্বরের দিকে চেয়ে বললে, "কারুর কিছু একটা হলেই কেন দিতে যাবেন খবর? তাতে ওঁরও অসুবিধে, আমাদেরও—কি যে বলে…"

ওঁর দিকে চেয়ে হাত কচলে বললে—"আমাদের অনুরোধ। যখন বুঝবেন খুব সঙ্গীন কেস, আমরা যেন খবরটা নিশ্চয়ই পাই একটু; অবিশ্যি আমরাও সতর্ক থাকবই—বাড়ী বাড়ী খোঁজ নোব—আজ সবাইকে বলেও রাখছি…"

হেসে পাঁচটি টাকা দিয়ে একটু চিন্তিতভাবে গাড়িতে গিয়ে বসলেন সুধিবাবু।

দুই

সঙ্গীন কেসের জন্য বেশীদিন হা-পিত্যেশ করে থাকতে হ'ল না। থাকোহরি বাবু অসুস্থ হয়ে শয্যাগ্রহণ করলেন। ঠিক যে ভগবতীবাবুর মত অবস্থা এমন নয়। বাড়ীতে

"কিছু বাঁশ, খড়, দড়িও কিনে রাখা ভালো"

সেবাশুশ্রূষা করবার লোক আছে—স্ত্রী, মেয়ে, পুত্রবধূ; ছেলে আপিসে কাজ করে, বাপের অসুখ, ঘাবড়ে গিয়ে সেও ছুটি নিয়ে বসল। অসুখটা নিমোনিয়া। সুধিবাবুরই হাতে রয়েছে। থাকোহরিবাবু ওঁর আবার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

লোক রয়েছে, আশা কম, তবু একটু উঁকিঝুঁকি মারলে দু'তিন জন, তার পর কেউ গা করে না দেখে সবাই মিলে সুধিবাবুর ওখানেই গেল।

কিছু বলতে হ'ল না, তার আগে সুধিবাবুই বললেন, "এই যে তোমরা এসেছ। দেখো! মনেই ছিল না তোমাদের কথা। থাকোটা একেবারে দু' সাইড নিয়ে পড়ল, আমার মনটাও তেমন বেশ ইয়ে নেই। তা বেশ হয়েছে, তোমরা রেডি আছ তো?"

বলাই হাত কচলে বললে, "আমাদের আর কি কাজ কাকা?"

"তা হলে এগোও তোমরা, আমি একটু ঘুরে একটা কেস্ দেখে সোজা চলে আসছি। থাকোর ছেলে বড্ড নার্ভাস, বউটাও চিরকাল ঢিলেঢালা—ওদের দ্বারা ঠিক…"

এত দ্রুত সফলতা কেউ আশা করে নি, বেশ চনমনে হয়ে উঠেছে দলটা, যুগোল একটু হেসে বললে—"যমের সঙ্গে লড়াই করতে হবে, নার্ভাস হলে চলে?—না, ঢিলে-ঢালা হলে?"

দলের সবার দিকে ঘুরে চাইলে। অনিল বললে—"তার ওপর নিমোনিয়া রুগী; এক রকম তো মড়া নিয়ে

টানাটানি যমের সঙ্গে···দেখলাম তো একটা কেস ঘেঁটে।··· শোভো একটু রোগা বলে তো ডাম্‌বেলও ধরেছে···নারে ?"

শম্ভু মাথা দোলালে, বললে, "আর ছোলাও।"

স্থষ্যিবাবু বললেন,"আচ্ছা, তা হলে তোমরা এসো এখন, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি।"

সেবা নয় ত, যেন কলে কাজ হয়ে যাচ্ছে। যে দেখছে তার মুখেই ঐ কথা। কোথায় ছিল এই সব ছেলেরা? গত বারে আদিনাথের মেয়েটা সেবার অভাবেই গেল মারা। পুরন্দরের নাতিটার বেলা ওষুধেরই গোলমাল হয়ে গেল, এই তো সেদিনকার কথা। নিজের বাড়ীতে অসুখ, মাথার ঠিকও থাকে না লোকের···

বলাই বলে, "আমাদের কি দোষ বলুন ? না ডাকলে তো আসতে পারি না। লোকে মনে করবে—কিছু একটা মতলব আছে। সঙ্ঘটা গড়েছি আপনাদের সবার জন্যে, ডাকুন হাজির হচ্ছি, প্রাণ পণ করে লেগে পড়ছি। দেখতেই তো পাচ্ছেন—নিজের মুখে কেন বলতে যাব ?"

সেক্রেটারি, শুধু সেবার দিকটা দেখলেই তো হবে না। আবার সঙ্ঘটা যাতে সবার নজরে পড়ে, টেকে, সেটাও তো দেখতে হয়। ওদিকটা ওর তদারকের ভার, দেখে শুনে আসে ঠিক চলছে কি না, তারপর এদিকটা দেখতে হয়। লোকজন আসেই খোঁজখবর নিতে, মেয়ে পুরুষ ; কখনও কম, কখনও বেশী ; গিয়ে দাঁড়াতে হয়, শুনতে হয়, গুছিয়ে বলতে হয়।

বেঁচে গেলেন থাকোহরিবাবু। একটু সময় নিলেন অবশ্য। ভগবতীবাবু যেমন ছিলেন মোটা ইনি আবার ঠিক তেমনি রোগা। অনেকগুলি মাদুলির জোরে সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে এসেছেন, গায়ে মেদ নেই, ঠাণ্ডা লাগলে অসুখ, গোড়া থেকেই বেশ ভাল ভাবে পেড়েছিল, কিন্তু সেবার গুণে সামলে উঠলেন।

সত্যেনের বাসায় তাঁর কথাই আলোচনা হচ্ছিল। অনিল বলছে—"শক্ত ছিল বটে কেসটা ভগবতীবাবুর চেয়ে, কিন্তু একদিক থেকে আবার কতবড় একটা সুবিধেও ছিল দেখতে হবে তো।···আমার নিজের কথা বলছি ভাই, তোমাদের সম্বন্ধে জানি না। মানে কত নিশ্চিন্দি হয়ে কাজ করতে পেরেছি থাকোবাবুর বেলা। ভগবানের দয়া, আমাদের হাতযশ—হ'ল না কিছু, কিন্তু একটা তো হয়েছিল—ভগবান না করুন, কিছু হয়ে গেলে ভগবতীবাবুর মত তো নিয়ে যাবার ভাবনাটা আর ছিল না। হাল্‌কা লোক—আমাদের মনটাও খুব হাল্‌কা ছিল—অবিশ্যি আমার কথা বলছি, তোমাদের কথা কি করে জানব বলো ?"

যজ্ঞেশ্বর একটু অন্যমনস্ক হয়ে মুখটা একটু কুঁচকে শুনছিল বললে, "আমরাই বা কি করে জানব ?"

অনিল প্রশ্ন করলে, "মানে ?"

ঘুগোলও একটু অন্যমনস্কই ছিল, বললে, "যগা বলতে চায় আর কি—ঘাড়ে যখন তুলতে হ'ল না—ভগবানের কৃপায় তখন কি করে জানবে—ভারী হ'ত কি হালকা হ'ত···"

কিছু দিন খালি গেল। সবাই একটু মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ডাক নেই, কাজ নেই। একদিন সেক্রেটারি বলাই মুখ ফুটে বললেও, "তা হলে আর কেন একটা ঠাট বজায় রাখা, তুলে দিই।"

অনিল বললে, "দেখ, আরও কিছু দিন। শীতটা কেটে গেলে বসন্তকালটায় একটু চাগিয়ে ওঠে আবার, স্থষ্যি-কাকাদেরও সিজ্‌ন্। ভেঙে দিলে তখন আবার আপসোস হবে সেবা করতে পারলাম না বলে।"

অত প্রতীক্ষা করতে হ'ল না ; যেমন দিনকতক খালি গিয়েছিল তেমনি এল তো এল এক সঙ্গে দু'দুটো কেস—পূর্ণবাবুর স্ত্রীর টাইফয়েড আর জগদীশবাবুর বড় মেয়ের—কি ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবে হয়তো টাইফয়েডেই দাঁড়াবে। পূর্ণবাবু একরকম বলতে গেলে একা মানুষ, তায় ষ্টেশনে কাজ করেন, খুবই বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। জগদীশবাবুর স্ত্রী আছেন, তবে দু'জনেরই বয়েস হয়েছে, জামাইকে হয়েছে লেখা, অন্ততঃপক্ষে ততদিন একটু সামলে দেওয়া। দু'জায়গা থেকেই ডাক এসেছে, সঙ্ঘের একটা জরুরি মিটিং বসল।

—উৎসাহ ফিরে এসেছে সবার। যেতে হবে বৈকি, বাঃ! না গেলে চলে ? মেহনত একটু বেশী হবে, ভাগা-ভাগি হয়ে যাবে তো। তা, মেহনতকে যদি ভয়ই করবে তো এ পথে পা বাড়ানো কেন ?

তর্ক একটু হ'ল, সবার খাটবার তো সমান ক্ষমতা নয়। অনিল বললে,"খাটুনি অবশ্য আছে, তেমনি বরাবরই যে দুটো ব্যাচকে আলাদা আলাদা খেটেই যেতে হবে এমন তো নাও হতে পারে। ভালোই হোক মন্দই হোক, একটা কিছু হয়ে গেলে তখন আর আবার তারা অন্য দিকে চলে এসে রিলিভ্ করতে পারবে।"

শম্ভু একটু দুর্ব্বল, তত পছন্দ ছিল না, মুখটা একটু ভার করেই বসে ছিল, বললে, 'মন্দ কেন হতে যাবে ? দুটোর মধ্যে কোন্‌টা মন্দ হ'ল ? সেদিক দিয়ে তো ভগবানের বেশ দয়াই আছে আমাদের সঙ্ঘের ওপর।"

সবাই ওর মুখের দিকে চাইলে, বেশ যেন বুঝতে পারা যাচ্ছে না মনের ভারটা।

শম্ভু এবার একটু বেশ বিরক্তই হয়ে উঠল, বললে, "চাইছিস কি ঘুরে ঘুরে ?—খেটে মরছি, কিন্তু যশ আছে

কি কপালে ? প্রাণান্ত করে বাঁচালাম আমরা, থাকোহরি-বাবুর কথা বলছি, যশ হ'ল হাতে কোমরে কোথায় মাদুলি বেঁধে রেখেছে গণ্ডা গণ্ডা, সেইগুলোর।···তা হলে মাদুলির ভরসাতেই থাকো গে না বাপু, গরীবদের ডাকা কেন ?"

নগেন এতক্ষণ চুপ করেই ছিল, মোটা, শান্ত প্রকৃতির মানুষ, থাকেই সাধারণতঃ চুপ করে, একটু এগিয়ে এসে বললে, "শোনো যখন তুললেই কথা—অপযশ কি শুধু একদিকেই ? খ্যাট নষ্ট করছি বলে চটেছেও অনেকে ভেতরে ভেতরে। এক এক সময় মনে হয়, কেন তবে এ ভূতের বেগার খাটা ? করবে, অথচ···"

অবশ্য, যা ওয়াই ঠিক হ'ল। শুধু যজ্ঞেশ্বর একটা সর্ত্তের কথা তুললে—ভগবান না করুন, কিন্তু দুটো কেসের মধ্যে একটার যদি ভালমন্দ কিছু হয়ে যায় তো অন্য ব্যাচ থেকেই লোক ডেকে নিতে হবে নিয়ে যাবার জন্যে, বাইরের লোককে আসতে দেওয়া হবে না।

সন্তোন প্রেসিডেণ্ট হিসাবে বললে, এ ত ন্যায্য কথা।

দু'জন দু'জন করে পড়ল। খাটুনি পড়ল খুবই বেশী। একে মাত্র দু'জনে চব্বিশটি ঘণ্টা আগলানো, তার ওপর ভাগাভাগি হয়ে একটু রেষারেষিও আছে, কেউ কোন দলের বেশী সুখ্যাতি না করতে পারে। খুব খাটুনি গেল।

জগদীশবাবুর বড় মেয়ে পনের দিনে পথ্য নিলে। খুবই ভয় ছিল যে ডাক্তার দেখছিলেন তার ; শুধু অক্লান্ত সেবার গুণে অসুখটা আর খারাপের দিকে যেতে পাবলে না।

পূর্ণবাবুর স্ত্রীও একুশ দিনে উঠে বসলেন। শহরে যেখানেই পাঁচটা লোক জড়ো হয়েছে, মেয়েদের তাসের আড্ডায়, কি বুড়োদের তামাকের বৈঠকে, সেবা-সঙ্ঘের কথা ছাড়া আর কথা নেই। মেয়েরা বলে, রোগ-ব্যামো আছেই সংসারে, থাকবেই, ছেলেগুলো কিন্তু ওরই মধ্যে অনেকখানি নিশ্চিন্দি করে দিয়েছে বাপু ; ষেটের কোলে বেঁচে বর্ত্তে থাক।

বুড়োরা বলে, অবশ্য যাবার সময় হয়ে এসেছে, যেতেই হবে এবার, তবু বেঘোরে মারা যেতে হবে না—কত বড় একটা ভরসা !—এইতেই পরমায়ু বেড়ে যায়।

সঙ্ঘের সবাই কিন্তু কেমন যেন একটু হয়ে গেছে। নিশ্চয়, ভাগাভাগি করে অল্প লোকে এত মেহনত করে খানিকটা অবসাদগ্রস্ত হয়ে থাকবে। বেশ একটু মনমরা হয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কেস দুটো সামলে দেবার পর, তারপর প্রশংসার কথাগুলো নূতন করে কানে আসায় আবার আস্তে আস্তে চাঙ্গা হয়ে উঠল। চাঁদা তুললে, আরও জিনিষপত্র কিনলে। বেশ গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে এক দিন আবার সূর্য্যি-বাবুকেও নিয়ে এল ; তারপর এই নূতন উৎসাহের মুখে কাজের চাপটা হঠাৎ গেল বেড়ে। একটাকে টেনে তুলছে, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা, এই করে করে পাঁচ-পাঁচটা কেস দিলে সামলে। গরমের ছুটি এসে পড়ল তাই সম্ভব হ'ল, ছুটি প্রায় কেটেও গেল এইতেই।

সেজন্য দুঃখ নেই কারুর। যা কাজ হাতে নিয়েছে তাতে নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-আমোদের দিকে নজর দিলে ত চলে না। সেজন্যে মোটেই দুঃখ নেই ; তবু একটা দুঃখ আছে বৈকি। সেই কথাই এক দিন সূর্য্যিবাবুকে বললে বলাই। তখন রমানাথের কাকার সেবা চলছে, আরও সবাই ছিল।

বলাই বললে, "গরম, ছুটিটাও এইতে কেটে গেল, তাতে দুঃখ নেই কাকা, দুঃখ রামসহায়বাবু মারা গেলেন, কেউ একবার ডাকলে না সেবা-সঙ্ঘকে ! যেন সেবা-সঙ্ঘ বলে শহরে নেই কিছু।"

"উনি হার্টফেল করে হঠাৎ মারা গেলেন কিনা।"

বলাই চুপ করে রইল। একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়ল, তবে সেটা যে রামসহায়বাবুর হার্টফেল করে মারা যাবার জন্যেই এমন মনে হয় না। চুপ করেই রইল—কেমন যেন একটা অভিমান লেগে রয়েছে কোথায়। যজ্ঞেশ্বর বললে, "কথাটা হচ্ছে কাকা, সারিয়ে তুলতে পারছি আমরা সে ভগবানের দয়া আর আপনাদের আশীর্ব্বাদ ; কিন্তু শুধু সারিয়ে তোলাটাই ত সেবা নয়। যাদের ভগবান নিজের হাতেই তুলে নিলেন—গীতায় যেমন বলেছেন, তাদেরও শেষ পর্য্যন্ত···"

অনিলের দৃষ্টিতে একটু প্রতিশোধেরই ভাব ছিল লেগে, বললে, "তাই আমরা ঠিক করেছি রামসহায়বাবুকেও যদি ভগবান নিজের হাতে···"

যুগোল টিপে দিতে চুপ করে গেল।

৩

রমানাথের কাকা বেঁচে যাওয়ার পর আরও কেমন যেন একটা এলাকাড়ি পড়ে গেল। যশ বেড়েছে, টাকাও আপনিই এসে পড়ছে, সঙ্ঘের উন্নতি হয়েছে আরও, তবু কেমন যেন জুৎ নেই।

তারপর যুগোল একদিন হন্তদন্ত হয়ে এসে উপস্থিত হ'ল। উৎসাহে মুখটা রাঙা হয়ে গেছে, খবর দিলে– "হয়েছে রে ! নিবারণবাবুর মাদার ডাউন এবার—তিরাশী বছর বয়েস !···"

তাতে হয়েছে-টা কি সেটা বললে না অবশ্য, তবে সবারই মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর সবাই যেন একটু লজ্জিতও হয়ে পড়ল। বলাই সামলে নেবার চেষ্টা করেই বললে, "হ্যাঁ, একে টেনে তুলতে পারি তবে আমাদের সঙ্ঘের

"একটি একটি করে চিবুক স্পর্শ করে চুমো খেলে"

আস্তে গিয়ে পড়ল, বেশ রপ্ত হয়ে উঠেছে ত।

সেবাও কাকে বলে দেখিয়ে দিলে। এদিকে শেষের ছুটো কেসে একটু যেন অবসাদ এসে গিয়েছিল আবার নূতন উৎসাহ নিয়ে লেগে পড়ল সবাই।

করে তুললে চাঙ্গা। এক রকম অসাড়-অচৈতন্যই হয়ে পড়েছিল বুড়ী, দিনদশেকের মধ্যে আবার চনমনে হয়ে উঠে বসল, পথ্যি করলে, বললে, "কোথায় সব—যারা দেখাশুনো করছিল? ডাক সবাইদের, দেখি একবার ভাল করে। ভরসা কি ছিল যে আবার পাব দেখতে?"

একটি একটি করে সবার চিবুক স্পর্শ করে চুমো খেলে, কাঁপা-গলায় আশীর্ব্বাদ করলে—"দীর্ঘজীবী হয়ে বেঁচে থাক সব, বাড়বাড়ন্ত হোক, মনস্কামনা পূর্ণ করুন ঠাকুর..."

বিড়বিড় করে আরও অনেক কথা।

আশীর্ব্বাদ নিয়ে মনমরা হয়ে বেরিয়ে এল সবাই; দু'এক জন ফোঁপাচ্ছে। যারা কাছে ছিল বলাবলি করলে—এরকম হয়ই কিনা—এত বুড়ো-মানুষের আশীর্ব্বাদ। মনটা উথলে-উথলে উঠছে—আহা, ছেলেমানুষই ত সবাই।

কেরামতি বটে! ভগবান যেমন মুখ রেখে এসেছেন আমাদের তেমনি রেখে যাবেন কি?...আহা, বড্ড ভাল বুড়ী; দিদিমা-দিদিমা বলি ত..."

অনিল বললে, "ডাকে আমাদের তবে ত..."

যুগোল কতকটা ভয়ে কতকটা বিরক্তিতে বললে, "তারপর হয়তো ডাকার আগেই রামসহায়বাবুর মতন হার্টফেল করে বসবে, কে কার সেবা করবে!"

অনিল বললে, "তখন ডাক বড়দের!"

হার্টফেলও করলে না, ডাকও পড়ল সেবা-সঙ্ঘের। লোক আছে সেবা করবার, তবে সুধিয়বাবুর কেস্, কি ভেবে তিনি সেবা-সঙ্ঘের ছেলেদেরও ডেকে পাঠালেন। একবার এসে পড়ার পর ওদের হাতেই সেবা-শুশ্রূষার ব্যাপারটা আস্তে

বহুদিন আগেকার কথা, একেবারে ছেলেবেলার। তারপর সবার বাড়বাড়ন্তও হয়েছে, দীর্ঘজীবীও হয়েছে সবাই, তবে মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার কোথায় একটু খুঁত থেকে গিয়েছিল, সত্তটি আশীর্ব্বাদ পাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে যায়।
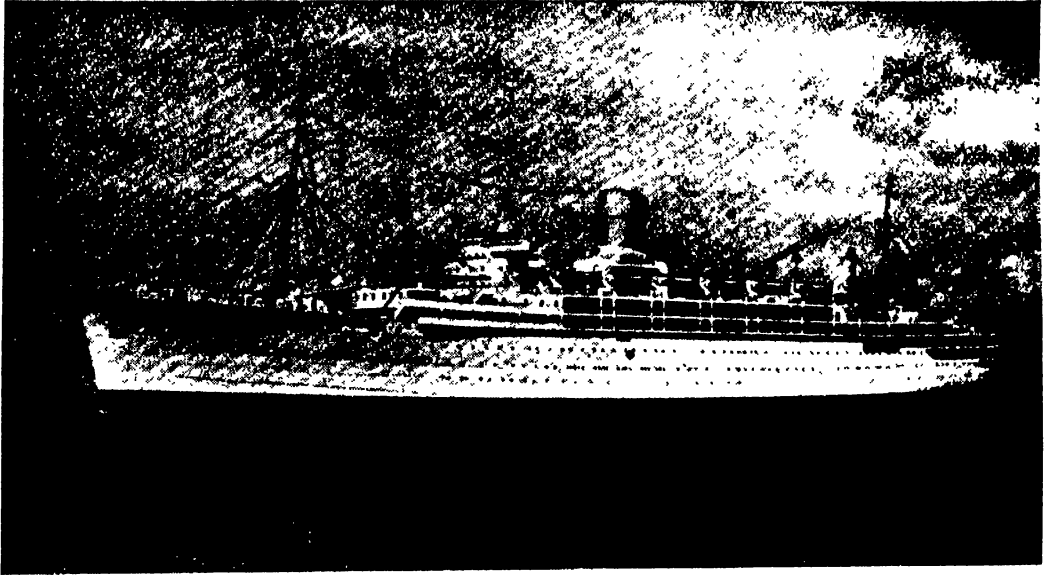
'পি এণ্ড ও' কোম্পানীর নবতম যাত্রী-জাহাজ 'চুজ্ঞান' (২৪০০০ টন)

সাগর দোলায় দোলে না এ তরী !

শ্রীনরেন্দ্র দেব

অকূল সমুদ্রে ভাসছি !

জাহাজের নাম "চুজ্ঞান"। চলেছে পৃথিবীর উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে। সপ্তসাগর পাড়ি দিয়ে বোম্বাই ও কলম্বো ছুঁয়ে, পেনাঙ্ ও সিঙ্গাপুরেও নোঙর ফেলে 'চুজ্ঞান' তার যাত্রা শেষ করবে মহাচীনের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হংকং বন্দরে পৌঁছে।

আমরা ইউরোপ ভ্রমণ শেষ করে ভারতে ফিরছিলাম। বোম্বাইয়ে নেমে যাব। জাহাজে আমাদের মেয়াদ মাত্র চৌদ্দ দিন। 'চুজ্ঞান' 'পি এণ্ড ও' কোম্পানীর এক সুবৃহৎ জাহাজ। চব্বিশ হাজার টন। মাত্র ১৯৫০ সনের জুন মাসে প্রথম জলে ভেসেছে। একেবারে ঝকঝকে নূতন। ভাড়া একটু বেশি। তবু এই জাহাজেই আসতে হ'ল। কারণ নবেম্বরের শীতে লণ্ডন আমাদের কাছে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল।

জাহাজ তো নয় একটি যেন ভাসমান বিরাট রাজপ্রাসাদ ! প্রাসাদটি আটতলা। আমরা স্থান পেয়েছিলাম 'E' ডেকের পাশাপাশি দুটি ডবল বার্থ কেবিনে। সে প্রায় পাতাল বললেই হয়। এ জাহাজখানি পি এণ্ড ও কোম্পানী বিশেষভাবে তৈরি করিয়েছেন যুক্তরাজ্য থেকে ফার্-ঈস্টে যাতায়াত করবার উপযোগী করে। এর দৈর্ঘ্য ৬৭২ ফুট; প্রস্থে ৮৫ ফুট, উচ্চতা ৭০ ফুটের বেশী হবে। কারণ এই আটতলা জাহাজের প্রত্যেক তলাটির উচ্চতা গড়ে অন্ততঃ আট ফুট হবেই। এর মধ্যে আবার 'A' ডেকের উচ্চতা অন্যান্য ডেকের চেয়ে একটু বেশী। এর ইঞ্জিনের বিক্রম

চুজ্ঞানের ক্যাপ্টেন আর. ই. টি. টানব্রাজ্

হচ্ছে সাড়ে বিয়াল্লিশ হাজার 'জাহাজী-অশ্বশক্তি'। বোঝা গেল না বোধ হয় কিছু ! চেষ্টাও করব না বুঝবার। কারণ

এই টারবাইন সংযুক্ত ডবল ইঞ্জিনের ব্যাপার আমরাও বুঝি নি! শক্তি-পূজকের জাত হলে কি হবে, শক্তির সঙ্গে পরিচয় আমাদের খুবই কম! সাধারণ জ্ঞান কতটুকুই বা!

'এ' ডেকে প্রথম শ্রেণীর বৈঠকখানা

'চুস্তান' জাহাজখানি দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী বা 'ফার্ষ্ট ক্লাস' আর যাত্রী শ্রেণী বা 'ট্যুরিষ্ট ক্লাস'। দুই শ্রেণী জড়িয়ে মোট এক হাজার ছাব্বিশ জন যাত্রী এঁরা নিতে পারেন। প্রথম শ্রেণীতে ৪৭৫ জন এবং 'যাত্রী'-শ্রেণীতে ৫৫১ জন যেতে পারেন। বলা বাহুল্য, আমরা ছিলাম এই 'ট্যুরিষ্ট' শ্রেণীর যাত্রী। এ ছাড়া, জাহাজের পরিচালক ও কর্ম্মীদের সংখ্যাও হবে ৫৭০ জন। অর্থাৎ, এই আটতলা ভাসমান অট্টালিকাখানির লোকসংখ্যা প্রায় ১৬০০ শত! পি এণ্ড ও কোম্পানীর মতে এইখানিই তাঁদের প্রাচ্যদেশ-গামী জাহাজের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী! কারণ এর গতি নাকি ঘণ্টায় ২২ 'নট'।
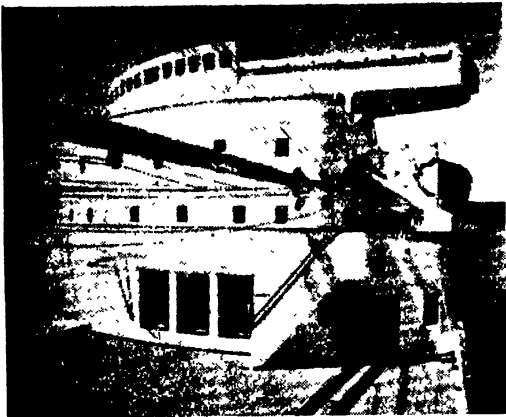
চুস্তান—উপরে 'স্পোর্টস-ডেক', তলায় 'বোট-ডেক', সামনে 'এ' ডেক

'চুস্তান' রূপসী তরণী। একেবারে যাকে বলে 'কুন্দেন্দু-তুষার-ধবলা' শ্বেতাঙ্গিনী। ভিতর-বার ধবধবে সাদা! দু'পাশে দুটি পাল তুলে দেবার সুদীর্ঘ মাস্তুল আছে। যদিই কোনও কারণে ইঞ্জিন কখনো অচল হয়ে পড়ে, জাহাজ পাল তুলে দিয়ে যেতে পারবে। এ সুবিধা বিমানযাত্রীদের নেই: ইঞ্জিন বিগড়ে গেলেই বিমানের স্বর্গ থেকে সশরীরে ভূতলে পতন ও অশরীরে স্বর্গযাত্রা!

ষ্টীম ও ইঞ্জিনের ধোঁয়া বেরুবার জন্য একটিমাত্র মোটা বেঁটে এবং ঈষৎ পীতাভ চোঙ্ বা ফানেল আঁটা আছে। এই চোঙাটির মুখের দু'পাশে অর্থাৎ জাহাজের দু'ধারেই 'চুস্তান' নামটি 'নিয়ন লাইটে'র বড় বড় হরফে লেখা আছে। অন্ধকার রাত্রে সমুদ্রবক্ষে এই আলোকোজ্জ্বল অক্ষরগুলি ভারি সুন্দর দেখায়।

জাহাজের প্রত্যেকটি উচ্চপদস্থ কর্মচারীই প্রবীণ ও অভিজ্ঞ। যিনি কর্ণধার, ক্যাপ্টেন আর. ই. টি. টানব্রীজ ডি-এস্-সি, আর.ডি. আর-এন্-আর, অত্যন্ত অমায়িক ভদ্রলোক। একদিন তাঁর সাদর আমন্ত্রণে আমরা 'ফার্ষ্ট-ক্লাস' পরিদর্শনে এবং নাবিকদের নিজস্ব আস্তানায়, মায় পোত পরিচালকদের ঘর এবং ইঞ্জিন রুম সব কিছুই ঘুরে দেখে আসবার সুযোগ পেয়েছিলাম। পূর্বেই বলেছি, জাহাজ-খানি দুটি অংশে বিভক্ত। মাঝামাঝি ভাগ করে অর্দ্ধেকটা 'ফার্ষ্ট ক্লাস' করা হয়েছে এবং বাকি অর্দ্ধেকটা 'ট্যুরিষ্ট ক্লাস'!

ফার্ষ্ট ক্লাসের যাত্রীরা প্রায় সবাই ধনকুবের। এঁদের মধ্যে কালোবাজারী বণিক সম্প্রদায় এবং তাঁদের প্রতিনিধিরাও কেউ কেউ আছেন। কোম্পানীর খরচায় যাত্রী আপিসের বড়সাহেব, বড় ডাক্তার, ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসের লোক, কোম্পানীর উঁচু অফিসার এঁরাও আছেন। আমাদের দু'জন পরিচিত বাঙালী বন্ধুও ফার্ষ্ট ক্লাসের যাত্রী হয়ে আসছিলেন, ডাক্তার লাহিড়ী এবং শ্রীলোকেন গুপ্ত মহাশয়। এঁরা বড়বাবুদের ঘরোয়ানা হলেও অধিকাংশ সময় আমাদের পাড়ায় এসে কাটিয়ে যেতেন। ফার্ষ্ট ক্লাসে আরও অনেক সৌভাগ্যবান বাঙালী যাত্রী ছিলেন, কিন্তু তাঁরা ট্যুরিষ্ট ক্লাসে আসা আদৌ পছন্দ করতেন না।

'ট্যুরিস্ট ক্লাসে' যত মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত ভদ্রলোকের সমাবেশ। একই জাহাজকে দুই ভাগে ভাগ করার ফলে দুই সরিকদের জন্য জাহাজের দু'দিকেই সবকিছু ব্যবস্থা ডবল করে করতে হয়েছে। 'ট্যুরিস্ট' ক্লাসের যাত্রীদের ফার্স্ট ক্লাসের দিকে যাওয়া নিষেধ! ঠিক যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় 'মালান-সরকার' শাদাদের পাড়ায় কালাদের থাকতে দিচ্ছেন না আর কি! তেমনি, ট্যুরিস্ট ক্লাসের যাত্রীদের এঁরা ফার্স্ট-ক্লাসের দিকে বেড়াতে যেতে মানা করে একখানি বিজ্ঞপ্তি-বোর্ড সীমান্ত পথে ঝুলিয়ে রেখেছেন! কিন্তু ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীরা ইচ্ছা করলে যখন খুশী ট্যুরিস্ট ক্লাসে পদার্পণ করতে পারেন। আমরা এর বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করব ভেবেছিলাম, কিন্তু যখন শোনা গেল সমুদ্রবক্ষে জাহাজের ক্যাপ্টেনই এই

'বি' ডেকে—'কেবিন-ডি-লুক্স' (নিজস্ব বারান্দা সংলগ্ন)

পোত সাম্রাজ্যটির একচ্ছত্র অধীশ্বর এবং তাঁর ইচ্ছাই এখানে আইন, আর তিনি ইচ্ছা করলে জাহাজের নিয়মভঙ্গকারী বিদ্রোহী যাত্রীদের সত্যাগ্রহ বন্ধ করবার জন্য তাঁদের পাঁজা-কোলা করে তুলে ধরে সাগর-সলিলে নিক্ষেপ করতে পারেন, তখন আমাদের উৎসাহ একেবারে হিম হয়ে গেল! তবে, হ্যাঁ, আমাদের সান্ত্বনা ছিল এই যে, ফার্ষ্ট ক্লাসের ভাড়া দিলে কালা ও বাদামী আদমিরাও সাদা মানুষগুলোর গা-ঘেঁষে ফার্ষ্ট ক্লাসে যেতে পারবে। জাহাজের খোল এখনও সম্পূর্ণ মালানের দক্ষিণ-আফ্রিকা হয়ে উঠে নি। চাঁদীর জুতো মেরে বাঁদীও বেগম হতে পারে এখানে।

এই আটতলা জাহাজে আটটি টানা ডেক আছে। তার মধ্যে সাতটি হ'ল যাত্রী ও খালাসীদের জন্য। আর একটি ক্যাপ্টেন ও তাঁর সহকর্ম্মীদের। এই মহলটি জাহাজের সর্ব্বোচ্চ স্তরে। এটিকে যদি এই ভাসমান অট্টালিকার ছত্র-মঞ্জিল বলে ধরা যায় তবে উপর থেকে নিচের দিকে নামতে দ্বিতীয় তলাটা হয় 'বোট-ডেক'। এখানে ঝুলছে সারি সারি সব 'লাইফবোট'। ৯৯ জন যাত্রী নিতে পারে এমন ১৪ খানি বোট, ৩৫ জন যাত্রী নিতে পারে এমন ২ খানি বোট, দুখানি ৭০ জনকে নেবার মত মোটর-বোট এবং দুখানি ২৮ জনকে নেবার মত ভেলার বন্দোবস্ত

চুস্তানের পার্সার মিঃ আর, জি, নিউবারি

আছে! অর্থাৎ, জাহাজের প্রায় সব যাত্রীকেই আপৎ কালে রক্ষা করবার আয়োজন পুরোপুরিই করা হয়েছে। এ ছাড়া, প্রত্যেক যাত্রীর ঘরে তার মাথার শিয়রেই সর্ব্বক্ষণ রাখা হয়েছে এক-একটি 'লাইফ-বেল্ট'। মাঝে মাঝে যাত্রীদের 'বোট ডেকে' জড় করে এই 'লাইফ বেল্ট' ব্যবহার করার কৌশল শেখান হয়। এই 'বোট-ডেকে'ই ৬টি কোর্ট করা আছে 'ডেকটেনিস' খেলবার। এ ছাড়া বারোটি 'কোয়েট' খেলবার ছক কাটা দাগ আছে। এ খেলাটি আর কিছুই নয়, একটি নির্দ্দিষ্ট বিন্দুতে দাঁড়িয়ে অদূরস্থ একটি নির্দ্দিষ্ট দাগকাটা গণ্ডীর মধ্যে একটি চামড়ার বিঁড়ের মত চাকা ছুঁড়ে ফেলা। সেই গণ্ডীর মধ্য বিন্দুতে বা তার খুব কাছে যার চাকা গিয়ে পড়ে বেশি বার সেই হয় এই খেলায় জয়ী।

তার পরেই জাহাজের 'A' ডেক। এর চার পাশে খানিক চাল ঢাকা, আর খানিক খোলা-ফাঁকা। এখানে সারি সারি অসংখ্য ডেকচেয়ার পাতা রয়েছে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় জাহাজের মাত্র দুটি পাশ আছে। কিন্তু জাহাজের ভিতরে গিয়ে উঠলে বোঝা যায় যে, প্রত্যেক জাহাজেই চারটি পাশ আছে এবং প্রত্যেক পাশটিই বেশ প্রশস্ত। জাহাজ যে মুখে চলে সেই মুখের দিকটা হ'ল

জাহাজের সম্মুখ ভাগ। এই সামনের দিকের চওড়া ডেকটিকে বলে 'Promenade Deck'। এর মাথা খোলা, কোনও চাল নেই। এই প্রশস্ত প্রাঙ্গণে প্রত্যেক যাত্রীরই ঠাঁই হতে পারে। জাহাজের পেছন দিকটিকে বলে জাহাজের পুচ্ছ দেশ! এও বেশ প্রশস্ত। মাথা খোলা, ছাদ নেই। এটিক বলে 'Rear Deck'। 'প্রমিনেড ডেক' পড়েছে ফার্ষ্ট ক্লাসের ভাগ্যবান যাত্রীদের ভাগে, কারণ তাঁরা বেশী টাকা দিয়ে মুখপাতে গিয়ে বসেছেন। আমরা টুরিষ্টের দল পেয়েছি পুচ্ছদেশের এই 'রীয়ার ডেক'। আমাদের লেজে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে আর কি!

চুজানের "ব্যুরো" বা দপ্তরখানা

তারপর হ'ল জাহাজের দুটি পাশ, যাকে বলে Broad side! এই 'ব্রড সাইড' দুটির আবার পৃথক নাম। একটি দিককে বলে Port side বা বন্দরের দিক, অপর দিককে বলে star Board অর্থাৎ, পোতাগ্রভাগের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে যেদিক ডাইনে পড়ে। যখন যে মুখো জাহাজ চলে তখন সেই মুখের বন্দরের দিকটাকেই বলে 'পোর্ট সাইড' বা 'বন্দরবাহু' আর বিপরীত দিকটাকে বলে 'ষ্টার বোর্ড'! বা দক্ষিণ মঞ্চ। কাজেই জাহাজের এ দুটো দিক পর্য্যায়ক্রমে কখনও পড়ে ডাইনে, কখনও বাঁয়ে। দু'দিকেই এ চালঢাকা। বারান্দা বা রেলিং-ঘেরা আছে জাহাজের চারদিক।

'প্রমিনেড ডেকে' প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করবার নানা ব্যবস্থা আছে। এখানে সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়বে ধনী যাত্রীদের শিশুগণের জন্য 'খেলা-ঘর' বা Nursery! এখানে হরেক রকম শিশুতোষ খেলনা ও বাল-মনোরঞ্জিনী বিবিধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আছে। ছুটোছুটি করে খেলবার একটু খোলা মাঠও আছে এবং জলে নেমে হাত পা ছুঁড়ে খেলার উপযোগী ছোট জলাশয়ও আছে। জাহাজ-কর্ত্তৃপক্ষ শিশুদের দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধান করবার জন্য একজন মাসীমা (Hostess) রেখেছেন। মায়েরা তাঁর কাছে নিজেদের ছেলেমেয়ে জিম্মা দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে জাহাজের ক্রীড়া-কৌতুক ও আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করেন।

প্রথম শ্রেণীর লাইব্রেরী ও লিপি-ঘরখানি ভারি চমৎকার! এখানে এসে বই পড়, চিঠি লেখ, ভ্রমণ-কাহিনী রচনা কর বা সমুদ্রের তরঙ্গে দুলে উঠা মন নিয়ে কবিতা লিখতে বস, কেউ বিরক্ত করবে না। এই সুসজ্জিত ও সুচিত্রিত হলগুলি বেশ প্রকাণ্ড এবং প্রচুর আলো-হাওয়া আছে। বিশেষ করে ভাল লাগে এর সুন্দর গড়নের জন্য। জাহাজের
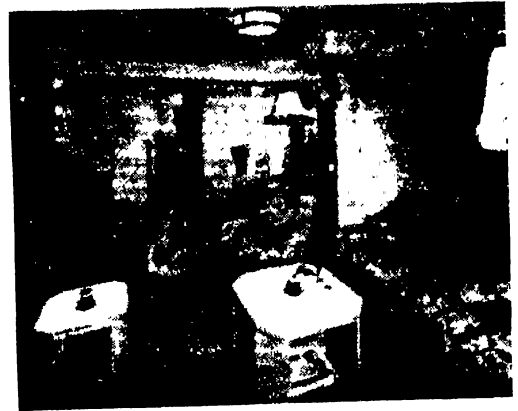
পার্লারের ঘর

চওড়া টানা 'ব্রীজ' অর্থাৎ পোতাধ্যক্ষের পোতপরিচালনা-মঞ্চটি (Bridge) এর এক পাশ দিয়ে সুসঙ্গত বঙ্কিম ভঙ্গীতে ঘুরে যাওয়ায় এর আকারে একটা সুষমা ফুটে উঠেছে!

এ ঘরের মধ্যে সবচেয়ে যা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা হচ্ছে এর প্রাচীর চিত্রের অপূর্ব্বসম্পদ! কিছুই না, মাত্র গুটি কয়েক স্তম্ভশ্রেণীর উপর সুদৃশ্য তোরণাকৃতি একটি আচ্ছাদন আঁকা! কলা-সিদ্ধ শিল্পীর তুলির আঁচড়ে এই সামান্য ছবিটুকুই অসামান্য হয়ে উঠেছে। রাত্রের বিজলী আলোকে এ ছবি বেশ একটা দৃষ্টিবিভ্রম উৎপাদন করে। মনে হয় এ ঘরখানি যেন আরও বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত! এই চিত্রের বর্ণবিন্যাস অতি প্রশান্ত ও পেলব। আশমানী নীলিমাই এর প্রধান রং। এ ঘরের পর্দাগুলি সোনালী ও হরিণ শিশুর মেদুর বর্ণে রঞ্জিত হওয়ায় বড় সুন্দর মানিয়েছিল।

রঙের রঙ্গীন মোহ থেকে বেরিয়ে একটু বাস্তবে আসা যাক। 'বন্দর বাহু' থেকে 'দক্ষিণ মঞ্চে' যাতায়াত করবার জন্য মাঝে মাঝে গলিপথ আছে। এগুলো এ পাশ থেকে ওপাশে যাবার 'শর্টকাট।' সারা জাহাজ প্রদক্ষিণ করতে

হবে না। লাইব্রেরী ও লেখাপড়ার ঘরের পরই এমনিতর একটি গলি আছে, তার পরই প্রথম শ্রেণীর 'লাউঞ্জ' বা বৈঠকখানা। এখানে নরম পুরু গদিওয়ালা আরাম আসনে হেলান দিয়ে বসে অলস বিলাসে খোশগল্প করে সময় কাটান যায়। বলা বাহুল্য, এ ঘরের সুপরিকল্পিত প্রত্যেকটি আসবাবপত্র লক্ষপতিদেরই ব্যবহারযোগ্য। এখানেও প্রাচীর-গাত্রের বর্ণবিভা ও প্রাচীরচিত্র আমার দৃষ্টিকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। প্রাচীরগাত্রে যে রঙ ছিল তা অনেকটা গোলাপীঘেঁষা হওয়ায় দৃষ্টি স্নিগ্ধকর। বাতায়নের পর্দাগুলিও গোলাপী রঙের ভেলভেটে তৈরি। এই মখমলের ঝলমলে চিকণ লেস আর পর্দা-ঝোলানো রঙীন ঘরে বসে উৎকৃষ্ট সুরা ও সরেশ সিগারের গুণে যাত্রীদের মন কোন্ বাদশাহী সুখ-স্বপ্নের প্রসন্নতায় ভরে ওঠে। অবশ্য এ ঘরে বসে কোনও যাত্রীর সুরা ও ধূমপানের অধিকার নেই। সুরাপানের জন্য পৃথক 'পানশালা' এবং ধূমপানের জন্য পৃথক "Smoking chamber" আছে। সুতরাং ও পথের যাঁরা পথিক নন তাঁরা এ বৈঠকখানায় সম্পূর্ণ নিরাপদ! সবচেয়ে ভরসার কথা যে, এখানে কেউ মাতলামি করেন না।

চুজানে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের খানা-ঘর

প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর একলা থাকার কেবিন

'লাউঞ্জে'র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সম্পদ হ'ল ঘরের ভিতরে শোভাবর্দ্ধক বড় বড় ছখানি দীর্ঘাকৃতি সুরঙীন প্রাচীর-চিত্র। ছবি ছখানি গাঢ় সবুজ রঙের লাক্ষা পালিশের গুণে বেশ উজ্জ্বল অথচ প্রীতিকর লাগছিল চোখে। ছবি ছখানির বিষয়বস্তু কিন্তু সেই মার্কোপোলোর ভ্রমণ-কাহিনী থেকে নেওয়া কুব্লয় খাঁর জীবনের কয়েকটি অবিস্মরণীয় ঘটনা!

লাউঞ্জের পিছনেই প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট নৃত্যাঙ্গন। এখানে নৈশভোজের পর রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত নৃত্যগীত চলে। এখানেই প্রতি সপ্তাহে চলচ্চিত্রও দেখানো হয়। তখন চারিপাশ পর্দা দিয়ে ঘিরে একে একেবারে সিনেমা-হলে রূপান্তরিত করা হয়। এখান থেকে 'পানশালা'
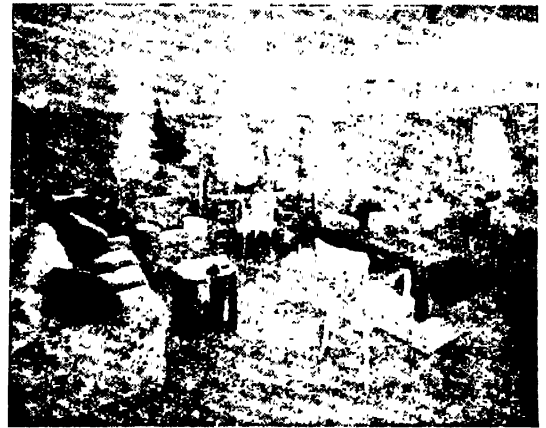
কাপ্তেনের ঘর

কাছেই। এটির নাম দিয়েছেন এঁরা "Verandah Cafe" অর্থাৎ 'অলিন্দ পানছত্র'। এখানকার প্রাচীর-গাত্রের রঙটিও বেশ; গজদন্তের মত শুভ্র ও ধূসর পলিতের সংমিশ্রণ। প্রশস্ত স্থান এটি। অনেক লোকের এখানে একত্রে বসে বিবিধ পানীয় সেবনের ব্যবস্থা আছে। এর পরেই প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের স্নান ও সন্তরণের জন্য নাতিবৃহৎ জলাশয়।

পূর্ব্বোক্ত 'অলিন্দ-পানছত্র' থেকেই সোজা সিঁড়ি বেয়ে নেমে 'A' ডেকের প্রথম শ্রেণীর কামরাগুলিতে যাওয়া যায়। ফার্ষ্ট ক্লাসের যাত্রীদের কাছে জাহাজে ভ্রমণ যেন মনে হয় অর্ণব-স্বর্গে জলধি-বিলাস। জাহাজ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষরাই যাত্রীদের আনন্দ-বর্দ্ধনের একাধিক ব্যবস্থা করে রেখেছেন, যেমন বিবিধ indoor এবং out-door খেলা, সিনেমা, রেডিও, Dog-Race, Howsie প্রভৃতি জুয়াখেলা। এই

. পোত-পরিচালন কক্ষ

জুয়ার প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ সব দেশের যাত্রীদের মধ্যেই দেখা যায়। চুঙ্গানের যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন ইংরেজ, আইরিশম্যান, স্কচ, ইহুদী, পর্ত্তুগীজ, আমেরিকান, ইরাণী, মিশরী, আরব, পার্শী, মাড়োয়ারী, আসামী, ভাটিয়া, মরাঠী, বাঙালী, সিংহলী, বর্ম্মী, চীনে, ট্যাশ-ফিরিঙ্গী, সিন্ধী, পঞ্জাবী, আর্মেনিয়ান, ইটালিয়ান, তুর্কী ও ভারতীয় মুসলমান, ওড়িয়া, গুজরাটি প্রভৃতি হরেকরকম জাতি ধর্ম্মের নর-নারী। জুয়ার আড্ডায় এদের বাজী জেতার উৎসাহ কারুর চেয়ে কম বলে মনে হ'ল না। জাহাজ যেন মনে হয় একটি মহাদেশ বা ছোট্ট পৃথিবী যেখানে সকল বর্ণের, সকল ধর্ম্মের, সকল জাতের ও সকল ভাষার মানুষেরা কিছু দিনের জন্য নিজেদের ভেদাভেদ ভুলে এক হয়ে গিয়েছে! জাহাজ বন্দর থেকে ছাড়বার পর নূতন যাত্রীদের সংবর্দ্ধনার জন্য ক্যাপ্টেন একদিন রাত্রে সকলকে ভুরি-ভোজনে আপ্যায়িত করেন। সে রাত্রের নৈশভোজের তালিকা একখানি সচিত্র কার্ডে ছাপা হয়। সেদিন বিনামূল্যে যাত্রীদের রকমারি উৎকৃষ্ট সুরা পরিবেশন করা হয়। হরেকরকম রঙীন কাগজের টুপী ও রবারের বেলুন বিলি করা হয় প্রত্যেককে। সে রাত্রে তরণীবক্ষে যাত্রীদের নৃত্যগীত চলে রজনীর তৃতীয় যাম পর্য্যন্ত! ঠিক এরই পুনরভিনয় হয় জাহাজ বড় বড় বন্দরে গিয়ে লাগবার পূর্ব্বরাত্রে! সেটি যাত্রীদের বিদায়-ভোজ! এ ছাড়া ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা, ফ্যান্সী ড্রেস বা সৌখীন সাজের প্রতিযোগিতা, নৃত্যগীত, আবৃত্তি, অভিনয়, যন্ত্র-সঙ্গীত, হাস্য-কৌতুক, যাদুবিদ্যা, জিমন্যাষ্টিক, এসব যাত্রীরা নিজেরাই আয়োজন করেন নিজেদের মধ্যে একটি কমিটি করে। এঁরা যাত্রীদের মধ্যে কার কি গুণ আছে সেটা অনুসন্ধান করে আবিষ্কার করেন এবং তার জন্য বিশেষ

"এ" ডেকে টুরিষ্টদের বৈঠকখানার একাংশ

আসরের ব্যবস্থা করেন। আগেই বলেছি, জাহাজে যা-কিছু হবে তা ফার্ষ্ট-ক্লাস ও 'ট্যুরিষ্ট-ক্লাস' উভয় পাড়াতেই হবে, এবং এ নিয়ে প্রতিযোগিতা ও উত্তেজনার অন্ত থাকে না। কাজেই জাহাজের দিনগুলো যে কোথা দিয়ে কেমন করে কেটে যায় বোঝা যায় না।

'A' ডেকে একলা থাকার সুসজ্জিত ঘর আছে ৪২ খানি। যুগলে থাকার ঘর আছে ৩৯ খানি, এর মধ্যে আবার ১৪ খানি ঘরের গৃহ-সংলগ্ন নিজস্ব স্নানাগার আছে। পোতাগ্রভাগেই জাহাজের উপর-নীচের উঠা-নামার প্রশস্ত সুন্দর সিঁড়ি এবং দুটি বৈদ্যুতিক লিফ্‌ট আছে। পিছনেও ট্যুরিষ্টদের জন্য বৈদ্যুতিক লিফ্‌ট ও সাধারণ সিঁড়ি আছে। 'A' ডেকের ঠিক প্রধান প্রবেশ-দ্বারের কাছেই প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের 'ক্ষৌরীঘর' এবং 'সব পেয়েছির দেশে'র মত একখানি দোকান ঘর। জাহাজের এই দোকানে সংসারী মানুষের প্রয়োজনীয় হেন জিনিস নেই যা পাওয়া যায় না। দামও খুব সস্তা, কারণ জাহাজে কেনা-বেচার ওপর কোনও শুল্ক বা ট্যাক্স দিতে হয় না! এখানে সমস্ত জিনিসই 'Duty-free'! আশী টাকার ফাউন্টেন পেন এখানে পঞ্চাশ টাকায় কেনা যায়। আড়াইশো টাকার ঘড়ি

পাওয়া যায় দেড়শো টাকায়। ওশেনিয়া ট্রেডিং কোম্পানীর একচেটে কারবার জাহাজে।

এই 'A' ডেকেরই অপর প্রান্তে ট্যুরিষ্টদের জন্যও 'ক্ষৌরঘর' আর তাঁদেরও মনিহারী বিপণি আছে। ট্যুরিষ্টদের 'A' ডেকেও জাহাজের ডাইনে-বাঁয়ে গ্যালারী। ইচ্ছামত পর্দা ঘিরে ঢাকাঘর করে নিয়ে তার মধ্যে নৃত্যগীত ও 'সিনেমা শো' চলে। দিনের বেলা ডেক-চেয়ার পেতে জাহাজী আড্ডা, বই-পড়া, সমুদ্র দর্শন বা ঘুম যা খুশী কর। আমাদের বেশ একটি উচ্চাঙ্গের আড্ডা জমেছিল। 'প্রাইস ওয়াটার হাউস, পীট এণ্ড কোম্পানী'র ভারতীয় অংশীদার সদাহাস্য মুখ, অদম্য উৎসাহী শ্রীযুক্ত রবি সেন এবং তাঁর শান্ত নম্র সরলস্বভাবা পত্নী শ্রীমতী বুলু সেন, ঈষৎ আদিরসাত্মক হাস্যরসিক এবং চটকদার গাল-গল্পবাজ পুলিস কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত অবনী দত্ত, ইনি শিকার-প্রিয়, কুকুর-প্রিয়, ক্যামেরা-প্রিয় এবং কামিনী-প্রিয়। অবশ্য পর-কামিনী নয়। স্ত্রীর গল্প তাঁর মুখে প্রায়ই শোনা যেত। পত্নীর জন্য সুবর্ণ বলয়যুক্ত একটি 'কামিনী-ঘড়ি' কিনেছিলেন —সকলকেই দেখাতেন। বোঝা যেত তিনি বেশ একটু বিরহ কাতর হয়ে পড়েছেন। জাহাজের উপর আমাদের সকলের চলচ্চিত্র তুলেছিলেন তিনি। কিন্তু সে চলচ্চিত্র সচল হয়েছে কিনা খবর পাই নি।

ক্রমশঃ

বিরহিণী

শ্রীকৃষ্ণধন দে

দ্বাদশীর চাঁদ-ওঠা আকাশে
একখানি সাদা মেঘ ভাসে কি?
কোথা থেকে বাঁশী-কাঁপা বাতাসে
ঘুমহারা ভুঁইচাঁপা হাসে কি?
এলোমেলো ঝড় বুঝি এলো রে
ঝাউ বন এ কি ভাষা পেলো রে?
মাঝ রাতে চোখে ঘুম আসে কি?
তুমি আজ এসে মোর কুটীরে
সারা রাত বসে' রবে পাশে কি?

রজনীর কালো চুলে বেণীটি
কে বাঁধিল সজিনার কুঁড়িতে?
তটিনীর ঢেউ-ভাঙ্গা ধ্বনিটি
কে বাজালো বেলোয়ারি চুড়িতে?
জ্বল্ জ্বলে লাল তা'রা টিপ কি?
আধখানি চাঁদ হাতে দীপ কি?
আঙিনায় এলে ফুল পাড়িতে?
জোনাকীরা ঢাকে মুখ ঘোমটায়
ঝিকিমিকি চুমকির সাড়ীতে?

আসে ঝড় থম্‌থমে প্রহরে,
রাত যেন চায় না'ক কাটিতে!
ধ্রুবতারা কাঁপে বন-শিয়রে,
আকাশ কি ঢুলে পড়ে মাটিতে?
সাত ভাই চম্পা কি নামিল,
পারুলের কাছে রথ থামিল,
শুকতারা এল পথে ফুটিতে?
ফালি চাঁদ নামে জলে নদীটির,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে কথা কয় ছুটিতে।

উষালোকে সব তারা চলে যায়
নিশাশেষে কেন তৃষা বাড়ালে?
প্রদীপের শেষ শিখা বলে' যায়—
একটি মধুর নিশা হারালে!
শিশিরের আঁখিজলে ভিজানো
ধরার মনের কথা কি জানো?
—মিছে কেন মনে রঙ ধরালে?
নিমেষহারানো চোখে জাগিয়া
ভুল করে' কারে মালা পরালে?

যে গান কখনো আমি গাহিনি
সে গান এসেছে ভেসে আকাশে,
এ জীবনে যারে আমি চাহিনি
সে যে এল দক্ষিণা বাতাসে!
যে ফুল গাঁথিনি আমি মালাতে
সেও এল মিছে মন ভুলাতে,
ভীরু বাণী রেখে গেল সুবাসে!
যার লাগি' পোহায়েছি যামিনী
এল না সে শুধু আজ উষাতে!

বেন্থামের হিতবাদ দর্শন

রেজাউল করীম

১

অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্রেট ব্রিটেনে নৈতিক আদর্শের প্রকৃত মানদণ্ড কি, এই লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। Ethical Standard ও Nature of Moral Faculty অর্থাৎ নৈতিক আদর্শের মানদণ্ড এবং নৈতিক মনোবৃত্তির প্রকৃতি কি হইতে পারে, ইহাই ছিল বিবেচ্য বিষয়। শেফ্‌সবেরী প্রমুখ দার্শনিকগণ নৈতিক চেতনার উপর জোর দিয়াছিলেন। তাঁহারা মানুষের বিবেককে অনুভূতির সহিত একীভূত করিয়া দেখিতে চাহিতেন এবং এই কথাই বিশ্বাস করিতেন যে, পরোপকারই হইতেছে মানুষের চরম নৈতিক আদর্শ। আর এক দল দার্শনিক ছিলেন, তাঁহাদিগকে 'Intuitive Moral Philosopher' বলা হয়। বিশপ বাটলার এই মতবাদের পরিপোষক। ইঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, মানুষের বিবেক একটি স্বাধীন মনোবৃত্তির অঙ্গীভূত। এই মনোবৃত্তি মূলতঃ বুদ্ধিজাত। কিন্তু এই মনোবৃত্তি বুদ্ধিজাত হইলেও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ও অদ্ভুত শক্তি-প্রভাবে মনের মধ্যে ক্রিয়া করিতে থাকে। অপর এক দল দার্শনিক উপরোক্ত কোন মতই গ্রহণ করেন নাই। স্কটল্যাণ্ডের দার্শনিক রীড এই মতের প্রচারক। তিনি বলেন যে, সাধারণ জ্ঞানই (common sense) নৈতিক আদর্শের ভিত্তি। এই সাধারণ জ্ঞান—অভ্রান্ত আভ্যন্তরীণ আবেদন। মানুষের প্রতিটি কার্য্যে এই সাধারণ জ্ঞানের সিদ্ধান্তই চরম। কারণ ইহাতে আছে সার্ব্বজনীন সম্মতি। অর্থাৎ, পৃথিবীর সমস্ত মানুষই এই সাধারণ জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হয়। সাধারণ ভাবে সমগ্র মানব-সমাজ ইহার আবেদন গ্রহণ করে। ইহা ব্যতীত আর এক দল দার্শনিক ছিলেন, তাঁহারা নীতিবোধকে নৈতিক আদর্শের মানদণ্ড বলিতেন। রিচার্ড প্রাইস এই মতবাদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারা বলেন যে, এই নৈতিক অববোধ বা জ্ঞান হইতেছে যুক্তি অথবা বোধশক্তির সংশয়াতীত উপলব্ধি। অন্য এক দল দার্শনিক বলিতেন যে, সত্য অথবা সাক্ষাৎ সত্যের মানসিক অনুভূতি হইতেছে নৈতিক আদর্শের প্রধান মানদণ্ড। তাঁহাদের মতে সত্যনিষ্ঠা বা ধর্ম্মনিষ্ঠার (virtue) একমাত্র উদ্দেশ্য—স্বার্থপরতা। স্বার্থের জন্যই সত্যপন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ "সহানুভূতি"র উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার নীতি-দর্শন প্রচার করেন। নীতির দিক দিয়া তাহাই সমর্থনীয় যাহার ভিত্তি সহানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। নতুবা কোন কার্য্যই সমর্থনীয় নহে। হিউম প্রমুখ দার্শনিকগণ হিতবাদ (utility) আদর্শের সমর্থক। সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণসাধনই তাঁহাদের নৈতিক আদর্শের মানদণ্ড। দার্শনিক বেন্থাম এই সব পরস্পরবিরোধী মতবাদগুলি গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেন। তিনি কতকগুলি গ্রহণ করিলেন, আর কতকগুলির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়া তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। এই প্রবন্ধে বেন্থামের মতবাদ লইয়া আলোচনা করিব। বেন্থাম তাঁহার "ইন্ট্রোডাকশন টু মর‍্যালস এণ্ড লেজিসলেশন" গ্রন্থের মুখবন্ধে বলিয়াছেন :

"প্রকৃতি মানুষকে দুইটি সার্ব্বভৌম প্রভুর অধীনে রাখিয়াছে, একটি ব্যথা ও অপরটি সুখ বা আনন্দ (pain and pleasure)। এই দুইটি প্রভুই দেখাইয়া দিতে পারে আমাদের কি করা উচিত, আর কি করা অনুচিত। ইহারাই ঠিক করিয়া দিতে পারে, আমরা কি করিব। এক দিকে আছে ন্যায় ও অন্যায়ের মানদণ্ড, আর অপর দিকে আছে কার্য্য-কারণের পারম্পর্য্য। এই দুইটিই সার্ব্বভৌম প্রভুর সিংহাসনের সহিত বাঁধা আছে। আমরা যাহা বলি, বা যাহা চিন্তা করি ঐ প্রভু সে সকলই শাসন করে। উহার অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বহু চেষ্টা করা হইয়া থাকে। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ইহাই প্রমাণ করে যে, সেই প্রভু পরম শক্তিশালী। হিতবাদ-নীতি উক্ত প্রভুর এই অধীনতা স্বীকার করে। এই হিতবাদ-নীতিই আমার গ্রন্থের ভিত্তি।"

হিতবাদ-নীতি বলিতে বেন্থাম সেই নীতির কথাই বলেন, যাহা মানুষের সুখ ও দুঃখকেই ন্যায়-নীতির আদর্শ বলিয়া জ্ঞান করে। যাহা আনন্দ বা সুখ প্রদান করে, তাহাই ন্যায় ও ধর্ম্ম। আর যাহা সুখসৃষ্টিতে বাধা দেয় অথবা বেদনা সৃষ্টি করে তাহাই অন্যায় ও অধর্ম্ম। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ব্যাপারেই যে এ নীতি প্রযোজ্য তাহা নহে। গবর্ণমেন্টের প্রত্যেক আইন এবং কর্ম্মধারারও এই নীতিই নিয়ামক ও পরিচালক। যাহা পরোপকার, সুখ-সুবিধা, আনন্দ ও প্রীতি বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে, তাহাকেই বেন্থাম বলিয়াছেন, "ইউটিলিটি" বা হিতবাদ। এই সংজ্ঞাকে বিপরীত ভাবেও বলা যাইতে পারে—যাহা অনিষ্ট, ক্ষতি, ব্যথা, অসৎ কার্য্য, দুঃখ ও অভাব ঘটাইতে বাধা সৃষ্টি করে তাহাকেও তিনি "ইউটিলিটি" বলিয়াছেন। একজনের ত বটেই, এমনকি সর্ব্বসাধারণের সুখ বৃদ্ধি করা এবং দুঃখ লাঘব করাই হইল বেন্থামের নীতির প্রাণধর্ম্ম। বেন্থাম এই আদর্শকে মাত্র নৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন নাই, জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারেই তিনি এই নীতির ক্রিয়া দেখিয়াছেন। এমন কি, সরকারের আইনকেও তিনি এই হিতবাদ-নীতির মানদণ্ডে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং উহার ঔচিত্য ও অনৌচিত্যকেও এই নীতির দ্বারা পরীক্ষা করিবার পক্ষপাতী। সেই আইন অন্যায় যাহা হিতবাদ-নীতির আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত নহে। আর তাহাই ন্যায় যাহা হিতবাদ-নীতির আদর্শসম্মত। দেশের সমস্ত শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, বিধিব্যবস্থার সংস্কার, রাজনৈতিক অধিকার সম্প্রসারণ—এই সমস্ত ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রয়োগ করিয়া তাহাদের ভালমন্দ বিচার

করা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি কেবল আদর্শবাদীর মত কতকগুলি উচ্চ ধরণের চিন্তাধারা প্রচার করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না। যাহাতে তাঁহার নীতি বাস্তবে পরিণত হয়, সে চেষ্টাও করিয়াছিলেন। গুটিকয়েক ব্যক্তির হিতসাধন তাঁহার চিন্তার বিষয় ছিল না। তিনি সমগ্র মানব-সমাজের কথাই ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু যেহেতু ব্যক্তি লইয়াই সমাজ, সেইজন্য ব্যক্তির সুখের ভিত্তিতে তিনি সামগ্রিক ভাবে সমাজের কল্যাণ কামনা করিতেন।

সুখ ও দুঃখই যদি সকল নীতির মূল হয়, সকল ধর্ম্মের সার হয়, তবে এ দুটির উৎপত্তিস্থল আবিষ্কার করা দরকার—তত্ত্বের দিক দিয়া বটে, আদর্শের দিক দিয়াও বটে। মানুষের সুখ কি কি বিষয় লইয়া হইতে পারে—এ সম্বন্ধে বেন্থাম বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে সুখ—আনন্দ ও ব্যথা-বেদনার অভাব অথবা ব্যথা-বেদনার উপর বাড়তি আনন্দ। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহার উৎপত্তির মূল হইতেছে চারিটি বস্তু—দৈহিক, রাজনৈতিক, নৈতিক ও ধর্ম্মীয়। যখন প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে সুখ বা দুঃখ আমাদের নিকট আসে তখন তাহার নাম "physical sanction"—দৈহিক আবেদন। মিতাচার স্বাস্থ্য রক্ষা করে; সুতরাং সুখ দেয়। আর অসুখ স্বভাবতঃ অমিতাচার হইতে উৎপন্ন, সুতরাং দুঃখ তাহার পরিণতি। যখন সুগঠিত রাষ্ট্র হইতে অথবা রাষ্ট্রকর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিসঙ্ঘ হইতে (যেমন, বিচারকগোষ্ঠী) সুখ অথবা দুঃখ আসে, তখন তাহাকে বলা যাইতে পারে রাজনৈতিক অনুমোদন (political sanction)। ইহারই অপর নাম দেশের আইন। জনমত যখন কোন কাজের জন্য চাপ দেয়, তখন তাহাকে বলা যায় নৈতিক আবেদন (moral sanction)। ইহার যথার্থ নাম গণ-আবেদন (popular sanction)। ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং বর্ত্তমান জীবনের সহিত পরলোকের যে সম্পর্ক আর যাহার জন্য আমরা বিশেষ ধরণের কতকগুলি ক্রিয়াকলাপ করি, তাহাকে বলা হইয়াছে ধর্ম্মের আবেদন (religious sanction)। বেন্থামের মতে নীতিবিদ ও আইন-প্রণেতাদের প্রধান সমস্যা হইতেছে কি ভাবে এই চতুর্ব্বিধ sanction বা আবেদন মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সুখ-সুবিধা বিধান করিতে পারে তাহার চেষ্টা করা। নীতিবিদ ও আইন-প্রণেতাদের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য যে একই তাহাতে সন্দেহ নাই। সুখ দুঃখের উৎপত্তিস্থলই যে বিভিন্ন তাহা নহে, তাহাদের মূল্যও বিভিন্ন। তাই বেন্থাম দেখাইতে চাহিয়াছেন···অনেকগুলি সুখ-দুঃখের মধ্যে কাহার মূল্য বা যোগ্যতা কতটুকু। তাঁহার মতে, রাষ্ট্রের আইন-প্রণেতাকেও এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ রাষ্ট্রের মধ্যে অনেকগুলি সুখ-সুবিধাকে এমন ভাবে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে যেন সমাজের সকল শ্রেণীর লোক তাহা হইতে যতদূর সম্ভব বেশী পরিমাণ সুবিধা ও কম পরিমাণ অসুবিধা পাইতে পারে। রাষ্ট্রকে এই নীতি সর্ব্বদাই মানিতে হইবে যে, রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি এক একটা সত্তা এবং কেহই যেন অপর অপেক্ষা অধিকতর সুবিধা না পায়, এবং কাহাকেও যেন অপর হইতে অধিকতর অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়। নীতিবিদগণের জন্যও এই আদর্শ অপরিহার্য্য। সুতরাং প্রশ্ন এই, ব্যক্তির সুখের মূল্য কেমন করিয়া যাচাই করা যাইবে? এবং কি ভাবে কতিপয় সমষ্টির ও সাধারণ ভাবে সমগ্র সমাজের সমস্ত প্রকার সুখ-সুবিধা বণ্টন করা সম্ভব হইবে?

অতঃপর বেন্থাম ব্যক্তির সুখ-সুবিধার কথা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্যক্তির সুখ দুঃখ চারিটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—(১) গভীরতা (intensity), (২) স্থিতিকাল (duration), (৩) নিশ্চয়তা বা অনিশ্চয়তা (certainty বা uncertitanty) এবং (৪) নৈকট্য বা দূরত্ব (propinquity বা remoteness—এই চারিটি বিষয় ব্যতীত বেন্থাম আরও তিনটি বিষয়ও লক্ষ্য করিতে বলিয়াছেন, যথা—(১) সুখ হইতে দুঃখের এবং দুঃখ হইতে সুখের অনুভূতি জাগে কিনা, (২) সুখের পর দুঃখের এবং দুঃখের পর সুখের সম্ভাবনা আছে কিনা, (৩) এই সুখ ও দুঃখ দ্বারা কতজন লোক প্রভাবিত হয়, কতজনের সুখ বা দুঃখ উৎপাদন হইয়া থাকে। অতঃপর তিনি দুই প্রকার সুখ বা আনন্দের কথা বলিয়াছেন, যথা—জটিল সুখ ও সহজ সুখ। জটিল সুখ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, ইহা সুখ ও দুঃখের মিশ্রণে সম্ভব। ইহা বিশ্লেষণ করা কঠিন ব্যাপার। তিনি সহজ সুখ ও সহজ দুঃখ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে চৌদ্দটি বিষয় সহজ সুখের অন্তর্গত, যথা—(১) জ্ঞান, (২) সম্পদ সম্বন্ধে ধারণা, (৩) কৌশল, (৪) মিত্রতা ও সদ্ভাব, (৫) যশ ও সুনাম, (৬) শক্তি, (৭) দয়া-প্রবণতা, (৮) পরোপকার-প্রবৃত্তি, (৯) ঈর্ষাপরায়ণতা, (১০) স্মৃতিশক্তি, (১১) কল্পনা, (১২) প্রত্যাশা, (১৩) সংযোগ বা সহযোগিতা, (১৪) স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বস্তি। সুখের পরেই দুঃখের ফিরিস্তি তিনি দিয়াছেন। তাঁহার মতে নিম্নোক্ত কয়টি বিষয় সহজ দুঃখের অন্তর্গত, যথা—(১) দৈন্য বা অভাব, (২) ইন্দ্রিয়সমূহ, (৩) কদর্য্যতা, (৪) শত্রুতা, (৫) অপযশ বা দুর্নাম, (৬)] ধার্ম্মিকতা, (৭) পরোপকার, (৮) ঈর্ষাপরায়ণতা, (৯) স্মৃতি, (১০) কল্পনা, (১১) প্রত্যাশা, (১২) আসঙ্গলিপ্সা। দেখা যাইতেছে, সুখ ও দুঃখের এই শ্রেণীবিভাগ কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর রচিত হয় নাই। এমন কতকগুলি বিষয়ের কথা তিনি বলিয়াছেন—যাহা সুখের উৎপাদক, আবার দুঃখেরও উৎপাদক। যেমন স্মৃতি সুখ উৎপাদন করে, তেমনি দুঃখও জাগ্রত করে। এই শ্রেণীবিভাগ বৈজ্ঞানিক না হইলেও বেন্থাম মোটামুটি ভাবে সুখ ও দুঃখের বিচিত্র হেতুমূল সম্বন্ধে একটা ধারণা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তব জীবনে এইগুলির অনেকটা সত্য। যে সব পারিপার্শ্বিক ঘটনা মানুষের প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে প্রভাবিত করে, সেগুলিকে একেবারে অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না। তিনি ত্রিশ

প্রকার প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নহে। যে সমস্ত বিষয় এই প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে প্রভাবিত করে, সেগুলির কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতে পারে, যথা—স্বাস্থ্য, জ্ঞান, মানসিক ক্ষমতা, ইচ্ছা-প্রবণতা, সংস্কার, আর্থিক অবস্থা, সামাজিক পদমর্য্যাদা, শিক্ষা, গবর্ণমেন্টের প্রভাব ইত্যাদি। বেন্থাম বলেন, এই সব অনুভূতি মানুষের কার্য্যকে ও জীবনের সুখ এবং দুঃখকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। ইহাদের প্রভাবে কেহ সুখী হয় আবার ইহাদের অভাবে কেহ দুঃখী হয়।

উপরের এই সব আলোচনা হইতে সাধারণ ভাবে মানুষের কর্ম্মের প্রেরণা সম্বন্ধে একটা ধারণা পরিষ্কার হইয়া গেল। ন্যায় ও অন্যায়, সৎ ও অসৎ, ভাল ও মন্দ, যোগ্যতা ও অযোগ্যতা—এই সমস্তই মানুষের নৈতিক কাজের মানদণ্ডের সহিত জড়িত। বেন্থাম বলেন, এই ভাবে সুখ দুঃখের আদর্শকে সামনে রাখিয়া যদি আইন-প্রণেতারা আইন রচনা করেন, আর সমাজ সংস্কারকগণ সমাজের কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করেন, তবে তাহাতে মানব-সমাজের বহু কল্যাণ হইবে। এই মতবাদ হইতেই দণ্ডের (punishment) প্রকৃত মানদণ্ড নির্দ্ধারিত হইবে। দণ্ডের প্রকৃতি কি, এবং আইন-প্রণেতা ও নীতিবিদগণ কি ভাবে সমাজে দণ্ডের বণ্টন-ব্যবস্থা করিতে চান, তাহাও এই হিতবাদ-নীতি হইতে পাওয়া যাইবে।

২

মানুষের কৃত কার্য্যের নৈতিক মূল্য বিচার করিতে হইলে, অথবা একটি বিশেষ আইনের প্রকৃত মান আলোচনা করিতে হইলে, সেই কর্ম্মের কর্ত্তার অভিপ্রায় কি তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনিতে হইবে। আরও বিচার করিতে হইবে যে, কর্ত্তা তাহার কর্ম্মের পরিণতি সম্বন্ধে কোন ধারণা পোষণ করিয়াছিল কিনা। নীতিশাস্ত্রের ভাষায় দুইটি শব্দ আছে—"Intention" ও "Motive" (অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্য বা প্রবর্ত্তনা)। এই শব্দ দুটি অত্যন্ত জটিল। আমরা সাধারণতঃ "অভিপ্রায়" ও "উদ্দেশ্য"কে সচরাচর একই অর্থে ব্যবহার করি। কিন্তু নীতিবিদগণের নিকট এই দুই শব্দের মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। বেন্থাম এই পার্থক্যটিকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, অভিপ্রায় হইতে জাত পরিণতির কথা চিন্তা করিলেই চলিবে না। প্রত্যেক কাজের উদ্দেশ্যকেও (অপর নাম "প্রবর্ত্তনা") বিচার করিতে হইবে। কেননা অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য এক বস্তু নহে। উদাহরণ: বিশেষ একটা কাজ করিবার সময় একজন লোকের অভিপ্রায় হইতে পারে "প্রতিবেশীর উপকার"। কিন্তু যে মনোভাব তাহাকে সেই কাজ করিতে উৎসাহিত করে, অথবা প্ররোচিত করে, তাহা হইতেছে সেই প্রতিবেশীর প্রতি তাহার একটা অনুরাগ (regard)। এই মনোভাব হইতেছে "উদ্দেশ্য"। যাহা কর্ত্তাকে কাজ করিতে প্রবর্ত্তনা দেয়, উৎসাহ দেয়, তাহার নাম উদ্দেশ্য। আর সেই কাজের পরিণতিটা হইতেছে "অভিপ্রায়"।

বিষয়টিকে আরও একটু পরিষ্কার করিয়া দেখা যাক। নীতিশাস্ত্রে "conduct" বা আচরণ বলিয়া একটা কথা আছে। মানুষ স্বেচ্ছাক্রমে যে কাজ করে, অথবা কোন উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করে, তাহাকেই বলে আচরণ। কর্ত্তা যদি এই কামনা করে যে তাহার কাজের দ্বারা একটা নির্দ্দিষ্ট কাজ হোক, একটা নির্দ্দিষ্ট ফল হোক, তবে তাহার সেই কাজটা তাহার আচরণ। আর যদি সে কোন কাজ করিতে চাহে নাই, অথবা কোন কাজ হোক এমন কামনা তাহার ছিল না, অথচ সেই কাজটা তাহার অনিচ্ছাক্রমে তাহারই হাত দিয়া হইয়া গেল, তবে সেই কাজটা তাহার আচরণ নহে। পূর্ব্বোক্ত কল্পিত উদ্দেশ্যকেই motive বা প্রবর্ত্তনা বলে। ফুটবল খেলার উদ্দেশ্য এই হইতে পারে—সে খেলা ভালবাসে। সেই সঙ্গে আরও কতকগুলি উদ্দেশ্য বা কার্য্যের পরিণতি উদ্ভূত হইয়া উহার সহিত সহযোগিতা করিতে পারে, যথা অপর খেলোয়াড়গণের সঙ্গলাভে আসক্তি, ব্যক্তিগত কোন লাভ, কোন একজন নিজের প্রিয় খেলোয়াড়ের জয় দেখিয়া নিজে আনন্দলাভ ইত্যাদি। কিন্তু intention বা অভিপ্রায় ইহা হইতে স্বতন্ত্র। যখন কোন কাজ হইতে কর্ত্তার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে তাহার কার্য্যের বিবিধ প্রকার পরিণতিলাভ হইতে পারে তখন সেগুলিকে অভিপ্রায় বলা হয়। কাহাকেও হত্যা করার উদ্দেশ্য বা প্রবর্ত্তনা হইতেছে নিহত ব্যক্তির টাকা প্রাপ্তি, অথবা তাহার উপর প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। কিন্তু এই হত্যার অভিপ্রায় অনেককিছু হইতে পারে। হত্যাকারীর এ জ্ঞান আছে এবং এ জ্ঞান যে আছে তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, তাহার এই নিধন-কার্য্যের পরিণতি-স্বরূপ আরও অনেকগুলি কার্য্য সেই সঙ্গে হইয়া গেল। যথা—মানুষের সুখনাশ, অপরের বাঁচিবার অধিকারে হস্তক্ষেপ ইত্যাদি। এই পরিণতি সম্বন্ধে জ্ঞানকেই অভিপ্রায় বলে।

বেন্থাম কার্য্যের অভিপ্রায় এবং অভিপ্রায়ের পরিণতির মধ্যে পার্থক্য দেখাইতে চাহিয়াছেন। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, কার্য্যের দোষগুণ বিচার অনেকটা নির্ভর করে কর্ত্তা কি করিতে মনস্থ করিয়াছে তাহার উপর। একজন লোকের সহিত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতে গিয়া যদি কেহ বিনা অভিপ্রায়ে তাহার কোন ক্ষতি করে, অথবা তাহাকে আহত করে তবে তাহার এই কার্য্যের গুরুত্ব এই জন্য লাঘব হয় যে উহা অনিচ্ছাকৃত। অপর পক্ষে কেহ যদি কাহারও ক্ষতি করিবার অভিপ্রায় লইয়া কোন কাজ করে, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলেও সে মন্দ অভিপ্রায়ের দায় হইতে মুক্তি পায় না। এমনকি যদি সেই ব্যক্তি অক্ষত দেহে বাঁচিয়া থাকে, তবুও কর্ত্তাকে দোষীই বলা হইবে। নীতিবিদগণের দিক হইতে এখানে কোন গণ্ডগোল বা দ্বিধার স্থান নাই। কিন্তু আইন-প্রণেতা ও বিচারকের দিক হইতে এই আদর্শ সম্পূর্ণ রূপে প্রতিপালন করার পথে বহু অসুবিধা আছে। তাহাদের নিকট প্রত্যেক কার্য্যের প্রকাশ্য অভিব্যক্তি ও পরিণতিই সর্ব্বাগ্রগণ্য। আদালতে বিচারক দেখেন, আসামীর উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইয়াছে কিনা। যদি কার্য্যে পরিণত না হয় তবে তিনি আসামীকে দণ্ড হইতে অব্যাহতি দেন:

কিন্তু নীতিবিদ্‌ এত সহজে তাহাকে অব্যাহতি দিতে পারেন না।

মানুষের উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করিয়া বেন্থাম ঘোষণা করেন, যে মনোভাব মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে প্রণোদিত করে, কার্য্যে নিযুক্ত করে, এবং কার্য্য নির্দ্ধারণ করে, তাহাই হইতেছে মানুষের মোটিভ বা উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, তাহার মূল প্রেরণাদাতা—সুখ ও দুঃখ। সুতরাং উদ্দেশ্য সুখ ও দুঃখের আবেগ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বেন্থাম বলেন, উদ্দেশ্য সর্ব্বক্ষণ ভালও নহে, মন্দও নহে। উদ্দেশ্য তখনই ভাল হয়, যখন ইহা হইতে জাত কর্ম্মাদি ভাল হয়। আর যখন উদ্দেশ্য হইতে জাত কার্য্যাদি মন্দ হইয়া পড়ে, তখন সেই উদ্দেশ্যকেও মন্দ আখ্যা দিতে হইবে। অভিপ্রায়ের বাস্তব ফলাফল দেখিয়াই বুঝিতে হইবে, তাহা ভাল কি মন্দ। অর্থাৎ, কোন অভিপ্রায়ের বাস্তব পরিণতি যদি মন্দ হয়, তবে সে অভিপ্রায়কেও মন্দ বলিতে হইবে। আর যদি তাহার পরিণতি বা ফলাদি ভাল হয় তবে তাহাকে ভাল বলিতে হইবে।

ইহার পর প্রশ্ন—বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন্‌টাকে ক্রমিক ভাবে সর্ব্বাগ্রগণ্যতা দেওয়া যাইবে? হিতবাদ নীতি অনুসারে উদ্দেশ্য কতটা বাস্তব প্রয়োজনীয়তার সহায়ক তাহার বিচারের উপর উদ্দেশ্যের সর্ব্বাগ্রগণ্যতা নির্ভর করে। অর্থাৎ, মানুষের যে উদ্দেশ্য যতটা তাহার বাস্তব প্রয়োজনীয়তা মিটাইতে পারিবে, সেই উদ্দেশ্যকেই সকলের অগ্রগণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; সেই দিক হইতে শুভেচ্ছাকেই প্রথম স্থান দিতে হইবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর নীতিবিদগণ ইহারই নাম দিয়াছেন পরোপকার বা পরহিতসাধন প্রবৃত্তি। কিন্তু বেন্থাম বলেন যে, "পরোপকার"-নীতি সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। ইহাকে উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রথম স্থান দিলে কতকগুলি অসুবিধার সৃষ্টি হয়। পরোপকার-নীতি এক দিকে অল্পসংখ্যক ও অপর দিকে অধিকসংখ্যক লোকের মধ্যে সমভাবে প্রয়োগ করা মোটেই সম্ভব নহে। অনেক ক্ষেত্রে বহু লোকের উপকার করিতে হইলে অল্পসংখ্যক লোকের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, আবার অল্প লোকের উপকার করিতে গেলে বহু লোকের অপকার করার সম্ভাবনাও থাকে। এই নীতির সর্ব্বত্র প্রসার করিতে গেলে অপরের সুখ-সুবিধার সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধিতে পারে। সুতরাং পরোপকার-নীতিকে কার্য্যকরী করিতে হইলে উহা আরও ব্যাপক ও উচ্চাঙ্গের হওয়া দরকার। সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ পরোপকার-নীতি প্রয়োগ করিলে অনেক ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে পারে। ব্যাপারটা আরও সহজ মনে হইবে যখন দেখা যাইবে, বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার সময় ব্যক্তিগত পরোপকার-নীতি বৃহত্তর ক্ষেত্রে সাধারণ পরোপকার-নীতির মধ্যে প্রায় কোন বিরোধ সৃষ্টি করে না। অর্থাৎ যাহা জনসাধারণের স্বার্থ তাহার সহিত ব্যক্তিগত স্বার্থের বিশেষ বিরোধিতা নাই। সেইজন্য বেন্থাম পরোপকার কথাটির পরিবর্ত্তে শুভেচ্ছা কথাটিকে উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রথম স্থান দিয়াছেন। শুভেচ্ছার পরে তিনি স্থান দিয়াছেন যশঃপ্রীতিকে। এখানেও তিনি বলেন যে, জনস্বার্থ ও যশঃপ্রীতির মধ্যে একটা সঙ্গতি থাকা চাই। যখন মানুষ নিজের পছন্দ ও অপছন্দকে, নিজের ভাল-মন্দের বিচারকে হিতবাদ-নীতির দ্বারা পরিচালিত করে না, তখনই যশঃপ্রীতি ও লোকহিতের সঙ্গতির মধ্যে বিপর্য্যয় সৃষ্টি হয়। অনেক সময় মানুষ সহানুভূতি বিতৃষ্ণা অথবা বৈরাগ্যভাবকে এত প্রবল করিয়া দেখে যে, সে পরোপকার-নীতিকে পূর্ণ ভাবে কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারে না। সুতরাং বেন্থাম বলেন—যশঃপ্রীতি এরূপ হওয়া চাই যেন তাহার সহিত পরহিত-নীতির বিরোধ না বাধে। যশঃপ্রীতি ব্যতীত আরও দুইটি বিষয়ের কথা তিনি বলিয়াছেন, যথা—(১) সদ্ভাব ও মিত্রতার অভিলাষ অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্নেহপ্রবণতা ও (২) ধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ। পরহিত-নীতির সহিত এই দুইটির সম্পর্ক আছে। এই দুইটির মধ্যে সদ্ভাব প্রীতি ও স্নেহ-প্রবণতাকে প্রথমে ও ধর্ম্ম-প্রীতিকে সর্ব্বশেষ স্থান দিয়াছেন। কারণ তিনি বলেন যে, পৃথিবীতে এত পরস্পরবিরোধী ধর্ম্ম আছে যে, একজনের ধর্ম্মপ্রীতি অধিকসংখ্যক লোকের অধিকমাত্রায় হিতের কারণ হইতে পারে না।

বেন্থাম প্রচারিত "হিতবাদ" আদর্শ যে স্বার্থপরতামূলক নহে, বরং ইহার পশ্চাতে একটা মহৎ নীতি আছে, তিনি তাহা প্রমাণ করিবার জন্য উদ্দেশ্যকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। উদ্দেশ্যকে এই ভাবে প্রকাশ করিয়াও ইহাকে পর্য্যায়ক্রমে শ্রেষ্ঠতম হইতে নিম্নতম শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, শ্রেষ্ঠতম উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন স্বার্থপরতা নাই। এই পর্য্যায়ের ভিতর প্রথম স্থান দিয়াছেন পরোপকারকে। তিনি এই ভাবে "অধিকতর লোকের অধিকতম উপকারের নীতি"তে তাঁহার মতবাদের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তিনি কোন "ব্যক্তি"কেও এই মানদণ্ড হইতে বাদ দেন নাই। "অধিকতম লোকের অধিকতম উপকারে"র নীতি যদি সর্ব্বক্ষেত্রে পালিত হইতে পারে, তবে হিতবাদ-নীতি "স্বার্থপরতা"র অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার যোগ্য। বস্তুতঃ সার্ব্বজনীন সুখবাদের (Hidonism) আর যে-কোন ত্রুটি থাকুক, উহা যে স্বার্থপরতামূলক নহে তাহা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য একথা সত্য যে, ব্যক্তিগত সুখ এই নীতির মর্ম্মগত ধর্ম্ম। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, আত্ম-সুখ ও স্বার্থপরতা এক কথা নহে।

বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায়, সৎ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত কার্য্য অভিলষিত সুখ বা আনন্দ উৎপাদন করে না। আবার অসৎ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত কার্য্য দুঃখ বা আনন্দহীনতা উৎপাদন করে না। আমার এই উদ্দেশ্যটি মন্দ—সব সময় এই ভাবে ভাল-মন্দকে কোন মানুষের উদ্দেশ্যের বিধেয় রূপে বিচার করা চলে না। তাহা হইলে স্বতঃই প্রশ্ন এই দাঁড়ায়—তবে "ভাল বা মন্দের" বিধেয়কে কি প্রকারে যথার্থ ভাবে প্রয়োগ করা চলিবে? বেন্থাম ইহার উত্তরে বলেন :—"disposition", অর্থাৎ মানুষের

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা প্রকৃতি। তিনি বলেন—এই ডিসপোজিশন একটি কাল্পনিক সত্তা। কেবল অলোচনার সুবিধার্থ ইহাকে আপাততঃ ধরিয়া লওয়া হয়। তবে একথাও তিনি অস্বীকার করেন নাই যে, মানুষের চিন্তাধারার মধ্যে ডিসপোজিশন কাল্পনিক হইলেও একটা স্থায়ী সত্তা। তাই মানুষ একটা বিশেষ সময়ে, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত হইয়া এমন একটা কাজ করিয়া বসে যাহা করিবার প্রবৃত্তি তাহার মধ্যে নিহিত থাকে। তাহার কৃত কর্ম্মের ফলাফল দ্বারা বুঝাইবে তাহার এই প্রবৃত্তির কোন্‌টা ভাল, আর কোন্‌টা মন্দ। বেন্থামের মতে এই প্রবৃত্তি যে পরিমাণে সমাজের বা ব্যক্তির সুখ ও আনন্দ বৃদ্ধি করিতে অথবা হ্রাস করিতে সহায়তা করিবে, তাহার প্রবৃত্তিটাও সেই পরিমাণ ভাল কিংবা মন্দ বলিয়া বিবেচিত হইবে। অর্থাৎ, সেই প্রবৃত্তি ভাল যাহার ফল মানুষের সুখ ও আনন্দ বৃদ্ধি করে, আর সেই প্রবৃত্তি মন্দ যাহার ফল বা পরিণতি মানুষের সুখ নষ্ট করে, অথবা হ্রাস করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রবৃত্তির সহিত অভিপ্রায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। আমরা অভিজ্ঞতা হইতে দেখি যে, দুইটি বিষয় এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ : ১। সাধারণ অবস্থায় একটা কাজের পরিণতির সহিত তাহার অভিপ্রায়ের (intention) সম্পর্ক আছে। সুতরাং প্রত্যেক কার্য্যের ভাল-মন্দ বা শুভাশুভ নির্ভর করে তাহার পরিণতি বা ফলের উপর; ২। যে ব্যক্তি এক সময় অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায় পোষণ করে, অপর সময় সেই একই প্রকার অভিপ্রায় পোষণ করিবার প্রবৃত্তি তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে।

নীতিবিদ বেন্থাম সুখ এবং আনন্দকেই মানুষের চরম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহার এই হিতবাদ-দর্শনে দণ্ডের স্থান কোথায়? দণ্ড ত মানুষকে আনন্দ দেয় না। তবে কি নীতির দিক হইতে দণ্ডের কোন স্থান নাই। বেন্থাম বলেন, তাঁহার নৈতিক দর্শনে দণ্ডেরও স্থান আছে। নীতির প্রশ্ন হইতে স্বতঃই দণ্ডের প্রশ্ন উদিত হয়। সাধারণতঃ পণ্ডিতগণ রাজনীতি ও আইনের দিক হইতে দণ্ডের প্রয়োজনীয়তা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। অন্যান্য নীতিবিদের মত বেন্থামও বিশ্বাস করেন যে, নীতির দিক হইতেও দণ্ডের স্থান আছে। তবে ইহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। দণ্ড-সংক্রান্ত তাঁহার আদর্শ সুখবাদ নীতির সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। বেন্থাম বলেন যে, দণ্ড কোনক্রমেই প্রতিহিংসা বা বৈরনির্যাতনের উদ্দেশ্যে দেওয়া চলিবে না। যে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, অথবা আহত হইয়াছে, তাহাকে আনন্দ দিবার জন্য বা তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য দোষীকে দণ্ড দেওয়া উচিত নহে। সত্যকার সুখবাদী দার্শনিক হিসাবে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রতিহিংসাপরায়ণতা হইতেও মানুষ সুখ এবং আনন্দ পায়। এই আনন্দ একটা লাভ বৈকি! প্রতিহিংসার আনন্দ একরূপ বিনা ব্যয়ে পাওয়া যায়। অপরাপর আনন্দের মত এই আনন্দেরও চর্চা করা যাইতে পারে। আদর্শের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে বলিতে হয় যে, প্রতিহিংসার আনন্দ অপরাপর আনন্দদায়ক বস্তুর মতই নিজস্ব গুণেই আনন্দ-উৎপাদক। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত আইনের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা ভাল জিনিষ। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ইহা সীমা লঙ্ঘন করে, সেই মুহূর্ত্তে ইহা একটা অপরাধে পরিণত হয়। তাই বেন্থাম বলেন, দণ্ডের উদ্দেশ্য হইবে অন্যায়কারীর সংশোধন, তাহার চরিত্রোন্নতি। সংশোধনকেই যদি দণ্ডের উদ্দেশ্য করা হয়, তবে প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তিকে যুক্তির আশ্রয়ে আনয়ন করা সহজ হইবে। তখন প্রত্যেক অন্যায়কারী বা আইনভঙ্গকারীকে সংশোধন করিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইবে। এই ভাবে দণ্ডের ব্যবস্থা করিলে সমগ্র সমাজের পাপপ্রবণতা হ্রাস পাইবে। কারণ দণ্ডের এই আদর্শের ফল শুভ ব্যতীত অশুভ হইবে না। সংক্ষেপে বেন্থামের নৈতিক আদর্শের পরিচয় প্রদান করিলাম।

একাকী

শ্রীকালিদাস রায়

মনে পড়ে বাল্যকালে শিশুদের উৎসবের মেলা,
গ্রামের প্রান্তরে পথে তাহাদের খেলা।
রুগ্নশীর্ণ দেহ লয়ে দূর হ'তে মেলি দুই আঁখি,
দেখিয়াছি ব'সে ব'সে আমিই একাকী।

শৈশবে কৈশোরে আর প্রথম যৌবনে
বিদ্যামঠে বসিয়াছি নিত্য বহু সতীর্থের সনে।
হয় নি কাহারো সাথে কভু মাখামাখি।
ছাত্রজনতার মাঝে ছিলাম একাকী।

আবদ্ধ হয়েছি আমি সংসার-বন্ধনে
ভরেছে আমার গৃহ বহু পরিজনে,
পাঁকাল মাছের মত সংসারের পাঁকে আমি থাকি,
আপন গৃহের মাঝে আমি যে একাকী।

বাণীর দেউলতলে যৌবনেই লভেছি আশ্রয়
শত সেবকের সাথে সেথা মোর হ'ল পরিচয়।
সবাই আগায়ে গেল বেদীপাশে মোরে পিছে রাখি'
এককোণে কৃতাঞ্জলি রই আমি, আমি যে একাকী।

দিন ত ফুরায়ে আসে—সন্ধ্যা হ'তে দেরি নাই আর,
গোধূলির ধূলিভরা রাঙাপথ সম্মুখে আমার।
পরলোক হ'তে কারা করে ডাকাডাকি
চিরদিনই একা আমি, ওপারেও চলিব একাকী।

(নাটক)

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

পাত্র	পাত্রী
বিজয়—বৈজ্ঞানিক যুবক	রমা—বিজয়ের কবি-ভগ্নী
অজিত—প্রফেসর যুবক	সবিতা—ভবেশের বিদুষী স্ত্রী
ভবেশ—ধনী ব্যবসায়ী যুবক	ললিতা—গণেশের স্ত্রী
গণেশ—মজুর যুবক	

১ম অঙ্ক

[গভীর বনের মধ্য দিয়ে একটা সরু পায়ে চলার পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে, সেই পথ ধরে এগিয়ে চলে অজিত, পরিধানে তার শতছিন্ন ট্রাউজার, গা খালি, হাতে একখানা কুড়ুল। পথ ধীরে ধীরে পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে নীচে নামতে থাকে, তার পরে আবার উপরে উঠতে থাকে। অজিতের পায়ের সাড়া পেয়ে গোটাকয়েক খরগোশ ছুটে পালিয়ে যায়, একটু পরে একজোড়া হরিণ পথের এপাশ থেকে এসে ও পাশের বনের মধ্যে মিলিয়ে যায়। বড় বড় পাথরের আশপাশ দিয়ে অজিত এঁকে-বেঁকে এগিয়ে চলে—এইবার সে ছোট পাহাড়টার মাথায় পৌঁছে যায়, দেখতে পায় সামনে তার সীমাহীন নীল সমুদ্র, আর সেই দিকে চেয়ে বসে আছে রমা। রমা অজিতের উপস্থিতি টের পায় না। কুড়ুলখানা কাঁধে তুলে অজিত নিঃশব্দে রমার পাশে এসে দাঁড়ায়। রমা চমকে ওঠে, কিন্তু পরক্ষণেই চিনতে পেরে হাসতে থাকে—পরনে ঘাসের তৈরি ঘাগরা আর পাতার তৈরি কাঁচুলি সংযত করে।]

অজিত। (কুড়ুল নামিয়ে রেখে) এক আধখানা জাহাজ কি দেখতে পেলেন রমা দেবী?

রমা। না, দেখতে পেলাম না

অজিত। জাহাজের মাস্তুল?

রমা। না, মাস্তুলও নয়।

অজিত। কোন দিন দেখবার আশা রাখেন কি?

রমা। আর রাখি না।

অজিত। (উৎসাহিত হয়ে) তা হলে আজ থেকে দৃষ্টিটা জলভাগ থেকে তুলে নিয়ে স্থলভাগের উপর স্থাপিত করুন, দেখুন আমাদের আশ্রয়দাতা এই দ্বীপটি সত্যিই কি সুন্দর। এখানে আমরা কত দিন এসেছি রমা দেবী?

রমা। ছ'মাসেরও বেশী।

অজিত। অথচ মনে হচ্ছে যেন এই সেদিন এসেছি। পরিষ্কার মনে পড়ছে সেই বিকেল, নারকোলগাছের দীর্ঘ ছায়া পড়ছে বেলাভূমির উপর, আকাশে সামুদ্রিক পাখীর ঝাঁক চক্রাকারে ঘুরছে—আমাদের লাইফ-বোট এসে ভিড়ল কিনারায়।

রমা। (কতকটা বিচলিত ভাবে) সেই ভয়াবহ অতীত ইতিহাসটা ভুলতে দেন অজিত বাবু।

অজিত। যেটা ভুলতে চাই সেইটাই মনে পড়ে বেশী।

রমা। সেকথা ঠিক। জাহাজডুবির রাতটা যেন স্মৃতির পটে কেটে বসে গেছে—ভাবতে গেলেই সেই ঝড়ের হাহাকার, মেয়ে-পুরুষের আর্তনাদ আবার শুনতে পাই—গা কেঁপে ওঠে।

অজিত। তার পরে ছোট লাইফ-বোটখানিতে সাতটি প্রাণীর দিগন্তের দিকে ভেসে ভেসে চলা, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত—

রমা। খাবার ফুরিয়ে গেল, জল ফুরিয়ে গেল।

অজিত। কুল পেয়ে তবু ত বাঁচলেন। বিধাতা যেন এই ছোট দ্বীপটি আমাদেরই জন্যে ফুলেফলে সাজিয়ে রেখেছিলেন, পাহাড়ের ঐ চূড়োটা এতকাল যেন আমাদেরই পথ চেয়ে ছিল।

রমা। অজিতবাবু, আপনি সব জিনিষই এক বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেন, যেটা আমাদের কাছে ভয়াল সেটা আপনি দেখেন সুন্দর, যেটা আমাদের কাছে অর্থহীন, সেটা আপনি দেখেন অর্থপূর্ণ।

অজিত। ওটা হচ্ছে আশাবাদীর দৃষ্টিভঙ্গী। আপনাকেও আশাবাদী হতে হবে রমা দেবী।

রমা। আশাবাদী হবার মত যথেষ্ট অবকাশ ত দেখছি না অজিত বাবু।

অজিত। অবকাশ নেই, বলেন কি রমা দেবী? আমি বলি বিরাট অবকাশ রয়েছে—না, বিরাট নয়—অনন্ত অবকাশ রয়েছে।

রমা। আপনি কি বলতে চান সভ্য জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন এই দ্বীপে অনন্ত অবকাশ রয়েছে? (হেসে) আমার মনে হয় অনন্ত অবকাশ রয়েছে আপনার কল্পনায়।

অজিত। না, কল্পনায় নেই, রয়েছে এই দ্বীপেই। সভ্য জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন বলেই এখানে অবকাশ আরও বেশী। বুঝতে পারছেন না রমা দেবী, একটা অতি পুরনো জরাতুর সভ্যতাকে ওষুধ খাইয়ে অথবা অস্ত্রোপচার করে প্রাণবন্ত এবং নবীন করে তোলার চেয়ে কুমারী মাটিতে বীজ পুঁতে নবীন সভ্যতা অঙ্কুরিত করে তোলা সহজ নয় কি?

রমা। (কিছু আকৃষ্ট হয়ে) কথাটা শুনতে মন্দ লাগছে না। আপনার মাথায় কি যেন একটা মতলব এসেছে অজিতবাবু।

অজিত। (উৎসাহিত হয়ে) ঠিক ধরেছেন রমা দেবী, একটা বিরাট মতলব এসেছে, যুগ স্বপ্নকে সফল করে তোলবার সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত।

রমা। (অধৈর্য্য হয়ে) আপনি কি গুছিয়ে, স্পষ্ট করে কোন কথা বলতে পারেন না অজিতবাবু?

অজিত। এ অপবাদ আমাকে আজ পর্য্যন্ত কেউ দেয় নি, রমা দেবী, একটা বিরাট কথা বিরাটভাবেই বলতে হয় এবং তা বোঝবার জন্যে বিরাট বুদ্ধিরও প্রয়োজন।

রমা। (হেসে) অন্যায় কথা বলেছি, ধৃষ্টতা ক্ষমা করুন। এখন তা হলে সহজভাবে স্বল্প কথায় স্বল্প বুদ্ধির উপযোগী করে বিষয়টা বলুন।

অজিত। (অধিকতর উৎসাহিত হয়ে কুড়ুলখানা কাঁধে তুলে) এ দ্বীপে আমরা সাম্যবাদ-সঙ্গত আদর্শ সমাজ গড়ে তুলব।

রমা। (হেসে ফেলে) কিন্তু কাকে নিয়ে সমাজ গড়া হবে? লোক কোথায়?

অজিত। হাসবেন না রমা দেবী, চার জন পুরুষ আর তিন জন নারীই যথেষ্ট।

রমা। কিন্তু এত অল্প লোকে কি একটা বিরাট কাজ সম্ভব?

অজিত। (গম্ভীর ভাবে) বীজই বৃক্ষে পরিণত হয়, ক্ষুদ্রই বৃহৎ হয়ে উঠে—সাতটি নরনারীর মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে।

(দূর থেকে বাঁশীর সুর ভেসে আসে)

অজিত। (শুনতে পেয়ে) বাঁশীর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।

রমা। সহজেরা বাঁশী বাজাচ্ছে, কি মিষ্টি আওয়াজ, কি চমৎকার।

অজিত। (আশ্চর্য্য হয়ে) সহজেরা আবার কারা?

রমা। দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের আমি নাম দিয়েছি 'সহজ', ওদের মত সহজ সরল সুন্দর মানুষ আর দেখি নাই। (দূরে দেখিয়ে) ঐ দেখুন, ঐ বড় গাছটার নীচে ওরা নাচগান করছে।

অজিত। সত্যিই ওরা ভারি সরল, শুধু সরল নয়, কোমলও। লক্ষ্য করেছেন রমা দেবী, অসভ্য হলেও ওরা পরদুঃখকাতর, সত্যবাদী।

রমা। আর যাই বলুন, ওদের অসভ্য বলবেন না অজিতবাবু। যারা সরল, সত্যবাদী পরদুঃখকাতর তারা যদি অসভ্য হয় তা হলে সভ্য কারা?

অজিত। (চিন্তিত ভাবে) না, অসভ্য বলা চলে না। তবে একটা কথা কি, ওরা লেখাপড়া জানে না এবং পোশাক-পরিচ্ছদ ওদের সুষ্ঠু নয়।

রমা। আমার মতে কেতাবী বিদ্যার বিশেষ কোন মূল্য নেই। আর যে বলে ওদের পোশাক সুষ্ঠু নয়, তার সৌন্দর্য্যবোধ অত্যন্ত কম। লম্বা ঘাসের ঘাগরা, কচি পাতার কাঁচুলি, ফুলের অলঙ্কার, এর চেয়ে সুন্দর পোশাক যে হতে পারে তা আমি জানি না।

অজিত। দেহের গড়ন ওদের অনবদ্য।

রমা। এর চেয়ে বেশী আর কি চান অজিতবাবু? সমাজ হিসেবে সহজদের সমাজই শ্রেষ্ঠ, কোন বাধা-নিষেধ নাই অথচ কদাচারও নাই। মানুষ হিসেবেও ওরা শ্রেষ্ঠ, কেননা ওরা সত্যবাদী, সরল, সহজ ও দরদী। ওদের নিজস্ব সম্পত্তি নেই, সম্পত্তি সমাজের। ওদের শাসনতন্ত্র বলে কিছু নেই, আপনাদের মতে সেইটাই ত উন্নতির চরম অবস্থা।

অজিত। কিন্তু—

রমা। (বাধা দিয়ে) কিন্তু-টিন্তু নেই। (যে দিকে সহজেরা নাচ-গান করছে সে দিকে তাকিয়ে) ওদের আনন্দও প্রচুর, দেখুন, কি সুন্দর নাচ ওদের। (অজিতের দিকে ফিরে) অজিতবাবু, সাতটা মানুষ দিয়ে সাম্যবাদ-সঙ্গত একটা সমাজ গড়ে তোলবার চেষ্টা না করে আসুন আমরা সহজদের সমাজে মিশে যাই।

অজিত। (হো হো করে হেসে ওঠে)

রমা। কথাটা কি এতই হাস্যকর?

অজিত। (হাসতে হাসতে) সত্যিই আপনার রহস্যবোধ আছে।

রমা। না, আমি মোটেই রহস্য করছি না।

অজিত। (হাসি থামিয়ে) কালক্রমে শাসনতন্ত্র গড়ে উঠবে, এবং যখন তার প্রয়োজনীয়তার অভাব হবে তখন তা অদৃশ্য হবে। সভ্যদের সমাজে শাসনতন্ত্র এখনও গড়ে ওঠে নি বলে খুব উৎসাহিত হবেন না রমাদেবী—ওদের সমাজে একটা শাসনতন্ত্র গড়ে উঠবার সম্ভাবনা রয়ে গেছে।

রমা। আমার সন্দেহ হচ্ছে অজিতবাবু, আপনারা শাসনতন্ত্রের বিলুপ্তি চান বটে, কিন্তু বিলুপ্তি সত্যিকার ঘটলে আপনাদের ঘুম হবে না।

[বহু দূর থেকে ঢাকের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়, টেলিগ্রাফের টরে টক্কার মত সাঙ্কেতিক ভাষায় তা বেজে চলে]

অজিত। (শুনতে পেয়ে) রমা দেবীর ডাক পড়েছে, আপনার বৈজ্ঞানিক দাদা শব্দ-সঙ্কেত পাঠাচ্ছেন।

রমা। হাঁ, শুনতে পেয়েছি, দাদা আমাকে ডাকছেন।

অজিত। কি আশ্চর্য্য উদ্ভাবনী-শক্তি আপনার দাদার। শুনেছিলাম কাফ্রীরা ঐভাবে এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে খবর পাঠায়। সেই তথ্যটি বৈজ্ঞানিক এই জঙ্গলে কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন, আমাদের বেকার-সমস্যার সমাধান ঘটেছে।

রমা। আমি চললাম অজিতবাবু।

অজিত। আমিও চলি, কাঠ সংগ্রহ এখনও হয় নি।

(রমা প্রস্থান করে, অজিত পাথরের উপর কুড়ুলখানা ঘসে ধারালো করে, তারপরে তা কাঁধে তুলে বনের মধ্যে প্রবেশ করে)

—

২য় অঙ্ক

গুটি-কয়েক গাছের নীচে লতাপাতা দিয়ে তৈরি তিন-চারখানা কুঁড়েঘর, পাশে বিস্তৃত বালুকাময় বেলাভূমি এবং অদূরে নীল সমুদ্র। কুঁড়েঘরের এক পাশে পাথর ও মাটি দিয়ে তৈরি অদ্ভুত ধরণের লৌহনিষ্কাশনের একটি চুল্লি, তার উপর দিয়ে প্রচুর ধোঁয়া বেরুচ্ছে, আশে-পাশে কাঁচা লোহার খণ্ড, ছোট-বড় হাতুড়ি। চুল্লির সামনে বসে বৈজ্ঞানিক বিজয় চুল্লিতে জ্বালানি ঠেলছেন। বেলা মধ্যাহ্ন, কাঠের বোঝা মাথায় করে প্রবেশ করে অজিত, সশব্দে বোঝা মাটিতে ফেলে দেয়, সে শব্দে বৈজ্ঞানিকের ধ্যান ভাঙ্গে না। একখানা কুটীর থেকে বেরিয়ে আসে রমা।

রমা। জঙ্গলের সব কাঠ আজ নিয়ে এসেছেন অজিতবাবু।

অজিত। (কপালের ঘাম মুছতে মুছতে) মাত্র গোটা দুই গাছের গুঁড়ি।

রমা। আর সব কোথায়?

অজিত। আর সবের খবর বলতে পারব না, তারা গেছে উত্তরে, আমি গেছি দক্ষিণে।

রমা। একি দুঃসংবাদ—আপনি দক্ষিণ-পন্থী?

অজিত। আগে কথাটা শুনুন, তারপরে শোক প্রকাশ করবেন। দ্বীপের দক্ষিণ দিকে যে পাহাড়টা আছে তার কাছাকাছি অনেক বিচিত্র ধরণের পাথর দেখতে পাই, আমার মনে হয় সেগুলোর বৈজ্ঞানিক মূল্য আছে, বিজয়বাবুকে দেখাবার জন্যে আজ একটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। আমি যা সন্দেহ করেছি সেটা যদি তাই হয় তা হলে আপনাকে আমি অবাক করে দিতে পারব।

রমা। (উৎসাহিত ভাবে) কোথায়, দেখি।

অজিত। এই দেখুন, (পাতার মোড়ক খুলে একখানা ভারী পাথর বার করে রমাকে দেয়)

রমা। (পাথর হাতে নিয়ে) খুব যে ভারী। (বিজয়ের কাছে গিয়ে) দাদা।

বিজয়। (চেতনা ফিরে আসে) কি রমা?

রমা। এই দেখ, অজিতবাবু আজ কেমন সুন্দর একটা পাথর এনেছেন।

বিজয়। (পাথরখানা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে) পাথরখানা সুন্দরই বটে - বলতে পারিস রমা এটা কি পাথর?

রমা। না দাদা, বলতে পারব না, তোমার মত পণ্ডিত হলে বলতে পারতাম।

বিজয়। এই পাথরের প্রাপ্তিসংবাদটা যদি সভ্য জগতে পাঠাতে পারতিস তা হলে দেখতিস পৃথিবীর চারদিক থেকে অসংখ্য জাহাজ এই দিকে ছুটে আসছে।

অজিত। (সাগ্রহে) তা হলে আমি যা সন্দেহ করেছি এ পাথর তাই।

বিজয়। তাই, এ সোনা।

রমা। সোনা! (বিজয়ের হাত থেকে পাথরখানা নিয়ে) এ সোনা!

অজিত। দেখুন, আমি যে বলেছিলাম আজ আমি আপনাকে অবাক করে দেব।

রমা। (সোৎসাহে) পাহাড়ের নীচে এ পাথর অনেক আছে?

অজিত। অনেক, অনেক আছে।

রমা। আমাকে এক দিন সেখানে নিয়ে যাবেন অজিতবাবু?

অজিত। কেন বলুন ত? উদ্দেশ্য সাধু বলে মনে হচ্ছে না।

রমা। (হাসতে হাসতে) হয়ত আমি আরও মূল্যবান পদার্থ আবিষ্কার করতে পারি।

অজিত। আপনার সাহায্য নেবার আগেই আমি আরও মূল্যবান পদার্থ আবিষ্কার করেছি।

রমা। নিশ্চয় হীরক!

অজিত। তার চেয়েও মূল্যবান, এই দেখুন (আর একটা পাতার মোড়ক খুলে সুন্দর কয়েকটি ফুল বার করে)

রমা। (এগিয়ে এসে) কি আশ্চর্য, এমন সুন্দর ফুল আমি আর কখনও দেখি নি।

অজিত। (ফুলগুলো রমার হাতে দিয়ে) এই নিন, এ আপনার জন্যে এনেছি।

রমা। (সোনার টুকরোটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে এবং ফুলগুলো নিয়ে) কি সুন্দর—কি সুন্দর!

অজিত। এ দেশে সোনার চেয়ে ফুলের আদর বেশী।

(দূর থেকে গানের আওয়াজ ভেসে আসে)

রমা। ঐ যে ওরাও এসে পড়েছে—সবিতাদির গান শুনতে পাচ্ছি।

(গান গাইতে গাইতে সর্বাগ্রে সবিতার প্রবেশ, তার মাথার একটা ফলের ঝুড়ি, তার পিছনে লতি, আরও পিছনে গোটাদুই বনমুরগী হাতে গণেশ ও ভবেশের প্রবেশ)

রমা। (এগিয়ে গিয়ে সবিতার হাত থেকে ফলের ঝুড়ি নিয়ে) আজ বুঝি অনেক দূরে গিয়েছিলেন সবিতাদি?

সবিতা। (পাতার পোশাকটা গুছিয়ে নিতে নিতে) গিয়েছিলাম সেই ঝরণাটার কাছে যেটার নাম তুমি রেখেছ 'উচ্ছ্বাস।'

লতি। আহা, কি মিষ্টি তার জল।

অজিত। আজ দেখছি বিরাট শিকার হয়েছে।

ভবেশ। (মুরগী রেখে) তবে কি আশা করেছিলেন সিংহ শিকার করে নিয়ে আসব?

অজিত। শুনেছি সিংহের মাংস তেমন সরস নয়, একটা হরিণ হলেও হ'ত।

সবিতা। অজিতবাবুর কুক্কুট-মাংসে অরুচি ধরে গেছে হয়েছে?

ভবেশ। দু'এক জনের অরুচি হওয়া মন্দ নয়। (একটা পাথরের উপর বসে)

গণেশ। সেকথা আর বলবেন না বাবু, একটা হরিণের পিছনে বেজায় ছুটেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ফসকে গেল।

ভবেশ। আহা, অজিতবাবু উপস্থিত থাকলে সে হরিণ কি প্রাণ নিয়ে পালাতে পারে? সেদিন সমুদ্রের ধারে সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য আপনার মনে পড়ে রমা দেবী?

রমা। (হাসতে হাসতে) পরিষ্কার মনে পড়ে, অজিতবাবু ছুটেছিলেন একটা সামুদ্রিক কচ্ছপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

ভবেশ। এবং জয়লাভ করেছিলেন, কিন্তু সেটা উল্টে দিতে গিয়ে নিজেই উল্টে পড়েছিলেন।

রমা। সেই থেকে উনি শিকার ছেড়ে দিয়ে কাঠ কুড়োতে সুরু করেছেন।

অজিত। কাঠও কুড়ুই আবার কাঞ্চনও কুড়ুই।

রমা। হাঁ, সত্যিই অজিতবাবু আজ এক খণ্ড সোনা কুড়িয়ে এনেছিলেন।

ভবেশ। (ব্যগ্রভাবে) দেখি—দেখি।

রমা। ঐ যে ওদিকে ফেলে দিয়েছি।

ভবেশ। ফেলে দিয়েছেন! মাথা খারাপ নাকি আপনার? (উঠে খুঁজতে সুরু করে) কোথায় ফেলেছেন ঠিক করে বলুন তো।

রমা। ঐ দিকেই ফেলেছি বোধ হয়।

[ভবেশ ব্যগ্রভাবে খুঁজতে থাকে]

অজিত। চলে আসুন ভবেশবাবু, এক টুকরো সোনার জন্যে অত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কেন? আমাদের এই নতুন দেশে আমরা একটা নতুন মানদণ্ড গড়ে তুলেছি, এখানে সোনার চেয়ে ফুলের দাম বেশী।

বিজয়। সভ্যতার আরম্ভে যা ছিল।

অজিত। এবং সভ্যতার শেষে যা হবে।

ভবেশ। (খুঁজে কিছু না পেয়ে ফিরে এসে বসে) অবিশ্যি এখন সোনার মূল্যই বা কি?

সবিতা। আর সভ্য জগতে ফিরে যাবার সম্ভাবনাও নাই।

অজিত। সভ্য জগৎ যাকে বলছেন সেটাকে আর আমরা সভ্য জগৎ বলে স্বীকার করব না।

রমা। (হাসতে হাসতে) আপনারা জানেন না, অজিতবাবু আজ সকালে সঙ্কল্প করেছেন আমাদের এই সাত জনকে নিয়ে সাম্যবাদ সঙ্গত এক আদর্শ সমাজ গড়ে তুলবেন।

বিজয়। অজিত বাবুর সঙ্কল্পে মৌলিকতা আছে।

অজিত। এ মৌলিকতা আমার নয়, বিধাতার। তিনি কেমন বিচিত্রতার সমাবেশ করেছেন দেখুন, অসীম সমুদ্রের মাঝখানে অজানা দ্বীপ, তার মধ্যে সাতটি মানুষ—একজন বৈজ্ঞানিক, একজন তাঁর কবি ভগ্নী, (নিজের বুকের উপর হাত রেখে) একজন শিক্ষক, একজন ধনী ব্যবসায়ী, একজন তাঁর বিদুষী পত্নী, একজন শ্রমজীবী, একজন তার স্ত্রী।

বিজয়। তা হলে আপনি অবিলম্বে কাজে লেগে যান।

অজিত। (উৎসাহিত ভাবে) চমৎকার প্রস্তাব (চারিদিকে তাকিয়ে) আশা করি সকলেরই এ বিষয়ে সম্মতি আছে।

সবিতা। না, আমার ঘোরতর আপত্তি আছে। আমি প্রস্তাব করছি অজিতবাবু প্রথমে তাঁর আরব্ধ কর্ম্ম শেষ করুন, অর্থাৎ কাঠগুলো চেলা করুন।

ভবেশ। আমি এ প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি।

বিজয়। ঠিক কথা, কাঠ কাটা সভ্যতার প্রথম পাঠ।

অজিত। কেবল আমার নয়, আজ অনেকেরই পাঠ বাকি আছে। (উঠে কুড়ুল নিয়ে কাঠ কাটার আয়োজন করে)

রমা। (হাসতে হাসতে) বেশ ত, এই আমিও যাচ্ছি ঝরণা থেকে জল আনতে।

[রমা একটা কলসী নিয়ে ঝরণা থেকে জল আনতে যায়, সবিতা ও লতি কুটীরে প্রবেশ করে, গণেশ একখানা ছুরি ধার দিতে বসে, ভবেশ একটা গাছে ঠেস দিয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে, অজিত সশব্দে কাঠ কাটতে থাকে। একটু পরে জল নিয়ে রমা ফিরে আসে, গণেশ ধারালো ছুরি ও মুরগী নিয়ে অন্তরালে যায়, নেপথ্যে সবিতা গান গেয়ে উঠে, ভবেশ চোখ মেলে চায়]

অজিত। (ঘাম মুছতে মুছতে) বৈজ্ঞানিক মহাশয়কে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

বিজয়। (ফিরে বসে) নিশ্চয় পারেন।

অজিত। মহাশয় ত পাথর থেকে লৌহনিষ্কাশন করে চমৎকার কুড়ুল তৈরি করে দিয়েছেন, কাঠ কাটা মেশিনটি দয়া করে কবে তৈরি করে দেবেন ?

বিজয়। তাও তৈরি হবে।

অজিত। তত দিন বাঁচব কি ?

ভবেশ। বাচবেন বৈকি—আশায় বুক বাঁধুন, নতুন সভ্যতা গড়ে তুলতে হবে যে।

[সবিতা ও লতি কুটীরের দরজায় এসে দাড়ায়]

অজিত। গড়ে তুলতে হবে, নিশ্চয় গড়ে তুলতে হবে। তবে আপনার মত নিকৃষ্ট উপাদানকে যথেষ্ট পুড়িয়ে পিটে নিতে হবে।

সবিতা। তা হলে কাজটা অবিলম্বে আরম্ভ করা উচিত।

ভবেশ। (সবিতাকে লক্ষ্য করে) তাই নাকি ? দশ বছর বিবাহিত জীবনে তোমার উপাদানটাও অনেকভাবে পরীক্ষা করবার সুযোগ আমার হয়েছে, কিন্তু কোনদিনই সেটা যথেষ্ট উৎকৃষ্ট বলে মনে হয়নি।

গণেশ। আজ্ঞে কর্তা আমি কিন্তু বরাবরই লতিতে দু'চার ঘা দিয়ে এসেছি, ওর উন্নতি বোধ করি শিগগীরই হবে।

[সবাই হেসে ওঠে]

লতি। (ঝঙ্কার দিয়ে) কি বললি ? তা হলে হাটের মদ্দি আমি হাঁড়ি ভেঙ্গে দি ?

অজিত। থাক থাক, আর হাঁড়ি ভাঙ্গতে হবে না, আমরা সব বুঝতে পেরেছি। আমি ভাবছিলাম আমাদের এই নতুন সভ্যতার সুরু হবে কোন খান থেকে, এইবার তার উত্তর মিলেছে — সুরু হবে মামুলি বিয়ের আমূল পরিবর্তন থেকে।

ভবেশ। (উদগ্রীব ভাবে) কি বললেন ! কথাটায় যেন যথেষ্ট যুক্তি আছে মনে হচ্ছে।

সবিতা। তুমি এত যুক্তিবাদী কবে থেকে হলে ?

রমা। এ দ্বীপের জলহাওয়ার গুণ আছে।

অজিত। (উৎসাহিত হয়ে) এ দ্বীপের জলহাওয়ার গুণ আছে, ভবেশবাবু পর্য্যন্ত যুক্তিবাদী হয়ে উঠেছেন।

রমা। হয় ত যুক্তিবাদী উনি বহুকাল, তবে সেটা প্রকাশ করবার সাহস ছিল না।

ভবেশ। যারা নতুন সভ্যতা গড়বে তাদের সাহসী হতে হবে, কি বলেন অজিতবাবু ?

অজিত। নিশ্চয়, নিশ্চয়, ভয়টয় আর আমাদের নেই, পুরোনো পচা সভ্যতার মাধ্যাকর্ষণের বাইরে আমরা এসে পড়েছি।

রমা। সেই সঙ্গে ভবেশবাবুও সবিতাদির মাধ্যাকর্ষণের বাইরে এসে পড়েছেন বুঝি ?

সবিতা। আর একটা অসম্ভব সম্ভব হ'ল।

রমা। অজিতবাবু, আপনি হচ্ছেন আমাদের নতুন মনু।

অজিত। (উৎসাহিত ভাবে) তা হলে আসুন আমরা এক নতুন সংহিতা রচনা করি।

সবিতা। আমরা কিন্তু ডিক্টেটর চাই না।

অজিত। কোনমতেই না।

রমা। শ্রেণীবিভাগ লোপ করতে হবে।

অজিত। অবিলম্বে।

সবিতা। ধনকে সমানভাগে বণ্টন করতে হবে।

ভবেশ। নূতন পরিস্থিতিতে আমার আপত্তি নেই।

রমা। যৌথ কৃষি চালাতে হবে।

অজিত। নিশ্চয়, নিশ্চয়।

ভবেশ। মামুলি বিয়ের আমূল পরিবর্তন করতে হবে।

রমা। এটা খুব সহজ হবে কি ?

বিজয়। কেন হবে না, প্রথমে পুরোনো গ্রন্থিগুলো খুলে ফেলা হোক। অর্থাৎ পূর্ব্বের বিয়েগুলো বাতিল করে দেওয়া হোক।

অজিত। দেখুন কত সহজ !

রমা। আমার মতে এ বিষয়ে ভোট নেওয়া উচিত।

ভবেশ। আশা করি অবিবাহিতেরা নিরপেক্ষ থাকবেন।

অজিত। খুবই যুক্তিসঙ্গত কথা (সবাইকে সম্বোধন করে) বন্ধুগণ, আমি প্রস্তাব করছি আমাদের এই নতুন সমাজে প্রাচীন সমাজের বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়ে যাক। এই প্রস্তাবের সপক্ষে যাঁরা ভোট দেবেন তাঁরা হাত তুলুন।

গণেশ। আজ্ঞে বাবু, আপনারা কি কওয়া-বোলা করছেন তা বুঝতে পারছি নে।

ভবেশ। বুঝতে পারছ না ? শোনো, কথাটা হচ্ছে এই যে এখানে আমরা এক ভারি মজার দেশ গড়ে তুলব, তাই পুরোনো বিয়েটিয়ে—যেমন তোমার লতির এসব ভেঙ্গে দিতে হবে—এখানে এসব চলবে না। এতে তোমার আপত্তি আছে ?

গণেশ। আজ্ঞে আমি পরে বলব, আগে লতি বলুক।

লতি। ইস্, আমি কেন আগে কইতে যাব।

অজিত। আগে-পরের দরকার নাই, একসঙ্গে হাত তুলুন, এক, দুই, তিন—

[ভবেশ, সবিতা, গণেশ ও লতি হাত তোলে]

বিজয়। চমৎকার, চমৎকার, একটা বিরাট কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ হ'ল।

অজিত। এর পরে আর বিবাহ থাকবে না, যৌথ-পরিবার গঠন করতে হবে।

সবিতা। তার মানে?

ভবেশ। তার মানে বোধ হয় এই যে, কয়েক হাজার বছর আগে অনেক সমাজ যেমন ছিল, অর্থাৎ কেউ কারু আপনার নয়, সবাই-সবার এই রকম কিছু—তাই না অজিতবাবু?

অজিত। ঠিক তাই, তবে আমরা কয়েক হাজার বছর পেছিয়ে যাব না—কয়েক হাজার বছর এগিয়ে যাব।

সবিতা। (উত্তাপের সঙ্গে) যৌথ-পরিবার মানে যদি ঐ হয় তা হলে তাতে আমার ঘোরতর আপত্তি আছে।

ভবেশ। এত তেতে উঠলে কেন? আপত্তি হবার কারণটা কি শুনি?

সবিতা। একটা প্রশ্নের উত্তর দিন তো অজিতবাবু, যৌথ-পরিবারে শিশুসন্তান পালন করবে কে?

অজিত। মায়েরা পালন করবে।

সবিতা। কেননা, পিতৃত্বের দায়িত্ব যেমন সবার থাকবে তেমনি কারুরই থাকবে না—এই তো?

ভবেশ। সবারই ঘাড়ে কিছু কিছু পড়লে দায়িত্ব হালকা হবে।

সবিতা। থাম, পুরুষকে আমি ভাল করে চিনি। পিতৃত্বের জন্যে ষোল আনা দায়ী যারা, অর্থাৎ যারা বিবাহিত স্বামী তারাও সব সময় শিশুপালনটা মায়ের ঘাড়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করে, আর যেখানে দায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকবে সেখানে যা ঘটবে তা আমি বেশ কল্পনা করতে পারছি। না অজিতবাবু, যৌথ-পরিবার চলবে না।

রমা। এ যুক্তি অকাট্য।

ভবেশ। লতির মতামতটাও তা হলে শোনা যাক।

লতি। একটা বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছি বলে আর একটা বিয়ে করতে পারব না এ কেমন কথা বাবু!

সবিতা। লতি তার আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রেরণা থেকে ঠিক কথা বলেছে—আমরা আবার বিয়ে করতে চাই।

অজিত। ও বিষয়ে মেয়েদের মধ্যে যখন মতভেদ নেই তখন বিবাহ প্রথা চালু রাখতেই হবে।

ভবেশ। আবার মাঝে মাঝে ভেঙ্গে দিলেই হবে।

সবিতা। তাও যখন খুশী চলবে না, দু'পক্ষের মত হলে তবেই ভেঙ্গে দেওয়া চলবে—তার আগে নয়।

অজিত। ও সব খুঁটিনাটি বিষয় ক্রমে ক্রমে ভাবা যাবে—এখন—

ভবেশ। হ্যাঁ এখনও খাওয়া হয় নি, পেটের তাগিদটা মিটিয়ে ফেলা যাক।

রমা। সংস্কারের দেয়াল ভেঙ্গে পথ পরিষ্কার করা হ'ল, এখন পেটের তাগিদের কথা ভুলে গিয়ে হৃদয়ের তাগিদ মেটাবার প্রচেষ্টায় লাগুন।

ভবেশ। বস্তুতান্ত্রিক মীমাংসা কিন্তু বলছে পেট আগে, হৃদয় পরে।

রমা। নীচের দিক থেকে দেখলে পেট অবশ্যই আগে, কিন্তু উপরের দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে হৃদয়ই আগে।

বিজয়। মানুষের পক্ষে যখন ও দুটোর সমান প্রয়োজন তখন দুটোরই চাহিদা মেটাতে হবে। কয়েক ঘণ্টায় আমরা কয়েক বছরের কাজ করে ফেলেছি, এখন সেই অনুপাতে পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা কর রমা।

রমা। রান্না হয়ে গেছে—আপনারা আসতে পারেন।

[উৎসাহের সঙ্গে একে একে সকলে কুটীরে প্রবেশ করে—সর্ব্বশেষে প্রবেশ করে বিজয়]

—

৩য় অঙ্ক

বনের মধ্যে খানিকটা খোলা জায়গা, সময় অপরাহ্ন। দূরে গান শোনা যায় এবং একটু পরে গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে সবিতা, সঙ্গে তার গণেশ।

সবিতা। (গান)—

জীবন ভরিয়া চেয়েছি যাহারে কাছে
সে প্রিয় আমার কোথায় লুকায়ে আছে।
বন-পথে পথে বাজায়ে মধুর বীণ,
মনে হয় যেন আসিছে সে নিশিদিন
রাজার মতন সাজিয়া সগৌরবে,
বলো সে অজানা আসিবে আমার কবে!

সবিতা। (গান শেষ করে) কেমন লাগল?

গণেশ। আজ্ঞে খুব ভাল লাগল—আপনার খাসা গলা।

সবিতা। (সুর করে) 'বলো সে অজানা আসিবে আমার কবে?'

গণেশ। (মাথা নাড়ে)

সবিতা। (আবার সুর করে) বলো সে অজানা আসিবে আমার কবে?

গণেশ। আজ্ঞে?

সবিতা। (হেসে) বলতে পারলে না?

গণেশ। (চিন্তিত ভাবে) আজ্ঞে বলতে পারলাম না।

সবিতা। গানের মানেটা বুঝতে পার নি বুঝি?

গণেশ। (মাথা নাড়ে) আজ্ঞে না।

সবিতা। ভাবটাও কি বুঝতে পার নি?

গণেশ। আজ্ঞে তা একটু একটু বুঝতে পেরেছি—গান শুনে বুকের মধ্যে যেন কেমন করে উঠেছে।

সবিতা। তুমিই সত্যিকার রসিক, ভাষা না বুঝেও ভাব বুঝতে পেরেছ। মালয়ে তুমি কি কাজ করতে গণেশ?

গণেশ। আজ্ঞে, কুলীর কাজ করতাম।

সবিতা। চমৎকার কাজ করতে, কেমন সুস্থ সবল দেহ, ক্ষিধে পায়, রাত্রে ঘুম হয়—হার্টের দোষ নেই, লিভারের দোষ নেই, ব্লাড-প্রেসার নেই,— চমৎকার।

গণেশ। (বুঝতে না পেরে) আজ্ঞে ?

সবিতা। আমার সব কথা তুমি বুঝতে পার না গণেশ ?

গণেশ। আজ্ঞে, আপনি যথার্থই ধরেছেন।

সবিতা। আমারও হয়েছে ঐ বিপদ, তোমার সব কথা বুঝতে পারি না।

গণেশ। আজ্ঞে, আমি মুখ্যু মানুষ।

সবিতা। সেজন্যে লজ্জিত হয়ো না, বই-পড়া বিদ্যের মূল্যই-বা কি।

গণেশ। (সোৎসাহে) আজ্ঞে হাঁ, বিদ্যের মূল্যই-বা কি।

সবিতা। (হাসতে হাসতে) আমি বলেছি বই-পড়া বিদ্যার মূল্য নেই, বিদ্যার মূল্য আছে বৈকি। একটু চেষ্টা করলে কাজ চালাবার মত লেখাপড়া তুমিও শিখে নিতে পারবে।

গণেশ। (মাথা নেড়ে) ছোটবেলায় বাবার ইচ্ছে হয়েছিল আমাকে পাঠশালায় পড়ায়, তাই পেরথম ভাগ কিনে দিয়েছিল। তাই না দেখে আমি রাতারাতি সাঁতরে নবগঙ্গা পার হয়ে মামা-বাড়ী পালিয়ে গিছিলাম।

সবিতা। (চিন্তিতভাবে) বল কি গণেশ! তবে লেখাপড়ার কথা তুলে আর দরকার নেই। ছোটবেলায় সাঁতরে নদী পার হয়ে পালিয়েছিলে, এখন হয় ত সাঁতরে সমুদ্রই পার হয়ে যাবে।

গণেশ। আজ্ঞে তা সত্যি, এ বয়সে আর লেখাপড়া হবে না।

সবিতা। আচ্ছা গণেশ, তুমি আমাকে এত 'আজ্ঞে, আজ্ঞে' কর কেন ?

গণেশ। আজ্ঞে আপনাদের সঙ্গে কথা কইতে গেলেই ওটা মুখ দিয়ে বার হয়ে আসে।

সবিতা। বুঝতে পারছ না, আমি তোমাকে ভালবাসতে চেষ্টা করছি ?

গণেশ। (হেসে) আজ্ঞে তা একটু একটু বুঝতে পারছি বৈকি।

সবিতা। আবার আজ্ঞে! ও অভ্যাসটা তোমার ছাড়তে হবে। গণেশ ?

গণেশ। আজ্ঞে (লজ্জিত হয়ে) ইয়ে— কি বলছেন ?

সবিতা। বলছি কি ভালবাসার চেষ্টাটা কি এক-তরফাই হবে ? তোমার দিক থেকে মোটেই সাড়া আসছে না, এটা যেন তেমন সুষ্ঠু হচ্ছে না।

গণেশ। (লজ্জিতভাবে) আমরা চাষা মানুষ, আমরা কি আর আপনাদের মত কথা বলতে পারি।

সবিতা। আমাদের মত নাই-বা বললে, তোমাদের মতই বল, বেশ নতুনত্ব হবে।

গণেশ। আজ্ঞে তুইতোকারি এসে পড়বে।

সবিতা। ও আর এমন মারাত্মক কি, তার বেশী নয় ত ?

গণেশ। মাঝে মাঝে চড়টা-চাপড়টা।

সবিতা। (চিন্তিতভাবে) সমস্যায় ফেললে গণেশ।

গণেশ। (অভয় দিয়ে) প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হলেও শেষে অভ্যেস হয়ে যাবে।

সবিতা। তার পরে ও না হলে জমবেই না —কি বল ?

গণেশ। (উৎসাহিত ভাবে) আজ্ঞে ঠিক বলেছেন।

সবিতা। ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

গণেশ। (খুশী হয়ে) আজ্ঞে তা ঠিক, ভবেশবাবুই বলেন আর অজিতবাবুই বলেন, কোন বাবুই আমার সঙ্গে পারবে না, দেখবেন আমি রোজ হরিণ মেরে নিয়ে আসব।

সবিতা। কিন্তু নতুন দেশের নতুন আইন অনুসারে ভাগ যে হবে সমান সমান!

গণেশ। (মাথা চুলকে) তা ত হবে, কিন্তু একি নেয্য কাজ হবে —বলুন ত আপনি ?

সবিতা। ঠিক এই যুক্তিই ত দেখায় ওদেশের সোনার হরিণ-শিকারীরা, কিন্তু সেখানে তোমরা মজুরেরা তা মান কৈ ?

গণেশ। (বুঝতে না পেরে মাথা চুলকোয়) আজ্ঞে কথাটা ঠিক বুঝতে পরেলাম না।

সবিতা। (হেসে) তা নাইবা বুঝলে —ও এমন কিছু কাজের কথা নয়, ভালবাসার কথা ত বুঝতে পার ?

গণেশ। (উৎসাহিতভাবে) তা খুব পারি।

সবিতা : তবে চল সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসি, সেখানে খোলা আকাশ দেখলে মনও খুলে যায়।

গণেশ। আজ্ঞে না বুঝলেও আপনার কথা বড় মিষ্টি লাগে।

[দু'জনে প্রস্থান করে, একটু পরে ছুটতে ছুটতে আসে লতি, একটা গাছের আড়ালে লুকোয়, পেছনে প্রবেশ করে ভবেশ]

ভবেশ। (চার দিকে তাকিয়ে) এরাও বেশ লুকোচুরি খেলতে পারে দেখছি —লতি, ও লতি [ডাকে]।

লতি। (কোন সাড়া দেয় না)

ভবেশ। আমি চললাম, ঐ যে একটা মস্তবড় অজগর এদিকে আসছে।

লতি। (আড়াল থেকে বেরিয়ে) কৈ, কোথায় অজগর ?

ভবেশ। (হাসতে হাসতে নিজেকে দেখিয়ে) এই যে সেই মস্তবড় অজগর।

লতি। (কৃত্রিম ভয় প্রকাশ করে) ও বাবা, এ কেমন অজগর—এ অজগর আমাকে খেয়ে ফেলবে না ত ?

ভবেশ। একবার ধরা দিয়ে দেখই না।

লতি। অজগরের মুখে গিয়ে কি কেউ ধরা দেয় বাবু, অজগরকেই ফন্দিফিকির করে শিকার ধরতে হয়।

ভবেশ। তাই নাকি! আমার ধারণা ছিল চাষার মেয়ে

ভারি সরল হয়, এখন দেখছি তা মোটেই না, তাদেরও মাথায় বেশ দুষ্ট বুদ্ধি খেলে !

লতি। দুষ্ট মানুষের সঙ্গে দুষ্টুমি করতে হয়।

ভবেশ। দুষ্টুমি তোমাকে চমৎকার মানায়। দুষ্টুমিভরা চোখ দুটি তোমার কি সুন্দর লতি।

লতি। (দু'হাতে দু'চোখ ঢেকে হাসতে থাকে)

ভবেশ। কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে।

লতি। (চোখ খুলে) আমি আবার সুন্দর!

ভবেশ। সত্যিই তুমি সুন্দর। বিদ্যুতের মত তোমার হাসি, মৃণালের মত তোমার বাহু, চাঁপার কলির মত আঙুল।

লতি। (হেসে ঢলে পড়ে) চাঁপার কলির মত আবার আঙুল হয়!

ভবেশ। কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ এ ক্ষেত্রে অচল দেখছি। ওহো, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে—আশা করি এবার ঠিক বুঝতে পারবে—কৃষ্ণবরণ কন্যা তুমি, মেঘবরণ চুল। লতি তোমাকে আমি ভালবাসি।

লতি। তা হলে আমাকে কি দেবেন বলুন।

ভবেশ। সবটা মনই যে তোমাকে দিয়ে ফেলেছি।

লতি। ও সব কথা আমি জানি নে, আমাকে বাজু গড়িয়ে দিতে হবে, তবে জানব ভালবাসা।

ভবেশ। এখানেও দেখছি ভালবাসা ওজনদরে বিক্রী হচ্ছে। বাজু আমি গড়িয়ে দিতে রাজী আছি, কিন্তু এখানে সেকরা কোথায়?

লতি। (দুঃখিত ভাবে) তা হলে কি দেবেন?

ভবেশ। দেব বৈকি, অনেক জিনিষ দেব—কচি পাতার সবুজ শাড়ী দেব, গলায় ঝিনুকের মালা দেব, হাতে ফুলের বালা দেব, খোঁপায় গোঁজবার বন-মোরগের পালক দেব।

লতি। আমাকে সুন্দর দেখাবে?

ভবেশ। খুব, খুব সুন্দর দেখাবে। সেই পোশাকে তুমি যখন নাচবে তখন কি সুন্দর যে তোমাকে দেখা যাবে তা আমি কল্পনাও করতে পারছি নে।

লতি। (লজ্জিত ভাবে) আমি নাচতে জানি না।

ভবেশ। কিন্তু আমি যে নাচ ভালবাসি লতি।

লতি। তা হলে আমি নাচ শিখব।

ভবেশ। (উৎসাহিত ভাবে) তা হলে এখন থেকে শিখতে সুরু কর।

লতি। সুরু করব কেমন করে, কেউ শিখিয়ে না দিলে কি শেখা যায়?

ভবেশ। আচ্ছা দাঁড়াও, আমাকে দেখে কতকটা শিখতে পারবে, নাচতে যদিও আমি পারি না, নাচ দেখেছি কিন্তু অনেক। কথাকলি নাচের কয়েকটা ভঙ্গী দেখাচ্ছি, ভাল করে দেখ (নাচের হাস্যকর অনুকরণ করতে থাকে, এমন সময় প্রবেশ করে অজিত ও রমা। ভবেশের ভঙ্গী দেখে উভয়ে হাসতে সুরু করে)

অজিত। (হাসতে হাসতে) এ কি হচ্ছে ভবেশবাবু?

ভবেশ। (থেমে গিয়ে) কিছু না।

রমা। এ কি অদ্ভুত কিছু না! (হাসতে থাকে)

লতি। বাবু আমাকে নাচ শেখাচ্ছেন রমা দিদি।

অজিত। ওহো বুঝতে পেরেছি, এ সেই জীবজগতের অতি প্রাচীন ধারা—পুং-মানুষ স্ত্রী-মানুষকে নাচ দেখিয়ে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করছে।

"এ সেই জীবজগতের অতি প্রাচীন ধারা—পুংমানুষ স্ত্রীমানুষকে নাচ দেখিয়ে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করছে।"

ভবেশ। তা হলেই বুঝতে পারছেন এতে হাসবার বিশেষ কিছু নাই।

রমা। (অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে) হাসিটা সত্যিই এক্ষেত্রে অনুচিত হয়েছে, ক্ষমা করবেন ভবেশবাবু।

অজিত। এখানে হঠাৎ এসে পড়াটাও অনুচিত হয়েছে।

ভবেশ। খুবই তন্ময় ছিলেন বুঝি, আমাদের অস্তিত্ব একেবারেই টের পান নি!

অজিত। আমরা একটা অতি গুরুতর বিষয় আলোচনা করছিলাম, তাই না রমা দেবী!

ভবেশ। আজ্ঞে হাঁ, সেই বিষয়টা নিয়ে আমরাও আলোচনা করছিলাম।

(সবাই হেসে উঠে)

রমা। কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছেন ভবেশবাবু?

ভবেশ। অগ্রসর হতে পারছি কৈ, পদে পদে বাধা উপস্থিত হচ্ছে। এই যেমন প্রেম বললে লতি বোঝে না—রূপ বললে আমি

বুঝি এক রকম, লতি বোঝে আর এক রকম, রস বললে লতি বোঝে এক রকম, আমি বুঝি আর এক রকম।

রমা। এ দিকেও ঐ ব্যাপার, এগোনো যাচ্ছে না, একটার পর একটা বাধা আসছে, স্বাধীনতা বললে আমি বুঝি এক, অজিতবাবু বোঝেন আর, সাম্যবাদ বলতে অজিতবাবু বোঝেন এক, আমি বুঝি আর।

অজিত। আমি তবু নিরাশ হচ্ছি নে, গরমিল অনেক আছে আবার মিলও ঢের আছে, যেমন শীতে দু'জনেই কাঁপি, গ্রীষ্মে দু'জনেই ঘামি, ক্ষিধে পেলে দু'জনেই খাই, সুখে দু'জনেই হাসি, দুঃখে উভয়েই কাঁদি।

ভবেশ। (উৎসাহিত হয়ে) যথেষ্ট, যথেষ্ট, ওতেই কাজ চলে যাবে।

অজিত। শুনলেন রমা দেবী, ওতেই কাজ চলে যাবে।

রমা। কাজ চলে গেলেই কি হ'ল? কাজ ত আগেও চলছিল। আমাদের আদর্শসমাজে কাজ-চলাগোছ বিয়ে চলবে না অজিতবাবু, এখানে চাই মনের সম্পূর্ণ মিলের উপর প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দর বিয়ে।

ভবেশ। এতকাল যে সব বিয়ে হয়েছে তা মনের সম্পূর্ণ মিলের উপরেও প্রতিষ্ঠিত নয়, সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দরও নয়, অথচ তার ফলে আপনাদের মত সম্পূর্ণ এবং সুন্দর মানুষ সৃষ্টি হয়েছে।

অজিত। এর পরে আর আপনার বলবার কিছু নাই রমা দেবী, 'সম্পূর্ণ' এবং 'সর্ব্বাঙ্গীণ' কথা দুটোর উপর আপনি একটু বেশী জোর দিচ্ছেন।

রমা। আমার ধারণা ছিল অজিতবাবু আদর্শবাদী, কিন্তু এখন দেখছি সে ধারণা ভুল।

ভবেশ। আপনার মত উচ্চ আদর্শের পেছনে যিনি চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরছেন তিনি যদি আদর্শবাদী না হন তা হলে বলুন আদর্শবাদী কে?

(নেপথ্যে বাঁশীর সুর ভেসে আসে)

রমা। শুনছেন সহজাদের উৎসব সুরু হয়েছে।

অজিত। হয়ত ওটা বিবাহোৎসব।

রমা। বাঁশীর সুরে বুঝতে পারছি ওরা নাচছে

লতি। চলুন রমাদি, ওদের নাচ দেখতে যাই।

ভবেশ। ওরা নাচে মন্দ নয়, লতি না হয় ওদের নাচটা শিখে নিও।

রমা। মন্দ নয় কি বলছেন ভবেশবাবু ওদের নাচ অপূর্ব। সহজ ও সাবলীল ভঙ্গীগুলো মনের ভাবকে পরিষ্কার ফুটিয়ে তোলে।

লতি। (আগ্রহের সঙ্গে) চলুন না রমাদি।

রমা। চল যাচ্ছি—লক্ষ্য করেছেন অজিতবাবু, ওদের বাঁশীর সুর মনকে টানতে থাকে।

(সকলের প্রস্থান)

৪র্থ অঙ্ক

বেলা তখন পূর্ব্বাহ্ণ, কুটীরগুলির সামনে বসে বৈজ্ঞানিক বিজয় একমনে লোহা পিটছে। প্রবেশ করে ভবেশ, গণেশ, সবিতা ও লতি। ভবেশ ও গণেশের হাতে লম্বা ঘাসের বোঝা, লতি ও সবিতার হাতে কচিপাতা আর ফুল। সবিতার মুখে গান। হাতুড়ি ফেলে রেখে বৈজ্ঞানিক ঘুরে বসে।

বিজয়। ব্যাপার কি! রোজ মাংস খেয়ে বুঝি অরুচি হয়েছে তাই মুখ বদলাবার জন্যে আজ ঘাস আর কচিপাতার ব্যবস্থা! তা মন্দ কি।

ভবেশ। এ সব আয়োজন পেটের তাগিদে নয়—হৃদয়ের তাগিদে।

"লতির কলহংসগমনের ভিতর ভবেশবাবু একটা কবি-প্রতিভা আবিষ্কার করেছেন।"

সবিতা। আমরা সপিং করে এলাম বিজয়বাবু। (ঘাস দেখিয়ে) এই সব দামী শাড়ী আর (ফুল দেখিয়ে) এই সব গয়না নিয়ে এলাম। আজকে আমাদের উৎসব।

বিজয়। উৎসবটা কি বিবাহ-বিচ্ছেদের ?

ভবেশ। আজ্ঞে না, মিলনের।

বিজয়। (আশ্চর্য্য হয়ে) আবার মিলন।

সবিতা। আবার মিলন, তবে এবার কিছু তেরফের আছে।

বিজয়। (আরো আশ্চর্য্য হয়ে) এত অল্প সময়ে এত দ্রুত উন্নতি! বলুন তো সবিতা দেবী তেরফেরের ফলে অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াল ?

ভবেশ। গণেশের ব্লাডপ্রেসার নেই এবং রাত্রে ঘুম হয় এই তথ্য জেনে সবিতা দেবী মুগ্ধ হয়েছেন।

গণেশ। (নিঃশব্দে হাস্য করে)

সবিতা। লতির কলহপ্রিয়তার ভিতর ভবেশবাবু একটা কবি-প্রতিভা আবিষ্কার করেছেন।

লতি। (লজ্জিতভাবে পাশ ফিরে দাড়ায়)

বিজয়। খুবই আনন্দের আর আশার কথা।

ভবেশ। আনন্দের ও আশার এইখানেই শেষ নয়, অজিতবাবু রমা দেবীর মধ্যে তাঁর আদর্শের সন্ধান পেয়েছেন।

[শুকনো মুখে কুড়ুল কাঁধে অজিতের প্রবেশ, সকলে সোৎসাহে তাকে অভ্যর্থনা করে]

সবিতা। আপনি যে একা অজিতবাবু, রমা কোথায় ?

অজিত। (বিষণ্ণভাবে হাসে)

ভবেশ। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, ধোঁয়া যখন দেখা দিয়েছে, বহ্নি নিকটেই আছেন, সময়মত এসে পড়বেন।

অজিত। (ম্লানভাবে হেসে) এইখানেই প্রমাণ হচ্ছে ন্যায় শাস্ত্রেও অসঙ্গতি আছে, বহ্নির অবর্তমানে ধোঁয়া দেখছেন।

সবিতা। এ আপনার অন্যায় অজিতবাবু, রমাকে ছেড়ে আপনি পালিয়ে এলেন ?

অজিত। এক্ষেত্রে অজিতবাবুকে ছেড়ে রমা পলায়ন করেছেন।

সবিতা। (আশ্চর্য্য হয়ে) বলেন কি অজিতবাবু।

ভবেশ। কি হয়েছে খুলে বলুন তো ?

অজিত। রমা দেবী সভ্যদের সমাজে যোগ দিয়েছেন।

[সবাই হেসে ওঠে]

সবিতা। আপনি নিশ্চয় তামাশা করছেন অজিতবাবু।

অজিত। (কুড়ুল নামিয়ে রেখে) আজ্ঞে না, এটা তামাশার বিষয় মোটেই নয়।

ভবেশ। ওঃ বুঝেছি, রমা দেবী ঐ অসভ্যগুলোকে সভ্য করবার মতলব করেছেন।

অজিত। না উল্টো বুঝেছেন, সভ্যদের সংসর্গে রমা দেবী নিজেই সভ্য হবার মতলব করেছেন। যাদের আপনি অসভ্য বলছেন রমাদেবী তাদেরই পরম সভ্য মনে করেন।

সবিতা। ওদের কিছু কিছু সদ্গুণ আছে একথা স্বীকার করতে হবে।

অজিত। কিছু কিছু নয়, রমা দেবীর মতে ওরা সর্ব্বগুণের আধার। তা ছাড়া ওদের কোন শাসনতন্ত্র নেই।

সবিতা। (দুঃখিত ভাবে) এখন কি উপায়! ওকে ফিরিয়ে আনবার একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে।

"উদীয়মান সূর্য্যের অরুণ আলোয় আমি তাঁর মুখে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার লিপি পাঠ করলাম।"

অজিত। (বসে পড়ে) আমি ওঁর সঙ্গে সঙ্গে সভ্য-পল্লীর প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম, সেইখানে সেই সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে তিনি আমাকে বললেন, "আপনি ফিরে যান অজিতবাবু, আমি আমার জীবন-দেবতার আহ্বান শুনতে পেয়েছি, আমার সাধনা ও সিদ্ধি ঐ ওদের মধ্যে।" উদীয়মান সূর্য্যের অরুণ আলোয় আমি তাঁর মুখে একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞার লিপি পাঠ করলাম।

সবিতা। তা হলে জোর করে ফিরিয়ে আনতে হবে।

অজিত। না—তা অসম্ভব।

ভবেশ। তা হলে তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করা হবে।

বিজয়। (হাতুড়ি রেগে) না, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করা চলবে না। রমা ইচ্ছে করে যেখানে গেছে সেইখানেই থাকুক।

সবিতা। কিন্তু—

অজিত। আমিও ঐ 'কিন্তু'র অবতারণা করেছিলাম। তিনি বললেন, "সমস্ত 'কিন্তু'র অবসান করে দিয়ে আমি এসেছি।"

সবিতা। (দুঃখিত ভাবে) আমাদের আজকের উৎসব তা হলে বন্ধ থাক।

বিজয়। কেন বন্ধ থাকবে? এ উৎসব হচ্ছে মিলনের উৎসব, সবিতাদেবী মিলিত হচ্ছেন গণেশের সঙ্গে, ভবেশবাবু মিলিত হচ্ছেন লতির সঙ্গে, রমা মিলিত হয়েছে সজ্জনদের সঙ্গে, আমার মতে উৎসব রীতিমত জাঁকালো হওয়া উচিত।

ভবেশ। (উৎসাহিত ভাবে) ঠিক কথা, যুক্তিসঙ্গত কথা।

সবিতা। তা হলে এসো লতি, আমরা আয়োজন করতে লেগে যাই।

ভবেশ। নিশ্চয়, নিশ্চয়, পোশাক-আশাক করতেই তোমাদের অনেক সময় লেগে যাবে।

সবিতা। এস লতি, এস (ঘাস ও ফুলের বোঝা নিয়ে লতি ও সবিতা কুটীরে প্রবেশ করে)

ভবেশ। (অজিতকে লক্ষ্য করে) অত হতাশ হয়ে পড়বেন না অজিতবাবু, আপনি ত আশাবাদী লোক।

অজিত। (হতাশ ভাবে) আমি মোটেই হতাশ হইনি ভবেশবাবু।

বিজয়। সামান্য বাধাতে বিপ্লবী কখনও হতাশ হয় না। আমরা একটা বিরাট কাজে হাত দিয়েছি, এ কাজ সফল করে তুলতেই হবে।

ভবেশ। অজিতবাবুর নেতৃত্বে সফলতার পথে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি।

বিজয়। (হেসে) কার নেতৃত্বে বললেন?

ভবেশ। (সগর্ব্বে) অজিতবাবুর নেতৃত্বে।

বিজয়। পৃথিবীতে যারা দেখেও দেখতে চায় না তাদের মধ্যে আপনি একটি।

ভবেশ। পাওনাদারকে অবশ্য অনেক সময় দেখেও দেখতে চাই নে, তা ছাড়া আর সব আমি বেশ ভাল করেই দেখতে পাই মশায়।

বিজয়। কৈ আর দেখতে পেলেন! রাষ্ট্রিক নেতৃত্ব যে হাত বদলেছে তা দেখতে পেয়েছেন কি?

ভবেশ। তাই নাকি অজিতবাবু? আমরা ত আপনাকেই নেতা জানতাম।

অজিত। ও বিষয়ে এখনও ভোট নেওয়া হয়নি।

বিজয়। আমি কেবল এখানকার নেতৃত্বের কথা বলছিনে, আমি ব্যাপকভাবে পৃথিবীর নেতৃত্বের কথা বলছি। চেয়ে দেখুন তাত্ত্বিক আর রাষ্ট্রনৈতিকের নেতৃত্ব শেষ হয়ে গেছে—সুরু হয়েছে বৈজ্ঞানিকের নেতৃত্ব।

অজিত। তাত্ত্বিক আর রাষ্ট্রনৈতিক চিরকাল নেতা থাকবে।

বিজয়। ভুল, ভুল! মনে পড়ে একদা স্বর্গের রাষ্ট্রনৈতিকের দল দধীচির দরজায় ধরণা দিয়েছিলেন? ঠিক তেমনি আজ আবার রাষ্ট্রনৈতিকের দল বৈজ্ঞানিকের দরজায় ধরণা দিয়েছেন। আজ বৈজ্ঞানিকের সাধনায় তৈরি হচ্ছে এটম বম, হাইড্রোজেন বম। যে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক বড় আজ সে দেশ বড় নয়, যে দেশের বৈজ্ঞানিক বড় আজ সেই দেশ বড়।

ভবেশ। মশায় তো খান দুই কুড়ুল তৈরি করেছেন।

বিজয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে কুড়ুল তৈরি হতে লেগেছিল কয়েক হাজার বছর, আমার লেগেছে মাত্র ছ'মাস।

ভবেশ। এই হিসেব অনুসারে বৈজ্ঞানিক এটম বম তৈরি করবার আশা রাখেন কি?

বিজয়। এ দ্বীপে এটম বমের কোন দরকার নেই, কুড়ুলই যথেষ্ট। আপনার মত বীরও কুড়ুলের সাহায্যে একটা সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পারবেন।

ভবেশ। মাফ করবেন, অত বড় কাজ আমাদ্বারা হবে না।

বিজয়। তা হলে আসুন, একটা সামান্য কাজ করুন, ঐ হাতুড়িটা দিয়ে খানিকটা লোহা পিটুন।

(ভবেশ এগিয়ে এসে হাতুড়ি নিয়ে লোহা পিটতে বসে, অজিত গালে হাত দিয়ে চিন্তামগ্ন হয়, গণেশ গোঁফে তা দেয়। এই ভাবে কিছুক্ষণ কাটে তার পরে লম্বা ঘাসের ঘাগরা পরা, ফুলের মালা গলায় প্রবেশ করে সবিতা ও লতি)

ভবেশ। (হাতুড়ি ফেলে দিয়ে) কি সুন্দর, কি অপূর্ব্ব!

বিজয়। উৎসবের আয়োজন তো বিশেষ ভাবেই হয়েছে।

ভবেশ। (সবিতা ও লতিকে) আপনারা এইখানে, এই মাঝখানে আসুন, আমরা চারদিকে ঘিরে বসছি।

সবিতা। (মাঝখানে এসে) তার পরে?

ভবেশ। তার পরে নৃত্য আর গীত।

সবিতা। এ ত হ'ল আমাদের তরফ থেকে, আপনাদের তরফ থেকে কি হচ্ছে?

ভবেশ। আমরাও নাচে যোগ দেব।

অজিত। আজ্ঞে না, আপনাকে আর নেচে দরকার নেই, সেদিন আপনার নাচের নমুনা দেখেছি।

ভবেশ। তা হলে আমি হাততালি দেব।

গণেশ। আজ্ঞে, আমি বাঁশী বাজাব (একটা বাঁশী বার করে)

বিজয়। আমি বয়োজ্যেষ্ঠ, উৎসবের শেষে আমি আশীর্ব্বাদ করব।

ভবেশ। (ব্যস্ত ভাবে) তা হলে আর দেরি কেন, নাচগান সুরু হোক!

[সবিতা ও লতি একটা জঙ্গলী নাচ ও গান সুরু করে, কিছুক্ষণ নাচ গান চলে, হঠাৎ ছুটে প্রবেশ করে রমা, আলুথালু চুল, অসংযত বেশ, নাচ-গান বন্ধ হয়ে যায়]

অজিত। রমা, রমা, কি হয়েছে, তোমার এ কি অবস্থা ?

রমা। (বেশ সংযত করতে করতে) আমি দেখেছি অজিতবাবু, আমি দেখেছি।

সকলে। কি দেখেছ ?

রমা। আমি দেখেছি—পরিষ্কার দেখেছি।

ভবেশ। বলুন না খুলে কি দেখেছেন ?

রমা। সত্যি বলছি আমি দেখেছি।

সবিতা। (চিন্তিত ভাবে) মাথা খারাপ হয়ে গেছে অজিতবাবু।

রমা। না, না, মাথা খারাপ হয়নি, আমি ঠিক দেখেছি। উত্তরের ঐ পাহাড়টার মাথায় দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আমি দেখলাম আসছে, এই দিকে আসছে।

ভবেশ। নবীন সভ্যতার ঢেউ !

রমা। না—জাহাজ।

সকলে। (উত্তেজিত ভাবে) জাহাজ, জাহাজ আসছে ?

রমা। হ্যাঁ, জাহাজ আসছে।

সবিতা। (উত্তেজিত ভাবে) জাহাজ আসছে, সত্যি বলছ জাহাজ আসছে ? কোথায়, কোন্ দিকে ?

অজিত। আপনারও কি মাথা খারাপ হ'ল সবিতা দেবী ?

[সে কথায় ভ্রূক্ষেপও না করে সবিতা ছুটে বেরিয়ে যায়, পিছনে পিছনে যায় ভবেশ]

রমা। চলুন অজিতবাবু, চল দাদা আর দেরি করো না।

অজিত। এ দ্বীপ ছেড়ে যাওয়া এখন আমাদের উচিত হবে না।

রমা। কিন্তু—

অজিত। আপনি ত সমস্ত 'কিন্তু'র অবসান করে দিয়েছেন।

রমা। এখন তর্ক করবার সময় নেই অজিতবাবু।

অজিত। ভেবে দেখুন, আপনার সেদিনকার সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ?

রমা। জাহাজ আসবে সেদিন সেকথা ভাবতেই পারি নি।

অজিত। আশ্চর্য্য—

বিজয়। কিছুই আশ্চর্য্য নয়, পুরনো পৃথিবীটার সঙ্গে যাই আমাদের যোগাযোগ হয়েছে অমনি মাধ্যাকর্ষণের টানে কাত হয়ে পড়েছি। বুঝলে ভাই, হয় কালস্রোতের কিনারায় গালে হাত দিয়ে বসে থাক, স্রোতের আঘাতে তিলে তিলে পুরাতন ক্ষয়ে যাবে, নতুন দেখা দেবে ; আর তা না হলে নিজের হাতে পুরনোকে নির্মম ভাবে ভেঙ্গে গুঁড়ো করে ফেল, যেন সে আর আকর্ষণ করতে না পারে।

[ছুটে সবিতা প্রবেশ করে, পিছনে পিছনে প্রবেশ করে ভবেশ]

সবিতা। সত্যিই জাহাজ এসেছে—বোট প্রায় কিনারায় এসে পড়েছে। চলুন, চলুন, দেরি করবেন না।

রমা। চলুন অজিতবাবু, দাদা চল।

[সবিতা এগিয়ে যায়, ভবেশ কি যেন খুঁজতে থাকে]

সবিতা। (ভবেশকে) ওগো এস, দেরি করছ কেন ?

ভবেশ। এই আসছি (খুঁজতে থাকে)

সবিতা। (ব্যস্ত হয়ে) পাগলের মত কি করছ ?

ভবেশ। অজিতবাবুর পাওয়া সেই সোনার টুকরোটা খুঁজছি।

[সবিতা ফিরে এসে ভবেশের হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়]

রমা। দাদা চল, আসুন অজিতবাবু (এগিয়ে যায়)

অজিত। আমার তেমন যেতে ইচ্ছে করছে না।

রমা। (ভ্রূভঙ্গী করে) চলে আসুন।

[রমা, অজিত, বিজয় প্রস্থান করে, দাঁড়িয়ে থাকে গণেশ আর লতি]
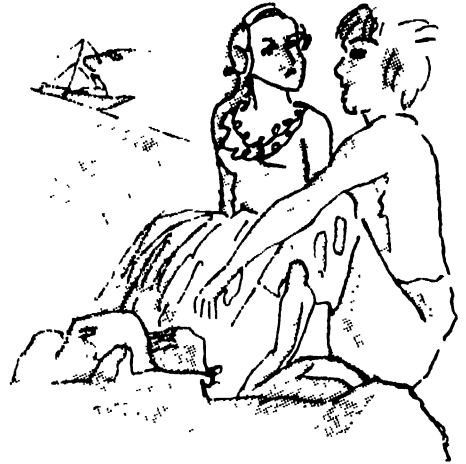
"লতি—তুই যাবিনে ?
গণেশ—না"

লতি। তুই যাবি নে ?

গণেশ। না।

লতি। (গণেশের কাছে এসে) তুই এখানে থাকবি ?

গণেশ। তুই যাবি ত যা, আমি এখানে থাকব, আমি এখন এখানকার মালিক।

লতি। আমিও থাকব।

[দু'জন দু'জনের দিকে তাকায়, লতি গণেশের আরও কাছে সরে আসে]

পটক্ষেপ

প্রাচীন ভারতে বণিক-সংগঠন

শ্রীসুরেশপ্রসাদ নিয়োগী

প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বৈদিক যুগ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। সেই যুগের ভারতীয়েরা সাধারণতঃ পশুচারণ ও কৃষিকার্য্য করিয়া জীবনধারণ করিতেন। তাই তখনও বাণিজ্যের উদ্ভব হয় নাই। ঋগ্‌বেদে অবশ্য আমরা কয়েকটি শিল্পের নাম পাই।

বৈদিক যুগের মাঝামাঝি সময়ে দেখা যায় যে, কোন কোন স্থানে চাহিদার অপেক্ষা কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন অনেক বেশী হইতেছে। অনেক কর্ম্মঠ ও উৎসাহী যুবক এই সুযোগ গ্রহণ করেন। তাহারা উদ্বৃত্ত পণ্য বহন করিয়া লাভের আশায় ঘাটতি অঞ্চলে যাইতে আরম্ভ করেন। এইভাবে বৈদিক যুগে বণিকের উদ্ভব হয়। অথর্ব্ববেদ ও যজুর্বেদ হইতে সে যুগের বণিক সম্বন্ধে আরও অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়।

যাহা হউক, সমগ্র বৈদিক যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে সাধারণতঃ তিন প্রকারের বণিক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইঁহারা বৈশ্য, পণি ও ব্রাহ্মণ বণিক। যজুর্বেদের সমাজ-ব্যবস্থা অনেক উন্নত ছিল এবং এই বেদের শ্রেণীবিভাগে আমরা দেখিতে পাই যে, বৈশ্যের উপর বাণিজ্যের ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে।১ এই তিন শ্রেণীর বণিকের মধ্যে বৈশ্যেরাই ছিলেন শ্রেষ্ঠ এবং বৈদিক সাহিত্যের বহু স্থানে তাঁহাদের গুণ কীর্ত্তন করা হইয়াছে।২

বৈদিক সাহিত্যে পণি শব্দের অর্থ বণিক।৩ এই পণিরা কে বা কাহারা তাহা সঠিক জানিতে পারা যায় না। তবে বৈদিক সাহিত্য অনুযায়ী ইহারা খুব জবরদস্ত বণিক ছিল। তাহাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল ব্যবসা ও অত্যধিক সুদে ঋণদান করা। অনেক পণ্ডিতের মতে তাহারা ভারতে ব্যবসারত বিদেশী বণিক। ভাষাতত্ত্ব বিচার করিয়া আবার কেহ কেহ বলেন যে, পণিরা ফিনিস্ দেশের অধিবাসী।৪ যাহা হউক, তাহারা যে আর্য্য ছিল না তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাহারা আমাদের দেবদেবী বিশ্বাস করিত না ও পুরোহিতদের সম্মান করিত না। বাজসনেয়ী সংহিতায় "আপেতোহযন্তু পণযোজন্তয়ঃ দেবপীয়ব" এই পংক্তিটি পাওয়া যায়। ইহার অর্থ "পণিরা যাহারা দুঃখ দুর্দ্দশা আনয়ন করে এবং যাহারা দেবদ্বেষী তাহারা এই স্থান হইতে (দেশ হইতে) চলিয়া যাউক। পণিরা নিশ্চয়ই অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিত, তাহা না হইলে সেই যুগের জনমত এইরূপ হইত না। ভাষ্যকার মহীধরের মতে পণি অর্থ "পণন্তি পণদ্রব্যৈঃ ব্যবহরন্তি ইতি অসুরাঃ"। নিরুক্তে (৬.২৬) "ইন্দ্রো বিশ্বান্বেকনাটাং অহদৃশ উত ক্রত্বা পণীংরভি॥" ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পণিরা বেকনাটদের সমগোত্রীয় ছিল। বেকনটান শব্দের অর্থ "বৃদ্ধিজীবান" অর্থাৎ সুদখোর। ভাষ্যকারের মতে পণিরা দুষ্কৃতকারী এবং অসদ্‌ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল।৫ তাহারা নাস্তিকও ছিল।৬ পণিরা যে আর্য্য দেবদেবীদের ভক্তি করিত না তাহা ঋগ্‌বেদের আর একটি মন্ত্র হইতে বুঝিতে পারা যায়।৭ আচার্য্য সায়ন ইহাদের ব্যাধের সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং দুষ্কৃতকারী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।৮ পণিদের ব্যবহারে যে আর্য্যেরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহার আরও প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ঋগ্‌বেদে "মোচাক্কুর্ব্বাণঃ ইন্দ্রভরি বামং মা পণিঃ ভূ (১।৩৩।৩) এই পংক্তিটি পাই। ইহার অর্থ "হে ইন্দ্র! আমাদিগকে সম্পদ দিবার সময় (গরুদানের সময়) আমাদের সহিত পণিদের মত ব্যবহার করিও না। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পণিরা জোড় করিয়া অর্থ আদায় করিত। এইভাবে সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে আর্য্য ও পণিদিগের মধ্যে সংঘর্ষ দেখিতে পাই। পূর্ব্বের অপ্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ছাড়াও ঋগ্‌বেদে (৮।৩।৪) এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষও দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ "সনং পণেঃ সমবিন্দত ভোজনম" পংক্তিটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, আর্য্যরা তাহাদের যুদ্ধের দেবতা ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিয়া পণিদিগের নিকট হইতে তাহাদের সম্পদ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পণিরা একবার আর্য্যদের

১। তুলায়ৈ বাণিজম্ ৩০. ১৭

২। বিশো বিশো বো অতিথিমিতি পুষ্টিকামঃ। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ) ঋগ্‌বেদ ৮।৭৪।১ বিশো বৈশ্যাস্তে বাণিজ্যেন বহুধনসাধয়ন্তঃ করমপি বহুলং প্রযচ্ছন্তি। অতো বিশঃ পুষ্টিহেতুম। ভাষ্যকার

৩। পণিবর্ণিগ্ ভবতি। পণিঃ পণনাৎ। বণিক্ পণ্যম্ নেনেক্তি॥ (যাস্কের নিরুক্ত)

৪। যেমন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদের অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী।

৫। দুষ্কৃতকারিণোঽভিভবতি নহি বিশুদ্ধেন কর্ম্মণা বাধতে।

৬। অহনি পণ্যন্তি

৭। উৎপণীহতম্য্যা মন্দতা (ঋগ্‌বেদ ১।৪৪।২)

৮। পণীন্ বণিজেষু লুব্ধকান্ অর্থাৎ উৎউল্মল্য হতং নাশাত্তর।

গরু (ধনসম্পদ) অপহরণ করিয়াছিল। অগ্নি ও সোমের উপাসকেরা এই গরু পুনরুদ্ধার করিয়াছে।৯

বৈদিকযুগে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেরা বাণিজ্য করিতেন না। পূজা-আর্চ্চা ও কৃষিকার্য্যই ছিল তাঁহাদের প্রধান উপজীবিকা। তবে বিশেষ কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে তাঁহারাও ব্যবসা করিতে বাধ্য হইতেন। এইভাবে ঋগ্বেদের এক স্থানে দেখা যায় যে, অনাবৃষ্টির ফলে দীর্ঘশ্রবস নামে এক ব্রাহ্মণ ধনলাভের আশায় ব্যবসা করিতেছেন।১০

এই ত গেল বণিকদের কথা। ইহাদের কোন সংগঠন ছিল কিনা তাহা সঠিক বলা যায় না, তবে বৈদিক সাহিত্যে "গণ", "ব্রত" প্রভৃতি সংগঠনবাচক শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু এই সংগঠনগুলি যে বণিকদের সংগঠন ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে আর্য্যদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পণিরা সংগঠিত হইয়াছিল। ইহার সত্যতা প্রমাণ করা শক্ত। তবে পণিদিগের যে সংগঠন ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ সংগঠন ছাড়া ঐ যুগে ঐ ধরণের ব্যবসা করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। বৈশ্যদেরও যে সংগঠন ছিল ঋগ্বেদে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈশ্যদের সংগঠনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন "বিশপতি" অর্থাৎ বৈশ্যজাতির অধিনায়ক।১১

অথর্ব্ববেদ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বৈদিক বণিকেরা মালপত্র বহন করিয়া বিপৎসঙ্কুল অরণ্যের ভিতর দিয়া লাভের আশায় এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতেছে। ইহাতে অনেক সময় দস্যুতস্কর ও বন্যজীবজন্তুর হাতে তাহাদের জীবন ও মালপত্র হারাইতে হইত, এবং এই বৈদিক বণিকই পরবর্ত্তী রামায়ণ, মহাভারত ও বৌদ্ধযুগের সার্থবাহ ও ভ্রাম্যমাণ বণিকদলের অগ্রদূত।

পরবর্ত্তী বৈদিক যুগে আমরা শ্রেষ্ঠী (বাংলা শেঠ, দক্ষিণ-ভারতে—chetty) শব্দ পাই। এই শ্রেষ্ঠী শব্দের অর্থ প্রধান বণিক বা বণিকসার্থের প্রধান। ইহা সংস্কৃত শ্রেষ্ঠ (প্রধান) শব্দ হইতে উৎপন্ন। এই যুগে আর্য্যেরা এক এক দেবতাকে রাজা, শ্রেষ্ঠী প্রভৃতি কল্পনা করিতেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে "ভর্গো বা আকাময়ত। ভগ শ্রেষ্ঠী দেবানাং স্যামিতি। স এতং ভগায় ফল্গুনীভ্যাং চরুং নিরবপৎ। ততো বৈ স ভগ শ্রেষ্ঠী দেবানাং ভবৎ। ভগ হবৈ শ্রেষ্ঠী সমানানাং ভবতি"১২ (তৈ ব্রা. ৩।১।৪।১০) এই ছত্রটি পাওয়া যায়। এখানে আর্য্যেরা ভগকে দেবতাদের শ্রেষ্ঠী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। ভগ আর্য্যদিগের অতি প্রাচীন দেবতা। তিনি ছিলেন সৌভাগ্যের দেবতা এবং বার আদিত্যের এক আদিত্য। আবেস্তায়ও ইহার উল্লেখ আছে। (বগ) ভগ ছিলেন সমগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাহার প্রধান প্রধান গুণ ছিল—সৌভাগ্য, মান, নাম, যশ ইত্যাদি। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমান করা যাইতে পারে যে, তখনকার দিনে এক জাতীয় বণিকদের লইয়া সার্থ গঠিত হইত এবং সার্থের প্রধানের ঐ সকল গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন ছিল।

রামায়ণ ও মহাভারতের যুগের প্রধান অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য (ক) নূতন শহরের উৎপত্তি, (খ) বণিক ও কারিগরী সার্থের প্রসার ও (গ) দেশী ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার। বণিকসার্থের প্রসারতা লাভের একমাত্র কারণ দেশে বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি।

রামায়ণে আমরা 'নৈগম' ও 'গণবল্লভ' শব্দ পাই। নৈগম শব্দের অর্থ শহুরে বণিকসার্থ। জয়সোয়ালের মতে এই নৈগম খুবই সংগঠিত ছিল। রাজ্যের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনে তাঁহারাই প্রভুত্ব করিতেন। রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে দেখা যায় যে, অযোধ্যানগরে প্রবেশের সময় এক জন বণিকসার্থের প্রধান রামচন্দ্রকে সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছেন।১৩ এই বণিকসার্থের প্রধানই তখনকার দিনে শ্রেষ্ঠ নাগরিক হিসাবে পরিগণিত হইতেন এবং ইঁহারা বর্ত্তমান যুগের শেরিফের মত ছিলেন।

মহাভারত হইতে বণিকসার্থের অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটন করা যায়। আরণ্যপর্ব্বে দেখা যায় যে, এক মহাসার্থ ব্যবসার জন্য চেদী রাজ্যের দিকে যাইতেছে (দময়ন্তী উপাখ্যান) মহাসার্থের অর্থ বড় বণিকদল। ইহাতে ছিল প্রধান বণিক, সার্থের সদস্যেরা, হস্তি, অশ্ব, রথ এবং সহকারী ভৃত্য প্রভৃতি।১৪ এই সার্থের প্রধান অধিকর্ত্তাকে বলা

৯। অগ্নীষোমা চেতি তদ্বীর্য্যং বাম্। যদমুষ্ণো তমবস পণিং গোঃ। (গোঃ অর্থ এখানে ধনসম্পদ)

10. *Yabhih sudana Ausijaya Vanije Dirghasravasa madhu kosa aksarat.*
—(R.V. 1.112.11)

১১। এখানে বিশ শব্দের অর্থ "বৈশ্য", অনেক বৈশ্য (বণিক)

12. Bhaga the God desired—"let me be the Lord of earthly and supernatural powers and be the leader of the gods. Bhaga is the chief among the equals."—(Author's translation).

১৩। কস্মাৎ প্রকৃতি মুখ্যাস্তে শ্রেণীমুখ্যাশ্চরাঘব
কিঙ্করা নাগ তিষ্ঠন্তি যৌবরাজ্যাভিষেচনে।
অযোধ্যা ২৬।১৬

১৪। হস্ত্যশ্বরথ সংকুলম্ (৩।৬১।১০৬)

হইত সার্থবাহ এবং এই সার্থবাহই ছিলেন সার্থের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা।১৫

মনুসংহিতায় আমরা "শ্রেণী" শব্দ পাই। এই শ্রেণী শব্দের অর্থ বণিকসংগঠন (মেধাতিথি ও কুলুকের মতে)। এই শ্রেণীর নিয়মাবলী প্রণয়ন ও রক্ষা করিবার ভার রাজার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে।১৬ বশিষ্ঠ ও গৌতম ধর্ম্মসূত্রে বণিকসার্থের নিয়মাবলীর উল্লেখ আছে। তবে সেই সকল নিয়মাবলী কি আমরা তাহা জানি না।

বৈদিক যুগের শেষভাগে বণিকসার্থের উদ্ভব হইলেও মৌর্য্যপূর্ব্বযুগ হইতেই ইহার প্রকৃত সংগঠন আরম্ভ হয়। এই যুগের (খ্রীঃ পূঃ ১০০০ হইতে ৪০০ খ্রীঃ পূঃ) অর্থ নৈতিক ইতিহাস মহামুনি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ও অন্যান্য সূত্র সাহিত্য হইতে জানিতে পারা যায়। এই যুগে ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্প দ্রুত উন্নতিলাভ করিতে থাকে। পাণিনি পারস্য তিব্বত প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

গৃহ্যসূত্রে দেখা যায় যে, বৈশ্যরাই প্রধান বণিকসম্প্রদায়। পণ্যসিদ্ধি যজ্ঞে তাঁহারা নিজ নিজ ব্যবসার দ্রব্য খণ্ডিত করিয়া অগ্নি, ইন্দ্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতেছেন।১৭ এই পণ্যসিদ্ধি যজ্ঞের প্রধান উদ্দেশ্য অধিক ধনলাভ করা। আরও দেখা যায় যে, লাভবান হইবার উদ্দেশ্যে প্রায় সকল বণিকই কোন-না-কোন সার্থের সদস্য। কেবলমাত্র তাহাই নহে, দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার উপর ইহাদের প্রবল প্রভাব ছিল।

মৌর্য্যযুগে এই সকল বণিক প্রতিষ্ঠান এত শক্তিশালী হইয়া উঠে যে, তাহাদের কার্য্যকলাপ, লভ্যাংশ প্রভৃতি সম্রাটের নিয়ন্ত্রাধীন ছিল। নৈগমদের তখন নিজস্ব সভাগৃহ ও দপ্তরখানা পর্য্যন্ত ছিল।১৮ আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মৌর্য্য সম্রাট তাহাদিগকে বৈধ মুদ্রা চালু করিবার এবং রাজকীয় টাঁকশাল ব্যবহার করিবার অনুমতি দেন। এই যুগে ভারতের সহিত গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কিন্তু প্রথম শতাব্দীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই বাণিজ্যবন্ধন ছিন্ন করিয়া ভারতীয় বণিকেরা সমুদ্রগামী জাহাজে করিয়া পারস্য, আরব প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য করিতেছেন। এই যুগেই আবার হিন্দুরা জাভা, সুমাত্রা, বলি, বোর্নিও প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। চাহিদা বর্দ্ধিত হওয়ার ফলে ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রসারলাভ করে ও বণিকসংগঠনও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতাব্দীর সংস্কৃত ও পালি সাহিত্য আলোচনা করিলে বণিকসংগঠনের আরও কিছু তথ্য উদ্‌ঘাটন করা যায়। মহাকবি শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকের নায়ক চারুদত্ত এক বণিকসার্থের কর্ম্মকর্ত্তা বা প্রধান ছিলেন।১৯ মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে আমরা সার্থবাহ ধনমিত্রের কথা পাই।২০ চারুদত্তের বিচারের দৃশ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, এক জন বণিক বিচারপতির (অধিকরণ) কাজ করিতেছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে, সে যুগের বণিকসার্থগুলি ছিল প্রতিনিধিমূলক (representative)। পালি সাহিত্যেও শ্রেষ্ঠী শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এণ্ডার্সনের মতে সেট্টিরা রাজা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন এবং অনেক সময় এই পদ বংশপরম্পরায় চলিত।২১ বণিকসার্থ বা শ্রেণীগুলির আইন ও নিয়মাবলী রাজা স্বয়ং প্রণয়ন করিতেন এবং অন্যান্য অর্থ নৈতিক বিষয়ে ইহারা রাজাকে সাহায্য করিত।

গুপ্তযুগ ভারতের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। এই যুগে বণিকসার্থ বা সংগঠন চরম উৎকর্ষলাভ করে। গুপ্তযুগের বণিকসার্থ অনেকটা বর্ত্তমান যুগের বণিক সভা বা Chamber of Commerce-এর মত ছিল। এই যুগে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের ব্যবসায়ীদের সার্থ গঠিত না হইয়া সকল বণিক, শিল্পের মালিক, কারিগর ও ব্যাঙ্কের মিলিত সার্থ গঠিত হইয়াছিল। একটি গুপ্তযুগের মীল ইহার সাক্ষ্য দেয়।২২ ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সে যুগে সংগঠনমূলক কার্য্যকলাপ জাতীয় জীবনে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া-

১৫। সার্থস্য নেতা সার্থবাহ সার্থস্য মহতঃ প্রভুঃ সার্থবাহ
৩।৬১।১২০ ও ১২২

১৬। জাতিজনপদান্ধর্ম্মাঁ শ্রেণী ধর্ম্মাংশ্চ ধর্মবিদ্—
মনু ৮।৪১

17. The rite of *panyasidhhi* or success in trade (H. 1.48) in which a portion of the particular article of trade is cut off and sacrificed with the verse, "If, O God, we carry on trade to acquire (new) wealth by means of our (old) wealth, let Soma, Agni, Indra, Brihaspati and Indra bestow lusture thereon."

18. The Naigama was a corporate body with its own Assembly hall and office and was connected with the *srenis* or guilds of the city. These Naigamas were so powerful that they were allowed to use the Royal mint to issue legal tender coins though coinage was a royal perogative at that time. (Jaysawal's views).

১৯। অবন্তি পুর্য্যাং দ্বিজ সার্থবাহ চারুদত্ত ২।৬

২০। সমুদ্রব্যবহারী সার্থবাহো ধনমিত্র নাম নৌব্যসনে বিপন্ন

21. In later times the Setthis were appointed by the king. The post was sometimes hereditary.—Andersen's *Pali Reader.*

২২। শ্রেষ্ঠী সার্থবাহ কুলীকা নিগম

ছিল। এই সার্থ এত শক্তিশালী ছিল যে, সাথের প্রধান,২৩ প্রধান বণিক২৪ ও প্রধান কারিগর২৫ প্রভৃতিকে রাজ্য পরিচালনার বিশেষ বিশেষ ভার দেওয়া হইত। কুমারগুপ্ত ও বুদ্ধগুপ্তের মন্ত্রণাসভায় ইহাদের ডাকা হইত। সত্য কথা বলিতে গেলে উহারা দুই জনই ইহাদের হস্তে পুত্তলিকার ন্যায় ছিলেন। এই যুগে ভারতীয় রেশম শিল্প চরম উৎকর্ষ লাভ করে এবং রেশম ব্যবসায়ীদের এক শক্তিশালী সার্থ গঠিত হয়। কথিত আছে, এই সার্থের চাপে পড়িয়া বুদ্ধগুপ্ত বণিকদের উপাসনার জন্য সূর্য্যদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।২৬ এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, স্বদেশে ব্যবসারত এবং বিদেশে ব্যবসারত ভারতীয় বণিকদের পৃথক সার্থ সংগঠিত হইত।

এই যুগেই আবার স্থানীয় শাসন পরিচালনার ভার বণিকসার্থের উপর ন্যস্ত থাকিত। আবার বণিক অপরাধীদের বিচার তাহাদের সার্থেই হইত। অপরাধীকে সকল কথা বলিবার সুযোগ দেওয়া হইত এবং বণিকসার্থের সদস্যেরা একমত হইয়া অপরাধীকে শাস্তি দিতেন। আবার রাজদরবারে কোন বণিকের বিচার হইলে সার্থ জামীন থাকিয়া তাহাকে খালাস করিতে পারিত।

এই যুগের সংস্কৃত সাহিত্যে ও অনুশাসনগুলিতে বিশেষ করিয়া "নগরশ্রেষ্ঠী" শব্দ পাওয়া যায়।২৭ সম্ভবতঃ এই নগরশ্রেষ্ঠী রাজ্যের সমস্ত সার্থের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। রাজ্যে তাঁহার স্থান অনেকটা আজকালকার মিলিত বণিক সভার সভাপতির মত ছিল। অবশ্য তাঁহার ক্ষমতা সভাপতি অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। কারণ দেখা যায়, রাজকীয় ন্যায়ালয়ে তাঁহাকে বিচারপতির কাজ দেওয়া হইয়াছে। এই নগরশ্রেষ্ঠী পদ তখনকার দিনে খুব লোভনীয় ছিল—তাহার প্রমাণ মুদ্রারাক্ষস নাটকে পাওয়া যায়। দামোদরপুর তাম্রশাসনেও এই নগরশ্রেষ্ঠীর কথা পাওয়া যায়।

বিভিন্ন যুগে বণিক সংগঠনের রূপ সম্বন্ধে বিস্তারিত বলা হইল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সাধারণতঃ বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের ব্যবসায়ী লইয়া এক একটি সার্থ গঠিত হইত। এই বণিকসার্থের আইন প্রতিপালন ও শৃঙ্খলারক্ষার ভার বণিকপতির উপর ন্যস্ত ছিল। এক কথায় বলিতে গেলে বণিকপতিই সার্থের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিল। যে সকল সদস্য উহা প্রতিপালন করিতেন না তাহাদিগকে সার্থ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল। বর্ত্তমান যুগের বণিক সভার মত ইহারা প্রতিদিন কাজকর্ম্ম না করিলেও দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর ইহাদের প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। রাজকীয় কোন আইন ইহাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলে ইহারা হরতাল প্রতিপালন করিত ও অনেক সময় প্রবল প্রতাপশালী রাজাকেও ইহাদের কথা শুনিতে হইত।

উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে, গুপ্তযুগের পর হইতেই আস্তে আস্তে ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য অপরের হাতে যাইতে থাকে এবং রাজ্যে বিশৃঙ্খলার ফলে ইহাদের সংগঠনও ক্রমশঃ হীন হইতে থাকে। তাই গুপ্তযুগের পরে ইহাদের কোন উল্লেখযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না।

২৩। নগরশ্রেষ্ঠী (Guild President) আধুনিক গুজরাটী নগরশেঠ। দক্ষিণ ভারতে "পট্টনাস্বামী" (Lord Mayor of the town)

২৪। প্রথমসার্থবাহ (The chief merchant)

২৫। প্রথমকুলীক

26. The Mandasore Inscription narrates how "by command of the guild and from devotion this temple of the Sun God was caused to be built."

২৭। য এষ শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসঃ স পৃথিব্যাং সর্বনগরশ্রেষ্ঠী-পদমারোপ্যতাম্ —মুদ্রারাক্ষস, সপ্তম অঙ্ক।

(This chief merchant Chandandasa should be raised to the dignity of the chief provost of all the cities of the kingdom. This suggests that there was a post like president of all the guilds of all the towns of the empire.—(Cf. *Modern Federation of Commercial Associations and Chambers of Commerce*).

মধ্যজীবীয় যুগের লুপ্ত প্রাণিকুল

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার দত্ত

প্রথমতঃ প্রবন্ধের শিরোনামার একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। এখানে পৃথিবীর ইতিহাসের যে অধ্যায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা ইতিহাসের মধ্যযুগ নহে—উহা ভূবিদ্যার মধ্যজীবীয় যুগ, অর্থাৎ ইংরেজীর Medieval times নয়—Mesozoic times। আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, এ যুগের আরম্ভ এক কি দেড় হাজার বছর আগে নয়—এর আরম্ভ আঠার কোটি বছর আগে। আর এর সমাপ্তি ছয় কোটি বছর আগে। অতএব এ যুগের ব্যাপ্তি বার কোটি বৎসর। ভূবিদ্যায় মধ্যজীবীয় যুগ বলিতে গেলে পৃথিবীর ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়কেই বুঝায়। ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই যে, এই যুগে জীব ও উদ্ভিদ্ বিবর্তনের পথে প্রায় মধ্যবর্তী অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যান্য অধ্যায়ের ন্যায় এই যুগেও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ জীব ও উদ্ভিদের উদ্ভব ও বিলোপ এবং কতক পরিমাণ

মাংসাশী ডাইনোসর টাইর‍্যানোসরাস

শিলার গঠন হইয়াছিল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভূবিদ্যায় জীব এবং উদ্ভিদের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের দ্বারাই পৃথিবীর ইতিহাসকে মধ্যজীবীয় প্রভৃতি বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করা সম্ভব হইয়াছে।

মধ্যজীবীয় যুগে জীবকুলে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল—সরীসৃপজাতীয় প্রাণীরা। ঐ যুগে সরীসৃপজাতীয় প্রাণীদের মধ্যে বহু প্রকারভেদ পাওয়া গিয়াছে। এই সময় জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে এই সরীসৃপজাতীয় জীবের ছিল অব্যাহত প্রতিপত্তি। অধুনা সরীসৃপকুলের মাত্র পাঁচ প্রকার বংশধর বর্তমান, যথা—সর্প, কচ্ছপ, টিকটিকি, কুমীর ও নিউজিলাণ্ডের টুয়াটারা। বস্তুতঃ পক্ষে মধ্যজীবীয় যুগকে সরীসৃপের যুগও বলা যাইতে পারে। আবার এই যুগের সরীসৃপকুলে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল ডাইনোসর জাতীয় প্রাণী। ইহারা ছিল ভীষণদর্শন—আর ইহাদের প্রতাপ ছিল দোর্দণ্ড। জীবাশ্ম (fossil) রূপে প্রাপ্ত ইহাদের কঙ্কালের সাহায্যে আমরা মনশ্চক্ষে ইহাদের যে প্রতিমূর্তি অবলোকন করি তাহাতে আমাদের মন বিস্ময়ে ও ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। এই ডাইনোসর জাতীয় প্রাণীদের কথাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

আকৃতিতে ইহাদের বৈষম্য ছিল অদ্ভুত রকমের। সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ডাইনোসরের নাম দেওয়া হইয়াছে কম্‌সোনথাস্—ইহার দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র আড়াই ফুট আর শরীরের আয়তন ছিল একটি সাধারণ বিড়ালের মত। ইহা হইল ক্ষুদ্রতমটির মাপ। সর্ববৃহৎদের মধ্যে আছে জাইগ্যাণ্টোসরাস। ইহার দৈর্ঘ্য ছিল ৮০ ফুট আর দৈর্ঘ্যের মধ্যে গলাটা ছিল ৩৬ ফুট লম্বা। ইহাদের ওজন ছিল আরও বিস্ময়কর। জাইগ্যাণ্টোসরাসের ওজন ছিল ৪০ টন অর্থাৎ প্রায় ১২২০ মণ। ব্রণ্টোসরাস বৃহৎ আর একটি ডাইনোসর। ইহার দৈর্ঘ্য ছিল ৬৫ ফুট আর লেজ ছিল ৩০ ফুট। ব্রণ্টোসরাসের ওজন ছিল ৩৭ টন অর্থাৎ ১০০০ মণের উপর। আরও একটি সুবৃহৎ ডাইনোসরের নাম ডিপ্লোডোকাস,—ইহার শরীরের দৈর্ঘ্য ছিল ৮০ ফুট। ইহা হইতে ধারণা করা যাইতে পারে, উহাদের দেহ

ডাইনোসর শ্রেণীর ডিপ্লোডোকাস

কিরূপ সুবিশাল ছিল। ডাইনোসর জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত প্রকারভেদ ছিল সুস্পষ্ট। ইহাদের কেহ কেহ ছিল উটপাখীর মত। ইহাদের পিছনের পা দুইটি ছিল বেশ শক্ত, আর নখ ছিল সুতীক্ষ্ণ। ইহারা খুব দৌড়াইতে পারিত। অপর পক্ষে আর কতকগুলি ডাইনোসর এরূপ সুবিপুল ছিল যে, নড়াচড়া করা তাহাদের পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য ছিল। কেহ কেহ ছিল পাখীর ন্যায় দ্বিপদবিশিষ্ট, কিন্তু অধিকাংশই ছিল চতুষ্পদ। ডাইনোসরদের এক শাখার প্রাণীদের ছিল গণ্ডারের মত নাকের উপর সুতীক্ষ্ণ খড়্গ। বাহ্যিক আকৃতিতে ডাইনোসরেরা অনেকটা কুমীরের মত ছিল যদিও তাহাদের কাহারও কাহারও দৈহিক গড়নের সঙ্গে পক্ষীর শারীরিক গঠনের সাদৃশ্য ছিল। মূলতঃ সরীসৃপ বলিয়া ইহারা ডিম্ব প্রসব করিত। ইহাদের ডিম্ব মোঙ্গোলিয়া হইতে পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের কেহ কেহ ত্রিনেত্র ছিল।

ডাইনোসরদের ভোজন এবং খাদ্যদ্রব্যও আর এক বিস্ময়কর ব্যাপার। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ছিল নিরামিষাশী। সাধারণতঃ

গাছপালা, লতাপাতা প্রভৃতিই তাহাদের আহার্য্য ছিল। ইহারা প্রায়শঃ জলাভূমিতে বাস করিত। এই সকল জলাভূমিতে জাত বৃক্ষাদির অংশই তাহাদের খাদ্য ছিল। এই সকল নিরামিষাশী ডাইনোসরের মধ্যে কাহারও কাহারও দাঁত তত শক্ত না থাকায় তাহারা খাদ্যদ্রব্য চর্ব্বণ না করিয়া গিলিয়া ফেলিত। অপর পক্ষে কাহারও কাহারও এত শক্ত দাঁত ছিল যে, যে-কোন প্রকার বৃক্ষই হউক না কেন তাহারা অনায়াসেই তাহা চর্ব্বণ করিতে পারিত। মধ্যজীবীয় যুগের গাছপালাগুলি সাধারণতঃ তত পুষ্টিকর ছিল না। সেইজন্য অতিকায় উদ্ভিদ্‌ভোজী ডাইনোসরদের অতিমাত্রায় ভোজন করার প্রয়োজন হইত। কঙ্কালের গঠন হইতে

ডাইনোসর শ্রেণীর ব্রন্টোসরাস
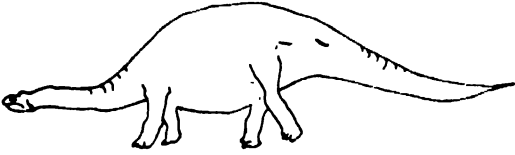
অনুমিত হয়, উপযুক্ত ব্রন্টোসরাসের দৈনিক ৭০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় সাড়ে আট মণ গাছপালার প্রয়োজন হইত। আমিষাহারী ডাইনোসরেরা সাধারণতঃ অপরের ডিম আহার করিয়া জীবনধারণ করিত। তাহা ছাড়া তাহারা ছোট ছোট প্রাণীদেরও নির্ব্বিচারে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করিত। মাংসাশী ডাইনোসরেরা ছিল ভয়ঙ্কর। তাহাদের দাঁত ছিল ছুরিকার ন্যায় তীক্ষ্ণ, নখ ছিল ঈষৎ বক্র এবং কব্জি ছিল ভীষণ শক্তিশালী। এইগুলির সাহায্যে] তাহারা অনায়াসেই প্রাণীদের হত্যা করিতে পারিত। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত মাংসাশী জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছে তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর হইতেছে টাইরানোসরাস নামক ডাইনোসর। এই প্রাণীটি ছিল ৪৭ ফুট লম্বা আর প্রায় ২০ ফুট উচ্চ। ইহার ওজন ছিল প্রায় একটি হস্তীর ন্যায়। ডাইনোসরদের কাহারও কাহারও আদপেই দাঁত ছিল না। শেষোক্ত শ্রেণীর খাদ্য সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা চলে না।

ডাইনোসর জীবদেহে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় তাহাদের মস্তিষ্কের স্বল্পতা। অধিকাংশ ডাইনোসরেরই বিশাল দেহ ছিল। কিন্তু তাহাদের দেহের তুলনায় মস্তিষ্কের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত স্বল্প। মস্তিষ্কগহ্বরের ক্ষুদ্রতা হইতেই এইরূপ অনুমান করা হয়। এত বড় বিরাট বপু যে কি করিয়া এরূপ অল্প মস্তিষ্কের দ্বারা চালিত হইত ইহাই আশ্চর্য্য। ইহা হইতেই অনুমিত হয় যে, প্রাণীগুলি অত্যন্ত নির্ব্বোধ প্রকৃতির ছিল এবং তাহাদের গতিবিধি ও ক্রিয়াকলাপ যান্ত্রিক ভাবেই নিষ্পন্ন হইত। ৩৭ টন ওজনের ব্রন্টোসরাসের মাত্র ১ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধ সের মস্তিষ্ক ছিল।

ডাইনোসর প্রাণীরা সাধারণতঃ স্থলেই বাস করিত। ইহাদের উৎপত্তি সম্ভবতঃ কতকটা শুষ্ক আবহাওয়াতেই হইয়াছিল। পরে অবশ্য তাহারা আর্দ্র আবহাওয়াতেও বসবাস সুরু করিয়াছিল। ইহাদের কেহ কেহ উভচরও হইয়া পড়িয়াছিল। ভূপৃষ্ঠে তাহাদের অবাধ গতি ছিল। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ডাইনোসরের দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে প্রাচীন শ্রেণীর ডাইনোসরদের অস্থিভস্মের একটি দাঁত মধ্যজীবীয় যুগের প্রারম্ভিক শিলা হইতে অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রাপ্ত হন। পরবর্ত্তী কালের ডাইনোসরদের দেহাবশেষ ডাঃ ম্যাটলি শুলিডেকার জব্বলপুর অঞ্চল হইতে ও মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত ওয়ারোয়ার নিকটবর্ত্তী পিসড়ুরা নামক স্থান হইতেও পাইয়াছেন। মাদ্রাজের অন্তর্গত ত্রিচিনোপল্লীর নিকটবর্ত্তী আর্য্যলুর নামক স্থান হইতেও ডাইনোসরের জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে। একই প্রকার ডাইনোসরের জীবাশ্ম মাডাগাস্কার, ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশের কোন কোন স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে। এস্থলে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, মধ্যজীবীয় যুগের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা, মাডাগাস্কার, দাক্ষিণাত্য, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি স্থান একীভূত ছিল। এই সংযুক্ত মহাদেশের নাম দেওয়া হইয়াছে গণ্ডোয়ানা মহাদেশ।

এখানে প্রসঙ্গতঃ ডাইনোসরদের বিলোপের বিষয় একটু আলোচনা করা দরকার। মধ্যজীবীয় যুগের শেষ দিকে ভূপৃষ্ঠে একটি বিরাট আলোড়ন চলিতেছিল। ইহার ফলে গণ্ডোয়ানা মহাদেশ ছিন্নভিন্ন হইয়া অনেকটা বর্ত্তমানের রূপ পায়। ভারতে দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে বহুল পরিমাণে লাভা উদ্গীরণের ফলে দাক্ষিণাত্যের মালভূমির সৃষ্টি হয়। এতদ্ব্যতীত হিমালয়, আল্পস প্রভৃতি পর্ব্বতমালার সৃষ্টিও প্রায় আসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল এবং তজ্জন্য ভূপৃষ্ঠে আলোড়নও চলিতেছিল। ইহার ফলে ডাইনোসরদের আবাসভূমির পরিবর্ত্তনের জন্য উদ্ভিদশ্রেণীর বহুলপরিমাণে বিলোপ সাধিত হয়। সেইজন্য উদ্ভিদভোজী ডাইনোসররা অত্যন্ত নিরুপায় হইয়া পড়ে। ডাইনোসরদের শেষ অবস্থায় শারীরিক গঠনবৈশিষ্ট্য আসিয়া পড়িয়াছিল। জীবজগতে ইহার অর্থ জাতিগত বার্দ্ধক্য। প্রাণিকুলের কোন শ্রেণী এই অবস্থায় পৌঁছিবার পর কোনরূপ অবস্থান্তরের সহিতই সাধারণতঃ তাহাদের বিলোপ ঘটিয়া থাকে। স্থলভূমির উত্থানের জন্য যখন আবাসভূমির পরিবর্ত্তন ঘটিল তখন সেই অবস্থান্তরের সহিত ডাইনোসররা নিজেদের খাপ খাওয়াইতে পারিল না। অপর পক্ষে মাংসাশী ডাইনোসরসমূহ কর্ত্তৃক ডিম্ব ও দুর্ব্বলতর ডাইনোসরদের ভক্ষণ হেতু তাহাদের দ্রুত বিলোপ ঘটে। পরবর্ত্তী যুগের অধিকতর বুদ্ধিসম্পন্ন স্তন্যপায়ী জীবদের সহিত সংগ্রামে এই নির্ব্বোধ ডাইনোসরেরা পরাজিত হয়। জীবন-সংগ্রামে ইহাই তাহাদের চূড়ান্ত বিপর্য্যয়। ইহারই ফলে তাহারা আজ বিলুপ্ত হইয়াছে। এমন করিয়া ১২ কোটি বছর ভূপৃষ্ঠে অবাধে রাজত্ব করিয়া ডাইনোসর প্রাণিকুল ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিদায় লয়। একদা তাহাদের অপ্রতিহত প্রতাপে অস্তিত্বের সাক্ষ্য আজ শুধু ভূগর্ভে প্রোথিত কঙ্কালের ধ্বংসাবশেষসমূহ।

চুরি

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

স্ত্রী-আচারের জন্য বর কনেকে সবে ছাঁদনাতলায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে—হৈ-হৈ শব্দ উঠল চারদিকে। কি ব্যাপার? বিয়ে বাড়ীতে অবশ্য গোলমাল হয়ই; নানান কণ্ঠে নানা ধরণের আলাপ-আলোচনা, অভ্যর্থনা, উচ্ছ্বাস, হাস্যকৌতুক, গান, সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামার শব্দ। তবু এই সব মিলিয়ে তার সুরটাও একটু বিশিষ্ট ধরণের, অর্থাৎ অনৈক্যজাত এই শব্দ-স্রোতে আনন্দের বার্তাটি সাগরবেলায় তরঙ্গ প্রসারের মতই রূপময় হয়ে ওঠে। উপস্থিত যে শব্দটা উঠল—তার উগ্র ধ্বনিটা কেমন যেন হিংসাত্মক আনন্দ-পরিবেশে প্রতিকূল।

সকলেই জমা হয়েছে একটি জায়গায়—সকলেই তীব্র কণ্ঠে হুঙ্কার আর শাসনে কাঁপিয়ে তুলছে বাড়ীখানা। ধ্বনিটা সর্ব্বত্র থেকে গুটিয়ে একটি ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে অত্যন্ত প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। একটিমাত্র ঘরে—যেখানে এইমাত্র পুরোহিতকে সম্মুখে রেখে নবপুষ্পর-শোভিত পট্টবস্ত্র-পরিহিত সুগোল সুগৌর তনু বর বসেছিল আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে, সামনে তার ছিল পঞ্চগুঁড়ি দিয়ে তৈরি পদ্মদলের মধ্য-বৃন্তে স্থাপিত সপল্লব তাম্রঘট, তার পাশে তামার কোশাকুশিতে গঙ্গাজল, পুষ্পপাত্রে সুগন্ধি ফুল আর চন্দন—অগুরু, ধূপ ও গব্যঘৃতের সুগন্ধে ঘর ছিল পরিপূর্ণ। ঘরের মধ্যে এখনও রয়েছে রৌপ্য সিংহাসনে শালগ্রাম শিলা এবং নতুন জলচৌকির উপর সাজানো ঝকঝকে কাঁসার বাসন বিজলী আলোর তীব্র প্রভায় দানের গরিমাকে প্রচার করছে একটু উদ্ধত ভাবেই। অন্য পাশে ততোধিক উদ্ধত ভাবে উঁচু পালিশ দেওয়া শো-কেসে বন্দী উপহার-দ্রব্যগুলিও পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার উত্তেজনায় ঝক্-ঝক্ করছে। ঘরের আধখানা জুড়ে যে খাটখানা রয়েছে—তার ছত্রিতে ও অঙ্গে বিচিত্র বসনের বেসাতি বসিয়েছে কে যেন। সেখানে তালা-চাবির ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি—আর গোলযোগের সূত্রটা ওরই ছিদ্র থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

ব্যাপার কি? শত-কণ্ঠের উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন।

ব্যাপার নতুন কিছু নয়, যা হামেশাই হচ্ছে বিয়েবাড়ীতে। ঘরে লোকজন কেউ নেই, সবাই হল্লোড় করে গেছে ছাঁদনা-তলাতে—আস্তড় ঘর পেয়ে মানুষের লোভ কি সামলানো সোজা! তা হলে সবাই ত সন্ন্যাসী হয়ে যেত। ইনিও তাই···

বক্তাকে অনুসরণ করে এক বেপথুমতী অবগুণ্ঠিতার পানে চাইলে সবাই।

অ্যাঁ, বল কি, চুরি করেছে? কি চুরি করলে?

কি আর! সোনাদানা নয়, বাসনকোসন নয়, হীরে মুক্তো পান্না জহরৎ নয়—মাত্র একখানি কাপড়! বক্তা বক্র হাসিতে ঘর ভরিয়ে তুললে।

এই—এইখানি। বলে একখানি ঝকঝকে ক্রেপ বেনারসী শাড়ী মেলে ধরলে তীব্র আলোর অভিমুখে। ফিকে আকাশী রঙের ওপর রূপালি জরির ফুলগুলো ঝক্ ঝক্ করে উঠল—অন্ধকার আকাশে বায়ু-চালিত মেঘের গতি সংঘাতে যেমন ঝক্ ঝক্ করে অনেকগুলি নক্ষত্র।

অ্যাঁ—বল কি এ-যে সবচেয়ে দামী বেনারসীখানা! মাগীর সাহস ত কম নয়?

দাও ক'সে গোটা দু'চার রদ্দা—আক্কেল হোক চোরের।

কিন্তু মেয়েছেলের গায়ে হাত তোলা—

আরে—রেখে দাও তোমার মেয়েছেলে! যে চুরি করে তাকে আবার খাতির কিসের! বক্তার কণ্ঠে হিংস্র উত্তেজনা।

না-না, আগে কবুল করিয়ে পুলিসে দাও। এদের শাস্তি না হলে সমাজ যে নষ্ট হয়ে যাবে।

কি রে মাগী—কবুল করবি? সমবেত কণ্ঠে হিংস্র গর্জ্জন উঠল।

মেয়েটি তখনও কাঁপছে। এক-ঘর উত্তেজিত মানুষের সামনে কত অসহায় ও। এরা উত্তেজনার বশে এই মুহূর্ত্তে কি না করতে পারে! মৃত্যু আর এমন বেশী কি? এই অপমান লাঞ্ছনার চেয়ে—সে আর বেশী কি।

মেয়েটি বসে পড়েছে মেঝের উপর। দু'হাতে মুখ ঢাকে নি—অবসন্ন দুখানি হাত কোলের উপর এলিয়ে পড়েছে। দেহ নিস্পন্দ, মুখখানি ঘোমটায় ঢাকা, সুতরাং সে মুখের ভাব ঈষৎ থর্-থর্-কম্পিত ঘোমটার প্রান্তে প্রকাশিত। প্রশ্নের পর প্রশ্ন-বাণ নিক্ষিপ্ত হচ্ছে—মেয়েটি নির্ব্বিকার নির্ব্বাক। ওর বলবার আছেই বা কি! অভিযোগ খণ্ডনের কোন উপায়ই ত ও রাখে নি।

ভিড়ের মাঝে রাস্তা করে এক স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়া ওর সামনে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিট ধরে মেয়েটির আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করলে। একবার চাইলে জনতার দিকে। তারপর বললে, কেউ চেন একে?

চিনবই যদি ত সওয়াল করব কেন?

তা হলে এক বাড়ী লোকের সামনে কি সাহসে এই ঘরের মধ্যে এল ও? মেয়েটির দিকে ফিরে বললে, কি গো, কথা কও না কেন? তোমার পরিচয় কি?

পরিচয়? আপাদমস্তক কেঁপে উঠল মেয়েটির। সব পরিচয় কি এ হেন অপযশের কালিতে ঢেকে যায় নি? মানুষের পরিচয় কোথায়? নিজ কর্ম্ম-গুণে সমাজে মাঙ্গলাভ করার যে সামান্য সুযোগ জীবনে আসে—তাইতেই ত প্রকাশিত হয় মানুষ, অবশ্য প্রত্যেক মানুষের ভাগ্যে এমনটি ঘটে না—তারা জন্ম থেকে জীবনান্ত পর্য্যন্ত অপরিচিতই থেকে যায়। এই প্রকাশ-ক্ষেত্রটি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ বলেই

কোন কোন মানুষই তা আয়ত্ত করতে পারে। এঁরা সমাজে ঢেউ তোলেন, কর্ম্মে সাড়া জাগান, অন্ত মনের মাঝখানে গুছিয়ে-গাছিয়ে একটু জায়গা করে নেন। এমন মানুষ বিশ্বেও বেশী নাই। আর সব জলের ঢেউ; যেমন ওঠে—তেমনি ভাঙে। কতক্ষণের জন্তই বা! সেই ঢেউকে চিনে জেনে হিসেব-নিকেশে কি-ইবা প্রয়োজন!

ও বুঝেছি—বলবে না? কিন্তু বাছা, একটা কেলেঙ্কারি হওয়া কি ভাল? আনন্দের দিনে মানুষকে দুঃখ দিতে নাই। সত্যি কথা বল—

কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

একজন বললে, ওকে পুলিসের হাতে দিন মা—আপনি কবুল করবে।

পুলিস! চমকে উঠল প্রৌঢ়া।

হাঁ মা—যখন চাবুক লাগাবে সপাং সপাং—

মেয়েটি কেঁদে উঠল শব্দ করে। কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়। সবাই থ হয়ে ওর কান্না দেখতে লাগল। এমন ভরা আনন্দের হাটে—এ কি দুর্লক্ষণ!

প্রৌঢ়া অবাক হয়ে বললে, ওমা—একি অলক্ষণ! নিয়েছ-নিয়েছ—একখানা শাড়ী, তা বলে কাঁদ কেন?

তবু কি কান্না থামে। চাপা কান্নার অদম্য বেগে ফুলে ফুলে উঠছে ওর সর্ব্বাঙ্গ। একটি অসহায় মানুষের মর্ম্মস্থল থেকে ওঠে যে হাহাকার—তা অগণিত মানুষকে অভিভূত করে দেয়। সকলের মনই বেদনা-বোধের নিগ্রহে কেমন যেন মুহ্যমান হয়ে পড়ল। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে এখনও ঘরখানি উজ্জ্বল রয়েছে—পৃথিবীর ধূলি-জঞ্জালের অনেকখানি ঊর্দ্ধে পবিত্র এক লোক ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। সে লোকের দেবতা প্রজাপতি-ঋষি। গায়ত্রীছন্দের আবাহনীতে আরও বহু দেবতার অভ্যর্চ্চনা চলেছে, স্থূল দেহ-মাংসের কামনাকে অমর যুগ-প্রবাহের জলে শুদ্ধস্নাত করিয়ে সৃষ্টিরহস্তের আদিভূত এই অনুষ্ঠানটিকে পুণ্যময় করে তোলা হয়েছে। অগ্নি, দেবতা, ব্রাহ্মণ আর দেবলোক পিতৃলোককে সাক্ষী রেখে দুটি দেহধারী আত্মার মিলন-গ্রন্থি-রচনার সূচনাপর্ব্বে—সহসা এই ছন্দপতন।

প্রৌঢ়া বিব্রত হয়ে পড়ল। হাত ধরে তুলল মেয়েটিকে। বললে, এস—এ ঘর থেকে। শোন।

কান্নার বেগ সামলে নিয়ে মেয়েটি অধোমুখে ওকে অনুসরণ করল।

২

প্রৌঢ়া কক্ষান্তরে এসে দুয়োর বন্ধ করে দিলে। ছোট্ট ঘর, উচ্চশক্তির বিদ্যুৎ-আলোয় দিনের মত স্পষ্ট হয়ে রয়েছে—কোণে-কাঁদাড়ে যেখানে যা আছে সবই নজরে পড়ে। তারের আলনায় টাঙানো দুখানা কম্বলের আসন টেনে নিয়ে মেঝের পাতলে প্রৌঢ়া। ঘরের কোণ থেকে নিয়ে এল গঙ্গাজলে ভর্ত্তি তামার বড় ঘটিটা—নিয়ে এল লাল ও সাদা চন্দনের কৌটায় ভর্ত্তি লক্ষ্মী-নারায়ণের পটখানি। মেয়েটির হাত ধরে একখানি আসনে বসিয়ে—নিজে বসল তার সামনে। বললে, এই তামার পাত্তরে গঙ্গাজল রয়েছে। ঠাকুর রয়েছেন সামনে, রাত্তিরবেলায় চুণের ঘরে মিথ্যে বলবি নে ছোটবউ। মিথ্যে বললে নরকেও তোর ঠাঁই হবে না।

ততক্ষণে মেয়েটির অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছে। দুটি অশ্রুধারা-লিপ্ত বিবর্ণ গণ্ডসমেত শ্যামল মুখখানি বর্ষাকালের সন্ধ্যার মতই বিষণ্ণ ও থমথমে দেখাচ্ছে। আধ-বোজা চোখ দুটি কলঙ্ক-কালিমার প্রলেপে জীবনীরসশূন্ত পাণ্ডুর; কান্নার ঢেউ তখনও কাঁপিয়ে তুলছে সারা দেহ।

একটা কথা সত্যি করে বল—তোর সন্তানের দিব্যি রইল যদি মিথ্যে বলিস। সত্যি বল ছোটবউ। দেখ, তোর মান বাঁচাতে আমি একঘর লোকের সামনে মিথ্যে বললাম। বললাম, তোকে জানি না। এ কাজে তোর লজ্জা যেমন—আমাদের লজ্জা তার চেয়ে কিছু কম নয়।

অপরাধিনীর মাথাটা আরও খানিক হেঁট হয়ে পড়ল। যেন স্বীকৃতির ভারে নুয়ে পড়ল।

প্রৌঢ়া বলতে লাগল, কুমারী মেয়ের আইবুড়ো ভাতের কাপড়—ও নিয়ে অনেকে তার সুখসৌভাগ্যের পথ চিরদিনের জন্ত বন্ধ করে দেয়। পোড়াকপাল নিয়ে মেয়েকে কাটাতে হয় চিরকাল।

না, না, না। আর্ত্তনাদ করে উঠল মেয়েটি।

তবে কেন করলি এমন কাজ? একবাড়ী কুটুম, বাইরের অতিথ অভ্যাগত, নতুন বেয়াই তাঁর আত্মীয়স্বজন—তোর কি একটুও হুঁস হ'ল না—এ কাজের পরিণাম কি! ও বেনারসী শাড়ী নিয়ে তুই করবি কি? ও পরবার বয়স কি তোর আছে?

আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল দিদি। অস্ফুটে উচ্চারণ করল মেয়েটি।

না, এ মতিচ্ছন্ন হওয়ার কথা নয়—সত্যি বল।

কি বলব—আমায় যা-খুশী সাজা দাও, দূর করে দাও—

তাতে আমাদের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে? নতুন কুটুম খুশী হবে?

তা হলে আমি কি করব! কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল মেয়েটি।

ওর আর্ত্তনাদে চমকে উঠল প্রৌঢ়া। ধমকের সুরে বললে, অমন করে কাঁদবি না বলছি—ওতে অকল্যাণ হয়।

বাইরে দুয়োরে ঘা পড়ল। মা—মা আছেন এ ঘরে?

কে? ভিতর থেকে শুধোলে প্রৌঢ়া।

আমি মেনকা। বর-কনে বাসরে বসেছে—আপনি আশীর্ব্বাদ করবেন আসুন।

সবাইকে বলগে আশীর্ব্বাদ করতে।

সে কি করে হবে—আপনি পেরথম আশীর্ব্বাদ না করলে—সবাই অপিক্ষে করছে আপনার।

চ' ছোট বৌ—আশীর্ব্বাদ করে আসি।

ছোটবউ ফুঁপিয়ে উঠল।

আচ্ছা—আচ্ছা—চুপ কর্ বাপু, নাই করবি আশীর্ব্বাদ। একটু থেমে বললে, তোর কষ্ট বুঝি, কিন্তু এই কান্না বুঝি না। দুয়োর খুলে প্রৌঢ়া বাইরে এল।

ঘরের মধ্যে কে গো—ছোট খুড়িমা? তা আপনিও আসুন না—দু'জনে এক সঙ্গে—

ছোটবউ কাল আশীর্ব্বাদ করবে—ওর মনটা ভাল নেই।

কেনে গো—কোন খারাপ খবর এল বুঝি?

হ্যাঁ—ওর ছেলের বড় অসুখ—কাল ভোরেই চলে যাবে। হ্যাঁ দেখ—পারিস তো সন্তুকে বলে একখানা গাড়ী ঠিক করে রাখবি। খুব ভোরের যে ট্রেন সেই ট্রেনেই যাবে ও।

প্রৌঢ়া চলে যেতেই ছোটবউ কাত্যায়নী উঠে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল মেঝেতে। কাজের বাড়ী—কোলাহলের অন্ত নাই—আলোরও বিক্রম কম নয়। অন্য ঘরের কৌতূহলী আলোর রেখা এই নির্ব্বাণদীপ ঘরখানিকে তরল ছায়াময় করে রেখেছে। সেই ছায়াপথ বেয়ে ভেসে এল অসংখ্য ঘটনা। পূর্ব্বাপর বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে পরিণত হ'ল কাহিনীতে। সে কাহিনী গত জন্মের।

৩

মৃত্যু আসন্ন জেনে শাশুড়ী দূর নিকট সকল আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। খবর পেয়ে যে যেখানে ছিল এসে পড়ল। তিন ছেলে—পুত্রবধূ এবং নাতি-নাতনীর দল—এরা হ'ল আপন পক্ষের; এ ছাড়া খুড়তুতো জ্যাঠতুতোর দলও এলেন। বিরাট এক সমারোহের মধ্যে মৃত্যু আসছেন বোঝা গেল। কিংবা জীবনের কোলাহল দিয়ে মৃত্যুকে পরিহাস করবার আয়োজনও বলতে পারা যায়। কেনই বা আসবেন না আত্মীয়স্বজন? শ্বশুর ভবশঙ্কর ছিলেন কৃতী পুরুষ। চিরজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জ্জন করেছেন, সঞ্চয় করেছেন এবং মৃত্যুকালে সে সমস্তই নিজ পত্নী নিত্যময়ীর নামে লেখাপড়া করে দিয়ে গেছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, বাল্যে, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে নারী, পিতা, পতি অথবা পুত্রের রক্ষণাধীনে থাকবে—শাস্ত্রকারদের এ ব্যবস্থা ঠিকই। সে-কালে স্নেহ-মমতার সোনায় একালের মত এত বেশী খাদ মেশানো থাকত না—কর্ত্তব্যবোধের দায়িত্বটুকু মুছে ফেলে কেউ হাল্কা হবার চেষ্টাও করতেন না, কাজেই পিতা থেকে পুত্র পৌত্র পর্য্যন্ত নারীর একটি নিশ্চিন্ত আশ্রয় স্থল ঠিক করে দেওয়া তাঁদের পক্ষে কঠিন ছিল না। সংসারে না থাক তীর্থস্থানে বসতি কর; দেব-দর্শন, গঙ্গাস্নান আর পারলৌকিক চিন্তা—এসবের ব্যবস্থা অনায়াসে হ'ত। কিন্তু এ কালে ও বিধির খানিকটা সংস্কার প্রয়োজন। পিতা আর স্বামী পর্য্যন্ত বিধিকে টেনে নেওয়া যেতে পারে কোন ক্রমে, কিন্তু তার পর? পুত্র পৌত্রদের সঙ্গে আর একটি শক্ত খুঁটি জুড়ে না দিলে নারী ঝড়-খাওয়া লতাটির মত মাটিতে লুটোবেই। সে খুঁটি আর কিছু নয়—অর্থ অথবা সম্পদ। সোনাদানা, জমিজিরেত কিংবা আসবাব-অট্টালিকা। এরাই সম্মানের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে নারীকে মাননীয়া করে তোলে। সেইজন্য মৃত্যুর পূর্ব্বে পুত্র পৌত্র স্বজন সমিতি কাউকে কিছু না দিয়ে পত্নী নিত্যময়ীকে এই সম্পদ-স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। নিত্যময়ীর মৃত্যুকালে আত্মীয়স্বজন সবাই এসে যে শেষযাত্রার পাথেয় ভরে দিলে—এ তো তাঁরই দূরদৃষ্টির ফলে। নতুবা কার্য্যব্যপদেশে কে কোন্ দূর দেশে ছিটকে পড়েছিল এতকাল? মাত্র সম্বলহীনা খুড়তুতো পুত্রবধূ ছাড়া এতকাল তাঁকে দেখেছেই বা কে?

মৃত্যুর আগে নিত্যময়ী তাকে ডেকে বললেন, কাতু, সবাইকে খবর দাও, সবাই আসুক। যার যা পাওনা-দেনা মিটিয়ে দিয়ে যাব।

কাত্যায়নী বললে, অমন কথা বলছেন কেন মা?

নিত্যময়ী বললেন, অনেক বয়স হ'ল—অনেক মৃত্যু দেখেছি মা—আমাকে ভুলিও না।

কাত্যায়নীর চোখে জল দেখে সান্ত্বনা দিলেন, তুমি আমার যে সেবা করেছ—তা পেটের মেয়েতেও করে না। তোমার কথা দিনরাত ভাবি। ভবটা যদি মানুষ হ'ত তা হলে তোমাদেরই বা এত কষ্ট হবে কেন। যাক, ভগবান এমন দিন চিরকাল রাখবেন না, যে ক'টি কুচোকাচা পেয়েছ ওদের হতেই তুমি সুখী হবে। এদিকে সরে এস, শোন একটা কথা। খবরদার কাউকে বলবে না—বললে তুমিই ফাঁকে পড়বে। শোন।

সব শুনে শিউরে উঠল কাত্যায়নী। বললে, না মা, ওসব আমার ঘাড়ে চাপাবেন না, যাঁদের পাওনা তাঁদেরই দিন।

ওদের তো বঞ্চিত করে যাচ্ছি না। কিন্তু তোমাকে না দেখলে আমার যে অধর্ম্ম হবে—আমি যে মরেও স্বস্তি পাব না।

শুনতে শুনতে কাত্যায়নীর বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল। এ ভাবে সকলকে লুকিয়ে নিত্যময়ীর অলঙ্কার নেওয়ার সাহস সে সঞ্চয় করতে পারলে না। এ যেন চুরি করার ব্যাপার—কাউকে বঞ্চনা করার মত লাগছে। কোথায় কুলুঙ্গির গোপনে রয়েছে লোহার সিন্দুকের চাবি—সেই সিন্দুকের মধ্যে আছে গহনার হাতবাক্সটি—তার চাবি আবার আছে অড়হীন পাশ-বালিশটার পেটের মধ্যে। ওরা সব আসবার আগেই কাত্যায়নী যেন গহনা-গুলি সরিয়ে অন্যত্র রাখে, না রাখলে—

দু'দিন দু'রাত ভাবলে কাত্যায়নী—পাশ-বালিশ ফাঁড়তে সাহস হ'ল না ওর।

আঃ বোকা মেয়ে—পারলি নে?

কোথায় লুকুব মা—আমার যে কোনখানে জায়গা নেই যাবার।

চিরকালের আশ্রিত ওরা। এই বাড়ীর হিস্সা করে অংশী-দারকে বেচে দিয়েছে ওর শ্বশুর। ওর স্বামী কাজ করে জমিদারী সেরেস্তায়—বিদেশে চাকরি নেবার মত বিদ্যে বা ভরসা ওর নেই। মানুষটাও কেমন যেন, নেশা ভাঙ করে—জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। ওরই জন্য কাত্যায়নীর মনে শান্তি নাই।

যাবি কোথায়—এই বাড়ীতেই থাকবি, সে ব্যবস্থাও করে গেলাম। কিন্তু চাবিটা বাছা তোমাকে লুকোতেই হবে, না হলে জানি ত সবাইকে।

তবু গহনার বাক্সটা সরাতে পারলে না কাত্যায়নী। একে একে সবাই এসে পড়ল।

এ ঘরে নিত্যময়ী আচ্ছন্নের মত পড়ে আছেন—অন্য ঘরে বউদের সভা বসল—হিসাব-নিকাশ চলতে লাগল সম্পত্তির, স্থাবর-অস্থাবর জিনিসের। জমির হিসাব তো দলিল-দস্তাবেজে মিলবে—টাকা গহনা তো সে বস্তু নয়। এতকাল ধরে কত টাকাই তো জমিয়েছেন নিত্যময়ী—গহনাও ওঁর সিন্দুক বোঝাই—প্রবাদবাক্যের মত। কোথায় সেই টাকা আর গহনা?

কাত্যায়নীর দিকে সবাই কটমট করে চাইলে। তুমি নিশ্চয় জান কোথায় টাকা আছে?

কাত্যায়নী শুকনো গলায় বললে, সত্যি বলছি দিদি জানি না।

গহনা? তাও বোধ করি জান না! মেজ বৌ তিক্ত হাস্যে ব্যঙ্গের সুর মেশালে।

নিত্যময়ীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ মনে পড়ল, গহনা ওদের হাতে পড়লে মরেও আমার শান্তি হবে না কাতু। ওগুলো তুই নিস।

কাত্যায়নীর পক্ষে জানি বলাও যেমন শক্ত—জানি না বলাও তেমনি অপরাধ। মাথা হেঁট করে ও ভাবতে লাগল। হাসি টিটকিরি কটুবাক্য বর্ষণ—চোখা চোখা তীরের মত ওকে বিঁধতে লাগল—তবু অটল ধৈর্য্যে দৃঢ় হয়ে রইল কাত্যায়নী।

মেজবৌ বললে, ধন্যি মেয়ে—সাত সায়েবের নাক কান কেটে আনতে পার। এমন ঝাঁহাবাজ মেয়ে না হলে কি আর নিবন্ধ্যা পুরীতে বুড়ীকে নিয়ে পড়ে আছ! যেখানে গুড়—সেইখানেই পিঁপড়ে—ও আমরা জানি।

সভা ভঙ্গ হ'ল, বড়বৌ ওর হাত ধরে বললে, বেশ করেছিস—বলিস নি। কেন বলতে যাবি, ও হকের ধন ত তোরই পাওনা। এত করে খেটে-খুটে কল্প করে—শেষকালে কিনা:

যে এল খেতে—রইতে দিল না দেশে,
নাড়া কাটার ভাত বাড়সে।

রস দেখে আর বাঁচিনে!

ঝর ঝর করে চোখের জল পড়ল কাত্যায়নীর। বলল, সত্যি বলছি বড়দি—তোমার পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করছি—

কেন—কিসের জন্যে দিব্যি দিলে না? বড় বউ সহানুভূতিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। যে গতর জল করে সেবাযত্ন করলে—সে বানের জলে ভেসে যাবে। আয়—আমার ঘরে আয়।

ওকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল নিজের ঘরে। বললে, সত্যি বলছি ভাই—শাশুড়ী গুরুজন—মায়ের তুল্য, তাঁর সেবা করা কি কম ভাগ্যির কথা। আমাদের যে বিধাতা মেরেছেন, এমন চাকরি ওঁরার যে এক দণ্ড কামাই করলে আপিস চলা ভার। সায়েবরা কিছুতেই যদি ছাড়ে। এই না কত বলে কয়ে মাত্তর দুটি হপ্তার ছুটি। এর মধ্যে যদি ভালমন্দ কিছু হয়ে যায় ত রক্ষে—না হলে তল্পিতল্পা গুটিয়ে ছোট্ শহরে। চাকরির খুরে খুরে দণ্ডবৎ বাবা!

ওঁর আশ্বাসে কাত্যায়নী বিগলিত হয়ে গেল। এমন আপন জনের মত সুখদুঃখের কথাই বা কে বলে। অন্য জায়েরা ত ওকে দেখলেই মুখ ভার করে—যেন ওদের সবকিছু লুটেপুটে নিয়েছে কাত্যায়নী। ওদের কাছে সেবা করার একটি মাত্রই অর্থ হয়; সেবা মানেই খোসামোদ করে অর্থ সম্পত্তি বাগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা। মানুষের মনের খবর ওরা রাখে না। কোমল কতকগুলি বৃত্তি যে মানুষকে মানুষের মত দেখতে শেখায়, কখনও-বা দেবতার আসনে বসায়—এ বিশ্বাস এরা করবে না। দেওয়া আর নেওয়ার দুই তৌলে এদের তুলাদণ্ড কখনও ডাইনে, কখনও-বা বাঁয়ে হেলছে। হায় রে পৃথিবী!

সহানুভূতি পেয়ে অনেকক্ষণ কাঁদলে কাত্যায়নী। কাঁদতে কাঁদতে মনটা বেশ নরম হয়ে উঠল। মনে হ'ল বড়বৌয়ের মত এমন চমৎকার মানুষ পৃথিবীতে আর নাই—এমন আপনজনও কেউ নাই। সুতরাং সেই নরম মনের যেখানে যা কিছু দুঃখকথা গোপন কথা ছিল—সবই উজাড় করে ঢেলে দিলে কাত্যায়নী।

বড়বৌ ওকে আশ্বাস দিলে, তা বেশ ত, কেউ তোকে জায়গা না দেয়—আমার জিম্মেয় থাকবি তুই, আমি মাস মাস টাকা পাঠাব—

না দিদি, এ ভার সব তুমি নাও—আমি চাবি এনে দিচ্ছি তোমায়।

না রে—না। বাধা দিলে বড়বৌ।

কাত্যায়নী শুনলে না—সিন্দুকের চাবি এনে ওর হাতে দিয়ে বললে, যা বোঝ—কর দিদি। তোমাদের পাওনা জিনিসে আমার এতটুকু লোভ নেই।

বড় বউ চাবিটা বারকতক ঘুরিয়ে দেখলে, তার পর সেই চাবি ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, যেখানকার চাবি সেইখানে রাখ গে। মা'র দেহান্তর না হওয়া পর্যন্ত—খবরদার—কাউকে ঘৃণাক্ষরে বলবি নে এ কথা। শ্রাদ্ধশান্তি চুকেবুকে গেলে ওই সব গহনা নিজে হাতে তোকে দিয়ে যাব আমি। মা সগ্গে থেকে আশীর্ব্বাদ করবেন আমাদের।

হাঁ—স্বর্গে থেকে আশীর্ব্বাদই করেছিলেন শাশুড়ী। তারই ফলে বড়বৌ সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার পরে নতুন-কেনা অট্টালিকায় দাস-দাসী আর মোটর নিয়ে সুখে কালযাপন করছেন। কিসে থেকে কি হ'ল—ঈশ্বরই জানেন। বড় ভাসুর ত কাজ করতেন কোন আপিসে। মাইনে যা পেতেন—তাতে চিরকালই টেনে গুঁজে চলেছে সংসার। মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর অবশ্য পদোন্নতি হয়নি, কিন্তু যুদ্ধের বাজারে কি সব জিনিসপত্তর কিনেছেন আর বেচেছেন—তার বিশ-ত্রিশ গুণ দরে। তাই থেকেই কমলার দয়া।

কিন্তু মেজবৌ বলে, জিনিসপত্তর কিনলে কি দিয়ে শুনি? সে-ও ত মোটা টাকার দরকার। ওই যে শ্রাদ্ধের আগের দিন

সিন্দুকের চাবি হারিয়ে গেল—ওর মধ্যেই রয়েছে ব্যাপার। মায়ের সিন্দুকে কি কম সোনাদানা ছিল? সব হাতিয়েছে—দুই কর্তা-গিন্নীতে। না হলে দোকান হ'ল কোথা থেকে? বাড়ী উঠল—মোটর হ'ল—আকাশ ছেঁদা করে ভগবান বুঝি ঢেলে দিয়েছেন টাকা! আর লোক ছিল না—ভূ-ভারতে টাকা দান করবার?

সে দিনের কাণ্ডটাও মনে পড়ল কাত্যায়নীর। বড়বৌ ওকে আড়ালে ডেকে বললে, খবরদার বলবি নে কোথায় চাবি আছে। আমরা চলে গেলে সব বার করে নিবি, বুঝলি?

কাত্যায়নী কাতর কণ্ঠে বললে, কিন্তু দিদি, চাবি যে খুঁজে পাচ্ছি নে।

পাবি—পাবি। ভিড় পাতলা হোক আগে, ভাল করে খুঁজলেই পাবি। বলে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসিতে কাত্যায়নীর চাবি খুঁজে-না-পাওয়ার রহস্যটিকে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছেন এই ভাবটি জানালেন। চুরি না করেও চোর হয়ে রইল কাত্যায়নী।

তার পর অনেকগুলি বছর কেটে গেছে। দেশের বাড়ীতে বড়বৌ বা অন্য কোন সরিক কেউ আসে না; বাড়ীটা যে মেরামত করা প্রয়োজন সেটিও কারও খেয়াল হয় না। কালের প্রহারে ইমারতের গা থেকে চূণসুরকির প্রলেপ খসেছে। ইট কড়িবরগা স্থানচ্যুত হয়েছে, বট অশ্বত্থেরা ভিতের বুকে শিকড় চালিয়ে বনিয়াদ আলগা করে দিচ্ছে। মানুষও সেই তালে চলেছে এগিয়ে। পুরাতন কত চলে গেছে—নূতন কত এসেছে। কাত্যায়নীর সংসারও ভারী হয়েছে। মেয়ে হয়েছে বিবাহযোগ্যা, স্বামী সামর্থ্যহারা হয়েও জমিদারী সেরেস্তায় কলম চালনা করছেন। কিন্তু জমিদারীও প্রায় নিঃশেষ হয়ে এল। ছেলেরাই বা মানুষ হ'ল কৈ। বড়টি বাপের মত জড়বুদ্ধিসম্পন্ন—মানুষের আকার নিয়েও মানুষের মধ্যে ঠাঁই করে নিতে পারলে না। মেজটা স্কুল ছেড়ে দিয়ে বাবুদের সখের থিয়েটারের আড্ডায় আশ্রয় নিয়েছে। মাথায় লম্বা লম্বা চুল রেখেছে, সুর করে বক্তৃতা করছে আর রাতদিন বিড়ি সিগারেট ফুঁকছে। ছোটটি স্কুলে যায় বটে—পড়াশোনায় মনোযোগ কম। সময়মত স্কুলের মাইনে দিতে না পারলে—মাষ্টারেরা মিষ্ট মিষ্ট বাক্যবাণে বিঁধবে বৈ কি। মাসের মধ্যে দশ দিন সে স্কুল কামাই করে। এ সবেও কাত্যায়নীকে তত ভাবায় না—যত দুশ্চিন্তা তার মেয়ের বিয়ের জন্য। উনিশ শেষ করে মেয়ে কুড়িতে পা দিয়েছে। সম্বন্ধ যে না আসে তা নয়, কিন্তু দেনা পাওনার হিসাব নিয়ে তারা খবর দেব বলে চলে যায়, আর আসে না। দুর্দ্দশাগ্রস্ত বাড়ীটার মতই ওদের অবস্থা।

মাঝে মাঝে অনেক কথা মনে হয়—বিশেষ করে মনে পড়ে মেজ জায়ের মন্তব্যগুলি।

বড়বৌ মিষ্ট কথায় মনের খবর টেনে নিয়ে নিজের আখের গুছিয়ে নিলে—আর সাধু হয়ে সততাকে পোষণ করে কাত্যায়নী কোথায় এসে দাঁড়াল, যেমন মনে ওঠে এ সব কথা অমনি কালবৈশাখীর মেঘছায়া-ছড়িয়ে-পড়া নদীজলের মত সেখানটা থম থম করতে থাকে। ঝড় উঠে একটু পরে। তুফানে তুফানে অশান্ত হয়ে ওঠে নদী—ক্রুদ্ধ তরঙ্গ পলাতক তরঙ্গের গায়ে আঘাত হানে—বাতাসের গতি সেই স্রোতবেগকে বয়ে নিয়ে যায় তটের অভিমুখে—প্রচণ্ড আঘাতে ও শব্দে কেঁপে ওঠে তটভূমি। কাত্যায়নী কেমন যেন পাগলের মত হয়ে যায়। কেন এমন নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করলে সে? তার বোকামির সুযোগ নিয়ে বড়বৌ ঐশ্বর্য্যের স্তূপে সাধু সেজে বসে রইল—আর···

তাড়াতাড়ি ঠাকুর ঘরে গিয়ে চোখের জলে মনের আগুন নিবিয়ে দেবার প্রয়াস করে। আকুল কণ্ঠে বলে, ঠাকুর, আমায় রক্ষা কর। দুর্নাম দিয়েছ যদি—সহ্য করবার শক্তি দাও।

সত্য, কাত্যায়নী দিনে দিনে দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে—ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে ওর অন্তরাত্মা। এক দণ্ডের প্রলোভনকে জয় করে ও যেন চিরজীবন তাকে পোষণ করে চলেছে।

আবার প্রার্থনা করে ঠাকুরের কাছে, আমাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার কর ঠাকুর—তা হলে এই পাপ চিন্তা আর মনে উঠবে না। আমায় রক্ষা কর।

হয় ত তার প্রার্থনাতেই ঠাকুর মুখ তুলে চাইলেন—সুপাত্র জোগাড় হ'ল। সাধারণ গৃহস্থ-ঘর—খাওয়া-পরার কষ্ট নাই। পাত্রটি দোজবরে হলেও বয়স ত্রিশ পেরয় নি—প্রথম পক্ষের সন্তানাদি নাই। দেনা পাওনার কথাই তারা তুললে না। শাঁখা শাড়ী যা হোক কিছু দিলেই দুর্ভাবনা ঘুচবে।

স্বামীকে বললে, কিছুই ত দিতে-থুতে পারব না আমরা—এক-জোড়া সোনাবাঁধানো-শাঁখা—আর একখানি ভাল শাড়ী যদি পার—

স্বামী বললেন, আগেকার দিন হলে জমিদারের কাছ থেকে শাড়ী গয়না—আদায় করতাম।

তা হলে কিছুই দেওয়া হবে না? শুষ্ক স্বরে বললে কাত্যায়নী।

কোনখানে···কোন আশাভরসা না পেয়ে—হঠাৎ কাত্যায়নীর মনে হ'ল—এই বিষয়ে বড়-জাকে জানালে হয় না? ওদের অবস্থা আজকাল ভালই—তা ছাড়া বহুদিন আগে উনি ত আশ্বাস দিয়ে রেখেছিলেন দায়ে-অদায়ে ঠেকলে কাত্যায়নী যেন ওঁকে জানায়। অভাব অনটন—এ সব ত নিত্যদিনের—আপদ-বিপদ এসেছে বহুবার—তবু কাত্যায়নীর মনে পড়েনি তাঁর আশ্বাসবাক্য। কেন পড়েনি মনে? কে জানে মনের কোথায় এতটুকু অভিমান, বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ—আর অপছন্দের বাষ্প যেন থিতিয়ে ছিল। বহুবার মনে হয়েছে—বড়-জা তাকে ঠকিয়ে নিয়েছেন—তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছেন—তার সম্পত্তি অপহরণ করেছেন। জন্য বিশ্বাসকে নষ্ট করে উনি কাত্যায়নীর ভালবাসার ক্ষেত্র থেকে কোন দূরান্তরে সরে গেছেন—ওঁকে অভাব অনাটনের কথা জানান যায় না।

মেয়ের মুখ চেয়ে সেই অভিমান আর ঘৃণার বাষ্পকে মুছে ফেল-বার প্রয়াস করে কাত্যায়নী। না, কিসের ঘৃণা, কেনই বা অভি-মান? তার মত গরীবের এ সব মনে পুষে রাখা মানেই সংসারের

কল্যাণ কথা। স্বামীকে বলে একখানি পত্র লেখার সঙ্কল্প করছে —এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে এল নিমন্ত্রণপত্র! শুধু ছাপানো অক্ষরে নয়—তার সঙ্গে হাতের লেখা কয়েক ছত্র। এর পর স্বর্গিস্থাতে যাতায়াতের রাহাখরচ এল। এ বুঝি ভগবানেরই ইঙ্গিত —তার চিন্তার জট খুলতে দৈব-প্রেরিত সমাধান। কাত্যায়নী যাত্রা করলে বাড়ী থেকে।

তার পর এখানে এসে বিয়ের আয়োজন-উপচার—মাঙ্গলিক বিধি-বিধান যতই দেখেছে—ততই মনে উগ্র হয়ে উঠেছে মেয়েকে সুখী করার কামনা। ওকে আশীর্ব্বাদ দেওয়ার কামনা সুপ্রসাধিতা করার কামনা—বস্ত্রে অলঙ্কারে অঙ্গচর্চ্চায় এমনি রুচিস্মিতা করে সর্ব্বজন-প্রশংসিতা ও অনন্যা করে তোলার কামনা। এমনি চিন্তায় ডুবে নিজের মনের জগতে হারিয়ে গেল কাত্যায়নী। এই সমারোহে কোলাহল, এই আনন্দ-বন্যার প্লাবন, মাতৃহৃদয়ের সাধ-আহ্লাদ পূরণের প্রথম আস্বাদ—এ তো একান্ত ভাবে কাত্যায়নীরই। এখানে এত প্রাচুর্য্য কেন? চিরবর্ষায় দেশে মেঘের দাক্ষিণ্য— মরুভূমির দেশকে বঞ্চিত করেই কি অবারিত হয় না?

অনেক বার উপর নীচেয় ওঠানামা করলে কাত্যায়নী। কে যেন দেহের শিরা-উপশিরায় আগুন জ্বালিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। যাদের অজস্র রয়েছে—তাদেরই কমলা দিচ্ছেন দু'হাতে ঢেলে। এত আড়ম্বর, এত প্রসাধনী, এত উপচার—··· কাঁচের শো-কেসে বন্দী হয়েও সোনার গহনাগুলো জ্বলছে, খাটের উপর অসংখ্য শাড়ী স্তূপাকার হয়ে উঠছে—এর একখানি পেলেই ত কাত্যায়নীর মনের সাধ পূর্ণ হয়। এত শাড়ী এরা করবে কি? লোকের দেখা হয়ে গেলে বাক্সবন্দী হয়ে থাকবে বহুকাল ধরে। সেই বন্ধনদশায় ওদের দেহ জীর্ণ হবে, পাড় জ্বলে যাবে, পোকায় শতছিদ্র করবে, আজকের ফ্যাসান বদলে গিয়ে—পুরাতন কালের নমুনা হয়ে···নূতন কালের মানুষের হাসিতামাশার বিষয় হবে। অথচ ওর একখানি পেলে···

পুনরায় নেমে এল কাত্যায়নী।

সম্প্রদানের জায়গা থেকে বর গিয়েছে ছাঁদনাতলায়—সঙ্গে গেছে স্ত্রী-আচার-দর্শন লোভী কৌতূহলীর দল। পুরোহিতমশায় একখানি আসনে বসে হেঁটমুণ্ড হয়ে পুঁথির পাতাগুলি গুছোচ্ছেন, কেউ হয় ত একবার এসে উঁকি মেরে যাচ্ছে—ঘরে দাঁড়াচ্ছে না এক মুহূর্ত্তও। যাদের নিয়ে এ ঘরের মর্য্যাদা—তাদের অবর্ত্তমানে এ ঘর অভ্যাগত বা আত্মীয়-গোষ্ঠী কাউকেই টানতে পারছে না। তবু এই ঘরই প্রবল বেগে টানলে কাত্যায়নীকে। যেমন চুম্বক টানে লোহাকে—জল টানে তৃষ্ণাকে—খাদ্য টানে ক্ষুধাকে—রাত্রি টানে অভিসারিকাকে—তেমনি প্রবল আকর্ষণে বস্ত্র-উপচিত পালঙ্কের কাছে গিয়ে দাঁড়াল কাত্যায়নী। আশ্চর্য্য, জড়বস্তুর এমন সম্মোহনী-শক্তি—ধীরে ধীরে কাত্যায়নীর চৈতন্য অপহরণ করলে ওরা···তার পর আলোগুলি হঠাৎ দপ দপ করে নিভে গেল, কোলাহল হ'ল প্রচণ্ড, বজ্রনির্ঘোষে যে বিস্ফোরণ কর্ণপটহে আঘাত করল তারই বেগে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে মেঝের উপর বসে পড়ল কাত্যায়নী।

৪

মেঝেতেই শুয়ে রইল সে অনেকক্ষণ ধরে। ওপারে আলোর দেশের ছায়া এসে এপারের অন্ধকারমাখা কিনারায় পড়েছে—ছল-ছলাৎ করুণ বিলাপে অশ্রান্ত কেঁদে চলেছে তটিনী। অমা-অভিমুখী তিথির শেষ রাত্রির প্রহরে মরা জ্যোৎস্নায় তট-ভাঙ্গা নদীর ধারে গিয়ে বসেছে কি কেউ কখনও? ওপারে বনের মাথায় সেই জ্যোৎস্নার পাণ্ডুর ছায়া দেখেছে কি? আকাশ তখন অসীম সাগরের হাহাকারে ভরে ওঠে—মনের মাঝে সেই হাহাকার প্রতিধ্বনি তোলে। একটু একটু করে নিঃশেষ হয়ে যায় রাত্রি—তেলফুরানো দীপশিখার মত। এই অসহ্য ক্ষণে মৃত্যুর কথা মনে আসে না, জীবনের কথাও না; রূপ-রস-শব্দ-গন্ধময়ী ধরিত্রী তখন কোন্ অতলে যায় ফুরিয়ে।···এই দৃশ্যের মাঝখানে মানুষও যদি নিঃশেষিত হয়ে যেত!

ভোর বেলাতে ঘুম ভাঙ্গল বড়-জায়ের ডাকে। সে শিয়রের কাছে মাথায় হাত দিয়ে ডাকছে, ছোটবউ—ও ছোটবউ —ওঠরে।

ওকে চোখ মেলতে দেখে বললে, তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে নে —খিড়কিতে গরুর গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। সকাল হলে সবাই জিগ্‌গেস করবে কালকের কথা—কি লজ্জাতেই যে পড়ব! সতের জনের কাছে সাত শো রকমের কৈফিয়ত দিতে দিতে প্রাণ যাবে। তার চেয়ে তুই বরং···

একটু থেমে বললে, আর এই কাপড়খানা রাখ। বড় আশা করে কাপড় নিয়েছিলি—তা বেনারসী পরবার সময় ত তোর নেই —দিলেও পরতে পারবি নে, এইখানা নে। আশার জিনিস বঞ্চিত করলে—ওদের মঙ্গল হবে না। ওদের আশীর্ব্বাদ করে যা ভাই— যেন ওরা সুখী হয়।

শেষ রাত্রির মরা-জ্যোৎস্নার আলোয় পৃথিবী ঘুমিয়ে থাকে না— পৃথিবী মরেই যায়। দীর্ঘকাল-লালিত মনের সুপ্ত কামনার পদতলে আত্ম-বলিদান দিয়ে কাত্যায়নী অনায়াসে হাতে তুলে নিলে সেই কাপড়খানি।
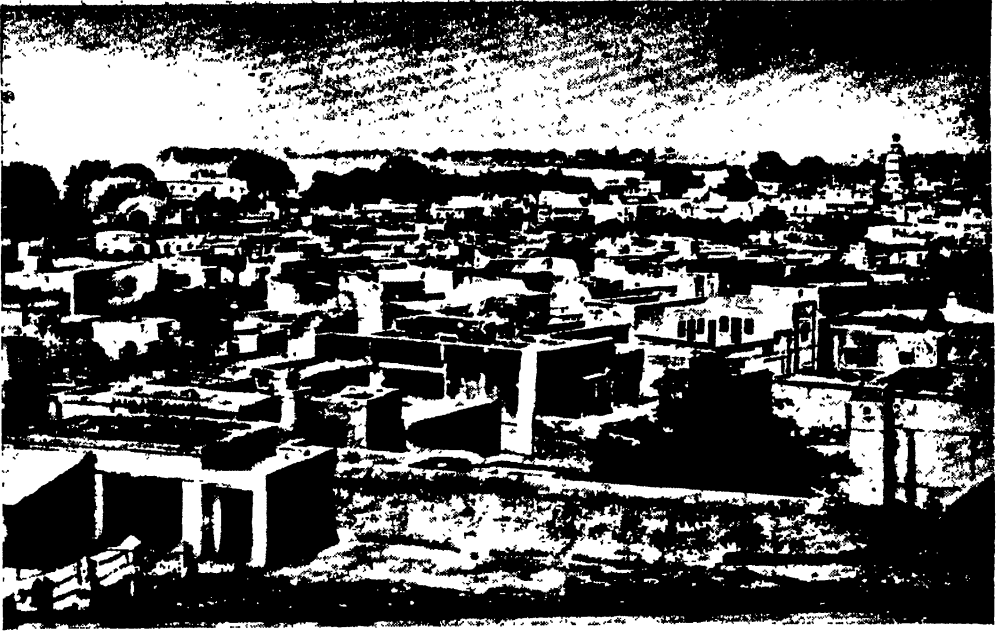
বর্ত্তমান বৃন্দাবনের দৃশ্য

করৌলীতে শ্রীমদনমোহন

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

পূর্ব্ব-রাজস্থানে করৌলী নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রধান নগর করৌলী, মথুরা হইতে প্রায় ৪৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কথিত হয়, মহারাজ বিজয় পাল যাদব মথুরা হইতে স্বীয় রাজধানী বিধর্ম্মীর আক্রমণের আশঙ্কায় পার্ব্বত্য প্রদেশ বায়ানায় স্থানান্তরিত করেন। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, ইনিই করৌলী রাজ্যের মূল পুরুষ। ইনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে বংশপারম্পর্য্যে ৮৮তম অধস্তন বলিয়া কথিত হন। ইঁহার রাজত্বকাল আনুমানিক বিক্রমসংবৎ ১০৯৬-১১৫০ (=১০৩৯-১০৯৩ খ্রীষ্টাব্দ)। মথুরা হইতে বায়ানা প্রায় ২৪ ক্রোশ, তথা হইতে করৌলী আরও বিশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। ১১৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী ও কুতব উদ্দীন আইবক কর্ত্তৃক বায়ানা ও তহানগড় অধিকৃত হইবার পর রাজবংশধরগণ বায়ানা পরিত্যাগ করিয়া করৌলীতে আগমন করেন এবং তথা হইতে যমুনা অতিক্রম-পূর্ব্বক সবলগড়ে আশ্রয় লন। অনন্তর তাঁহারা পুনরায় করৌলীতে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন।

করৌলী নগরের পূর্ব্বদিকে ভদ্রাবতী নদী প্রবাহিতা। বিজয়-পালের ৭ম অধস্তন মহারাজ অর্জ্জুন পালের প্রতিষ্ঠিত কল্যাণজীর নামানুসারে এই নগরীর নাম কল্যাণপুরী ছিল। পরে উহারই অপভ্রংশ করৌলী হইয়াছে। ১৪০৫ বিক্রম সংবতে (=১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে) অর্জ্জুন পাল এই নগর স্থাপন করেন। পার্ব্বত্য "মেনা" জাতির উৎপাতে এই নগরের সমৃদ্ধি প্রতিহত হইয়াছিল। ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্জ্জুন পালের ৭ম অধস্তন মহারাজ গোপাল দাস উক্ত পার্ব্বত্য জাতিকে দমন করিয়া এই নগরের শ্রীবৃদ্ধি এবং তথায় সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। গোপালদাসের সময়ের সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদটি চতুর্দ্দিকে অত্যুচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত ও দুইটি সুন্দর সিংহদ্বারবিশিষ্ট। নগরটি দৈর্ঘ্যে প্রায় এক ক্রোশ হইবে। গোপালদাসের ৮ম অধস্তন মহারাজ গোপালসিংহের সময় করৌলী নগরীর অধিকতর সমৃদ্ধি হইয়াছিল। ইনি এই নগরীর চতুর্দ্দিকে প্রস্তরের প্রাকার, নগরে প্রবেশ করিবার ৬টি সিংহদ্বার এবং ১১টি গুপ্তদ্বার নির্ম্মাণ করান। মহারাজ গোপালসিংহ ১৭৮১ বিক্রম সংবৎ (=১৭২৪ খ্রীঃ) হইতে ১৮১৪ সংবৎ (=১৭৫৭ খ্রীঃ) পর্য্যন্ত করৌলীতে রাজত্ব করেন। দিল্লীর তদানীন্তন বাদশাহ মহম্মদ শাহ গোপালসিংহকে ১৮১০ সংবতে (=১৭৫৪ খ্রীঃ) দিল্লীতে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে সম্মানসূচক পদবীতে ভূষিত করেন। করৌলীতে গোপালসিংহের সময়ই বৃন্দাবন হইতে সনাতন গোস্বামী প্রভু-পাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমদনমোহনদেব শুভ বিজয় করেন এবং করৌলী নগরীতে বহু দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। মদনমোহনের মন্দিরই করৌলী নগরীর প্রধান মন্দির। জয়পুরে যেরূপ শ্রীশ্রীগোবিন্দজী তৎস্থানের অধিদেবতা বলিয়া 'শ্রীজী' নামে খ্যাত, করৌলীতেও সেইরূপ শ্রীশ্রীমদনমোহনজী 'শ্রীজী' নামে বিখ্যাত। করৌলীর প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ও দুর্গের অভ্যন্তরে মদনমোহনদেবের মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। করৌলী রাজগণ শ্রীকৃষ্ণের বংশধর এবং যদুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

তিনি সেখানে গুরুদেবের সহিত শ্রীশ্রীমদনমোহনকে আনয়ন করিবার জন্ত এতটা ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি ভাবী সেবাপূজার ব্যবস্থার জন্ত একটি একরারনামা লিখিয়া সুবলদাসজীর নিকট প্রেরণ করেন।
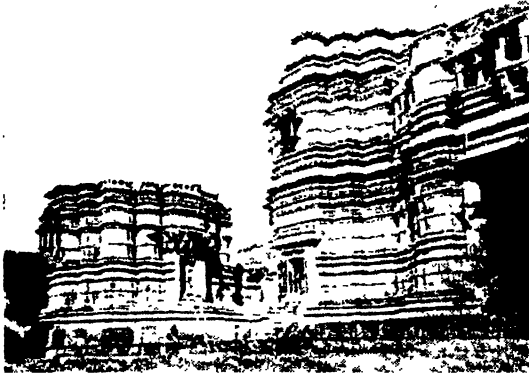
গোবিন্দজীর মন্দির

গোপালসিংহ স্বয়ং পুনরায় জয়পুরে গিয়া গুরুদেবকে মদনমোহনের সহিত করৌলীতে পদার্পণ করিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। তদনুসারে একদিন সুবলদাসজী গোপালসিংহের সহিত জয়পুরাধিপতি সয়াই জয়সিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া গোপালসিংহের প্রার্থনার কথা জানান। সয়াই জয়সিংহ অনন্যোপায় হইয়া মদনমোহনজীকে সুবলদাসের সহিত করৌলী গমনের প্রার্থনায় সম্মতি প্রদান করেন।

ভগ্নীপতি সয়াই জয়সিংহের অনুমোদন পাইয়া গোপালসিংহ পরম আনন্দিত হইলেন এবং মদনমোহনকে দোলায় আরোহণ করাইয়া তৎসঙ্গে পদব্রজে করৌলী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। করৌলীতে পৌঁছিয়া রাজভবনের দক্ষিণে মন্দিরের মধ্যে মদনমোহনকে মহাসমারোহে স্থাপন করিলেন। এই ঘটনা ১৭৮৫ বিক্রম সংবতে (=১৭২৯ খ্রীঃ) অনুষ্ঠিত হয়। জয়পুরাধীশ সয়াই জয়সিংহের (২য়) শ্যালক করৌলী-নরেশ ভক্তবর গোপালসিংহজীর আগ্রহাতিশয়েই শ্রীরাধামদনমোহনদেব করৌলীতে শুভবিজয় করেন। তৎপর গোপালসিংহ ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাধামদনমোহন ও রাধাগোপালকে স্থাপন করেন।

গৃহস্থধারায় সেবাপ্রাপ্তি

সুবলদাসজী (সুবলানন্দ) করৌলীতে আসিবার পর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। তাঁহার অপ্রকটের পর তাঁহার শিষ্য কৃষ্ণচরণদাসজী মদনমোহনের সেবাধিকারী হন। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে গৃহস্থ-প্রণালী স্বীকার করেন। সনাতন গোস্বামীপ্রভুপাদের শিষ্য কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী গোস্বামী; তাঁহার শিষ্য চন্দ্রদাস, তৎশিষ্য বংশীদাস, তৎশিষ্য কিশোরদাস, তৎশিষ্য সুবলদাস গোস্বামীজী পর্য্যন্ত ছয় পুরুষ ত্যক্তগৃহ ও শিষ্যপারম্পর্যে মদনমোহনের সেবাধিকারী ছিলেন। কৃষ্ণচরণদাসজী সর্ব্বপ্রথমে বিবাহ করেন এবং তাঁহার সময় হইতেই মদনমোহনের সেবাধিকারিগণ গৃহস্থধারায় নির্দ্ধারিত হন। কথিত আছে, সনাতন গোস্বামিপ্রভুপাদ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, তাঁহা হইতে সাত পুরুষ পর্য্যন্ত শিষ্যপ্রণালীতে মদনমোহনের সেবা চলিবে। ইহার পর শ্রীশ্রীমদনমোহনের যেরূপ ইচ্ছা হইবে, সেইরূপ প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবে।

মদনমোহনদেবের সেবাধিকারী সুবলদাস গোস্বামী, বৃন্দাবন-জয়পুর-করৌলী

কৃষ্ণচরণদাসজী অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার কন্যা প্রেমকুমারীকে মহারাজ গোপালসিংহই বঙ্গদেশীয় হুগলী জেলার গঙ্গা-গ্রামনিবাসী ভট্টাচার্য্যবংশীয় রামকিশোরের সহিত মহাসমারোহে বিবাহ দিয়াছিলেন। রামকিশোর বঙ্গদেশ হইতে প্রথমে বৃন্দাবনে এবং তথা হইতে করৌলীতে আগমন করেন। অপুত্রক কৃষ্ণচরণ জামাতা রামকিশোরকেই মদনমোহনের সেবাধিকারী ও গাদী প্রদান করেন।

রামকিশোরের দশটি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ নৃসিংহ কিশোরজী সেবাইতের গাদী প্রাপ্ত হন। ইহার সময় তাঁজ খাঁ নামক এক মুসলমান মদনমোহনের ভক্ত হইয়া পড়েন। মদনমোহনের দর্শন না করিয়া তিনি কোন দিন জল গ্রহণ করিতেন না —ইহাই তাঁহার একমাত্র ব্রত ছিল।

নৃসিংহকিশোরজী নিঃসন্তান ছিলেন। এজন্ত তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিকিশোরজী গাদীতে উপবেশন করেন। ইহার সময় 'কাম্বে'-নামক এক ব্রাহ্মণ-ভক্তের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কাম্বে

শ্রীকৃষ্ণদাসব্রহ্মচারী—সনাতন গোস্বামীপাদের শিষ্য ও সমাধিমন্দির-নিম্মাতা, বৃন্দাবন

কবি ছিলেন। কারের একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় তিনি সেই মৃত পুত্রকে লইয়া মদনমোহনমন্দিরের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং করুণ-রসাত্মক একশত আটটি কবিতা রচনা করিয়া মদনমোহনকে উচ্চৈঃস্বরে শুনাইতে লাগিলেন। তিনি ভগবানের গুণানুবাদ করিতে করিতেই নিজ শরীর পরিত্যাগ করিবেন—এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন। এই প্রকারে যখন অষ্ট প্রহর অতীত হইয়া গেল, তখন মদনমোহনের সেবাধিকারী হরিকিশোরদেবজী এক স্বপ্নাদেশ লাভ করিলেন। তদনুসারে তিনি কারের মৃত পুত্রের মুখে চরণামৃত প্রদান করেন; তাহাতে মৃত বালক প্রথমে অল্প অল্প নড়িতে থাকে এবং কিছুক্ষণ পরে চক্ষু মেলিয়া স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করে। মৃত পুত্র পুনর্জীবিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া কারে পুত্রকে উঠাইয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে লইয়া যান এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করাইয়া পুনরায় কবিতা দ্বারা স্তুতি করিতে থাকেন। এখনও এই সকল কাহিনী এই প্রদেশে গ্রাম্য-গীতির মধ্যে প্রচারিত আছে।

হরিকিশোরদেবজীর পরে তৎপুত্র প্রাণকিশোরজী গাদী লাভ করেন। প্রাণকিশোরজী কোন কারণে তাঁহার পুত্রের পরিবর্তে পৌত্র দামোদরকিশোরজীকে গাদী প্রদান করিয়া যান (১৯০২ বিক্রমসংবৎ=১৮৪৫ খ্রীঃ)। দামোদরকিশোর অল্পায়ু ছিলেন, সুতরাং দৈববিধানে তাঁহার দেহত্যাগের পর তাঁহার পিতা অর্থাৎ প্রাণকিশোরের পুত্র অটলকিশোরই গাদীতে উপবেশন করেন। ইহার বহু বৎসর পরে তাঁহারই সুযোগ্য উত্তরাধিকারী শ্রীকিশোরদেবজী ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে করৌলী মদনমোহনের সেবাধিকার প্রাপ্ত হন।

সম্রাট জয়সিংহ (দ্বিতীয়)—জয়পুররাজ

করৌলীতে মদনমোহনের মন্দির ও সেবাপূজা

করৌলীর প্রাচীন রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন দক্ষিণভাগে মদনমোহনদেবের বর্তমান মন্দির অবস্থিত। রাজপ্রাসাদের বা দুর্গের বহির্দ্বার ও প্রাকারের মধ্য দিয়াই মদনমোহনের মন্দির-প্রাঙ্গণে যাইতে হয়। উচ্চ বেদীর উপর বিস্তৃত ও দীর্ঘ গর্ভালয়ে মদনমোহনদেব অধিষ্ঠিত আছেন। গর্ভালয়ের উত্তর ও দক্ষিণপার্শ্বে আরও দুইটি প্রকোষ্ঠ। এই দুই প্রকোষ্ঠের মধ্যবর্তী গর্ভালয়ে সিংহাসনোপরি মদনমোহনদেব বিরাজমান। উত্তর দিকের প্রকোষ্ঠে পৃথক্ সিংহাসনে মদনমোহনের স্বরূপশক্তিদ্বয় রাধা ও ললিতা অধিষ্ঠিতা থাকেন। এই স্থান হইতে উক্ত শক্তিদ্বয় বিভিন্ন অবসরে মদনমোহনের সিংহাসনে আসিয়া মিলিত হন। মদনমোহনের দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে করৌলীর মহারাজ গোপালদাসজীর আবিষ্কৃত করৌলীর আদি বিগ্রহ রাধাগোপালদেব অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহারই সংলগ্ন পৃথক্ সিংহাসনে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া রাধা ও ললিতাদেবী বিরাজিত আছেন। মদনমোহন যে সময় যুগলিত স্বরূপে সবসাধারণকে দর্শন দান করেন, সেই সময় রাধাগোপালও যুগলিতস্বরূপ প্রকট করেন। মন্দিরটি পূর্বাভিমুখী।

গর্ভালয়ের সম্মুখে সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত শ্বেতকৃষ্ণ প্রস্তরমণ্ডিত উচ্চ জগমোহন। জগমোহনের নিম্নে মর্মরমণ্ডিত সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণ হইতেই দর্শকেরা মদনমোহনদেব ও রাধাগোপালদেবের দর্শন লাভ করেন।

করৌলীর বর্তমান সেবাধিকারী গোস্বামিগণ বঙ্গদেশীয় হুগলী জেলার গঙ্গা গ্রামের ঘোষাল-বংশীয় ব্রাহ্মণ। মদনমোহনের সেবাধিকার লাভ করিয়া বংশপরম্পরায় 'গোস্বামী' উপাধি ধারণ করিয়াছেন। মূলতানে ইঁহাদের অনেক শিষ্য-সেবক ছিলেন। পাকিস্থান হইবার পর সেই সকল শিষ্য নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বর্তমানে দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, গাজিয়াবাদ, কানপুর, বোম্বাই, পুনা ও কলিকাতা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে শিষ্যগণ বাস করিতেছেন।

মদনমোহনের সেবার জন্য প্রায় ত্রিশটি দেবোত্তর গ্রাম আছে। তাহা হইতে বাৎসরিক প্রায় উনত্রিশ হাজার টাকা আয় হয়। তাহা ছাড়া, ভেট, শিষ্য-সেবকগণের ও বিভিন্ন দেশাগত যাত্রিগণের প্রদত্ত প্রণামী প্রভৃতি হইতেও সেবানুকূল্য পাওয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন, করৌলীতে ৩৬০টি দেবমন্দির আছে। করৌলীর মদনমোহনের মন্দির হইতে দক্ষিণ দিকে প্রায় ১৬ মাইল দূরে কয়লাদেবী (কালীদেবীর অপভ্রংশ) ও দুর্গাদেবী আছেন। এই প্রদেশের সাধারণ ব্যক্তিগণের নিকট এই কয়লাদেবীর নামই অধিক প্রচারিত। হিন্দী চৈত্রী কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি হইতে শুক্লা দ্বাদশী পর্যন্ত এক পক্ষকাল এই কয়লাদেবীর স্থানে একটি বিরাট মেলা হয়। সেই সময় সহস্র সহস্র লোক নানা স্থান হইতে তথায় সমবেত হন।

করৌলী যাইবার পথ

ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের দিল্লী-মথুরা-বরদা-বোম্বে লাইনের (বড় লাইন) গাড়ীতে দিল্লী বা মথুরা হইতে সরাসরি হিণ্ডৌন সিটি ষ্টেশনে পৌঁছনো যায়। কোন কোন মেল হিণ্ডৌন সিটিতে থামে না; এজন্য উহার দুই ষ্টেশন পরে গঙ্গাপুর সিটি ষ্টেশনেও অবতরণ করা যায়। হিণ্ডৌন সিটি ষ্টেশন হইতে করৌলী প্রায় বিশ মাইল। প্রত্যেক ট্রেনের সহিত মোটরবাসের সংযোগ আছে। গঙ্গাপুর সিটি

চন্দ্রদাসদেব গোস্বামী—বৃন্দাবনস্থ মদনমোহনদেবের সেবাধিকারী

ষ্টেশন হইতে করৌলী প্রায় ২৫ মাইল হইবে। তথা হইতেও মোটর ট্যাক্সি ও মোটর-বাস পাওয়া যায়, কিন্তু প্রথম দিকে কোন পাকা রাস্তা নাই, হিণ্ডৌন সিটি দিয়া করৌলী যাওয়ার পথই অপেক্ষাকৃত সুগম বলিয়া মনে হয়। করৌলীতে যে স্থানে যাত্রিগণ অবতরণ করেন (অর্থাৎ মোটরবাসের বিরতি-স্থান) তাহা হিণ্ডৌন-দরজা নামে খ্যাত। হিণ্ডৌন-দরজা হইতে মদনমোহনের মন্দির প্রায় তিন ফার্লং।

কবি-কথা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

উদ্বাস্তুর সংখ্যা বাড়িছে, অন্ন বস্ত্র চাকুরী চাহি,
হে কবি, তোমার কবিতা পড়ার ইচ্ছা এবং সময় নাহি।
দুর্ঘটনার নাতিক অবধি, দিন যে কাটিছে চিন্তা ভয়ে,
সকল দ্রব্য অগ্নিমূল্য,—মানুষের প্রাণ এত কি সহে?
মান কি অর্থ কিছুই পাবে না, কবিতা তোমাকে দেবে না পেতে,
কবির কর্ম্ম বল কিছে শুনি? কি কর বসিয়া দিবস রেতে?
হও ব্যবসায়ী, কর্ম্মী কি নেতা, কিংবা বেড়াও স্লোগান দিয়ে,
বহু দিকে পাবে বহুৎ সুবিধা, মাথা ঘামায়োনা কবিতা নিয়ে।
কালের, কলের ঘর্ঘর শোন, থামাও তোমার বেণু ও বীণা—
ও পেশা অচল, বুঝলে কিনা?

২

সীড্ ম্যানরী'র দাপট দেখেছ? 'মালান' 'ম্যালেনকফ'কে মানো?
'রোজেনবার্গে' মৃত্যুদণ্ড কেন দিল তার কারণ জানো?
থাকো ছন্দের ঝুমঝুমি নিয়ে, সুরের সোহাগে, কথার ধূমে,
খপর নাও না কি যে করিছেন, 'হো চিন্ মিন্' আর 'মে সাতুমে'।
'আইসেনহাওয়ার' হাওয়ায় যে বীজ বপন করেন আনন্দেতে—
দেখো না হয়ে তা আফিম ফুল যে, ফোটে কোরিয়ার তুষার-ক্ষেতে?
'ইরাণ' খনিতে কি তেল উঠিছে? 'সুয়েজে' 'নাজীব' কি খেলা খেলে
জানো কি কেমনে সাগর বাঁধিছে 'ফরমোসা' দ্বীপে কাঠবিড়ালে?
ওই সব নিয়ে নাটক লেখো না, লাগাও উপন্যাসের কাজে—
কবিতা লিখো না—বকো না বাজে।

৩

কবি বলে ক্ষমা কর হে বন্ধু, যা করি করিব য'দিন বাঁচি,
বৃহৎ ব্যাপার তোমাদেরি থাক, আদার বেপারী ভালই আছি।
অভাবের কথা কহিছ, কিন্তু গ্রাহ্য না করি বৃষ্টি হিম ও,
সিনেমা গৃহেতে নিত্য দেখছি লোকের ভিড় যে অপরিসীম।
সকলেই সহি সমান দুঃখ, ব্যথার অংশ সমান আছে,
কিন্তু তা বলে, দেখিতে ভুলিনে কদম্ব ফুল ফুটেছে গাছে।
রামায়ণ পাঠ বন্ধ করিনে, উৎপাত করে যেহেতু হনু,
বৃষ্টিতে ঘরে জল পড়ে বলে দেখিব না নাকি ইন্দ্রধনু?
দেখ সুন্দর সত্য ও শিবে নয়ন-মনের তৃপ্তি যাহা—
একা তুমি অতো ভেব না আহা!

৪

মাটির হাঁড়ির মূল্য বেড়েছে, তবু কুতূহলী দেখে যে কবি—
'গোয়ারি'র মৃৎশিল্পীর গড়া সুন্দর দেব-দেবীর ছবি।
'গামছা' 'ফেরানি' মহার্ঘ হ'ল, ক্রয় করিতেও কষ্ট ভারি
কিন্তু তবুও 'জাহবা' যে দিই দেখিয়া শান্তিপুরের শাড়ী।
মৃৎশিল্পীরা গড়িবে কি 'টালি'? গড়িবে কি শুধু 'গামলা' 'জালা'?
'মালসা' 'ভাঁড়ে'র গুদাম হবে কি তাহাদের চারু শিল্পশালা?
রবে কি মোদক 'সরভাজা' ত্যজি কেবল 'পাটালি' 'মুড়কি' নিয়া?
মণিকার আর স্বর্ণকারেরা কাষ্ঠ কাটিবে কাননে গিয়া?
দেশটাকে দেখা পরিণত হতে রুগ্ন মনের হাসপাতালে—
বিধাতা মোদের লেখেনি ভালে!

৫

কবিতা না পড় তাতে কি দুঃখ? এ তো করা নয় অনুগ্রহ,
যেচে মান নেওয়া, আমরা যে ভাবি, অপমান চেয়ে দুর্বিষহ।
সকল দৈন্য চেয়ে, হে বন্ধু মনের দৈন্য বিষম ব্যাধি,
আধপেটা খাই তবুও এখনো বীণার গৎটি তেমনি সাধি।
লাভ যাতে নাই, না করাই শ্রেয়ঃ সাধু উপদেশ, সরল অতি,—
কিন্তু কোকিল বলিভুক হলে—'বাবুই' হলে যে দেশের ক্ষতি।
আমাদের আছে শত অনটন, উদরেতে আছে প্রচুর ক্ষুধা।
তবুও তুচ্ছ ক্ষুদে পাই মোরা 'বিদুরে'র সেই ক্ষুদের সুধা।
ডাকি অনাগত চিরাকাঙ্ক্ষিতে, শূন্য কলস সুধায় ভরি —
ভাঙা এ পৃথিবী নূতন গড়ি।

৬

কবির কর্ম্ম বুঝিনে বন্ধু—যতটুকু জানি কই তুঁহারে,
দুপের শিখরে সুপের অলকা সৃষ্টি করিতে সে-ই যে পারে।
মহাসাগরের সোহাগ-পরশ হেরে কবি পাণিশঙ্খ-গায়ে,
শোনে চন্দন-বনের কাহিনী নিদাঘের পর ঝঞ্ঝাবায়ে।
প্রাসাদ-নগরী মর্ম্মরপুরী কবে যাবে উবে স্থিরতা নাহি
পৃথিবীর সব বস্তুর চেয়ে স্বপ্ন কবির অধিক স্থায়ী।
মৃগনাভি মাঝে মৃগেরে জীয়ায়, শুক্তিকে তার মুক্তা মাঝে,—
সীতা নাই যেথা, কবি অবিরত রত ছায়াসীতা গড়ার কাজে।
ভাবকে রূপ আর রূপকে ভাব যে দেওয়াই তাহার কর্ম্ম জানে
তাই করি কবি ধন্য মানে।

পূজা ও প্রীতি

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

শুনেছি আমি বনের মুখে মর্ম্মরিত ভাষা,
সূর্য্যোদয়ে উঠেছে ফুটে নূতনতর আশা,
স্বর্ণালোকে জেগেছে ধরা শেফালি ঝরা প্রান্তে,
দেখেছি জাগে একাকী চাঁদ জোৎস্না ঝরা রাতে।
বিচিত্র কে? প্রকাশ কার নিত্য নব রূপে?
হেরি যে হাসি, হেরি যে তার অশ্রু চুপে চুপে।
একান্ত সে নিঠুরা নয়, মমতা আছে তারো।
প্রকৃতি? তারে বেসেছি ভালো, মানবে বাসি আরো।

ক্রুদ্ধ বায়ু ফুঁসিয়া ওঠে ঝটিকা বহে বেগে,
বিজলী-জ্বালা ঝলকি ওঠে আকাশভরা মেঘে।
স্রোতস্বিনী উন্মাদিনী—ছোটে সে কলরোলে,
তরঙ্গিত সিন্ধু-বুকে প্রলয় দোলা দোলে।
নয়নে জ্বলে বহ্নি, কাঁপে চরণতলে ধরা,
সে রূপে ভীমা প্রকৃতিদেবী ভীষণা মনোহরা।
কখনো তারে লাগে যে ভালো, কখনো করি ভয়,
মানুষে ভালবাসিয়া গাহি মানবতার জয়।

নিবিড় শ্যাম অরণ্যানী—হরিণী চলে ছুটে,
সরল দুটি লোচনে তার কি-ভাষা উঠে ফুটে!
শার্দ্দূলের লোলুপ চোখে জ্বলে সন্ধ্যা শিখা,
শান্ত পরিবেশে সে করে সৃষ্টি বিভীষিকা।
প্রকৃতি আছে স্নেহের মাঝে, প্রকৃতি আছে ভয়ে,
আজও নাহি পড়িল ধরা সে কোন পরিচয়ে।
কখনো ভাবি অচেনা চির, কখনো চিনি তারে,
মানবপ্রেমে ফিরিয়া আসি তাই তো বারে বারে।

আমার গীতি মানবগীতি বেসেছি যারে ভালো,
হৃদয়ে তার প্রীতির ভার, নয়নে তার আলো।
কত-না আছে দুর্ব্বলতা, অপূর্ণতা কত,
কেহ ত নহে, কিছু ত নহে তবুও তার মত।
আলোকে সেই—পেয়েছি খুঁজে অর্থ জীবনের,
সবার বড় মানুষ—তাই পেয়েছি আমি টের।
প্রকৃতি? তারে পূজেছি আমি বিবিধ উপচারে,
মানুষ মম নিকটতম, বেসেছি ভালো তারে।

অজানার দেখা

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

আজি বরষাধৌত ধরা
কালো মেঘের উত্তরীয়ে
দোলে স্বপন ছন্দ-ভরা
শ্যাম-শোভন কান্তি নিয়ে।

বুকে দহন-বেদনা ধরি'
জাগে অনল-দীপ্ত রবি,
আলো-সাগরে সিনান করি'
কবি আঁকিলো সে রাঙা ছবি।

শুনেছে সে যে কাহার বাণী?
সে কি চপলা-চকিতে থামে?
তা'র স্বপন-মূরতিখানি
আলোর যেন জোয়ারে নামে।

মরমে তাই ধরিল আশা
প্রাণের তা'র সাগর-কূলে,
কণ্ঠে তা'র হারানো ভাষা
পলকে আজি উঠিল দুলে।

হৃদি-কমল রক্ত 'পরে
মন-মধুপ সঞ্চরণে
প্রেম-পরাগ নীরবে ঝরে
গোপন তার গুঞ্জরণে!

তাই বিরত-অশ্রু, কবি
রেখেছে যত নয়নে ধরি'
সঁপিয়া আজি দিবে কি সবি
তার জীবন-পাত্র ভরি'।

দেহ-রূপের বেদিকা 'পরে
প্রেম সে তার আগুন জ্বালে,
দুটি নয়নে আরতি করে
প্রাণের বুঝি আহুতি ঢালে!

বঁধুয়া যবে দাঁড়ালো একা
অপরূপ সে রূপের সাজে
অজানার সে পেলে কি দেখা
মুগ্ধ কবি হিয়ার মাঝে!

নবগঠিত অন্ধ্ররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিশাখাপত্তনের সমুদ্রতীরে জেলে স্ত্রী-পুরুষ। দূরে বিশাখাপত্তন শহর
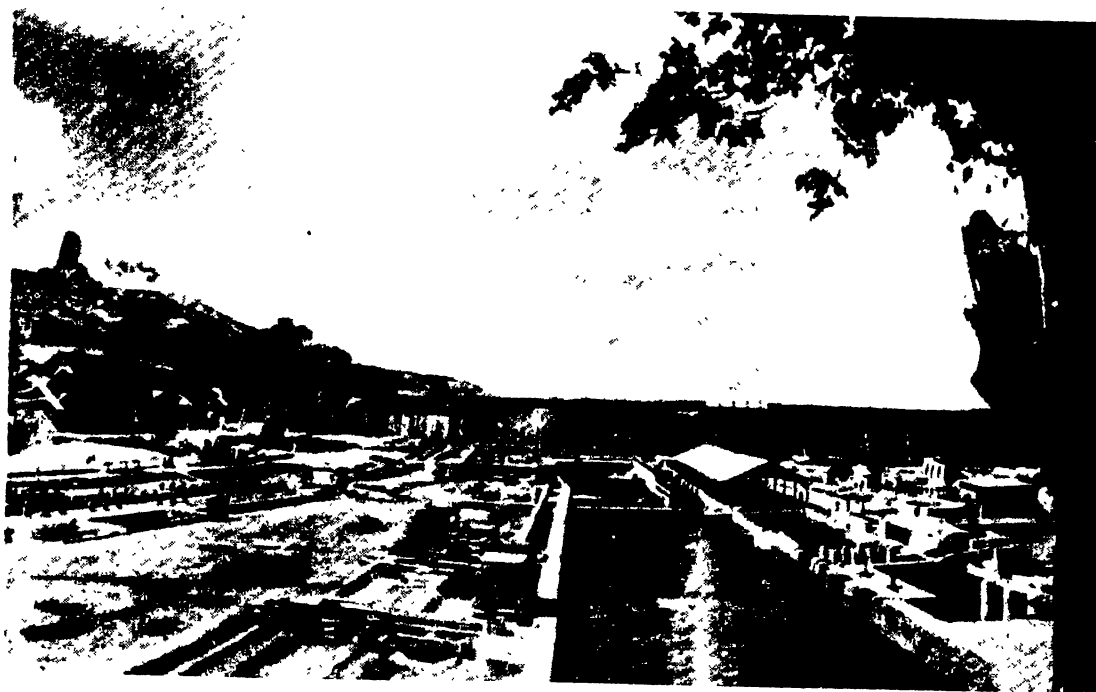
মুথা নদীর খাডাকোয়াসলা বাঁধের নিকটে পুণা রিসার্চ ষ্টেশন

BBC

বি-বি-সি'র টি ভি ষ্টুডিওতে উইলিয়ম সেক্সপীয়রের "দি লাইফ এণ্ড ডেথ অফ্ কিং জন"-এর অভিনয়

আলেক্জাণ্ড্রিয়ার আই. এন্. এস-এর লেঃ কম্যাণ্ডার ইন্দ্র সিং ও কম্যাণ্ডার কোহলি সহ জেনারেল মহম্মদ নেজীব

দুর্গামূর্ত্তির ঐতিহাসিকতা

ডক্টর শ্রীললিতকুমার মুখোপাধ্যায়, এম-এ, পিএচ-ডি

১

শিশুকাল হইতেই আমরা শারদীয়া বোধনকে জাতীয় উৎসবরূপে দেখিতে অভ্যস্ত। সিংহবাহিনী দশভুজা ও মহিষাসুরের অতিরিক্ত দুর্গার দুই তনয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতী এবং দুই পুত্র কার্ত্তিক ও গণেশ এই মূর্ত্তির অচ্ছেদ্য অঙ্গ। দুর্গামূর্ত্তির সহিত এই চারিটি মূর্ত্তি সংস্থাপনের বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। বৎসরের অন্য সময় বিশেষ পূজার ব্যবস্থা থাকিলেও, শারদীয়া পূজা উপলক্ষে এই চারিটি দেবদেবীর পূজা হয় না।

কবিগণ এই পূজা-উৎসবকে পুত্র-কন্যা সমভিব্যাহারে পার্ব্বতীর পিতৃগৃহে তিন দিবস যাপন কল্পনা করিয়া অনেক কাব্যের সৃষ্টি করিলেও পুরাণে এরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না। যে চণ্ডীর উপাখ্যান অবলম্বনে দুর্গাপূজার সৃষ্টি, তাহা মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে গৃহীত। উক্ত পুরাণে চণ্ডীর তিনটি লীলার বর্ণনা আছে। প্রথমটির নাম যোগমায়া বা মহাকালী। ইহাতে দেবীর অংশ গৌণমাত্র। ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হইয়া ইনি মাত্র বিষ্ণুকে মায়ামুক্ত করেন; বিষ্ণুই মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়কে সংহার করেন।১ দুর্গার দ্বিতীয় আবির্ভাব মহিষাসুর দলনের নিমিত্ত হয় ও দেবতাদের সম্মিলিত তেজে ইঁহার জন্ম।২ ইঁহার নাম জয়া বা মহালক্ষ্মী—ইনি সিংহবাহিনী এবং কখনও বা দশভুজা কখনও বা সহস্রভুজা। মহিষাসুর বধের সমগ্র আখ্যানে ইঁহার সাহায্যার্থ কোনও দেবীমূর্ত্তির উদ্ভব হয় নাই।৩

শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দৈত্যপতিদ্বয়ের অত্যাচার-প্রতিকারার্থ দেবতারা পার্ব্বতী অথবা অপরাজিতা দেবীকে স্তবে তুষ্ট করিলে দেবীর শরীর হইতে চণ্ডীর তৃতীয় মূর্ত্তির উদ্ভব হয়।৪ ইনিও সিংহবাহিনী কিন্তু অষ্টভুজা। শুম্ভের প্রথম সেনাপতিকে একাকিনী সংহার করিলেও, চণ্ড ও মুণ্ড নামক দৈত্যদ্বয় নিধনার্থে ইনি আপন শরীর হইতে চামুণ্ডা নাম্নী দেবীর সৃষ্টি করেন।৫ পরে শুম্ভ ও নিশুম্ভের সহিত যুদ্ধের প্রাক্কালে ব্রহ্মা, মহেশ্বর, বিষ্ণু, বরাহ ও নৃসিংহ নামক বিষ্ণুর অবতারদ্বয় এবং ইন্দ্র আপন আপন শরীর হইতে শক্তিরূপিণী দেবীর উদ্ভব করিয়া ইঁহার সাহায্যার্থে প্রদান করেন।৬ শুম্ভকে নিধন করিবার সময়ে আবার এই সকল শক্তি বা দেবী চণ্ডীর শরীরে লীন হইয়া যান—পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে।৭

লক্ষ্য করিবার বিষয় দুর্গার শেষ মূর্ত্তিতে আমরা একাধিক দেবীর সমাবেশ দেখিতে পাই। পার্ব্বতীর শরীর হইতে কেবল ইঁহারই উদ্ভব হয়। ইনি কিন্তু মহেশ্বরের শক্তিরূপিণী দেবী নহেন। বিষ্ণুর শক্তি বৈষ্ণবী ব্যতীত বরাহ ও নৃসিংহ অবতারদ্বয়ের শক্তি বরাহী ও নারসিংহীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব উল্লেখযোগ্য। এই দেবীর নাম মহাসরস্বতী। পক্ষান্তরে তিন অবতারের মধ্যে যাঁহার মূর্ত্তি আমরা পূজা করি তিনি মহিষ-মর্দ্দিনী হইলেও তাঁহার নাম মহালক্ষ্মী ও পার্ব্বতীর সহিত তাঁহার কোন সংস্রব নাই। তিনি একাকিনীই দৈত্য দলন করেন।

২

পৌরাণিক ভিত্তির অতিরিক্ত ঐতিহাসিক তথ্যালোচনার জন্য আমাদের মূর্ত্তির ধারাবাহিক অভিব্যক্তির অনুসরণ করাও কর্ত্তব্য। ইহার যুক্তি একটু দুর্ব্বল, কারণ যে সকল মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে কেবল তাহাদের দ্বারাই অভিব্যক্তির ধারা অনুসরণ সম্ভব। কাল-প্রবাহ ও ধ্বংসকারীর দ্বারা সম্পূর্ণ নষ্ট ও এখনও ভূকন্দরে প্রোথিত মূর্ত্তির হিসাব না থাকায় আমাদের সিদ্ধান্ত একটু দুর্ব্বল। যে সকল একাকিনী দেবীমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে যেগুলির সময় নির্দ্ধারণ সম্ভব তাহাদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল:

(ক) কাওদীর পার্ব্বতী মূর্ত্তি, অনুমান প্রথম শতাব্দী।৮

(খ) মহাবলীপুরের চণ্ডীমূর্ত্তি, অনুমান ষষ্ঠ শতাব্দী।৯

(গ) কল্পিভরমে মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি, অনুমান সপ্তম শতাব্দী।১০

(ঘ) কোদণ্ডপুর ও ইলোরার গঙ্গামূর্ত্তি, অনুমান অষ্টম শতাব্দী।১১

(ঙ) ত্রিপন্তির ভদ্রকালী, মাগের মহাকালী এবং ইলোরার পার্ব্বতী মূর্ত্তি, অনুমান অষ্টম শতাব্দী।১২

(চ) মহেন্দ্রপালের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে নির্ম্মিত পার্ব্বতী মূর্ত্তি, অষ্টম শতাব্দী।১৩

পক্ষান্তরে আমরা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে একাধিক মূর্ত্তি পাই:

(ক) ইলোরার পার্ব্বতী মূর্ত্তি, অনুমান নবম বা দশম শতাব্দী।১৪

এই মূর্ত্তির সহিত পার্ব্বতীর নিম্নলিখিত অষ্ট-অবতারের মূর্ত্তি আছে:

ভদ্রকালী, মহাকালী, অম্বিকা, মঙ্গলা, সর্ব্বমঙ্গলা, কালরাত্রি, ললিতা ও গৌরী। লক্ষ্য করিবার বিষয় কালী, তারা প্রভৃতি বাংলায় প্রচলিত দশমহাবিদ্যা হইতে ইহা বিভিন্ন

এবং লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কোনও উল্লেখ ইহাতে নাই—মূল মূর্ত্তির অভিব্যক্তিস্বরূপ দেবীমূর্ত্তিই ইহাতে দেখা যায়।

(খ) মহাবলীপুরের শ্রীমূর্ত্তি এবং ইলোরার লক্ষ্মীমূর্ত্তি দুইটির সহিত দুইটি করিয়া দেবীমূর্ত্তি আছে, অনুমান সপ্তম শতাব্দী ইহাদের নির্ম্মাণকাল।১৫

(গ) মাদ্রাজ মিউজিয়মে রক্ষিত ভবানীমূর্ত্তি প্রকৃতপক্ষে সরস্বতী মূর্ত্তি, ইহার সহিত দুইটি দেবীমূর্ত্তি আছে। অনুমান অষ্টম শতাব্দী।১৬

(ঘ) কোদণ্ডপুরের সরস্বতী মূর্ত্তি, দুইটি দেবীমূর্ত্তি সহ, উপরি-উক্ত মূর্ত্তির সমসাময়িক।১৭

(ঙ) দুইটি দেবমূর্ত্তিসহ উদয়গিরির গঙ্গামূর্ত্তি—অনুমান অষ্টম শতাব্দী।১৮

(চ) খগেন্দ্র রাজবংশের শর্ব্বাণীমূর্ত্তি (দুই দেবী সহ) একাদশ শতাব্দী।১৯

(ছ) লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে নির্ম্মিত দুইটি সঙ্গিনীসহ (যাহার অন্যতমা বীণাবাদিনী) পার্ব্বতীমূর্ত্তি দ্বাদশ শতাব্দী।২০

(জ) বর্দ্ধমান কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী কালিকাপুর গ্রামের মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি, লক্ষ্মী ও সরস্বতী সহ, অনুমান পূর্ব্বোক্ত-গুলির সমসাময়িক।

উপরি-উক্ত তালিকায় লক্ষ্য করিবার বিষয় খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বের সকল দেবীমূর্ত্তিই একক এবং অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে লক্ষ্মী, সরস্বতী অথবা গঙ্গামূর্ত্তির সহিত দেবী-মূর্ত্তি পাওয়া গেলেও দুর্গা বা পার্ব্বতীমূর্ত্তির সহিত অন্য দেবী-মূর্ত্তির (ইলোরার পার্ব্বতীমূর্ত্তির সহিত অন্য মূর্ত্তি মূল মূর্ত্তিরই অভিব্যক্তি মাত্র) নিদর্শন একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে পাওয়া যায় না।

৩

যতগুলি হিন্দুমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে (যাহাদের সঠিক কাল নিরূপণ সম্ভব) তাহাদের মধ্যে কাওদীর পার্ব্বতীমূর্ত্তি (মতান্তরে ইহা বৌদ্ধদেবী তারার মূর্ত্তি) ব্যতীত অপরগুলি বৌদ্ধযুগের শেষ দিকে অথবা বৌদ্ধযুগের পরে নির্ম্মিত। মূর্ত্তি-নির্ম্মাণের কলা বিশেষ ভাবে বৌদ্ধযুগেরই অবদান। প্রথম যুগে বুদ্ধের যতগুলি মূর্ত্তি পাওয়া যায় তাহাতে তিনি একক হইলেও পরবর্ত্তীকালে কখনও কখনও সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইত। স্ত্রীত্যাগী বুদ্ধের পূজার সহিত মহাযান সম্প্রদায় ভোগী বুদ্ধের উপাসনা করেন ও হীনযান সম্প্রদায় একক যোগীবুদ্ধের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে থাকায় দুই প্রকারের মূর্ত্তি একসঙ্গে দেখা যায়। যে সকল একক বুদ্ধমূর্ত্তি দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলির কাল নিরূপণ সম্ভব:

(ক) হস্তিনানগরের মূর্ত্তি, অনুমান ৮১ খ্রীষ্টাব্দ।২১

(খ) সয়েট উপত্যকার মূর্ত্তি, অনুমান ১০০ খ্রীষ্টাব্দ।২২

(গ) মথুরায় রক্ষিত মূর্ত্তি, অনুমান ১২৫ খ্রীষ্টাব্দ।২৩

(ঘ) তক্ষশীলায় প্রাপ্ত মূর্ত্তি, প্রথম শতাব্দীর।২৪

(ঙ) হস্তিনানগরের মূর্ত্তি, অনুমান ৭২ খ্রীষ্টাব্দ।২৫

(চ) খুলনা বাগেরহাটের (বর্ত্তমান শিবমূর্ত্তিরূপে পূজিত) মূর্ত্তি, তৃতীয় শতাব্দী।২৬

(ছ) নালন্দার বৌদ্ধমূর্ত্তি, অনুমান চতুর্থ শতাব্দী।২৭

ইহাদেরই সমসাময়িক সঙ্গিনীসহ বুদ্ধমূর্ত্তির তালিকা প্রদত্ত হইল:

(ক) সয়েট উপত্যকার দুইটি দেবীসহ বুদ্ধমূর্ত্তি, অনুমান খ্রীঃ পূঃ ১০০।২৮

(খ) দুইটি দেবীসহ বুদ্ধমূর্ত্তি বর্ত্তমানে মিউনিক্ মিউ-জিয়মে রক্ষিত, অনুমান ৮০-১০০ খ্রীষ্টাব্দ।২৯

(গ) উপরি-উক্তটির অনুরূপ ও সমসাময়িক মথুরা মিউ-জিয়মের মূর্ত্তি।৩০

(ঘ) ছয়টি মূর্ত্তি (চারিটি দেবীমূর্ত্তিসহ) তক্ষশীলার মূর্ত্তি, দ্বিতীয় শতাব্দী।৩১

(ঙ) শাহজীর চেরীতে প্রাপ্ত দুই দেবীসহ বুদ্ধমূর্ত্তি, অনুমান ৮০-১০০ খ্রীষ্টাব্দ।৩২

(চ) পাঁচটি দেবদেবী সহ পেশোয়ারের মূর্ত্তি, দ্বিতীয় শতাব্দী।৩৩

(ছ) দুইটি দেবীসহ গুপ্তযুগের (৪র্থ শতাব্দী) বুদ্ধমূর্ত্তি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত।৩৪

(জ) বেলারামের অবলোকিতেশ্বর দুইটি দেবীসহ, পূর্ব্বোক্তটির সমসাময়িক।৩৫

(ঝ) উদয়গিরির লোকেশ্বর দুইটি দেবীসহ ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর।৩৬

(ঞ) মুসলমান-আক্রমণ আশঙ্কায় ভূগর্ভে প্রোথিত ও কুর্কীহারা (বিহার) গ্রামে প্রাপ্ত একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি।৩৭ অপর একটি ৩ ফুট উচ্চ প্রস্তরমূর্ত্তি।৩৮ অনুমান অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে নির্ম্মিত। উভয়েরই সহিত দুইটি দেবী-মূর্ত্তি আছে, যাহার অন্যতমা তারাদেবী।

(ট) দুইটি দেবীসহ খাসপাড়ার লোকেশ্বর মূর্ত্তি (অনু-মান সপ্তম শতাব্দী)।৩৯

(ঠ) তারা ও বিদ্যাদেবী প্রজ্ঞাপারমিতাসহ দশম শতাব্দীর লোকেশ্বর মূর্ত্তি।৪০

(ড) তারা নাম্নী দেবী ও হয়গ্রীব নামক অর্দ্ধ অশ্ব ও

অর্দ্ধ নরাকৃতি দেবমূর্ত্তিসহ ঢাকা মিউজিয়মের লোকনাথ মূর্ত্তি, ১০ম শতাব্দী।৪১

(ঢ) দুইটি দেবীমূর্ত্তি (অন্যতমা তারা)সহ চম্পিতা লোকনাথ ভট্টরিকা মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্তটির সমসাময়িক।৪২

(ণ) অষ্টম শতাব্দীতে নির্ম্মিত লোকনাথের একটি মূর্ত্তি মহাকালী নামক গ্রামে পাওয়া যায়। তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি দণ্ডায়মানা দেবীমূর্ত্তি ও সম্মুখে উপবিষ্ট দুইটি দেবীমূর্ত্তি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক ও গণেশ-সম্বলিত দুর্গামূর্ত্তির সাদৃশ্য প্রদর্শন করে।৪৩

(ত) পুরুলিয়াতে প্রাপ্ত বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তির বাম পার্শ্বে তারা ও দক্ষিণ পার্শ্বে ভ্রূকুটি তারার মূর্ত্তির সহিত দক্ষিণ দিকে হয়গ্রীবের মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ইহা সম্ভবতঃ নবম বা দশম শতাব্দীর।৪৪

এখানে, তারামূর্ত্তির বহু নিদর্শন একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। প্রজ্ঞাপারমিতা বিদ্যাদেবী ও হয়গ্রীব বিদ্যাদেব এরূপ বিশ্বাস মহাযানশ্রেণীতে সুপ্রচলিত ছিল।৪৫ হয়ত ইহার আদর্শেই দুর্গামূর্ত্তির সহিত বাগ্‌দেবী সরস্বতীকে দেখা যায়। হয়গ্রীব গণেশমূর্ত্তির আদর্শ কিনা তাহাও বিচার্য্য, কারণ উভয় মূর্ত্তি অর্দ্ধপশু ও অর্দ্ধনর এবং গণেশকেও লেখনীহস্তে দেখা যায়।

৪

পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, মহাযান বৌদ্ধসম্প্রদায় বুদ্ধমূর্ত্তির সঙ্গিনীরূপে দেবীমূর্ত্তি গঠন আরম্ভ করেন ও এই সকল দেবী-মূর্ত্তির মধ্যে তারার মূর্ত্তি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে, কারণ শেষের দিকে বুদ্ধমূর্ত্তির অন্যতমা সঙ্গিনীরূপে তারাকে বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়। বুদ্ধের সঙ্গিনীদের মধ্যে অন্যতমা হইবার গৌরবের সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় তাঁহার স্বতন্ত্র ভাবেও পূজা হইতে থাকে ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারামূর্ত্তির সঙ্গিনীরূপে দুই বা ততোধিক দেবদেবী দেখা যায়। নিম্নে কয়েকটি প্রসিদ্ধ তারামূর্ত্তির বিবরণ দেওয়া হইল :

(ক) দুইটি দেবীমূর্ত্তিসহ আফগানিস্থানের তারামূর্ত্তি, চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দী।৪৬

(খ) মহেন্দ্রপালের রাজত্বের নবম বর্ষ ও রামপালের রাজত্বের সময়ে নির্ম্মিত দুইটি তারামূর্ত্তি নবম শতাব্দী (প্রত্যেকটি দুইটি দেবীমূর্ত্তিসহ)।৪৭

(গ) শ্যামবাগের তারামূর্ত্তি ইহাদের অনুরূপ ও সমসাময়িক।৪৮

(ঘ) ভাগলপুরের নিকট প্রাপ্ত সাড়ে তিন ফুট লম্বা ও দুই ফুট উচ্চ প্রস্তরখণ্ডে দুইটি সঙ্গিনীসহ তারামূর্ত্তি খোদিত, অনুমান নবম শতাব্দী।৪৯

(ঙ) কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত দুইটি সঙ্গিনীসহ খদিরবরণী তারার দণ্ডায়মানা মূর্ত্তি, শ্যামবাগের মূর্ত্তির সমসাময়িক।৫০

(চ) কলিকাতা মিউজিয়মে দুইটি সঙ্গিনীসহ উপবিষ্টা তারার মূর্ত্তি। পূর্ব্বোক্তটির কিছু পরের বলিয়া মনে হয়।৫১

এই তালিকায় উল্লেখযোগ্য যে, ভাগলপুরের প্রস্তরখণ্ডের তারামূর্ত্তির অন্যতমা সঙ্গিনী পদ্মাসনা ঊষা বা মারীচি দেবী ও দ্বিতীয়া সঙ্গিনী তরবারিধারিণী একজটা।

শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ষষ্ঠ হইতে দশম শতাব্দীতে প্রাপ্ত তারামূর্ত্তির শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। যথা :

(ক) মহামযূরী ও মারীচি নাম্নী সঙ্গিনীদ্বয়সহ চতুর্ভুজা সিতাতারা।৫২

(খ) ষড়ভুজা সিতাতারা, ইনি একাকিনী।৫৩

(গ) পাঁচটি মূর্ত্তিসহ মহাশ্রীতারা।৫৪

(ঘ) মারীচি ও মহামযূরীর অতিরিক্ত একজটাদেবী ও জাঙ্গুলী নামক দেবদ্বয়সহ অশোকাতারা।৫৫

(ঙ) বরদাতারা—ইহার সহিত দুইটি দেবীমূর্ত্তি ও দুইটি দেবমূর্ত্তি দেখা যায়, দেবীমূর্ত্তিগুলি নিকটবর্ত্তিনী।৫৬

(চ) একাকিনী আর্য্যতারা।৫৭

বৌদ্ধযুগের দেবী তারামূর্ত্তির সহিত বর্ত্তমান দুর্গামূর্ত্তির সাদৃশ্য সুপরিস্ফুট। তারার সঙ্গিনীদের মধ্যে একাধিক ক্ষেত্রে পদ্মাসনা মারীচিমূর্ত্তি দুর্গার তনয়া লক্ষ্মীদেবীর সহিত সাদৃশ্য সূচিত করে। মহামযূরীই হয়ত পরে সরস্বতীতে রূপান্তরিত হইয়াছেন, কারণ সরস্বতী কোথাও-বা হংসবাহিনী, কোথাও কোথাও ময়ূরবাহিনী। একজটা পরে শীতলাদেবীতে পরিণত হন তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।৫৮

৫

হিন্দু দেবমূর্ত্তির সহিত একাধিক দেবদেবীমূর্ত্তি বৌদ্ধ রীতির অনুকরণ বলিয়াই মনে হয়।

আমাদের বাংলাদেশে সরস্বতীকে ব্রহ্মার স্ত্রীরূপে কল্পনা করিলেও ব্রহ্মার যে কয়টি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে সরস্বতীর অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্মার চারিটি মূর্ত্তির মধ্যে তিনটিতে যথা : (ক) মাদ্রাজ৫৯, (খ) এভারু৬০ ও (গ) আহোলের৬১ ব্রহ্মামূর্ত্তি একাকী। আকোলহোসের ব্রহ্মামূর্ত্তির সহিত সাতটি সঙ্গী ও সঙ্গিনী থাকিলেও৬২ তাহাতে সরস্বতীর চিহ্ন-মাত্র নাই।

গণপতির মূর্ত্তি কখনও-বা একাকী, কখনও তাঁহার সহিত একটি ক্ষুদ্র স্ত্রীমূর্ত্তি দেখা যায়। বিহারের একসরাই গ্রামে প্রাপ্ত, অনুমান একাদশ শতাব্দীর গণপতি-মূর্ত্তির সহিত দুইটি দেবীমূর্ত্তি আছে।৬৩

শিবলিঙ্গ ভিন্ন শিবমূর্ত্তির পূজা অপেক্ষাকৃত বিরল হইলেও মাঝে মাঝে হরপার্ব্বতীর যুগলমূর্ত্তিও দেখা যায়। নিম্নলিখিত তিনটি মূর্ত্তিতে একাধিক দেবীমূর্ত্তি দেখা যায়।

(ক) ইলোরার উমা-মহেশ, দুইটি দেবীমূর্ত্তিসহ, অষ্টম শতাব্দী।৬৪

(খ) ইলোরার রাবণ গ্রহ (উমা-মহেশ) দুইটি দেবী ও দুইটি দেবমূর্ত্তিসহ, পূর্ব্বোক্তের সমসাময়িক।৬৫

(গ) বাদামীর হরিহর (অর্দ্ধ বিষ্ণু অর্দ্ধ শিব) অনুমান নবম বা দশম শতাব্দীর। ইহার দুই পার্শ্বে বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী ও হরপ্রিয়া পার্ব্বতীর অতিরিক্ত নন্দী ও গরুড়মূর্ত্তিও আছে।৬৬

নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে ভারতে ব্যাপক সূর্য্যোপাসনা সিথিয়ান ব্রাহ্মণেরাই প্রচার করেন। বৈদিক যুগের সূর্য্যোপাসনা লোকে ভুলিয়াই গিয়াছিল।৬৭ প্রায়ই সূর্য্যমূর্ত্তির সহিত অন্য দুই মূর্ত্তি বা তাহার অধিক মূর্ত্তি দেখা যাইত। যথা :

(ক) মাদ্রাজ-গৌড় মিশ্রিত (ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দী) উষা ও প্রত্যুষার সহিত।৬৮

(খ) মাড়োয়ার (অষ্টম শতাব্দী) রজনী, সুবর্ণা, সুবাচা ও ছায়ার সহিত।৬৯

(গ) মাড়োয়ার (অষ্টম শতাব্দী) রজনী ও নিকাহুবা দেবীদ্বয়—দণ্ড ও পিঙ্গলের সহিত।৭০

(ঘ) ছাভেরীর মূর্ত্তি (নবম শতাব্দী) রজনী ও নিকাহুবার সহিত।৭১

(ঙ) পাটনা মিউজিয়মের দুইটি দেবীমূর্ত্তিসহ সূর্য্যমূর্ত্তি (৯ম বা ১০ম শতাব্দী)।৭২

(চ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মূর্ত্তি, পূর্ব্বোক্তটির সমসাময়িক, ইহাতে দণ্ড ও পিঙ্গল দেবমূর্ত্তি থাকিলেও কোন দেবীমূর্ত্তি নাই।৭৩

(ছ) বুদ্ধগয়ার দুইটি সূর্য্যমূর্ত্তি, ইহাদের সহিত দুইটি করিয়া দেবীমূর্ত্তি আছে, নির্ম্মাণের তারিখ পাওয়া যায় না।৭৪

(জ) পালযুগের সূর্য্যমূর্ত্তি, অনুমান ৯ম শতাব্দী. দুই দেবী ও দুই দেবসহ।৭৫

বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে নবম অবতার বুদ্ধ। বৌদ্ধযুগের অবসানে হিন্দু ধর্ম্মান্তরিত বৌদ্ধগণকে আপন আপন দলে টানিবার একটা ব্যাপক প্রয়াস হয়। সেই উদ্দেশ্যেই বৈষ্ণবগণ বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার স্বীকার করিয়া লইয়া ও ভারতে অধিক প্রচলিত মহাযান পদ্ধতিতে বুদ্ধমূর্ত্তির অনুরূপ বিষ্ণুমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া মহাযান বৌদ্ধদের দলে টানিবার চেষ্টা করেন এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

নিম্নে এই মহাযান রীতিতে নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তিগুলির (যাহাদের তারিখ প্রদান সম্ভব) একটি তালিকা দিতেছি :

(ক) দুইটি দেবীমূর্ত্তিসহ নালন্দার ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি, অনুমান ষষ্ঠ শতাব্দী, বৌদ্ধকেন্দ্রেই ইহা প্রথম নির্ম্মাণ হয় দেখা যাইতেছে।৭৬

(খ) দুইটি দেবীমূর্ত্তিসহ বিষ্ণুমূর্ত্তি, তিব্বতে প্রাপ্ত। গঠনভঙ্গী অনুসারে পূর্ব্বোক্তটির এক শতাব্দী বা দুই শতাব্দী পরে।৭৭

(গ) মহাবলীপুরের মার্কণ্ডেয় (দেব) ও ভ্রুকুটি (দেবী)সহ যোগাসন বিষ্ণুমূর্ত্তি, অনুমান সপ্তম শতাব্দী।৭৮

(ঘ) মহাবলীপুরের ভূদেবী ও লক্ষ্মীসহ ভোগাসন মূর্ত্তি—পূর্ব্বোক্তটির সমসাময়িক।৭৯ ভূদেবীর হস্তে শ্বেতপদ্ম থাকায় ইনিই বোধ হয় পরে সরস্বতীতে রূপান্তরিত হন।

(ঙ) ভোগস্থান মূর্ত্তি—পূর্ব্বোক্তটির অনুরূপ ও সমসাময়িক (বিষ্ণু উপবিষ্ট)।৮০

(চ) উচাই বিহারের বাসুদেব মূর্ত্তি লক্ষ্মী ও বীণাবাদিনী দেবী (পরবর্ত্তী যুগের সরস্বতী)সহ মহীপালের সময়ে (৯ম শতাব্দী) নির্ম্মিত।৮১

(ছ) স্থানক মূর্ত্তি, লক্ষ্মী ও সরস্বতীসহ, অনুমান নবম শতাব্দী।৮২

(জ) মাহেশ্বরতিন বিষ্ণুমূর্ত্তি, লক্ষ্মী-সরস্বতীসহ, নবম শতাব্দী।৮৩

(ঝ) কটকের বিষ্ণুমূর্ত্তি, লক্ষ্মী-সরস্বতীসহ, পূর্ব্বোক্তটির সমসাময়িক।৮৪

(ঞ) বিক্রমপুরের বিষ্ণুমূর্ত্তি, লক্ষ্মী-সরস্বতীসহ, দশম শতাব্দী।৮৫

(ট) বর্দ্ধমানে প্রাপ্ত প্রস্তরখণ্ডে (১ ফুট ৫ ইঞ্চি × ১০ $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি) চক্রধারিণী লক্ষ্মী ও বীণাবাদিনী সরস্বতীসহ বিষ্ণুমূর্ত্তি খোদিত, দশম শতাব্দী।৮৬

(ঠ) গোরক্ষপুরের লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্ত্তিসহ দশম শতাব্দীর বিষ্ণুমূর্ত্তি।৮৭

(ড) উহারই অনুরূপ ও সমসাময়িক আর একটি মূর্ত্তি।৮৮

(ঢ) একসরাই গ্রামে প্রাপ্ত লক্ষ্মী ও সরস্বতীসহ বিষ্ণুর দণ্ডায়মান মূর্ত্তি, ইহার পশ্চাতে চালচিত্রের অনুরূপ খোদিত আছে—অনুমান একাদশ শতাব্দী।৮৯

বৌদ্ধযুগের শেষ দিকে প্রথমে দাক্ষিণাত্যে ও তাহার পর শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুত্থানের পর উত্তর ভারতে সঙ্গিনীসহ বিষ্ণুমূর্ত্তি গঠিত হইতে থাকে—তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস উপরে দেওয়া হইল। বিষ্ণুসঙ্গিনীরূপে লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়

দেবীই নবম শতাব্দী হইতে পূজিতা হইতে থাকেন তাহার প্রমাণও আমরা পাই।

৬

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে আমরা যে তথ্য পাই তাহার সারাংশ :

(ক) যে পৌরাণিক ভিত্তি অনুসারে আমরা মহিষ-মর্দ্দিনীর পূজা করি সেই মহালক্ষ্মীর সহিত পার্ব্বতীর কোন সংস্রব নাই।

(খ) খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায় বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত দেবীমূর্ত্তির উপাসনা করেন। কতকটা আকার-সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও কতকটা সুন্দরের পূজারী শিল্পী-মনের আকর্ষণ একের স্থানে দুইটি নারীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব করে।

(গ) অনুমান ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে বৌদ্ধমূর্ত্তিতে দুইটি পরিবর্ত্তন দেখা যায়। প্রথমতঃ, বুদ্ধমূর্ত্তির অন্যতমা সঙ্গিনী-রূপে তারামূর্ত্তি একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যাদেবী প্রজ্ঞাপারমিতা কখনও কখনও দ্বিতীয়া সঙ্গিনীরূপে দেখা দেন।

(ঘ) তারা এই সময় হইতে কখনও কখনও মূল মূর্ত্তি-রূপেও পূজিতা হইতে থাকেন ও তাঁহার সহিত পদ্মাসনা মারীচি বা ঊষা ও ময়ূরবাহিনী মহাময়ূরীকে সঙ্গিনীরূপে দেখা যায়।

(ঙ) প্রায় এই সময়েই হিন্দুপ্রধান দক্ষিণ-ভারতে শ্রী (লক্ষ্মী) বা ভবানী (সরস্বতী) দেবী ও সূর্য্যাদিদেবের সঙ্গিনী-সহ মূর্ত্তি দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধবিরোধী হিন্দু অভ্যুত্থান সূচিত করে।

(চ) নবম শতাব্দী হইতে বিষ্ণুসঙ্গিনীরূপে লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজিতা হইতে থাকিলেন। ইহার পূর্ব্বেকার বিষ্ণু-মূর্ত্তির সহিত দেবীমূর্ত্তি থাকিলেও তাহা সর্ব্বদা লক্ষ্মী বা সরস্বতী নয়।

(ছ) পার্ব্বতীমূর্ত্তির ব্যাপক পূজা নবম শতাব্দীর পরে ও পার্ব্বতীর সহিত লক্ষ্মী এবং সরস্বতী মূর্ত্তির পূজা প্রধানতঃ উত্তর ভারতে একাদশ শতাব্দীর পরেই হয়।

(জ) বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতাররূপে গণ্য করিয়া ও মহাযান রীতিতে দুই সঙ্গিনীসহ বিষ্ণুমূর্ত্তির নির্ম্মাণ করিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে অনেক ধর্ম্মান্তরিত বৌদ্ধকে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করিতে সফলকাম হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই সাফল্যই তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী শাক্ত সম্প্রদায়কে তাঁহাদের নীতি অনুকরণে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁহারা প্রথমে "তারা"দেবীকে দুর্গার দশমহাবিদ্যার অন্যতমা গণ্য করিলেন ও দুই সঙ্গিনীসহ তারার অনুকরণে দুর্গামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। বিষ্ণুর দুই স্ত্রীকে দুর্গার সঙ্গিনী করিয়া লওয়ায় তাঁহাদের দুর্গার কন্যারূপে গণ্য করিতে হইল। দুই স্ত্রীর মধ্যে একজনকে ব্রহ্মার ও অপর জনকে বিষ্ণুর স্ত্রী মনে করার হয়ত একটা কারণ ইহাও ছিল যে, ইহার দ্বারা দুই দেবাদিদেব দুর্গার জামাতা ও দুর্গা ইঁহাদের প্রণম্যা হইলেন।

মূল দেব বা দেবীমূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মানা ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায়া দেবীমূর্ত্তির অতিরিক্ত আরও দুইটি দেবমূর্ত্তি যে প্রায় উপবিষ্ট দেখা যায় তাহা হয়ত আকারসাম্যের কারণ। দশম শতাব্দী হইতে কয়েকটি বৌদ্ধ ও বিভিন্ন হিন্দু দেবমূর্ত্তিতে ইহা দেখা যায়। দুর্গার মূর্ত্তিতে এইগুলিই তাঁহার পুত্রদ্বয় কার্ত্তিক ও গণেশ হওয়াও স্বাভাবিক। গণেশের আদর্শ বৌদ্ধ হয়গ্রীব বলিয়া মনে হয়। অর্দ্ধ অশ্ব ও অর্দ্ধ নরাকৃতি হয়গ্রীব বিদ্যার দেবতা, অপরক্ষেত্রে অর্দ্ধ হস্তী ও অর্দ্ধ নরাকৃতি গণেশের হস্তেও লেখনী। যুদ্ধদেব কার্ত্তিক বৌদ্ধ তরবারিধারিণী একজটারই রূপান্তরিত মূর্ত্তি কিনা কে বলিবে?

আদিশূরের সময়ে বাংলায় হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলেও দুর্গার বর্ত্তমান মূর্ত্তি লক্ষ্মণসেনের সময় হইতে প্রচলিত মনে হয়। কবির কল্পনা সকল অভাব পূরণ করিয়াছে। পুত্র-কন্যা সমভিব্যাহারে দেবীর তিন দিন পিতৃগৃহে বাস মানবীয়-ভাবের যে মাধুর্য্য আনিয়াছে তাহা মহিষমর্দ্দিনীর অন্য মূর্ত্তিতে সম্ভব নহে। পুরাণ যাঁহাকে কঠোরা রণচণ্ডী রূপে চিত্রিত করিয়াছে, ইতিহাস যাঁহার পাষাণী মূর্ত্তি রক্ষা করিতেছে, বাংলার শিল্পী তাঁহার মাটির মূর্ত্তি গঠন করিয়া এক করুণ ও মধুর ভাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

পরিশিষ্ট

(১) মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৭৮ অধ্যায় ৪৭-৭৪ শ্লোক
(২) ঐ ৮০ „ ১-৩৩শ „
(৩) ঐ ৮১ „ ৩৯শ „
(৪) ঐ ৮২ „ ৪র্থ „

(৫) মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৮৪ অধ্যায় ৪র্থ শ্লোক
(৬) ঐ ৮৫ „ ১৯শ „
(৭) ঐ ৮৭ „ ২য় „

8. *Early Hindu Sculpture*—Ludwig Bach Hoffer, Vol. II, Plate 7.
9. *Hindu Iconography*—Gopi Nath Rao, Vol. I, Part II, Plate CV.
10. *Ibid*, Vol. II, Part II, Plate CIII.
11. *Ibid*, Vol. I, Part II, Plate CIV.
12. *Ibid*, Vol. I, Part II, Plates CVI, CVII.
13. *Eastern School of Medieval Sculptures*—R. D. Banerjee, Plate VI.

14. *Hindu Iconography*—Gopi Nath Rao, Vol. 1, Part II, Plate CVIII.
15. *Ibid*, Vol. I, Part II, Plates IX, X.
16. *Ibid*, Vol. I, Part II, Plate CXIII.
17. *Ibid*, Vol. I, Part II, Plate CXIV.
18. Patna Museum—Exhibit No. 6498.
19. *Eastern School of Mediaeval Arts*—R. D. Banerjee, Plate IC.
20. *Ibid*, Plate XIC.
21. *Early Indian Sculptures*—Ludwig Bach Hoffer, Vol. II, Pl. 79.
22. *Ibid*, Vol. II, Pl. 83.
23. *Ibid*, Vol. II, Pl. 103.
24. *Ibid*, Vol. II, Pl. 140.
25. *Ibid*, Vol. II, Pl. 142.
26. বাংলায় ভ্রমণ E B. Rly 1940 Ed প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ২৩৯
27. Patna Museum--Exhibit No. 8459.
28. *Ibid*, Exhibit No. 1066.
29. *Early Indian Sculptures*—Ludwig Bach Hoffer, Vol. II, Plate 82.
30. *Ibid*, Vol. II, Plate 81.
31. *Ibid*, Vol. II, Plate 152.
32. *Ibid*, Vol. II, Plate 148.
33. *Hand-Book of Sculptures of Peshwar Museum*, Page 51, Plate 280.
34. *Hand-Book of Sculptures of Bangiya Sahitya Parishat Museum*, Pl. C6/169.
35. Patna Museum--Exhibit 9791.
36. *Ibid*—Exhibit 6890.
37. *Ibid*—Exhibit 9771.
38. *Ibid*—Exhibit 9891.
39. Lucknow Archaeological Museum—Exhibit No. G 219.
40. Nalanda Museum.
41. *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures of Dacca Museum*—N. K. Bhattashali, A(11)a/2.
42. *Ibid*, Plate II. P. 14.
43. *Ibid*, Plate A(11)a/4.
44. *Hand-Book of the Sculptures of Museum of Bangiya Sahitya Parishat*, Plate cd(1)/20.
45. *Eastern School of Medieval Arts*—R. D. Banerjee, Page 3.
46. *Eastern Indian Sculptures*—Ludwig Bach Hoffer, Vol. II, Plate 160.
47. *Eastern School of Medieval Sculptures*—R. D. Banerjee, Plates IIIC, IVC.
48. *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures at the Dacca Museum* by N. K. Bhattashali, IB(V)a/1.
49. *Hand-Book of the Sculptures of Bangiya Sahitya Parishat Musium*, C(c)/269.
50. *Buddhist Iconography Based on Sadhan Mala*—Benoytosh Bhattacharya, Plate XXXIC.
51. *Ibid*, Plate XXXIIC.
52. *Ibid*, Page 137.
53. *Ibid*.
54. *Ibid*.
55. *Ibid*, Page 136.
56. *Ibid*.
57. *Ibid*.
58. *Hindu Iconography*—Gopi Nath Rao, Vol. 1, Part I, Page 139.
59. *Ibid*, Vol. 2, Part II, Plate CXLIII.
60. *Ibid*, Vol. 2, Part II, Plate CXLII.
61. *Ibid*, Vol. 2, Part II, Plate CXLIV.
62. *Ibid*, Vol. 2, Part II, Page 506.
63. Patna Museum (Not classified and numbered).
64. *Hindu Iconography*—Gopi Nath Rao, Vol. 2, Part II, Plate XXVII.
65. *Ibid*, Vol. 2, Part I, Plate LIII.
66. *Ibid*, Vol. 2, Part I, Page 335.
67. *Ibid*, Vol. I, Part I, Page 310.
68. *Ibid*, Vol. I, Part I, Plate LIII.
69. *Ibid*, Vol. I, Part I, Plate LXXXVII.
70. *Ibid*, Vol. I, Part I, Plate LXXIX.
71. *Ibid*, Vol. I, Part I, Plate LXXXVIII.
72. Patna Museum—Exhibit 32.
73. *Hand-Book of Sculptures of Bangiya Sahitya Parishat Museem*, Pl. XVII.
74. *La Sculptures de-Bodh Gaya—Ananda Coomaraswamy*.
75. Lucknow Archaeological Museum—Exhibit 11 29.
76. Patna Museum—Exhibit No. 10609.
77. *Ibid*--Exhibit No. 2763.
78. *Hindu Iconography*—Gopi Nath Rao, Vol. I, Part I, Page 81.
79. *Ibid*, Vol. I, Part I, Page 82, Plate XXII.
80. *Ibid*, Vol. I, Part I, Pages 87-88.
81. বাংলায় ভ্রমণ E B. Rly vol. 1, page 136
82. *Hindu Iconography*—Gopi Nath Rao, Vol. I, Part I, Page 84.
83. Patna Museum—Exhibit No. 6563.
84. *Ibid*--Exhibit No. 1356.
85. *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures of Dacca Museum* by N. K. Bhattashali, No.3A(1)a/2.
86. *Hand-Book of the Sculptures of Bangiya Sahitya Parishat Museum*, F(a)1/352.
87. Lucknow Museum (Archaeological)—Exhibit H-106.
88. *Ibid*—Exhibit No. H-107.
89. Patna Museum—Exhibit 10629.

ভাসের বাসবদত্তা

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

স্বপ্নবাসবদত্তম্ কবিকুলপতি ভাসের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। রাজশেখর বলেছেন,

ভাসনাটকচক্রেঽপি ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্।
স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোঽভূন্ন পাবকঃ।

অর্থাৎ ভাসের নাটকসমূহ বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক পরীক্ষার নিমিত্ত যখন উপস্থাপিত করা হ'ল, তখন অগ্নি বা পরীক্ষাগ্নি "স্বপ্নবাসবদত্তম্" গ্রন্থকে দগ্ধ করতে পারলেন না।

কবিসম্রাট কালিদাসও স্বীয় মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের প্রারম্ভে ভাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। স্বপ্নবাসবদত্তম্ ও মালবিকাগ্নিমিত্রম্ গ্রন্থদ্বয়ের বিষয়বস্তুর অনেক সামঞ্জস্য পরিস্ফুট এবং কালিদাস বহু ক্ষেত্রে ভাসের দ্বারা প্রভাবিত—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই মহাকবির শ্রেষ্ঠ নাটকের নায়িকা বাসবদত্তা যে কবি-হৃদয়ের অনুপম স্নেহে, নিপুণ তুলিকার কোমল লেপনে, রূপে লাবণ্যে গুণ-গরিমায় অতুলনীয় হবেন, সন্দেহ কি? স্বপ্নবাসবদত্তার নায়িকা সতী, সাবিত্রী, দময়ন্তীর মতই চিরশ্রদ্ধেয়া, চিরবন্দনীয়া।

উদয়ন-বাসবদত্তার প্রেমকাহিনী ভারতের যুগ-যুগান্তরের সম্পদ। কালিদাস মেঘদূতে বলেছেন গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়ন-বাসবদত্তার কাহিনী আলোচনায় চিত্ত বিনোদন করতেন। গুণাঢ্য তাঁর বৃহৎকথায় উদয়ন-বাসবদত্তার ভারতবিখ্যাত প্রেমকাহিনী লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন—তার রসাস্বাদন আমরা এখনও করছি, "কথাসরিৎসাগর", "বৃহৎকথা মঞ্জরী" বা "বৃহৎকথা শ্লোক সংগ্রহ" প্রভৃতির মাধ্যমে। ধম্মপদ গ্রন্থের ২১-২৩ কবিতার টীকাংশেও উদয়নবাসবদত্তার প্রেমবৃত্তান্ত পূর্ণভাবে লিখিত আছে। দিব্যাবদান, মহাবংশ প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থ ও কুমারপাল প্রতিবোধ প্রভৃতি জৈন-গ্রন্থেও এই কাহিনী সমুদ্ধৃত হয়েছে। বাসবদত্তা গল্পের তারতম্য অনেক। সে তারতম্য নায়কের চরিত্র, বাসবদত্তার প্রতি প্রকৃত হৃদয়ের আকর্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে। যেমন কথা সরিৎসাগরের গল্পাংশ থেকে জানতে পারি যে উদয়ন "বিরচিতা" নাম্নী কোনও রাজান্তঃপুরস্থা দাসীর প্রতি প্রেমাসক্ত ছিলেন এবং বাসবদত্তার কাছে তিনি এজন্য পা ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন, কিন্তু বাসবদত্তা-চরিত্রে—বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বিশিষ্ট লেখকের বর্ণনাভঙ্গিতে কোনও বিসদৃশ ইঙ্গিত পর্যন্তও দৃষ্ট হয় না। তাঁর পিতা অবন্তীরাজ কূটচক্রী ছিলেন, রাজকীয় কৌশল প্রয়োজনবশে গ্রহণ করতেন—উদয়ন বৎসরাজের প্রতি প্রদ্যোতন ঈর্ষ্যার ভাব পোষণ করতেন, বরণীয় মনোভাব পোষণ করেন নি সত্যি—কিন্তু বাসবদত্তার জীবনে উদয়ন ব্যতীত আর ছিল না কিছুই, শয়নে স্বপনে নিশি-জাগরণে উদয়ন-চিন্তাই ছিল তাঁর সম্বল, উদয়ন-অভ্যুন্নতিই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র কাম্য। উদয়নের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সূত্রপাত—ভিন্ন ভিন্ন যুগের লেখকের মতে—নানাপ্রকারের কপটতার মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল সত্য; কিন্তু হৃদয় যখন তিনি দান করলেন, তখন সর্ব্বস্ব উজাড় করেই দান করেছিলেন—নিজের বাসনা-কামনার তিলমাত্র স্থানও নিজের হৃদয়ের নিভৃত কোণেও রাখলেন না। ভাসের সুনিপুণ অঙ্কনে উদয়ন চরিত্র সমুজ্জ্বল; উদয়ন নানা অবস্থার বিপর্যায়েও বাসবদত্তার এই অকৃত্রিম ভালবাসার অমর্য্যাদা করেন নি, এবং স্বতঃই আজকের যুগের দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজার বহু দার পরিগ্রহ প্রথমা পত্নীর প্রেমের অমর্য্যাদাকর; কিন্তু তখনকার দিনের সামাজিক প্রথাকে মেনে নিলে উদয়নের চরিত্র ভাসের অঙ্কনে বাসবদত্তাচরিত্রের মত চির সমুজ্জ্বল না হলেও হীনপ্রভ নয়। রাজদুহিতা বাসবদত্তা, অবন্তীর পুরজানপদবাসীর চোখের মণি বাসবদত্তা, সেই যে স্বামীর হাত ধরে একবার রাজান্তঃপুর থেকে বের হয়ে এলেন—আর ত দ্বিতীয় বার অবন্তীতে পদার্পণ করেন নি। তিনি ছিলেন জননীর বড় আদরের দুহিতা—তাঁর জননীই ত এক দিন কন্যার বিবাহের কথায় হৃদয়ের মনোব্যথা অশ্রুসিক্ত নয়নে সুব্যক্ত করেছিলেন (প্রতিজ্ঞা—যৌগন্ধরায়ণ, ২·৭)—

"অদত্তেত্যাগতঃ লজ্জা দত্তেতি ব্যথিতং মনঃ।
ধর্ম্মস্নেহান্তরে ন্যস্তা দুঃখিতাঃ খলু মাতরঃ।"

অর্থাৎ, কন্যার বয়স্থাবস্থায় বিয়ে হয় নি, এতে জননীর হয় লজ্জা; অন্য দিকে কন্যা বিবাহিতা—এ ভাবতে মন হয় ব্যথিত। ধর্ম্ম ও স্নেহের উভয় রজ্জু-পাশে আবদ্ধা জননীদের দুঃখ অনিবার্য্য। এই আদরের জননীর মুখও ত তার পর দিন থেকে বাসবদত্তা আর দ্বিতীয় দিন দেখেন নি। যে উদয়নরাজের জন্য তিনি মাতাপিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিতা হলেন, মাতৃভূমিতে দ্বিতীয় বার পদার্পণ করলেন না, সেই উদয়নরাজের দ্বিতীয় দার পরিগ্রহের সহায়তার জন্য তিনি হলেন গৃহত্যাগিনী, অজ্ঞাতভাবে ভবিষ্য সতিনীর দাসী—শুধু তাই নয়, তাদের মিলন-প্রতীক বরণমালা গেঁথে দিতে হ'ল তাঁকেই—কি অদৃষ্টের বিড়ম্বনা। এ দুঃখে—চরম দুঃখের মধ্যেও, তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা বৎসরাজ উদয়ন তাঁকে ভুলতে পারেন নি। এই সুমধুর ভাবোন্মেষ, এই অনুপম নারী-চরিত্রের সম্পূর্ণ মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্য ভাসের জগজ্জনমনোবিমোহন বাসবদত্তাচরিত্রের পূর্ণোপলব্ধির জন্য স্বপ্নবাসবদত্তার বাসবদত্তা এবং প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণের বাসবদত্তার চরিত্র যুগপৎ ভাবে অবলোকন করা অত্যাবশ্যক।

প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণের বাসবদত্তা

ছলে-বলে-কৌশলে প্রতাপান্বিত বৎসরাজ উদয়ন আজ অবন্তীরাজ প্রদ্যোতনের বন্দী। তাঁর বিশ্রুতকীর্ত্তি ঘোষবতী বীণা বাসবদত্তার উপহারের সামগ্রী। যৌগন্ধরায়ণ, বসন্তক এবং রুমণ্বান্—বৎসরাজের হিতাকাঙ্ক্ষিগণ উদয়নের সঙ্গে যোগাযোগ সংরক্ষণ করে তাঁর উদ্ধারের চেষ্টায় ব্যাপৃত। উদয়নের উদ্ধারের নিমিত্ত যৌগন্ধরায়ণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কিন্তু মদনদেব তাতে বাদ সাধলেন। উদয়নরাজের উদ্ধারের পূর্ব্ব পরিকল্পনা ত্যাগ করে এখন যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তা সহ উদয়নের উদ্ধারের পুনঃপ্রতিজ্ঞা করলেন। বাসবদত্তা প্রিয়ের হাত

ধরে বের হয়ে পড়লেন অচেনা জগতে। বাসবদত্তার স্নেহাতুরা জননী কন্যার দুঃখে আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত করলেন। রাজা বাসবদত্তা ও উদয়নের প্রতিমূর্ত্তির বিবাহ দিতে সম্মত হওয়ায় জননী সে সঙ্কল্প ত্যাগ করলেন। যে বাসবদত্তাচরিত্র-কুসুম উত্তরকালে বিচিত্র সুষমায় জগৎ সুরভিত করেছে, সে অনুপম লাবণ্যময় কোরকের উন্মেষ ও বিকাশ প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণে। ফলে ফুলে পরিণতি স্বপ্নবাসবদত্তায়।

স্বপ্নবাসবদত্তায় বাসবদত্তা

স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে ঘোষবতীমোহন উদয়ন সুখের স্রোতে দিলেন গা ভাসিয়ে। রাজকার্য্য করলেন উপেক্ষা। ফলে স্বীয় রাজ্যের কতক অংশ আরুণির হস্তগত হ'ল। যৌগন্ধরায়ণ অতি বিচক্ষণ রাজমন্ত্রী; তিনি দেখলেন যে আরুণিকে বৎসরাজ্য থেকে বিতাড়িত করতে হলে মগধরাজের সহায়তা অত্যাবশ্যক। মগধ-রাজের ভগিনী পদ্মাবতীর সঙ্গে রাজা উদয়নের বিবাহসংঘটনই এই সহায়তা লাভের একমাত্র উপায়। রাজা উদয়ন একান্তভাবে বাসবদত্তার প্রেমনিষ্ঠ বলে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তার সঙ্গেও এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। স্বামীর ইষ্ট-সাধনের জন্য তিনিও এ বিবাহে সম্মত হলেন এবং যৌগন্ধরায়ণকে পূর্ণ সহযোগিতাপ্রদানে বদ্ধপরিকর হলেন। লাবাণক গ্রামের অগ্নিকাণ্ডে রাণী বাসবদত্তা এবং যৌগন্ধরায়ণ ভস্মীভূত হয়েছেন এই কথা তাঁরা সর্ব্বত্র রটিয়ে দিলেন। অতঃপর মগধরাজ্যে উপনীত হয়ে রাজা দর্শকের ভগ্নী পদ্মাবতীর আশ্রিতারূপে বাসবদত্তাকে গচ্ছিত রেখে যৌগন্ধরায়ণ রইলেন আত্মগোপন করে। বিপত্নীক উদয়নরাজের গুণগ্রামে বিমুগ্ধ হয়ে রাজা দর্শক স্বীয় ভগ্নীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহে স্বীকৃত হলেন এবং অচিরকালে এ বিবাহ সংঘটনের পূর্ণ আয়োজন হ'ল। পদ্মা-বতীর আশ্রিতা বাসবদত্তা গাঁথলেন তাঁদের মিলনমালা। এ সমস্ত দুঃখের মধ্যে তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা রইল এইটুকু যে রাজা দর্শকই এ বিবাহ ঘটিয়েছেন, উদয়ন উপযাচক হয়ে এই বিবাহ করেন নি। যৌগন্ধরায়ণের গূঢ় প্রচেষ্টায় স্বীয় অলৌকিক আত্মদানের ফলে সব সঙ্ঘটিত হচ্ছে বটে; কিন্তু হৃদয় বাধা মানে কোথায়? তাই বাসবদত্তা বলছেন—এ বিবাহ তাড়াতাড়ি সম্পাদন করার জন্য এরা যতই চেষ্টা করছেন, ততই হচ্ছে হৃদয় আমার দুঃখ-ভারাক্রান্ত—"জহ জহ তুবরদি, তহ তহ অন্ধীকরই মে হিঅঅং।" নিরন্তর গভীর ধ্যানের ফলে তিনি এতই আত্মস্থ হয়ে গেছেন যে, তিনি যে বেঁচে আছেন, সেটিই গেছেন ভুলে। তাই মালা গ্রন্থন সময়ে তিনি অবিধবাকরণ গুল্ম দিলেন প্রচুর, কিন্তু "সপত্নী মর্দ্দন" ব্যবহারই করলেন না—তাঁর মতে যার সপত্নী নেই, সেই পদ্মাবতীর বিবাহ-মাল্যে সপত্নী মর্দ্দনের ব্যবহার অপ্রাসঙ্গিক, অযৌক্তিক।

মগধ রাজ্যে উদয়ন-পদ্মাবতীর দিন কাটছে। বাসবদত্তার মানসিক সহস্র কষ্টের মধ্যেও একমাত্র সান্ত্বনা—উদয়ন পদ্মাবতীর নিকট বীণা বাদনে স্বীকৃত নন; বীণা বাজাতে বললেই দীর্ঘ-নিঃশ্বাসই হয় রাজা উদয়নের একমাত্র উত্তর। বিদূষকের প্রশ্নের উত্তরে নিভৃতে রাজা যখন হৃদয়ের বাণী জ্ঞাপন করেন—

"পদ্মাবতী বহুমতা ম যদ্যপি রূপশীল মাধুর্য্যৈঃ।
বাসবদত্তাবদ্ধং ন তু তাবন্মে মনো হরতি।"

অর্থাৎ, যদিও পদ্মাবতী রূপ ও স্বভাব মাধুর্য্যে বহুমানযোগ্যা, তথাপি বাসবদত্তাগতপ্রাণ তাঁর প্রাণ নিলীন রয়েছে বাসবদত্তায়।

পদ্মাবতী শিরঃপীড়ায় আক্রান্তা হয়ে সমুদ্রগৃহে শয়ানা। বাসব-দত্তা সরল প্রাণে পদ্মাবতীর পরিচর্য্যার জন্য তত্র উপস্থিতা; পদ্মাবতীর স্থলে রাজা শয়ান—তিনি জানবেনই বা কি করে? স্বপ্ন ভাষণের ফলে রাজাই শয়ান, তিনি জানতে পেরেই করলেন প্রস্থানের উদ্যোগ। রাজার নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেই পিপাসিত নেত্র তৃপ্ত করে রাজাকে তিনি দেখে নিলেন। সুপ্তোত্থিত রাজা বাসবদত্তার সান্নিধ্য অনুভব করলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে হ'ল যেন সবই স্বপ্ন। এ ঘটনা অবলম্বনে বিরচিত গ্রন্থের নামকরণ করেছেন ভাস স্বপ্ন-বাসবদত্তা।

অতঃপর রাজা উদয়নের কাছে রাজা দর্শক শুভ সংবাদ দিলেন যে তাঁর শত্রু আরুণি রুমণ্বান্ কর্ত্তৃক পরাজিত হয়েছে। স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন রাজা উদয়ন। অবন্তীরাজ মহাসেন ও তাঁর মহিষীও এমন সময় তাঁকে শুভাশীর্ব্বাদ জানিয়ে তাঁদের প্রিয়া কন্যার বিবাহকালীন একটি প্রতিমূর্ত্তি স্মারকরূপে করলেন প্রেরণ। পদ্মাবতী ছবি দেখেই বাসবদত্তার প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারলেন এবং হলেন অনুতপ্তা। অতঃপর যৌগন্ধরায়ণ স্বয়ং উপস্থিত হয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করলেন।

উপসংহার

সংস্কৃত কাব্য-জননীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপে যে সকল কবি রসিকজনের চিত্তবিনোদন করছেন, তাঁদের সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে কবি বলেছেন—

যস্যাশ্চৌরশ্চিকুরনিকরঃ কর্ণপূরো ময়ূরো
ভাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ।
হর্ষো হর্ষো হৃদয়বসতিঃ পঞ্চবাণস্তু বাণঃ
কেষাং নৈষা কথয় কবিতাকামিনী কৌতুকায়।

(জয়দেবকৃত প্রসন্নরাঘব, প্রস্তাবনা, শ্লোক ২২)

অর্থাৎ, কবিকুলগুরু কালিদাস কাব্য-জননীর চিরবিলাস, মহাকবি ভাস তাঁর মুখের শুভ্র শুচি হাস্যরাশি—তাঁর আনন্দের মূর্ত্ত প্রতীক।

এই শোভন মধুরিমময় হাস্যবিকাশের মধ্যমণি হচ্ছেন বাসবদত্তা। ভারতীয় নারীহৃদয়ের যত সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, অনবদ্য কমনীয়তা, মহনীয়তা, বরণীয়তা—সমস্ত পূর্ণমাত্রায় ঢেলে দিয়ে মহাকবি ভাস বাসবদত্তার চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। ভারতীয়েরা স্মৃতির সুবর্ণ প্রকোষ্ঠে চিরদিন বাসবদত্তাকে উজ্জ্বলতম বিভায় দেদীপ্যমান করে সুসজ্জিত করে রেখেছেন, জানিয়েছেন হৃদয়ের অনুপম শ্রদ্ধা।

সাহিত্য-শিক্ষকের কাহিনী

(২য় পর্ব্ব)

এনটন পাভলোভিশ শেকভ

অনুবাদক— শ্রীজীবনময় রায়

"গীর্জ্জায় ভীড় হয়েছে খুব, আর ভারি গোলমাল হচ্ছে। একবার কে একজন যেন চেঁচিয়ে উঠল। আমার সঙ্গে মাশার বিয়ে দিচ্ছিলেন প্রধান যাজক ; তিনি চশমার মধ্যে দিয়ে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে চটেমটে বললেন, 'চুপ করে দাঁড়িয়ে প্রার্থনায় যোগ দাও সব ; গীর্জ্জার মধ্যে গোলমাল ঘোরাঘুরি কর না। প্রাণে তোমাদের ধর্ম্মভয় থাকা উচিত।'

"আমার দু'জন সহকর্ম্মী আমার মিতবর সেজেছিল ; আর মাশার মিতবর সেজেছিল ক্যাপ্টেন পলিয়ান্‌সকি আর লেফটেন্যাণ্ট জারনেট। বিশপের গাইয়ে দল চমৎকার গান করলে। মোমবাতির চড়বড় শব্দ, চোখ-ঝলসান আলো, জমকাল পরিচ্ছদ, অফিসারের দল, আনন্দে উচ্ছ্বাসে ভরা সব মুখ, আর মাশার মুখে বিশেষ এক রকম অপার্থিব ভাব—সমস্ত মিলে—চারদিকের যা কিছু সব—বিবাহ-মন্ত্রের কথাগুলি—আমার চোখ অশ্রুতে ভরে দিল, আর বুক ভরে দিল বিজয় গর্ব্বে। ভাবলাম কি ভাবে জীবন আমার ফুটে উঠল। কেমন কবিতার ছন্দে ছন্দে সে নিজেকে গড়ে তুলছে। মাত্র দু'বছর আগেও ছিলাম ছাত্র, থাকতাম সস্তা ঘরে। টাকা নেই, পয়সা নেই, আপনার বলতে কেউ নেই। তখন কল্পনাই করতে পারি নি যে ভবিষ্যতে আশাভরসা করবার মত আমার কিছু থাকতে পারে। আর এখন আমি শ্রেষ্ঠ একটা শহরের হাই স্কুলের শিক্ষক, বাঁধা আমার আয়, ভালবাসা পেয়েছি, আদরে প্রশ্রয়ে এখন আমার দিন কাটে। ভাবছি—আমারই জন্যে এত লোক জড়ো হয়েছে ; আমারই জন্যে তিন তিনটে বাতি-দান জ্বালান হয়েছে ; পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করছেন ; গানের দল সাধ্যমত ভাল গাইতে চেষ্টা করছে ; আর এই যে নবীনা, একটু পরেই যাকে আমি গৃহিণী বলবার অধিকার পাব, সে ত আমারই জন্যে এমন তরুণ, এমন মনোরম, এমন আনন্দময়ী। মনে পড়ছে, আমাদের দেখাশোনার প্রথম দিনগুলি, শহরের বাইরে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানোর কথা ; আমার প্রেম-নিবেদনের ঘটনা ; আর সারা গরম কালটা, যেন ইচ্ছে করেই, অমন চমৎকার হয়ে উঠেছিল, যে সুখ-সৌভাগ্য আমার আগেকার ঘরে বসে শুধু উপন্যাসে আর রূপকথাতেই ঘটতে পারে বলে মনে হ'ত, তার কথা। সেই সুখ-সৌভাগ্য আজ আমি দেহে মনে প্রাণে প্রত্যক্ষ করে পাচ্ছি—সেই সৌভাগ্য, ঠিক যেন আমার হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছি।

"বিয়ে শেষ হলে, মাশাকে আর আমাকে ঘিরে, ওরা এসে দাঁড়াল এলোমেলো ভিড় করে। হৃদয়ের অকপট আনন্দ, অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা আমাদের জানাল—'আমরা যেন সুখী হই।' সত্তর বছরের বুড়ো ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শুধু মাশাকেই তাঁর শুভেচ্ছা জানাতে লাগলেন। বুড়ো বয়সের ক্যাঁকানো গলায় এত চেঁচিয়ে ওকে বলতে লাগলেন যে সারা চার্চের লোক শুনতে পেল :

'আজ যেমন গোলাপ ফুলটির মত আছ, আশা করি, বিয়ের পরেও অমনি থাকবে।'

"অফিসারেরা, ডিরেক্টর, মাষ্টার মশায়রা সকলেই সবিনয়ে হাসলেন আর বুঝতে পারলাম, আমার মুখেও একটা কৃত্রিম অমায়িক হাসি ফুটে উঠেছে। ইতিহাস ও ভূগোলের শিক্ষক, আমাদের ইপ্পলিট ইপ্পলিটিচ—সবাই যা আগে শুনেছে তা ছাড়া কখনও যে আর কিছু বলে না, আন্তরিকতার সঙ্গে আমার হাতখানা চেপে ধরে আবেগভরে বললে :

'এত দিন পর্য্যন্ত অবিবাহিত ছিলে আর একলা কাটিয়েছ। আজ তুমি বিবাহিত—আর তুমি একা নও।'

'গির্জ্জা থেকে আমরা গেলাম একটা দোতলা বাড়ীতে। বাড়ীটা হচ্ছে যৌতুকের একটা অংশ। ঐ বাড়ীটা ছাড়াও মাশা বিশ হাজার রুবল নিয়ে আসছে—তা ছাড়া খানিকটা পোড়ো জমি। তার মধ্যে একটা কুঁড়েঘরে শুনেছি এক পাল মুরগী আর হাঁস হেপাজতের অভাবে বুনো হয়ে যাচ্ছে। গির্জ্জা থেকে বাড়ী গিয়ে পড়বার ঘরের নীচু সোফাটাতে গা এলিয়ে পড়ে চুরুট ফুঁকতে লাগলাম। কি সুখ, কি আরাম, কি তৃপ্তি, জীবনে এমনটি আর কখনও পাই নি। ও দিকে বিয়েবাড়ীতে লোকেরা হল্লা করে হলু-ধ্বনি করছে—ব্যাণ্ডে বাজছে যত বাজে মার্কা লক্কড় সব গৎ।

মাশার দিদি ভারিয়া—যেন তার মুখে এক মুখ জল, এমনি অদ্ভুত বিকৃত মুখ করে, একটা মদের গেলাস হাতে, দৌড়ে পড়বার ঘরে ঢুকে পড়ে ; বোঝাই যায় যে, ইচ্ছে করে সে থেমে যায় নি ; কিন্তু হঠাৎ সে হেসে উঠে কান্নায় ভেঙে পড়ে, আর মদের গ্লাসটা মেঝেয় পড়ে চুরমার হয়ে যায়। আমরা ওকে জড়িয়ে ওখান থেকে বার করে নিয়ে গেলাম।

" 'কেউ বোঝে না গো,' পিছনদিকের ঘরে বুড়ী নার্সের বিছানায় শুয়ে ও বিড়বিড় করে বকে, 'কেউ না গো, কেউ না। হা ঠাকুর! কেউ বুঝতে পারে না।'

"বুঝেছিল সকলেই—ভাল করেই বুঝেছিল, বুঝেছিল যে মাশার চেয়ে চার বছরের বড় হয়েও ওর এখনো বিয়ে হ'ল না, তাই। ও কাঁদছে—কোন হিংসে থেকে নয়—কিন্তু ওর সুসময় যে চলে যাচ্ছে, হয়ত বা চলে গেছেই, এরই চেতনা ওর মনটাকে বিষাদে ভরে তুলছে, তাই ওর এই কান্না।

যখন ওরা কোয়াড্রিল নাচ নাচছে তখন ও ফিরে এল— চোখের জলে ভিজে, ঘন পাউডারে-মাখা ওর মুখ—দেখলাম ক্যাপ্টেন পলিয়ানস্কি এক প্লেট বরফ ওর মুখের সামনে ধরেছেন আর একটা চামচ দিয়ে ও তাই খাচ্ছে।

"ভোর পাঁচটা বেজে গেছে। আমার চরম ও পরম সুখের কথা লিখে রাখবার জন্যে ডায়েরীখানা তুলে নিলাম—ভাবলাম বেশ পাতা ছয়েক লিখব, আর কাল মাশাকে পড়ে শোনাব। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এক ভারিয়ার ঘটনাটা ছাড়া আর সবই আমার মাথার মধ্যে এলোমেলো ছায়াময় স্বপ্নের মত হয়ে গেছে। শুধু লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে 'বেচারা ভারিয়া'। ঐ একটা কথাই এখানে বসে আমি ক্রমাগত লিখে যেতে পারতাম, 'বেচারা ভারিয়া'। ও দিকে, গাছে গাছে ঝরঝর শব্দ শোনা যাচ্ছে, এখুনি বৃষ্টি আসবে। কাকেরা ডাকতে সুরু করেছে, আর আমার মাশা এই সবেমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে, কেন জানি না, ওর মুখটা করুণ বিষাদে ভরা দেখাচ্ছে।

এর পর অনেকদিন আর নিকিটিন ডায়েরী লেখে নি। আগষ্টের গোড়ায় ওদের স্কুলের পরীক্ষা হয়ে যায়—১৫ই তারিখ থেকে ক্লাস সুরু হয়। কাজিন-মাস্টার ন'টার সময় ও স্কুলে যায় আর দশটার সময় থেকে মাশার জন্যে ওর নতুন বাড়ীর জন্যে হেদোতে থাকে। নীচের ক্লাসে কোন কোন ছেলেকে ও ডিক্‌টেশন দিতে বলে। ছেলেরা লিখতে থাকে আর ও জানলার উপরে চোখ বুজে বসে স্বপ্ন রচনা করে চলে—তা সে ভবিষ্যতের স্বপ্নই হোক কি অতীতের স্মৃতিই হোক—সবই তার কাছে মনে হয় রূপকথার মত মনোরম। উঁচু ক্লাসে ছেলেরা গোগোল কিংবা পুশকিনের গদ্য রচনা কিছু পড়ছে: ওতেই ওর ঘুম পাচ্ছে, গাছপালা মানুষ ঘোড়া তার কল্পনায় ভেসে উঠছে—নিঃশ্বাস ফেলে ও বলছে, 'কি চমৎকার!' যেন লেখকের রচনায় মুগ্ধ হয়ে গেছে।

ধবধবে একটা ঝাড়নে বেঁধে টিফিনের ঘণ্টায় মাশা রোজ ওর খাবার পাঠায়। অনেকক্ষণ ধরে তারিয়ে তারিয়ে খাবার জন্যে একটু একটু করে থেমে থেমে ও খাবারগুলো খায়, আর ইপ্পলিট ইপ্পলিটিচ—শুধু রুটি ছাড়া দুপুরে আর কোনও খাবার বেচারার জোটে না—সসম্ভ্রমে ওর দিকে চেয়ে থাকে, মনে মনে হিংসে হয়, সকলেই যা জানে এমন একটা কিছু বলে ওঠে, যেমন:

'না খেয়ে কেউ বাঁচে না।'

স্কুলের ছুটির পর তাকে সোজা যেতে হয় ছেলে পড়াতে, আর শেষে ছ'টা নাগাদ যখন সে বাড়ী গিয়ে পৌঁছয় তখন ওর মনে সে কি উদ্বেগ, কি উত্তেজনা—যেন এক বছর ধরে ও বিদেশে পড়ে আছে। ছুটে ও উপরে চলে যায়, মাশাকে খুঁজে বার করে, দুই হাতে জড়িয়ে ধরে ওকে চুমু খায়, দিব্যি করে বলে, ওকে ভালবাসে, ওকে না হলে ও বাঁচতে পারে না, বলে, সমস্ত দিন ওর জন্যে কি ভীষণ হেদিয়েছে। তার পর, খুব ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করে—কেমন আছে, কেন ওকে এমন মনমরা দেখাচ্ছে। তার পর দু'জনে মিলে খেতে বসে। খাওয়ার পর পড়বার ঘরে সোফায় পড়ে ও তামাক ফোঁকে, আর পাশে বসে মাশা গুন্ গুন্ করে গল্প করে।

রবিবার আর ছুটির দিন ওর সবচেয়ে আনন্দের দিন। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি ও বাড়ী বসে কাটায়। এই সব সরল সুন্দর দিনগুলো ওর কাছে গ্রাম্য গাথার মত মনোহর লাগে। কেজো-মেয়ে হিসাবী মাশা কি ভাবে যে তার গৃহ-নীড়টিকে সাজিয়ে তুলছে, দেখে দেখে ওর চোখ আর ক্লান্ত হয় না; ও নিজেও যে একেবারে অকর্মা নয় এইটে দেখাবার আগ্রহে, এক একটা অকর্ম করে বসে—হয়ত বা আস্তাবল থেকে গাড়ীটা টেনে বার করে এনে, একবার এদিক থেকে একবার ওদিক থেকে, চারদিক থেকে সেটাকে দেখতে থাকে। মাশা দস্তুরমত একখানা ডেয়ারী খাড়া করে তুলেছে তার গোয়ালে, তিনটে গরু, তার ভাঁড়ারে গামলা গামলা দুধ, বাটি বাটি পচা ননী—এই ননীকেই সে মাখন তুলবে বলে জমিয়ে রেখেছে। সময় সময় একটু রসিকতা করে নিকিটিন এক গ্লাস দুধ চায়, আর মাশা পড়ে যায় মহা ফাঁপরে, কেননা ওটা তার নীতি-বিরুদ্ধ। শেষে হেসে উঠে নিকিটিন ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'ঠাট্টা করছিলাম মণি, ঠাট্টা করছিলাম।'

পাথরের মত একটুকরো শক্ত মাংস কি এক খণ্ড পচা পনীর দেখে ওর কড়া গিন্নিপণা নিয়ে হেসে উঠলে ও গম্ভীর হয়ে বলে, 'ওরা রান্নাঘরে ওসব খেয়ে ফেলবে।'

নিকিটিন টিপ্পনী কাটে, 'ও রকম সব টুকরো ইঁদুরকে ছাড়া আর কাউকে দেওয়া চলে না।' মাশা উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকে, 'গিন্নীপণার ভারি ত বোঝে পুরুষেরা! রান্নাবাড়ীতে কাঁড়িকাঁড়ি পোলাও কালিয়াই পাঠাও আর যাই পাঠাও, চাকরবাকরদের কাছে ও সবই সমান।' নিকিটিন বলে, 'ঠিকই ত, বটেই ত।' আর দুই হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে। মাশার কথার মধ্যে ন্যায্য কিছু শুনলেই ও ভাবে অসাধারণ! আশ্চর্য্য! আর ওর মতের সঙ্গে যা মেলে না তা ওর কাছে মনে হয়, সরল! বেচারা!

কখনো কখনো নিকিটিন দার্শনিকের মেজাজে থাকে; একটা কোন অবাস্তব বিষয় নিয়ে আলোচনা সুরু করে; আর মাশা অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে শোনে।

মাশার আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে কিংবা ওর বিনুনী নিয়ে জড়াতে জড়াতে আর খুলতে খুলতে ও বলে, বুক-জোড়া ধন আমার, তোমাকে পেয়ে আমার সুখের সীমা নেই।

আমি মনে করি না যে, আমার পক্ষে এ সুখ, বেরালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া; আকাশ থেকে খসে পড়েছে, এ সুখ একটা অতি স্বাভাবিক, সঙ্গত, যথাযথ পরিণাম। আমি বিশ্বাস করি যে মানুষ নিজেই নিজের সুখের বিধাতা। আজ আমি যা ভোগ করছি, আমি তা নিজের হাতেই গড়েছি। বাজে বিনয় না করেই বলছি; আমিই এ সুখের বিধাতা—তাই এতে আমার অধিকার জন্মেছে। আমার অতীতের কথা তোমার অজানা নেই। পিতৃমাতৃহারা সেই আমার দুঃখের শৈশব; আমার নিরানন্দ যৌবন, আমার দারিদ্র্য

—এ সবই ছিল একটা সংগ্রাম ; আমার সুখের স্বর্গে আমি যে দ্বার দিয়ে এসে প্রবেশ করেছি, এ ছিল তারই পথ।

অক্টোবর মাসে স্কুলের একটা মস্ত ক্ষতি হয়ে গেল। মাথায় ইরিসিপেলাস হয়ে ইপ্পলিট ইপ্পলিটিচ মারা গেল। মরার আগে দু'দিন সে অজ্ঞান হয়ে প্রলাপ বকেছে। কিন্তু প্রলাপের মধ্যেও সবাই যা ভাল করেই জানে তা ছাড়া আর কিছুই বলে নি।

ভলগা নদী কাস্পিয়ান হ্রদে গিয়ে পড়েছে ;···ঘোড়া ; ভুট্টা আর ঘাস খায়···"

সৎকারের দিনে হাইস্কুলের পড়াশুনা বন্ধ ছিল। শবাধার বয়ে নিয়ে গেল ওর সহকর্মীরা আর ছাত্রেরা—স্কুলের গানের দল সারা পথে "হোলি গড" গানটি গাইতে গাইতে গেল। মিছিলে ছিল হাইস্কুলের তিন জন পাদ্রী, দু'জন যাজক, বয়েজ হাইস্কুলের ইপ্পলিটের সব ছাত্র আর শিক্ষকেরা, তা ছাড়া ছিল বিশপের গাইয়ে দল, তাদের সবচেয়ে ভাল পোশাকে সেজে। মিছিলের সঙ্গে লোকের দেখা হলেই তারা বুকের উপর দুই হাতে ক্রুশচিহ্ন করে বলতে থাকে—"ভগবান, এই রকম মরণই যেন আমাদের হয়।"

গোরস্থান থেকে বড় বিচলিত হয়ে বাড়ী ফেরে নিকিটিন—টেবিল থেকে তার ডায়েরীটা নিয়ে লেখে,

"ইপ্পলিট ইপ্পলিটিচ রাইশিজকীকে এইমাত্র আমরা কবর দিয়ে এলাম। ওগো বিনয়ী কর্মী! শান্তি লাভ কর, শান্তি লাভ কর। মাশা, ভারিয়া আর যত মেয়েরা সৎকারে উপস্থিত ছিল, সবাই অকপটে চোখের জল ফেলেছে। তাদের মনে এই কথাটাই জেগেছে যে, এই সামান্য নীরস মানুষটি কোনো মেয়ের ভালবাসা পায় নি। কবরের কাছে দাঁড়িয়ে একটু কিছু মর্মস্পর্শী কথা এই বন্ধুটির সম্পর্কে বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে ওরা সাবধান করে দিলে যে ডিরেক্টর ওকে বেশী পছন্দ করতেন না, তিনি কিন্তু এতে চটতে পারেন। বিয়ের পর, আমার বিশ্বাস এই প্রথম আমার মনটা ভার হয়ে আছে।"

বলবার মত কোন ঘটনা বিদ্যালয়ে সে বছর আর ঘটে নি।

তুষার পড়ে নি বলে স্যাঁৎসেঁতে বরফে সে শীতটা তত তীব্র হয়ে ওঠে নি। যেমন ধরুন, বলা যায় যে শরৎকালের মত, "এপিফেনী ইভে" সমস্ত রাত ধরে বাতাস হেঁকে চলেছে—ছাদ বেয়ে টিপ টিপ করে জল ঝরেছে ; আর সকালে, 'বারিমঙ্গল' উৎসবের সময় পুলিস কাউকে নদীতে যেতে দিলে না—বললে, নদীর উপর বরফের চেহারাটা সুবিধের দেখাচ্ছে না—ফুলছে। আবহাওয়া মন্দ হলেও নিকেটিনের জীবন সুখেই কাটছিল—গরম কালেও যেমন, এখনও তেমনি। অবশ্য, আরও একটা আমোদের রাস্তাও সে পেয়ে গেছে, সে ভিন্ট খেলতে শিখেছে। সুখের স্বর্গে তার একটা মাত্র কাঁটা ছিল, সে ঐ বেরাল কুকুরের পাল। ওগুলো ওর স্ত্রী যৌতুক পেয়েছিল।

ঘরগুলো (বিশেষ করে সকাল বেলায়) চিড়িয়াখানার মত দুর্গন্ধ ছাড়তে থাকে, কিছুতেই সে গন্ধ নষ্ট করা যায় না। বেরালেরা কুকুরগুলোর সঙ্গে লড়াই করে। হিংসুটে জানোয়ার মুশকাটাকে দিনে বিশ বার খাওয়ান হয়। এত দিনেও সে ব্যাটা নিকিটিনের উপর প্রসন্ন হয়নি, ওকে দেখলেই গর্-গোঁ-গোঁ-গোঁ করে ওঠে।

রোজার উপোসের সময় একদিন রাত্রে সে ক্লাব থেকে বাড়ী ফিরছে ; সেখানে তাস খেলছিল। অন্ধকার রাত, বৃষ্টি পড়ছে, চারদিকে কাদা প্যাচপেচে। নিকিটিনের মনের মধ্যে একটা অশান্তি জাগছে—কেন, তা বুঝতে পারছে না। তাসের বাজীতে সে বারো রুবল হেরে এসেছে ; তাই ! না, হিসেব-নিকেশ করার সময় একজন খেলুড়ে ওর স্ত্রীর দৌলতের স্পষ্ট ইঙ্গিত করে বলেছে, "নিকিটিনের কিনা ঘড়া ঘড়া টাকা—তাই।"

টাকা হেরে তার দুঃখ হয়নি, আর যা বলেছে তাও এমন অপমানের কথা কিছু নয়, কিন্তু তবু কিছুতেই অস্বস্তি ঘোচে না। এমন কি বাড়ী ফিরবে, সে ইচ্ছেও না।

স্থির হয়ে একটা ল্যাম্প-পোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে ও বলে ওঠে, "ওঃ, কি ভীষণ !"

এই কথাটা মনে উদয় হয় যে, টাকা মুফতে পেয়েছে বলেই ঐ বারোটা রুবল ওর গায়ে লাগে নি। যদি গতর পেটে রোজগার করতে হ'ত তবে প্রত্যেকটি পাই পয়সার মূল্য ও বুঝত ; হারজিত সম্বন্ধে এতটা উদাসীন ও হতে পারত না। সব সৌভাগ্যই তার বরাতের জোরে এসে গেছে—ফোকোটে। সে ভাবে, ওটা তার পক্ষে বাড়তির ভাগ, যেমন সুস্থ মানুষের পক্ষে ওষুধ। যদি দুনিয়ার বেশীর ভাগ লোকের মত রুটির দুশ্চিন্তায় ওকে বিব্রত হতে হ'ত যদি বেঁচেবর্তে থাকার জন্যে ধস্তাধস্তি করতে হ'ত, যদি খাটতে খাটতে বুকপিঠ ব্যথায় ভেঙে পড়ত, তা হলে রাতের খাওয়া, গৃহকোণের আরাম, গৃহস্থ জীবনের সুখ—এ সব তার কাছে সংসারে একান্ত আবশ্যক, সংগ্রামের বিশেষ পুরস্কার, জীবনের সার্থক জয়মুকুট হয়ে উঠত। এখন যা চলেছে, তার মূল্য বা অর্থ তার কাছে দুর্বোধ্য, অনিশ্চিত, পরিণামশূন্য।

এই রকম চিন্তাটাই যে একটা খারাপ লক্ষণ এ কথা ভাল করে জেনেই সে আবার বললে, "উঃ! কি ভীষণ !"

বাড়ী যখন পৌঁছল তখন মাশা ঘুমিয়ে পড়েছে। নিঃশ্বাস পড়ছে তার সহজ সমান তালে—মুখে লেগে আছে হাসি—মানে, ভারি আরামে ঘুমচ্ছে। কাছেই কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে সাদা বেরালটা আরামে গুরগুর শব্দ করছে। নিকিটিন আলো জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাতেই মাশা জেগে ওঠে—উঠে বসে ঢক ঢক করে এক গ্লাস জল খায়।

বলে, 'অনেক মিষ্টি খেয়ে ফেলেছি', আর হাসতে থাকে। একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, 'আমাদের বাড়ী গিয়েছিলে ?'

'না।'

ইতিমধ্যেই নিকিটিনের কানে এসেছে যে ক্যাপটেন পলিয়ানস্কি, (ভারিয়া সম্প্রতি ওর সম্বন্ধে মনে মনে বিরাট আশার সৌধ গড়ে

ভুলছিল) পশ্চিমের কোন একটা প্রদেশে বদলি হতে যাচ্ছে; আর এরই মধ্যে সে শহরে সবাইকার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেড়াচ্ছে—সুতরাং তার শ্বশুরবাড়ীর আবহাওয়া এখন মোটেই প্রীতিকর নয়।

মাশা উঠে বসে বললে, "ভারিয়া এসেছিল সকালে। কিছু বললে না, কিন্তু তার মুখ দেখে বোঝা যায় যে, কি ভীষণ মনের অবস্থা তার—আহা বেচারা! দু'চক্ষে দেখতে পারি না পলিয়ান্স্কিকে। একটা ঢ্যাপ্সা, ভুঁড়োপেটা, চলতে নাচতে গালের মাংস থল থল করে···আমি হলে, ও লোকটাকে, কখনই পছন্দ করে নিতাম না। কিন্তু যাই হোক, তবু ভেবেছিলাম লোকটা অন্ততঃ ভদ্রলোক।"

নিকিটিন বলে, "এখনও ত আমার ওকে ভদ্রলোক বলেই মনে হচ্ছে।"

"তবে ভারিয়ার সঙ্গে এমন ছোটলোকমি করল কেন?"

নিকিটিন জিজ্ঞেস করে—"কেন? ছোটলোকের মত কিসে হ'ল?" সাদা বেরালটার উপরও মনে মনে চটতে সুরু করেছে—বেরালটা আড়ামোড়া ভাঙছে, আর পিঠটা ধনুকের মত করে তুলছে। বলে, "যতদূর জানি সে কোন বিয়ের প্রস্তাবও করে নি, কোন কথাও দেয় নি।"

"তবে অতবার করে ও বাড়ী আসার মানে কি? বিয়ে না করার মতলবই যদি ছিল, তবে ও রকম করে আসা খুব অন্যায়।"

বাতি নিবিয়ে দিয়ে নিকিটিন বিছানায় গিয়ে ওঠে। কিন্তু শুয়ে পড়তে কি ঘুমতে ওর ইচ্ছে করছে না। মাথাটা বোধ হচ্ছে প্রকাণ্ড আর খামারবাড়ীর মত ফাঁকা, আর লম্বা লম্বা ছায়ার মত নতুন সব অদ্ভুত চিন্তা সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে ভাবছে, ঐ মূর্ত্তিওয়ালা বাতিদান থেকে যে কোমল আলো তাদের এই ঘরোয়া নিশ্চিন্ত সুখের উপর উদ্ভাসিত হয়ে পড়ছে, যে নিরাময় ছোট জগৎটির আশ্রয়ে সে আর এই বেরালটা এত আরামে, এত শান্তিতে যাপন করছে, এ ছাড়াও আরও একটা জগৎ আছে—ভাবছে, আর ওর মনে সেই জগতে প্রবেশ করবার জন্যে একটা তীব্র, সচল, মর্ম্মভেদী আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগছে; ইচ্ছে হচ্ছে যে, কোন একটা আড়তে, কিংবা বিরাট একটা কারখানায় গিয়ে কাজে ভর্ত্তি হয়; প্রকাণ্ড জনতাকে আহ্বান করে বক্তৃতা করে; লিখে, ছাপিয়ে চারিদিকে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করে নিজেকে খাটিয়ে, নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলে, দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করে···। শুধু, নিজেকে ভোলবার মত—একঘেয়ে উত্তেজনার অনুভূতি ছাড়া যা তাকে আর কিছুই দেয় না নিজের সেই আরাম, আয়াসের চেষ্টা ভোলবার মত—এমন কিছু একটা চায় যার মধ্যে সে নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দিতে পারে। তারপর হঠাৎ তার কল্পনার পটে স্পষ্ট করে শেবালডিনের পরিষ্কার করে কামানো মুখটা জেগে উঠে—আতঙ্কিত হয়ে সে যেন বলছে—"বল কি! লেসিঙের লেখাও তুমি পড়ো নি! তুমি যে একেবারে সেকেলে! কি অপদার্থই হয়ে গেছ!"

মাশা জেগে উঠে। খানিকটা জল খায়। নিকিটিন ওর পুষ্ট ঘাড়, নধর গলার দিকে চেয়ে দেখে, মনে পড়ে চার্চে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল যে কথাটা বলেছিল—"গোলাপ!"

বিড় বিড় করে বলে, "গোলাপ!" বলে হেসে উঠে।

ওর হাসির জবাবে মুশকা ঘুমের ঘোরে খাটের তলা থেকে "গরর-গোঁ-গোঁ-গোঁ" করে ওঠে।

একটা রাগ, ঠাণ্ডা ভারী জগদ্দল পাথরের মত ওর বুকের মধ্যে গিয়ে যেতে বসেছে—মাশাকে একটা নিষ্ঠুর কিছু বলে ফেলতে, এমনকি লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে এক ঘা মারতে মনে মনে একটা দারুণ লোভ জাগছে, বুকের মধ্যে ওর তোলপাড় করছে।

নিজেকে সামলে নিয়ে ও জিজ্ঞেস করে, "মানে, যেহেতু তোমাদের বাড়ীতে আমি যেতাম, অতএব তোমাকে বিয়ে করতে আমি বাধ্য ছিলাম, কেমন?"

"ছিলেই ত? তা তোমার খুব ভাল করেই জানা আছে।"

"বাঃ বেশ!" তারপর আর এক মিনিট চুপ করে থেকে ও আবার বলে—"বাঃ! এ মন্দ কথা নয়!"

বুকের দাবড়ানি থামাতে, আর পাছে আরও বেশী কিছু একটা বলে ফেলে এই ভয়ে, নিকিটিন পড়বার ঘরে গিয়ে বিনা বালিশেই সোফার উপর শুয়ে পড়ে—তারপর নেমে মেজেয় কার্পেটের উপর গিয়ে শোয়।

নিজেকে আশ্বস্ত করবার জন্যে বলে, "এ সব কি বোকার মত চিন্তা! তুমি একটা শিক্ষক, জগতে তোমার পেশার মত এমন মহৎ আর কিছু নেই···তোমার আবার আর একটা জগতের দরকার কি পড়ল? যত বাজে সব!"

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে দৃঢ় বিশ্বাসে মনে মনে বলে যে, খাটি শিক্ষক ও নয়, ও শুধু একটা সরকারী চাকর। ঐ যে চেক ভদ্রলোক, যে গ্রীক পড়ায়, তার মতই নেহাৎ চলনসই নিতান্ত সাধারণ। জীবনে শিক্ষার কাজের জন্যে তার ভিতরের স্বাভাবিক তাগিদ ছিল না, ও বিষয়ে আগ্রহও ছিল না—শিক্ষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও কিছুই সে জানে না; বাচ্চাদের কি রকম করে চালাতে হয় তারও কোন জ্ঞান ওর নেই, যা পড়ায়—তা যে কেন পড়ায় তাও সে জানে না, আর হয়ত বা ঠিক ঠিক যা শেখানো দরকার তাও শেখানো হয় না। বেচারা ইপ্পলিট ইপ্পলিটিচের কোন ভান ছিল না, সোজাসুজি হাঁদা ছিল, কি ছেলেরা কি ওর সহকর্ম্মীরা সবাই জানত ওকে দিয়ে কতটা কাজ পাওয়া যাবে। কিন্তু নিকিটিন ঐ চেকেরই মত, জানে, চালাকী করে, "ভগবানকে ধন্যবাদ, যে তার শিক্ষার কাজ সফল হচ্ছে"—লোকের কাছে; এই ভান করে, প্রত্যেককে ঠকিয়ে, নিজের বোকামি কেমন করে ঢাকা দিতে হয়, এই সব নতুন ভাবনা ওর মনে ভয় ধরিয়ে দেয়। মন থেকে ঝেড়ে ফেলে সব। বলে, এ সব বোকা চিন্তা; সাব্যস্ত করে যে এগুলো হচ্ছে ওর স্নায়ুবিকার। হেসে উড়িয়ে দিতে হবে ওসব।

সকালে উঠে সত্যিই সে নিজেকে ঠাট্টা করে বলে, বুড়ী একটা

মেয়ে-মানুষ হয়ে গেছি। কিন্তু সে স্পষ্টই দেখে যে তার মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে; হয়ত চিরদিনের মতই গেছে। আর, এখন থেকে ঐ ছোট দোতলা বাড়ীটার মধ্যে সুখের সন্ধান মেলা তার পক্ষে অসম্ভব। মনে মনে বুঝতে পারছে যে, তার স্বপ্নের জগৎ মিলিয়ে গেছে, নতুন একটা অতৃপ্তির জগৎ, একটা সুস্পষ্ট জ্ঞানের জগৎ তার সামনে জেগে উঠেছে, যে জগতের সঙ্গে ব্যক্তিগত সুখ-শান্তির কোন সম্পর্ক নেই।

পরদিন, সে দিন রবিবার। স্কুলের উপাসনা ঘরে গিয়ে তার স্কুলের ডিরেক্টর আর সহকর্ম্মীদের সঙ্গে দেখা হয়। ওর মনে হয় যে, নিজেদের মূর্খতা আর জীবনের অসন্তোষ ঢাকবার চেষ্টায় ওরা সবাই প্রাণপণ করছে—আর সে নিজেও, নিজের অস্বস্তি ঢাকবার জন্যে ভদ্রতার হাসি হাসছে, আর আজে-বাজে বিষয় কথা বলছে। তারপর সে ষ্টেশনে যায়; দেখে, মেল-ট্রেন এল, গেল; একলা একলা থাকতে আর কারো সঙ্গে দায় পড়ে আলাপ করতে হচ্ছে না বলে ওর ভাল লাগে।

বাড়ী ফিরে দেখে ভারিয়া আর তার শ্বশুরমহাশয় এসেছেন; এসেছেন ডিনারে। ভারিয়ার চোখ কেঁদে কেঁদে লাল হয়ে উঠেছে; সে বলছে তার মাথা ধরেছে। শেলেষ্টভ খুব এককাড়ি গিলে বলছেন যে, আজকালকার ছেলেদের উপর বিশ্বাস রাখা যায় না—তাদের মধ্যে ভদ্র মনোভাবের একেবারে অভাব। বলছেন:

"এ হ'ল চাষাড়েপনা; তার মুখের উপর বলব যে, এ তার চাষাড়েপনা। বলবই।"

নিকিটিন অমায়িক হাসি মুখে টেনে এনে মাশার সঙ্গে অতিথি-সৎকারে লেগে যায়। কিন্তু ডিনারের পরে ও গিয়ে নিজের পড়বার ঘরে ঢুকে দরজা দেয়।

মার্চ্চ মাস। জানলা গলে তপ্ত রোদ পড়েছে টেবিলের উপর। সবে মাসের বিশে, কিন্তু এরই মধ্যে গাড়ীওয়ালারা গাড়ীতে চাকা জুড়ে চালাতে সুরু করেছে, আর ষ্টারলিং পাখীরা কিচির-মিচির করে গোলমাল করছে বাগানে। আবহাওয়াটা ঠিক তেমনি, যেমনটি হলে মাশা এসে ঘরে ঢুকবে, এক হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরবে, বলবে, ঘোড়ায় জীন চড়ানো হয়েছে কিংবা বলবে গাড়ী দরজায় তৈরি, আর জিজ্ঞাসা করবে কি গরম কাপড় পরলে শীত করবে না। ঠিক গত বছরের মতই চমৎকার রূপ নিয়ে বসন্ত এসেছে, গত বছরের মতই আনন্দের বার্ত্তা ওর আবির্ভাবে…কিন্তু নিকিটিন ভাবছে যে, একটা ছুটি নিয়ে মস্কৌতে গিয়ে ওর পুরনো আস্তানায় থাকতে পারলে বেশ হয়। পাশের ঘরে ওরা কফি খাচ্ছে আর ক্যাপ্‌টেন পলিয়ান্‌স্কির কথা আলোচনা করছে। ওদের কথায় কান না দিতে চেষ্টা করে ও ডায়েরীতে লেখে—"হা ভগবান! এ কোথায় আমি? চারদিকে আমার শুধু ইতরতা, বর্ব্বরতা, পশুর জীবন। বিরক্তিকর ক্লান্তিকর নগণ্যের দল, বাটি বাটি পচা ননী, ঘড়া ঘড়া দুধ, আরসোলার পাল, নির্ব্বোধ অজ্ঞ মেয়ে-মানুষ…ইতর বর্ব্বর পশু-জীবনের চেয়ে ভীষণ, মর্ম্মান্তিক, উদ্বেগজনক আর কি হতে পারে?" এখান থেকে আমাকে পালাতেই হবে, আজই সরে পড়ব, নইলে পাগল হয়ে যাব।

হেমন্ত-ল

শ্রীকরুণাময় বসু

সজল শিশির-স্নিগ্ধ স্বপ্নঢাকা ছায়া ঝিলমিল
ঘুমায় প্রান্তর-লক্ষ্মী; বনান্তরে চিত্রসম আঁকা—
স্বর্ণাভ ধানের ক্ষেত, অভিযাত্রী হংসের বলাকা
সুদূর উত্তরমুখে মেলিয়াছে পাখার মিছিল।

এখন প্রাণের বাঁকে নীলকান্ত মণিমালা রঙ,
পাহাড়ের ঝর্ণাধারা এনেছে সে আশ্চর্য্য ধূসর—
বর্ণাভ জীবন-স্বপ্ন; তাই তো মেদুর এ প্রান্তর
ছায়াময় অপরাহ্নে, বাজে প্রাণে কি জলতরঙ্গ!

স্তিমিত নদীর স্রোত, কুয়াশায় ম্লান ইন্দুলেখা,
ঝরাপাতা এলোমেলো, রূপকন্যা যেন উদাসিনী—
গৈরিক বসন পরি' দূর পথে চলে একাকিনী
ফুলের কঙ্কণ ফেলি, আঁখি-পক্ষ্মে হিম-অশ্রুরেখা।

ওগো মেয়ে, কোথা যাও, আঁচলে ত' এনেছ ফসল,
এনেছ প্রদীপশিখা, জেলে দিলে অন্ধকার প্রাণে;
পৃথিবী-প্রাঙ্গণ তাই মুগ্ধ হ'ল নবান্নের গানে,
নিতল দীঘির জলে পদ্মকুঁড়ি কাঁপে ছলোছল।

হিমস্নিগ্ধ বনবায়ু, শুভ্র ওড়ে পায়রার ঝাঁক—
আকাশের নীল গায় ফোঁটা ফোঁটা চন্দনের দাগ।

রবীন্দ্র-দর্শনের ভূমিকা

ডক্টর শ্রীসুধীর নন্দী

বহুবিচিত্র সৃষ্টির অন্তরালে কখনো কখনো দার্শনিক দেখেন এক মনোময় ঐশী শক্তির অস্তিত্ব। রবীন্দ্রনাথের বহুবিচিত্র সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে রয়েছে এক চৈতন্যময় বিশ্ববোধের ধারণা। যেমন একই মহাচৈতন্যে চৈতন্যময় হ'ল বহুব্যাপ্ত সৃষ্টি, ঠিক তেমনিভাবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে দীপান্বিত করেছে একটি দেউটির আলো। রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্ববোধ' আলোকিত করেছে তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকে। সে আলো ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর গানে, তাঁর কবিতায়, তাঁর জীবনে ও তাঁর দর্শনে। এই মূল ভাবটিকে অনুসরণ করে আমরা রবীন্দ্রমানসের বিবর্তনকে অনুধাবন করতে পারি। সর্বমানবের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রীতি, জীবের প্রতি অসীম মমত্ববোধ, প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর নিগূঢ় আত্মীয়তা, জাতি ও সমাজের প্রতি তাঁর কর্তব্যবোধ, এ সবই তাঁর মূল ভাবনার দ্বারা ভাবিত। এই চৈতন্যময় বিশ্ববোধের ধারণা তাঁর সমস্ত ভাবনা ও বেদনাকে আচ্ছন্ন করেছিল, একথা বললে সত্য কথাই বলা হবে। উপনিষদের ঋষিদের মত রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনা ছিল মহাচৈতন্যকে আপনার মধ্যে উপলব্ধি করার সাধনা, আপনাকে ব্যাপ্তচৈতন্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়ার তপস্যা। তাঁর নিজের কথাতেই বলি :

> "এই যে বাধাহীন চৈতন্যময় বিশ্ববোধটি ভারতবর্ষে অত্যন্ত সত্য হয়ে উঠেছিল এই কথাটি আজ আমরা যেন সম্পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি। এই কথাটি স্মরণ করে আমাদের বক্ষ যেন প্রশস্ত হয়, আমাদের চিত্ত যেন আশান্বিত হয়ে উঠে। যে বোধ সকলের চেয়ে বড় সেই বিশ্ববোধ, যে লাভ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মলাভ—কাল্পনিকতা নয়।"

[শান্তিনিকেতন, পৃ: ৪]

ভারতবর্ষে এই বিশ্ববোধের স্ফুরণ আগেকার দিনে এতই সহজ ছিল যে, সেদিনের মানুষকে এই বোধে নূতন করে উদ্বুদ্ধ করার জন্য হয় ত কোন ঋষি-কবির প্রয়োজন হয় নি। কালক্রমে ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির তাড়নায় আমরা এই বোধটিকে হারিয়ে ফেলি। জীবনের খণ্ডিত আকাশের ধ্রুবতারাটি হারিয়ে গেল আমাদের আচ্ছন্ন দৃষ্টির অন্তরালে। লাভ, ক্ষতি, টানাটানির গ্লানিকর আবহাওয়ায় ভারতবাসী সেদিন সুস্থ মনের সহজ সম্পদকে হারিয়ে ফেলেছিল, তাই কবিগুরু আমাদের বিভ্রান্ত দৃষ্টিকে পুনরায় ফিরিয়ে দিলেন আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদের দিকে—যে সম্পদ প্রাচীনকালে বিশ্বসৃষ্টির মূল তত্ত্বটিকে অত্যন্ত সহজেই আয়ত্ত করতে আমাদের সহায়তা করেছিল। এই বিশ্ববোধটিকে একান্তভাবে আপনার করে নেওয়ার ফলে কবির জীবনবেদ বহুবিচিত্র হয়ে উঠেছে।

কবির ব্যক্তিসত্তা ব্যাপ্ত হয়েছে শুধু বর্তমানে নয়, অনাদি অতীতে এবং অনন্ত ভবিষ্যতে। কবি আপনাকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেন আদিগন্তবিস্তৃত বসুন্ধরার প্রতিটি অণুপরমাণুতে। কবির মনে হয়—ঐ মূক মাটির মৃন্ময় দেউলদ্বার খুলে তিনি যেন পৃথিবীর পথে ভ্রমণে বেরিয়েছেন। ঐ মাটি, তৃণ, জল সবাই যেন তাঁর আত্মার আত্মীয়। নিখিল বিশ্বের যে যেখানে আছে, কবি তাদের সবারই আপনার জন। কবি-মানসের আমি, সে আমি স্থান কাল বা ব্যক্তিস্বার্থের সীমায় সীমাবদ্ধ নয়। সে আমি সর্ব আমিতে পরিব্যাপ্ত। সে একাত্মতা উপলব্ধির মধ্যে কোন ব্যক্তিস্বার্থের ফাঁকি নেই। সে অসীম আমি এক দিকে যেমন কালজয়ী, অন্য দিকে তেমনি ব্যক্তি-সঙ্কীর্ণতার কূপমণ্ডুকতাকেও সে অতিক্রম করেছে। সে আমির ধারা বয়ে এসেছে অতীত থেকে বর্তমানে, বহমানতার নূপুর-নিক্কণে ঐতিহ্যকে বহন করে। আবার সেই আমির ধারাই বর্তমান থেকে চলে গেছে ভবিষ্যের দিকে। সেই আদি অন্তহীন 'আমি' প্রবাহের একটি খণ্ড হ'ল কবিসত্তা। একথা কবি জেনেছিলেন, উপলব্ধি করেছিলেন এই মহাসত্যকে সমস্ত অন্তর দিয়ে। তাই কবি সে অসীম আমির সুর শুনেছেন, গান শুনেছেন নিজের গাওয়া গানে, নিজের রচিত সঙ্গীতে। তাঁর কথা উদ্ধৃত করি :

> "যে আমি রয়েছে তোমার আমায়
> সে আমি আমারই আমি.
> সে আমি সকল কালে,
> সে আমি সকল খানে,
> প্রেমের পরশে সে অসীম আমি বেজে ওঠে মোর গানে।"

[সেঁজুতি, পৃ: ১৪]

কবি-মানসের এই যে অহংবোধ, এ বোধ তাঁর বিশ্ববোধ থেকে সঞ্জাত। তাই দেখি কবিচিত্তের আমি, সে আমি ছড়িয়ে আছে দেশে দেশান্তরে এবং যুগে যুগান্তরে। এ আমির অভিসার চলেছে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে এবং এ অভিসার চলবে প্রলয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। নানা ঘাটে তার আনাগোনা, অসংখ্য ঘটে ভরা রয়েছে তার প্রসাদ। তার আত্মীয়তার শিকড় চলে গিয়েছে অনন্ত সৃষ্টির অণুতে

পরমাণুতে। একালের বোদ্ধা সমালোচক রবীন্দ্র-মানসে এই বিশ্ববোধের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন :

"এই যে দেশ কালকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বজীবনের সহিত অখণ্ড যোগ রবীন্দ্রনাথ সে সত্যটিকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে এত গভীরভাবে অনুভব করিয়াছেন যে তাঁহার ব্যক্তিসত্তাকেও তিনি একটা বর্তমানের 'আমি-সত্তার' ভিতরে সীমাবদ্ধ করিয়া দেখিতে পারেন নাই। এই 'আমি'র জীবনইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে বহু পূর্বে—সেই সুদূর অতীতের অন্ধকারের ভিতরে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে তাহার অগ্রসরণের কাহিনী।"*

অহংবোধের এই সর্বব্যাপী বিস্তার রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের মূলীভূত ধারণা এবং তাঁর কর্মাদর্শের প্রেরণা। যে মানুষ এক মহাচৈতন্যময় বিশ্ববোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ তাঁর পথে কোন সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিসত্তার মোহে মুগ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর চেতনা বিশ্বের চেতনার সঙ্গে মালাবদল করেছে, একাত্ম হয়েছে। তাঁর আমির পথপরিক্রমা সুরু হয়েছে অনাদিকাল থেকে এবং তা চলেছে অনন্তকালের দিকে। কোন বিচারই কবির কাছে স্বতন্ত্র, সীমাবদ্ধ ব্যক্তিমানসের বিচার নয়। কবির অহঙ্কার সমস্ত মানুষের হয়ে—সেখানে কবি সকল মানুষের প্রতিনিধি, সসাগরা পৃথিবীর মানব-সন্তানেরা মহাকবির আত্মার আত্মীয়। দেশকালের সীমায় কবি আপনাকে সীমায়িত করেন নি। তিনি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেন যে, দেশকালের বেড়া তাঁর ব্যক্তিত্বকে ক্ষুদ্র করে রাখে নি। কবি-মানসের সে 'আমি'র ব্যাপ্তি ঘটেছে দেশ এবং কালের সীমানা পেরিয়ে। যেখানে ক্ষুদ্র স্বার্থের কলহ বৃহত্তর স্বার্থকে খর্ব করেছে সেখানে কবি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এটা সত্য হয়েছে শুধু তাঁর ব্যক্তিস্বার্থের ক্ষেত্রেই নয়, তাঁর জাতি-স্বার্থের ব্যাপারেও।

সেদিনের মানুষ কবিকে ভাববিলাসী বলেছে, কোন কোন সমালোচক তাঁকে 'escapist' বা পলায়নী মনোবৃত্তিসম্পন্ন বলেছেন, কবি তার প্রতিবাদ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের মনের বিস্তৃত প্রান্তরে যে পলিমাটি জমা হয়ে উঠেছিল উপনিষদের পুণ্যতোয়া রসের প্রবাহে, সে খবর অনেকেই হয়ত রাখেন নি। তাঁরা বাইরেটাকে বিচার করেছেন, গভীরে যাবার প্রয়াস পান নি। যে মানুষ সমস্ত মানুষের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত দেখে, যে মানুষ অতীতে এবং ভবিষ্যতে আপনাকে প্রসারিত করে দেয়, তার পক্ষে নিছক জাতীয়তার আদর্শের মধ্যে নিজের ভাবকল্পনাকে সীমাবদ্ধ রাখা কতখানি সম্ভব সহজেই বুঝতে পারা যায়। রবীন্দ্র-মানসের আমি-সত্তা, সে তো কবির ব্যক্তিসীমায় বন্দী নয় :

"সে আমি তো বন্দী নহে আমার সীমায়,
পুরাণে বীরের মহিমায়
আপনা হারায়ে
তারে পাই আপনাতে দেশকাল নিমেষে পারায়ে।

* * *

এই আমি যুগে যুগান্তরে
কত মূর্তি ধরে।
কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করে পারাপার
কত বারবার। [আমি, পরিশেষ]

রবীন্দ্র-দর্শনের এই আমি-তত্ত্বের সম্যক্ অনুধাবন তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা সংবেদনশীল মন নিয়ে তাঁর বিশ্ববোধের ধারণাটিকে উপলব্ধি করবার প্রয়াস পাব। যে চৈতন্যময় প্রেরণা আপনকে প্রকাশিত করেছে তৃণে, গুল্মে, পুষ্পে, পল্লবে, তারই প্রকাশ হ'ল ব্যক্তি-সত্তায়। তাই ত কবিগুরুর জীবনে ও দর্শনে, দৃষ্টি ও সৃষ্টিতে বাজছে একটি একতারার সুর।

এই চৈতন্যময় প্রাণপ্রৈতির স্ফুরণ হয়েছে পুষ্পে পল্লবে, তৃণে শাদ্বলে, একথা এইমাত্র বলেছি। অনন্ত প্রাণলীলাপ্রবাহে একদা প্রাণের উৎসার হয়েছিল বৃক্ষকে আশ্রয় করে—উদ্ভিদ্জগতে সে প্রাণের নয়নাভিরাম প্রকাশ। কবির প্রাণের ভাষা ও গাছের ইসারায় বাণীবিনিময় চলে। কবি তাদের অন্তরের ভাষা বোঝেন। তারা যে একই প্রাণপ্রৈতির বিভিন্ন রূপভঙ্গী। তাদের মর্মরধ্বনি কবির কাছে হারিয়ে যাওয়া সুরের স্মারণিক। ঘুঘু ডাকা মধ্যাহ্নে কবি কান পেতে শোনেন পল্লবদলের কলকাকলি ; কবি পত্রমর্মরের প্রাণের সুরটি ধরে দেন তাঁর গানের ভাষায়। তাঁর কথাতেই বলি :

"আমার ঘরের আশেপাশে যেসব আমার বোবা-বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছল। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদি ভাষা। তার ইসারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে ; হাজার হাজার বৎসরের ভুলে-যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয় ; মনের মধ্যে যে সাড়া ওঠে সেও ওই গাছের ভাষায়—তার কোন স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগ-যুগান্তর গুন্গুনিয়ে ওঠে।"*

গাছের ভাষায় কবি শোনেন যুগান্তরের কথা। কোন্ স্মরণাতীত কালে প্রাণের প্রকাশ একদা হয়েছিল লতা, বৃক্ষে, পুষ্পে, পত্রে এবং সে প্রকাশের মধ্যেও যেন কবি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সেদিন মানুষ ছিল না। সেদিনের পত্রমর্মরে কালান্তরের সঙ্গীত যেন ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। গাছের ইঙ্গিতময় ভাষায় আর কবির ছন্দোময় বাণীতে যেন কোথাও একটা প্রাণের যোগ রয়ে গেছে। তাই কবি গাছের ভাষা বোঝেন। প্রকৃতির সঙ্গে কবিপ্রাণের এই মরমী

* শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত 'ত্রয়ী', পৃঃ ১৫৮ দ্রষ্টব্য।

* 'বনবাণী' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

যোগাযোগটি আমরা ঠিকমত বুঝতে পারব যদি আমরা রবীন্দ্র-দর্শনের গোড়ার কথাটি মনে রাখি যে, মানুষের মনে আর অরণ্যনিকেতনে একই প্রাণের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের মতে মানবসত্তাকে প্রকৃতি-সত্তা থেকে বিশ্লিষ্ট করে বোঝা যায় না। একে অপরের পরিপূরক। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই নিগূঢ় সম্পর্কটি আরো অনেক কবি-মনীষীই প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরা শুধু ছন্দগুরুই ছিলেন না, তাঁদের মধ্যে আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদেরও দেখেছি। শুধু ওয়ার্ডস্বার্থ কেন ভূরি ভূরি ন্যায়বিদ্ দার্শনিক রয়েছেন এই দলে। প্রসঙ্গতঃ হেগেলের উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ও হেগেল একই দৃষ্টিতে মানব ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্বন্ধটিকে দেখেছিলেন। তাঁদের চোখে মানুষ ও প্রকৃতি, জীবন ও মৃত্যু এরা পরস্পরের পরিপূরক। কবি মৃত্যুকে দেখেছেন নবীন প্রাণের উৎসরূপে, জীবনের জননীরূপে। কবিদৃষ্টি আবিষ্কার করেছে বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে একটি ঐক্যসূত্রকে আর হেগেল দেখেছেন একটি 'Concrete moving unity' বা বাস্তব সঞ্চরমাণ ঐক্যের অস্তিত্ব। হেগেলের মতে :

> "Life is death. And nature is man. Here too, underneath the surface diversity as apprehended by our fragile senses, there is a profound and moving unity. Nothing external to man is really different from man. The world around us is over other self. We see a tree . . . Its existence is part of us. Our existence is not of it.
>
> (*Living Biographies of Great Philosophers*—H. Thomas & D. L. Thomas).

হেগেলীয় দর্শনের এই সর্বব্যাপী ঐক্যের ধারণা রবীন্দ্র-দর্শনের বিশ্ববোধের ধারণার অনুরূপ। হেগেল বলছেন, গাছের অস্তিত্ব এবং মানুষের অস্তিত্ব নিবিড় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ এবং একেকে পূর্ণভাবে বুঝতে হলে অন্যটির সম্যক্ ধারণা থাকা প্রয়োজন। কারণ সৃষ্টির কেউই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়। এখানে রবীন্দ্রনাথ ও হেগেলে সাদৃশ্য আছে।

যে অনন্ত প্রাণের ধারা আপনাকে প্রকাশ করেছে প্রকৃতির শস্পসম্পদে, মানবের আশায় ও ভাষায়, সেই প্রাণই আবার প্রকাশ পেয়েছে জীবজগতে, পশুপাখীর মধ্যে। তাই কবি পশুপাখী, জীবজন্তুর সঙ্গে আত্মীয়তার হারিয়ে-যাওয়া যোগসূত্রটি খুঁজে পাবার জন্য দুরূহ প্রয়াস পেয়েছেন। এরা যেন তাঁর জন্মজন্মান্তরের পরিচিত। কবি নিজের মধ্যে যে প্রাণোন্মাদনা অনুভব করেন, তাঁর আশেপাশের জীবজগতে সেই একই প্রাণের লীলা প্রত্যক্ষ করেন। তাই তাঁর কাছে পশুপাখীরও একটা বিশেষ মূল্য আছে ; তাদের বেঁচে থাকার অর্থ কবির কাছে অত্যন্ত ব্যাপক এবং গভীর। তারা সবাই একই প্রাণপ্রেতির বিশেষ বিশেষ প্রকাশ। যে অবিচ্ছিন্ন প্রাণধারা মানুষকে প্রাণময় করেছে, তাই-ই আবার মনুষ্যেতর ভুবনেও প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে। পশুপক্ষীরাও প্রাণের মূল্যে বিকায়। তাই কবি তাঁর পোষা ময়ূরটির কথা ছন্দোময় ভাষায় লিখেছেন, লিখেছেন তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের সরস কাহিনী। ময়ূর কবিকে ভয় করেনি, অসঙ্কোচে কবির কাছে এসেছে, এটা কবির জীবনে একটা মস্তবড় ঘটনা। এ তাঁর গর্বের কথা, জয়ের ইতিহাস। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সেই আদিম মধুর সম্বন্ধটিকে ফিরে পেয়ে কবি পুলকিত হয়েছেন, সে পুলকের মধুটুকু কাব্যের পত্রপুটে ভরে রেখে গেছেন সহৃদয় পাঠকের জন্য। তিনি যে নিত্য পুরস্কার পেয়েছেন এই বিহঙ্গের কাছ থেকে, সে কথা সানন্দে ব্যক্ত করেছেন তাঁর অনবদ্য ভাষায় :

> "সহজ রঙ্গের রঙ্গী
> ওই যে গ্রীবার ভঙ্গী,
> বিস্ময়ের নাহি পাই পার।
> তুমি যে শঙ্কা না পাও,
> নিঃসংশয়ে আস যাও
> এই মোর নিত্য পুরস্কার।" [বনবাণী, পৃঃ ৩৫]

ময়ূরের মধ্যে কবির নিত্য পুরস্কার পাওয়াকে কবি-সুলভ অত্যুক্তি বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এর সমর্থন তাঁর অনেক প্রবন্ধেও পাঠক খুঁজে পাবেন। কবি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন যে, মানুষ এবং পশুপক্ষীর মধ্যে এমন একটা নিবিড় আত্মিক সম্বন্ধ রয়েছে যে, তাকে অস্বীকার করলে জীবনের এবং দর্শনের অনেক কিছুকেই হারাতে হয়, কাব্যের মূল্যহানি ঘটে। উদাহরণস্বরূপ কবি মিল্টনের 'প্যারাডাইজ লস্ট' কাব্যের কথা বলেছেন। সেখানে আমরা জীবজন্তুর সঙ্গে আদিম-মানব দম্পতির কোন আত্মিক সম্পর্ক খুঁজে পাই না। মহাকবি মিল্টন এই ধরণের বিশ্ববোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন নি। অথচ এই সহজ সম্বন্ধটিকে স্বীকার না করার ফলে রবীন্দ্রনাথের মতে, মিল্টনের কাব্যে রসাভাস ঘটেছে। তাঁর মতে জীবের সঙ্গে মানুষের এই সম্পর্ক হ'ল সাত্ত্বিক সম্পর্ক। তাকে স্বীকার করে না নিলে ঠিক তত্ত্বটিকে বোঝা যায় না, কাব্যের আত্যন্তিক মর্যাদার হানি ঘটে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

> "মিলটনের Paradise Lost কাব্যে আদি মানব-দম্পতির স্বর্গারণ্যে বাস বিষয়টি এমন যে অতি সহজেই সেই কাব্যে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলনটি সরল প্রেমের সম্বন্ধে বিরাট ও মধুর হয়ে প্রকাশ পাবার কথা। কবি প্রকৃতি-সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন। জীবজন্তুরা সেখানে হিংসা পরিত্যাগ করে একত্রে বাস করছে, তাও বলেছেন, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাদের কোন সাত্ত্বিক সম্বন্ধ নেই। এই যে নিখিলের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ, এর মূলে একটি গভীরতর বিচ্ছেদের কথা আছে। এর মধ্যে 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ', জগতে যা কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা সমাবৃত করে জানবে, এই বাণীটির অভাব আছে।" [শিক্ষা, পৃঃ ১১৮]

এ বাণীটির অভাব মিল্টনে থাকলেও রবীন্দ্রনাথে নেই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বচরাচরকে এক মহৎ প্রাণের দ্বারা সমাবৃত করে দেখেছিলেন। সর্বপ্রাণনা ও প্রাণপ্রেতির উৎস যিনি তিনিই এই বিশ্বপ্রাণের অধীশ্বর। কবি তাঁরই প্রকাশ দেখেছেন এই ভুবনে এবং ভুবনান্তরে।

ঋতু পরিবর্তন হয় প্রকৃতিতে। সৃষ্টির প্রেরণা নূতন করে জাগে জীবজগতে এই ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে। বসন্ত-বোধন শুধু পুষ্পে-পল্লবেই হয় না, তার আগমনী-গান বেজে উঠে মানুষের মনে। যে সুর বনবাণীকে মধুরতর করে, সেই সুরের মূর্চ্ছনাই মানবের আশায় ও ভাষায় অনুরণিত হয়ে উঠে। বৈশাখ আসে নবজীবনের উদ্বোধনের বার্তা নিয়ে। সে রুদ্র তাপসের পদপাত শুধু তো প্রকৃতির শ্যাম শষ্পঘেরা মাটিতেই ঘটে না, তার চরণের ছোঁয়া লাগে মানুষের মনেও। নব অভ্যুদয়ের আগমনী-গান কবির হৃদয়তন্ত্রে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠে। কবি বৈশাখকে আবাহন করেন :

"জাগো ফুলে ফলে নব তৃণদলে,
তাপস, লোচন মেলো হে,
জাগো মানবের আশায় ভাষায়,
নাচের চরণ ফেলো হে।
জাগো ধনে ধানে, জাগো গানে গানে,
জাগো সংগ্রামে, জাগো সন্ধানে,
আশাসহারা উদাস পরাণে
জাগাও উদার নৃত্য।" [বনবাণী, পৃঃ ৫৯]

যে সুরটি বাজে প্রকৃতির প্রাঙ্গনে তারই প্রতিধ্বনি শুনি মানবমনের অঙ্গনে। প্রকৃতি ও মানবসত্তা যেন একই সুরে বাঁধা। এ দুয়ে মিলে এক বৃহত্তর সত্তাকে প্রকাশ করছে। তাই যখন প্রকৃতি ফলে-ফুলে ভরে উঠে, তার আকাশে-বাতাসে নবজীবনের বন্দনাগান ধ্বনিত হয়ে উঠে, তখন সৃষ্টির সেই আদিম চাঞ্চল্য এসে লাগে মানুষের মনে। মানবমনের ভাব ও ভাবনা প্রকৃতির রঙে অনুরঞ্জিত হয়ে উঠে। একই সুরের প্রাণময়তা শ্রাবণের ধারার মত ঝরে পড়ে ভিতরে এবং বাইরে। প্রকৃতির সঙ্গে কবি নিবিড় নিগূঢ় যোগসূত্রটি খুঁজে পান। মৃন্ময়ী ধরণীর প্রেমে তিনি আপনাকে নিঃশেষে হারিয়ে ফেলেন। তাঁর ভুবন ঐ পত্রপুষ্পে ছাওয়া ধরণীর আনন্দনিকেতনে আপনাকে হারিয়ে ফেলে। কবি গেয়ে ওঠেন :

"আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে :
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে ;
প্রভাত সন্ধ্যার
আলো অন্ধকার
মোর চেতনায় গেছে ভেসে ;
অবশেষে
এক হ'য়ে গেছে আজ আমার জীবন
আর আমার ভুবন।
ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো,
জীবনেরে তাই বাসি ভালো।"
[বনবাণী, পৃঃ ৫২]

কবি জীবনকে ভালবেসে জগৎকে ভালবাসেন নি। ধরণীর মোহে মুগ্ধ কবি জীবনকে ভালবেসেছেন। আগে ভালবেসেছেন পৃথিবীকে, পৃথিবীর মাটিকে, তার অনন্ত আকাশে ছড়ানো অন্তহীন আলো-কে ; জীবনকে ভালবেসেছেন তার পরে। দুটির স্বরূপ কবির কাছে অবারিত হয়েছে। কবি সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছেন যে, দুটি সত্তা মিশে এক হয়ে গেল এবং এই এককে প্রত্যক্ষ করা, তাকে উপলব্ধি করা মানুষের ধ্যান ও ধারণায়, এটাই হ'ল আমাদের ঐতিহ্য। রবীন্দ্রনাথ সেই ঔপনিষদিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ছিলেন। 'মধুবাতা ঋতায়তে' মন্ত্রের উত্তরাধিকার তাঁর জীবনে ও দর্শনে সত্য হয়ে উঠেছিল একথা আমরা তাঁর বিভিন্ন লেখায় পড়েছি। পৃথিবী মধুময়, তাই জীবনও মধুময়। জীবনচর্যা অলীক নয়। সুন্দরী ধরণীর আনন্দ-নিকেতনেই তাঁর শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার সাধনা। তাঁর প্রতিবেশীর দল তাঁর চিত্তের প্রসাদ পেয়েছে। তারা যে তাঁর বড়ই প্রিয় ছিল। মানুষকে তিনি ভালবেসেছেন প্রাণ ভরে ; দুটি হাত দিয়ে তাদের বুকে টেনে নিয়েছেন অনন্ত আগ্রহে। দেবতার সন্তান, অমৃতের পুত্র মানুষ—কবি এই দেবতাত্মা মানব-সন্তানকে ভালবেসেছেন ; আপনার করে নিয়েছেন মানুষকে তার শুভবুদ্ধির বিকার ঘটলেও। এদের দম্ভকে এবং মূঢ়তাকে সাময়িক বিচ্যুতি বলে তিনি উপেক্ষা করেছেন—ক্ষমা করেছেন এদের দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য ত্রুটিকে। তিনি দুঃখ পেয়েছেন সত্য, কিন্তু এ দুঃখ তাঁর চিত্তের বলিষ্ঠ আশাবাদকে কখনও স্পর্শ করতে পারে নি।

কবির বেদনার্ত হৃদয় অসহায় আর্তের জন্য কেঁদেছে অঝোর ধারে। তবু ত ছন্দপতন ঘটে নি কখনও। কে যেন এই বেসুরকে ছাপিয়ে সুর এনে দিয়েছে কবির জীবনে। কবি কান পেতে শুনেছেন ঝঞ্ঝার উন্মত্ত তাণ্ডবলীলায় শান্ত-শিবের বাণী। শাসক ইংরেজের সীমাহীন অত্যাচারের পটভূমিকায় তিনি এণ্ডরুজ সাহেবকে তাহাদের সত্যিকার প্রতিনিধি বলে মেনে নিলেন। আর সমস্ত অত্যাচারের পুঞ্জীভূত রক্তময় ইতিহাসকে তিনি শ্বেত জাতির শুভবুদ্ধির সাময়িক বিকার বলে অস্বীকার করলেন, তাকে শাশ্বত সত্যের মর্যাদা দিলেন না। তিনি কখনও এ তত্ত্বে বিশ্বাস করেন নি যে, ইংরেজ জাতির মধ্যে প্রকৃতিগত পাশবিকতা রয়েছে। তাঁর চোখে এণ্ডরুজ, পিয়ার্সন হলেন শ্বেতজাতির প্রতিনিধি। যারা জালিয়ানওয়ালাবাগকে লাল করে দিয়েছিল মানুষের

বুকের রক্তে তারা কি কখনও মিল্টন, কীটস বা শেলীর সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী বলে বিবেচিত হতে পারে? সে জাতির ঐতিহ্যের মশাল বহন করেছিলেন এণ্ডরুজ সাহের। তিনি এই জাতির প্রতি কবির শ্রদ্ধাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন সে কথা কবি আমাদের শুনিয়েছেন। শ্বেতজাতির এই সন্ন্যাসীকল্প প্রতিনিধির অনুপম চরিত্রের স্বর্গীয় আলোকে তিনি দেখেছেন সমগ্র ইংরেজ জাতির ধ্যান ও ধারণাকে। তাই এদের শক্তিমান রুদ্রদূতদেরও তিনি ক্ষমা করতে পেরেছিলেন। মানুষের আত্যন্তিক শুভ প্রচেষ্টাকে তিনি কখনও সন্দেহের চোখে দেখেন নি। মানুষের যা-কিছু ভাল, যা-কিছু শ্রেয়ঃ তাকেই তিনি সত্য বলে স্বীকার করেছেন। মন্দ অধ্রুব এবং অসত্য—তাই তিনি বলেন :

> "এ দ্যুলোক মধুময়
> মধুময় পৃথিবীর ধূলি,
> অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
> এই মহামন্ত্রখানি,
> চরিতার্থ জীবনের বাণী। [আরোগ্য, পৃঃ ১]

এই মধুময়, দ্যুলোকে, ভূলোকে কবির অশ্রান্ত সঞ্চরণ। একটুকরো সবুজের মায়া, অনন্ত আকাশের মোহ, এরা কবিকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। হাক্সলির মত প্রকৃতির কুকীর্তিগুলোকেও তিনি বড় করে দেখেন নি। তিনি দেখেছেন প্রকৃতির চিন্ময় রূপটিকে। হাক্সলি দেখলেন তার হিংস্র পাশবিকতা আর রবীন্দ্রনাথ সেখানে দেখলেন শান্ত, শিব ও অদ্বৈতের প্রকাশ। "যাদৃশী ভাবনা যস্য"—রবীন্দ্রনাথের ভাবনা তাঁকে প্রকৃতির মনোময় রূপটিকে দেখিয়েছে আর হাক্সলি দেখেছেন হিংস্র উন্মাদনায় মত্ত প্রকৃতির রুদ্র রূপকে। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিশ্বের এই আনন্দময় রূপটি প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়েছিল, কারণ তাতেই তিনি মুক্তির স্বাদ পান। বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে তিনি প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শোনেন। চৈতন্যময় বিশ্ববোধের ধারণা সত্য হয়ে দেখা দেয় কবির জীবনে। যা ছিল তত্ত্ব-কথা তাই মূর্ত হয়ে উঠে ব্যক্তিজীবনের বৃহত্তর পরিধিতে। জীবন ও দর্শন সেখানে মিলে গেছে, মনন ও সাধনের আর পৃথক সত্তা নেই।

মোমের পুতুল

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

দু'দিনের খেলা মোরা খেলেছি দু'জনে
মনের পুতুল দিয়ে সাজান বাসর,
মোমের পুতুল তাই গলে যায় মনে
দিবালোকে ভেঙ্গে যায় গানের আসর।

মন দেওয়া নেওয়া তার কোনও মূল্য নাই
সে মনে সুড়ঙ্গ কাটে কালের খেয়ালী—
অবাস্তব অবাস্তব প্রভাতী সানাই
তৈলহীন দীপে দীপে স্তিমিত দেয়ালী।

তুমি আমি মুখোমুখি বসেছিনু কবে
কবে বা তোমার হাতে রেখেছিনু হাত।
বিহ্বল আবেশে ওষ্ঠ চুম্বন-বৈভবে
রাঙা হয়ে উঠেছিল উতলা সে রাত।

সে রাতে তোমার সাথে রভসলীলায়
এক হয়ে গিয়েছিনু ; ভাবি নি তখন
ইন্দ্রধনু ক্ষণস্থায়ী আকাশে মিলায়,
আশ না মিটিতে ভাঙ্গে আশার স্বপন।

সমস্ত অন্তর দিয়ে করেছি কামনা
সর্ব্ব অঙ্গে ব্যাপ্ত তার বহ্নি-শিহরণ
বিফল হয় নি চাওয়া—এ নহে সান্ত্বনা
ধিক্‌ত জীবনে দৈন্য মৃত্যুর কারণ।

মৃত্যু সেও ভাল ছিল, জীবনে কি কাজ
পলে পলে অপমৃত্যু এই ত জীবন,
খেলাঘর ভেঙ্গে গেছে—এমনি নিলাজ
মোমের পুতুল নিয়ে করি আকিঞ্চন।

শম্ভু-কুঞ্জ

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য

আসলে কুঞ্জ চক্রবর্তীর দোকানের কাঠের খেলনা আর শম্ভু বটব্যালের দোকানের তামাক, দুই-ই সমানভাবে বিক্রী হ'ত। কিন্তু কুঞ্জ ভাবত শম্ভুর দোকানে ভিড়, কারণ তামাক জিনিষটার চাহিদাই বেশী; তাতে আবার আর ভাল দোকান নেই বললেই হয়। নইলে শম্ভুর আবার তামাক; তার আবার ভিড়।

শম্ভু ভাবত তামাক ধরেই সে করেছে ভুল। কাশীর শহরে যাত্রীর ভিড়ই আসল ভিড়; যাত্রী খদ্দেরই খদ্দের। তারা চায় টুকিটাকি খেলনাটা আসটা কেনে। তামাক তো দরকার যারা বুড়ো তাদের। তেমন তেমন জুৎসই একখানা কাঠের খেলনার দোকান করা যায়। কোথায় উড়ে যায় কুঞ্জের ভিড়! হ্যাঃ!... ভারি তো কুঞ্জ!

ওদের এ কলহ আজকের নয়। এ বহুকালের কলহ। আমারই হয়ে গেল এই বত্রিশ বছর। জন্মেছি এই বাড়ীতে; অর্থাৎ এ বাড়ীর মুখোমুখি গলির ওপারের সারিতে ওদের দোকান। জ্ঞান হবার পর থেকেই জানি নিত্য ত্রিসন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে ওরা লেগে যায় বচসায়। এর বাধা নেই, বিশ্রাম নেই। ওরা যে নিশ্চিন্তে এক দিন বিছানায় শুয়ে জ্বর ভোগ করবে এমন জো-টি নেই। আশঙ্কা—একের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে অন্য জন পাঁচ কথা বানিয়ে বানিয়ে শোনাবে পুরুষোত্তমকে, ভগেলুকে আর নিবারণ হালদারকে, ওরা ত আসল খবর জানে না।

আসল খবর অবশ্য আজ অবধি কেউ জানে না। কেউ যে কোনও দিন জানবে এমন আজগুবী কল্পনা করাও মূঢ়তা। কারণ শোনা যায়, শম্ভু বটব্যাল দোকান ভাড়া করেছে যখন ওর বয়স ষোল বা সতের। আর কুঞ্জ তারও বছর দুই আগে, যখন ওর বয়সও ঐ ষোল বা সতের হবে। আর এখন শম্ভু হবে বাষট্টি বা আরও দু-এক বছর বেশী।

সুতরাং কম দিন হ'ল না ওদের এই ব্যবসায়ে। এ ভাবে 'তামাক'; আর ও ভাবে 'কাঠের খেলনা'—অথচ যে ভাবে তামাক তার ব্যবসা খেলনা; আর যে ভাবে খেলনা, দা কেটে তামাক মেখে মেখে তার গায়ে পোশাকে তামাকের গন্ধ হয়ে গেছে।

হতভাগ্য এমন ওরা, ছুটি পায় না একটি দিন। মাঝে কাশীতে নিয়ম হ'ল একাদশীতে সব দোকান-পাট বন্ধ থাকবে। বন্ধ থাকত, কিন্তু বেলা ন'টার মধ্যেই সেই পুরাতন কণ্ঠে তীব্র বচসা চলত। দেখা যেত দোকানের সামনের রকে বসে একজন, আর একজন কাঠের পাটাতনে বসে চালিয়ে যাচ্ছে বাগ্‌যুদ্ধ।

বেঁটে শুকনো চেহারা। মাথায় গুটি পাকানো, কাঁচা-পাকা চুল। অল্প গোঁফ ছোট করে ছাঁটা, রংটা মাঝামাঝি। চোখের চাউনি পিটপিটে, কিন্তু চকচকে, এদিকে সৌখীন। চশমা যেটা পরে তার ফ্রেমটা রোল্ড গোল্ডের। গলার আওয়াজ জোরালো আর ধারালো।...এই ছিল কুঞ্জ চক্রবর্তী। অবিবাহিত, তবে ব্রহ্মচারী নয়। বাড়ীতে যিনি রাঁধেন, তিনি বরাবরই বাড়ীতেই থাকেন।

এই জন্যই শম্ভুর ঘেন্না অপরিসীম ঐ নচ্ছার কুঞ্জটার উপর। সমাজে থাকার যোগ্য নয় ও। শম্ভু বিবাহিত। শেষবয়সে একটি মেয়ে আর দুটি ছেলে হয়েছে। মেয়েটার এখন বছর চৌদ্দ বয়স। সত্যি, গৌর কেন, সুগৌর বর্ণ শম্ভুর। এই বুড়ো বয়সেও গাল দুটি লাল, হাতের আঙুলগুলো রক্তে টসটস করছে। লম্বা শক্ত চেহারা, পেশীর ভাঁজগুলো স্পষ্ট,—মোটা মোটা শিরাগুলো নীল হয়ে ফুটে বেরুচ্ছে হলদে আভার চামড়ার মধ্য দিয়ে। গম্ভীর গলায় কথা কয়, চোখের পাতা ভারী, চোখের কোণে যেন জলের কোয়া লুকোনো।

সেদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি। বাড়ী থেকে বেরুতে পারছি না। ওদের বচসা চলছে বর্ষাধারার সঙ্গে সমান তাল রেখে। বৃষ্টি ধরেছে। ওরাও থেমেছে। পাড়া খানিকটা শান্ত। আমি বেরুচ্ছি; কাজে নয়,—তার চেয়েও জরুরী তাগিদে,—আড্ডায়।

শম্ভুদা ডাকলেন—"বলি, এই বাদলায় বেরুলে কোথায়?"

দোকানের কাছেই গিয়ে দাঁড়ালাম। প্রায়ই এমনি দাঁড়াই; সুখ-দুঃখের কথা শুনি। সেদিন বিশেষ করে দুঃখ করলেন পশুপতি বাবুর কথা নিয়ে। উনি নিজে যে বাড়ীতে থাকেন তারই উপর তলায় পশুপতিবাবু থাকেন। রেলে চেকারের কাজ করেন। তাঁর ছেলেটির বিবাহ দেবার বয়স হয় নি। শম্ভুদার মত যে, বিয়ে করতে গেলে ঐ বয়সটাই সমীচীন।

"আসল মতলব জানলে ভায়া, আমার মেয়েকে নেবে না। নেবে কেন? গরীবের মেয়ে, পয়সা-কড়ির মতলব নেই তো, তা সে কথা বললেই হয়।"

সহানুভূতি দেখিয়ে বললাম, "অপ্রিয় কথাটা যদি ভদ্রলোক এড়িয়ে গিয়ে থাকেন তো—"

কিন্তু কথা বলব কি। অনুভব করলাম—এরই মধ্যে কুঞ্জদার ঘাড়শুদ্ধ মাথাটা বারছয়েক সট সট করে তার দোকানের পাল্লার বাইরে বেরিয়েই আবার ঢুকে গেল। মনে মনে ভারি অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলাম।

কি করে না জানি শম্ভুদা তা টের পেয়েছে। বললে, "কুঞ্জ বেহ্মচারী দেখছে বুঝি?" আমি তৎক্ষণাৎ সেটা সজোরে অস্বীকার করবার আগেই শম্ভুদা বলতে লাগল, ও শালার ত কম্মোই ওই। ভাবছে ওর কি সর্বনাশ করছি বুঝি। হ্যাঁ ভায়া, আমার এই দোকানখানা আলমারি দিয়ে সাজাতে কত লাগবে বলতে পার?"

হঠাৎ কন্যাদায়ের ভ্রূ কুঞ্চন থেকে নতুন আলমারী দিয়ে দোকান সাজাবার আড়ম্বর দেখে বিস্মিত বোধ করলাম। "কেন বলুন ত?"

"নাঃ, বড় তেজ হয়েছে ওর। বড্ড তেজ। ওর তেজ আর সয় না।"

"ব্যাপার কি?" আরও যেন বিস্ময় বোধ হ'ল। বিনয়ী, সদালাপী, অমায়িক সে শম্ভুদাই যেন নয়। মুখখানা শিথিল, মাংসপেশীগুলো যেন কিসের প্রেরণায় সতেজ হয়ে উঠেছে।

"কিছু নয় ব্যাপার। ব্যাপার ওর ব্যাভার। জান ভায়া সব আমি সইতে পারি। পারি না ওর দেমাক! তোমারও বাপু জেদ কম নয়। বলই না। তোমরা আজকালকার ছেলে। ফ্যাসন জানা আছে। এই তো ছোট ঘর আমার। যদি আলমারী করি কত লাগবে?"

ব্যাপার সত্যিই বুঝি না। তাড়াতাড়ি চাপা দেবার আশায় বললাম, "কত আর লাগবে, বড় জোর শ'খানেক টাকা।"

"এই ত? ব্যস—কালই একটা ছুতোর ডাকবে তুমি। ভারি উনি কাঠের খেলনার দোকান করেন। এমন ধাঁধানো দোকান করব যে দেখবেন উনি। একটা খদ্দের দাঁড়াক ত দেখি ওর দোকানে। থাকে থাকে রাখব রকম বে-রকমের খেলনা, কাঠের খেলনা। একধারে শুধু কৌটো। জয়পুরে আমার এক বন্ধু আছে। তাকে চিঠি লিখেছি। জয়পুরের কাঠের কাজ জান ত? সেরা জিনিষ, দুনিয়ায় জুড়ি নেই। প্যারি বিদ্যেরত্নের বেয়াই আছে বর্ম্মায়, শুধু সেই বা কেন, এই ত এ-পাড়ার অমূল্য—বর্ম্মায় ব্যবসা করে। বাঁশের উপর গালার কাজের অভিনব জিনিষ সব। আনাব, আনিয়ে আলমারি সাজাব। কি জানে ও ব্যবসার! তামাক ঘেঁটে ঘেঁটে, চিটেগুড় মেখে মেখে, দা কেটে কেটে হদ্দ হয়ে গেলাম। কিছু নেই ব্যবসায়ে। ওর দোকানে ঘুঘু চরাব আমি তবে—

শেষ হবে কি না ওর কথা জানি না। সুযোগ খুঁজছিলাম সরে পড়ার জন্য। কেননা কুঞ্জদা আরও বারকতক ঘাড়-বের-করা-ভেতরে-নেওয়ার ব্যায়াম সেরে এবার একেবারে পথে নেমে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমি ত প্রমাদ গণলাম।

একটা ছুতোর আমার জানা আছে। তার বাড়ীর দিকেই যাচ্ছিলাম।

"ব্যস ব্যস। আজই।"

"আচ্ছা" বলেই এক রকম সরে পড়লাম।

কিন্তু শম্ভুদা পুরোন ঘাগী লড়িয়ে। কোন্ প্যাঁচে কুঞ্জদা কি করে কাত হবেন, একেবারে নখদর্পণে। একটু চেঁচিয়ে বললেন, 'সবার সেরা কারিগর এনো। করব আলমারি, দশজনায় দেখবে।"

চলে ত গেলাম। পিছনে যে কি রেখে এলাম বেশ বুঝলাম। অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক এখন চলবে।

কিন্তু চলেছিল আরও বেশী। কারণ আমি ফিরেই ছিলাম দু' ঘণ্টারও পর। যখন গলির মোড়ে তখন শুনছি সব শান্ত। নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ফিরছি। কুঞ্জদা একেবারে ডেকে বসলেন, "বাড়ি ত যাচ্ছ; একটা কথা শুনে যাও ত।"

বাপের বয়সী ভদ্রলোক। জন্মাবধি দেখছেন, এড়াই সাধ্য কি। দাঁড়ালাম।

"কি বলছিল শম্ভু পাঁঠাটা!" যদিও কণ্ঠস্বর খাদে। তাতে বারুদ ছিল অনেকটা। এ তরফ থেকে অগ্নিসংযোগ ঘটলেই একেবারে বারুদ ফাটবে।

"চুপ করে রইলে যে? বলছিল যে আমার তামাকের প্ল্যানটা গাঁজা? তাই ঠাট্টা করল আমায় আলমারি বলে।"

সাহস পেয়ে তৎক্ষণাৎ বললাম, "আরে রামো রামো। শম্ভুদা সে ধার দিয়েই যান নি। উনি বলছিলেন পশুপতি বাবুর ছেলেটির কথা। সে ত আমার বন্ধু কি না! তাই আমায় দিয়ে বলাতে চান ওঁর মেয়ের জন্য। মেয়েটি ত বড় হয়েছে!"

"থাম হে বাপু, আমায় আর ভাঁওতা দিতে হবে না। জন্মাতে দেখলাম, আমার চোখে ধূলো দিতে আসা! দেখ, আফিং খাই বলে বুদ্ধির গোড়ায় নেশা ঢোকে নি আজও। মেয়ের বিয়ে! মেয়ের বিয়ে ওর হবে নাকি কখনও। বিয়ে করার ফের ও নিজে জানে না? ওর মেয়ের বিয়ে হবে? ভিক্ষে করবে, ভিক্ষে।" ভাল লাগল না কথাটায়। বললাম, "ছিঃ কুঞ্জদা! সে ত আপনারও মেয়ের মত। তার সম্বন্ধে এমন নিষ্ঠুর কথা বলতে আছে?"

"রাখ হে তোমার দয়া। ঢের ঢের দেখা আছে আমার দয়া। নয় দু'দিন ওর নেশাখোরেরা একটু বেশী তামাকই নিচ্ছে। আমি ত তামাকের দোকান করলাম বলে। আমাদের পান্নুবাবু আর ললিত চাটুজ্জে—তামাক খায় কোথায় বসে, জান? কি পায় মধু? কেউ জান?···কুঞ্জ চক্কোত্তির দোকানের তামাক! দেখবে হে দেখবে! ভালেট বলতে যেমন ক্ষুর, গ্রাক্সো বলতে যেমন দুধ, সিঙ্গার যেমন সেলাই, পীয়ার্স যেমন সাবান তেমনি কুঞ্জ চক্কোত্তি বলতে জানবে তামাক, আর তামাক বলতে কুঞ্জ চক্কোত্তি। মালাখানা, গয়া, বিষ্ণুপুর, মতিহারি সব জায়গায় লোক পাঠিয়েছি। দেখবে তখন···।"

শম্ভুদা সহ্য করেন এমন সংযম ছিল না। দোকান থেকে হাঁক পাড়লেন, "তামাকের ব্যবসা করার হুমকি দেখায় সব সুমুন্দি। করনেওলাকে দেখলাম না আজও। বলেছি মরদ কা বাত,—হ্যাঁ, জানিস পুরুষোত্তম, এবার পুজোয় আমি খেলনার দোকান করবই।"

কুঞ্জ চক্রবর্ত্তী চীৎকার পাড়লেন—"পুরুষোত্তমকে মধ্যস্থ মানতে হয় মানো গে। কাজ করে যারা মধ্যস্থ তাদের মানতে হয় না; কাজই তাদের মধ্যস্থ। তাই নয়? তুই-ই বল না ভগেলু।"

ভারি বিপদে পড়া গেল। আবার সংগ্রাম। এটার জের চলবে সেই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত।

সেদিন সন্ধ্যায় জ্যেঠামশায় ওদের থামিয়ে দিয়ে বললেন, "তোমাদের গোলমাল ত মিটে যায় যদি তুমি এ দোকানে বস আর ও

তোমার দোকানে। তোমার তামাক বেচার সখ, তুমি খেলনা ছেড়ে ও দোকানে যাও; আর তোমার খেলনা বেচার সখ, তুমি তামাক ছেড়ে ও দোকানে যাও।"

শম্ভুদা বললেন, "এঁটো জিনিষ বামুনে নেয় না; তাতে আবার কুকুরের এঁটো।"

কুঞ্জদা বললেন, "কুকুরের এঁটো বাছুড়ের প্রিয় জিনিষ, ওরা যে মুখে খায় সেই মুখেই ত্যাগে কিনা। বামুন হলে তবু কথা ছিল।"

জ্যেঠামশায় সরে পড়লেন।

ক'দিন কেটে গেল। রাত্রে পড়বার ঘরের বাইরে দরজায় শব্দ শুনে সাড়া দিলাম, "কে?"

দেখি শম্ভুদার স্ত্রী। শুনলাম অভাবের সংসারের গচ্ছিত যা কিছু ছিল নিংড়ে আলমারির খরচ জোগান দেওয়া হচ্ছে।

"দু'দিন পরে মেয়ের বিয়ে আমি কি করে দেব দাদা? কাঠের খেলনার ব্যবসা করার কি এই বয়স, মাথার উপর কন্যাদায়। একটিবার গিয়ে বোঝাও দাদা।"

কাঁদতে লাগলেন ভদ্রমহিলা।

বাইরে তখন ঘটাং ঘটাং করে শব্দ হচ্ছে। কুঞ্জদা তালা টানা-টানি করে দেখছেন লেগেছে কিনা। এ তাঁর নিত্য কাজ। দরজায় তালা দিয়ে অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক তিনি টানাটানি করেন। নইলে মনের তৃপ্তি হয় না।

এই সময়টা শম্ভুদা দোকানে বসে একটু ধ্যান সেরে নেন—তালা টানাটানির শব্দে তার হয় আশ্রমপীড়া। তিনি তাই নিয়ে হুলস্থূল বাধান।

বিশেষ ঝগড়া করেন না তিনি। সন্দিগ্ধচেতা কুঞ্জদা ঘণ্টাখানেক পরিশ্রম সেরে, তালা ছেড়ে যখন বাড়ীর দিকে পা বাড়ান তখন শম্ভুদা শুধু একটি বার হাঁচেন। এর জন্য নস্য, গোলমরিচের গুঁড়ো, কাঠি, পালক ইত্যাদির সরঞ্জাম শম্ভুদার আছে।

আর—সেই একটি হাঁচি মানে কুঞ্জদার আবার ফিরে আসা এবং ঘণ্টাখানেক আবার সেই তালার সঙ্গে যুদ্ধ করা। যতই অসম্ভব হোক্ না কেন, কুঞ্জদা মনে করতেন হাঁচির পর দোকানের তালা না টেনে যাওয়া আর খুলে যাওয়া একই কথা। বরং দোকান খুলে রেখে গেলে যদি বা চুরি নাও ঘটে, হাঁচির পরে গেলে চুরি অনিবার্য্য।

কিন্তু শম্ভুদার জপের সময় যেদিন কুঞ্জদা তালার শব্দ করবে, সেদিন কুঞ্জদাকে তালা টেনে বাড়ী ফিরতে হয় অন্ততঃ রাত একটায়।

বেচারী কুঞ্জদার বাড়ীর সেই 'মর‍্যাল্'—রাঁধুনী মহিলাটি এসে শম্ভুদাকে হাত জোড় করে,"আর হেঁচো না ঠাকুর, দোহাই তোমার। হাঁপানির রুগী, এতো রাতে খেয়ে সারারাত ঘুমুতে পারবে না।"

শম্ভুদা বলে, "সব সইতে পারি; আমার জপের সময় ছোট-লোকমী সইব না। আমিও নাক টিপি কি না টিপি, আর ওই যবনটাও সঙ্গে সঙ্গে ঘটাং ঘটো, ঘটাং ঘটো! এ কি ঠাট্টা?..."

শম্ভুদার স্ত্রীর কথা শুনে বাধ্য হয়ে আমায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হয়। অনেক বোঝালাম। কিন্তু পারলাম না। একদিন দেখি ছুতোর এসে আলমারি লাগাচ্ছে।

ছুতোর কাজ করছে। শম্ভুদা নেই। ছেলে কাশীনাথ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ দেখছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "বাবা কোথায় রে?"

"বাড়ী।"

"দোকানে আসবে না?"—শম্ভুদার দোকানে না আসা সহজ কথা নয়।

"বাবার আজ ক'দিন জ্বর।"

চলে যাচ্ছিলাম। কুঞ্জদা দুখানা গোলাপী লম্বা কাগজ হাতে নিয়ে বললেন, "দেখ ত ক' পেটি তামাক আসছে। বিষ্ণুপুর আর বালাখানা দুটোই আসছে ত?"

দেখলাম, প্রচুর মাল আসছে। এমন অভিনব রেষারেষির শেষ কোথায় দাঁড়ায় দেখার জন্য পাড়ার অনেকেই উদ্‌গ্রীব।

কিন্তু যার জন্য এত উৎসুকতা তিনিই তখন বিছানায়।

আলমারি আর খেলনার দাম মেটাতে শম্ভুদার স্ত্রীর গায়ের সামান্য সোনাদানাটুকু পর্য্যন্ত বিকিয়ে গেল। বাড়ীতে খাদ্য-সংস্থান ফুরুলো।...আর সেই মুখে শম্ভুদা এ-পারের দোকানদারির পাট চুকিয়ে ও-পারে পাড়ি দিলেন। এ-পারে রয়ে গেল বন্ধ দোকানে আলমারি, খেলনার পেটি আর ঝোলান তালা। আর রয়ে গেল—বিধবা স্ত্রী, তিনটি ছেলে-মেয়ে, ক্ষুধা, অভাব, দৈন্য, হাহাকার।

কুঞ্জদা যেমন দোকান রোজ খোলেন আর বন্ধ করেন, তেমনিই করে যান। পাড়াটা কেমন যেন শান্ত হয়ে গেছে। কুঞ্জদা যেন সে কুঞ্জদা আর নেই; কেমন ঝিমিয়ে পড়া চোপসানো ভাব।—]

পূজা এসে পড়েছে। বিদেশী যাত্রীরা দলে দলে আসছে। কুঞ্জদার খেলনার দোকান গুটিয়ে নিয়ে তামাক নিয়ে জমে বসার কথা। কিন্তু কৈ, কোনই উৎসাহ নেই সে সবের। তামাক সেই প্যাকিং বাক্স-বন্দী হয়েই রয়েছে।

অনেক রাতে বাড়ী ফিরছি। ক্লাবে একটু বেশী রাত হয়ে গেছে। পাড়া নিস্তব্ধ। বাড়ীর কাছে এসে দেখি সামনের রকে উবু হয়ে বসে কুঞ্জদা। আফিংখোর লোক, ঝিমুচ্ছে বুঝি-বা। ডাক-লাম, "কুঞ্জদা, বাড়ী ফিরবেন না?"

"কৈ আর ফিরছি। ফিরছি, ফিরবো...এই ত সমানে চলেছে। রোজই এই ভাব। কেমন যেন গা-গতি লাগে না কিছু করতে। উৎসাহই নেই কিছুতে।"

আমি হেসে বললাম, "আফিং।"

মাথা নেড়ে কুঞ্জদা বললেন, "আরে তা হলে ত তুরীয় আনন্দে থাকতাম। সে আর হ'ল কৈ ভাগো। এ নেশা-পাকার ঝিমুনি নয়, নেশা-চটার খেউড়ি। এই ত ঘণ্টাখানেক ধরে ভাবছি দোকানটা বন্ধ করি; তা ভাবছি ত ভাবছিই। বন্ধ আর করে উঠতে পা পাচ্ছি না। যত বার পা বাড়াই মনে হয় যেন শম্ভু হাঁচছে। আবার ফিরে আসি।...বন্ধ করে দাও না দোকানটা।...শালা মরেই

গেল হে! আমার মাস্তের খেলাটার দফা গয়া করে দিলে!···হাড় বজ্জাত, হাড় বজ্জাত!"

দোকান বন্ধ করে দিচ্ছি, কুঞ্জদা বলে চললেন—"আমিও তেমনি কেউটের বাচ্চা। শম্ভুর দোকানখানা কিনে নিলাম।" বলেই ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগলেন।

"কিনে নিলেন? বলেন কি? দুটো দোকান চালাতে পারবেন কেন?"

চটে গিয়ে বললেন, "তা বলে শম্ভুর দোকান কিনে নেবে একটা বিদেশী সিন্ধী? আমি তাই দেখব? আমার উপর টেক্কা দিতে গিয়ে খেলনা কেনা হয়েছিল। দিয়েছিলাম জবর কিস্তী, মাৎ-ই হয়ে যেত। শালা মরে গিয়ে উঠ-কিস্তী দিলে। দেখি···মনে হচ্ছে সামলে নেব।"

"কি করে সামলাবেন?" প্রশ্ন করি আমি।

"দেখি। আছে মতলব একটা। শম্ভুর দফা গয়া না করে আমার কাশীতে মরেও মুক্তি নেই, এ কথা তুমি জানবে।"

না বলে পারলাম না —"এই জিদে শম্ভুদা সর্বস্ব খুইয়ে স্ত্রী-পুত্র কন্যাকে পথে বসিয়ে গেলেন, আপনি এখনও তা বুঝলেন না!"

দু'হাতের বুড়ো আঙুল নাচিয়ে কুঞ্জদা বললেন, "আমি আর কাকে পথে বসাব? আছে কে? আমার ত ঐ এক হা-পিত্যিশি রাঁধুনী! সে বুড়ীর ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। কিন্তু এ খেল্ আমি খেলবই! দান যে-কালে ধরেছি এক নয় সিংহাসন, না হয় অনশন। এর মধ্যে আর ফেরেপবাজী নেই। ছিঃ, খেলতে নেমে দান ধরেছি, ফিরে যাব? বল কি হে?"

"কি করবেন?" জিজ্ঞাসা করতে হ'ল আমায়।

"শম্ভুর দোকান থেকে সব মাল নর্দ্দমায় ফেলব, পায়ের তলায় থ্যাংলাব, রাখব শুধু যে তামাক, সেই তামাক।"

আশ্চর্য্য হয়ে বললাম, "তবে আপনার? আপনার দোকানে?"

ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন কুঞ্জদা। তাই ত! "কি করা যায়? বল ত হে বল ত! এঃ, দেখেছ, শালা জাতখচ্চর, বদমায়েসীর মোরব্বা ছিল। মরতে মরতেও শালা প্যাঁচ মেরে গেছে দেখছ! ···তাই ত!"

বিশেষ ভাবনায় পড়ে গেলেন কুঞ্জদা। বললাম, "বেশ ত ওর দোকানে আপনার আনা তামাক তুলে দিন। আপনি বদলে ওর খেলনাগুলো নিয়ে নিন। বাপের সঙ্গে লড়াই ছিল বলে ত আর ছেলের সঙ্গে নেই। বেশ যেমন ছিল—তামাক আর খেলনার দোকানই যেমন ছিল তেমনি চলবে।"

হঠাৎ খেয়াল হ'ল কুঞ্জদা আমার একটি কথাও শোনেন নি!

বললাম, "কি, শুনলেন না কথা, না মনে ধরল না?"

কুঞ্জদা বললেন, "শুনলে না শালা হাঁচলো? হাড়ের ভেতর অবধি বজ্জাতি ওর। না, না, তোমার মত প্যানপেনে মেয়েমানুষের খেল খেললে হবে না আমার।···আমি যা মতলব করছি সেই ভাল।···দেখি দাও তালাটা বন্ধ করে। মরুক, আবাগেরা তদ্দিন সত্রে সত্রে ভাত কুড়িয়ে।"

ভারি রাগ হ'ল; বললাম, "হ'লই-বা শম্ভুদা শত্রু; তার ছেলে-মেয়েদের উপর এমন কথা বলতে পারবেন, এতটা হীন হতে পারবেন ভাবতে পারি না।"

"থামাও ত তোমার লেকচার বাপু। তালা বন্ধ করতে হয় ত করে দাও; নয় ত যাও।"

তালা বন্ধ করে দিলাম।

উপরে জ্যেঠামশায়ের কাছে আরও যা শুনলাম—মন একেবারে বিষিয়ে গেল। উনি দোকান কিনেছেন, তার উপর ঠিক করেছেন দোকান খুলে অর্থের যূপকাষ্ঠে শম্ভুদার স্ত্রী-পুত্রকে এনে বাঁধবেন, ওদের দিয়েই সেই দোকান চালাবেন, কিন্তু নাম মিটিয়ে দেবেন শম্ভুদার। এতখানি অপমান উনি ভেবে-চিন্তে করবেন।

আরও সঠিক জানার জন্য শম্ভুদার স্ত্রীর কাছে গেলাম।

ওদের বাড়ী খালি। পশুপতিবাবু বললেন, "ওদের ত বেঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজের বাড়ী তুলেছে। জান না? বুড়ীকে লোভ দেখিয়েছে ছেলের চাকরি করে দেবে, মেয়ের বিয়ে দেবে। অথচ নিয়ে গিয়ে, শুনতে পেলাম, সেই রাঁধুনীটার পরিচর্য্যা করাচ্ছে।"

কিন্তু রাগ হতে লাগল; ওরা গেল কেন!

এতটা নির্ম্মম প্রতিশোধস্পৃহা যে নরপশুটার হৃদয়ে, তার সঙ্গে বোঝা-পড়া করবই। পাড়ার ছেলেদের বলে ওর দোকান লুঠ করাতে হয়; তাও করাব। মনে মনে স্থির করে সারাদিন টো টো করে বেড়ালাম।

রাতে ক্লাবে এ সব কথার পরে অনেক ক'জনাই ঠিক করলে কুঞ্জদার দোকানে গিয়ে ওকে যেমন করে হউক বাধ্য করবে শম্ভুর দোকান তার ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে। দরকার হয় ত দাম দেওয়া যাবে চাঁদা তুলে। বন্ধুদের শুভ-ইচ্ছায় নিজের বুকখানা ফুলে উঠল। রাতে বাড়ী ফিরলাম, কুঞ্জদার দোকান তখন বন্ধ।

পরের দিন কুঞ্জদা দোকান খুললেন না; তার পরের দিনও না। মনে হ'ল টের পেয়েছে কোন মতে। ভয়ে এখন গা-ঢাকা দিয়েছে।

রাতে বাড়ী ফিরছি, শুনছি ঘটাং-ঘট, ঘটাং-ঘট তালা টানার শব্দ। অনেক রাত তখন, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। কেমন যেন একটা অনুভূতিতে গা-টা ছম্ ছম্ করতে লাগল।

কুঞ্জদাই ত তালা টানছেন। জ্যেঠামশায় জানালা খুলে দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কেবল ডাকছেন, "কুঞ্জ ও কুঞ্জ", কোন সাড়া-শব্দই নেই। তালা টানছে ত টানছেই। আফিংখোরের কাণ্ডই আলাদা।

শীতকাল, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, খালি গায়ে কুঞ্জদা তালা টানছেন, মাথায় ঘাম দেখা দিয়েছে। আমিও ডাকলাম, "ও কুঞ্জদা!"

জ্যেঠামশায় বললেন, "অন্ততঃ দু' ঘণ্টা হয়ে গেল এই কাণ্ড করে চলেছে। কি যে হ'ল ওর।"

গায়ে হাত দিয়েই হাত সরিয়ে আনলাম। হাত যেন পুড়ে গেল।

খুব জর কুঞ্জদার।

আমি জোর করে টেনে আনতেই ঢলে পড়লেন। সামনের ঘরে শুইয়ে দিলাম।

চোখ লাল টকটকে। আমায় দেখে কটমট করে চেয়ে বললেন, "শালা হেঁচে হেঁচে উচ্ছন্নে দিলে আমায়। ছেলে বৌকে এ্যায়সা নাচান নাচাবো—তখন হাঁচি কপালে উঠবে। মরেও শালা ছাড়ে না। ওঃ হাড়-বজ্জাত, জাত-খচ্চর। মেয়ে-জামাই হবে, উনি আমায় ঐশ্বর্য্য দেখাবেন। দেখাচ্ছি মেয়ে-জামাই।"

আমি মাথায় জল দিতে লাগলাম।

উনি কতকটা শান্ত হয়ে বললেন, "তুমি ত সবই জান ভাই। জীবন্ত লড়েছি, লড়েছি। মরেও শালা ভোগাবে? নূতন বদমায়েসী শুনবে? তোমায় ত বলেছি এই তালা টানার সময় হাঁচত। ক'দিন আগে তালা টেনে টেনে হাতের রগ ছিঁড়ে যাবার জো। শালা হাঁচে না। যত বলি 'হাঁচ না শালা, হাঁচ' ওঃ কি হাসি, হাঁচবে না শালা—ও-ই অন্ধকারে বসে ফিকির ফিকির বিচ্ছুর হাসি। হাঁচি বন্ধ করে দিলে। ঐ একটা জায়গায় রোজ তবু জানান যেত যে ও বুঝছে আমি কি করছি। প্রেত কিনা, বুঝতে পেরে সে হাঁচিও বন্ধ করে দিলে। আচ্ছা, এই কি ধর্ম্ম হ'ল। পাকা খেলা, শেষ করে এনিছি; এখন চাল দেবে না ত খেলি কি করে? আজ আমি তাই বিছানা ছেড়ে ছুটে এসেছি। সারা রাত তালা টানব। ছাড় আমায় ছাড়, টানব তালা, টানব, দেখি শালা হাঁচে কিনা।"

জোর হেঁচকা মেরে উঠতে গেলেন। পরক্ষণেই পড়ে গেলেন। আমার হাতের মধ্যেই মারা গেলেন। খানিকটা বাদে…নাক দিয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল।

ততক্ষণে কাশীনাথ আর সেই রাঁধুনী এসে গেছে।

* * *

কুঞ্জদার উইলে সব টাকা দোকান কাশীনাথকে দিয়ে গেছেন বলে যেদিন প্রকাশ হ'ল, সেদিন আর ক্লাবে যেতে পারলাম না। মরবার আগেই নিজের বাড়ীখানায় ওদের বসিয়ে রেখে গিয়েছিলেন।

নিশীথে

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

নিস্তব্ধ নিদাঘ নিশি। নিদ্রায় নিলীন
রুগ্ন শিশুপুত্র মোর পালঙ্কের 'পর।
কর্পূরধবল অভ্র; নক্ষত্রনিকর
নির্নিমেষ আছে নিয়ে চাহিয়া নিয়ত
শোকতাপদুঃখদীর্ণ ধরণীর পানে—
সন্তানের ম্লান মুখে জননীর মত
সুনিবিড় করুণায়! একটি প্রদীপ
নশ্বর জীবনসম মৃত্যুর সম্মুখে
উন্মত্ত বায়ুর মুখে রেখেছে বাঁচায়ে
কোনোমতে নিবু নিবু জীর্ণ শিখাটুকু
ক্ষুদ্র গৃহকোণে! ওরে ক্ষীণপরমায়ু
অসহায় শিশু মোর, যদি এ নিশায়
ধুক্ ধুক্ প্রাণ তোর একটি ফুৎকারে
নির্ব্বাণ-উন্মুখ ঐ দীপশিখাপ্রায়
মিশে যায় অকস্মাৎ অনন্তের সনে—
কেমনে বাঁচায়ে তারে তুলিব আবার—
ভাবি তাই বসি' তোর শিয়রে কেবল!
অশ্রুসিক্ত স্নেহ মোর—কিবা মূল্য তার
অন্ধ প্রকৃতির কাছে মমতাবিহীন!
এ বিশাল ভুবনের পটভূমিকায়
অণু হতে অণু মোর কতটুকু স্থান!
যাহা নয় আপনার—সেই পরধন
মর্ম্মমঞ্জুষায় ভরি' রাখিবারে চাই
ভুল ক'রে কৃপণের ঐশ্বর্য্যের মত
চিরকাল! কে কাহার?—কারে ভাবি মোর
প্রাণের অধিক প্রিয়! অনিত্য ধরায়
আত্মার আত্মীয় কোথা? জীবন-মনের
কেহ নাই—কেহ নাই—কেহ নাই সাথী!
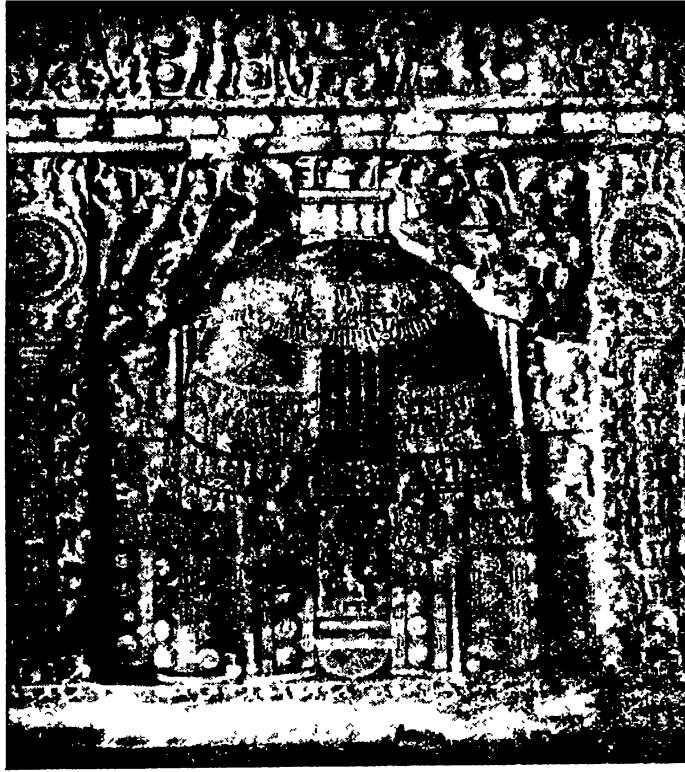
অন্ধ্র রাজ্যের অমরাবতীতে অলঙ্করণযুক্ত একটি বৌদ্ধ স্তূপ

নবগঠিত অন্ধ্র রাজ্য

গত ১লা অক্টোবর নূতন অন্ধ্র রাজ্য গঠিত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু এই রাজ্যের রাজধানী কুর্নুলে আনুষ্ঠানিক ভাবে ইহার উদ্বোধন করিয়াছেন। এখন ভারতে ক-শ্রেণীর রাজ্যের সংখ্যা হইল দশটি।

গোদাবরী, কৃষ্ণা ও পেন্নার এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র উপনদী-বিধৌত, ৪০০ মাইল পর্য্যন্ত প্রসারিত সমুদ্রবেলা-সমন্বিত অন্ধ্রদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ দেশের পুনর্গঠন পরিকল্পনার পক্ষে বিশেষ ভাবে সহায়ক হইবে। এই রাজ্যে এসবেষ্টস, বেরাইট, কয়লা, লৌহ প্রস্তর, চূণা পাথর ম্যাঙ্গানীজ, অভ্র প্রভৃতি নানা প্রকার খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্ত্তী বিশাখাপত্তন ভারতের অন্যতম প্রধান বন্দর। সমগ্র অন্ধ্র এলাকা ব্যাপিয়া উৎকৃষ্ট স্থাপত্যশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ যে সকল মন্দির বিদ্যমান সেগুলিতে প্রাচীন ইতিহাস এবং সংস্কৃতি-সম্ভারের নিদর্শন দৃষ্ট হয়।

অন্ধ্রের আয়তন ৫৩,৫০০০ বর্গ মাইল এবং ইহার লোক-সংখ্যা ২,৮৫,০০,০০০। যদিও এই রাজ্যের ভূমির এক বিরাট অংশ কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়, তথাপি জঙ্গলাকীর্ণ বিস্তীর্ণ অঞ্চল-সমূহ অনাবাদী পড়িয়া আছে।

লোকবলবিশিষ্ট এবং জলে ও স্থলে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ অন্ধ্রদেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিবে, অন্ধ্রের জন-গণের সঙ্গে সমগ্র দেশবাসীও এই আশাই পোষণ করিতেছে।

ভ্রম-সংশোধন

সংখ্যা	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	হইবে না	হইবে
কার্ত্তিক, ১৩৬০	১৮	১	৬	পুত্র-কন্যা, পুত্রবধূ ও পৌত্র-পৌত্রী	পুত্রকন্যা ও পৌত্র-পৌত্রী

রাজস্থানের কোনো এক পঙ্গপাল-আক্রান্ত এলাকায় বিমান হইতে আলড্রিন প্রক্ষেপণ

পঙ্গপাল

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

মানবজাতির অন্যতম ভয়ঙ্কর শত্রু হচ্ছে পঙ্গপাল। ইতিহাসের একেবারে সুরু থেকে পঙ্গপালেরা মানুষকে দুর্ভোগ দিয়ে আসছে। ইদানীং পঙ্গপালের উপদ্রব এত দূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে যে, এদের দ্বারা পৃথিবীর অধিবাসীদের এক-চতুর্থাংশের সমগ্র খাদ্য বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

আধুনিক কালে পঙ্গপালের আক্রমণ-জনিত শস্যাদির মহামারী সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়রূপে দেখা দেয় ১৯৫১-৫২ সনে মধ্য-প্রাচ্যে। ইরাণ, ইরাক, জর্ডন এবং সৌদি আরবের হাজার হাজার মাইল পরিমিত স্থানের সমস্ত সবুজ এবং প্রবর্দ্ধমান শস্যাদি বিনষ্ট হয়। বর্ত্তমান বৎসরে শস্যাদির এই মহামারী আফ্রিকার জঙ্গল থেকে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত প্রসার লাভ করেছে—ভারত ও পাকিস্থানের চল্লিশ কোটি অধিবাসী রয়েছে এই পঙ্গপাল-উপদ্রুত এলাকায়।

আমাদের বাগানে আমরা যে সকল ফড়িং দেখতে পাই তারা অপেক্ষাকৃত ঢের কম অনিষ্টকারী, কেননা তারা সংখ্যায় অল্প। কিন্তু উষ্ণ অর্দ্ধ মরু-দেশগুলিতে গোমহিষাদির তৃণজাতীয় খাদ্যের প্রাচুর্য্য হলে পর কোন কোন জাতির পতঙ্গদের বংশবৃদ্ধি সুরু হয়, তাদের উৎপাদনকার্য্য দ্রুততর হয় এবং তাদের আহারের পরিমাণ বেড়ে যায়—তারা যত বেশী খায় তত বেশী বংশবৃদ্ধি করে।

এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে অনবরত এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ধারণাতীত অঙ্কে গিয়ে দাঁড়ায়। কখনও কখনও পঙ্গপাল-উৎপাদন এলাকার এক বর্গগজ পরিমিত স্থানে ডিমের সংখ্যা পাঁচ হাজারে পর্য্যন্ত দাঁড়ায় এবং উক্ত এলাকা ১,৮৮,০০০ একর স্থান জুড়ে বিস্তৃত হয়।

এই সমস্ত উৎপাদন-এলাকা পরিত্যাগ করে ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপালেরা স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। একটা বড় ঝাঁকে পঙ্গপালের সংখ্যা হয় আন্দাজ ৫০ কোটি এবং তারা ২০০ বর্গমাইল পরিমিত স্থানের শস্যাদি ধ্বংস করে। একটি ঝাঁক দু'হাজার বর্গমাইলের অধিক স্থান জুড়ে ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল এমন দৃষ্টান্তও আছে।

যেখানে ডিম ফুটে বের হয় সেখান থেকে ৪০০০ মাইল দূরে পর্য্যন্ত একটা পঙ্গপালের ঝাঁককে দেখা গিয়েছে। আর একটি ঝাঁক দৃষ্ট হয়েছিল সমুদ্র-নিকটতম স্থলভাগ থেকে ১২০০ মাইল দূরে। একথাও জানা গেছে যে, ১৫০০০ ফুট উচ্চ পর্ব্বত পর্য্যন্ত তারা অতিক্রম করেছে।

পঙ্গপাল বিমানের মত উড্ডীয়মান হয়। এর দুই প্রস্থ ডানা আছে। বাইরের দিকের পক্ষদ্বয় দৃঢ়ভাবে বসানো এবং সেগুলো থাকে বিমানের পাখা দুটির ধরণে আর কোমল আভ্যন্তরীণ পাখাগুলি দ্রুত স্পন্দিত হতে থাকে এবং প্রপেলারের কাজ করে। পঙ্গপালের ক্ষুদ্র কিন্তু শক্ত চোয়াল প্রকৃতির সর্ব্বাপেক্ষা ধ্বংসকারী শক্তিসমূহের অন্যতম। রৌদ্র করোজ্জ্বল দিনে হয়ত আপনি একটি সবুজ শস্য-ক্ষেত্রের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন—দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিলে দেখতে পাবেন দিগন্তের কাছে একখণ্ড ছোট কালো মেঘের আবির্ভাব হয়েছে—দেখতে দেখতে তা সঞ্চরমাণ ঝোড়ো মেঘের মত দ্রুত বর্দ্ধিতায়তন হতে লাগল। শীঘ্রই ঐ চলমান মেঘ সূর্য্যকে

ঢেকে ফেলল আর বাতাসে অনুরণিত হয়ে উঠল গভীর গুঞ্জনধ্বনি। এ হচ্ছে উড়নশীল পঙ্গপালের ঝাঁক।

অকস্মাৎ গোটা ঝাঁকটা ক্ষেত্রের উপর আপতিত হ'ল—সূর্য্য

পঙ্গপালদের ডিম পাড়িবার আদর্শ স্থান—একটি বালুকাময় পাহাড়

আবার হ'ল দৃশ্যমান, কিন্তু সবুজ ক্ষেত্রটি এখন ধারণ করেছে পিঙ্গল-বর্ণ এবং মনে হচ্ছে সমগ্র সমতলভূমি যেন বুকে হেঁটে চলেছে। পঙ্গপালেরা ধীরে ধীরে কাজ করে বটে, কিন্তু তাদের ধ্বংসকার্য্য সম্পন্ন হয় নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে। তারা শস্য, পাতা এবং গোটা এমন ভাবে ভক্ষণ করে যে, শেষ পর্য্যন্ত শস্যক্ষেত্রের সবুজ শোভা অন্তর্হিত হয়ে নগ্ন মাটি বেরিয়ে পড়ে। এই ধ্বংসলীলার অবসানে দেখা যায় সবুজ শস্য-ক্ষেত্র পরিণত হয়েছে ধূসর মরুপ্রান্তরে।

বিরাট সমতল ক্ষেত্র কম থাকায় ইউরোপই একমাত্র মহাদেশ যা পঙ্গপালের আক্রমণে মারাত্মকরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকায় পঙ্গপালের আক্রমণ অনবরত লেগেই আছে। সম্প্রতি ৬০ মাইল প্রস্থবিশিষ্ট এক বিরাট পঙ্গপালবাহিনী কর্ত্তৃক ব্রাজিল আক্রান্ত হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৭০ সনে শত শত লোক পঙ্গপালের অত্যাচারে নিরুপায় হয়ে নিজেদের জন্মস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তার পর থেকে পশ্চিম-আমেরিকায় পঙ্গপাল-সৃষ্ট শস্যাদির মহামারী হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু সেখানকার সরকার যদি সময়মত উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করতেন তা হলে পঙ্গপালের অত্যাচারে পশ্চিম-আমেরিকার অন্ততঃ ছয়টি রাষ্ট্রে কৃষিকার্য্য খতম হয়ে যেত। পঙ্গপালের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীব্যাপী সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার সূচনা হয় ইংলণ্ডে পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে। ১৯২৮ সনে ব্রিটিশ পূর্ব্ব-আফ্রিকায় শস্যের মহামারী মারাত্মক ভাবে দেখা দেয়। অনতিবিলম্বে ডাঃ বোরিস উভারোভ নামক রাশিয়ার জনৈক বৈজ্ঞানিকের অধীনে লণ্ডনে একটি গবেষণা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পঙ্গপাল সমস্যা নিয়ে যারা প্রথম মাথা ঘামান ইনি তাঁদের এক জন।

সমগ্র পৃথিবীতে সম্ভবতঃ উভারোভই পঙ্গপাল সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা ওয়াকিবহাল লোক। তিনি পঙ্গপালের উৎপত্তি-স্থলগুলি এবং বিরাট বিরাট ঝাঁকসমূহের গতিপথের চার্ট তৈরি করেছেন। পঙ্গপাল-কবলিত যে সকল দেশের কল্যাণ-সাধনে গ্রেট ব্রিটেনের আগ্রহ আছে সেগুলির অধিকাংশের স্কাউটরা তাঁকে তথ্যাদি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। স্কাউটদের দ্বারা সংগৃহীত তথ্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করে উভারোভ পঙ্গপালের অত্যাচার-প্রতিরোধের ব্যবস্থার জন্য তৎপরতার সঙ্গে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। স্কাউটরা যদি এ ধরণের রিপোর্ট দেয় যে, আরবে ডিম ফুটে বের হওয়া এক বিরাট পঙ্গপালের ঝাঁক রওনা হয়েছে পাকিস্থানের দিকে, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্থান সরকারকে সতর্ক করে দেওয়া হয় এবং পরে দেখা হয় যে, উক্ত গবর্ণমেণ্ট নিজে এ সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

কখনও কখনও কিন্তু স্থানীয় সরকারের পক্ষে বাইরের সাহায্যের

(বামে) খোলস পরিত্যাগ করিবার পর একটি পরিণতিপ্রাপ্ত পাখাওয়ালা পঙ্গপাল, (দক্ষিণে) খোলস ছাড়াইবার অবস্থায় একটি পঙ্গপাল

প্রয়োজন অপরিহার্য্য হয়ে উঠে। ১৯৫১-৫২ সনে মধ্য-প্রাচ্যে পঙ্গপাল-নিধনকার্য্যে প্রধান সাহায্য এসেছিল গ্রেট ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। পূর্ব্ব-আফ্রিকার উচ্চভূমিতেও একবার পঙ্গপালদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হয়। ঝাঁকে ঝাঁকে

পঙ্গপাল উত্তরাভিমুখে উড়ে চলতে থাকে এবং ইথিওপীয়া ও এরিট্রিয়ার মধ্যবর্তী এক শত মাইলব্যাপী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শস্য-সংহারের নিদর্শন রেখে যায়। অগ্রসরণের পথে তারা লোহিত সাগর

খুব সকালে অথবা সন্ধ্যায় পরিণতিপ্রাপ্ত পঙ্গপালসমূহ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে এবং এই সকল ঝোপঝাড়ে প্রবেশ করে।

অতিক্রম করে। আরবের মরুভূমি, হাজার হাজার মাইলব্যাপী শুষ্ক বালুকারাশি তাদের প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয় নি — তারা উড়ে চলল পারস্য উপসাগরের উপর দিয়ে, পাখা বিস্তার করে পার হয়ে গেল ইরাক, ইরাণ ও জর্ডন।

১৯৫১ সনের ১৭ই এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি-বিভাগের নিকট ইরাণ থেকে সাহায্যের জন্য আবেদন এসে পৌঁছয়। দশ দিন পরে নেভাদার পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রণের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী বিল মাবী আটটি পাইপার কাব বিমান-সহ রওনা হলেন তেহেরাণের পথে। তিনি প্রচুর পরিমাণে নব-উদ্ভাবিত অালড্রিন নামক বিষ সঙ্গে করে নিয়ে যান। আমেরিকার পশ্চিম অঞ্চলে পঙ্গপাল-ধ্বংসে এই বিষের আশ্চর্য্যজনক কার্য্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছিল। এক গ্যালন জলে দু' আউন্স পরিমাণ এই বিষ দ্রবীভূত করে এক একর জমির উপর প্রক্ষেপ করলে, প্রায় প্রত্যেকটি পঙ্গপাল মারা যায়।

মাবি ঝটপট পঙ্গপালের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু করে দিলেন। তাঁর নির্দ্দেশে স্থানীয় লোকেরা উটের পিঠে এবং রেডিও সম্বলিত জিপে চড়ে পঙ্গপালের ঝাঁকের উপর গিয়ে চড়াও হ'ল। যে পতঙ্গের ঝাঁক সারা রাত্রির জন্যে ক্ষেতে অবতরণ করেছে, তারা কিন্তু পর দিন সকালে সূর্য্যালোকে পাখা শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত শূন্যে উড্ডীয়মান হয় না। এমতাবস্থায় পঙ্গপাল-ধ্বংসকারীদের নীতি হ'ল, কোনও স্থানে পঙ্গপালের দল অবতরণ করামাত্র অবিলম্বে মাবির নিকট খবর দেওয়া। বিমানসমূহ তাদের নির্দ্দেশিত স্থানের চার পাশে অবস্থান করত, ক্ষেত্রের নিকটতম স্থানের বিমান প্রত্যুষেই সুরু করত তরল বিষ-প্রক্ষেপণ।

এমনি ভাবে ১৯৫১ সনে ইরাণে পঙ্গপাল-ধ্বংসকার্য্য বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়, ফলে সেখানে বেশীর ভাগ শস্যই রক্ষা পায়।

তারপর এল ১৯৫২ সনের বসন্তকাল; সঙ্গে সঙ্গেই পঙ্গপাল-দের প্রাদুর্ভাব হ'ল পুনঃ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বিপুলতর সংখ্যায়। গোটা বসন্তকাল এবং গ্রীষ্মকাল বিল মাবি বিমানযোগে সেই সকল স্থানে যেতে লাগলেন যেখানে এই পতঙ্গের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ভারত, পাকিস্থান, আফগানিস্থান, জর্ডন, ইরাক এবং ইরাণ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে তিনি কাজ করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ পঙ্গপাল-নিয়ন্ত্রণ-বিভাগও এই একই অঞ্চলে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ল। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অগণিত পঙ্গপাল ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে লাগল।

কিন্তু এর শেষ যে কোথায় তা এখনও মানব-বুদ্ধির অগম্য। বর্ত্তমান বৎসরে পঙ্গপালের সংখ্যা যেরূপ ক্রমবর্দ্ধমান তাতে এদের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযান অবিলম্বে সুরু করা অনিবার্য্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।
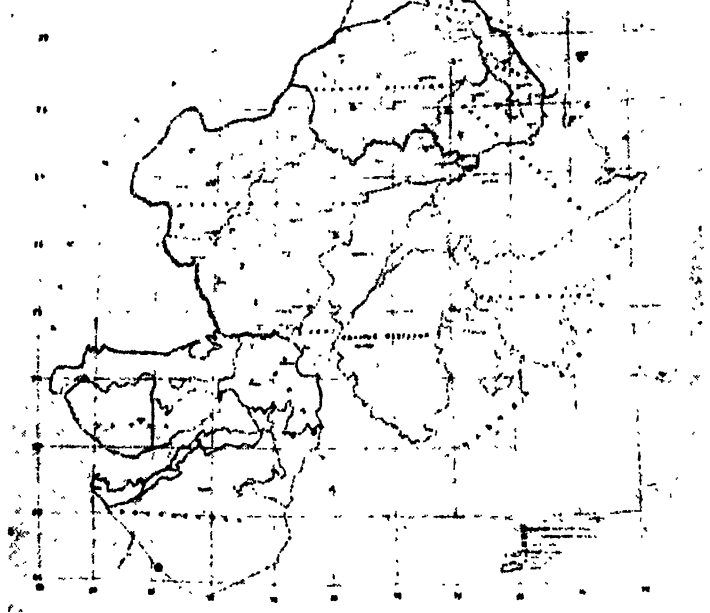
ভারতের পঙ্গপাল-প্রতিরোধ কেন্দ্রাবলী

ভারত এবং পাকিস্থানে মরুভূমির পঙ্গপালের বংশবৃদ্ধির হার দ্রুত প্রভূত পরিমাণে বেড়ে চলেছে এবং তা আরও দু'মাস কাল সমভাবেই চলবে—লণ্ডনের পঙ্গপাল-প্রতিরোধ গবেষণা-কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সাম্প্রতিক সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে এরূপ মত প্রকাশিত হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত বিবরণীর মন্তব্য থেকে জানা যায় যে, জুলাই মাসে পাকিস্থানে পঙ্গপালের ঝাঁকের গতি ছিল প্রধানতঃ সিন্ধু, ভাওয়ালপুর এবং পশ্চিম পঞ্জাবের দিকে। ঐ সময় ভারতবর্ষে নিম্নলিখিত অঞ্চলসমূহে পঙ্গপালের প্রাদুর্ভাব হয়: রাজস্থান, পঞ্জাব, পেপসু, আজমীর, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ, বিন্ধ্যপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশের উত্তর-পূর্ব্ব ভাগ।

রাজস্থান, পূর্ব্বপঞ্জাব, পেপসু, আজমীর, দিল্লী ও উত্তর-প্রদেশের মরু এবং কথিত অঞ্চলে পঙ্গপালেরা ব্যাপক ভাবে ডিম পাড়ে এবং জুলাইয়ের মাঝামাঝি জয়সলমীরে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুনো সুরু হয় আর ক্রমে ক্রমে তা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে বলা হয়েছে—আগামী দু'মাসে পাকিস্থানে এবং ভারতে পঙ্গপালেরা আরও বিপুল সংখ্যায় ডিম পাড়বে এবং অগণিত বাচ্চা বের হবে। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণী পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায়, মরুভূমির পঙ্গপালের ঝাঁক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ক্রমশঃই ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে এবং তাদের অসম্ভব রকম বংশবৃদ্ধিও হচ্ছে। তুর্কী এবং ইরাকে এবারকার মত পঙ্গপাল নিধনকার্য্য সমাপ্ত হয়েছে জুলাই মাসে। ওদিকে আবার কিন্তু ইরাণে জুন এবং জুলাই মাসে পঙ্গপালের ঝাঁক দেখা গিয়েছে।

লক্ষ কোটি পঙ্গপাল ধ্বংস করা সত্ত্বেও বৎসরকাল পূর্ব্বে যা ছিল, আজকের দিনে পৃথিবীতে পঙ্গপালের সংখ্যা সম্ভবতঃ তার চেয়ে বেশী। এমন দিন হয় ত আসতে পারে যখন মনুষ্য-সমাজের উদ্বর্ত্তনের জন্য বিভিন্ন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই সমস্ত পতঙ্গের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে হবে।

* ১৯৫৩, আগষ্ট সংখ্যা *Readers Digest*-এ প্রকাশিত The years of the Locust নামক প্রবন্ধ এবং ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস্ প্রদত্ত তথ্যাদি অবলম্বনে।

সেকালের কুলীন ব্রাহ্মণ-সমাজ

(কুল-রক্ষা)

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

(রাজা রামমোহন রায়ের পর এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমলের পূর্ব্বে একটি প্রকৃত ঘটনা আমি গল্পচ্ছলে বর্ণনা করিব। গল্পটি আমি শুনিয়াছিলাম একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে। তিনি আমার পিতার দূরসম্পর্কীয় মাতুল প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায়। হুগলী জেলার জনাই গ্রামে তাঁহার বাস। জনাই গ্রামটি ব্রাহ্মণ-প্রধান। শত শত কুলীন ও অকুলীন ব্রাহ্মণ এই গ্রামের অধিবাসী। আমি যে ঘটনার কথা লিখিতেছি তাহা আমার ঐ দাদামহাশয় নিজে দেখিয়াছিলেন। তিনি জীবিত থাকিলে তাঁহার বয়স এক শত তিরিশ বৎসরেরও অধিক হইত। এই প্রাণবল্লভ বাবু হাওড়া আদালতে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ ব্যবহারাজীব ছিলেন।)

দাদামহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, জনাই গ্রামে রাধাচরণ মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বলা বাহুল্য, এই গল্পে আমি যে সকল নাম ব্যবহার করিব তাহা সমস্তই কাল্পনিক। এই মুখুয্যে মহাশয়ের দুইটি পুত্র ও তিনটি কন্যা। পুত্র দুইটি বড়। ষোল-সতের বয়সের পূর্ব্বেই ছেলে দুইটির বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু মুশকিল হইল কন্যাদের বিবাহ লইয়া। বল্লালসেনের ব্যবস্থা মত কুলীনদিগের কন্যাগত কুল। অর্থাৎ, কোন কুলীনের পুত্র যদি একটু নীচু ঘরে বিবাহ করে তাহা হইলে সেই পুত্রেরই কুলে দোষ হয়। তাহার পিতা বা সহোদরদের কুলে কোন দোষ হয় না। তাহাদের কুল ঠিক বজায় থাকে। কিন্তু কোন কুলীনের কন্যার যদি একটু নীচু ঘরে বিবাহ হয় তাহা হইলে সেই কন্যার পিতা এবং তাঁহার পুত্রকন্যাগণ সেই ন ঘরের দোষযুক্ত হইয়া থাকেনটী। এমন কি সেই কন্যার বৈমাত্রেয় ভ্রাতারাও সেই দোষে দোষী বলিয়া গণ্য হন।

রাধাচরণ মুখুয্যে মহাশয় পুত্রদিগের বিবাহে কুল রক্ষার জন্য এতটা কড়াকড়ি করেন নাই। কিন্তু কন্যার বিবাহের সময় তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, কন্যাদিগকে কিছুতেই "নীচু ঘরে" অর্থাৎ দোষযুক্ত ঘরে বিবাহ দিবেন না। যেমন করিয়াই হউক পৈত্রিক কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিতেই হইবে। সমান ঘর খুঁজিতে খুঁজিতে মেয়েদের বয়স বাড়িতে লাগিল। বড়মেয়ে গৌরীর বয়স হইল ২০ বৎসর, মধ্যম দুর্গার বয়স হইল ১৭ বৎসর এবং ছোট মেয়ে উমা ১৫ বৎসরে পদার্পণ করিল। কিন্তু তাহাদের কপালে বর আর জুটিল না। মুখুয্যে মহাশয়ের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। এক শত বিঘার উপর নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল। অনেক ধনবান শিষ্যও ছিল। সেকালে কুলীন সন্তানগণ কৌলীন্য মর্য্যাদা স্বরূপ "গণ-পণ" হিসাবে মাত্র সতের টাকা পাইবার অধিকারী ছিলেন। ইহার অধিক নগদ টাকা তাঁহারা দাবি করিতে পারিতেন না। তবে কন্যার পিতা নিজের ইচ্ছানুসারে বরাভরণ, কন্যার অলঙ্কার ও ভূমি যৌতুক দিতেন। সুতরাং সেকালে, এখনকার মত, টাকার জন্য কন্যাদায় বলিয়া কিছু ছিল। মুখুয্যে মশায় কন্যাদের জন্য স্বঘরে পাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। চারিদিকে ঘটক প্রেরিত হইল। কিন্তু কোন পাত্রের কুলশীল তাঁহার পছন্দ হইল না। একজন ঘটক একটি পাত্রের সন্ধান আনিলেন। পাত্রটি সকল রকমেই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু মুখুয্যে মশায় গোপনে অনুসন্ধান করিয়া

জানিতে পারিলেন যে, কন্তার প্রপিতামহের এক বৈমাত্রের ভগিনীর যে বংশে বিবাহ হইয়াছে সে বংশে নাকি "কেশর কুনী" দোষ আছে। সুতরাং সেখানে তিনি কন্তা দিতে রাজী হইলেন না। আর একটি পাত্রেরও খবর পাইলেন। সেটিও সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ। কিন্তু তাহারা নাকি "বীরভদ্রি", অর্থাৎ নিত্যানন্দ বংশের সহিত তাহার সম্পর্ক আছে। সুতরাং "বীরভদ্রিতে" কন্তা দেওয়া চলে না।

অবশেষে মুখুয্যে মশায় একদিন খবর পাইলেন যে জনাইয়ের নিকটবর্ত্তী বাক্সা গ্রামে বৃদ্ধ হরিহর গঙ্গোপাধ্যায়কে তীরস্থ করা হইয়াছে। তাঁহার পুত্রপৌত্রেরা বৃদ্ধকে লইয়া উত্তরপাড়ায় গঙ্গাতীরে মুমূর্ষু নিকেতনে আজ দুই দিন হইল গিয়া বাস করিতেছেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র মুখুয্যে মশায়ের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে যেন একখানি যবনিকা অপসৃত হইল। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া কেবল "পাত্রের অনুসন্ধানে যাইতেছি" বাটীতে এই সংবাদ দিয়া তিনি গ্রাম ত্যাগ করিলেন। যথাসময়ে তিনি উত্তরপাড়ায় গঙ্গাযাত্রী নিবাসে উপস্থিত হইলেন এবং মৃত্যুপথযাত্রী গঙ্গোপাধ্যায়কে বলিলেন, "আপনার পীড়ার কথা আমি কিছুই জানিতাম না। আজ খবর পাইবামাত্র আপনার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছি।" বৃদ্ধ গঙ্গোপাধ্যায় নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ মুখুয্যের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "রাধাচরণ এসেছ। আমি ত যাচ্ছি। ছেলেপিলেরা রইল। তুমি মাঝে মাঝে খোঁজখবর নিও।"

বলা বাহুল্য, মুখোপাধ্যায় মহাশয় অপেক্ষা গাঙ্গুলী মহাশয় পঁচিশ বৎসরের বড়।

রাধাচরণ বলিলেন, "খোঁজখবর নেব বলেই ত আমি এখানে ছুটে এসেছি। আপনি ত চললেন। কিন্তু যাবার পূর্ব্বে আমার একটা উপকার করে যান। আমার কুল রক্ষার ব্যবস্থা করে গেলে আপনার অক্ষয় স্বর্গ লাভ হবে।"

গাঙ্গুলী মহাশয় সবিস্ময়ে বলিলেন, "আমি তোমার কুল রক্ষা করব কেমন করে? আজকালকার ছেলেরা কি বাপ-মাকে মানে— না তাদের কথা রাখে? তারা যে এখন সব সাহেব হতে আরম্ভ করেছে। আমার ত দুটি ছেলেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে জান। তারা কি আর আমার কথা শুনে তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী হবে?"

রাধাচরণ বলিলেন, "আমি আপনার ছেলেদের কথা বলি নি। আমি আপনার কথাই বলছি। আপনি দয়া করে আমার গৌরীকে আপনার পায়ে স্থান দিন। তার আইবুড়ো নাম ঘুচিয়ে দিন। এই আমার ভিক্ষে। এতে আপনি আর অমত করবেন না।"

বৃদ্ধ গাঙ্গুলী মহাশয় এই কথা শুনিয়া তাঁহার নিষ্প্রভ চোখের কোণে একটু হাস্যের আমেজ টানিয়া বলিলেন, "আমি? আমি আর কতক্ষণ আছি? মা গঙ্গার কোলে এসে ত দু'রাত্তির কাটিয়ে দিলাম। বড় জোর আর একটা কি দুটো রাত্তির।"

রাধাচরণ বলিলেন, "তা হোক গৌরীর আইবুড়ো নাম ত ঘুচবে। তার পর যা থাকে তার কপালে। সেজন্য আপনাকেও ভাবতে হবে না, আমাকেও ভাবতে হবে না। আপনি শুধু কুলীনের কুলরক্ষা করে অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় করুন। আপনি বিজ্ঞ লোক, সবই ত জানেন। ব্রহ্মার সৃষ্টি এই কুলীনের কৌলীন্য মর্য্যাদা। যে কুলাঙ্গার এ মর্য্যাদা রক্ষা না করে তাকে যে অনন্ত কাল নরক ভোগ করতে হয়। আমাকে সেই নরক থেকে আপনি রক্ষা করুন। আপনি বেগের গাঙ্গুলী। আমি ফুলের মুখুটি। আমরা পরস্পর সমান। আপনি দয়া করে রাজী হন। আমি আমার মেয়েকে এইখানে এনে আপনার হাতে সমর্পণ করব। আপনি আপনার ছেলেদের ডেকে তাদের একটু বুঝিয়ে বলুন. "কুলীনের কুল রক্ষা করা কাশীতে শিব স্থাপনা করার চেয়েও বড় কাজ। টাকা থাকলে সকলেই কাশীতে গিয়ে শিব স্থাপনা করতে পারে। কিন্তু কুলীনের কুল রক্ষা করা কি যার তার কাজ? আপনি আপনার ছেলেদের বুঝিয়ে বলুন। আমিও তাদের বুঝিয়ে বলব। আপনি বলুন আমি তাদের এইখানে ডেকে আনি।" এই কথা বলিয়া মুখুয্যে মহাশয় বৃদ্ধ গাঙ্গুলী মশায়ের দুইটা হাত চাপিয়া ধরিলেন। বৃদ্ধ তখন অতিকষ্টে বলিলেন, "ভাল, তাই হোক। আমি যাবার সময় কুলীনের ছেলের মনে আর কষ্ট দিয়ে যাব না। আমি তোমার মেয়েকে পত্নী রূপে গ্রহণ করব। তুমি আমার ছেলেদের আর নাতিদের এইখানে ডেকে আন।"

এই কথা শুনিয়া প্রৌঢ় মুখুয্যে মশায় আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ বাহিরে গিয়া গাঙ্গুলীর পুত্রগণকে ও আত্মীয়গণকে ডাকিয়া আনিলেন। তাহারা রোগীর শয্যার নিকট উপস্থিত হইলে বৃদ্ধ গাঙ্গুলী পুত্রদিগকে বলিলেন, "আমি রাধাচরণের কাছে একটা বিষয় বাগ্‌দত্ত হয়েছি। আমি মা-গঙ্গার কূলে এসে তাকে কথা দিয়েছি যে আমি তার বড় মেয়ে গৌরীকে বিবাহ করব। তোমরা তাতে কোন আপত্তি করো না। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনে সিংহাসন ছেড়ে বনবাসী হয়েছিলেন, একথা আমাদের শাস্ত্রে আছে। তোমরা যদি এতে বাধা দাও তবে আমাকে সত্যভঙ্গের জন্য অনন্ত নরকে বাস করতে হবে। তোমাদের কিছুই করতে হবে না। যা-কিছু করবার রাধাচরণই সব করবে।"

পিতার কথা শুনিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভু ভাবিল পিতা বুঝি প্রলাপ বকিতেছেন। সে মধ্যম সহোদরকে বলিল, "হরিশ, বাবা প্রলাপ বকছেন। আর বিলম্ব করো না, চল ধরাধরি করে এই বেলা অন্তর্জ্জলির ব্যবস্থা করা যাক্।"

সেই কথা শুনিয়া রাধাচরণ বলিলেন, "শম্ভু, না প্রলাপ নয়। উনি সজ্ঞানেই আছেন এবং সজ্ঞানেই কথা বলছেন। তোমরা সৎ পুত্র, বাপকে তাঁর সত্যপালনে আপত্তি করো না। আমি এখনই বাড়ীতে গিয়ে আমার মেয়ে গৌরীকে আর আমাদের পুরুতমশাইকে নিয়ে শিগ্গীর ফিরে আসছি। বিবাহের যা-কিছু প্রয়োজন এই

ত্তরপাড়ার বাজারেই সব কিনতে পাওয়া যাবে। আমি তোমা-র হাতে কিছু টাকা দিয়ে যাই, তোমরা সব কেনা-কাটা করে ।। আমি গৌরীকে আর পুরুত মশাইকে নিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ ইখানে ফিরে আসব। তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না। ঙ্গুলী মহাশয় পুণ্যাত্মা, ঋষিতুল্য লোক। তাঁর সংকার্যের ফলে মাদের গাঙ্গুলী-বংশের মুখ উজ্জ্বল হবে।" এই বলিয়া শশুর তে দশটা টাকা দিয়া দ্রুতপদে মুখুয্যে মশায় স্বগ্রাম অভিমুখে যাত্রা রলেন।

রাধাচরণ প্রস্থান করিলে গাঙ্গুলী মহাশয় পুত্রদিগকে বলিলেন, খ বাবা, কুলীনের কুল রক্ষা করা কুলীনেরই কাজ। কলিমজুরের জ নয়। তাই অনেক ভেবেচিন্তে আমি তার কথায় রাজী য়েছি। তারপর তার মেয়ের কপালে বিধাতা যা লিখেছেন তাই রে। তোমার আমার সাধ্য নেই যে সে লেখা খণ্ডন করি।"

সেকালে লোকের পক্ষে দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে তিন চারি ক্রোশ অতিক্রম করা অতি সহজসাধ্য ছিল। তিনি বেলা দুইটা ড়াইটার মধ্যে নিজ বাটীতে উপস্থিত হইয়া উল্লাসভরে পত্নীকে লেন, "ওগো, গৌরীর বিয়ের কথাবার্তা পাকা করে এলাম। রীকে নিয়ে এখনই উত্তরপাড়ায় যেতে হবে। আজ রাত্রেই বাহ। বর এখানে আসতে পারবে না। আমার অনেক সাধ্য-ধনার পর বললে, "তবে আপনি আজকেই আপনার মেয়েকে খানে আনুন। আমার এখন যাবার সময় নেই। আমাকে বার দুই-এক দিনের মধ্যেই এখান থেকে যেতে হবে।" তুমি র মেয়েকে নিয়ে কাপড়চোপড় পরে তৈরি হয়ে থাক! আমি বরা ডুলেকে বলিগে, সে তার গাড়ী নিয়ে এখনই আসবে। র গাড়ী এলেই তোমরা চার জনেই দুর্গা দুর্গা বলে বেরিয়ে বে। আমি আমাদের পুরুত বিষ্টু ঠাকুরকে ডেকে নিয়ে সি।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাগা আজকেই বিয়ে? এতদিন র কি তবে গৌরীর বিয়ের ফুল ফুটলো? তারা আমাদের স্বঘর ? তাদের কুলে ত কোন দোষ নেই?"

রাধাচরণ বলিলেন, "তুমি পাগল হয়েছ? সে আমার খুব য়া ঘর। রাধু মুখুয্যে কুল রাখতে না পারলে মেয়েকে গলা প মেরে ফেলবে, তবু কুলে কালি দেবে না।" এই বলিয়াই নি গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান এবং বিষ্টু ঠাকুরের উদ্দেশ্যে দ্রুতপদে স্থান করিলেন।

এদিকে উত্তরপাড়ায় শম্ভু, হরিশ প্রভৃতি সমস্ত কেনা-কাটা য করিয়া রাধাচরণের প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় পথের দিকে চাহিয়া সিয়াছিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে রাধাচরণ ও বিষ্টু ঠাকুর আসিয়া সংবাদ দিলেন যে মেয়েরা গাড়ীতে আসছে। দশ-বারো মিনিটের মধ্যেই এসে পৌছবে। বিষ্টু ঠাকুর পথিমধ্যে রাধাচরণের মুখে পাত্রের সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, "এ বেশ হয়েছে! বুড়ো যে এত সহজে রাজী হবে তা আমি ভাবতে পারি নি। আজকে পাঁজীতে বিয়ের লগ্ন না থাকলেও যে কোন দিন গোধূলি লগ্নে বিবাহ হতে পারে এ ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে।" গাঙ্গুলী মশায়ের মধ্যম পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা ত বসতে পারবেন না। তিনি কি বিছানায় শুয়েই কনের পাণি গ্রহণ করবেন?" বিষ্টু ঠাকুর বলিলেন, "টোপর মাথায় দিয়ে বসা, ছাদনাতলায় বরকে নিয়ে গিয়ে বরণ করা ওসব মেয়েলি শাস্ত্র। ওসব এক এক দেশে এক এক রকম প্রথা। ওসব দেশাচার পালন না করলেও বিবাহের কোন ক্ষতি হয় না। কনের বাপ বলবেন, "এসা সালঙ্কারা সবস্ত্রা কন্যাং অহং সম্প্রদদে। আর বর বলবেন, 'ওঁ স্বস্তি, অহং গৃহ্ণামি। বাস বিয়ে হয়ে গেল। তারপর বাকি রইল আভ্যুদয়িক। সেটা বিবাহের রাত্রেও হতে পারে, কিংবা বিয়ের পর যে কোন দিন হতে পারে। বিয়ের রাত্রিতে হলে বেশী সময় লাগে না। আমি সংক্ষেপে সেরে নেব! আপনারা তার জন্য চিন্তা করবেন না।"

রাধাচরণ মুখুয্যে কন্যা সম্প্রদানের সময় একটা অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তিনি বড় মেয়ে গৌরীর কাপড়ের সঙ্গে, সকলের অলক্ষ্যে, একটা সরু সুতা বাঁধিয়া সেই সুতার অপর প্রান্ত মধ্যমা কন্যা দুর্গার এবং কনিষ্ঠা কন্যা উমার বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। বিবাহের সময় গৌরীর মধ্যমা এবং কনিষ্ঠা ভগিনীরাও বিবাহ-কক্ষের এক পার্শ্বে বসিয়াছিল। রাধাচরণের উদ্দেশ্য ছিল বৃদ্ধ গাঙ্গুলীর হস্তে একযোগে তিনটি কন্যাকেই সম্প্রদান করিবেন। তাই তিনি একগাছা সুতার দ্বারা কন্যাদের অঞ্চলগুলি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।

আভ্যুদয়িকের সময় গাঙ্গুলী মহাশয় যখন গৌরীর সিঁথিতে সিন্দুর পরাইয়া দেন সেই সময় রাধাচরণের গৃহিণী দুর্গাকে ও উমাকে অন্তরালে লইয়া গিয়া তাহাদের সীমন্ত সিন্দুর-শোভিত করিয়া দিলেন। রাধাচরণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। সংপাত্রে ও স্বঘরে একযোগে তিনটি কন্যা সম্প্রদান করা হইল।

তাহার পর? আরও কিছু শুনিতে চাহেন? দুই দিন পরে বৃদ্ধ গাঙ্গুলীর গঙ্গাপ্রাপ্তি হইলে রাধাচরণ তিনটি কন্যার কপালে সিন্দুর মুছিয়া সাদা থান ধুতি পরাইয়া হৃষ্টচিত্তে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন পূর্বক বিজয় গৌরবে ঘোষণা করিলেন যে তিনি ফাঁকি দিয়া এক ঢিলে তিন পাখী মারিয়াছেন। তাঁহার ঢিলের আঘাতে পাখী তিনটি মরিল, কি বিধবা হইয়া জীবনমৃত অবস্থায় রহিল সে আলোচনার আর প্রয়োজন নাই।

আকাশ-গঙ্গা

শ্রীউমা দেবী

উথাল-পাথাল আকাশ-গঙ্গা নামে
শিব কই এই শিবহীন নগরীতে ;
মেঘ-বাহনারা মেঘনা-নদীর বাঁকে
বিদ্যুৎ রাঙা কলসীটি নিয়ে কাঁখে
হঠাৎ চমকে থামে—
ইতি-উতি চায় স্তম্ভিত ইঙ্গিতে—
উথাল-পাথাল আকাশ-গঙ্গা নামে
শিব কই হায় শিবহীন নগরীতে ?
শিব কই ? থামো, ক্ষণেক দু-চোখ বুঁজে
দেখ একবার হৃদয়ারণ্য খুঁজে।
হৃদয়ারণ্যে গহন গভীর রাত
নেমেছে অকস্মাৎ—
চাঁদ মরে গেছে, তারার ফুলকি ছাই—
মরা জোছনার প্রেতেরা নেমেছে তাই
ফুল পাতাহীন তরুদের নীল-শাখে।
পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে
বাসনা-গুহার হিম শিলাতল
কার কান্নায় হয়েছে পিছল—
অনেক অনেক প্রজাপতিদের
রঙীন রঙীন পাখা
ঝরানো ফুলের পাপড়ির মত
নিপুণ তুলিতে আঁকা
বিস্মরণের ধুলায় পড়েছে ঢাকা।
শিব নাই—নাই, অরণ্য নির্জন
হিমালয়ে বুঝি চ'লে গেছে তপোধন।
উথাল-পাথাল আকাশ-গঙ্গা নামে
শিব কই হায়— শিবহীন নগরীতে ;
বিদ্যুৎঘাতবিদীর্ণ বক্ষের
মেঘমোহম্লান নিমীলিত চক্ষের
দৃষ্টিতে ছায়া নামে
ইতি-উতি চাই স্তম্ভিত ইঙ্গিতে-
আকাশ-গঙ্গা হঠাৎ চমকে থামে—

শিব কই এই শিবহীন নগরীতে
শিব নাই—থামো, ক্ষণেক দু'চোখ বুঁজে
ভাবি একবার কোন্খানে পাবো খুঁজে ?
এই যে—এই ত হিমালয় হিমরত
স্থিত পৃথিবীর মানদণ্ডের মত।

মুঠিভরা মণিমাণিক্য গৈরিকে
কত মরকত ওষধি যে দিকে দিকে।

ওই যে তুঙ্গ কৈলাস গিরি-মালা
শিখরে শিখরে বজ্র-অনল ঢালা—
নাগবালা আর সিদ্ধ-কন্যারা
মেঘময় পথে বিচরণ করে যারা
ওরি শিখরে কে চন্দ্রশেখর জাগে
অনুরাগবতী ধরা তার বৈরাগে !

গত জন্মের প্রাণপ্রিয়তমা কে সে
নব কলেবর নিয়েছে মোহন বেশে --
সিন্ধু যেমন চন্দ্রের টানে
হয় উদ্বেল গগনের পানে,
তেমনি হরের বিভ্রম জাগে
গৌরীর মুখ-চাঁদে --
হায় ! কই শিব, কই কৈলাস ?
অতন্দ্র-আশারা কাঁদে।
ইট-ভরা শুধু স্তূপীকৃত সাদা পাতা,
কৈলাস নয়—নগরী এ কলিকাতা।

উথাল-পাথাল আকাশ-গঙ্গা নামে
শিব কই এই শিবহীন নগরীতে ;

পুঞ্জিত ব্যথা সঞ্চিত আশা নিয়ে
কে বেঁধেছে সারা আকাশকে মেঘ দিয়ে —
কে ওরা—চমকে থামে
ইতি-উতি চায় স্তম্ভিত ইঙ্গিতে—
উথাল-পাথাল আকাশ-গঙ্গা নামে
শিব কই হায় শিবহীন নগরীতে !

অতুলপ্রসাদের গান

শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্ত্তী

অন্তর হইতে আপনার বেগে উৎসারিত হইয়া যে কাব্যের রসস্রোত সৃষ্ট হইয়াছে, কেবলমাত্র অন্তরের অনুভূতি দিয়াই তাহার যথার্থ রসোপলব্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু উপলব্ধিতেই অনুভূতির চরম সার্থকতা নহে। তাই মানুষ তাহার উপলব্ধ ধনকে চিরদিন বাহিরে আনিতে চাহিয়াছে—তাহাকে ব্যক্ত করিতে এবং তাহার রূপ নির্ণয় করিতে চাহিয়াছে। আমরা জানি যে সব সময় এই প্রয়াস সফল হয় না; কিন্তু মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হইতে ইহার উদ্ভব বলিয়া এইরূপ অসফলতা ক্ষমার্হ বলিয়াই গণ্য হইবে। এই সাহসেই গায়ক-কবি অতুলপ্রসাদের গানের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

রবীন্দ্র-যুগে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত যে কয়টি উজ্জ্বল নক্ষত্র বাংলার সাহিত্যাকাশকে দীপ্তিময় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রবাসী কবি অতুলপ্রসাদ অন্যতম। রবীন্দ্র-সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়াই ইঁহাদের বাংলা-সাহিত্য-মণ্ডলে আবর্ত্তন একথা সত্য বটে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের পরিব্যাপ্তি ও পরিপুষ্টিতে যে ইঁহাদের দান অসামান্য তাহাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। বাংলা ভাষাকে যাঁহারা "মোদের গরব মোদের আশা" করিয়াছেন তাঁহাদের সহিত অতুলপ্রসাদের নামও যুক্ত থাকিবে।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যবহারাজীবী ছিলেন এবং এই সূত্রেই তিনি লক্ষ্ণৌয়ে জীবন কাটাইয়াছেন। ঢাকা নগরীতে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। বিলাত হইতে তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে আসেন ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। ব্যবহারিক জীবনে তিনি ছিলেন উদ্যোগী, সদালাপী এবং বন্ধুবৎসল। আপনার যোগ্যতা দ্বারা তিনি কর্ম্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। "অযোধ্যা ব্যবহারজীবী সঙ্ঘে"র তিনি সভাপতি ছিলেন। একবার ন্যাশনাল লিবারাল ফেডারেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন ও ১৯৩৩ সনে ইউ. পি. লিবারাল কন্‌ফারেন্সে সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত "উত্তরা" পত্রিকাখানির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক ছিলেন তিনিই। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায় বলিতে গেলে, "He was one of Bengal's foremost cultural ambassador to the Ayodhya People's Durbar" অর্থাৎ, অযোধ্যার জনসমাজে বঙ্গ-সংস্কৃতির অন্যতম দূত। কিন্তু আমরা জানি যে কবিকে কবির জীবন-চরিত হইতে পাওয়া বা জানা যাইবে না। তাঁহাকে জানিতে হইলে যে রসের উৎসকে তিনি উৎসারিত করিয়াছেন তাহারই সন্ধান করিতে হইবে। সেই রসের ধারাতেই তাঁহার আত্মার পরিচয় রহিয়াছে। সে রসের স্রোত তিনি তাঁহার সঙ্গীতে, তাঁহার গানের অলকানন্দায় প্রবাহিত করিয়াছেন। সুবিস্তৃত বাংলা ভাষার পরিপ্রেক্ষিত হইতে সাধারণ রসগ্রাহী হিসাবে আমরা তাঁহার কাব্য-স্রোতস্বিনীর বেগ, প্রবাহ, গতি, গভীরতা, ব্যাপ্তি ও বিশালতা নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিব।

স্বতঃই প্রশ্ন জাগে অতুলপ্রসাদ কোন্ প্রেরণাবশে এই রস-প্রবাহকে উৎসারিত করিলেন? অর্থাৎ, কোন প্রেরণা তাঁহাকে "আজীবন গান গাহিতে" উদ্বুদ্ধ করিল?

ইহা সত্য যে, গভীর রসানুভূতি হইতেই কবিগণ গান গাহিবার প্রেরণা পান। অর্থাৎ, বহিঃপ্রকৃতির রূপ রস শব্দ স্পর্শ বর্ণ গন্ধ কবির অন্তঃপ্রকৃতিকে যে আহ্বান জানায় তাহাতে সাড়া দেওয়াতেই কাব্যের প্রাণ সৃষ্ট হয়। আর বহিঃপ্রকৃতির সহিত নিবিড়-মিলনের এই যে নিরন্তর প্রয়াস ও ব্যগ্র আকুতি, তাহাতেই কাব্যের উৎস নিহিত রহিয়াছে। এই আবেগের প্রেরণাই কবিকে গাহিতে উদ্বুদ্ধ করে। অতুলপ্রসাদের "প্রকৃতি"তে আমরা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি যে বহিঃপ্রকৃতির আকর্ষণ কবির নিকট কত গভীর। "প্রকৃতি"র—

> "যাব না, যাব না, যাব না ঘরে,
> বাহির করেছে পাগল মোরে।
> বনের বিজনে মৃদুল বায়
> দুলে দুলে ফুল বলে আমায়
> —ঘরের বাহিরে ফুটিবি আয়
> পুলক-ভরে।"

অথবা

> "কে গো তুমি বিরহিণী আমারে সম্ভাষিলে
> এ পোড়া পরাণ-তরে এত ভালবাসিলে?
> কভু, হরিত-বসনে সাজি'
> কুসুমে ভরিয়া সাজি,
> মধুমাসে মধু হাসে মম পানে চাহিলে,
> কে আমারে সম্ভাষিলে?"

এই স্তবকগুলিতে বহিঃপ্রকৃতির আহ্বানকেই মাত্র ব্যক্ত করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে "প্রকৃতি"র প্রায় প্রতিটি গানই তিনি তাঁহার প্রিয় প্রকৃতির প্রেমে পাগল হইয়া গাহিয়াছেন। রহস্যময়ী, লীলাময়ী প্রকৃতিকে তিনি উহার নানা বৈচিত্র্যের মাঝ হইতে বুঝিয়া লইতে চাহিয়াছেন।—

> "বাদল ঝুমঝুম বোলে
> না জানি কি বলে,
> বুঝিতে পারি না কথা
> তবু নয়ন উছলে।"

বহিঃপ্রকৃতিকে না বুঝিবার বেদনাই এই গানটিতে ব্যক্ত হইয়াছে।

কিন্তু আমরা ভুলিব না যে তাঁহার গানের উৎসমুখ এত সীমাবদ্ধ নহে। কেবলমাত্র এইটুকু হইতেই যে প্রতিভা তাঁহার কাব্য

ধারাকে প্রবাহিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, যথার্থরূপে তাঁহার কাব্যরূপ নিরূপণ করিতে হইলে, আরও যে কয়টি ধারা আসিয়া তাঁহার কাব্যের গতিকে সাবলীলতা দিয়াছে তাহাদেরও সন্ধান লইতে হইবে।

প্রথমেই আমাদের চোখে পড়ে অতুলপ্রসাদের ভক্তিরসাত্মক গানগুলি। এইখানেই আমরা ভক্ত অতুলপ্রসাদকে, সাধক গায়ক-কবিকে আবিষ্কার করি। এই ভক্তি-সাধনাই যে তাঁহার কাব্যের বৃহত্তর অংশে রূপ পাইয়াছে তাহা আমাদের অবিদিত নহে। তাঁহার বহুসংখ্যক গান এই ভক্তিরই অভিব্যক্তি। বিশেষ করিয়া "বিবিধ" বিভাগ ও "দেবতা"র বহু গান এ স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

"প্রভাতে যারে নন্দে পাখী
কেমনে বল তারে ডাকি?
কুসুম লয়ে গন্ধ-বরণ
নিতি নিতি যারে করিছে বরণ,
এ কণ্টক বনে কি করি' চয়ন—
কোন্ ফুলে বল সে পদ ঢাকি?"

"ঘুরে ফিরে এলাম আবার তোমার চরণতলে,
কুড়িয়ে সবার ভালবাসা
ভবের ডালে বাঁধনু বাসা,
ঝড় এসে এক সর্বনাশা
হে নাথ ফেলল ভূমিতলে
দর্প আমার দর্পহারী ফেলে এলাম জলে।"

"যবে মানবের বিচারশালায় অবিচার পাব দান
যখন লুকানো নিন্দা আমারে আঁধারে হানিবে বাণ,
সহিব নীরবে, কহিব তখন
তুমি জান নাথ তুমি জান।"

আবার

"সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া
তুমি তো আমার রহিবে,
বহিবারে যদি না পারি এ ভার
তুমি গো বন্ধু বহিবে।
জানি তুমি মোরে করিবে অমল
যতই অনলে দহিবে।"

এইরূপ উদাহরণ অজস্র দেওয়া যাইতে পারে। কবির ভক্তি-রসাত্মক গানগুলি শুনিয়া মনে হয় যে তিনি যেন তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া যেন পরম-নির্ভরতার সহিত মনের কথা কহিতেছেন। অথচ, এই কথা-গুলি নিছক ব্যক্তিগত কথা নহে—যে কোন ভক্তের মনের কথা।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা মনে আসে। অতুলপ্রসাদ যে দেবতার বন্দনা করিয়াছেন তাহা কি শুধু মন্দিরের পাষাণ-প্রতিমা? স্পষ্টতঃই তাহা নহে। কেননা তাহা হইলে ত তিনি যে কোন পুরোহিতের কথাই বলিতেন—তাহাকে কাব্য বলা যাইত না। আমরা দেখি তাঁহার ভক্তি সেই বিশ্ব-সত্তার প্রতি রহিয়াছে, "স্থলে জলে তলে তলে, গূঢ় প্রাণের হরষ" দিয়া তিনি যাঁহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহাকেই তিনি আপন হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—ইনিই তাঁহার হৃদয়-দেবতা।

ইহার পর আমরা আর একটি ধারাকে অতুলপ্রসাদের গানে আসিয়া মিশিতে দেখি। মূল সুরটি যদিও এখানে তাহার ভক্তির, কিন্তু তাহা আরও বেশী আবেদনক্ষম। এইজন্যই কবিরূপে তিনি এখানে অধিকতর সফল। তাঁহার "মানবে" ইহা চোখে পড়ে। ভক্তির ভাব থাকিলেও "মানবে" মানব-মনের প্রতিচ্ছবি আরও অধিক স্পষ্ট। মানুষের হৃদয়ের ইহা আরও কাছাকাছি বলিয়া মনে হয়। ইহার কথা যেন অধিকতর মানবীয় অর্থাৎ সাধারণের মাঝে তাহার বিস্তার দেখিতে পাই। কয়েকটি গানের উল্লেখ করিতেছি :

"মোরে কাঙাল বলিয়া করিও না হেলা,
পথের ভিখারী নহি গো,
শুধু তোমারই দুয়ারে একের মতো
অন্তর পাতি বহি গো।
* * *
তোমারই লাগিয়া গাহিয়া গান
মনের কথা কহি গো।"

কিংবা

"ওগো আমার নবীন শাখী ছিলে তুমি কোন বিমানে,
আমার সকল হিয়া মুঞ্জরিছে তোমার ওই করুণ গানে।
জগতের গহন বনে ছিনু আমি সঙ্গোপনে
না জানি কি লয়ে মনে এলে উড়ে আমার পানে।
* * *
ঝরে গেছে সকল আশা, ফোটে না আর ভালবাসা,
আজ তুমি বাঁধলে বাসা আমার প্রাণে কোন্ পরাণে?"

"মানবে"র এবং "বিবিধ" বিভাগের গানে মানুষের আনন্দ-বেদনায়, আশা-নৈরাশ্যে, অবসাদ-উদ্দীপনায় কবিচিত্তে যে স্পন্দন জাগিয়াছে তাহারই প্রকাশ রহিয়াছে। সাধারণ পাঠক এইজন্যই ইহাদের সহিত বেশী নৈকট্য অনুভব করে। কেননা তাহার মাঝে তাহার নিজের কথাও যে বলা আছে—নিজের অভিজ্ঞতার সহিত যে তাহার মিল রহিয়াছে। শুধু ভক্তরূপে নহে, সাধারণ মানুষরূপে তাঁহার অনুভূতিশীল মনে এই বিভিন্ন ভাবগুলি তাঁহাকে আঘাত করিয়াছে, আর এই আঘাতেই তাঁহার কাব্যের আর একটি উৎসমুখ খুলিয়া গিয়াছে এবং তাহা তাঁহার গানকে বহিয়া চলিবার নূতন শক্তি যোগাইয়াছে।

কিন্তু এইগুলি ছাড়া যাহার জন্য তিনি এত জনপ্রিয় হইয়া-ছিলেন, আর যে প্রবাহটি মিলিয়াছিল বলিয়া তাঁহার গান জনগণের অন্তর ভাসাইয়াছে, তাহা তাঁহার গভীর দেশাত্মবোধ-জাত, তাহা তাঁহার আন্তরিক জাতীয়তা-জনিত।

এই স্বাজাত্যবোধের ঢেউ অতুলপ্রসাদের সময় পরাধীন ভারতের সর্বত্র তীব্র ভাবে বহিতেছিল। অতুলপ্রসাদ অন্তর দিয়া এ ভাবকে

গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জাতীয়তামূলক গানে আমরা দুইটি ভাবের প্রাধান্য দেখি। প্রথমতঃ তিনি ভারতের বর্তমান শ্রীহীন দৈন্য দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। অথচ, ভারতের অতীত ইতিহাস গৌরবোজ্জ্বল এবং সেই অতীত গৌরবের স্মৃতি সমস্ত দেশময় ছড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি তাই গাহিয়াছেন—যে জাতির অতীত এত গৌরবময় ছিল অদূর ভবিষ্যতে সে জাতি আবার জাগিয়া উঠিবে।—

"আসিবে শিল্প ধন বাণিজ্য,
আসিবে বিদ্যা বিনয় বীর্য্য,
আসিবে আবার আসিবে।"

এই আশার বাণী তিনি বার বার শুনাইয়াছেন। তাঁহার জাতীয়তামূলক গানগুলি তখন যে এত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিল তাহার মূলে রহিয়াছে তখনকার গণমানসে অতীত ভারতকে ফিরাইয়া আনিবার যে আকাঙ্ক্ষা গুমরাইতেছিল তাহাকে তিনি ভাষা দিয়াছিলেন।—

"বল বল বল সবে
শত বীণা বেণু রবে
ভারত আবার জগৎ-সভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্ম্মে মহান হবে
কর্ম্মে মহান হবে
নব দিনমণি উদিবে আবার
পুরাতন এ পূরবে।"

এ আশ্বাস-বাণী তিনি বহু গানের ভিতরে দিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে যত দিন আমাদের মধ্যে এই বর্ণ-বিদ্বেষ, এই সাম্প্রদায়িক বিরোধ বর্তমান থাকিবে তত দিন পর্য্যন্ত ভারতের উন্নতি অসম্ভব। তাই তাঁহার এই জাতীয় গানে যে দ্বিতীয় ভাবটি লক্ষ্য করি তাহা হইল সমস্ত মিথ্যা জাত্যভিমান ও আত্মকলহ ত্যাগ করিয়া মিলনের আহ্বান।—

"এস হে কৃষক কুটির নিবাসী
এস অনার্য্য গিরিবনবাসী
এস হে সংসারী এস হে সন্ন্যাসী
মিল হে মায়ের চরণে।
এস অবনত, এস হে শিক্ষিত
পরহিত-ব্রতে হইয়া দীক্ষিত
মিল হে মায়ের চরণে।
এস হে হিন্দু এস মুসলমান,
এস হে পারসী বৌদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান,
মিল হে মায়ের চরণে।

খুব কম কবির গানেই এরূপ সার্ব্বজনীন মহামিলনের আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছে।

সার ত্যজিয়ে খোসার বড়াই
মন্দিরে মসজিদে লড়াই,
প্রবেশ ক'রে দেখরে সবাই
অন্দরে যে একজনাই।
ছাড় দেখিয়ে রেশারেশি
কর প্রাণে প্রাণে মেশামেশি।"

ইহার মধ্যেও ভেদাভেদ ভুলিয়া মিলিত হইতে আহ্বান জানান হইয়াছে।

মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে এই ভাবধারাগুলিই তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে ও ইহাদের লইয়াই তাঁহার কাব্য-স্রোতস্বিনী প্রবাহিত। কিন্তু কেবল এইটুকুর সন্ধান লইলেই কোন কাব্যের যথার্থ রূপ নিরূপণ করা যায় না বা তাহার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয় না। আমাদের অনুসন্ধিৎসা জাগে ইহাদের প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি সম্বন্ধে।

সর্ব্বপ্রথমে কবির ভক্তিরসাত্মক গানগুলি লওয়া যাউক। এই গানগুলি যে সম্পূর্ণ অন্তরের আবেগ হইতে নিঃসৃত তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভক্ত হইলেই যে কবি হওয়া যায় না, এ কথা নিশ্চয়ই প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং আমাদের দেখিতে হইবে যে তিনি এই রসকে কাব্যের খাতে কতদূর প্রবাহিত করিতে পারিয়াছেন —অর্থাৎ, ভক্তিরস যতই থাক কাব্য হিসাবে তাহা কতদূর সফল?

আমরা দেখিয়াছি যে, তাহা মন্দিরের বিগ্রহ-বন্দনার রূপ লয় নাই। বিশ্ব-সৃষ্টির সর্ব্বত্র যাঁহাকে তিনি ভক্ত রূপে দেখিয়াছেন তাঁহাকেই তিনি ছন্দের ঝঙ্কারে আরতি করিয়াছেন। ইহার কাব্য-আবেদন নিশ্চয়ই রহিয়াছে।—

"কভু নির্ম্মল-নীল পাতে
কনক কিরীট মাথে
অভ্রভেদী আলোসনে
রাজিছ অতি সুন্দর।
কভু পুষ্পিত নভ কুঞ্জে
তব নৈশ বংশী গুঞ্জে,
কভু পীত জ্যোৎস্না-বসন
শ্যাম মুরতি অতি সুন্দর।"

ইহার মধ্যে যে ব্যাপক সৌন্দর্য্যবোধ রহিয়াছে তাহাই ইহাকে কাব্য-মূল্য দিয়াছে। সমগ্র সৃষ্টিকে তিনি সুন্দর দেখিয়াছেন এবং সেই সৌন্দর্য্যের কথাই বলিয়াছেন। সমস্ত সৌন্দর্য্য এক করিয়া তিনি যদি তাহা দিয়া তাঁহার হৃদয়-দেবতার প্রতিমা রচনা করিতে পারেন তাহা হইলে তাহা ত তাঁহার শিল্প-প্রতিভারই পরিচয় দিবে।

তাহার পর:

"এ জীবন জমীন বড়ই ঊষর,
বরষ বরষ বরষে তবু ধূলায় ধূসর,
তাই, নিরাশ হয়ে বসে আছি
মনের মলিন বাটে।
খুব গভীর ক'রে দাও লাঙলের চির
ঢালো তাহে যত পারো নয়ন-কূপের নীর,

লাগে লাগুক হুলের খোঁচা
চরণ রেখো বাঁটে।"

ইত্যাদি গানে কবির নির্ভরশীল তদগত চিত্তেরই প্রকাশ রহিয়াছে অথচ কাব্যরসের অভাব তাহাতে হয় নাই। এ প্রসঙ্গে আমরা বলিতে পারি যে, দুই-একটি বিশেষ গানের ক্ষেত্র ব্যতীত আর প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁহার গান কাব্যের শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে। আর একটি উদাহরণ দিতেছি :

"নিশির শিশির সম
পশহে জীবনে মম,
মোরে ফুটাও অনুপম
তব সৌরভে।"

তাঁহার সুন্দর কল্পনাশক্তি ও ছন্দ-মাধুর্য্য মিলিয়া এই পংক্তিগুলি ঐ কথাই প্রতিপন্ন করিতেছে।

এই গানগুলির উপর বাংলার বৈষ্ণব-গীতি কাব্যের প্রভাব প্রত্যেকেই লক্ষ্য করিবেন। কিন্তু আমরা ভুলিব না যে বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে তখন ইহার প্রভাব অর্থাৎ এই ভক্তিপ্রবণতা অত্যন্ত প্রবল ছিল। রবীন্দ্র-কাব্যের ধারাও তখন এই দিকেই বহিতেছিল। সুতরাং এই প্রভাব হইতে মুক্ত থাকা তখন নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়ে।

কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের সহিত তাঁহার অনেক ক্ষেত্রেই ভাব সামঞ্জস্য রহিয়াছে। রজনী কান্তের

"তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল-করে মলিন মর্ম্ম মুছায়ে—
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর মোহ কালিমা ঘুচায়ে।"

সহিত অতুলপ্রসাদের

"কাটো হে আমার স্বার্থের পাশ
তব প্রিয় কাজে কর মোরে দাস,
সাধো এ জীবনে তব অভিলাস
হরষে কিংবা বেদনে।"

গানটি তুলনীয়।

তাঁহার যে গানগুলি মাতৃরূপিণী বিশ্বপালিকাকে উদ্দেশ করিয়া গাওয়া তাহাতে রামপ্রসাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অতুলপ্রসাদের :

"তোর কাছে আসবো মাগো শিশুর মত
সব আবরণ ফেলবো দূরে হৃদয় জুড়ে আছে যত।"

গানটির উল্লেখ করিলে রামপ্রসাদের :

"মায়ের চরণতলে স্থান লব
আমি অসময়ে কোথা যাব।"

গানটির কথা মনে হইবে। ইহা ছাড়াও ভাব প্রকাশের ভঙ্গীতে রামপ্রসাদের সহিত তাঁহার মিল রহিয়াছে। যেমন :

"শকতি নাই তোমায় ধরি
হার মেনেছি হে শ্রীহরি—
দিয়ে খুলি চোখের ঠুলি
দেখা দাও হে দুঃখহর।"

ইহার সহিত রামপ্রসাদের

"মা আমায় ঘুরাবি কত
কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত ?"

গানটি উদাহরণ-স্বরূপে উদ্ধৃত করা যায়।

অবশ্য এইরূপ সামঞ্জস্য ঘটিবার প্রধান কারণ, এই কবিগণ প্রত্যেকেই ভক্ত ছিলেন ও একই ভাবের ভাবুক ছিলেন। একই ভাব যখন বিভিন্ন কণ্ঠে গীত হইবে তখন ত তাঁহাদের পারস্পরিক মিল থাকাই সম্ভব।

এ প্রসঙ্গে আমরা তাঁহার গানে রবীন্দ্র-প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বস্তুতঃ তাঁহার গান এত অধিক রবীন্দ্র প্রভাবিত ছিল যে, অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহার গানকে শ্রোতারা রবীন্দ্র-রচিত বলিয়া ভুল করিতেন।

"আমার আবার যখন প্রভাত হবে
মেঘগুলি সব সরে যাবে
আমায় এমনি করে রাঙিয়ো নাথ
এমনি করে রাঙিয়ো।"

গানগুলির প্রকাশভঙ্গী ও ভাব যে অত্যন্ত গভীর ভাবে রবীন্দ্র-প্রভাবিত, শুনিবামাত্রই তাহা বুঝা যাইবে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন।

তবে তাঁহার প্রতি ও তাঁহার দানের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রাখিয়াও এ কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, এই গানগুলিতে অতুলপ্রসাদের প্রতিভার কোন বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আমরা দেখি না। ভাবে ও ভঙ্গীতে এইগুলি মধুর সত্য, ইহাতে কাব্যরসের অভাব নাই ইহাও সত্য, কিন্তু বাংলার কাব্য-সাহিত্যে ইহাকে পৃথক করিয়া দেখা সম্ভব নহে। যদিও ইহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য যে, রবীন্দ্র-যুগে বৈষ্ণব-কাব্যধারার ভাবটি যে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহাতে অতুলপ্রসাদেরও বিশিষ্ট স্থান আছে।

ইহার পর "মানব" ইত্যাদিতে অতুলপ্রসাদের যে পরিচয় পাই তাহাতে কবি-রূপে তিনি আরও সফল ইহাই বুঝিতে পারি। তাহার অন্যতম কারণ তাহাতে universality বা ব্যাপকতা আরও অধিক। আর গীতি-কবিতার সার্থকতা ত এখানেই নির্ভর করে।

কিন্তু "মানবে"র গান কোথাও কোথাও অধিক mystic বা 'ছায়াবাদী' হইয়া গিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহার বক্তব্য রহস্যাবৃত। আমরা বুঝিতে পারি না যে, কোন ক্ষেত্রে তিনি ভগবানকে মানবরূপে কিছু কহিতেছেন অথবা মানবকেই স্বয়ং মানবরূপে কিছু বলিতেছেন। যেমন :

"প্রেম অধীরা
কণ্ঠ মদিরা
এ মধু রাত্রে পরাণ-পাত্রে ঢালো গো,
নয়নে চরণে বসনে ভূষণে গাহ গো,
মোহন রাগ-রাগিণী,
ওগো নব-অনুরাগিণী।
তব চরণ-মগ্ন পরাণ-যন্ত্রে বাজিবে
সুখস্মৃতিগুলি আমারে ঘেরিয়া নাচিবে
রিণিকি রিণিকি রিণি রিণি
ওগো পরাণ-বিলাসিনী।"

আমরা জানি না এ পরাণ-বিলাসিনী, নব-অনুরাগিনী কে? ইংরেজ কবিদের মত তিনি যে সাধারণ মানবীর স্তুতি করিতেছেন তাহার উল্লেখ কোথাও করেন নাই। ভারতীয় ধারা অনুসরণ করিয়া প্রকৃতিকেই নারীরূপ দিয়া স্তুতি করিতেছেন কি না তাহাও রহস্যাবৃত রাখিয়াছেন। কিন্তু তাহা উপেক্ষণীয় বিষয় বলিয়াই গণ্য হইবে, কেননা কাব্যের রসাস্বাদনে ত কোন অসুবিধা হইতেছে না। কাব্যরস বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা ইহাতে ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

প্রকাশভঙ্গী ও ভাবের দিক দিয়া এগুলিও স্পষ্টতঃই রবীন্দ্র-প্রভাবিত। তবে সরস কাব্যের সার্থক দৃষ্টান্ত রূপে ইহাদের মূল্য নিশ্চয়ই রহিয়াছে।

"পাগলা মনটারে তুই বাঁধ,
কেন রে তুই যেথায় সেথায়
পরিস প্রাণে ফাঁদ।"

গানগুলি এইজন্যই আজও তাহাদের আবেদন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এইরূপ:

"আছে তোর গানের তরী,
আছে তোর প্রেমের হরি,
ভুলে যা ঝড়ের বাধা
খোল্‌রে নোঙর খোল।"

এই দৃষ্টিকোণ হইতে "প্রকৃতি"র গানের আলোচনা পূর্বেই হইয়াছে। গীতিকার প্রকৃতির ভালবাসায় এখানে অস্থির। অথচ, এ প্রকৃতি কিন্তু নেহাত জল মাটি আকাশ ছাড়াও আরও কিছু। প্রকৃতিকে কবি প্রিয়া এবং অনুরাগিণীরূপে আপনার কাছে টানিয়া লইয়াছেন। এইজন্যই তাহা শুধু ভৌগোলিক বর্ণনা না হইয়া কাব্য হইতে পারিয়াছে।

তাঁহার স্বদেশী সঙ্গীতগুলির আলোচনা দ্বারা উহাদের বিশেষ দিকগুলির উল্লেখ পূর্বেই কিছু করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে শুধু আর দুই-একটি কথা তাঁহার সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন। অতুলপ্রসাদ চারণ-কবি ছিলেন। তিনি নবভারত গড়িতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন—কিন্তু সেই সঙ্গে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, ভারতীয় ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করিয়া এবং ভারতীয় সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করিয়া ঐ নির্মাণ আরম্ভ করিতে হইবে।

"হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর
হও উন্নত শির নাহি ভয়।
ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান
সাথে আছে ভগবান—হবে জয়।
নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান,
দেখিয়া ভারতে মহা জাতির উত্থান
জগজন মানিবে বিস্ময়।"

অর্থাৎ, ভারতকে তিনি তাঁহার অন্তর্নিহিত গভীর ঐক্যের কথা শুনাইয়া আত্মসচেতন করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন ইহা ত সত্যই, সেই সঙ্গে তিনি এই মহাজাতিকে উত্থানের পথে অগ্রসর হইতে উদ্বোধিত করিতেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই কয়টি পংক্তির মাঝেই তাঁহার সমগ্র জাতীয় মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে। আবার জাতিগঠনের শত অন্তরায় বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যখন মিথ্যা আত্মম্ভরিতায় মত্ত হইয়া ভারতবাসী সাম্যের বাণী ঘোষণা করিত, বড় বড় আদর্শবাদের বুলি আওড়াইত তখনও তিনি উহার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে ছাড়েন নাই।—

"তোরাই আবার সভাতলে
হাঁকিস সাম্য উচ্চরোলে,
সমকক্ষ চাস সকলে
বিশ্বপ্রেমের দিস দোহাই।"

তাঁহার এই চারণ ব্রতের উল্লেখ আমাদের ইতিহাসে থাকিবে।

বোধ হয় উল্লেখ করা উচিত যে দ্বিজেন্দ্রলাল এবং রবীন্দ্রনাথের সহিত এক্ষেত্রে তাঁহার বহু সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বোধে কেবলমাত্র একটির উল্লেখ করিতেছি। দ্বিজেন্দ্রলালের

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ,
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ।"

গানটির কথা অতুলপ্রসাদের—

"উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী, উঠ আদি জগ-জনপূজ্যা,
দুঃখ দৈন্য সব নাশি কর দূরিত ভারত-লজ্জা।"

শুনিলেই মনে হয়।

এখন তাঁহার গানের সুর সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করি। কেননা সুর গানের অপরিহার্য অঙ্গ। অবশ্য একথা সত্য যে, এই আলোচনা কোন সাহিত্য-রসিকের মন প্রলুব্ধ করিবে না—শুধু সাধারণ অনুসন্ধিৎসা মিটাইবার জন্য ইহার অবতারণা। নহিলে, "কোন্ বাংলা গানে তিনি গজলের সুর বসাইয়াছেন ও তাহার দ্বারা বাংলা গানকে কতদূর সমৃদ্ধ করিয়াছেন," এ আলোচনা সঙ্গীত-রসিকেরই উপভোগ্য।

প্রথমতঃ, "বাংলা গানে শ্রেষ্ঠ ঠুংরী চালের প্রবর্তন তিনিই করিয়াছেন" (দিলীপকুমার রায়ের "সাঙ্গীতিকী" দ্রষ্টব্য)। এইজন্য এই দিক হইতে তিনি এক বিশেষ সম্মানের দাবি রাখেন।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের কথায় বলিতে গেলে "তাঁর অনেক গানেই সুর ও কবিত্ব উভয় মিলেই সৃষ্টি রমণীয় হয়েছে, এ কথা ভুললে চলবে না। অতুলপ্রসাদের গানের একটি অবিসম্বাদিত সম্পদ এই যে, তাতে গানের গানভঙ্গী অত্যন্ত সহজ, সরল; স্বতঃস্ফূর্তি—spontaniety শ্রেষ্ঠ শিল্পের একটি নিত্য আনুষঙ্গিক মস্ত ঐশ্বর্য।"

তৃতীয়তঃ, বহু গানে তিনি বহু পূর্বে, যখন অন্য কোন ভারতীয় সাময়িক কোন কালে বিদেশী বা পাশ্চাত্য সুর-সমন্বয় গানের ক্ষেত্রে খুব কমই ছিল, তখন তিনি তাহা বাংলায় তাঁহার স্বরচিত (সাধারণতঃ জাতীয়) গানে প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা এক নূতন পরীক্ষা ছিল এবং এ বিষয়ে দেখি তিনি অগ্রণীদের অন্যতম।

সর্ব্বোপরি তাঁহার অধিকতর (সাধারণতঃ ভক্তিমূলক) গানে বাউল, কীর্ত্তন ইত্যাদি সুর থাকায় তিনি বাংলার নিজস্ব সুরধারার প্রচার ও সংরক্ষণে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন।

উপসংহারে সামান্য কিছু বলিয়া প্রবন্ধের ছেদ টানিতেছি। তাহা হইল—বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে অতুলপ্রসাদের গানের সাহিত্যিক মূল্য কতখানি স্বীকৃত হইবে? ভাবীকাল তাঁহাকে তাঁহার এই সৃষ্টির জন্য কিরূপ অর্ঘ্য দিবে, তাহাই চিন্তা করিতে ইচ্ছা হয়।

একথা সত্য যে, ইহার সঠিক উত্তর ভবিষ্যৎই দিতে পারে। তথাপি আমাদের মনে হয় যে, হউক না বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি, সে অতুলপ্রসাদকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারিবে না। বৃহৎ সৃষ্টি বলিতে যাহা বুঝায়, অতুলপ্রসাদ বাংলা-সাহিত্যকে তাহা দিতে পারেন নাই—যে শক্তির বলে কোন সাহিত্যের মোড় ফিরাইয়া দেওয়া যায় সেইরূপ শক্তির পরিচয় তাঁহার রচনায় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা কোনমতেই ভুলিব না যে, তিনি অত্যন্ত গভীর আন্তরিকতা লইয়া বঙ্গ-ভারতীর সাধনা পরম নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার সময়ে বাংলা-সাহিত্য এত রবীন্দ্র-প্রভাবিত ছিল যে, বিশেষ কোন স্বাতন্ত্র্য সে যুগে প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের বেড়া দিয়া তাঁহার স্থান ঘেরা না থাকুক, আন্তরিকতায়, অকপট ভাব-প্রকাশে ও নিষ্ঠায় বাংলা সাহিত্যে যে স্থান তিনি অধিকার করিয়াছেন, সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিচরণশীল ব্যক্তি মাত্রেই তাহাতে তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য দিতে কার্পণ্য করিবেন না। তাহা ছাড়া—

"দিসুদরিয়ায় বান ডেকেছে সামাল রে তোর গানের তরী"

এবং

"বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে
তুমিও একাকী আমিও একাকী
আজি এ বাদল রাতে"—

গানগুলি প্রথম শ্রেণীর রচনার সহিত তুলনীয় এবং এইজন্যই আমরা বিশ্বাস করিতে পারি যে, ইহাদের বক্তব্যের আবেদন দীর্ঘকাল অক্ষুন্ন থাকিবে।

সকলশেষে বলিতে পারি যে যত দিন বাংলা ভাষা থাকিবে, তত দিন অতুলপ্রসাদের এই গানটিও স্মরণীয় হইয়া থাকিবে :

"মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা,
তোমার কোলে, তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালবাসা।
* * *
ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে
ডাকনু মায়ে মা মা বলে
ঐ ভাষাতেই বলবো হরি
সাঙ্গ হ'লে কাঁদা-হাসা।"

ভগবান বুদ্ধ ও যক্ষিণী হারীতিকা

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

ক্ষিতিপতি বিম্বিসার যখন ক্ষিতির সার রাজগৃহ নগরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন সহসা তথাকার অধিবাসীবৃন্দের উপর এক ভয়ঙ্কর উপদ্রব আরম্ভ হইল। একদিন রাজা যখন রাজসভায় বিরাজ করিতেছেন, তখন প্রজাগণ জনকসদৃশ তাঁহার সমীপে নিজেদের বিপদের বার্ত্তা নিবেদন করিলেন :

"হে দেব, আপনি দিব্য প্রভাবশালী। আপনার শাসনে জনগণ কেহই কোনো অন্যায় আচরণ করে না। দীর্ঘকাল আমরা পরমসুখে এ রাজ্যে বাস করিতেছি। এযাবৎ আমাদের কোনো দুঃখই ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি এক মহান অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। প্রতিরাত্রে আমাদের গৃহ হইতে কে আমাদের শিশুসন্তানদের হরণ করিতেছে। আমরা বহু চেষ্টাতেও তাহাকে ধরিতে পারিতেছি না। ধরা দূরে থাক—আজ পর্য্যন্ত কেহই তাহাকে চক্ষে দেখে নাই। আমাদের বিশ্বাস—ইহা কোনো প্রেত, পিশাচ অথবা ডাকিনীর কার্য। মহারাজ রক্ষা না করিলে অল্পদিনের মধ্যেই আমরা সকলেই সন্তান-হারা হইব।"

প্রজাদের এই করুণ বচন শ্রবণ করিয়া নৃপতির অন্তঃকরণ সমবেদনায় ব্যথিত হইল। জনগণের এই দুঃখ তাঁহার সমস্ত হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইয়া কিছুক্ষণের জন্য তাঁহাকে দিগ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। অবশেষে তিনি বলিলেন :

"যাহা ভূমিপতির ধর্ম পালিত হইবার নহে, তাহা আমি কিভাবে করিব? জানি না কিরূপে ইহার প্রতিকার হইতে পারে। আপনারা এক দিন আমাকে চিন্তা করিবার সময় দিন। কি ভাবে আপনাদের এই মহাভয় নিবারণ করা যায়, একচিত্তে রাত্রিজাগরণ করিয়া তাহাই আমি চিন্তা করিব।"

রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পৌরজন পরম পরিতুষ্ট চিত্তে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন :

"হে রাজন্, আপনার সংকল্প, উদার মধুর দৃষ্টিই জনগণকে যেন সঞ্জীবিত করে। আপনার এই উদার পীযূষসদৃশ মধুর বচনের কথা আর কি বলিব। আমরা এখন পরম আশ্বাসলাভ করিলাম।"

অতঃপর নৃপতিকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে পুরবাসিগণ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

নৃপতি তখন শুদ্ধচিত্তে ব্রত ধারণ করিয়া সমস্ত নগরে শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি অনুষ্ঠান করাইলেন। দিবাশেষে দৈববাণী হইল :

"হারীতিকা নাম্নী এক যক্ষিণী পুরবাসিগণের সন্তানগণকে হরণ করিতেছে!"

সেই সময় ভগবান বুদ্ধ বেণুবনে কলন্দকনিবাপে অবস্থান করিতেছিলেন। নৃপতি বিম্বিসার অমাত্য ও পৌরজনের সহিত তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। দূর হইতে সেই প্রিয়দর্শন শাক্য-কুমারকে দর্শন করিয়া নৃপতি প্রণত হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন।

পরস্পর কুশল প্রশ্নের পর নৃপতি ভগবান বুদ্ধকে পৌরজনের এই বিপদের কথা নিবেদন করিলেন। মহাকারুণিক সুগত পৌরগণের সন্তাতিক্ষয়ের বিষয় অবগত হইয়া ক্ষণকাল নীরবে ধ্যানস্থ রহিলেন।

অতঃপর সহসা নরপতি বিম্বিসার ও পৌরজনকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পাত্রচীবর গ্রহণ করিয়া তথাগত যক্ষিণী হারীতিকার নিবাস অভিমুখে গমন করিলেন। হারীতিকার অবর্ত্তমানে সেথায় উপস্থিত হইয়া তিনি যক্ষিণীর প্রিয়ঙ্কর নামক এক পুত্রকে তপোবলে অদৃশ্য করিলেন।

ভগবান অন্তর্হিত হইলে যক্ষিণী গৃহে আসিয়া তাহার পুত্রগণের মধ্যে প্রিয় পুত্র প্রিয়ঙ্করকে দেখিতে পাইল না। তখন পুত্রের অনুসন্ধানে হৃতবৎসা গাভীর ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া সে লোকালয়ে, অরণ্যে দিশাহারা হইয়া ঘুরিতে লাগিল।

"বৎস প্রিয়ঙ্কর তুমি কোথায়? কোথায় তোমার দেখা পাইব?"—তারস্বরে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে যক্ষিণী সমস্ত দিশার শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিল।

সমস্ত আশায় (দিকে) পুত্রকে দর্শন না করিয়া নিরাশা যক্ষিণী পর্ব্বত ও দ্বীপসমূহ অনুসন্ধান করিতে করিতে সমুদ্র পর্য্যন্ত গমন করিল।

মর্ত্ত্যভূমিতে অনুসন্ধান শেষ হইলে সে ঘোর নরকে প্রবেশ করিল। সেখানে না পাইয়া বিমান ও উদ্যানশালী স্বর্গের সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

প্রাণঘাতিনী যক্ষিণী পরিশ্রান্ত হইলেও অবিশ্রামে ইন্দ্র যম বরুণাদি লোকপালগণের সমস্ত পুরী অনুসন্ধান করিল। তথাপি পুত্রের দর্শন পাইল না।

অবশেষে কুবেরের পরামর্শে সুগতের আশ্রমে গমন করিয়া শোকার্ত্তা যক্ষিণী পরম শরণ্যের শরণ লইল।

দুঃখার্ত্তা হারীতিকা তাহার দুঃখের কথা নিবেদন করিলে ভগবান স্মিতবদনে তাহাকে কহিলেন:

"হারীতি, তোমার তো পঞ্চ শত পুত্র রহিয়াছে। একটি গিয়াছে, তাহাতে এত কাতর হইতেছ কেন?"

ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখশোকার্ত্তা যক্ষিণী বলিল:

"হে ভগবান, এক লক্ষ পুত্র থাকিলেও এক পুত্রের ক্ষতি সহ্য করা যায় না। পুত্র অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছু নাই। সেই পুত্রের বিয়োগের অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ আর কি আছে?

"যাহার পুত্র আছে, সে-ই পুত্রস্নেহ এবং পুত্রশোকের ব্যথা অনুভব করিতে পারে। নিতান্ত অকারণে স্বতই লোকের সন্তানের প্রতি স্নেহ হয়। সন্তান কুৎসিত হউক, বিকলাঙ্গ হউক, রুগ্ন হউক, ক্ষীণকায় হউক, জননীর নিকট সে-ই পূর্ণশশীর ন্যায়।"

বাৎসল্যবিহ্বলা যক্ষিণীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত প্রাণীর প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ সুগত স্মিতবদনে তাহাকে কহিলেন:

"বহু সন্তানের জননী হইয়াও একটি সন্তানের বিয়োগে তুমি এইরূপ শোকার্তা হইয়াছ, তুমি যখন একমাত্র সন্তানের জননীর ক্রোড় হইতে তাহার সন্তানকে হরণ কর, তখন তাহার কিরূপ দুঃখ হয় বল দেখি?

'অলক্ষ্যে অপরের গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক নারীগণের সন্তান অপহরণ করিয়া, ব্যাঘ্রী যেমন মৃগশাবক ভক্ষণ করে, সেইরূপ সন্তানের জননী হইয়াও অপরের সন্তানকে ভক্ষণ করিয়াছ।'

"যে আঘাতে নিজে দুঃখ পাও, সেই আঘাত অপরকেও দুঃখ দেয়—ইহা আজ তুমি অন্তরে অনুভব করিলে। অতএব আজ হইতে আর অপরকে আঘাত করিও না!

"হিংসা পরিত্যাগ করিয়া তুমি যদি বুদ্ধধর্ম সঙ্ঘের তিনটি[১] উপদেশ গ্রহণ করো তাহা হইলে তোমার পুত্রকে ফিরিয়া পাইবে।"

ভগবান ইহা কহিলে যক্ষিণী হিংসা পরিত্যাগ করিয়া শীল গ্রহণ করিল। তখন সে তাহার প্রিয়ঙ্কর নামক প্রিয়পুত্রকে ফিরিয়া পাইল।[২]

১। (ক) চৌর্য্য পরিত্যাগ, (খ) ব্যভিচার পরিত্যাগ, (গ) মিথ্যাভাষণ পরিত্যাগ।

২। হারীতিকাদমন—অবদান।

পৃথিবীব্যাপী বীজবিনিময়

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

"নিউ ইয়র্ক টাইমস" পত্রিকায় ক্যাথেরিন্ ই মিকেল আমেরিকায় বীজ-বিনিময় প্রতিষ্ঠান ও উহার কার্য্যাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠান আমেরিকার কৃষি-বিভাগের অন্তর্গত, এবং ইহার নাম "Division of Plant Expl ration and Introduction।" ইহার কার্য্যাবলী প্রায় সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তৃত, পৃথিবীর বহু স্থানের বহু ব্যক্তির সহিত ইহার যোগাযোগ আছে। এই প্রতিষ্ঠানে সকলেই নূতন ও সঙ্কর জাতীয় উন্নত উদ্ভিদ উৎপাদনের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। একটি উদাহরণ দিলেই ইহার ব্যাপকতা উপলব্ধি করা যাইবে। ১৯৫২ সনে ইউনাইটেড ষ্টেটসের বাহিরে অবস্থিত ৭৮টি দেশে বহু শত বার তাহাদের বীজ প্রেরিত হইয়াছিল। এই সকল দেশের মধ্যে আছে—সামোয়া, টোগো, কুকদ্বীপ ইত্যাদি। ইজরাইল ও ভারতবর্ষ হইতেই অধিক সংখ্যক অনুসন্ধান হইয়াছে। যুগোস্লাভিয়ার নামও এই প্রসঙ্গে করা যাইতে পারে।

এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্য্য হইতেছে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন রকমের গাছপালা, তরুলতা, অব্যাহত ভাবে আমদানী করা। প্রধানতঃ দুইটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এইরূপ ভাবে আমদানী করা হইয়া থাকে—(১) আমেরিকায় নূতন নূতন শস্য, গাছপালা প্রভৃতির প্রবর্ত্তন করা—যেগুলি ভবিষ্যতে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করিবে এবং (২) এমন সব গাছপালা প্রবর্ত্তন করা—যে সকল স্থানীয় গাছপালা অপেক্ষা উন্নততর। আমেরিকার প্রধান প্রধান শস্যের মধ্যে দশটিরও কম শস্যকে 'স্থানীয়' বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। ইহা হইতে অতি সহজেই বুঝা যাইবে দেশ-দেশান্তর হইতে বীজ, গাছপালা প্রভৃতি আমদানী করা কত বেশী প্রয়োজনীয়।

বর্ত্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যাবলী অধিকতর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং বীজের চাহিদা বর্দ্ধিত হইয়াছে। অধুনা আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী অধিকতর হইতেছে। বিনা মূল্যেই বীজ সরবরাহ করা হইয়া থাকে। তবে ইহা এই আশায় করা হয় যে, ইহার পরিবর্ত্তে কিছু-না-কিছু নূতন জিনিষ পাওয়া যাইবে। একই রকমের গবেষণায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের গবেষকগণের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করাও এই প্রতিষ্ঠানের অপর একটি উদ্দেশ্য, উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যদি কোন দেশের কোন গবেষক, উদ্ভিদতত্ত্ববিদ, বা কোন কৃষক পেঁপের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন তাহা হইলে তাঁহাকে হাওয়ালির (Hawali) গবেষকদিগের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইবে। এই কৃষিক্ষেত্রে পেঁপের গবেষণাই প্রধান কাজ।

বিনিময়ের জন্য গাছপালা, তরুলতা অপেক্ষা বীজই অধিকতর উপযোগী, কেননা বীজ শীঘ্র নষ্ট হয় না এবং সহজে প্রেরণ করা যায়। গাছপালা, বীজ প্রভৃতির সঙ্গে কোন রকমের রোগের বীজাণু বা পোকামাকড়ের বাচ্চা, ডিম প্রভৃতি না যায় সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়।

এই প্রতিষ্ঠানটি ১৮৯৮ সনে স্থাপিত হইয়াছিল এবং "ধৈর্য্য ও আশাই" ইহার মূল মন্ত্র ছিল। প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত গাছপালা, বীজ প্রভৃতির আদান-প্রদানের একটি স্থায়ী তালিকা আছে এবং কোন্ স্থানে কোন্ গাছপালা কি রূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহারও সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।

পশু-খাদ্যশস্য, তৃণজাতীয় খাদ্যশস্য, তুলা, ওষধি, ফল প্রভৃতি সকল রকম শস্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইয়া থাকে, এমনকি উদ্যানের শোভাবর্দ্ধক গাছপালাও বাদ পড়ে না। বিভিন্ন স্থানে গাছপালা ও বীজ নির্ব্বাচনের ক্ষেত্র আছে; মেরীল্যাণ্ড, জর্জিয়া, ফ্লোরিডা, আইয়া, ওয়াশিংটন, ক্যালিফোর্নিয়া প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গাছপালা নির্ব্বাচিত হয়; যেমন চিকো এবং ক্যালিফোর্নিয়াতে অলিভ, এপ্রিকোট প্রভৃতি নির্ব্বাচন করা হইয়া থাকে। ফ্লোরিডা এভোকেডস এবং আমের নির্ব্বাচন স্থান।

গাছপালা সংগ্রহের জন্য পূর্ব্বের মত এখন আর কোন অভিযান পাঠান হয় না, তবে বিশেষ বিশেষ গাছপালা সংগ্রহের জন্য বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষজ্ঞ প্রেরিত হয়, বর্ত্তমানে একজন বিশেষজ্ঞ পার্ব্বত্য অঞ্চলের উপযোগী পশু-খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য আফ্রিকায় প্রেরিত হইয়াছেন। আমাদের দেশের কৃষি-বিভাগের অন্তর্গত এইরূপ প্রতিষ্ঠান আছে বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমানে কত বিশেষজ্ঞ, কত কর্ম্মচারী দেশে-বিদেশে যাইতেছেন। এই কারণে অজস্র অর্থ ব্যয় করা হইতেছে। কিন্তু নূতন গাছপালা, শস্য প্রভৃতির সংখ্যা ও সম্পদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে কি? যদিও-বা কিছু হইয়া থাকে সাধারণ লোক তাহা জানে না।

বাঁশীর বেদনা

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

সকলের মনের কথা যদি না বাজ্‌ল ওরে
আমার এই বাঁশীর ব্যথার সুরে,
সে বাঁশী বাজাই বৃথা সে বেণু বোবাই ভালো
সে বাঁশী থাকুক নীরব-পুরে।

যদি গো বাজাই বাঁশী তাহাতে উঠবে যে সুর
তাহা তো নিজের খবর নয়,
তাহা যে সকল জনের হৃদয়ের ব্যথার কথা
সে বাঁশী বাজবে জগৎময়।

আমার এই বাঁশীর সুরে ফুটিবে যেসব কুসুম
তাহা যে আগুন-তারার ফুল,
সকলের হাহাকারের তাহাতে গাঁথব মালা
সবারি ভাঙবে পথের ভুল।

আমার এই নয়তো বাঁশী মিলনের কুঞ্জবনের
অলিদের গুঞ্জরণের গান,
এ বাঁশী ঘুমের বনের মিলনের স্বপন ভাঙ্গায়
সকলের দুঃখ-পরিত্রাণ।

এ বাঁশী গাইবেরে গান নারীদের ঘুমভাঙ্গানীর
যত সব বন্ধ ঘরের তালা—
ভেঙ্গে সে খুলবে দুয়ার জীবনের পরিত্রাণের
পরাবে কণ্ঠে সবার মালা।

বাজাব এমনি করে আমার এই আগুনবাঁশী
যা' শুনে সকল বেদন ভুলে',
দাঁড়াবে সকল মানুষ জীবনের সাগর তীরে
ঘরেরি সকল বাঁধন খুলে'।

সে বাঁশীর সুরটি গা'বে চালাকির চুক্তি ভেঙ্গে
মানুষের মুক্তি দেবার বাণী,
জীবনের মুক্তামণি যাহারা ধূলায় লুটায়
তাদের তুলবে সে সন্ধানি'।

যত সব দুঃখীকাঙাল হাজারো নিষ্পেষণে
বেদনায় কাঁদছে অসীম কাঁদন,
আমার এই আগুনবাঁশীর ঢেউয়েরি হিল্লোলেতে
তাদেরি ভাঙুক সকল বাঁধন।

জ্বলো মোর বাঁশীর আগুন জ্বলোরে হাজার শিখায়
তাহারি প্রলয় তাপের তলে,
ব্যথিতের পরিত্রাণের ভগবান উঠুক জেগে
আমারি রক্তকমল-দলে।

পথের শেষে

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

পাথেয় ফুরালো স্বদেশের পানে ফিরিয়া চলেছি তাই।
'দেরাদুন' গাড়ী ছুটে দুরন্ত, চলার বিরাম নাই।
ছেলে মেয়ে আর জননী আমার
ফিরে যেতে যেন ডাকে বার বার
বুকের বেতারে আহ্বান-ধ্বনি, যেন রে শুনিতে পাই।

স্মৃতির-সুরভি মর্ম্মে বহিয়া ফিরিয়া চলেছি দেশে।
পৌঁছিব সেথা তিনটি দিনের রেলের পাড়ির শেষে।
কতনা তীর্থ, নগরী ও গ্রাম
পার হয়ে মেল ছুটে অবিরাম
কয়লার গুঁড়া, ধুম ধূলি উড়ে লাগিছে অঙ্গে কেশে।

দীর্ঘ পথেতে হেরিলাম কত, পরিচয় হ'ল মেলা।
ব্যথা বাজে আজ ভেঙে গেল বলে শুধু দু' দিনের খেলা
জুলুম করেছে পাণ্ডারা কত
ভেট হয় নাই ভাল মন মত
পারমার্থিক বচন তাদের করিয়াছি অবহেলা।

ভিখারীর দল পিছু ধরিয়াছে, ধমক দিয়াছি কড়া;
সে-কথা স্মরিলে আঁখি-পল্লব জলে হয়ে উঠে ভরা।
দেওয়া হয় নাই কত কিছু দান
পূজিনি পূজ্যে করি অভিমান
মন্দিরে গাঁথা মর্ম্মবেদীতে মিছে করিয়াছি ত্বরা।

প্রাণ ভরে গেছে অচেনা জনার চলা-ফেরা মধু ভিড়ে।
কত না উপল কুড়ায়ে ফিরেছি মন্দাকিনীর তীরে।
ছায়া-অঞ্চলে বেঁধেছে তরুরা
তীর্থ-সলিলে স্মৃতি-ঘট ভরা
কন্টের মোর পথের দাবীতে গিয়ে ছিল যে রে ছিঁড়ে।

. তুফানের বেগে ছুটে চলে গাড়ী, ওই দেখা যায় কাশী।
শিবালয় ভরা পবিত্র ধাম এবার পড়িল আসি।
থামিয়া ক্ষণেক যন্ত্র-দানব
ছুটে গর্জ্জনে কাঁপায়ে মানব
গয়া পার হ'ল, গেল কোডার্ম্মা, টানেলে ধ্বনিল বাঁশী।

হাজারীবাগের শ্যাম শোভা হেরি ভরিল হৃদয়-মন
ঘরের দুয়ারে মনে পড়ে পুনঃ মধুর বৃন্দাবন।
মুসৌরী পারে গিরি হিমালয়
মানস পটেতে হয় যে উদয়
স্মৃতির ফলকে শাশ্বত হ'ল পথের পরম ক্ষণ।

সৌন্দর্যের
সার্থক প্রতিনিধি...
সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের
সার্থক প্রতিনিধি তার শিল্প-সৃষ্টি।
শিল্পের ভাষা সর্বজনীন, সহজ ও সুন্দর।
তার আবেদন তাই স্থান ও কালের সীমা
অতিক্রম করে নিখিল-মানবের মর্মলোকে।
তেমনি রূপ-সৃষ্টিতে শতাব্দীর গৌরব-দৃপ্ত

দীপায়ন—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য চারি টাকা।

তিনখানি কবিতার বই প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার ইহার পূর্ব্বেই কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এখানি অপূর্ব্বকৃষ্ণের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থে ছিয়ানব্বইটি কবিতা স্থান পাইয়াছে। বইখানির প্রধান বৈশিষ্ট্য বিষয়-বৈচিত্র্য। ইহাতে প্রেম আছে, প্রশ্ন আছে, পল্লী ও প্রকৃতির গান আছে, স্বাধীনতার কথা আছে, দেবতার আরাধনা আছে, বুদ্ধ-বন্দনা আছে, মেঘোৎসবে মেঘদূতের কবির প্রতি প্রণাম-নিবেদন আছে। "ধানের ভিতর যে ধ্বনি হৃদয়ে এনে দেয় আলোড়ন", সে কি ?

"সময়ের মহা স্রোত মাঝে কি গো অসীমের গানখানি
চেতনার ঢেউ তুলে দেয় দোল স্বপনে ও জাগরণে ?"

"সভ্যতার পরিহাসে"র অবসান হইবে কি ?

"ভাবীযুগ-রশ্মিরাগ কোন্‌খানে পাবো মোরা দেখা ?"

মাঝে মাঝে আশা হয়,

"মনোকুসুমের গন্ধ বেড়ায় বনে :
প্রাণের অতিথি ফাল্গুনে মোর আসিয়াছে নির্জ্জনে।"

আবার মন উদাস হইয়া যায়,

"প্রবাসী পথিক ঘরে ফিরে চলো অচেনা সিন্ধুপারে।"

তবুও বলিতে হয়,

"তোমার নিখিলে মোর যৌবনের গানখানি
সমাদরে কণ্ঠে তুলে নিও।"

কিন্তু, "যৌবনশ্রী কোথা পাব আজ ?" সবই ছলনার খেলা,

"ক্ষণিকের প্রেম বুদ্বুদসম মন কেড়ে নেয় এসে।"

বিশ্বাস আসে,

"রাত্রির তিমিরপ্রান্তে পাওয়া যাবে শান্তির আভাস।"

উপলব্ধি হয়,

"একটি ক্ষণের স্মৃতি অনন্ত কালের সাথে
অঙ্কিত করিছে তব মহিমার ছবি।"

'আগ্নেয় রজনী', 'নবান্ন উৎসব', 'বুদ্ধের স্মরণে' প্রভৃতি কবিতাগুলি চমৎকার। ছন্দনিপুণ কবির শব্দগুলি সুনির্ব্বাচিত। কবিতাগুলি বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। অবতরণিকায় তিনি বলিতেছেন, "কবিতার ভিতর দিয়ে জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি নিজের জীবনের স্বপ্ন।" "দীপায়ন" তাঁহার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিবে।

জীবন খাতা—ধরণীধর চট্টোপাধ্যায়। দি বুক এম্পোরিয়ম লিমিটেড, ২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম লেখা নাই।

কবি পরলোকগত। পুত্র গিরিজাশঙ্কর পিতার কবিতাগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। স্মৃতিতর্পণ করিয়াছেন শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত এবং শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। "জীবন-খাতা" প্রকাশ করিয়া গিরিজাশঙ্কর পুত্রের কর্ত্তব্য কাজই করিয়াছেন। না করিলে ছন্দে এবং প্রকাশভঙ্গীতে অনেকগুলি সুন্দর কবিতা বিস্মৃতি-সাগরে তলাইয়া যাইত।

'প্রবাসে' পাই,

> অম্বরতল মেঘসম্বৃত গম্ভীর পরকাশ,
> স্বর্ণ-নাগিনী ঝলকে ঝলকি চমকে দামিনী-হাস।

'এস' কবিতায় আছে,

> এস নব-বধূটির
> অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত অনুরাগ-সিঞ্চিত লজ্জার প্রায়।

'অনুতপ্ত' কবিতায় আছে,

> মনে হ'ল যেন ব্যথা দিয়ে মনে কাহারে কয়েছি কথা,
> বিহগের গান তাহারি মনের অস্ফুট ব্যাকুলতা।

'সমর্পণ', 'বিকাশ-ভিখারী' প্রভৃতি কবিতাগুলি বড় ভাল লাগিল। 'মৃত্যু-আবাহনে' কবি নিজের মনের ইচ্ছা অকুণ্ঠ ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন; 'জীবন-খাতা' শেষ কবিতা। ইহাতে তিনি বলিতেছেন,

> ঘাটের মায়া কাটিয়ে দিয়ে
> অকূলপানে লক্ষ্য করি'
> নানা ভুলের পণ্য বোঝাই
> ভাসিয়ে দি' এই জীর্ণ-তরী।

পরলোকগত কবির জীবনের আকৃতি এই কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ পাইয়াছে। "জীবন-খাতা" কাব্যামোদী পাঠকের ভাল লাগিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

অপলাপ—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ডি এম, লাইব্রেরী· ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানিতে বহু চরিত্রের ভিড়, সবগুলিই প্রয়োজনীয় নয়, অনেক ঘটনা—যাহা না ঘটিলেও গল্পাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হইত না, এবং অনেক সমস্যা আছে—যাহার উপর একাধিক প্রতিভাশালী কথা-সাহিত্যিক ইতিপূর্ব্বে বহুবার আলোকপাত করিয়াছেন। কিন্তু এইগুলিই গল্প শোনার আসল বাধা নহে—যদি গল্প বলার ধরণটি হয় সরস। একই গল্প তো আমরা বহুজনের মুখে শুনিয়া থাকি, ভালও লাগে শুনিতে, তবু কোন কোন ক্ষেত্রে কৌতূহল জাগ্রত হয় না কেন? শুধু কথন-ভঙ্গীর তারতম্যে এমনটি হয়। উপন্যাস লেখার মধ্যেও এই সত্যটি নিহিত। আমরা জানি, নূতন বা পুরাতন যে কাহিনীই হউক বক্তৃতায় জমাইয়া তাহাকে বাস্তব করা যায় না—শুধুমাত্র লেখার ভঙ্গীতে ও বস্তু গ্রহণ-বর্জ্জনের সংযমে তাহা রস-গ্রাহ্য ও চিত্তাকর্ষক হয়। আলোচ্য উপন্যাসে যদিও লেখক সমাজ এবং জীবনের কয়েকটি সমস্যা লইয়া বিদগ্ধ-জনোচিত আলোচনা করিয়াছেন তথাপি প্রকাশভঙ্গীর দৈন্যে এই সুদীর্ঘ ঘটনাবহুল কাহিনীটি পাঠকচিত্তে রেখাপাত করিতে পারে নাই।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

অগ্নিযুগের অস্ত্রগুরু হেমচন্দ্র:—শ্রীবিনয়জীবন ঘোষ। ক্যালকাটা পাবলিসার্স, ১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। পৃষ্ঠা ১৫৬, মূল্য ২॥০।

বাংলার তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগোর (১৮৭০—১৯৫১) জীবনী। বাংলার অগ্নিযুগের ইতিহাসে যাঁহাদের

নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হইয়া আছে হেমচন্দ্র তাঁহাদের একজন। তিনি নিজের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা 'বাংলায় বিপ্লব-প্রচেষ্টা' এবং 'অনাগত দিনের তরে' এই দুইখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হেমচন্দ্র ফরাসীদেশ হইতে বোমা তৈয়ার শিখিয়া আসিয়াছিলেন একথা অনেকেরই জানা আছে। তিনি গান্ধীবাদের বিরোধী ছিলেন এবং অরবিন্দ-বারীন্দ্রের সহিত তাঁহার মতের মিল ছিল না। অথচ হেমচন্দ্র বারীন্দ্রের নেতৃত্বে সংগঠিত বিপ্লব-প্রচেষ্টায় যোগ দান করায় আন্দামানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি আশী বৎসর বাঁচিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিপ্লবীজীবন ১৯০২-১৯২০ এই আঠার বৎসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলা চলে। লেখক 'অগ্রপুরুষ' হেমচন্দ্রের পরিচয় দিতে গিয়া যে আর একটি খাঁটি দরদী মানুষ হেমচন্দ্রের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার ব্যক্তিত্ব আরও যেন উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। হেমচন্দ্র ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে তিন বৎসর পড়িয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে তিনি ছয় মাস মাত্র চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। আবার এই হেমচন্দ্রই যৌবনে সুগায়ক ও সুরজ্ঞ ছিলেন। কিছুকাল তিনি মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের চিত্রবিদ্যার শিক্ষক ছিলেন। পরবর্তীকালে ফরাসীদেশে চিত্রবিদ্যার অনুশীলন করার আরও সুযোগ তাঁহার মিলিয়াছিল। দরজীর কাজে হেমচন্দ্রের পাকা হাত ছিল, কাঠের আসবাবপত্র তৈরি করিতে পারিতেন, নিজ হাতে ফুলের বাগান করিতেন। রন্ধনবিদ্যায়ও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ফরাসীদেশে যখন এই বোমা প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষার্থী আর্থিক সঙ্কটে পড়েন তখন পাচকবৃত্তির আয় দ্বারা অর্থাভাব দূর করিতে এবং বোমা তৈরি শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এছেন গুণী হেমচন্দ্র পরলোকগত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর সহযোগিতায় ১৯০২ সনে মেদিনীপুর শহরে বিপ্লবী সংগঠনের গোড়াপত্তন করেন। পরে এই দল ও কলিকাতার বিপ্লবীদল একসঙ্গে কার্য্য করে এবং ১৯০৮ সনের ২রা মে পুলিস কর্তৃক ধৃত হন, তন্মধ্যে অনেকে আলিপুরের মামলায় শাস্তি প্রাপ্ত হন! আন্দামান হইতে ফিরিবার পর (১৯১৯) হেমচন্দ্র আর কোন বিপ্লবীদলে ছিলেন না যদিও এই বিপ্লবী নেতা আমরণ স্বদেশের ও মানবের হিতের জন্য বিপ্লবকামী ছিলেন। তিনি মানবতাকে আস্তিক্যের উপরে স্থান দিতেন এবং নাস্তিক বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেন। তাঁহার বিপ্লবের আদর্শ ছিল ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ—যাহা সে যুগে অন্যান্য বিপ্লবী নায়কেরা অবাস্তব মনে করিতেন।

হেমচন্দ্রের জীবনী আলোচনা-প্রসঙ্গে লেখক তৎকালের বিপ্লব-প্রচেষ্টার যে একটি আলেখ্য প্রদান করিয়াছেন তাহা একাধারে যথাযথ ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। লেখকের নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীর দরুন পুস্তকখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে।

বাংলা বর্ষলিপি ১৩৬০—শ্রীশিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী সম্পাদিত। সংস্কৃতি বৈঠক। ১৭, পণ্ডিতিয়া প্লেস, কলিকাতা-২৭। পৃষ্ঠা ৩৫২। মূল্য আড়াই টাকা।

ভারতের প্রাকৃতিক পরিচয়, ১৯৫১ সনের আদমশুমারী, ভারতের সংবিধান, বাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ বিবরণ, কলিকাতা করপোরেশন, শিক্ষা, গ্রন্থাগার, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, পাক-ভারত বাণিজ্য, পাসপোর্ট, খেলাধুলা, দেশের ও বিদেশের সরকার, রাজনৈতিক দল, কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গের বাজেট প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য তথ্য দ্বারা বর্ষলিপিখানি পূর্ণাঙ্গ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যাঁহারা ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ, এই বর্ষলিপি তাঁহাদের পক্ষে খুবই উপযোগী সেকথা বলাই বাহুল্য। ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও এই পুস্তকে প্রদত্ত তথ্যাদির উপর নির্ভর করিতে পারেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক চাকুরির পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতার অন্যতম কারণ সাধারণ জ্ঞানের অভাব। উক্ত বর্ষলিপিখানি সযত্নে অধ্যয়ন করিলে এই অভাব অনেকটা পূরণ হইবে। বর্ত্তমান দশম সংস্করণে বহু নূতন জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

রাশিয়া কি সমাজতন্ত্রী দেশ?—অনুবাদক শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত। প্রাচী প্রকাশন, ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা-১। পৃষ্ঠা ৭২। মূল্য চারি আনা।

এখানি ইংরেজী হইতে অনূদিত। ষ্ট্যালিনের রাশিয়া সমাজতন্ত্রী দেশ কিনা এই প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন—"হাঁ" আর্ল ব্রাউডার (কম্যুনিষ্ট) এবং "না" মাক্স আইম্যান (কম্যুনিষ্ট বিরোধী)। উভয় তরফেই যুক্তি দেখানো হইয়াছে এবং পাঠক যাহাতে স্বকীয় মতামত গঠন করিতে পারেন সে বিষয়ে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যেই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও পুস্তকখানি কম্যুনিষ্টবিরোধী প্রচারগ্রন্থ বলিয়া মনে হয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

মনের কথা—শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য। ১১, কৃষ্ণরাম বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪ হইতে শ্রীঅপর্ণা ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১২৬। মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানি আধুনিক মনোবিজ্ঞানসংক্রান্ত গ্রন্থ নহে। ঈশ্বর-পরায়ণ, মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ চিন্তাশীল লেখক এতে সংসারী মানুষের পক্ষে জ্ঞাতব্য ও পালনীয় কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা করেছেন। কামক্রোধাদি রিপু মানুষের মনকে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল করে, সুখদুঃখ আশানিরাশা মনে তোলে আলোড়ন। কিভাবে সংসার-তাপে তাপিত মানুষ শান্তিলাভ করতে পারে তা গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে শ্লোক সঙ্কলন করে দেখিয়েছেন। শিশু, কিশোর, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ—মানব-জীবনের এই বিভিন্ন অবস্থায় মানুষের মনঃপ্রকৃতি ও সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা সংক্ষিপ্ত হলেও তাতে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর ভাবের ইঙ্গিত আছে। হাল্কা লেখার প্লাবনে দেশের মন ভেসে গেলে সুফল ফলবে না, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'পারিবারিক প্রবন্ধ' প্রভৃতি পুস্তকের মত বাঙালীকে আত্মস্থকারী এ ধরণের বইয়ের সমাদর হওয়া আবশ্যক।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

ভুখা মিছিল—শ্রীশশাঙ্ককুমার পাত্র। দেবগ্রাম, নদীয়া। মূল্য ৸৹।

পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভিক্ষ বর্ণনা এবং সরকারী নীতির প্রতিবাদ—প্রচার-ধর্মী কবিতা। ভাষায় জোর আছে, হেঁয়ালি নাই, ছন্দ ত্রুটিহীন।

অভিজ্ঞান:—শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়। ইণ্ডিয়ানা, ২১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹।

ইতঃপূর্বে 'ভাষণ' ও 'পঙ্কজ' নামে সুবোধ বাবুর দুইখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সাহিত্যরসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ঐ দুই গ্রন্থের কয়েকটি নির্বাচিত কবিতার সহিত পাঁচটি নূতন কবিতা এই পুস্তকে সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার সুকবি। নূতনত্বের প্রলোভন অথবা বুদ্ধি-বিলাস তাঁহাকে স্বধর্ম চ্যুত করে নাই। "নতশির মোরা প্রতি দিবসের বেদনা-শোকে, যাপি বিবর্ণ প্রভাত সন্ধ্যাবেলা" এ দুঃখের সুর তাঁহার কবিতায় বাজিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া "সন্ধ্যামালতী ফুটেছে দেহলি পাশে"—তাহাকে তিনি উপেক্ষা করেন নাই।

কেশরঞ্জনের
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
চুল উঠা বন্ধ করে
মাথা ঠাণ্ডা রাখে
এই মার্কা দেখে কিনুন•নকল থেকে সাবধান

ধপ্ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্ঝকে
ক'রে কাচা
সান্‌লাইট্
সাবানের দৌলতে
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT
SOAP
SUNLIGHT SOAP

যুক্তি ও বিশ্বাস—শ্রীরণেন্দ্রকৃষ্ণ বিশ্বাস। ২৬।১বি, গরচা রোড, কলিকাতা ১৯। মূল্য ।০।

লেখক চিন্তাশীল। 'যুক্তিহীন সাধন কিংবা সাধনহীন অন্ধবিশ্বাস কোন কালেই মানুষকে তার চরম লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারবে না' ইহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য। সরস প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি তাঁহার বক্তব্য বিষয় গুছাইয়া চলিয়াছেন।

নির্ঝর সঙ্গীত—পোদ্দারনীহার ভারতী। ৬।১এম, ছিদাম মুদী লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য বার আনা।

কবিতাগুলির সরল প্রাণচাঞ্চল্য সুর নির্ঝরের মত বহিয়া চলিয়াছে। কিন্তু ছাপার ভুল দৃষ্টিকে পীড়িত করিয়া তোলে।

সৃষ্টিতত্ত্ব—শ্রীআদিনাথ সেন। আশুতোষ লাইব্রেরী। ৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য আট আনা।

বিজ্ঞানের কথা সহজ করিয়া বুঝাইয়া বলার প্রয়োজন আজ অপরিসীম। বিজ্ঞ গ্রন্থকার এ কাজে হাত দিয়াছেন ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়। আশা করি তাঁহার দান পাঠক-সমাজে সাদরে গৃহীত হইবে।

মেস্‌মেরিজম্ বা সম্মোহন বিদ্যা শিক্ষা—প্রফেসর জে চৌধুরী, এম-এ। প্রকাশক—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ভড়, ১৬৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

গ্রন্থকার সম্মোহনবিদ্যার সাহায্যে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা করেন। আলোচ্য পুস্তকে তিনি অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত সহ এই বিদ্যার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রহস্যময় চোর—শ্রীসুধাকান্ত দে। প্রকাশক—শ্রীপ্রিয়নাথ দাশ, ৯, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য—২৸০।

রহস্যোপন্যাস। জীবজন্তুকে শিক্ষা দিলে তাহাদের দ্বারা কত দুঃসাধ্য কাজ করানো যায়—এক চতুর দস্যু তাহারই পরিচয় দিয়াছে একটি বালককে অপহরণ করাইয়া। নানা ঘটনার সমাবেশে গল্প বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। সমালোচ্য পুস্তকখানি এক শ্রেণীর পাঠকের আনন্দবিধান করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

নূতন পৃথিবী—শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—১৸০।

উপন্যাস। সমুদ্রের ঝড়ে "কল্পনা" নামে একখানি জাহাজ বহুযাত্রী সহ চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতবেষ্টিত এমন এক স্থানে গিয়া আটক পড়িল যাহার সহিত পৃথিবীর সভ্য সমাজের কোন যোগাযোগ নাই। তার পর নানা ঘটনা-সংঘাতের ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠিল এক নূতন উপনিবেশ। মানুষের চেষ্টা ও ঐকান্তিকতা থাকিলে জীবনধারণের সকল প্রকার ব্যবস্থাই যে তাহারা করিতে পারে গল্পের ছলে লেখক একথা বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। লেখকের এই প্রয়াস বহুলাংশে সার্থক হইয়াছে।

ঝড়—ইলিয়া এরেনবুর্গ। অনুবাদক—শ্রীঅশোক গুহ। ভারতী লাইব্রেরী, ১৪৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ৩৸০।

পৃথিবীখ্যাত ষ্টালিন-পুরস্কার প্রাপ্ত "ঝড়" উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ। সমালোচ্য পুস্তকখানি উক্ত পুস্তকের তৃতীয় খণ্ড। প্রথম দুই খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডটিও একখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ উপন্যাস। ইহার পরিচিতি নিষ্প্রয়োজন। যাহারা পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ পাঠে আগ্রহশীল, পুস্তকখানি তাহাদের নিঃসন্দেহে আনন্দবিধান করিবে। স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীল অনুবাদের গুণে পুস্তকখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

বেদস্মৃতি—শ্রীবিহারীলাল সরকার সম্পাদিত। বসুমতী সাহিত্য মন্দির ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা ।০+১১৪। মূল্য আট আনা।

শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধের সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ নির্গুণ ব্রহ্মচিন্তাবিষয়ে প্রশ্ন করায় শুকদেব সর্ব্বোপনিষদ্‌গণের সার সংগ্রহরূপ শ্রীনারায়ণ-নারদ সংবাদ শুনাইয়াছিলেন। বেদের সার উপনিষদ। সেই উপনিষদের সার কথা শুকমুখে নারায়ণ-নারদ সংবাদ-প্রসঙ্গে এই পুস্তকে ব্যক্ত হওয়ায় ইহা গৃহী ও ত্যাগী উভয় শ্রেণীর পাঠকের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। শ্রীধরস্বামীপাদের টীকাবলম্বনে সম্পাদক "নির্গুণ ব্রহ্ম কিরূপে শ্রুতিপ্রতিপাদ্য" এই দুরূহ বিষয়টির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীনৃপেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ—শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ১২।১, কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন, কলিকাতা-২৬ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ।০+৯৮।

আলোচ্য পুস্তিকায় কবিশেখর কালিদাস রায় হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহী-সাধু নৃপেন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ বহু ব্যক্তির লিখিত নৃপেন্দ্র-স্মৃতি এবং প্রশস্তি পরিবেশিত হইয়াছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী
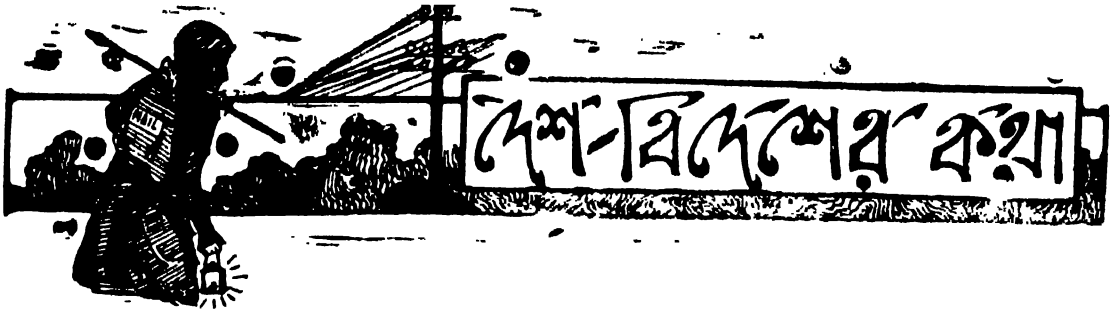
পুণা রিসার্চ্চ ষ্টেশন

পুণা শহর হইতে এগার মাইল দূরে মুঠা নদীর উপরকার ৮০ বৎসরের পুরনো খাড়াকোয়াসলা বাঁধের ছায়ার নীচে খেলনার মত জলসেচ এবং নৌচালনের অনুকৃতি মডেল দৃষ্ট হয়। 'সেণ্ট্রাল ওয়াটার এণ্ড পাওয়ার রিসার্চ ষ্টেশনে' কর্ম্মে নিযুক্ত ইঞ্জীনিয়ার-বৈজ্ঞানিকদের তত্ত্বাবধানে এগুলি নির্ম্মিত। ১৯৪৭ সাল হইতে তাঁহারা এখানে হাইড্রলিক ইঞ্জীনিয়ারিং সম্পর্কিত গবেষণাদি চালাইয়া আসিতেছেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই ষ্টেশনটি এখন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে।

১৯১০ সালে বোম্বাই পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের একটি বিশেষ জলসেচ বিভাগরূপে ভিন্ন নামে এই ষ্টেশনের সূচনা হয়। চারি বৎসর পরে হাডাপাসারের নিকট ইহাকে স্থানান্তরিত করা হয়।

এই দীর্ঘকালের মধ্যে যে সমস্ত কার্য্যে উক্ত ষ্টেশন প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করিয়াছে, সক্কুর বাঁধনির্ম্মাণ তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ১৯৩৪ সালে ইহাকে খাড়াকোয়াসলাতে ফাইফ হ্রদের নীচে মূল মুঠা খালের ধারে সরাইয়া লইয়া যান। ১৯৩৭ সালে ইহা সর্ব্বভারতীয় স্বীকৃতি লাভ করে। ইহার উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার ইহার ভার গ্রহণ করেন। ১৯৪৩ সালে ইহা 'সেণ্ট্রাল ওয়াটার এণ্ড পাওয়ার কমিশনে'র নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে এবং তখন হইতেই ইহার নূতন নামকরণ করা হয়—সেণ্ট্রাল ওয়াটার রিসার্চ ষ্টেশন।

এই ষ্টেশনটি এখন একটি পুরনো গবেষণাকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। জলসেচ, নৌ-চলাচল, জমি সংরক্ষণ, হাইড্রলিক মেশিনারি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক গবেষণা ইহার বহুমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টার অন্তর্গত। ১৯৩৩ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত এই ষ্টেশন কর্ত্তৃক ২৫০০টি পরীক্ষণ সম্পন্ন হইয়াছে। ষ্টেশনের উপর খাড়াকোয়াসলা বাঁধের অপর দিকে ইহার জলাধার লেক ফাইফ অবস্থিত।

'সঙ্গীতকলাকেন্দ্রে'র নৃত্যগীতানুষ্ঠান

গত ৪ঠা অক্টোবর ৮ নং জগন্নাথ সুর লেনে সঙ্গীতকলাকেন্দ্র নামক নৃত্যকলা ও সঙ্গীত শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বিখ্যাত নাট্যকার শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পৌরোহিত্যে এক বিচিত্রানুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। সভার উদ্বোধন করেন শ্রীরতন চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন 'যুগান্তরে'র সহকারী বার্তা-সম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীসৌরেন দেব পরিচালনায় উদ্বোধন-সঙ্গীত গীত হইবার পর শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র ভারতীয় নৃত্যের গোড়ার কথা, উদয়শঙ্করের নৃত্য-প্রতিভা, সঙ্গীতকলাকেন্দ্রের জন্মকথা ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তারপর সঙ্গীতকলাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাত্রী, পাশ্চাত্ত্যে উদয়শঙ্করের নৃত্যসঙ্গিনী শ্রীমতী প্রীতি চক্রবর্ত্তী এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, শিক্ষাপদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু বলেন। সভাপতি মহাশয়ের সারগর্ভ ভাষণের পর সঙ্গীতকলাকেন্দ্রের ছোট বালিকাদের নৃত্যানুষ্ঠান আরম্ভ হয়। মঞ্জু নাহার (বয়স ৮) এবং অরুণা (৯) রবীন্দ্রনাথের 'শাওন গগনে' গানটিকে নৃত্যচ্ছন্দে চমৎকার ভাবে ফুটাইয়া তোলে। চন্দ্রা সাহা কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'হৃদয় মন্দিরে' গানটির একক-নৃত্য-রূপায়ণ সকলকে মুগ্ধ করে এবং তাহাকে একটি কাপ পুরস্কার দেওয়া হয়। "শাহজাহান মমতাজ", "অসিনৃত্য", "রাসলীলা" খুবই উপভোগ্য হইয়াছিল। সবগুলি নৃত্যেরই পরিকল্পনা এবং কম্পোজিশন শ্রীপ্রীতি চক্রবর্ত্তীর। এই নৃত্যানুষ্ঠানে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার আবহ-সঙ্গীতে কেবলমাত্র মহিলারাই অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতাংশে ছিলেন তৃপ্তি, স্মৃতি, হৈমন্তী গুহ। কমলা দাশগুপ্তার সেতার, স্নেহ চক্রবর্ত্তীর বাঁশী ও তবলাবাদন অতি উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। নৃত্যের শেষে শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক সকলকে ধন্যবাদ প্রদানের পর অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

সঙ্গীতকলাকেন্দ্র উত্তর কলিকাতায় ছোট বালিকাদের গীত, বাদ্য ও নৃত্য শিক্ষাদানের একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। লণ্ডন ও আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর প্রীতি চক্রবর্ত্তীর একক চেষ্টায় ও নিজের অর্থে মাত্র চার জন ছাত্রী লইয়া ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। আজ ইহার ছাত্রীসংখ্যা ষাট জন। এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। ৩৩এ, নবকুমার রাহা লেন। শ্যামপুকুর, কলিকাতা —৪ এই ঠিকানায় সঙ্গীতকলাকেন্দ্রের সম্পাদিকা প্রীতি চক্রবর্ত্তীর নিকট অর্থসাহায্য প্রেরণ করিলে এই শিশু-প্রতিষ্ঠানটির বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। আমরা এই রকম প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

—

পূরবী সিনেমা হলে রাজ্যপালের সঙ্গে মানিকতলা রেশনিং অপিসের কর্ম্মচারিগণ

সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দের প্রশংসনীয় কার্য্য

গত মাসে মানিকতলা সাব-এরিয়া রেশনিং আপিসের কর্ম্মচারী-বৃন্দের সহযোগিতায় এবং সহকারী রেশনিং অফিসারের তত্ত্বাবধানে "পূরবী" প্রেক্ষাগৃহে যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের সাহায্যার্থে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল মাননীয় শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, উপমন্ত্রী শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রচারসচিব শ্রীগোপিকাবিলাস সেন, প্রাক্তন সেরিফ শ্রী জে. কে. মিত্র, মেজর থিও এইচ. থর্ণ প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে রেশনিং অফিসার এম. কে. ঘোষ সকলকে স্বাগত করেন। অনুষ্ঠানটি ব্যবস্থাপনার অভিনবত্বে চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। প্রতিটি টিকিটের সহিত একটি করিয়া সুদৃশ্য মোড়ক ক্রেতাকে দিয়া তাঁহার সাপ্তাহিক খাদ্যবরাদ্দ হইতে দুই ছটাক চাল উক্ত মোড়কে করিয়া আনিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। এই অনুরোধ সকলেই সানন্দে রক্ষা করেন। চাউল সমেত মোড়কগুলি প্রেক্ষাগৃহের প্রবেশপথে সংগৃহীত হয়। এই অভিনব ব্যবস্থায় অনুষ্ঠান-পরিচালকগণ প্রায় দুই মণ চাউল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। একটি হৃদয়গ্রাহী ভাষণের পর শ্রীঅপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় (খাদ্যবিভাগীয় উপমন্ত্রীর পত্নী) কয়েকটি মোড়ক রাজ্যপালের হাতে অর্পণ করেন। ইহা ব্যতীত ৯৩৪৪/১৫ (টিকিট বিক্রয়ের যাবতীয় অর্থ) যক্ষ্মা হাসপাতালের সাহায্যার্থে দেওয়া হয়। অতঃপর কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞ ডাঃ পি. কে. সেন ঐ রোগ সম্বন্ধে একটি শিক্ষাপ্রদ ভাষণ দেন। রাজ্যপাল তাঁহার সারগর্ভ ভাষণে বলেন—সরকারের পক্ষে জনগণের নিকট হইতে সাড়া পাওয়া দরকার, নতুবা সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভবপর হয় না। খাদ্যমন্ত্রী এই অভিনব উপায়ে চাউল সংগ্রহের জন্য উদ্যোক্তাদিগকে ধন্যবাদ দেন।

মুখ্যতঃ মানিকতলা আপিসের এসিষ্টাণ্ট রেশনিং অফিসার শ্রীসমর মিত্রের চেষ্টায় অনুষ্ঠানটি বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

বিল
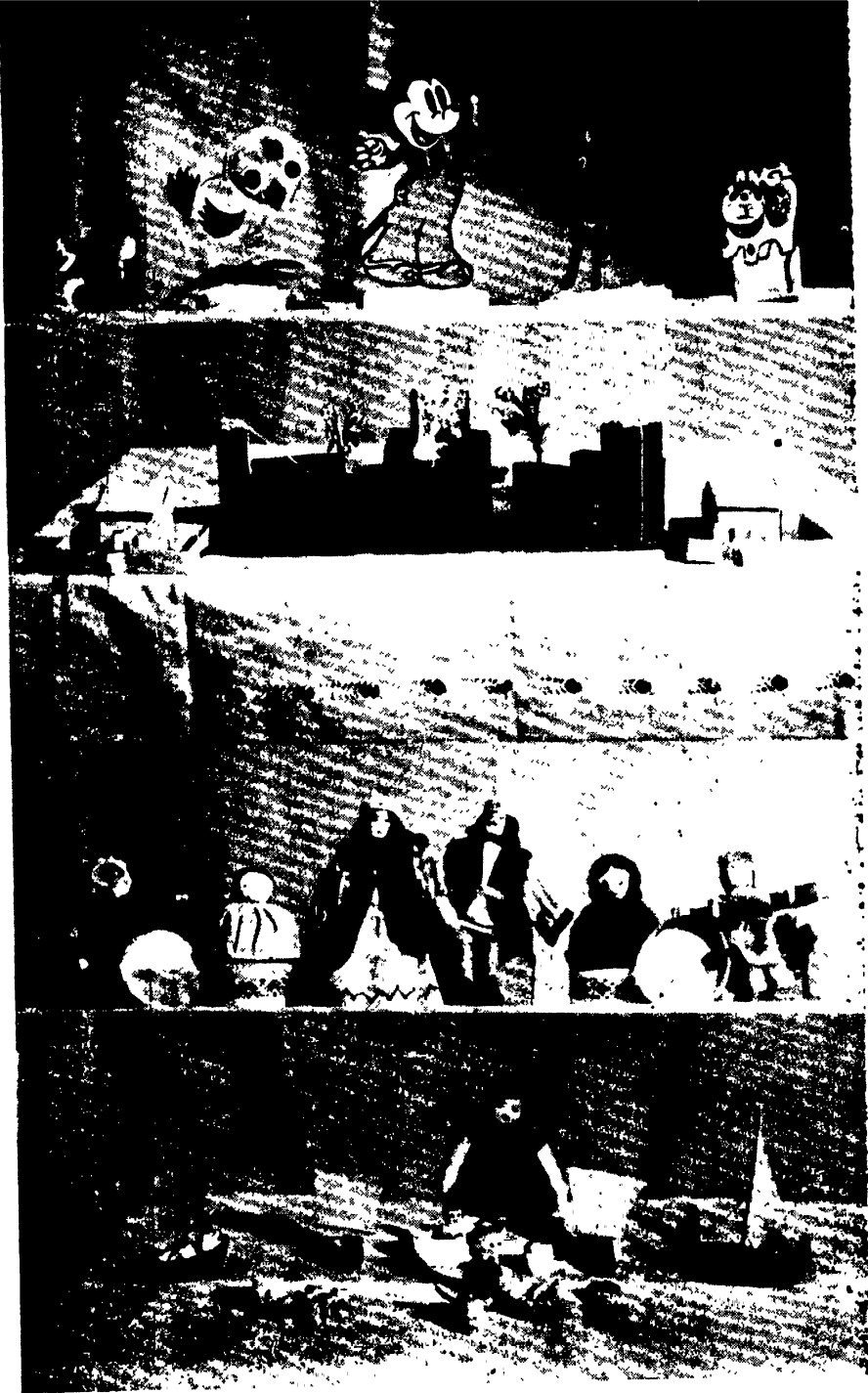
উপর হইতে নীচে—(১) পিচবোর্ডের জন্তু-জানোয়ার (২) সিগারেটের বাক্স হইতে তৈরী পুতুলের ড্রয়িং-রুম সেট ও সিগারেটের কাগজের তৈরি পুতুলের বাড়ী (৩) তামাকের টিন হইতে প্রস্তুত সুঁচ সুতা রাখার কৌটা ও ঐ টিনের ঢাকনায় তৈরি ট্রে (৪) নানা প্রকার পুতুল

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৩শ ভাগ
২য় খণ্ড { অগ্রহায়ণ, ১৩৬০ } ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সংবাদপত্র, সাংবাদিক ও পুলিস

বিগত জুলাই মাসে কলিকাতার যে মাৎস্যন্যায়ের পালা অনুষ্ঠিত হয় তাহার মধ্যে এক বিশেষ শোচনীয় ব্যাপার ঘটে ২২শে জুলাই। সেদিনকার সাংবাদিক নিগ্রহের কথা প্রত্যেক সংবাদপত্রেই বিশদ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এবং ভারতের সকল প্রান্তেই তাহার উপর মন্তব্য ও আলোচনা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই।

ঐ ঘটনার পর সাংবাদিকমণ্ডলীতে স্বভাবতঃই বিশেষ আন্দোলন হয় এবং তাহার ফলে কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তের দাবি করা হয়। সেই দাবির ফলে কমিশন বসে এবং কলিকাতা হাই-কোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মুখার্জি কমিশন পরিচালনা করিয়া বিগত ২রা নবেম্বর তাঁহার রিপোর্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দিয়াছেন। ঐ রিপোর্টের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি আমরা পরে দিতেছি। কিন্তু প্রথমে তাহার সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন, কেননা ঐ রিপোর্ট সাংবাদিক ও সংবাদপত্রসেবী উভয়ের পক্ষেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বিচারপতি মুখার্জি তাঁহার রিপোর্ট আইনের প্রাকারের মধ্যে বাধিয়া দিয়াছেন। ইহা ন্যায়সঙ্গত এবং যখন সাংবাদিকগণই আইন-সঙ্গত তদন্ত চাহিয়াছিলেন তখন আমাদের কিছু বলিবার নাই। বিচারপতি মহাশয়ের সম্মুখে যে সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত হয় এবং ব্যবহারজীবীর সওয়ালজবাবে তাহার যে অবস্থা হয় তিনি তাহারই ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গত নিষ্পত্তি করিয়াছেন ইহাও সত্য। তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং সাংবাদিকের অধিকারের বিষয়ে ঐ পরিপ্রেক্ষিতে যাহা বলিয়াছেন তাহাও অগ্রাহ্য করা চলে না, কেননা দায়িত্ব ভিন্ন স্বাধীনতা বা কোনও অধিকার বর্তায় না তাঁহার এই উক্তি স্বতঃসিদ্ধ সত্য। তিনি বলিয়াছেন, "সাংবাদিকের স্বাধীনতা অপর যে কোনও দেশবাসীর সমান এবং উহা সাধারণ নাগরিকের স্বাধীনতা অপেক্ষা বেশীও নহে কমও নহে।" ইহা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই, এবং যদি কোনও সাংবাদিক এ বিষয়ে ভুল ধারণা পোষণ করেন তবে তাহা তাঁহারই অশান্তির কারণ হইবে ইহাও ঠিক।

কিন্তু ইহা কি প্রমাণিত হয় নাই যে, বহুসংখ্যক সাংবাদিক পুলিস কর্তৃক প্রহৃত হইয়াছিলেন? এবং এই প্রহার নিরোধ করিবার চেষ্টা উপস্থিত পুলিস অফিসার কেহ করিয়াছিলেন এরূপ কোনও প্রমাণ কি উপস্থিত হয়? ইন্‌স্পেক্টর সেনকে প্রহার যে বা যাহারা করিয়াছিল তাহারা ভিন্ন কেহই কি প্রহৃত হয় নাই?

পুলিস কঠোর নিয়মানুবর্তী ও শিক্ষিত রক্ষক প্রতিষ্ঠান। বিদেশে যদি কেহ আইনভঙ্গ করে এবং তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য বলপ্রয়োগ নিতান্তই প্রয়োজন হয় সে ক্ষেত্রেও পুলিস যতটা প্রয়োজন ততোধিক বলপ্রয়োগে অধিকারী নহে এইরূপ আমরা শুনিয়াছি। এক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ কি যথাযথ এবং disciplin এর মর্যাদা অনুযায়ী হইয়াছিল?

এদেশের সাংবাদিক জগতে স্বেচ্ছাচার বাড়িয়া চলিয়াছে সন্দেহ নাই। সে বিষয়েও সাংবাদিক দেশবাসীর এক অংশ অপেক্ষা অধিকও নহে কমও নহে। কিন্তু পুলিসও ত সাধারণ জনসমষ্টি নহে। তাহাদের ব্যবহার সমীচীন হইয়াছিল কি?

সংবাদপত্র-জগতে "সারকুলেশন" দেবতার পূজায় দরিদ্র সাংবাদিক-গোষ্ঠীর কয়েকজন নিগৃহীত হইলেন ইহাই শুধু দুঃখের কথা নহে। এইরূপ একটি লজ্জাকর ব্যাপার যে আদৌ ঘটিল তাহাও দুঃখের কথা।

সাংবাদিক নিগ্রহ তদন্ত রিপোর্ট

কলিকাতায় বিগত ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় সাংবাদিকদের কার্য্যে বাধাদান ও ২২শে জুলাই ময়দানে সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার ও প্রহারের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য কমিশন নিযুক্ত হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী পি. বি. মুখার্জি এই তদন্ত কমিশন পরিচালনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট ২রা নবেম্বর তাঁহার রিপোর্ট পেশ করেন। নিম্নে তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রদত্ত হইল:—

১৯৫৩ সালের ১লা আগষ্ট কলিকাতা গেজেটের বিশেষ সংস্করণে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে ১৯৫২ সালের তদন্ত কমিশন আইন অনুযায়ী আমাকে তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করা হয়। তদন্তের বিচার্য্য বিষয়গুলি ছিল—

(১) ট্রামভাড়া বৃদ্ধি সম্পর্কে সাম্প্রতিক আন্দোলনকালে

কার্য্যরত বার্ত্তাজীবীদের কার্য্যে বাধাদান ও হস্তক্ষেপের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত।

(২) নিম্নলিখিত বিষয়ে তদন্ত :

(ক) ১৯৫৩ সালের ২২শে জুলাই অপরাহ্ণে কলিকাতা ময়দানে সংবাদপত্রের রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারদের উপর পুলিসের প্রহার ও গ্রেপ্তারের অভিযোগ।

(খ) কোন্ অবস্থার মধ্যে প্রহার ও গ্রেপ্তার হইয়াছে।

(গ) কে বা কাহারা প্রহার ও গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং

(ঘ) ১৯৫৩ সালের ২২শে জুলাই অপরাহ্ণে সংবাদপত্রের রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারদের উপর প্রহারের কালে অন্য ঘটনা বা ঘটনাসমূহ।

সংবাদপত্রের রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারগণকে এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে তাঁহাদের বিবৃতিতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে মৌখিক ও নথিভুক্ত তথ্যাদিসহ তাঁহাদের বক্তব্যসম্বলিত বিবৃতি কমিশনের নিকট পেশ করিতে বলা হইয়াছিল। পুলিসের পক্ষের সাক্ষীদিগকে কমিশন, সংবাদপত্র ও কমিশনের নিকট উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তি-গণের পক্ষ হইতে জেরা করা হয়।

ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘ, প্রেস ক্লাব, প্রেস ফটোগ্রাফার্স এসোসিয়েশন এবং সংবাদপত্র উপদেষ্টা কমিটির পক্ষ হইতে কমিশনে একটি যুক্ত বিবৃতি পেশ করা হয়। লোকসভার সদস্য শ্রীসত্যপ্রিয় ব্যানার্জ্জি কমিশনের নিকট একটি বিবৃতি দাখিল করেন; কিন্তু তিনি উহাতে স্বাক্ষর করেন নাই। তাঁহার পক্ষে তাঁহার এডভোকেট উহাতে স্বাক্ষর করেন। তবে শ্রীব্যানার্জ্জি শেষ পর্য্যন্ত কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দেন নাই, যদিও কমিশনের শুনানীর সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই সম্পর্কে কমিশন মন্তব্য করিয়াছেন, "একথা অবশ্যই ধরিয়া লইতে হইবে যে, তাঁহার (শ্রীব্যানার্জ্জির) পক্ষে তাঁহার এডভোকেট কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে তিনি যে সকল অভিযোগ করিয়াছিলেন সেগুলি প্রমাণ করিবার সাধ্য তাঁহার ছিল না। অতএব আমি এই মত দিতেছি যে, পুলিসের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই।"

বিচার্য্য বিষয়ে প্রথম দফা সম্পর্কে কমিশনের সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

কলিকাতার বহুসংখ্যক সংবাদপত্রের মধ্যে কোনটিরই স্বত্বাধিকারী, মালিক বা সম্পাদক (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের অস্থায়ী সম্পাদক ব্যতীত) পুলিস কর্ত্তৃক সাংবাদিকদের নিকট সংবাদের সূত্র বন্ধ করিয়া দিবার অভিযোগ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে আসেন নাই, যদিও আমি দেখিতেছি, কমিশনের নিকট সাক্ষীদের যে তালিকা পেশ করা হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতার প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের প্রত্যেক সম্পাদকের নামই সাক্ষীরূপে উল্লেখ করা হইয়াছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা, লোকসেবক, দৈনিক বসুমতী বা স্বাধীনতার এক জন রিপোর্টারও তাঁহাদের সাক্ষ্যে সংবাদ-সরবরাহের কোন সূত্র বন্ধ হইয়া যাওয়ার অভিযোগ করেন নাই। আমার মনে হয় এই সম্পর্কে কতকগুলি সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য। প্রথমতঃ, পুলিস কোনভাবে সংবাদপত্রের নিকট কোন সংবাদের সূত্র বন্ধ করিয়াছিল, এইরূপ কোন সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ নাই। দ্বিতীয়তঃ, ফায়ার ব্রিগেড বা এম্বুলেন্স ঘটনা সম্পর্কে কোন সংবাদ দিতে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা প্রমাণ করার মত কোন সাক্ষ্য দেওয়া হয় নাই। ফায়ার ব্রিগেড বা এম্বুলেন্স পুলিসের নিয়ন্ত্রণাধীন অথবা সাংবাদিকদের প্রার্থিত সংবাদ দিবার ব্যাপারে পুলিস কোন-ভাবে ফায়ার ব্রিগেড বা এম্বুলেন্সের কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, এইরূপ কোন সাক্ষ্য দেওয়া হয় নাই। তৃতীয়তঃ, হাসপাতালগুলির প্রসঙ্গে হাসপাতাল-কর্ত্তৃপক্ষ যে কলিকাতা পুলিসের অধীনে কাজ করেন বা তাহাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এইরূপ কোন সাক্ষ্য দেওয়া হয় নাই। কলিকাতা পুলিস কর্ত্তৃক কলিকাতা পুলিসের পক্ষ হইতে কোন হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষকে সাংবাদিকদিগকে সংবাদ দিতে নিষেধ করিয়া লিখিত বা মৌখিক কোন আদেশ দেওয়া হইয়াছে এইরূপ কোন সাক্ষ্য দেওয়া হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষ এই অর্থে কড়াকড়ি করিয়াছিলেন যে, সাংবাদিকদিগকে হতাহত সংক্রান্ত সংবাদ সরকারের নিকট হইতে লইতে বলা হইয়াছিল। এই কড়াকড়ির কারণ স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টর হাসপাতাল কর্ত্তৃ-পক্ষের নিকট হইতে অভিযোগ পাইয়াছিলেন যে, সাংবাদিকগণ রোগীদিগকে বিরক্ত করিতেছেন ও তাঁহাদের চিকিৎসায় বাধা সৃষ্টি করিতেছেন। রোগীদের স্বার্থেই ইহা করা হইয়াছিল, এবিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই। চতুর্থতঃ, ইহাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নাই যে, সাংবাদিকদিগকে কিভাবে সংবাদ দেওয়া হইবে সে সম্পর্কে পুলিস কমিশনারের আদেশ ছিল। ১৩ই আগষ্ট, ১৯৪৮, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ ও ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৫২ তারিখে কলিকাতা পুলিস গেজেটের বিজ্ঞপ্তিতে এই আদেশ প্রকাশিত হইয়াছে।

সাক্ষ্য হইতে আমি দেখিতে পাইতেছি, এ ক্ষেত্রে বরাবরই নিরবচ্ছিন্নভাবে এই কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। সাক্ষ্য হইতে আমি আরও দেখিতে পাইতেছি যে, সাংবাদিকদের রাইটার্স বিল্ডিংস, প্রচার-বিভাগের ডিরেক্টর এবং মন্ত্রীদের নিকট অবাধে যাইবার পূর্ণ সুযোগ ছিল।

এই সকল আদেশ যেভাবে উদ্ভূত হইয়াছে তাহা বিচার করিলে দেখা যায় যে, ১৯৪৮ সনে এই আদেশ দেওয়া হয়। অতএব একথা বলা যায় না যে, ১৯৫৩ সনের জুলাই মাসে কলিকাতার গোলযোগের দরুন সাংবাদিকদের উপর নিয়ন্ত্রণাদেশরূপে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমার মনে হয়, এই সকল আদেশের পশ্চাতে যুক্তিযুক্ত ও ন্যায্য নীতি রহিয়াছে। ব্যাপক গোলযোগের সময় যদি যে-কোন ব্যক্তি, যে-কোন স্থানীয় থানা, রাস্তার যে-কোন স্থান হইতে টুকরা টুকরা অসংলগ্ন সংবাদ সংগ্রহ করা হয়, তাহা হইলে উপযুক্ত যাচাই ও পরীক্ষার অভাবে এই সকল সংবাদ প্রকাশের ফলে সম্পূর্ণ বিকৃত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভুল বিবরণ প্রচারিত হইতে পারে। জনসাধারণ যখন উত্তেজিত হইয়া থাকে, ভাবাবেগ

যখন সহজেই জাগাইয়া তোলা যায় তখন ইহা খুবই বিপজ্জনক বলিয়া বিবেচিত হইবে। অতএব মনে হইতেছে যে, এই সকল আদেশের অন্তর্নিহিত নীতি হইল, সংবাদপত্রে পূর্ণ ও যাচাই করা সংবাদ দিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা থাকা প্রয়োজন। এইরূপ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পুলিস বা সরকারী ভাষ্যই প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে বলিয়া যে কথা বলা হইয়াছে তাহার কোন যৌক্তিকতা নাই বলিয়া মনে হয়। কারণ যদি রাস্তার একজন সাধারণ পুলিসের লোকও সাংবাদিককে সংবাদ দেয় তাহা হইলে সে কেবল তাহার নিজের বা পুলিসের ভাষ্যরূপেই সেই সংবাদ দিতে পারে এবং এই পদ্ধতিতে সর্ব্বদাই এই বিপদ রহিয়াছে যে, সে নিজে যাচাই করিয়াছে বা দেখিয়াছে এমন সংবাদ না দিয়া কেবল তাহার শোনা সংবাদই দিতে পারে। দ্বিতীয় অন্য দিক হইতে সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, এই সকল আদেশ পালন না করিয়া বরং অমান্যই করা হইয়াছে। আমি যেভাবে সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিয়াছি তাহাতে এই সমালোচনার সত্যতা প্রমাণিত হয় নাই। যত দিন না আদেশগুলি প্রত্যাহৃত হইতেছে তত দিন পর্য্যন্ত সাংবাদিকগণ বা পুলিস কেহই এই সকল আদেশ অমান্য করিবার অধিকার অর্জ্জন করিয়াছে, একথা বলা চলে না। অতএব আমি এই মত দিতেছি যে, সংবাদপত্রের নিকট কোন সংবাদের সূত্র বন্ধ করিয়া পুলিস বার্ত্তাজীবীদের কার্য্যে বাধা দানা ব হস্তক্ষেপ করে নাই এবং এই মর্ম্মে পুলিসের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রসমূহ যে অভিযোগ করিয়াছে তাহা প্রমাণ করা যায় না, উহা ভিত্তিহীন ও ভুল তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই প্রথম দফা বিচার্য্য বিষয়ের অধীনে আর একটি বিষয় হইল, বার্ত্তাজীবীদের কার্য্যে বাধাদান ও হস্তক্ষেপের অভিযোগ সম্পর্কিত। এই বিষয়ে সাংবাদিকদের বক্তব্য এই যে, পুলিস সাত জন বার্ত্তাজীবীর কার্য্যে বাধাদান ও হস্তক্ষেপ করিয়াছে। এই বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

"সাক্ষ্যদৃষ্টে ও উপরোক্ত কারণে বিচার্য্য বিষয়ের প্রথম দফার অর্থে এই সকল সাক্ষী ও ঘটনার সম্পর্কে পুলিস কর্ত্তৃক বার্ত্তাজীবী-দের কাজে বাধাদান বা হস্তক্ষেপ করা হয় নাই।"

বিচার্য্য বিষয়ের দ্বিতীয় দফার সম্পর্কে তদন্ত কমিশন নিম্নরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :

"সাক্ষ্যদৃষ্টে এবং উপরোক্ত কারণে ও ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেলের সওয়াল ও স্বীকৃতির ভিত্তিতে আমি রিপোর্ট দিতেছি যে, বিচার্য্য বিষয়ের ২ (ক), ২ (খ), ও ২ (গ) দফা অনুসারে গত ২২শে জুলাই অপরাহ্নে কলিকাতা ময়দানে সংবাদপত্রের কয়েকজন রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারকে বিশেষ করিয়া যাহাদের সাক্ষ্য আমি মানিয়া লইয়াছি তাহাদের প্রহার ও গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। আমি এই রিপোর্টও দিতেছি যে, কেবলমাত্র সাদা পোশাক পরিহিত পুলিসের লোকই এই সকল গ্রেপ্তার ও প্রহার করিয়াছিল। তাহাদিগকে সনাক্ত করা যায় নাই।

কলিকাতার পুলিসের কোন অফিসার এই ধরণের প্রহার বা গ্রেপ্তারে অংশ গ্রহণ করেন নাই। পুলিস কমিশনার, হেড কোয়ার্টার্সের ডেপুটি কমিশনার অথবা অন্য কোন ডেপুটি কমিশনার কিংবা কোন ইনস্পেক্টর অথবা সাব-ইনস্পেক্টর প্রেস রেপোর্টার অথবা প্রেস ফটোগ্রাফারদের প্রহার কিংবা গ্রেপ্তারে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, কিংবা তাঁহাদের উপস্থিতিতে, উস্কানিতে অথবা নির্দ্দেশে এইরূপ করা হইয়াছে, এমন কোন সাক্ষ্য আমি স্বীকার করিতে পারি না। আমি ইহাও দেখিতে পাইতেছি এবং রিপোর্ট করিতেছি যে, কর্ত্তব্যরত পুলিসের লোকদের প্রেস রিপোর্টাররা বাধা দিয়াছিলেন এবং রিপোর্টারদের দলের কয়েকজন সুনীল সেনগুপ্তকে গ্রেপ্তারের সময় ইনস্পেক্টর নৃপেন সেনকে বাধা দিয়াছিলেন ও তাঁহাকে প্রহার করিয়াছিলেন। আমার মতে ইহাই রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারদের প্রহার এবং গ্রেপ্তারের অব্যবহিত কারণ ও প্রধান পরিস্থিতি। ইহাও সত্য যে, যেখানে ঘটনাটি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সেখানে পুলিস অপেক্ষা খবরের কাগজের লোকই বেশী ছিল। প্রকৃতপক্ষে খবরের কাগজের লোকদের সংখ্যা পুলিস অপেক্ষা অনেক বেশীই ছিল। এ বিষয়ে আইন সম্পর্কে আমি পরে আলোচনা করিব। আইনসঙ্গত হউক বা নাই হউক, ইনস্পেক্টর সেন সুনীল সেনগুপ্তকে গ্রেপ্তার করার সময় রিপোর্টারেরা তাঁহাকে বাধা দিয়াছিলেন এবং প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। ঐরূপ করার সময় তাঁহারা নিজেদের সাংবাদিক দায়িত্ব পালনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন না। ময়দানের ঘটনার পরের দিন ২৩শে জুলাই সুনীলের নিজের কাগজেই ৪র্থ পৃষ্ঠার ৬ষ্ঠ কলমে যাহা লেখা হইয়াছে তাহা এইরূপ দাঁড়ায় : "এই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত সমস্ত খবরের কাগজের লোকেরা সমবেত প্রতিবাদ জানায় এবং বলে, 'সুনীলকে যদি পুলিস গ্রেপ্তার করে তবে পুলিসকে সমস্ত খবরের কাগজের লোককে গ্রেপ্তার করিতে হইবে।' "স্বাধীনতা" অন্ততঃ সরকার-সমর্থক পত্রিকা হিসাবে পরিচিত নয় এবং উহার রিপোর্ট সরকারের অনুকূল বলিয়া না গ্রহণ করিলেও দেখা যায় সাংবাদিকেরা নিজেদের গ্রেপ্তার চাহিয়া এমন চূড়ান্ত বেআইনী কাজ করিয়াছেন যাহার ইতিপূর্ব্বে কোন নজীর নাই। সুতরাং পুলিস কখনও সাংবাদিকদের প্রহার বা গ্রেপ্তার করিয়াছে ইতিহাসে এমন উল্লেখ নাই, এই যুক্তিকে মিলাইয়া দেখিতে হইবে—প্রেস রিপোর্টারেরাও কখনও পুলিসকে মারিয়াছে অথবা বাধা দিয়াছে এমন উল্লেখ ইতিহাসে নাই। সাক্ষ্যে দেখা যাইতেছে, 'কোন কোন প্রেস ফটোগ্রাফারকে জনতার সহিত মিশিয়া না যাইতে অনুরোধ করা হইয়াছিল।' বিচারপতি তাঁহার রায়ে আরও বলিয়াছেন যে, সাংবাদিক পক্ষের বক্তব্যে প্রধানতঃ বলা হইয়াছে যে, জুলাই মাসে সংবাদপত্রে পুলিসের তীব্র সমালোচনা হওয়ায় পুলিস সাংবাদিকদের আক্রমণ করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই পরিকল্পনা করিয়াছিল। কমিশনের সম্মুখে যে সমস্ত সাক্ষ্য রহিয়াছে তাহাতে পূর্ব্বকল্পিত এবং ইচ্ছাকৃত আক্রমণের অভিযোগ নাকচ

হইয়া যায়। প্রথমতঃ, সাংবাদিকদের সাক্ষ্যেও বলা হইয়াছে যে, নিষিদ্ধ সভা ভাঙিয়া যাওয়া এবং সভাকারীদের গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে সাংবাদিকদের প্রহার করা হয় নাই। যদি আক্রমণ পূর্ব্বকল্পিতই হইত তবে প্রথমে তাঁহাদের অবাধে ঘোরাফেরা করিতে দেওয়া হইত না। সে ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ সভা ভাঙিয়া দেওয়ার ঘটনাবলী সাংবাদিকদের প্রত্যক্ষ করিতেও দেওয়া হইত না। দ্বিতীয়তঃ, সাক্ষ্যে ইহাও দেখা যাইতেছে যে, সাংবাদিকেরা ছবিও লইয়াছিলেন, রিপোর্টও করিয়াছিলেন এবং কোন কোন রিপোর্টারকে গ্রেপ্তারও করা হয় নাই, প্রহারও করা হয় নাই। ষ্টেটসম্যানের শ্রীঅমল দাশগুপ্ত, টাইমস অব ইণ্ডিয়ার মিঃ ম্যাকমোহন ও অমৃত বাজার পত্রিকার শ্রীগোবিন্দ সেন এবং শ্রীঅসীম সেনকে কোনরূপ বাধাই দেওয়া হয় নাই। মিঃ ম্যাকমোহন কয়েকজন গ্রেপ্তার হওয়া সাংবাদিককে ছাড়াইয়া আনিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, ফটোগুলিতে দেখা যাইতেছে যে, ঐগুলি খুব নিকট হইতে তুলিতে দেওয়া হইয়াছিল। আরও দেখা যাইতেছে, যাঁহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাঁহাদের সকলকেই প্রহার করা হয় নাই। তাঁহাদের ঘটনাস্থলে তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দেওয়াতেও এই আভাস পাওয়া যাইতেছে যে, কলিকাতা পুলিসের তেমন কোন অভিসন্ধি ছিল না। সাদা পোষাকের পুলিসেরা সর্ব্বত্র এবং দূরে দূরেও ছড়ান ছিল এবং ইনস্পেক্টর নৃপেন সেন কেবল রিপোর্টারদের মধ্যে আলাদা করিয়া সুনীলকে খোঁজ করারও অনুরূপ আভাস পাওয়া যায়। যদি সেইরূপ কোন অভিসন্ধি থাকিত তবে কেবল একজনের খোঁজ করা হইত না। বিচারপতির মতে এইগুলি অনস্বীকার্য্য দৃঢ় যুক্তি যাহার ফলে এমন কোন সন্দেহ করা যায় না যে, পুলিসের আক্রমণ ইচ্ছাকৃত ও পূর্ব্বকল্পিত। ইহাতে প্রমাণিত হয় সাংবাদিকদের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন হইতেছে, সাংবাদিকেরা ১৪৪ ধারার আদেশ ভঙ্গ করিতে পারেন কি না। যে স্থানে ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকে সেই স্থানে সংঘটিত কোন ঘটনা রিপোর্ট করিতে হইলে প্রেস রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারদের ঝুঁকি লইতে হইবে। তাঁহাদের সেই ঝুঁকি এড়াইবার জন্য তাঁহারা পাঁচ জনের অধিক সংখ্যায় একত্র থাকিয়া আইন ভঙ্গ করিতে পারেন না। তাঁহারা যদি তাঁহাদের নিরাপত্তার দিক দেখিতে চাহেন, তাহা হইলেও আইন ভঙ্গ করিয়া তাঁহারা উহা করিতে পারেন না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারগণ কর্ত্তৃক ১৪৪ ধারা অথবা দেশের অপর কোন আইন ভঙ্গ করা সমর্থন করে না। সাংবাদিকের স্বাধীনতা অপর যে কোন দেশবাসীর স্বাধীনতার সমান এবং উহা সাধারণ নাগরিকের স্বাধীনতা অপেক্ষা বেশীও নহে, কমও নহে। আইন এই ব্যাপারে সাংবাদিকদের জন্য কোন বিশেষ সুবিধা স্বীকার করে না। (এই প্রসঙ্গে বিচারপতি আর্ণল্ড বনাম সম্রাট মামলার প্রিভি কাউন্সিলের লর্ড শ' মন্তব্য উল্লেখ করিয়াছেন।)

উক্ত মামলা অপেক্ষা বর্ত্তমান বিবয়টি অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই ব্যাপারে সাংবাদিকরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নামে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিবার অভূতপূর্ব্ব স্বাধীনতা দাবি করিয়াছেন। ভারতের আইন অথবা বিশ্বের যে সমস্ত দেশে স্বাধীন সংবাদপত্র বর্ত্তমান সেই সমস্ত দেশের আইনও সাংবাদিকদের এই দাবি সমর্থন করে না।

সাংবাদিকদের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, কেবলমাত্র ইউনিফর্ম্ম পরিহিত পুলিসের লোকই কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে পারে, সাদা পোশাকে পুলিস কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারে না এবং সেই কারণেই সাদা পোশাক পরিহিত পুলিস কর্ত্তৃক সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার বেআইনী হইয়াছে। এই যুক্তি ঠিক নহে। গ্রেপ্তার করার অধিকার ইউনিফর্ম্মের উপর নির্ভর করে না এবং এমন কি একজন সাধারণ নাগরিকও কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন। গ্রেপ্তার করিবার সময়ে পুলিসকে ইউনিফর্ম্ম পরিহিত থাকিতে হইবে এইরূপ কোন রীতি ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন অথবা ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনে বাণত নাই। আইন তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার কর্ত্তব্য অথবা দায়িত্ব দিয়াছে, তাহার ইউনিফর্ম্মের বলে সে অধিকার পায় নাই।

পুলিস কাহাকেও গ্রেপ্তার করিবার সময়ে, এমন কি অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করিলেও নাগরিকদের যেমন পুলিসকে জিজ্ঞাসাবাদ করা অথবা বাধা দিবার অধিকার নাই সেইরূপ সাংবাদিকদেরও তদপেক্ষা বেশী কোন অধিকার নাই। সুতরাং শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্তের পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার চেষ্টা এবং আরও বিশেষ করিয়া সাংবাদিকগণ কর্ত্তৃক তর্কের দ্বারা এবং সাক্ষ্য হইতে যাহা বুঝা যায় সেই বলপ্রয়োগ দ্বারা ময়দানে শ্রীসুনীল সেনগুপ্তকে গ্রেপ্তার প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা সাংবাদিকদের পক্ষে বেআইনী কাজ হইয়াছে। এইগুলি ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৪ ধারায় অন্তর্গত অপরাধ। সাংবাদিকরা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের আওতা-বহির্ভূত নহেন।

সুতরাং আমি মনে করি যে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সাংবাদিকদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিবার অথবা কর্ত্তব্যরত পুলিসের কাজে হস্তক্ষেপ করিবার স্বাধীনতা দেয় না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অর্থ দেশের সাধারণ আইন হইতে প্রেস রিপোর্টারদের অব্যাহতি নহে। উহার অর্থ হইল যে, সংবাদ ও মন্তব্য সম্পর্কে পূর্ব্ব হইতে সেন্সর করার কোন রীতি থাকিবে না এবং কোন আইনগত শাস্তি অথবা আইনগত পরিণতির সম্মুখীন হইবার ব্যাপারে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকিবে। সুতরাং কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নামে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিবার অথবা কর্ত্তব্যরত পুলিসকে জিজ্ঞাসাবাদ বা তাহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ কিম্বা তাহাকে প্রতিরোধ করিবার অধিকার দাবি না করিলেই ভাল করিতেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা ঐরূপ দাবি করিয়াছেন এবং যথেচ্ছাচার করিবার ও বিশেষ সুবিধা পাইবার অধিকার চাহিয়াছেন।

ইহা বুঝা দরকার যে, কোন দায়িত্বশীল গণতন্ত্র কোনও একটি বিশেষ সংস্থা যথা, সংবাদপত্রেরও যথেচ্ছাচার করিবার অথবা বিশেষ সুবিধা পাইবার চেষ্টা সহ্য করিবে না। সুতরাং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই বিষয়ে সংবাদপত্রের গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে। আমি এই মাত্র আশা করি যে, সেই দায়িত্ব অস্বীকার করা হইবে না, কারণ তাহার ফল সাধারণতঃ যাহা মনে করা হইয়া থাকে তদপেক্ষা অনেক বেশী গুরুতর হইতে পারে।

কমিশন ১৯৫৩ সনের জুলাই মাসে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়াছেন। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, অন্ততঃ কয়েকটি সংবাদপত্র ঘটনার বিবরণ প্রকাশে ও তাঁহাদের মন্তব্যে সংবাদপত্রের মহৎ কর্ত্তব্যবিধি বজায় রাখেন নাই।

একটি বিশিষ্ট বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রের ২৪শে জুলাই সংখ্যায় পুলিসকে ও সাধারণভাবে সরকারী কর্ম্মচারীদের "জারজ", "জননীর গর্ভের লজ্জা" এবং "কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত মন" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

ক্রোধের বশবর্ত্তী হওয়ার কথা স্বীকার করিয়া লইলেও, কোনও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সাংবাদিকের পক্ষে ইহা শোভা পায় না। কঠোর সমালোচনা করিতে হইলেই যে কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিতে হইবে এরূপ কোনও কথা নাই। একখানা মাত্র সংবাদপত্র যদি এইরূপ একটা কাজও করে তাহা হইলে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সাংবাদিকতার যথেষ্ট পরিমাণে সুনাম হানি হয়। সংবাদপত্র পুলিসের অপেক্ষাও ক্ষমতা এবং শক্তির অধিকারী। তাহাদের উপর সমাজের জীবন, স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব অনেক বেশী পরিমাণে নির্ভর করে। যদি পুলিসের দায়িত্বজ্ঞান লোপ পায় এবং এরূপ সঙ্কট দেখা দেয় যখন অধিকাংশ লোকই ঔচিত্যবোধ হারাইয়া ফেলে তখন সংবাদপত্রও কি তাহাদের অনুসারী হইবে?

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মূলে যুক্তি এই যে, পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার সংঘর্ষের মধ্য হইতে সত্য প্রকাশ পাইবে। কিন্তু পরস্পরের কুৎসা করার সূচনা হইলে বিরুদ্ধ মত প্রচারের অবকাশ থাকে না। সি. পি. হেলের গ্রন্থের (ল অব দি প্রেস, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৪৩০) এটর্নি জেনারেল বনাম শেফোর্ডের মামলায় মার্শালের বিখ্যাত উক্তির উল্লেখ করিয়া বলা হয়, "গালাগালির যেখানে সূচনা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সেইখানেই সমাধি।"

রাজা রামমোহন রায়

এবারে জয়পুরে নিখিল-ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন সে বিষয়ে একটু মন্তব্য করা প্রয়োজন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন: "...তাঁহার (রামমোহনের) মহিমা অযথা বড় করিতে গিয়া আমরা বাঙ্গালী জাতিকে খাটো করিয়াছি। সাধারণের ধারণা এই যে, তিনিই বাংলা গদ্যসাহিত্যের জনক—প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের প্রচারক এবং প্রথম ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তক। কিন্তু ইহার কোনটিই সত্য নহে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতেরা রামমোহনের পূর্ব্বে বাংলা গদ্য গ্রন্থ লেখেন এবং তাঁহাদের অনেকের রচনারীতিই রামমোহনের রচনারীতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে হিন্দু কলেজ ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রধান কেন্দ্র ছিল তাহার প্রতিষ্ঠায় রামমোহনের কোন হাত ছিল না বরং যখন এইরূপ একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত তখন তিনি ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন...।" ইত্যাদি।

এ যেন ধান ভানতে শিবের গীত—খানিকটা যেন গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করার মত। রামমোহন রায়কে বাংলা গদ্যসাহিত্যের জনক বলা হয় ঠিক সেই অর্থে যে অর্থে ড্রাইডেনকে ইংরেজী গদ্যসাহিত্যের জনক বলা হয়। ড্রাইডেনের পূর্ব্বেও ইংরেজী গদ্যসাহিত্য ছিল, কিন্তু ড্রাইডেন ইংরেজী গদ্যসাহিত্যকে সহজ ও পরিমার্জ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন—তিনি নবপথপ্রদর্শক। রামমোহনও অনুরূপ বাংলা-সাহিত্যকে সহজ ও পরিমার্জ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন—তাই তাঁহাকে বাংলা গদ্যসাহিত্যের জনক বলা হয়। এ কথাটি স্মরণ থাকিলে রমেশবাবু রামমোহনের উপর কটাক্ষপাত করিতে পারিতেন না।

রাজা রামমোহন প্রথম ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তক একথা কে বলিয়াছে এবং তিনি কোথা হইতে পাইলেন তাহা আমরা জানি না। আর বাংলা সংবাদপত্র সম্বন্ধে বলা যায় যে, তিনি প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের অন্যতম এবং এক জন প্রধান প্রচারক ছিলেন।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে রামমোহনের বিরোধিতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক রমেশবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা অনৈতিহাসিক এবং সত্যের অপলাপ মাত্র। উইলসন সাহেব এবং রাজা রামমোহন রায় যুক্তভাবে বিলাতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর-বর্গের নিকট লিখিয়াছিলেন যে, ভারতে ইংরেজী ভাষার প্রবর্ত্তন করা অবশ্য প্রয়োজন—তাহা না হইলে দেশের উন্নতি হইবে না। ১৮১৬ সনে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারক ছিলেন স্যর হাইড ঈষ্ট। তাঁহার নিকট রামমোহন লিখিয়াছিলেন যে, ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি কলেজ স্থাপন করা উচিত। হিন্দু কলেজ স্থাপন করিবার প্রস্তাব লইয়া যে সভা স্যর হাইড আহ্বান করেন তাহাতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ বলেন যে, রামমোহন রায় বিধর্ম্মী, তিনি থাকিলে তাঁহারা যোগ দিবেন না। তাহাতে রামমোহন জানাইলেন যে, কলেজ স্থাপনই যখন তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য এবং তাঁহাকে বাদ দিয়াই যদি একার্য্য সুসম্পন্ন হয় তাহা হইলে তিনি সুখী বই অসুখী হইবেন না। রামমোহন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করিয়াছিলেন এ সম্বন্ধে রমেশবাবুর ঐতিহাসিক ভিত্তি কি জানিতে পারিলে সুখী হইব।

রামমোহন মহান্ পুরুষ ছিলেন—তাঁহাকে নীচে নামাইয়া আনিয়া কাহার গৌরব বাড়িবে—বাঙালী জাতির না যিনি বলিতেছেন তাঁহার? আজকাল প্রতিক্রিয়ার যুগ, বিশেষতঃ বাংলায়। তবে এরূপ সস্তায় বাহবা লইবার উৎসাহ রমেশবাবুর মত লোকেরও হয় ইহাই আশ্চর্য্য।

জমিদারী বিলোপ বিল

পশ্চিমবঙ্গের জমিদারী বিলোপ বিল সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে একবার আলোচনা করিয়াছিলাম। এবারে দুই-একটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

প্রথমে ধরা যাক, মাথাপিছু জমি রাখার ব্যবস্থা। বিলের প্রস্তাব অনুসারে মাথাপিছু ২৫ একর জমি পর্য্যন্ত রাখিতে দেওয়া হইবে। বাংলাদেশে জরিপ হয় একর হিসাবে। কিন্তু এক একর কত? কলিকাতা ও সুন্দরবন অঞ্চলে এক কাঠা ৭২০ বর্গ ফুট, মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার মাজনামুঠা পরগণায় এক কাঠা ৯৯২ বর্গ ফুট, আর কাঁথি মহকুমার জলামুঠা ও বাহিরিমুঠা পরগণায় এক কাঠা ১,১৫৬ বর্গ ফুট। পশ্চিমবাংলার বহু জেলায় একরের এই রকম বিভিন্ন মাপ আছে। তাই একর বলিলে সঠিক সংজ্ঞা বুঝায় না। কলিকাতা ও সুন্দরবন এলাকার একরের মাপ সবচেয়ে বেশী। জমিদারী বিলোপ আইন অনুসারে একরের মাপ কি হইবে? ৪,৯০০ বর্গ গজে এক একর, কিন্তু কাঠার বিভিন্ন রকম মাপ হওয়ায়, একরের পরিমাণ বিভিন্ন রকম হয়।

আর একটি কথা। এদেশে জমির উপর বিভিন্ন রকম স্বত্ব আছে, যেমন নিষ্পী, মালিকানা ইত্যাদি। পশ্চিমবাংলার সর্ব্বত্রই পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট নয়, বহু স্থানে টেম্পোরারী সেটেলমেন্ট আছে। কাঁথি মহকুমার বাহিরিমুঠা পরগণায় পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট, অধিকাংশ অঞ্চলে টেম্পোরারী সেটেলমেন্ট—ত্রিশ বৎসর অন্তর নূতন জমা নির্দ্ধারণ করা হয়। এখন মালিকানার কথা ধরা যাক। মালিকানা হইতেছে জমিদারের পেন্সনের মত—জমিদারদের জমি খাস করিয়া লওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের পেন্সন দেওয়া হয়। যেমন ১৮৭৪ সনে কাঁথির মাজনামুঠা-রাজ সরকারী খাজনা দিতে অক্ষম হওয়ায়, তাঁহার জমি খাস করিয়া লওয়া হয়। জমিতে তাঁহার কোন অধিকার নাই—কিন্তু তবু তিনি মালিকানা পাইতেছেন।

লাখেরাজ, নিষ্পী প্রভৃতির প্রতিকরহার কিভাবে নির্দ্ধারিত হইবে? পাশাপাশি নিষ্পি ও খাসমহলের জমিতে দেখা যায় যে, নিষ্পীর খাজনা নামমাত্র, কিন্তু জমির মূল্য অধিক। আর খাসমহলের জমির মূল্য কম, কিন্তু জমির খাজনা অধিক। এই অবস্থায় পাশাপাশি জমির কি বিভিন্ন রকম প্রতিকর ব্যবস্থা হইবে? বাদশাহী লাখেরাজ, অবাদশাহী লাখেরাজ, জায়গীর, আলতামঘা, আইমা এবং মদদমাশ প্রভৃতি স্বত্বের কি হিসাবে প্রতিকর দেওয়া হইবে এ সম্বন্ধে পরিষ্কার করিয়া কিছু বলা হয় নাই।

জনসংখ্যা-বৃদ্ধি রোধ

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন কিনা সেবিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। সেজন্য নিম্নস্থ সংবাদটি প্রণিধানযোগ্য:

নয়াদিল্লী, ১১ই নবেম্বর—১৯৫১ সালের লোকগণনা সম্পর্কে সেন্সাস কমিশনার শ্রীআর. এস. গোপালস্বামী সরকারের নিকট যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি ভারতে জনসংখ্যা-বৃদ্ধি রোধে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষিজাত উৎপাদন বৃদ্ধির যে ব্যবস্থা স্থান পাইয়াছে, উৎপাদনের পরিমাণ তদপেক্ষাও বৃদ্ধির প্রতি মনোনিবেশ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। এই রিপোর্ট অদ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

লোকগণনার রিপোর্টটি পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ১৯৫১ সালের লোকগণনায় যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে উহাতে তৎসমুদয় বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এবং উহার ভিত্তিতে আগামী ৩০ বৎসরের অবস্থাও অনুমান করা হইয়াছে।

বিগত লোকগণনায় সংগৃহীত তথ্য-তালিকা পর্য্যালোচনা এবং গত ৩০ বৎসরের অবস্থার সহিত উহার তুলনাক্রমে শ্রীগোপালস্বামী এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বিগত ৩০ বৎসরে লোকে যেভাবে খাদ্য পাইয়াছে আগামী ৩০ বৎসরেও যদি সেইভাবে খাদ্য পায় তাহা হইলে ভারতের লোকসংখ্যা ১৯৫১ সনে প্রায় ৩৬ কোটি হইতে ১৯৬১ সনে ৪১ কোটি, ১৯৭১ সনে ৪৬ কোটি ও ১৯৮১ সনে ৫২ কোটি দাঁড়াইবে।

যন্ত্রাদি সাহায্যে দেশে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির সর্বপ্রকার সম্ভাব্যতার কথা বিবেচনার পরও সেন্সাস কমিশনার এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, খাদ্যের সরবরাহ অব্যাহতভাবে চলিতে থাকিবে এইরূপ অনুমান নাও টিকিতে পারে। দেশে খাদ্যে ঘাটতি এবং উহার পরিণতিতে খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা আছে। এইরূপ ঘটিলে ১৯২১ সনের পূর্ব্ববর্ত্তী ৩০ বৎসরে দুর্ভিক্ষ, মড়ক প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় দেখা দিয়া যেভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে তাহারই পথ পুনরায় উন্মুক্ত হইতে পারে।

সরকার সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুসরণে খাদ্যশস্যের ব্যবসায় চালাইয়া গেলে এইরূপ ব্যাপার হয়ত ঘটিতে পারিবে না। ফলতঃ স্থায়ীভাবে খাদ্য ঘাটতি এড়াইবার উদ্দেশ্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উহা যথোপযুক্তভাবে কার্য্যকরী করণের জন্য পর্য্যাপ্ত সময় পাওয়া যাইবে। এইজন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির যে ব্যবস্থা স্থান পাইয়াছে, আগামী ১৫ বৎসরে ঐ বিষয়ে আরও বেশী তৎপর হওয়া দরকার।

পাটের ফাটকা

কেন্দ্রীয় সরকার ২৯শে অক্টোবর হইতে কাঁচা পাটের অগ্রিম ব্যবসায় (forward trading) বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ১৯৪৮ সনের আগষ্ট মাস হইতে পশ্চিম বাংলা সরকার কাঁচা পাটের ফাটকা বন্ধ করিয়া দেন। সে নিষেধ আজ পর্য্যন্ত বলবৎ আছে—ইহা শুধু পাকানো কাঁচা পাটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বর্ত্তমানে এই আইনকে ফাঁকি দিবার জন্য আলগা কাঁচা পাটের ফাটকা খেলা হইতেছে। নূতন আদেশ দ্বারা আলগা কাঁচা পাটের অগ্রিম চুক্তি তথা ফাটকা খেলা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

যে সকল পাটের অগ্রিম চুক্তি হস্তান্তরিত করা যাইবে না, সেগুলি ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার পাটের অগ্রিম চুক্তি নিষিদ্ধ। এই আদেশ খুবই সাময়িক হইয়াছে।

যে সকল অগ্রিম পাটের চুক্তি হস্তান্তরিত করা যাইবে না, তাহাতে আইনতঃ ব্যবসায় করা যাইবে। ইহাতে প্রতীয়মান হয়

যে, শুধু বেআইনী ফাটকা নিষেধ করা হইয়াছে কিন্তু আইনগত ভাবে পাটের অগ্রিম চুক্তি ব্যবসায় করা যাইতে পারে। ১৯৫২ সনের অগ্রিম চুক্তি আইন অনুসারে যে সকল অগ্রিম চুক্তি হস্তান্তরিত করা যাইবে না, তাহাদের সংজ্ঞা এইরূপ দেওয়া হইয়াছে :

"Specific delivery contract, the rights or liabilities under which or under any delivery order, railway-receipt, bill of lading, warhouse receipt or any other document of title relating thereto are not transferable."

এই রকম নির্দ্ধারিত অগ্রিম চুক্তিকে বলা হয় "non-specific delivery contract"—যাহা নিষিদ্ধ করা হয় নাই।

কিন্তু ইহা মনে করা ভুল হইবে যে, নূতন আদেশ দ্বারা বেআইনী ফাটকা বাজার একেবারে নির্ম্মূল হইবে। ফাটকা বাজারের উত্তরাধিকারী এখনও জীবিত—তাহা হইতেছে কলিকাতার কাটনী বাজার—ফাটকার আড্ডা। ফাটকা বাজার বন্ধ হইয়াছে, কাঁচা পাটের অগ্রিম ব্যবসায় বন্ধ হইয়াছে ঠিকই, কিন্তু কাটনী বাজার এখনও বর্ত্তমান। ফাটকা যেন মরিয়াও মরে না।

ভারতের পাট ব্যবসায় বর্ত্তমানে সমৃদ্ধির পথে। আমেরিকার চাহিদা বাড়িতেছে। এই অবস্থায় কাটনী বাজারকে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। যাঁহারা আইনসঙ্গত প্রতিষ্ঠানের সভ্য, তাঁহারাই কাটনী বাজারে ফাটকা খেলেন, তাই কাটনীর প্রভাব আইনসঙ্গত বাজারগুলিকেও প্রভাবান্বিত করে। কাটনীর বিলোপসাধন সেইজন্য প্রয়োজন।

ব্যাঙ্ক অর্ডিন্যান্স

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাঙ্ক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন যাহাতে দেউলিয়া ব্যাঙ্কগুলির সমাপন কার্য্য (liquidation) সত্বর সমাধা করা হয়। ভারতবর্ষে ১৯৪৭ হইতে ১৯৫১ সনের মধ্যে ১৮০টি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়াছে এবং অংশীদার ও আমানতদারদের প্রায় ৯২ কোটি টাকার মত নষ্ট হইয়াছে। এই দেউলিয়া ব্যাঙ্কগুলির প্রায় সব কয়টিই ছিল মাঝারি ও ছোট আকারের ব্যাঙ্ক—ইহাদের আমানতকারীদের মধ্যে মধ্যবিত্তদের সংখ্যাই ছিল অধিক, তাহাদের ক্ষতিই আজ সবচেয়ে বেশী। অনেক মধ্যবিত্ত সংসারের শেষ সম্বল যাহা ব্যাঙ্কে জমা ছিল তাহা চলিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কের সমাপন কার্য্যের নূতন সংজ্ঞা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহা হইতেছে এই যে, আমানতদার, অংশীদার ও উত্তমর্ণের সমস্ত দাবিই সমাপন করিয়া দেওয়া হয়, অবশ্য টাকা পরিশোধ করিয়া দেওয়া হয় না—টাকা পরিশোধ করার অক্ষমতার দ্বারা। ১৯৪৭ সনে যে সকল ব্যাঙ্ক দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশেরই আমানতদাররা আজ পর্য্যন্ত কিছুই পান নাই এবং যাঁহারা কিছু পাইয়াছেন, তাহা না পাওয়ারই মত।

সম্প্রতি দেখা যাইতেছে, কয়েকটি দেউলিয়া ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরকে প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইতেছে—ইহা খুবই যথোচিত হইতেছে। কিন্তু আসল ব্যবস্থা—অর্থাৎ, গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আমানতদারদের জমা টাকা ফেরত দেওয়ার কি ব্যবস্থা করা হইতেছে?

ব্যাঙ্কগুলির দেউলিয়া হওয়ার মূলে শুধু ডিরেক্টরবর্গের শঠতা এবং অকর্ম্মণ্যতাই দায়ী নয়—ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অকর্ম্মণ্যতা ও অজ্ঞতা এবং গবর্ন্মেণ্টের উদাসীনতাও বহুল পরিমাণে দায়ী।

১৯৪৯ সনের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে ভারতীয় কমর্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলিকে যথোপযুক্ত ভাবে চালিত করিবার জন্য।

১৯৪৯ সনের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের ২২শ ধারা অনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে লাইসেন্স দেওয়ার পূর্ব্বে তাহাদের খাতাপত্র ভালভাবে পরীক্ষা করার ক্ষমতা দেওয়া আছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাইসেন্স ব্যতীত ভারতবর্ষে কোন ব্যাঙ্ক কার্য্য করিতে পারে না। কোন ব্যাঙ্ক যদি নূতন শাখা খুলিতে চায় কিংবা বর্ত্তমান শাখা স্থানান্তরিত করিতে চায়, তাহা হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি লইতে হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলে যে কোনও সময়ে যে কোন ব্যাঙ্কের খাতাপত্র পরীক্ষা করিতে পারে। অধিকন্তু প্রত্যেক ব্যাঙ্ক প্রতি সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে তাহাদের বর্ত্তমান পরিস্থিতির হিসাবনিকাশ নিয়মিত ভাবে পাঠায়। তৎসত্ত্বেও ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ১৯৪৯ সন হইতে ১৯৫১ সন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রায় ১০৫টি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, যে সকল ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়াছে তাহাদের সাপ্তাহিক হিসাব-নিকাশ কি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন? এই ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা হঠাৎ রাতারাতি খারাপ হয় নাই। অনেকদিন ধরিয়াই ভিতরে ভিতরে অবস্থা খারাপ হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু সে অবস্থা বুঝিবার দায়িত্ব কার? অবশ্যই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের। একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সংশ্লিষ্ট বিভাগ হয় সাপ্তাহিক হিসাব বুঝিতে অক্ষম কিংবা তাঁহারা হিসাব পরীক্ষা ব্যাপারে গাফিলতি করিয়াছেন। যেমন, ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের ব্যাপার। এই ব্যাঙ্কের অবস্থা কয়েক বৎসর ধরিয়াই খারাপ হইয়া আসিতেছিল—রাতারাতি কিছু হয় নাই। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কি ইহার ব্যাপারে নিদ্রিত ছিলেন? প্রথমেই কেন যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই? ভিতরে ভিতরে যখন ঝাঁজরা হইয়া গিয়াছে তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শাসনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিকে পরিচালন ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ব্যাঙ্কের আমানতী টাকা ইনসিওর করিবার প্রথা আছে—আমেরিকার ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইলে প্রত্যেক আমানতদারের ২৫,০০০ ডলার পর্য্যন্ত ইনসিওরেন্স কোম্পানী

(গবর্মেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট) দ্বারা প্রদত্ত হয় আর ইউরোপ এবং আমেরিকায় ব্যাঙ্কগুলিকে সাধারণতঃ দরজা বন্ধ করিতে দেওয়া হয় না। কোন ব্যাঙ্কের অবস্থা খারাপ হইলেই তাহাকে অন্ত কোন ব্যাঙ্কের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয় কিংবা তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্ত অন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ভারতবর্ষের মত ব্যাঙ্কগুলিকে আমানত গ্রহণকরিতে নিষেধ করিয়া কিংবা শিডিউল হইতে বহির্ভূত করিয়া দিয়াই ঐ সকল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কিংবা গবর্মেণ্ট নিজেদের দায়িত্ব খালাস করেন না। আমানতদারদের টাকা বাঁচানোই প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিংবা গবর্মেণ্ট সম্পূর্ণ উদাসীন এবং নিশ্চেষ্ট।

ধরা যাক, ক্যালকাটা ন্তাশনাল ব্যাঙ্কের ব্যাপার। এই ব্যাঙ্ক বর্তমানে লিকুইডেশনে গিয়াছে—কিন্তু লিকুইডেশনে ব্যাঙ্কের আমানতদারেরা কি পাইবে? এই ব্যাঙ্কের নিজস্ব চার-পাঁচখানি বাড়ী আছে, যাহার মূল্য প্রায় এক কোটি টাকার উপর। এই বাড়ীগুলির মোট ভাড়া খুব কমপক্ষে বৎসরে বেশ কয়েক লক্ষ টাকার মত হইবে। এই বাড়ীগুলি হইতে যে পরিমাণ টাকা ভাড়া পাওয়া যাইবে তাহা আমানতদার ও অংশীদারদের টাকা শোধ করিবার পক্ষে শ্রেষ্ঠ উপায়।

ব্যাঙ্ক অর্ডিন্যান্সের সংক্ষিপ্ত ধারাগুলি এইরূপ :

(১) অল্প টাকার আমানতদারদের টাকা আগে দেওয়া হইবে। সেভিংস একাউণ্টে জমা টাকার ১০০৲ টাকা পর্যন্ত শোধ দেওয়া হইবে এবং পাঁচ-শ' টাকা পর্যন্ত কারেণ্ট একাউণ্টে জমা টাকার ১০০৲ টাকা শোধ দেওয়া হইবে।

(২) দেউলিয়া ব্যাঙ্কের সম্পত্তি সত্বর উদ্ধার করা হইবে। লিকুইডেশনের জন্ত আদেশ দেওয়ার ছয় মাসের মধ্যে দেনাদারদের নিকট হইতে ঋণ আদায় করা হইবে। পাঁচ হাজার টাকার কম হইলে তাহার উপর আপীল করিবার অধিকার দেনাদারদের দেওয়া হইবে না।

(৩) আদালতের আদেশক্রমে লিকুইডেটরের ডিক্রী ভূমি-রাজস্ব আদায় করার মত "summary procedure" দ্বারা জারী করা হইবে।

(৪) ব্যাঙ্ক লিকুইডেশনের জন্ত প্রত্যেক হাইকোর্টের একজন করিয়া লিকুউডেটর থাকিবে।

(৫) ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরবর্গকে জেরা করা হইবে এবং তাঁহাদের বিবৃতি লওয়া হইবে এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের বিচার করা হইবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও কাছাড়

"যুগশক্তি" লিখিতেছেন, ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে আসামের তেমন উল্লেখযোগ্য স্থান নাই। পত্রিকার ভাষায় "আসাম যাহা পাইয়াছে তাহা রাজ্য সরকারের সাধারণ বার্ষিক বাজেটের নূতন স্কীমের একটু বড় সংস্করণ মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, কোন রাস্তায়, কোন শহরের বৈদ্যুতিক অবস্থায় উন্নয়ন অথবা কোন সরকারী বিভাগের পরিপুষ্টিতেই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আসামের বরাদ্দ নিঃশেষিত হইয়াছে।" কিন্তু আসামের উন্নতির জন্ত অবশ্য প্রয়োজনীয় "আসামের নদী নিয়ন্ত্রণ ও তাহার বিপুল জলসম্ভারকে কাজে লাগাইবার কোন পরিকল্পনা গৃহীত হয় নাই। আসামের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে সার্থক করিয়া তুলিবার কোন প্রচেষ্টাও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্থান পায় নাই।"

কাছাড়ের অবস্থা আরও নৈরাশ্যজনক। একমাত্র শিলচর শহরে বরাকর পুল ছাড়া জনগণের আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্ত আর কোন ব্যবস্থাই পরিকল্পনায় স্থান পায় নাই। কাছাড়ের চাষী প্রতি বৎসর বন্যার প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকারী চাকুরীর বাজার কাছাড়ের যুবক-যুবতীদের নিকট প্রায় বন্ধ; উপার্জ্জনের অন্ত আর কোন পথও খোলা নাই; কাছাড়ে ছাত্রদের জন্ত সরকারী উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির প্রবেশদ্বারও সঙ্কুচিত। "যুগশক্তি" লিখিতেছেন, তবু যদি কাছাড়ের বনজ সম্পদ ও প্রাকৃতিক বিভব শিল্পে রূপায়িত করিবার জন্ত এই অঞ্চলে কয়েকটা শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিত তবে এখানকার বেকার সমস্যার কতকটা সমাধান হইত।" শিল্পের জন্ত প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ পাওয়াও খুবই সহজ হইত যদি নদী-নিয়ন্ত্রণের কোন চিন্তা পরিকল্পনা-রচয়িতাবৃন্দ করিতেন। একমাত্র বরাকর নদীর নিয়ন্ত্রিত জলের শক্তি হইতে উৎপন্ন বিদ্যুতের সাহায্যে কাছাড়, মণিপুর, লুসাই পাহাড় ও ত্রিপুরার উত্তরাংশে যথেষ্ট বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা যাইত। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত হইবার সংবাদ শুনা যাইতেছে। যাহাতে দ্বিতীয় বার কাছাড়ের দাবি এইরূপ অবহেলিত না হয় "যুগশক্তি" তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

যে দেশে জনমত জাগ্রত নহে, এমন কি উচ্চতম অধিকারীবর্গও দেশের ও দশের স্বার্থ সম্বন্ধে অবহেলা করিয়া নিজস্ব এবং দলগত স্বার্থেরই চর্চ্চায় ব্যস্ত, সে দেশের পরিত্রাণ-পথ সুগম এ তো সহজ নয়। কাছাড়ের তথা আসামের দাবি তখনই গ্রাহ্য হইবে যখন সেখানকার জনমত প্রবলভাবে ব্যক্ত হইবে।

ভারতে বৈদেশিক পুঁজি নিয়োগ

"আমেরিকান রিপোর্টারে"র সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন বাণিজ্য-দপ্তর ভারতে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ সম্পর্কে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতে বিদেশী পুঁজিলগ্নীর পরিমাণ বৃদ্ধির উল্লেখ করিয়া তাহাতে বলা হইয়াছে যে, মার্কিন ও বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ দিবার জন্ত ভারত-সরকার যে সর্ত্তাবলী দিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় যে, ভারতে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের গুরুত্ব সম্পর্কে সকলে ক্রমশঃই যেন সচেতন হইয়া উঠিতেছেন।

পুস্তিকাটিতে বলা হইয়াছে যে, বিদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে এখন স্বীকৃতি দেওয়া হইতেছে এবং ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে,

মার্কিন ও অন্যান্য বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকারীদের অধিক সংখ্যায় ভারতে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হইতেছে এবং তজ্জন্য প্রদত্ত সর্ত্তাবলী সন্তোষজনক।

বিদেশী পুঁজি নিয়োগ সম্বন্ধে একটি সর্ত্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হওয়া উচিত। ভারতীয় উদ্যোগ ও যোজনার পথ যাহাতে সকল ক্ষেত্রেই উন্মুক্ত থাকে এবং তাহার প্রসার যাহাতে সুচারু হয় সেইরূপ সর্ত্ত সর্ব্বক্ষেত্রেই থাকা আমরা প্রয়োজন মনে করি।

দিয়াশলাই পল্লীশিল্পে পোষকতা

৩১শে অক্টোবর "হরিজন" পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ," সম্প্রতি অখিলভারত খাদি ও পল্লীশিল্প বোর্ডের সাধারণ উৎপাদন কার্য্যক্রম সমিতির বোম্বাই অধিবেশনে ভারতে দিয়াশলাই শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হয়। উক্ত অধিবেশনে ক্ষুদ্র বা কুটীর-শিল্পরূপে দিয়াশলাই নির্ম্মাণ-শিল্পের উজ্জীবনের জন্য পন্থা ও উপায়ের সুপারিশ করা হইয়াছে।

উইমকো পরিচালিত পাঁচটি কারখানা হইতে ভারতের দিয়াশলাই সরবরাহের শতকরা আশী ভাগ পাওয়া যায়। "হরিজন"-এর সংবাদ অনুযায়ী "গত তিন বৎসরের মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অপর ৭২টি কারখানা উইমকোর শক্তিশালী বিক্রয়-ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার ফলে বন্ধ করিতে হয়। কমিটি দিয়াশলাই কারখানাগুলিকে এ, বি, সি, ডি এই চার পর্য্যায়ে ভাগ করিয়াছেন। বৎসরে পাঁচ লক্ষ গ্রোস দিয়াশলাই বাক্স নির্ম্মাতাকে 'এ' পর্য্যায়ে রাখা হইয়াছে। পাঁচ লক্ষের নিম্নপরিমাণ নির্ম্মাতাকে 'বি' শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে। যে কারখানায় দৈনিক এক শত গ্রোস দিয়াশলাই নির্ম্মিত হয় সেগুলি 'সি' পর্য্যায়ভুক্ত এবং যেগুলিতে প্রত্যহ পঁচিশ গ্রোস হয় সেগুলি 'ডি' পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে।

"'এ' শ্রেণীর নির্ম্মাতাদের নিকট হইতে তাহাদের নির্ম্মিত প্রতি গ্রোস দিয়াশলাইয়ের উপর সাড়ে চার আনা শুল্ক আদায় করা হউক এবং গ্রোস প্রতি 'বি' শ্রেণীর নির্ম্মাতাকে ছয় পয়সা, 'সি' শ্রেণীর নির্ম্মাতাকে সাড়ে চার আনা এবং 'ডি' শ্রেণীর নির্ম্মাতাকে ছয় আনা সাবসিডি বা সাহায্য দেওয়া হউক, কমিটি এই সুপারিশ করিয়াছেন।

"কমিটির মতে পল্লীতে দিয়াশলাই নির্ম্মাণের ব্যয় বৃহৎ কারখানায় নির্ম্মাণ-ব্যয়ের অধিক হইবে না। ভারতে প্রতি মাসে ছত্রিশ কোটি বাক্স দিয়াশলাই প্রয়োজন হয়। পল্লীতে দিয়াশলাই নির্ম্মাণ-শিল্পের প্রথম বৎসরেই পাঁচ হাজার ব্যক্তির কর্ম্মসংস্থান হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা বেকার সমস্যার তৎপরিমাণ লাঘব হইবে।"

আমরা কেবলমাত্র সাবসিডির উপর নির্ভরশীল শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ নিশ্চিন্ত নহি। ঐরূপ শিল্প স্থায়ী হইতে পারে না।

বর্দ্ধমানে আলু-চাষের সঙ্কট

সাপ্তাহিক "নূতন পত্রিকা" লিখিতেছেন, "বাংলাদেশের মধ্যে অন্যতম প্রধান আলু-উৎপাদনকারী জেলা হইল বর্দ্ধমান। হুগলীর পরেই ইহার স্থান। প্রায় ৫০,০০০ বিঘা জমিতে আলু চাষ হয়। এই চাষ মেমারী, জামালপুর ও কালনা থানাতে সবচেয়ে ব্যাপক।"

কিন্তু গত দুই বৎসর যাবৎ কৃষকেরা আলুর চাষে মার খাইতেছেন, কারণ চাষের সময় কৃষকদের হাতে অর্থ না থাকায় তাঁহারা বীজ, সার ও অর্থের জন্য মহাজনের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হন এবং এই ব্যবস্থার আনুষঙ্গিক অসুবিধার সম্মুখীন হন। এ বৎসর কৃষকদের অবস্থা আরও খারাপ। তাঁহারা সরকারী ঋণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু চাষের মরশুম সুরু হওয়া সত্ত্বেও কৃষি-ঋণ প্রদানের কোন ব্যবস্থা সরকার পক্ষ হইতে করা হয় নাই। ফলে কৃষকগণ মহাজনের কবলে পড়িতে বাধ্য হইতেছেন।

সময়ের মূল্য সর্ব্বক্ষেত্রেই আছে। কিন্তু চাষে সময়ের মূল্য স্বর্ণের মানে হয়। এই সাধারণ তথটি সরকারী কৃষিবিভাগ হৃদয়ঙ্গম করিলে বাংলার কৃষি ঢের উপকৃত হইবে। সরকার সকল ক্ষেত্রেই ঋণদান করেন, কিন্তু সময়মত পাইলে তাহাতে দ্বিগুণ উপকার হয়।

বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের শতবর্ষ

নবেম্বর মাসে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের এবং কলেজিয়েট স্কুলের শতবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "মুর্শিদাবাদ সমাচার" বহরমপুর কলেজের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদান-প্রসঙ্গে লিখিতেছেন: "১৮৫৩ সনের নবেম্বরে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বহরমপুরে ক্যান্টনমেন্টের ১০ নং ব্যারাক যাহা এখন মণীন্দ্রচন্দ্র হোষ্টেল নামে পরিচিত, উক্ত ব্যারাকে একটি কলেজ স্থাপন করেন। পুরাতন গেজেটিয়ারগুলিতে দেখা যায় যে, ১৮২৬ সনে বহরমপুরে একটি ব্রিটিশ কলেজ স্থাপন করা হয়। কিন্তু উক্ত ব্রিটিশ কলেজই যে ২৭ বৎসর চলার পর বহরমপুর কলেজ নাম গ্রহণ করে তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরে বিভিন্ন সময়ে উক্ত কলেজ স্থান পরিবর্ত্তন করে এবং বোর্ডিং স্কুলের পার্শ্ববর্তী ভার্দোন সাহেবের কুঠি হইতে বাবুলবোনা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া শেষ পর্যন্ত পুরাতন ব্যারাকেই কলেজ চলিতে থাকে। অবশেষে ১৮৬৯ সনে বহরমপুর কলেজ বর্ত্তমান সুদৃশ্য অট্টালিকায় আরম্ভ হয়।"

১৮৬৭ সনে বহরমপুর কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় প্রথম উত্তীর্ণ হন শ্রীজানকীনাথ পাঁড়ে। ১৮৬৪ সনে কলেজে আইনের ক্লাস খোলা হয় এবং ১৮৬৯ সনে কলেজটি প্রথম গ্রেডের আর্টস কলেজ হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু ১৮৭২ সনে কলেজটি দ্বিতীয় গ্রেডের কলেজে পরিণত হয় এবং ১৮৭৫ সনে কলেজের আইন বিভাগ উঠাইয়া দেওয়া হয়। ১৮৮৬ সনে সরকার এই কলেজের পরিচালনার দায়িত্ব ত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং কলেজটি বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। তখন স্বর্গতা মহারাণী স্বর্ণময়ী কলেজের পরিচালনভার গ্রহণ করেন। ১৮৮৭ সনের ১৪ই মে তারিখের এক সরকারী প্রস্তাবে কলেজের পরিচালনা ও আর্থিক ব্যবস্থার ভার এক ট্রাষ্টী-বোর্ডের উপর অর্পিত হয়। ১৮৮৮ সনে

বহরমপুর কলেজ পুনরায় আইনবিভাগ সমেত প্রথম শ্রেণীর কলেজ হিসাবে পরিগণিত হয়।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর মৃত্যুর পর স্বর্গীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কলেজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং কলেজের অর্থভাণ্ডার পরিপুষ্টির জন্য কিছু জমিদারী দান করেন। তখন বহরমপুর কলেজের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ করা হয়। ১৯০৫ সনে দলিল দ্বারা কলেজের পরিচালনার ভার এক বোর্ডের উপর ন্যস্ত হয়। তদবধি কাশিমবাজার রাজবংশের আর্থিক সাহায্যে বহরমপুর কলেজ চলিতেছে।

কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্রসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস পাইলেও মুর্শিদাবাদ জেলার সরকারী পরিচালনাধীন তিনটি কলেজ অপেক্ষা এখনও ঐ কলেজের ছাত্রসংখ্যা অনেক বেশী। কলেজের বিজ্ঞান-শ্রেণীর ফলাফল প্রতিবৎসরই ভাল হয়। বাংলার বৈপ্লবিক ইতিহাসে কৃষ্ণনাথ কলেজের নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

কলেজিয়েট স্কুলটিরও শতবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। প্রথমাবধিই এই বিদ্যালয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী পাইয়াছে এবং ইহাই মুর্শিদাবাদ জেলার বৃহত্তম বিদ্যালয়।

পরিশেষে পত্রিকা লিখিতেছেন: "মফঃস্বলের একটি কলেজ বা একটি স্কুল সুদীর্ঘ শতবর্ষ নিরবচ্ছিন্নভাবে সাফল্যের সহিত চলিতেছে, ইহা শিক্ষায় অনগ্রসর দেশের পক্ষে একটি স্মরণীয় ঘটনা এবং সেই শতবার্ষিকী উৎসবকে আরও স্মরণীয় করিয়া তোলা প্রতিটি প্রাক্তন ছাত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি।"

শিলচর গুরুচরণ কলেজের অধ্যক্ষের পদচ্যুতি

কিছুকাল পূর্ব্বে শিলচর গুরুচরণ কলেজের পরিচালক সমিতি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরবীন্দ্রকুমার দত্তগুপ্তকে নৈতিক অপরাধ ও অযোগ্যতার অভিযোগে সাময়িকভাবে পদচ্যুত করেন। "সুরমা"র সংবাদে, প্রকাশ, গত ১লা নবেম্বর তারিখে পরিচালক সমিতি ছয় ঘণ্টাব্যাপী দীর্ঘ অধিবেশনে সমগ্র প্রমাণ ও নথিপত্র বিবেচনা করিয়া কলেজের অধ্যক্ষকে অপসারিত করিবার সিদ্ধান্ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিয়াছেন। সমিতি অধ্যক্ষকে কলেজের সম্পত্তি আত্মসাৎ করা এবং অসাধুতার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

পরিচালক সমিতির উক্ত সভায় কলেজের ক্রমবর্দ্ধমান শৃঙ্খলা-হীনতার কারণ সম্পর্কে তদন্ত করিবার এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। ছাত্রদের আচরণ এবং কতিপয় অধ্যাপকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কেও তাঁহারা বিবেচনা করিবেন।

অধ্যক্ষকে অপসারিত করিবার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাইয়া কতিপয় ছাত্র এক সভা করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী তদন্ত সাপেক্ষে অধ্যক্ষের পুনর্নিয়োগ দাবি করে। তাহারা ধর্ম্মঘটের চেষ্টা করিলে তাহা ব্যর্থ হয়।

এই সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "সুরমা" মন্তব্য করিয়াছেন, "যে সিদ্ধান্ত পরিচালক সমিতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নিতান্তই চরম সিদ্ধান্ত। তাঁহারা যদি অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া অধ্যক্ষকে নির্দোষ সাব্যস্ত করতঃ তাঁহাকে পুনরায় কাজে বহাল করিতেন তবে আমরা সর্ব্বাধিক সুখী হইতাম। পরিচালক সমিতির সিদ্ধান্ত শুধু ব্যক্তিগতভাবে অধ্যক্ষের পক্ষেই মর্ম্মান্তিক নহে, আমরাও ইহাতে গভীর মর্ম্মবেদনা বোধ করিয়াছি। আমরা বিশ্বাস করি, পরিচালক সমিতির সদস্যগণ অনুরূপ মর্ম্মবেদনাসত্ত্বেও বৃহত্তর কল্যাণ কামনায় এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।"

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এরূপ ঘটনা বাস্তবিকই অতিশয় দুঃখ-জনক। দেশের নৈতিক অবনতির একটি কারণও ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

পৃথিবীর বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়

"সোবিয়েত দেশ" লিখিতেছেন, মস্কো নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম স্থান লেনিন পাহাড়ে মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নূতন ভবনের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এই সুবিশাল ভবনের মোট আয়তন ২৬,১১,০০০ ঘনমিটারেরও বেশী—প্রায় ৫০,০০০ অধিবাসীর উপযুক্ত একটি শহরের মোট ঘরবাড়ীর আয়তনের সমান।

মোখোভায়া সড়কের উপর অবস্থিত মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো বাড়ী হইতে ভূতত্ত্ব, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং বলবিদ্যা ও গণিত এই পাঁচটি বিভাগ লেনিন পাহাড়ের নবনির্ম্মিত ভবনে উঠিয়া আসিয়াছে।

ছাত্রদের জন্য যে আবাসভবন নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাতে ৫,৭৫৪টি কামরা আছে।

মেদিনীপুরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

"মেদিনীপুর পত্রিকা"র শারদীয় সংখ্যায় এক প্রবন্ধে শ্রীবিনয় ঘোষ মেদিনীপুরের প্রাচীন সভ্যতার উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন, "মেদিনীপুরের ইতিহাস দু'দশ শতাব্দীর নয়, সভ্যতার উদয়দিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। প্রস্তর যুগের নিদর্শন মেদিনীপুরে পাওয়া গেছে, তাম্রযুগেরও। সিংভূম জেলায় তাম্রখনি ও প্রাচীন তাম্রচুল্লির যেসব নিদর্শন আজও রয়েছে তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় ভারতে তাম্রযুগের সভ্যতার কেন্দ্র শুধু সিন্ধু উপত্যকা ছিল না, বাংলাদেশের মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম সিংভূম অঞ্চলও ছিল। বল সাহেব (V. Ball) সিংভূম অঞ্চলের এই তাম্রখনি ও খনিমজুরদের বিবরণ প্রায় এক শতাব্দী আগে লিপিবদ্ধ করে গেছেন (Proceedings, Asiatic Society of Bengal, 1869)। তাম্রলিপ্ত বা তমলুক প্রাচীনতম বন্দর এবং এই বন্দর থেকে ভারতের সর্ব্বত্র ও বাইরে সমস্ত পণ্যদ্রব্যাদি রপ্তানী হ'ত। তাম্রযুগের তামার তৈরি দ্রব্যাদিতে ও কাঁচা তামায় বন্দরটি পরিপূর্ণ থাকত বলেই 'তাম্রলিপ্ত'—'তাম্রলিপ্তি' নাম হওয়াই সম্ভবপর। হেমচন্দ্রের 'দামলিপ্ত' বা দামল-জাতির সংশ্লিষ্ট; তা কষ্ট করে অকারণে ভাববার কোন কারণ নেই, বিশেষ করে সিংভূম অঞ্চলে তাম্রখনি ও তাম্রচুল্লী কারখানায়

পর্যাপ্ত নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও। এখনও মনে হয়, ঠিক মতন অনুসন্ধান করলে ঝাড়খণ্ড অঞ্চল থেকে তাম্রযুগের অনেক নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে, শুধু টেকনিক্যাল নয়, সাংস্কৃতিক নিদর্শনও।"

তাম্রলিপ্ত জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের একটি কেন্দ্র ছিল। লেখকের অনুমান প্রাচীন 'বঙ্গ' হইতেই কলিঙ্গদেশে জৈনধর্ম্মের প্রসার ঘটে। "এই বঙ্গই হ'ল গ্রীকদের বর্ণিত 'গঙ্গারিডি'। গঙ্গা-বিধৌত অঞ্চলে ছিল 'বঙ্গ' আর তার পশ্চিমের প্রতিবেশী ছিল 'উৎকলরা'। কপির্সা নদী (টলেমির 'ক্যাম্বিসোন', আধুনিক কাঁসাই নদী) ছিল বঙ্গ ও উৎকলের সীমারেখা এবং তাম্রলিপ্ত ছিল বঙ্গের প্রধান শহর—'গঙ্গা' শহর।" বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির যুগেও বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুন্ন ছিল এবং তাম্রলিপ্ত ছিল তাহার প্রধান কেন্দ্র। বৌদ্ধ সংস্কৃতশাস্ত্রের অন্যতম অধ্যয়ন-কেন্দ্র ছিল তাম্রলিপ্তি। ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্তিতে দুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। চেঙ্-তেঙ্ ছিলেন বার বৎসর এবং তাও-লিন্ তিন বৎসর। "এই সব চীনা পরিব্রাজকের আনাগোনা থেকে বোঝা যায় তাম্রলিপ্তি বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চার শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল ভারতবর্ষে এবং বৌদ্ধ নিদর্শন তমলুক-মেদিনীপুরে পাওয়া উচিত, বৌদ্ধশাস্ত্রের পুঁথিও।"

প্রাচীন তাম্রলিপ্ত হইতে জলপথে এবং স্থলপথে দেশবিদেশের সহিত বাণিজ্য চলিত এবং এই বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলার সংস্কৃতি ভারতের সর্ব্বত্র এবং বাহিরেও প্রচারিত হয়।

উপসংহারে লেখক লিখিতেছেন যে, মেদিনীপুরের সমৃদ্ধিশালী সংস্কৃতির উপকরণের সন্ধান গ্রামাঞ্চলে পাওয়া যাইবে। বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করিতে হইলে সেগুলির সন্ধান করিতে হইবে এবং সেই সন্ধান একেবারে ব্যর্থ হইবে না। "একের কাজ নয়, এক দিনের কাজ নয়। তবু সুরু করতে বাধা নেই।"

অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাংলার নবজাগরণ

'মেদিনীপুর পত্রিকা'র শারদীয় সংখ্যায় এক প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী মহাশয় লিখিতেছেন, "উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে অভূতপূর্ব্ব ও বিস্ময়কর নবজাগরণ ঘটিয়াছিল উহাকে সম্যক্‌রূপে প্রণিধান করিতে হইলে আমাদিগকে জ্ঞানতাপস অক্ষয়-কুমারের বিরাট দানের কথাও শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করিতে হইবে। সত্যই অক্ষয়কুমার ছিলেন একজন যুগমানব বা Representative Man এবং তাঁহার মধ্যে সে যুগের কয়েকটি প্রধান ভাবধারা সংহত হইয়াছিল। আগষ্ট কোমতের প্রত্যক্ষবাদ ও মানবতার আদর্শ (Positivism and Humanism), জন ষ্টুয়ার্ট মিলের হিতবাদ বা অধিকতম লোকের প্রভূততম সুখবিধানের আদর্শ (Utilitarianism বা Universalistic Hedonism), হার্বার্ট স্পেন্সারের অজ্ঞেয়বাদ (Agnosticism) এবং সে যুগের বাঙালীর নবজাগ্রত স্বদেশপ্রেম তাঁহার মধ্যে এক আশ্চর্য্য সমন্বয় লাভ করিয়াছিল।

"তিনি আমাদের মনে কৌতূহলের উদ্রেক করিতে এবং আমা-দিগকে শ্রেয়ের পথ নির্দ্দেশ করিতে চাহিয়াছেন, অধিকন্তু তিনি বৈজ্ঞানিক পরিভাষার পুষ্টি করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সম্পন্ন করিয়া-ছেন।"

কিন্তু আধুনিক বাঙালী এই মহান্ চিন্তানায়কের বিরাট সাধনার সন্ধান রাখে না। তাহার কারণ বাঙালী এখন সকল দিকেই প্রগতির বিপরীত পথই শ্রেয়ঃ মনে করিতেছে। আজ প্রতিক্রিয়াবাদীর ও অজ্ঞতাবাদেরই জয়।

বর্দ্ধমানের পৌরপতি সম্পর্কে সরকারী তদন্ত

২৬শে কার্ত্তিক "আর্য্য" পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, বর্দ্ধমান পৌরসভার বিরোধী দল কর্ত্তৃক পৌরপতির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য সরকার এক আদেশ দিয়াছেন। গত ৬ই নবেম্বর তদন্ত আরম্ভ হইবার কথা ছিল; কিন্তু পৌর উপ-নির্ব্বাচন নিকটবর্ত্তী হওয়ায় পৌরপতির অনুরোধক্রমে নবেম্বরের শেষ সপ্তাহে তদন্তকার্য্য আরম্ভ হইবে।

উক্ত সংবাদে আরও প্রকাশ, পৌরসভা-ভবন হইতে উনিশ দফা দলিল বা ফাইল উধাও হইয়াছে। তদন্তকার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ঐ সকল ফাইলপত্র উধাও হওয়ায় পৌরসভায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। এই সংবাদ সম্পর্কে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। যদি ইহা সত্য হয় তবে ইহার সম্পূর্ণ বিচার হওয়া উচিত যাহাতে এইরূপ অনাচারের জন্য কাহারা দায়ী ও দোষ কাহাদের তাহা নির্ণীত হয়।

ঐশ্লামিক সাধারণতন্ত্র

পাকিস্থানের গণপরিষদের এক সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে স্থির হইয়াছে যে, পাকিস্থান রাষ্ট্রের নাম হইবে "ইসলামী সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পাকিস্থান"। মূলনীতি কমিটির প্রাথমিক রিপোর্টে রাষ্ট্রের নাম কেবলমাত্র 'পাকিস্থান' রাখার সুপারিশ করা হইয়াছিল। জনাব নূর আহমেদ এক সংশোধনী প্রস্তাবে বলেন, পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠাতার ইচ্ছার কথা স্মরণ রাখিয়া রাষ্ট্রের নাম "ইসলামী সাধারণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র পাকিস্থান" রাখাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হইবে। সরকার পক্ষ এই সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করেন। পরিষদের কংগ্রেসী সভ্যবৃন্দ এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কক্ষ ত্যাগ করেন। স্মরণ থাকিতে পারে, পরিষদ পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করেন যে, মুসলমান ব্যতীত অপর কেহই পাকিস্থান রাষ্ট্রের কর্ণধার হইতে পারিবেন না।

এই সম্পর্কে ঢাকা হইতে নব-প্রকাশিত দৈনিক "বাংলা ভাষা" এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন, "পাকিস্থানের জন্মদাতা কায়েদে আজম জিন্না তাঁহার বিভিন্ন ভাষণে পাকিস্থানে সকল সম্প্রদায়ের সমান অধিকার ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ রাখিলে 'পাকিস্থান একটি বিশেষ রাষ্ট্র ও বিশেষ জাতির এই যুক্তি সমর্থন করা যায় না। রাষ্ট্র-প্রধান সম্পর্কে গণপরিষদের সিদ্ধান্ত "সংখ্যালঘুদের পক্ষে শুধু মারাত্মক ক্ষতিকর নহে, অপিচ গণতন্ত্রবিরোধী তথা অবৈজ্ঞানিক ও জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণার বিরোধী।"

উপসংহারে সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে, "বিশ্বে পাকিস্থানই একমাত্র মুসলিম সংখ্যা-গরিষ্ঠ ও মুসলিম-শাসিত অঞ্চল নহে। মুসলমানের ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি অম্লান ও অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ঐ সকল রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা প্রয়োজন হয় নাই। ইসলামের অফুরন্ত প্রাণবত্তাই ঐ সকল রাষ্ট্রকে মহীয়ান ও গরীয়ান করিয়া তুলিয়াছে। এমতাবস্থায় পাকিস্থানের ক্ষেত্রে 'ইসলামী সাধারণতন্ত্র' যোগ করা অহেতুক বাড়াবাড়ি বলিয়াই আমরা গণ্য করি।" এই সিদ্ধান্তের মধ্যে "পাকিস্থানের সংখ্যালঘু তপশিলী হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও পার্শীদের প্রতি ঔদাসীন্য, তাচ্ছিল্য সর্ব্বোপরি একটা অবিশ্বাসের ভাব" পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া সম্পাদকীয় মন্তব্যে এই সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তনের অনুরোধ করা হইয়াছে।

তুর্কি সংবাদপত্রে পাকিস্থানের এই সংবিধান ও রাষ্ট্রনামের সিদ্ধান্তের প্রতিকূল সমালোচনা করা হইয়াছে। তাহাদের মতে তুর্কি জাতির ইতিহাস এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়।

পাকিস্থান ও মার্কিন দেশ

সম্প্রতি পাকিস্থান ও মার্কিনদেশের মধ্যে সামরিক যোগাযোগের ব্যবস্থা বিষয়ে কিছু গোপনীয় আলোচনা চলিতেছে। এ বিষয়ে মার্কিনী সংবাদপত্র মহলে যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ঐরূপ সন্দেহের বিশেষ কারণ রহিয়াছে। এই সম্পর্কে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মতামত নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই মত প্রকাশ সময়োচিত, এবং ইহা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

নয়াদিল্লী, ১৫ই নবেম্বর—"পাকিস্থান এবং আমেরিকার মধ্যে কোনরূপ সামরিক ব্যবস্থা হইলে দক্ষিণ এশিয়ার সমগ্র কাঠামো এবং ভারত ও পাকিস্থানের পক্ষে তাহার পরিণতি সুদূরপ্রসারী হইবে"—আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা বলিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে বড় রকমের একটা রাজনৈতিক বোমা নিক্ষেপ করিয়াছেন।

শ্রীনেহরু বলেন, পাক-মার্কিন আলোচনা বর্ত্তমানে কোন্ পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে তাহা তিনি সঠিক বলিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস, আলোচনার স্তর পার হইয়া গিয়াছে এবং ব্যাপার 'বেশ কিছুদূর' অগ্রসর হইয়াছে। 'ঘটনার এই বড় রকমের ক্রমপরিণতিতে' তিনি ভারতের পক্ষ হইতে 'গভীর উদ্বেগ' প্রকাশ করেন। পাক গণপরিষদ বর্ত্তমানে পাকিস্থানের জন্য ধর্ম্মীয় ধরণের যে সংবিধান রচনায় ব্যাপৃত আছেন তাহার পরিণাম পাকিস্থান ও ভারত উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ হইবে এই অভিমত ব্যক্ত করিয়া শ্রীনেহরু বলেন যে, রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী এই মধ্যযুগীয় পরিকল্পনা পরিহারের জন্য ভারত বন্ধুভাবে পাকিস্থানকে অনুরোধ করিবে। পাকিস্থানকে উহার সংবিধান সংক্রান্ত সমস্যা সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া কঠিন হইলেও শ্রীনেহরু একথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই যে, পাক গণপরিষদের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের ফলে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে বিভেদ ঘটিবে—এমন কি কাশ্মীর সমস্যা সমাধানও কঠিনতর হইয়া দাঁড়াইবে।

কোরীয় সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীনেহরু বলেন যে, তিন মাস ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ চলার পরও পরিকল্পিত রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত না হইলে সমগ্র প্রশ্নটি যুদ্ধে লিপ্ত পক্ষগুলির নিকট পুনরায় পেশ করা হইবে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ এলেন সম্প্রতি বলিয়াছিলেন, ১২০ দিন পরে এবং রাজনৈতিক সম্মেলনে না হইলে বন্দীদের ইচ্ছামত যেখানে খুশী যাইবার সুযোগ দেওয়া হইবে। মিঃ এলেনের এই অভিমতের সহিত তিনি একমত নহেন।

শ্রীনেহরু আরও বলেন, যেভাবে প্রস্তাবিত পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছে, সেইভাবে এইরূপ একটি গুরুতর বিষয় আলোচিত হওয়ায় তিনি বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, ভারত এই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্থানের সংবাদপত্রগুলিতে যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, আলোচনা বেশ কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, নয়াদিল্লীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতের সহিত ভারত এ বিষয়ে বেসরকারীভাবে আলোচনা করিয়াছে।

প্রস্তাবিত পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করিতে অনুরোধ করা হইলে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, প্রস্তাবিত চুক্তি সম্পর্কে সঠিক কিছু অবগত হইলে তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দান করিবেন। আলোচনা ঠিক কি অবস্থায় আছে তাহা তিনি জানেন না। তবে এইরূপ চুক্তি সম্পর্কে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়াছে এবং আলোচনাও বেশ কিছুদূর যে অগ্রসর হইয়াছে সে কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রগুলি এই চুক্তি সম্পর্কে অনেক কিছু লিখিয়াছে এবং সংবাদগুলি নিশ্চয়ই কর্ত্তৃপক্ষ মহল হইতে প্রাপ্ত। যুক্তরাষ্ট্রের এবং এমনকি পাকিস্থানের দায়িত্বশীল পত্রিকাগুলি এই ধরণের যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার কিছু কিছু আভাস দিয়াছেন।

শ্রীনেহরু বলেন, এই চুক্তির প্রশ্নটি আবার এইরূপ যে, পাকিস্থান অথবা যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ে কি করিতেছে তাহার সহিত আইনসঙ্গত ভাবে তাঁহাদের কোন সংস্রব নাই। কিন্তু বস্তুতঃ এই বিষয়টি তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এইরূপ একটি চুক্তি সম্পাদিত হইলে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় এবং বিশেষ করিয়া ভারত ও পাকিস্থানের রাজনীতি ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিণাম দেখা দিবে। সেইজন্য এইরূপ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যেরূপ ভাবে আলোচনা চলিতেছে, তাহাতে তিনি বিস্মিত হইয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাকিস্থানে মার্কিন ঘাঁটি স্থাপন সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছে। পাকিস্থান এলাকার মধ্যে ঘাঁটি স্থাপন অথবা বিদেশী সৈন্য রাখা কিংবা এই ধরণের কিছু করা সম্পূর্ণ পাকিস্থানের ইচ্ছাধীন। পাকিস্থান স্বাধীন রাষ্ট্র—ইচ্ছা করিলে পাকিস্থান স্বাধীনতা বিসর্জ্জন অথবা স্বাধীনতার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ

করিতে পারে—এ বিষয়ে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু এই সকল কার্য্যের পরিণামের সহিত তাঁহারা বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট—সেইজন্য তাঁহারা এই বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছেন।

গিলগিটে ঘাঁটি স্থাপনে পাকিস্থান সম্মতি দিতে পারে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীনেহরু বলেন যে, গিলগিট কাশ্মীরের একটি বিরোধমূলক এলাকা। প্রশ্নটি সম্পূর্ণ অমূলক। তবে ঘাঁটি স্থাপনের প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও কাশ্মীর এলাকায় কোন কিছু করাই পাকিস্থানের পক্ষে সম্ভব নয়।

কোনরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পূর্ব্বে চুক্তি সম্পর্কে ভারতের মনোভাব ওয়াশিংটনে জানাইবার উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন কি না এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, তাঁহার পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তরদান কষ্টকর। তাঁহারা এই সকল বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রদূত এবং বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টের সহিত আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা না করিয়া বেসরকারীভাবে আলোচনা করিয়া থাকেন।

পাকিস্থান গণপরিষদ কর্ত্তৃক পাকিস্থানকে 'ইসলামী সাধারণতন্ত্র' ঘোষণার সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু বলেন যে, সম্প্রতি পঞ্জাবে ভারত ও পাকিস্থানের পুলিসের কুচকাওয়াজ সময়ে উভয় রাষ্ট্রের সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে যে সৌহার্দ্য দেখা গিয়াছে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে যখন এইরূপ আন্তরিক বন্ধুত্বের ভাব রহিয়াছে, তখন ভারত কিংবা পাকিস্থানে ভেদ সৃষ্টিকারী কোনরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। শ্রীনেহরু বলেন যে, যে-কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের মতই পাকিস্থানের নিজের ইচ্ছামত সংবিধান রচনা করার স্বাধীনতা আছে। তবে দুই দিক হইতে তিনি এই সংবিধান সম্পর্কে আগ্রহী। প্রথমতঃ মানুষ হিসাবে এবং দ্বিতীয়তঃ পাকিস্থানের প্রতিবেশী ও দেশ বিভাগের পূর্ব্বে পাকিস্থান এলাকার সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে তাঁহার পাকিস্থানের সংবিধান সম্পর্কে আগ্রহ। শ্রীনেহরু বলেন, গণপরিষদের সিদ্ধান্তগুলিতে পাকিস্থান যে ধরণের রাষ্ট্র হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে পাকিস্থানের এইরূপ মনোভাবে মানুষ হিসাবে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত—পাকিস্থানের এইরূপ মনোভাব আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর যে কোন দিক হইতে উপলব্ধি করা কষ্টকর। ইহা মধ্যযুগীয় আদর্শ এবং যে কোন গণতান্ত্রিক আদর্শের বিরোধী—ইহাই সাধারণের ধারণা।

শ্রীনেহরু বলেন যে, পাকিস্থানের এইরূপ সিদ্ধান্তের ফলে পাকিস্থানের সংখ্যালঘুদের উপর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবে এবং ভারতেও যে পরিণাম দেখা দিবে তাহার জন্যই তিনি বিশেষ চিন্তিত। এইরূপ একটি সংবিধান রচনার ফলে দুই শ্রেণীর অথবা দুই স্তরের নাগরিক সৃষ্টি হইবে এবং এক শ্রেণীর নাগরিক যে অপেক্ষাকৃত বেশী সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অপেক্ষাকৃত কম সুযোগ-সুবিধার অধিকারী সংখ্যালঘুদের মনে হীনমন্যতার ভাব সৃষ্টি করিবে। রাষ্ট্রের সকল শ্রেণীর মধ্যে স্থায়িত্বের ভাব সৃষ্টির দিক হইতে ইহা গণতান্ত্রিক আদর্শ অথবা প্রকৃত বাস্তব আদর্শ নয়। শ্রীনেহরু বলেন যে, সংখ্যালঘুদের রক্ষা-ব্যবস্থা থাকিতে পারে—কিন্তু এই সামগ্রিক নীতির মূলে অধিকতর সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারা অধীন ব্যক্তিদের রক্ষার ভার রহিয়াছে। যাহাদের রক্ষা করা হইবে, তাহারাও এইরূপ ব্যবস্থা পছন্দ না করিতে পারে। ইহার ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টান, কি ইহুদী অথবা বৌদ্ধ নিজেদের অসহায় বোধ করিবে—তাহাদের ভবিষ্যতের কোন আশাই থাকিবে না।

শ্রীনেহরু বলেন, পাকিস্থান গণপরিষদের এই সিদ্ধান্তে ভারতে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে, তাহার জন্য তিনি বিশেষভাবে চিন্তিত। ১৯৫০ সনে লিয়াকৎ আলি খান এবং তাঁহার মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছিল, সেই চুক্তি সম্পর্কে তাঁহারা যে যুক্ত বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহাতে এই বিষয়ের উল্লেখ ছিল। তাঁহার যতদূর স্মরণে আছে, তাহাতে লিয়াকৎ আলি খান বলিয়াছিলেন যে, পাকিস্থান সংবিধানে পাকিস্থানীদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য থাকিবে না। কিন্তু সংবিধানে সেই পার্থক্য করা হইয়াছে। তিন বৎসর পূর্ব্বে যে চুক্তি হইয়াছিল, সেই চুক্তি লঙ্ঘন করা হইয়াছে, এইরূপ প্রশ্ন অবশ্য বর্ত্তমানে তিনি উত্থাপন করিবেন না। তবে যাহারা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন তাহারা ভ্রান্ত নীতি প্রচার করিয়া সুযোগ গ্রহণের এবং বিদ্বেষ সৃষ্টির চেষ্টা করিবে।

দেশান্তরে বসতি ও বর্ণবিদ্বেষ

রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, গত ২৭শে আগষ্ট কেনিয়াবাসী বিশ হাজার ইউরোপীয়দের প্রতিনিধি স্থানীয় ইউরোপীয়ান নির্ব্বাচক সমিতি এক প্রস্তাবে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে কেনিয়াতে অনূন ত্রিশ হাজার ইউরোপীয় বসতিকারীকে প্রবেশ করিবার অনুমতিদানের সুপারিশ করেন। প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে নূতন এশিয়ান বসতিকারীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিবার প্রার্থনাও করা হইয়াছে। প্রস্তাবের মর্ম্মার্থ অনুযায়ী "কেনিয়ার ইউরোপীয় সমাজের স্থায়িত্বের একমাত্র আশা হইতেছে এই স্থানে নূতন কোন ভারতীয়ের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়া ইহাকে ইউরোপীয়দিগের রক্ষিত অঞ্চলে পরিণত করা।"

৩রা অক্টোবর "হরিজন" পত্রিকায় এক প্রবন্ধে শ্রীমগনভাই দেশাই এই সংবাদের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া লিখিতেছেন, "কৃষ্ণকায়দিগের মহাদেশ আফ্রিকায় ভবিষ্যতে জাতি ও বর্ণবিদ্বেষমূলক যুদ্ধবিগ্রহের সূচনা এই প্রস্তাবে দেখা যাইতেছে। অন্যথা কি করিয়া দেশের একটি মুষ্টিমেয় সংখ্যার সম্প্রদায় এইরূপে ন্যায়ধর্ম্ম ও সদাচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত হুকুম চালাইয়া দিবার সাহস পাইতেছেন?" পূর্ব্ব-আফ্রিকার ১,৮১,০০,০০০ অধিবাসীর মধ্যে এই ক্ষুদ্র শ্বেতকায় সম্প্রদায়ভুক্তের সংখ্যা মাত্র ৪৪,০০০। কেনিয়া প্রদেশে দেখা যাইতেছে উহার অধিবাসীদের মধ্যে ৩০,০০০ ইউরোপীয়; ৯০,০০০ ভারতীয়; ২৪,০০০ আরব এবং ৫০,০০,০০০ কাফ্রী। এশিয়াবাসিগণ ইউরোপীয়দের অধীনে মধ্য পর্য্যায়ের কাজ করেন, কাফ্রীগণ সর্ব্বহারা শ্রেণীর লোক। কাফ্রীদের ভাল জমি-

গুলি শ্বেতকায়গণ আইন-বলে নিজেদের খাসজমিতে পরিণত করিয়াছে। কাফ্রীদিগকে মাথাপিছু জিজিয়া কর (poll tax) দিতে হয় এবং তাহাদের নিজ বাসভূমে তাহাদিগকে সর্ব্বদা একটি রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট অর্থাৎ আঙুলের টিপসহিযুক্ত পরিচয় প্রমাণপত্র বহিয়া বেড়াইতে হয়।

শ্রীদেশাই লিখিতেছেন, এই পরিপ্রেক্ষিতেই উক্ত সংবাদটিকে আমাদের বিচার করিতে হইবে। "ইউরোপীয়দিগের এই মনোভাব আমাদের আর এক দিক দিয়াও লক্ষ্য করিবার যোগ্য। পশ্চিমবাসিগণ আমাদের ন্যায় প্রাচ্যবাসীদিগের কর্ণে এই শব্দ গুঞ্জন করিতেছেন যে, আমাদের জনসংখ্যা অত্যধিক, অতএব ক্ষুধা ও অনাহারের তাড়নায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবার সখ যদি আমাদের না থাকে, তাহা হইলে আমাদের জন্ম-নিয়ন্ত্রণ অভ্যাস করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রতীচ্যের নির্ম্মিত গর্ভনিরোধক সরঞ্জামাদির চাহিদা সৃষ্টি করিয়া তাহাদের ব্যবসায়ক্ষেত্র খুলিয়া দিতে হইবে।" অস্ত্রবলে বলীয়ান পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি জনবিরল মহাদেশে বসতির উদ্দেশ্যে এশিয়াবাসীদের তথায় যাত্রা বন্ধ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করেন না যে, "পৃথিবীর কোন অঞ্চলে জনবাহুল্য এবং অপর অঞ্চলে একান্ত জনবিরলতা—এই যে সমস্যা, মানব জাতির পক্ষে তাহার মীমাংসার স্বতঃসিদ্ধ ও স্বাভাবিক পথ হইল আন্তর্জাতিক একটি সংস্থার মাধ্যমে যুক্তিযুক্ত পন্থায় জনবহুল দেশ হইতে জনবিরল দেশে যাত্রার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া পৃথিবীর সর্ব্ব অঞ্চল মানুষের উপকারে লাগাইয়া দেওয়া।"

বিদেশে মুষ্টিমেয় শ্বেতকায়দের এইরূপ ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ বিশ্বশান্তি বিপন্ন করিতেছে। শ্বেতকায়দের এই সকল আইন ন্যায়ধর্ম্মের বিপরীত এবং জাতিপুঞ্জের সনদেরও বিরোধী। জাতি ও বর্ণগত বৈষম্য মানবজাতির পক্ষে অবমাননাকর। শ্রীদেশাই আশা প্রকাশ করিয়াছেন কমনওয়েলথ গোষ্ঠীভুক্ত কেনিয়া-রাজ্য ইউরোপীয়দের এই ভ্রান্তিমূলক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবেন। আমাদের সে আশা নাই। বিশ্বশান্তির মায়া কুসুম শুধু আশাবাদীদিগেরই নয়নগোচর হয়। এখনও শ্বেতজাতিপুঞ্জ কেবলমাত্র শক্তিরই সম্মান জানে।

মার্কিন সরকারের ঔপনিবেশিক নীতি

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের নিকট প্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া এবং আফ্রিকা-বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ হেনরী. এ. বাইরোড বিগত শেষে অক্টোবর উত্তর-ক্যালিফোর্নিয়ার বিশ্ববিষয়ক পরিষদের অধিবেশনে এক বক্তৃতায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ এবং পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতামত ব্যক্ত করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমান বিশ্বে আমেরিকার প্রধান উদ্বেগের বিষয় "সোভিয়েট আক্রমণের আশঙ্কা।" কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি অঞ্চলের পরাধীন দেশগুলি এ সম্পর্কে তেমন সচেতন নহে। পরবশতার অবসানের সংগ্রামেই তত্রত্য জনগণ ব্যস্ত।

মিঃ বাইরোড বলেন, "বাস্তবিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লাভের এই অভিযানই বিংশ শতাব্দীর অন্যতম সর্ব্বাধিক শক্তিশালী সামাজিক ক্রিয়া"; কিন্তু এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের মধ্যে এক "স্ব-বিরোধিতা" নিহিত আছে। পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ দীর্ঘকাল স্বাধীনতা-ভোগের পর "স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের ঘটনাটাকে ক্রমশঃ অলীক" বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং পারস্পরিক সংহতির জন্য স্বেচ্ছায় জাতীয় সার্ব্বভৌম অধিকারের কিছু অংশ বিসর্জ্জন দিতেছেন। জাতীয় স্বাধীনতা লাভের অভিযান সম্প্রতি "আরও অদ্ভুত এবং সম্ভাব্যতার দিক হইতে আরও বেশী বেদনাদায়ক স্ব-বিরোধিতার" সম্মুখীন হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ আজ লুপ্তপ্রায়—সেই স্থলে এক নব সাম্রাজ্যবাদ—সোবিয়েৎ সাম্রাজ্যবাদ দেখা দিয়াছে। কিন্তু পরাধীন জাতিগুলি এই সাম্রাজ্যবাদের বিপদ সম্পর্কে তেমন সচেতন নহেন।

মিঃ বাইরোড স্বীকার করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক নীতি সকলের নিকট স্পষ্ট নহে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সমস্যার বিভিন্নতাই এই অস্পষ্টতার কারণ। এই নীতির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে মিঃ বাইরোড বলেন, "আমরা সমস্ত জাতি কর্ত্তৃক শেষ পর্য্যন্ত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভে বিশ্বাস করি এবং আরও বিশ্বাস করি যে, একমাত্র বিবর্ত্তনের পথ গ্রহণ করিলেই সবচেয়ে কম সময়ে এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব।"

তিনি বলেন, "আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সর্ব্বদাই যে জাতীয় স্বাধীনতার আকারে ব্যবহৃত হইবে না এই সত্যকেও আমরা স্বীকার করি। কোনও কোনও জাতি হয়ত স্বেচ্ছায় তাহাদের অতীত শাসক জাতির সঙ্গে স্বাধীনতা ও সাম্যের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ বা মিলিত হইতে পারে। জাতিসমূহের ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অথবা আরও সাম্প্রতিক ফরাসী ইউনিয়ন এই ধরণের ঐক্য বা মিলনের চমৎকার নিদর্শন।"

কেন যুক্তরাষ্ট্র পরাধীন জাতিগুলির স্বাধীনতার দাবীকে অবিলম্বে স্বীকার না করিয়া তাহাদের জাতীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য ক্রম-বিবর্ত্তনের পথকে পছন্দ করে তাহার উত্তরে মিঃ বাইরোড বলেন, "অসময়োচিত স্বাধীনতা অত্যন্ত বিপজ্জনক, প্রগতিবিরোধী, ও ধ্বংসাত্মক।" তাঁহার অভিমতে "অসময়োচিত স্বাধীনতা বলিয়া একটা কিছু আছে, তাহা যদি আমরা স্বীকার না করিতে ইচ্ছুক থাকি তবে পরাধীন জাতিগুলির অবস্থা সম্পর্কে আমরা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বা সৃষ্টিমূলক ভাবে কোনও চিন্তাই করিতে পারিব না।"

যে দেশ নিজের স্বাধীন সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অসমর্থ সে দেশ হইতে বিদেশী শাসন অপসারিত হওয়ায় আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা এবং বহিরাক্রমণকেই ডাকিয়া আনা হইবে। "প্রয়োগ করার ক্ষমতা অর্জ্জনের পূর্ব্বেই যদি কোনও জাতি নামেমাত্র সার্ব্বভৌম অধিকার অর্জ্জন করে তাহা হইলে তাহার একমাত্র পরিণতি হইল দুর্ব্বলতা।" পরাধীন রাষ্ট্রসমূহ স্বাধীনতা লাভ করিলে তাহা যেন স্থায়ী হয় তাহাই যুক্তরাষ্ট্রের কামনা। অধিকন্তু "জাতীয় স্বাধীনতা

যে কোনক্রমেই এশিয়া এবং আফ্রিকার অসংখ্য কঠিন ও বিভ্রান্তিকর সমস্তার সর্ব্বরোগহর সমাধান নয়," একথাও যুক্তরাষ্ট্র সরকার জানেন এবং "বিশ্বের পরাধীন অঞ্চলে যেসব ইউরোপীয় জাতি প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে, তাহাদের শক্তি ও স্থায়িত্বে আমাদের [যুক্তরাষ্ট্রের] যে স্বার্থ আছে তাহা আমাদের [যুক্তরাষ্ট্রের] স্বীকার করিতে হইবে।" যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ তাহাদের স্বার্থ হইতে অভিন্ন এবং বিশ্বের শক্তির ভারসাম্যে এই সকল দেশের ভূমিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মিঃ বাইরোডের ভাষায় ঔপনিবেশিক প্রশ্নের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহাদের বক্তব্য অগ্রাহ্য করিতে পারে না। "বিশেষতঃ কোনও কোনও পরাধীন রাজ্যে ইউরোপীয় জাতিগুলির যে বৈধ বৈষয়িক স্বার্থ রহিয়াছে, আমরা তাহাও অস্বীকার করিতে পারি না। অন্য দিকে যে ইউরোপীয় কাঠামোকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য আমাদের অনেক কিছু করিতে হইয়াছে, সেই বৈষয়িক কাঠামোর সঙ্গে ঐ সকল বৈধ স্বার্থের সংযোগের গুরুত্বও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিস্মৃত হইতে পারে না। এই সকল দিক বিবেচনা করিয়াই যুক্তরাষ্ট্র পরাধীন জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণ লাভের বিবর্ত্তনের পথকে এত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করে।"

মিঃ বাইরোড বলেন, তবে "ইউরোপের বৈষয়িক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে আমাদের স্বার্থ জড়িত থাকিলেও পরাধীন জাতিগুলির অধিকার ইউরোপেরই স্বার্থের অধীনস্থ হইবে আমরা নিশ্চয়ই তাহা বলিতে চাই না। আমাদের বক্তব্য হইল সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষই বেশ সতর্কতার সহিত নিজ নিজ স্বার্থের কথা বিবেচনা করুক। ইহা পরাধীন জাতিগুলির ব্যয়ে ইউরোপের শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখার প্রশ্ন নহে। বরং ইহা উভয়ের শক্তিবৃদ্ধির উপায় অনুসন্ধানের প্রশ্ন। বিবর্ত্তনের পথে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতিতে বিদেশী রাজ্যগুলিতে ইউরোপের বৈধ স্বার্থ রক্ষারও যেমন ব্যবস্থা হইতে পারে, ঠিক তেমনই সম্পূর্ণ ভাবে সম্পর্কচ্ছেদের ফলে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা হইতে ইহারা বঞ্চিত হইবার যে সম্ভাবনা আছে সে সম্ভাবনাও থাকে না।"

মরক্কোর ক্রমবর্দ্ধমান মুক্তিসংগ্রাম

মরক্কোর প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য ও গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অবস্থানের জন্য বহুদিন হইতে সাম্রাজ্যবাদীদের লোলুপ দৃষ্টি এই দেশটির উপর পড়িয়াছিল। অবশেষে ১৯১২ সনের ৩০শে মার্চ ফরাসীরা মরক্কো অধিকার করে। ফরাসী অধিকারে মরক্কোবাসী ক্রমশঃই সর্ব্বস্বান্ত হইতেছিল—ফরাসী অধিকারের প্রথম বৎসরের মধ্যেই মরক্কোর সাত লক্ষ হেক্টর সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর জমি দেশবাসীর হাত হইতে ছিনাইয়া লওয়া হয়।

সাম্রাজ্যবাদী শাসনে সামন্ততান্ত্রিক শোষণব্যবস্থা অব্যাহত থাকায় মরক্কোর কৃষকশ্রেণী নির্মম শোষণে জর্জ্জরিত, শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থাও তদ্রূপ। বিদ্যালয় ও শিক্ষকের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য ও বিদ্যালয়ে পড়িবার উপযুক্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শতকরা মোট সাড়েসাত ভাগ বিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ পায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমেরিকা মরক্কোতে প্রবেশ করে এবং মার্কিন পুঁজি ব্যাং, দস্তা ও দেশের অন্যান্য ঐশ্বর্য্য করায়ত্ত করে। আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে 'ঠাণ্ডা লড়াই'য়ের সঙ্গে সঙ্গে মরক্কোতে বিরাট সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে।

গত দুই বৎসর যাবৎ মরক্কোর স্বাধীনতা-সংগ্রামের ব্যাপকতা অভূতপূর্ব্বরূপে বৃদ্ধি পায়। আন্দোলনের এই প্রসারে ভীত হইয়া ফরাসীরা মরক্কোতে সন্ত্রাসবাদী শাসন কায়েম করে এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠান ইস্তিকলালের সমর্থক সুলতানকে গদিচ্যুত করিয়া ফরাসী তাঁবেদারকে সুলতান নিযুক্ত করে। ইহার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে প্রবল বিক্ষোভ ও আলোড়ন দেখা দেয় তাহাতে সৈন্যদল ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষের দরুন শত শত লোক হতাহত হয় এবং অনূ্যন ২০,০০০ দেশভক্তকে কারারুদ্ধ করা হয়।

সুলতানের পদচ্যুতির বিরুদ্ধে আরব-এশীয় রাষ্ট্রগোষ্ঠী জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনার জন্য যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর প্রবল বিরোধিতার ফলে তাহা অগ্রাহ্য হয়; অবশ্য সাধারণ পরিষদের কার্য্যসূচীর মধ্যে মরক্কোর প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

ত্রিয়েস্তে অশান্তি

ইটালী ও যুগোস্লাভ রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে যে বহুদিনব্যাপী প্রচ্ছন্ন শত্রুতা ছিল তাহা বর্ত্তমানে ইংরেজ ও মার্কিন সরকারের অদূরদর্শিতার ফলে ধূমায়িত হইয়াছে। সম্প্রতি যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা নিম্নরূপ:

বেলগ্রেড, ১৫ই নবেম্বর—প্রেসিডেণ্ট টিটো আজ ব্রিটেন ও আমেরিকাকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, ত্রিয়েস্তের 'এ' এলাকা ইটালীকে দেওয়া হইলে যুগোস্লাভিয়া ও ইটালীর মধ্যে বিরোধ বাধিবে।

বর্ত্তমান বৎসরের গ্রীষ্মকালে ও শরৎকালে মার্শাল টিটো যে ভাষণ দেন, তাহার তুলনায় বর্ত্তমান মন্তব্যে তিনি কোন নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করেন নাই বা যুগোস্লাভিয়ার সর্ব্বশেষ মনোভাবের নূতন কোন ইঙ্গিত দেন নাই। যুগোস্লাভ সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান "টনযুগ" মার্শাল টিটোর ভাষণের কথা উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন যে, 'এ' অঞ্চল ইটালীকে দিলে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী।

বেলগ্রেডের রিপাবলিক স্কোয়ারে এক বিরাট সমাবেশে মার্শাল টিটো বলেন, ইটালীকে ত্রিয়েস্তের 'এ' এলাকা দেওয়ার অর্থ যুগোস্লাভিয়া আক্রমণে ইটালীকে নূতন কতকগুলি সুযোগ দেওয়া।

প্রেসিডেণ্ট টিটো ঘোষণা করেন যে, ত্রিয়েস্তের 'এ' এলাকা ইটালীকে দেওয়া সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা শেষ হইয়াছে, ইহা একেবারেই ভুল ধারণা। যুগোস্লাভিয়া এখন মীমাংসার প্রস্তাবে রাজী হইবে, এই ধারণা মারাত্মক। 'এ' এলাকায় গণভোট গ্রহণের জন্য ইটালীর প্রধানমন্ত্রী যে প্রস্তাব করিয়াছেন, মার্শাল টিটো পুনরায় তাহা অগ্রাহ্য করেন।

এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাময়িক পত্রের তালিকা

"মার্কিনবার্ত্তা"র সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম গ্রন্থাগার "লাইব্রেরী অব কংগ্রেস" ভারত, পাকিস্থান, সিংহল, থাইল্যাণ্ড, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনের প্রচলিত সাময়িক পত্রিকাসমূহের একটি তালিকা প্রণয়ন করিতেছেন বলিয়া উক্ত কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ জানাইতেছেন। ইতিমধ্যে ১৭৬০টি সংবাদ-পত্রের নাম তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে এবং আগামী মাসের মধ্যেই এই সমীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। প্রত্যেকটি দেশের পৃথকভাবে পত্রিকা প্রকাশের স্থান, প্রথম প্রকাশের তারিখ ও পত্রিকার ভাষা এই তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। ইহা ব্যতীত যে যে বিষয়ে পত্রিকাসমূহ প্রকাশিত হইতেছে তাহাও ইহাতে উল্লেখ করা হইতেছে।

লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের কর্ম্মিগণ ১৯৪৫ সনের পর উর্দ্দু ভাষায় যে সকল উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহারও একটি তালিকা প্রস্তুতির জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। ভারত হইতে বাংলা, হিন্দী, উর্দ্দু, তামিল, তেলুগু, কানাড়ী, মালয়ালম, গুজরাটী, মরাঠী, অসমীয়া, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, সিন্ধী এবং খাসিয়া ভাষায় প্রকাশিত এবং পাকিস্থানের বাংলা, উর্দ্দু, আরবী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, পুশতু এবং সিন্ধী ভাষায় প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাসমূহ এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

তটিনী দাস

বাংলার বিশিষ্ট মহিলা শিক্ষাব্রতী, বেথুন কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা তটিনী দাস গত ৩০শে আশ্বিন আটান্ন বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বাংলার নারীসমাজের নানাবিধ উন্নতি, বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষার প্রচার ও প্রসারে স্বর্গতা তটিনী দাসের দান অবিস্মরণীয়। তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে যুগে স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষা তেমন সমাদর লাভ করে নাই। কিন্তু নিজের চরিত্রবলে, সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় তিনি উচ্চশিক্ষার চরম সোপানে উপনীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রেরণা ও উৎসাহের ফলে বাংলার নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে এক তাৎপর্য্যপূর্ণ অধ্যায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রায় ১৭ বৎসর বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা হিসাবে তিনি কৃতিত্বের সহিত কাজ করিয়াছেন; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য এবং ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের অন্যতম কর্ম্মী হিসাবে তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। বরিশাল জেলার এক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মপরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয়া দাসের ছাত্রীজীবন গৌরবোজ্জ্বল। তিনি ১৯১২ সনে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯১৪ সালে আই-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি "সংস্কৃত" বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ বি-এ এবং "দর্শন" শাস্ত্রে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া প্রথম শ্রেণীতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি তাঁহার স্বামী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ডঃ সরোজকুমার দাসের সহিত ইউরোপের বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং লণ্ডনে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণের তত্ত্বাবধানে টিচার্স ডিপ্লোমা গ্রহণ করেন। তিনি বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সমাজহিতকর আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শিক্ষাব্রতী হিসাবে গৌরবময় কর্ম্মজীবনের শেষে ১৯৫০ সনের ডিসেম্বর মাসে তিনি বেথুন কলেজের অধ্যক্ষের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহার উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি বেথুন কলেজের শতবার্ষিকী উৎসব। ঐ সময়ে তাঁহার উদ্যোগে "বেথুন কলেজ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ" নামে একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত হয়; ইহা বাংলাদেশের মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের একটি নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক গ্রন্থ।

ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গের খ্যাতনামা চিকিৎসক ও বিশিষ্ট ম্যালেরিয়া-তত্ত্ববিদ ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-বি, এফ-আর-আই (লণ্ডন) বিগত ১৬ই অক্টোবর তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স চুরাশী বৎসর হইয়াছিল। ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের বহুমুখী প্রতিভা ও কর্ম্মৈষণা বাঙালী মাত্রেরই অনুকরণীয়। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের 'প্যাথলজি' ও 'ব্যাকটিরিওলজি'র সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। প্রথম দিকে ডাঃ সরকারের সায়ান্স এসোসিয়েশনে তিনি অবৈতনিক অধ্যাপকের কার্য্য করেন। কারমাইকেল, অধুনা আর. জি. কর, মেডিক্যাল কলেজেও তিনি অবৈতনিকভাবে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। কালাজ্বর সম্পর্কে ডাঃ চট্টোপাধ্যায় মৌলিক গবেষণার জন্য ১৯১৭ সালে বিশেষভাবে সম্মানিত হন। ম্যালেরিয়া-তত্ত্ববিদ্ হিসাবেও ডাঃ চট্টোপাধ্যায় সমগ্র ভারতে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি কলিকাতা সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ এণ্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটি স্থাপন করিয়া সমগ্র বঙ্গে তাহার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত করেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি সোসাইটির কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সোসাইটির প্রকাশিত "সোনার-বাংলা" পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তাঁহার বিশেষ দানের জন্য ডাঃ চট্টোপাধ্যায়কে বিলাতের রয়্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের এক জন সম্মানিত সদস্য নির্ব্বাচিত করা হয়। ভারতে সুচিকিৎসকরূপে অনেকে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর গবেষণাকারীর সংখ্যা এদেশে অতি বিরল। এই স্বল্পসংখ্যক গবেষণাকারীর মধ্যে ডাঃ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অন্যতম।

ডাঃ চট্টোপাধ্যায় শুধু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষণায়ই নিয়োজিত ছিলেন না, তিনি দেশহিতকর অন্যান্য চিন্তাও করিতেন। বাংলায় মৎস্য-চাষের উন্নতিকল্পে তিনি কয়েকখানি পুস্তিকা রচনা করেন। হাজামজা নদীর সংস্কার উদ্দেশ্যেও তিনি প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন। নিজ গ্রাম সুখচরে (২৪ পরগণা) তিনি একটি কুটীর-শিল্প সমিতি গঠন করেন। চরিত্রগুণে এবং একনিষ্ঠ দেশসেবায় ডাঃ চট্টোপাধ্যায় সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

শাহজাদা দারাশুকো

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

পিতা-পুত্রের ভাগ্যবিপর্যয়

৯

দিল্লীতে বসিয়া দারা সুলেমান শুকোর সেনাবাহিনী ও আগ্রার খবরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, চার-পাঁচ দিন পরে সম্রাটের বন্দীদশার খবর পাইয়া কোথায় পলাইবেন স্থির করিতে পারিলেন না। আওরঙ্গজেবের গতিবিধির খবর পাইলে তিনি অন্ততঃ আরও দশ-বার দিন সুলেমানের জন্য নিশ্চিন্ত মনে অপেক্ষা করিতে পারিতেন; কিন্তু আওরঙ্গজেব আগ্রা হইতে মথুরার দিকে যাত্রা করিবার একদিন পূর্ব্বেই তিনি দিল্লী ত্যাগ করিলেন (১২ই জুন ১৬৫৮ খ্রীঃ)। এই ক্ষেত্রেও তিনি ধীরভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সমগ্ররূপে বিবেচনা না করিয়া ভয়ে ঝোঁকের মাথায় লাহোরে পলাইয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। এই অদূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক সাহসের অভাব তাঁহার এবং সুলেমানের ভাগ্য-বিপর্যয় দুর্গতির শেষ পর্য্যায়ে টানিয়া আনিল।

তত্ত্বদর্শী বলিয়া খ্যাতিমান হইলেও দারা প্রাকৃত জনের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত মনস্তত্ত্ব কোন দিন অনুশীলন করেন নাই—যাহা শাসক ও যোদ্ধার কৃতিত্বের প্রথম সোপান। রাজনীতি কিংবা স্বার্থের সংঘাতে চিরশত্রু অথবা চিরমিত্র বলিয়া কোন জীব ও জাতি নাই; এই সত্য তখন দারার বুঝিবার কথা নয়। শাহজাহানের বন্দীদশা এবং আওরঙ্গজেবের প্রথম রাজ্যাভিষেকের পরে সাম্রাজ্যের রাশিচক্রে শুজা মোরাদের শত্রুস্থান হইতে দারার মিত্রস্থানে সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু বুদ্ধির দোষে তিনি এই শেষ সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। কূটনীতি ও সামরিক ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত সম্ভাব্যতার উপর অদৃষ্টের ফাট্‌কাবাজি খেলা ব্যতীত দারার তখন অন্য উপায় ছিল না, অথচ বড়রকমের ঝুঁকি গ্রহণ করিবার বেপরোয়া নৈতিক সাহস তাঁহার হইল না। আওরঙ্গজেব যে "ইসলাম বিপন্ন" তক্তার (political platform) উপর ভর করিয়া শাহীতক্তে পা দিয়াছিলেন, মোরাদকে ঘৃণ্য উপায়ে বন্দী করার পর উহা তাঁহার পায়ের নীচ হইতে সরিয়া গিয়াছিল। এই সময়ে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইয়া দারা ও শুজা যদি তাঁহার বিরুদ্ধে "সম্রাটের মুক্তি, পিতৃদ্রোহীর শাস্তি" এইরূপ পাল্টা ধ্বনি তুলিতেন তাহা হইলে তিনি তলোয়ারের জোরে জনমত শান্ত করিতে পারিতেন না, পঞ্জাব, রাজপুতানা ও যমুনার পূর্ব্বতীর তাঁহার শত্রুগণকে আশ্রয় করিয়া সম্রাটের মুক্তির জন্য আগ্রার দিকে ছুটিয়া আসিত। পূর্ব্বপ্রদেশে দারা-শুজার সম্মিলিত সেনা ও জনপ্রিয়তা, রাজপুতনায় রাঠোর যশোবন্ত, উত্তরে অবিজিত পঞ্জাব মুলতান কাবুল-সিন্ধু, দক্ষিণে বদ্ধবৈর বিজাপুর গোলকুণ্ডা এবং উদীয়মান শিবাজী, নিজের বগলে সন্দিহান হিন্দু-মুসলমান—এইরূপ অবস্থায় পড়িলে আওরঙ্গজেব উত্তর-দক্ষিণ দুই দিক সহজে সামলাইতে পারিতেন কিনা বলা যায় না।

যাহা হউক, সময়মত দারার সুবুদ্ধির উদয় হইল না। দিল্লী হইতে তিনি সুলেমানের কাছে সংবাদ পাঠাইলেন, তাড়াতাড়ি হিমাচলের পাদভূমি বরাবর কুচ করিয়া লাহোরে উপস্থিত হইবে, এবং রাজা জয়সিংহ ও দেলের খাঁকে সঙ্গে আনিবার চেষ্টা করিবে। সামুগড়ের সংবাদ পাইয়া সুলেমান ২রা জুন (১৬৫৮ খ্রীঃ) কোরা শহর (এলাহাবাদ হইতে ১০৫ মাইল পশ্চিম) হইতে পলাইয়া আবার এলাহাবাদের দিকে চলিয়াছেন; বর্ষা আসন্ন, ফৌজ ছারখার, লাহোর বহু দূর।

১০

১২ই জুন (১৬৫৮ খ্রীঃ) দশ হাজার সৈন্য ও অপরিমিত ধন-ভাণ্ডার লইয়া দিল্লী হইতে দারা লাহোরের দিকে চলিলেন, পথে পূর্ব্ব পঞ্জাবের প্রধান শহর সরহিন্দ; এইখানে উদ্বৃত্ত বাদশাহী তহবিল জমা থাকিত। শতদ্রুর অপর তীর ব্যতীত আওরঙ্গজেবকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নাই, এই পারে সমস্তই শত্রুর হাতে পড়িবে; এই জন্য দারা দিশা-শূন্যচিত্তে সরহিন্দের পলাতক রাজস্ব আদায়কারী "করোরী"-র (সং—ক্রোরী, লক্ষদাম রাজস্ব-সংগ্রাহক) ধন-সম্পত্তি কাড়িয়া লইলেন এবং সরকারী তহবিলের বার লক্ষ টাকা যাহা মাটির নীচে পোঁতা ছিল তাহাও খুঁড়িয়া বাহির করিলেন। শতদ্রু নদী পার হইয়া তিনি তাঁহার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ দায়ূদ খাঁ কোরেশীকে তলোয়ান গুজার-ঘাটে [i. rr ; প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র আলিওয়ালের চার মাইল উত্তরে], এবং সৈয়দ ঘায়েরত খাঁকে (উপাধি ইজ্জত খাঁ) তলোয়ানের ষাট মাইল পূর্ব্বে রুপার ঘাটে শতদ্রুসীমা রক্ষার্থ রাখিয়া গেলেন এবং শতদ্রু বা সতলেজ নদীর দুই পারের সমস্ত নৌকা ধ্বংস করিয়া দিলেন। এই ভাবে আওরঙ্গজেবকে যথাসাধ্য বাধা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া ৩রা জুলাই লাহোরে দারা কিঞ্চিৎ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন;

তখনও কিন্তু আওরঙ্গজেবের দিল্লী পৌঁছিবার দুই দিন বিলম্ব!

লাহোরে পৌঁছিয়াই দারার যেন বুদ্ধি খুলিয়া গেল। আওরঙ্গজেবের মত তিনিও হাতে কলমে প্রতিপক্ষকে জব্দ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়' লাগিলেন, নীতি প্রয়োগে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণকে সপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিহাসে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও দারার দৃঢ়তা ও বুদ্ধি-বিকাশের পশ্চাতে কোন রহস্য ছিল বলিয়া সন্দেহ করা যায়; হঠাৎ এত বুদ্ধি দার্শনিক দারার মাথায় গজাইবার নহে। লাহোরে প্রতিদিন তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল; ভেরা এবং খুশ্‌আব্‌ সরকারের ফৌজদার প্রসিদ্ধ যোদ্ধা খঞ্জর খাঁ, পাঠানকোট-নূরপুরের পরাক্রান্ত ডোগরা-রাজা রাজরূপ প্রভৃতি দারার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। দারা গোপনে আওরঙ্গজেবের কর্ম্মচারিগণকে বশীভূত করিবার জন্য বিশ্বস্ত হরকরার মারফত চিঠি লিখিতে লাগিলেন, রাজপুতানার সামন্ত রাজগণকে আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার জন্য প্ররোচিত করিলেন। লাহোর হইতে দারা অবশেষে শুজার কাছে সাম্রাজ্য ভাগাভাগির প্রস্তাব করিয়া তাঁহাকে সসৈন্যে আগ্রার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ধর্ম্মাতের যুদ্ধের পর কিংবা অন্ততঃ দিল্লী পৌঁছিয়া শুজার কাছে এই প্রস্তাব করিবার বুদ্ধি হইলে হয়ত পিতা-পুত্র রক্ষা পাইতেন—বিলম্বে কার্য্যনাশ হইল।

দারা কি সত্যই এইরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন? না—আওরঙ্গজেব মোকদ্দমা সাজাইবার জন্য এই অভিযোগ দারার বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার দরবারী ইতিহাস আলমগীর-নামার মারফত আমাদের কাছে পৌঁছিয়াছে? ম্যানুসী সাহেব ফকিরের বেশে আওরঙ্গজেবের ফৌজের সহিত দিল্লী পর্য্যন্ত আসিয়া লাহোরের দিকে পলাইয়াছিলেন এবং সিন্ধুর সীমান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার দুর্ভাগ্যের সাথী হইয়াছিলেন। তাঁহার সাক্ষ্য দ্বারাও এই সমস্ত ঘটনা কিছু কিছু সমর্থিত হয়; সুতরাং দারার বোধোদয়ে অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। একটি ঘটনা হইতে অনুমান করা যায়, দারার এই কর্ম্মতৎপরতার পশ্চাতে নাদিরা বানুর* প্রেরণা নিশ্চয়ই ছিল। নূরপুর পাঠানকোটের ডোগ্‌রা রাজপুত রাজা রাজরূপ দারার আমন্ত্রণে তাঁহার সাহায্যার্থ লাহোর আসিয়াছিলেন। দারা তাঁহাকে সেনা সংগ্রহের দশ লক্ষ টাকা অগ্রিম দিয়াছিলেন। রাজরূপ নিজ রাজ্যে ফিরিয়া যাইবেন, এই সময় নাদিরা বানু তাঁহাকে অন্দরমহলে ডাকিয়া পাঠান। স্বামীর সপক্ষে রাখিবার জন্য নাদিরা তাঁহাকে সেকালের প্রথামত দুধ-ধোয়া জল পান করাইয়া পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন এবং নিজের গলার বহুমূল্য মুক্তার মালা তাহার গলায় পরাইয়া দিলেন।* লাহোরে দারা মোটা বেতনে সৈয়দ মোগল ও পাঠান জাতীয় বিশ হাজার নূতন অশ্বারোহী ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। তিনি ভরসা করিয়াছিলেন সেনাপতি দায়ুদ খাঁ শতদ্রুতীরে বর্ষার দুই তিন মাস আওরঙ্গজেবের ফৌজকে বাধা দিতে পারিবে এবং ইতিমধ্যে পুত্র সুলেমান নিশ্চয়ই লাহোর আসিয়া পৌঁছিবে। দারার সঙ্গে কয়েকজন ফিরিঙ্গী গোলন্দাজ অফিসার আসিয়াছিল। কয়েকটি বিপদ এড়াইয়া ম্যানুসীও লাহোরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিমকহালালী মনে করিয়া দারার চোখে জল আসিল, এবং বলিয়া উঠিলেন, "সাবাশ, সাবাশ! যাহারা বহুকাল আমার অসীম অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে, তাহারা এই বিপদে আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, আর এই ফিরিঙ্গী বাচ্চা?"

১১

১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ, এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ। তখনও ধর্ম্মাতের যুদ্ধে মহারাজ যশোবন্তের পরাজয় হয় নাই, কুমার সুলেমান খুল্লতাত শুজার সুরজগড় রক্ষাব্যূহ ভেদ করিয়া তাঁকে মুঙ্গের-দুর্গে কোণঠাসা করিয়াছেন, তৈমুর বংশের ধারা ও মীর্জ্জাই নাড়ী চতুর শুজা বিলক্ষণ বুঝিতেন, শাহজাদের পুত্রগণ যদি বাপকে ডিঙাইয়া শাহীতক্তে বসিতে চায়, তাহা হইলে সুলেমান, দারাকে পাশ কাটাইয়া ঐ গদীতে বসিবার সুযোগ পাইলে ছাড়িবে কেন? এই জন্য তিনি নাকি সদুপদেশপূর্ণ দীর্ঘ পত্র সুলেমানের চোখে পড়িবার জন্য মুঙ্গের দুর্গের প্রাচীরগাত্রে লাগাইয়া রাখিয়াছিলেন; সত্যমিথ্যা খোদাতালা জানেন, তবে ঐ ধরণের এক চিঠি পাওয়া গিয়াছে। উহাতে শুজা তাঁহার সুশীলা নন্দিনীসহ শাহজাহানের গোটা বাদশাহীটা জামাতা সুলেমানকে প্রদান করিয়া স্বয়ং দুনিয়াদারীর ঝঞ্ঝাট হইতে অবসর লইবার সাধু সঙ্কল্প প্রকট করিয়াছিলেন। যাহা হউক ভ্রাতুষ্পুত্র টোপ গিলিল না, তাহার যুদ্ধোদ্যম দ্বিগুণ হইল, মীর্জা রাজা তাহাকে বাগ মানাইতে পারিলেন না। ইহার কিছু

* দারার প্রধানা মহিষী; আসল নাম করিমউন্নিসা বেগম। ইনি শাহজাদা পরবেজের (জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র) কন্যা। স্বামী যে পরিমাণ অপদার্থ কিংবা কুক্রিয়াসক্ত, স্ত্রী ততই বুদ্ধিমতী ও সাধ্বী হওয়া সে যুগেও দেখা যায়। পরবেজ অপেক্ষা তাঁহার স্ত্রী অধিক স্থিরবুদ্ধি ছিলেন। মায়ের গুণ করিমউন্নিসা পাইয়াছিলেন এবং দারার সন্তানগণের (যথা সুলেমান ও জানী বেগম) মধ্যে পিতা অপেক্ষা মাতার চরিত্রই অধিক পরিস্ফুট, দারার চরিত্রে যে সমস্ত গুণের অভাব, সেগুলি নাদিরার মধ্যে দেখা যায়, তবে নূরজাহানের মত 'অদ্বিতীয়া' হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা নাদিরার ছিল না।

* *Storia*, I, p 3.0

দিন পরে ধর্ম্মাতের দুঃসংবাদ মুঙ্গেরে পৌঁছিল। সম্রাট ও দারা মীর্জা রাজা জয়সিংহের কাছে লিখিলেন, তাড়াতাড়ি শুজার সহিত সন্ধি করিয়া যেন অবিলম্বে দ্রুত আগ্রায় চলিয়া আসেন; সুলেমানের কাছেও অনুরূপ আদেশ আসিল। এই খবর পাইয়া সুলেমান মুঙ্গেরের অবরোধ উঠাইয়া আগ্রায় ফিরিবার জন্য ছটফট করিতে লাগিলেন; কিন্তু মীর্জা রাজা তেমন কোন গরজ দেখাইলেন না, ধীরে সুস্থে সন্ধির কথা-বার্ত্তা চালাইতে ও শুজার দূত মীর্জা জান বেগকে রাজসিক আতিথেয়তায় আপ্যায়িত করিতেই প্রায় আট দশ দিন* নষ্ট করিলেন। প্রথম খবরের পর সম্রাট মীর্জা রাজাকে আর এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—সন্ধিপত্র স্বাক্ষরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া অন্ততঃ তিনি যেন নিজ তাবিন ও অন্যান্য রাজপুত মনসবদারগণের ফৌজ লইয়া তৎক্ষণাৎ আগ্রা যাত্রা করেন; অথচ তাঁহাকে ছাড়িয়া সুলেমানও যাত্রা করিতে পারিলেন না। অবশেষে ৭ই মে উভয় পক্ষে স্থিতাবস্থা সন্ধি স্থাপিত হইল, সুলেমান ও জয়সিংহ মুঙ্গের হইতে আগ্রা রওনা হইলেন। জয়সিংহকে দ্রুত পথ অতিক্রমে বাধ্য করিবার জন্য সুলেমান দুই-এক মঞ্জিল আগেই চলিতে লাগিলেন; এই ভাবে পঁচিশ দিন পরে ২রা জুন বাদশাহী ফৌজ এলাহাবাদ হইতে একশ' পাঁচ মাইল পশ্চিমে কোরা নামক স্থানে উপস্থিত হইল। এই সময়ে আওরঙ্গজেবের দূত, মীর্জা রাজা এবং দেলের খাঁ রোহিলার কাছে চিঠি লইয়া আসিয়াছিল। দারার পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া মীর্জা রাজা সুলেমানকে সাফ জবাব দিলেন—তিনি বিজয়ী শাহজাদা আওরঙ্গজেবের পক্ষে যোগ দিবার জন্য আগ্রা যাইবেন; সুলেমান যেখানে ইচ্ছা, হয় দিল্লী না হয় এলাহাবাদে যাইতে পারেন। সুলেমানকে বন্দী করিয়া আনিবার জন্য আওরঙ্গজেব রাজার কাছে লিখিয়াছিলেন। এই অবস্থায় এত দূর নীচে নামিতে বোধ হয় তাঁহার বিবেকে বাধিল। ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহার এইরূপ চেষ্টায় কচ্ছবাহ ব্যতীত অন্য রাজপুত অগ্রসর হইত না, দারার প্রতি বিশ্বস্ত সৈয়দ ও অন্যান্য মুসলমান মনসবদারগণ প্রবল বাধা দিত, দেলের খাঁও ইহা সহ্য করিতেন না। দেলের খাঁর কিছু মনুষ্যত্ব ছিল। তিনি সুলেমানকে এলাহাবাদে গঙ্গা পার হইয়া দোয়াবে পাঠান-উপনিবেশ শাহজাহানপুর জেলায় আশ্রয় লইতে বলিলেন এবং সেখান হইতে তাঁহার জন্য পাঠানদের এক নূতন ফৌজ সংগ্রহ করিবার ভরসাও দিলেন। ৪ঠা জুন তারিখে উক্ত পরামর্শমত সুলেমান এলাহাবাদ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু ইতিমধ্যে কুচক্রী মীর্জা রাজা সব বানচাল করিয়া দিলেন। বাহাদুরপুরের যুদ্ধের পর হইতে মীর্জা রাজা দেলের খাঁকে তাঁহার যশঃস্পর্দ্ধী ভাবী শত্রু জ্ঞানে ঈর্ষা করিতেন এবং সুলেমানের উপর দেলের খাঁর প্রভাব তাঁহার চক্ষুশূল ছিল। এখন তিনি দেলের খাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী মুরুব্বী সাজিয়া বসিলেন। তিনি দেলের খাঁকে প্রলোভন ও ভয় দেখাইয়া বলিলেন—নিমকহালালীর জন্য বাজে ভাব-প্রবণতার ঝোঁকে সুলেমানের সঙ্গ লইয়া নিজের সর্ব্বনাশ ও পাঠানের দুর্গতি যেন খামকা ডাকিয়া না আনেন; শাহজাহান ও দারার দৌলত শেষ হইয়াছে, আওরঙ্গজেবের কোপ হইতে দুদিন পরে কেহ তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। দেলের খাঁ ইহাতে দমিয়া গেলেন, শেষ মুহূর্ত্তে সুলেমানের সঙ্গে এলাহাবাদের দিকে যাইতে রাজী হইলেন না। দেলের খাঁর দেখাদেখি গঙ্গা-যমুনার দোয়াবের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে যাহাদের বাড়ীঘর তাহারাও সুলেমানকে বর্জ্জন করিল, বাইশ হাজারের মধ্যে মাত্র ছয় হাজার সৈন্য তাঁহার সঙ্গে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত চলিল।*

এলাহাবাদে পৌঁছিয়া কুমার সুলেমান কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এইখানে তিনি সংবাদ পাইলেন দারা ১২ই জুন দিল্লী হইতে লাহোরের দিকে পলাইয়া গিয়াছেন। সাত দিন নানা জল্পনা কল্পনায় বৃথা নষ্ট হইল, কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন সুবা এলাহাবাদের স্বাধীন শাসক হিসাবে ঐখানে থাকিয়াই সেনাবল বৃদ্ধি করা যুক্তিযুক্ত; কিন্তু শুজা এবং আওরঙ্গজেবের মাঝখানে পড়িয়া তিনি কত দিন আত্ম-রক্ষা করিতে পারিবেন, ইহাতে পিতার কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হইবে? অন্য কয়েক জনের মত হইল এলাহাবাদ হইতে পাটনায় শুজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার সাহায্যে আওরঙ্গজেবকে আক্রমণ করাই প্রকৃষ্ট উপায়। শেষোক্ত পন্থা অবলম্বন করিলে সুলেমান রক্ষা পাইতেন, দারার ভবিষ্যৎও কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল হইত। দারার বিশ্বস্ত বারহাবাসী সৈয়দ সৈন্যাধ্যক্ষগণ সুলেমানকে উপদেশ দিলেন গঙ্গার উত্তর কূল ধরিয়া মধ্য দোয়াবে তাঁহাদের এলাকায় গেলে ঐখান হইতে গঙ্গা পার হইয়া পাহাড়ের গায়ে গায়ে পঞ্জাব সীমান্ত অতিক্রম করা দুরূহ হইলেও অসম্ভব নয়।

---

* ধর্ম্মাতের যুদ্ধের (১৫ই এপ্রিল) খবর মুঙ্গেরে পৌঁছিতে দশ দিনের বেশী সম্ভবতঃ লাগে নাই; অথচ শুজার সহিত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল ৭ই মে অর্থাৎ বাইশ দিন পরে।

* ম্যানুসী লিখিয়াছেন, সুলেমান, মীর্জা রাজা ও দেলের খাঁকে হত্যা কিংবা বন্দী করিবার জন্য এক ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। সুলেমানের শল্য-চিকিৎসক আর্ম্মানী সেকেন্দর বেগ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রাজার কাছে সমস্ত ফাঁস করিয়া দিয়াছিল। এই সেকেন্দর বেগের কাছেই এই গল্প ম্যানুসী শুনিয়াছিলেন। অন্তের কথায় সত্য মিথ্যার জন্য ম্যানুসী বিশেষ মাথা ঘামাইতেন বলিয়া তাঁহার *Storia* পড়িলে মনে হয় না। বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাস করিয়া ইতিহাস লেখা যায় না (*Storia*, i 255-6)।

কুমার সুলেমান এলাহাবাদ দুর্গে বারহাবাসী সৈয়দ কাসিম খাঁর হেফাজতে শাহী লটবহর অধিকাংশ স্ত্রীলোক ও চাকরবাকরকে রাখিয়া হাল্‌কা সরঞ্জাম (light kit) লইয়া ১৪ই জুন লক্ষ্ণৌ-মোরাদাবাদের দিকে যাত্রা করিলেন। মোরাদাবাদ হইতে নগীনা পৌঁছিয়া গঙ্গা অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু প্রত্যেক ঘাটে তাঁহার ফৌজ দেখিলেই স্থানীয় মাঝিমাল্লা অপর পারে সরিয়া পড়ে। এই ভাবে গঙ্গার উজান চলিতে চলিতে তিনি হরিদ্বারের অপর তীরে চণ্ডী নামক স্থানে তাঁবু ফেলিলেন।

এই জায়গা গাড়োয়াল-শ্রীনগরের* নাক-কাটি রাণীর হিমাচল রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত। সুলতান মহম্মদ তোগলকের সময় হইতে শাহজাহানের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত কোন মুসলমান সেনা এই রাজ্য আক্রমণ করিয়া নাক লইয়া ফিরিয়া যাইতে পারে নাই। দরবারী ঐতিহাসিক লাহোরী লিখিয়া গিয়াছেন, সোনার লোভে শাহজাহানের নামজাদা আমীর সাহারানপুরের ফৌজদার নেজাবত খাঁ এই "নাক-কাটি রাণী"র রাজ্যে প্রবেশ করিয়া দেরাদুন পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। নাক-কাটি রাণীর উত্তরাধিকারী রাজা পৃথ্বীচাঁদ জাহানারা ও দারার মারফত আপোষমীমাংসার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; পাহাড়ের ভিতরে ঢুকিলে শাহী সম্ভ্রমের নাকের ডগা কাটা যাইবার আশঙ্কা দেখিয়া সম্রাট কিছু নজর ও নামমাত্র বশ্যতা স্বীকার মঞ্জুর করিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। কুমার সুলেমান বিপদগ্রস্ত হইয়া তাঁহার কর্ম্মচারী ভবানীদাসকে সাহায্যের আবেদন লইয়া রাজা পৃথ্বীচাঁদের কাছে পাঠাইলেন এবং উত্তরের প্রতীক্ষায় ঐ স্থানে কয়েক দিন অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

১২

ইতিমধ্যে সুলেমানের সেনাবাহিনীকে বেড়াজালে ফেলিবার জন্য আওরঙ্গজেব দিল্লী হইতে খান-দৌরান্‌ নাসিরী খাঁকে এলাহাবাদের দিকে এবং শায়েস্ত খাঁকে গঙ্গা-যমুনা দোয়াব তালাশ করিয়া গঙ্গার তীর বরাবর হরিদ্বারের দিকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দিয়াছিলেন। কুমার সুলেমান পাছে শায়েস্ত খাঁর দৃষ্টি এড়াইয়া যমুনার পারে আসিয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় উজানে যমুনা অতিক্রমণে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে শেখ মীর এবং দেলের খাঁর অধীনে আর এক দল সেনা নদীর দক্ষিণ তীরে মোতায়েন রাখিলেন। শায়েস্ত খাঁ গঙ্গার দক্ষিণ তীর ধরিয়া হরিদ্বারের দিকে আগাইয়া চলিলেন, তাঁহার সহকারী মনসবদার ফিদাই খাঁ হাপুরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব পুথ নামক খেয়াঘাটে ওৎ পাতিয়া রহিল; কারণ লক্ষ্ণৌ হইতে সুলেমানের ফৌজ এইখানে আসিয়াই গঙ্গা পার হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। সেনার বেড়াজালের বাহিরে আওরঙ্গজেবের গুপ্তচর ও কূটনৈতিক পত্রের জাল আরও বহুদূরে হিমাচল পর্য্যন্ত ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল। কুমায়ুঁ পাহাড়ের রাজা গাড়োয়াল-শ্রীনগরের রাজার প্রতিবেশী, সুতরাং সহজাত শত্রু। তিনি এক চিঠিতে জানাইলেন, রাজা পৃথ্বীচাঁদের সাহায্যে হরিদ্বারে গঙ্গা পার হওয়ার জন্য সুলেমানের ফৌজ ঐ দিকে চলিয়াছে। এই সংবাদ পাওয়ামাত্র শায়েস্ত খাঁকে পিছনে ফেলিয়া ফিদাই খাঁ ঝড়ের বেগে হরিদ্বারের দিকে ধাবিত হইলেন এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ১৬০ মাইল ঘোড়া দৌড়াইয়া অপরাহ্ণে হরিদ্বার পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে মাত্র পঞ্চাশ জন সওয়ার; ঠিক ঐ সময়ে অপর পার হইতে সুলেমান নদী পার হওয়ার জন্য প্রস্তুত। ঐ পারে শত্রুর আকস্মিক আবির্ভাবে তাঁহার সেনা দারুণ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িল, ঐ শত্রুর বলাবলের খবর কে লইবে? গুজবের গরমে ৫০ জন ৫ হাজার হইয়া গেল, উহাও আবার স্বয়ং আওরঙ্গজেবের অগ্রগামী ফৌজ।

এই অবস্থায় পিতার সহিত মিলিত হইবার শেষ আশা বিসর্জ্জন দিয়া সুলেমান শ্রীনগর ব্যতীত নিজের আশ্রয় খুঁজিয়া পাইলেন না, তাঁহার ফৌজে ভাঙ্গন ধরিল। বিশ্বস্ত সৈয়দগণ শত্রুর হাতে তাঁহাদের স্ত্রীপুত্রের কি দশা হইবে ভাবিয়া সুলেমানকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। শ্রীনগরের রাস্তায় সুলেমানের উপদেষ্টা এবং পিতৃস্থানীয় বৃদ্ধ সেনানী বাকী বেগ মৃত্যুর কবলগ্রস্ত হইলেন। বাকী বেগ এই পর্য্যন্ত নানা বিপর্য্যয়ের মধ্যেও সুলেমানের ফৌজকে সামলাইয়া রাখিয়াছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া ছয় হাজার অশ্বারোহীর মধ্যে মাত্র দুই হাজার শ্রীনগরের দিকে চলিল। রাজা পৃথ্বীচাঁদ রাজধানী হইতে চার মঞ্জিল দূরে সুলেমানকে যথোচিত অভ্যর্থনা জানাইলেন; কিন্তু শাহী লটবহর, হাতী ঘোড়া ও দুই হাজার সওয়ার শ্রীনগর পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে রাজী হইলেন না, যেহেতু তাঁহার গরীব দেশে এতগুলি মানুষ ও জানোয়ারের খোরাক জুটিবে না। দ্বিধাগ্রস্ত সুলেমান সাত দিন পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া কোন কূল-কিনারা পাইলেন না। অবশেষে তিনি রাজার সর্ত্ত মানিয়া লওয়া ব্যতীত গত্যন্তর দেখিলেন না। যাহারা এত দিন নিমকহালালী করিয়াছে, শত্রুর চক্রান্তে পাহাড়ে বেঘোরে মারা যাওয়ার ভয়ে তাহারাও নিমকহারামীর পথ খুঁজিতে লাগিল। সুলেমানকে শ্রীনগর যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করাইবার জন্য তাঁহার অনুচরবর্গ এক ষড়যন্ত্র করিল এবং এলাহাবাদ-দুর্গাধ্যক্ষ সুবিশ্বাসী সৈয়দ

* শ্রীনগর বর্ত্তমানে গৌরী জেলার অন্তর্গত অলকানন্দার উপত্যকায় অবস্থিত একটি বড় গ্রাম।

কাসিম খাঁর জাল নাম স্বাক্ষরিত এক ভুয়া চিঠি তাঁহার কাছে উপস্থিত করা হইল, যেন কাসিম খাঁ এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন —আগ্রা দুর্গ হইতে বন্দী সম্রাট শাহজাহানকে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে শাহ শুজা বিরাট সেনাবাহিনী ও নৌবহর লইয়া এলাহাবাদে উপস্থিত হইয়াছেন এবং কুমার সুলেমানের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। এই চিঠি আসল মনে করিয়া সুলেমান রাজাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্ব্বক বিদায় লইলেন এবং এলাহাবাদ পৌঁছিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আবার নগিনা* পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িলেন। এইখানে বিশ্বাসঘাতকের দল শত্রুর জালের ভিতর সুলেমানকে ফেলিয়া পলাইয়া গেল, মাত্র সাত শত সওয়ার তাঁহার সঙ্গে রহিল। কপাল চাপড়াইয়া হতভাগ্য সুলেমান দারুণ বর্ষার মধ্যে আবার পাহাড়ের দিকে ছুটিলেন। তিনি নগিনা হইতে পলায়ন করিবার আঠার ঘণ্টা পরেই মোরাদাবাদের নূতন আলমগীর-শাহী ফৌজদার ঐখানে উপস্থিত হইল— এইবার শিকারী কুকুর ও খরগোশের দৌড়। সঙ্গে অন্তঃপুরের দুই শত পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোক লইয়া সুলেমান মহা ফাঁপরে পড়িলেন, অবশেষে অধিকাংশকে পথে বিসর্জ্জন দেওয়া ছাড়া উপায় রহিল না, সাত শতের মধ্যে পাঁচ শত সওয়ার উধাও হইয়া গেল, সুলেমান কোথায়ও বিশ্রাম না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে লাগিলেন, পাহাড়ে পৌঁছিতে পৌঁছিতে মাত্র সতর জন অনুচর অবশিষ্ট রহিল। আগষ্ট মাসের (১৬৫৮ খ্রীঃ) প্রথম সপ্তাহে ভরা বর্ষায় দুর্গম পাহাড়ী রাস্তায় কুমার সুলেমান, তাঁহার স্ত্রী ও দুই-চারি জন স্ত্রীলোক, দাই-ভাই (foster brother) মহম্মদ শা ও সতর জন অনুচর সঙ্গে লইয়া সম্ভবতঃ কোটদ্বার ঘুরিয়া গাড়োয়াল-শ্রীনগরের দিকে চলিলেন।

রাজা পৃথ্বীচাঁদ সুলেমানকে সাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং দুই বৎসর পাঁচ মাস পর্য্যন্ত দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ আওরঙ্গজেবের প্রলোভন, ভ্রূকুটি ও যুদ্ধোদ্যম উপেক্ষা করিয়া শরণাগতকে রক্ষা করিয়াছিলেন। উপকারের প্রতিদানে যাঁহারা দারার অনিষ্টসাধন করেন নাই এরূপ অতি অল্প কয়েক জনের মধ্যে রাজা পৃথ্বীচাঁদ সর্ব্বাগ্রগণ্য।

* নগিনা বিজনৌর জেলায় অবস্থিত একটি শহর ও রেলষ্টেশন (O. R. Ry.)। হরিদ্বারের দক্ষিণে মোরাদাবাদের উত্তরে মাঝামাঝি স্থান, এইখান হইতে পূর্ব্বোত্তর দিকে *Koldwara* গিরিপথ।

সংশোধন ও সংযোজন

	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	হইবে না	হইবে
ভাদ্র, ১৩৬০	৫৩৪	১	১৯-২০	দাক্ষিণাত্য তরঙ্গিণী এই সেনাপ্রবাহের	দাক্ষিণাত্য সেনাপ্রবাহের
আশ্বিন, ১৩৬০	৬৫৭	২	২০-১	ধূলিরাশির দ্বারা আষাঢ়ের	ধূলিরাশির দ্বারা ঘনায়মান হইয়া আষাঢ়ে
	,,	,,	২৫-৬	হরাবল লইয়া স্ব স্ব বাহিনীকে	হরাবল লইয়া রাও ছত্রসাল
	৬৬০	২	১৭	যাহা পাইল…লাগিল	যাহা পাইল গাপ্ করিয়া লইল
	,,	,,	৩২	ফিরোজজঙ্গের সহিত আহত	ফিরোজজঙ্গের সহিত যুদ্ধে আহত
	৬৬৩	১	১৭	ক্লান্ত রাজপুত	ক্লান্ত রাঠোর
	,,	,,	২১	আওরঙ্গজেবের	আওরঙ্গজেব
	,,	,,	২৪	রক্ষী	রক্ষী এবং
	,,	,,	২৮	বিক্রান্তমূর্ত্তি	বিক্রান্তমূর্ত্তি
	৬৬৪	১	১৯	হাওদাসহ	রামসিংহের হাওদাসহ
	,,	২	২	সর সরি	--
	,,	,,	১১	সাঁজোয়ার	সাঁজোয়া
	৬৬৭	২	২	যোদ্ধ প্রাণের	যোদ্ধগণ প্রাণের

পথিক

শ্রীসুবোধ বসু

প্রায় দুই শ' মাইল আসিবার পর এই প্রথম বাধা পাইলাম। বিরক্তিভরে সজোরে ব্রেক কষিলাম; ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ করিয়া চৌদ্দ সিলিণ্ডারের দানব দাঁড়াইয়া পড়িল।

সকাল হইতেই ছুটিতেছি। হাওড়ার পুল যখন পার হই তখন কাক-ভোর; ট্র্যাফিক বা ট্র্যাফিক-নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি ছিল না। তার পর গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া সমানে ছুটিয়া আসিয়াছি, কোথাও বাধা পাই নাই। হুগলীর আগে পর্য্যন্ত জনপদ ও বেপরোয়া পথচারী জন ও যানের বাহুল্য; তবুও একবারও থামিতে হয় নাই। এমন কি শ্রীরামপুরে রেলওয়ে লেভেল্ ক্রসিংটিও অবলীলাক্রমে পার হইয়া আসি। এটি যে কত বড় সৌভাগ্য তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন; ট্রেন পাস করার অপেক্ষায় অন্ততঃ পনেরো মিনিট এইখানে খাড়া না দাঁড়াইয়া কখনও রাস্তা খালি পাই নাই। তারপর হইতে সৌভাগ্যের মরশুম চলিয়াছে; রাস্তায় যেখানেই রেলের ক্রসিং পড়িয়াছে, হয় সেখানে দ্বার অবারিত পাইয়াছি, নয় ত আমার ছুটন্ত যানটি হাজির হওয়ামাত্র ফটক খুলিয়া গিয়াছে। যাত্রালগ্নটি আজ নিশ্চয়ই শুভ ছিল; এই সৌভাগ্য চলিতে থাকিলে ননস্টপ দোড় না হোক, স্বেচ্ছামত চলিবার একটা রেকর্ড স্থাপন করিতে পারিতাম। এমন সময় গন্তব্য হইল হাজারিবাগের মাইল পনেরো মাত্র দূরে সৌভাগ্য আমাকে পরিত্যাগ করিল। রেল-ক্রসিঙের বন্ধ হওয়া ফটকের সামনে নিরুপায় ভাবে অনির্দ্দিষ্টকালের প্রতীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সারাটা দিন শ্রাবণের আকাশের সঞ্চরমাণ মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়াছি; ছুটের প্রতিযোগিতায় উহারা যে খুব সুবিধা করিয়াছে, এমন মনে হয় না। এইবার আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া দিগন্তজোড়া আকাশে উহারা গড়গড় করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং সকৌতুকে আমার গাড়ীর ছাদে জোর এক পশলা বৃষ্টি ছিটাইয়া দিয়া সহাস্যে সম্মুখে আগাইয়া গেল।

রাস্তার দু'দিকে অসমতল ক্ষেত। ডান দিকে দিগন্ত বরাবর উঁচু পাহাড়ের একটা অখণ্ড দেয়াল নিরুদ্দেশ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। বাঁ দিকে রাস্তার গা ঘেঁষিয়া এক টুকরা জঙ্গল দৃষ্টিকে যথাসাধ্য বাধা দিতেছে, কিন্তু উহার ভিতর দিয়া রেলের বাঁধটা পুরাপুরি ঢাকিতে পারিতেছে না। এই দুর্গম প্রদেশ হইতে লাইন বাহির হইয়া আসিয়া পিচ-ঢালা গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ভেদ করিয়া অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে ডান দিকের সুদূর পর্ব্বতরেখার পাদদেশ দিয়া আগাইয়া গিয়াছে। অবারিত আকাশ, দিগন্তজোড়া পৃথিবী, আশেপাশে কোন গ্রাম বা জনমানবের কোন বসতিই চোখে পড়ে না। রেল-ক্রসিঙের কাছাকাছি ইটের গুমটি ঘরটিকেই সভ্যতার একমাত্র নিদর্শন বলিয়া মনে হয়।

পনেরো মিনিট অপেক্ষার পর গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। ইতিমধ্যে বহুবার হর্ণ বাজাইয়া ও ইলেকট্রিক হুটারের আওয়াজ করিয়া এই অযথা বিলম্বের প্রতি গুমটি-ওয়ালার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি; কিছুই ফল হয় নাই। এইবার নিজেই হাঁটিতে হাঁটিতে তাহার ডেরায় হানা দিলাম।

আমার প্রতিবাদের সেও বিরক্তিভরে প্রতিবাদ করিল। কহিল, নিকটতম ষ্টেশন পাঁচ মাইল দূর; সেখান হইতে সঙ্কেত পাইয়াই সে ফটক বন্ধ করিয়াছে। পর পর বিভিন্ন দিকের দুটো ট্রেন পাস করিবে; অন্ততঃ আধঘণ্টার আগে ফটক খোলা সম্ভব নয়। বলিয়া কোনরূপ আদর-আত্মীয়তা না দেখাইয়া সে আবার আটা সানিতে বসিল।

অগত্যা রেল-লাইনের স্লিপারের উপর দিয়া হাঁটিয়া গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডে ফিরিয়া আসিলাম। বৃষ্টিধৌত রাস্তাটা চক্ চক্ করিতেছে; যত দূর দেখা যায় মানুষ বা যানের চিহ্নমাত্র নাই। যেন বিপুলা ধরিত্রীর সবুজ বসনের অনন্ত বিস্তৃত কালো পাড়। রাস্তার উভয় পার্শ্বে উঁচু গাছের সারি; তার পর জনহীন বন্ধুর প্রকৃতি। অদ্ভুত মায়া আছে এই রাস্তায়। যেন এক সমাপ্তিহীন চলচ্চিত্রের রীল। এই পথে গাড়ী চালাইতে চালাইতে কত বার ভাবিয়াছি, রাস্তার ধারের কোন "নিরীক্ষণ বাংলা"য় খামকা দুটো দিন কাটাইয়া রাস্তাটার সঙ্গে ভাব করিয়া লই; পিঠ-উঁচু যে পাহাড়গুলি সারাক্ষণ রাস্তার সঙ্গে দৌড়াইতে থাকে, তাহাদের অনেকক্ষণ ধরিয়া লক্ষ্য করি, তোপচাঁচীর ডাক-বাংলোটা দেখিয়া আজও একবার লোভ হইয়াছিল। কিন্তু দেরী করিবার আজ মোটেই উপায় ছিল না। হাজারীবাগে সন্ধ্যার আগেই পৌঁছানো দরকার; কনট্রাক্টের খসড়া তৈরী করিয়া সেখানে পার্টির লোক সহির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ইতিমধ্যেই সিডিউল হইতে কিছুটা পিছাইয়া পড়িয়াছি। দুর্গাপুর ফরেস্টের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড যেখানে তরঙ্গায়িত হইয়া একবার তেতলায় উঠিয়া পরের মুহূর্ত্তে আবার একতলায় নামিয়া আসিয়াছে, সেখানে নাগরদোলায়

চড়িয়া রীতিমত ক্লান্তিবোধ না করিলে স্বেচ্ছায় আসানসোল রেল-ষ্টেশনের দোতলায় রেস্তোরাঁতে দুপুরের খানা খাইতে নামিতাম না। এখন অনুতাপ হইতে লাগিল, কেন আর একটু তাড়াতাড়ি সে পর্ব্ব শেষ করি নাই; আর কয় মিনিট আগে আসিলে হয়ত এখানে এমন আটকা পড়িতে হইত না।

আবার টিপিটিপি বৃষ্টি সুরু হইয়াছে। সারাটা দিনই এমনই চলিয়াছে। গাড়ীর দিকে পা চালাইলাম। এইবার গাড়ীর পনেরো-কুড়ি হাত পিছনে, পথের পাশেই একটা মুদির দোকান নজরে পড়িল। অকূল সমুদ্রে ইহাকে লাইট-হাউসের মত মনে হইল। জায়গাটাকে যতটা নির্জ্জন মনে করিয়াছিলাম, তাহা হইলে ইহা ততটা নির্জ্জন নয়। গতিহীন গাড়ীর গরমে হজম হইবার চেয়ে ওখানে হাজির হইলে কেমন হয়? সিগারেটের রেশনের ঘাটতি পড়িয়াছিল; সেই অজুহাতে মুদিখানার দিকে আগাইয়া গেলাম।

মাটির দেয়ালের ছোট ঘর; ছাদটা খোলার। দোকানের এক দিকে মুদিখানার উপযুক্ত নানা সামগ্রী সাজাইয়া রেলের গুমটিওয়ালার মত নীল রঙের ফতুয়া গায়ে বুড়া এক মুদি বসিয়া হিসাব দেখিতেছিল। ঘরের অপর দিকে একটা অয়েল-ক্লথ মোড়া টেবিলকে বেষ্টন করিয়া গোটাকয়েক জীর্ণ চেয়ার চায়ের খদ্দেরের অপেক্ষা করিতেছে, কিন্তু কোনও ক্রেতা নাই।

'গোল্ড ফ্লেক সিগারেট হ্যায়?' বিহারের বাসিন্দার পক্ষে সহজবোধ্য করিবার জন্য 'আছে'র পরিবর্ত্তে 'হ্যায়' লাগাইয়া দিলাম।

লোকটি হিসাব হইতে চোখ একটু তুলিয়া একবার তাকাইয়া দেখিল, তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে কয়েক মুঠো সিগারেটের প্যাকেট ও টিন সামনে আনিয়া উপস্থিত করিল। গোল্ড ফ্লেক এবং তার চেয়ে বহু উৎকৃষ্ট সিগারেটের সংগ্রহ! এতটা আশা করি নাই; একটু বিস্মিত হইয়া একটা ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইটের টিন তুলিয়া লইলাম।

নিঃশব্দেই সিগারেটের মূল্য ও ফেরত-চেঞ্জের আদান-প্রদান হইল। বোধ হয় হিসাব লইয়া ব্যস্ত থাকাতেই মুদি আলাপ-আলোচনায় উৎসাহ দেখাইল না। কিন্তু ইতিমধ্যে বৃষ্টি জোর করিয়াছে; সম্পূর্ণ না ভিজিয়া গাড়ীতে ফিরিবার উপায় নাই। অগত্যা নিজের গরজেই কহিলাম, 'চায় মিল্ সকে?'

এইবার মুদি হিসাবের খাতা সরাইয়া রাখিয়া ভাল করিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইল। কহিল, 'হ্যাঁ, পাবেন।...বাবুমশায় বাঙালী তো? আমিও বাঙালী। নাম মুরারি দাস। চেয়ারে এসে বসুন। গরম জল চড়ানোই আছে; আমি নতুন চা দিয়ে চা তৈরি করে দিচ্ছি।' বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। এখন দেখিলাম, বৃদ্ধের একটা পা কাঠের।

যথা আজ্ঞা একটি নড়বড়ে চেয়ারে আসিয়া বসিলাম। কাঠের পা ঠক্‌ঠকাইয়া দোকানী মহাশয় বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে পিছনের পাকশালায় গেলেন। এখান হইতেই জলন্ত তোলা-উনান ও তাহার উপরকার টগবগায়মান কেৎলি নজরে পড়িতেছিল। এই কেৎলিসহ অবিলম্বেই তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইবার এই কেৎলিই পেয়ালার উপর উপুড় করিয়া পাইকিরি ভাবে তৈরি চা পরিবেশন করা হইবে, আশঙ্কা করিতেছিলাম, এমন সময় আমাকে বিস্মিত করিয়া বুড়ো এই দোকানের তুলনায় অত্যন্ত বেমানান আশ্চর্য্যরকম সম্ভ্রান্ত একটি টি-পট তাক হইতে পাড়িয়া তাহাতে দামী এক চায়ের প্যাকেট হইতে তিন চামচ চা ঢালিল। আমার দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়া কহিল, 'আপনাদের মত বড় বড় বাবুরা এই পথে গাড়ী হাঁকিয়ে যেতে যেতে গরিবের দোকানে পদধূলি দেন, তাই ভাল চা, ভাল সিগারেটের ব্যবস্থা রাখতে হয়...' বলিয়া গর্ব্বিত ভাবে সে 'পটে' কেৎলির জল ঢালিতে লাগিল।

'দাস মশায়ের দেশ কোথায়?'

'আজ্ঞে দেশ চব্বিশ পরগণার বারাসত মহকুমায়; গাঁয়ের নাম নহবৎপুর।' দাস মহাশয় আমার আত্মীয়তায় খুসি হইয়া কহিলেন। 'আমাদের বংশ ওখানকার বহুকালের বোষ্টম বংশ। আমার ঠাকুরদাদা নামকরা পদকর্ত্তা ছিলেন...'

'আপনি এখানে এলেন কি করে?' প্রশ্ন করিলাম।

'লেখাপড়া কিছু হ'ল না। ধর্ম্মকর্ম্মেও মতি নেই। ভাসতে ভাসতে চলে এলাম।...এই গুমটিঘরের আমি পয়েণ্টসম্যান ছিলাম সতেরো বছর। আরও বারো বছর স্বচ্ছন্দে কাজ চালাতে পারতাম। এমন সময় একদিন সান্টিং এঞ্জিনে পা-টা কাটা গেল। তদন্ত এল; রিপোর্ট দিলে। পয়েণ্টসম্যান চোখে কম দেখে বলেই দুর্ঘটনা ঘটেছে! কিছু খেসারত আর প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের টাকা গুণে নিয়ে অবসর দিয়ে দিলে। সেই টাকা থেকেই এই দোকান করে এখানেই বসে গেছি...' বলিয়া দাস মহাশয় তাক হইতে দামী চায়ের পেয়ালা নামাইয়া আনিলেন।

'এখানে আর কে আছে?' জিজ্ঞাসা করিলাম।

'পরিবার অনেক দিন গত হয়েছে। এখানে একাই থাকি।' বৃদ্ধ চায়ের 'পটে' চামচ নাড়িয়া কহিল। 'দেশে

ছেলেরা আছে ; ছেলের বৌয়েরা, নাতিনাতনীরা আছে। এক ছেলে কলকাতায় চাকরি করে—বার্ড কোম্পানীর আপিসের পিওন···অন্যেরা দেশে চাষবাস করে, খেয়ে-দেয়ে ভালই আছে···'

'এই বুড়ো বয়সে তাদের কাছে গিয়ে থাকলেই ভাল হ'ত না ?' আমি কহিলাম।

বৃদ্ধ ইহার কোনও জবাব না দিয়া চায়ের সরঞ্জাম আমার কাছে আনিয়া রাখিল। কহিল, 'ঐ ইলেভেন ডাউন আসছে। কিছু তাড়াতাড়ি করবেন না। পরের গাড়ি আসতে আরও ১০।১২ মিনিট। তার আগে ফটক খুলবে না···'

চায়ের 'পট'কে উপেক্ষা করিয়া প্রথমেই রেলপথের দিকে চাহিলাম। সুদূর পাহাড়শ্রেণীর পাদদেশ দিয়া অর্দ্ধবৃত্তাকার লৌহবর্ত্মে সম্পূর্ণ ট্রেনটা নজরে পড়িল। একটা প্রকাণ্ড হার কে যেন অদৃশ্যসূত্রে বাঁধিয়া দিগ্‌বধূর কণ্ঠে দোলাইয়া দিয়াছে। ট্রেন লোহার ঝঞ্ঝনা বাজাইয়া লেভেল ক্রসিং পার হইয়া ওধারের জঙ্গলে অদৃশ্য হইবার আগে আর চায়ের দিকে মন দিতে পারা গেল না।

চা-টা সত্যই ভাল হইয়াছিল। দুধ ও চিনি সংযোগের পর এক চুমুক খাইয়া দেখিলাম, এদিকে দাস মহাশয়ের নৈপুণ্য আছে।

'আপনাকে যে প্রশ্ন করছিলাম', আমি আবার গল্প চালাইয়া লইয়া কহিলাম, 'বুড়ো বয়সে নিজের দেশে গাঁয়ে গিয়ে নাতিনাতনী নিয়ে কাটালে ভাল হ'ত না ? এখানে একা একা থাকতে কষ্ট হবার কথা। বিদেশে পড়ে থাকবার খুব দরকার আছে কি ? ছেলেরা আগ্রহ করে না ? না বৌয়েরা···'

'না না, বৌয়েরা তেমন নয়। আগ্রহ করে বৈকি, সবাই আগ্রহ করে। ছেলেরা মাঝে মাঝে টাকা পাঠায়, নিজেরাও এসে দু'চারদিন থেকে যায়। আমিই যেতে চাই নে। বেশ আছি। স্বাবলম্বী হয়ে আছি।···আপনি ঠিকই বলেছেন, বাবুমশায় ; নাতিনাতনীর মধ্যে গিয়ে থাকতে ইচ্ছে না হয়, এমন নয়। কিন্তু এই পা-টা। এই পা-টা যদি আস্ত থাকত, তা হলে হয়ত তাদের কাছে গিয়েই থাকতাম···'

'কাটা পায়ের জন্য ওরা আপনাকে তাচ্ছিল্য করবে এমন মনে করছেন কেন ?' আমি তাহার অদেখা আত্মীয়-স্বজনের হইয়া কহিলাম।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ নীরব রহিল। দেখিলাম, কেমন যেন উদাস দৃষ্টিতে দিগন্তের শৈলশ্রেণীর দিকে তাকাইয়া আছে। এই উদার প্রকৃতি, এই পর্ব্বতরেখা, ধরিত্রীর এই সুন্দর বিভঙ্গ বৈষ্ণব-সন্তানকে মুগ্ধ করে নাই তো ? সতেরো বছর এই সুন্দর দৃশ্যের মধ্যে বাস করিয়া গাছপালা, ডোবা-পুকুর ভর্ত্তি অপরিষ্কার গ্রামে ভাল না লাগিলে দোষ দিবার উপায় কি।

'কি জানেন, বাবুমশায়', বৃদ্ধ যেন সহসা তন্দ্রা দূর করিয়া কহিল, 'দুটো পা-ই ঠিক থাকলে গাঁয়ে ফিরতে ভয় ছিল না। মনে টান পড়লে ইচ্ছেমত পথে বেরিয়ে পড়তে পারতাম। যেখানে খুশী চলে যেতাম। এই গুমটিঘরের কাছেই আবার চলে আসতাম।···জায়গাটার ওপর বড় মায়া পড়ে গেছে বাবু। দু'বেলা হুস্ হুস্ করে কত ট্রেন পাহাড়ের গায়ে বাঁক নিয়ে এসেছে, চলে গেছে। আপনার মত কত বাবু দু'বেলা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মোটর হাঁকিয়ে এই রাস্তা দিয়ে ভেঁপু বাজাতে বাজাতে চলে গেছে। নিত্য সর্ব্বক্ষণ যেন ছুটোছুটির পালা চলেছে। না রেলগাড়ী, না মোটর গাড়ী, কারুর গন্তব্য জায়গাই আমার নজরে পড়ে নি, কিন্তু সারাক্ষণ তাদের ছুটে-চলা দেখছি সতেরো বছর ধরে। এই ছুটো-ছুটিটা আমার মনের মধ্যে বসে গেছে। আমার কাটা পায়ের পঙ্গুতা পর্য্যন্ত আর টের পাই না। গাড়ীগুলির সঙ্গে মনও ছুটতে থাকে !···কিন্তু থাক ওসব কথা।···ঐ আপনার ও গাড়ীটাও বোধ হয় এসে পড়ল। নিজের কথা বলে আর আপনাকে দেরি করাব না। যারা ছুটে যায়, তাদের আমার বড় ভাল লাগে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও ছুটে চলি কিনা···'

খোলা রাস্তা দিয়া আবার অবাধে গাড়ী ছুটাইতে ছুটাইতে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডটা যেন অকস্মাৎ আরও অধিক আকর্ষণীয় মনে হইল। গতির প্রতীক এই রাস্তা ! ভারত উপ-মহাদেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত এই রাজপথের উপর দিয়া যান ছুটিয়া চলে, জন ছুটিয়া চলে ; সৈন্য ও সাম্রাজ্য ছুটিয়া যায়, ইতিহাস ছুটিয়া চলে। আর ইহাদের সঙ্গে ছুটিয়া চলে বুড়ো মুদি মুরারি দাসের মন !

"সাগর দোলায় দোলে না এ তরী"

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীনরেন্দ্র দেব

অবনীবাবুর মুখে শিকারের গল্প শুনতে এত ভাল লাগত যে অসম্ভবকেও সম্ভব বলে মনে হ'ত। যদিও অবিশ্বাস্য সব শিকারের গল্প শুনে আমরা তাঁর নাম রেখেছিলাম "গুলঝাড়িলাল"! কিন্তু তাঁকে পেলেই আমরা গল্প বলবার জন্য ধরতাম। তিনি নিজে উকীল হলেও শ্রোতাদের কাছ থেকে কোনও প্রতিবাদ বা জেরা বরদাস্ত করতেন না। জমিয়ে রেখেছিলেন জাহাজের আড্ডা অনেকটা তিনি একাই। তারপরেই নাম করতে হয় ডিব্রুগড়ের নির্বিরোধী শ্রীযুক্ত লোকেন গুপ্ত মহাশয়। ইনি কেবল খেতে ও শুতে ফার্ষ্ট ক্লাসে যেতেন। নইলে চব্বিশ ঘণ্টাই প্রায় আমাদের সঙ্গে কাটাতেন। দত্ত মশাই এঁকে নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টাই ক্ষ্যাপাবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু পারতেন না। ডাঃ লাহিড়ী মাঝে মাঝে দেখা দিতেন। খুব সম্ভব লোকেনবাবুই তাঁকে ধরে নিয়ে আসতেন। মিঃ সেনও খুব সদালাপী ও হিসাবে শুভঙ্কর পুরুষ। কিন্তু আমাকে তিনি বড়ই বিপদে ফেলেছিলেন। তিনি নিজেই

টুরিষ্টদের খাবারঘর
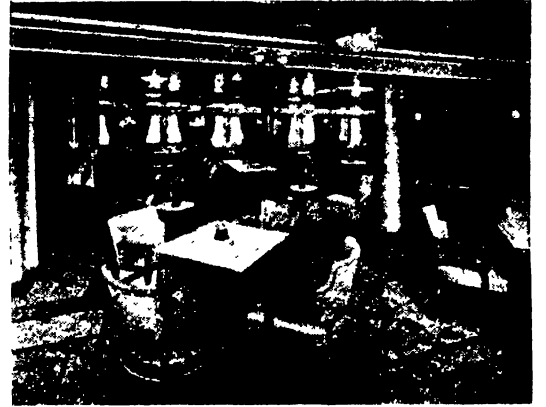
টুরিষ্টদের ধূমপানের ঘর ('বি'-ডেক)

গবর্ণমেণ্ট কণ্ট্রাক্টর শ্রীযুক্ত মণি চক্রবর্তী। ইনিও ক্যামেরা-প্রিয়। ক্যামেরা বগলে না করে ডেকে আসতেন না। আমাদের অসংখ্য ছবি তুলেছেন তিনি। জার্মানী থেকে সস্তায় অনেক মূল্যবান জিনিস কিনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। দত্তবাবুও অবশ্য তাঁর চেয়ে কিছু কম নিয়ে যাচ্ছিলেন না। দু'জনেই বেশ সৌখীন লোক। পরের জন্য কিঞ্চিৎ ব্যয়কুণ্ঠ হলেও নিজের জন্য খরচে দত্তবাবু কিছুমাত্র কৃপণতা করতেন না। চক্রবর্তী মশাই ঠিক বিপরীত। দিল দরিয়া মানুষ। ডিব্রুগড়ে সকলকেই যাবার নিমন্ত্রণ করে রেখেছেন। বড় পুত্রবৎসল পিতা। জাহাজে ছেলেদের কথা কেবলই বলতেন। কত জিনিস ছেলেদের জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন। তার পর বহরমপুরের টেক্সটাইল অভিজ্ঞ নম্র বিনয়ী ও সদালাপী শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস এম-এসসি এবং নর্থ ব্রিটিশ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর শ্রীযুক্ত বি. বি. ও এস. কে. মুখার্জি। এ চৌকস ছেলে দুটি শিবের চেলা নন্দী-ভৃঙ্গীর মত দত্ত মহাশয়ের একান্ত বশম্বদ হয়ে পড়েছিলেন। এ ছাড়া পূর্বেই বলেছি ফার্ষ্ট ক্লাশ থেকে আসতেন শিবতুল্য নির্বিকার নিজের যা-কিছু কাজ করতেন এবং তাঁর স্ত্রীর যা-কিছু করণীয় সমস্তই করে দিতেন, এমন কি কেশ-প্রসাধন পর্যন্ত! কিন্তু আমি স্ত্রীর কর্তব্য তো দূরে থাক্ নিজের কাজও কিছু করতে পারতাম না। সম্পূর্ণ পত্নী-নির্ভর ছিলাম। কিন্তু অসামান্য কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত সেনের দৃষ্টান্ত আমাকে যত দূর সম্ভব একটি সাংসারিক অপদার্থ জীব বলে প্রমাণিত করেছিল। তিনিও বেশ আসর জমিয়ে রাখতে পারতেন। ক্যামেরাতেও যে তাঁর হাত বেশ ভাল, তার প্রমাণ এই প্রবন্ধের মধ্যেই পাবেন। আর একটি ছেলে শ্রীমান মতিলাল কর আমাদের সঙ্গে থেকে নানাভাবে আমাদের সাহায্য করতেন। আমাদের এই আড্ডায় রাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, বিশ্বসমস্যা, দর্শন, অধ্যাত্মতত্ত্ব, তার সঙ্গে আইন-আদালত, ইন্সিওরেন্স, সিনেমা, খেলাধূলা এবং 'স্ক্যাণ্ডাল'—সব রকম আলোচনাই হ'ত। ব্যাঙ্কের হিসাব ও ব্যালান্স-শীটের কথাও বাদ যেত না। আমরাও ঐ খাওয়া আর শুতে যাওয়া ছাড়া ডেক আর লাউঞ্জ বড় কেউ ছাড়তাম না। ঐ একখানা জাহাজ

আসছে—'বাইনোক্যুলার' নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত এবং চাঁদ ওঠা জাহাজ থেকে দেখতে ভারি ভাল লাগত।

টুরিষ্ট ক্লাসের ছেলেমেয়েদের খেলাঘর (সি-ডেক)

'ঐ ষ্ট্রম্বলী', 'ঐ জিব্রাল্টার দেখা যাচ্ছে', 'ইটালীর কিনারায় এসে পড়েছি', 'পোর্ট সৈয়দ', 'সুয়েজ খাল', 'এডেন বন্দর'—এসব জাহাজ যাত্রীদের এক একটা উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত্ত বা মনের মধ্যে নাড়া দিয়ে স্মৃতির পাতায় অক্ষয় আনন্দের স্মরণিকা লিখে রাখে।

ঠিক ফার্ষ্ট ক্লাসের মতই টুরিষ্টদের ক্লাসেও লাইব্রেরী ও লেখা-পড়ার ঘর, 'লাউঞ্জ' বা বৈঠকখানা, 'বার' বা পানশালা এবং ধূমপানাগার আছে। এর পরেই আমাদেরও সাঁতার খেলা ও স্নানের 'হৌজ' আছে। 'বুল রিংবোর্ড' ও 'ডেক কয়েট' খেলারও ছক আছে। পিং-পঙ বা টেবিল টেনিস ও ডেক টেনিসেরও ব্যবস্থা রয়েছে। আসবাবপত্রগুলিও বেশ ভাল। বড়লোকের বাড়ীর মত! 'টুরিষ্ট' বলে দুঃখ রাখে নি কিছু। যা ও পাড়াতে আছে তা এ পাড়াতেও আছে।

এইবার "B" ডেকের কথা বলি। "B" ডেকের মাঝামাঝি আছে জাহাজের সকল যাত্রীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় একটি বিভাগ। একে বলে Bureau। এখানে টাকা ভাঙান, ডাক-টিকিট কিনুন, টেলিগ্রাম করুন, চিঠি দিন, হারান প্রাপ্তির সংবাদ দিন। এই 'ব্যুরো'র কর্ত্তা হলেন জাহাজের 'Purser' বা ভাণ্ডারী। ইনি যাত্রীদের মালপত্র খাদ্যসামগ্রী এবং টাকাকড়ির হিসাব রাখেন। 'চুস্নানে'র পার্সার মিঃ আর. জি. নিউবারি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্রলোক। একদিন রাত্রে জাহাজের নাচের মজলিশে আমার হাতের আংটি থেকে হীরেখানি খুলে পড়ে যায়। পার্সার সেখানি খুঁজে বার করবার জন্ম সমস্ত জাহাজখানি তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করিয়েছিলেন। পার্সারের কাছেই আমি 'চুস্নানে'র বিশদ বিবরণ সব পেয়েছি। বন্ধুবর শ্রীলোকেন গুপ্ত মহাশয় আমাকে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। লোকেনবাবু তাঁর নিজের সম্পত্তি 'চুস্নানে'র নক্সাখানি পর্য্যন্ত আমাকে দিয়েছিলেন যাতে এই জাহাজের বিবরণ লেখা আমার পক্ষে সহজ হয়েছে। আমি এজন্ত তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।
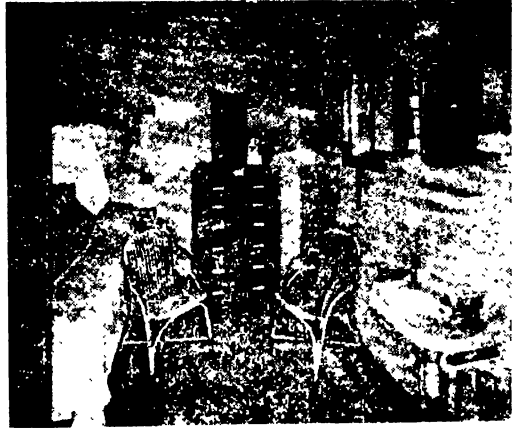
আমাদের দু'বার্থ ক্যুপে কেবিন ('ই'-ডেক)

এই ব্যুরোর সামনের দিকে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের থাকবার 'বি' ডেকের অনেকগুলি কেবিন আছে। সতরখানি বিরহীদের অর্থাৎ একজনের থাকবার, ৫৭খানি দু'জনের থাকবার এবং ৮খানি একেবারে 'De-Luxe Cabin'! এই 'ডি-লুক্স' কেবিনের মধ্যে দুটি ঘরের সামনে আবার বারান্দা আছে। এই বারান্দাওয়ালা ঘর নিতে হলে টাকার থলিতেও বারান্দা বার করা চাই, কারণ ডি-লুক্স কেবিনের মধ্যেও এই বারান্দাওয়ালা ঘর দুটিতে আবার একটু বিশেষ ধরণের স্বতন্ত্র বিলাস-আরামের ব্যবস্থা আছে।

'বি' ডেকে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের পোশাক ইস্ত্রি করবার এজমালি 'ইস্ত্রিঘর' আছে। এ ছাড়া কেবিন-সংলগ্ন যাত্রীদের নিজস্ব বাথরুমেও ইস্ত্রির সরঞ্জাম আছে। ব্যুরোর পিছনদিকে 'বি' ডেকের টুরিষ্টদের ঘর। ২৫খানি যুগলে থাকার ঘর আর ১৩খানি চার জনে থাকার ঘর। 'ব্যুরো' থেকে দুধারেই দুটি করে প্যারালাল লাইন গলিপথ বরাবর চলে গেছে সামনের দিকে, প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের পাড়ায় যাওয়ার জন্ম, এবং পিছন দিকে 'টুরিষ্ট' শ্রেণীর যাত্রীদের পাড়ায় যাওয়ার জন্ম। ঘরগুলি সব এই গলি পথেরই দু'ধারে। ঠিক যেমন শহরের রাস্তার দু'ধারে বাড়ী, এও সেই রকমেরই, শুধু আকারে ছোট এবং মাথা ঢাকা। কারণ 'বি' ডেকের মাথার উপর 'এ' ডেক। আবার 'এ' ডেকের মাথার উপর বোট-ডেক। এইভাবে চলেছে আটতলা পর্য্যন্ত আগাগোড়া, কাজেই রোদে-জলে জাহাজের গলিপথে চলতে ছাতি মাথায় দেবার প্রয়োজন নেই। অন্ধকারকে দিবারাত্র প্রজ্বলিত বৈদ্যুতিক আলোক কাছে ঘেঁসতে দেয় না। সমস্ত জাহাজখানি 'শীত-তাপ-নিয়ন্ত্রণ' (air-conditioned) করা বলে পাখার কারবার নেই। প্রত্যেক ঘরের পৃথক নম্বর লেখা আছে দরজায়। কাজেই একমাত্র অতিরিক্ত নেশায় খেয়াল ছাড়া ভুলে অন্ত কারুর ঘরে ঢুকে পড়বার সম্ভাবনা কম।

এইবার 'সি' ডেকে আসা যাক। এখানেও সেই যথাপূর্ব্বম। সামনের দিকে ৮৯টি প্রথম শ্রেণীর এবং পিছন দিকে ৫০টি টুরিষ্ট কেবিন। এখানেও কাপড় কেচে শুকিয়ে ইস্ত্রি করে নেবার ঘর আছে। অবশ্য কেবল প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য। এই 'সি' ডেকের পিছন দিকে টুরিষ্টদের থাকার ঘরের শেষে টুরিষ্টদের বাচ্চাদের জন্যও চমৎকার 'খেলাঘর' আছে। এ ঘরের দেওয়ালে আঁকা পশুপক্ষীর বড় বড় রঙীন চিত্র সাহায্যে ছেলেমেয়েদের বর্ণপরিচয় শেখাবার ব্যবস্থা আছে। খেলনা ও খেলাধূলার তো কথাই নেই!

এইবার 'ডি' ডেকে নামা যাক। এখানেও সামনের দিকে ২০টি প্রথম শ্রেণীর কামরা এবং পিছন দিকে ৪৩টি টুরিষ্টদের কামরা। এই 'ডি' ডেকের সামনে প্রথম শ্রেণী ও পিছনে টুরিষ্টদের জন্য পৃথক দুটি প্রশস্ত খাবার ঘর আছে। প্রথম শ্রেণীর খাবার ঘরে এবং টুরিষ্টদের খাবার ঘরে একসঙ্গে ২১৪ জন যাত্রী
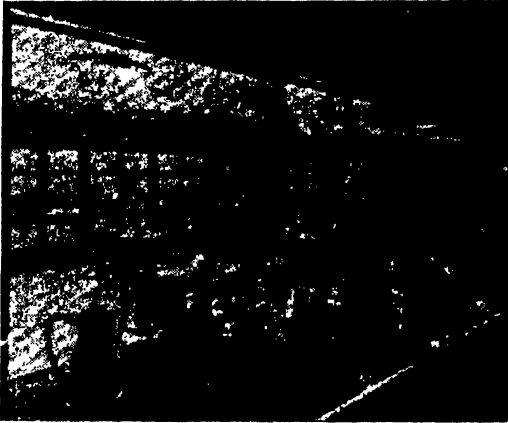
প্রথম শ্রেণীর 'অলিন্দ-পানশালা' (Verandah Cafe)

বসে ভোজন করতে পারেন। তাই প্রত্যেক বার দু'ব্যাচে ভাগ করে এক ঘণ্টা পর পর যাত্রীদের খাওয়ানো হয়। খাওয়ার মেনু চমৎকার। খাদ্যও অতি উৎকৃষ্ট। যেন নিত্যই ভোজের নিমন্ত্রণ খাওয়া। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের আলাদা খাবার ঘর আছে এবং দু'বেলাই তাদের খুব সকাল সকাল খাইয়ে দেওয়া হয়। যাত্রীরা কেউ যদি সকলের সঙ্গে না বসে আলাদা নিরিবিলিতে বসে খেতে চান তারও বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়। যাত্রীদের সুখ-সুবিধার দিকে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি থাকে।

জাহাজের রন্ধনাগারের বিরাট ব্যবস্থা দেখলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে যেতে হয়। বৈদ্যুতিক তাপে অতি অল্প সময়ের মধ্যে রান্না শেষ করবার জন্য জাহাজে যে 'ইলেক্‌ট্রিক কুকিং রেঞ্জ' আছে সেটি দৈর্ঘ্যে বাইশ ফুট। এর মধ্যে ১৬টি চুল্লী জ্বলে। প্রত্যেকটিতে একসঙ্গে তিনটি জিনিস রান্না হতে পারে। এই চুল্লীর আঁচ ইচ্ছামত কমানো বাড়ানো যায়। রান্না-করা খাবার গরম রাখার জন্য কয়েকটি 'hot-press' আছে। একটি সাড়ে পঁয়ত্রিশ ফুট লম্বা, একটি ত্রিশ ফুট লম্বা এবং দুটি চৌদ্দ ফুট লম্বা। বাষ্পের

প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের ছেলেমেয়েদের 'খেলাঘর'

তাপে রাঁধবারও ছয়টি চুল্লী আছে। তিনটি ভাজা ভাজবার আধার সহ বৈদ্যুতিক উনুন, এর সঙ্গে ভাজা গরম রাখবার ব্যবস্থাও সংযুক্ত আছে। ছয়টি আছে কেবল মাছ ভাজবার বৈদ্যুতিক খোলা। এ ছাড়া শূকর-মাংস রাঁধার পৃথক ব্যবস্থা, কেক তৈরির তপ্ত চাটু, চা ও কফী তৈরির বিরাট বৈদ্যুতিক পাত্র, আমিষ বা নিরামিষ 'স্যুপ' তৈরি করবার জন্য ইক্‌মিক্ কুকারের ন্যায় বাষ্পাচ্ছাদিত বারোটি বিরাট পাত্র আছে, তার মধ্যে চারিটিতে ৬৫ গ্যালন এবং আটটিতে ১৫ গ্যালন করে স্যুপ এক এক বারে তৈরি হতে পারে। গুঁড়ো দুধ ও শুকনো ডিমকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা আছে। একেবারে হাজার হিসাবে ডিমসিদ্ধ ও টোষ্ট তৈরির

প্রথম শ্রেণীর যাত্রী-যুগলের ঘর

আয়োজন করা যেতে পারে এখানে। জাহাজের 'বেকারি'তে প্রতিবারে ৪৮০ পাউণ্ড পাঁউরুটি তৈরি হয়। এখানকার আইস-

ক্রীম জমাবার যন্ত্রটিও দেখবার মত। প্রতিদিন দেড় হাজার যাত্রীকে এঁরা যত বার ইচ্ছা এবং যত ইচ্ছা আইসক্রীম খাওয়াতে পারেন। জাহাজের আইসক্রীম এক বার যাঁরা খেয়েছেন তাঁরা আর ভুলবেন না। এমন সুস্বাদু সুগন্ধি মালাই বরফ কোনও প্রথম শ্রেণীর হোটেলেও পাওয়া যায় না।

প্রথম শ্রেণীর লাইব্রেরী ও লেখাপড়ার ঘরের একাংশ

প্রত্যহ চার বেলা দেড় হাজার লোক দুই পর্য্যায়ে আট দফায় এসে খেয়ে যাচ্ছেন, এতটুকু গোলমাল, বিশৃঙ্খলা বা পরিবেশনে শৈথিল্য নেই! ঘড়ির কাঁটার মত নিঃশব্দে কাজ চলছে। আলু কপি, কড়াইশুঁটি, বীট, গাজর, পেঁয়াজ, শালগম, বিলিতি কুমড়ো, স্যালাড, ডিম, মাছ, মাংস, ডাল, ভাত, রুটি, তরকারি, চাটনি, দই, ক্ষীর, পায়েস, পুডিং, আইসক্রীম, পাঁউরুটি, বিস্কুট, ফলমূল ইত্যাদি দেড় হাজার লোকের রকমারি খানা প্রস্তুত হচ্ছে প্রত্যহই ঠিক ঘড়ি ধরে। এক মিনিট কোনও দিন এদিক-ওদিক হয় না। ভোর ছয়টার মধ্যে কেবিন ষ্টুয়ার্ড ঘরে ঘরে 'knock' করে দিয়ে যায় 'এক কাপ গরম চা' (bed-tea) ও তার সঙ্গে লেবু কিংবা আপেল একটি। বেলা আটটা-নয়টার মধ্যে প্রাতরাশ —চা, রুটি, মাখন, ডিম, মাংস, টোষ্ট, বিস্কুট, জ্যাম, জেলী ইত্যাদি। দুপুরে বারোটা একটার মধ্যে ভুরিভোজ (lunch)। বিকেলে দুইটা হইতে চারটের মধ্যে বৈকালী ভোগ—চা, রুটি, মাখন, কেক, বিস্কুট, স্যাণ্ডউইচ, প্যাণ্ট্রী ইত্যাদি। রাত্রে আটটা-নয়টার মধ্যে 'নৈশভোজ' (dinner)। খাদ্য-তালিকা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক এক দিন এক এক রকম করা হয়। যাতে একঘেয়ে না লাগে। দিনের পর দিন সমুদ্রের বুকে ভাসতে ভাসতে নিত্য এই রাজসূয় যজ্ঞ চলেছে। অবাক হই আমরা ভেবে এদের সংগঠনশক্তি, কর্ম্মপটুত্ব এবং পরিচালন-দক্ষতা দেখে।

জাহাজে নিরামিষভোজীদের জন্য আহারের পৃথক ব্যবস্থা আছে। আচারনিষ্ঠরা স্বপাক রন্ধনও করতে পারেন। জাহাজের ঠাণ্ডা গুদামটিও (cold storage) দেখবার মত। এখানে পৃথক পৃথক হিমকক্ষে মাছ, মাংস, মাখন, শাকসব্জী, ফলমূল এবং মিঠাপানি থেকে ভাল ভাল উৎকৃষ্ট সুরা ও পানীয় জল রক্ষিত আছে। পুরাকালে প্রয়োজনমত পানীয় জল একটি সুবৃহৎ পাত্রে বহন করে নিয়ে যেতে হ'ত। অধুনা বিজ্ঞানের সাহায্যে সমুদ্রের জলই পাম্প করে তুলে নিয়ে জাহাজ চলতে চলতে পরিশ্রুতকারী যন্ত্রের দ্বারা নির্ম্মল লবণহীন ও সুস্বাদু করে নেওয়া হয়। কাজেই

চুল্লানের ভাঁড়ারঘর

সেকালের মত এখন আর জাহাজে যাত্রীদের পানীয় জলের অভাব ঘটে না। এই 'ডি' ডেকেরই এক কোণে সুবৃহৎ ধোবীখানা (Laundry) আছে—আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতি সজ্জিত।

এইবার আমাদের পাড়ায় আসা যাক, অর্থাৎ 'ই' ডেকে। 'ই' ডেকে আমরা পাশাপাশি দুটি কেবিন পেয়েছিলাম। এ কেবিন-গুলিকে বলে 'কাপ্‌ল' কেবিন। অর্থাৎ কেবলমাত্র দুটি বার্থ আছে। একটিতে আমার স্ত্রী ও কন্যা আশ্রয় নিয়েছিলেন। আর পাশেরটিতে আমি একলাই ছিলাম। কিন্তু জাহাজ ছাড়বার মাত্র অল্পক্ষণ আগেই একটি গুজরাটি যুবক শ্রীমান চিমণলালপ্রসাদ শা দ্বিতীয় বার্থটি দখল করলেন। ইনি খুব উৎসাহী যুবক। আমেরিকা থেকে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে সবকিছু শিক্ষা সমাপ্ত করে দেশে ফিরছেন। বোম্বাইয়ে বিঠলভাই প্যাটেল রোডে থাকেন। দেশে ফিরে ইনি বোম্বাইয়ে একটি সিনেমা সংক্রান্ত টেকনিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করবার পরিকল্পনা একেবারে কাগজ-কলমে ছকে এনে-ছিলেন। আমার পরিচয় পেয়ে খুশী হয়ে তিনি দিনের পর দিন এই প্রতিষ্ঠানটির সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলোচনা করে বহু বিষয় লিপিবদ্ধ করে নিয়েছিলেন। এঁর আন্তরিকতা প্রশংসনীয়। এক দিন প্রমথেশ বড়ুয়ার ভগ্নী শ্রীমতী নীলিমা বড়ুয়া, বোম্বাইয়ের পার্শী মহিলা শ্রীমতী নানাভাটি এবং শ্রীযুক্ত পাঠক প্রভৃতি বোম্বাইয়ের আরও কয়েক জন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে নিয়ে আমাদের কাছে এলেন জাহাজে 'দেওয়ালী' উৎসব করবার প্রস্তাব নিয়ে। জাহাজ কর্ত্তৃপক্ষ নাকি এঁদের এই উৎসবে সর্ব্বপ্রকারে সহযোগিতা করবেন। আমরাও ব্যাপারটাতে বেশ উৎসাহিত হয়ে

উঠলাম। নৃত্যগীত, আবৃত্তি, বক্তৃতা, কবিতা পাঠ ও নাট্যাভিনয় হবে ঠিক হ'ল। সব কিন্তু ইংরেজীতে করতে হবে। কারণ জাহাজের ছত্রিশ জাতের ঐটিই ছিল সাধারণ ভাষা (Lingua franca)! আমাকে দেওয়ালির উপর ইংরেজীতে একটি কবিতা লিখতে হ'ল এবং "Affairs in Law" বলে একটি হাস্যরসাত্মক দৃশ্যনাট্য রচনা করে দিতে হ'ল, রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান "মন মোর মেঘের সঙ্গী" এর ইংরেজী অনুবাদ করে দিতে হ'ল। শ্রীমতী নীলিমা বড়ুয়া এই গানখানি গাইলেন এবং কুমারী নবনীতা তার সঙ্গে নৃত্য করলেন। এ ছাড়া গুজরাটি ও পার্শী মহিলারা গর্ব্বানৃত্য দেখালেন। শ্রীযুক্ত পাঠক দেওয়ালী সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন ও যাদুবিদ্যা দেখালেন। মোটের উপর দেওয়ালী উৎসব খুব প্রশংসা ও সাফল্য অর্জ্জন করলে। ফার্ষ্ট ক্লাসের যাত্রীরা এবার টুরিষ্টদের কাছে হার মানলেন।

চুজানের বিরাট রান্নাঘর
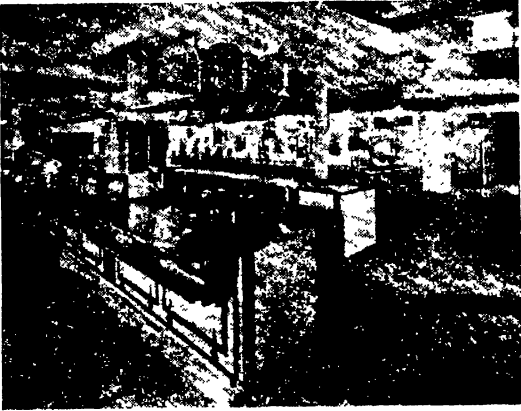
'ডি' ডেকে ৮৩টি টুরিষ্ট কেবিন আছে। টুরিষ্টদেরও কাপড়-কাচা ও ইস্ত্রি করে নেওয়ার একাধিক পৃথক ঘর আছে। প্রত্যেক ডেকে একাধিক বাথরুম, শাওয়ার ও ল্যাভেটরি আছে। বাথটবে গরম ও ঠাণ্ডা জল প্রচুর পাওয়া যায়। জাহাজে যে কোনও রোগের চিকিৎসার ও অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা আছে। প্রসূতি-আগার আছে। হাসপাতাল আছে। এগুলি সব 'সি' ডেকের সামনের দিকে। বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি ছোঁয়াচে রোগীদের রাখবার জন্য 'বি' ডেকের পিছনে স্বতন্ত্র আরোগ্যশালা এবং প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য অভিজাত হাসপাতাল আছে। ডাক্তারের চেম্বার ও ডিসপেন্সারী 'সি' ডেকের মাঝামাঝি। চিকিৎসা কিন্তু ফ্রী নয়। ডাক্তারকে একটা consultation fee দিতে হয়। আবার কেবিনে এসে দেখে যাবার জন্য ডেকে পাঠালে আলাদা 'ভিজিট' দিতে হয়। আন্দাজ ৫ শিলিং হবে। চুল ছাঁটাইয়ের জন্য নেয় ২ শিলিং। মেয়েদের কেশ-প্রসাধনের ব্যয় স্বতন্ত্র।

জাহাজের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা থাকেন যেমন সর্ব্বোচ্চ তলায়, জাহাজের নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীরা অর্থাৎ খালাসীবৃন্দ থাকেন তেমনি সর্ব্বনিম্ন তলায়। সর্ব্বোচ্চ তলায় ব্রীজ-ডেকে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের

শুশ্রূষাকারিণীর 'ফ্যান্সী ড্রেসে' কুমারী নবনীতা দেব

জন্য সর্ব্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত আছে। তাঁদেরও পানশালা, প্রমোদাগার, তাম্রকূট সেবনাগার ইত্যাদি আছে। কিন্তু তাঁদের খেতে আসতে হয় আমাদের পাড়ায় অর্থাৎ এই 'E' ডেকে। এখানে তাঁদের ভোজনের পৃথক ব্যবস্থা আছে। কেবল ক্যাপ্তেন সাহেব এবং তাঁর লেফ্‌টেনাণ্টরা কেউ কেউ প্রথম শ্রেণীর ভোজনাগারে বা কখনো কখনো টুরিষ্ট শ্রেণীর ভোজনাগারেও খেতে এসে যাত্রীদের ধন্য করেন।

'চুজান' কেবল যে যাত্রী বহন করে তাই নয়। প্রচুর মালও বহন করে। আগুনে পুড়বে না এমনতর গুদামে মাল নেবার
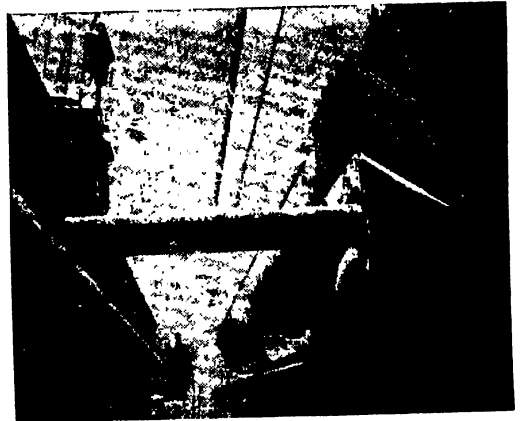
চুজানের 'দোলন-ত্রাণ' পাখনা (এই রকম ষ্ট্যাবিলাইজার দু'দিকেই আছে)

স্থান আছে এতে ২২,৫০৫ কিউবিক ফুট। আরও ৪৮,৫৬০ কিউবিক ফুট অগ্নি-নিরোধক গুদামে মাল নেবার স্থান করা হয়েছে। সাধারণ মালপত্র যেগুলির অগ্নিদহন থেকে নিরাপত্তার প্রয়োজন

বোধ করেন না প্রেরকেরা, সেরূপ মাল নেবার মত স্থান ৪,০৯,৬৯০ কিউবিক ফুট আছে। এই হিসাব থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, এ জাহাজের খোলটি কি বৃহৎ! জাহাজের এই খোল থেকে কপিকলের সাহায্যে মাল তুলে বন্দরে বন্দরে ক্রেণে করে নামিয়ে দেবার জন্ম জাহাজের 'A' ডেকে পর পর

চুজানের অগ্নি-বারণ মালখানা

চারটি Hatch বা 'মালকূপ' আছে। এগুলি সর্বদাই সযত্নে ঢাকা থাকে। বন্দরে পৌঁছলে মাল তোলা-নামানোর জন্ম এগুলি উপযুক্ত প্রহরী বেষ্টনে যাত্রীদের সতর্ক করে খোলা হয়। কেননা দৈবাৎ কেউ অসাবধানতা বশতঃ এর মধ্যে এসে পড়লে একেবারে আটতলা জাহাজের সর্ব্বনিম্ন খোলের গর্ভে চিরসমাধি লাভ করবে। এ ছাড়া যাত্রীদের সঙ্গের বড় বড় ট্রাঙ্ক বাক্স স্যুটকেস সিন্দুক যেগুলো কেবিনে যাওয়া সম্ভব নয় সেগুলো রাখবার 'ব্যাগেজ রুম' আছে। নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যহ এ ঘর খোলা হয় এবং যাত্রীরা সেই সময় গিয়ে তাঁদের সিন্দুক বাক্স খুলে প্রয়োজনীয় জিনিস বার করে আনতে পারেন এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিস রেখেও আসতে পারেন। যে মাল একেবারে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে তবে নেওয়া হবে, সেগুলি জাহাজের 'হোল্ডে' রাখা হয়। এই হোল্ডে রাখা মাল পথে প্রয়োজন হলে বার করে নেওয়া যায় না।

এইবার 'চুজানে'র প্রধান ও অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের কথা বলে এই জাহাজী প্রবন্ধ শেষ করব। আমরা চুজানের যাত্রী হয়েছিলাম এর দ্বিতীয় বার প্রাচ্য দেশাভিমুখে অভিযানের সময়। সেই সবেমাত্র এ জাহাজ তার 'কুমারী যাত্রা' শেষ করে ফিরেছে। ক্যাপ্তেন একদিন আমাদের ডাকলেন। জাহাজের মাঝবরাবর 'বি' ডেকে যে বক্তৃতা দান, প্রার্থনা-সভা, অভিনয়-আসর ইত্যাদি অনুষ্ঠানের জন্ম জলসাঘর আছে সেখানে যাত্রীদের এক সভা ডেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে বক্তৃতা দিয়ে বোর্ডে খড়ি দিয়ে এঁকে বোঝালেন যে এই 'চুজান' তৈরি হবার সময় এ জাহাজে পোত-বিজ্ঞানের নবতর আবিষ্কার সমুদ্র-তরঙ্গে জাহাজের দোলন স্তম্ভনকারী এক অত্যাশ্চর্য যন্ত্র

"আমাদের আসর।" বসে আছেন: (বাঁ-দিক থেকে) শ্রীমতী বুলু সেন, শ্রীমতী রাধারাণী দেবী, শ্রীযুক্ত লোকেন গুপ্ত ও অবনী দত্ত। পিছনে দাঁড়িয়ে (বাঁ-দিক থেকে) ডাঃ শ্রীরামচন্দ্র রাও, নরেন্দ্র দেব, বি. বি. মুখার্জি, মণি চক্রবর্তী, মতিলাল কর ও এস. কে. মুখার্জি

'ষ্টাবিলাইজার' (Stabilizer) লাগানো হয়েছে। আপাততঃ প্রাচ্যসমুদ্রগামী আর কোনও যাত্রী জাহাজেই এ 'Denny Brown' যন্ত্র নেই, সুতরাং সেগুলি পূর্ব্ববৎ উত্তাল সাগর-তরঙ্গে মোচার খোলার মত দুলবে, কিন্তু 'ষ্টাবিলাইজার' আছে বলে চুজান স্থির হয়ে ভাসে। 'সাগর দোলায় দোলে না এ তরী'!

'ষ্টাবিলাইজার' আর কিছু নয়, জাহাজের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও আকার অনুযায়ী মাছের পাখনার মত জাহাজের দু'ধার থেকে দুটি ডানা বার করে দেওয়া হয়। প্রয়োজন বোধ করলে সর্ব্বোচ্চ তলের কণ্ট্রোল রুম থেকে একটি সুইচ টিপে দিলেই জাহাজের তলার দু'পাশ থেকে দুটি পাখনা বেরিয়ে পড়ে এবং অবিলম্বে জাহাজের দুলুনি থেমে যায়। কারণ এই পাখনা দুটো দুর্দ্দান্ত ঢেউয়ের মুখেও জাহাজের ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রাখে। এক একটি পাখনা দৈর্ঘ্যে বারো ফুট এবং প্রস্থে সাড়ে ছ'ফুট। এগুলি একটা সংযোজিত ধাতুতে তৈরি। জলের মধ্যে দেখলে মনে হয় যেন বিপন্ন তরী দুই বাহু বিস্তার করে সাঁতরে সাগর পার হবার চেষ্টা করছে। মাত্র তিন মিনিটের মধ্যেই জাহাজ থেকে 'ষ্টাবিলাইজার' নিক্রান্ত করা যায়।

আমাদের ভাষা

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমরা বাঙালী। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। কিন্তু আমাদের ভাষার নাম পূর্ব্বে বাংলা ভাষা ছিল না। আমি বাল্যকালে প্রাচীনগণের মুখে শুনিয়াছি তাঁহারা যে পুস্তক পাঠ করিয়া স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণাদি শিখিয়াছিলেন সে পুস্তকের নাম ছিল "গৌড়ীয় ভাষার বর্ণমালা"। সেকালে "ক্ষ" ব্যঞ্জনবর্ণের শেষ অক্ষররূপে ব্যবহৃত হইত। উহা যুক্তাক্ষর হইলেও অযুক্তাক্ষর-সমাজে কি করিয়া স্থান পাইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বর্ণ-পরিচয় রচনা করেন তখন এই "ক্ষ" অক্ষরটা বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগে যুক্তাক্ষরের সমাজে নিজের আসন প্রাপ্ত হয়।

এইবার আমাদের ভাষার কথা বলি। বাংলাদেশে ইংরেজের প্রভাব লুপ্ত হওয়ায় অনেকে এখন বাংলা ভাষাতে যে সকল ইংরেজী শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে সেগুলিকে বর্জ্জন করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু তাহা অসম্ভব। বিদেশীয় শব্দের সংযোগে পুষ্টিলাভ না করিলে কোন ভাষাই পরিপুষ্ট হইতে পারে না। পৃথিবীতে যে সকল ভাষা এখন উন্নত ভাষা বলিয়া সর্ব্বজনস্বীকৃত সেই সকল ভাষায়ও প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক শব্দ প্রবেশলাভ করিয়া বর্ত্তমান উন্নত ভাষারূপে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান ইংরেজী ভাষায় ডেনিশ, ফরাসী প্রভৃতি শব্দ এত অধিক পরিমাণে মিশ্রিত যে উহাদিগকে ইংরেজী ভাষা হইতে পৃথক করিতে গেলে বর্ত্তমান ইংরেজী ভাষার সম্পদ বহুল পরিমাণে বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। যখন একটা দেশ অপর দেশের সংস্পর্শ লাভ করে তখন সেই অপর দেশের শব্দনিচয়ও সেই দেশের ভাষায় স্থান লাভ করে। এই সংস্পর্শ ধর্ম্ম সম্বন্ধে, বাণিজ্য সম্বন্ধে বা রাজ্যজয় ব্যাপারে ঘটিয়া থাকে। উহাকে কেহ প্রতিরোধ করিতে পারেন না। একটা সামান্য উদাহরণ দিয়া আমার কথা বুঝাইবার চেষ্টা করি। বাংলার শহর হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর মফস্বলে কোথায় সাবানের ব্যবহার নাই? গায়ে মাখিতে, কাপড় কাচিতে, দ্রব্যাদি পরিষ্কার করিতে সব কাজে সাবানের ব্যবহার অনিবার্য্য। কিন্তু এই সাবান শব্দ বাংলা ভাষায় আসিল কোথা হইতে? সাবানের ইংরেজী প্রতিশব্দ সোপ। অবশ্য ইংরেজের এদেশে আগমনের পূর্ব্বে বাঙালী সাবান ব্যবহার করিত না। যদি আমরা ইংরেজের নিকট হইতে সাবান ব্যবহার করিতে শিখিতাম তাহা হইলে ঐ দ্রব্যকে সাবান না বলিয়া সোপ বলিতাম। সকলেই জানেন যে, মুসলমান নবাব বাদশাহেরা এবং ইউরোপে ফরাসীরা বিলাসিতার চরম আদর্শ বলিয়া গণ্য হইতেন। সেই নবাবী আমলে ফরাসী বণিকেরা এদেশে সাবান আমদানী করেন। তখন ধনবান মুসলমানেরা ফরাসীদের নিকট হইতেই সাবান ব্যবহার করিতে শেখেন। সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে চর্ব্বি লাগে। কিন্তু চর্ব্বি হিন্দু জনসাধারণের পক্ষে অস্পৃশ্য। বাল্যকালে দেখিয়াছি বর্ষীয়সী ব্রাহ্মণ বিধবারা প্রাণান্তেও সাবান স্পর্শ করিতেন না। এই সাবান শব্দের ফরাসী প্রতিশব্দ "সাভঁ" (savon)। এই সাভঁ ইংরেজী বানানে সাভন এবং তাহা হইতে বাংলায় সাবান হইয়াছে। উহা উত্তর ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে "সাবুন" শব্দে পরিণত হইয়াছে।

আমরা বিদেশে কোথাও যাইতে হইলে পোঁটলা-পুঁটলি "বোচকা-বুঁচকি" বাঁধি। এই বোচকা শব্দ কোথা হইতে আসিল? পর্ত্তুগীজ ভাষায় একটা শব্দ আছে "বুশ্‌কা" (Bouchka)। এই "বুশ্‌কা" শব্দের মানে কাপড়চোপড়ের পুঁটুলি। আমি শুনিয়াছি আমার মাতামহ পর্ত্তুগীজ ভাষা জানিতেন। তিনিই আমার মাতাকে বলিয়াছিলেন যে, বোচকা শব্দ পর্ত্তুগীজদিগের কাছ হইতে আসিয়াছে। ইংরেজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্য ব্যপদেশে বাংলায় আসিবার পূর্ব্বে ইউরোপের ডেনমার্কে ডেনস হল্যাণ্ডে ডাচ, ফ্রান্সের ফরাসী এবং পর্ত্তুগালের পর্ত্তুগীজ বণিকেরা বাংলায় আসিয়া কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ সকল কুঠীর শেষ নিদর্শন ফরাসী চন্দননগর বা ফরাসডাঙ্গা মাত্র তিন বৎসর পূর্ব্বে বিলুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং এই সকল বিদেশী জাতির ব্যবহৃত অনেক শব্দ আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের ভাষায় প্রবেশলাভ করিয়াছে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে গরমের সময় আমরা আগ্রহ সহকারে লিচু ও জামরুল খাইয়া থাকি। কিন্তু ঐ দুইটি ফলের জন্মভূমি ভারতবর্ষ নহে—চীন দেশ। 'লিচু' শব্দটি চীন ভাষাতেও আছে। কিন্তু জামরুল শব্দটা চীনদেশীয় কিনা তাহা আমি বলিতে পারি না।

বাঙালীর প্রায় সকল ইষ্টকালয়েই কক্ষমধ্যে প্রাচীর-গাত্রে কুলুঙ্গী দেখিতে পাওয়া যায়। এই "কুলুঙ্গী" শব্দটি কোন্ ভাষা হইতে আসিয়াছে? তিব্বত-পর্য্যটক শরৎচন্দ্র দাস মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, তিব্বতী ভাষায় পর্ব্বতকে বলে

"কুল" আর গহ্বরকে বলে "ঙ্গী"। তিব্বতী ভাষায় কুলুঙ্গী মানে পর্ব্বত-গহ্বর। তাহা হইতে আমাদের কক্ষ-প্রাচীর-গহ্বরের নামও কুলুঙ্গী হইয়াছে। আমরা যে চা পান করি সেই চা চীন দেশ হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। চীনের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে চা শব্দই ব্যবহৃত হয়। এইরূপ জন-প্রবাদ আছে যে, মহর্ষি বশিষ্ঠ চীন দেশ হইতে ভারতে চা আনিয়াছিলেন এবং তাঁহার সময় হইতে উত্তর ভারতের হিমালয়ের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে চা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এইরূপ অনেক শব্দ আমাদের ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে অথচ আমরা জানি না যে ঐ সকল শব্দ কোন্ সময় হইতে, কোন্ ভাষা হইতে আসিয়া বাংলা ভাষায় মিশিয়া গিয়াছে।

অনেকের ধারণা যে, সংস্কৃত ভাষায় কোন বৈদেশিক শব্দ নাই। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত-অধ্যাপক ভাগবত শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, সংস্কৃত "উৎপল" শব্দ দ্রাবিড় ভাষা হইতে সংস্কৃতে প্রবেশলাভ করিয়াছে। এরূপ আরও অনেক শব্দ বিদেশী আর্য্য বা অনার্য্য ভাষা হইতে আসিয়া আমাদের দেবভাষায় মিশিয়া গিয়া থাকিবে—তাহা অসম্ভব নহে। শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে আর একটা কথা শুনিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, আমরা কথায় কথায় ভাল মন্দ সকল ক্ষেত্রে "যোগদান" শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় "যোগদান" শব্দটি মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হইত। চোরে যখন চুরি করিতে যায় তখন কেহ চুরি করিবার উদ্দেশ্যে সেই তস্করদলের সহিত মিলিত হইলে তাহাকেই যোগদান করা বলে।

গোরক্ষপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত-অধ্যাপক ললিত-মোহন কর সংস্কৃত এবং পালিভাষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পাশ করেন। তিনি আমার প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি বলিতেন, "পাষণ্ড" শব্দটা আমরা নিষ্ঠুর, নির্ম্মম বা অধার্ম্মিক অর্থে ব্যবহার করি। কিন্তু পালিভাষায় "পাষণ্ডি" শব্দে ধার্ম্মিককে বুঝায়। মহারাজ অশোকের শিলালিপিসমূহে 'পাষণ্ডি' শব্দ অশোকের গুণবাচক অর্থে বহুস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ, দেখা যাইতেছে যে, একই শব্দ কালভেদে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হওয়াও বিচিত্র নহে।

ভারতবর্ষে মুসলমান আমল হইতে আরবী, ফারসী প্রভৃতি যাবনিক ভাষার এত অধিক শব্দ আমাদের ভাষায় মিশিয়া আছে যে তাহার সংখ্যা হয় না। আমরা "আদালতে" "মামলা-মোকদ্দমা" করিতে গিয়া "উকিল" "মোক্তারে"র সাহায্য লইয়া থাকি। তাঁহারা "আদালতে"র "নাজীর", "পেশকার" ও "কারকুন" প্রভৃতিকে ধরিয়া বিচারকের সম্মুখে আমাদের অভিযোগ "দায়ের" করেন। "আসামী" ও "ফরিয়াদী"র উকিলেরা বিপক্ষ পক্ষের "সওয়াল" "জবাব" গ্রহণ করেন। সাক্ষীদিগকে "জেরা" করিয়া "নাস্তানাবুদ" ও "নাজেহাল" করিয়া থাকেন। আমার এই বাক্যাংশে আমি কতগুলি আরবী, ফারসী বা উর্দ্দু শব্দ ব্যবহার করিয়াছি তাহা দেখাইবার প্রয়োজন আছে কি? লোকে বাদী কিংবা প্রতিবাদী নিম্ন আদালতের বিচারে পরাজিত হইলে হাইকোর্টে "আপীল" করে। আমি জিজ্ঞাসা করি, উচ্চতম বিচারালয়ে পুনর্বিচারের আবেদন করা অপেক্ষা "হাইকোর্টে" "আপীল" করা কি অনেক সহজ নহে?

সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য আমরা যদি বিদেশীয় শব্দ বর্জ্জন করি তাহা হইলে সেই বিশুদ্ধ ভাষাটাই কি আমাদের কর্ণে বিদেশীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না?

"শিশি", "বোতল", "গেলাস", "মগ", "বুরুশ", "উল" প্রভৃতি শব্দ বিদেশী অথবা বিদেশী শব্দের অপভ্রংশ হইলেও ঐ সকল শব্দকে আমরা স্বচ্ছন্দে বর্জ্জন করিতে পারি কি? আমরা "পেপার" না বলিয়া যদি "কাগজ" বলি তাহা হইলেই কি আমরা বিদেশী শব্দের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইব? সুতরাং আমার মনে হয়, যে সকল শব্দ বিদেশী হইয়াও আমাদের ভাষার অঙ্গীভূত হইয়াছে সেগুলিকে বর্জ্জন করিবার চেষ্টা না করিয়া যেমন আছে তেমনই রাখাই ভাল। অকারণে ভাষাকে সরল করিতে গিয়া উহাকে জটিলতর করা হয় না কি? হিন্দী "করণ" শব্দের অর্থ লেখক। পূর্ব্বে কায়স্থরাই আমাদের দেশে লেখকের কার্য্য করিতেন। সেই জন্য বিহার বা উত্তর প্রদেশে কায়স্থের প্রতিশব্দ "করণ"। এই করণ হইতে বাংলা কেরাণী শব্দ হইয়াছে। এখন যদি এই কেরাণী শব্দকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া "কারণিক" করি তাহা হইলে সে বেচারা আমাদের সমাজভুক্ত থাকিবে, না সমাজচ্যুত হইবে?

বিদেশীয় শব্দ আমাদের ভাষায় প্রবেশ করিয়া সমাজের নিম্নতম স্তরে পর্য্যন্ত কিরূপ ব্যবহৃত হইতেছে তাহার একটা প্রমাণ দিতেছি। তিন-চারি মাস পূর্ব্বে আমি একদিন আমাদের প্রতিবেশী একজন ডাক্তারের বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছি এমন সময় দেখি এক বৃদ্ধা একটি রুগ্ন শিশুকে কোলে লইয়া ডাক্তারের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল। সেই সময় আর একটি বৃদ্ধা সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। এই শেষোক্ত বৃদ্ধা রুগ্ন শিশুটিকে দেখিয়া বলিল, "তোমার নাতি না? বড্ড রোগা হয়ে গেছে। কি হয়েছে?" তাহা শুনিয়া প্রথম বৃদ্ধা বলিল, "কি জানি দিদি। ডাক্তার বললে ওর পেটে যকৃড়ি না কি হয়েছে। আমি ত শুনে ভয়ে

মরি। পেটে পিলে হয়, নেবার হয় তা জানি। কিন্তু যকৃড়ি কি তা কখনও জানি না। যকৃড়ি শুনে অবধি আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গেছি।" আমি ঐ কথা শুনিয়া ডাক্তারবাবুকে গিয়া বলিলাম, "আপনি ঐ ছেলেটির পেটে যকৃড়ি হয়েছে বলাতে বুড়ী ত ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ও পিলে জানে, নেবার জানে। কিন্তু যকৃড়ি কাকে বলে বুঝতে পারে নি। ওকে ও রকম বিটকেল শব্দ একটা না বলে বাংলা করে লিভার বললেন না কেন? তা হলে ওর ভয় হ'ত না।" আমার কথা শুনিয়া ডাক্তারবাবু উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

এ স্থলে একটা কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যার কল্যাণে আমাদের দেশের অশিক্ষিত লোকেরা "ডাক্তার" বলিলে চিকিৎসককেই বুঝে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিশেষ বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারীকে বুঝে না। চিকিৎসক আসিয়া বিরেচকের ব্যবস্থা করিলে তাহারা অবাক হইয়া ভাবে বিরেচক আবার কি? পেট পরিষ্কার করিবার জন্ত ডাক্তারেরা "জোলাপ" দিয়া থাকেন। কিন্তু বিরেচক কাহাকে বলে? এইরূপ শত শত বিদেশী শব্দ আমাদের বাংলা ভাষার সর্ব্বস্তরের লোকের মধ্যেই প্রচলিত হইয়াছে। ঐ সকল শব্দকে আমরা বর্জ্জন করিব কিরূপে?

আমাদের একটা কথা মনে রাখা উচিত যে, অত্যুচ্চ হিমালয় শৃঙ্গে তুষারস্তূপ গলিয়া নির্ঝরিণীমুখে যখন নির্গত হয় তখন উহা অতি ক্ষীণপ্রাণ সামান্ত জলধারা থাকে। উহার গতি যতক্ষণ নিম্নাভিমুখে থাকে ততক্ষণ আরও শত শত জলধারা উহার সহিত মিলিত হইয়া সেই ক্ষীণ স্রোতস্বিনীকে প্রবল নদীর আকারে পরিণত করে। হিমালয়ে গঙ্গোত্রী হইতে গঙ্গা যখন পাহাড় পর্ব্বত ও নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া হরিদ্বারের সমতলভূমিতে অবতীর্ণ হয় তখনও তাহার বিস্তার বা গভীরতা একটা সামান্ত খালের অপেক্ষা অধিক নহে। কিন্তু সেই গঙ্গা সাগরাভিমুখে আসিবার সময় সরস্বতী, যমুনা, শোণ, অজয়, কোশী প্রভৃতি নদনদীর সহিত মিলিত হইয়া যে প্রবল ও বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করে তাহা কে না জানে। যদি ঐ সকল উপনদী গঙ্গার সহিত মিলিত না হইত তাহা হইলে ভাগলপুর, মুঙ্গের, সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে গঙ্গা কি এরূপ দুস্তর ও বিরাট কলেবর হইতে পারিত! ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে হইলে অগ্রে দেখা উচিত যে, ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ কোন শব্দ বা কোন পদ ভাষাকে কলঙ্কিত করিতেছে কি না। আমি অনেক খ্যাতনামা গ্রন্থকারের পুস্তকে পড়িয়াছি তাঁহারা "আবশ্যক" এই বিশেষণ শব্দকে "আবশ্যকীয়" লিখিয়াছেন। লিখিবার সময় তাঁহাদের বোধ হয় মনে থাকে না যে আবশ্যক শব্দ নিজেই বিশেষণ। উহাতে "ীয়" যোগ করিয়া আর বিশেষণ করা চলে না। ইংরেজীতে "use" শব্দটা বিশেষ্য; উহার বিশেষণ "useful"। সেই usefulকে আবার বিশেষণ করিয়া "usefulable" করা চলে কি? রবীন্দ্রনাথ একটা প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন ভাষা দেবতা। তাহাকে আয়ত্ত করিতে হইলে অগ্রে সাধনা করিতে হয়। বিনা সাধনায় কোন দেবতাকে আয়ত্ত করা যায় না।

জিজ্ঞাসা

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

আজো আসে বাঁশরীর আকুল আহ্বান
মাটির ধরার বুকে। অমৃতের গান
ভেসে আসে ধরণীর দগ্ধ বক্ষ 'পরে,
বহিয়া শান্তির বাণী প্রতি ঘরে ঘরে।
মোরা পাপী-তাপী, মত্ত নৃত্য-গীত-গানে।
মুহূর্ত্তে বিহ্বল হই ঐহিকের টানে,
কামনা-কণ্টকে ক্ষত হয়ে ওঠে মন;
অশান্তির দাবদাহে জর্জর জীবন।

মহা-কল্যাণের বাণী, মধু ভক্তিরস,
আজো করে ধরিত্রীরে স্নিগ্ধ ও সরস।
বাঁশীর যে-মঞ্জুধ্বনি আহ্বানিছে সবে
আনন্দে কল্যাণে তাহা কবে মূর্ত হবে?
অমৃতের পুত্র কবে খুঁজে পাবে পথ,
থামিবে হৃদয়দ্বারে অনন্তের রথ?

রক্তরাখী

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

অস্তাচলযাত্রী সূর্য্যের আলো তখন মাটির বুক ছাড়িয়া কাশীর মন্দিরচূড়ায় আশ্রয় লইয়াছে। পুণ্যময় মন্দিরের স্পর্শ ছাড়িয়া যাই যাই করিয়াও যাইতে পারিতেছে না। শুধু মা-গঙ্গা আপন বিশাল বক্ষে গোধূলির পাতলা আবরণ ধীরে ধীরে টানিয়া দিতেছিলেন।

তড়িৎকুমার একা হইতে নামিয়া গোধূলির এই শান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তন্ময় হইয়া গেল। কিন্তু গঙ্গার উপর পণ্টন ব্রীজ না দেখিয়া চিন্তায় কপাল কুঞ্চিত করিল। খবর পাইয়াছিল যে ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে পুলিসের খুব কড়া নজর, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী দেখিলে ত কথাই নাই; কাজেই সে মোগলসরাই হইতে একা করিয়া আসিয়া ক্ষুদ্র কাশী ষ্টেশনের অপর পারে নামিয়াছিল এই মনে করিয়া যে পণ্টন ব্রিজের উপর দিয়া গঙ্গা পার হইবে, তা ছাড়া কাশীর মত এত ছোট ষ্টেশনে পুলিসের নজর অত বেশী হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বর্ষার বেগ একটু তাড়াতাড়ি আসার ফলে দিন দুই আগেই পণ্টুন তুলিয়া লইয়াছিল, এ খবর তাহার জানা ছিল না।

অগত্যা তড়িৎকে রেল-পুলের উপর দিয়াই অগ্রসর হইতে হইল। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিল প্ল্যাটফরমে মাত্র দু-একজন রেলকর্ম্মচারী ভিন্ন আর জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। পুল পার হইয়া রেলরাস্তার ধার দিয়া ষ্টেশনের কাছাকাছি আসিয়া তারের বেড়া ডিঙ্গাইয়া বাহিরে আসিল। গেট দিয়া বাহিরে আসার সাহস পায় নাই, পাছে গেটে পুলিস প্রহরায় থাকে; কিন্তু তাহাতেই কি আর নিস্তার আছে! কয়েক পা কেবল অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় দুই জন হিন্দুস্থানী তাহার সামনে আসিয়া বলিল—"আপনি বাঙ্গালী বাবু আছেন, আপনার কোথা হইতে আসা হইল, কোথায় যাওয়া হইবে?"

তড়িতের ইচ্ছা হইয়াছিল জবাব দেয়—আসিয়াছি তোমার মনিবের ভিটায় ঘুঘু চরাইয়া, তাহাদের পিতৃপুরুষের পিণ্ডের ব্যবস্থা করিতে; কিন্তু নিজেকে যথাসম্ভব সামলাইয়া লইয়া কহিল—"আমি কাশীতেই থাকি, মোগলসরাই গিয়েছিলাম কাজে"।

"আপনার ঠিকানাটা বলিয়া দিন ত বাবুজী।"

"নাম ঠিকানা নোট বইয়ে টুকে লাভ কি, আমার সঙ্গে এসে দেখে গেলেই ত হয়"—বিরক্তিভরে কহিল তড়িৎ।

"রাগ করছেন বাবুমশাই, পেটের ধান্দায় ঘুরি, যার নিমক খাই তার হয়ে দু'চারটা নাম ঠিকানাও যোগাড় করতে না পারলে বাল-বাচ্চা লইয়া বাঁচি কি করে!"

তড়িৎ আর কথা না বাড়াইয়া মিথ্যা নাম ঠিকানা দিয়া অগ্রসর হইল। গোয়েন্দা কর্ম্মচারীরাও ফিরিয়া চলিল।

তড়িৎ কিছুদূর অগ্রসর হইলে এক একাওয়ালা তাহার পাশ দিয়া গাড়ী ঘুরাইয়া কহিল, "গাড়ী চাই বাবু!"

"চাই, কত নেবে বল!"

"আপনারা রোজকার খদ্দের, আপনাদের সঙ্গে আবার দর-কষাকষি কি করব বাবুমশাই!"

"সে হয় না, এখন করছ বাবুমশাই, আর বাড়ী পৌঁছলে একেবারে ঘাড়ে চেপে দেড়গুণ দাম না দিলে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে নেবে।"

"তা আপনার কাছে আর বেশী চাইব না, ছয় গণ্ডা পয়সা দেবেন।"

"ওসব ছ'গণ্ডা টণ্ডা বুঝি নে, চার আনায় যাবে ত চল।"

"ওতে হবে না বাবুজি।"

তড়িৎ আর দরকষাকষি না করিয়া পা বাড়াইল, দু'চার পা গিয়াই ফিরিয়া কহিল, "পাঁচ আনা পাবে, যাবে ত চল।"

"আচ্ছা, আসুন বাবু, আসুন। আর চারটি পয়সা আপনার কাছ থেকে বকশিশ চেয়ে নেব।"

এতক্ষণ এই দরকষাকষি এই গোয়েন্দা কর্ম্মচারী দুইটি দূর হইতে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিতেছিল। গাড়ী চলিতে সুরু করা মাত্রই হাঁক ছাড়িল, "এই গাড়োয়ান গাড়ী রোখ।"

গাড়ী থামিতেই একটি লোক দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, "এই ব্যাটা নিমকহারাম, বাবুর সঙ্গে হাঙ্গামা করবি নে, বাবুকে ঠিকসে পৌঁছে দেবি।" পরে তড়িতের দিকে চাহিয়া কহিল—"আপনার কোন ভয় নাই বাবুমশাই; ও অমনি ধারা লোক আছে।" কথা শেষ করিয়া ফিরিয়া চলিতেই গাড়ী দ্রুতবেগে চলিল।

লোকটাকে পুনরায় আসিতে দেখিয়া তড়িৎ একটু চিন্তিত হইয়াছিল। যাহা হউক, বিপদ ভালয় ভালয় কাটিয়াছে দেখিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—"তোফা গাড়োয়ান সেজেছ ত বনোয়ারী! তোমায় চেনে কার সাধ্যি! আমারই প্রথমটা ভুল হয়েছিল।"

"অমনি না হলে কাজ এগোয় কি করে তড়িৎ দা"—হাসিয়া মন্তব্য করিল বনোয়ারী। তাহার পরই কথায় ঝাঁজ মিশাইয়া কহিল—"দেখলে ত ব্যাটা হারামজাদার কাণ্ড; আমার খবরদারী করার অর্থ হ'ল যে ফিরে এসে ওকে বলতে হবে তোমায় কোথায় রেখে এলাম। গাড়ীর নম্বরটাও দেখে নিলে।"

"তুমি পাকা লোক, তোমার সঙ্গে ও এঁটে উঠবে কি করে। থাক্‌গে, ও ত আমাদের পথের নিত্য সঙ্গী, আসল কথা এখন বল—সব খবর ভাল ত!"

"এখন পর্য্যন্ত ত খবর সব ভালই, তবে টিকটিকির উপদ্রব

বড্ড বেড়ে গেছে—তার নমুনা ত হাতে হাতেই পেলে। রমেশ বাবুর ওখানে তোমার থাকা হবে না; তোমার জন্য কোথায় নাকি আলাদা বাসা ঠিক করা হয়েছে, তা রমেশবাবু নিজেই তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবেন।"

"আচ্ছা বনোয়ারী, তুমি না আগে মোটরগাড়ী চালাতে, সেটা কি হ'ল।"

"সেটা ত অনেকদিন খুইয়েছি! তাই ত এখন ষ্টিয়ারিং ছেড়ে লাগাম ধরেছি! সেবার গাড়ী নিয়ে গিয়েছিলাম পেশোয়ার। একদিন কি মাথায় চাপল, এক মিলিটারী গাড়ীর সঙ্গে পাল্লা দিলাম। শেষে গাড়ীতে গাড়ীতে হ'ল কলিশন! গাড়ী ত চুরমার! নিজে কোনগতিকে ছিটকে পড়ে গিয়ে বেঁচে গেলাম। কিছুদিন যে হাসপাতালে থাকতে হয় নি তা নয়। জানেন ত এমনি দুরন্তপনার জন্য কত গালমন্দই না শুনেছি।"

তড়িৎ বলিল—"এখন অনেকটা শান্ত হয়েছ ত?"

বনোয়ারী শুধু হাসিতে লাগিল।

"আসল কথাটা খুলে বল ত! তুমি ত আজকাল আর অমনি ঝুঁকি নেওয়ার ছেলে নও! কিছু একটা মতলব নিশ্চয় ছিল তোমার।"

বনোয়ারী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। "তড়িৎ-দাকে মিছে কথা বলে সারবার উপায় নেই, ধরা পড়বই পড়ব। অনেক বার চেষ্টা করে দেখেছি, রেহাই আজ পর্য্যন্তও পেলাম না।"

"আর ভনিতার দরকার নেই, এখন আসল কথাটাই খুলে বল!"

"অবশ্য ঝুঁকিটা খুবই মারাত্মক ছিল তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বাধ্য হলে সবই করতে হয়। তুমি বোধ হয় জান কোহাটের রাস্তায় পাহাড়িয়াদের একটা রাইফেল তৈরির কারখানা আছে। ওরা হাতেই সাধারণ যন্ত্রপাতি দিয়ে রাইফেল তৈরি করে—কলে তৈরি যে-কোন রাইফেলের তুলনায় খারাপ নয়। কিছুদিন ধরে ওদের সন্দেহ হয়েছিল যে, বুঝি মিলিটারীর নজর পড়েছে ঐ কারখানার উপর। তাই আমার উপর হুকুম ছিল যে, কোন মিলিটারী গাড়ীর আগমন দেখলেই যেন আমি ওদেরকে সঙ্কেতে হুসিয়ার করে দিই। দেখলাম এক গাড়ী যাচ্ছে ঐদিকে। মনে হ'ল কুমতলবেই যাচ্ছে, ওমুখো মিলিটারী গাড়ী দেখেই পাল্লা দিয়ে আগে পৌঁছবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু যখন দেখলাম যে ওতে সুবিধে হবে না, স্পীডে (দ্রুতগতিতে) ওদের সঙ্গে পারব না, তখন দিলাম গাড়ী বাঁকিয়ে, হ'ল কলিশন—তারপর দিন দুই পরে জ্ঞান হলে দেখি হাসপাতালে পড়ে আছি, হাতে পায়ে মাথায় অজস্র ব্যাণ্ডেজ। পরে ভাল হয়ে শুনতে পেলাম মিলিটারী গাড়ীরও বেশ ক্ষতি হয়েছিল তবে আসলে কারখানা বেঁচে গেছে।"

তড়িৎ এতক্ষণ রুদ্ধনিশ্বাসে তাহার কথা শুনিতেছিল। কথা শেষ হইতে বনোয়ারীকে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, এমনি করে গাড়ী ঘোরাবার সময় তোমার নিজের কথাটা একবারও মনে হয় নি।"

বনোয়ারী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে কহিল, "তুমি হাসালে তড়িৎ দা, তুমিই বল ত, যখন ঘর ছেড়ে এ পথে পা দিয়েছ, তখনই কি জানটা বকেয়া খাতায় লেখাও নি। ঐ গাড়ীটার আগে পৌঁছতে হবে, না হয় ওর যাওয়া বন্ধ করতে হবে, এই ছিল সমস্যা।"

"তা বটে—"

ততক্ষণে গাড়ী জনবহুল রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে। বনোয়ারী কহিল, "তড়িৎ দা, এবার কিন্তু আর কথা নয়। বাবু-গাড়োয়ানে এত হাসিগল্প লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ওটা এড়িয়ে চলাই আমাদের কাজ।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ী আসিয়া বাঙ্গালীটোলার এক গলির মুখে থামিল। তড়িৎ তাড়াতাড়ি ভাড়ার পয়সা বনোয়ারীর হাতে দিয়া দ্রুতপদে গলির ভিতর প্রবেশ করিল। অনেকটা আগাইয়া রমেনদের বাড়ী। বাড়ীতে পা দিতেই রমেন কহিল, "এখানে তোমার থাকা হবে না তড়িৎ-দা। তোমার জন্য আলাদা বাড়ী ঠিক করে রেখেছি, সেখানেই চল। কাকা এখনও বাড়ী ফেরেন নি। তিনি এসে তোমার চেহারা দেখলে কি যে করবেন তাই ভাবছি। একেই ত আমরা—আমি ও আমার বুড়ো মা ওর গলগ্রহ হয়ে আছি। তারপর একদিন এসে পুলিস বাড়ী তল্লাস করে গেছে। কাকা ত একরকম প্রকাশই করেছেন যে, আমরা এ বাড়ী ছাড়লেই তিনি সুখী হবেন, কেননা আমার এই ছেলেমানুষির জন্য বাড়ীসুদ্ধ সব লোকের হাতকড়া পড়বে এ তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবেন না। একথা শুনে মা আমার কাঁদছিলেন। সত্যি বলছি তড়িৎ-দা, এমনি খারাপ লাগছে তা আর কি বলব। আমায় বাইরের কোন কাজে পাঠিয়ে দাও না। এখানে যেন আর ফিরতে না হয়।"

"পাগল হয়েছ নাকি রমেন? ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোকের ঔদাসীন্য যদি তুমি উপেক্ষা করতে পার, তা হলে কাকার কথাটাই বা উপেক্ষা করতে পারবে না কেন? সত্যিই ত আর তুমি আলস্য করে বাজে বদখেয়ালে সময় কাটাচ্ছ না যে তাঁর কথা গায়ে লাগবে। এখানে থাকলেই তুমি বেশী কাজ করতে পারবে। এ বাড়ীতে থাকা যখন তোমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে তখন অবশ্য ছাড়তে হবে। থাকগে, এখন আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই—চল তুমি কোথায় আস্তানা ঠিক করেছ।"

২

বাঙ্গালীটোলারই আর একটা ক্ষুদ্র গলির মধ্যে তিনতলা বাড়ীর ভাড়াটে একখানা ছোট ঘর তড়িতের জন্য ঠিক করা হইয়াছে। এই বাড়ীতে অনেক লোক—একেবারে সাড়ে বত্রিশ ভাজা। অধিকাংশ একখানা ঘর লইয়া থাকে। অতি অল্প লোকই দুটো ঘরের বাসিন্দা।

তখন বিকাল গড়াইয়া আসিতেছে। ঐ বাড়ীরই এক ঘরে একটি বৃদ্ধা বিধবা বসিয়া মালা জপিতে জপিতে ভাবিতেছে যে যদি

কাল-পরশু নাগাদ মনিঅর্ডার আসিয়া না পৌঁছে তবে বিশ্বনাথের প্রসাদ ভিন্ন আর উপায় নাই। অবশ্য তখন মাত্র পাঁচটি টাকা হইলেই একলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

পাশের ঘরের বিধবা ঘরে ঢুকিয়া প্রথমাকে চিন্তিত দেখিয়া কহিল, "দিদি কিছু ভেব না, বিশ্বনাথের চরণে আছি, ভয় আর কি। এ বাড়ীর কত লোকই ত ছত্রে গিয়ে খেয়ে আসে। বিশ্বনাথের কৃপায় সতীনপোর টাকা ত আমি কালই পেয়েছি—তুমি কিছু ভেব না। বরাতে সতীন জুটলেও ছেলেটা ভালই ছিল দিদি। কিন্তু বিয়ে করবার পর বৌটার মতিগতি ভাল না দেখে ছেলে পাঠিয়ে দিলে এই বিশ্বনাথের চরণে"—কথাগুলি শেষ করিয়াই একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। পুনরায় কহিতে লাগিল—"ঐ সাত নম্বর ঘরের দিদির কথা ভাবতে কষ্ট হয়। স্বামী-স্ত্রীতে এলি জোড়ায় বিশ্বনাথের চরণ সেবা করবি বলে। কিন্তু বরাত এমনি স্বামীটা দু'দিনও টিকল না। ত্রিসংসারে এমন কেউ নেই দু'দিন চালিয়ে নেবে! কিন্তু বিশ্বনাথ সবাইকে দেখেন, তাই ত তের নম্বরে ওর রান্নাবান্নার কাজ জুটল—আর বিশ্বনাথের প্রসাদ ত আছেই, কোন গতিকে যাই হোক দিন চলে যাচ্ছে।"

দ্বিতীয়ার কথা শেষ হইতেই চার নম্বরের বিধবা আসিয়া কহিল, "এই যে তোমরা এখানেই আছ, ভাসুর চিঠি লিখেছে তার বড় ছেলের বিয়ে, আমায় নিতে আসবে। কিন্তু দিদি, বিশ্বনাথের চরণ ছেড়ে কোথাও নড়তে ইচ্ছে নেই।"

"তোমার ভাগ্য ভাল দিদি, এমন ভাসুর তপস্যা করলে পাওয়া যায়"—মন্তব্য করিল প্রথমা। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে কহিল, "হ্যাগা দিদি, পাঁচ নম্বরের দিদির ছেলেটার নাকি চাকুরি হয়েছে?"

"হ্যাঁ হয়েছে, জোয়ান বেটাছেলে ঘরে বসে থাকলে কি রকম দেখায় বল ত?"

এখন যদি কেহ সতের নম্বর ঘরের দরজায় কান পাতিয়া শোনে তবে জানিতে পারিবে তাহারা তখন সাধুর সন্ধানে ব্যস্ত, অর্থলাভ কি করিয়া হইতে পারে। আর কোন উপায়েই ক্ষুধা মিটিতেছে না। আর একটি ঘরে পলাতক কয়েকটি দুর্বৃত্ত পরম নিশ্চিন্তে দিন কাটাইতেছে ও বিশ্বনাথাশ্রিত লোকগুলির জয়গান করিতেছে।

এ বাড়ীর অধিকাংশ বাসিন্দা অবশ্য বিধবা কিংবা এমনি যাহাদের বিশ্বনাথ ভিন্ন অন্য কোন আশ্রয়ই নাই। জীবনে কোন একটা ভুলের বা অবিবেচনার জন্য পরিত্যক্তা নারীও আছে।

ইচ্ছা করিয়াই রমেন এ বাড়ী পছন্দ করিয়াছে। এরকম বাড়ীর উপর গোয়েন্দা পুলিশের নজর সহজে পড়ে না। তড়িতের সঙ্গে যখনই যাহার দেখা হইত—সিঁড়ি দিয়া উঠিতে নামিতে তখন তাহাকে নাম ধাম আর বাপের নাম এমন কি কাশীতে কি কাজ করা হয় তাহা বলিতে হইত! সুবিধা এই ছিল যে, উত্তর একটা কিছু দিলেই হইত। সত্যাসত্য লইয়া কেহ মাথা ঘামাইত না।

তড়িতের আহারের ব্যবস্থা বিচিত্র। নিজে রাঁধাবাড়ায় একান্ত অপটু—সত্যি কথা বলিতে কি, ও ব্যাপারটায় তাহার কোন উৎসাহও ছিল না। কিন্তু তবু পয়সা বাঁচাইবার জন্য নিজেই ষ্টোভে ভাত সিদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে দুই চারিটা আলু বেগুন ফেলিয়া দিয়া আহার পর্ব্ব সমাধা করিত। সারাদিন পর বাড়ী ফিরিবার সময় যে দিন মনে হইত যে বাড়ী ফিরিয়া ষ্টোভ জ্বালাইবার উৎসাহ থাকিবে না সেদিন রাস্তা হইতে দু'চার পয়সার যাহা হউক কিছু কিনিয়া আনিয়া খাওয়া শেষ করিয়া শুইয়া পড়িত। যে দিন তাহাও মনে থাকিত না, সে দিন গ্লাস দুই জল ঢক ঢক করিয়া গিলিয়া শুইয়া পড়িত!

একদিন তড়িৎ দুপুরবেলা বাড়ী ফিরিয়া কোনরকমে গায়ের জামা খুলিয়া রাখিয়া বিছানায় দেহ এলাইয়া দিল। ক্লান্তিতে চোখ বুজিয়া আসিতেছে। সামনেই ষ্টোভটা—মনে হইতেছে যদি কোন গতিকে ষ্টোভটা জ্বলিয়া উঠিত আর চালের ডেকচি জল আর চালসহ বসিয়া যাইত তবে বোঝা যাইত বিশ্বনাথের মাহাত্ম্য! ষ্টোভটার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়াও উঠিয়া রান্না করিবার উৎসাহ মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না।

হঠাৎ দরজায় শব্দ পাইয়া চকিতে চাহিয়া দেখিল অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী ঘরে প্রবেশ করিতেছেন। কোন ভনিতা না করিয়া তিনি কহিলেন, "তড়িৎ, এ সময় আর শুয়ে থেক না, নাও চট করে স্নান সেরে এস, আমি খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি!"

তড়িৎকে কোনপ্রকার প্রতিবাদ করিবার সুযোগ না দিয়াই তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

তড়িতের বিস্ময় মাত্রা ছাড়াইয়া গেল। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর সহিত তাহার সিঁড়ি দিয়া উঠিতে নামিতে দেখা হইয়াছে সত্য, কিন্তু কোন দিন কোন কথা হয় নাই! হঠাৎ এমনি করিয়া ঘরে ঢুকিয়া খাবারের কথা বলিয়া গেলেন—যেন আদেশ করিয়া গেলেন ইহার আর ব্যতিক্রম হইতে পারে না। ইহার তাৎপর্য্য তাহার নিকট দুর্ব্বোধ্য—অপরিচয়ের কোন দ্বিধা কিংবা সঙ্কোচ কিছুরই চিহ্নমাত্র নাই! যাহা হউক আপাততঃ স্নান সারিয়া আসাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া গামছা কাঁধে করিয়া চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর কথাই মাথায় ঘুরিতে লাগিল। যতই ভাবিতেছে ততই অবাক হইতেছে। একটা জিনিষ সে অল্পদিনের মধ্যেই লক্ষ্য করিয়াছিল যে, এই বাড়ীর সকল ভাড়াটিয়াই তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলে!

অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর স্বামী একদিন নিরুদ্দিষ্ট হন। এক ছেলে এক মেয়ে লইয়া তিনি একটু বিপদেই পড়িয়াছিলেন। হয়ত একদিন স্বামী আবার ফিরিয়া আসিবেন এই আশায় শ্বশুরের ভিটা আঁকড়াইয়া ছিলেন। কিন্তু একদিন বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল। তাহার একমাত্র পুত্র চিকিৎসার কোনপ্রকার সুযোগ না দিয়াই চিরনিদ্রায় শয়ন করিল। ক্রমে যখন দেখিলেন কন্যা প্রতিমাকে লইয়া শ্বশুরের ভিটায় আর আশ্রয় পাইবেন না তখন একদিন অশ্রু-

বিসর্জ্জন করিতে করিতে ইহা পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বনাথের চরণে আসিয়া আশ্রয় লইলেন।

কাশীতে গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে আসিয়া অন্নপূর্ণা অকস্মাৎ আবিষ্কার করিলেন তাহার স্বামীকে! ঐ ঘাটেই তিনি মৌনী সাধু নামে পরিচিত। ঐ ঘাটেই তিনি মৌন হইয়া বসিয়া থাকিতেন, কেহ তাঁহাকে কখনও কথা কহিতে শোনে নাই, অধিকাংশ সময় চক্ষু মুদিয়া থাকিতেন। যদি চক্ষু মেলিতেন তখনও অপলক, যেন ধ্যানমগ্ন। গঙ্গার ঘাটে বহু বৎসর উলঙ্গ দেহে মৌনী হইয়া প্রায় সর্ব্বক্ষণ যোগাসনে বসিয়া কাটাইয়া দিতেন।

প্রথম দর্শনে এতদিনকার রুদ্ধ আবেগ অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর হৃদয়ে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া সমস্ত কথা জানান। কিন্তু তিনি নিজেকে সংযত করিলেন অতি কষ্টে এই ভাবিয়া যে, তাঁহার স্বামী গৃহত্যাগ করিয়া পরম পিতার ধ্যানে মগ্ন, তাঁহার সঙ্কল্প খণ্ডন করাইয়া আর লাভ কি? বিশ্বনাথের ইচ্ছা যদি তাহা না হইবে তবে তিনি কেন তাঁহাকে ছিনাইয়া আনিলেন! অন্ততঃ তাঁহাকে দুই বেলা দেখিতে পাইবেন এই সৌভাগ্যের জন্য বিশ্বনাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করিলেন।

তাহার পর হইতে অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী আসিয়া সন্ন্যাসীর আশ-পাশ পরিষ্কার করিয়া যাইতেন এবং ঘটে করিয়া পানীয় জল, কিছু ফলমূল এবং মিষ্টি রাখিয়া যাইতেন। সন্ন্যাসী তাহা গ্রহণ করিতেন কিনা তাহা তিনি জানিতেন না। এই সামান্য সেবা করিবার অধিকার পাইয়াই তিনি পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এইটুকুও তাঁহার ভাগ্যে বেশীদিন টিকিল না। অল্প কিছুদিন পরই সাধু দেহত্যাগ করিলেন।

এই অঞ্চলের সকলেই এই মৌনী সাধুকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত—সেই সূত্রে অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী আর প্রতিমাও তাহাদের ভক্তিশ্রদ্ধা হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী বৈধব্যক্লিষ্ট বিষাদগম্ভীর মুখ তাঁহাকে অভেদ্য বর্ম্মের মত সকলের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখিত। প্রতিমা সত্যই প্রতিমাপ্রতিম, কিন্তু মাতৃদত্ত গৈরিক বাস রূপের তীক্ষ্ণতাকে একটা পবিত্র আভায় ঢাকিয়া দিয়াছিল। লোকে তাহার দিকে মাথা তুলিয়া চাহিতে সহসা সাহস পাইত না।

স্বামীর দেহান্ত হইলেও তিনি নিজে হাতে দুই বেলা তাঁহার বসিবার স্থান পরিষ্কার করিয়া প্রতিমাকে পাশে বসাইয়া চুপ করিয়া থাকিতেন—স্বামীকে অন্তর দিয়া অনুভব করিবার জন্য।

তড়িতের জীবনে ইহা একটা নাটকীয় ঘটনা। তাহার আহারের অব্যবস্থার কথা কি ভাবেই তাহার গোচরীভূত হইল এবং কি করিয়াই বা তাহার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইলেন কিছুতেই সে রহস্য ভেদ করিতে পারিল না। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া আরও অবাক হইল। পরিচ্ছন্ন একটি আসন পাতা, সামনে খাবারের থালা সাজানো, পাশে এক গ্লাস জল ঢাকা দেওয়া আর ঘরের এক কোণে প্রতিমা দাঁড়াইয়া খাবার পাহারা দিতেছে। প্রতিমাকে দেখিয়া তাহার বিস্ময় মাত্রা ছাড়াইয়া গেল। মনে হইল তড়িৎকে দেখিয়া প্রতিমার ক্ষণেকের তরে যেন লজ্জা-সঙ্কোচের ভাব আসিল; কিন্তু তাহা কিছুক্ষণের জন্য মাত্র। সে ধীরে ধীরে কহিল, "আর দেরী করবেন না, খেতে বসুন, মা খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

তড়িৎ অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর কথায় প্রতিবাদ করিতে পারে নাই। বিনা প্রতিবাদে এমনি সাহায্য গ্রহণ করিতে তাহার কেমন কেমন লাগিতেছিল। সুতরাং খাইতে বসিতে বসিতে প্রতিমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আমার জন্য এত পরিশ্রম করবার কি প্রয়োজন ছিল বলুন ত? আমি একা মানুষ, ষ্টোভ জ্বালিয়ে এখ্‌খুনি খাবার তৈরি করে নিতে পারতাম।"

এই কথার প্রত্যক্ষ কোন জবাব না দিয়া প্রতিমা কহিল, "আমি এখন যাচ্ছি, একটু বাদে আসব, কিছু প্রয়োজন হলে বলবেন।"

তড়িৎ ভাতের থালা হইতে মুখ তুলিয়া দেখিল প্রতিমা চলিয়া যাইতেছে। মনে মনে ভাবিল, 'মা মেয়ে দুই-ই সমান দেখছি।'

এই নীরব শাসন যে তড়িৎকে মুহূর্ত্তের জন্য বিরক্ত করে নাই তাহা নয়, কিন্তু তাহার মনে হইল 'এই ত আমার দেশ যাহার জন্য সব ছাড়িয়াছি; দেশ ত আর এক মুঠো মাটি নয়, এর কোটি কোটি নর-নারী—যারা সজীব, যারা মানুষ, যারা দুঃখে কাঁদে আবার আনন্দে নাচে তাদেরই জন্য, তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এই সংগ্রাম। এরা ত পর নয়। ভাই, বোন, মাতা, পিতা, এরাই। এদের বাদ দিয়ে কি দেশের স্বাধীনতা? এই অনুভূতি আজ যেন তাহার হৃদয়ে নূতন করিয়া এক আনন্দের স্বাদ দিয়া গেল। স্নেহের অযাচিত স্বরূপ তাহাকে মুগ্ধ করিল। তৃপ্তির এক গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস তাহার সমস্ত হৃদয় মথিত করিয়া বাহির হইল।

পরিতোষ করিয়া আহার তড়িৎ অনেক দিন ভুলিয়া গিয়াছিল। আজিকার প্রতিটি গ্রাস তাহার নিকট অপরূপ লাগিল। একটু বাদে প্রতিমা আসিয়া খোঁজ করিয়া গেল তাহার আর কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা। বিপ্লবী গৃহত্যাগীর বৈচিত্র্যময় জীবন—সে হয়ত কোন কোন স্থানে নানা সুখাদ্যও আহার করিয়াছে, কিন্তু এমন তৃপ্তি সে আর বোধ হয় কোথাও পায় নাই। তৃপ্তির এক মধুর রোমাঞ্চে তাহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা বিদূরিত। খাওয়া শেষ করিয়া একটু বিছানায় গড়াইল।

মাত্র আধ ঘণ্টার বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাহাকে ছেলেবেলাকার দিনগুলির মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে। যদিও তাহার নামে ঠিক কোন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল না, কিন্তু তাহার উপর পুলিসের কড়া নজর থাকায় সে ঘর ছাড়িয়াছে বহু দিন। এমনিধারা নীরব শাসন তাহাকে তাহার মা ভিন্ন একমাত্র দেবেশের মা করিত। কিন্তু তাহার সঙ্গে এই অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর বাহ্যিক ব্যবহারে কিংবা পোশাকে কোন মিল নাই। কিন্তু চেহারায় যেন একটা সাদৃশ্য ছিল। তাহার মনে হইল, এরা আসলে মা, আমারই হউক, কিংবা দেবেশের

হউক বা প্রতিমার হউক! এমনিধারা চিন্তার স্রোত কখন ঘুমের দেশে মিলাইয়া গিয়াছে তাহা সে খেয়াল করিতে পারে নাই।

তাহার ঘুম ভাঙ্গিল রমেনের ডাকে, "কি তড়িৎ-দা, অসুখ করল নাকি, ঘুমোচ্ছ যে।"

"না, না, অসুখ করবে কেন, কাল বড্ড রাত্ত জাগতে হয়েছে।"

"ও ত তোমার নিত্যকার সাথী, তার জন্য দিনে ঘুম ত তোমার কখনও দেখি নি। কাল রাতে আবার কোথায় ছিলে?"

"কৃষাণদের পাড়ায় মোড়লদের সঙ্গে আলাপ করলাম। তারপর এসে ছাতে শুলাম, কিন্তু ঘুমোয় কার সাধ্যি। আবার ভোর হতে না হতেই বিশ্বনাথের নাম করে জেগে উঠেই তুমুল ঝগড়া।"

"সকালবেলাই ঝগড়া!"

"আরে, রাতে শোবার সময় কার নামে কে কি ফিস ফিস করে বলেছে তাই নিয়ে কুরুক্ষেত্র আর কি।"

"আমার কিন্তু এই ভেবে আশ্চর্য্য লাগে তড়িৎ-দা যে, ধর্ম্ম-কর্ম্ম করতে এসেও এরা নীচ আচরণ ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলতে পারে না।"

তড়িৎ এতক্ষণ শুইয়া ছিল, সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "আসলে কি জানিস রমেন, এতগুলি লোক এক ক্ষুদ্র অপরিসর স্থানে থাকলে পদে পদে ঠোকাঠুকি ও ঝগড়া হবেই। এতটুকু ছাদে বাড়ীর অধিকাংশ লোকই এসে ঘুমোয়। সকলেরই এখানে আসার ইতিহাস আছে, কাহারও কাহারও খারাপ ইতিহাস আছে—এসেছে অনেক নোংরামি লোকচক্ষুর অন্তরাল করতে, আপনার পরিচিত সমাজ থেকে বঞ্চিত হয়ে আশ্রয় নেয় নীলকণ্ঠের কণ্ঠনালীতে। ঝগড়ার সময় খেয়াল থাকে না, পরস্পরের বিরুদ্ধে নোংরা ইতিহাসের ঘাটাঘাটি হয়। এদের না আছে শিক্ষা, না আছে ধৈর্য্য—থাকতেও পারে না! কাজেই আদিম প্রবৃত্তিই এদেরকে চালায়। এদের দোষ দিও না রমেন! এই বাড়ীর অর্দ্ধেক লোকও এ ছাতে শোবার জায়গা পায় না। নিদারুণ গরমে সবাই চায় একটু আরামে ঘুমোতে। সুতরাং অগ্রাধিকারের প্রশ্ন ত সহজ।

"ধর্ম্ম-কর্ম্ম এদের অছিলা মাত্র, আসলে এরা..."

রমেনের কথা শেষ করিতে না দিয়া কহিল, "এরা মানুষ, এরা বড় দুঃখী রমেন। এদের দুঃখের তুলনা কোথায়! এদের প্রায় সবাই সব খুইয়ে, সব প্রিয়-পরিজন হারিয়ে একেবারে ছিন্নমূল, একেবারে সর্ব্বহারা! এখানে এসেছে খাদ্য, আশ্রয় ও হয়ত শান্তি মিলবে—এই আশায়। বাঁচবার তাগিদেই আজও এরা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে নি! আজও আছে এরা বিশ্বনাথের চরণ ভরসা করে।"

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য উভয়েই নীরব রহিল। রমেন নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিল, "আচ্ছা, থাক এদের কথা, কাল মোড়লদের সঙ্গে কি আলাপ করলে এখন তাই বল।"

"কাল ওদের সঙ্গে আলাপে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পেলাম অনেক। ওদের সঙ্গে নিতে হলে আমাদেরকে ঢেলে সাজাতে হবে।"

"ওরা কি তা হলে আমাদের আসল কথাটাই বুঝতে পারে নি। এদের সঙ্গে নেওয়ার যে মেহনত তার অর্দ্ধেক যদি যুব-সমাজ ও ছাত্র-সমাজের প্রতি করি তবে আমাদের সাফল্য নিশ্চয় বলেই ত মনে হয় তড়িৎ-দা!"

"আমাদের ওরা বিশ্বাস করতে চায় না রমেন। দোষী ওরা নয়। ওরাই দেশের মেরুদণ্ড। আমাদের মুরুব্বিয়ানা ডাক ওদের প্রাণে সাড়া জাগায় না।

"আমাদের যুব-সমাজ, আমাদের ছাত্র-সমাজের কথা বলছ, এরা ভাবপ্রবণ। উত্তেজনায় এরা সচল, আর বাস্তবের কশাঘাত এদের করে চিরতরে পঙ্গু। কিন্তু ঐ যে বললে, নির্ব্বোধ কিষাণদের কথা দু' বেলা দু' মুঠো ভাত, মাথা গোঁজবার ঠাঁই, আর দুখানা মোটা কাপড় এই হচ্ছে সবকিছু বিচারের মাপকাঠি, এই সিধে কথা নিয়ে যদি ওদের কাছে টানতে পার তবেই ওদের বিপ্লবের পুরোভাগে দাঁড় করাতে পারবে। ওদের মনে জাগাতে হবে বিশ্বাস, স্থাপন করতে হবে আত্মপ্রত্যয়।"

রমেন—"সবই বুঝলাম! কিন্তু প্রথম চাই স্বাধীনতা, তারপর আর সব। পরাধীনতার অপমান অসহ্য, আগে ভাঙ্গতে হবে এই শৃঙ্খল।"

তড়িৎ—"রাজনৈতিক স্বাধীনতার বুলি ওদের হৃদয় স্পর্শ করে না। এদের কাছে আমরা বাবু—হাত-পা গুটিয়ে টাকা খাটাই আর মুনাফা ব্যাঙ্কে জমা দিই! ইংরেজও তাই করে। আমাদের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকদের sentiment বা ভাবাতিশয্যে মাতিয়ে তোলা যায়। কিন্তু কৃষাণদের—যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উৎপাদন করছে তারাই প্রকৃত স্বার্থ বোঝে। আমাদের প্রাচীন গৌরব, আমাদের পুণ্যভূমি, আমরা এমন ছিলাম তেমন ছিলাম, ইংরেজ এসে আমাদের পরাধীন করে রেখেছে—শুধু এই বলে মাতানো যায় না। ওদের একজন ত জিজ্ঞাসা করে বসলে, 'আচ্ছা বুঝলাম না হয় ইংরেজ গেল, কিন্তু তাতে করে আমাদের ফয়দা কোথায়? দেবে আমাদের জমি ফিরিয়ে? দেবে আমাদেরকে রেহাই খাজনা আদায়ের অছিলায় জুলুম থেকে? আমাদের জমি ও উৎপন্ন ফসলের মালিকানা হবে কাদের? এই কথাগুলো একটু বুঝিয়ে দিন।

ইংরেজ গেলেই দেশের দুর্ভিক্ষ চলে যাবে একথায় তারা নিশ্চিন্ত হয় না। তারা বলে জমির মালিক ও জমিতে উৎপন্ন ফসলের মালিক কৃষকেরা না হলে ইংরেজ গেলেও দুর্ভিক্ষ যাবে না।

রমেন—"কিন্তু এটা কেন এরা বুঝতে পারে না যে, আমাদের দেশ স্বাধীন হলে গণভোটে হবে দেশ-শাসকের গোষ্ঠী নির্ণয়।"

তড়িৎ—"ভোটের রহস্য এরা ভাল করেই জানে রমেন, কাল ওরা আমায় বললে, 'বাবু ভোটের কথা বলছ, ও ত নিলামের ডাক, যে বেশী পয়সা ছড়াবে সে-ই করবে কাম হাসিল। একবার ক্ষমতা হাতে পেলেই হয় তখন আর ঠেকায় কে। তারপর পাঁচ-সাত বৎসর আর আপনাদের উপর হাত দেয় কে? এর মধ্যেই নিজেদেরটা গুছিয়ে নেবেন এবং পরের বৎসরের ভোট জোগাড়ের ব্যবস্থাও করে

ফেলবেন। এই ত সেবারে কিসের যেন ভোট হ'ল, টাকায় ছড়াছড়ি ত দেখলামই, তা ছাড়া তোমায় কি বলব বাবু, এত করে বললাম, আমাদের গ্রামের কথা, তখনও বাবু বলেন উনি জিতলে আমাদের গ্রাম আর গ্রাম থাকবে না; ভোট ত শেষ হ'ল, উনি জিতলেনও, তারপর তাঁর আর পাত্তা কে পায়! একবার অনেক করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম; সেবার অনাবিষ্টি—অন্য কিছু করা ত দূরের কথা, আমাদের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করলে না।' কাজেই বুঝলে রমেন ও ভোটের তত্ত্ব বই না পড়েও অভিজ্ঞতার আগুনে পুড়ে আপনি জেনে নিয়েছে।"

"ইংরেজকেই তা হলে ওরা বহাল রাখতে চায়!"

"না, তা অবশ্য চায় না, তবে আমাদের মুরুব্বিয়ানাও ওরা চায় না! ওরা বলে, ইংরেজ যাক এটা আমরা নিশ্চয়ই চাই। তবে আপনারা ইংরেজ হয়ে বসবেন না, আপনারা আমাদেরই হয়ে যান এই আমরা চাই। ওদের বাদ দিয়ে কোন কিছুই সার্থক হতে পারে না রমেন।"

হঠাৎ তড়িতের ধুতি লইয়া প্রতিমা ঘরে প্রবেশ করায় আলোচনার স্রোত বাধা পাইল। আজ তড়িতের অবাক হইবার দিন, কোনকিছু সঠিক মাথায় আসিবার আগেই প্রতিমা কহিল, "কাপড়খানা নীচে পড়ে গিয়েছিল, দেখতে পেয়ে নিয়ে এলাম।"

তড়িৎ কিংবা রমেন কাপড় নেওয়ার জন্য হাত না বাড়ানোতে প্রতিমা সামনের কম্বল-জড়ানো একটা পুটুলির উপর কাপড়খানা রাখিয়া বাহির হইয়া গেল।

রমেনের আশ্চর্য্য দৃষ্টি দেখিয়া তড়িৎ নিজের বিস্ময়কে অধিক মনে করে নাই। আজিকার দুপুরের ঘটনার পর অবশ্য তড়িৎ আর হতভম্ব হয় নাই! রমেনের কৌতূহল নিবৃত্ত করিবার জন্য আজিকার সমস্ত ইতিহাস তাহাকে বলিল।

রমেন ইহাদিগকে মোটামুটি যে না চিনিত তা নয়, তবে সে পরিচয় একান্তই লোকমুখে শোনা। তার অভিজ্ঞতার যে নূতন পরিচয় পাইয়াছিল তাহাই বর্ণনা করিয়া কহিল, "ওরা এমনি অদ্ভুত, লোকে ওদের যেমন করে ভয় আবার শ্রদ্ধাও আছে ওদের উপর। জানেন তড়িৎ-দা সেদিন একটা ছেলে পড়েছে অতি অপ্রশস্ত রাস্তায় গড়িয়ে, আর ঠিক সেই সময়ে ওধার দিয়ে আসছিল একটা ষাঁড় ছুটে, যে যেখানে ছিল সবাই দৌড়ে নিজের প্রাণ বাঁচাল, আর যারা ছিল নিরাপদ দূরত্বে তারা হায় হায় করে উঠল, কিন্তু দেখলাম বুকের পাটা এই অন্নপূর্ণা ঠাকরুণের! মুহূর্তের মধ্যে ছেলেটাকে আড়াল করে দাঁড়াল। ধাক্কা খেলেন খুব জোরসে, আঘাতও পেলেন খুব। কিন্তু স্রেফ মনের জোরেই বোধ হয় ছেলেটাকে দিলেন বাঁচিয়ে। ওর মা যখন কাঁদতে কাঁদতে নিয়ে গেল ছেলেটাকে ওর হাত থেকে ওকে ধন্যবাদ দিয়ে, উনি ত একটা কথাও বললেন না বরং ওদের মুখের পানে কটমট করে দৃষ্টি হেনে গঙ্গার দিকে এগিয়ে গেলেন।

তখন গোধূলির আভা এই ক্ষুদ্র অপরিসর গৃহে ছায়ার পর্দা টানিয়া দিয়াছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তাহাদিগকে বাহির হইতে হইবে তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া রমেন কহিল, "এক কাজ করা যাক তড়িৎ-দা, ষ্টোভটা জ্বেলে রান্নাটা সেরে যাওয়াই ভাল।

"তার আর দরকার নেই, ফিরে এসে করলেই হবে।"

"আজকের ফেরা অনিশ্চিত কাজেই তা হলে আজ আর কলের জল ছাড়া গতি নেই! সুতরাং ও পাট সেরে যাওয়াই মহাজন লায়েক।"

ইহার পর আর যুক্তি নাই, সুতরাং উভয়ে মিলিয়া রান্না সারিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

"সুবেদার বলবন্ত সিংকে খবর দেওয়া হয়েছে কি"—জিজ্ঞাসা করিল তড়িৎ।

"হাঁ।"

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছে। তাহারা এ রাস্তা ও রাস্তা কিছুক্ষণ ঘুরিয়া একটা গলির মধ্য দিয়া আসিয়া বড় রাস্তার মোড়ে পড়িয়া বনোয়ারীর একায় মুহূর্তে অন্যান্য যানবাহনের স্রোতে মিশিয়া গেল।

৩

গভীর রাত্রে তড়িৎ বাড়ী ফিরিল। সমস্ত বাড়ী তখন নিদ্রায় নিঝুম। সিঁড়ি বাহিয়া উঠায় নিজের পায়ের শব্দ ভিন্ন আর কোন শব্দ নাই।

উপরে উঠিতে উঠিতে তড়িৎ লক্ষ্য করিল, প্রতিমা তাহার ঘরের দিক হইতে ফিরিয়া আসিতেছে। কাছাকাছি আসিতেই প্রতিমা কহিল, "আমাদের ঘরে একটু আসবেন, মায়ের বড্ড অসুখ।"

তড়িৎ তাহার কথায় জবাব না দিয়া প্রতিমাকে অনুসরণ করিয়া তাহার ঘরে গিয়া দেখিল অন্নপূর্ণা দেবী যন্ত্রণায় কাতরাইতেছেন। জানিয়া লইল যন্ত্রণা পেটের। ডাক্তার ডাকাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া কহিল, "একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখখুনি ডাক্তার ডেকে আনছি।"

অন্নপূর্ণা দেবী তড়িতের গলা শুনিতে পাইয়া ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "এত রাতে আবার ওকে ডেকে আনলি কেন বল ত!" পরে তড়িৎকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তুমি বাবা কিছু ভেব না, ও ব্যথা আমার এমনিতেই হয়, আবার এমনিতেই চলে যায়। ওষুধ আমি খাই না, ও আমি আর জীবনেও ছোঁব না। মিথ্যে ডাক্তার ডেকে হাঙ্গামা করো না।"

তড়িৎ এক মিনিট ভাবিয়া নিজের ঘর হইতে ষ্টোভটা আনিয়া জ্বালিয়া দিল। প্রতিমাকে জল গরম করিয়া পেটে সেক দিতে বলিল। অন্নপূর্ণা দেবী কাতর কণ্ঠে প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু বৃথা। দুপুরবেলা যাহার শাসন নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহাকে শাসন করিবার সুযোগ পাইয়া তড়িতের মন যেন কিছু পরিতৃপ্ত হইল। তড়িৎ ও প্রতিমা উভয়ে অন্নপূর্ণার সেবায় ব্যাপৃত হইল।

অন্নপূর্ণা দেবী যখন একটু সুস্থ বোধ করিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন তখন পূর্ব্বাকাশে রূপালী আভাস অতি সুস্পষ্ট। তড়িৎ

নিজের ঘরে ফিরিয়া ক্লান্ত দেহ এলাইয়া দিল নিদ্রার কোলে। ঘুম ভাঙিল অনেক বেলায়।

ইহার পর তড়িৎ নিজেই প্রতিমাদের খোঁজখবর লইত। এই সাধারণ মেলামেশার মধ্যেই তড়িৎ প্রতিমার লেখাপড়ার প্রতি অনুরাগ লক্ষ্য করিল।

তাহার এই মামুলি মেলামেশা অচিরে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল। অন্নপূর্ণা দেবীর কঠিন আবরণের অন্তরালে যে স্নেহের ফল্গুধারা তাহার জন্য নিহিত ছিল তাহা তড়িতের বিপ্লবী অনিশ্চিত জীবনে শ্যামলিমা আনিয়া দিল।

প্রতিমার স্বাভাবিক আত্মমর্য্যাদাবোধ এবং তাহার ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য অচিরে তড়িতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। তড়িৎ নিজেও সংযমী ও সদাচারী। সুতরাং তাহাদের অন্তরের এই সহজ যোগসূত্র উভয়ের মধ্যে একটা অকৃত্রিম অনুরাগ সৃষ্টি করিল।

এই অনুরাগের প্রেরণায় তড়িৎ প্রতিমাকে আনিয়া দিত মহান্ লোকের জীবনী সম্পর্কে দু-একখানা বই। ক্রমে স্বদেশী যুগের বই আনিয়া দিতে আরম্ভ করিল এবং তাহার সহিত এই সমস্ত বই সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করিয়া প্রতিমার আগ্রহকে আদর্শের প্রতি অনুরাগে পরিণত করিল।

প্রতিমার জীবন চলিয়াছিল এতদিন এক উদ্দেশ্যহীন এক ঢিমা-তেতালা কঠোর পথে। ক্রমশঃ তাহার জীবনাকাশে দেখা দিল এক নূতন আদর্শের আলো। প্রতিমা এক দিন আবিষ্কার করিল যে, সে এই আদর্শকে নিজের একান্ত অজ্ঞাতে আকণ্ঠ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে। মনে মনে কহিল, "ভগবান, আমাকে শক্তি দাও, আমায় উপযুক্ত কর।"

আজকাল প্রায়ই প্রতিমা ও অন্নপূর্ণা দেবী দুপুরবেলা তড়িতের ঘরে আসিয়া কাটাইয়া যাইত। এমনি এক দুপুরবেলায় প্রতিমা ঘরে ঢুকিয়াই ঘর গুছাইতে আরম্ভ করিয়া মন্তব্য করিল, "সম্বলের মধ্যে দুটো কাপড়, দুটো জামা, একটা কম্বল আর একটা পুঁটলী, তাই দেখছি ঘরময় ছড়ানো।"

"ছেলেবেলা থেকে এই বদ-অভ্যাস হয়ে আছে। আর যাচ্ছে না। এ অভ্যাস আমার বাল্যসহচর। আমার জীবনে অনেক ঘটনা ঘটেছে, অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে, কত পেয়েছি, কত হারিয়েছি তার অন্ত নেই। অনেক বন্ধু পেয়েছি, আবার অনেক বন্ধু বিদায় নিয়েছে, কিন্তু ওটি আমার সত্যিকারের বন্ধু—আজ পর্যন্ত ছাড়তে পারে নি।"

অন্নপূর্ণা দেবী বেশ কৌতুক বোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা না শুনিবার ভান করিয়া কহিলেন, "আজ আমার নামে একটা মনি-অর্ডার এসেছে, কিন্তু কি একটা গণ্ডগোল বেধেছে, তুমি যদি বাবা পোষ্ট-আপিসে গিয়ে কিছু একটা বিহিত করে আসতে পার।"

তড়িৎ ইহার কোন জবাব না দিয়া পোষ্ট-আপিস যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

"তোমার কিন্তু এসব বালাই নেই তড়িৎ-দা! ডাকপিয়নও তোমার খোঁজ করে না, পোষ্ট-আপিসে যাতায়াতও তোমার কোন প্রয়োজন হয় না—কৌতুক করিয়া কহিল প্রতিমা। তড়িতের নিকট হইতে কোন জবাব না পাইয়া পুনরায় কহিতে লাগিল, "আচ্ছা তড়িৎ-দা, মা, বাপ, ভাইবোন ছেড়ে এই দূরদেশে একা পড়ে থাকতে তোমার কষ্ট হয় না!"

"তার সুযোগ তোমরা দিচ্ছ কৈ! তোমরাই করে দিয়েছ আমার সে অভাব পূরণ। তোমাদের স্নেহে যত্নে ভালবাসায় আমি মা-বোনের অভাব বোধ করবার ফুরসতই পাচ্ছি নে। অবস্থা এখন এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এখন আমার না খেয়ে থাকবার বা অসুখ হলে খামোখা দু'দণ্ড বিছানায় পড়ে চেঁচাবার উপায় রাখো নি।"

প্রতিমা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা দেবী যেন হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলেন। ভারী গলায় বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন—"ওসব ভালবাসা-টালবাসা আমি জানি নে বাপু—আমার কেউ নেই, আমি কাউকে চাইও না, দয়া-মায়া আমার ধাতে নেই বাপু।"

তড়িতের বিস্মিত দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া প্রতিমা কহিল, "কিছু মনে করো না তড়িৎ-দা। মাঝে মাঝে মার যে কি হয় তার ঠিক নেই। জান, মা জীবনে আঘাত পেয়েছেন অনেক—তাই বোধ হয় মাঝে মাঝে···"—প্রতিমা কথাগুলি শেষ করিতে পারে নাই, তাহার গলাও খুব সহজ ছিল না।

"তোমার মায়ের করুণায় আমি অভিভূত প্রতিমা। এ সামান্য কথায় আমি কি মনে করব।"

"কাল রাতে কথায় কথায় মা বলছিল, 'জানিস পাঁচু, এ তড়িৎ নিশ্চয় তোর দাদা দেবেশের বাল্যবন্ধু। ওরা ছিল একেবারে রাম-লক্ষ্মণ। তড়িৎ স্বদেশী দলে ভিড়বার পর কর্ত্তা ওর সঙ্গে দেবেশের মেলামেশা বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু গোপনে ওদের মেলামেশা কোন দিনই বন্ধ হয় নি। তার পর যেদিন দেবেশ আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেল সেদিনকার কথা আজও আমার মনে আছে। ঐ ছোঁড়া বাড়ী ঢুকল না, কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি কান্না। ওর কান্না দেখে শোক ভুলে গেলাম—মনে হ'ল দেবেশ আমার ওর মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছে। মা এ পর্য্যন্ত বলেই থেমে গেলেন। একটু পরে হঠাৎ যেন কার উপর চটে গিয়ে বলতে লাগলেন তারপর তুই ছোঁড়াও এক দিন ঘরছাড়া হলি—তোকে আর দেখতে পেলাম না। মনে হ'ল হাড় জুবলো। কিন্তু আবার কেন—কেন-কেন-কেন!' মাকে এমনি ভাবে উত্তেজিত হতে আমি কোন দিন দেখি নি। ভয় পেয়ে গেলাম। অনেক বুঝিয়ে মাকে আস্তে আস্তে শান্ত করে ঘুম পাড়ালাম। ওর কথায় রাগ করো না তড়িৎ-দা।"

তড়িৎ সমস্ত কাহিনী রুদ্ধনিশ্বাসে শুনিয়া এই মনে করিয়া আশ্চর্য্য হইল যে, এতদিন দেবেশের মাকে চিনিতে পারে নাই। তাহার স্মৃতির পর্দ্দায় ভাসিয়া উঠিল বহু দিনের বিস্মৃত অনেক চিত্র।

কি ভাবে তাহার সঙ্গে দেবেশের গোপন মেলামেশা হইত তাহার পিতার নিষেধ সত্ত্বেও, কি করিয়া তাহারা সুরেন বাড়ুজ্জে ও বিপিন পালের মতামত লইয়া তর্ক করিয়া ক্লাসে গোলমাল বাধাইয়া একত্রে বেঞ্চের ওপর দাঁড়াইয়া শাস্তি ভোগ করিত। ঘরে কোনকিছু ভাল খাবার তৈরি হইলেই দেবেশের মা তাহাকে গোপনে খাওয়াইতেন।

সমিতির কাজে তড়িৎ গৃহত্যাগ করিয়াছে অনেক দিন। পিতার মৃত্যুর পরও শেষকৃত্য করিতে বাড়ী ফিরিতে পারে নাই—পুলিস তখন তাহাকে খুঁজিতেছে। তাহার নিজের মায়ের সঙ্গে পরে দেখা হইয়াছিল গোপনে কলিকাতায়। তাহার সেই শোকাচ্ছন্ন বৈধব্য-মূর্তি আজ আবার তাহাকে নূতন করিয়া বাধা দিল। কিছু কাল আর তাহার মার সঙ্গেও দেখা হয় নাই। বহু কাল পর সমিতির কাজে নিজের জেলা-শহরে গিয়াছিল—সেখানে অনেক রাত্রে গোপনে আবার তাহার মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। মা তাহার হাত ধরিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিয়াছিলেন, "এমনি করে আমার আর ভাল লাগে না বাবা, তোর সঙ্গেই আমায় নিয়ে চল—তুই যখন যেভাবে থাকবি আমার তাতে কোনই কষ্ট হবে না। মনে শান্তিই পাব।"

তড়িৎ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে নিজের পারিপার্শ্বিক ভুলিয়া গিয়াছিল। কিসের শব্দে তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিতেই লক্ষ্য করিল প্রতিমা তাহার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, "কি দেখছ প্রতিমা?"

"প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউ।"

"ওটা জলের ধর্ম।"

"কিন্তু তোমাদের নাকি ওটা অবাস্তব।"

"মানুষের বার হতে পারলে ভাল হ'ত। কিন্তু তা ত হই নি, হতে চাইও নে। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না নিয়ে মানুষের সঙ্গে তাদের কল্যাণের পথে এগিয়ে যেতে পারলেই নিজেকে ধন্য মনে করব।"

কথা বলিতে বলিতেই তড়িৎ সিঁড়ি বাহিয়া তরতর করিয়া নামিয়া যাইতে লাগিল। যাইতে যাইতে শুনিতে পাইল, "তড়িৎ-দা, ও তড়িৎ-দা, শুনতে পাচ্ছ, রাত্তিরে আর বাঁধার হাঙ্গামা করো না। তোমার ঘরেই খাবার ঢাকা থাকবে।"

৪

ধীরে ধীরে নিশ্চিত গতিতে তড়িৎ প্রতিমাকে বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতেছিল। প্রতিমা বাংলা হিন্দি যেমন জানিত, তেমন ছোটবেলায় এক পাদ্রী-পত্নীর যত্নে ইংরেজী লেখা-পড়া মোটামুটি শিখিয়াছিল—কথাবার্তাও চলনসই শিখিয়াছিল। সুতরাং এদিকে আর তড়িৎকে তত মাথা ঘামাইতে হয় নাই।

কিছুদিনের মধ্যে তড়িৎ মাঝে মাঝে প্রতিমাকে দিয়া তাহার একান্ত অজ্ঞাতেই সমিতির সাধারণ কাজ করাইয়া লইতে আরম্ভ করিল। প্রতিমা পূর্ব হইতেই রাস্তায় একা চলাফেরা করিত সুতরাং তাহার যাতায়াত কাহারও সন্দেহের কারণ ঘটায় নাই।

এতকাল প্রতিমা যেখানেই যাইত মার সঙ্গেই যাইত, কিন্তু ইদানীং মাঝে মাঝে তাহাকে একা চলিতে দেখিয়া অনেকে, বিশেষতঃ বৃদ্ধারা শঙ্কিত হইয়াছিল। কিন্তু সন্ন্যাসীর মেয়ে বলিয়া কেহ কিছু বলিতে সাহস পায় নাই।

এক দিন দুপুরে প্রতিমা ছাত হইতে কাপড় লইয়া আসিবার জন্য উপরে উঠিতে উঠিতে তড়িতের ঘর খোলা দেখিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল তড়িৎ হাত পোড়াইয়া ফেলিয়াছে। দৌড়াইয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল—"শীগ্‌গির স্পিরিটে হাত ভেজাও।"

কড়াইয়ে বেগুনগুলি পুড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া কড়াইটা নামাইয়া ষ্টোভ নিভাইয়া দিল।

"আজ আর তোমার তরকারি রেঁধে কাজ নেই। ভাত তো তোমার হয়েই গেছে।" কথা শেষ করিয়া প্রতিমা নিজের ঘর হইতে কিছু ডাল তরকারী আনিয়া ভাতের পাশে রাখিবার সময় ভাতের দিকে লক্ষ্য পড়িতে কহিল—"এ ত ভাত নয় যেন তোমাদের জেলের লপসি। এক দিন কিনা বলেছিলে জেলখানার লপসী নাকি এক বছর খেতে দেয়, এ বোধ হয় তাই হয়েছে। বাইরেও সে অভ্যাসটা রাখছ বুঝি। কিছু ভাত ও নিয়ে আসছি।"

"ওর আর দরকার নেই—এ খাসা; বেশ ভাল লাগে।"

"তা ত লাগবেই জানি। ডাল মাছ পেটে পাও না, চাল গেলাই তাদের চরম লাভ মেলায়।"

কথা বলিতে বলিতেই একখানা আসন পাতিয়া খাবার জায়গা করিয়া দিয়া তড়িৎকে খাইতে বসিতে অনুরোধ করিল। তড়িৎ খাইতে আরম্ভ করিলে প্রতিমা কহিতে লাগিল—"আচ্ছা, তুমি একটা হোটেলে থাকতে পার, নয়ত একটা বামুনকে বা বামনীকে কিছু পয়সা দিলে সেই তোমার রান্না-বান্না করতে পারে। দু'বেলা খাওয়া তোমার প্রায়ই হয় না মনে হয়। যে দিন একবেলা জোটে ভাত ত দেখেছি আলুভাতে আর বেগুনপোড়া।"

"বিদেশে বিভূঁয়ে এর চেয়ে আর কি চাই বল ত?" মন্তব্য করিল তড়িৎ।

"বিদেশ বিভূঁই ত আপনার নিজেরই সৃষ্টি। এ চলবে আপনার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। কিন্তু টাকার অভাব আপনার আছে বলে ত মনে হয় না। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আপনার পকেটে দেখেছি।"

তড়িৎ প্রতিমাকে বৈপ্লবিক জীবনে টানিয়া লইতেছিল। প্রতিমা জানিত তড়িৎ 'স্বদেশী' করে, কিন্তু তাহার সত্যিকারের রূপ কি তাহার সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না, তড়িৎও পরিষ্কার করিয়া এতদিন বলে নাই। মনে করিয়াছিল কর্মের মধ্য দিয়াই প্রকাশ হইলে ফল ভাল হইবে। সুতরাং আজও তাহাকে টাকার আসল রহস্য গোপন করিয়া মন্তব্য করিল—"আমি বড্ড কৃপণ। তুমি কৃপণ বড়লোক দেখ নি কখনও? তারা ক্ষুধায় মরে গেলেও

পয়সা খরচ করে খায় না, শীতে কষ্ট পেলেও জামা কেনে না! আমি আসলে তাই···"

"থাক আর মিথ্যে কথার ঝুড়ি বাড়িয়ে লাভ কি তড়িৎ-দা! কৃপণ লোক ঢের দেখেছি। আপনারা আসলে সেই জাতীয় লোক যারা নিজেকে উজাড় করে পরকে ভরে তোলে; পরকে নিশ্চিন্ত করতে নিজের ঘাড়ে ঝঞ্ঝাট তুলে নেয়—অপরের সংসার গড়তে গিয়ে নিজের সংসার ছারেখারে দেয়—আর পরের মুখে হাসি ফোটাতে আপন জনকে কাঁদায়।" প্রতিমার চোখ জলে চক্ চক্ করিতেছে।

তড়িতের মনে হইল প্রকাশ করিবার দিন আসিয়াছে। ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল—"কৃপণ আমি সত্যি নই বোন। যে টাকা আমার কাছে দেখিস বোন, ও ত আমার সুখের জন্য খরচ করতে নেই এটা কি তুই আজও বুঝতে পারিস নি?" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবহাওয়াকে হালকা করিবার জন্য পুনরায় কহিতে লাগিল—"তোদের স্নেহের অত্যাচার দিন দিন যে পরিমাণে বাড়ছে তাতে মনে হচ্ছে তোদের জন্যই আমাকে এখান থেকে পালাতে হবে।"

"পালাও না কেমন পার।" প্রতিমার এই তুমি সম্বোধন তড়িৎ ও প্রতিমা উভয়কেই মুহূর্তের জন্য চকিত করিয়াছে। প্রতিমা কখনও আপনি, কখনও তুমি বলিত। কিন্তু এমন দরদভরা তুমি যেন কখনও বলে নাই। কিন্তু প্রতিমা অসঙ্কোচে এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনকে গ্রহণ করিয়া কহিতে লাগিল—'মা কাল রাতে কি বলছিল জান ত, মা বলছিল তড়িৎ ও দেবেশ ত ছেলেবেলায় একই পথে চলছিল। বেঁচে থাকলে আজ সেও হয়ত ওরই মত সব ছেড়ে সেই আদর্শ ধরেই চলত। দেবেশের অন্ত হতে ভেবেছিলাম বিশ্বনাথের চরণতলে জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটিয়ে দেব, কিন্তু বিশ্বনাথ যখন তড়িৎকে আমার কাছে আবার ফিরিয়ে দিয়েছেন তখন ওকে আর ছাড়ব না। পারবে তুমি মাকে ছেড়ে যেতে তড়িৎ-দা?"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কেন আমাকে তোমার কাজের সঙ্গী করে নাও না তড়িৎ-দা।"

তড়িৎকে কোন জবাব না দিতে দেখিয়া কহিতে লাগিল, "তুমি হয়ত ভাবছ পারব কিনা। পারব, নিশ্চয়ই পারব। প্রথম প্রথম হয়ত দোষ-ত্রুটি হবে, তুমি শুধরে দিও। এক দিনেই আর কেউ সব শিক্ষা পায় না।"

এতদিনকার সাধনা সফল হইয়াছে দেখিতে পাইয়া মনে মনে আনন্দিত হইল। যে বিপ্লবের বীজ প্রতিমার অজ্ঞাতে তাহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল তাহার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করিতে তড়িৎ মন স্থির করিল।

নীচ হইতে অন্নপূর্ণা দেবীর ডাক শুনিয়া প্রতিমা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ

অশান্ত ধরা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

শান্ত হয়েছে ক্ষুব্ধ পৃথিবী, শান্তি কোথায় প্রভু?
ক্লান্ত ক্ষণিক যুযুৎসু দল, ক্ষমা নাই—নাই তবু।
কোথায় করুণা? কোথায় মমতা? নিত্য-নিরন্তর
শুধুই বিবাদ, শুধুই বিভেদ, শুধুই আত্মপর।

শুধু জেগে আছে রক্ত চক্ষু, শুধু ঘৃণা-বিদ্বেষ,
আদিম কালের বর্ব্বর যুগ আজো কি হ'ল না শেষ?
মানুষ সত্য—ব'লে গেছে যারা, মিথ্যা তাদের বাণী?
ক্ষমতা এবং প্রভুত্ব তরে সেই চির-হানাহানি!

মানব কি শুধু কামনা করেছে প্রলয়-আবির্ভাব,
দানবী সাধনা করি' আণবিক অস্ত্র করেছে লাভ?
বিধাতার কাছে প্রার্থনা তার সৃষ্টির তরে নয়?
শান্তি চাহে নি, সত্য চাহে নি, চেয়েছে কি শুধু জয়?

হেথা আদর্শ-সংঘাতে বুঝি ওঠে শুধু হলাহল,
বিষাক্ত ধূমে সমাচ্ছন্ন আকাশ-ধরণীতল।
অতীতে দেখেছি ধর্ম্মের নামে ক্রুসেডের অভিযান,
নীতির যুদ্ধে উগ্র ক্রুসেড আজো সে বর্ত্তমান।

এ-দেশ ও-দেশ, আমরা ও ওরা, পশ্চিম আর প্রাচী
কাহারো মধ্যে মিলন হ'ল না, এল নাকো কাছাকাছি।
ধনতন্ত্র ও গণতন্ত্র ও নায়কতন্ত্রগুলি
রচিয়া আড়াল মানুষের মনে প্রাচীর দিয়াছে তুলি।

মানুষ কি শুধু 'মতে'র মূর্ত্তি? শুধু কি 'বাদে'র বাদী?
চিরদিন ধরি' পরস্পরে কি ক'রে যাবে অপরাধী?
প্রকৃতির মাঝে মানুষ করেছে সুন্দরে সন্ধান,
শুধু আপনারে পারে নি করিতে আপনি সে সম্মান।

ধর্ম্ম ও দেশ, বর্ণ, সমাজ, রাষ্ট্রের মাপে মাপা
ওরা নিষ্প্রাণ যন্ত্রের জীব, মানুষ পড়েছে চাপা।
কে চেনে কাহারে? কোথায় হৃদয় হাসি ও অশ্রু-ঝরা?
অপরিচয়ের বেদনা দিয়া যে এই সংসার গড়া।

ক্লান্ত মানব যুদ্ধ-বিরত, শান্তি কোথায় প্রভু?
হ'ল না হ'ল না পীড়িত মনের পরিবর্ত্তন কভু।
বল বল তুমি, অপরূপ সেই জীবন-মন্ত্রে কবে
গড়িয়া উঠিবে নূতন পৃথিবী, মানুষ মানুষ হবে?

গৃহাভিমুখে

শিল্পী—শ্রীহরেন দাস

শিল্প এবং শিল্পী

শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের দেশে ছবি আঁকা বা মূর্ত্তি গড়া যাদের পেশা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দারিদ্র্যকে তাদের বরণ করে নিতে হয়। কারণ ছবি কিংবা মূর্ত্তি সম্বন্ধে এদেশের লোকের অনুরাগ কম। শিল্পবোধের উন্মেষসাধনে ও রসগ্রহণে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন আছে—আমাদের দেশে সে সুযোগ নেই বলে সর্ব্বসাধারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ বিষয়ে উদাসীন : আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের ক্ষেত্রেও সৌন্দর্য্যানুভূতির, উন্নত রুচির কোনও স্থান নেই। ফলে শিল্পকলার যথাযোগ্য সমাদর হয় না। ছবি বা মূর্ত্তি আমাদের দেশে কদাচিৎ বিক্রী হয়। যাঁরা শিল্পকর্ম্মে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন, তাঁদের ছবির কিছু চাহিদা আছে—কিন্তু যাঁদের খ্যাতি কম, সার্থক শিল্পী হলেও তাঁদের শিল্পকর্ম্মের আশানুরূপ চাহিদা নেই। এই সব কারণে শুধুমাত্র ছবি এঁকে বা মূর্ত্তি গড়ে শিল্পীর সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা চলে না। ছাত্রাবস্থার পরই যখন জীবন-সংগ্রামে রত হতে হয়, তখন অধিকাংশ শিল্পীই বিজ্ঞাপন-চিত্র আঁকা সুরু করেন বা অন্য পেশা অবলম্বন করতে বাধ্য হন। যে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস সুরু হয়েছিল, ক্রমে ক্রমে তা লুপ্ত হয়ে যায়—সৃষ্টির উৎসও ক্রমশঃ শুকিয়ে আসে। কেবলমাত্র অন্নবস্ত্রের সমস্যাই যেখানে গুরুতর রূপে দেখা দেয়—সেখানে সার্থক শিল্পসৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠে।

করাতী

শিল্পী—শ্রীহরেন দাস

দারিদ্র্যের সঙ্গে দেশবিদেশের বহু শিল্পীর কঠোর সংগ্রামের কথা নানা বইয়ে পড়ি—জানতে পারি, দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করেও অনেকে বড় শিল্পী হয়েছেন—সৃষ্টি করেছেন সার্থক শিল্পসম্পদ। কিন্তু আজকের দারিদ্র্যের রূপ আর আগেকার দিনের দারিদ্র্যের রূপে অনেক প্রভেদ।

মূর্ত্তি

ভাস্কর—শ্রীপ্রদোষ দাশগুপ্ত

দরিদ্রের জীবন-সংগ্রাম আজকের যুগে অধিকতর কঠিন এবং জটিল।

অতীত ভারতে রাজা, জমিদার এবং ধনী ব্যক্তিরাই শিল্প-কলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শিল্পকলার রসগ্রহণে, গুণাগুণ বিচারে তাঁদের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়—অতীতের শিল্পসম্ভারই তার প্রমাণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়—অজন্তা, ইলোরা, কোণারকের শিল্প-কলার কথা। কত সুযোগ্য শিল্পীর দীর্ঘকালব্যাপী সাধনায় এর এক-একটা

নৃত্য

শিল্পী—শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরাট শিল্প-পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হয়েছিল—আজকের দিনে ভাবতেও মনে বিস্ময় জাগে। যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যানুভূতি এবং রসবোধ নিহিত রয়েছে এই সব অপূর্ব্ব শিল্পসৃষ্টির মূলে, আমাদের দেশে আজকের সমাজ থেকে তা লুপ্ত হয়ে গেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। সাধারণ মানুষও সৌন্দর্য্য এবং রুচিবোধ বর্জ্জিত ছিল না, তাই তার গার্হস্থ্য

পরিবেশেও শিল্পকলার বিশেষ স্থান ছিল—লোকশিল্পের বিভিন্ন নিদর্শনে তার প্রমাণ মেলে

মেঘমল্লার

শিল্পী শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজারাজড়ার প্রাধান্যের যুগ বদলেছে—শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকের পরিবর্তন হয়েছে। এখন শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক জনসমাজ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, দেশের বিত্তশালী ব্যক্তিরা এবং সরকার। বিশেষ করে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের প্রয়োজনের তাগিদে ক্রমশঃ শিল্পকলার উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক হতে চলেছে।

স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর থেকে ভারতে বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতিমূলক নানা পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে এবং কাজও স্থরু হয়েছে। সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের মত শিল্পকলাও জাতির কৃষ্টির ধারাকে বহন করে চলে। তাই জাতীয় সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির ক্ষেত্রে শিল্পকলার গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য্য। আজকের দিনে তাই শিল্পকলা এবং শিল্পীর কথাও বিশেষভাবে বিবেচনা করবার প্রয়োজন আছে।

আজকের বিশ্বে শিল্পকলার অগ্রগতির ক্ষেত্রে ভারতের স্থান অনেক পিছনে। শিল্পকলার উন্নতিবিধান করতে হলে শিল্পীর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের পথকে স্থগম করতে হবে। উৎকৃষ্ট শিল্পকলার যাতে সমুচিত সমাদর হয়, আর্থিক অসচ্ছলতা যাতে শিল্পীর সাধনার পথে অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়—শিল্পী যাতে উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে তার স্বজনী-শক্তিকে জাতীয় কল্যাণে পূর্ণরূপে নিয়োজিত করতে পারে, রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য তার ব্যবস্থা করা।

স্বপ্ন

শিল্পী —শ্রীগোপাল ঘোষ
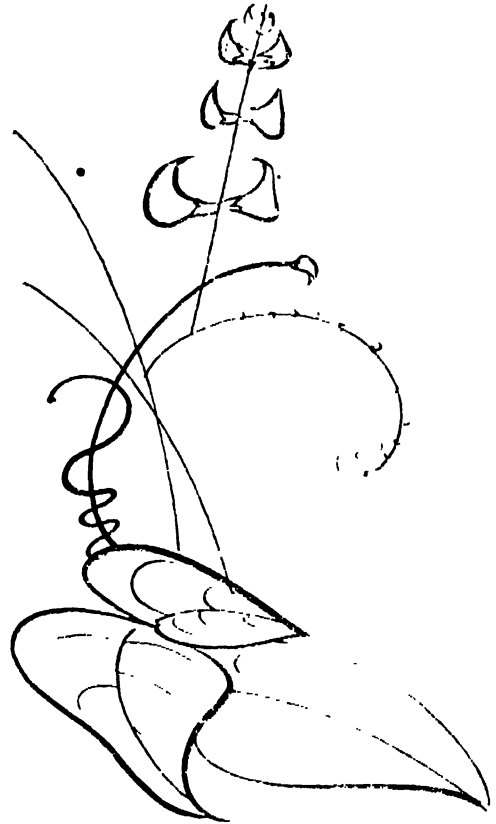
দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিল্পকলার স্থান অতিশয় সঙ্কীর্ণ। প্রচলিত শিক্ষার মাধ্যমে শিল্পে অনুরাগ জন্মায় না, সৌন্দর্য্যানুভূতির বিকাশ হয় না—স্থষ্ঠু রুচিবোধও সৃষ্ট হয় না। জাতীয় জীবনের পরিবেশকে সুন্দর করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাও তাই উপলব্ধি হয় না। শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিল্পকলার বিশেষ স্থান হওয়া উচিত, একথা আজ স্বীকৃত হয়েছে—কিন্তু কার্য্যতঃ উন্নতিমূলক কোনও চেষ্টা এখনও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। অন্যান্য উন্নত দেশে সরকার এবং নানা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন চিত্রশালা দেশের উৎকৃষ্ট শিল্প-কলার নিদর্শন সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করে। জনসাধারণ যাতে আধুনিক চিন্তাধারা এবং শিল্পের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে, সেজন্য বিভিন্ন শহরে উন্নত ধরণের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। ইউরোপ ও

আমেরিকার কোন কোন শিক্ষায়তনে ছাত্রেরাও দেশের সমকালীন শিল্পীদের ছবি সংগ্রহ করছে। এতে করে শিল্পীরাও উৎসাহিত হচ্ছে—ভাল ছবি আঁকার প্রেরণা পাচ্ছে। আর আমাদের দেশে দেখি কলকাতার এত বড় মিউজিয়মে দেশের সমকালীন শিল্পীদের মাত্র কয়েকখানি ছবি রয়েছে—বহু দিন আগে হাভেল সাহেবের চেষ্টায় সংগৃহীত অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিত হালদার, ঈশ্বরী-প্রসাদ প্রমুখ শিল্পীদের কয়েকখানি মাত্র ছবি। আমাদের দেশের অতীত শিল্পকলার কত শ্রেষ্ঠ সম্পদ বাইরে চলে গিয়েছে, সমকালীন শিল্পীদের ভাল সৃষ্টিগুলিও বাইরে চলে যাচ্ছে—দেশের তরফ থেকে দেশের শিল্পসম্পদ সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের প্রচেষ্টার অভাবে। সমকালীন ভাস্কর্য্যের নিদর্শন ভারতের কোন যাদুঘরে রয়েছে বলে জানি না।

দিনান্তে

শিল্পী—শ্রীহরেন দাস

দুর্গামূর্ত্তি-গড়ন

শিল্পী—শ্রীগায়ত্রী দত্ত

বৎসরখানেক হ'ল দিল্লীতে জাতীয় চিত্রশালা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে এবং চিত্রও কিছু কিছু সংগৃহীত হয়েছে সরকারের প্রযত্নে। দেশ স্বাধীন হবার পর সরকারের তরফ থেকে শিল্পকলার উন্নতিসাধনের চেষ্টা কিছু কিছু হচ্ছে। প্রতিভাবান শিল্পীদের অল্পস্বল্প বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করাও হয়েছে। ভারতীয় শিল্প ও ভাস্কর্য্যের প্রদর্শনী ভারতের বাইরেও অনুষ্ঠিত হচ্ছে—ভারতের প্রধান প্রধান শহরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শিল্পকলার প্রদর্শনীতে আয়োজন হচ্ছে—যার দরুন এদেশের শিল্পানুরাগীদের সমগ্র পৃথিবীর শিল্পকলার গতি-প্রকৃতি এবং ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ হয়েছে। এ বিষয়ে দিল্লীর একাডেমী অফ ফাইনআর্টস্ এণ্ড ক্র্যাফট্স সোসাইটির উদ্যম প্রশংসনীয়। কলকাতার একাডেমী অব ফাইন আর্টসের উদ্যোগে ভারতের সাম্প্রতিক শিল্পকলার কিছু কিছু নিদর্শন আমেরিকার বিভিন্ন শহরে প্রদর্শিত হচ্ছে।

কিন্তু এই সব প্রচেষ্টার দরুন আমাদের দেশের শিল্পীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি বড় একটা হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ ছবি বিক্রী খুব কমই হয়। অন্যান্য দেশে সরকারী আপিসে ধনী ব্যক্তিদের বাসভবনে বা সাধারণের বিশ্রামাগারে, লাইব্রেরীতে প্রাচীরচিত্র আঁকা হয়—চিত্রে এবং মূর্ত্তিতে বিশেষ বিশেষ স্থানের পরিবেশকে রূপায়িত করে তোলা হয়, আমাদের দেশে অনুরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হলে বহু শিল্পীর কর্ম্মসংস্থান হ'ত। আজকাল ব্যবসায়ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনী চিত্রের প্রচলন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বহু শিল্পী বিজ্ঞাপনী চিত্র এঁকে জীবিকার সংস্থান করে থাকেন। ভারতেও বিজ্ঞাপনী চিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হতে পারে—অন্যান্য দেশে কিছু কিছু হচ্ছেও।

শিল্পকলার নিদর্শন সংগ্রহ করা সব ক্ষেত্রেই ব্যয়সাপেক্ষ নয়। আমাদের দরিদ্র দেশে দুর্মূল্য ছবি বা মূর্ত্তি সংগ্রহ করার মত অর্থসংস্থান সাধারণের নেই। তবে এমন কতক-

গুলি শিল্প আছে যা সহজেই শিল্পানুরাগী সাধারণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও সংগ্রহ করতে পারেন। বিখ্যাত ছবির ভাল প্রতিলিপি, কাঠখোদাই চিত্র, এচিং, স্কেচ, লিনোকাট, প্রতিকৃতি-চিত্র, এগুলি সংগ্রহ করা খুব বেশী ব্যয়সাপেক্ষ নয়। ধনীব্যক্তিরাও 'ম্যুরাল' এবং ভাল চিত্র, ভাস্কর্য্যশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে পারেন—যদি তাঁদের মধ্যে সৌন্দর্য্যানুভূতি জাগ্রত হয়। শিল্পকলার প্রদর্শনীতে আজকাল জনসমাগম হয় খুব, কিন্তু এও যেন একটা ফ্যাশানে দাঁড়িয়ে গেছে, আসলে শিল্পের প্রকৃত রসগ্রহণে সাধারণ লোক অসমর্থ। ছবি ইত্যাদির মর্ম্মকথা তাদের বুঝিয়ে দেবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন শহরে সম্ভব হলে জনবহুল গ্রামেও শিল্পকলা-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হলে, দেশবাসী আধুনিক শিল্পের ভাবধারা এবং শিল্পকলার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পায়। মাসিক পত্রিকাদিতে যেমন-তেমন ছবির পরিবর্ত্তে ভাল ছবির প্রতিলিপি ছাপার প্রয়োজনীয়তা আছে। শিল্পকলা সম্বন্ধে আলোচনা, বক্তৃতামালার ব্যবস্থা হলে এ বিষয়ে সাধারণের জ্ঞানলাভের সুযোগ মিলবে। বাংলা ভাষায় শিল্পকলা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি খুব কম, আজ পর্য্যন্তও বাংলা ভাষায় ভারতীয় শিল্পকলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয় নি! এই সব বিষয়ে রাষ্ট্রের, জনসাধারণের, এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যেমন কর্ত্তব্য রয়েছে তেমনি শিল্পীদেরও গুরুদায়িত্ব আছে—পরমুখাপেক্ষী না হয়ে তাঁদেরও এ বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

কলিকাতার রাস্তা

শিল্পী—শ্রীইন্দু রক্ষিত

রোমন্থন

শ্রীসবিতা চৌধুরী

কল্পনার রথ
বাতাসের অগ্রে ধায় খুঁজি তার পথ,
উদ্ধ হতে উর্দ্ধতর লোকে আরোহিয়া
সহসা স্বেচ্ছায় পুনঃ আসিল নামিয়া
শান্ত, নম্র, মন্থর গতিতে—
মুগ্ধ, স্তব্ধ, চাহি দেখে সুদূর অতীতে!
যা কিছু পশ্চাতে
ফেলিয়া গিয়াছে চিত্ত, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে,
সবই যেন বহুমূল্য রত্নরাজি সম
জীবনে দিতেছে দেখা! অতি তুচ্ছ, অতি তুচ্ছতম
অতীতের স্মৃতিকণা অন্তরের প্রশস্ত অঙ্গনে
বেদনার ঝঞ্চাবাত্যা—আনন্দের উদ্দাম নর্ত্তনে
জাগে আজি। দুঃখ, ব্যথা, দুঃসহ বেদনা
অতীতের, সবই যেন সুখপ্রসূ, আনন্দের অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা
জাগায়ে তুলিছে মোর অন্তরের নিস্তব্ধ বীণায়
কল্পনার রথ আসি থামিল সেথায়।
পরিত্যক্ত যে-অতীতে প্রবেশ নিষেধ,
যেথায় নিস্ফল চেষ্টা ব্যর্থ লক্ষ্য-ভেদ—
দ্বারপ্রান্তে তার
লুণ্ঠিত মস্তকে নামে শক্তি কল্পনার,
পরম তৃপ্তিতে স্নিগ্ধ মুদ্রিত নয়ন,
অতীতের সুপ্ত স্মৃতি করে রোমন্থন!

জ্যোতির্গময়

শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পনের বছর পরে গৌতম বাড়ী এল।

চাকরির চাকায় ঘুরতে ঘুরতে, ঘর-সংসার টানতে টানতে নানা স্থানে কেটেছে এই সুদীর্ঘ দিন। হয়রানির একশেষ হয়ে উঠেছে জীবনটা। ভাটার টান ধরেছে শক্তিতে, চুল পেকে চলেছে বয়সকে পেছনে ফেলে। বড় বড় ছেলেমেয়ে, ভাইবোনদের সংসারে প্রতিষ্ঠিত করবার মেহনত কতখানি, জীবন-সায়াহ্নে আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে গৌতম। তাই মনে পড়েছে এবার দেশের বাড়ীর এবং পৈতৃক জমিজমার কথা। হাঁপিয়ে উঠেছে একটানা অনুদার বিদেশে, বৎসরান্তে সেখানকার স্নেহপূর্ণ পরিবেশে একটা মাসও কাটিয়ে আসতে পারলে সব দিক দিয়ে সুরাহা হয় অনেকখানি।

শোভা বলেছিল, যাওনা বাপু একবার নিজের বাড়ীতে। অমন সুন্দর দেশ, আত্মীয়-স্বজন, জানা-পরিচয়, কেমন মাঝে মাঝে থাকা যায় দিব্যি।

সেই বিয়ের প্রথম বছরের নীলগঞ্জের মধুময় ছবি ফুটে উঠল শোভার চোখের সামনে।

সুমিত্রাও বৌদির সঙ্গে একমত হয়ে উঠল: সত্যি দাদা, তোমার কাছে আর বৌদির কাছে দেশের যা গল্প শুনেছি, মনে হয় আজই চলে যাই।

—আমিও তাই বলি, বাবা।—বড়ছেলে অসিত প্রবীণের মত সায় দিল: আমাদের দেশ তো স্বর্গ!

নাগপুরের মালভূমি বাংলার এই সীমান্ত পর্যন্ত গড়িয়ে এসেছে। এইখানেই গৌতমের কল্পনার সুইট হোম—নিজের দেশ।

ছোট গাড়ীর ছোট ষ্টেশনে নেমে একটা বাউরি মেয়ের মাথায় সুটকেস আর বিছানা চাপিয়ে দিল। এই এখানকার কুলি।

ষ্টেশনের পাশ দিয়ে দিগন্তবিস্তৃত শালের জঙ্গল। ভোরের ঝিরঝিরে বাতাসে লোদফুল আর কুরচি ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। লাল কাঁকর-বিছানো প্লাটফরমের ধারে সারবন্দী নিমের গাছ, একটা সুন্দর তেঁতোমিঠে পরিবেশ। দূরে শাল-পলাশের পাতা কাঁপছে সিরসির করে।

আনন্দে গৌতমের মনটা নেচে উঠল। সেই ছেলেবেলার মতই সুন্দর নীলগঞ্জ, সকল দেশের সেরা। এ যে তার জন্মভূমি।

ষ্টেশনের টিনের শেড পার হলেই গেরুয়া রঙের ভাঙ্গা কাঁকরের পাকা সড়ক, মিশেছে গিয়ে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সদর রাস্তায়। ডানদিকের আম-কাঁঠালের বাগানের মধ্যে পায়ে চলা পথটা এঁকেবেঁকে বালু-রেখায় চলে গেছে, গৌতম নেমে এল এই আটপৌরে গৃহমুখী সোজা পথে।

নানা মানুষের হাতে গড়া প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বেকার এই ফলের বাগানটা। কিন্তু অবহেলা এবং অত্যাচারের ছাপ যেন ফুটে উঠেছে প্রত্যেকটি গাছে, প্রতিটি ডালপাতায়। বাগানটা যেন বুড়িয়ে গেছে এই কয়েকটা বছরের মধ্যেই, স্থবিরত্বের প্রভাবে ঝিমোচ্ছে একদা যৌবনচঞ্চল গাছগুলো। গাব-ভেরেণ্ডা আর কালকাসুন্দি ছেয়ে ফেলেছে সর্ব্বত্র, ঘাস-আগাছা ভর্ত্তি।

শাল-পলাশের নির্ম্মল মসৃণতা চোখের উপর স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু গ্রামের পথে ঢুকেই সে আনন্দের স্রোত যেন বালুচরে পড়ে গেল।

বাগানটার এমন অবস্থা কেন? গৌতম প্রশ্ন করল বাউরি মেয়েকে।

—যেমন গাঁয়ের দশা বাবু, বাগানেরও তাই দশা হইছেন।

—গাঁয়ের কি দশা হ'ল?

—আর বাবু! আপুনি কি লতুন হন? নীলগনজো আর সি নীলগনজো লাই।

গৌতম সত্যই আজ নূতন লোক, গ্রামের দুর্দ্দশার কথায় চমকে উঠল।

—দেখবেন বাবু, পথটার উপর পাতাঢাকা কুয়ো আছে একটা।

বোঝবার উপায় নেই, কয়েকটা কুলকাঁটা, নীচে আম কাঁঠালের শুকনো পাতার স্তূপ। ওর মধ্যে বুঝি কুয়ো। ষ্টেশন যাবার পথে এমনিধারা বিপদ করে রাখা—গ্রামের লোকের কি দায়িত্ব জ্ঞানও নেই।

কতকটা গিয়ে পথটা একটা সুরঙের মত হয়ে গেছে। এক দিকে তালগাছের সারি, অন্য দিকে কামরাঙার বাগান। তিৎফলার লতা ঝুলছে এধার-ওধার গাছগুলো ঘিরে ফেলে, মাঝের পথটা অন্ধকার।

এটা পার হয়ে গ্রামের মধ্যে গিয়ে পড়ল গৌতম। সামনেই স্কুলের মাঠ, যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে। ঐ গোটা বাগানটা হাসত এক দিন, সকাল বিকেল খেলা করে বেড়িয়েছে এর গাছে গাছে গ্রামের ছেলের দল। আজ ওটা পার হতে ভয়ে যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে এল গৌতমের!

—কুথায় যাবে আপুনি?

বুড়ো শিবতলা।

উদিকের পথটা বড় ঝোপঝাড় গো! তা সকাল বেলা বটে—চলো।

পরিষ্কার সুন্দর রাস্তা বলেই তো গৌতম জানত! একটা গরুর গাড়ী রাত দুপুরে হাসতে হাসতে চলে যেত তার ছোট বেলায়—এমনই সুন্দর আর চওড়া ছিল রাস্তাটা।

একটু থেমে মেয়েটা নিজের মনে গজ গজ করতে লাগল : ঐ হুথা তেলিপাড়ার বাঁকটোয় আঁকোড়তলায় মা-মনসা দিনমানেই বড় উংপাত করছে গো আজকাল ! গাঁয়ে কি মনিষ্যি আছে বাবু, সাপের রাজত্বি শেয়ালের রাজত্বি !

আরও কত কি সে চলতে চলতে বলল, গৌতম সব বুঝে উঠতে পারে নি। তেলিপাড়ার মোড়টায় এসে সত্যিই দেখে, কথাটা মিথ্যে নয়। আঁকোড়ের জঙ্গল, ফণিমনসা আর চোর-পলতা গাছ ঢেকে রেখেছে সমস্ত জায়গাটা। পথের উপর ঝুঁকে এসেছে চারা চারা নাগফণী, সবুজ গাছের উপর সুতীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম কাঁটা বর্ষার জল পেয়ে দুলে দুলে নাচছে। এত পাতলা এর কাঁটা, বাতাসে উড়ে এসে গায়ে বেঁধে।

মেয়েটি গলিটা ছুটে পার হয়ে জানাল, শামুখ-ভাঙ্গা সাপের আড্ডা হয়েছে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন ঝোপের মধ্যে।

চওড়া বালির পথটা বর্ষার ঢল নেমে নেমে মজে উঠেছে একদম। কোনরকমে পাশাপাশি দুটো মানুষ চলতে পারে এখন, গরুর গাড়ীর বোধ হয় অগম্য পথ হয়েছে।

মনে পড়ল, অঘ্রাণ মাসে নবান্ন খেয়ে তারা সব ডাংগুলি খেলত এই পথের উপর। পনের-কুড়ি জন একসঙ্গে হই-হুল্লোড় করত সন্ধ্যে পর্য্যন্ত। সেই সোনার মত ঝকঝকে মিহিবালির কুলিরাস্তাটা মজে ধ্বসে পঙ্গু হয়ে গেছে এই বছর কুড়ির মধ্যে। সাপের ভয়ে প্রাণ নিয়ে ছুটে পালাতে হয় সঙ্কীর্ণ রাস্তাটা।

টাঁড় আর জঙ্গল। ঘাস আর আগাছা যেখানে সেখানে চোখে পড়ে। আর ম্যালেরিয়া ! দূর থেকে শহরের বাবুরা নীলগঞ্জে চেঞ্জে আসত গৌতমের ছেলেবেলাতেও।

পথে, বাড়ীর রোয়াকে যে কয়জনের সাক্ষাৎ মিলল, সবারই যেন পানসে চোখ ম্লান, জ্যোতিহীন। কঙ্কালের পর্য্যায়ে এসে গেছে মানুষগুলো, কয়েক মাসের রোগভোগের ক্লিষ্টতা মুখের উপর চেপে বসেছে। রুক্ষ চুল, হলুদ-বসা দাঁত, তেলচিটে কাপড়ের আঁচল গায়ে জড়ানো। নীলগঞ্জের অধিবাসীর সাদাপেটা চেহারা গেল কোথায় ? পাখার এক ঝাপটায় অনেক কিছু উড়ে গেছে, শুধু রয়ে গেছে জয়ঢাকের মত উদর একটি। ম্যালেরিয়ার দান !

তেমনি ঘরবাড়ীর চেহারা। ঝোপ-ঝাড়ের মাঝে হাড়গোড় বের করা খড়ের ঘর ; দালানগুলো নোনাধরা, টালি আর কড়ি-বরগা খসা। রাস্তার উপরে মুখ উচিয়ে আছে, যেন বলছে—পড়ি পড়ি। পিলেপেটা ছেলেমেয়ে নিঃশব্দে, নির্ভয়ে তারই নীচে দিয়ে আনাগোনা করছে।

বাড়ীর কাছটায় এসে একটু সংশয়ে পড়ে গেল গৌতম। আবর্জনা-আকীর্ণ, ঘুপসি পথটায় মানুষ চলে, একথা ভাবা খুব সহজ নয় অবশ্য। কিন্তু বাড়ীর পাশের রাধাকৃষ্ণের মন্দির চোখে পড়তে সন্দেহের নিরসন হ'ল। ইস্, মন্দিরে উঠবার সিঁড়িগুলো ভেঙ্গে গেছে, চাতাল গেছে ধ্বসে। ছোট ছোট জাফরি ইটের ভেতর হতে সুরকি ঝরে পড়ছে, শুধু মন্দিরের ওপরের কারুকার্য্যগুলি তেমনি অটুট। প্রাচীন শিল্পীর হাতের কাজে কেবল এইটুকু নোনা ধরতে পারে নি, পচা মাটির দূষিত বাষ্প পৌঁছুতে পারে নি দেবায়তনের চূড়ায়।

দরজার কাছে দাঁড়াতেই পাড়ুহাতে মহানন্দর সঙ্গে দেখা। কে রে, গৌতম নাকি ?

—কাকা !

প্রণাম করল গৌতম। মহানন্দ আশীর্ব্বাদ করে বললেন, আয়। ভাল আছিস? বৌমা, ছেলেমেয়ে…

—ভাল, কাকা।

একই বাড়ীর পশ্চিম দিকটা পেয়েছে গৌতম, এদিকে থাকেন মহানন্দ। মাঝে মাটির দেয়াল।

এদিকে পেরিয়ে এসে উঠানে পা দিতেই গৌতম দাঁড়িয়ে পড়ল। কালমেঘ, ধুতরোফুল, কালকাসুন্দি—গোটা বাড়ীটা গ্রাস করেছে। জায়গায় জায়গায় কাঁটানটে, কণ্টকারির ঝাড়। দেয়ালের মাঝখানটা ভাঙা, এ পাশটায় একটা আস্তাকুঁড় পচা জলে নরককুণ্ড সৃষ্টি করেছে। সবকিছু জঞ্জাল কাকা দেওয়াল পার করে এখানেই পাচার করেন বোধ হয়। পায়রার বিষ্ঠা আর পালকে রকটা বোঝাই তালাটাও মরচে পড়ে খোলা অবস্থায় বোবার মত ঝুলছে।

এই গৌতমের নিজের বাড়ী। কল্পনার সেই নীলগঞ্জের স্বপ্ন-মাখা ছেলেবেলার বাড়ী ! এই একটুখানি বাড়ী, এই নীলগঞ্জের কথা কত রকমে সে গল্প করেছে, তার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে কত আশা, কত রঙ ছড়িয়ে।

মনের মধ্যে গৌতমের কান্না ঠেলে এল।

পরিষ্কার করাতে লেগে গেল সারা সকালটা।

এদিকে লোকের মুখে মুখে গোটা গ্রামে প্রচার হয়ে গেল, গৌতম এসেছে। শিক্ষায়, সম্মানে গ্রামের ইতিহাসে শীর্ষস্থানীয় সে ; সকলের ধারণা সে খুব বড় একটা সরকারী অফিসার, প্রভাব-প্রতিপত্তিও অসাধারণ !

কাকার অন্তরে যাই হোক, বাইরে খুব হৈচৈ করলেন, এজমালি পুকুর থেকে সেরচারেক কাতলা একটা এনে ফেললেন। অন্ততঃ আজকের দিনটা আমার ওখানে খেতেই হবে বাবা।

অর্থাৎ, কাল থেকে নিজের ব্যবস্থা নিজে তুমি করে নিও কিন্তু।

তবু গঙ্গাজলেই গঙ্গাপুজো করছেন ! দু-চার বিঘে যা আছে, তিনিই তো ভোগ করেন। এতক্ষণে হাসল একটু গৌতম।

একটি আধাবয়সী মেয়ে বেশ চটকদার সজ্জায় দাওয়ায় বসে ধান ঝাড়ছে আর হাসছে মিটিমিটি এদিকে তাকিয়ে। ঠিক এমনি অবস্থায় পাড়ার কয়েকটি ছোকরা একেবারে সামনে এসে পড়ে যেন বিষম অপ্রস্তুত হয়ে গেল। মেয়েটির হাবভাব ভাল নয়, গৌতমও লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠল।

দেবেন তাদের লীডার, একটু মুচকি হেসে বলল, আমরা 'নবীন

সঙ্ঘ'। আজ ভলিবলের ফাইন্যাল। আপনাকে প্রেসিডেন্ট করতে চাই, যেতে হবে কিন্তু বিকেল চারটায়।

তার পর একটু উসখুস করে বলল, একটা কথা গৌতম-দা। তরুণ-সঙ্ঘ আমাদের বিপক্ষে তাদেরও আজ ফাইন্যাল। আমাদের দলে চোদ্দটা টীম, ওদের মাত্র আটটা। আমাদের কাছেই যাবেন কিন্তু।

এই একটা গ্রামে দুটো খেলার দল? বিস্মিত গৌতম প্রশ্ন করল।

এখন দুটোয় ঠেকেছে, ছিল চারটে। সমাজসেবী দলের ছেলেটাকে আটক রেখেছে জেলে, ওদের টীম উঠল। টাউন-ক্লাব তো টাকার হিসেব নিয়ে ঘরে ঘরে ঝগড়া করেই ভাঙল।

বিদায় নিল তারা। যাবার পথে কে যেন বলছে, এসেই জুটে গেছে রে ভাই।

আর একজন বলল, চুপ।

শুনল গৌতম। ছেলেমানুষের দল, কিন্তু এই বয়সেই এই রুচি! শূন্যের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

খুড়িমা তাগাদা দিলেন, চান কর, বাবা।

কাকার ছেলেমেয়ে বোধ হয় ডজনখানেক, প্রায় জনসাতেক ঘুর ঘুর করছে গৌতমের চারদিকে। কেউ সুটকেশ খুট খুট করছে, কেউ ঠিক পাশে বসেই পকেট আন্দাজ করছে হাত দিয়ে। যখনই জিজ্ঞাসা করে, কাকা এটি কে?

—ও? আমার ন' ছেলে—ভোতা।

—আর এটি?

—ছোট মেয়ে—নেকা।

ছোট মেয়ে নেকা কিন্তু বড় সেয়ানা, হাত লাগিয়েছে আসল জায়গায়। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে, একটা টাকা দাও না। এবং অনুমতির অপেক্ষা না করেই সে তৎক্ষণে বের করেছে টাকা-পয়সা, যা-কিছু ছিল পকেটে। বাকি ভাই-বোনেরা ইশারা করল, নেকা চটপট ছুট দিল দরজা দিয়ে।

অতঃপর একটা চাপা জয়ধ্বনি, পর পর সকলের, অন্তর্দ্ধান। কাকা ও খুড়িমা এতক্ষণ হাত আড়াল দিয়েছিলেন, বললেন, দুষ্টুমি করছে বুঝি ছেলেগুলো?

গৌতম লজ্জায় পড়ে বলে, না—না—

বাইরে কে ডাকল। কাকীমা স্নেহ দেখিয়ে ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, বাছাকে আমার নাওয়া-খাওয়া করতে দেবে না!

এলেন গ্রামের কয়েকটি ভদ্রলোক। রমাই ভট্টাচার্য্য, রঘুনাথ রায়, ইন্দ্র চৌধুরী, আরও জন দুই। বৃদ্ধ রমাই দাওয়ায় বসে সেই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে একটু রহস্যজনক ভাবে হাসলেন, এই ধানের গুঁড়োর মধ্যেই বসে আছ বাবা? অনেক বড়টি হয়েছ, কৃতকর্ম্মাও হয়েছ। এবার গাঁয়ের একটু দেখাশোনা করো। তোমারও তো একটা কর্ত্তব্য আছে!

—আজ্ঞে। কি করতে হবে বলুন? আমার তো আবার চাকরি—

মুখের কথা বন্ধ করে দিয়ে ইন্দ্র চৌধুরী বললেন, তা বলে কি দেশটা পাঁচভূতে লুটে খাবে? গৌতম মুখ তুলতেই তিনি বুঝিয়ে দিলেন: এই ইউনিয়ন বোর্ড—ওটা হয়েছে একটা মদের আড্ডা, বাবাজী, গাঁজা-গুলির আড্ডা। তুমি সেদিনের ছেলে, তোমাকে বলতে লজ্জা—

রঘুনাথ সম্মতিসূচক ম্লান হাসলেন, কোন শব্দ হ'ল না সে হাসিতে। বললেন, দশটা দল হয়েছে বাবা। দেশের ভাল লোক সব কোণঠাসা হয়ে বসে পড়েছে, রাজত্বি করছে চোরগুলো। তোমাদের মত বিদ্বান লোকেরা যদি এগিয়ে না আসে—বলে তিনি দেশের অবশ্যম্ভাবী দুর্দ্দশার ইঙ্গিত ঘাড় নেড়েই সমাপ্ত করলেন।

—প্রেসিডেন্ট কে জানো? ঐ যদুনন্দন সরকার। বোশেখ মাসে একটা সার্কেস পার্টি এল, সে হুজুগে বোর্ডের আপিস ঘরের পেছনে সব মেম্বাররা মদ আর—

—থাক ওসব কথা—

রঘুনাথ সুরটা একটু নীচু করে বললেন, যেন ভয়ে ভয়ে: পথে-বিপথে চায়ের দোকান, তার ভেতরে আবার একটা করে স্পেশাল ঘর। অনেক গণ্যমান্য লোককে সেই ঘরের মধ্যে দেখতে পাবে একটু রাত হলেই।

আলোচনা শেষ হ'ল। অনেক আশা-ভরসা দিয়ে এবং অনেক আশা-ভরসা পোষণ করে এঁরা বিদায় নিলেন এক ঘণ্টা পর। কালই একটা সাধারণ মিটিং ডাকা হবে, সভাপতি হতে হবে বাবাজী গৌতমকে।

তেলের বাটি হাতে বের হলেন খুড়িমা। কাকা সামনে বসে পড়ে হাত ঘুরিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, এ গাঁয়ের কাউকে আর বিশ্বাস করো না বাবা। সেদিন আর নেই।

গৌতম কথাটি বলতে পারল না; কি আছে, কি নেই, হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পেরেছে এরই মধ্যে।

খাবার পর নিজের ঘরে শোবার উদ্যোগ করল গৌতম, একটা উই-ধরা চৌকির উপর কম্বল বিছিয়ে।

—পান নাও।

দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে সেই মেয়েটি; হাতে পানের বাটি, মুখে চটুল হাসি।

—গৌতম আছে?

কয়েকটি লোক একেবারে দরজার কাছে এসে পড়েছে। মেয়েটি পানের বাটি ত্রস্তভাবে নীচে নামিয়ে দিয়ে কেমন একটা অহেতুক তৎপরতার সঙ্গে তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল।

গৌতমের মনে হ'ল, বাইরের লোকগুলি যেন দাঁড়িয়ে পড়েছে। বিমূঢ় ভাবটা ঝেড়ে ফেলে বাইরে এল, আপনারা ভেতরে আসুন।

—ব্যস্ত আছেন কি? না হয় বিকেলে আসতাম।

প্রশ্নের অর্থ পরিষ্কার। গ্রামের এই হয়ত আজকের পরিবেশ, কাঁটায় ঢেকে ফেলেছে এর প্রতিটি ইঞ্চি মাটি। তবু হাসি টেনে গৌতম বলল, ব্যস্ত আর কি? আসুন।

পরিচয় হ'ল এদের সঙ্গে, অনেকেই বন্ধুস্থানীয়। এসেছেন গ্রামের স্কুল সম্বন্ধে আলোচনার জন্যে। স্কুল কমিটি বুঝি জোচ্চোর; অযথা খরচ দেখায়, টাকা বার থেকে আদায় করে জমা করে না খাতায়; ভাল হেডমাষ্টার এলে তাকে পাগল সাজিয়ে, ইংরেজী জানে না ইত্যাদি বলে তাড়িয়ে দেয়। এই সব অভিযোগ। প্রেসিডেন্ট তাঁর দল নিয়ে এমন শিকড় গেড়ে বসে আছেন—কমিটি ভাঙতে হবে এবং গৌতমকে আসতে হবে দু-এক দিনের মধ্যে মিটিং একটা ডেকে ইত্যাদি।

সারারাত্রি ট্রেনের ধকলের পর দুপুরটা একটু ঘুমুবে ভেবে-ছিল, কিন্তু এই ঘণ্টাকয়েক লোকের সঙ্গে পরিচয় করে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা বুকে জমাট বেঁধেছে, তাতেই ঘুম তার চোখ থেকে বিদায় নিয়েছে।

তারপর খেলা দেখে গ্রামটা একটু ঘুরে সন্ধ্যার সময় যখন বাড়ী ফিরল, তখন গৌতম প্রায় মুষড়ে পড়েছে। তার আশা ছিল, এইখানেই এবার স্থায়ী বাসা বাঁধবার চেষ্টা করবে। এই তার গ্রাম, এককালের বিখ্যাত নীলগঞ্জ। রেশম এবং লাক্ষাকে কেন্দ্র করে যে শিল্প এখানে গড়ে উঠেছিল, "গেজেটিয়ারে" পর্য্যন্ত তার উজ্জ্বল ইতিহাস লিখিত আছে। সুদূর জার্ম্মানী পর্য্যন্ত নীলগঞ্জ সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল এই সব ব্যবসার দৌলতে। গালা গলাবার ভাটি, নীলকর সাহেবের কুঠি, গ্রামের প্রান্তিক সীমানায় এদের ভগ্নাবশেষ এখনও পথিকের ঔৎসুক্য জাগায়, তারা আজ মূক, কিন্তু তবু মুখর। কোথায় সেই নীলগঞ্জ? সেঁয়াকুলের জঙ্গল গ্রাস করেছে ঐতিহাসিক পীঠভূমি, হলদে রঙের কলকে ফুল নীরবে মৃদু মৃদু হাসে আজ নীলকর সাহেবের কাছারিবাড়ীর ভাঙ্গা ইটের স্তূপের উপর। শেয়াল আর নেউলের ছুটোছুটি দেখে এসেছে গৌতম গ্রাম ঘুরতে গিয়ে।

সন্ধ্যারতি আরম্ভ হয়ে গেছে। এতক্ষণে একটু যেন তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে দাঁড়াল গৌতম রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের সামনে। নষ্ট গ্রাম, ভগ্ন দেউল, শুধু পাথরের দেবতার হাসিটি তেমনি আগেকার মত মিষ্ট। রঙ্গভরা জগৎমাঝে তিনি বুঝিবা বসে বসে মজা দেখছেন, আর মুখ টিপে হাসছেন।

প্রণাম করে গৌতম ঘরে ঢুকল। এক ডজন সন্তানের পিতা মহানন্দ খেজুর পাতার তালাই বিছিয়ে আধ ডজনকে ঘুম পাড়িয়েছেন, বাকিগুলোকেও প্রায় কাত করে এনেছেন। বললেন, এস বাবা।

শীতটা পড়ি-পড়ি সময়, ঠাণ্ডা বাতাসও দিচ্ছে, তবু হাতে তাঁর একটা তালপাতার পাখা চলছে। গৌতম সেটার দিকে দৃষ্টিপাত করতেই তিনি হাসলেন, পাখাটা দেখছ? ঐ—

অর্থটা পরিষ্কার করবার দরকার হ'ল না। প্রথমে সরোষ গুঞ্জন গৌতমকে সচকিত করল, তারপর দলে দলে আক্রমণ ও দংশন। থপ থপ করে গায়ের সর্ব্বত্র বসে অদৃশ্য মশকের দল, মুহূর্ত্তে শরীরের স্থানবিশেষ ফুলে ওঠে। বুঝতে পারল গৌতম—জীর্ণ গ্রাম আর ক্ষয়িষ্ণু মানুষের মৃত্যুদণ্ড বিধান করছে কে?

—গৌতম বাবা মশারি এনেছ তো? আমরা আবার মশারি ব্যাভার করি না—দম বন্ধ হয়ে যায়!

গৌতমের মুখ শুকিয়ে গেল, খেয়াল হয় নি এ বিশেষ প্রয়োজনটার। তবু আমতা আমতা করে বলতে হ'ল, সে ঠিক করে নেব'খন।

রাত্রে খেতে বসে কাকা আসল কথাটাই পাড়লেন, নিজের কথা। রেলে মালবাবু ছিলেন তিনি, বছরকয়েক রিটায়ার্ড করেছেন। উপযুক্ত ভাইপো যদি কিছু একটা করে দেয়, যেমন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, অন্ততঃ মেম্বার, নয় ত স্কুল কমিটিতে একটা কিছু—সংসারটা যেমন করে হোক চলে।

জমিজমা আর কয়েক টুকরো বই তো নয়, তাতে চলে কি করে! আগামীকাল এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে উঠে পড়ল গৌতম। সারাদিন বড় ধকল গেছে শরীরটার উপর। একটু বিশ্রাম দরকার।

নিজের ঘরে শুয়ে দু'হাতে মশা তাড়াচ্ছে আর ছটফট করছে, কাকীমা এলেন—জল খেলে না, বাবা?

—ও ভুলে গেছি। রেখে যাও।

কাকীমা হঠাৎ একটু থেমে একেবারে চৌকির উপর বসে পড়ে গৌতমের হাতদুটো ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে সুরু করে দিলেন—আমাকে একটু দেখ, বাবা?

সর্ব্বনাশ! আবার কোন্ বিপদ এল।

কিন্তু না, বিপদ অন্ততঃ তার নয়। ইনিয়ে বিনিয়ে কাকীমা বলতে লাগলেন মহানন্দ কাকার কথা। ষাটের উপর বয়স হ'ল, কন্তু এখনও স্বভাব পালটাল না। ঐ মেয়েটি ধান ঝাড়ছিল, কলকাতা ফেরত ঝিয়ের মেয়ে, নাম নমিতা, তার বাড়ি যাওয়া আসা চলছে। একশ' টাকায় ষাট সত্তর টাকা সুদে টাকা ধার দিয়ে একদিকে লোকের সর্ব্বনাশ করছে, আর এদিকে ডোবাচ্ছে। পাড়ার লোক আরও অনেকে।

একটু থেমে কাকীমা বললেন, হাঁরে, তোর সঙ্গে নমির কোন কথা হয়েছে?

—আমার সঙ্গে? গৌতম শঙ্কিত হয়ে উঠল।

—নমি তো বলছে সকলকে, দাদাবাবুর সঙ্গে যাবে, কথাবার্ত্তা সব হয়ে গেছে। তা নিয়ে যা না। ঝিয়ের কাজ ও বেশ ভাল পারবে।

ক্ষোভে, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল গৌতম। আধঘণ্টা পর কাকীমা চোখের জল মুছে বিদায় নিলেন।

ঘুম অবশ্য আসে নি। শেষরাত্রে চোখটা একটু জড়িয়ে এসেছিল, গৌতম ধড়মড় করে উঠে বসল। সুটকেশ বিছানা গুছিয়ে নিল। কাকীমার দেওয়া জলটুকু চোখে দিয়ে গেলাসটি বাইরে রেখে মরিচাধরা তালাটা আবার দরজায় লটকিয়ে দিল।

আর না। পালাতে হবে এখনই। নীতিকে পুড়িয়ে খেয়েছে নীলগঞ্জবাসীরা, সুন্দরকে সমাধি দিয়েছে, এঁদোপুকুরের বিষাক্ত

মাটি পরস্পরের গায়ে ছিটিয়ে উৎকট ধুলটে উন্মত্ত হয়েছে। নীলগঞ্জের শ্মশানে একটি দিনে তার ছেলেবেলায় কল্পনার জন্মভূমি ছাই হয়ে যায় বুঝি। ঝলসে গেছে ছবি, এখনও পালালে হয়ত কল্পনাটুকু অক্ষয় হয়ে থাকে। না হলে বাঁচবে কি নিয়ে গৌতম?

নিজেই সুটকেশ বিছানা কাঁধে করে বের হয়ে পড়ল সে। ছাদের কার্নিসে একটা আমড়া গাছ ডাল মেলে ঝুঁকে পড়েছে। চমকে দাঁড়াল গৌতম। না, কিছু না, গাছই বটে। পা বাড়াল উঠানে। শিউলি গাছটার আশেপাশে জোনাকির মেলা বসেছে, কালকাসুন্দির জঙ্গল থেকে একটানা ঝিঁঝি ডাকছে। খসখস করে কি একটা চাল গেল তার পায়ের শব্দ পেয়ে। আকাশের বাঁকা চাঁদের ক্ষীণ আলোয় নজর হয় না। বোধ হয়, শেয়াল কি নেউল।

খিড়কির দরজা খুলে রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের চত্বরে এসে দাঁড়াল। মোট নামিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল কুলদেবতাকে, স্নানজলের কুণ্ড থেকে দুটো ফুল বেলপাতা হাতড়ে তুলে পকেটে রাখল।

তারপর হন্‌হন্‌ করে ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে চলল।

ট্রেন ভোর পাঁচটায়। পূর্ব্ব-দিগন্তে ঈষৎ রক্তিমাভা ফুটে উঠেছে। সূর্য্যসারথি দেখা দিবেন ক্ষণিক পরেই, নীলগঞ্জের জমাট অন্ধকার ক্রমশঃ তরল হয়ে মিলিয়ে যাবে দশ দিকে। সামনের ঐ বনবীথির সবুজ পাতায় সোনার কিরণ উপচে পড়বে সেই আগেকার দিনের মত, এখনই শাল-পিয়ালের বনের উপর আসবে সেই ফুরানো দিনের উজ্জ্বল নব প্রভাত।

তার কল্পনার নীলগঞ্জ মরবে না।

দূরে রেল লাইনের উপর ট্রেনের ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ শোনা গেল। গৌতম পা চালাল জোরে।

আন্দামান

শ্রীকরুণাময় বসু

সমুদ্রে অনেক ঝড়,
অনেক স্রোতের শেষে জেগে ওঠে পলিমাটি চর।
নতুন প্রাণের বীজে ছায়া-রৌদ্র স্বপ্ন আঁকে,
হাওয়া দেয় বসন্ত-মর্ম্মর;
অনেক নতুন মুখ, বাঁধে ফের ছোট কুঁড়ে ঘর।
কোথা থেকে এলো এরা এই সব ছন্নছাড়া মানুষের দল,
অবোধ জন্তুর মতো খুঁজেছিল মাঠ ঘাট, জলা ও জঙ্গল;
ছড়িয়ে পড়েছে দূরে যেন এরা সমুদ্রের ফেনা,
এরাও মানুষ ছিল, স্বপ্ন দেখে মালঞ্চের আধফোটা হেনা।
অনেক চোখের জলে ভেজা দুঃস্বপ্নের রাত্রি হ'ল শেষ;
ইতিহাসে নতুন অধ্যায়, বাঙালীর আশ্চর্য্য এই উপনিবেশ!
ফেলে আসা জীবনের মণি-হার ছিঁড়ে গেছে,
ভেসে গেছে সাগরের জলে,
পদ্মাতীরে ঝাউবনে যে চাঁদ উঠেছে,
সেই চাঁদ এখানে কি জলে?
পদ্মাতীর কোথা গেল, সপ্তডিঙা নিয়ে এলো অন্ধকার দ্বীপে;
পাতাল-নাগিনী যতো ঢেউয়ের ফণায় জ্বালে
মণিমালা হীরার প্রদীপে;
নারিকেলকুঞ্জশাখে মৌসুমী হাওয়া, স্বচ্ছ জলে প্রবাল-সকাল,
সাতরঙা প্রজাপতি উড়ে আসে, ভিজে ঘাসে শিশিরের জাল।
হঠাৎ ঘুমের শেষে কানে আসে মেঘনার ডাক,
কর্ণফুলী নদীজলে জেগেছে জোয়ার, যেথা চক্রবাক
মেলেছে ধূসর পাখা নিঃসীম আকাশে,
উড়ন্ত ডানার শব্দ সমুদ্রের পার হতে আসে।
দুই চোখে স্বপ্ন আসে নেমে,
দুই চোখে জল আসে, এখনো কি মুগ্ধ তারা সে পদ্মার প্রেমে?
কানে আসে মেঘনার ডাক,
এ কোন অচেনা দেশ, অজানা পাখীর শব্দ,
ভাবে তারা আশ্চর্য অবাক!
কোথায় সবুজ মাঠ, নীলকণ্ঠী পায়রার ঝাঁক,
বেতঝোঁপ, বাঁশবন, উলুঘাস গাছে গাছে সবুজ মৌচাক;
পথে ঘাটে ঝরে-পড়া চাঁপা, যুঁই, দূর মাঠে রাখালের বাঁশী,
মাঝিদের সারি গান, ভাঙা মন এখনো উদাসী।
ঘুম নেই, চোখে যেন ঘুম নেই, শুকতারা জলে দপদপে,
এখনো বালুর চরে কাশফুল ফুটে ওঠে;
সেই স্মৃতি ভুলে গেছে কবে।
ভোরের, গোধূলি বেলা পদ্মাজলে ঝিলিমিলি আবীরের রঙ;
আশ্বিনের উতলা হাওয়ায় কেঁপে ওঠে মীড়ে মীড়ে গৌড় সারঙ,
কত হাসি, কতো গান, ঝরে-পড়া বেলফুলে গাঁথা ফুলমালা,
কত ভালোবাসাবাসি, কত স্বপ্ন—কেন এলো বিদায়ের পালা,
কোথায় বাংলাদেশ, কোথা এই মৃত আন্দামান?
পদ্মগন্ধা অতীতের স্মৃতি মনে পড়ে,
ভেসে আসে সে পদ্মার গান।

সর্বোদয়—সমাজতন্ত্রবাদের পরিণত রূপ

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ

অনুবাদক—শ্রীরবীন মুখোপাধ্যায়

[বর্তমান সমাজের চতুষ্পার্শ্বে যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে, শান্তিময় পথে ইহার সম্পূর্ণ পরিবর্তনের উপায় যে কেবলমাত্র "ভূ-দান যজ্ঞে"র মধ্যেই নিহিত আছে, শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ এই ধারণায় বিশ্বাসী হইয়া সম্প্রতি এই যজ্ঞের কাজে নিজের দেহ-মন সমর্পণ করিয়াছেন। গত ৮ই মার্চ, ১৯৫৩, চাণ্ডিলে ৫ম সর্বোদয় সম্মেলনের যুবকদের সভায় প্রদত্ত তাঁহার ভাষণের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হইল।]

"হে যুবকবৃন্দ, আপনাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সংগঠন সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য আমাকে কেন বলা হইয়াছে, তাহা আমি জানি না। কারণ আমি নিজেই এখন সবেমাত্র সর্বোদয়ের মূলমন্ত্রগুলি বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। যদিও দেশের যুবকবৃন্দের সহিত আমি বহুদিন হইতেই যুক্ত আছি ও তাহাদের নিকট সময় সময় বলিয়াছি, তথাপি আমার নিজের মধ্যে এখন নূতন বিচারের অবকাশ আছে বলিয়া মনে করি।

দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা

"আজকাল সাধারণতঃ আমি দেখিতেছি যে, স্কুল ও কলেজের ছাত্রেরা হয় সমাজতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদ, না হয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এবং দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়ীয় যুবসংঘের ন্যায় সাম্প্রদায়িক নীতি দ্বারা চালিত কোন আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। ১৯২১-২২ সনে আমার যৌবন অবস্থায় দেখিয়াছি যে, সেই সময়ে দেশব্যাপী গান্ধীয় আন্দোলনের যে ঝড় প্রবল বেগে বহিতেছিল, দেশের যুবকবৃন্দ তাহাতে ঝাঁপ দিয়াছিল। কিন্তু আজকাল তাহারা বলিতেছে যে, গান্ধীজীর রাস্তা প্রাচীনপন্থী, বর্তমানের আণবিক বোমার যুগে এবং রাশিয়া ও চীনদেশের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দৃষ্টান্তে, গান্ধীয় পন্থা তাহাদের প্রাণে সাড়া জাগাইতে পারে না। কিন্তু সম্ভবতঃ এখানে যে সমস্ত যুবক সমবেত হইয়াছে তাহারা সর্বোদয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই আসিয়াছে।

"আমি সাম্যবাদী কিংবা সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দের সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া বরং সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে কিছু বলিব। অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, আমি আমার নিজের মনে সর্বোদয় ও সমাজতন্ত্রের ভাবধারার মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে পারিয়াছি কিনা।

খাঁটি সমাজতন্ত্রই হইতেছে প্রকৃত সর্বোদয়

"আপনারা যদি আপাততঃ সমাজতন্ত্রবাদের সূত্রগুলি ভুলিয়া গিয়া ইহার উদ্দেশ্যকে বুঝিবার চেষ্টা করেন, তবে আপনারা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, কি প্রকারে আমরা সর্বোদয় ও সমাজতন্ত্রবাদ উভয়কে একই সূতায় বাঁধিতে পারি, আমরা এমন এক সমাজব্যবস্থা আশা করি যেখানে কোনপ্রকার শোষণ থাকিবে না, পূর্ণ সাম্যাবস্থা থাকিবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির বিকাশের সমান সুযোগ থাকিবে। সুতরাং এখন এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় সম্বন্ধে প্রশ্ন আসে। আমরা দেখিয়াছি যে, যখনই হিংসাত্মক উপায়ে এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, শোষণ বন্ধ হয় নাই, সাম্যাবস্থা আসে নাই, কিংবা প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব-স্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ লাভ করে নাই।

"যেখানেই হিংসাত্মক বিপ্লবের মধ্য দিয়া কোন নূতন সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে, সেখানেই সম্পূর্ণ অন্য আর এক নয়া অবস্থা আসিয়া গিয়াছে। কেননা স্বভাবতঃই আমরা পুরাতন কায়েমী শাসনব্যবস্থাকে কেবল ধ্বংস করিতেই চাই ও কল্পনা করি যে, ইহাতেই বুঝি এক নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছি। সমাজতন্ত্রবাদীরা চিন্তা করিয়া থাকে যে, ধনতন্ত্রকে ভাঙ্গিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নয়া ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে, কিন্তু তাহারা ইহাতে ভুল করে। সমাজতন্ত্র কেবলমাত্র একটি নেতিবাচক ধ্বংসাত্মক আদর্শবাদ নয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, জাতীয়করণের কথা যাহা সমাজতন্ত্রের একটি মুখ্য আধার। কেবলমাত্র জাতীয়করণের দ্বারাই যে সমাজতন্ত্র আসে না, তাহা আমরা আমাদের দেশে ও অন্যান্য দেশেও দেখিয়াছি। রাশিয়ার কথা ছাড়িয়া দিন, আমাদের দেশে রেলওয়ে এখন একটি কোম্পানীর সম্পত্তি রূপে গণ্য না হইয়া জাতীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু যদি বলা যায় যে, রেলওয়ে শাসনব্যবস্থা শোষণমুক্ত হইয়াছে, তবে আমরা ভুল করিব। সত্য, এখন যেমন পুঁজিবাদও নাই, তেমনি সমাজতন্ত্রও আসে নাই। বর্তমানে যাহা চলিতেছে, তাহা হইতেছে আমলাতন্ত্রী শাসন। সেইরূপ আমরা যদি বলি যে, অন্যান্য শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিলেই সমাজতন্ত্রের সূচনা হইবে, তবে

আমরা কেবল নিজেদেরই বঞ্চনা করিব। তাহা হইলে কেমন করিয়া আমরা প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছিব, ইহাই এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়। আমরা যে রাস্তায় অগ্রসর হইতেছি বা যে বিষয়ে চিন্তা করিতেছি, সর্বোদয় এই পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। অতএব যদি আমরা খাঁটি সমাজতন্ত্রবাদী হই, তবে প্রকৃত সর্বোদয়পন্থীও হইব।

বিনোবা সর্বোদয়ের রাস্তা প্রবর্তন করিয়াছেন

"কেমন করিয়া প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা যায় এই প্রশ্নের উত্তর-দান প্রসঙ্গে বিনোবা ঘোষণা করিলেন যে, গ্রাম-রাজ প্রতিষ্ঠা করা একান্ত আবশ্যক। আমরা যদি প্রকৃত সমাজতন্ত্রবাদী হই তবে গ্রামীণ স্বরাজে আমাদেরও বিশ্বাসী হইতে হইবে। এখানেই এই দুই আদর্শবাদের মিলন-ক্ষেত্র—সর্বোদয় সম্মেলনে আমার যোগদান করা ও বিনোবাজীর প্রশংসা করা লইয়া কেহ কেহ আমাকে উপহাস করেন, অপর দল বলিয়া থাকেন তাহা হইলে তোমাকেও শেষ পর্যন্ত আসিতে হইল। আমাদের সকলেরই সত্য পন্থায়, গভীর ভাবে ও সাহসের সহিত চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। যে-কোন প্রকৃত সমাজতন্ত্রী, যিনি তাঁহার লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট, তিনিও ঠিক আমি আজ যে অবস্থায় আছি, সেই অবস্থায় নিজেকে দেখিবেন।

"এমন সময় আসিয়াছিল যখন কেহই নির্দেশ দিতে পারেন নাই কোন্ পন্থায় অগ্রসর হইব ও কোথায় যাইব। সাধারণ মানুষ আশা করিয়াছিল যে, গান্ধীজী বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই যেমন সমাজের পরিবর্তনের রাস্তা দেখাইতেন, তেমনি গান্ধীজীর অন্তরঙ্গ শিষ্যবর্গও নূতন রাস্তা বাতলাইবেন। কিন্তু গান্ধীজীর তিরোধানের পর ঘোর আঁধার চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই যে, যদি বিনোবাজী ভূ-দান যজ্ঞ আন্দোলন আরম্ভ না করিতেন, তবে আমরা ভুলিয়া যাইতাম গান্ধীজী ও সর্বোদয়ের কথা। গান্ধীজী যাহা কিছু বলিয়াছিলেন ও করিয়াছিলেন তাহাতে বিশ্বাস হারাইতাম ; ফলে সর্বোদয়ের আলো চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইত এবং গঠন-কর্মীরা তাঁহাদের নিজ নিজ কর্মস্থলে একক ভাবেই কর্মচক্র ঘুরাইতেন। ইহাতে দেশের সামান্য উপকার হইলেও গান্ধী-শিষ্যরা সমাজ-পরিবর্তনের রাস্তা দেখাইবেন, সাধারণ লোকের এই আশা বিলীন হইয়া যাইত এবং এক সশস্ত্র বিপ্লব সম্পূর্ণ ভিন্ন ফলাফল লইয়া উপস্থিত হইত।

সমাজতন্ত্রের স্থলে সর্বোদয়

"আমি ইচ্ছাপূর্বক ছাত্রদের সম্মুখে এই সকল বিষয়ের অবতারণা করিতেছি, কারণ তাহারাও আজ এই সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। তাহাদের ধারণা যে, আমরা বুঝি ভিন্ন পথে চালিত হইতেছি। আমাদের সম্মুখে যে লক্ষ্য আজ আছে, অপর অনেকেই ইহাকে তাহাদের বলিয়া স্বীকার করে, কিন্তু আমাদের পন্থা ভিন্ন। শোষণমুক্ত সমাজ রচনাই যদি কাম্য হয় এবং আপাতদৃষ্টিতে তাহা যদি হিংসাত্মক উপায়ে অর্জিত হয়, তথাপি ঐ লক্ষ্য অনর্জিত থাকিয়া যাইবে, কারণ হিংসায় আসে নূতন ধরণের শোষণ এবং শোষণ মানে অপরের ন্যায্য অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা। এমন কি, আজিও যেহেতু আমাদের নিজেদের জীবন-মান সমাজের অবশিষ্ট ভাইদের হইতে অনেক উন্নত, সেইজন্য অস্বীকার করা যায় না যে, আমরা তাহাদের শোষণ করি নাই। এখন তোমাদের ছাত্রাবস্থায় তোমাদের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইতেছে, গরীব ছাত্রদের অভিভাবকেরা তাহাদের শিক্ষার জন্য ঐ পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে পারেন না বলিয়া উহার আংশিক দায়িত্ব তোমাদেরও উপর আসিয়াছে। সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ শোষণমুক্ত অবস্থার কল্পনা করা অসম্ভব হইলেও আমাদের এই আদর্শকে প্রতিপালন করিয়া যাইতে হইবে। এমন কি, রাশিয়াতেও আজ সর্ব-উচ্চ এবং সর্ব-নিম্ন স্তরের কর্মচারীদের বেতনের পার্থক্য প্রায় ৪০ গুণ। সর্ব-উচ্চ স্তরের কর্মচারীদের জীবনমান অনেক উচ্চে বলিয়া সেখানেও শোষণযন্ত্র আজও বিদায় লয় নাই। তাহারা হিংসাত্মক পন্থায় ক্ষমতা লাভ করিয়াছে বলিয়াই ঐ একই উপায়ে শ্রমের মজুরী নির্ধারণ করে। প্রকৃত শোষণমুক্ত সমাজরচনা কেবলমাত্র অহিংস উপায়েই সম্ভব। সেই হেতু সমাজতন্ত্রকে সর্বোদয় নামে অভিহিত করায় আমার কোন আপাত্ত নাই।

অছি-বাদের বাস্তব রূপায়ণ

"আমাকে অছি-বাদ (trusteeship) সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়। গান্ধীজী যখন ১৯৩৫ সালে উত্তর প্রদেশে যান, তখন সেখানকার জমিদারবৃন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, সদ্যপ্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রীদের শাসনব্যবস্থায় তাঁহাদের অবস্থা কেমন দাঁড়াইবে? গান্ধীজী উত্তর দিলেন, 'আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি না, সমাজতন্ত্রীরা কংগ্রেসীদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিলে কি ঘটিবে ; যতক্ষণ আপনারা নিজেদের জমির অছিস্বরূপ থাকিবেন ততদিন আমি আপনাদের বিনাশকারীর দলভুক্ত হইব না।'

"আমি ইহা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া বন্ধুদের বলিলাম যে, যে সমস্ত জমিদার দরিদ্র প্রজাদের উপর ভীষণ অত্যাচার করিয়াছে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গান্ধীজী এই কথা বলিতেছেন, তিনি তাহাদের ট্রাষ্টি বানাইতে চাহিতেছেন। এই সকল কথার প্রকৃত অর্থ এইরূপ যে, তাহারাও ট্রাষ্টিস্বরূপ হইয়া বসিতেছে না বা গান্ধীজীও তাহাদের

বিনাশ সাধন করিবেন না। আমরা তখন বিশ্বাস করিয়াছিলাম যে, অহিংসার এই আদর্শ কেবলমাত্র কাগজেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু আজ আমি গয়ায় দেখিতেছি যে, যেখানে এক বিঘা জমির মূল্য দুই হইতে ছয় হাজার টাকা, সেখানেও লোকেরা জমি দান করিতেছে। প্রায় ৪৮,০০০ একর জমি দানে পাওয়া গিয়াছে। গান্ধীজীর প্রিয় সূত্র সম্বন্ধে কিশোরলালভাই* একবার লিখিয়াছিলেন, 'আমরা ভুল চিন্তা করিতেছি যে, তিনি যে সব আদর্শবাদ প্রচার করিতেছেন তাহা কোন দিন বাস্তবে রূপ লইবে না। আমাদের নিকট এইরূপ মনে হয় যে, গান্ধীজী অছি বনিয়া যাইবার জন্য ধনীদের অনুপ্রাণিত করিলেও, তাহারাও এরূপ কোন কাজ করিবে না (অবশ্য যদি ধনী ব্যক্তিগণ জ্ঞানী না হন), সমাজের কাঠামো ও ইহার দারিদ্র্য যেমন আছে তেমনই থাকিবে। কিন্তু আমরা যদি গান্ধীজীকে এই দৃষ্টিতে বিচার করি তাহা হইলে এক মস্ত বড় ভুল করিয়া বসিব। যদি আজ তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে বিনোবা আজ যে কর্মযজ্ঞের প্রবর্তন করিয়াছেন, তিনি নিজে তাহা করিতেন। এমনও হইতে পারিত যে, তিনি ইহা অনেক পূর্বেই সুরু করিতেন এবং তাঁহার করিবার পদ্ধতি অধিকতর আকর্ষণীয় হইত। গান্ধীজী বলিতেন যে, যাহারা সমাজের অছি হইতে ইচ্ছুক আমরা তাহাদের অভ্যর্থনা জানাইব; আর যদি তাহারা ইহাতে না আসে, তবে আমরা দরিদ্রদের প্রস্তুত করিয়া বলিব যে, তাহারা যেন তাহাদের আত্মশোষণের যন্ত্রের সহিত অসহযোগ করে। এইভাবে আমরা উভয়কেই প্রস্তুত হইতে বলিব। সেইরূপ ভূ-দান যজ্ঞে দাতা ও গ্রহীতা (beneficiary) উভয়েই প্রস্তুত হইতেছে। যে পরিমাণে ভূ-দান যজ্ঞ জনপ্রিয় হইবে, গ্রামের শোষিত জনসাধারণ সেই পরিমাণে জাগ্রত হইয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিবে কি ভাবে অহিংস উপায়ে শোষণযন্ত্রে বাধা দেওয়া যায়। সুতরাং আমরা যদি কেবলমাত্র এই বলিয়া অছিবাদের ভাবধারাকে দূরে সরাইয়া দিই যে, ইহা লইয়া কেহ কখনও কাজ করিবে না, তবে আমরাও এক মস্ত বড় ভুল করিব। মোটের উপর, সমাজতন্ত্রীরাও কি সংঘর্ষ ও শ্রেণীসংগ্রামের কথা চিন্তা করে না? শ্রমিক সাধারণ পিস্তল বা বোমা লইয়া সজ্জিত নহে। যখন তাহারা সাধারণ ধর্মঘটের দ্বারা ধনতন্ত্রের দুর্গকে ভাঙিয়া মাটিতে মিশাইয়া দিতে চাহে, তখন ইহাতেও কিছু পরিমাণ হিংসা অবশ্যই আসিয়া পড়ে।

বিপ্লব আসিয়া গিয়াছে

"আজ যখন আমার সম্মুখে যুবকবৃন্দকে দেখিতেছি তখন পাটনা কলেজে আমার ছাত্রজীবনের দৃশ্য মনে পড়িতেছে। সেই সময় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পাটনাতে আসিয়া অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, আমি তাহা শুনিয়াছিলাম। তাঁহার বক্তৃতাই আমাদের সকলকে কলেজ ত্যাগ করাইল। এই সময় যুবকবৃন্দের মানসপটে যে বিপ্লব-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা গান্ধীজীর আন্দোলনের জন্যই সম্ভব হইয়াছিল। ঐরূপ আর এক বিপ্লব-বহ্নি আজ দৃশ্যমান। গতকল্য বিনোবা যে বক্তৃতা* দিয়াছেন, আজ পর্যন্ত আমি আর এইরূপ বক্তৃতা শুনি নাই। তিনি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হইতে অবস্থা যেমন দেখিয়াছেন, তেমন বর্ণনা করিয়াছেন। যে কেহ ইহার ইঙ্গিত হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, তাহার জীবনও নিশ্চয়ই পরিবর্তিত হইয়াছে। আমি যুবকদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হইয়া বেদনার্ত হইতেছি। তাহাদের উৎসাহ আছে সত্য, কিন্তু আমার ধারণা তাহাদের বিশ্বাস, অভিনিবেশ (concentration) ও মানসিক গভীরতার অভাব আছে।

"যদি সর্বোদয়ের বীজ তোমাদের চিত্তে ও বুদ্ধিতে উপ্ত হইয়া থাকে, তবে এই অভাবগুলি দূর করিয়া দিয়া তোমাদের কতব্যকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে; এই কর্তব্যপালনের ফলে তোমরা, ও যে সমাজে বাস কর তাহা সমভাবেই উপকৃত হইবে। বিনোবা বলেন যে, ছাত্রেরা ভূ-দান যজ্ঞে যোগদান না করিলেও তাহাদের কলেজ ত্যাগ করা উচিত। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের পক্ষে জ্ঞানার্জনের বিরোধিতা করার কথা চিন্তা করাও অসম্ভব। কেন তবে তিনি এই কথা বলিলেন? কারণ এই যে, যে ধরণের শিক্ষা আজ দেওয়া হইতেছে, তাহা ছাত্র, সমাজ বা দেশ কাহারও উপকারে আসিতেছে না। ইহাই বর্তমান অবস্থা। সুতরাং কতব্যকে সর্বাংশে পালন করার জন্য সামান্যতম চেষ্টারও অপব্যবহার করা উচিত নয়।

এক বৎসর এই আন্দোলনে দান কর

"১৯২১ সালের মত আমরা এক উত্তেজনাপূর্ণ কালে বাস করিতেছি। বিপ্লব আসিয়া গিয়াছে, আমরা আমাদের অংশ লইবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকি। আমি ইহাই আশা করি, তোমরা সকলে এইরূপ শিক্ষাগ্রহণ ত্যাগ করিয়া গ্রামে চলিয়া যাও, সেখানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভূ-দান আন্দোলনে যেটুকু

* কিশোরলাল মশ্রুওয়ালা, "হরিজন" পত্রিকার সম্পাদক

* সর্বোদয় সম্মেলনে ৭. ৩. ৫৩ তারিখে প্রদত্ত বিনোবাজীর ভাষণ।

পার, তাহা দান করিয়া এই আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোল।

আরও এক বৎসরের শিক্ষা

"এক বৎসরের জন্ম কলেজ ছাড়িতে কেন দ্বিধা বোধ করিতেছ। আমি আমেরিকায় থাকাকালীন দেখিয়াছি যে, ছাত্রেরা কিছুকাল অধ্যয়ন করে, তৎপরে পরবর্তী শিক্ষা-কালের ব্যয় বহন করিবার জন্ম কোন কারখানায় কাজ করিয়া উপার্জন করে। সেই সময় আমি 'সাম্যবাদে' বিশ্বাসী হইয়া রাশিয়া যাইবার জন্ম সিদ্ধান্ত করি ও কলেজ ছাড়িয়া দিই। যথেষ্ট অর্থ উপার্জনের জন্ম কাজের সন্ধানে নানা দিকে ঘুরিতে লাগিলাম। কিন্তু তৎকালে "আর্থিক মন্দা"র জন্ম বেকার-সমস্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল, আমি ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া যে-কোন কাজের জন্ম প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও কিন্তু কিছুই যোগাড় করিতে পারিলাম না। তার পরে অসুস্থ হইয়া পড়ায় চিকিৎসার জন্ম যে ঋণ হইল, তাহা কোন কারখানায় কাজ করিয়া পরে শোধ করিয়া দিই।

"এত দিন পরে ফেলিয়া-আসা দিনগুলির দিকে দৃষ্টি ফিরাইলে আমি মনে করি না যে, এক বৎসর কলেজ ত্যাগ করায় কোন দিকে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। আমি কখনও অনুভব করি নাই যে, মাঠে অথবা কারখানায় কাজ করিয়া যে শিক্ষালাভ করিয়াছি, তাহা কোন অংশে হেয় বা অব-হেলার যোগ্য। এখানে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া-ছিলাম তাহা কখনও কোন কলেজের শিক্ষায় পাওয়া সম্ভব নয়। সেইরূপ যে শিক্ষা তোমরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া লাভ করিবে তাহা স্কুলে বা কলেজে কখনও পাইবে না এবং আমি ইহাও বিশ্বাস করি যে, যদি তোমাদের পিতামাতারা তোমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বা তোমাদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের জন্ম চিন্তাশীল হন তবে তাঁহারা স্বেচ্ছায় এই কথাই বলিবেন, 'ভাল কথা, যাও, এক বৎসর এই ভাবে কাজ কর।' প্রত্যেকের নিকট এইরূপ আশা করা যায় যে, সে নিজেকে ভূ-দান যজ্ঞের জন্ম এক বৎসর সমর্পণ করুক। লোকেরা তাহাদের জমি দান করিতেছে, আর আমরা আমাদের সময় ও শক্তি দান করি। বিনোবা বলেন, ইহা এমন এক বিপ্লব হইবে যাহা সমগ্র জগতের ইতিহাসে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবে। অবশ্য আমরা যদি এই ভাবে পূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে জমির ন্যায় বৃহৎ সমস্যার সমাধান করিতে পারি।... সুতরাং আমরা তোমাদের সকলকে বিপ্লবের এই নূতন হোমাগ্নিতে হাত মিলাইতে আহ্বান জানাইতেছি, এবং আশা ও বিশ্বাস করি যে, দেশের যুবকবৃন্দ এই পথে পদক্ষেপ করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না।"*

* জুলাই ১৯৫৩ সনের ইংরেজী "সর্বোদয়" পত্রিকা হইতে গৃহীত।

দুই 'আমি'

শ্রীশিশিরকুমার রায়

এ দুঃখ আমার নয়—অশ্রু-ভারাক্রান্ত এই দিন
আনন্দ-পরশ-ভরা জীবনের পরিচয়হীন
কুজ্ঝটিকা আবরণে। গ্লানিমুক্ত দিবসের শেষে,
এই যে নূতন আমি আঁধারের নগ্ন পরিবেশে
ভাবের কমল-কলি মুগ্ধ মনে করি বিকর্ণিত—
সজীব প্রাণের সুরে লতিকার মত হিল্লোলিত
আনন্দের সমীরণে।

দিবসের প্রচুর আলোক
আমার দারিদ্র্য লাগি' সৃষ্টি করে যে সমালোচক—
লক্ষ দৃষ্টি দিয়ে সেই লক্ষ্য করে মোর ছিন্ন বেশ
নগ্নরূপ বুভুক্ষায়। আলোকের এই ব্যঙ্গ শ্লেষ
যে 'আমি'-রে সৃষ্টি করে, সে অপর, ভিন্ন প্রকৃতির
এই ক্ষণে আমা হ'তে। ধুলায় লুণ্ঠিত তার শির
দুর্ভাগ্যের পদ-ভারে, বর্ষশেষে ঝরাপাতা মত
জীবনের ভালোটুকু ঝরে যায় তার অবিরত—
ব্যথায় হলুদ হয়ে।

অন্ধকার ভরা অমানিশা
এনে দেয় চেতনায় আকাঙ্ক্ষিত সুন্দরের তৃষা
পরিবর্তিত এ 'আমি'র। আলোকের নাহিক আভাস,
তাই, জীবনের শতদলে জাগে নব যে সুবাস
তাহে মুগ্ধ এই আমি। এই মোর পূজা আপনার
ছদ্মবেশ মুক্ত হয়ে আনন্দের স্বচ্ছন্দ বিহার।
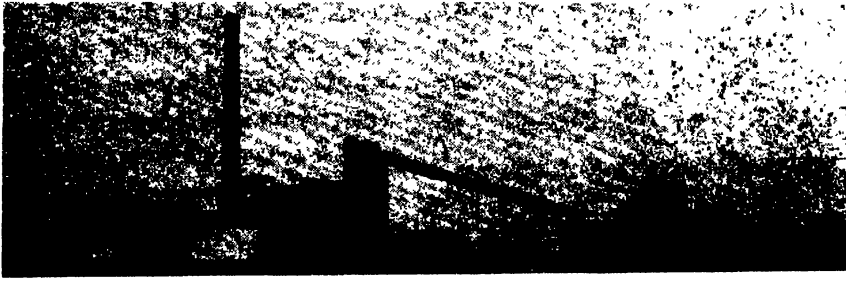
একটি আধুনিক কাগজের কল

কাগজ-বিজ্ঞান ও কাগজ-শিল্প

শ্রীসলিল বসু

সৃষ্টির আদিযুগে মানুষ যেদিন আগুন জ্বালতে শিখেছিল, সেইদিনই হয়েছিল তার বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সূচনা, তার সভ্যতার সত্যিকারের গোড়াপত্তন। তারপর সভ্যতার পথে আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি—সেই স্মরণাতীত কালের গুহাবাসী মানুষের জীবনধারা থেকে আজকের বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য সমাজ-জীবনে। এই যুগ থেকে যুগান্তরে আসার পথের ধারে ধারে রয়ে গেছে অনেক অলিখিত কাহিনীর খণ্ড বিচ্ছিন্ন সমাবেশ। এর কিছু কিছু ধরা পড়ে প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণায়, কিছু পাওয়া যায় অনুমানে। এই অলিখিত কাহিনীর আভাসে জানা অধ্যায়গুলোকে বিভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি নিজ নিজ গবেষণায় সুবিধামত ভাগ করে নিয়েছেন বিভিন্নভাবে। গুহামানব প্রথম গুহা ছেড়ে নেমে এসেছিল পশুপালনের ক্ষেত্রে, সুরু হয়েছিল পশুচারণ যুগ। কিন্তু এই সীমার মাঝে তাকে বেশী দিন বেঁধে রাখা যায় নি। নদীপ্রধান অঞ্চলে পলিমাটিতে তারা সুরু করল শস্য উৎপাদন, চাষ-আবাদ; সূচনা হ'ল নূতন যুগের—কৃষিযুগের। এই যুগেই সে প্রথম গড়ে তুলল তার সমাজ, বাঁধতে চাইল নিবিবিলি ছোট্ট বাসা। পানভোজনে, সাজপোশাকে এল তার রূপান্তর, বিরাট পরিবর্ত্তন। মনের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে তারা সৃষ্টি করল সুরের লহরী, আনন্দপ্রকাশের উত্তাল ছন্দে উঠল নেচে। সেই তার রূপসৃষ্টির প্রথম প্রেরণা। কিন্তু তাকে সে নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে স্থায়িত্ব দান করতে চাইল। মানুষের সেই যুগের যা-কিছু কীর্ত্তিকলাপ সবই সে রেখে যেতে চাইল অনাগত কালের মানবসন্তানের জন্যে। এমনিভাবে যুগ থেকে যুগান্তরে মানুষ যাত্রা করল অগ্রগতির পথে। ক্রমে ক্রমে এই আকাঙ্ক্ষা হয়ে উঠল আরও প্রবল। তাই তার প্রয়োজন হ'ল লেখার সামগ্রীর। তার অনুসন্ধিৎসু মন খুঁজতে লাগল নূতন পথের নিশানা। পথ পেতে খুব বেশী দেরি হ'ল না। গাছের ছাল ও পাতাকেই তারা বেছে নিলে তাদের ক্রিয়াকলাপ, জীবনধারা ইত্যাদির স্থায়ী রূপ দেবার উপকরণ হিসাবে—আগামী কালের কাছে বাণী পৌঁছে দেবার বাসনা মেটাবার পন্থা আবিষ্কৃত হ'ল। নীলনদের কূলে কূলে জন্মায় যে সেজ গাছ তারই ছাল থেকে তৈরি হ'ত প্যাপিরাস কাগজ আর মিশরের জনসাধারণের দ্বারা তা ব্যবহৃত হ'ত। এতে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর চাহিদা মিটত। প্রাচীন ভারতের এই রচনার সাধনা চলত "ভূর্জ্জপত্রে"। এশিয়া মাইনরে ছাগল বা ভেড়ার চামড়া থেকে লেখার উপযোগী সামগ্রী তৈরি করে নেওয়া হ'ত। এসব হ'ল খ্রীষ্টপূর্ব্ব সাড়ে তিন হাজার বৎসর আগেকার কথা। আজকের গাছপালা থেকে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কাগজ তৈরি হচ্ছে তার সূচনা হয়েছিল চীনে, আনুমানিক ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু রক্ষণশীল চীন তাদের কাগজ নির্ম্মাণ-পদ্ধতির কথা বাইরের জগৎ থেকে গোপন রেখেছিল প্রায় ৬০০ বছর। তার পর যখন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ তাতারসম্রাট চেঙ্গিস খাঁর আক্রমণে দলিত মথিত হ'ল সমরখন্দ, সেইদিন থেকেই আরব জ্ঞানীবিজ্ঞানীদের সামনে উদ্ঘাটিত হ'ল এই রহস্য। কিছুকাল পরে আরব-জগতের সঙ্গে ইউরোপের বাধল 'ধর্ম্মযুদ্ধ' আর তারই ফলে কাগজ প্রস্তুত-পদ্ধতির কথা গিয়ে পৌঁছল ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে—১১৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে, ১২৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডে, ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্ম্মানীতে আর ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে। এইভাবে প্রক্রিয়াটির কথা যেমন ছড়িয়ে পড়ল, তেমনি এর উন্নতিও হতে লাগল যথেষ্ট। আজকের দিনে কাগজ ব্যবহার সভ্যতা ও সংস্কৃতির অপরিহার্য্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাগজকে বাদ দিয়ে আজকের সভ্যতার মূল্য নিরূপণ করা যায় না।

আজকের দিনে কাগজ তৈরি চলছে সেলুলোজ নামে এক জাতীয় জটিল সংগঠনের রাসায়নিক পদার্থ থেকে, এই পদার্থ পাওয়া যায় গাছপালার ডালপালা, গুঁড়ি পাতা থেকে। প্রথমে কাঠের ছালগুলোকে আলাদা করে নেওয়া হয়, আর এই প্রক্রিয়ার জন্যে 'বার্কিং-ড্রাম' নামে কতকগুলো বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। তারপর এগুলোকে পাঠানো হয় 'চিপার মেসিনে'। এখানে কাঠগুলোকে

কেটে কেটে ছোট করে নেওয়া হয় যাতে করে পরবর্তী রাসায়নিক প্রক্রিয়াসমূহ ভালভাবে চলতে পারে। তার পর এই পদার্থগুলোকে কষ্টিক সোডার সাহায্যে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে ফোটানো চলতে থাকে। এই সময় সাধারণতঃ চাপ থাকে ৬ থেকে ৮ এ্যাটমসফিয়ার আর উষ্ণতা ১৬০° থেকে ১৮০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। অন্য একটা বিশেষ পদ্ধতিতে কষ্টিক সোডা ব্যবহার না করে ক্যালসিয়াম বাই-সালফাইড ব্যবহার করা হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে লিগনিন্‌টা সহজেই পৃথক হয়ে পড়ে আর তার সঙ্গে কিছু হেমিসেলুলোজ নামে পদার্থও চলে যায়। এখন সেলুলোজটা যে অবস্থায় পরিণত হয় তাকে বলে পাল্‌প। এটাকে ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে নেওয়া হয় এবং ব্লিচিং পাউডার বা সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট প্রভৃতির সাহায্যে বিরঞ্জন করা হয়। এর জন্যে বিরাট বিরাট আধার ব্যবহৃত হয় আর সেগুলোকে বলে ব্লিচিং ট্যাঙ্ক। তার পর তুষারশুভ্র সেলুলোজকে অনেকগুলো তারজালির মধ্য দিয়ে পাঠানো হয়। এই সময় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জলও দেওয়া হয়, প্রক্রিয়াটি যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় সেজন্যে। এই জলসম্পৃক্ত সেলুলোজকে ফেল্ট রোলার নামে কতকগুলো যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে পাঠানো হয়। এই যন্ত্রটিকে বাষ্প-সাহায্যে উত্তপ্ত করা হয়, তার ফলে উক্ত সেলুলোজ যখন এর মধ্যে দিয়ে যায় তখন এর মধ্যেকার সমস্ত জলই প্রায় উড়ে যায় আর ব্লটিং পেপারের মত একপ্রকার পদার্থ পাওয়া যায়। তারপর যে প্রক্রিয়া অনুসৃত হয় তাকে বলে 'সাইজিং'। এই প্রক্রিয়ার ফলে কাগজটা কালি দিয়ে লেখার উপযুক্ত হয়—অর্থাৎ কালি কাগজের উপর পড়লে আর 'ধেবড়ে' যাবার সম্ভাবনা থাকে না। এই পদ্ধতির জন্যে সচরাচর রোজিন্‌, এ্যালাম, জিলেটিন্‌ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। উচুদরের 'আর্ট' কাগজের জন্যে সাইজিং-এর সময় কিছু পরিমাণে চীনামাটিও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্বচ্ছ কাগজ বা সেলোফেন্‌ পেপার নামে আখ্যাত কাগজগুলো তৈরি করাও এমন কিছু একটা শক্ত ব্যাপার নয়। উপরোক্ত প্রক্রিয়ার সাহায্যে পাল্‌প তৈরি করা হয় আর সেই পাল্‌পকে কষ্টিক সোডা এবং কার্ব্বন ডাই-সালফাইডের মধ্যে ভাল করে গুলে নেওয়া হয়, যার দরুন একটা কমলা রঙের দ্রবণ তৈরি হয়। তার পর এই দ্রবণটিকে একটা সরু নলের মধ্যে দিয়ে অম্লগাহের (Acid bath) মধ্যে চালানো হয়। নলের সূক্ষ্মতার ও দৈর্ঘ্যের উপর কাগজের প্রকৃতি ও প্রতিকৃতি বেশ কতকটা নির্ভর করে। এই প্রক্রিয়ার পর কাগজটাকে বেশ ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে নেওয়া হয়, তারপর বাই-কার্ব্বনেট দ্রবণের সাহায্যে অতিরিক্ত এসিডকে প্রশমিত করে নিয়ে আবার অতিরিক্ত কার্ব্বনেটটাকে অপসারিত করবার জন্যে জল ও লঘু এসিড দিয়ে ধোয়া হয়। তারপর এটাকে গ্লিসারিন দিয়ে ধোয়া হয় যার ফলে প্রায় শতকরা ১৬ ভাগ গ্লিসারিন বিশোষিত হয়ে যায়। জল-বিরোধক করবার জন্যে এটাকে তখন ইথাইল এসিটেট বা ঐ জাতীয় উদ্বায়ী (volatile) দ্রাবক পদার্থ মিশ্রিত ল্যাকার দ্রবণের মধ্যে দিয়ে চালানো হয়। তারপর বাষ্প-সাহায্যে গরম করে শুষ্ক করা হয় আর সেই সময় ল্যাকারটা কাগজের গায়ে আবরণী হিসাবে থেকে যায়, যাতে করে নমনীয় গুণটা বজায় থাকে।

যাদবপুর কলেজের বাৎসরিক শিল্পপ্রদর্শনী
প্রদর্শিত আখের ছিবড়া হইতে কাগজ প্রস্তুত-পদ্ধতির মডেল

আজ থেকে প্রায় ৭০।৮০ বৎসর আগেও কেবলমাত্র ভাল জাতের গাছপালা থেকেই কাগজ প্রস্তুতি চলত। বাঁশ থেকে কাগজ প্রস্তুতি প্রথম সুরু হয় ভারতবর্ষে। বাঁশের গাঁট, তরলনিরোধকতা ও অন্যান্য কতকগুলো অসুবিধা থাকার দরুন এ থেকে কাগজ তৈরি অনেক দিন সম্ভব হয় নি। ভারতীয় বনবিদ্যা গবেষণাগারে ডক্টর রেইটের গবেষণায় এই অসুবিধা দূর হয় এবং আমাদের কাগজ-শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা দেখা দেয়। পাশ্চাত্য দেশসমূহে ধান ও ভুট্টার খোলা, শণ ও পাটের ফেলে দেওয়া অংশ থেকেও কাগজ প্রস্তুতি চলছে। তবে বর্ত্তমান সময়ে কাগজ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে 'ব্যাগাস' অর্থাৎ আখের ছিব্‌ড়া উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে এবং এর জন্য নব নব পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হয়েছে, যন্ত্রাদিও পেটেন্ট করা হয়েছে। ভারতের রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজের ডালমিয়া নগরের কারখানায় আখের ছিব্‌ড়া থেকে কিছু কিছু কাগজ প্রস্তুতি চলছে ও পুণার ওয়ালচাঁদের কারখানাতেও এর পরীক্ষা চলছে। কাগজ-শিল্পের উপযোগী কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বাংলার অবস্থা খুবই আশাপ্রদ। সাধারণতঃ বাঁশগাছের দৌলতেই আমাদের দেশে বেশীর ভাগ কাগজের কল চলছে। পশ্চিম বাংলা ছাড়া বোম্বাই, আসাম, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও প্রচুর পরিমাণে বাঁশ উৎপন্ন হয়। বাঁশগাছে পরিপূর্ণ প্রধান অঞ্চল হচ্ছে উড়িষ্যার আঙ্গুল বনভূমি। সাবয় ঘাস নামে একপ্রকার ঘাসই উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, বাংলা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশে বাঁশের সঙ্গে

ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এখনকার কাগজের কলগুলোতে বছরে প্রায় ২০০,০০০ টন বাঁশ আর ৪০,০০০ টন সাবয় ঘাস ব্যবহৃত হয়। কষ্টিক সোডা, কার্ব্বনেট, সালফেট ও সালফাইড প্রভৃতি রাসায়নিক সামগ্রীর বেশীর ভাগই বিদেশ থেকে আমদানী করা হচ্ছে। তবে কিছু পরিমাণে এই সব এখন আমাদের দেশে তৈরি সুরু হয়েছে এবং আরও যাতে তৈরি করা যায় সেই দিকে সরকার,

বার্কিং-ড্রামের সাহায্যে পাতলা করে কাঠ কাটা

শিল্পপতি ও বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি পড়েছে। কলগুলো চালানোর জন্যে যে পরিমাণ শক্তি দরকার হয় তার বেশীর ভাগই পাওয়া যায় কয়লার সাহায্যে। অধিকাংশ কলই কয়লার ক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হওয়ায় অনেক সময় খুবই অসুবিধার সৃষ্টি হয়। আজকাল কোন কোন জায়গায় জল-বিদ্যুতের সাহায্যে কল চালানো হচ্ছে, তাতে যে বেশ কিছু চাহিদা মিটছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আমাদের প্রয়োজনের মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ কাগজ আমাদের দেশে তৈরি হয়। আর বাকী সব আসে সাগরপারের দেশগুলো থেকে। ১৯৩৬ সালের দু' লক্ষ টন প্রয়োজনীয় কাগজের মধ্যে মাত্র ৪৮,০০০ টন এ দেশে তৈরি হয়েছিল—আর বাকী সবই আনতে হয়েছিল বাইরে থেকে। সাধারণতঃ ইংলণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, জার্ম্মানী, কানাডা প্রভৃতি দেশ থেকেই বরাবর আমাদের আমদানীটা হ'ত, তবে বর্ত্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেও বেশ আমদানী সুরু হয়েছে। যুদ্ধ বাধবার ঠিক আগেই ১৯৩৯ সালে প্রয়োজনীয় ১,০৬,২৫৫ টনের মধ্যেই ৮৭,০৫৮ টনই আমদানী হয়েছিল বাইরে থেকে, আর ১৯৪৯ সালে অর্থাৎ ১০ বছর পরে ১,৮৭,৯২১ টনের মধ্যে আমদানীর পরিমাণ প্রায় ৮৪,৯২৬ টন। কেন্দ্রীয় সরকারের পেপার প্যানেল বোর্ডের মতে ১৯৫৬ সালের মধ্যে আমাদের কাগজের চাহিদা প্রায় ৪,৫০,০০০ টনে দাঁড়াবে, কিন্তু আমাদের দেশে বর্ত্তমানে তৈরি হচ্ছে মাত্র ১ লক্ষ টনের কিছু বেশী। বৎসরে আমাদের বহু কোটি টাকার কাগজ বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে প্রায় ২৫টি কাগজের কল রয়েছে যাতে ২০,০০০ লোক কাজ করে। বোম্বাইয়ের স্থানই এ বিষয়ে প্রথম, আর পশ্চিম বাংলা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। যথাক্রমে ৮টা ও ৫টা কল রয়েছে এই দুটি প্রদেশে। এই সব মিল থেকে বৎসরে প্রায় ১,১০,০০০ টন করে কাগজ

কাগজের কলের প্রাঙ্গণে স্তূপীকৃত কাগজের 'পাল্প' তৈরির কাঠ

পাওয়া যাচ্ছে, তা ছাড়া এগুলোর উৎপাদন বাড়ানোরও খুবই চেষ্টা চলছে। শীঘ্রই কাশ্মীর ও আসামে কাগজের কল চালু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তবে নিউজ প্রিণ্ট সম্বন্ধে আমাদের পুরো-পুরি নির্ভর করতে হয় বিদেশের উপর। মেক্যানিক্যাল উড পাল্পের অভাবে আমাদের দেশে এখনও নিউজ প্রিণ্ট কাগজ তৈরি করা সম্ভব হয় নি এবং প্রয়োজনের প্রায় সবটাই আমদানী হয় কানাডা, নরওয়ে ও সুইডেন থেকে। এইজন্য যে কাঁচামালের প্রয়োজন হয় সে সম্বন্ধে ভারতীয় গাছপালা নিয়ে দেরাদুন বনবিদ্যা গবেষণা-গারে কিছু কিছু গবেষণা চলছে। বর্ত্তমান বৎসরে আমাদের নিউজ প্রিণ্টের প্রয়োজন প্রায় ৬০,০০০ টন। মধ্যপ্রদেশে একটা বড় কারখানা স্থাপনের চেষ্টা চলছে এবং সেটা খুবই তাড়াতাড়ি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এখান থেকে প্রায় ৩০,০০০ টন পাওয়ার সম্ভাবনা। হায়দ্রাবাদেও একটা কারখানা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। জাম জাতীয় গাছ থেকে ভাল পাল্প পাওয়া যেতে পারে আর সে বিষয়ে পশ্চিম বাংলার ভবিষ্যৎ খুবই আশাপ্রদ, অবশ্য যদি যথোচিত চেষ্টা করা যায়।

আজকের পৃথিবীর বহুল ব্যবহৃত সামগ্রীর মধ্যে কাগজ একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু বৎসরে কাগজের প্রয়োজন হয় প্রায় ১৭৫ পাউণ্ড, ইংলণ্ডে ১৫০ পাউণ্ড আর ভারতবর্ষে ১ পাউণ্ডের কিছু বেশী। তবুও সারা বৎসর আমাদের দেশে কাগজের দুর্ভিক্ষ চলছে। এ কথা বললে খুব অন্যায় হয় না।

স্মরণে

শ্রীকালীপদ ঘটক

আমার এ গৃহ শূন্য যে আজ, শূন্য এ ধরাতল
এ মহাশূন্যে ওরে চঞ্চল, কোথায় লুকালি বল্।
তোরে খুঁজে ফিরি পথে প্রান্তরে বিজন বিটপীমূলে,
খুঁজে ফিরি মাগো শ্মশানের বুকে, তটিনীর কূলে কূলে।
আট বছরের বর্ষা শরৎ বসন্ত মালিকায়—
সাজায়েছি তোরে, সে মালা কি আজ অকালে শুকায়ে যায়!
আকাশের কোলে অষ্টমী চাঁদ আজো হাসে মধুহাসি,
আমার সোনার অষ্টমী চাঁদে রাহু কি গ্রাসিল আসি।
কে দিল রে এঁকে স্মৃতিপটে তোরে রূপের মাধুরী ছানি',
রূপ আছে, নাই রূপের আধার কনক পুতলীখানি।
রূপ যে মা তোর অঙ্গ উপচি মাটিতে পড়িত চুঁয়ে,
ঘন কেশদাম খেলিত লীলায় গ্রীবামূল ছুঁয়ে ছুঁয়ে।
হাসির ঝলকে ঝরিত মাণিক, মুকুতা অশ্রুজলে,
চরণে বাজিত মুখর নূপুর নৃত্যের হিন্দোলে।
এত উচ্ছল প্রাণতরঙ্গ এত হাসি এত গান,
থেমে গেল কি রে একটি নিমেষে, সবই আজ অবসান!
জ্যৈষ্ঠের তাপে ঝরে গেল হায় কনকচাঁপার কলি,
ধরার ধূলায় দিয়ে গেল শেষ বিদায়ের অঞ্জলি।
মাটি আর সোনা—সোনা আর মাটি—এক হয়ে গেল মিশে,
সোনার গরবে গরবিনী মাটি, ও সোনা থুইলি কিসে!
যে ছিল হিয়ার হিয়াতে লুকানো, দুটি নয়নের তারা,
কোন্ প্রাণে তার বিদায়ের ডালি সাজাবি সর্ব্বহারা!
এত ফুল দিয়ে সাজানু মা তোরে, ঢেকে দিনু ফুলে ফুলে,
জীবনের ধন দিব বলে' কি রে চিতাশয্যায় তুলে।
চুয়াচন্দনে চন্দনকাঠে কতটুকু সান্ত্বনা,
আত্মাহুতির উৎসব এ যে আত্মপ্রবঞ্চনা।
মানস যাত্রী বলাকা যে আজ গগনে মিলেছে ডানা,
শূন্য এ বুকে সে পাখী ত আর ফিরিবে না—ফিরিবে না।
ওরে পথভোলা, দিশাহারা হয়ে পথ যাস যদি ভুলে,
দু'বাহু বাড়ায়ে কণ্ঠে জড়ায়ে কে নেবে রে বুকে তুলে।
কে বিছাবে তোর শয্যা যখন ঘুমেতে পড়িবি লুটি,
চুমায় চুমায় ভরে দেবে তোর টুকটুকে ঠোঁট দুটি।
'আয় ঘুম' বলে কে শোনাবে তোরে ঘুমপাড়ানিয়া গান,
গল্পে গাথায় কথায় কথায় ভরে দেবে কচি প্রাণ।
তুই নাই বসে' সবকিছু আজ বিষাদকালিমা মাখা,
সবই যেন রূপ-বর্ণবিহীন, গভীর তিমিরে ঢাকা।
ওরে বুলবুল, বাগিচায় তোর ফুলকুঁড়ি কেঁদে সারা,
পিছু ডাকে তোরে রজনীগন্ধা, দো-পাটি, নয়নতারা।
পঞ্চমুখী সে পাঁচটি শীর্ষে হাতছানি দেয় তোরে,
তুই যে এদের ভালবেসেছিলি, বেঁধেছিলি স্নেহডোরে।
বেলা-মল্লিকা ঝরে' পড়ে তোর বিচ্ছেদ-বেদনায়,
এরা যেন সবে কেঁদে বলে—খুকু, ফিরে আয়—ফিরে আয়।
তোর প্রাণরসে এরা যে সজীব, রূপে রঙে অভিরাম,
গোপা-কুঞ্জের ফুলে ফুলে তাই লেখা আজো তোরি নাম।
ফুলের বরণী কন্যা আমার, ফুলখেলা করি সায়,
ঝরে গেলি মাগো ঝড়ের দোলায় অসময়ে অবেলায়।
কি কাল ঘুম যে ঘুমালি মাণিক, ডেকেও পাইনে সাড়া,
হেনে গেলি বুকে একি শেল মাগো, এ যে মরণেরও বাড়া।
তুই নাই এ যে স্বপ্নের কথা, মনে জাগে সংশয়,
তোরে যেন আজ কে দিল ছড়ায়ে নিখিল বিশ্বময়।
জগতে যা-কিছু সুন্দর ছিল অণুপরমাণু ছেয়ে,
সুন্দরতর হ'ল বুঝি তোর রূপতরঙ্গে নেয়ে।
চাঁদের হাসিতে হাসি ঝরে তোর সুদূর গগনতলে,
নীলিমার ভরা তারার মালা সে দোলে যেন তোর গলে।
সজল মেঘের কাজল মায়ায় নব শ্যামজলধরে—
মেঘের বরণ এলোচুল তোর বিছালি কি থরে থরে।
ব্যথায় পুলকে ভূলোকে দ্যুলোকে এক হয়ে গেল সবি,
যে দিকে তাকাই হেরি যেন তোর নয়ন-জুড়ানো ছবি।
যে ছিল আমার একলার ধন গৃহ-অঙ্গন তলে,
বিশ্বের হয়ে দেখা দিল আজ শতরূপে শত ছলে।
তবে কেন মিছে ভেবে মরি মাগো, কে বলে মা তুই নাই,
মরণ বিদারি স্মরণ-বেদীতে নিয়েছিস এসে ঠাঁই।
মনের মুকুরে ভাসে তোর ছবি, এই যে এখানে তুই,
হিয়ার মাণিক দাঁড়া রে খানিক হিয়ার মাঝারে থুই।
স্বপনের ঘোরে দিয়ে যাস ওরে মাঝে মাঝে দুটো চুমা,
স্মৃতিমন্দিরে সোনার কোঠায় ঘুমা রে মাণিক ঘুমা।*

---

* নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন, জয়পুর অধিবেশনে পঠিত

ভুজঙ্গ-কবলিত

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

ভরা ভাদ্রের গুমোট রাত। কি একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে মানসিক পীড়ন ভোগ করছিল রাসমণি। কাছেই কোথায় সাপে ব্যাঙ ধরেছে। ভুজঙ্গ-কবলিত ভেকের আর্ত্তনাদ শুনেই ঘুম ভাঙলো ওর। বুকটা টিপ টিপ করছে এখনো। পাশে ছেলেটা ঘুমুচ্ছে অকাতরে। হাত দিয়ে স্পর্শ নিলে তার কোমল অস্তিত্বের। ওপাশে মেয়েটাও ঘুমে অচেতন। ঘেমে নেয়ে গেছে হতভাগী। ভাঙা হাত-পাখাটা হাতড়াতে যাচ্ছিল রাসমণি। আবার সেই মর্ম্মান্তিক কাতরানি। সাপের গ্রাস থেকে মুক্তি পাবার অন্তিম প্রয়াস। রাসমণির বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। হিমাচ্ছন্ন হয়ে এল যেন হাত-পা। সাপেরই মত কি একটা বীভৎস জীব ধীরে ধীরে গ্রাস করছিল যেন তাকে স্বপ্নের মধ্যে। তার সমস্ত চৈতন্যকে অসাড় করে দিয়ে—সমস্ত সত্তাকে বিলুপ্ত করে দিয়ে কে যেন নির্ম্মমভাবে টেনে নিয়ে চলেছিল তাকে ভয়াবহ তিমির-গহ্বরের মধ্যে। মুখ চেনবার আলো নেই সেখানে। নিশ্বাস নেবার বাতাস গিয়েছে ফুরিয়ে। জীবনের সব আনন্দ, সমস্ত আশাকে নির্ম্মমভাবে নিষ্পিষ্ট করছিল যেন কি এক ধরণের কদর্য্য অন্ধকার। উঃ, ব্যাঙটা ডাকল আবার! আর কতক্ষণ ডাকবে অমনি করে কে জানে। ধীরে ধীরে তিলে তিলে কবলিত করা—ভুজঙ্গের এ কেমন আহারসম্ভোগ।

বস্তির একধারে এই ভাঙ্গা ঘরখানায় আশ্রয় দিয়েছেন তাকে—বস্তিরই মালিক ভোলাবাবু। অনুকম্পা! হাঁা, হয়ত তাই। না হলে ছেলেমেয়ে দুটির হাত ধরে কোথায় পড়ে থাকতে হ'ত তাকে কে জানে। কিন্তু ও জানে—এ অনুগ্রহের মূলে দেবতার প্রসন্নতা নেই। আছে জৈববাসনার কুৎসিত মনোবৃত্তি। পাশেই এঁদো ডোবা একটা। গাড়ী গাড়ী ওঁচলা ফেলে ডোবাটার আধখানা প্রায় ভরিয়ে এনেছে মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা। পাড়ে পাড়ে পচাধরা কচুবন। বর্ষার জলে ভেজা বনবাদাড় আর পচা ওঁচলাকাঁড়ির বিশ্রী এক ধরণের গন্ধ। মাঝে মাঝে অসহ্য ঠেকে। ওপাশে পচা নর্দ্দমার বীভৎস অস্তিত্ব। সবকিছু মিলে আবহাওয়াটা নরককুণ্ডকেও হার মানিয়েছে যেন। মানুষ থাকার ঠাঁই নয় এ। এখানে পদচিহ্ন আঁকে যারা তারা ভিন্ন জাতের জীব। তাদের আব্রু থাকে না, সম্ভ্রম থাকে না। শিক্ষা-দীক্ষা কিংবা সমাজচেতনারও বালাই নেই তাদের। অপাংক্তেয় এরা মানববিশ্বে। বিধাতাও প্রসন্ন নয় যেন এদের উপর। রাসমণি এখন এই পরিমণ্ডলমধ্যচারিণী অসহায়া নারী। এখানে আসে অবশ্য আর এক জাতের নিশাচর জীব। এরা মাংসাশী। শিকার খোঁজে এরা। স্থান-অস্থান বিচার নেই এদের। রক্তমাংসের দেহের লোভে আসে।

বস্তির মালিক ভোলাবাবু প্রচুর বিত্তের মালিক এবং প্রতিপত্তিশালী। সভ্য মানুষ ইনি। আলো সহ্য হয় না এঁর শ্রীঅঙ্গে। রাতের অন্ধকারে তাই গা-ঢাকা দিয়ে আসেন তিনি। অভিসারপ্রমত্ত মন নিয়ে আসেন। বয়স হয়েছে অনেক। রাসমণির বাপের বয়সীই হবেন বা। তা হোক। নজরে ধরেছে রাসমণিকে। প্রলোভনের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে রাসমণির মনের ভিত কেঁপে উঠছে ক্রমশঃ। লোভ দেখাচ্ছেন ওর ছেলেমেয়েদের অঙ্গে রঙীন কাপড়-জামা উঠবে। পেটভরে ভালমন্দ খেতে পাবে দুটিতে। মাথার উপর ভাল ছাউনিও জুটবে একটা। সর্ব্বোপরি ওর উপোসী দেহমনে আবার ভরা কোটালের জোয়ার আসবে কুল ছাপিয়ে। আজ সন্ধ্যাতেও হত্যা দিয়ে পড়েছিলেন ভোলাবাবু। ও আর কতদিন লড়বে এমনি করে বিবেকের সঙ্গে। আজন্মের সংস্কার—আর আগলাতে পারবে না ওকে। সব সামর্থ্য নিঃশেষিত হয়েছে ওর। মনের সকল বাঁধন এলিয়ে পড়েছে যেন। অন্ধকার—হ্যাঁ, বীভৎস অন্ধকারই গ্রাস করছে তাকে ক্রমশঃ। স্বপ্ন নয় এ—বাস্তবের অসহনীয় অথচ অতি লোভনীয় অন্ধকার। যত্ন করে চা খাইয়েছে আজ সন্ধ্যায় রাসমণি বস্তির মালিক ভোলাবাবুকে। হেসে পানের খিলি দিয়েছিল হাতে তুলে। কি এক দুর্ব্বার আকর্ষণ যেন। বিষধরের সম্মোহনই হয়ত বা এ! যা কোনদিন করে না—তাই করবার দুরন্ত লোভ জেগেছিল আজ ওর। নিপুণ যত্ন দিয়ে কবরী রচনা করেছিল আজ সে। অঙ্গরাগ—হ্যাঁ, তারও ছোঁয়াচ লেগে রয়েছে এখনো ওর দেহ-মনে। পানের রসে ঠোঁট দুটিতে রঙ ধরে হয়েছিল ঠিক বিম্বাধর। কপালের সিঁদুর টিপটিও হয়েছিল কি নয়নলোভন! মাথায় আজ আর ও ঘোমটা টানে নি ভোলাবাবুর সামনে। ভোলাবাবু বস্তির মালিক, ওর দেহমনেরও মালিক হতে চান। হতভাগা ছেলেমেয়ে দুটো জেগে না থাকলে কি করে বসত ও কে জানে! হাত ধরে কাছেও টেনে ছিলেন ওকে ভোলাবাবু। বিষধরের স্পর্শ অন্য সময় হলে ওর সমস্ত নারীত্ব শিউরে সঙ্কুচিত হয়ে মাটিতে মিশিয়ে যেতে চাইত নিশ্চয়ই। নয়তো আগুন ছিটকে বেরুত বিদ্রোহিনীর চোখ দিয়ে। আজ কিন্তু দুর্ব্বার লজ্জা আর মাতৃত্বের মহিমাই শুধু ওর মনের পাগলামিকে দাবিয়ে রেখেছিল কোনরকমে। ঝি-গিরি করতে হবে না আর ওকে। পরের সংসারের জন্যে শরীরপাত করতে হবে না আর। ভোলাবাবু প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন নাগাড়ে। ভদ্দর লোক উনি। কথার কি খেলাপ হয় তাঁর।

হ্যাঁ, বিয়ের কাজই করে রাসমণি। পাটঝাঁট বাসনমাজা আরও কত কি। একটি সংসারকে পরিচ্ছন্ন করে রাখার দায়িত্ব তার। বিনিময়ে পায় অনেককিছু। হ্যাঁ, অনেক বই কি!

হু'বেলায় দুমুঠো করে ভাত। ভাগাভাগি করে খায় ছেলে মেয়ে মা। তা ছাড়া পাতে পাতে উচ্ছিষ্টও থাকে একটু আধটু। তাতেও কোন কোনদিন পেট ভরে যায় ছেলে মেয়ে দুটির। নগদ তিনটে করে টাকা মাসে মাসে। বছরে দুখানা করে কাপড়। ছেঁড়াখোঁড়া জামা-কাপড়ও জোটে ছেলেমেয়েদের ভাগ্যে। প্রত্যাশার তুলনায় যথেষ্ট বৈকি।

সকালে ফরসা হতে না হতেই হাজির হতে হয় ওকে মনিব-বাড়ীতে। স্কুল-কলেজ আপিস-আদালত আছে ছেলেদের বাবুদের। কর্ত্তা-গিন্নীরা ছেলেমেয়েরা হাঁক-ডাক সুরু করে দেয় সকাল থেকেই। পাটঝাঁট সেরে বাসনের কাঁড়ি নিয়ে গিয়ে বসে ও খিড়কী পুকুরের ঘাটে নয়ত কলতলায়। একরাশ ছাই, মুঠো দুই খোল, একটু তেঁতুল। মাজবার সব সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে ও কোমর বেঁধে বসে। সুরু হয় ঘষামাজার দৈনন্দিন তৎপরতা। দিনের প্রথম প্রহর পেরিয়ে যায়। প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন অগ্নিবর্ষণ করে মাথার উপর। ছেলেমেয়েদের রাজ্যের জামা-কাপড়ে সাবান দিতে হবে এখনো। তারপর পোড়া কড়া-চাটু নিয়ে ঘষামাজার কসরত আছে। অবেলায় দুমুঠো মুখে দিয়ে একটু দেহ এলিয়ে দম না নিতেই চারটে বাজবে ঢং ঢং করে। মশলার কাঁড়ি নিয়ে বসতে হবে আবার ওকে। সুরু হবে আবার শিল-নোড়া নিয়ে একটানা কসরত। সত্যি, গতর যেন ওর গুঁড়িয়ে যায় দৈনন্দিন কর্ম্মপেষণে পড়ে। হ্যাংলা ছেলেমেয়ে দুটো ঘ্যান ঘ্যান করে পিছু পিছু ঘোরে সর্ব্বক্ষণ। মুখপোড়াদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না আর কিছুতেই। পেটে রাক্ষস ঢুকেছে যেন। বাবুদের উচ্ছিষ্ট এঁটোকাঁটা পরম তৃপ্তিতে দেবতার প্রসাদের মতই চেটে চেটে খায় দুটিতে ভক্তিভরে। সব দিন পায় না অবশ্য। রাসমণি চাইতে পারে না ওদের দিকে। আঁস্তাকুড়ে এঁটো পাতা-চাটা কুকুরদের মতই ঠিক দেখায় তখন ওদের। বাবুদের ছেলেমেয়েরা ভালমন্দ খায়। পর্ব্বে পর্ব্বে ঋতুতে ঋতুতে ভোজন-উৎসব লেগেই আছে প্রায় এ সংসারে। উপরন্তু আছে প্রত্যেকের জন্মতিথি-উৎসব। ছেলেমেয়েদের সে আনন্দযজ্ঞে ওর কুচোদুটি ঠাঁই পায় না। তা ছাড়া ওর নিজের জীবনেও কতই না সাধ-আহ্লাদ ছিল এক দিন। কিন্তু আজ! দায়ী এর জন্য কে! কে জানে—হয়ত তার অদৃষ্টই দায়ী। আর দায়ী নিশ্চয়ই সনাতন।

সনাতন ওর স্বামী। গায়ে হলুদ, ছাঁদনাতলা, বাসরঘর, ফুলশয্যা—সব আনন্দ-অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে পাওয়া একান্ত আপন জন। একেবারে নিজস্ব সম্পত্তি। জীবনের পরম দেবতা। জন্মজন্মান্তরেও নাকি সম্পর্ক ঘোচে না এ মানুষের সঙ্গে। তাকে ভালও বাসত প্রাণভরে, কিন্তু কি মতিগতি যে শেষ পর্য্যন্ত হ'ল তার। আজ স্বামীর মুখখানা মনে করতেও গা কেমন করে ওঠে ওর ঘেন্নায়।···তার জন্তে না হোক—ছেলেমেয়ে দুটোর জন্তেও মায়া হ'ল না একটুও। কি খাবে পরবে কুচোদুটো—ভাবলে না এক বার। বাঁশবেড়ের চটকলে নাকি কাজ করে এখন শুনতে পায়।···মিনসের মরামুখ দেখলেও এখন রাগ যাবে না ওর।

···সাপের মুখের ব্যাঙটা ডেকে উঠল আবার। উঃ, মরে নি এখনো! কি মর্ম্মান্তিক পীড়ন!

অন্ধকার—চারদিকে যেন সর্ব্বগ্রাসী অন্ধকার। ঘুম আসছে না আর রাসমণির কিছুতেই। অতীতের কয়েক বছরের যবনিকা তুলে ধরল যেন কে হঠাৎ। ছোট একটি গ্রাম। আম-কাঁঠালের বাগানের ধারে শ্রীময় একটি নিকেতন। আলো, বাতাস, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু—প্রকৃতির সে কি অকুণ্ঠ দাক্ষিণ্য। স্বামী, স্ত্রী আর শাশুড়ী তিন জনের সংসার তখন। প্রাচুর্য্যে ভরিয়ে দিতেন ভূমি-লক্ষ্মী। মাটি—মাটিই ছিল না শুধু, মাটি ছিল সোনা;—মাটি ছিল স্বর্ণগর্ভা। ফসল-বেচা পয়সায় অঙ্গে সোনা উঠতে সুরু করেছে সবে এক-আধখানি করে। শাশুড়ী বলতেন—জোতজমি বাড়া সনাতন। জমিই সোনা। জমিতেই ফলবে সোনা। স্বপ্ন দেখতেন তিনি। সোনার ফসলের স্বপ্ন। বৃন্দাবনের যশোদারাণীর সোনার সংসারের স্বপ্ন। ছোট ছোট নাতি-নাতনীরা উঠানে হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে বেড়াবে নন্দদুলালের মত। ধেই ধেই করে নাচবে ননীচোরার দল। আরও কত কি! সে স্বপ্নমায়া রাসমণির মনেও রঙ ধরাত অলক্ষ্যে। মনিব-বাড়ীতে তারই সমবয়সী বউ রয়েছে দুটি। রূপে লাবণ্যে ঝলমল করে দুটিতে। কত রকমের শাড়ী-গয়না ওদের। বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অঙ্গরাগ করে ওরা। নিপুণ শিল্পীর যত্ন দিয়ে গড়া ওদের তনুদেহ। আয়নায় প্রতিবিম্ব পড়ে। লাবণ্যের নদীতে লহরীলীলা সুরু হয় যেন। মনে হয় মনসিজ মূর্চ্ছিত হয়ে বুঝি-বা লুটিয়ে পড়বে পদপ্রান্তে। বাসরের রাণী সাজে ওরা অমনি করে প্রতি অপরাহ্ণে। ওর অন্তরের লাবণ্যময়ী হায় হায় করে। চেয়ে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শুধু। অমনি জীবনের স্বপ্ন দেখাও তার পক্ষে বিড়ম্বনা এখন। ওদেরই মত চিকণগৌর রঙ ছিল এক দিন ওর দেহের। শ্রীদাম বৈরাগীর মেয়ে ও। অত্যন্ত গরীবঘরের মেয়ে। কিন্তু শাশুড়ী সব জেনে শুনেও ঘরে এনেছিলের ওকে—শুধু ওই গায়ের রঙ দেখে। তের বছরের রাসমণি আধ ফুটন্ত পদ্ম-কুঁড়ির মতই অপরূপ ছিল যেন। শ্বশুর বেঁচে ছিলেন তখন। বৈষ্ণব মানুষ তিনি। হেসে হেসে বলতেন সবাইকে—রাধারাণীর দয়া গো—আমাদের রাধারাণীর দয়া। তিনিই ঘরে এসেছেন আমার মায়ের রূপ ধরে।

কিন্তু কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল! প্রদীপ নিভ্‌ল। উঠানে তুলসীতলায়—ঘরের কোণে পিলসুজে—একসঙ্গেই প্রদীপ নিভল। আকাশ-প্রদীপও আর জ্বলল না। দীপালীর আলোও গেল চির-দিনের মত নিভে। যুদ্ধ এল—দুর্ভিক্ষ এল। জমিজমা অনেক কিছুই খোয়ালে সনাতন একে একে। মাটির দাক্ষিণ্য গেল ফুরিয়ে। শ্রীময়ী হলেন বিভীষিকাময়ী। অন্নপূর্ণা সাজলেন কালিকা। সুন্দরের পরিবেশ গেল বদলে। শ্মশান-শয্যা বিছাতে সুরু করলেন পল্লীলক্ষ্মী। মাটির স্বর্ণকান্তি হয়ে এল ম্লান। স্বর্ণ-সম্ভাবনাও হয়ে এল বিলুপ্ত। বোমারু বিমান বিষ-নিশ্বাস ছড়িয়ে গেল আকাশে-বাতাসে আর মানুষের মনে। পল্টন সেপাই আর

কামান-বারুদে ভরে গেল দেশ। যুদ্ধের চাহিদা নির্মম এবং সর্ব্বগ্রাসী। উড়ো জাহাজের ঘাটি হবে। সরকার চাইলেন জমি। সাতপুরুষের ভিটে—আজন্মের আবাসভূমি—আলোবাতাস—চিরপরিচিত পরিবেশ সবকিছু ছেড়ে মানুষকে বেরিয়ে পড়তে হ'ল ছন্নছাড়া হয়ে। এমনি ছন্নছাড়াদের দলে ভিড়ে রাসমণিরাও স্রোতের কুটোর মত ভেসে মরেছে বহু দিন ধরে। ভাগ্যিস শাশুড়ী গত হয়েছিলেন। পুণ্যাত্মা ছিলেন নিশ্চয়ই তিনি। কোলেরটা হয় নি তখনো। মেয়ের হাত ধরে স্বামীর সঙ্গে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ-তাড়নায় নাকানিচোবানি খেতে খেতে এসে পড়েছিল এক দিন এই ভাগাড়ে। একটা অধ্যায় শেষ হয়ে নতুন একটা পর্ব সুরু হ'ল আবার জীবনের। গোল্দলপাড়ার এই চটকলে চাকরী জুটল সনাতনের। দশ টাকা হপ্তা। মাসে চল্লিশ টাকা করে। দুর্য্যোগের রাত্রিশেষে শুকতারা ওঠার মত আশার প্রসন্ন ইঙ্গিত ফুটে উঠল যেন। বিনোদতলার বস্তিতে ঘরও জুটল একটা। তিন টাকা করে ভাড়া। আবার মাদুর-পাটি-কম্বল-বিছানা, গেলাস-কলসী কড়া-চাটু, কলাইয়ের থালা-বাসন—গৃহস্থালীর সব সাজ-সরঞ্জাম এল একে একে। পাখী পুষলে সনাতন। ছোট একটা ছাগলছানাও আনলে কোথা থেকে। ঘরের চালে লতিয়ে লতিয়ে লাউ পুঁই উঠল। মায়াবিনী আশা হাতছানি দিতে সুরু করলে সব দিক থেকে। কিন্তু পাপ জুটল ওই মুচি-বউ। পঙ্গু স্বামী তার। পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে গেছে এক দিকের অঙ্গ জীবনের মত। একটানা সেবা করতে করতে বিরক্তির পাহাড় জমে উঠেছিল এতদিন ধরে বউটার মনের মধ্যে। ভরা যৌবন তার। টলমল করত দেহ। আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরের মত মনের মধ্যে কি এক ধরণের দুর্ব্বার প্রেরণাও যেন সক্রিয় ছিল। এমনি দিনে সনাতন এসে জুটল। প্রথম দিনেই এমন প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে তাকালে সনাতনের দিকে—দেখে ওর গা ঝিঁঝিঁ করে উঠেছিল। কয়েক মাসের স্বপ্ন-ছবি হঠাৎ মিলিয়ে গেল এক দিন। বন্ধুবান্ধব জুটল সনাতনের। নেশা ধরল—তাড়ি মদ—আরও অনেককিছু। মুচি-বউ হয়ে উঠল মনের মানুষ। রাসমণির রাগ, অভিমান, চোখের জল, সাধ্যসাধনা কিছুতেই কিছু নয়। কোন আকর্ষণই বাগ মানাতে পারে নি।···

তার পরের ইতিহাস—শুধু দুঃখের সঙ্গে একটানা সংগ্রাম। না—লড়াই নয় এ।···উঃ, ব্যাঙটা ডাকল যেন আবার! এলিয়ে পড়েছে সব সামর্থ্য। ঝিমিয়ে এসেছে আর্ত্তকণ্ঠ। পরমায়ু আগলে রাখবার এই বোধ হয় শেষতম প্রয়াস। বুকটা আবার কেঁপে উঠল যেন রাসমণির। ব্যাঙটার মত তারও আত্মরক্ষার অন্তিম প্রয়াস ব্যর্থ হবে নিশ্চয়ই। মনে হ'ল—সংসারের সব দিক যেন বিষধরে ভরা। নিষ্ঠুর নিয়তি ঠেলে নিয়ে চলেছে তাকে সাপের গ্রাসের দিকে। তাদেরই উপভোগ্য আহার্য্য যেন সে। বস্তির নরপশুদের লোলুপদৃষ্টি পড়েছে তার উপর। ষাট বছরের এক বুড়ো। সেও চেয়েছিল তাকে গ্রাস করতে। এক অমাবস্যার রাতে তারও বিষাক্ত নিশ্বাসের স্পর্শ তাকে সন্ত্রস্ত করে তুলল। অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করল সে। যে কেউ ওর পানে তাকায় তারই চোখে ওই বিষধরের দৃষ্টি। তাকে পরিপূর্ণরূপে গ্রাস করবার কি দুর্নিবার কামনা প্রতিটি চোখে। অভাব-অনটন সত্ত্বেও দেহের মোহনীয়তা ঘোচে নি কিন্তু আজও। হাঁ, পোড়া দেহটাই ত সকল জ্বালার মূল। কোথায় লুকাবে ও এই দেহকে। এমনভাবে বাঁচতে চায় না আর রাসমণি। অন্ধকারই গ্রাস করুক তাকে। আর্ত্তধ্বনি তুলে ভেকের মতই ধীরে ধীরে ভুজঙ্গ-কবলিত হতে থাকবে সে। এই বস্তির অন্যান্য মেয়েদের জীবনধারারই অনুবর্ত্তন করবে রাসমণি। হাঁ, নিশ্চিত সম্ভাবনাকেই বরণ করবে ও হৃদয় দিয়ে। চুলোয় যাক ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ। কাল সন্ধ্যায় ভোলাবাবুকে ও আর বিমুখ করবে না কোনমতেই। শিরায় শিরায় মর্ম্মে মর্ম্মে দুর্নিবার অগ্নি-জ্বালা সঞ্চারিত হয় যেন।···ব্যাঙটা ডাকল যেন আবার। মরে নি এখনো, এখনো গ্রাস করে নি তাকে জীবনান্তক অন্ধকার। আচ্ছা, তা হলে ভুজঙ্গ-কবল থেকে ভেকটার আর বাঁচবার আশা কি নেই—চরাচরব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে আলোর দিশা কি নেই কোথাও!···

অন্ধকার থাকতেই ছেলেমেয়েকে ডেকে তুলল রাসমণি। জ্বল জ্বল করছে শুকতারা ভোরের আকাশে। প্রভাতের প্রসন্নময় ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে পূর্ব্বাশার প্রান্তদেশে। পথ—দিগন্ত-প্রসারী পথ—দূরের দিশারী পথই আহ্বান জানাল যেন। পদচিহ্ন আঁকে তিনটি প্রাণী। চার বছরের ছেলেটা হাঁটতে পারছে না আর। মেয়েটা বলে—আজ আর কাজে গেলে না মা—এত সকালে কোথায় চলেছি মা আমরা। মা বলে শুধু—জোরে জোরে হাঁট দেখি। পৌঁছতে অনেক বেলা হবে হয়ত। চণ্ডীতলায় চলেছি! মানুষের আস্তানা ছেড়ে দেবতার মন্দিরে আশ্রয় নিতে আজ বদ্ধপরি-কর রাসমণি। ছেলেমেয়ে দুটো ক্লান্ত পা দুটোকে জোরে জোরে টানতে থাকে বিপুল উৎসাহভরে। মাও মনে বল পেয়েছে আজ। দেবতার চরণতলে ফিরে চলেছে সে। ফিরে চলেছে অন্ধকারের পারে আলোর দেশে। আপাততঃ ভুজঙ্গ-কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভ তো করল সে—সম্মুখে অফুরন্ত পথ—পথের দেবতাই তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন পরম কল্যাণতীর্থে।

মনীষী এমিল ফিসার

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়

মহাপুরুষদের জীবনী যত আলোচনা করা যায় ততই দেশের ও দশের কল্যাণ। আমাদের দেশ যেমন আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষদের আবির্ভাবে ধন্য হইয়াছে, পাশ্চাত্ত্য দেশ তদ্রূপ বৈজ্ঞানিক সাধকদের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে। আজ যাঁহাকে স্মরণ করিতেছি তাঁহার নাম এমিল ফিসার। সর্ব্বসাধারণ তাঁহার নাম না জানিতে পারেন, কিন্তু রসায়নীগণ নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে স্মরণ করিবেন। প্রুশিয়াতে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ফিসার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন বিচক্ষণ ব্যবসায়ী হওয়ায় ছেলেরও মন ছোটবেলা হইতে ব্যবসায়ের দিকে ধাবিত হয়। ম্যাট্রিক পাস করিয়া সতর বৎসর বয়সে তিনি পিতার ব্যবসায়ে যোগদান করেন। কিন্তু ব্যবসার আকর্ষণ তাঁহাকে বেশী দিন আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। সে সময় তাহাদের দেশের বিখ্যাত জৈব-রসায়নবিদ্ কেকিউলী গবেষণার বিপুল প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। ফিসার অর্থের লিপ্সা ত্যাগ করিয়া কেকিউলীর ছাত্ররূপে তাহার গবেষণাগারে প্রবিষ্ট হন। তাঁহাকে বেশী দিন কেকিউলীর অধীনে থাকিতে হয় নাই। কারণ ইনিই ফিসারকে ট্রাস্‌বুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রোজের অধীনে গবেষণা করিবার জন্য প্রেরণ করেন। সে সময় জার্ম্মানীর ছাত্রগণ এক স্থান হইতে অপর স্থানে সদাসর্ব্বদা যাতায়াত করিত। রোজের অধীনে তিনি প্রথমতঃ রাসায়নিক বিশ্লেষণের বিবিধ পদ্ধতি আয়ত্ত করেন। এখানেই তাঁহার মন জৈব-রসায়নের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এক বৎসরের মধ্যে তিনি একজন কৃতী জৈব-রসায়নী বলিয়া পরিচিত হইলেন। জার্ম্মানীর অপর একজন প্রথিতযশা জৈব-রসায়নী ব্যায়ারের সঙ্গে এখানে তাঁহার আলাপ ও বন্ধুত্ব হয়। এই ব্যায়ারই কৃত্রিম নীল প্রস্তুত করিয়া রসায়নে নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছেন এবং স্মরণীয় হইয়া আছেন। সেই যুগে ব্যায়ার একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ছিলেন। তাহার সংস্পর্শে আসিয়া গ্রাবে, বীলবারম্যান, ভিক্টর মায়ার প্রভৃতি মনীষিগণ বিশ্ব-বিখ্যাত হইয়াছেন।

ফিসার এই মহান সাধকের আশীর্ব্বাদ ও সহানুভূতি পাইয়া রসায়নে প্রাণ-মন ঢালিয়া দিলেন এবং অতি সত্বর (১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ) দুইটি বর্ণের গঠনভঙ্গী ও তাহাদের অন্যান্য গুণাবলী নির্দ্ধারণ করিয়া পিএচ-ডি উপাধি পাইলেন। তিনি ফিসারের শক্তিমত্তার পরিচয় পাইয়া অতি সত্বর তাহাকে তাঁহার সহকর্ম্মীরূপে গ্রহণ করিলেন। ইহার পর এক বৎসরের মধ্যে ফিসার ফিনাইল হাইড্রাজিন নামক একটি অতি মূল্যবান জৈব পদার্থ আবিষ্কার করিয়া জৈব-রসায়নীদের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিলেন। এই অমূল্য পদার্থটির দ্বারা তিনি পরবর্ত্তীকালে গবেষণাগারে চিনি প্রস্তুত করিতে সফলকাম হইয়াছিলেন। জৈব রসায়নীগণ আজ একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, ফিসারের ওসাজোন পরীক্ষা কি অপূর্ব্ব আবিষ্কার। চিকিৎসক ও অন্যান্য বহু বিজ্ঞানী সম্প্রদায় এজন্য তাহার নিকট চিরঋণী।

কিছু দিন পর ব্যায়ার মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন এবং প্রিয় ছাত্র ফিসারকে সঙ্গে লইলেন। এরূপ উপযুক্ত রসায়ন-সাধকের সঙ্গ পাইয়া ফিসারও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ইহার পর তিন বৎসর গবেষণা ছাড়া তাহার কোন কাজ ছিল না। ফিসার উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক পাইয়া একেবারে ইহাতে ডুবিয়া গেলেন। তাঁহার এই সময়ের দান জৈব-রসায়নের এক অপূর্ব্ব সম্পদ। এই কঠোর সাধনার ফলে তিনি যাহা আবিষ্কার করেন তাঁহার সঙ্গে ভিক্টর মায়ারের একটা যোগাযোগ থাকায় ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মে। কাজেই এ সময় তাঁহার দুইটি লাভ হয়। একটি গভীর গবেষণালব্ধ ফল, অপরটি এক অকৃত্রিম বন্ধু। অগ্নি কখনও চাপা থাকে না—দেখিতে দেখিতে ফিসারের জন্য একটি উপযুক্ত পদ সৃষ্টি হইল এবং তিনি ব্যায়ার-গবেষণাগারের বিশ্লেষণ বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন (১৮৭৮)

মানুষ স্বপ্নেও ভাবে নাই কোন দিন উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ পদার্থ গবেষণাগারে প্রস্তুত হইবে। যেদিন মনীষী উলার জৈব ও অজৈব পদার্থের সীমারেখা ছেদ করিলেন সেদিন হইতে জৈব রসায়নের যুগ আরম্ভ হয় (১৮২৮)। অজৈবকে ছাড়িয়া বিজ্ঞানী জটিল, অস্পষ্ট, অসম্ভব ব্যাপারে মাতিয়া উঠিলেন। দুই জন মনীষী উলার ও লিবিগের উদ্দীপনায় জার্ম্মানীতে তুমুল গবেষণার ঢেউ উঠিল। হফম্যান, কেকিউলী, পার্কিন, ব্যায়ার, ফিসার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ একে একে আসরে নামিয়া আসিলেন। ফলে কল্পনাতীত আবিষ্কার দেখা দিল। ফিসার কৃষিজাত চিনি, চা ও কফির প্রাণ ক্যাফিন ও থিওব্রোমিনের গঠনভঙ্গি, এমন কি অত্যন্ত জটিল প্রোটিনের রূপরাজি নির্দ্ধারণে মাতিয়া উঠিলেন। তিনি জৈব রসায়নে এমন একটি আলোড়ন সৃষ্টি করিলেন যে, রাসায়নিক জগতে আবার নব্য-রসায়ন গবেষণার ঢেউ উঠিল। প্রাণী-জগৎ ও উদ্ভিদ-জগৎ উভয়ই এখন গবেষণার বিষয়বস্তু হইল।

ফিসার এখন ধাপে ধাপে উঠিতে লাগিলেন এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াব্‌জবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৩৩ বৎসর। এতদিন তিনি নিজেই কাজ করিতেন, এখন হইতে তিনি ছাত্র গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার জন্য একটি চমৎকার গবেষণাগার তৈয়ারী হইল, সেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ হইতে দলে দলে ছাত্র ছুটিয়া আসিতে লাগিল। ফিসারের ছাত্রগণ আচার্য্যের পরামর্শে ইউরিক এসিড ও চিনি লইয়া আরও গভীরতম গবেষণায় নিমগ্ন হইলেন। অতি সত্বর

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেথেওসডা, ম্যারিল্যাণ্ডে ভারতের দুই জন মহিলা সমাজকর্মী —কুপ্প স্বামী এবং কৃষ্ণাবাঈ নিম্বকর

বি. বি. সি'র টি-ভি'তে চিত্রকলা শিক্ষাদান

বিবিধ চিনি সংস্করণ তাঁহাদের হস্তগত হইল এবং উহাদের ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির গূঢ় সঙ্কেত পাওয়া গেল। ফিসার কার্বোহাইড্রেট প্রস্তুতির প্রাকৃতিক প্রাথমিক সংকেতটা অতি সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করেন, এমন কি যে তাপে প্রাকৃতিক ক্রিয়া সাধিত হয় তাহাও তিনি অতি স্পষ্টভাবে গবেষণাগারে প্রয়োগ করেন। কিন্তু এত কাছাকাছি অগ্রসর হইয়াও তিনি চিনি প্রস্তুতির সম্পূর্ণতা বিধান করিতে পারিলেন না। আজ পর্য্যন্ত কেহই ফিসারের আংশিক সফলতাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে পারেন নাই। গবেষণাগারে প্রস্তুত হইল সত্য, কিন্তু সাশ্রয় হইল না, ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে স্থান পাইল না।

ফিসারের গবেষণা যখন পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে, তখন তাঁহার শরীরের উপর এক আকস্মিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। চিনি প্রস্তুতির পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে গিয়া তাঁহাকে এত বেশী ফিনাইল হাইড্রাজিন ঘাটিতে হইয়াছিল যে, ইহা তাহার শরীরে বিষক্রিয়া করিল। তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ফিনাইল-হাইড্রাজিনের হাওয়ায় অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। এই ব্যাধি তাঁহাকে একেবারে পঙ্গু করিয়া ফেলিল। ইহার পর অনেকটা সুস্থ হইলেও তাঁহার স্বভাবে একটা রুক্ষতা উপস্থিত হইল। যিনি একান্তভাবে ছাত্রদের বন্ধু ও সহায়ক ছিলেন তিনি ক্রমশঃ তাহাদের সঙ্গ পরিহার করিতে লাগিলেন।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ফিসার বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এ পদটি সে সময় অত্যন্ত লোভনীয় ছিল, কারণ তদানীন্তন প্রুশিয়ার গবর্মেণ্ট ইহাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করিবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ দ্বারাই এ পদ অলঙ্কৃত হইত। ফিসারের জন্য একটি নূতন গবেষণাগার সৃষ্ট হইবে এই সর্ত্তে তিনি ওখানে যাইতে স্বীকৃতি জানাইয়াছিলেন। বার্লিনে গিয়া তিনি আবার সেই চিনির মধ্যে ডুবিয়া গেলেন—চিনির দ্রবণ কিছুদিন ফেলিয়া রাখিলে যে পচনক্রিয়া লক্ষিত হয় তাহার গূঢ়ার্থ নির্দ্ধারণে এবার তিনি মনোনিবেশ করিলেন। ফলে এন্‌জাইম ফারমেণ্ট প্রভৃতির রাসায়নিক গঠনভঙ্গীর দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি ক্রমশঃ এদিকেও অনেক কিছু প্রাকৃতিক গূঢ় রহস্য উদ্ধার করেন। বিবিধ চিনি আবিষ্কার ও তাহাদের আভ্যন্তরীণ কাঠামোয় সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়া তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা অতুলনীয়। তিনিই বলিয়াছিলেন "এন্‌জাইম, একটি রাসায়নিক ঘটক, ইহারা প্রাকৃতিক রাজ্যে বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাধন করে, প্রত্যেকটি এন্‌জাইমের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রতি পছন্দ বা অপছন্দ আছে। সকল এন্‌জাইম সব রকম প্রক্রিয়া সাধন করিতে পারে না। ইহারা যেন এক একটি তালার জন্য এক একটি চাবি।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে শীতকালে তিনি আবার ইউরিক এসিড ও ক্যাফিন লইয়া কাজ আরম্ভ করেন। তিন বৎসর অবিরাম সাধনার ফলে তিনি দুইটি বস্তুরই গঠনরূপ নির্দ্ধারিত করেন এবং উহারা যে পিউরিন নামক একটি রাসায়নিক পদার্থের বংশধর—সে সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেন।

ফিসার যে জয়যাত্রার পথ রচনা করিলেন তাহাতে রসায়নী, শারীরতত্ত্ববিদ্‌ ও চিকিৎসকদের চক্ষু খুলিয়া গেল। ইউরিক এসিড প্রাণীজ পদার্থ ও ক্যাফিন বৃক্ষজ পদার্থ, কিন্তু উভয়ের মূল এক। এই নূতন সিদ্ধান্তের ফলে সকলেই এক উজ্জ্বল আলোর সন্ধান পাইলেন। ফিসারের শক্তিমত্তার কে ইয়ত্তা করিবে? ইউরিক এসিড, ক্যাফিন প্রভৃতি প্রাকৃতিক জটিল পদার্থগুলি প্রস্তুত করিয়া তাহার আশা মিটিল না। তিনি আরও জটিলতর গভীর গহনে প্রবেশ করিলেন। এবার তিনি প্রোটিনের গঠন-রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হইলেন। প্রোটিন খাদ্য আমাদের শরীররক্ষার একটি প্রধান অবলম্বন। ইহাকে বাদ দিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। ফিসার ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ প্রোটিন লইয়া যথেষ্ট ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছেন এবং জীবদেহে উহাদের শেষ পরিণতি যে এমিনো এসিড তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। এমন কি, প্রাণিদেহে প্রোটিন খাদ্যের পরিবর্ত্তনে যে ১৯টি এমাইনো এসিড তৈয়ারি হয় তাহাদের প্রত্যেকটি গবেষণাগারে প্রস্তুত করিয়াছেন এবং উহাদের কয়েকটির যোগাযোগে একটি সরল, সহজ প্রোটিন তৈয়ার করিয়াছেন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফিসারের গবেষণা পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছিল। তিনি ঐ সনের জন্য রসায়নের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। বিজ্ঞানীগণ মনে করেন, ফিসারের চিনি গবেষণাই নোবেল পুরস্কারের পক্ষে যথেষ্ট ছিল, প্রোটিন গবেষণার জন্য যে পুরস্কার তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা কাহারও শক্তিতে কুলায় নাই।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিলাতের ফ্যারাডে পদক প্রাপ্ত হন। তিনি নিজে লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া উক্ত সম্মান গ্রহণ করেন। তদানীন্তন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার উইলিয়ম র‍্যামজে বলিয়াছিলেন, "আপনার নিকট আমরা শ্রদ্ধায় মস্তক নত করিতেছি। আপনি আমাদের সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসায়নী এবং পৃথিবীর একজন বিরাট মনীষী।" অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজ বৈজ্ঞানিক স্যার হেন্‌রী রস্কো বলিয়াছিলেন, "আমি ডুমাস, ওয়ার্জ প্রভৃতি মহা মহা পণ্ডিতদের বক্তৃতা শুনিয়াছি, কিন্তু আপনার বক্তৃতায় যে রস সৃষ্টি করিয়াছে এরূপ কখনও দেখি নাই।" চিনি, প্রোটিন প্রভৃতির সংগঠন ও বিশ্লেষণ করিয়া তিনি সংগঠন-রসায়নকে প্রাণবিদ্যার গোড়ায় আনিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার চিনি-গবেষণা যে আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল, প্রোটিন-গবেষণা দ্বারা তাহা শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মানুষ যে এমন অচিন্তনীয় দুরূহ ব্যাপারের মধ্যে এরূপ রস সৃষ্টি করিতে পারে তাহা কেহ কোন দিন কল্পনা করিতে পারে নাই।

ফিসারের সময়ই জার্ম্মানীতে বিজ্ঞান গবেষণার শ্রেষ্ঠ আয়োজন মূর্ত্ত হইয়া উঠে। অসওয়াল্ড, নার্ন্‌ষ্ট প্রভৃতি মনীষিগণ ফিসারের সঙ্গে একযোগে রাসায়নিক জাগরণ আনয়ন করিলে তদানীন্তন জার্ম্মান সম্রাট কাইজার দ্বারা সর্ব্বান্তঃকরণে উঁহাদের উৎসাহিত করেন।

ফলে বার্লিন রিসার্চ ইনসটিটিউট স্থাপিত হয় এবং রাজা ও রাষ্ট্রের দৃষ্টি একযোগে বিজ্ঞান-সমৃদ্ধির দিকে পতিত হওয়ায় জার্মানী পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে। ফিসার দেখাইয়াছেন যে, তৎকালীন জার্মান গবেষণার ফলে বর্ণ-রসায়ন, নেত্রজান উদ্ধার, কৃত্রিম নীল, কৃত্রিম কর্পূর, ব্যাকেলাইট প্রভৃতি সভ্য জগতে অমূল্য সম্পদরূপে দেখা দিয়াছে। ক্লোরোফিল নামক বৃক্ষাদির সবুজ প্রাণ ঐ সময়েরই দান।

ফিসার অধ্যাপক পদে ব্রতী হইয়াই বিবাহ করিয়াছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মেধাবী ও সুশ্রী ছিলেন। তাঁহাদের বিবাহিত জীবন খুবই মধুর ছিল।

কাশ্মীরে কোজাগরী

শ্রীমহাদেব রায়

যত সাধ ছিল, সাধ্য ছিল না—
শ্রীনগরে বসি' করিব যাপনা
দিব্য-কান্তি স্নিগ্ধ-জ্যোছনা
কোজাগরী জাগরের,
আঁখির পিপাসা মিটে কোথা হেন,
আকাশের চাঁদ হাতে এল যেন,
মিছে তবে করি পরিতাপ কেন
ব্যর্থ এ জীবনের ?
জ্বলিত সুধা গিরির গাত্রে
ভরিয়াছে যেন পাত্রে পাত্রে
ছন্দে ছন্দে রসের পাত্রে
পরিবেষণের আশে।
ধরিনু লেখনী কক্ষে প্রবেশি,
করে হৈ-চৈ যত প্রতিবেশী
সঙ্গী স্বজন করি মেশামেশি,
হাসিতে কান্না আসে।
তুষার-কিরীট গিরি চূড়ে হাসে,
রজত-ধারায় বন্যায় ভাসে,
সমগ্র পুরী যেন পরকাশে
বঙ্গের জ্যোছনায়,
কোজাগরী যেন সেথা হ'তে আসি
দিল ভূ স্বর্গে এ সুষমারাশি,
ভূলোকে-দ্যুলোকে মিশি হাসাহাসি
রচিয়াছ মহিমায়।

হোথা জ্যোছনায় ঝিলমের তীর
মায়াময়ী দেবদারু অটবীর
রন্ধ্রে রন্ধ্রে মুক্তামদীর
চিত্রিত রূপে হাসে,
চাদিনী পশিছে মর্মের মূলে,
ঝিলম উঠিছে তাই দুলে দুলে,
আলোকিতা গৃহ-তরী কূলে কূলে
মায়াপুরী যেন ভাসে।
'ডাল' হ্রদে আর 'শালিমার বাগে'
করিনু বিহার নব অনুরাগে
চলিতে চলিতে যে 'নিশাতবাগে'
ব্যথায় ভরিল হিয়া,
বীর-প্রসবিনী বাংলা মায়ের
বরণীয় সেই বীর তনয়ের
উদ্দেশে দিনু নতি মরতের
তারই স্মৃতিটুকু দিয়া।
পহলগাঁয়ের ছবি ভুলিব না,
গিরি গুলমার্গ অধিক-শোভনা
ডাকে পলায়—"শীঘ্র এস না,
শীতল হইলে আমি,
যত কবিত্ব উঠিবে সিকায়,"
এমনি দগ্ধ উদরের দায়,
কোজাগরে শ্রীনগরে শ্রীর পায়
লেখনী নমিল থামি।

তিব্বত-ভারতের ঐতিহাসিক যোগসূত্র—ভোটবাগান

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর

ভারতের চিরন্তন নীতি—প্রতিবেশী দেশসমূহের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হওয়া। সিংহল, যবদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কাম্বোজ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের সহিত এই ভাবেই এক দিন তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রারম্ভ হইতে বাঙালী আচার্য্য শান্তরক্ষিত, পদ্মসম্ভব, কমলশীল, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, অতীশ প্রভৃতি তিব্বতে বৌদ্ধ পতাকা উড্ডীন করিয়া গিয়াছেন। সহস্র বর্ষেরও অধিক হইল সেই পতাকা কৈলাস-মানস-চুম্বিত বায়ু হিল্লোলে আজও সগর্ব্বে হিল্লোলিত হইতেছে। তিব্বত বৃহত্তর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পশ্চিম তিব্বতেই সারা বিশ্বের প্রাকৃতিক শোভারাশির অপূর্ব্ব নিদর্শন মানস-সরোবর ও চিরনীহারময় কৈলাস-শিখর বিরাজ করিতেছে—ইহাতেই তিব্বতের প্রসিদ্ধি। অনেকের নিকট নূতন মনে হইলেও একথা সত্য যে, তিব্বতের মঠে মন্দিরে দেববিগ্রহের পার্শ্বে তাঁহাদের মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। আজও ভারত বিশ্বের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ। এই কারণে নানা দেশ হইতে মৈত্রীর প্রতীকসমূহ আসিতেছে এই প্রাচীন দেশে—সিংহল হইতে বোধিবৃক্ষের চারা, গ্রীস দেশ হইতে জলপাই বৃক্ষের চারা ইহার অল্পকাল আগেই আসিয়াছে। ইহা স্মরণ করাইয়া দেয় তিব্বতের এহেন প্রচেষ্টা, প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে, যখন ওয়ারেন হেষ্টিংস ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল। তাঁহারই সহায়তায় তিব্বতী তাসী লামা স্বীয় ব্যয়ে ও স্বেচ্ছায় কলিকাতার অপর তীরে ঘুসুড়ীতে ভাগীরথীতটে এক মঠ স্থাপন করেন।—১লা আষাঢ়, সন ১১৮৫ সাল, ২২শে জুন, ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ। এই মঠে স্বয়ং ওয়ারেন হেষ্টিংস যাতায়াত করিতেন এবং তিব্বত হইতে কোন কোন গণ্যমান্য দর্শক ইহার অতিথিশালায় অবস্থান করিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রথম মোহান্ত পূরণগির গোঁসাইয়ের হস্তে তিব্বত ও চীন রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের ভার লহলাংশে ন্যস্ত ছিল। ইহা অদ্যাবধি তিব্বত-ভারত মৈত্রীর জাগ্রত প্রতীক রূপে বিরাজ করিতেছে; কিন্তু পরিতাপের বিষয় কালক্রমে লোকে ইহার কথা ভুলিতে বসিয়াছে এবং বর্ত্তমানে অযত্ন-সেবিত অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। 'এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' পত্রিকায় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের এক সংখ্যায় গৌরদাস বসাক মহাশয় অশেষ অনুসন্ধানে এই বিষয়ে যে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ* প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন বর্ত্তমান যুগে তাহার পুনরালোচনা প্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া এখানে আলোচিত হইল। তাঁহারই অনুরোধে মোহান্ত উমরাওগির গোসাই দুইখানি দুষ্প্রাপ্য মূল তিব্বতী পুথি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলকে দান করেন এবং ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার জানুয়ারী অধিবেশনে তাহা আলোচিত হয়।

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ যদি তিব্বত-ভারত মৈত্রী-বন্ধনের এই পুরাতন স্মৃতিমন্দিরটি সংরক্ষণ করেন তবে বোধ হয় তাঁহারা দেশের কৃষ্টির প্রভূত উপকার সাধন করিবেন। আগ্রহশীল ব্যক্তিদের অবগতির জন্য সংক্ষিপ্ত ভাবে একটি স্মৃতিফলক স্থাপনও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কলিকাতার অপর পারে, ভাগীরথীর দক্ষিণ তটে ঘুসুড়ী। এইখানে এক ঘাটের সিঁড়ি বাহিয়া উঠিলেই সম্মুখে পড়ে কতকগুলি মন্দির। ইহার পশ্চাতে দেখা যায় অট্টালিকা, প্রাচীন ধরণের অথচ পরবর্ত্তী যুগের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ইহাতে রহিয়াছে। ইহার বিশেষত্ব এই যে, এই অট্টালিকার কুত্রাপি খিলান নাই। ইহাই তিব্বতী স্থপতি-শিল্পের বৈশিষ্ট্য। পি-ডব্লু-ডি বিভাগের ইঞ্জিনিয়র ডব্লু. বি. গাইথর, এ-আর-আই, গৌরদাস বসাকের নিকট মঠের এইরূপ বর্ণনা দিয়াছিলেন, "দ্বারদেশের উপরের অংশের পুরানো ধরণের গঠনপ্রণালী যে কোন দর্শকের নজরে পড়িবে। তিব্বতীয়েরা ইহার প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট থাকায় এই অট্টালিকায় ঐ দেশীয় ভাব পরিস্ফুট। কিন্তু কতটুকু অংশ প্রথমে নির্ম্মিত হয় এবং কে বা কাহারা, কত পরেই বা ইহার পরিবর্দ্ধন বা পরিমার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন তাহা বর্ত্তমানে বলা শক্ত। তবে নদীসংলগ্ন অংশেই তিব্বতী ভাব বেশী রহিয়াছে। এখানে ওখানে ক্ষুদ্র গবাক্ষযুক্ত প্রাচীর ইহার বহিঃসীমা; মধ্যস্থলে প্রবেশদ্বার। প্রাচীরঘেরা দ্বিতল বাড়ী, সারিবদ্ধ দৃঢ় স্তম্ভযুক্ত, উচ্চতা প্রায় সাত ফুট। যে অংশে খিলান একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে হয়, সেখানেও ইহার ব্যবহার করা হয় নাই; অথচ ছাদের মধ্যভাগ যে ভাবে উঁচু করিয়া তৈয়ারী হইয়াছে তাহাতে সৌধটির শোভা বর্দ্ধিত হইয়াছে—এ পদ্ধতি প্রশংসনীয় শিল্প। জানালা যা আছে তা দেখিয়া মনে হয় তিব্বতী প্রভাবযুক্ত।"

এই মঠের নাম ভোটবাগান। তিব্বতদেশের আর এক নাম 'ভোট'; তিব্বতীয়দের বাগান এই অর্থে ইহার নামকরণ হইল 'ভোটবাগান'। ইহার অধীশকে বলা হইত ভোট-গোসাই। বর্ত্তমানে সমগ্র পল্লীটি ভোটবাগান নামে পরিচিত।

মঠমধ্যে হিন্দু ও তিব্বতী পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। হিন্দু দেবমূর্ত্তির মধ্যে বিষ্ণু, দুর্গা, বিন্ধ্যবাসিনী, গণেশ, গোপাল, শালগ্রাম শিবলিঙ্গ (তন্মধ্যে তিন বিভিন্ন বর্ণের গোলাকৃতি বিরল ধরণের কয়েকটি), শিবের বাহন বৃষ। তিব্বতী দেবদেবী যথা: আর্য্য-তারা, মহাকাল ভৈরব, সম্বরচক্র, সমাজ-গুহ্য, বজ্র-ভ্রুকুটি এবং পদ্মপাণি। কপিল মুনির পদচিহ্ন এবং এক জোড়া খড়মও রহিয়াছে।

---

* উপাদান প্রধানত:—

(১) ফার্সী ভাষায় লিখিত চারিখানি মূল দলিল, (২) তিব্বতী ভাষায় লিখিত তিব্বতী ছাড়পত্র, (৩) জর্জ বোগল, ক্যাপ্টেন স্যামুয়েল টার্ণার ও মার্থাম প্রণীত গ্রন্থাদি এবং (৪) তৎকালীন মোহান্ত উমরাওগির গোঁসাইয়ের বিবৃতি।

তিব্বত ভ্রমণে ও তিব্বত বিষয়ে বিশেষরূপে অভিজ্ঞ স্বনামখ্যাত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর, সি-আই-ই, স্বয়ং মন্দিরটি দর্শন করিয়া প্রথম পাঁচটি তিব্বতী দেবদেবীর পরিচয় দিয়াছেন। তিব্বতীয়েরা এই-রূপ দেবগৃহকে বলে লহা-খঙ্গ। মঠের পশ্চাতে নীচুমত এক ছোট গৃহ; তাহাকে মন্দিরও বলা চলে। ইহার মধ্যে সমাধি রহিয়াছে; তিব্বতী ভাষায় ইহার নাম ডউন্‌তেন বা স্মৃতিমন্দির। ইহার উপরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। মঠের পূজা হিন্দু ও তিব্বতী রীতির সংমিশ্রণে সম্পন্ন হয়।

শরচ্চন্দ্র দাসের বর্ণনা: (১) তারা—প্রধান দেবতা আর্য্য-তারা। নেপালী বৌদ্ধেরা বলেন, প্রজ্ঞা পারমিতা বা জ্ঞানের অধিদেবতা। তিনি সমুদয় অতীত তথাগত ও বুদ্ধগণের জননী বলিয়া তিব্বতীয়েরা বিশ্বাস করেন। আবার উত্তর অঞ্চলের বৌদ্ধ-তন্ত্র মতে তারা হইলেন ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান বুদ্ধগণের অর্দ্ধাঙ্গিনী—এ ভাব হিন্দুতন্ত্রোক্ত শক্তির সহিত তুলনীয়। তারার তিব্বতী নাম দ্রোল্‌মা। প্রতিমা তাম্রের উপরে চীনা স্বর্ণের কলাই করা। সম্ভবতঃ পূরণগির যখন তাসী লামার সহিত পিকিং গিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনিই পিকিং (চীন) হইতে ইহা আনয়ন করেন। পিকিঙে অবস্থানকালে শরচ্চন্দ্র অনলমন গেটের নিকটে হ্বাঙ্গশের মঠে অনুরূপ তারার প্রতিমা দেখিয়া আসেন। তাঁহার বামহস্তে ভিক্ষাপাত্র—মণি-রত্ন পূর্ণ, দক্ষিণে পদ্ম শোভা পাইতেছে। তাঁহার শিরোভূষণ পঞ্চচূড়া-বিশিষ্ট এবং মণিরত্ন-খচিত। কেশগুচ্ছ ভারতীয় বৌদ্ধ রীতিতে বাঁধা—কণ্ডলী আকারে মস্তকের শীর্ষদেশে রক্ষিত, তদুপরি মণিশোভিত। বেশ তিব্বতী ধরণের নহে। পরিধানে তিব্বতী চীনা পেটিকোট, চরণে সাধু রমণীর মত চীনা কাঠের পাদুকা। মূর্ত্তির উচ্চতা প্রায় দুই ফুট। চঙ বংশের রাজা টাইছুঙের দুহিতার সহিত তিব্বতরাজের (৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে) বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তিনি তারার অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ; এই মূর্ত্তি বোধ হয় তাঁহারই স্মারক।

মূর্ত্তির বেদীমূলে বঙ্গাক্ষরে লেখা শ্রীপাস কামিনী—সম্বৎ ১৮৫২, ১৫ই, শুক্লপক্ষ, মার্গশিরা (নবেম্বর), ইহা সম্ভবতঃ প্রতিষ্ঠার তারিখ। ইহার পরে রহিয়াছে ভোলাগিরি, লহাসা, ভোটক্ষেত্র।

(২) মহাকাল ভৈরবের মূর্ত্তির পরিকল্পনা অতি বিস্ময়জনক। তিনি বিকটদর্শন, শক্তি তাঁহার বাহুতে আবদ্ধ; নয়টি মস্তক চারিদিকে—একটি মস্তক অপরগুলি হইতে উচ্চে এবং মধ্যস্থলে স্থাপিত। চত্রিশ হস্ত, অষ্টাদশ পদ, অস্ত্রাদি সজ্জিত অবস্থায় গলদেশে মুণ্ডমালা ধারণ করায় মূর্ত্তির ভয়ঙ্কর রূপ। তিনি তিব্বতী লামাগণের, বিশেষতঃ তাসী লামার রক্ষাকর্তা।

(৩) সম্বরচক্র তিব্বতীতন্ত্রে প্রধান দেবতা। তাঁহার এক মস্তক, কিন্তু দশবাহু; শক্তি আলিঙ্গনবদ্ধ। বিজিত দানবের বক্ষোপরি দণ্ডায়মান, বোধ হয় এই দৈত্যটির নাম 'মারা'। দেবমূর্ত্তি স্বর্ণের আস্তরণ দেওয়া তাম্রে প্রস্তুত—তাই হরিদ্রাবর্ণের। মূর্ত্তি উচ্চতায় নয় ইঞ্চি হইবে।

(৪) সমাজগুহ্য ও তন্ত্রোক্ত দেবতা—ত্রিমুণ্ড, ছয় বাহু; তাঁহার সহধর্ম্মিণী শক্তিরও অনুরূপ আকৃতি—দেবদেবী আলিঙ্গনরত।

(৫) বজ্রভ্রুকুটি—তারার রূপান্তর বিশেষ। সম্ভবতঃ ইহা নেপালে গঠিত। রাজা স্রোঙচেন গোংপোর তিনি দ্বিতীয়া মহিষী এবং নেপালরাজ প্রভাবমার-(রাজত্বকাল ৬৩০-৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ) দুহিতা। তাঁহার মস্তকের চারিধারে দেবতার দিব্য জ্যোতি উদ্ভাসিত।

সমাধি মন্দিরের দ্বারের উপরে বাংলা ভাষায় ও বাংলা অক্ষরে লিপি উৎকীর্ণ। ভাষা মার্জ্জিত বা ব্যাকরণমতে শুদ্ধ নহে। ইহার ভাবার্থ—মঠাধীশ ও প্রধান চেলা, দলজিংগির মোহান্ত স্বর্গীয় পূরণগির মোহান্তের এই সমাধির উপর শিব প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই মন্দির ও মহাদেবকে যেন সকলে শ্রদ্ধা করেন। যে ইহা না করিবে তাহার ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপসঞ্চয় হইবে ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠার দিবস, সম্বৎ ১৮৫২, শকাব্দ ১৭১৭, বঙ্গাব্দ ১২০২, ২৩শে বৈশাখ রবিবার, পূর্ণিমার দ্বাদশদণ্ড মধ্যে। ইংরেজী তরা মে, ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ।

এই প্রতিষ্ঠান দেখিয়া দর্শকের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে—(১) কলিকাতার উপকণ্ঠে এই বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠার মূল কি; (২) হিন্দু ও তিব্বতী দেবদেবী কি করিয়া এইখানে স্থান লাভ করিয়াছেন; (৩) পূরণগির গোসাই, যাহার সমাধির উপর এই রকম ফলক রহিয়াছে, তাঁহারই বা পরিচয় কি?

প্রথম প্রশ্নটির অনুধাবনে এক রাজনৈতিক পটভূমি দেখা যায়। ভূটানরাজ দীপ শীদর (বা দিতার-বগ) বলপূর্ব্বক সিকিম অধিকার করিয়া কোচবিহার আক্রমণ করেন ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে। ওয়ারেন হেষ্টিংস তখন বঙ্গের শাসনকর্ত্তা। কোচবিহার রাজ সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানাইলে দূরদর্শী বড়লাট একদল দেশীয় সৈন্য অবিলম্বে ভূটানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। প্রাণপণ বাধা দিবার চেষ্টা সত্ত্বেও ভূটান পরাজিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে বাধ্য হইল। দীপ শীদর তিব্বতের তাসী লামাকে এই উদ্দেশ্যে তাঁহার ও ইংরেজের মধ্যে মধ্যস্থতা করিতে অনুরোধ করেন।*

তিব্বতের সর্ব্বময়কর্ত্তা দলাই লামা তখন শিশুমাত্র। সে কারণে তাসী লামাই তাঁহার অভিভাবক ও প্রতিনিধিরূপে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। সেই তাসী লামা তখন পয়মা নামে এক তিব্বতীয়†

* ". . . the Raja (of Bootan) weary of conflict and alarmed for the safety of his dominions, applied to Teshoo Lama and obtained his mediation for peace. Teshoo Lama was at that time the Regent of Tibet and the guardian of the Dalai Lama. The Lama, moved by the prayers of the Raja and interested for the safety of Bootan which was a dependency of Tibet, sent a deputation to Calcutta with a letter to the Governor."—Captain Samuel Turner: *An Account of an Embassy to the Court of Teshoo Lama in Tibet.* (London, 1800), p. viii.

† বঙ্গের সীমান্তদেশে যুদ্ধ চলিতে থাকায় এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের করাল ছায়া উপস্থিত হওয়ায় মাত্র একজন তিব্বতীয় এ দেশে আসিতে ভরসা পান এবং সেই সময়ে ঐ দেশে তীর্থভ্রমণে রত পূরণগিরের উপর প্রগতা লামার ভার ন্যস্ত হয়।

ও পূরণগির নামে ভারতীয় তীর্থযাত্রীর হস্তে ওয়ারেন হেষ্টিংসকে এক পত্র দেন; ক্যাপ্টেন স্যামুয়েল টার্ণার তাঁহার লিখিত "তাসী লামার দরবারে রাষ্ট্রদূত" শীর্ষক ইংরেজী পুস্তকে সে পত্রের অনুলিপি দিয়াছেন; ইহার একাংশের অনুবাদ এই: "...পত্র আর বিস্তারিত করিবার প্রয়োজন নাই। কেননা ইহার বাহকগণের মধ্যে একজন হইতেছেন গোঁসাই, তিনি স্বয়ং আপনার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবেন। আশা করি, আপনি তাহাতে সম্মতি দিবেন।" এই বাহকদ্বয়ের নিকট হইতে হেষ্টিংস ২৯শে মার্চ্চ, ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে পত্র প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে বঙ্গ ও ভূটানের মধ্যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়, ২৫শে এপ্রিল, ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ।

তাসী লামার সহিত এই যোগাযোগই ভোটবাগান মঠ প্রতিষ্ঠার মূলসূত্র। লামার দূতহস্তে প্রেরিত উপঢৌকন-দ্রব্য* দেখিয়া দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপনের বাসনা হেষ্টিংসের মনে উদয় হয়। তিনি চারি দফা দূত পাঠাইয়া এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন:

(১) জর্জ বোগল, কুশবিদ চিকিৎসক ডাঃ হ্যামিল্টন ও পূরণগির গোঁসাই—১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ,

(২) জর্জ বোগল ও পূরণগির (অংশতঃ কার্য্যে পরিণত)—১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দ,

(৩) ক্যাপ্টেন স্যামুয়েল টার্ণার ও পূরণগির—১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দ,

(৪) শেষ দৌত্যকার্য্যে পূরণগির স্বয়ং গিয়াছিলেন—১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।

প্রথম দফার বিবরণে দেখা যায় যে, বোগল সদলবলে ভূটানের রাজধানী তাসী ছোয় জং-এ উপস্থিত হইয়া দেব রাজার নিকট তিব্বত-যাত্রার বাসনা জানাইলে প্রথমে তিনি অনুমতিদানে অসম্মত হন। অবশেষে পূরণগিরের সময়োচিত ও নিপুণ চেষ্টায় যাত্রার পথ সুগম হয়। তাঁহারা ১৩ই অক্টোবর যাত্রা করিয়া ৮ই নবেম্বর তাসী লামার প্রাসাদে উপস্থিত হন। পাঁচ মাস সেখানে তাঁহারা অবস্থান করেন। এখানেও পূরণগিরের দক্ষতার জন্য মিশনের সাফল্য অনেকাংশে লাভ হয়। তাঁহারা ৭ই এপ্রিল, ১৭৭৫, তাসী লুহুম্পো ছাড়িয়া জুনে ভারতে ফিরিলেন। দলটি ফিরিবার পথে তাসী সদনে আসিলে ওয়ারেন হেষ্টিংস বোগলকে ৭ই মে তারিখে এই পত্র লেখেন:

"I am happy to learn that your visit has proved so acceptable to the Lama, and flatter myself it will be productive of good consequences proposed from your journey to him. I have given the necessary orders to the Custom masters at Hugli and Murshidabad for passing at those places the boats which you or the Gosain who is accompanying you from the Lama may bring with you . . ."—C. R. Markham, C.B., F.R.S.: *Narratives of the Mission of George Bogle to Tibet*, etc. etc.- London, 1879, p. 186.

দ্বিতীয় বারের আয়োজন হয় আবার জর্জ বোগলের নেতৃত্বে ও পূরণগিরের সাহচর্য্যে। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে যাত্রার প্রাক্কালে কিন্তু সংবাদ আসিল তাসী লামা বৃদ্ধ চীন সম্রাট ক্বাঙলুঙ-এর আমন্ত্রণে পিকিং যাত্রা করিতেছেন। বোগল এই সুযোগে তাসী লামার উপস্থিতিতে চীনসম্রাটের সহিত পরিচিত হইয়া হেষ্টিংসের বাণিজ্যনীতির সম্প্রসারণ করিবার সুযোগ পাইলেন। তদনুসারে উপযুক্ত সহযোগী পূরণগিরকে তাসী লামার সহিত মিলিত হইতে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি যাওয়ায় ফল আশাপ্রদ হইয়াছিল বটে, কিন্তু ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে নবেম্বরে পিকিঙে তাসী লামার আকস্মিক মৃত্যুতে এবং পর বৎসর এপ্রিল মাসে কলিকাতায় বোগলের পরলোকগমনে বিষয়টি অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

তৃতীয় প্রচেষ্টার সূচনা করিয়া দিলেন পরবর্তী তাসী লামা চেম্‌জো কুশো, তিনি মৃত তাসী লামার ভ্রাতা। তাঁহার লিখিত এক পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের হাতে।*

ক্যাপ্টেন স্যামুয়েল টার্ণারের নেতৃত্বে তৃতীয় মিশন পরবর্ষে ৯ই জানুয়ারী কলিকাতা হইতে রওনা হয়। প্রতিবারেরই অপরিহার্য্য সভ্য পূরণগির ব্যতীত এই দলের উল্লেখযোগ্য আর দুই জন লেঃ স্যামুয়েল ডেভিস ও ডাঃ রবার্ট সাণ্ডার্স। বোগলের ভ্রমণপথ ধরিয়া তাঁহারা ২২শে সেপ্টেম্বর তাসী লামার প্রাসাদে

* "Among the presents sent by the Lama are sheets of gilt leather . . ., talents of gold and silver, bulses of gold dust, bags of genuine musk, narrow cloths of woollen, the manufacture of Tibet and silks from China—the chests which contained these were of no bad workmanship."—Captain Samuel Turner: *An Account of an Embassy to the Court*, p. xiii.

* Translation of a letter from Changoo Cooshoo, Punjun Irtunnee Neimoheim, Regent of Teshoo Loomboo to Warren Hastings, Esqr., Governor-General received on the 12th February, 1782:—". . . Poorungheer Gosein arrived here in the year 1193, after the departure of the Lama towards China and nine strings of pearls, without blemish and perfect in their form; and among them one string of large pearl of great brightness and purity and two chaplets of coral, which you sent as a gift arrived safe and your satisfactory letters and that which you wrote concerning the village of the Raja, and the remission of all matters relating thereto, to do honour to me, the whole, as there written, was in those days submitted to the inspection of the Maha Gooroo . . . That you will grant a lot of land in the noble city of Calcutta, on the bank of the river. Concerning this offer I have spoken fully and particularly to the Gosein Poorungheer and he will make known to you the whole thereof and you will comply with my request. And I have communicated other matters, and other things to the faithful Poorungheer by whom you will be informed."

Written on the 1st day of the month of Zehijjah, in the year of the Majera 1195, corresponding to the 16th November 1781.—Captain Samuel Turner: *An Account of an Embassy to the Court of the Teshoo Lama*, London 1800, pp. 449-453.

উপনীত হন। ২রা ডিসেম্বর তাসী লহুম্পো ছাড়িয়া ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে পাটনায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যে কয় মাস তাঁহারা তাসী লহুম্পোয় অবস্থান করেন পূরণগির সাতিশয় কর্ম্ম-নিপুণতার সহিত সম্ভবপর সকল বিষয় নিষ্পন্ন করিতে সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

শেষ পর্য্যায়ে বড়লাট হেষ্টিংস যোগ্য কর্ম্মী পূরণগিরকে তিব্বত শাসন পরিষদে ভারতের কূটনৈতিক প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করা স্থির করেন। ইহার অব্যবহিত পরে ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংস পদত্যাগ করিলেন। তাঁহার অনুবর্ত্তী জন ম্যাকফর্সনের অনুমোদনে মার্চ্চ মাসে পূরণগির যাত্রা করেন।

পূরণগির পাঁচ মাস মাত্র এই পদে অবস্থানকালে তিব্বতীয় উচ্চপদস্থ সকলের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে সমর্থ হন। আসিবার সময় তাসী লামা যে পত্র দিয়াছিলেন তাহার সহিত পূরণগিরের নিজ কর্ম্মবৃত্তান্ত স্যামুয়েল টার্ণার লাটের কাছে নিম্নলিখিত পত্রে পেশ করিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পূরণগির তাসী লামার সঙ্গে পিকিঙ দরবারেও গিয়াছিলেন।

The Hon. John. Macpherson, Esq.,
Governor-General, etc., etc.

Calcutta, Feb. 6th, 1786.

Honourable Sir,—Having in obedience to the instructions with which you were pleased to honour me, examined Poorungheer, the Gosein, who has at different times been employed in deputation to the late Teshoo Lama, who formerly accompanied him to the Court of Pekin, and who is lately again returned from Tibet, and having collected from him an account of the journey he has just performed, and such other information as he could give me, relative to the countries he has left, I beg leave to submit it to you, in the following narrative.

In the beginning of last year, Poorungheer having received from Mr. Hastings, a short time previous to his departure from Bengal, dispatches for Teshoo Lama and the Regent of Teshoo-Loomboo, immediately set about preparing for the distant journey, he had engaged to undertake . . . He then commenced his journey from Calcutta and early in the month of April had passed, as he relates, the limits of the Coy's provinces and entered the mountains that constitute the Kingdom of Bootan; where, in the prosecution of his journey, he recovered, from the subjects of the Daeb Raja, the most ample and voluntary assistance to the frontier of his territory . . . and on the 8th of May following, reached Teshoo Loomboo, the capital of Tibet.

Immediately upon entering the monastery, he went to the Durbar of the Regent Chanjoo Cooshoo, Punjun Irtinnee Nimoheim, to announce his arrival and the purpose of his commission.

Quarters were then allotted for his residence, and an hour appointed for him to wait upon the Lama. . . . In the course of the morning, at the hour appointed for his admission Poorungheer went down to the Lama's tents . . . Poorungheer found him (young Lama), when summoned to his presence attended by the Regent, his parents, Soopoon Choomboo, the cup-bearer and the Principal Officer of the court. . . . He (Poorungheer) delivered the letters and presents with which he had been charged.

The packages were all immediately opened before the Lama, who had every article brought near to him viewed them separately one by one. The letter he took into his own hand, himself broke the seal, and taking from under the cover a string of pearls, which it enclosed, rub them over between his fingers, as they read their rosaries and then with an arch air, placed them by his side, nor would, while the narrator was in his presence, permit any one to take them up.

Poorungheer says, that the young Lama regarded him with a very kind and significant look and spoke to him in the Tibet language and asked him if he had a fatiguing journey. The interview lasted more than an hour . . . when ordered to receive his dismission, Poorungheer approached the Lama to receive his blessings, which the Lama gave, by stretching out his hand and laying it upon his head. He then ordered him, as long as he continued at Teshoo Loomboo, to come to him once every day.

The following day Poorungheer waited upon the Regent at his apartments in the palace . . . to whom he delivered his dispatches. After this he visited Soopoon Choomboo, the Lama's parents, etc., etc.

With respect to the lately established commercial intercourse Poorungheer informs me, that though he returned so early he found himself not the first person who had arrived Teshoo Loomboo from Bengal. Many merchants had already brought their commodities to market and others followed before he left his place.

Poorungheer during his residence at Teshoo Loomboo had frequent interviews with the Regent. . . . The Lama and the Regent of Teshoo Loomboo addressed the letters which Poorungheer had the honour to deliver to you. Translations of these letters, having applied for them to your Persian translator, in obedience to your directions, I now subjoin, *viz* :—from Teshoo Lama.

". . . At this time, as friendly offerings of union and affection and unanimity, I send one handkerchief, one kitoo of silver of one piece of Cochin. Let them be accepted."

From the Regent of Teshoo Loomboo:

". . . At this time, as friendly offerings of union of affection, and unanimity, I send one handkerchief, three tolas of gold and one piece of cochin. Let them be accepted."

Poorungheer, having received these dispatches, in the beginning of October, after a residence of 5 months at Teshoo Loomboo, took leave of the Lama and the Regent and set out; upon his return, by the same route he came, to Bengal . . .

Yet another circumstance it may not be improper to point out; that ground alluded to, is a part of the land situated on the western bank of the river, opposite to Calcutta which was formerly granted, under a sunnud of this Government to Teshoo Lama, for the foundation of a place of worship, and as a resort for those pilgrims of his nation, who might occasionally make visits to the consecrated Ganges . . .

I have the honour to be,
etc., etc.,
Samuel Turner.

তিব্বত-বঙ্গ তথা ভারতের সহিত যোগসূত্র স্থাপনে এই সন্ন্যাসী অথচ বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ্ পূরণগিরের প্রভাব সহজে অনুমেয়। তিনি দশনামী গিরি সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী, বদরিকাশ্রমের বিখ্যাত জোশীমঠে তিনি দীক্ষিত হন। যখন হেষ্টিংসের সংস্পর্শে আসেন তখন তাঁহার বয়স মাত্র পঁচিশ। তাসী লামার সহিত তাঁহার এরূপ ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠে যে, তাঁহার সম্মুখে একদিন লামা চীন সম্রাটের কাছে ভারতের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তিব্বত, ভুটান, হিমালয়স্থ রাজ্যসমূহ ও মধ্য এশিয়ার ভূখণ্ডের আদান-প্রদান ব্যাপারে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরেই এই যোগ্য কর্ম্মীর জীবনের উপর যবনিকাপাত হইয়াছিল। একাধারে সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক ও রাজনীতিজ্ঞ পূরণগিরের কথা দেশবাসীর স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

ভোটবাগান প্রতিষ্ঠার বীজ বপন করেন স্বয়ং তাসী লামা। বোগলের প্রথম ভ্রমণকালে লামা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমার ইচ্ছা গঙ্গাতীরে এক ধর্ম্ম-মন্দির স্থাপন করা, যাহাতে আমার স্বদেশবাসী গিয়া প্রার্থনাদি করিতে পান। গবর্ণর জেনারেলের নিকট এই ব্যাপারে আমি পত্র দিবার বাসনা করি; আশা করি ইহাতে আপনার সমর্থন থাকিবে।" বলা বাহুল্য, বোগল সহজেই নিজ ক্ষমতানুসারে এই বিষয়ে ব্রতী হইবেন এই আশ্বাস দিলেন এবং ৫ই ডিসেম্বর, ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংসকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন: "লামা গঙ্গাতটে এক ধর্ম্মগৃহ নির্ম্মাণে উৎসাহী। তিনি আমাকে জানাইয়াছেন যে, সাত-আট শত বৎসর পূর্ব্বে তিব্বতী সন্ন্যাসীদের বঙ্গদেশে বহু মঠাদি ছিল। তখন ভিক্ষুরা এখানে আসিতেন, ব্রাহ্মণদের ভাষার অনুশীলন করিতেন এবং হিন্দুস্থানের তীর্থসমূহ পর্য্যটন করিতেন। মুসলমান বিজয়কালে তাঁহাদের এই সকল ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান নষ্ট হয় এবং তাঁহারা বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইলেন। তদবধি এই দুই রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ হইয়া যায়। লামার ধারণা এতকাল পরে তিনি যদি বাংলায় একটি ধর্ম্ম-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন তবে তাহা তাঁহার নিজের ও সঙ্ঘের গৌরব সূচিত করিবে। এই কারণেই তাঁহার এত আগ্রহ। কয়েক জন ভিক্ষুকে তিনি শীতকালে পাঠাইবার ইচ্ছা করেন; তদনন্তর তাঁহারা গয়াতীর্থে গমন করিবেন। শুধু ইহাই নহে, লামা চীনসম্রাটের দৃষ্টিও এ বিষয়ে আকর্ষণ করিয়াছেন যাহাতে সে দেশ হইতেও আপনার সমীপে গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রেরিত হয় ও বঙ্গদেশের দর্শনীয় মন্দির দর্শন করেন। চীনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে লামার এই প্রচেষ্টা কতদূর ফলবতী হইবে জানি না, তবে এই সুযোগ গ্রহণ করা চলিতে পারে। ভবিষ্যতে সুবিধামত এক দিন হয়ত আপনার অনুমোদনক্রমে পিকিঙে উপস্থিত হইয়া সম্রাট সমীপে যাতায়াত ঘটিয়া উঠিতে পারে।"

বোগলের সহিত মধ্যে মধ্যে যখনই সাক্ষাৎলাভ হইয়াছে তখনই তাসী লামা এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন। তিনি বলিলেন, গঙ্গাতীরে জমি সংগৃহীত হইলে তিনি পূরণগিরকে তথায় নিযুক্ত করিবেন। কলিকাতার উপকণ্ঠে কোন স্থান লইলেই ভাল হয়। গৃহ বড় হওয়ার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু গৌড়ীয় পদ্ধতিতে ইহা গঠিত হইবে। তিনি শুকদেব নামক অপর এক প্রাচীন গোঁসাইয়ের নামও উল্লেখ করেন। পূরণগিরের সহিত দেবমূর্ত্তি তথায় স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিবার অভিলাষ জানান। কেন তিনি বঙ্গদেশ পছন্দ করিয়াছেন তাহার কারণ এই দেখাইয়াছেন যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে তিনি নানা ভূখণ্ডে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, কেবল বঙ্গদেশেই দুই বার তিনি জন্মলাভ করিয়াছেন, তাই সে দেশের প্রতি লামার আকর্ষণ অধিক।

ওয়ারেন হেষ্টিংস আদেশ প্রদান করিলেন এবং অনতিকাল পরে জমির ব্যবস্থার কথা তাসী লামার গোচরীভূত করিলেন। এই জমি সংগ্রহ বিষয়ে মূল ফার্সী ভাষায় লিখিত দলিল (বা সনদ) ভোটবাগান মঠের তদানীন্তন মোহান্ত উমরাওগির গোঁসাইয়ের নিকট গৌরদাস বসাক দেখিয়াছিলেন ও প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাসী লামা এই মন্দিরের জন্য বোগলের হস্তে বিস্তর অর্থ দিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারই কর্তৃত্বাধীনে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। সনদ অনুসারে জমি সংগ্রহের তারিখ ১লা আষাঢ়, ১১৮৫ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ইংরেজী ১২ই জুন, ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ। বোগল-লিখিত গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাসী লামা প্রেরিত দেবমূর্ত্তিসকল এই মন্দিরে স্থাপিত হইয়াছিল। হেষ্টিংস দেড় শত বিঘার কিছু বেশী জমি (নিষ্কর) সংগ্রহ করিয়া লেখাপড়া করিয়া প্রত্যক্ষভাবে পূরণগির গোঁসাইকে ও পরোক্ষভাবে তাসী লামাকে (পুরা নাম পঞ্চেন অর্দনী বকডেও পঞ্চেন বা তাসী লামা পঞ্চেন দেও পঞ্চেন) দান করেন। তাসী লামা—যাঁহাকে তিব্বতে অবতার জ্ঞানে পূজা করা হয়, তাঁহার এই দান-গ্রহণ ব্যাপার এক উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন রহিয়াছে, কেমনভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবী পাশাপাশি স্থান পাইয়াছেন। বোগল তাহারও উত্তর দিয়াছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মে কিছু কিছু সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং কতক কতক দেবদেবী দুই ধর্ম্মেই সমান, এমন কি তিব্বতী শাস্ত্রও ভারত হইতে অনূদিত।

এক্ষণে ভোটবাগানের প্রথম যোগ্য মঠাধীশ পূরণগির সম্বন্ধে বসাক মহাশয় এবং ইংরেজ গ্রন্থকারগণ যাহা বিবৃত করিয়া রাখিয়াছেন তাহার আলোচনা প্রয়োজন।

পূরণগির রাজনৈতিক কার্যকলাপ শেষ করিয়া তিব্বত হইতে ফিরিবার পর হইতে ভোটবাগানে সাধুর যোগ্য জীবন যাপন করিতে থাকেন। তিনি লোকচক্ষে পূজ্য হইয়া উঠেন; রাজসরকারে তাঁহার সম্মানও অক্ষুণ্ণ রহিল। এমন কি, গবর্ণর জেনারেল সাক্ষাৎ করিতে স্বয়ং মঠে উপস্থিত হইতেন। প্রায় বার বৎসর এই ভাবে ভোটবাগানের প্রতিপত্তি রক্ষা করিয়া চলিবার পর একদিন রাত্রে একদল দস্যু অতর্কিতে মঠে প্রবেশ করিয়া দেবগৃহ হইতে অলঙ্কারাদি আত্মসাৎ করে। একাকী পূরণগির অসীম সাহসে তরবারি হস্তে বাধা প্রদানে রত হইয়া শেষ পর্যন্ত তাহাদের হস্তে সড়কির আঘাতে নির্মম ভাবে হত হইলেন; তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৫০ বৎসর। শিষ্য দলজিৎ যোগ্যভাবে মঠ মধ্যে যে সমাধি ও সমাধি মন্দিরের ব্যবস্থা করেন তাহার বর্ণনা পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। পূরণগিরের এই শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ ইংরেজ সরকারের গোচরীভূত হইলে দুষ্কৃতদের দণ্ডবিধান হইয়াছিল।

তাঁহার পর দলজিৎ সিংহ ৪৩ বৎসর মোহান্ত পদে আসীন থাকিয়া ৬ই মাঘ ১২৪৩ বঙ্গাব্দে দেহত্যাগ করিলে, কালীগির তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ১৫ই আশ্বিন, ১২৫৪ বঙ্গাব্দে এক শিবমন্দির নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। কালক্রমে এই প্রতিষ্ঠান নিষ্প্রভ হইয়া আসিলেও আজ পর্যন্ত তাসী লামা, পূরণগির ও হেষ্টিংসের অন্যতম কীর্ত্তিরূপে বিরাজ করিতেছে। বসাক মহাশয়ের কথায়—

"A solitary monument of the genius and policy of the first Governor-General of India, of the piety of the Teshi Lama and of the Tibeto-Bengal trade which flourished centuries ago and was restored though in a stifled form, a century ago."

মঠ নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হইলে, হেষ্টিংস তাসী লামাকে জানাইয়াছিলেন, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে এই প্রতিষ্ঠান হইতে আপনার নাম এতদ্দেশে প্রচারিত হইবে এবং আমাদের মধ্যে সখ্য দৃঢ় হইবে। সেই সঙ্গে আপনি ইহাকে আপনার প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার নিদর্শন বলিয়া গণ্য করিবেন।* এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থাদ্বারা ভারত ঐ পুরাতন হৃদ্যতা পুনরুজ্জীবিত করিবে।

যে চারিটি মূল দলিল (ফার্সী ভাষায় লিখিত) পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের কথা এইভাবে বসাক মহাশয় আলোচনা করিয়াছেন:

১ম সনদ—দলাই লামা ও তাসী লামার পৃথক এক একটি মোহর ইহাতে অঙ্কিত। মূল ফার্সী হইতে সনদের বঙ্গানুবাদ:

"এতদ্বারা, সর্ব্বদেশমধ্যে স্বর্গতুল্য সুবা বাংলায়, হুগলি চাকলা সংশ্লিষ্ট, সাতগাঁও সরকারে, বোরো ইত্যাদি পরগণায় দরি বার্বাকপুরস্থ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল ব্যাপারের পরিচালক মুৎসুদ্দী, চৌধুরী, কানুনগো, তালুকদার, প্রজা ও কৃষকদিগকে অবগত করা যাইতেছে যে এক শত বিঘা এবং আট বিশ* কৃষিক্ষেত্র, যাহার ১৬ বিঘা অংশ পরগণা বোরো, মৌজা দরি বার্বাকপুর অন্তর্গত এবং চৌত্রিশ বিঘা আট বিশ অংশ, পরগণা পাইকান, ঘুসুড়ী মৌজার মধ্যস্থ এবং যে অংশগুলি সমষ্টিগতভাবে গঙ্গানদী তীরে অবস্থিত এবং নিষ্কর, সেই সমস্ত ভূমিখণ্ড নিষ্কলুষ চরিত্র, সত্যাশ্রয়ী, সত্যানুসন্ধানীদিগের নায়ক, জ্ঞান ও বিচক্ষণতার আকর, পূরণগির গোসাইকে, তদীয় সদ্গুণাবলী বিচারে, ১১৮৫ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভ হইতে মন্দির নির্ম্মাণ ও উদ্যান রচনার্থে প্রদত্ত হইল। অভিপ্রায় প্রকাশ করা যাইতেছে যে, এই মন্দির নির্ম্মাণ ও উদ্যান রচনাকরতঃ তিনি উহা ভোগ দখল করিবেন।

আপনাদিগকে অবগত করা যাইতেছে যে, এই ভূমি নিষ্কর, ইহার জন্য কোন কর আদায় করিতে পারিবেন না, এবং কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। এই সম্পর্কে কোন নূতন দাবিদাওয়াও চলিবে না।

আপনাদের গোচরীভূত করা যাইতেছে যে, এই ব্যাপারে যথাযথ নিয়মানুবর্ত্তিতা বাঞ্ছনীয়।

ইতি ১২ই জুন, ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ ১লা আষাঢ় সন ১১৮৫ সাল।"

২য় সনদ ভূমির বিবরণে নিম্নপ্রকার পার্থক্য ব্যতীত অন্য সব কথায় ইহা ১ম সনদের নকল স্বরূপ:

"৫০ বিঘা চাষের জমি পূর্ব্বে লিখিত বার্বাকপুর মৌজায় —যাহার মধ্যে ৩ বিঘা ৭ বিশ মহারাজ নবকিষের (নবকৃষ্ণ) জমিদারীভুক্ত, ২৯ বিঘা রাজা রামচাঁদ রায়* ও ১১ বিঘা, ১৩ বিশ রাজা রামলোচনের সম্পত্তিভুক্ত।

তারিখ ১১ই ···(ফেব্রুয়ারী)···১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দ যাহা বঙ্গাব্দের ২রা ফাল্গুন ১১৮৯ সাল।"

[···চিহ্নিত অংশ অস্পষ্ট হওয়ায় পড়া কষ্টকর]

৩য় সনদ—ইহা অবিকল ১ম সনদ, কেবল গ্রহীতার নাম পূরণগির গোসাইয়ের স্থলে তাসী লামা পঞ্চেন অর্দনী বকডেও পঞ্চেন।

তারিখ ১২ই জুন, ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ যাহা বঙ্গাব্দের ১১৮৫ সালের ১লা আষাঢ়।

৪র্থ সনদ—ইহা ১ম সনদের হুবহু নকল, কেবল পূরণগির গোসাইয়ের স্থলে নাম রহিয়াছে "তাসী লামা পঞ্চেন অর্দনী বকডেও পঞ্চেন।"

* "By the grace of God it will be the means of making your name known in this country and of strengthening the friendship which is between us and you will consider it as a mark of confidence and regard which I bear to you."—C. R. Markham, C.B., F.R.S.: *Narratives of the Mission of George Bogle etc. etc,* p. 108.

† এক বিশ = ১ কাঠা।

তারিখ ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, বঙ্গাব্দ ২রা ফাল্গুন ১১৮৯ সাল।

প্রথম ও দ্বিতীয় সনদে পূরণগির গোঁসাইকে যথাক্রমে এক শত বিঘা, আট বিশ এবং পঞ্চাশ বিঘা নিষ্কর জমি দানের লেখাপড়া। উভয় সনদের উপরিভাগে দুইটি করিয়া শীলমোহর—তন্মধ্যে একটি নাগরী অক্ষরের।

তৃতীয় ও চতুর্থ সনদের তারিখ যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় সনদের তারিখের সমান। জমির পরিমাণও একই রূপ; কেবল গ্রহীতার নাম পূরণগিরের স্থলে তাসী লামা। দুই সনদে শাহ আলম বাদশাহের দেওয়ান রূপে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মোহর অঙ্কিত। তৃতীয় দলিলে আরও দুইটি মোহর দেওয়া। ওয়ারেন হেষ্টিংস এই দুই দলিলেই স্বাক্ষর করিয়াছেন।

তিব্বতী ভাষায় ছাড়পত্র (লমযিগ) মঠে প্রাপ্ত পঞ্চম ও শেষ প্রাচীন দলিল। তাসী লুহুম্পো হইতে দেওয়া এই ছাড়পত্র। ভাবার্থ—

নার্থেন, গ্যীয়াছুন, নো-সন, ফুন-ছোগ-লিন, লহার-ছে, নমরিণ ও নীরিনের লামার প্রতি। অবগত হউন যে, এই সরকারের এক কর্ম্মচারী আচার্য্য পূরণগিরি তিন জন অনুচরসহ মফস্ত হ্রদে (মানস-সরোবর) স্নান ও পরিক্রমার্থ অগ্রসর হইতেছেন। উল্লিখিত স্থান-সমূহে এই দলের জন্ম ব্যবস্থা করা হউক, ইন্ধন, মৃন্ময়পাত্র, রন্ধনের তৈজস, ঘোটক, পাচক, ভৃত্য ইত্যাদি, অপরাপর বস্তু যাহা আবশ্যক হইবে—দিবাভাগে ও রাত্রে যাত্রার বিরামকালে।

চারটি ঘোড়া ও ভারবাহী সাতটি পশু দরকার হইবে। বদলা-বদলি করিয়া ঘোটকের বন্দোবস্ত করা হউক এখান হইতে ফুন-ছোগ-লিন; ফুন-ছোগ-লিন থেকে লহার-ছে; লহান-ছে হইতে নমরিন; নমরিন হইতে সগা-ওয়া পর্য্যন্ত। ইহার পূর্ব্বে লিখিত পত্রানুযায়ী বিভিন্ন জিলা ও মৌজার চারণক্ষেত্রের ভারপ্রাপ্ত প্রধান অশ্বরক্ষকগণকে জ্ঞাত করা হউক যেন আগে বর্ণিত নির্দ্দিষ্টসংখ্যক বলিষ্ঠ অশ্বের ব্যবস্থা করা হয় এবং বদলাইবার অশ্ব লইয়া ঘোড়া-ওয়ালা যেন যথাকালে উপস্থিত থাকে। যাত্রায় এই দলকে সকল সম্ভবপর সাহায্য যেন দেওয়া হয়। ভারবাহী পশু বদলের বরাবর ব্যবস্থা হইবে শিগর্চী শহর হইতে ফুন-ছোগ-লিন; ফুন-ছোগ-লিন হইতে নমরিন; নমরিন হইতে নীরিন, নীরিন হইতে সগা-ওয়া অবধি করিতে হইবে। প্রতিপদে এই দলকে ভারবাহী পশু বদলাইবার লোক দিতে হইবে। একজন অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ পথ-প্রদর্শক তাঁহাদের দিতে হইবে। ফিরিবার সময় অনুরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইহা খুব জরুরী ব্যাপার।—তারিখ...১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ, দলই লামা, তাসী লামা এবং মন্ত্রীর শীলমোহর অঙ্কিত।

এই ঐতিহাসিক মঠ বর্ত্তমানে যেমনটি রহিয়াছে: ঘুসুড়ীর নিকট ভোটবাগান পল্লীতে ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে মঠ। নদীর ধারেই দুই সারিতে যথাক্রমে তিন ও পাঁচটি শিব-মন্দির। প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকে আরও দুই শিবমন্দির। সবগুলির গঠনপ্রণালী একরূপ নহে। পশ্চিমের একটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সম্মুখে স্তম্ভযুক্ত দালানবিশিষ্ট; মন্দিরদ্বারের উপরে বড় ব্রোঞ্জ ফলকে বঙ্গাক্ষরে লিপি রহিয়াছে। অপর মন্দিরগুলির মধ্যে আরও তিনটিতে বাংলায় লেখা প্রস্তরফলক। সবগুলি মোহান্তদের সমাধি, তদুপরি শিবমূর্ত্তি বিরাজমান। বৃহত্তমটি প্রাচীনতম বলিয়া মনে হয় এবং উহাই পূরণগিরের সমাধি। ইহার বিষয় বসাক মহাশয়ের প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। ভাগীরথীতীরের শিব-মন্দিরগুলির মধ্যে একটিতে শিবমূর্ত্তি ব্যতীত শ্বেত প্রস্তরের অপর এক দেবমূর্ত্তি রহিয়াছে। উচ্চতায় প্রায় এক হাত, চতুষ্কোণ শ্বেত প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ। চারি হাত, মেষশাবকের পৃষ্ঠে এক পা ঝুলানো, বাম পদ ভাঁজ করিয়া দক্ষিণ পদের জানুদেশে স্থাপিত। সামনের দক্ষিণ হস্ত বক্ষে রাখা, বাম হস্তটি ভাঁজ করা অবস্থায় জানুর উপর; ধরিয়া আছেন পদ্মের মত গোল কিছু। পিছনের দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল, বামে পুস্তক, এই দুই হাতই উঁচু করিয়া পাথরের গায়ে সংলগ্ন রহিয়াছে।

মূল মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে—চতুষ্কোণ ঠাকুরদালান—গর্ভগৃহে তিনটি দ্বার আছে। ঠাকুরদালানের উপরে বাংলায় লেখা 'শ্রীশ্রী৺মহা-কাল জিউ।' প্রত্যেক দরজার সামনে এক একটি মর্ম্মরবেদী। মধ্যের বেদীটি অপেক্ষাকৃত বড় আকারের। তাহার উপর নেপালী ধরণের প্রায় তিন হাত উচ্চ পিতলের সিংহাসন—উপরে দুই ময়ূর; দুই পার্শ্বে দুই ত্রিশূল। ভিতরে পাঁচটি ছত্র; মধ্যের ছত্র অপেক্ষাকৃত বড়। প্রতি ছত্রের নীচে দেবতার জন্ম মাথা গোল করিয়া কাটা পিতলখণ্ড চালচিত্রের মত আঁটা। মধ্যস্থলে বহু হস্তবিশিষ্ট মহাকাল মূর্ত্তি, তাঁহার দক্ষিণে কাল রঙের কালমূর্ত্তি, আরও দক্ষিণে দুর্গা। বামে ভৈরব; আরও বামের চালচিত্রের সামনে কোন মূর্ত্তি নাই। এই মূর্ত্তিগুলি ধাতব। সিংহাসনের নিম্নে বড় খড়্গ; শুনা যায় দুর্গোৎসবের সময় বলিদানের ব্যবস্থা আছে। সিংহাসনের দক্ষিণে একই মর্ম্মরবেদীতে উপবিষ্ট পিতলের তারামূর্ত্তি, বেশ বড় আকারের, পরিধানে লাল চেলী, মাথায় পালকের আকারে পিতলের মুকুটের মত। ইহা ভারতীয় ধরণের দেবীর মুকুট নহে। যে তিব্বতী মূর্ত্তিগুলি শরৎচন্দ্র দাস দেখিয়া গিয়াছেন সেইগুলিই রক্ষিত রহিয়াছে, তবে বর্ত্তমানে এইভাবে মূর্ত্তিগুলি সাধারণের মধ্যে পরিচিত।

দক্ষিণের মর্ম্মরবেদীতে অষ্টভুজা দেবী সিংহবাহিনী মূর্ত্তির মত—চতুষ্কোণ প্রস্তর-নির্ম্মিত। ইহার দক্ষিণে মহাদেব (মৃন্ময় বলিয়া

* রামচরণ রায়ের দুই পুত্র—রাজা রামলোচন ও রাজা রায়চাঁদ রায়। রামচরণ ভ্যান্‌সিটার্ট ও জেনারেল স্মিথের দেওয়ান ছিলেন। প্রভূত বিত্তশালী হইয়া তিনি কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটায় বাস করিতেন। পরে তাঁহার বংশধরেরা আন্দুলে বসবাস করিতে থাকেন এবং আন্দুলরাজ বলিয়া পরিচিত হন।

মনে হয়)। বামে পিতলের গণেশ মূর্ত্তি। মূল মর্ম্মরবেদীর বামের বেদীতে রাধাকৃষ্ণ, গোপাল, শিবলিঙ্গ ইত্যাদি ও পিতলের ছোট ছোট হিন্দু দেবদেবী মূর্ত্তি।

মঠের প্রবেশ-দ্বারের দক্ষিণে বৃহৎ দ্বিতল বাড়ী, বোধ হয় ইহাই অতীতের অতিথিশালার রূপান্তর।

গ্রন্থপঞ্জী

(1) গৌরদাস বসাক—

The Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LIX, Part I, No. 1, 1890.

(2) শরচ্চন্দ্র দাস—

Indian Pandits in the Land of Snow. Edited by Nobin Chandra Das, M.A. Calcutta, 1893.

(3) Clements R. Markham, India Office—*Narratives of the Mission* s *George Bogle to Tibet and the Journey of Thomas Manning to Lhasa*. London, 1879.

(4) Capt. Samuel Turner: *An Account of an Embassy to the Court of Teshoo Lama in Tibet.* London. 1800.

চিরন্তনী

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

ধূসর অতীতের কোন্ এক অখ্যাত জনপদের
শৈবাল-ঘেরা শ্যাম সরোবরের স্বপ্নেরা
ঘুমিয়ে আছে তোমার পটোল-চেরা ডাগর আঁখির
কাজল-কালো রেশম-কোমল ছায়ায়!
ওরা কি রূপকথার নিদ্রিত রূপসী রাজকন্যা?
কার চুম্বনের সোনার কাঠির স্পর্শে ওরা হঠাৎ উঠবে জেগে?
অজন্তা-ইলোরা, ধারাবতী-উজ্জয়িনীর
বহুদিন-ভুলে-যাওয়া মেদুর, মধুর, মদির সৌরভ
ওদের কিংখাব পেলব স্পর্শ-কাতর দেহে!
ভুলিয়ে দেয় ওরা বিংশ শতাব্দীর অস্তিত্বের দুঃসহ গ্লানি,
বাস্তব জীবনের রক্ত-ঝরা কঠোর সংগ্রামের মাঝখানে
এনে দেয় ওরা কালিদাসের কবিতার মঞ্জুল কলগুঞ্জন!
তোমার ঐ নীল দুকূলের অঞ্চলপ্রান্তে
কোন্ অজানা নীল সাগরের উত্তল উর্ম্মিমালা
শ্রান্তিহীন শুধু নাচে আর দোলে?
যৌবনপুষ্পিত ঐ চারুদেহসিকতায়
উচ্ছ্বসিত আবেগে ওরা কেন—কেন পড়ে রাত্রিদিন লুটিয়ে?
দুরন্ত, দুর্ব্বার, উদগ্র ওদের কামনা!
লক্ষকোটি উল্লোল রসনা বিস্তার ক'রে
পান করতে ছুটে চলেছে ওরা তোমার হৃদয়-কুহরের
অষ্টাদশবর্ষ সঞ্চিত অনাস্বাদিত সীধু!
মেঘদূতের অনুপম শ্লোকের তিরস্করণী তুলে
কখন তুমি বেরিয়ে এলে কুহকিনী!
মন্দাক্রান্তা ছন্দে হিল্লোলিত ললিত দেহবল্লী নিয়ে
মহানগরীর পীচ-ঢালা প্রতপ্ত রাজপথের
কোলাহলমুখর কুৎসিত পরিবেশে তোমার অভ্যুদয়
লোভনীয় বটে—তবু বেদনাদায়ক!
তুমি আধুনিকা নও পুরাতনী নও—
নিখিল চিত্তহারিণী চিরন্তনী নারী!
মালবিকা-শকুন্তলা, নিপুণিকা-মদনিকার তুমি নর্ম্মসখী।
কোকিল-ডাকা বৃক্ষবাটিকায়, দধিশুভ্র জ্যোৎস্নায়
মঞ্জীর-ঝঙ্কৃত চরণে তোমার গোপন অভিসার।
উষ্ণীষখচিত শির, চন্দনচর্চ্চিত দেহ রাজসভাবিহারী কোন্ কবি
আজো শার্দ্দূলবিক্রীড়িত আর বসন্ততিলক ছন্দে
গেয়ে চলেছে তোমার অশ্রান্ত স্তবগান!

কৃষিবিজ্ঞানে রসায়নের ব্যবহার

শ্রীবিনয়ভূষণ ঘোষ

গত কয়েক শতাব্দীতে রসায়নবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিবিজ্ঞানেরও প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। রাসায়নিকদের অক্লান্ত গবেষণার ফলে রসায়ন-শিল্পের মত কৃষিও আজকাল একটা লাভজনক কারবারে পরিণত হইতে চলিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও চাষ করিয়া ফসল উৎপাদন করা একদিকে যেমন ভয়ানক পরিশ্রমের কাজ ছিল, তেমনই উহা হইতে লাভও হইত অতি অল্প। এজন্ত কৃষকেরা সর্ব্বদেশে দরিদ্র ছিল। কিন্তু ফলিত রসায়নের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এ অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

কৃষিবিজ্ঞানকে যেদিন হইতে বৈজ্ঞানিকেরা রসায়নের অংশরূপে ভাবিতে আরম্ভ করিলেন সেদিন হইতেই এই পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত। উনবিংশ শতাব্দীতে বিখ্যাত জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক লিবিগ-এর দৃষ্টি প্রথম এদিকে আকৃষ্ট হয়। মাটি এবং বাতাস হইতে গাছ আপন জীবনধারণোপযোগী সকল প্রকার অজৈব পদার্থ এবং কার্ব্বনডাই-অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাস সংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে যৌগিক পদার্থে পরিণত করে—এই তথ্য উপলব্ধি করিয়া লিবিগ গাছের পুষ্টি-সাধনের উপযোগী উপাদানের সংমিশ্রণে কৃত্রিম রাসায়নিক সার প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করেন। যদিও তাঁহার সে চেষ্টা বিশেষ কারণে ফলপ্রসূ হয় নাই, তথাপি ইহা কৃষিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে।

গাছের দেহ যেসব রাসায়নিক উপাদানে পুষ্ট সেই সব উপাদানই জমিতে বর্ত্তমান থাকিলে জমিকে উর্ব্বর করে। গাছের দেহ-পুষ্টি এবং গাছ ও মাটির রাসায়নিক উপাদানগত সম্বন্ধ বিষয়ে রাসায়নিকদের জ্ঞান কৃষিবিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি সাধন করিয়াছে। চারা গাছ কি ভাবে মাটি হইতে নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম, ফস-ফরাস, পটাস প্রভৃতি উপাদান শিকড়ের সাহায্যে সংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে নানা মিশ্রণে রূপান্তরিত করে এবং দেহের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত করে—রাসায়নিকদের তাহা জানা আছে। সুতরাং কি ভাবে উপরোক্ত উপাদানগুলি মাটিতে বর্ত্তমান থাকিলে গাছের পক্ষে সহজে গ্রহণযোগ্য হয়, তাহা সহজেই বলা যায়। রাসায়নিক-দের এই আবিষ্কার কৃষিক্ষেত্রে কৃত্রিম সার ব্যবহারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। বৃক্ষদেহে যে প্রোটিন থাকে তাহার প্রধান উপাদান এমোনিয়া-ঘটিত নাইট্রোজেন। চারা গাছ জমি হইতে এই এমোনিয়া-ঘটিত নাইট্রোজেন কতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিল তাহার উপর কৃষিকর্ম্মের সার্থকতা নির্ভর করে।

রাসায়নিকদের গবেষণা আজকাল ভূমিবিজ্ঞানেও যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে এবং তাহা কৃষিকর্ম্মকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। জমির রাসায়নিক অবস্থা বিচার না করিয়া জমিতে ফসল লাগান একটা মারাত্মক ভুল এবং ভারতের কৃষিকর্ম্মে এই ভুল ক্রমাগত করার ফল আজকাল ভয়ানক ভাবে দেখা দিয়াছে। প্রত্যেক ফসলই জমি হইতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাস প্রভৃতি বস্তু সংগ্রহ করে। সুতরাং ক্রমাগত ফসল উৎপাদনের পর জমিতে ঐ সব বস্তুর ঘাটতির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করার জন্ত জমির রাসায়নিক পরীক্ষা করা দরকার। অধুনা সরকার এদেশে জমির রাসায়নিক অবস্থা নির্দ্ধারণের জন্ত ব্যাপক কাজ সুরু করিয়াছেন। জমির রাসায়নিক গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া এদেশের জমিকে মোটা-মুটি চার ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। বাংলাদেশের জমি সাধারণ ভাবে পলিমাটি গঠিত। বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের এই প্রকার জমিতে সাধারণতঃ ফসফরাস, চূণ ও জৈব পদার্থের অভাব এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে লবণের আধিক্য হেতু জমির উর্ব্বরতা নষ্ট হইয়াছে।

এবারে কৃত্রিম রাসায়নিক সারের কথা। কৃষিকর্ম্মে এই সারের ব্যবহার আজকাল সর্ব্বদেশেই বৃদ্ধির দিকে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইউরোপে ১০৮টিরও অধিক রাসায়নিক কারখানা কৃত্রিম সার তৈরি করিত। ভারতে সিন্দ্রিতেও একটি বৃহদাকার কারখানা বৎসরে প্রায় ৩·৫ লক্ষ টন কৃত্রিম এমন-সালফ প্রস্তুত করিতেছে। এদেশে জমির বর্ত্তমান অবস্থায় নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। জমিতে নাইট্রোজেনের অভাব পূর্ণ করিতে হইলে এমন-সালফ ব্যবহার করা দরকার। সিন্দ্রির তৈরি এমন-সালফ দেশের মোট চাহিদা অপেক্ষা অনেক কম। দেশে রাসায়নিক সার উৎপাদনের পরিমাণের উপর কৃষির উন্নতি যথেষ্ট নির্ভর করে।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র কৃষিকর্ম্মের যে উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে—ভূমিবিজ্ঞানে উন্নত জ্ঞান এবং ব্যাপক রাসায়নিক সার প্রস্তুত-প্রণালী আবিষ্কারই তাহার কারণ। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকর্ম্ম করিতে হইলে উহাকে রাসায়নিক গবেষণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। জমির রাসায়নিক অবস্থা, জল ধারণ ক্ষমতা, এবং জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা জমিতে ফসল উৎপাদনের পক্ষে অপরিহার্য্য। এ বিষয়ে কৃষিবিজ্ঞান রসায়নের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর-শীল।

ভারতের কৃষির অবস্থা বিচার করিলে এদেশে যথেষ্ট পরিমাণ কৃত্রিম সার প্রস্তুত করা একান্ত প্রয়োজন। তা ছাড়া, জীবাণুনাশক এবং আগাছা ধ্বংসকারক রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের প্রয়োজনও যথেষ্ট আছে। বীজ হইতে চারা গাছের উৎপত্তি এবং তাহাতে ফসলের বিকাশ পর্য্যন্ত গাছের দেহাভ্যন্তরের রাসায়নিক পরিণতি সম্বন্ধে রাসায়নিকের জ্ঞান ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। অন্ত দিকে রসায়ন-বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারও কৃষির উন্নতিকল্পে নিয়োজিত হইতেছে। সুতরাং রসায়ন এবং উদ্ভিদ্‌বিদ্যার সম্মিলিত জ্ঞানের সদ্ব্যবহারে কৃষিকর্ম্ম যে অদূর ভবিষ্যতে আরও উন্নত ধারা অনুসরণ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতের বৃহত্তম শিল্প—তাঁত

শ্রীঅজিতকুমার বসু

শহর অঞ্চলের চাকুরীপ্রার্থী এবং গ্রামাঞ্চলের কৃষিকার্য্যের অন্তর্ব্বর্তী অবসর সময়ে কৃষকদের কাজের অভাব, এই দুয়ের হিসাব ধরলে দেখা যাবে, ভারতের সমস্ত কর্ম্মক্ষম ব্যক্তির আধাআধি সারা বৎসর বেকার থাকে। বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে প্রতি বৎসর এই বেকারের সংখ্যা দশ লক্ষাধিক করে বাড়ছে।

দেশের জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বৃদ্ধি তথা আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধির উপরই যে জাতীয় সমৃদ্ধি নির্ভরশীল, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। বেকারদের অর্থকরী কাজে এবং যতদূর সম্ভব উৎপাদনমূলক কাজে নিযুক্ত করেই তাদের আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি করা যেতে পারে। শিল্পের সম্প্রসারণ এবং কৃষিকার্য্যে যন্ত্রের প্রবর্ত্তন ও একই জমিতে বৎসরে একাধিক ফসলের চাষ,—একই সঙ্গে পরস্পরের সামঞ্জস্য রেখে এই তিনটি ব্যবস্থা অবলম্বন করলে তবে বেকার-সমস্যার সমাধান হতে পারে। অবশ্য একাধিক ফসল ফলানোর জন্য যেমন, তেমনই ফলনের হার বৃদ্ধির জন্যও ব্যাপক সেচের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কিন্তু ভারতে ধনীদের স্বার্থপরতাজনিত দেশাত্মবোধের অভাবও যেমন অত্যধিক প্রকট, পুঁজি বৃদ্ধির ক্ষেত্রও তেমনই অতি সঙ্কীর্ণ। সেই জন্য প্রয়োজনমত দ্রুত শিল্প-সম্প্রসারণ মোটেই সম্ভব নয়, অন্ততঃ বর্ত্তমান আর্থিক ব্যবস্থায় তো সম্ভব নয়ই। এমতাবস্থায় কৃষিকার্য্যে যন্ত্রের ব্যাপক প্রবর্ত্তন সমীচীন নয়; তা সম্ভবও নয়। সেচের ব্যবস্থা হচ্ছে বটে, কিন্তু তাও আর্থিক ও অন্যান্য কারণে যথেষ্ট নয়। এই সব কারণে অর্থনীতিবিদ্‌রা প্রায় একমত হয়েছেন যে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় যতদূর সম্ভব শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ, কুটীর-শিল্পের ব্যাপক প্রসার এবং কৃষকদের হাতে জমি বিলি করার দ্বারাই ক্রয়ক্ষমতার বৃদ্ধি ও বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হবে। এখানে কুটীর-শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হস্ত-চালিত তাঁত সম্বন্ধেই আলোচনা করা হবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ বিষয়ে সুচিন্তিত আলোচনা হয়েছে। কথঞ্চিৎ সমাধান হবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রায় দু'বৎসর তো কেটেই গেল। কয়েক শ' কোটি টাকা খরচও হয়েছে। আর বাকী বৎসর তিনেক। এই দু'বৎসরে বেকার-সমস্যা সমাধানের দিক থেকে কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে? কারখানায়, আপিসে, কাছারিতে ছাঁটাই এবং বেকারের সংখ্যা তো ক্রমাগত বাড়ছেই; উপরন্তু কুটীর-শিল্পের মধ্যে যে স্বল্পসংখ্যক লোকের কর্ম্ম-সংস্থান হচ্ছিল বা হচ্ছে, তাও সঙ্কটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

হাতে চালানো তাঁতশিল্প ভারতে যেমনই পুরাতন, লোকনিয়োগের দিক থেকে তেমনই বৃহত্তম। সরকারী তদন্তের (ফ্যাক্টস্ ফাইণ্ডিং কমিটির রিপোর্ট) হিসাবে ১৯৩৮-৩৯ সনে ভারতে তাঁত ছিল ২০ লক্ষ। এর মধ্যে শতকরা ১৩টা ছিল অকেজো। অর্থাৎ, তখন কাজের তাঁত ছিল সাড়ে সতের লক্ষ। বিভক্ত ভারতে (ভারতীয় ইউনিয়নে) শতকরা ৯০টা তাঁত থাকলেও, তখনকার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬ লক্ষের কমই। যুদ্ধের ফাঁপাইয়ের দরুন এক দিকে কেনা-বেচা বৃদ্ধি, অপর দিকে কাপড়ের অভাব, এই দুটি কারণে কিছু তাঁত বেড়েছে এবং কিছু অকেজো তাঁতও কাজের হয়েছে। সেই হিসাবে বর্ত্তমানে কাজের তাঁতের সংখ্যা অনধিক ২০ লক্ষ হবে বলেই মনে হয়।

সরকারী সূত্রে প্রচার করা হ'ত, তাঁতের সংখ্যা ২৬ লক্ষ; পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হয়েছে ৩০ লক্ষ। এ হিসাবে ভুল আছে, ভুল থাকার কারণও আছে। তাঁতের লাইসেন্স ও সূতার কন্ট্রোলের সময় বহু মিথ্যা লাইসেন্স যে ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। উপরোক্ত সরকারী হিসাবমতে তাঁতপ্রতি এক জন তাঁতি এবং দেড় জন যোগানদার লাগে। এই অনুপাতে ২০ লক্ষ তাঁতেই সর্ব্বসমেত অন্ততঃ ৫০ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। যোগানদারদের মধ্যে অল্পসংখ্যক তাঁতি-পরিবারভুক্ত। এদের বাদ দিলেও সর্ব্বসমেত অন্ততঃ ২ কোটি লোকের জীবিকা তাঁতের উপর নির্ভরশীল। এর উপর আছে খাদির সূতা কাটুনী। তাঁতের সংখ্যা আরও বেশী ধরলে তো কথাই নেই। সুতরাং তাঁত ভারতের বৃহত্তম শিল্প।

এই বৃহত্তম শিল্প আজ আবার মহা সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। কংগ্রেসের তালিকায় কয়েক লক্ষ "সক্রিয় সদস্য" থাকা সত্ত্বেও খাদি শিল্পেও সমধিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এই সঙ্কটের প্রধান কারণ হ'ল—(১) সূতার অভাব, (২) সূতার দামও অত্যধিক, যার ফলে পড়তায় এত বেশী পড়ে যে, (৩) কলের কাপড়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁত পেরে ওঠে না, (৪) উপরন্তু কলেই সস্তায় সৌখিন কাপড় বোনা হচ্ছে।

তাঁতিদের মুখপাত্রেরা দাবি করছেন যে, সস্তায় প্রচুর সূতা দেওয়া হউক এবং কলে ধুতি, শাড়ী বোনা কমানো হউক। কেউ কেউ এমনও দাবি করেছেন যে, কলে ধুতি, শাড়ী বোনা সম্পূর্ণই বন্ধ করা হউক। এই নিয়েই শ্রীরাজাগোপালাচারীর সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারীর বিরোধ বেধেছিল। কারণ মাদ্রাজেই হস্ত-চালিত তাঁতের সংখ্যা বেশী—সারা দেশের শতকরা প্রায় ২০ ভাগ। অবশেষে রাজাজীর মতেই কেন্দ্রীয় সরকার কতকটা সায় দিয়েছেন। তাঁতশিল্পকে রক্ষা করার জন্য কলে উৎপন্ন কাপড়ের উপর গজপ্রতি এক পয়সা হারে কর ধার্য্য করা হয়েছে এবং কলে ধুতি, শাড়ীর উৎপাদন শতকরা ৪০ ভাগ কম করার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আপাততঃ এই ব্যবস্থাকেই বলবৎ করা হয়েছে। এ ছাড়া একটি কমিটি নিয়োগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কমিটির পরামর্শ পেলে পরে কি করা হবে তা এখন ভবিষ্যতের গর্ভে। গত

২রা ফেব্রুয়ারী যথারীতি কমিটির বা বোর্ডের উদ্বোধন করা হয়েছে।

অথচ কাপড়ের উৎপাদন কম করা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূলনীতির বিরোধী। পরিকল্পনায় বলা হয়েছে কাপড়, চিনি, সাবান ও অন্যান্য কয়েকটি চলতি শিল্পের সম্প্রসারণ না করে, তাঁতে নিযুক্ত কল-কব্জার উৎপাদন-ক্ষমতার (Installed capacity) পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হবে। তা ছাড়া, উৎপাদন হ্রাস সরকারী শিল্পনীতিরও বিরোধী। সরকার বরাবর বলে আসছেন, "উৎপাদন বৃদ্ধি না করলে ধ্বংস হবে" (Produce more, or perish)।

মূল কথাই হ'ল ক্রয়-ক্ষমতা। ক্রয়-ক্ষমতার বৃদ্ধি না করে উৎপাদন বৃদ্ধি করলে যে তা আর্থিক অচল অবস্থা তথা সঙ্কটকেই ডেকে আনবে, বর্ত্তমান ব্যবস্থায় তাই প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৫১-৫২ সনে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু তাও মাথাপ্রতি গড়ে মোট মাত্র ১২-১৩ গজের বেশী নয়, তার মধ্যে ধুতি, শাড়ী আনুমানিক মাত্র ছয়-সাত গজ। প্রয়োজনের তুলনায় এ যে কত কম তা বর্ণনা করতে হবে না। হাতে পয়সা থাকলে এত সামান্য কাপড় অবিক্রীত থাকা তো দূরের কথা, বাজারে অভাবই হবার কথা। কিন্তু এতেই বাজারে কাপড় অবিক্রীত হয়ে জমে উঠেছিল। ফলে কলের কাপড়ের দাম কমতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁতের কাপড়ের বাজারে যে মন্দা দেখা দিয়েছিল, তা বেড়ে সঙ্কটে পর্যাবসিত হয়েছে। সুতরাং সব কাপড়ের উপরই কর আরোপ করে অক্ষম ক্রেতাদের উপরই বোঝা চাপানো হয়েছে। উপরন্তু সব ধুতি, শাড়ীরই উৎপাদন ৪০ ভাগ কমানোর ফলে বাজারে কাপড়ের অভাব ঘটবে এবং তার ফলে দাম বাড়াবার সুযোগ নিতে মালিকরা ও ব্যবসাদাররা কসুর করবে না। অর্থেরই যেখানে অভাব সেখানে কলের কাপড়ের অভাবে তাঁতের কাপড় কেনা গরীবদের পক্ষে তো সম্ভব নয়! সুতরাং গরীব জনসাধারণ বিপন্ন হয়ে পড়বে। ইতিমধ্যেই সে লক্ষণ দেখা দিয়েছে—কাপড়ের দাম এখন ঊর্দ্ধমুখী। তা ছাড়া, ৪০ ভাগ ধুতি-শাড়ীর বদলে অন্য জিনিষ বুনলে ভারতের বাজারে তার ক্রেতা মিলবে বলে ভরসা হয় না। অবশ্য আগের কন্ট্রোলের মত গরীবদের বাধ্য করলে স্বতন্ত্র কথা। বিদেশের বাজারেও যে তা চালান করা যাবে এমন ভরসাও নেই। ফলে কলের উৎপাদনই কম হবার আশঙ্কা আছে। এতে শ্রমিকদের বেকার দশা বাড়বে তো বটেই, করও কম উঠবে।

এ সব সত্ত্বেও তাঁতিদের কি কোন উল্লেখযোগ্য সুরাহা হবে? কর বাবদ সাড়ে ছয় কোটি টাকা আদায় হতে পারে, যদি না উৎপাদন কম হয়। সে টাকা কি ভাবে খরচ করা হবে, তারও বিশেষ কোন নির্দ্দেশ পরিকল্পনায় নেই; তা বোর্ডের পরামর্শসাপেক্ষ বলেই ধরে নেওয়া যায়। তবে মোটা টাকা বোর্ডের দরুন এবং বোর্ডের পরামর্শ কার্য্যকরী করতে এক বিপুল কর্ম্মচারী-বাহিনীর পিছনে যে খরচ হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে-কথা ছেড়েই দেওয়া যাক। সব টাকাই যদি আর্থিক সাহায্য বাবদ খরচ করা হয়, তা হলে খাদির দরুন সাহায্য বাদে, হাতে চালানো তাঁতের সুতার মূল্য বাবদ পাউণ্ড প্রতি দু' আনারও কম তাঁতিরা পেতে পারে (১৯৩৮-৩৯ সালে তাঁতে ৩৫ কোটি পাউণ্ড সুতা লেগেছিল)। অর্থাৎ, তাঁতে উৎপন্ন কাপড়ের গজপ্রতি মাত্র দু' পয়সা লাগে এইটুকু পার্থক্যের জন্যই যে তাঁতে দুর্যোগ দেখা দিয়েছে, তা কখনই নয়।

হাতে চালানো তাঁতের উৎপাদন-ব্যয় অনেক বেশী। তাঁত ও কলে মিলে সর্ব্বাধিক যা উৎপন্ন হতে পারে, তার শতকরা আনুমানিক মাত্র ৩২ ভাগ তাঁতে উৎপন্ন হতে পারে। অথচ উভয়ে মিলিয়ে যত শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, তার শতকরা ৮৪ ভাগ তাঁতেই লাগে। অর্থাৎ, কলের তুলনায় তাঁতে শ্রমিকপ্রতি মাত্র এক-একাদশাংশ ($\frac{1}{11}$) উৎপন্ন হতে পারে। তাঁত ও কলের মধ্যে পার্থক্য এখানেই। এই পার্থক্য দূর করার উপরই তাঁতশিল্পের জীবন-মরণ নির্ভর করছে।

তথাপি জনসংখ্যা ও উৎপাদনের পরিমাণ হিসাবে এখনও তাঁতের জিনিষ বিক্রী হতে পারে, যদি সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সেদিকে উল্টো ধারাই বইতে সুরু করেছে। এক দিকে কৃষিজাত দ্রব্যের দাম ক্রমাগত কমে আসছে, অপর দিকে বাজারের অভাবে কলকারখানায় ছাঁটাই চলেছে। উপরন্তু বিদেশের বাজারে সস্তার জাপানী কাপড়ের সঙ্গে ভারতের কল পেরে উঠবে বলে ভরসা নেই। এখানে সে সমস্যা দেখা দিতে পারে বলেই আশঙ্কা হয় বরং। সুতরাং ভারতীয় কাপড়ের কলকে তাঁতের বাজার দখল করতে হবে। কাজেই তাঁতের অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্নই হবে। বস্তুতঃ যন্ত্রচালিত শিল্পজাত পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পুরাতন পদ্ধতির কুটীর-শিল্পজাত কোন দ্রব্যই পাল্লা দিতে পারে না। সুতরাং যৎসামান্য আর্থিক সাহায্য কেবল অর্থের অপচয় ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু অর্থ উপার্জ্জনের পাল্টা কোন ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত হাতে চালানো তাঁতশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। বেকার সমস্যা বৃদ্ধির দিনে এত বড় একটা শিল্পের উপর নির্ভরশীল কোটি লোকের আর্থিক সঙ্কট জাতীয় জীবনেও বিপর্য্যয় আনবে। সুতরাং নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে:

তদন্ত কমিটির মতে শতকরা ৭২ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ১৫ লক্ষ তাঁতে সুতি কাপড় বোনা হয়। এ ছাড়া ১৯ ভাগ তাঁতে রেশম, ৫ ভাগে পশম, এবং অন্যান্য ও কৃত্রিম রেশম ৭ ভাগে। সুতির মধ্যে শতকরা ১২ ভাগে ৪০ নম্বরের বেশী মিহি বোনা হয়। ৭০।৮০ নম্বর ও তার বেশী মিহি সুতার তাঁতের সংখ্যা আনুমানিক এক লক্ষ।

রেশম ও মিহি তাঁতের কতকটা সুরাহা সহজেই করা যায়। কলে ৪০ থেকে ৭০ নম্বরের কাপড় বোনা কমিয়ে ৭০ নম্বরের বেশী মিহি বোনা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলে ধনীরা ও সৌখিন ব্যক্তিরা

তাঁতের জিনিষের প্রতি ঝুঁকবে। এরা তখন রেশমের প্রতিও বেশী ঝুঁকবে। সৌখিন জামার কাপড় বোনা কলে কিছু কম করলেও রেশমের কাটতি বাড়বে। তা ছাড়া প্রচার ও প্রদর্শনী এবং গুণগত ও সৌখিনতার উন্নতি করতে পারলেও চাহিদা বাড়বে। রেশম কলের তাঁতে কিছু কিছু সুতির কাপড় বোনার ব্যবস্থা করা যায় কি না, তাও দেখা দরকার।

খাদির ব্যাপারে বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারীরাই অনেকটা সমস্যা মিটিয়ে দিতে পারেন। তাঁরা সামান্য ত্যাগ স্বীকার করে খাদি ব্যবহার করলে অনেক খাদিই বিক্রী হয়ে যায়। রেশমও তাঁদের বেশী ব্যবহার করা উচিত। নাগরিক হিসাবেও যেমন সরকারী তথা সাধারণের কর্ম্মচারী হিসাবেও তেমনি, এ বিষয়ে তাঁদের নৈতিক দায়িত্ব আছে। তা ছাড়া সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে যে পোশাক দেওয়া হয় তার জাঁকজমক ত্যাগ করে খাদির পোশাক দেওয়ার ব্যবস্থা করলে, খাদির আর কোন সমস্যাই আপাততঃ থাকে না। গান্ধীজীর নাম নিয়ে খাদির ভেক ধরে প্রতারণা চলছে কি না, তারও তদন্ত হওয়া দরকার। কারণ প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারই খাদিকে মোটা টাকা সাহায্য করে আসছেন, তথাপি খাদির না হয়েছে মূল্যহ্রাস, না হয়েছে কোন উন্নতি। কলে মোটা সুতো খাদির মত করে বুনে এবং মোটা সুতো তাঁতে বুনে খাদি বলে বিক্রী হচ্ছে। এ বন্ধ করা দরকার। এর জন্য অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান মারফত উৎপাদন ও বিক্রীর ব্যবস্থাও করতে হবে।

বাকী ১৩ লক্ষাধিক সুতি তাঁতে বোনা হয় ১-১০ নম্বরের সুতা শতকরা ১৯.৯৫ ভাগ, ১১-২০ নম্বর ৩৪.৪৩ ভাগ, ২১-৩০ নম্বর ১৯.৬২ ভাগ এবং ৩১-৪০ নম্বর ১৪.১৬ ভাগ। গড়ে পাউণ্ড প্রতি ৪ গজ কাপড় উৎপন্ন হয় এবং প্রতি তাঁতে প্রতিদিন গড়ে সাড়ে চার গজ উৎপন্ন হতে পারে। প্রতি তাঁতি বছরে গড়ে ২৭৫ দিন কাজ করলে সর্ব্বসমেত ৪০ কোটি পাউণ্ড সুতার দরকার হবে। তাঁতিরা দরকারমত সুতা পায় না, আর দামও অত্যধিক, পাউণ্ড প্রতি গড়ে ৪৲ টাকার বেশী।

টেরিফ বোর্ড ও উৎপাদন তদন্ত কমিটির মতে সারা বছরে কাপড়ের কলে গড় হাজিরা শতকরা ১০ ভাগ। এদেরই মতে একই কলে যা গড়ে উৎপন্ন হয়, তার বেশী উৎপাদন করলে বাড়তি উৎপন্ন কাপড়ের খরচে সর্ব্বসাকুল্যে শতকরা ৪ ভাগ কম পড়ে। বোম্বাইয়ের মিলমালিক সভাও এ কথা স্বীকার করেছেন। সুতরাং গড় হাজিরার জন্য পরিপূরক শ্রমিক (relieving) নিয়োগ করলে ১৪ কোটি পাউণ্ড বাড়তি সুতা উৎপাদন করা যাবে। তা ছাড়া, কলে যে ১,১২,৫২,৪৪৩টি সুতা কাটা টেকো আছে, তাতে ১৯৫১ সনে ১৪৬ কোটি পাউণ্ড সুতা হয়েছিল। ১৯৪৮ সনের উৎপাদনের গড় ধরলে এই টেকোতে ১৫৭ কোটি পাউণ্ড সুতা উৎপন্ন হতে পারে। অর্থাৎ, সর্ব্বসমেত ২৫ কোটি পাউণ্ড বাড়তি সুতা উৎপন্ন হতে পারে। এর জন্য কাঁচা মাল আর মজুরী ব্যতীত অপর কোন খরচ বিশেষ নেই। এর দাম দাঁড়াবে পাউণ্ড প্রতি গড়ে ১৷০ টাকা। তাঁতের জন্য যে ৪০ কোটি পাউণ্ড সুতা লাগে কেবলমাত্র তার উপরই এই বাড়তি সুতার সস্তা দরটা চাড়িয়ে দিলে গড়ে প্রতি পাউণ্ডের দাম দাঁড়াবে ২৷০ টাকা মাত্র। অর্থাৎ, পাউণ্ড প্রতি গড়ে ১৷০ টাকার বেশী বা গজ প্রতি ।৵০ আনারও বেশী সস্তা হবে। তা হলে কলের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তাঁতের পক্ষে অসম্ভব হবে না এবং ক্রেতার সংখ্যাও বাড়বে।

কলে দেড়া বা ডবল কাজ করিয়ে সুতা কাটালেও এই হিসাবে অতিরিক্ত উৎপন্ন সুতার পড়তা দরে মোট ১০ থেকে ২০ কোটি টাকা কম পড়বে। সর্ব্বোপরি পরিকল্পনা অনুসারে কলকজার উৎপাদন-ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা করলেও অনেক সস্তায় সুতা উৎপন্ন করা যায়। ভারতের কাপড়ের কলে গড়ে শতকরা ৬০।৬৫ ভাগ মাত্র উৎপাদন-ক্ষমতার সদ্ব্যবহার হয়। একে শতকরা ৮০ ভাগে তুলতে পারলেও ১৫।২০ কোটি পাউণ্ড বাড়তি সুতা উৎপাদন করা যায়। এইভাবে বাড়তি উৎপন্ন সুতার বা কাপড়ের দরুন কলের মালিকদের বাড়তি লাভ না দিয়ে যদি রপ্তানীর সুতা বা কাপড়ের উপর, তাঁতের সুতার উপর এবং সম্ভব হলে মোটা কাপড়ের উপর ছাড় দেওয়া হয়, তা হলে সস্তায় রপ্তানী করে বিদেশী মুদ্রা অর্জ্জন করাও যেমন সহজ হবে তেমনই তাঁতিদের এবং গরীব ক্রেতাদের সস্তায় দিয়ে বাজারের কেনা-বেচা বাড়ানো যাবে। এ বিষয়ে নজর দিতে হবে, তবে মনে রাখতে হবে মালিক আর পাইকারদের লাভ বাড়াবার জন্য করলে চলবে না। মোট কথা, কল এবং তাঁতকে পৃথক ও পরস্পরবিরোধী শিল্প হিসাবে না দেখে একই শিল্পের অভিন্ন অংশ হিসাবে গণ্য করে সামঞ্জস্যবিধান করতে হবে। এর জন্য কঠোর নিয়ন্ত্রণ দরকার।

কলে চালানো তাঁত (Power-looms) হাতে চালানো তাঁতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র, জাতীয় সম্পদ উৎপাদনে সহায়তা করে না। আর যাতে কোন নূতন এমন কল না বসে তার ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

কেনা-বেচার ব্যাপারে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অধিকাংশ তাঁত এবং তাঁতিই, বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নামে মহাজনদের কবলিত। তাঁতিদের সুতা কিনতে এবং কাপড় বেচতে অনেক সময় কয়েক হাতে লাভ গুণতে হয়। সুতা রং করা এবং পাট করার ব্যাপারে একা করলেও খরচ বেশী পড়ে। তাই সমবায়ের ভিত্তিতে কেনা-বেচার ব্যবস্থা করলে খরচের অনেক সুরাহা করে পড়তা কমানো যায়।

ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন প্রদেশে সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছিল, কিন্তু সফল হয় নি। তার কারণ উদ্যোক্তাদের অজ্ঞতা এবং অসাধুতা, সরকারী উদাসীনতা, আইনের গলদ এবং তাঁতিদের মহাজনদের উপর আর্থিক নির্ভরশীলতা। তাঁতিদের অজ্ঞতা এবং উদাসীনতাও অবশ্য কম দায়ী নয়। পশ্চিমবঙ্গে যুদ্ধের সময় অসংখ্য তাঁতি

সমবায় সমিতি হয়েছিল। তখন সব কেনা-বেচা সমিতি মারফতই হ'ত। প্রত্যেকটি সমিতিতেই প্রচুর লাভ হয়েছে। কিন্তু তার হিসাব নেই। উপরন্তু সমিতিগুলির অধিকাংশই স্থানীয় মহাজনদের কবলে ছিল। নিয়ন্ত্রণ উঠে যেতেই মহাজনরা সমিতিকে চেপে রেখে নিজের নিজের কারবার সুরু করেছে। কিন্তু সবকিছু জেনে-শুনেও সরকার এবং সরকারী কর্ম্মচারীরা নীরব আছেন। এর জন্ত কর্ম্মচারীদের অসাধুতা এবং উপরওয়ালাদের অবহেলা ও উদাসীনতা দায়ী, তবে সমবায় আইনেই এঁরা প্রশ্রয় পান। এ বিষয়ে প্রকাশ্যে বিচার বিভাগীয় তদন্ত হলে অনেক তথ্যই প্রকাশ পাবে। মোট কথা, সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীদের সমিতির ও পরিচালকদের সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে সমবায় আইনের সংশোধন করতে হবে এবং তাঁতিদের কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। তা হলে সমিতিগুলি আবার সচল হয়ে উঠবে। এ ছাড়া, কোন এলাকায় যদি কোন সর্ব্বার্থসাধক বা অপর কোন কৃষক জেলিয়া বা অন্ত কোন সমবায় সমিতি থেকে থাকে, তা হলে তাঁতি সমিতিকে তার সামিল করে বা সবগুলিকে মিলিয়ে একটি সমিতি করবার উপযোগী আইন করে সকলকেই সমিতির সভ্য হবার অধিকার দিলে সম্ভবতঃ সুফল পাওয়া যেতে পারে।

তাঁতের উন্নতির দিকেও নজর দিতে হবে। 'ফ্লাই' (fly) মাকুর তাঁতে 'থ্রো' (throw) মাকুর তাঁত অপেক্ষা শতকরা ৭৫ ভাগ বেশী উৎপন্ন হয়। আগে থ্রো মাকুর (হাতে ঠেলা) তাঁতেরই প্রচলন ছিল। উৎপাদন-ক্ষমতা বেশী বলে ফ্লাই তাঁত চালু হয়েছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে শতকরা ৩৫টা ছিল ফ্লাই মাকুর তাঁত। ফ্লাই মাদ্রাজেই সবচেয়ে বেশী, শতকরা ৮১টা; তার পরই বাংলায়, শতকরা ৬৭টা; বোম্বায়ে শতকরা ৫৫টা। থ্রো মাকুর তাঁত আসামেই সবচেয়ে বেশী, শতকরা ৯৭টা, তার পরই পঞ্জাবে শতকরা ৯৫টা, উড়িষ্যায় শতকরা ৮৫টা, উত্তর প্রদেশে শতকরা ৮১টা এবং বিহারে শতকরা ৬২টা। তখনকার দিনে অবসরকালীন কাজ হিসাবে তাঁত চালানো হ'ত ভারতে শতকরা ২৯টা, আসামে শতকরা ৯৯টা, উড়িষ্যায় শতকরা ৪০টা। ফ্লাই মাকুর তাঁতের দাম অনেক বেশী এবং এক জায়গায় বসিয়ে রাখতে হয়। থ্রো মাকুর তাঁতে খরচ খুবই কম, অধিকাংশই বাড়ীতে তৈরি করা যায় এবং যখন যেখানে খুশী তুলে রাখা যায়। এ সব সত্ত্বেও যাতে সস্তায় ফ্লাই মাকুর তাঁত উৎপন্ন হতে পারে তার ব্যবস্থা হওয়া দরকার এবং এই তাঁতের প্রচলন বাড়ানো দরকার। এ ছাড়া আরও উন্নত ধরণের এবং অধিক উৎপাদন-ক্ষমতাসম্পন্ন সস্তা তাঁতের উদ্ভাবন করবার চেষ্টাও দরকার। স্বদেশী আন্দোলন ও খাদির প্রচলন এবং বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী বিশ্বব্যাপী অর্থসঙ্কটের সময় বেকার-সমস্যা সমাধানের প্রয়াস হিসাবে বে-সরকারী ভাবে তাঁতের কিছু কিছু উন্নতি সাধিত হয়েছিল। তখন অটোমেটিক তাঁত হয়েছিল। হ্যাটার্সলে তাঁত সবচেয়ে ভাল হয়েছিল। তবে দাম বেশী এবং কলকজার জটিলতা ছিল। দরকার মত তাঁতের অংশ পাওয়া যেত না, সারাবার জন্ত সব সময় মিস্ত্রীও মিলত না। তাই যাও বা চালু হয়েছিল তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ত ছিলই।

সর্ব্বোপরি জাপানের মত ছোট ছোট সুতাকাটা ও তুলা পেঁজা কল তৈরী করাতে হবে এবং সম্ভব হলে জাপান থেকে আনাতে হবে। জাপান এই কলের সাহায্যেই বিশ্বের বাজারে সকল দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে পেরেছিল; বর্ত্তমানে আবার পাল্লা দিতে সুরু করেছে। এতে তাদের খরচ কম পড়ে। ভারতে তা চালু না হবার কোন কারণ থাকতে পারে না। গ্রামের মধ্যেই এই কল বসানো যেতে পারে। আর সেজন্ত ধনী বা পুঁজি-পতিদের দরকার হবে না, কেননা বেশী টাকার দরকার হবে না, সমবায় ভিত্তিতেই চলতে পারবে। এমন কল চালু করতে পারলে গ্রামের মেয়ে পুরুষে কাজ করতে পারবে এবং তার ফলে বেকার সমস্যার সমাধান ত অনেকটাই হবে, উপরন্তু বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে সস্তায় বিদেশেও চালান দেওয়া যাবে। নমুনা মত ভারতের কারখানায়ই এ কল প্রস্তুত করা যেতে পারে।

মূল কথা, কুটীর-শিল্পকে কোন উচ্চতর আদর্শের ভাবাবেগে দেখলে চলবে না। তাতে তাঁতকে ত বাঁচানো যাবেই না, কোন কুটীর-শিল্পকেই বাঁচানো যাবে না। আধুনিক যন্ত্রের উৎপাদন-ক্ষমতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে তার উপযুক্ত যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করতে হবে। সেজন্ত যন্ত্রপাতি প্রস্তুতির কারখানাকে নির্দ্দেশ দিতে হবে এবং বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে। তা হলে পথ মিলবেই। এ প্রচেষ্টাই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সামিল হওয়া দরকার। নচেৎ বোর্ড, কমিশন আর কমিটি দিয়ে কিছু হবে না। ইতিপূর্ব্বে ঢের ঢের কমিশন নিয়োগ করা হয়েছিল। তাদের মণ মণ রায় সরকারী দপ্তরখানায় চাপা পড়ে আছে। নূতন কোন বোর্ড বা কমিশন তাদের চেয়ে বেশী কিছু আবিষ্কার করতে পারবেন বলে মনে হয় না, কেবল সময় আর অর্থের আরও অপচয় হবে হয়ত।

শাকসব্জীর বাগান

শ্রীদীপ্তি পাল

বাগান করতে আমার খুব ভাল লাগে—তাই আমার স্বামী যখন ডায়মণ্ডহারবারে বদলি হলেন তখন আমাদের সরকারী বাসাবাটীতে পেলাম সাত-আট বিঘা জমি আর দুটো পুকুর। তখন আশ মিটিয়ে বাগান করা যাবে ভেবে খুবই আনন্দ হ'ল। আমরা এখানে এসেছিলাম পৌষ মাসের প্রথমে। আমাদের আগে এখানে কেহ কোন দিন বাগান করে নি। জমিটা একেবারে অনাবাদী পড়ে ছিল। কাজেই আমাকে একেবারে গোড়া থেকে কাজ সুরু করতে হ'ল। এখানকার মাটি খুবই শক্ত; কিন্তু একবার জলে ভিজলে মাখনের মত নরম হয়। এর জল ধারণ করবার শক্তিও ভাল; অর্থাৎ এঁটেল জাতীয়। আমরা প্রথমে পুকুরের কাছের খানিকটা জমি বেছে নিয়ে জল দিয়ে ভেজাতে লাগলাম। আজ বিকালে যাকে জলে ভেজাতাম কাল তার উপরের ঘাস সাফ করা হ'ত। এই ভাবে প্রাথমিক কার্য্য শেষ হ'ল প্রায় দশ কাঠায়। এর মধ্যে অর্দ্ধেক ফুলবাগান আর বাকি অর্দ্ধেক তরিতরকারি।

বাগানের অভাবে বাড়ীটা বড় নেড়া নেড়া লাগত বলে প্রথমেই আমরা ফুলের দিকে হাত দিলাম। মাঘ মাসের শেষ থেকে আমার বাগান গাঁদা ও অন্যান্য কয়েক জাতীয় ফুলে ভরে গেল। একটু দেরীতে আরম্ভ করেছিলাম বলে মরসুমী ফুল প্রায় চৈত্রের শেষ পর্য্যন্ত ফুটেছিল। বর্ত্তমানে ফুলের মধ্যে আমার বাগানে আছে সূর্য্যমুখী, রজনীগন্ধা ও আরও কয়েক রকমের ফুল।

চোখের আর মনের ক্ষুধা মিটিয়ে এর পর স্বভাবতঃই পেটের ক্ষুধার দিকে লক্ষ্য পড়ল। বাড়ীর বাঁ হাতি পুকুরপাড়ের জমিটাকে তখন ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করা হ'ল। তাতে বীজ দিলাম—ডাঁটা, পালং, ধনে, কুমড়ো, ঝিঙ্গে, উচ্ছে, কুটি, তরমুজ, ঢেঁড়স, শশা আর পুঁইয়ের। এ বাদে প্রায় ৫০টা ক্ষেত-মরিচের চারা বসালাম আমরা।

এবারে এদিকে বড্ড খরা গেছে। জলের অভাবে কত ক্ষেত যে নষ্ট হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নাই! গাছগুলিকে কেবল বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমরা দিনে এক শ' দেড় শ' বালতি করে জল ঢেলেছি বাগানে। সারও এবার কিনেই দিতে হ'ল সব।

সবচেয়ে আগে ফলল ঝিঙ্গে উচ্ছে আর কুটি। ঝিঙ্গে প্রথমে ২।৫টা থেকে আরম্ভ করে শেষে দিনে ২।৩ সের পর্য্যন্ত তুলেছি। উচ্ছের জমি ছিল ছোট—হ'তও কম। কোনদিনই দেড়পোয়া, আধসেরের বেশী হয় নি। কুটি ছোটতে বড়তে পেয়েছি প্রায় শতখানেক। তরমুজ আমার বাগানে হয়েছে বটে; কিন্তু তার আকার মাঝারি কুমড়োর চেয়ে বড় নয়। বাজারের সাধারণ পাকা তরমুজের মত এগুলো লালও হ'ত না পাকলে; তবে আস্বাদ ভালই।

পালং আর ধনে পাতা একেবারেই হয় নি। শশা গাছও খরার প্রকোপে মরে গিয়েছিল দুই-একটি শশা হবার পর। পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচাতে গিয়ে ঢেঁড়স গাছগুলির খানিকটা করে কেটে দিতে হয়েছিল; এখন সেইসব গাছে আট-নয় ইঞ্চি লম্বা সুন্দর ফল ফলছে। পুঁইশাক প্রচুর হয়েছে।

সবশেষে বলি কুমড়ো আর লঙ্কার কথা। প্রথমদিকে বৃষ্টির অভাবে গাছগুলি কোন রকমে বেঁচেছিল। আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টিটা পেয়ে গাছগুলির আশ্চর্য্য উন্নতি হয়। এর মধ্যে একটা গাছে ৫টি ডাল একসঙ্গে জুড়ে প্রায় চার ইঞ্চি চওড়া একটা ডাল হয়েছিল। তাতে এক সারে পাঁচটি পাতা, পাঁচটি ফুল, পাঁচটি কড়া দেখেছি। কিছুদিন পরে ডালটিতে পচন ধরে ও সব কুমড়োই নষ্ট হয়ে যায়। কুমড়ো সবশুদ্ধ পেয়েছি ৩৩টা। লঙ্কা গাছে প্রথমে একপোয়া থেকে আরম্ভ করে এখন পর্য্যন্ত দিনে পাঁচ পোয়া, দেড়সের পর্য্যন্ত লঙ্কা পাচ্ছি।

আমার বাগানের ফসলের হিসাব দিলাম। বাজার দর জানা থাকলে মোট কত টাকার ফসল পেয়েছি তাও জানাতে পারতাম। একটু উৎসাহ আর উদ্যম থাকলে পোড়ো অনাবাদী জমির কি রূপান্তর ঘটে এটা তারই একটা সামান্য উদাহরণ।

সিগারেটের বাক্স হইতে তৈরি ড্রয়িং-রুম-সেট ও ভিতরের কাগজ হইতে তৈরি পুতুলের বাড়ী-ঘর

ছুটছাঁট দ্রব্য হইতে প্রস্তুত

শ্রীশোভনা গুপ্ত

পূর্ব্বে দেশী খেলনার প্রচলন একরূপ ছিল না বললেই চলে। শিশুদের আনন্দদানের জন্ত দুই-চারিটি খেলনা প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতাম। বর্ত্তমানে দেশী খেলনার প্রচলন হওয়ায় সে অভাব অনেক দূর হইয়াছে।

কিন্তু ছুটছাট দ্রব্য হইতে কি প্রস্তুত করা যায়, ইহা তাহারই চেষ্টা। এই খেলনাগুলি বেশীর ভাগই পরিত্যক্ত দ্রব্য হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। নূতন দুই-চারিটি দ্রব্যও ক্রয় করিতে হইয়াছে, যথা—কিছু কালো উল, তুতলা, জরি, পেরেক, রং, তুলা ও রঙীন কাপড়। পরিত্যক্ত দ্রব্য —রিঠার বীচি, ছিপি, পাউডারের টিন, তামাকের টিন, সিগারেটের বাক্স, দেশলাইয়ের বাক্স, ঔষধের বাক্স, খালি রিল, কাপড়ের ছাঁট, নূতন কাপড়ের টুকরা, শাড়ীর পাড়, ছেঁড়া শাড়ী ও ব্লাউস, পিচবোর্ড ইত্যাদি। অতএব সংসারের নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের পরিত্যক্ত অংশ দ্বারাই এই সকল খেলনা প্রস্তুত হইতে পারে। তবে এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে, এই সকল খেলনা শিশুদের চিত্তাকর্ষক করিতে হইলে যথেষ্ট ধৈর্য্য ও পরিশ্রমের প্রয়োজন। সামান্ত সামান্ত বস্তুদ্বারা চেষ্টা করিলে কত সুন্দর সুন্দর খেলনা হইতে পারে নীচের এই ছবিগুলি তাহারই নিদর্শন।

শিশুদের আনন্দদানের জন্য প্রতি পরিবারের মায়েরা তাহাদের লইয়া অবসর সময়ে ইচ্ছা করিলে এই সমস্ত খেলনা প্রস্তুত করিতে পারেন। ইহাতে অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার হয়, পরিবারের শিশুদের উৎসাহ, আনন্দ ও শিক্ষার ব্যবস্থাও হইতে পারে।

এ সব খেলনার পরিচয় নীচের ছবির তালিকার প্রায় সবগুলি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে :—

১। পাউডারের টিন ও রিঠার বীচির প্রস্তুত পুতুল।

২। পুতুলের শোবার ঘরের আসবাব।

(সাবানের বাক্স, ঔষধের বাক্স ইত্যাদি দ্বারা শুইবার খাট আর পিচবোর্ডের দ্বারা আলমারী, টেবিল প্রভৃতি করা হইয়াছে।)

৩। ছিপির পুতুল (মুখটি ছিপির উপরে করা)।

৪। দেশলাইয়ের বাক্স হইতে পুতুলের 'ড্রয়িং রুম সেট', 'ডাইনিং রুম সেট' আর পুতুলের 'চেস্ট অব ড্রয়ার' করা হইয়াছে।

৫। তামাকের টিনটিকে ছুঁচ-সুতা ও Thimble রাখার কৌটা করা হইয়াছে। সেই টিনের ঢাকনাটিকে ছোট ট্রে করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ছিপির পুতুলও ছবিতে রহিয়াছে।

৬। রিল হইতে পুতুলের মোড়া, ঘুড়ির লাটাই আর 'আপিস-রুম সেট' প্রস্তুত করা হইয়াছে।

৭। নেকড়ার পুতুল।

৮। সিগারেটের বাক্স হইতে পুতুলের সুন্দর 'ড্রয়িং-রুম সেট', ট্রাক আর সিগারেটের বাক্সের (গোল্ড ফ্লেক) ভিতরের

দেশলাইয়ের বাক্স হইতে প্রস্তুত পুতুলের ড্রয়িং-রুম-সেট ইত্যাদি
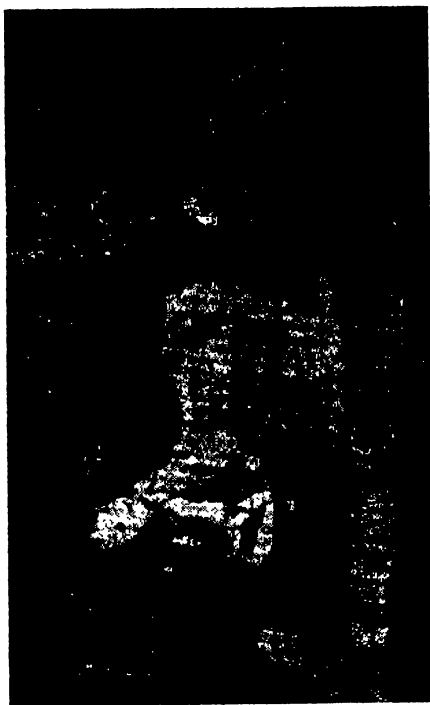
পুতুলের শোবার ঘরের আসবাব

পিচবোর্ডের পুতুল আর নৌকা

পাউডারের টিন ও রিঠার বিচির প্রস্তুত পুতুল

সুন্দর হলদে রঙের কাগজ দ্বারা পুতুলের বাড়ী প্রস্তুত করা হইয়াছে।

৯। নানাপ্রকার পুতুল।

১০। পিচবোর্ডের পুতুল আর নৌকা।

১১। পিচবোর্ডের জন্তু-জানোয়ার।

১২। নূতন কাপড়ের ছাঁট পুতুলের মাথায়, পায়ে, হাতে ভরা হইয়া থাকে। নূতন কাপড়ের বড় বড় টুকরা দ্বারা পুতুলের ফ্রক, টুপী ইত্যাদি প্রস্তুত করা থাকে। শাড়ীর সুন্দর সুন্দর পাড় দ্বারা পেনসিল, চিরুণী ও খুচরা পয়সা রাখার থলে প্রস্তুত করা হয়। ছেঁড়া শাড়ী আর ব্লাউসের শক্ত ভাগ দ্বারা পুতুলের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং ড্রয়িং-রুম, ডাইনিং-রুম-সেট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এই ভাবে অতি সামান্য সামান্য দ্রব্য হইতে শিশুদের চিত্তাকর্ষক খেলনা প্রস্তুত হইয়াছে।

ডি. এম.

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ভারত স্বাধীন হইয়াছে এ কথা অবশ্যই আপনারা অবগত আছেন—

নেহাত ভাগ্যলব্ধ এই স্বাধীনতার ফলে একদা অভিজাত বংশজাত এই অধম ব্রাহ্মণতনয় বর্ত্তমানে উদ্বাস্তু আশ্রয়প্রার্থী নামে পরিচিত হইয়া গৃহ-সম্বল-আশ্রয়হীন অবস্থায় রেল-ষ্টেশন হইতে বহু দূরে জমিদার-শাসিত তথাকথিত ছোটলোক-অধ্যুষিত কোন নামহীন পাড়াগাঁয়ের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে কালাতিপাত করিতেছি। দিন যায় রাত্রি আসে—শিক্ষকতা কার্য্যে বৈচিত্র্যও নাই—অশান্তিও নাই—নিত্য একই এ স্কয়ার মাইনাস বি স্কয়ার, মোগল বাদশাহের নামের তালিকা ও কগনেট অবজেক্ট ও জিরাণ্ড পার্টিসিপ্‌ল লইয়া দিন কাটে। অবসর সময়ে সংবাদ-পত্র চর্ব্বিত চর্ব্বণে ও পরম আলস্যে ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন দেখিয়া দিন যায়—ধর্ম্মঘট, প্রতিবাদ সভা, রাজনীতিক বিতণ্ডাহীন গ্রাম্য শান্ত পরিবেশে কর্ম্মহীন দিনগুলি অতি ধীরমন্থর গতিতে চলিয়া যায়।

অকস্মাৎ সেদিন একটা আলোড়ন উপস্থিত হইল।

শুক্রবার। জনৈক ছাত্র আসিয়া একখানি পত্র দিল—বিদ্যালয় সমিতির একজন সভ্য জানাইতেছেন, রবিবার বেলা দশটা হইতে এগারটার মধ্যে ডি. এম. বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবেন। বিদ্যালয়ের ভাঙ্গা ছাত্রাবাসের যদি একটা কোন গতি করা যায়। অতএব একটু কিছু সহ চায়ের বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবেন।

মন্থর স্বপ্নাচ্ছন্ন জীবনে হঠাৎ এক ঝলক প্রখর আলোকপাত হইয়াছে। ডি. এম. আসিবেন। ডি. এম. কে? অনেক ভাবিয়া বুঝিলাম ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট অর্থাৎ জেলাশাসক—শরীরে ও মনে একটা বৈদ্যুতিক শিহরণ বহিয়া গেল। বিদ্যালয়-সম্পাদক নাই, কি করা যায়?

বৃদ্ধ কেরানী বাবুকে ডাকিয়া কহিলাম—ডি. এম. আসছেন। একটু চা-র জোগাড় করা দরকার। কি করা যায় বলুন ত?

নিকটতম বাজার তিন মাইল। ষ্টেশন আট মাইল দূরে—কয়েক দিন ক্রমাগত বৃষ্টি হইয়া পথ কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে। কেরানীবাবু কহিলেন, এই অল্প সময়ে কি জোগাড় করা যায়? টাকাও ত নাই, মাসের ২৭শে। সে যাহোক, একটা ফর্দ্দ ধরা যাক্—

তিনি লিখিলেন :			
	কলা—	১ ডজন—	।/০
	আপেল	২টা	৸০
	ন্যাসপাতি	২টা	।৶০
	রসগোল্লা	/।০	১৲
	সন্দেশ	৮টি	১৲
	ভাল চা	সিকি পাঃ	১৲

চাকর গোপাল কহিল—আজ্ঞে হজরৎপুরের দোকানে আপেল ত দেখিনি, তবে আঙুর আছে।

কেরানীবাবু কহিলেন—বেশ আপেল না পেলে আঙুর আনবি।

সহকারী শিক্ষক একজন কহিলেন—ডি. এম. সাহেবেরা মিষ্টি-কিষ্টি পছন্দ করেন না, ফল, বিস্কুট, কেক—

—বিস্কুট, কেক এখন কোথায় পাওয়া যাবে?

—সেই ত কথা।

কেরানীবাবু কহিলেন—এতেই হবে। হয়ত খাবেনই না—যদি একখানা মুখে দেন।

আমি হেডমাষ্টার, অতএব বিজ্ঞের মত কহিলাম—দেবতারা ত খান না, কিন্তু অত যত্নে নৈবেদ্য ফলমূলাদি গুছিয়ে দেন কেন?

সহকারী শিক্ষক কহিলেন—দৃষ্টিভোগ, ওতেই দেবতার তুষ্টি।

তিনি হো হো করিয়া হাসিলেন। আমি কহিলাম—গোপাল, শোন্। কাল ভোরে উঠে চলে যাবি, হাটে বা পাস আনবি। আর ভনা ময়রাকে সন্দেশ রসগোল্লার বায়না দিবি—রসগোল্লা নয়

—রাজভোগ বুঝলি। ভাল হয় যেন—ডি. এম. আসছেন বলবি।

গোপাল সবিনয়ে কহিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপাততঃ ঐ রূপই স্থির হইল।

রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে সাইক্লোনের মত ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মনে মনে কি করিতে হইবে ভাবিতে লাগিলাম—বিদ্যালয় গৃহ, আপিস ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে—আপিসে বসিবার স্থান করিতে হইবে। ছাত্রাবাসের বালকগণকে পরিচ্ছন্ন থাকিতে বলিতে হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি—পাছে কোন কিছু ভুল হয় সেজন্য একখানা কাগজে কাজেরও একটা ফর্দ্দ করিয়া ফেলিলাম যথা :

সত্যবাবুর বাড়ী হইতে টেবিল ক্লথ—১
পার্ব্বতীবাবুর বাড়ী হইতে ফুলদানি—১।২
গাবুলবাবুর বাড়ি হইতে ছাইদানি—১
ঐ ... ভাল প্লেট—৩
বিরিঞ্চিবাবুর বাড়ী হইতে ভাল কাপ—৪, ঐ প্লেট—৪
ঐ ... চামচে—২

যদি পাওয়া যায়—টিপট, সুগার ও মিল্ক পট —

রাত্রি-নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে আর এক বার ভাবিয়া দেখিলাম কি প্রয়োজন? মনে হইল সবই হইয়াছে। গৃহিণীকে কহিলাম, হ্যাঁগা, রবিবার ডি. এম. সাহেব আসছেন সকালে একটু চা করে দিতে হবে। উনুনে ভাল আগুন রেখো যেন চট করে চা-টা হয়—

—কখন আসবে তার ঠিক কিছু নেই? উনুনে কয়লা ত দিতে হবে—আধঘণ্টা আগে খবর না পেলে আমি চা করে দিতে পারব না।

—বল কি ডি. এম. আসছেন।

—ডি. এম. ফি. এম. তোমাদের, আমার ত গুরুঠাকুর নয় যে সারা সকাল তিনটে উনুন জেলে বসে থাকব। ছেলেপুলে আছে, রান্না-খাওয়া ত লাগবে।

—কিন্তু আমি ত চাকুরী করি, এসব ত করতেই হবে। তাতে ধর হেডমাষ্টার যখন আর এ ডাঙ্গায় থেকে—

গৃহিণী সংবাদটাকে শুভ মনে করেন নাই; তাই বিরক্তির সঙ্গে কহিলেন, আমি ত কারও চাকুরী করি নে—

—তা বটে, তবে আমার চাকুরী রাখাটা ত দরকার—কালকে যেমন করে হোক্ চালিয়ে দাও—

—দাও বললে ত হয় না, তুমি ছেলে দুটোকে রাখ, করে দিচ্ছি—

যাক্ ও-সব বাগবিতণ্ডা পরে, এখন সব জোগাড় করতে পারলেই হয়।

শনিবার—

সম্পাদক ও কমিটির সভ্যগণ আসিলেন, তাঁহাদিগকে সংবাদ জানাইয়াছিলাম। তখনও ঝড় ও বৃষ্টি চলিতেছে। বর্ষণ প্রবল নহে, কিন্তু হাওয়া প্রবল।

সম্পাদক মহাশয় গম্ভীরভাবে কহিলেন, ভুল করেছেন মাষ্টার মশায়। রাণীগঞ্জ কি আসানসোল লোক পাঠান উচিত ছিল—হজরংপুরে কি ফল পাওয়া যায়—মিষ্টি অখাদ্য—

সভয়ে বলিলাম, এটা গ্রাম তা ত ডি. এম. জানেন, তার পর যেমন দুর্য্যোগ, টাকাও হাতে নেই।

যাহা হউক সময় নাই। যাহা জোগাড় করা যাইতে পারে তাহাই ভাল, তবে ডি. এম. আসিবেন তাঁহার উপযুক্ত অভ্যর্থনা হওয়া চাই ত?

বেলা প্রায় একটার সময় চাকর গোপাল আসিল। আমি কহিলাম, এত বেলা হ'ল কেন গোপাল—

গোপাল কহিল, বাবু হিংকোয় বান পড়েছে, যাবার সময় গামছা পরে গেলাম কিন্তু আসবার সময় জল এক গলা হয়ে গেছে তাই সঙ্গী ধরে আসতে হ'ল—

—কি কি পেলে—

—কলা, আসপাতি ছাড়া কিছু পাই নি—

কেরানীবাবু কহিলেন, সর্ব্বনাশ, আপেল আঙুর কিছুই পাওনি।

—আজ্ঞে না।

—কি উপায়?

আমি চিন্তিত হইলাম। কহিলাম, মিষ্টি ভাল করে তৈরি করতে বল গিয়ে আর ধর যদি খাঁটি ঘিয়ের সিঙ্গাড়া নিমকি হয়—

কেরানীবাবু কহিলেন, ও-সব ওরা খান না—

—যদি কেউ আসানসোল যায় তা হলে—

—এ দুর্য্যোগে কে যাবে? আর ট্রেন ছ'টায়, সে গেলেও কাল দশটায় ফিরতে পারবে না।

অতএব এই পর্য্যন্তই প্রস্তুতি হইল।

শনিবার ছুটায় ছুটি হইল।

গোপালকে কহিলাম, সমস্ত ভাল করে পরিষ্কার কর। আপিস, ক্লাস সব।

গোপাল কহিল, স্তর আমি খাই নি, দুটো খেয়ে আসি।

অত্যুৎসাহী সহকর্মী একজন কহিলেন, সকালে ডি. এম. আসছেন আর তুমি বলছ খাওয়া হয় নি। এক দিন নাই-বা খেলে।

আমি কহিলাম, না খেয়ে বেঞ্চি টানবে কি করে। যাও চট করে খেয়ে এসো।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গোপাল সব পরিষ্কার করিল, দাঁড়াইয়া থাকিয়া সব দেখাইয়া দিলাম।

রবিবার ঘুম হইতে উঠিয়া তেত্রিশ কোটি দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া কহিলাম, আজকার দিনটা কোনমতে পার করে দিও ভগবান।

প্রস্তুত হইয়া স্কুলে যাইব। কনিষ্ঠ-সন্তান দুইটি কি লইয়া চীৎকার করিতেছে, গৃহিণী সম্ভবতঃ কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়াছেন। আমি কহিলাম, আজ আর মারামারি-ধরাধরি কর না। উনুনে আঁচ রেখ গোপালকে দিয়ে খবর দিলেই, কলা, মিষ্টি দিয়ে খাবারটা গুছিয়ে, চা-টা পাঠিয়ে দিও।

গৃহিণী ঝঙ্কার দিলেন, মারবে না, শত্তুর শত্তর এসেছে সব। মারবো না কেন শুনি—আজ কি পূজোসভার দিন না কি শুনি? আর কেমন বলছ, গুছিয়ে দিয়ে চা-টা পাঠিয়ে দিও, কলে যেন সব তৈরী হচ্ছে—আমি আমার জ্বালায় মরে গেলাম।

পুনরায় কথা বলিলে উত্তেজনা বাড়িতে পারে অতএব দুর্গানাম স্মরণ করিয়া স্কুলে গেলাম। ছাত্র রাম ও মধুর সঙ্গে দেখা। বলিলাম, কি রে, টেবিল-ক্লথ, ভাস্ সব এনেছিস?

—হাঁ স্যর, গোপালকে দিলাম :

—টি-পট—

—ও স্যর, গ্রামে নেই।

— আচ্ছা থাক।

আপিস ঘরে একখানা টেবিল সাজাইয়া ডি. এম.-এর জন্য যখন প্রস্তুত হইলাম তখন ন'টা। ইস্কুলের বারান্দায় দাঁড়াইলে দূরের ডাকবাংলা দেখা যায়—এখানেই ডি. এম.-এর অবস্থিতি।

স্কুলের কর্তৃপক্ষ আসিলেন। একজন কহিলেন, এ কি করছেন মাষ্টার মশায়? এই ঘিঞ্জি ঘরে কি ডি. এম.কে বসান যায়? একটা ক্লাসরুম পরিষ্কার করে বড় টেবিলটা দিয়ে, চেয়ার সাজিয়ে দিতে হ'ত।

সকলেই কথাটা অনুমোদন করিলেন। আমি কহিলাম, কিন্তু সময় ত আর নেই।

—খুব আছে, এক ঘণ্টায় কত উত্থান-পতন হয়। গোপাল ক্লাস কাইভটার বেঞ্চি বের করে ফেল।

গোপাল কহিল, একলা কেমন করে।

—এই, এই রাম, বঙ্কিম ধর ত বেঞ্চি সব, কস করে ঘরটা তৈরি করে ফেল।

ছাত্রগণ ও গোপাল বেঞ্চি বাহির করিতে লাগিল। জনৈক-ছাত্র চীৎকার করিয়া উঠিল, 'হুই ডি. এম. এল হুঁই।' হাঁ, এক-খানা মোটর ডাকবাংলায় ঢুকিল।

—গোপাল তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি, হুস করে এসে পড়বে। সাহেব বড্ড পাংচুয়েল শুনেছি—জলদি।

মেঘমেদুর দিন। রৌদ্রও নাই, বৃষ্টিও নাই—গোপাল ও ছাত্র-গণ বেঞ্চি টানিয়া গলদঘর্ম্ম হইয়া গিয়াছে। বড় টেবিল টানিয়া আনিতে গোপালের পায়ে হোঁচা লাগিয়াছে। যাহা হউক, তথাপি দশটার মধ্যেই বসিবার গৃহ প্রস্তুত হইয়া গেল। ফুলদানিতে করবী-গুচ্ছ—সম্মুখে রূপার ছাইদানী। আর একজন কহিলেন, চেয়ারের ছিরি কি সব? যা দত্তবাড়ীর থেকে একটা কুশান চেয়ার নিয়ে আয়।

দুই জন ছাত্র ছুটিল কুশান চেয়ার আনিতে।

সবই প্রস্তুত। এখন ডি. এম. আসিলেই হয়—একবার বাসায় গিয়া বলিয়া আসা দরকার। অতএব বাসায় গিয়া কহিলাম, ডি. এম. এসে গেছেন ডাকবাংলায়। এই এলেন বলে—গ্লাসপাত্তিটা কেটে রাখ—কলা, মিষ্টি, আর চা'র জল তুলে রাখ।

গৃহিণী কটুকটাক্ষে চাহিয়া কহিলেন, মাসে মাসে চাঁদে চাঁদে সব গুরুঠাকুররা আসবেন আর মরবি মর এই আপখোরাকী বিনা মাইনের বান্দীটাই মর।

—আহা, রাগ করছ কেন? একদিন ত? ডি. এম. ত রোজ আসছেন না।

—ডি. এম., ডি. এম. আমার রথ উঠেছে না কি? যা পারি করব, না পারলে এসে করে নিয়ে যেও।

স্কুলে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

একদল ছাত্র জুটিয়াছে, তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিল—ঐ ঐ মোটর বেরিয়েছে—আমরা তৎপর হইয়া বারান্দায় আসিলাম। মোটরখানা অন্য রাস্তায় চলিয়া গেল।

কেহ বলিলেন, ইউনিয়ন বোর্ড দেখে আসবেন, কেহ বলিলেন, ওদিকে নতুন রাস্তা দেখতে গেলেন।

এগারটা, বারটা, সাড়ে-বারোটা বাজিল। মোটরগাড়ী ঘুরিয়া ডাকবাংলোয় গিয়াছে। প্রশ্ন করিলাম, আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব? খাওয়া-নাওয়া ত করতে হবে?

কর্তৃপক্ষের একজন কহিলেন, যা গোপাল, সাইকেলটা নিয়ে যা, শুনে আয় কখন আসবেন।

গোপাল শ্রমক্লান্ত, সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছে, সকাল হইতে না খাইয়া কাজ করিয়াছে, তথাপি চাকুরী ত! সাইকেলে উঠিয়া ছুটিল।

জনৈক ব্যক্তি কহিলেন, গোপাল ঘুরে আসতে দেরী এক ঘণ্টা। একটু চা খাওয়াতে পারেন মাষ্টার মশাই—বেলাও হ'ল।

আমি কহিলাম, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—গরীবের ঘরে যা আছে।

বাসায় আসিতেই গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন, কি আমার গুরুঠাকুর এলেন?

—না, আসেন নি। তবে ভদ্রলোকেরা একটু চা খেতে চাইছেন—পাঁচ কাপ।

গৃহিণী ঠক্ করিয়া কেৎলিটাকে উনুনে চাপাইয়া দিলেন এবং কহিলেন, চা কি আমি দিয়ে আসব?

—আমি নিয়ে যাবো'খন।

চা-পান শেষ হইবার পরে গোপাল ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, এখন সাহেব চান করে খাবেন তার পর ওবেলা আসবেন।

—কখন?

—তিনটা-চারটা।

—কে বললে?

—চাপড়াশী সাহেব বললেন।

খাইয়া অবিলম্বে ফিরিতে গোপালকে উপদেশ দিয়া এবং মোটরের শব্দ পাইলেই আমাকে সংবাদ দিতে বলিয়া খাইতে গেলাম। আহারাদি করিতে ছুটা বাজিল। একটু বিশ্রাম করিতে-ছিলাম।

মেয়েটা আসিয়া সংবাদ দিল, দারোগাবাবু ডাকছেন।

দারোগা? তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিলাম।

দারোগা নহে, ছোট দারোগাবাবু। তিনি জানাইলেন, এখন তিনটা ইউ. বি. প্রেসিডেন্টদের মিটিং হবে থানায় তারপর চারটা-সাড়ে চারটা নাগাদ এখানে আসছেন সাহেব—গ্রামের লোকদের মিটিং হবে। আপনি স্কুলে একটু ব্যবস্থা করে রাখুন, আমি গ্রামের লোক ডাকবার ব্যবস্থা করি।

—আজ্ঞে রাখছি, আপনি আসুন।

তাড়াতাড়ি স্কুলে গেলাম। গোপাল দেয়ালে হেলান দিয়া ঝিমাইতেছে—পায়ের শব্দে উঠিয়া কহিল, কি স্যর?

—এখানে মিটিং হবে দারোগাবাবু বললেন, নাইনের ঘরটা সাজিয়ে দাও। হোটেল থেকে শ্যামা আর সরোজকে ডেকে আন—বেঞ্চি ধরবে।

উঁচু ক্লাসের অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর ঘরটা প্রস্তুত হইতে লাগিল এবং দারোগাবাবুর আহ্বানে দেখিতে দেখিতে গ্রামস্থ ভদ্রমণ্ডলী বাক্সে তোলা জামা পরিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অর্দ্ধ উলঙ্গ বাগ্দী-বাউরীও কিছু আসিল, মদীয় ছাত্রগণও কেহ তামাশা দেখিতে, কেহ-বা কেবলমাত্র কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া উপস্থিত হইল।

ছোট দারোগাবাবু ব্যস্তসমস্ত হইয়া তদারক করিতে লাগিলেন।

চারটা-পাঁচটা-সাড়েপাঁচটা হইল—সন্ধ্যা সমাগত।

ডি. এম. সম্ভবতঃ আসিবেন না অনুমান করিয়া কেহ কেহ চলিয়া যাইতে চাহিলেন।

ছোট দারোগাবাবু কহিলেন, যাবেন না, যাবেন না, নিশ্চয়ই আসছেন সব। ডি. এম. সাহেব না আসুন, এস. পি. আসবেই—আচ্ছা আমি খবর নিচ্ছি।

—এস. পি.? আর কে আছেন?

—এস. পি., ডি. এম. আর সিভিল-সার্জ্জন আছেন।

—সর্ব্বনাশ!

সম্পাদক মহাশয়ের কাছে ছুটিলাম। প্রশ্ন, সামান্ত জল, সামান্ত মিষ্টি এখন কি করা যায়?

—শীগ্‌গির গোপালকে পাঠান সাইকেলে—ভনার দোকান থেকে এক সের রাজভোগ এনে রাখুক। তিন জনের ত? তা ছাড়া দারোগা সেপাই—এক সেরই আনতে বলুন।

গোপাল ছুটিল বালতি ও সাইকেল লইয়া।

সংবাদ আসিল—ইউ. বি. প্রেসিডেন্ট মিটিং প্রায় শেষ, এখখুনি আসবেন ওরা।

আমি কহিলাম, সন্ধ্যা আগতপ্রায়, মিটিং করতে হলে আলো চাই, একটা হ্যাজাগ, সকলে কহিলেন, একটা হ্যাজাগ, হ্যাজাগ চাই।

গোপালকে সামনে পাইয়া প্রশ্ন করিলাম, রাজভোগ এনেছিস?

—হ্যাঁ, বাসায় দিয়ে এলাম।

—বেশ।

কর্ত্তৃপক্ষের একজন কহিলেন, গোপাল, শীগগির শীগগির চট করে ক্ষীরোদবাবুর হ্যাজাগটা তেল ভরে ধরিয়ে নিয়ে আসবি বুঝলি—

গোপাল আবার ছুটিল—কেরোসিনের ও ম্যান্টেলের পয়সা লইয়া।

সম্পাদক মহাশয় কহিলেন, দারোগাবাবুরা দুপুর থেকে এসে খাটা-খাটনি করছেন একটু চা দিন—ডি. এম. এলে ত আর হবে না।

আমি কহিলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ।

সভয়ে বাসায় আসিলাম, এই সময়েই অবোধ শিশুপুত্রেরা গোলমাল করে এবং গৃহিণীর মাথাটা অপেক্ষাকৃত উষ্ণ থাকে। যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিলাম, ছ' কাপ চা চাই এখনও দারোগাবাবুরা সব চা খান নি।

—পারব না, দোকান নাকি?

—ভদ্রতা ত একটা আছে?

—কর গিয়ে ভদ্রতা, আমি কারও চাকুরী করি নে, আমার গুরু-ঠাকুরও কেউ নন। ছেলে দুটো কেঁদে ককিয়ে গেল, সকাল থেকে ধুনি জেলে বসে আছি, দুধ দেবার সময় নেই।

—তুমি জরুরী সময়ে কেবল।

—পারব না কি করবে।

ক্লান্তি বশতঃ উত্তেজিত হইয়াছিলাম তাই বলিলাম, এ বাবা, ঘরে ডি. এম. বাইরে ডি. এম.—আমি যাই কোথায়, হায় ভগবান! পার ত দিও পাঠিয়ে।

যাহা হউক, চা পান হইল। হ্যাজাগ জ্বলিল, কিন্তু গ্রামের লোক এক পায়ে দুই পায়ে সরিয়া গেল। ছোটবাবু কহিলেন, এই ক'জন লোক দেখলে যে আমার চাকরী থাকবে না।

—তাই ত!

যাহা হউক, সংবাদ আসিল—ডি. এম. রাত্রি হওয়ায় আজ আর আসিবেন না।

—অতএব আসুন দারোগাবাবু মিষ্টিগুলোর সদ্ব্যবহার করা যাক।

গোপাল বাসা হইতে মিষ্টি আনিল। চা সহযোগে তাহাদের সদ্ব্যবহার হইল! উঠিতে উঠিতে কহিলেন, ডি. এম. এলেন না, এলে কাজ হ'ত!

যাইবার পূর্ব্বে সম্পাদক-মহাশয় কহিলেন, শেষের এক সের রসগোল্লা ছেলেপুলেকে খেতে দেবেন এবং একটু হাসিয়া কহিলেন, দামটাও ভনাকে দিয়ে দেবেন।

—আজ্ঞে রসগোল্লা ত কিনে খাই নে কোনদিন, মাসের ২৭শে আজ।

—ছেলেপুলেকে মাঝে মাঝে দিতে হয়।

রসিকতার ফাঁকে হাসিয়া প্রস্থান করিলেন। আমার দুইটি টাকা গেল।

এখন ঘরে তালা দিয়া জিনিষপত্র গোছাইয়া যাইতে হইবে। রাত্রি সাড়ে সাতটা। ডাকিলাম—গোপাল।

সাড়া নাই। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি গোপাল বইয়ের আলমারি ঠেস দিয়া ঘুমাইতেছে। গায়ে ধাক্কা দিয়া ডাকিলাম, গোপাল।

গোপাল তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, সার ডি. এম?

—ডি. এম. আসবেন না আজ।

—আসবেন না! গোপাল হয়ত ভাবিয়াছে তাহার অপরাধেই ডি. এম. আসেন নাই তাই বলিলাম, চল গোপাল, ঘরে তালা দিয়ে চল।

গোপাল ঘরে তালা দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। কহিলাম—চল গোপাল স্বাধীন ভারতের আমি হেডমাষ্টার আর তুমি চাকর, দুটো রসগোল্লা খেয়ে একটু জল খাই চল, তারপর বাড়ী যাবে।

গোপাল বিনয়ে অবনত হইয়া কহিল, থাক স্যর দরকার কি?

—না গোপাল, আমার পয়সায় কেনা রসগোল্লা, চল।

আমূল সংশোধন আবশ্যক

শ্রীবিনোবা ভাবে

অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

পরিকল্পনা-সমিতি এক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈয়ারি করিয়াছেন। ইতিমধ্যে পাঁচ বৎসরের অর্ধেক সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, বেকার সংখ্যা বাড়িতেছে।

কোন লোক দিল্লী অভিমুখে যাইতেছিল। দিল্লী ছিল তাহার গন্তব্য। কয়েক দিন চলার পরে তাহার মনে হইল সে বোম্বাইয়ের দিকে চলিতেছে। কেন এইরূপ হইল? দিল্লীর পথে চলিয়াছিল বটে, কিন্তু দিল্লীর দিকে মুখ করিয়া চলার পরিবর্তে দিল্লীর দিকে পিঠ রাখিয়া চলিয়াছিল।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বেকার বাড়ানোর জন্য ত তৈয়ারি করা হয় নাই। তবে বেকার বৃদ্ধি পাইল কি ভাবে? এ-কথার জবাবে কেহ কেহ বলেন, তার হেতু হইতেছে লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি। কিন্তু লোকসংখ্যা যে বাড়িবে তাহা ত অপ্রত্যাশিত ছিল না। তবে এই উত্তর কি প্রকারে সন্তোষজনক হইতে পারে?

পল্লীশিল্পের দুর্দশা

রাজাজী হাঁকিয়া বলিতেছেন—তাঁতিদের বাঁচাও। ইহারা বলেন, মিল বাঁচাইয়া আমরা যাহা কিছু করিতে পারি করিব। স্বাধীনতা লাভের পাঁচ-সাত বৎসরে তৈলঘানি শেষ হইতে বসিয়াছে। এক মধ্যপ্রদেশের বরোবা তহশিলেই পঞ্চাশটি ঘানি সম্প্রতি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এই খবর আমি পাইয়াছি। রাধাকৃষ্ণ পাতিল এই তালুকের অধিবাসী। পাতিল হতাশ ভাবে বলিতেছিলেন, "ইহার প্রতিকার কি? পল্লীশিল্প ক্ষমতা বিনা কিরূপে বাঁচিবে?"

মিল কাপড়ের উপর সম্প্রতি টাকাপ্রতি পুরা এক পয়সা কর ধার্য করা হইয়াছে। ঐ এক পয়সার সহায়তায় খাদিকেও নিজ পায়ে দাঁড়াইতে হইবে আর মিলের সুতা-বয়নকারী তাঁতিদেরও জীবন নির্বাহ করিতে হইবে। ঐ এক পয়সার মাকড়সা-জালে খাদিকর্মীরা পর্যন্ত জড়াইয়া গিয়াছেন!

বেকার বাড়িয়া গিয়াছে, ইহা আদৌ অপ্রত্যাশিত নহে। আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী, গণিতের হিসাব অনুসারেই তাহা বাড়িয়াছে। জনৈক আদিবাসী সেবক আসাম অঞ্চলের আদিবাসীদের অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ঐ অঞ্চলের মণিপুর ইত্যাদি আদিবাসী-অধ্যুষিত রাজ্যে হাতে-কাটা সুতার কাজ খুব চলিত। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরে এখন তাহা লোপ পাইতেছে। যেদিন হইতে রাজ্য বিলীন হইয়াছে সেদিন হইতে পল্লীশিল্পও যন্ত্রশিল্পে বিলীন হইতেছে!

গৃহীত কৃত্য: সবাইকে কাজ

পরিকল্পকদের সহিত আমার কথা হইয়াছিল। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলাম, "সকলকে পুরা কাজ দেওয়ার দায়িত্ব পরিকল্পনায় স্বীকার করা চাই।" তদুত্তরে তাঁহারা বলেন, "এরূপ দায়িত্ব আমরা যদি স্বীকার করিতে পারিতাম ত ভাল হইত, কিন্তু তাহা সম্ভব মনে হয় না।" তাঁহাদের আমি বলি, "দেশের সকল লোককে কাজ দেওয়া যাইতে পারে, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার ইহা 'গৃহীত কৃত্য'।" 'গৃহীত কৃত্য' আলোচনার বিষয় হইতে পারে না। উহা মানিয়া লইয়া উহার ভিত্তিতে পরিকল্পনা রচনা করিতে হয়।

সকলকে কাজ দিতে হইবে এই 'গৃহীত কৃত্য' স্বীকার করিয়া লউন, তখন কিরূপ যন্ত্র ব্যবহার করা হইবে তাহা আপনা হইতেই অবিলম্বে পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

সমতা বনাম ক্ষমতা !

আমরা 'সমতা'র কথা বলিয়া থাকি। সমতার বিরুদ্ধে বিষমতার নাম কেহ করিতে পারে না। তাই 'সমতা'র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ইঁহারা নূতন শব্দ খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন—'ক্ষমতা'। গুণের বিরুদ্ধে গুণ দাঁড় করাও ইহা হইতেছে পুঁজিবাদের যুক্তি। আমি বলি 'ক্ষমতা' আমরাও চাই। কিন্তু যেভাবেই হোক আগে সকলকে খাইতে দিবে ত, না—খাইতে দিবে না ? আগে ত খাইতে দিন, পরে 'ক্ষমতা' বাড়ান। আগে জোয়ারের রুটিই দিন। তারপরে সুযোগ-সুবিধা মত মালপোয়া দিবেন। যে হাতিয়ার হাতে আছে, তাহা ব্যবহার করিয়া বেকার-সমস্যা দূর করুন, আর হাতিয়ারে যে সংশোধন করা দরকার তাহা ধীরে ধীরে করুন।

যন্ত্রের ক্ষেত্র

কেহ কেহ বলেন, যন্ত্রীকরণ ছাড়া উপায় নাই। তার মানে, ইহা তাহাদের 'গৃহীত কৃত্য'। আমি বলি, পল্লীশিল্প বিনাশের জন্য যন্ত্রীকরণ কেন করিতেছেন ? বিদেশ হইতে যেসব মাল শহরে আসিয়া দেশ ভাসাইতেছে তাহা বন্ধ করার জন্য যন্ত্রীকরণের জোর ব্যবস্থা করুন না ! শহরবাসীর বুদ্ধি গ্রামের কাঁচামাল পাকামাল করিয়া গ্রামেই তাহা সস্তা দামে বিক্রয় করার কাজে খরচ হইতেছে আর ওদিকে বিদেশী মাল অবাধে শহর ছাইয়া ফেলিতেছে। তার পরিবর্তে গ্রামের ক্ষেত্র আলাদা করিয়া রাখুন আর আপনাদের যে ক্ষেত্র বিদেশী মাল দখল করিয়া বসিয়াছে তাহা নিজ হাতে আমুন, নচেৎ কাল যদি গ্রামবাসীরা শহরবাসীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তবে বিদেশী ব্যাপারী ও পল্লীর মজুর এই উভয়ের মার শহরের উপর পড়িবে ও শহর চূর্ণ হইয়া যাইবে।

আমূল পরিবর্তন চাই

আগ্রায় অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির বৈঠক হইয়া গিয়াছে। উহাতে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে আমি ইহা লিখিতেছি। কংগ্রেস কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা নিবারণের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সংশোধন করা একান্ত প্রয়োজন। প্রস্তাব ভাল, কিন্তু আংশিক সংস্কারকামী সংশোধন কোন কাজের নয়। আমি মনে করি, মূল পরিকল্পনারই সংশোধন করা আবশ্যক।

'সর্বোদয়' হইতে

জীবন-অরণ্য

শ্রীশান্তশীল দাশ

জীবন-অরণ্য মাঝে ঘুরি ফিরি : গভীর আঁধার :
বার বার একই পথ করি অতিক্রম।
ঘন কুজ্‌ঝটিকা ঘেরা সে পথের বাহিরে আসার
মেলে না নিশানা কোনো, ব্যর্থ পরিশ্রম।
তবু চলি সেই পথে—মনে জাগে দুরন্ত দুরাশা :
শেষ হবে একদিন আরণ্য-জীবন ,
অন্তরেতে আছে মোর যে আলোর সুতীব্র পিপাসা,
অরণ্যের প্রান্তে তার হবে নিরসন !

আলোকের স্বপ্ন দেখি : পরিক্রমা আঁধারের মাঝে,
নৈঃশব্দ্যের মাঝে শুনি অশ্রান্ত বিলাপ ;
ঝিল্লির অক্লান্ত সুর একটানা কানে এসে বাজে,
ভোগ করি জীবনের ক্রূর অভিশাপ।
মন ছুটে চলে যায় জীবন-অরণ্য ভেদ করে,
পুঞ্জীভূত অন্ধকার হয়ে আসে ম্লান :
স্বপ্ন মোর দেখা দেবে একদিন সত্যরূপ ধরে,
সে দিনের আজিও তো পাই নি সন্ধান।

স্বাধীনতার সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে দাঁড়িয়ে দু' বাহু বাড়িয়ে মানুষকে নর-দেবতা বলে প্রণাম করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। গান্ধীজীর মতই তিনি বিশ্বাস করতেন, সকলের অধম যে মানুষ, দীনের থেকেও যে দীন তারও জীবনের এমন একটি মূল্য আছে যার কোন পরিমাণ হয় না। পরমপুরুষ প্রতিটি মানুষকে এমন আলাদা আলাদা করে যে তৈরি করলেন—সে তো নেহাৎ খেয়ালের বশে নয়। একজন মানুষকে দিয়ে তাঁর যে-উদ্দেশ্য সফল হতে পারে আর একজন মানুষকে দিয়ে কখনও তা হবার নয়। প্রতি মানুষের সঙ্গে প্রতি মানুষের যে একটি স্বাতন্ত্র্য আছে, এই স্বাতন্ত্র্য এসেছে স্রষ্টারই ইচ্ছা থেকে। এর মূল্য অসীম, এর পবিত্রতা অনির্ব্বচনীয়। যে মূর্খ বলে, আমি নইলে দুনিয়ার চাকা অচল হয়ে যাবে তার দুর্ব্বিনীত ঔদ্ধত্য মার্জ্জনীয়। কিন্তু যে ক্লীব বলে, আমি অপদার্থ—আমার জীবনের কোনই সার্থকতা নেই তার আত্ম-অবিশ্বাসের সত্যসত্যই মার্জ্জনা নেই।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন প্রতিটি মানুষের জীবনের অপরিমেয় মূল্যে, অপার্থিব সুষমায়, অনির্ব্বচনীয় মহিমায়। আমাকে তাঁর প্রয়োজন আছে বলেই আমার সৃষ্টি, তোমাকে তাঁর প্রয়োজন আছে বলে তোমারও সৃষ্টি, দুনিয়ায় যে যেখানে আছে সকলেরই কোন-না-কোন সার্থকতা আছে বলেই তাদের সৃষ্টি। আমাদের সৃষ্টি করে তিনি আমাদের জীবনের মূল্যকেই স্বীকার করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিমা নিয়েই রবীন্দ্রনাথ 'নৈবেদ্যে' লিখেছেন :

> আমারে সৃজন করি' যে মহাসম্মান
> দিয়েছ আপন হস্তে, রহিতে পরাণ
> তার অপমান যেন সহ্য নাহি করি।

এই দৃষ্টিভঙ্গিমা নিয়েই মার্কিন কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান লিখলেন :

> I swear I begin to see the meaning of these things,
> It is not the earth, it is not America who is so great,
> It is I who am great or to be great, it is you up
> there, or any one,
> It is to walk rapidly through civilisations, governments, theories,
> Through poems, pageants, shows, to form individuals.

হুইটম্যান ঘোষণা করলেন রবীন্দ্রনাথের মতই তাঁর রুদ্রবীণায় :

> দেখতে পাচ্ছি এখন এসবের তাৎপর্য্য..
> পৃথিবীর গৌরব কি এতই বেশী ? আমেরিকার গরিমা কি এতই বিপুল ?
> আমি হচ্ছি বড়, বড় আমাকেই হতে হবে, তুমি হচ্ছ বড়,
> বড় নয় কে ?
> সভ্যতা বলি, গবর্ণমেণ্ট বলি, মতবাদ বলি,
> সাহিত্য, শোভাযাত্রা, প্রদর্শনী—সবকিছুই গৌণ, মুখ্য হ'ল মানুষ তৈরী করা।

হুইটম্যান বললেন :

The whole theory of the universe is directed unerringly to one single individual—namely to You.

আমি যে স্রষ্টার ক্ষণিকের খেয়ালের বশে তৈরি হই নি, আমার একটা অসীম সার্থকতা আছে বলেই আমি তৈরি হয়েছি—এ ভাবটাই অপরূপ মহিমায় প্রকাশ পেল যখন রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

> আমায় দেখবে বলে তোমার অসীম কৌতূহল,
> নইলে ত এই সূর্য্যতারা সকলি নিষ্ফল। (বলাকা)

ঠিক এই কথাটাই আর এক ভঙ্গিমায় প্রকাশ পেয়েছে 'গীতালি'তে—

> থাক্‌না তোমার লক্ষ গ্রহ তারা,
> তাদের মাঝে আছ আমার-হারা।
> সইবে না সে, সইবে না সে,
> টান্‌তে আমায় হবে পাশে
> একলা তুমি, আমি একলা হ'লে।

তাঁর স্বর্গ যে আমাকেই রচনা করতে হবে। তাই তো মানুষ করে তৈরি করলেন আমাকে :

> দিয়েচ আমার 'পরে ভার
> তোমার স্বর্গটি রচিবার।

আর সকলকেই তিনি দিয়েছেন। তার বেশী তারা দান করে না। আমার কাছ থেকেই কেবল তিনি দাবি করেছেন।

> পাখীরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান,
> তার বেশী করে না সে দান।
> আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশী করি দান,
> আমি গাই গান।

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই 'বলাকা'র লেখা হয়েছে :

> আর সকলেরে তুমি দাও।
> শুধু মোর কাছে তুমি চাও।

যেহেতু তাঁর স্বর্গটি রচনা করবার ভার দিয়ে তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন এই পৃথিবীতে সেই হেতু 'ফাল্গুনী'র কবিশেখরের ভাষায় বাঁচার মত করেই বাঁচতে হবে। যাতে বাঁচতে পারি মুক্ত হয়ে, পূর্ণ হয়ে, আস্ত মানুষ হয়ে তারই জন্ত আমি স্রষ্টার কাছ থেকে নিয়ে এসেছি অধিকার—ভদ্রভাবে জীবনযাপনের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, নিজের মতকে ভাষায় ব্যক্ত করবার অধিকার, আরও নানা অধিকার। এই অধিকারকে ক্ষুণ্ণ হতে দিলে জীবন হয়ে থাকে অবগুণ্ঠিত, আত্মপ্রকাশ আর সম্ভব হয় না। যুগ যুগ ধরে

মানুষ স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম করেছে—সে তো স্বেচ্ছাচারী হবে বলে নয়, জীবনকে সার্থক করবে বলে। তাই তো 'নৈবেদ্যে' রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

তুমি মোরে অর্পিয়াছ যত অধিকার,
ক্ষুণ্ণ না করিয়া কভু কণামাত্র তার
সম্পূর্ণ সঁপিয়া দিব তোমার চরণে
অকুণ্ঠিত রাখি' তারে বিপদে মরণে,
জীবন সার্থক হবে তবে !

কেন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করব ? অধিকার রক্ষায় দৃঢ় পণ হব ? রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

তুমি যা দিয়েছ মোরে অধিকার ভার
তাহা কেড়ে নিতে দিলে অমান্য তোমার !

স্বাধীনতার উপরে কারও হস্তক্ষেপ যদি সহ্য করি, অধিকার যদি কাউকে কেড়ে নিতে দিই তবে আত্মপ্রকাশ সম্ভব হবে না, বাঁচার মত বাঁচতে পারব না, আর জীবন যদি পূর্ণ না হয়, শুদ্ধ না হয়, মুক্ত না হয় তবে যে দায়িত্ব দিয়ে তিনি আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সেই স্বর্গ রচনার কাজটি কেমন করে সফল হবে ?

আমাকে প্রয়োজন আছে স্রষ্টার, আমাকে দিয়ে তিনি রচনা করতে চান তাঁর স্বর্গ—এই তত্ত্বটি স্বীকার করে নিলে একথাও সত্য হয়ে দাঁড়ায় যে, আত্মপ্রকাশই আমাদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর বন্ধন মোচনের দ্বারা আত্মপ্রকাশই কি আমাদের মর্ম্মের গভীরতম কামনা নয় ? কেউ যদি আমার ব্যক্তিত্বকে দাবিয়ে রেখে, আমার আত্মপ্রকাশের পথকে বিঘ্নসঙ্কুল করে আমাকে ব্যবহার করতে চায় তার নিজের উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য—সে আমার বেঁচে থাকবার অধিকারকেই অস্বীকার করে। আর যে আমার বেঁচে থাকার অধিকারকে অস্বীকার করে সে তো দেবতার বিরুদ্ধেই অপরাধ করে। দেবতার কাজ করবার জন্যই যার সৃষ্টি তাকে স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করবার ঔদ্ধত্য যে প্রকাশ করে সে আসলে দেবদ্রোহী আর দেবদ্রোহীকে কখনও ক্ষমা করা উচিত নয়। এই বিরাট তত্ত্বটি ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে তবেই বুঝতে পারব কেন রবীন্দ্রনাথ নৈবেদ্যে লিখেছিলেন :

মোর মনুষ্যত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা,
আত্মার মহত্বে মম তোমারই মহিমা
মহেশ্বর ! সেথায় যে পদক্ষেপ করে,
অবমান বহি' আনে অবজ্ঞার ভরে
হোক না সে মহারাজ বিশ্বমহীতলে
তারে যেন দণ্ড দিই দেবদ্রোহী বলে'
সর্ব্ব শক্তি লয়ে মোর ! যাক আর সব
আপন গৌরবে রাখি তোমার গৌরব !

মনে পড়ে বার্ণার্ড শ'য়ের কথা :

Now to treat a person as a means instead of an end is to deny that person's right to live.

মানুষের অধিকারে যিনি এমন গভীর ভাবে বিশ্বাস করতেন, মানবিকতা-অধিকারের হানিতে কখনও তিনি বিপদের ভয়ে নীরব থাকেন নি, নিষ্ক্রিয় থাকেন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন Love thy neighbour as thyself—এই মহাজন বাক্যে। প্রতিবেশী যদি মানুষের অধিকারে বঞ্চিত হয়ে থাকে—ক্ষতি কি একা শুধু তারই ?

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে।
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।

আমাদের পরস্পরের জীবন যে একই সূত্রে গাঁথা। প্রতিবেশী যদি শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয় আমারও কল্যাণ তার দ্বারা ব্যাহত হবে।

অজ্ঞানের অন্ধকারে
আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।

সুতরাং আত্মসম্মান যদি অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই তবে পড়শীর সম্মান যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সে দিকেও অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে। শুধু ভালবাসার ভিতর দিয়েই স্বাধীনতার সমস্যার সমাধান হতে পারে, যারা পরস্পরকে ভালবাসে দুনিয়ায় অপরাজেয় থাকা কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব। মার্কিন কবির ভাষায়—

Be not dishearten'd, affection shall solve the problems of freedom yet.

তাই ত দেখতে পাই যেখানে যেখানে মানুষের স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ করবার চেষ্টা হয়েছে সেখানে সেখানে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে কবির কণ্ঠ জলদনির্ঘোষে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। ডায়ার এবং ও'ডায়ার—মানব-শত্রুর এই দুই অনুচরে মিলে পঞ্জাবে যখন অত্যাচারের তাণ্ডব নৃত্য চালিয়ে ছিল তখন সেই অত্যাচারের প্রতিবাদে ভারতের যিনি প্রথম উপাধি বর্জ্জন করে অসহযোগের পথ দেখিয়েছিলেন—তিনি রবীন্দ্রনাথ। কার্জ্জনী ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে বাংলা যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তখনও বিদ্রোহী স্বদেশাত্মার বাণীমূর্ত্তি আমরা দেখেছিলাম রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। সেদিনের ঝড়ের রাতে রবীন্দ্রনাথের রুদ্র বীণায় আগুনভরা সুর বিপ্লবীদের অগ্রগতির পথে যুগিয়েছিল প্রেরণা, উৎপীড়িতদের হৃদয়ে তুলেছিল আশার তরঙ্গ, উৎপীড়কদের চিত্তে জাগিয়েছিল আসন্ন সর্ব্বনাশের বিভীষিকা।

মহাচীনের উপরে জাপানী আক্রমণের বর্ব্বরতা রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে কি রকম ক্ষুব্ধ করেছিল তার প্রমাণ কবির সেদিনের রচনাবলীর মধ্যে স্থায়ী হয়ে আছে। জাপানী কবি নোগুচির সঙ্গে এই নিয়ে ভারতীয় কবির যে মতবিরোধ ঘটেছিল তার কথাও আজ ইতিহাসের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কবির সেদিনের ঐতিহাসিক পত্রাবলীর মধ্যে আমরা আবিষ্কার করি একটা বিরাট প্রাণকে—চীনের কান্নায় তাঁর প্রাণ উঠেছে দুলে আর সেই বিক্ষুব্ধ চিত্ত লেখনীর মুখে আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গীরণ করেছে।

'মুক্তধারা' নাটকে রাজা রণজিৎ ক্ষুধার্ত প্রজাদের মতামতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে চান। অন্ন বিনে তারা তখন মরণের মুখে। রাজাকে খাজনা দিতে গেলে তাদের ক্ষুধার অন্ন দিয়ে দিতে হয় আর ক্ষুধার অন্ন দিলে জোরের সঙ্গে বাঁচা চলবে না। মানুষের বাঁচার অধিকারের উপরে রাজার এই উদ্ধত পদক্ষেপ রবীন্দ্রনাথ সহ্য করেন নি। নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীকে খাড়া করে তার মুখ দিয়ে তিনি রাজাকে বলিয়েছেন :

'আমার উদ্বৃত্ত অন্ন তোমার, ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।'

রণজিৎ জিজ্ঞাসা করলেন :

খাজনা দেবে কিনা বল।

দৃপ্ত কণ্ঠে বৈরাগী উত্তর দিল,

না, মহারাজ, দেব না।

উৎপীড়িতেরা ভয়ে উৎপীড়কের হুকুম তামিল করে বলেই ত পৃথিবীতে অত্যাচারের আজও অবসান হ'ল না।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন :

তুমিই প্রজাদের বারণ কর খাজনা দিতে ?

বৈরাগী শান্ত স্বরে আবার জবাব দিল :

ওরা ত ভয়ে দিয়ে ফেলতে চায়, আমি বারণ করে বলি, প্রাণ দিবি তাঁকেই প্রাণ দিয়েছেন যিনি। ভয় মানে মূল্যবান বলে যা মনে করি তাকে হারানোর ভয়, সম্পত্তি এবং পৈতৃক প্রাণ হারানোর ভয়, বেতের ভয়। বিদ্রোহ করলে রাজশক্তি বেত মারবে, মারলে লাগবে আর লাগার অভিজ্ঞতা দুঃখের। দুঃখকে আমরা সর্বপ্রযত্নে এড়াতে চাই। আর মারকে আমরা ভয় করি বলেই অত্যাচারীকে কুর্নিশ দিই এবং অত্যাচারীকে কুর্নিশ দিই বলেই তার আকাশস্পর্শী স্পর্দ্ধা।

কিন্তু লাগছে না বলা যে শক্ত। প্রজারা এই জবাবই দিয়েছে ধনঞ্জয় বৈরাগীকে। জবাবের উত্তরে বৈরাগী যা বলেছে তা মনে রাখবার মত কথা :

আসল মানুষটি যে, তার লাগে না, সে যে আলোর শিখা। লাগে জন্তুটার, সে যে মাংস, মার খেয়ে কেঁই কেঁই করে' মরে।

বৈরাগীর কণ্ঠে এই যে বাণী—এই বাণীর মধ্যেই রয়েছে ভয়কে জয় করবার রহস্য। আমাদের যা সত্য পরিচয় তার পরিমাপ তো মাংসপিণ্ড দিয়ে হবার নয়। শরীর আমার কিন্তু আমি তো শরীর নই। মানুষের ভিতরে আর একটা যে সূক্ষ্ম মানুষ রয়েছে—সেই মানুষটাই হ'ল আসল মানুষ। সে আত্মা, তার লাগে না। ধনঞ্জয় বৈরাগী রাজশক্তির বিরুদ্ধে এই আত্মার শক্তিকে ব্যবহার করবার অগ্নিমন্ত্র দিয়েছেন প্রজাদের কানে। শরীর থেকে আত্মা পৃথক ; শরীর নশ্বর, আত্মা অবিনশ্বর—এই শাশ্বত সত্যকে স্বীকার করতে পারলে তবেই আত্মার শক্তিকে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা সম্ভব। সত্যাগ্রহের মধ্যে আত্মার এই অপরাজেয় শক্তির প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে যাঁদের নায়ক-নায়িকা করে তৈরি করেছেন তারা কেবল ভাল মানুষ নয়, তারা শক্ত মানুষও। তারা শুধু হৃদয়বান লোক নয়, তাদের জীবনের হালে রয়েছে জ্ঞান। ধনঞ্জয় বৈরাগী একদিকে যেমন প্রজাদের কান্নায় কেঁদেছে, আর একদিকে তাদের কানে সত্যাগ্রহের মন্ত্র দিয়ে মুক্তির পথও তাদের দেখিয়ে দিয়েছে।

নারীজীবনের মর্যাদায় পুরুষের অসহ্য পদক্ষেপের বিরুদ্ধেও রবীন্দ্র-সাহিত্যে ধ্বনিত হয়েছে বিদ্রোহের সুর। যোগাযোগ উপন্যাসে অযোগ্য মধুসূদনের হাতে কুমুর লাঞ্ছনার অন্ত নেই। স্বামীর সেই লাঞ্ছনাকে শিরোধার্য্য করে কুমুর শ্বশুরবাড়ীতে বাস করাই কর্ত্তব্য কিনা—মোতির মার এই প্রশ্নের উত্তরে বিপ্রদাস যা বলেছেন বাংলা-সাহিত্যে তা বহন করে এনেছে লড়াইয়ের হাওয়া। বিপ্রদাস জবাব দিয়েছেন :

"স্থিতি কোথায় ? অসম্মানের মধ্যে ? আমি তোমাকে ব'লে দিচ্ছি কুমুকে যিনি গড়েছেন তিনি আগাগোড়া পরম শ্রদ্ধা করে গড়েছেন। কুমুকে অবজ্ঞা করে এমন যোগ্যতা কারও নেই, চক্রবর্ত্তী সম্রাটেরও না।"

মোতির মা জবাব শুনে নিরুত্তর। স্বামীর আশ্রয়ে বিঘ্ন ঘটলে মেয়েদের পক্ষের লোকেরাই তো পায়ে ধরাধরি করে, এ যে উল্টো কথা। কিন্তু মানুষের মধ্যে যাঁরা পথিকৃৎ তাঁরা তো পুঁথির ছেঁদো কথা বলেন নি, তাঁরা উল্টো কথাই বলেছেন। 'ফাল্গুনী'তে নবযৌবনের দল গান ধরেছে :

> দেশে দেশে নিন্দে রটে,
> পদে পদে বিপদ ঘটে,
> পুঁথির কথা কইনে মোরা
> উল্টো কথাই কই।

রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে উল্টো কথাই শুনিয়েছেন। যতসব ইচ্ছাকৃত অন্ধ দাসত্বকে বড় নাম দিয়ে মানুষ দীর্ঘকাল পোষণ করেছে, তারি বাসা ভাঙবার দিন এল। বিপ্রদাস 'যোগাযোগে' কুমুর মাথায় হাত দিয়ে বলেছে :

তুই তো ইংরেজী সাহিত্য কিছু কিছু পড়েছিস, বুঝতে পারিস নে, এই রকম যত দল-গড়া শাস্ত্র-গড়া নির্বিকার ক্ষমতার বিরুদ্ধে সমস্ত জগতে আজ লড়াইয়ের হাওয়া উঠেছে।

পাতিব্রত্য ধর্ম্মের নামে কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়ে পতি চেয়েছে পত্নীকে খেলাঘরের পুতুল করে রাখতে। Doll's House নাটকে ইবসেন পুতুলের এই খেলাঘর ভেঙে দিয়ে 'নোরা'কে মুক্তি দিয়েছেন। যে-লড়াইয়ের ঝড় ইবসেন এবং তাঁর শিষ্য বার্ণার্ড শ' এনেছেন পাশ্চাত্য-সাহিত্যে অন্ধ দাসত্বের বাসা ভেঙে নারীকে মুক্তি দেবার জন্যে—সেই ঝড়েরই ঝঙ্কার রবীন্দ্র-সাহিত্যে। জগৎ জুড়ে নারীর মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাসে বাংলা-সাহিত্যের দান অকিঞ্চিৎকর নয়। লাঞ্ছিতা নারীকে গৌরব দেবার দিক থেকে সাহিত্যের

ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যা করেছেন তাতে অনায়াসে বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ বাংলা-সাহিত্যের ইবসেন।

গল্পগুচ্ছের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি বাংলা-সাহিত্যে দাঁড়িয়ে আছে নারী-বিদ্রোহের জয়ধ্বজা উড়িয়ে। মেজো বৌ তীর্থ থেকে স্বামীকে লিখেছে :

কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কি তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।

যে মৃত্যুর জাল পাতিব্রত্যধর্মের মুখোস পরে নারীর জীবনকে ঘিরে রেখেছে নিদারুণ অসম্মানের মধ্যে তাকে ছিন্ন করবার জন্ম দরকার ছিল জোরের সঙ্গে 'না' বলবার। স্ত্রীর পত্রে মৃণালের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছে এই 'না'। পতিগৃহে অসম্মানের মধ্যে স্থিতিকে মৃণাল স্বীকার করল না।

'পলাতকা'র তরুণী মঞ্জুলিকাকেও তিনি তথাকথিত কর্ত্তব্যের হাড়িকাঠে বলি হতে দেন নি। পুলিন ডাক্তারের সঙ্গে তাকে জব্বলপুরে পাঠিয়ে দিয়ে কবি জোরের সঙ্গে তার বাঁচার অধিকারকেই স্বীকার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবী, রবীন্দ্রনাথ পথিকৃৎ। রবীন্দ্রনাথ একহাতে পুরাতনকে ভেঙেছেন, আর একহাতে নতুনকে গড়েছেন। হুইটম্যান লিখেছেন 'By Blue Ontario's Shore' কবিতায় :

For the great Idea, the idea of perfect and free individuals,
For that, the bard walks in advance, leader of leaders

কবিদের কণ্ঠে মহৎ আদর্শের জয়ধ্বনি। এই মহৎ আদর্শ হ'ল মানুষের মুক্তির আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের রুদ্র বীণায় তাই শুনতে পাই শিকল-ভাঙার প্রচণ্ড আহ্বান। যা-কিছু মানুষের সম্মানে আঘাত দিয়েছে তাকে রবীন্দ্রনাথ কোথাও ক্ষমা করেন নি। মানুষের লাঞ্ছনাকে কখনও তিনি প্রশ্রয় দেন নি। তাঁর হাতে স্বাধীনতার জয়-কেতন, তাঁর কণ্ঠে মুক্তির বন্দনাগান। মানুষকে অসম্মানের মধ্যে টেনে আনবার ষড়যন্ত্র যখন চলেছে দিকে দিকে তখন রবীন্দ্রনাথকে আমাদের বড় দরকার। এই প্রয়োজন সম্পর্কে আমরা যত সচেতন হব আমাদের ততই মঙ্গল।

মুক্তি

("Liberation" by Sri Aurobindo)

শ্রীরবি গুপ্ত

করেছি নিক্ষেপ মোর আবর্তন-নৃত্য মানসের,
রহি এবে চিরমুক্ত বিনিস্পন্দ আত্ম-স্তব্ধতায় ;
কালজয়ী মৃত্যুঞ্জয়ী বহু ঊর্দ্ধে এ-মর্ত্ত্য জন্মের,
ধ্রুব মর্ম্ম যে বিধৃত আমারি শাশ্বত প্রথায়।

লভিয়াছি পরিত্রাণ, ক্ষুদ্র-আমি হয়েছে নিঃশেষ,
মৃত্যুর অতীত আমি, আমি এক, অনির্ব্বচনীয়
সমুত্তীর্ণ আমারি রচিত মহাবিশ্ব রেখা শেষ,
উঠেছি জাগিয়া লভি' রূপ অনাম অধারণীয়।

সুমহান অনন্ত আলোকে হয়েছে নীরব মন,
হৃদয় নিভৃতে শান্তি ও আনন্দ-মন্ত্রগান বাজে,
অনুভূতি অন্ধকারে স্পর্শ-শব্দ দৃষ্টির বন্ধন
কায়া মোর বিন্দু এক চিরশুভ্র অসীমের মাঝে।

একক সত্তার আমি অচঞ্চল হবব পরম
নহি আমি রূপ কোন, আমি সব—স্থাবর-জঙ্গম।

নিঃস্বের দান

শ্রীকালিদাস রায়

যা ছিল মোর বিলিয়ে দিলাম নির্ব্বিচারে।
আপন পরে বইল ঘরে ভারে ভারে।

বিলিয়ে দিলাম ব্যথার মেঘের পাখার আঁখিজল।
মোর স্বপনের ফাল্গুনী ফুল চৈত্র বোশেখের ফল।
প্রেম-পিপাসার তপ্ত খতুর কুলায় কল কল,
আর—শেষ শরতের স্মৃতির সোনা যারে তারে।

এখন আমার শূন্য প্রভু ঝোলাঝুলি,
গোপন আমি করব না কই খোলাখুলি।

হেমন্তে আজ শুরু জরায় অঙ্গ টলমল,
সঙ্গীতহীন কণ্ঠ, এ চোখ নিষ্প্রভ পিঙ্গল।
তোমায় দিতে দেহে মনে নেই কোন সম্বল।
হোক্—শীর্ণ হাতে তোমার সাথে কোলাকুলি।

পদাবলী-সাহিত্যে রায় বসন্ত

শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায়

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত বাংলারও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। বাংলার সে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম। শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয়ে বাংলার আত্ম-প্রতিষ্ঠার অঙ্কুরোদ্গম। জগতে কেউ কখনো যা শোনায় নি, শ্রীচৈতন্যের মুখে সেই অমিয়-ভাগবত শুনিয়ে বাংলা বহু দেশের চৈতন্য সম্পাদন করেছে। পরমপ্রেম রূপ পরিগ্রহ করে বাংলায় চৈতন্য-মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিল। আর সে রূপের মহিমা তৎকালীন শিক্ষাদীক্ষা, জাতীয় সভ্যতা-সংস্কার, শাস্ত্রীয় ইতিহাস, তান্ত্রিক বামাচার, মায়াবাদের শুষ্ক যুক্তিতর্ক ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তার ফলে শীর্ণা বাংলাভাষা তটিনীর উচ্ছল তরঙ্গভঙ্গের মত পবিত্রতা ও প্রবলতা পেয়ে ধন্য হয়েছিল।

বৈষ্ণব-সাহিত্য তথা বৈষ্ণব গীতিকাব্য বৈষ্ণব কবিদের দ্বারা পরিপূর্ণভাবে অনুশীলিত হয়েছিল এই যোড়শ শতাব্দীতে। আর ঐ গীতিকাব্যের ভিতর দিয়ে মৈথিল সংমিশ্রণে বঙ্গসাহিত্যের চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। পদাবলী- সাহিত্যে বাংলার বৈষ্ণব কবিরা প্রেমের যে নিষ্কাম মাধুর্য বর্ণনা করেছেন, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য তাতে ভাস্বর, মধুরোজ্জ্বল। পদাবলী-সাহিত্য সেই প্রেমের রাজ্য, নয়ন-জলের রাজ্য। বাঞ্ছিতকে নয়নে-নয়নে রেখেও যাঁরা ব্যবধান ভেবে কাতর হয়েছেন, দর্শনে বিঘ্ন জন্মায় বলে আঁখির পলককে অভিশাপের মধ্যে গণ্য করেছেন, যাঁদের প্রেমের গীতি ধর্মবেদী থেকে উচ্চারিত স্তোত্রের মত শোনায়, সেই কবিদের ব্যাকুলতার ইতিহাস, বাঞ্ছিতের সঙ্গে মিলিত হবার প্রাণাবেগের ইতিহাস এই পদাবলী।

পাঠান রাজত্বের শেষভাগে শ্রীচৈতন্যই প্রধান চরিত্র। পাঠান-কুলতিলক হুসেন শাহের আমলে দেশব্যাপী বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন জাগে। ফরাসী-বিপ্লব যেমন সমগ্র ইউরোপের মতিগতি ফিরিয়ে দিয়েছে, চৈতন্য-বিপ্লব তেমনি বাংলাকে গড়েছে এক নূতন ছাঁচে। প্রতাপাদিত্য-বসন্ত রায়ের যশোরও সে ভাববিপ্লব-যজ্ঞে আহুতি দিতে পরাঙ্মুখ হয় নি। সেই প্রাচীন যশোরের (অধুনাতন খুলনা জেলা) যবন হরিদাস ও রায় বসন্ত আপন আপন গ্রাম ও রাজ্যের গণ্ডী ছাড়িয়ে বৈষ্ণব ধর্মের সুদৃঢ় স্তম্ভরূপে দেশের অমূল্য সম্পত্তি হয়ে রয়েছেন।

রায় বসন্তকে বাদ দিয়ে বঙ্গের ইতিহাসের কথা চলে না, খুলনার ইতিহাসও হয় না। হরিদাসের অলৌকিক প্রেমোন্মাদনা ও রায় বসন্তের অকুণ্ঠিত প্রজ্ঞা ও প্রেম একত্র করলে শ্রীচৈতন্যের আভাস পাওয়া যায়। পূর্বাশার উদয়-দিগন্ত যেমন নব সূর্যোদয়ে রক্তিমাভায় রঞ্জিত হয়, শ্রীচৈতন্যের মহাবির্ভাবে তেমনই রায় বসন্ত প্রমুখ তাঁরই মন্ত্রে তাঁরই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। প্রভাত-বিহঙ্গের প্রথম কাকলীর মত পদকর্তা রায় বসন্তের কণ্ঠ-কাকলী ভগবদ্ মাহাত্ম্যে সপ্তগ্রামে অনুরণিত হয়েছে।

রায় বসন্ত বঙ্গজ কায়স্থের গুহবংশের সন্তান। বিরাট গুহের এগার পুরুষ অধস্তন রামচন্দ্র গুহের মধ্যমাত্মজ গুণানন্দ গুহের পুত্র এই রায় বসন্ত। আদি নাম জানকী-বল্লভ। খ্রীষ্টীয় ১৫৩৪ অব্দে সপ্তগ্রামে তাঁর জন্ম হয়। সে সময় জানকীবল্লভের পিতামহ রামচন্দ্র গুহ এবং জ্যেষ্ঠতাত ভবানন্দ, পিতৃদেব গুণানন্দ ও পিতৃব্য শিবানন্দ সপ্তগ্রাম-রাজসরকারে চাকরি করতেন। ঘটনাক্রমে উপরিতন কর্মচারীর সঙ্গে প্রবল মতভেদ হওয়ায় সপুত্র রামচন্দ্র চাকরি ত্যাগ করে ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ের নবাব-সরকারে প্রবিষ্ট হন। মহম্মদ খাঁ শূরের পুত্র বাহাদুর শাহ তখন বঙ্গাধিপ। পরে ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সুলেমান কররাণী গৌড়ের মসনদে বসলে ভবানন্দ-প্রমুখ ভ্রাতৃত্রয় সুলেমানের সুদৃষ্টি লাভ করে উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত হন। সুলেমানের বায়জিদ ও দাউদ নামে পুত্রদ্বয়ের সঙ্গে ভবানন্দ-পুত্র শ্রীহরি এবং গুণানন্দ-পুত্র জানকীবল্লভের সাতিশয় সৌহৃদ্য জন্মে। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে দাউদ সিংহাসনারোহণ করে পূর্ব-প্রতিশ্রুতিমত শ্রীহরিকে "রাজা বিক্রমাদিত্য" এবং জানকীবল্লভকে "রাজা বসন্ত রায়" উপাধি দিয়ে বিক্রমাদিত্যকে প্রধান মন্ত্রী ও বসন্ত রায়কে বাংলার প্রধান দেওয়ান নিযুক্ত করেন। বসন্তের মোট এগারটি পুত্র। তন্মধ্যে ইত্‌নার কৃষ্ণচন্দ্র দত্তের কন্যা রাণী বিমলাদেবীর গর্ভজাত দশম পুত্র যশোর-রাজ রাজা চন্দ্রশেখরের কেবলমাত্র নূরনগর ও খোড়গাছিস্থিত বংশধারাই বর্তমানে রাজা বসন্তের একমাত্র রাজবংশধারা। নবম পুত্র রাজা রাঘবের (কচুরায়ের) একটি মাত্র কন্যা ব্যতীত কোন পুত্রসন্তান ছিল না। অবশিষ্ট পুত্রদের মধ্যে অষ্টম পুত্র রমাকান্ত ব্যতীত আর কারো বংশ নেই। পুঁড়াগ্রামস্থিত রমাকান্ত বংশীয়েরা রাজ্য ও রাজোপাধি বঞ্চিত।

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দাউদের পরাজয় ও মৃত্যুর পর যখন তোডরমল্ল তাণ্ডায় আসেন, সে সময় রাজা বসন্ত বাংলা রাজ্যের রাজস্ব-হিসাব প্রস্তুত করার পক্ষে প্রধান সহায়ক হন। পরে

১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে তোডরমল্ল বাংলা-বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে এসে ভবিষ্যতে এদেশে রাজস্ব-সংক্রান্ত কোন গোলযোগ না ঘটে, তজ্জন্য তিনি সমগ্র বাংলার-রাজস্বের এক হিসাব প্রস্তুত করেন। এই হিসাব প্রস্তুতকালে রাজা বসন্তের কাছ থেকে পূর্বে যে হিসাব পাওয়া গিয়েছিল, তাই প্রধান সম্বল হয়। এ দেশীয় রাজস্ব সংগ্রহ ব্যাপারে রাজা বসন্তের হিসাবই এখনো ভিত্তিস্বরূপ হয়ে রয়েছে। "In actuality, the matter of realisation of land revenue is based on the accounts supplied by Raja Basanta Roy."—"Pratapaditya" by Nagendra Nath Roy. সেই ভিত্তিরই উপরে হয়েছিল লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। অল্পাধিক পরিবর্তনের সঙ্গে তা এখনও চলছে। (যশোহর-খুলনার ইতিহাস, বঙ্গীয়-সমাজ ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।) এই কারণে রাজা বসন্তের কাছে মোগল সম্রাট আকবর তো বটেই, বাংলা বা বাঙালী চিরদিন ঋণী।

খ্রীষ্টীয় ১৫৭৭ থেকে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের সুরু। বিক্রমাদিত্য রাজা মাত্র, বসন্ত রায়ই রাজ্যের সব। বিক্রমাদিত্য-পুত্র রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্যদেব এই রাজা বসন্তের চরিত্র সত্যই অপূর্ব। যশোর-রাজ্য অভিনয়ে তিনিই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। যশোরের যাবতীয় ভার ছিল তাঁর উপর। "সারতত্ত্বতরঙ্গিণী" গ্রন্থে আছে, "যশোরের প্রতিপত্তির যুগে দ্রাবিড়াগত জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বলেছিলেন:

> "যশোর-পুরী কাশী, দীর্ঘিকা মণিকর্ণিকা।
> তক পঞ্চাননো ব্যাসঃ, বসন্ত কালভৈরবঃ।"

তিনিই মন্ত্রী, তিনিই কোষাধ্যক্ষ, তিনিই সেনানায়ক, তিনিই একনিষ্ঠ প্রজানুরঞ্জক প্রতিপালক। যশোর-সমাজের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা, তিনিই নেতা। রাজা বসন্ত অসমসাহসী ও অসাধারণ যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু বীরেন্দ্রের বীরবপুতে কঠোরতার ছায়ামাত্র ছিল না। মূর্তি তাঁর সর্বদা সৌম্য, শান্ত ও গম্ভীর প্রতিভাব্যঞ্জক। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ পরিশূন্য এই মহাপুরুষ ছিলেন সতত দেবদ্বিজে ভক্তিমান। পণ্ডিতের সমাদর তাঁর কাছে ছিল, তিনি গুণের পুরস্কারও দিতে জানতেন। নিজে যেমন বিদ্বান, তেমনি সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইতিহাসে বা প্রবাদে বা কুলকাহিনীতে তাঁর সম্বন্ধে যা-কিছু সঞ্চিত আছে তা থেকে এই প্রমাণিত হয় যে, তিনি ছিলেন তেজস্বী বীর, কর্মকুশল, রাজর্ষি এবং মহাপ্রাজ্ঞ। চন্দ্রদ্বীপের প্রাচীন কারিকায় আছে:

> "কৃতী বসন্ত রায়োহসৌ শ্রীমান্ সত্যপরায়ণঃ।
> প্রাপ্নবাৎ স নরশ্রেষ্ঠঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥
> মহাতেজাঃ মহাপ্রাজ্ঞঃ সর্বধর্মভৃতাংবরঃ।
> অধ্যাত্মজ্ঞানবিৎ সোঽপি ব্রাহ্মণস্য প্রিয়ঃ সদা॥"

অসপত্ন রাজত্ব, নিরঙ্কুশ প্রতিপত্তি, বিপুল অর্থ, প্রভূত যশ, প্রাচুর্যের পরিপূর্ণতা কোনদিন বসন্তকে প্রলোভিত বা বিচলিত করতে পারে নি। চিরদিন তিনি ধীরগম্ভীর, অনাসক্ত এবং অকৃত্রিমভাবে তাঁর মহৎ জীবন যাপন করে গেছেন। মানুষের প্রতি তাঁর ছিল অফুরন্ত দরদ, অন্তহীন প্রেম। ঈর্ষা, দ্বেষ, সংকীর্ণচিত্ততা ইত্যাদি যে সব চারিত্রিক দৈন্য মানুষের জীবনকে নিরন্তর ক্লিষ্ট করে তোলে, তাঁর চরিত্রের প্রোজ্জ্বল দীপ্তির কাছে সে সব সূর্যরশ্মির নিকট কুয়াশার মতন ছিন্নভিন্ন হয়েছে।

রাজা বসন্ত আজন্ম বৈষ্ণব। পিতৃদেব গুণানন্দও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণব কুলতিলক শ্রীপাদ সনাতনের বৃন্দাবনের আদিত্যটীলাস্থিত শ্রীশ্রীমদনমোহন বিগ্রহই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গোস্বামিগণের প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম বিগ্রহ। শ্রীশ্রীমদনমোহনের এই মন্দির ভগ্ন ও বিস্মৃতপ্রায় হয়ে যায়। গুণানন্দ গুহই পরে সুবৃহৎ কারুকার্যমণ্ডিত মন্দির নির্মাণ করে দেন। শ্রীজীব গোস্বামী তখন ব্রজমণ্ডলের কর্তা। কৃষ্ণলীলা পদগান বসন্তের অতি প্রিয় ছিল। পদকবি গোবিন্দদাসের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয় গৌড়ে। প্রাণে-প্রাণে মিলন হয়েছিল কবি গোবিন্দের সঙ্গে রায় বসন্তের। রাজারই অনুরোধে গোবিন্দদাস যশোরে আসতেন এবং প্রতিবারে দীর্ঘকাল রাজসভায় অবস্থান করে যেতেন। ("যশোহর-খুলনার ইতিহাস" দ্রষ্টব্য।) "বঙ্গীয়-সমাজ" গ্রন্থে আছে, "বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাস বসন্ত রায়ের সভার সভাসদ ছিলেন।" Pratapaditya পুস্তকে আছে, "The famous Vaishnab Poet Govinda Das decorated the courts of Raja Basanta Roy."

রাজা বসন্ত যে শুধু সুকণ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন তা নয়। তাঁর অপর দিকের শ্রেষ্ঠ পরিচয়—তিনি স্বভাবকবি। বাংলা ভাষায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক মধুর ও প্রেমভাবের বহু সুললিত পদ তিনি রচনা করে গেছেন। বসন্ত-পদাবলী অধুনালুপ্ত হলেও কয়েকটি পদ বিক্ষিপ্তভাবে এখনও পাওয়া যায়। বসন্ত-গোবিন্দ বন্ধুযুগল পদ রচনা করে পরস্পরকে শোনাতেন। কখনও কখনও গোবিন্দের সঙ্গে বসন্তের তর্জার লড়াই চলত। এমন ভাবে ক্ষিপ্র উত্তর দিতেন রাজা বসন্ত, যাতে করে গোবিন্দদাস বসন্তের কবিত্ব ও অনুসন্ধিৎসার ভূয়সী প্রশংসা না করে পারেন নি। গোবিন্দদাস তাঁর পদাবলীর রাসলীলা প্রসঙ্গে গেয়েছেন—

"কুহরিত কুঞ্জ কল্পতরুকানন মণিময়মন্দিরমাঝ।
রাস বিলাস-কলা-উৎকণ্ঠিত মনোমোহন নটরাজ।
কামিনী-কর-কিশলয়-বলয়াঙ্কিত রাতুল পদ-অরবিন্দ।
রায় বসন্ত মধুপ অনুসন্ধিত নিন্দিত দাস গোবিন্দ।"

গোবিন্দ-পদাবলীর কোন কোন পদে "দ্বিজরাজ বসন্ত" ভণিতা দেখা যায়। যেমন শ্রীশ্যামসুন্দরের রূপ-প্রসঙ্গে পাই :

"পদতলে অলকি কমল ঘনরাগ।
তাহে কলহংস কি নূপুর রাগ॥
গোবিন্দ দাস কহয়ে মতিমন্ত।
ভুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত॥"

অনেকে এই "দ্বিজরাজ বসন্ত" সম্বন্ধে বিভিন্নতা আরোপ করেন। কিন্তু এই ধারণা সত্য কিনা সন্দেহ। রায় বসন্ত কায়স্থ হলেও তাঁকে বৈষ্ণবগণ "ঠাকুর বসন্ত" বলে অভিহিত করতেন। এই কারণে দ্বিজরাজ বসন্ত ভণিতা দেওয়া অসম্ভব নয়।—"Raja Basanta Roy who was known under the name of Thakur Basanta Roy by the great Vaishnabas of the time."—Pratapaditya by N. N. Roy। নজীর-স্বরূপ প্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, "দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে"—এমন ভণিতা প্রসাদী পদাবলীর বহু পদে আছে। বৈষ্ণব গীতিকাব্য, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি কাব্যে এমন বহু কবির নামাগ্রে "দ্বিজ" ভণিতা দৃষ্ট হবে, যাঁরা ব্রাহ্মণ ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ, যশোর-রাজ প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্যদেব রাজা বসন্ত এবং দ্বিজরাজ বসন্ত যদি না অভিন্ন ব্যক্তি হবেন, তা হলে কবিরাজ গোবিন্দদাসের মাথুর প্রসঙ্গের—

"এতহি বিরহে আপহি মুরছই শুনহ নাগরকান।
প্রতাপ আদিত এ রস ভানিত দাস গোবিন্দ গান॥"

—এই পদে প্রতাপাদিত্যের নামের ভণিতা কেন? মনে হয়, সেকালে ভণিতায় "দ্বিজ" উল্লেখ এক প্রচলিত লিপি-রীতি ছিল।

রায় বসন্ত স্বীয় ভক্তিনিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় সুবিখ্যাত শ্রীপাদ নরোত্তম গোস্বামীর চিত্ত জয় করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুকুমার সেনের "বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা" গ্রন্থে আছে—"নরোত্তমের শিষ্যদিগের মধ্যে বড় পদকর্তা ছিলেন রায় বসন্ত।" নরোত্তম গোস্বামী পদ্মাতীরস্থ খেতরী গ্রামের কায়স্থ জমিদার রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের একমাত্র পুত্র। তাঁর মায়ের নাম নারায়ণী। নরোত্তম একজন বিশিষ্ট পদাবলী-রচয়িতা ছিলেন। বৈষ্ণব-সাধন-বিষয়ক কয়েকখানি ছোট গ্রন্থ ইনি রচনা করেছিলেন। তন্মধ্যে "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" সর্বোৎকৃষ্ট।

পদাবলী-সাহিত্যে রায় বসন্তের অসামান্য নৈপুণ্য আমরা লক্ষ্য করি। তাঁর পদগুলি অনুরাগ ও ভাবরসে ভরপুর। সাধক বসন্তও অপরাপর সাধকের মত আরাধ্য দেবতাকে বলেছেন—

"অহে নাথ! কিছুই না জানি।
তোমাতে মগন দিবস-রজনী॥
জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি।
পরাণ-পুতলী তুমি জীবনের সখি॥
অঙ্গ-আভরণ তুমি নয়নে অঞ্জন।
বদনে বচন তুমি শ্রবণ রঞ্জন॥"—বসন্ত-পদাবলী

কি গভীর একাত্মতা! সর্বেন্দ্রিয়ানুভূতির ভাব! মানুষী ভালবাসার উর্ধ্বে এ অনুরাগ। আরাধ্য ধনের প্রেমে ভক্ত এমনই তন্ময় হয়ে আছেন যে, আপন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে কবি বসন্তের পাণ্ডিত্য থাকলেও ভাষার অলঙ্করণের উপর তাঁর তত দৃষ্টি ছিল না। বিদ্যাপতির মত উপমার প্রয়োগ করতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি মরমী ভাবুক ও দরদী ভক্ত—প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ উপমার অলঙ্কারে বর্ণনা না করে সংক্ষেপে তিনি তাই জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি আরও বলেছেন—

"তুমি মোর ত্রিজগতে বিভব-বিহার।
পরাণ-পুতলী মোর হিয়ে মণিহার॥
সরবস ধন মোর সকল সংসার।
রায় বসন্ত পঁহু পীরিতির সার॥"—বসন্ত-পদাবলী

এখানেও বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাসের মত সেই প্রাণে-প্রাণে মিলন, একাঙ্গীভাব। জন্মজন্মান্তরেও যেন বিচ্ছেদ নেই। সাধক কবির এই-ই প্রাণ-প্রেম। ভক্ত-ভগবানের এ প্রেমের খেলার রসাস্বাদ কবি বসন্তও করেছিলেন, করে সে রসের পরিবেষণ করেছিলেন। কবি বসন্তের পরাণ-পুতলী তাঁর প্রেমাস্পদাকে বলেন—

"তোমা না হেরিয়া আমি কেমনে রহিব?"

প্রেমাস্পদা উত্তর দেন—

"বঁধু, তুঁহু দয়ার সাগর।
হাম নারী মতিহীনে এতেক আদর॥"—বসন্ত-পদাবলী

প্রেমিক বসন্তের এ অনুরাগের নিগূঢ়তা কত সুন্দর, কত মর্মস্পর্শী। বিশ্বাসের কত উর্দ্ধস্তরে তিনি পৌঁছেছেন। তাঁর পরাণ-পুতলী একটি ধ্যানশান্ত-সমাহিত মূর্তি। আর প্রেমাস্পদা সকল দুরত্ব ঘুচিয়ে নিজের দেহমন দিয়ে লীলার রসোপলব্ধি করছে। তার মধ্যে যে মিলন সে কল্পনা করেছে, সেই মিলনের ভাবতরঙ্গ তাকে উদ্বেল করেছে। তার পরেই রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বৈচিত্র্য নিজের সঙ্গে দেহাতীতের ও রূপাতীতের অপার্থিব প্রেমলীলায় পর্যবসিত হয়ে উঠল তখন, যখন কবি তাঁর প্রেমাস্পদাকে দিয়ে বলালেন—

"বঁধু! আমি পরাণ নিছিয়া দেই পিরিতে তোমার।"

পরাণ যেখানে নিছিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে দুই এক হয়—বিন্দু সিন্ধুতে লীন হয়ে যায়। সে কথা কবি বসন্তও বলেছেন—

> "ধনি! তুয়া কিসের গঞ্জনা।
> তুমি আমি একই পরাণ চজনা।
> তোমার আমার গতি মুরতি একভাব।
> একস্বরূপ রতি এক অনুভাব।"—বসন্ত-পদাবলী

আত্মহারা অনন্ত বিশ্বাসপূর্ণ একান্ত সান্ত্বনার মধুর অভিব্যক্তি! আত্মসমর্পণে যে প্রেমের পরিণতি, সে প্রেমের সার্থকতা এখানে প্রাণবন্ত, শাশ্বত। কবি সাধক বলেই এই রসৈশ্বর্য্যের এত গভীরে ডুবতে পেরেছেন। ভাববীর বসন্তের পদসৃষ্টির মধ্যে এমন এক শেফালি-শুভ্র পবিত্রতা রয়েছে, যাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না; অথচ সে সকল অনুভূতিকে আপ্লুত করে দিয়ে যায়। এখানে বাসনার কদর্যতা নেই, কামনা এখানে পবিত্র মহিমার বিশিষ্ট রূপ নিয়েছে। ভালবাসার জন্যেই কবি তাঁর আরাধ্যধনকে ভালবাসেন, তাঁকে ভালবেসেই কবি ভূমানন্দ লাভ করেছেন। তাঁর সকল পদে এক পরিমার্জিত শুচি-বোধ রয়েছে এবং তার মাধুর্য সকল পদকেই অনির্বচনীয় করে তুলেছে। এই রসে ভক্ত ভগবান ভিন্ন আর কিছু জানে না, কিছু দেখে না। ভগবানের আনন্দের জন্যে তাঁর চরণে নিজের যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করে সে নিজেই পরমানন্দ লাভ করে। এই রসে ভক্ত আপনাকে পত্নী ভেবে এবং ভগবানকে পতি মনে করে ভগবানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে। বৈষ্ণবধর্মে স্ত্রীভাবে ভগবানের সেবার বিধি আছে। বৈষ্ণবেরা বলেন, রতি বা ভাবের উন্মেষ না হলে সুন্দরের সন্ধান পাওয়া যায় না এবং সাধুসঙ্গ ভিন্ন সে ভাবের বিকাশ হয় না। দার্শনিক নিউম্যান বলেছেন—"If thy soul is to go on into higher spiritual blessedness, it must become a woman."

পদকর্তা বসন্তের পদাবলী সঙ্গীতধর্মী। শব্দের সাহায্যে তিনি মনোরম মাধুর্যের ঝঙ্কার সৃষ্টি করেছেন। ভাবের গভীরতায়, রসের মাধুর্যে, ছন্দের লালিত্যে তাঁর পদ-সাহিত্য চিরবিচিত্র, চিরসুন্দর। যে ভক্তির ধারা তাঁর অন্তস্তলে অন্তঃস্রোতে বয়েছিল, পরিপূর্ণতায় তা সহস্রধারা হয়ে গীতিকাব্যের মধ্য দিয়ে বাংলাকে রসতৃপ্ত করেছে। সরল অনাড়ম্বর ভাষায় ও ভঙ্গীতে মর্মস্পর্শী আবেগ, মধুর বিহ্বলতা, মনের সুষমা প্রকাশ করে পদকবি রায় বসন্ত অমর হয়েছেন। বিদ্যাপতির প্রেমে যেমন নবীনতা, চণ্ডীদাসের প্রেমে যেমন প্রগাঢ়তা, গোবিন্দদাসের প্রেমে যেমন আবেগ রায় বসন্তের প্রেমে তেমনি আমরা মধুরতা অনুভব করি। তাঁর পদাবলী সোজাসুজি অনুভূতিকে সক্রিয় করে তোলে। তাই তাঁর পদাবলী-সাহিত্যের কোন বিশ্লেষণ, কোন বিচার চলে না। কেবল অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। দরদী কবি বসন্তের এক একটি পদ যেন এক একটি রত্নখণ্ড, যার দীপ্তি যুগে যুগে বাঙালীকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করবে।

এই মহাভাগ রাজা বসন্ত, এই বরণ্যে দ্বিজ বসন্ত, এই প্রাতঃস্মরণীয় পদকবি রায় বসন্ত ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দ ২৬শে চৈত্র, সোমবার, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে যশোরের আপন ছয় আনা অংশের রাজধানী "রায়গড়ে" মৃত্যু বরণ করেন। তদ্বংশীয়েরা আজও এই মৃত্যু-তিথি প্রতি বৎসর উদ্‌যাপন করে আসছেন।

বর্ষণ-মন্দ্রিত রাতের বিরহ-বিধুর পত্র

শ্রীসন্ধ্যারাণী মজুমদার

সুচরিতাসু,

...আমাদের এখন যা বয়েস, এ বয়েসের প্রেমকে প্রবীণ মাত্রেই প্রীতির চক্ষে দেখেন না! তাঁদের বিশ্বাস, আমরা যে প্রেমিকার কণ্ঠে মালা পরাই বা প্রেমিকার মালা গলায় পরি, এই বিনিময়-মালিকা কণ্ঠকে অতিক্রম করে কোন মতেই হৃদয় পর্যন্ত প্রলম্বিত হতে পারে না। শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামীর মত বিশেষ বিশেষ সহৃদয়েরা হয়ত নবীন প্রেমের মহিমা প্রচারে বলে থাকবেন—

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥

এ ছাড়া সব শেয়ালের একই রা। সকলেই Friar Laurence-এর মত বলেন :

"Young men's love then lies
Not truly in their heart, but in their eyes."

এ প্রেমকে প্রেমই বলেন না, কেননা তা দেহ-কামনার ক্লেদে ক্লিন্ন,—যা জৈব-বন্ধনে আবদ্ধ বা biological তা কাম, প্রেম নহে; প্রেম হচ্ছে নিছক anti-biological বা জৈব গতি বিরোধী। এ-কথা তারা স্বীকারই করতে চান না যে—

"Love should be a tree whose roots are deep in the earth but whose branches extend into heaven."

অথবা :

"জৈববন্ধনের মধ্যে মানুষ আবদ্ধ। যদি সে বন্ধনের কোন মুক্তির পথ থাকে তবে সে পথও এই বন্ধনের মধ্যেই পাওয়া যাইবে। তাই কাম প্রেমের বিরোধী হইলেও কামকে অবলম্বন করিয়াই প্রেম উৎপন্ন হয় পঙ্কে পঙ্কজের উৎপত্তি, অথচ পঙ্ক থাকে গভীর জলের মধ্যে ক্লিন্নতায় অবসন্ন হইয়া, আর পঙ্কজ মৃণাল-দণ্ডের উপর ভর করিয়া পঙ্কে নিরুন্মুখ হইয়া সূর্য্যের দিকে, বিশ্বের দিকে, আপন বদন-মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া আপন-সৌরভে বিশ্বের রস আপনাদের মধ্যে অনুভব করে।"—ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

তাই আমার হৃদয়ের প্রাত্যহিক প্রেম-স্ফূর্তি পর্য্যবসিত হয়েছে অবিমিশ্র নীরবতায়। কিন্তু ঘনায়মান মেঘপুঞ্জ—অবিরল বর্ষণের মধ্যে কি যে অজ্ঞাত রহস্য আছে—নীরব আমাকে থাকতে দিল না কিছুতেই। বাদল, মেঘ এরা এমনি করে প্রণয়ী-চিত্তকে আকুল করে বলেই বুঝি অমর হয়ে আছে প্রেমের কাব্যে। 'মেঘদূতে' দেখি, মিলন-বিরহের উদ্দীপক রূপে বর্ষা চির-প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে প্রেমের দেউলে। প্রোষিতকান্তের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করবার জন্যে ঘটকর্পরও কালিদাসের মত মেঘকে বরণ করেছেন প্রেমের যোগ্য দূতরূপে। জয়দেবের অমর কাব্যারম্ভও এই চন্দ্রসমাচ্ছন্ন প্রদোষের পুঞ্জিত মেঘচ্ছায়ে।

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং,
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ॥ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্

এখানে রাধামাধবের নীপ যমুনাপুলিনস্থ কেলি-বিলাসের উদ্দীপনময়ী প্রাকৃতিক অবস্থাকে যা অনুপমতায় মণ্ডিত করেছে সে এই তমালবনরাজী শ্যামলিত মেঘমেদুর সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্নতা। এমনতর প্রত্যাসন্ন বাদলদিনে প্রণয়ী-হৃদয় যে বিরহ-বিধুরতায় অতীব কাতর হয়ে ওঠে, তার চিত্র আর্য-কবির রামায়ণেও দেখা যায়। কিংশুক গুরুগম্ভীর নিনাদকারী মেঘমালায় আবৃত অম্বর, মাল্যবানে অবস্থানকালে রামচন্দ্রের সীতা-বিরহ নূতন করে উদ্বোধিত করেছে। নবাম্বুধারায় নিষিক্ত হয়েও ভ্রমরকুল কদম্বপুষ্পের প্রতি ধাবিত হতে নিরস্ত হয় না। এই ঋতুতেই—

"প্রবাসিনো যান্তি নরাঃ স্বদেশান্।"

সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের সীতা-বিরহিত বর্ষার মাসগুলি যে শত বৎসরের মত দীর্ঘ বলে অনুমিত হবে, এ আর আশ্চর্য্য কি—

"চত্বারো বার্ষিকা মাসা গতা বর্ষশতোপমাঃ।"

বাল্মীকির রামচন্দ্রের মত 'নরচন্দ্রমা'ই যদি বাদলদিনে এমন দশাপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন, তবে আমাদের মত ভোগসর্ব্বস্ব জনের যে কি দশা দাঁড়ায় সহজেই অনুমান করতে পার। সুতরাং আজ তোমায় কিছু বলতে গিয়ে বিহ্বলতাবশতঃ কোথাও চাপল্য প্রকাশ করে ফেলি, মাফ করবে নিশ্চয়। সত্যি বলতে কি, জগতে যেখানে যত প্রিয়-বিরহী রয়েছে, আজকের দিনে তারা তাদের সর্ব্বপ্রকার চাপল্যের জন্যে তাদের আপন আপন প্রেমাস্পদার ক্ষমার পাত্র। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় একস্থানে রবীন্দ্র-নাথকে 'যৌবনে বৈরাগী' অভিধা প্রদান করেছেন, তাই রবীন্দ্রনাথও বলে গেছেন—

হে নিরুপমা,
চপলতা আজ যদি কিছু ঘটে করিয়ো ক্ষমা
এলো আষাঢ়ের প্রথম দিবস,
বনরাজি আজি ব্যাকুল বিবশ,
বকুলবীথিকা মুকুলে মত্ত কানন-'পরে।
নবকদম মদির গন্ধে আকুল করে। 'অবিনয়' : ক্ষণিকা

এখানে 'এলো আষাঢ়ের প্রথম দিবস' প্রধান কথা নয়, প্রধান কথা হচ্ছে, 'বর্ষণঘন শীতল আঁধারে জগৎ ঢাকা।' 'মেঘদূতে'ও দেখা যায়—

'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে' ॥

অর্থাৎ, সুদূর, প্রোষিতকান্তের তো কথাই নাই, এমনতর বাদলদিনে প্রণয়িনী কণ্ঠলগ্ন ভাগ্যবানেরও হৃদয়ে বিরহ সমুপস্থিত হয়।

'নব মেঘ হেরি', সুখী যে, তাহারো
অকারণে করে মন-কেমন,
বিরহী কি বাঁচে নিয়ত যে যাচে
প্রিয়ার কণ্ঠ-আলিঙ্গন।'

বাস্তবিক, যে কথাটি সমস্ত জীবনভর লজ্জা-সঙ্কোচে ব্যক্ত হতে পারল না, মূক হয়ে গুমরে মরতে লাগল হৃদয়ের পরতে পরতে, তার যদি কোনদিন মুখর হয়ে উঠবার অবসর জোটে ত সে এই মধুর লগ্নে —

"ব্যাকুল বেগে আজি বহে যায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
যে-কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সেকথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায় ॥' 'মানসী' : রবীন্দ্রনাথ

'বর্ষার দিনে' কবিতায় যে কথাটি বলবার ইঙ্গিত রয়েছে মাত্র তা রবীন্দ্রনাথের লেখার অন্যত্র অভিব্যক্ত হয়েছে সুস্পষ্ট ভাবে। তিনি বলেছেন—

'বৃষ্টির দিনে, যাকে ভালবাসি তার দুটি হাত চেপে বলতে ইচ্ছে করে—জন্ম-জন্মান্তরে আমি তোমার। আজ এই কথা বলা সহজ। আজ সমস্ত আকাশ যে মরীয়া হয়ে উঠল, হু হু করে কি যে হেঁকে বলছে তার ঠিক নেই, তারই ভাষায় বন-বনান্তর ভাষা পেয়েছে।'

আমার আজকের রাতটিও এমনি—

গগনে গরজে ঘন মেহ দারুণ,
সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝনঝন
পবন খরতর বলগই ॥

অন্যান্য দিনের বিরহেরও তাপ আছে স্বীকার করি এবং তাতেও যে সবিশেষ তাপিত না করে তা নয়। কিন্তু আজকের বিরহ-তাপের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না—এ তাপে এক তিলও বাঁচতে ইচ্ছে করে না। আর সব দিনের কৃষ্ণ-বিরহের কাতরতার কথা প্রকাশ করে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলেছেন—হরি অদর্শনে অধন্য দিনগুলি, তাঁর বিরহের এই দীর্ঘ দিনগুলি কেমন করে যে কাটাবেন?

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥

এ কাতরতায় প্রাণের স্পন্দনকে মন্দীভূত করে বটে, কিন্তু বাঁচবার আগ্রহকে একেবারে নিরস্ত করে না। পক্ষান্তরে যেখানে বলা হয়েছে—

সজনি অব শমন-দিন হোয়।
নব নব জলধর চৌদিক ঝাঁপল
হেরি' জিউ নিকসয়ে মোয় ॥

সেখানে প্রিয়সঙ্গলিপ্সার অচরিতার্থতায় প্রাণের স্পন্দন স্তব্ধীভূত। 'যক্ষ'-প্রিয়ার এবম্প্রকার প্রাণবিনাশী বিরহের অন্তর্নিগূঢ় বেদনা হৃদয়ঙ্গম করেই সদ্যঃস্ফুট কুটজ-কুসুমে 'ধূম-জ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ' মেঘের অর্ঘ্য রচনা করেছিল।

প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী
জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম।
'আসিছে শ্রাবণ,—প্রিয়ার জীবন কি লয়ে কাটিবে সে বরষাতে;
ভাবে তাই,—স্বীয় কুশল-বারতা পাঠাবে প্রিয়ারে মেঘের হাতে।'

আচ্ছা, আমার ভাগ্য কি মন্দ বল ত? শরতের অজস্র উল্কাপাতের মতই বর্ষার রাত্রিতে, 'স্বর্গে মর্ত্তে স্বপনের গুপ্ত আনাগোনা' ত সর্ব্বত্রই চলে থাকে নিরবধি; আমার মন্দ ভাগ্যের দোষে স্বপ্নেও তোমার সঙ্গে আজকাল দেখা হবার জো নেই। মনের পটে ভেসে উঠছে শ্রীরাধিকার স্বপ্নে কৃষ্ণ দর্শনের চিত্র। সেও ছিল এমনি এক জীমূত মন্দ্রিত বর্ষণমুখর শাওন ঘন রাত্রি।

শিখর শিখণ্ড-রোল মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝি ঝাঁ ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপনে দেখিনু হেনকালে ॥

মনে পড়ছে, বিখ্যাত লেখক 'স্পেনসারে'র ফেয়ারি কুইনে'র 'আর্থার-গ্লোরিয়ানা'র কথা। পরীরাণী গ্লোরিয়ানাকে যে রজনীতে রাজা আর্থার স্বপ্নে দেখলেন, সে রাতেও এমনি বৃষ্টি—আকাশপ্রান্তে ক্ষীয়মাণ কুকুরের ঘেউ ঘেউ রবের প্রতিধ্বনি। আজ যদি স্বপ্নে আমিও তোমার দর্শন পেতাম, কি এমন ক্ষতি ছিল—আগে ত এমন দেখতামও কত রাতে! সেই স্বপ্ন-মিলন নিয়ে খোঁটা দিয়ে একদিন দু'কথা বলেছিলাম বলেই বুঝি এই সাজা।

সে যাই কেন হউক না, আমি নিশ্চয় করে বলছি—আমার হৃদয়ে আজ যে সঙ্গলালসা জেগেছে, একে কেহ ঠেকাতে পারবে না। এ লালসার চরিতার্থতার জন্যে প্রিয়া-দেহ, স্বপ্নাবেশ এ সবের কিছুরই প্রয়োজন নেই—এ মিলন হবে ধ্যানলোকের। আমি জানি, আমার এ বিরহ-বিধুরতার মধ্যে এমনও তাপ আছে এবং সে তাপ ক্রমে আমায় এমন ভাবেই তাপিত করবে—তৎকালীন ভাবনার মধ্যে আমি এমন তন্ময় হতে পারব যে, তারই দ্বারা অবসান ঘটবে বিয়োগ

ব্যথায়, সেই আবিষ্টতার মধ্যেই আস্বাদ লাভ করব তোমার মিলন-মাধুরী। জানি না, কথাটা তোমার অদ্ভুত ঠেকছে কি না। তা যদি ঠেকে ত বাল্মীকির রামায়ণ খুলে দেখো, সন্দেহ মিটে যাবে। এই অন্তর্গূঢ় মিলন-লাভের জন্যেই শ্রীরামচন্দ্র সসৈন্যে লঙ্কাপুরে প্রবিষ্ট হয়ে অশোকবন-নিঃসৃত সীতা-অঙ্গস্পৃষ্ট বায়ুর স্পর্শে পুলক-পূরিত অন্তরে ধ্যান মগ্ন হয়েছিলেন। 'মেঘদূতে' 'যক্ষ' যেখানে বলেছে—

'মৎসঙ্গং বা হৃদয়নিহিতারম্ভমাস্বাদয়ন্তী
প্রায়েণৈতে রমণবিরহে হ্যঙ্গনানাং বিনোদাঃ'।
'কিম্বা সে মোর সঙ্গ-সোহাগ সম্ভোগ করে কল্পনায়,—
প্রিয় বিরহিণী অঙ্গনাদের এরূপে শুনি দিবস যায়।'

সেখানে পরিচয় রয়েছে এবম্প্রকার মিলনেরই। শ্রীমদ্ভাগবতে এই সত্যোপলব্ধির ফলে গোপীগণ বলতে পেরেছেন—

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃত-পূরকেণ
হাসাবলোক-কলগীতজ-হৃচ্ছয়াগ্নিং।
নোচেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে॥

হে কৃষ্ণ! তোমার হাস্য-বিজড়িত অবলোকন এবং সুমধুর সঙ্গীতে আমাদের যে কামাগ্নি উদ্দীপিত হ'ল, তুমি তা অধরামৃত সিঞ্চনে নির্বাপিত না করলে, এই অগ্নির সঙ্গে তোমার বিরহাগ্নি সংযোজিত করে আমাদের দ্বিবিধ অগ্নিদগ্ধ হৃদয়ে যোগীদের মত ধ্যানযোগে তোমার চরণ-সান্নিধ্য লাভে সমর্থ করবে।

তুমি হয়ত বলবে, এত ঘুরে, এত জনে-স্থানে এতখানি কান্না কাঁদতে গেলে কেন তবে। আজ সংক্ষেপে শুধু এইটুকু জানিয়ে রাখছি যে, মানুষের কান্নার হেতুটা বুঝেছি বলেই বিশ্বের বিদ্রূপকে উপেক্ষা করে কাঁদবার সাহস হয়েছে। 'সমস্ত কান্নার সমুদ্র পেরিয়েও তার (মানুষের) পার আছে—এই জন্যেই সে কাঁদে, নইলে কাঁদতও না'—(ঘরে-বাইরে)।

কিন্তু আর নয়, এবার আমায় বিদায় দিতে হচ্ছে—ঐ দেখ, সমস্ত রাত্রির জাগরণে চোখ রাঙিয়ে সূর্য্য বেরিয়ে আসছে উষার কক্ষ থেকে, সদর দোরে দাই-মেয়ে চুলো জ্বালাতে এসে ডেকে-ডেকে সারা হ'ল।...

ব্যথার ব্যাপ্তি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

যুগ যুগ ধরি এ পৃথিবী সাথে
ছিল মোর পরিচয়,
নতুবা হৃদয় সুদূর ব্যথায়
এত কি কাতর হয় ?
যত বেদনার যত ইতিহাস পড়ি,
জন্মান্তর জীবন কি মোর স্মরি ?
বুক নিঙাড়িয়া সেই পুরাতন
অশ্রুধারা যে বয়।

২

তেমনি তীক্ষ্ণ, তীব্র, কঠোর—
আঘাত করে যে দান
উপশম কিছু হয় নাই তার
হয় নাই অবসান।
দেশের, জাতির, যুগের বাহির দুখ
দেয় একই ব্যথা—নিপীড়িত করে বুক,
পৃথিবী কতই ক্ষয়ে গেল—দেখি
তাহার নাহি তো ক্ষয়!

৩

তবে কি আমরা একই বুকের
যৌথ অংশীদার ?
যে বুকেতে ডোবে ভাসে রবি শশী
বহে প্রেম-পারাবার ?
অল্প ও নয়, এ ব্যথা নয় তো কাছে,
ইহাতে যে দেখি ভূমার পরশ আছে,
বহু ব্যবধান, বিবিধ বিভেদ
তবে কি কিছুই নয় ?

৪

একই পাত্রে সুধা খাই মোরা,
একই পাত্রে বিষ,
এক সাথে আছে হরিহর হয়ে
আমাদের জগদীশ।
জানায় অচেনা লাগি এ যাতনা ভোগ,
পরস্পরের সুনিবিড় সংযোগ,
আত্মার এই আত্মীয়তার
পীড়নই মানুষ সয়।

রবীন্দ্রনাথ ও "সোঽহম্"

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

১৩৬৯ সালের কার্ত্তিক মাসের "প্রবাসী"তে "রবীন্দ্রনাথের সাধনায় সোঽহং" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। উহাতে ভ্রমাত্মক উক্তি ও সোঽহং তত্ত্ব ব্যাখ্যায় লেখকের (শ্রীসুধীরচন্দ্র কর) যে গুরুতর ত্রুটি ছিল অদ্যাপি তাহার কোনও প্রতিবাদ বাহির হয় নাই; কিন্তু অধুনা রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মমত বা "ধর্ম্মচিন্তা" ভিত্তি করিয়া সাময়িক পত্রাদিতে তদীয় মতের যে অপপ্রচার বা অপব্যাখ্যা চলিয়াছে তদ্দর্শনে, অতি বিলম্ব হওয়া সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করা প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

প্রবন্ধটির অবতরণিকাভাগে লিখিত হইয়াছে—

"একদা আদি ব্রাহ্ম-সমাজেও কেবল ব্রাহ্মণেরই উপাসনা-পরিচালনার অধিকার ছিল। কবি তাঁর কালে সে বিধি তুলে দেন। জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে যোগ্য ব্যক্তি মাত্রকেই তিনি আচার্য্যত্বে বরণ করে নেন।" ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে এই উক্তিটি অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বহু পূর্ব্বেই আদি ব্রাহ্ম-সমাজে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ উপাচার্য্য দ্বারা উপাসনা পরিচালনার নিয়ম ভঙ্গ করেন।

স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী লিখিত মহর্ষির জীবন চরিতে দেখিতে পাই—

"২৭শে চৈত্রের যে সভায় ব্রাহ্ম সমাজের ব্যবস্থার নানা গুরুতর পরিবর্ত্তন হইল, সেই সভার সভাপতি দেবেন্দ্রনাথের এক চিঠি পড়িলেন। তাহাতে তিনি কেশবচন্দ্রকে ১লা বৈশাখ হইতে কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্যের পদে অভিষিক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সে বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মদিগের মত জানিবার জন্ম প্রার্থনা করিয়াছিলেন।…১লা বৈশাখ (১৭৮৪ শক) সমাজ ঘরে আর লোক ধরে না। যেমন উপাসনা হইয়া থাকে তাহা হইয়া গেলে, দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে আচার্য্য পদে কেন নিয়োগ করিতেছেন তাহার কারণ খুলিয়া বলিলেন"…(৩৪২-৪৩ পৃষ্ঠা)।

আদি ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত বা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই অবগত আছেন যে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনকে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য পদে নিয়োগ করিয়া মহর্ষি সাময়িকভাবে হইলেও ব্রাহ্মণ আচার্য্য নিয়োগের প্রথা ভঙ্গ করেন। আচার্য্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত মহর্ষির "আত্মজীবনী"র ৪১১ পৃষ্ঠায় আরও দেখা যায়, কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্র ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহার প্রদেশের তিন ব্যক্তিকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করান, এবং দেবেন্দ্রনাথকে একজন বেদজ্ঞ উপদেষ্টা পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া চিঠি লেখেন। দেবেন্দ্রনাথ লালা হাজারীলালকে পাঠাইলেন। হাজারীলাল শূদ্র এবং বেদবিৎ নন, সেইজন্ম রাজা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন। যাহাই হউক, হাজারীলালকে তিনি বিদায় করিলেন না।" ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, মহর্ষি ব্যক্তিগত ভাবে যে সকল অনুষ্ঠানে কার্য্য করিতেন সেখানে জাতি-নির্ব্বিশেষে ভগবদ্ভক্ত যোগ্য ব্যক্তিকেই আচার্য্য ও উপদেষ্টার কার্য্যের ভার দিতেন। ইহার আরও প্রমাণ এই যে, "সে যুগে অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ব্রাহ্ম-সমাজে উপদেশ দান করিতেন।" কিছুকাল পরে উপবীতধারী ও উপবীতত্যাগী উপাচার্য্যদিগের বেদীতে বসিয়া উপাসনা করার অধিকার লইয়া যখন প্রাচীন ও অগ্রসর দলের মধ্যে প্রবল বিরোধিতা উপস্থিত হইল তখন এই উভয় দলের মধ্যে "মিলন হওয়া নিতান্ত উচিত, এই কথা মনে করিয়া তিনি (মহর্ষি) পৈতাধারী ও পৈতাত্যাগী, অগ্রসর ও অনগ্রসর দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মের জন্যই উপাসনার বেদী খোলা রাখিয়াছিলেন" (অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, ৩৩২ পৃঃ)।

"শান্তিনিকেতন" আশ্রমে "ব্রাহ্ম সমাজের আচারকে আর সকলের উপরে চাপানো" হয় না—ইহা সপ্রমাণ করিতে গিয়া লেখক সম্ভবতঃ কোনও অনভিজ্ঞ গ্রামবাসীর অজ্ঞানতাপ্রসূত, বা কল্পিত একটি অভিযোগ খণ্ডন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু আশ্রমে যে অসাম্প্রদায়িক ভাব রক্ষিত হয় তাহারও আদিতে যে আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি ছিলেন তাহা আশ্রমের ট্রাষ্ট-ডীড হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় (দ্রষ্টব্য, ঐ ৬২৪ পৃঃ)। অতঃপর "রূপ ও অরূপ" প্রবন্ধ হইতে "মূর্ত্তিকেই বিশেষভাবে অবলম্বন" করিয়া পূজা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধার করিয়া লেখক প্রবন্ধের কলেবর পুষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু উল্লিখিত দুইটি প্রসঙ্গই পরবর্ত্তী মূল বক্তব্য বিষয়ের সহিত যুক্ত নয়। প্রমাণস্বরূপ বলা যায়—"রূপ ও অরূপ" হইতে স্বতন্ত্র এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে "সোঽহং" ভাবের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অতঃপর প্রবন্ধের প্রধান বিষয় "রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মসাধনায় সোঽহম্"-এর কথা। কোনও সাধকের "ধর্ম্মসাধনা" বলিতে যাহা বুঝি তাহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং অন্তরের বস্তু; এজন্ম উহার প্রকৃত রূপ সাধকের সঙ্গে নিয়ত বাস করিয়াও তাঁহার পার্শ্বচর ব্যক্তি সম্যক্ জানিতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ mystic বা মরমী সাধক ছিলেন ইহা সর্ব্বসাধারণের নিকট সুবিদিত। এই শ্রেণীর সাধকের ধর্ম্মসাধনার গূঢ় কথা সাধারণ পাঠকবর্গের পক্ষে সম্যক্ জ্ঞাত হওয়া সহজ নয়। তবে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তাধারার নানা দিক তিনি তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধাদি ও উপদেশাবলীর মধ্য দিয়া পরিস্ফুট করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে "শান্তিনিকেতন", "সঞ্চয়", "আত্মপরিচয়" প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলির অন্তর্গত প্রবন্ধাবলীতে তিনি স্বীয় বক্তব্য, অনেক স্থলেই নানা উপনিষদ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকের বা বাক্যাংশের সাহায্যে, নিজ

বিশিষ্ট চিন্তাধারার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "নিজ চিন্তাধারার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া"—এই কথাটি বলা প্রয়োজন এই জন্য যে, উপনিষদের "কোন কোন বাক্যের অস্পষ্টতা হইতে একাধিক অর্থ করাও সম্ভব ; এবং এই সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়াই বৈদান্তিকেরা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইতে পারিয়াছেন" (লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা—ভারত-দর্শন সার, ২৪৮ পৃ)।

"সোঽহমস্মি" এইরূপ একটি উপনিষদ-উক্ত বাক্য ; শঙ্করাচার্য্য বেদান্তের ভাষ্যকার হিসাবে জীব ও ব্রহ্মের ঐকমত্য ব্যাখ্যা করিয়া যে অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহার ভিত্তিস্বরূপ কয়েকটি শ্রুতি বাক্যের মধ্যে (যথা, "তত্ত্বমসি", "সোঽহমস্মি", "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" প্রভৃতি) ইহা একটি প্রধান বাক্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে কোনও স্থানেই অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদক কোনও কথা বলেন নাই। এতদ্ভিন্ন তিনি স্বয় স্বতন্ত্রের আলোকে "সোঽহমস্মি" এই বাক্যের যে ব্যাখ্যা স্বয়ং দিয়াছেন (দ্রষ্টব্য— "সঞ্চয়", "আমার জগৎ") তাহাতে অদ্বৈতবাদমূলক কোনও ভাব নাই। তাঁহার সাধনার যে মূল মন্ত্রটি তিনি জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রচার করিয়াছেন তাহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সেইটির ভাবেই 'সোঽহং' বাক্যের ব্যাখ্যায় বিবৃতি করিয়াছেন (দ্রঃ "অসীম যেখানে আপনাকে সীমায় সংহত করেছেন সেখানেই অহঙ্কার। সোঽহমস্মি। সেখানেই তিনি হচ্ছেন আমি আছি। অসীমের বাণী, অর্থাৎ সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশই হচ্ছে, অহমস্মি। আমি আছি।...সমস্ত সীমার মধ্যেই অসীম বলছেন, অহমস্মি")। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রবন্ধলেখক রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত প্রবন্ধের কোনও অংশ তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থনে উদ্ধৃত করা দূরে থাকুক, উহার নামোল্লেখও করেন নাই। ইহার ফলে যে সকল পাঠক রবীন্দ্রনাথের "আমার জগৎ" প্রবন্ধ পড়েন নাই তাঁহারা মনে করিবেন লেখক রবীন্দ্রনাথের রচনা-বলীর মধ্যে তাঁহার 'সাধনায় সোঽহং' তত্ত্বের সন্ধান পাইয়া উক্ত বিষয়ে একটি মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। প্রাঞ্জল ভাবে ও ও অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ব্যাখ্যাটি, ও তাহাকে বাদ দিয়া উহার যে ভাষ্য বর্ত্তমান লেখক লিখিয়াছেন এই উভয় প্রবন্ধ পর পর পাঠ করিলে পাঠকবর্গই সম্যক্ বিচার করিতে পারিবেন রবীন্দ্রনাথকৃত সোঽহং-তত্ত্বের ব্যাখ্যাটির ভাব লেখকের ভাষ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে কিনা। এইখানে মনে পড়ে "গোরা" উপন্যাসের একটি বাক্য—"সে (অবিনাশ) গোরার শিষ্য। গোরার মুখ হইতে সে যাহা শোনে তাহাই সে নিজের বুদ্ধির দ্বারা ছোট এবং নিজের ভাষা দ্বারা বিকৃত করিয়া চারিদিকে বলিয়া বেড়ায়।" রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কিত একটি বিশিষ্ট মতবাদ জ্ঞাপক ('সোঽহমস্মি') বাক্যের স্বীয় ভাবানুযায়ী যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা অপরের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের নিজ বাক্য উদ্ধৃত না করিয়া অথচ তাহার সমগ্র ভাবধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পাঠকবর্গের নিকট যথাযথ পরিবেষণ করা দুরূহ কার্য্য, বিশেষতঃ যখন উক্ত 'সোঽহং ভাব' কিরূপে তাঁহার ধর্ম্মসাধনার বস্তু হইয়াছিল বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়।

ঘুম

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত

মৃতকল্প স্তব্ধ নীল সমুদ্রসৈকতে বৃথা কাটে ক্লান্ত দিনরাত
জীবনের অর্থ খুঁজে খুঁজে। চুনকো এ জীবনের রামধনু রঙ
ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে নেভে। আসে নিত্য প্রত্যাশিত নিষ্ঠুর সংঘাত
একাকার করে সব : তবু বাজে মিঠে রব প্রাণের সারঙ।

কুটিল চক্রান্ত থেকে সুদূর প্রশান্তি পথে এবার উধাও
যেখানে শত্রুতা নেই নিস্তব্ধ রাতের তারা জাগে
পলাতক ভীরু মন : সবুজ শস্যের শীষে দিগন্ত রেখাও
মুছে যায় মন থেকে, শীতল পাণ্ডুর স্পর্শ জড়ায় সোহাগে।

এখানে জীবন নেই ; বাস্তুত্রস্ত প্রত্যহের হিংস্র বাতাসে
ভয়ার্ত প্রহর এখানে অনেকে গোনে। একান্ত নির্জ্জনে
শৈবালজড়তাচ্ছন্ন স্থবির হৃদয় জাল বুনে বুনে
বিভোর অলীক স্বপ্ন রজনীর নীলাভ আকাশে।

কপট বান্ধব প্রেমে পৃথিবীর প্রাণসুধা যদি নিভে যায়
রক্তের উন্মত্ত স্রোতে বারংবার কসাইএর লোভ ওঠে জ্বলে,
পুড়ে পুড়ে খাঁটি হওয়া সে মন্দের ভাল এই মন বলে
যেখানে যৌবন মৃত : ঝিঁ ঝিঁর ঘুম্‌রে ক্লান্ত প্রাণ অঘোরে ঘুমায়।

অন্ধ প্রদীপ

শ্রীবিজনলতা দেবী

পদত্যাগ করবেন বলে স্থির করে রেখেছিলেন সুপ্রভা চৌধুরী। পশ্চিমের একটা মেয়ে স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হয়ে এদেশে আসেন যখন, তখন বয়স ছিল কম। আজ পঁচিশ বছর বয়সের কথাই যেন একটা স্বপ্ন। বিয়ে করেন নি তিনি, চিরকুমারী। স্কুলের চাকুরিতে সুনাম অর্জন করেছেন। যথারীতি পদত্যাগ করার সময় অবশ্য এখনও হয় নি তাঁর। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, আর ভাল লাগে না এই নীরস জীবনটাকে। নিজেকে ছুটি দেবেন এইবার। প্রভিডেণ্ড ফণ্ডে যে টাকাটা আছে তা তুলে নিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন স্থির করে রেখেছেন। আজীবন তিনি সুনামের সঙ্গে চাকুরি করেছেন। তাঁর চরিত্র-গৌরবে স্কুলও গৌরবান্বিত। স্কুল-সংলগ্ন একখানি ছোট বাংলো-বাড়ী, আর তার সঙ্গে এক টুকরো ফুলের বাগান তাঁর নিজেরই। একদা যখন জমির দাম কম ছিল, তখন এই সম্পদটুকু তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। নিতান্ত সাদাসিধা দু'একটা আসবাব আর সাধারণ খাওয়া-পরা নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। আজ পদত্যাগ করার পরও এটা তাঁর থাকবে। ধীরে ধীরে নিজেকে তিনি আবিষ্কার করবেন আবার। যে বসন্তের দিনগুলি তাঁর এই মাষ্টারনী-গিরি করতে করতে ঝরে পড়ে গিয়েছে, সেই বিগত দিনগুলিকে সঞ্চয় করে রাখবেন মনের ভিতর। যে দিন গেছে—তা যাক, কিন্তু যে দিন আছে এখনও বাকি, তাকে কেন আর গ্রামার, কন্‌জুগেশান, ট্র্যান্‌স্লেশনের বেড়া ঘিরে রাখা? তাঁকে এবার ছুটি নিতে হবে। যৌবন গত হয়েছে। শুকনো ডালপালা মেলে দেহটা একটা প্রকাণ্ড ব্যঙ্গের স্তূপ হয়ে উঠেছে। রুক্ষমেজাজ, কর্কশস্বভাব শিক্ষিকা হয়ে উঠেছেন আজ। লাবণ্যের জোয়ার কি করে বয়ে যায়, কি অপূর্ণতার শ্রীহীন হয় যৌবন, তা তো অজানা নয় তাঁর।

সেদিন আর ফিরবে না, তবু ছুটি দিতে হবে জীবনকে। ছক্‌ কাটা, রুটীন বাঁধা জীবনকে দেখলে ভয় করতে থাকে কেমন যেন তাঁর। এরকম জীবন তিনি চান নি। স্কুল থেকে ফিরে অবধি একলা চুপ করে জানালার কাছে বসে আছেন সুপ্রভা। স্কুলের ছুটির পর আজ মহিলাদের একটা মিটিং ছিল। মিটিং থেকে ফিরতেই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। মেয়েদের স্বাধীন জীবিকার সপক্ষে মতামত জানাবার জন্যই মিটিং হয়েছিল। অনেক মহিলাই নিজের নিজের সুচিন্তিত মন্তব্য লিখে এনেছিলেন, পড়েও ছিলেন অনেকে। সুপ্রভাও কিছু লিখেছিলেন, কিন্তু পড়েন নি। মহিলা-বৃন্দের দিকে তাকিয়ে শুধু স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন। বার বার মনে হয়েছিল তাঁর—এরা ত শুকিয়ে উঠে নি? ব্যর্থ হয় নি এরা আমার মত! ব্যর্থ হয় নি বলেই ব্যর্থতার বেদনা বুঝতে পারছে না। তাই জোরগলায় মন্তব্য জানাতে পারছে? মনে হয়েছে শুধু এদের ঘরে ছেলেমেয়ে আছে। মা হবার জন্য ভগবান যাকে সৃষ্টি করেছেন, এরা তাকে ব্যর্থ করে তোলে নি। এরা সংসারের নানা খুঁটিনাটির মধ্যে ডুবে গেছে। তবু হারায় নি নিজের নারীত্বকে! আর তিনি—? খিটখিটে অকালবৃদ্ধার রূপ নিয়েছেন। নিজের শুচিতা বাঁচিয়ে চলতে চলতে এমন অভ্যাস করেছেন যে, বাতাসে যেন বদ্‌নামের গন্ধ পান।

'আপনি কিছু পড়লেন না?'—প্রশ্ন করেছিলেন একজন মহিলা। প্রশ্ন শুনে তাড়াতাড়ি হাতের লেখা কাগজগুলো হাত-ব্যাগে পুরে নিয়েছিলেন সুপ্রভা। তাঁর কিছু পড়বার নেই। বলবারও নেই। জীবনকে যে ভরপুর করে নিতে পারে নি, কি অধিকার আছে তার জীবনের সম্বন্ধে মন্তব্য করার? সুপ্রভা বলে-ছিলেন, 'না আমার কিছু বলবার নেই।'—'তবে কি এনেছিলেন কাগজগুলোয় লিখে? কবিতা নাকি?' প্রশ্ন করেছিলেন আর একজন মহিলা। একটা ছোট নিশ্বাস ফেলে সুপ্রভা বলেছিলেন, 'না, কবিতা নয়। কবিতা আর লিখি না, লিখতাম বহুকাল আগে, সে সব শুধু স্বপ্ন।'

সত্যই তিনি কবিতা আর লেখেন না। প্রতিজ্ঞা করে লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। যখন তিনি প্রথম কবিতা লিখতে সুরু করেন, তখন অন্তর ভরে সে কি উল্লাস! সে কি রোমাঞ্চবিহ্বল তনুমন! নিজেকে একটু একটু করে উন্মোচনের মাদকতা! কিন্তু বেশী দিন এ স্পর্দ্ধাকে সহ্য করে নি তাঁর পরিজন ও গুরুজনেরা। কয়েকটা কবিতা মাসিকে প্রকাশিত হবার পরই গুরুজনদের টনক নড়ল। বিধিমতে সতর্ক করে তাঁরা তাকে ধমকে দিয়েছিলেন এজন্য। গৃহিণীরা তাকে ধিক্কার দিয়েছিলেন। কর্তারা করেছিলেন শাসন ও নিষেধ। সমবয়স্কারা তাঁকে বেহায়া বলে গাল দিয়েছিলেন। মেয়েরা প্রেমের কবিতা লিখবে একথা অবিশ্বাস্য ও অনভিপ্রেত। যে মেয়ে লেখে, সে নিশ্চয় উচ্ছন্নে যাওয়া মেয়ে। সে কবিতার খাতাখানা আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছিলেন গুরুজনেরা। পাপ একটা, তাকে ধ্বংস করা দরকার।

আজ বার বার নিজের অতীতটাকে মনে পড়ে যায় সুপ্রভার। প্রথম যখন তিনি বিয়ে করতে চাইলেন, তখন গুরুজনরা শুধুই যে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তা নয়, দারুণ দুঃখিতও হয়েছিলেন। বিয়ে? মেয়েরা নিজে হতে বিয়ে করতে চাইবে, এ কেমন কথা? কস্মিন্‌কালেও এমন কথা কেউ শুনেছে আমাদের দেশে? সময় হলে গুরুজনরা তার জন্যে পাত্র দেখে বিয়ে দেন। নিজেই নিজের প্রার্থিত পাত্র বেছে নিয়ে বিয়ে করতে চাইবে এমন কথা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল তাঁদের? সুপ্রভার মনে আছে, তাঁর জ্যেঠামশাই বলেছিলেন, 'এসব হ'ল মেয়েদের বেশী লেখাপড়া শেখানোর জন্য।'

তখনই মানা করেছিলাম, বেশী পড়াতে—তা তোমরা ত শুনলে না, এখন বোঝ এর ঠ্যালা!' সুপ্রভার মা বেঁচে ছিলেন না তখন, কিন্তু বাবা শুনে বিরক্ত হয়েছিলেন। সুপ্রভার উপার্জ্জনের মোটা টাকায় তাঁর সংসার চলছে, টাকা বন্ধ হয়, এমন কোন কাজ তিনি অনুমোদন করতে পারেন না। বাধা দিয়ে ছিলন তাঁর ভাই বীরেন সব থেকে বেশী। কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলেছিলেন—আমার ম্যাট্রিক একজামিনের পরে তুমি বিয়ে করলে পারতে দিদি—বাবার চাকরি নেই, তোমার বিয়ে হয়ে গেলে কে আমার পড়ার খরচ দেবে শুনি—? তখন কি লোকের বাড়ী চাকর-বাকরের কাজ করব?

একবার দারুণ একটা ধাক্কা লেগেছিল তাঁর মনে। তিনি বিয়ে করেন নি তাই। এখনও মনে আছে সেই স্বপ্নের রেশ। আজও মনে পড়ে সেই তরুণ যুবককে। প্রত্যাখ্যাত হয়ে সেই যে সে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল আর ফিরে আসে নি।

বীরেনকে তিনি লেখাপড়া শিখিয়েছেন। তাকে কলেজের পড়া থেকে ইঞ্জিনিয়ারীং পর্যন্ত পাস করতে সাহায্য করেছেন। বিয়েও দিয়েছেন তার। এই চাকরি করেই তাকে সুযোগ দিয়েছেন মানুষ হবার জন্যে। আজ বীরেনের ঘরে স্ত্রী, সন্তান, শ্রী ও আনন্দ। আর তিনি? মেয়েদের অর্বাচীন ভুলের সংশোধন করতে করতে হারিয়ে ফেলেছেন নিজের নারীত্বকেই। কবে যেন একদিন প্রেমের কবিতা লিখতেন তিনি। নিজের একক শুভ্র শয্যায় শুয়ে স্বপ্ন দেখতেন। নিজের তনুদেহকে অপলকে নিরীক্ষণ করতেন। এক দিন এই দেহ ধন্য করে জন্ম নেবে তাঁর সন্তান—কোন এক অনাগত মনীষা, কোন এক অনাগত আদর্শবাদ মূর্ত্ত হয়ে উঠবে তাঁরই কোলের মধ্যে। শিশুদেবতা রূপে জন্ম নেবে তাঁর মনের গোপাল। সর্ব্বাঙ্গের উপর দিয়ে আনন্দের ঢেউ বয়ে যেত তখন। দিবাকরের দিকে চেয়ে চেয়ে প্রস্ফুটিত কমলের মত প্রত্যাশায় বিকশিত হতে চেয়েছিল তাঁর জীবন।

মস্ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন সুপ্রভা। এমনিই হয়। সেদিন আর নেই। পিটপিটে অকালবৃদ্ধার রূপ নিয়েছেন আজ তিনি কি জন্যে? রং রূপ মাধুর্য্যকে হারিয়ে ফেলেছেন এই চাকরির বেড়াজালের ভিতর। মেয়েরা মা হতে চায়। তারা মায়ের জাত। ঐখানেই তাদের সার্থকতা। তারা আশ্রয় নেয় যতটুকু—তার চেয়ে ঢের বেশী দেয় আশ্রয়। সর্ব্বপ্রথম সে জননী, তার পর প্রিয়া। প্রিয়ার প্রচ্ছদপটে ঘিরে একটি প্রচ্ছন্ন জননীকেই বরণ করে ঘরে তোলে পুরুষ।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন সুপ্রভা চৌধুরী, দেওয়ালে টাঙানো ছোট আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখতে লাগলেন নিজের। গাল বসা, চোখের কোণে কালি। কপালের চামড়ায় রেখার শত কুঞ্চনে শত চিহ্ন আঁকা। হাড়সার ড্যাবা হাড়, দেখলে নিজেরই ঘৃণা হয় নিজের উপর। বারান্দায় বেরিয়ে এলেন সুপ্রভা। ছোট এক টুকরা মাটির উঠান জুড়ে নানা রকম ফুলের গাছ। বারান্দার একপাশে তোলা উনুন জেলে দাসী লছমীয়া তাঁর জন্যে রাত্রের রুটি তরকারি তৈরি করছে। সুপ্রভা বাগানে বেরিয়ে এলেন। হাসনাহানার ঝাড়ের পাশ দিয়ে চলতে লাগলেন। বাতাসে ভারি মনোরম গন্ধ। আকাশে চাঁদ উঠেছে, পথের মাঝে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো ছিটিয়ে পড়েছে। স্তব্ধ অন্ধকার পথ। সমস্ত নিস্তব্ধ, জনহীন রাত্রি। ভারি ভাল লাগছিল সুপ্রভার। তিনি অন্যমনে বাগান ছেড়ে বেরিয়ে এলেন পথে। অভিভূতের মত চলতে লাগলেন পথে।

নিস্তব্ধ রজনীর সীমাহীন অন্ধকারটা বিপুল এক আনন্দের মত প্রতিভাত হতে লাগল তাঁর মনে। ধূমল পাহাড়, পথের দু'ধারের তরুশ্রেণী, অগণিত নক্ষত্রের ঝিকিমিকি ভরা আকাশের তলায় হাঁটতে হাঁটতে দু'চোখে জল আসতে লাগল। নিজের একাকিত্বে মনোহর জীবনটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে আজ কাছে। রাতের নির্জ্জনতার নিঃশেষে নিজেকে সমর্পণের আনন্দে ভরে গেল অন্তর। মনে মনে বলতে লাগলেন—আমি আছি—আছি—নিঃশব্দে ঘন নৈকট্যের মাঝে নিজেকে সমর্পণ করার আনন্দ নিয়ে বেঁচে আছি আমি। কবে এসেছিল বসন্ত তা গিয়েছি ভুলে, ধন্য হই নি, রিক্ত হয়েছি দিনে দিনে। তবু এই রিক্ত নিঃস্ব জীবনটাই আজ চেয়ে নিয়েছে পৃথিবী। ধূলি জল গাছ-পাতা ঘেরা, আকাশের তলায় নিঃশেষে আমায় গ্রহণ করেছে সে। আর আমি স্কুলের শিক্ষিকা সত্তর টাকা মাইনে পাওয়া অকালবৃদ্ধা নিঃস্ব নারী নয়। আমি সার্থক, আমি ধন্য, আমার উপস্থিতি পৃথিবী সাদরে গ্রহণ করেছে। পথে পথে অনেক এগিয়ে গেলেন সুপ্রভা, বাড়ী ফেরার কথা তাঁর মনে এল না।

—শুনছেন—থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন সুপ্রভা। পথের মাঝখানে সাইকেল থেকে নেমে পড়ে সত্যবিকাশ তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। ভয়ানক চমকে উঠেছিলেন প্রথমটা সুপ্রভা, পরে চিনতে পারলেন, সে সত্যবিকাশ। ছেলেটি সম্প্রতি ইঞ্জিনীয়ার হয়েছে। কলেজ থেকে বিশেষজ্ঞ হবার জন্য তাকে এবার ইংলণ্ডে পাঠানোর কথা হয়েছে। তাঁরই স্কুলের সেকেণ্ড মিসট্রেস, রঞ্জনাকে সে বিয়ে করতে চায়। বহু বার শিক্ষিতা মেয়েমহলে সে কথার আলোচনা হয়েছে। রঞ্জনার নিজেরও পরিপূর্ণ সম্মতি ছিল একথাও শুনেছেন তিনি। হঠাৎ রাত্রের অন্ধকারে এমন ভাবে তাঁর গতিরোধ করে উপস্থিত হওয়ায় ভারি বিরক্ত হয়ে পড়লেন সুপ্রভা।

—কি দরকার তোমার—ভারি ত ইয়ে দেখছি—

সত্যবিকাশ হাত জোড় করে ক্ষমা চাইল। বলল—ভয়ানক বিপদে পড়েছি বড়দি—কোন উপায় নেই, তাই আপনার শান্তি ভঙ্গ করলাম। শুনেছেন রঞ্জনার বাবা আমাদের বিয়েতে সম্মতি দেন নি?—

ভারি বিরক্ত হলেন সুপ্রভা।

—তা কি করতে পারি আমি? রঞ্জনার বাবা নিশ্চয় আমার স্কুলের ছাত্র নন্—

ফিরে চললেন সুপ্রভা এবার বাড়ীর দিকে। জোরে জোরে

হাঁটতে লাগলেন এবার। বাইকটা ঠেলতে ঠেলতে সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল সত্যবিকাশ।

—আপনি মুখ ফেরালে কে থাকবে আমার। ভেবে দেখুন একটু—প্রথম যখন টাকার অভাবে এগজামিন দেওয়া বন্ধ হয়েছিল, তখন আপনিই ত সাহায্য করেছিলেন। ভাল চিনতেনও না, আপনার ভাইয়ের বন্ধু বলে শুধু জানা ছিল। আজ কূলে এসে ডুবে যাব? উপায় হবে না? ভারী হয়ে উঠল সত্যবিকাশের কণ্ঠস্বর। একটু উদাস নরম গলায় বললেন সুপ্রভা—'আমি কি করব বল? আমি ত তার সত্যিকার অভিভাবক নয়। রঞ্জনাকেই বল না মীমাংসা করুক।'

'তবেই হয়েছে।'—হতাশ হয়ে এলিয়ে পড়ল সত্যবিকাশ। বাইকটা গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল পথের ধারে। 'রঞ্জনার ভাই-বোন তারই উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করে আছে যে। সে চাকরি না করলে চলবে কেন? কোনমতেই তাকে রাজী করান যাবে না।' 'তবে আর কি হবে? রঞ্জনাই যখন রাজী নয়।'—হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন সুপ্রভা, এগিয়ে চললেন দ্রুত পদক্ষেপে। সত্যবিকাশ তবু অনুসরণ করতে লাগল তাঁকে। আমার অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারছেন না আপনি। ভাল করে ভেবে দেখুন বড়দি—দোহাই আপনার। বিলাত যাওয়ার সব ঠিকঠাক আমার। কলেজ অবশ্য যাওয়া আসা আর পড়ার খরচ দেবে, কিন্তু খাওয়া থাকা হবে কিসে? তাই বাবা আমার বিয়ে দিয়ে টাকা যোগাড় করতে চাইছেন।—মৃদু একটু হেসে উঠলেন সুপ্রভা। 'ভালই ত। যাও না বিলেত, বুদ্ধিমান ছেলে তুমি—এ ত স্বর্ণসুযোগ তোমার. রঞ্জনাকে বিয়ে করলে ত আর টাকা পাবে না।'

'টাকা! সামান্য টাকার জন্য আমি বিয়ে করব বড়দি? টাকা কি আমি পরে রোজগার করব না? রঞ্জনার জন্যে যদি আমার বিলেত যাওয়া বন্ধ হয় জন্মের মত সেও অনেক ভাল।'

সুপ্রভা কথার উত্তর দিলেন না। এগিয়ে চলতে লাগলেন। সত্যবিকাশ সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল।—'রঞ্জনার মনের কথা আমি জানি। সে যদি বিদ্রোহ করে কেউ বাধা দিতে পারে না। আমি পালিয়ে যেতে চাই তাকে নিয়ে, যদি আপনি···।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন সুপ্রভা।—'তোমার স্পর্দ্ধার সীমা নেই দেখছি! জান আমার স্কুলের সুনামের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। কোন দিন এসব আমি অনুমোদন করতে পারি?' বিস্ময়ে স্থির হয়ে গেল তাঁর দুই চোখের দৃষ্টি। 'তা জানি।'—নরম গলায় বলল সত্যবিকাশ, 'আপনারা ভয়ানক ভাল। কেন এত ভাল আপনারা? কেন এত নিরীহ? কেন করতে চান না বিদ্রোহ? কেন বিদ্রোহীকে সমর্থন করেন না? কি পেয়েছেন জীবনভোর? নিজে শূন্য হয়েছেন, শূন্য করেছেন অপরকেও। আজীবন ঠকেছেন শুধু। একটু ব্যতিক্রম কি করাতে পারেন না? ঘটাতে পারেন না এর সম্ভাবনা?'

ভারি বিচলিত দেখাল সুপ্রভা চৌধুরীকে। স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছেন যেন। কি যেন একটা বলতে গেলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না। বাড়ীর কাছেই এসে পড়েছিলেন, দ্রুত পদে ঢুকে পড়লেন ভিতরে। যেন পলায়ন করলেন সেখান থেকে।

বাড়ীর ভিতর এসে ধপ করে বসে পড়লেন একটা চেয়ারে। সমস্ত শরীর কাঁপছে তাঁর। কল কল করে ঘাম বরছে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে। কেঁপে উঠছে সমস্ত অন্তর বার বার।

মনে পড়ছে তাঁর নিজের জীবনের তরুণ পথিকের কথাগুলো।

—কেন তুমি এত ভাল? কেন চাও না সহজ হতে? তুমি রাজী হও সু—তোমায় নিয়ে আমি অন্য দেশে চলে যাই।

সে অন্য দেশে তাঁর যাওয়া হয় নি। অস্থির ভাবে বাড়ীর বারান্দায় বেড়াতে লাগলেন সুপ্রভা। শুচিতা বাঁচিয়ে চলতে চলতে জীবন তাঁর আজ সঙ্কুচিত, সংস্কারে বাঁধা হাত-পা। আকাশে বাতাসে বদনামের গন্ধ পেয়ে কাতর হয়ে উঠে সমস্ত অন্তরাত্মা। মনে মনে বলতে লাগলেন—আমার জীবন আজ শক্ত কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো অকালবৃদ্ধার ছবির মত। কিন্তু ওদের? ওদের ত সময় আছে, বয়স আছে, বসন্তের দিন আছে ওদের? ওরাও কি এমনি হয়ে উঠবে? মনে পড়ল রঞ্জনার তরুণ সুন্দর মুখখানা, মনে পড়ল সত্যবিকাশকে। না না, এ জীবনের পুনরাবৃত্তি হোক এটা তিনি সত্যই চান না। কোন দিন কোন শত্রুর জন্যও চান্ না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে আছেন সুপ্রভা চৌধুরী। রঞ্জনার সঙ্গে সত্যবিকাশের বিয়ে দিয়েছেন তিনি। তারা দু'জনে এই মাত্র যে ট্রেনটা ছাড়ল তাতে করে কলকাতায় রওনা হয়ে গেছে। সুপ্রভা চৌধুরী নিজের প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের সমস্ত টাকাটাই ওদের বিয়েতে যৌতুক দিয়েছেন। সত্যবিকাশ আর রঞ্জনাকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছেন তিনি। ট্রেন ছেড়ে গেছে, গম গম শব্দ আর শোনা যায় না। দুখানা হাস্যোজ্জ্বল মুখ মিলিয়ে গেছে দূরে। প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের টাকায় সত্যবিকাশ বিলাত যেতে পারবে। অন্যমনস্ক ভাবে সুপ্রভা দূরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্ততঃ একটা জীবন এই ধরণের পুনরাবৃত্তি থেকে রক্ষা পাবে। তাঁর চাকরি ছাড়লে চলবে না। রঞ্জনার ভাই-বোনদের পড়ার খরচ অতঃপর তিনিই যে দেবেন স্থির করেছেন। পদত্যাগ-পত্রখানা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে বাতাসে ভাসিয়ে দিতে হবে এবার। আর রঞ্জনার গোপনে পলায়ন, গোপনে বিবাহে সাহায্য করার জন্য যে অপযশ তার এত দিনের সুনামকে ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকবে, তাকেও বহন করতে হবে আজীবন তাঁকেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মন্থর পদক্ষেপে তিনি ফিরে চললেন বাড়ীর দিকে।

আঞ্চলিক বাহিনীর উন্নতি

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের দ্বারা কতটুকু সাফল্য লাভ করা যায়, গত চার বৎসরের মধ্যে আঞ্চলিক বাহিনীর উন্নতির কাহিনী হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহার গোড়াপত্তনের পর ইহার উন্নতি সম্বন্ধে যে সকল উচ্চ আশা পোষণ করা গিয়াছিল, শীঘ্রই তাহা কার্য্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইল এবং ইহা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিল যে, ইহাতে লোক আমদানী দুঃসাধ্য ব্যাপার। স্থায়ী ভাবে সকল সময়ের জন্য কর্ম্মলাভের সুযোগ না থাকায় ইহাতে চাকরি প্রার্থীদের সুরাহা হওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। চাকরিতে বা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা তখন তখনই আঞ্চলিক বাহিনী দ্বারা সম্ভাব্য উন্নতির বিষয় উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। উহা বর্ত্তমানে যেরূপে আছে, তা ভারতে কতকটা অভিনব ব্যাপার।

ইহা ছাড়া অন্যান্য অসুবিধাও ছিল। যাহারা যোগদান করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকেও নিজ নিজ মনিবের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী আঞ্চলিক বাহিনীতে যোগ দিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদিগকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন। বেসরকারী মনিবেরা কিন্তু নিজেদের কর্ম্মচারীদিগকে ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক হইলেন, কেননা তাঁহাদের নিকট ইহার মানে হইতেছে কাজের সময় নষ্ট হওয়া। যাহারা আঞ্চলিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, কোন ক্যাম্পে দীর্ঘকাল অবস্থান করিলে তাহাদের কর্ম্ম-চ্যুতি হইতে পারে এরূপ আশঙ্কা দেখা দিল। প্রকৃত-পক্ষে ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল যখন কতকগুলি আঞ্চলিক বাহিনীর ইউনিটকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ক্যাম্পে থাকিতে হইত। এই মর্ম্মে অভিযোগ আসিয়া পৌঁছিল যে, কোন কোন মনিব আঞ্চলিক বাহিনীতে যোগ-দানকারী কর্ম্মচারীদিগকে তাহাদের মূল চাকরীতে পুনর্গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। যাই হোক, আইন প্রণয়ন দ্বারা এই অবস্থার প্রতিকারের উপায় হইল—এই আইনের বলে সকল মনিবকেই আঞ্চলিক বাহিনীতে যোগদানকারী তাঁহাদের কর্ম্মচারীদিগকে কিছুকালের জন্য ছুটি মঞ্জুর করিতে বাধ্য করা হইল। এই আইন প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, আঞ্চলিক বাহিনী সম্পর্কিত সমস্যাসমূহের প্রকৃত সমাধান নিহিত রহিয়াছে মনিবের স্বতঃপ্রবৃত্ত সহযোগিতা এবং মনিব ও কর্ম্মচারী উভয়ের দেশপ্রেমের মধ্যে। উভয়কেই আঞ্চলিক বাহিনীর আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধাসমূহের সমান ভাগীদার হইতে হইবে। আঞ্চলিক বাহিনীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী যখন আবার পূর্ব্ব কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া যাইবেন তখন তিনি হইবেন অধিকতর নিয়মানুবর্ত্তী ও কর্ম্মক্ষম-কর্ম্মীর জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে এবং তিনি হইবেন উৎকৃষ্টতর নাগরিক।

মেরামত কার্য্যে রত আঞ্চলিক বাহিনীর ইলেকট্রিক্যাল এবং কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারগণ

সেই জন্যই দুই বৎসরের অধিককাল যাবৎ যোগ্য লোকসংগ্রহ আর সর্ব্বসাধারণের পরিপূর্ণ সহযোগিতা লাভের জন্য এবং সংগঠিত ইউনিটগুলির অন্তর্ভুক্ত লোকেদের আঞ্চলিক বাহিনীর প্রকৃত আদর্শে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে প্রবল চেষ্টা চলিয়াছিল। প্রাদেশিক ইউনিটসমূহ সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, সেগুলির জন্য গ্রামাঞ্চল হইতে প্রয়োজনীয় যোগ্য লোকসংগ্রহে কখনই খুব বেশী বেগ পাইতে হয় নাই। এই সমস্ত ইউনিটের লোকেদের বৎসরে একনাগাড়ে দুই মাস শিক্ষা-শিবিরে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয় এবং এরূপ ব্যবস্থা আছে যে, গ্রামের লোকেরা অনায়াসে সেগুলিতে গিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। এই সমস্ত ইউনিট ক্রমশঃ উন্নতির পথে আগাইয়া

চলিল। গ্রামাঞ্চলস্থ ইউনিটগুলিতে কিন্তু উন্নতি হইতে লাগিল খুব ধীর মন্থর গতিতে। এই সমস্ত ইউনিটে শিক্ষা দেওয়া হয় সপ্তাহের শেষ দিনে অথবা ছুটির দিনে—মোট শিক্ষাদানের সময়ের পরিমাণ ২৪০ ঘণ্টা। যদিও ইহা বলা হইয়াছিল যে, এই সমস্ত ইউনিটের লোকেরা কেবলমাত্র অবসর সময়েই শিক্ষালাভ করিতে পারিবে তথাপি লোকেদের নিকট হইতে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নাই। ক্রমে ক্রমে কিন্তু অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল। আঞ্চলিক বাহিনীর কথা লোকে যতই বেশী জানিতে লাগিল এবং ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইল, ততই ইহার প্রতি তাহারা দিন দিন অধিকতর সংখ্যায় আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ইহা প্রতিষ্ঠার তৃতীয় কিংবা চতুর্থ বৎসরে আজ লোকসংগ্রহ এবং শিক্ষাদান এই উভয় ব্যাপারে সাফল্যের নিদর্শন পরিলক্ষিত হইতেছে। আজকের দিনে, এমন কি গ্রামীণ ইউনিটগুলিতে পর্য্যন্ত লোকসংগ্রহের ব্যাপার দুই বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, তাহার চেয়ে অনেক উন্নত। আঞ্চলিক বাহিনীর লোকেরা প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে যোগদান করিয়া এবং অন্যান্য জাতীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। আঞ্চলিক বাহিনীর ইউনিটগুলির শিক্ষাদানকে কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য যে সমস্ত চেষ্টা হইয়াছে তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইতেছে 'ফার্ষ্ট টেরিটরিয়্যাল আর্মি ব্রিগেড' গঠন, গত বৎসর গড়গাঁওয়ের নিকট ইহার শিবির সংস্থাপিত হয়। ইহাই সম্ভবতঃ আঞ্চলিক বাহিনীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ লোকসমাবেশ। যেমন বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রী পার্লামেণ্টের সদস্য প্রভৃতি, তেমনি সৈন্যবাহিনীর যে সকল উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ইহা পরিদর্শন করেন তাঁহারা সকলেই আঞ্চলিক বাহিনীর লোকেদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন।

আঞ্চলিক বাহিনীর সৈন্যদের দড়ির পুলের উপর দিয়া নদী অতিক্রমণ

কেন্দ্রে এবং রাজ্যসমূহে উপদেষ্টা সমিতি গঠনও আঞ্চলিক বাহিনীর উন্নতি এবং বিকাশের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এই সমস্ত কমিটি মাঝে মাঝে সম্মিলিত হইয়া আঞ্চলিক বাহিনী প্রগতির পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করেন এবং ইহার উন্নতিবিধানের পন্থা নির্দ্ধারণ করেন।

উপসংহারে একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, আঞ্চলিক বাহিনী আজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দৃঢ় ভিত্তির উপর। ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের বলে আজ ভারতের দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা-ব্যূহ রচনা করা সম্ভবপর হইয়াছে। প্রারম্ভিক শুভ লক্ষণ আঞ্চলিক বাহিনীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা করিতেছে—আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহা দেশের গৌরব বৃদ্ধিকারী একটি শক্তিশালী সংস্থায় পরিণত হইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

নারী টেনে তাঁরে তুলেছে ঊর্দ্ধে

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

১

প্রয়াগের ঠিক পশ্চিমাংশে চিত্রকূটের পূবে
রাজাপুর গ্রামে করিতেন বাস শ্রীআত্মারাম দুবে।
হুলসী নাম্নী গৃহিণী তাঁহার অতি রূপবতী নারী,
গর্ভে তাঁহার জন্ম লভিল দুটি ছেলে বলিহারি !
নন্দদাসের কনিষ্ঠ বটে ভক্ত তুলসীদাস,
কান্যকুব্জী ব্রাহ্মণ তাঁরা, দুঃখে করেন বাস।
আট বছরের তুলসীকে রাখি' পিতা তাঁর মারা যান,
দ্বাদশ বর্ষ কাশীধামে থাকি পাঠে ঢেলে দেন প্রাণ।

২

বাড়ীতে আসিয়া বদ্ধ হলেন ভক্ত তুলসীদাস,
রূপসী নারীর আঁচল ধরিয়া রহিতেন বারো মাস।
সহ্য হ'ত না কখনো বধূর ঈষৎ অদর্শন,
রূপজ মোহের মোহিনী মায়ায় বিমোহিত ছিল মন।
চোখের আড়াল হলেই অমনি ঘটে যেত সঙ্কট,
জল-থেকে তোলা মাছের মতন করিতেন ছটফট!
স্ত্রৈণ বলিয়া জানিত সবাই, ভ্রূক্ষেপ নাহি তায় ;
শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা আসিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া যায় !

৩

কোনো একদিন তুলসী যখন গেছেন স্থানান্তরে
শ্বশুরবাড়ীর আত্মীয় আসে বধূকে নেবার তরে।
জননী তাঁহার পুত্রবধূকে পাঠান পিত্রালয়,
তুলসী আসিয়া আলয়ে দেখেন—বাড়ীটা আঁধারময় !
প্রাণাধিকা নারী গিয়েছে কোথায় শুধান মায়ের কাছে ;
জননী বলেন, "যেতে দিছি আমি বাপ-মা যেথায় আছে।
তোমার অসম্মতি সত্ত্বেও পাঠানু বাপের বাড়ী,
বলিয়া দিয়েছি পই-পই করি' আসিবারে তাড়াতাড়ি।"

৪

মাতার বচন শুনিয়া তুলসী ভীষণ মর্ম্মাহত !
ঝটিতি গেলেন শ্বশুরবাড়ীতে ঠিক পাগলের মত।
স্বামীরে হেরিয়া ক্ষুব্ধ চিত্তে কহে সুন্দরী প্রিয়া,—
"লজ্জা তোমার হ'ল না আসিতে ? আমার ফাটিছে হিয়া !
অস্থিচর্ম্মময় এই মোর ক্ষণভঙ্গুর দেহ !
তোমার প্রেমকে শত ধিক্কার ! কামে-ভরা এই স্নেহ !
রামচন্দ্রের প্রতি তুমি দাও এই স্নেহ প্রেম প্রীতি,
বিমলানন্দ পাবে তুমি তবে, রহিবে না ভব-ভীতি !"

৫

জ্ঞানোদ্দীপক এ-কথা শ্রবণে তুলসীর প্রাণ জাগে,
একেবারে সোজা কাশী চলে যান গাঢ় ধর্ম্মানুরাগে।
এই কনৌজী ব্রাহ্মণ সেথা অসীঘাটে করি' বাস
নিত্য সন্ধ্যা-স্তুতিবন্দনা করিতেন বারো মাস।
রামচন্দ্রের রাতুল চরণ ধ্যান করি' দিনরাত
কাশীর বিজন অসীঘাটে বসি' করেন জীবনপাত !
প্রত্যহ তিনি গাড়ু হাতে নিয়ে যেতেন প্রাতঃকালে,
সন্নিকটেই বসিতেন গিয়ে ঝোপের অন্তরালে।

৬

একটি ঝোপের মাঝারে সেথায় পিশাচ করিত বাস,
শৌচের অবশিষ্ট জলেতে মিটাতো তৃষার আশ !
তুলসীদাসের শৌচের জলে তৃপ্ত হইয়া ভূত
বর-প্রার্থনা করিতে বলিল, কথা বটে অদ্ভুত !
তুলসী বলেন, "আমি অক্ষম ; কর্ণঘণ্টা গ্রামে
সাধু ব্রাহ্মণ আছে একজন, তিনি দেখাবেন রামে !
তুমি যাও সেথা, তাঁর সাহায্যে পূরিবে মনস্কাম !"
তুলসী চলিলা কর্ণঘণ্টা ত্যাগ করি কাশীধাম।

ছুটিয়া গেলেন তুলসী সেথায় ওই বামুনের কাছে,
সকল বাসনা কাতরে বলেন, মনে যাহা-কিছু আছে।
সাধু ব্রাহ্মণ শ্রীরাম-মন্ত্রে দীক্ষা করিয়া দান
পাঠান চিত্রকূট পর্ব্বতে লুব্ধ করিয়া প্রাণ !
গুরুর কৃপায় ছয় মাস পরে সিদ্ধি করিয়া লাভ
সহসা দেখেন ওই পর্ব্বতে রামের আবির্ভাব !
তুলসীদাসের উগ্র সাধনা সেদিন হইল শেষ,
অবনত শিরে আজিও তাঁহারে স্মরিছে সকল দেশ !

৮

তুলসীদাসের গৃহিণীর মতো কোথা মহীয়সী নারী ?
পুণ্যের পথে প্রেরণা লভিতে কেবা হবে অভিসারী ?
ঘুচাইতে মোহ, কাটাইতে মায়া, সহায়তা পেলে তাঁর
এখনো মানুষ হবে দেবোপম, ঘুচিবে অন্ধকার !
মানবাত্মার কল্যাণকামী কোথা কল্যাণী বধূ ?
শান্তি-সুধার ক্ষুধাতুর প্রাণ পিয়িবে প্রেমের মধু !
ক্ষণিকের সেই শুভ মুহূর্ত্তে জাগিল তুলসীদাস !
নারী টেনে তাঁরে তুলেছে ঊর্দ্ধে, পুরায়েছে অভিলাষ !

বিজয়া

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

বিজয়া দশমী। মধ্যাহ্নে আহারের পর কেদারায় হেলান দিয়ে একটু আরামের চেষ্টা করছি; হঠাৎ অদূরে রাস্তার ধারে প্রতিবেশী এক বন্ধুদম্পতির ব্যগ্র আহ্বান উপর্যুপরি শোনা গেল। কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটল নাকি—মনের মধ্যে এরূপ একটা উদ্বেগ নিয়ে নগ্নগাত্রেই তাঁদের দিকে ধাবিত হলাম। অর্দ্ধপথে দেখি এক গ্রাম্য ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে বন্ধুবর আমার দিকেই অগ্রসর হচ্ছেন। সামনে এসে বললেন, "ইনি আপনাকে খুঁজছিলেন। চিনতে পারেন কি ?"

মোটা খদ্দরের মামুলি ধুতি-পাঞ্জাবীধারী এক গ্রামবাসী। ধূলিধূসরিত চরণ—জুতার বালাই নাই! পোশাকও ধোপ-দুরস্ত নয়। কে ঠিক চিনতে পারছি না! গ্রামবাসী কোন আত্মীয়স্বজন হবেন কি ?

স্মৃতিসমুদ্র আলোড়ন করে ধীরে ধীরে যেন একটি পরিচিত মুখ ভেসে উঠছে। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ছাত্রজীবনে যাঁদের সঙ্গে একই ঘরে বাস করেছি—ইনি যেন তাঁদেরই কেউ! সহসা আনন্দে চীৎকার করে উঠলাম—"নবকৃষ্ণ"! আমার ভুল হয় নাই। নবকৃষ্ণ আমায় জড়িয়ে ধরলেন। উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী নবকৃষ্ণ।

তিনি আমাকে ধরে টেনে নিয়ে চললেন তাঁর শিক্ষার স্থান গুরুদেবের শান্তিনিকেতনে ঘুরে বেড়াবার জন্য। আমার গায়ে জামা ছিল না বলে ইতস্ততঃ করছিলাম। তাই বুঝতে পেরে তিনি বললেন, "না হয় আমার জামাটাই গায়ে দাও। আমিই না হয় খালি গায়ে ঘুরব!"

অগত্যা সমস্ত সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে কোঁচার খুঁটখানি গায়ে দিয়ে পরমোৎসাহে তাঁর সঙ্গে হেঁটে চললাম। চীন-ভবনের বারান্দায় এসে মালতীর সঙ্গে দেখা হ'ল। নব-কৃষ্ণের সহধর্ম্মিণী মালতী। আমাদের সহ-পাঠিনী। কন্যা নাতি-নাতনী পরিবৃতা হয়ে এসেছেন শৈশবের লীলাভূমি শান্তিনিকেতনে।

মালতী চৌধুরাণী এককালে দেবীচৌধুরাণীর মতই দুর্দ্দান্ত ছিলেন। শারীরিক শক্তিতে তাঁর সমকক্ষ ছিল—আমাদের মধ্যে এমন কোন "ভবানী পাঠকের" কথা আমার মনে আসছে না। দু-তিনটি ডাকু ছেলেকে একসঙ্গে চড়, চাপড়, থাপ্পড় দিয়ে নাকাল করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গাছে চড়ে আম বা পেয়ারা পাড়তে পারত, এমন ছেলে খুব কমই ছিল। গাছের মগডালে লোভনীয় ফলটি তিনি দয়া ক'রে না দিলে, কারও পাবার উপায় ছিল না। অবশ্য দয়ার তাঁর অন্ত ছিল না। ওই দুর্দ্দান্ত মেয়েটির হৃদয় ছিল অতি কোমল। আমাদের এমন স্নেহময়ী বন্ধুও আর কেউ ছিল না।

তাঁর ওই দুর্দ্দমনীয়তা ও স্নেহশীলতা পরবর্ত্তী জীবনে বিদেশী শাসকসম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধে এবং দেশসেবায় পরিপূর্ণ-ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

মালতী চীন-ভবনের প্রবেশমুখে প্রাচীর-গাত্রে অঙ্কিত চিত্রগুলি দেখছিলেন। সম্মুখে গুরুদেবের "নটীর-পূজা" অপূর্ব্ব-তুলিকায় চিত্রিত রয়েছে। মুগ্ধ হয়ে দেখছিলেন। এক দিন "নটীর-পূজা"র রাণী লোকেশ্বরীর পাঠ নিয়েছিলেন মালতী। তাঁর সেদিনের সেই অপূর্ব্ব অভিনয়ের কথা আজও আমাদের চিত্তপটে অঙ্কিত আছে। 'লোকেশ্বরী' চরিত্রের অভিনেত্রী মালতী আজ সত্যই লোকেশ্বরী।

নবকৃষ্ণের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের ছাত্র-জীবনের বাসগৃহটির সম্মুখে এলাম। এখন তা পাঠভবন-অধ্যক্ষের কার্য্যালয়। নবকৃষ্ণ পরম আগ্রহের সহিত তাঁর ঘরখানি দেখতে লাগলেন। এককালে এই দোতলা গৃহের নীচের তলায় নবকৃষ্ণ, রামচন্দ্রন্[১] এবং আমরা দু'জন অখ্যাত ব্যক্তি বাস করতাম। আমাদের পাশেই থাকতেন গোপাল রেড্ডি[২] ও সৈয়দ মুজতবা আলি।[৩]

নবকৃষ্ণ এক সময় হাস্যচ্ছলে বললেন—"বিশ্বভারতীতে খুব বেশী দিন থাকার সুযোগ হয় নি। কাজেই বিশেষ কিছু নিয়ে যেতে পারি নি। তবে যাবার সময় মালতীকে নিয়ে গেছলাম।"

কথাটা তিনি হাস্যচ্ছলে বললেও আমাদের মনে তা বেশ ছাপ দিয়ে গেল। সংস্কৃতে একটি কথা আছে "স্ত্রীরত্ন"; সত্যই নবকৃষ্ণ বিশ্বভারতী হতে এই অপূর্ব্ব রত্নটি লাভ করেছিলেন। যে শুভক্ষণে এই মণিকাঞ্চন যোগ হয়েছিল, বিশ্বভারতীর ইতিহাসে তা অক্ষয় হয়ে থাকবে।

বীরভূমের রাঙামাটির ধুলোর পথে নগ্ন পদে পদব্রজে নব-কৃষ্ণ, মালতী তাঁদের কন্যাদ্বয় এবং নাতিটি চলেছেন। মাঝে মাঝে ধুলোর মধ্যে নাতিটি বসে পড়ছে এবং তৎক্ষণাৎ ধুলে

১। জি. রামচন্দ্রন্—স্বনামধন্য গান্ধীপন্থী শিক্ষাব্রতী।

২। বি. গোপাল রেড্ডি—মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব অর্থমন্ত্রী। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্র-আচার্য্য (Pro Chancellor)

৩। নানা ভাষাবিদ, পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক।

নিয়ে খেলা আরম্ভ করে দিয়েছে। সেই অপূর্ব্ব দম্পতি তার সেই ধুলোখেলা হাসিমুখে দেখছেন। নিতান্ত সময়াভাব, তাই ক্ষণেক পরেই সেই ধূলিধূসরিত বাল গোপালকে কোলে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। সঙ্গে দাসদাসী, বেয়ারা, চাপরাশী কেউ নাই। লাল-পাগড়ীধারী পুলিস নাই। কেবলমাত্র গোয়েন্দাবিভাগীয় একটি কর্ম্মচারী সাধারণ ভদ্রবেশে বেশ একটু দূরত্ব রক্ষা করে নিজের কর্ত্তব্যপালন করে চলেছেন।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে দেখা। এর মধ্যে কত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। কিন্তু সে কথা যেন আমাদের কারও মনে এল না। ছাত্রজীবনের ন্যায় সহজে স্বচ্ছন্দে আমরা পরস্পরে আলাপ করে চললাম।

মালতী ও নবকৃষ্ণ তাঁদের প্রত্যেক পুরাতন বন্ধুর খবর নিলেন, যাঁদের খোঁজ পেলেন তাঁদের সকলের সঙ্গেই দেখা করলেন। মাত্র পাঁচ ঘণ্টা ছিলেন। মাঝখানে পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যে আহার সেরে এই পাঁচ ঘণ্টার বাকি সমস্ত সময় আশ্রম ও আশ্রমিক দর্শনে অতিবাহিত করলেন।

গুরুদেব-দুহিতা মীরাদেবী, আচার্য্য নন্দলাল, আচার্য্য ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রীর পদপ্রান্তে উপবেশন করে তাঁদের সরস মধুর অমূল্য বাক্যালাপ মুগ্ধ হয়ে শ্রবণ করতে লাগলেন। সময় তাঁদের সীমাবদ্ধ, অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় যে তাঁদের ফিরতে হবে, সেকথা তাঁরা ভুলে যাচ্ছিলেন। আমাদেরই সে কথা মনে করিয়ে দিতে হচ্ছিল।

পানাগড়ের কাছে এক গ্রামে এসেছেন মন্ত্রিত্বের ধড়াচূড়া দূরে ফেলে বিশ্রামের জন্য। সেখান থেকে মোটরে করে বারোটার সময় শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, পাঁচটার সময় ফিরে গেলেন। যাবার সময় আমাদের প্রত্যেককে বার বার সনির্বন্ধ অনুরোধ করে গেলেন তাঁদের গৃহে যাবার জন্য।

কিছুকাল যাবৎ মানসিক অবস্থা ভাল যাচ্ছিল না, কি এক ভয়াবহ নিরাশা ও বিষাদে হৃদয় ভারাক্রান্ত ছিল। গান্ধীজীর অবর্ত্তমানে তাঁর শিষ্যগণ নূতন গুরু বরণ করেছেন। জনগণের শোচনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে গান্ধী-শিষ্যের রাজকীয় আড়ম্বর দেখে মনে হ'ত, সত্যই গান্ধীজীর মৃত্যু হয়েছে!

কিন্তু না। গান্ধীজীর মৃত্যু হয় নাই। মালতী-নবকৃষ্ণ প্রমুখ শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে এখনও তিনি জীবিত রয়েছেন! মর্ত্তের কোন রাজপদ, কোন ঐশ্বর্য্য যাঁদের বাঁধতে পারে না, রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েও মন যাঁদের পড়ে থাকে দরিদ্র, লাঞ্ছিত জনগণের পর্ণ-কুটীরে, তাঁদের মধ্যেই গান্ধীজীকে আজ প্রত্যক্ষ করলাম। সেই সর্ব্বত্যাগী শ্মশানবাসী মহাদেবসদৃশ মহাত্মার মৃত্যুবিজয়ী আত্মাকে আমার বিজয়ার প্রণাম জানালাম।

মুহূর্ত্তের মূল্য

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

কালের প্রবাহ সখি, বহিতেছে নিরন্ত দুর্ব্বার,
ভেসে চলে বর্ষ-মাস, প্রাত্যহিক তুচ্ছ লাভ-ক্ষতি।
থামার সঙ্কেত নাই—দীর্ঘ পথ রয়েছে চলার,

ক্ষুদ্র বীজে জন্ম নেয় যুগান্তের বৃদ্ধ বনস্পতি।
শতাব্দী চলিয়া যায়, উড়ে যায় সময়ের রথ,
আরেক শতাব্দী আসে—নব আশা, নব সম্ভাবনা।
বনস্পতি মৃত্যু লভে, ধ্বসে পড়ে জীর্ণ ইমারত,
অতীতের চিতা-ভস্মে ঝরে পড়ে অশ্রু এক কণা।

এ মুহূর্ত্ত কতটুকু সীমাহীন সময়ের কাছে?
তথাপি মনের কোণে জাগে মোর পরম গৌরব।
—তোমার আঁখির প্রান্তে প্রীতির যে আলোটুকু নাচে
কালের পথিক সেথা যুগে যুগে মানে পরাভব।

প্রণয়, চুম্বন আর অর্থহীন তুচ্ছ আলাপন,
সহসা ভুলায়ে দেয় সুখ দুঃখ বিশ্ব চরাচর।
আকাশের শতভিষা একমাত্র করে নিরীক্ষণ,
তোমার প্রেমের স্পর্শে এ মুহূর্ত্ত শাশ্বত সুন্দর।

প্রাণদণ্ড

শ্রীসুধীর ব্রহ্ম

অপরাধ যতই গুরু ও ভীষণ হউক না কেন, মানুষের প্রাণদণ্ড দান কর্ত্তব্য কি না, এ বিষয় লইয়া বহুকাল যাবৎ তর্ক-বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। বিলাতে লর্ড বার্কমাষ্টার প্রাণদণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা উঠাইয়া দিবার জন্য তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, রক্ষণশীল ব্রিটিশ জাতি কিন্তু সে প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও এই প্রস্তাবটি লইয়া এখনও আলোচনা বন্ধ হয় নাই। প্রাণদণ্ড-প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের মৃত্যু কি উপায়ে সঙ্ঘটিত করা যায়, এই সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য ব্রিটেনে যে 'রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল, উহার রিপোর্ট সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। ব্রিটিশ পদ্ধতি অর্থাৎ ফাঁসী লটকাইয়া মারাই সর্ব্বোত্তম; আমেরিকার ইলেকট্রোকিউশন (বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসাইয়া) অথবা গ্যাস প্রয়োগে হত্যা ইহাদের কোনটাই ব্রিটিশ রয়্যাল কমিশনের মতে কম যন্ত্রণাদায়ক বা স্বল্প সময়সাধ্য নয়। কমিশন আশু মৃত্যুদায়ক ইনজেকশনের কথাও বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু ফাঁসীর সঙ্গে কি উহার তুলনা হয়? ফাঁসী হইল সনাতন ব্রিটিশ প্রথা। বনিয়াদী ঘরের সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের মত ফাঁসীরও তাই একটা কৌলিন্য আছে। তাহা ছাড়া ফাঁসীতে হাত পাকাইতে পাকাইতে ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞেরা উহাকে একটি অব্যর্থ মৃত্যুযন্ত্রে পরিণত করিয়াছেন। মার্কিন ইলেকট্রোকিউশন গ্যাস, অথবা ইনজেকশন সব কিছুতেই নাকি ভুল হইতে পারে। কিন্তু ফাঁসী নির্ভুল, একেবারে অমোঘ! সুতরাং ব্রিটিশ আদালতের বিচারে যাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে, তাহাদের জন্য আপততঃ ফাঁসীই অবধারিত রহিল। ভারতে প্রাণদণ্ড প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে। বিষয়টি ভারতবাসীর নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কেবলমাত্র বাহ্য আচরণ ও ব্যবহার দেখিয়া কোন জাতি সভ্য কি অসভ্য, দানব কি দেবতা, তাহা ঠিক নির্ণয় করা যায় না। সভ্যতা কখনও একটা লোক দেখান ব্যাপার হইতে পারে না। যাহাদের বাহ্য কার্য্যের সহিত অন্তরের মিল আছে, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে সভ্যপদবাচ্য। যাহাদের কথায় ও কাজে মিল নাই, যাহারা আত্মপর-ভেদে ব্যবহারের ভেদ করে, তাহারা জড়বিজ্ঞানের দুই চারিটি রহস্য অধিগত করিয়া পার্থিব ব্যাপারে কতকটা শক্তিলাভ করিলেই যে সভ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, সভ্যতার উদ্ভবস্থল ভারতবর্ষ কখনই তাহা মনে করিতে পারে না। অপরাধীকে শাস্তিদানের ব্যবস্থায় সভ্যতার প্রকৃত লক্ষণ কতকটা প্রকাশ পায়। অপরাধীদিগের সহিত ব্যবহারে যে জাতির বিধি-বিধানে প্রতিহিংসার ভাব প্রবল থাকে, সে জাতি যে তখনও তাহাদের বর্ব্বরভাব পরিহার করিতে সমর্থ হয় নাই, এই পরিচয়ই তাহারা পৃথিবীব্যাপী লোকের সমক্ষে প্রদান করিয়া থাকে। যে সময়ে ইউরোপে খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম প্রবেশলাভ করে নাই, সে সময়ে তথায় শাস্তিদানের ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর ছিল। তখন অপরাধী অন্যকে যতটা বেদনা দিয়াছে, তাহাকে ততটা বেদনা ভোগ করাইবার জন্যই শাস্তি প্রদান করা হইত। তখন শাস্তিদান প্রতিহিংসামূলক ছিল। 'Eye for an eye, tooth for a tooth'—তখন শাস্তিদানের মূলমন্ত্র বিবেচিত হইত। কিন্তু প্রাচী হইতে খ্রীষ্টধর্ম্ম যখন প্রতীচীতে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন হইতেই তথায় এই ধারণার পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। তখনই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাবে লোক বুঝিতে পারে যে, অনুষ্ঠিত কার্য্যের জন্য হিংসা সাধনের উদ্দেশ্যে শাস্তি পরিকল্পিত হওয়া উচিত নহে—ভবিষ্যতে যাহাতে আর ঐরূপ অপরাধের অনুষ্ঠান না হয়, তাহার জন্যই বিধিপুস্তকে শাস্তির উল্লেখ থাকা আবশ্যক। প্রাণদণ্ডের অনুকূলে প্রধান যুক্তি এই যে, যদি প্রাণদণ্ড রহিত করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে লোকে অকারণে বহুলোকের প্রাণ বিনষ্ট করিবে। মানুষের মৃত্যুভয় স্বাভাবিক। অধিকাংশ লোক মৃত্যুভয়েই নরহত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইবে না। অতএব লোকের প্রাণরক্ষার জন্য, সমাজের স্থিতির জন্য, মানবজীবনের পবিত্রতা স্থাপনের জন্য অতি ভীষণ অপরাধীর প্রাণদণ্ড করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মশাস্ত্রে অতিদণ্ডের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাই বলিয়া অপরাধীকে অতি কঠোর দণ্ড দিতে হইবে, ইহা শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত নহে। সেইজন্য শুক্রনীতিতে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে:

'অতি দণ্ডাচ্চ গুণিভিস্ত্যজ্যতে পাতকী ভবেৎ'

অতিদণ্ড প্রদানের ফলে গুণী ব্যক্তিরা অতিদণ্ড-প্রদাতা বিচারককে পরিত্যাগ করেন; অধিকন্তু, সেই বিচারপতি পাতকী হইয়া থাকেন। অন্যত্র বলা হইয়াছে—

'ক্ষময়া যত্ত, পুণ্যং স্যাত্তৎ কিং দণ্ড নিপাতনাৎ?'

অপরাধীকে ক্ষমা করিলেই যে পুণ্য হয়, দণ্ডদান করিলে কি তাহাই হইয়া থাকে? ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রন্থে বা দণ্ডবিধি পুস্তকে কোন অপরাধের জন্য যদি কঠোর শাস্তিদানের উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে বিচার-

পতিকে সেইজন্য দায়ী বলিয়া প্রমাণিত অপরাধীকে সেই কঠোর দণ্ডই দিতে হইবে, এরূপ কোন কথা নাই। বিচারপতি স্বীয় হৃদয়কে ক্ষমারসে সিক্ত করিয়া তবে আসামীকে দণ্ড দিবেন, ইহাই মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের ব্যবস্থা। তবে ধর্ম্মশাস্ত্রে যে অতিদণ্ডের বা কঠোর দণ্ডের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অপরাধ অনুষ্ঠানে লোলুপ লোকদিগের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিবার জন্য, সেই দণ্ড প্রদান করিবার জন্য নহে। justice temper d with mercy—'করুণরস-সিক্ত ন্যায় বিচার' এই কথাটা প্রাচীর, প্রতীচীর নহে।

প্রাণদণ্ডদানের প্রতিকূলে বহু যুক্তি উপস্থিত করা হইয়া থাকে, যথা:—

(১) মানুষের জীবন অত্যন্ত পূত বস্তু। কারণ যতই গুরুতর হউক না কেন, কোন কারণেই মানুষের প্রাণদণ্ড দান বিধেয় নহে। যে প্রাণ দিবার শক্তি মানুষের নাই সে প্রাণ গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা মানুষের দায়িত্ব-বুদ্ধির দারুণ অভাবের পরিচায়ক।

(২) দণ্ডের কঠোরতার দ্বারা অপরাধের নিবৃত্তির অজুহাত নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ত চিরকালই আছে, কিন্তু তাই বলিয়া মানব-সমাজে নরহত্যা অপরাধ রহিত হয় নাই। ড্রেকোর আমলে যখন পাতাকাটা চোরকে ফাঁসী দিবার ব্যবস্থা ছিল, তখন এই অপরাধ-বিড়ম্বিত মানব-সমাজ দিব্য সমাজে পরিণত হয় নাই

(৩) একজনের প্রাণদণ্ড দেখিয়া অন্য সকলে যে অপরাধের অনুষ্ঠান হইতে বিরত হয়, এই হেতুবাদ মিথ্যা, তথ্য দ্বারা সমর্থন করা যায় না।

(৪) বিচারকের ভ্রান্তির ফলে, মামলা সাজাইবার কৌশলে, কূট সাক্ষ্যের প্রভাবে নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে দোষী বিবেচনায় শাস্তিদান সম্ভবে—এরূপ ব্যাপার প্রায়ই হইয়া আসিতেছে। এরূপ অবস্থায় যে দণ্ড আর প্রত্যাহার করিয়া লওয়া সম্ভব হইবে না, অপরাধীকে সেরূপ দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। যাহার জীবনদানের ক্ষমতা নাই, তাহার জীবন গ্রহণেরও অধিকার নাই।

(৫) অপরাধপ্রবণতা একটা উৎকট ব্যাধি। ব্যাধিগ্রস্তকে শাস্তি দেওয়া উচিত নহে। তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই বিধিসম্মত এবং সাধুজনসম্মত।

উপরোক্ত অনুকূল ও প্রতিকূল পক্ষের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া এই সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করাই বিধেয়।

এখন প্রথম কথা এই যে, মানুষ অপরাধ করে কেন? অপরাধপ্রবণতা জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল মানব সমাজেই দেখিতে পাওয়া যায়। কৌলিক-প্রভাব, শিক্ষা-দীক্ষা এবং ধর্ম্মবুদ্ধির প্রভাবে উহার কিছু তারতম্য হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু নিরপরাধ সমাজ নরলোকে নাই। যেখানে সমাজ সেইখানেই অপরাধ এবং সেইখানেই দণ্ডবিধি বিদ্যমান। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, অপরাধপ্রবণতা ব্যাধির ন্যায় সমাজে বরাবর স্থানলাভ করিয়া আসিতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য, এই অপরাধ করিবার প্রবৃত্তির কারণ কি?

সচরাচর উহার দুইটি কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। একটি কারণ প্রচণ্ড ক্রোধ বা মানসিক উত্তেজনা, দ্বিতীয়টি প্রতিহিংসাবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন। এই দুইটি কারণেই শতকরা নব্বইটি বা তাহা অপেক্ষা কিছু অধিকসংখ্যক নরহত্যা এবং অন্যান্য অপরাধ সঙ্ঘটিত হয়।

যাঁহারা বলেন যে, মনুষ্য-জীবনের বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে হইলে প্রাণদণ্ড কর্ত্তব্য নহে, তাঁহাদের প্রতিবাদস্বরূপ অপর পক্ষ বলিয়া থাকেন যে, মনুষ্য জীবন সম্বন্ধে পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইলে, প্রাণদণ্ড বহাল রাখা আবশ্যক, কারণ প্রাণদণ্ড রহিত করিয়া দিলে নরহত্যাজনিত অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। উদাহরণ-স্বরূপ তাঁহারা বলিয়া থাকেন, অনেক ক্ষেত্রে অতি ভীষণ অপরাধে প্রাণদণ্ড উঠাইয়া দিলে নরহত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাঁহারা বলেন, মার্কিনের অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি রাষ্ট্রে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া আবার উহা বহাল করিতে হইয়াছে। এইরূপ অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, ইটালী এবং সুইজারল্যণ্ডের কতকগুলি ক্যাণ্টনে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা উঠাইয়া দিয়া পুনরায় উহা প্রবর্ত্তিত করিতে হয়। কারণ প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা রহিত করিবার পর সর্ব্বত্রই নরহত্যা অপরাধীর সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ইটালীতে দশ লক্ষ লোকের মধ্যে এক শত পাঁচটি হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে বিলাতে দশ লক্ষ লোকের মধ্যে গড়ে সাতাশটি মাত্র নরহত্যা ঘটে। ইহা অবশ্য কিছুদিন পূর্ব্বকার হিসাব। ইটালীতে লোককে সাধ্যপক্ষে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় না বলিয়াই তথায় নরহত্যা এত অধিক সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং মনুষ্য-জীবনের পূতত্ব রক্ষা করিতে হইলে মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা কর্ত্তব্য। ফাঁসিকাষ্ঠ হইতে অপরাধীর জীবন রক্ষা করিতে গেলে জনসাধারণের আজকের পবিত্র জীবন নরঘাতকের হস্তে নষ্ট হইবে। অতএব দণ্ডবিধি পুস্তক হইতে প্রাণদণ্ড একেবারে নির্ব্বাসিত করা কোনমতেই সঙ্গত হইবে না। যাঁহারা হিসাবপত্র দেখাইয়া এই কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথা অযৌক্তিক মনে করিবার উপায় নাই।

কিন্তু অপর পক্ষের যুক্তিও দুর্ব্বল নহে। প্রাণদণ্ডের প্রতিকূলে যে (৪) এবং (৫) যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা যে সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; উহা খণ্ডন করা

যায় না। এই অল্প পরিসর স্থানে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করাএকপ্রকার অসম্ভব। অবশ্য দণ্ডের ভয় না থাকিলে মানুষ সহজেই লোভের এবং কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনায় অত্যন্ত ভীষণ পাপানুষ্ঠানে রত হইয়া থাকে। লোক প্রাণদণ্ডকে স্বতঃই অত্যন্ত ভয় করে। সুতরাং উহা দণ্ডবিধি হইতে একেবারে উঠাইয়া দেওয়া সঙ্গত নহে।

আমাদের মনে হয়, উভয় মতের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য-সাধন অবশ্য করা যাইতে পারে। লঘু হস্তে মানুষের প্রাণ-দণ্ড করা অতীব গর্হিত। বিশেষতঃ যেখানে মানুষ ক্ষণিক উত্তেজনার বশে নরহত্যা করিয়া বসে, সেখানে অপরাধীর প্রাণদণ্ড দান সমীচীন নয়; তবে যে ক্ষেত্রে মানুষ বহুদিন চক্রান্ত করিয়া বা ষড়যন্ত্র পাকাইয়া অত্যন্ত ভীষণভাবে নরহত্যা করিয়া বসে, সেই ক্ষেত্রে সময় সময় প্রাণদণ্ড দেওয়া যাইতে পারে। উপরে যে সকল দেশের কথা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ যে সকল দেশে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা পুনঃ-প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে সে দেশেও প্রায়ই লোককে ঐ দণ্ড দেওয়া হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও তথায় ঐ ব্যবস্থা বিধি-পুস্তকে স্থান পাইয়াছে বলিয়াই লোক আর উহার ভয়ে নর-হত্যা করিতে চাহে না। অধিকন্তু একটি নরহত্যার জন্য একাধিক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা ঘোর নিষ্ঠুরতা-সূচক, সে বিষয়েও আর সন্দেহ নাই।

তবে যদি কোন পরিণতবয়স্ক ও সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি নিতান্ত কুপ্রবৃত্তির বশে কোন নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়া সেই ঘটনার একমাত্র সাক্ষীকে লুপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে সেই নারীকে বধ করে, তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড করিলে কখনই বিশেষ দোষের হয় না। যদি কোন দস্যুদল লোকের সর্ব্বস্ব হরণ এবং লোককে হত্যা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগেরও মৃত্যুদণ্ডে অবিধেয় নহে।

এই প্রসঙ্গে আলোচ্য ব্রিটেনের রাজকীয় কমিশন পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে প্রাণদণ্ডের পার্থক্য করা উচিত কিনা সে প্রশ্নও বিবেচনা করিয়াছেন। অবশ্য বর্ত্তমানে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত নারীদের শতকরা নব্বই জনকেই নাকি বিকল্প শাস্তি (কারা-দণ্ড) দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু কমিশনের ভাষায় "নারী ও পুরুষের মধ্যে এ বিষয়ে আইনগত পার্থক্য করিবার কোন যুক্তিই আমরা দেখিতে পাই না।"

অপরিচিতা

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

চিনি না যাহারে সেই রূপহীন অপরূপা মেয়ে
মোহিয়াছে মন;
আমার সর্ব্বস্ব শুধু নির্নিমেষ শত চোখে চেয়ে
তাহারি কারণ।
দুঃসহ ব্যথার মত অব্যক্ত কি আনন্দে অপার
এই চেয়ে থাকা।
অন্তরের তলে তলে অনর্থক মহাশূন্যতার
পূর্ণ রূপ আঁকা।
বাস্তব জীবন আর যত সত্য সুপ্রচুর সুখ
সব ডুবে যায়;
কোথাও যে নাই তার রমণীর স্বপ্ন অহৈতুক
হাসায় কাঁদায়।
বনানী-বীণায় কভু বাজে যেন ভীরু আগমনী
তন্দ্রালস রাতে;
আকাশের পথে পথে ভাসে শুভ্র রূপের লাবণী
রূপালী জ্যোৎস্নাতে।
বিহগের কল-কণ্ঠে শুনি তার কম্প্র-সুধা-স্বর—
বিপিনে বিপিনে;
পুষ্পের অস্ফুট ভাবে উচ্ছ্বসিত হাসির নির্ঝর
ফাল্গুনের দিনে।
বরষার মেঘাম্বরে মনে হয় চারু নীলাম্বরী
ওড়ে যেন তার;
রোমাঞ্চিত তৃণে তৃণে স্পন্দমান প্রাণ ওঠে ভরি'
সেই অধরার।
নিখিলের মর্ম্মে মর্ম্মে কাল্পনিক ছবি তার নাচে
গীত-গন্ধ-রূপে;
পলকে পলায় কভু, হৃদয়ের সব চেয়ে কাছে
আসে চুপে চুপে।
স্তব্ধতার গানে গানে কেঁদে কয় ধ্যানরত মন,
হে লীলা-সঙ্গিনী!
বিস্ময়-রহস্যে তুমি সর্ব্বময় ভরি' এ ভুবন
যদিও না চিনি।

রোজকার ধূলোময়লার
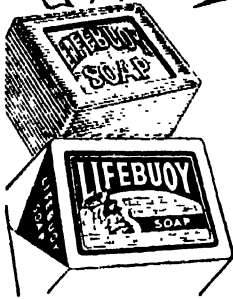
আলোচনা

"রাজা গণেশের প্রাচীনতম উল্লেখ"

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন

১৩৫০ সালের চৈত্র সংখ্যার প্রবাসীতে "রাজা গণেশ, দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উহাতে আমার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে, যখন "বাল্যলীলা সূত্র" ও "অদ্বৈত প্রকাশ" গ্রন্থে গণেশ নামক বৈষ্ণব রাজার এবং "লঘুতোষণী"তে গণেশের সমসাময়িক দনুজমর্দ্দন নামক (সম্ভবতঃ চন্দ্রদ্বীপের) পৃথক এক জন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায় তখন ডঃ ভট্টশালী রিয়াজ-উস্-সালাতীনের (১৭৮৮ খ্রীঃ) ভ্রমপূর্ণ বিবরণের ভিত্তিতে মুদ্রার "চণ্ডীচরণ পরায়ণ দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবকে যথাক্রমে রাজা গণেশের ও তৎপুত্র যদুর[১] (জিৎমল) উপনাম বলিয়া যে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহা অবাস্তব কল্পনা এবং দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব রাজা গণেশ ও তৎপুত্র হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। বস্তুতঃ নিজ নাম গোপন করিয়া মুদ্রায় কেবলমাত্র উপনাম ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।

বিগত বৈশাখ সংখ্যায় উপরোক্ত নামধেয় প্রবন্ধে লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় "সঙ্গীত শিরোমণি" (১৪২৮-২৯ খ্রীঃ) নামক একখানি অমুদ্রিত গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ও অন্যান্য হেতুতে আমার ঐ মতবাদ খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন তাহাই আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

গণেশ সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রাচীন মুসলমান ইতিহাস 'তবকাৎ-ই-আকবরী' (১৫৯৩ খৃঃ) বলেন, শামসুদ্দিনের (সিহাবুদ্দিন বায়াজিদ্) মৃত্যুর পর রাজা গণেশ বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন এবং গণেশের মৃত্যুর পর তৎপুত্র জিৎমল রাজ্যলোভে মুসলমান হইয়া জালালউদ্দিন নাম গ্রহণ করেন। মুদ্রার প্রমাণে পাওয়া যায় ৮১৭ হিঃতে শামসুদ্দিনের মৃত্যু হয় ও ঐ অব্দেই তৎপুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজশাহ মুয়াজ্জমাবাদ ও সাঁতগা হইতে মুদ্রা প্রচার করেন। সুতরাং এই আলাউদ্দিন ফিরোজশাহ ও তাঁহার সমর্থক মুসলমান প্রধানগণকে যুদ্ধে সংহার করিয়াই গণেশকে বাংলার সিংহাসন অধিকার করিতে হইয়াছিল। অতঃপর ৮১৮/৮১৯ হিঃ-তে জালালউদ্দিন ফিরোজাবাদ, সোনার গাঁ ও চট্টগ্রাম হইতে মুদ্রা প্রচার করেন। 'তবকাৎ-ই-আকবরী'র পূর্ব্বোক্ত বিবরণের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বলিতে হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, ৮১৭ হিঃ শেষ অথবা ৮১৮ হি প্রথমে রাজা গণেশের মৃত্যু হইয়াছিল এবং ৮১৮ হিঃতে তৎপুত্র জিৎমল রাজ্যলোভে মুসলমান হইয়া জালালউদ্দিন নাম গ্রহণ করতঃ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাজা গণেশের এই আকস্মিক মৃত্যু ও জিৎমলের সহসা রাজ্যলোভে মুসলমান হওয়ার কারণ কি? আমার বোধ হয়, এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর দীনেশবাবুর উদ্ধৃত "সঙ্গীত শিরোমণি"র বচনের মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে, এবং দীনেশবাবু এই রচনাটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া শুধু আমার নহে সমগ্র ঐতিহাসিক সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। দীনেশবাবুর উদ্ধৃত শ্লোকগুলির একাংশ এই:

> "ঘনাটোপঃ গর্জ্জদ্গজতুরগসেনাজলধরৈঃ
> শমংনীত্বাশঙ্কং শকশলভ সপ্তার্চিনময়ং।
> তুরুষ্কঃ নির্ম্মায় প্রকটিতনয়ং তস্য তনয়ং
> ব্যধাদ্ গৌড়ান্ প্রৌঢ়ঃ পুনরপি শকানাং জনপদান্॥"
> "আদক্ষিণোদধেরা চ হিমাদ্রেরা চ গাজনাৎ।
> আগৌড়াদ্রক্ষলং রাজ্যমিবরাহিমভূভুজঃ॥
> অস্যৈব সার্ব্বভৌমস্য * *।"

অর্থাৎ, এই প্রধান (সম্রাট ইব্রাহিম) ঘোরদর্পে গর্জ্জনকারী হস্তী, অশ্ব ও সেনারূপ মেঘবর্ষণ দ্বারা শকপতঙ্গের অগ্নি [রাজা গণেশকে] নির্ব্বাপিত অর্থাৎ বিনষ্ট করিয়া তাঁহার সুনীতিজ্ঞ[২] পুত্রকে তুরুষ্ক নির্ম্মাণ করতঃ গৌড়দেশকে পুনরায় শকজনপদ করিয়াছিলেন। এই সার্ব্বভৌম সম্রাট ইব্রাহিমের রাজ্য দক্ষিণ সমুদ্র, হিমালয়, গাজন (গজনী?) ও গৌড় পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল।

এই শ্লোকে পতঙ্গের নাশক অগ্নি ও অগ্নির নাশক জলধরের উল্লেখ করিয়া যেভাবে উপমাটিকে সাজান হইয়াছে তাহা প্রণিধান করিয়া দেখিলে সন্দেহ থাকে না যে, গণেশ যেমন যুদ্ধে মুসলমানগণকে বিনষ্ট করিয়া রাজা হইয়াছিলেন সেইরূপ ইব্রাহিমরূপ জলধর গণেশরূপ অগ্নিকে নির্ব্বাপিত অর্থাৎ বিনষ্ট করিয়া গৌড়দেশ অধিকার করিয়াছিলেন এবং রাজ্যলোভে গণেশের পুত্র জিৎমল (যদু) ইব্রাহিমের সহিত সন্ধিসূত্রে মুসলমান হইয়া ইব্রাহিমের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া বাংলাদেশের রাজা হইয়াছিলেন।

'সঙ্গীত শিরোমণি'র প্রমাণে গণেশের বিরুদ্ধে ইব্রাহিমের

১। ষ্টেপলটন বলেন, মহেন্দ্রদেব রাজা গণেশের দ্বিতীয় পুত্র।

২। রিয়াজের মতে এই সময় যদু (জিৎমল)-এর বয়স ১২ বৎসর ছিল। কিন্তু "সঙ্গীত শিরোমণি" তাঁহাকে "প্রকটিতনয়" বলায় রিয়াজের উক্তি মিথ্যা প্রমাণিত হইতেছে।

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
আন্‌লাইট্‌
সাবানের দৌলতে
SUNLIGHT
SOAP
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT
SOAP

S. 203-50 BG

গৌড়াভিযানের বিষয় প্রমাণিত হওয়ায় রিয়াজের বিবরণের এই অংশ মাত্র সমর্থনযোগ্য। অতঃপর রিয়াজ বলিতেছেন যে, যে বৎসর ইব্রাহিম গৌড়দেশ আক্রমণ করে (৮১৭।৮১৮ হিঃ) সেই বৎসরেই ইব্রাহিমের মৃত্যু হওয়ায়৩ গণেশ সাহসী হইয়া জালাল-উদ্দিনকে সিংহাসনচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া স্বয়ং রাজা হন ও সাত বৎসর সিংহাসনে থাকিবার পর জালালউদ্দিনের ষড়যন্ত্রে নিহত হইলে জালালউদ্দিন পুনরায় রাজা হন।

ইতিহাস ও মুদ্রার প্রমাণে জানা যায় যে, ইব্রাহিম ৮৪৫ হিঃ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। অতএব ৮১৭।৮১৮ হিঃ ইব্রাহিমের মৃত্যু হওয়া সম্বন্ধে রিয়াজ যে উক্তি করিয়াছেন তাহা অযথার্থ এবং ঐ উক্তির উপর ভিত্তি করিয়া গণেশ ও জালালউদ্দিনের দ্বিতীয় বার রাজা হওয়ার যে বিবরণ রিয়াজকার দিয়াছেন তাহারও ভিত্তি নাই। বস্তুতঃ ৮০৪ হিঃ তৈমুরলংয়ের ভারত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ও ৮৫৫ হিঃতে বহলোল লোদীর দিল্লীশ্বর হইবার মধ্যবর্ত্তী কালে দিল্লীশ্বরগণের রাজ্য প্রধানতঃ পুরাতন দিল্লীর প্রাচীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল এবং এই সময়ের মধ্যে ৮৪৫ হিঃ (১৪৪১ খ্রীঃ) পর্য্যন্ত ইব্রাহিমের সার্ব্বভৌম রাজ্য গৌড় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে পরিব্যাপ্ত ছিল। "সঙ্গীত শিরোমণি"র বচন হইতেও আমরা তাহারই সমর্থন পাইতেছি। সুতরাং ১৩৩৯ শকে (৮২০ হিঃ—১৪১৭ খ্রীঃ) রাজা গণেশ যদি জীবিতও থাকিতেন তাহা হইলেও ইব্রাহিমের ন্যায় সার্ব্বভৌম ও শক্তিশালী নরপতির বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করিতে সাহসী হইতেন কিনা সন্দেহ।

এই প্রসঙ্গে দীনেশবাবু আমার মূল প্রবন্ধের অন্যান্য বিষয়ের যে সমালোচনা করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে এস্থলে আমার বক্তব্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য মনে করি।

দনুজমর্দ্দন কর্ত্তৃক বাংলার সিংহাসন অধিকার করার ঘটনাকে দীনেশবাবু আরব্য উপন্যাসের গল্প বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; কিন্তু রাজা গণেশের হাতেও আলাদিনের প্রদীপ ছিল না যাহার বলে উত্তরবঙ্গের এই সামান্য ভূম্যধিকারী৪ বাংলার হিন্দু ভৌমিকগণের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া একাকী সপ্তগ্রাম হইতে সুদূর সুবর্ণগ্রাম ও চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত অধিকার করিতে পারিতেন। বাংলার বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু ভৌমিক-গণের সক্রিয় সাহায্যলাভ করিয়াই রাজা গণেশের পক্ষে মুসলমান-কবলিত বাংলা-দেশে স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ এই ভৌমিকগণের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব অগ্রণী ছিলেন। বহু মুসলমান হইলে তাঁহাদের স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প

৩। বুকানন বলেন, জালালউদ্দিন রাজা হইয়াই ইব্রাহিমকে আক্রমণ করেন ও তাঁহাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। বলা বাহুল্য, এই সব উক্তি অযথার্থ।

৪। Ganesh, a Hindu and Hakim of Dinwaj (perhaps a petty Hindu chief of Dinajpur) —Buchanan.

ব্যাহত হওয়ায় তাঁহারা পরবর্ত্তী নেতা দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেবের পতাকাতলে সমবেত হইয়া জালালউদ্দিনকে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালবাবুও ইহা অসম্ভব মনে করেন নাই।

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন যে, শ্রীহরিদাস দাস মহাশয় 'বাল্যলীলা সূত্র' ও 'অদ্বৈত প্রকাশ'কে আধুনিক গ্রন্থ বলিয়াছেন। দীনেশবাবু আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে চান যে, ঐ গ্রন্থ দুইখানি কৃত্রিম। কারণ স্বরূপ বলেন, (১) বাল্যলীলা সূত্রে লিখিত আছে যে, গণেশ "গ্রহপক্ষাক্ষিশশধৃত মিতে শাকে" রাজা হন। সংস্কৃত সংখ্যাকোষের মতে "অক্ষি" পদে "দুই" বুঝায়, তদনুসারে গণেশের ১৩০৭ খ্রীঃ রাজা হওয়া বুঝা যায়। কিন্তু গণেশ খ্রীষ্ট পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগের লোক। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে সংস্কৃত সংখ্যাকোষ স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। "অক্ষি" পদে "তিন" সংখ্যাও বুঝায়। এ সম্বন্ধে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৭ ভাগ "নামসংখ্যা" নামক প্রবন্ধের ১৭ পৃষ্ঠায় ডঃ বিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয় যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয়ও "অক্ষি" পদে "তিন" ধরিয়াছেন। (২) বুকাননের অনুসরণ করিয়া দীনেশবাবু বলিতে চান যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে দিনাজপুরের অভ্যুদয় হয় নাই। দীনেশবাবুর এই মত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। দিনাজপুরের বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা শুকদেব ঘোষ শ্রীমন্ত দত্তের দৌহিত্র সূত্রে দিনাজপুর রাজ্য প্রাপ্ত হন। এই শুকদেব ঘোষ ১৬৭৭ খ্রীঃ পরলোকগমন করিলে তাঁহার তিন পুত্র রামদেব, জয়দেব ও প্রাণনাথ যথাক্রমে রাজা হন। ১৭১৫ : এই প্রাণনাথের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে লিপি সম্বন্ধে I. H. Q vol. 12, page 355-এ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী মহাশয় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, রাজা প্রাণনাথ ১৬৮২ হইতে ১৭২২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজা ছিলেন। ওয়েষ্টমেকট সাহেব ১৮৭২ খৃঃ *Calcutta Review*, page 132-তে দিনাজপুর রাজবংশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন —"The name which Dr. Buchanon writes—Dinwaj is undoubtedly the first part of the name of Dinajpur." ওয়েষ্টমেকট ঐ প্রবন্ধে দিনাজপুর রাজবংশের প্রচলিত প্রবাদ অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন যে, ঐ রাজবংশের পূর্ব্বাধিকারী শ্রীমন্ত দত্ত রাজা গণেশের কোন অধস্তন পুরুষের নিকট হইতে দিনাজপুর রাজ্য লাভ করেন—"It is much more probable that the Estate dated from earlier time possibly from that of Ganesh."

(৩) দীনেশবাবু বলেন, যখন "বাল্যলীলা সূত্র" রচিত হয় (১৪০৯ শক=১৪৮৭ খ্রীঃ) তখন মহাপ্রভু (১৪৮৫ খ্রীঃ জন্ম) ১ বৎসরের শিশু। অবশ্য অচ্যুতবাবুর "বাল্যলীলা সূত্রে"র প্রথম সর্গের ২১৩ শ্লোকে ও ষষ্ঠ সর্গের ২৪.২৫ শ্লোকে গৌরের নাম আছে। কিন্তু উহা পরবর্ত্তীকালে কোন গৌরভক্ত কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। "বাল্যলীলার" যে পুথি দৃষ্টে অচ্যুতবাবু তাঁহার গ্রন্থ ১৩২২ সালে মুদ্রিত করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত ঐ গ্রন্থের অপর একখানি পুথি পাবনার অদ্বৈত বংশীয় প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পণ্ডিত ৺মুরলীমোহন গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ছিল। অচ্যুতবাবুর গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে উক্ত গোস্বামী মহাশয় তাঁহার ঐ হস্তলিখিত পুঁথি হইতে রাজা গণেশ সম্বন্ধীয় প্রথম সর্গের ৪৬।৪৭।৪৮।৪৯।৫০ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেন এবং আমি তাহা ১৩২০ সালে আমার বগুড়ার ইতিহাসের প্রথম সংস্করণে ও পরে দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশ করি। অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঐ গ্রন্থ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ঐ পুঁথির লেখা প্রায় ২০০।২২৫ বৎসরের পুরাতন। মুরলীমোহন গোস্বামীর পুঁথির উক্ত ৪৬।৪৭।৪৮।৪৯।৫০ শ্লোক যথাক্রমে অচ্যুত বাবুর সম্পাদিত গ্রন্থের ৪৮।৪৯।৫০।৫১।৫২ শ্লোক। অচ্যুতবাবুর পুঁথির প্রথম সর্গের ২১৩ শ্লোক মুরলীমোহন গোস্বামী মহাশয়ের পুঁথিতে না থাকায় ঐরূপ হওয়া সম্ভব। সুতরাং গৌরবিষয়ক ঐ দুই শ্লোক অচ্যুতবাবুর পুঁথিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে অনুমান করা যাইতে পারে। যিনি এই দুইটি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন তিনিই ষষ্ঠ সর্গের ২৪।২৫ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করিয়া থাকিবেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে পারদর্শী ড. শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়ও এই শ্লোকগুলিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন ঈশান নাগরের অদ্বৈত প্রকাশ ১৪৯০ শকে (১৫৬৮ খ্রীঃ) রচিত। এই গ্রন্থকে কৃত্রিম বলিবার কোন বিশেষ কারণ দীনেশবাবু দেন নাই। রূপকথায় পরিপূর্ণ বলিয়া যদি এই গ্রন্থ কৃত্রিম হয় তবে বোধ

কে, হে, বজের
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
চুল উঠা বন্ধ করে
মাথা ঠাণ্ডা রাখে
এই মার্কা দেখে কিনুন • নকল থেকে সাবধান
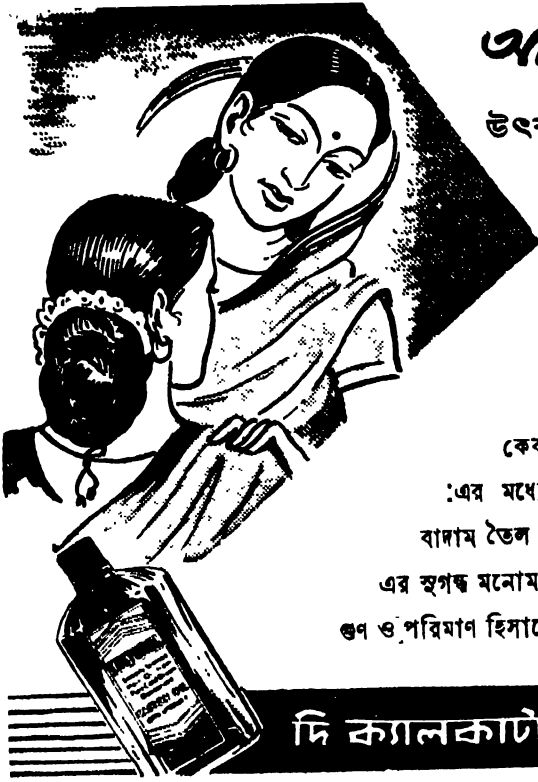
কৰি কোন বৈষ্ণব গ্রন্থই বাদ যায় না।৫ ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের *History of Bengali Language and Literature* (p. 495-96) রাখালবাবুর বাংলার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০২, ও "বঙ্গীয় মহাকোষে" "অদ্বৈত আচার্য্য" প্রবন্ধে "বাল্যলীলা সূত্র" ও "অদ্বৈত প্রকাশ"কে মৌলিক গ্রন্থ বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। সেখানেও "অব্দি" পদে "তিন" সংখ্যা ধরা হইয়াছে।

দীনেশবাবু বুকাননের "Hakim of Dinwaj" কথার মধ্যে দনুজমর্দ্দনদেবের অস্তিত্ব বাহির করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। কিন্তু স্বয়ং বুকানন "Hakim of Dinwaj" অর্থে "Raja of Dinajpur" বুঝিয়াছেন। ওয়েষ্টমেকট সাহেবও বুকাননের "Dinwaj" অর্থে "Dinajpur" বুঝিয়াছেন।

রিয়াজে জালালউদ্দিনকে হিন্দুদের প্রতি অত্যাচারী বলা হইয়াছে। তাহার প্রতিবাদে আমি "স্মৃতি রত্নহারে"র বচন উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। দীনেশবাবুর ব্যাখ্যা অনুসারেও দেখা যায় জালাল-উদ্দিন জগদত্তের৬ পুত্র রায় রাজ্যধরকে সেনাপতি পদ প্রদান ও বহু দান করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি যে হিন্দুদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাহাই বুঝা যায়। দীনেশবাবু জগদত্তকে সঙ্কর জাতীয় বলিয়া ভুল করিয়াছেন। "মূর্দ্ধাভিষিক্ত" পদের অর্থ রাজা ও ক্ষত্রিয়। "মূর্দ্ধাভিষিক্তঃ ক্ষত্রিয়ঃ রাজা ইত্যমরঃ" (শব্দকল্পদ্রুম)। দীনেশবাবু মনূক্ত বর্ণসঙ্কর "মূর্দ্ধাবসিক্ত" (মনু ১০।৬)কে "মূর্দ্ধাভিষিক্ত" বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। তিনি জালালউদ্দিনের পূর্ব্বে "শ্রী" না থাকায় তাঁহাকে মৃত মনে করিয়াছেন, কিন্তু তাহার উদ্ধৃত "সঙ্গীত শিরোমণি"র বচনে "ইব্রাহিম" নামের পূর্ব্বেও "শ্রী" দেখিতেছি না, যদিও ইব্রাহিম তখনও জীবিত ছিলেন।

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, "প্রভাসবাবু আর একটি হিন্দু সূত্র বাদ দিয়াছেন—ইহা নগেন্দ্রনাথ বসুর উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ডের রাজা গণেশের বিবরণ।" আমি উহা উল্লেখ করা সঙ্গত বোধ করি নাই।

চন্দ্রদ্বীপের রাজা বলিয়া কথিত দনুজমর্দ্দন দেবকে দীনেশবাবু "রামনাথ দনুজমর্দ্দন" বলিয়াছেন। বোধ হয়, বিভারিজ সাহেবের বাখরগঞ্জের ইতিহাস হইতে তিনি ঐ নাম সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু ব্রজসুন্দর মিত্রের চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ, বৃন্দাবন পুতিতুণ্ডের চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস ও কুলগ্রন্থে তিনি কেবল দনুজমর্দ্দনদেব নামেই অভিহিত হইয়াছেন। উপনামের সহিত বংশোপাধি যুক্ত করা সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না। দনুজমর্দ্দনদেবের দনুজমর্দ্দন পদকে উপনাম মনে করিবার কোন হেতু দেখা যায় না।

"সঙ্গীত শিরোমণি"তে রাজা গণেশকে শলভরূপ পতঙ্গের অগ্নি বলিয়া যে উপমা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে দীনেশবাবু রাজা গণেশকে মুসলমানদের প্রতি অত্যাচারী বলিয়া রিয়াজের বিবরণকে সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ঐ উপমা হইতে রাজা গণেশকে তাঁহার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত মুসলমান সুলতান আলাউদ্দিন ফিরোজশাহ ও তাঁহার সমর্থক মুসলমান প্রধানগণের বিনাশক ভিন্ন আর কিছু বুঝায় বলিয়া মনে হয় না। ফিরিস্তা (১৬১১ খ্রীষ্টাব্দ) রাজা গণেশকে মুসলমানদের সহৃদয় বন্ধু বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম ভাগের অন্ধকার যুগের একটি ঐতিহাসিক সমস্যা সম্বন্ধে সত্য আবিষ্কারের জন্যই আমি আমার প্রবন্ধ লিখিয়াছি। সত্য নির্ণীত হউক ইহাই আমার উদ্দেশ্য।

দীনেশবাবু ১।২ নং তথ্যদ্বারা বলিতে চান যে, নরসিংহ নাড়িয়াল গণেশের সমসাময়িক নহেন ও দিনাজপুর নামটি আধুনিক। অতএব "বাল্যলীলা সূত্রম্" ও "অদ্বৈত প্রকাশ" গ্রন্থদ্বয় কৃত্রিম। অদ্বৈতাচার্য্যের বংশাবলী সম্বন্ধে আমি "বঙ্গীয় মহাকোষের" অনুসরণ করিয়াছি। কেবলমাত্র প্রবাদমূলক কুলগ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া কোন ঐতিহাসিক ঘটনার কাল নির্ণয় করা, কিংবা বুকানন ও গ্রাণ্ট সাহেবের অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া দিনাজপুর গ্রামটিকে আধুনিক বলা এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়া "বাল্যলীলা সূত্র" ও "অদ্বৈত প্রকাশ"কে কৃত্রিম গ্রন্থ বলা নিরাপদ নহে।

বুকানন লিখিয়াছেন, "Then Ganesh, a Hindu Hakim of Dinwaj (perhaps a Hindu Chief of Dinajpur), seized the Government." এখানে perhaps কথা দ্বারা Hindu chiefকে লক্ষ্য করাই বোধ হয় লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। এবং এইজন্যই হয়ত ওয়েষ্টমেকট "undoubted" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

যাহা হউক, "বাল্যলীলা সূত্র" হইতে রাজা গণেশ যে হরিভক্ত ছিলেন তাহাই দেখান আমার উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং ঐ গ্রন্থদ্বয়ের প্রমাণ বাদ দিলেও আমার প্রতিপাদ্য বিষয় বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় না।

দীনেশবাবুর ৩নং তথ্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, "বৈষ্ণব তোষণী (লঘুতোষণী)-র রাজা দনুজমর্দ্দন ও চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের আদিপুরুষ বলিয়া কথিত রাজা দনুজমর্দ্দনদেব যে রাজা গণেশের সমসাময়িক তাহা আমার মূল প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। অন্ততঃ রাজা দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব নামে রাজা গণেশের সমসাময়িক যে দুই জন হিন্দুরাজা বঙ্গদেশের কোথাও বর্ত্তমান ছিলেন তাহা মনে করিলে অসঙ্গত হয় না।

দীনেশ বাবুর চতুর্থ তথ্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, টীকা-কারেরা যাহাই বলুন "মূর্দ্ধাভিষিক্তঃ" ও "মূর্দ্ধাবসিক্তঃ" দুইটি পৃথক জাতি। মনুসংহিতায় ও শব্দকল্পদ্রুমে "মূর্দ্ধাবসিক্তঃ"কেই ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে জাত বর্ণসঙ্কর জাতি বলা হইয়াছে।

৫। শ্রীহরিদাস দাস মহাশয়ের গ্রন্থ আমার নিকট না থাকায় তৎসম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

৬। "জগদত্ত" পাঠ ভুল বলিয়া মনে হয়। "জগদত্ত" হইলেই বোধ হয় ঠিক হইত

বঙ্কিম-রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)—সমগ্র উপন্যাস. সাহিত্য-সংসদ, ৩২এ, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯। দাম দশ টাকা।

একত্রে একটিমাত্র খণ্ডে নিবদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাসের সুদৃশ্য শোভন সংস্করণ প্রকাশ করিয়া সাহিত্য-সংসদ বাঙ্গালী পাঠককে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।—ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক; বাংলা গদ্য সাহিত্য তখনও শৈশব অতিক্রম করে নাই। মিত্রাক্ষরের বন্ধন-বিমুক্ত করিয়া শ্রীমধুসূদন বাংলা কাব্যকে নবমহিমামণ্ডিত করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে শ্রী ও সৌষ্ঠব দান করিয়াছেন। সেই যুগসন্ধিকালে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবে বাঙ্গালীর হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব সাড়া পড়িয়া গেল। সকলেই অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইল বাংলায় রাজচক্রবর্ত্তীর আবির্ভাব হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদ্‌পদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল। পূর্ব্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তে অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলো, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য।....বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে "কপালকুণ্ডলা" এবং ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে "মৃণালিনী" বাহির হইল। মাসিকপত্র "বঙ্গদর্শনে"র প্রকাশকাল ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ। রবীন্দ্রনাথ "জীবনস্মৃতি"তে বলিয়াছেন, "বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালীর হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল।" বঙ্কিমের প্রত্যেক উপন্যাস, প্রত্যেক পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পাঠকসমাজে এক আনন্দময় চাঞ্চল্য উপস্থিত হইত। ইহার পূর্ব্বে অথবা পরে একরূপ ঘটনা আর ঘটে নাই। এমন অবিসম্বাদে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি-লাভের সৌভাগ্য আর কাহারও হয় নাই। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, "দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা, সকল বিষয়ে বোধ হইল যেন বঙ্কিমবাবু দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন।" বঙ্কিমচন্দ্র শুধু রোমান্স অথবা ঐতিহাসিক উপন্যাস "রাজসিংহ" প্রভৃতি লিখিয়া ক্ষান্ত হন নাই। "বিষবৃক্ষ" রচনা করিয়া তিনি বাংলা-সাহিত্যে 'নভেলে'র প্রবর্তন করিলেন। "কৃষ্ণকান্তের উইলে" তাহা অপূর্ব্বতা লাভ করিল। "চন্দ্রশেখরে"র প্রতাপ এক আদর্শ চরিত্র। "রজনী" এক নূতন ধরণের উপন্যাস। "ইন্দিরা", "রাধারাণী", "যুগলাঙ্গুরীয়" লিখিয়া তিনি বাংলায় ছোট গল্পের সৃষ্টি সম্ভবপর করিয়া তুলিলেন। পরে অবশ্য 'ইন্দিরা' উপন্যাসাকারে পরিবর্দ্ধিত হয়।

শুধু রসস্রষ্টা হিসাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় সম্পূর্ণ নয়। "বঙ্গদর্শনে"র মধ্য দিয়া ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান এবং জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের পরিবেশন করিয়া তিনি বাঙালীর চিন্তাধারাকে নূতন খাতে প্রবাহিত করিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক, দার্শনিক, ইতিহাস-ব্যাখ্যাতা, ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাতা, রসরচয়িতা, কবি—এ সমস্তই সত্য। সর্ব্বোপরি তিনি দেশপ্রেমিক। "মৃণালিনী" হইতে "কমলাকান্ত" পর্য্যন্ত তাঁহার সমস্ত রচনা স্বদেশপ্রেমে ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, "বঙ্কিমবাবু যাহা
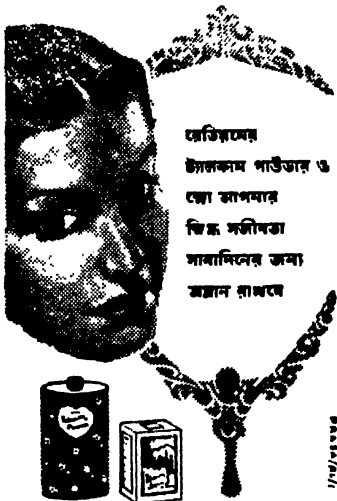
"চেষ্টা ক'রে দেখুন...

লাক্স্ টয়লেট্ সাবান মেখে
...আপনি আরও সুন্দর
হ'তে পারেন।"

রেহানা বলেন।

"এ এক সৌন্দর্য্যচর্চ্চার অপূর্ব্ব সহায়." রেহানা বলেন, "লাক্স্ টয়লেট সাবানের সরের মত ফেনা মুখে ও গায়ে বেশ ভাল ক'রে ঘ'ষে নিয়ে ধুয়ে ফেলুন। নিয়মিত ব্যবহার ক'রলে, লাক্স্ টয়লেট্ সাবান আপনার ত্বকের এক নতুন সৌন্দর্য্য এনে দেবে।"

LUX
TOILET SOAP

যতো সাদা, ততো বিশুদ্ধ, তেমনি সুগন্ধ

লাক্স্ টয়লেট্ সাবান
চিত্র-তারকাদের
সৌন্দর্য্য সাবান

LTS. 383-X52 BG

কিছু করিয়াছেন সব গিয়া এক পথে দাঁড়াইয়াছে। সে পথ জন্মভূমির উপাসনা, জন্মভূমিকে মা বলা—জন্মভূমিকে ভালবাসা—জন্মভূমিকে ভক্তি করা। তিনি এই যে কার্য্য করিয়াছেন তাহা ভারতবর্ষে আর কেহ করে নাই। সুতরাং তিনি আমাদের পূজ্য, তিনি আমাদের নমস্য, তিনি আমাদের আচার্য্য, তিনি আমাদের ঋষি, তিনি আমাদের মন্ত্রকৃৎ, তিনি আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা। সে মন্ত্র বন্দে মাতরম্।" তাঁহার শেষ কয়খানি উপন্যাস "দেবী চৌধুরাণী", "সীতারাম" প্রভৃতিতে এই দেশ ভক্তির প্লাবন বহিয়াছে, "আনন্দমঠে"র ত কথাই নাই। শুধু রাঢ়ে বঙ্গে নয়, এই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের সর্বত্র সুপরিচিত।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল এই সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁহার উপন্যাসগুলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিয়াছেন। সংক্ষিপ্ত হইলেও এই জীবন-চরিত ও পরিচয় বহু মূল্যবান তথ্যে পূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্রের সুলভ সংস্করণ আছে এবং নানা তথ্য ও পাঠান্তর সমন্বিত মূল্যবান সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণও আছে। কিন্তু একখণ্ডে সম্পূর্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাসের এরূপ একটি সুমুদ্রিত সুদৃশ্য অথচ সুলভ সংস্করণ পাইয়া বাঙালী পাঠক নিশ্চয় আনন্দিত হইবেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি—ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (১ম খণ্ড)—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দশ টাকা।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর 'রাগ ও রূপ' গ্রন্থে আভাস দিয়েছিলেন যে, ভারতীয় সঙ্গীতের আনুপূর্বিক ইতিহাস প্রকাশে তিনি ব্রতী হয়েছেন। সে ইতিহাসের প্রথম খণ্ড পাঠ করে প্রত্যেকে স্বীকার করবেন যে কি অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনায় তিনি এই ইতিহাস রূপায়িত করেছেন। ভারতীয় সঙ্গীতের পটভূমিকার প্রথম অধ্যায় রচনা করে তিনি তুলনামূলক পদ্ধতিতে ভারতের সঙ্গে ভারতেতর দেশে সাঙ্গীতিক যোগাযোগ বিষয়েও গভীর আলোচনা তুলেছেন। এ ধরণের আলোচনা একমাত্র ফরাসী ভাষায় সাঙ্গীতিক বিশ্বকোষ (Encyclopedia of Music) প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে তিনি সামবেদাদি বৈদিক যুগের সঙ্গীত-শাস্ত্র থেকে শুরু করে আরণ্যক ও উপনিষদ যুগের সঙ্গীতের আলোচনা করেছেন। বৈদিক ভাষা কালক্রমে রূপান্তরিত হয়ে সংস্কৃত ভাষায় স্থায়ী রূপ পেয়েছিল এবং সে ভাষার একজন আদি গুরু বৈয়াকরণিক পাণিনি। তাঁর শিক্ষায় যেমন সঙ্গীতের বহু তত্ত্ব মেলে তেমনি পরবর্তী যুগের নারদী শিক্ষায়ও আমাদের সঙ্গীত-ইতিহাসের অমূল্য উপাদান মেলে। এইসব দুষ্প্রাপ্য ও দুর্বোধ্য গ্রন্থাদি মন্থন করে প্রজ্ঞানানন্দজী যে অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেছেন সেটি বহুকাল আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। আমরা আশা করি যে সঙ্গীত-কলাবিদ্ বিশেষজ্ঞেরা তথা সাধারণ পাঠক-পাঠিকারাও প্রথম খণ্ডের প্রচারে সাহায্য করে অপর খণ্ডগুলিরও আশু প্রকাশে সহায়তা করবেন। গ্রন্থখানিতে বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র, রাগ-রাগিণীর চিত্র ও ছন্দোবদ্ধ মুদ্রা চিত্র সন্নিবেশিত করে গ্রন্থের উপযোগিতা বর্দ্ধিত করেছেন। আমরা তাঁর দ্বিতীয় খণ্ড পঠনের আশায় উন্মুখ হয়ে আছি এবং আশা করি স্বামিজী সুস্থ শরীরে ভারতীয় সঙ্গীতের এই বিরাট বিশ্বকোষ সুসম্পন্ন করে যাবেন।

বিশাল অন্ধ্র—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র। দেশবন্ধু বুক ডিপো, ৮৪-এ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য দুই টাকা আট আনা।

অন্ধ্র জাতি বৈদিক যুগের শেষ পর্বে আরণ্যক ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যে দেখা দিয়েছে। জাতিতে দ্রাবিড় হলেও অন্ধ্রেরা উত্তর-ভারতীয় আর্যগণের সঙ্গে সুপ্রাচীন কাল থেকে মেলামেশা করেছে। দু'হাজার বৎসর আগেও আন্ধ্র সাম্রাজ্য বঙ্গোপসাগর থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্ব ও পশ্চিম অন্ধ্র রাজবংশের কীর্তিকলাপ ক্রমশঃ প্রকাশিত হলেও আধুনিক কালের আন্ধ্রদের সঙ্গে প্রাচীন আন্ধ্রদের যোগাযোগ নিয়ে অনেক মতভেদ আছে, কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প ও সঙ্গীতে আন্ধ্রদের সঙ্গে উত্তর-ভারতীয় জাতিসঙ্ঘের এবং বিশেষভাবে বাঙ্গালীজাতির গভীর মিল আছে। দক্ষিণ ভারতে প্রগতিবাদী অন্ধ্রেরাই রাজা রামমোহন ও মনীষী বিদ্যাসাগরের প্রেরণায় অগ্রণী হয়ে সমাজ-সংস্কারের পথ সুগম করেছেন। সুতরাং ভাষার ভিত্তিতে প্রথম স্বাধীন ভারতে অন্ধ্র রাষ্ট্র গড়ে উঠার শুভক্ষণে শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 'বিশাল অন্ধ্র' বইখানি প্রকাশিত করে আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। মুক্তিসাধনার পথে অন্ধ্রদেশের দান তিনি গভীর সমবেদনার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং সুদূর হায়দ্রাবাদ থেকে রাজমহেন্দ্রী পরিভ্রমণ করে অনেক মূল্যবান তথ্য সন্নিবেশিত করেছেন অন্ধ্রের আদিবাসীদের কথাও তিনি ভুলেন নি এবং একালের সুপ্রসিদ্ধ অন্ধ্র নেতাদের সঙ্গে সাহচর্য করে বঙ্গ ও অন্ধ্রবাসীদের মধ্যে স্থায়ী প্রীতি ও সম্বন্ধ স্থাপনা করেছেন। সাধারণে 'বিশাল অন্ধ্র' পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি।

উপনিষদ্—শ্রীচিত্রিতা দেবী। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড, ১৪ নং বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য আড়াই টাকা।

শ্রীমতী চিত্রিতা দেবী কিছুদিন থেকে মূল উপনিষদ পাঠ করে তার বঙ্গানুবাদ পত্রিকাদিতে প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে, ঈশ, কেন ও

কঠোপনিষদ এই তিনটি উপনিষদের সংস্কৃত পাঠ ও সেই সঙ্গে তার বঙ্গানুবাদ পাশাপাশি সন্নিবেশিত করে প্রকাশ করেছেন। উপনিষদ-যুগের সংস্কৃত ভাষা ও অন্বয়াদি বুঝতে পারা অনেকের পক্ষেই কঠিন অথচ চিত্রিতা দেবীর বইখানি সেদিক থেকে বহু নরনারীকে উপনিষদ পড়তে ও বুঝতে উৎসাহিত করবে। অর্থবোধের দিকে সাহায্য করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য এবং সে কর্তব্য তিনি যথাসাধ্য পালন করেছেন এবং তাঁর পূজনীয় অধ্যাপক ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে লিখেছেন: "যাহারা সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সুযোগবঞ্চিত তাঁহাদের পক্ষে বঙ্গভাষায় রচিত এই অনুবাদ ও ব্যাখ্যা কল্যাণ মার্গের অনুসরণে বিশেষ উপযোগী হইবে। সেইদিনে কল্যাণীয়া অনুবাদকর্ত্রীর অবদানের গৌরব ও মহিমা সহৃদয় সমাজে অকৃপণ অঙ্গীকার ও সমাদর লাভ করিবে।" আমিও এ বিষয়ে পণ্ডিতপ্রবর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত একমত। লেখিকা শুধু উপনিষদের ভাবে নয় ভাষার মাধুর্যেও প্রেরণা লাভ করে তাঁর অনুবাদকে প্রাণবন্ত করেছেন। গদ্যে উপনিষদের অনুবাদ অনেক হয়েছে অথচ উপনিষদের গদ্যও পদ্যাত্মক। সেটি অনুভব করে লেখিকা ছন্দের আভাষে তাঁর অনুবাদকে মাধুর্যমণ্ডিত করেছেন। এই দুর্লভ মনুষ্যজন্মই সাধনক্ষেত্র এবং এইখানেই ব্রহ্মোপলব্ধি সম্ভব। উপনিষদের এই মূল কথাটি কঠোপনিষদের সুনিপুণ অনুবাদে লেখিকা পরিস্ফুট করেছেন। বিশেষজ্ঞেরা তথা সাধারণ পাঠকপাঠিকাগণও চিত্রিতা দেবীর 'উপনিষদ' পাঠ করে উপকৃত হবেন। আমি আশা করি অন্যান্য উপনিষদগুলির অনুবাদও তিনি প্রকাশিত করে বঙ্গভাষার সমৃদ্ধি সাধন করবেন। তাঁর বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীকালিদাস নাগ

এই মর্তভূমি—শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—৩৷৹ টাকা।

লণ্ডন শহরের পটভূমিতে গল্পের আরম্ভ এবং পরিসমাপ্তি। গল্পের নায়ক ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থী এক ভারতবর্ষীয় যুবক। কয়েকটি বৎসরের শিক্ষানবিশীকালে ঐ দেশের বিভিন্ন চরিত্রের নর-নারী এবং তাহাদের বিচিত্র জীবনধারার সঙ্গে তাহার পরিচয় ঘটিয়াছে—একটি মেয়েকে সে ভালবাসিয়াছে। ইহাদেরই সুখ-দুঃখ হাসি-বেদনার প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে গল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। লণ্ডন-প্রবাসী ভারতীয়দের লইয়া ইতিপূর্বে বাংলা-সাহিত্যে কিছু গল্প যে না লেখা হইয়াছে তাহা নহে, সেগুলি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে কিনা সে প্রশ্ন না তুলিয়াও আলোচ্য উপন্যাসখানি যে পাঠকচিত্তকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

লণ্ডন শহরকে এবং শহরের বাসিন্দাদের ঠিকমত জানিবার সুযোগ শতকরা নিরানব্বই জন বাংলা-উপন্যাস পাঠকের ভাগ্যে ঘটে না, সুতরাং অপরিচিত দেশ ও মানুষগুলিকে জানিবার জন্য মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটু কৌতূহল জমিয়াই থাকে। অবশ্য অনুবাদ-সাহিত্যের মাধ্যমে এই কৌতূহল বহুলাংশে পরিতৃপ্ত হইতে পারে, কিন্তু ভারতীয় মন ও দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে সেই শহর ও মানুষগুলি যথাযথ ধরা পড়ে না বলিয়া খানিকটা অতৃপ্তি রহিয়া যায়। ভারত-শাসক রূপে একদা যে জাতির পরিচয় আমরা ভিন্নরূপে লাভ করিয়াছি। প্রভুত্বের অহমিকা সেখানে মানুষকে বুঝিতে দেয় নাই—শ্রেণীগত বৈষম্যে সমাজের সুস্থ রূপটিও চোখে পড়ে নাই। দুই পক্ষের ভুল বোঝাবুঝির পাল্লায়, চিত্র ও চরিত্রে অধিকাংশ লেখকই ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারেন নাই।

পরশাসনের বাধা অপসারিত হওয়ার পর এই কাহিনীর সূত্রপাত—কাজেই চরিত্রগুলি স্থান কালের স্বকীয়তায় সজীব হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে জাতি-গর্বের অহমিকা নাই—কল্পনা-সৃষ্ট নাটকীয় বস্তুও নাই, এগুলি জীবন্ত মানুষের ছবি। মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ কেরানী, কারখানার শ্রমিক, পুত্রস্নেহান্ধ জননী, পরশ্রীকাতর ও কলহনিপুণা প্রতিবেশিনী, আত্মসুখাভিলাষিণী বিলাসিনী, প্রিয়সুখভাগিনী প্রেমিকা—অসংখ্য চরিত্রের আশা-আনন্দ-বঞ্চনার চিত্রপট সমুজ্জ্বল একটি অপরিচিত দেশ। যদি স্থান ও নামের চিহ্নটুকু মুছিয়া দিলে সেই দেশ ও মানুষগুলিকে অপরিচিত বোধ হয় না; সে যেন নিত্য-দেখা ভূমি অন্তরঙ্গ আত্মীয়জনের স্পর্শ-স্বাদে সুমধুর। শুধু চোখের দেখা নহে, মনের অনুভূতি মিশাইয়াছেন লেখক এবং কোথাও অভিজ্ঞতার সীমা অতিক্রম করেন নাই বলিয়া স্থানসমেত চরিত্রগুলি সজীব হইয়াছে।

গল্পের মূল চরিত্র সুকুমার ও পামেলা। ইহারা পরস্পরের অনুরাগী; ছোটখাটো ঘটনার মধ্য দিয়া সেই অনুরাগ গভীর ভালবাসায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই ভালবাসা সার্থক হইতে পারে নাই বলিয়া কোন কোন পাঠক অনুযোগ করিতে পারেন। অর্থকৃচ্ছ্রতা ও পারিবারিক বাধা এই অকৃত্রিম ভালবাসায় আকস্মিক ছেদ টানিয়াছে। এইভাবে ব্যক্তিগত বাধা অতিক্রম করিতে না পারায় নায়ক-চরিত্র কিছু দুর্বল হইয়াছে। তথাপি, প্রতিবেশ, সমস্ত পার্শ্বচরিত্র ও ছোটখাটো ঘটনা মিলিয়া গল্পটিকে শেষ পর্য্যন্ত সাবলীল গতিতে টানিয়া লইয়া গিয়াছে এবং ইহারই মধ্যে রসসৃষ্টি হইয়াছে প্রচুর।

নিশ্চেতন মন—শ্রীশোভা হুই। ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ২৷৷০ টাকা।

অবসরপ্রাপ্ত রায়বাহাদুরের তিন ছেলে ও একটি মেয়েকে লইয়া গল্পের সূচনা। ছেলেরা স্বদেশী করিয়া বেড়ায়—মেয়েটি সমাজহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করে, সুতরাং রায়বাহাদুরের সঙ্গে তাহাদের মতের গোরতর অমিল। মেয়েটিকে আত্মমুখী করিবার জন্য রায়বাহাদুর কৌশল অবলম্বন করিয়া প্রবাসী হইলেন। সেবার ভার লইয়া মেয়েটি সঙ্গে গেল। সেখানে এক জমিদার-পরিবারের সঙ্গে পরিচয়, সেই বংশের একটি গুণবান ও রূপবান ছেলের সঙ্গে মেয়েটির আলাপ ও ভালবাসা—গল্পটি অবশ্য মিলনাত্মক। অত্যন্ত সাধারণ কাহিনী—ঘটনাবিন্যাস বা লিপিচাতুর্য্য বিশেষত্বহীন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

নববর্ষ (বাংলা বার্ষিকী)—শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৯, নূর মহম্মদ লেন, কলিকাতা-৯, নববর্ষ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৷৷০।

কয়েকটি বিষয়ে এই বার্ষিকীখানি উল্লেখযোগ্য মনে করি। মুদ্রণ-পরিপাট্যে, চিত্রগৌরবে, বিষয়-বৈচিত্র্যে, সর্বদিক দিয়াই ইহার সৌষ্ঠব ও উৎকর্ষ প্রশংসনীয়। খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণের লেখা ছাড়া ইহার তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ, ইহার চিত্রগুলি সুমুদ্রিত ও সুদর্শন। দ্বিতীয়তঃ, ইহা সস্তা নিউজ-প্রিণ্টে ছাপা নহে, উৎকৃষ্ট মূল্যবান এণ্টিক কাগজে ছাপা। এদিক দিয়া যাঁহারা একখানি উৎকৃষ্ট উপহারযোগ্য বই খুঁজিতেছেন, তাঁহারা এইখানি নির্ব্বাচিত করিলে সুবিবেচনার কাজ করিবেন। তৃতীয়তঃ, ইহাতে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ চলতি বৎসর পর্য্যন্ত বাংলা নাটক, সাহিত্য, সংবাদপত্র, শিল্পকলা ও চলচ্চিত্রের সালতামামি ও বহুমুখী বিচিত্র বিকাশের সম্ভাবনা পাঠকগণের বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। মলাটের পটশিল্পের আদর্শে অঙ্কিত মাতৃমূর্ত্তির পরিকল্পনাটি চমৎকার।

মনের পটে অমর ছবি—"দাদুভাই" শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়। গ্রন্থজগৎ, ৭ জে, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা-২৯। মূল্য ৷৷০ আনা।

ছেলেদের বই। লিকলিকে ছেলে, সুরেন্দ্রনাথ নিজেই করি নিজের কাজ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, গাড়োয়ানের ছেলে এই পাঁচটি গল্প ইহাতে স্থান পাইয়াছে। সবগুলিই সচিত্র। কিন্তু গল্পগুলি পড়িয়া মনের কোণে অতৃপ্তি থাকিয়া যায়, মনে হয় সবগুলি চিহ্নিত না করিয়া এইরূপ আরও পাঁচটি গল্প উপহার দিলে গ্রন্থকার ভাল করিতেন।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

আহ্‌মেদাবাদে দুর্গাপূজা

আহমেদাবাদে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা আনন্দ ও উৎসাহের মধ্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পার্শ্বের ছবিতে পূজা সমিতির কর্ম্মীগণ সহ (দক্ষিণ হইতে বামে) সভাপতি শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীসমর ঘোষ ও শ্রীরাজেন দত্তকে দেখা যাইতেছে।

আহমেদাবাদে দুর্গাপূজা

বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী—১৯৫২

আলোচ্য বর্ষে নিত্যনৈমিত্তিক পূজানুষ্ঠান যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। ৫১টি ধর্ম্মবিষয়ক ক্লাস এবং প্রতি একাদশীতে জন্মতিথি উৎসব যথারীতি নিষ্পন্ন হইয়াছে।

এই বৎসরে গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের কার্য্য নিয়মিতভাবে চলিয়াছে। মোট পুস্তকের সংখ্যা ছিল ১৮৮৮। ১৯৫২ সালে ০০খানি নূতন পুস্তক গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হ। ৩০ খানা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং দুইখানা দৈনিক পত্রিকা পাঠাগারে রক্ষিত থাকে।

১৯৫২ সালের শেষভাগে গঙ্গাজলঘাটি থানার অন্তর্গত রামহরিপুর কেন্দ্রে একটি ক্ষুদ্র পুস্তকাগার স্থাপিত হইয়াছে। পল্লী-গ্রামে স্থাপনা হেতু এখনও পুস্তকাগারের আশানুরূপ উন্নতিসাধন করা সম্ভব হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষে তিনটি চিকিৎসা-কেন্দ্রের কার্য্যই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে নূতন ও পুরাতন মিলাইয়া মোট চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ৬১৫০১ জন, অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে ৬৪৭ জনের উপর। রামহরিপুর শাখা চিকিৎসাকেন্দ্রে ২০৭১৬ জন চিকিৎসিত হইয়াছে।

রামহরিপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মোট ১১৭ জন। আলোচ্যবর্ষে ১৬ জন প্রাথমিক ফাইনাল পরীক্ষা দিয়াছিল, ১৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। বিবেকানন্দ হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা মোট ৭ জন।

সারদানন্দ ছাত্রাবাসে মোট ২০ জন ছাত্র অবস্থান করিয়া অধ্যয়ন করিতেছে। একটি ছাত্র স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

রামহরিপুর পরিবর্দ্ধিত মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে মোট ১৫০ ছাত্রের মধ্যে ১১ জন অবৈতনিক এবং ২৩ জন অর্দ্ধবেতন দেয়।

বিদ্যালয়টিকে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। তজ্জন্য নূতন গৃহনির্ম্মাণকার্য্য প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে।

বিভিন্ন সূত্রে মিশনের মোট আয় ১৩৩৮০৲ টাকা ২ পাই, ব্যয় হইয়াছে ১৩৭৮০৵০ আনা।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
প্রতিষ্ঠিত

প্র

পৌষ, ১৩৮০

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

নৃত্য

শ্রীমণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মাটির মানুষ

ভাস্কর : শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৩শ ভাগ
২য় খণ্ড
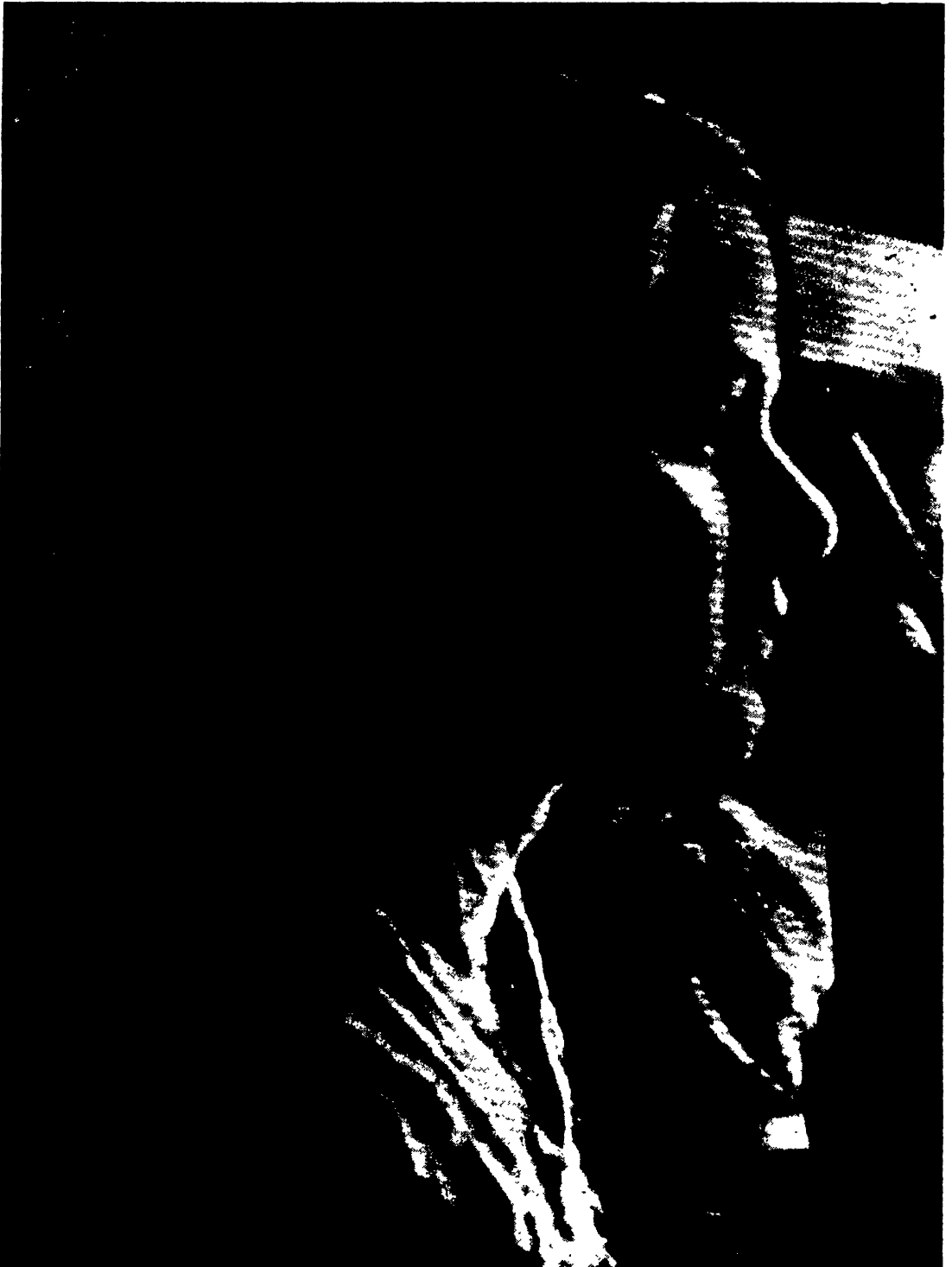
পৌষ, ১৩৬০

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কলিকাতায় পণ্ডিত নেহরু

আমরা সচরাচর প্রবাসীর সম্পাদকীয় বিবিধ প্রসঙ্গে দীর্ঘ বক্তৃতা বা সাময়িক সংবাদের সুদীর্ঘ বিবরণ দিই না। এই মাসে আমরা সেই নিয়ম ব্যতিক্রম করিয়া পণ্ডিত নেহরুর কয়েকটি বক্তৃতার দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি এবং অন্য প্রসঙ্গেও দীর্ঘ উদ্ধৃতি আছে। বিশেষ কারণে আমরা ইহা করিতে বাধ্য হইয়াছি।

পাকিস্থান ও আমেরিকার মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ এবং অন্যভাবে পাকিস্থানের যুদ্ধশক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থার আলোচনা চলিতেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐরূপ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে ভারতবাসীর বিপদ কি ভাবে এবং কতটা হইতে পারে সে বিষয়ে আমরা বোধ হয় কেহই সম্পূর্ণ সচেতন নহি। পণ্ডিত নেহরুর ন্যায় শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিও ইহাতে বিষম বিচলিত হইয়াছেন ইহাই ঐ বিপদের সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। এইজন্য আমরা তাঁহার বিভিন্ন বক্তৃতার দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি।

ভারতকে অগ্রাহ্য করিয়া পাকিস্থানের সহিত এইরূপ ব্যবস্থা করিতে আমেরিকা কেন উদ্যত হইল তাহার ইঙ্গিতও ঐ সকল বক্তৃতায় রহিয়াছে।

যে দেশে মুষ্টিমেয় রাষ্ট্রবিধ্বংসকারী দল নিজ স্বার্থে বা বিদেশীর ইঙ্গিতে বৃহত্তম শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে বিকল বা অচল করিতে পারে, যে দেশে মুষ্টিমেয় অপরিণতমস্তিষ্ক এবং অসহিষ্ণু যুবক দেশের শাসন-তন্ত্রকে বিকল করিতে পারে এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লক্ষ লক্ষ লোক জড়ভরত হইয়া তাহা দেখে, যে দেশের রাজনীতি প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রে এবং সর্ব্বদলে ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং নীচ লালসায় দুষ্ট, সে দেশ ঐরূপ অবহেলা ত পাইতেই পারে।

আমাদের ইতিহাসের পাতায় পাতায় এইরূপ অবস্থার ফল কি হয় তাহা রক্তাক্ষরে লিখিত আছে। আমরা যদি এতই মোহগ্রস্ত বা নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থে এতই অন্ধ হই যে, ঐ ইতিহাসের শিক্ষা আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে পারে না তবে আমাদের দুর্দ্দশা ও দাসত্ব নিশ্চিত।

কলিকাতায় বেকার-সমস্যা ভীষণ। কিন্তু স্বার্থান্ধ নীচ লোকের প্ররোচনায় এবং অপরিণতমস্তিষ্ক লোকের উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে এই নগরীর কুখ্যাতি এরূপ হইয়াছে যে, কেহই এই অঞ্চলে নূতন শিল্পোদ্যম করিতে সাহস পায় না। আমরা দুইটি বিশাল শিল্পোদ্যোগের কথা জানি যাহার কলিকাতায় স্থাপনা ও চালনার ব্যবস্থা হইতেছিল। ঐ দুইটিতে অন্ততঃ পনর-বিশ হাজার লোকের সংস্থান হইত। কিন্তু বিগত জুলাইয়ের অরাজকতার পর এগুলি অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানে যে সকল প্রতিষ্ঠান এখানে আছে তাহারাও নূতন কলকারখানা অন্যত্র বসাইবার চেষ্টা করিতেছে। এই তো আন্দোলনের ফল।

আমরা চিন্তাশীল লোকমাত্রকেই পণ্ডিত নেহরুর ভাষণগুলির উদ্ধৃত অংশ পাঠ ও বিচার করিতে অনুরোধ করিতেছি।

দেরাদুনে পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা

"দেরাদুন, ১১ই ডিসেম্বর—অদ্য এখানে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ঘোষণা করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের মধ্যে সামরিক চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাবনায় গুরুতর বিপদের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে পাকিস্থানে সৈন্যবাহিনী বৃদ্ধি পাইলে, শুধু ভারতে নহে, সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ায় গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে এবং এই অঞ্চলের শক্তিসাম্য নষ্ট হইবে।

দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্ত্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে তাহাদের সর্ব্বদা সজাগ থাকা প্রয়োজন। ক্ষুদ্র বিবাদ বিসম্বাদ ও উচ্ছৃঙ্খল কার্য্যকলাপ পরিহার করিয়া দেশবাসীকে ঐক্যের মূল্য উপলব্ধি করিতে হইবে।

তিনি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। শ্রীনেহরু বলেন, যুবজনই ভবিষ্যৎ ভারতের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে। তাহারা যদি বিভেদসৃষ্টিমূলক কার্য্যকলাপে নিজেদের শক্তি নিঃশেষিত করে তাহা হইলে কিরূপে তাহারা ভবিষ্যৎ ভারতের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিবে। বিশেষ জোরের সহিত তিনি বলেন, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য যদি ব্যর্থ হইয়া যায় তাহা হইলে তাহার দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

শ্রীনেহরু বলেন, ভারত এবং পাকিস্থান উভয়েই স্বাধীন। সুতরাং যে-কোন দেশের সহিত তাহারা আলাপ-আলোচনা চালাইতে পারে। পাকিস্থান ও আমেরিকার মধ্যে বর্ত্তমানে যে আলোচনা চলিতেছে তাহার উদ্দেশ্য পাকিস্থানের সশস্ত্র শক্তিবৃদ্ধি। ইহা শুধু ভারতের নহে, অন্যান্য দেশের পক্ষেও ক্ষতির কারণ

হইবে। তিনি বলেন, ভারতকে তাহার প্রতিরক্ষার জন্ম শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে। ভারত যে-কোন বিপদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত আছে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

দেশের উন্নয়নে বিজ্ঞানের ভূমিকা কি প্রধানমন্ত্রী তাহা পর্য্যালোচনা করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি হিন্দুস্থান বিমান কোম্পানীর টেষ্ট পাইলট ক্যাপ্টেন নামযোশীর মৃত্যুর কথা আবেগজড়িত কণ্ঠে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ঐরূপ প্রতিভাবান কর্ম্মীর মৃত্যু দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

প্রধানমন্ত্রী অতঃপর পাকিস্থানের সাম্প্রদায়িক নীতির কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, পাকিস্থান স্পষ্টতঃ ভারতের ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতার নীতি পছন্দ করে না।

শ্রীনেহরু জনগণকে রাজনীতিতে ধর্ম্মীয় ব্যাপার আমদানীর বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দেন। তিনি বলেন, রাজনীতিতে ধর্ম্মীয় ব্যাপার আমদানী করিলে তাহা ভারতের ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে এবং জনগণের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হইবে।

শ্রীনেহরু বলেন: "এইরূপ প্রবণতাই অতীতে ভারতের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। এই প্রবণতা রোধ করা না হইলে তাহা বর্ত্তমানেও ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে সর্ব্বনাশকর হইতে পারে। প্রত্যেকেই তাহার ধর্ম্ম আচরণ করিতে পারে, কিন্তু রাজ-নীতির ক্ষেত্রে তাহা আমদানী করিতে দেওয়া হইবে না।"

কলিকাতা ময়দানে পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা

বিগত ১৩ই ডিসেম্বর পণ্ডিত নেহরু যে ভাষণ কলিকাতা ময়দানে প্রদান করেন তাহার সারাংশ নিম্নে দেওয়া হইল:

শ্রীনেহরু তাঁহার ভাষণে বলেন, প্রায় দুই বৎসর পরে তিনি এই মহানগরীতে আসিয়াছেন। সাত বৎসর হইয়াছে আমাদের দেশ এক স্বাধীন দেশ হইয়াছে, এই দেশে স্বরাজ আসিয়াছে। সাত বৎসর অবশ্য কোন দেশের জীবনে বেশী সময় নহে; আবার, কখনও কখনও এক বৎসরও জাতির জীবনে খুব বড় সময়। এই কয় বৎসর কি হইয়াছে না হইয়াছে, ভাল কি হইয়াছে, মন্দ কি হইয়াছে, সে সম্পর্কে সর্ব্বদা সচেতন থাকিতে হইবে, ভুলত্রুটি হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। কোন সময়ে অসতর্ক হইলে দেশ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে।

তিনি বলেন, ভারতের স্বাধীনতা একটি বড় ঘটনা। বহু শত বৎসর পরে আজ প্রথমবার হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে ভারতকে আমরা চিনি তাহা এক শাসনের অধীনে আসিয়াছে। ৩৬ কোটি নরনারী শিশু যেখানে বাস করে, পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ লোকের বাসভূমি সেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ইতিহাসের একটা বড় ঘটনা। উহার সঙ্গে সঙ্গে বড় দায়িত্বও আসিয়াছে। প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে এই দায়িত্ব কেবল দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত সরকার বা বাংলা-সরকারের নহে, দেশের কোটি কোটি মানুষ সকলেরই উপর সেই দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমগ্র বিশ্বে যাহা ঘটে ভারতের উপর তাহার প্রভাব পড়েই। পৃথিবীতে কোন যুদ্ধ না হয়, ভারত তাহাই চাহে। প্রধানতম যে বিষয়টি বর্ত্তমানে ভারতকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইল কি করিয়া ভারতবর্ষকে অগ্রসর করা যায়, কি করিয়া দেশবাসীর দারিদ্র্য দূর করিয়া দেশকে উন্নত ও শক্তিশালী করা যায়। কেবল সেনাবাহিনীর শক্তি নহে, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, সভ্যতার যে শক্তি মানুষকে আগাইয়া লইয়া যায় ৩৬ কোটি মানুষের দেশে কি করিয়া সেই শক্তি আনা যায় তাহা একটি বিরাট প্রশ্ন। আমাদের দেশ দরিদ্র নহে, উহার জমিতে যথেষ্ট সম্পদ আছে। কিন্তু অধিকাংশ দেশবাসী দরিদ্র। নিজেদের দেশে ধন উৎপাদনের দ্বারাই এই দারিদ্র্য দূর করা যায়। নিজেদের পরিশ্রমের দ্বারা, জমিতে কাজ করিয়া, কারখানায় খাটিয়াই ইহা করা সম্ভব। পৃথিবীর সকল দেশই এই ভাবে উন্নতি করিয়াছে। রাশিয়া গত ত্রিশ বৎসরে সেখানকার মানুষের নিজেদের শ্রম, নিজেদের সংগঠন, নিজেদের ঐক্যের সাহায্যে অনেক উন্নত হইয়াছে। কোন যাদুমন্ত্রের দ্বারা ইহা সম্ভব নহে। আমরা যে নীতিই অনুসরণ করি না কেন, ভালমন্দ বিচার করিয়া তাহা করিতে হইবে, কোন নীতিই চোখ বুজিয়া নকল করার প্রয়োজন নাই।

শ্রীনেহরু বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলিতেছে। যে অর্থ মানুষের হিতের জন্য ব্যয়িত হইতে পারিত তাহা তোপ, বন্দুক, এটম বোমা নির্ম্মাণে ব্যয় করা হইতেছে। ভারত কোন দেশের সহিত শত্রুতা করিতে চাহে না, সকলেরই বন্ধুত্ব সে কামনা করে, নিজের জন্য সে যে পথ বাছিয়া লইয়াছে সেই পথে সে স্বাধীনভাবে চলিতে চাহে। ভারতের এই নীতি অনেক দেশের মনঃপূত নহে। কতকগুলি দেশের অভ্যাসই এমন হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা মনে করে, তাহারা যে হুকুম করিবে ছোট দেশগুলিকে তাহা মানিয়া লইতেই হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষ এইভাবে অন্য দেশের নিকট নতিস্বীকারে অভ্যস্ত নহে। যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারত স্বাধীনতার সংগ্রাম করিয়াছিল, তখন গান্ধীজী এদেশের মানুষকে অভয় হইতে শিখাইয়াছেন। শক্তিহীন ভারতবাসী তখনই যখন নতি-স্বীকার করিতে রাজী হয় নাই, তখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়া কেন অন্যের নিকট নতি স্বীকার করিবে? এক দেশ আর এক দেশের পদানত হইয়া থাকিবে, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। কেননা যতদিন পরাধীনতা থাকিবে, ততদিন দ্বন্দ্ব-বিবাদের মূল থাকিয়া যাইবে।

গত দুই যুদ্ধে পৃথিবীর যে পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, আজ পৃথিবীতে রাশিয়া ও আমেরিকা এই দুই শক্তিশালী দেশের মধ্যে মোকাবেলা চলিতেছে। কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না, পরস্পরের প্রতি তাহারা বিদ্বিষ্ট। প্রত্যেকেই চাহে, অন্য দেশগুলি উহার দলভুক্ত হউক। অন্য দেশ-গুলি তাহাদের ইচ্ছামত কাজ করিতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষ এমন কিছু করিতে চাহে না, যাহাতে যুদ্ধের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইতে পারে। ভারতবর্ষের নিজেরই যথেষ্ট বড় বড় সমস্যা রহিয়াছে।

বিশ্বের সমস্যায় জড়িত হইয়া পড়িতে ভারতবর্ষের সময়ও নাই, ইচ্ছাও নাই। কিন্তু কোন দেশের পক্ষেই বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকা সম্ভব নহে, ভারতবর্ষের পক্ষেও নহে। ভারতবর্ষ চাহে বা না চাহে, বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে ভারতকেও একটি ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এশিয়া ও আফ্রিকার যে সকল দেশ এখনও পরাধীন হইয়া আছে, সেগুলি ভারতবর্ষের দিকে তাকাইয়া আছে। একদা ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সম্মুখে যে নমুনা রাখিয়াছিল বর্তমানে ভারতীয় স্বাধীনতা বিদেশী শাসিত দেশগুলির সম্মুখে তাহার একটা বিপরীত নমুনা রাখিয়াছে। এই সকল পরাধীন দেশের প্রতি ভারতের সহানুভূতি আগেও ছিল, এখনও আছে। ভারতবর্ষ তাহাদের দায়িত্ব লইতে চাহে না ; কিন্তু ভারতবর্ষ উহাদিগকে পিছনেও ফেলিয়া দিতে পারে না।

শ্রীনেহরু বলেন, প্রায় চার শত সাড়ে চার শত বৎসর পূর্ব্বে ভাস্কো-ডি-গামা যখন প্রথম ভারতভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন তখন হইতে ইউরোপ হইতে এশিয়ার অভিমুখে যে প্রবাহ সুরু হইয়াছিল, সেই প্রবাহ আজ রুদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন হইয়াছে, প্রতিবেশী অনেকগুলি দেশও স্বাধীন হইয়াছে, এশিয়ার অন্যান্য যে সকল দেশ এখনও স্বাধীন হয় নাই সেগুলিতেও স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠিয়াছে।

পাক-মার্কিন চুক্তি প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, দুইটি দেশই স্বাধীন দেশ এবং তাঁহারা যদি ঐরূপ চুক্তি করেন, তবে ভারত তাহাতে বাধা দিতে পারে না ; কিন্তু সকলেই একথা জানেন যে, ইহার প্রতিক্রিয়া ভারত ও দূরপ্রাচ্যের সর্ব্বত্র আসিয়া পড়িবে। এই প্রশ্ন ভারত উক্ত দুই দেশের নেতৃবৃন্দের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছে।

ভারতীয় সেনাবাহিনী কোরিয়াতে যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই প্রথমবার স্বাধীন ভারতের পতাকা বহন করিয়া লইয়া সৈন্যদল বিদেশে গিয়া অনেক অসুবিধার মধ্যেও যে শান্তির জন্য কাজ করিয়াছে, দেশের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছে এজন্য তিনি আনন্দ অনুভব করেন।

শ্রীনেহরু বলেন, বিশ্ব পরিস্থিতির এই চিত্র সম্মুখে রাখিয়া ভারতের সমস্যাসমূহ বিচার করিতে হইবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু যাত্রা শেষ হয় নাই। অতঃপর দারিদ্র্য, বেকার-সমস্যা দূর করার, সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতার অবসান ঘটাইবার সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে। ইহাই বড় প্রশ্ন। এইজন্য দেশের সকল মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। এই কলিকাতায় নানা স্থানের নানা লোক আছে। তাহাদের মধ্যে দারিদ্র্য আছে, বেকার আছে। শোভাযাত্রা বাহির করিয়া, গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া ত সেগুলি দূর করা যাইবে না। এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা মনে করেন, একটা গোলযোগ বাধাইয়া তাঁহারা তাঁহাদের দাবি আদায় করিতে পারিবেন। এমনকি ছাত্ররাও মনে করিতেছে যে, গোলমাল করিয়া তাহারা যাহা চাহে তাহা পাইবে।

এই বিরাট দেশে বহু মত থাকিতেই পারে, উহা জীবনেরই লক্ষণ। কিন্তু কতকগুলি মৌলিক বিষয় আছে যেগুলি মানিয়া লইতেই হইবে। প্রথমতঃ, ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম যে ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠিত হইয়াছে, তাহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। যে কোন নীতিই অনুসরণ করা হউক, এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতের ঐক্য যেন নষ্ট না হয়। এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, কাজের সুবিধার জন্যই প্রদেশগুলি গঠিত হইয়াছে। বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাংলা যদি পৃথক পৃথকভাবে নিজ নিজ পথে চলে, তাহা হইলে সমগ্র ভারতবর্ষ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। সমগ্র দেশের একটি অখণ্ড সত্তা রহিয়াছে, উহাকে খণ্ডিত করা চলে না। ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বহু ধর্ম্মের লোক আছে, হিন্দুদের মধ্যেও বহু বিভেদ আছে। রাজনীতির মধ্যে যদি ধর্ম্মের এই বিভেদ আনা হয় তাহা হইলে দেশ টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় আর একটি মৌলিক বিষয় হইল, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ বা গান্ধীবাদ—যে কোন পথই আমরা গ্রহণ করি না কেন, কলহ-বিবাদের পন্থা অবলম্বন করিলে যে নূতন ভারতবর্ষ গঠিত হইতে যাইতেছে, তাহারই মূলোচ্ছেদ করা হইবে। কলহ-বিবাদে মত্ত হইয়া গেলে ভারতবর্ষের উন্নয়নের সকল কাজ ব্যাহত হইবে।

শ্রীনেহরু বলেন, সাম্যবাদের মূল নীতির সহিত তাঁহার কোন বিরোধ নাই। তাঁহারা সকলেই চাহিবেন যে, উচ্চনীচের মধ্যে বিভেদ কমিয়া যাইবে, প্রত্যেকেই সমান সুযোগ পাইবে। আজ সকলের সমান সুযোগ নাই। ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, এই দেশের ছোট ছোট শিশুগুলির ঠিকমত যত্ন লওয়া হইতেছে না। কিন্তু কম্যুনিষ্টরা বা অন্য কেহ যদি মনে করেন যে, তাঁহারা গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবেন, তাহা হইলে তাঁহারা ভুল করিবেন। তাঁহাদের পথ ধ্বংসের পথ, গঠনের পথ নহে। ভারতের সমগ্র ইতিহাসে দেখা যায় যে, এ দেশে মহৎ আদর্শের কোন দিন অভাব হয় নাই, আবার এদেশের লোক নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদে মত্ত হইবার মূর্খতাও বার বার দেখাইয়াছে। সেইজন্যই ভারতবর্ষ পরপদানত হইয়াছে। আবার, তখনই দেখা গিয়াছে যে, স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় যখন ভারতবর্ষ ঐক্যবদ্ধ হইয়া নিজেকে সংগঠিত করিয়াছে তখন উহা শক্তিশালী হইয়াছে। ইতিহাসের এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীনেহরু নাগপুরে বিমান দুর্ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন, এই দুর্ঘটনায় তাঁহার দুই জন পুরাতন সহকর্ম্মী মারা গিয়াছেন। ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যাঁহারা দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা মত কাজ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সময় বহিয়া যাইতেছে। পুরাতন দিনের সাথীদের মধ্যে এক এক জন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। আজ প্রশ্ন উঠিতেছে তাঁহাদের স্থান কাহারা গ্রহণ করিবেন, কাহারা দেশের শাসনভার লইবেন। আজ যাহারা স্কুল কলেজে শিক্ষালাভ করিতেছে তাহাদিগকে এই দায়িত্ব লইতে হইবে। ইহা একটি বিরাট দায়িত্ব। সেইজন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। আজ যাহারা

নও জওয়ান তাহাদের মধ্যেই রহিয়াছে ভবিষ্যৎ ভারত, তাহাদের চোখে, তাহাদের চেহারায় তিনি ভবিষ্যৎ ভারতের সন্ধান করেন।

তিনি আরও বলেন যে, এদেশে অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী, সেইজন্য এখানে জমির প্রশ্নই বৃহত্তম প্রশ্ন। এইজন্য বরাবরই কংগ্রেসের নীতি ছিল জমিদারী, জায়গীরদারী প্রভৃতি উচ্ছেদ করা। আজ কংগ্রেস শাসনভার গ্রহণ করিয়া এই নীতি কার্য্যকরী করিয়াছে বা করিতেছে।

কলিকাতায় সম্প্রতি যে সকল গোলযোগ হইয়াছে, সেগুলির উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, কলিকাতার যেখানে ত্রিশ-চল্লিশ লক্ষ লোকের বাস সেখানে মাত্র চার-পাঁচ হাজার লোক কি করিয়া এই গোলযোগ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। যদি দাবি জানাইতে হয়, তাহা সংগঠিতভাবে, শান্তিপূর্ণভাবে করিতে হইবে। অপরপক্ষে মালিকদিগের উদ্দেশে তিনি বলিবেন যে, এই শহরের একদিকে বিরাট বিরাট প্রাসাদ, অপর দিকে বস্তী—ইহা অতি লজ্জার বিষয়, এক কদর্য্য ব্যাপার। তাঁহার মনে হয় যে, এখন আর কোন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করা চলিবে না, এইরূপ একটা আইন করা উচিত।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু বলেন, এই পরিকল্পনায় ভুল-ত্রুটি থাকিতে পারে, কিন্তু উহা একটি বিরাট পাদক্ষেপ। এই পরিকল্পনায়ই সর্ব্বপ্রথম সমগ্র দেশের প্রয়োজন ও ক্ষমতা বিবেচনা করিয়া একটি সুচিন্তিত কার্য্যক্রম স্থির করা হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় ভুল-ত্রুটি হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহারা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি আরও ভাল করিয়া প্রণয়ন করিতে পারিবেন, তাঁহার এই আশা আছে। বেকার-সমস্যা দূর করার জন্য ইতিমধ্যে তাঁহারা কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন, গ্রামের জন্য তাঁহারা সমাজ-উন্নয়ন কেন্দ্র খুলিয়াছেন। উহার সঙ্গে সঙ্গে ন্যাশনাল এক্সটেনশন সার্ভিসের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার দ্বারা ভারতের সাত হাজার গ্রামে এক বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আসিতেছে। আর সাত-আট বৎসরে ভারতের সাত লক্ষ গ্রামে ইহার সুফল ছড়াইয়া পড়িবে।

এইভাবে চলিতে চলিতে ভারত যদি আর্থিক স্বতন্ত্রতার লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে তাহা হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। যাত্রা অবশ্য তখনও শেষ হইবে না। কেননা যে জাতির সম্মুখ যাত্রা বন্ধ হইয়া যায় তাহার পতন ঘটে। কিন্তু এক লক্ষ্য হইতে অন্য লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইবে। ছত্রিশ কোটি মানুষের দেশের পক্ষে ইহা এক বিরাট কাজ।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সংগঠন

সোমবার ১৪ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে কংগ্রেস-কর্ম্মিগণের এক বৈঠকে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু কলিকাতায় সাম্প্রতিক উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় এবং কয়েক মাস পূর্ব্বে ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন কালে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়া বলেন, ঐ উভয় ঘটনার মধ্য দিয়া কংগ্রেস সংগঠনের দুর্ব্বলতা—বিশেষ করিয়া কলিকাতার উহা সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের নিন্দা করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সামান্য ব্যাপার যাহার মীমাংসা সহজেই হইতে পারিত তাহা লইয়া কলিকাতা বিপথগামী হইয়াছিল—ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে, এই নগরীর জনসাধারণের সহিত কংগ্রেসকর্ম্মীদের ঘনিষ্ঠতা হ্রাস পাইয়াছে। এই ঘটনা হইতে কংগ্রেসকর্ম্মীদের হুঁসিয়ার হওয়া উচিত বলিয়া তিনি মনে করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি দুইটি উপনির্ব্বাচনে নদীয়ায় কংগ্রেসের জয় কেন হইল এবং কলিকাতায়ই বা পরাজয় হইল কেন তাহা কংগ্রেসকর্ম্মীদিগকে চিন্তা করিতে হইবে। তিনি শুনিয়াছেন যে, কলিকাতার কংগ্রেসের পক্ষ হইতে খুব কম কাজ হইয়াছে। যিনি কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন তিনি খুব কম কাজ করিয়াছেন। কংগ্রেসপ্রার্থী খুব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হয়ত নির্ব্বাচনের ব্যাপারটি ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু কংগ্রেসকর্ম্মিগণ কাজ করেন নাই কেন তাহা তিনি (প্রধানমন্ত্রী) বুঝিতে পারিতেছেন না।

সম্মিলিত বণিক-সভার সভাপতির উক্তি

এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মিঃ পেকস বিগত ১৪ই ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সম্মুখে যে বক্তৃতা করেন তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত অংশ বিচারযোগ্য :

দ্বিতীয়টি হইতেছে বর্ত্তমান শ্রমিক আন্দোলন সংক্রান্ত পরিস্থিতি। এই সম্পর্কে মিঃ পেকস বলেন যে, বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্পের অধিকতর দ্রুত সম্প্রসারণ ও এই সব ক্ষেত্রে মূলধন আসিবার পথে প্রধান বিঘ্নগুলি শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের দুর্গম ক্ষেত্রেই অধিকতর সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। যে সকল অবস্থায় শিল্প উহার বাড়তি শ্রমিককে ঝাড়িয়া ফেলিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম বোধ করে এবং ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে হৈ চৈ তুলিয়া কারিগরী দিকের উন্নতি ব্যাহত করা হয় এবং যে ক্ষেত্রে বাহির হইতে ক্রমশঃই উচ্চহারে মজুরী ও বোনাসের রায় চাপাইয়া দেওয়া হয়, সেই অবস্থায় পুঁজিপতিগণ আনন্দিত মনে তাঁহাদের মূলধন নিয়োগের জন্য আগাইয়া আসিবেন, এরূপ আশা করা বৃথা। সেই হেতু প্রকৃত কাজ ও উৎপাদনের দিক হইতে টাকার কিরূপ মূল্য ধরা হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখার সময় এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা হইবে না, একথা তিনি বলেন না। কিন্তু তিনি একথা বলিবেন যে, দেশের অভ্যন্তরে টাকার নিজস্ব মূল্যটা যদি যথাযথ বজায় রাখা না হয়, তাহা হইলে ঐ জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে না ; বরং উহা হ্রাস পাইবে। ইহার প্রতীকার পন্থা হিসাবে মিঃ পেকস বলেন, শ্রমিককে তাহার দৈনিক মজুরীর বিনিময়ে উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। উৎপাদনের পদ্ধতিতে কারিগরী দিক হইতে উন্নতি বিধান করিতে হইবে—উহার ফলে ভারতের শিল্পগুলি তাহাদের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করিতে সমর্থ হইবে এবং খাদ্যের মূল্য যাহাতে

হ্রাস হইতে পারে,তজ্জন্য উন্নততর কৃষি-পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। একমাত্র এই ধরণের পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করিয়াই টাকার ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি করা এবং দেশের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব।

পণ্ডিত নেহরুর ভাষণ

বণিকসভায় পণ্ডিত নেহরুর ভাষণে বর্ত্তমানে শিল্পোদ্যমক্ষেত্রের সমস্যা সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য ছিল :

"প্রধানমন্ত্রী নেহরু বলেন, তিনি ভারতের অবস্থার পক্ষে উপযোগী আধুনিকতম কারিগরী দক্ষতার পক্ষপাতী। ভারতকে গড়িয়া তুলিবার জন্যই তিনি উহা চাহেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে ভিত্তিভূমি রচনা করিতে হইবে। কি ভাবে আধুনিকতম কারিগরী দক্ষতা ভারতের কাঠামোর সহিত বিন্যস্ত করা যায়, তাহাই সমস্যা। কারিগরী দক্ষতা ও শ্রমশিল্পের দিক দিয়া তাঁহাদিগকে ঐ কাঠামোর উন্নতি সাধন করিতে হইবে। তাঁহাদের শ্রমশিল্পগত ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারারও প্রভূত পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না তাহাও বিবেচনা করা উচিত। তাঁহাদের অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, তাঁহাদিগকে জেট ইঞ্জিন ও আণবিক শক্তির বর্ত্তমান জগতের সহিত সম্পর্ক রাখিতে হইবে। এমনও হইতে পারে যে, ১০ কিংবা ১৫ বৎসরের মধ্যে হয়ত কারখানার প্রধান যন্ত্র পরিচালনায় আণবিক শক্তি ব্যবহৃত হইবে। কাজেই যখন দ্রুত পরিবর্ত্তন চলিতেছে, তখন ব্যক্তিগত মনও পিছাইয়া থাকিলে চলিবে না। যদি বাঁচিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আধুনিক চিন্তাধারা গ্রহণ করিতে হইবে, পুরাতন চিন্তাধারাকে অবলম্বন করিয়া থাকা চলিবে না।

অতঃপর শ্রীনেহরু বলেন, ভারত শ্রমশিল্পের দিকে অনুন্নত এবং ইহাই হইতেছে ভারতের সমস্যা। কিন্তু সীমাবদ্ধ ক্ষমতা লইয়া ভারত অগ্রসর হইয়া যাইতে চাহে। তবে তাঁহাদিগকে কোটি কোটি অধিবাসীকে সঙ্গে লইয়া চলিতে হইবে। ইহা সর্ব্বদাই তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত। তিনি বলেন, তাঁহাদিগকে (শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী) 'প্রস্তরীভূত' অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী বর্জ্জন করিতে হইবে এবং বিবেচনা করিতে হইবে যে, অর্থবিজ্ঞান ও শ্রমশিল্প সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

শ্রীনেহরু আরও বলেন, ভারতের মত গণতান্ত্রিক দেশে ভাবসাম্য আনয়নের ক্ষেত্রে বিরাট জনসমাজকে বিশ্বাস করিতে হইবে; তাহারা যাহাতে মনে করিতে পারে যে, তাহারা শ্রমশিল্পের অংশীদার তদ্বিষয়ে তাহাদের মনে প্রেরণা জাগাইতে হইবে। বস্তুতঃ যখন রাজনৈতিক গণতন্ত্র আসিয়াছে, তখন তাঁহারা অর্থনৈতিক দাবি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন না এবং তিনি তাহা করিতেও চাহেন না। তিনি মন্তব্য করেন যে, রাজনৈতিক গণতন্ত্র ক্রমে ক্রমে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রে পরিণত হয়।"

কুটীর-শিল্প ও বৃহৎ যান্ত্রিক শিল্পের প্রতিযোগিতা সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর মতামত সুস্পষ্ট

"প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঐরূপ শ্রমশিল্পের ভিত্তিভূমি রচনার দ্বারা ব্যক্তিগত শ্রমশিল্পের সাধারণতঃ ক্ষতি হইবে না। তাঁহাদিগকে যদি দ্রুত অগ্রসর হইতে হয় এবং দৃঢ় ভিত্তি রচনা করিতে হয়, তাহা হইলে কিছুকালের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অর্থনৈতিক ও শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে নিজস্ব ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। সরকারী ভূমিকাও যেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত ভূমিকাও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারে এবং এতদ্বিষয়ে তাঁহার কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিষয়ে কোন কঠোর নিয়ম করা যায় না, কেননা বিবর্ত্তনমূলক অবস্থায় বিষয়বস্তুর দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটে। তিনি নিজে কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ দেখিতেছেন না এবং তিনি বৃহৎ যান্ত্রিক অর্থ-নীতি ও কুটীর-শিল্প অর্থনীতির মধ্যেও কোন মূলগত বিরোধ দেখেন না, যদিও চেম্বার্স অব কমার্সের প্রেসিডেণ্ট শেষোক্ত অর্থনীতিকে "গরুর গাড়ীর অর্থনীতি" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তাঁহার বিশ্বাস এখনও দেশের সংগঠিত সমুদয় শ্রম-শিল্প অপেক্ষা অনেক বেশী লোক ভারতে হস্তচালিত তাঁতশিল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে।"

"দেশে সমস্ত লোকের কর্ম্মে নিয়োগ-ব্যবস্থার অভাবের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, যাহাতে তাঁহারা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লোকজনকে কাজ দিবার স্তরে উপনীত হইতে পারেন তদ্বিষয়ে অবহিত হইয়াই তাঁহাদিগকে ঐ বিষয়ের সম্মুখীন হইতে হইবে এবং ঐ উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। অবশ্য উহার অর্থ এই নহে যে, যেখানে ছাঁটাই আবশ্যক অথবা যেখানে এমন লোকজন আছে যে উহারা অন্যান্য লোকের কার্য্যের পথে প্রতিবন্ধক হইতেছে, সেখানে শ্রমশিল্পে কোন ছাঁটাই করা উচিত নহে। তিনি মনে করেন যে, বাড়তি কর্ম্মচারী ছাঁটাই অধিকতর দক্ষতা সূচিত করার সহায়ক হইবে। তিনি বলেন, উহার কারণ এই যে, অপ্রয়োজনীয় ভার বহন করিতে পারা যায় না; তবে তাহাদের জন্য অন্যত্র কি ভাবে কাজের ব্যবস্থা করা যায়, তাঁহাদিগকে সেই প্রশ্নটির সম্মুখীন হইতে হইবে। এই সকল বিষয় অর্থনৈতিক তত্ত্বের প্রশ্ন নহে। সর্ব্বোত্তম কি উপায়ে বাড়তি কর্ম্মচারীদিগকে অন্যত্র গ্রহণ করা যায়, উহা হইতেছে সেই প্রশ্ন।

নৌ-ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পণ্ডিত নেহরু

ভারতের সর্ব্বপ্রথম নৌ-ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের দ্বারোদ্ঘাটন কালের বক্তৃতায় পণ্ডিত নেহরু প্রাচীনকালে জাহাজের ব্যাপারে বিশ্বে ভারতের বিশেষ দানের কথা অত্যন্ত আবেগের সহিত উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রাচীনকালে ভারত নিজের জাহাজ নিজেই নির্ম্মাণ করিত এবং শত সহস্র মাইল ব্যাপী সপ্ত সমুদ্র পাড়ি দিয়া দেশ-বিদেশের সহিত ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্য ও স্থাপত্যশিল্প সম্পর্কে সংযোগসাধন করিত। সেই যোগসূত্রের প্রমাণ আজিও যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশে সুস্পষ্ট বিদ্যমান আছে। ভারতের কাছে চীন সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছে। সমুদ্রপথে শত শত লোক ভারত হইতে চীনে গিয়াছে ও চীন হইতে ভারতে আসিয়াছে। নেপোলিয়নের সময়

ইংরেজ নৌ-যুদ্ধের জন্ম ভারতে প্রস্তুত জাহাজ ব্যবহার করিয়াছে। কিন্তু আমরা চাই সমুদ্র হইবে এক দেশের সহিত অন্ত দেশের যোগ-সূত্র, বিচ্ছেদের সূত্র নহে।

শ্রীনেহরু বলেন, আজ ভারত তাহার প্রাচীন ইতিহাস, সমুদ্রের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা ভুলিয়াছে, ভারতের অধঃপতনের যুগে ইহা ঘটিয়াছে। ধর্ম্মের নামে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। যাহারা সমুদ্র পাড়ি দিয়াছে তাহাদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। ইহা সত্য যে, ভারতের ধর্ম্ম অতি মহান্। কিন্তু অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারত ছিল শক্তিহীন। ধর্ম্ম যখন অস্পৃশ্যতার রূপ ধরিয়া আসে তখন উহা মানুষের প্রগতির পথ রোধ করে। আজ ভারতের সম্মুখে নূতন দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। প্রাচীন ইতিহাস নূতন করিয়া আমাদিগকে শিখিতে হইবে। সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের পুরাতন বন্ধুত্ব আবার নূতন করিয়া পত্তন করিতে হইবে।

শ্রীনেহরু বলেন, কিছুকাল আগে বিদেশ হইতে ভারতকে খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইয়াছে। কিন্তু ভারতের জাহাজ নিতান্ত অপর্যাপ্ত ছিল বলিয়া কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে আমাদিগকে বিদেশী জাহাজে খাদ্যশস্য আনিতে হইয়াছে। কি বিপুল পরিমাণ অর্থ ভারতের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে তাহা দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি ও উদ্বেগ বোধ করিতেছি। জাহাজের জন্ম বিদেশের উপর নির্ভর করা ভারতের উচিত নহে। সদাগরী জাহাজের সংখ্যা অবিলম্বে বৃদ্ধি করা ভারতের জরুরী প্রয়োজন। নৌ-বিভাগীয় জাহাজের সংখ্যাও ভারতকে বাড়াইতে হইবে। বিশেষভাবে ভারতের যুবকদিগকে সমুদ্রযাত্রায় অভ্যস্ত হইতে হইবে।

আলিগড়ে মুস্লিম সম্মেলন

"নয়াদিল্লী, ৯ই ডিসেম্বর—স্বরাষ্ট্র-সচিব ডঃ কাটজু আজ লোকসভায় ডাঃ চৈৎরাম গিদোয়ানীর প্রশ্নের উত্তরে বলেন, সম্প্রতি আলিগড়ে অনুষ্ঠিত মুস্লিম সম্মেলনে যাহারা জনসাধারণকে হিংসাচারে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্ম উত্তেজিত করিয়া বক্তৃতা দেয় তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী আরও বলেন, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্মেলনে যোগ দেওয়ার সুবিধার জন্ম রাত্রিতে সম্মেলন হইয়াছিল এবং পাকিস্থানের কোন কোন দলের সহিত উদ্যোক্তাদের যোগ ছিল বলিয়া উত্তরপ্রদেশের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী যে মন্তব্য করেন তাহা তিনি দেখিয়াছেন। কিন্তু ভারত-সরকার এই বিষয়ে কোন সংবাদ পান নাই।

কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দান প্রসঙ্গে ডঃ কাটজু এই মন্তব্য করিয়া বলেন, আলিগড় সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের সহিত পাকিস্থানের কোন কোন দল ও সংবাদপত্রের যোগাযোগের বিষয়ে সরকার কোন সংবাদ পান নাই। তবে এ কথা সত্য যে, পাকিস্থান এসোসিয়েটেড প্রেসের দিল্লীর সংবাদদাতা পাক সংবাদপত্রের জন্ম এই সম্মেলনের বিবরণ পাইয়াছিলেন এবং সম্মেলনের সংবাদ সংগ্রহের জন্ম আলিগড়ে গিয়াছিলেন। সম্মেলনের বিবরণ ভারতের কয়েকটি উর্দ্দু সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন—সরকার কি অবগত আছেন যে, হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করিতে এবং ১৮৫৭ সনের ঘটনার (সিপাহী বিদ্রোহ) পুনরাবৃত্তি করিতে জনসাধারণকে উস্কাইয়া সম্মেলনে অনেকগুলি রক্তজমাটকারী বক্তৃতা প্রদত্ত হয়?

স্বরাষ্ট্র-সচিব উত্তরে বলেন যে, উর্দ্দু কাগজে তিনি কয়েকটি বক্তৃতা পাঠ করিয়াছেন। এই সমস্ত বক্তৃতার স্বরূপ বর্ণনায় যে ভাষা ব্যবহার করা হইতেছে, তাহা অতিরঞ্জিত বলিয়াই মনে হইতেছে।

হিংসা ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টিতে উস্কানি-দাতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

মিঃ জোয়াকিম আলভা—সরকার কি অবগত আছেন যে, আলিগড়ে প্রদত্ত শিক্ষা-সচিবের বক্তৃতার প্রতি অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা প্রদর্শনের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত তথায় (আলিগড়ে) মুস্লিম লীগের নীতি আত্মগোপন করিয়া থাকিলেও চালু রহিয়াছে?

মিঃ আলভার প্রশ্নে স্বরাষ্ট্র-সচিব ও অন্যান্য মন্ত্রীবৃন্দ হাসিতে থাকিলে স্পীকার মন্তব্য করেন যে, মিঃ আলভার প্রশ্নটি ফেলনা নয়।

ইহার পর স্বরাষ্ট্র-সচিব উপরোক্ত উত্তর দেন। তিনি আরও বলেন যে, কিছুসংখ্যক ব্যক্তি এখনও মুস্লিম লীগ মনোবৃত্তি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকার চেষ্টা করিতেছে এবং অপর একদল উহার প্রভাব হইতে নিজেদের মুক্ত করার চেষ্টা করিতেছে।

শ্রীপট্টনায়ক—দেশের অভ্যন্তরে পঞ্চমবাহিনীর কার্য্যকলাপ দমনের জন্ম দেশরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র-দপ্তরের অধীনস্থ নিরাপত্তা বাহিনী সমবেতভাবে চেষ্টা করিতেছে কি না?

স্বরাষ্ট্র-সচিব—দেশে কোন পঞ্চমবাহিনী নাই; আমরা শান্তিতে বাস করিতেছি। স্বরাষ্ট্র-সচিবের এই উক্তির প্রতিবাদে সভাকক্ষের সর্ব্বত্র হইতে 'না', 'না' ধ্বনি উঠিতে থাকিলে ডঃ কাটজু বলেন, "পঞ্চমবাহিনী যদি থাকেও, তাহা হইলেও আপনারা আমাদের উপর নির্ভর করিতে পারেন যে, আমরা উহা দমনে সক্ষম হইব।"

ডঃ কাটজুর উপর নির্ভর করিলে দেশের কি অবস্থা হইবে তাহার ইঙ্গিত এই প্রশ্নোত্তরের মধ্যেই পাওয়া যায়। ঐরূপ উট-পক্ষী নীতি দেশরক্ষা ব্যাপারে সর্ব্বনাশের পথ।

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রলাপ

"লক্ষ্ণৌ, ১০ই ডিসেম্বর—নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী শ্রী এস. এন. অগ্রবাল প্রস্তাবিত পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির "বিপজ্জনক সম্ভাবনা"র বিরুদ্ধে 'জনমত' গড়িয়া তোলার জন্ম কংগ্রেসের সকল ইউনিটকে আবেদন জানাইয়াছেন। এই চুক্তির ফলে কেবলমাত্র ভারত ও পাকিস্থান নহে, পরন্তু সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় "সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া" দেখা দিবে।

সকল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নিকট এক সার্কুলার প্রেরণ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, প্রস্তাবিত চুক্তির ফলে সমগ্র ভারসাম্য বানচাল হইয়া যাইবে এবং স্নায়ুযুদ্ধের ঢেউ আমাদের সীমান্তে আসিয়া স্পর্শ করিবে। ফলে যদি কখন প্রকৃত যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে উহাতে আমরা জড়াইয়া পড়িব। আমাদের নীতি হইল কোন শক্তিগোষ্ঠীর সহিত জড়াইয়া না পড়া এবং যুদ্ধ যদি বাধে তাহা হইলে এশিয়ার যতখানি সম্ভব এলাকাকে উহা হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করা। পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হইলে পাকিস্থান যুদ্ধজালে সম্পূর্ণ জড়াইয়া পড়িবে এবং ভারতেও শান্তি-রক্ষার পক্ষে এক নূতন বিপদ দেখা দিবে।

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী এই বিষয়ে সভানুষ্ঠানের আয়োজন করিতে কংগ্রেস কমিটিগুলিকে আবেদন জানাইয়াছেন। তিনি বলেন, "ঐ সব সভায় পাক ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই দুই দেশ ও সরকারের বিরুদ্ধে কোনরূপ নিন্দাবাদ করা উচিত হইবে না। বিশ্বশান্তির পক্ষে বিপজ্জনক ও ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া কেবলমাত্র ঐ নীতির নিন্দা করা হইবে। তথায় ইহা সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে হইবে যে, যদি এই ধরণের চুক্তি হইয়া থাকে তাহা হইলে পাকিস্থানের সহিত ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার সম্ভাবনা হ্রাস পাইবে এবং ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইবে।"

দোষীর নিন্দাবাদ না করিয়া নীতির নিন্দাবাদ করার ব্যবস্থা কংগ্রেসের মস্তিষ্ক-বিকৃতির পূর্ণ লক্ষণ ভিন্ন অন্য কিছু কি?

ভূমি উন্নয়ন আইন ও সুপ্রিমকোর্ট

১১ই ডিসেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের কনষ্টিটিউশন বেঞ্চে যে আপীল করা হইয়াছিল প্রধান বিচারপতি শ্রীপতঞ্জলি শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত বেঞ্চ আজ তাহা বাতিল করিয়া দিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ই বহাল রাখিয়াছেন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪৮ সনের পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-উন্নয়ন ও পরিকল্পনা আইনের ৮ম অণুচ্ছেদের খ সংখ্যক ব্যবস্থার শেষাংশ সংবিধানের ৩১(২) অণুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থাবলীর বিরোধী। আলোচ্য ধারার ব্যবস্থা এই ছিল যে, উক্ত আইনবলে গবর্মেণ্ট যে সকল জমি অধিকার করিবেন সেই সকল জমির বাবদ দেয় সর্ব্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ ১৯৪৬ সনের ৩১শে ডিসেম্বরে জমির যে মূল্য ছিল তদনুযায়ী নির্দ্ধারিত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের এই আইন ১৯৪৮ সনের ১লা অক্টোবর পাস হয়। পূর্ব্ববঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরিণতিতে যে সকল লোক পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসে তাহাদের জমি বন্দোবস্ত দেওয়াই ছিল উক্ত আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রীমতী বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং অপর দুই জন জমির মালিকের জমি এই আইনে অধিকার করা হইলে তাহাদের পক্ষ হইতে এই আইনকে বাতিল ও সংবিধান-বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করার জন্য ২৪-পরগণার অন্তর্গত আলিপুরের সাব-জজের এজলাসে এক মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত প্রশ্ন জড়িত বলিয়া প্রতিবাদীরা অতঃপর সংবিধানের ২২৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে কলিকাতা হাইকোর্টের নিকট সিদ্ধান্ত প্রার্থনা করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের একটা ডিভিসন বেঞ্চে আবেদনের শুনানী হয়। হাইকোর্ট এই রায় দেন যে, সমগ্র আইনটি সংবিধান-বিরোধী নয়, তবে উহার দুইটি ব্যবস্থা, যথা—(১) জমি অধিকার সাধারণ-সংশ্লিষ্ট কার্য্য বলিয়া সরকারী ঘোষণা এবং (২) ১৯৪৬ সনের ৩১শে ডিসেম্বর জমির যে বাজার দর ছিল ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদেয় অর্থ তাহার বেশী হইতে পারিবে না। এইরূপ ব্যবস্থা বাতিল হইবে।

আইনের এই সকল ব্যবস্থা কলিকাতা হাইকোর্ট কর্ত্তৃক বাতিল ও সংবিধান-বিরোধী বলিয়া ঘোষিত হইলে, পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপীল করেন।

শ্রীমতী বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমি যাহারা সরকারী ব্যবস্থায় কুক্ষিগত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহারা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী—অর্থাৎ বাস্তুঘুঘু। সেইজন্য সুপ্রীম কোর্টের এই রায়ে আমরা সন্তুষ্ট।

আবর অভিযান

"শিলং, ১২ই ডিসেম্বর—তুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে ক্রমাগত ২০ দিন ধরিয়া চলিবার পরে আসাম রাইফেল বাহিনী আচিংমোরী প্রবেশ করিয়াছে। অভিযান আরম্ভ হইবার পরে এই বাহিনী কোথাও বিশেষ বাধা পায় নাই। ডফলাগণ পূর্ব্বেই আচিংমোরী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আটক ব্যক্তি-দিগকে তাহারা পার্ব্বত্য অঞ্চলের অভ্যন্তরভাগে সরাইয়া লইয়াছে।

১২ই ডিসেম্বর—নাগা জাতীয় পরিষদের স্বাধীনতার দাবির নিন্দা করিয়া ২৭ জন পণ্ডজাতি-নেতা যে বিবৃতি দিয়াছেন, উহাতে সুফল ফলিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। পণ্ডজাতি-নেতারা ইহার পূর্ব্বে নাগা-সমস্যা সম্পর্কে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিয়া কখনও বিবৃতি দেন নাই। নাগা নেতৃবৃন্দকে তাঁহারা যে পরামর্শ দিয়াছেন, উহা তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

নাগা জনসাধারণের মনোভাবেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নাগা পর্ব্বতাঞ্চলে গবর্মেণ্ট যে সকল সমাজ-কল্যাণ কার্য্য করিতেছেন, তাহারা ক্রমেই তাহার সঙ্গে অধিকতর সহযোগিতা করিতেছে।"

আমরা মনে করি, এই সীমান্ত অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ঐ অঞ্চলে শুধু শান্তি-স্থাপন বা শান্তি-বিধানই যথেষ্ট নহে। উহা যথাযথভাবে চালিত ও রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন, কেননা আমাদের সীমান্ত অঞ্চলের মধ্যে উহা ছিদ্রপথ বিশেষ।

মিশর ও ব্রিটেন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পুনর্জ্জাগরণ হইতে

ছয়-সাত বৎসর লাগিয়াছিল। এইবার সময় কিছু বেশী লাগিয়াছে, কিন্তু অবস্থা আবার সেইরূপ ঘনাইয়া আসিতেছে মনে হয়। নিম্নোক্ত সংবাদ তাহার সাক্ষ্য দেয় :

"ওয়াশিংটন, ১১ই ডিসেম্বর—মার্কিন পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ জন ফষ্টার ডালেস নাকি এখানে মিশরীয় দূতকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, সুয়েজখাল সম্পর্কে ব্রিটেন তাহার মনোভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন করিতেও অস্বীকার করিয়াছেন।

মিঃ ডালেস আজ হোয়াইট হাউসে মিশরীয় দূত মিঃ আমেদ হোসেনের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে ৪০ মিনিটকাল আলোচনা চলে।

ওয়াকিবহাল কূটনৈতিক মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, মিঃ ডালেস মিশরীয় দূতকে জানাইয়াছেন যে, বারমুডা সম্মেলনের সময় তিনি ও প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিলকে খাল এলাকা হইতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণ বিষয়ে মিশরের দাবিগুলি সম্পর্কে কোনপ্রকার সুবিধা দিতে সম্মত করাইতে পারেন নাই। স্যর উইনষ্টন চার্চিল এইরূপ প্রকাশ করেন যে, রক্ষণশীল দলের ২৫ হইতে ৩০ জন সদস্য মিশরকে পূর্ব্বে যে সুবিধা দেওয়া হইয়াছে তৎসম্পর্কে ইতিপূর্ব্বেই কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। নূতন কোন সুবিধা দিলে তাঁহারা সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিতে শ্রমিক দলে যোগদান করিবেন।

কায়রো, ১১ই ডিসেম্বর—বারমুডা সম্মেলনে সুয়েজখালের বিরোধ-মীমাংসায় আমেরিকার সালিশী ব্যর্থ হইলে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে বলিয়া আজ মিশরী পত্রিকাগুলিতে ঘোষণা করা হইয়াছে।

মিশরের বৈপ্লবিক পরিষদের সদর দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র আজ বলেন যে, খাল এলাকা সম্পর্কে ব্রিটেনের অনমনীয় মনোভাব এবং একচুলও ত্যাগ না করিবার ব্রিটিশ হুমকীতে মিশরের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ উত্তেজিত হইয়াছেন।

মিশরী দূত টেলিফোন যোগে কর্ণেল নাসেরকে মিঃ ডালেসের সহিত সাক্ষাৎকারের বিবরণ এবং বারমুডায় সুয়েজসমস্যা সমাধানে আমেরিকার ব্যর্থ চেষ্টার সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।"

চন্দননগর কংগ্রেস কমিটি বাতিল

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত একটি প্রস্তাবের দ্বারা চন্দননগরের পশ্চিমবঙ্গভুক্তির বিরুদ্ধে 'সমাজবিরোধী' ও 'বিভেদসৃষ্টিকারী' শক্তিসমূহের সহিত মিলিত হইয়া এবং সহযোগিতা করিয়া কংগ্রেসের মর্য্যাদা ও সংহতি ক্ষুণ্ণ এবং শৃঙ্খলাভঙ্গ করিবার জন্য চন্দননগর কংগ্রেস কমিটি বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রস্তাবটিতে বলা হইয়াছে : "চন্দননগর ঐতিহাসিক, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক দিক দিয়া পশ্চিমবঙ্গের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া ভারত-সরকার চন্দননগরকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা জাতীয় ঐক্য ও সংহতির পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্চলিক অবিচ্ছিন্নতা রক্ষার ঐকান্তিক ইচ্ছা-প্রণোদিত।

"এই রাজ্যের অখণ্ডতা ও সংহতি ক্ষুণ্ণ করিয়া চন্দননগরের জনগণের স্বার্থের ক্ষতির উদ্দেশ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির নির্দ্দেশ ও ইচ্ছার নিন্দনীয়ভাবে বিরুদ্ধাচরণপূর্ব্বক মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন বয়কট করিয়া চন্দননগরের এক শ্রেণীর লোক যে ক্রমবর্দ্ধমান বিভেদাত্মক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এই অধিবেশন তাহা উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছে। এই অধিবেশন দুঃখের সহিত আরও লক্ষ্য করিতেছে যে, যে সমস্ত সমাজবিরোধী ও বিভেদসৃষ্টিকারী শক্তি পশ্চিমবঙ্গের অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ করিবার উদ্দেশ্যে বিভেদাত্মক মনোভাব সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতেছে, চন্দননগর কংগ্রেস কমিটি তাহাদের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং সহযোগিতা করিতেছে। এই অধিবেশনের আরও অভিমত এই যে, চন্দননগর কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকলাপ শৃঙ্খলা-বিরোধী এবং কংগ্রেসের মর্য্যাদা ও সংহতি ক্ষুণ্ণ করিবার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এরূপ অবস্থায় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি দুঃখের সহিত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া চন্দননগর কংগ্রেস কমিটি বাতিল করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন এবং যথাযোগ্য বলিয়া বিবেচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতির উপর ক্ষমতা অর্পণ করিলেন।"

চন্দননগর কংগ্রেস কমিটির ব্যাপার একটি ব্যাপক রোগের আংশিক উপসর্গ মাত্র। মূল রোগের উপশম না হইলে চিকিৎসাই বৃথা যাইবে।

ভারত-সোভিয়েট বাণিজ্য-চুক্তি

গত ২রা ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং ভারতের মধ্যে পাঁচ বৎসরের মেয়াদী এক বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। চুক্তিতে বলা হইয়াছে যে, উভয় দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর অর্থনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করাই চুক্তিকারী রাষ্ট্রদ্বয়ের উদ্দেশ্য। উভয় রাষ্ট্রই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবার অঙ্গীকার করিয়াছে। চুক্তিতে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যের জন্য যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ করা হইয়াছে ভারতের ব্যবসায়ীবৃন্দ এবং সোভিয়েট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহা ছাড়া অন্যান্য দ্রব্য সম্পর্কেও ব্যবসাবাণিজ্য চালাইতে পারিবেন। স্থির হইয়াছে যে, সকলপ্রকার দেনা-পাওনা ভারতীয় মুদ্রার (টাকা) মিটান হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে সোভিয়েটের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ভারতের এক বা একাধিক ব্যাঙ্কের সহিত হিসাব রক্ষা করিবে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন বাণিজ্য প্রসারের উদ্দেশ্যে ভারতে একটি সংস্থা খুলিবে। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি ব্যাপারে সাহায্য এবং সহযোগিতা সম্পর্কেও দুই দেশের মধ্যে আলোচনা হয়। রাশিয়া হইতে যে সকল যন্ত্রপাতি আমদানী করা হইবে সেইগুলি প্রতিষ্ঠা করা এবং চালাইবার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সাহায্য দিতে

সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্মত হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার ব্যাপারেও সোভিয়েট ইউনিয়ন কারিগরি সাহায্য দানের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে।

প্রথম বৎসরে ভারত হইতে পাটজাত দ্রব্যাদি, চা, কফি, তামাক, গালা, গোলমরিচ ও অন্যান্য মশলা, পশম, চামড়া, উদ্ভিজ্জ ও অন্যান্য আবশ্যক তৈল প্রভৃতি রপ্তানী হইবে এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন খাদ্যদ্রব্য (গম, বার্লি), অপরিস্রুত খনিজ তৈল ও পেট্রোলজাত দ্রব্যাদি, কাঠ ও কাগজ, লৌহ এবং ইস্পাতজাত দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, রং, ছায়াচিত্রের ফিল্ম, বই এবং বিভিন্ন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় নানারূপ যন্ত্রপাতি ও কৃষিকার্য্যের উপযোগী যন্ত্রপাতি ভারতে পাঠাইবে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের বহির্বাণিজ্য নীতি সম্পর্কে ওয়াই. মিরফ লিখিতেছেন, "অপরাপর দেশসমূহের সহিত অর্থনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের নীতি সোভিয়েট-সরকার চিরদিনই অত্যাজ্যভাবে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। সোভিয়েট-যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যে সমস্ত দেশের বাণিজ্যসম্পর্ক রহিয়াছে তাহাদের সংখ্যা সাম্প্রতিক কালে তাৎপর্য্যগত ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এখনও পাইতেছে। ফ্রান্স, ইটালী, ফিনল্যাণ্ড, ইরাণ, ডেনমার্ক, গ্রীস, নরওয়ে, সুইডেন, আর্জেন্টিনা ও আইসল্যাণ্ডের সহিত সোভিয়েট-সরকারের বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। মিশরের সঙ্গেও লেন-দেন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে; অন্যান্য দেশের সঙ্গেও বাণিজ্য-চুক্তির কথাবার্ত্তা চলিতেছে।"

ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য-চুক্তি সম্পর্কে অন্য কথাও আছে। ভারতের সহিত রাশিয়ার বাণিজ্য অতি নগণ্য ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষই অধিক টাকার মাল রপ্তানী করিত। ১৯৫২-৫৩ সালে ভারতবর্ষ রাশিয়াতে ৮৫ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী করিয়াছে, ১৯৫১-৫২ সালে করিয়াছে ৬·৬৭ কোটি এবং ১৯৫০-৫১ সালে ১·৩৪ কোটি টাকার মাল। রাশিয়া হইতে ভারত ১৯৫২-৫৩ সালে ২৪·১৭ লক্ষ টাকার মাল আমদানী করিয়াছে, ১৯৫১-৫২ সালে করিয়াছে ১·৩৮ কোটি টাকার। ১৯৫০-৫১ সালে ২২·৯ লক্ষ টাকার মাল আমদানী করিয়াছে। এই বৎসরের এপ্রিল হইতে জুলাই এই চার মাসে রাশিয়া ভারতবর্ষ হইতে ৮·৬ লক্ষ টাকার মাল ক্রয় করিয়াছে, কিন্তু এই সময়ে ভারতবর্ষ কোনও জিনিষ রাশিয়া হইতে আমদানী করে নাই। রাশিয়া ভারতবর্ষ হইতে সাধারণতঃ চা, পাটজাত দ্রব্য, তামাক এবং গালা ক্রয় করে। রাশিয়া-ভারতবর্ষের ব্যবসা এতদিন পর্য্যন্ত প্রধানতঃ জিনিষের পরিবর্ত্তে জিনিষ দ্বারাই হইত।

নূতন চুক্তি অনুসারে রাশিয়া তাহার রপ্তানীর জন্য ভারতবর্ষের টাকা লইতে রাজী বলা হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যাপারটি একটু তলাইয়া দেখা প্রয়োজন। রাশিয়া তাহার রপ্তানী বাবদ ভারতবর্ষ হইতে টাকা লইয়া যাইবে না। এখানে তাহার নামে টাকা জমা পড়িবে ঠিকই, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লেন-দেনের নিষ্পত্তি হইবে ষ্টার্লিং দ্বারা। ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের মাধ্যমে ষ্টার্লিং মারফত রাশিয়া তাহার প্রাপ্য টাকা ভারতবর্ষ হইতে লইবে।

বর্ত্তমানে রাশিয়া ব্রিটেন হইতে অধিক মাল আমদানী করিতেছে। ব্রিটেনের সহিত ব্যবসায়ে রাশিয়ার ঘাটতি যাইতেছে, এবং এই ঘাটতি শোধ করিবার জন্য রাশিয়া তাহার জমা স্বর্ণ পৃথিবীর সাদাবাজারে অপেক্ষাকৃত অল্পদামেও বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। রাশিয়ার ষ্টার্লিঙের অভাব হইয়াছে, তাই সে বিমানে করিয়া সতর টন সোনা (যাহার মূল্য দেড়কোটি ষ্টার্লিং পাউণ্ড) লণ্ডনে চালান দিয়াছে। রাশিয়ার প্রায় ২০০ কোটি ষ্টার্লিঙের সোনা মজুত আছে।

ভারতের সহিত নূতন চুক্তি অনুসারে রাশিয়া টাকার সমপরিমাণ মূল্যের ষ্টার্লিং পাইবে এবং তাহার দ্বারা সে ব্রিটেনকে ষ্টার্লিঙে তাহার দেয় টাকা শোধ দিতে পারিবে। ইঙ্গ-রাশিয়া বাণিজ্যকে সহজ করিবার জন্যই বোধ হয় রাশিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া ভারতের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও রাশিয়া তাহার আন্তর্জাতিক রপ্তানীর বদলে জিনিষ দাবি করিত—টাকা লইতে একেবারেই নারাজ ছিল।

সরকারী ব্যবস্থা-বিভ্রাট

কলিকাতায় কিছুদিন যাবৎ সাদাবাজারে চাউল বিক্রি করিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে—জনসাধারণের অনেকেই এই চাউল ক্রয় করিতেছিলেন। এই চাউলের মূল্য সাত আনা হইতে এক টাকা চার আনা পর্য্যন্ত এবং সবচেয়ে সুবিধা এই যে, উহাতে কাঁকর নাই। রেশনের চাউলে কাঁকর থাকায় আজ স্পেশাল চাউলের চাহিদা দিন দিন বাড়িতেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আদেশ জারী করিয়াছেন যে, বাংলার জেলা ও গ্রাম হইতে সাদাবাজারের জন্য চাল ক্রয় করা চলিবে না। সাদাবাজারের বিক্রেতারা যদি চালের ব্যবসা করিতে চাহে তাহা হইলে তাঁহারা হয় ভারতের বাহির হইতে অথবা উত্তরপ্রদেশ হইতে চাউল ক্রয় করিতে পারেন। এই আদেশের মর্ম্মার্থ এই দাঁড়ায় যে, সাদাবাজারী চাউলের দোকানগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়াই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্দেশ্য এবং জনসাধারণ অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতে পারে, ইহার কারণ কি?

কলিকাতায় রেশনের চাউল সরবরাহ করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কলিকাতার রেশন বাবদ বৎসরে সাড়ে তিন লক্ষ টন চাউল দিবেন। এই চাউল পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলার জেলাগুলি হইতে সংগ্রহ করিতেন—এখন আভ্যন্তরিক সংগ্রহ রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের এই নূতন আদেশে জনসাধারণের অসুবিধা হইবে। সরকার যখন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কণ্ট্রোল ও রেশন তুলিয়া দিবেন, তখন যাহাতে ব্যবসায়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করাই কি সমীচীন ছিল না? বর্ত্তমানে

ল্যের চাউল কতকটা এ-প্রদেশে ও কতকটা বাহির হইতে আনিয়া বিক্রয় করিতে দিলে ধান্যের চাষ ভাল চলে এবং কলিকাতার লোকে মাঝে মাঝে একটু ভাল চাউল খাইয়া বাঁচে।

ভারতে সোনার চোরাকারবার

১৯৪৯ সাল হইতে ভারতে সোনার গুপ্ত আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ বৎসর হইতে ইউরোপে, মধ্যপ্রাচ্যে, পর্ত্তুগীজ গোয়া ও ম্যাকাওতে, ব্যাঙ্ককে এবং ফরাসী পণ্ডিচেরীতে সোনার সাদাবাজারী কারবার সুরু হইয়াছে। ১৯৫১ সালে পৃথিবীতে মোট ২'৫০ কোটি আউন্স সোনা উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে কেবলমাত্র ৭৪ লক্ষ আউন্স কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি ক্রয় করে। বাকি ১'৮০ কোটি আউন্সের মধ্যে ৮০ লক্ষ আউন্স গহনা ও সৌখীন জিনিষের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং এক কোটি আউন্স গুপ্তধন হিসাবে লোকে ক্রয় করে। এই এক কোটি আউন্সের শতকরা প্রায় ত্রিশ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৮০ লক্ষ তোলা মধ্যপ্রাচ্য হইতে ভারতবর্ষে গুপ্তভাবে আমদানী করা হইয়াছে। ১৯৫২ সালে সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ১'২০ কোটি আউন্স সোনা গুপ্তধন হিসাবে লোকে জমা রাখিয়াছে।

১৯৪৭ সালের মার্চ্চ মাস হইতে ভারতে সোনা আমদানী আইনতঃ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতের আভ্যন্তরিক উৎপন্ন সোনা কেবলমাত্র শতকরা ৫০ ভাগ চাহিদা মিটাইতে সক্ষম। বাকি ৫০ ভাগ গুপ্ত আমদানীর দ্বারা মিটানো হয়। বর্ত্তমানে আমদানী সোনার উপর ভরি প্রতি সাড়ে বারো টাকা আমদানী শুল্ক আছে। কিন্তু গুপ্তভাবে আমদানী হওয়ার জন্য সরকার এই আমদানী শুল্ক হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। শুধু তাহাই নহে, চোরাকারবারী সোনার জন্য আমেরিকান ডলারে মূল্য দিতে হয়। সাধারণতঃ গোয়া, পণ্ডিচেরী এবং বিভিন্ন মাছ ধরিবার বন্দর হইতে চুরি করিয়া ভারতবর্ষে সোনা আমদানী করা হয়। এই বৎসরে ১৫ই সেপ্টেম্বরের পর হইতে প্রায় দুই মাসের মধ্যে দেড় লক্ষ আউন্স সোনা গুপ্তভাবে আমদানী হইয়াছে।

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের স্বর্ণনীতি রহস্যজনক। তাঁহাদের মতে সোনা কোন প্রয়োজনীয় বস্তু নয়, সুতরাং ইহার আমদানী নিষিদ্ধ থাকিবে। কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণ ভাবে অন্যরকম। ভারতে বৎসরে প্রায় ৪০ কোটি টাকার সোনা জমা সম্পত্তি হিসাবে রাখা হয়। গড়পড়তায় মাথাপিছু প্রায় এক টাকা হিসাবে পড়ে। এদেশে মাথাপিছু বৎসরে সাত টাকা হিসাবে জমা পড়ে এবং এই টাকার শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ মাত্র সোনাতে নিয়োজিত হয়। অর্থাৎ, গড়পড়তায় মাথাপিছু ২৫৫ টাকা বাৎসরিক আয়ের মাত্র এক টাকা সোনা মজুত রাখার জন্য খরচ হয়।

ভারতবাসীর মনে সোনার চাহিদা ব্যাপক এবং আইনসঙ্গত সরবরাহ যথেষ্ট না হওয়ায় চোরাকারবারী দ্বারা সরবরাহ বজায় রাখা হইতেছে। এ তথ্য গবর্ণমেণ্ট এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুবিদিত।

অনেকে বলেন যে, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার নির্দ্ধারিত মূল্যের (৩৫ ডলারে এক আউন্স) বাহিরে সোনা বিক্রয় করিতে দিবেন না। কিন্তু তাহা সত্য নহে। ১৯৫০ ও ১৯৫১ সনে ফ্রান্সে সোনার মূল্য অত্যধিক ছিল। এই অবস্থায় ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স সোনা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে এবং তাহাতে ফরাসীদেশের মূল্যমান স্থিতিশীল হয়। ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স নিজে সোনা আমদানী করিয়া জনসাধারণের কাছে বিক্রয় করে। ১৯৫০-৫১ সনে দক্ষিণ আফ্রিকাও জনসাধারণকে নির্দ্ধারিত মূল্যের বাহিরে সোনা বিক্রয় করে।

পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি

গত নবেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাক গবর্ণর-জেনারেলের মার্কিন মুলুক সফর উপলক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের মধ্যে সামরিক আলোচনার কথা প্রথম সাধারণের গোচরীভূত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্থানের সরকারী মহল উচ্চস্বরে এইরূপ কোনপ্রকার কথাবার্ত্তার অস্তিত্বই অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মার্কিন পররাষ্ট্র-সচিব ডালেস ১৭ই নবেম্বর ঘোষণা করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের মধ্যে পাকিস্থানে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি সম্পর্কে কোন আলোচনাই হয় নাই; সঙ্গে সঙ্গে তিনি অবশ্য জানান যে, ভবিষ্যতে এইরূপ আলোচনা হইবার সম্ভাবনা তিনি অস্বীকার করেন না। কিন্তু ঠিক তাহার পর দিন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, পাক গবর্ণর-জেনারেল গোলাম মহম্মদের সহিত সামরিক সাহায্য এবং ঘাঁটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয় নাই—অর্থাৎ, আলোচনা যে হইয়াছিল প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ১৫ই নবেম্বর সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নেহরু পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি এবং যুদ্ধ-ঘাঁটি স্থাপন সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিলে তাহার উত্তরে পাক গবর্ণর-জেনারেল গোলাম মহম্মদ এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন যে, পণ্ডিত নেহরু সত্যাসত্য বিচার না করিয়াই মন্তব্য করিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের উক্ত স্বীকৃতির পর গোলাম মহম্মদের খেদোক্তির অর্থ সহজে বোধগম্য হয় না। ২৯শে নবেম্বর করাচীতে মার্কিন কংগ্রেসের ডেমোক্রাটিক প্রতিনিধি ইমানুয়েল সেলারও বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক পাকিস্থানকে সামরিক সাহায্য দানের পথে কোন বাধা নাই।

ভারতীয় জনসাধারণ দলমত-নির্ব্বিশেষে এই প্রস্তাবিত পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধতা করিয়াছেন। পাকিস্থানের প্রগতিশীল দলগুলিও এই চুক্তির বিরোধিতা করিয়াছেন। এই চুক্তি কার্য্যকরী হইলে 'ঠাণ্ডা লড়াই' ভারতের দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইবে, ফলে ভারতের স্বাধীনতা, শান্তি এবং সমৃদ্ধি ব্যাহত হইবে। তৃতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ভারতকে জড়াইয়া পড়িতে হইবে এবং ভারতবর্ষ আণবিক বোমার অবশ্যম্ভাবী লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হইবে; কারণ পাকিস্থানে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি

করার অন্যতম লক্ষ্য সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা; এই সকল ঘাঁটি হইতে সোভিয়েটের বিভিন্ন সামরিক দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে আক্রমণ চালান খুবই সহজ হইবে। স্বভাবতঃই যুদ্ধ বাঁধিলে সোভিয়েট ইউনিয়ন সর্বপ্রথম এই ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিবে এবং সন্নিকটবর্তী ভারতবর্ষকে আয়ত্তে রাখিবার জন্ত কোন পক্ষই চেষ্টার ত্রুটি করিবে না।

দ্বিতীয়তঃ, সামরিক সাহায্য দানদ্বারা পাকিস্থানের সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করিয়া তোলার মধ্যে আর এক বিপজ্জনক ইঙ্গিত রহিয়াছে। পাকিস্থানী শাসকবর্গের এক অংশ প্রায়ই ভারতের বিরুদ্ধে যেরূপ জেহাদী ধ্বনি তোলেন এবং কাশ্মীরে যাহার প্রথম আস্বাদ আমরা লাভ করিয়াছি, মার্কিন সাহায্যে পুষ্ট পাকিস্থানী সামরিক মহলের আচরণ তদপেক্ষা অনেক বেশী জঙ্গী হওয়াই স্বাভাবিক। ফলে আত্মরক্ষার জন্ম ভারতকেও সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং তাহার জন্ত অধিকতর ব্যয় প্রয়োজন হওয়ায় বিদেশী সাহায্য গ্রহণ না করিলে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি স্থগিত রাখিতে হইবে। বিদেশী সাহায্যও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত পাওয়া সম্ভব নহে। তাহাদের নিকট সাহায্য চাহিলেই সেই সুযোগে ভারতের উপরও সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের অনুমতিদানের জন্ত চাপ পড়িবে এবং ভারতের নিরপেক্ষতা ব্যাহত হইবে। এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের যোগসাজসে কাশ্মীর সম্পর্কে তাহাদের সমাধান ভারতের উপর চাপাইয়া দিবারও চেষ্টা চলিবে।

স্বভাবতঃই ভারত-সরকার দৃঢ়তার সহিত এই চুক্তির বিরোধিতা করিয়াছেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন, আফগানিস্থান, চীনা গণতান্ত্রিক সরকার এবং নেপাল সরকারও এই প্রস্তাবিত চুক্তির বিরোধিতা করিয়াছেন।

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, ভারতের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও মার্কিন সরকার পাকিস্থানের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে পারেন। ১৩ই নবেম্বর নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সম্বর্দ্ধনা সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ জর্জ্জ এলেন বলেন, তিনি স্মরণ করাইয়া দিতে চান যে, কোন দুই দেশ চুক্তিবদ্ধ হইতে চাহিলে তৃতীয় রাষ্ট্রের তাহা বানচাল করিয়া দিবার অধিকার থাকিতে পারে না। সামরিক সাহায্যপুষ্ট পাকিস্থানী বাহিনী কর্তৃক কাশ্মীর আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনায় ভারতের উদ্বেগ তিনি বুঝিতে পারেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে এবং সেই বিচারে পাকিস্থানের ক্ষেত্রে ভারতের বিরুদ্ধতাসত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চুক্তিবদ্ধ হইতে পারে বলিয়া মিঃ এলেন বলেন।

মার্কিন সহসভাপতির ভারত সফর

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহ-সভাপতি মিঃ রিচার্ড নিক্সন দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া সফরের পর ভারত সফরে আসিয়াছিলেন। এই সফর নানা দিক হইতেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গত মে মাসে মার্কিন পররাষ্ট্র-সচিব ডালেসের সফর হইতে আরম্ভ করিয়া ডেমোক্রাটিক নেতা এডলাই ষ্টিভেনসন, সিনেটর নোল্যাণ্ড প্রভৃতির দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া সফরের পর এই অঞ্চলে সর্বপ্রথম মার্কিন সহ-সভাপতির ভ্রমণের গুরুত্ব লঘু করিয়া দেখা যায় না। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি এবং বিশেষ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সমস্যাবলীর প্রতি লক্ষ্য করিলে তাঁহার ভ্রমণের তাৎপর্য্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়—তদুপরি ফরমোজা, ইন্দোচীন, কোরিয়া এবং জাপানে মিঃ নিক্সন যে সকল বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মনোভাব এবং ভ্রমণের উদ্দেশ্য বেশ স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে, যাহার সর্বশেষ প্রকাশ পাইয়াছে পাকিস্থানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের প্রচেষ্টায়। কাশ্মীরকেও কুক্ষিগত করিবার অনুরূপ প্রচেষ্টা সৌভাগ্যক্রমে সময়ে প্রকাশিত হওয়ায় তাহা বিফল হয়। ভারতে মিঃ নিক্সন সৌজন্ত দেখাইবার চেষ্টা করিলেও তাহা যে নিতান্তই বাহ্যিক ভারতের বাহিরে গিয়াই তিনি তাহার পরিচয় দিয়াছেন। পাক-ভারত মনোমালিন্য জীয়াইয়া রাখিবার সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে বিগত ৭ই ডিসেম্বর করাচীতে শ্রমিকদের সম্মুখে প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, "বিরোধী শক্তিগুলির ধ্বংসাত্মক কার্য্যাবলীর বিরুদ্ধে" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্থানকে রক্ষা করিবে। তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বদাই পাকিস্থানের পার্শ্বে থাকিবে বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস। কোন্ বিরোধী শক্তির ধ্বংসাত্মক কার্য্যাবলী পাকিস্থানের নিরাপত্তা বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে তাহা আমরা অবগত নহি। বহু-আলোচিত পাক-মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও সাহায্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলে এই উক্তির তাৎপর্য্য সম্পর্কে ভুল হইবার অবকাশ খুব কমই আছে।

ভারতীয় জন-পরিস্থিতি

ভারতবর্ষে পৃথিবীর প্রায় এক চতুর্থাংশ লোক বাস করে। এই জনসংখ্যা গণনা করা, তাহাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা করা শ্রমসাধ্য ব্যাপার। প্রতি দশ বৎসর অন্তর এই কার্য্য সম্পন্ন করা প্রশংসার যোগ্য। স্বাধীন ভারতের প্রথম জনগণনায় অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা সাধারণতঃই প্রধান স্থান পাইয়াছে।

১৯৫১ সনের জনগণনায় ভারতের জনসংখ্যা মোট ৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষ হইয়াছে (জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত)। ইহার মধ্যে ২৯.৫০ কোটি লোক ৫৫৮,০৮৯ গ্রামে বাস করে এবং বাকি লোক ৩০১৮ শহরে বাস করে। জম্মু ও কাশ্মীরের জনসংখ্যা লইয়া ভারতের জনসংখ্যার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬.১৩ লক্ষে। গত পঞ্চাশ বৎসরে—১৯০০ সন হইতে ১৯৫০ সন পর্য্যন্ত ভারতীয় জনসংখ্যা ২৩ কোটি ৫০ লক্ষ হইতে ৩৫.৬৮ কোটিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সময়ে পৃথিবীর অধিবাসীর সংখ্যা ১৬০.৮০ কোটি হইতে প্রায় ২৩৯ কোটিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিংশ শতকে মাত্র একবার ভারতের জনসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯১১ সন হইতে ১৯২১ সনে ভারতীয় জনসংখ্যা ৯০ লক্ষ হ্রাস পায় এবং ১৯২১ সনে জনসংখ্যা দাঁড়ায় ২৪.৮১ কোটিতে। ১৯২১ সন হইতে ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি

পাইয়াছে। ১৯৩১ সনে লোকসংখ্যা ছিল ২৭·৫৫ কোটি, অর্থাৎ, ২·৭৪ কোটি বৃদ্ধি পাইয়াছিল; ১৯৩১-৪১ সনে ৩·৭৩ কোটি বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৪১ সনে লোকসংখ্যা ছিল ৩১·২৮ কোটি। ১৯৪১-৫১ সনে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৪·৪১ কোটি। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে ক্রমবর্দ্ধিত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই বিপুল লোকসংখ্যার খাদ্য-সংস্থান কিরূপে হয়? মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশেরও কম, অর্থাৎ ১০·৪৪ কোটি কোনরূপে নিজেদের গ্রাসাচ্ছদন করিতে পারে, ইহাদের ধরা হয় স্বাবলম্বী হিসাবে। ৩·৭৯ কোটি লোক আংশিকভাবে নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদন করে। ২১·৪৩ কোটি লোক নিজেরা কোনও কাজ করে না এবং গ্রাসাচ্ছদনের জন্য সম্পূর্ণরূপে পরের উপর নির্ভরশীল। যে দেশের প্রায় তিন ভাগ অধিবাসী বেকার এবং পরনির্ভরশীল, ইহা খুবই স্বাভাবিক যে সে দেশ অত্যন্ত দরিদ্র। ভারতের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ২৪·৯১ কোটি লোক চাষবাস করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহাদের মধ্যে ৭·১০ কোটি লোক চাষী স্বাবলম্বী, ১৪·৬৯ কোটি কৃষক পরনির্ভরশীল এবং ৩·১১ কোটি আংশিকভাবে নিজেদের জীবিকানির্ব্বাহ করে।

যে ৭·১০ কোটি লোক চাষবাস দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, তাহাদের মধ্যে ১৬ লক্ষ লোক জমিদারশ্রেণীভুক্ত। ইহারা নিজ-হাতে চাষ করে না। বাকি কৃষিজীবীদের মধ্যে ৪·৫৭ কোটি লোক নিজেদের জমি চাষ করে; ৮৮ লক্ষ লোক অপরের জমি চাষ করে এবং প্রায় ১·৪৯ কোটি লোক কৃষি-মজুর মাত্র। ভূস্বামী কৃষকের সংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হইতেছে ভূমিহীন কৃষক। ভূস্বামী কৃষকের সংখ্যা (৪·৫৭ কোটি) অত্যধিক হওয়ায় ভারতবর্ষে সমবায়-কৃষি বর্দ্ধিত হয় নাই।

এদেশে ভূমির উপর নির্ভরশীলতা অত্যধিক। ৩৫·৬৯ কোটি লোকের জন্য মোট ৭,৫৩২ লক্ষ একর জমি আছে, অর্থাৎ মাথাপিছু গড়পড়তায় ২·১১ একর জমি পড়ে। মোট ভূমির বৃহৎ অংশ পাহাড়-পর্ব্বত দ্বারা আবৃত এবং মোট ৪,৯৯৭ লক্ষ একর জমি চাষের উপযোগী।

১০·৭৫ কোটি লোক শিল্প, ব্যবসায় প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, ইহাদের মধ্যে ৩·৩৪ কোটি স্বাবলম্বী, ৬·৭৩ কোটি পরের উপর নির্ভরশীল এবং ৬৮ লক্ষ আংশিকভাবে নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদন করে। ৩·৩৪ কোটি স্বাবলম্বীর মধ্যে ১১ লক্ষ মালিক, ৫৯ লক্ষ ব্যবসায়ে নিয়োজিত, ৫৫ লক্ষ বিভিন্ন শিল্পে কার্য্য করে এবং ৩২ লক্ষ শিক্ষা ও অন্যান্য কার্য্যে নিয়োজিত।

স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও জীবনধারণের মান

উইলফ্রেড ওয়েলক্ "হরিজন পত্রিকা"য় লিখিতেছেন, "শিল্প-সম্মিলিত কৃষি আশ্রয়ে বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাহায্যে যতদূর সম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার সহিত সমগ্র সমাজের কল্যাণের ও সুখের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যদি অর্থনৈতিক কাঠামো সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তবে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তি-সঙ্গত, সৃষ্টিমূলক ও শান্তিপূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা হইবে।"

স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্থানীয় অর্থনীতি জীবনধারণের মান অবনমিত করিবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ওয়েলক্ লিখিতেছেন, "প্রথমে হয়ত কিছু করিতে পারে, খুব সম্ভব তাহাও করিবে না, কিন্তু পরে সর্ব্বদিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে ব্যয়ের মাত্রা বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। জাতীয় অর্থনীতির স্থানে স্থানীয় অর্থনীতি কায়েম করিলে দেখা যাইবে এক, দুই, এমনকি, কোথাও কোথাও তিন স্থলে মধ্যবর্ত্তী মুনাফাখোরের পালা শেষ হইয়াছে।"

এইরূপ অর্থনীতিতে বহুদূরে মাল প্রেরণের ব্যয়ও অনেক বাঁচিবে। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় দ্রব্য বহু দূরে প্রেরিত হইয়া গুদামজাত হয় এবং সেখান হইতে অন্যত্র রপ্তানী হয়; কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথম স্থানেই পুনরায় ঐ সকল দ্রব্য চালান আসে। ওয়েলক্ সাহেবের কথায় "মূর্খতাপূর্ণ এই কর্ম্মপদ্ধতি বন্ধ করিলে দুই বারের আনয়ন-প্রেরণের ব্যয় এবং এক অথবা দুই বার মুনাফা প্রদান বন্ধ করা যায়।" বৃহদাকার বস্ত্র-শিল্পের স্থলে কুটীর-শিল্প প্রবর্ত্তিত হইলে 'ওভারহেড' খরচও অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়।

বস্ত্র-শিল্পের পরিমাণগত উৎপাদনের পরিবর্ত্তে হস্ত-শিল্পের গুণগত উৎপাদনের দ্বারা হয়ত সর্ব্বাধিক "পরিশ্রম বাঁচান যায়, ইহা দ্বারা ব্যক্তিগত রুচি ও বিচার-বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করা যায় এবং জনসাধারণের মনের উপর ফ্যাশনের যে প্রভাব রহিয়াছে তাহা হ্রাস করা যায়। সৃজনীশক্তির সাধনা দ্বারা কুটীর-শিল্প ও হস্ত-শিল্পকে প্রভূত পরিমাণে উৎসাহ প্রদান করা যায়, অতিরিক্ত ব্যয়ের অভ্যাস ও কাঁচা টাকার প্রভাব হইতে জনসাধারণকে সরাইয়া আনা যায়। ফ্যাশনের গোলামি ও অশুভ সঙ্গ হইতে রেহাই পাওয়া যায়। স্থানীয় জীবনযাত্রা-পদ্ধতিতে উন্নতি আনয়নের প্রচেষ্টা দ্বারা এই সকল সদ্গুণ পুষ্টিলাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অধিক দ্রব্য ব্যবহারের প্রবণতাকে সীমাবদ্ধ রাখে। ফলে কলকারখানা পুরাদমে চালাইবার দরকার হয় না। ইহার ফলে যথেষ্ট পরিশ্রম ও পয়সা বাঁচিয়া যাইবে।"

হস্তশিল্পের অর্থনীতিতে উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশী হইলেও সেই ব্যয়ের সার্থকতা আছে, কারণ তাহা অপরের মুনাফা-বৃদ্ধির কারণ হয় না। উৎপাদন করা হয় ব্যবহারের জন্য, ব্যবসারের জন্য নহে। উপরন্তু হস্ত-শিল্পে প্রস্তুত দ্রব্যাদির স্থায়িত্ব অনেক বেশী। "সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায়—সময়, পরিশ্রম, সামগ্রী, সন্তুষ্টি ও অর্থ সকল দিক হইতেই এই ব্যবস্থায় হিসাবের খাতায় জমার দিকেই বেশী পড়িবে। দেখা যাইতেছে, অল্প কিন্তু উত্তম সামগ্রী ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের অর্থনীতি।"

সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার কার্য্যের অগ্রগতি

"ভিজিল" পত্রিকায় ৫ই ডিসেম্বর সংখ্যায় "জনৈক গ্রামকর্ম্মী" একটি রাজ্যের সমাজ-উন্নয়নমূলক দুইটি কেন্দ্র পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা

বিবৃত করিয়া লিখিতেছেন যে, প্রথমেই তাঁহার দৃষ্টিতে যে ত্রুটি ধরা পড়িয়াছে তাহা হইতেছে একটি সুপরিকল্পিত কর্ম্মপদ্ধতির অভাব। তিনি লিখিতেছেন, মোটামুটিভাবে দুইভাবে কার্য্যে অগ্রসর হওয়া চলে—প্রথমতঃ ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে সাধারণকে স্বমতে আনয়ন করিয়া কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করা চলে। অবশ্য ইহাতে কর্ম্মের গতি মন্থর হইয়া পড়ে; কিন্তু এই পদ্ধতিতে কাজ করিলে সুদূরপ্রসারী ফল লাভ করা যায়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তি অনুভব করিতে পারে যে, সমগ্র পরিকল্পনার মধ্যে তাহার একটি বিশেষ অত্যাবশ্যক স্থান আছে; ফলে প্রত্যেকের মধ্যেই কর্ম্মের প্রেরণা জাগে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে কাজের মন্থর-গতিতে নয়াদিল্লীর কর্ত্তাদের চিত্তবিক্ষোভ ঘটে এবং তাহার ফলে স্থানীয় কর্ম্মীদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার পরিবর্ত্তে আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আদেশ জারী করিয়া কর্ম্মসমাধার চেষ্টা হওয়ায় তাহাতে একনায়কত্বের ছাপ আসিয়া পড়ে। উপরওয়ালা আদেশ করেন—নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে। অবস্তন কর্ম্মচারী অলস প্রকৃতির হইলে তাহারা তাহাদের বিভাগীয় রিপোর্টে কোন কিছু তদন্ত না করিয়াই নির্দ্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া জানাইয়া দেয়। লেখক এক স্থানে এইরূপ একটি কাহিনী শুনিয়াছেন যে, নথিপত্রে কর্ম্মসম্পাদনার রিপোর্ট পাইবার পর ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী অকুস্থল পরিদর্শন করিতে আসিয়া দেখেন যে, কোন কাজই করা হয় নাই। লেখকের অভিমতে যদি সমাজ-উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্য জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া স্বায়ত্তশাসনের উপযোগী করাকে ব্যর্থ করিতে না হয় তবে আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হুকুম জারীর অভ্যাস ত্যাগ করিয়া জনসাধারণের সহিত ব্যক্তিগত সংযোগ স্থাপন করিতে তৎপর হইতে হইবে।

পরিকল্পনা-ব্যবস্থার যে দ্বিতীয় ত্রুটি তাঁহার দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে তাহা হইতেছে এই যে, জনসাধারণকে সমাজ-উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার উপযোগী কোন সংস্থা সরকারী বিভাগে নাই। সমাজ-শিক্ষার ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত আছে, তাঁহাদের অধিকাংশই বিদ্যালয়ের শিক্ষক অথবা অনভিজ্ঞ তরুণ স্নাতক। ইঁহাদের মধ্যে অভিজ্ঞতা এবং কল্পনা-শক্তির যথেষ্ট অভাব আছে এবং কৃষক জনসাধারণের নাড়ীর স্পন্দন ইঁহারা বুঝিতে অক্ষম। এই ব্যাপারে গান্ধীজীর অনুগামী গঠনমূলক কর্ম্মীরা ফলপ্রসূ অনেক সাহায্য করিতে পারেন বলিয়া লেখকের বিশ্বাস।

পরিকল্পনা-ব্যবস্থার তৃতীয় ত্রুটি হইতেছে—ব্যয়াধিক্য। লেখকের মতে ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাসের মাধ্যমে প্রভূত পরিমাণে ব্যয় সঙ্কোচ করা সম্ভব।

ত্রিপুরায় পাট-উৎপাদনকারীদের সঙ্কট

"সেবক" পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ, বর্ত্তমান বৎসরে পাট-উৎপাদনকারীরা এক সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছেন। দেশ বিভাগের পরে পাকিস্থান হইতে কলিকাতায় পাট প্রেরণ বন্ধ হইলে বড় বড় ব্যবসায়ীরা ত্রিপুরার কৃষকদের নানা প্রলোভনে পাট চাষে উৎসাহিত করে এবং কৃষকেরাও লক্ষ লক্ষ টাকা দাদন পাইয়া অধিক পরিমাণে পাট চাষ করিতে মনোযোগী হয়। উক্ত সংবাদে প্রকাশ, "চলিত বৎসরে বড় বড় ব্যবসায়ীরা অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অনেক কম টাকা দাদন করিয়াছে। টাকা দাদন ও পাট খরিদ সাধারণতঃ মজুতদারেরা তৃতীয় ব্যক্তির মারফতে করিত, কিন্তু চলিত বৎসরে তাহারা এই নীতি পরিত্যাগ করিয়া নিজেরাই বরাবর কৃষকদের সঙ্গে লেনদেন করিতেছে। কলিকাতার বাজারে ত্রিপুরার পাটের চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া জানা যায়। বড় বড় মজুতদারেরা পাট খরিদ করার বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছে না বলিয়া পাট উৎপাদনকারী কৃষক তাহার ঈপ্সিত দর যেমন পাইতেছে না তেমন প্রয়োজনীয় পরিমাণ পাট বিক্রীও করিতে পারিতেছে না।"

ধান্য-চাষীর নূতন বিপদ

১৮ই অগ্রহায়ণের "দামোদর" পত্রিকা উক্ত শিরোনামায় এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন যে, এ বৎসর ধান্য ফসল ভাল হইলেও চাষীদের সম্মুখে ধান্যের পড়ন্ত-মূল্যের এক বিভীষিকা দেখা দিয়াছে। এ বৎসর পাট-চাষ না করায় অধিকাংশ চাষীর হাতেই কোন অর্থ নাই; উপরন্তু তাহাদের দেনার পরিমাণ ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। শস্য-কাটার সময় এই সকল ঋণ পরিশোধ এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য ধান্য-চাষীর অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন হওয়ায় চাষীরা এখন ধান্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে; কিন্তু ধান্যের পড়ন্ত মূল্যমানের জন্য তাহারা উপযুক্ত মূল্য পাইতেছে না। সরকার সাম্প্রতিক এক ঘোষণায় ধান্যের দর মণপ্রতি এক টাকা কমাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু সরকারী নির্দ্ধারিত মূল্যে ধান্য ক্রয়েরও কোন ব্যবস্থা সরকারপক্ষ করেন নাই। যদি ধান্যের মূল্যের অনুপাতে অন্যান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যও হ্রাস পাইত তবে অভিযোগের কোন কারণ থাকিত না; কিন্তু তাহার ত কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইতেছে না বরং বিপরীত গতিই পরিলক্ষিত হইতেছে। এই ব্যাপারে সরকারী নিষ্ক্রিয়তার উল্লেখ করিয়া "দামোদর" লিখিতেছেন: "লেভী প্রত্যাহারের সময় কেন্দ্রীয় খাদ্য-মন্ত্রী কিদোয়াই তাঁহার বিবৃতিতে চাষীর উৎপন্ন ফসলের ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিবার জন্য খোলা বাজারে ধান্য ক্রয় করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহা আজও বাস্তবে পরিণত হয় নাই। আমরা অবিলম্বে কেন্দ্রীয় খাদ্য-মন্ত্রীকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করি।"

প্রথম দিকে লেভী বন্ধ করিবার আন্দোলন, পরে ধান্য ক্রয় করিতে তৎপর হওয়ার জন্য সরকারকে আহ্বান! এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কি ভাবে হওয়া উচিত, তাহার কোনও নির্দ্দেশ নাই। দেশের জমিহীন দরিদ্র গৃহস্থের জীবনযাত্রার মান কি ভাবে ধীরে নামিতে পারে সে বিষয়েও কি চিন্তার অবকাশ আমাদের নাই?

বাঁকুড়ায় টেষ্টরিলিফ কার্য্যে দুর্নীতি

বিষ্ণুপুর কৃষ্ণগোপাল ইঞ্জিনীয়ারিং ইনষ্টিটিউটের ছাত্র শ্রীসুভাষচন্দ্র দাস ব্যবহারিক শিক্ষালাভের জন্য তাঁহার বিদ্যায়তনের অধ্যক্ষের অনুমোদন লইয়া ১৮।৯।৫৩ তারিখে বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটি থানার অন্তর্গত উধরাডিহি-চুরুড়ী রাস্তার টেষ্ট রিলিফকার্য্য পরিচালনার জন্য সরকারী বিভাগীয় অফিসার নিযুক্ত হন এবং গত ২১।৯।৫৩ তারিখে কার্য্যে যোগদান করেন। তাঁহার কার্য্যকালে যে সকল দুর্নীতি তাঁহার গোচরে আসে, পাক্ষিক "হিন্দুবাণী" পত্রিকার ১৫ই অগ্রহায়ণ সংখ্যায় এক বিবৃতিতে তিনি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি লিখিতেছেন: "আমি কার্য্যে যোগদান করিয়াই দেখিতে পাই যে আমার পূর্ব্ববর্ত্তন বিভাগীয় অফিসার সম্পূর্ণরূপে অমরকাননের কংগ্রেসসেবীদের একটি বেসরকারী ছায়া পরিচালকমণ্ডলীর উপর নির্ভরশীল। রাস্তায় যথারীতি পরিমাপ করা, প্ল্যানমাফিক কাজ হইতেছে কি না তাহা জানিবার বা তদারক করিবার কোন অধিকারই তাঁহার নাই। মুহুরীগণ এই বেসরকারী পরিচালকচক্রের আদেশে কাজ করিয়া থাকেন এবং তাঁহারাও ঐ একই চক্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষ। ইহাদের এইরূপ স্বেচ্ছাচারমূলক কার্য্য হইতে আমি জানিতে পারি যে রাস্তার সংলগ্ন স্থান হইতে অল্প পরিমাণ মাটি তুলিয়া ২১০ ফুট মাটি ভরাট করা হইয়াছে বলিয়া চালাইয়া দেওয়া হইতেছে। অনেক ক্ষেত্রে রাস্তাটি নিজেদের সুবিধাজনক স্থানের মধ্য দিয়া নিয়ন্ত্রিত করিয়া, যথা উচ্চস্থান দিয়া লইয়া গিয়া আড়াই ফুটের কম মাটি ফেলিয়া কৃত্রিমভাবে কাজের হিসাব দেওয়া হইতেছে।...

"আর এক প্রকার দুর্নীতির বিষয় আমি জানিতে পারি। যত জন শ্রমিক কাজ করিতেছে তাহা অপেক্ষা বেশী শ্রমিকের জাল ও মিথ্যা সংখ্যা তৈয়ার করিয়া মুহুরী ও তাহাদের বেসরকারী ছায়া পরিচালকবৃন্দ অজস্র সরকারী পয়সা আত্মসাৎ করিতেছে।...

"১।১০।৫৩ তারিখে শ্রীসত্য সিংহ নামক জনৈক কংগ্রেসী বেসরকারী পরিদর্শক আমার নির্দ্দিষ্ট লাইন (Alignment) সরাইয়া নষ্ট করেন। আমি তাহাতে আপত্তি করিলে তিনি বলেন: 'আমি এখানে সর্ব্বেসর্ব্বা। আমি এই রাস্তার কাজ তদারক করিবার জন্য গোবিন্দবাবু (বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি) কর্ত্তৃক বিশেষ পরিদর্শনকারী অফিসার নিযুক্ত হইয়াছি। আমার হুকুমমত এখানকার সমস্ত কাজ হইবে...ইত্যাদি। আমি এইরূপ অহেতুক মন্তব্যের প্রতিবাদ করিলে স্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীরামলোচন মুখার্জী বলেন যে, সত্যবাবুর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করার মত শক্তি তোমার বা তোমার উপরওয়ালারও নাই। সে মনে করিলে তোমাকে এখানে লাঠির আঘাতে শেষ করিয়া দিতে পারে। এইরূপ ভীতিপ্রদর্শন সত্ত্বেও আমাকে প্রত্যেকটি চুরি, দুর্নীতি এবং সরকারী অর্থের অপব্যয় নিবারণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া স্থানীয় কংগ্রেসী মুহুরী এবং তাহাদের বেসরকারী পরামর্শদাতারা মিলিয়া আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। আমি খুব সন্তর্পণে কাজ করিতে লাগিলাম। এইরূপ পরিস্থিতিতে গত ১১।১০।৫৩ তারিখে বেলা একটার সময় আমি যখন আমার কার্য্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ভোলানাথ সরকার নামক মুহুরীর এলেকা পার হইতেছি তখন হঠাৎ গুয়ালডাঙ্গা-নিবাসী শ্রীহলধর পাল একটা টাঙ্গি লইয়া আমার সাইকেল আটকায় এবং ভোলানাথ সরকার (কংগ্রেসপন্থী মুহুরী) প্রায় দুই শত লোক সঙ্গে লইয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলে। আমার হাতে Acquittance Roll-টি দিয়া বাইশটি গ্যাং-এর স্থানে চব্বিশটি গ্যাং লিখিতে বলে। অর্থাৎ, যাট জন শ্রমিক লইয়া দুইটি ভুয়া গ্যাং কাজ করিতেছে লিখিতে বলে। আমি না লিখিলে আমাকে কাটিয়া পুঁতিয়া দিবার ভয় দেখায়। এই অবস্থায় আমি নিতান্ত বাধ্য হইয়া প্রাণভয়ে বাইশের স্থানে আরও দুইটি ভুয়া গ্যাং কাজ করিতেছে বলিয়া লিখিয়া দিই। পরে অবশ্য আমার বাসায় ফিরিয়া পে-মাষ্টারকে লিখিতভাবে উক্ত ভুয়া গ্যাং দুইটির জন্য কোন টাকা দিতে নিষেধ করি। পে-মাষ্টারের নিকট প্রেরিত উক্ত চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার-সম্বলিত অনুলিপি আমার কাছে আছে। আমি এই ঘটনার বিষয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকেও জানাইয়াছি। এই ঘটনার পর আমি লোক-পরম্পরায় জানিতে পারি যে, আমার জীবন বিপন্ন হইতে পারে। আমার পক্ষে আর কাজ করা নিরাপদ নহে জানিয়া আমি পীড়িত বলিয়া রিপোর্ট দিয়া সাইকেলযোগে ঘুরিয়া জঙ্গলে জঙ্গলে বাঁকুড়া ফিরিয়া আসি এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আমি সমস্ত বিষয় লিখিয়া জানাই। তিনি প্রতিকারের আশ্বাস দিয়া আমাকে বিষ্ণুপুর ফুটবল গ্রাউণ্ডে টেষ্ট রিলিফের কার্য্যে (Assistant Sectional Officer) নিযুক্ত করেন। উধড়াডিহি-চুরুরী রাস্তায় যে সকল ব্যক্তি বেসরকারী পরিদর্শক ও তদারককারী সাজিয়া মুহুরীদের সহায়তা করেন তাঁহাদের সকলেই এই অঞ্চলের কংগ্রেসকর্ম্মী বলিয়া পরিচিত এবং কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ।

"শ্রীঅবনী মুখার্জী, শ্রীপঞ্চানন সরেন, শ্রীচন্দ্রমোহন হেমব্রম্, শ্রীকালাচাঁদ গোস্বামী, শ্রীরামলোচন মুখার্জী এবং শ্রীসত্য সিংহ প্রভৃতিকে আমি প্রত্যহ মুহুরীগণের সহিত মিলিত হইয়া গোপনে সলাপরামর্শ করিতে দেখিয়াছি।"

আমরা গোবিন্দবাবুর নিকট হইতে এই অভিযোগের উত্তর চাহিতেছি। তিনি অবহিত হউন।

আসামে শিক্ষকদের দাবি

গত ২১শে ও ২২শে নবেম্বর আসাম রাজ্য বিধানসভার বিরোধী-দলপতি শ্রীহরেশ্বর গোস্বামীর সভাপতিত্বে শিলচরে নিখিল-আসাম সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চবিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতির অভিভাষণ প্রদান-প্রসঙ্গে শ্রীগোস্বামী দেশের ক্রমবর্দ্ধমান অর্থনৈতিক সমস্যা এবং নানাবিধ দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ

করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। তাঁহার মতে বর্ত্তমানে কারিগরি শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন যে, দেশের শিক্ষার উন্নয়ন নির্ভর করে শিক্ষকদের উপযুক্ততার উপর, কিন্তু উপযুক্ত বেতন না পাইলে শিক্ষকগণের পক্ষে যথারীতি শিক্ষাদানকার্য্য চালান অসম্ভব।

উক্ত সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে একটিতে সরকারী হাই স্কুলের শিক্ষকদের সমপর্য্যায়ে সাহায্যপ্রাপ্ত হাই স্কুলের শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধাদানের অনুরোধ জানান হয়। অপর এক প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, তিন মাসের মধ্যে সরকার কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে আগামী ১লা মার্চ্চ হইতে শিক্ষকগণ ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিবেন।

সাপ্তাহিক "যুগশক্তি" এই প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সম্মেলনের গুরুত্ব উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন যে, বর্ত্তমান শাসকগণ শাসনক্ষমতা হস্তগত হইবার পূর্ব্বে সরকারী ও সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহের পার্থক্য দূরীকরণকল্পে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়াছেন, কিন্তু স্বাধীনতালাভের সাত বৎসর পরেও অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। শিক্ষকগণ একাধিক বার তাঁহাদের দাবি সরকারের নিকট পেশ করিয়া বিফল হইয়াছেন। সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় ঐ সকল বিদ্যালয়ের কিছু উপকার হইয়াছে, কিন্তু শিক্ষকদের প্রধান দাবি সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের হার সরকারী হাই স্কুলের সমপর্য্যায়ভুক্ত করা সম্পর্কে সরকার কোন "কিছু না করিয়া বারংবার শুধু 'বিবেচনা করা হইতেছে' বলিয়া সময় ক্ষেপণ করিতেছেন।"

পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "শিক্ষক-সম্মেলনের এবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বিরোধী-দলপতিকে সভাপতি মনোনয়ন। ইতিপূর্ব্বে শুধু কংগ্রেস দলভুক্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরই শিক্ষকসমিতি সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। এবার তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।" শিক্ষকদের বেতনের অস্বাভাবিক নিম্নহারের উল্লেখ করিয়া পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "৮০৲ টাকা বেতন ও ১০৲ টাকা মাগ্‌গী ভাতায় শিক্ষকতা আরম্ভ ও শেষ করিয়া এখন কোন শিক্ষকের পক্ষে যথারীতি শিক্ষাদানকার্য্য চালাইয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে। কারণ ইহা তাঁহাদের পরিবার প্রতিপালনের ন্যূনতম চাহিদার পক্ষেও অপ্রচুর।

"শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির জন্য আসাম তৈল কোম্পানী, চা-বাগান, বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপর সেস ধার্য্য করার যে প্রস্তাব সভাপতির ভাষণে করা হইয়াছে তাহা বিবেচনার যোগ্য। দেখা গিয়াছে, সরকারী হাই স্কুলের শিক্ষকদের সমান বেতনের হার নির্দ্ধারণ করিলে আসামের সাহায্যপ্রাপ্ত হাই স্কুলসমূহের জন্য ত্রিশ-চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। উপরি-উক্ত উপায়ে তাহার অনেকটা সংগ্রহ করা যাইতে পারে।"

ত্রিপুরায় শক্তিশালী রেডিও স্থাপন

আগরতলা হইতে নবপ্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা "সেবক" সংবাদ দিতেছেন যে, ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আগরতলায় "ওয়েষ্টার্ণ ইলেকট্রিক রেডিও টারমিনাল" নামক শক্তিশালী একটি বেতার-সেট বসান হইবে। বিশেষ ভাবে ত্রিপুরার জন্যই সরকার আমেরিকা হইতে মেশিনটি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সংবাদ অনুযায়ী জানা যায় আসাম সার্কেলের টেলিগ্রাফ বিভাগের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, বিলোনীয়া ও উদয়পুরে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই এবং ধর্ম্মনগর ও কৈলাশহরে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি জনসাধারণ বেতারে তার প্রেরণ করিতে পারিবেন। সোনামুড়া, সাব্রুম, খোয়াই, কমলপুর ও অমরপুরে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বেতার ষ্টেশন বসিবে। ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার বলেন যে, এই প্রকার রেডিও-যোগে তার প্রেরণ ব্যবস্থা ভারতে এই সর্ব্বপ্রথম করা হইতেছে। তিনি আরও জানান, ১৯৫৫ সালের মার্চ্চ মাসের মধ্যে স্থলপথে টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করিয়া ত্রিপুরার সমস্ত বিভাগীয় প্রধান কার্য্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হইবে। তার বিভাগের সাজসরঞ্জাম ত্রিপুরায় আমদানী করার অসুবিধার জন্যই তার বিভাগের সম্প্রসারণে বিলম্ব হইতেছে।

বর্দ্ধমানে মেডিক্যাল কলেজ

"বর্দ্ধমান বাণী"র এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জনাব আবদুস সাত্তার লিখিতেছেন, ভোর কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের মেডিক্যাল স্কুলগুলি তুলিয়া দিয়াছেন। ভোর কমিটি স্কুলগুলিকে কলেজে উন্নীত করিবার যে সুপারিশ করিয়াছেন তদনুযায়ী কলিকাতার মেডিক্যাল স্কুলগুলিকে কলেজে পরিণত করা হইলেও বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও জলপাইগুড়িতে অবস্থিত মফস্বলের তিনটি স্কুলকে কলেজে পরিণত করিবার কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

জনাব সাত্তার লিখিতেছেন: "বর্দ্ধমানে একটি মেডিক্যাল কলেজের প্রয়োজন আছে এবং কলিকাতার ভীড় কমাইতে হইলে মফস্বলের ঐ তিনটি মেডিক্যাল স্কুলকে কলেজে পরিণত করা আবশ্যক এবিষয়ে ভিন্ন মত নাই। সরকার পক্ষও ইহা অস্বীকার করেন না।" জলপাইগুড়ি এবং বাঁকুড়ার প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁহাদের নিজ নিজ জেলায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন। বর্দ্ধমানেও অনুরূপ দাবি উঠিয়াছে। ইহার উত্তরে সরকার পক্ষ অর্থের অভাবের কথা বলিয়া নিজেদের অক্ষমতা প্রদর্শন করেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া গেলেই বর্দ্ধমানে কলেজ স্থাপন করা হইবে এবং ইতিমধ্যে যাহাতে মেডিক্যাল স্কুলের সুযোগ-সুবিধা বিফলে না যায় সেজন্য বর্দ্ধমানে একটি নার্স-শিক্ষায়তন খোলা হইবে।

জনাব সাত্তার লিখিতেছেন, শোনা যায় যে দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া সরকারকে দিলে নাকি কলেজের কাজ আরম্ভ হইতে পারে। "বর্দ্ধমান একটি বড় জেলা, অধিবাসীর সংখ্যা কুড়ি লক্ষের অধিক। বহু শিল্প ও শিল্পপতি এই জেলায় আছেন।

প্রতিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী গৃহস্থের সংখ্যাও জেলায় কম নহে। রাজনীতির উর্দ্ধে থাকিয়া যদি সমবেতভাবে চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে এই দশ লক্ষ টাকা বর্দ্ধমান জেলাবাসীদের নিকট হইতে সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না বলিয়া মনে করি।"

"হরিজন" সাপ্তাহিকের প্রচারসংখ্যা

১৪ই নবেম্বরের "হরিজন" পত্রিকায় নবজীবন ট্রাষ্টের ম্যানেজিং ট্রাষ্টি শ্রীজীবজী দয়াভাই দেশাই লিখিতেছেন, গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণের পর "হরিজন" সাপ্তাহিকগুলি কিছুদিন বন্ধ রাখা হইয়াছিল; ১৯৪৮ সনের এপ্রিল মাস হইতে পত্রিকাগুলি পুনঃপ্রকাশিত হয়। তদবধি বিভিন্ন সময়ে পত্রিকাগুলির প্রচারসংখ্যা নিম্নের তালিকায় দেওয়া হইল :

তারিখ	ইংরেজী	গুজরাটি	হিন্দী	বাংলা
	হরিজন	হরিজন বন্ধু	হরিজনসেবক	হরিজন পত্রিকা
৪-৪-৪৮	৯,৪৫১	৯,১০৩	৪,৭১৭	১৬০০
১-২-৫২	২,৮৪০	৩,৮৯০	২,২৭০	৬০২
১৩-৯-৫২	৪,৪৭৫	৭,৪০৮	৬,০২৪	৫৫১
১-৩-৫৩	৩,৩৭৫	৫,৪৪১	৫,৩৮৫	৬০৪
১-৯-৫৩	৩,১৫০	৪,৭৭৭	৩,৬২০	৫৮২

সংখ্যাগুলি হইতে দেখা যায় যে, গত ৬।৭ মাসে পত্রিকাগুলির গ্রাহকসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

শ্রীদেশাই লিখিতেছেন, "পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় ট্রাষ্টকে ক্রমেই বেশী ক্ষতি সহিতে হইতেছে। গুজরাটী অপেক্ষা হিন্দী ও ইংরেজী সংস্করণের গ্রাহকসংখ্যা কম, ইংরেজীর গ্রাহকসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম (বাংলা ব্যতীত)। গ্রাহকসংখ্যা না বাড়িলে সাপ্তাহিকগুলি আর চালাইতে পারা যাইবে কি না ট্রাষ্টকে তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ইংরেজীর গ্রাহকসংখ্যা প্রয়োজনীয় রূপে বাড়িলে অথবা হিন্দী ও গুজরাটীর সংখ্যা উহার পরিপূরকরূপে যথেষ্ট বাড়িয়া গেলে সঙ্কট কাটাইয়া উঠা যায়।"

বাংলা পত্রিকার পরিচালক শ্রীসুধীরচন্দ্র লাহাও অনুরূপ মন্তব্য করিয়া গ্রাহকসংখ্যাবৃদ্ধির আবেদন করিয়াছেন।

কেনিয়ায় শ্বেত বর্ব্বরতা

কেনিয়াতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার যে নৃশংস ও অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়াছে তাহার তুলনা মেলা ভার। এই অমানুষিকতা এতই প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিয়াছে যে, শ্বেতাঙ্গদের ভারতীয় মুখপত্র "ষ্টেটস্‌ম্যান" পর্য্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলিয়াছে। কল্পিত মাউ মাউ সন্ত্রাসবাদের ধুয়া তুলিয়া কেনিয়ার শ্বেতাঙ্গ শাসকগোষ্ঠী নিরস্ত্র কিকিউবাসীকে কুকুরের মত গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে, আবালবৃদ্ধবনিতা নির্ব্বিশেষে কিকিউরা লিঙ্কন বোমারু-বিমান হইতে নিক্ষিপ্ত হাজার পাউণ্ডের ওজনের বোমা ও মেশিনগানের গুলিতে মরিতেছে। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে কেনিয়া বিধান সভায় ইউরোপীয় বসতিকারীদের প্রতিনিধি মিঃ ওয়েলউডকে বলিতে শোনা যাইতেছে, "যদি আমরা অধিকতর সংখ্যায় ইউরোপীয় আগমনকারীদের প্রবেশের অনুমতি না দিই তবে আফ্রিকাবাসীদের উন্নততর জীবনযাত্রায় পৌঁছাইবার আশা অল্প।"

কিরূপভাবে আফ্রিকাবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করিবার জন্য শ্বেতাঙ্গ-প্রভুরা চেষ্টা করিতেছেন নাইরোবীতে সামরিক আদালতে ক্যাপ্টেন ডি. এস. এল. গ্রিফিথস-এর বিচারের সময় প্রকাশিত তথ্য হইতে তাহার কিছু নমুনা মিলিবে। গ্রিফিথসের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, উক্ত কর্ম্মচারী দুই জন রাজভক্ত আফ্রিকাবাসীকে ব্রেনগান দ্বারা পিছন হইতে গুলি করিয়া হত্যা করে। বলা হইয়াছে যে, গ্রিফিথস নাকি সার্জেণ্ট মেজর লেওয়েলিনকে বলিয়াছিল যে, সে যাহাকে খুশী গুলি করিতে পারে—কালা আদমী হইলেই হইল। বিচারের বিবরণ হইতে আরও জানা যায় যে, প্রত্যেক সৈন্যবাহিনীতে নিহতদের একটি তালিকা রাখা হয় এবং নিরস্ত্র আফ্রিকাবাসীকে হত্যা করিবার পুরস্কারস্বরূপ প্রত্যেক নিহত কিকিউর মাথাপিছু হত্যাকারীকে পাঁচ হইতে দশ শিলিং দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, বিচারে ক্যাপ্টেন গ্রিফিথস বেকসুর খালাস পাইয়াছে।

এই নগ্ন বীভৎসতার সংবাদে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে সরকার পক্ষকে প্রশ্ন করা হইলে উত্তরে যুদ্ধমন্ত্রী মিঃ হেড বলেন যে, সরকার সামরিক আদালতে গ্রিফিথসের বিচার সম্পর্কীয় সকল নথিপত্র চাহিয়া পাঠাইয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই আশ্বাস দেন যে যদি দেখিতে পাওয়া যায় যে কেনিয়াতে ব্রিটিশবাহিনী কিকিউদের প্রতি ব্যাপকভাবে অন্যায় আচরণ করিয়াছে তাহা হইলে সরকারী তদন্তের ব্যবস্থা করা হইবে।

মিঃ হেডের এই ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ২রা ডিসেম্বর কেনিয়া সরকার ঘোষণা করেন যে, কিকিউদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের জন্য দণ্ডিত ১৯ বৎসর বয়স্ক ব্রিয়ান ওয়াল্টার হেওয়ার্ডকে অস্থায়ী জেলাশাসকের পদে পুনরায় বহাল করা হইবে। কেনিয়া বিধানসভার প্রধান নেটিভ কমিশনার মিঃ ডেভিস বলেন যে, হেওয়ার্ড অল্পবয়স্ক হইলেও তাহার কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। হেওয়ার্ডের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হইতে জানা যায়, হেওয়ার্ড যে দলের নেতৃত্ব করিতেছিল তাহারা উক্ত টাঙ্গানিকায় চর্ম্মরজ্জু দ্বারা কিকিউদের গলা বাঁধিয়া সিগারেটের আগুন দিয়া ঐ সকল নিরীহ আফ্রিকাবাসীর কর্ণপটহ পোড়াইয়া দিত। প্রধান কমিশনার ডেভিসের মতে টাঙ্গানিকার সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাব এই অমানুষিক বর্ব্বরতার জন্য দায়ী। কিন্তু যাহাদের অপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে তাহাদের প্রতি যদি এইরূপ কোমল ব্যবহার করা হয় তবে যে কিরূপে এইপ্রকার বর্ব্বরতা বন্ধ হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ যুদ্ধমন্ত্রী কর্ত্তৃক সরকারী তদন্তের আশ্বাসের মূল্যই বা কি সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থাকিয়া যায়।

শাহজাদা দারাশুকো

ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

পলায়নের পথে কুমার সুলেমান ও দারা

১

পুত্র সুলেমানের আশায় দারা যখন লাহোরে বসিয়া দিন গণিতেছিলেন তখন সংবাদ পৌঁছিল শতদ্রু নদীর অপর পারে পৌঁছিয়া আওরঙ্গজেবের সেনাধ্যক্ষ বাহাদুর খাঁ ছাউনী ফেলিয়াছে, দিল্লী হইতে নূতন সম্রাট গাজী আলমগীর বাদশাহের নবনির্ম্মিত নৌবহর গরুর গাড়ীতে বাদশাহী রাস্তা ধরিয়া লুধিয়ানা অতিক্রম করিয়াছে, কোন্ ঘাটে শতদ্রুর জলে ভাসিবে ঠিক নাই। দারার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, অথচ সুলেমানের কোন খবর নাই। যাঁহার বুদ্ধি ও পৌরুষের দাপটে ডাঙ্গায় নৌকা চলে তাঁহার সহিত স্বয়ং খোদাতালা আঁটিয়া উঠিতে পারেন না, সুতরাং দারার ভরসা কোথায়? যে সমস্ত সেনাধ্যক্ষকে তিনি ব্যক্তিগত চরিত্রমার্য্যা, অনুগ্রহ ও দান দ্বারা আপন করিয়া লইয়াছিলেন, যাঁহারা বহুদিন একনিষ্ঠভাবে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন তাঁহাদের অর্দ্ধাংশ কুমার সুলেমানের সহিত শুজার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিল, অর্দ্ধাংশ সামুগড় ও ধর্ম্মাতের যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, না হয় বিপাকে কিংবা লোভে পড়িয়া শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, প্রথম শ্রেণীর কোন মনসবদার লাহোর পর্য্যন্ত অনুগমন করেন নাই। পুরাতন বিশ্বস্ত মোসাহেবগণের মধ্যে তোপখানার অধ্যক্ষ জাফর (উপাধি বরকান্দাজ খাঁ) ব্যতীত কেহ আসে নাই, ফিরিঙ্গী গোলন্দাজগণ স্বেচ্ছায় বিপদ মাথায় লইয়া শুধু প্রাণের টানে দুই একজন করিয়া লাহোরে আসিতেছিল। উল্লেখযোগ্য সেনানায়কগণের মধ্যে ফিরোজ মেবাতী (বাবরের প্রতিদ্বন্দ্বী সুবিখ্যাত মেবাত বা বর্ত্তমান আলোয়ার রাজ্যের অধিপতি হোসেন খাঁ মেবাতীর বংশধর) দারার পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহার শেষযাত্রার সাথী হইয়াছিলেন। সুলেমানের সহিত প্রেরিত মনসবদারগণের মধ্যে একমাত্র দায়ুদ খাঁ কোরেশী কোনক্রমে কৌশল ও দৃঢ়তার সহিত বহু বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া জঙ্গলী রাস্তায় কোনক্রমে লাহোর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন। এই সঙ্কটে শতদ্রু ও বিপাশার (বিয়াস নদী) তীর বরাবর ঘাটিসমূহ রক্ষা করিবার জন্য দারা দায়ুদ খাঁকে প্রধান সেনাপতিরূপে কয়েক হাজার অশ্বারোহী ও হাল্কা তোপখানাসহ লাহোর হইতে ঐ দিকে প্রেরণ করিলেন।

দায়ুদ খাঁ দূরদর্শী বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ যোদ্ধা। বিপাশার উজানে সুলতানপুর* পর্য্যন্ত পারাপারের সমস্ত ঘাটির বলবৃদ্ধি করিয়া তিনি শতদ্রুর দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং অধস্তন সেনামুখ্যগণকে কড়া হুকুম দিলেন তাঁহার হুকুম-নামা ব্যতীত পরিচিত অপরিচিত কাহাকেও যেন লাহোরের দিকে যাইতে দেওয়া না হয়। এই সময়ে যুবক যোদ্ধা ম্যানুসী সাহেব কখনও ফকীর, কখনও আমীর সাজিয়া শত্রুর চোখে ধূলা দিয়া দিল্লী হইতে বিপাশার তীর পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছিলেন, এই স্থানে দায়ুদ খাঁর সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার ধড়ে প্রাণ আসিল। অন্য এক ফৌজ লাহোরের ফৌজদার খায়েরত খাঁর (উপাধি ইজ্জত খাঁ) এবং মুসায়েব বেগের অধীনে শতদ্রু পারে রুপার শহরের (আম্বালা হইতে ৪০ মাইল উত্তরে) দিক হইতে নদী পারের ঘাটি রক্ষা করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। লাহোরের সোজা রাস্তা ছাড়িয়া এই স্থানে দিল্লী হইতে আগুয়ান কোন ফৌজের নদী অতিক্রম করিবার সম্ভাবনা কম; এই জন্য এইখানে দারার সেনাপতিদ্বয় সর্ব্বদা কোমরপেটি কষিয়া থাকা প্রয়োজন মনে করেন নাই। আওরঙ্গজেবের দৃষ্টি কিন্তু রুপারের উপর নিবদ্ধ ছিল; কেননা, সুলেমান কোন প্রকারে গঙ্গা যমুনার দোয়াব অতিক্রম করিতে পারিলে শতদ্রু নদী পার হওয়ার ইহাই নিকটতম ব্যবহারযোগ্য ঘাট। লাহোরগামী সর্ব্বাপেক্ষা কম দূরের রাস্তার মুখে নদীর অপর পারে দারার প্রধান ঘাটি তলোয়ান নামক স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল, এই পারে দক্ষিণে প্রসিদ্ধ শিখযুদ্ধক্ষেত্র আলিওয়াল, উভয়ের মধ্যে দূরত্ব চার মাইল; রুপার হইতে তলওয়ান সাট মাইল ভাটিতে পশ্চিম দিকে; দুই স্থান হইতে প্রায় সমান দূরে মধ্যবর্ত্তী স্থানে লুধিয়ানা ও মাচিওয়ারা। চম্বলের পারে আওরঙ্গজেবের হাতে ঠকিয়া দারার বুদ্ধি কিঞ্চিৎ খুলিয়াছিল, তাহা না হইলে শতদ্রুনদীর পারে বাহাদুর খাঁর মত আওরঙ্গজেবের ত্বরিৎকর্ম্মা সেনাধ্যক্ষের সাময়িক কাল বিব্রত হইবার কথা নয়।

২

আওরঙ্গজেব মথুরার নিকট হইতে ২১শে জুন (১৬৫৮ খ্রীঃ) বাহাদুর খাঁর অধীনে পাঁচ-ছয় হাজার অশ্বারোহীর এক অগ্রগামী ফৌজ দারার পশ্চাদ্ধাবন করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। দিল্লীতে দারাকে ধরিতে না পারিয়া বাহাদুর

* লুধিয়ানা হইতে তিন ঘণ্টার রাস্তা বিপাশা নদীর পাঁচ মাইল দক্ষিণে বর্ত্তমান লোদী সুলতানপুর ষ্টেশন।

খা দ্রুত শতদ্রু নদীর দিকে অগ্রসর হইলেন। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে শতদ্রুপারে পৌঁছিয়া তিনি দেখিলেন এই পারে ৫০।৬০ মাইলের মধ্যে একখানা নৌকাও নাই; জলে এবং অপর পারে তলোয়ানে সজাগ শত্রু যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, কোথায়ও পার হওয়ার উপায় নাই এবং নূতন সৈন্য না পৌঁছাইবার পূর্ব্বে পার হওয়াও নিরাপদ নয়। ইতিমধ্যে আওরঙ্গজেব মেসো খলিলুল্লা খাঁকে পঞ্জাবের সুবাদার নিযুক্ত করিয়া তাঁহার অধীনে দ্বিতীয় সেনাবাহিনী বাহাদুর খাঁর সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন; খলিলুল্লা রুপার গামী রাস্তা ধরিয়া আসিতেছিলেন। দারার সেনাধ্যক্ষগণ তলোয়ানে শত্রুকে প্রাণপণে বাধা দেওয়ার জন্য তোড়জোড় করিতে লাগিলেন, কাছাকাছি ঘাটিগুলির উপরও কড়া নজর ছিল। ছলপরায়ণ বাহাদুর খাঁ তলোয়ানের আশা ছাড়িয়া স্থানীয় জমিদারগণের সাহায্যে গোপনে অতিদ্রুত পূর্ব্বদিকে কুচ করিয়া রুপারের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং এই স্থানে দিল্লী হইতে আনীত এবং স্থানীয় লোকের দ্বারা সংগৃহীত মোট পঁচিশখানা নৌকার সাহায্যে ৫ই আগষ্ট রাত্রির অন্ধকারে আট শত অশ্বারোহী ও কয়েকটা হাল্কা তোপ বিনা বাধায় নদী পার করাইয়া ফেলিলেন। অকুতোভয় শত্রুর অতর্কিত আক্রমণে দারার অসতর্ক রক্ষী সেনা ভীতিবিহ্বল হইয়া আশ্রয়ার্থ তলোয়ানের দিকে পলায়ন করিল, এবং তাহাদের উপস্থিতিতে সেখানেও আতঙ্ক সৃষ্টি হইল। এই দিকে বাহাদুর খাঁর বাহাদুরীর খবর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ৬ই আগষ্ট রাত্রিতে খলিলুল্লার শিবিরে পৌঁছিল। তিনি ঝড়ের বেগে দ্বিতীয় বাহিনীসহ ৭ই আগষ্ট রুপারের ঘাটে নদী পার হইলেন।

সেনাপতি দায়ুদ খাঁ এই অবস্থায় বাহাদুর খাঁ ও খলিলুল্লার সম্মিলিত বাহিনীর সহিত শতদ্রুতীরে যুদ্ধ করা অসাধ্য বিবেচনা করিয়া সমস্ত ঘাটি উঠাইয়া লইলেন এবং দ্রুত পিছু হটিয়া বিপাশা নদীর তীরে সুলতানপুরে সেনা সন্নিবেশ করিলেন। লাহোরে এই দুঃসংবাদ পাইয়া দারা তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সিপহর শুকোকে কয়েক হাজার অশ্বারোহী ও হাল্কা তোপখানাসহ দায়ুদ খাঁর সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। তিনি দায়ুদ খাঁকে লিখিয়া পাঠাইলেন যেন ঐখানে শত্রুকে যথাসাধ্য বাধা দেওয়া হয়, ঐখানে আত্মরক্ষা সম্ভব না হইলে এই পারে গোবিন্দওয়ালে (সুলতানপুর হইতে পশ্চিম হেলিয়া ১১ মাইল উত্তরে) সরিয়া আসিয়া শত্রুকে শেষ পর্য্যন্ত বাধা দিতে হইবে। এইখানেই দারার আর এক বার ভাগ্য পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু শতদ্রু অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই আওরঙ্গজেব মিথ্যার জাল বিস্তার করিয়া সেই সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়া দিলেন।

৩

২১শে জুলাই (১৬৫৮ খ্রীঃ) দিল্লীতে দ্বিতীয় রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করিয়া রাহু-মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় আওরঙ্গজেব ভারতের ভাগ্যাকাশে প্রকট হইলেন। ২৭শে তারিখ তিনি সসৈন্যে শতদ্রু অভিমুখে পাণিপত-আম্বালার রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইলেন, দিল্লী হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার ছদ্মবেশী চরগণ দারার পাহারা এড়াইয়া কাবুল পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। লাহোর হইতে পলাইয়া দারা যাহাতে কাবুলে প্রবেশ করিতে না পারে সেইজন্য তিনি দারার অধীনস্থ নায়েব-সুবাদার মহাবত খাঁকে (জাহাঙ্গীরশাহী প্রথম মহাবত খাঁর পুত্র) কাবুল সুবার পাকাপাকি সুবাদার নিযুক্ত করিয়া হাত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরে দারা যখন মহাবত খাঁকে তাঁহার জন্য খাইবারের রাস্তা খোলা রাখিবার হুকুম পাঠাইলেন মহাবত খাঁ জানাইয়া দিলেন ঐ দিকে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়, দিল্লীর খবর পাইয়া পাঠান মালিকগণ মাথা চাড়া দিয়াছে। কাবুল কিংবা ঐ পথে ইরানে দারার আশ্রয় গ্রহণের পথ এইভাবে অবরুদ্ধ হইল। লাহোরে খঞ্জর খাঁ প্রভৃতি যে সমস্ত বাদশাহী মনসবদার প্রথমে দারার আনুগত্য স্বীকার করিয়া অনুগ্রহপুষ্ট হইয়াছিলেন তাঁহাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া ভয় ও প্রলোভনের দ্বারা আওরঙ্গজেব তাঁহাদিগকে স্বপক্ষে আনিয়া ফেলিলেন। দায়ুদ খাঁর বিক্রমে শতদ্রু তীরে বাহাদুর খাঁর অগ্রগতি ব্যাহত হইয়াছে শুনিয়া [illegible]কে হাত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া আওরঙ্গজেব বি[illegible] হইয়াছিলেন। বিপাশা নদীর তীরে হয়ত দারা তাঁহাকে প্রবল বাধা দিবে এই আশঙ্কায় তিনি দুর্ভাবনাগ্রস্ত হইলেন। বাস্তবিকপক্ষে ঐখানেই দারা যুদ্ধ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। তিনি সিপহর শুকোকে দায়ুদ খাঁর সাহায্যার্থ পাঠাইয়া আওরঙ্গজেবের হরাবলকে আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহার প্রতি নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। লাহোর হইতে তিনি বার বার ডোগরা রাজা রাজরূপের কাছে চিঠি লিখিয়া বিফলমনোরথ হইলেন। তাঁহার টাকায় ফৌজ সংগ্রহ করিয়া রাজরূপ গোপনে আওরঙ্গজেবের সহিত দরকষাকষি করিতেছিল।

রাজনৈতিক মারণ-উচাটন ও বশীকরণ ব্যাপারে হিন্দুস্থানে চাণক্য পণ্ডিতের পর আওরঙ্গজেবের জুড়ি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। আকবর বাদশাহ এই বিদ্যা কিছু কিছু জানিতেন, তবে তিনি দেবতা-সিদ্ধ ছিলেন; আওরঙ্গজেব কিন্তু বিবেক ও ধর্ম্মবর্জ্জিত কূট-মিথ্যার সাধনায় একেবারে পিশাচ-সিদ্ধ। চর এবং চিঠিই ছিল তাঁহার মন্ত্রের ধারক ও বাহক, কলমেই তাঁহার ভেল্কী খেলিত।

দায়ুদ খাঁর অসামান্ত প্রভুভক্তি দেখিয়া আওরঙ্গজেবের শ্রদ্ধা তাঁহার প্রতি বাড়িয়া গিয়াছিল; দায়ুদ খাঁ তাঁহার চিঠির উত্তরে সাফ জবাব দিয়াছিলেন শাহজাদা দারার জন্য তিনি জান্ মান-দৌলত কবুল করিয়াছেন, তিনি খালাস না দিলে অন্য সরকারে তিনি চাকরী স্বীকার করিতে পারেন না। বিশ্বস্ততা, সাহস ও রণচাতুর্য্যে দায়ুদ খাঁ একাই দশ হাজার, এ হেন ব্যক্তি সঙ্গে থাকিলে দারাকে বন্দী করা মানুষের সাধ্যাতীত। দারার এই দক্ষিণ হস্তকে পঙ্গু করিবার জন্য আওরঙ্গজেব এক ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করিলেন।

তিনি দায়ুদ খাঁর কাছে এই মর্ম্মে এক মিথ্যা চিঠি ছাড়িলেন; উহাতে নাকি লেখা ছিল:

অমুক জায়গায় আপনার আরজ-দস্ত (চিঠি) পাইয়া আমি আপনার কাজের হাজার হাজার তারিফ না করিয়া পারি না। আপনার লেখা মতে আমি ঐদিকে তাড়াতাড়ি কুচ করিতেছি। ইন্‌শাল্লাহ্ আপনি শীঘ্রই হুজুরে হাজির হইবার ইজ্জত হাসিল করিবেন। আপনার মত ইসলামের জন্য দরদী মাতব্বর ব্যক্তিগণ এই ব্যাপারে লিখিত চিঠি মাফিক কাজ করিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি। এই উপায়ে কাজ চলিলে কেবল সিপহর শুকো নয়, হজরত রসুল্লাহ্‌র ইমানের নিন্দুক তামাম দুশমন্ ইসলামী ফৌজের হাতে কয়েদ হইবে...

এই চিঠি দায়ুদ খাঁর জন্য নয়, দারার হাতে পড়িবার জন্যই লিখিত হইয়াছিল। পত্রবাহককে গ্রেপ্তার করিয়া দারার প্রহরীগণ এই ভয়ানক চিঠি লাহোরে পাঠাইয়া দিল। চিঠি পড়িয়া শাহজাদা চোখে আঁধার দেখিলেন, চারিদিকে বিশ্বাসঘাতকের দল; সুতরাং একান্ত বিশ্বাসী দায়ুদ খাঁ উহাদের মধ্যে এক জন নহেন তিনি কেমন করিয়া বুঝিবেন? আওরঙ্গজেবের এক চিঠিতেই বিনারক্তপাতে তিনটি বড় কাজ হইয়া গেল। দায়ুদ খাঁর উপর ভরসা হারাইয়া তিনি আওরঙ্গজেবকে পঞ্জাবে বাধা দেওয়ার আশা ত্যাগ করিলেন। পত্র পাওয়া মাত্র ফৌজ লইয়া দায়ুদ খাঁর শিবির হইতে চলিয়া আসিবার জন্য তিনি সিপহর শুকোকে লিখিয়া পাঠাইলেন; এবং দায়ুদ খাঁকে নির্দ্দেশ দিলেন শত্রু-সেনা গোবিন্দ্‌ওয়াল পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িবার উপক্রম হইলে তিনি যেন নদীর সমস্ত নৌকা পোড়াইয়া রক্ষা-ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া পিছু হটিয়া আসেন। এই দিকে তিনি লাহোর হইতে পলায়ন করিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।*

দায়ুদ খাঁ আসল ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিলেন না। আওরঙ্গজেব ১৪ই আগষ্ট রুপারের কাছে নদী পার হইয়াই মীর্জ্জা রাজা জয়সিংহ ও দেলের খাঁকে বাহাদুর ও খলিলুল্লা খাঁর বলবৃদ্ধি করিবার জন্য আগে পাঠাইয়া দিলেন। চারি জন প্রসিদ্ধ সেনানীর মিলিত ফৌজ এবং সফ্‌শিকন খাঁর তোপখানার বিরুদ্ধে গোবিন্দ্‌ওয়ালে অল্পসংখ্যক সেনা লইয়া আত্মরক্ষা দায়ুদ খাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, তবুও দুই-এক দিন তিনি শত্রুকে অসীম বীরত্বে বাধা দিয়া অগত্যা লাহোরের দিকে পশ্চাদপসরণ করিলেন।

৪

লাহোর হইতে মুলতানের দিকে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে পাঁচ শত বড় বড় নৌকায় বিপুল রণসম্ভার ও ধনরত্ন বোঝাই করিয়া দারা নদীপথে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শাহজাদার নিজ ধনরত্ন, বাদশাহী কোষাগারে সঞ্চিত নগদ এক কোটি টাকা ও অন্যান্য দামী জিনিস, দুর্গের বড় বড় তোপ ও যুদ্ধের সরঞ্জাম নৌকায় বোঝাই করিবার পর যাহা স্থলপথে লইয়া যাওয়া সম্ভব ছিল না উহা সমস্তই সরকারী বারুদখানা সমেত অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করা হইয়াছিল। দারার সেনাদল এক দিনে শহর খালি করে নাই। আট হাজার অশ্বারোহী, হালকা তোপ ও খচ্চরের পিঠে বোঝাই যুদ্ধের উপকরণ সহ শাহজাদা স্বয়ং ১০ই আগষ্ট (১৬৫৮ খ্রীঃ) মুলতানের দিকে স্থলপথে যাত্রা করিয়াছিলেন। শহরে কিছুসংখ্যক সৈন্য, সামরিক কর্ম্মচারী, নগররক্ষক কোটোয়াল প্রভৃতি শান্তি-রক্ষার জন্য মোতায়েন ছিল। নৌবাহিনীর অধিনায়কস্বরূপ বিশ্বস্ত খোজা বসন্ত স্থলসৈন্যের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া মুলতানের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তোপখানার উপরিস্থ সহকারী অধ্যক্ষ রুমী খাঁর উপর হুকুম ছিল তোপখানার যে সমস্ত কর্ম্মচারী পিছনে পড়িয়া গা ঢাকা দিবে তাহাদিগকে যেন গ্রেপ্তার করা হয়। ম্যানুসী সাহেব নিজের কাজ গুছাইয়া তৃতীয় দিন যাত্রা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। ম্যানুসীকে জোর করিয়া হাজির করিবার বাহবা লইবার চেষ্টা করিয়া রুমী খাঁ গালে গালে চড় খাইলেন। তৃতীয় দিন যাত্রার প্রাক্কালে কোতোয়ালীর এক কর্ম্মচারী ম্যানুসীর তালাশে আসিয়া মাতাল অবস্থায় দারার পক্ষীয় সকলের বাপান্ত করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া সাহেব মাতালের মুখে এক পাথর মারিয়া দুইটি ভাঙা দাঁত দারা-

* তারিখ সম্বন্ধে কিছু গোলমাল দেখা যায়। যথা ১৮ই তারিখে মীর্জ্জা রাজা ইত্যাদি (History of Aurangzib ii, p. 448) লাহোর হইতে দারার পলায়নের সংবাদ পাইলেন, অথচ অন্যত্র দেখা যায় "on the 18th August he [Dara] left Lahore..." (ibid, p. 451)। লাহোর হইতে খবর পৌঁছিতে অতি কম পক্ষে দুই দিন দরকার।

নিন্দুকের গলার ভিতর ঢুকাইয়া সরিয়া পড়িলেন। যে সমস্ত ফিরিঙ্গী গোলন্দাজ দারার প্রতি অনুরক্ত ছিল, ম্যানুসীর প্রতি রুমী খাঁর আচরণে রুষ্ট হইয়া তাহারা গা ঢাকা দিয়া লাহোরেই রহিয়া গেল। এই সময় সেনাপতি দায়ুদ খাঁর ফৌজ মুলতানের দিকে দারার সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল; ম্যানুসী এই ফৌজের সহিত রাস্তায় মিলিত হইয়া তিন দিন পরে মুলতানে উপস্থিত হইলেন।

লাহোর হইতে মুলতান সে যুগের হিসাবে দশ দিনের রাস্তা। রাবী নদী যেখানে চেনাব নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে উহার ভাটিতে চেনাব নদীর পূর্ব্ব-তীরে মুলতান শহর। দারার সেনাবাহিনী লাহোর হইতে তাড়াহুড়াভাবে পলায়ন করে নাই, সুশৃঙ্খলভাবে ধীরে সুস্থে কুচ করিয়া উনিশ দিন পরে ৫ই সেপ্টেম্বর (১৬৫৮ খ্রীঃ) মুলতান পৌঁছিয়াছিল; ঐ তারিখে সবেমাত্র আওরঙ্গজেব নিজের সেনা ও রণসম্ভার শতদ্রু নদী পার করাইতেছিলেন। ইতি-মধ্যে সুবা পঞ্জাবের নবনিযুক্ত সুবাদার খলিলুল্লা খাঁর অগ্রগামী সেনাদল দারা লাহোর ত্যাগ করিবার সাত দিন পরে বিনা বাধায় শহর অধিকার করিয়াছিল; খলিলুল্লা খাঁ লাহোরে প্রবেশ না করিয়া দারার পশ্চাতে ছুটিলেন (২৯শে আগষ্ট)। দুই-এক মঞ্জিল অগ্রসর হইয়া তিনি শুনিতে পাইলেন, দারার সঙ্গে প্রায় ১৪০০০ অশ্বারোহী ও তোপখানা রহিয়াছে এবং মুলতানেই প্রবল যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা। এই খবর আওরঙ্গজেবের কাছে পাঠাইয়া তিনি তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষায় ধীরে ধীরে দারার সহিত দশ মঞ্জিল ব্যবধান রাখিয়া মুলতানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

৫

মুলতানে পৌঁছিয়া দারা নূতন সৈন্য ভর্ত্তি করিতে লাগিলেন, যাহারা সঙ্গে আসিয়াছিল তাহাদিগকে বেতন অগ্রিম দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। শহরের পুরাতন সরকারী হাবেলীসমূহ মেরামত করিয়া বাসযোগ্য করিবার হুকুম হইল; শহরবাসীরা মনে করিল শাহজাদা ঐখানে অনেক দিন থাকিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। শত্রু তখনও অনেক দূরে; সুতরাং একটু সোয়াস্তি পাইয়াই সুফিয়ানা বাতিক শাহজাদাকে পাইয়া বসিল; ইহা কথঞ্চিৎ স্থানমাহাত্ম্যও বটে। এই শহরে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রসিদ্ধ সাধক শেখ বাহাউদ্দীন জেকেরিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তাঁহার পিতামহ "মুলতানের শেখ" আখ্যা পাইয়া দেশপূজ্য হইয়াছিলেন। ইঁহাদের বংশানুক্রমিক প্রতিপত্তি তখনও অক্ষুণ্ন; লোকে মনে করিত খোদাতালা ও হজরত রসুলাল্লার দরবারে এই ঘরানার পীরগণের গৈবী যাতায়াত আছে, ইহাদের মারফত রসুলাল্লার দরবারে আর্জ্জি পেশ হইলেই মঞ্জুর হয়। বলা বাহুল্য, দারাও ঐ পথের পথিক ছিলেন, দরবার পর্য্যন্ত সশরীরে পৌঁছিবার নসিব না হইলেও ফেরেশতাগণের মারফত দৈবী ও গৈবী আওয়াজ তিনি সুষুপ্তি অবস্থায় শুনিতে পাইতেন। তিনি বাহা-উদ্দীনের দরগায় জিয়ারত করিয়া কবরের জন্য বহুমূল্য আচ্ছাদন বস্ত্র দান করিলেন, এবং জেকেরিয়া ঘরানার ওয়ারিশগণের শরণাপন্ন হইয়া আওরঙ্গজেবের উপর ফতে হাসিল হওয়ার দোয়া ভিক্ষা করিলেন।

শাহজাদার কাকুতি-বিনতি ও দানে দয়াপরবশ হইয়া তাঁহারা কথা দিলেন ঐ রাত্রিতেই রসুলাল্লার দরবারে হাজির হইয়া তাঁহার আর্জ্জি পেশ করিবেন, এবং অধিকন্তু ভরসা দিলেন এমন ন্যায্য আর্জ্জি নিশ্চয়ই মঞ্জুর হইবে। দারা নিজ শিবিরে ফিরিয়া অস্থিরভাবে রাত্রি-প্রভাতে সংবাদের অপেক্ষায় রহিলেন। পরের দিন এই সমস্ত পাকা ঘুঘু মুখ ভার এবং মাথা হেঁট করিয়া নিতান্ত সপ্রতিভ ভাবে শাহজাদার কাছে দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করিল—যথা, তাহারা সারারাত রসুলাল্লার নিকট হাজির ছিল; কিন্তু পরম দয়াল অল-রহীমের সঙ্গে কোন কথা বলিবার ফুরসত পাওয়া গেল না, যেহেতু রসুলাল্লা সর্ব্বক্ষণ আওরঙ্গজেবের সহিত কথায় ব্যস্ত ছিলেন! ইহাতেও দারার চৈতন্যোদয় হইল না, ধর্ম্মধ্বজী ঠগদের কথায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিলেন না, খোদাতালা ও রসুল ভাল রকম মক্কেল চিনেন বুঝিতে পারিলেন না; তিনি অধিকন্তু উহাদিগকে আর একবার চেষ্টা করিবার জন্য অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন, এবং খয়রাত স্বরূপ নগদ পঁচিশ হাজার টাকা দিয়া বিদায় দিলেন। ফকীরেরা তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া গেল এইবার তাঁহারা সকলের আগে পৌঁছিয়াই পয়গম্বরের দরবারে আর্জ্জি পেশ করিবেন! পরের দিন সকাল বেলাও ঘুঘুদের মুখে ঐ এক অজুহাত; কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারে দারা দমিবার পাত্র নহেন। এই ভাবে তিন দিন ফকীরী ধাপ্পা-বাজী চলিল, হয়ত আরও কিছু দিন চলিত; কিন্তু ইতিমধ্যে মুলতানে সংবাদ পৌঁছিল স্বয়ং আওরঙ্গজেব লাহো-রের রাস্তা ছাড়িয়া কাসুরের পথে দৈনিক চৌদ্দ মাইল হইতে বাইশ মাইল ঘোড়া দৌড়াইয়া সোজা মুলতানের দিকে আসিতেছেন।

৬

আসলে মুলতানে যুদ্ধ করিবার মতলব দারার ছিল না; লোকজনকে শান্ত রাখিবার জন্য তিনি ঐখানে পাকাপাকি ব্যবস্থার ভান করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরাট নৌবহর শহরের

ঘাটেই নঙ্গর ফেলিয়াছিল। মুলতান হইতে সরকারী তহবিলের নগদ বাইশ লক্ষ টাকা, আটটা ভারী তোপ, গোলাগুলি ও প্রচুর রসদ নৌকায় বোঝাই করা হইল। এক শত টন ভারবহনক্ষম মোট পাঁচ শত সাতখানা বহরী নৌকা সিপাহী লস্কর রসদ ও তোপখানা লইয়া খোজা বসন্ত ও সাহসী সেনাধ্যক্ষ ফিরোজ মেবাতীর রক্ষণাধীনে শতদ্রু নদীর ভাটি ধরিয়া সপ্তসিন্ধুমধ্যস্থ ভক্কর জলদুর্গের দিকে যাত্রা করিল। দারা স্বয়ং ঐ একই দিনে (১৩ই সেপ্টেম্বর ১৬৫৮ খ্রীঃ) মুলতান হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মুলতান হইতে যাত্রা করিবার সময় মাত্র পাঁচ হাজার অশ্বারোহী ও পাঁচ হাজার পদাতিক অবশিষ্ট ছিল। লাহোর ও মুলতানে অগ্রিম বেতন লইয়া যাহারা দারার ফৌজে ভর্ত্তি হইয়াছিল তাহারা সিন্ধুর মরুভূমির নাম শুনিয়া পলাইয়া গেল। তাঁহার পুরাতন বিশ্বস্ত সেনাধ্যক্ষগণের মধ্যে যাহারা এতদিন দিল্লী লাহোর ঘুরিয়া তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল তাহারা প্রায় সকলেই তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল, উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে কেবলমাত্র মীর আতিশ জাফর (বরকান্দাজ খাঁ) তাঁহার সঙ্গে চলিল। পূর্ব্বতন হিতৈষী সেনানায়কগণের প্রতি দারার অবিশ্বাস, ব্যবহারে স্বাভাবিক হৃদ্যতার অভাব ইহার জন্য বহুলাংশে দায়ী। দায়ুদ খাঁ প্রতি লিখিত আওরঙ্গজেবের প্রথম মিথ্যা চিঠি দারার মর্ম্মস্থল বিষদিগ্ধ করিয়াছিল; যিনি আওরঙ্গজেব ব্যতীত অন্য মানুষকে আজীবন সরল প্রাণে বিশ্বাস করিয়াছেন মানুষের প্রতি পাইকারী হিসাবে অবিশ্বাস সাময়িকভাবে তাঁহাকে পাইয়া বসিল। ভাবগোপন করিবার সহজাত রাজসিক শক্তি দারার কোনকালেই ছিল না, কাজেই তাঁহার কথায় ও ব্যবহারে অনুজীবিগণের প্রতি অন্তরের ব্যবধান ধরা পড়িতে লাগিল; যাহারা স্বার্থান্বেষী ছিল না তাহারাও ভাঙ্গা মন লইয়া চলিয়া গেল।

হিন্দুস্থানে চলতি কথা আছে, গরম দুধে যাহার মুখ একবার পুড়িয়া গিয়াছে সে ঘোলের সরবতেও ফুঁ না দিয়া চুমুক দেয় না। লোকের মধ্যে আসল মেকী চিনিবার ক্ষমতা না থাকায় শাহজাদারও আনাড়ির দশা হইয়াছিল। মুলতানে সেনাপতি দায়ুদ খাঁর সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় দারা তাঁহাকে প্রকৃত হিতৈষী সহায়কের ন্যায় হৃদ্যতার সহিত গ্রহণ করিতে পারিলেন না। দারার প্রতি তাঁহার অন্তরের টান থাকাতে তিনি বিরক্ত না হইয়া নতিস্বীকার করিলেন, প্রভুর পায়ের কাছে তরবারি রাখিয়া শপথ করিলেন তিনি নির্দ্দোষ, শাহজাদা ও তাঁহার পরিজনবর্গের রক্ষার নিমিত্ত প্রাণ দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। ইহাতে দারার মন গলিয়া গেল, দায়ুদ খাঁর কথা অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না; কিন্তু আওরঙ্গজেবের ছায়া দায়ুদ খাঁকে অনুসরণ করিতেছিল। পূর্ব্ববৎ উপায়ে দ্বিতীয় এক মিথ্যা চিঠি ঠিক সময়ে দারার হাতে পড়িল।

এই চিঠি আরও ভয়ানক অনর্থকারী—ইহাতে এরূপ কিছু লেখা ছিল [দায়ুদ খাঁর প্রতি], যথা—আপনি জানাইয়াছিলেন, ইন্‌শাল্লাহ কাফের দারার মাথা শীঘ্রই এই দিকে প্রেরিত হইবে। আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষায় এমন বিলম্ব হওয়ার কারণ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না... ইত্যাদি। চারিদিকে বিশ্বাসঘাতকতার শাণিত ছুরিকা যাঁহার চিত্তকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে এই চিঠি পড়িয়া তাঁহার অবস্থা "তুমিও? দায়ুদ?" [Thou too, Brutus?] ব্যতীত অন্য কিছু কল্পনা করা যায় না।

যাহা হউক, আওরঙ্গজেবের কারসাজি সার্থক হইল, দারা তাঁহার নিমজ্জমান ভাগ্যতরণীর বিশ্বস্ত কর্ণধার দায়ুদ খাঁকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করিয়া মুলতান হইতে বিদায় দিলেন। স্বীয় প্রভুর "ক্ষণং তুষ্টঃ ক্ষণং রুষ্টঃ" স্বভাব এবং ভাগ্যবিপর্য্যয়ে শোচনীয় মানসিক অবস্থা স্মরণ করিয়া দায়ুদ খাঁ এই অপমান সহ্য করিলেন। পশ্চাতে অনুসরণকারী আওরঙ্গজেবের যমদূত বাহাদুর খাঁ, সম্মুখে সিন্ধুর মরুভূমি ও সহায়শূন্য নিরুদ্দেশ যাত্রা—এই অবস্থার মধ্যে শাহজাদার সঙ্গ ত্যাগ না করিয়া আওরঙ্গজেবের মনস্কামনা ব্যর্থ করিবার জন্য দায়ুদ খাঁ প্রস্তুত হইলেন এবং দারা যে পথে চলিয়াছেন সে পথে যাত্রা করিলেন। দারার সুদিনে দায়ুদ খাঁ এমন কিছু অনুগ্রহ লাভ করেন নাই যাহার জন্য এইরূপ নির্ভীক একনিষ্ঠ সেবা ন্যায়তঃ দারা প্রত্যাশা করিতে পারিতেন; যাহারা তাঁহার বসন্তের কোকিল ছিল তাহারা বর্ষা সমাগমে উড়িয়া গিয়াছে। দারার পলায়মান সেনার পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিয়া অবিচলিত চিত্তে দায়ুদ খাঁ মুলতান হইতে একশত মাইল দক্ষিণে শতদ্রু নদীর নিকটবর্ত্তী অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত উচ্ (uch; বাওয়ালপুর রাজ্যের অন্তর্গত) পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর মুলতান ত্যাগ করিয়া দারা ২৩শে সেপ্টেম্বর (১৬৫৮) ঐ স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন; এই সময়ে শত্রুর অগ্রগামী ফৌজ এবং তাঁহার সেনার মধ্যে মাত্র চারি মঞ্জিল [চারিদিনের রাস্তা] ব্যবধান। দায়ুদ খাঁ নিজের ফৌজকে দারার ছাউনী হইতে পৃথক এবং কিছু দূরে রাখিতেন, দারার নিষেধ অগ্রাহ্য করেন নাই। প্রভুর অমূলক সন্দেহ দূর করিবার জন্য তিনি চিঠি লিখিয়া জানাইলেন, শত্রুর মিথ্যা চিঠিতে বিশ্বাস করিয়া শাহজাদা যেন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে দুর্দ্দিনে সেবার অধিকার হইতে বঞ্চিত না করেন, নামের উপর এই কলঙ্ককালিমা নিজ রক্তে ধুইয়া তিনি স্বামীঋণ-মুক্ত হইবেন। লোকে বলে বিনাশকালে

বিপরীত বুদ্ধি; দারা সন্দেহ করিলেন আওরঙ্গজেবের ইশারায় তাঁহার মাথা লইবার মতলবেই দায়ুদ খাঁ শুভাকাঙ্ক্ষী সাজিয়া পিছু লইয়াছে। তিনি দায়ুদ খাঁকে সরাসরি জানাইয়া দিলেন আমার প্রতি আপনার প্রীতি ও বিশ্বস্ততা যদি অকৃত্রিম হয় তবে আপনি আমাকে আর অনুসরণ করিবেন না। দায়ুদ খাঁ নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহাকে জানাইলেন লিখিত ভাবে বরখাস্ত হুকুম পাইলেই আমি ফিরিয়া যাইব। দারা এই মর্ম্মে এক হুকুমনামা লিখিয়া দিলেন, 'আমি দায়ুদ খাঁকে চাকরী হইতে জবাব দিলাম এবং তাঁহার প্রতি আদেশ করিতেছি তিনি যেন আমার ফৌজ হইতে সরিয়া যান; তাঁহাকে অনুমতি দেওয়া হইল তিনি অন্যত্র যে কোন ব্যক্তির অধীনে চাকরী গ্রহণ করিতে পারেন।'

ম্যানুসী লাহোরের রাস্তা হইতে দায়ুদ খাঁর সঙ্গে মুলতান ও উছ্ শহর পর্য্যন্ত সফর করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,

এই জবাব পাইয়া [at Uch : Storia i 31·] দায়ুদ খাঁ বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন এবং উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন, দুর্ভাগ্য ও অশুভ প্রতি পদক্ষেপে শাহজাদার অনুসরণ করিতেছে। ইহার পর প্রভুর মঙ্গল প্রার্থনা করিতে করিতে নিতান্ত অনিচ্ছায় লাহোরের দিকে ফিরিয়া চলিলেন। এই সংবাদ পাইয়া পথিমধ্যে আওরঙ্গজেব তাঁহাকে সসম্মানে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। দারার বিরুদ্ধে কো[illegible] অস্ত্রধারণ করিতে সম্রাট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইবেন না— [illegible] তিনি আওরঙ্গজেবের চাকরী গ্রহণ করিলেন। [illegible] রার অনুগ্রহ-পুষ্ট জয়সিংহ যশোবন্ত দেলের খাঁ? এইরূপ সর্ত্ত আওরঙ্গজেবের নিকট উত্থাপন করিবার বুকের পাটা কাহারও হয় নাই, আওরঙ্গজেবের ইঙ্গিতে জয়সিংহ দেলের খাঁ শিকারী বাজের মত পলায়মান দারার উপর ছোঁ মারিবার জন্য প্রস্তুত, যশোবন্ত তখনও এত নীচে নামিতে দ্বিধাবোধ করিতেছেন। বস্তুতঃপক্ষে পরাজিত আর্য্যবীরের আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিলেন দায়ুদ খাঁ,—জয়সিংহ-যশোবন্ত নহেন। অমানুষ ও অতিমানুষ লইয়াই ইতিহাস, "মানুষ" ও মনুষ্যত্ব ইহার পাতায় বিরল। এইজন্য সেকালের মানুষ শত্রু-মিত্র দায়ুদ খাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়াছে, লোকমুখে তাঁহার ত্যাগ ও প্রভুভক্তির খ্যাতি সত্যের* সীমা অতিক্রম করিয়াছে।

৬

দারা উছ্ [Uch] শহরে মাত্র চারিদিন অপেক্ষা করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দক্ষিণদিকে পলায়ন করিলেন (২৭শে সেপ্টেম্বর) এবং অসীম দুর্গতিভোগ করিয়া ষোল দিন পরে (১৩ই অক্টোবর ১৬৫৮) তাঁহার শেষ লক্ষ্যস্থল ভক্কর দুর্গে উপস্থিত হইলেন। খোজা বসন্ত মুলতান হইতে নৌবহর লইয়া পূর্ব্বেই এইখানে পৌঁছিয়াছিলেন এবং তখনও তোপ, যুদ্ধের সরঞ্জাম ইত্যাদি নামাইতেছিলেন। যেখানে বর্ত্তমানে সিন্ধু-নদের উপর Sakkar Barrage নির্ম্মিত হইয়াছে ঐখানে নদগর্ভে চারিটি পাহাড়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পাহাড়ী দ্বীপের উপর শত্রুর অভেদ্য ভক্কর দুর্গ অবস্থিত ছিল। প্রায় সমগ্র দ্বীপ জুড়িয়াই এই দুর্গ, দৈর্ঘ্যে ৮০০ শত গজ এবং প্রস্থে ৩০০ গজ*। সিন্ধুতীরে পৌঁছিয়া দারা খবর পাইলেন শত্রুসেনা প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে। এইজন্য তিনি তাড়াতাড়ি

---

* সিন্ধুর "সক্কর" শহর হইতে দায়ুদ খাঁ বিদায় লইয়াছিলেন [History of Aurangzib ii p. 458] ইহা বোধ হয় ঠিক নহে দায়ুদ-খাঁ সম্বন্ধীয় ঘটনার সমসাময়িক বৃত্তান্ত ম্যানুসী এবং তাঁহার আশ্রিত ঐতিহাসিক মাসুম এবং আলমগীর-নামার গ্রন্থকার লিখিয়া গিয়াছেন। আচার্য্য যদুনাথ মাসুমের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন,

"He (Daud Khan) murdered the honourable of his *harem*, in order to be free from anxiety about them, and then reported to Dara how he had 'composed his mind about certain objects which men hesitate and shrink from (desperate) exertion and fighting at such times (danger).—*History of Aurangzib*, I & II, p. 459.

পরিবারের স্ত্রীলোকগণকে হত্যা করিয়া নিশ্চিন্ত ও বেপরোয়া হওয়া দায়ুদ খাঁর পক্ষে বেশী কিছু নহে, রাজপুত, পাঠান ও হিন্দুস্থানী মুসলমানগণ এইরূপ করিতেন, ইহার প্রমাণ আছে। এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি মাসুমের উপর নির্ভর করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছি, যেহেতু মাসুম যাহা "শুনিয়া" লিখিয়াছেন, উহা ম্যানুসীর নিজের চোখে দেখিবার এবং মনে রাখিবার কথা। এই অবস্থায় ম্যানুসীর অনুক্তি মাসুমের উক্তি অপেক্ষা বেশী গ্রহণযোগ্য মনে হয়। ম্যানুসীর তারিখের ভুল ইত্যাদি স্যর যদুনাথ শুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক হইতে দারার জীবনীর উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। আমার মতামত আপীলে টিকিবে কিনা তিনিই জানেন।

* ম্যানুসীর মাপে দৈর্ঘ্য ৯৭৫ কদম (pace) এবং প্রস্থ ৫৫৩ কদম। এই স্থান সেকালে "সক্কর-ভক্কর" [*Sakkur wa* Bhakkor] নামে পরিচিত ছিল। বৃদ্ধ বয়সে কাহিনী লিখিবার সময় ম্যানুসীর দিগ্‌ভ্রম হইয়াছিল। সক্কর সিন্ধু নদের ডান দিকে (অর্থাৎ পশ্চিম তীরে) এবং পূর্ব্বতীরে রোরি শহর, এই উভয়ের মধ্য স্থানে পূর্ব্বতীর ঘেঁষিয়া ভক্কর দুর্গ। ইহার কাছে (Storia i p. 326 & footnote] প্রাচীন আর্য্যগণের Father Indus একটি দ্বীপের উপর ফেরেশতা খোজা খিজির হইয়া পূজা পাইতেছেন।

নদী পার হইয়া অপর তীরে সক্কর শহরে শিবির স্থাপন করিলেন এবং শত্রুকে বাধা দেওয়ার জন্য দুপারের কাছাকাছি সমস্ত নৌকা পশ্চিম তীরে একত্র করা হইল। দুই হাজার সাহসী পাঠান সৈয়দ মোগল ও রাজপুত যোদ্ধা এবং বাইশ জন নানাদেশীয় ফিরিঙ্গী গোলন্দাজ কর্ম্মচারী খোজা বসন্তের অধীনে দুর্গরক্ষার্থ নিযুক্ত হইল এবং প্রচুর পরিমাণ রসদ, গোলাবারুদ, বড় বড় তোপ ও বহু টাকা আশরফী দুর্গাধ্যক্ষের হেপাজতে দেওয়া হইল। এইখানে দারার অন্তঃপুরের গুরুভার বহুল পরিমাণে হাল্কা করা হইল। সুলেমানের স্ত্রী এবং আদরের নাতি দুইটিকে অন্যান্য স্ত্রী ও পরিচারিকা সমেত দুর্গে রাখিয়া কেবলমাত্র নাদিরা বানু ও বিশিষ্ট কয়েক জন অন্তঃপুরবাসিনীকে শাহজাদা সঙ্গে লইলেন।

ইতিমধ্যে ভক্করের ১২৬ মাইল উত্তরে সফশিকন খাঁর ফৌজ সিন্ধুনদের পূর্ব্বতীর এবং শেখমীর নদী পার হইয়া পশ্চিমতীর বরাবর সক্কর-ভক্করের দিকে ধাবিত হইতেছিল। দারার সহযাত্রিগণের ভরসা ছিল এইস্থানে হয়ত তিনি দুর্গের আশ্রয়ে কিছুদিন শত্রুকে বাধা দিবেন। তাঁহার সক্কর ত্যাগ করিবার আয়োজন দেখিয়া তাহারা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল এবং চারি হাজার সৈন্য এবং বিশ্বস্ত সেনানায়কগণ তাঁহার শিবির ত্যাগ করিয়া আওরঙ্গজেবের পক্ষে যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল; কেবলমাত্র ফিরোজ মেওয়াতী ও দুই-তিন হাজার সিপাহী তাঁহার সঙ্গে রহিল। ম্যানুসী দারার সঙ্গে যাইবার কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। দারা তাঁহাকে সিরোপা বকশিশ করিয়া ফিরিঙ্গী গোলন্দাজগণের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন এবং আবার দেখা হইবে আশ্বাস দিয়া সাশ্রুনেত্রে বিদায় দিলেন।

দারা মুষ্টিমেয় অনুচর ও দ্রুতগামী ক্ষুদ্র নৌবহর লইয়া সক্কর হইতে দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু কোথায় যাইবেন তখনও মনস্থির করিতে পারেন নাই। সক্করের কিছু দক্ষিণে বর্ত্তমান লারখানা শহরের কাছাকাছি পৌঁছিয়া তিনি ঐ স্থান হইতে কান্দাহারের রাস্তায় অগ্রসর হইলেন; কিন্তু তাঁহার অনুযাত্রীরা ইরাণে নির্ব্বাসন আশঙ্কায় ক্ষেপিয়া উঠিল, স্বয়ং নাদিরা বানু ইহাতে বাধা দিলেন। অগত্যা বাধ্য হইয়া তিনি সিন্ধুতীরে সিবিস্থান (বর্ত্তমান Sehwan) দুর্গের দিকে চলিলেন। ঐ স্থানে শেখ মীর এক দারুণ ফাঁদ পাতিয়াছিলেন, একপারে পিছনে শেখমীর, অন্যপারে সফশিকন খাঁ, সম্মুখে সেওয়ান দুর্গে শত্রুর ঘাঁটি। দারার সঙ্গে অগ্রগামী দলে এক হাজার সওয়ার ও দশটা হাতী, পিছনে বাদবাকী ফৌজ ও লটবহর, উহাদের কাছাকাছি নৌবহরে ধনসম্পত্তি ও যুদ্ধের সরঞ্জাম। দারার নৌবাহিনী পশ্চিম তীরে দুর্গের নিকট দিয়া দুই তীরের গোলাবৃষ্টির মধ্যে ফাঁদ এড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িল, দুইখানা মাত্র নৌকা গোলার আঘাতে খোয়া গেল। দারা স্থলবাহিনী লইয়া দুর্গের ঘাঁটি নিরাপদে অতিক্রম করিলেন, দুর্গাধ্যক্ষ হামলা করিতে ভরসা পাইল না (২রা নবেম্বর ১৬৫৮ খ্রীঃ)। দশ দিন ক্রমাগত কুচ করিয়া নৌবহরের সাহায্যে দারা অবশেষে ১৩ই নবেম্বর সিন্ধুর রাজধানী টাট্টানগরীতে (করাচীর নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম) আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইখানেও তাঁহার বিশ্রাম মিলিল না, টাট্টা হইতে তিনি পূর্ব্বদিকে কোথায় পলাইয়া গেলেন শত্রুপক্ষ [illegible] করিতে পারিল না।

ক্রান্তি-দেবতা সরস্বতী

(বিনোবা)

আমি সাহিত্যিকদের দেবসিতুল্য মনে করি। এ কথাও আমি মনে করি যে সরস্বতীই মুখ্য ক্রান্তি-দেবতা। বেদে আছে

"সরস্বতি, ত্বং অস্মান্ অবিড্ঢি।
মরুত্বতী ধৃষতী জেষি, শত্রূন্।"

(হে সরস্বতী, আমাদের সতত রক্ষা কর। তোমার কৃপায় বিচার-প্রবাহ সুরু হয়, ভ্রান্ত মূল্য অভিভূত হয়। শত্রু পরাস্ত হয়।)

সরস্বতীর যদি কৃপা না হইত তবে 'ভূদান শব্দ'ও মনে আসিত না।

রাজা রামমোহন রায় ও ইংরেজী শিক্ষা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

রাজা রামমোহন রায় যুগপ্রবর্ত্তক ছিলেন এ কথা নূতন করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই তাঁহাকে ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাষ্ট্রনীতি—বিভিন্ন বিষয়ে যুগ-স্রষ্টার সম্মান দান করিয়া থাকেন। রামমোহন বাঙালী, বাংলাই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র। এইজন্য বাঙালী জাতি বিশেষ করিয়া তাঁহার কৃতিত্বে গৌরব অনুভব করিয়া থাকেন। আজ শতাধিক বর্ষ পরে রামমোহনের ভাবাদর্শ সমাজ জীবনের প্রতি স্তরে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

সম্প্রতি এই অতি সত্য কথার উপর কতকটা আবরণ দিবার চেষ্টা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, শিক্ষা সাহিত্য, সমাজ-সংস্কার কোন দিকেই নাকি তাঁহার কৃতিত্ব নাই; বরং তাঁহার কৃতিত্বের আলোচনার মিথ্যা চাপে বাঙালী জাতিকে 'খাটো' করা হইয়াছে! স্থানে স্থানে এরূপ উক্তির প্রতিবাদও যে না হইয়াছে এমন নয়। আমি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে গত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের বাংলার শিক্ষা-ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে দীর্ঘকাল যাবৎ আলোচনা-গবেষণায় লিপ্ত আছি। শিক্ষাবিষয়ক আলোচনার ফল-স্বরূপ কিছু কিছু পুস্তকও লিখিত হইয়াছে এবং হইতেছে।* কাজেই আমাকে ঐ সময়কার সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা-প্রচেষ্টাগুলির বিষয়ও প্রচুর অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে। এই সকলের নিরিখে রাজা রামমোহন রায়ের হিন্দু কলেজ এবং ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে যোগাযোগের বিষয় এখানে কিছু বলিব। স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে গবেষণা করিয়াছিলেন। শিক্ষা বিস্তারে রামমোহনের কৃতি বিষয়েও তিনি একটি স্বতন্ত্র সারগর্ভ প্রবন্ধে† আলোচনা করিয়াছেন।

হিন্দু কলেজের সহিত সংস্রব

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা ও ইহার সঙ্গে রামমোহনের সংস্রব সম্পর্কেই এখানে আগে বলিব। হিন্দু কলেজের দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসরের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্টের ভবনে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে আহূত প্রথম দিনকার সভার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র ইহাতে পাইয়াছি। ১৮৩০ সনে হিন্দু কলেজের 'আদি-কল্পক' (orginator) লইয়া যখন সমসাময়িক সংবাদপত্রে বিতর্ক উপস্থিত হয় তখন গবর্ণমেণ্ট গেজেটে (২৪ জুন, ১৮৩০) "A Director of the Institution from its very Foundation"-এর পত্রে ইহার মর্ম্ম উদ্ধৃত হয়। উক্ত পাণ্ডুলিপির বিবরণটিতে রাজা রামমোহনের উল্লেখ থাকিবারও কথা নয়। তাঁহার বিষয়ে উল্লেখ আমরা প্রথম পাই ঈষ্ট-ভবনে ১৪ই মে, ১৮১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার বিবরণ-সম্বলিত জন হার্বার্ট হেরিংটনকে লেখা ঈষ্টের এক পত্রে। হেরিংটন সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারক ছিলেন। এই সময় তিনি বিলাতে ছুটি ভোগ করিতে-ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধে এই পত্রখানি হুবহু উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতে আবশ্যক অংশ এখানে প্রদত্ত হইল:

"Talking afterwards with several of the company, before I proceeded to open the business of the day, I found that one of them in particular, a Brahmin of good caste, and a man of wealth and influence, was mostly set against Rammohun Roy, ... (who has lately written against the Hindu idolatry, and upbraids his countrymen pretty sharply). He expressed a hope that no subscription would be received from Rammohun Roy. I asked, why not? 'Because he has chosen to separate himself from us, and to attack our religion.' 'I do not know,' I observed, 'what Rammohun's religion is'- (I have heard it is a kind of Unitarianism) -'not being acquainted or having had any communication with him; but I hope that my being a Christian, and a sincere one, to the best of my ability, will be no reason for your refusing my subscription to your undertaking.' This I said in a tone of gaiety; and he answered readily in the same style, 'No, not at all; we shall be glad of your money; but it is a different thing with Rammohun Roy, who is a Hindu, and yet has publicly reviled us, and written against us and our religion; and I hope there is no intention to change our religion.' I answered, that 'I knew of no intention of meddling with their religion; that every object of the establishment would be avowed, and a committee appointed by themselves to regulate the details, which would guard against everything they should disapprove of; that their own committee would accept or refuse subscriptions from whom they pleased.' . . . The Brahmin said he had no objection to this; and some of the others laughed and observed

---

* বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত লেখকের (১) বাংলার জনশিক্ষা, (২) বাংলার স্ত্রীশিক্ষা, এবং (৩) বাংলার উচ্চশিক্ষা (যন্ত্রস্থ)।

† "Ram Mohun Roy as an Educational Pioneer" —*The Journal of the Bihar and Orissa Research Society*, June, 1930

to me, that they saw no reason, if Rammohun Roy should offer to subscribe towards their establishment, for refusing his money, which was as good as other people's."

পত্রখানির এই অংশ হইতে কয়েকটি বিষয় জানা যাইতেছে: (১) রামমোহনের সঙ্গে হাইড ঈষ্টের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না, এমন কি উভয়ের মধ্যে পত্রব্যবহারও কখনো হয় নাই। (২) একজন প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্রাহ্মণ প্রস্তাবিত কলেজের সঙ্গে রামমোহনের সংস্রব সম্পর্কে কথা তুলিয়া উহাতে ঘোরতর আপত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার নিকট হইতে চাঁদাও গ্রহণ করা হইবে না; কারণ রামমোহন হিন্দুসমাজে থাকিয়াই হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিতেছেন। (৩) ঈষ্টের নিকট হইতে চাঁদা বা সাহায্য গ্রহণে তাঁহার আপত্তি নাই, কারণ তিনি ত আর হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিবেন না, বা খ্রীষ্টধর্ম্মের সপক্ষে প্রচারকার্য্য চালাইবেন না। (৪) উক্ত ব্রাহ্মণ-প্রবরের আপত্তিতে কেহ কেহ কৌতুক অনুভব করেন এবং ঈষ্টকে বলেন, রামমোহনের নিকট হইতে চাঁদা গ্রহণে তাঁহারা কোন আপত্তির কারণ দেখেন না। (৫) এই সকল কথাবার্ত্তা সভারম্ভের পূর্ব্বে হইয়াছিল।

এখানে কথা এই—রামমোহন একেশ্বরবাদী, মূর্ত্তিপূজার বিরোধী; প্রচলিত হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থা এবং ধর্ম্মীয় আচার-আচরণের নিন্দাবাদে অভ্যস্ত। ইহা জানা সত্ত্বেও উক্ত স্থলে যেখানে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং মান্যগণ্য হিন্দুগণ উপস্থিত ছিলেন—রামমোহনের কথা আদৌ উঠিল কেন? তিনি কি তবে হিন্দু কলেজের মত একটি উচ্চাঙ্গের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জল্পনা-কল্পনার কথা জানিতেন? চাঁদা সংগ্রহের যখন আয়োজন হইতেছিল তখন কি নিজে ঐ উদ্দেশ্যে চাঁদা দিতে চাহিয়াছিলেন? আবার দেখি, রামমোহনপন্থী রাজনারায়ণ বসু এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী হিন্দু কলেজের 'আদিকল্পক' বা 'originator' রূপে খোলাখুলিভাবে, কখনো আভাসে-ইঙ্গিতে ডেভিড হেয়ারকেই উল্লেখ করিয়াছেন। রামমোহন-বন্ধু উইলিয়ম এডাম নিজ 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' (১৪ই জুন ১৮৩০) সম্পাদকীয় মন্তব্যে খুব জোরের সহিত বলিয়াছেন যে, ডেভিড হেয়ারই হিন্দু কলেজের 'আদিকল্পক'। ১৮৩০ সনে সুপ্রীম কোর্টে হাইড ঈষ্টের যে মূর্ত্তি স্থাপিত হয় তাহাতে ঈষ্টকেই হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল। 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' এডাম ইহার প্রতিবাদেই ঐ কথা বলিয়াছিলেন।* এসব সত্ত্বেও রামমোহন যে গোড়া হইতেই কলেজের পরিকল্পনা বা প্রতিষ্ঠার আয়োজনে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাহাই বা কেমন করিয়া ধরিয়া লওয়া যায়? নিম্নের উদ্ধৃতিটি এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করিতেছে। 'দি ক্রিশ্চয়ান অবজার্ভার', জুলাই ১৮৩২, লেখেন:

"In 1815, a distinguished Native, not now in India, entertained a few friends in his house; in the course of conversation, a discussion arose as to the best means of improving the moral condition of the natives. It will readily occur to most of our readers, that the distinguished individual alluded to was Rammohun Roy, who, by his superior attainments in knowledge, and familiar intercourse with Europeans, became deeply imbued with a spirit of repugnance to the superstitious notions, and idolatrous practices of his countrymen. He was not only convinced of their errors, but animated with a fervent desire to correct them. For this end he proposed the establishment of a Brumha Sobha, for the purpose of teaching the doctrines of religion according to the Vedanta system,—a system, strongly deprecating every thing of an idolatrous nature, and professing to inculcate the worship of one supreme, undivided, and eternal God.

Mr. Hare, who was one of the party, not coinciding in the views of Rammohun Roy, suggested as an amendment, *the establishment of a College.* He wisely judged that, the education of native youths in European literature and science would be a far better means of enlightening their understandings . . . than such an institution as the Brumha Sobha.

"This proposition seemed to give general satisfaction, and Mr. Hare himself soon after prepared a paper, containing proposals for the establishment of the College. Baboo Buddinath Mookerjya, the father of the present native Secretary (Lakshminarayan Mookerjee, father of Justice Anukul Mookerjee of the Calcuta High Court), was deputed to collect subscriptions. The circular was put into the hands of Sir E. H. East, who was very much pleased with the proposal, after making a few corrections, offered his

* "Let the Truth be told, and it will appear that Mr. Hare was the originator, and the most active individual in effecting the establishment of the Hindoo College. He it was who first . . . . induced the worthy members of the native community to subscribe towards the establishment of a fund for such an institution; he prevailed upon them to do so; . . ."(*The India Gazette*, June 14, 1830).

আবার অন্যত্র,

". . . had there been no such proposal in writing circulated among several native gentlemen? . . . . And was not the author and originator of that paper, Mr. David Hare? . . ." (*Ibid*, June 25, 1830).

most cordial and in the promotion of its objects. He soon after called a meeting at his house, and it was then resolved, 'That an establishment be formed for the education of native youth'."

এই উদ্ধৃতি হইতে কতকগুলি বিষয়, বিশেষতঃ হাইড ঈষ্টের গৃহে সাধারণ সভা হইবার পূর্ব্বেকার ঘটনাগুলি পরিষ্কার জানা যাইতেছে। ১৮১৫ সনে রামমোহন-গৃহে আহূত কয়েক জন বন্ধুর এই বৈঠকে এইরূপ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা সর্ব্বপ্রথম উত্থাপিত হয়। রামমোহন ব্রহ্মসভা স্থাপনের কথা বলিলে ডেভিড হেয়ার তাহার সংশোধনীস্বরূপ একটি উন্নত ধরণের ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবের অনুকূলে উপস্থিত সকলেই মত দিলেন। পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি এই : হেয়ার পরিকল্পনা রচনা করিলেন, দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় চাঁদা সংগ্রহের জন্ত প্রেরিত হইলেন। হাইড ঈষ্টের পত্রেই প্রকাশ, তাঁহার নিকটও বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ই এই পরিকল্পনার কথা বলেন এবং তাঁহাকে ইহা দেখান। ঈষ্ট সাহেব ইহার সামান্ত সংশোধন করিয়া দেন। তাঁহার গৃহেই তৎকর্তৃক প্রথম ও পরবর্ত্তী সভা আহূত হয় এবং বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হয়।

কাজেই জানা গেল, হিন্দু কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা রচনার পূর্ব্বে প্রথম উল্লেখের সময় হইতেই রামমোহন রায় এইরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয় অবগত ছিলেন। এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত হইবে না যে, তাঁহারই নির্দ্দেশে এবং উপস্থিত সকলের সমর্থনে এ বিষয়ে চাঁদা সংগ্রহের ভার তাঁহারই আত্মীয় সভার অন্যতম উৎসাহী সভ্য দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপর অর্পিত হইয়াছিল। ডেভিড হেয়ার তখনও হিন্দু-প্রধানদের নিকট স্বল্পপরিচিত ; কাজেই তাঁহার পরিকল্পনা তাঁহাদের দেখাইবার ভারও বৈদ্যনাথের উপরই পড়ে। আর একটি কথা। ঈষ্ট-ভবনে প্রথম দিনের সভায়ই উপস্থিত মান্তগণ্য হিন্দুগণ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলেন। আরও বহু সহস্র টাকার প্রতিশ্রুতি এই সভাতেই পাওয়া গেল। যাঁহারা অনুপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে অর্থ দিতে সম্মত এইরূপ জানিয়া ঈষ্ট-গৃহে এক সপ্তাহ পরে ২১শে মে ১৮১৬ দিবসে পুনরায় সাধারণ সভা আহ্বানের বিষয়ও তখন ধার্য্য হয়। প্রস্তাবিত কলেজের অধ্যক্ষ-সভায় কে কে থাকিবেন সে বিষয়েও আলোচনা হইয়া থাকিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় রামমোহনের অর্থদানে প্রতিশ্রুতি উপরোক্ত ঘটনাপরম্পরায় অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ।

হিন্দু কলেজ পরিকল্পনায় রামমোহনের কতখানি হাত ছিল দুইটি পরোক্ষ প্রমাণ দ্বারা তাহা অনেকটা বুঝা যায়। রামমোহনের নিকট হইতে কলেজের জন্য চাঁদা গ্রহণে যে কোন কোন রক্ষণশীল হিন্দু-প্রধানের আপত্তি—ঈষ্টের পত্র হইতে আমরা তাহা জানিতে পারিয়াছি। যখন চাঁদা গ্রহণেই আপত্তি তখন রামমোহন কমিটিতে থাকেন কি করিয়া ? অথচ কলেজ-পরিকল্পনার সঙ্গে তাঁহার এতই যোগ যে, ডেভিড হেয়ার প্রথম হইতেই ধরিয়া লইয়াছিলেন তিনি ইহার অন্যতম অধ্যক্ষ বা পরিচালক হইবেন। প্যারীচাঁদ মিত্র হেয়ার-জীবনীতে (১৮৭৭, পৃ. ৬) এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন,—হেয়ার যখন রামমোহনকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তিনি অধ্যক্ষপদ লইতে ক্ষান্ত না হইলে মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পণ্ড হইয়া যায়, তখন উদারচেতা স্বদেশকল্যাণকামী রামমোহন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইহা হইতে নিরস্ত হন বিদ্যালয় স্থাপনে আর কোন বাধা রহিল না। ৮ অক্টোবর ১৮৩১ দিবসীয় 'সমাচার দর্পণে'র একটি মন্তব্য হইতে এই বিষয়ের সমর্থন মিলিতেছে। দর্পণ লেখেন :

"আমরা শুনিয়াছি যে বাবু রামমোহন রায় যখন হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষেরদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিলেন না তখন তিনি এতদ্রূপ প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছিলেন যে তদ্বিষয়ে ভগ্নাশতাপ্রযুক্ত তাঁহার মন কিছু দুঃখী না হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজে এক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন এবং তাহাতে এতদ্দেশীয় শতং বালক বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে লোকের এতদ্রূপ বিরোধে সর্ব্বসাধারণের উপকার।" ("সংবাদপত্রে সেকালের কথা" দ্বিতীয় খণ্ড, ৩য় সং, পৃ. ৪৯)

সমসাময়িক দলিল-দস্তাবেজ ও রচনাদির নজিরে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকালে রামমোহন ইহার বিরোধিতা করা দূরে থাকুক, তিনি ইহার যথেষ্ট সহায়তাই করিয়াছিলেন। রামমোহন বরাবর ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। কলেজের 'আদিকল্পক' ডেভিড হেয়ার এবং দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় রামমোহনের নিকট হইতে এতদর্থে যে বিশেষ প্রেরণা পাইয়াছিলেন তাহা এখন নিঃসন্দেহে বলা যায়। তিনি গোড়ায় কলেজ প্রতিষ্ঠা-ব্যাপারের মধ্যে ছিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

এংলো-হিন্দু স্কুল, শিমলা

'সমাচার দর্পণে'র উক্তি হইতে জানা যাইতেছে, রামমোহন প্রস্তাবিত হিন্দু কলেজের কমিটিতে গৃহীত না হইলেও 'ভগ্নাশতাপ্রযুক্ত তাঁহার মন কিছু দুঃখী না হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজে এক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন।' এই নজিরে উক্ত বিদ্যালয় ১৮১৬ সনের মাঝামাঝি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া

আমরা ধরিয়া লইতে পারি। বিদ্যালয়টি শিমলা—শুঁড়িপাড়ায় অবস্থিত ছিল। এটি ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক। শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য ব্যয় রামমোহন স্বয়ং বহন করিতেন। ইংরেজী পঠন-পাঠনার ব্যবস্থা হইল প্রথম হইতেই। তবে নিজ মাণিকতলা বাগানবাড়ীতে বিদ্যালয়ের অঙ্গস্বরূপ ইহার কিছু পরে স্বতন্ত্র একটি ইংরেজী শ্রেণীও খুলিয়াছিলেন। রামমোহন মিঃ মোরক্রফ্ট নামক একজনকে ইংরেজী শিক্ষক নিযুক্ত করেন এক শত টাকা বেতনে। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, নলিনী মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বর সরকার প্রভৃতি এখানে পড়িতেন। রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন, তাঁহার পিতা নন্দকিশোর বসুও রামমোহন রায়ের স্কুলে ইংরেজী পড়িয়াছিলেন। নন্দকিশোর ইংরেজীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হন। তিনি দিনকতক রামমোহনের সেক্রেটারীর কার্য্য করেন।* ১৮১৮ সনের একটি বিবরণে প্রকাশ—রামমোহন নিজ ব্যয়ে এই স্কুল পরিচালনা করিতেছিলেন। এখানকার ছাত্রসংখ্যা পঞ্চাশ। সংস্কৃত, ইংরেজী ও ভূগোল এখানে শিক্ষা দেওয়া হইত।†

রামমোহন হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া সেখানে এই বিদ্যালয়ের জন্য একটি গৃহ নির্ম্মাণ করেন। ১৮২২ সনে এখানে বিদ্যালয়টি নূতন পরিবেশে উঠিয়া আসে। তখন হইতে ইহা এংলো-হিন্দু স্কুল বা হিন্দু স্কুল নামে পরিচিত হইতে থাকে। সাধারণ লোকে রামমোহন রায়ের স্কুলও বলিত। এই বিদ্যালয়টি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আমি অন্যত্র‡ প্রদান করিয়াছি। এখানে সংক্ষেপে মাত্র কিছু কিছু উল্লেখ করিব।

নূতন বাড়ীতে উঠিয়া আসিবার পর বিদ্যালয়টি নবোদ্যমে ইংরেজী শিক্ষাদানে ব্যাপৃত হয়। 'ক্যালকাটা জর্ন্যালে'র সম্পাদক স্যাণ্ডফোর্ট আর্নটকে রামমোহন এংলো-হিন্দু স্কুলের ইংরেজী শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন ১৮২৪ সনের জুন মাসে। কিন্তু তাঁহার উপরেও সরকারের কোপদৃষ্টি পড়িল। তাঁহাকে প্রেস-অর্ডিন্যান্স বলে এদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা হইল। ইহার পূর্ব্বে রামমোহনের ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কতিপয় বাঙালী ভদ্রলোক ১৮২৪ সনের ১৩ই অক্টোবর সরকারের নিকট এই আদেশ রদ করিবার জন্য একখানি আবেদন প্রেরণ করেন। এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারকল্পে যে আর্নটের মত লোকের একান্ত আবশ্যক তাহাই ইহাতে প্রতিপাদন করা হয়। কিন্তু এই আবেদনে কোনও ফল ফলে নাই, আর্নট নির্ব্বাসিত হইলেন। এই বিদ্যালয়ের 'ভিজিটর' বা পরিদর্শক পদে কার্য্য করেন রামমোহন-বন্ধু উইলিয়ম এডাম। বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পরিদর্শক ছিলেন একজন বাঙালী। এডাম বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য যে-যে পন্থা অবলম্বন করিতে চাহিতেন তাহাতে তিনি বাধা দিতেন। অথচ রামমোহন তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কারণ তিনি বাঙালীদের মধ্যে প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। এডাম বিরক্ত হইয়া ১৮২৮ সনে ভিজিটরের পদ অগত্যা ত্যাগ করিলেন।

এডাম ১৮২৭ সনে যে রিপোর্ট দেন তাহাতে বিদ্যালয়টির শিক্ষক, ছাত্র ও পাঠ্য বিষয়সমূহ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। তখন এখানে দুই জন শিক্ষক ছিলেন—এক জনের মাসিক বেতন দেড় শত টাকা, দ্বিতীয় শিক্ষক পাইতেন সত্তর টাকা। খ্রীষ্টতত্ত্ব এখানে শিক্ষা দেওয়ার নিয়ম ছিল না। তবে সযত্নে নীতিশিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল। খ্রীষ্টধর্ম্মের ইতিহাসের দিকটা অবশ্য শেখানো হইত। কিছুকাল যাবৎ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী জন আলেকজাণ্ডার টর্নবুল। বিদ্যালয় অবৈতনিক ছিল এবং দরিদ্র গৃহস্থের সন্তানগণই এখানে পড়িতে আসিত। তথাপি কোন কোন বিত্তশালী ব্যক্তির ছেলেরাও যে এ বিদ্যালয়ে না পড়িত তাহা নয়। উদাহরণ-স্বরূপ বিদ্যালয়ের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এই বিদ্যালয়ে ছাত্ররূপে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮২৮ সনের বার্ষিক পরীক্ষার বিবরণ প্রদানকালে 'বেঙ্গল ক্রনিকল' (১০ জানুয়ারী ১৮২৮) এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লিখিলেন:

"To the intelligent observer it must have also been an additional source of gratification to notice among the scholars several of the children of the native gentlemen who contribute to the support of the school, in no respect distinguished from those who receive their education gratuitously."

ছেলেরা যে ইংরেজী পাঠে বিশেষ উন্নতি করিতেছিল বাৎসরিক পরীক্ষাগুলিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতে লাগিল। ১৮২৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক পরীক্ষায় অনেকে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ইঁহাদের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রামমোহন-পুত্র রমাপ্রসাদ রায়েরও নাম পাইতেছি। এই বৎসরের পরীক্ষার বিবরণ দিতে গিয়া 'ক্যালকাটা গেজেট' সংবাদপত্র (২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৮২৯) বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠাতা রামমোহনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। 'গেজেট' অংশতঃ লেখেন:

"It becomes us to state here that although the Anglo-Indian school is partly assisted by public contributions, yet the greater portion of its expenses

* রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, পৃ. ৭

† ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত অংশের মর্ম্ম।

‡ *The Modern Review* for September, 1951, p. 229-30.

is paid by one of the most liberal and enlightened of native gentlemen—one whose name has been long before the world, whose talents are surpassed by his worth only, and whose efforts to ameliorate the intellectual condition of his countrymen, can never be too highly appreciated. As the founder of the institution, he takes an active interest in its proceedings, and we know that he is not more desirous of anything than of its success, as a means of effecting the moral and intellectual regeneration of the Hindoos. We were sorry to learn that indisposition prevented his witnessing that success yesterday; but whatever may be his state, he must feel the satisfaction that every benevolent mind enjoys for having been useful to mankind,—and it must always be to him a pleasing prospect that when millions yet unborn shall hail the return of knowledge to this country, they will associate that circumstance with the name of Rammohun Roy."

এই উক্তিতে রামমোহনের কৃতিত্বের কথা সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করিবার পর বলা হইয়াছে যে, ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা জ্ঞানানুশীলন পুনঃপ্রবর্ত্তনের নায়করূপে রামমোহন রায়ের নাম উল্লেখ করিতে বাধ্য থাকিবে। রামমোহন রায়ের বিলাত গমনের পর ইহার পরিচালনার ভার প্রধান শিক্ষক পূর্ণ মিত্রের উপর ন্যস্ত হয়। সাধারণের নিকট ইহা তখন পূর্ণ মিত্রের স্কুল বলিয়াও পরিচিত হইতে থাকে। ১৮৩৪ সনের জানুয়ারী হইতে ইহার নাম হয় ইণ্ডিয়ান একাডেমি। সমসাময়িক সংবাদপত্রে ও সাময়িক পুস্তকে এই বিদ্যালয়টির উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮৪১ সন পর্য্যন্ত। ক্রমে এটি অবৈতনিক হইতে বৈতনিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। এখানে তিনি প্রথম ইংরেজী পড়িয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের 'ভিজিটর' পদ ত্যাগ করিলেও উইলিয়ম এডাম বরাবর ইহার সঙ্গে যোগরক্ষা করিয়াছিলেন। এখানকার প্রাক্তন ছাত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রমাপ্রসাদ রায় প্রভৃতি ১৮৩২ সনের ডিসেম্বর মাসে 'সর্ব্বতত্ত্ব দিপিকা সভা' স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানকার কর্ম্মসূচী একমাত্র বাংলা ভাষার মাধ্যমেই পরিচালিত হইত। রামমোহনের বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যে প্রকৃত নীতিমূলক জাতীয় শিক্ষা পাইতেছিলেন, তাঁহাদের ইংরেজীনবীশ হইয়াও বাংলা ভাষার অনুশীলনের আগ্রহ তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট পত্র

রামমোহন জাতির উন্নতির নিমিত্তই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ ও অনুশীলনের উদ্দেশ্যে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে তিনি ইহা হইতে দূরে সরিয়া যান; তাহা এজন্য নহে যে, তিনি অতঃপর ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী আর ছিলেন না, বরং তিনি যে জনসাধারণের মধ্যে ইহার সম্যক্ প্রচলন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, তৎকর্ত্তৃক এংলো-হিন্দু স্কুল নামক অবৈতনিক ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। রামমোহনের উক্ত অভিমত লর্ড আমহার্ষ্টকে ১৮২৩ সনের ১১ই ডিসেম্বর লেখা তাঁহার পত্রখানিতে সুব্যক্ত। তখন সরকার কলিকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। রামমোহন উক্ত পত্রে পরিষ্কারই লিখিলেন যে, প্রচলিত পদ্ধতিতে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য একটি নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠার কোনই আবশ্যকতা নাই, পরন্তু তখন দেশাভ্যন্তরে যে সকল চতুষ্পাঠী বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাদের অর্থসাহায্য করিলেই এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। সরকার অর্থব্যয় করিয়া এইরূপ একটি নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠা দ্বারা মধ্যযুগীয় সংস্কারকে জীয়াইয়া রাখিতেই সহায়তা করিতেছেন। তাহার ফলে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া উহা দ্বারা লাভবান হওয়ার সুযোগ থাকিবে না। বরং এই অর্থ প্রচলিত পদ্ধতির শিক্ষায় ব্যয় না করিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের অনুকূল নূতন পদ্ধতি, অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষার খাতে ব্যয় করিলে আমরা বিশেষ লাভবান হইব। পত্রখানির একটি প্রধান অংশ এই :

"If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge, the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the schoolmen which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful sciences, which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe and providing a college furnished with the necessary books, instruments, and other apparatus."

এখানে শিক্ষার বাহনের কথা বলা হয় নাই বটে, কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য উদার শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তনের কথা স্পষ্ট করিয়াই উক্ত হইয়াছে। যোগ্য ইউরোপীয় শিক্ষকের দ্বারা এই পদ্ধতির প্রবর্ত্তন মানে যে ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়ন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই। অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ব্যবচ্ছেদবিদ্যা প্রভৃতি এই ভাষার মারফতই আমা-

দিগকে আয়ত্ত করিতে হইবে। তিনি এই পত্রে সরকারকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানান যে, সরকারী অর্থে যোগ্য ইউরোপীয় অধ্যাপকের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বিদ্যার অনুশীলনোপযোগী পুস্তক এবং যন্ত্রপাতিও আমদানী করা কর্ত্তব্য। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিলাত হইতে বিজ্ঞানশিক্ষার রকমারি যন্ত্রপাতি লণ্ডনস্থ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নিজ অর্থে ক্রয় করিয়া এদেশে এই সময় পাঠাইয়াছিলেন। রামমোহন এ বিষয় অবগত ছিলেন কিনা জানা যায় নাই। তবে তিনি সরকারকেই এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া স্বকর্ত্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ জানাইলেন।

রামমোহনের এই পত্রখানির উত্তর দেওয়া বড়লাট সমীচীন মনে করেন নাই। তবে তিনি নব-নিযুক্ত শিক্ষা-সভার উপর ইহার উত্তরদান বা যথাবিহিত করিবার নির্দ্দেশ দিয়াই নিরস্ত থাকেন। শিক্ষা-সভাও রামমোহনের মতামত গ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহারা সরকারকে জানাইলেন যে, রামমোহন সকৌশলে স্বদেশবাসীর মুখপাত্র সাজিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তাহা নহেন; কাজেই হিন্দুপদ্ধতির বদলে পাশ্চাত্যপদ্ধতির প্রবর্ত্তনে তিনি যে হিন্দুসাধারণেরই মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন ইহা আদৌ বলা যায় না। কিন্তু ইহার বার বৎসর পরে সরকারই ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন ধার্য্য করিয়া প্রকারান্তরে রামমোহনের কথাই মানিয়া লইয়াছিলেন। পত্রখানির অংশবিশেষের মর্ম্ম প্রদান করিয়া 'প্রত্নকত্র' ছদ্মনামে সুপণ্ডিত শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন:

"হিন্দু পণ্ডিতের অধীনে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পূর্ব্বাবধি প্রচলিত ব্যাকরণের ফক্কিকা ও দর্শনের সূক্ষ্ম বিচার মাত্র ছাত্রদের মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করিবে, যাহা ব্যক্তি বা সমাজের কোন কাজেই লাগে না। ১২ বৎসর ধরিয়া ব্যাকরণ পড়া, কিংবা পূর্ব্বোত্তর-মীমাংসাশাস্ত্রের আত্মতত্ত্ব, মায়াবাদ ও বৈধহিংসাদি নিরর্থক বিচারশিক্ষা অথবা ন্যায়শাস্ত্রের পদার্থ-বিভাগ ও সম্বন্ধতত্ত্ব আয়ত্ত করা চিত্তবৃত্তির কোন প্রকার উৎকর্ষ বিধায়ক ত নহেই, কেবল অজ্ঞানান্ধকারে দেশকে আবৃত করিয়া রাখার শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া বিবেচিত হইবে। ভারতীয় রাষ্ট্রচেতনার উন্মেষসূচক এই বিশ্লেষণ অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের উজ্জ্বল প্রতিভা যে চিরন্তন প্রণালীতে প্রবহমাণ ছিল তাহা রাষ্ট্রচেতনার অত্যন্ত বিরোধী—আদি রাষ্ট্রগুরু মহাত্মা রামমোহন কঠোর ভাষায় ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার দীর্ঘ পত্রের এই প্রধান মন্তব্য উইলসন প্রমুখ ইংরেজ প্রভুর চিত্তে যে গূঢ় ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল, রামমোহনের প্রতি তাঁহাদের প্রযুক্ত ভাষাতেই তাহা ধরা পড়ে।"*

* "রামমোহন রায় ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ"—শনিবারের চিঠি, পৌষ ১৩৫৫, পৃঃ ২৬৮।

এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক, রামমোহন কখনও সংস্কৃত-শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না, সংস্কৃত বা প্রাচীন পদ্ধতিতে (Sanskrit system) শিক্ষাদানেরই বিরোধিতা করিয়াছেন। দীর্ঘকাল পরাধীন থাকিবার পর ভারতবাসীর মনে রাষ্ট্রচেতনা তথা স্বাধীনতা-স্পৃহার উন্মেষের পক্ষে যে ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক তাহা তিনি মনেপ্রাণে অনুভব করিয়াই এতাদৃশ প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

ডাফ সাহেবের স্কুল

উক্ত বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়াই রামমোহন ড. আলেকজাণ্ডার ডাফকে ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮২৪ সনে কলিকাতাস্থ চার্চ্চ অফ স্কটলণ্ডের পাদ্রী ডক্টর ব্রাইস শিক্ষাসম্পর্কে বিলাতস্থ চার্চ্চ-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত আবেদনে রামমোহনের মতামত জ্ঞাপন করেন। এই আবেদনে ৮ই ডিসেম্বর ১৮২৩ তারিখে রামমোহন-প্রদত্ত একটি মন্তব্য জুড়িয়া দেওয়া হয়। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, লর্ড আমহার্ষ্টকে পত্রপ্রেরণের মাত্র তিন দিন পূর্ব্বে ইহা লেখা। মন্তব্যটি এই:

"As I have the honour of being a member of the congregation meeting in St. Andrew's Church (although not fully concurring in every article of the Westminster Confession of Faith), I feel happy to have an opportunity of expressing my opinion that, if the prayer of the memorial is complied with there is a fair and reasonable prospect of this measure proving conducive to the diffusion of religious and moral knowledge in India."*

রামমোহন বিদ্যালয়ে আধুনিক শিক্ষাকে ধর্ম্ম ও নীতির উপর ভিত্তি করিতে চাহিয়াছিলেন। এ কারণ হিন্দু কলেজের শিক্ষাদান রীতির উপর তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। নিজের বিদ্যালয়ে ইহার অনুসরণ করিতে প্রয়াস পাইতেন। ধর্ম্ম ও নীতির উপর ভিত্তি করিয়া স্কটিশ পাদ্রীগণ যখন এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী হইলেন তখন তাঁহাদিগকে তিনি সানন্দে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি একাধিক বার বলিয়াছেন, বাইবেল পাঠ করিলেই আমরা খ্রীষ্টান হইয়া যাইব না। প্রত্যেক ধর্ম্মেরই সারতত্ত্ব ও মূলনীতির সঙ্গে আমাদের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। এ কারণ আলেকজাণ্ডার ডাফ ১৮৩০ সনে কলিকাতায় আগমনান্তর রামমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তিনি তাঁহাকে সকল প্রকারে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই সময় ডাফের জীবনীকার ধর্ম্মের

* ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধের পাদটীকায় উদ্ধৃত।

ভিত্তিতে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রামমোহন যে মতামত ব্যক্ত করেন তাহা সংক্ষেপে এরূপ বিবৃত করেন :

"All true education, the reformer emphatically declared, ought to be religious, since the object was not merely to give information, but to develop and to regulate all the powers of the mind, the emotions, and the workings of the conscience. Though himself not a Christian by profession he had studied the Bible, and declared that, as a book of religious and moral instruction it was unequalled. As a believer in God he also felt that everything should be begun by imploring His blessing."*

ইহার পর ডাফের জীবনীকার এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন যে, রামমোহন বলেন, তিনি বেদ, কোরাণ, বৌদ্ধ ত্রিপিটক পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু বাইবেলের "Lord's Prayer"-এর মত সকল দিক দিয়া উৎকৃষ্ট একটি প্রার্থনা কোথাও পান নাই। কাজেই ডাফের প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে এই প্রার্থনাটি পঠিত হইলে আপত্তির কারণ থাকিবে না। রামমোহন বাংলা, ফার্সি, আরবি বা সংস্কৃতের মাধ্যমে শিক্ষাদান না করিয়া ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন।

ডাফের স্কুল বাঙালী পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। কারণ বঙ্গসন্তানদের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে এইরূপ বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীতা সমধিক। বিদ্যালয়ে বাইবেল পড়ানো হইবে শুনিলে অভিভাবকগণ ছেলেদের তো এখানে পাঠাইবেন না। এই অবস্থায় রামমোহনের সাহায্য বিশেষ দরকার। তিনিও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্কুল-স্থাপনে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। তখনও ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ (যাহা এখনও বিদ্যমান) প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মেছুয়াবাজার ও চিৎপুরের মোড়ে জোড়াসাঁকো পল্লীতে অবস্থিত রামকমল বসুর (ফিরিঙ্গি কমল বসু-নামে সর্ব্বত্র পরিচিত) গৃহ ভাড়া করিয়া সেখানে ব্রহ্মসভা বা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য চলিত। রামমোহন এই গৃহের একটি ঘর কিছু ভাড়ায় ডাফ সাহেবের স্কুলের জন্য ছাড়িয়া দিলেন। তিনি ডাফের স্কুলে ছেলেদের পাঠাইতে বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধ করিলেন। বিদ্যালয় যে অবৈতনিক তাহা বলাই বাহুল্য।

রামমোহনের উপস্থিতিতে ১৮৩০ সনের ১৩ই জুলাই ব্রাহ্মসমাজের ভাড়াটিয়া বাড়ীর এক অংশে ডাফ বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। কার্য্যারম্ভে ডাফ যখন বাইবেলের অংশ পাঠ করিতে সুরু করিলেন তখন ছেলেদের মুখপাত্রস্বরূপ একজন ইহাতে আপত্তি করিল। তখন রামমোহন তাহাদিগকে এই বলিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, বাইবেল পাঠ করিলেই যে আমরা খ্রীষ্টান হইয়া যাইব এমন কোন কথা নাই। ডাঃ হোরেস হেম্যান উইলসন হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তো আর হিন্দু হন নাই। তিনি নিজে কোরাণ খুব ভাল করিয়া বার বার পড়িয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কি তিনি মুসলমান হইয়া গিয়াছেন? তিনি সমগ্র বাইবেল গ্রন্থও পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তো খ্রীষ্টান হইয়া যান নাই। তবে তাহারা কেন বাইবেল পাঠে শঙ্কিত হইবে? তাহারা বাইবেল পাঠ করুক এবং তাহার ভালমন্দ নিজের বিচার করিতে শিখুক। ইহাতে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ হইবে। রামমোহনের কথায় ফল হইল। ছেলেরা বাইবেল পাঠে আর আপত্তি তুলিল না। বস্তুতঃ রামমোহন যেমন সংস্কৃত পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন, সংস্কৃত-শিক্ষার নহে; তেমনি তিনি খ্রীষ্টানীর বিরুদ্ধে ছিলেন, খ্রীষ্টানশাস্ত্র অধ্যয়নের বিরোধী ছিলেন না; উভয়েরই তিনি পোষকতা করিয়া গিয়াছেন।

ইহার পর পুরা এক মাস যাবৎ প্রত্যহ তিনি ঠিক দশটার সময় বাইবেল পাঠকালে ডাফের স্কুলে আসিয়া হাজির হইতেন। পরেও যত দিন না বিলাত যাত্রা করেন, প্রায়শঃ তিনি বিদ্যালয়ে যাইতেন। তাঁহার বিলাত গমনের পরে জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় বিদ্যালয়টির বিশেষ পোষকতা করিতে লাগিলেন। তিনিও প্রায়ই বিদ্যালয়ে যাতায়াত করিতেন। কোন খ্রীষ্টান পাদ্রী তখন ডাফকে কোনরূপ সাহায্য দান করেন নাই।* আলেকজাণ্ডার ডাফ রামমোহনের সহায়তার কথা চিরকাল শ্রদ্ধাভরে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেন।

কলিকাতা তখন ভারতের সমগ্র ব্রিটিশ-অধিকৃত অঞ্চলের রাজধানী বা শাসনকেন্দ্র। এখান হইতে জাতীয় উন্নতিমূলক ভাব ও কর্ম্মপ্রবাহ চারিদিকে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়ে। রামমোহন এই শাসনকেন্দ্রে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের উদ্দেশ্যে ইংরেজী শিক্ষার সপক্ষে যে আলোড়ন উপস্থিত করেন তাহা শুধু তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাহা ক্রমে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও পরিব্যাপ্ত হয়। ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্যবোধের উন্মেষ ও রাষ্ট্রীয় চেতনার পরিপুষ্টিকল্পে যে ইহার প্রবর্ত্তন আবশ্যক তাহা তিনিই সর্ব্বপ্রথম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার মত যুগপ্রবর্ত্তকের আবির্ভাবে বাঙালী সমাজ ধন্য।

---

* *The Life of Alexander Duff*—George Smith, p. 73.

* ঐ, পৃ, ৭৬

বর্ণমালা দ্বিতীয় ভাগে য-ফলা পাঠ করবার সময়ে খ্যাতি, অখ্যাতি, বিখ্যাত প্রভৃতি শব্দগুলি সকলকে পড়তে হলেও, বিখ্যাত হওয়া আর ক'জনের ভাগ্যে ঘটে থাকে। খ্যাতিলাভ ভাগ্যে ঘটে নি, কুখ্যাতিই লাভ করেছিলেন সুধাসিন্ধুবাবু। তাঁর কাছে চাওয়া আর পাওয়ার দাবি যারা করতে পারত তাদের রসনা এবং বাসনা দুইটিকেই অতৃপ্ত রেখে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন তিনি। নিজের সংসারটি ক্ষুদ্র হলেও সেই ক্ষুদ্র সংসারকে আবার থাকতে হয় এক বৃহৎ সংসারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে। দেশগত জন্মসূত্রাধিকারে পারিপার্শ্বিক বৃহৎ সংসারও কিছু দাবি করে, আস্থাশীল ক্ষুদ্র সংসারের কাছে। সুধাসিন্ধুবাবুর কাছে বিমুখ হয়ে সেই বৃহৎ সংসার তাঁকে বিখ্যাত করেছিল। সবকিছুরই সুরু আছে, সেই সুরু যখন সমাপ্তিলাভ করে তখন আরম্ভের কথা কারও মনে পড়ে না, আর সে দিন-তারিখকে স্মরণ করে লাভ কি পূর্ণতাপ্রাপ্তির পর? যুবক ছেলের মাকে বেশ কষ্ট করেই মনে করতে হয় আঁতুড়ে ছেলের ভাবলেশহীন মুখখানিকে—হাত-মুঠো করা, কাদার তালের মত সেই অতি ক্ষুদ্র মানবাকৃতির কথা। তথাপি সুধাসিন্ধুবাবুর বাড়ীর লোকেরা ভোলে নি সেই কবেকার কথা, যখন তিনি নাকি এমন ছিলেন না। মার জন্যে, পিসিমার জন্যে, ভাই-বোন-স্ত্রীর জন্যে, নানান দরকারী অদরকারী জিনিস কিনে আনতেন নিজের মাইনের নগদ টাকা দিয়ে, চাইবামাত্র হাসিমুখে দিতেন সাধ্যমত অর্থ, সকলের আশা মেটানোই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা।

সেদিন আর নেই, পরিবর্ত্তন হয়েছে তাঁদের সংসারের, পরিবর্ত্তন হয়েছে তাঁর নিজের। পিতা-মাতা গত হয়েছেন, ভায়েরা সকলেই ভিন্ন হয়েছেন। বৃদ্ধা পিসিমাকে ভাগাভাগি করে ভাইপোদের বাড়ী থাকতে হয়। পিসিমার আগমনের দিনটি সঙ্গে সঙ্গেই সুধাসিন্ধুবাবুর নিজস্ব খাতায় লেখা হয়ে যায়, আর দেখা যায় ঠিক নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ফেরার পথেই রিক্সা নিয়েই এসেছেন তিনি। ঘরের জানলা থেকেই রিক্সা দেখে পিসিমা বলে উঠেন—'তামার তামার, এক বেলা বেশী থাকলেই কি এত বেশী খেয়ে ফেলতাম আমি। মুখ নীচু করে থাকেন ননীবালা—সুধাসিন্ধুবাবুর স্ত্রী সেই আগেকার দিনের কথা মনে করিয়ে দিয়ে স্বামীর লজ্জার হাত থেকে নিজেকে বাঁচান।—'সত্যি দিন দিন কি যেন হচ্ছেন উনি, আগে ত এমন ছিলেন না, সবই ত জানেন পিসিমা।'

একটু ঠাণ্ডা হন পিসিমা, নিজের পোঁটলা-পুঁটলি গুছাতে গুছাতে বলেন, তাই ত এই সুধাই এক সময়ে পিসিমা বলতে অজ্ঞান ছিল। এই ত এই আহ্নিক করি, এই পঞ্চপাত্রটা ঐ সুধাই ত এনে দিয়েছিল না চাইতেই, ভেবেছিলাম বিকেলের গাড়ীতে যাব—

পিসিমার কথায় বাধা দিয়ে, চোখ বড় বড় করে সুধাসিন্ধুবাবুর ছোট মেয়ে শোভা বলে, বাবা এনে দিয়েছিলেন! বাবার কিছু এনে দেওয়া আজ অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।—রিক্সায় চড়ে চলে যান পিসিমা। পিসিমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে থার্ড-ক্লাশের একটা টিকিটও করে দেন তিনি, ভাগের বেলায় ভায়েদের সঙ্গে যে কথা হয়েছিল তার এক-চুল এদিক-ওদিক করেন না সুধাসিন্ধু। তবুও তিনি কৃপণ, যাক, লোকে বললে আর কি করছেন তিনি। বাইরের লোকের মুখ ত আর চাপা দিতে পারেন না, কিন্তু শুধুই কি বাইরের লোক?—বাড়ী ফিরতেই 'ছিঃ ছিঃ' করে উঠে ননীবালা। নিজের মরণ কামনা করে সে। সুধাসিন্ধুবাবু নীরব। সপ্তাহে

এক দিন দাড়ি কামান, আজ সেই দিন, চার বারের কামানো ব্লেডটা কাঁচের গ্লাসে ঘসে ধার দিতে থাকেন আর মৌন অবলম্বন করে নিজেকে নিরাপদ রাখেন।—অনর্গল বকে চলেছে ননীবালা।

গালে সাবান লাগালেন সুধাসিন্ধুবাবু।

তাঁর গালের উপরকার পুঞ্জীভূত সাবানের ফেনা দেখে, বহুকাল আগেকার দুধের ফেনার কথা মনে পড়ে যায় ননীবালার, কারণ দুধ এখন এ বাড়ীতে নিষিদ্ধ। হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে সে আরও এগিয়ে এসে স্বামীর মুখের কাছে হাত নেড়ে বলে, বলি সবই ত বাজে খরচ, তা এই বাজে খরচটাই বা করা কেন, একগাল দাড়ি রাখলেই ত হয়, তাও দু'পণ্ডা পয়সা বাঁচে, শ্রাদ্ধের খরচ জমে আমার।—আশার আলো দেখতে পান সুধাসিন্ধুবাবু। একজন বয়স্ক উকিলের পক্ষে দাড়ি রাখা মোটেই বেমানান হয় না—তারপর থেকে দাড়িই রাখলেন তিনি।

দেশের ও দশের উন্নতির জন্তে যেদিন চাকরি ছেড়ে দিয়ে সদরে এসে প্র্যাকটিস সুরু করলেন, সকলে ধন্ত ধন্ত করেছিল তাঁকে। তারপর বহু দিন পর্য্যন্ত অপরের খুশীমতই নিজের উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করতেন তিনি। প্রথম প্র্যাকটিসের যুগেও স্থানীয় দাতব্য হাসপাতালে একান্ন টাকা দান করেছিলেন, বহু সাধারণ প্রতিষ্ঠানে মোটা টাকা দানের স্বপ্ন দেখতেন সুধাসিন্ধু, কিন্তু সবকিছুই ওলট-পালট করেছিল এই যুদ্ধ। যুদ্ধের ফলে চতুর্দ্দিকে অভাব বাড়ল যখন, তখন টান ধরল চালে, কাপড়ে, খুচরা পয়সায়, প্রথম প্রথম চালের অভাবে পয়সা দিয়েই ভিক্ষা দেওয়া চলল, তারপর তারও অভাব, তারপর হ'ল ভিখারীর অভাব। এই ভাবে দ্রব্যের অভাবে, কাপড়ের অভাবে কৃচ্ছ্রসাধন করে থাকা প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল যতই, বাক্সের টাকা বাক্সে জমতে লাগল ততই বেশী। এক দিন সুধাসিন্ধুবাবু তাঁর ছোট ক্যাশবাক্সটা খুলতেই খস খস করে উঠল, নোটের কাগজগুলো। এতগুলো টাকা জমে গিয়েছে—এলোমেলো করে রাখা নোটগুলো কাগজের তাড়ের মত করে গুছিয়ে, দক্ষিণ হস্তের চাপ দিয়ে বাক্স বন্ধ করলেন। কাঁচা টাকাগুলো ছোট একটা কাঠের বাক্সে রাখলেন, কেমন যেন একটু স্বস্তি বোধ করলেন টাকাগুলোর জন্তে, নিত্য আনা নিত্য খাওয়ার ঘরে কিছু বিত্ত থাকা ভাল, মনে হ'ল তাঁর। এর পর একদিন খাওয়ার সময় কাছে বসে পাখা নাড়তে নাড়তে ননীবালা জানাল যে জামা কাপড় কিছু না হলে আর চলছে না, দোকান-বাজারে ত কিছু নেই, একটু এদিক-ওদিক চেষ্টা কর।

সাবেক কালের সুধাসিন্ধু বাবু বললেন, না-না এ ত ঠিক নয়, বরং কিছু বেশীই সংগ্রহ করে রাখা ভাল, তুমি লিষ্টি কর কার কি চাই, আমি খোঁজ করছি—খোঁজখবর করে যখন কেনা হ'ল, দেখা গেল ক্যাশবাক্সের নোটের কেতা অনেকখানিই পাতলা হয়ে গিয়েছে। মনে মনে বেদনা বোধ করলেন তিনি, বারে বারেই ক্যাশবাক্সটা খুলে পরিপূর্ণ অবস্থার কথাটা স্মরণ করতে লাগলেন, রাগ হতে লাগল ননীবালার উপর, সবই বাড়াবাড়ি, এতগুলো কাপড় জামা একসঙ্গে না কিনলেই হ'ত, কমেও ত চালায় লোকে। ভাগ্যে টাকাগুলো জমেছিল, এর পর যদি আরও দাম বাড়ে—টাকা কিছু জমাই ভাল। গাঁয়ের দুর্ভিক্ষ সমিতির সম্পাদক সাহায্য চাইতে এলেন, বললেন, আপনিই ভরসা।—চিন্তিত মুখে তাঁদের বসিয়ে ভেতরে আসেন সুধাসিন্ধু বাবু। গোটা পঞ্চাশেক দিতেই হবে। কিন্তু টাকা বার করে দেখেন তা হলে ত সবই ফুরিয়ে যাবে। পঁচিশই দেওয়া যাক, হয়ত এই শেষ নয়, বারে বারে দিতে হবে, কিন্তু হাতে টাকা নেবার সময় নিলেন কুড়ি টাকা, থাক পাঁচটা টাকা। এসে ভূমিকা করলেন, দিনকাল চালানোর দুরবস্থা, দুর্ম্মূল্যতা—সস্ত কেনা কাপড়ের দামটা আরও একটু চড়িয়ে বললেন। সম্পাদকের সমবেদনায় শান্তি লাভ করে দেবার সময় মরীয়া হয়ে দশ টাকা দিলেন।

আপনি দশ!—অবাক হয় সম্পাদক ধীরেন দে। উপায়-হীনতার দোহাই শুনে নীরবেই চলে যায়।

বিজয়ীর আনন্দে বাকী দশ টাকা বাক্সবন্দী করলেন সুধাসিন্ধু বাবু। এই ভাবেই সুরু, এর পরে ছেলের জন্তে হরলিক্স কিনতে গিয়ে ফিরে এলেন, কারণ সে জিনিষের তখন যা দাম হয়েছিল অত টাকা তিনি নিয়ে যান নি। একটা বেলা দুধ-বার্লিতেই চালানো হ'ল, উপায় দেখতে পেলেন তিনি, আট টাকা দিয়ে হরলিক্স কেনার উৎসাহ রইল না তাঁর। তারপর থেকে, চলে যাবার মতন করেই চালাতে থাকেন তিনি; চলেই যায়, আটকায় না কিছুতেই, হীরার বদলে জীরার মতন করেই চালাতে থাকেন সুধাসিন্ধু। যুদ্ধের সময়ে বহু লোকের হাতে প্রচুর অর্থ হ'ল, আর সেই অর্থ বাড়াবার, খাটাবার, রাখবার, ফিকির খুঁজতে উকিলের বাড়ী আসতে লাগল অনেকেই, আর ভরে দিয়ে গেল উকিল সুধাসিন্ধু বাবুর সিন্ধুকের ফোকরগুলো। তাড়াবন্দী পুরনো নোটের সোঁদা সোঁদা গন্ধ, পিন-গাঁথা নূতন নোটের খসখসে আওয়াজ, টাকার ঝকঝকে রূপ নেশা ধরিয়ে দিল ওঁর মনে। লয়েড্স আর ইম্পীরিয়্যালের ছাপ মারা ছোট্ট খাতাখানার লাল দাগ দেওয়া খোপগুলোর মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান অঙ্কের অক্ষরগুলো দেখে যতই খুশি হতে থাকেন সুধাসিন্ধু, ততই অসুবিধা ভোগ করে তার ক্ষুদ্র সংসার ও বাইরের বৃহৎ সংসার। কিছু দিন পরে তাঁর আশা ত্যাগ করল বাইরের সংসার, কারণ বহু লোক আছে তার। মুশকিলে পড়ল তাঁর ক্ষুদ্র সংসার। যুদ্ধ মিটে গিয়েছে অনেক কাল, কোন জিনিষের অভাব নেই, বরং প্রাচুর্য্যের প্রভাবে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

ননীবালা বলে, হ্যাগো পাওয়া যায় না বলে এতকাল কাটালে, এবারও কি জামা কাপড় পাবে না পূজোয় মেয়ে জামাই, ছেলেরা। এবার পূজোয় শান্তিকে টাকা দেওয়া চলবে না, কাপড় জামা দিতে হবে, না হলে ওরা কি ভাববে বল দেখি।

সুধাসিন্ধু উছলে উঠেন, কি ভাববে বল দেখি, কেন আমি কি দেওয়া বন্ধ করেছি নাকি। হুঃ, আমায় বলে কিপটে। কোন্

বাপ বিয়ের পর এত দিন পূজোয় তত্ত্ব করেছে দেখাও দেখি। যত সব হয়েছে…

স্নেহ পদার্থ বিগলিত করে ননীবালা, তত্ত্ব করেছ বলতে লজ্জা করছে না? বিয়ের পর শহরের সেরা উকিলের মেয়ের বাড়ী থেকে তত্ত্ব গেল—না কাপড়, না মিষ্টি, খালি কয়েকটা টাকা—তা কি দু'শো চার শো—পঞ্চাশটা, তার পর থেকে তারও অর্দ্ধেক করেছ. ওরা খুব ভদ্দরলোক তাই কিছু বলে না মেয়েকে। এখন দুটো নাতি হয়েছে, এবার কাপড়চোপড় কিনে দিতেই হবে।

—দিতেই হবে, বলি আমি কি মেয়ের বিয়ের সময় রেজেষ্ট্রী ষ্ট্যাম্পের উপর সই করে দিয়েছিলাম নাকি? তোমাকে আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি—যতদিন ছোট মেয়ের বিয়ে না হয়, ততদিন বড় মেয়ে কুড়ি টাকা করে পাবে, ব্যস—তাতে কাপড় কেন, জুতো কেন, যা তোমার ইচ্ছা। —আপন মনেই বলে চলেন মধুময় বাণী—কে সেই হাঁদারাম যে স্ত্রীকে বলেছিল ঘরের লক্ষ্মী, সব সময়ে ত ওদের মাথায় ঘোরে—কি করে ঘরের পয়সা বার করে পরের কাছে নাম কিনবে। শাড়ী, গয়না, তত্ত্বতাবাস, বার-ব্রত, পান-দোক্তা, গ্যাঃ, অলক্ষ্মী—অলক্ষ্মী যত সব।

নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে দিতে চলে আসে ননীবালা…।

বড় ছেলে বিকাশ বি-এ পড়বে, ভর্ত্তির হিসাব করে টাকা দেন সুধাসিন্ধু বাবু।

টাকা দেখে বিকাশ বলে, অনার্স নিয়ে পড়ব আমি।

—অনার্স নিয়ে পড়ব, কেন তাতে আর দুখানা হাত-পা গজাবে, কি কাজে আসবে অনার্স, ভারি দাম আছে বি-এ পাশের—তার আবার…যাও, যাও গোল করো না আর।

তপ্ত হয়ে ওঠে তরুণ মন, ছুঁড়ে ফেলে দেয় বাপের দেওয়া টাকা, বলে ওঠে, লোকে আপনাকে যা বলে—তার চেয়ে শত গুণ কৃপণ আপনি, চাইনে আপনার টাকা, টিউশনি করে পড়ব আমি।

ননীবালা বলে, হাঁ লোকের কাছে বলিস, মা মরেছে, বাপ পড়ার খরচ দেয় না—

অমৃত ঝরান সুধাসিন্ধুবাবু, তার চেয়ে বিধবা মায়ের ছেলে বললে, লোকে দয়া একটু বেশী করবে বুঝলে। আমায় বলে চামার—যত সব হয়েছে শত্রু, পড়বার ইচ্ছে ত কত, ঐ যে দুটো টাকা বেশী লাগবে। যত সব হয়েছে…

ছোট ছেলে প্রকাশ, একটু গোঁয়ার গোছের। বাপের কাছে গিয়ে বলে, পাঁচটা করে টাকা দিতে হবে আমায় মাসে মাসে।

—অপরাধ?—প্রশ্ন করেন বাপ।

—পাব্লিক ব্যাডমিন্টন ক্লাবে খেলব আমি।

—কি জানি বাপু, টাকা দিয়ে খেলা, পয়সা ছাড়া কি খেলা যায় না,
কৈ আমরা কখনও টাকা-পয়সা দিয়ে খেলেছি বলে মনে হয় না।

স্পষ্ট কথা শুনে নীতিপথ ধরেন সুধাসিন্ধুবাবু, জ্ঞান এই গরীবের দেশে খেলে টাকা নষ্ট করা উচিত নয়।

—কোন্ সাধু-প্রতিষ্ঠানে টাকা দিচ্ছেন আপনি, আর তা ছাড়া আপনি ত গরীব নন, আপনার চেয়ে অনেক গরীবের ছেলেরা খেলে, আমি কেন খেলব না, আমাদের দিতে বাধ্য আপনি।

—বাধ্য আমি। বাঃ খাসা লেখাপড়া শিখছ ত! আর দরকার নেই ম্যাট্রিক পাসে, লেখাপড়ায় ইস্তফা দাও।

ষোল বৎসর বয়সের সমস্ত শখ অপূর্ণ থাকার ক্রোধ রুদ্ধ বেদনায় ফেটে পড়ে। চীৎকার করে বলে, তার চেয়ে জীবনে ইস্তফা দিলে আপনার ব্যাঙ্কের অঙ্কটা আর একটু বাড়ে।

ভয় পেয়ে যান সুধাসিন্ধুবাবু। চড়া সুর চালানো চলে খালি স্ত্রীর কাছে। সুর নরম করেন তিনি—টাকা, টাকার কথা কে বলেছে, তোমরা খালি ওই দিকটাই দেখছ, বলি রাতে ঐ আলোয় খেললে চোখ খারাপ হতে পারে, ঠাণ্ডাও লাগতে পারে, সেটাও ত ভাবতে পারি আমি।

—বেশ দিনের বেলাই খেলব, ক্রিকেট, ভলিবল, এক টাকা চাঁদা লাগবে।

—কি জানি বাপু টাকা দিয়ে খেলা, পয়সা ছাড়া কি খেলা যায় না কৈ আমরা কখনও টাকা-পয়সা দিয়ে খেলেছি বলে মনে হয় না।

—খেলতেন ত হাডুডুডু।

—কি বললে, ক্রিকেট ভলিবল, এক টাকা—আট আনা চাঁদায় কি খেলা যায় তা হলে।

—কিছু না।—আরও এগিয়ে আসে বাপের টেবিলের কাছে, বোঝাপড়াই করবে সে আজ।

বলে—আচ্ছা এই যে টাকা জমিয়েছেন, কি হবে এ দিয়ে, কিছু কি নিয়ে যেতে পারবেন।—ভাবল এইবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবেন সুধাসিন্ধুবাবু।

ঠাণ্ডাই হলেন তিনি, ছেলের পিঠের উপর সস্নেহে ছোট একটি থাপ্পড় মেরে বললেন, ওটা বুঝলেই ত পাগলামি সারে বাবা, কিচ্ছুই নিয়ে যাব না, সবই তোমাদের জন্তে।

শীতল হয়ে যায় গোঁয়ারগোবিন্দ প্রকাশ।

ছেলেমেয়েদের নিয়ে সান্ত্বনার পুঁটুলি খুলে বসে ননীবালা। সুধাসিন্ধুবাবুর যত কিছু উপহারের, স্ব-ইচ্ছায় ব্যয়ের, উপকারের, দানের কাহিনীর স্বল্প-সঞ্চয়, তাই এখন একমাত্র সান্ত্বনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভবিষ্যতের ক্ষীণ আশাও মাঝে মাঝে উঁকি দেয় ননীবালার মনে, হয়ত কোন দিন ভুল ভেঙে যাবে, আবার ফিরে আসবে সেই সব দিন।

সস্নেহে ছোট একটি থাপ্পড় মেরে বললেন, ওটা বুঝলেই ত পাগলামি সারে বাবা, কিচ্ছুই নিয়ে যাব না, সবই তোমাদের জন্তে।

অতীত উঁকি দিয়ে যায় সুধাসিন্ধুবাবুর মনে—কত অপব্যয়ের, নগদ মাহিনা পাওয়া করকরে টাকাগুলোর কথা কাঁচা ফোড়ার মতই খোঁচা দিয়ে উঠে। হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া সেই অর্থের সঙ্গে বর্ত্তমান অর্থের একটা মোটামুটি হিসাব করে হাত কামড়াতে থাকেন তিনি। ভবিষ্যৎ ভাবেন তিনি, কৃপণ, চামার বলে ত সবাই জানে তাঁকে। কিন্তু ওই যে মেয়ে মেয়ে করে ননীবালা, ঐ মেয়েই হয়ত ছেলেপিলে নিয়ে চলে আসতে পারে একদিন। বেকার অবস্থায় বহুদিন বসে থাকতে পারে ঐ বিকাশ-প্রকাশ। তাঁর অবর্ত্তমানের পর কত দিন বেঁচে থাকতে পারে ননীবালা! চিন্তায় শিউরে উঠেন তিনি। অতীতের অসাবধানতার জন্য অনুশোচনা করেন। নাম সুধাসিন্ধু হলেও সে নাম শ্রবণে লোকের মন বিষময় হয়ে উঠে, তা হোক—তাতে তাঁর কিছুই যায় আসে না, তিনি নির্ব্বিকার, যেমন নির্ব্বিকার হন পরমার্থের সন্ধান যারা পেয়েছেন। সুধাসিন্ধুবাবুও পেয়েছেন অন্তরে অমৃতের সন্ধান—পরম-অর্থে। একেই কি গুণীজনেরা বলেন, মোক্ষলাভ।

কেদার-বদ্রী দর্শনে

শ্রীঅসীমকুমার ঘোষ

কেদার-বদ্রীর দুর্গম তীর্থযাত্রায় আমি যে নির্ম্মল আনন্দ লাভ করেছি ভাষায় তার কতকটা প্রকাশ করতে ইচ্ছা হয়। এই পথযাত্রা-কাহিনী সম্বন্ধে দু'একখানা বই পড়েছি এবং কোন কোন বইয়ে দেখেছি যে, ভ্রমণ-পথকে বড় ভয়াবহ করে তোলা হয়েছে যার ফলে উপরোক্ত দুটি তীর্থ ই আমাদের কাছে বড় দুর্গম হয়ে আছে। এমনি একটা বোধ আমারও হয়েছিল। কিন্তু সে ভুল আমার ভেঙে গিয়েছে নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। আমার ইচ্ছা হয়, বাঙালীর ছেলেমেয়েরা এক বার কেদার-বদ্রী ঘুরে আসুন, দেখে আসুন প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির মধ্য উপভোগ করুন নিজেকে, প্রেরণা জাগান অপরের মনে।

অলকানন্দা সাঁকো, কীর্ত্তিনগর

আমার গন্তব্যস্থল হ'ল কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণ। ১৯৫০ সনে আমি যখন দেরাদুন, হরিদ্বার যাই তখনই মনে বাসনা জেগেছিল এ দুটি তীর্থ দর্শন করে আসবার। দু'বছর কেটে গেল। '৫৩ সনের জানুয়ারী মাসে আবার আমার মনে ঐ তীর্থযাত্রার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। জানি না কি এক অজ্ঞাত কারণে কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণ দর্শনের ইচ্ছা খুব প্রবল হয়ে উঠল। সেই ইচ্ছাই সফল হয়েছে গত মে মাসে।

১৯শে মে রাত ন'টায় হাওড়া থেকে গাড়ী ছাড়ল। আমি যে বগীতে ছিলাম, সে বগীতে আরও দশ জন বৃদ্ধা মহিলা ও চার জন পুরুষ উঠেছিলেন। পরে অনুসন্ধানে জানলাম, তাঁরাও আমার যাত্রাপথের সঙ্গী। মনে সাহস বাড়ল; কারণ বাড়ী থেকে আমি একাই বেরিয়েছিলাম। অজানা পথে সঙ্গী পেয়ে বেশ আনন্দ হ'ল। যাই হোক, ২১শে মে ভোর ছ'টার সময় আমরা হরিদ্বারে এসে পৌছলাম। আমরা সদলবলে পাণ্ডা পান্নালাল কুম্ভকর্ণের ধর্ম্মশালায় উঠলাম। ধর্ম্মশালাটি বড় সুন্দর, একেবারে গঙ্গার উপর। গঙ্গার ধারে বসে স্রোতস্বিনীর দৃশ্য দেখে মনে বড় আনন্দ হয়েছিল। একদিকে গগনস্পর্শী পর্ব্বতমালা উন্নত শিরে দণ্ডায়মান, তাদেরই পাদদেশ ধৌত করে কলকলনাদে বয়ে যাচ্ছে সুরধুনী। সে যে কি নয়নমুগ্ধকর দৃশ্য, লেখনী দ্বারা তা প্রকাশ করা যায় না। হরিদ্বারে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে জানলাম যে, তিনিও আমাদের সঙ্গী হতে ইচ্ছুক। আমরা তাঁকে সঙ্গী করে নিলাম।

রুদ্রপ্রয়াগের সুড়ঙ্গ

২২শে মে, বিকালবেলা, আমি আমার ট্রেনের সঙ্গীদের কাছে আমার চলে যাওয়ার সঙ্কল্পের কথা বললাম। তাঁদের "গোবিন্দে"র চলে যাওয়ার সংবাদ পেয়ে তাঁদের চোখে জল এসে গেল; ব্যথাতুর কণ্ঠে তাঁরা আমায় প্রশ্ন করলেন, "আমাদের ফেলে সত্যই চলে যাবে গোবিন্দ? আমরা কি যেতে পারব তুমি না থাকলে?" তাঁরা এমন সহজ সরল ভাবে আমার উপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন যে, তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিতে আমি যে কি অব্যক্ত বেদনা অনুভব করেছিলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। দু'চোখ-ভরা জল নিয়ে বিদায়ের সময় তাঁদের শুধু এই কথাই বলেছিলাম, "ভয় কি মা! গোবিন্দ ত সঙ্গে রইল। যদি পথে দেরি না করেন গোবিন্দর সঙ্গে আবার দেখা হবে!"

এর আগে কিছু গোড়ার কথা বলা প্রয়োজন। হাওড়ায় যখন ট্রেনে উঠি, আমাদের বগীতে আমরা এই পনর জনই ছিলাম। আর অন্য কেউ ছিল না। কারণ বগীটা পনর জনের নির্দ্দিষ্ট করা ছিল। আমি ট্রেনে মালপত্র গুছিয়ে রাখার পর যখন আমার নির্দ্দিষ্ট আসনে বসলাম তখন এক জন মহিলা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা, তুমি কোথায় যাবে?" উত্তরে আমি বলেছিলাম, "কেদার-বদ্রী।" তার

রুদ্রপ্রয়াগের নিকট অলকানন্দা নদী
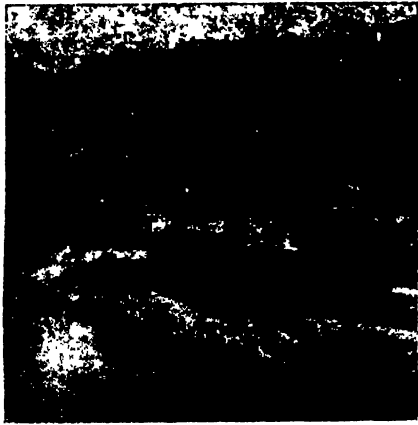
পরেই দেখি তাঁদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যভাব এবং সকলেরই মুখে প্রফুল্ল হাসি। খানিক পরে তাঁদের মধ্যে এক জন আমায় বললেন, "তুমি বাবা আমাদের গোবিন্দ! তুমি হচ্ছ ভগবান, তোমায় এখানে আমাদের মাঝখানে পাঠালেন কেন? এই দেখ না বাবা! আমাদের কত ভয় করছিল, এতখানি দুর্গম পথ! কিন্তু তোমায় পাবার পর আর ত আমাদের সে ভয় হচ্ছে না! এখন মনে হচ্ছে ঠিক চলে যেতে পারব।"

২২শে মে, হৃষীকেশে এসে আমরা প্রথমে ২৩ তারিখের বাসের আসন সংরক্ষিত করে রাখলাম এবং পরে কুলি এজেন্সি আপিসে গিয়ে কুলি ঠিক করলাম। কুলিরা সাধারণতঃ এক মণের কম মাল বহন করে না। এক মণ মালের ভাড়া সাধারণতঃ ১০০৲ টাকা নেয়। চুক্তি থাকে, কেদার-বদ্রী দর্শন করিয়ে বাসে তুলে দেবে। আমাদের মাল খুব বেশীই হয়েছিল, তাই আমরা একটি কুলিই নিয়েছিলাম। এক জন যাত্রীর পক্ষে দুখানা কম্বল, দু' জোড়া কেড্স জুতো (১ জোড়া নিলেও হয়), দু'তিনটে কাপড় বা প্যাণ্ট, গোটা দু'তিন জামা এবং এক সুট গরম পোশাক, কিছু পেটের অসুখ ও সর্দ্দিজ্বরের ওষুধ, এক শিশি মালিশ (যা কোন ব্যথার স্থানে প্রয়োগ করা যেতে পারে) একটা মগ, একটা ওয়াটার বট্‌ল ও একটা লাঠি যথেষ্ট।

২৩শে মে, সকাল সাড়ে ছ'টার সময়ে আমাদের বাস হৃষীকেশ ছেড়ে দেবপ্রয়াগের দিকে রওনা হ'ল। হৃষীকেশ থেকে দেবপ্রয়াগ চুয়াল্লিশ মাইল। বাসে এই রাস্তা অতিক্রম করতে চার-পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে। দেবপ্রয়াগের রাস্তা বড় দুর্গম; পাহাড়ের বুকে আঁকা-বাঁকা, উঁচু-নীচু পথে উঠতে প্রথমে বড় ভয় হয়। মনে হয়, বুঝি হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবে। রাস্তা এত সরু যে মধ্যে মধ্যে মনে হয় ছয়-সাত ফুটের বেশী চওড়া হবে না। একদিকে আকাশচুম্বী বিরাট পাহাড়, আর এক দিকে ভূপৃষ্ঠে গঙ্গা প্রবাহিত। কিন্তু ভয়ের সঙ্গে আছে আবার আনন্দের সংমিশ্রণ যা উদ্বুদ্ধ করে আরও এগিয়ে যেতে। আমরা বেলা সাড়ে এগারটার সময় দেবপ্রয়াগে এসে পৌঁছলাম। দেবপ্রয়াগে আমরা শৈলেন্দ্রনাথ ভট্ট নামে এক পাণ্ডার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলাম; পাণ্ডাজী ছড়িদার আমাদের বেশ খাতির-যত্ন করেছিল। অলকানন্দা ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে দেবপ্রয়াগ অবস্থিত। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য খুব উপভোগ্য। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দেবপ্রয়াগ [illegible] ফুট উঁচু। অলকানন্দা ও ভাগীরথীর পবিত্র সঙ্গমে স্নান করে পর দিন ২৪শে মে বেলা বারটার সময়ে আমরা কীর্ত্তিনগরের দিকে রওনা হলাম। কীর্ত্তিনগর দেবপ্রয়াগ থেকে বাইশ মাইল। আমরা বেলা তিনটার সময়ে কীর্ত্তিনগর পৌঁছলাম। কীর্ত্তিনগরে বাস বদল করে আমরা শ্রীনগরে এলাম। শ্রীনগর কীর্ত্তিনগর থেকে তিন মাইল। শ্রীনগর গাড়োয়াল রাজ্যের একটা বড় শহর; এখানে ভাল হোটেল ও কালীকমলীওয়ালার ধর্ম্মশালা, বেশ বার্মাশেলের তেলের পাম্প আছে। আমরা বাসের অফিসে অনুসন্ধান করে জানলাম, শ্রীনগর থেকে রুদ্রপ্রয়াগের বাস বেলা চারটের সময় ছাড়বে। জলযোগ সেরে নিয়ে আমরা চারটের বাসে রুদ্রপ্রয়াগের দিকে রওনা হলাম।

শ্রীনগর থেকে রুদ্রপ্রয়াগ কুড়ি মাইল। রুদ্রপ্রয়াগ পৌঁছতে আমাদের প্রায় আটটা বেজে গেল, কারণ রাস্তায় আমাদের বাস খারাপ হয়ে যায়। এই সময় বড় ভয় পেয়েছিলাম। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হচ্ছিল বুঝি এই দুর্গম পার্ব্বত্য পথে রাত্রিবাস করতে হবে। একে কঠিন প্রস্তরাবৃত পার্ব্বত্য-প্রকৃতির ভয়াল রূপ, আবার অপর দিকে অজানা-অচেনা পথ! ভয় কিছু হয় বৈ কি! কিন্তু ভয়ের সঙ্গে আনন্দের যোগও কম ছিল না। আনন্দ হচ্ছিল নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য। রাত আটটার সময় আমরা যখন কালীকমলীওয়ালার ধর্ম্মশালায় এলাম তখন দেখি, এত যাত্রীর ভিড় যে অনেকে রাস্তায় শুয়ে আছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য আমরা ধর্ম্মশালায় সবচেয়ে ভাল ঘরটা পেলাম। এটা দেবার নিমিত্ত যেন ধর্ম্মশালার চৌকিদার আমাদের জন্যই

অপেক্ষা করছিল। যাই হোক, সারাদিনের পরিশ্রমে বড় ক্লান্ত হয়েছিলাম, তাই ঘরটি পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রাত কাটালাম।

রুদ্রপ্রয়াগে দু'রাত্রি কাটাবার পর আমরা ২৬শে মে ভোর সাড়ে পাঁচটার সময়ে হাঁটাপথে পরম তীর্থ কেদার-নাথের দিকে রওনা হলাম। এইবার হাঁটাপথের অভিজ্ঞতার জন্যে আমরা তৈরি হয়ে নিলাম। কি জানি, কি রকম রাস্তা! হয়ত বা পা একটু এদিক-ওদিক হলেই মৃত্যু, না হয় রাস্তা হারিয়ে হিমালয়ের বনে ঘুরপাক খাওয়া! পার্ব্বত্য অঞ্চলের কোন হিংস্র জন্তুর কবলে পড়ে যাওয়াও

গুপ্তকাশীর সাধারণ দৃশ্য

বিচিত্র নয়। ছ'দিন পরে হেঁটে গুপ্তকাশী চলে এলাম। রাস্তা বেশ প্রশস্ত পড়ে যাবার কোন কারণ নেই। তবে একটু পাথর ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়ে নি। বিপথে যাবারও কোন ভয় নেই, কারণ পথ ঐ একটিই। রুদ্র প্রয়াগ থেকে কেদারনাথ মাত্র আটচল্লিশ মাইল। ভাবতেও প্রাণটা আনন্দে নেচে ওঠে! আর মাত্র ৪৮ মাইল! যাঁর দর্শনেচ্ছায় ঘরছাড়া হয়ে মাইলের পর মাইল কত চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে অপরিসীম আনন্দে এগিয়ে যাচ্ছি, এবার তাঁর দর্শন পাব। অন্তর নেচে উঠল। নিস্তব্ধ প্রকৃতির অন্তরাল থেকে কার মধুর আহ্বান যেন বায়ুভরে ভেসে আসে, "ওরে, এগিয়ে আয়, এগিয়ে আয়।" রুদ্রপ্রয়াগ থেকে আর দু'জন ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গী হলেন। তার মধ্যে এক জন বাঙালী, শ্রীভূপতিরঞ্জন দাশগুপ্ত ও অপর জন মাদ্রাজী শ্রীনীলকণ্ঠ শাস্ত্রী। ভদ্রলোক দু'জন বেশ অমায়িক। এঁরা উভয়েই লক্ষ্ণৌ মিলিটারী বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। আমরা এই চার জন বরাবর এক সঙ্গেই ছিলাম। আমরা কয়েকজন পরস্পর পরস্পরকে বন্ধু-ভাবে গ্রহণ করলাম। এর ভেতরে যে কি মাধুর্য্য আছে তা অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত অপরের পক্ষে সম্যক্ উপলব্ধি করা অসম্ভব।

২৮শে মে আমরা গুপ্তকাশীর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। গুপ্তকাশী রুদ্রপ্রয়াগ থেকে চব্বিশ মাইল। এখানে বিশ্বেশ্বর ও অর্দ্ধনারীশ্বরের দুটি মন্দির আছে। কেদারের পথে বদল-পুর চটীর কাছে জটাধারী, সৌম্যদর্শন এক নাগা সন্ন্যাসীর দর্শন পেলাম—শান্তমূর্ত্তি, স্থিরদৃষ্টি। আপন মনে তিনি চলে গেলেন। দেখে বড় ভাল লাগল আমাদের। প্রণাম করতে গেলাম, কিন্তু ছুঁতে দিলেন না। ইঙ্গিতে বারণ

বিশ্বেশ্বর মন্দির, গুপ্তকাশী

করলেন; শুনলাম তিনি মৌনী। পরদিন সকালে আমরা ত্রিযুগী নারায়ণে এলাম। এখানে হরপার্ব্বতীর একটি মন্দির আছে। প্রবাদ আছে, এইখানে নারায়ণ সাক্ষী রেখে হর-পার্ব্বতী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। একটি অগ্নিকুণ্ড আছে; এটি নাকি হরপার্ব্বতীর বিবাহের দিন থেকে জ্বলে আসছে। ঐ দিনই আমরা গৌরীকুণ্ড হয়ে বিকালবেলায় রামওয়াড়ায় আশ্রয় নিলাম।

গৌরীকুণ্ডে দুটি উষ্ণ কুণ্ড আছে—লোকে এখানে স্নান করে। এখানে শিলাজিৎ নামে একপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়। পাহাড়ীরা এই ঔষধটি পাহাড়ের উপর থেকে সংগ্রহ করে। ওরা বলে, এটা এক প্রকার পাহাড়ের ঘাম। এ ছাড়া এখানে বাঘ ও হরিণের ছাল এবং মৃগনাভি পাওয়া যায়। রামওয়াড়া সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ন'হাজার ফুট উঁচু। এখান থেকে কেদারনাথ তিন মাইল। রামওয়াড়া থেকে কেদার-নাথ পর্য্যন্ত রাস্তা বেশ চড়াই। সওয়া তিন মাইল রাস্তা—প্রায় চার হাজার ফুট উঁচুতে উঠতে হয়। কেদারের পথে এই রাস্তাটা বড় ক্লেশদায়ক। এ খাড়াই পথ অতিক্রম করতে নিশ্বাস-প্রশ্বাসেরও কষ্ট হয় খানিকটা। যা হোক,

হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে যে তৃপ্তির আনন্দ পাওয়া যায় সে তুলনায় পথের কষ্ট কতটুকুই বা! কেদার পৌঁছতে আর দেরি নেই বেশী। ভাবতে মনে এক অভূতপূর্ব শিহরণ জাগে! তুষারমণ্ডিত ঐ যে হিমগিরি, সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে যে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, ঐ কি সেই বিরাট, সেই অসীমের মাথার কিরীটচ্ছটা! এই কি ধ্যানমৌনী মহাযোগীর প্রগাঢ় স্তব্ধতা! তাই বুঝি আর্য্যঋষি হিমালয়ের বুকে শঙ্করের আবাস খুঁজে পেয়েছিলেন। সব যেন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। কানের কাছে বাজতে লাগল বিশ্বকবির সেই মহান্ সঙ্গীত "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।"

মন্দাকিনী

৩১শে মে বেলা দশটার সময় আমরা কেদারনাথে পৌঁছলাম। কেদারনাথের দৃশ্য কি অপূর্ব্ব! তিন দিকে তুষারমণ্ডিত সুবিশাল গিরিশ্রেণী যেন আকাশ ভেদ করে মহাশূন্যে চলে গিয়েছে। সেই তুষারাবৃত গিরিসমূহের উপর আলোকচ্ছটা পড়ে মনোরম শ্রী ধারণ করেছে। যেন মনে হয় রজত-পাহাড়ে ঘেরা কেদারনাথ, আর তার পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে স্রোতস্বিনী মন্দাকিনী দেবতার চরণামৃত নিয়ে। আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত কেদারনাথ দর্শন করলাম। ভগবান তাঁর সৃষ্ট জীবকে আকার দান করেছেন। তাই মানুষ ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডে আবদ্ধ করে রেখেছে পরমপুরুষকে। আমিও পরম ভক্তিভরে কেদারনাথ দর্শন করলাম। পূজাদি ও দর্শনাদি শেষ করে আমরা পাণ্ডা বিশ্বেশ্বরপ্রসাদ বিদ্যাধরপ্রসাদ শুক্লের বাড়ীতে উঠলাম। আহার ও বিশ্রামের পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা আবার মন্দিরে গেলাম সন্ধ্যারতি দেখবার বাসনা নিয়ে।

কিন্তু এ কি! সে দৃশ্য কোথায়? এবার প্রকৃতির আর এক রূপ দেখতে পেলাম। অস্তগামী সূর্য্যের কনককিরণে উদ্ভাসিত হয়ে সমগ্র তুষারশৃঙ্গে এক অপরূপ অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। মন স্থির করে কিছুক্ষণ আত্মস্থ হবার প্রয়াস পেলাম। কি যেন ভাবতে গিয়ে সব গুলিয়ে যেতে লাগল। নিঃশব্দে আমি আমার সঙ্গীদের সঙ্গে মন্দির-প্রাঙ্গণে চলে এলাম। সেখানে দেখি মন্দিরের পুরোহিত মহাভারত পাঠ করছেন, আর অগণিত মানুষ নিঃশব্দে শ্রবণ করছে তাঁর পাঠ। আমরাও বসে গেলাম তাঁদের মাঝখানে।

সন্ধ্যারতি সকলের সামনে হয় না। কত নরনারী মহাভারত পাঠান্তে অপেক্ষা করছে মন্দিরের প্রধান তোরণদ্বারে ভগবানের শৃঙ্গার-রূপ দর্শন করবার জন্যে, আর আমরা মন্দির প্রদক্ষিণ করে চারিদিককার সৌন্দর্য্য উপভোগ করছি, এমন সময় মন্দিরের পশ্চাদ্দ্বার খুলে প্রধান পুরোহিত প্রবেশ করলেন এবং আমরাও তাঁকে অনুসরণ করলাম। বেশ ভাল করে ভগবানের শৃঙ্গার-রূপ দর্শন করে বেরিয়ে আসার পর প্রধান-দ্বার খুলে দেওয়া হ'ল। কেদারনাথ সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ১১,৭৫০ ফুট উঁচু।

আমরা যখন পাণ্ডার বাড়ীতে ফিরে এলাম, তখন বেশ রাত্রি হয়ে গিয়েছে। কেদারনাথে খাবার জিনিস তেমন পাওয়া যায় না। আমরা কিছু পুরী, তরকারি খেয়ে সে রাত্রের মত পাণ্ডাপ্রদত্ত কূপে আশ্রয় নিয়ে রাত্রি কাটিয়ে দিলাম। কেদারনাথে তখন বেশী শীত ছিল না। আমাদের এখানে পৌষ-মাঘ মাসের চেয়ে কিছু বেশী।

১লা জুন সকাল সাতটায় আমরা বদ্রীনারায়ণের দিকে রওনা হলাম। কেদারনাথ থেকে বদ্রী যেতে হলে ঐ রাস্তায় তেইশ মাইল নেমে এসে নালাচটী নামে এক জায়গা থেকে বদ্রীর রাস্তায় যেতে হয়। কেদার থেকে বদ্রী এক শ' এক মাইল। কেদারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ভেতর থেকে নিজেদের টেনে নিয়ে আসতে আমাদের বড় কষ্ট হ'ল। যতদূর দেখা যায়, আমরা ফিরে ফিরে কেদারনাথকে দেখতে দেখতে নেমে এলাম।

কেদার, বদ্রীর অধিবাসীরা অর্থাৎ গাড়োয়ালরা বড় দরিদ্র। যখন যাত্রীরা তাদের গ্রামের পাশ দিয়ে যায়, তখন ছোট ছোট গাড়োয়াল ছেলেমেয়েরা, এমন কি বড় বড় মেয়েরাও, "শেঠজি, পাই পয়সা, শেঠজি, এক পাই পয়সা" করতে করতে তাদের সঙ্গে কিছুদূর পর্য্যন্ত যাবে; তবে "পয়সা নেই" বললে আর তারা চায় না। গাড়োয়ালদের প্রধান উপজীবিকা চাষ। চাষ এখানে দেখবার মত জিনিষ। সমস্ত কেদারের রাস্তায় দেখা যায়, পাহাড়ের উপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত যেন সোপানশ্রেণী। এই সোপানশ্রেণীর সমতল

জায়গায় চাষ করে এরা। এরা খুব পরিশ্রমী। গাড়োয়াল মেয়েরাও বড় বড় বোঝা পিঠে নিয়ে পাহাড়ের গায়ে অক্লেশে ঘোরাফেরা করে।

আমরা যখন নালাচটীর কাছাকাছি এসেছি তখন "এই ত আমাদের গোবিন্দ" বলে একটা আওয়াজ কানে আসতে চেয়ে দেখি, এক চায়ের দোকানে আমার সেই ট্রেনের যাত্রীরা বসে চা পান করছেন। আমাকে দেখে তাঁদের কি আনন্দ! আমাকে ঘিরে কত প্রশ্ন! একজন বললেন,

কেদারনাথের নিকটে তুষার-রেখা

"বাব! তুমি ত ঘুরে এলে; আমরা যেতে পারব ত?" আর একজন বললেন, "আর কত দিন লাগবে পৌঁছতে? আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে বাবা!" আমি তাঁদের অভয় দিয়ে বললাম, নিশ্চয় পারবেন, এই ত শেষ করে এনেছেন। আর দিন দুই হাঁটলেই পৌঁছে যাবেন। প্রায় আধ ঘণ্টা কথাবার্তার পর আবার বিদায়ের পালা। বৃদ্ধারা আমার মাতৃস্থানীয়া। তাই তাঁদের বাৎসল্য আমাকেও আকুল করে তুলেছিল। সজল চোখে পরস্পরের দুঃখের ব্যবধান দেখতে দেখতে দৃষ্টির আড়ালে এগিয়ে এলাম।

৩রা জুন আমরা উখীমঠে এলাম। শীতকালে (অর্থাৎ মহালয়ার পর থেকে) যখন কেদারনাথে বরফ পড়ে, তখন এই উখীমঠে কেদারনাথের পূজা হয়। কেদারনাথ ছ'মাস বন্ধ থাকে, আবার অক্ষয়তৃতীয়ার কাছাকাছি খোলা হয়। ৪ঠা জুন, আমরা তুঙ্গনাথ পৌঁছলাম। তুঙ্গনাথ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১২,০৭৯ ফুট উঁচু। কেদারখণ্ডের মধ্যে তুঙ্গনাথের উচ্চতাই বেশী। এখানে একটি শিবের মন্দির আছে। তুঙ্গনাথকে তৃতীয় কেদার বলা হয়। তুঙ্গনাথ একটা পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত; তাই তুঙ্গনাথ থেকে হিমালয়ের দৃশ্য খুব চমৎকার দেখায়। যেন মনে হয়, হিমালয়ের সমান উচ্চতায় উঠে গিয়েছি; বহু পাহাড় অনেক নীচে মনে হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য, সেদিন এত মেঘ করেছিল যে, তুঙ্গনাথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্পুর্ণ ভাবে উপভোগ করতে পারি নি। আমরা পুজা, দর্শনাদির পর বেলা দেড়টার সময় ভুলোকণা চটীতে এসে পৌঁছলাম। সেদিন আমাদের খুব পরিশ্রম হয়েছিল; তুঙ্গনাথ থেকে নামবার সময়ে খুব উৎরাই পেয়েছিলাম। জায়গায় জায়গায় এত ঢালু যে, মনে হয় গড়িয়ে পড়ে যাব। তুঙ্গনাথ থেকে নামবার পথটা শঙ্কাজনক হলেও একত্রে সবাই মিলে হৈ হৈ করে নামতে বেশ আনন্দ হচ্ছিল। পথটি বেশ উপভোগ্য।
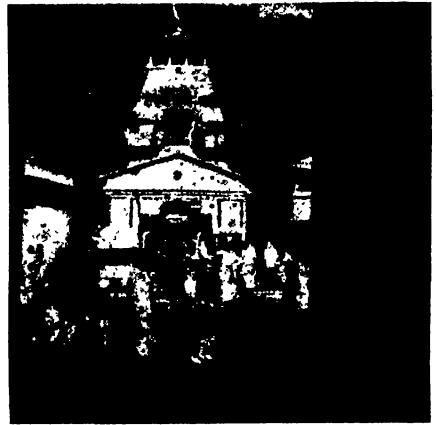
অগস্ত্যমুনির মন্দির

৫ই জুন আমরা গোপেশ্বর হয়ে লালসাঙ্গা বা চামৌলি এসে পৌঁছলাম। আমরা চামৌলিতে যখন পৌঁছলাম, তখন বেলা পাঁচটা কি ছটা হবে। এখানে এক হোটেলে মিঃ এস. এস. কর বলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি বর্ম্মাশেলের রিটায়র্ড চীফ ল' অফিসার; কলকাতায় থাকেন। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে বেরিয়েছিলেন তীর্থ-দর্শনেচ্ছায়। নগরের কোলাহল, মানুষের স্বার্থপরতা থেকে দূরে, বহু দূরে এক শান্ত সুন্দর প্রকৃতির কোলে ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাদের আপন করে নিলেন। সেই সঙ্গে আমাদের দল আরও ভারী হ'ল। রান্না-খাওয়ার ভার তাঁরাই নিলেন। শুধু তাই নয়, দু'বেলা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়াতেন কর-গৃহিণী। কেদার-বদ্রীর পথে প্রধান খাদ্যদ্রব্য হ'ল—চাল, ডাল, আলু, আটা, ঘি, তেল, কয়েক প্রকার মশলা, দুধ ও জিলাপী। বদ্রীর পথে দুধ পাওয়া দুরূহ। যদিও পাওয়া যায়, দুর্ম্মূল্য। সমস্ত চটীতেই এইপ্রকার খাদ্যদ্রব্য ও রান্নার সরঞ্জাম পাওয়া যায়।

অগস্ত্যমুনির আর একটি মন্দির

চামৌলি বেশ বড় শহর। পাশ দিয়ে অলকানন্দা বয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করবার মত। চামৌলি হ'ল বদ্রী থেকে কেদার যাবার পৃথক পথ। আমার মতে যাঁরা বদ্রী হয়ে কেদার যান, তাঁরা ভুল করেন। কারণ বদ্রী হয়ে কেদার যেতে হলে পথে প্রায় দশ-পনর মাইল রাস্তা টানা চড়াই ভাঙতে হয়। এতে কষ্ট হয় অত্যধিক। যাঁরা শুধু বদ্রী যেতে চান তাঁরা কোটদ্বার থেকে টানা বাসে চামৌলি যেতে পারেন। চামৌলি থেকে বদ্রীনারায়ণ মাত্র আটচল্লিশ মাইল। দু'এক বৎসর হ'ল চামৌলি থেকে আরও দশ মাইল এগিয়ে বাস পিপুলকুঠি পর্যন্ত যাচ্ছে। পিপুলকুঠি থেকে হাঁটাপথে বদ্রীনারায়ণ সাঁইত্রিশ মাইল মাত্র।

ক্রমশঃ

ঈশ্বর

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

বাক্‌মনেরি নও ত গোচর হয় না তোমার বিশ্লেষণ
বৈজ্ঞানিকে পায় নি নাগাল বিজ্ঞানে,
ব্যাখ্যা তোমার করতে গিয়ে চিন্তার হ'ল পক্ষাঘাত
বস্তুবাদের বুদ্ধি ?—তাদের ধিক্ জ্ঞানে ?
মনুষ্যেরি মধ্যে যারা মনস্বী ও মহাপ্রাণ
আকাশসম অসীম তাদের মন-গগন,
মনের গতির সূক্ষ্ম তলায় প্রজ্ঞালোকের দর্পণে
তোমার তারা নাগাল পেল চিরন্তন !

হঠাৎ তোমার স্পর্শ পেয়ে হর্ষ কি সুখ তাদের মনে
জানলো তোমার সত্ত্বা তারাই ঠিক করি',
ঊর্দ্ধে অধে মধ্যে পাশে সর্ব্ব পরমাণুর মাঝে
অবস্থিতি তোমার যে সব দিক্ ভরি'।
তখন তাদের তৃষ্ণা আরও জাগলো মনে দেখতে তোমায়
তোমার কোনও সত্যিই আছে রূপ কিনা ?
মন ভেদিয়া তখন তারা আত্মায় হ'ল মগ্ন যে
ঝঙ্কারিয়া বাজলো তাদের প্রাণ-বীণা।

অনন্ত এই আকাশ-তলে মন-গগনের মিল যেথায়
সেথায় তারা দেখল তোমার রূপভাতি,
দেখল তোমার সাকার এবং আকার-বিহীন অঙ্গ যে,
বিহ্বল হয়ে তোমায় দিল বুক পাতি।

বন্ধু, তোমায় সত্য জেনে তথ্যে তারা জ্ঞান-পুঁথির
বিশ্লেষণে করল প্রমাণ দর্শনে,
সত্যি করেই অস্তি তোমার লক্ষ হাত ও লাখ পদে
দেখল তোমায় ধন্য হ'ল স্পর্শনে।

দেখল তুমি সত্যিই আছ, ভরল হৃদয় শান্তিতে
ভাবনাবিহীন ঘুচল সবার সন্দেহ,
কেন্দ্রবিহীন মানব-নারী কেন্দ্র পেয়ে স্বস্তিতে
সুস্থ হয়ে তোমায় দিল মন দেহ।
বিজ্ঞানীরা দম্ভে আজও করছে প্রমাণ নেই তুমি
বন্দনাগান গাচ্ছে তারা বিদ্যুতের,
শিবকে তারা দেখল না তো দেখল শুধুই শক্তিকে
নৃত্য তারা দেখল শুধুই শিবদূতের।

কল্পনাতে মূর্ত্তি রচি' তোমায় যারা পূজলো প্রভু
ঐ চরণে আত্মাদেহ মন দানি',
তাদের সাথে কইলে কথা বর দিলে গো প্রাণবঁধু
ধন্য তারাই তোমার যারা সন্ধানী।
আমায় যেদিন করলে দয়া দেখনু তোমার চাঁদবদন
মন-বিপিনে জাগল আমার ফুলবাগান,
বাস্তবেরি মূর্ত্তিতে মোর সদাই থেকো সম্মুখে
অন্তিমেতে দয়াল দিয়ো পরিত্রাণ।

রক্তরাখী

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

৫

কিছুদিন পর এক সন্ধ্যায় তড়িং রাস্তায় বাহির হইলে তাহার মনে হইল কে তাহার পিছু লইয়াছে। তড়িং কিছুক্ষণ এগলি সেগলি করিয়া অনুসরণ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইয়া এক গলির মধ্য দিয়া গঙ্গার ঘাটে আসিয়া নামিল। দূর হইতেই লক্ষ্য করিল, প্রতিমা ঘাটের জলের কাছে এক সিঁড়িতে বসিয়া কি করিতেছে।

প্রতিমাকে আজ চেনা মুশকিল। গৈরিক বাস পরিত্যাগ করিয়া খাঁটি হিন্দুস্থানী মহিলার বেশ আজ তাহার অঙ্গে।

প্রতিমা কোঁচড় ভর্তি করিয়া ফুল লইয়া আসিয়াছিল। একা একা বসিয়া এক একটা করিয়া ফুল ভাসাইয়া দিয়া নিজের মনেই হাসিতেছিল।

সন্ধ্যা গড়াইয়া তখন রাত্রির অন্ধকার জমাট বাঁধিবার উপক্রম করিতেছিল। গঙ্গার অপর পারে গাছগুলির আড়াল ঠেলিয়া পাতলা সাদা মেঘের অন্তরালে থাকিয়া চাঁদ অন্ধকারকে ফাকাশে করিয়া দিল।

কয়েকদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর আজ দিন দুই বর্ষণ ক্ষান্ত হইয়াছে। কিন্তু অসম্ভব গুমটে লোক অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। অনেকেই নৌকা কিংবা পানসীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে গঙ্গার স্নেহশীতল আলিঙ্গনে।

দুই-একখানা সৌখীন লোকের পানসী হইতে কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতের মূর্ছনা গঙ্গার বুকে আছাড় খাইতেছে।

এদিক সেদিক চাহিয়া তড়িং প্রতিমার পাশে বসিয়া পড়িল। প্রতিমা তড়িংকে লক্ষ্য করিল, কিন্তু কোনও কথা কহিল না। তড়িংও কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল—"দেখেছ প্রতিমা, এই যে অবিরাম স্রোত, এ চলেছে ত চলেছেই। হিমালয়ের শিলা ভেদ করে তার যাত্রা সুরু হ'ল। পথের সকল বাধা কাটিয়ে সে চলেছে তার স্থির লক্ষ্যে ঐ দূর সমুদ্রে—মিলনতীর্থে। তার এই অভিসার রোধ করতে পারে এমন শক্তি জন্মায় নি পৃথিবীতে প্রতিমা! তুমি বাংলাদেশের সন্তান—মনে আছে নিশ্চয় সেই বৈষ্ণব কবির কণ্ঠে—"একলি চলত রাধা, কিছু নাহি মানয়ে বাধা—পন্থ বিপথ নাহি মান।"

তড়িং নিজের কথায় নিজেই কৌতুক বোধ করিয়া হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "তুমি হয়ত ভাবছ তড়িংদা বিপ্লবী, তার আবার বৈষ্ণব-কবিতা কেন। কিন্তু কি জান, বাংলার আকাশ বাতাস বৈষ্ণব কবিতায় ভরপুর। বাঙালী হয়ে তার রস যে প্রতি নিশ্বাসে গ্রহণ করেছি। এর হাত থেকে কোন বাঙালীরই রেহাই নেই প্রতিমা।"

"গান আর কাব্যছন্দ এ নিয়েই বোধ হয় মানুষের জন্ম। কেউ তাদের প্রকাশ করে দশ জনকে অবাক করে, আবার কারুর জীবনে ওটা বয়ে যায় ফল্গুধারায়।"

"কিন্তু তুমি যে বললে নদীর অবিরাম গতির কথা · এর সঙ্গে তোমাদের মিল কোথায়! নদীর গতিপথ শস্যশ্যামল আর তোমাদের ধ্বংসের তাণ্ডব।"

"নতুন করে গড়তে হলে অনেক সময় পুরোনোকে ভেঙে ফেলতে হয়। নদীও তাই করে। এক পার ভাঙে আর তার পলিমাটি বয়ে নিয়ে যায় অপর পারে দূর দূরান্তে দেশান্তরে। তারই জমাট আলিঙ্গনে মাটি হেসে উঠে বুকভরা শ্যামল স্নেহে। ভাঙনের কূলে কূলে জন্ম নেয় নবজীবনের সঙ্গীত।"

"কিন্তু আমাদের এই পুরাতন সমাজের মধ্যে যদি কোন মঙ্গল না-ই থাকবে তবে এতদিন টিকল কি করে?"

"টিকে থাকাই কিছু স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। জীবনের লক্ষণ গতি। আমাদের সমাজ সে গতি হারিয়েছে। আজিকার পারি-পার্শ্বিকের পরিপ্রেক্ষিতে সে অচল—মৃত। তাই একে ফেলে দিয়ে আমাদের পুঁততে হবে নতুন চারা, আবার জন্মাবে বিরাট সমাজ।"

আস্তে আস্তে একখানা ছোট ডিঙ্গি তাহাদের পাশে আসিয়া থামিল। তাহারা আলোচনা বন্ধ করিয়া নৌকায় উঠিলে অবিলম্বে নৌকা মাঝ নদীতে গিয়া একখানা পানসীর গায়ে ভিড়িল। তড়িং ও প্রতিমা পানসীতে উঠিলে ডিঙ্গি চলিয়া গেল। পানসী স্রোত ঠেলিয়া উজানে চলিতে লাগিল।

তড়িং রমেনকে একান্তে ডাকিয়া কহিল—"প্রতিমাকে এনেছি পানসীতে স্বাভাবিক আবহাওয়ায় সৃষ্টি করতে। তোমরা গান-বাজনার আয়োজন কর, বাইরে যেন এটা সবাই প্রমোদ তরণী বলেই মনে করে। দেখ বাংলা গান যেন কেউ না গায়, ওতে বিপদ হতে পারে।"

তড়িং রমেনকে নির্দেশ দিয়া ভিতরে ঢুকিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল।

সর্দার বলবন্ত সিং কহিলেন—"উৎসাহ জাগিয়ে রাখবার জন্য আমাদের একটা কিছু করতে হবেই। মীরাট, দিল্লী, লাহোর, ফিরোজপুর, রাওয়ালপিণ্ডি আর আম্বালা ক্যান্টনমেণ্ট থেকে যা সংবাদ পাচ্ছি তা থেকেই আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। উৎসাহে ভাটা পড়লে আবার নতুন করে সুরু করতে হবে। দলগতভাবে কিছু না হলে, আমার ভয় হচ্ছে কেউ কেউ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হবে, তার ফল হবে সমিতির পক্ষে বিষময়।"

পেশোয়ার হইতে আসিয়াছেন ডাঃ কিষণচাঁদ। তিনিও সর্দারজীর মত সমর্থন করিয়া কহিলেন—"কাবুল, হিরাট, বোখারা, তাসখেণ্ট এবং আরও সব জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ-ব্যবস্থা আর

টিকিয়ে রাখতে পারা যাবে বলে ত মনে হচ্ছে না। কর্ম্মীদের পক্ষে আর কতদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকা সম্ভব তা অনিশ্চিত। খাসনভ থেকে মিঃ রায়, মেশেদ থেকে মিঃ আইয়ার জানিয়েছেন যে তাঁরা ক্রমেই সন্দেহের আওতায় এসে পড়েছেন, তাঁরা আর বেশীদিন ওখানে থাকতে পারবেন না।"

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন সোমেশ-বাবু। এই যুক্তি তিনি সমর্থন করিতে না পারিয়া কহিলেন, "বাংলাদেশে সমিতির অবস্থা যদিও বেশ ভাল এবং আপনারা যে পরিস্থিতির কথা বললেন তার গুরুত্ব যে আমি অস্বীকার করি তা নয়, তবুও চারদিক বিবেচনা না করে বিপদের ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল।"

মিঃ ভেলিংকার এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন। সর্দ্দার ও কিষণচাঁদ ডাক্তারের মতামত তাঁহার মনোমত হয় নাই। সোমেশবাবুর কথায় নিজের যুক্তি খুঁজিয়া পাইয়া উৎসাহভরে কহিলেন, "ঠিক বলেছেন সোমেশবাবু। নরম করে পা না বাড়ালে চোরাবালিতে ডুবে মরতে হতে পারে।"

সোমেশবাবু তাহার পূর্ব্বকথার জের টানিয়া কহিতে লাগিলেন— "নিশ্চয়, সমিতি ত নষ্ট হবেই, তা ছাড়া শাসকশ্রেণী অত্যাচারের স্রোতে দেশে যে ভীতির বান বইয়ে দেবে, এক যুগে তা কাটিয়ে উঠতে পারবেন কিনা কে জানে।"

"অতি খাঁটি কথা"—সায় দিয়া মন্তব্য করিলেন ভেলিংকার।

এতক্ষণ তড়িৎ সকলের মতামত শুনিতেছিল; কোন মন্তব্য করে নাই। সকলেই তাহার মুখের দিকে তাকাইতে তড়িৎ কহিতে লাগিল—"অবশ্য অভ্যুত্থান করা না করা—আপনারা সবাই মিলে সিদ্ধান্তে পৌঁছলেই সম্ভব, নচেৎ কারুর ব্যক্তিগত ইচ্ছায় নয়। পৃথিবীর ইতিহাস হবে এ বিষয়ে আমাদের বিবেচ্য। তবে আমার মনে হয় আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে, সুযোগ সহসা সৃষ্টি করাও যায় না, বা হাত পাতলেই পাওয়া যায় না। আজ যদি সুযোগ উপস্থিত হয়ে থাকে তবে আমাদের তাকে কাজে লাগাতে হবেই। আমাদের সমস্ত ব্যবস্থা গোপন, এর ফলাফল আপনারা নিত্য হাড়ে হাড়ে অনুভব করছেন। যা গোপন তা বেরিয়ে পড়বেই—এ অবস্থা ক'দিন টিকবে কে জানে। চেষ্টাবিহীন আত্মপ্রকাশের চেয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শ্রেয় নয় কি?"

"কিন্তু একটা সত্য আপনারা নিশ্চয় জানেন যে আমাদের দেশের অতি অল্পসংখ্যক লোকই মাত্র স্বাধীনতা তথা জনজাগরণ সম্পর্কে সচেতন। জনগণের প্রস্তুতি ভিন্ন আমাদের প্রচেষ্টা যে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে।"—মন্তব্য করিলেন সোমেশবাবু।

"সম্পূর্ণরূপে তৈরি কোন দিনই হবে না দেশ। কর্ম্মের মধ্য দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে খাঁটি মানুষ। একেবারে খাঁটি লোক কোন দেশেই খুব বেশী জন্মায় না।

আজ যে সমিতি গড়ে তুলেছেন তার সভ্যদের পুলিস যদি ধরে নাও নেয়, তবুও কিছুদিন পরে আপনিই তারা সমিতি ছেড়ে দেবে। অধিকাংশের বেলায়ই এটা সত্য। এটাই কি অভিজ্ঞতার কথা নয়? আমাদের বেলায়? বারে বারে কি তাই হচ্ছে না? আমাদেরই কি বারে বারে ছত্রভঙ্গ সমিতিকে গড়ে তুলতে হচ্ছে না।"

ইহার পরও আলোচনা কিছুক্ষণ চলিয়াছিল। সিদ্ধান্ত হইল সমস্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই কার্য্যে হাত দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তড়িৎকে সমস্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য দিল্লী, মীরাট ও রাওয়ালপিণ্ডি যাইতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইল।

একখানা পানসী তখন তাহাদের পানসীকে অতিক্রম করিয়া গেল। পানসীখানা নারীকণ্ঠের সুললিত সঙ্গীতে মাতোয়ারা। মাঝে মাঝে বাহবা বাহবা করিয়া বিকট চীৎকার চলিতে লাগিল।

তড়িৎ বাহিরে আসিয়া দেখিল তাহারা রামনগর ছাড়াইয়া আসিয়াছে। পানসী ফিরাইয়া লইতে উপদেশ দিয়া ভিতরে গেল। এতক্ষণ পানসী চলিয়াছিল উজান বাহিয়া দক্ষিণ মুখে, এবার উত্তর দিকে ফিরতিমুখে ভাটির টান পাইয়া পানসী কিছুক্ষণের মধ্যেই আসিয়া গঙ্গাবক্ষে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিল।

পানসী হইতে সকলেই দুই তিনখানা ছোট ডিঙিতে নামিয়া গেল। সর্দ্দার বলবন্ত সিং প্রতিমার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, "মাঈ, তোর দীর্ঘজীবন কামনা করি। ভগবান তোকে এই কর্ম্মের শক্তি দিন।" কথা কহিতে কহিতে তাহার প্রশস্ত বুক চিরিয়া দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "জানিস, তোর বয়সী ছিল আমার মেয়ে, বেঁচে থাকলে সেও হয়ত আজ এমনি করে পাশে দাঁড়াত। তার বড় ছিল এক ব্যাটা—কাল খবর এসেছে সেও মেসোপটেমিয়ার লড়াইয়ে প্রাণ দিয়েছে। ইংরেজের হয়ে লড়াইয়ের ফলে এ মৃত্যু তাকে বীর পদবী দেবে কি না জানি না, কিন্তু সে ভীরু ছিল না।"

বলবন্ত সিং আর কিছু বলিতে পারিলেন না—উদ্বেলিত হৃদয় কণ্ঠরোধ করিয়াছে—তিনি বোধ হয় আত্মগোপন করিবার জন্য আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

প্রতিমাও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সর্দ্দারের ডান হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে লইয়া আবেগভরা কণ্ঠে কহিতে লাগিল, "পিতাজী, আশীর্ব্বাদ করো যেন আমি তোমার কন্যার স্থান পূর্ণ করতে পারি। যে আদর্শে ব্রতী হয়েছি তা উদ্‌যাপন করবার শক্তি যেন না হারাই।" কিছুক্ষণ থামিয়া পুনরায় কহিতে লাগিল, "যদি অনুমতি হয় তবে একদিন বাড়ীতে গিয়ে উপদেশ নিয়ে আসব।"

সর্দ্দার প্রতিমার কথার জবাব দিতে পারিলেন না। তাঁহার চোখে জল চক্ চক্ করিয়া জ্বলিতেছে।

তড়িৎ ও প্রতিমা যে ডিঙিতে নামিয়াছিল তাহা ঘাটের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। ঘাটটা সাধারণতঃ নির্জ্জন থাকে—

একে ভাঙা সিঁড়ি, তার উপর কাছের শ্মশানের ধোঁয়ায় এ ঘাট সাধারণের পক্ষে এক রকম বর্জ্জনীয়।

অস্পষ্ট চাঁদের আলো হইলেও লক্ষ্য করিয়া মনে হইল কয়েকটি লোক ঘাটে চঞ্চল ভাবে ঘোরাফেরা করিতেছে। ঘাটের পাশে জনহীন মন্দিরের পাশ দিয়া একটা বাতি বারতিনেক জ্বলিয়া নিভিল। তড়িৎ বিপদের সঙ্কেত পাইয়া মাঝিকে ঘাটের দিকে যাইতে নিষেধ করিল। পানসীর দিকে চাহিয়া দেখিল অনেক দূর ভাটির টানে চলিয়া গিয়াছে।

ডিঙি মাঝ নদীতে ভাটির টানে চলিতেছে। তড়িৎ প্রতিমাকে কহিল, "তুমি বাঙ্গাল দেশের মেয়ে, নদীর দেশের লোক ---জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নদী সাঁতরে যেতে পারবে ত?"

"পারব না বললেও আর এখন চলবে না।"—কাপড় কোমরে বাঁধিতে বাঁধিতে জবাব দিল প্রতিমা।

"আমরা আস্তে আস্তে জলে নেবে যাচ্ছি, তুমি নৌকো নিয়ে ও ঘাটেই ফিরে যেও, তা হলে আর ওদের সন্দেহ থাকবে না।" মাঝিকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল তড়িৎ।

তড়িৎ ও প্রতিমা জলে নামিয়া কিছুক্ষণ নৌকার ধার ধরিয়া ভাসিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। প্রতিমাকে সাহস দিবার জন্য কহিল, "তুমি আমার কাছাকাছি থেক, কষ্ট হলে আমার কাঁধে ভর দিও। বেশী ক্লান্ত হলে বলো কিন্তু, আমি তোমাকে নিয়ে অনায়াসে এইটুকু সাঁতরে যেতে পারব। আজ এই তোমার প্রথম, কিন্তু আমাকে এমনি অবস্থায় পদ্মায় অনেক বার সাঁতরাতে হয়েছে।"

চাঁদের আলো গঙ্গার বুকে তখন হীরার টুকরা ছড়াইয়া ঢেউয়ের তালে তালে নাচিতেছে। জলের অনিশ্চিত ভীতি তখন প্রতিমার আর নাই। কিসের এক অজানা আনন্দ তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। তড়িৎকে আস্তে আস্তে কহিল, "জান তড়িৎদা, চাঁদের আলোয় তোমার সঙ্গেই চলেছি ভেসে, আমার কেন জানিনে মরতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

"ও কথা বলতে নেই, আমাদের ব্রত এখনও অসম্পূর্ণ।"—জবাব দিল তড়িৎ।

স্রোত ঠেলিয়া ওপারে উঠার চেষ্টা বৃথা মনে করিয়া তড়িৎ পুনরায় কহিতে লাগিল, "আজ রাতে আর আমাদের ওপারে যাওয়া হবে না, এ পারেই আশ্রয় নিতে হবে।"

"তা হোক এমনি শুভ মুহূর্ত্ত জীবনে কদাচিৎ আসে—মনে হচ্ছে আজ এসেছে আমার জীবনের শুভরাত্রি—মধুরাত্রি। এ ত সলিলশয্যা নয়, ফুলশয্যা।"

"কিসের মধুরাত্রি ফুলশয্যা প্রতিমা?"—প্রশ্ন করিল তড়িৎ।

প্রতিমা কথাটা এত খেয়াল করিয়া বলে নাই। তড়িতের প্রশ্ন তাহাকে লজ্জিত করিল। ফুলশয্যা, শুভরাত্রি কথা দুইটি বলিয়া ফেলিয়া কেমন একটা অপরিসীম লজ্জা আসিয়া প্রতিমার কণ্ঠরোধ করিল। নববর্ষার এই স্ফীত নদীবক্ষে দুর্ব্বার স্রোতে এই সঙ্কটের মধ্যেও লজ্জা আসিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া ফেলিল। কিন্তু কোন কিছু না বলা আরও লজ্জাকর মনে করিয়া কহিতে লাগিল, "এতদিন আমার জীবন চলেছিল এক ভাবে—তুমি এনে দিলে আমার জীবনে নূতনের সন্ধান—আজ রাতে হ'ল সেই নবজীবনের সঙ্গে মিলন—তাই ত বলি এল মধুরাত্রি।"

"তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ প্রতিমা। আর একটু কাছে এসে আমার কাঁধে হাত রাখ—সাঁতরাবার চেষ্টা কর, প্রয়োজন হলে আমাকে জড়িয়ে ধরতে দ্বিধা করো না। ওতে আমার কোন অসুবিধে হবে না।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহারা রাজঘাটের অপর দিকে বালুচড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতিমা আপনার ক্লান্ত দেহ এলাইয়া দিল বালুচড়ার উপর। "তুমি বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছ প্রতিমা"—এই কথা বলিয়া তড়িৎ প্রতিমার মাথা নিজের কোলের উপর উঠাইবার জন্য হাত বাড়াইলে প্রতিমা কহিল, "দরকার নেই তড়িৎদা। আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না।"

ওপারে যাওয়ার আর কোন আশাই নাই। সুতরাং তাহারা উভয়েই বালুশয্যা গ্রহণ করিল। ঘুম যে কখন আসিয়া তাহাদের ক্লান্তির উপর যবনিকা টানিয়া দিয়াছিল তাহা তাহারা কেহই টের পায় নাই।

৬

দিন দুই পরে প্রতিমা শিখ রমণীর বেশে সজ্জিত হইয়া, বাঁ কটিতে কৃপাণ ঝুলাইয়া বলবন্ত সিংহের বাসার উদ্দেশে ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে রওনা হইল।

কাশী শহর হইতে বরাবর ক্যাণ্টনমেণ্ট যাওয়া নিরাপদ নয় মনে করিয়া মোগলসরাই গিয়া সেখান হইতে ট্রেনযোগে খুব ভোরেই ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে নামিল। সেখান হইতে একখানা টাঙ্গা করিয়া বলবন্ত সিঙের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

সর্দ্দারজী তখন আপিসে চলিয়া গিয়াছেন। বাড়ী ঢুকিয়া এঘর ওঘর ঘুরিয়া চারিদিকের অগোছালো অবস্থা দেখিয়া ব্যথিত হইল। ঝি, চাকর ডাকাইয়া নিজে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল পরিচ্ছন্নতার পরিবেশ সৃষ্টি করিতে। এতটা অসঙ্কোচ ব্যবহার দেখিয়া সকলেই মনে করিয়াছিল সর্দ্দারজীর কন্যা আসিয়াছে।

আপিসে খবর চলিয়া গিয়াছিল যে, তাহার মেয়ে আসিয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিলেন নিশ্চয় প্রতিমাই আসিয়াছে। তিনি অবিলম্বে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

বাড়ীতে ঢুকিয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া সর্দ্দারজী বিস্মিত হইলেন। "এ কি করেছিস মা—এ যে আমার বাড়ী তাই ত মনে হচ্ছে না।"

"পিতাজী, তোমার ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে সবাই তোমার উপর দৌরাত্ম্য করে। এতগুলি ঝি চাকর, কিন্তু না ঘর-দোর না বাসন-কোসন কিছুই এরা চোখে দেখে ঠিক করে রাখে না।"

সর্দ্দারজীর অপলক দৃষ্টি প্রতিমার উপর নিবদ্ধ। প্রতিমা

পুনরায় কহিতে লাগিল, "পিতাজী, আর দেরী নয়, স্নান সেরে এসো, আহারাদির পর সব কথা হবে।"

বৃদ্ধ শিখের বিশাল বুক চিরিয়া এক গভীর নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে কহিলেন, "এমনি মিঠে-কড়া শাসন অনেক দিন ভুলে গেছি। একটু উপভোগ করতে সময় দে মা।" কথা বলিতে বলিতে প্রতিমাকে কাছে টানিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া তাহার উদ্বেলিত হৃদয়কে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই স্নান করিতে চলিয়া গেলেন।

স্নানের পর সর্দ্দার তাঁহার শয়নকক্ষে আসিয়া দেয়ালে বিলম্বিত একখানা তরবারি ফুল দিয়া সাজাইতেছিলেন। প্রতিমা কখন আসিয়া তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে। তরবারির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া পিছন ফিরিয়া প্রতিমাকে দেখিয়া কহিলেন, "জানিস মা, এই তলোয়ার নিয়েই আমার পিতামহ শেষ শিখযুদ্ধে মহাবীর শের সিংহের পল্টনে যোগ দিয়ে দেশ রক্ষা করতে প্রাণ দেন। জীবনভোর এর পূজোই করলাম। কবে যে একে হাতে করে আবার মরণ-যজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব শয়তান তাড়াতে, তারই জন্ম প্রতীক্ষা করছি। শুধু লোকদেখানো পূজোয় যে আর মন ভরে উঠছে না।"

"পূজো করবার কি তবে কোন সার্থকতা নেই পিতাজী"—প্রশ্ন করিল প্রতিমা।

"আছে বৈ কি। রোজ অন্ততঃ একবারও পরাধীনতার জ্বালা হৃদয় দিয়ে চিন্তা করবার অবসর পাই।"

"আর দেরী করো না পিতাজী, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে"—কথায় কথায় দেরী হইতেছে দেখিয়া প্রতিমা সর্দ্দারকে তাড়া দিল।

বলবন্ত সিং আহারে বসিয়াছেন। তাঁহার এক পাশে দুইটি বিড়াল, আর এক পাশে একটি কাঠ-বিড়ালী, আর দরজার সামনে একটি কুকুর লেজ নাড়িয়া অপেক্ষা করিতেছে।

প্রতিমা অবাক হইয়া লক্ষ্য করিল ইহাদের সকলের জন্যই কিছু না কিছু আহার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। কাঠ-বিড়ালীটা মাঝে মাঝে সর্দ্দারজীর ঘাড়ে উঠিয়া লেজ উঠাইয়া চিক্ চিক্ আওয়াজ করিয়া তাহার ভাগের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছিল।

"যুদ্ধে মানুষ খুন করা যার পেশা, তাকে এই নিরীহ প্রাণীগুলি বিশ্বাস করে কি করে তাই অবাক হয়ে ভাবছি পিতাজী।"

"মা, আমি হলে জিজ্ঞাসা করতাম, এত ভালমানুষ হয়েও মানুষ মারার পেশা নিলে কি করে"—সকৌতুকে জবাব দিলেন বলবন্ত সিং।

"হেরে গেলাম পিতাজী"—

"আসলে কি জানিস মা, শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করতে না পারলে আমি যে বংশের কলঙ্ক হবো মা, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে কারুর বিরুদ্ধে সামান্যতম অস্ত্রপ্রয়োগ করতেও আমার ঘোর আপত্তি আছে। এই নিরীহ প্রাণীগুলি, এরা আমার মান-ইজ্জতের বিরোধী নয়। ওরা আমায় ভালবাসে—তাই আমাকেও ওদেরকে ভালবাসতে হয়। আমার ভালবাসায় আমি বুঝতে পারি ওরা কতখানি বিগলিত হয়।"

"তুমি ওদের ভাষা বুঝতে পারো"—কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল প্রতিমা।

"হৃদয় থাকলে বুঝতে কষ্ট হয় না মা।"

সর্দ্দার আহার করিতে লাগিলেন। প্রতিমা উঠিয়া গিয়া আরও কিছু তরকারি আনিয়া দিল। পাচক দুধ লইয়া আসিল। প্রতিমা দেখিয়া বলিল, "দুধ যে বড্ড গরম রয়েছে, বাটিটা জলের উপর রেখে ঠাণ্ডা করে নিয়ে এস।"

কথায় কথায় আহার শেষ হইল। সর্দ্দারের মুখে তৃপ্তির প্রশান্তি। তিনি আপিসে চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন বিশেষ কারণে যাইতে পারিবেন না।

পরে প্রতিমা নিজে আহার শেষ করিয়া বলবন্ত সিংএর শয়নকক্ষে আসিল, সর্দ্দার তখন বিছানায় অর্দ্ধশায়িত। প্রতিমা তাঁহার পায়ের নিকট উপবেশন করিলে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল গুরু নানকের একখানা ছবির দিকে। প্রতিমা জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা পিতাজী, গুরু নানক প্রচার করলেন প্রেমের ধর্ম্ম, কিন্তু তাঁর শিষ্যগণ মানুষকে করল চ্যালেঞ্জ উন্মুক্ত কৃপাণে, এ দুয়ের সামঞ্জস্য ত খুঁজে পাচ্ছি না।"

"প্রেমই মানুষের ধর্ম্ম। প্রেম মানুষকে সহজ, সুন্দর আর সরল করে তোলে। প্রেমের মহিমায় মানুষ মহিমান্বিত—সমস্ত দীনতা হীনতার ঊর্দ্ধে। প্রেম যেমন কুসুমকোমল তেমনি বজ্রেও বাজে প্রেমের বাণী। যা ভালবাসি তাকে রক্ষা করতেই না রুখে দাঁড়াতে হয়। তাই ত দেখছ না, বাদশাহী অত্যাচার যখন সীমা লঙ্ঘন করল তখন গুরু গোবিন্দ সিং নিজে তুলে নিলেন আর সাথীদের হাতে তুলে দিলেন এই কৃপাণ ধর্ম্ম রক্ষার জন্য।"

"অপরাধ নিও না পিতাজী, আত্মরক্ষাই কি সব"—প্রশ্ন করে প্রতিমা।

"আত্মরক্ষা দু'রকমেই হতে পারে। সক্রিয় হয়ে শত্রু বিনাশ করে কিংবা আক্রান্ত হলে তাকে প্রতিরোধ করে। আত্মরক্ষা আর আত্মসমর্পণ এক নয়। আত্মরক্ষা করতে পারে বীর, আর আত্মসমর্পণ করে ভীরু কাপুরুষ। প্রয়োজনবোধে বীর আত্মদান করে রক্ষা করে নিজের আর বৃহৎ এক গোষ্ঠীর মর্য্যাদা। এমনি আত্মদানের ইতিহাসই শিখজাতির ইতিহাস মা।"

তিনি বলিতে লাগিলেন, "আত্মরক্ষার প্রয়োজন শুধু শরীররক্ষার জন্য নয় মা, যে আত্মরক্ষা করতে পারে না তার মনও যে ছোট হয়ে যায়। আত্মরক্ষায় পরাঙ্মুখ জাতির মধ্যে দীনতা, হীনতা ও কুশ্রীতা এসে পড়ে, পরাধীনতা চিরস্থায়ী হয়! শিখগুরু ও মহাপুরুষগণ ত নিজের শরীর রক্ষার জন্য কখনও বিন্দুমাত্র ব্যাকুল হন নি। তাঁরা আত্মদান করে জাতির আত্মার মুক্তির পথ খুলে দিয়ে গেছেন।"

কথা কহিতে কহিতে বৃদ্ধের চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—মনে

হইতেছে তাঁহার সারা দেহে যেন যৌবন ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বর্ণনা করিলেন বহু শিখবীরের কাহিনী। তিনি বলিয়া চলিলেন—কাহাকে দেয়ালে গাঁথিয়া মারিয়াছে, কাহার চক্ষু উৎপাটন করা সত্ত্বেও শত্রুর অভিলাষ সিদ্ধ হয় নাই, কে আপন মর্য্যাদা রক্ষার জন্ত বেণীর সঙ্গে মাথা দিয়াছেন।

বহুদিন পর আজ আবার বৃদ্ধের জীবনে জোয়ার আসিয়াছে। অবসাদ, ক্লান্তি কখন সেই স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে তাহা তিনি টের পান নাই। কখন যে দুপুর অপরাহ্নে গড়াইয়াছে—আর অপরাহ্নের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করিয়া সন্ধ্যা পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিয়াছে তাহা কাহারও হুঁস ছিল না। ঝি আসিয়া ঘরের আলো জ্বালিয়া দিয়া গেলে তাঁহাদের চৈতন্ত হইল।

উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব রহিল। বলবন্ত সিং প্রথম কথা কহিলেন, "তোমরা কবে রওনা হচ্ছ মায়ী।"

"আগামী কাল, দিল্লী এক্সপ্রেসে।"

"যা যেমন করেই হোক আমার দিন এক রকম কাটছিল। পুত্র, কন্তা হারা হয়ে অদৃষ্টের সঙ্গে এক রকম আপোষ করে নিয়েছিলাম। কিন্তু তুই এসে যে আমার সব ওলট-পালট করে দিয়ে গেলি মা! আশীর্ব্বাদ করি তোর এত সঙ্কল্প হউক।" সন্ধ্যার আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, প্রতিমাকে দুই বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

প্রতিমা আপনার শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বিদায় লইল।

৮

রাত্রি দশটা কয়েক মিনিটে মোগলসরাইয়ের গাড়ী ছাড়ে। ট্রেন ছাড়িবার মাত্র কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তড়িৎ ও প্রতিমা বেনারস ক্যান্টনমেন্ট ষ্টেশনে উচ্চশ্রেণীর প্রবেশপথ দিয়া হন্ হন্ করিয়া ঢুকিয়া প্রথম শ্রেণীর এক কামরায় উঠিয়া বসিল।

পূর্ব্ব হইতেই বনোয়ারী বিছানা পাতিয়া, সুটকেশ ও ব্যাগ যথাস্থানে রাখিয়া আর্দ্দালীর বেশে অপেক্ষা করিতেছিল। তড়িৎ ও প্রতিমা ঢুকিতেই "সেলাম বাবুজী, সেলাম মাঈজী" সম্ভাষণ করিয়া সসম্মানে সরিয়া দাঁড়াইল।

"বহুত আচ্ছা।"

পরে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া তড়িৎ জিজ্ঞাসা করিল সে কেন আসিয়াছে; অপর যে ছেলেটির আসিবার কথা ছিল তাহার কি হইয়াছে।

বনোয়ারী জানাইল, "পাটনা থেকে যে ছেলেটি এসেছে তার সম্পর্কে রমেনের কাছে আজই চিঠি এসেছে যে ছেলেটি নাকি অসাবধানী, ওকে দায়িত্ব দিয়ে বিশ্বাস করা যায় না। মজঃফরপুরে নাকি ওকে কি কাজে পাঠানো হয়েছিল, সেখানে অনেক ক্ষতি করে এসেছে। তাই বনোয়ারীকেই শেষ পর্য্যন্ত রমেন পাঠিয়েছে।"

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিতেই বনোয়ারী পাশের ভৃত্যদের জন্ত নির্দ্দিষ্ট কামরায় চলিয়া গেল। তড়িৎ ও বনোয়ারী একবার গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া লইল কোন অনুসরণকারী গোয়েন্দা গাড়ীতে উঠিতেছে কিনা।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে প্রতিমা কহিল, "অদ্ভুত লোক এই বনোয়ারী। কখনও এক্কাওয়ালা, কখনও কুলী, আজ ত আর্দ্দালীই সেজে এসেছে। এত যে ছোট কাজ করছে—মুখে সেজন্ত কোন অসন্তোষের চিহ্নও নেই, মনে হয় পরমানন্দেই করছে।"

"মনটা খুব বড় বলেই দেশের কাজে ওর কাছে ছোট বড় কিছুই নেই, বিশেষ করে সমিতির জন্ত"—মন্তব্য করিল তড়িৎ। একটু থামিয়া পুনরায় কহিতে লাগিল, "জান প্রতিমা, সমিতির বিভিন্ন শাখা এবং ব্যক্তির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার কাজে ও হচ্ছে মধ্যমণি, আর এর জন্ত যে ওকে কত দুঃখলাঞ্ছনা সহ্য করতে হয় তার ইয়ত্তা নেই। এই ত সেবার মোগলসরাই ষ্টেশনে নিজের চোখেই ওর যে অপমান আর লাঞ্ছনা দেখলাম তা ভাবলে আজও আমার মন ব্যথায় ভরে উঠে, বনোয়ারীর বন্ধু বলে গর্ব্বে আমার বুক ফুলে উঠে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তড়িৎ থামিয়া গেল। তাহাকে থামিতে দেখিয়া প্রতিমা কহিল, "থামলে কেন তড়িৎদা, বলো না কি হয়েছিল মোগলসরাই ষ্টেশনে।"

"সমিতিরই কাজে ওকে একবার থাকতে হয় মোগলসরাই ষ্টেশনে প্রায় মাসতিনেক। প্রকাশ্যে ডালপুরী বিক্রী করত। এ কাজটিতে যে এত ঝঞ্ঝাট হইতে হয় তা আগে জানতাম না। ষ্টেশনের ছোট-বড় সবাইকে খুশী করে তবে ফেরিওয়ালার কাজের অনুমতিপত্র মেলে। তাকে বহাল রাখতেও হয় প্রতিদিন তাদের খুশী করে। প্রতিদিন লাঞ্ছনা অপমান সহ্য করে নিজের ব্যবসা বজায় রাখতে হয়।

"আমি যাচ্ছিলাম পঞ্জাব-মেলে লাহোরের দিকে, কিছু জিনিষ আমার হাতে পৌঁছে দেবার ভার ছিল ওর ওপর। ডালপুরীর নীচে একটা গোপন খুপরীর মধ্যে লুকোনো ছিল সেই জিনিষ। একটা কনেষ্টবল ওকে মোটে দেখতে পারত না। কারণে অকারণে ওর উপর অকথ্য অত্যাচার করত। গাড়ী এসে প্ল্যাটফরমে ঢুকতেই বনোয়ারী যত গাড়ীর দিকে এগোতে চায় ঐ কনেষ্টবলটা ততই তাকে বাধা দেয়, কিছুতেই তাকে ফিরি করতে দেবে না। একবার ত কয়েকটা ঠোঙা মাটিতে টান মেরে ফেলে দিলে। তবুও বনোয়ারী নিবৃত্ত হয় না দেখে কনেষ্টবলটা আর তার বেয়াদবি সহ্য করতে পারল না, বেটনের আঘাতে তার কপাল ফাটিয়ে দিলে, ঝর ঝর করে রক্ত পড়তে লাগল। যাত্রীদের কেউ কেউ যে এর মৌখিক প্রতিবাদ করে নি তা নয়, তবে ভিড় থাকায় যে যার উঠা-নামায় আর জায়গা দখলের চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। বনোয়ারীও অবশ্য চায় নি যে তাকে ঘিরে ভিড় জমুক। কপালে হাত চেপে ও বাইরে চলে গেল, কিন্তু এরই মধ্যে পরে এক ফাঁকে জিনিষটি আমার হাতে পৌঁছে দিয়ে পুনরায় প্লাটফরমের বাইরে চলে গেল। এ ত একদিনকার কাহিনী মাত্র। ওর জীবনের অনেকগুলি দিনই এমনি ইতিহাসে ভরা।"

বনোয়ারীর কাহিনী শেষ হইতেই তাহার মায়ের কথা মনে পড়িয়া গেল। জীবনে এই প্রথম মাকে ছাড়িয়া সে একরকম নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইয়াছে। আসিবার সময় অবশ্য মা বলিয়াছেন যে তাহার কোনই অসুবিধা হইবে না, কিন্তু তাহার যদি কিছু হয় তবে মা কি করিবেন তাহা ভাবিতেই তাহার মনের মধ্যে মোচড় দিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ী মোগলসরাই ষ্টেশনে আসিয়া থামিল, তাহারা গাড়ী হইতে নামিয়া প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারে অপেক্ষা করিতে লাগিল দিল্লী এক্সপ্রেসের জন্য। গাড়ী আসিল রাত্রি দেড়টায়। মিনিট পনের পর একজন হিন্দুস্থানী রেল-কর্মচারী আসিয়া খবর দিয়া গেল যে তাহাদের জন্য একখানা প্রথম শ্রেণীর কুপে ঠিক করা হইয়াছে। তাহারা যেন অবিলম্বে তাহা দখল করে। আরও বলিয়া গেল তাহারা যেন সাবধানে থাকে। আজকাল একরকম সব গাড়ীর উপরই নজর রাখছে, সামান্য সন্দেহে সব জিনিষ ওলটপালট করছে।

তড়িতের কপালে চিন্তার রেখা পড়িল। লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, "গতকাল বোম্বে মেলে ভেলিংকারের যাওয়ার কথা ছিল, সে নিরাপদে গিয়েছে কি?"

"বেশ মুশকিলে পড়তে হয়েছিল। অনেক কারসাজি করে তবে রেহাই। রাত তিনটে নাগাদ গাড়ী আসে। আমি যখন তার দেখা পেলাম তখন গোয়েন্দারা তাকে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করে তুলেছে। বেগতিক দেখে আমি ওদের পাণ্ডাকে গুড মর্ণিং জানিয়ে ভেলিংকারকে উদ্দেশ করে বললাম কেমন আছেন, গাড়ীতে কোন কষ্ট হয় নি ত?"

ওরা একটু অপ্রতিভ হ'ল—আমায় জিজ্ঞেস করল, 'উনি আপনার পরিচিত নাকি?"

'বিলক্ষণ, ও আমার বাল্য বন্ধু। আজ আপনারা হতাশ হবেন।' তারপর ভেলিংকারকে উদ্দেশ করে বললাম, আজ তুমি এ পথে যাচ্ছ জানতে পেরে তোমার বৌদি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা পাঠিয়েছেন, অপরাধীসহ ফেরত না গেলে অদৃষ্টে কি আছে তা ত বুঝতেই পারছ।'

গোয়েন্দারা সকৌতুক হাসি হেসে এবং মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করে নেমে গেল। আমিও ভেলিংকারকে হাত ধরে নামিয়ে নিয়ে এলাম।

"ভেলিংকার এখন তবে কোথায়"—উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিল তড়িৎ।

"তাকে পরের ট্রেনে তুলে দিয়েছি। সুযোগ বুঝে গার্ডের গাড়ীতে উঠিয়ে দিলাম। গার্ড এংলো-ইণ্ডিয়ান —মাঝে মাঝে দু-এক বোতল মদ ওকে দিই তাতেই খুশী থাকে। আমিও ওর সঙ্গে সসারাম পর্য্যন্ত যাই, সেখান থেকে এক আপ ট্রেনে ফিরে আসি।"

তড়িৎ স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িল। ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, গাড়ী ছাড়িবার আর পাঁচ মিনিট বাকী। কর্ম্মচারীটি কহিল—"আর সময় নেই, আপনারা গাড়ীতে উঠে বসুন।"

"যাচ্ছি, তুমি আর আমাদের সঙ্গে গাড়ী পর্য্যন্ত এস না; কোন কারণে তুমি যদি আউট হয়ে পড় তবে সমিতির খুব ক্ষতি হবে।"

"যাচ্ছি, কিন্তু নজর রাখব"—এই কথা বলিয়া কর্ম্মচারী বিদায় লইল।

এতক্ষণে বনোয়ারী মালপত্র গাড়ীতে উঠাইয়া সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়া দিয়াছে। মিঃ ও মিসেস মণিলালের জন্য রিজার্ভ করা একখানা প্রথম শ্রেণীর কামরা নির্দ্দিষ্ট ছিল। গাড়ীতে উঠিবার সময় প্রতিমা নাম পড়িল—প্রথম তাহার খেয়াল হয় নাই। পরমুহূর্ত্তেই খেয়াল হইতে তড়িৎকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ গাড়ী যে অন্য নামের, আমাদের ত নয়।"

"ও আমাদেরই নাম"—ঈষৎ হাসিয়া জবাব দিল তড়িৎ।

মিঃ ও মিসেস কথা দুইটি হঠাৎ প্রতিমাকে অসীম লজ্জায় ফেলিল। সে তাড়াতাড়ি বাইরের দিকে জানালায় মুখ বাড়াইয়া লুকাইতে চেষ্টা করিল। নানা কথা চিন্তা করিয়া এ লজ্জার হাত হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু এটা একবার চাপিয়া বসিলে সহসা যায় না। মনে হইতে লাগিল—ছিঃ ছিঃ তড়িৎদা, আমার মুখ দেখে কি মনে করবে! সে নিজের মুখের ভাব স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

বনোয়ারী নিজের কামরায় যাইবার সময় কহিল—"মা, তুমি একবার জিনিষগুলি দেখে নিও।"

বনোয়ারী তাহাকে বরাবরই মা বলিয়া ডাকিত, কিন্তু আজিকার সম্বোধন তাহাকে নতুন করিয়া আর এক দফা লজ্জার কথা স্মরণ করাইল। তাহার মানসিক অবস্থাকে স্বাভাবিক করিবার জন্য বৃথাই গোছানো সুটকেশ পুনরায় গুছাইতে লাগিল। এই কাজ আর কতক্ষণ করা যায়। পুনরায় জানালার ধারে গিয়া বসিল।

বিকট চীৎকার করিয়া গাড়ী হুস্ হুস্ করিয়া চলিল। প্লাট-ফরমের আলোগুলি পিছনে পড়িতে লাগিল। ক্রমশঃ যেন অন্ধকার গভীর হইতেছে, কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে গাড়ী একেবারে বিরাট অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। প্রতিমার মনে হইল পরিচিত জগৎ পিছনে ফেলিয়া সেও যেন আজ অজানা অন্ধকারের দেশে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। মনে হইল যেন গাড়ী ভয় পাইয়াছে আর প্রচণ্ড গতিতে বাঁধা লাইনের উপর দিয়া ছুটিয়া পলাইতেছে।

মাকে ছাড়িয়া আসায় এমনিতেই তাহার মন ব্যথাতুর। তাহার উপর এই দারুণ লজ্জাকর অভিনয় তাহার মনকে ভীষণ চঞ্চল করিয়া তুলিল। সে আজীবন সন্ন্যাসীর বেশে ছিল—তাদের মতই নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকারভাবে কাশীর রাস্তায় চলাফেরা করিয়াছে। পরিচিত-অপরিচিত যে-কোন পুরুষের সঙ্গে অকুণ্ঠিতভাবে আলাপ করিয়াছে। অথবা লজ্জার বালাই তাহার কোন দিনই ছিল না। তড়িতের সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিনেও নিজের মনে কোন লজ্জা অনুভব করে নাই। কিন্তু সে ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতেছিল আজ

কেমন করিয়া সামান্য এই দুইটি কথা তাহাকে এমনি ভাবে বিব্রত করিতেছিল।

তড়িৎও মুহূর্ত্তের জন্য সঙ্কুচিত হইয়াছিল। বিপ্লবী জীবন সুরু হওয়ার পর হইতে নানা ভাবে নানা বেশে নাম ভাড়াইয়া সে দুনিয়ায় চলাফেরা করিয়াছে; তবে স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকায় এই প্রথম। কিন্তু আদর্শ তাহাকে দিয়াছে এই সঙ্কোচের হাত হইতে মুক্তি। তড়িৎ প্রতিমার মনের অবস্থাটা আন্দাজে অনুমান করিয়া দুঃখ অনুভব করিল। বেচারা! যুগ যুগ সঞ্চিত সংস্কারের বাঁধন! সে ভাবিল—আমাদের যখন একসঙ্গে এই ভাবে কিছুদিন থাকিতে হইবে তখন উভয়ের এই সঙ্কোচ কিছুতেই ভাল নয়। এই সঙ্কোচ যে কথাটাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, সেই অবাঞ্ছনীয় ভাবকে মনের ভিতর বেশীক্ষণ স্থান দিতে নাই। একটা ভাবকে মনের ভিতর যে ভাবেই হউক বেশীক্ষণ লালন করিলে মনের উপর তা কতকটা আধিপত্য বিস্তার করিবেই। তাহার ভয় হইল যে সহজ ব্যাপারটা জটিল হইয়া পরিণামে ভয়াবহ হইয়া না উঠে। প্রতিমাকে সঙ্কোচের হাত হইতে মুক্তি দিবার জন্য ডাকি দিল—"প্রতিমা…"

গাড়ী তখন এক ছোট ষ্টেশন হুস করিয়া অতিক্রম করিতেছিল, সুতরাং তড়িতের ডাক প্রতিমার কাণে যায় নাই। তড়িৎ পুনরায় তাহাকে ডাকিল। প্রতিমা চমকাইয়া উঠিল। তড়িতের চোখ ইহা এড়ায় নাই। প্রতিমা এতক্ষণে নিজেকে বেপরোয়া করিয়াছে। মুহূর্ত্তের জন্য মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া যেন সকল দুর্ব্বলতা পদদলিত করিয়া তড়িতের মুখের দিকে সহজভাবে তাকাইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "কি বলবে তড়িৎদা, বল।"

তড়িৎদা শব্দটা সে খুব স্পষ্ট করিয়া জোর দিয়া বলিল। নিজের মনের দ্বিধা-সঙ্কোচগুলিকে সে যেন স্পষ্ট করিয়া শুনাইয়া দিতে চাহে যে এখানে তাহাদের কোন স্থান নাই, এ তাহার তড়িৎ-দা, এ আর কেউ নয়।

তড়িৎ বলিল, "বনোয়ারী যেমন আজ চাকর সেজে বেরিয়েছে, আমরাও তেমনি একটা কিছু সেজে বেরিয়েছি। কিন্তু এতে তোমার বড্ড লজ্জা করছে, নয় প্রতিমা?"

প্রতিমা ধীরে ধীরে কহিল, "কখনও আজকের মত অবস্থা ত হয় নি! তাই…"

তড়িৎ—"নিত্যকার জীবনেও আমরা সময় সময় অভিনয় করে চলি। মুখের কথা আর মনের কথা সর্ব্ব অবস্থায় এক হয় না। তা যাক, অভিনয়টাকে বাস্তব বলে বিশ্বাস করাতে গেলে ভাল করে অভিনয় করতে হয়। তবে সতর্ক থাকতে হয় যেন অভিনয়টা মনের মধ্যে জায়গা করে না বসে।

প্রতিমা—"মনেও স্থান দিতে পারব না! কেউ যদি পরম প্রিয় হয়ে পড়ে শুধু মনের মধ্যেও তাকে স্থান দিতে পারব না!" তারপর হাসিয়া বলিল, "না তড়িৎদা, কলিতে মনের পাপে দোষ নেই, পাপ কাজ না করলেই হ'ল, সাধু মহাত্মারা বলে গেছেন।"

তড়িৎও হাসিয়া বলিল, "এ হ'ল কলির মানুষের দুর্ব্বলতার জন্য কনসেশন, দয়া। আমরা যে কলিকালে জন্মালেও কলির মানুষ নই! এই যে আমাদের সাধনা—এ দেশের মানুষগুলি মনুষ্যত্বে নবজন্ম লাভ করে নূতন দেশের নূতন মানুষ হয়ে উঠবে। এ জন্যেই ত সব।"

তড়িৎ কহিতে লাগিল, "দেখ প্রতিমা, আমরা একই পথে একই উদ্দেশ্যে চলেছি, এই হ'ল আমাদের পরস্পরের যোগসূত্র। আমাদের ভালমন্দ, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য সবই নির্ভর করে এ সমস্ত আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাবার সহায়তা করে কি না তার উপর। এই দিয়েই আমাদের কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের বিচার।"

হঠাৎ গাড়ীর গতিবেগ মন্দীভূত হইল। এমনি সময় গাড়ী হঠাৎ কোথাও থামার কথা নয়। তড়িৎ জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দেখিল সিগন্যাল ডাউন আছে। সময় দেখিয়া অনুমান করিল গাড়ী চুনার ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী। ভাল করিয়া নজর করিয়া দেখিল অন্ধকারে চুণার দুর্গের কালো রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

গাড়ীর মধ্যে একটা কেমন অস্বস্তির ভাব। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার জন্য তড়িৎ কহিল, "জান প্রতিমা, প্রয়োজন হলেই অভিনয় করতে হয়, সেজে বেরুতে হয়। তুমি ত সেদিন সালোয়ার কামিজ পরে, কোমরে কৃপাণ ঝুলিয়ে সর্দ্দারজীর ওখানে গেলে। কিন্তু তোমায় একটি লোক অনুসরণ করেছিল, তা তুমি টের পেয়েছিলে?"

"কৈ না ত! কি আশ্চর্য্য!"

"ভয় পেয়ো না, আমিই সেই। তুমি সর্দ্দারজীর বাসায় নিরাপদে পৌঁছলে আমি ফিরে আসি। ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে মনে করেছিলাম তোমায় কয়েকটা কথা বলি, কিন্তু ওখানে দুটো ওয়াচার ছিল, ওদের এড়াতে গিয়ে আর পারলাম না। কেননা তুমি শিখ রমণী আর আমি বাঙালী হয়ত সন্দেহের উদ্রেক করবে? তোমার সাজটি কিন্তু খুব চমৎকার হয়েছিল। তোমাকে না জানলে বাঙালী বলে চেনা মুশকিল। বঙ্গললনা বলে চিনলে হয়ত বিপদ হ'ত।"

"কেন, চিনতে পারলে কি হ'ত!"

"হয়ত গুণ্ডার হাত এড়াতে পারতে না।"

"আমি অত কচি কোমল নুইয়ে পড়া লতিকা নই তড়িৎদা। আসলে কিন্তু আমি অত নিরীহ নই। কাশীর গুণ্ডাদের সঙ্গে দু'একবার মোলাকাৎ যে হয় নি তা নয়। ছোটবেলা এক ওস্তাদের কাছে কিছু কিছু যুযুৎসু শিখেছিলাম! একবার কি হয়েছিল জান। এক দিন রাত্তিরে আরতির পর আমি আর মা বিশ্বনাথের মন্দির থেকে ফিরছি। এক গুণ্ডা আমার গায়ে হাত দিতেই আমি তার হাত মুচড়ে ধরলাম—মা এসে গলা চেপে ধরল—ততক্ষণে রাস্তায় ভিড় জমে গেছে। তখন ঐ লোকটার যে লাঞ্ছনা হ'ল তা ত বুঝতেই পার! সবাই ওকে পুলিসে দিতে বলল—মা শুধু বলল, ওকে আর পুলিসে দিয়ে কাজ নেই—লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এমন কাজ আর করো না বাছা।' অবশ্য এইটাই গুণ্ডা-কাহিনীর শেষ নয়। এর পরও যে ছোটখাটো

চেষ্টা হয় নি তা নয়। একদিন মনে মনে ঠিক করলাম এর একটা বিহিত করতেই হবে। একটা ছোরা নিয়ে একেবারে ওদের আড্ডায় গিয়ে হাজির হলাম। যে লোকটাকে সর্দার মনে করলাম, সোজা তার কাছে গিয়ে বললাম, 'আপনারা আমার কাছ থেকে কি চান বলুন ত! সহায়-সম্বলহীন নারীকে পীড়ন করবার জন্যই কি আপনারা ডন কুস্তি করেন নাকি!' লোকটার কি মনে হয়েছিল জানি নে। মিনিটখানেক কোন কথা বললে না, তার পর আমার দিকে চেয়ে বিনীত সুরে বললে, 'মাপ কর মাঈজী'; আমার গায়ে এক বিন্দু রক্ত থাকতে তোমার কোন অনিষ্ট হবে না।' তারপর তার নীরব দৃষ্টি চারদিকে বুলিয়ে নিয়ে তার চেলা-চামুণ্ডাদের হুকুম দিলে। তারপর আর কোনদিন কিছু হয় নি।"

"ছোরা নিয়েছিলে ওদের খুন করতে নাকি।"

"ওটা নিয়েছিলাম প্রয়োজন হলে ওদের বুকে বসাতাম আর ইজ্জৎ রাখতে নিজের বুকে বসিয়ে দিতাম!"

"যে পথে পা দিয়েছ তার জন্য এমনি আরও প্রয়োজন হতে পারে, সেই মুহূর্ত্তে তোমার জন্য নিশ্চিন্ত হলাম প্রতিমা।"

রাত্রি তখন তিনটা বাজিয়াছে। গাড়ী মির্জ্জাপুর ষ্টেশনে থামিল।

"তুমি শুয়ে পড় প্রতিমা।"

"ঘুম আসবে না।"

"বিশ্রাম হবে অন্ততঃ। আমি এখন শোব না। এলাহাবাদে আমার দরকার আছে।"

"তুমি বরং শুয়ে পড়, আমি তোমায় এলাহাবাদ এলে জাগিয়ে দেব।"

তড়িৎ আর বাক্যব্যয় না করিয়া শুইয়া পড়িল। প্রতিমা নিজের বেঞ্চিতে ফিরিয়া আসিয়া জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া তাহার মুখমণ্ডলে আরামের রেশ দিয়া গেল। সমস্ত গ্লানি ধুইয়া-মুছিয়া গেল। দিগন্তের কালো গাছের ছায়া একের পর এক ছুটিয়া চলিয়াছে। কোথাও কচিৎ এক-আধটা আলো দৃষ্টিপথে উদয় হয় বটে, কিন্তু নিমেষেই তাহা আবার মিলাইয়া যায়। একমাত্র আকাশের মহাশূন্যে তারাগুলি নিশ্চল হইয়া জাগিয়া আছে। এক আনন্দের আবেগে তাহার দেহ রোমাঞ্চিত হইল। গাড়ী নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে গিয়া থামিবে, কিন্তু এ যাত্রার শেষ কোথায়। এই অনিশ্চয়তায়ও তাহার হৃদয় আজ পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে।

কখন যে দুই ঘণ্টার পথ শেষ হইল তাহা প্রতিমা জানিতেও পারে নাই। এলাহাবাদ ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিলে তাহার খেয়াল হইল। তড়িৎকে জাগাইয়া দিল। এক ভদ্রলোক তড়িতের হাতে একখানা চিঠি দিয়া গেল। তাহাদের কানপুর যাওয়া নিরাপদ নয়—চিঠির মর্ম্ম ইহাই। তাহারা সোজা আগ্রা যাওয়াই স্থির করিল।

৮

বেলা দুইটা নাগাদ তড়িৎ, প্রতিমা ও বনোয়ারী আগ্রার এক প্রসিদ্ধ হোটেলে আসিয়া আশ্রয় লইল। আহারাদির পর একখানা চিঠি লিখিয়া বনোয়ারীকে ক্যাণ্টনমেণ্টে যাইতে নির্দ্দেশ দিল তড়িৎ।

বনোয়ারী চিঠি লইয়া চলিয়া গেল। ভাত ছড়াইলে কাক গন্ধ পায়। তাহাদের আগমনের গন্ধ পাইয়া অচিরেই জনা পাঁচ-ছয় গাইড আসিয়া আপন আপন বিদ্যার পরিচয় দিতে লাগিল। ইহাদেরই এক জনের পক্ষ সমর্থন করিয়া হোটেলের কেরানীটি কহিল, "বাবু একে আপনি নিন। সাহেবরাও একে পেলে আর কাউকেই চায় না!"

"বিলিতি সাহেবদের আর গুণের সীমা নেই। তারা মুখ দেখেই গাইড চিনতে পারে দেখছি"—সকৌতুকে মন্তব্য করিল তড়িৎ। লোকটির আর জবাব জুটিল না।

তড়িৎ তখন একটু বিশ্রামের জন্য লালায়িত ছিল। সুতরাং গাইডদের বিদায় দিল এই বলিয়া যে যখন তাহার প্রয়োজন হইবে খবর দিবে যাকে তার পছন্দ।

তড়িৎ একটা আরাম কেদারায় হেলান দিয়া বসিয়া খবরের কাগজে চোখ বুলাইতে লাগিল। প্রতিমা ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "কাল রাতে ঘুমোও নি এখন একটু গড়িয়ে নাও, বিছানা তৈরি আছে।"

"অত আরাম সইবে না প্রতিমা, এই যা আছে ঢের।"

তর্ক করিয়া লাভ নাই। একটা বালিশ আনিয়া তড়িতের মাথার নীচে গুঁজিয়া দিল। তড়িৎ নিজের অজ্ঞাতেই নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

বিকালের দিকে এক নূতন গাইড আসিয়া বলিল, "এতক্ষণে বোধ হয় আপনাদের গাইড ঠিক হয়ে গিয়েছে, না হলে আমায় নিতে পারেন।"

"কি করে জানব তুমি ভাল গাইড?" সন্দিগ্ধ চিত্তে প্রশ্ন করিল তড়িৎ।

"আপনি আর একবার এসেছিলেন না সাহেব।"

"তখন ভাল গাইডও পেয়েছিলাম।"

"আপনি সুখবীরের কথা বলছেন—সে আমার চাচা।"

তড়িৎ আর হাসি সম্বরণ করিতে পারিল না। কহিল, "যাক্, আর অভিনয়ের প্রয়োজন নেই। খবর সব ভাল ত?"

"তেমন সুবিধে নয়। কাল থেকে খুব কড়া নজর পড়েছে চারদিকে, মনে হচ্ছে যেন ঝড়ের আগেকার থমথমে ভাব। আজ সকালে এই জরুরী চিঠি পেয়েছি, পড়ে দেখুন।"

"আমাকে অবিলম্বে পেশোয়ার যেতে হবে। দিল্লী গিয়ে যাদের সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল তারাও ওখানে যাচ্ছে।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া এক টুকরা কাগজে সামান্য কি লিখিয়া গাইডের হাতে দিয়া কহিল, "আগামী পরশু সোমেশ ও ভেলিংকার

নঙ্গল হাইডেল ক্যানাল পরিদর্শন-রত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু

দূর হইতে কেদারনাথের দৃশ্য

ওখীমঠ—কেদারনাথের শীতকালীন আবাস

কেদারনাথে শঙ্করাচার্য্যের সমাধি

পঞ্চকেদারের অন্যতম তুঙ্গনাথ

কেদারনাথের মন্দির—প্রভাতে

ত্রিযুগী নারায়ণ

এই পথেই আসবে, তাদের হাতে এই চিঠি দিয়ে বল—ভেলিংকার যেন অবিলম্বে করাচি যায় আর সোমেশ যেন যায় দিল্লী ও মীরাট হয়ে আম্বালায়। ওদিকে আমার আর যাওয়া সম্ভব হবে না। আজ বিকেলের গাড়ীতে আমার রওনা হওয়ার কোন উপায় করা যায় কি!"

"টুরিষ্ট হয়ে এসে কিছু না দেখে যাওয়া নিরাপদ নয়। অন্ততঃ ফোর্ট আর তাজ দেখে কালকের কোন গাড়ীতে যাওয়াই ভাল।"

"আচ্ছা, আজ বিকেলে তাজমহল যাব, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে সবাইকে ওখানে মিলিত হওয়ার খবর দিতে পারবে কি?"

"তা নিশ্চয়ই পারব"—এই কথা বলিয়া বিলম্ব না করিয়া সে চলিয়া গেল।

গাইডের চলিয়া যাওয়ার অনতিবিলম্বেই দুই জন গোয়েন্দা কর্ম্মচারী আসিয়া তড়িতের নাম ধাম এবং এখানে আসিবার উদ্দেশ্য লিখিয়া লইয়া গেল। যাইবার সময় তাহাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া গেল।

ইহারা চলিয়া গেলে তড়িৎ কেরানীকে [illegible] জিজ্ঞাসা করিল, এইভাবে আসিয়া গোয়েন্দারা টুরিষ্টদের [illegible] কেন করে!

"কি করি বাবু, এ ত কোনদিন দেখি নি। জার্ম্মান লড়াই সুরু হওয়ার পর থেকে এই উপদ্রব! এমনি আর বেশী দিন চললে হোটেলের পাততাড়ি গোটাতে হবে দেখছি"—হাত কচলাইয়া বিনীতভাবে কেরানীটি জবাব দিল।

বৈকালের দিকে তড়িৎ ও প্রতিমা ফোর্টের পথে তাজমহলের দিকে অগ্রসর হইল।

তাজমহল যাইতে তাহারা আগ্রা ফোর্টের পাশ দিয়াই চলিয়াছিল। কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়া তাহারা ফোর্টের গঠনবিন্যাস দেখিল। কলিকাতার কেল্লা প্রতিমা দেখিয়াছে, তাই কেল্লা সম্বন্ধে যে ধারণা তাহার মনে মনে ছিল তাহা [illegible] দেখিয়া নষ্ট হইয়া গেল।

বাহির হইতে একটু দেখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। [illegible] তাড়ি ঘুরিয়া কয়েকটা প্রধান অংশ দেখিয়া বাহির হইয়া আসিল। ভিতরটা আরও সুন্দর।

"এমনি করে দুর্গ তৈরি হয় আগে জানতাম না তড়িৎদা" বিস্মিত কণ্ঠে কহিল প্রতিমা। তড়িৎকে জবাব দেওয়ার অবকাশ না দিয়াই পুনরায় বলিতে লাগিল—"মোগলদের রুচিবোধ ছিল। কলকাতার কেল্লা এমন ভীষণও মনে হয় না, সুন্দরও দেখায় না, একটু দূর থেকে তা চোখেই পড়ে না। মোগলেরা দুর্গের ভীষণতা পর্য্যন্ত শ্রীমণ্ডিত করে রেখেছে।"

"ওটা হচ্ছে প্রয়োজনের গরজ। মুসলমানেরা এদেশ দখল করে এখানেই বসবাস করেছে, আর তখনকার দিনে দুর্গের মধ্যেই বাদশাদের বেশীর ভাগ সময় থাকবার রীতি ছিল, তাই অঢেল পয়সা খরচ করে ওরা ঐ দুর্গের অঙ্গসৌষ্ঠব সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এ যুগের রীতি ভিন্ন। দুর্গ-নির্ম্মাণ-পদ্ধতিই বদলে গেছে বর্ত্তমানে প্রয়োজনের তাগিদে। এখন শুধু যারা লড়াই করে তারাই থাকে দুর্গের মধ্যে। কাজেই দেখছ ওর অঙ্গ শোভিত [illegible]"—তড়িতের কথায় কৌতুকের আভাস।

"তার ফলে মোগলরা আমাদের আপনজন হয়ে পড়েছে, কেননা ওরা এদেশে থেকে এদেশেই পয়সা খরচ করেছে, [illegible] আমাদের দেশের লোকও নিশ্চয় উপকৃত হয়েছে [illegible]"—বলিল প্রতিমা।

"মোটেই নয়। আসলে ওরাও ছিল বিদেশী। [illegible] ধন রত্ন বিদেশী আক্রমণকারীদের প্রলুব্ধ করে এনেছে [illegible] ছিল এদের চরম লক্ষ্য; মানুষকে এরা কোনদিন চোখে দেখে নি। মানুষকে তারা ততটুকু রক্ষা করেছে যতটুকু না করলে তাদের ভোগবিলাসের সুবিধা ব্যাহত হয়। এই বিলাস-ব্যসনের [illegible] জন্যে দেওয়ান থেকে তারা টাকাপয়সা [illegible] নি। [illegible] অর্থে—যে অর্থে বহু লোকের ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটবার ব্যবস্থা হতে পারত, শিক্ষার বন্দোবস্ত হতে পারত, সেই বিপুল অর্থ বিলাসের খরচ যোগাতেই ব্যয় হয়েছে। তা ছাড়া বিদেশী এসে দেশ অধিকার করে কিছুদিন বাস করলেই তার বিদেশীত্ব ঘোচে না, দেশের পরাধীনতাও দূর হয় না।

আরও একটা কথা মনে রেখো। [illegible] বিদেশী শাসকের অত্যাচার ও শোষণের কথা নয়; আমি বলছি মানব সমাজের ইতিহাসে শ্রেণী-স্বার্থের কথা। এতে স্বদেশী-বিদেশী ভেদ নেই—যে যে শ্রেণীতে পড়ে। শোষক ও শোষিত এই দুই শ্রেণী।

প্রতিমা—"ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের [illegible] ত সন্দেহই নেই। কিন্তু দেশীয়দের বেলায়ও কি এই বিচার হবে?"

তড়িৎ—"নিশ্চয়ই। [illegible] চাবুক [illegible] চালানের হাঙ্গর আর বঙ্গোপসাগরের [illegible] করে। দেশীয় শোষকশ্রেণীর হাতে [illegible] পার্থক্য শুধু এই [illegible] ঘুরে বেড়াবে।"

প্রতিমা [illegible] করা এইত শুধু আমাদের উদ্দেশ্য।"

তড়িৎ—"শুধু তাই নয়। আমাদের [illegible] শুধু ইংরেজ তাড়াবার জন্য নয়, সেই সঙ্গে সমস্ত শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধেও আমাদের অভিযান। অবশ্য আমরা জনগণকে তেমন করে সচেতন করে তুলতে পারি নি, জনগণ সচেতন না হলে এই অভিযান সফলও হয় না। আমরা জনগণের এই বিপ্লবের অগ্রগতির পথ অবারিত করে দেব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মত প্রবল বাধা অপসারিত করে দিয়ে। তবেই হবে প্রকৃত বিপ্লব।"

কথায় কথায় তাহারা তাজমহলের নিকটে আসিয়া পড়িল।

তাহারা যখন তাজমহলে আসিয়া পৌঁছিল তখন তাজের গম্বুজ

ও মিনারের চূড়াগুলি গোধূলির আভায় মণ্ডিত হইয়া লজ্জারক্ত তরুণীর মত দেখাইতেছিল।

কটক পার হইয়া এই দৃশ্য চোখে পড়িতেই প্রতিমা বিস্ময়ে অভিভূত হইল। বিশ্বের আশ্চর্য্য এই তাজমহল। শত শত বৎসরের লক্ষ কোটি মানুষের হৃদয়ে প্রেমের এক অপূর্ব্ব স্মৃতি—শুধুই কি স্মৃতি, এই কি প্রেম নয় যা শিলামণ্ডিত হয়ে আছে নীরব নিথর।

সামনেই দীর্ঘ জলাধার সযত্নে রক্ষিত, মাঝে মাঝে পদ্ম ফুটিয়া আছে, যেন তাজের নিকট আত্মোৎসর্গের জন্য জলের বুকে তাজ প্রতিবিম্বিত। ভক্তের কাছে ভগবান যেমন সর্ব্বব্যাপ্ত তেমনই এখানে সবকিছুর মধ্যেই তাজ আপনি আপন মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া আছে। দুই পাশে সযত্নে রক্ষিত ঝাউয়ের সারি সমস্ত পারিপার্শ্বিককে এক অপরূপ শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।

আস্তে আস্তে হাঁটিয়া তড়িৎ ও প্রতিমা তাজমহলের উপরের চাতালে উঠিল। এতক্ষণ কেহই কথা কহে নাই। এর মাধুর্য্য সমস্ত হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া নির্ব্বাক করিয়া দিয়াছিল।

নীরবতা ভঙ্গ করিল তড়িৎ। এদিকওদিক চাহিয়া কহিল, "তুমি চার দিক ঘুরে ফিরে দেখ, আমি ততক্ষণে ঐ মিনারের ওপরে উঠে কাজ সেরে নিচ্ছি। ভয় পেয়ো না। আমাদের অনেক লোক এই আশেপাশে আছে।"

"ভয়, ভয় আমার নেই। আমার যা-কিছু ভয় সে শুধু তোমাকে।"—হাসিয়া জবাব দিল প্রতিমা।

তড়িৎ যাইতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু প্রতিমার কথা যেন হেঁয়ালী মনে হইল। ইচ্ছা হইয়াছিল এই কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া লয়। কিন্তু অন্য জরুরি কাজ থাকায় মুহূর্তকাল অপেক্ষা করিয়া পুনরায় চলিতে সুরু করিল।

প্রতিমা আস্তে আস্তে সমস্ত দেখিয়া সমাধি-গৃহে প্রবেশ করিল। তখন সমাধি-রক্ষকেরা শ্রদ্ধাভরে ফুল ছড়াইতেছিল। প্রতিমা নীরবে তাহার হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া দুই-একটি ফুল তুলিয়া লইল।

বাহিরে আসিয়া প্রতিমা যমুনার ধারে উপবেশন করিল। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। আশপাশের ফুল হইতে গন্ধ ছড়াইয়া বাতাস সকলের হৃদয়ে এক মধুর আবেশ সৃষ্টি করিতেছিল। যেন সম্রাট-দম্পতির প্রেম যুগে যুগে ফুল হইয়া গন্ধ বিতরণ করিতেছে!

যতই তাজের কথা ভাবিতেছে, এক অনাস্বাদিত আনন্দের ঢেউ আসিয়া তাহার হৃদয়কে ততই আন্দোলিত করিয়া তুলিতেছিল। প্রেম কি বস্তু তা তাহার জানা নাই—তাহার জীবনপথে এ ছিল নিষিদ্ধ বস্তু এত দিন, আজও আছে। কিন্তু এই পাষাণ কি তাহাকে নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করিবে নাকি!

সম্রাট পাষাণ-ফলকের এই ফুলের মধ্যে যে কাব্য রচনা করিয়াছেন তা মানুষেরই কাব্য। আবহমানকাল প্রবাহিত স্ত্রী-পুরুষের প্রেম মূর্ত্ত হইয়া আছে শ্বেতশ্রীমণ্ডিত এই সৌধে।

প্রতিমার মনে হইল প্রেম কেবল মিলনেই সার্থক নয়—বিরহের মধ্যেও এর মাধুর্য্য লুকিয়ে আছে। তাহার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে মিলাইতে গিয়া দুই ফোঁটা জল তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া মাটিতে পড়িল। মনে মনে সম্রাট-দম্পতিকে প্রণাম জানাইয়া কহিল, "ওগো সম্রাট দম্পতি, তোমাদের প্রেম, তোমাদের মিলন, তোমাদের বিরহ চিরতরে মূর্ত্ত করে রেখে গিয়েছ—ভাসিয়ে দিয়েছ তোমাদের প্রেম-কাহিনীর তরণী যুগে যুগে মানুষের কাছে বার্ত্তা বয়ে নিয়ে যেতে, কিন্তু আমার ব্যথা কাউকে বলা দূরের কথা, নিজের মনেও ভাবতে অধিকারী নই।

তড়িৎ পাশে আসিয়া বসিতেই প্রতিমার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল।

"কি ভাবছ?" প্রশ্ন করিল তড়িৎ।

"এ প্রেমের তীর্থ। এক দিন সম্রাট বিরহব্যথায় ব্যথিত হয়ে এর সৃষ্টি করে গিয়েছেন—কিন্তু এ আজও এমন জীবন্ত হয়ে থাকতে পারে তা এখানে না এলে বুঝতে পারতাম না। আমি সন্ন্যাসিনী—কিন্তু আমার হৃদয়কেও দিয়েছে এক অপূর্ব্ব দোলা—এমনি অনুভূতি আমার জীবনে কোনদিন আসে নি তড়িৎদা।"—কথার শেষে দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল প্রতিমার হৃদয় মথিত করিয়া। প্রতিমার চক্ষু মুদিয়া আসিল।

"আমার কি মনে হয় জান প্রতিমা, এ তাজমহল এক বিলাসী সম্রাটের ব্যথার বিলাসের আত্মপ্রকাশ মাত্র। দেশ-বিদেশের অর্থ তরবারির মুখে এনে ঢেলেছেন তাঁর খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য। সহস্র সহস্র ক্রীতদাস জীবন দিয়েছে তাঁর এই খামখেয়ালীর বেদীতে। তাদের দীর্ঘনিঃশ্বাস লুকিয়ে আছে তাজের প্রতিটি পাথরের গাঁথুনিতে। পৃথিবীতে সহস্র সহস্র লোকের জীবনে আসে এমনি প্রেম-মিলন-বিরহ। তাদের ব্যথা, তাদের বিরহ মিলিয়ে যায় দীর্ঘনিঃশ্বাসে, তাদের জীবনের সঙ্গে—কে তার খবর রাখে প্রতিমা! কিন্তু প্রবলের খামখেয়ালীর কাঠগড়ায় বলহীনতা বাড়িয়ে দিতে বাধ্য নিজেদের গলা"···

তড়িৎকে বাধা দিয়া প্রতিমা কহিল, "তোমার মুখে এমনি কথা শোনবার প্রত্যাশা করি নি তড়িৎদা। সম্রাটের মহান হৃদয়ের অশ্রুরাশি জমাট বেঁধে আছে এই শুভ্র পাষাণ-ফলকে। চাঁদের কলঙ্ক আর কুসুমের কীট বিচার করে জীবনটাকে বিষময় করে তুলো না তড়িৎদা!"

"পারতাম প্রতিমা, যদি না মনে হ'ত তখনকার বঞ্চিত লাঞ্ছিত জনগণের তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস যেন প্রাসাদের প্রত্যেক পাথরের ভিতর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে! সেই সব অত্যাচরিতের বিষাক্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস আজও আমার গায়ে লাগছে!"

"সত্যই তোমার জন্য দুঃখ হয় তড়িৎদা। এই প্রেমের তীর্থে বসেও তোমার মন এতটুকু সাড়া দিচ্ছে না।"—উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল প্রতিমা।

"দেখছ দূরে, ঐ যমুনার অপর পারে, সেখানে নিশ্চয় দেখেছ

গোধূলির আলোয় একটা ভাঙা অট্টালিকা ও মিনার। গল্প আছে—কথা হয়েছিল ওখানেও গড়ে উঠবে আর একটা তাজমহল কালো পাথরের। সম্রাটের দেহ নাকি ওখানে রাখবারই পরিকল্পনা হয়েছিল। তিনি আরও ভেবেছিলেন যে, এই কালো-সাদার মাঝে যমুনার বুকের উপর দিয়ে তৈরি হবে এক রূপার পুল। হয়ত এটা নিছক গল্প, কিন্তু এমন গল্পও মানুষের কল্পনায় আসত! এই ছিল বিলাসিতা ও কল্পনাতীত অপব্যয়ের স্বরূপ!"

প্রতিমা—"থাক, থাক তড়িৎদা, এখন এ সব কথা নাই-বা বললে।"

তড়িতের হৃদয় উদ্বেলিত—সে বলিয়া চলিল, "ইতিহাসের পৃষ্ঠা ঘেঁটে লাভ নেই। সরলহৃদয় বিদ্বেষলেশহীন দরিদ্র চাষী গৃহস্থের কথা ভাব। তাদের কুটীর ভেঙে গৃহহীন করে, তাদেরই অর্জিত সম্পদে সেখানে সুরম্য অট্টালিকা তৈরি করে যদি তাদের বা তাদের ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের সেই প্রাসাদের স্থাপত্য-শিল্পের সৌন্দর্য্য অনুভব করতে বলা হয় তবে তা কি ঠিক নির্মম পরিহাসের মত শোনাবে না?"

তাহাদের আলোচনা-স্রোতে বাধা পড়িল। বনোয়ারী আসিয়া তড়িতের হাতে একখানা টেলিগ্রাম দিল। তাড়াতাড়ি ইহার খাম ছিঁড়িয়া পাঠ করিল। সমস্ত ওলটপালট হইবার উপক্রম হইয়াছে মনে হইল। ব্যাপক একটা ধরপাকড়ের ছবি আসিয়া তাহার সম্মুখে নীরবে দাঁড়াইল। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া প্রতিমাকে কহিল, "এখন চল।"

সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার সময় তড়িৎ বারে বারে পিছন ফিরিয়া তাকাইতে গিয়া হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল।

"তোমাদের সন্দেহ দেখছি পদে পদে"—সকৌতুকে কহিল প্রতিমা।

"এই পবিত্র তীর্থ ছেড়ে যেতে আমার মন চাইছে না প্রতিমা। সম্রাটকে যখন সিংহাসন থেকে নামিয়ে শুধু মানুষ হিসেবে দেখি, সুখে-দুঃখে, মিলনে-বিরহে অবহেলিতহৃদয় শুধু মানুষ বলে ভাবি তখন তাঁর ও মমতাজ বেগমের এই অকলঙ্ক প্রেমের শুভ্র নিদর্শনটিকে হৃদয় দিয়েই অনুভব করি। বিরহে সম্রাটের হৃদয়ে যে দীর্ঘনিশ্বাস জমা হয়েছিল আজও তা এখানকার আকাশে-বাতাসে মিশে আছে। এ ত শুধু শাজাহান-মমতাজের কাহিনী নয়, মানুষের বিরহ-ব্যথাতুর হৃদয়ের প্রতিমূর্ত্তি। সম্রাটের পাষাণ কবিতা যুগ যুগ ধরে মানুষের বিরহ-ব্যথাকে রূপায়িত করছে। কিন্তু পেয়ে না পাওয়ার দীর্ঘনিশ্বাস যে কত মানুষের ব্যথার অদৃশ্য তাজমহল গড়ে তুলেছে যুগে যুগে, তার খবর কেউ পায় না, খবর পাওয়ার উপায়ও নেই।" বলিয়াই তড়িৎ দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—"কেমন নিজের কথায় নিজেই প্রতিবাদ করছি, নয় প্রতিমা?"

প্রতিমার বিস্ময়ের মাত্রা ছাড়াইয়া গেল। এই মাত্র যে লোক তাজমহলের মুণ্ডপাত করিয়াছে তাহার এই কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। প্রতিমার মনের কোণে যে বিরক্তিটুকু জাগিয়াছিল তাহা নিমেষে মিলাইয়া গেল। প্রতিমার চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হইল, বলিল, "এই ত তোমার দরদী মনের আসল স্নিগ্ধ রূপ তড়িৎদা! বিরহীর ব্যথাও তোমার হৃদয়ে ব্যথা জানায়! শুধু পাথরই নয়, পাথর ফেটে জলও বের হয়!"

"আমার নিজের কথায় প্রতিবাদ নিজেই করেছি। কিন্তু এই প্রতিবাদই সবটুকু নয়—এ হচ্ছে হৃদয়ের সঙ্গে যুক্তির বিরোধ। অত্যাচারীর হৃদয়ের ব্যথা সব সময় সহানুভূতি নিয়ে স্মরণ করা যায় না প্রতিমা।"

৯

তাজ হইতে ফিরিয়া তড়িৎ তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ করিয়া কয়েকখানা চিঠি লিখিল। তখনই ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিবার জন্য বনোয়ারীকে পাঠাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িবার আয়োজন করিতে লাগিল।

একই ঘরের দুই দিকে দুইটি নেয়ারের খাটিয়ায় তড়িৎ ও প্রতিমার শোয়ার ব্যবস্থা। তড়িৎ নিজের বিছানায় গা এলাইয়া দিল। প্রতিমা বারান্দায় রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তড়িৎ তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "আর দেরি করো না প্রতিমা। কাল ঘুমোতে পার নি—আগামী কাল আবার কি অবস্থায় পড়বে তারও ঠিক নেই। কাজেই আজকের সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নাও প্রতিমা।"

প্রতিমা ঘরে আসিয়া তড়িতের মাথার পাশে বসিয়া তাহার চুলের মধ্যে আঙুল চালাইতে চালাইতে কহিল, "আমার ঘুম হয় নি আর তুমি বুঝি খুব ঘুমিয়েছ তড়িৎদা।"

তড়িৎ আরামে চোখ বুজিয়া কহিল, "মিছে এসব করছ প্রতিমা, আমার অদৃষ্টে এত সুখ সইবে না।"

প্রতিমা মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তোমাকে দুঃখ দেয় কে? দুঃখকে যে সুখের মত ভোগ করে তাকে দুঃখ দেবার সাধ্য কারও নেই!"

"মানুষ হয়ে জন্মে সুখ-দুঃখের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নেই প্রতিমা। আদর্শকে জীবনসর্ব্বস্ব করে সমস্ত সুখ-দুঃখ আজও বলি দিতে পারি নি। এতদিন এ পথে চলবার পরও সুখের প্রতি টান এবং দুঃখ এড়াবার চেষ্টা যেন এখনও মনের ভিতরে কোথায় লুকিয়ে আছে টের পাই।"

"কৈ তার কোন চিহ্ন ত আজও দেখতে পেলাম না।"

"অন্তর্যামী হলে পেতে।"

"যে মহান্ আদর্শ ধরে চলেছি, সেই একাগ্র সাধনার মধ্যে নিজের সুখ-দুঃখ বাসনা-কামনা সবগুলিকে ডুবিয়ে দিয়ে চলতে চেষ্টা করছি মাত্র। এ ত চেষ্টা নয়! এ অন্তর্লোকের নিদারুণ সংগ্রাম! এ সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হয়ে কত নিষ্ঠাবান কর্ম্মী তলিয়ে গেছে!"

প্রতিমা কহিল, "আচ্ছা তড়িৎদা, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার বাইরে বাস করে এমন হয়ে পড়েছ যে এই ভালবাসা, প্রেম প্রভৃতির আভিধানিক মানে বোঝা ছাড়া এসবের আর কোন বালাই নেই তোমার মধ্যে— নিজের অনুভূতির সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই—নয় কি? অনাসক্ত প্রেম কি তবে নেই? আমার কিন্তু মনে হয় তোমার [illegible] প্রয়োজন।"

প্রতিমার হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া নিজের বুকের উপর টানিয়া আনিল—প্রতিমার চোখের প্রতি স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, "বাইরের [illegible] দেখো, মনে যা [illegible] হৃদয়ে যে তরঙ্গ উঠে [illegible] পাথরের মধ্যে যে মানুষ লুকিয়ে আছে, তা [illegible] তুমি কি আজ পর্যন্ত দেখতে পাও নি প্রতিমা!"

তড়িতের [illegible] সরাইয়া নিয়াছে—শুধু দেহখানি কাঁপিতেছে—তাহার এই মূর্তি প্রতিমার অজ্ঞাত। কিসের এক অজানা ভয়ে [illegible] কাঁপিতে লাগিল, প্রতিমার মনে হইল তড়িতের দুই চোখ যেন তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। তাড়াতাড়ি জোর করিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া আপন শয্যায় আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

যে ঝাঁকুনিতে প্রতিমা নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়াছিল তাহাতেই তড়িতের সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। তড়িৎ নিজের হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের এই দুর্বলতায় লজ্জিত হইল। প্রতিমার শঙ্কিত দৃষ্টি দেখিয়া প্রথমে একটু আশ্চর্য হইয়া [illegible] অপরিসীম লজ্জায় [illegible] করিল, মনে হইল বিজলী বাতির আলোকরশ্মি তাহাকে যেন চাবুক মারিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া [illegible] নিবাইয়া দিল। তড়িতের হঠাৎ মনে পড়িল প্রতিমা তাকে বলিয়াছিল—"ভয় আমার শুধু তোমায়।" তবে কি প্রতিমা [illegible] তাহাকে এমনি সন্দেহ করিয়াছিল—ছিঃ ছিঃ। প্রতিমাকে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া! তাহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এবং তাহার উপর একান্ত নির্ভরশীল হইয়া প্রতিমা সমস্ত ছাড়িয়া আসিয়াছে আর সেই কি না হইবে বিশ্বাসঘাতক! আত্মভোলা বিপ্লবী সে, শ্মশানবাসী ভোলানাথের ডমরুধ্বনি শুনিয়া যে সংসারের সমস্ত সুখ-দুঃখ বাসনা-কামনার আগুন জ্বালাইয়া মহাপ্রলয়ের আয়োজনে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছে, আজ প্রলয়ের পূর্বমুহূর্তে তাহার মনে কোথা হইতে এই নারীর প্রতি ভালবাসা জাগ্রত হইয়া উঠিল!

কিন্তু সত্যই কি সে অপরাধী। বিপ্লবীর কি মানুষ হইতে নাই। প্রতিমার প্রতি ভালবাসায় তাহার হৃদয় এতদিন তাহারই অজ্ঞাতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। আজ যদি তাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে তবে উহাতে পাপ কোথায়। এই প্রেম ত তাহাকে আদর্শচ্যুত করিবে না। প্রয়োজন হইলে আজই সে সমিতির স্বার্থে প্রতিমাকে খুন পর্যন্ত করিতে পারে। ভাবিতে ভাবিতে নিজের [illegible] অবসন্ন হইয়া পড়িল।

প্রতিমার কান্না আর কিছুতেই থামিতে চাহিতেছে না। এতদিন যাহাকে প্রাণমন দিয়া ভালবাসিয়াছে তাহাকে আজ একান্ত ভাবে পাইয়াও তাহার আজ কিসের ভয়। কেন সে তড়িতের হাত ধরিয়া বলিতে পারিল না—'আমি তোমারই তড়িৎদা। বিপ্লবের সাথী করে জীবনসঙ্গিনী হওয়ার অধিকার থেকে যে বঞ্চিত করো নি এর বেশী আকাঙ্ক্ষা আমার আর কিছু নেই।' তড়িৎদাকে কিসের ভয়। এই শঙ্কাকুল মূর্তি যদি তড়িৎদা দেখিয়া থাকে তবে তাহা হইতে লজ্জার আর কি আছে? হয়ত চলিয়া আসিয়া ভালই করিয়াছে। যদি মোহাবিষ্ট হইয়া তড়িৎদা আদর্শচ্যুত হয় তবে সে মুহূর্ত [illegible] হইবে শোকাবহ। সে আজীবন রিক্ত—কিন্তু তড়িৎদাকে এই রিক্তার পদতলে লুটাইতে সে কিছুতেই দিতে পারিবে না। তড়িৎদার চেয়ে তড়িৎদার আদর্শ, তাহার মহান্ ব্রত যে তাহার কাছে অনেক বড়। প্রয়োজন হইলে কালই সে কাশী চলিয়া যাইবে। কিন্তু যতদূরেই থাক তার হৃদয় ত তড়িৎদার জন্যই ব্যগ্র হইয়া থাকবে। দূরে গেলেও দূরে সে যাইতে পারিবে না। মনের নাগালের বাহিরে এমন স্থান আছে কোথায় যে সে সরিয়া যাইবে।

তড়িৎদাকে সে অধঃপাতের পথের সাথী করিয়া চাহে নাই, সে চাহিয়াছে তাহার মহান্ হৃদয়ের সঙ্গিনী রূপে। সেই অধঃপাত যদি আজ তাহার দুয়ারে আসিয়া থাকে তবে তাহাকে বরমাল্য দিতে লজ্জা কিসের। অনেক ভাবিয়া সে স্থির করিল যে তাহার এত উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নাই। সেও সম্পূর্ণরূপে নিজেকে তড়িতের নিকট সমর্পণ করিয়াছে। তড়িৎ কখনও তাহাকে অধঃপাতের পথে টানিয়া নামাইবে না। সে ভাবিল যে মহান্ দেশব্রতের কর্ণধারের ভালবাসা পাইয়া আজ তার জীবন সার্থক, সে কিনা আজ ভীত হইয়া চলিয়া আসিয়া তাহার তড়িৎদার ভালবাসার অপমান করিয়া বসিল।

আঁচলে চোখ মুছিয়া প্রতিমা শয্যা ত্যাগ করিল। ধীরে ধীরে তড়িতের পদতলে মাথা রাখিয়া ডাক দিল—"তড়িৎদা।"

তড়িৎ চমকাইয়া উঠিল—"কে?"

"আমি তোমার প্রতিমা।"

"আলোটা জেলে দিয়ে তুমি আমার মাথার কাছে এসে বসো প্রতিমা।" তড়িতের কথায় ক্লান্তি ফুটিয়া উঠিল।

প্রতিমা মাথার কাছে আসিয়া বসিলে তড়িৎ প্রতিমার ডান হাতখানা নিজের দুই হাতের মধ্যে রাখিয়া উত্তাপহীনভাবে কহিতে লাগিল—"এতদিন আমাদের প্রেম বয়ে চলেছিল অন্তঃধারায়, আজ যদি সেই ধারা বাইরে বেরিয়ে থাকে তবে তাকে কলুষিত মন নিয়ে অপমানিত করব না প্রতিমা। আজকের এই পবিত্র মুহূর্তকে অন্তঃস্থলে গ্রহণ করে নবতর উদ্যমে এগিয়ে চলব। আজই তাজমহলে বসে বলেছিলে প্রেম মানুষের মৃত্যুকে জয় করে, সেই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম আমাদের জীবনকে সার্থক করে তুলুক।"

তড়িৎ শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রতিমাকে নিজের পাশে দাঁড়

করাইয়া কহিল, "প্রতিমা, মনে মনে এই সঙ্কল্প করো যে আমাদের প্রেম আমাদের বিপ্লবের পথের সহায়ক হবে, প্রতিবন্ধক হবে না। যদি হয় তবে এক অপরকে নির্মম হস্তে পৃথিবী থেকে অপসারিত করতেও কুণ্ঠিত হব না।

"আর একটা কথা প্রতিমা, যেভাবে নর-নারীর স্বাভাবিক মিলন হয় আমাদের সেই পথ পরিত্যক্ত, সংযমের মধ্যেই আমাদের প্রেমের সার্থকতা। ভোগের মধ্যে আমরা সার্থকতা খুঁজব না।" অচিরেই বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠবে, এই পরাধীন ভারতবাসী মরণ-খেলায় মেতে উঠবে, সে যজ্ঞে সম্পূর্ণ আত্মাহুতির মধ্যেই আমাদের প্রেম সার্থক হবে

কথা শেষ করিয়া তড়িৎ সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দাড়াইয়া রহিল। প্রতিমা আস্তে আস্তে তড়িতের বাহুবেষ্টন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া তড়িৎকে প্রণাম করিয়া কহিল, "আশীর্বাদ কর তড়িৎদা [illegible]

তড়িৎ কহিল, "আমাদের [illegible] কোন [illegible] থাকবে না [illegible] আমাদের [illegible] থাকবে [illegible]

দরজায় মৃদু করাঘাত হইলে উভয়ে [illegible] বনোয়ারী [illegible] আওয়াজ পাইয়া দরজা খুলিয়া দিল। বনোয়ারীর মুখে উদ্বেগের ছায়া দেখিয়া তাহার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইল।

"চিঠি ডাকে দিয়েছি, কিন্তু আজ এই হোটেলের উপর পুলিশের কড়া নজর পড়েছে। গোয়েন্দা [illegible] পিছু নিয়েছিল [illegible] করে তাকে এড়িয়ে এসেছি।

"[illegible] আমাদের [illegible] চল বেরিয়ে পড়ি।"

"গাইডকে [illegible] যদি [illegible] তবে তিনি মোটর নিয়ে হাজির হবেন।

"জিনিষপত্র [illegible] গুছিয়ে ফেলা দরকার। [illegible] প্রতিমা এদিককার কাজ করছি, আর তুমি বারান্দার ঐ কোণে যেখানে একটু আলো কম ওখানে দাড়িয়ে লক্ষ্য রাখ রাস্তার উপর।"

প্রতিমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "কেরোসিনের টিনটা বাক্স থেকে বার করে রেখে দাও, পালাবার অবসর না পেলে কাগজপত্র পোড়াতে ওটার দরকার হবে—তাড়াতাড়ি জ্বালিয়ে ফেলবার জন্য। আর একটা কথা ঐ স্যুটকেসটার মধ্যে প্রয়োজনীয় কয়েকটা মাত্র জামাকাপড় নিয়ে নাও। প্রয়োজন হলে বিছানাপত্র ফেলেই যেতে হবে।"

তড়িৎ প্রতিমার চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিল, "এই আমাদের জীবন, এই আমাদের সাধনা—সদাজাগ্রত হয়ে থাকতে হয় এর জন্য।"

তড়িতের হাত গরম মনে হইল। সন্দেহ দূর করিবার জন্য কপালে হাত দিতেই মনে হইল হাত পুড়িয়া যাইতেছে। চিন্তান্বিত হইয়া কহিল, "তোমার যে ভীষণ জ্বর তড়িৎদা, আজ কি করে যাবে!"

"একমাত্র মৃত্যু ভিন্ন অন্য কোন কিছুই এ যাত্রা রোধ করতে পারবে না"—ঈষৎ হাসিয়া তড়িৎ জবাব দিল।

দূরে মোটরের হর্নের আওয়াজ পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই বনোয়ারী ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "মোটর নিয়ে এসেছে গাইড। ওকে অনেকেই চেনে, কাজেই হোটেলের খুব কাছে আসবে না।"

তড়িৎ কহিল, "আমি তোমাদের সঙ্গে বেরুব না। বাড়ীর পেছনে ছাত থেকে জল নামবার পাইপ বেয়ে পেছন দিয়ে নেমে যাব। নামলেই একটা ছোট রাস্তা আছে সেটা দিয়ে পশ্চিমে কিছুদূর গেলে [illegible] মিনিট চারেক হাঁটলেই একটা মোড়ে এসে পৌঁছানো যাবে—সেখানে আছে একটা বটগাছ, তার নীচে ধুনি জেলে বসে এক সন্ন্যাসী। তোমাদের মোটর ওর কাছাকাছি গিয়ে সঙ্কেত করবে। খুব কাছে এস না।"

প্রতিমা ও বনোয়ারী ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া কহিল, "[illegible] মুহূর্ত বিলম্ব নয়।"

তাহারা সিঁড়ি দিয়া নামিতে আরম্ভ করিল। প্রতিমা পিছন ফিরিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, "তোমার [illegible] বড় ভয় হচ্ছে। তুমি যদি শেষ পর্য্যন্ত না যেতে পার—আমি তোমায় ছেড়ে যেতে পারব না।"

"[illegible] নামতে পারব না [illegible] আমার কিছু হবে এসব চিন্তা করে যত সময় নষ্ট করবে ততই বিপদকে কাছে ডাকবে। এখন চঞ্চল হওয়ার সময় নয়।" হাসিয়া উত্তর দিল তড়িৎ। প্রতিমা ফিরিয়া নামিতে আরম্ভ করিলে তড়িৎ কহিল, "মাল সব ঠিক আছে ত?"

"[illegible] ঠিক আছে।" উত্তর [illegible] একসঙ্গেই প্রতিমা ও বনোয়ারী [illegible] লুক্কায়িত পিস্তল স্পর্শ করিয়া।

সিঁড়ি [illegible] নামিতে নামিতে প্রতিমা বনোয়ারীকে লক্ষ্য করিয়া [illegible] তবে তুমি নিজে [illegible] আমি [illegible] হাত-ঘার সঙ্গেই আছে।"

প্রতিমা [illegible] বনোয়ারী [illegible] দিকে নামিতে [illegible] জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা [illegible] কোথায়?"

"[illegible]

[illegible] যাওয়ার নিয়ম নেই—"

"[illegible] না [illegible]" তারপর প্রতিমাকে [illegible] "চলুন [illegible]"

[illegible] বনোয়ারী পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া কহিল "[illegible] হোটেলের চার্জ। আর বাকীটা বক্‌শিস।"

[illegible] টাকাটা একবার লক্ষ্য করিয়া বিনীতভাবে কহিল, "ও আবার কেন, আমরা ত আপনাদেরই হুকুমের চাকর—তবে কিনা জানেন, আপনারা না হয় কাল সকালেই চলে যাবেন। রাত্রিরে যাওয়াও ত কম হাঙ্গামা নয়। তা ছাড়া বোধ হয় সাহেবের শরীর

তত ভাল নেই—তিনি রাত্তিরে খাবেন না বলে পাঠিয়েছেন।" দারোয়ান এবার দরজায় রুখিয়া দাঁড়াইল।

বনোয়ারীর হাসি পাইল, কিন্তু বাগবিতণ্ডায় সময় নষ্ট করা একেবারেই সমীচীন নয়—পুলিস আসিয়া পড়িলেও আর উপায় নাই। তা ছাড়া বেশী তর্কাতর্কি হইলে হোটেলের লোকজন জাগিয়া গেলে মুশকিল হইবে।

বনোয়ারী একবার প্রতিমার দিকে চাহিয়া বুক-পকেটে হাত দিল। প্রতিমাও তাহার ব্লাউজের ভিতর হাত ঢুকাইল। ধীরে ধীরে রিভলবারের নল একটু বাহিরে আসিল।

কেরানী ও দারোয়ান ভীত হইল।

"ক্যায়া দোস্ত, রাস্তা ছেড়ে দাও ত ভালমানুষের ছেলেরা। সারাদিন খাটুনি গেছে, একটু ঘুমিয়ে নাও গিয়ে।"

তাহারা বাহির হইলে কেরানী তাহাদের পিছু লইল। পুলিসের নিকট হইতে সে মোটা টাকা পাইয়াছিল—কাজ হাসিল হইলে আরও পাইবার আশা আছে।

বনোয়ারী কেরানীকে পিছু লইতে দেখিয়া সে একটু পিছনে গিয়া দশটি টাকা দিয়া কহিল, "আর এগোবার চেষ্টা করলে জান নিয়ে টান পড়বে। কাল সকালে সাহেবের কাছ থেকে আরও কিছু পাবে। তার হাত খুব দরাজ।"

নিজের জীবন দিয়া টাকা লইয়া কি হইবে। তাহা ছাড়া সাহেব ত হোটেলেই আছে। আর সাহেবই ত আসল ব্যক্তি, পুলিস যাকে বিশেষ করে চায়। আর অনুসরণ না করিয়া হোটেলে ফিরিয়া আসিল। উপরে উঠিয়া দেখিয়া আসিল তড়িতের ঘর ভিতর হইতে বন্ধ—আলোও জ্বলিতেছে। তড়িতের উপস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া নীচে নামিয়া শুইয়া পড়িল—দারোয়ানকে কড়া পাহারার নির্দেশ দিয়া।

তড়িৎ কালো জামা ও কালো প্যান্টে সজ্জিত হইল এবং আলো জ্বালা রাখিয়া পিছন অলিন্দের কার্নিশ ধরিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইল। হাতের কাছে যে জল নিকাশের পাইপ ছিল তাহাই বহিয়া নীচে নামিল।

সন্ন্যাসীর কাছে পৌঁছিতে তড়িতের খুব বেশী বিলম্ব হইল না। বাবাজী তখন নেশায় মশগুল পাশে জনতিনেক ভক্ত কলিকার আশায় তাঁহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে।

সন্ন্যাসীর পায়ে দুইটি টাকা রাখিয়া তড়িৎ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। আড়চোখে টাকার অঙ্কটি দেখিয়া সন্ন্যাসী হাত বাড়াইয়া কহিল, "জীতা রহো ব্যাটা।"

দুই টাকা দিয়া যে সেবক কলিকার ভক্ত হইতে চায় তাহার নিকট হইতে ভবিষ্যতে আরও পাইবার আশা আছে অনেক, কাজেই তাহার দিকেই কলিকাটা দিল বাড়াইয়া।

তড়িৎ মনে মনে হাসিয়া, কল্কে হাতে লইয়া গঞ্জিকা সেবনের অভিনয় করিতে লাগিল। তাহাকে অবশ্য এ অবস্থায় বেশীক্ষণ কাটাইতে হয় নাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই বনোয়ারী আসিয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল।

তড়িৎ পুনরায় সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল। তড়িৎ ও বনোয়ারী গাড়ীতে উঠিলে গাড়ী তীরবেগে ছুটিল।

মাইল ত্রিশ দূরে হাতরাস জংশন ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দিল্লীর গাড়ীতে উঠিয়া তাহারা গাজিয়াবাদ পর্য্যন্ত গেল। সেখান হইতে প্রায় চল্লিশ মাইল পথ মোটরে গিয়া নর্থ-ওয়েষ্টার্ন রেলের পেশোয়ার-গামী একখানা আপ-ট্রেনে চাপিল। একেবারে পেশোয়ার ষ্টেশনে নামা নিরাপদ কিনা জানা নাই, সুতরাং পঁচিশ মাইল আগে নৌসেরাতে নামিয়া মোটরে পেশোয়ার গেল।

অনিশ্চয়তার মধ্যেও যে এত মাধুর্য্য লুকাইয়া থাকিতে পারে তাহা প্রতিমার অজ্ঞাত। কাশীর সেই নিত্যকার জীবনে বাঁচিয়া থাকিবার নিশ্চিত আরাম ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই যে বিপৎসঙ্কুল অভিযান—সামান্য ভুলও যখন মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতে পারে, কিন্তু তার মধ্যেও গতি এবং বৈচিত্র্যের এমন মধুর রোমাঞ্চ দেহমনকে পুলকিত করিতে সক্ষম—বড়ই আশ্চর্য্য!

তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ অবাঙালীর। কথাবার্ত্তায় কোন কারণে বাঙালী বলিয়া সন্দেহ করিলে বিপদ হইতে পারে মনে করিয়া তাহারা সমস্ত পথ এক প্রকার নীরবেই অতিক্রম করিল।

ক্রমশঃ

প্রাচীন সাহিত্যে ভারতীয় সংস্কৃতি

অধ্যাপক শ্রীপরিতোষ দাস

প্রায় পাঁচ হাজার বৎসরেরও পূর্ব্বে যখন অন্য সমস্ত দেশ অজ্ঞানতার অন্ধকারে আবৃত ও অপরিজ্ঞাত ছিল, তখন হিন্দু-প্রতিভার বিকাশ নানা দিক দিয়া পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। সেদিন ভারতবর্ষ জ্ঞানে, গুণে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, শিল্পে-সাহিত্যে, শোভায়-সম্পদে গরীয়ান হইয়া জগতের শীর্ষ আসনে আরূঢ় হইয়া সর্ব্বত্র ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা বলিতে স্বতঃই আর্য্য-সভ্যতার কথাই মনে উদিত হয়। কিন্তু মোহেনজোদড়ো ও হরপ্পার আবিষ্কারের পর অনেক পণ্ডিতের ধারণা যে ভারতে আর্য্য সভ্যতা বিস্তৃতির পূর্ব্বে সিন্ধু উপত্যকায় দ্রাবিড়-সভ্যতা নামে এক উন্নততর সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া আর্য্যদের এই শক্তিশালী দ্রাবিড় এবং কোল, ভীল, মুণ্ডা, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি অন্যান্য অনার্য্য জাতিদের সম্মুখীন হইতে হয়। নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও যুদ্ধবিগ্রহের ভিতর দিয়া দুই বা ততোধিক সভ্যতার মিলন সাধিত হয় এবং তাহারই ফলে যে এক অখণ্ড নব-সভ্যতা গড়িয়া উঠে, তাহারই নাম ভারতীয় হিন্দু বা বৈদিক সভ্যতা। শুধু যে একাধিক সভ্যতার মিলন হইয়াছে তাহা নহে, পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনরূপ এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া সম্পূর্ণভাবে যে নূতন জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার নাম হিন্দুজাতি। পরবর্ত্তী যুগে শক, হুন, গুর্জ্জর প্রভৃতি অন্যান্য জাতি বাহির হইতে ভারতে আগমন করিয়া হিন্দুজাতির অবয়বে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে যুক্ত হইয়া যায়। আজ আর ভারতবর্ষে কে শক, কে হুন ইহার প্রভেদ নির্ণয় করিতে পারা যায় না। ইহা কলঙ্কের কথা নয়, গৌরবেরই বিষয়। ইহা একটা সচল জাতির জীবনের স্পন্দনেরই পরিচয় প্রদান করে। নূতন নূতন রক্তধারার মিশ্রণ একটা জাতিকে সতেজ রাখিবার পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। সুপ্রাচীনকালে হিন্দু-জাতি যে সজীব, প্রাণবন্ত ছিল তাহার প্রমাণ—"ঐ যুগে ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতির মত কবি; শূদ্রকের মত নাট্যকার; বিষ্ণুশর্ম্মার মত গল্প-রচয়িতা; যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম, শঙ্কর প্রভৃতির মত দার্শনিক; পাণিনি, কাত্যায়নের মত বৈয়াকরণ; পিঙ্গলের মত ছন্দশাস্ত্রজ্ঞ; আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য্যের মত জ্যোতিবিদ ও গাণিতজ্ঞ; চরক ও সুশ্রুতের মত চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ্; কৌটিল্যের মত অর্থশাস্ত্রকার ও নাগার্জ্জুনের মত রাসায়নিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

এক সময়ে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙালী জাতির বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ খ্যাতি ছিল। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, তাহার কারণই হইল দ্রাবিড়, আদি-অষ্ট্রেলীয়, নেগ্রিটো ও আর্য্যজাতির সংমিশ্রণে বাঙালী জাতির উৎপত্তি। বিভিন্ন রক্তের ধারা আসিয়া একত্র মিলিত হইয়া বাঙালী জাতির প্রাণশক্তিকে পরিপুষ্ট করিয়াছিল বলিয়াই আহারে-বিহারে, সমাজ-ব্যবস্থায়, রীতিনীতিতে, তৈজসপত্রে, গৃহ-নির্ম্মাণে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে, গুণগ্রাহিতায়, বীরত্ব-প্রদর্শনে অপূর্ব্ব প্রতিভার ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়াছে। বহুকাল যাবৎ রক্তের স্রোত একই খাতে প্রবাহিত হওয়ায় বাঙালীর ধী-শক্তি ও প্রাণবেগ ক্রমশঃ ক্ষুণ্ন হইয়া পড়িতেছে।

যাহাই হউক, এখানে আমাদের যে আলোচ্য বিষয় ভারতীয় সভ্যতা বা কৃষ্টি, তাহার ভিত্তিই হইল ধর্ম্ম। ভারত-বর্ষের ধর্ম্ম হিমালয়ের মত অত্যুচ্চ ও গম্ভীর। গঙ্গার ধারা যেমন হিমালয়ের বক্ষ হইতে উৎসারিত হইয়া বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া সারা দেশকে সরস ও সঞ্জীবিত করিয়া রাখে, ভারতবর্ষের ধর্ম্মও তেমনি আহিমাচল-কুমারিকা পর্য্যন্ত গ্রাম-নগর, গিরিগুহা, এবং আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিত। ভারতবর্ষের সকল বস্তুর মূলেই ধর্ম্ম। ভারতবর্ষে রাজ্য ধর্ম্ম অর্থ ফলের নিমিত্ত। ভারতবর্ষে কবি অর্থে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। উপনিষদের ঋষি উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, "বেদ-বিদ্যাশিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ প্রভৃতি সবই অপরা বিদ্যা; যাহার দ্বারা অক্ষর-ব্রহ্মকে লাভ করা যায়, শুধু তাহাই পরা-বিদ্যা।" ভারতবর্ষ শুধু প্রভাত-সূর্য্যকিরণের মধ্যেই অমৃতের আস্বাদ পায় নাই, স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষ নবোদিত স্নিগ্ধ সূর্য্যের মত প্রখর মধ্যাহ্ন-ভাস্করকেও বন্দনা করিয়াছে। ভারতবর্ষের চরিত্রের গঠনই এইরূপ—একদিকে উহা যেমন কুসুমের মত কোমল, অপরদিকে তেমনি বজ্রের মতই কঠোর। ভারতবর্ষ একই দেবতাকে রুদ্র ও শিব—ধ্বংস ও কল্যাণের মূর্ত্তি বলিয়া কল্পনা করিয়াছে। ভারত-বর্ষেই মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা—মা অন্নপূর্ণা; ভারতবর্ষেই শ্মশান-চারিণী, নৃমুণ্ডমালিনী, করালিনী কালী মাতৃস্বরূপা। ভারত-বর্ষেই কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র। ভারতবর্ষেই অর্জ্জুন ভক্তিরসামৃত পান করিয়া বিশ্বরূপ দর্শনপূর্ব্বক ভীষণ লোকক্ষয়কারী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছে মৃত্যুর ভিতর দিয়াই জন্মের সার্থকতা।

কোন এক বিস্মৃত অতীতের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে তরুচ্ছায়া-বেষ্টিত পর্ণকুটীরে নবোদিত রবি-করজালে পূর্ব্ব-দিক্‌প্রান্ত

উদ্ভাসিত হইবার পূর্ব্বক্ষণে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে সমস্ত আকাশ-বাতাস ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত, প্রকম্পিত করিয়া ঋষির কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল 'ওঁ'। কারণ শব্দই ব্রহ্ম—যে ব্রহ্ম অনন্ত, অসীম, নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ও নির্ব্বিকল্প, এক ও অদ্বিতীয়; যে ব্রহ্ম সমস্ত জীবজগৎও বটেন আবার জীব-জগতের অতীতও বটেন। ইহারই পরে সেই অতীত যুগে রচিত হইল প্রথম ধর্ম্মগ্রন্থ—ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদ শুধু ভারতের নয়, সমস্ত জগতের প্রাচীনতম ধর্ম্মগ্রন্থ। তিলকের মতে ঋগ্বেদের কাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪৫০০ বৎসরের কম নয়। ঋগ্বেদ বলিতে ঋক্ সংহিতা বুঝায়। ঋক্-সংহিতা এক জনের রচিত নয়, বহু মন্ত্র বা ঋষিদের স্তব ও প্রার্থনার সমষ্টি। এই সমস্ত ঋষির মধ্যে গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, বামদেব, অত্রি প্রভৃতি বিখ্যাত। বিশ্বামিত্র গায়ত্রীমন্ত্রের ঋষি। সে যুগে চিন্তা সম্বন্ধে গণ-স্বাধীনতা প্রচলিত ছিল। প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের চিন্তা অবলম্বন করিতে পারিত। তাই দাসীপুত্র কবষ ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রের ঋষি। 'বিশ্ববারা নাম্নী একটি অত্রিবংশীয় স্ত্রীলোক ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের অন্তর্গত একটি সম্পূর্ণ সূক্ত রচনা করেন এইরূপ কথিত আছে।' এতদ্ব্যতীত নারীদের মধ্যে ঘোষা, অপালা ও লোপামুদ্রা প্রভৃতি ঋষির নাম পাওয়া যায়। "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি"—স্ত্রী স্বাধীনতালাভের যোগ্য নয়—মনুর এইরূপ উক্তি তখন হিন্দু ঋষিগণ কল্পনাও করেন নাই, কিংবা স্ত্রীলোক ও শূদ্রদের উপর বেদপাঠ বা শ্রবণের নিষেধাজ্ঞা জারী হয় নাই।

সেই প্রাচীনকালে ঋক্‌মন্ত্রের ঋষিগণ জগতের আদি কারণ সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছেন তাহা তৎকালীন জগতে আর কোথাও সম্ভবপর হয় নাই। ভাবের মহত্ত্ব ও গাম্ভীর্য্যে, কল্পনার উৎকর্ষে তাহা চিরদিনই জগতের বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে। ঋগ্বেদ ভিন্ন আরও তিনটি বেদ আছে: সাম, যজুঃ ও অথর্ব। সামবেদের পঁচাত্তরটি স্তোত্র ব্যতীত সমস্তটাই ঋক্-সংহিতার মন্ত্র; শুধু তফাৎ এই যে, সামবেদে ঐ সমস্ত মন্ত্র গীত হইত। যজুর্বেদের দুইটি শাখা: শুক্ল যজুর্বেদ ও কৃষ্ণ যজুর্বেদ। সংহিতার পরেই ব্রাহ্মণের সৃষ্টি। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ একটি না-একটি বেদের অন্তর্ভুক্ত। 'কৌষীতকি' ও 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' ঋগ্বেদের অন্তর্ভুক্ত, 'শতপথ ব্রাহ্মণ' শুক্ল যজুর্বেদের ও 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ' কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত। যাগযজ্ঞাদির বিষয় সংহিতায় সংক্ষেপে এবং ব্রাহ্মণে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণের পর আরণ্যক ও উপনিষদের সৃষ্টি। ছয় হাজার বৎসরের অধিককাল পূর্ব্বে যে বৃক্ষের অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছিল, তাহাই পুষ্ট হইয়া কালক্রমে সুগন্ধ ফুলে ও সুমিষ্ট ফলে সুশোভিত হইয়া উঠে। ঋগ্বেদে যে জ্ঞানের বিকাশ দেখিতে পাই, উপনিষদে তাহা পরিপূর্ণতা লাভ করে। ভারতবর্ষের গৌরীশঙ্কর যেমন অভ্রভেদী মহিমায় জগতের সামনে দণ্ডায়মান, উপনিষদের চিন্তাধারাও তেমনই।

উপনিষদের ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাস গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে ডাকিয়া তাঁহার সঙ্কল্পের কথা বলিলেন এবং তাঁহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি অপর স্ত্রী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীর মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের কথা শুনিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন, 'এই বিষয়-সম্পত্তি দিয়া আমি কি অমৃত লাভ করিতে পারিব?' প্রত্যুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য যখন বলিলেন, 'না, ভোগোপকরণসম্পন্ন মানুষের জীবন যে রকম হয়, তোমারও সেরকম হবে।' তখন মৈত্রেয়ী যাহা বলিয়াছিলেন তাহা ভারতবর্ষের প্রাণের অন্তরতম প্রদেশের কথা—"যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্"—যা দিয়া আমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব না তাতে আমার কি প্রয়োজন!' মৈত্রেয়ীর মুখ দিয়া ভারতবর্ষের ঋষি, ভারতের ধর্ম্মের ভিত্তি যে ত্যাগ, সেই কথা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"—একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়—এই মহাবাক্য চিরকাল ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সকল মনীষীই নতমস্তকে গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। এতদিন ভারতবর্ষ ছিল ত্যাগপ্রবণ এবং ধর্ম্মপ্রবণ। কিন্তু আজ ভারতবর্ষ হইয়া উঠিয়াছে ধনপ্রবণ। লোভ আজ আমাদের আকাশচুম্বী। লোভের বশবর্ত্তী হইয়া আজ আমরা চরিত্রের বলিষ্ঠতা হারাইয়া ফেলিয়াছি। ভারতবর্ষের যে মহান্ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী আমরা, আজ প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তাহা নষ্ট করিতে বসিয়াছি। আজ জাতির মেরুদণ্ড ভাঙিয়া চুরমার হইয়া পড়িতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন "what India needs today is character"—আজকের দিনে তাহার প্রয়োজনীয়তা আরও সহস্র গুণে বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রাণসত্তাকে আবার যদি পুনরুজ্জীবিত করিতে হয়; তাহাকে যদি আবার জগতের শীর্ষস্থানে বসাইতে হয়, তবে শুধু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, না অর্থনৈতিক সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভেও হইবে না; সর্ব্বাগ্রে ভারতবাসীকে হইতে হইবে চরিত্রবান ও ত্যাগনিষ্ঠ।

উপনিষদে ভারতীয় ঋষিরা প্রাচীনকালে যে মহান্, প্রশান্ত, গভীর চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন—প্রাচীন জগতে অন্য কোথাও সেরূপ দৃষ্ট হয় না। শুধু চিন্তাশক্তি নহে, অন্তর্দৃষ্টি উপনিষদের বিশেষত্ব। উপনিষদ শুধু যুক্তির প্রাধান্য দেয় নাই। "যৎ তৎ পশ্যসি তদ্বৎ"—আপনি

যাহা দেখিতেছেন, অর্থাৎ উপলব্ধি করিতেছেন তাহাই বলুন, ইহাই উপনিষদের ভিতরকার কথা। উপনিষদ যে পরম জ্ঞানের নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহা শুধু উপনিষদ পাঠেই লাভ করা যায় না। উপনিষদও সেই কথাই বলিয়াছেন—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"—এই আত্মাকে অধ্যাপনা, মেধা বা বহুশাস্ত্র পাঠে লাভ করা যায় না। উপনিষদে ব্রহ্ম এবং আত্মা একার্থবাচক। উপনিষদের ব্রহ্ম ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের পুরুষ, আর গীতার পুরুষোত্তম সমার্থবাচক। ১০৮খানি উপনিষদের নামোল্লেখ আছে, তন্মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় ও শ্বেতাশ্বতর—এই এগারখানি উপনিষদই প্রসিদ্ধ ও বহুলপ্রচলিত। ব্রাহ্মণে বেদের কর্মকাণ্ড ও উপনিষদে জ্ঞানকাণ্ড পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এইজন্ত উপনিষদকে বেদান্ত বলা হয়। চারি বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ শিষ্যপরম্পরায় ঋষিদের মুখ হইতে শ্রুত হইত বলিয়া ইহাদের শ্রুতি বলা হয়। বৈদিক গ্রন্থ বলিতে এই সমস্তই বুঝায়। এই সমস্ত বৈদিক গ্রন্থই প্রাগ্‌বৌদ্ধযুগের।

বিভিন্ন উপনিষদে যে পরম জ্ঞান বহু স্থানে বিক্ষিপ্ত, বাদরায়ণ তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে বা বেদান্তশাস্ত্রে এক জায়গায় সে সমস্ত সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আর সর্ব্বোপনিষদ-রূপ গাভীকে দোহন করিয়া যে দুগ্ধ বা অমৃত লব্ধ হইয়াছে, তাহাই হইল গীতা। উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা—এই তিন প্রস্থানত্রয়ী বা বেদান্তশাস্ত্রের তিন শাখা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই তিনটির মধ্যে গীতাই সর্ব্বাধিক জনপ্রিয়, কিন্তু গীতা শ্রুতিপর্য্যায়ভুক্ত নহে।

গীতা হিন্দুসমাজের সার্ব্বজনীন ধর্ম্মগ্রন্থ। অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ এবং দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য্য সকলেই নিজ নিজ মত সমর্থন করিবার জন্ত গীতাভাষ্য লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন। ভাষার লালিত্য, ভাবের গভীরতা ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতির দিক দিয়া গীতা কাব্যহিসাবেও গৌরবময় স্থান পাইতে পারে। কিন্তু গীতা প্রথমে ধর্ম্মগ্রন্থ, পরে কাব্য। হিন্দুর ধর্ম্মকে বুঝিতে হইলে গীতার সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার।

গীতোক্ত ধর্ম্ম কি সে বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে নানা মনীষী নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত গীতার নূতন নূতন ভাষ্য রচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি সত্য তাহা নির্দ্ধারণ করিবার ব্যর্থ প্রয়াসে প্রবৃত্ত না হইয়া গীতা পাঠ করিয়া সাধারণ ভাবে যাহা হৃদয়ঙ্গম হয় তাহাই বিশ্লেষণ করা যাক।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রাক্কালে আত্মীয়স্বজনকে বিনাশসাধনপূর্ব্বক রাজ্যলাভ করা নিরর্থক ভাবিয়া অর্জ্জুনের মনে বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তিমূলক নানাপ্রকার যুক্তি দিয়া, এমন কি বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া অর্জ্জুনের মানসিক জড়তা দূর করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের বিষাদে গীতার প্রারম্ভ, আর "নষ্টমোহ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত। স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহ করিষ্যে বচনং তব॥"—'হে ভগবান, তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে, আমি স্মৃতিলাভ করিয়াছি, স্থিত ও গতসন্দেহ হইয়াছি, এখন তোমার বাক্যানুযায়ী কাজ করিব'—অর্জ্জুনের এই উক্তির সঙ্গেই গীতার সমাপ্তি। অর্থাৎ, অর্জ্জুনের কর্ম্মে অপ্রবৃত্তিরূপ জড়তায় গীতার আরম্ভ, আর কর্ম্মে প্রবৃত্তি ফিরিয়া আসার সঙ্গেই গীতার শেষ। কোন একটি মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত গীতা রচিত হয় নাই; গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল অর্জ্জুনের বিষাদ দূর করিয়া তাঁহাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করানো এবং উহাতে তিনি সফলকাম হইয়াছিলেন।

গীতায় 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও—শ্রীকৃষ্ণ এ কথাও যেমন বলিয়াছেন, তেমনি 'তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব, জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্'—সেই হেতু তুমি ওঠ, যশ লাভ কর, শত্রু জয় করিয়া সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ভোগ কর—এই উক্তিও করিয়াছেন। একদিকে উচ্চাঙ্গের দর্শন—কে কাকে মারে, কেই-বা মারে; আত্মা অমর, মানুষ যেমন জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তেমনি আত্মাও জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীর আশ্রয় করে। আবার অপর দিকে লৌকিক যুক্তি—তুমি যদি যুদ্ধ হইতে বিরত হও, তাহা হইলে তুমি ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধে বিমুখ হইয়াছ বলিয়া লোকসমাজে তোমার অকীর্ত্তি প্রচারিত হইবে এবং সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে অকীর্ত্তির চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ, অতএব যুদ্ধ কর। যুদ্ধে প্রবৃত্ত করানোর জন্ত এই উভয় প্রকারের যুক্তিই প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই সমস্ত যুক্তিরই একমাত্র লক্ষ্য—মোহ ও ভ্রান্তিবশতঃ অর্জ্জুনের মনে যে ক্লীবত্ব ও জড়ত্ব আসিয়াছিল তাহা হইতে তাঁহাকে মুক্ত করা।

অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করতঃ জ্ঞান লাভ করিয়া পরম ভক্তিতত্ত্ব অবগত হইয়া, ভীষণ লোকক্ষয়কারী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায়—গীতায় কর্ম্মের প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে এরূপ সিদ্ধান্ত অনেকে করিয়াছেন। কিন্তু ইহা যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়া মনে হয়। কারণ ইহা শুধু এই কথাই প্রমাণ করে যে, পরম ভক্তি ও জ্ঞান লাভ করিয়াও কর্ম্ম করা যাইতে পারে, তাহার মধ্যে অসামঞ্জস্য কিছুই নাই। গীতায় কর্ম্ম, জ্ঞান বা ভক্তি কোনটিকেই প্রাধান্ত দেওয়া হয় নাই, বরং

তাহাদের সামঞ্জস্তবিধান করা হইয়াছে। পরম জ্ঞানী ও ভক্ত, সমাজ এবং দেশের কল্যাণের জন্ম ধর্ম্মবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া কর্ম্ম করিতে পারেন—ইহাই গীতার প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম। দেশকে অধর্ম্মের গ্লানি হইতে মুক্ত করিবার জন্ম, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশসাধন করিয়া সাধু অর্থাৎ সৎ ব্যক্তিদের লাঞ্ছনার হাত হইতে রক্ষার্থ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত অর্জ্জুনকে ঐ রকম কর্ম্মে প্রবৃত্ত করানোর প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এবংবিধ উপদেশই দিয়াছিলেন। গীতা এই হিসাবে কর্ম্মমূলক বটে, কিন্তু তাহা ভক্তি ও জ্ঞানের উপর প্রাধান্য স্থাপনের জন্ম নহে। মোহবশে কর্ম্মবিমুখ ব্যক্তির কর্ম্মবিমুখতা দূর করাই ধর্ম্ম। কাজেই কর্ম্মবিমুখতা দূর করিয়া অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে বারংবার প্রণোদিত করার মধ্যে কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াস নাই, আছে জগতের শাশ্বত ধর্ম্মকে পরিস্ফুট করার আকাঙ্ক্ষা। যে ভক্তি ও জ্ঞান কর্ম্মবিমুখতাকে সমর্থন করে, তাহা তামসিকতার নামান্তরমাত্র—তাহা ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম। কর্ম্মবিমুখ ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—গীতায় শ্রীকৃষ্ণের 'তস্মাৎ যুধ্যস্ব' এই কথাই প্রমাণ করে—ভক্তি ও জ্ঞানের উপর কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নানা দিক দিয়া হিন্দু প্রতিভার বিভিন্নমুখী বিকাশ হইয়াছিল। তখন ভারতের আত্মা কর্ম্মচঞ্চল ছিল, নব নব কর্ম্মের মধ্য দিয়া আত্ম-আবিষ্কারের পথকে উন্মুক্ত করিতেছিল। কিন্তু তুর্কিদের দ্বারা বিজিত হওয়ার পর মধ্যযুগে হিন্দুর প্রতিভা-বিকাশের পথ ক্রমশঃ রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। হিন্দু তাহার ধর্ম্মের গতিবেগ ও ঔদার্য্যের কথা ভুলিয়া নিজের চারিদিকে শুষ্ক আচার-বিচার রূপ কুসংস্কারের বেড়াজাল দিয়া অচলায়তনের সৃষ্টি করিল। পণ্ডিতবর্গ 'তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল' প্রভৃতি অসার তর্ক-বিতর্ক লইয়া দিনের পর দিন ঘরের কোণে বসিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া আলস্যে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বাহিরের সমস্ত সংস্পর্শ সযত্নে পরিহারপূর্ব্বক চলমান জগতের পরিবর্ত্তনের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কূপমণ্ডুক হইয়া বসিয়া রহিলেন। ফলে জাতীয় জীবনে পঙ্গুতা ও জড়তা আসিয়া প্রবেশ করিল, জাতিকে কর্ম্মবিমুখ করিয়া তুলিল। তাহারই ফলে ভারতের এই অধঃপতন, বিদেশীর হাতে লাঞ্ছনার একশেষ। ভারতবর্ষকে নূতন করিয়া গঠন করিবার ভার আজ আমাদের উপর ন্যস্ত। আমাদিগকে নৈতিক বলে বলীয়ান ও শুভবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া 'তস্মাৎ যুধ্যস্ব' এই বিবেকের বাণী শ্রবণে জাগ্রত হইয়া অন্যায় অবিচার অত্যাচার প্রলোভনের বিরুদ্ধে, দুষ্কৃতকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, প্রাচীন ভারতের যে প্রাণবেগ এক দিন সমস্ত বিশ্বকে এক জাতি, এক প্রাণ, এক ধর্ম্মসূত্রে গ্রথিত করিবার শক্তি রাখিত, মধ্যযুগের অচলায়তনের প্রাচীরে সেই প্রাণস্রোত রুদ্ধ হইয়া পড়ায় নানা ক্লেদ আসিয়া জমিয়াছে। আমাদের নবীন প্রাণশক্তিরূপ বন্যার স্রোত বহাইয়া বহু যুগসঞ্চিত ক্লেদ অপসারিত করিতে হইবে, তবেই ভারত আবার জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইবে।

গীতা আর একটি অমূল্য শিক্ষা প্রদান করে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" ফলের দিকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া অর্থাৎ প্রলুব্ধ মন লইয়া কখনও কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় না। নির্লোভ এবং নির্লিপ্ত মনে কর্ম্মসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িলে অমৃতের আস্বাদন আপনা হইতে পাওয়া যায়।

কোন জাতিকে জানিতে, বুঝিতে বা চিনিতে হইলে জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে তাহার স্বরূপ অনুসন্ধান করিতে হইবে; কারণ জাতীয় সাহিত্য জাতীয় জীবনের দর্পণস্বরূপ। জাতীয় জীবনের চিন্তা, ভাবধারা, অনুভূতি, কল্পনা সবকিছুই উহার সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া উঠে। যে জাতির নিজস্ব সাহিত্য নাই, সে জাতি ক্রমে নিজের পরিচয়কে হারাইয়া ফেলে। সেই সুপ্রাচীন কালে ভারতবর্ষে শুধু ধর্ম্মগ্রন্থ নয়, উচ্চতম কাব্য-সাহিত্যও রচিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ প্রভৃতি বৈদিক ধর্ম্মগ্রন্থের কোন কোনটিতে যদিও কবিত্বশক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, তথাপি সেগুলি কাব্য নহে, রামায়ণ ও মহাভারতই ভারতবর্ষের দুইটি সুপ্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। এই দুই মহাকাব্যেই ভারতবর্ষের প্রাণের মূর্ত্তবিকাশ। গীতা মহাভারতের অংশ এবং মহাভারতের বহু পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। তবে রামায়ণ ঠিক কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহা এখনও সঠিক নির্ণীত হয় নাই। রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুইয়ের মধ্যে রামায়ণই অধিকতর জনপ্রিয়। তাহার প্রধান কারণ—বাল্মীকি রামায়ণে যে কাহিনী অতি সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও মধুর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষের প্রাণকে অমৃতধারায় সিঞ্চিত করিয়া আসিতেছে। তাই রামায়ণ প্রাচীন হইলেও প্রভাত-সূর্য্যের মত চির-নবীন, চির-সুন্দর।

মহাভারতে রামায়ণ অপেক্ষা উন্নততর সামাজিক ও রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সংস্কৃতির নিদর্শন পাই। সমস্ত জগতের সাহিত্যে মহাভারতের ন্যায় এত বৃহৎ কাব্য আর আছে কিনা সন্দেহ। মহাভারতে মূল আখ্যায়িকার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার সৃষ্টি এত বেশী যে মনে হয় আজকালকার

অনবসর যুগে এত বড় গ্রন্থ পড়িবার ধৈর্য্য বিরল ? কিন্তু সারাদিনের পরিশ্রমের পর শ্রান্তি অপনোদনের জন্ম কথকের মুখ হইতে যখন ভারতবাসী রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক উপাখ্যান শুনিত, তখন ইহার সার্থকতা ছিল। এই সমস্ত কথকতার ভিতর দিয়াই আমাদের দেশে লোকশিক্ষা প্রচলিত ছিল। তাহার ফলে ভারতের জনসাধারণ মস্ত বড় এক সভ্যতার উত্তরাধিকারী হইতে পারিয়াছে এবং সেই কারণেই হ্যাভেলের মত বিদ্বান বিংশ শতাব্দীতেও ভারতের জনসাধারণ সম্বন্ধে বলিতে পারিয়াছেন, "ভারতের নিরক্ষর জনসাধারণ—এমন কি, আধুনিক ইউরোপের বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষিতদিগকে সভ্যতা শিক্ষা দিতে পারে।" কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজ সেই লোকশিক্ষার সহজ পন্থাটি ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। আগে ভারতবর্ষ ছিল গ্রামপ্রধান। ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র ছিল গ্রামীণ সভ্যতা ; সেদিন আনন্দ-উৎসবে মুখরিত থাকিত গ্রামের আকাশ-বাতাস, ঘাট-হাট-বাট-মাঠ। আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে ভারতবর্ষ হইয়া উঠিয়াছে শহরমুখী। পূর্ব্বের সেই সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ও অনাবিল গ্রাম্য জীবনস্রোত আজ শুকাইয়া মরিতেছে। সে প্রাণ-স্পন্দন আজ আর অনুভূত হয় না। বিজ্ঞানের দৌলতে সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও আজ আমাদের আনন্দ পরিবেশন করে সত্য ; কিন্তু প্রাচীনকালে কথকতা যেরূপ জাতির নৈতিক চরিত্রগঠন করিতে সহায়তা করিত, তেমনটি আর হয় না। দিবসের কঠোর পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার শান্ত অন্ধকারে পল্লীর সুশীতল স্নেহের আবেষ্টনীর মধ্যে চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যস্থলে কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া সম্মুখে প্রজ্বলিত প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোকের সামনে তুলোট কাগজের পুথি খুলিয়া নাকে চশমা দিয়া যখন কথক-ঠাকুর ধ্রুব-প্রহ্লাদের, সাবিত্রী-সত্যবানের হৃদয়-গলানো কাহিনীর বর্ণনা করিতেন, তখন উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া দর-বিগলিত ধারায় যে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিত তাহা ভারতবর্ষেরই বৈশিষ্ট্য। এইরূপে ভারতবাসীর হৃদয়ে যুগপৎ যে কোমল ও সুদৃঢ় ভাবের রেখাপাত হইত তাহা তাহাকে অধর্ম্মাচারী হইবার হাত হইতে রক্ষা করিত।

সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্মশিক্ষালাভের জন্য হিন্দুপ্রতিভা পুরাণ সৃষ্টি করিয়াছে। হৃদয়মন-মুগ্ধকারী ভক্তিরসামৃতকে আস্বাদন করানোই পুরাণের উদ্দেশ্য। অতি সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাবে পুরাণে উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মতত্ত্বসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণের ধ্রুব ও প্রহ্লাদের কাহিনী সারা বাংলায় সুবিদিত। প্রহ্লাদ ভক্তের আদর্শস্থানীয়। প্রহ্লাদের চরিত্র ধ্রুবতারার মত সামনে রাখিয়া ভক্ত অশেষ দুঃখের মধ্যেও ভগবানের কল্যাণময় বরাভয় রূপ দেখিতে পায়। পদ্ম-পুরাণের বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী আজও বাঙালীর হৃদয়ে সুধা বর্ষণ করে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী যেমন নারী-জাতির আদর্শ, বেহুলাও তেমনই।

"আমি নরকে বাস করিলে যদি আর্ত্তজনের দুঃখের লাঘব হয় তবে অনন্তকাল নরকে বাস করাই শ্রেয়ঃ মনে করি।"—মার্কণ্ডেয় পুরাণের রাজা বিপশ্চিতের এই উক্তি জগতের যে-কোন ধার্ম্মিক মহাপুরুষের উপযুক্ত বাক্য। মহাপুণ্যবান রাজা বিপশ্চিতকে সামান্ত ক্রটির জন্ম নরকে যাইতে হইয়াছিল। কিছুক্ষণ নরকে থাকিবার পর যমদূতের আদেশমত যখন তিনি স্বর্গে যাওয়ার জন্ম উদ্যত হইলেন, তখনই নরক-বাসীরা তাঁহাকে মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করিবার জন্ম চীৎকার করিয়া অনুনয় করিল। কারণ তাঁহার শরীর হইতে এমন মধুর গন্ধ নির্গত হইতেছিল যাহাতে নরকযন্ত্রণা লাঘব করে। তাহাদের করুণ আবেদন শুনিয়া তিনি নরক পরিত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, "আমার মনে হয়, মানুষ আর্ত্তের দুঃখ লাঘব করিয়া যে আনন্দ লাভ করে, স্বর্গে কিংবা ব্রহ্মলোকে সেরূপ আনন্দ কখনও লাভ করিতে পারে না। আমার উপস্থিতিতে যদি সমস্ত আর্ত্তের দুঃখের লাঘব হয়, তবে আমি এইখানেই স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিব, এখান হইতে এক পাও নড়িব না।" এইরূপ উচ্চ ভাব খুব কম ধর্ম্মগ্রন্থেই পাওয়া যায়।

বিষ্ণু, পদ্ম, ভাগবত, বায়ু, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ—পুরাণসমূহের মধ্যে সমধিক প্রচলিত। পুরাণসমূহ কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে বর্ত্তমান অষ্টাদশ পুরাণ যে একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই রচিত তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। কারণ সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের সময় আলবারুনী নামে একজন পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। তিনি অষ্টাদশ পুরাণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কবি বাণভট্ট সপ্তম শতাব্দীতে তাঁহার গ্রামে বায়ুপুরাণ পাঠ শুনিয়াছেন। কাজেই বায়ুপুরাণ যে সপ্তম শতাব্দীর আগে রচিত, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। বিষ্ণুপুরাণে মৌর্য্যবংশীয় রাজাদের (যাঁহাদের রাজত্বকাল ৩২১ হইতে ১৮৫ খ্রীষ্টপূর্ব্ব), মৎস্যপুরাণে অন্ধ্ররাজাদের (২২৫ খ্রীষ্টাব্দে যাঁহাদের রাজত্ব শেষ হয়) এবং বায়ুপুরাণে গুপ্তবংশের প্রথম চন্দ্রগুপ্তের (রাজত্বকাল ৩২০ হইতে ৩৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) রাজত্বের বর্ণনা আছে।

বৈদিক যুগ হইতে ভারতবর্ষের ধর্ম্মানুষ্ঠানাদির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই দেখিতে পাই যে, বৈদিক ধর্ম্ম প্রথম অবস্থায় বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণ-যুগে যাগযজ্ঞাদি রূপ কর্ম্মপ্রধান, উপনিষদের যুগে জ্ঞানপ্রধান ও পৌরাণিক যুগে

ভক্তিপ্রধান ছিল। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য এগারখানি উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতাভাষ্য লিখিয়া অদ্বৈত মত সুপ্রতিষ্ঠিত করিলে পর, ধর্ম্মমতসমূহকে শুধু কর্ম্ম, জ্ঞান বা ভক্তির মাপকাঠিতে বিচার করিবার পরিবর্ত্তে ইহা অদ্বৈতবাদ কি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ কি দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিবার রীতি হইল।

কাব্যসাহিত্য ছাড়া শ্রেষ্ঠ নাটক রচনাতেও সে যুগে হিন্দুর কল্পনা যৎপরোনাস্তি উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে ভাসের নাটকসমূহ বহু প্রাচীন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গণপতি শাস্ত্রী 'স্বপ্নবাসবদত্তা', 'প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ', 'চারুদত্ত', 'প্রতিমা' প্রভৃতি তেরখানি ভাসের নাটক আবিষ্কার করেন। গণপতি শাস্ত্রীর মতে ভাস কৌটিল্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। ভাসের নাটকের ভাষা খুব সহজ ও প্রাঞ্জল; কাজেই সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য হওয়ায় বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ভাসের নাটকসমূহের মধ্যে 'স্বপ্নবাসবদত্তা' শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত।

ভাসের পর আমরা একেবারে খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে আসিয়া পড়ি। এই যুগের প্রথম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবি অশ্বঘোষ কণিষ্কের সমসাময়িক। অতএব তিনি প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগ বা দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। তিনি সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন এবং এক দল গায়ক ও গায়িকা লইয়া নানা স্থানে গান গাহিয়া বেড়াইতেন। তিনি তাঁহার গানের ভিতর দিয়া জগতের অনিত্যতা প্রচার করিতেন এবং শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহা শ্রবণ করিত। অশ্বঘোষ ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি আর্য্যদেব কর্ত্তৃক বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি বৌদ্ধদের মধ্যেও খুব সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তবে বৌদ্ধসন্ন্যাসী হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি এখানে বিবেচ্য নহে, তাঁহার কবিপ্রতিভার কথাই এখানে আমাদের আলোচনার বিষয়। ফরাসী পণ্ডিত সিলভাঁ লেভি তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "খ্রীষ্ট শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সমস্ত বৃহৎ ভাবস্রোত ভারতবর্ষকে সঞ্জীবিত ও প্রভাবিত করিয়াছে, তিনি তাহার উৎপত্তিস্থলে দণ্ডায়মান। ভাবের সম্পদে ও বৈচিত্র্যে তিনি মিল্টন, গ্যেটে, কাণ্ট ও ভল্টেয়ারের কথা স্মরণ করাইয়া দেন।" অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত, সৌন্দরানন্দ কাব্য, সূত্রালঙ্কার ও বজ্রসূচী-প্রণেতা। সম্প্রতি, সারিপুত্রপ্রকরণ নামক অশ্বঘোষের একখানি নাট্যকাব্যও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বুদ্ধচরিত কাব্যে যেখানে বুদ্ধদেবের জন্মের পর অসিত মুনি আসিয়া নবজাত শিশুর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন সেই জায়গা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। এই শ্লোকে অশ্বঘোষের উঁচুদরের কবি প্রতিভার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়:

> দুঃখার্ণবাদ্ব্যাধি বিকীর্ণফেনা জরাতরঙ্গান্মরণোগ্রবেগাৎ।
> উত্তারয়িষ্যত্যয় মুহ্যমানমার্তং জগজ্জ্ঞান মহাপ্লবেন॥"

অর্থাৎ, ব্যাধিরূপ বিক্ষিপ্ত ফেনা, জরারূপ তরঙ্গ, মৃত্যুরূপ উগ্র স্রোতোবেগসমন্বিত দুঃখসাগরে প্রবাহিত আর্ত্ত জীবসকলকে তিনি জ্ঞানরূপ মহানৌকা দ্বারা উদ্ধার করিবেন।

অশ্বঘোষের পর পঞ্চম হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সুবর্ণযুগ। ইহার অধিকাংশ সময়ই গুপ্ত রাজাদের রাজত্বকাল। মহাকবি কালিদাস, বিখ্যাত নাট্যকার শূদ্রক, ভারবি, ভর্ত্তৃহরি, বাণভট্ট, ভবভূতি প্রভৃতি এই যুগের বিখ্যাত কবি শুধু এই যুগের নহে, সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যেই শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস। কি নাটক, কি কাব্য, সর্ব্বদিকেই কালিদাসের অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষায় "তিনি সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক, সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। কোন দেশের কোন কবিই কালিদাসের ন্যায় সর্ববিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ছিলেন না, এরূপ নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয় অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না।"

কালিদাসের নাটকের মধ্যে শকুন্তলাই শ্রেষ্ঠ। ইউরোপের কবিকুলগুরু গ্যেটে শকুন্তলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "কেউ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, যা আকৃষ্ট করে ও বিমোহিত করে, যা ক্ষুধার নিবৃত্তি ও পরিপুষ্টি সাধন করে এবং স্বর্গ ও মর্ত্ত্য একত্র দেখিতে চায় তবে শকুন্তলায় তা পাবে।" এই অল্প কথার মধ্যে গ্যেটে শকুন্তলা নাটকখানির পরিপূর্ণ তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন। কণ্বের আশ্রমে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মিলনের মধ্যে যে যৌবনচাঞ্চল্য রহিয়াছে, সে মিলন পরিপূর্ণ মিলন নহে। দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হওয়ার পর মারীচের আশ্রমে তপস্যানলে দগ্ধ হইয়া শকুন্তলা 'নিকষিত হেম' হইয়াছিলেন; আর শকুন্তলাকে দেওয়া অঙ্গুরীয়ক ফিরিয়া পাওয়ার পর দুষ্মন্তের হৃদয় অনুতাপের আগুনে পুড়িয়া শ্মশান হইয়াছিল এবং সেই আগুনে তাঁহার চিত্ত পরিশুদ্ধ হইয়াছিল। তাই মারীচের আশ্রমে যখন দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুনর্মিলন হয়, তখন বৃক্ষান্তরাল হইতে গোপনে দেখিবার চেষ্টা নাই, অতিথিকে ভুলিয়া যাওয়া নাই, সে মিলনে ভোগাকাঙ্ক্ষা বড় নয়, পবিত্র দাম্পত্য প্রেম অপত্যস্নেহের মধ্য দিয়া মধুরতর হইয়া উঠিয়াছে।

উপরোক্ত নাটকসমূহ ছাড়া ভবভূতির উত্তররামচরিত ও মালতীমাধব; হর্ষবর্দ্ধনের রত্নাবলী ও নাগানন্দ; অষ্টম শতাব্দীর বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস; নবম শতাব্দীর

ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার ও একাদশ শতাব্দীর কৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

ভারতবর্ষে নাট্যকলা যে প্রভূত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাহা শুধু এই সমস্ত নাটকের মারফতে নহে, উড়িষ্যার পণ্ডিত বিশ্বনাথ কবিরাজ কর্তৃক একাদশ শতাব্দীতে লিখিত সাহিত্য-দর্পণ হইতেও একথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কি ভাবে নাটক লিখিতে হইবে, নাটকের নায়কের কি কি গুণ থাকা দরকার, কি রকম জিনিস নাটকে স্থান পাইবার যোগ্য নহে—এ সমস্ত বিষয়ের স্পষ্ট নির্দেশ সাহিত্য-দর্পণে দেওয়া আছে। সাহিত্য-দর্পণ নাটককে প্রধান দুইটি ভাগে ভাগ করিয়াছে: (১) রূপক ও (২) উপরূপক। আবার রূপকের দশ ও উপরূপকের আঠার রকম বিভিন্ন বিভাগ উহাতে স্বীকৃত হইয়াছে। তখনকার যুগে নাট্যসাহিত্যের ব্যাপকতার ইহাই প্রকৃষ্ট পরিচয়।

সংস্কৃত সাহিত্যে বিয়োগান্ত নাটক নাই। "হিন্দুপ্রাণ সে দুঃখকেই বোঝে, যে দুঃখ আনন্দকে আরও মধুর করিয়া তোলে। হিন্দু সেই বিরহই সহ্য করিতে পারে, যে বিরহ-মিলনে পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে। আত্যন্তিক দুঃখ যাহার পরিসমাপ্তি, হিন্দুর প্রাণ তাহা সহ্য করিতে পারে না। তাই সাহিত্য-দর্পণকার বলেন, রঙ্গমঞ্চে আত্যন্তিক দুঃখকর কোন ঘটনাই দেখানো নিষেধ। শুধু তাই নয়, এমন কথাও বলা হইয়া থাকে, কোনও প্রকারের দৃষ্টিকটু জিনিসও রঙ্গমঞ্চে দর্শকের সামনে অভিনীত হইতে পারে না।

গল্প ও আখ্যায়িকা রচনাতেও হিন্দু-প্রতিভা কোন অংশে কম প্রকাশ পায় নাই। আচার্য্য উইন্টারনিট্সের কথায় ভারতবর্ষ গল্প ও আখ্যায়িকার দেশ। মহাভারত অসংখ্য আখ্যায়িকায় পরিপূর্ণ। উপনিষদেও গল্পচ্ছলে অনেক মূল্যবান কথা বলা হইয়াছে। পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধজাতক গল্পের ভাণ্ডার। ইহা খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে লিখিত। গল্প-পুস্তকের মধ্যে বিষ্ণুশর্ম্মার পঞ্চতন্ত্র বিখ্যাত। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে পঞ্চতন্ত্রের খ্যাতি দেশ-বিদেশে এতদূর বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল যে, তৎকালীন পারস্য-সম্রাট নৌসরবনের আদেশক্রমে পহ্লবী ভাষায় ইহার অনুবাদ হয়। পঞ্চতন্ত্র অবলম্বনে লিখিত 'হিতোপদেশ'ও খুব জনপ্রিয় গল্পের বই। এতদ্ব্যতীত বেতাল পঞ্চবিংশতি, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি আরও কয়েকখানি গল্পের বইও আছে। কথা-সরিৎসাগর কাশ্মীরী কবি সোমদেবের রচনা। তিনি একাদশ শতাব্দীর লোক।

ইহা ছাড়াও হিন্দুরা অত্যাশ্চর্য্য 'সূত্র' সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতবর্ষে ধর্ম্মগ্রন্থ মুখস্থ করা এবং মুখে মুখে শিক্ষালাভ করার প্রথা সুবিদিত। যাহাতে লোকে সহজে মনে রাখিতে পারে এই জন্য খুব সংক্ষেপে মনোভাব ব্যক্ত করার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। তাহার ফলেই সূত্রের সৃষ্টি। সূত্রগুলি রাসায়নিক সঙ্কেতের মত সংক্ষিপ্ত অথচ যিনি তাহার অর্থ ঠিক ঠিক বুঝেন তাঁহার কাছে বিভিন্ন ভাব-প্রকাশক এবং মনে রাখিবার পক্ষে খুব সুবিধাজনক। অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট অবশ্য ইহা অর্থশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অনেক বিখ্যাত পুস্তক সূত্রের সমষ্টি, যথা—পাণিনির ব্যাকরণ, পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র ও বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রে বা বেদান্ত দর্শন।

যে সংস্কৃত সাহিত্যের মাধ্যমে হিন্দু-প্রতিভা নানা দিকে বিকাশ লাভ করিয়াছে, সেই সংস্কৃত ভাষা অমরসিংহ ও পাণিনির নিকট যেরূপ ঋণী, তাহাতে তাঁহাদের কথা কিছু না বলিলে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় ত্রুটি থাকিয়া যাইবে। অভিধান বা কোষ প্রত্যেক ভাষার সম্পদ-স্বরূপ। কালিদাসের সমসাময়িক অমরসিংহ প্রণীত 'নামালিঙ্গানুশাসন'ই সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ অভিধান, সাধারণতঃ ইহা 'অমরকোষ' নামে বিখ্যাত। প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত এই অভিধান যে এক আশ্চর্য্য কীর্ত্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সংস্কৃত ভাষাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার কৃতিত্ব পাণিনির কম নয়। পাণিনি জগতের শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ। তাঁহার ব্যাকরণের নাম 'শব্দানুশাসন'। আট অধ্যায়ে বিভক্ত বলিয়া ইহাকে সাধারণতঃ 'অষ্টাধ্যায়ী' বলা হয়। পাণিনি খ্রীষ্টের জন্মের সাত শত বৎসর পূর্ব্বে, পঞ্জাবস্থ আটকের নিকটবর্ত্তী সালতুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। পাণিনি ব্যাকরণ রচিত হইবার পর সংস্কৃত ভাষা উক্ত গ্রন্থ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।

যে জাতির অতীত এত গৌরবময়, বর্ত্তমানে তাহার ভাগ্যাকাশ দুর্য্যোগের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন থাকিলেও তাহা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। আবার মেঘ অপসারিত হইবে, জাতি সচেতন হইয়া উঠিবে—নবোদিত সূর্য্যের আভায় তাহার ভবিষ্যৎ গগনের দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

হিজলীর উপভাষা

শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল

ইতিপূর্ব্বে হিজলীর উপভাষা সম্পর্কে যৎসামান্য আলোচনা করিয়াছি।* এ বৎসর আমি পুনরায় হিজলীতে (খেজুরী থানায়) গিয়াছিলাম। স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত আলোচনা করিয়া আরও কিছু তথ্য ও শব্দাবলী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। এখানে তাহা লিপিবদ্ধ করা হইল। কোন উদ্যমশীল ভাষাতাত্ত্বিক হিজলীর বিভিন্ন অঞ্চলে অনুসন্ধান করিলে নিঃসন্দেহে ভাষাতত্ত্বের প্রচুর উপাদান পাইবেন। বঙ্গ ও উড়িষ্যার সীমান্তবর্ত্তী হিজলী অঞ্চলে বাংলা ও উড়িয়া ভাষা-সহোদরাদ্বয়ের পারস্পরিক যোগ খুবই স্বাভাবিক। আজও যেমন হিজলী বা মেদিনীপুর জেলায় উড়িয়া ভাগবতাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পঠিত বা পূজিত হয়, সেইরূপ উড়িষ্যার কটক ও বালেশ্বর জেলায়ও উড়িয়া হরপে লিখিত প্রাচীন বাংলা পদাবলী গীত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের পর হইতেই উড়িয়া সাহিত্যের যথার্থ প্রচলন সুরু হয়। কবি পিণ্ডীক শ্রীচন্দনের 'বসন্ত রাসর' কাব্য বাংলা ও উড়িয়া ভাষার হরগৌরী মিলনের সুন্দর দৃষ্টান্ত। শ্রীমতী মাধবী দেবী, রামচন্দ্র পট্টনায়ক, কানাই খুঁটিয়া প্রমুখ উড়িয়া কবিগণ বহু বাংলা-পদ রচনা করিয়াছেন।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের বাংলা-সাহিত্যে এমন কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায় যেগুলি আজিকার বাংলা ভাষায় (ভাগীরথীর উভয় তীরে) নাই, কিন্তু হিজলী বা উড়িষ্যার ভাষায় প্রচলিত আছে। প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে 'বেন্ত' (মুখ), 'ছামু' (সম্মুখ), 'মোহার' (আমার), 'হন্তে' (হইতে), 'করন্তি' (করে) ইত্যাদি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আজিকার বাংলা ভাষায় এগুলি নাই। ইহাতে হিজলীর উপভাষাকে উড়িয়া বা উড়িয়ার প্রভাবজাত না বলিয়া ইহাকে উড়িয়া ভাষার মত সংরক্ষণশীল বলাই সমীচীন। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন সত্যই বলিয়াছেন—"প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য আলোচনা করিলে হিন্দুস্থানী, মৈথিলী ও উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার অনেক শব্দের ঐক্য দৃষ্ট হয়। এই প্রাদেশিক ভাষাগুলির একটি অপরটি হইতে উদ্ভূত হয় নাই—কিন্তু এক জাতির ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চ শাখা সে সময়ে পরস্পরের অধিকতর নিকটবর্ত্তী ছিল, এইজন্য এই সাদৃশ্য।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র ভাষা পঞ্চদশ শতকের বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা অসম্ভব নয়। কিন্তু আজও হিজলী বা মেদিনীপুরের কোন কোন অঞ্চলের (ধলভূমের পূর্ব্বাঞ্চলেরও) ভাষায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' ব্যবহৃত বহু প্রাচীন শব্দ ও ইহার ভাষা-রীতির সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।১

দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বাংলাদেশের সর্ব্বত্রই ভাষায় অপিনিহিতি (Epenthesis) ছিল। এখন পূর্ব্ববঙ্গের উপভাষায় আছে, পশ্চিমবঙ্গের উপভাষায় নাই বলিলেই চলে, কিন্তু হিজলীর উপভাষায় ইহা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—আজি > আইজ, কালি > কাইল, হাসি > হাইল, মাগু > মাউগ ইত্যাদি।

কোন কোন মহাপ্রাণ বর্ণের অল্পপ্রাণ উচ্চারণ হয়। যথা, ঢেঙ্গা > ডেঙ্গা।

'ও' বর্ণের 'উ'-কারের দিকে প্রবণতা আছে। যথা, কুন্, তুমার, বুল্ (চলিত ভাষায়) ইত্যাদি। এই অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাচীন পুঁথিতে ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

হিজলীর উপভাষায় দ্বৈত ক্রিয়ার রূপ বর্তমান। যেমন, আমি খেয়ে যাব—আমি খাইকরি যাবা, তুমি করেছ—তুমি করি পেলছ ইত্যাদি। ধলভূমের উপভাষায়ও এরূপ ক্রিয়া দেখা যায়।২

ঘটমান বর্তমানে (Present progressive) ক্রিয়ার সহিত 'বট' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। কর্তার প্রয়োগ অনুসারে ইহার পরিবর্তন ঘটে। আবার দ্রুত উচ্চারণে মধ্যবর্তী 'ব' লোপ পাইয়া এক নূতন ক্রিয়াপদের সৃষ্টি করে। যেমন, আমি করিবটি > আমি করিটি, তুমি করবট > তুমি করট, সে করে বটে > সে করেটে, তুই করু বটু > তুই করুটু। এই ক্রিয়া-রূপ ধলভূম-মানভূম উপভাষায়ও বৈশিষ্ট্য। পশ্চিম প্রান্তের ভাষাগোষ্ঠীর সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া ডক্টর জি. এ. গ্রীয়ার্সন হিজলী বা মেদিনীপুরের ভাষাকে 'দক্ষিণ-পশ্চিমী বাংলা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। (Linguistic Survey of India, Vol. V.)

শুধু পৃথক মহকুমায় নয়—একই মহকুমার বিভিন্ন থানাতেই ক্রিয়াপদের রূপে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, তুমি করেছ, খেজুরী থানায় 'তুমি করি পেলছ,' কাঁথি থানায় 'তুমি করিপেকিছ'; সে করেছিল খেজুরী থানায় 'সে করথলা,' কাঁথি থানায় 'সে করথলন্' ইত্যাদি।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ খেজুরী থানার ভাষা সম্পর্কে লিখিয়াছেন:

"লিখন-পঠনের ভাষা বাঙ্গালা। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ওড়িয়া ভাষার বহুল চলন ছিল। বর্ত্তমান সময়ে উহা আদৌ প্রচলিত নাই। কথা কহিবার ভাষা বাংলার সহিত অল্প ওড়িয়া মিশ্রিত। প্রত্যেক জাতির মধ্যে কথনের ভাষার কিছু না কিছু তারতম্য দৃষ্ট হয় এবং অধিকাংশ স্থলে কথনের ভাষা হইতে জাতি নির্ণয় শক্ত হয় না। কথার ভাষা দ্রুত মার্জিত হইয়া বাংলাতে পরিণত হইতেছে।" (খেজুরী বন্দর, পৃ. ৭০)

* প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯

১ বাগর্থ—ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য

২ ধলভূম ও মানভূমের ভাষা ও সংস্কৃতি—সুধীর করণ, যুগান্তর ৭ই জুন, ১৯৫৩

সমগ্র হিজলী জেলা সম্পর্কেও এই কথা খাটে। কেদারনাথ মণ্ডল সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ পুঁথির লিপিকরের উক্তি হইতে প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বেকার হিজলীর ভাষার নমুনা দেওয়া গেল :

"এ পুস্তক সম্পূর্ণ সদাজয় ইতি সন ১২২০ সাল। মগশুর মাসের ১৯ দিনে বুধবারে বেলা ছয় ঘড়ি সময়ে কৃষ্ণপক্ষে তিথি চতুর্দ্দশী। এ পুস্তক লেখিলে কেওড়ামাল প্রগণা তবক বিযুয়ান গরাণিয়া গ্রামর শ্রীগদাধর দাসর বালক শ্রীসাগর দাস। হে সাধু সুজন মানে শুদ্ধ অশুদ্ধ মেলাই গাইন লেখা দোস না ধরিব।" ('বেলা', 'বালক', 'মেলাই', ও 'লেখা' শব্দগুলির 'ল' ও 'ব'-এর উচ্চারণে বিশেষত্ব আছে।)

এই সঙ্গে তুলনামূলকভাবে ঐ অঞ্চলের বর্তমান ভাষারও যৎসামান্য নমুনা দেওয়া হইল : 'গত আষাঢ় মাসে আমি হিজলী যাথলি। সেঠি আমার বন্ধু চুনীলাল মণ্ডলের দুয়ারে অতিথি থাইলি। চুনীবাবু আর তার স্ত্রী প্রমীলা দেবীর আদর যত্নে কদিন বেশ আনন্দে কাটিথলা। একদিন সকানু তান্নাকের গ্রামটা ঘুরিয়া আইলি। গ্রামের মেল্লা লোকের সাথে দেখা হোলা। তানুনে খুব ভদ্র। তানুনে আমাকে মেল্লা 'হিজলী বাদাম' খাতে দিলা।' ('সকানু' ও 'ঘুরিয়া' শব্দ দুটির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য আছে)। শব্দ সূচী দিবার পূর্ব্বে একটি কথা জানান প্রয়োজন মনে করি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিভিন্ন জাতির (caste) মধ্যে ভাষার পার্থক্য আছে। এমনও দেখা গিয়াছে, এক জাতির ব্যবহৃত কোন শব্দ আর এক জাতির অজ্ঞাত। হিন্দু মুসলমানের মধ্যেও আবার ভাষার তারতম্য লক্ষিত হয়। আমরা যে শব্দতালিকা দিলাম, তাহা খেজুরী থানার কোন না কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও প্রচলিত।

শব্দসূচী :

অগলি [<অর্গল]—যপকাষ্ঠ
অঝাড়্—অভবা
অন্তাল—হয়রান
অলঘুস্—অমার্জিত
অসাড়ুয়া—আজেবাজে, শৃঙ্খলাবিহীন
আউসান—[<আউস্থান <উষ্ম]—পচিয়া উঠা
আকর্তা—(১) বেশী ; (২) তাড়াতাড়ি
আহড়া—অমসৃণ
আজা [<অজ্জ <আর্য্য]—মাতামহ [তুলনীয় আজিমা, আইমা]
আঁঠিয়াচণ্ড—নাছোড়বান্দা, আঠার মত লাগিয়া থাকা
আড়ি [<প্রাঃ অড্ড]—পুকুরের পাড়
আঁদস্তা—অস্থির
আফোয়া—বকাটে
উক্লা [<উক <উষ্ণ ; স্বার্থে লা প্রত্যয়]—তৈলবিহীন [তুলনীয় উকু—২৪ পরগণা]
উথি দেওয়া বা ঝুনা দেওয়া—ছড়ান
উন্কুন্—আরম্ভ
উমড় কাছাড়—ঈর্ষ্যায় জলিয়া যাওয়া
উমড়ি [<হিন্দী উমড় <উম্মড্ড <উম্মর্দ]—প্রস্তুত (প্রাচীন বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে শব্দটি পাওয়া যায়)
উরাল বা আউরাল—গোলমাল
ওড়পনা—খোঁচা দিয়া একই কথা পাল্টাইয়া বলা
কত্‌রে—কাছে
কন্দ [<স্কন্ধ]—গাছের মেতি
কণ্‌কট্টা—মিশ্‌মিশে কালো [তুলনীয় কালকুটি—রূপরাম]
করভাঙ্গা [সং করমর্দ, মর্দ অর্থে ভঙ্গ]—কামরাঙ্গা
কর্ম্ম—ভাগ্য [তুলনীয় মোহোর করমে তোহ্মা আণি দিল বিধী—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন]
কাউচ—গবাদি পশুর কাঁধের ঘা [তুলনীয় কাউর—২৪ পরগণা]
কাউচান—আমেজ (যেমন ঘুমের)
কাউর [<কাউরু <কামরু <কামরূপ] আসঙ্গলিপ্সা [তুলনীয় রাতি ভইলে কামরু জায়ে—চর্য্যাগীতি]
কাঁকতুড়া (কাঁকপাখীর ঠোকর দেওয়া ?)—রোগা
কাখুর বা কাইখোর [<কর্কড়ি <কক্কডিয়া <কক্কডিয়া <কর্কটিকা]—কুমড়া (কাঁকুড়, কুমড়া প্রভৃতি একই শ্রেণীর ফল)
কানপাড়া—শুনিয়াও না শোনার ভাণ করা
কুকুড়া [<কুক্কুট]—মোরগ [তুলনীয় করে ধরি পর ছুরি কুকুড়া জবাই করি দশ গণ্ডা দান পায় কড়ি—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম]
কুৎকুতি [<কাতুকুতু]—খুনসুড়ি
,,—গাঢ়
কুচন—আনন্দ
কেটকু [কি+ঠাঁই+কু]—কোথায়
কেঁদি—পায়ু, মলদ্বার
কেল্লা [<হিন্দী করেলা <করবেল্ল]—উচ্চে [তুলনীয় কইল্যা—সিরাজগঞ্জ]
কোলঠাপ্পা [<কোল+স্থাপন]—কুলা
খরকা [<খড়ি ; কাষ্ঠ জাতীয়]—নারিকেল কাঠির ঝাটা
খারি [<ক্ষার]—লবণাক্ত
খুলি (মুখ খোলা) বা তালানি (বড় তলাযুক্ত)—বিস্তৃত মুখ অগভীর হাঁড়ি [তুলনীয় তেলানী গভীর নাভি লাবণ্য জল—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন]
খেরশানি [<খর+উষ্ম] নোনা গন্ধ
গড়া (শামুক অর্থে 'জোঙ্গড়া') বা সুপি (<প্রাঃ সিপ্প ; হিন্দী সীপ)—ঝিনুক
[নৌকার] গাছ—মাস্তুল [তুলনীয় গুণ বৃক্ষ]
গাড়ুয়া [<প্রাঃ গড্ড]—ভুঁড়িওয়ালা
গাদেড়ী (গা+দেড়ী, অর্থ অনিয়ম)—অসুস্থ, ঋতুমতী
গ্যাঙ্গযানো—বুক ফুলিয়ে চলা
গুজুরী—ছোট
গুণা—বপন করা

গোড়া কাঠি (গোড়া+কাষ্ঠ)—ধানের বিচালী
গোড়ে গোড়ে—ধীরে ধীরে
গোতর (<গোত্র)-পোঁচা—মৃতাশৌচ
গোঁতা (<ঊর্দ্ধ গোতা)-মারা—কোন বিষয় চাপিয়া যাওয়া
ঘিনি*—ঘেঁসিয়া (উদাহরণ, দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা ঘিনি আসে পাশে)
চণ্ডীশাল—রান্নাঘর (ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষ্যে চণ্ডীর ঘট স্থাপন করিয়া রান্না করা হইত বলিয়া এই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে)
চহল [<ফার্সী চুহল, chahl]—চীৎকার
চাটু—বড় চামচ বা হাতা
চিচিঙ্গা, ভেড়ু বা ভেঁড়ী (হিন্দী ভেণ্ডী বা ভিণ্ডী—ঢেঁড়শ (২৪ পরগণায় চিচিঙ্গা অন্ত এক রকম লম্বাকৃতি সব্জী, খেজুরীতে ইহাকে বলে 'সগ্লা')
চিরণ—বিস্ত্রী [তুলনীয় উচকপালী চিরণদাঁতী—বাংলা প্রবাদ]
চেন্না (তেলুগু 'চিন্না' অর্থে ছোট)—তরকারি রূপে ব্যবহৃত ছোট তরমুজ
ছুর—ক্ষৌর
ছেনিয়া—ঝাড়ু
জঁহুরা বা জরা—আবর্জ্জনা
জুঁই, জিঁয়া—জামাই
ঝোট—তেতো পাট
টাক্‌রা—আম আঁটি
টাঁঠি—ছোট হাঁড়ির ঢাক্‌না
টিক্‌রা—মাথার তেলো
টিকরি [<টিকর, something high]—রোমাক [তুলনীয় টিকর বুঝিয়া ঠাঁঞি কাটিলেক বন—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, মাধবাচার্য্য। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের মতে শক্তিগড় ষ্টেশনের প্রকৃত নাম হওয়া উচিত 'শাঁখটিকর']
টিক্‌লি—কোণা (যেমন মশারির টিক্‌লি)
টুবি—ডোবা
ঢেঁক—এঁটুলি, গবাদি পশুর গায়ের পোকা
টেনিয়া—কাপড়ের পাড় (বর্দ্ধমানে 'টেনা' অর্থ বস্ত্রখণ্ড, তুলনীয়—কটিতে কেবল এক টেনা মাত্র হেরি—ভক্তমাল, লালদাস নামান্তরে কৃষ্ণদাস)
ঠাকা—ধামা
ঠানা [<স্থান]—সমাবেশ [তুলনীয় পাপ পুন্ন বেণি তোড়িঅ সিকল মোড়িঅ খম্বাঠানা—চর্য্যাগীতি]
ঠিয়া (উড়িয়া শব্দ, স্থিতক>ঠিঅ-অ>ঠিয়া)—দাঁড়ানো
ঠেকি—ছোট ভাঁড়
ডাবরা—ঘটরূপে ব্যবহৃত কলস (২৪ পরগণায় সাধারণ কলসকেও 'ডাব্‌রি' বলে)

* ইতিপূর্ব্বে 'গ্রহণ করা' অর্থে ঘিনি শব্দের প্রয়োগ দেখান হইয়াছে।

ডাবুয়া—ছেঁড়া কাপড়ের টুক্‌রা
ডাহা [<ডাহ<দাহ] জ্বালা [তুলনীয় ডাহ ডোম্বীঘরে লাগেলি আগি—চর্য্যাগীতি]
ডিঙ্গা—মাছ ধরিবার উদ্দেশ্যে জলের মধ্যে মাটির বেষ্টনী দিয়া শুষ্ক স্থল
ঢেঁউচ (পু. বাং ডেও)—একজাতীয় মাদার [তুলনীয় ঢেঁকয় —২৪ পরগণা]
তক্কম—ক্রোধ
তনিক—লক্ষ্য
তঁপসাপ—কেউটে সাপ
তরং—ঢং, ভঙ্গিমা [তুলনীয় গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি —ভারতচন্দ্র]
তর্ব বা তরাই (হিন্দুস্থানী তরঈ)—এক জাতীয় ঝিঙ্গা।
তাম্বু—আমানি
তুম্বা [<তুম্ব, হিন্দী তুমড়া] —একতারা (প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে শব্দটির বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। 'সারাদিন ভিক্ষা করে এক মুঠা চাল তুম্বায় ভরে')
থুংমা—ভোঁতা
ধাউড়ি [<ধাওড়া<ধাঙড়া<ধাঙড়] তৃণ নির্ম্মিত লম্বা আসন (আসানসোলে মজুরদের বাস গৃহকে 'ধাউড়া' বলে। তুলনীয় চোর ধাউড় নাহি জানি কোন কালে—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, মাধবাচার্য্য)
ধুঁদি—ভুঁড়ি
ধুমড়ী—বৃদ্ধা
ধুলছুচনা (ধূলা+ছুঁচা ?)—হাভাতে
ধূপ (পুরাতন বাংলায় ছিল, এখন হিন্দীতে আছে)—রৌদ্র [তুলনীয় ধূপছায়া]
ধোসা—বাস্তুসংলগ্ন উঁচু জমি
পইড় (উড়িয়া শব্দ)—ডাব (চৈতন্যচরিতামৃতে শব্দটি পাওয়া যায়)
পত্ত—সুবিধা
পচরানো [<পুচ্ছ]—জিজ্ঞাসা করা
পড়ি (<প্রতি)-ঠাকুর্দ্দা—প্রপিতামহ [তুলনীয় পড়িনাতি—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ]
পাড়য়া—শ্মশান [তুলনীয় পড়ে—২৪ পরগণা]
পলুয়া—শুষ্ক ঝাল ব্যঞ্জন
পসারিয়া[<প্রসার] বা চাড়ুয়া—ভড়ংদার
পসিন্দা [<পস্বেদন <প্রস্বেদন ; হিন্দী পসীনা]—ঘাম
পাউচ—সিঁড়ি
পাদোস্তানা (পাদ+আস্তানা ?)—খোসামোদ
পানা [>পনহঅ<প্রস্রব]—গাভীর পালান বা দুগ্ধস্থলী
পিঁচ—কাঠি, (যেমন নারিকেলের)
পিড়া—ঘরের চাল (কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়)
পীড়ি—[<পীঠিকা]—বংশানুক্রম

পীড়িঘর—পায়ু
পুইমিচ্‌ড়ি—পুইবীচি [তুলনীয় পুইমেটুলি—কলিকাতা ; পুইডেমী —২৪ পরগণা ; উড়িষ্যায় পোইমঞ্জী]
পেকা (হিন্দী ফেক্‌না)—ফেল (যেমন, লিখি পেকা)
পেটেকলা—মর্ত্তমান কলা ('পেটে' অর্থ মোটা)
ফাইমা—ফুলবাবু [তুলনীয় ফইমে—২৪ পরগণা]
ফাটান—প্রহার
ফিরকিটি [< ফিকির]—ফন্দীবাজ
বাঁউকিয়া—উচু পিঁড়ি
বাউড়া [< বাহুড়া]—দ্বিরাগমন (প্রাচীন বাংলায় শব্দটির প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়। তুলনীয় বাহুড়ী আপণ ঘর করহ গমন—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন)
বাখার—বড় মরাই (চিঠিপত্রে সমাজচিত্র—পঞ্চানন মণ্ডল, পৃ. ৩২০ দ্রষ্টব্য)
বাড়—পার্শ্বদেশ (যথা —'বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ'—ভারতচন্দ্র)
বাড়িয়া [< বাটি]—তৈল বা ঘৃত রাখিবার মাটির পাত্র
বাড়ু [< বৃদ্ধ]—মোড়ল, প্রধান
বাস্‌কুড়া বা বাস্‌কিড়া—বেলে মাছ
বি (পুরাতন বাংলায় পাওয়া যায় ; হিন্দী ভী)—ও, also (উদাহরণ, আমি বি যাবা)
বিবেদর (ফার্সী)—(১) ভাই বন্ধু, (২) তেফাজত (কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে)
বুদা—ঝোপ
বেনিয়া [< বিনন] বা ছাঁকা—আগুন রাখার খড়ের বিনানী (বর্দ্ধমানে—'সাঁজালি')
বোধমুই—মুখভার
ভণ্ডারী (উড়িয়া) বা ভাড়ারী—নাপিত (পূর্ব্বে নাপিতরা ক্ষুর আর ভাণ্ড লইয়া ঘুরিত)
ভাঁ [ভাঙ < ভাঙ্গ < ভঙ্গ]—আলগা (উদাহরণ, অত রাতির বেলা দুয়ার ভাঁ রাখলু কেনি ?)
ভাবুয়া [< প্রাঃ ভবুহ , পু. বাং বা হিন্দী ভৌঁহ]—ভ্রূ
ভুই সুড়কী [ভুবি + সড়ক]—ঘন ঘন যাতায়াত
ভোঁড়া—মোচা
মচঙ্গ্—রসিক যুবা
মশ্‌না—মাদুর
মাই [< মাই < মাবই < মামী]—মাতুলানী
মাই [< মাতৃকা]-টকা—মেয়েছেলে
মাইশোর বা মগশুর [< মার্গশীর্ষ]—অগ্রহায়ণ মাস [তুলনীয় মাস মধ্যে মাইসর আপনি ভগবান—চণ্ডীমঙ্গল, মুকুন্দরাম]
মাজা (মধ্য বা মজ্জা হইতে)—থোড়
মাড়া [< মর্দ্দ] স্ত্রীসঙ্গ
মালপা—তৈল
মুণ্ডমরণ—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, হতভম্ব [তুলনীয় মুড়ামারা - কালকাতা]
মুর্দ্দার [ফার্সী মুর্দ্দা]—শব [তুলনীয় মুর্দ্দফরাস]
মোন্‌গী—অসংস্কৃত
ম্যাকা—খুঁটি
যা পাত্তা [যা + পাই + তা]—যা' তা'
রগ্—ঝোল
রণ—দিব্য, শপথ
রাঁয়া—ডাঁশা, পাকিবার পূর্ব্বাবস্থা
রীষালি [< রিষ < ঈর্ষা]—হিংসুক
রোগদী বা রোরোগদী—বিরক্ত [তুলনীয় রোষ > রোগ]
লুলিইছে—পাকিয়া তরল হইয়াছে (২৪ পরগণায় 'নুলেছে')
শাপাপাতি—নরম শাঁসবিশিষ্ট (২৪ পরগণায় 'নেওয়াপাতি')
সঁপড়া—সর্দ্দি
সয়লা—চিচিঙ্গা
সারু—জল কচু
হলুডাক্‌চা—বনকচুর ডাঁটা
হামার—নৌকার কাছি
হুদুর—ফন্দী
হেস—জলজ ঘাসের চাটাই (২৪ পরগণায় ইহাকে 'ঝাতলা' বলে)
হোড়—পিচ্ছিল*

* এই শব্দ সংগ্রহে শ্রীযুক্তা নীলিমা মণ্ডল ও শ্রীযুক্তা সাধনা প্রামাণিকের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি এবং কোন কোন শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তা লাভ করিয়াছি ; ইঁহাদের সকলেরই কাছে আমি কৃতজ্ঞ—লেখক।

শ্রীহরিদাস স্বামী

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
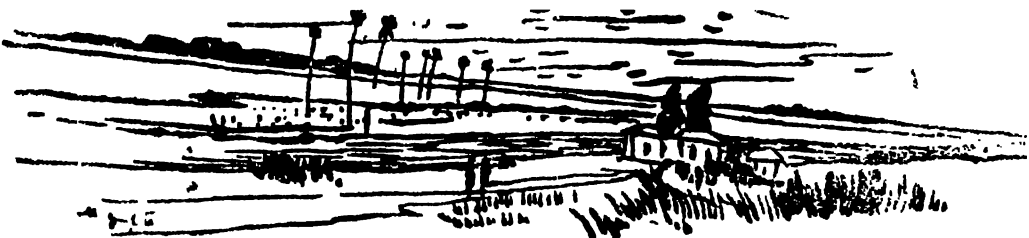
তানসেন ও বৈজু-বাওরার সঙ্গীত-শিক্ষাগুরু শ্রীহরিদাস স্বামী ১৫৬৯ বিক্রম সংবতে (=১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে) আলিগড় (তৎকালে 'কোল' নামে খ্যাত) জেলার হরিদাসপুর বা হরদাসপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আলিগড় শহর হইতে এই স্থান প্রায় চারি মাইল দূরবর্ত্তী। ইহা পরবর্ত্তীকালে হরিদাস স্বামীর নামানুসারেই হরিদাসপুর বা হরদাসপুর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

পঞ্জাবে 'চরণোদক' গ্রামে কর্ণদেব নামক গর্গ-গোত্রীয় এক সারস্বত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কর্ণদেবের পুত্র বিষ্ণুশর্ম্মা যখন বার বৎসরের বালক, তখন তাঁহার পিতা দেহত্যাগ করেন। ইনি তখন মাতার সহিত পিতৃদেবের শিষ্য লক্ষ্মীনারায়ণ বর্ম্মার নিকট মূলতান

শ্রীহরিদাস স্বামী (প্রাচীন তৈলচিত্র হইতে), বৃন্দাবন

জেলার উচ্চ গ্রামে গিয়া বাস করেন। কিছুকাল পরে এক সারস্বত ব্রাহ্মণ-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া যথাসময়ে তাঁহার গদাধর নামক এক পুত্র লাভ হয়। গদাধরের পুত্র আশুধীর ১৫৪৮ সংবতে (=১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্জাবের তদানীন্তন মুসলমান শাসকগণের উপদ্রবে আশুধীর পৈত্রিক নিবাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং উত্তর-প্রদেশের আলিগড় জেলার খেড়ে নামক গ্রামে আসিয়া বসবাস শুরু করেন। এই স্থানে এক শিবলিঙ্গের আবির্ভাব হয়, তিনি খেড়েশ্বর মহাদেব নামে খ্যাত হন। আশুধীর ও তাঁহার পত্নী গঙ্গাদেবী খেড়েশ্বর শিবের সেবা-পূজায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহাদের প্রথম পুত্র হরিদাস ১৫৬৯ সংবতের (১৫১২ খ্রীষ্টাব্দের) পৌষী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে শুক্রবারে জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে জগন্নাথ ১৫৭৫ সংবতে (=১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে) ও তৃতীয় পুত্র গোবিন্দ ১৫৮০ সংবতে (—১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

হরিদাসের দ্বিতীয় ভ্রাতা জগন্নাথের বংশধরগণই বৃন্দাবনের বাঁকাবিহারীর গোস্বামী নামে খ্যাত হইয়াছেন। ইঁহাদের মতে হরিদাস বিজয়া সতী নাম্নী এক সারস্বত ব্রাহ্মণ-কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং পত্নীর মৃত্যুর পর পঁচিশ বৎসর বয়সে ১৫৯৪ সংবতে (=১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে) সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃন্দাবনের নিধুবনে আসিয়া ভজন করিয়াছিলেন। সত্তর বৎসর কাল বৃন্দাবনে বাস করিবার পর ১৬৬৪ সংবতে (=১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে) নিধুবনেই তাঁহার দেহান্ত হয়। অদ্যাপি নিধুবনে তাঁহার সমাধি রহিয়াছে।

কথিত আছে, নিধুবনের একটি স্থানে তিনি প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন। লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে স্বামী হরিদাস বলিয়াছিলেন যে, ঐ স্থানে কুঞ্জের মধ্যে শ্রীবঙ্কুবিহারীজী ক্রীড়া করেন। শুনা যায়, হরিদাস স্বামী বিহারীজীর মানস-সেবা করিতেন। হরিদাস স্বামীর সমসাময়িক বিখ্যাত হিত হরিবংশ ও হরিরাম ব্যাস প্রমুখ কয়েকজন বৈষ্ণব হরিদাস স্বামীকে লোক-কল্যাণের নিমিত্ত বঙ্কুবিহারীজীকে প্রকট করিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে হরিদাস বঙ্কুবিহারীজীর মূর্ত্তি প্রকট করেন এবং নিধুবনেই সেবা করিতে থাকেন। বঙ্কুবিহারীজী ত্রিভঙ্গবঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি, তাঁহার বামদেশে শ্রীরাধার কোন মূর্ত্তি নাই, শ্রীরাধার গাদি-সেবা আছে।

এক সময় ব্রজের কতিপয় সাধু বদরিকাশ্রমে যাইবার সঙ্কল্প করিয়া হরিদাস স্বামীকেও তাঁহাদের সঙ্গী হইবার জন্য অনুরোধ করেন। কথিত আছে, হরিদাস বঙ্কুবিহারীজীর নিকট ইহা জানাইলে বাঁকাবিহারী স্বপ্নাদেশ করেন যে, তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিলেই বদরীনারায়ণ দর্শনের ফল পাওয়া যাইবে। ইহা শুনিয়া সেই সাধু ভক্তগণও বদরীনারায়ণ দর্শনের ক্লেশ স্বীকার না করিয়া বৃন্দাবনেই অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে (যেদিন বদরিনারায়ণের দর্শন উন্মুক্ত হয়) বাঁকাবিহারীর শ্রীচরণ দর্শন করেন। সেই সময় হইতে অদ্যাপি কেবল অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতেই বাঁকাবিহারীর শ্রীচরণ দর্শনের ব্যবস্থা। ইহা ছাড়া অন্য সময় বাঁকাবিহারীর চরণ আবৃত থাকে এবং তাঁহার ঝাকি-দর্শন হয়। গর্ভমন্দিরের দ্বারে একটি পর্দ্দা ঝুলানো থাকে, কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সেই পর্দ্দাটিকে সরাইয়া ফেলা হয়, আবার পর্দ্দাটি কিছুক্ষণের জন্য টানিয়া পুনরায় খুলিয়া দেওয়া হয়। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে ঝাকি-দর্শনের প্রথাটি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। বাঁকাবিহারীর

দর্শনার্থী জনৈকা কুলবধূ এক সময় বিগ্রহের মাধুরী দর্শন করিতে করিতে একেবারে তন্ময় হইয়া পড়েন। এদিকে ঐ ভক্ত-ললনার পতিপত্নীকে গৃহে আসিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে থাকেন। কুলবধূটি তখন বাঁকাবিহারীকে জানান যে, তাঁহার দেহ লৌকিক পতির অধীন, কাজেই তাঁহার মন বাঁকাবিহারীর মুখারবিন্দ

কুঞ্জমূলে ভজনরত হরিদাস স্বামী, তাঁহার দক্ষিণে—হিতহরিবংশ ও বামে—হরিরাম ব্যাসজী

হইতে অন্যত্র যাইতে ইচ্ছুক না হইলেও লৌকিক পতির ভয়ে গৃহে যাইতে হইবে। ইহাতে ভক্তবৎসল বাঁকাবিহারী অনুরাগিণী ললনার গৃহে চলিয়া আসেন। এই ঘটনার পর বাঁকাবিহারীজীর পূজক-সম্প্রদায় কাহাকেও বিগ্রহদর্শনে অধিকক্ষণ অবসর প্রদান করেন না। অনুরাগী দর্শকের আকাঙ্ক্ষা ও আর্তিবর্ধন করাও ঝাকি-দর্শনের আর একটি উদ্দেশ্য।

হরিদাস স্বামী যখন তদানীন্তন যমুনা-পুলিনস্থ নিধুবনে বসিয়া মানস-সেবা করিতেছিলেন, সেই সময় এক ধনাঢ্য ভক্ত এক শিশি অতি উৎকৃষ্ট আতর আনিয়া স্বামীজীকে উপহার দেন। হরিদাস শিশি হইতে আতরটুকু নিঃশেষে যমুনার বালুকার উপরে ঢালিয়া দিলেন। দাতা অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়াছেন বুঝিয়া হরিদাস উক্ত ভক্তকে বিহারীজী দর্শন করিয়া আসিতে বলিলেন। আতরদাতা তথায় গিয়া দেখিলেন যে, বিগ্রহের অঙ্গ হইতে বিন্দু বিন্দু আতর গড়াইয়া পড়িতেছে এবং চতুর্দিক আতরের সুগন্ধে আমোদিত হইয়াছে।

তানসেন ও বৈজু-বাওরা

তানসেন পূর্ব্বে রামতনু মিশ্র নামে এক হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইনি একজন মুসলমান মৌলবীর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। মুসলমান ওস্তাদের সংস্পর্শে ইসলাম ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ হয় এবং তিনি একটি সুন্দরী যবনীর পাণিগ্রহণ করিয়া মিঞা তানসেন নামে খ্যাত হন। ইহার পর তানসেন বুন্দেলখণ্ডের রাজারাম বাঘেলা নামক এক ধনকুবেরের প্রধান গায়ক নিযুক্ত হন। বাদশাহ আকবর তানসেনের সুকণ্ঠের কথা শুনিয়া রাজারামের নিকট হইতে তানসেনকে চাহিয়া লইয়া নিজের প্রধান গায়করূপে

বাঁকাবিহারীর আবির্ভাব-স্থান নিধুবন, বৃন্দাবন

নিযুক্ত করেন। তানসেনের ইচ্ছানুসারে বাদশাহের দরবার হইতে এই মর্ম্মে একটি ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয় যে, তানসেন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গায়কই দিল্লীতে গান করিতে পারিবেন, ইহার অন্যথা আচরণকারীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে।

এক দিন এক ভিখারী সাধু বৈজু নামক জনৈক বালককে সঙ্গে লইয়া একতারা বাজাইয়া দিল্লী নগরে গান করিতেছিলেন। পূর্ব্ব ঘোষণা অনুযায়ী উক্ত ভিখারী সাধু তাঁহার সঙ্গী বালকের সহিত ধৃত হন। সাধুর প্রাণদণ্ড হয় এবং তাঁহার সঙ্গী বালকটিকে অল্পবয়স্ক দেখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে তানসেনকে সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় পরাজিত করিবার জন্ত বালক বৈজুর প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হয়। বৈজু বৃন্দাবনে আসিয়া হরিদাস স্বামীর সন্ধান পাইয়া তাঁহার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন এবং তৎপরে দিল্লীতে গিয়া তানসেনকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেন। দিল্লী হইতে কিছু দূরে একটি বনের মধ্যে আকবরের মধ্যস্থতায় এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় এবং তানসেন ও বৈজু উভয়েই একটি সর্ত্তে আবদ্ধ হন যে, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যাঁহার গান শুনিয়া বনের হরিণ সম্মুখে

উপস্থিত হইবে এবং যিনি তখন হরিণের গলায় মাল্য পরাইয়া দিতে পারিবেন, তিনিই জয়ী বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

বৈজু সঙ্গীত আরম্ভ করিলে কিছুক্ষণ পরেই বন হইতে একটি হরিণ সকলের সমক্ষে বৈজুর পদপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং উৎকর্ণ হইয়া স্থিরভাবে বৈজুর গান শ্রবণ করিতে লাগিল। তন্ময়-চিত্ত বৈজুও তখন হরিণের গলায় মালা পরাইয়া দিলেন। বৈজু গান বন্ধ করিলে হরিণ প্রকৃতিস্থ ও ভীতিবিহ্বল হইয়া পুনরায় স্বস্থানে চলিয়া গেল। ইহার পর তানসেনের পালা আরম্ভ হইল। কিন্তু তানসেনের গান শুনিয়া সেই বন্য হরিণটি পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল না। অতএব পূর্ব্ব সর্ত্তানুসারে বৈজুর জয় ও তানসেনের পরাজয় ঘোষিত হইল। কথিত আছে, এই সময় বাদশাহ আকবর নাকি বলিয়াছিলেন, যখন বৈজুর সঙ্গী সাধুটি তানসেন অপেক্ষা নিকৃষ্ট গায়ক বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, তখন তানসেন অপেক্ষা বৈজুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হওয়ায় তদনুরূপ
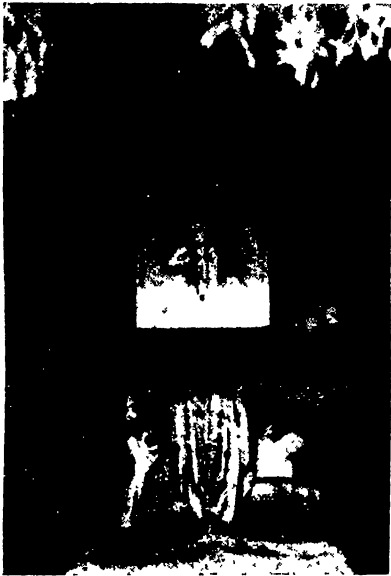
হরিদাস স্বামীর সমাধি ও প্রাচীন তৈলচিত্র, নিধুবন

বিচারে তানসেনেরও প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত; কিন্তু বৈজু ইহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, তানসেন একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক ও গুণী ব্যক্তি, ইঁহাতে কোন সন্দেহ নাই, ইঁহাকে প্রাণদণ্ড দিলে পরমেশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হইবে। বৈজুর ঐরূপ উদারতা দর্শন করিয়া তান-সেন বৈজুর চরণে পতিত হইলেন এবং বৈজুর সঙ্গীত-শিক্ষাগুরুর সন্ধান লাভ করিয়া বৃন্দাবনে হরিদাস স্বামীর নিকট গিয়া কিছুকাল সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া আসিলেন।

আকবর বৈজুকে তাঁহার দরবারে প্রধান গায়করূপে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলে বৈজু বলিলেন, "আমি দিল্লীশ্বরের মনোরঞ্জন করিবার জন্য গান শিক্ষা করি নাই, আমি একমাত্র পরমেশ্বরের তৃপ্তিবিধানের জন্যই গান শিক্ষা করিয়াছি, জাগতিক সম্মান ও অর্থ পরমেশ্বর-সন্তোষের তুলনায় অতি তুচ্ছ।" দিল্লীশ্বরের কোন প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইলেন না দেখিয়া সেই পরমেশ্বর-প্রেমিক বৈজুকে সজ্জনগণ 'বাওরা' উপাধি দিয়াছিলেন। 'বাওরা' শব্দের অর্থ পাগল—প্রেম-পাগল; সেই সময় হইতে তিনি বৈজু-বাওরা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

বাদশাহ আকবর ও হরিদাস স্বামী

১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে আকবর তানসেনকে সঙ্গে করিয়া হিন্দুর বেশে হরিদাস স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বৃন্দাবনের নিধুবনে আগমন করেন। আকবরের ইচ্ছা ছিল, তিনি বৈজু-বাওরার গুরু হরিদাস স্বামীর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া যাইবেন; কিন্তু দিল্লীশ্বরের হুকুমমত স্বাধীনচেতা হরিদাস স্বামী গান করিবেন না জানিয়া তানসেন একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। তানসেন হরিদাস স্বামীর নিকট একটি সঙ্গীত কীর্ত্তন করিবার কালে ইচ্ছা করিয়াই রাগিণীর মধ্যে একটু ভুল করিয়া গেলেন। সেই ভ্রমটি সংশোধন করিবার জন্য হরিদাস স্বামী যখন গান ধরিলেন, তখন সম্রাট আকবর অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন এবং অত্যন্ত কাতরভাবে স্বামীজীর কিছু সেবার অধিকার প্রার্থনা করিলেন। হরিদাস স্বামী বলিলেন, তাঁহার কোন অভাব নাই, তবে বাদশাহ যখন সেবা করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছেন তখন যমুনার নিকটস্থ ঘাটের একটি ভগ্ন সোপানের কিয়দংশ মেরামত করাইয়া দিতে পারেন। বাদশাহ ইহাকে অতি অকিঞ্চিৎকর সেবা মনে করিয়াছিলেন; পরে হরিদাস স্বামী ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া আকবরকে দেখাইলেন যে, উক্ত সোপান এরূপ বহুমূল্য হীরক, মুক্তা প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত যে, বাদশাহ তাঁহার সমগ্র রাজ্য বিক্রয় করিয়াও উহা মেরামত করাইয়া দিতে পারিবেন না।*

অন্য বিবরণ অনুসারে রামতনু মিশ্র বালক অবস্থায় বৃন্দাবনে কোন ব্রজবাসীর গৃহের গোচারণে নিযুক্ত ছিলেন। এক দিন প্রাতঃ-কালে হরিদাস স্বামী যমুনায় স্নান করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় পথে অকস্মাৎ ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিতে পাইলেন এবং কতকগুলি গাভীকে ভীতিবিহ্বল হইয়া উর্দ্ধপুচ্ছে পলাইয়া যাইতে দেখিলেন। বৃন্দাবনে ব্যাঘ্রের উপদ্রব ছিল না; তথাপি কোথা হইতে ঐ গর্জ্জন শুনা যাইতেছে, ইহা চিন্তা করিয়া হরিদাস বিস্মিত-নয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে দেখিলেন, এক বালক একটি বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া বাঘের ন্যায় ডাক ছাড়িতেছে। বালকের কণ্ঠস্বর এতটা ব্যাঘ্র-গর্জ্জনের অনুরূপ যে, তাহা শুনিয়া গাভীগণও ভয়ে পলাইতেছে। হরিদাস বালককে নিকটে ডাকিলেন এবং ব্রাহ্মণ-পুত্র জানিয়া তাহাকে সঙ্গীত-বিদ্যা শিখাইতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই রামতনু সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। এই বিবরণ

* কেহ কেহ বলেন, গৌড়ীয় গোস্বামীপাদগণের সম্বন্ধে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

অনুসারে আকবর বাদশাহ রামতনুকে দিল্লীর দরবারে প্রধান গায়ক নিযুক্ত করেন এবং উত্তরকালে তাঁহাকে এক সুন্দরী যবনীর সহিত বিবাহ দেন। তখনই তিনি মিঞা তানসেন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। গোয়ালিয়র শহরে একটি তেঁতুল বৃক্ষের নীচে মিঞা তানসেনের কবর আছে। অদ্যাপি নানা দেশের গায়কগণ সুকণ্ঠ হইবার আশায় তথায় গিয়া তেঁতুল গাছের পাতা চিবাইয়া থাকেন :

হরিদাসী সম্প্রদায়

হরিদাস স্বামীর তৃতীয় ভ্রাতা গোবিন্দর পুত্র বিট-ঠল-বিপুলজী। ইনি হরিদাস স্বামীর নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়া সংসার-ত্যাগী হন। হরিদাসের দ্বিতীয় ভ্রাতা ও শিষ্য জগন্নাথ এবং বিট-ঠল-বিপুল উভয়েই হরিদাসের তিরোধানকালে
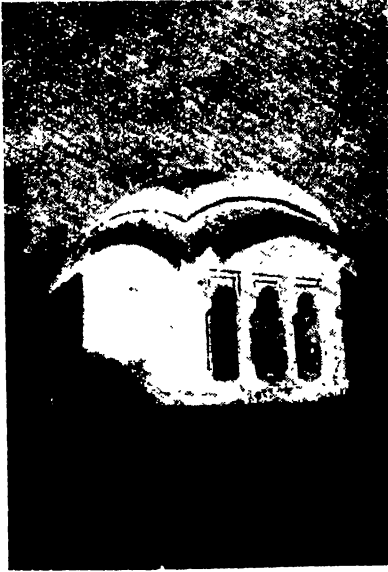
রঙ্গমহল বা রাধাকৃষ্ণ বিশাল স্থান

তাঁহার নিকট ছিলেন। কথিত আছে, হরিদাস স্বামী জগন্নাথকে বাঁকাবিহারীর সেবা এবং বিট-ঠল-বিপুলকে নিজ ব্যবহৃত কৌপীন ও করঙ্গ দিয়া যান। জগন্নাথদাসের বংশধর গৃহস্থ গোস্বামিগণ এবং বিট-ঠল-বিপুলের শিষ্য পরম্পরায় ত্যাগী সাধুগণ নিধুবনে থাকিয়া বাঁকাবিহারীকে স্ব-স্ব আরাধ্য রূপে সেবা করিতেন। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ত্যাগী ও গৃহস্থ-সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঁকাবিহারীর সেবা-পূজার অধিকার লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। বাঁকাবিহারীর গোস্বামিগণের অন্যতম মোহনলাল গোস্বামী নামক এক ব্যক্তি উক্ত বিবাদের ফলে নিধুবনের মধ্যে নিহত হন। তখন সিন্ধিয়ার মহারাজ সুবাদার ছিলেন। তিনি মোহনলালের পুত্রকে বাঁকাবিহারীর মন্দিরের মহান্তের গদিতে বসাইয়া দোষী ব্যক্তিগণকে বার বৎসর কাল নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করেন।* এই সময় হইতে বাঁকাবিহারীর সেবা ও নিধুবন-স্থান সমস্তই জগন্নাথের বংশধর গৃহস্থ গোস্বামিগণের অধিকারভুক্ত হয়। এই সময় বাঁকাবিহারী নিধুবন হইতে মদনমোহনের মন্দিরে যাইবার পথে পুরনো সহরে বিহার করেন এবং ঐ পল্লী বিহারীপুরা নামে খ্যাত হয়। এই স্থানের বিহারীজীর মন্দিরটিও কালক্রমে জীর্ণ হইয়া পড়িলে হরিদাসী সম্প্রদায়ের ধনী ভক্ত ও গোস্বামিগণ প্রায় সত্তর হাজার টাকা ব্যয় করিয়া একটি সুন্দর নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমানে বাঁকাবিহারীর সেবাই বৃন্দাবনের বিশেষ সমৃদ্ধ সেবা।
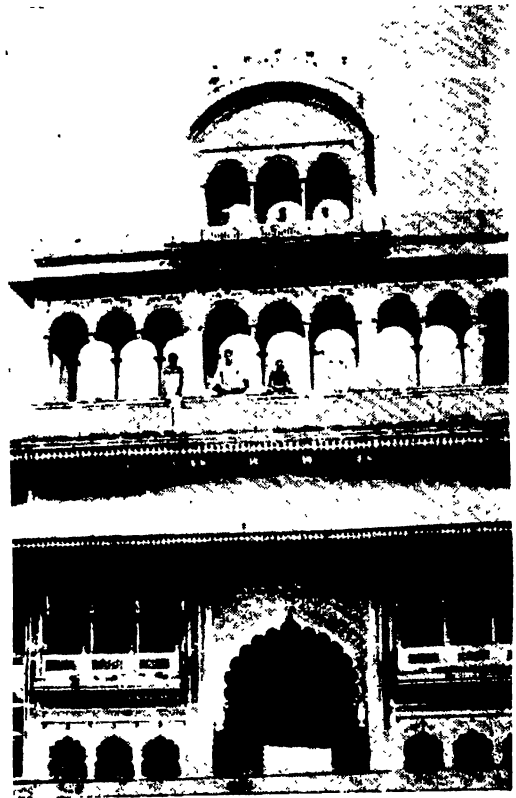
শ্রীবাঁকাবিহারীজীর মন্দির

উক্ত বিরক্ত হরিদাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌনীদাস বা মোহিনী দাস নামক এক ব্যক্তি সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। শুনা যায়, ইনি বার বৎসর পরে পুনর্ব্বার বৃন্দাবনে আগমন করিলে ইঁহার শিষ্য-সম্প্রদায় ইঁহাকে পাণিঘাটের নিকট যমুনার তীরে বাঁশের টাট্টি (বেড়া) দিয়া ঘিরিয়া একটি স্থানে থাকিতে দেন। এই স্থানটি কালে 'মৌনীদাসের টাট্টি' বা 'টাট্টি-আস্থান' নামে খ্যাত হয়। অনেকে

* গোয়ালিয়র-রাজের হাকিম প্রহ্লাদ সেবাজী যে রায় প্রদান করেন, ফার্সি ভাষায় লিখিত ও সিলমোহরযুক্ত সেই হুকুমনামাটি আমরা বাঁকাবিহারীর গোস্বামিগণের নিকট দেখিয়াছি।

ভুলক্রমে টাট্টি-আস্থানকে হরিদাস স্বামীর ভজন-স্থান এবং এখান হইতেই বাদশাহ আকবর তানসেনকে লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ ইহা পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে মৌনীদাসের সমাধি ও তাঁহার গুরু ললিতা কিশোরদাসের নামানুসারে ললিতা-কিশোরজী নামক শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি শ্রীরাধিকার সহিত স্থাপিত হইয়াছেন। মৌনীদাস বিরক্ত-শিষ্য-পারম্পর্য্যে হরিদাস স্বামীর অষ্টম অধস্তন বলিয়া কথিত। হরিদাস স্বামী কোন্ সম্প্রদায়-

ভগবানদাসজী, টাটি-আস্থান

ভুক্ত ছিলেন, তদ্বিষয়ে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন গ্রন্থেই কোন উল্লেখ নাই। মৌনীদাসের সমসাময়িক নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কিশোরদাসজী 'নিজ-মত সিদ্ধান্ত' নামক পুস্তকে হরিদাস স্বামীকে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অধস্তন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। ইহার পর শুনা যায়, মৌনীদাসের সপ্তম অধস্তন মহান্ত ভগবান্-দাসজী হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভ মেলার সময় বৃন্দাবনে টাটি-আস্থানের ত্যাগী হরিদাসী সম্প্রদায়কে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া প্রচার করেন। উক্ত মতানুসারে নিম্বার্কাচার্য্যের ষোড়শ অধস্তন বলিয়া বিদিত দেবাচার্য্যের শিষ্যের অন্যতম ব্রজভূষণ দেবজী হইতে হরিদাস স্বামীর গুরু-পারম্পর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে। ভগবান-দাসের শিষ্য রণছোড়দাস ও তাঁহার শিষ্য রাধারমণদাস টাটি-আস্থানের মহান্ত হইয়াছিলেন। এখন রাধারমণদাসের গুরুভ্রাতা শ্রীরাধাচরণদাস তথাকার মহান্তপদে অধিষ্ঠিত আছেন। বাঁকা-বিহারীর গোস্বামিগণের মতানুসারে হরিদাস স্বামীর পিতা আশুধীর আদি বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ে (বল্লভ-সম্প্রদায় নহে) দীক্ষিত হইয়া-ছিলেন। তদনুসারে আশুধীরের পুত্র ও শিষ্য হরিদাস স্বামীকে আদি বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ভুক্ত বলা গেলেও বস্তুতঃ তিনি সম্প্রদায়-স্বতন্ত্রই ছিলেন। হরিদাসী সম্প্রদায়ে হরিদাস স্বামীকে ললিতাদেবীর অবতার বলিয়া কল্পনা করা হয়।

মতভেদ

টাট্টি-আস্থানের বিরক্তগণের ও বাঁকাবিহারীর গৃহস্থ-গোস্বামি-গণের মতের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান পার্থক্য সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতে পারে :

বাঁকাবিহারীর সেবায়েত
গৃহস্থ-গোস্বামিগণের মত

১। হরিদাসের পিতা আশুধীর ও মাতা গঙ্গাদেবী।

২। জন্মস্থান—আলিগড় জেলার হরিদাসপুর গ্রাম।

৩। কুল—সারস্বত ব্রাহ্মণ।

৪। জন্মকাল—১৫৬৯ সংবৎ, পৌষী শুক্লা ত্রয়োদশী। রাধাষ্টমী তিথিতে দীক্ষালাভ।

৫। পত্নী—বিজয়মতী। পত্নীর মৃত্যুর পর বিরক্ত হইয়া বৃন্দাবনে আসেন।

টাটি-আস্থানের বিরক্ত
হরিদাসী সম্প্রদায়ের মত

১। হরিদাস স্বামীর পিতা গঙ্গাধর ও মাতা চিত্রাদেবী।

২। জন্মস্থান—বৃন্দাবন হইতে এক মাইলের মধ্যে রাজপুর গ্রাম।

৩। কুল—সনাঢ্য ব্রাহ্মণ।

৪। জন্মকাল—১৫৩৭ বিক্রমসংবৎ, রাধাষ্টমী তিথি।

৫। হরিদাস স্বামী আজন্ম বিরক্ত।

সাম্প্রদায়িক সাহিত্য

হরিদাস স্বামী সংস্কৃত ভাষায় কোনও গ্রন্থ রচনা করেন নাই। ব্রজভাষায় রচিত তাঁহার দুইখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। ১। 'অষ্টাদশ সিদ্ধান্তকে পদ'—ইহাতে ১৮টি পদ বা সঙ্গীত আছে। ২। কেলিমাল—ইহাতে ১১০টি গীতি দৃষ্ট হয়। গীতিগুলিতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস বর্ণিত হইয়াছে। হরিদাস স্বামীর পর তাঁহার বিরক্ত শিষ্য বিট্ঠল-বিপুলজী ব্রজভাষায় ৪০টি পদ রচনা করেন। তাহা 'বিট্ঠল-বিপুলজীকী বাণী' নামে খ্যাত। হরিদাস স্বামীর তিরোধানের পর বিট্ঠল-বিপুলজী চল্লিশ দিন জীবিত ছিলেন। তিনি গুরুদেব ব্যতীত আর কাহাকেও জীবনে দর্শন করিবেন না, এই সঙ্কল্প করিয়া দুই চক্ষুর উপর একটি বস্ত্র বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন এবং চল্লিশ দিনে চল্লিশটি পদ রচনা করিয়া দেহত্যাগ করেন। উক্ত পদাবলী মুদ্রিত হইয়াছে।

বিট্ঠল-বিপুলের শিষ্য বিহারণদেবজী ব্রজভাষায় কয়েক সহস্র পদাবলী রচনা করিয়াছেন। ইহার রচিত সাহিত্যই তৎসম্প্রদায়ের সর্ব্বাপেক্ষা বিপুলাকার; কিন্তু অদ্যাপি ঐ সকল মুদ্রিত হয় নাই।

এতদ্ব্যতীত সরসদেবজীকী বাণী, নরহরিদেবজীকী বাণী, ভগবদ্‌-রসিকজী বাণী (৮০০ পদাবলী), ললিতমোহনদেবজীকী বাণী প্রভৃতি পদাবলী-সাহিত্য হরিদাসী সম্প্রদায়ে ব্রজভাষায় রচিত হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান

বৃন্দাবনের নিধুবনে হরিদাস স্বামীর আবিষ্কৃত বাঁকাবিহারীজীর প্রকট-স্থান, রাধাকৃষ্ণের বিহারস্থলী রঙ্গমহল এবং হরিদাসজী, বিট্‌ঠল-বিপুলজী, বিহারণদেবজী প্রমুখ আচার্য্যগণের সমাধি দৃষ্ট হয়। রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের মধ্যবর্ত্তী স্থানে হরিদাস স্বামীর ভজনস্থলী ও বিহারীজীর মন্দির আছে।

সেবাপূজার প্রণালী

বাঁকাবিহারীর সেবায়েত সম্প্রদায় বলেন যে, তাঁহারা রাগাত্মিকা পদ্ধতিতে সেবা করেন। এজন্য তাঁহাদের সেবা পূজাকালে কোনরূপ শাস্ত্রীয় মন্ত্রোচ্চারণ বা আরতির সময় ঘণ্টা-বাদনাদি করা হয় না। তাঁহারা তৎসম্প্রদায়ের মহাজনগণের রচিত পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া সেবা ও আরতি প্রভৃতি সম্পাদন করেন। ইঁহারা সন্ধ্যারাত্রিক করেন না, কেবল জন্মাষ্টমীর দিন মঙ্গলারাত্রিক হয়।

সাম্প্রদায়িক মত

হরিদাসী সম্প্রদায় কোন বিশেষ বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত বা মতবাদ স্বীকার করেন না। খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে বিট্‌ঠল-বিপুলজীর শিষ্য-পারম্পর্য্যে মৌনীদাসের শিষ্য ভাগবত-রসিকজী তাঁহার এক বাণীতে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের মত সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মতবাদকে 'ঈশ্বর-ইচ্ছা-দ্বৈত' নামে উল্লেখ করিয়াছেন:

"আচারজ ললিতা সখী, রসিক হমারী ছাপ।
নিত্য কিশোর উপাসনা, যুগল মন্ত্র কো জাপ।
যুগল মন্ত্রকো জাপ, বেদ রসিকন্ কী বাণী।
শ্রীবৃন্দাবনধাম, ইষ্টশ্যামা মহারাণী।
* * * *
নাহী দ্বৈতাদ্বৈত হরি, নহী বিশিষ্টাদ্বৈত।
বঁধে নহী মতবাদ মে, ঈশ্বর ইচ্ছা দ্বৈত।"

অর্থাৎ, ললিতা সখীই আমাদের আচার্য্য। আমাদের সম্প্রদায়ের ছাপ (মুদ্রা)—রসিকতা, নিত্যকিশোর শ্রীকৃষ্ণের সেবাই-উপাসনা, যুগলমন্ত্রের জপই—ভজন; রসিকগণের বাণীই আমাদের বেদ অর্থাৎ প্রমাণ, বৃন্দাবনই—ধাম; রাধারাণীই আমাদের ইষ্ট। আমরা দ্বৈতাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত কোনও মতবাদেই আবদ্ধ নহি। ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী যে দ্বৈত-সিদ্ধান্ত অর্থাৎ "একোঽহং বহুস্যাম্"—আমি এক বহু হইব—পরমেশ্বরের সঙ্কল্পানুযায়ী এই যে সেব্য-সেবকভাবযুক্ত দ্বৈত-সিদ্ধান্ত, তাহাই আমাদের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত। ইঁহারা বলেন, শ্যামা ও শ্যাম নিত্য-কিশোর-কিশোরীরূপে নিধুবনে সর্ব্বক্ষণ বিহার করিতেছেন। ইঁহাদের নিত্য-সংযোগ বা মিলন, কখনও বিয়োগ বা বিরহ নাই।

যে আমার প্রিয়তম

আ. ন. ম বজলুর রশীদ

যে আমার প্রিয়তম জন্মে জন্মে আপনার জন
যে আমার জীবনের অবিরাম আবেগ-স্পন্দন,
পুষ্পের প্রচ্ছন্ন গন্ধ, প্রভাত ও সন্ধ্যারক্তরাগ—
যে জন আমার ভাষা, সহস্র সঙ্গীত সপ্তরাগ,
চৈতন্য-চেতনা-দীপ্ত প্রাণশক্তি রস-রসায়ন,
আকাশ ও পৃথিবীর অবিশ্রাম সৃষ্টি-রূপায়ণ
যার করস্পর্শে, সেই নিকট ও দূরতম জনে
রেখেছি অনেক দূরে, ভিন্নদেশী, আপনার মনে
তুচ্ছ সুখ দুঃখ দিয়ে সৃষ্টি করি আমার জগৎ।
নির্ব্বাক সমুদ্র-মরু, অর্থহীন নীলাভ পর্ব্বত—
অসংখ্য তরুর ছবি বিচিত্র রঙের প্রসারণ
তৃণ থেকে তারালোকে, মর্ম্মমূলে নিবিড় কম্পন
সুগভীর রসাবেগ। বিসর্পিত কামনা আমার,
সর্ব্বগ্রাসী বুভুক্ষার বাসনার নির্লজ্জ বিস্তার
আমারে করেছে ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড মত্ত স্বার্থপর—
সঙ্কীর্ণ স্বপথচারী লুব্ধকের লালসা দুস্তর
দু'চোখে বেঁধেছে বাসা—সচকিত নিঃশঙ্ক সকাম
অতৃপ্ত, যৌবনবতী নারীদেহ নয়নাভিরাম,
সকাতর আবেদন, দেখি না সে রেখায় রেখায়
কলা-কুতূহলা তার ভাব বর্ণ কান্তি সুষমায়
অজানা শিল্পীর সূক্ষ্ম রূপকল্প রস-প্রলেপন
প্রশান্ত নির্লিপ্ত প্রাণ আবেগের অক্লান্ত স্ফুরণ
অফুরন্ত অনুরাগ। পরদেশী সে শিল্পী আমার
তবু অবচেতনায় স্পর্শ তার প্রেম দুর্নিবার।

সঞ্জয়ের জীবনকথা

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

সঞ্জয় ছিল বেশ চালাকচতুর এবং চটপটে ছেলে—অর্থাৎ, এক কথায় ওকে সার্টিফিকেট দেওয়া যেত স্মার্ট বলে। একটু পাতলা ধরণের গড়ন হলেও চেহারাটা ছিল বেশ মানানসই। চোখ দুটো ছিল মুখের আয়তনের তুলনায় একটু ছোট, দেখলেই মনে হ'ত কি যেন একটা দুষ্ট বুদ্ধির প্ল্যান চলছে সব সময়, সুযোগ পেলেই আত্মপ্রকাশ করবে। ভুরুজোড়া ছিল বিশাল, ফর্সা কপালে কাল জোড়া ভুরু হঠাৎ দর্শনীয় বলে মনে হ'ত। নাকটা বিশেষ লম্বা ছিল না, তবে ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যেত অগ্রভাগটা সামান্য একটু উপর-দিকে উঠে রয়েছে। আর সব চাইতে সুন্দর ছিল ওর চুল। এক মাথা সে চুল—অতিমাত্রায় কুঞ্চিত, মনে হ'ত বড় কর্কশ বুঝি, কিন্তু হাত দিয়ে দেখেছি রেশমের মত নরম, বাচ্চারা ওর চুলে হাত দেবার জন্য পাগল হয়ে উঠত। চোখে ওর চশমা ছিল না, যদিচ নাকটা ছিল চশমার ব্রিজের পক্ষে আদর্শ। বোধ হয় সেই কারণেই ও একজোড়া গগল্‌স ব্যবহার করত মাঝে মাঝে।

কিন্তু চেহারার জন্যই আমরা ওর ভক্ত ছিলাম না। ছেলেটার গুণ ছিল অনেক। অনেকক্ষণ ধরে ট্যাপ করে করে যখন আমরা টেলিফোনটাকে ছুঁড়ে ফেলার উপক্রম করতাম তখন ও কি এক অজানা কৌশলে টেলিফোনের চোঙায় ফুঁ দিয়ে, হ্যালো হ্যালো করে চেঁচিয়ে, মধ্যে কখনও মিষ্টি কথা বলে, কখনও-বা ধমকে মিনিট-কয়েকের মধ্যেই এনে দিত বাঞ্ছিত নম্বর। সাহেবী দোকানে ঢুকতে আমরা যখন ইতস্ততঃ করতে থাকতাম, ও তখন দিব্যি স্বচ্ছন্দে ঢুকে পড়ে অনর্গল কথা চালিয়ে দিত ফিরিঙ্গী মেয়েদের সঙ্গে, দু'একটা হাল্কা রসিকতাও করত, যার মর্ম আমরা বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে থাকতাম হাঁ করে। আমাদের পশ্চিমী ভায়াদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমরা যখন ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খেতে থাকতাম, ও তখন আমাদের ত্রাণ করবার জন্য দৌড়ে আসত, ওর লক্ষ্ণৌ-মার্কা চোস্ত হিন্দুস্থানী শুনে তাদের পর্য্যন্ত ধাঁধা লেগে যেত। সঞ্জয় উড়িয়াও বলতে পারত বেশ। মাদ্রাজী ভাষার দু'চারটে বুকনি আর পঞ্জাবীদের কয়েকটা গালাগালও ওর কণ্ঠস্থ থাকত সব সময়। বিদেশে চিঠি, পার্সেল, মনিঅর্ডার পাঠাবার জটিল নিয়মসমুদ্রে আমরা যখন হাবুডুবু খেতাম ও তখন অযাচিত ভাবে আমাদের উদ্ধারে এগিয়ে আসত, দরকার হলে গলা সপ্তমে চড়িয়ে ঝগড়া করত কাউণ্টারবাবুদের সঙ্গে। বালিগঞ্জের মিলন সমিতি থেকে সেক্রেটারিয়েট পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ছিল ওর অবাধ গতি-বিধি, যে-কোন দুরূহ কাজও সম্পন্ন করে আসতে পারত হাসিমুখে। আমরা ওর নাম দিয়েছিলাম সঞ্জয় দি কঙ্কারার। বাংলায় বলতাম অপরাজেয় সঞ্জয়।

সঞ্জয়ের সঙ্গে রাস্তায় হাঁটতে ভয়ও করত, মজাও লাগত। উৎকট টাই-কলার বাঁধা দিশী সাহেবদের দেখলে পাশ দিয়ে যেতে হঠাৎ ও বলে বসত, 'কি গো বাছারা, কবে এলে হোম থেকে?' বম্বে-হলিউডি শাড়ী পরা দিশী মেয়েদের পাশ দিয়ে যাবার সময় অকস্মাৎ আলগোছে টিপ্পনী কাটত, 'গাউনটা বুঝি ধোপা এখনও দিয়ে যায় নি ললিতে?'' আমি প্রায়ই শিউরে উঠে তফাতে সরে যেতাম —যদি কিছু হয় তবে ওরই উপর দিয়ে যাক সবকিছু। কিন্তু ও নির্ব্বিকার।

একদিন বাসে করে বালিগঞ্জ থেকে ফিরছি। ভর্ত্তি বাস। আমরা দাঁড়িয়ে সামনের দিকে। বিপুলকায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এক ভদ্রলোক উঠলেন সাদার্ন এভিনিউর মোড় থেকে। দু'হাতে অনেকগুলো আংটি, গলায় একগাছা হার আর সুপ্রচুর পাউডার। তিনি উঠেই একবার এ পাশে একবার ওপাশে মেয়েদের দিকে তাকাতে লাগলেন ভিড় ঠেলে। প্রথম প্রথম আমার হাসি পাচ্ছিল পরে বিরক্তি ধরে গেল। কিন্তু সঞ্জয় যেন এসব জাগতিক ব্যাপারের উর্দ্ধে। এক সময় যখন ভদ্রলোক ওর বুকে বেশ একটু জোরেই গুঁতো মেরে বৃষস্কন্ধ লম্বা করে তাকাতে গেলেন ডানধারের মেয়েদের দিকে, ও অকস্মাৎ কাঁচুমাচু হয়ে ঘাড় চুলকে বললে, 'আজ্ঞে? আমরা নেমে যাব? না না আপনি দেখুন—ভাল করে দেখুন।' আমি হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলাম। ওর এই সস্তা রসিকতায় নয়, ওর নিরীহভাবে বলার কায়দাটা দেখে। আরোহীদের মধ্যেও অনেকে হেসে ফেলল, মেয়েদের মধ্যে বর্ষীয়সীরা একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করল, তরুণীরা অনেকেই খিল খিল করে হেসে উঠল রুমালে মুখ গুঁজে। আর ভদ্রলোক ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে সবাইকে ধাক্কা দিয়ে পড়ি কি মরি ভাবে নেমে গেলেন পরের ষ্টপেজেই।

ওর সবচেয়ে মজার খেলা ছিল অপরিচিত লোকদের বোকা বানানো। আমি কত দিন ওর হাতে পায়ে ধরেছি এই সর্ব্বনেশে খেলা ছেড়ে দেবার জন্য, কিন্তু হিত বচন ওর কাছে গ্রাহ্যই নয়—(বয়সে আমার চেয়ে ছোট হওয়া সত্ত্বেও আমাকে ও থোড়াই কেয়ার করত)। কিছু নয়, হয়ত ট্রাম থেকে নামছে এমন সময় হঠাৎ ও পাশের ছেলেটিকে বলে বসত, 'কিরে ভ্যাবলা, দু'বছর ধরে বইখানা ফেলে রেখেছিস, নিবি নে আর? পড়াশুনো বুঝি কচ্ছিস নে? বাবাকে বলে দেব?...আচ্ছা কালকে একবার আসিস, আমি থাকব সকালে।' ছেলেটিকে হতভম্ব করে দিয়ে ও নেমে যেত টক্ করে। হয়ত মেট্রোর পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিত্রাহিভাবে সিগারেট ফুঁকছে, অকস্মাৎ কোন ভদ্রলোককে দেখে সিগারেটটা এমনভাবে লুকিয়ে ফেলত যাতে ভদ্রলোক বুঝতে পারতেন সেটা লুকনো হয়েছে তাঁকে দেখেই। 'আরে হাবুমামা

যে! কবে এলে কলকাতায়?' চোখের নিমিষে পায়ের ধুলো নিয়ে নিত ও। 'কাওলা মামা কেমন আছে? ভোম্বল দাছ? তুমি এখানে কি মনে করে? ওঃ কদ্দিন পর! বছর তিনেক হবে না?' ওর হাবুমামা কিছু বোঝার আগেই ও পকেট থেকে নোটবই বের করে বলত, 'কোথায় উঠেছ? চল না আমাদের বাড়ীতে? যাবে? গাড়ী ডাকব?'

তবে ভরসার বিষয় সঞ্জয়ের এই উৎকট সখ পুরুষদের নিয়েই চরিতার্থ হ'ত প্রধানতঃ। মেয়েদের ও বোকা বানাতে চাইত না এমন নয়, কিন্তু ও বলত মেয়েদের ঠকিয়ে নাকি সুখ পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ তাদের লজ্জা-সঙ্কোচ ভয় কাটতে চায় না কিছুতেই আর দ্বিতীয়তঃ জিনিষটাকে তারা হিউমারাসলি নিতে জানে না। অনেক সময় ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে—যেন মস্ত কি লোকসান হয়ে গেল। অনেক সময় আরও গভীর কিছু মনে করে বসে। তবুও ওর মেয়ে-ঠকানোর যে ক'টি উদাহরণ দেখেছি তার প্রত্যেকটিই চমকপ্রদ, প্রত্যেকটিকে দিয়েই বানানো যেতে পারে এক-একটা পাঁচশ' পাতা উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়। তারই মধ্য থেকে একটির বর্ণনা দিচ্ছি:

হাজরা রোডের মোড় থেকে আমরা দু'জনে একটা বাসে উঠলাম। আমি উঠতেই বাস ছেড়ে দিয়েছিল, সঞ্জয় দৌড়তে দৌড়তে এসে লাফিয়ে উঠল। ঠিক সামনের লেডিজ সীটটাতে জনকয়েক স্ত্রী-জাতীয়া বসে ছিল, ও ভেতরে পা দিয়েই তাদের একজনকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে তুই! কত বড় হয়ে গেছিস, চিনতেই পারি নি প্রথমে। আবার বিয়েও করেছিস দেখছি।'

চমকে উঠে একটি মেয়ে তাকাল সঞ্জয়ের দিকে। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই লাল হয়ে উঠল লজ্জায়। মাথা নীচু করে স্মিত মুখে বসে রইল। বাসসুদ্ধ লোক ফিরে তাকাল এদিকে। আঠার-উনিশ বছর বয়স হবে মেয়েটির। সুন্দর চেহারা।

'কোথায় থাকিস আজকাল? কর্তাটি আসেন নি বুঝি?'

মেয়েটি ঈষৎ হেসে দণ্ডায়মান এক যুবকের দিকে তাকাল। যুবকটি সঞ্জয়কে নমস্কার করে হেসে বলল, 'আজ্ঞে আমিই সেই হুর্ভাগা ব্যক্তি।'

নমস্কার অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর সঞ্জয় বলল, 'আপনার স্ত্রী ছিলেন আমার প্রতিবেশিনী। কিন্তু ও এত বড় হয়ে গেল কি ক'রে তাই ভাবছি। এই ত সেদিনও ওকে পুলিসে ধরিয়ে দেব বলে ভয় দেখাতাম আর ও কাঁদত হাউ হাউ করে। আর এই ত সেদিনও ওকে সিগারেটের বাংতা দিয়েছি কত-- পুতুলের গয়না বানাবে বলে চেয়ে নিত। আচ্ছা ভেবে দেখি ত ক'দিন আগেকার কথা। তিন? চার? না না, সাত বছর হয়ে গেল এর মধ্যে! কি আশ্চর্য্য!'

তারপর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'সেই যে আমার টেবিল থেকে একটা চক্চকে স্ক্রু চুরি করেছিলি মনে পড়ে তোর? ধরা পড়লে বলেছিলি—তোর পুতুল-জামাইয়ের গাড়ী হবে ওটা?'

এবার মেয়েটি মুখ খুলল। মিষ্টি হেসে মাথা দুলিয়ে বলল, 'আর সেই যে তুমি আমার পুতুলগুলো ভাঙতে খালি খালি আর ধরা পড়লে বলতে পুতুলগুলোর ভেতরে কি আছে তা দেখবে? মনে পড়ে তোমার?'

বিস্ফারিত চোখ করে সঞ্জয় তাকাল মেয়েটির স্বামীর দিকে। বলল, 'দেখলেন মশাই! আমার নামে এমন অপবাদ। ওকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি আর আমি কিনা যাব ওর পুতুল ভাঙতে! আপনার স্ত্রীটি ত খুব ভাল লোক নন্ মশাই। একটু সাবধানে চলবেন।'

তার স্বামী সোৎসাহে সঞ্জয়ের পক্ষ সমর্থন করে একটা বক্তৃতা দেবার উপক্রম করেছিল এমন সময় মেয়েটির পাশের জায়গাটা খালি হ'ল। সঞ্জয় ঝুপ করে সেখানে বসে পড়ল নিঃসঙ্কোচে। যুবকটিকে বলল, 'আপনি মশাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিড় ঠেলে রাখুন।'

আমি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে চুপচাপ। ও আর আমার দিকে তাকায়ই না। বোধ হয় ভুলেই গেছে আমার কথা। আমিও কিছু বললাম না, ভাবলাম বাল্যসঙ্গিনীর সাক্ষাৎ পেয়েছে এত দিন পরে, এর মাঝে আমার স্থান কোথায়।

এক সময় শুনলাম ও বলছে, 'তোর কর্তাটিকে নিয়ে একদিন আয় না আমাদের বাড়ীতে···ভাল কথা, আমরা আর সে বাড়ীতে নেই জানিস বোধ হয়, বীডন ষ্ট্রীটে থাকি আজকাল।'

নোট বইয়ের পাতা ছিঁড়ে সঞ্জয় তার ঠিকানা লিখে দিল মেয়েটিকে। 'তোর ঠিকানাটাও বল। সাত বছর পরে যখন দেখা পেয়েছি তখন সাত দিনে অন্ততঃ একবার করে হামলা করব তোর শ্বশুরবাড়ী গিয়ে--সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।'

মেয়েটির অন্যধারের জায়গাও খালি হ'ল। স্বামীটি বসল সেখানে। তিন জনে মিলে খুব হাসিগল্প চলতে লাগল। ইতিমধ্যে অনেকটা সঙ্কোচ কেটে গেছে মেয়েটির। বুঝতে অসুবিধা হ'ল না বহুদিন পরে বাল্যবন্ধুর দর্শনে ছেলেবেলার স্মৃতি বন্যাবেগে উচ্ছসিত হয়ে ফিরে আসছে তার মানসপটে, খুশির জোয়ার বাঁধ মানছে না।

বাস তখন কলেজ ষ্ট্রীট পার হয়েছে। বসবার জায়গা পেয়ে সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে দেখি ওর হাসিখুশী ভাবের ভেতর থেকে ফুটে উঠেছে একটি অধীর মূর্ত্তি—যেন হাতে আর সময় নেই, এখুনি যা-হয় একটা কিছু করে ফেলতে হবে। হঠাৎ কি একটা কথায় ও হাসতে হাসতে আমার দিকে তাকাল। দেখলাম চোখের কোণে অতি সূক্ষ্ম একটা ইশারা আর ঠোঁটের কোণে ভয়ঙ্কর একটা হাসি। সে ইশারা, সে হাসি আমার অতিপরিচিত। হৃৎপিণ্ডটা একবার লাফিয়ে উঠেই যেন স্থির হয়ে যেতে চাইল, হাত-পা অবশ হয়ে এল। কি সর্ব্বনাশ! এতক্ষণ ধরে তা হলে সেই অভিনয়ই হচ্ছে। বন্ধু-টন্ধু সব বাজে! হায় ভগবান, এত দিন ধরে লোক-ঠকানোর শাস্তি কি তুমি শেষকালে এই বাসের মধ্যেই দেবে? এতগুলো লোকের বারোয়ারি কিল-চড় খেয়েই আমাদের মরতে হবে শেষে?

"আচ্ছা তুই কবে আসছিস বল। পরশু? রোববার আছে? ভাল কথা, তোর দাদা এখন কোথায় কাজ করে?" সঞ্জয় জিজ্ঞাসা করল।

"বড়দা ব্যাঙ্কে, ছোটদা টাটা কোম্পানীতে।"

"ছোটদাটা আবার কোত্থেকে এল?"

"কেন? ছোটদাকে তোমার মনে নেই? এত ভুলো মন তোমার! তোমার প্রাণের বন্ধু মন্টী!"

"দাঁড়া ভেবে নিই। মন্টী? মন্টী? না, মনে পড়ছে না ত। যাক গে তোর মার খবর কি? বাবা শিলঙেই আছেন?"

"বাবা ত শিলঙে ছিলেন না কোনদিন। আর তিনি ত মারা গেছেন আজ ছ' বছর হ'ল।"

"ছ' বছর!" তড়াক করে প্রায় লাফিয়ে উঠল সঞ্জয়। "আমি ত এই বছরদুয়েক আগেও তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি শিলঙে।"

"সে কি!" বিস্মিত হয়ে বলল মেয়েটি। আড়চোখে একবার তাকাল স্বামীর দিকে। চুপ করে রইল সবাই।

"আচ্ছা তোদের সেই কুকুরটা এখনও বেঁচে আছে? ও প্রায় চলে এসেছি বাড়ীর কাছে। ভাল কথা, তোদের মহানির্ব্বাণ রোডের বাড়ীর পাশে সেই যে বোবা মেয়েটা থাকত তার খবর শুনেছিস কিছু?"

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল মেয়েটি। তার স্বামীও তাকাল সঞ্জয়ের দিকে। কেউ কোন জবাব দিল না।

উত্তেজনায় আমি তখন উঠে দাঁড়িয়েছি। চকিতে একবার ভাবলাম নেমে যাই সঞ্জয়ের অলক্ষ্যে। কিন্তু বন্ধুকে একলা এই বিপদে ফেলে যেতে মন সরল না, তা ছাড়া শেষ পরিণতিটা দেখবারও লোভ ছিল প্রচুর।

ধীরে ধীরে মেয়েটি বলল, "দেখুন আমার মনে হচ্ছে কোথাও একটা ভুল হয়ে গেছে। আমার বাপের বাড়ী বাগবাজার, আমরা মহানির্ব্বাণ রোডে কখনও থাকি নি। আপনি বোধ হয় অন্য কেউ ভেবে আমার সঙ্গে আলাপ করেছেন।"

"অ্যা! বলেন কি! আপনার নাম তা হলে খেঁদী নয়?"

খেঁদি! এত দুঃখেও হাসি পেল আমার। এ নামটা আবার কোত্থেকে জোগাড় করল সঞ্জয়! স্বামী ভদ্রলোকের গম্ভীর মুখেও একটু হাসির রেখা উঁকি মেরে গেল। মেয়েটির মুখ টকটকে লাল।

"আমার নাম বনলতা, বাড়ীতে ডাকে লতা বলে।" জবাব দিল সে।

"উঃ কি ভয়ঙ্কর ভুল করে ফেলেছি। ছিঃ ছিঃ, চেনা মুখ মনে হতেই আলাপ সুরু করে দিয়েছি, এক বারও মনে হয় নি ঠিক কি না। কি বিশ্রী ব্যাপার! ভারি অন্যায় হয়ে গেছে, জানি না আপনারা আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন কিনা।" অনুতপ্ত সুরে বলল সঞ্জয়।

"আপনি যখন ভুল কথা বললেন তখনিই আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু আবার ভাবলাম হয়ত আপনি ঠাট্টা করছেন। অন্যায়টা আসলে আমারই। আমারই তখন বলা উচিত ছিল।" বনলতা রাঙা হয়ে বলল।

"না না, কি অন্যায় দেখুন আমার! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আপনারা হয়ত কত কি ভাবছেন আমার সম্বন্ধে।" জবাব দিল সঞ্জয়।

হঠাৎ হেসে উঠল স্বামীটি। বলল, "যাক আপনার ভুলে আর আমার স্ত্রীর অন্যায়ে আমাদের শাপে বর হয়ে গেল। একজন বন্ধু পেলাম আজ। আপনি আসবেন পরশু দিন, নেমন্তন্ন রইল। না এলে বুঝব লজ্জায় পালিয়েছেন।"

আমিও একটু হাসলাম সকলের আড়ালে।

২

কিন্তু অকস্মাৎ সঞ্জয়ের জীবনে একটা ছেদ পড়ে গেল। সঞ্জয়ের সমস্ত ক্রিয়াকলাপই আমরা অবশ্য সমর্থন করতাম না, কিন্তু ওর সম্বন্ধে আমরা মনে মনে অনেক কিছু আশা পোষণ করতাম। কোন্‌দিক দিয়ে সঞ্জয় বিখ্যাত হয়ে উঠবে তা হয়ত আমরা ঠিক করে বলতে পারতাম না, তবে এটুকু বিশ্বাস করতাম সঞ্জয় নিজে কোন অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে যাক না যাক ওকে দেখে প্রেরণা লাভ করবে বহু কীর্ত্তিমান, ওকে তারা অক্ষয় করে রেখে যাবে নিজেদের বহু কীর্ত্তির ভেতর। কিন্তু আমাদের হতাশ করে শেষ পর্য্যন্ত ওর জীবনের গতি এক জায়গায় এসে স্থির হয়ে পড়ল, যেন একটা ভাল নাটক দেখতে দেখতে সবাই খুব উৎসাহিত হয়ে পড়েছিল এমন সময় প্রথম অঙ্কের মাঝখানেই অকস্মাৎ যবনিকা পড়ে গেল, আর সে যবনিকা উঠল না। সে ইতিহাস অতি করুণ।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ওদের বারান্দায় দু'জনে পাশাপাশি বসে রয়েছি দুটো বেতের চেয়ারে। সঞ্জয়ের মুখখানা শুকনো, চুলগুলো উস্কোখুস্কো, তেল নেই। কয়েকদিন ধরে ওর জ্বর চলছিল, সেদিনই ভাত খেয়েছে। বাড়ীতে মালী আর একটা চাকর ছাড়া আর কেউ নেই, কোথায় যেন গিয়েছিল সবাই। সঞ্জয় বলে দিয়েছিল সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আসতে, কিন্তু তখনও আসছে না দেখে ও ক্রমশঃ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল। আমারও ভাল লাগছিল না বসে থাকতে, কিন্তু সঞ্জয়ের মা-বাবার সঙ্গে দেখা না করে চলে আসতে চক্ষুলজ্জায় বাধছিল বলে বসে ছিলাম। আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বিদায় নিতে উঠে দাঁড়িয়েছি এমন সময় চোখে পড়ল একটি মেয়ে ওদের বাগানের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। রোগা লিকলিকে তার চেহারা, লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি। মুখখানা বেজায় লম্বা, গালদুটো ভেতরদিকে বসানো, নাকটা যেন ছোট শিশুর কাছ থেকে ধার করা। বগলে একটা ব্যাগ। আরো কাছে এলে লক্ষ্য করলাম মুখখানা বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত, শুকনো ঠোঁট দুটি টকটকে লাল। কেন জানি না একটু বিরক্তি বোধ করলাম। সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে দেখি সেও বিশেষ প্রসন্ন নয়।

কাছে এসে দাঁড়াল সে বেশ স্মার্টনেস দেখিয়ে। দু'জনের দিকেই চেয়ে বলল, "এটা কি মিষ্টার সুবোধ ঘোষের বাড়ী?"

"হ্যাঁ!" সংক্ষেপে জবাব দিল সঞ্জয়।

"আচ্ছা এখানে সঞ্জয়বাবু থাকেন বোধ হয়। তিনি আছেন কি?"

"সঞ্জয়!" নিজের নামটা উচ্চারণ করতে করতে হঠাৎ যেন চমকে উঠল সঞ্জয়। রুগ্ন মুখখানা দেখতে দেখতে আরও পাণ্ডুর আরও বিবর্ণ হয়ে উঠল। সিগারেটে একটা টান দিতে যাচ্ছিল, মাঝপথেই থেমে গেল হাতটা, ক্ষণকাল কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইল শূন্য দৃষ্টিতে। আমি একটু শঙ্কিত হয়ে পড়লাম।

একটু পরেই বিপরীত দিকের একটা চেয়ারের পানে হাত দেখিয়ে বলল, "বসুন।"

"মেয়েটির চেয়ারে বসার পর সঞ্জয় সিগারেটে একটা টান দিল। ধোঁয়াটাকে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিতে লাগল। চোখে তখনও সেই শূন্য দৃষ্টি। তারপর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি কোত্থেকে আসছেন?"

"আমি আসছি শ্যামবাজার থেকে। সঞ্জয়বাবু আমার দাদা রমেশ সেনের বন্ধু।"

"রমেশ সেন? রমেশ সেন?" রুক্ষ চুলে হাত বুলাতে বুলাতে অনেকটা আপন মনেই সঞ্জয় বারদুয়েক উচ্চারণ করল নামটা।

"আজ্ঞে হ্যাঁ রমেশ সেন, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট।"

"হবে হয়ত," সঞ্জয় জবাব দিল। তারপর গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, "যদি কিছু মনে না করেন···আপনার কোন বিশেষ দরকার ছিল কি?"

মেয়েটি একটু বিব্রত হয়ে উঠল।

"দরকার? দরকার আমার সঙ্গে ঠিক ছিল না। তবে একটু দেখা হলে ভাল হ'ত।"

"আপনি কি সঞ্জয়কে চেনেন? ওর সঙ্গে আপনার কত দিনের আলাপ? একটা বিশেষ কারণে আপনাকে এসব জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত। আপনি কিছু মনে করবেন না।"

তরুণী আরও বিব্রত হয়ে উঠল। একটু হেসে বলল, "আমার সঙ্গে সঞ্জয়বাবুর আলাপ নেই। তবে আমাদের বাড়ীতে উনি প্রায়ই যান। দাদা একটা চিঠি পাঠিয়েছেন একটা বিশেষ দরকারী বইয়ের জন্য। ক'দিন ধরে উনি একটু অসুস্থ, বাড়ীতেও আর কেউ নেই তাই আমাকেই পাঠিয়েছেন।'

এ পর্য্যন্ত বলে সে একবার চারদিকে তাকাল। তারপর বলল, "কিন্তু সঞ্জয়বাবু কি বাড়ী নেই?"

সঞ্জয় কোন জবাব দিল না। মাথা নীচু করে এশ-ট্রেতে সিগারেটের ছাই ফেলতে ফেলতে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিল। তারপর যখন মুখ তুলল, দেখি সে মুখ আরও গম্ভীর, আরও থমথমে।

"দেখুন প্রথমে কথাটা বলব না ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম, আপনি বোধ হয় সঞ্জয়ের কোন বান্ধবী বা বিশেষ পরিচিতা হবেন, খবরটা শুনে হয়ত আঘাত পেতে পারেন। কিন্তু আপনার সঙ্গে যখন ওর পরিচয় নেই তখন আর কথাটা বলতে অত বাধা নেই। তা ছাড়া আপনি ওর বন্ধুর বোন, আপনাদের জানানোও ত কর্ত্তব্যের মধ্যেই।"

সঞ্জয় আবার চুপ করল। মেয়েটি বলে উঠল, "কি, কি হয়েছে?"

"অত্যন্ত দুঃখিত হচ্ছি কথাটা জানাতে। কিন্তু···পরশুদিন সকালে সঞ্জয় মারা গেছে।"

মুহূর্ত্তে ফ্যাকাশে হয়ে গেল মেয়েটির নানা বর্ণরঞ্জিত মুখখানা। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগল আমাদের দিকে। আমি ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠলাম। সঞ্জয়ের অনেক রকম ঠাট্টা দেখেছি, কিন্তু এক জন অপরিচিতা তরুণীর উপর এ রকম অদ্ভুত রসিকতার প্রয়োগ আর দেখি নি। সব কথা ফাঁস করে দিতে যাচ্ছিলাম এমন সময় চকিতে মনে পড়ল—সঞ্জয় একবার বলেছিল অপরিচিত বা অল্প-পরিচিত লোকের মৃত্যুসংবাদ শুনে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনের কাছে মানুষ কিভাবে শোকের অভিনয় করে তা সে একবার হাতে-কলমে দেখতে চায়। তবে কি এখন সেই পরীক্ষাই চলছে? সঞ্জয়ের দিকে তাকালাম। ওর দৃষ্টিতে একটু বিস্ময় মেশানো। তা হলে কি ও নিজেও এতটা আশা করে নি?

আত্মস্থ হয়ে মেয়েটি কাঁপা গলায় বলল, 'কিন্তু এ কি হ'ল! ক'দিন আগেও ত উনি আমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন শুনেছি। হঠাৎ এ কি হয়ে গেল। আমরা কেউ কিছু জানতেও পারলাম না। আচ্ছা কি···।'

গলা ভেঙে গেল মেয়েটির। সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি তার ঠোঁটদুটো কাঁপছে। তারপর হঠাৎ তার চোখের দৃষ্টি এক জায়গায় এসে স্থির হয়ে গেল।

এবার ঘাবড়াবার পালা সঞ্জয়ের। আমার দিকে একবার ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে মেয়েটির উদ্দেশ্যে বলতে গেল, 'দেখুন একটা অন্যায় হয়ে গেছে। আমি ঠিক···।'

কথা শেষ হবার আগেই মেয়েটি একটা অস্ফুট শব্দ করে চেয়ার থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। আমরা দু'জনে লাফিয়ে উঠলাম একসঙ্গে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম এক মুহূর্ত্ত। তারপর দৌড়ে কাছে গিয়ে দেখলাম চৈতন্যের কোন লক্ষণ নেই, তবে শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে ঠিকমতই। সঞ্জয় ব্যস্ত হয়ে ভেতরে ছুটল মাকে ডেকে আনার জন্য, কিন্তু পরক্ষণেই ওর মনে পড়ল বাড়ীতে কেউ নেই। চীৎকার করে মালীকে ডাকল।

বুড়ো মালীর পরামর্শে মেয়েটিকে বারান্দায় লম্বা টেবিলের উপর শুইয়ে দিলাম। সঞ্জয় ছুটে গেল টেলিফোনের কাছে। এদিকে আরম্ভ হ'ল মেয়েটির হাত পা ছোঁড়া আর সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে বেরুতে লাগল একটা গোঁ গোঁ শব্দ। ক্রমশঃ সে এত জোরে হাত পা ছুঁড়তে লাগল যে ভয় হ'ল বুঝি টেবিলের উপর

থেকে পড়ে যাবে। নিরুপায় হয়ে আমরা তিন জনে মিলে চেপে ধরলাম তাকে। সরু লিকলিকে তার পা, কিন্তু কি অবিশ্বাস্য জোর তাতে। বুকে লাথি খেয়ে সঞ্জয় দু'বার ছিটকে পড়ল মেঝেতে। কিন্তু নিজের কথা ভাববার সময় তখন ওর নেই, যত বার পা সরে যায় তত বার জোরে চেপে ধরে।

সে কি ভয়ানক সময়। এক একটি মুহূর্ত যেন এক একটি বছর। ঘামে আমাদের সমস্ত শরীর ভিজে গেল, টপটপ করে গড়িয়ে পড়তে লাগল মেয়েটির গায়ে। একটা করে সেকেণ্ড যাচ্ছে আর আমরা ভাবছি ডাক্তারবাবু কেন আসছেন না, বাড়ীর লোকেরাই বা আসছেন না কেন?

বাইরে মোটরের দরজা খোলার শব্দ।...কে? ডাক্তারবাবু? নাঃ। স্বরটা পরিচিত। অনেকগুলো পায়ের শব্দ বাগানে। কিছু ভরসা পেয়ে আমরা বাগানের দিকে চেয়েছি এমন সময় মেয়েটির হাত পা ছোঁড়া আবার নূতন করে বেড়ে গেল। আমরা মাঝখানে ছেড়ে দিয়েছিলাম, আবার সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করে তাকে চেপে ধরলাম।

সঞ্জয়ের বাবা মা ভাই বোন আর বউদির সেই হতভম্ব ভাব আমি সারা জীবনেও ভুলব না। বারান্দায় পা দিয়েই সবাই চমকে উঠেছিল ভূত দেখার মত, তারপর স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছিল কয়েক মুহূর্ত। দৃশ্যটা মনে রাখার মতই বটে, ভাবতে গেলে এখনও সমস্ত গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। একটা লম্বা টেবিলের উপর শুয়ে একটি অপরিচিতা তরুণী প্রাণপণে হাত পা ছুঁড়ছে। কাপড়-চোপড় তার অসম্বৃত, শাড়ীর আঁচলটা টেবিলের এক দিক দিয়ে ঝুলছে, ব্লাউজের বোতামগুলো খুলে গেছে, ছেঁড়া সোনার হারটা মাটিতে গড়াচ্ছে, ব্যাগটা পড়ে রয়েছে আর একটু দূরে। আরও দূরে দূরে তার দু'পাটি জুতো। আর তরুণীটিকে স্থির রাখবার চেষ্টা করছে দুটি যুবক আর একটি বৃদ্ধ। তাদের একজন সে বাড়ীর ছেলে, একজন ছেলের বন্ধু, আর একজন বহুদিনের বিশ্বস্ত মালী। খানিক দূরে দাঁড়িয়ে সে বাড়ীর কর্ত্তা-গিন্নী, বড় পুত্র, এক কন্যা এবং পুত্রবধূ।

কিন্তু সত্যি বলতে কি এসব আমার তখনও খেয়াল হয় নি, খেয়াল হ'ল আরও পরে, সঞ্জয়ের বাবার মুখে অস্ফুট স্বরে 'একি' শব্দ শুনে। সকলের স্তম্ভিত দৃষ্টি অনুধাবন করে একবার তরুণীর দিকে তাকাতেই চকিতে উপলব্ধি করলাম আমাদের অবস্থাটা আর সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠলাম বলির ছাগশিশুর মত। সে বাড়ীতে আমার স্থান ছিল সঞ্জয়ের কাছাকাছিই। সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে দেখলাম তারও হাত পা কাঁপছে।

ক' সেকেণ্ড বা ক' মিনিট সবাই স্তম্ভিত হয়ে ছিল মনে নেই। আমরাও কোন কথা বলতে পারলাম না। জিভ যেন আটকে গিয়েছিল একেবারে। চমক ভাঙল সঞ্জয়ের মায়ের তীব্র কণ্ঠস্বরে, "এ সব কি! কে এই মেয়েটা?"

মায়ের সেই গলা শুনে সঞ্জয় একেবারে কেঁপে উঠল থরথর করে। চোখ দুটো তার বড় বড় হয়ে উঠল ভয়ে। মায়ের রাগ সে ভালভাবেই জানত। কোনমতে জবাব দিল, "ইয়ে...আমি ওকে চিনি না। ফিট হয়ে পড়েছে।"

"সে ত দেখতেই পাচ্ছি। বলি কোত্থেকে এল মেয়েটা? বাতাসে উড়ে এল নাকি?"

সঞ্জয় কি বলত জানি না এমন সময় মেয়েটির গোঙানি আরও বেড়ে গেল। সঞ্জয় বলল, "সব বলছি মা, কিন্তু এ রকম শব্দ করছে কেন? একটু দেখে যাও না।"

"ওসব পরে হবে। আগে জবাব দে আমার কথার।" মা তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন।

বাধা দিয়ে সঞ্জয়ের বাবা বললেন, "আঃ কর কি! মেয়েটাকে মেরে ফেলবে নাকি। আগে দেখ কি ব্যাপার তারপর জেরা করো।"

এগিয়ে গেলেন তিনি। তারপর সঞ্জয়ের বউদিকে বললেন, "বউমা স্মেলিং সল্টের শিশিটা নিয়ে এস ত শীগগির।"

বউদি এতক্ষণ ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল তরুণীর দিকে নয়, সঞ্জয়ের দিকে। শ্বশুরের কথায় সম্বিৎ পেয়ে ভেতরে ছুটে গেল।

এমন সময়ে ডাক্তারও এসে পড়লেন। প্রথমেই তিনি রোগিণীকে পরীক্ষা করলেন। সবাইকে আশ্বস্ত করে বললেন, "ভয় নেই, হঠাৎ 'শক' লেগে ফিট হয়ে গেছে।" তারপর সঞ্জয়ের মায়ের দিকে চেয়ে বললেন, "কি ভাবে ব্যাপারটা হ'ল বলুন ত?"

সঞ্জয় বলে উঠল, "আমি বলছি সব। বিনয় আর আমি বসে গল্প করছিলাম এমন সময় এই মেয়েটি এসে আমার নাম জিজ্ঞাসা করল। আমি বসতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কোত্থেকে এসেছে, কি দরকার। আমার কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ ও অজ্ঞান হয়ে চেয়ার থেকে পড়ে গেল। আমরা তাড়াতাড়ি করে ওকে টেবিলের উপর শুইয়ে দিয়েই আপনাকে খবর দিলাম। তারপর থেকে এই একই অবস্থা।"

বাড়ীর লোকেরা সঞ্জয়ের কথা বিশ্বাস করল না বোঝা গেল, কিন্তু ডাক্তারের সামনে কেউ কিছু বলল না। ডাক্তার চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জয়ের মা হেঁট হয়ে একটা ভাঁজ-করা কাগজ কুড়িয়ে নিলেন। সেটা খুলে পড়ে কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, "মেয়েটা যে রমেশের বোন সন্ধ্যা তা এতক্ষণ বলিস নি কেন?"

"কি করে জানব ও কার বোন। আমার সঙ্গে ত কথাই হ'ল না"—অসহায়ভাবে সঞ্জয় বলতে চেষ্টা করল।

'কি করে জানবে কার বোন! রোজ দু'বেলা যাতায়াত আর এদিকে চেনই না কে কার বোন! বেশ বেশ,"—ব্যঙ্গের সুরে জবাব এল।

আমি সঞ্জয়ের পক্ষ সমর্থন করার জন্য বলতে গেলাম, "আজ্ঞে আমিও ত মাঝে মাঝে যাই রমেশদের বাড়ীতে, কিন্তু এ মেয়েটিকে ত কোনদিন দেখি নি।"

মা চেঁচিয়ে উঠলেন, "চুপ কর বিনয়। তোদের কাউকে জানতে আমার বাকি নেই।"

সঞ্জয়ের বউদি এবার একটু কৌতূহলভরে এগিয়ে এল। বলল, "কে? রমেশ ঠাকুরপোর বোন! দেখি কেমন দেখতে।"

সন্ধ্যার হাত পা ছোঁড়া থেমে গেছে। কথা উঠল এবার তাকে নিয়ে কি করা যায়—রমেশদের বাড়ীতে সমস্ত সংবাদ জানানো, না জ্ঞান ফিরলে সন্ধ্যাকে একেবারে গাড়ী করে বাড়ী পৌঁছে দেওয়া? আমি আর সঞ্জয় বললাম, রমেশদের এ খবর দিয়ে উৎকণ্ঠিত করে লাভ নেই। সামান্য ফিট বৈ আর ত কিছু নয়, জ্ঞান হওয়া মাত্র পৌঁছে দিয়ে আসব। সঞ্জয়ের বাবা মা তাতে রাজী হলেন না। যা হবার তা ত হয়েই গেছে, কিন্তু নাড়াচাড়া করতে গেলে যদি আবার ফিট হয়? তার চেয়ে বরং সেখানেই রাত্রিটা থাকুক আর ওদিকে রমেশদের খবর দেওয়া হোক, তারা যদি আসতে চায় আসুক। সেকথা শুনে আমরা দু'জনেই একটু ঘাবড়ে গেলাম। মেয়েটাকে যত তাড়াতাড়ি বিদায় করা যায় ততই ভাল, কখন সব ফাঁস করে দেবে কে জানে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদেরই হার হ'ল এবং সঞ্জয়কেই ফোন করে রমেশকে সব কথা জানাতে হ'ল।

রমেশ ছাড়া তাদের বাড়ীর প্রায় সবাই এসে পড়ল অল্পক্ষণের মধ্যে। এই তাদের এ বাড়ীতে প্রথম আসা। ততক্ষণে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে সন্ধ্যাকে। সঞ্জয় যথাসম্ভব স্থির ভাবে একই ইতিহাস শোনায় তাদের। কিন্তু স্পষ্ট দেখলাম ও ঘাবড়ে গেছে।

সন্ধ্যার জ্ঞান ফিরে এল। একবার ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল চারদিকে। অপরিচিত জায়গায় বাড়ীর লোকদের পাশে অপরিচিত মুখ দেখে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল বিস্মিত হয়ে। আমি আর সঞ্জয় তখন আস্তে আস্তে সন্ধ্যার পেছন দিককার একটা সোফায় গিয়ে বসেছি, যাতে সে চট করে আমাদের দেখতে না পায়।

হঠাৎ সন্ধ্যা একটা বিরাট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠল, "উঃ, আর যে পারি না ভগবান। সঞ্জয় বাবু, আপনি এখন কোথায়?"

সঞ্জয় যে তখন কেন উঠতে গেল সেকথা ভেবে আমি এখনও আশ্চর্য্য হয়ে যাই। নিজের নাম শোনা মাত্র ও নত মস্তকে খাটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু ওকে দেখেই সন্ধ্যার চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল, মুখ থেকে সমস্ত রক্ত কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তমধ্যে। ভয়ার্ত গলায় বলতে লাগল, "একি তুমি! তুমি এখানে? তবে কি তুমি···ওরা যে বললে তুমি নেই!"

আমি একেবারে বজ্রাহত। খানিকক্ষণ আগে এই মেয়েই সঞ্জয়কে চিনতে পারে নি, এখন চিনল কি করে, এ কি রহস্য!

অকস্মাৎ সন্ধ্যা উঠে বসল বিছানায়। চোখদুটো তার ঘুরতে লাগল চরকির মত। সে চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝলাম সে আর প্রকৃতিস্থ নেই। ভয় পেয়ে সবাই ধরাধরি করে সন্ধ্যাকে শুইয়ে দিতে গেল। সন্ধ্যা হাততালি দিয়ে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল। বলল, "না না, অসম্ভব। একেবারে অসম্ভব।" তার পর একেবারে ভেঙে পড়ে কান্নার সুরে বলল, "কিন্তু ওরা যে বললে! তবে কি সত্যিই···না না, সে হতে পারে না।"

তার পর হঠাৎ সবলে জড়িয়ে ধরল সঞ্জয়কে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও সঞ্জয় তার হাতের বাঁধন খুলতে পারল না। উচ্ছ্বসিত ভাবে সন্ধ্যা বলে উঠল, "না না, আগে তুমি বল আমাকে ছেড়ে যাবে না কোথাও? বল আগে। কেন তুমি এতদিন আমার সঙ্গে দেখা কর নি? রাগ করে ছিলে? কিন্তু আমি কি করতে পারতাম ভেবে দেখ।···তা ছাড়া আমি ত বলি নি যে আংটিটা নেব না। তবে অত রাগ করলে কেন? কি বললে? না না, ও সব আর মানব না সঞ্জয়, আজ আমাকে নিতেই হবে। অনেক দিন তোমার সঙ্গে বেরুই নি।"

ঘরসুদ্ধ লোক একেবারে স্তম্ভিত। আড়চোখে সঞ্জয়কে দেখলাম সবাই চোখ নীচু করে মাটির দিকে চেয়ে রয়েছে। এমন কি সঞ্জয় পর্যন্ত ভুলে গেছে সন্ধ্যার আলিঙ্গনমুক্ত হবার কথা। আমার মনে পর্যন্ত একবার দোলা দিয়ে গেল তবে কি সত্যিই সঞ্জয়···। কিন্তু সেটা যে অসম্ভব, ওর নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখি আমি। তবে এ সব কি!

হঠাৎ দ্রুত পায়ের কয়েকটা শব্দে চমকে উঠলাম। দেখি সন্ধ্যা ঝড়ের বেগে সঞ্জয়ের সারা মুখে চুমো খেয়ে চলেছে। সঞ্জয় প্রথমে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটার আকস্মিকতায়। তার পর প্রাণপণ শক্তিতে সন্ধ্যাকে প্রায় ঠেলে ফেলে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে দৌড়ে পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়াল। সন্ধ্যা বিছানায় নেতিয়ে পড়ল।

সঞ্জয়ের বাবাই সর্বপ্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন। গম্ভীরভাবে ডাকলেন, "সঞ্জয়।"

"আজ্ঞে।"

"বাইরে গিয়ে বসো। না ডাকা পর্যন্ত আর এ ঘরে এসো না।"

সন্ধ্যার বাড়ীর লোকেদের দিকে চেয়ে দেখি তারা লজ্জায় অপমানে দুঃখে ক্ষোভে তারা যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে। এ বাড়ীর লোকেরাও তাদের চোখের দিকে চাইতে পারছে না।

সে রাত্রে আমি বাড়ী ফিরলাম না। সঞ্জয়ের ঘরেও গেলাম না, যদিও সেটাই সবচেয়ে শোভন ছিল আমার পক্ষে। আমাদের বিচারের সময় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সন্ধ্যার প্রলাপোক্তিগুলিও আমাদের জানার দরকার ছিল। তাই সকলের স্পষ্ট অনিচ্ছা সত্ত্বেও আর সকলের সঙ্গে আমিও সে ঘরের বারান্দাতেই শুয়ে কাটিয়ে দিলাম সে রাতটা।

পরদিন সকালে সঞ্জয়ের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখি এক রাত্রেই বেচারা একেবারে অর্দ্ধেক হয়ে গেছে। সন্ধ্যার অদ্ভুত আচরণ নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা করছিলাম এমন সময় শোনা গেল সন্ধ্যার ঘুম ভেঙেছে আর পরিষ্কার জ্ঞানও নাকি ফিরে এসেছে।

ইচ্ছা না থাকলেও আমরা দু'জনেই গেলাম সে ঘরে, গত রাত্রির ঘটনা সম্বন্ধে সন্ধ্যা কি বলে কে জানে। গিয়ে দেখি সবাই সেখানে উপস্থিত, এমন কি সঞ্জয়ের বাবা পর্যান্ত। বাবাকে দেখে সঞ্জয় ফিরে আসার উপক্রম করছিল এমন সময় সন্ধ্যা ক্লান্ত স্বরে তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, "না না, আপনি যাবেন না।" সবাই শঙ্কিত হয়ে উঠল আর একটা ঝড়ের আশঙ্কায়।

সঞ্জয় নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে ফিরে দাঁড়াল। ম্লান হেসে সন্ধ্যা বলল, "দেখুন আপনাদের কত কষ্ট দিলাম এই দুঃসময়ে। একে আপনারা সঞ্জয়বাবুর শোকে মুহ্যমান; তার উপর আমার হঠাৎ এই ফিট। ছিঃ ছিঃ, এমন হবে জানলে আসতাম না। আচ্ছা, কি ভাবে মারা গেলেন সঞ্জয়বাবু?"

মাথার উপর ছাদটা ভেঙে পড়লেও বোধ হয় সবাই এত চমকে উঠত না। সন্ধ্যা পাগল হয়ে গেছে, না তারাই পাগল! কিন্তু আমি এবার খুশি হয়ে উঠলাম। সঞ্জয়ের চোখ দেখে মনে হ'ল যেন সে সবেমাত্র শুকনো ডাঙায় পা রেখেছে আসন্ন সলিল-সমাধির কবল থেকে রক্ষা পেয়ে।

অনুতপ্ত সুরে সব কথা খুলে বলল সঞ্জয়। আপিসের 'প্লে'তে ওকে নামতে হবে মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশকারী এক প্রৌঢ়ের ভূমিকায়। তাই ও হাতে কলমে দেখতে চেয়েছিল কি ভাবে মানুষ অল্পপরিচিতের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে। সমস্ত বলার পর সঞ্জয় সকলের কাছে বার বার ক্ষমা চাইল মুখ নীচু করে।

এবার সবাই পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না, অল্পক্ষণ পরেই সবার মুখে নেমে এল সন্দেহের কালো ছায়া। সন্ধ্যা যদি ওকে নাই চিনত তা হলে ফিটের ঘোরে অমন করল কেন? তবে কি তারা আসার আগে ওদের মধ্যে কিছু ঘটেছিল? অথবা সন্ধ্যা যা বলল সেটা শুধু সবাইকার চোখে ধুলো দেবার অভিনয়? বুঝলাম সবার মনেই গুমরে গুমরে ফিরছে প্রশ্নটা, কিন্তু কেউ প্রকাশ করতে সাহস পাচ্ছে না। আরও দেখলাম সবাই আমার দিকে কেমন ভাবে যেন তাকাচ্ছে। হয়ত তারা ভেবেছিল রাত্রিবেলা সবার অলক্ষ্যে আমিই সন্ধ্যাকে জাগিয়ে সব কথা বলে দিয়েছি—সে কি করছে না করছে সব জানিয়ে দিয়েছি এবং সবার চোখে ধুলো দেবার জন্য সন্ধ্যাকে শিখিয়েও দিয়েছি কি বলতে হবে।

সন্ধ্যারা সেদিনই সকালে চলে গেল। একটা জিনিস দেখে আমরা অমন বিপদের মধ্যেও একটু স্বস্তি অনুভব করলাম। মনে মনে যে যাই ভাবুক ফিটের ঘোরে সন্ধ্যা কি করেছে সে সম্বন্ধে কেউ কিছু তাকে জানাল না, অতি সন্তর্পণে এড়িয়ে চলল সে প্রসঙ্গ।

আমি আর সঞ্জয় সেদিন বিকেলেই গেলাম এক সাইকোলজিষ্টের কাছে। সব কথা শুনে তিনি বললেন, 'ব্যাপারটা একটু অসাধারণ তবে খুব বেশী জটিল নয়। সন্ধ্যা অতি-রোমান্টিক ধরণের মেয়ে। রূপহীনা হবার জন্য খুব সম্ভব সে কারুর ভালবাসা পায় নি, আর পায় নি বলেই হয়ত সে রোমান্টিক হতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু আর সকলের মত সেও ভালবাসতে চায় ও ভালবাসা পেতে চায় অথচ সে জানে সে কুরূপা, তাকে কেউ ভালবাসবে না। তাদের বাড়ীতে সঞ্জয়ের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই খুব আলোচনা হ'ত আর সেই আলোচনা শুনে শুনেই সন্ধ্যা ওকে ভালবেসে ফেলেছিল গোপনে। ঠিক গোপনে বললেও ভুল হবে। ভালবেসেছিল অবচেতন মন দিয়ে। অত্যন্ত রোমান্টিক ধরণের মেয়ে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সঞ্জয়কে ভালবাসলেও নিজের সম্বন্ধে তার ইনফিরিয়রিটি কম্প্লেক্সের সীমা নেই, তাই সে পারতপক্ষে ওর সামনে বেরুতে চাইত না লজ্জায়। সে জানত সঞ্জয়ের পক্ষে তাকে ভালবাসা অসম্ভব, তাই নিজের মনে মনে সঞ্জয়কে নিয়ে কল্পনার জাল বুনেই সে খুশী ছিল, রমেশ তাকে সঞ্জয়ের কাছে না পাঠালে কোন দিন তাদের মুখোমুখি দেখাও হ'ত না হয়ত। অবশ্য সন্ধ্যা এক আধবার দূর থেকে সঞ্জয়কে দেখেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু ওকে নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত অবাস্তব কল্পনা করার ফলে সে সঞ্জয়ের আসল চেহারাই ভুলে গিয়েছিল, যদিও তার অবচেতন মন সঞ্জয়কে ভোলে নি কখনও। সাধারণ লোকের কাছে হয়ত এ ব্যাপারটা অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু চরম রোমান্টিক এবং অতি কল্পনাপ্রবণ লোকদের জীবনে এ রকম ঘটনার দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল নয়। সঞ্জয়দের বাড়ীতে গিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় সন্ধ্যা ওকে চিনতে পারে নি এই কারণেই। কিন্তু ফিটের সময়, যখন তার অবচেতন মন মাথা নাড়া দিয়ে উঠল আর তার ফলে মনের সমস্ত অর্গল খুলে গেল শুধু তখনই সে চিনতে পারল সঞ্জয়কে; আর আবার যখন তার স্বাভাবিক চেতনা ফিরে এল, সঞ্জয়কেও আর চিনতে সক্ষম হ'ল না। সবশেষে তিনি বললেন, 'এ রকম চরম রোমান্টিকদের ভাগ্যে সাধারণতঃ দুঃখ ছাড়া আর কিছু জোটে না। বাস্তবের রূঢ় আঘাতে যখন তাদের স্বপ্ন ভঙ্গ হয় তখন তাদের জীবনে আসে নিদারুণ বৈরাগ্য আর মানুষের উপর জাগে তীব্র ঘৃণা আর অবিশ্বাস। এর ফলে তারা অনেক সময় উন্মাদ পর্য্যন্ত হয়ে যায়। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্বপ্নভঙ্গের ফলেই তারা বাস্তব জীবনে ফিরে আসে, আর অনেক সময় বিয়ে হলে এবং প্রকৃত ভালবাসা পেলে সাধারণের তুলনায় একটু বেশীই সুখী হয়।'

সাইকোলজিষ্টের ব্যাখ্যা শুনে সঞ্জয় যেন কেমন হয়ে গেল। অনেক মেয়ের সঙ্গেই ও ঠাট্টা-ইয়ার্কি করত, কিন্তু কোনও মেয়ে যে ওকে ভালবাসে এটা ও কোন দিন কল্পনাও করতে পারে নি। সারাটা পথ ও অভিভূতের মত হাঁটতে হাঁটতে বাড়ী ফিরল।

কিন্তু আরও বিস্ময় ওর জন্য অপেক্ষা করে ছিল। সে ঘটনার পর প্রায় দিন পনের চলে যাওয়া সত্ত্বেও সে সম্বন্ধে কেউ কোনও উচ্চবাচ্য করছে না দেখে আমরা মনে মনে ভাবছি ফাঁড়াটা বুঝি নির্বিঘ্নে উৎরে গেলাম এমন সময় এক দিন আকস্মিকভাবে আর এক কল্পনাতীত বিপদ এসে উপস্থিত হ'ল। সঞ্জয়ের বাবা একটু রাশভারি এবং গম্ভীর প্রকৃতির লোক, এক কথা দু'বার বলেন না। এক দিন তিনি সিধে সঞ্জয়ের ঘরে ঢুকে বিনা ভূমিকায় বললেন,

"আমি সন্ধ্যার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে রাজী আছি। এ মাসেই হয়ে যাক শুভকর্ম্মটা।"

হতভম্ব সঞ্জয় কিছু বলার আগেই আবার তিনি বললেন, "আপিসে ক'দিন ছুটি পাওনা আছে?"

এবার সঞ্জয় বলল, "কিন্তু…!"

বাবা বললেন, "কিন্তু কি?"

"কিন্তু…মানে আমি বলছিলাম কি…ইয়ে কি বলে…" আর কিছু বেরুল না মুখ দিয়ে।

বাবা ভ্রূ কুঁচকে কিছু না বলেই চলে গেলেন।

মার কাছে আপীল করতে গেল সঞ্জয়। মা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন,"হতভাগা লজ্জা করে না আমার কাছে আসতে? বংশের মান-মর্য্যাদা খুইয়ে সকলের মুখে জুতো মেরে আবার আমার কাছে এসেছিস ঢঙ দেখাতে! যেখানে এদ্দিন পড়ে রয়েছিলি সেখানেই যা না এখন, আমার কাছে কেন?"

তারপর কপালে করাঘাত করে বললেন, "আমারই কপাল! নইলে সেদিনই কানু মিস্তিরের ছোট মেয়েটার সঙ্গে তোর বিয়ের কথাবার্ত্তা ঠিক করে আসি! আহা কি মিষ্টি স্বভাব মেয়েটার। ভাগ্যে নেই কি আর হবে। কোথায় মা-দুর্গার মত মেয়ে সরমা আর কোথায় ঐ শাকচুন্নি! কথা দিয়ে আবার আমাকেই নিজের মুখে কথা ফিরিয়ে নিতে হ'ল হাতে পায়ে ধরে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।"

সঞ্জয় বলল,"বিশ্বাস কর মা, আমি এসবের কিছুই জানতাম না, মেয়েটাকে আমি এর আগে কোনদিন দেখি নি পর্যান্ত।"

মা ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে বলে উঠলেন, "এখনও সেই কথা! আমরা কি সব ঘাস খেয়ে থাকি? এতদূর এগিয়ে আবার মেয়েটাকে অকূলে ভাসিয়ে দিবি? ঐ মেয়েকেই বিয়ে করতে হবে তোর, নইলে আমি গলায় দড়ি দেব।"

নিরুপায় হয়ে সঞ্জয় বউদির শরণাপন্ন হ'ল। বউদি ছোট্ট একটু মিষ্টি হাসি হেসে বলল, "আর ন্যাকামো কেন ঠাকুরপো? সবই ত জেনে গেছি।"

অবশেষে সঞ্জয় আমার কাছে এসে কেঁদে পড়ল। সব কথা শুনে আমি আৎকে উঠলাম। কোথায় অমন সুন্দর চেহারার সঞ্জয় আর কোথায় সন্ধ্যা! অনেক ভেবে-চিন্তে পরামর্শ দিলাম—বাড়ী ছেড়ে কয়েক মাস কোথাও অজ্ঞাতবাসে কাটাতে। প্রস্তাবটা সঞ্জয়ের মনে লাগল আর সত্যি সত্যিই ও তার আয়োজন করতে লাগল এমন সময় আর একটা সংবাদ শুনে আমরা মাথায় হাত দিয়ে পড়লাম।

সেই ঘটনার পর থেকেই সঞ্জয়ের বউদি নিজে থেকে যেচে সন্ধ্যার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিল এবং মাঝে মাঝে রমেশের বাড়ীতে যাওয়া আসাও আরম্ভ করেছিল, আমরা তখন তাতে সন্দেহের কিছু দেখি নি। একদিন সে রমেশদের বাড়ীতেই সন্ধ্যাকে কথায় কথায় সমস্ত জানিয়ে দেয় ফিটের ঘোরে সে কি কি করেছিল। পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে সন্ধ্যা সব শোনে আর সেই দিনই রাত্রে আফিং খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। ভাগ্যক্রমে সময়মত ধরা পড়ায় তার জীবন রক্ষা পায়।

তার পর আরম্ভ হ'ল এ বাড়ী ও বাড়ী ছোটাছুটি। এদিকে সঞ্জয়ের মার হুমকি—সন্ধ্যাকে বিয়ে না করলে তিনি গলায় দড়ি দেবেন আর ওদিকে সন্ধ্যার এক কথা—এ ঘৃণিত কলঙ্কময় জীবন আর সে রাখবে না। অবশেষে সঞ্জয়ের বউদি অনেক কষ্টে সন্ধ্যাকে বোঝাল যে জীবন যখন সে রাখবে না বলেই ঠিক করেছে তখন সেটা একজনকে দান করে ফেললেই সমস্যা চুকে যাবে। তা ছাড়া যার জন্য সে নিজেকে কলঙ্কবতী মনে করছে তার জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনটা যোগ করে দিলেই আর কোন কলঙ্কের প্রশ্ন থাকবে না। বলা বাহুল্য, শুধু এটুকু বলাতেই সন্ধ্যা বিয়েতে রাজী হ'ল না, তাকে বিশ্বাস করাতে হ'ল যে সে ঘটনার পর থেকে সন্ধ্যার জন্য সঞ্জয় একেবারে উম্মাদপ্রায় হয়ে উঠেছে, সন্ধ্যাকে না পেলে হয়ত ও আত্মহত্যাই করে বসবে। সন্ধ্যার সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা-গুলোই সঞ্জয়ের বউদি বোঝাল সঞ্জয়কে। একটি মেয়ের জীবন-মরণ নির্ভর করছে ওরই উপর একথা শুনেই সঞ্জয় একেবারে কেঁচো হয়ে গেল। আর কোন বাক্যব্যয় না করে সুড় সুড় করে হাজির হ'ল ছাঁদনাতলায়।

এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। কুরূপা সন্ধ্যার মধুর ব্যবহার সবাইকে ভুলিয়ে দিয়েছে তার রূপহীনতার কথা। ওদের দাম্পত্য জীবন দেখে অনেকে ঈর্ষা করে, অনেকে বিস্মিত হয়! অনেকে সুখী হয়। আর সবচেয়ে সুখী হয়েছেন বোধ হয় সঞ্জয়ের মা আর বাবা, বউমা বলতে তাঁরা একেবারে অজ্ঞান।

কিন্তু এ রকম সুখময় পরিণতি হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কাছে এটা ট্র্যাজেডিই রয়ে গেল। বিয়ের পর থেকেই সঞ্জয় অতিরিক্ত রকমের সুবোধ বালক হয়ে পড়ল, ওর সেই স্মার্টনেস, লোক ঠকাবার উৎকট আনন্দ, সেই চটপট সদাসপ্রতিভ ভাব কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। এখন ও মেপে কথা কয়, মেপে হাসে, ভিড় দেখলে পাশ কাটিয়ে চলে যায়, রাস্তায় ঝগড়া দেখলে টিপ্পনী কেটে ঝগড় দেখার বদলে তাড়াতাড়ি গিয়ে মধ্যস্থতা করে, এ ফুট দিয়ে কোন স্বল্পপরিচিতা মেয়েকে যেতে দেখলে ওফুটে গিয়ে ওঠে, দশ বার না তাকিয়ে, একেবারে নিঃসন্দেহ না হয়ে কারু সঙ্গে কথা আরম্ভ করে না। চেহারাতেও ওর পরিবর্ত্তন এসে গেছে। শরীরটা একটু মোটা হয়ে গেছে, চোখের দৃষ্টিটাও কেমন যেন স্থূল হয়ে উঠেছে। আগেকার জীবনের রোমান্স আর রোমাঞ্চের কথা যদি কখনো ওঠে ত ও শুধু সলজ্জ হেসে ঘাড় নেড়ে বলে, "ধোৎ।"

সখ্য-ভক্তির যুগ

শ্রীবিনোবা ভাবে

অনুবাদক—শ্রীজ্যোতির্ময় রায়

কালের আহ্বান

আজ সেপ্টেম্বর মাসের ১৪ তারিখ। গত বৎসর এই দিনে আমি বিহারে প্রবেশ করি। এক বছর পূর্ণ হ'ল। এর মধ্যে বিহারের ভাইদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছে। পরিচয়ও হয়েছে যথেষ্ট। আমি দেখেছি বিহারে প্রচুর শক্তি পড়ে রয়েছে, এই শক্তিকে জাগিয়ে তোলা দরকার।

রাজাদের দিন আজ চলে গেছে, এ কথা আপনারা জানেন। বড় জমিদারদের দিনও আর নাই। ভবিষ্যতের পৃথিবী হবে জনগণের পৃথিবী। সেখানে সাধারণ জনগণের দাবিই মর্যাদা পাবে। আজ সারা দুনিয়ার ক্ষুধা জেগে উঠেছে। আজকার যুগ সমান সম্পর্কের দাবি করছে। এ যুগ সখ্য-ভক্তির যুগ।

সখ্য-ভক্তির উদাহরণ

অর্জ্জুন আর ভগবানের মধ্যে সখ্য-প্রীতির সম্পর্ক ছিল। দু'জনে সমান মর্যাদার সঙ্গে কাজ করতেন। ভগবান জ্ঞানের ভাণ্ডার। অর্জ্জুনের জ্ঞান ছিল সীমাবদ্ধ। তিনি পরাক্রমশালী ছিলেন, কিন্তু তাঁর শক্তিরও সীমা ছিল। ভগবানের শক্তির সীমা ছিল না। তবুও দু'জনের মধ্যে সখ্য ছিল, সম্পর্কে উঁচু-নীচুর ভেদ ছিল না। ভগবানের প্রতি অর্জ্জুনের মনে শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু সম্পর্কে ছোট-বড়র ভাব ছিল না।

অতীতের দাস্য-ভক্তি

এর আগে এক যুগ ছিল, দাস্য-ভক্তির যুগ। সে যুগও খুব ভাল ছিল। ঐ যুগে প্রভু আর সেবকের ভাব চলিত ছিল। প্রভু আর সেবক পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ছিল। তবে প্রভু সেবককে পালন ও পোষণ করত, আর সেবক প্রভুকে ভক্তি করত। সে ছিল হনুমানের যুগ। হনুমান রামকে যে ভক্তি করত তার নাম দাস্য-ভক্তি।

বিকাশের প্রণালী

আজ দুনিয়াতে সখ্য-ভক্তির আকাঙ্ক্ষা খুব বেশী। তার মানে এ নয় যে যাঁরা শ্রদ্ধার পাত্র তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে না, কিন্তু শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে এখন সমমর্য্যাদার সম্পর্ক থাকবে। যখন যুদ্ধের সময় এল অর্জ্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমায় সাহায্য করবেন? তা হলে আমার সারথি হন ও ঘোড়া সামলান। এইরূপে তিনি নিজের পরম পূজ্য ব্যক্তিকে ঘোড়ার পরিচর্য্যা করার কাজ দিয়েছিলেন। এইরূপ তাঁদের মিত্রের সম্পর্ক ছিল।

হনুমানের আমলে সমাজের গড়ন ছিল এইরূপ যে, কিছু শক্তিশালী লোক প্রভু ছিল, আর কিছু সেবাপরায়ণ লোক সেবক ছিল। সেবক আর প্রভুর মধ্যে ভালবাসা ছিল। ঝগড়া ছিল না কিন্তু ঐ সময়ে এই সম্পর্কের এক সীমা ছিল।

রামচন্দ্র ছিলেন রাজা রাম। কৃষ্ণ কিন্তু রাজা ছিলেন না। তিনি ছিলেন গোপাল কৃষ্ণ। বন্ধুই ছিলেন তিনি। আজকের দিনে প্রভু-সেবকের সম্পর্ককে, তা যদি ভালবাসার সম্পর্কও হয়, যথেষ্ট বলে মনে করা হয় না। এর মধ্যে এমন সময়ও এসেছিল যখন প্রভু হয়ে উঠেছিল অত্যাচারী, আর সেবকের মনে প্রভুর প্রতি সম্মানের ভাব ছিল না। আজও প্রভু-সেবকের সম্বন্ধ মধুর হতে পারে, কিন্তু এ যুগের দাবি হ'ল সখ্য-ভক্তির। প্রভু-সেবকের সম্বন্ধ এ যুগের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়।

সেইজন্য আমি যখন দান চাই তখন এ কথা বলি না, "আপনি বড়লোক, প্রভু, আপনি আমাকে দান করুন, আমি আপনার সেবা করব। আমার খুব উপকার হবে।" আমি ত এই বলি যে সকলে ভাই-ভাই। আপনার নিজের সমান ভাগ দিন। দানের অর্থই সমান বিভাগ, সমবণ্টন। শঙ্করাচার্য্য এইরূপ অর্থ করেছেন। এইজন্য একশ' একর থেকে যখন কেউ আমাকে দুই একর দেয় তখন আমি সে দান গ্রহণ করি না। যদি আমি সেবক ভাব থেকে দান চাইতাম ত দুই একরও নিয়ে নিতাম এবং দাতাকে নমস্কার করতাম ও দাতার অনুগ্রহ মেনে নিতাম, কিন্তু আজ আমি সখার সম্পর্ক দাবি করছি। আজকের সমাজ-রচনা এখন সখ্যভাবকেই স্বীকার করে নেবে। গুরু-শিষ্যও আজ একে অপরের মিত্র হবেন। দু'জনে একে অন্যকে ভালবাসবেন। গুরু শিষ্যকে শেখাবেন আর শিষ্যও গুরুকে শেখাবে। যার নিকটে যা আছে তা পরস্পর পরস্পরকে দেবেন এবং একে অন্যের উপকার স্বীকার করবেন। এইরূপে সমান সম্পর্ক মেনে নিয়ে গুরুশিষ্য থাকবেন, মালিক-মজুর থাকবেন, প্রভু-সেবক থাকবেন।

এক সময় ছিল, যখন স্ত্রী স্বামীকে পতিদেবতা বলে মনে করত আর নিজেকে দাসী বলে পরিচয় দিত। সে কাল খারাপ ছিল না, কিন্তু আজ আমরা এক এক পা এগিয়ে গিয়েছি। আজকের পত্নী পতিব্রতা হবে, পতিও হবে পত্নীব্রত। দু'জনে একে অন্যকে দেবতা বলে মনে করবে। যার যোগ্যতা বেশী হবে তার খাতির হবে বেশী। স্বামীর যোগ্যতা বেশী হলে স্ত্রী তার সমাদর করবে, আর স্ত্রীর যোগ্যতা বেশী হলে স্বামী করবে স্ত্রীর সমাদর। এই দু'জনের সম্পর্কের দাম কিন্তু সমান থাকবে। একেই আমি নাম দিয়েছি "সখ্য-ভক্তির যুগ।"

সমাজ-রচনার বুনিয়াদ

কালের দাবি অনুসারে আমাদের সমাজ তৈরি করতে হবে। তার পরে কি করব সে বিচার আজ করছি না। আজ ত এই কথা

বুঝে নেওয়া দরকার যে পুরানো আমলের মূল্য, পূর্ব্বের অনুরূপই, আজ আর টিকবে না। তুলসী-রামায়ণের সময়ে যে মূল্য ছিল আজকের দিনে সে মূল্য আর নাই। ঐ সময়ে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ছিল, কিন্তু আজকের দিনের রামায়ণে কেবল ব্রাহ্মণকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হবে না। যেখানে গুণ থাকবে সেখানে—এই সখ্য-ভক্তির যুগে—তার সমাদর হবে, কিন্তু সম্পর্ক সমান থাকবে।

এ যুগে কারখানাওয়ালা ও মজুর থাকবে। একের বুদ্ধি বেশী থাকবে, অপরের শক্তি বেশী থাকবে। তবে মজুর এ কথা বলবে না যে আপনি মালিক আর আমি আপনার চাকর। এ সম্পর্ক এখন চলবে না। এখন ত দু'জনে শরিক হয়ে যাবে। কারখানা-ওয়ালারও নিজের বুদ্ধির পারিশ্রমিক মিলবে, আর মজুরেরও নিজের শক্তির ঐ পরিমাণই পারিশ্রমিক মিলবে। পারিশ্রমিক সকলের সমান হবে। যেখানে যোগ্যতা হবে সেখানে সমাদর করা হবে, কিন্তু সকলে একে অন্যের মিত্র থাকবে, একে অন্যের সাথী হবে।

আজকের দিনে ভাই-ভাই, গুরু-শিষ্য ও পতি-পত্নীর সম্পর্ক মান অনুসারে তৈরী হবে। এতে করে এক নতুন মাধুর্য্য আসবে। পুরানো কালেও মাধুর্য্য ছিল, কিন্তু সে মাধুর্য্য আজ নষ্ট হয়ে গেছে। পতি মহারাজ খারাপ হয়েছেন, তবুও তাঁকে দেবতাই মনে করা হয়, আর স্ত্রী সাধ্বী হলেও তার দাম নাই। যেখানে সম্পর্কে গলদ ঢুকেছে সেখানে নব যুগের দাবি সামনে এসে পড়েছে।

আজ যদি রামচন্দ্র নিজে পৃথিবীতে এসে রাজা রাম হতে চান ত আমি তাতে রাজি হব না। মহাত্মা গান্ধীও যদি আসেন তবে আমি তাঁকে রাজা গান্ধী করে নেব না, মহাত্মা গান্ধীই রাখব। পুরানো আমলে ভাল রাজাও হয়েছে, কিন্তু তার চাইতে বেশী হয়েছে খারাপ রাজা। ঐ সময়ে প্রজার বিকাশ এক সীমা পর্যন্ত হ'ত, কিন্তু কাল আজ এগিয়ে গেছে।

যে লোক কালের পরিবর্ত্তন অনুসারে কাজ করতে জানে না, সে হেরেও যায়, মারও খায়। লোক যদি স্রোতের অনুকূলে যায়, নাও সাঁতরায় ত সে এগিয়ে যেতে পারে, কিন্তু যদি স্রোতের প্রতিকূলে সে যেতে চায় তা হলে তার কিছু ব্যায়াম ত হবেই, কিন্তু সে এগিয়ে যেতে পারবে না।

তাই লোক যতই বড় হউক না কেন, তার পুরানো মান-মর্য্যাদা, চালচলন, প্রভাব-প্রতিপত্তি এখন চলবে না। আমার কাছে এর দৃষ্টান্তও আছে। পরশুরাম কি মহান্ পুরুষই না ছিলেন! তাঁর শৌর্য্যবীর্য্য ছিল। একুশ বার তিনি পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। তিনি অবতারই ছিলেন, কিন্তু যখন রামচন্দ্রের নতুন অবতার হ'ল, তখন পরশুরামের বুঝে নেওয়া উচিত ছিল যে, নতুন অবতার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তিনি তা বুঝলেন না, আর রামের সঙ্গে বিরোধ করলেন। তাতে তিনি হেরে গেলেন। পরশুরামের মত বলশালী লোকেরও কালের বিরোধিতা যেখানে টিকল না সেখানে দ্বিতীয় কে আর টিকবে? প্রাচীন রীতি ভাল হলেও, নতুন যুগে তাকে ভাল বলে মেনে নেওয়া হয় না।

সকলের সমান অধিকার

আজ কর্ম্মীদের সঙ্গে যখন কথা হয় তখন আমি বলি যে, ষষ্ঠ-ভাগ আমাদের চাই—এ যেন ট্যাক্স আদায় করা হচ্ছে। আমি ত এই কথা বোঝাচ্ছি যে, জমি সম্পত্তি আর উৎপাদনের উপকরণের উপর সকলেরই আজ সমান অধিকার। কালের দাবির কথা যে বলে তাকে লোকে উদ্ধত বলে থাকে। যদি তাকে উদ্ধত বলে মনে কর তবে সে উদ্ধত হয়ে উঠবে। কিন্তু কালের ক্ষুধাকে যদি স্বীকার করে নাও ত সকল দাবিদার নম্র থাকবে, বড়র আদর ছোট করবে।

লোকে বলে আজকাল ছেলেপিলেরা মা বাপের সমাদর করে না। ছেলেমেয়েরা ত ছেলেবেলা থেকেই মায়ের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে কাজ করে। মা যদি বলে যে ওটা চাঁদ, শিশু তা মেনে নেয়। এ কথা সে বলে না যে, দাঁড়াও জিজ্ঞাসাবাদ করে আসি ওটা সত্য-সত্যই চাঁদ কি না। এত শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও লোকে বলে সন্তান মা-বাপকে মানে না। আমি ত এই বলব যে মাতা-পিতা এ যুগকে চিনে নাই। মাতাপিতা শিশুর সঙ্গে সমান সম্পর্ক রেখে চলবে, সমান সম্পর্ক রেখে তাদের ভালবাসবে। তাদের হুকুম করবে না, পরামর্শ দেবে। আজ্ঞা করবে না, পিটবে না। আগে ত মা-বাপ ছেলেমেয়েদের মারত, কিন্তু ভালবাসার সঙ্গে মারত। এ যুগে ও কথা চলবে না। এ কালে মা বলবে, তোমাকে সাজা দেব না, আমি নিজে নিজেকে দণ্ড দেব। আমি না খেয়ে থাকব।

লোকে জিজ্ঞাসা করে, ছেলেপিলেদেরও মারা চলবে না? আমি বলি যে, সন্তানেরা শিশুকাল থেকে আপনাদের উপর শ্রদ্ধা রেখে এসেছে, তাদের মারার কোন কথাই উঠতে পারে না। ভালবাসা ত আজ চাই-ই, তাহাই পর্য্যাপ্ত নহে, সমানে সমান ভালবাসা চাই।

ভূদান আর বিচার-বিপ্লব

সকলেরই নিজের নিজের বিশেষত্ব থাকে। মজুরের বুদ্ধি কম হলেও হৃদয় বড় হতে পারে। কারও জন্য সে জীবন দিয়ে পরিশ্রম করতে পারে। আমাদের বুদ্ধি বেশী, কিন্তু কিছু দুর্ব্বলতাও থাকতে পারে। সকলের মধ্যেই কিছু দুর্ব্বলতা আর কিছু বিশেষত্ব থাকে। এই জন্য সমানে-সমান ভালবাসা হওয়া দরকার। নিছক প্রেম যথেষ্ট নয়। এই দৃষ্টিতে যদি আপনারা ভূদান-যজ্ঞকে দেখেন তবে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা আজকের দিনের দাবি। ভূদান-যজ্ঞ যদি কালের দাবির অনুকূল না হ'ত তবে গরীব লোক আমাকে জমি দিত না, আর বড়লোকদের মধ্যেও কিছু লোক আমাকে বাধা দিত। আর যে লোক জমি দিত তার অনুগ্রহ আমাকে স্বীকার করতে হ'ত। আজ ত আমি প্রত্যেক লোকের নিকট জমি চাইছি, কারণ সবাইকে আমি বলতে চাইছি যে তোমরা জমির মালিক নও। গরীবের ঘরে যদি ষষ্ঠ সন্তান আসে ত সে কি খাবে না? আমীরের ঘরে যদি ষষ্ঠ সন্তান আসে সে কি তাকে ভাগ দেবে না? নিশ্চয়ই দেবে। এই ভাবে আমি সকলের কাছে চাই, আর আমি পাইও অনেক। আমি ত এখন বলি যে যত কৃষক আছে তত দানপত্র

আমার পাওয়া চাই। যখন কোন লোক কালের দাবিকে বুঝতে পারে, ধর্ম্মভাবনাকে জাগিয়ে তোলে, তখন প্রত্যেকেরই এই কথা মেনে নেওয়া কর্ত্তব্যস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এটি এক নূতন বিচারধারা। নিজের থলি থেকে এটা আমি বার করি নাই। কালেরই দাবি পেশ করছি। এই বিচারধারাকে প্রসারিত করার দৃষ্টি নিয়ে আপনারা কাজ করবেন, কেবল জমি পাওয়ার দৃষ্টি নিয়ে নয়।

কোটা—নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ—পূর্ণ করে কাজ হবে না। যখন আপনারা লোকেদের বুঝিয়ে দেবেন যে সখ্য-ভক্তির যুগ এসে গিয়েছে তখন আপনাদের কাজ সফল হবে।*

* মুঙ্গের জেলার কিয়াজোরীতে ভাষণ

আঁখির পূজা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

বুঝি আর রাত পোহাতে
প্রভাত হতে নাইকো দেরি,
আকাশের শুকতারাটি
মলিন সেটি তোমায় হেরি।
তবুও মন মানে না
কেউ জানে না মনের কথা
যদিও বক্ষে রাখি
ভরাই আঁখি
বক্ষে তবু ঘনায় ব্যথা।
এবে মোর বক্ষে আছ
চক্ষে আছ
তাইতে বাঁচি ;
তবু এই আঁখির পূজায়
ঐ প্রতিমায়
প্রসাদ যাচি।
এ যে মোর ঔদরিকের
আর্ত্ত চোখের বুভুক্ষুতা
ভ'রে চোখ উপচে পড়ে
তাই সে ঝরে
মাল্য গাঁথি সেই মুকুতা।
অধরের তীব্র সুধার—
এই বসুধার পাত্র ভরি
ধরা নয়—মাটির সরা—
সেই পসরা মাথায় করি।

সীমা নাই সান্ত্বনা নাই
চাই তবু চাই
হায় রে চাওয়া!
ঘটে যার ধরবে যত
মিলবে তত
তাহার অধিক যায় কি পাওয়া?
তোমার ঐ রূপের শিখায়
নির্নিমিখা
আঁখির তারা,
বাসনার রক্তরাগে
রাত্রি জাগে
তন্দ্রাহারা।
তোমার ঐ চোখের লীলায়—
নিকুম্ভিলার
দহন-দাহ
তোমার ঐ ভ্রূ-ভঙ্গিমার
অপাঙ্গিমায়
যখন চাহ।
সে-চোখের দৃষ্টি দিয়ে
ধিক্‌ধিকিয়ে
তৃষ্ণা জ্বলে—
সরে যাই এলোকেশের
মেঘাবেশের
ছায়ার তলে।

হতাশার বুকভাঙা সে
দীর্ঘশ্বাসের
দগ্ধ ধূমে,
করে তাই এই আরতি
তোমার প্রতি
চোখের মতি
ঐ প্রতিমার বক্ষে চুমে।

মহাসাগরের শিশু

শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

কি করে তৈরি হ'ল এই ভাসন্ত রাস্তা? কোন্ নাবিক কোন্ কারিগরকে দিয়ে এই অতলান্তিক সমুদ্রের বুকে গড়ল একে? লম্বা রাস্তার দু'ধারে লাল ইটের এক সার বাড়ী—রং উঠে ধূসর হয়ে গিয়েছে—টালির ছাদ, ছোট্ট দোকানঘর? আর এই নক্সাকাটা পাথরের মিনার? এই এখানে শুধু খানিকটা সমুদ্রের জল, যদিও কারও বাগান করবার বাসনা ছিল মনে হয়, ভাঙা বোতলের টুকরো বসানো পাঁচিলে ঘেরা—কখনও কখনও দু'একটা মাছ তার উপরে লাফিয়ে ওঠে।

কি করে এরা খাড়া হয়ে রইল ঢেউয়ের আঘাতে অটল হয়ে? আর সঙ্গীবিহীন বার বছরের শিশুটি এই জলপথ বেয়ে অনায়াসে চলে কি করে—যেন কঠিন মাটির ওপর দিয়েই চলেছে? কি করে এসব সম্ভব হ'ল?

সবই যথাসময়ে বলব, যতটুকু আমি বুঝতে পেরেছি। যদি তার পরেও রহস্য রয়ে যায়, আমি নিরুপায়।

যখনই কোনও জাহাজ এদিকে আসত, দিগন্তে তার আভাস পাওয়ার আগেই শিশুর বড্ড ঘুম পেত, আর সমস্ত গ্রামখানা তলিয়ে যেত ঢেউয়ের নীচে। তাই কোনও নাবিক দূরবীন দিয়েও আজ অবধি সে গ্রাম দেখতে পায় নি, তার অস্তিত্বের কথা ভাবতেও পারে নি।

শিশু ভাবত সে-ই বুঝি জগতে একমাত্র ছোট্ট মেয়ে। কিন্তু সে কি জানত যে, সে একটি মেয়ে?

খুব সুন্দর দেখতে ছিল না সে, দাঁতগুলো একটু অসমান, নাকটাও একটু বেশী উঁচু, কিন্তু রংটি ধবধবে সাদা, ছোট্ট দু'একটি তিল তার উপর। ক্ষুদে শরীরে ধূসর, একটু সলজ্জ কিন্তু খুব উজ্জ্বল চোখ দুটি তোমার মধ্যে এক বিস্ময় জাগিয়ে তুলত—কালের মতই প্রাচীন এবং নিবিড় সে বিস্ময়।

সেই গ্রামের একমাত্র পথ বেয়ে যেতে যেতে শিশু ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে চলত, যেন কারও হাল্কা হাতছানির প্রত্যাশা করছে; তেমনিই একটা আভাস, শুধু আভাসই, কারণ আসলে কেউ কোনদিন ঐ হারানো গ্রামে আসতে পারবে না—এলেই ঢেউয়ের তলায় মিলিয়ে যাবে সে গ্রাম।

কি খেয়ে বাঁচত সে? মাছ ধরে ভাবছ বোধ হয়? না, আমার তা মনে হয় না। রান্নাঘরের দেয়াজে থাকত তার খাবার, মাংসও থাকত দু-তিন দিন অন্তর। আলুও থাকত, অন্যান্য আনাজ আর মাঝে মাঝে একটা ডিম। রোজ নতুন নতুন খাবার। যদিও একটা পাত্র থেকে সে রোজ আচার নিয়ে খেত, তবু তা ফুরিয়ে যেত না কখনও, পরিমাণে ঠিক একই থাকত, যেন চিরকালই ঐ একটি দিনের মতই চলবে।

রোজ ভোরে রুটিওয়ালার দোকানে তার জন্যে এক পোয়া পাঁউরুটি কাগজে মোড়া থাকত মার্বেল পাথরের টেবিলের উপর—তার পিছনে কাউকে সে কোনওদিন দেখে নি—কারও হাত নয়, আঙুলও নয় এমন কি।

ভোরবেলা উঠে সে দোকানের সার্সিগুলো খুলে দিত। সমস্ত বাড়ীর পাল্লাগুলো তুলে ভাল করে সেগুলো আটকে দিত জোরালো জোলো হাওয়ার ভয়ে। তার পর কোন কোন রান্নাঘরে গিয়ে উনুন ধরাত, দু'তিনখানা বাড়ীর ছাদের ওপর ধোঁয়া উঠত কুণ্ডলী পাকিয়ে।

শুতে যাবার ঘণ্টাখানেক আগে আবার সে পাল্লাগুলো বন্ধ করে দিত, যেন তা-ই স্বাভাবিক, আর দোকানের করগেট লোহার খড়খড়িগুলো দিত নামিয়ে।

শিশু এ কাজগুলো করত যেন কোন সহজাত প্রবৃত্তির বশে, যেন কোন এক সুদূর প্রেরণা তাকে বলত রোজ এই সব দেখাশুনো করতে। ভাল আবহাওয়া থাকলে সে খোলা জানলা দিয়ে একটুকরো কার্পেট বা কাপড় ঝুলিয়ে দিত শুকোতে, যেন গ্রামে যে লোকজন থাকে, সেটা দেখানো নিতান্তই প্রয়োজন, যত দূর সম্ভব জীবন্ত করে তোলা দরকার।

রাত হলে সে মোমবাতি জ্বালিয়ে বসে সেলাই করত। কয়েকটা বাড়ীতে বিজলী আলোর ব্যবস্থা ছিল, সেগুলো সে বেশ অনায়াসে, সুন্দর ভাবে জ্বালাতে পারত। একবার একটা বাড়ীর সামনে সে এক টুকরো কালো কাপড় ঝুলিয়ে দিয়েছিল। দেখাচ্ছিল বেশ। দু'তিন দিন বাদে তার পর সেটা সে লুকিয়ে ফেলেছিল।

আবার কখনও সে গাঁয়ের জয়ঢাকটা বাজাত, যেন মস্ত কিছু খবর রটনা করতে চায়। তার দারুণ ইচ্ছে হ'ত চীৎকার করে কিছু বলে, যা সমুদ্রের প্রতি কোণায় শোনা যাবে; কিন্তু গলা যেন তার আটকে আসত, স্বর ফুটত না। প্রাণপণ চেষ্টায় তার মুখ আর গলা কালো হয়ে উঠত ডুবে-মরা মানুষের মত। তখন সে ঢাকটা ঠিক জায়গায় রেখে দিত—মণ্ডপের বাঁদিকের কোণে।

ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে শিশু গীর্জার চূড়ায় উঠত, হাজার পায়ের তলায় তার ধাপগুলো গিয়েছে ক্ষয়ে। মনে হ'ত যেন সিঁড়ির সংখ্যা পাঁচ হাজার হবে (আসলে ছিল বিরানব্বইটা)। চূড়ার হলদে ইটের ফাটল দিয়ে আকাশের কয়েক চিল্তে আসত ভিতরে। উপরে উঠে বড় ঘড়িটা দম দিয়ে ঠিক করে দিত সে, যাতে ঘণ্টাগুলো ঠিক সময়ে বাজে।

গীর্জার দালানঘর, উপাসনা-বেদী, নীরব আদেশদান-রত সাধু-সন্তদের প্রস্তর-মূর্তিগুলি, কিটকাট সিধে চেয়ারের সারি—সকল বয়সের সকল মানুষের জন্যে প্রতীক্ষা করে রইত—দেয়ালের গায়ে মিনের

কাজগুলি মলিন হয়ে এসেছে—মলিন হয়েই চলবে—এ সমস্ত শিশুকে ওদিকে টানত, আবার তার ভয়ও জাগাত। কখনও সে ঢুকত না ঐ উঁচু বাড়ীটায়, অবসর সময়ে আধখোলা দরজার ফাঁক উঁকি দিয়ে দিয়ে এক ঝলক দেখে নিত ভয়ে ভয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে।

তার ঘরে একটা তোরঙ্গের মধ্যে সংসারের কাগজপত্র থাকত। 'ডাকার' থেকে, 'রিয়োডে জ্যানীরো' থেকে আর 'হংকং' থেকে পাঠানো ছবির পোষ্টকার্ড। তলায় সই করা থাকত 'চার্লস' কিংবা 'সী. লীডেন্‌স'—ঠিকানায় লেখা থাকত 'ষ্টীনভুর্ড (নর্ড)'। সমুদ্রের শিশু কিছুই জানত না এই চার্লস বা এই ষ্টীনভুর্ডের'।

দেরাজের ভিতর একখানা ফোটোর এলবামও থাকত। একটা ছবি ছিল একটি ছোট্ট মেয়ের—ঠিক সমুদ্রের শিশুরই মত—অনেকক্ষণ ধরে সে সেখানা দেখত আর ভাবত। তার মনে হ'ত যেন ঐ ছবির শিশুটিই সত্যি। হাতে তার একটা লোহার চাকা। শিশু সারা গ্রাম খুঁজে ফিরেছিল অমনি একটা চাকা, পেয়েছিলও এক দিন। কিন্তু যেই সেটা গড়তে গেল, অমনি সেটা সমুদ্রের মধ্যে তলিয়ে গেল।

একখানা ছবিতে শিশু নাবিকের বেশে একজন লোক আর সাজগোজ করা শক্ত চেহারার একজন মহিলার মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল। সমুদ্রের শিশু কখনও কোনও পুরুষ বা মেয়েকে দেখে নি, তাই অনেকক্ষণ নিজেকে প্রশ্ন করেছিল এই সব মানুষের মানে কি --ভেবেছিল অনেক রাত্রে, যখন মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মত হঠাৎ এক নিমেষে কোন কোন জিনিষ পরিষ্কার বোঝা যায়।

রোজ সকালে সে গাঁয়ের পাঠশালায় যেত এক মস্ত কার্ডবোর্ডের খাম বগলে নিয়ে। তার মধ্যে থাকত তার খাতাপত্র, একখানা ব্যাকরণ, একখানা গণিতের বই, একখানা ফরাসী দেশের ইতিহাস আর একখানা ভূগোল। আরও তার কাছে থাকত একখানা ভেষজ-বিজ্ঞানের বই—"সম্পাদক : গাষ্টন বনিয়ে, ভেষজ সমিতির সদস্য, 'সর্ব'-র অধ্যাপক এবং জর্জ দ্য লায়েস, বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি।" বইখানিতে সব রকম গাছগাছড়ার নাম ছিল—উপকারী এবং অপকারী, আর ছিল আটশ' আটানব্বইখানা ছবি।

মুখবন্ধে সে পড়ত : "গ্রীষ্মকালে মাঠ ও বনের ওষধিসমূহ সংগ্রহ করা অত্যন্ত সহজ।..."

আর এই ইতিহাস, ভূগোল, দেশবিদেশ, বড় বড় লোক, পাহাড়, নদী—কেমন করে এসব তাকে বোঝানো যায়—যে জানে না মহাসমুদ্রের জনহীন কোণে ছোট্ট একটি গাঁয়ের নিরালা একটি রাস্তা ছাড়া আর কিছুই? সমুদ্রই কি সে চিনত, সমস্ত মানচিত্রের গায়ে যে সমুদ্র আঁকা দেখত দিনরাত, জানত কি যে সেই সমুদ্রেরই বুকে তার বাস? একবার, একদিন, এক মুহূর্তের জন্যে এটা সম্ভব বলে তার মনে হয়েছিল। তারপরেই মন থেকে এ ভাবনা সে সরিয়ে ফেলে অন্যায়, বিপজ্জনক বলে।

কখনও কখনও সে দু'একখানা চিঠি লিখত নিজের খবর, গাঁয়ের খবর দিয়ে। কারও উদ্দেশেই লিখত না সেগুলো, শেষে ভালবাসাও জানাত না কাউকে, খামের উপর লেখা থাকত না কারও নাম। চিঠি শেষ হয়ে গেলে সে সমুদ্রের জলে ফেলে দিত—দূর করে দেবার জন্যে নয়, সে শুধু জানত যে ঐ তার করা উচিত—অনেকটা ডুবো-জাহাজের নাবিকদের মত, মরিয়া হয়ে যারা বোতলের ভিতর তাদের অন্তিম বার্তা পুরে রেখে দিয়ে যায় ঢেউয়ের বুকে।

ভাসন্ত সেই গ্রামে সময় বলে কিছু ছিল না। শিশুর বয়স চিরকালই বার বছর। বৃথাই সে আয়নার সামনে তার ক্ষুদে শরীরটিকে টান করে ধরবার চেষ্টা করত। শেষে একদিন নিজের ফটোর ঐ চওড়া কপাল আর বেড়াবিনুনির উপর বিরক্ত হয়ে সে সব চুল এলিয়ে দিল পিঠের উপরে—মনে সাধ যদি অদ্ভুত কিছু ঘটে যায়—যদি হঠাৎ সে মস্ত বড় হয়ে যায়! কিংবা যদি সমুদ্রের তলা থেকে ইয়া দাড়িওলা বড় বড় ছাগল তার সামনে এসে দাঁড়ায়! কিন্তু সমুদ্র চিরকালের মতই জনহীন হয়ে রইল, তাকে দেখা দিয়ে গেল শুধু আকাশের খসে-পড়া তারা।

শেষে একদিন ঘটল অদ্ভুত ব্যাপার। যেন ভাগ্যের হঠাৎ মত বদলাল। একটা সত্যিকারের মালের জাহাজ, বুনো কুকুরের মত একরোখা, সমুদ্রের উপর দিয়ে অনায়াসে ভেসে এল—বুকে আঁকা তার সুন্দর একটি রাঙা দাগ সূর্য্যের আলোয় জ্বল্ জ্বল্ করছিল—সত্যি সত্যি, জ্যান্ত একটা মালের জাহাজ ভেসে এল গাঁয়ের সেই সাগরপথ বেয়ে, তবু গ্রামখানা মিলিয়ে গেল না, শিশুরও ঘুম এল না।

তখন ঠিক মধ্যদিন। মালের জাহাজ তার বাঁশী বাজাল, এবার গীর্জ্জার ঘণ্টার শব্দের সঙ্গে মিশে গেল না তার স্বর।

এই প্রথম লোকালয়ের স্বর শুনল শিশু। জানালার ধারে ছুটে এসে সে প্রাণপণে ডাকল, 'ওগো! বাঁচাও!'

কিন্তু নাবিকেরা ফিরেও তাকাল না। একজন খালাসী চুরুট মুখে দিয়ে ওদিকে চেয়ে রইল, যেন কোথাও কিছু নেই। আর সবাই যে যার ধোয়ামোছা করতে লাগল—জাহাজের দু'দিকে সিন্ধুশুশুকেরা পথ করে দিল ত্রস্তব্যস্ত হয়ে।

শিশু তাড়াতাড়ি পথে নেমে এল, জাহাজের পিছু পিছু কিছু দূর গেল, জলের উপরকার চাকার দাগগুলি দু'হাত মেলে জড়িয়ে ধরল, কিন্তু উঠল যখন, তখন চারদিকে শুধু ধূ-ধূ করছে চিরন্তন সমুদ্র, কুমারী সিন্ধু।

বাড়ী ফিরে এসে শিশু সবিস্ময়ে ভেবেছিল কেমন করে সে 'বাঁচাও' বলে ডাকতে পারল! সে ত ওকথা জানত না, শুধু ওর নিগূঢ়তম অর্থই বুঝত। আর এই নিগূঢ় অর্থ তাকে শঙ্কিত করে তুলল। ওরা কি তার ডাক শুনতে পায় নি? তবে কি ওরা কানে শুনতে পায় না? বোবা? না কি ওরা গভীর সমুদ্রের চেয়েও নিষ্ঠুর?

তখন একটি ঢেউ তাকে খুঁজতে এল। এই ঢেউটি ছিল খুব স্বাধীন, এতকাল সে গ্রামের থেকে দূরে দূরেই থাকত। প্রকাণ্ড

ঢেউ, অন্ত সবার চেয়ে বেশী দূরে ছড়িয়ে পড়ল দু'ধারে। মাথার উপরে যেন ফেনার দুটি চোখ—যেন অনেক কিছুই ও দেখতে আর বুঝতে পারে, যদিও সবকিছুতে তার মন সায় দেয় না। যদিও দিনের মধ্যে একশ' বার সে নিজেকে গড়ত আর ভাঙত, তবু ঐ চোখ দুটি ঠিক একই জায়গায় প্রতিবার পরে নিতে ভুলত না। ভারি জীবন্ত দেখাত তাতে। মধ্যে মধ্যে যখন কোন কৌতূহলের জিনিষ চোখে পড়ত, ঢেউটি পুরো এক মিনিট স্থির হয়ে থাকত বাতাসে মাথা তুলে—প্রতি সাত সেকেণ্ড অন্তর যে নিজেকে ভেঙে ফের গড়তে হবে, সেকথা যেন সে ভুলেই যেত।

বহুকাল ধরে এই ঢেউয়ের সাধ ছিল শিশুর জন্যে কিছু করে—কি যে করবে তা ঠিক ভেবে পেত না। এইবার সে মালের জাহাজকে দূরে মিলিয়ে যেতে দেখল, যাকে ফেলে গেল, তার বেদনা সে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝল। এবার সে আর দূরে রইল না, কোন কথা না বলে শিশুকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, যেন হাত ধরে নিয়ে চলেছে।

শিশুর সামনে এসে নতজানু হয়ে সে বসল—ঢেউয়েরা যেমন করে। তারপর পরম শ্রদ্ধাভরে তাকে কোলে করে নিল, একমুহূর্ত্ত চেপে ধরল, যেন মরণের সাহায্য নিয়ে শিশুর দুঃখ সে দূর করে দিতে চায়। শিশুও তার বাসনা বুঝে নিয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে রইল।

কিন্তু সমাপ্তি ঘটল না, তখন সেই ঢেউ শিশুকে আকাশে ছুঁড়ে দিল, যেন সে সাগরপাখীর চেয়ে একটুও বড় নয়, আবার বুকে লুফে নিল, শেষটায় টুটপাখীর ডিমের মত বড় বড় ফেনার মধ্যে তাকে নিয়ে ফেলল।

অবশেষে কিছুতেই কিছু হ'ল না দেখে, শিশুকে কোনমতেই মরণের হাতে সঁপে দিতে পারল না দেখে ঢেউ অজস্র অশ্রু আর ক্ষমা-প্রার্থনায় বিনীত মর্ম্মরধ্বনির মধ্যে শিশুকে তার নিজের বাড়ীতে রেখে এল।

আর ছোট্ট শিশু, একবিন্দু আঁচড়ও লাগেনি তার দেহে, হতাশ মনে আবার জানালার পাল্লা খুলতে আর বন্ধ করতে লাগল দিনের পর দিন—দিগন্তে জাহাজের মাস্তুল দেখা দিলেই মিলিয়ে যেতে লাগল ঘুমের অতলে।

মহাসাগরের নাবিক, যারা জাহাজের রেলিঙে কনুই রেখে স্বপ্ন দেখে, রাতের অন্ধকারে কারও সুন্দর মুখের ছবি বেশীক্ষণ ধরে যেন তোমরা ভেব না! হয়ত তা হলে তোমরা এই জনহীন জায়গায় জন্ম দেবে কোন নিঃসঙ্গ আত্মার—যে অনুভব করতে পারে মানুষেরই মত, কিন্তু বাঁচতে পারে না, মরতে পারে না, ভালবাসতে পারে না—শুধু বেদনা বইতে পারে বাঁচার মত, মরার মত, মরণ-মুহূর্ত্তের মত। সে আত্মা চিরকালের মত অনাথ হয়ে থাকবে এই জলময় নির্জ্জনতার মধ্যে, যেখানে ছিল আমাদের মহাসাগরের শিশু—একদা সে জন্ম নিয়েছিল টীনুভূর্ডের নাবিক চার্লস লীভেনসের মনে, 'লে হার্ডি' জাহাজের বুকে, এক সমুদ্রযাত্রার সময়ে হারিয়ে যাওয়া তার বার বছরের মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে, এক গভীর রাতে, পঞ্চান্ন ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখা আর পঁয়ত্রিশ ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখার সংযোগস্থলে। সুদীর্ঘ সময়ের সেই ভাবনা, অতি নিবিড় সেই ভাবনা চিরকাল শিশুর গভীর বেদনার কারণ হয়ে রইল।*

* জুল্স্ সুপের্ভিয়েইয়ের 'এ চাইল্ড অব দি হাই সীজ' গল্পের অনুবাদ।

পদাবলী

শ্রীসুধীর গুপ্ত

চির-বহমানা দূর যমুনার তীরে,
'পদাবলী'-পথে ঘন-বর্ষণ-দিনে
গাগরী ভরিতে 'রাধা'-মন রস-নীরে
করে অভিসার বাঁশী-সুরে পথ চিনে।
বাজিয়া চলেছে সে বাঁশরী চিরদিন
হৃদয়-যমুনা সিকতায়—সিকতায় ;
সীমারে চাহিয়া ফিরে যেন সীমাহীন ;
গৃহ-বেষ্টনী আলুলিয়া শুধু যায়।

নিশীথ-নিতল বাদল-বরিষা-ধারে,
'সুরধুনী'-তীরে নদীয়ার পথে পথে
'পদাবলী'-গান গুঞ্জরি' বারে বারে
চলি অভিসারী। 'গোরা'র মাধুরী হ'তে
যে 'রাধা'-ভাবের প্লাবন বহিল দেশে,
'পদাবলী'-পথে তারই সুধা-স্বাদ লভি'
মিশাই নিজেরে সেই অসীমেই শেষে।—
নদীয়ায় হেরি যমুনারই জলছবি।

চির-সুরধুনী চির-যমুনার তীরে
নিখিল মনের হাসি আর আঁখ-ধার
রূপ ধরে শুধু যুগে যুগে ফিরে ফিরে :—
'পদাবলী' তারই অভিনব সম্ভার।
শ্রাবণ-ভুবন একাকার-করা ধারা
'পদাবলী'-পথে তাই শুধু টানে মন ;
ছোট বড় পথ এ পথে হয়েছে হারা,
অশেষে গড়েছে সুধার বৃন্দাবন।

ভারতের অনুন্নতদের সমস্যা ও উহার সমাধান

ব্রহ্মচারী রমেশ

আমাদের সমাজের বুকে এক শ্রেণীর মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া অবহেলিত জীবন যাপন করিয়া আসিতেছে। ইহারা ভারতের আদিবাসী ও তপশীলীভুক্ত হিন্দু। ১৯৫১ সনের আদমশুমারি অনুসারে সমগ্র ভারতের জনসংখ্যা ৩৫ কোটি ৬৭ লক্ষ। তন্মধ্যে আদিবাসী ১ কোটি ৯১ লক্ষ এবং তপশীলীভুক্ত বা অনগ্রসর সম্প্রদায় ৫ কোটি ১৩ লক্ষ। অর্থাৎ, প্রতি সহস্র মানুষের মধ্যে ৫৪ জন আদিবাসী এবং ১৪৪ জন তপশীলীভুক্ত অনগ্রসর সম্প্রদায়। ভারতের বিরাট জনবলের এই অংশটি উপেক্ষণীয় নহে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে জীবনযাত্রার মান অনুসারে সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার সহিত ইহাদের তুলনামূলক পরিসংখ্যান পর্য্যালোচনা করিলে বিষয়টির গুরুত্ব সহজে অনুমান করা যায় :

	সমগ্র জনসংখ্যা	আদিবাসী বা উপজাতি	তপশীলীভুক্ত অনগ্রসর হিন্দু
গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী	২৯ কোটি ৭৮ লক্ষ	১ কোটি ৮৬ লক্ষ	৪ কোটি ৬২ লক্ষ
শহর অঞ্চলের ,,	৬ ,, ১৮ ,,	৫ ,,	৭১ ,,
কৃষিজীবী	২৪ ,, ৯১ ,,	১ ,, ৭৩ ,,	৩ ,, ৮১ ,,
অকৃষিজীবী	১০ ,, ৭৬ ,,	১৮ ,,	১ ,, ৩২ ,,
জমির মালিক কৃষিজীবী	১৬ ,, ৭৪ ,,	১ ,, ২৫ ,,	১ ,, ৭৪ ,,
পোষ্যসহ ক্ষেত মজুর	৮ ,, ৪৮ ,,	২৮ ,,	৫৬ ,,
কৃষি-খাজনা গ্রহণকারী অকৃষিজীবী পোষ্যসহ জমির মালিক	৫৩ ,,	১ ,,	৩ ,,
কৃষি ছাড়া অন্যান্য উৎপাদনকারী	৩ ,, ৭৭ ,,	৭ ,,	৫৩ ,,
বাণিজ্যজীবী	২ ,, ১৩ ,,	১ ,,	৯ ,,
অন্যান্য	৪ ,, ৩০ ,,	৯ ,,	৬৪ ,,

ইহা হইতে সমাজের চিন্তাশীল সমাজসেবকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদের অতি নিকট-প্রতিবেশী এই অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষগুলি জাতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ; ইহারা আমাদের জাতীয় জীবনকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার পক্ষে অপরিহার্য্য অঙ্গ।

প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, ভারতের স্বাধীনতা-সংরক্ষণ-ক্ষেত্রে এই অনগ্রসর সম্প্রদায়ের দান অতুলনীয়। মহারাণা প্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজী প্রমুখ স্বাধীনতা-সংগ্রামের অমর বীরগণ এই অনগ্রসর সমাজের বিশেষ সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গণে এই অনুন্নত সমাজের যে শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী আমরা পাঠ করি তাহাতে ইহাদের স্বাধীনতা-প্রীতির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতে হয়। বর্ত্তমান যুগেও আমরা দেখি শোষক ও অত্যাচারী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করিয়া রাঁচির মুণ্ডাবীর বীরসা ভগবান মুণ্ডাদের মধ্যে স্বাধীনতা-স্পৃহা জাগ্রত রাখিয়াছেন। ভীলনেতা মোতীলাল তেজাবতের জীবন-কাহিনী স্বাধীনতালাভের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়।

১৯২২ সনে শ্রীরামরাজার নেতৃত্বে কোণ্ডাডোরাগণ ব্রিটিশের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিলেন। শ্রীরামরাজা ভারতের স্বাধীনত-সংগ্রামের অমর শহীদ। ইহা ছাড়া তীরত সিং, রাণী গুইদালো, নেতা নির্ম্মল কাছাড়ী, নেতা মধুবন, কমলা গিরি প্রভৃতির ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং স্বাধীনতালাভের জন্য ঐকান্তিক নিষ্ঠার কথা আজ বিশেষভাবে স্মরণীয়।

কিন্তু এই সাত কোটি নরনারীর জীবনের মান এতই অনুন্নত যে, তাহা ভারতের জাতীয় জীবনের অগ্রগতিকে ব্যাহত করিতেছে। ভারত সরকারের তপশীলী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়ন বিভাগের কমিশনার শ্রীএল. এম. শ্রীকান্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত ১৯৫১-৫২ সনের তথ্যগুলি অনুধাবন করিলে দেখা যায়, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অস্পৃশ্যতা অনাচরণীয়তা ও এই অনগ্রসর সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার এখনও নানা স্থানে প্রকট রহিয়াছে। বহু স্থানের বর্ণহিন্দুগণ 'তথাকথিত নিম্নবর্ণের স্পর্শ ও সান্নিধ্য দূষণীয়'—এই সংস্কার হইতে মুক্ত হইতে পারেন

নাই। বহু স্থানে ধর্ম্মস্থান, উৎসবক্ষেত্র, বিদ্যায়তন, প্রভৃতিতে এবং কূপোদক ব্যবহার করতে গিয়ে তপশীলী নরনারী নানা ভাবে উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া থাকেন। ইহাও জানা গিয়াছে যে, কোন কোন স্থানে বর্ণহিন্দুগণের দৌরাত্ম্যে নিম্নবর্ণের নারীরা অলঙ্কারাদিতে সজ্জিত হইবার সাহস করে না। শ্রীশ্রীকান্তের রিপোর্টের এক স্থানে বলা হইয়াছে :

"In the villages, however, it can not be said that the social disabilities have completely faded out as the social customs are deep-rooted and cannot be done away within a short space of time. So far as access to shops, public restaurants, and places of public entertainment and the use of wells, tanks, bathing ghats, roads, etc., are concerned, except for a few advanced and enlightened Harijans, the majority of the Harijans are still afraid of making free use of public institutions. They fear that any claim of right on their part would wound the feelings of the Caste Hindus on whom they are depending for their livelihood. Religious institutions in villages continue to be used by the Caste Hindus only."

প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে এইরূপ বৈষম্যমূলক প্রথা অশোভন ও লজ্জাকর। ঐ সকল সামাজিক বৈষম্য ও অবিচারের জন্যই আমাদের জাতীয় জীবনের অভ্যুদয় ও সাংস্কৃতিক গৌরব ক্ষুণ্ণ হইতেছে। ফলে আমরা ক্ষয়িষ্ণু হইয়া পড়িতেছি। যুগ-যুগব্যাপী এই সামাজিক দুর্বলতার ফলে আমাদের সমাজের একটি বিরাট অংশ বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সমাজের কুক্ষিগত হইয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে হীনবল করিয়া দিতেছে। যে সকল আদিবাসী ও তপশীলী হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে উদ্বুদ্ধ হয় তাহারা বহুলপ্রচারিত নবধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগবশতঃ উহা গ্রহণ করে না; বস্তুতঃ আর্থিক সুখ-সুবিধা ও জীবনযাত্রাকে সহজ ও সুখকর করিবার জন্য প্রলুব্ধ হইয়া তাহারা ভিন্নধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

আবার কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দুরবস্থায় পড়িয়া অনুন্নত-গণ আমাদের সমাজ হইতে যে দূরে সরিয়া যাইতেছে তাহা নহে, সামাজিক অবিচার ও উচ্চবর্ণের ধর্ম্মান্ধতা এক্ষেত্রে অনেকাংশে দায়ী। এই বিষয়ে একটি উদাহরণ দিতেছি : বরিশাল জেলার কোনও বৈদ্যপ্রধান গ্রামের মধ্য দিয়া এক দিন এক গ্রাজুয়েট নমঃশূদ্র যুবক জুতা পায়ে ও ছাতা মাথায় দিয়া যাইতেছে দেখিয়া ছোট লোকের স্পর্দ্ধায় ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়া স্থানীয় স্কুলের হেডমাষ্টার তাহাকে লক্ষ্য করিয়া হাতের গাড়ু ছুঁড়িয়া মারিয়াছিলেন। গাড়ু লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেও রসনার কটুবাক্য যুবকের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়াছিল। পর-দিবসই উক্ত শিক্ষিত যুবকটি স্থানীয় খ্রীষ্টান মিশনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজ ত্যাগ করেন এবং এক শত শিক্ষিত হিন্দু যুবককে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষাদানের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

ঝাড়গ্রামে সরকারী উন্নয়ন বিভাগের কর্ম্মিগণসহ স্বামী আত্মানন্দজী

মাদ্রাজ প্রদেশে হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ প্রচার করিবার সময় আমরা লক্ষ্য করিয়াছি—বর্ণহিন্দুগণের বাড়ী পরিষ্কার করিতে আসিবার সময় মেথর ঘণ্টা বাজাইয়া তাহার আগমনবার্ত্তা প্রচার করিয়া আসে; তখন বর্ণহিন্দুগণ তথাকথিত অস্পৃশ্য-গণের মুখাবলোকন রূপ মহাপাতক হইতে অব্যাহতিলাভের জন্য গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। গুজরাট প্রদেশের দুর্ভিক্ষে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সেবাকার্য্য পরিচালনা করিবার সময় আমরা দেখিয়াছি— উচ্চবর্ণের হিন্দুর জলাশয়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুর গৃহপালিত পশুরও জলপান করিবার অধিকার নাই!

আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ কিরূপ অর্থ-নৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্য ও সামাজিক অবিচারের মধ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে তাহা সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। বাঁকুড়ায় রাণীবাঁধ একটি অনগ্রসর সম্প্রদায়-অধ্যুষিত অঞ্চল। উক্ত অঞ্চলে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সেবাকার্য্যরত জনৈক প্রচারক সম্প্রতি একখানি পত্রে তথাকার উপজাতি সম্প্রদায়ের যে চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। উহা হইতে সহজে অনুমান করা যাইবে যে, ঐ সকল অবহেলিত নরনারী কিরূপ দুঃখময় জীবন যাপন করিতেছে। পত্রখানি এই :

"...আমরা জুলাই মাস (১৯৫৩) হইতে এখানে সাঁওতালদের ভিতর কাজ আরম্ভ করিয়াছি। এই অনুন্নত সম্প্রদায়টি সাধারণতঃ অশিক্ষিত। ইহাদের ভিতর ঐক্য সখ্য স্থাপন করিয়া সদাচার, নিষ্ঠা ও ভারতীয় ভাবধারাসমূহ প্রচার করিবার পর ইঁহারা কিছু

আলোকের সন্ধান পাইবে বলিয়া আশা করি। সঙ্ঘনেতার প্রদর্শিত পথে ইহাদিগের ভিতর নৈতিক জীবন গঠনের শিক্ষা, চরিত্র গঠনের প্রেরণা, শারীরিক ও মানসিক উন্নতির প্রচেষ্টা, শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি ব্যাপক ভাবে প্রচার করিতে হইবে। আর একটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, ইহাদের অর্থনৈতিক জীবন নিতান্ত অনগ্রসর। দুঃখদারিদ্র্য, অর্থকষ্টের ভিতর ইহারা অশেষ ক্লেশ সহ্য করে। আমরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য পীড়ার

আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে বৈদিক যজ্ঞাদি ধর্মানুষ্ঠান প্রবর্তন
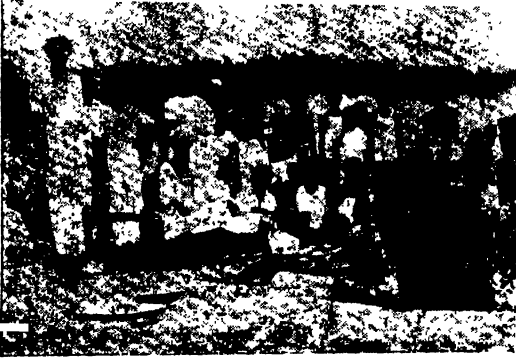
ঔষধ বিতরণ করিতেছি। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকগণ ইহাদের বাড়ী বাড়ী যাইয়া ইহাদের অভাব অভিযোগের কথা শুনিয়া তাহাদের প্রয়োজনীয় সাহায্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতেছে। অধিকাংশ বাড়ীতে শীত নিবারণের বস্ত্রাদি নাই। পৌষ মাঘ মাসের শীতে তাহারা খেজুর পাতার চাটাই মোড়া দিয়া কোন প্রকারে রাত্রি কাটাইয়া দেয়। মশারি ইহাদের কল্পনার বস্তু। মশার কামড় এড়াইবার জন্য ইহারা সমস্ত শরীরে নিম বা ঐ জাতীয় তৈল মাখিয়া ঘুমায়। আমরা সাঁওতাল বালকদের শিক্ষার জন্য একটি অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় খুলিয়াছি। বর্তমানে ৬০টি ছেলে পড়াশুনা করে। ইহাদের অনেকের পরনে কাপড় নাই। অধিকাংশ ছেলেই কৌপীন পরিয়া পড়িতে আসে। এই প্রকৃতির কোলে বর্দ্ধিত মানবশিশুগুলি আরও কতকাল দূরে সরিয়া থাকিবে তাহা বলা কষ্টকর। আমাদের প্রগতিশীল সমাজের বুকে ইহারা কিরূপ দুঃখের জীবন যাপন করে আজ আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি।"

অনুন্নতগণের প্রতি আমাদের সামাজিক অবিচার ও তাহাদের অর্থনৈতিক দুর্ব্বলতার সুযোগে বৈদেশিকগণ কিভাবে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছে তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন। স্বাধীন ভারতে জাতীয় কল্যাণকামী ব্যক্তিগণের এই বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক। এখানে খ্রীষ্টান প্রচারকগণের প্রচারকৌশলে তাহাদের সমাজ কিরূপ পরিপুষ্টিলাভ করিতেছে তাহা আমরা উল্লেখ করিতেছি। বর্ত্তমানে ভারতে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য সাত হাজার খ্রীষ্টান প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। অন্যূন ৭ হাজার দেশীয় পাদ্রী ও ১৮ হাজার শ্বেতাঙ্গ পাদ্রী প্রচারকার্য্যে নিয়োজিত আছেন। উহাতে বাৎসরিক ৮ কোটি পাউণ্ড ব্যয় হয়। তাহা ছাড়া ৭১৭টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, ১৪১টি অনাথালয়, ১৭০টি শিল্প-বিদ্যাপীঠ, ৯৪টি প্রচারক শিক্ষাগার, ১৫ হাজারেরও অধিক রবিবারের স্কুল, ১৮টি কৃষি-বিদ্যালয়, ৫০টি কলেজ, ৪৩টি ছাপাখানা, ৯৯টি সাময়িক পত্রিকা, ৪০০টি দাতব্য চিকিৎসালয় খ্রীষ্টান মিশনরীদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু ২৩ কোটি হিন্দুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবনের মান উন্নয়নমূলক সেরূপ সুপরিকল্পিত ব্যাপক আয়োজন কোথায় ?

যদি কোন সমাজের নর-নারী কর্ম্মক্ষম, সুস্থ এবং সুরক্ষিত ও সঙ্ঘবদ্ধ না হয় তবে তাহার বিরাট জনবল লইয়া গর্ব্ব করা বৃথা! একটি জাতির শক্তি শুধু বিপুল জনসংখ্যার উপর নির্ভরশীল নহে। সমাজের কত সংখ্যক মানুষ স্বাবলম্বী, শিক্ষিত এবং জাতি তথা মানব-সমাজের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে কর্ম্ম করিতে সচেষ্ট তাহাই একটি সমাজের প্রকৃত শক্তি নির্দ্দেশ করে। সমাজ ও ধর্ম্মের বাহ্যিক আচরণে দিশাহারা হইয়া আমরা আমাদের সমাজের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গকে যুগ যুগ ধরিয়া অবজ্ঞাত হইতে দিয়াছি। এই অবহেলিত জনসমষ্টি আমাদের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতেছে।

আজ যান্ত্রিক সভ্যতার চরম উৎকর্ষের যুগে বৈষয়িক উন্নতি ও রাজনৈতিক সচেতনতার দিক দিয়া ভারত আশানুরূপ অগ্রসর নহে। কাজেই আমাদের সমাজের সর্ব্বাধিক অনগ্রসর শ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অযোগ্যতার কথা আজ বিশেষভাবে চিন্তার বিষয়। এই সংখ্যালঘিষ্ঠ অবজ্ঞাতদের উন্নতির প্রচেষ্টা যথোচিতভাবে করা হইলে উচ্চবর্গের মানুষের অগ্রগতির পথ সুগম হইবে। এইভাবে একটি সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সম্ভব। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, "আজ আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে যে সামাজিক ন্যায়-বিচার, সমাজ-কল্যাণ, ও সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামই আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে অনুন্নত শ্রেণীসমস্যার উদার ও ন্যায়সঙ্গত সমাধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হইবে।"

রাজনৈতিক সংগঠনে ও সমাজ-ব্যবস্থায় অবজ্ঞাত বা অবহেলিত কোন বর্ণ বা জাতি থাকিবে না বলিয়া ভারতের নব-রচিত সংবিধানে উল্লিখিত হইয়াছে। তাই সকলকে সমান অধিকার, সমান সুযোগ দিয়া এক সার্ব্বভৌম ভারতরাষ্ট্র গঠনের জন্য আজ আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে

হইবে। নূতন সংবিধান অনুসারে আদিবাসী ও তপশীলী সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য নানাবিধ পন্থা আলোচিত হইতেছে। অস্পৃশ্যতা অনাচরণীয়তাকে আইনতঃ দণ্ডনীয় বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে; কিন্তু আইনের দ্বারা কোন সার্ব্বজনীন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় যদি বলিষ্ঠ জনমত গঠিত না হয়। প্রকৃত জনমত সুদৃঢ়ভাবে গঠিত হইলে রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী পাণ্ডাগণ সন্ত বিনোবাজীকে অপমানিত করিতে পারিত না। আশার কথা, বর্ত্তমানে ভারত-সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নয়নকল্পে বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়াছেন। এগার জন সদস্য লইয়া কাকা কালেলকরের সভাপতিত্বে অনুন্নত উন্নয়ন কমিশন গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা ভারতের অনগ্রসর সমাজের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ-কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন, বিশেষভাবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতায় অনুন্নত-উন্নয়ন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ তাঁহার ধ্যানলব্ধ সত্যদৃষ্টির ফলে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে এই সকল অনুন্নত জনগণের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি না হইলে জাতি বলিষ্ঠ হইয়া গড়িয়া উঠিবে না। তিনি তাঁহার প্রজ্ঞালোকিত প্রতিভার দ্বারা জাতির প্রকৃত কল্যাণের পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন, "উচ্চবর্ণের বালক-বালিকাদের সহিত নিম্নবর্ণের বালক-বালিকাদেরও শিক্ষার সুযোগ সমানভাবে দেওয়া উচিত। একই ছাত্রাবাসে উভয় সম্প্রদায়ের স্থান দান করিতে হইবে। তাহা হইলে উচ্চবর্ণের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আচরণের সহিত তাহাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিবে এবং তাহাদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হইতে মুক্ত হইবার সুযোগ মিলিবে।" তাই তিনি সঙ্ঘের পরিচালিত ছাত্রাবাস ও বিদ্যালয়সমূহে সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীকে সমান সুযোগ দান করিয়া গিয়াছেন। কেবলমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রে নহে, ধর্ম্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও অনুন্নত শ্রেণীর সর্ব্বাধিক কল্যাণের বিষয় তিনি গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছেন। হিন্দু ধর্ম্মের মহান্ আদর্শ ও উদারতা সম্বন্ধে তাহাদের সম্যক্ পরিচয়সাধনের জন্য তিনি সঙ্ঘের প্রচারকমণ্ডলী প্রেরণ করিয়া তাহাদের ভিতর ধর্ম্মীয় জাগরণ আনিয়াছেন এবং সামাজিক অযোগ্যতার অজুহাতে তাহারা যে অস্পৃশ্য নয় তাহা ব্যাপকভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে স্বামীজী তাঁহার হাতে গড়া ত্যাগব্রতী সঙ্ঘকর্ম্মী ও সন্ন্যাসিগণকে কর্ম্মনির্দ্দেশ দান করিবার সময় যে সমস্ত পত্রাদি লিখিতেন তাহাতে দেখা যায় যে ঐ সকল অনুন্নত শ্রেণীর মঙ্গলের জন্য তাঁহার চিন্তাধারা ছিল সুস্পষ্ট। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বামীজী মাদারীপুর হইতে জনৈক সঙ্ঘ-সন্তানকে লিখিয়াছিলেন: "তোমাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে হীন অন্ত্যজ ও পতিত

বৃন্দাবনপুর [ঝাড়গ্রাম] আদিবাসী সম্মেলনে সাঁওতালদের তীর ছোঁড়া প্রতিযোগিতা

জাতির ভিতরে যদি কোনরূপ ধর্ম্মের উদ্দীপনা আনয়ন করিতে পার তবে তোমাদের যত্নের সফলতা হইবে। এই নিঃস্বার্থ কর্ম্মের ভিতর দিয়া প্রসুপ্ত শক্তির উদ্বোধন, অবিকশিত অপ্রকাশিত শক্তির বিকাশ প্রকাশ হইয়া তোমাদিগকে ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্য্যের পথে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। আজ তোমরা হীন অন্ত্যজকে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য, পতিতকে উদ্ধারের জন্য মহাব্রতে ব্রতী হইয়াছ।"

অনুন্নতদের উন্নয়নকল্পে স্বামীজীর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গী, অনন্যসাধারণ কর্ম্মপ্রবাহ, ব্যাপক ও সুপরিকল্পিত প্রচার-কৌশল জাতিকে ভেদভাব হইতে বিমুক্ত করিয়া মহামিলনের পথে ব্রতী করিবে। উচ্চ-নীচের মধ্যে একটি যুগোপযোগী সাংস্কৃতিক সমতা আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু—বিশেষতঃ তথাকথিত অনুন্নতবর্গের মধ্যে হিন্দু-মিলন-মন্দিররূপ বিশাল মিলন-পাদপীঠ প্রতিষ্ঠার সূচনা করিয়া গিয়াছেন। এই গঠনমূলক কর্ম্মপন্থার মাধ্যমে জাতির জাগরণ সম্ভব। জনগণের মানসিক পরিবর্ত্তন ব্যতীত সমাজদেহ হইতে সর্ব্বনাশা ভেদনীতি বিদূরণ ও বৈষম্যরূপ দূষিত ক্ষত নিরাময় হওয়া সম্ভব নহে। সেজন্য চাই নিরবচ্ছিন্ন প্রচার। একটি হৃদয়গ্রাহী ও সর্ব্ববাদি-সম্মত উচ্চ আদর্শ নিয়মিতভাবে দিনের পর দিন আলোচনা করিয়া শুনাইলে জনগণের অন্তরে উহা গভীরভাবে রেখাপাত করে। ঐ প্রচারিত আদর্শকে যদি সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মধারার ভিতর বাস্তব রূপ দান করা যায় তবে স্থায়ীভাবে উহা মানসিক পরিবর্ত্তনসাধন করিতে সমর্থ হয়। সার্দ্ধ চারি শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এক অভিনব পন্থার অতি দ্রুত ও

স্বাভাবিকভাবে হিন্দু সমাজের উচ্চ-নীচের মধ্যে সাংস্কৃতিক সমতা আনয়নপূর্ব্বক আপামর সাধারণকে অস্পৃশ্যতা, অনাচরণীয়তা পাপ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগের প্রয়োজনে আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজীও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মিলন-মন্দির আন্দোলনের ভিতর দিয়া জাতির জীবনে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছেন। উক্ত মিলন-মন্দিরসমূহের

মহালী বালক-বালিকা

সাপ্তাহিক ও পার্ব্বাহিক অধিবেশনে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর সমান অধিকার আছে। সমবেত ভজন-কীর্ত্তন, প্রার্থনা, সন্ধ্যা-উপাসনা, বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে সমবেত অঞ্জলিপ্রদান, প্রসাদ-গ্রহণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া স্বামীজী সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুকে সমদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন এবং সকলকে সমভাবে আচরণের সুযোগ-সুবিধা দান করিয়া গিয়াছেন। উক্ত মিলন-মন্দিরের মাধ্যমে অস্পৃশ্যতা, অনাচরণীয়তার কুফলসমূহ্ আলোচনা, মাদক বর্জ্জনের উপদেশদান, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী, উপনিষদ প্রভৃতি পঠন-পাঠন, ছায়া-চিত্র যোগে নৈতিক শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি গঠনমূলক কার্য্যাবলী পরিচালিত হইতেছে। এই সকল অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের দ্বারা হিন্দুত্বের উদার মহান্ ভাবধারা এবং হিন্দু সমাজের সনাতন আদর্শ জনগণের হৃদয়ে গভীরভাবে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইতেছে। মিলন-মন্দিরের কার্য্যাবলীর মধ্যে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষবিধানের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের ভিতর শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্য-উন্নয়ন ও আর্থিক মান উন্নততর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম্মধারা আরোপিত হইয়া থাকে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ আজ অনগ্রসর শ্রেণীর সর্ব্বপ্রকার উন্নতিবিধানে মনোনিবেশ করিয়াছে। ইতিমধ্যে সঙ্ঘের পরিচালনায় আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নয়নকল্পে নয়টি কেন্দ্র পরিচালিত হইতেছে। প্রতিটি কেন্দ্রে আদর্শ ছাত্রাবাস, অবৈতনিক পাঠাগার, নৈশ-বিদ্যালয়, ব্যায়ামাগার স্থাপন করা হইয়াছে।

অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নয়নকল্পে গঠনমূলক কর্ম্মধারার একটি মাত্র দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। অনগ্রসর সমাজের সমস্যা-সমাধানে যেমন চরিত্রগঠনের উপযোগী আদর্শ শিক্ষা, স্বাস্থ্য-উন্নয়ন, অনুকূল মনোবৃত্তি গঠনের জন্য সাংস্কৃতিক ভাবধারার উৎকর্ষবিধান আবশ্যক তেমনি তাহাদের অর্থনৈতিক জীবনের মানকে উন্নত এবং তাহাদিগকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যোগ্য অধিকার দান করার জন্য উপযুক্ত সংস্কারসাধন আজ বিশেষভাবে প্রয়োজন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ-পরিচালিত বিভিন্ন 'অনুন্নত উন্নয়ন কেন্দ্রে' কার্য্য করিবার সময় আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, অনগ্রসর সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ভূমিহীন। জীবিকার জন্য তাহাদিগকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। আবার বহু ক্ষেত্রে জমির মালিকগণ এই সকল সরলহৃদয় অনুন্নতগণকে নানাভাবে প্রতারিত করিয়া থাকেন। জনৈক প্রাচীন আদিবাসী মোড়লের নিকট শুনিয়াছি—জমির মালিকগণ অভাবের সময় চুক্তিতে তাহাদিগকে ধান্যাদি ফসল কর্জ্জ দিত। দেওয়ার সময় তাঁহারা যে ওজন দিতেন গ্রহণের সময় তদপেক্ষা বেশী ওজনের বাটখারা ব্যবহার করিতেন। বৈষয়িক নীতিতে অনভিজ্ঞ আদিবাসিগণ এই কারসাজির কিছু বুঝিতে পারিত না। ফলে তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িত

ঝাড়গ্রামে সঙ্ঘের একটি কেন্দ্র আছে। সেই অঞ্চলে লোধা নামে একটি অনুন্নত শ্রেণীর বাস। সমগ্র বাংলায় লোধার সংখ্যা আট হাজার; তন্মধ্যে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়খণ্ড অঞ্চলেই ছয় হাজার। ইহাদের আর্থিক অবস্থা অতীব শোচনীয়। ইহারা মেদিনীপুরের আদিবাসী। জীবিকার জন্য ইহারা নরহত্যাদি করিত। ব্রিটিশ সরকার ইহাদিগকে স্বভাবদুর্বৃত্ত আখ্যা (Criminal Tribes) দিয়াছিলেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ হইতে এই লোধা নামক আদিবাসীদের ভিতর উন্নয়নমূলক কর্ম্মপন্থা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। তাহাদের পানীয় জলের অভাব দূরীকরণের জন্য কূপ খনন, শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন এবং কৃষিকার্য্যাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহের সুযোগ দেওয়া হইতেছে।

ভূমিসমস্যা সমাধানই অনগ্রসর শ্রেণীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান উপায়। ভূমিহীন অনুন্নত সমাজ যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহাদের জীবিকার্জ্জনের পথ সুগম করিতে পারে, সেইজন্য চাই কুটীর-শিল্পের ব্যাপক প্রসার। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ঔদ্যোগিক শিক্ষার (Basic Training) প্রসারের জন্য সরকার বহু অর্থ ব্যয় করিতেছেন। এই শিক্ষা কেবলমাত্র হাতেকলমে কাজ শিখাইবার ভিতর সীমাবদ্ধ

থাকে তবে উহাতে জনগণের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব হয়। জীবিকার্জনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে মানসিক উন্নতিবিধানের ব্যবস্থা থাকে তাহারও কার্য্যপদ্ধতি থাকা বিশেষ প্রয়োজন। ভারত সরকারের অনগ্রসর শ্রেণীর কমিশনার তাঁহার প্রকাশিত রিপোর্টে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের জন্য কুটীর-শিল্প প্রসারের সুপারিশ করিয়াছেন। সুখের বিষয়, সরকার এই কার্য্যে বিশেষভাবে আগ্রহশীল।

একটি লোধা পরিবার

বাংলাদেশে আদিবাসী ও অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দু ব্যতীত আর একটি সম্প্রদায় অবহেলিত জীবনযাপন করে। তাহারা বাংলার পটুয়া। বাংলার পটশিল্প একদা ছিল জগদ্বিখ্যাত। এই বিখ্যাত শিল্পটির সংরক্ষণ করা আজ বিশেষ প্রয়োজন। পটুয়াদের এক অদ্ভুত সামাজিক জীবন যাপন করিতে হয়। ইহারা বেশভূষা আচার-আচরণ প্রভৃতিতে হিন্দু রীতিনীতি-সমূহ অনুসরণ করে; ইহারা হিন্দু-দেবদেবীর পূজা করে, হিন্দু-দেবদেবীর চিত্রাদি অঙ্কিত করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। হিন্দুর বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ ইহারা পালন করে; কিন্তু বিবাহ ও পারলৌকিক অনুষ্ঠানের সময় মুসলমান মৌলবীর আশ্রয় গ্রহণ করে। হিন্দু পুরোহিতগণ ইহাদের এই দুইটি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন না। সামাজিক অযোগ্যতার অজুহাতে ইহারা দুইটি বিষয়ে অপাংক্তেয়। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ হইতে এই শ্রেণীটির উন্নয়নমূলক কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। চিত্রকরগণকে শুদ্ধি করিয়া অন্যান্য উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের সমপর্য্যায়ে আনয়নের জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। উহারা যে আমাদের সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ তাহা বর্ণহিন্দুর সমাজপতিগণকে বুঝাইয়া দিয়া যাহাতে তাঁহারা উহাদিগকে সমমর্য্যাদা দান করেন এবং শিক্ষায় সমৃদ্ধিতে তাহাদিগকে অন্যান্য স্তরের নাগরিকগণের সমপর্য্যায়ে উন্নীত করিবার জন্য সহযোগিতা করেন সেই বিষয়ে সঙ্ঘ হইতে প্রচারকার্য্য চালানো হইতেছে। এই চিত্রকর সম্প্রদায়টির

একটি বর্ষীয়সী লোধা স্ত্রীলোক

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তাহাদের জাতীয় বৃত্তিটিকে উজ্জীবিত করিয়া রাখা দরকার। এই বিষয়ে আমরা জাতীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

সরকার অনগ্রসর সমাজের কল্যাণের জন্য অর্থব্যয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কোন কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ইহাতে সহযোগিতা করিতেছেন। কিন্তু এই বিরাট সমস্যা সমাধানের জন্য শুধু এই প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়। এই উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করা দেশের যুবশক্তির আজ বিশেষ প্রয়োজন। দেশের যুবক ও ছাত্র-সংগঠনই জাতীয় অভ্যুদয়ের প্রতীক; আজ স্বাধীন ভারতকে জগতের বুকে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহাদের কর্ত্তব্য—সরকার তথা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করা।

গান

সিন্ধু—কাওয়ালী

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল

দুঃখ রূপে হৃদয়-দুয়ারে
ডাক দিল কে—ডাক দিল কে
তাঁহারে ও তোর সকল পরাণ
সঁপিয়া দে—সঁপিয়া দে !
দুঃখ রূপে তিনি দাঁড়ায়ে দ্বারে
প্রাণের ঠাকুর তোর ফিরাস্ না রে —
ভকতি-প্রেমের কণিকা দিয়ে
অশ্রু-সম্পদে ঝুলি ভরি'.নে।
সংসার-পথে চলিতে চলিতে
কখন যে নেমে আসে ঝড়—
অন্তরে জানি ইচ্ছা বিনা
কাঁপে না তো তৃণ-পত্তর !
কল্যাণময় তিনি মরমে জেনে
আনন্দে চলি' যাও ফুল্লমনে—
সকলি সমর্পিয়া ঐ চরণে
চিরশান্তিতে বও ধ্রুব-শরণে ॥

	১´					0					১´					0				
II	র্রা	-র্ণা	ণা	ধা	|	পা	-া	-া	-া	I	র্ণা	ণা	ণা	ধা	|	পধা	-া	পা	-া	I
	দুঃ	০	খ	রূ		পে	০	০	০		হৃ	দ	য়	দু		য়া ০	০	রে	০	

১´					0					১´					0				
সা	-া	রা	রা	|	মণা	-া	-া	-া	I	পা	-া	মা	জ্ঞা	|	রা	-া	-া	-া	I
ডা	ক্	দি	ল		কে	০	০	০		ডা	ক্	দি	ল		কে	০	০	০	

১´					0					১´					0				
সা	সা	সা	সা	|	ণ্সা	-ণ্া	-ধ্া	-া	I	ধ্া	ধ্া	ণ্া	জ্ঞা	|	রা	-া	-া	-া	I
তাঁ	হা	রে	ও		তো	০	০	র্		স	ক	ল	প		রা	০	ণ্	০	

১´ 0 ১´ 0
মা পা পা -া | মা -া -ণা -া I পা মা জ্ঞা -া | রা -া -া -া II
সঁ পি য়া ০ দে ০ ০ ০ সঁ পি য়া ০ দে ০ ০ ০

১´ 0 ১´ 0
II { মা -পা পা পা | পা -া পা ধা I না র্সা র্রা না | র্সা -া -া -ণধা I
{ দুঃ ০ খ র পে ০ তি নি দাঁ ড়া য়ে দ্বা রে ০ ০ ০০

১´ 0 ১´ 0
ধা ধা -া ধা | ধা -া ধা -র্সা I র্সা র্ণা -া ধা | পা -া -া -া } I
প্রা ণে র্ ঠা কু র্ তো র্ ফি রা স্ না রে ০ ০ ০ }

১´ 0 ১´ 0
মা ধা ধা ধা | ধা -া -া -র্সা I র্সা র্সা ণা ধা | পা -া -া -া I
ভ ক্ তি প্রে মে ০ ০ র্ ক ণি কা দি য়ে ০ ০ ০

১´ 0 ১´ 0
মা -া মা মা | ণা -া পা পা I মা মা মজ্ঞা জ্ঞা | রা -া -া -া II
অ ০ ক্ষ য় স ম্ প দে ঝু লি ভ রি নে ০ ০ ০

১´ 0 ১´ 0
II { সা -া সা সা | সা -া -ণ্ সণ্ I ধ্ ধ্ -ধা জ্ঞা | রা -া রা -া I
{ স ং সা র প ০ থে ০ চ লি তে চ লি ০ তে ০

১´ 0 ১´ 0
মা মা -া গা | রা রা জ্ঞা রা I সা -া -া -া | -া -া -া -া I
ক খ ন্ যে নে মে আ সে ঝ ০ ০ ০ ০ ০ ড় ০

১´ 0 ১´ 0
মা -পা পা পা | পা -া পা -া I মা -ণা ণা ণা | ণা -া -া -জ্ঞা I
অ ন্ ত রে আ ০ নি ০ ই ০ চ্ছা বি না ০ ০ ০

১´ 0 ১´ 0

জ্ঞা জ্ঞা রা সা | সা মা মজ্ঞজ্ঞা -া I রা -া -া -া | -া -া -া -া } I

কাঁ পে না তো [তৃ ণ প০ ০ ত্র ০ ০ ০ ০ ০ র্ ০}

১´ 0 ১´ 0

II { মা -পা পা পা | পা পা পা ধা I না র্সা র্রা না | র্সা -া -া -ণধা I

{ ক ০ ল্যা ণ ম য় তি নি ম র মে জে নে ০ ০ ০০

১´ 0 ১´ 0

ধা ধা -া ধা | ধা ধা ধা -র্সা I র্ণা -া ধা ধা | পা -া -া -া } I

আ ন ন্ দে চ লি যা ও ফু০ ০ ল্ল ম নে ০ ০ ০ }

১´ 0 ১´ 0

মা ধা ধা ধা | ধা -া ধা র্সা I র্ণা -া ধা ধা | পা -া -া -া I

স ক লি স ম র্ পি য়া ও ই চ র ণে ০ ০ ০

১´ 0 ১´ 0

মা মা মা -া | মা ণা পা -া I মা মা মজ্ঞা জ্ঞা | রা -া -া I

চি র্ শা ন্ তি তে র ও ধ্রু ব শ র ণে ০ ০ ০

ক্ষুধা

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায়

সখ! সখ বলতে ও বাঁদর বোঝে কি। আশ্চর্য্য এর পরেও ওর গলা দিয়ে ভাতগুলো ত বেশ চলে গেল।

শীতকালের সকালবেলা, চাটুজ্যে-বাড়ীর যশোদা বুড়ী আপন মনে বকতে বকতে ঘাট বেয়ে নেমে জলরেখার সন্নিকটে এসে পড়েছিল। 'সখে'র কথাটি হচ্ছে গত রাত্রির, ভাইপো প্রহ্লাদের বিষয়ে ও তার মেয়ে যশোদার নাতনী কনকলতাকে কেন্দ্র করে। ওই কচি মেয়েটার পুরো এক বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে, সেই থেকেই সে শ্বশুরবাড়ী। তাকে আনবার কথা বললে প্রহ্লাদ বলে কিনা ও পিসির সখ।

উত্তেজনায় যশোদার পা দুখানা জড়িয়ে আসতে চায়। তেলের বাটি, গামছা ও ছোট্ট কলসীটি জলের একটু তফাতে রেখে সে অল্প জলে নামতে নামতে উপর দিকে একবার চেয়ে দেখল ক্রমবর্দ্ধমান সূর্য্যের জলন্ত চাহনি। তারপরে সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটু স্পষ্ট কণ্ঠে বলে উঠল—মুখে আগুন, মুখে আগুন সব।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে হঠাৎ সে সামনে চেয়েই দেখে অদূরে কোমর পর্য্যন্ত জলমগ্ন অবস্থায় প্রৌঢ় বাসু ভটচায স্নানশেষে পৈতে হাতে সূর্য্যপ্রণাম করছে। যশোদা অপ্রতিভ হ'ল এবং একটু থেমে তার উদ্দেশে বলল, ছিমন্ত এখন কেমন আছে বাসু?

বাসু চমকে উঠল, তারপরে একটু সামলে নিয়ে চিন্তিত স্বরে বলল, ভাল নাই দিদি।

বড় ডাক্তার কখন এসেছিল?

সেই সন্ধ্যের পরে। বলে গেল নিমোনিয়া, কতক্ষণ বাঁচে বলা মুশকিল। আর ওষুধপত্তরও এমন দামের যে কিনে আনব সে উপায় দেখি না।

যশোদা বোঝে। শ্রীমন্ত বাসুদেবের বড় ছেলে, কি সুন্দর স্বাস্থ্য তার। যশোদার বহু দিনের ইচ্ছে ছিল তার নাতনী কনকলতার সঙ্গে বিয়ে দেয়। পাশাপাশি ঘর, কি সুন্দরই না হ'ত। আর আজ? কনকের সেই যে দূরে কোথায় বিয়ে হ'ল, আজ বছরখানেক দেখা নাই, আর এদিকে শ্রীমন্ত মৃত্যুশয্যায়। লোকে এখন যে যাই বলুক তার নিজের স্থির বিশ্বাস কনক পয়মন্ত মেয়ে, তার সঙ্গে বিয়ে হলে শ্রীমন্ত এমনভাবে মরত না।

সে মুখে শুধু বলল, আচ্ছা বাসু যাও আর দাঁড়িও না। দেখা-শোনা করগে, আমি টাকা নিয়ে যাচ্ছি। কথায় বলে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। যাও।

বাসুদেব কথা না বাড়িয়ে চলে যায়, যশোদাও হাত-পা ধোয়া শেষ করে জলের কিনারায় উঠে আসে এবং খানিকটা উঁচু শুকনো জায়গায় পা ছড়িয়ে আরাম করে বসে যায় তেল মাখতে।

কিন্তু না! ওদিকে ছেলে মরছে, আর এদিকে বুড়ো মিন্সের চানের ঘটা দেখ না! যশোদার হাত-পায়ের গতি ক্ষিপ্র হয়ে ওঠে। পেছনের ভিজে মাটিতে কার পায়ের শব্দ শোনা যায় এবং গলায় শব্দও।

কি দেখবে যশোদিদি? একটু দেরি হ'ল আজ তোমার, না?

মিত্তিরদের মেজবৌ সুনীতি। যশোদার অদূরে এসে জলের ধারে দাঁড়িয়ে কলসীটা নামিয়ে রাখে।

যশোদা কাল রাত্রির পর থেকে এই প্রথম হাঁপ ছেড়ে বাঁচল একজন সঙ্গিনী পেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তেলের বাটিটা একটু তফাতে সরিয়ে রেখে ব্যগ্র স্বরে বলল, আয় সুনী, ক'দিন তোর খোঁজখবর নেই। নে, সব বল দেখি।

সুনীতি গামছাটা কলসীর উপর রেখে দিয়ে দুখানা ময়লা কাপড় হাতে গুছিয়ে নিতে নিতে হঠাৎ বিষণ্ণ সুরে বলল, হ্যাঁ! আমাদের আবার খবর!

অর্থাৎ, খবর নয়, সবগুলোই সমস্যা। তার মধ্যে প্রধান হ'ল আপাততঃ অরক্ষণীয়া মেয়ে টুনির বিয়ের ব্যবস্থা। ক'দিন ধরে তারই একটা হেস্তনেস্ত চলছে।

যশোদা উৎসুক সুরে জিজ্ঞাসা করল, নতুন গাঁয়ের ওরা কি বলে?

বলছে আমার সাতপুরুষের মাথা, বুঝলে দিদি? এত চাই, অত চাই, কেন কুবেরের ভাণ্ডারটি কি ভগবান আমাকেই লিখে দিয়েছেন? হবে না, হবে না, ও যে আমার সৃষ্টিছাড়া মেয়ে। ওর কপালে ছাই ছাড়া কিছু নেই বলে দিলাম দেখো। সুনীতি যেন আক্রোশে ফেটে পড়ে।

অমন করে বলতে নেই রে। মেয়ের কি দোষ বল?

না, যত দোষ আমার। বেশ তাই হ'ল।

এমন ছেলেমানুষি কান্নার সুরে সে কথাটা বলল যে, যশোদা অল্প হেসে ফেলে বলল, কারও যে দোষ হয়েছেই এ কথা তোকে কে বলছে? এ দোষের কথা নয় রে, এ হ'ল সংসারের কথা।

সুনীতি ততক্ষণ জলে নেমে পড়ে কাপড় কাচতে লেগেছে। এই সহানুভূতির ইঙ্গিতে তার মনটা নরম হয়ে ওঠে, সে বলে, তা ত বুঝলাম, কিন্তু করি কি বল ত দিদি? এখন শুধু বাকি আছে মেয়েকে গলায় বেঁধে জলে ডুব দেওয়াটা। তাও হয়ত এক দিন করব।

যশোদা গামছাটা উঠিয়ে নিয়ে একটু নাড়া-চাড়া করতে করতে বলল, এবার ঐ বোসেদের ছেলেটাকেই ধর বাপু। মেয়েমানুষের অত বাছাবাছি করলে চলে না।

সুনীতি কাপড় দুখানাকে হাত সমেত পটাপট ঝেড়ে পাড়ে এনে একটু তফাতে ঘাসের উপর রাখল, তারপর একটু শ্রান্তভাবে বলল, তুমিও তাই বুঝলে দিদি? কথায় বলে ডুবতে বসলে মানুষ ঘাসও ধরে। ওই শ্যামলটাকে তার চাইতে কিছু কম ধরাধরি করা হয় নি।

যশোদা একটু বিস্মিত হয়। মিত্তিররা ভাল বনেদী ঘর, অবস্থা

যদিও আর আগের মত নয়। বিশেষ করে পর পর তিনটি মেয়ের বিয়ে দিয়ে মেজ তরফ (মেজ তরফই এখন গাঁয়ে থাকে, বড় ও ছোট কোথায় কোথায় চাকরি করে, মাঝে মাঝে আসে এই মাত্র) প্রায় পতন-দশায় উপস্থিত। কিন্তু অবস্থা যাই হোক মিত্তিররা পাত্র খুঁজেছে বরাবর নিজেদের সমান বনেদী ঘরে। তিনটির এক রকম ভালই বিয়ে হয়েছে এখন শেষের এটিকে নিয়েই হয়েছে যত টানাটানি। ওপারের বোসেরা লোক ভাল, কিন্তু তেমন বনেদী বংশ নয় এবং অবস্থাও নিতান্ত মন্দ। ওরা এপারের মিত্তিরদের ঘরে সম্বন্ধ করতে বরাবরই রাজী, মিত্তিররাই রাজী হয় না।

যশোদা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তবে যে শুনি অন্য রকম। সে যাক, ওরা কি বলে?

সুনীতি চটপট স্নান সেরে নিচ্ছিল, কিন্তু তৈরি হয়েই ছিল এই ভঙ্গীতে সংক্ষেপে উত্তর দিল—বলল এখন ছেলের বিয়ে দিতে পারবে না, বড্ড বড় দেনা।

সে কি?

কেন, খাবে কি? চালের দর জান না, নিজেরাই খেতে পায় না। বলতে বলতে সুনীতির সারা মুখখানা প্রচণ্ড বিদ্রূপভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

যশোদা কিন্তু ব্যথা পায়। কথাটা সে বোঝে, কিন্তু ঠিক এমন ভাবে আগে তার নজরে পড়ে নি যে, বাজারে চালের দর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে মেয়ের দাম কমে যায়। কিন্তু এই নিয়ে মস্করা ঠাট্টা করে! কেন সে মেয়ে ত সুনীতিরই।

সুনীতি ক্ষণকাল যশোদার এই বিব্রত মুখভঙ্গির পানে চেয়ে নিতে বলে, তাই করব এবার, একটা জেলে-চাষী ধরে চুনির বিয়ে দিয়ে দেব। ওরা আর যাই হোক বৌ পুষতে পারে। আমাদের আর সে মুরোদও নাই।

যশোদা আবার বলে, সে কি!

সুনীতি ভরা কলসীটা কাঁখে উঠিয়ে নিয়ে বললে, তুমি ভাবছ সবটাই ঠাট্টা, তা নয়। এ ছাড়া উপায় কি, বিয়ে ত দিতে হবে। আচ্ছা চলি দিদি, আবার দেখা হবে।

সুনীতি চলে যায়, যশোদা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। এর কতখানি সত্যি আর কতখানি ঠাট্টা সে খুঁজে পায় না, তার মনে হয় ও-দুটো তা হলে একই জিনিস।

দুপুরবেলা একসঙ্গে একটু ছাড়াছাড়ি ভাত খেতে বসে যশোদা অন্নদাকে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা বৌমা, কনককে একবার দেখতেও ইচ্ছে করে না তোমাদের?

অন্নদার বয়স বছর পঁয়ত্রিশ হবে, দেখতে স্বাস্থ্য কিন্তু কিছু রুগ্ন ও নির্বিকার। কাল রাত্রে খাওয়ার সময় কনক সম্বন্ধে স্বামী ও পিসির বাদানুবাদে সে মোটেই যোগদান করে নি। এ কথায় সে ভাত খেতে খেতে সংক্ষেপে বলল, সে উপায় কৈ?

যশোদা একটু আহত স্বরে বলে, উপায়ের কথা ত বলি নি বৌ, বলছি ইচ্ছের কথা।

অন্নদা চকিত হয়ে ভাত খাওয়া থামিয়ে এবার পিসশাশুড়ীর পানে তাকায়, ভাবখানা যেন ও দুটো জিনিস আলাদা নাকি?

যশোদা নিজের কথার জের টেনে চলে—আর মেয়েটা হাজার হোক তোমারই, আর কারও নয়।

অন্নদার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় শুধু কনকের কথা নয়, মেজ মেয়ে বিনির কথাও। [illegible]

[illegible] না, [illegible]

—তাই বলে না বাপু কিছু [illegible]

অন্নদা একটু হেসে বলে, [illegible] দিলে চলবে না। [illegible]

ঠিক সন্ধ্যার একটু আগেই [illegible] যশোদা বলল, পাশেই বাগ্দীপাড়ার [illegible]। [illegible] এসেই [illegible] এল কিনা। [illegible]

আঃ মরণ! [illegible] সহজ হল। যশোদা [illegible] গোড়ায় দাঁড়ায়।

বাগ্দীদের স্বভাবই [illegible] উপর [illegible] কষ্ট করবে কে?

বাগ্দীদের এত উদার দৃষ্টিভঙ্গি নেই, [illegible] করে বলে, কেবল [illegible] ভাল হবে নাকি!

আর যার যাই হোক, তার যে ভাল হচ্ছে না একথা অতি সত্য। সংস্কারের অভাবে পুরনো বাড়ীখানা পড়োপড়ো অবস্থায়। যশোদা অন্ধকারে হাতড় করতে করতে ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে বাইরের একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু এ কি, সব অন্ধকার নিঝুম, কে বলবে এখানে কেবল রোগী মরছে! কে, বাপ, মিছে কোথায় রে [illegible]! [illegible] বাড়ী যা হোক বাপু! —বলতে বলতে ওদিকের কোণে একটি কুপির ক্ষীণ আলো লক্ষ্য করে দ্রুত কম্পিত পদে যশোদা সেই দিকে অগ্রসর হয়।

বেশী দূর যেতে হল না, দোরগোড়ার অনেকটা এদিক হতেই সে স্পষ্ট দেখতে পেল—বাগ্দীদের বিভিন্ন বয়সের গুটি তিন-চার ছেলে মেয়ে নিয়ে রান্নাঘরের মেঝেয় যেমন তেমন করে বসে ভাত খাচ্ছে

এবং সম্প্রতি যশোদার কণ্ঠস্বর শুনে একবার ভাতের হাঁড়ির দিকে, একবার মৃণালিনীর দিকে ও একবার ছেলেমেয়েগুলোর পানে তাকাচ্ছে।

যশোদা এত সব দেখল না, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তিরস্কারের সুরে বলল, তোদের কাণ্ড এ কি বাপু! ছেলেটার ঘর এমন অন্ধকার আর এদিকে একসঙ্গে সব খাওয়ার এমন মোচ্ছব!

মোচ্ছবই বটে! আজ তিন দিন পরে এই প্রথম সন্ধ্যাবেলা তাদের রান্নাঘরে আগুন জ্বলেছে। এ তিন দিন যে তারা কি খেয়ে কাটিয়েছে তারাই জানে। বাসুদেব থালায় মাখা ভাতের উপর নিবদ্ধদৃষ্টি। ছেলেগুলো বুঝল তাদের বাবা কিছু একটা অন্যায় করেছে, সুতরাং তাদের অবস্থাও তেমনি। মৃণালিনী অদূরে বসে শুষ্ক ক্ষুধার্ত দৃষ্টি দিয়ে ওই ভাতগুলোকে যেন লেহন করছে।

কি রে তোদের মুখে কথা নাই কেন, বোবা হয়ে গেলি নাকি সব?

যাচ্ছি দিদি, এই যে হয়ে গেল। বলতে বলতে অকস্মাৎ বাসুদেব থালা ছেড়ে উঠে পড়ে প্রায় দৌড়ে যশোদার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। যশোদা হতবাক, কি বলবে ভেবেই পেল না।

মৃণালিনী বুঝতে পারল। উঠে গিয়ে একটা ছোট পিঁড়ি এনে চৌকাঠের অদূরে পেতে দিয়ে প্রথমে ছেলেমেয়েগুলোর উদ্দেশে বলে, তোরা গেলনা কেন বাপু, তোদের কি হ'ল। তারপরে যশোদার উদ্দেশে বলে, বোস দিদি এইখানটায়। আমাদের কাণ্ডই হ'ল এই, তুমিই বা কি বলবে আর আমরাই কি করব।

বাসুদেব অমন করে উঠে যাওয়াতে যশোদা বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল, এ কথায় সে কিছুটা কৈফিয়তের সুরে বলল, সে কি শ্রীময়ের ঘরে কেউ নাই, অন্ধকার, তাই বললাম।

গরীবের সংসারে অলক্ষ্মীর সঙ্গে লড়াই লেগেই আছে, সেটা বরং অপরিহার্য্য বিড়ম্বনা বলে মেনে নেওয়া যায় কিন্তু যমের সঙ্গে লড়াই করাটা তাদের পোষায় না। কারণ সংসারে নানাবিধ গলা-ধাক্কা খেয়ে তাদের প্রাণের মূল্যবোধটাই অতি ক্ষীণ, দ্বিতীয়তঃ যমের সঙ্গে লড়াই করাটাও অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য।

ধরা পড়ে বহুদিনের দাগী চোর যেমন রুখে দাঁড়ায় সেই ভঙ্গিতে মৃণালিনী বলল, নাই কেন, আছে। যম ঠিকই আছে দেখ।

যশোদা আতকে উঠে বলে, সে কি রে মৃণী, তুই কি মা!

মৃণালিনী তৎক্ষণাৎ বলে, না জা'ন। মার দশা এমন হবে কেন!

যশোদা সম্মোহিতের মত তার মুখের পানে চেয়ে বলে, নিজের দশার ওপর ত হাত নাই মানুষের, নইলে তার এমন দশা হবে কেন। সে যাক, ওষুধপত্তরগুলো ঠিকমত এসেছিল ত?

একটা এটো পাতার উপর পড়ে তিন-চারটা কুকুর যেমন করে, ঠিক সেই ভাবে প্রকাণ্ড ভাতের থালাটা ছেলেগুলোর মাঝখানে পড়ে প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। যশোদা তাদের একটু আড়ালে পিছন করে বসেছিল তাই সে ঠিক দেখতে পাচ্ছিল না। মৃণালিনী কিন্তু একেবারে সামনে বসে প্রতিটি ভাতের গতিভঙ্গি লক্ষ্য করছিল, এ কথায় সে এক রকম অদ্ভুত ক্ষুধিত চাহনির সঙ্গে সেই দিকে আঙুল নির্দেশ করে ধরা-গলায় বলল, হাঁ্যা এসেছে, ওই দেখ না।

ভাগাভাগির ভাত শেষ হয়ে আসার মুখেই চরম অবস্থার সৃষ্টি করে বিশেষ যদি পেট না ভরে থাকে। ছেলেমেয়েগুলো থালায় এ কোণ ও কোণ হাতড়াতে হাতড়াতে প্রায় হাতাহাতি আরম্ভ করে দিয়েছিল, যশোদা ঠিক সেই সময় একটু ঘুরে সেদিকে চাইল। চোখে পড়ল তার সেই হাতাহাতির দৃশ্য এবং মনে পড়ল বাসুদেবের সেই পলায়নের ভঙ্গিটি। সে বুঝল। তাদের যে রোগ তার ওষুধ ত এই।

ছেলেরা সমস্বরে আবদার তোলে—মা আরও খাব।

মৃণালিনীর চোখে সঙ্গেসঙ্গে আগুন জ্বলে ওঠে, সে প্রায় চিৎকার করে বলে, খাও এবার আমাকেই খাও সবাই মিলে। যা বেরিয়ে যা সব হতভাগারা বলছি। লক্ষ্মীছাড়া রাক্ষসের গুষ্টি যত জুটেছে আমারই কপালে।

ক্ষণপূর্ব্বের মমতা কোথায় উবে যায়, পরিবর্ত্তে যেন সচকিত হয়ে ওঠে কুকুরতাড়ানি এক দজ্জাল মেয়ে। আর ওরা পালিয়েও গেল কুকুরের মতই, এতক্ষণ যেন কার-না-কার ঘরে ঢুকে পাত চাটছিল। যশোদা এবারেও নির্ব্বাক, কিছুক্ষণ পরে শুধু বলল, তোর রইল ত?

মৃণালিনী হঠাৎ অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ে, অসহায় কণ্ঠে বলে, ধিক আমাকে, তুমি কি তাই ভাবলে দিদি?

আবেগের আধিক্যে সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তার পর সামলে নিয়ে খানিকটা বেপরোয়া ভাবেই বলে ওঠে—তোমার ভাবনা নাই দিদি। ভাত ত আর চোখের সামনে নাই বলতে পারি না, তাই হাঁড়িতে চড়াবার আগেই কিছুটা চিবিয়ে রাখি।

চিবিয়ে রাখি কথাটা সে এমন চিবিয়ে বলল যে, যশোদা আর একবার আতকে উঠে ভাবল—ডা'নই বটে।

মৃণালিনীকে যেন ভূতে পেয়েছে, সে বলে চলে—আর দিদি, তোমার টাকা শুধু খেয়ে উড়িয়ে দিলে ত চলবে না, কিছু ধার শোধ করতেই হবে, আর মরলেও ত খরচ আছে—

যশোদা মিনতির সুরে বাধা দিয়ে বলে—থাক রে আর হিসেব দিতে হবে না, সবই বুঝেছি।

আরও দিন ছয়-সাত পরে। শ্রীময় এখনও মরে নি, কেবলই ধুঁকে চলেছে। যশোদার সে একান্ত স্নেহের পাত্র, কিন্তু যশোদা তাকে বিশেষ আর দেখতে যায় না। বোধ হয় অমন স্নেহের পাত্র বলেই যায় না, কারণ ও দৃশ্য শত্রুরও দেখা যায় না। করারও তার আর কিছু নাই। বহু দিন হতে দু'চার পয়সা করে তার হাতে যা জমে ছিল এ ক'দিনে তার প্রায় সবই খরচ হয়ে গেছে, খানিকটা শ্রীময়ের চিকিৎসার ব্যাপারে, আর-কিছুটা কনকের বাড়ী তত্ত্ব পাঠানোর ব্যাপারে। তাতেও যে কি রকম তত্ত্ব যাবে তার আজ কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। আরও অবশ্য কিছু সঞ্চিত আছে তার পাশের গাঁয়ের এক জনের কাছে। কিন্তু তার নিজের মরলেও ত খরচ আছে।

ব্যবহৃত হয়। গৌড় নগর যখন বাংলার রাজধানী ছিল তখন সেই গৌড়ের ভাষাকেই সমগ্র বাংলার লোক আদর্শ ভাষা বলিয়া মনে করিত। তখন লোকে বাংলা বা বঙ্গ-ভাষাকে গৌড়ীয় ভাষা বলিত। তাহার পর নবদ্বীপ যখন বাংলার রাজধানী হইল তখন নবদ্বীপের প্রচলিত ভাষাই বাঙ্গালীর আদর্শ ভাষা হইল। আমি বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহারা বাল্যকালে যে বর্ণমালা শিক্ষার জন্য পুস্তক পড়িতেন সেই পুস্তকের নাম ছিল "গৌড়ীয় ভাষার বর্ণমালা"। তাহার স্বরবর্ণের তালিকায় দীর্ঘ 'ঋ' ও দীর্ঘ 'ঌ' এবং ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকায় শেষ অক্ষর ছিল 'ক্ষ'। বিদ্যাসাগর মহাশয় এক শত বৎসর পূর্ব্বে যখন "বর্ণ পরিচয়" প্রথম ভাগ রচনা করেন তখন তিনি দীর্ঘ 'ৠ' ও দীর্ঘ 'ৡ' পরিত্যাগ করেন এবং 'ক্ষ' অক্ষরকে প্রথম ভাগ হইতে দ্বিতীয় ভাগে প্রমোশন দেন।

লক্ষ্য করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, সকল ভাষাই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। মাৰ্জ্জিত ও অমাৰ্জ্জিত অথবা শহুরে ও গ্রাম্য। মাৰ্জ্জিত বা শহুরে ভাষা একই প্রদেশের মধ্যে সকলেরই বোধগম্য হইয়া থাকে। কিন্তু অমাৰ্জ্জিত ও গ্রাম্য ভাষায় প্রত্যেক জেলায় এমনকি প্রত্যেক মহকুমায় পার্থক্য আছে। আবার, ব্যবসায় বিশেষে গ্রাম্য ভাষাতেও পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়-রচিত "গোষ্ঠীকথা" নামক পুস্তকের এই অমাৰ্জ্জিত ভাষার একটি সুন্দর উদাহরণ এখন আমার মনে পড়িতেছে। বহুকাল পূর্ব্বে বাংলার একজন ছোট-লাট একবার হুগলীতে গিয়া একটা দরবার করিয়াছিলেন। সেই সুযোগে ছোটলাট বাহাদুরকে দেখিবার জন্য সহস্র সহস্র পল্লীগ্রামবাসীর হুগলীতে সমাগম হইয়াছিল। একজন গ্রাম্য জেলে দরবারের পর স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাহার প্রতিবেশীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল লাটসাহেবের দরবার কি রকম হইয়াছিল। উত্তরে সে বলিল, "ভাই, গিয়ে দেখলুম যেন পোনার ঝাঁক ভেসেছে। আমি কৈকানায় কৈকানায় (কৈমাছ কানকোর সাহায্যে অতিকষ্টে ধীরে ধীরে যেমন অগ্রসর হয়) গিয়ে যেমন ঘরসোলা ছলপ দিইচি (ঘরসোলা মাছ যেমন সহসা জলের উপর ভাসিয়া উঠে) অমনি চিতল পটকে দিলে (চিতল মাছ ক্ষুদ্র মাছকে যেরূপ তাড়া করে), আমিও অমনি গুঁতো সটকলুম (গুঁতো মাছ ভয় পাইয়া সহসা যেরূপ অদৃশ্য হয়)।" সম্ভবতঃ সেই ধীবর দূর হইতে লাটসাহেবকে দেখিতেই পায় নাই বলিয়া ভিড়ের মধ্যে একটু লাফাইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পার্শ্বস্থিত একজন পুলিস কর্ম্মচারী শৃঙ্খলারক্ষার জন্য তাহাকে ধরিয়া ফেলিলে সে পুলিসের হাত ছাড়াইয়া সহসা অদৃশ্য হইয়াছিল। ঐ ধীবর যে ভাষায় তাহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছিল সে ভাষার শব্দ কোন অভিধানে নাই! "অগুণ নেই বগুণ আছে", "ঘুরো লুসে কুপোকাত" এই সকল বাক্যাংশ অমাৰ্জ্জিত ভাষাতে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। মাৰ্জ্জিত ভাষায় ইহার অর্থ ভাত খাইয়া নিদ্রা যাওয়া, গুণ নাই দোষ আছে। কিন্তু অশিক্ষিত জনসাধারণ মাৰ্জ্জিত ভাষায় কথা কহে না বলিয়াই এই প্রকার কথা বঙ্গভাষাভাষী অপর জেলার লোক সহসা বুঝিতে পারে না। মেদিনীপুর, রংপুর, ঢাকা বা ত্রিপুরা, চট্টগ্রামের লোক যখন পরস্পরের মধ্যে এরূপ অমাৰ্জ্জিত ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে তখন আমরা তাহার অর্থবোধ করিতে পারি না। অথচ তাহারা বাংলা ভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে।

সকল দেশের ভাষা সম্বন্ধেই এই একই কথা বলিতে পারা যায়। আমরা ইংরেজী বই পড়িয়া যে ইংরেজী ভাষা শিখিয়াছি তাহা ইংলণ্ডের মাৰ্জ্জিত ভাষা। ইংলণ্ডের এক এক কাউণ্টি বা জেলার লোকে যে অমাৰ্জ্জিত ভাষায় কথা-বার্ত্তা বলে তাহা আমরা সহসা বুঝিতে পারি না। ঐরূপ অমাৰ্জ্জিত ভাষাকে ইংরেজীতে slang বলে। আমি দেখিয়াছি দুই জন ইংরেজ পরস্পরের সহিত কথা কহিবার সময় কোন দেশীয় শিক্ষিত লোক সেখানে উপস্থিত থাকিলে, যদি কোন গোপনীয় বিষয় উল্লেখ করিবার সময় slang ব্যবহার করেন তাহা হইলে ইংরেজী শিক্ষিত দেশীয় ভদ্রলোক সহজে তাহার অর্থ বুঝিতে পারেন না। ইংলণ্ডের উত্তর প্রান্তস্থিত নর্দ্দাম্বারল্যাণ্ড বা ইয়র্কের অমাৰ্জ্জিত ভাষা ঐ দেশের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত কেণ্ট বা কর্ণওয়াল জেলার লোক সহসা বুঝিতে পারে না। আমরা ফরাসী ভাষা বলিতে যাহা বুঝি তাহা ফ্রান্সের মাৰ্জ্জিত বা সাহিত্যের ভাষা। প্যারিসের অমাৰ্জ্জিত ভাষা এবং মার্সাই বা লিয়ঁর অমাৰ্জ্জিত ভাষা একরূপ নহে। সকল দেশেরই ভাষা সম্বন্ধে এই একই ব্যবস্থা।

মাৰ্জ্জিত ভাষাও কাল সহকারে পরিবর্ত্তিত হয়। রাম-মোহন রায় তাঁহার পুস্তকে যে বাংলা ভাষা ব্যবহার করিয়া-ছেন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা করেন নাই। আবার, বিদ্যাসাগরের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বা রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বঙ্কিমী যুগের সাহিত্যিকগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাসবহুল বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সীতার বনবাসে' "এই গিরির শিখরদেশ সতত সঞ্চরমান নবজলধর-পটল-সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় আচ্ছন্ন হইয়া আছে।" এই ভাষা বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে একেবারে অচল। বঙ্কিম-চন্দ্র তাঁহার প্রথম রচিত উপন্যাস বা রচনাসমূহে কতকটা

এইরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী-কালে রচিত কোন গ্রন্থে এইরূপ ভাষা গ্রহণ করেন নাই। তিনি একবার তাঁহার বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রকে বলিয়াছিলেন, "অনেক সাধনার ফলে সরলতা দেবীর কৃপালাভ করিয়াছি। আর আমি নিজেকে সে কৃপা হইতে বঞ্চিত করিব না।"

আজকাল অনেক উপন্যাস লেখক তাঁহাদের নিজের জেলার বা মহকুমার গ্রাম্য ভাষায় পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, ঐ প্রকার ভাষা সমগ্র বঙ্গদেশের সুবোধ্য নহে। যাহা সমগ্র বাংলার লোক সহজে বুঝিতে পারে এরূপ সরল ও মার্জ্জিত ভাষা ব্যবহার করা উচিত। নতুবা স্থানীয় গ্রাম্য ভাষায় পুস্তক রচনা করিলে তাহা সমস্ত বাঙালীর পক্ষে সুখবোধ্য বা সুখপাঠ্য হইবে না। উপন্যাসে ও নাটকে নায়ক-নায়িকার মুখেই গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করা উচিত।

মাতৃস্নেহের বিকাশ

শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়

জৈব-বিবর্ত্তনের প্রথম দিকে মাতৃস্নেহের উন্মেষ।

বিশ্ব-প্রকৃতির পরীক্ষাগারে জীব-জীবন নিয়ে যখন নিত্য নব পরিকল্পনা চলছিল, বড়ঝঞ্ঝা, ভূকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, প্লাবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক রুদ্রতাণ্ডবের করাল কবল থেকে তরুণ জীবদের রক্ষা করবার জন্য প্রকৃতির ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না, তখন ধরণীতে স্থায়ীভাবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস হয়েছিল জন্মসংখ্যার হার বৃদ্ধি করে। উষাযুগের প্রাণী যারা আজও বেঁচে আছে তারা মৃত্যুঞ্জয়ী, আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া তাদের মৃত্যু নেই (এমিবা ব্যাকটিরিয়া ইত্যাদি)। তবে এ সমারোহ অন্তঃসারশূন্য নীরস গুণ-লেশহীন প্রাণী। উদ্দেশ্যসাধনের উপায় না হয়ে তাদের অগণিত সংখ্যা বৃদ্ধিই হয়ে দাঁড়াল চরম লক্ষ্য। অর্থাৎ, অভিব্যক্তির পরম রূপ গেল হারিয়ে, বেঁচে রইল শুধু জীব-জীবন। কিন্তু এ সার্ব্বভৌম আয়োজনে পারিবারিক স্বার্থ অপেক্ষা বৃহত্তর কল্যাণই আদর্শ বলে বিবেচিত। সেজন্য কেবল অগণিত সংখ্যার জোরে বেঁচে থাকার মোহ পরিত্যাগ করে গুণ বিকাশের দিকে মনোযোগ পড়েছিল, তার ফলে 'মাতৃস্নেহে'র উদ্ভব। মন-অভিব্যক্তির ইতিহাসে এ এক পরম শুভ মুহূর্ত্ত। আহার-বিহার-সংস্কারের বাধাহীন অনায়াসলব্ধ জীবন দৃঢ়চিত্তে পরিত্যাগ করে স্বইচ্ছায় বন্ধন ও নিরন্তর কষ্ট স্বীকার করা সহজ নয়, জীব-বিবর্ত্তনের সমস্ত ইতিহাসে তা অনুপম। এর দরুন স্নেহ, প্রীতি, আনন্দ,অনুরাগের তোরণদ্বার খুলে গেছে, কোমল ও সুকুমার মানবীয় বৃত্তির শুভ উদ্বোধন হয়েছে; এক দিকে উন্মেষ হয়েছে বেদনা, অনুকম্পা, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সামাজিক গুণ, অপর দিকে হয়েছে সৌন্দর্য্যানুরাগ, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সমাবেশ। এক-মাত্র মাতৃস্নেহ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে যাবতীয় বুদ্ধিবৃত্তি, আবার নীতিজ্ঞান, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সত্যস্পৃহাও এসেছে এই পথে।

এ কি উপায়ে সম্ভব? একটি মাত্র প্রবৃত্তিগর্ভে কি এই বিপুল উদ্ভাবনশক্তি সুপ্ত?

এ তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমে মাতৃস্নেহের উৎপত্তি সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। পশুজগতের আদিম জৈব-ক্ষুধা নিরসনকল্পে যৌন আকর্ষণের জন্ম। প্রাণী-জীবনের নিত্য প্রবহমাণ আলোড়ন-বিলোড়নের পশ্চাতে বিশ্ব-প্রকৃতির শুভ্রোজ্জ্বল নবজীবন সৃষ্টির যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা যৌনজনন তার একটি প্রধান ধারা, জীব-জগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই ধারায়। যৌন-প্রেমের রূপ দুটি: একদিকে প্রভুত্বব্যঞ্জক দম্ভ, রুদ্র-কঠিন শক্তি; অন্যদিকে কান্তকোমল মনোভাব, মধুময় জগতের মোহন আবেশ। জীব-সৃষ্টিতে উভয়েরই প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। প্রথমোক্ত ভাবটি থেকে আক্রমণ, পলায়ন, আক্রোশ, বিদ্বেষ, অহমিকার আবির্ভাব—প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যুদ্ধ, খেলাধূলা হতে আরম্ভ করে রাজ্যশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য পর্য্যন্ত এর দ্বারা প্রভাবান্বিত; মাতৃস্নেহের উন্মেষ হয়েছে দ্বিতীয়োক্ত ধারায়। নারী-পুরুষের প্রেম যে কেবল আদিম যৌন-ক্ষুধা নিবারণের জৈব-প্রেরণা নয়, স্মরণাতীত কাল থেকে এ-ভাব যে প্রতিনিয়ত পরিপূর্ণ সার্থকতা অনুসন্ধান করছে, অসংখ্য বস্তুর ভিতর দিয়ে বিচিত্র আত্মপ্রকাশে তার প্রমাণ। প্রেমের একটা বৃহৎ অংশ শুচিস্নিগ্ধ সুষমামণ্ডিত, যত বর্ব্বর, যত নিম্নস্তরের হোক না কেন ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা না থাকলে তার কমনীয়তা অনুপম। শৃঙ্গারের এ দিকটা রসপ্রধান, জনিতৃ-যন্ত্রের সূত্রপাত এখান থেকে।

কিন্তু প্রাণীর মানসিক অবস্থার তারতম্য আছে, স্বভাব ও আচরণ থেকে পশু-জগতের উচ্চ-নীচের যাচাই। কীট-পতঙ্গের ভিতর বুদ্ধির অনুশীলন প্রায় নেই, এদের জীবন প্রবৃত্তির নিয়মানুগ বন্ধনে নিয়ন্ত্রিত। অভিনব কোন কৃতিত্ব প্রদর্শন করবার অবসর তাদের অল্প। স্ত্রী-পুরুষের

মিলনে সাহচর্য্য যতটা তার মধ্যে ললিতকোমল ভাবটি ঠিক পরিস্ফুট হয়ে ওঠে না ; শুধু পিতামাতার স্নেহ কেন, কোন রকমের মমত্ববোধ এদের মধ্যে বিরল। ফেবর, লুবক প্রমুখ কীটতত্ত্ববিদ্‌রা চেষ্টা করেও কীট-পতঙ্গের মধ্যে স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসার নিদর্শন বিশেষ দেখেন নি, বিবাদ-কলহের স্পৃহাই অধিক বলে তাঁদের নিকট প্রতিভাত হয়েছে। মাতৃস্নেহের ক্ষীণ আভাস দেখা যায় একক বোলতার ভিতর। লার্ভার খাদ্য সংস্থান করে ডিম পাড়ে—ফিরে আর আসে না ; নির্বুদ্ধিতা এত অধিক যে মাতৃস্নেহের পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। মধুপ ও পিপীলিকা এদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জীব, শৈশবে কিছু যত্ন পায় বটে, তবে সে পিতামাতার লালন পালন নয় কর্ম্মী ভগিনীদের পরিচর্য্যা ; দারুণ শীতে খাদ্যাভাবে এরাই আবার সাবাড় করে ফেলে শিশুদের। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-পরিজনদের বিপদ-আপদে সাহায্য করা এদের ধাতে নেই, নিমজ্জমান মধুপ পিপীলিকাকে সাহায্য করতে কেউ দেখে নি ; হয়ত পার্শ্ববর্ত্তী একটি সঙ্গী মারা পড়ল, কিন্তু তাতে কি ? অন্যেরা তিলমাত্র দুঃখিত বা বিচলিত না হয়ে পরিতৃপ্তি সহকারে কর্ম্ম করে যেতে থাকে। স্ত্রী অক্টোপাসকে ডিমের পাশে সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত দেখা গেছে, গুবরে-পোকা, জল-ছারপোকা (waterbug) আশ্রয় ও খাদ্য জোগাড় করে রাখে ভবিষ্যৎ সন্তানের জন্য, কিন্তু তবু অমেরুদণ্ডী জগতে মাতৃস্নেহের প্রকাশ কোথাও সুষ্ঠু নয়। ডিম ফুটে বার হবার পর কীটশিশু যত্ন আশ্রয় পেয়েছে এমন শোনা যায় না, সেজন্য এদের শৈশবাবস্থা তুলনায় অতি অল্পকালের, কেউ কেউ শৈশব-বিরহিত। আত্মরক্ষা জীবনধারণ ইত্যাদির শিক্ষা, অভিভাবকত্ব লালনের সুযোগ নেই বলে বোধ হয় অমেরুদণ্ডী জগৎ প্রবৃত্তির দাস, পূর্ব্বপুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র এদের কার্য্যের সুসংস্থিত সীমারেখা, তার বাইরে যাবার কৌশল জানা নেই

মেরুদণ্ডী জগতের সর্ব্বনিম্ন স্তরে আছে মৎস্যকুল ও উভচরেরা—যাদের মানসিক অবস্থা অমেরুদণ্ডীর চেয়ে কিছু উন্নত হলেও তাদের মধ্যে মাতৃস্নেহের বিকাশ অল্প। এই পর্য্যায়ে ডিম থেকে বার হয়ে আসবার পরও চলতে থাকে মাতৃ অথবা পিতৃ-যত্ন। অনেক মাছ জলতলে গৃহ নির্ম্মাণ করে এবং সন্তান জাত হলে সাবধানে রক্ষণাবেক্ষণ করে। ষ্টিকলব্যাক ও বেগিন পুরুষদের অতন্দ্র প্রহরায় প্রসিদ্ধ, ক্রীড়ারত শিশু দূরে গিয়ে পড়লেই পিতা ধাড় ধরে ফিরিয়ে আনে, কারণ অন্যান্য শত্রুদের মধ্যে রাক্ষসী মাও উদরসাৎ করে ফেলে নিজ সন্তানকে। কোন কোন জাতের ভেক মাটির দেওয়াল ঘিরে কৃত্রিম চৌবাচ্চার মত তৈরি করে শিশুদের নিরাপদে রাখে ; বেঙাচিদের মাতাপিতার সঙ্গে সঙ্গে সন্তরণ করতে দেখা যায়। সর্প বা কুমীরের সন্তানের জন্য সবিশেষ উৎকণ্ঠার কথা শোনা যায় নি ; বিরাট দেহী পাইথন-জননী অবশ্য কুণ্ডলী মধ্যে শতাধিক ডিম রেখে চারি মাসাধিককাল নিঃশব্দে অবস্থান করে, কুমীর নাকি দূর হতে আপন ডিমের প্রতি লক্ষ্য রাখে—কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, বাচ্চা বের হলে আর তার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। সন্তান পালনের দায়িত্ব সুকঠিন। দেখা গেছে সাধারণতঃ যে পর্য্যন্ত না স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্বন্ধ পূর্ণ বিকাশলাভ করেছে, অর্থাৎ যৌনমিলনেই সে সম্বন্ধে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে নি—দূর গৃহস্থালী ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে, সে পর্য্যন্ত মাতৃস্নেহের সম্যক্‌ রূপ অনুপলব্ধ থেকে গেছে। বসুন্ধরায় সরীসৃপের প্রভুত্ব কয়েক কোটি বৎসর ধরে অবাধে চলেছিল, অথচ তাদের মানসিক শক্তি-মত্তার দিকে এদের প্রভূত উন্নতি হলেও শিক্ষা হয় নি কিছুই, বুদ্ধিবিকাশ হয়েছে যথাসামান্য, সেজন্য প্রবল চাটুই এরা বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল নিরীহ অথচ বুদ্ধিমান স্তন্যপায়ীদের কাছে যাদের শিক্ষার কিছু সুযোগ

যতক্ষণ না সুব্যবস্থিত আত্মীয়তা গড়ে ওঠে ততক্ষণ সন্তান-শিক্ষার প্রশ্ন নিরর্থক। এতে উভয়েরই সহযোগিতা প্রয়োজন, সে কারণে শিক্ষা ও লালন-পালন-ব্যবস্থা স্তন্যপায়ীদের পূর্ব্বকার যুগে বিকশিত হয় নি। সরীসৃপ যুগে কিছুই নয়, তাদের উদ্বর্ত্তন বংশীয়রা বিক্রমকে আশ্রয় করে দ্বন্দ্ব বিবাদের মধ্যে, হিংস্র আচরণ কোপন স্বভাব ও তৎপরতা দেহসজ্জা ও আয়তনে তাহা বিকশিত হয়েছিল। দাম্পত্য জীবনে স্নিগ্ধ মধুর ভাব নেই, কলিং যত্ন ত তার পরের কথা।

ইতর প্রাণিজগতে মাতৃস্নেহের প্রকৃত উন্মেষ বিহঙ্গকুলে। পতঙ্গাদির ন্যায় অনাগত সন্তানকে অভ্যর্থনা জানাবার নিমিত্ত নীড় রচনায় উদ্যোগপর্ব্ব, ডিমে তা দেওয়া কতকটা সরীসৃপদের অনুকরণ ; অনেক ক্ষেত্রে পুরুষরা একাজে বেশ সাহায্য করে ; এমু কিউই পাখীদের মধ্যে পুরুষরাই কেবল একাজ করে, বহুপত্নীক উটপাখী পর্য্যায়ক্রমে সকল স্ত্রীকেই সাহায্য করে ; পুরুষ পেঙ্গুইন স্নেহশীল পিতা পূর্ব্বাপর সন্তানদের যত্ন করে ; ব্রাশ টার্কি শুষ্ক ঘাসপাতা আগাছা দিয়ে দশ-বার বর্গ ফুটের বিরাট স্তূপ তৈরি করে ডিম পাড়ে, পুরুষরা প্রায়ই উত্তাপ পরীক্ষা করে দেখে যে, ডিম ফোটবার উপযোগী উষ্ণতা আছে কিনা ; ধনেশ তার গৃহিণীকে বৃক্ষকোটরে বন্দী রেখে দ্বার রুদ্ধ করে দেয়, কাদা-মাটি দিয়ে তার পর বহির্গত হয় খাদ্যানুসন্ধানে। লালন-পালনের সঙ্গে নীড় বাঁধার সম্বন্ধ গভীর, যে-সব পাখীর শৈশব মাতাপিতার কর্ত্তৃত্বাধীনে খুব বেশী দিন অতিবাহিত হয় না তাদের নীড় সাধারণ, অনায়াসে রচিত, যেমন তিত্তির-কালিজ পেঙ্গুইন উটপাখী বনমোরগ সামুদ্রিক হাঁস ইত্যাদি।

জন্মের অল্প দিন পরে হয় স্বাবলম্বী, ক্ষিপ্রপদে পলায়নতৎপর, এদের বাসা ভূমিতলে। শিক্ষার কাল সকলের সমান নয়, চড়ুই-পায়রা মাতা-কর্তৃক সন্তানকে উড়তে শেখানো অনেকেই দেখেছেন, বাবুই, ঈগল প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল পক্ষীকেই সন্তানদের অনুরূপ শিক্ষা দিতে হয়, এদের বাসাও সাধারণের অনধিগম্য। স্ত্রী-পক্ষীর বধূজীবন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আসন্ন মাতৃত্বের আভাসে শুরু হয় নীড় রচনার ব্যস্ততা, আনাগোনা—তারপর সন্তান পালনের সবটুকু দায়িত্ব এসে পড়ায়। স্নেহ বিশেষ করে যে মাতার দিক থেকে আসে তা নয়, এর উদ্ভব নারীসুলভ কোমল বৃত্তি অবলম্বনে। যে পুরুষের প্রেম একনিষ্ঠ নয় সে লঘুচিত্ত ব্যক্তি সন্তানকেও ভালবাসতে পারে না, সহজেই এড়িয়ে যায় লালন-পালনের দায়িত্ব।

ক্রীড়া কৌতুক আমোদ প্রমোদের মাধ্যমে যে চিত্ত বিকাশ হয়, কৈশোর কাল তার উপযুক্ত সময়, এই কৈশোরই পিতামাতার স্নেহ শাসন পরমাশ স্বাবলম্বী হয়ে উঠবার কাল। খেলাধূলা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের বিশেষ ক্ষেত্র এবং পিতামাতার আশ্রয় ও আহার্য যত দীর্ঘদিন সহজলভ্য হয়, পরীক্ষামূলক কাজকর্মের সুবিধা তত অধিক হয়ে থাকে। বহুবিধ বিচিত্র পর্যবেক্ষণ সমৃদ্ধ করে তোলে অভিজ্ঞতাকে, নিখাঁটি অবকাশ তাই ত মূল্যবান। বিবিধ পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের সহিত প্রাথমিক পরিচয় একদিকে যেমন মনকে সমৃদ্ধ করে অন্যদিকে আবার কূপমণ্ডূকতার অবসান ঘটিয়ে তাকে প্রশস্ত করে তোলে, গ্রহণ-ক্ষমতা বেড়ে গিয়ে নিজেকে ঠিকমত খাপ খাইয়ে নেওয়া সহজ হয়ে যায়। এইখানে বুদ্ধির আবির্ভাব, প্রবৃত্তির সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ধীরে ধীরে কেটে গিয়ে যুক্তিবাদী মনের বিকাশ। কীট পতঙ্গ-জগতে শৈশবকালের বালাই একরূপ নেই, ওরা পূর্ণমাত্রায় প্রবৃত্তির দাস, কুলস্মৃতি ওদের সকল কাজের উৎস। পাখীদের জীবনে আনুষঙ্গিক কয়েকটি বিষয়ের সূত্রপাত দেখা যায়: শিক্ষা অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি জনকজননী খাদ্যান্বেষণে বের হয়ে সন্তানের কথা ভুলে যায় না, আর অনেক পাখীর ব্যক্তিগত জীবনের একনিষ্ঠ প্রেমের এরূপ দৃষ্টান্ত আছে যা স্তন্যপায়ী ছাড়া অপর কিছুতে পরিলক্ষিত হয় না। মাতৃস্নেহের উন্মেষ পক্ষী বিবর্তনের পূর্ব্বেই হয়েছে, হয়ত কীট পতঙ্গের সমাজের মধ্যেই এর অঙ্কুর, কিন্তু তা বিকাশপ্রাপ্ত হয় নি, এদের মধ্যে এ বস্তুর অস্তিত্বের কথা বিশদভাবে জানা যায় না। প্রবৃত্তি-চক্রের আরম্ভ হতে পরিণতি পর্যন্ত যথোচিত উদ্দীপনা দিয়ে প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলা হয়, তার পরের সমস্ত কার্য্যকলাপ একের পর এক যেন পূর্ব্বনির্দ্ধারিত নিয়মে সম্পন্ন হয়ে যায়, এর মধ্যে বিরাম নেই, ছন্দ ব্যাহত হয় না। কাক রবিন কোকিল-ডিম বা কোকিল-ছানা অম্লান বদনে পালন করে যায়, বাৎসল্যভাব একবার জেগে উঠলে আত্মপর জ্ঞান থাকে না, সন্তান সন্তানই; নিজের ছানা হয়ত বাসাচ্যুত হয়ে নীচে পড়ে গিয়েছে (অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী কোকিলশাবক ধাক্কা মেরে ফেলেও দেয়), সকরুণ আর্তরব মাতার কানে পৌঁছচ্ছে অথচ খাবার এনে খাওয়াচ্ছে সেই ক্ষুদে রাক্ষসকে, কিন্তু ক্ষীণতর হয়ে আসে নিজ সন্তানের কণ্ঠস্বর, শেষে চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায়, জননীর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, পালিত সন্তানের পরিচর্য্যায় সে ব্যস্ত! এ সমস্ত প্রবৃত্তির অধিকারভুক্ত, স্তন্যপায়ীর বুদ্ধি-জগতে এরূপ সমস্ত নেই। সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি, সন্তান নিজের বা পরের সে গোলমেলে প্রশ্ন বিচারে নিজেকে বিব্রত করবার ইচ্ছা মোটেই নেই।

আত্মজ সম্বন্ধে স্তন্যপায়ীর ধারণা সুস্পষ্ট, দুঃস্থ শিশুর প্রতি করুণাবোধ আছে তার আপন শাবককে বঞ্চিত করে নয়। বুদ্ধির স্পর্শে পশুসুলভ জনিতৃ-যত্ন রূপান্তরিত হয় প্রকৃত মাতৃস্নেহে, আর সেইটেই হল আদিম যৌন প্রেমের সুকুমার ভাব-দ্যোতনা। মাতৃস্তননিঃসৃত দুগ্ধ অন্যনির্ভর শিশুর জীবনরক্ষার একমাত্র উপায়, শিশুর অসহায় অবস্থা মাতাকে অধিকতর মনোযোগী করেছে সন্তানের প্রতি; অধিকাংশ তৃণভোজী স্তন্যপায়ী মাতার সঙ্গে খাদ্যানুসন্ধানে বের হয়; মাংসাশী মাতা শাবককে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে শিকারে যায়, শিকার এনে শাবকদের সঙ্গে ভাগ করে খায়। অনেক সময় বন্যবানর পিতা শিকার পরে স্ত্রী পুত্র-কন্যাকে নিয়ে একত্রে ভোজ লাগায়: পরিবার তথা গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার ভিত্তির সূত্রটি পাওয়া যায় এর মধ্যে। স্তন্যপায়ী শাবক ও মাতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী নিবিড় করে তুলেছে উচ্চতম জীবের এই প্রবৃত্তি। স্তন্যপায়ীর বুদ্ধিদক্ষতা গড়ে উঠে শিক্ষার মাধ্যমে, মাতাপিতার অভিভাবকত্বে থাকবার সুযোগ যে জাতের যত অধিক তাদের তত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও কৌশলী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। কাঠবিড়াল শজারু ছুঁচোর মত অনুন্নত স্তন্যপায়ীরা সন্তানকে অল্প কিছুদিন আশ্রয় এবং দুধ, পোকামাকড়, মাংস প্রভৃতি খাদ্য সরবরাহ করে খালাস। তাদের শুধু মাতৃস্নেহ নয়, কোন প্রবৃত্তিই বুদ্ধিবৃত্তি অথবা অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ সুবিধা পায় না: ফলে প্রবৃত্তি কেবলমাত্র প্রবৃত্তিই থেকে যায়, বুদ্ধি বিবেচনার সহযোগিতা বিরহিত হয়ে যন্ত্রবৎ কাজ করে। অন্য পক্ষে বৈড়াল গোষ্ঠী, সীল সিন্ধুঘোটক জাতীয় উচ্চশ্রেণীর মাংসাশীদের মাতৃস্নেহ খাদ্য যোগানেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সুদীর্ঘকাল ধরে কাছে রেখে শিকার ধরা শিক্ষা দিতে, আক্রমণ পলায়ন থেকে আরম্ভ করে নিজের সকল অভিজ্ঞতা সন্তানের মনে অনুপ্রবিষ্ট

করে দিতে এরা ত্রুটি করে না। শিকারী পশুদের মাতৃস্নেহ ঔদার্য্যে, নমনীয়তায় আদর্শস্থানীয়। কুকুর-বিড়ালমাতা প্রায়ই অপরের শাবক প্রতিপালন করে, কিন্তু অশ্ব ছাগল-ছানা পালন করেছে বা গাভী মেষশাবককে খাওয়াচ্ছে এমন দৃষ্টান্ত কয়টা আছে? কার্লগ্রুজ এক স্নেহশীল কুকুরের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন যে, সে অসহায় কুক্কুট শাবককে ঠিক মানুষের মত অসীম ধৈর্য্য সহকারে পালন করেছিল; আবার, এক বিড়াল মুরগী-হাঁস-ছানাকে অত্যন্ত স্নেহ করত। একসঙ্গে চারিটি সন্তান প্রসব করবার পর তার কাছে সদ্যো-জাত ছয়টি কুক্কুটছানা এল, তার পক্ষে এগুলোকে উপেক্ষা করাই স্বাভাবিক, কিন্তু আশ্চর্য্য, সে দিনের পর দিন ঐ পালিত সন্তানদের নিজ সন্তানদের সঙ্গে পরম স্নেহে লালনপালন করতে লাগল, কুক্কুট ছানাগুলো ঠুকরে ঠুকরে গলা লোমশূন্য করে দিলেও সে নির্ব্বিকার। বানর বনমানুষের মাতৃস্নেহের পরিধি আরও ব্যাপক ও উদার। সমস্ত উচ্চশ্রেণীর স্তন্যপায়ীর মধ্যে মাতৃস্নেহের প্রভাব বিস্তৃত ও তীব্র। রোমানিজ একটি তিমিমাছের অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহের কথা উল্লেখ করেছেন: গত শতাব্দীতে উত্তরসাগরে একটি বাচ্চা তিমিকে হার্পূণবিদ্ধ করে জাহাজে তোলা হয়, কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল এক বৃহদায়তন মাদী তিমি জাহাজটির পাশে ভেসে উঠে সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতবেগে চলতে সুরু করেছে—একবার ডোবে আবার ভেসে ওঠে, জাহাজের সঙ্গ ছাড়ে না, নিরতিশয় বেদনায় ছটফট করতে থাকে, নিজের বিপদ অগ্রাহ্য করে সন্তানকে রক্ষার স্থির ও অদম্য সঙ্কল্প তার মনে। নাবিকরা অবশেষে হার্পূণের পর হার্পূণ মেরে ঘায়েল করেছে, তবু সে একবারও পালাবার চেষ্টা করে নি। অবশেষে নাবিকদের হার্পূণের আঘাতেই তার সকল ব্যথার অবসান হয়েছে। মাতৃস্নেহের এই যে অপূর্ব্ব রূপ, শাবকরা বিপন্ন হলে লের সমস্ত সমর্থ ও শক্তিশালী প্রাণী ছুটে আসে সাহায্যার্থে; র দুঃখ-দুর্দ্দৈবের একটি কাতর আহ্বান পক্ষীমাতাকে ন্তানের পাশে টেনে আনে, সেই আর্ত্তরব স্তন্যপায়ী-জগতে কল সবল সক্ষম পুরুষকে উত্তেজিত করবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত। শকারে সহযোগিতা যূথ-বিকাশের ভিত্তি এ কথা সত্য, বে যূথের ঐক্য ও সংহতি বিধানের মূলে স্নেহ-করুণার প্রভাব অপরিমিত। কেবল আত্মরক্ষা এবং আক্রমণের ারা যূথজীবন স্থায়ী হতে পারে না, সেখানে দাম্পত্য প্রেম মাতৃস্নেহের মধুর দিকটি সুস্পষ্ট। এইজন্য স্তন্যপায়ী ীবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সংহতি বা ঐক্যের কোন সম্ভাবনা ছল না, পরস্পরের প্রতি সহজ ও স্বাভাবিক সহানুভূতি কে সহযোগিতা এবং সর্ব্বক্ষেত্রে এরূপ সাহায্য পরস্পরের ম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করে তুলেছে। যূথের প্রয়োজনীয় বিকাশ ঘটেছে এইদিক থেকে। মানুষের সমাজগোষ্ঠী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূলে স্নেহ-প্রীতির প্রভাব যথেষ্ট। পরিবার প্রতিষ্ঠার মূল জনন-বৃত্তি ও সুকুমার বৃত্তির সমন্বয়, অনুদার আত্মানুরাগ প্রবণতা অবদমিত হয়েছে শ্রমসাধ্য সন্তান-পরিচর্য্যায়। গোষ্ঠী তথা সামাজিক সমৃদ্ধির পক্ষে বিবাহ যেমন অপরিহার্য্য, পিতামাতার কর্ত্তব্য ঠিক অনুরূপ—তাই প্রত্যেক ধর্মে সামাজিক অনুশাসনে সংস্কারে এই দুইটির সবিশেষ প্রাধান্য লোকাচার থেকে আরম্ভ করে দেশজ আইন কানুন প্রভৃতি এদের বৈধ করেই ক্ষান্ত থাকে নি, পবিত্র ভাবব্যঞ্জনা দিয়ে উচ্চ আদর্শজাত করা হয়েছে।

স্তন্যপায়ী জীবের অভ্যুদয়ের কিছু পূর্ব্ব হতে সন্তানরক্ষার দায়িত্ব স্থূল অপরিণিত অবস্থা পরিত্যাগ করে ক্রমশঃ মানসিক বোধের পর্য্যায়ভুক্ত হচ্ছিল। প্রথমতঃ, সন্তান জন্মসংখ্যা প্রভূত পরিমাণে কমে আসায় লালন-পালনের দায়িত্ব সহজ হয়ে এল। শত শত আত্মজকে রক্ষা করা অসম্ভব, সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দু-চারটিতে এসে দাঁড়াতে সুষ্ঠুরূপে দেখাশোনার অবসর মিলল, সেই সঙ্গে বাড়ল ঘনিষ্ঠতা ও স্বজনবোধ। দ্বিতীয়তঃ, পক্ষী ও উচ্চশ্রেণীর জীবের শৈশব-অসহায়ত্ব আমূল পরিবর্ত্তন করে দিল পিতামাতার স্বভাব। ক্ষীণ দুর্ব্বল আত্মজকে উপেক্ষা করা কঠিন, মনের সুকুমার ভাব দানা বেঁধে আসাতে মাতৃস্নেহের মাধ্যমে আনন্দের স্বাদ অনুভূত হতে লাগল, দৃঢ়তর হয়ে উঠল আত্মজ ও পিতামাতার সম্পর্ক। সন্তান পালনের দায়িত্ববোধ উচ্চ-জীবকুলে নিবিড়ভাবে অনুভূত। জাতি রক্ষায় প্রযুক্ত বলে অপর সমস্ত প্রবৃত্তিকে ছাপিয়ে উঠেছে এই প্রবৃত্তি, মাতৃশক্তির নীরন্ধ্র সমাবেশ এখানে, ব্যক্তিগত দুঃখদৈন্য ক্লেশ এমনকি মৃত্যু পর্য্যন্ত এর কাছে তুচ্ছ।

স্তন্যপায়ীদের মধ্যে ক্যাঙারু ওপসম ওলাবী সর্ব্বাপেক্ষা আদিম, এরাও সন্তানকে দেহসংলগ্ন থলিতে নিয়ে বেড়ায়। প্রসবান্তে থলিতে রাখবার বুদ্ধি নেই, সন্তান অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে নিজেই থলিতে প্রবেশ করে। প্রবেশ-পথও অনিশ্চিত; শিশু প্রায়ই ভুল করে বিপথে চলে যায়, মাতার ভ্রূক্ষেপ থাকে না। মায়ের কোলে পিঠে থেকে জাতীয় বিশেষত্ব শিক্ষা করে অনেকেই। জলহস্তী-বীবর সিন্ধু-ঘোটকের শাবক সন্তরণের পাঠ গ্রহণ করে স্কন্ধে চড়ে; চামচিকে অসহায় অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, তখন মাতার পক্ষপুটই তার আশ্রয়, প্রথমে মাতৃদুগ্ধ, পরে চর্ব্বিত ফলপাতা তার আহার। বানর, বনমানুষ ও মানুষের সন্তানপালনে বিশেষ পার্থক্য নেই, মাতাপিতা ও সন্তানের কর্ম্মপ্রবৃত্তি পারস্পরিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে সংস্থাপিত ও সংহত। মানবী তার শিশু-সন্তানকে খাওয়ানো, পরিচ্ছন্ন রাখা এবং

ছিল তাহাও নহে, উপরন্তু যে সকল শিল্পের সহিত বহু পল্লীবাসীর স্বার্থ ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। আবহাওয়া অনুকূল, এক কালে যেমন ছিল তেমনই আছে ব্যবহারের রীতির খুব পরিবর্ত্তন হয় নাই, উপরন্তু নূতন দেশে নূতন ধরণের ব্যবহার প্রচলিত হওয়ায় চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে, অথচ ক্রমেই সেই শিল্প বিব্রত হইয়া পড়িয়া অপর দেশকে পথ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেছে।

মৃৎশিল্প, কাংস্য, পিতল, শর্করা, শঙ্খ, বয়ন, কৃষি-যন্ত্রপাতি, ঘানি প্রভৃতি সকল শিল্পই এই শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু দেশ-বিদেশের চাহিদা ও ব্যবহারের কথা ধরিলে বয়ন-শিল্প, বিশেষতঃ রেশম-শিল্পকে একটা বিশেষ স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

রেশম শিল্পের দুইটি প্রধান ও স্বতন্ত্র দিক আছে। প্রথম, গুটি-পালন হইতে রেশম "লাটাই" বা ছড়ি করা আর, দ্বিতীয়, ছড়ি রেশমকে বয়ন করিয়া বস্ত্রে রূপান্তরিত করা। দুঃখের বিষয়, অপরাপর ভারতীয় বহু শিল্পের মত রেশম-শিল্পের বিভিন্ন স্তরে অন্যান্য দেশ, বিশেষতঃ জাপান, যে সকল উন্নতিসাধন করিয়াছে, আমাদের দেশে তাহা হয় নাই। ক্রমে সমগ্র রেশম-শিল্প যে পর্য্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সরকারী সাহায্যদানে, রোগীর শ্বাসকষ্টে যেমন অক্সিজেন দিবার ব্যবস্থা আছে, সেই ভাবে ইহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা হইতেছে।

অক্সিজেন দিয়া মানুষকে চিরকাল বাঁচাইয়া রাখা যায় না। ভিতর হইতে জীবনীশক্তি প্রবল হইয়া বায়ুমণ্ডল হইতে শ্বাসগ্রহণ করিতে সমর্থ হইলে স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়া উপনীত হওয়া যায়। আমাদের দেশের রেশম প্রভৃতি শিল্পকে সেই অবস্থার সহিত তুলনা করিতে হয়। আজ সরকারী সংরক্ষণ-ব্যবস্থার সাহায্যে ইহাকে বিদেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে রক্ষা করা হইতেছে। কিন্তু যাহা কিছুই করা যাক, তাহাতে পণ্যের দর নিতান্ত বেশী পড়িয়া গেলে লোকে ক্রয় করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। নিতান্ত প্রাণধারণের জন্য অন্ন ও লজ্জানিবারণের বস্ত্র হইলে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু রেশম সে পর্য্যায়ভুক্ত নহে। সুতরাং সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হয় যে, ক্রমে লোকে রেশম ব্যবহারে অনভ্যস্ত হইলে, চাহিদা হ্রাস পাইবে। পূর্ব্বে নৈষ্ঠিক ক্রিয়াকর্ম্মে ক্ষৌম বা রেশম-বস্ত্র পরিধানের একটা রীতি ছিল, আজ তাহা বিলুপ্তপ্রায়। সুতরাং বিশেষাদিনী মার্কিন নারী আজ রেশমের প্রধান ক্রেতা, তাহা নহিলে ভারতবাসীর গৃহে অচল হইয়া পড়িবে।

বিদেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রেশম-বস্ত্রের চাহিদা হ্রাস, রেশম-ছড়ি প্রস্তুতে অবহেলা, রেশমের গুণাগুণ বিচারের বিধিব্যবস্থার অভাব, বিক্রয়-কারের উপদ্রব প্রভৃতি কারণে রেশম আজ বিপন্ন। কেবল রক্ষণ-শুল্ক প্রভৃতির সাহায্যে ইহার দুর্দ্দশার প্রতিকার অসম্ভব; যথারীতি উৎকর্ষসাধন ও মূল্যহ্রাস করিতে না পারিলে রেশম-শিল্পের উদ্ধার পাইবার সম্ভাবনা নাই।

আজ রেশম-শিল্প সম্বন্ধে যে দোষ-ত্রুটি প্রযোজ্য, ভারতীয় অন্যান্য বহুতর শিল্পের মধ্যেও তাহা প্রবেশ করিয়াছে। রক্ষণের একটা সাহায্য-কাল নির্দ্ধারিত করিয়া শিল্পের মূল উন্নতিসাধনই সকলের লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে এক কালে এই সকল শিল্পের আত্মরক্ষা করা সহজ হইতে পারিবে।

কার্য্যক্ষেত্রে যাহা ঘটিতেছে, তাহা প্রয়োজনের বিপরীত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ পর্য্যন্ত যে সকল চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে রেশম-শিল্পের উন্নতির সহায়ক বিশেষ কিছু হয় নাই, সুতরাং তাহা বাঁচিয়া উঠিবার বা তাহার পক্ষে বাঁচিয়া থাকিবারও যথেষ্ট শক্তি-সঞ্চয় হইতেছে না। এদিকে বিদেশী কৃত্রিম রেশম ত ছিলই, দেশেও তাহা উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতেছে। এরূপ রেশমের দাম কম, দরিদ্র দেশের লোকের রেশমের সখ মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে হইবার কথা।

এ দেশের শিল্পের দুরবস্থার এইখানেই শেষ নয়। বিদেশের শিক্ষা আমাদের কাজে লাগে না, উপরন্তু তাহা অর্জ্জন করিতে যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহাই ক্ষতির পর্য্যায়ে পড়ে। জাপানে বহু শিক্ষার্থী গিয়াছেন, কিন্তু তাহা আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয় নাই। মানুষের জীবনে যেমন গতানুগতিক ধারা আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে, কুটীর-শিল্পের ক্ষেত্রেও সেই এক অবস্থা বর্ত্তমান। কোনও এক দেশের জ্ঞান অপর দেশে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হয়ত সম্ভব হয় না। দেশের আব-হাওয়া, লোকের সংস্কার, রুচি প্রবৃত্তি, পুরাতন প্রথার প্রতি মজ্জাগত অনুরাগ, কর্ম্মে প্রেরণা ও কুশলতা অর্জ্জন দেশভেদে বিভিন্ন হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু পুরাতনের সংস্কার করিয়া নূতন ব্যবহার সাথে তাল রাখিয়া চলিতে শিক্ষা করা সকল জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাতে যে জাতি অক্ষম তাহা মৃত্যুর লক্ষণ, অর্থাৎ সেই জাতির জনশিল্প লোপ পাইবার পথে চলিয়াছে।

রেশম যেন বিদেশী আমদানীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া হটিতেছে, কিন্তু এমন ত সহস্র শিল্প আছে যাহা পল্লীর নিজস্ব, যাহা অবহমানকাল দেশের লোকের প্রয়োজন অন্ন যোগাইয়া আসি-য়াছে এবং এখনও বহু লোক যাহার উপর নির্ভর করিয়া আছে, কিন্তু আজ তাহা দুর্ব্বল তাহার শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। দেশে উৎপন্ন বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্য দ্রব্যকে আজ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। মাটির পাত্রের বিপক্ষে চীনা-মাটি, এনামেল, কাচ, এলু-মিনিয়ম, প্লাষ্টিক,—এতগুলি শত্রু জুটিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই দেশে প্রস্তুত হইতেছে। পিতল কাঁসা যে প্রতিপক্ষতা করিয়াছে, তাহা সস্তা মৃৎপাত্র সহজেই সহ্য করিয়াছে; তাহা ছাড়া আবার পিতল, কাঁসার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু উচ্চস্তরের হওয়ায় দুইটা বা বড় একটা শিল্প গড়িয়া উঠিবার সুযোগ হইয়াছিল। এখন তাহারাও বিব্রত, মৃৎশিল্পের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চলিয়াছে।

দেশীয় পল্লীশিল্প রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে দেশীয় 'বড় শিল্পজাত পণ্যের উপর বিবিধ কর ধার্য্য হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে তাহাও রক্ষণশুল্ক। কলের কাপড়, তেল, চিনি, দিয়াশলাই প্রভৃতির উপর ধার্য্য করা বহুবিধ ট্যাক্স সাহায্যে উৎপাদন-প্রসার-চেষ্টা ব্যাহত

যাত্রী ক্লাবের সদস্যদেরও এগিয়ে আসতে হবে। তাঁদের ভাবা দরকার যে, নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের বিনিময়ে ও অন্ধ সংস্কারবোধে ভবিষ্যৎ সন্তানের সু-উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা নিষ্পিষ্ট হতে চলেছে। দেশের ইস্কুলে অর্থকরী বিদ্যা না শিখিয়ে প্রচলন করতে হবে সামরিক শিক্ষা। একদা ভারতের সন্তানেরা শৌর্যে ও বীর্যে দেশ-দেশান্তরে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। অতীতের সেই মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আজ মেয়েদের জন্যে পৃথক ইস্কুলের কোন আবশ্যকতা আছে বলে মনে হয় না। যারা পুরুষের পাশে দাঁড়াতে ভয় পান, তাঁরা কোনদিনই আত্মরক্ষায় সক্ষম হবেন না। যুবশক্তিরও আজ জানা দরকার যে, কেবলমাত্র রাণা প্রতাপ, শিবাজী বা টিপু সুলতানের ভূমিকায় অভিনয় করে দেশে বীরের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারবেন না। নকল অভিনয় করে যে অর্থব্যয় হয়—তা দিয়ে দেশের সত্যিকারের অনেক কাজ হয়। অমিতব্যয়ী ব্যক্তি দেশের শত্রু। এদের পরিপোষক যারা তাঁরাও সমান অপরাধী। এই দুর্দিনেও যদি প্রত্যেকে আমরা ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং আনন্দ নিয়ে মত্ত থাকি, তা হলে আমাদের সাধনা কি নিষ্ফল হবে না? অপরিসীম অর্থনৈতিক দুর্দশার অবসান কি কোনদিনই সম্ভব হবে?

উৎসাহীরা খুব হাততালি দিলেন। কিন্তু গ্রামের মধ্যে ছি-ছি পড়ে গেল। সকলের মুখে একই কথা, হোক না ডেপুটির মেয়ে, কলকাতার কলেজে পড়ে—ছোট মুখে বড় কথা শোভা পায় না। ছিঃ ছিঃ।

বৃদ্ধদের আড্ডাতেও আজ এই কথা। ন্যায়তীর্থ মশায় ঢুকতেই বাচস্পতি মশায় বললেন, শুনেছ ভায়া, আমাদের সন্দীপের মেয়ের বক্তৃতা—

পাশ থেকে ঘোষাল মশায় অবজ্ঞার হাসি হেসে টিপ্পনী কাটলেন, আমাদের বলে কিনা গঙ্গাযাত্রী। ওরে বাবা, এই গঙ্গাযাত্রীরা বেঁচে আছে বলে এখনো সমাজ-শৃঙ্খলা বজায় রয়েছে।

ন্যায়তীর্থ মশায়কে গ্রামের 'পোপ' বললেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি সনৎ গাঙ্গুলীর পাশে বসে নাকে নস্যি গুঁজে বললেন, অর্বাচীনের কথা ধর্তব্যের মধ্যে না আনাই শ্রেয়।

বাচস্পতি মশায়ের মনঃপূত হ'ল না কথাটি—বেশ বোঝা গেল। তিনি উত্তেজিতভাবে বললেন, ঘোর কলি ভায়া, নইলে ঐ একরত্তি মেয়ে বলে কিনা গড়তে হবে নতুন সমাজ—যে সমাজে শান্ত শিষ্ট নারীকেও প্রয়োজনবোধে হাতিয়ার নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে আমাদের সনাতন সমাজ—যে সমাজের আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।

বেঁচে থাকলে আরও কত কি শুনতে পাব। এখন আমাদের প্রতিবাদ করবার মত গলার জোরও নেই, ক্ষমতাও নেই—জের টেনে গেলেন ঘোষাল মশায়।

আমরা এখনও মরি নি যে সমাজের বুকে বসে যার যা খুশি তাই করবে—ক্রোধান্বিত হয়ে জানালেন বাচস্পতি মশায়।

সনৎ গাঙ্গুলী দু'হাতের চেটোয় ক্রমাগত ঘুঁটি ঘসছিলেন মনোমত দান ফেলবার আশায়। কানের কাছে নিয়তই টে কথাই-টে কথাই করাতে বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন, এটা ধুতি-চাদরের দেশ, গঙ্গার দেশ—এখানে বিলিতী বুজরুকি খাটবে না। এখনো চন্দ্র-সূর্য উঠছে, এখনো বেদ-পুরাণ লোপ পায় নি। যদি মুখের কথাতেই সামাজিক প্রথা উল্টে দেওয়া যেত, তা হলে এদেশে সংস্কৃতি, সভ্যতা বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকত না।

বাচস্পতি মশায় বাধা দিয়ে বললেন, তুমি ভায়া কোন খবরই রাখো না। দেশের সবাই এখন হুজুগে মেতেছে। কালই দেখবে খবরের কাগজে এ নিয়ে আন্দোলন সুরু হয়েছে। তখন ঘর সামলানো দায় হয়ে উঠবে।

এই কথায় সনৎ গাঙ্গুলীর পূর্ণ সমর্থন পাওয়া গেল। মাথা নেড়ে তিনি জানালেন, ঠিকই বলছ রমাপতি, প্রতিবাদ প্রয়োজন।

তখনি ঠিক হ'ল কাল সকালে সকলে মিলে সন্দীপের কাছে গিয়ে মেয়ের ঔদ্ধত্যের ও হঠকারিতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করবেন। সন্দীপ তেমন ছেলে নয়। দেব-দ্বিজে তার ভক্তি অগাধ। একথা শুনে সে মেয়েকে শাসন করতে বাধ্য হবে।

আবার হাড়ের ঘুঁটির খটাখট শব্দ হ'ল। বারো পাঞ্জা সতেরো—উঁচু হয়ে বসে হেঁকে উঠলেন সনৎ গাঙ্গুলী।

অপরাহ্নের স্তিমিত সূর্যালোক পাঁচ মন্দিরের চূড়ায় ঝিকমিক করছে। বেলা পড়ে আসছে। তার উপর কাল থেকে বেজায় শীত পড়েছে। তবু পালেদের খিড়কির পুকুরের শান-বাঁধানো ঘাট জনশূন্য নয়। কায়েত-পিসি চাল ধুতে ধুতে মুখুজ্যেদের ছোট-বৌ অতসীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, তুমি বৌমা যাই বল, মেয়েমানুষের মুখে ওসব কথা মানায় না। হ'লই বা সে হাকিমের মেয়ে। বলি, সংসার তো তাকেও করতে হবে। ধাড়ীবুড়ো মেয়ে চিরকাল তো আর লম্বা লম্বা বুলি আওড়ালে চলবে না? পরেশ পালের বৌও ত কলেজে পড়া মেয়ে। কোনদিন তার মুখে একটা রা' শুনেছ? কলেজে পড়লে সবাই অমন ধিঙ্গি হয় না।

বামুন-খুড়ীমা ঘড়ায় জল ভরতে এসেছিলেন। মনের মত কথা শুনে না বলে থাকতে পারলেন না, ওটো পাস করে ও যেন সাপের পাঁচ পা দেখেছে। সংসারে একবার ঢুকলে সব জুরজুরি ভেঙে যাবে। শুনতে পাই ত বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে—হলে আমরা বাঁচি। নিত্য নূতন হুজুগের ঠেলায় আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। বলতে যাও দিকি কোন কথা, অমনি মা-মেয়ে তেড়ে আসবে। নিজেদের বেলায় দোষ নেই—যত দোষ নন্দ ঘোষ।

শুনলে ত বৌমা—খুড়ী ত আর মিছে কথা বলবে না। রসান দিলে কায়েত-পিসি।

শহরে মেয়ে এবং আধুনিকা হয়েও অতসী কিছু না বলে মাজা বাসনের গোছা নিয়ে উঠে গেল।

ময়রা-গিন্নী উঠে যাচ্ছিলেন ভিজে-কাপড়ে। এই কথা শুনে ফোঁস করে তেড়ে এলেন, বড়লোকদের কথায় আর যদি কখনও বিশ্বাস করি! বলি, সেবারের কথা মনে আছে ত ঠাকুরঝি? দেশ-

সুদ্ধ লোক মোটা চট পরে পরে মরল আর ওনারা দিব্যি মিহি কাপড় পরে ঘুরে বেড়ালেন। ধাঁওতায় আর ভুলছি নে। আগে দেখব ওরা এগিয়েছে—তবে এগোব।

কথাটা কায়েত-পিসির খুব মনে ধরল। বললেন, নেড়া এক বারই বেলতলায় যায়।

বামুন-খুড়ীমা বললেন, ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় করবে যত, ওরা ততই পেয়ে বসবে। ডেপুটি-গিন্নীর কানে একথা তোলা দরকার। তবে যদি ওদের চেতনা হয়।

কায়েত পিসি চিরদিনই স্পষ্টভাষিণী ও নির্ভীক। তিনি বললেন, আমার সঙ্গে যদি কেউ যায়, ডেপুটি-পরিবারের জারিজুরি ভেঙে দিয়ে আসতে পারি।

সবাই যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কাল সকালে যাওয়াই স্থির হ'ল।

ভর সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। রাস্তার আলো জ্বলে উঠল। মডেল গার্লস ইস্কুলের হেডমিস্ট্রেসের ঘরে এখনও শিক্ষয়িত্রীরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সকলের মুখেই উদ্বেগের চিহ্ন। ইস্কুল উঠে গেলে বিপন্ন হতে হবে সবাইকেই। কাজেই ছুটির পর বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আজ সবাই সমান উদাসীন।

হেডমিস্ট্রেস এম-এ, বি-টি। বুদ্ধিমতী, বহু ইস্কুল-ফেরত। বয়সের অভিজ্ঞতায় ও বিভিন্ন লোকের সম্পর্কে এটুকু জ্ঞান তিনি অর্জন করেছেন যে, বিরোধিতার অবসান ঘটাতে গেলে প্রতিবাদ চালিয়ে কোন লাভ হবে না। সিপ্রাকে মুঠোর মধ্যে আনার চেষ্টা করাই যুক্তিসঙ্গত। স্থানীয় অধিবাসিনী হিসাবেও বটে, এবং সিপ্রার সহিত বন্ধুত্বের খাতিরেও বটে, শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে এ বিষয়ে অমিয়ার সাহায্য একান্ত আবশ্যক। তাকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, চিঠি করে কোনই ফল হবে না। তার চেয়ে সিপ্রাকে এক দিন ইস্কুল দেখাবার নাম করে এইখানে নিয়ে এলেই কাজ বেশী হবে।

জবাবে অমিয়া জানালে, সিপ্রাকে আপনি চেনেন না হৈমদি। ওর পেছনে আছে সবুজ-সঙ্ঘ। তাদের উস্কানিতেই ত সে এই সব করে বেড়াচ্ছে।

এই কথা শুনে হেডমিস্ট্রেসের আরও দমে যাবার কথা। কিন্তু তিনি স্বকীয় গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললেন, অমন যে জাঁদরেল ইন্সপেকট্রেস মিস দত্ত তাঁকেও যখন ঠিক করতে পেরেছি, সিপ্রাকে না পারবার কোন কারণ নেই। দু'এক দিনের মধ্যেই যাতে তাকে ইস্কুলে নিয়ে আসতে পার, সেই চেষ্টাই এখন কর। আদর-আপ্যায়নের পর সাধারণতঃ তার মন একটু না একটু নুয়ে পড়বেই। তখন তাকে বুঝিয়ে দেওয়া খুব শক্ত হবে না যে স্বাধীনতা, প্রত্যেক নরনারীই কাম্য। কিন্তু মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষসাধন ব্যতীত অন্তরে প্রকৃত স্বাধীনতাবোধ জাগতে পারে না। শিক্ষা সেই উৎকর্ষসাধনের বাহক। সুতরাং একমাত্র শিক্ষার ভেতর দিয়েই সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব-ভাব অন্তরে জাগিয়ে দেওয়া সম্ভব।

অমিয়া সহসা বলে উঠল, সিপ্রা অত সহজে ভোলবার মেয়ে নয় হৈমদি। দেখবেন তখন সে হাজার নজির দেখাতে সুরু করে দেবে।

হেডমিস্ট্রেস বললেন, আগে আমার কথা শেষ করতে দাও। এতেও যদি দেখি সে বাগ মানছে না, তখন যেমন করে মৈমনসিংহের মিসেস সুতপা মুখার্জিকে হাত করেছিলাম সেই ব্যবস্থা করব। সবাই গিয়ে হাজির হব তার বাড়ীতে। প্রথমতঃ, আমাদের সবাইকে দেখে সে নিজেকে খুব বড় বলে মনে করবে, তার পর যখন শুনবে যে আমরা তাকে অনুনয় জানাতেই এসেছি, দেখি তখন সে কেমন করে আর বিরোধিতা করবে?

এই কথা শুনে সকলের ধড়ে যেন প্রাণ এল।

অমিয়া সোৎসাহে জানালে, নামের দিকে সিপ্রার বিশেষ দুর্বলতা আছে। ঠিক হয়েছে, কাল আমরা সবাই এখানে আসব। আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে হৈমদি।

হেডমিস্ট্রেস সানন্দে সম্মতি জানালেন। সবাই খুশীমনে বিদায় নিলে।

সাতটা বাজল।

নবারুণ নাট্যসমাজে সাতটা থেকে ফুল রিহার্সাল হবার কথা। সবাই এসে জমেছে। কিন্তু সে উৎসাহ নেই—প্রত্যেককে দেখে মনে হয় যেন ভেঙে পড়েছে। সিপ্রার এই নির্ভীকতার পিছনে অনেকের সহযোগিতা আছে, সে বিষয়ে সবাই যেমন একমত, তেমনি আবার অনেকে বিরুদ্ধাচরণ করতে ভয় পাবে এটাও সুনিশ্চিত। হালদার মশায়ের প্রাঙ্গণে অভিনয় হবার সব ঠিকঠাক। তিনি আবার যেরূপ ভীরু প্রকৃতির তাতে এত কাণ্ডের পর রাজী হবেন বলে ত মনে হয় না। তা ছাড়া ক্লাবের সেক্রেটারী অরিন্দমের উপর সিপ্রার যথেষ্ট প্রভাব আছে। এই নাটকে রামের ভূমিকায় অভিনয় করবে সে। সে যদি বেঁকে বসে তো এ বৎসরের মত নাটকের দফা গয়া। তার অনুপস্থিতি তাই সকলের মনকে আরও নিরুৎসাহে ভরিয়ে তুলেছে।

আটটাও যখন বেজে গেল, কেষ্ট আর চুপ করে থাকতে পারলে না, বললে, অরিন্দম যে শেষ পর্যন্ত ডোবাবে, এ আমি আগেই জানতাম। তখন পই পই করে বলেছিলাম যে, অষ্টমী পূজোর দিন নামিয়ে দাও। তখন দিলে এই হাঙ্গামার মধ্যে ত আর পড়তে হ'ত না!

হাবু একমনে বিড়ি টানছিল। সখের থিয়েটারে বিভিন্ন গ্রামে অভিনয় করে যশ ও প্রতিষ্ঠা সে অর্জন করেছে। সেই সূত্রে অনেকের সঙ্গে তার সদ্ভাবও আছে। বিড়িতে জোরে টান দিয়ে বললে, হাজার বাগড়া দিলেও কেউ আমাদের প্লে বন্ধ করতে পারবে না। পঁচিশে আমরা করবই। হালদার মশায় রাজী না হন, গুড়েদের রথতলায় হবে। অরিন্দম না করতে চায় নৈহাটি থেকে রাম 'বরো' করে নিয়ে আসব।

চন্দ্রশেখর বলে উঠল, জোর করে প্লে করতে গেলে আরও কেলেঙ্কারী হবে। সবুজ-সঙ্ঘ মনে করলে সব পারে।

দেখুন, কেন ডাল্‌ডা বনস্পতি সব রকম রান্না-বান্নার পক্ষে সবচেয়ে ভাল।

"এখন ডাল্‌ডা দিয়ে রান্না করি ব'লে আমাদের পরিবারের সকলেই কেমন আনন্দ ক'রে খায়।"

এখন ডাল্‌ডা দিয়ে রান্না করি ব'লে আমাদের পরিবারের সকলেই সব রান্না খায়।

তার কারণ ডাল্‌ডা সত্যিই খাবার-দাবারের স্বাদ-গন্ধ ফুটিয়ে তোলে।
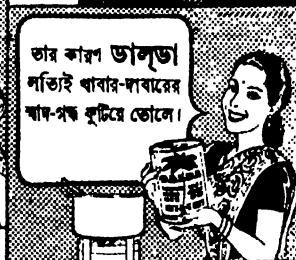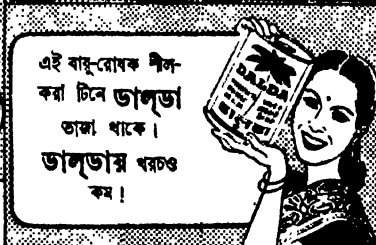
এই বায়ু-রোধক শীল-করা টিনে ডাল্‌ডা তাজা থাকে। ডাল্‌ডায় খরচও কম!

ডাল্‌ডার এই পাকপ্রণালীটি পরীক্ষা

ক'রে দেখুন—চমৎকার রান্না—মুর্গী-মশালা!

বেশ বড় বড় টুক্‌রো কোরে মুর্গীটা কেটে নিন। পাত্রে তিন বড় চামচ ডাল্‌ডা নিয়ে তাতে মুর্গীর টুক্‌রোগুলো, থেঁতো করা রসুন, আদা আর পিঁয়াজ, চার ফালি কোরে কাটা দুটি টোমাটো, দু চা-চামচ ধনে গুঁড়ো, এক চা-চামচ হলুদ গুঁড়ো ও দুকাপ জল দিন। নরম হওয়া পর্য্যন্ত রান্না করুন।

বাংলায় ডাল্‌ডা রন্ধন পুস্তক বেরুলো! ডাল্‌ডা রন্ধন পুস্তক এখন বাংলা, হিন্দী, তামিল ও ইংরিজিতে পাবেন। ৩০০ পাকপ্রণালী, তা ছাড়া স্বাস্থ্য, রান্নাঘর ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য বিষয়। দাম মাত্র ১৲ টাকা আর ডাকমাশুল বাবদ ১০ আনা। আজই লিখে আনিয়ে নিন:-

দি ডাল্‌ডা এ্যাড্‌ভাইসারি সার্ভিস্, পোঃ. আঃ, বক্স নং ৩৫৩, বোম্বাই ১

ডাল্‌ডা

সকল রকম রান্নার পক্ষে অতুলনীয়

১০, ৫, ২ ও ১ পাউণ্ড্ টিনে পাওয়া যায়

HVM. 101-X52 BG

বংশের প্রপিতামহের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটির সংস্কার হ'ল। তোমাকে আর কি বলে আশীর্ব্বাদ করব, তুমি রাজ্যেশ্বর হও।

বাচস্পতি মশায়ের দেখাদেখি সবাই উঠে দাঁড়ালেন।

গুপ্ত সাহেব উপরে গিয়ে দেখলেন, সবাই খুশীমনে চলেছেন। পাইপ বেঁকিয়ে ধরে সেই দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন।

বেলা বাড়ল।

কায়েত-পিসি জোট বেঁধে ডেপুটি-পরিবারকে নালিশ জানাতে বেরুলেন। গেট খোলা। কিন্তু ঢুকেও ভয়ে বেরিয়ে পড়তে হ'ল। কালো ঝাঁকড়া কুকুরটা এমন ভাবে তেড়ে এল যে, কামড়ে দেয় আর কি? ছুঁয়ে ফেললে যাঁদের নাইতে হয়, কামড়ে দিলে বোধ হয় স্বর্গের পথও তাঁদের বন্ধ। সেই ভেবে কেউই আর এগোতে সাহস করলেন না।

কায়েত-পিসি আমগাছের আড়ালে এসে বললেন, আজকালকার বড়লোকদের সবই কি অনাসৃষ্টি।

বামুন-খুড়ীমা জের টেনে বললেন, কুকুর পোষা মানে আর কিছুই নয়, গরীব ভিখিরীদের ঢুকতে না দেওয়া—

কুকুরটা হঠাৎ আবার তেড়ে এল সশব্দে। পশ্চাদপসরণ সাফল্যমণ্ডিত হ'ল, নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। কিন্তু মুখুজ্জো-গিন্নী আর একটু হলে মিলিটারী লরী চাপা পড়তেন।

এমন দিনকাল পড়েছে যে এগোলেও বিপদ, পিছোলেও বিপদ। কায়েত-পিসির মন্তব্য শুনে তর্করত্ন-গৃহিণী জানালেন, হনুমানদের জ্বালায় কি রাস্তায় হেঁটে সুখ আছে দিদি!

ডেপুটি-পরিবার জর্জ্জেট শাড়ী পরে মোটরে বেরুচ্ছিলেন। কনভয়ের জন্যে গেট থেকে বেরিয়েই আটকে পড়লেন। তাঁকে দেখে সবাই গিয়ে ছেঁকে ধরলেন।

ডেপুটি-পরিবার কায়েত-পিসিকে উদ্দেশ করে বললেন, আপনার নাতির চাকরির কথা বলে রেখেছি। পাশ না হলে ত আর ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না।

কায়েত-পিসি উত্তরে জানালেন, সে ত ঠিক কথাই মা—

তর্করত্ন-গৃহিণী এগিয়ে গিয়ে বললেন, আমার ভাইপোটাকে যদি কোথাও ঢুকিয়ে দিতে পার মা, হাড় জুড়োয়। দিনরাত টো-টো করে ঘুরে বেড়াবে আর বাড়ীতে এলেই যত তম্বি।

আচ্ছা, বলব'খন—

বামুন-খুড়ীমা মুখ বাড়িয়ে বললেন, নন্টেকে রোজ বলি একবার দেখা করে যেতে। এমন মুখচোরা ছেলে কখনো দেখি নি—একলা কিছুতেই আসতে চায় না।

একদিন সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। এখন আমার বড্ড তাড়াতাড়ি। ন'টা আটাশের ট্রেন ধরতে হবে।

মুখুজ্জো-গিন্নী এগিয়ে আসবার আগেই মোটর ছেড়ে দিল। তিনি নিজের ভায়ের জন্যে আর্জ্জি পেশ করতে না পারায় নিতান্ত মনমরা হয়ে পড়লেন।

বেলা আরো বাড়ল।

মডেল গার্লস স্কুলের সাত জন শিক্ষয়িত্রীকেই দল ভিড়িয়ে হলঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখা গেল। সিপ্রা তখন ফোনে কার সঙ্গে কথা কইছিল। নিজের কদর বাড়াবার এত বড় একটা সুযোগ পেয়ে সে যেন মরীয়া হয়ে উঠল। কিন্তু দূরবর্ত্তিনীর হয়ত তাড়া ছিল। কাজেই সে বিদায় নিলে। বাধ্য হয়ে সিপ্রাকে রিসিভার নামাতে হ'ল। টেবিলের সামনে এসে সকলকে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে বললে, বসুন আপনারা।

সোফা ও চেয়ারের অভাব ছিল না ঘরে। সবাই বসল।

সিপ্রা বললে, যদিও বেলা হয়ে গেছে, তবুও গরম কিছুতেই কাটছে না। চায়ের কথা বলে আসি।

হেডমিস্ট্রেস আপত্তি জানাবার আগেই সিপ্রা অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। কিন্তু কোন ফল হ'ল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই সিপ্রা নিজে চা, বিস্কুট এনে হাজির করলে।

আধুনিক সভ্যতায় ভদ্রতা রক্ষা করা প্রধান অঙ্গ। কাজেই চায়ের পেয়ালা সবাইকে তুলে নিতে হ'ল।

প্রথম চুমুক দিয়ে হেডমিস্ট্রেস বললেন, আপনার কাছে আমাদের যে জন্যে আসা, সেই কথাটাই আগে পাড়া যাক।

সিপ্রা শুধু মুখখানা কৌতুহলে তুলে ধরল।

হেডমিস্ট্রেস বললেন, আমাদের ইস্কুল সম্বন্ধে আপনি যাই বলুন না কেন –

সে জাতের মেয়ে সে নয়—যার মুখ দেখলে আরসুলা ধরতে পারে না। একটুখানি থেমে পাড়ে দৃঢ় অথচ শান্ত স্বরে বললে, নিজেদের সঙ্কীর্ণতা ও দীনতা ঢেকে রাখবার দিন চলে গেছে। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, অভাবের তাড়নায় আমাদের দেশের মেয়েরা বিদেশী প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেও ইতস্ততঃ করছে না। অথচ দেশের ছেলেদের সঙ্গে পড়বার বেলাতেই আসে যত নীতিজ্ঞান। আপনাদের মধ্যে এই সংস্কার না থাকাই বাঞ্ছনীয়। আজ দরকার, পুরুষ ও নারীর সমান আন্তরিকতা। সেই আন্তরিকতা আসবে কোথা থেকে যদি আপনারা পরস্পরকে পাশাপাশি দাঁড়াতে না দেন।

হেডমিস্ট্রেসও বোবা হয়ে যাবার মেয়ে নন। তিনি বললেন, আমরা সেজন্যে আসি নি। সমান অধিকার সম্বন্ধে আমরা সবাই একমত।—ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে তিনি পুনরায় বলতে সুরু করলেন, তেসরা জানুয়ারী ইস্কুলের প্রাইজ। মিসেস দত্ত, ইন্সপেক্ট্রেস অফ স্কুলস, আসতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন। তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।—সিপ্রা বললে, আমার চেয়ে যোগ্য লোক খুঁজলে ঢের পাবেন। তাঁদের কাউকে এ অনুরোধ জানালে নিশ্চয়ই স্বীকৃত হবেন।

হেডমিস্ট্রেস তৈরি হয়েই এসেছেন। প্রত্যুত্তরে হাসলেন,
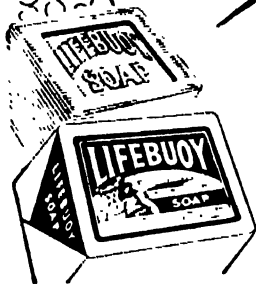
এখানকার মেয়েরা আপনাকে পেলে যতখানি উৎসাহিত হবে, কেমব্রিজের গ্রাজুয়েট এলেও কি তারা ততখানি খুশী হতে পারবে ভেবেছেন।

অমিয়া বললে, উঠুন হেমদি, বেলা হয়ে গেছে অনেক। পরক্ষণেই সিপ্রার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, আমি হলে ভাই তোমার মত না নিয়েই কার্ডে নাম ছাপিয়ে দিতাম। দেখতাম দেশের স্কুলে না গিয়ে থাকতে কেমন করে? চলি ভাই, আর এক দিন আসব।

এত সহজে অমিয়া ব্যাপারটাকে মিটিয়ে দিতে পারবে, হেড-মিস্ট্রেস তা ভাবতে পারেন নি। সিপ্রার পক্ষেও বাস্তবিক এই কথার পর আর গুরুতর আপত্তি তোলা সম্ভবপর হ'ল না।

বেলা আড়াইটে।

অরিন্দম লম্বা লম্বা পা ফেলে বড় রাস্তা ধরে চলেছে। সমীরকে এখন ধরতে না পারলে যেন রাজ্যই চলে যাবে এইরকম ভাব। সে বেচারী সবে একটু শুয়েছে। আহ্বান শুনে উঠে পড়ল। রেলিঙে ঝুঁকে পড়ে অরিন্দমকে দেখে নীচে নেমে এল।

পোস্টার ছাপিয়ে নিয়ে এসেছি। এই বার যা-যা করবার সব তোমাকেই করতে হবে সমীরদা। অরিন্দম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে একখানি ভাঁজ-করা কাগজ পকেট থেকে বের করে সম্মুখে প্রসারিত করে ধরলে।

ঠিক হয়েছে। চোখ বুলিয়ে নিয়ে সমীর বললে, এখুনি এগুলো মারবার ব্যবস্থা করতে হবে। সময় নেই আর। কাল থেকেই টিকিট বিক্রী সুরু করে দিতে হবে।

অরিন্দমের চোখ দুটো সিপ্রাকে খুঁজছিল। কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করেও জলে বাস করা চলে—এই কথা প্রমাণ করবার জন্যে সে অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু সমীরের এ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দেখে সে নিবৃত্ত হ'ল।

সমীর বললে, আমি এখন যাচ্ছি ছটুলালের সন্ধানে। দেখি, কোথায় তাকে ধরতে পারি। তুমি যত তাড়াতাড়ি পার, পোস্টার-গুলো যথাস্থানে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করো। এবেলা যতগুলো পারে, মারুক ত!

ছটুলালকে পাওয়া যাবে ত? উত্তরের অপেক্ষা না করে অরিন্দম সোজা বেরিয়ে গেল।

কয়েক দিন পরে একটি বিখ্যাত দৈনিকের মফস্বল সংবাদে নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত নীচেকার সংবাদগুলো প্রকাশিত হ'ল:

২৩শে ডিসেম্বর তারিখে—

সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুত জয়চন্দ্র তর্করত্নের প্রপিতামহ-প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরটির সংস্কারকার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। স্থাপত্যশিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে এই মন্দিরটি রক্ষা করিবার যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। সরকার এই নিমিত্ত এক হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। দেশের সুসন্তান শ্রীযুত সন্দীপ সেনগুপ্ত মহোদয় অবশিষ্ট ব্যয়ভার বহন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

২৫শে ডিসেম্বর তারিখে—

গত ২১শে ডিসেম্বর বলরাম সরকারের ঠাকুরবাড়ী-প্রাঙ্গণে স্থানীয় মহিলাবৃন্দ একটি মহতী সভার আয়োজন করিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুত সন্দীপ সেনগুপ্ত মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী সুরভিত সেনগুপ্তকে একখানি মানপত্র প্রদান করেন। সভায় স্থির হয় যে, মহিলা-পার্ক এই নামের পরিবর্তে সুরভিত-পার্ক নামে অভিহিত করিবার জন্য স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষকে একটি আবেদন জানানো হইবে।

২৭শে ডিসেম্বর তারিখে—

গত শনিবার স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ হালদার মহাশয়ের ভবনে আই. এন. এ ফণ্ডের সাহায্যকল্পে নবারুণ নাট্য-সমাজের সভ্যবৃন্দ সীতা অভিনয় করেন। রামের ও শম্বুকের ভূমিকায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় করিবার জন্য যথাক্রমে শ্রীঅরিন্দম রায় চৌধুরী ও শ্রীকৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সবুজ-সঙ্ঘ একটি করিয়া রৌপ্য পদক উপহার দেন। টিকিট বিক্রয়লব্ধ সমস্ত টাকাই আই. এন. এ ফণ্ডের সেক্রেটারীর নিকট পাঠানো হইয়াছে।

৪ঠা জানুয়ারী তারিখে—

মডেল গার্লস স্কুলের বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ উৎসব গত রবিবার মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন ব্যারাকপুর মহকুমার এস-ডি-ও শ্রীসমুদ্র গুপ্ত। সবুজ-সঙ্ঘের সম্পাদিকা সিপ্রা সেনগুপ্তা বি-এ. পারিতোষিক বিতরণ করেন। এই উপলক্ষ্যে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।
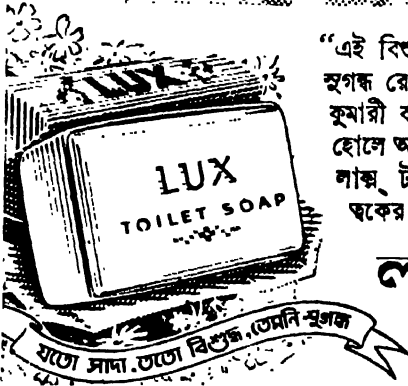
কৃষিবিদ্ বাণেশ্বর সিংহ

শ্রীহট্ট জেলার স্বনামধন্য কৃষিবিদ্ বাণেশ্বর সিংহ বিগত ১৫ই নবেম্বর রবিবার অষ্টাশি বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বাড়িশাল গ্রামের সম্ভ্রান্ত সিংহবংশে তাঁহার জন্ম। বাণেশ্বরবাবু শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ সাংবাদিক শচীন্দ্রচন্দ্র সিংহ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজ্ঞ হরেন্দ্রচন্দ্র সিংহের ভ্রাতা ছিলেন। আপন জন্ম-পল্লীকে কেন্দ্র করিয়াই তিনি দীর্ঘজীবন লোকসেবায় ও গবেষণামূলক কৃষিকার্য্যের ব্যাপক চর্চ্চায় ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। কৃষি, গো-পালন,

বাণেশ্বর সিংহ

পল্লীর স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধীয় তাঁহার মৌলিক প্রবন্ধাদি বহু সংবাদপত্রে গত ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরকাল প্রকাশিত হইয়াছে। ভারত-বিভাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বহু বৎসর তিনি আসাম কৃষি-বিভাগের অবৈতনিক উপদেষ্টার কাজ করিয়াছিলেন। বাংলা কৃষি-সাহিত্যে তাঁহার মৌলিক দান যথেষ্ট। তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—"কৃষি প্রবন্ধ", "গো-পালনশিক্ষা" ও "আয়কর ফলের চাষ"। তাঁহার রচিত ক্ষুদ্র পুস্তকাবলীর সংখ্যাও অনেক। গঠনমূলক সমাজসেবাই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহার পরলোকগমনে একটি অমূল্য জীবনের অবসান ঘটিল।

কৃষির অবনতি যে কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দুর্গতির অন্যতম প্রধান কারণ যৌবনেই তাহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য হাতেকলমে গো-পালন ও কৃষিচর্চ্চাকে তিনি জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ব্রত তিনি শেষবয়স পর্য্যন্ত উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থসমূহ স্বকীয় পর্য্যবেক্ষণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত, সেই জন্য সেগুলি বাংলা কৃষি-সাহিত্যে স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া থাকিবে।

বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবহারিক কৃষিকার্য্যে তাঁহার অনুরাগ কত গভীর ছিল, তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাদিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ:—"পঞ্চাশ বৎসরেরও উর্দ্ধকাল যাবৎ কৃষিকার্য্যের লাভজনক ও ফলপ্রদ উপায়গুলি লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে দেশের মামুলী প্রণালীতে উৎপাদিত শস্যাদির পরিমাণ কিভাবে বাড়ানো যায়, তাহা ঠিক ঠিক ভাবে বুঝিবার জন্য একদিকে যেমন আমাকে নানাপ্রকার পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছে, তেমনই অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেও হইয়াছে। আশৈশব পল্লীগ্রামে বাস করিয়া প্রতিবেশী কৃষিজীবীদের অবস্থার তারতম্য সম্বন্ধে আমার দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও আমার ঐ কাজে প্রবৃত্ত হইবার অন্যতম প্রধান কারণ হইয়াছিল।" (কৃষি-প্রবন্ধের ভূমিকা)।

গ্রন্থকারের "আয়কর ফলের চাষ" নামক পুস্তকে আছে—"ছেলেবেলায় (৭৪ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা) আমার এক পিসিমার বাড়ীতে এইরূপ একটা আমগাছ দেখিয়াছিলাম, যাহার আম প্রতি বৎসর পাইকাররা এক শত টাকা দিয়া কিনিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিত···ছেলেবেলার সেই আমগাছের দৃশ্য আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারি নাই, বরং সেই গাছের অবস্থা ক্রমশঃ গভীরভাবে চিন্তা করিতে করিতে আমাকে এই পথের পথিক হইতে হইয়াছে।"

বাণেশ্বরবাবুর জীবনে অনুরূপ ঘটনার সমাবেশ বহুক্ষেত্রেই ঘটিয়াছে। মূলতঃ তিনি দেশের ব্যবহারিক কৃষি-বিজ্ঞান ও কৃষককুলের সুখ-দুঃখের সহিত নিজের জীবনকে একীভূত করিয়াছিলেন। আজ দেশে খাদ্যশস্যের প্রশ্ন জাতির জীবন-মরণের সমস্যারূপে প্রকট। সেজন্য বাণেশ্বরবাবুর কর্ম্মজীবনের দু'একটি ঘটনা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

শ্রীহট্টের যে অঞ্চলে বাণেশ্বরবাবুর জন্ম সেখানকার কৃষকেরা অর্দ্ধ-শতাব্দীকাল পূর্ব্বে একমাত্র ধানের উপরই বিশেষভাবে নির্ভর

করিত, রবিশস্যের চাষ-আবাদ বড় করিত না, ফলে অজন্মা হইলেই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। অন্যূনাধিক চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা : সেই অঞ্চলে পর পর কয়েকটি বৎসর জলপ্লাবনে ধান সম্পূর্ণ বিনষ্ট হওয়ায় দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই অবস্থার স্থায়ী প্রতিকারের চিন্তায় বাগেশ্বরবাবু রবিশস্যের চাষ-আবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। রবিশস্যের জন্য প্রসিদ্ধ স্থান ও প্রদেশসমূহ বৎসরাধিককাল ঘুরিয়া দেখিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার সফলতা চারিদিকের কৃষককুলের উপর প্রভাব বিস্তার করিল। দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় পুস্তকাবলীতে—(১) রবিশস্যের প্রচুর আবাদ, ২) গোধন রক্ষা ও (৩) ভাবিবার কথা), তিনি নিজের কার্য্যকরী অভিজ্ঞতার বিবরণ ছাপাইয়া বহু সহস্র প্রতিলিপি কৃষকদের মধ্যে স্থানে স্থানে বিতরণ করিলেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে প্রচুর সুফল হইয়াছিল।

বাগেশ্বরবাবুর বহুমুখী প্রতিভা শুধু কৃষি ও গো-পালনে নিবদ্ধ ছিল না ; বাস্তব সমাজসেবার অখণ্ড একটি আদর্শকে তিনি জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পল্লীর স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় উদ্ভাবনে তিনি আজীবন কাজ করিয়াছেন। দরিদ্র পল্লীবাসীর চিকিৎসার জন্য তিনি হোমিওপ্যাথিক ও কবিরাজী বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অর্থাভাবে যে সকল রোগী চিকিৎসার সুযোগ পাইত না, তিনি নিজ ব্যয়ে তাহাদের চিকিৎসা করিতেন। এই কাজে তাঁহার দক্ষতার ফল এই হইয়াছিল যে, তাঁহার বাড়ীতে রোগীর ভিড় সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকিত। লক্ষাধিক রোগীকে তিনি চিকিৎসা ও পরিচর্য্যা দ্বারা নীরোগ করিয়াছেন। গ্রামে কলেরা বা কোন মড়ক দেখা দিলে রোগ-বিস্তার প্রতিরোধকল্পে অক্লান্তভাবে তিনি অহোরাত্র শ্রম করিতেন। "কলেরা ও পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যবিধি" ইহার প্রমাণ।
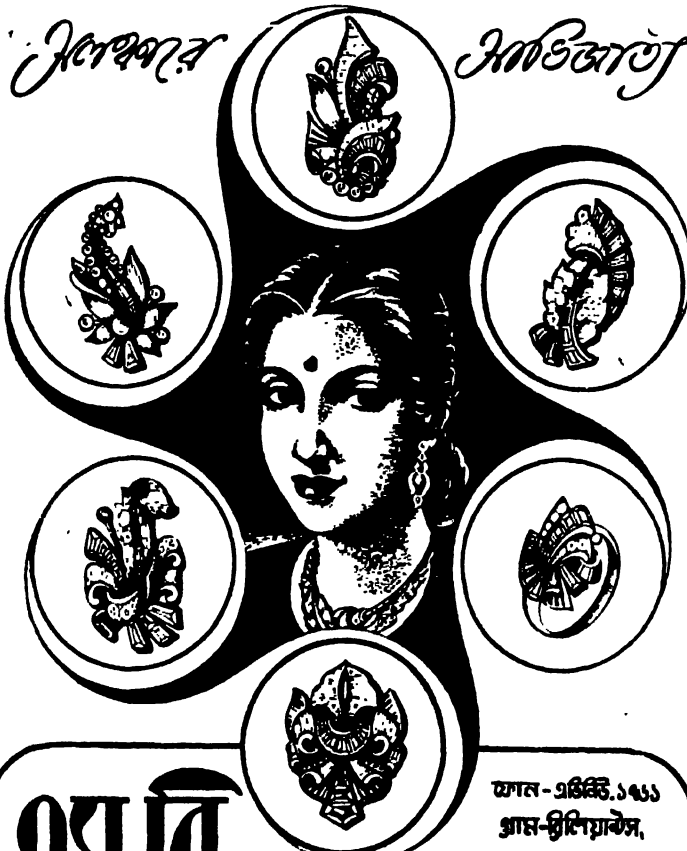
তরুণ বয়সে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবে আসিয়াছিলেন। তখন তিনি শিবনাথ শাস্ত্রীর সংস্পর্শে আসেন। আপন জীবন-পথের আদর্শ হয়ত তিনি সেইখানেই লাভ করিয়াছিলেন। তখনকার দিনের কলিকাতার বিখ্যাত নার্শারীসমূহ কৃষি-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক চর্চা তাঁহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং বিজ্ঞানসম্মত কৃষিকে তিনি জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশবাসীর মধ্যে কৃষিবিষয়ক জ্ঞানের প্রচারে তাঁহার যুবজনোচিত উৎসাহ জীবনের শেষ কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল।

শিল্প-চর্চায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল ; চারু-শিল্পে তাঁহার দক্ষতাও ছিল। বাগেশ্বরবাবু গভীর শাস্ত্রানুরাগী ছিলেন। কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে বিদ্যাবিনোদ উপাধি দান করিয়াছিলেন, কিন্তু উপাধি তিনি কোন দিনই ব্যবহার করিতেন না। তিনি সুকণ্ঠ কীর্ত্তনগায়ক ছিলেন। শাস্ত্রাধ্যয়ন ও কীর্ত্তন তাঁহার নিত্য কর্ম্মের অঙ্গ ছিল। তিনি অসাধারণ অতিথিবৎসল ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে ইহ-জগতের সহিত, আত্মগোপনশীল একটি প্রতিভাবান সমাজসেবীর সম্পর্ক ছিন্ন হইল।

মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বেও তিনি "গরুর মূল্য বৃদ্ধি ও কৃষির সর্ব্বনাশ" নামক পুস্তিকা লিখিয়া গিয়াছেন।

দ্রুত-ফেনিল সানলাইট

না আছড়ে কাচলেও সাদা ও ঝকঝকে ক'রে দেয়

"আমার ক্লাসের মধ্যে আমাকেই সব চেয়ে চমৎকার দেখায়। সানলাইট দিয়ে কাচার জন্য আমার রঙিন ফ্রক কেমন ঝকঝকে থাকে দেখুন। মা বলেন সানলাইট দিয়ে কাচলে কাপড়-চোপড় নষ্ট হয় না আর তা টেঁকেও বেশী দিন। এতে খুব খুসী হবার কথা — নয় কি?"

S. 210-X52 BG

পুস্তক পরিচয়

আধুনিক আলোকচিত্রণ—পরিমল গোস্বামী। ফটোগ্রাফী ষ্টোর্স এণ্ড এজেন্সি লিঃ। ১৫৪ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য সাড়ে সাত টাকা।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও বিশেষজ্ঞ বা বিশেষ কৌশলী ভিন্ন অন্যের নিকট আলোকচিত্র প্রায় বৈজ্ঞানিক রহস্যবস্তু ছিল। নিপুণ আলোকচিত্রকার তখনকার দিনে অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতেন। আলোকচিত্রের সরঞ্জামও তখন ছিল দামী এবং জটিল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি।

অর্দ্ধ-শতাব্দীব্যাপী অবিরাম চর্চ্চার পর আজ আলোকচিত্র শিক্ষিত মানুষের জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপারের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু হইয়াছে। এখন ইহার ব্যবহার ও চর্চ্চা সাধারণ লোকের আয়ত্তেও আসিয়াছে, আলোকচিত্র তোলা বা তোলানো তো অতি সাধারণ ব্যাপার। ছেলে-বুড়া স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই এ বিষয়ে সখ আছে।

কিন্তু ব্যবহার যতটা প্রচলিত হইয়াছে বা সাধারণ লোকের কাছে আলোকচিত্রের পরিচয় যতদূর ব্যাপক হইয়াছে এদেশে উহার সম্বন্ধে জ্ঞান ততটা গভীর হয় নাই। এরূপ হওয়ার প্রধান কারণ বোধ হয় সহজ বাংলায় এই জটিল বিষয়টি সম্বন্ধে কোনও সুলিখিত বই এতদিন ছিল না।

শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী একাধারে লেখক ও আলোকচিত্রণ-কলাবিদ্। তিনি আধুনিক আলোকচিত্রণ লিখিয়া এতদিনে সেই অভাব মোচন করিয়াছেন। এই পুস্তকে আলোকচিত্রের বৈজ্ঞানিক সমস্তার প্রতি দিকের পূর্ণ চর্চ্চা এবং নিপুণভাবে নির্দ্দেশ দান করা হইয়াছে। পরিমল বাবুর দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার পূর্ণপ্রয়োগ ইহাতে রহিয়াছে।

বইটিতে ফাঁক কোন জায়গায় রাখা হয় নাই। সুতরাং আলোকচিত্রে সাধারণ জ্ঞান যাহার আছে, তিনি ইহার সাহায্যে ঐ বিষয়ের অসংখ্য ব্যবহারিক সমস্যা পূরণ করিতে পারিবেন। ভাষা সহজ, তথ্য পর্যাপ্ত।

তবে একটি বিষয় বলা প্রয়োজন। আলোকচিত্রণ চতুঃষষ্টি কলার পরও আর এক নূতন কলার আস্বাদ দিয়াছে। পরিমল বাবু কলাবিদ্ এবং আলোকচিত্রণ শিল্পের রসজ্ঞ। পরের সংস্করণে তাঁহার নিকট আমরা তাহাও প্রত্যাশা করিব।

ক. চ.

কান্না-হাসির দোলা—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ। ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

উপরতলার একটি মেয়ে—বাড়ী গাড়ী আর পার্ট-কালচারে তাহার জীবন নিয়ন্ত্রিত। দিনা আয়াসহীন বিলাসপুষ্ট সে জীবন : তাহার চারিপাশে বিপুল দুঃখভার-আবর্ত্তিত জলরাশিতে সমস্যা-কুটিল ঢেউগুলি যেন উঠিয়া ভাঙ্গিয়া যায়, সেই শব্দের কি মর্ম্মান্তিক ভাষা—সে সব জানিবার কৌতূহল কোনদিনই জাগে না মেয়েটির মনে। অথচ মনের গভীরে, তাহার অগোচরেই সেই ঢেউ ভাঙ্গার হিসাব-নিকাশ যে রাখে—শব্দ-প্রতিধ্বনি অন্তরতন্ত্রীতে তাহার সুরের মন্দ্রকম্প উপলব্ধি করিতে উৎসুক হয়। ফলে স্থান-কালের অনুকূল পরিবেশে মনের বদ্ধ দুয়ার খুলিয়া দিয়া মেয়েটি নামিয়া আসে মাটির পৃথিবীতে। প্রকৃতি যেন পুনর্জন্মের আশ্রয় লাভ করিয়া আপন লীলাপ্রসারে স্রষ্টার সৌন্দর্য্যলোকে নিজেকে নূতন করিয়া অনুভব করে—জীবনের নূতন অর্থ, নূতন স্বাদ তাহাকে পুলক-বিহ্বল করিয়া তুলে। এমনকি প্রতিদিনের দেখা জড় বস্তুজগৎ চৈতন্যময় হইয়া উঠে, আকাশ, মাঠ, মাটি, লোহা আর গাছ সকলের সঙ্গেই অন্তরের যোগসূত্র গ্রথিত হয়। এইভাবে এক

= বিজ্ঞপ্তি =
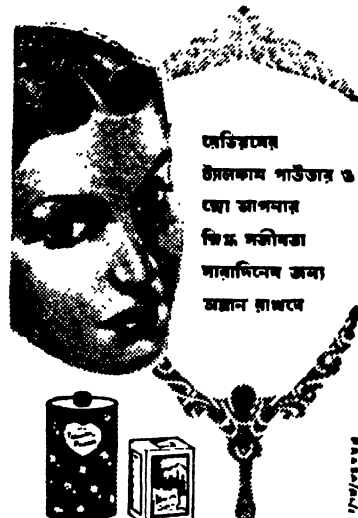
আমরা অতীব সন্তোষের সহিত জানাইতেছি যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সর্বত্র ৸১০ সাড়ে বারো আনা সের দরে চিনি যাহাতে পাওয়া যায় সেজন্য স্থানে স্থানে বিক্রয়কেন্দ্র এবং পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা নিয়োগের সুব্যবস্থা হইতেছে। চিনি সরবরাহে কোন বাধা বিঘ্ন ঘটিলে তৎপ্রতিকারার্থে যে কোনরূপ পরিকল্পনা সাদরে গৃহীত হইবে।

সুগার ডিষ্ট্রিবিউটার্স্ লিঃ

২নং দয়হাট্টা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭

টেলি ঃ ঠিকানা—'চিনিবিক্রি' ফোন ঃ ৩৩-১০১৭

জীবন পর্য্যবসিত হয় নাই ; তিনি যে জ্ঞানসম্পদ আহরণ করিয়াছেন তাহা তুলনাহীন। বিতরণেও তিনি কার্পণ্য করেন নাই। পনেরখানি ইংরেজী এবং সতেরখানি বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থে তাহা বিবৃত। সেই জ্ঞানের বৈচিত্র্যে এবং বিস্তৃতিতে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রাণেশকুমার চল্লিশ বৎসরেরও অধিককাল মহিমবাবুর সঙ্গ লাভ করিয়াছেন। গ্রন্থকার তাঁহার সহিত ভারতবর্ষের বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। বইখানি সেই তীর্থভ্রমণের কাহিনী। মহিমবাবুর জীবনের অনেক কথা জানিতে কৌতূহল হয়। বর্ত্তমানে এই তীর্থভ্রমণের কাহিনী পাঠেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে। মহিমবাবুর বয়স এখন চুরাশি বৎসর। আশা করি, পরবর্ত্তী গ্রন্থে মহিমবাবুর দীর্ঘদিনের সঙ্গী গ্রন্থকার তাঁহার একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত লিখিয়া আমাদের কৌতূহল পূর্ণ করিবেন। পুস্তকে মহেন্দ্রনাথের আর্ট এবং চুরাশি বৎসর বয়সের দুইখানি ছবি আছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

মহাভারতসার—[illegible] ৮ [illegible] রোড, কলিকাতা-২৯ ; মূল্য ১৲।

গ্রন্থ-পরিচয় হইতে জানা গেল, লেখক সরকারী রাসায়নিকের কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার অবকাশ-জীবন যদি শাস্ত্র-পুরাণের আলোচনায় একান্তভাবে নিবিষ্ট হয় তবে সুখের কথা। গ্রন্থখানিতে গভীর অভিনিবেশের এবং [illegible] অধ্যবসায়ের পরিচয় নাই, বিচ্ছিন্ন চিন্তার নিবন্ধন আছে। 'ধর্মতত্ত্ব', 'সমাজতত্ত্ব', 'পুরাতত্ত্ব', '[illegible]' এবং 'স্বর্গ ও নরক'—এই পাঁচটি পর্বে তিনি তাঁহার মহাভারত-পাঠের কতকগুলি ধারণা বা চিন্তাকে সূত্রাকারে গ্রথিত করিয়াছেন। শেষ দিকের কয়েক পৃষ্ঠা ইংরেজীতে লিখিত। সে বিষয়ে লেখকের কৈফিয়ত : ইহা 'সর্বধর্মসমন্বয় ভাব হইতে লিখিত হইয়াছে।' বার্দ্ধক্য মানুষের দ্বিতীয় শৈশব, কৈফিয়ত পড়িয়া এই কথাই মনে হইল। নামে ইংরেজীয়ানা এবং প্রারম্ভে ইংরেজী প্রশংসাপত্র—ইহাও দৃষ্টিকটু।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের অ-আ ক খ—শ্রীবিনয়রঞ্জন সেনগুপ্ত, এম্-এ। শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল কর্তৃক যাদবপুর কলেজ, কলিকাতা-৩২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

জ্যোতিষশাস্ত্র-চর্চার দিকে আজকাল শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বিষয়ে সহজ সরল ভাষায় লিখিত বই বাজারে খুব কম। বর্তমান পুস্তকখানি এই অভাব কতকটা পূরণ করিবে। যাঁহারা অল্প পরিশ্রমে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করিতে চান বইখানি তাঁহাদের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী হইয়াছে। ইহাতে আঠারটি অধ্যায়ে জ্যোতিষশাস্ত্রের বহু জটিল বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। লেখকের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ভাষার প্রসাদগুণ পুস্তকখানিকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে। গ্রন্থের 'বিবিধ প্রবন্ধ' নামক অধ্যায়ে জাতক কোন্ কোন্ গ্রহের কারকতায় কবি দার্শনিক লেখক চিকিৎসক শিল্পবিদ্ ইত্যাদি হইয়া থাকেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানের সেই দুরূহতম ও সর্বাপেক্ষা জটিল বিষয়টি দু'চার কথায় বড় চমৎকারভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

পলাশীর যুদ্ধ—শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। নাভানা, ৪৭ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩। পৃ. ১৫৩। মূল্য চারি টাকা।

পলাশীর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে—দুই শত বৎসর পূর্ণ হইতে মাত্র চার বৎসর বাকী। এত দিনেও কিন্তু ইহার নবীনতা লুপ্ত হয় নাই। এখনও পলাশীর যুদ্ধ বলিতে আমাদের মনে কতই না কৌতূহল জাগে! পলাশীকে কেন্দ্র করিয়া কত ইতিহাস, কাহিনী, কাব্য রচিত হইয়াছে, ইতিহাস-পুস্তক ত কত! না হইবেই বা কেন? ভারতবর্ষের মত একটা বিরাট দেশের ভাগ্য নির্ধারিত হয় এই পলাশীর মাঠে, ইংরেজ তখন অপরিচিত ছিল, আগন্তুক ছিল। কিন্তু পলাশীর মাঠে যে জয়মাল্য ভাগ্যদেবী তাহার গলায় পরাইয়া দেন তাহাই দেখিতে দেখিতে কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সমগ্র ভারত-বিজয়েরই মালা হইয়া উঠে। এহেন পলাশীর যুদ্ধ যে আমাদের অন্তর্মন জুড়িয়া রহিয়াছে এবং আরও অনেককাল জুড়িয়া থাকিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি!

গ্রন্থকার যখন ধারাবাহিকভাবে পত্রিকান্তরে 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রকাশ করিতেছিলেন তখন তাহা আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। পুস্তক আকারে প্রকাশের পর রসজ্ঞ অনেকে এখানির উপর যে অনুকূল অভিমত প্রদান করিয়াছেন তাহাও দেখিয়াছি। তদবধি এখানি আদ্যোপান্ত একবার পড়িয়া দেখিবার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল। সম্প্রতি সেই সুযোগ ঘটিয়াছে। তাই দু'ছত্র লিখিতেছি।

বইখানি কাহিনী বা গল্পের ভঙ্গীতে লিখিত হইলেও ইহাতে ইতিহাস চাপা। গল্প—কিন্তু এতটুকুও অতিরঞ্জন নাই। পলাশীর যুদ্ধ লইয়া কাব্য রচিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকার গল্পাকারে লিখিতে গিয়াও কাব্যাংশ সম্পূর্ণ বাদ দিয়াছেন; ভয় হইয়াছিল যেরূপ গল্প ফাঁদিয়াছেন, ইতিহাস বুঝি-বা বানচাল হইয়া যায়, কিন্তু তাহা হয় নাই। সমসাময়িক দলিল-দস্তাবেজ, পুঁথিপত্রে যে সম্বন্ধে যতটুকু আছে, গল্প বলিতে গিয়া তাহার বাহিরে এতটুকু যান নাই। গ্রন্থকারকে এজন্য অভিনন্দন জানাই।

পলাশীর যুদ্ধ নাম দিলেও ইহাতে পলাশীর যুদ্ধাংশ কতটুকু? কলিকাতার প্রাচীন ইতিহাস আজ কাহিনীর মত লাগে, কিন্তু একটা মানুষ বা জাতির মত বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া কলিকাতা মহানগরীর এত বিস্তৃতি, এত সমৃদ্ধি, এত ঐশ্বর্য। পলাশীর যুদ্ধে সেই কাহিনীটিও বড় সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমাজতত্ত্ববিদ্ কলিকাতার বাঙালী-সমাজ লইয়া আলোচনা-গবেষণা করিয়াছেন কিনা জানি না, কিন্তু তিনি ইহার প্রচুর খোরাক, স্পষ্ট নির্দেশ এই বইখানিতে পাইবেন। এই কলিকাতার বাঙালী-সমাজ পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় নিজে আপ্লুত হইয়াছেন, সমগ্র ভারতবর্ষে তাহা বিলাইয়া দিয়াছেন। গ্রন্থকার উপসংহারে অতি চমৎকারভাবে এটি

পুস্তকখানিতে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি—যেমন কাপুরুষ ড্রেক, অসমসাহসী ক্লাইভ, বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর, ইংরেজ-ভক্ত উমিচাঁদ, কুটচালী নন্দকুমার, অকৃতজ্ঞ সিরাজদ্দৌলাঘাতক, পতিপ্রাণা লুৎফুন্নিসা এমনভাবে পর্দার আড়াল হইতে প্রকাশ্যে আসিয়া পড়িতেছেন যেন নাটক দেখিতেছি; অথচ কোনটিতেই এতটুকু নাটকীয়তা নাই। কি সংযমের সহিত চরিত্রগুলি চিত্রিত! সর্ব্বোপরি বইখানির ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। খাঁটি বাংলা ভাষা, মায়ের ভাষা, পিসীমা মাসীমার ভাষা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। খাঁটি বাংলা উপিয়ম বা বাকরীতি, বাকাংশ পুস্তকখানিতে বিশেষভাবে ধরিয়া রাখা হইয়াছে। এরকমটি কচিৎ দৃষ্ট হয়। লেখক এই দিক দিয়া একটি মস্ত উপকার করিয়াছেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

দেশ-বিদেশের কথা

উত্তমাশ্রমে স্মৃতিতর্পণ

সম্প্রতি স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি মহারাজজীর নবম বার্ষিক তিরোভাব মহোৎসব যথোচিতভাবে সুসম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে ৯ই অগ্রহায়ণ বুধবার সন্ধ্যায় আরতি ও সমবেত শিষ্য বর্গের "গীতাপাঠ" এবং সঙ্গীত ও সঙ্কীর্তন হয়। মৃদঙ্গ ও তবলা-সঙ্গত দ্বারা কলিকাতার শ্রীবলাইচন্দ্র গোস্বামী সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। ইহার পর শিবপুরের পাগলের দলের সুমধুর নামসঙ্কীর্তনে রাত্রি অতিবাহিত হয়।

১০ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার তিথিপূজা উদ্‌যাপিত হয়। স্বামী বিশ্বানন্দজীর উপনিষদ, শ্রীকানাইদেব দেবশর্মার শ্রীশ্রীচণ্ডী, ধ্রুবানন্দ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীইন্দুভূষণ ভট্টাচার্যের শ্রীশ্রীগীতা পাঠ ও ঋষিবেশ [illegible] ব্রাহ্মণের সহিত স্তোত্র পাঠে এক স্বর্গীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ভগবতীর তবলা-সঙ্গতের সুললিত কালীকীর্তন সকলকে মুগ্ধ করে।

অপরাহ্নে বর্দ্ধমানের শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রায়বেঁশে ও ম্যাজিক প্রদর্শনও সকলের প্রশংসা অর্জন করে। সন্ধ্যায় আরতি ও সমবেত গীতাপাঠের পর স্বামী ধ্রুবানন্দ মহারাজজীর জীবনী আলোচিত হয়।

অনুন্নতদের উচ্চশিক্ষা

কৌন্সিল অব্ ষ্টেটস-এ ডিমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগের এক প্রশ্নের উত্তরে উপশিক্ষামন্ত্রী শ্রী কে. ডি. মালবীয় বলেন যে, ১৯৪৭-৪৮ সালে (ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আমলে) অনুন্নত সম্প্রদায়ের বাইশ জন ছাত্রকে এবং ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রায় ত্রিশ জন ছাত্রকে বৈদেশিক বৃত্তি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৫০ সাল হইতে '৫২ সাল পর্যন্ত অনুন্নত সম্প্রদায়ের কোন ছাত্রকে একটি মাত্র বৈদেশিক বৃত্তিও দেওয়া হয় নাই।

ইহার প্রত্যুত্তরে ডক্টর নাগ উপশিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি আকৃষ্ট করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন: "আমাদের দেশের অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা গ্রেট ব্রিটেনের লোকসংখ্যার সমান। এদিকে পাঁচ কোটি অনুন্নত সম্প্রদায়ের সঙ্গে যদি এক কোটি আশী লক্ষ উপজাতীয় সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা যোগ করা যায় তাহা হইলে তাহা তুর্কীর সমগ্র জনসংখ্যার সমান হয়। এই বিপুল জনসমষ্টিকে যদি আমরা নেতৃত্বের উপযুক্ত করিয়া তৈয়ারি করিতে না পারি, তাহা হইলে দুনিয়ার সামনে বিচারে আমরা কি জবাব দিব? আমরা যদি ইহাদের ভিতর হইতে নেতা তৈয়ারি করিতে না পারি তাহা হইলে সাম্প্রতিক কালে আসাম এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় দুর্ভোগ সর্বত্রই আমাদের অদৃষ্টে ঘটিতে পারে।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০৷২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

মাঘ

প্রবাসী

করিবার যান্ত্রিক ব্যবস্থা সিংহলের ট্রিঙ্কোমালি, মালয়ের সিঙ্গাপুর এবং জাপান ভিন্ন সমগ্র এশিয়ার কোথায়ও নাই। শিক্ষিত লোক-লস্করের কথাও আছে, তাহাও ঠিকমত করিতে হইলে তিন-চার বৎসর লাগিবে। তিন হাজার এরোপ্লেনের সংবাদ আরও অপরূপ!

যাহা হউক, এবিষয়ে বিশেষ কিছু মন্তব্যের প্রয়োজন নাই। সময় ও অর্থ এই দু-ই যথেষ্ট থাকিলে কিছুই অসম্ভব নহে এবং সেইজন্যই আমাদের নিশ্চিন্তমনে নিদ্রিত হওয়ার বিরুদ্ধে যুক্তি আছে। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে জাতি নিষ্পলক নেত্রে দিবারাত্র সচেতন না থাকে তাহার বিপদ অবশ্যম্ভাবী। আমাদের ইতিহাস এ বিষয়ে সারা বিশ্বের সম্মুখে সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে।

কূপমণ্ডূক বৃত্তির ফলে আমরা সাত শত বৎসর দাসত্ব বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম এবং আজও আমাদের শিক্ষিত সমাজ সারা জগতের অন্যান্য শিক্ষিত সমাজের তুলনায় কূপমণ্ডূক বৃত্তিতে পরিপূর্ণ। আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকের দৃষ্টিই তাঁহাদের দৈনন্দিন কার্যক্ষেত্রের বাহিরে যায় এবং তাহা অপেক্ষা আরও অল্প লোকের দেশ, সমাজ বা রাষ্ট্রের হিতাহিত সম্পর্কে চেতনা আছে। নিজস্ব স্বার্থ, নিজস্ব দ্বেষ-বিদ্বেষই আমাদের প্রায় সকলের নিকট চরম। ফলে রাষ্ট্রের শক্তি ও মর্যাদা দুইয়েরই হানি হইতেছে এবং সেই কারণেই আমরা ক্রমে বিদেশীর নিকট গুরুত্ব হারাইতেছি। পাক-মার্কিন চুক্তি ব্যাপারের ইহাই প্রধান কারণ, অবশ্য অন্য কারণও আছে।

সারা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ এখন ক্রমেই একই শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। মিশর, চীন, ইরাণ, ইটালী, রুশিয়া, এ সকল দেশের শিক্ষিত জনসমাজ ক্রমে বুঝিতেছে যে, তাহাদের ভবিষ্যতের বাগডোর সম্পূর্ণ রূপে তাহাদের হস্তে নাই, তাহাদের ভাগ্যের স্রোতের সহিত আফ্রিকার মার্কিন দেশের ইতিহাসের স্রোতের ঢেউয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। এমনকি মার্কিনের ন্যায় অসীম ঐশ্বর্যশালী ও প্রবলপরাক্রান্ত জাতির মধ্যেও আজ চেতনা আসিয়াছে যে তাহাদের ভবিষ্যতের অনেক কিছু নির্ভর করে পেইপিং, মস্কো ও দিল্লীর নির্দ্ধারিত কার্যক্রমের উপর। সকল দেশের সুধীজন জানেন যে, ইতিহাসের সকল ধারা ক্রমেই একীভূত হইতে চলিয়াছে, তাহার বাহিরে কোন দেশ, কোন জাতি, যাইতে পারে না। শুধু আমরাই বুঝি অন্যরূপ। শত শত বৎসরের দাসত্ব-কূপের মধ্যে নিমজ্জিত থাকার ফলে আজ উন্মুক্ত আকাশের নীচে স্বাধীনতার স্রোতে ভাসিয়াও আমাদের কূপমণ্ডূকত্বের সঙ্কীর্ণ ও ক্ষীণ দৃষ্টিতে আমরা স্রোতের গতি দেখিতে পাইতেছি না। আমরা কেবল চেষ্টা করিতেছি সেই অকূল স্রোতের মধ্যে নিজস্ব এক গণ্ডী গড়িবার জন্য, যেন সাগর-উর্ম্মীমালার মধ্যে নিজস্ব কূপখননের জন্য।

বাস্তবিক পক্ষে জগতে বাস করিয়া পৃথিবীর সকল জাতি হইতে বিচ্যুত ও প্রভেদযুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে থাকিবার ধারণা এক আমাদের দেশেই আছে, আর কোথায়ও নাই। যে মার্কিন দেশ এককালে সম্পূর্ণ পৃথক গণ্ডীতে থাকার (isolationalism) বৃহত্তম উদাহরণ ছিল সেও আজ নিজ হাতে সেই গণ্ডী ভাঙিতেছে, সোভিয়েট রুশিয়া যে গণ্ডী এতদিন তাহার চতুর্দিকে রাখিয়াছিল আজ তাহার উন্মোচনের পথ খুঁজিতেছে। শুধু আমরাই নিজেকে "ন মাতা, ন পিতা, ন চ ভ্রাতা বন্ধু" বলিয়া নিজের উপর দেবত্ব আরোপ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছি এবং সেই কারণেই জাতীয়তাবাদের সহিত নানারূপ নূতন সংজ্ঞা যোগ করিয়া এক অভিনব চুঃমার্গের সৃষ্টি করিয়াছি।

এরূপ অবস্থায় আমাদের সহিত অন্য দেশের বা অন্য জাতির ঘনিষ্ঠতা অসম্ভব, বন্ধুত্ব অসম্ভব এবং এইরূপ অবস্থায় বহির্জগতের সহিত আমাদের সংযোগও অতি সঙ্কীর্ণ হইতে বাধ্য।

পাকিস্থান এ বিষয়ে অন্যভাবে জগতে চলে। সম্প্রতি আমেরিকার "ওয়ার্লড" নামক মাসিকে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার শিরোনামা "Why We Flirt with Pakistan" অর্থাৎ, "আমরা পাকিস্থানের সঙ্গে প্রেমবিনিময়ে লিপ্ত কেন"?

এই সম্পর্কে লেখা হইয়াছে, "ইহার আংশিক উত্তর পাওয়া যাইবে পাকিস্থানের মার্কিন দেশস্থ প্রতিনিধিবর্গের ব্যক্তিত্বে ও আদান প্রদানে এবং তাহার বহির্নীতি-অধিকারীবর্গের কার্যক্রমে। পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষ ও প্রতিনিধি দল বুঝিয়াছেন যে, ভারতের মর্যাদা এদেশে (আমেরিকায়) ক্রমশঃ কমিতেছে এবং ভারতীয়েরা সে বিষয়ে ক্ষুব্ধমাত্র হইয়া আছে, অন্য কিছু করিতেছে না। সুতরাং পাকিস্থান সেই সুযোগে ফসল কাটিয়া গোলা বোঝাই করিতেছে। এদেশে (আমেরিকায়) প্রেরিত প্রতি পাকিস্থানীর যেন সর্বসাধারণের সহিত আদান-প্রদান করার বিষয়ে একটা জ্ঞান অস্থিমজ্জাগত হইয়া আছে। তাহারা যেখানেই যায় সেখানেই নিজেদের দেশের বিষয় একটা সুসমাচারের প্রচার করে এবং সকলকে বুঝিতে দেয় যে, তাহারা পশ্চিমের গণতন্ত্রের সমর্থক এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ পশ্চিমের সহিত জড়িত।"

"পাকিস্থানের বৈদেশিক বিভাগের লোকেরা শুধুমাত্র রাষ্ট্রনীতিতে দক্ষ নহেন, তাঁহারা লোকের সঙ্গে মিশিতে জানেন, অন্যের মতামতের মর্য্যাদা বুঝেন।"

আর আমরা? সে বিষয়ে কি বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন আছে? আমরা কাহারও সঙ্গে পাছে শত্রুতা করা হয় সেই ভয়েই আড়ষ্ট। এতই আড়ষ্ট যে, কাহারও সঙ্গে সখ্য বা মিতালি করারও অবসর নাই। ঘরে-বাইরে আমরা সদাই শঙ্কিত পাছে অহিংসার চুঃমার্গে কলঙ্ক আসে। কাজেই পাকিস্থানের মরশুম ভাল।

আমাদের এখন স্থির ভাবে ঠিক করা দরকার আমরা কি চাই। অসহায়, নিরস্ত্র, নিঃসঙ্গ দেশের পরিত্রাণ নাই এ কথা ইতিহাসে অক্ষরে অক্ষরে লেখা আছে। আমরা সেই ভাবে বাঁচিতে পারি একমাত্র দাসত্ব বরণ করিয়া। সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী ও সবল হইয়া সম্পূর্ণ পৃথক অস্তিত্ব রক্ষা করার ক্ষমতা বর্ত্তমান জগতে কাহারও নাই ইহা আমাদের বুঝা প্রয়োজন।

এ কথার অর্থ ইহা নহে যে বর্তমানে যে দুইটি শক্তি প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সশস্ত্র প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদের যে-কোন একটির দলে সেবকরূপে আমাদের নাম লিখাইতে হইবে। তবে আমাদের স্পষ্ট বলিতে হইবে আমাদের রাষ্ট্র কোন্ মতে চলিতে চাহে, কোন্ আদর্শকে মানিতে প্রস্তুত এবং সেই আদর্শ রক্ষার জন্য কি করিতে প্রস্তুত। সেই সঙ্গে ইহাও স্পষ্টভাবে জগৎকে জানান প্রয়োজন যে, আমরা নিজের ও প্রতিবেশীর স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কি ভাবে এবং কি পরিমাণে ক্ষমতা ও ইচ্ছা রাখি।

ক্ষমতার কথাই চরম। বর্তমান জগতে অহিংসনীতি শুধু শক্তিমানের পক্ষেই মর্য্যাদাদায়ক। দুর্ব্বলের অহিংসাবাদ এই মর্ত্যলোকে ক্লীবত্বেরই পরিচায়ক এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যটি আমাদের বুঝিবার সময় আসিতেছে। ইহা কোনও নূতন তথ্য নহে, ইহা চিরন্তন সত্য। আমাদের দেশে ক্ষাত্রধর্ম্ম যখন জাগ্রত ছিল তখন হইতেই উহা প্রতিষ্ঠিত।

পাক-মার্কিন চুক্তি সম্পর্কে মহম্মদ আলী

"ওয়াশিংটন, ১১ই জানুয়ারী—পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলীর মতে জরুরী অবস্থায় দেশরক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ যে-কোন মিত্ররাষ্ট্রকে পাকিস্থানের ঘাঁটি ব্যবহার করিতে দিবার পক্ষে কোন বাধা থাকিতে পারে না।

মিঃ মহম্মদ আলীর সহিত সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ এখানে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি একথা বিশেষ জোরের সহিত বলিয়াছেন যে, পাকিস্থান যদিও মার্কিন সামরিক সাহায্য সানন্দে গ্রহণ করিবে তথাপি দুই দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত ঘরোয়া বৈঠকে ঘাঁটি দিবার প্রশ্ন কখনও উঠে নাই। মহম্মদ আলী আরও বলেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সামরিক সাহায্যের সঙ্গে কোন বৈদেশিক শক্তিকে ঘাঁটি দেওয়ার কথা না থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা সকলের সমর্থনলাভ করিবে।

মিঃ মহম্মদ আলী 'ইউ. এস. নিউজ এণ্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্টে'র প্রতিনিধির নিকট এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ উক্ত পত্রিকায় 'সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত' সংবাদরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে।

জরুরী অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্থানের ঘাঁটি ব্যবহার করিতে পারে কিনা—এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ মহম্মদ আলী বলেন, আমরা দেশরক্ষার জন্য পাকিস্থানের বিভিন্ন এলাকায় অবশ্যই ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিব এবং জরুরী অবস্থায় এই এলাকা রক্ষার জন্য আমেরিকাসহ যে-কোন মিত্ররাষ্ট্রকে এই সমস্ত ঘাঁটি ব্যবহার করিতে দিবার পক্ষে কোন বাধাই থাকিতে পারে না। তিনি আরও বলেন যে, মার্কিন সাহায্য দ্বারা পাকিস্থান সেনাবাহিনী পৃথিবীর মধ্যে একটি অন্যতম শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত হইতে পারে। প্রস্তাবিত পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিবাদের কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ আলী বলেন,—পাক বাহিনীর আক্রমণের আশঙ্কা শ্রীনেহরুর নাই। ভারতের ৩৬ কোটি লোক সাড়ে সাত কোটি লোকের দেশ পাকিস্থানের আক্রমণের আশঙ্কায় ভীত হইয়া পড়িবে—ইহা কল্পনা করা সম্পূর্ণ অবাস্তব। শ্রীনেহরু কোন্ নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন, তাহা আপনাদের মনে রাখা দরকার। পৃথিবীতে বর্তমানে দুইটি রাষ্ট্রজোট রহিয়াছে। এই দুইটির শক্তিই প্রায় সমান সমান। শ্রীনেহরু রহিয়াছেন ঠিক মাঝখানে। নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে তাঁহার দলে টানিবার চেষ্টা করিতেছেন। বিশ্ব-রাজনীতি ক্ষেত্রে শক্তি-সাম্যের অবস্থা এরূপ জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে, ভারত রাশিয়ার দিকে ভিড়িয়া পড়িবে, এই আশঙ্কায় পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহ শ্রীনেহরুকে চটাইতে চাহিতেছেন না। দুইটি সমান শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত একটি দুর্ব্বল রাষ্ট্রকে চূড়ান্ত কাজে লাগান যাইতে পারে। শ্রীনেহরুও ইহাই চাহিতেছেন। দুইটি ভারসাম্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করিয়া তিনি দুইটি রাষ্ট্রজোটের উপরই প্রভাব বিস্তার করিতে চান। অন্য কোন রাষ্ট্র যদি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে দলে টানিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে শ্রীনেহরুর অবস্থা অনেকটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। এই কারণেই শ্রীনেহরু পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরোধী।

পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলী ঢাকায় এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, ভারত ও পাকিস্থানের পারস্পরিক স্বার্থ সম্পর্কিত বিরোধের মীমাংসার উদ্দেশ্যে যত বার প্রয়োজন তত বার তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু প্রস্তাবিত সামরিক সাহায্য সম্পর্কে এইরূপ সাক্ষাতের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না—ইহা সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। পাকিস্থানকে সামরিক সাহায্যের ব্যাপারে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে ভারতে প্রবল আন্দোলন চলার জন্য পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি উপরি-উক্ত মন্তব্য করিয়া বলেন যে, ভারত যদি তাঁহাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া তোলে তাহা হইলে তাহাদের উদ্বেগের কারণ আছে। সেইজন্য তিনি পুনরায় ভারতকে এ সম্পর্কে সংযম অবলম্বনের অনুরোধ করিতেছেন।"

পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতিতে ওকালতীর কুটতর্ক অনেক কিছুই আছে। আমাদের প্রশ্ন এইমাত্র, "কোন্ শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্রসজ্জা করিতে চাহিতেছেন।" ইহার স্পষ্ট উত্তর কি তিনি সারা পৃথিবীকে জানাইবেন?

পণ্ডিত নেহরুর মনের অবস্থা বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তবে তাঁহাকে প্রশ্ন এইমাত্র যে, ভারতের মান-মর্য্যাদার কোনও মূল্য জগতে আছে কি? যদি তাহা না থাকে তবে সে বিষয়ে তিনি কি করিতে চাহেন?

নিক্‌সনের ভারত-বিরোধী বিষোদ্‌গার

গত ৬ই অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহঃ-সভাপতি মিঃ রিচার্ড নিক্‌সন এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের দেশগুলি সফরে বাহির হন এবং

সম্প্রতি সফর শেষ করিয়া তিনি যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার সফরের এক গুপ্ত রিপোর্ট জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের নিকট পেশ করেন। এই নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার স্বয়ং; অন্যান্য সভ্যরা হইতেছেন প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্রসচিবদ্বয়, বৈদেশিক কার্য্যকরণ সংস্থার প্রধান এবং জাতীয় নিরাপত্তা সম্পদ বোর্ডের সভাপতি। মার্কিন সাপ্তাহিক "নিউজ উইক" পত্রিকার ৩১শে ডিসেম্বর সংখ্যায় বলা হইয়াছে যে, পরিষদে দুই ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মিঃ নিক্সন বলেন যে, সফরান্তে তিনি এই বিশ্বাস লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন যে, "ভারতের নিরপেক্ষতার কারণ এই, নেহরু এই কথা বিশ্বাস করেন যে অ-কমিউনিষ্ট এশিয়ার দেশগুলি দুর্ব্বল এবং অস্ত্রহীন থাকিলেই কেবলমাত্র ভারত প্রভুত্বশালী শক্তি হিসাবে অবস্থান করিতে পারিবে।"

পত্রিকাটি আরও লিখিতেছেন, "মিঃ নিক্সন নাকি মনে করেন যে নেহরু স্তুতিবাদ ঘৃণা করেন কিন্তু শক্তিকে সম্মান করেন।" তিনি রিপোর্টে বলেন—তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, "আমেরিকার পক্ষে যাহা ভাল তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই মার্কিন নীতি নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত, নেহরুর ক্রুদ্ধ হইবার ভয়ের উপর নহে।" এই নীতির ভিত্তিতে তিনি পাকিস্থানকে সামরিক সাহায্যদানের সুপারিশ করেন।

পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী মিঃ নিক্সন মনে করেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং রোডেশিয়ার পরিস্থিতি "স্পর্শকাতর" এবং তথায় ও "সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় অনুরূপভাবে ভারতীয় বৈদেশিক সংস্থা পশ্চিমের বিরোধিতা করিতেছে।"

মার্কিন সহঃ-সভাপতি নাকি আরও বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর সম্পদ হ্রাস পাইবার সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকার স্থান বিশেষ গুরুত্বলাভ করিবে।

মিঃ নিক্সন ইন্দোচীনের সম্পর্কে লঘু মনোভাবের বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া বলেন যে, যদি কমিউনিষ্ট জয়লাভের ফলে অথবা ফ্রান্সের সহিত কোন চুক্তির ফলে ইন্দোচীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তচ্যুত হয় তবে মালয়, থাইল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিও সেই পথ অনুসরণ করিবে। পরিশেষে জাপানও কমিউনিষ্টদের কবলে পড়িতে বাধ্য হইবে, কারণ এই সকল দেশের সহিতই তাহার বাণিজ্যের অধিকাংশ নির্ভর করে।

সীংম্যান রীর ব্যক্তিত্ব নিক্সনকে মুগ্ধ করিয়াছে এবং মিঃ নিক্সনের অভিমতে একমাত্র রীর পিছনেই কোরীয় জনগণের সমর্থন আছে।

বিহারে বাঙ্গালী দমন

অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে বিহারের প্রধানমন্ত্রীর সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে বিহারের নেতৃবর্গ বাংলার ও উড়িষ্যায় বিহার সম্পর্কে যে মতামত প্রকাশ হইতেছে তাহাকে অপপ্রচার বলিয়া নিন্দা করেন এবং মানভূম ইত্যাদি বাঙালী অঞ্চল ও সরাইকলা ইত্যাদি উড়িষ্যাদেশজ অঞ্চল বিহারের কবল হইতে উদ্ধারের চেষ্টাকেও নিন্দাবাদ করেন।

তাহার কিছুদিন পরে জামতাড়ায় বিহারের মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় বিহারের কর্ত্তৃপক্ষের বাঙালীর ও বাংলাভাষার প্রতি প্রীতি জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, বাংলাভাষা বা বাঙালীর প্রতি তাঁহাদের কোনও বিদ্বেষ আছে এরূপ অপপ্রচারের কোনও মূল্য নাই।

নিম্নলিখিত সংবাদে এই সকল বিষয়ের উপর তীব্র আলোকপাত হইয়াছে:

"পুরুলিয়া, ১৩ই জানুয়ারী—পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে মানভূমের গণ-উৎসবের অঙ্গ-স্বরূপ 'টুসুর' সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে। স্থানীয় শহরে লোকসেবক সঙ্ঘের ১২ জন লোককে পুলিস এই গান গাহিবার অপরাধে বেলা সাড়ে বারোটায় গ্রেপ্তার করিয়াছে। এইদিন অপরাহ্ণ ছয়টায় পুরুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার কর্ত্তৃক মানভূম লোকসেবক সঙ্ঘের পরিচালক শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার দলের ১১ জন লোক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ইহা ভিন্ন পুলিস শ্রীহেমচন্দ্র মাহাতোর নেতৃত্বে ১৬ জন লোকের আর একটি দলকেও আজ ঝালদায় গ্রেপ্তার করিয়াছে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিব্যক্তি রোধ করিবার উদ্দেশ্যে পুলিস নির্ব্বিচারে যে ভাবে দমন-নীতির আশ্রয় লইয়াছে, তাহাতে এখানকার বর্ত্তমান পরিস্থিতি ঘোরালো হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পুরুলিয়া কোতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে, 'টুসুর' গান এবং বেআইনী শোভাযাত্রা পরিচালনার জন্য জন-নিরাপত্তা আইনে এই সমস্ত লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পৌষ সংক্রান্তি উৎসব উপলক্ষে স্ত্রী-পুরুষ, যুবা-বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে মানভূমের লক্ষ লক্ষ লোক 'টুসুর' গান গাহিয়া আনন্দোৎসব করিয়া থাকেন। জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিব্যক্তির কণ্ঠরোধে চেষ্টা সত্যই বিস্ময়কর!"

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি

১৯৫৩-৫৪ সনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ৭'৭১ কোটি ডলার সাহায্য দিবে। ইহার মধ্যে সদ্যসম্পন্ন চুক্তি অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষকে ২ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা সাহায্য দিবে। এই অর্থ দিয়া ভারতবর্ষ চারি প্রকার ইস্পাত দ্রব্য ক্রয় করিবে, যথা—শীট, প্লেট, রেল এবং রেলপথের জন্য লোহার স্লীপার। ১৯৫৩-৫৪ সনে ভারতবর্ষের প্রায় ৭'২৫ লক্ষ টনের মত এই জিনিষগুলির প্রয়োজন, কিন্তু ভারতবর্ষে এই জাতীয় দ্রব্যগুলির উৎপাদন কেবলমাত্র ৩'৪০ লক্ষ টনের মত হইবে। আমেরিকার ডলার দ্বারা ভারতবর্ষ প্রায় ২ লক্ষ টন এইরূপ ইস্পাতদ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করিবে। এই জিনিষগুলি আমদানী করিবার এবং বন্দরে জাহাজে উঠানো-নামানোর জন্য প্রায় দেড় কোটি টাকা খরচ হইবে। এই টাকা ভারত-সরকার দিবেন।

চলতি বৎসরের জন্য যে ৭'৭১ কোটি ডলার ভারতবর্ষ সাহায্য পাইবে, তাহার মধ্যে মোট সে ৪'৫৫ কোটি ডলার পাইয়াছে। পূর্ব্বে ২ কোটি ডলার লইয়াছে। গত দুই বৎসরে ভারতবর্ষ আমেরিকা হইতে মোট ১৬'৫৪ কোটি ডলার সাহায্য পাইয়াছে।

বর্ত্তমান চুক্তি অনুসারে, ভারতবর্ষ তাহার প্রয়োজনীয় ইস্পাত দ্রব্য পৃথিবীর যে-কোন দেশ হইতে ক্রয় করিতে পারিবে।

রেলপথের ও ইস্পাতের জন্য মার্কিন সাহায্য

ভারতীয় রেলপথগুলির উন্নতি বিধানের জন্য বিদেশ হইতে ইঞ্জিন ও ওয়াগন ক্রয় করিতে ১৯৫৪ সালে বৈষয়িক সাহায্যের অঙ্গ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত-সরকারকে দুই কোটি ডলার দিবেন। এই প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে এক শতটি নূতন ইঞ্জিন এবং পাঁচ হাজার ওয়াগন ক্রয় করা যাইবে। জাহাজ ভাড়া, মাল উঠানামা ও বিভিন্ন অংশ সংযোজন করার জন্য ভারত-সরকার ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত-সরকার ইতিমধ্যেই ৭৬০টি ইঞ্জিনের ফরমায়েস দিয়াছেন এবং আগামী দুই বৎসরে আরও ৫০০টির ফরমায়েস দিবেন।

আগামী ১৯৫৬ সালের মার্চ্চ মাসের মধ্যে ভারতীয় রেলপথে চলাচলকারী প্রায় ২৮ শত ইঞ্জিনের বয়স ৪০ বৎসরের বেশি হইবে, এবং ভারতের ৭২ হাজার ওয়াগনের আয়ু ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত হইয়াছে অথবা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমাপ্তির সহিত শেষ হইবে।

গত ৫ই জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে স্বাক্ষরিত ভারত-সরকার ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মধ্যে আর এক চুক্তির বলে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারত-সরকারকে বিদেশ হইতে দুই লক্ষ টন ইস্পাত কিনিবার জন্য ১২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা সাহায্য হিসাবে প্রদান করিবেন। বন্দরে মাল নামান, বিভিন্ন কার্য্যকেন্দ্রে মাল পাঠান এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় হিসাবে ভারত সরকার ব্যয় করিবেন ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ১৯৫৩-৫৪ সালে ভারতবর্ষকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য যে ৭ কোটি ৭১ লক্ষ ডলার আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইবে বলিয়া যুক্তরাষ্ট্র স্থির করিয়াছে, ইহা তাহার দ্বিতীয় চুক্তি। ভারতকে যে কেবল আমেরিকা হইতেই ইস্পাত কিনিতে হইবে চুক্তিতে সেরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নাই। ১৯৫৩ সনের জুন হইতে ১৯৫৪ সনের জুন পর্য্যন্ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার নিমিত্ত ভারতের আনুমানিক ৭ লক্ষ ২৫ হাজার টন ইস্পাতের প্রয়োজন, অথচ ঐ সময়ে ভারতে আনুমানিক ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টন ইস্পাত উৎপন্ন হইবে। স্থির হইয়াছে চার প্রকারের ইস্পাত আমদানী করা হইবে, শীট ৮০ হাজার টন, প্লেট ৫০ হাজার টন, রেল ৫০ হাজার টন এবং স্লীপার বার ২০ হাজার টন।

শতবার্ষিকী বৎসরে ভারতের রেলওয়ে

ভারতের রেলওয়ে বোর্ডের সভাপতি শ্রী এফ. সি. বাধোয়ার লিখিতেছেন যে, ১৯৫৩ সাল ভারতীয় রেলপথের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে—ঐ বৎসরে রেলপথ স্থাপনের শতবার্ষিকী পালন করা হয়; দ্বিতীয়তঃ, আঞ্চলিক ভিত্তিতে রেলপথগুলির পুনর্বিন্যাসের পর পূর্ণ এক বৎসর অতীত হয়; তৃতীয়তঃ, গত ১লা অক্টোবর হইতে প্রথম শ্রেণী তুলিয়া দেওয়ার ফলে বহুকাল হইতে প্রচলিত চারিটি শ্রেণীর স্থলে ভারতীয় রেলপথগুলিতে বর্ত্তমানে কেবল তিনটি শ্রেণী চালু থাকিবে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে একটি হইতেছে রেলপথগুলির স্থানীয় উপদেষ্টা কমিটি এবং কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ তুলিয়া দিয়া তাহার স্থলে রেলপথ-ব্যবহারকারী পরামর্শদাতা-সংস্থা গঠন এবং রেলকর্ম্মচারীদের বিভিন্ন সঙ্ঘ একত্রিত হইয়া একটি প্রতিষ্ঠান—রেলওয়ে কর্ম্মী জাতীয় ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্তি।

রেলপথগুলির ইঞ্জিন, ওয়াগন এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জাম অত্যন্ত পুরাতন হইয়া পড়ায় বর্ত্তমানে রেলপথগুলির সম্মুখে পুনর্গঠনের কার্য্যই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য স্বভাবতঃই নূতন রেলপথ স্থাপন এবং নূতন উন্নয়ন-পরিকল্পনা প্রভৃতিকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হইয়াছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ মোট ২০৬৯ কোটি টাকার মধ্যে রেলপথের জন্য ৪০০ কোটি টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে; এই টাকার মধ্যে রেলবিভাগই ৩২০ কোটি টাকা দিতে সক্ষম হইবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ইতিমধ্যেই ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। বর্ত্তমান এবং আগামী দুই বৎসরে অবশিষ্ট ২৫০ কোটি টাকা নিম্নোক্তরূপে ব্যয় করা হইবে:

১	পুনর্গঠন এবং কতকগুলি সাজসরঞ্জাম তৈরি	১৮৩ কোটি টাকা
২	পরিচালনা ও কারিগরি উন্নয়ন এবং যাত্রী ও কর্ম্মীদের সুখসুবিধা	৮৩ কোটি ,,
৩	গাড়ীর সংখ্যাবৃদ্ধি এবং নূতন লাইন স্থাপন	৩০ ,, ,,
৪	বিবিধ	৪ ,, ,,

শ্রীবাধোয়ার লিখিতেছেন, "১৯৫১ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত নূতন নূতন সাজসরঞ্জাম ও ইঞ্জিন ক্রয় করা সত্ত্বেও ঐ তারিখে মোট ৮২০০টি রেল-ইঞ্জিন, ১৯,১২৩টি বগি গাড়ী ও ১,৯৯,৪২৪টি ওয়াগনের মধ্যে ২৬৫৪টি রেল-ইঞ্জিন, ৬,৮৩৫টি বগি গাড়ী ও ৪৭,২৫৬টি ওয়াগনই ছিল কার্য্যকারিতার মেয়াদ অতিক্রান্ত পুরাতন। অর্থাৎ, ১৯৫১ সনের ১লা এপ্রিল তারিখে ভারতীয় রেলওয়ের শতকরা ৩২টি ইঞ্জিন, ৩৬টি বগি এবং ২৪টি ওয়াগানই প্রথম মহাযুদ্ধেরও পূর্ব্বের। ১৯৫৬ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখের মধ্যে আরও শতকরা ১৩টি ইঞ্জিন, ১৬টি বগি ও ১৩টি ওয়াগন পুরাতন হইয়া যাইবে।"

১৯৫১-৫৬ সালে ভারতের রেল-ইঞ্জিন কারখানাগুলিতে বয়লার এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জাম ছাড়াও ৪৪০টি পূর্ণাঙ্গ ইঞ্জিন নির্ম্মিত হইবে। প্রয়োজনের তুলনায় দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের স্বল্পতা হেতু পরিকল্পনা কালে বিদেশ হইতে মোট ৮৫০ হইতে ৯০০টি নূতন ইঞ্জিন আমদানীর পরিকল্পনা রহিয়াছে। এই সময়ে ভারতে ৪৫০টি বগি গাড়ী নির্ম্মিত হইবে এবং বর্ত্তমান চাহিদা ইহাতেই পূরণ হইবে বলিয়া মনে হয়। স্থির হইয়াছে যে, ভারতীয় উৎপাদকদের নিকট হইতে ৪০ হাজার ওয়াগন এবং বিদেশ হইতে ১৮

হাজার ওয়াগন ক্রয় করা হইবে। বগি গাড়ী নির্ম্মাণের জন্ম মাদ্রাজের নিকট পেরামবুরে একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আশা করা যায়, এই কারখানার উৎপাদন আরম্ভ হইলে অন্ততঃ যাত্রীবাহী গাড়ীর জন্ম বিদেশের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না।

১৯৫৪ সালে পাঁচটি নূতন লাইনের কাজ চলিবে—"তাহাদের মোট দৈর্ঘ্য ২৬৭ মাইল। অপর ৭টি প্রস্তাবিত লাইন জরীপের কাজও ১৯৫৩-৫৪ সালের কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে একটির উদ্দেশ্য হইল পশ্চিমবঙ্গে তিলডাঙ্গা-খাজুরিয়া মালদহ লাইনে সম্ভাব্য সংযোগ সাধন।"

শ্রীবাধোয়ার লিখিতেছেন: "বর্তমানে মাল ও যাত্রীবহনের হ্রাসবৃদ্ধি প্রায় স্বাভাবিক পর্য্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে যাত্রীবহনের পরিমাণ সর্ব্বোচ্চে উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহার পরে ভাড়া বৃদ্ধি করায় যাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাইলেও আয় হ্রাস পায় নাই। বর্তমানে যাত্রীর ও যাত্রী মাইলের সংখ্যা হ্রাস পাইলেও যুদ্ধ-পূর্ব্বের অবস্থার তুলনায় এখন শতকরা ১৭০.১৩ ভাগ বেশী যাত্রী বাহিত হইতেছে এবং যাত্রী মাইলও এখন শতকরা ১২৫ ভাগ বেশী।" যাত্রী ও মালের দরুন আয়ের হার এখন প্রায় প্রাক্-যুদ্ধকালীন হারের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। অবিলম্বে যাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধির তেমন আশা না থাকিলেও উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে মালবহনের পরিমাণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আলোচ্য বৎসরের অপর নূতন প্রচেষ্টার কথা প্রথমেই উল্লেখ করা হইয়াছে—তাহা হইতেছে, প্রত্যেক রেলওয়েতে এবং কেন্দ্রে রেলওয়ে ব্যবহারকারীদের পরামর্শদাতা সংস্থা স্থাপন। জনসাধারণের সুখসুবিধা বিধান এবং রেলপথের সাধারণ পরিচালনা বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখাই ইহাদের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বেকার স্থানীয় উপদেষ্টা কমিটির স্থান ইহারা গ্রহণ করিয়াছে।"

পরিশেষে শ্রীবাধোয়ার বলেন, "রেলওয়ে শ্রমিকদের দিক বিবেচনা করিয়া বলা যায়, ১৯৫৩ সাল ছিল সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার বৎসর, বস্তুতঃ ইঁহাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ব্যতীত ভারতীয় রেলওয়ের উন্নতি সম্ভব হইত না। রেলওয়ে শতবার্ষিকী বৎসরে লক্ষ লক্ষ রেলওয়ে কর্ম্মী সত্যই উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছেন।"

কলম্বো পরিকল্পনার দ্বিতীয় বর্ষের কার্য্যবিবরণী

কলম্বো পরিকল্পনা সম্পর্কিত উপদেষ্টা কমিটির দ্বিতীয় বার্ষিক রিপোর্টে বলা হইয়াছে, "কলম্বো পরিকল্পনা সম্পর্কিত কার্য্যসূচী কঠিন অবস্থায় পৌঁছিতেছে।" রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, পরিকল্পনার সাফল্য তিনটি অবস্থার উপর নির্ভর করিবে। "প্রথমতঃ, পরিকল্পনাভুক্ত এলাকার দেশসমূহকে তাহাদের প্রধান প্রধান কার্য্যসূচীর উপর মনোনিবেশ করিতে হইবে এবং তাহাদের সর্ব্বপ্রকার সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, পণ্যাদির মূল্যবৃদ্ধিরোধ এবং যথাসম্ভব অধিক পরিমাণ অর্থসঞ্চয় ও বিনিয়োগ করিবার জন্ম ঐ দেশগুলিকে দৃঢ় আভ্যন্তরীণ নীতি অনুসরণ করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, বৈদেশিক মূলধন আমদানী রদ করা হইবে না। উহা যথাসম্ভব বাড়াইতে হইবে।"

পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ দেশেরই প্রধান রপ্তানী দ্রব্য কাঁচামাল। গত দুই বৎসরে এই সকল রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য অনেক কমিয়া যাওয়ায় এবং বিশেষতঃ মূলধনী মাল কিম্বা অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় আমদানী দ্রব্যের মূল্য অনুরূপ ভাবে না কমিবার ফলে রপ্তানী বাবদ দেশের আয় কমিয়া যাওয়ায় দেশে বেকারসমস্যা বৃদ্ধি হয় এবং রাজস্বও কমিয়া যায়। তাহা ছাড়া জনসাধারণের সঞ্চয় ও উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্য্যসূচী রূপায়িত করিবার সম্পদও হ্রাস পায়।

"তাহা সত্ত্বেও দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দেশসমূহ ১৯৫১-৫২ সালের তুলনায় ১৯৫২-৫৩ সালে উন্নয়নের কাজে অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে। এজন্ম তাহাদিগকে সঞ্চিত উদ্বৃত্ত টাকা বাহির করিতে হয় এবং বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। তাহাদের আভ্যন্তরীণ সম্পদের উপরেও খুব বেশি চাপ পড়ে।"

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ১৯৫২-৫৩ সালে ভারতে ৩৫ লক্ষ একর জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হইয়াছে এবং ১৯৫১-৫২ সালের তুলনায় খাদ্যোৎপাদন ৫০ লক্ষ টন বাড়িয়াছে। ভারতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের পরিমাণ ৩১৫০০০ কিলোওয়াট বাড়িয়াছে।

ঐ বিবরণী হইতে আরও জানা যায় যে, ঐ অঞ্চলের জন্ম ১৯৫২-৫৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সাহায্য পাওয়া যায়—পরিমাণ ২৬ কোটি ৯১ লক্ষ ডলার, তন্মধ্যে ভারত প্রায় ৯ কোটি ৭১ লক্ষ ডলার, নেপাল ৭ লক্ষ ডলার, পাকিস্তান ২ কোটি ২৭ লক্ষ ডলার, কাম্বোডিয়া, লাওস ও ভিয়েৎনাম ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ ডলার এবং ৫ কোটি ১৪ লক্ষ ডলার পায় ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। তাহা ছাড়া ঐ দুই বৎসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানকে গম কিনিবার জন্ম ধার দিয়াছে ৩০ কোটি ডলার। ঋণ-করা গম বিক্রয়ের টাকায় যে তহবিল সৃষ্টি হইবে তাহা আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় খরচ করা হইবে। গত তিন বৎসরে ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়া ঋণ পাইয়াছে ৮ কোটি ৯২ লক্ষ ডলার।

ভারত, পাকিস্তান, সিংহল প্রভৃতি দেশের পাওনা ষ্টার্লিং ব্রিটেন শোধ করিয়া দিতেছে; প্রতি বৎসরে ৪ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড হিসাবে পরিকল্পনার ছয় বৎসর কাল দিতে থাকিবে। কমনওয়েলথ উন্নয়নের জন্ম মূলধন সরবরাহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লণ্ডনে একটি ফিন্যান্স কোম্পানী গঠন করা হইয়াছে। মালয়, সিঙ্গাপুর, সারওয়াক এবং উত্তর বোর্ণিও পুনর্গঠন ও উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্ম ব্রিটেন সাড়ে ছয় কোটি পাউণ্ড দিবে। উহার মধ্যে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড ১৯৫২-৫৩ সালে ব্যয় হইয়াছে। ব্রিটিশ সরকার ব্রিটেনে সাজসরঞ্জাম ক্রয়ের জন্ম পাকিস্তানকে এক কোটি পাউণ্ড ধার দিয়াছে।

কানাডা এ পর্য্যন্ত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলিকে ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ডলার ধার দিয়াছে। উহার মধ্যে পণ্য ও সরঞ্জামও রহিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়া সরকার কলম্বো পরিকল্পনার জন্য প্রতিশ্রুত তিন কোটি ১২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ডের মধ্যে ১৯৫২-৫৩ সাল পর্য্যন্ত ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছে।

ভারত নেপালকে ২ কোটি টাকা দিয়াছে। তন্মধ্যে এক কোটি টাকা সড়ক উন্নয়নে এবং ভারত ও নেপালের মধ্যে যোগাযোগ সংস্থাপনে, ৫০ লক্ষ টাকা সেচব্যাপারে এবং ৫০ লক্ষ টাকা সমগ্র নেপালে বিমান হইতে তদন্ত কার্য্যে ব্যয় হইয়াছে। তাহা ছাড়া ভারত বিভিন্ন দেশকে ৫ জন বিশেষজ্ঞ সরবরাহ করিয়াছে এবং বিদেশের ২৮ জন শিক্ষার্থীকে এদেশে কারিগরি শিক্ষার সুযোগ দিয়াছে।

ভারত-জার্ম্মান ইস্পাত শিল্প-চুক্তি

গত ২১শে ডিসেম্বর ভারত গবর্মেণ্ট জার্ম্মানীর শিল্প সংস্থানদ্বয়,—ক্রুপ ও ডেমাগের সহিত ভারতে ইস্পাত কারখানা স্থাপন সম্বন্ধে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন। প্রস্তাবিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানটি সরকারী শিল্পক্ষেত্রে বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান হইবে। এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানটি "হিন্দুস্থান ষ্টীল লিমিটেড" নামে একটি যৌথ সংস্থান হইবে—ইহার মোট মূলধন হইবে ১০০ কোটি টাকা।

প্রথম দফায় ৭০ কোটি টাকা খরচ হইবে এবং ইহার মধ্যে আপাততঃ ৩৫ হইতে ৫০ কোটি টাকার মত মূলধন প্রদত্ত হইবে। বাকী টাকা সম্ভবতঃ আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করা হইবে। এই কারখানাটি প্রথমে বৎসরে পাঁচ লক্ষ টন করিয়া ইস্পাত উৎপন্ন করিবে, পরে ইহার উৎপাদন-ক্ষমতা ১০ দশ লক্ষ টনে বৃদ্ধি করা হইবে।

এই যৌথ সম্পর্ক দশ বৎসরের জন্য স্থায়ী থাকিবে, পরে যে-কোনও পক্ষ আরও দশ বৎসরের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। ক্রুপ ও ডেমাগ চার বৎসরের মধ্যে কারখানাটিকে চালু করিবে। চালু হইবার পর তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা অতিরিক্ত পারিশ্রমিক ব্যতীত উপদেষ্টা হিসাবে কার্য্য করিবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট শতকরা ৮০ ভাগ মূলধনের স্বত্বাধিকারী থাকিবেন, বাকী কুড়ি ভাগ জার্ম্মান কার্ম্মগুলির অধীনে থাকিবে।

নয় বৎসর পরে ভারত-সরকার ইচ্ছা করিলে এই প্রতিষ্ঠানটিকে ক্রয় করিয়া লইতে পারেন। কিংবা নয় বৎসর পরে যদি জার্ম্মান ফার্ম্ম ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহাদের অংশ গবর্ণমেণ্টের কাছে বিক্রয় করিয়া দিতে পারে। জার্ম্মান ফার্ম্ম তাহাদের পারিশ্রমিক হিসাবে ২.১০ কোটি টাকা লইবে। যদি চুক্তিমত তাহারা কারখানাটিকে কার্য্যকরী করিতে না পারে তাহা হইলে শাস্তি হিসাবে তাহাদের ঐ পারিশ্রমিক মুদ্রা পাইবে না। জার্ম্মান ফার্ম্ম কোন বোনাস কিংবা রয়্যালটি পাইবে না এবং তাহাদের আয় ভারতীয় আয়করের আওতায় পড়িবে।

এই প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভারত-সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণভাবে প্রায় ভারতীয়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। ভারত ও জার্ম্মান অংশের অনুপাত হইবে ৪ : ১। প্রথমে মাত্র পাঁচ লক্ষ টাকা লইয়া এই শিল্পটির সূচনা হইবে—ভারত-সরকার দিবেন ৪ লক্ষ টাকা, জার্ম্মান ফার্ম্ম দিবে ১ লক্ষ টাকা।

প্রথমে অনেকে এই প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, প্রায় সব কয়টি সর্ত্তই ভারতের অনুকূলে। অধিকন্তু টাটা আয়রণ, ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং হিন্দুস্থান ষ্টীল এই তিনটি প্রতিষ্ঠান পরস্পর সাহায্যমূলক ভাবে কার্য্য করিবে।

আমাদের দেশ এখনও ইস্পাতের বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল নহে। একদিকে যে পরিমাণ ইস্পাতের চাহিদা দেশে বরাবর থাকে তাহার অর্দ্ধেকও দেশে উৎপন্ন হয় না, অন্য দিকে বিশেষ বিশেষ প্রকারের ইস্পাত—যেমন জাহাজ তৈরির জন্য প্রয়োজন—এদেশে আদৌ হয় না। সুতরাং এই নূতন প্রতিষ্ঠানটির স্থাপনা জরুরী।

ভারতীয় জীবনযাত্রা প্রণালী

ভারতের মোট জনসংখ্যা ৩৫ কোটি ৬৬ লক্ষের মধ্যে ২১ কোটি ৪৩ লক্ষ লোক (অর্থাৎ, মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬০.১ ভাগ) পরনির্ভরশীল, তাহারা নিজেরা কোন জীবিকা অর্জ্জন করে না। ১৯৫১ সনের জনগণনায় এই তথ্য জানা গিয়াছে। প্রধানতঃ ইহারা স্ত্রীলোক এবং শিশু—পিতা বা সংসারের অন্যান্য স্বাবলম্বী পুরুষের উপর নির্ভরশীল। সংসারের চাষবাসে যে সকল স্ত্রীলোক সাহায্য করে তাহাদিগকে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

নিম্নলিখিত তালিকায় পরনির্ভরশীল পুরুষ ও স্ত্রীর সংখ্যা দেওয়া হইল :

পরনির্ভরশীল পোষ্য	সংখ্যা (লক্ষ হিঃ)	শতকরা
গ্রাম্য পুরুষ	৬৭৪	৪৫·০
শহুরে পুরুষ	১৫২	৪৫·৬
গ্রাম্য স্ত্রী	১,০৬৫	৭৩·৫
শহুরে স্ত্রী	২৫২	৮৮·১
	——	——
	২,১৪৩	৬০·১

পরনির্ভরশীল স্ত্রীলোকের সংখ্যা পরনির্ভরশীল পুরুষের সংখ্যার চেয়ে অধিক। আবার গ্রামের চেয়ে শহরের মেয়েরা বেশী পরনির্ভরশীল, কারণ গ্রামের মেয়েরা সাধারণতঃ চাষবাসে সাহায্য করে।

স্বাবলম্বী লোকের সংখ্যা মোট ১০ কোটি ৪৪ লক্ষ। তাহার মধ্যে ৭ কোটি ১০ লক্ষ (অর্থাৎ, শতকরা ৬৮·১) লোক হইতেছে চাষী এবং ৩ কোটি ৩৪ লক্ষ (অর্থাৎ, শতকরা ৩১·৯) জন কৃষিজীবী নয়। কৃষিজীবীদের মধ্যে শতকরা ৬৪·৪ জমির অল্পবিস্তর মালিক। শতকরা ২১ জন হইতেছে কৃষিমজুর। কৃষকদের মধ্যে অধিকাংশই জমির মালিক।

স্বাবলম্বী অকৃষকদের মধ্যে (non-agriculturists)

মালিকের অনুপাত অত্যল্প—ত্রিশ জনের মধ্যে একজন মালিক কিংবা তাহারও কম। স্বাধীন ব্যবসায়ে লিপ্ত যাঁহারা আছেন (মালিক ব্যতীত) তাঁহাদের সংখ্যা মালিক এবং শ্রমিক ও কর্ম্মচারীর যুক্ত সংখ্যা হইতে অধিক। ইঁহারা সাধারণতঃ উকীল, ডাক্তার, মোক্তার, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি।

আয়কামীদের (income-earners) মধ্যে যাহারা লভ্যাংশ পায় তাহাদের সংখ্যা শ্রমিক এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীদের যুক্ত সংখ্যা হইতে অধিক। অর্থাৎ, কৃষিজীবীদের মধ্যে মালিকের সংখ্যা অধিক, কিন্তু অকৃষকদের মধ্যে (স্বাধীন উপজীবিকা ব্যতীত) যাহারা ব্যবসায়ে এবং শিল্পে লিপ্ত আছে, তাহাদের মধ্যে মুনাফাকামীদের earners of profit) সংখ্যা অধিক।

৩ কোটি ২৪ লক্ষ লোক শিল্পে এবং চাকুরীতে নিয়োজিত আছে। প্ল্যান্টেশান শিল্প, যথা—চা, রবার, কফি ইত্যাদিতে ১০'৬ লক্ষ লোক কাজ করে; কয়লার খনিতে ৩'১ লক্ষ লোক; উৎপাদন শিল্পে ৯২ লক্ষ; বস্ত্রশিল্পে ২১ লক্ষ; কেমিক্যাল এবং ধাতব শিল্পে ১২'৪ লক্ষ; এবং অন্যান্য উৎপাদন শিল্পে ২৪'৩ লক্ষ। ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে ৫৯ লক্ষ;—ইহার মধ্যে খুচরা ব্যবসায়ে আছে ৫১ লক্ষ লোক আর পাইকারী ব্যবসায়ে আছে ৪'৬ লক্ষ লোক। নির্ম্মাণ-কার্য্য প্রভৃতিতে আছে ১৬ লক্ষ লোক এবং যানবাহন ও পরিবহন ব্যবস্থায় ১৯ লক্ষ লোক কাজ করে।

৩৩ লক্ষ লোক চাকুরীজীবী, ইহাদের মধ্যে সরকারী শাসন-কার্য্যে আছে ২১ লক্ষ লোক। ইহাদের মধ্যে ৫ লক্ষ ৩ হাজার কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীজীবী (সৈন্যদলকে লইয়া)। ঘরোয়া কাজে ১৪ লক্ষ লোক নিয়োজিত আছে।

একজন স্বাবলম্বী ব্যক্তি দুই জনকে পোষণ করে এবং প্রতি তিন জন স্বাবলম্বী ব্যক্তি একজন উপায়জীবী পরনির্ভরশীল ব্যক্তিকে (earning dependent) আংশিক ভাবে পোষণ করে। ৩ কোটি ৭৯ লক্ষ লোক, অর্থাৎ, মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০'৬ ভাগ, "উপায়জীবী-পরনির্ভরশীল"—তাহারা সম্পূর্ণ ভাবে নিজেদের ভরণপোষণ করিতে পারে না। নিম্নে তাহাদের তালিকা দেওয়া হইল :

উপায়জীবী পরনির্ভরশীল

	সংখ্যা (লক্ষ)		শতকরা
গ্রাম্য পুরুষ	১১৯	...	৭'৯
শহুরে পুরুষ	১৫	...	৪'৬
গ্রাম্য স্ত্রীলোক	২৩২	...	১৬'০
শহুরে স্ত্রীলোক	১৩	...	৪'৫
	৩৭৯		১০'৬

ইহাদের সংখ্যা গ্রামেই অধিক, প্রধানতঃ স্ত্রীলোকদের মধ্যে। ইহারা সংসারের চাষবাসে এবং কাপড় বোনায় সাহায্য করে ও কোন মাহিনা লয় না।

মোট জনসংখ্যার মধ্যে ১০ কোটি ৪৪ লক্ষ লোক স্বাবলম্বী, তাহাদের অনুপাত শতকরা ২৯'৩ ভাগ। নিম্নে ইহাদের তালিকা দেওয়া হইল :

স্বাবলম্বী ব্যক্তি

	সংখ্যা (লক্ষ)	শতকরা
গ্রাম্য পুরুষ	৭০৬	৪৭'১
শহুরে পুরুষ	১৬৬	৪৯'৮
গ্রাম্য স্ত্রীলোক	১৫১	১০'৪
শহুরে স্ত্রীলোক	২১	৭'৪
	১,০৪৪	২০'৩

স্বাবলম্বী ব্যক্তির মধ্যে প্রত্যেক ছয় জনের ভিতর একজন করিয়া স্ত্রীলোক। গ্রামে প্রায় প্রত্যেক পাঁচ জনে একজন, শহরে প্রত্যেক আট জনে একজন। স্বাবলম্বী কৃষিজীবী ও অকৃষিজীবীদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :

স্বাবলম্বী ব্যক্তি

	কৃষিজীবী		অকৃষিজীবী	
	সংখ্যা (লক্ষ)	শতকরা	সংখ্যা (লক্ষ)	শতকরা
গ্রাম্য পুরুষ	৫৬৬	৮০'২	১৪০	১৯'৮
শহুরে পুরুষ	১৯	১১'৪	১৪৭	৮৮'৬
গ্রাম্য স্ত্রীলোক	১২১	৮০'২	৩০	১৯'৮
শহুরে স্ত্রীলোক	৪	১৯'৭	১৭	৮০'৩
	৭১০	৬৮'১	৩৩৪	৩১'৯

কৃষি, শিল্প, সরকারী চাকুরী ইত্যাদি ব্যতীত আরও ৭৫'৪ লক্ষ লোক অন্যান্য বিভিন্ন কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। আট লক্ষ চাকুরিজীবী এবং ১৪'৫ লক্ষ স্বাধীন-স্বাবলম্বী (self-employed) ব্যক্তিরা কি কার্য্যে নিয়োজিত আছে সে সম্বন্ধে আদমসুমারী রিপোর্ট সঠিক কিছুই বলিতে পারে না। ইহারা সবাই গ্রামে বাস করে।

এই অবশিষ্ট ৭৫'৪ লক্ষ লোকের মধ্যে কেবলমাত্র ৩৮'১ লক্ষ লোকের উপজীবিকা সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়, যথা—

	সংখ্যা (হাজারে)
গৃহকার্য্য	১,৪২৪
ধোপাখানা ও ধোপাখানার কাজ	৫৬৫
নাপিত ও ক্ষৌরকার্য্য	৫১১
ধর্ম্ম, দাতব্য ও মাঙ্গলিক কার্য্য	৩৬৯
আইনসংক্রান্ত এবং ব্যবসায় কার্য্য	২৩০
খেলাধূলা, গানবাজনা ইত্যাদি	২১৪
হোটেল, রেস্তোরাঁ	৪৫৮
আর্ট, সংবাদপত্র ইত্যাদি	৩৯
	৩,৮১০

চা-রপ্তানীর পরিমাণ

সম্প্রতি ভারত-সরকার ভারতের চা-রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। গত এপ্রিল মাসে আন্তর্জাতিক চা-চুক্তি অনুসারে ভারতের চা-রপ্তানীর পরিমাণ রপ্তানী মালের শতকরা ১১৫ ভাগে নির্দ্ধারিত হয় (অর্থাৎ, প্রায় ৪০ কোটি পাঃ)। গত আগষ্ট মাসে শতকরা পরিমাণ ১২২শে বৃদ্ধি করা হয় (অর্থাৎ, প্রায় ৪২ কোটি ৪৮ লক্ষ পাঃ)। দ্বিতীয় বারে, ১৯৫৩-৫৪ সনের রপ্তানীর পরিমাণ ৪৩·৭০ কোটি পাউণ্ডে বৃদ্ধি করা হইয়াছে, অর্থাৎ, রপ্তানী মালের শতকরা ১২৫·৫ ভাগ। আন্তর্জাতিক চা-চুক্তি অনুসারে ভারতের রপ্তানীর পরিমাণ ৪৭ কোটি পাউণ্ডে নির্দ্ধারিত করা আছে, অর্থাৎ, রপ্তানী মালের শতকরা ১৩৫ ভাগ।

ইদানীং বিদেশে ভারতীয় চায়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে, ফলে চা রপ্তানী করিবার অধিকারের মূল্যও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। চা রপ্তানী করিবার জন্য লাইসেন্স পাইতে হইলে রপ্তানী কোটার অধিকারী হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। কোটার তুলনায় চাহিদা বেশী হওয়ায় দালাল ও মাধ্যমিক ব্যবসাদারেরা লাভ করিতেছে, ফলে রপ্তানী চায়ের মূল্য পাউণ্ড প্রতি পায় ৪০ পাই হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথমে, রপ্তানীর লাইসেন্স পাওয়ার জন্য পাউণ্ড প্রতি দেড় পাই হিসাবে মূল্য দেওয়া হইত; যখন রপ্তানীর পরিমাণ শতকরা ১১৫ ভাগে নির্দ্ধারিত হয় তখন ১৩ পাই পাউণ্ড হিসাবে রপ্তানী কোটা কেনা-বেচা হইতে থাকে। জুলাই মাসে পাউণ্ড প্রতি ২২ পাই হিসাবে বৃদ্ধি পায়। যদিও মাঝে ইহা অল্প হ্রাস পায়, কিন্তু পরে ইহা পাউণ্ড প্রতি ৪০ পাইয়ে বাড়ে। চলতি বৎসরে ব্রিটেনে প্রায় ৫ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড উত্তর-ভারতীয় চা অতিরিক্ত পরিমাণে রপ্তানী হইয়াছে। রাশিয়ার সহিত সদ্য ব্যবসা-চুক্তি অনুসারে রাশিয়া অন্ততঃ ৩ কোটি পাউণ্ড ভারতীয় চা লইবে। ইদানীং চায়ের ফাটকা-বাজার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে রপ্তানী চায়ের মূল্য অযথা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ফলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ভারতীয় চা অসুবিধায় পড়িয়াছিল। চায়ের রপ্তানী বৃদ্ধিতে ভারতের আভ্যন্তরিক বাজারে চায়ের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা কম, কারণ গত বৎসরের তুলনায় উত্তর-ভারতের চায়ের পরিমাণ মোট এক কোটি পাউণ্ড কম হইবে। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতীয় চা এবারে ৪০।৫০ লক্ষ পাউণ্ড অতিরিক্ত হইবে।

খাগড়াই বাসন-শিল্পের দুর্গতি

৭ই পৌষের 'মুর্শিদাবাদ-সমাচার' পত্রিকা মুর্শিদাবাদে কুটীর-শিল্পী, বিশেষতঃ কাংস্য-শিল্পীদের দুরবস্থার উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন: ১৯৫১ সনের লোকগণনার হিসাব হইতে জানা যায় মুর্শিদাবাদের শতকরা ৯·৭৭ জন অধিবাসী শিল্পজীবী। মুর্শিদাবাদের প্রধান শিল্প রেশম; তাহা এখন ধ্বংসের পথে। ১৯১১ সনে মুর্শিদাবাদ জেলায় যেখানে অনূন ১৪০০০ লোক রেশমী সূতা কাটিয়া বা রেশম বস্ত্র বুনিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন ১৯৫১ সনে তাঁহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া মাত্র ৯২০ জনে দাঁড়াইয়াছে। রেশম শিল্পের পরই শিল্পীর সংখ্যার দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় শিল্প হইতেছে বাসন-শিল্প। কাঁসার বাসনের জন্য খাগড়ার কাংস্যশিল্পীরা সমগ্র বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। খাগড়া এবং বহরমপুর ছাড়াও কান্দী, জঙ্গীপুর, পাঁচগ্রাম ও বড়নগরেও কাংস্য-শিল্পের বেশ প্রসার ছিল। কাংস্য-শিল্প এখনও যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকেই চলিতেছে। মাত্র কিছুকাল হইতে কলের সাহায্যে কাঁসার বাসনগুলি পালিশ করা হইতেছে। পিতল-শিল্পেও কেবলমাত্র পিতলের থান-(শীট)গুলি কল হইতে আসে—অন্যান্য সকল কাজই কারিগরেরা হাতে করে।

এই শিল্পে মজুরী এবং কাঁচামাল সরবরাহের সমস্যার জন্য বহু পরিবার জাত-ব্যবসা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ফলে রেশম-শিল্পের মত খাগড়াই বাসন-শিল্পেও শিল্পীর সংখ্যা রীতিমত হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯৪৭ সনে বঙ্গ-বিভাগের পর নবাবগঞ্জ, ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক পিতল ও কাংস্য-শিল্পী সপরিবারে আসিয়া খাগড়া প্রভৃতি স্থানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করিয়া কারখানা চালাইবার কারণে শিল্পীসংখ্যা হ্রাস তেমন সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না। তবে "শিল্পীর সংখ্যা বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি-সাধন হয় নাই।"

পরিশেষে "মুর্শিদাবাদ-সমাচার" লিখিতেছেন: "মুর্শিদাবাদের রেশম-শিল্পের উন্নতি-সাধন সম্পর্কে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সচেষ্ট হইয়াছেন এবং সমবায় পদ্ধতির সাহায্যে রেশম-শিল্পের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে একটা কার্যকরী ব্যবস্থা করিবার উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে। এ সম্পর্কে একটি রেশম সমবায়-সমিতি গঠিত হইয়াছে। যদি এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় তাহা হইলে খাগড়াই বাসন-শিল্পের উন্নতিকল্পে সমবায় প্রথার সাহায্যে অগ্রসর হইলে এই প্রখ্যাত কুটীরশিল্পটিও বিলোপের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। খাগড়াই বাসন-শিল্প সম্পর্কে সরকারী শিল্প-বিভাগের অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে।"

লবণ শুল্ক

ভারত স্বাধীন হইবার পর লবণ-কর রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সম্প্রতি লবণ শুল্ক প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। বেসরকারী কারখানায় প্রস্তুত লবণের উপর মণ প্রতি দুই আনা হিসাবে এবং সরকারী কারখানায় প্রস্তুত লবণের উপর মণ প্রতি চৌদ্দ পয়সা হিসাবে শুল্ক দিতে হইবে। উৎপাদনের উপর লবণ শুল্ক পূর্ব্ব হইতে ছিল, নূতন আইনদ্বারা লবণ শুল্ককে নিয়ন্ত্রিত করা হইল। লবণ শুল্ক হইতে বৎসরে প্রায় ৯৫ লক্ষ টাকার মত গবর্ণমেণ্টের আয় হইবে। এই অর্থ সরকারী লবণ বিভাগের ব্যয়ে নিয়োজিত করা হইবে। বৈজ্ঞানিক প্রথায় এবং পরিকল্পিতভাবে লবণ শিল্পের উন্নতির জন্যও এই শুল্ক সাহায্য করিবে।

সরকারী কৈফিয়ত হইতেছে এই যে, এই উৎপাদন শুল্কের পরিমাণ এত অল্প যে ইহা রহিত করিয়া দিলেও জনসাধারণের কোন সুবিধা হইবে না। ইহাতে কেবলমাত্র বড় বড় কারখানাগুলি ও মাধ্যমিক ব্যবসাদাররা উপকৃত হইত। ১৯৪৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে লবণ-কর রহিত করিয়া দেওয়া হয় তাহাতে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি হয় বৎসরে ৮'২৫ কোটি টাকা।

পশ্চিমবঙ্গে তৈল সন্ধানের জন্য চুক্তি সম্পাদিত

পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা অঞ্চলে পেট্রোলিয়ম সন্ধান করিবার জন্য ডিসেম্বর মাসে ভারত-সরকার ও মার্কিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানীর মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে সম্পাদিত পূর্ব্ববর্তী এক চুক্তি অনুযায়ী অনুসন্ধানের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়, এই পর্য্যায়ে ম্যাগনেটোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে বিমান হইতে পেট্রোল অনুসন্ধান করা হইয়াছিল। গত মাসের চুক্তিতে এই অনুসন্ধানের কাজ অব্যাহত রাখিবার ও প্রসারিত করিবার কথা বলা হইয়াছে। তৈল অনুসন্ধানের কার্য্য পরিচালনার ব্যয়ের এক-চতুর্থাংশ বহন করিবেন ভারত-সরকার এবং অবশিষ্ট অংশ বহন করিবেন উক্ত তৈল কোম্পানী ও অনুসন্ধানের ভার থাকিবে তৈল কোম্পানীর উপর।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম তৈল কোম্পানী ভারত-সরকারকে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, অনুসন্ধান ও পরীক্ষাদির ফলে ভবিষ্যতে যদি বাণিজ্য এবং শিল্পের ভিত্তিতে খনিজ তৈল উত্তোলন করা সম্ভবপর হয়, তবে তৈল কোম্পানী একটি তৈল শোধনাগার স্থাপন ও পরিচালনা সম্বন্ধে বিবেচনা করিবে। এই শোধনাগারে দৈনিক ১০ হাজার ব্যারেল (পিপা) পেট্রোল ন্যূনপক্ষে শোধন করা সম্ভব হইবে।

ধানের দরের নিম্নগতি

৩১শে ডিসেম্বরের "নূতন পত্রিকা" ক্রমহ্রাসমান ধানের দর লক্ষ্য করিয়া এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন যে, বর্দ্ধমান জেলার অনেক স্থানেই ধানের দর মণপ্রতি ৭৲ টাকার নীচে নামিয়াছে। সরকারী খাদ্যবিভাগ আশ্বাস দিয়াছিল যে ধানের দর পড়িতে দেওয়া হইবে না, কিন্তু শ' ওয়ালেস কোম্পানীকে ধান ক্রয়ের একচেটিয়া সুবিধা দেওয়ার পর সরকারের আর সে কথা স্মরণ নাই। কোম্পানী জেলার ধান-চাউল ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলির অর্দ্ধেকেও খরিদ ডিপো খোলে নাই। উপরন্তু তাহারা চাষীকে ন্যায্য দরও দেয় না। এই ভাবে অন্য খরিদ্দারের খরিদের পথ বন্ধ করিয়া শ' ওয়ালেসকে একচেটিয়া খরিদের সুযোগ দেওয়ায় চাষীর সর্ব্বনাশ হইতেছে।

পত্রিকাটি লিখিতেছেন: "যদি অবিলম্বে ছোট বড় সব মোকামে খরিদ ডিপো খোলান যায় ও কোম্পানীকে ন্যায্য মূল্য দিতে বাধ্য করা যায় তবেই কৃষক কতকটা রক্ষা পাইতে পারে।"

এখানে প্রশ্ন—ন্যায্য মূল্য কি? যাহারা চাল কিনিয়া খায় এবং তাহাদের সংখ্যা কোন অংশেই নগণ্য নহে—তাহারা চাহে চাউলের দর পড়ুক। চাষী চাহে ধান্যের উচ্চ মূল্য। দুইয়ের মাঝামাঝি কিছু স্থির হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে চাষীরও কিছু লাভ থাকে এবং 'কুলাক'বর্গও রক্ত শোষণ করিতে না পারেন। সরকারের লেভী ও প্রোক্যুরমেণ্টের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া সে বিভাগ ত তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন খরিদ ডিপোর খরচ দিবে কে?

পশ্চিমবঙ্গে ভূদান আন্দোলন

"ভূদান যজ্ঞের প্রাথমিক উদ্দেশ্য এই যে, যে সকল ভূমিহীন দরিদ্র ভূমি চাষ করিতে জানে ও ভূমি চাষ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে চায় তাহাদের দারিদ্র্য মোচনের জন্য ভূমিদানের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের জীবিকার সংস্থান করা। উহার চরম লক্ষ্য এই যে, ভূমিহীন দরিদ্রের জন্য ভূমির সংস্থানকে ভিত্তি করিয়া দেশে সর্ব্বোদয়ের প্রতিষ্ঠা।"

পশ্চিমবঙ্গে ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভূদান আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য করিয়া শ্রীযুত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী লিখিতেছেন যে, বিভিন্ন সরকারী হিসাব হইতে দেখা যায়, অবিভক্ত বঙ্গে ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছিল। "দুর্ভিক্ষের সময় ৯ লক্ষেরও অধিক পরিবার তাহাদের খানী জমি বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। আড়াই লক্ষ পরিবার তাহাদের বাস্তুভিটা পর্য্যন্ত হারাইয়া সর্ব্বহারা হইয়া যায়। দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে কৃষিমজুর পরিবারের মধ্যে শতকরা ১৬টি পরিবারের কিছু কিছু খানী জমি ছিল। দুর্ভিক্ষের সময় ইঁহাদের মধ্যে শতকরা ১৩টি পরিবার তাহাদের যাহা কিছু জমি ছিল তাহা সবই হারাইয়া বসে। অন্যান্য কৃষিজীবী পরিবারও অনুরূপ দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছিল।"

এই সকল কথা স্মরণে রাখিলে ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুভূত হইবে।

তিনি লিখিতেছেন: "ভারতের মোট কর্ষণযোগ্য ৩০ কোটি একর ভূমির এক-ষষ্ঠাংশ পাঁচ কোটি একর ভূমি ভূদানযজ্ঞে দানস্বরূপ গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করা হইয়াছে। তবে প্রথম পাদক্ষেপস্বরূপ দুই বৎসরে অর্থাৎ ১৯৫৪ সনের মার্চ মাসের মধ্যে সারা ভারতে পঁচিশ লক্ষ একর ভূমি সংগ্রহ করিতে হইবে। ঐ ২৫ লক্ষ একরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২ লক্ষ একর ভূমিদান করিবার কথা। এই দুই বৎসর পূর্ণ হইতে আর চার মাস বাকি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত পশ্চিম বাংলায় যে ভূমি সংগৃহীত হইয়াছে তাহার পরিমাণ মাত্র ৩৭৫ একর। এই অবস্থা নিতান্ত বেদনাদায়ক।"

ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনের প্রসার পশ্চিমবঙ্গে কেন আশানুরূপ হয় নাই সে সম্পর্কে শ্রীযুত ভাণ্ডারী চারিটি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা:

(১) অনন্যকর্ম্মা ও একনিষ্ঠ হইয়া ভূদানযজ্ঞের কাজে প্রভাবশালী কর্ম্মীর সংখ্যা নিতান্ত কম।

(২) কর্ম্মী ও নেতৃবৃন্দ তাহাদের নিজ নিজ ভূমি, সম্পত্তি ও আয় উপযুক্ত পরিমাণে ভূদানযজ্ঞে বা সম্পত্তিদান যজ্ঞে আহুতি না দেওয়ায় অন্যকে দান দিবার প্রেরণা দিতে সক্ষম হন নাই।

(৩) পশ্চিম বাংলায় বহুল প্রচলিত সংবাদপত্রগুলি এই আন্দোলনকে অকুণ্ঠভাবে উৎসাহদান করিতে পারে নাই।

(৪) বাংলার শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ভূদানযজ্ঞকে তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

শ্রীযুত ভাণ্ডারীর বিবৃতি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ ভূদানযজ্ঞ সমিতি চারখানি ভূদানযজ্ঞ সম্পর্কীয় পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। সভা-সম্মেলনে ও গ্রামে এ যাবৎ উহাদের ৮,৫০০খানি বিক্রয় করা হইয়াছে। ভারতবাসীর প্রতি বিনোবাজীর আবেদন এবং পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রতি বাণীর ৩৫,০০০খানি বাংলা অনুবাদ গ্রামে গ্রামে ছড়ানো হইয়াছে।

ভূদান আন্দোলনে প্রাপ্ত জমির পরিমাণ

অখিল-ভারত সর্ব্বসেবা সঙ্ঘের আপিস সেক্রেটারী শ্রীকৃষ্ণরাজ মেহতা জানাইতেছেন যে, ২০শে নভেম্বর পর্যান্ত ভূদান আন্দোলনে প্রাপ্ত জমির পরিমাণ নিম্নরূপ :

রাজ্যের নাম	মোট প্রাপ্ত জমি (একর)	দাতার সংখ্যা
বিহার	১১,৪৯,৫৬৫	৮২,৩৭৯
উত্তরপ্রদেশ	৫,০০,৩৩১	১২,৩৪৩
রাজস্থান	২,২৯,৭৭০	৯২৬
হায়দরাবাদ	৬৮,৭৬৮	
মধ্যপ্রদেশ	৫৬,৫৩৫	
মধ্যভারত	৫১,৪৩৮	
উড়িষ্যা	৪৫,০২১	
গুজরাট	১৮,৩৯৬	
তামিলনাদ	১৪,২৫২	১,৮৭৭
অন্ধ্র	১০,২৯৯	
কেরালা	১০,০০০	
মহারাষ্ট্র	৯,২৭০	৬৯৮
সৌরাষ্ট্র	৮,০০০	
দিল্লী	৭,৬৫৯	
বিন্ধ্যপ্রদেশ	৩,৭০০	
পঞ্জাব	২,৪৩৫	
মহীশূর	২,০০৭	৮৩০
কর্ণাটক	১,৬৩৪	
হিমাচলপ্রদেশ	১,৩৫০	
আসাম	১,৩৪৯	
বাংলা	৩৭৪	৩১০
মোট	২১,৯২,১৫৩	৯৯,৩৬৩

মোট ৩৮,১৭৪ একর জমি ৬,৬৩৬টি পরিবারের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

নিলোখেরী

গত ১লা জানুয়ারী নিলোখেরী ভারত-সরকারের শাসন হইতে পঞ্জাব সরকারের শাসনে চলিয়া গিয়াছে। একটি সরকারী বিবৃতিতে নিলোখেরীর এক সংক্ষিপ্ত বিবরণে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪৮ সনে কুরুক্ষেত্রে উদ্বাস্তু শিবিরের এক দল কর্ম্মী শ্রী এস. কে. দে-র নেতৃত্বে কর্ণাল হইতে ১২ মাইল দূরে দিল্লী-অমৃতসর সড়কের উপর অবস্থিত একটি বিজন প্রান্তর বাছিয়া লইয়া একটি নূতন শহর পত্তন আরম্ভ করেন। ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসেই জঙ্গল পরিষ্কারের কাজ সুরু হইয়া যায়। দুই বৎসরের মধ্যে সেই জনহীন প্রান্তর একটি সুন্দর, সমৃদ্ধ শহরে রূপান্তরিত হয়। শহরটি সমবায়ের ভিত্তিতে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং সকল ক্ষেত্রেই সমবায়ের ভিত্তিতে ইহা পরিচালিত হয়।

অবশ্য সমবায়ের ভিত্তিতে কাজ করিয়া সাফল্য লাভ করিতে হইলে কর্ম্মীদের আর্থিক ও সামাজিক সংগতির এবং পরস্পরের মননশক্তির বিশেষ ব্যবধান থাকিলে তাহা সম্পূর্ণ সুফলপ্রসূ হয় না। এই পার্থক্য দূরীভূত হইলে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। এই জন্যই কুটীরশিল্পগুলিতে সমবায়পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রসূ, কিন্তু মধ্যম ও বৃহৎ শিল্প পরিচালনায় ইহার প্রয়োগ সীমাবদ্ধ।

প্রথমে ঠিক হইয়াছিল নিলোখেরীকে একটি শহর ও গ্রামের সমন্বয়ে গড়িয়া তোলা হইবে, কিন্তু বাস্তব অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া পরে শুধু শহরটিকেই গড়িয়া তোলা হইয়াছে।

নিলোখেরীতে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিচালক অফিসার মহাকেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে—পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলগুলির এবং সমগ্র পঞ্জাবের কর্ম্মী ও কারিগরদের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে এই স্থানে। নিলোখেরীর পলিটেকনিকে এখন ৩০০ জন ছাত্র আছে। তাহা ছাড়া সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার গ্রামস্তরের কর্ম্মীদের শিক্ষাকেন্দ্র এবং সমাজসেবাশিক্ষা কর্ম্মীদের আর একটি শিক্ষাকেন্দ্রও এখানে সংস্থাপন করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে শীঘ্রই নিলোখেরীতে ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট অফিসারদের একটি শিক্ষাকেন্দ্র এবং একটি বুনিয়াদী কৃষি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইবে। এই কেন্দ্রে সকল শ্রেণীর কর্ম্মীই শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। সেখানে পঞ্জাব সরকারের পক্ষ হইতেও একটি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইবে—বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ-কেন্দ্র। দেশ-বিভাগের পূর্ব্বে পঞ্জাবের রাসুল নামক স্থানে যে সরকারী ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলটি চালু ছিল, তাহাও দুই বৎসর পূর্ব্বে নিলোখেরীতে স্থাপিত হইয়াছে।

নিলোখেরীতে যে একটি ছাপাখানা আছে শীঘ্রই ভারত-সরকার ইহা নিজ তত্ত্বাবধানে লইয়া গিয়া ইহার সম্প্রসারণ করিবেন। নিলোখেরীর ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা হইতে ভারতীয় রেলওয়েসমূহের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ তৈয়ার হয়।

নিলোখেরীর লোকসংখ্যা ৬,৪০০, তাহাদের মধ্যে ছাত্র ১৩০০। তাহা ছাড়া সেখানকার পলিটেকনিক ও অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্রে যোগ দিবার জন্য বাহির হইতে আরও ৬০০ জন ছাত্র সেখানে যায়।

শহরে ১০০০টি বাড়ী আছে। একটি হাই স্কুল, কয়েকটি বুনিয়াদী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি হাসপাতাল, একটি পশু চিকিৎসালয়, একটি দুগ্ধাগার, একটি পশুপালনকেন্দ্র, অনেকগুলি কুটীরশিল্প ও কতকগুলি ক্ষুদ্র শিল্প আছে।

শহরের নির্মাণকার্য্য শেষ হইয়া যাওয়ায় এবং অন্যান্য কারণে ১৯৫২ সালে নিলোখেরীতে কর্ম্মসংস্থানের অভাব ঘটে। বর্ত্তমানে অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে।

নিলোখেরী শহর বাবদ ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ৬৩,৫০,৮৫০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ঐ তারিখ পর্য্যন্ত ১২,১৭,৮৩৬ টাকা শোধ করা হইয়াছে।

পশ্চিম বাংলায় ঐরূপে নূতন শহর গঠন ও স্থাপনের চেষ্টা বহুদিন যাবৎ চলিতেছে। কিন্তু বিশেষ কোনও ফল দেখা যায় নাই। ইহার কারণ নির্ণয় দুরূহ নহে। কারণ পঞ্জাবী ও বাঙালী উদ্বাস্তুর মধ্যে মনোপ্রবৃত্তির প্রভেদ। ইহার প্রতিকার না হইলে উদ্বাস্তু-দিগের শোচনীয় দুর্গতি অনিবার্য্য।

আসানসোল হাসপাতালে অব্যবস্থা

"বঙ্গবাণী" আসানসোল হাসপাতালের নানাবিধ অব্যবস্থা সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন যে, হাসপাতালের উন্নতির প্রতি কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ উদাসীন। দুই বৎসর যাবৎ হাসপাতালের এক্সরে যন্ত্রটি বিকল হইয়া রহিয়াছে, বহুবার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও মেরামত হয় নাই। পোর্টেবল এক্সরে যন্ত্রটির অবস্থাও তদ্রূপ। রেফ্রিজারেটরটিও অচল। অথচ গড়ে প্রত্যহ এই হাসপাতালে ২৫।৩০ জন আঘাতপ্রাপ্ত রোগী চিকিৎসার জন্য আসে। হাসপাতালের অস্ত্রোপচারকক্ষে উপযুক্ত আলো নাই; অস্ত্রোপচারে সাহায্যক্ষম কোন শিক্ষিত সহকারীও নাই যদিও প্রতি বৎসর ন্যূনপক্ষে দুই-তিন হাজার অস্ত্রোপচার এই হাসপাতালেই হয়। যন্ত্রপাতি উপযুক্তভাবে সংরক্ষিত করিবার জন্য লোকের অভাবে বহুমূল্য সরকারী যন্ত্রপাতি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে হাসপাতালের বসন্ত ওয়ার্ডটি ধূলিসাৎ হইয়াছিল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার পুনর্নির্ম্মাণ সম্ভব হয় নাই। হাসপাতালে সরকার যে পরিমাণ ঔষধপত্র সরবরাহ করেন তাহা ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। তিন মাসের জন্য যে পরিমাণ প্লাষ্টার দেওয়া হয় তাহাতে তিন সপ্তাহের বেশী চলে না। হাসপাতালে পরিস্রুত (distilled) জল থাকে না, ফলে কলেরা রোগীর স্যালাইন পর্য্যন্ত সাধারণ কলের জল দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। চক্ষুর ঔষধেও ঐ কলের জল অথবা ইঁদারার জল ব্যবহার করা হয়।

'বঙ্গবাণী' লিখিতেছেন: "হাবভাব দেখিয়া মনে হয় গবর্ণমেণ্ট নূতন নূতন হেলথ সেণ্টার খুলিয়া এবং কলিকাতার বড় বড় হাসপাতালের ব্যবস্থা করিয়া প্রশংসা লইতেই ব্যস্ত। মফস্বলের হাসপাতালগুলির কোনরকম উন্নতিসাধন করিবার দিকে তাঁহাদের আদৌ দৃষ্টি নাই এবং বোধ হয় প্রয়োজনও মনে করেন না।"

নিখিল-ভারত শিক্ষা-সম্মেলন

গত ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কলিকাতায় নিখিল-ভারত শিক্ষা-সম্মেলনের ২৮শ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা-সম্পর্কীয় সমিতিগুলির নিখিল-ভারত ফেডারেশনের (All-India Federation of Educational Associations) উদ্যোগে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ভারত-সরকারের শিক্ষা-বিষয়ক যুগ্ম পরামর্শদাতা শ্রী কে. জি. সৈয়িদায়েন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। উক্ত নিখিল-ভারত ফেডারেশনের সভাপতি ডঃ অমরনাথ ঝা এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ শ্রীঅনাথনাথ বসুও এই সম্মেলনে অভিভাষণ প্রদান করেন।

প্রায় তিন হাজার শিক্ষাব্রতী প্রতিনিধি এবং দর্শকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে শিক্ষার বিভিন্ন পর্য্যায়, দিক এবং সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং সেই আলোচনার উপর ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সম্মেলনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে: "এই সম্মেলন দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন যে, দেশের রাজনৈতিক মুক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতির পথ প্রশস্ততর করে নাই। বিভিন্ন কমিশন এবং কমিটি বসিয়াছে এবং তাহাদের রিপোর্টও প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু শিক্ষাকে আগাইয়া লইবার জন্য সরকার কোন মূল্যবান প্রচেষ্টাই করেন নাই। ফলে সর্ব্বত্রই ইতস্ততঃভাবের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি প্রত্যেকটিতেই সাজ-সরঞ্জামের অভাব, শিক্ষকগণ বাঁচিবার উপযুক্ত মজুরী পান না এবং ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ নাই।"

সভাপতি শ্রী কে. জি. সৈয়িদায়েনের ভাষণের মধ্যেও এই একই সুরের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। অতীতে শিক্ষকদিগকে কিরূপ হতাশাময় পরিবেশে কার্য্য করিতে হইত তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, তবুও সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, এমন সুদিন আসিবেই যেদিন শিক্ষা জাতীয় জীবনের ন্যায্য আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তিনি বলেন, "আজ সেদিন আসিয়াছে। একটু দ্বিধাভরেই এই কথা বলিতেছি। কারণ আমাদের অধিকাংশ শিক্ষকই এখনও কি অবস্থার মধ্যে কাজ করিতেছেন সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অবহিত আছি।" দেশের পরাধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন হইবার পর দেশ-গঠনের বিভিন্ন কাজ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে; কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন এক প্রকার অসাধ্যসাধন বলিয়াই প্রতিভাত হয়। একমাত্র শিক্ষাই এই অসাধ্যসাধনে সহায়তা করিতে পারে যদিও আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে অক্ষম।

শ্রীসৈয়িদায়েন বলেন, "বর্ত্তমানে বৃত্তি হিসাবে শিক্ষকতার যে অবস্থা তাহাতে উন্নত শ্রেণীর কর্ম্মিগণ ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে না, তাহারা নিরুপায় হইয়াই এই কাজ গ্রহণ করিয়া থাকে। কাজেই শিক্ষাদানের মহান্ কার্য্যে তাহাদের আগ্রহ থাকে না। শিক্ষাদানের কার্য্যের ভার যাহাতে কেবলমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তিগণের উপরেই ন্যস্ত থাকে তজ্জন্য শিক্ষক নির্ব্বাচনের উন্নত মান প্রবর্ত্তন

করিতে হইবে। মনে রাখা দরকার যে, যে যুগের লোক কুশিক্ষা লাভ করিবে সমাজের নিকট তাহারা স্তূত বলিয়া গণ্য হইবে। আজ যে লক্ষ লক্ষ শিক্ষক বিদ্যায়তনগুলিতে শিক্ষাদানের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের অবশ্যই কিছু করিতে হইবে।···ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য আমরা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতেছি। কিন্তু শিক্ষকদের সামান্য আমোদ-প্রমোদের নিমিত্ত অতি সামান্য পরিমাণ অর্থব্যয় করিতেও আমরা রাজী নহি। আমার মনে হয়, শিক্ষকদের আমোদ-প্রমোদের জন্য সামান্য কিছু ব্যয় করিলে তাহার উপযুক্ত প্রতিদান পাওয়া যাইবেই।"

প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন কমিশন এবং কমিটি শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে মতামত পেশ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড দুইটি কার্য্যকরণ কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট অনুসারে এই কমিটি দুইটি মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পুনর্গঠনের কাজ করিবেন। শ্রীসৈয়িদায়েন বলেন: "তবে সরকার, দপ্তর বা কমিটি যে পরিকল্পনাই করুন না কেন, সত্যকারের কাজ করিবেন শিক্ষকগণ। তাই শিক্ষক নির্ব্বাচনে এবং তাঁহাদের চাকুরীর সর্ত্তাবলী নির্দ্ধারণে কর্তৃপক্ষ যেন মনে না করেন যে, তাঁহারা অর্থের বিনিময়ে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতেছেন। বিভিন্ন কমিশন এবং কমিটি বারংবার এই কথা বলিয়াছেন, কিন্তু অর্থাভাবের জন্য সেই সুপারিশ কার্য্যকরী করা হয় নাই। সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এই যুক্তিকে লঘু করিয়া দেখিতে পারি না। তবে একথাও বলি যে, মানুষকে যন্ত্র অপেক্ষা অধিক মূল্যবান বলিয়া গণ্য না করিলে এবং অর্থ অপেক্ষা সমাজকল্যাণকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে না করিলে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সাধিত হইতে পারে না। শিল্প এবং কারিগরি উন্নয়নের জন্য যদি অর্থ পাওয়া যায় তবে শিক্ষার জন্যই বা পাওয়া যাইবে না কেন, অন্ততঃপক্ষে শিক্ষাকেই বা অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে না কেন?"

সাম্প্রতিক ছাত্রবিক্ষোভের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, "পরিদর্শক, শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই শিক্ষাব্যবস্থা সার্থকতা লাভ করিতে পারে। আমলাতান্ত্রিক মনোভাব লইয়া এক্ষেত্রে কাজ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। শিক্ষকগণ ছাত্রদের আস্থা অর্জ্জন করিতে পারিলে ছাত্রগণ নিশ্চয়ই বিপুলভাবে সাড়া দিবে। তিনি সাম্প্রতিককালে ছাত্রদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার গুরুত্ব লাঘব করিতে চাহেন না। 'কিন্তু বহুক্ষেত্রে আমরাও কি সমান দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিই নাই? ছাত্রদের বিশৃঙ্খলা কি সামগ্রিক জাতীয় বিশৃঙ্খলারই একটা অঙ্গ নহে? আমাদের প্রবীণ ব্যক্তিরাই কি বুকে হাত রাখিয়া এ কথা বলিতে পারেন যে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে, সামাজিক জীবনে, এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনায় তাঁহারা অধিকতর শৃঙ্খলা ও সহযোগিতার নিদর্শন স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন? ছাত্রগণ যখন বিদ্যালয় এবং পরে কলেজে প্রবেশ করে তখন তাহারা সেখানে কি সামাজিক সম্পর্ক, শৃঙ্খলা ও চরিত্র গঠনের অনুকূল পরিবেশ দেখিতে পায়? আমার মনে হয় পায় না। প্রত্যেক শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে, ফলে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতেছে না।' বর্ত্তমান যুগের রাজনৈতিক আবহাওয়া, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং ভবিষ্যতের বেকারদশা স্মরণ করিয়া ছাত্ররা হতাশ হইয়া পড়ে। "সর্ব্বোপরি বড়দের মধ্যে আদর্শবাদ, চারিত্রিক অপাপতা এবং নিঃস্বার্থ সেবার নিদর্শন খুব কমই দেখা যায়। প্রায় সকলেই যে-কোন পন্থায় অর্থ, বিত্ত ও প্রতিষ্ঠালাভের জন্য লালায়িত।"

এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কের উন্নতিসাধনের মারফতই কেবলমাত্র এই দুষ্টচক্র ভেদ করা সম্ভব বলিয়া শ্রীসৈয়িদায়েন মনে করেন।

পরিশেষে বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে নিহিত "যুগপৎ বৈপ্লবিক ও সৃজনী শক্তি"র প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি বলেন, "ইহার সংকীর্ণ ব্যাখ্যা না করিলে বা যন্ত্রের মত ইহা কার্য্যকরী করিবার চেষ্টা না হইলে ইহা শিক্ষককে জাতীয় পুনরুজ্জীবনের শক্তি রূপে সৃষ্টি করিতে পারে।"

সম্মেলনে গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে একটিতে আগামী মাসে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের সুপারিশ অনুযায়ী ন্যূনতম বেতন ও মহার্ঘভাতার দাবিতে নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গব্যাপী যে শিক্ষক ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে এক প্রস্তাবে সম্মেলন আবেদন জানান যেন প্রত্যেক কলেজের কার্য্যকরী সমিতির শতকরা ৫০ জন সদস্য শিক্ষকদের মধ্য হইতে গৃহীত হয়। সম্মেলন আরও দাবি করেন যে, বেসরকারী কলেজগুলিকে সরকার যেন যথোপযুক্ত আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন যাহাতে শিক্ষকদের বেতন ৩৫০ হইতে ৮০০ টাকা গ্রেডে নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্মেলন অবিলম্বে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকরী করিবার দাবি করেন।

অপর এক প্রস্তাবে সরকার, অভিভাবক এবং শিক্ষা ও সামাজিক কর্ম্মীদের প্রতি আবেদন করা হইয়াছে যেন তাহারা সত্বর যে-কোন উপায়ে যুবক-যুবতীদের নৈতিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর আপত্তিজনক সাহিত্য, ছায়াছবির বিজ্ঞাপন, ছায়াছবি প্রকাশ, বিক্রয় এবং প্রদর্শন রহিত করেন।

সম্মেলনে গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে শিক্ষা, সামাজিক প্রগতি এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির স্বার্থে বিশ্বশান্তির প্রতি সমর্থন জানান হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের জঙ্গী মনোভাবের নিন্দা করিয়া শান্তির জন্য ভারত-সরকারের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানান হয়।

সম্মেলন সরকারের নিকট "শিক্ষকদের সনদ" মানিয়া লইবার দাবি জানান এবং স্থির করেন যে, আগামী ৭ই আগষ্ট ভারতের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষকদের সনদ দিবস পালন করা হইবে।

মুর্শিদাবাদে কলেজীয় শিক্ষার প্রসার

২২শে ডিসেম্বর তারিখের মুর্শিদাবাদ-সমাচার পত্রিকার "প্রসাদ" লিখিত এক বিবরণী হইতে জানা যায় যে, ১৯৪৬-৪৭ পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ-কলেজ ব্যতীত অন্য কোন কলেজ ছিল না। তাহার পর হইতে চারিটি কলেজ বৃদ্ধি পাইয়াছে যথা: জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎসিং, কান্দীরাজ, জঙ্গীপুর ও বহরমপুর গার্লস কলেজ। ছাত্রসংখ্যার দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে যে, যে স্থলে ১৯২২ সনে একমাত্র কৃষ্ণনাথ-কলেজে ১০৪০ জন, ১৯২৩ সনে ১০৩৭, ১৯২৪ সনে ১০৩০ জন, ১৯২৫ সনে ১০৬৬ জন ছাত্র ছিল, ১৯৪৬-৪৭ সনে সেখানে ছিল মাত্র ৭৬৬ জন। সরকারী Dispersal Scheme অনুযায়ী কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার পর হইতে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিম্নরূপ:

বৎসর	কলেজের সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা
১৯৪৭-৪৮	২	১৩২৭
১৯৪৮-৪৯	২	১৫৩২
১৯৪৯-৫০	৩	১৫৯৮
১৯৫০-৫১	৫	১২৭৪

১৯২২ সনের ১০৪০ জন ছাত্রের তুলনায় ১৯৫০-৫১ সনে ১২৭৪ জন ছাত্র! জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা স্মরণ রাখিলে বলিতে হইবে যে, কলেজের সংখ্যাবৃদ্ধি সত্ত্বেও মুর্শিদাবাদে শিক্ষার অগ্রগতি ত হয়ই নাই বরং অধোগতি হইয়াছে। কিন্তু দেশের অর্থনীতি এতই চমৎকার যে, এই স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তির পর্য্যন্ত কর্ম্ম-সংস্থান সম্ভব হইতেছে না। ২৪শে ডিসেম্বরের "ভারতী" 'কথা-প্রসঙ্গে' শীর্ষক মন্তব্যে লিখিতেছেন: "সংবাদে প্রকাশ, নূতন প্রাথমিক শিক্ষক-নিয়োগ পরিকল্পনা অনুসারে মুর্শিদাবাদ জেলায় মোট ৫৮৭ জনকে লওয়া হইবে এবং উক্ত পদের জন্য চার সহস্রাধিক প্রার্থী আবেদন করিয়াছে। মোটামুটিভাবে ধরা যাইতে পারে আবেদনকারিগণ সকলেই এই জেলার অধিবাসী এবং ইহাদের ছাড়া আরও বহু সংখ্যক শিক্ষিত বেকার এই জেলায় আছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ জেলা পশ্চিমবঙ্গে অত্যন্ত অনগ্রসর। আজ এই জেলাতেই শিক্ষিত বেকারের যদি এই অবস্থা হয়, তবে অপেক্ষাকৃত উন্নত অন্যান্য জেলায় যে কি অবস্থা তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় জাতীয় প্রাণ-শক্তির এই বিপুল অপচয় যত শীঘ্র প্রতিরোধ হয় ততই মঙ্গল।"

আসামে সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি

ধুবড়ী হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "বাতায়ন" সমগ্র আসামে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহের ম্যানেজিং কমিটিগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জেলার উপায়ুক্ত সভাপতি থাকিবার পদ্ধতির সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিতেছেন:

"জেলার উপায়ুক্ত জেলার বহু উচ্চ-বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিরই সভাপতি। তিনি যেন দশভুজা, তাঁর 'দশ ভুজ দশ দিকে প্রসারিত'। এইরূপে একই ব্যক্তি দক্ষিণ শালমারা হাই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, হামিদাবাদের পরিচালক, বিলাসীপাড়ার নায়ক, ধুবড়ী গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের, শিশুপাঠশালা হাই স্কুলের ও ধুবড়ী বালিকা উচ্চ-বিদ্যালয়ের কর্ণধার। জেলার গুরু শাসনভার যে উপায়ুক্তের উপর ন্যস্ত, তিনি কি করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক কর্ম্মের বাহিরেও এতগুলি বিদ্যালয়ের মঙ্গল চিন্তা করিবার অবকাশ পান? পাইবারই বা দরকার কি? নিয়োগ, বরখাস্ত ও শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কিত প্রশ্ন ব্যতীত অন্যান্য সব ক্ষেত্রে সব স্কুলের, বিশেষতঃ মফস্বল স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভায় অনুপস্থিত থাকিলেও ত চলিতে পারে!"

উপায়ুক্ত সকল সময় যে বিদ্যালয়ের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখেন তাহাও সত্য নয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ "বাতায়ন" লিখিতেছেন, "উপায়ুক্ত সভাপতি থাকিতেই হামিদাবাদ হাই স্কুলের সাহায্য বন্ধ হইয়াছিল—স্কুলের শিক্ষার মাধ্যম পরিবর্ত্তনকল্পে চাপ আনিবার জন্য। বিলাসীপাড়া ইন্দ্রনারায়ণ একাডেমীর সভাপতি জেলার উপায়ুক্ত মহাশয়। আগুনে যখন স্কুল-গৃহটি ভস্মসাৎ হইয়া গেল তখনও উপায়ুক্ত ঐ স্কুলের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া দেখা যায় নাই।"

আসাম শিক্ষাবিভাগের অর্ডার বা রুলে বলা হইয়াছে যে, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইবেন; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সকল সময়েই দেখা যায় যে সভাপতি ও সম্পাদক মনোনীত হন। ধুবড়ী গার্লস স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির গঠন লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, চৌদ্দ জন সদস্যের মধ্যে তিন জন অভিভাবকদিগের প্রতিনিধি, দুই জন শিক্ষকদের প্রতিনিধি, চার জন পদাধিকার বলে গৃহীত সভ্য এবং পাঁচ জন নিছক মনোনীত সভ্য—অর্থাৎ, মনোনীত ও পদাধিকার বলে গৃহীত সভ্যসংখ্যা নয় এবং নির্ব্বাচিত সভ্যসংখ্যা পাঁচ। "বাতায়ন" লিখিতেছেন:

"যে-কোন কমিটির কথাই বিবেচনা করা যাউক না কেন, মনোনীত সভ্যগণ বস্তুতঃ উপায়ুক্তেরই গ্রামোফোন ছাড়া আর কিছু নহেন। যাহারা একদা আমানীয়া সভা অলঙ্কৃত করিতেন, যুদ্ধের যুগে ন্যাশনাল ফ্রণ্টে সমর পরিচালনা করিতেন বা বর্ত্তমানেও সরকারী অনুগ্রহজীবী, তাঁহারাই আজ মনোনয়নের গবাক্ষপথে জনপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিতেছেন।"

বিনিময় পরিকল্পনার এক বৎসরের খতিয়ান

"মার্কিনবার্ত্তা" লিখিতেছেন যে, বিনিময় পরিকল্পনাসমূহ অনুসারে এ বৎসর "স্বাধীন" বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশ হইতে প্রায় ৪৪ হাজার লোক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ছাত্রদের সংখ্যাই সর্ব্বাধিক। পৃথিবীর ১২টি বিভিন্ন দেশ হইতে প্রায় ৩৪ হাজার ছাত্র আমেরিকার ১৫০০ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই সরকারী অথবা বেসরকারী বৃত্তি লইয়া আসিয়াছে।

পূর্ব্বে অধিকাংশ ছাত্রই আসিত ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে, কিন্তু গত জুন মাসে যে শিক্ষাবৎসর সমাপ্ত হইয়াছে,

তাহার হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, ঐ সময়ের মধ্যে যে সকল ছাত্র যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করিতেছিল তাহাদের অধিকাংশই ভাষা ও সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন বা শিল্পকলা বিষয়ে শিক্ষালাভ করে।

ছাত্রদের এক-তৃতীয়াংশ আসিয়াছে নিকট-প্রাচ্য ও দূর-প্রাচ্যের দেশগুলি হইতে। শতকরা ২৩ জন আসিয়াছে ইউরোপ ও দক্ষিণ-আমেরিকা হইতে। সর্ব্ববৃহৎ জাতীয় দল আসিয়াছে কানাডা হইতে। এই দলে ৪৫০০ জন আছে। একটি বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী মোট ৩৬০০ জন চীনা ছাত্র চীনে কম্যুনিষ্ট অধিকারের পর যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়াছে।

ইহা ব্যতীত ৫৫০ জন শিক্ষাবিদ, ৫৫০ জন গবেষণাকারী এবং ১৪০০ জন জাতীয় নেতা ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ এই পরিকল্পনা অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রে পদার্পণ করিয়াছেন।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ও বিশ্বশান্তি

আমেরিকান ইণ্টারন্যাশনাল নিউজ সার্ভিসের ইউরোপীয় বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ কিংসবেরী স্মিথ ১৯৫৩ সনের ২৯শে ডিসেম্বর সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী জর্জি ম্যালেনকভকে নববর্ষ উপলক্ষ্যে কয়েকটি প্রশ্ন লিখিয়া পাঠান। তন্মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর এইরূপ:

প্রশ্ন—"১৯৫৪ সনে বিশ্বশান্তি রক্ষা করিবার এবং আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের সম্ভাবনা কতটা আছে বলিয়া আপনার ধারণা?"

উত্তর—"সকল মানুষই স্থায়ী শান্তির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছে এবং ১৯৫৪ সনে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা আরও প্রশমিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সরকারসমূহ, বিশেষ করিয়া প্রধান প্রধান দেশের সরকারসমূহ জনগণের এই প্রার্থনায় কান না দিয়া এবং তাহাদের স্থায়ী শান্তির পক্ষে ক্রমবর্দ্ধমান ইচ্ছাকে সম্মান না দিয়া পারিবেন না।

"সোভিয়েট সরকারের কথা ধরা যাউক। তাহার দেশের জনগণ যাহাতে শান্তিতে বাস করিতে পারে, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমিত হয় এবং দেশগুলির মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাহার জন্য সে সকলকিছুই করিয়াছে, বর্তমানে করিতেছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে।"

প্রশ্ন: বিশ্বশান্তির স্বার্থে ১৯৫৪ সালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কি পন্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে বলিয়া আপনি মনে করেন?"

উত্তর: "পন্থা হইল জাতিগুলির মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন: যে চুক্তিবলে দেশগুলি পরস্পরের প্রতি বিনাসর্ত্তে এই পবিত্র অঙ্গীকারে আবদ্ধ থাকিবে যে কেহ আণবিক বোমা, উদযান বোমা, এবং ব্যাপক ধ্বংস-ক্ষমতাসম্পন্ন অন্যান্য অস্ত্রগুলি যুদ্ধে ব্যবহার করিবে না। এই চুক্তি সম্পাদনের পর মারণাস্ত্র হিসাবে আণবিক অস্ত্রের প্রয়োগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে এক বোঝাপড়ায় উপনীত হওয়া সহজ হইবে এবং যুদ্ধে আণবিক শক্তি প্রয়োগ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার উপর কঠোর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

"অবশ্য এই অঙ্গীকার আসার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট সরকার অন্যান্য সকল প্রকারের মারণাস্ত্র এবং সৈন্যবাহিনী বহুলাংশে হ্রাস করা সম্পর্কেও একটি চুক্তি সম্পাদন জরুরী মনে করিবে।

"ইহা অনুষ্ঠিত হইলে সামরিক প্রয়োজনে রাষ্ট্রের খরচ নিঃসন্দেহে কমিয়া যাইবে এবং জনগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটিবে।"

যতদিন পৃথিবীর বিভিন্ন শক্তিশালী জাতিসকল পরস্পরকে সন্দেহ ও হিংসার চক্ষে দেখিবে ততদিন ঐরূপ চুক্তির মূল্য কিছুই নাই।

শ্রীসুভাষ দাসের অভিযোগের প্রতিবাদ

আমরা গত পৌষ সংখ্যায় "বাঁকুড়া ষ্টেট রিলিফ কার্য্যে দুর্নীতি" শীর্ষক একটি প্রসঙ্গে শ্রীসুভাষ দাসের কতকগুলি অভিযোগের উল্লেখ করিয়াছিলাম। এই প্রসঙ্গের শেষে বাঁকুড়ার প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত গোবিন্দপ্রসাদ সিংহের নিকট এই মর্ম্মে অনুরোধ করা হয় যে, তিনি যেন উক্ত দুর্নীতির অভিযোগের প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের বক্তব্য আমাদিগকে জানান। আমরা নিম্নোক্ত উত্তর পাইয়াছি। ইহা হইতে শ্রীসুভাষ দাসের অভিযোগের অসারতা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে। উত্তরটির মূল অংশ এখানে প্রদত্ত হইল:

"...আমাদের জ্ঞাত তথ্যগুলি জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

রাস্তার প্ল্যান বা লাইন সম্বন্ধে (alignment) কংগ্রেস-কর্ম্মিগণ কোনদিন তাঁহাকে বাধা দান করেন নাই। নূতন রাস্তাটি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত করিবার কথা স্থির হয়, কিন্তু তাহা সংশ্লিষ্ট মালিকগণের স্বেচ্ছাকৃত দানের উপর নির্ভরশীল ছিল। শ্রীসুভাষ দাসের অবিবেচনার ফলে কোন কোন স্থানে ধান্যক্ষেত্রের এবং পলাশ বনের মধ্য দিয়া রাস্তাটিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা হয়। ফলে ভূমাধিকারিগণের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হয়। কংগ্রেস-কর্ম্মিগণ ভূমাধিকারিগণকে মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া এই সকল সমস্যার সুমীমাংসা করিয়া দেন। ইহাই কংগ্রেস-কর্ম্মিগণের অপরাধ। শ্রীসত্য সিংহ কিংবা শ্রীরামলোচন মুখার্জ্জী তাঁহাকে কোন স্পর্দ্ধাসূচক কথা বলেন নাই। বরং রামলোচন মুখার্জ্জী এই সকল বিষয়ে তাঁহাকে গ্রাম-বাসিগণের সহযোগিতা লইবার সুপরামর্শ প্রদান করায় তিনিই রামলোচন মুখার্জ্জীর প্রতি রূঢ় কথা ব্যবহার করেন। রামলোচন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিনয়বশতঃ আর উচ্চবাচ্য করেন নাই। পরে শ্রীসুভাষ দাস অনুতপ্ত হইয়া রামলোচনের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

দুর্নীতির উদাহরণ-স্বরূপ শ্রীসুভাষ দাস তাঁহার বিবৃতিতে দুইটি উদাহরণ দিয়াছেন, কিন্তু এই সকল উদাহরণের সহিত কংগ্রেস-কর্ম্মিগণের নাম সংযুক্ত করিবার কারণ কি? মুহুরী সহদেব সেন কিংবা ভোলানাথ সরকার কেহ কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন। বরং আমি অবগত হইয়াছি যে, শ্রীসহদেব সেন হিন্দু মহাসভাপন্থী এবং তিনি জম্মু-আন্দোলনের সমর্থক হিসাবে দিল্লীতে সত্যাগ্রহী স্বরূপে গিয়াছিলেন।

শ্রীসহদেব সেন ও শ্রীভোলানাথ সরকার সম্পর্কিত যে ঘটনা

দুইটি শ্রীসুভাষ দাস বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নিজের অপরাধ লোকচক্ষের অন্তরালে রাখিয়াছেন এবং একটু রং ধরাইয়াছেন। ৫৫নং ভুয়া গ্যাং-এর জালিয়াতি পে-মাষ্টার আবিষ্কার করেন এবং তিনি ঐ গ্যাং-এর টাকা দিতে অস্বীকার করেন। এইরূপ প্রকাশ যে, এই ভুয়া গ্যাং-এর allotment slip-এ শ্রীসুভাষ দাস নিজ স্বাক্ষর দিয়া মঞ্জুর করিয়াছিলেন, পরন্তু পে-মাষ্টার টাকা দিতে অস্বীকার করেন। এইরূপ হইবার পর শ্রীসুভাষ দাস নিজের অপরাধ গোপন করিবার উদ্দেশ্যে এই ভুয়া গ্যাং-এর জন্য মুহুরী সহদেব সেনই দায়ী এইরূপ অভিযোগ করিয়া আমাকে একটি লিখিত বিবৃতি দেন। ঐ জালিয়াতি পে-মাষ্টার ধরিয়াছিলেন এবং তাহাও বিবৃতিতে স্বীকৃত হইয়াছে। আমি সেই লিখিত বিবৃতি কর্তৃপক্ষকে পাঠাইয়া দিই। তাহার পর সহদেব সেন বরখাস্ত হন।

শ্রীসুভাষ দাস ১১।১০।৫৩ তারিখে acquittance roll-এ ২২টি গ্যাং-এর পরিবর্তে ২৪টি গ্যাং-এর উল্লেখ করেন। এইরূপ হইবার পর মুহুরী ভোলানাথ সরকার তাহা মানিয়া লইতে রাজি না হইয়া সকলকে এই বিষয় জানাইয়া দেন। এমনকি ঐ সংবাদ অমরকাননে শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ের নিকটও প্রেরিত হয়। এইরূপভাবে লোক জানাজানি হইবার পর শ্রীসুভাষ দাস পে-মাষ্টারকে নিম্নলিখিত পত্রটি প্রেরণ করেন :

"I do hereby inform you that I checked the acquittance roll of the works clerk Shri Bholanath Sarkar today and found 22 gangs of coolies but due to my own mistake I wrote there 24 gangs. Hence, in conclusion, I request you to stop the payment of the last two groups, *i.e.*, 23rd and 24th as they might be false."

ইহা হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, সুভাষ দাস নিজেই ভুয়া গ্যাং চালাইবার চেষ্টা করিয়া ধরা পড়িয়া পে-মাষ্টারকে লিখিত পত্রে সাফাই গাহিয়াছেন। এই সম্বন্ধে শ্রীভোলানাথ সরকারের বা সুভাষ দাসের কি দোষ আছে তৎসম্বন্ধে আমি বিচারকের আসন গ্রহণ করিতেছি না, কিন্তু এই ঘটনা হইতে কি সিদ্ধান্ত সমীচীন তাহাই জনসাধারণকে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি। ইহাতে কংগ্রেসের কি অপরাধ হইয়াছে তাহাও বুঝা গেল না! নিজের দোষ ঢাকিয়া তিনি এক্ষণে নিজ বিবৃতিতে ভোলানাথ সরকারের নামে এক রোমহর্ষণকর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

এই ঘটনার পর ১২।১০।৫৩ তারিখে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কার্য্য পরিদর্শনে গেলে Supervising officer শ্রীসুভাষ দাসের উপরোক্ত কার্য্য সম্বন্ধে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একটি লিখিত অভিযোগ প্রদান করেন। তাহার পর ১২।১০।৫৩ তারিখেই শ্রীসুভাষ দাস পে-মাষ্টারকে পত্র লিখিয়া জানান যে, 'তাঁহার রক্ত-আমাশয় হইয়াছে তজ্জন্য তিনি ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, পূজার পর পুনরায় কার্য্যে যোগদান করিবেন।' এই ভাবে তিনি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া যান, আর প্রত্যাবর্তন করেন নাই। এই প্রসঙ্গে ইহাও জানান আবশ্যক যে, তথায় সকল সময় চার জন সশস্ত্র পুলিস থাকিত এবং ১২।১০।৫৩ তারিখে স্বয়ং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার লুকাইয়া স্থান ত্যাগ করিবার কারণ কি? কারণ এই যে, ঐ তারিখে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত বিষ্ণুপুর ইঞ্জিনীয়ারিং ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার পরামর্শে সুভাষ দাস স্থান ত্যাগ করেন এবং সুভাষ দাস ইনষ্টিটিউটের ছাত্র থাকায় তাঁহার বিরুদ্ধে অন্য কোন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। আমরা এই বিষয়ে তদন্তের দাবি করি। তদন্ত হইলে প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত হইবে।

উপসংহারে বলা আবশ্যক যে, ঐ রাস্তায় টেষ্ট রিলিফের কার্য্য আরম্ভের প্রারম্ভেই বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হওয়ায় শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ সিংহের পরামর্শে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কিছুকাল কার্য্য স্থগিত করিয়া দেন এবং পরিদর্শনের সুব্যবস্থা করিয়া পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করেন। ঐ রাস্তায় তত্ত্বাবধানের জন্য তিনটি কেরাণী বরখাস্ত হন। কংগ্রেস-কর্ম্মিগণ Watchdog বা সতর্ক প্রহরীর কার্য্য করিয়াছিলেন মাত্র এবং অনুরোধ করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে বার বার পরিদর্শনের কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহাদের অপরাধ। কংগ্রেসের এই প্রচেষ্টাকে 'বেসরকারী ছায়া পরিচালকমণ্ডলী' নাম দিয়া কদর্থ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। শ্রীসুভাষ দাস বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন যে, তিনি এক দিন কতকগুলি সাদা স্লিপে নিজ নাম সহি করিয়া শ্রমিকদলকে টাকা দিবার আদেশ দিয়া অপদস্থ হইয়াছিলেন, কেননা মুহুরীর নাম সহি-করা ছাপা স্লিপ না হইলে ঐরূপ সাদা স্লিপ জাল হইবার সম্ভাবনা থাকায় তাহা গ্রাহ্য হয় না। শ্রীসুভাষ দাস বিপন্ন হইয়া শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ সিংহের দ্বারস্থ হন। শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ সিংহ মহাশয় কর্তৃপক্ষকে বুঝাইয়া অনুসন্ধানমতে প্রকৃত কার্য্যকারী শ্রমিকগণকে টাকা দিবার জন্য অনুরোধ করেন এবং এই তরুণমতি বালক অজ্ঞানতাবশতঃ এইরূপ করিয়াছেন বলিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করেন। আরও বহু কথা প্রকাশ করা যাইতে পারে কিন্তু এই বিবৃতির কলেবর বৃদ্ধি করিবার আমার ইচ্ছা নাই।..."

শ্রীশিশুরাম মণ্ডল, এম-এল-এ
অমরকানন, বাঁকুড়া।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

লেখকগণের লেখা ফেরত লইতে হইলে লেখার সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকা আবশ্যক। কোন-কিছুর উত্তর পাইতে হইলে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক রিপ্লাই-কার্ডে চিঠি লিখিবেন। কবিতা যাঁহারা পাঠান তাঁহাদের প্রতিও এই অনুরোধ। তবে তাঁহারা দয়া করিয়া কবিতার নকল রাখিয়া পাঠাইলে ভাল হয়। বুক-পোষ্টে প্রেরিত লেখা সব সময় আপিসে নাও পৌঁছাইতে পারে।

পত্রিকার গ্রাহক, বিজ্ঞাপন, কাগজ-অপ্রাপ্তি, ঠিকানা পরিবর্ত্তন, টাকাকড়ি প্রেরণ সংক্রান্ত চিঠিপত্র 'ম্যানেজার, প্রবাসী'র নিকট প্রেরিতব্য।

শ্রীচৈতন্যদেবের পতিতোন্নয়ন

শ্রীকালিদাস দত্ত

ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে সকল মহাপুরুষের নাম মহামানব প্রেমিক রূপে অমর হইয়া আছে শ্রীচৈতন্যদেব তন্মধ্যে অন্যতম। তিনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে আবির্ভূত হন।

ঐ সময় তাঁহার জীবনের আদর্শ ও আচরণে ভগবৎপ্রেম অভিনব ভাবে বিকশিত হইয়া বিরাট শক্তিরূপে জনচিত্তে ছড়াইয়া পড়ে। তাহার ফলে বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যায় তৎকালীন অসংখ্য শিক্ষিত এবং নিরক্ষর নরনারীর ধর্ম্মে প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটে। অতি অল্পকালের ভিতর তাঁহাদের মধ্যে এক গণতান্ত্রিক ও উদার সমাজ গড়িয়া উঠে, যেখানে সর্ব্ব শ্রেণীর জাতিবহির্ভূত ও সমাজচ্যুতরা আশ্রয় পাইয়া মনুষ্যত্ব লাভের অধিকারী হয়।

উহা ভিন্ন তখন তাঁহার ঐ প্রকার শক্তি প্রভাবেই ঐ প্রদেশ দুইটির জনসাধারণের ভাষা এবং শিল্পও নূতন আকারে তাঁহাদের জ্ঞানবর্দ্ধনে সহায়ক হয়।[১] হিন্দু জাতির বহুধা বিভক্ত বর্ণ ও শ্রেণীগুলিও ঐ প্রকার জাতিবহির্ভূত ও সমাজচ্যুতদের সহিত একত্রে শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তনের মাধ্যমে সমভাবে ধর্ম্মসাধনে মিলিত হইয়া ভগবৎপ্রেমরস আস্বাদনে সমর্থ হয়।

তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বকাল হইতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় উপরোক্ত দুইটি প্রদেশেও ঐ সকল জাতিবহির্ভূতরা পতিতরূপে হিন্দুদের অস্পৃশ্য ছিলেন। তাঁহারা উঁহাদের ধর্ম্মপালনে অধিকারী ছিলেন না। সে কারণ দেশের আদিম ও পরবর্ত্তীকালীন বিকৃত বৌদ্ধ মতবাদজাত নানা প্রকার লৌকিক ধর্ম্মই পালন করিতেন। ঐ সমস্ত লৌকিক ধর্ম্মে ধর্ম্মঠাকুর, পঞ্চানন্দ, বাশুলী, বিষহরি, ষষ্ঠী প্রভৃতি দেবতা ও বিভিন্ন রকমের ভূতপ্রেতাদি তাঁহাদের উপাস্য ছিল। মহিষ, মেষ, ছাগ, শূকর, হাঁস প্রভৃতি পশুপক্ষীর মাংসে ও মদ্যে তাঁহারা ঐ সমস্ত দেবতা ও উপদেবতার পূজার্চ্চনা করিতেন। উহা ব্যতীত ঐ সকল দেবতার জাত ও চড়কাদি পার্ব্বণ উপলক্ষে ভাং, গাঁজা ও মদ্যপান, সং সাজিয়া কুৎসিত নৃত্যগীত, জিহ্বাচ্ছেদ, পৃষ্ঠে বাণফোঁড়া প্রভৃতি বহু রজঃ ও তমঃ গুণ বর্দ্ধক নিকৃষ্ট অনুষ্ঠানও তাঁহাদের ধর্ম্মসাধনের প্রধান অঙ্গ ছিল।

তৎকালীন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবনদাসও ঐ সকল নরনারীর ঐ প্রকার পূজার্চ্চনা ও আচার-অনুষ্ঠানের এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

> "ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সবে এইমাত্র জানে।
> মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
> দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি।
> তাও যে পূজেন সে মহাদম্ভ করি॥
> ধনবংশ বাড়ুক বলিয়া কাম্য মনে।
> মদ্যমাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে॥"[১]

ঐ সময় উক্তরূপ ধর্ম্মাচরণের ফলে ঐ সকল পতিতের মধ্যে অনেকের নৈতিক অবস্থা কত শোচনীয় ছিল তাহা জানা যায় নরহরি চক্রবর্ত্তীর বিখ্যাত গ্রন্থ নরোত্তমচরিতের এই বর্ণনা হইতে ঃ

> "করয়ে কুক্রিয়া কত কে কহিতে পারে।
> ছাগ, মেষ, মহিষ শোণিত ঘরে ঘরে॥
> ... ...
> সস্ত্রেী লম্পট সর্ব্ব বিচার রহিত।
> মদ্য মাংস বিনে না ভুঞ্জয়ে কদাচিৎ॥"[২]

অস্পৃশ্যতার সংস্কারেই তখন সমাজে পতিতরূপে পরিগণিত হইয়া ঐ সমস্ত নরনারী ঐ রকম দুরবস্থায় কালাতিপাত করিতেন এবং ধর্ম্মেকর্ম্মে কোথাও হিন্দুদের সহিত সমভাবে একত্রে মিলিত হইতে পারিতেন না। তদুপরি তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় উক্তরূপ সংস্কারের নিমিত্ত দারুণ বৈষম্য থাকায়, সময় সময় তাঁহাদের নানারকম পীড়ন ও অবিচারও সহ্য করিতে হইত। তজ্জন্য উচ্চশ্রেণীদের প্রতি তাঁহাদের অনেকের আন্তরিক প্রীতি ও সহানুভূতিও ছিল না।

রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মপুরাণের "নিরঞ্জনের উষ্মা" নামক

---

১ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেরণায় ঐ সময় বঙ্গভাষা জনসাধারণের জ্ঞানবর্দ্ধনে কি প্রকারে সহায়ক হয় সে সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার "বঙ্গীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম" নামক পুস্তকে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :

"Bengalee in our province received a new inspiration becoming the vehicle of a new thought, creating a new body of religious and spiritual literature that had previously been practically confined to Sanskrit. . . . The creation of the religious scripture in the vernacular of the people gave at once a very powerful impetus to mass education in Bengal. The result of it was seen even in the early years of the present century, when the Vaisnavas of Bengal were found to be only literates as a class among our Hindu population. Not only the males of this denomination but even their females became thus more or less educated in their own vernacular."—*Bengal Vaishnavism*, pages 116-118.

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়।

২ নরোত্তম চরিত।

রচনাটি পাঠ করিলে জানা যায় যে, উক্ত কারণেই মুসলমানেরা ঐ সময় জাজপুর আক্রমণ করিয়া হিন্দু মন্দিরাদি ধ্বংস করিলে ধর্ম্মঠাকুরের উপাসকেরা তাহাতে দুঃখিত হন নাই; বরং উহা তাঁহাদের দেবতাদেরই কাজ বলিয়া প্রচার করেন। তাঁহাদের ধারণা হয় যে, তাঁহাদের উপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের জন্তই নিরঞ্জন (ধর্ম্মঠাকুর) ক্রুদ্ধ হইয়া ঐরূপ ঘটাইয়াছেন। ঐ রচনাটির কিয়দংশ এই :

"এইরূপ দ্বিজগণ, করে ছিষ্টি সংহারণ,
এবড় হইলা অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম্ম, মনেতে পাইয়া মর্ম্ম,
মায়াতে হইল অন্ধকার॥
নিরঞ্জন নিরাকার, হইলা ভেস্ত অবতার,
মুখেতে বলেন দাম্মাদার।
যতেক দেবতাগণ, সবে হয়ে একমন,
আনন্দেতে পরিল ইজার॥
ধর্ম্ম হইল যবনরূপী, মাথায়েতে কালটুপী,
হাতে শোভে তিরুচ কামান।
চাপয়ে উত্তম হয়, ত্রিভুবনে লাগে ভয়,
খোদার বলিয়া একনাম॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে, কাড়াকিড়া খায় রঙ্গে,
পাখড় পাখড় বলে বোল।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায়, রমাই পণ্ডিত গায়,
ইবড় বিষম গণ্ডগোল॥"

প্রাচীন বিবরণাদি হইতে জানা যায় যে, উল্লিখিতরূপ ধর্ম্ম ও সমাজ ব্যবস্থার জন্তই তখন ঐ সকল পতিত, তৎকালীন রাষ্ট্রপোষিত, মুসলমান ধর্ম্মে দলে দলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন এবং ঐ প্রকারে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের উপর জুলুম ও পীড়নের মাত্রাও অধিকতর হইতে থাকে। ঐ সময় মুসলমানদের হস্তে হিন্দুদের কি রকম নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত তাহার কিছু কিছু বিবরণ প্রসঙ্গক্রমে পুরাতন বাংলা-সাহিত্যের নানা স্থলে উল্লিখিত আছে। বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে উহা এইরূপ :

"ব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে।
কারো পৈতা ছিঁড়ি ফেলি থুথু দেয় মুখে।
... ...
পরেরে মারিতে পরের কিবা লাগে ব্যথা।
চড় চাপড় মারে আর ঘাড়ে মারে গোঁতা॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন থাকে ভয়ে অতিশয়।
গোময় না দেয় ঘরে সব দুর্জ্জনের ভয়।"

জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গলেও উহার যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা এই :

"নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধনপ্রাণ লয়ে তার জাতি নাশ করে॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কাঁধে।
ঘরদ্বার লোটে তারে সেইখানে বাঁধে॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী॥"

এই রকম অত্যাচারের ভয়ে তৎকালে অনেককে দেশত্যাগ করিতে হয়। তন্মধ্যে বিখ্যাত পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভটাচার্য্যও একজন। তিনি চিরদিনের মত বঙ্গদেশ ছাড়িয়া সপরিবারে নীলাচলে গিয়া বসবাস করেন। শ্রীচৈতন্তভাগবতে গঙ্গাদাস নামে অন্ত একজন ব্যক্তিরও ঐ সময় সপরিবারে রাত্রিকালে নবদ্বীপ হইতে নৌকাযোগে পালাইবার উল্লেখ আছে। উহাতে দেখা যায়, ঐ ঘটনার বহুদিন পরে এক সময় ভাবাবস্থায় শ্রীচৈতন্তদেবই গঙ্গাদাসকে উহা এই ভাবে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন :

"তব মনে জাগে,
রাজভয়ে পালাইলে যবে নিশাভাগে॥
সর্ব্বপরিকর সনে আসি খেয়া ঘাটে।
কোথাও না দেখি নৌকা পড়িলে শঙ্কটে॥
রাত্রি শেষ হইলে তবে নৌকা না পাইয়া।
কাঁদিতে লাগিলে তুমি দুঃখিত হইয়া॥
মোর অগ্রে যবনে স্পর্শিবে পরিবার।
গঙ্গা প্রবেশিতে চিত্ত হইল তোমার॥
তবে আমি নৌকা লয়ে খেয়ারির রূপে।
গঙ্গায় বাহিয়া যাই তোমার সমীপে॥
সেই নৌকা দেখি তুমি সন্তোষ হইলে।
অতিশয় প্রীতি করি বলিতে লাগিলে॥
আরে ভাই আমারে রাখহ এইবার।
এক জোড় এক তঙ্কা বকসিস তোমার॥"[১]

প্রাচীন বিবরণাদি হইতে আরও জানা যায় যে, ঐ সময় বঙ্গদেশে তান্ত্রিক মতবাদের খুব বেশী প্রাধান্ত থাকায় বহু আড়ম্বরপূর্ণ নানারূপ কাম্য অনুষ্ঠান হিন্দু উচ্চশ্রেণীদেরও ধর্ম্মসাধনের প্রধান অবলম্বন ছিল। তাঁহারা ঐ সকল বাহ্যিক অনুষ্ঠানে ও নানাপ্রকার জড়বিলাসেই কালহরণ করিতেন। পণ্ডিতমহলেও ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা তখন প্রবল হওয়ায় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদেরও অধিকাংশ তর্কযুদ্ধে প্রশংসা অর্জ্জনের নিমিত্ত ব্যস্ত থাকিতেন। সেজন্ত দেশবাসীদের ঐরূপ দুরবস্থায় কেহ বিশেষ দুঃখবোধ করিতেন না। বৃন্দাবনদাস তজ্জন্ত দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন :

"কুতর্ক ঘুষিয়া সব অধ্যাপক মরে।
ভক্তি হেন নাম নাহি জানয়ে সংসারে॥
হরিভক্তি শূন্ত হইল সকল সংসার।
অসৎসঙ্গ অসৎপথ বহি নহি আর॥
নানারূপে পুত্রাদির মহোৎসব করে।
দেহ গেহ ব্যতিরিক্ত আর নাহি স্ফুরে॥"[২]

১ শ্রীচৈতন্তভাগবত, মধ্যখণ্ড, ৯ অধ্যায়।
২ শ্রীচৈতন্তভাগবত, আদিখণ্ড, ৩।৬ অধ্যায়।

ঐ সকল কারণে ঐ সময় শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভৃতি মানবপ্রেমিক মহাত্মারা খুবই কাতর হইয়া পড়েন। তাঁহারা তখন দেশবাসীদের ঐ রকম মতিগতি দেখিয়া শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা জানাইয়া ক্রন্দন করিতেন। যথা :

"অদ্বৈত আচার্য্যআদি যত ভক্তগণ।
জীবের কুমতি দেখি করয়ে ক্রন্দন ॥"১

দেশের ঐ প্রকার দুর্দ্দিনেই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটে ও তাঁহার প্রেমধর্ম্মের প্রচার হয়। তিনি জানিতেন যে, ঐ সময় হিন্দুদের রক্ষার নিমিত্ত ঐ সকল পতিতকে উন্নত করা ও তাঁহাদের উচ্চবর্ণদের সহিত ধর্ম্মসাধনে সমান অধিকার দিয়া একই রূপ একটি সহজ ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করা প্রয়োজন। তজ্জন্যই তিনি তাঁহাদের অন্তরে ভক্তি-ভাব উদ্দীপ্ত করিয়া সত্ত্বগুণ বর্দ্ধনদ্বারা উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনার্থ সর্ব্ববর্ণের একত্র সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করেন ও শ্রীভগবানকে ভজনা করিবার সমান অধিকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণেরই আছে ইহাও ঘোষণা করেন।

তৎপূর্ব্বে ভারতবর্ষে কোথাও জনসাধারণের ঐ ধরণের একত্র সংকীর্ত্তন ছিল না। সে কারণ তাঁহার পুরীগমনের পর সেখানেও ঐরূপ সংকীর্ত্তন দেখিয়া উড়িষ্যার মহারাজা প্রতাপরুদ্রদেব বিস্মিত হন ও তাঁহার সভাপণ্ডিতকে "উহা কি রকম সঙ্গীত ?" জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে বলেন উহা সংকীর্ত্তন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের সৃষ্টি। বৃন্দাবন-দাস তজ্জন্যই তাঁহাকে "সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ"—সংকীর্ত্তনের একমাত্র জনক বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন।

ঐ সময় তিনি সর্ব্বাগ্রে তাঁহার জন্মভূমি নবদ্বীপেই সমাজের উচ্চনীচ সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণের সহিত একত্রে ঐরূপ সংকীর্ত্তন প্রচারের সূত্রপাত করেন এবং তদ্দ্বারা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকে একরকম ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলেন। প্রথমে কি প্রকারে উহাতে জনসাধারণ আকৃষ্ট হয় তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠে জানা যায়।

তৎকালে যখন নবদ্বীপে তাঁহার সংকীর্ত্তনে উত্থিত ভাব-প্রবাহের ঘাতপ্রতিঘাতে যুগযুগান্তরের অস্পৃশ্যতার সংস্কার-জনিত বৈষম্যবোধ জনচিত্তে শিথিল হইয়া ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে সমভাবসূচক প্রীতি জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ হয় তখন ব্রাহ্মণ-দের কিয়দংশ উহার বিরুদ্ধবাদী হন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের নিন্দা প্রচার করিতে থাকেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইহার এইরূপে উল্লেখ আছে :

"চণ্ডালাদি নাচয়ে প্রভুর গুণগ্রামে।
ভট্ট মিশ্র চক্রবর্ত্তী নিন্দা সবে জানে ॥২
… … …
শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে পরিহাস।
কেহ বলে যত পেট ভরিবার আশ ॥
কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার।
পরম উদ্ধত্যপনা হেন ব্যবহার ॥
কেহ বলে কতরূপ পড়িল ভাগবত।
নাচিব কাঁদিব হেন না দেখিল পথ ॥
ধীরে ধীরে বলিলে কি পুণ্য নয়।
নাচিলে গাহিলে ডাক ছাড়িলে কি হয় ॥"১

ঐ সকল ব্যক্তি তখন এই প্রকারে নিন্দা প্রচার ব্যতীত সংকীর্ত্তন বন্ধ করাইবার উদ্দেশ্যে রাজদণ্ডের ভয় দেখাইয়াও চারিদিকে কতকগুলি মিথ্যা জনরবের সৃষ্টি করেন। উহা এইরূপ :

"কেহ বলে আরে ভাই পড়িল প্রমাদ।
শ্রীবাসের তরে হৈল দেশের উচ্ছাদ ॥
আজি মুক্তি দেওয়ানে শুনিল সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে হেথা ॥
শুনিলেন নদীয়ার কীর্ত্তন বিশেষ।
ধরি আনিবারে হইল রাজার আদেশ ॥
… … …
এই মত কথা হৈল নগরে নগরে।
রাজনৌকা আসে বৈষ্ণব ধরিবারে ॥"২

এই ধরণের প্রতিবন্ধকতাচরণে কোন ফল না হইলে অবশেষে কয়েকজন নবদ্বীপের তৎকালীন শাসক চাঁদ কাজির নিকট গিয়া সংকীর্ত্তনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন :

"হিন্দুধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই ॥
… … …
কৃষ্ণকীর্ত্তন করে নীচ বার বার।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥"৩

কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে উক্ত কাজিরও মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে এবং তিনি কীর্ত্তনের বিরুদ্ধতা পরিহার করেন। তখন ঐ সকল বিরোধীর অনেকেও তাঁহার সংকীর্ত্তনে যোগ দেন। ঐরূপে ক্রমশঃ তাঁহার সংকীর্ত্তন স্থান সর্ব্ববর্ণের সাধনক্ষেত্রে পরিণত হইয়া উঠে এবং উহাতে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ ও পতিত সকলে আসিয়া সমভাবে মিলিত হন।

ভারতবর্ষে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে হিন্দুদের ঐভাবে একত্রে ধর্ম্মসাধনের কল্পনা তৎপূর্ব্বে যাহা কোনদিন কেহ ধারণায়ও আনিতে পারিতেন না, তখন আমাদের এই বঙ্গদেশের পুণ্যময় সুরধুনীতীরে বাস্তবে রূপায়িত হইয়া উঠে।

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, ৫ অধ্যায়
২ শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, ৬ অধ্যায়

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত, ঐ
২ শ্রীচৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, ২১ অঃ।
৩ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১৭ পরিচ্ছেদ।

এই প্রকারে শ্রীচৈতন্যদেবের নাম সংকীর্ত্তনে উত্থিত প্রেমপ্রবাহে সর্ব্বাগ্রে নবদ্বীপ ও শান্তিপুর ডুবিয়া যায় ও তৎসহ উচ্চনীচে যুগযুগান্তের বিদ্বেষও ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে থাকে। তজ্জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন তখন :

"উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ যুবা সকলে ডুবায়।"১

সে কারণ জনসাধারণের সংকীর্ত্তনে অনুরাগও দিন দিন বাড়িয়া যায় এবং কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী হইতে দলে দলে লোক উহাতে যোগ দিতে থাকেন। উহার জন্যও বৈষ্ণবদের তখন সংকীর্ত্তন-বিরোধীদের নানা রকম বিদ্রূপ সহ্য করিতে হয়। তাঁহাদের ঐ প্রকার বিদ্রূপ-বাক্যের একটি আজিও লোকমুখে প্রবচন রূপে প্রচলিত আছে। উহা এই :

"যত ছিল নাড়াবুনে সবাই হ'ল কীর্ত্তনে।
কাস্তে কুড়ুল ভেঙ্গে সবে গড়ালে কর্ত্তাল॥"

ঐ সময় নবদ্বীপে জনসাধারণ শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত একত্রে সংকীর্ত্তন করিবার আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন এবং তিনি গৃহের বাহির হইলেই আনন্দে দিশাহারা হইতেন। বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন তখন :

"প্রভু মাত্র বাহির হইলে নৃত্যরসে।
হরি বলি সর্ব্বলোকে মহানন্দে ভাসে॥
সংসারের তাপ হরে শ্রীমুখ দেখিয়া।
সর্ব্বলোকে হরি বলে অলস হইয়া॥"২

টোলের ছাত্রেরাও তৎকালে তাঁহার সহিত সংকীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত খুবই ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেন ও তাঁহাকে বলিতেন, "প্রভু! আমরাও আপনার সহিত সংকীর্ত্তন করিব। উহা কিরূপ আমাদের শিখাইয়া দিন।" তিনি তখন হাতে তালি দিয়া উহা শিখাইতেন ও তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া সংকীর্ত্তন করিতেন :

"শিষ্যগণ বলেন কেমন সংকীর্ত্তন।
আপনি শিখায় প্রভু শচীর নন্দন॥
... ...
দিশা শিখায়েন প্রভু হাতে তালি দিয়া।
আপনি কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লইয়া।"২

তাঁহার অন্তরঙ্গ সঙ্গীরাও তখন তাঁহার সংকীর্ত্তনে মিলিত হইলে আনন্দে উন্মত্ত হইতেন। শ্রীবাস অঙ্গনে সারারাত্রি কীর্ত্তন করিয়াও তাঁহাদের আশ মিটিত না। রাত্রি কিরূপে শেষ হইত তাহা জানিতে পারিতেন না। প্রভাত হইলে সকলে দুঃখে অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতেন। তাঁহাদেরও তৎকালীন অবস্থা বৃন্দাবনদাস এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :

"চমকিত হইয়া সবে চারিদিকে চায়।
নিশি পোহাইল বলি কাঁদে উভরায়॥
কোটি পুত্রশোকেও এত দুঃখ নহে।
যে দুঃখে বৈষ্ণব সব অরুণেরে চাহে॥"১

এই ভাবে ঐ সময় হইতে দিন দিন সংকীর্ত্তনের প্রভাব দেশের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। জনসাধারণও সংকীর্ত্তনকে তাঁহাদের ধর্ম্মসাধনের প্রধান অঙ্গে পরিণত করিয়া তুলেন। উহাতে প্রচারিত শ্রীভগবানের নামগান তৎকালে জনচিত্তকে কত বেশী আকৃষ্ট করে তাহা বুঝিতে পারা যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রকাশিত এই দুইটি পঙ্‌ক্তি হইতে :

"কুলীন গ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেও কৃষ্ণ গায়॥"২

এইরূপে নবদ্বীপ ও শান্তিপুর হইতে সংকীর্ত্তনে উত্থিত প্রেমপ্রবাহ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া প্রথমে বঙ্গদেশে ও তৎপরে উড়িষ্যায় প্লাবনের সৃষ্টি করে। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেবের সংকীর্ত্তনের প্রতি জনসাধারণের ঐ রকম প্রবল আকর্ষণের এই প্রকার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :

"The unsophisticated non-Brahmin classes could not study the Vedas. They could not recite the *mantras*. They neither understood nor were taught, nor indeed allowed to read and understand the sacred texts and laws. Religious ritual was to them practically mere magic and incantation. But Sree Chaitanya Mahaprabhu gave to each man the right and the power to directly worship the Supreme Lord by chanting and singing His name. The old Pujas and Yajnas were nothing really to the people at large. The Harinam that they received from the Mahaprabhu became something personal and intimate to them, became, indeed, everything in their religious and spiritual life."৩

শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখা যায় যে, নবদ্বীপে ঐরূপ নাম সংকীর্ত্তনের প্রারম্ভকালে অদ্বৈত আচার্য্যও চৈতন্যদেবকে ঐ সকল অবহেলিত ও নিরক্ষর জনগণের মধ্যেই উহা প্রচারের জন্য অনুরোধ করেন। যথা :

"অদ্বৈত বলেন যদি ভক্তি বিলাইবে।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবে॥"৪

মহামানবপ্রেমিক নিত্যানন্দও ঐ উদ্দেশ্যেই চৈতন্যদেবের

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।
২ শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, ২৩ অঃ
৩ শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, ১ অধ্যায়

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য, ১ অঃ
২ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ১০ পঃ
3. *Bengal Vaishnavism*, page 156.
৪ শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য, ৬ অঃ

সহিত সম্মিলিত হন। তজ্জন্য নবদ্বীপে আসিয়া চৈতন্যদেবের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকালেই তিনি বলেন :

"পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায়
শুনিয়া আইনু মুঞি পাতকি এথায়॥"১

উক্ত কারণেই তিনি তৎকালে সর্ব্বপ্রকার বাধা নিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া কি প্রকারে পতিতদের ঘরে ঘরে গিয়া তাঁহাদিগকে ভগবানের নাম দান করেন তাহা পুরাতন বৈষ্ণব-সাহিত্য পাঠে জানিতে পারা যায়। কবি লোচনদাস তাঁহার গানেও উহার এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন :

"অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥
চণ্ডাল পতিতজনের ঘরে ঘরে গিয়া।
হরিনাম মহামন্ত্র দেন বিলাইয়া॥"২

শূদ্রদের উন্নয়নের নিমিত্ত তিনি প্রায়ই তখন তাঁহাদের মধ্যেই থাকিতেন। তজ্জন্য নীলাচলে চৈতন্যদেবের নিকট জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহার বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগও করেন :

"দণ্ড ছাড়ি লৌহ দণ্ড ধরেন বা কেনে।
শূদ্রের আশ্রমে কেন থাকেন সর্ব্বক্ষণে॥"৩

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায় যে, চৈতন্যদেবই তাঁহাকে ঐ প্রকার পতিতোন্নয়ন কার্য্যভার দিয়া নীলাচল হইতে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। শুধু তাঁহাকে কেন তাঁহার অন্যান্য সকল অনুগামীকেই জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রেমধর্ম্ম প্রচার ও জনসেবার জন্য তিনি যে নির্দ্দেশ দেন তাহা এই :

"অতএব আমি আজ্ঞা দিনু সবাকারে।
যাহা তাহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥
... ...
ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জনম সার্থক করি কর পর-উপকার॥"৪

এই প্রকারে বাহ্যতঃ ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিয়া চৈতন্যদেব শুধু যে দেশের জনসাধারণকে একত্রে একভাবে ধর্ম্মসাধনের জন্য একটি উচ্চাঙ্গের অথচ সহজ ও গণতান্ত্রিক ঈশ্বর আরাধনা-পদ্ধতি দিয়া যান তাহা নহে, তখন উহার দ্বারা অসংখ্য পতিতকেও উন্নত করেন, যাহার ফলে সমাজে অস্পৃশ্যতার সংস্কার শিথিল হইয়া যায় এবং পতিতদের উপর উক্ত সংস্কারের প্রভাবে যে সমস্ত কঠোর সামাজিক আচরণ প্রচলিত ছিল তাহারও অনেক উচ্ছেদ হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশে হিন্দুদের মধ্যে অস্পৃশ্যতার সংস্কারের কঠোরতা যে অনেক কম তাহার কারণই তাঁহার তৎকালীন ঐরূপ প্রচেষ্টা। উহার জন্য তাঁহার যে সমস্ত উপদেশ ও বাণী প্রচারিত হয় তন্মধ্যে একটি এই :

"সহজ জীবেরে যে অধম পীড়া করে।
বিষ্ণু পুজিয়াও সে প্রজাদ্রোহ করে॥
পূজা তার নিষ্ফল হয় আর দুঃখে মরে॥
সর্ব্বভূতে আছেন শ্রীবিষ্ণু না জানিয়া।
বিষ্ণুপূজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া॥
একহস্তে যেন বিপ্র চরণ পাখালে।
আর হস্তে ঢিলা মারে মাথার কপালে॥
এসব লোকের কুশল কোন ক্ষণে।
হইয়াছে? হইবেক? বুঝ ভাবি মনে॥"১

শ্রীচৈতন্যদেবের মুখনিঃসৃত এই প্রকার বহু বাণী ও শ্রীভগবানের নামগান ঐ সময় দেশের চারিদিকে প্রচারিত হইবার ফলে জনমতের পরিবর্ত্তন হইয়া শুধু যে পতিতরা তৎকালীন নানারূপ সামাজিক উৎপীড়ন হইতে মুক্তি পান তাহা নহে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে উন্নত জীবন যাপনের সুযোগ পাইয়া মানুষের মহিমময় মহত্ত্বলাভেও সক্ষম হন এবং বুঝিতে পারেন যে মানুষের অধিকার ও মর্য্যাদা শ্রেণীবিশেষে সীমাবদ্ধ নহে। এ প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ও যাহা বলিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য। উহা এইরূপ :

"The Vaishnava movement in Bengal, initiated by Sree Chaitanya Mahaprabhu, not only gave a new theology of the Absolute or a new philosophy of art or created new forms of beauty through its lyrics,—the richest in the whole body of Bengalee literature—but it delivered a new social message, the message of the presence of the Lord in every human individually and collectively in the human society, and applied itself to secure both individual and social uplift. . . . It repudiated the mediæval Hindu dogma of Adhikaree-veda or the classification of worships according to the qualification of the worshipper, which had been organised in the mediaeval institution of caste. And thus granted the highest religious franchise to all men and women, irrespective of all considerations of birth, parentage and social status and proclaimed the great gospel of universal worship."২

এই সকল কারণে তৎকালে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি লোকানুরাগ এরূপ প্রবল হয় যে :

"যাহা যাহা প্রভুর চরণ পড়য়ে চলিতে।
সে মৃত্তিকা লয় লোকে গর্ত্ত হয় পথে॥"৩

ঐ সময় তিনি একবার নীলাচল হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য, ৪ অঃ
২ গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃষ্ঠা ২৭৮
৩ শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত খণ্ড, ৭ অধ্যায়
৪ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ৯ পরিচ্ছেদ

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য খণ্ড, ৫ অধ্যায়
(2) *Bengal Vaishnavism*, pp. 115, 129.
৩ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১ পরিচ্ছেদ

গঙ্গাতীরে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে অবস্থান করেন। বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন যে, সেখানে তাঁহার পৌঁছিবার সংবাদ লোকমুখে প্রচারিত হইবামাত্র :

"তখন অসংখ্য লোক বলি হরি হরি।
চলিলেন দেখিবারে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
পথ নাহি পায় কেহ লোকের গহলে।
বন ডাল ভাঙ্গি লোক চারিদিকে চলে॥
... ...
ক্ষণেকে আইল সব লোক খেয়াঘাটে।
খেয়ারি করিতে পার পড়িল শঙ্কটে॥
শত শত লোক একো নায়ে চড়ে।
বড় বড় নৌকা সেই ক্ষণে ভাঙ্গি পড়ে॥
নানা দিকে লোক খেয়ারিরে বস্ত্র দিয়া।
পার হইয়া যায় সব আনন্দিত হইয়া॥
নৌকা যে না পায় সেও নানা বুদ্ধি করে।
ঘট বুক দিয়া কেহ গঙ্গায় সাঁতারে॥
কেহ বা কলার গাছ বান্ধি করে ভেলা।
কেহ কেহ সাঁতারিয়া যায় করি খেলা।"[১]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঐ ঘটনার সংক্ষেপে যে উল্লেখ আছে তাহা এইরূপ :

"আসি বিদ্যাবাচস্পতি গৃহেতে রহিলা।
প্রভুরে দেখিতে লোক সংঘট্ট হইলা॥
পঞ্চদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম।
লোকভয়ে রাত্রে প্রভু আইলা কুলিয়াগ্রাম॥
কুলিয়া গ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন।
কোটি কোটি লোক আসি কৈল দরশন॥"[২]

তৎপরে তিনি কুলিয়া হইতে তৎকালীন বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড়ের সান্নিধ্যে অবস্থিত রামকেলি গ্রামে আসেন। সেখানেও তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য এত অত্যধিক জনসমাগম ঘটে যে উহার বিবরণ পাইয়া গৌড়ের সুলতান বিস্মিত হন ও তাঁহার অমাত্যগণ সকাশে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন :

"বিনাদানে যাঁর পাছে এত লোক হয়।
সেই তো গোসাই ইহা জানিহ নিশ্চয়॥"[৩]
"এই যুক্তি বলিলু সভারে।
কেহো যেন উপদ্রব না করয়ে তাঁরে॥
যেখানে তাঁহার ইচ্ছা থাকুন সেখানে।
আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধানে॥
সর্ব্বলোক লয়ে সুখে করুন কীর্ত্তন।
কি বিরলে থাকুন যে লয় তাঁর মন॥
কাজি বা কোটাল বা তাঁহাকে কোন জনে।
কিছু বলিলেই তার লইমু জীবনে।"[৪]

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত, ৩ অঃ
২ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১ পঃ
৩ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১ পঃ
৪ শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত খণ্ড, ৪ অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত আছে যে, তিনি চব্বিশ বৎসর বয়সে নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে বাস করেন ও ছয় বৎসর দাক্ষিণাত্য, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি দেশে গমনাগমনে অতিবাহিত করেন। আটচল্লিশ বৎসর বয়সে, ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে, আষাঢ়ের শুক্লপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে রবিবাসরে তাঁহার অপূর্ব্ব লীলার অবসান হয়। এই অল্পকালের মধ্যেই, সেই যুগে যখন যানবাহন বা সংবাদ আদানপ্রদানের বর্ত্তমান সময়ের মত কোন ব্যবস্থা ছিল না, তাঁহার শক্তি পূর্ব্বোক্তরূপে জনচিত্ত অধিকার করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীর ধর্ম্মে কর্ম্মে ঐ প্রকার পরিবর্ত্তন সাধন করে।

প্রাচীন বাংলাসাহিত্য পাঠে বুঝা যায় যে, ঐ অসামান্য শক্তির মূলে ছিল তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃপ্রবাহিত দেবদুর্লভ ভগবৎপ্রেম, অপরিসীম মানবপ্রীতি, অসাধারণ শাস্ত্রার্থজ্ঞান, অমায়িক চরিত্রমাধুর্য্য, আদর্শ ত্যাগ, মধুর আচরণ ও অপূর্ব্ব সুষমামণ্ডিত মূর্ত্তি।

ঐ সময় জনসমুদ্রের মধ্যে সংকীর্ত্তনানন্দে বিভোর তাঁহার ঐরূপ রমণীয় মূর্ত্তিতে প্রেমের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিয়া কত লোক যে তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে সংযত করিয়াছে, কত দস্যু তস্কর ও পাষণ্ড মানুষের মহত্ত্ব ফিরিয়া পাইয়াছে, কত পাণ্ডিত্য ও ধনদর্পীর গর্ব্বোন্নত মস্তক আপনা হইতে নত হইয়া গিয়াছে, কত পতিত যে তাহাদের জীবন বৃথা সৃষ্টি হয় নাই তাহা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে তাহার সংখ্যা হয় না।

সংকীর্ত্তনকালে তাঁহার প্রেমমাধুরীমণ্ডিত মূর্ত্তি মানবহৃদয়ে কত গভীর রেখাপাত করিত তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায় তৎকালীন সপ্তগ্রামের রাজকুমার, পরে সর্ব্বস্বত্যাগী মহাত্মা রঘুনাথদাসের এই রচনাটি হইতে :

"রসের অবধি মোর গোরা।
রসের উল্লাসভরে, অপরূপ নৃত্য করে,
দু'নয়নে বহে প্রেমধারা॥
অভিনব সে মাধুরী, স্মরণ করিয়া হরি,
বারি বহে রাঙ্গা দুই নেত্রে।
বসন্ত-উৎসব কালে সেচন করয়ে জলে,
যেন পিচকারি জলযন্ত্রে॥
সকম্প আনন্দাবেশে, দশনে অধর দংশে,
হেন প্রেম আছিল কোথায়?
একবার যারে হেরে, তার আঁখি মন হরে,
মোর মন সতত মাতায়।"[১]

১ শ্রীগৌরাঙ্গস্তব কল্পতরুঃ। নবদ্বীপ গোস্বামীর অনুবাদ

গ্রামবাসীর কথা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নহি জ্ঞানী, গুণী, ভক্ত ভাগ্যবান—
বিশ্বাসী মোরা, এই শুধু অভিমান।
'বনের-বুড়া'কে অর্চ্চনা করি,
'জল-কুমারী'কে পূজি।
'ষষ্ঠী' 'শীতলা' 'মনসা' 'লক্ষ্মী'
সবার মহিমা বুঝি।
আকাশে বাতাসে দেবতা ফেরেন,
ক্ষেত্রে ক্ষেত্রপাল,
পদ্ম-হস্তে সরাইয়া দেন
সব জ্বালা জঞ্জাল।
দেবতারে ডাকি, দেবতার কথা কহি
দেবে ও মানুষে প্রতিবেশী হয়ে রহি।

২

পৃথিবীর রজে দিই মোরা গড়াগড়ি,
অপার্থিবের সাথে কারবার করি।
গান গায় পাখী, গান গায় বায়ু
কি মুখর নীরবতা!
ভাবের মাঝারে অভাব হারায়,
সুরের মাঝারে কথা।
কখন কিরূপে দেখা দেন হরি
পথ চাই বারবার,
তাঁহারি লাগিয়া সাজাইয়া রাখি
এই ঘর-সংসার।
রজনীর দেবস্বপ্নই দিবাভাগে,—
জীবনের চেয়ে অধিক সত্য লাগে।

৩

বিপদেও দেখি অকরুণ ন'ন বিধি,
মিলে 'শ্রীবৎস' 'চিন্তার' সন্নিধি।
অতিথি বিমুখ করিনে—গোঁসাই
বহু আত্মীয় লয়ে,
শ্রদ্ধায় করি ধর্ম্মকর্ম্ম—
শুচি দারিদ্র্য সয়ে।
পূজা হোম যাগ প্রাচীন প্রথার
ধারা বহে অনিবার,
শত বিপ্লবে অক্ষত আছে
বৈদিক সদাচার।
ত্যাগে ও গ্রহণে হেথা বিলম্ব ঘটে,
সুদূর অতীত রয়েছে সন্নিকটে।

৪

প্রকৃতির প্রিয় গুপ্ত এই ভবন—
শুচিতায় এরে গড়েছে ভক্ত মন।
কত অভাগিনী সাবিত্রী হায়
বাঁচাতে না পারি স্বামী,
হেথায় কঠোর 'পঞ্চতপে'তে
কাটায় দিবস যামী।
কত অর্জ্জুন রহে অজ্ঞাত
বৃহন্নলার বেশে,
কত 'নলরাজ' আশ্রয় লয়,
ঘোর দুর্দ্দিনে এসে।
সমগ্র ধরা একদা পূজিবে যাকে,
গ্রাম্য-দেবতা হইয়া এখানে থাকে।

৫

পঙ্কেতে রই, দুখী নই তায় মোটে,
পুণ্য আলোকে বুকে পঙ্কজ ফোটে।
'ধরা ও দ্রোণের' নিকট পড়শী,
বিদুরের জ্ঞাতি মোরা
আমরা চাহি না 'মায়া কাপেট'
ইন্দ্রজালের ঘোড়া।
পরশ-মণির আকাঙ্ক্ষী নহি,
তার চেয়ে মানি দামী—
স্বপ্নেও যদি পদধূলি দেন
সনাতন গোস্বামী।
অর্থই আনে অনর্থ অবনীর,
'কুবেরে'র কাছে নোয়াই না মোরা শির

৬

শুনি আমেরিকা যত গুণী তত ধনী
বিজ্ঞানে তারা জগতের শিরোমণি।

আমরা চাহি না ওয়াশিংটন,
ব্রিটেন, মস্কো, রোম—
মোরা মরীচির তপোবন খুঁজি,
'সুরভীর' আশ্রম।
ধ্বংস-করার বিরাট সৃষ্টি
'অণুবোমা' নাম তার,
লোকক্ষয়কৃৎ আমেরিকা নাকি
করেছে আবিষ্কার ?
আমরা অণুর বেশী জানি গুণপনা,
তাই মাগি সাধুপদরজ-অণুকণা।

৭

অমিত প্রতাপ, বিপুল শক্তিধর,
কাল যারা ছিল—কোথায় অতঃপর ?
দুষ্প্রধর্ষ দুষ্কৃতি দল
কোথা গেল ত্বরা উবে ?
গেল দর্পের বিপুল বহর
কোন্ সাগরেতে ডুবে ?
উল্কার মত কোথায় মিলাল ঃ
উদগ্র বেগে ছুটি
প্রচণ্ড রথী, রাষ্ট্রনায়ক,—
আগুনের ফিন্‌কুটি ?
দূর্ব্বাশীর্ষে শিশিরবিন্দু হায়—
সসাগরা এই ধরণী গ্রাসিতে চায় ?

৮

যে বিশ্বরূপ কৃষ্ণ যোগেশ্বর—
দেখান—দেখেন পার্থ ধনুর্দ্ধর,
ক্ষীণ পুণ্যেতে কেমনে হবো তা
দেখিবার অধিকারী ?
আমরা অবোধ এই বিশ্বই
রূপ বলে জানি তাঁরি।
ভুবন এবং ভুবনেশ্বরে,
পৃথক দেখে না আঁখি,
শরীর শিহরে প্রেমে বুক ভরে
বিস্মিত হয়ে থাকি।
দয়াল ভয়াল তাঁর রূপ দেখি নিতি
অনুভব করি তাঁহার উপস্থিতি।

৯

কাল-সাগরের কালিদহে করি বাস,
নিস্তরঙ্গ, প্রশান্ত চারি পাশ।
অন্তবিহীন এ কমলবনে
লাগে না আন্দোলন,
'কমলে কামিনী' বিরাজেন সদা
পেতে পারি দর্শন।
স্থির শৈবাল-শয্যায় হেথা
শুক্তি মুক্তা রাগে,
যুগের যুগের মণিকর্ণিকাও
অক্ষয় হয়ে থাকে।
প্রলয়-পয়োধি তরঙ্গ আসি ছুটে—
জননীর পাদপদ্মেতে পড়ে লুটে।

১০

পল্লী—বিবর নহে দুখ-দৈন্যের,
বহে বায়ু হেথা নৈমিষারণ্যের।
মহাভারতের মহিমার মাঝে
আজও মোরা বাস করি,
ক্ষুদ্র মধুপ ভাবের স্নিগ্ধ
চক্রতীর্থ গড়ি।
অজ্ঞাতবাসে আলেখ্য আঁকি
রাজসূয় যজ্ঞের,
প্রতীক্ষা করি অনাগত দিন
শুভ সৌভাগ্যের।
আঁখিজলে ধুয়ে পল্লীর পথধূলি,
বৈতরণীর ব-দ্বীপ গড়িয়া তুলি

মামার দেশ

শ্রীঅমরকুমার দত্ত

চরিত্র

বিশ্বম্ভর বাগ—	ম্যানেজার	(ঝুনো ব্যবসায়ী)
সুলোচন নাগ—	প্রুফ-রীডার	(কানা)
সাতকড়ি সিংহ—	হেড কম্পোজিটার	(তোতলা)
গোপাল গোয়েল—	কম্পোজিটার	(ছিটগ্রস্ত প্রেমিক ও কবি)
রমেশ শর্ম্মা—	ঐ	(নেশাখোর)
রাধাচরণ হাতী—	মেসিনম্যান	(উগ্র স্বভাবের)
কাঞ্চন শীল—	আংশিক অধ্যাপক ও আংশিক সাংবাদিক (সুচতুর ও রসিক)	
প্রেমতোষ রায়—	শ্রম-দপ্তরের কর্ম্মচারী ও সরকারী শ্রমিক সঙ্ঘের পাণ্ডা	
হাবু—	বেয়ারা	(বোকা শয়তান)
ছোটলাল—	বেহারী দারোয়ান	

স্থান—"বেঙ্গলী ছাপাখানা"র আপিসঘর।

সময়—বেলা তিন ঘটিকা।

(ম্যানেজার বিশ্বম্ভর ও প্রুফ-রীডার সুলোচন দু'খানা টেবিলে বসে কাজে ব্যস্ত)

সুলোচন। (একটা নীল চশমা পরে এক চোখ দিয়ে প্রুফ দেখছিলেন, দেখতে দেখতে ম্যানেজারকে উদ্দেশ করে হঠাৎ বলে উঠলেন) না মশাই, এদের জন্যে প্রুফরীডারের চাকরি রাখা দেখছি দায় হয়ে উঠল। (তার পর হাসতে হাসতে বললেন) একবার শুনুন আপনার কম্পোজিটার কি রকম কম্পোজ করেছে। ঐ যে ডি. এল. রায়ের সেই "বঙ্গ আমার, জননী আমার" গানটা, যা আজকেই বিকেলে দিতে হবে, তার শেষের ছত্র দুটি কি রকম কম্পোজ হয়েছে, তা একবার পড়ে শোনাই, শুনুন—

"আমরা মুছাব মা তোর লালিমা, ফানুস, ভোমরা, নহেত মেষ,
দেবীকে মার, সাধনা আমার, স্বর্ণ আমার মামার দেশ।"

কোন মূর্ত্তিমান্ এটা কম্পোজ করেছে মশাই? পণ্ডিতটিকে একবার ডেকে পাঠান তো।

বিশ্বম্ভর। ব্যাপার শুনে মনে হচ্ছে আমাদের গোপাল কম্পোজ করেছে। শেষের ছত্র দুটা কি বললেন? দেখি, প্রুফটা আমায় একবার দিন। (প্রুফটা ভাল করে দেখে তারপর নিজে নিজেই পড়লেন) "ফানুস, ভোমরা, নহে ত মেষ, দেবীকে মার, সাধনা আমার, স্বর্ণ আমার মামার দেশ।" এ ত সর্ব্বনাশের ব্যাপার দেখছি, হঠাৎ মামার দেশ? (এমন সময় হাবু বেয়ারা খানকয়েক চিঠি এনে ম্যানেজারকে দিল, ম্যানেজার দেখতে দেখতে গোপালের একটা খামের চিঠি দেখে বললেন) গোপালের যে আবার একখানা খামের চিঠি দেখছি, মেয়েলি হাতের লেখা, বর্দ্ধমানের ছাপ, বর্দ্ধমানেই তো ওর মামার বাড়ী, মনে হচ্ছে এর মধ্যে কিছু রহস্য আছে, দাঁড়ান, একবার ডেকে পাঠাই। হাবু—

(হাবুর প্রবেশ)

হাবু। আজ্ঞে এই, কি বলছেন?

বিশ্বম্ভর। একবার গোপাল কম্পোজিটারকে ডেকে দাও।

হাবু। আজ্ঞে এই, ডেকে দিচ্ছি। (প্রস্থান)

বিশ্বম্ভর। দেখুন বিপদ, জরুরি কাজ, ছ'টার সময় দিতে হবে, আর এই রকম কাজ করলেই তো দিয়েছি; যত সব আপদ এখানে এসে জুটেছে। জ্বালিয়ে মারলে। (গোপাল কম্পোজিটারের প্রবেশ ও নমস্কার) এই যে, গোপাল, (প্রুফটা দেখাইয়া) এই গানটা তুমি কম্পোজ করেছ?

গোপাল। (প্রুফ দেখে) আজ্ঞে হাঁ।

সুলোচন। একটা গান কম্পোজ করতে তো ভুল করেছ অসংখ্য, তার ওপর শেষের দু'ছত্র তুমি কোথা থেকে পেলে?

গোপাল। কেন স্যার, ঐ গানেতেই তো সব আছে।

বিশ্বম্ভর। (ধমক দিয়ে) ঐ গানেতেই সব আছে?

গোপাল। (বিনীত ভাবে) তবে আজ্ঞে, বড্ড জড়ানো লেখা কিনা, একটু আধটু ভুল যে না হতে পারে, তেমন নয়।

বিশ্বম্ভর। (ধমক দিয়ে) একটু আধটু ভুল? চোখ মেলে একবার দেখ তো কি কাণ্ড করেছ? আচ্ছা, ঘুচাব না হয় ভুল করে মুছাব হতে পারে, কালিমাও না হয় লালিমা হ'ল কিন্তু তারপর এ রকম অপরূপ পদ্য বানালে কোথা থেকে? "ফানুস, ভোমরা, নহে তো মেষ,

দেবীকে মার, সাধনা আমার, স্বর্ণ আমার মামার দেশ?"

গোপাল। আজ্ঞে, ও সব তো ওতেই আছে।

বিশ্বম্ভর। (রাগত ভাবে) ও সব ওতেই আছে? কোথায় আছে দেখাও তো? (লেখাটা তার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।)

গোপাল। (লেখাটা দেখে বিনীত ভাবে) আজ্ঞে, কিছু মনে করবেন না, লেখা তো ওই রকমই লাগছে।

বিশ্বম্ভর। (রাগতভাবে) ওই রকমই লাগছে? গোপাল আমার! (লেখাটা নিয়ে দেখিয়ে) চোখ মেলে দেখ তো ভাল করে—এই কথাটা ফানুষ না মানুষ, এটা ভোমরা না আমরা, এটা নহেত না নহি ত?

গোপাল। আজ্ঞে, তা হলে তাই হবে।

বিশ্বম্ভর। (ধমক দিয়ে) তা হলে তাই হবে? কেন, তুমি দেখতে পাচ্ছ না? তারপর দেবী আমারকে করে বসলে একেবারে দেবীকে মার? স্বর্গকে করলে স্বর্ণ। (উপহাস করে)

আর গোপাল গোবিন্দ, আমার দেশকে একেবারে মামার দেশ বানিয়ে ছাড়লে? বাহাদুর বটে!

গোপাল। আজ্ঞে তা হলে—

সুলোচন। সব ভুল প্রুফে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। আবার ভুল যেন না হয়, হুঁসিয়ার হয়ে কাজ কর—যাও। (প্রুফ নিয়ে গোপাল প্রস্থানোদ্যত)।

বিশ্বম্ভর। (গোপালকে ডেকে) আচ্ছা, শোন?

গোপাল। আজ্ঞে, বলুন।

বিশ্বম্ভর। তোমার মামার বাড়ী কোথায়?

গোপাল। আজ্ঞে বর্দ্ধমানে।

বিশ্বম্ভর। তুমি সেখানে যাও?

গোপাল। আজ্ঞে হ্যাঁ, যাই বৈ কি, প্রত্যেক ছুটিতেই যাই।

বিশ্বম্ভর। তোমার মা সেখানেই থাকেন?

গোপাল। আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে কিনা, ঠিক মাকে দেখতেই যাই না।

বিশ্বম্ভর। ঠিক মাকে দেখতে যাও না, অথচ প্রত্যেক ছুটিতেই যাও, তা হলে কাকে দেখতে খরচ করে যাও?

গোপাল। আজ্ঞে, (মাথা চুলকাতে চুলকাতে) বলব?

সুলোচন। হ্যাঁ, বল না? জিজ্ঞাসা করছেন তো?

গোপাল। আজ্ঞে, এই আজ্ঞে, (আমতা আমতা করে) তা হলে বলব?

বিশ্বম্ভর। (বিরক্তির সুরে) আঃ, সময় নষ্ট করো না, তাড়াতাড়ি বল।

গোপাল। আজ্ঞে তা হলে এই বলছি—(মাথা চুলকাতে লাগল।)

সুলোচন। কৈ মাথা চুলকাচ্ছ কেন, বল না?

গোপাল। (আমতা আমতা করে মাথা চুলকাতে চুলকাতে) আজ্ঞে, এই আজ্ঞে, আমি যাই ওই সাধীকে—তার মানে সাধনাকে দেখতে।

বিশ্বম্ভর। সাধনা? সে কে? তুমি তো বিয়ে কর নি এখনও?

গোপাল। আজ্ঞে না, বিয়ে করি নি, তবে আজ্ঞে করব ভাবছি।

বিশ্বম্ভর। বিয়ে করবে? কাকে?

গোপাল। আজ্ঞে ওখানকার ওই সাধীকে যাকে বলে সাধনাকে, যদি পাই তা হলে।

বিশ্বম্ভর। দেবী বলেও ওখানে কেউ থাকে নাকি?

গোপাল। দেবী (রাগত ভাবে) আজ্ঞে হ্যাঁ, বলবেন না ওর কথা, ওটা, ওটা একটা বদমায়েস, পাজী, নচ্ছার, পাই যদি একবার তো ওর মুণ্ডপাত করে ছাড়ব।

সুলোচন। কেন, দেবী কি করল তোমার?

গোপাল। কি করল? কি করে নি মশাই? বলছেন কি, ওটা একটা পয়লা নম্বরের বদমায়েস। সারাদিন ছিপ হাতে করে পুকুরপাড়ে মাছ ধরবার অছিলে করে বসে থাকে ওই সাধীকে দেখবার জন্য। বেচারা ওর জন্যে জ্বালাতন, পুকুরে আসতে যেতে পারে না আর আপনি বলছেন, কি করল ও? পাজী, নচ্ছার বেটা! (রাগে ফুলতে লাগল)

সুলোচন। তোমায় বুঝি সাধনা এ সব কথা বলেছে?

গোপাল। না, সাধনা বলবে কেন? (হতাশার সুরে) তার সঙ্গে তো আমার আলাপই নেই।

সুলোচন। আলাপ নেই? তা হলে তুমি জানলে কি করে?

গোপাল। জানব না? কেন জানব না মশাই? আমি জানলা দিয়ে নজর করে দেখি না? সাধীদের বাড়ী তো আমার মামার বাড়ীর পুকুরের ঠিক ওপারেই।

বিশ্বম্ভর। (হাসি চেপে গম্ভীর হয়ে) যাও এখন ঠিক করে গানটা করেকশন করে নিয়ে এস। এবার ভুল হলে ভাল হবে না—তাড়াতাড়ি করে নিয়ে এস। যাও।

(গোপালের প্রস্থান)

(প্রুফরিডারকে উদ্দেশ করে হাসতে হাসতে বললেন) এবার বুঝেছেন মশাই কেন ও ছত্র কম্পোজ হয়েছে? দেবীকে মার, সাধনা আমার, স্বর্ণ আমার মামার দেশ? (দু'জনের হাস্য।)

সুলোচন। কি করে জানব বলুন যে কম্পোজ করতে করতে আবার কম্পোজিটারের মনের ভাব বেরিয়ে পড়ে?

বিশ্বম্ভর। এই ত্রিশ বছর ধরে অনেক ভূত নিয়ে কারবার করে আসছি, তবে তো ওদের মনস্তত্ত্ব কিছু বুঝতে পারি। দেখলেন না, একটু পরখ করতেই সব ফাঁস হয়ে গেল। ওর চিঠিটা ওকে এখন দেওয়া হবে না, থাক এখানে। (চিঠি দেখে) হুঁ, কিছু যেন রহস্য আছে এর মধ্যে।

সুলোচন। কি জানি মশাই, আমারও ত এই দশ বছর হতে চলেছে প্রুফরিডারের কাজ, কিন্তু এরকম অদ্ভুত মনস্তত্ত্বের পরিচয় আর কখনও পাই নি, আজ এই প্রথম।

বিশ্বম্ভর। আরে নাগ মশাই এর চেয়ে আরও অদ্ভুত কম্পোজের ব্যাপার তা হলে বলি শুনুন—(বাইরের দিকে চেয়ে) এই মাটি করেছে, প্রোফেসার শীল এসে পড়লেন যে—

(প্রোফেসার শীলের প্রবেশ)

প্রোঃ শীল। Hallo, Mr. Bag, আমার গানটার ফাইন্যাল প্রুফটা দিন দেখে দিয়ে যাই।

বিশ্বম্ভর। আর প্রোঃ শীল—ওই গানটার কম্পোজের ব্যাপার নিয়েই চলছিল এতক্ষণ, সে অনেক কথা, তবে ফাইন্যাল প্রুফটা এখনও হয় নি, একটু না হয় অপেক্ষা করে দেখে দিয়ে যান। এই এখনই হয়ে যাবে।

প্রোঃ শীল। সে কি মশাই! সর্ব্বনাশ করবেন দেখছি, চারটে বাজে এখনও proof ready হ'ল না? ছ'টার সময় আমার ছাপা গান চাই-ই চাই। Be sure of that Mr. Bag.

সুলোচন। তা হয়ে যাবে, করেক্শন এখনই হয়ে যাবে। আপনি একটু দয়া করে বসে দেখে যান না ?

প্রোঃ শীল। By jove! I have no breathing time. কালেজ থেকে এই ছুটে এলাম, আবার এখনই "সত্যবাদী" পত্রিকার কাজে যেতে হবে। অনেক কষ্টে একটু সময় করে এসেছি। সকলের জানা একটা গান কম্পোজ করতে কত সময় লাগে মশাই ? আমি তা হলে এখন চললাম, ঠিক ছ'টার সময় আসব নিতে। আপনারা ভাল করে প্রুফটা দেখে দেবেন, ভুল-টুল যেন না থাকে। Mind you Mr. Bag.

(বিরক্তির সহিত প্রস্থান)

বিশ্বম্ভর। হায় রে ! জানা গান, কার জানা, আর কে জানে ? কম্পোজিটারদের ব্যাপার ত আর জানা নেই ? জানতেন যদি কি ঠেঁডিয়ে কি করতে হয় ? আর কালেজে পড়িয়ে জানবেনই বা কি করে ? ছাপাখানার ম্যানেজার হবার সৌভাগ্য হলে জানতে পারতেন, বুঝতে পারতেন যে তাদের অতি জানা নিজের নিজের নাম কম্পোজ করতে দিলেও সে হয়ে যায় তাদের কাছে অজানা। যাক্, (সুলোচনকে সম্ভাষণ করে বললেন) দেখুন, আমায় তো আবার এই মুহূর্তে সেই "শ্রীবিলাসে"র টাকাটার জন্য তাগাদায় যেতে হবে। অনেক দিন ধরে ঘোরাচ্ছে। আজ সময় দিয়েছে সওয়া চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে। ভুজনের ছলের অভাব নেই, একটু দেরি হলেই বলবেন, কৈ আপনি ত সময়ে এলেন না, আজ আর হ'ল না, সব খরচ হয়ে গেছে। টাকাটা দেখছি মারাই যাবে। আমি চললাম, আপনি প্রুফটা ভাল করে দেখে দেবেন। (বিল হাতে দারোয়ানের প্রবেশ) এত্না দেরী কাহে, রুপেয়া মিলা ?

ছেটলাল। কাঁহা রুপাইয়া হুজুর ?

বিশ্বম্ভর। কেয়া বোলা ?

জেটলাল। বাবুকা পাওা নেহি মিলতা, বোলেগা কোন হুজুর ?

সুলোচন। আপনি কিন্তু পাঁচটার মধ্যেই আসবেন। আমি ঠিক পাঁচটায় উঠব। জানেন ত আমার আজ বিশেষ দরকার আছে।

বিশ্বম্ভর। আচ্ছা তাই হবে, তা হলে আসি। হাঁ, নাগ মশাই ফাইন্যাল প্রুফটা দু'চোখ দিয়ে ভাল করে দেখে তারপর ছাপতে দেবেন।

(বিশ্বম্ভর ও জেটলালের প্রস্থান)

সুলোচন। (রেগে চোখ থেকে কালো চশমাটা খুলে, সামনে তাকিয়ে) আমার এক চোখ কানা বলে ঠাট্টা করে বলা হল, দু'চোখ দিয়ে দেখে দিতে—(স্বগত স্বরে) স্কাউন্ড্রেল।

(সবেগে প্রস্থান)

(নিজেদের প্রুফ নিয়ে গোপাল ও রমেশের প্রবেশ এবং কাহাকেও না দেখে)

রমেশ। কেউ নেই রে গোপাল এইবার তোর ভালবাসার কথাটা শেষ কর, বলছিস তো তাকে খুব ভালবাসিস। হ্যারে সত্যি নাকি ?

গোপাল। মাইরি বলছি ভাই, খুব ভালবাসি। পাগল হয়ে গেছি।

রমেশ। তাই তো খামকা পাগল হলি ? কিন্তু সে তোকে ভালবাসে কি না সেটা একবার খোজ নে, না হলে তাকে বিয়ে করবি কি করে ?

গোপাল। কেন ? বিয়ে করব বিয়ে করে। আবার কি ? হ্যারে সব মেয়েই কি ভালবেসে বিয়ে করে ?

রমেশ। দূর, মেয়েরা যাকে হোক্ একটা বিয়ে করলেই তাকে ভালবাসে। আহা—কে বলে পিরিতি নাই ? (সুর করে)

"পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর ভুবনে আনিল কে ?
ও পাড়ার সাধী বধূরে আমার, ধরিয়া আনিয়া দে।"

গোপাল। না ভাই না, ঠাট্টা রাখ, এ বিয়ে যদি না হয় তা হলে আমি তো প্রাণে বাঁচবো না ? মাইরি বলছি—

রমেশ। কি করে বুঝলে বাবা যে এ বিয়ে না হলে প্রাণে বাঁচবে না ?

গোপাল। এই দেখনা ভাই কি রকম শুকিয়ে যাচ্ছি, আগে বারখানা রুটি না হলে পেট ভরত না আর এখন তোকে বলব কি দুখানা, শুধু দুখানা খেতে না খেতেই খাওয়া হয়ে যায়। এই খাওয়া খেয়ে ক'দিন আর বাঁচব বল ? আমি মামীকেও এবার সে-কথা বলে এসেছি, যে যদি এ বিয়ে না দিতে পার তো আর তোমার গোপালের প্রাণের আশা রেখো না।

রমেশ। হু৷—ঠিক, বারখানা থেকে যখন দু'খানায় নেবেছে তখন রোগ ঠিকই ধরেছে। মরেছ ঠিকই, (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) বাবা ও রোগ আমায় একবার ধরেছিল—(হেসে) যাই আর কি—আটখানা থেকে একেবারে ওই দু'খানায় তারপর (শিশি দেখাইয়া) বেঁচে থাক এই ধাক্কেশ্বরী, এখন বাবা চড় চড় করে বেড়ে একেবারে ষোলখানা। হাঁ, তা তোর মামী সব শুনে তোকে কি বললে ?

গোপাল। বলবে আর কি আমার মাথা আর মুণ্ডু—বললে আমার মামার মত নেই, সাধীরা নাকি ছোট ঘরের—

(সুলোচনের প্রবেশ)

সুলোচন। কৈ গোপাল তোমার প্রুফ এনেছ ?

(সুলোচনের উপবেশন ও প্রুফ রেখে রমেশের প্রস্থান)

গোপাল। এই নিন স্যার।

সুলোচন। (প্রুফ দেখিতে দেখিতে) এ আবার কি করেছ ? এত করে করেক্শন করে বলে দেওয়া সত্বেও ঠিক হ'ল না ? কি করেছ দেখ দেখি—(গোপালের ট্যারা চোখের দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে) কোন দিকে তাকিয়ে আছ ? এই, এই দিকে দেখ কি করেছ—

মানুষ নহত তোমরা যেথ,
দেবী কামার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার মায়ার দেশ !

এত করেও ভুল ? আলালে দেখছি, নহত নয়, ওটা নহি ত, আর

তোমরা নয় ওটা আমরা। দেবীকে আবার কামার বানালে কেন ?

গোপাল। আজ্ঞে, দেবীরা জাতে কামার তো।

সুলোচন। তোমার মুণ্ডু, এখানকার দেবী জাতে কামার নয়, ওটা হবে দেবী আমার, বুঝেছ ? আবার মামার দেশ ? উঃ জ্বালাতন করে মারলে। ওরে বাবা মামার দেশ নয়, ওটা আমার দেশ—আ-মার দেশ বুঝেছ ? করেকশন করে দিলুম, আর যেন ভুল না হয়। যাও তাড়াতাড়ি ঠিক করে নিয়ে এস।

গোপাল। যে আজ্ঞে স্যার, এখখুনি ঠিক করে আনছি।

(গোপালের প্রস্থান)

সুলোচন। হারু, ও হারু।

হারু। (নেপথ্যে) আজ্ঞে এই, যাই। (আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে প্রবেশ করে) আজ্ঞে এই, কি অনুমতি করেন ?

সুলোচন। আরে হারু, তুমি যে আবার শুদ্ধ ভাষায় কথা কইছ ?

হারু। আজ্ঞে এই, তা কইব বৈকি (ঘাড় চুলকে) কইব বৈকি আপনাদের সঙ্গে। শুদ্ধ ভাষায় কথা তো কইতে ইচ্ছে যায়, কিন্তু ওই বাগ মশায়ের হালুম, হুলুমে সব কি রকম গুলিয়ে যায়।

সুলোচন। একবার হেড কম্পোজিটার সিংহ মশাইকে ডেকে দাও তো !

হারু। আজ্ঞে এই, যাই। (জনান্তিকে) বাবারে বাবা—বাগ, নাগ, সিংহ একেবারে যেন সোঁদরবন। (প্রস্থান)

সুলোচন। ওই গোপালটার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ, না হলে এরকম--

(হেড কম্পোজিটার সাতকড়ির প্রবেশ)

সাতকড়ি। আ—আ—আমায় ডাকছেন ?

সুলোচন। হাঁ—আচ্ছা দেখুন, ওই গোপালের মাথাটার কি কিছু গোলমাল আছে ?

সাতকড়ি। তা—তা—তা—একটু—আছে বোধ হয়। প্রা—প্রা—প্রায়ই ও অ—অন্যমনস্ক থাকে, আর মা—মা—মাঝে মাঝে—আপন মনে বি—বি—বিড় বিড় করে, সময় সময় আবার গা—গা—গানের সুরও ভাঁজে। মা—মা—মামার আদরে আদরে একটু খা—খা—খামখেয়ালী হয়ে উ—উ—উঠেছে আর কি।

সুলোচন। মশাই আপনি একবার গিয়ে দেখুন তো ও কি করছে ? প্রুফটা তাড়াতাড়ি করে পাঠিয়ে দিন। সাড়ে চারটা তো দেখছি বেজে গেল, আমায় পাঁচটায় উঠতেই হবে।

সাতকড়ি। আ—আ—আচ্ছা, আমি এখনই গি—গিয়ে বেশ করে তা—তা—তাড়া দিয়ে পা—পা—পাঠিয়ে দিচ্ছি।

(সাতকড়ির প্রস্থান)

সুলোচন। উঃ তোতলার সঙ্গে কথা কওয়া কি জ্বালা রে বাবা—শেষ হয় না।

(তৃতীয় প্রুফ নিয়ে গোপালের প্রবেশ)

গোপাল। এই নিন স্যার, এবার একেবারে ঠিক করে এনেছি, হ্যাঁ, আর ভুল পাবেন না।

সুলোচন। (প্রুফ দেখতে দেখতে) ভুল পাব না, তোমার মাথা পাব। ভুল নয়তো এটা কি হয়েছে ?

মানুষ নহেত আমরা মেষ,
স্বর্গ আমার মামার দেশ।

সেই আবার মামার দেশ ? পাগল করে তুলবে যে দেখছি ? শোন ভাল করে শোন—ওপরে "মানুষে"র পরে আসবে "আমরা" আর তার পরে হবে "নহিত", নহেত নয়, বুঝেছ ? আর নীচের লাইনের শেষ কথা "আমার দেশ", মামার দেশ নয়। বুঝলে এবার ? ফের যদি ভুল হয়, মুণ্ডু ভেঙ্গে ফেলব, বুঝেছ ?

গোপাল। আজ্ঞে হাঁ।

সুলোচন। আচ্ছা যাও, শীগ্‌গির নিয়ে এস। (ঘড়ি দেখে) আঃ পাঁচটা যে বাজে। আচ্ছা এক কাজ করো, সিংহ মশাইকে একবার পাঠিয়ে দাও, আর সোজা চোখ চেয়ে কাজ করো, বুঝলে ?

গোপাল। যে আজ্ঞে। (জনান্তিকে) "কানা খোড়া একগুণ বাড়া"—আমার ট্যারা চোখ নিয়ে ঠাট্টা, (রাগত স্বরে) আচ্ছা—

(গোপালের প্রস্থান)

সুলোচন। আবার সেই তোতলাকে বোঝাতে হবে—ভাল জ্বালা।

(সাতকড়ির প্রবেশ)

সাতকড়ি। আ—আ—আমায় ডা—ডা—ডাকছেন ?

সুলোচন। মশাই, পাঁচটা বাজে, ম্যানেজার মশাইতো এখনো এলেন না, আমাকে এখনি যেতে হবে। উনি বোধ হয় এখনি এসে পড়বেন। যদি তাঁর আসতে দেরি হয়, তা হলে আপনি দয়া করে গোপালের ফাইন্যাল প্রুফটা একবার দেখে ছাপতে দিয়ে দেবেন। ওরা ঠিক ছ'টার সময় নিতে আসবে। একটু দেখবেন যেন আবার "মামার দেশ" না থেকে যায়। আচ্ছা, আমি তা হলে এখন আসি। (রুমালে মুখ মুছে, চশমা পরে প্রস্থান)

(চতুর্থ প্রুফ নিয়ে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে গোপালের প্রবেশ)

গোপাল। নিন্ স্যার, এবার একেবারে ঠিক না হয়ে যায় না। (সাতকড়ির প্রতি) কৈ, নাগ মশাই কোথায় গেলেন ?

সাতকড়ি। ও—ও—ওঁর বিশেষ—জরুরি কাজ থাকার দরুন উ—উ—উনি চলে গেছেন। আ—আমায় দে—দে—দেখে দিতে —বলেছেন, দা—দা—দাও দেখি। (প্রুফ দেখে) এ কি ? মা—মা—মামার দেশ করেছ কেন ? ওটা হবে আ—আ—আমার দেশ। যাও—ওটা ঠিক করে দিয়ে জ—জ—জমাদারকে ছাপতে দিয়ে দাও, আ—আ—আমার হাতে—অনেক কাজ রয়েছে,—আমি যাই। চো—চো—চোখ দিয়ে দেখে—কাজ করো। (প্রস্থান)

গোপাল। (সরোষে মুখভঙ্গী করে) আরে তোতলা আজ

হতে পারে না, সেও আমার চোখ নিয়ে ইঙ্গিত করে—ওঃ, মামার শকে আমার দেশ করতে হবে, কেন—আমার দেশ কি মামার শ হতে পারে না? একটা গানের মধ্যে সাতশ গণ্ডা আমার, মামার, আর আমার। কেন, বাবা একটা মামার হলে কি হয়? আমি বদলাব না। আমার দেবী, আমার সাধনা, আছে মামার দেশে, আর আমি করব তাকে আমার দেশ?

(রাধাচরণের প্রবেশ)

রাধাচরণ। কৈ গোপাল, এখনো কাজ দিচ্ছ না যে—জান আজ আমার শালীর বিয়ে—

গোপাল। (চমকে উঠে) কি বললে, আজ সাধীর বিয়ে?

রাধাচরণ। আরে না না, (গোঁফে মোচড় দিয়ে) আজ আমার শালীর বিয়ে।

গোপাল। (আশ্বস্ত হয়ে) তাই বল, তোমার শালীর বিয়ে মাথা বিয়ে—(প্রুফ দিয়ে) এই নাও ভাই এই নাও—আহা ব—য়ে। (বলিতে বলিতে উভয়ের প্রস্থান ও বিশ্বম্ভরের প্রবেশ)।

বিশ্বম্ভর। হাবু, এই হাবু?

হাবু—(নেপথ্যে) আজ্ঞে এই যাই। (প্রবেশ করে) আজ্ঞে এই, কি আজ্ঞা করেন?

বিশ্বম্ভর। হাঁরে—প্রুফ রিডার বাবু, মানে নাগ মশাই কি চলে গেছেন?

হাবু। আজ্ঞে এই, বোধ হয় গিয়েছেন।

বিশ্বম্ভর। (বিরক্তির সুরে) বোধ হয় গিয়েছেন? কেন তুমি ছিলে কোথায়?

হাবু। আজ্ঞে এই—এইখানেই তো ছিলাম।

বিশ্বম্ভর। এইখানেই ছিলে তো হবুচন্দ্র বলতে পারছ না কেন, তিনি চলে গেছেন কি না?

হাবু। আজ্ঞে এই, তাঁকে তো চ—লে যেতে দেখি নি।

বিশ্বম্ভর। (রাগত ভাবে) আজ্ঞে তাঁকে চ--লে যেতে দেখি নি, —তবে কি উড়ে যেতে দেখেছ?

হাবু। আজ্ঞে এই, উ—ড়েও তো যেতে দেখি নি।

বিশ্বম্ভর। তা হলে তিনি গেলেন কোথায়? তাঁকে চলেও যেতে দেখ নি, উড়েও যেতে দেখ নি, আর তিনি এখানেও নেই, তা হলে তিনি কি কর্পূরের মত উবে গেলেন?

হাবু। আজ্ঞে এই, তাই তো ভাবছি। (মাথা চুলকাতে চুলকাতে) তাই তো, তাই -

বিশ্বম্ভর। (ধমক দিয়ে) আর অত ভেবে কাজ নেই। যত সব ভূত এসে জুটেছে এখানে। ওদিকে খদ্দেরের কাছে হেঁটে হেঁটে টাকা পাবার জো নেই, আর এদিকে হবুচন্দ্র, গোপালগোবিন্দ জ্বালাতন করে মারলে। ঘুমুচ্ছিলি বুঝি?

হাবু। (হাত কচলাতে কচলাতে) আজ্ঞে তা মিথ্যে বলব কেন, একটুখানি নিদ্রে এসেছিল কি না? তাই, তাই একটু বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

বিশ্বম্ভর। বিকেল পাঁচটার সময় একটু বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলে? উদ্ধার করলে, মূর্তিমান কুম্ভকর্ণ কোথাকার—

(প্রোফেসার শীলের প্রবেশ)

প্রোঃ শীল। Hallo Mr. Bag, গানের কাগজগুলো কি ছাপা হয়েছে? (হাতঘড়ি দেখে) I am a bit early-একটু আগেই এসে পড়েছি।

বিশ্বম্ভর। আমি একটু কাজে বাইরে গিয়েছিলাম, এই আসছি, বোধ হয় হয়ে এসেছে। হাবু— (হাবুর প্রবেশ)

হাবু। আজ্ঞে এই, কি বলছেন?

বিশ্বম্ভর। যা, সিংহ মশাইকে গানের কাগজগুলো নিয়ে আসতে বল। (টেবিলের উপর গোপালের চিঠিটা দেখে) হাঁ—এই দেখ, গোপালের এই চিঠিটা—আচ্ছা থাক এখন। তুই যা।

হাবু। আজ্ঞে এই, যাই। (প্রস্থান)

প্রোঃ শীল। আরে বাপরে, এখানে দেখছি সবাই রয়েছেন—বাগ, নাগ, সিংহ সকলেই বিরাজমান।

বিশ্বম্ভর। আমার যা অবস্থা হয়েছে মশাই তা আর আপনাকে কি বলব। সারাদিন ধরে কতকগুলো ভূত তাড়িয়ে বেড়াচ্ছি। এদের সঙ্গে বকতে বকতে আমার মাথার ঝিকুটি নড়ে গেল, ব্লাডপ্রেসার হয়ে গেল।

(কয়েকখানা গানের কাগজ নিয়ে সাতকড়ির প্রবেশ)

সাতকড়ি। স—স—সব এখনও ছাপা হয়নি।

প্রোঃ শীল। দিন আমায় দিন, একবার পড়ে দেখি (পড়তে পড়তে) একি সর্বনাশ, Mr. Bag, এ কি ছাপা হয়েছে? দেখুন তো—[illegible]? (নিজেই পড়িতে লাগিলেন)

ম নুষ নহিত আমরা মেষ,

দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, মামার দেশ!

(ম্যানেজারের দিকে সজোরে গানের কাগজগুলি ছুঁড়ে ফেলে) দেখুন একবার পড়ে দেখুন। এখন উপায়? What's the way out?

বিশ্বম্ভর। (প্রুফ দেখে) তাই তো—সর্বনাশ! সিংহ মশায়—?

সুলোচন। আমি গোপালকে পাঁ—পাঁ—পাঁচ'শ বার বলেছি মা—মা—মামার দেশ নয় ওটা আমার দেশ, ক—ক—করেকশন করে দিলাম, তবুও সে ও—ও—ওই ভুল করলে? আ—আ—আশ্চর্য।

বিশ্বম্ভর। হাবু, এই হাবু। জমাদারকে এখনি মেসিন থামাতে বল।

হাবু। (নেপথ্যে) আজ্ঞে এই যা—ই।

প্রোঃ শীল। শুধু মামার দেশ? আর তার ওপরের লাইনে কি হয়েছে? মানুষ নহিত আমরা মেষ?

সাতকড়ি। কেন, ওখানটা তো ঠি—ঠি—ঠিকই আছে?

বিশ্বম্ভর। ওখানটা ঠিকই আছে?

প্রোঃ শীল। তা ঠিকই আছে বৈ কি।

সাতকড়ি। কেন মশাই, ও গা—গা—গান তো আমরা স্বদেশী আমলে ক—ক—কত গেয়েছি। আমাদের বিখ্যাত কে—কে—কেষ্ট দা, তো বরাবরই আমাদের দিয়ে গাইয়েছেন—মা—মা—মানুষ নহিত আমরা মে—মে—মৈষ ?

বিশ্বম্ভর। আপনার বিখ্যাত কেষ্ট দা বোধ হয় ঐ জাতীয় একটি জীব ছিলেন, তাই আপনাকে দিয়েও গাইয়েছেন। এখন আর সময় নষ্ট না করে কাজে যান। ওখানটা হবে "মানুষ আমরা, নহিত মেষ।" তাড়াতাড়ি করে করেক্‌শন করে দিন আর গোপালকে এখানে পাঠিয়ে দিন। (সাতকড়ির প্রস্থান)
দেখলেন ত মশাই ? কি বলছিলাম আপনাকে, ভূত নিয়ে কাজ করছি, এক একটি জ্যান্ত ভূত। (গোপালের প্রবেশ) কি এসেছ, গোপালগোবিন্দ, কতগুলো ছাপা হয়েছে ?

গোপাল। আজ্ঞে, শখানেক হবে।

বিশ্বম্ভর। (রাগত স্বরে) শখানেক—ক'খানা প্রুফ করেকশন হয়েছিল ?

গোপাল। আজ্ঞে চারখানা।

বিশ্বম্ভর। শুনলেন তো মশাই, চার চার বার প্রুফ করেকশন হয়েও হয়েছে—মানুষ নহিত আমরা মেষ, স্বর্গ আমার মামার দেশ মেষ কোথাকার, যাও মামার দেশে চরে খাও গে, কাল থেকে আর এখানে এসো না, আজ থেকেই তোমার চাকরি খতম, যাও।

গোপাল। আজ্ঞে—

বিশ্বম্ভর। আর আজ্ঞে টাজ্ঞে নয়, যাও এখান থেকে, বেরোও।

(গোপালের প্রস্থান ও জমাদার রাধাচরণের প্রবেশ)

রাধাচরণ। ম্যানেজার মশাই, মেসিন বন্ধ করে দিতে হুকুম দিলেন নাকি ?

বিশ্বম্ভর। হাঁ, ভুল রয়ে গেছে, আবার করেকশন করে দিতে হবে।

রাধাচরণ। এখন আবার করেক্‌শন করে ছাপা শেষ করতে হলে সাতটা বেজে যাবে। আমি আজ ওভারটাইম থাকতে পারব না—আপনাকে আগেই বলে রেখেছি। আমি ছ'টাতেই যাব। আমার শালীর বিয়ে।

বিশ্বম্ভর। যাব বললেই যাওয়া হয় নাকি ? শালীর বিয়ে তো মাথা কিনেছ আর কি—ভদ্রলোকের গানগুলো যতক্ষণ না ছাপা হয়, ততক্ষণ ওভারটাইম থাকতে হবে। তার জন্যে তো দ্বিগুণ মাইনে পাবে, অমনি থাকবে নাকি ?

রাধাচরণ। (রেগে) আপনার মাইনের ব্যাপার আমার জানা আছে। দ্বিগুণ মাইনে আমি চাই না, আমি ওভারটাইম থাকতে পারব না। আমি আপনাকে আগেই বলে রেখেছি, আজ আমি থাকতে পারব না, কোন মতেই নয়, আজ আমার শালীর বিয়ে। আমার স্ত্রী—

প্রোঃ শীল। (ব্যাপার সঙ্গীন দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে বলে উঠলেন) ওয়েল ব্রাদার, আপনার তো ভাই শালীর বিয়ে, আমার যে বাপের শ্রাদ্ধ আজ সাড়ে ছ'টার সময়।

বিশ্বম্ভর। আপনার বাবার শ্রাদ্ধ ?

প্রোঃ শীল। আহা—বাপ মানে শ্বশুর। Father-in-law, আমার অর্দ্ধাঙ্গিনীর বাপ। নিজের বাবা হলে তবুও রক্ষা ছিল, এ যার বাবা সে তো কোন কথাই শুনবে না। তার ওপর আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে বিখ্যাত "সত্যবাদী পত্রিকার" সম্পাদক আসবেন প্রধান অতিথি হয়ে। আর এই গানটিই হচ্ছে তার উদ্বোধন-সঙ্গীত। এর জন্যে নাচগানের ছেলেমেয়েরা সব সেজে গুজে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

বিশ্বম্ভর। (আশ্চর্য হয়ে) শ্রাদ্ধে নাচগান ?

প্রোঃ শীল। নাঃ, আপনি নেহাত সেকেলে লোক দেখছি! একেবারে ওল্ড ফসিল, কেন জানেন না যে আজকাল সব মহাপুরুষের শ্রাদ্ধ হয় নাচে আর গানে ? যিনি যত বড় মহাপুরুষ হবেন তাঁর শ্রাদ্ধে চলবে তত বেশী নাচ। নাচের মধ্যে দিয়েই তো ফুটে ওঠে তাঁদের জীবনের মাহাত্ম্য, তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবনের সুষ্ঠু বিকাশ। এ তো মহাপুরুষদের ব্যাপার, আর আমার শ্বশুর ছিলেন একজন অবতারকল্প মহাপুরুষ। তাঁর নাম ছিল কি জানেন ? ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীজগদ্‌গুরু ভগবান শ্রীরামহরি কৃষ্ণানন্দ অবধূত মহারাজ। মেয়েদের নাচের মধ্যে দিয়ে না হলে এহেন ভগবানের ভগবদ্বাণীর অধ্যাত্মরস ফুটবেই না একেবারে। এ সকল নাচের নাম হ'ল mataphysical dance।

রাধাচরণ। ম্যানেজার মশাই! আমার স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনী—

প্রোঃ শীল। (সকৌতুকে) আরে, আরে, আমার স্ত্রী বিঘ্ন-নাশিনী, তা হলে তোমার স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনীর সাক্ষাৎ বোন। দেখ মিলিয়ে দেখ—বিন্ধ্য বিঘ্ন, বাসিনী-নাশিনী। ব্যস Brother, তা হলে আমার স্ত্রীও তোমার শালী—

রাধাচরণ। (হতভম্ব হয়ে) আজ্ঞে—সে কি ?

প্রোঃ শীল। আরে ভাই তাই তো বলছি—এ সব ওই অধ্যাত্ম নাচের মহিমা।

বিশ্বম্ভর। নাচ আবার আধ্যাত্মিক হয় নাকি ?

প্রোঃ শীল। কেন হবে না ? জানেন না সেকালে স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব ছিলেন নটরাজ ? আর একালে, এই প্রগতির যুগে, in this modern age ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েদের আধ্যাত্মিক নাচ শুনেই একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন ? ওয়েল দেখবেন কাল সকালের "সত্যবাদী পত্রিকা"তে আমার শ্বশুরের আধ্যাত্মিক চৈতন্যময় সত্তার অপরূপ নৃত্যময় প্রকাশের মহাসত্য কি রকম প্রকাশিত হয় ?

রাধাচরণ। (হতভম্ব হয়ে জনান্তিকে) কি রকম হ'ল, ওর স্ত্রীও আমার শালী—?

বিশ্বম্ভর। তা এ কি তাঁর উপদেশবাণী পড়ে—পাওয়া যায় না ?

প্রোঃ শীল। পড়ে? ও তার মানে আবার আপনাদের খপ্পরে পড়ি ছাপাতে এসে? Bravo, Brother Bravo, একটা গান ছাপাতে এসে তো নাজেহাল হচ্ছি, এবার তাঁর বাণী ছাপাতে এলে একেবারে উন্মাদ করে ছেড়ে দিন আর কি?

বিশ্বম্ভর। তা হলে লেখাপড়ার আর প্রয়োজন নেই না কি?

প্রোঃ শীল। পড়বে? কেন পড়বে মশাই? লেখাপড়াটা কি ভগবানের অভিপ্রেত? তা যদি হ'ত তা হলে তিনি তাঁর ব্যবস্থা করে দিতেন। ছেলেরা কি বলে জানেন? বলে যে কতকগুলো লোক নিছক তাদের কায়েমী স্বার্থ, মানে vested interest বজায় রাখবার জন্য এই লেখাপড়ার প্রচলন করেছে। ভগবান দিয়েছেন নাক, কান, চোখ—ধূপ ধুনা পোড়াও গন্ধ শুকব, গান গাও কান দিয়ে শুনব, নাচ চোখ ভরে দেখব। তা নয় read and learn—পড়, পড়ে জান। পড়ার যদি এতই প্রয়োজন থাকত তা হলে ভগবান নিশ্চয়ই তার জন্যে স্বতন্ত্র একটা organ মানে ইন্দ্রিয় দিয়ে দিতেন। তা যখন তিনি দেন নি তখন আপনাদের পড়ার ভাওতা দেওয়া ওই জুলুমবাজী আর চলবে না। বুদ্ধিমান বাঙালীর ছেলেরা সেটা ভাল করেই ধরতে পেরেছে, তাই তারা আর ও পথ মাড়াচ্ছে না। ভগবান যা দিয়েছেন তার সার্থকতার জন্যে তারা করে চলেছে অফুরন্ত নাচ, গান, স্ফূর্তি আর হল্লা, আর তার মাঝখান দিয়ে ফুটে উঠছে তাদের জীবনে পরম আনন্দময় অধ্যাত্ম-কুসুম। আর আমরাও তাদের নাচতে দিয়ে সেই অবসরে এক উপায়ে দুটো পয়সা রোজগার করতে পারছি।

রাধাচরণ। ম্যানেজার মশাই, ছ'টা বাজল, আমায় এখনই যেতে হবে। আমি তা হলে চললাম—আর থাকতে পারব না এক্ষ আমার শালীর বিয়ে। স্ত্রীর নিজের ছোট বোন—

প্রোঃ শীল। (হঠাৎ লাফিয়ে উঠে জমাদারের হাত ধরে) ও দাদা, Oh brother, এবারকার মতন আমায় রক্ষা কর। আমি বুঝতে পেরেছি তোমার ব্যথা। আজ দেখি হওয়া মানে অনেক মুখনাড়া তোমার ভাগ্যে আছে। কিন্তু ভাই, আমার কথাটাও একবার ভেবে দেখ।

রাধাচরণ। আপনার কথা আবার কি ভেবে দেখব? আপনার স্ত্রী আমার—

প্রোঃ শীল। শালী, সে যে আবার সাক্ষাৎ ভগবানের দৈবাৎ কোটা দেবকন্যা—হঠাৎ হয়ত কৃপাবশে আমায় গিলেই ফেলবেন। দোহাই দাদা, এ যাত্রা রক্ষা ক'রো। I know you are my saviour. (ম্যানেজারের প্রতি) কৈ মশাই, উঠুন আবার কি হ'ল দেখবেন চলুন। এখন দয়া করে আমাকে মেষত্ব থেকে উদ্ধার করে, মামার দেশ থেকে মুক্তি দিয়ে আমার দেশে প্রতিষ্ঠিত করুন। (জমাদারের প্রতি) চল ভাই চল। Thank God.

(সাতকড়ির প্রবেশ)

সাতকড়ি। আ—আরে র—রাধাচরণ আমি তোমায় গো—গোরু খোঁজা করছি। চ—চ—চলো সব ঠিক।

রাধাচরণ। কিন্তু, আমার শালী—

প্রোঃ শীল। নিশ্চয় নিশ্চয়, আমার স্ত্রী নিশ্চয়ই তোমার শালী।

(সকলের প্রস্থান এবং গোপাল ও রমেশের প্রবেশ)

রমেশ। জাতের কথা বলছিলি—তোরা ও সাধনারা কি জাত? তোরা তো বাবা গয়লা। না?

গোপাল। আরে সাধীরাও তাই।

রমেশ। তবে, (গোপালের চিবুক ধরে) আটকাচ্ছে কোথায় গোপাল?

গোপাল। (হতাশার সুরে) বলিস নে ভাই আমার কপালের কথা, মামা বলেন আমরা নাকি জাতগয়লা আর ওরা নাকি পাত-গয়লা।

রমেশ। এ্যা—সে আবার কি? জাতগয়লা আর পাত-গয়লা কি বাবা?

গোপাল। তার মানে আমরা জাতিতে গয়লা, ঘোষ—বড় বংশ আর তারা নাকি একেবারে পাতি গয়লা—তারা গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া পালে আর দুধের ব্যবসা করে, এই তাদের কাজ। এখন কি করি বল দেখি? একটু বুদ্ধি জুগিয়ে দে ভাই! সাধীকে না পেলে আমি মাইরি বাঁচব না, বাঁচব না, হয়ত আত্মহত্যা করব। কি করব ভাই? (তার হাত ধরল)

রমেশ। একেবারে আত্মহত্যা? মরেছে, আচ্ছা যার জন্য বাঁচবি না সেই তোর সাধীকে কি রকম দেখতে, তাই এক বার বল দিকিনি শুনি?

গোপাল। কি রকম? সুন্দর, সুন্দর, সুন্দর। পুকুরের ওপারে ও, আর এপারে আমি, যখন চোখোচোখি হয়—

রমেশ। আরে ম'ল যা, সুন্দর, সুন্দর, কি রকম সুন্দর, কার মতন সুন্দর তাই বল। (ব্যঙ্গের সুরে)

বাঁকা চোখে চোখোচোখি,
মোরা দুটি চকাচকী।

গোপাল। কার মতন? তা'লে বললে পেত্যয় যাবিনি ভাই, সে যেন ওই আর্টের সরস্বতীর মত সুন্দর।

রমেশ। কার মতন?

গোপাল। ওই যে বললাম—আজকাল ওই যে কি বলে আর্টের বাঁকা (বাঁকা হয়ে দেখিয়ে) সরস্বতী, ঠিক ওই রকম বাঁকা হয়ে দাঁড়ায় পুকুরঘাটে কাঁখে কলসী নিয়ে, তফাৎ শুধু ওই কলসীর বদলে বীণা। ওই সরস্বতী যখন দেখি, তখন কি যেন মনে হয়, প্রাণটা সাধীর জন্যে হু হু করতে থাকে। ওঃ কি সে রূপ—একেবারে বাঁশঝাড় আলো করা রূপ।

রমেশ। বাঁশঝাড় আলো করা? তার মানে? তার রং কি খুব ফর্সা।

গোপাল। ফর্সা টর্সা জানি না ভাই, কিন্তু ভোরের বেলা যখন সে তাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে, বাঁশবাগানের মধ্যে দিয়ে

পুকুরঘাটে আসে তখন সমস্ত বাঁশঝাড় একেবারে আলো হয়ে ওঠে।

রমেশ। ও—বুঝেছি, তার পর বাঁশঝাড় আলো করে এসে কি করে?

গোপাল। সে আর বলিসনে ভাই, আমি জানলায় বসে বসে সব দেখি, পুকুরে নেমে স্নান করে, উঠে গা মোছে, চুল ঝাড়ে, আর তার পরে যখন নীল শাড়ীখানা নিঙড়োতে নিঙড়োতে ঘাটের পথ দিয়ে চলে যায় তখন, ওঃ আমার বুকের মধ্যে যে কি তোলপাড় করতে থাকে তা আর তোকে কি বলব—তখন ইচ্ছে করে কবিতা লিখি, কিন্তু কবিতা লিখতে জানি না—ইচ্ছে করে গান গাই, হায় তাও জানি না। ভাই, তুই তো ছড়া লিখতে, গান গাইতে জানিস, দেনা ভাই আমায় ছটো ছত্র লিখে—যার মধ্যে থাকবে ওই পুকুরঘাটে আসা—আর ঘাট থেকে ভিজে কাপড়ে যাওয়ার কথাগুলো।

রমেশ। দাঁড়া, দাঁড়া তোর বর্ণনা শুনে মনে আমার কেমন ঢেউ মেরে উঠছে, শোন ভাল করে—(একটু চিন্তা করে)

(আহা) আসে গো সে ধনী, ছড়ায়ে লাবণী, বাঁশঝাড় আলো করে,
সিনান করিয়া, অলক ঝাড়িয়া, আমার হিয়াটি হরে।

গোপাল। তারপর, তারপর—

রমেশ। বঁধু গো আমার, কহিব কি আর, রজনী হইলে ভোর,
"চলে নীল শাড়ী, নিঙাড়ি নিঙাড়ি, পরাণ সহিত মোর"

গোপাল। ঠিক, ঠিক, একেবারে আমার মনের কথাটা ঠিক বলেছিস ভাই। একটু সুর করে গা না? শিখে নি সুরটা।

রমেশ। আর ম্যানেজারবাবু এসে পড়লে—তখন? তুমি সামলাবে?

গোপাল। হ্যাঁ আসবেন? (বাইরের দরজা দিয়ে দেখে এসে) তিনি এখন যে পাল্লায় পড়েছেন—তাঁর আর এখুনি নিস্তার নেই। দে ভাই দে একটু শিখিয়ে—দে ভাই দে—আহা! কি কথা—যেন আমারই প্রাণের কথা—(রমেশ গান ধরল ও গোপাল তার সঙ্গে গাইতে লাগিল)

"(আহা) আসে গো সে ধনী, ছড়ায়ে লাবণী, বাঁশঝাড় আলো করে,
সিনান করিয়া, অলক ঝাড়িয়া, আমার হিয়াটি হরে।
বঁধু গো আমার, কহিব কি আর, রজনী হইবে ভোর
চলে নীল শাড়ী, নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর।"

(ছ'জনে গাইতে লাগল, ওদিকে গানের সুর শুনতে পেয়ে ম্যানেজার আপিসঘরের দিকে কি হ'ল দেখতে আসছেন, রমেশ তাঁকে দূর থেকে আসতে দেখে পালিয়ে গেল, কিন্তু গোপাল তন্ময় হয়ে চোখ বুজে গেয়েই যেতে লাগল। ম্যানেজার আস্তে আস্তে তার পাশে এসে দাঁড়ালেন, সে ভাবাবেগে প্রথমটা টেরই পেল না, তারপরে চোখ খুলে হঠাৎ সামনে ম্যানেজারকে দেখে বলে উঠল)

গোপাল। এ্যা—ম্যা—নে—জার মশাই?

ম্যানেজার। আজ্ঞে হ্যাঁ—সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। এটাকি নাচগান করবার তালিমখানা হয়ে উঠল নাকি? (ধমক দিয়ে) তোমায় না যেতে বলেছি? এখনও যাও নি যে বড়? তোমায়—তোমায়—দাঁড়াও, জেটলাল?

(জেটলালের প্রবেশ)

জেটলাল। জী হুজুর।

ম্যানেজার। (গোপালকে দেখিয়ে রাগত স্বরে) গর্দানা পাকাড়কে ইসকো হিয়াসে নিকাল দেও।

(এমন সময় প্রেমতোষ রায় এসে একরাশ ছাপানো কাগজ ম্যানেজারের টেবিলের উপর ফেলে খুব রেগে বললেন)

প্রেমতোষ। মেনেজর মশয়, এই সব কি যা নয় তা ছাপ্‌ছেন? কাইল্ আমার ফংসন, মাননীয় মন্ত্রী আসবা। আর তাঁর সম্ভাষণে এই সর্বনাশ্ কইরা বইসা আছেন?

(ম্যানেজার তাড়াতাড়ি এসে বসলেন, জেটলাল ও গোপালের প্রস্থান)

বিশ্বম্ভর। কি, কি হয়েছে?

প্রেমতোষ। আর কি হইছে, হইছে আমার মস্তক (কাগজ দেখিয়ে) আপনাদের প্রেইসে কি "R" কথাটার মন্বন্তর হইছিল নাকি? Friend-এর "R" উঠাইয়া দিয়া য়েকেবারে কইরা বসছেন Fiend?

বিশ্বম্ভর। তাই ত এরকম হ'ল কেন?

প্রেমতোষ। আর এরকম হইল ক্যান্? বাংলা সম্ভাষণটার নামের নীচে—

বিশ্বম্ভর। (স্বগত) এইরে আবার গোপাল?

প্রেমতোষ। একি করছেন ছাপেন ত শ্রমমন্ত্রীকে য়েকেবারে প্রেমমন্ত্রী কইরা বসছেন?

বিশ্বম্ভর। তাইতো এ কেন হ'ল? আপনি নিজেই তো ফাইন্যাল প্রুফ দেখে দিয়ে গিয়েছিলেন? হরু, রমেশকে একবার আসতে বল।

হরু। (নেপথ্যে) আজ্ঞে এই যাই।

প্রেমতোষ। এ কি রকম কথা মশয়, আপনেরা কি সব অন্ধ? য়েকবার পইরাও ছাপেন নাই, কি ছাপাইলেন? সাপ না ব্যাঙ—

(কতকগুলি প্রুফ-সীট নিয়ে এক চিবোতে চিবোতে রমেশের প্রবেশ)

বিশ্বম্ভর। রমেশ, এর ফাংসনের ইংরেজী সম্ভাষণটা তোমায় কম্পোজ করতে দিলাম আর তুমি এই করলে?

রমেশ। আজ্ঞে উনি যা ফাইন্যাল প্রুফ করে দিয়েছেন তাই তো ঠিক করেছি—এই তো রয়েছে ওঁর নিজের হাতের কারেকশন, দেখুন।

বিশ্বম্ভর। (প্রুফগুলো নিয়ে) ও মশায় আপনার কাটা ফাইন্যাল প্রুফ মত তো ঠিকই ছাপা হয়েছে?

প্রেমতোষ। কি কন্, মশয়?

বিশ্বম্ভর। এই দেখুন ইংরেজী address-এ "R" টা

আপনিই delete করে দিয়েছেন—আর বাংলাটারও প্রেমমন্ত্রী কেটে তো শ্রমমন্ত্রী করে দেন নি।

প্রেমতোষ। কই ছান্ দেহি। (প্রুফ দেখে) এখানে "R" টা ভাঙা আছিল, সেইটারে বদলাইতে কইছিলাম, উঠাইতে কইল ক্যাডা?

বিশ্বম্ভর। কিন্তু আপনি যা sign দিয়েছেন তা তো delete করবার, আর বাংলাটাও করেক্‌শন করতে ভুলে গেছেন। আমাদের তো ছাপার গলদ কিছু হয় নি।

প্রেমতোষ। বাংলাটাতে তো আগতেছি ভুল রইয়া গ্যাছে। আর (প্রুফ দেখিয়ে) এইডা কি delete করবার চিহ্ন?

বিশ্বম্ভর। (গম্ভীর হয়ে) আজ্ঞে হাঁ।

প্রেমতোষ। এহন উপায় কি কন?

বিশ্বম্ভর। address গুলো হাতে করেক্‌শন করে নিন্।

প্রেমতোষ। কন্ কি? মন্ত্রীর হাতে যাইব জানেন।

বিশ্বম্ভর। তাতে আর কি হয়েছে—মন্ত্রী যদি আপনাদের friend না বলে fiend বলে সম্ভাষণ করেন তা হলেও সকলে খুশী হবেন। আর মন্ত্রী মশায়ের নামের সঙ্গে—তার মানে এবলাকান্ত মহাপাত্রের সঙ্গে প্রেমমন্ত্রী ঠিক খাপ খেয়েছে তো গিয়েছে, বরঞ্চ শ্রমমন্ত্রী হলে খাপছাড়া শোনাত। তাঁকে একটি প্রেমের portfolio খুলতে বলুন না? যে রকম প্রেমের ব্যাপার আজকাল চলছে তাতে ওটা তো একটা necessity হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রেমতোষ। মস্কড়া রাখেন, এইডা মস্কড়ার সময় না। এহন কন্ পরিত্রাণের উপায় কি করব্।

বিশ্বম্ভর। বললাম তো হাতে লিখে দিন, আর তা—না হলে ফের ছাপতে হবে, সে অনেক হাঙ্গামা।

প্রেমতোষ। হাঙ্গাম যাই হোক, আবার ছাপাইতে হইবই।

বিশ্বম্ভর। বেশ তা যদি হয়, তা হলে বাজার থেকে কাগজ এনে দিন। আর যেহেতু, এটা আমাদের ভুল নয়, সেইজন্য দ্বিতীয় বার ছাপার খরচ দিতে হবে।

প্রেমতোষ। উঃ আইচ্ছা বিপদেই পরলাম—যাইক্। কাগজ লইয়া আসতে আছি। (প্রস্থান)।

বিশ্বম্ভর। যাক্ রমেশ, এ যাত্রা রক্ষা পেলাম, খুব বাঁচিয়েছ। আর গোপালটা আমায় কি ভোগানই ভোগাচ্ছে। আবার এখানে আপিসে ঢুকে নেচে নেচে গান গাইছিল। ওটাকে পাঠিয়ে দাও তো একবারে দূর করে দেব এখান থেকে।

রমেশ। তা হলে আমার মাইনেটা এবার বাড়িয়ে দিন সার—

বিশ্বম্ভর। (গম্ভীর হয়ে) হ্যাঁ, তোমার মুখ দিয়ে কিসের গন্ধ বের হচ্ছিল যেন?

রমেশ। কৈ না তো, (নিজের হাতের চেটোতে হাই তুলে শুঁকে) কৈ না, ও এলাচের গন্ধ এলাচের—(বলিতে বলিতে প্রস্থান ও দরোয়ান জেটলালের প্রবেশ)।

জেটলাল। আপকো উ বাবু সেলাম দিয়া।

ম্যানেজার। গোপালবাবুকো ভেজ দেও।

(জেটলালের প্রস্থান)

(গোপালের প্রবেশ ও ম্যানেজার কিছু বলবার আগেই দৌড়ে তার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদকাঁদ স্বরে বলতে লাগল)

গোপাল। আমায় এবারকার মত মাফ করুন। এ রকম ভুল আমার আর কখনো হবে না। আমি বড় গরীব, আপনিই আমার মা বাপ। আমায় ক্ষমা করুন। আপনার পায়ে ধরে মাফ চাইছি।

বিশ্বম্ভর। (খুব রাগত ভাবে) পা ছাড়, শীগ্‌গির পা ছাড়। কেন? মামীর আদরে গোপাল মামার দেশে গিয়ে সাধনাকে বিয়ে করে দুধ ভাত খাওগে। যাও এখান থেকে। এখনি যাও।

গোপাল। (কাঁদকাঁদ স্বরে) কিন্তু থার্ড ক্লাসে পাঁচ বার ফেল করবার পর থেকে মামা আমার মুখ দেখেন না, কথা কন্ না, মামীমা আমায় একটু ভালবাসে বলে বাড়ী ঢুকতে পাই। দোহাই আপনার, চাকরি গেলে আমি না খেতে পেয়ে মরে যাব। দয়া করে আমায় এবারকার মত ক্ষমা করুন।

বিশ্বম্ভর। না, না, না,—আমি কোন কথা শুনতে চাই না, যাও আর কাল থেকে এসো না, খবরদার।

(জেটলালের প্রবেশ)

জেটলাল। উ বাবু ফিন সেলাম দিয়া।

বিশ্বম্ভর। আচ্ছা, চলো। (উভয়ের প্রস্থান)

গোপাল। (মুখভঙ্গী করে বলল) ঃঃ, আসবে না কাল থেকে। পাঁচশো বার আসব, হাজার বার আসব। তাড়াও না দেখি—হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করব না? লাল ঝাণ্ডা নিয়ে আসব না? "নচিত কথাটা "আমরা"র পরে না হয়ে আগে হয়েছে তো হয়েছে কি? সব কথা তো আছে, না নেই? আর আমার দেশ না হয়ে মামার দেশ হয়েছে বলে ভুলকালাম লাগিয়ে দিয়েছেন। চাকরিতে জবাব। মামার দেশটা যেন বাংলাদেশেই নয়। ওঁদের "মা-রা" যেন সব বিলেত থেকে এসেছেন। যেন ওঁদের মামার বাড়ী সব বিলেতে, বাংলাদেশে নয়। আমার দেশও যা মামার দেশও তা, দুটোই বাংলাদেশে। তবে এত অনর্থ কেন? (ছাপা প্রুফ দেখতে দেখতে) আহা কি সুন্দর লাইনই না হয়েছে—দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার মামার দেশ। স্বর্গ, স্বর্গ, স্বর্গ, সেখানে আছে আমার দেবী, আমার সাধনা। (ছাপানো কাগজ দেখে) বাঃ কি সুন্দর! আমি এই লাইনটা কেটে আমার সাধীকে পাঠিয়ে দেব। নিশ্চয়ই দেব। আর ওই পাজী দেবীটা পাঠিয়েছে, একথা যাতে না ভাবতে পারে, তার জন্য ছোট্ট করে তলায় লিখে দেব আমার নাম—শ্রীগোপালগোবিন্দ গোয়েল। ভাগ্যিস ঠাকুরদা আমাদের পদবীটা বদলে গোয়েল করে গিয়েছিল। গোয়েল যেন কোয়েল-পাখীর ভায়রাভাই। ইচ্ছে করছে আবার গান গাই।

(একখানা চিঠি নিয়ে রমেশের প্রবেশ)

রমেশ। এই নে তোর একখানা চিঠি, ম্যানেজারের টেবিলে ছিল।

গোপাল। (চিঠি খুলে পড়তে পড়তে) ওরে রমেশ!

রমেশ। কি রে কি খবর।

গোপাল। ওরে, আমার মামা হঠাৎ মারা গেছে।

রমেশ। তাই তো রে, বড় দুঃখের কথা জানালাম দেখছি!

গোপাল। (পড়তে পড়তে) দুঃখ কিরে, সুখের কথা, মামাটা একেবারে কাঠগয়লা ছিল। তার পরে শোন, মামী আমাকে এখনি ডেকেছে তাঁর সম্পত্তি দেখতে। ওঃ কি আনন্দ!

রমেশ। যাক্, তা হলে মাইরি আদপেটা খেয়ে, এই ঘানি-পেশা চাকরির হাত থেকে বেঁচে গেলি বল?

গোপাল। (চিঠি পড়তে পড়তে) ওরে আরো সুখবর আছে, সাধীর সঙ্গে তার বাবা আমার বিয়ের সম্বন্ধ করে পাঠিয়েছিল, মামী তাতে রাজী হয়েছে। সাধীর বাপও খুব অসুখে পড়েছে, তার গরু মোষ দেখবার কেউ নেই। তার সাতটা মোষ, পাঁচটা গরু, কিছু ছাগল আর ভেড়া দেখাশুনো করে দুধের ব্যবসা আমায় করতে হবে এই কড়ার করেছে। ওরে রমেশ, কি আনন্দ কি আনন্দ—আমি নাচব, না গাইব, না পাগল হয়ে যাব? সাধীকে পেলে সাতটা মোষ কি ছার, সাতশো মোষ চরাতে পারি! বল, বল ভাই।ক করি এখন?

রমেশ। কি আবার করবি, এখনি ম্যানেজার মশাইকে কলা দেখিয়ে গড়গড় করে বর্দ্ধমান গিয়ে সাধীকে বগলদাবা করে, ঘরদর করে ঘর করগে যা।

গোপাল। রমেশ! আনন্দের চোটে আমারও কবিতার লাইন গজ গজ করে এসে গিয়েছে রে, ছাপার লাইনের সঙ্গে একেবারে মিল করে, সেইটে এখানে দাঁড়িয়ে গাইব, নাচব, তার পরে যাব। ওঃ কি আনন্দ, সাধী গয়লানী, রাধাও ছিল গয়লানী, সাধী হবে রাধা, আর, আর আমি হব তার কেষ্ট—নাচব আর গাইব—তুইও আমার সঙ্গে সুর ধর ভাই।

ধন্ধ আমার বিধবা মামীমা, চরাব মহিষ, ছাগল, মেষ,
পেয়েছি গাঁয়ের সাধীরে আমার, স্বর্গ আমার মামার দেশ।

(দু'জনের গান চলছে এমন সময় প্রোঃ শীল, রাধাচরণ ও সাতকড়ির ছাপানো কাগজ নিয়ে বিশ্বম্ভরের প্রবেশ)

বিশ্বম্ভর। (সরোষে) আবার গান, গোপাল তুমি এখনো যাও নি? কেটলাল--

গোপাল। যাব ম্যানেজার মশাই, নিশ্চয়ই যাব, আপনার পায়ে ধরা ফিরিয়ে নিয়ে যাব। আমার মামা মরে গেছে, এখন তার সম্পত্তি আমার! আর আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে সাধী—ওই সাধনার সঙ্গে। এই দেখুন মামীমার চিঠি। (চিঠি দিয়ে) আমার বিয়েতে আপনাদের সকলের নেমন্তন্ন রইল। চিঠি দেব। কিন্তু যাবার আগে আমার মামার দেশের গানটা গাইতে হবে (প্রোঃ শীলের দিকে এগিয়ে গিয়ে) ভাগ্যিস মশাই, আপনি গানটা ছাপাতে এনেছিলেন তাই তো আমার বরাত খুলল, আপনাকে ছাড়ব না, আপনারও আমার সঙ্গে গান গেয়ে যেতে হবে। গাইবেন না?

প্রোঃ শীল। (সকৌতুকে) নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই গাইব। বল কি গান।

(উচ্চৈঃস্বরে গোপাল গাইতে লাগল ও সকলে হতবাক্ হয়ে শুনতে লাগল)

ধন্ধ আমার বিধবা মামীমা, চরাব মহিষ, ছাগল, মেষ,

সনেট

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

বলেছিনু ভুলিব না, তবু গেছি ভুলে!
আজি মধ্যাহ্নের এই অলস বেলায়
জীর্ণ স্মৃতিযবনিকা দেখিলাম তুলে
তোমার আলেখ্য মোর মর্ম্ম-মণ্ডপায়
কীট-দষ্ট পুরাতন পট্টবস্ত্রসম
প'ড়ে আছে একপ্রান্তে দীর্ণ নিশিদিন!

হু হু ক'রে কাঁদে প্রাণ! বৃথা দর্প মম,
পারি নাই শুধিবারে তব প্রেমঋণ!
ভেবেছিনু ভুল ক'রে—জীবন-আকাশে
তুমি একা রবে জাগি' স্থির শুকতারা।—
এ যে আত্ম-প্রবঞ্চনা! আজি তব পাশে
কেমনে মাগিব ক্ষমা? দিয়ে অশ্রুধারা

কেমনে করিব ধৌত এই মহা পাপ,
এই ক্ষোভ, লাজ, দাহ, হিয়ার সন্তাপ!

কেদার-বদ্রী দর্শনে

শ্রীঅসীমকুমার ঘোষ

২

৬ই জুন, বেলা বারটার সময়ে আমরা বাসে করে রওনা হলাম। বেলা দেড়টার সময় আমরা পিপুলকুঠী পৌছলাম। বাস থেকে যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে ত চক্ষুস্থির! কাতারে কাতারে লোক রাস্তায় শুয়ে বসে আছে। অনুসন্ধানে জানতে পারলাম, তারা তিন-চার দিন ধরে এই ভাবে অপেক্ষা করছে ফিরে যাবার বাসের টিকিটের জন্য। এখানে বাসের নিয়ম-কানুন সুবিধাজনক নয়। কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে

দেবপ্রয়াগ

যাত্রীদের প্রতি একটু নজর রাখা উচিত। যাই হোক, আমি বুকিং আপিসে অনুসন্ধানে জানলাম যে, অগ্রিম টিকিট দেওয়া হয়। ১১ তারিখে ফিরে যাব বলে আমি ও ভূপতিবাবু অগ্রিম টিকিট সংগ্রহের জন্য থেকে গেলাম; আর আমার সঙ্গীদের আগের চটীতে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিলাম। এখানে আমাদের সঙ্গে আর দুই দল যাত্রীর আলাপ হয়—এক দল বাঙালী, তাঁরা রামপুর, উদয়পুরে থাকেন; আর এক দল বিহারী শিক্ষয়িত্রীত্রয়। আমরা যখন টিকিট পেলাম তখন বেলা ছয়টা। তারপর নির্দিষ্ট চটীর দিকে আমরা রওনা হলাম। সন্ধ্যা আটটায় (ওখানে আটটায় সন্ধ্যা হয়) আমরা গরুড়গঙ্গায় পৌছলাম। গরুড়গঙ্গায় এসে যখন আমরা আমাদের সঙ্গীদের খুঁজে বেড়াচ্ছি, তখন সেই বিহারী শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে দেখা—তাঁরা কোথাও স্থান না পেয়ে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছেন। তাঁরাই আমাদের সংবাদ দিলেন যে, আমাদের দলের লোকেরা এখানে জায়গা না পাওয়ায় পরের চটীতে এগিয়ে গেছেন।

মনের অবস্থা তখন সঙ্গীন একে সারাদিনের পরিশ্রম, তাতে আবার দিনের আলোও নিভে গেছে! এই রাত্রে বিনা আলোয় এগিয়ে যাব কি করে? সেই সময় সেই বিহারী দলটিই পরামর্শ দিলেন—তাঁদের সঙ্গে হ্যারিকেন ও টর্চ আছে, যদি আমরা এগিয়ে যাই তবে তাঁরাও আমাদের সঙ্গ নেবেন। প্রাণে যেন বল এল। সেই রাত্রে নবোদ্যমে পাহাড়ী পথ চলার অভিজ্ঞতায় আমরা পাঁচ জন মনের আনন্দে, গানের তালে তালে পা ফেলে নিবিড় অন্ধকারে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

গাড়োয়াল রমণী

রাত প্রায় দশটায়, আমরা টাঙ্গনী চটীতে এসে পৌছলাম। এখানেও অবস্থা তথৈবচ। তিলধারণের স্থান নেই। কর মশাই রাস্তার ধারে বিছানা পেতে বসে তামাক খাচ্ছেন আর খিচুড়ির তদারক করছেন। আমাদের দেখেই নির্ভাবনার সুরে বলে উঠলেন, "যাক, আপনারা এসে পৌছেছেন তা হলে! এবার তা হলে আসুন, জীবনে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করুন। কলকাতায় ফুটপাথে অনেককে রাত কাটাতে দেখেন, আজ আমরা রাস্তায় কাটাই আসুন।" খাবার আমাদের প্রস্তুত ছিল। আহারাদির পর আমরা বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলাম। উন্মুক্ত আকাশের নীচে, সুবিস্তৃত পাহাড়ের কোলে সম্পূর্ণ অপরিচিত অথচ পরমাত্মীয়ের মত আমরা পাশাপাশি শুয়ে রইলাম; মনে কারও কোন দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই, জড়তা নেই। কখন যে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লাম জানি না।

৮ই জুন, আমরা সদলবলে যোশীমঠ পৌছলাম। যোশী-

মঠ বদ্রীনারায়ণের শীতকালীন পূজাস্থান। শীতকালে বদ্রীনাথে যখন বরফ পড়ে, তখন বদ্রীনারায়ণের প্রতিকৃতি নিয়ে আসা হয় এই যোশীমঠে; ছ'মাস এখানে পূজা হয়। এ ছাড়া যোশীমঠ শঙ্করাচার্য্যের সাধনপীঠের জন্যও বিখ্যাত। শঙ্করাচার্য্য এখানে একটি গাছের তলায় শিবের আরাধনা

সাধারণ দৃশ্য, চামোলী

করতেন। সাধক এই সুদূর হিমালয়ের বুকে তাঁর সাধনার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই বিরাট্ প্রশান্ত প্রকৃতির মাঝে তিনি পেয়েছিলেন শিবকে। এই স্থানটি বড় মনোহর, দু'দণ্ড বিশ্রাম করলে মনের প্রসার বেড়ে যায়। যোশীমঠ থেকে ছ'মাইল উৎরাই পার হয়ে আমরা বেলা দশটা নাগাদ বিষ্ণুপ্রয়াগে পৌঁছলাম। বিষ্ণুপ্রয়াগ বিষ্ণুগঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থল। কেদার-বদ্রীর পথে যত প্রয়াগ পেয়েছি, বিষ্ণুপ্রয়াগের মত এত উদ্দাম উত্তাল তরঙ্গময় প্রয়াগ আর চোখে পড়ে নি। কি ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে এই দুই নদীর জলস্রোত মিলিত হচ্ছে পরস্পরের নিবিড় আলিঙ্গনে। এই প্রয়াগে খুব কম লোকেই স্নান করে। সকলেই এর পবিত্র জল স্পর্শ করে চলে যায়। বিষ্ণুপ্রয়াগের প্রাকৃতিক দৃশ্যও বেশ নয়নমুগ্ধকর। বিষ্ণুগঙ্গার উপর একটি ঝোলানো সেতু আছে। এই সেতুটি স্থানীয় পুলিস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত করা হয়, কারণ সেতুটি মাত্র দুটি তারের দড়ির উপর ভর করে আছে। আর তারই নীচে প্রচণ্ড খরস্রোতা বিষ্ণুগঙ্গা। কর্তৃপক্ষের এই সেতুটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। হাজার হাজার যাত্রীর জীবনের দায়িত্ব নির্ভর করে তাঁদের উপর।

আমরা ৯ই জুন পাণ্ডুকেশ্বর হয়ে বদ্রীনারায়ণ এসে পৌঁছলাম। পথে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা ঘটে নি। পাণ্ডুকেশ্বরে ভগবান বিষ্ণুর দুটি মন্দির আছে। বদ্রীর পথে বিস্তর ভিখারী চোখে পড়ে। খঞ্জ, কাণা, কুষ্ঠী ইত্যাদি নানা রকমের ভিখারী দেখা যায়। এই রকম এক অতি বৃদ্ধ—সমস্ত শরীরের চর্ম্ম লোল, শ্রবণশক্তি রহিতপ্রায়—অন্ধ ভিখারিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। জানি না সে সাক্ষাতের ফল ভাল কি মন্দ, তবে তার স্ববর্ণিত কাহিনী শুনে এইটুকু মনে হয়েছিল যে, যাঁর মাহাত্ম্যে এত লোক সমস্ত বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করে সুদূর হিমালয়ে এসে উপস্থিত হয়, সেখানেও ব্যবসাদারি! এই বুড়ীর এককালে সবই ছিল—স্বামী, পুত্র, কন্যা; কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে আজ তার কেউ নেই, সে একা। তারই কাছে শুনলাম যে এখানে একটি দল আছে, তারা লোক যোগাড় করে রাস্তায় বসিয়ে দিয়ে যায় এবং সমস্ত দিনের রোজগারের বিনিময়ে এক বেলা খেতে দেয়।

বদ্রীনাথে আমরা ধীরেন্দ্রনাথ ভট্ট নামে এক পাণ্ডার বাড়ীতে উঠেছিলাম। বাড়ীটি বেশ ভাল জায়গায়। ভদ্রলোক আমাদের খুব আদরযত্ন করেছিলেন। নিজহাতে আমাদের খাবার এনে খাওয়াতেন এবং আমাদের কিছু কষ্ট হচ্ছে কি না খবর রাখতেন। বদ্রীনাথে একটি তপ্ত কুণ্ড আছে। এই কুণ্ডে স্নানের পর সাধারণতঃ লোকে ঠাকুরদর্শনে যায়। আমার ঈপ্সিত শ্রীবদ্রীনারায়ণ দর্শন করব ভেবে মন আনন্দে ভরে উঠল। যাত্রা এবার আমার পূর্ণ হবে। বড় তৃপ্তিতে বদ্রীনাথের মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলাম। মন্দিরের ভিতর ভগবান শ্রীনারায়ণের মূর্ত্তি দর্শন করলাম। পরম শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এল। এই প্রস্তর-প্রতিকৃতির অন্তরালের কোন শক্তির পূজা করে আসছে মানুষ যুগ যুগ ধরে। সেই শক্তি, যার অভিব্যক্তি আছে কিন্তু রূপ নেই—ভূধর, সাগর, মেঘ, চন্দ্র, সূর্য্য সর্ব্বত্রই ত সেই শক্তির বিকাশ। আমি ত সেই শক্তিরই সৃষ্ট জীব। আমার আত্মা সেই পরমাত্মারই ত অংশ। আমার চেতনা—এ ত তাঁরই দান। জ্ঞানের দুয়ার খুলে গেল। আমি যেন আলো দেখতে পেলাম। কেদারনাথে যা গুলিয়ে ফেলেছিলাম, বদ্রীনারায়ণে তা আমি খুঁজে পেলাম। মনে হতে লাগল, আমি যেন ধন্য হলাম। মনে হ'ল আমি যেন তাঁকে উপলব্ধি করতে পারছি—তিনি আছেন; সারা বিশ্ব জুড়ে যে মহাশক্তি, সেই মহাশক্তিতে তিনি বিরাজমান। বদ্রীনাথে আমরা তিন দিন ছিলাম। বদ্রী অলকানন্দার ধারেই অবস্থিত এবং বেশ শহরের মত। এখানে মন্দিরে ও বাজারের রাস্তায় ইলেকট্রিক আলো আছে। এখানকার বাজারে বাঘ, হরিণ, মৃগনাভি ও আরও দু'এক প্রকার পাহাড়ী জন্তুর চামড়া, সুর্ম্মা, শিলাজিত ইত্যাদি পাওয়া যায়।

১০ই জুন, বেলা ন'টার সময় আমরা কিছু লুচি, তরকারি

ও হালুয়া সঙ্গে নিয়ে বসুধারার দিকে রওনা হলাম। বসুধারা বদ্রীনাথ থেকে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। কথিত আছে, এই স্থান থেকেই পঞ্চপাণ্ডব মহাপ্রস্থানের পথে অগ্রসর হন এবং উহারই অনতিদূরে দেহত্যাগ করেন। এখানে দুটি

বিষ্ণুপ্রয়াগ

জলের ধার আছে, প্রায় ৪০০ ফুট উঁচু থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে অলকানন্দায় মিশছে। এখানকার দৃশ্য অতীব সুন্দর। এখান থেকেই বরফের পাহাড়ের আরম্ভ। আমরা যখন বরফ অতিক্রম করে বসুধারা প্রপাতের কাছে এলাম, তখন বেলা প্রায় দুটো হবে। প্রপাতের ঝিরঝিরে বারিধারা ও অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের স্পর্শে আমাদের সমস্ত পথশ্রম যেন এক মুহূর্তে কে হরণ করে নিল। আমরা আবার যেন নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনা ফিরে পেলাম। অস্তমিত সূর্য্যের স্নিগ্ধ আভায় প্রপাতের জলের ধারা দুটি রৌপ্যনির্ম্মিত রজ্জুর মত মনে হচ্ছিল। যেখানে সমতল ভূমি, সেখানে পীত ও বেগুনী রঙের ফুল এমন সুন্দর ভাবে সাজানো যে মনে হয়, কে যেন স্থানোপযোগী মানানসই রং বেছে স্থানটিতে মনোরম গালিচা বিছিয়ে দিয়েছে। অনিমেষ দৃষ্টিতে আমরা কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। এখানে আমরা এক মৌন সাধুর সাক্ষাৎ পেলাম। তিনি কৈলাস, মানসসরোবর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বদ্রীনাথে অপেক্ষা করছেন। কারণ প্রতি বৎসর কৈলাসের রাস্তায় জুন মাসের শেষের দিকে যাত্রীদের যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। আহার ও বিশ্রামের পর আমরা বেলা তিনটার সময়ে ওখান থেকে রওনা হয়ে পাঁচটার সময় বদ্রীনারায়ণে ফিরে এলাম। বসুধারার পথে ব্যাসগুহা নামে একটি গুহা আছে। প্রবাদ, ব্যাসদেব এই গুহায় বসে বেদকে চার ভাগে ভাগ করেন।

১১ই জুন সম্পূর্ণ বিশ্রামের পর ১২ই জুন ভোরে আমরা বদ্রীনারায়ণ ত্যাগ করে কলকাতা অভিমুখে রওনা হলাম। পথের জীবনযাত্রায় কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল, বদ্রী ছাড়তে গিয়ে একজন নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে যে ধরণের মনোবেদনা হয়, ঠিক তেমনই হয়েছিল। কিন্তু হৃদয় তৃপ্ত—আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর দর্শন মিলেছে; ক্রমে

পাণ্ডুকেশ্বর মন্দির

ক্রমে মনে হতে লাগল বাড়ীর কথা। একে একে পরিচিত মুখগুলি চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যত দিন আমাদের যাত্রার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়েছে, তত দিন আমরা কর্ম্মজগতের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। তখন চলাই ছিল আমাদের প্রধান কাজ। সাল, মাস, তারিখ সবই যেন বিস্মৃত হয়েছিলাম। নিজের বাড়ী, আপন প্রিয়জন, যারা আমার পথের পানে চেয়ে বসে আছে, এবার সব স্মৃতিপথে উদিত হতে লাগল। পথের কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে যেতে লাগলাম। সেদিন প্রায় কুড়ি মাইল হেঁটে বদ্রীনাথ থেকে সিংহদ্বার পৌঁছে-ছিলাম। যোশীমঠ পার হয়ে সিংহদ্বার।

বিষ্ণুপ্রয়াগ পর্য্যন্ত আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় নি। কিন্তু তারপর সিংহদ্বার পর্য্যন্ত দু'মাইল খাড়া চড়াই। এই রাস্তায় সেদিন আমাদের খুব কষ্ট হয়েছিল। দু'চার মিনিট হাঁটি, আবার বসে পড়ি রাস্তায়, পা যেন আর চলতে চায় না। হাতের মূক লাঠিটি যেন ইঙ্গিতে জানায়, "ভয় কি? আমি ত আছি বন্ধু।" এমনি করে যাত্রীরা "জয় বদ্রী বিশাল কী জয়" বলে ভগবানের জয়গান করতে করতে কেউ-বা দুর্গম রাস্তা অতিক্রম করে উপরে উঠে, কেউ-বা কর্ম্ম-সমাপনান্তে নেমে আসে। সিংহদ্বার অভিমুখে নেমে আসছি, এক দল যাত্রী উঠছে "জয় বদ্রী বিশাল কী জয়" বলে। তাকাবার অবকাশ ছিল না। নিশ্বাস নিতে বেশ

কষ্ট হচ্ছিল। তবুও কষ্ট করে প্রত্যুত্তরে জানালাম "জয় বদ্রী।" এগিয়ে আসছি, "ওমা এ কি? এ যে গোবিন্দ! কি চেহারা হয়েছে বাবা তোমার? আমরা ত চিনতেই পারি নি।" কাদের কণ্ঠস্বরে আমি থমকে দাঁড়ালাম। এ

অলকানন্দা, বিষ্ণুপ্রয়াগ

যে আমার সেই ট্রেনযাত্রীর দল। ওঁরা আমায় প্রশ্ন করেন, "ত' বাবা, এ পথে কি খুব কষ্ট?" তাঁদের উৎসাহ দিয়ে বললাম, "কিছু না। এই ত আপনারাও ত প্রায় এসে গেছেন, খুব কি কষ্ট হচ্ছে?" উত্তরে তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, "না বাবা! কষ্ট হয় নি, শুধু দু'জন আর পারে নি, তাই কাণ্ডি করেছে।" সামনে কাণ্ডি সোয়ারীকে উদ্দেশ করে বললাম, "কি কাণ্ডি করেছেন?" তিনি একটু ক্লান্তির হাসি টেনে বললেন, "হাঁ বাবা! এই দেখ না, পা দুটো ফুলে গোদ হয়ে গেছে। যা-ও একটু-আধটু হাঁটতে পারছিলাম, কাণ্ডিতে চড়ে সে শক্তিও গেছে। কোমরে এত ব্যথা হয়েছে যে আর যেন দাঁড়াতেই পারি না! বড় কষ্ট হয় এই কাণ্ডিতে ...।" কিছুক্ষণ নানা রকম গল্প চলতে থাকে। তার পর আবার বিদায়ের পালা শেষ করি। প্রথম দর্শনে আমি সত্যই এঁদের চিনতে পারি নি। বদ্রীর পথে এঁদের অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলাম। অনেকে মুণ্ডিতমস্তক, পরনে গেরুয়া বসন, কেউ-বা গেরুয়া বসনধারী—হাতে হরিনামের ঝোলা। এঁদের সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি, আর কখনও দেখা হবে কিনা তাও জানি না। এঁরা সকলেই কোন্নগর উত্তর-পাড়ার বাসিন্দা।

১৪ই জুন, বেলা দশটার সময় সেই পরিচিত পিপুল-কুঠীতে আবার এসে পৌঁছলাম। সে কি আনন্দ সেদিন হয়েছিল। আমাদের হাঁটাপথ শেষ হ'ল। বহুদিন পর আবার হিমালয়ের বুকে 'বাস' দেখে যেন মনে হচ্ছিল, কতকাল বাসে চড়ি নি। বাসে উঠবার জন্য মন অধীর হয়ে উঠল। যাই হোক, সেদিনকার মত আমরা একটি ঘর ভাড়া করে সেখানেই রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করলাম। পিপুলকুঠী বেশ বড় জায়গা, এখানেও বদ্রীনাথের মত সব জিনিস পাওয়া যায়। বিকাল-

অলকানন্দা তীরে লেখক, বদ্রীনারায়ণ

বেলা আমরা সাজগোজ করে সব সওদা করতে বার হলাম। ঠিক যেন আমরা পার্ব্বত্য অঞ্চলের একটি বড় শহরে হাওয়া বদল করতে এসেছি। কয়েক ঘণ্টা আগে আমাদের যে কি পরিশ্রম গেছে তা আমরা যেন ভুলেই গেলাম। এখানে দু'একজন যাত্রীর সংস্পর্শে এসে জানতে পারলাম যে, তাঁদের যথাসর্ব্বস্ব চুরি হয়ে গেছে। সাধুবেশী চোরের উপদ্রব আছে এখানে, অবশ্য তারা অসাবধানী যাত্রীদের কেবল টাকা-পয়সাই চুরি করে, মালপত্রে নজর কম। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, বাসে যাতায়াতের সুবিধার জন্যই এত চুরি হয়। চোরেরা যাত্রীর পাথেয় হরণ করে বাসের সাহায্যে পালাবার সুযোগ নেয়। কেদার-বদ্রীর পথে আর কোথাও চুরির সংবাদ আমরা পাই নি। ১৫ই জুন নূতন উৎসাহ নিয়ে আমাদের যখন ঘুম ভাঙল তখনও ভোরের আলো ফোটে নি।

আজ আমাদের ফিরে যাবার দিন! বাসের আসন আগেই সংরক্ষিত করা আছে। কতদিন পরে বাড়ী ফিরে যাব! বিছানাপত্র বাঁধা-ছাদায় মন দিলাম এবং স্নান সেরে খিচুড়ি ভক্ষণের পর বেলা আটটার সময়ে আমরা সদলবলে বাস ষ্ট্যাণ্ডের নিকট উপস্থিত হলাম। আমাদের বাস ন'টায় পিপুলকুঠী ছেড়ে যাবে। এখানে এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হ'ল। আমরা যেন এক বৃহৎ পরিবার খণ্ড খণ্ড হয়ে গেলাম। যাঁরা হৃষীকেশ হয়ে ফিরবেন তাঁদের বাস স্বতন্ত্র। আমি এবং কর-পরিবার কোটদ্বারযাত্রী আর

ভূপতিবাবু, শাস্ত্রীজী, জয়পুর পরিবার ও বিহারী শিক্ষয়িত্রীর দল হৃষীকেশযাত্রী। এখানেই কুলিদের বিদায় দেওয়া হয়। আমার কুলি করবীর বয়সে খুব অল্প; এই বছরেই সে প্রথম কুলি হয়ে কেদার-বদ্রী ঘুরে গেল। তার প্রাপ্য টাকা ও আমার দেওয়া বকশিশ নিয়ে সে সজল চোখে বিদায় নিয়ে গেল।

তারপর "জয় বদ্রী বিশাল কি জয়!" "জয় কেদারনাথ-স্বামী কি জয়!" বলে ন'টার সময় আমরা বাসে পিপুলকুঠী ত্যাগ করলাম। পিপুলকুঠী থেকে কোটদ্বার এক শ' আটান্ন মাইল। বাসে দু'দিন সময় লাগে। আমাদের বাস পাহাড়ের কোল বেয়ে চড়াই ও উৎরাই ভাঙতে ভাঙতে বেলা একটার সময় কর্ণপ্রয়াগে এসে পৌঁছল। কিছুক্ষণ পর জানা গেল যে, আমাদের বাস বদল করতে হবে। অলকানন্দার উপর যে একটি অস্থায়ী কাঠের সেতু আছে, সেটি বর্ষায় প্রতি বছর ১৫ই জুন বেলা একটার সময়ে জলস্ফীতি-আশঙ্কায় খুলে দেওয়া হয়। আমরা

সাধারণ দৃশ্য, বদ্রীনারায়ণ

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা বেজে পাঁচ মিনিট হয়েছে। এই পাঁচ মিনিটের জন্য অনেক দুর্ভোগ ভোগ করতে হ'ল। যা হোক, আমরা কর্তৃপক্ষের হুকুম তামিল করে, মালপত্র সমেত হাঁটাপথের স্থায়ী সেতু পার হয়ে নির্দিষ্ট বাসে এসে বসলাম। বেলা প্রায় দু'টার সময়ে আমাদের বাস কর্ণপ্রয়াগ ত্যাগ করল।

রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে আমরা যখন আবার সেই পরিচিত শ্রীনগরে বেলা ছ'টার সময়ে এসে পৌঁছলাম, তখন বড় পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছিল। হৃষীকেশ অথবা কোটদ্বার যেতে হলে পিপুলকুঠী থেকে সবগুলো বাসকে শ্রীনগর আসতে হয়। এখানেই বাস ও যাত্রীদের বিশ্রামকেন্দ্র। পরদিন সকালে আবার বাস ছুটে চলে কোটদ্বার অভিমুখে। বেলা দশটার সময় আমরা পৌড়ী এসে পৌঁছলাম। পৌড়ী স্থানটি বেশ সুন্দর। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৫,৫০০ ফুট উচ্চ। এখানকার

তোরণদ্বার, বদ্রীনারায়ণ
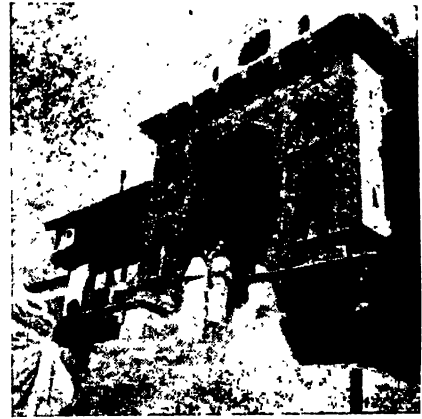
মনোরম দৃশ্য দেহ-মনের ক্লান্তি জুড়িয়ে দেয়। জায়গাটা অনেকটা মুসৌরির মত। রাজপথ পীচের তৈরি এবং বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এখানেও বেশ ঠাণ্ডা আছে। এই দেখছি সূর্য্যালোক-নির্ঝরস্নাত শহর, আবার কোথা হতে একখণ্ড মেঘ এসে সারা শহরকে করে দিল তমসাচ্ছন্ন। কখনও কখনও বা দু'এক পশলা বারিপাত হয়ে যায়; আবার, পরমুহূর্তেই সব পরিষ্কার। আজ মনে হয় যেন

ডাণ্ডিতে বিশ্রাম

কোন এক কুহেলিকাচ্ছন্ন স্বপ্নরাজ্যের ভিতর দিয়ে বিচরণ করে এসেছি। দেড় দিন বাসে আবদ্ধ থাকার পর পৌড়ী শহরে ঘুরে বেড়াতে বেশ ভাল লাগছিল। এখানে অনেক হোটেল ও রেষ্টুরেণ্ট আছে। আমরা একটি হোটেলে কিছু জলযোগ সেরে নিয়ে আবার বাসে এসে বসলাম।

বাস ছুটল কোটদ্বার অভিমুখে। কখনও ৫,০০০ ফুট, কখনও ১,০০০ ফুট চড়াই-উৎরাই ভাঙতে ভাঙতে বাস যখন কোটদ্বার পৌঁছল, তখন বেলা সাড়ে তিনটে। দু'দিন ধরে বাস ভ্রমণে শরীর বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল; তার উপর সমস্ত শরীরে বাসের ঝাঁকুনিতে এত ব্যথা হয়েছিল যে, বাসের উপর বিরক্তি ধরে গেল। এমন সময় আমাদের বাস কোটদ্বার রেলষ্টেশনের সামনে এসে থামল। বিপুল গিরি হিমালয়ের দিকে তাকালাম। আনন্দে, বিস্ময়ে বিরাট্ পর্ব্বতকে শেষ প্রণাম জানিয়ে আমরা কোটদ্বার ত্যাগ করলাম। কোটদ্বার থেকে নাজিবাবাদ পনর মাইল। কোটদ্বার-নাজিবাবাদ একটি ব্রাঞ্চ লাইন। আমাদের ট্রেন যখন নাজিবাবাদে পৌঁছল, তখন বেলা ছ'টা। আমরা একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্রামাগারে আশ্রয় নিলাম, কারণ আমাদের ট্রেন ছিল রাত এগারটায়। বিশ্রামাগারে আমরা ভাল করে ধারাস্নান সেরে নেবার পর মিঃ কর আমাকে নিয়ে একটা হোটেলে গেলেন। সেখানে আহারাদির পর যখন ষ্টেশনে ফিরে এলাম, সে এক নির্ম্মল আনন্দ এবং সতেজ অনুভূতির স্পর্শ পেলাম।

তীর্থযাত্রী দল

ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে এল। পরম তৃপ্তিতে একটি আরাম-কেদারায় দেহ এলিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে কাটাবার পর রাত প্রায় সাড়ে দশটার সময় আমরা আবার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম। দূরে, বহু দূরে একটি ছোট টিমটিমে আলো দৃষ্টিগোচর হ'ল। ক্রমে সেই আলো স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে ডুন এক্সপ্রেস রাত এগারটার সময়ে ষ্টেশনে প্রবেশ করল। আমি কর-পরিবার সমভিব্যাহারে ট্রেনে একটি কামরায় আসন গ্রহণ করলাম। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর ট্রেন ছাড়বার সঙ্কেত পেলাম। গাড়ী দুলে উঠল। ট্রেনের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিলাম। আত্মীয়-পরিজন এখানে কে আর আছে? তবু কেমন একটা ব্যথা অনুভব করলাম। যে কঠিন মাটির উপর আমার পায়ের ছাপ পড়ে ধূলির সঙ্গে মিশে গেছে, সে মাটিও আমার কাছে প্রিয় হয়ে উঠল। সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে লাগলাম।

গাড়ী ছুটতে লাগল, আর হৃদয়ে জাগল বিপুল আলোড়ন ...ঐ নগাধিরাজ হিমালয়! হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গের তুষাররাশি বিগলিত হয়ে সৃষ্টি করেছে কলনাদিনী স্রোতস্বিনী, যার

সেতু, কোটদ্বার

বারিধারা ভারতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আমার দেশকে করেছে সুজলা, সুফলা। ঐ যে শ্যামময় ধূর্জটির আবির্ভাব পার্ব্বত্য প্রকৃতির আকাশে বাতাসে—যার সুবিশাল বক্ষে আশ্রয় নিলে হৃদয় হয় পবিত্র, মন হয় প্রশস্ত ও উন্নত! বিশ্বপতির অপ্রমেয় মহিমার ছায়া যেন হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠে। ঐ যে সৌরকরোজ্জ্বল কনক কিরণে উদ্ভাসিত হিমাদ্রি-শিখর, ঐ যে নীল চন্দ্রাতপের ন্যায় আকাশের নীচে আলো-ধৌত বনানী অপরূপ শ্রী ধারণ করে, কোন্ মহাশক্তির প্রভাবে? কোন্ মহাশক্তি সৃষ্টি করে মানুষ? বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তরালে ঐ বিরাট মহান্ শক্তি তিনি কে? মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভেসে উঠে কেদারনাথের শিলাখণ্ড, যার উপর ভগবান-জ্ঞানে, যুগ-যুগান্তরের নরনারীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হচ্ছে, তারই আড়ালে ঐ যে জ্যোতি! ঐ যে আলো! বদ্রীনারায়ণের প্রতিকৃতির আড়ালে ঐ যে দীপ-বর্ত্তিকার স্নিগ্ধ আলোকচ্ছটা! এ কি দর্শন করলাম? অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে উত্তর আসে, জ্ঞানালোক, ঐ দিব্যালোকের আলোকচ্ছটায় তোমার অজ্ঞানকে, অন্ধকারকে দূর কর। আমার দু'চোখ জলে ভরে আসে। অবনত মস্তকে, সশ্রদ্ধচিত্তে আমি বিশ্বপিতার উদ্দেশ্যে আমার পরিতৃপ্ত হৃদয়ের প্রণতি জানাই।
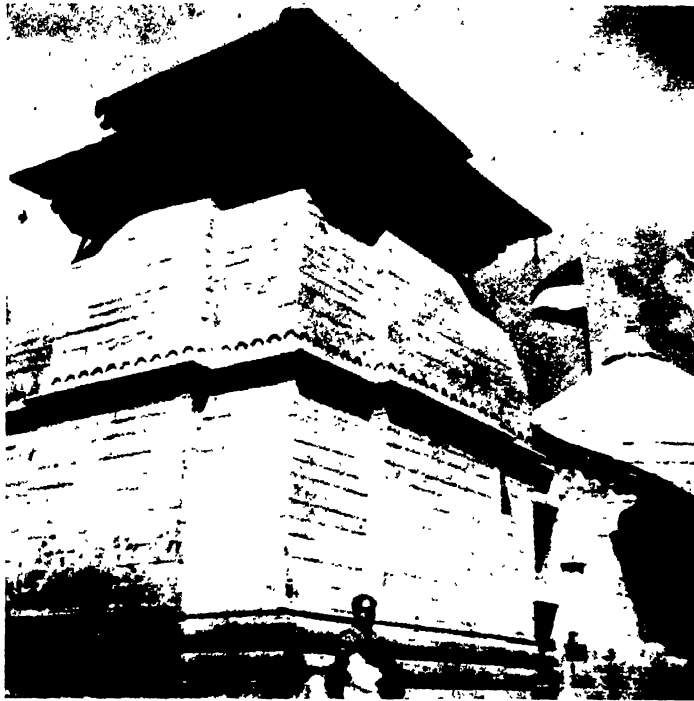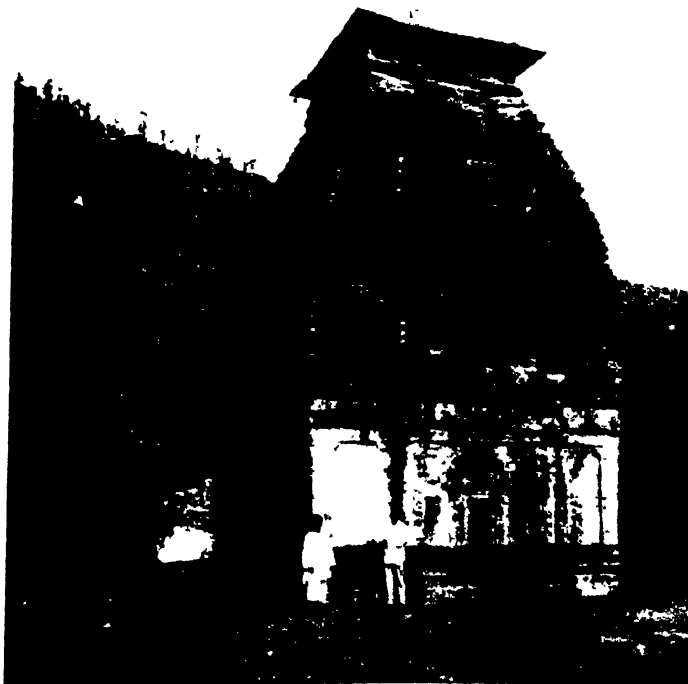
বদ্রীনারায়ণের মন্দির

গোপেশ্বর মন্দির

বদ্রীনারায়ণ হইতে নীলকণ্ঠ পাহাড়ের দৃশ্য

শঙ্করের সাধনক্ষেত্র যোশীমঠ

কথা হচ্ছিল সেক্স নিয়ে ; অন্য কারুর সঙ্গে নয়। আমার স্ত্রীর সঙ্গে।...কিছুতেই মানবে না। অবশেষে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হ'ল, "আচ্ছা ধর বিপাকে পড়েছ। একটি মাত্র ওষুধের গুলি। পুত্র ও স্বামী উভয়েই পীড়িত। এক জনকে দিতে পার।...কাকে দেবে? মনে থাকে যেন একজনকে বড়ি দেওয়ার মানে অন্যকে গুলি করে মারা।..."

খানিকটা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেকে বললে, "ছেলেকে দেব। মা হবার আগে স্বামী বড় ; স্বামী হবার আগে পুরুষ বড়। কিন্তু মা হবার পর না পুরুষ, না স্বামী। শুধু সন্তান!"

"বেশ! আর বাপের বেলায়। স্ত্রী আর পুত্রের মধ্যে বাপ কাকে দেবে ওষুধ?"

হাসতে লাগলেন শ্রীমতী। বললেন, "পুরুষ আবার কি চায়? স্ত্রী মরবে, পুত্র বাঁচবে।"

আমি বললাম, "খোলস!"

শ্রীমতী গাইলেন, "অনেক হেঁয়ালিই বুঝি না তোমার। কিন্তু এটা বড্ড বাড়াবাড়ি হ'ল। খোলসটা কি? মানে?"

"তোমার জবাবটার ব্যঞ্জনা মনোহর। সন্তানের বিশুদ্ধ স্নেহের কাছে সবই পিছিয়ে যায়। সেক্স এর ক্ষুধা হার মানে মনের মাঝে প্রেম, ভক্তি, ভালবাসার তপস্যার কাছে!"

চোখ বড় বড় করে গদগদ হয়ে বললেন শ্রীমতী, "হাঁ গো হাঁ...হাসছ কেন? বিশ্বাস হয় না?"

"না হয় না। যযাতির গল্প শোন নি?"

শ্রীমতী বললেন, "রাখ গল্প কথা।"

"তবে শোন সত্য ঘটনা। জান সবই, মনে পড়বে সব। কিন্তু বাকী নামধাম জিজ্ঞাসা করো না।"

শ্রীমতী লেপটা টেনে নিয়ে বললেন, "একটু জায়গা ছেড়ে শোও। গল্প শুনতে বেশ লাগে।"

"গল্পই বলবে একে? 'সাহিত্যাচার্য মশায়' গল্প? আচ্ছা শোন।..."

"সাহিত্যাচার্য মশায়ের ছেলে বরেন্দ্রর জন্য সাহিত্যাচার্য মশায় অনেক মেয়ে দেখছিলেন। ওদের ঘর ভাল ; তা ছাড়া সাচ্ছল্য আছে সংসারে। বরেন্দ্র অঙ্কে এম-এ পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকতা করছে। সাহিত্যাচার্য ত নিজেই প্রাচীন ও বিশিষ্ট অধ্যাপক। সুতরাং পাত্রী আকৃছারই দেখা হচ্ছে। ওদের রং ত কাঁচা সোনার রং। ঘি আর ফল খেয়ে খেয়ে যেমন রংটি হওয়া উচিত, সেই তাপোবনিক রংটি ওদের সুবিখ্যাত।...মেয়ের মৌচাকে ঢিল পড়ল যেন।

"ঢিল পড়ল, মাছিও উড়ল ; হুল আর বেঁধে না। সাহিত্যাচার্য ত নাকাল হবার জো! নিজের বয়স হয়েছে পঞ্চান্ন। স্ত্রী মারা গেছেন বছর দুই। বাড়ীতে বরেনই বড় ছেলে। তার পর একটি মেয়ে শ্যামা এবং তার পর দুটি ছেলে। মেয়েটি বি-এ পড়ছে এবং বউ নইলে সংসার চালানো দায়। অথচ বরেন বিয়ে করছে না।

"আমরা জানতাম বরেন বিয়ে করছে না, এই পর্য্যন্ত। করছে না ত করছে না। কেন করছে না, কি বৃত্তান্ত, অতশত খোঁজ করি নি। শ্যামা এক দিন এসেছিল বড়-

বৌদির সঙ্গে দেখা করতে। বড়বৌদির এক বোন বিবাহ-যোগ্যা…"

"তোমার আবার বড়বৌদি কে?" বিস্মিতা শ্রীমতী মিছে কথা ধরে ফেললেন।

হেসে বললাম, "গল্পের গরু শুধু গাছেই চড়ে না। তার বড়বৌদিও থাকে। সবার নাম করব না বলেই ত এ সব আয়োজন। শুনে যাও।…তার কাছে কথা পাড়তেই শ্যামা বলেছিল, 'দাদার বিয়ে হবে না বৌদি, ও হবার নয়। বৃথা চেষ্টা করবেন না।'…বৌদির কাছ থেকে কথাটা শুনে অবধি আমার ইচ্ছে হ'ল শ্যামাকে জিজ্ঞাসা করব। বরেনের মত সংস্বভাব নির্ম্মল ছেলের জীবনে আবার 'কমপ্লেক্স' এল কোত্থেকে, জানতে ইচ্ছা হ'ল; যদি পারি সাহায্য করব। আমায় ত ওরা ভাইবোন সবাই মানে!

"সুযোগও হয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা ভাল বক্তৃতা ছিল। শেষ হবার পর মিসেস দত্ত শ্যামাকে তাঁর বাড়ী নিয়ে গেলেন। শ্যামা আমায় ডেকে বলল, 'দাদা, আপনি ত আপাততঃ হোষ্টেলের দিকে যাবেন। শহরে ফিরবেন যখন আমায় ডেকে নেবেন। আমিও যাব।'

"কাশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শহর অনেকটা পথ। মেয়েদের পক্ষে তখনকার দিনে একা একা ফেরা কেউ কল্পনাও করত না।

"আমি বললাম, 'আচ্ছা; কিন্তু সুবিধে করতে পারলে চলেই যাস। আমি ফিরলেও আমার রাত হতে পারে।'

"বোধ করি আমার ভরসাতেই ও রাত করেছিল। মোটর উপর পাড়ার আশার গেটের বার অবধি এসেও গাড়ী পেলাম না।

"হেসে বললাম, 'পারবি হাঁটতে?'

"দু'জনাই হেঁটে চললাম।

"সুতরাং সুযোগ হয়ে গেল।

"কথায় কথায় যা প্রকাশ পেল তা অতি-সাধারণ কথা। দুনিয়ার ঘটনাচক্রের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে তুচ্ছ ব্যাপার—আকছার ঘটছে।

"গরমের বন্ধে বরেন গিয়েছিল তার এক বন্ধুর দেশে, মেদিনীপুরে। সেখানে গিয়ে বন্ধুর গ্রামে এক পরিবারে তার ভাব-সাব হয়। ভাব-সাব শেষ অবধি চরমে উঠে। পরিবারের অনিন্দ্যকান্তি এক কিশোরীর সঙ্গে চারি চক্ষের মিলন। মেয়ের বাপ গ্রাম্য স্কুলে শিক্ষকতা করেন। মেয়েটি তাই বেশ লেখাপড়া শিখেছে। বুদ্ধিমতী মেয়ে। বাপের কষ্ট ও সংসারের অনটন দুটোই বোঝে। বরেনের সঙ্গে যে ওর বিয়ে হতে পারে না, তা বিলক্ষণ জানে এবং সেইজন্যেই বরেনকে ও মুখে কিছু জানায় নি। তবে ওর কথা ছাড়া আর সবকিছুতে বরেনের মনে মনে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল যে, বরেনের সঙ্গে বিবাহকে ও বরণ করে নিতে চায়।

"পালটি ঘর; ভাল মেয়ে; সুন্দরী কেন অপূর্ব সুন্দরী। বয়সও বিবাহযোগ্য, এ বিয়ে তবে হ'ল না কেন?

"সাহিত্যাচার্য ঘোরতর আপত্তি তুলেছেন—রাঢ় দেশ, পাণ্ডববর্জিত দেশ—ওখানে করণ-কারণ করবেন না। বরেন আজকালকার ছেলে। পাণ্ডববর্জিত আর করণ-কারণ ওর মনকে স্পর্শ করে নি। বাপ টাকা চায়। ছেলের মইয়ে পা দিয়ে বেয়াই ফলপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তার নিষ্প্রভ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মর্যাদা থেকে একেবারে সামাজিক প্রতিষ্ঠার রৌপ্য-শিখরে সমাসীন হতে।

"বরেন একথা যতই ভাবে ততই তার মন খারাপ হয়ে যায়। তার সমস্ত মন জুড়ে বসে আছে রাজকন্যার মত সেই মেদিনীপুরের মেয়ে। হাসতে হাসতে ও নাকি শ্যামাকে বলেছিল, 'মেয়েটা যে পাণ্ডববর্জিত দেশের তাতে আর সন্দেহ নেই, জানিস শ্যামা। পাণ্ডববর্জিত বলেই ওরা আজও আছে। শ্রীমান পাণ্ডবদের কানে ঐ দেশের রূপলাবণ্যের খবর গেলে পর আর ও দেশটাও বর্জিত থাকত না।'

"পরে আমি বরেনের সঙ্গে এ আলোচনা করেছিলাম। বাইরেটা ওর বরাবরই চাপা। তা ছাড়া আমায় একটু সমীহও করত। অনেক প্রশ্ন করে, অনেক খোঁচখুঁচ নিয়ে আমি কিছু কিছু জানতে পেরেছিলাম।

"চন্দন একাদশীর দিন সাঁতারকাটা, নৌকাচড়া কাশীর একটা রেওয়াজ। নৌকা নিয়ে অসীর আগেও দক্ষিণে চলে গেছি উজানে। ছেলেরা মাছ ধরায় ব্যস্ত। রামনগরের ফেরি চলাচল করছে।

"বরেনকে বললাম, 'যা হবার হয়ে গেছে বরেন, বিয়ে কর এবার, গোল মিটে যাক।'

"বরেন বললে, 'যা হবার হয়েই গেছে যখন তখন আর হবার কিছু নেই। জানেনই ত আমি রোম্যান্টিক টাইপ নই। আমাদের সব ম্যাথামেটিকস—একটা প্রশ্নের একটাই উত্তর—যদি সেটা খাঁটি প্রশ্ন হয়।'

"আমি বললাম, 'দেখ বরেন, জীবন আর ম্যাথামেটিকস যে কেন এক নয়, সেকথা তুলে আমি আমার আসল বক্তব্যটাকে বানচাল করে দিতে চাই না। ও সব হেঁদো দার্শনিকতার ধাঁধায় ভোলাবার মত প্রবৃত্তি আমার যত কম, ভোলবার মত বুদ্ধিও তোমার নয়। সুতরাং আমি একেবারে চরম কথায় এসে পড়ি।'

"হেসে বরেন বললে, 'বলুন'—একেবারে হাল ছেড়ে দেওয়া হাসি।

" 'আমি ভাল এবং সুন্দরী মেয়ে জানি। আমার জানা মেয়ে; ভাল মেয়ে। তোমায় তাঁরা চেনেন। মেয়েটিরও মত আছে। আমি নিশ্চিত জানি বিবাহ করলে তুমি সুখী হবে।'

"বরেন গম্ভীর হয়ে জবাব দিলে, 'বিবাহিত সুখ যদি অন্য গোত্রে হয় জানি না। তবে সুখ যদি একটা নিরবয়ব স্বয়ংসম্পূর্ণ চরিতার্থতা হয়, আমার ধ্রুব বিশ্বাস বিবাহ না করেও আমার সুখ কিছু কম নয়।'

"বিস্মিত হয়ে বললাম, 'সত্যিই তোমার মন এতটা বসে গেছে মায়ার উপর?'

বরেন বললে, 'যা হবার হয়েই গেছে যখন তখন আর হবার কিছু নেই'

" 'মন-বসার মত বস্তু তাতে ছিল'—বলল বরেন ম্লান হাসি হেসে, 'কিন্তু পাণ্ডবের বর্জিত যা তা নিয়ে আমাদের মত আর্যনন্দনের কি করব?

" 'এতই একনিষ্ঠ যখন তোমার নিবেদন তখন বাবার কথা শোনার দরকার কি?'—আমি সসঙ্কোচে বললাম। তার পর জোর দিয়ে বললাম, 'বিবাহ তুমি কর; তারপর আমরা সব সামলে নেব।'

"ম্লান হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। ও বলল, 'এ হ'ল আদর্শের কথা। ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর কথা। আমার প্রেম, সে ত আমার। কিন্তু প্রশ্ন—আমার বাবা যতটা 'আমার', তার চেয়ে অনেক বেশী 'আমি' তাঁর। অর্থাৎ বিবাহ আমার ভবিষ্যৎ সম্ভাবিত সার্থকতা; আর আমি বাবার অতীতের সার্থকতা; ভবিষ্যতের অবলম্বন। এ অবলম্বন টাকাকড়ির অবলম্বন নয়, মনের অবলম্বন, শান্তির অবলম্বন। আমার বিবাহ হবে আমার অনাস্বাদিত সুখলাভের আকাঙ্ক্ষায়; অথচ সে হবে আমার বাবার আস্বাদিত ও প্রতিষ্ঠিত সুখলাভে বিঘ্ন। আমি ভেবে দেখলাম যে একটু সংযত আচরণ দিয়েই সমস্ত অশান্তি মেটানো যায়।'

"কথা শুনে গলা কাঠ হয়ে গিয়েছিল। প্রশ্ন করলাম, 'আর তোমার শান্তি?'

"ঠাট্টার সুরে বললে, 'শান্তি ত মায়া!' মায়া ত সেই মেয়েটির নাম।' রহস্যচ্ছলে বললেও বেদনা ছিল এই ঠাট্টায়। সামলে নিয়ে বলল, 'বাবাকে দুঃখ দিয়েও যে আমি শান্তিতে থাকব এ ভরসা আমার নেই।'

"আমি কথাটা আর বাড়াতে চাই নি। মন আমার ভরে গিয়েছিল। আমাদের দেশটা মূলতঃ পিতৃভক্ত রামচন্দ্রের দেশ সেই কথাটাই মনে হ'ল।
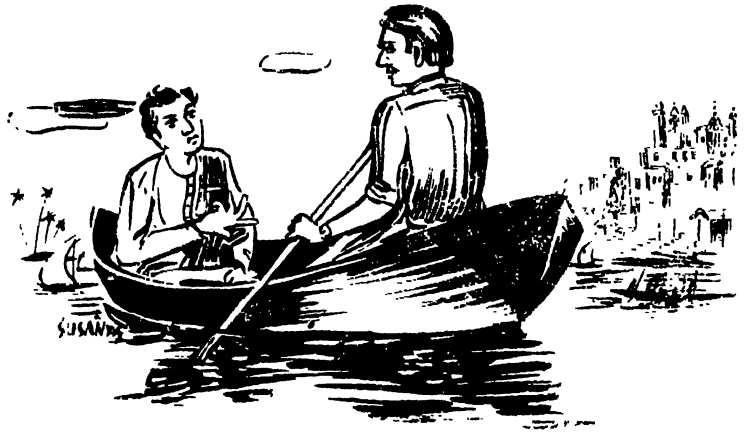
"কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে কথাটা এক দিন সাহিত্যাচার্য মশায়কে বলে ফেললাম। তিনি ত তলিয়ে বুঝতেই চান না। ওঁদের শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে আমি বরাবর একটা অভাব লক্ষ্য করি, সেটা কোনও ব্যাপারকে সূক্ষ্মরূপে ধারণা করার ধৈর্যের অভাব। যেসব তত্ত্বকথা দার্শনিকতার সংজ্ঞায় পড়ে, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক সেই সব চুলচেরা সংজ্ঞার নির্ণয় করায় ওঁদের প্রসন্নতা খুব বেশী। মতের অনৈক্যে ওঁরা ভারি খুশী; কারণ অনৈক্য হলেই দ্বন্দ্ব, আর দ্বন্দ্ব হলেই সূত্র ও যুক্তি যোগে বহুক্ষণ ধরে বিদগ্ধ মুখমণ্ডলের কণ্ডুয়ন চলতে থাকবে। এত যে পাণ্ডিত্য, এত যে পাত্রাপাত্র, সংজ্ঞালিঙ্গের বিচার, সবটাই মাথায়। অন্তরের কোঠা একেবারে জ্ঞানের হীরায় ভর্তি। ওঁদের ধারণায় আর আসে না যে আসলে হীরাও পাথর।

"ক্ষেপে গিয়ে সাহিত্যাচার্য বললেন, 'কোনকালে ছিল না, কেউ কখনও করে নি বলেই আজও হবে না, আজও কেউ করবে না এটাকে যেমন তোমরা পূর্বপক্ষ মানতে চাও না, তেমনই আমিও স্বীকার করি না যে, মনের চাওয়াটাই জ্ঞানের বা বুদ্ধির সরে-যাওয়ার পক্ষে একমাত্র যুক্তি। আমি উত্তরপক্ষ করব না; বলব মন যদি চায় কর; তবে মন চাইতেই যারা করে তাদের মনের জোর তোমার আমার মনের মত নয়। তেমন মনের জোর যাদের আছে তাদের পিতামাতা, সংসারবন্ধন কিছু নেই। তাদের থাকে শুধু মন। বরেনের যে তেমন জোরালো মন আমার তা বোধ হয় না।' "

এতক্ষণে শ্রীমতী কথা কইলেন। লেপের মাঝ থেকে

সাহিত্যাচার্য বাঁকা চোখে একটু হাসলেন। টিকি থেকে ফুলটা খুলে সামনের পুঁথিখানার উপর রাখলেন

"দরকার ছিল না এই দম্ভোক্তির। তবু বললেন তিনি, যুক্তিসঙ্গত বোধ করলেন, যতই অসঙ্গত হোক তার প্রয়োগ বা প্রকৃতি।

"এরই কিছুদিন পরে শুনলাম বরেন বিবাগী হয়ে চলে গেছে।

"জানতাম এ রকম একটা কিছু হবে। তবে প্রায় দু'বছর কেটে গিয়েছিল; ভেবেছিলাম এতদিনে ওরা মোটামুটি একটা নিষ্পত্তি করে নিতে পেরেছিল।

"শ্যামা আমায় বারান্দা থেকে দেখতে পেয়েই চুপি চুপি নেমে এসেছিল। এসে সদর দরজা খুলে অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল। আমি তখন ক্লাব-ফেরতা বাড়ীমুখো। ফিরতে ফিরতে হঠাৎ শ্যামার কথা, বরেনের কথা মনে পড়েছিল।

বলে উঠলেন, "সাংঘাতিক লোক বাবা! কিছু বললে না তুমি?"

"সাংঘাতিক বলছ; কিন্তু কেমন গভীর যুক্তি বল ত? আমি নেহাত নাছোড়বান্দা; বিশেষতঃ পরের কথায় থাকাতে আমার ভারি রুচি। কোনমতে চোখ কান বুঁজে বলে ফেললাম, 'যে বরেনকে আপনি এতটা উপহসনীয় বলে বোধ করছেন তার মন জোরালো বলেই সে তার পিতাকে লঙ্ঘন করে আত্মসর্বস্ব হতে চাইল না।'

"শ্লেষ করে বললেন চিবিয়ে চিবিয়ে, 'কি বলব? যদি বলি তার মনের জোর, তোমাদের বহুপ্রচারিত প্রথম প্রণয়ের জোরকে শিথিল করা হয়; যদি বলি প্রণয়ই জয়ী, বললে মনের জোর যায় ভেসে, বলতে হয় আমার হাতযশ!'

"না বলে পারি নি, 'সীতাকে রাম বনে দিয়েছিলেন প্রেমের জোর শিথিল হয়ে গিয়েছিল বলে বুঝি?'

"সাহিত্যাচার্য বাঁকা চোখে একটু হাসলেন। টিকি থেকে ফুলটা খুলে সামনের পুঁথিখানার উপর রাখলেন। বললেন চাপাগলায় বাক্যের আগুন ভরে, 'আর কিছু বক্তব্য আছে তোমার? রামায়ণের ব্যাখ্যা শোনার মত ধৈর্য আমার নেই।'

"এর পরেও সেখানে থাকার চেয়ে একটা অজগরের মুখে ঢুকে যাওয়া বোধ হয় সহজ।

"আমি যাচ্ছিলাম। ডেকে বললেন, 'আমার ঔরসজাত সন্তান হলে আমাকে বা আমার বাক্যকে অতিক্রম করে যাওয়া ওর সাধ্যের বাইরে।'

"দু'মাস সাহিত্যাচার্যও বাইরে ছিলেন। ওর সঙ্গে দেখা করারও একটা ইচ্ছা ছিল। বরেনকে খুবই স্নেহ করতেন। সেই বরেন গৃহত্যাগী। কোনও খোঁজখবর পেলেন কিনা।

"কিন্তু শ্যামা বাদ সাধল।

"যেতেই সেই অন্ধকার দরজার একধারে টেনে নিয়ে গিয়ে দুই হাতের মধ্যে আমায় জড়িয়ে কানে কানে বললে, 'ভেতরে ঢুকবেন না; এইখানেই দাঁড়ান। পায়ে পড়ছি আপনার। একটু দাঁড়ান। আসছি। শব্দ করবেন না।'

"নিঃশব্দে সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম। বুঝলাম শ্যামা খুব কাঁদছে।

"একটু পরে ও ফিরে এল। ওর হাতে একটা সুটকেস।

"বাড়ীর বাইরে এসে চুপি চুপি দরজা বন্ধ করে দিল ও।

"লক্ষ্য করি নি বাইরেই একখানা গাড়ী দাঁড়িয়েছিল।

"গাড়ীর ভেতরে অনিল রায় বসে। অনিল রায় কাশীর কায়স্থ জমিদার বিপিন রায়ের ভাইপো। বর্মায় কাঠের ব্যবসা করে। ও যে সেদিনই বর্মায় যাচ্ছে সে খবর আমি জানতাম।

"আমি যেন কি বুঝলাম। হঠাৎ শ্যামার হাত ধরে বললাম, 'তোকে এমন করে আমি যেতে দেব না শ্যামা।'

"গাড়ীর ভেতর সুটকেসটা রেখে শ্যামা বলল, 'আপনি

বারণ করলে আমি যাব না, কথা দিলাম; তবে আমার কথাগুলো শুনুন।'

"গম্ভীর হয়ে বললাম, 'বল কথা, শুনি।'

"শ্যামা বলল, 'গাড়ীতে উঠুন, বলছি।'

"যা বলবার শ্যামা বলল। আমি পাথরের মত চুপ করে শুনছিলাম। গাড়ী তখন রাজঘাটের পুল পার হচ্ছে। গঙ্গার বাতাস মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দিচ্ছে। শ্যামার চুল খোলা নয়, তবু ভেঙে-পড়া অবাধ্যপনায় দু'চারগোছা উড়ে মুখে লাগছে।

"আমি বললাম, 'বিশ্বাস করতে যে পারছি না শ্যামা।'

"কাঁদতে কাঁদতে শ্যামা বলল, 'আমি চললাম। দিদি ত গেছেন। আপনারা রইলেন; রইলেন বাবা, সমাজ, হিন্দু ধর্ম আর শাস্তিতত্ত্ব। বাড়ী যাবেন; গিয়ে দেখবেন। যদি মিথ্যা হয়, কোন কালে ক্ষমা করবেন না; বলবেন শ্যামা কুলটা, শ্যামা নষ্ট মেয়ে।'

"মোগলসরাইয়ে গাড়ী হুইস্‌ল দিল। শ্যামা বলল, 'আশীর্বাদ করবেন না আমাদের?'

"করেছিলাম আশীর্বাদ। ভারী খুশী হয়েছিলাম ওদের এই প্রতিবাদ চালানোতে। ওরা সুখী হবেই।"

আর সহ্য করতে পারছিলেন না শ্রীমতী, "ও কি কথা-বলা তোমার? কি ধারার গল্প তোমার? শ্যামা কি বলল তোমায় যে তোমার এত খুশী?"

আমি বললাম, "পারবে বিশ্বাস করতে তুমি?"

"কি কথা এমন?" শ্রীমতী শুধালেন।

"বড় সঙ্কোচ হয়। সমস্ত মনুষ্যত্বের অপমান, পৌরুষের অপমান। সাহিত্যাচার্য শিবুবাড়ী গিয়েছিলেন। ফিরে এলেন। সঙ্গে নবপরিণীতা স্ত্রী। স্ত্রী আর কেউ নয়—সেই মায়া—বরেনের মায়া।"

এবার শ্রীমতী উঠে বসলেন, "বল কি? সত্যি? কিছু বল নি তোমরা? সমাজ কিছু বলে নি? সে কি?" বিস্ময়ের, ক্ষোভের অবধি ছিল না সেই কণ্ঠস্বরে।

এক দিন আমি গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "এ কাজ আপনি করলেন কি করে?"

"সাহিত্যাচার্য উদাস কণ্ঠে উত্তর করেছিলেন, 'ওপরের আকাশকে জিজ্ঞাসা কর, অনঙ্গ দেবতাকে জিজ্ঞাসা কর, আর পার ত জিজ্ঞাসা কর রাজা যযাতিকে। কিন্তু বিবাহ যাকে করেছি সে নারী নয়, রমণী নয়, হিমগিরিশিখরে সঞ্চিত যুগান্তস্থায়ী তুষারস্তূপ।'"

শ্রীমতী লেপটা টেনে নিয়ে আমায় একেবারে দারুণ জড়িয়ে ধরলেন।

প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রাচীন সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসের সম্যক্‌ আলোচনা প্রাচ্যবিদ্যালোচনা নামে পরিচিত। ব্যাপকভাবে এই বিদ্যার অনুশীলনের ব্যবস্থা ইউরোপ ও আমেরিকার কোন কোন শিক্ষাকেন্দ্রে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও শতাধিক বৎসর যাবৎ এই বিদ্যার আংশিক আলোচনার প্রবর্তন হইয়াছে। আমরা মুখ্যতঃ ভারতীয় ও ভারতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত বিষয়েরই আলোচনা করিতেছি—সংস্কৃত ও সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত সাহিত্য ছাড়া আরবী ফারসী চীনা তিব্বতী সাহিত্যের সঙ্গে ভারতীয় ইতিহাস ও সাহিত্যের যে যে অংশে গভীর যোগ রহিয়াছে বিশেষ করিয়া সেই সেই অংশের আলোচনা আমাদের কাছে আদৃত। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই আলোচনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন—বিভিন্ন পত্র পত্রিকা পুস্তক-পুস্তিকার মারফত তাঁহাদের আলোচনার ফল প্রকাশিত হইতেছে—মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন সম্মেলনের মধ্য দিয়া তাঁহাদের সুবিধা-অসুবিধা অভাব-অভিযোগের কথা কিছু কিছু প্রচারিত হইতেছে। এই সব সম্মেলনের মধ্যে নিখিল-ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন প্রাচীনতম। ১৯১৯ সনে পুনা শহরে ইহার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তদবধি প্রতি দুই বৎসর অন্তর প্রায় নিয়মিত ভাবেই বিশিষ্ট মনীষিবৃন্দের অধিনায়কতায় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে এইরূপ অধিবেশনের অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। বেদ, দর্শন, ইতিহাস, সংস্কৃত সাহিত্য, পালি, প্রাকৃত, বিজ্ঞান প্রভৃতি শাখায় অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় বিভক্ত হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের গবেষকগণ এই সমস্ত শাখায় তাঁহাদের গবেষণার ফল প্রবন্ধাকারে উপস্থাপিত করেন। মূল ও শাখা-সভাপতিগণ তাঁহাদের অভিভাষণে দেশে-বিদেশে পরিচালিত গবেষণা এবং প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য পুস্তক-পুস্তিকার পরিচয় ও বিবরণ প্রদান করেন—নূতন নূতন আলোচ্য বিষয়ের দিকে পণ্ডিত-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দুঃখের বিষয়, এই সম্মেলনের কথা সাধারণের

নিকট তেমন পরিচিত নয়—ইহার কার্যকলাপ প্রচারের তেমন সুব্যবস্থা নাই।

সম্প্রতি আমেদাবাদে সম্মেলনের সপ্তদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল। মূল সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক শ্রীসুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়। দেশবিদেশের বহু পণ্ডিত এই উপলক্ষ্যে এখানে সমবেত হইয়াছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে ভাল মন্দ প্রায় সাড়ে তিন শত প্রবন্ধ আমদানী হইয়াছিল—ইহাদের সংক্ষিপ্তসার-সংবলিত একখানি সুমুদ্রিত পুস্তক সভার প্রারম্ভেই সভ্যদের দেওয়া হইয়াছিল। তিন দিন ব্যাপী অধিবেশনের নানা কাজের মধ্যে এতগুলি প্রবন্ধ পড়িবার ও আলোচন করিবার ব্যবস্থা করা অসম্ভব। তাই এ জাতীয় অধিবেশনে এই মুখ্য কাজটি কোন রকমে সারিয়া লওয়া হয়। সাধারণতঃ প্রবন্ধ পাঠে ইচ্ছুক কাহাকেও বঞ্চিত করা হয় না সত্য তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠ ও যথাযোগ্য আলোচনা সম্ভবপর হয় না। তাহা ছাড়া, শ্রোতাদেরও অনেক সময় বিশেষ কোন আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না—অনেক ক্ষেত্রে শ্রোতার অভাব ও ঔদাসীন্য অতিবড় উৎসাহী পাঠককেও হতাশ করিয়া থাকে। সমস্ত ব্যাপার মিলিয়া কোন রকমে একটা নিয়ম রক্ষামাত্র হয়। অধিবেশনের মুখ্য অঙ্গের এই দুরবস্থার প্রতিবিধানের উপায় চিন্তা করা খুবই দরকার।

আসলে এই জাতীয় সম্মেলনের সার্থকতা প্রবন্ধ পাঠের উপর নির্ভর করে না। ইহার সামাজিক দিকটাই ইহার প্রধান দিক ও যথার্থ লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ জ্ঞান সাধনায় যাঁহারা একই পথের পথিক—জীবনে যাঁহারা একই আদর্শে অনুপ্রাণিত তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে চাক্ষুষ পরিচয়ের ও আলাপ-ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা করিয়া দেওয়া সম্মেলনের একটা মস্ত বড় কাজ। শুধু ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে নয়, এই সূত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও তাহাদের কার্যের সহিতও পরিচয় ঘটিয়া থাকে।

আলোচ্য সম্মেলনের আহ্বানকর্তাদের অন্যতম শতাধিক-বর্ষের প্রাচীন গবেষণাকেন্দ্র গুজরাট বিদ্যাসভা সম্মেলন উপলক্ষ্যে যে সাহিত্য প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছিল তাহাতে প্রদর্শিত গুজরাটের প্রাচীন পুথি-সম্পদের বিচিত্র নিদর্শনসমূহ মুনি শ্রীপুণ্যবিজয়জীর অভিভাষণের সহ-যোগিতায় দর্শকদের নিকট গুজরাটের জ্ঞান ভাণ্ডারের আংশিক পরিচয় উদ্ঘাটিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সম্মেলনে প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা গেল গুজরাট বিদ্যাসভা এমন একটি কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে যাহা সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। পুণার ভাণ্ডারকার ইনষ্টিটিউট যেরূপ মহাভারতের সংস্করণ প্রকাশ করিতেছে—বরোদার ওরিয়েণ্টল ইনষ্টিটিউট যেরূপ রামায়ণের সংস্করণ প্রকাশের কাজ আরম্ভ করিয়াছে গুজরাট বিদ্যাসভাও সেইরূপ ভাগবতের একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সংস্করণ প্রকাশে উদ্‌যোগী হইয়াছে।

গুজরাট বিদ্যাসভার মত সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান ছাড়া আমেদাবাদের কয়েকটি স্বল্পপরিচিত সংস্কৃতিকেন্দ্রের পরিচয় লাভের সৌভাগ্যও এই অবসরে পাওয়া গেল। ইহাদের মধ্যে সন্ন্যাসাশ্রমে আমাদের কয়েকজনের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সবরমতী তীরে এই আশ্রম অবস্থিত। আশ্রমের মন্দিরে নিয়মিত পূজাপাঠের অনুষ্ঠান হয়। মন্দির-সংলগ্ন প্রশস্ত প্রাঙ্গণে প্রতিদিন অপরাহ্ণে মহামণ্ডলেশ্বর স্বামীজী শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন—এই ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য বহু লোক-সমাগম হইয়া থাকে। মন্দিরপার্শ্বস্থ দ্বিতল গৃহে আশ্রম-পরিচালিত কাশী বিশ্বনাথ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের অন্তেবাসীদের আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা আশ্রম হইতেই করা হয়। ছাত্রগণকে কতকগুলি বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। ইহাদের মধ্যে বিশেষ চিত্তাকর্ষক—প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় উঠিয়া সমবেত ভাবে মহিম্নঃ স্তোত্র পাঠের ব্যবস্থা। বোম্বাইয়ের উপকণ্ঠে ভিলে পার্লেতে অবস্থিত সন্ন্যাসাশ্রম পরিচালিত কাশী বিশ্বেশ্বর আধ্যাত্মিক সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়টিও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান। এখানকার মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত বিবিধ মূল্যবান্ শাস্ত্রবচন দর্শকমাত্রের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মথুরার বিড়লা মন্দিরে এইরূপ শাস্ত্রবচন ছাড়া সমস্ত গীতা গ্রন্থ উৎকীর্ণ হইয়াছে। আমেদাবাদের গীতামন্দিরেও দেওয়ালে অঙ্কিত গীতা ও শ্রীকৃষ্ণের জীবনালেখ্য বিশিষ্ট দর্শনীয় বস্তু। গীতামন্দির কর্তৃক গীতার বহুল প্রচারের চেষ্টা উল্লেখযোগ্য। মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামীজী নানা দেশ ঘুরিয়াছেন। খ্রীষ্টানগণ কর্তৃক বাইবেল সংরক্ষণের অনুকরণে তিনি সোনা-রূপার পাত তৈয়ার করিয়া তাহার উপর গীতা উৎকীর্ণ করিয়া পুস্তকাকারে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন।

ধর্ম বা শাস্ত্র প্রচার প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের উদ্দেশ্য না হইলেও প্রাচীন গ্রন্থ উদ্ধার ও প্রচারে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান ইহার অন্যতম লক্ষ্য সন্দেহ নাই। সেই হিসাবে এই সব প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা এখানে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়। ইহাদের মধ্যে কোন কোন প্রতিষ্ঠানের প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজনও উল্লেখযোগ্য। গীতা-মন্দির হইতে গীতা ব্যতীত সানুবাদ বৃহদারণ্যক উপনিষদ ও মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। বোম্বাই সন্ন্যাসাশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী মহেশ্বরানন্দ গিরি মহারাজ বেদের অংশ বিশেষের অদ্বৈতপরব্যাখ্যা ও নৈতিক এবং ব্যবহারিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া ঋগ্‌বেদোপনিষচ্ছতক, শুক্লযজুর্বেদো-পনিষচ্ছতক ও অথর্ববেদোপনিষচ্ছতক নামে তিনখানি

উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশ ও বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা দরকার যে, শাস্ত্রালোচনার প্রাচীন পদ্ধতিকে সম্মেলন হইতে তেমন আমল দেওয়া হয় না। সত্য বটে, প্রাচীন ধরণের কোন কোন পণ্ডিত সম্মেলনে মাঝে মাঝে সংস্কৃতে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া থাকেন। তবে সম্মেলনে তাঁহারা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন না। দ্বারভাঙ্গার অধিবেশনে যেরূপ পণ্ডিত-সম্মেলনের ব্যবস্থা হইয়াছিল তদনুরূপ ব্যবস্থা সর্ব্বত্র হয় না। পণ্ডিত সমাজে এজন্য একটা ক্ষোভের ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আমেদাবাদেও ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এইজন্যই আমেদাবাদের পণ্ডিতমণ্ডলী সম্মেলনের সময়েই সংস্কৃতালোচনার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে একটি সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। বৃহৎ গুজরাট সংস্কৃত পরিষদের প্রযোজকতায় সম্মেলনের প্রাঙ্গণে এই সভার অনুষ্ঠান হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন দ্বারভাঙ্গার মিথিলা সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীউমেশ মিশ্র। সম্মেলনের অনেক সদস্যও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার কার্য্যাবলী মুখ্যতঃ সংস্কৃত ভাষায়ই পরিচালিত হইয়াছিল। দুই এক জন বৈষয়িক লোকের সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ বাংলার বাহিরে সংস্কৃত ভাষায় আলাপ আলোচনার চলন কিছু বেশি বলিয়াই মনে হয়। সংস্কৃত পণ্ডিত ছাড়া সাধারণ শিক্ষিত লোকও কেহ কেহ মোটামুটি ভাবে সংস্কৃতে দুই-চারি কথা বলিতে পারেন—এরূপ দৃষ্টান্ত বাংলার বাহিরে দুর্লভ নয়। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত অবাঙালীদের কাহাকে কাহাকেও সভায় সংস্কৃতে বক্তৃতা দিতে দেখা যায়। বাংলাদেশে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

তবে অনভ্যাসই মুখ্যতঃ এই দুরবস্থার জন্য দায়ী—বাঙালী সংস্কৃতে একেবারে অজ্ঞ নয়। একটু চেষ্টা করিলেই সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীও সংস্কৃত বলিতে ও বুঝিতে পারে। পাঠদ্দশায়ই এ বিষয়ে কিছু কিছু অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকিলে তাহা আনন্দজনক ও মঙ্গলকর হইতে পারে। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বেও বাঙালীর এ বিষয়ে কিছু অভ্যাস ছিল—পূর্ববঙ্গে পণ্ডিত-সমাজে বিবাহসভায় অনেক স্থলে বর ও কন্যাপক্ষে সংস্কৃতে আলাপ হইত—যুবকেরা এই উদ্দেশ্যেও আগ্রহ করিয়া সংস্কৃত বলিতে শিখিত। অবশ্য, বাঙালীর উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য সংস্কৃতভাষী বাঙালীকে অবাঙালীর নিকট দুর্বোধ্য করিয়া তুলে। সুখের বিষয়, আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত বাঙালী ক্রমশঃ এই বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করিতেছে। এখনও বিভিন্ন প্রদেশে সংস্কৃত উচ্চারণের যে বৈচিত্র্য আছে তাহা যথাসম্ভব রহিত করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে এ বিষয়ে একটা ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

শুধু উচ্চারণে নয়, সংস্কৃত ভাষার লিপি ও পঠন-পাঠন-পদ্ধতির মধ্যেও যথাসম্ভব সাম্য স্থাপনের ব্যবস্থা অতি অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে হয়। একই সংস্কৃতভাষার গ্রন্থ বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রাদেশিক লিপিতে লিখিত ও মুদ্রিত হওয়ায় সর্বত্র প্রচারের পক্ষে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। পঠন-পাঠন-পদ্ধতি ও পরীক্ষা-গ্রহণ ব্যবস্থার মধ্যেও এক স্থানের সহিত অন্য স্থানের যোগাযোগ না থাকায় নানা জটিলতার উদ্ভব হইয়া থাকে। এই অবস্থার প্রতিকার করা দরকার। এ বিষয়ে প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের দায়িত্ব এবং কর্তব্যও অস্বীকার করিতে পারা যায় না। ভারতে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার মূল ভিত্তি সংস্কৃত ভাষা—ইহার অনুশীলন যাহাতে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুব্যবস্থিত হইতে পারে সেজন্য প্রাচ্যবিদ্যানুরাগী প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই যত্নবান্ হওয়া উচিত। বর্তমান ব্যবস্থার ব্যাপক পর্যালোচনা ও তাহার ত্রুটিবিচ্যুতি দূরীকরণের উপায় নির্ধারণ সম্মেলনের পক্ষ হইতে করা যাইতে পারে।

বস্তুতঃ সাড়ম্বরে সাময়িক অধিবেশনের ব্যবস্থা করিয়াই সম্মেলন কর্তৃপক্ষের কৃতকৃতার্থ হইলে চলিবে না—প্রাচ্যবিদ্যার পক্ষে হিতকর বিবিধ কার্য সম্মেলনের পক্ষ হইতে যাহাতে সম্পাদিত হইতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দেশে বিদেশে এ জাতীয় নানা সম্মেলন নানারূপ কাজের ভার লইয়া থাকে। সংস্কৃত শিক্ষার ব্যাপার ছাড়া করিবার মত আরও অনেক কাজ আছে। প্রাচ্যবিদ্যানুশীলনে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও তাহাদের কার্যের পূর্ণ পরিচয়াত্মক বিবরণ সঙ্কলন—নানা স্থানে প্রচারিত বিক্ষিপ্ত পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক পুস্তিকার সবিবরণ-সূচী প্রকাশ, প্রাচ্যবিদ্যানুশীলনব্রতী জ্ঞানসাধকগণের পরিচয় ও কৃত কার্যের বিবরণ প্রচার প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে সম্মেলনকে উদ্যোগী হইতে হইবে। শোনা যায়, সম্মেলন কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। আশা করি, দুই বৎসর পরে অন্নামলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযোজকতায় ও বিশিষ্ট মনীষী শ্রীসর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ মহোদয়ের অধিনায়কতায় চিদম্বরমে অনুষ্ঠেয় সম্মেলনের আগামী অধিবেশনে তাঁহাদের আলোচনার ফলাফল প্রকাশিত হইবে এবং কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু কাজ আরম্ভ করা সম্ভবপর হইবে।

নবাবী ও দেওয়ানী আমলে রাজস্ব

শ্রীযামিনীমোহন ঘোষ

অশেষ সমৃদ্ধিশালী এই বাংলাদেশে সেকালে কোন পণ্যদ্রব্যের আমদানী করা দরকার হইত না। এখনকার মত পণ্যবিনিময় প্রথাও (barter) ছিল না। কৃষিজাত ও শিল্পজাত রপ্তানী-দ্রব্যের বিনিময়ে প্রভূত অর্থ বাংলায় আসিত। বাংলাই ছিল মুঘল বাদশাহদের সাম্রাজ্যের স্বর্গ। রাজস্বই তাঁহাদের আয়ের একটা প্রধান অংশ ছিল। বহুকাল পূর্ব্বে উৎপন্ন শস্যের অংশ রাজস্ব বাবদ দেওয়ার প্রচলন থাকিলেও অনেককাল হইতেই তাহার বিনিময়ে মুদ্রা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। অবশ্য জমিদারদের খাজনা বাবদ শস্য দেওয়ার প্রথা এখনও স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে, যেমন —উত্তর ময়মনসিংহের 'টঙ্ক' খাজনা। এস্থলে টঙ্ক টঙ্কন শব্দ বা তন্খা শব্দ হইতে উৎপন্ন তাহার আলোচনা অবান্তর, তবে টাকার পরিবর্তে যে শস্য দেওয়া হয় ইহাই এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। বাঁকুড়া জেলার সাঁজা খাজনাও অনুরূপ। এই প্রথা আদিবাসীদের মধ্যেই বিশেষ প্রচলিত। তাহারা এখনও বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করে। বাংলার রাজস্ব-প্রথা বিবৃত করিতে গেলে বহু অবান্তর কথা আসিয়া পড়ে। তোডরমল যে খাজনা ধার্য্য করেন তাহা 'দামে' ধার্য্য হয়। ৪০ দামে এক টাকা।

পাঠান আমলে আফগান জায়গীরদারগণ দেশরক্ষার ভার লইয়া সাধারণতঃ সীমান্ত অঞ্চলে কেল্লা তুলিয়া অৰ্দ্ধ স্বাধীনভাবে শাসন করিতেন। সুলতানের ক্ষমতা ও প্রতাপের উপর আনুগত্যের এবং রাজস্বের পরিমাণ নির্ভর করিত। মুঘল আমলে বাংলার ভূমি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—নিজামত ও হুজুরী। সুবেদারের নিজ ব্যয়, শাসন ও শান্তিরক্ষার জন্য যেসব কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল তাহাদের বেতন নির্ব্বাহে নিজামত ভূমির রাজস্ব নিয়োজিত ছিল। ইহার অধিকাংশই জায়গীর স্বরূপ কর্ম্মচারীরা দখল করিতেন, ইহার রাজস্বের সঙ্গে দেওয়ানের বা তাঁহার খালসা বিভাগের কোন সম্পর্ক ছিল না। জায়গীরদারদেরও কোন স্থায়ী স্বত্ব ছিল না, পদাধিকার বলে তাঁহারা দখল করিতেন। হুজুর শব্দের অর্থ কতকটা হিজ ম্যাজেষ্টি। হুজুর শব্দের এখন যত্রতত্র ব্যবহার। হুজুরী ভূমির রাজস্বের কতক অংশ খালসা ও কতক অংশ মনসবদারদের জায়গীর ছিল। খালসা ভূমির রাজস্ব দেওয়ানকে আদায় করিয়া দিল্লীর সম্রাটের নিকট পাঠাইতে হইত। দেওয়ান যেমন রাজস্ব আদায়ের জন্য তাগিদ দিতেন, তেমনি জায়গীরদারও তাঁহার প্রাপ্যের জন্য তাগিদ দিতেন। ঢাকায় রাজধানী থাকাতে নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে নিজামতের কর্ম্মচারীদের জায়গীর দেওয়া হইত। কোন কোন স্থলে জায়গীরদারগণ নিজেরাই তাঁহাদের জায়গীরের খাজনা আদায় করিতেন, আবার অনেক ক্ষেত্রেই জায়গীরের বাবদ নির্দ্দিষ্ট টাকা পরগণার রাজস্ব হইতে বরাত দেওয়া ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পাতিলাদহ পরগণার কথা উল্লেখ করা যায়।

আবার, নিজামত ভূমির আয় হইতে সুবেদারের ব্যয়, নিজামের ব্যয় শাসন-সংরক্ষণ ও দেশরক্ষার ব্যয় অকুলান হওয়াতে হুজুরী বা দেওয়ানী ভূমির আয় হইতে কতক অংশ জায়গীর বাবদ দেওয়া হইত। দেওয়ানী ভূমির আয়ের কিয়দংশ জায়গীর বাবদ বাদ দিয়া যে অংশ অবশিষ্ট থাকিত তাহাই খালসার নিট আয়রূপে ধরা হইত। এইরূপ জায়গীর পূর্ব্ববাংলার সীমান্ত অঞ্চলেই বেশী ছিল, কারণ সেখানে মগদের অত্যাচারের জন্য নাওয়ারা বাহিনী রাখিতে হইত। সাধারণতঃ নাওয়ারা বাহিনী ঢাকায় বেশীর ভাগ থাকিত মগ ও পর্ত্তুগীজদের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য। মুর্শিদকুলী, জাফর খাঁর আমলে ৭৬৮খানা রণতরী ও নৌকা ছিল। ইহাতে দেশীয় নৌসেনা ব্যতীত কামান দাগিবার জন্য গোলন্দাজ ৯২৩ জন ফিরিঙ্গী ছিল। ইংরেজ আমলের প্রথম ভাগে যখন চট্টগ্রাম কোম্পানীর হস্তগত হয়, তখনও এই সব গোলন্দাজ (খ্রীষ্টান নামে অভিহিত) ছিল। জাফর খাঁর সময়ে ইহার জন্য আট লক্ষ তের হাজার টাকা ব্যয় হইত। জাফর খাঁর পূর্ব্বে এইরূপ ব্যয় সরকার হইতে না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জমিদারদের উপর নাওয়ারা বাহিনী লইয়া মগদের আক্রমণ-প্রতিরোধের ব্যবস্থা ছিল। তাঁহারাই বাহিনীর মাঝি-মাল্লা, সৈন্য রাখিতেন। এই জন্যই পূর্ববাংলায় দশ কোশা, নয় কোশা (ময়মনসিংহ জেলা), সতের কোশা, চৌদ্দ কোশা, আট কোশা (ত্রিপুরা জেলা) ইত্যাদি জমিদারীর নাম এখনও পুরাতন কাগজ-পত্রে দেখা যায়। কোশা এক প্রকার রণতরী। বহু প্রকার রণতরীর প্রচলন ছিল, যথা—মহালগিরি, কোশা, বজরা, ময়ূরপঙ্খী, পালোয়ার ইত্যাদি। যাঁহারা এ বিষয়ে জানিতে চান, তাঁহারা বাহারিস্থান-ই-ঘায়বী গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্য যে নৌবাহিনী লইয়া মুঘল সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা দেখিবেন। পরে জমিদারগণ নৌবাহিনী না যোগাইয়া রাজস্ব দিতেন। রাজস্বের কতক অংশ জায়গীর বলিয়া নিজামত রাজস্বভুক্ত হইত। মগদের আক্রমণ কেবল পূর্ব্ববাংলায় সীমাবদ্ধ ছিল না, দক্ষিণ বাংলার যে অংশ সুন্দরবনে পরিণত হইয়াছে, তাহাও মগদের অত্যাচারের ফলে। ইহা রেনেলের ম্যাপে উল্লিখিত আছে।

মগদের অত্যাচারের একটা দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করিব। যশোহর ভূষণার রাজকুমারকে তাহারা বন্দী করিয়া লইয়া যায় এবং পর্ত্তুগীজ পাদ্রীর নিকট বিক্রয় করে। পরে পাদ্রী এই রাজকুমারকে লেখাপড়া শিক্ষা দেন এবং ডন আন্তোনিয় ডি রোজারিও নামকরণ করেন। এই আন্তোনিয় বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ লেখেন। মগদের অত্যাচার নিবারণের জন্য স্বাধীন সুলতান হোসেন শাহ এখন যেখানে বোটানিক্যাল গার্ডেন সেখানে এক কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়া

একটি থানা স্থাপন করেন। ইহাও পরবর্তীকালে মগকেল্লা বা থানা-কেল্লা নামে পরিচিত হয়। ইহার গোলন্দাজগণ দেশীয়। তাহারা আরশা পরগণায় বহু জমি ভোগ করিত। বোটানিক্যাল গার্ডেনের জন্ম এই সব ভূমি গৃহীত হইলে তাহাদিগকে শ্যামপুর থানার অধীনে জমি দেওয়া হয়। এই মগকেল্লার অপর পারে ছিল মাটির কেল্লা বা মেটিয়াবুরুজ। ইংরেজেরা মগদের নৌকা ঠেকাইবার জন্ম এই পারের কেল্লার মধ্যে লোহার শিকল বাঁধিয়া দেয়।

এইরূপে দেখা যায়, শাসন, দেশরক্ষা, নাজিমের ব্যয় ইত্যাদি বাবদ বহু রাজস্ব ব্যয় হইত। সীমান্তবর্তী পরগণা-সমূহের, যথা—আসামের বিজনী, বিদিগাঁও, রাঙ্গামাটি, করইবাড়ী ইত্যাদির জমিদারদের নিকট হইতে রাজস্ব বাবদ হাতী আদায় হইত। এই সব পরগণার জমিদারগণ এবং সুসঙ্গের মহারাজা অনেকটা অর্দ্ধ-স্বাধীন ছিলেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে করইবাড়ীর জমিদার গারোদের কয়েকটি গ্রাম পোড়াইয়া দিলে ময়মনসিংহ সেরপুরের জমিদার গারোদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া করইবাড়ীর জমিদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন; এই লড়াইয়ে উভয় জমিদার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। জমিদারদের ব্যবহৃত অস্ত্রাদি এখনও তাঁহাদের বাড়ীতে দেখা যায়। করইবাড়ীর জমিদার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া গারো পাহাড়ে আশ্রয় নেন। এই সংঘর্ষের মূলেও রাজস্ব। যেসব গারো পাহাড়ের পাদদেশের হাটে আসিয়া তুলা, কস্তুরী ও অগুরু-চন্দন-কাঠের বিনিময়ে লবণ ও কুকুর লইত তাহাদের নিকট হইতে জমিদারগণ কর আদায় করিতেন। করইবাড়ীর জমিদার গারোদের হাটে আসা বন্ধ করিয়াছিলেন। ত্রিপুরার রাজা হাতী ধরিয়া নবাবের নিকট উপঢৌকন-স্বরূপ পাঠাইতেন, তবে তাঁহার জমিদারী চাকলা রোসনাবাদের রাজস্ব হইতে বার্ষিক তের হাজার টাকা হাতী ধরার খেদা-খরচ বাবদ বাদ পাইতেন। সুসঙ্গের রাজারা রাজস্ব ব্যতীত অগুরু, চন্দন, কস্তুরী ইত্যাদি দিতেন। বর্ত্তমান মহারাজা গারো পাহাড় হইতে চারা আনিয়া সুসঙ্গে অগুরু চন্দনের চাষ করিয়াছেন। চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টে শস্তরক্ষার্থ সরকার হইতেই খেদা করিয়া হাতী ধরিবার ব্যবস্থা করিতে হইত, তাহা না হইলে পাহাড় হইতে বন্য হাতী আসিয়া শস্য ও গৃহাদি নষ্ট করিত। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী খেদা খরচ তুলিয়া দিতে চাহিলে ঢাকার চীফ, আপত্তি করিয়া লিখিলেন, যদি হাতী ধরা বন্ধ করা হয় তবে হাতীর সংখ্যা মনুষ্য-সংখ্যা হইতে বেশী হইবে। তবে নবাবী আমলে সাধারণতঃ সর্ব্ব-প্রকার করই মুদ্রায় আদায় হইত। পশ্চিম বাংলার সীমান্ত রক্ষা করিতেন ঘাটোয়ালরা। ইংরেজ আমলে এই সব ঘাটোয়ালের জমি বাজেয়াপ্ত হইয়া খাজনা ধার্য্য হইয়াছে। বীরভূমের বিদ্রোহী জমিদার রাজা আসাদজুমানের বিরুদ্ধে নবাব মীর কাশিম ব্যর্থ অভিযান করিয়াছিলেন। আনন্দমঠের মুসলমান জমিদার এই রাজা আসাদজুমান খাঁর বাসভূমি ছিল অজয়-তীরে। ইংরেজ আমলেও বর্দ্ধমানের মহারাজার বার শত নগদী সৈন্য ছিল। এই সৈন্যবাহিনী ভাঙিয়া দিবার জন্ম ইংরেজ বহু ষড়যন্ত্র করে। পশ্চিমবঙ্গে সাহসী দুর্দ্ধর্ষ সৈন্য ছিল—রায়বেশীগণ, সুদূর নোয়াখালী জেলায় মগদের দমনের জন্ম ইহারা নীত হইয়াছিল এবং জায়গীরদার রূপে ভূমি ভোগ করিত, যাহার শেষ নিদর্শন নবাব মীরজাফরের আমলেও সন্দীপে দেখা যায়।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, স্বাধীন, অর্দ্ধ-স্বাধীন জায়গীরদার জমিদার, হুজুরী ও নিজামতের তহশীলদার এবং ইজারাদার ইত্যাদি নানা শ্রেণীর ভূমির খাজনা আদায়কারী ছিলেন। ইংরেজের বিচিত্র বিধানে জগাখিচুড়ি তৈয়ার হইয়া ইঁহারা সকলে দশসালা বন্দোবস্ত-কালে ভূম্যধিকারী আখ্যা পাইলেন। রাজস্ব ধার্য্য ছিল তুমার জমার উপর, অর্থাৎ টোডরমল যে কর বিঘাপ্রতি পরগণা নিরিখ ধার্য্য করিয়া গিয়াছিলেন, সেই হার অনুসারে আবাদী জমির উপর যে কর ধার্য্য হইত তাহাকে আসল তুমারী জমা বলে। তার উপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হারে আবোয়াব ধার্য্য হইয়াছিল।

মুদ্রার সঙ্গে কর-ধার্য্য-প্রথা অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। নবাবী আমলে দেশের সকল প্রকার করই জমিদার মারফত রাজস্বের সঙ্গে আদায় হইত। কৃষি-আয়কর না থাকিলেও নবাবের প্রয়োজনমত রাজস্বের উপর আবোয়াব ধার্য্য হইত। এই আবোয়াবের কতকগুলি সারা বাংলায় প্রযোজ্য হইত। যথা 'কস্থর' বা দেশ খরচ অর্থাৎ মফস্বলে আদায়ী রাজস্বের বিভিন্ন টাকার সমতা রক্ষার জন্যও খরচ —জমিদারী টাকা প্রতি আড়াই আনা হিসাবে আদায় হইত। ইহাও এক প্রকার বাট্টা অর্থাৎ টাকায় আড়াই পয়সা, সরঞ্জামি বা সিবান্দি খরচ টাকায় দেড় আনা। তার পর আবোয়াব আলি সাহি বা সরকার আলি প্রায় সাড়ে পাঁচ আনা—মোট ।৵০ আনা। ইহার পর মনসুরগঞ্জ অর্থাৎ নবাব আলীবর্দ্দি খাঁর প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌল্লার মনসুরগঞ্জে প্রাসাদ তৈয়ার করার খরচ—ইহা অবশ্য সব পরগণায় বসানো হয় নাই। তার পর চৌথ বর্গীদের দেওয়ার বাবদ। এই সব তুমার জমার উপর ধার্য্য হইত। চট্ট-গ্রাম অঞ্চল মগদের নিকট হইতে সায়েস্তা খাঁর পুত্র বুজুর্গ উমেদ খাঁ ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দখল করেন। সেখানে প্রথমতঃ কোন খাজনাই লওয়া হইত না, পরে আবাদের সঙ্গে সঙ্গে সামান্য জমা ধার্য্য হয়। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে জমার উপর টাকা প্রতি বৃদ্ধি চাপাইয়া দেওয়া হইতে থাকে। এইরূপে ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দের জমার উপর ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের জমা টাকা প্রতি প্রায় চারি টাকা বৃদ্ধি পায়। সফররাজ খাঁর আমলের শাসনকর্ত্তা জুলকাদের খাঁ নূতন রাজধানী বা দৌলত বাবদ টাকায় ৵৮ গণ্ডা আবোয়াব ধার্য্য করেন। আবার দশমাশা টাকার টাকায় আট আনা ও সুরাট টাকার উপর ⁄১৮ গণ্ডা বাট্টা ধার্য্য করেন। এই জুলকাদের খাঁ সরফরাজ খাঁর দলভুক্ত ছিলেন। মীরকাশিমের নিকট হইতে ইংরেজরা চট্টগ্রামের জমিদারী স্বত্ব পাইলে চট্টগ্রামের শেষ শাসনকর্ত্তা রেজা খাঁ ভেরেলেষ্টকে হিসাবপত্র বুঝাইয়া দেন।

এইরূপে আসল তুমারী জমা অর্থাৎ আবাদী জমির উপর পরগণায় প্রচলিত জমির মাপের উপর টোডরমল কর্তৃক ধার্য্য নিরিখ অনুসারে জমা ধার্য্য হইত। তাহার সহিত সর্ব্বপ্রকার আবোয়াব, বাট্টা ইত্যাদি যোগ হইত। জমিদারের আদায় করিবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ঐ টাকা হইতে এগার ভাগের এক অংশ বাদ দিয়া নিট রাজস্ব ধার্য্য হইত। জমিদারের নিজ পদগৌরব ও সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তাহাদিগকে বিনা খাজনায় নিজ জোত, খাস, হানাবাড়ী ইত্যাদি ভোগ করিতে দেওয়া হইত। ইহা ব্যতীত তাঁহাদের রাজকর্ম্ম করার জন্ত নানাবিধ চাকরান ছিল, যথা: ধোপা, নাপিত, মালি, পাল্কীর বেহারা, নৌকার মাঝি ইত্যাদি। এমন কি তহশীলদার আমলা গোমস্তা ইত্যাদিও চাকরান জমি ভোগ করিতেন। নবাবের গৃহস্থালির যে আটত্রিশ কারখানা ছিল তাহার কর্ম্মচারিগণও নিজামত হইতে চাকরান জমি ভোগ করিতেন। এইসব কারখানা হইল, পিলখানা হইতে আরম্ভ করিয়া চিরাগীখানা ইত্যাদি। গৃহস্থালির সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের জন্তই ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ ছিল।

লাখেরাজ জমি দুই প্রকার ছিল: বাদশাহী ও অ-বাদশাহী। দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে ফরমান-প্রাপ্ত যে লাখেরাজ তাহাকে বাদশাহী লাখেরাজ বলিত। নূতন বাদশাহের নিকট হইতে সনদ নূতন করিয়া লইতে হইত। কোন রাজকর্ম্মচারীর লাখেরাজ সনদ দিবার ক্ষমতা ছিল না। জমিদারগণ তাহাদের এলাকার ভিতর যে লাখেরাজ দিতেন তাহাকে অ-বাদশাহী লাখেরাজ বলিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কয়েক বৎসর পরেই ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট উভয় প্রকার লাখেরাজের সনদ পরীক্ষা করিয়া যেগুলি অগ্রাহ্য করেন সেগুলির মালিকদের উপর চিরস্থায়ী রাজস্ব ধার্য্য হয়। থাকবস্ত জরিপের পর যেসব জমিদারীভুক্ত লাখেরাজ পঞ্চাশ বিঘার অতিরিক্ত পাওয়া যায় তাহাও বাজেয়াপ্ত করিয়া কর ধার্য্য করা হয়। এই প্রকারে দশসালা বন্দোবস্তকালে যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছিল তাহা হইতে অধিকতর রাজস্ব এই সকল বাজেয়াপ্তি লাখেরাজ ও নদীমধ্যস্থ বৃহৎ বৃহৎ চর হইতে দিয়ারা বন্দোবস্ত করিয়া আদায় হয়।

বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গের জেলাসমূহে রাজস্বের হার অন্যান্য অঞ্চল হইতে উচ্চতর। ইহার কারণ এই যে, ইংরেজরা প্রথমেই কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের জমিদারী স্বত্ব পান। তখন ইঁহারা বিঘাপ্রতি তিন টাকা যে প্রচলিত আসল তুমারি জমা ছিল তাহা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু নবাব নির্দ্দেশ দেন যে, এই খাজনার হার বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা বাদশাহেরও নাই। যাহা হউক, পরবর্ত্তীকালে মীরজাফরের নিকট হইতে চব্বিশ পরগণা পাওয়ার পর ইংরেজের কড়া জমিদারী শাসনে কর ধার্য্য হয়। মীরকাশিমের নিকট হইতে বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার জমিদারী স্বত্ব পাইয়া ইংরেজ কালেক্টারগণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া কর ধার্য্য করেন। এখনও দেখা যায় যে, প্রজাদের নিকট হইতে আদায়ী খাজনার পরিমাণ রাজস্ব হইতে খুব বেশী নহে। নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরের মহারাজার উপর দশসালা বন্দোবস্তের পূর্ব্বে বৎসরের পর বৎসর রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানো হয়। ফলে তাঁহার জমিদারীর অনেক অংশ হস্তচ্যুত হয়। এইসব আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, দশসালা বন্দোবস্তের সময়েও পশ্চিমবঙ্গে রাজস্ব নিতান্ত কম ছিল না। তৎকালে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে পতিত, অনাবাদী, বিল ও খাল ইত্যাদি কম ছিল। সেইজন্য জমিদারী হইতে লাভও কম হইত। পরবর্ত্তীকালে পথকর, পূর্ত্তকর, শিক্ষাকর, আয়কর ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার কর ধার্য্য করিয়া রাজস্ব বাবদ বহু পরিমাণ টাকা আদায় হইতেছে। জমিদারী প্রথা তুলিয়া দিলে এই পরিমাণ অর্থ আদায় হইবে কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। বিশেষতঃ, ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, শিবোত্তর, ভুক্ততালুক ইত্যাদি যে সকল নিষ্কর রহিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে তাহাও ভাবিয়া দেখা দরকার।

ঢাকাই ছিল রাজবন্দীদের নির্ব্বাসন-স্থান। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় পেন্‌সনপ্রাপ্ত রাজবন্দীদের তালিকায় সুজা খাঁ, সরফরাজ খাঁ, জুলকাদের খাঁ, হোসেনকুলী খাঁ, একরামদ্দৌলা ইত্যাদির বংশধরগণের সঙ্গে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার প্রিয়তমা বেগম লুৎফুন্নেসা ও তাঁহার অসামান্যা সুন্দরী কন্যা উম্মতজহুরার নামও দেখা যায়। কালের কি বিচিত্র গতি! বাংলার বিভিন্ন নবাবদের, তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের ও সমর্থনকারীদের বংশধরগণ ঢাকায় আনীত হইয়া বৃত্তিভোগী ছিলেন। সবচেয়ে বেশী বৃত্তি পাইতেন নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার পত্নী ও কন্যা—তাহাও মাত্র ছয় শত টাকা ছিল। একালে ইহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এই সব বৃত্তিভোগী ব্যতীত লুপ্ত নাওয়ারার দেওয়ান ইত্যাদির বংশধরগণ, নিজামতের কবিরাজ ও হেকিম এবং দারোগাদের বংশধরগণও বৃত্তি পাইতেন। হোসেনী-দালানে পর্ব্ব উপলক্ষে আলো দেওয়ার জন্য ২৫০০৲ টাকা ধার্য্য ছিল। প্রধান প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্রে (শাহবন্দরে)—যথা, ঢাকা, হুগলী ইত্যাদি স্থানে নবাবের কর্ম্মচারীরা (ফৌজদারের অধীন দারোগারা) শুল্ক আদায় করিতেন। কিন্তু হাট-বাজারের কর (সায়রজমা) বা চলতি নৌকার মালের উপর কর (সায়র চলন্ত) জমিদারগণ আদায় করিয়া পরগণার রাজস্বের সঙ্গে সরকারে দাখিল করিতেন। মীরজাফর ইংরেজের প্রাপ্য দেনার জন্য বর্দ্ধমান ও নদীয়ার মহারাজাদের এবং হুগলী ও হিজলীর ফৌজদারদের উপর "বরাত" দিয়াছিলেন। মরাঠাদের ভয়ে মুঘল সম্রাট বাংলার রাজস্বের চৌথ আলীবর্দ্দিকে দিবার বরাত দিয়াছিলেন। মরাঠাগণ তাহা জোর করিয়া আদায় করিতে বাংলায় আসিয়াছিল। ইহাই বর্গীর হাঙ্গামা। রাজস্ব হইতে পরিশোধ করিবার জন্য এইরূপ বরাত দেওয়ার প্রথা কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও জমিদারদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাঁহারা তাঁহাদের দেয় কোন দিন নিজেরা না দিয়া তাঁহাদের কোন কাছারির নায়েব গোমস্তাকে দিবার জন্য বরাত চিঠি দিয়া দিতেন। প্রাপক কাছারিতে বসিয়া চাপ দিয়া টাকা আদায় করিয়া লইতেন। আয়কর, সুপারট্যাক্স বা সারচার্জ্জ বলিয়া

আইনতঃ কোন কর আদায়ের ব্যবস্থা না থাকিলেও ধনী, বণিক মহাজনদের নিকট হইতে নজরানা বাবদে নবাব টাকা আদায় করিয়া লইতেন। কোন পদে নিযুক্ত হইয়া সনদ হাসিল করিতে নজরানা দিতে হইত। প্রত্যেক জমিদারকে সনদ হাসিলের সময়ও নজরানা দিতে হইত। এইরূপে সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ হইতে নজরানা আদায় হইত। দর্পনারায়ণ কানুনগো পদপ্রাপ্তির সময় মুর্শিদকুলী খাঁকে দুই লক্ষ টাকা নজরানা দেন। মোবারকউদ্দৌল্লার অভিভাবিকা-পদ প্রাপ্তির জন্য মণিবেগম ক্লাইভকে দেড় লক্ষ টাকা নজরানা দেন। মণিবেগম ইংরেজদের নিকট "Mother of the company" (কোম্পানীর মাতা) বলিয়া পরিচিত ছিলেন। উর্মিচাঁদ মীরজাফরকে সিরাজউদ্দৌল্লার বিরুদ্ধে প্রলুব্ধ করার জন্যই কি তিনি এই আশা পাইয়াছিলেন! নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাসের দেওয়ানী পদপ্রাপ্তি বাবদ নজরানা দেওয়ার কথা অবিশ্বাস্য নহে। দুর্লভরাম বা রাজা দুর্লভের (পুরা নাম মহারাজা মহীন্দ্রনারায়ণ দুর্লভরায়) জীবন এইরূপ বিভিন্ন আকারের নজরানা দেওয়ার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। উঁহার পুত্র রায়রায়াণ রাজবল্লভের এক আরজিতে কিরূপে তাঁহার পিতা সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন তাহা বিবৃত আছে। এই দুর্লভরাম সিরাজউদ্দৌল্লার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে একজন প্রধান নায়ক ছিলেন। প্রথমতঃ, মীরজাফরের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানীর সন্ধিসূত্রে দেয় তিন কোটি টাকার মধ্যে তিনি দুই লক্ষ টাকা দেন, তৎপর মীরজাফরের অধীন চৌদ্দ-পনর হাজার সৈন্যের বাকি বেতন বাবদ প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা দেন, তাহা চাহিতে গিয়াই মীরণের সহিত ঝগড়া হওয়াতে কলিকাতায় বিতাড়িত হন। তারপর ওলন্দাজদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধের সময় (১৭৫৯ খ্রীঃ) লর্ড ক্লাইভের অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য গঠনে তাহার ১,৭০,০০০ টাকা খরচ হয়। তারপর মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের গোলযোগের সময় তিনি গবর্ণর ভ্যানসিটার্টের আদেশমত সৈন্যগঠনে ১,৭৩,০০০৲ টাকা ধার দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মাত্র ৫৫,০০০৲ টাকা পাইয়াছিলেন। ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ের সুবিধা করিয়া দেওয়া বা তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়াই নজর আদায়ের চিরানুমোদিত প্রথা ছিল। আলীবর্দি খাঁর সময়ে ইংরেজের কাশিমবাজারের কুঠি হইতে বার লক্ষ টাকা নজরানা আদায় করা হইয়াছিল। জগৎশেঠের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া এই টাকা দেওয়া হয়। আবার ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার কুঠিয়ালের নিকট নজরানা দাবি করা হইলে, কুঠিয়াল তাহা দিতে রাজী না হওয়ায় জনসাধারণের উপর পরোয়ানা জারী হইল যে, ইংরেজের সঙ্গে কেহ ব্যবসা করিতে পারিবে না। ইহার পর হুকুম হইল, ইংরেজের কুঠীতে কেহ খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে না। এই বয়কটে বাধ্য হইয়া চতুর ইংরেজ আলীবর্দি খাঁকে একটা আরবী তাজী ঘোড়া নজর দিয়া রেহাই পাইল। সোরার ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকারলাভের জন্য দীপচাঁদ নবাব আলীবর্দিকে ২৫ হাজার টাকা নজরানা দিয়াছিলেন। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রাজবল্লভ ঢাকায় নোয়াজিস মহম্মদের নায়েব হইয়া গিয়া ইংরেজ কুঠিয়ালকে নজরানা লইয়া দেখা করিতে বলিলেন। কিন্তু প্রথমে কুঠিয়াল রাজী হইলেন না। পরে তিনি ৪,৩০০ টাকা নজরানা বাবদ দিলেন। পর বৎসর রাজবল্লভের পুত্র 'নবাব' কৃষ্ণদাসের গোমস্তা ওলন্দাজদের নিকট নজরানা দাবি করিয়া তাহাদের একজন কুঠিয়ালকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। নজরানা দিবার প্রতিশ্রুতি দিলে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, এই রাজা রাজবল্লভ দুর্লভরামের পুত্র রাজা রাজবল্লভ নহেন। ইনি ঢাকার রাজনগর প্রতিষ্ঠাতা রাজা রাজবল্লভ। ইনি প্রথমে সরফরাজ খাঁর আমলে ঢাকার নাওয়ারা দপ্তরে কার্য্য করেন। আলীবর্দি খাঁর আমলে নোয়াজিস মহম্মদের অধীনে ঢাকায় তাঁহার নায়েব হিসাবে কার্য্য করেন। নোয়াজিস-পত্নী আলীবর্দির কন্যা ঘেসেটি বেগম সিরাজউদ্দৌল্লার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। রাজবল্লভ ঘেসেটি বেগমের প্রিয়পাত্র ছিলেন। সেইজন্য সিরাজউদ্দৌল্লা নবাব হইলে তাঁহার ভয়ে রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস সাগর-স্নান করিবার ভান করিয়া কলিকাতায় ইংরেজের দুর্গ ফোর্ট উইলিয়মে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সিরাজউদ্দৌল্লার কলিকাতা আক্রমণের পূর্বে রাজবল্লভ সিরাজউদ্দৌল্লার সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থী হন। সেইজন্য কলিকাতা বিজয়ের পর তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাসকে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা খেলাত দিয়া সম্মানিত করেন। ইহার পর ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ইংরেজদের সহিত সন্ধি স্থাপন করাইয়া ইনি সিরাজউদ্দৌল্লার প্রিয়পাত্র হন। সেইজন্য নবাব তাঁহাকে খেলাত, স্বর্ণখচিত ঝালরওয়ালা পাল্কী ও নহবৎ পুরস্কার দেন। ইঁহার সাহায্যে ওলন্দাজগণ নবাবের সঙ্গে দরবার করিতেন। সিরাজউদ্দৌল্লার পতনের পর মীরজাফরের পুত্র মীরণের ইনি বিশেষ প্রিয়পাত্র হন এবং মীরণ বা ছোট নবাবের দেওয়ান নিযুক্ত হন। নবাব আলীবর্দি খাঁ মরাঠা আক্রমণে রিক্তহস্ত হইলে বহু লক্ষ টাকা দিয়া জগৎশেঠ তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সোরার তৎকালীন একচেটিয়া ব্যবসায়ী আরমানি বণিক সাজিয়া ওয়াজিদ বহু অর্থ দিয়া সিরাজউদ্দৌল্লাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌল্লা তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন, বণিকশ্রেষ্ঠ (ফকর-উল-তুজার) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌল্লা কলিকাতা জয় করিয়া ফিরিবার পথে তাঁহাকে সাহায্য করা হয় নাই বলিয়া ওলন্দাজদের দোষী সাব্যস্ত করিলেন এবং তাহাদের হুগলীর কুঠী আক্রমণ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। তখন তাঁহার ক্রোধ শান্ত করিবার জন্য হুগলী কুঠীর কুঠিয়াল অনন্যোপায় হইয়া খাজে ওয়াজিদের শরণাপন্ন হইলেন। সিরাজউদ্দৌল্লা প্রথমতঃ ৫০ লক্ষ টাকা দাবি করিলেন, পরে খাজে ওয়াজিদ, দুর্লভরাম ও নবাবের অন্যান্য বিশ্বস্ত পারিষদের মধ্যস্থতায় চার লক্ষ টাকায় রাজী হইলেন। ওলন্দাজ কুঠিয়াল চার লক্ষ টাকা নগদ দিতে সমর্থ না হওয়াতে নবাব বরাবর এক খত লিখিয়া দিলেন। খাজে ওয়াজিদের গোমস্তা পরের দিন তাহা ফেরত আনিয়া বলিলেন, নবাবের নগদ টাকার দরকার, সৈন্যদের মাহিনা দিতে হইবে; খত লইবেন না। তাঁহার

সঙ্গে জগৎশেঠের কুঠীর দেওয়ান বৈদ্যনাথকে আনিয়াছিলেন। অগত্যা ওলন্দাজ কুঠিয়াল জগৎশেঠ ফতেচাদজী ও শেঠ আনন্দচাঁদজী বরাবর চার লক্ষ টাকার খত লিখিয়া দিলেন—মাসিক সুদ শতকরা বার আনা। জগৎশেঠের কুঠী হইতে নবাবকে টাকা দেওয়া হইল। ইহার পর বৎসর (১৭৫৭ খ্রীঃ) ইংরেজের সহিত সন্ধির পর সিরাজউদ্দৌলা আবার ওলন্দাজদের উপর দাবি করিলেন। যদিও সিরাজ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বিষয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন তথাপি তিনি নিরুপায়। তাঁহার তখন প্রিয়পাত্র ছিল মোহনলাল ও রণজিৎ রায়। জগৎশেঠদের উপর বিরাগ, সেইজন্য তাঁহাদের পক্ষে রণজিৎ রায় কথাবার্তা চালাইতেন। যাহা হউক, এবার ওলন্দাজেরা টালবাহানা করিতে লাগিল, দেখা যাক ষড়যন্ত্রের ফল কি হয়। ফলে আর কিছু দিতে হইল না। মীরজাফরের সন্ধি অনুসারে ইংরেজের প্রাপ্য তিন কোটি টাকার মধ্যে দুর্লভরাম দুই লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মীরজাফরকে ওলন্দাজদের চুঁচুড়ার কুঠী আক্রমণে কাশিম খাঁকে ৫০,০০০ স্টার্লিং দিয়া ওলন্দাজগণ রেহাই পান। ঐ সনেই নবাব কাশিমবাজারের ওলন্দাজ কুঠীর কুঠিয়ালকে ডাকাইয়া বলিলেন, তোমরা সৈন্য সংগ্রহ করিতেছ। এই অজুহাতে তাহাদের নিকট সাড়ে বাইশ টন সোনা বা ৫০ লক্ষ টাকা নজর দাবি করিলেন। ওলন্দাজ কুঠিয়াল প্রমাদ গণিলেন। তখন রায়রায়াণ ও উমেদরায়ের মধ্যস্থতায় সাড়ে সাত টন সোনা দিয়া রেহাই পাইলেন। সোনার দাম কি তখন এত সস্তা ছিল বা সিক্কার মান কি এত বেশী ছিল? মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় এক তোলা সোনার দাম ১৲ সিক্কা টাকা মাত্র। ইহা হইল ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা। চৈতসিংহের বিরুদ্ধে অভিযানে হেষ্টিংসকে নাগপুরের রাজা ভোঁসলার প্রতিনিধি বেণীরাম পণ্ডিত এক লক্ষ টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। এইরূপে স্বেচ্ছায় বা জোর করিয়া তৎকালে ধনীদের নিকট হইতে নজর বা কর আদায় হইত। যদিও সেকালে রাষ্ট্রের মজুত ধন বলিয়া কিছু ছিল না তথাপি নবাব বা তাঁহার পরিবারভুক্ত সকলের মণি-মুক্তা মোহর জহরত রাষ্ট্রের অনটনকালে ব্যবহৃত হইত। বক্সারের যুদ্ধে অযোধ্যার নবাব পরাজিত হইয়া রিক্তহস্ত হইলে তাঁহার প্রিয় বাহু বেগম তাঁহাকে ধন-রত্নাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। মজুত স্বর্ণ (gold reserve) বলিয়া কিছু না থাকিলেও এইরূপ ধন-রত্নাদি অসময়ের সহায় হইত, বরং কোম্পানীই কোন মজুত অর্থ রাখিত না বলা যাইতে পারে। যাহা মজুত হইত তাহা যাইত সাগরের অপর পারে। ইহার পর "Sterling Balance" হইল। এইরূপে ধনীদের নিকট তাঁহাদের সঞ্চিত ধন হইতে নজর আদায় হইত। অনন্যোপায় হইলে মহাজনদের নিকট হইতে বাংলার রাজস্বের মাতব্বরিতে নবাব টাকা কর্জ্জ লইতেন। আবার, কোন স্থলে প্রবল পক্ষের দাবি মিটাইতে না পারিলে রাজস্বের কোন অংশ প্রতিপক্ষের নিকট ছাড়িয়া দিতেন। আলীবর্দ্দি খাঁ মরাঠাদের বাকি চৌথের দাবি মিটাইতে না পারিয়া উড়িষ্যা প্রদেশ মরাঠাদের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, যদিও ঠাট বজায় রাখিবার জন্য দেওয়ান দুর্লভরাম মরাঠা শাসনকর্ত্তাকে উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের জন্য এক সনদ দিয়াছিলেন। বাংলা ও বিহারের চৌথের জামিনস্বরূপ মেদিনীপুরের অন্তর্গত পটাশপুর পরগণাও মরাঠা-অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। সেইরূপ ইংরেজের দাবি মিটাইবার জন্য মীরকাশিম বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী স্বত্ব দিয়াছিলেন। ইহাও কি একরূপ 'লীজ-লেণ্ড' নহে? তাই বলিতেছি যে, মজুত স্বর্ণ না থাকিলেও নবাবী আমলে অর্থসংগ্রহের বহুবিধ উপায় ছিল। তখন নগদ অর্থের কারবার—বাজেটের সমতা রক্ষা করিতেই হইবে। বর্ত্তমান জমিদারী প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব-প্রথার আমূল পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। পথকর, পূর্তকর, শিক্ষাকর এবং কৃষি-আয়কর উঠাইয়া দিয়া সেস্থলে একটা একত্রীকৃত কর জমির চাষীর উপর ধার্য্য হইবে। যেসব স্থানে সেচকর আছে তাহাও খাজনার সঙ্গে যুক্ত হইবে। বহু শতাব্দী প্রচলিত কর-দায়-প্রথা এবং দেড় শত বৎসরের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠিয়া যাইবে। ইহার আদি ইতিহাস পাঠকগণের জানিয়া রাখা দরকার।*

* ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার লেখা *Select Chapters on Mymensingh* পুস্তিকায় এবং *Bengal Past and Present*-এ প্রকাশিত 'Revenue History of a Bengal Pargana' প্রবন্ধ অবলম্বনে এই প্রবন্ধের কতক অংশ লিখিত হইয়াছে।—লেখক

কথার রাজা ডক্টর জনসন

রেজাউল করীম

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে সেক্সপীয়র, মিল্টন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীটস্, ব্রাউনিং, টেনিসন এবং আরও অনেক প্রথিতযশা কবি ও শিল্পী অমর স্থান অধিকার করিয়া আছেন। কোন দিক দিয়াই ডক্টর জনসন তাঁহাদের পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য নহেন। তবুও আশ্চর্যের কথা এই যে, তিনিও ইংরেজী সাহিত্যে স্থায়ী আসন পাইয়াছেন, আর সে আসনে তিনি সম্মানের সহিত প্রতিষ্ঠিত। ডক্টর জনসন নিজেই যেন একটা প্রতিষ্ঠান। ইংরেজ জাতি তাঁহাকে সমগ্র ব্রিটিশ-মনের প্রতীক বলিয়া মনে করে। সেক্সপীয়র, শেলী, কীটস কেহই ইংরেজ জাতির প্রতীক বা প্রতিনিধি নহেন। যদি একজনমাত্র লোককে সমগ্র ইংরেজ জাতির প্রতিনিধি বলা যাইতে পারে, তবে তিনি হইতেছেন ডক্টর জনসন। সাহিত্যিক প্রতিভা অথবা কাব্যগুণের জন্য নহে, বরং তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রগুণেই তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

ডক্টর জনসন লিখিয়াছেন অনেক—নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, সমালোচনা। সাহিত্যের এই সব দিকে তিনি নিজস্ব প্রতিভার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কালের বিচারে আজ তাঁহার রচনার মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থ খুব কম লোকেই পাঠ করে। সেক্সপীয়র, মিল্টনের কথা না হয় বাদ দিলাম; ড্রাইডেন, পোপ, গ্রে, শেলী, কীটসের কবিতা যত লোক পড়ে জনসনের রচনা তত লোক পড়ে না। তবুও সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি যেন স্থায়ী আসন জুড়িয়া বসিয়া আছেন। এক যুগে তিনি ছিলেন সাহিত্য-সম্রাট, সাহিত্যের ডিক্টেটর। সে যুগে তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তির সম্মুখে কেহই টিকিতে পারিত না। তাঁহার সুনজরে পড়িবার জন্য, তাঁহার একটু সহানুভূতি লাভের জন্য কত লর্ড, মন্ত্রী, বিশপ, কবি ও সাহিত্যিক ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। তাঁহার স্নেহ-দৃষ্টি পাইলে মনে করিতেন যে জীবন ধন্য হইল। আর যে তাঁহার কৃপাবাণী পাইত না সে মনে করিত তাহার জীবন ব্যর্থ। বাস্তবিকই জনসনের কোপদৃষ্টিতে পড়িলে মনে হইত যে তাহার মত হতভাগ্য জীব বোধ হয় আর কেহ নাই। দোষেগুণে, ভালমন্দে গঠিত এই বিশালবপু মানুষটি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের নিকট কতকটা অতি মানব বলিয়া সম্মান পাইয়াছেন।

যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচির বহু পরিবর্তন হইয়াছে। সাহিত্যের আদর্শ ও সীমার পরিবর্তন হইয়াছে। জনসনের যুগে শিল্পীগণ গ্রীক ও রোমান আদর্শের অনুসরণ করিতেন। কিন্তু রোমান্টিক প্রভাবের ফলে তাঁহাদের অতীতের মোহ কাটিয়া গেল—তাঁহারা এখন অতীত অপেক্ষা অগ্রগামী যুগের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। সেইজন্য রোমান্টিক আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত যুগে ডক্টর জনসন অচল হইয়া পড়িলেন। পরবর্তী যুগে পূর্বযুগের অনেক অচল কবি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; কিন্তু কবি ও শিল্পী হিসাবে জনসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার কোন আশা নাই।

কিন্তু মানুষ হিসাবে ডক্টর জনসন এত বড় এবং সাহিত্যের উপর তাঁহার অপ্রত্যক্ষ ও নীরব প্রভাব এত বেশী যে যদিও আজ তাঁহার রচনা কেহ বড় একটা পড়ে না, তবুও তাঁহার কথা কেহই বিস্মৃত হয় নাই। সাহিত্য-জগৎ হইতে নিঃশব্দে নেপথ্যে বিদায় লইলেও সর্বত্র তাঁহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ আছে। তাঁহার জীবনের ছোটখাটো ঘটনা, নানাপ্রসঙ্গে তাঁহার কথা ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে প্রায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। আর ইংলণ্ডের জনসাধারণ অজ্ঞাতসারে তাঁহার মূল্যবান উক্তি উদ্ধৃত করিতে বিস্মৃত হয় না। যখনই কোন নীতি ও বাস্তব জীবনের কর্তব্যের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, তখনই ডক্টর জনসনের ছবি আপনা হইতে লোকের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। নৈতিক আদর্শ ও বাস্তব জীবনে সেই নীতির প্রয়োগ এই দুইয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তিনি জীবনের যাত্রাপথে অগ্রসর হইতেন। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী নীতিবিদ। জীবনের উপর তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বাস্তব জীবনের সাধারণ কথাকে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। পোশাক-পরিচ্ছদে তাঁহার কোন আড়ম্বর ছিল না।

ভোজনে তিনি ছিলেন খুবই পটু। সে যুগে মদ্যপান একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল, কিন্তু জনসন প্রায় মদ্য স্পর্শ করিতেন না। মদের পরিবর্তে পেয়ালার পর পেয়ালা চা পান করিয়া তিনি পান-প্রবৃত্তি নিবারণ করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে এত অধিক বই লেখা হইয়াছে যে, সেক্সপীয়রের পর বোধ হয় আর কোন সাহিত্যিক এ সম্মান পান নাই। বর্তমান যুগেও তাঁহার সম্বন্ধে অনেক বই লিখিত হইয়াছে। বিগত দুই শত বৎসরে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া যেসব বই লেখা হইয়াছে সেগুলিতে একটা ছোট লাইব্রেরি পূর্ণ হইতে পারে।

জনসনকে অমর করিয়াছে জেমস বসওয়েলের বিখ্যাত গ্রন্থ 'ডক্টর জনসনের জীবনী'। যাহাকে বলে "হিরো-ওয়ারশিপ" বা বীরপূজা, বসওয়েল-লিখিত জনসনের জীবনী হইতেছে সেই বীরপূজার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বসওয়েলের সহিত জনসনের আলাপ-পরিচয় হয় বহু পরে। একবার আলাপ-পরিচয় হইয়া গেলে বসওয়েল এত ঘনিষ্ঠভাবে জনসনের সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার জীবনের ছোটবড় কোন ঘটনা বিবৃত করিতে বিস্মৃত হন নাই। একজন গুরুর পদপ্রান্তে শিষ্য যেমন ভক্তিভরে গুরুর বচনামৃত পান করে বসওয়েলও সেইরূপ জনসনের কথাগুলি শুনিতেন। জনসনের কথাবার্তা, চালচলন, স্বভাবচরিত্র, অঙ্গভঙ্গী

ও জীবনের প্রতিটি ঘটনা তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন—কি তিনি ভালবাসিতেন, কি তিনি ঘৃণা করিতেন, কখন তাঁহার মেজাজ উগ্র ছিল, আর কখনই বা শান্ত ছিল, কাহাকে কি ভাষায় ভর্ৎসনা করিয়াছেন, আর কাহাকেই বা আদর করিয়া কাছে বসাইয়াছেন, কি খাইতেন, কিরূপ পোশাক পরিতেন, কতক্ষণ ঘুমাইতেন, কখন গির্জ্জায় যাইতেন, কখন উপবাস করিতেন, তাঁহার পায়ের জুতাটা, হাতের ছড়িটা কিরূপ ছিল, এমন কি তাঁহার বাড়ীর বিড়ালটা কি খাইত আর তাহার জন্য জনসন কিভাবে খাদ্য সংগ্রহ করিতেন—এইসব খুঁটিনাটি ঘটনাও বসওয়েলের পুস্তকে অতি নিপুণ ভাবে লিপিত হইয়াছে। সেইসঙ্গে বসওয়েল আরও দেখাইয়াছেন, কোথায় ছিল জনসন-চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব, আর কোথায় ছিল ত্রুটি-বিচ্যুতি। বস্তুতঃ "জীবনী সাহিত্যে" বসওয়েলের গ্রন্থ অতুলনীয়। বসওয়েলের তুলিকার সাহায্যে দোষগুণসম্পন্ন এই বিরাট মানুষটি বাস্তব রূপ ধরিয়া প্রত্যেক পাঠকের নিকট উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবেন। বসওয়েলের নিজের কৃতিত্ব বেশী ছিল না। কিন্তু জনসনের মত বিরাট পুরুষের জীবনী লিখিয়া তিনি জনসনকে যেমন অমর করিয়াছেন সেইরূপ সেই অমর মানুষের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতসারে নিজেও অমর হইয়া গিয়াছেন। অবস্থা এমন হইয়াছে যে, আজ জনসন ও বসওয়েল পরস্পরের সহিত জড়িত হইয়া যেন একীভূত হইয়া গিয়াছেন। বসওয়েল না থাকিলে বোধ হয় জনসন এমনভাবে সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত হইতেন না।

অদ্ভুত মানুষ ছিলেন ডক্টর জনসন। পরস্পরবিরোধী বহু গুণের সমাবেশ হইয়াছিল তাঁহার মধ্যে। একদিকে তিনি ছিলেন চরম যুক্তিবাদী, আবার অপর দিকে ঘোর রক্ষণশীলতা তাঁহার প্রতি কাজে ফুটিয়া উঠিত ছিল। এক দিকে তিনি ছিলেন কুসংস্কারাপন্ন—আবার অন্য দিকে সহজে যে-কোন কথা বিনা যুক্তিতে বিশ্বাস করিতেন না। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন গোঁড়া টোরি, আর ধর্ম্মের ব্যাপারে তিনি ছিলেন ইংলিশ চার্চ্চের অন্ধ সমর্থক। পিউরিটান ও ডিসেণ্টার মতবাদকে তিনি ঘৃণা করিতেন, কিন্তু মানুষ হিসাবে সব মতাবলম্বী লোককেই শ্রদ্ধা করিতেন। কখনও কখনও কথাবার্ত্তায় তিনি অত্যন্ত রূঢ় হইয়া উঠিতেন অথচ মূলতঃ তিনি ছিলেন বিনয়ী ও ভদ্র। সেইজন্য গোল্ডস্মিথ বলিয়াছেন, তাঁহার দেহে ছিল ভল্লুকের চামড়া, কিন্তু অন্তরে ভল্লুকের কোন অংশই ছিল না। তিনি ছিলেন খাটি ইংরেজ, আর সেইজন্য তিনি বিশেষভাবে গর্ব্বিত ছিলেন—অথচ অন্য বিষয়ে তিনি ছিলেন উদার ও মানববন্ধু। রুশো ও ভল্টেয়ারের মত বিপ্লবীদিগকে তিনি ভালবাসিতেন না। তাঁহাদের মতবাদ সহ্য করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল, আবার ডন উইলকিসের মত উগ্রপন্থী রাজদ্রোহী লোকের সহিতও তাঁহার যথেষ্ট সখ্য স্থাপিত হইয়াছিল, অবশ্য ইহা বসওয়েলের মধ্যবর্ত্তিতায় সম্ভব হইয়াছিল। এত সব বিচিত্র গুণের সমাবেশে ডক্টর জনসন একজন গোটা মানুষ ছিলেন।

জনসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁহার অদ্ভুত কথাবার্ত্তা। তিনি ছিলেন কথার রাজা। তাঁহার মত সুন্দর কথা কেহই বলিতে পারিতেন না। কথা বলা যে সোজা ব্যাপার নয়, কথা বলার মধ্যে যে একটা আর্ট আছে তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন ডক্টর জনসন। তাঁহার কথাগুলি ইংরেজী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। যথাসময়ে যথাস্থানে যথোপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া তিনি যেসব কথা বলিতেন তাহার তুলনা হয় না। জনসন বার্কের মত বাগ্মী ছিলেন না। বাগ্মীবর বার্কের অপূর্ব্ব বক্তৃতায় পার্লামেণ্ট-ভবন কাঁপিয়া উঠিত। তাঁহার পার্শ্বে জনসন স্থান পাইবার যোগ্য নহেন। কিন্তু ক্লাবে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে বন্ধুবান্ধবের সম্মুখে জনসন যখন কথা বলিবার জন্য মুখ খুলিতেন, তখন বার্ক, ফক্স, শেরিডান প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বক্তারা হতবাক হইয়া নীরবে তাঁহার কথামৃত পান করিয়া ধন্য হইতেন। ক্লাবে বার্ক ফক্স শেরিডান তাঁহার কাছে অতি নগণ্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া জনসন কথা বলিয়া যাইতেন, আর উপস্থিত বন্ধুবান্ধবগণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার কথা শুনিতেন। কথার আর শেষ নাই, এক কথার পর আর এক কথা—এইভাবে বিশ্বের নানা বিষয় লইয়া জনসন কথা বলিতেন, তাঁহার জ্ঞানের পরিধি ছিল অসীম। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিয়া মানুষ মুগ্ধ হইয়া যাইত। এমন কথার রাজা ইংলণ্ডে ত ছিলই না, অন্য দেশেও বিরল। কথা আরও অনেকে বলিতেন এবং অপূর্ব্ব কথা বলিয়া মজলিস গুলজার করিতেন। কিন্তু কথাবলার আর্টিষ্ট হিসাবে জনসন অদ্বিতীয়।

কথা বলিয়েদের ইতিহাসে সক্রেটিস, মার্টিন লুথার, কোলরিজ বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন। কিন্তু জনসনের পার্শ্বে ইঁহারা কেহই দাঁড়াইতে পারেন না। ইঁহাদের প্রতিটি কথার মধ্যে নিহিত ছিল একটা উদ্দেশ্য, একটা আদর্শের ইঙ্গিত। তাঁহারা কথার শিল্পী ছিলেন না। তাঁহারা আদর্শ প্রচারের জন্য নানা স্থানে নানা লোকের সঙ্গে নানা কথা বলিয়াছেন। তাঁহাদের কথার প্রভাবে ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে ও সাহিত্যে বিরাট পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের কথা শিল্পের বস্তু নহে, সুতরাং তাঁহাদের কথার মধ্যে আনন্দের সামগ্রী ছিল না। তাঁহাদের কথা অন্তরে দোলা দেয়, যতটা কানে প্রবেশ করে অর্থ তাহার আরও গভীর, আরও ব্যাপক। তাঁহাদের কথার প্রভাবে অমানুষ মানুষ হয়, সাধারণ লোক দেবতায় পরিণত হয়। কোন মূল্য দিয়া তাঁহাদের কথার বিচার করা সম্ভব নহে। কিন্তু তবুও তাঁহারা কেহ কথার শিল্পী ছিলেন না। উপদেশ ও নীতিবচনই তাঁহাদের সর্ব্বশেষ কথা। ইঁহারা জনসাধারণকে শুনাইতেন ভাল ভাল কথা, চরিত্রের উন্নতিসাধনই ছিল ইঁহাদের কথার উদ্দেশ্য। তাই ইঁহাদের কথার মধ্যে ছিল না শিল্পের আনন্দ। শুধু কথার জন্য কথা এ আদর্শ তাঁহাদের জানা ছিল না। "শুন শুন দেশবাসী, আমার এ অমৃতময়ী বাণী—স্বর্গ হতে আগত এ বাণী, ইহাতে তোমাদের আছে কল্যাণ"—মহামানবদের কথার মধ্যে এই ধরণের উপদেশ-বাণী ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু ডক্টর জনসন ছিলেন কথার সত্যকার শিল্পী। তাঁহার

কথাবার্ত্তা এক বিস্ময়ের বস্তু। তাঁহার সব কথা আজ পাইবার উপায় নাই। তবে বসওয়েল এবং আরও কয়েকজন সমসাময়িক লেখকের চেষ্টায় যেসব কথা আজিও পাওয়া যায় তাহা পড়িলেই বুঝা যাইবে যে, তাঁহার কথা বলার কি অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তাঁহার কথা যাহারা তাঁহার মুখে শুনিয়াছেন তাঁহারাই সেসব কথার প্রকৃত মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়াছেন। পরের মুখে ঝাল খাওয়ার মত, অপরে যাহারা শুনিয়াছে আমরা কেবল তাহাই পড়িয়া জনসনের কথার মাধুর্য্য কতকটা উপলব্ধি করিতে পারি। মানুষ যখন কথা কহে, বিশেষতঃ জনসনের মত মানুষ যখন কথা বলেন তখন কেবল কর্ণদ্বয় একমাত্র ইন্দ্রিয় নহে যাহা সেই কথা উপলব্ধি করে। প্রথমে শুনিয়া পরে সেসব কথা লিপিবদ্ধ করিবার কালে সে কথার অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য কর্পূরের মত উবিয়া যায়। আচার্য্য কেশবচন্দ্র, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অথবা মহাত্মা গান্ধীর কথা যাহারা উপস্থিত থাকিয়া মুখোমুখি হইয়া শুনিয়াছেন তাঁহারা যতই উচ্চাঙ্গের শিল্পী হউন না কেন, নিখুঁতভাবে সেসব শুনা কথা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন না। কেননা কথাটাই একমাত্র বিষয় নহে। কথা বলার ভঙ্গীটাকেও প্রকাশ করা চাই। সে ভঙ্গী ব্যতীত কথাগুলির বিশেষ আকর্ষণ নাই। কারণ তাঁহাদের সব কথাই তাঁহাদের স্বলিখিত পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

কথা বলিবার সময় ডক্টর জনসনের চোখ দুটি আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠিত—ক্রোধে অথবা বিরক্তিতে তাঁহার গণ্ডদ্বয় ফুলিয়া উঠিত, তাঁহার দীর্ঘ ললাট সঙ্কুচিত হইত—ঠোঁট দুটি ঈষৎ নড়িয়া উঠিত—আর তাঁহার বিরাট মুখগহ্বর হইতে কি কথাই না বাহির হইবে এই চিন্তায় অপেক্ষমাণ শ্রোতৃমণ্ডলী অধীর আগ্রহে নীরবে অবাক হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে—ঠিক এই সময় বজ্রগম্ভীর স্বরে জনসনের মুখ হইতে কথা বাহির হইল—আর অমনি শ্রোতৃমণ্ডলীর কেহ কেহ হো হো করিয়া হাসিয়া চতুর্দ্দিকে ফাটিয়া পড়িল, একে অপরের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িল, আবার আক্রান্ত ব্যক্তি লজ্জায় মরিয়া যাইতে লাগিল। এই যে কথার মধ্যে একটা দৃশ্য সৃষ্টি করার আর্ট—ইহা সহজসাধ্য বিষয় নহে। ইহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তাঁহার যেসব কথা ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে যে তাহার মাধুর্য্য ছিল আরও ঢের। যাহারা তাঁহার কথা শুনিয়াছে কেবল তাহারাই সে মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়াছে। তবুও বসওয়েলের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি সাধ্যমত জনসনের কথাগুলি দৃশ্যসহ প্রকাশ করিতে কতকটা সমর্থ হইয়াছেন।

জনসনের কথার মধ্যে যে খুব গভীর তত্ত্বকথা ছিল তাহা নহে। এ বিষয়ে আরও অনেক পণ্ডিত ও সুধী ব্যক্তি জনসনকে পরাস্ত করিতে পারেন। তবে এই সব সুধী ও সাধকদের কথা কতকটা একঘেয়ে নীতি-উপদেশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সক্রেটিস, লুথার অথবা কোলরিজের প্রধান কাজ হইল আদর্শপ্রচার। দুই-চারি বার তাঁহাদের কথা শুনিলে আর ভাল লাগিত না। কারণ বিভিন্ন স্থানে বার বার তাঁহারা একই কথার পুনরাবৃত্তি করিতেন।

এ যুগের রাজনৈতিক নেতাদের মত তাঁহাদের কথার মধ্যে কোন বৈচিত্র্য ছিল না। বিষয়বস্তুর দিক দিয়া তাঁহাদের কথা সীমাবদ্ধ। কিন্তু জনসনের কথার কোন সীমা ছিল না, তাঁহার কথার বিষয় ছিল পৃথিবীর সবকিছুই। তিনি ছিলেন কথার শিল্পী। কথার রাজ্যে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট। বৈচিত্র্য, কৌতুক, আনন্দ, হাল্কা ভাব সবই তাঁহার কথার মধ্যে ছিল। কথার মধ্যে তিনি এত আনন্দ দিতে পারিতেন যে, একবার তাঁহার নিকট বসিলে কেহ উঠিতে চাহিত না।

তাঁহার কথার আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল—অনুপম ভাষা বা ষ্টাইল। তিনি যে-কোন বিষয় লইয়া কথা বলিতে পারিতেন। যে-কোন বিষয় লইয়াই আলোচনা হোক না কেন, তিনি তাহার উপর নূতন আলোকপাত করিতে পারিতেন। শ্রোতৃ-মণ্ডলী ভাবিত যে এত বিষয় তাঁহার জানা আছে। দর্শন, সাহিত্য, কবিতা, সাংসারিক বিষয়, রান্নার বিষয়, রাজনীতি, প্রেততত্ত্ব, দেশের শিক্ষাসমস্যা, এমনকি চামড়া, দোকানপাট, নর-নারীর সম্পর্ক—বিভিন্ন দেশের অবস্থা—এমন বিষয় ছিল না যাহার উপর তিনি আলোকপাত করেন নাই।

এ কথা সত্য যে কোন কোন বিষয়ে জনসন গোঁড়া রক্ষণশীল ছিলেন—সাহিত্যের সমালোচনা করিবার সময় অনেক ভুল করিয়াছেন। বহু তৃতীয় শ্রেণীর কবিকে তিনি উচ্চ আসন দিয়াছেন, আবার উচ্চ শ্রেণীর বহু কবির কাব্যের গুণ স্বীকার করেন নাই। রাজনৈতিক বিষয়েও তিনি বহু ভুল বিচার করিয়াছেন। কিন্তু এসব বড় কথা নহে। তাঁহাকে কেহই দূরদর্শী মহামানব বলে না। সে গুণও তাঁহার ছিল না। তাঁহার কথাবার্ত্তার সবচেয়ে অপূর্ব্ব ধরণ এই যে, তিনি যাহাই বলিতেন তাহাই এত মনোরম হইত যে শ্রোতৃমণ্ডলী বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে তাহা শ্রবণ করিত। মন্ত্রমুগ্ধবৎ আর কাহারও কথা এমন ভাবে কেহ শোনে নাই। কোন কথার উত্তর দিতে তিনি কখনও বিলম্ব করিতেন না। উত্তর যেন তাঁহার ঠোঁটে লাগিয়াই আছে—প্রশ্ন শুনিবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্ব ভাষায় উত্তর বাহির হইত। কেহ তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, উত্তর একটা দিতে হইবে—অন্য কেহ হইলে ভাবিয়া চিন্তিয়া শব্দ-ভাণ্ডার আহরণ করিয়া তবেই উত্তর দিত। কিন্তু জনসন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতেন—এত দ্রুত তাঁহার মুখ হইতে উত্তর বাহির হইত যেন মনে হইত যে নিশ্চয় পূর্ব্ব হইতে তৈয়ার করিয়াই উত্তর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তিনি কখনও পূর্ব্ব হইতে তৈয়ার করিয়া কোন কথার উত্তর দিতেন না। মুখে যাহা আসিত তাহাই বলিতেন। আর প্রস্তুত না হইয়াই যাহা বলিতেন তাহা একেবারেই উপযুক্ত উত্তর হইত। তাঁহার কথা দ্রুত ভাবে মুখ হইতে বাহির হইত। বসওয়েল বলিয়াছেন—

"He flew upon an argument. He has no formal preparation, no flouring with the sword; he is through your body in an instant."

তিনি তরবারি লইয়া পাঁয়তারা কষিতেন না, মুহূর্ত্তমধ্যে

তাঁহার কথার তরবারি তোমার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিত। ডক্টর জনসন অনেক সময় রূঢ় ব্যবহার করিতেন। কর্কশ কথা বলিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার স্বভাব রূঢ় ছিল না। আর রূঢ় ব্যবহারের জন্ত তাঁহার বন্ধুবিচ্ছেদ হয় নাই। তাঁহার কথার মধ্যে এমন একটা হাস্যরস মিশ্রিত ছিল যে তিনি রূঢ় কথা বলিয়া যাহাকে আক্রমণ করিতেন সেও মুগ্ধ না হইয়া পারিত না। তাঁহার বাক্য-বাণে জর্জ্জরিত হইয়া অনেকে প্রীতমনেই তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়াছেন। একবার এক যুবক তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার উপদেশ চাহিল: তিনি প্রথমে এ বিষয়ে তাহাকে কোন উপদেশ দিতে সম্মত হন নাই। যখন যুবকটি তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল তখন জনসন বিরক্ত হইয়া তাহাকে বলিলেন—

"I would advise no young man to marry who is not likely to propagate understanding."

ইহার ভাবার্থ :—"যে যুবক বুদ্ধিমান সন্তানের জন্ম দিতে পারিবে না তাহাকে আমি বিবাহের পরামর্শ দিব না"। অর্থাৎ প্রকারান্তরে জনসন সেই যুবকটিকে বলিলেন যে তুমি মূঢ়। কিন্তু এই কথাটি তিনি এমন ভাবে বলিলেন যে আক্রান্ত যুবকটিও না হাসিয়া পারিল না। এই যুবকটির প্রতি অপর লোকের সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু জনসনের কথার মধ্যে এমন একটা হিউমার প্রচ্ছন্ন ছিল যে তাহার দুঃখের কথা ভুলিয়া লোকে হাসিয়া কুটিকুটি হইয়া গেল। বস্তুবিকই জনসন মূঢ় ব্যক্তিকে এইভাবেই উত্তর দিতেন। মৃত্যুর পর পশুদের ভবিষ্যৎ কি হইতে পারে এসম্পর্কে এক দিন বসওয়েল তাঁহাকে প্রশ্ন করেন। জনসন একটা উত্তর দিলেন। কিন্তু তাহাতে বসওয়েল সন্তুষ্ট হইলেন না। তখন তিনি পুনরায় বলিলেন,

"But really, sir, when we see a very sensible dog, we don't know what to think of him."

এইবার আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া জনসন উত্তর দিলেন :

"True sir, and when we see a very foolish fellow, we don't know what to think of him."

ইহার দ্বারা তিনি প্রকারান্তরে বসওয়েলকেই মূর্খ বলিয়া অভিহিত করিলেন। সেই সময় বলিং ব্রুক নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কিছুদিন উচ্চপদ অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ও নীতির বিরুদ্ধে একখানা পুস্তকও লিখিয়াছিলেন। গোঁড়া রক্ষণশীল জনসন তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না। এক ব্যক্তি জনসনের সম্মুখে এই বলিং ব্রুকের প্রশংসা করিতে লাগিলেন আর অমনি ডক্টর জনসন গম্ভীর হইয়া বলিলেন—

"Sir, he was a scoundrel, and a coward;—a scoundrel, for charging a blunderbuss against religion and morality; a coward, because he had not resolution to fire it off himself, but left half a crown to a beggarly Scotchman, to draw the trigger after his daeth."

জনসনের এই আক্রমণ অত্যন্ত মারাত্মক। কিন্তু শব্দগুলি এত উপযোগী ও উপমাটি এত নিখুঁত যে, যে শুনিয়াছে সে-ই মুগ্ধ হইয়াছে। অন্ত এক সময় ডাক্তার আডামস তাঁহার নিকট ব্রিষ্টলের বিশপ নিউটনের লিখিত একটি পুস্তকের প্রশংসা করিতেছিলেন। তখন ডঃ জনসন বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

"Why, sir, it is Tom's great work; but how far it is great, or how much of it is Tom's, are other questions."

এই উত্তর দ্বারা তিনি একই সঙ্গে দুইটি কথাই বলিলেন। প্রথমতঃ, টমাস নিউটনের পুস্তকটা কিছুই হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ উহার মধ্যে নিউটনের নিজস্ব কথা খুব কম আছে। একবার এক জন লোক অসাবধানে তাঁহাকে বলিল, "মদ্যপান দুশ্চিন্তা দূর করিতে সাহায্য করে, আর অপ্রীতিকর বিষয় ভুলাইয়া দেয়।" সেইজন্ত সেই লোকটি জনসনকে বলিল, "তাহা হইলে কাহাকেও আপনি মদ্যপান করিতে অনুমতি দিবেন কিনা।" তদুত্তরে জনসন বলিলেন, "yes if he sat next you"। এই সামান্ত কথার মধ্যে তিনি সেই লোকটির উপর ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। প্রকারান্তরে তিনি তাহাকেই মূঢ় ও অবিবেচক বলিয়াই ভর্ৎসনা করিলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কতকগুলি মেথডিষ্ট আণ্ডার গ্র্যাজুয়েটকে তাহাদের ধর্ম্মমতের জন্ত বিতাড়িত করা হইয়াছিল। তাহাতে দুঃখিত হইয়া বসওয়েল এক দিন জনসনকে বলিলেন, "ইহা খুবই অন্যায়।" কিন্তু রক্ষণশীল জনসন একটুও বিচলিত হইলেন না। তিনি বলিলেন, ঠিকই করা হইয়াছে। তখন বসওয়েল বলিলেন, মহাশয় আমি জানি যাহাদিগকে বিতাড়িত করা হইয়াছে তাহারা খুবই ভাল লোক। সঙ্গে সঙ্গে জনসন উত্তর করিলেন—

"I believe they might be good fellows; but they were not fit to be in the University of Oxford. A cow is a very good animal in the field; but we turn her out from a garden."

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই উপমাটি কত উপযোগী হইয়াছে। হঠাৎ এমন কালোপযোগী উপমা প্রয়োগ করার মধ্যেই তাঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। সিডনস সে-যুগের বিখ্যাত অভিনেত্রী। জনসনের পীড়ার কথা শুনিয়া তিনি তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। সে গৃহে আরও কয়েক জন চেয়ারে বসিয়া ছিলেন। অতিরিক্ত চেয়ার একটিও ছিল না। সিডনস গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র সকলেই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। অভিনেত্রীকে চেয়ারও ছাড়িতে পারেন না, অথচ তাঁহারা চেয়ারে বসিয়া থাকিবেন আর এক জন মহিলা দাঁড়াইয়া থাকিবেন, ইহাও বিসদৃশ ঠেকিল। কিন্তু অসুস্থ জনসন তাঁহাদের সকলকে চমৎকৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"Madam, you who so often occasion a want of seats to other people, will the more readily excuse the want of one yourself."

অর্থাৎ, আপনি কতবার কত লোকের বসিবার আসনের অভাব

ঘটাইয়াছেন। আজ যদি আপনার আসনের অভাব হয় তবে কিছু মনে করিবেন না।

বসওয়েল তাঁহার পুস্তকে জনসনের কথাবার্তার বহু বিবরণ দিয়াছেন। সেগুলি পড়িতে পড়িতে আমরা মুগ্ধ হইয়া যাই। বসওয়েল ব্যতীত আরও অনেকেই জনসনের বহু উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। জনসন মহাপুরুষ নহেন। আমাদের মতই সাধারণ মানুষ। কিন্তু তবুও তাঁহার জীবন হইতে শিখিবার বহু বিষয় আছে। তাঁহার সমগ্র জীবনই শিক্ষার বিষয়। অবশ্য কেহ কেহ তাঁহার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন যে, তিনি নূতন কথা কিছুই বলেন নাই। সাধারণ চলতি কথাই তিনি বলিয়াছেন। আর তিনি যে-সব নীতি ও উপদেশ দিয়াছেন তাহাও সচরাচর ব্যবহৃত তুচ্ছ কথা ব্যতীত আর কিছুই নহে। নূতন কথা তিনি বলেন নাই সত্য; কিন্তু পুরাতন কথা তাঁহার মুখ হইতে যখন অনবদ্য ভাষায় বাহির হয় তখন তাহা নূতন ভাবেই দেখা দেয়। তাহা ছাড়া তিনি পুস্তক হইতে অপরের কথা ধার করিয়া বলেন নাই। তিনি প্রত্যেকটি কথা নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিয়াছেন। শোক দুঃখ আশা আনন্দ সাফল্য ব্যর্থতা—এসবের অভিজ্ঞতা তিনি পাইয়াছেন। এসকল অভিজ্ঞতা হইতে তিনি যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তাহাই তিনি তাঁহার অপরূপ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সাধারণ চলতি নীতি উপদেশকে অগ্রে নিজের জীবনে পালন করিয়াছেন, সেগুলিকে বাস্তব সত্য হিসাবে নিজে আয়ত্ত করিয়াছেন, তার পর তিনি তাহা লোকশিক্ষার জন্ম প্রচার করিয়াছেন। সেইজন্ম জনসনের কথা ও উপদেশাবলী সাধারণ হইলেও তাহার একটা নিজস্ব মূল্য আছে। আমরা বলি মানুষ ভ্রমশীল। জনসন এই কথাটা কি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন: "A fallible being will fail somewhere."

তাঁহার প্রচারিত কতকগুলি সাধারণ কথা তাঁহার নিজস্ব ভাষায় পড়িলে মনে হয় যে, পুরাতন কথা নূতনভাবে শুনিতেছি। কয়েকটি উদাহরণ দিব:

"(1) It is better to live rich than to die rich, (2) No man is a hypocrite in his pleasures, (3) It is the business of a wise man to be happy, (4) A man should keep his friendship always in repair, (5) A man talks to unburden his mind is the man to delight you, (6) No sir, let fanciful men do as they will, depend upon it, it is difficult to disturb the system of life."

ডক্টর জনসনের বিষয় যতই আলোচনা করি ততই মনে হয়, নৈতিক চরিত্রে বলবান ও জীবনের প্রেমিক এমন বাস্তববাদী মানুষ সংসারে বিরল। তাঁহার চরিত্র ছিল উন্নত। তিনি ছিলেন ক্ষমাশীল, বন্ধুপ্রিয়। তিনি দুঃখের মধ্যেও জীবন উপভোগ করিয়াছেন। common sense বা সাধারণ ও সহজজ্ঞানের তিনি বাস্তব নিদর্শন। তত্ত্বকথা অপেক্ষা বাস্তব জীবনই তাঁহার নিকট অধিকতর প্রিয় ছিল। তিনি বাস্তব জীবনের প্রধানমন্ত্রী। একজন লেখক বলিয়াছেন, ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর জন্ম যে গুণটা সবচেয়ে প্রধান তাহা হইতেছে বাস্তব জ্ঞান। ডক্টর জনসন সাহিত্য ও মানবজীবনের প্রধানমন্ত্রী। তাঁহার বাস্তব জ্ঞান এত প্রখর ছিল যে তিনি কোন থিওরী বা তত্ত্বদ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া এই বাস্তব জ্ঞান হারান নাই। তিনি ছিলেন আজন্ম বিপ্লববিরোধী। বিপ্লবের সময় তিনি মানুষকে পথের নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন না। অন্ম সময়ে দৈনন্দিন জীবনে তিনি সত্যই জীবনের প্রধানমন্ত্রী। সাধারণ অবস্থায় বাস্তব জীবনে যাহা যাহা প্রয়োজন সে সম্বন্ধে তিনি নির্ভরযোগ্য নেতা। আজ প্রায় দুই শত বৎসর হইল জনসন গত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রভাব সমগ্র ইংরেজী সাহিত্যের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া আছে। জনসনকে জানিলে সমগ্র ইংরেজ জাতিকে জানা হইবে। এক জন লোকের মধ্যে একটা গোটা জাতির সমগ্র চিত্র এমনভাবে অন্ম কোথাও ফুটিয়া উঠে নাই।

পাতা

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

(জার্ম্মান কবি Ludwig uhland হইতে)

বর্ষায় ভেজা রোদে পোড়া এক
পত্র এসে
আমারই চরণে পড়িল শেষে!
এক নিমেষে—
বুঝিনু তখন—তাজা ও তরুণ ছিল ও এ সে।
আমারও তখন ছিল যে স্বজন কি ভালোবেসে
পাতারা হায়
শুকালো বায়,
কত না শীঘ্র শুকায়ে যায়।

কত বসন্ত কত যে শরৎ
কি গেল কয়ে,—
তবুও বাঁচিয়া ছিল এ দীর্ঘজীবীই হয়ে।
আমার কি প্রেম তত দিন ধরে ছিল এ লয়ে?

রক্তরাখী

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

১০

তাহাদের আশ্রয় মিলিয়াছিল এক পাঠানের গৃহে। যদিও সকালেই তাহারা পেশোয়ার পৌঁছিয়াছিল, কিন্তু সতর্কতা অবলম্বনের জন্ত আর সারাদিন বাহির হয় নাই।

সন্ধ্যার পর এই বাড়ীর এক গৃহকোণে স্তিমিত আলোকে একে একে জমায়েত হইলেন বীর রাঘব আইয়ার—তিনি আসিয়াছেন মেসেদ হইতে। পূর্ব্বের পরিচয় না থাকিলে চেনা যায় না। ডাঃ কিষণচাঁদ পূর্ব্বেই আসিয়াছেন। পেশোয়ারে সুচিকিৎসক হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম আছে। তিনি সাধারণ ডাক্তারের বেশেই আছেন। পকেট হইতে ষ্টেথিসকোপের নলটা বাহির হইয়া আছে।

তড়িতের পোশাকও পেশোয়ারী পোশাকের অনুরূপ। ভিতর হইতে দুয়ার বন্ধ, একজন পাঠান দরজার বাহিরে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত। বনোয়ারীও দরজার ধারেই বসিয়াছিল; অদূরে মোটর প্রস্তুত বিপদ বুঝিলে পালাইবার জন্ত।

তড়িৎ মিঃ আইয়ারকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "আপনি যে নির্ব্বিঘ্নে এতগুলি ব্রিটিশ ঘাঁটি পার হয়ে আসতে পারবেন তা আপনি না পৌঁছানো পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতে পারি নি।"

"বিপদ পদে পদে, তবে একটা সুযোগও মিলেছিল। আপনি জানেন বৎসরের এমনি সময় মেসেদে লক্ষ লক্ষ সিয়া তীর্থ-যাত্রীর সমাগম হয়। সিয়াদের নিকট মেসেদ হ'ল গিয়ে মক্কার মত। সেই যাত্রীদের মধ্যে অনেকে ছিল ভারতীয়। তাদের সঙ্গে জুটে কোনগতিকে চলে এসেছি।"

"তা হলে বলুন মুসলমান সেজেই আসতে হয়েছে।"

"শুধু কি বেশভূষা, তা করে রেহাই পেলে ত বাঁচোয়া ছিল। দক্ষিণী ব্রাহ্মণ হয়ে ওদের সঙ্গে ওদের মত করেই মাংস খেতে হ'ত আর রোজ নমাজ পড়তে হ'ত। এখানে কোনপ্রকারে এসেই এক গাছা পৈতের খোঁজ করেছিলাম।" কথা শেষ করিয়াই আইয়ার হাসিয়া উঠিলেন এবং সকলেই হাসিতে যোগ দিয়া ঘরের আবহাওয়া প্রফুল্ল করিয়া তুলিলেন।

তড়িৎ কহিল, "মানলাম সিয়াদের সঙ্গে এসেছেন, কিন্তু খাইবারেতে কড়াকড়ি খুব বেশী, ওখানটা পার হলেন কি করে।"

"চারদিকের পারিপার্শ্বিক অবস্থা মাঝে মাঝে সহায় হয় তড়িৎবাবু। ল্যাণ্ডিকোটাল পর্য্যন্ত আসতে খুব বেশী বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু ওখানে এসেই একেবারে ন যযৌ ন তস্থৌ। ব্যবসায়ী লোকেরা যে গাধা কিংবা খচ্চরের ক্যারাভান নিয়ে আসে মাল বোঝাই করে, তার সঙ্গে আসে সাধারণ লোকও। তাই ঐ ক্যারাভানের সঙ্গে এসে সাধারণ লোকের মতই উঠতে হ'ল সরাইখানায়—সেখানকার পরিচ্ছন্নতার বর্ণনা করব না, কেননা ও কথাটা ওদের অভিধানে নেই।

সরাইখানায় সঙ্গী হ'ল চোর, জুয়াচোর, চোরাইমাল কারবারী আরও কত কি। গোয়েন্দাদের ওটা হচ্ছে আইডিয়াল থাকবার জায়গা। দু'একটি আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাও যে নেই তা বলা যায় না।

ওখানে থাকতে গেলেই নাম, ধাম, কোথায় যাব এবং কেন—এর সব খুঁটিনাটি জবাব দিতে হয়। বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলেও গ্রেপ্তার করে নেবে। বিপদ বুঝলে পালাবার উপায় নেই, একটি মাত্র দরজা, আর কড়া পাহারা। বেরিয়েই বা যাবেন কোথায়, সামনেই কেল্লা—সেখানে থাকতে হয় ঠাণ্ডা গারদে।

শেষের কথায় সকলেই হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে তিনি পুনরায় কহিতে লাগিলেন, খাইবার পাস হচ্ছে এখান থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল। বেলা সাড়ে চারটার মধ্যে না বেরুতে পারলে কয়েদখানায় থাকতেই হবে। কিন্তু সরাইখানায় থাকতে গেলে গোয়েন্দারা আমায় চিনবেই চিনবে।

কিন্তু এক অপূর্ব্ব সুযোগ মিলে গেল। পেশোয়ার থেকে ল্যাণ্ডিকোটাল পর্য্যন্ত দুধ নিয়ে আসে রোজই একটা মিলিটারী ভ্যান। তার চালকের সঙ্গে কয়েক টাকায় রফা করলাম সে আমায় পেশোয়ার পৌঁছে দেবে। পথে দু'তিন জায়গায় সাস্ত্রীরা জিজ্ঞেস করলে গাড়ী ঠিক আছে কিনা। কিন্তু জামরুদ কেল্লার সামনে একেবারে গাড়ী খুঁচক্রেই দেখতে এল। একে ত বসবার জায়গা নেই—বড় বড় দুধের ক্যানের পেছনে কোনরকমে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা, তার উপর ভীষণ ঝাঁকুনি, হাড় বার হবার উপক্রম, বার দুই বমিও করেছি। কিন্তু চালকটি, 'কই নেহী হ্যায়' বলে ওর সঙ্গে কি ফিস ফিস করলে পরে পয়সা গোনার আওয়াজ পেলাম। গাড়ী ছেড়ে দিলে। আমি পেশোয়ার ক্যান্টনমেণ্টের প্রায় মাইল-খানেক দূরে নেমে পড়লাম।"

সকলেই যেন নিশ্চিন্ত হইল। তড়িৎ কহিল, "পৈতের কথা বলছিলেন না? এই নির্দ্দোষ গোলসটি কিন্তু আমাদের দেশে মাঝে মাঝে বেশ কাজে লেগে যায়। ধর্ম্মের ভেক নিয়ে এখনও লোক ঠকানো যায়। একবার আমায় সশস্ত্র পুলিস ঘেরাও করে। পৈতে গলায় ছিল বলে এক গৃহস্থবাড়ীর মেয়েরা আমায় রক্ষা করে। সেই থেকে একগোছা পৈতে আমার সঙ্গে থাকে। আচ্ছা যাক এ সব কথা—খাসগড়ের মিঃ রায়ের খবর কি!"

"তিনি ল্যাণ্ডিখানার আগে আফগান সীমান্ত পর্য্যন্ত এসেছেন দেখে এসেছি। কিন্তু তিনি ব্রিটিশ সীমান্তে পা দিতে সাহস পাচ্ছেন না।"

"তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে বলে ত আমার মনে হয় না"—মন্তব্য করিলেন ডাঃ কিষণচাদ। "সব জায়গায় আছে তাঁর ফটো আর হুঁসিয়ারী। চিত্রলের পথ এমনিতেই দুর্গম, তার উপর ওখানে এমন তুষারপাত হচ্ছে, ওপথ দিয়ে আসবার চেষ্টাও তাঁর ব্যর্থ হয়েছে।"

"মিঃ রায়ের সঙ্গে ল্যাণ্ডিগানায় অনেক আলাপ হয়েছে। তাঁর মতে বাইরে থেকে বেশী কিছু সাহায্য পাওয়া যাবে না—আমাদের ভেতর থেকেই সব করতে হবে।" উত্তর দিলেন মিঃ আইয়ার।

"ঠিকই বলেছেন, একটা কিছু করা একান্ত প্রয়োজন। দিল্লী ও মীরাট থেকে লোক দেখা করে গিয়েছে। পথে আরও নানা জায়গা থেকে যে খবর পেলাম তা সবই উৎসাহজনক। অবশ্য রাওলপিণ্ডি ষ্টেশনে কারুর সঙ্গে দেখা হ'ল না। তবে সরকারপক্ষ যে নিষ্ক্রিয় আছে তাও নয়"।—মন্তব্য করিল তড়িৎ।

"আমিই নিষেধ করেছিলাম তড়িৎবাবু। রাওয়ালপিণ্ডি ষ্টেশনের উপর কড়া নজর"—উত্তর দিলেন ডাঃ কিষণচাদ।

"আচ্ছা, সীমান্তবাসী আফ্রিদী, মোমান্দ, জাকাসেল প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিগুলির মনোভাব সম্পর্কে আপনার কোন অভিজ্ঞতা আছে কি? এরা আমাদের আহ্বানে সাড়া দেবে কি?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কিষণচাদ কহিলেন, "এরা স্বাধীনচেতা, আমাদের সংগ্রামে এরা সহানুভূতিশীল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু ওদের ভেতর আমরা আজ পর্য্যন্ত কোন কাজ করি নি, সুতরাং ওরা আমাদের হয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যোগ দেবে এ আশা আমরা করতে পারি নে।

আপনি বোধ হয় জানেন কোহাটের পথে ওদের একটা অস্ত্র-নির্ম্মাণের কারখানা আছে। ওদের মাতব্বরদের সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনা হয়েছে। অস্ত্র-নির্ম্মাণের কারখানা শুনেছি ওদের আরও আছে, ওরা বলে ইংরেজ তোমাদের রাজা, ওদেরকে আমরা কোন দিনই মেনে নিই নি, নেবও না—আমরা চিরকাল লড়াই করে এসেছি—রসদের অভাব হলে কেবল মাঝে মাঝে চুপ করে থাকি। হিন্দুস্থান চিরকাল বিজিত হয়েছে উত্তর দিক থেকে। ভয় করি শুধু উত্তর দিককে। দক্ষিণ থেকে সাধ্য নেই আমাদের ত্রিসীমানায় আসে। ইংরেজরা আমাদের ভয় করে চলে। ওরা সোজা রাস্তা ভিন্ন চলে না। নোটিশ ঝুলিয়ে রেখেছে—"Beware, Independent tribal area।"

একটু থামিয়া ডাঃ পুনরায় কহিলেন, "আর একটা কথা, ওরা জানতে চায় আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, আমরা কি ঠিক মোকাম্মল আজাদী (পূর্ণ স্বাধীনতা) চাই, না ইংরেজকে ভয় দেখিয়ে কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিতে চাই। যাতে তাদের দেশে সুদে টাকা খাটাবার ব্যবসাটা ভাল চলে, তাদের খাদ্য সস্তায় কিনে নিয়ে হিন্দুস্থানে বেশী দরে বিক্রয় করে প্রচুর মুনাফা করতে পারি। লড়াইয়ে ইংরেজ কিছু কাবু হলেই পার্ব্বত্য জাতিদের ও 'সাতানা'র অধিকার কিছু পাই, আর বেশী কিছু চাকরি-বাকরিও পাই।

তড়িৎ—"ঠিকই বলেছেন আপনি, ওদের ভেতর আমরা কোন কাজই করি নি। ওদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করতে হবে। ওদেরকে বোঝাতে হবে আমরা স্বাধীন হলে ওরাও নিরাপদে পারবে নিজের দেশকে ইচ্ছামত উন্নত করতে। আমরা তাতে বাধা জন্মাব না।

আর একটা কথা সৈন্যদের অধিকাংশই আসছে কৃষক-পরিবার থেকে, সুতরাং এই দেশের কৃষকশ্রেণীর মধ্যে কাজ না করলে সৈন্যদের উপর আমাদের কাজও কঠিন হবে। গতকালের ভুল আজকের পথ নির্দ্দেশ করবে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তড়িৎ থামিলে ডাঃ কিষণচাদ কহিতে লাগিলেন, "চলুন না তড়িৎবাবু, একদিন গিয়ে ওদের অস্ত্র তৈরির কারখানা দেখে আসবেন। কুটীর-শিল্পের মারফতে যে অস্ত্রশস্ত্রও তৈরি হতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। বিদ্যুতের নামগন্ধ নেই, অথচ হাতে চালিয়ে প্রথম শ্রেণীর রাইফেল তৈরি করছে। ওতে ইংরেজী নাম আর নম্বর খোদাই করে দেয়। এমন একটা রাইফেলধারী জাত পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ। ছেলে, বুড়ো সবার হাতেই রাইফেল।"

তড়িৎ কহিল, "একথা বনোয়ারীর মুখেও শুনেছি। আমাদের এর থেকে শেখবার আছে অনেক। আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে হচ্ছে আমাদের সমিতি-প্রতিষ্ঠাতা মিঃ দাসের কথা। তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের গড়ে তুলতে হবে অস্ত্র তৈরির কারখানা।' অনেকে অবশ্য তাঁকে এজন্য গোপনে ঠাট্টা করত। তারা বলত ক্রুপস্ আর স্কোডার মত কারখানা তৈরি হবে তবে হবে বিপ্লব, তবেই হয়েছে আর কি! এই দুর্গম জায়গায় যেভাবে এরা লোহা যোগাড় করে অস্ত্র তৈরি করছে তার তুলনা সত্যই বিরল।"

তখন একখানা এরোপ্লেন আকাশে-বাতাসে কম্পন জাগাইয়া মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে একজন ঘোড়সওয়ার সামনের রাস্তা দিয়া তীরবেগে ছুটিয়া গেল।

তড়িৎ ও আইয়ার সচকিত হইয়া তাকাইতে ডাঃ কিষণচাদ কহিলেন, "এখন লড়াইয়ের সময়, দিনরাত এই চলেছে। এই লড়াইয়ের সুযোগ আমাদের পুরোমাত্রায় গ্রহণ করতে হবে। তা ছাড়া মনে হচ্ছে ওরা আমাদেরকে ঘা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ওদের আঘাত আসবার আগেই আমাদের ঘা দিতে হবে। নইলে আমরা পিছিয়ে পড়ব।"

দরজায় মৃদু করাঘাত হইলে ডাক্তার দরজা খুলিয়া দিলেন। বনোয়ারী খানকয়েক টেলিগ্রাম ডাঃ কিষণচাদের হাতে দিয়া কহিল, "এগুলি এইমাত্র এক আগন্তুক দিয়ে গেল।"

টেলিগ্রামগুলি সবই সাঙ্কেতিক ভাষায়। ডাক্তার কিষণচাদ উহাদের পাঠোদ্ধারে ব্যাপৃত হইলেন। তাহার কপাল কুঞ্চিত হইতে দেখিয়া তড়িৎ প্রশ্ন করিল, "কি খবর ডাক্তার…"

"সব বোধ হয় শেষ হ'ল—সোমেশ ও ভেলিংকার গ্রেপ্তার হয়েছে টাণ্ডলায়। মীরাট, আম্বালা, লাহোর, ফিরোজপুর, অমৃতসর,

কানপুর এবং আরও অনেক ক্যান্টনমেন্টে অনেকে গ্রেপ্তার হয়েছে। কয়েকটা রেজিমেণ্ট নিরস্ত্র করা হয়েছে।"

"বাংলা ও কাশীর খবর কি?"

"এখনও দুটো টেলিগ্রাম পড়া হয় নি—দেখি আরও কি আছে আমাদের জন্য।" কিছুক্ষণ পরেই কহিল, "কাশীতে বলবন্ত সিংকে গ্রেপ্তার করবার জন্য গিয়েছিল—তিনি বাধা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন। আর একটা টেলিগ্রাম ঠিক বুঝতে পারছি না—এটাও কাশী থেকে আসছে—কে একজন মহিলা···"

তাহার কথা কাড়িয়া লইয়া তড়িৎ প্রশ্ন করিল, "অন্নপূর্ণা নয় ত?"

"আপনি ঠিকই বলেছেন, অন্নপূর্ণাই বটে, তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। কিন্তু অত্যধিক উত্তেজনার বশে তাঁহার মাথা খারাপের মত হয়, অচিরেই হার্টফেল করে মারা যান। আপনাকে ধরবার জন্যও অনেক টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। আপনার আগ্রা পর্যন্ত আসার কথা পুলিস জানে।"

"নিশ্চয় আমাদের মধ্যেই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। নইলে এতটা খবর তাদের জানার কথা নয়"—উত্তেজিত ভাবে কহিল তড়িৎ।

এক আগন্তুক আসিয়া খবর দিল শহরে অনেক বাড়ী খানা-তল্লাসী হইয়াছে এবং অনেক বাড়ী পুলিস ও মিলিটারী ঘেরাও করিয়াছে। ডাক্তারের বাড়ীও তল্লাসী হইয়াছে। তড়িতের পেশোয়ারে উপস্থিতিও পুলিসের জানা আছে।

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় ঘরের প্রদীপ নিবিয়া গেল। ঘরের মধ্যে উত্তেজনা ও নৈরাশ্য যেন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। তড়িৎই প্রথম কথা কহিল,"এবারকার মত সব শেষ—তবে আমাদের শেষ নেই—আবার সুরু করব গোড়া থেকে। বার বার ব্যর্থতার ভিতর দিয়েই আমাদের নিশ্চিত সাফল্যের পথ তৈয়েরি হচ্ছে।"

আইয়ার বলিলেন, "কিন্তু এখানে তো আর থাকা চলে না।"

তড়িৎ—"নিশ্চয়ই, এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে।"

প্রতিমার কথা মনে হইতে তড়িৎ পুনরায় কহিল, "প্রতিমাকে কোথাও রেখে যেতে পারলে হ'ত।"

স্থির হইল, প্রথমে নিরাপদে শহরের বাইরে যাওয়া। বাইরে থেকে পালাবার চেষ্টা করা সহজ। ডাঃ কিষণচাঁদ কহিলেন, "আপনারা একটু বসুন, আমি শহরের অবস্থা দেখে আসছি, আর সেই সঙ্গে প্রতিমা দেবীর থাকবার ব্যবস্থাও করে আসব।"

"আপনি একা যাবেন? একা—অবশ্য না গিয়েই উপায় কি!" —উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করিল তড়িৎ। পরে তড়িতের অনুরোধে ডাক্তার বনোয়ারীকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া গেল।

সমস্ত অবস্থার গুরুত্ব প্রতিমাকে জানাইয়া যাওয়া উচিত মনে করিয়া প্রতিমা যে ঘরে ছিল সেই দিকে তড়িৎ অগ্রসর হইল। মিঃ আইয়ার তখন হাতিয়ার গুছাইতে ব্যস্ত।

বাইরের ঘরে সমিতির ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস লেখা হইলেও অন্দরে ইহার বিন্দুমাত্র ছাপ নাই। প্রতিমা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠান-বৌয়ের সঙ্গে জমাইয়া তুলিয়াছে।

অতিথিপরায়ণ সরল প্রকৃতির এই মহিলা তাহার এই নূতন সাথীকে কি করিয়া যত্ন করিবে, কোথায় বসাইবে, কি খাইতে দিবে তাহার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রতিমা অনেক কষ্টে অনেক অনুরোধ করিয়া তাহার জন্য ভাবিতে নিষেধ করিয়া তাহাকে তাহার পাশে বসাইয়া আলাপ সুরু করিল।

পাঠান-বৌ কথায় কথায় ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "বহিন তুমি বড় সুখী, তোমার শৌহর তোমাকে খুব পিয়ার করে। তোমার উপর তার খুব মোহাব্বত।

"তুমি বুঝলে কি করে?" দুষ্টুমির হাসি হাসিয়া প্রশ্ন করিল প্রতিমা।

"বুঝতে পারি বহিন, বুঝতে পারি।" ঐ মধুতে আমার কণ্ঠ পর্যন্ত ভরা। বাবুজী যখন তোমাকে এখানে রেখে গেলেন তখন তিনি তোমাকে যে চোখে ক্ষণিকের জন্য বিদায় দিলেন তেমনি চোখের চাহনি আমি নিজেই দেখেছি অনেক। চোখ দিয়ে যেন তার ভালবাসা পাহাড়ী ঝরণা-ধারায় ঝরে পড়ে তোমাকে নাইয়ে দিচ্ছিল। বাবুজী তোমার জন্য জান দিতে পারেন। প্রতিমা বলিল, "পিয়ার যেমন করেন তেমনি দরকার হলে তিনি আমার জানও নিতে ছাড়বেন না, বড় নিষ্ঠুর!"

"তা ত পারবেই হবে, আজাদীর জন্য, ইজ্জৎ রক্ষার জন্য যদি তোমায় খুন করতে হয় তবে তা তিনি করবেন তোমায় পিয়ার করেন বলেই! দিলকী পিয়ারকে, ভালবাসার বস্তুকে যদি না দিতে পারলাম আজাদীর লড়াইয়ে তবে আর নিছাবর করলাম কি? জান বহিন, আমার খসমও দরকার হলে আমায় খুন করতে পারে, আমিও পারি তার জান নিতে। অথচ ও আমার জানের জান, আমার কলিজা, তবে এ ত খুন নয়! এ হ'ল আমার নিজেকেই কোরবানী!

তড়িৎ গৃহে প্রবেশ করিতেই পাঠান-বৌ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। প্রতিমা উঠিয়া দাঁড়াইল। তড়িৎ দেখিল প্রতিমার মুখ খুশীতে ঝলমল করিতেছে। আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রতিমা গোপন করিতে পারে নাই—তড়িৎ তাহাকে ভালবাসে পাঠান-বৌও একথা বুঝিতে পারিয়াছে! প্রতিমা পাঠান-বৌয়ের সঙ্গে তাহার কথোপকথনের বিষয় বলিয়া চলিল। যদিও ভাব-বিলাসের সময় এ নয়। কিন্তু তড়িৎ প্রতিমাকে হঠাৎ দারুণ দুঃসংবাদ শুনাইতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। ভাবাবেগের প্রথম জোয়ার কাটিলে প্রতিমা লক্ষ্য করিল তড়িৎ যেন অন্যমনস্ক, মনে হইতেছে প্রতিমার কথা যেন সে ভাল করিয়া শুনিতেছে না—থামিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে তড়িৎদা, তুমি অন্যমনস্ক কেন?"

"না, এমনি কিছু নয়"—এই পর্যন্ত বলিয়া মনে হইল যাহা

বলিতেই হইবে তাহাকে আর ঢাকাঢুকি দিয়া লাভ কি! আস্তে আস্তে প্রতিমাকে সমস্ত কথা শুনাইল।

প্রতিমার পায়ের নীচ হইতে মাটি যেন সরিয়া যাইতেছে, আর বুঝি সে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না—হাত বাড়াইয়া যেন কোন-কিছু একটা আশ্রয় খুঁজিতেছে। তড়িৎ তাহার হাত খপ করিয়া ধরিয়া তাহাকে সস্নেহে বসাইয়া দিল।

তাহার চিরদুঃখী মা—প্রতিমা তাঁহাকে এতদিন ছায়ার মত অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু ঠিক তাঁহার শেষমুহূর্তে কাছে থাকিতে পারিল না। কেমন করিয়া না জানি মা শেষনিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন—নিশ্চয়ই একবার প্রতিমাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন—চীৎকার করিয়া প্রতিমার কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছিল। পরমুহূর্তেই তাহার মনে হইল তাহার মা জীবন দিয়াছেন এক মহান আদর্শের যূপকাষ্ঠে—তাঁহার জন্য কাঁদিয়া, শোক করিয়া মৃতের আত্মার অবমাননা করিবে না। এই কথা ভাবিতেই শোকের বোঝা যেন অনেকটা হাল্কা মনে হইল।

বসন্ত সিংহের জন্যও তাহার কষ্ট কম হয় নাই—কিন্তু তিনিও বীরধর্ম রক্ষা করিতে জীবন দিয়াছেন—ইঁহারা মহান—ইঁহাদের জন্য শোক সার্থক হইবে ইঁহাদের আদর্শ রক্ষা করিতে পারিলেই।

প্রবোধ দেওয়ার জন্য তড়িৎ ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, "যারা প্রাণ দিয়েছেন, যারা ধরা পড়েছেন তাঁদের সম্মানরক্ষার্থে তাঁদের আদর্শকে সিদ্ধির পথে নিতেই আমাদের অন্তরের শক্তিকে আরও বড় করতে হবে। বিপ্লবীর জীবনে শোকের প্রকাশ সাধারণ মানুষের মত হা-হুতাশ করে নয়। আমাদের শোক আমাদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে প্রেরণা যোগাবে—বীরধর্ম এমনি করেই শোক প্রকাশ করে আসছে যুগে যুগে…"

সহসা মিঃ আইয়ারের আহ্বানে তড়িৎকে ঘরের বাহিরে যাইতে হইল। মিঃ আইয়ারের নিকট শুনিতে পাইল যে, ডাঃ কিষণচাঁদ পথে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। বনোয়ারী গ্রেপ্তার এড়াইয়া আসিয়াছে সত্য, কিন্তু পুলিসের নজর এড়াইতে পারিয়াছে কিনা তাহা সন্দেহ—তাহার বিশ্বাস পারে নাই। সুতরাং এ গৃহও আর এক মুহূর্তের জন্যও নিরাপদ নয়। অবিলম্বে তাহারা গৃহত্যাগ না করিলে শুধু যে তাহারাই গ্রেপ্তার হইবে তাহা নয়। এ বাড়ীটিকেও পুলিসের আক্রোশের আওতায় ফেলিয়া যাইতে হইবে—ভবিষ্যতের আশ্রয় নষ্ট হইবে। স্থির হইল পাইবারের পথেই এক বার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে।

"বেরিয়ে পড়েই এক বার শেষ চেষ্টা করতে হবে। নৈরাশ্যে ভেঙে পড়লে চলবে না, দমে আমরা কিছুতেই যাব না—এগিয়ে যাবই"—দৃঢ় কণ্ঠে কহিল তড়িৎ।

প্রশান্ত হাসিতে আইয়ারের মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "আজ আমার মনে পড়ছে কনষ্টান্টিনোপলের একদিনকার একটি ঘটনা—কে এক জন সিগারেট খেয়ে শেষ টুকরোটুকু ফেলে দিয়েছিল, তারই আগুনে প্রলয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড সৃষ্টি করেছিল। আমরা প্রত্যেকেই একটা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ, একটা বিরাট দেশেও আগুন জ্বালাতে একটু অগ্নি-স্ফুলিঙ্গই যথেষ্ট। আমরা মরলেও আমাদের হৃদয়ের আগুন ছড়িয়ে পড়বে সারা দেশে—সারা দেশে জ্বলে উঠবে বিপ্লবের আগুন, আমাদের জয় হবেই।" মিঃ আইয়ারের চক্ষু দুইটি আগুনের মত জ্বলিতে লাগিল।

তড়িৎ তাড়াতাড়ি অন্য কোন উপায় না দেখিয়া গৃহকর্ত্তা পাঠানকে ডাকিয়া প্রতিমাকে এই বাড়ীতে রাখিবার প্রস্তাব করিতে সে আশ্বাস দিল যে, প্রতিমার জন্য তাহাদের কোন চিন্তা নাই। যদি তাহার নিজের বাড়ীতে প্রতিমাকে রাখিলে প্রতিমার কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয় তবে সে ব্রিটিশ সীমানার বাহিরে তাহার যে-কোন আফ্রিদী বন্ধুর বাড়ীতে প্রতিমাকে রাখিয়া আসিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিবে। মোট কথা জান কবুল। বাবুজী যেন নিশ্চিন্ত থাকেন।

তড়িৎ ভিতরে গিয়া প্রতিমার নিকট তাহার এখানে থাকিয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে সে কহিল,"দেখ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থানের পথে অনুসরণকারী পথের কুকুরটাকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করে স্বর্গে যেতে চান নি। আর তুমি কি বলে আমায় ফেলে যেতে চাচ্ছ? আমার আর কে আছে তুমি ছাড়া আর তোমার আদর্শ ছাড়া? সুখে-দুঃখে সকল অবস্থার মধ্যে আমাদের জীবন এক হয়ে গেছে। আজ এই বিপদের মুখে তোমায় ছেড়ে দিয়ে আমি একান্ত নিশ্চিন্ত আরামে কি করে বসে থাকি বল ত?"

"বুঝে দেখ প্রতিমা, আমি ত কোন সুখের স্বর্গে যাচ্ছি নে।" ব্যথিত কণ্ঠে তড়িৎ কহিল।

"তুমি যে কোন মরণসাগরে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছ তা কি আমি বুঝি নে? যে বিপদের তলোয়ার তোমার কাঁধের ওপর ঝুলছে সে যদি খুলে পড়েই তবে তোমার আমার দু'জনার ঘাড়ে একসঙ্গে পড়তে সুযোগ দাও তড়িৎদা—চিরসাথী বলে যে প্রতিজ্ঞা আমরা করেছি তার থেকে বঞ্চিত হবার কিংবা বঞ্চিত করবার অধিকার আজ আর আমাদের কারুরই নেই!" প্রতিমার কণ্ঠস্বর দৃঢ়তাব্যঞ্জক।

তড়িৎ বুঝিল তর্ক করিয়া আর লাভ নাই, ব্যথাভরা কণ্ঠে বলিল, "তবে চল, আমাদের মিলন বোধ হয় এ যাত্রায়ই সার্থক হবে। প্রতিমার দৃঢ় সংকল্প দেখিয়া সে গৌরববোধ করিল।

১১

অনিশ্চয়তার শতবাহু প্রসারিত রাত্রির ব্যাপক অন্ধকার। ইহারই মধ্যে মোটর শহর ছাড়াইয়া খাইবার গিরিবর্ত্মের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। স্বয়ং বনোয়ারী গাড়ীর চালক।

রাস্তার দুই দিকেই এবং সামনের দিকেও দূরে দূরে অবস্থিত পর্ব্বতমালা যেন কালো পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ভারত-প্রবেশের পথে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পাহারা দিতেছে।

পেশোয়ার ছাড়াইয়া আধ মাইল আগে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর পাশ দিয়া মোটর হুস্ করিয়া চলিয়া গেল। তড়িৎ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আইয়ারের দিকে তাকাইলে তিনি বলিলেন, "এটা হচ্ছে

প্রসিদ্ধ ইসলামিয়া কলেজ, এরই সঙ্গে আছে হোস্টেল ; এখানকার প্রিন্সিপাল হচ্ছে এক জন ইংরেজ—চার জন প্রোফেসরই ইংরেজ, তা ছাড়া এক জন বাঙালী মুসলমান প্রোফেসারও আছেন। পূর্ব্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলায় বাড়ী। আপনাকে খুব চেনেন। তিনি আমাদের পরিচিত এবং সমিতি সম্পর্কে অনেক খবর রাখেন। খুব সহানুভূতিশীল—প্রয়োজন হলে আমাদের সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এখানে শিক্ষার নামে ইংরেজপ্রীতি ও ইংরেজ রাজভক্তি বেশীর ভাগ প্রচার করা হয়। ইংরেজী আদব-কায়দাও খুব শেখানো হয়। তবে তারা কতদূর সার্থক হবে তার বিচারকর্তা ভবিষ্যৎ। ব্রিটিশের উপর অসন্তোষও তাদের মধ্যে খুব।"

"একটা কাজ করলে হয় না মিঃ আইয়ার! সংগঠনশক্তি-সম্পন্ন দুই-একটি বাঙালী ছেলেকে যদি এখানে ছাত্র করে পাঠানো হয়, এদের মধ্যে আমাদের সমিতির কাজ করবার জন্য। মুসলমান হলেই ভাল হয়—নিদেনপক্ষে হিন্দুকেই মুসলমান করে পাঠাতে হবে "

"তা' ঠিক, হিন্দু-মুসলমান, জৈন, খ্রীষ্টান প্রয়োজন হলে আমাদের সবই হতে হয়। টার্কিতে থাকবার সময় ভারতীয় মুসলমান বলে কত যে নিষিদ্ধ খানা খেয়েছি তার আর ইয়ত্তা নেই। আপনাদের সঙ্গে মিশে জাতধর্ম্ম আর কিছুই রইল না!" —আইয়ার হাসিতে লাগিলেন।

"ধুয়ে মুছে যাবে সব বিপ্লবের পবিত্র রক্তগঙ্গায় স্নান করে" —হাসিয়া মন্তব্য করিল তড়িৎ।

তাহার এই জবাবে আইয়ার অভিভূত হইল। হাত বাড়াইয়া তড়িতের সহিত করমর্দ্দন করিয়া আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার মনোভাব গোপনে আদান-প্রদান করিয়া লইল।

তড়িতের দৃষ্টি অন্ধকার ভেদ করিয়া বাহিরটাকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছে। কিছু দূরেই মনে হইল যেন রেল-লাইন পাতা! আইয়ারকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে কি কোন রেলপথ আছে নাকি?"

"আছে, কাছাকাছি একটা ছোট ষ্টেশনও আছে। এই লাইনই খাইবার পাসের মধ্য দিয়ে ল্যাণ্ডিকোটাল পর্য্যন্ত গিয়েছে। এ লাইনের ওপর মিলিটারী গোয়েন্দার নজর সদাজাগ্রত সুতরাং এ পথে যাতায়াত আমাদের মত লোকের জন্য নিষিদ্ধ বস্তুর মধ্যে"— কথার শেষের দিকে কৌতুকের আভাষ সুস্পষ্ট।

"আমরা কি জামরুদের কাছে এসে পড়েছি?"

"তিন-চার মাইলের মধ্যেই জামরুদ। খাইবার গিরিবর্ত্মের মুখেই হচ্ছে জামরুদ কেল্লা, এটা পার হওয়াই হচ্ছে সমস্যা। খাইবার পলিটিক্যাল এজেন্টের অনুমতি ছাড়া জামরুদ পার হওয়া নিষিদ্ধ। টোল আপিসে অনুমতিপত্র দেখে, গাড়ী ভাল করে তল্লাসী করে তবে ছেড়ে দেয়। বেলা সাড়ে এগারোটার পর অবশ্য কাউকেই ভিতরে ঢুকতে দেয় না—আর ওখান থেকে বেড়িয়ে আসবার শেষ সময় হচ্ছে বিকেল সাড়ে চারটে। জামরুদ বেশ ভাল করে শক্ত কাঁটা তারের বেড়ায় ঘেরা। কেননা তার চার পাশেই হচ্ছে আফ্রিদীপানদের ছোট ছোট রাজ্য। ব্রিটিশের একটা মাটির তৈরি ছোট কেল্লাও আছে।"

"বেলা সাড়ে এগারোটার পর যখন ঢোকা নিষেধ তখন এই রাত্রিবেলায় আমাদের বাধাপ্রাপ্তি ত নিশ্চিত!"

"তা ত বটেই, তবে গাড়ী এগোতে দেখলে প্রথমটায় হয় ত মনে করবে সরকারী গাড়ী—এমন অসময়ে আর কার ঘাড়ে দুটো মাথা থাকতে পারে। তবে নিয়মমত ওরা থামাতে চেষ্টা করবেই।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ী টোল অফিসের সামনে উপস্থিত হইল। গাড়ী অগ্রসর হইতে দেখিয়া যে সান্ত্রী মোটর থামাইবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল তড়িৎ তাহাকে গুলি করিয়া ভূতলশায়ী করিল। সঙ্গে সঙ্গেই বিপৎসূচক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—অন্যান্য সান্ত্রীরা মোটর লক্ষ্য করিয়া রাইফেলের গুলি ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। মোটর ততক্ষণে একটা বাঁক ঘুরিয়া গুলির আওতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

গাড়ীর মধ্যে একটা নীরব উত্তেজনা জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। গাড়ী ক্রমশঃ চড়াই বাহিয়া উপরে উঠিতেছে। দূরের শ্রেণীবদ্ধ কালো পাহাড়গুলি একবার আগাইয়া আসিতেছে, আবার গাড়ী মোড় ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও ঘুরিয়া যাইতেছে। এইটু পর পরই সাইনবোর্ডের মত কি দেখা যাইতেছে।

"এগুলি মোটর চালকদের সাবধান করার সঙ্কেত। সাবধানে গাড়ী চালিও বানোয়ারী।" বানোয়ারীর প্রায় কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিলেন আইয়ার। একটু পরে পুনরায় বলিলেন, "ইংরেজদের তরফ থেকে আমাদের এখন পিছু নেওয়ার ভয়, আর আশপাশ থেকে ভয় আছে আফ্রিদীদের কাছ থেকে। কেননা ওরা হয়ত ভাবছে এ গাড়ী ইংরেজদের।

খাইবার গিরিসঙ্কটের মধ্যে গাড়ী ঢুকিতে তখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। কিন্তু পাহাড়ের চড়াই উৎরাই সুরু হইয়া গিয়াছিল। অকস্মাৎ মনে হইল এক বিরাট পাহাড় তাহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মনে হইতেছিল পথ এখানেই শেষ। একটু আগাইয়া আসিলেই অবশ্য পথ দেখা যায়। এখান হইতেই পাহাড়ের গাত্র বাহিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া পথ উপরের দিকে উঠিয়া যাইতেছে। এক দিকে বিরাট খাদ, আর অপর দিকে পাহাড়ের উচ্চ গাত্র। খাদের দিকটায় মাঝে মাঝে লোহার বেড়া আছে—কিন্তু চলন্ত গাড়ীর ধাক্কা সামলাইবার মত মজবুত নয়। কাজেই হাত ফসকাইলে ঐ পাহাড়ের পাদদেশে বন জঙ্গলের মধ্যে কয়েক শত ফুট নীচে চিরসমাধি লাভ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই! রাস্তায় অগণিত বাঁক, মাঝে মাঝে পুলও আছে!

গাড়ী এদিক ওদিক হেলিয়া আস্তে আস্তে গোঁ গোঁ করিয়া উপরের দিকে উঠিয়া চলিয়াছে। বারে বারে গিয়ার বদলাইবার প্রয়োজন হইতে লাগিল। দিনের বেলাতেই যে পথে মোটর

চালানোর রীতিমত ওস্তাদির প্রয়োজন, সেই পথে এই নিবিড় অন্ধকারে মোটর চালানো মৃত্যুকেই চ্যালেঞ্জ করার মত।

বনোয়ারী একবার মাত্র এ পথে আসিয়াছে। কিন্তু তাহার প্রখর স্মরণশক্তি এবং দুর্জয় সাহস বজ্রকঠিন হাত তাহাকে লইয়া চলিয়াছে উপরের দিকে ভূতে পাওয়ার মত। কোনও দিন পিছু হটে নাই—আজও পিছু হটিয়া আদর্শের অমর্যাদা করিবে না।

আইয়ার বলিলেন, "ওর বাহাদুরি আছে বটে! এখানে দিনের বেলাই গাড়ী চালানো কঠিন, তা বানোয়ারি গাড়ী চালাচ্ছে ঘোর অন্ধকারের ভিতর দিয়েই। তাও একবার মাত্র এই রাস্তায় এসেছিল, সেই সেবার যখন আপনি ওকে জেলালাবাদে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন।"

উত্তেজনার আবহাওয়াকে হাল্কা করিবার জন্য তড়িৎ প্রতিমার হাতে ঈষৎ চাপ দিয়া কহিল, "জানো প্রতিমা বানোয়ারীর হাত ফসকালে, একটু ষ্টীয়ারিঙের গোলমাল হলে আমাদের কি গতি হবে।"

"ছোটবেলায় শুনেছিলাম, পুণ্যবানেরা সশরীরে স্বর্গে যায়—সুতরাং পুণ্যের জোর ততটা না থাকলেও আমাদের সজ্ঞানে স্বর্গ-প্রাপ্তি নিশ্চয়—সাধ্য কি ইংরেজ আমাদের গারদে পোরে!" প্রতিমার জবাব দেওয়ার আগেই সকৌতুকে মন্তব্য করিল আইয়ার।

প্রতিমা তড়িতের কাছে আরও সরিয়া ঘন হইয়া বসিল, কানের কাছে মুখ লইয়া কহিল, "এমনি করে একসঙ্গে তেমন সৌভাগ্য কি আমার হবে!"

"সেদিন গঙ্গার বুকে ভাসতে ভাসতে বলেছিলে তোমার ফুল-শয্যার কথা, মধুরাত্রির কথা। সেদিন বোধ হয় কথাটা অমনিতেই বলেছিলে। কিন্তু আজ বোধ হয় এসেছে আমাদের বজ্রকঠোর মধুরাত্রি, কঠিন পাষাণ-শয্যা।"—তড়িৎ প্রতিমার কানে কানে চুপি চুপি কহিল। প্রতিমাকে আরও একটু নিবিড় হইবার জন্য বাঁ হাত দিয়া আকর্ষণ করিল। ডান হাতে তখনও পিস্তল ধরা আছে। আজ আর প্রতিমা ফুলশয্যার কথায় লজ্জা পাইল না।

মাঝে মাঝে পাহাড়ের মাথায় আলোর দিকে তড়িৎ ও প্রতিমার দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া আইয়ার কহিল, "ওগুলি হচ্ছে গিয়ে সান্ত্রীদের পিকেট বক্স। মাটি থেকে মই বেয়ে ওগুলিতে চড়তে হয়। ওপরে উঠেই ওরা মইগুলি তুলে নেয়—নয়ত পাহাড়িয়ারা গোপনে উঠে ওদের অসতর্ক মুহূর্ত্তে ওদেরকে খুন করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যেতে পারে। এমনি ঘটনা অনেক ঘটেছে—তাই এই সতর্কতা।"

তড়িৎ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতেই তাহার মনে হইল, এই পিকেট বক্সগুলি হইতে আলোর সাহায্যে কি যেন সঙ্কেত করা হইতেছে। মিঃ আইয়ার দৃষ্টি সে ব্যাপারে আকর্ষণ করাইয়া কহিল, "এতক্ষণ নিশ্চয়ই জামরুদ টোল আপিস থেকে টেলিফোনে খবর এসে গিয়েছে। এদেরকে বোধ হয় আমাদের পিছু নিতে কিম্বা পথরোধ করতে নির্দ্দেশ দিয়েছে।"

আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আইয়ার কহিল, "আজ প্রকৃতিও বোধ হয় আমাদের বিরুদ্ধে—মনে হচ্ছে, শীঘ্রই আকাশ ঝড়ে ফেটে পড়বে। তখন কি আর গাড়ী চালানো সম্ভব হবে।"

"আমরা এখন সমস্ত সম্ভব অসম্ভবের বাইরে চলে গিয়েছি—একটা চূড়ান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের থামলে চলবে না দোস্ত! আমারও মনে হচ্ছে এই ঝড়ই আমাদের বাঁচিয়ে দেবে পেছু নেওয়ার হাঙ্গামা থেকে।"—অভয়বাণী উচ্চারণ করিল বানোয়ারী।

দিনের বেলা হইলে দেখা যাইত, কয়েকটা রাস্তা সমান্তরাল ভাবে সিঁড়ির মত পর পর উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে সাজানো। হঠাৎ দেখিলে মনে হইবে ইহারা পরস্পরবিচ্ছিন্ন। এগুলি একই রাস্তা, পাহাড়ের গা বাহিয়া কখনও উপর দিয়া কখনও নীচ দিয়া চলিয়াছে।

মিঃ আইয়ার বসিয়াছিলেন গাড়ীর বাঁ দিকে। আলোর ঝলকানিতে পথ হঠাৎ ক্ষণিকের জন্য উদ্ভাসিত হইয়া পুনরায় অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল। এ আলো বিদ্যুতের নয়। তীব্র সার্চ লাইট ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছিল তাহাদের পিছু ধাওয়া করিয়া সরকারী গাড়ী! ফলাফল এখন সকলের নিকট অতি স্পষ্ট আকারে আবার দেখা দিল!

"আলি-মসজিদ পর্য্যন্ত যেতে পারলে আজকের মত রক্ষা পাওয়া যেত। ওখানে এক আফ্রিদী পরিবারের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। আশ্রয় চাইলে কাউকেই ফেরায় না—আর আশ্রয় দিলে জান দিয়েও রক্ষা করতে চায় আশ্রিতকে।"—ড্রাইভারের সীটের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন মিঃ আইয়ার।

"আলি-মসজিদ কত দূর?" প্রশ্ন করিল তড়িৎ।

"খুব বেশী নয়; তবে চড়াই-উৎরাই করে, আর আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করে একটু সময় লাগবে বৈ কি।"

"ওখানে সেনানিবাস নেই?"

"আছে; তবে খুব বেশী লোক নেই। দু'একটা দোকান আর আছে একটা মসজিদ। আলি নামক এক মুসলমান ফকিরের নামেই এ জায়গা ও মসজিদ। ওখানে মালচলাচলের একটি রোপ ট্র্যান্সপোর্ট ষ্টেশনও আছে।"

"পেছন থেকে ওরা আমাদের কত দূরে আছে, তা ঠিক বুঝতে পারছি না। ওরা খুব বেশী দূরে থাকলে হয় ত শেষ পর্য্যন্ত ধরতে নাও পারে।" সম্ভাবনার কথা উচ্চারণ করিল তড়িৎ।

"পেছন থেকে ওরা আমাদের নাগাল পাবে না। ওরা আসছে সাবধানে নিজেদের জান বাঁচিয়ে—ওদের গতি আমাদের চেয়ে নিশ্চয় কম—সামনে থেকে কেউ আক্রমণ না করলে..."

কথা কহিতেছিল বানোয়ারী। তাহার বক্তব্য শেষ করিতে না দিয়াই প্রতিমা সকলের দৃষ্টি উপরের দিকে আকর্ষণ করাইয়া কহিল, "দেখুন, দেখুন ওপর দিক থেকেও যেন একটা আলো এগিয়ে আসছে।"

এতক্ষণ সকলেই নীচের দিকে তাকাইয়াছিল, নীচের আলোর

গতিপথ লক্ষ্য করিয়া, এবার উপরের আলো দেখিয়া উভয় দিক হইতেই আক্রান্ত হইতেছে দেখিয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে লাগিল।

"মিঃ আইয়ার। প্রতিমা, এস সবাই আমরা পিস্তল নিয়ে তৈরি থাকি একবার শেষ লড়াইয়ের জন্য।"—নির্দেশ দিল তড়িৎ।

"গাড়ীতে গাড়ীতে কলিশন করিয়ে দিয়েই একেবারে ওদের সঙ্গেই সহমরণে গেলে হ'ত না।" তখনও আইয়ার তার সহজাত কৌতুকপ্রিয়তা হারায় নাই।

"তা মন্দ নয়—কিন্তু আমি বলি আপনারা এখানে নেমে যান।—আমি এ কাজটি করব।"—মন্তব্য করিল বনোয়ারী।

আইয়ার—"এখানে নয়। তা হলে ধরা পড়ে যাব। এখানকার পাঠানদের ইংরেজরা অনেক টাকা দিয়ে কিনে রেখেছে। অল্প একটু এগিয়ে—তার পর এ চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু তোমায় ছেড়ে ত আমরা যেতে পারব না।"

বানোয়ারী একটু অধীর হইয়া বলিল, "এখন তর্ক-বিতর্কের সময় নয় আইয়ার বাবু। এখন আমাদের একজন মরলেও আমাদের অনেক লাভ।"

প্রতিমা—"সামনের গাড়ীটা যে বড্ড নিকটে এসে পড়ল।"

আইয়ার—"না, এখনও একটু দূরে আছে। তবে ওদের রাইফেলের পাল্লা বেশী। সঙ্গে মেশিনগান এনে থাকলে ত কথাই নেই।"

আইয়ার আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ গুলির আওয়াজে সকলেই সচকিত হইয়া উঠিল। গুলি বিদ্ধ হইয়াছে আইয়ারের বুকে। তিনি তাঁহার বুক শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "বিদায় তড়িৎবাবু, বিদায় প্রতিমা দেবী, বানোয়ারী তোমাকেও জানাই আমার চিরবিদায় সম্ভাষণ—যদি পুনর্জন্ম থাকে তবে যেন আমরা আবার স্বাধীন ভারতের পতাকাতলে মিলিত হতে পারি। চেয়েছিলাম ওদের সঙ্গে আলিঙ্গন করে মরতে—কিন্তু…" তাঁহার কথা শেষ হইল না। দুর্দান্ত দাক্ষিণাত্যী বীর রাঘব আইয়ারের প্রাণবায়ু মহাশূন্যে বিলীন হইয়া গেল। তড়িৎ আস্তে তাঁহার অসাড় দেহ মোটরের সীটের পিছনে এলাইয়া দিল। প্রতিমা হায় হায় করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

তড়িৎ প্রতিমাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল, "এখন শোক করবার সময় নয় প্রতিমা। দেখ নি মিঃ আইয়ার চরম মৃত্যুমুহূর্তেও মনের প্রফুল্লতা হারান নি, তিনি ত আমাদের আদর্শ হয়ে রইলেন। এখন তো কাঁদবার সময় নয়, আমার সঙ্গে নেমে এস।

তার পর বনোয়ারীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "নিষ্ফল আর আমাদের গাড়ী চালানো। গাড়ী থামিয়ে দাও। আমি আর প্রতিমা প্রথম নেমে পড়ছি, তুমিও নেমে এস, তার পর এক পাশে দাঁড়িয়ে এমন ভাবে চালিয়ে দাও যে গাড়ীটা খাদে পড়ে যায়। গাড়ী খাদে দেখলে ওরা মনে করবে বিপদ হয়ে গাড়ী উল্টে গেছে আর আমরাও তলিয়ে গেছি তার সঙ্গে। ওরাও নিশ্চিন্ত হবে। আর এক মুহূর্ত দেরী নয় বনোয়ারী। ঝড়ও বোধ হয় এসে পড়ল, এতে আমাদের সুবিধেই হবে।"

বনোয়ারী গাড়ী থামাইয়া কহিল, "আপনারা নেমে যান, আমি ঠিক নেমে পড়তে পারব।"

তড়িৎ ও প্রতিমা গাড়ী হইতে নামিলে বনোয়ারীও নামিল। ভাবিয়াছিল নীচে হইতেই হাত বাড়াইয়া গাড়ীতে ষ্টার্ট দিতে পারিবে। কিন্তু নীচে নামিয়া দুই-একবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়া পুনরায় গাড়ীতে উঠিয়া দেখিল একটা 'গীয়ার' ঠিক নাই। ঐ 'গীয়ার' ঠিক করিয়া মনের ভুলে গাড়ীতে বসিয়াই ষ্টার্ট দিয়া ফেলিল। গাড়ী এক লাফে গিয়া খাদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বনোয়ারী হয়ত নামিবার শেষ চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু পারে নাই।

প্রতিমা শক্ত করিয়া তড়িৎকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "বনোয়ারীও আমাদের ছেড়ে গেল তড়িৎদা।"

তড়িৎ কিছুক্ষণ নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজেকে প্রতিমার বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত করিল। "আপাততঃ সব শেষ হ'ল। কিন্তু আমাদের ত শেষ হয় নি, শেষ হবেও না কখনও। তুমি আমি ত এখনও বেঁচে আছি। দেশে আছে আমাদের আদর্শ-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প। আমাদের থামলে চলবে নেই, কিছুতেই নিরাশ হলে নেই। আমাদের চোখের সামনে আশার আলো কখনও নিভে যায় না। এগিয়ে আমাদের যেতেই হবে—প্রয়োজন হলে একাই। চল, আর দেরি নয়। ওদের গাড়ীটা প্রায় এসে পড়ল।"

অন্ধকারে দাঁড়াইয়া বনোয়ারী ও আইয়ারকে একবার মনে মনে শেষ অভিবাদন জানাইয়া তড়িৎ প্রতিমার হাত শক্ত করিয়া ধরিল। তারপর রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া পাহাড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

নিবিড় অন্ধকার, মাঝে মাঝে সামনে আর অগ্রসর হওয়া যায় না। এদিক-ওদিক করিয়া, চলিতে হইতেছে—প্রায় অন্ধের মতই।

ইতিমধ্যে ঝড়ের প্রলয় তাণ্ডব পাহাড়ের বুক মাতাইয়া তুলিয়াছে। ধূলি-ঝঞ্ঝায় অন্ধকার নিবিড়তর হইয়া উঠিল। ধূলিকণা আসিয়া তীব্রবেগে মুখে আঘাত করিতেছে, মনে হয় অসংখ্য সূচ ফুটাইয়া দিতেছে। কিছুতেই তড়িতের গতি শ্লথ হইল না। তড়িৎ সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রতিমাকে একরকম টানিতে টানিতেই লইয়া চলিল।

"ধূলোয় যে চোখ বন্ধ হয়ে এল তড়িৎদা।"

"ও ভালো চোখ বন্ধ করেই চল প্রতিমা, কেননা চোখ খোলা রেখেও এখন কিছু লাভ নেই।"

শিলাময় বন্ধুর পথে বারে বারে হোঁচট খাইতে লাগিল। পেশোয়ার হইতে তাড়াহুড়া করিয়া আসিবার সময় প্রতিমা জুতা ভুলে ফেলিয়া আসিয়াছে। তাহার পা স্থানে স্থানে কাটিয়া গিয়াছে। যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিল।

"এখানে কি পথ নেই তড়িৎদা—আর যে হাঁটতে পারছি না, পায়ে লাগছে !"

তড়িৎ—"এ ত পথ নয় প্রতিমা ! মানুষের পায়ে চলার পথ নয়। অজানা পাহাড়ের উপর দিয়ে আমরা চলেছি। আর এই অন্ধকারেই চলতে হবে, এখানে কেউ আলো ধরবে না। আমাদের অন্তরের আলোতেই, আমাদের বিশ্বাসের আলোতেই এই নীরন্ধ্র অন্ধকারে পথ দেখে চলতে হবে। এ দুর্যোগ থামবে—তিমির-রাত্রিরও অবসান হবেই, অন্ধকারের বুকে যে আলো লুকিয়ে আছে তাই একদিন আলোয় ফুটে উঠে পূর্ণপ্রকাশে আত্মপ্রকাশ করবে। চল, একটু পরেই ঐ মেঘের কোলে রূপালী রেখা দেখতে পাচ্ছ। দেখতে পাচ্ছ না মাঝে মাঝে মেঘের কোলে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—তারই সাহায্যে আজ আমি পথের নিশানা করে নিচ্ছি। আর এই ক্ষণিকের রূপালী রেখাই একদিন অনন্ত আলোর রাজ্যে আমাদের পৌঁছে দেবে।" সান্ত্বনার স্বরে প্রতিমাকে কহিল তড়িৎ, "চল, আমরা আলোক-পথযাত্রী। ওখানে আমাদের পৌঁছতেই হবে।"

তড়িতের মনে হইল প্রতিমা আর কিছুতেই পায়ে ভর দিয়া চলিতে পারিতেছে না। পা দুটো তাহার যেন ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। প্রতিমা আর মাথা খাড়া রাখিতে পারিতেছে না। চলিতে চলিতে তড়িতের কাঁধে মাথা রাখিল। তড়িৎ তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া অতি কষ্টে চলিতে লাগিল।

"আমরা দু'জনেই কি একসঙ্গে ঐ আলোর দেশে পৌঁছতে পারব ?" ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল প্রতিমা।

তড়িৎ—"কি জানি ! দু'জনেই পারব কিনা জানি নে। তুমি যদি পড়ে যাও, তোমাকে রেখে আমি এগিয়ে যাব, পিছন ফিরেও চাইব না। আমি যদি অক্ষম হয়ে পথেই থেমে যাই, তুমি কি আমায় ফেলে রেখে, পেছনে না তাকিয়ে, একলা এগিয়ে যেতে পারবে না। সাথী না জোটে একলাই যে আমাদের চলতে হবে। এই ভরসাটুকু দাও প্রতিমা।

"গতিই আমাদের সাধনা—গতিই আমাদের আদর্শ।"

"আমি পারব, তড়িৎদা, আমি সব পারব, আমি যে তোমারই প্রিয় শিষ্যা। তোমার চেয়ে তোমার আদর্শকে যে আমি বেশী ভালবাসি। নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ধরিয়া দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল প্রতিমা।

"আজ আমার বড় আনন্দের দিন প্রতিমা ! এই যে কণ্টকাকীর্ণ শিলাময় বন্ধুর পথ—এই যে গভীর অন্ধকারে ঝঞ্ঝার মাতামাতি একে ভেদ করে চলতে হবে আমাদের ঐ কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়ে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে তুলতে—এই মুহূর্তে তোমার আশ্বাস পেয়ে আমার মনে হচ্ছে আজই আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ শুভ মুহূর্ত—এই মুহূর্তেই এসেছে আমাদের মধুরাত্রি !

সমাপ্ত

ভাড়াটে ঘর

রওশান আলি শাহ্

ছোট একখানি ভাড়াটে টালির ঘর
রূপনারাণের বাঁকটার কোল ঘেঁসে,
নেপিয়ার ঘাসে ঢাকা পূবদিকে চর
সুপারি-তালের নিরিবিলি পরিবেশে।

ভরা কোটালের ক্ষ্যাপা জোয়ারের জল
ভাড়াটে ঘরের ভিৎ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়,
মড়া পোড়াবার কাঠ, কচুরীদল
ভেসে এসে ঠেকে জেলে ডিঙিটার গায়।

হিজল বনের নিঝ্ঝুম মরফিয়া
নিয়ে আসে কোন্ স্বপনের নিবিড়তা,
ধীরে নেমে আসে দূরের না-পাওয়া প্রিয়া
স্মৃতি-পর্দাতে পুরণো দিনের কথা।

ওপারে বিরাট প্রাসাদের ছায়া যত
ভাড়াটে ঘরের কাছে করে মাথা নত।

চিত্র-প্রদর্শনী

শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় গত ১৮ই ডিসেম্বর যাদুঘরে একাডেমী অব ফাইন আর্টসের অষ্টাদশ বাৎসরিক রম্যকলা-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিশিষ্ট শিল্পীদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে অঙ্কিত প্রায় পাঁচ শত চিত্র এবং চব্বিশটি ভাস্কর্য নিদর্শন এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। দেশীয় শিল্পীদের চিত্র ছাড়া রুশিয়া, জাপান, ইটালী, ব্রিটেন, অষ্ট্রিয়া এবং আমেরিকার কয়েকজন শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রাদিও এখানে প্রদর্শিত হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন শিল্পীর নানা ধরণের কাজের এই সমাবেশের মাধ্যমে বর্তমানে আমাদের দেশে চিত্রকলার ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং শিল্পকলার গতি-প্রকৃতি উপলব্ধির সুযোগ হয়েছে। এই সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা এদিক থেকে বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

নীল রঙের পরিচ্ছদে একটি মেয়ে   শিল্পী—শ্রীজগদীশ রায়

আঙ্গিকের ক্ষেত্রে ভারতের শিল্পীরা প্রধানতঃ দুই রকম ধারায় শিল্পচর্চা করছেন। একটাকে বলা হয় ভারতীয় পদ্ধতি, অপরটা হ'ল পাশ্চাত্য পদ্ধতি। যাঁরা ভারতীয় ধারা অবলম্বন করে শিল্পকর্ম করেন তাঁদের কারও কারও চিত্রে দেখা যায় লোকশিল্পের আঙ্গিকের প্রভাব, কারও-র শিল্পরচনায় অবনীন্দ্র-নন্দলাল-প্রবর্তিত ধারার প্রভাব। কেউ আঁকেন প্রকৃতিগত রূপ (realistic form), কেউ আঁকেন বস্তুর আলঙ্কারিক রূপ (decorative form)। আবার, কারও ছবিতে দেখা যায় বিভিন্ন পদ্ধতির সংমিশ্রণে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নব রূপায়ণের প্রয়াস। পাশ্চাত্যের বিবিধ "ism"-এর প্রভাবও বহু চিত্রে দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে যাঁরা চিত্রকর্ম করেন, তাঁদের কাজের মধ্যেও রয়েছে নানা ধরণের আঙ্গিক—ক্লাসিক্যাল, ইম্প্রেসনিজম্, কিউবিজম্, পোস্ট-ইম্প্রেসনিজম্, এক্স্‌প্রেসনিজম্। অতি আধুনিক 'ism'-এর প্রভাবও আমাদের দেশের শিল্পকলায় প্রতিফলিত হয়েছে। বিভিন্ন শিল্পীর কাজে এ সবের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপীয় শিল্পের এবস্ট্রাক্ট আর্টের রূপ ও আঙ্গিক—অবচেতন মন, কল্পনা এবং বুদ্ধির যথেচ্ছ বিকাশ। আলো-ছায়া ও বস্তুর স্থূলত্বকে অবলম্বন করে বিবিধ বিজ্ঞানসম্মত ভাবধারা, কল্পনা ও গতিবেগ এবস্ট্রাক্ট আর্টে রূপায়িত

সুরের স্বর্গ শিল্পী—শ্রীমোহন বি. সামন্ত
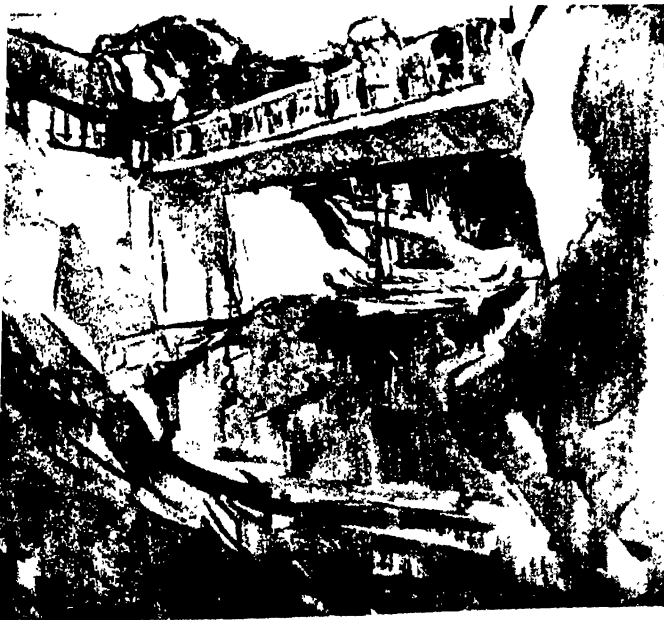
লাল সেতু শিল্পী—শ্রী কে. সি. এস. পাণিকার

করছেন ব্যক্তিবাদী শিল্পীরা। আমাদের দেশের কোন কোন শিল্পীও সেই পথে শিল্পসৃষ্টির সার্থকতা খুঁজছেন। বর্তমানে সব দেশের চিত্রকলায়ই দেখা যায়—আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের সমস্যাসঙ্কুল জীবনের রূপায়ণে নানা আঙ্গিক ও ভাবধারার পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এই বিবর্তন আমাদের দেশের অনেক শিল্পীর রসচেতনাকে আকৃষ্ট করেছে—যার সাহায্যে তাঁরা ভারত-শিল্পের নব-রূপায়ণের চেষ্টা করছেন।

শিল্পকলা অবশ্য স্থির ভাবে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, প্রচলিত সংস্কৃতি এবং রীতিনীতি শিল্পকলার অগ্রগতির পথে বন্ধনস্বরূপ। সংস্কারমুক্ত হলেই শিল্পকলা গতিশীল হয়—নতুবা হয়ে ওঠে গতানুগতিক। তাই নব-ভাবধারার সংমিশ্রণ, বিভিন্ন আঙ্গিকের অনুশীলন, নূতন পথসন্ধানের প্রয়াস শিল্পকলায় নূতন প্রাণসঞ্চারের লক্ষণ। তবে এ কথাও বিশেষভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, শুধুমাত্র আঙ্গিকের অনুকরণে 'ফ্যাশন' সৃষ্টি হতে পারে, সার্থক শিল্পসৃষ্টি হয় না। অনুকরণে এবং অনুসরণে প্রভেদ আছে।

এবারকার চিত্রপ্রদর্শনীতেও অনেক শিল্পীর চিত্রে লক্ষ্য করা যায় নূতনত্বের প্রয়াস। মোহন বি. সামন্তের রচনারীতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। এঁর চিত্রগুলিতে ড্রয়িং, রূপ এবং বর্ণযোজনায় প্রাচ্যরীতিসুলভ—বিশেষভাবে রাজপুত, পারসীক ও মিশরের আদিম চিত্রকলার ধরণের প্রভাব রয়েছে। সর্ব্বোপরি স্বকীয়তায় এবং অভিনবত্বে এঁর চিত্রগুলির সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে। কোন কোন চিত্রে মানুষের পা আঁকা হয়েছে খানিকটা দৃষ্টিকটু ভাবে। এই বিকৃতি চিত্রের ভাবপ্রকাশ বা অলঙ্করণের ক্ষেত্রে আদৌ সহায়ক নয়। ডেসমণ্ড ডয়েগের "রংয়ের পূর্ব্বে" ছবিটির

বিষয়বস্তু এবং রচনারীতি প্রতিভার পরিচায়ক। ঝড়ের আশঙ্কায় ভীতসন্ত্রস্ত বিড়ালের পিঠ-বাঁকানো ভঙ্গীটি মনোরম ভাবে অঙ্কিত হয়েছে। এঁর আঁকা "রাতের পথ", "গৃহাভ্যন্তর" সার্থক রচনা। সুদর্শন বেনেগালের "ঘূর্ণায়মান", "রোপণ" চিত্রেও দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্ব রূপের মাধুর্য্য এবং পরিকল্পনার কুশলতা আছে। রামকিঙ্কর বেইজের 'কৃষক' এবং রামকুমারের চিত্র এবস্‌ট্রাক্ট আর্টের ক্ষেত্রে সার্থক প্রয়াস। শ্রীযুক্তা দময়ন্তী চাওলার রচনায় ফ্ল্যাট এবং উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার, সংযত সংক্ষিপ্ত রেখায় গঠনের এবং ভাববিন্যাসের প্রয়াসে নূতনত্ব আছে। শৈলজ মুখোপাধ্যায়ের

ফেরি-ঘাট শিল্পী—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

দাদু শিল্পী—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বেদনার বিনোদন ভাস্কর—শ্রীপ্রদোষ দাশগুপ্ত

এইচ. ব্লাকবার্ণের "সাদা বিড়াল" পরিকল্পনা এবং আঙ্গিকের ধরণ মনোরম। ভবেশ সান্যালের রচনা-রীতিতেও বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়।
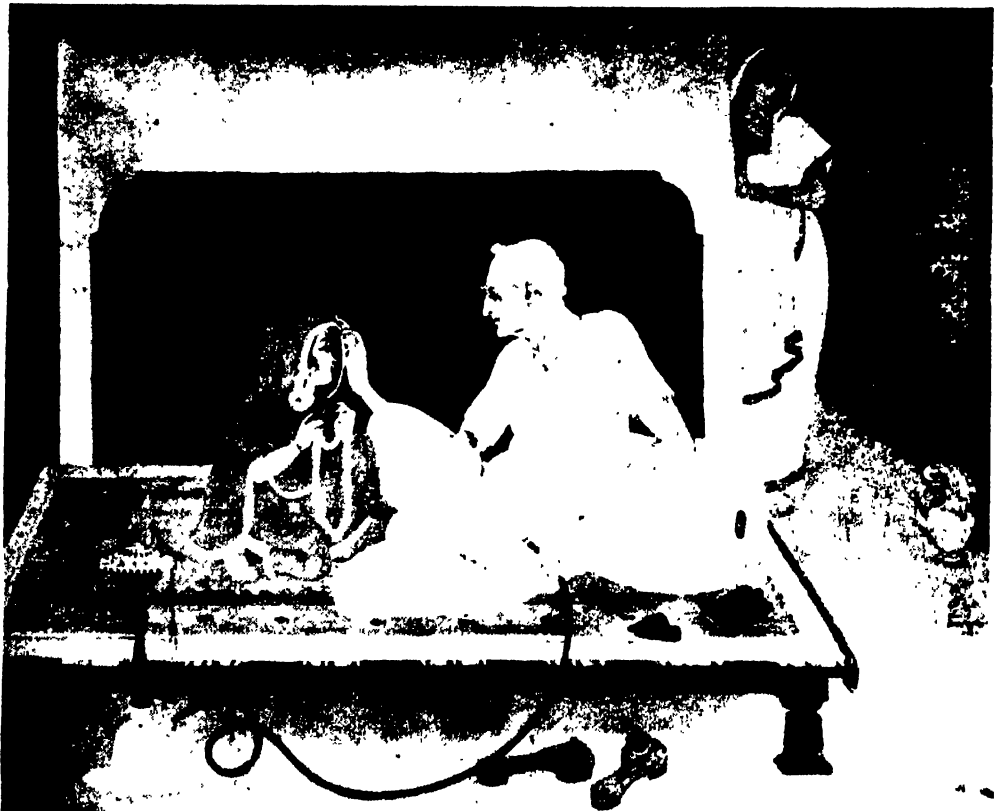
জলরঙ বিভাগে গোপাল ঘোষের "তরঙ্গ" এবং "মাছ ধরা" নিপুণ কাজ। এঁর আঁকা চিত্রগুলি বর্ণ ও তুলিকা-সম্পদের মাধুর্য্যে ভরপুর এবং শিল্পীর নিজস্ব আঙ্গিকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কানাই কর্ম্মকারের ছবিগুলি গতানুগতিক পদ্ধতিতে আঁকা চিত্রের মধ্যে ভাল কাজ। বীরেন দে-অঙ্কিত কতকগুলি চিত্র খেলো ধরণের বর্ণসমাবেশে [illegible] ব্যর্থ প্রয়াস। কল্যাণ সেনের দৃষ্টিকটু। সাদা কালোর কাজের ভেতর মাখন দত্তগুপ্তের রচনায় অভিনবত্ব অনেক ক্ষেত্রে সার্থক হয়েছে। চিত্রশিল্পী, কাজগুলি সজীব এবং সরস। হরেন দাসের কাজগুলির

তরঙ্গ শিল্পী—শ্রীগোপাল ঘোষ

মধ্যে দক্ষতার পরিচয় আছে, তবে চিত্রে রসসমাবেশের পরিধি কম বলে মনে হয়। সুশীল সেনের "এচিং" এবং মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্ত্তীর "তালগাছ" ড্রাইপয়েন্ট মনোজ্ঞ কাজ।

তেলরঙের কাজের বিভাগে পানিকারের "লাল সেতু"র পরিকল্পনা, বর্ণযোজনার অভিনব স্বাতন্ত্র্য ছবিটিকে একটি বিশিষ্ট রূপ দান করেছে। লাল রঙের ব্যবহারেও ছবিটি সরস হয়েছে। "ভোরবেলা মাঠের পথে" ছবিখানাও একই রীতিতে আঁকা। এথেল সি. সিয়ার "দুই বোন" চিত্রের রঙের ব্যবহারে শিল্পীর স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। জগদীশ রায়ের "দিপু", "নীল পরিচ্ছদে একটি মেয়ে" চিত্র দুখানি প্রতিকৃতি চিত্রাঙ্কনের সার্থক প্রয়াস। এঁর আঁকা ছবিগুলিতে দক্ষতা এবং প্রতিভার ছাপ আছে। সুশীল সেনের "পুষ্পাঞ্জলি", অনিল ভট্টাচার্য্যের "নিরালা রান্নাঘর", "অস্তগামী সূর্য্য" ছবিগুলি মৃদু এবং বর্ণযোজনার পরিপাট্য মাধুর্য্যমণ্ডিত। ক্ষিতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রূপলস্" এবং "একটি প্রতিকৃতি", ডি. পিওরিফিকাটো অঙ্কিত "রোমের গ্রাম্য মেয়ে" বলিষ্ঠ রচনা। চিত্রকারের অতি আধুনিক পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবান্বিত কাজগুলিতে নূতনত্বের চমক আছে, কিন্তু বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, রূপ, ছন্দ বা ভাবের যথাযথ বিকাশ, আঙ্গিকের কুশলতা, সবলতা বা সারল্য এসব কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না।

ভাস্কর্য্যের ক্ষেত্রে প্রদোষ দাশগুপ্তের "অবসর বিনোদন" রচনায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। সুনীল পালের "ভূমিকম্প" পরিকল্পনা-নৈপুণ্যে সার্থক হয়েছে। শ্রীদাম সাহার "তুতু" সুন্দর প্রতিকৃতি।

ভারতীয় চিত্রকলা বিভাগে সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দাদু" চিত্রটির বিষয়বস্তু এবং রচনানৈপুণ্য সর্ব্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আলবোলার নল হাতে উপবিষ্ট দাদু নববধূর মুখখানি দেখছেন! নববধূ নাতনীর হাতে বরমাল্য। দেয়ালের আড়ালে দণ্ডায়মানা মায়ের মুখে কৌতুকের মৃদু হাসি। এঁর কাজগুলির মধ্যে এমন একটা মাধুর্য্য আছে যা সহজেই মানুষের মনে সাড়া জাগায়। সমর ঘোষের এবারের কাজগুলিতে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু চকচকে খেলো রঙের ব্যবহারে ছবির মাধুর্য্য অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ধীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম, সুশীল মজুমদার ও শান্তি মুখোপাধ্যায়ের কোন কোন কাজের ভিতরে শিল্পীসুলভ রসের সন্ধান আমরা পাই। ধীরেন ব্রহ্মের "নাড়ুগোপাল" সার্থক রচনা। ইন্দ্র দুগারের চিত্রগুলিতেও আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিদায়ের প্রাক্কালে শ্রীমন্ত ও মালতী" উল্লেখযোগ্য কাজ। গোপেন রায়ের "রাজপুত্র ও অজগর", "শুকপঙ্খী নৌকা" চিত্র দুখানির আলঙ্কারিক ধরণটি মনোরম হয়েছে। রূপকথা অবলম্বনে আঁকা এঁর ছবিগুলিতে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে।

নবীন প্রভাত

সুফী মোতাহার হোসেন

যে জ্ঞান সৌন্দর্য্য-স্বপ্ন স্বর্গোপম যে শিল্প-সাধনা
তারাই মানুষ মাঝে দেবতার পরম বিকাশ
তারাই পূর্ণতা দিয়া আপনারে করুক প্রকাশ
মানব-মানবী সবে মুক্তি-স্বপ্নে লভিয়া চেতনা।
যে সুন্দর মূর্ত্তি মাঝে হবে শুধু দেবতা-বন্দনা
মূর্ত্ত ভগবান দিবে আপনার লীলার আভাস,
দেবতার মত সেথা নরনারী করিবে সম্ভাষ
লীলা-সুন্দরের স্বপ্নে মঙ্গলের করিবে বোধনা।

সুপ্ত ভগবানসম শিল্প রহে মানুষের মাঝে
বাণীর স্বপনে আর জ্যোতির্ম্ময় আলোর স্বপনে
বহিয়া স্বর্গের সুধা সৌন্দর্য্যের সুচির সেথানে।
তাহারি আনন্দ-মূর্ত্তি বিকাশিয়া সর্ব্ব কর্ম্মে জ্ঞানে—

নবীন প্রভাত হোক বিরচিত মানব-জীবনে
আলোকে সুস্নিগ্ধ স্নাত উষাসম ঝলোমলো সাজে।
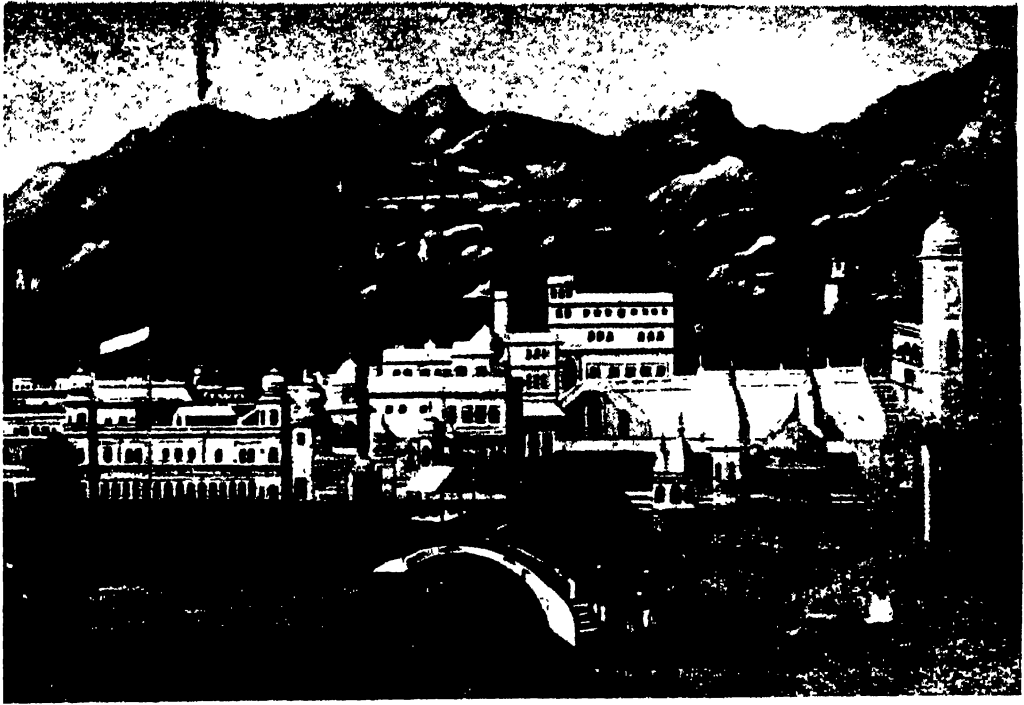
হরি কী পৈড়ী ও ব্রহ্মকুণ্ড, হরিদ্বার

কুম্ভমেলার ইতিবৃত্ত

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

এ বৎসর মাঘমাসে প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভমেলার অনুষ্ঠান হইতেছে। এই মেলায় সমগ্র ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু, সন্ন্যাসী, পুণ্যার্থী, ধর্ম্ম ও বিভিন্ন মতপ্রচারক সকল শ্রেণীর ব্যক্তিগণই সমবেত হন। কেহ কেহ কুম্ভমেলাকে সাধুসন্ন্যাসিগণের কংগ্রেস, কেহ কেহ বা পৃথিবীর বৃহত্তম সম্মেলন বলিয়া মনে করেন। পূর্ব্বে কুম্ভমেলায় সাধু-সন্ন্যাসী ও পুণ্যার্থিগণই সমবেত হইতেন। কিন্তু ক্রমে এই মেলা সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবধারায় প্রভাবিত জনতাপ্রিয় হইয়া পড়িতেছে। অনেকে মনে করেন বর্ত্তমান বৎসরে প্রয়াগে যে কুম্ভযোগ উপস্থিত হইয়াছে, গত শত বৎসরের মধ্যেও এইরূপ যোগ হয় নাই।

প্রয়াগে মাঘস্নান

স্মরণাতীত কাল হইতে প্রয়াগে মাঘ-স্নানার্থ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের সম্মেলন হইয়া আসিতেছে। প্রয়াগে মাঘ স্নান করিলে শ্রীহরির সন্তোষ উৎপাদন ও তৎফলে বিষ্ণুভক্তি লাভ —ইহা শ্রীসনাতনগোস্বামিপ্রভুপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। যেরূপ হরিনামে জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম, আশ্রম নির্ব্বিশেষে জীবমাত্রেরই অধিকার, সেইরূপ মাঘস্নানেও সকলেরই অধিকার আছে—শাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ থাকায় মাঘস্নানে ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়—ইহাই তাৎপর্য্য।১ স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মা-নারদ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে,

> ওঁকার সর্ব্ববেদানাং যথাদৌ পরিগীয়তে।
> তথা বিষ্ণুব্রতানাঞ্চ মাঘস্নানং মহামুনে।।২

অর্থাৎ হে মহামুনে! যেরূপ সর্ব্ববেদের মধ্যে 'প্রণব' সকলের আদিতে পরিগীত হন, সেইরূপ যাবতীয় বিষ্ণু-ব্রতের মধ্যে মাঘস্নানই সকলের অগ্রণী।

প্রয়াগে মাধবদেব

সনাতনগোস্বামিপাদের শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত-গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, প্রয়াগ ভগবদ্ভক্তির প্রকাশভূমি বলিয়া 'তীর্থরাজ' নামেও অভিহিত হইয়াছে। ছত্র ও চামর রাজার দুইটি চিহ্ন। তীর্থরাজ প্রয়াগেও শ্বেত ও কৃষ্ণ তরঙ্গময় গঙ্গা-যমুনারূপে দুইটি চামর এবং নীলছত্ররূপ

১। শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১৪। ৮—৫৫ মূল ও টীকা দ্রষ্টব্য;

২। ঐ, ১৪।৭৪ সংখ্যাধৃত স্কন্দবাক্য। ৩। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত টীকা ২।১।৫৫

শ্রীরূপকে লইয়া গিয়া ভাগবত-সিদ্ধান্তসমূহ শিক্ষা দিয়াছিলেন।৬

কবি তুলসীদাস তাঁহার 'শ্রীরামচরিতমানসে' বলিয়াছেন, শ্রীরামচন্দ্র বনগমনকালে প্রয়াগে মহর্ষি ভরদ্বাজের আতিথ্য

হরি কী পৈড়ীর দৃশ্য—হরিদ্বার

স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীরামপদাব্জপূত সেই পরম মনোহর ভরদ্বাজাশ্রমে প্রতিবৎসর মাঘমাসে মুনিঋষিগণ সমবেত হইয়া ত্রিবেণীস্নান, শ্রীমাধবের দর্শন ও অক্ষয়বট স্পর্শন এবং হরিগুণগান, ধর্ম্মবিধি প্রণয়ন, ব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপণ ও জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত ভগবদ্ভক্তির আলোচনা করিতেন।৭

হরি কী পৈড়ীর স্নানঘাট ও বাজারের দৃশ্য

কুম্ভমেলার ইতিহাস

তুলসীদাসের উক্ত বাণীতে প্রয়াগে কুম্ভমেলার কোন কথা পাওয়া যায় না। তুলসীদাস প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী গ্রামেই জন্মগ্রহণ করিয়া ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'শ্রীরামচরিতমানস' রচনা আরম্ভ করেন। তুলসীদাসের তিরোভাবের (১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দ) প্রায় এক শতাব্দী পরে রামানন্দ-শাখায় শ্রীরামানন্দের পর দশম-অধস্তন গোবর্দ্ধনবাসী শ্রীব্রজানন্দজীর অভ্যুদয় হয়। ইঁহার শিষ্য বালানন্দজী প্রবল প্রভাবশালী সাধু ছিলেন।
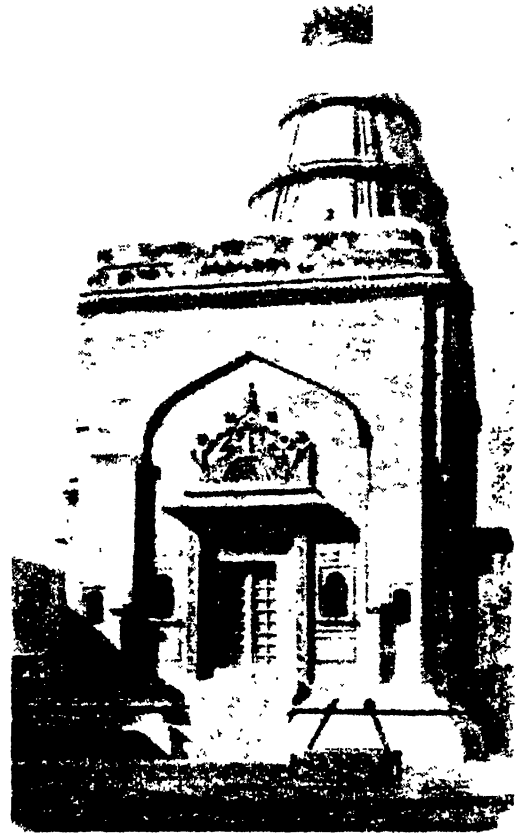
কেশীঘাটের উপর শ্রীকেশবমদনের পাষাণ ছত্র মন্দির বৃন্দাবন

কথিত আছে, ইঁনি তদানীন্তন এক শ্রেণীর সন্ন্যাসিগণের প্রবল দৌরাত্ম্যদমনার্থ চারি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধুগণকে একত্রিত করিয়া 'সাধু-সংরক্ষণী-সেনাবাহিনী' গঠন করেন। সেই সাধু সৈন্যগণ 'লশকর' নামে খ্যাত হয়। 'লশকর' শব্দের অর্থ পদাতি সৈন্য। বালানন্দের শিষ্যসম্প্রদায় 'লশকরী-বংশ' নামে বিখ্যাত হয়। বালানন্দ লশকরগণকে লইয়া হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনী—এই চারি স্থানে ধর্ম্মপ্রচার ও বিপক্ষ-দলন করিয়া বেড়াইতেন। অনেকে মনে করেন, বালানন্দজী চারি সম্প্রদায়ের লশকরগণকে লইয়া উক্ত চারিটি স্থানে যে যে ক্রমে ন্যূনাধিক তিন বৎসর অন্তর ভ্রমণ করিতেন, সেই ক্রমানুযায়ীই হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও

৬। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মঃ ১৯।৬০, ১১৪-১৫,

৭। শ্রীতুলসীদাসকৃত শ্রীরামচরিতমানস বালকাণ্ড ৫৮-৫৯

উজ্জয়িনীতে সাধুগণের মেলা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যে বৎসর হরিদ্বারে 'পূর্ণকুম্ভ' হয়, সেই বৎসরই তৎপূর্ব্বে বৃন্দাবনে বৈষ্ণবগণের একটি প্রারম্ভিক কুম্ভমেলা বসিয়া থাকে। ইহার কারণ বালানন্দজী বৃন্দাবনেই চারি সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণের সৈন্যবাহিনী সংগঠন করিয়া তথা হইতে হরিদ্বারে অভিযান করিতেন।

কেশীঘাট, বৃন্দাবন
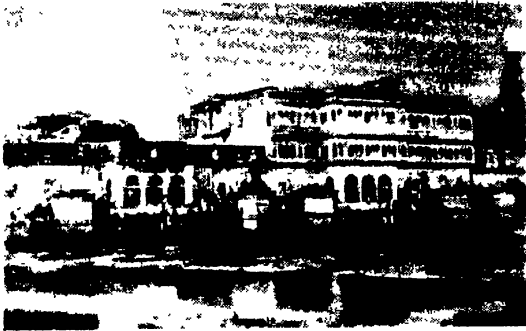
মতান্তরে শঙ্করাচার্য্য ভারতের চারি স্থানে চারিটি মঠ স্থাপন করিয়া কুম্ভযোগ উপলক্ষে সন্ন্যাসিগণ যাহাতে প্রতি তিন বৎসর অন্তর হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনীতে সম্মিলিত হইয়া ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে পরস্পর আলোচনা করিবার সুযোগ পান, তাহার ব্যবস্থা করেন। সেই সময় হইতে উক্ত চারিটি স্থানে কুম্ভযোগে সন্ন্যাসিগণের সম্মেলন হইয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ শঙ্করাচার্য্য পুরী, দ্বারকা, বদরিকা ও শৃঙ্গেরী—এই চারিটি স্থানেই মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন।

শাস্ত্রপ্রমাণ ও আখ্যায়িকা

কুম্ভমেলার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কেহ কেহ কুম্ভযোগের সুপ্রাচীনত্ব প্রতিপাদনকল্পে বৈদিক ও পৌরাণিক প্রমাণ এবং পৌরাণিক আখ্যায়িকাসমূহের উল্লেখ করেন। কোন পণ্ডিত বেদ হইতে নিম্নলিখিত প্রমাণটি উদ্ধার করিয়াছেন,

"কুম্ভো বনিষ্ঠুর্জনিতা শচীভির্যস্মিন্নগ্রে যোন্যাং গর্ভো অন্তঃ।"
[শুক্লযজুঃ ১৯।৮৭]

পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই যে, সমুদ্র-মন্থনকালে যখন ধন্বন্তরী অমৃতকুম্ভ লইয়া উত্থিত হইলেন, তখন অসুরগণ বলপূর্ব্বক ঐ কুম্ভ লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দেবতাগণ শ্রীহরির শরণাপন্ন হন। শ্রীহরি মোহিনী-রূপ ধারণপূর্ব্বক অসুরগণকে বঞ্চনা করিয়া শরণাগত দেবতা-গণকে স্বহস্তে অমৃত পান করান এবং ঐ কুম্ভটি দেবতাগণকে প্রদান করেন। অসুরগণ অমৃত পান করিতে না পাইয়া দেবতাগণের সহিত যুদ্ধ করেন।[৮] পুরাণান্তরের মতে সমুদ্র-মন্থনে সমুদ্ভূত সুধাকুম্ভ লইয়া দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে দ্বাদশ দিনব্যাপী যুদ্ধ হয়। ঐ দ্বাদশ দিনের মধ্যে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত পৃথিবীর যে চারি স্থানে যে যে ক্ষণে সুধাকুম্ভ রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই চারিটি স্থানেই সেই সেই ক্ষণ উপস্থিত হইলে কুম্ভযোগ হইয়া থাকে। দেবতাগণের একদিনে

শৃঙ্গার বট, বৃন্দাবন

মনুষ্যের এক বৎসর, এইজন্য দ্বাদশ বৎসর অন্তর প্রতি স্থানে কুম্ভযোগ হয়।

হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনী—এই চারিটি স্থানে 'অমৃতকুম্ভ' স্থাপিত হইয়াছিল। তৎকালে উক্ত কুম্ভ হইতে যাহাতে অমৃত ক্ষরিত হইয়া না পড়ে, তজ্জন্য চন্দ্র ঐ কুম্ভের মুখে আবরণ এবং সূর্য্য ঐ কুম্ভের নিম্নে আধারস্বরূপ হইয়াছিলেন। আর অসুরগণ যাহাতে অমৃত পান করিতে না পারে, তজ্জন্য বৃহস্পতি অসুরগণের হৃদয়ে বুদ্ধি রূপে স্থিত হইয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দিয়াছিলেন।

চারিটি স্থানে কুম্ভযোগের নিয়ম

হরিদ্বারে—বৃহস্পতি কুম্ভে ও সূর্য্য মেষে (বৈশাখ মাসে) থাকিলে 'কুম্ভযোগ' হয়।

প্রয়াগে—বৃহস্পতি বৃষে বা মেষে ও সূর্য্য মকরে (মাঘ মাসে) থাকিলে 'কুম্ভযোগ' হয়।

নাসিকে (গোদাবরীতে)—বৃহস্পতি সিংহে ও সূর্য্য কর্কটে (শ্রাবণ মাসে), অথবা বৃহস্পতি ও সূর্য্য কর্কটে (শ্রাবণ মাসে), অথবা বৃহস্পতি ও সূর্য্য সিংহে (ভাদ্র মাসে) থাকিলে 'কুম্ভযোগ' হয়।

উজ্জয়িনীতে (ধারানগরীতে)—বৃহস্পতি বৃশ্চিকে ও সূর্য্য তুলায় (কার্ত্তিক মাসে), অথবা বৃহস্পতি ও সূর্য্য তুলায়-

৮। শ্রীমদ্ভাগবত ৮ম স্কন্দ ৮ম ও ৯ম অধ্যায়

(কার্ত্তিক মাসে), অথবা বৃহস্পতি সিংহে ও সূর্য্য মেষে (বৈশাখ মাসে) থাকিলে 'কুম্ভযোগ' হয়।*

বৃহস্পতির এক এক রাশি অতিক্রম করিতে প্রায় এক-বর্ষ লাগে; সুতরাং প্রতি দ্বাদশ-বর্ষান্তে পুনরায় পূর্ব্ব-রাশিতে ফিরিয়া আসে। তবে কয়েক দিনের ইতর-বিশেষ থাকায় বহুদিনান্তে কিছু অমিল হয়। এজন্য কখনও কোন স্থানে এগার-বৎসরান্তে পূর্ণ-কুম্ভযোগ হয়। কিন্তু সাধারণতঃ স্থূল-ভাবে বার বৎসর অন্তর এক এক স্থানে পূর্ণ কুম্ভযোগ ধরা হয়।

গোদাবরীর একটি দৃশ্য, নাসিক

বিষ্ণু-তীর্থচতুষ্টয়ে কুম্ভমেলা

হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনী—এই চারিটি বিষ্ণু-তীর্থই পূত সলিলা নদীর তটে অবস্থিত। বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়া গঙ্গাদ্বার বা হরিদ্বার-তীর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। 'হরি কি পৈড়ী' কথাটি উহারই সূচক। পৈড়ী শব্দের অর্থ সোপান; উক্ত ঘাটের উত্তর পার্শ্বে হরির (বিষ্ণুর) চরণচিহ্ন প্রদর্শিত হয়। হরিদ্বার বা গঙ্গাদ্বার মায়াপুর নামেও কথিত হয়।[৯] চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-য়েন্-সাঙ্ হরিদ্বারের দক্ষিণে এক সুপ্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন, ইহাই প্রাচীন মায়াপুরের ধ্বংসাবশেষ। ব্রহ্মাণ্ডের চব্বিশটি বিভিন্ন স্থানে যে চব্বিশটি স্বয়ম্ভু শ্রীমূর্ত্তি স্ব-স্ব ধামসহ বিরাজমান আছেন, তাঁহাদেরই অন্যতম 'হরি' উক্ত মায়াপুরে অধিষ্ঠিত।[১০] এই মায়াপুরী সপ্ত-মোক্ষদায়িকা পুরীর অন্যতমও বটে। পূর্ব্বে 'হরি কি পৈড়ী' ঘাটটি সঙ্কীর্ণ ছিল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে মেলার সময় এই ঘাটে স্নানার্থীর এত ভিড় হয় যে,

গোদাবরীতটে বিভিন্ন ঘাট ও মন্দির, নাসিক

৪৩০ জন যাত্রীর সলিল-সমাধি ঘটে। এই দুর্ঘটনার পর উক্ত ঘাট এক শত ফুট প্রশস্ত ও ষাটটি সোপানযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

গোদাবরীর তীরে রামায়ণ-প্রসিদ্ধ রামলীলাক্ষেত্র নাসিক নগরী এবং সিপ্রা নদীর তীরে পুরাণ ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অবন্তী বা উজ্জয়িনী নগরী অবস্থিত। গোদাবরী নদী ব্রহ্মগিরি হইতে প্রবাহিত। নাসিক শহরটি গোদাবরীর দক্ষিণতটে এবং পঞ্চবটী বামতটে অবস্থিত। নাসিক শহর হইতে কুশাবর্ত্ত ও ত্র্যম্বকেশ্বর আঠার মাইল। কুশাবর্ত্ত হইতে ব্রহ্মগিরি পর্ব্বত চার মাইল উচ্চে। ব্রহ্মগিরিস্থ গোদাবরীর উৎপত্তি-স্থানকে গঙ্গাদ্বার বলে। অবন্তী-নগরীতে শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপনি মুনির গৃহে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহাও মোক্ষদায়িকা-পুরীর অন্যতম। মহাকবি কালিদাস-প্রমুখ নবরত্ন উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্যের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। 'বৈরাগ্যশতক'-রচয়িতা ভর্তৃহরি সংসার ত্যাগ করিয়া উজ্জয়িনীর একটি গুহায় তপস্যা করেন।

---

* ১। কুম্ভে গুরৌ হরিদ্বারে, প্রয়াগে মকরে রবৌ। (?) ধারায়াং বৃশ্চিকে জীবে, গোদাবর্য্যাং হরৌ গুরৌ ॥

২। অজে নক্রে তথা ঝষে কাকে সূর্য্যে যথাক্রমাৎ। কুম্ভাখ্যো দুর্লভো যোগশ্চতুর্বর্গফলপ্রদঃ ॥

৩। মকরে চ দিবানাথে অজগে চ বৃহস্পতৌ। কুম্ভযোগো ভবেৎ তত্র প্রয়াগে হ্যতিদুর্লভঃ ॥

৪। কর্কে গুরুস্তথা ভানুশ্চন্দ্রশ্চন্দ্রক্ষয়ে তথা। গোদাবর্য্যাং তদা কুম্ভো জায়তেঽবনিমণ্ডলে ॥

৫। সিংহরাশিগতে সূর্য্যে সিংহরাশৌ বৃহস্পতৌ। গোদাবর্য্যাং ভবেৎ কুম্ভো জায়তে খলু মুক্তিদঃ ॥

৬। ঘটে গুরুঃ শশী সূর্য্যঃ কুহ্বাং দামোদরে যদা। উজ্জয়িন্যাং তদা কুম্ভো জায়তেঽবনিমণ্ডলে ॥

৭। মেষরাশিগতে সূর্য্যে সিংহরাশৌ বৃহস্পতৌ। উজ্জয়িন্যাং ভবেৎ কুম্ভঃ সদা মুক্তিপ্রদায়কঃ ॥

৯। মহাভারত আদিপর্ব্ব ১০৩, ১৪০ অধ্যায়, কুম্ভকোণম্ সংস্করণ;

১০। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২০।২১৭

প্রয়াগে কল্পবাস ও কুম্ভমেলা

প্রয়াগে দক্ষিণবাহিনী গঙ্গা ও পূর্ব্ববাহিনী যমুনা যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, সেই সমকোণক্ষেত্রে প্রয়াগ-দুর্গ শোভা পাইতেছে। দুর্গের অভ্যন্তরে পৌরাণিক স্মৃতি-বিজড়িত শিবস্বরূপ 'অক্ষয়বট' কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও প্রকাশিত ছিলেন। গঙ্গার পশ্চিম পারে 'প্রয়াগ' ও পূর্ব্ব পারে 'ঝুসি', মধ্যস্থলে গঙ্গার প্রকাণ্ড চড়। প্রয়াগের গঙ্গাতটে, ত্রিবেণী-তটে, বিস্তৃত চড়ার মধ্যে ও ঝুসিতে 'কল্পবাস' উপলক্ষে প্রতি মাঘ মাসে সাধু সন্ন্যাসিগণের ছাউনী পড়ে। শাস্ত্রানুযায়ী এই স্থানে মকর সংক্রান্তি (পৌষ-সংক্রান্তি) হইতে এক মাসকাল নিরাহারে সৈকতশায়ী হইয়া পর্ণকুটীরে বাস এবং প্রত্যহ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে অনাবৃত দেহে ত্রিবেণীতে স্নান-পূর্ব্বক শ্রীমাধব-দেবের সেবারূপ ব্রত ধারণকে 'কল্পবাস' ও 'মাঘ-ব্রত' বলে। কুম্ভমেলার সময় তথায় সহস্র সহস্র কল্পবাসী সাধু সন্ন্যাসীর ছাউনী, ছাতা ও অস্থায়ী আশ্রমাদি স্থাপিত হয়। এই সকল সাধুর মধ্যে ধনাঢ্য মহন্ত অথবা সম্পত্তিশালী শেঠ ও রাজন্যবর্গ যাঁহাদের করতলস্থ—এইরূপ অনেক ব্যক্তি থাকেন; আবার, অনেক নিঃসম্বল, অযাচক, সঞ্চয়হীন, অনিকেত সাধুও দৃষ্ট হয়।

গোদাবরী হইতে প্রকাশিত [illegible], নাসিক

অনেক সাধু এক একটি ছাতার নীচে এক একখানি চাটাই বা কম্বলাসনে, কেহ বা সৈকতাসনেও অবস্থান করেন। কোথাও কোথাও এক একজন মহন্তের অধীনে এক এক দল সাধু এবং এইরূপ এক এক দলে শত শত সাধু অবস্থান করেন। বৈষ্ণব-সাধুগণের মধ্যে অধিকাংশই রামানন্দী বৈষ্ণব—নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের এবং মধ্ব ও বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয়-প্রদান-কারী সাধুগণও দৃষ্ট হয়। সন্ন্যাসিগণের মধ্যে দশনামী-একদণ্ডী-সন্ন্যাসীর বিভিন্ন শাখা এবং শাক্ত-সন্ন্যাসিগণের অন্তর্গত

গোদাবরীর তটে লক্ষ্মণকুণ্ড ও চতুঃসম্প্রদায়ের মঠ, নাসিক

ভৈরবী ও আলেক প্রভৃতি উপশাখার সাধুগণও দৃষ্ট হয়। গুরু নানকের পুত্র শ্রীচাঁদের প্রবর্ত্তিত উদাসী-সম্প্রদায়ের অনেক সাধু এবং দশম গুরু গোবিন্দসিংহের প্রবর্ত্তিত শিখ-সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তি কুম্ভমেলায় যোগদান করেন। এতদ্ব্যতীত দাদূ-পন্থী, কবীর-পন্থী, গরীব-দাসী, গোরক্ষনাথী, নিরঞ্জনী; নির্ম্মলী, নির্ম্মোহী, নির্ব্বাণী, জুনা প্রভৃতি অসংখ্য মতাবলম্বী ব্যক্তি এই মেলায় সমবেত হন। আবার, অনেক ব্যবসাদার নকল-তপস্বী সাধু-সন্ন্যাসীরও যথেষ্ট সমাগম হয়।

কুম্ভের স্নানযোগ

কুম্ভের স্নানযোগের সময় এক এক দল সাধুর এক একটি বিরাট শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। জরির ঝুল দ্বারা সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় সাধুগণের হস্তস্থিত সুবৃহৎ রৌপ্যদণ্ডের সহিত সংযুক্ত বিচিত্র বর্ণের জরোয়া কাজ-করা মূল্যবান পতাকাসমূহ বহুদূর হইতে বিপুল জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোন পতাকায় হনুমান, কোন পতাকায় ধনুর্ব্বাণ, কোন পতাকায় শ্রীরামচন্দ্র, কোন পতাকায় শ্রীকৃষ্ণ, কোন

বর্তমান কুম্ভমেলার মানচিত্র, প্রয়াগ
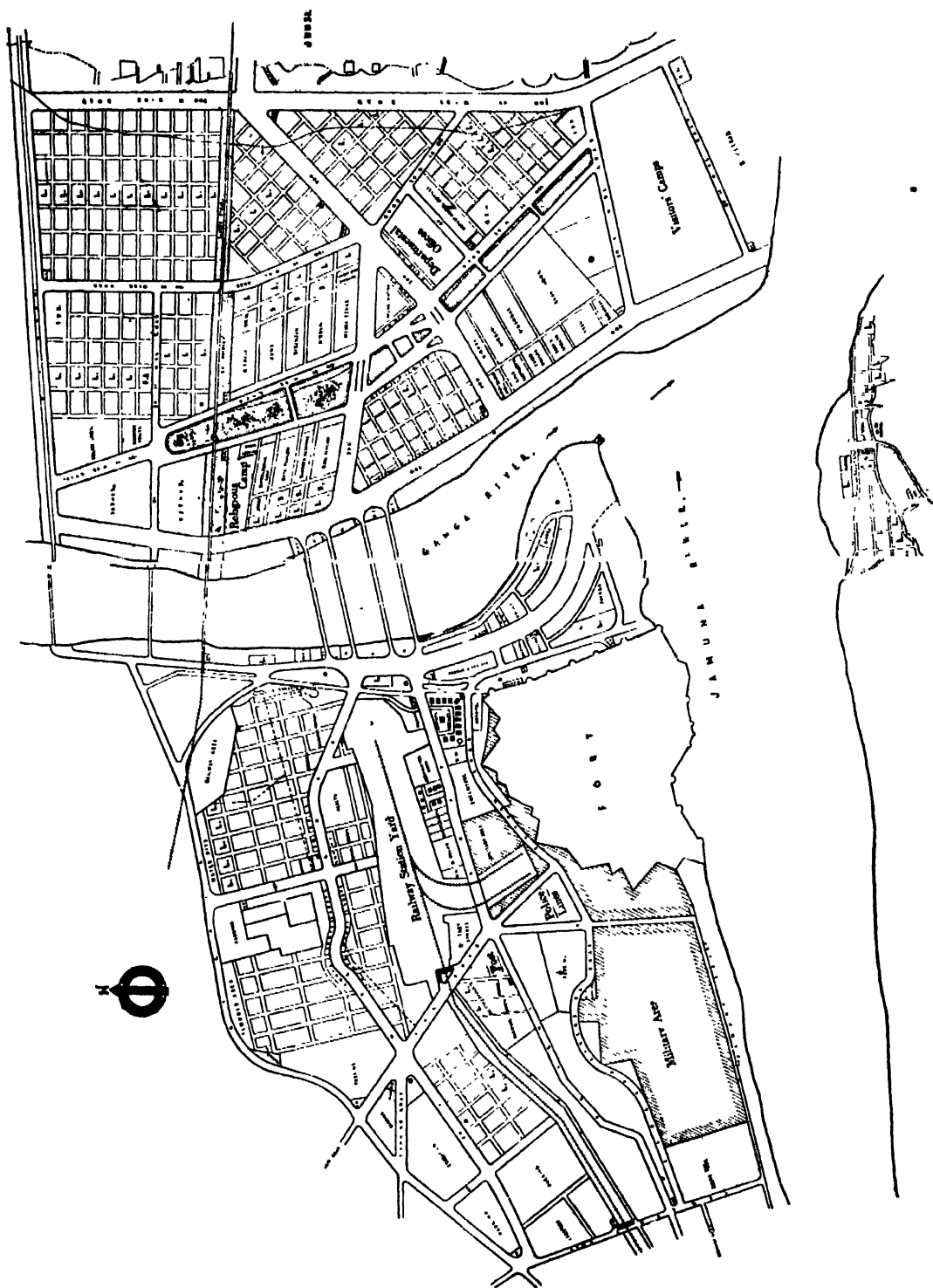
পতাকায় শেষনাগ, কোন পতাকায় ঐরাবত প্রভৃতি বহুবিধ মূর্ত্তি বিচিত্র কারুকার্য্যের দ্বারা খচিত থাকে। রৌপ্যভূষণে ভূষিত অশ্ব, সুসজ্জিত রৌপ্য-মণ্ডিত শিবিকায় আরূঢ় মহন্তগণ, কোথাও বা সুসজ্জিত উষ্ট্রপৃষ্ঠে বিভূতিমাখা জটাধারী সন্ন্যাসীর দল, কোথাও লাঠি তলোয়ার খেলোয়াড় নাগা সাধুর দল, রৌপ্যমণ্ডিত আসাসোটাধারী সাধুগণ, কোথাও বা "জয়

বেণীমা

সীতারাম" ধ্বনিমুখরিত সঙ্কীর্ত্তনসঙ্ঘ, কোথাও বা মৃদঙ্গ করতাল সহযোগে হরিসঙ্কীর্ত্তনকারী সম্প্রদায়—একটির পর আর একটি শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছে। প্রত্যেক স্নানঘাটেও ঐরূপ বিচিত্র বর্ণের পতাকাসমূহ উড্ডীয়মান দেখা যায় এক দিকে যেরূপ পূতসলিলা গঙ্গা যমুনার তীরে বিচিত্র ধ্বজাশ্রেণী শোভা পায়, অন্যদিকে সেইরূপ যমুনার শ্যামল চিক্কণ সলিলোপরি এবং গৈরিকবর্ণা গঙ্গার বীচি বিক্ষুব্ধ বক্ষোপরি অজস্র তরণী শ্রেণী মালাকারে শোভিত থাকিয়া মেলার আর একটি বিচিত্র শোভা সৃষ্টি করে। প্রত্যেক ঘাটে স্নানার্থীর ভিড়. বিস্তৃত চড়ায়ে জনসমুদ্রের তরঙ্গ ও স্রোতস্বিনীর মধ্যেও নানা জনতার সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়।

সাধারণতঃ বৈষ্ণব সাধুগণ তাঁহাদের উপাস্য বিভিন্ন বিষ্ণুবিগ্রহের অসংখ্য শিবির, ছাতা ও পর্ণকুটীরের দ্বারা একটি পৃথক বৈষ্ণবপল্লী রচনা করিয়া থাকেন। ঐ সকল মূর্ত্তির সম্মুখে পুরাণপাঠ, যাত্রা, মহোৎসব ও সঙ্কীর্ত্তনাদি হয়। অনেক মঠাধীশই সদাব্রত খুলিয়া থাকেন। কোথা বিভিন্ন প্রকার প্রদর্শনী, সভাসমিতিও উন্মুক্ত হয়।

১৩৬০ বঙ্গাব্দের প্রয়াগ কুম্ভমেলার প্রধান প্রধান স্নানের তারিখ নিম্নরূপ ঃ

(১)	মকর সংক্রান্তি	৩০শে পৌষ,	১৪ই জানুয়ারী, ১৯৫৪
(২)	পৌষী-পূর্ণিমা	৫ই মাঘ,	১৯শে ,, ,,
(৩)	মৌনী-অমাবস্যা		
	(প্রধান স্নানের তারিখ)	২০শে ,,	৩রা ফেব্রুয়ারী ,,

গঙ্গাতটে দশাশ্বমেধেশ্বর শিবতলা, প্রয়াগ

হরিদ্বারে কুম্ভযোগ উপলক্ষে শাঙ্কর-সন্ন্যাসিগণের রীতি-অনুসারে স্নানের দিন—১ শিবচতুর্দ্দশী, ২ ফাল্গুনী-অমাবস্যা, ৩ চৈত্রী শুক্লাদশমী, ৪ মহাবিষুব সংক্রান্তি। হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভযোগের পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনধামেও কেশীঘাট হইতে পানিঘাটের পুলিনে বসন্তপঞ্চমী হইতে ফাল্গুনী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত বৈষ্ণব সাধুগণের সম্মেলন, শ্রীকৃষ্ণযাত্রা মহোৎসব, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রব্যাখ্যা, হরিসঙ্কীর্ত্তন, শোভাযাত্রা ও যমুনাস্নান হইয়া থাকে। যমুনাস্নানের তিথি যথা—১ বসন্ত-পঞ্চমী, ২ মাঘীপূর্ণিমা, ৩ মাঘী-সংক্রান্তি, ৪ ফাল্গুনী-শুক্লা-একাদশী (বিশেষ স্নান), ৫ দোলপূর্ণিমা বা শ্রীগৌরজন্মোৎসব।

কানীন

শ্রীকৃষ্ণধন দে

মোর বেদনা-সাগর-মন্থন-ধন
হে অনুপম,
মোর কামনা-জাগর নিরালা-স্বপন
হে প্রিয়তম।
তুমি গোপন তৃষার অলখ সূতার মালা যে,
কত-আঁখি-জলে-রচা প্রিয় বরণের ডালা যে!
তুমি চিরপথ-চাওয়া ফাগুনের হাওয়া
মরুতে মম!

মোর দিশাহারা পথে মৌন কাহিনী
ব্যথায় কাঁদে,
হায়, অন্ধ চকোরী খুঁজিয়া মরিছে
হারানো চাঁদে!
এলে কোন্ মায়াতরু ক্ষণিকের তরে ছলিতে,
তব শেষ ছায়াটুকু পেয়েছিনু পথ চলিতে।
এল কার অভিশাপ বিধাতার চির
আশীর্ব্বাদে!

আজো যে-নাম আমার ফুটে নাই মুখে,
হিয়ায় জাগে,
আমি গোপনে সে-নামে মিটাব তৃষ্ণা
সবার আগে!
তব অদেখা পায়ের যে ধ্বনিটি মনে শুনেছি,
তারে ঘিরিয়া ঘিরিয়া কত স্নেহজাল বুনেছি,
নিতি অমৃত-তিলক দিয়েছি উদয়-
অস্তরাগে!
বল, ঝড়ের আকাশে উড়ে-যাওয়া-পাখী
ধরা কি যায়?
মোর পিপাসার বারি না ছুঁতে অধর
শুকালো হায়!
কোন্ নন্দন-তরু-বীথিকার ছায়া-আড়ালে
কেন কোমল নধর ছোট হাত দুটি বাড়ালে?
কেন ধরা দিতে এসে লুকালে চকিতে
মরীচিকায়?

মোর হারানো-গানের সুরটুকু আছে,
বাণী যে নাই,
হায়, যে ছিল সাগর, আজ বুকে তার
মরু-তৃষাই!
শুধু মনে জাগে কত স্মৃতিভরা রূপ-ছায়াটি,
কভু দেখিবে না ধরা চাঁদের অপর কায়াটি!
কোথা শুক্তির ব্যথা মুক্তা যে আজো
জানে না তাই!

কবে শেষ ঝরাপাতা রেখে গেল দাগ
লতার প্রাণে,
তারে উত্তর বায়ু কোথায় উড়াল
লতা না জানে!
কত পায়ের চিহ্ন পড়ে আছে পথ-ধূলাতে
কেন তারি মাঝে দুটি ছোট ছাপ চাও ভুলাতে?
আজ মেঘহারা নভে কাঁদে যে চাতকী
মরণ-গানে!

এলে হারানো এ পথে অচেনার মত
পরম ধন,
যদি না পারি চিনিতে, তবু যে কাঁদিবে
মায়ের মন!
কভু ঝরা ফুলে ডেকে বলে কি বনানী—"জাগরে!"
হায়, যে-নদী শুকাল, কি হবে তাহার সাগরে?
চির বাদল-আকাশে কেন গোধূলির
এল স্বপন?

শত উৎসব-দিনে স্নেহবিহ্বল
এ দুটি চোখ
পথে জনতার মাঝে, তোমারে খুঁজিয়া
অন্ধ হোক্!
তবু তোমারি উজল অদেখা-ললাট ভরিয়া
নিতি মায়ের আশিস-অশ্রু পড়িবে ঝরিয়া,
সেথা তুমি আর আমি তুলিব গড়িয়া
কল্পলোক!

প্রয়াগ-দুর্গ

সিপ্রা নদীর তটে মন্দিরশ্রেণী ও স্নানঘাট, উজ্জয়িনী

হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী ও গঙ্গার দৃশ্য, হৃষীকেশ

জলের আলপনা

শ্রীকরুণাময় বসু

চিঠি পড়ে অবাক হয়ে গেলাম।

দাদা পত্র লিখেছে, কাকা এবার পূজোর ছুটিতে টাকীতে এসে পূবদিককার ঘর সংস্কার করেছেন আর সামনের বারান্দায় একটা পাঁচিল খাড়া করেছেন। সদর রাস্তা থেকে সে পাঁচিল দেখা যায়। লোকে অবশ্য আমার কাকা চারুবাবুকে ছি-ছি করেছে, কিন্তু তিনি হাসিমুখে ঘুরে বেড়িয়েছেন, লোকের কথা গায়ে মাখেন নি ইত্যাদি।

তিনখানা ঘর, তার মধ্যে মাঝের ঘর আধাআধি ভাগ করে নিয়েছেন। বোঝা গেল দেড়খানা ঘরে দাদার সংসার পাতানো আছে। আমার সংসার পাতবার আর জায়গা হবে না টাকীর বাড়ীতে। হাওড়া'র বাসা উঠে গেলে কোথাও বাড়ী করতে হবে—তা সে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তসীমায় হোক না কেন?

ঠিক এতখানি হবে প্রত্যাশা করি নি কোনকালে। কাকা ছিলেন সাব-ডেপুটি। যুদ্ধের আগে রিটায়ার করে কলকাতায় বাড়ী করেছেন। ছেলে নেই; দুই মেয়ে, ভাল ঘরে বিয়ে দিয়েছেন। বাবা যত দিন বেঁচেছিলেন, তত দিন কিছু করেন নি। বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়ে লেগেছেন বাড়ী আর জমাজমি ভাগ করে নিতে। দাদা মধ্যে বলেছিল, এত দূর পাড়াগাঁয়ের জমাজমি, বাড়ী আপনার কি দরকার?—একটু চুপ করে থেকে কাকা জবাব দিয়েছিলেন, বাড়ী আর জমাজমি ভাগ করে নেওয়া আমার ন্যায্য অধিকার। আজ পর্য্যন্ত কেউ সেই দাবি ছেড়েছে বলতে পার হিরণ?

দাদা হেসে বলেছিল, তা বটে, এরকম ঘটনা কখনও ঘটে নি। —আমার কাকীমা অভিনয় করতে ওস্তাদ। আমাদের আত্মীয়-স্বজন যখনই কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যায় তিনি কাঁদতে বসেন আর নাকী সুরে বলেন, আমরা কি বাড়ী ঘরদোর ভাগ করতাম। হিরণদের ব্যবহারে এইসব করতে হ'ল।—আত্মীয়েরা কাকীমাকে চেনে, তারা হেসে চুপ করে যায়, কথা বাড়িয়ে লাভ কি? কাকীমা কখনও টাকী এসে শ্বশুরঘর করেন নি। আসবার কথা হলে তিনি নাকি কান্নাকাটি করতেন। চিরকাল বাইরে বাইরে কাটিয়েছেন।

বাবা বলতেন, ওরা হ'ল উড়োপাখীর জাত। ওরা হ'ল তাহিরপুরের মিত্তিরদের মেয়ে, ওরা শ্বশুরঘর করে না।

যতদূর মনে পড়ে কাকীমার জিভ ক্ষুরের চেয়েও ধারালো। আমার বাবা-মা গরীব ছিলেন বলে কি রূঢ় ভাষায় গালিগালাজ করতেন, অর্থাৎ করতে সাহস পেতেন, তা কানে না শুনলে বিশ্বাস করার উপায় নেই। ছেলেবেলায় দেখেছি কাকীমা ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ গালিবর্ষণ করছেন, আমার মা বিষণ্ণমুখে চুপ করে বসে চোখের জল ফেলছেন। সেইসব ছবি এখনও আমার মনে আছে। তখন ছোট ছিলাম, কি করে এর প্রতিকার হয় কিছু ভেবে পেতাম না। তার পর বিশ-পঁচিশ বছর কেটে গেল। কাকীমা, খুড়তুতো বোনদের চেহারার ছাঁচ পর্য্যন্ত ভুলে গিয়েছি।

এখন একটা করুণা আসে মনের মধ্যে। একটা দুর্ব্বল অনুকম্পা। •একটা অতি সাধারণ মানুষের প্রগলভ দাম্ভিকতা করুণার বস্তু বৈ কি? যাদের কেউ চেনে না, যাদের নাম পর্য্যন্ত কেউ জানে না, যারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, অত্যন্ত তুচ্ছ, তারা এক দিন ছেলেবেলায় আমাকে গালমন্দ করেছিল, একথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ চকমকির আলো জ্বলে উঠল, জ্বেলে দিলে স্মৃতির প্রদীপ। এই চিঠি পড়ে হারানো দিনের কাহিনী ছবির মত জেগে ওঠে মনের মধ্যে।

মুঠোয় ধরা ছিল চিঠি। মন ভেসে যায় ময়ূরপঙ্খী নৌকোয় উজানি স্রোত ঠেলে পিছনদিকে।

সেই সব ছেলেবেলাকার তুচ্ছ ঘটনা হঠাৎ নবীনরূপে, মাধুর্য্য-রসে বিচিত্র হয়ে ওঠে। কৈশোর-দিনের রঙ্গস্থল এই টাকী গ্রাম। কত আনন্দ, খেলাধুলা, মান-অভিমানভরা পুরনো জীবন হাতছানি দেয়।

পঁচিশ-ত্রিশ বছর পরে সরযু আবার হাসিমুখে কাছে এসে দাঁড়ায়। বুঝলি বরুণ, এবার পূজোয় আর নৌকো চড়ব না। তুই আমি স্বদেশ সোদপুরের মেলায় যাব। উঃ সে কি ভিড়? ভিড় ঠেলতে ভারি মজা লাগবে।

স্বদেশ দর করে মেলায় বাতাবি লেবুর। ও কর্ত্তা, জোড়া কত, পাকা নেবু তো?

হাঁ বাবু, পাকা বৈকি?

তা হলে তো হবে না কর্ত্তা, আমরা একটু কাঁচাই চাইছি। ঠিক করে বল?

না সেরকম পাকা না, একটু কাঁচাই আছে।

আমরা হাসতে হাসতে এগিয়ে যাই।

সন্ধ্যেবেলা কতদিন শ্মশানের ধারে সবুজ চরের ঘাসের উপর বসেছি আমরা। নীচেই ইচ্ছামতী নদী। বকের দল সারি বেঁধে পূব দিক থেকে পশ্চিমে উড়ে যায়। দিগন্তজোড়া চাঁপার রঙের মেঘ, লাল চেলি রঙের মেঘ হঠাৎ ধূসর তার পর সন্ধ্যার অন্ধকারে কালোরঙে মিলিয়ে গেল। দু'একটা নক্ষত্র জ্বলে ওঠে আকাশের এক কোণে। পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেকার কথা—তবু মনে হয় এই তো সেদিন। অফুরন্ত স্রোত চলে যায় বছরের পর বছরের সিঁড়িতে জলের আলপনা এঁকে। জলের আলপনা বৈ কি? কত এল, কত গেল। কত মুখ ভেসে আসে সেই স্রোতে, আবার হারিয়ে যায় জোয়ারের মত ভাঁটির টানে। তবু এক-একটা ঘটনা অবিস্মরণীয়

হয়ে থাকে মৃত্যু পর্য্যন্ত। এক-একটা মুহূর্ত, এক-একটা ছবি মৃত্যুকে এড়িয়ে ঝিলিমিলি রক্ত-প্রবালের বিচিত্র রঙে রঙীন হয়ে থাকে মনের মণিকোঠায়।

আমার মা আমাকে কি যে ভালবাসতেন, সেকথা বুঝিয়ে বলতে পারি নে। এক দিন সন্ধ্যার সময় বামনদাস কুণ্ডুর বাড়ী তাস খেলছি। ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি হচ্ছে, এলোমেলো হাওয়া বইছে।

মা আমার ভাগ্নেকে ডেকে বললেন, যা তো অরুণ, দেখে আয় বামনদাসের বাড়ী। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখবি শুধু, কিছু বলবি নে। শুধু আছে কিনা দেখে আয়।—এই কয়টি কথায় মাতৃহৃদয়ের কতখানি দরদ প্রকাশ পেয়েছিল, তা কি ভাষায় বোঝাবার?

সেই ছেলেবেলায় স্কুলের লাইব্রেরী থেকে একখানা পাতা ছেঁড়া গল্পগুচ্ছ সংগ্রহ করি। তার আগে রবীন্দ্রনাথের বই সম্ভবতঃ পড়ি নি। মনে আছে, তাতে ছুটি, পোষ্টমাষ্টার, একরাত্রি এসকল গল্প ছিল। গানের ঝঙ্কারের মত গল্পের সুরের অনুরণন হৃদয়ের মীড়ে মীড়ে আশ্চর্য্য মোহ বিস্তার করেছিল। সেই অনুভূতি, সেই শিহরিত দুর্লভ মুহূর্ত্তগুলি আজও হারায় নি, আজও জেগে আছে মনের মধ্যে। তার পর কত গল্প পড়লাম কত লেখকের, কিন্তু সে অনুভূতি আর পাই নি। কিছু পেয়েছি শরৎ চন্দ্রের গল্পে আর বিভূতি বাঁড়ুজ্জের গল্পে।

আজ যেন বেশী করে ছেলেবেলাকার কথা মনে হচ্ছে।

উঃ কতকাল টাকী যাই নি, বোধ হয় সাত-আট বছর হবে। এখনও কি সব সেইরকম আছে আগেকার মত। গাঁয়ে ঢুকবার মুখেই শ্রীকান্তর খাবারের দোকান, তার পর স্কুল, বোর্ডিং, পদ্ম-ঢাকা কাজল-দীঘি। তার পর পশ্চিম বাড়ী, মুরারি ডাক্তারের ডিস্পেন্সারি। কি জানি হয় তো কত বদলে গিয়েছে এই ক'বছরে। গেল বছর টাকী মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশন হয়ে গেল। দুই প্রতিযোগী দল থেকে চিঠি দিয়েছিল ভোট দেবার জন্ম। আমি যাই নি। একটা ছোট পাড়াগাঁ, তার মিউনিসিপ্যালিটি, তার আবার ইলেকশন। তবু শুনলাম খুব ধুমধাম, উত্তেজনা, টাকার শ্রাদ্ধ হয়েছিল এই নির্ব্বাচনে। একটা ছোট পাড়াগাঁয়ের মোড়লি করে এরা কি যে সুখ পায়, তা আমার ধারণায় আসে না। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ এদের জীবন। সত্যি দুঃখ হয় এদের জন্ম। এরা কি দেখল, কি অনুভব করল বৃহৎ জীবন-সমুদ্রের অনন্ত কল্লোলের অফুরন্ত সৌন্দর্য্য-বিস্তার! শুধু ঝগড়া কোন্দল করেই জীবনটা কাটিয়ে দিলে। তবু ভালবাসি এই গ্রামকে। এর লোকজনের সঙ্গে আমার হৃদয়ের যোগ আছে। পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে চলে গেলেও সে সূত্র ছিন্ন হবে না। তবু আমি জানি এই গ্রামের কেই-বা আমাকে চেনে, ক'জনাই বা আমাকে ভালবাসে। তা হোক, তবু এর মাটিতে নিয়েছিলাম আমার প্রথম নিশ্বাস। এর চারিদিককার গাছপালা, বনের ফুল, আকাশের রঙ, ঝিলিমিলি সন্ধ্যার মেঘ সাত-সমুদ্দুরের কথা মনে করিয়ে দিত ছেলেবেলায়।

বড় হয়েও সেই সব অনুভূতি হারায় নি। শনিবারে যখন ট্রেন থেকে নেমে প্রথম পা দিতাম মাটিতে সন্ধ্যেবেলা, চারিদিককার বনকাসুন্দে, ভাঁটি ফুলের ঝোপ থেকে একটা ঘনগন্ধ উঠে আসত, কাঁচামাটির গন্ধ থাকত তার সঙ্গে মিশে। ঝিঁঝিঁ-ডাকা ঝিমঝিম রাত। জোনাকির ফুল ঝুলছে লতায়পাতায়, ঘাসের ডগায়। মন আচমকা আনন্দে ভরে উঠত। যেন কতকাল যাকে খুঁজে পাই নি আজ হঠাৎ তাকে ফিরে পেলাম।

পাড়ায় ঢুকবার মুখে আমতলায় গুরুপদ বোষ্টমের তেলেভাজার দোকান। গুরুপদ আমার দিকে চেয়ে বললে, এই ট্রেনে বুঝি আলেন দাদাবাবু?

এই একটি মাত্র কথায় মনে হ'ত এরা আমার কত আপনজন। টাকী যে কতকাল যাই নি! কেমন সব আছে সেখানকার লোক-জন ছোট ছোট সুখদুঃখ নিয়ে, ছোট ছোট ভালবাসার প্রদীপ জ্বেলে। আহা, সুখে থাক তারা, ভাল থাক তারা।

হঠাৎ এক আশ্চর্য্য অনুভূতি আসে মনের মধ্যে। ছোট বেলাকার আমি ফিরে যেন গিয়েছি হারানো জগতে। সেই সিঁদুর-মাখানো মেঘের রঙ ফুটে উঠত পিছনের সুপুরি, চালতে বনের মাথার উপরে। হু হু করে পূবালি-হাওয়া আসছে গাঙের উপর দিয়ে। একটা মাছরাঙা পাখী সোঁ করে নেমে জলে ছোঁ মেরে আবার উপরে উঠে যায়। একটা জামগাছের ডালে বসে পাখনা ঝাড়ে। আবার কখনও টিয়ে পাখীর পালকের মত সবুজ রঙের মেঘ অল্প অল্প ফুটে উঠত আকাশে—যেন চিত্রবিচিত্র রঙের সাড়ীর খানিকটা ছড়িয়ে দিয়েছে কে আকাশের এক কোণে। আমি একটা ছোট ছিপ নিয়ে পুঁটিমাছ ধরতাম খিড়কির পুকুরে।

হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ার গর্জ্জন হু হু করে ছুটে আসে দূরদূরান্তর থেকে—কত নদী, বনের গাছপালার মধ্যে দিয়ে। চাপারঙের মেঘ, সবুজরঙের মেঘ আকাশের শ্লেট থেকে হঠাৎ মুছে যায়। ফুলে ফুলে ওঠে মিশকালো মেঘের দল ঝোড়ো হাওয়ায়। বাড়ী থেকে ঠাকুর্দ্দা চেচান শুনতে পাই: ও দাদু, বাড়ী আয়। মাছ ধরে আমাদের কি আর রাজা করবি? কি রকম মেঘ করে আসছে দেখ?...

কি জানি কেন মনে হ'ল যাই এক বার টাকী ঘুরে আসি। আর হয় তো কখনও যাওয়া হবে না। রাত্তিরের ট্রেনে যাব, ভোরবেলায় ফিরে আসব, সকলের অলক্ষ্যে, অগোচরে। আমার ছোটবেলাকার খেলাঘর সেই বাড়ী আমবনের, লিচুগাছের ছায়ায় এখনও দাঁড়িয়ে আছে আগেকার মত। সেই সব ছবির মত শান্ত উদাস অপরাহ্ণ, পাখীর কূজনে মুখরিত বনভূমি। উলুঘাস, ভাঁটবনে গাঙশালিখ, চঞ্চল চড়ুইয়ের আসা-যাওয়া, সে সব কি ভুলবার?

কতদিন পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না-রাত্রে নদীর পাড়ে রাত কাটিয়েছি একা একা। টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে-পড়া অফুরন্ত উর্ম্মিমালায় চাঁদের আলোর ঝিলিক। মনে হয় ঢেউয়ের ডগায় ডগায় যেন হাজার হাজার রূপালি মাছের দল খেলা করে বেড়ায়। কখনও মনে হয় যেন পাতাল-নাগিনীরা লক্ষ প্রদীপ জ্বালিয়েছে আলেয়ার

মায়ার খেলায় ঘুমন্ত পৃথিবীর নির্জ্জন রঙ্গমঞ্চে; দর্শক শুধু আমি একা। সত্যি অপূর্ব্ব সেই জীবনের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। দিগন্তে হেলে-পড়া চাঁদের ভগ্নাবশেষ। মাথার উপরে জ্বল জ্বল করছে কালপুরুষ, সপ্তর্ষিমণ্ডল। নিস্তব্ধ নির্জ্জন প্রকৃতি যেন সম্মোহিত করত আমায় সেই ছেলেবেলায়, কৈশোর-দিনে।

কোথায় যাচ্ছ এ সময়? গিন্নীর রুক্ষ কণ্ঠস্বর।

জানি নে, তবে আজ আর ও সব না। কাল আসব।

কোন বন্ধুর বাড়ী আড্ডা মারতে যাচ্ছ বুঝি। সমস্ত রাত আড্ডা চলবে না কি?

উত্তর না দিয়ে হাসলাম একটু। তার পর বেরিয়ে পড়লাম। বেলগাছিয়া ট্রাম ডিপোর কাছেই ছোট রেলষ্টেশন।

টিকিট দেখি একখানা। টাকীর টিকিট।

ষ্টেশনে যখন নামলাম বারোটা বেজে গেছে। নিস্তব্ধ নিশুতি রাত। অত রাত্রে কোন যাত্রী নামে নি এক আমি ছাড়া। ফুট-ফুটে চাঁদিনী রাত। জোৎস্নায় যেন আকাশ-অপ্সরার হাসির আমেজ মেশানো। উড়ন্ত আঁচলের প্রান্ত থেকে টুকরা টুকরা স্বপ্নের মত উড়ে পড়া জোনাকি আলোর ঝিকিমিকি। সরু মেঠো পথ, দু'ধারে ঘন বনজঙ্গল। গাটা কেমন ছম ছম করে ওঠে।

একেবারে নদীর ধারে বাড়ী। ইচ্ছামতী নদী, ওপারে অস্পষ্ট দিগন্তরেখার উপরে একটা নক্ষত্র জ্বল জ্বল করছে, বোধ হয় চিত্রা কি উত্তরফাল্গুনী গোষ্ঠীর কোন একটি। ছল ছল নদীর স্রোতে যেন গানের শব্দ। এই ত মাঠ, পাশেই আমবন, শিউলি ফুলের গন্ধ ভেসে আসে কোথা থেকে আচমকা হাওয়ায়। সদর দরজা ভেজানো ছিল, বাড়ীতে ঢুকলাম। সমস্ত বাড়ীটা নিথর ঘুমে নিঝুম। আমার পায়ের শব্দে একটা কুকুর কেঁউ কেঁউ শব্দ করে আবার চুপ করে গেল। দেখলাম বারান্দার উপর একটা পাঁচিল খাড়া হয়ে আছে। বাড়ীর ডান দিকটা চুনকাম করা, বারান্দায় সিমেণ্টের পোঁচ দেওয়া হয়েছে। নূতন সংস্কারের চিহ্ন এখনও মোছে নি। বুকখানা কে যেন সজোরে মুচড়ে ধরল। চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে।

একবার ভাবি বৌদিকে ডাকি। না, না থাক, আর কতক্ষণ বা আছি। রাত ফুরাবার আগেই ট্রেনের সময় হয়ে যাবে। হয় ত টাকীতে এই আমার শেষ ভোরবেলা। আর আসা হবে না, আর জায়গা নেই এখানে। আবার কোথায় নূতন দেশে নূতন নীড় বাঁধব।

ছেলেবেলাকার, কৈশোর-দিনের খেলাঘর এই বাড়ী, এই মাঠ, বনজঙ্গল সব হারিয়ে যাবে ক'দণ্ডের পরে। চোখে যেন কি পড়ল, অকারণে জল আসে কেন? অন্ধকার বন-বনান্ত থেকে একটা পাখী পাখার ঝাপট দিয়ে ওঠে।

বাড়ীর সিঁড়ির উপর বসলাম।

ছেলেবেলাকার কথা কেবলই মনে পড়ে যায়। আলেয়ার আলো হাতছানি দেয় যেন। ওই ত নীচু জমি, ধানের শীষে শীষে ধুসর সমুদ্রের মত দেখায়।

সেই ছোটবেলাকার কথা। ঠাকুর্দ্দা পিঠে করে নিয়ে গেলেন ধানক্ষেতের মধ্যে।—দাদু বেড়াবে এই ধানক্ষেতে? দূরে যেও না যেন।

আমি প্রায় লাফিয়ে পড়ি কাঁধ থেকে। ছুটে ধানবনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাই।

পিছনে ডাক শুনি: ও দাদু, কোথায় গেলি? ফিরে আয় সোনা আমার, মানিক আমার। বেশী দূর যাস নে দাদাভাই।

সেদিনের মত আজও সবুজ ধানের সমুদ্র থেকে কাঁচা শীষের গন্ধ আসে পুব-হাওয়ায়। ঐ ত একটু দূরেই হীরু সরকারের জামরুলগাছ। ছেলেবেলায় আমি, সরযূ আর স্বদেশ কোঁচড় ভর্ত্তি জামরুল পেড়েছি সন্ধ্যার অন্ধকারে চোরের মত।

কে, কে, কে রে? লাঠি হাতে হীরু সরকার তাড়া করে আসে।

হি, হি, হি শব্দে হাসতে হাসতে লাফিয়ে পড়ি গাছ থেকে। তার পর কাঁটা ঝোপ, খাল, বিল ডিঙিয়ে ছুট, ছুট।

চারি দিকে ঘুম ঘুম আবছায়া। ফুলের গন্ধে মন-কেমন-করা রাত নিঝুম; চোখে যেন স্বপ্ন নেমে আসে। কত কাল আগেকার স্বপ্ন; হয় ত পঞ্চাশ, একশ' বছর কি তারও আগেকার একটা খণ্ড দৃশ্য ছায়াছবির মত ভেসে আসে।

বকুলতলার পথ দিয়ে পাল্কী এসে নামল বাড়ীর দোরগোড়ায়। আমার প্রপিতামহী নববধূর বেশে এসে দাঁড়িয়েছেন পদ্ম-আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে। পরনে রেশমী চেলি। হাতে মাথায় কঙ্কণ, কেয়ূর, রতনসিঁথি। চোখে সরু কাজলরেখা। কি সুন্দর দেখাচ্ছে নববধূকে! কে যেন চেঁচাচ্ছে: ওরে ও ছোটবউ, লক্ষ্মীর ঝাঁপি দেও বৌর মাথায়। তোরা সব কোথায় গেলি ও সুরবালা, তরঙ্গিণী দেখ না একটু। ছবির মত মিলিয়ে যায় অতীত ঘটনাগুলো। হারানো দিনের নিশ্বাসে ভেসে আসে অতীত কালের মানুষের দল। তারা হাসে, কাঁদে, ভালোবাসে, মান-অভিমান করে ঠিক আজকেরই মত। আবার বকুলতলার পথে অন্ধকারে মিশিয়ে গেল চিরদিনের চেনা পথের বাঁকে। আর সে পথ দিয়ে ফিরে এল না তারা। ফিরে এল নূতন মুখ, নূতন ফসলের ডালা, নূতন কালের সুখদুঃখ নিয়ে। এই ত অনাদি, অনন্ত কালের জীবন। তুমি আমি কে? ফসলের শীষের মত জেগে উঠি হঠাৎ অনন্ত কালের পরমায়ুর একটুকু ক্ষণকালের বৃন্তের ডগার উপর। চঞ্চল হাওয়ায় হাসি-কান্নায় আন্দোলিত হই দু'দণ্ডের জীবন-দোলায়। তার পর—তার পর পারাপারহীন সমুদ্রের ঢেউয়ে মিলিয়ে যাই বুদ্বুদের মত।

নূতন নীড়ের স্বপ্ন হাতছানি দেয় আমাকে। বনবনান্ত পার হয়ে শ্যামল মাঠের এক কোণে দিগন্তের শেষসীমায় খড়কুটো দিয়ে বাঁধা ছোট কুঁড়েঘরের স্বপ্ন। ইতিহাসের পাতায় পাতায় উপনিবেশ রচনা করার কত রোমাঞ্চকর দুঃসাহসিক গল্প আছে ছড়ানো। হয়ত আমারই পূর্ব্বপুরুষ হাজার হাজার বছর আগে মধ্য-এশিয়ার বালুপ্রান্তর পার হয়ে সিন্ধু নদ অতিক্রম করেছিল

এক দিন এই উপনিবেশ রচনা করার দুর্ব্বার মোহে। পিছনে ফেলে এসেছিল খেলাঘরের মত পিছনের জীবন।

কে, কে, কে ওখানে ?

নিঝুম গা-ছমছম-করা অন্ধকারে কে দাঁড়িয়ে ওখানে ? আমি কি স্বপ্ন দেখছি ?

ভয় নেই দাদু, আমি। আমি তোমার ঠাকুর্দ্দা।

ভয়ে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। কি চাও তুমি, এত দিন পরে কেন দেখা দিলে ?

তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে চাইছ, তাই তোমাকে বারণ করতে এলাম। তুমি আমাদের ছেড়ে যেও না। আমাদের ভিটেয় তুমি প্রদীপ জ্বালাবে এই আমাদের অনুরোধ।

তা হয় না দাদু, আমাকে যেতেই হবে। এখানে গা ঘেঁষা-ঘেঁষি করে থাকতে পারব না। আমাকে ছেড়ে দাও দাদু।

তুমি ভয় পেয়ে চলে যাবে। নূতন করে ঘর বাঁধ এই সামনের উঠানে, ঐ পোড়ো জমির উপরে। এ তোমার সাতপুরুষের ভিটে, তুমি পালিয়ে যেও না বরুণ।

তুমি যদি সুখী হও তবে তাই হোক দাদু। আমি কোথাও যাব না তোমাদের ছেড়ে। আমাকে ক্ষমা কর দাদু।

নীচের জলাভূমি, ধানক্ষেত থেকে কুয়াশার একটা ধূসর পর্দ্দা উঠে আসছে দিগন্ত আচ্ছন্ন করে, আমার চৈতন্যকে সম্মোহিত করে। চোখের পল্লবে জড়িয়ে আসছে ঘুম ঘুম স্বপ্নের আবছায়া। স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে— নিস্তব্ধ নির্জ্জন প্রকৃতি ওষ্ঠপ্রান্তে তর্জ্জনী রেখে রহস্যময় সঙ্কেত করছে, এতক্ষণ যা দেখেছ সব ভুল, সব মিথ্যা, সব কল্পনা। তা হলে কি আমি নিজের মনে কথা কয়েছি মনের প্রতি-চ্ছায়াকে অনুসরণ করে। কেউ কোথাও নেই, নিশুতি রাত ঝাঁ ঝাঁ করছে। শুধু ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে সুরু করেছে, শুক-তারা জ্বল জ্বল করে উঠল আকাশের এক কোণে।

খুট্ করে শব্দ হতেই দেখি দরজা খুলে বাইরে কে এসে দাঁড়িয়েছে।

কে ওখানে বসে ?

রাত্তিরের ট্রেনে আমি এসেছি বৌদি।

ট্রেন লেট করেছে বুঝি।

হ্যাঁ, শীগগির বিছানা করে দাও। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

বিধাতার হাসি

শ্রীকালিদাস রায়

ভবনে যখন উৎসব করি হর্ষে মাতি
নিখিল ভুলিয়া উন্মাদনায় সারাটি রাতি।
মাঝে মাঝে বুক দুরু দুরু করে আচম্বিতে
মনে হয় যেন বিধাতা হাসিছে অলক্ষিতে।

ফাল্গুনরাতে জাল বুনি কত কল্পনাতে,
আকাশকুসুম তুলি আনমনে আশার সাথে।
মাঝে মাঝে কোন্ অজানা শঙ্কা উদাস করে।
মনে হয় যেন বিধাতা হাসিছে মাথার 'পরে।

সংসার-মোহে মুগ্ধ যখন সকল ভুলি',
শিশু পেলে কোলে চারি পাশে হাসে স্বজনগুলি।
সুখের মাঝে কে বুকের পাঁজরে আঘাত হানে।
মনে হয় যেন বিধাতা হাসিছে কোথা কে জানে।

রোষভরে যবে অপরাধীজনে শাসন করি।
বিচারক হয়ে অন্য সবার দূষণ ধরি',
রুক্ষ ভাষণ সহসা কণ্ঠে মিলায়ে যায়।
কেন ? মনে হয় হাসিছে বিধাতা যেন কোথায়।

অন্যেরে যবে গণ্য করি না দর্পভরে,
আমার তুল্য ভাবি কেবা আছে এ চরাচরে,
চমকায় বুক, মাথাটা কে যেন নামায় টানি'।
মনে হয় যেন বিধাতা হাসিছে দণ্ডপাণি।

এই বিধাতার নখে বিম্বিত ভবিষ্যৎ।
যুগে যুগে সে যে সাজায় ব্যথার মাথুর রথ।
শুনি লোকে তারে অক্রুর বলে, সে-ই ত ক্রুর।
দুগ্ধ ক্রোড়ে দুগ্ধ কাঁদায় তাহার হাসি নিঠুর॥

বিবাহে লোকগীত

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

সঙ্গীত একটি অপূর্ব্ব জিনিষ। সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে মানুষ যুগে যুগে তার সুখ-দুঃখ ব্যক্ত করছে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত ধনী-দরিদ্র, সভ্য-অসভ্য পৃথিবীর সব জাতির মধ্যেই সঙ্গীত অতি প্রিয় এবং সব্বত্রই সঙ্গীতের বহুল প্রচলন আছে। আমাদের দেশে নানা ধর্ম্মানুষ্ঠানে, বিশেষতঃ বিবাহ-উৎসবে সঙ্গীতের প্রাচুর্য্য দেখা যায়।

বাংলাদেশেও এককালে বিবাহের সময় মেয়েদের গীত গাইবার বড় চল ছিল। সাধারণতঃ রামসীতার সাজসজ্জা বিবাহ ইত্যাদিরই গীত গাওয়া হ'ত। আজকাল অবশ্য নব্য সভ্যসমাজে সে সমস্ত সেকেলে লোকগীত গাওয়া উঠে গেছে, তবে বাংলার বাইরে, বিশেষতঃ উত্তর ও মধ্য-ভারতে এবং রাজস্থানে সমস্ত উৎসবে এখনও মেয়েদের গীতবাদ্য, এমনকি নাচেরও প্রচলন আছে।

এবার মধ্যভারতে থাকাকালে সে দেশীয় প্রবাসী উত্তর-ভারতীয় গ্রাম্য নারীদের লোকগীত সংগ্রহের সুবিধা পেলাম। সেদিন আমাদের প্রতিবেশী এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-পরিবারে খুব ধূমধামে বিয়ে হচ্ছিল। আমি সে বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। পাত্রের সাগাই বাগদান থেকে সুরু করে বৌভাত পর্য্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি কৌতূহলের সহিত লক্ষ্য করে দেখলাম, এদের অনুষ্ঠানগুলি বড়ই বৈচিত্র্যপূর্ণ।

সাগাইর দিন থেকে বিয়ের দিন পর্য্যন্ত রোজ দু'বেলা বর ও কনেকে হলুদ মাখান হয়। নাপ্তেনী এসে অঙ্গন পরিষ্কার করে প্রথমে লাল মাটি দিয়ে লেপবে, তারপর 'চৌক পুরবে'। চৌক পুরা হ'ল আবীর, আটা ও একরকম সাদা পাথরের গুঁড়ো দিয়ে সুন্দর করে রেখা টেনে ছোট ছোট নক্সা আঁকা, অনেকটা আমাদের দেশের পিটুলি দিয়ে আলপনা দেবার মত। তারপর নাপ্তেনী বরকে পিঁড়ি পেতে বসায়। সব সধবা একত্র হয়ে বরের গায়ে হলুদ মাখায় আর বরকনের মাকে গালি দিয়ে গান গায়।

এদের গানের মধ্যে গালি দেওয়া একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়। গান গাইবার সময় প্রথমে ঠাকুরদার নাম নিয়ে তারপর বাপকাকার নাম নিয়ে গান সুরু করে :

"বোলাও আজ ভগবান দীন
সুখ দেখো আজ, কুছ খরচ আজ।
কাইসা নাতি বৈঠে হাঁয় উবটনা,
শাহাজাদা বাঠে হাঁয় উবটনা।"

"ঠাকুরদাদা ভগবানদীনকে খবর পাঠাও, তার নাতি কি সুন্দর হলুদ লাগাতে বসেছে। তাকে বল কিছু খরচ করতে, আজ কত আনন্দের দিন।"

যেদিন শুভ বিবাহ হবে, সেদিন সব এয়োতিরা মিলে পেয়ারা-পাতা পেড়ে আনবে। সব শুভ কাজেই অন্ততঃ সাত জন এয়োতি থাকবে। ব্রাহ্মণ এসে যখন পাঁজি দেখে শুভ মুহূর্ত্ত বলবে, তখন একজন পুরুষ বাঁশের একটা খুঁটি বিয়ের মণ্ডপের জন্য গাড়বে, তারপর চারদিকে সাতটা খুঁটি গেড়ে বিয়ের মণ্ডপ বাঁধবে, আর এয়োদের আনা সেই পেয়ারাপাতা আমপাতা দিয়ে মণ্ডপ সাজাবে। এদিকে এয়োরা একটা থালাতে খুব করে হলুদ গুলে রাখে, আর যখন ব্রাহ্মণ মন্ত্র বলতে থাকে ও পুরুষেরা খুঁটি গাড়তে থাকে, তখন এয়োস্ত্রীরা দু'হাতে হলুদ গুলে জলে হাত চুবিয়ে এদের পিঠে জামাতে ছাপ মেরে দেয় ও গান গাইতে থাকে :

"মণ্ডপ ত ভারি সুন্দর, ন জানে কেতে গুণ
ন জানে বঢ়াইয়ে গুণ, ন জানে কাঠ গুণ।
কলস ত ভারি সুন্দর, ন জানে কৌনে গুণ
না জানে কুম্হরকা গঢ়ায়ে, ন জানে মাটি গুণ
দুলহা ত ভারি সুন্দর, ন জানে কৌনে গুণ
ন জানে মায়ি কি কোখি, ন জানে বাপা গুণ।"

"মণ্ডপ ত ভারি সুন্দর, তা কার গুণে হয়েছে, কে জানে কাঠের গুণ, না কারিগরের হাতের গুণ? কলসী অতি সুন্দর, তা কি মাটির গুণ, না কুমারের হাতের গুণ। বর এত সুন্দর, সে কি মায়ের গুণ, না বাপের গুণ।"

এসব বিয়ের কাজে নাপ্তেনীর খুব দরকার, আর বিয়ের সময় নাপ্তেনীদের রোজগারও খুব হয়। নাপ্তেনী এসে মণ্ডপের ভিতর গোবর দিয়ে খুব ভাল করে লেপবে, আবীর আটা দিয়ে সুন্দর করে চৌক পুরবে। সাত সধবা একটি নূতন মাটির কলসী এনে গোবর দিয়ে লেপে তাতে গেরিমাটি দিয়ে রং দেয়, তারপর যব দিয়ে সেই গোবরের উপর গেঁথে গেঁথে নানারকম নক্সা আঁকে। মণ্ডপের মধ্যভাগে নাপ্তেনী মাটি দিয়ে বেদী বাঁধে, তাতে যব বিছিয়ে দেয়, তারপর সধবারা সেই অঙ্কিত মঙ্গলকলসী জলে পূর্ণ করে বেদীর উপর রাখে ও তার উপর একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়।

সাতটি কুমারী কন্যা এসে একে একে সাত বার দূর্ব্বা হাতে নিয়ে তেল-হলুদে চুবিয়ে বরের পায়ে, হাঁটুতে, বাহুতে ছুঁইয়ে মস্তকে রাখে ও নিজের হাতে চুমো খায়। এদের পর সাত সোহাগিন পূর্ব্বের মতই বরের শরীরে তেল হলুদ মাখায় ও অন্য সোহাগিনরা গান গাইতে থাকে :

"ছাটিকা চাওল, ঝালারি দুব,
তেল চড়াওয়ে, মোহন কী বহিন।
তেল চড়াওয়ে ধেরিয়া, দেও আশীষ,
বাঢে দুলহা দুলহিন লাখ বরিষ।"

"মিহি চাল, সুন্দর সতেজ দূর্ব্বা। মোহনের বোন তেল লাগাচ্ছে।

বরের শরীরে কন্যারা তেল লাগাচ্ছে, তোমরা সবে আশীর্বাদ কর বর-কনে লক্ষ বর্ষ বেঁচে থাক।"

উঠানে বরকে স্নানের জন্য এনে পিঁড়ির উপর বসান হয়। বরের স্নানের জন্য ভারী বালতী (কাঁহার) ভরে জল আনে। সোহাগিনরা মণ্ডপের মঙ্গলকলসী থেকে কিছু জল এনে সেই বালতীর জলে মিশিয়ে দেয়। বাকী কলসীর জলটা দুলহিনের জন্য একটা ঘটিতে ভরে নেয়। সাত সোহাগিন জল ঢেলে দুলহাকে স্নান করিয়ে দেয়, সখীরা গান গাইতে থাকে:

"কে সগরা খনায়ে, কেনে ঘাট বন্ধাওয়া ?
কে কর ভরায় কাঁহার ?
—দুলহা নৌওয়ায়ে।
বাবা মোরে সগরা খনায়ে, ভাইকা ভরায়ে কাঁহার
—দুলহা নৌওয়ায়ে।"

"বর জিজ্ঞেস করছে, কে কুয়া খুঁড়েছে, কে ঘাট বাঁধিয়েছে, কে ভারী এনেছে ?

সখীরা বলছে, বর নাইতে এস, বাপ কুয়া খনন করে দিয়েছে, ভাই জল দেবার জন্য ভারী এনেছে, ও বর তুমি নাইতে এস।"

নাপিত এল নখ কাটতে—

"—ঘর ঘর ফিরিহি নউনিয়াঁ, গোতিন বুলায়াই
আজ মেরে রামকা নাখুর, সব সখী আয়োই।
কই ছুঁড়ে চুনকি মুন্দারিয়া, কই ছুড়ে রূপ
কই ছুড়ে রতন পদার, ভরি গয়া সুখ।
মায়া ছুড়ে চুটকি মুন্দারিয়া, বাপা ছুড়ে রূপ
বুআ ছুড়ে রতন পদার, ভরি গয়া সুখ।"

"ঘরে ঘরে নাপিত ফিরে, সখীরা তাকে ডেকে নিয়ে আসে, আজ আমার রামের নখ কাটবে, সব সখী এস, কেউ দেয় আংটি, কেউ দেয় হীরামোতি, চার দিকে সুখ উপচে পড়ছে। মা দিচ্ছে হাতের রকমারি আংটি, বাপ দেয় টাকা, পিসী দেয় হীরা জহরত, চার দিকে কত সুখ।"

নখ কাটা হয়ে গেলে বরের শৃঙ্গার, মানে সাজসজ্জা হবে। নখ কাটা হলে পর নাগুনী বরের পায়ে একরকম লাল রং, আলতার মত পরিয়ে দেয়। হলুদে নতুন জামা কাপড় রঙিয়ে রাখা হয়। দুলহা সেই হলুদ-ছোপান নব বস্ত্র পরে পিঁড়িতে বসে। বোন এসে চোখে কাজল পরিয়ে দেয়। সমস্ত কপালে চন্দনের ছোট ছোট ফোঁটা দিয়ে চিত্রিত করে তোলে। কেউ কেউ মাঝে মাঝে অভ্রের কুচি দিয়ে দেয়, তাতে আলো পড়লে সব কপাল চকমক করে ওঠে। মালী মৌর নিয়ে আসে, বহ্নোই (ভগ্নীপতি) বরের মাথায় মুকুট পরিয়ে দেয়।

সখীরা গাইতে গাইতে জিজ্ঞেস করে—

"মায় তুসে পুছা, ও বানা, মৌর কাঁহা পায় ?"

অন্য সখী গানে উত্তর দেয়—

"তোমার বহিনকা ইয়ার মালী লে আয়া।"
"মায় তুসে পুছা, ও বানা জামা কাঁহা পায় ?"
তোমারা ভাবীকি ইয়ার দর্জি লে আয়া।" ইত্যাদি

এ ভাবে মাসী-পিসী সবার নাম নিয়েই গায়িকারা গানের ভিতর দিয়ে রসিকতা করে, উত্তর-প্রত্যুত্তর চালাতে থাকে। বর নিশ্চুপে বসে থাকে।

মুকুট পরান হলে চার জন সোহাগিন ছটা নতুন কাপড় এনে বরের চারদিকে বরকে আড় করে ঢাকে। সাত জন সোহাগিন বরের চারদিকে সাত বার সুতো ঘুরিয়ে আনে, একজন সোহাগিন হাতে খানিকটা চাল নিয়ে কাপড়ের নীচে বরকে দেখায়, জিজ্ঞেস করে -

"বলত দুলহা চাল ভাল কি মন্দ ?"

দুলহা বলে—"ভাল না চাল।" এ রকম ছয় বার জিজ্ঞেস করার পর দুলহা সাত বারের সময় বলে "ভাল চাল।" তখন কাপড় তুলে নেয়, সাত দিকে ঘুরান সুতো ভাঁজ করে হলুদে চুবিয়ে নেয়। লোহারের কাছ থেকে নতুন লোহার কাঁকন তৈরি করে আনে। সেই হলুদ-রঙানো সুতো কাঁকনে বেঁধে বরের ডান হাতে পরিয়ে দেয়, বিয়ের সব অনুষ্ঠান শেষ হলে তবে হাত থেকে লোহার কাঁকন খুলে ফেলে।

এখন বরাত (শোভাযাত্রা) বেরুবে, বাইরে ঘোড়া ফুলের হার দিয়ে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে আনে। দুলহাকে তার বহ্নোই (ভগ্নীপতি) অভাব পক্ষে নাপিত ঘোড়াতে বসিয়ে দেয়। বাদ্য বেজে উঠে—স্ত্রী পুরুষ সব শোভাযাত্রা করে চলে কুয়ো পূজা করতে। বাঁধান কুয়োর পাড়ে মা বসেন এক পা কুয়োর ভিতরে দিয়ে। সাত জন সধবা বাঁধান পাড়ে সাত জায়গায় পান, সুপারি, সিন্দুর, হলুদ, ঘি, গুড় ও দু পয়সা রাখে। তার পর জলভরা ঘটি হাতে নিয়ে কুয়োকে সাত বার প্রদক্ষিণ করে, ও সেই পান সুপারির উপর অল্প অল্প জল ছিটিয়ে দেয়। তখন ছেলে বলে—"মা ঘরে চল।" মা কুয়োতে এক পা বাড়িয়ে বলেন—"আমি ঘরে যাব না। তুই ত বিয়ে করতে যাবি, আমাকে খাওয়াবে পরাবে কে ?" ছেলে বলে—"মা তুমি ঘরে চল, আমি রোজগার করব তুমি খাবে, বৌ আনব সেবা করবে। তুমি শুধু বসে থাকবে।" তখন মা অভিমান ছেড়ে উঠে আসেন।

এই মা এবং ছেলের প্রশ্ন ও উত্তরে মনে হয়, মা ছেলের বিয়ে দিতে গিয়েও সম্পূর্ণ প্রসন্ন হতে পারছেন না, তার মনে সব সময়ই একটা ভয় জাগছে, বিয়ে হলেই আমার এতদিনের কষ্টে মানুষ করা আদরের ছেলে সম্পূর্ণ পর হয়ে যাবে। বুড়ো বয়সে আমার অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করবে না, তার চেয়ে আমি কুয়োতে ঝাঁপ দিলেই সব আপদ চুকে যায়।

ছেলে আশ্বাস দিয়ে মাকে ঘরে ফিরিয়ে আনছে। শোভাযাত্রা আরও খানিক দূর এগিয়ে যায়, মা কুলো হাতে নিয়ে ছেলের চার-দিক ঘুরিয়ে কপাল ছুঁইয়ে সোহাগিনদের হাতে দেন। এ ভাবে মশলা পিষবার নোড়া, ঘোল ঘুঁটবার ঘুটনি, চাল কুটবার মুগুর, এ সব দিয়ে একে একে ছেলের কপালে ছুঁয়ে সধবাদের হাতে দেন।

তার পর পিতলের থালায় মঙ্গল দীপ নিয়ে ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করে বিয়ে করতে বিদায় দেন। বর বেচারা এসব স্ত্রী-আচার করণ-কারণের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে বুঝতে পারে বিয়ে করাটা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়।

কুয়া পূজাতে গায়িকারা গাইছে—

"তুম ত পুত চলে বিয়াহন,
মোরে দুধকা মোল কিহে যাও।"

অন্য সখী উত্তর দিচ্ছে—

"গাইয়া ভইসকা মোল হোয়ে
মাতা, তোরে দুধকা মোল নেহি হোয়
তোরে দুধ উরিন নেহি হোয়।"

"মা ছেলেকে বলছেন, ছেলে তুমি ত বিয়ে করতে যাচ্ছ, আমার দুধের মূল্য দিয়ে যাও।

ছেলে উত্তর দিচ্ছে, গাই মহিষের দুধের মূল্য দেওয়া যায় কিন্তু তোমার দুধের মূল্য নেই, তোমার ঋণ এ জীবনে শোধ হবে না।"

গায়িকারা গেয়ে চলেছে—

"সাজ সাজ হৈ হো মোরে সঙ্গ-সাথী ন কৈ,

অন্য সখী বলছে—

"সঙ্গ সাথী যো হই ভায়- মোহনরাম,
যে কে বিয়াহন যায়।
সঙ্গ সাথী যো হই ভায়—উনকা বাপ রাম
উনকা পুত বিয়াহন যায়।"

বর বলছে—আমার সাজসজ্জা ত হ'ল, কিন্তু সঙ্গী-সাথী কেউ নেই, কি করে বিয়ে করতে যাই। সখীরা বলছে—সঙ্গী-সাথী ত মোহনরাম আছে, যার ভাই বিয়ে করতে যায়।

"ঘোড়ে চড় গরজে চলহে রাম,
বাবা, হাম না বরাতে যাবে
ঘাম মোরে লাগে।"

পিতা বলেন—

"হরা হরা বাঁশ কটোবে, ছাতা ছওবে
পুত ওহি ছায়ে ছায়ে যাও, ঘাম কাইসা লাগে।
ঘোড়া ত বান্ধ পুত, ঐ ঘোড়া সড়িয়া,
হাতী লওং কি ডাল, হোত ভোর পুত,
তুমকা বিহৌবে।"

বর ঘোড়ায় চড়ে বলে, "বাবা আমি বিয়ে করতে যাব না, আমার রোদ লাগে।"

বাপ বলছে—"সবুজ বাঁশ কেটে ছাতা বানাব, তারই ছায়ায় ছায়ায় বাছা যাও, রোদ কি করে লাগবে। ঐ দেখ ঘোড়াশাল আছে ঘোড়া বাঁধ, হাতী লংগাছের ডালে বাঁধ। ভোর হয়ে আসছে ছেলে, তোমার বিয়ের সময় হয়ে এল।"

বর ত বিয়ে করতে চলে গেল, এবার বৌ নিয়ে ফিরে আসবার পালা। বাদ্যভাণ্ড শোভাযাত্রা করে বর বিয়ে করে কনে নিয়ে এল। বড়োই এসে বরকে ঘোড়া থেকে নামাল। নাপ্তেনী এসে কনেকে পাল্কী থেকে নামিয়ে নিল। অঙ্গনে বর-কনেকে দাঁড় করিয়ে বাপ মা জোড়ে যান ছেলেবৌকে বরণ করতে। হাতে একখানা কুলা, তাতে এক এক মুঠা করে সব রকমের ডাল, গুঁড়া হলদি, ধানদূর্ব্বা, তেলসিন্দুর, আর মধ্যভাগে একটা প্রদীপ জ্বলতে থাকে। মা ছেলেবৌকে সেই কুলা দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আরতি করেন। ছেলেবৌয়ের কপালে হলুদ সিন্দুরের ফোঁটা দেন, এক ঘটি জল নিয়ে ছেলেবৌয়ের চারদিকে জলের ধারা দেন। অঙ্গন থেকে যে ঘরে বধূ বরণ হবে সে রাস্তা পর্যন্ত এক টুকরা নতুন চুনরি (ছাপ দেওয়া ফুলতোলা নতুন সুন্দর কাপড়) বিছানো হয়। ওদিকে এয়োরা এক হাত চওড়া বড় বড় লুচি ভেজে রাখে, লুচিগুলি একের পর এক বিছিয়ে রাখে সেই ফুল তোলা বিছানো কাপড়ে। বরকনে তখন লুচির উপর ধীরে ধীরে পা রেখে ঘরে প্রবেশ করে। নাপ্তেনী এসে সেই লুচিগুলো আর নতুন চুনরিখানা উঠিয়ে নেয়, ওগুলি তারই প্রাপ্য। বরকনে গৃহদেবতাকে প্রণাম করে ঘরে ঢুকতে চায়, কিন্তু সেখানে এক মহা বিপদ, বরের বোন দোর আগলে বসে থাকে, বলে—তোমাদের ঘরে ঢুকতে দেব না। ভাই তখন মিনতি করে বলে—"বোন রাস্তা ছেড়ে দে, যা চাস তাই দেব।"

বোন তখন তার ইচ্ছানুযায়ী কোন গয়না, সাড়ী বা পাঁচ দশ টাকা চেয়ে বসে। ভাই তাই দিবে এই প্রতিশ্রুতি দিলে বোন দোর ছেড়ে দেয়, বর বৌ নিয়ে ঘরে ঢোকে, এই সামান্য নিয়মটুকুতেই ননদ-ভাজের ঈর্ষার সম্পর্ক ফুটে উঠে।

বরের হাতে বিয়ের দিনে যে লোহার কাঁকন পরিয়ে হলুদ-রঙের সুতো বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, এবার কনেকে তা খুলতে হবে। বরের তরফে এক দল এয়ো বসে সেই সুতোয় খুব কষে গিট লাগায়। বরের পক্ষে এয়োরা সেই হলুদ সুতোতে তেল ও মাষকলাই-ডাল বাটা মেখে সুতোটাকে পিছল করে রাখে যাতে কনে খুলতে না পারে। কনেকে এক হাতে ঐ গিট খুলতে হবে। কনের তরফের এয়োরা কনেকে উৎসাহ দিতে থাকে। বেচারা কনে গলদঘর্ম্ম হয়ে উঠে ঐ পিচ্ছল সুতোর গিট খুলতে। না খুলতে পারলে বরপক্ষের এয়োরা উল্লসিত হয়ে উঠে কনের পক্ষের এয়োদের গালি দিয়ে গান শুরু করে। "আমার ছেলে রাজা, তুই অমুকের মেয়ে, তুই হেরে গেলি" ইত্যাদি।

তার পর একজন এয়ো সেই কাঁকন, সুতো, আঙটি এসব নিয়ে উপর থেকে ফেলবে। বর কনে ওৎ পেতে থাকবে, কে আগে এগুলো নিতে পারে। যে দল হারবে সেই দলই গালি খায়। এ ভাবে সধবা স্ত্রীরা বরকনেকে নিয়ে খুব হাসিতামাশা করে।

এবার পাকস্পর্শের পালা। কনেবৌ হেঁসেলে গিয়ে একটু ক্ষীর (পায়েস) রান্না করে। শ্বশুর, ভাসুর, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী নিতান্ত ঘরোয়া যারা তাঁরা খেতে বসেন, সামনে পাতা বিছানো। বৌ এক হাত ঘোমটা টেনে সকলের পাতায় খিচুড়ী আর ক্ষীর পরি-

বেশন করে, আর পাতা ছুঁয়ে বসে থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্বশুর, ভাসুর এঁরা কেউ শাড়ী, কেউ গয়না এসব দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি না দেন।

বরাত চলে গেলে এক সখী গাইলে—

"কে বানাকো বিয়াহন যায়, মোতি ঝালর লাগি"

"কে বরের বিয়েতে যাচ্ছে, মোতির সাজগোজ প'রে?"

সখি বলছে—

"আগে ঘোড়া উনকে আজাকা,
পিছে আজীকা মেয়ানা
বীচ ডোলা শাহজাদাকা
টোপিওয়ালেকা মোতি ঝালর লাগি।"

"ঘোড়ায় চড়ে যে যাচ্ছে, সে হ'ল বরের ঠাকুরদাদা, পিছনে ঠাকুরমার পাল্কী, মধ্যখানে শাহাজাদা বরের ডুলি, বর ভরি মোতিতে সেজে বসেছে।"

বরাত এসেছে, সখি বলছে—

"ইতনি দের কঁহা লগায়া দুলারী পুতা,
মোরি ধিয়া গয়ি কুম্হলায়।"

অন্য সখি উত্তর দিচ্ছে—

"বাপ হামারে পতুরিয়া নচাওয়ে
ঐচি ভই ইতনি দের।"

"ও আমার বাছা, তুমি এত দেরী করলে কেন, আমার মেয়ের মুখ শুকিয়ে উঠছে।"

বর বলছে, "আমার বাপ পুতুল নাচাচ্ছে, তারই জন্যে এত দেরী হ'ল।"

বর খেতে বসেছে, এয়োরা তখন গান শুরু করলে—

"জৌনে দিন রাম জনকপুর আয়ে
দেখন আয়ী সারি দুনিয়া।
কিষা চাওল ঘতিন সে বিক্কো,
মুংকি দাল বঘারি
বরা, বরৌরী, আওর ফুলৌরী
লৈ দহিয়ামে চ ভোরি
ময়দাকি রোটি ঘতিনসে সেকো
লৈ ঘিওন মে চ ভোরি।
রাম সীতাসে ভজ।
চন্দনকাঠ পিটই বণী আঙ্গ
পাত্তিন পাত বিছাই,
পাননকি পতরি বন আঙ্গ
লওংন জোভ ডোভাই।
জেওন বৈঠে লছমন রাম,
পরশন লাগি হাঁয় জনক দুলারি,
বিছিয়ান কি ছনকারি।"

"যেদিন রাম জনকপুরে এলেন, পৃথিবীর সব লোক দেখতে এল। দইয়ে ভিজিয়ে বরাফুলৌরি নিয়ে এস, ময়দার রুটি যত্ন করে সেঁকে ঘিয়ে ভিজিয়ে আন। মুগডাল ঘিয়ে ফোড়ন দিও, আর সরু চালের ভাত রান্না কর। রামসীতার বন্দনা কর। চন্দনকাঠের পিঁড়ি তৈরি হয়ে এসেছে, পাতাওয়ালী সারি সারি পাতা বিছিয়েছে, লং জুড়ে জুড়ে পাতার ঠোঙা বানিয়েছে। খাবার জন্য রাম-লক্ষ্মণ বসেছেন, জনকনন্দিনী পায়ের আংটির ঝঙ্কার তুলে খাদ্য পরিবেশন করছেন।—

"জেওন বাঠে কৃষ্ণকানাইয়া, দেত্তি সখিসব গারি।"

কৃষ্ণকানাইয়া বর বলছেন,

"হাম্ ত আহি, তিনলোককে ঠাকুর,
হাম্ হি তুম হি ক্যাইসা গারি?"

"আমি ত তিনলোকের ঠাকুর, আমাকে কি করে গালি দিচ্ছ?"

সখীরা উত্তর দিলে,

"যো তুম আহো, তিনলোককে ঠাকুর
কাঁহে ত আয়ে শ্বশুরালী।"

"তুমি যদি তিনলোকের ঠাকুরই হবে, তবে কেন শ্বশুরবাড়ী এসেছ?"

শ্বশুরবাড়ীতে ছেলে যে গিয়েছে, আর ফিরবার নাম নেই,

"মাতা যশোদা চিঠি লিখ ভেজে
ছায় ললন শ্বশুরালী
চিঠিয়া বাচত, পুত ঘোড়া সাজাও হঁহি
যায় কি পৌঁছে দুয়ারী
হাসি হাসি পুছে মাত যশোদা
ক্যাইসি ললন শ্বশুরালী?"

"মা যশোদা চিঠি লিখে পাঠালেন, বাছা শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে আমাকে ভুলে গেছ? চিঠি পড়ে ছেলে ঘোড়া সাজিয়ে ঘরের দুয়ারে গিয়ে পৌঁছল। হাসিমুখে মা জিজ্ঞেস করলেন কেমন শ্বশুরবাড়ী?"

ছেলে উত্তর করলে,

"শ্বশুর হামারে গজপতিয়াকে ঠাকুর
শাস গঙ্গাজল পাণি
আজীয়া শাস মেরি অধিক পিয়ারী
আঁচল ঝালাইন বয়ারী
শালা সে শরহজ, অধিক পিয়ারী
শারে বড় অভিমানী।"

"শ্বশুর তিনলোকের পূজ্য, শাশুড়ী গঙ্গাজলের মত পবিত্র, দিদি-শাশুড়ী আমাকে খুব ভালবাসেন, আঁচল দিয়ে হাওয়া করেন। শালার চেয়ে শালাবৌ বেশী প্রিয়, শালা বৌ বড় অভিমানী।"

"নওরে মাহ উদরী মে রাখি
পুত কবহু না কিয়ো বড়াঈ।
চারদিন পুত গয়োও শ্বশুরালী শাসকী কিয় বড়াঈ।"

"নয় মাস জঠরে ধারণ করলাম, তার জন্যে ত কোন অহঙ্কার কর নাই, আর চারদিন শ্বশুরবাড়ীতে গিয়েই শাশুড়ীর প্রশংসা সুরু করেছ।"

ছেলে—"যো তুম মাতা, ইতনা দুখগয়া
কভিহি ন যাবে শ্বশুরালী।
বহিনকে যাবে, শশুরারী ন যাবে (সীতারাম ভজ)
মাতাবহিন পায়ো গালি।"

"মা তুমি যদি এতই দুঃখ পাও, তবে কখনো শ্বশুরবাড়ী যাবো না, বোনের বাড়ীতেই যাব।"

মাতা —"হামারে কহেকো পুত মাগ না মানেও
নিতহে ভোজন, নিতহে গালি,
যুগ যুগ বাঢে পুত, তোমারি শ্বশুরালি
নিত ভোজনবে নিত গালি।"

মা বলছেন, "আমার কথায় দুঃখ পেয়ো না, বাছা তোমার শ্বশুরবাড়ী যুগযুগ ধরে অক্ষয় থাক।"

এই গানগুলির ভিতর দিয়ে আমাদের চোখে ভেসে ওঠে চিরন্তন সুখদুঃখ-ব্যথা-অভিমান-ভরা মাতৃহৃদয়। এই অযোধ্যা-বাসিনীদের বিবাহের গানগুলিতে সপ্তাপের প্রশ্ন ও উত্তরে মায়ের অন্তরের মূর্ত্তি অতি সুন্দর পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। মার কাছে ছেলে প্রাণাধিক প্রিয়, তারই বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে আনবেন, কিন্তু মা তো সর্ব্বান্তঃকরণে আনন্দিত হয়ে উঠতে পারছেন না; বৌ এলে ছেলে পর হয়ে যাবে, এই ভাবনাটাই মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে মায়ের মনে। তারই রক্তমাংসে গড়া, তার প্রাণের পুত্তলীকে কে অন্যের কন্যা এসে তার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবে এমনি একটা আশঙ্কা মার মনকে চিন্তায় অভিমানে ভরে তুলল। মা তাই কুয়োতে পা দিয়ে বসে রইলেন, ঘরে যাবেন না। ছেলে এসে মাকে অনুনয়-বিনয় করলে, প্রতিশ্রুতি দিলে বৌ এসে মার সেবা করবে, ছেলে রোজগার করে মাকে খাওয়াবে। ছেলের কথা শুনে মার মন প্রসন্ন হ'ল, মা ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করে বিয়ে করতে পাঠালেন। কিন্তু ছেলে বিয়ে করতে গিয়ে ফিরে আসতে দেরী করছে, মায়ের মনের যে মেঘ কেটে গিয়েছিল তা আবার একটু একটু করে জমা হতে লাগল। মা ছেলেকে অনুযোগ করে চিঠি দিলেন, শ্বশুরবাড়ীর মায়ায় দু'দিনেই ভুলে গেলে বাছা? ছেলে মায়ের চিঠি পেয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এল। মা তখন ছেলেকে শ্বশুরবাড়ীর সংবাদ জিজ্ঞেস করলেন, ছেলে উচ্ছ্বসিত হয়ে শ্বশুরবাড়ীর প্রশংসা করতে লাগল।

মার মন অভিমানে ভরে উঠল, বললেন, "হা রে, তোকে যে ন' মাস জঠরে ধরলাম, তার জন্যে ত কোন বড়াই করতে দেখলাম না, আর এক দিনেই তোর শ্বশুর-শাশুড়ী আপনার জন হয়ে উঠল? মার এই ঈর্ষা আর অভিমানের কথায় ছেলের মনেও অভিমান হ'ল। বললে থাক্ মা, শ্বশুরবাড়ীর কথায় যদি তোমার এতই দুঃখ হয় তবে কখনও শ্বশুরবাড়ীতে যাব না।

ছেলের এই অভিমানে মায়ের মন অনুতপ্ত হয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি সস্নেহে বললেন, "না বাবা, তুই শ্বশুরবাড়ী যা, তোর শ্বশুরবাড়ী যুগযুগ ধরে অক্ষয় থাক, তোরা সুখী হ'।"

মায়ের মনের এই বিচিত্র সংঘাত গানগুলির ভিতর দিয়ে অতি সুষ্ঠুভাবে ফুটে উঠেছে। অযোধ্যাবাসিনীরা তাদের সহজ সরল কথা আর গানের মিষ্ট সুরে আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভরা মাতৃহৃদয়ের এই বিচিত্র অনুভূতি অন্তরে অঙ্কিত করে দিল।

গ্রাম্য নারীদের গান শেষ হ'ল। গানগুলির বিশেষত্ব এই, এগুলো কোন পুস্তকে ছাপা হয় নি, এগুলো বহু প্রাচীন সঙ্গীত। অযোধ্যাবাসিনীরা বৎসরের পর বৎসর বিবাহ ও অন্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে মুখে মুখে রচিত এই গানগুলি গেয়ে উৎসবকে আনন্দপ্রদ করে তুলেছে। এদের গানে নবরসের কোন রসই বাদ যায় নি— গানের গালিগুলো যদিও সুরুচিসঙ্গত নয়, তবুও গানগুলোর ভিতর দিয়ে এদের সামাজিক জীবনের বহু বৈচিত্র্য ও মাধুর্য্য ফুটে উঠেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পরিচয়

শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্ম্মকার

আকাশের চাঁদ মাটির পৃথিবী
চোখে চোখে চেয়ে রয়
এত দিন পরে দুটি হিয়া যেন
মনের কথাটি কয়।
চাঁপা ফুল শ্যাম-শাখে
মেলে ধ'রে আপনাকে
সুরভি তাহার উতল পবনে
মিলনের বাণী বয়।

সকল আগল দূরে সরে যায়
সুনিবিড় অনুরাগে,
প্রেম-অলকার মধু পরশন
যদি প্রিয় মনে জাগে।
সে মধু-মাধবী রাতে
ছিনু দোঁহে এক সাথে
হবে কি আবার জীবনে সেদিন
নব রূপে পরিচয়।

দাগ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

গভীর রাত। পূর্ণিমা—সাদা আলোর বন্যা নেমেছে। উষা আর অনিরুদ্ধ হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে তাদের শয়নঘরের সংলগ্ন ছাদে। চোখে মুখে ওদের স্বপ্নের আবেশ। কথা ওদের হারিয়ে গেছে যেন। হাওয়ায় ভেসে এল এক খণ্ড কালো মেঘ। ক্ষণকালের জন্য ওদের আশপাশের চেহারা গেল বদলে। অনিরুদ্ধ ভ্রূকুটি করে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কথা কয়ে উঠল, অসহ্য—

উষার তন্ময় ভাব ধাক্কা পেয়ে কেটে গেল। ঈষৎ চমকে উঠে মৃদু কণ্ঠে বললে, কেন!

অসহিষ্ণু কণ্ঠে অনিরুদ্ধ জবাব দিলে, ওটুকু কি মাত্রাজ্ঞান আছে। দিলে ত সব অন্ধকার করে।

উষা শান্ত গলায় বললে, উড়ো মেঘ—এখুনি সরে যাবে।

অনিরুদ্ধ জবাব দিলে, সে আমি জানি, কিন্তু মুহূর্তের জন্য হলেও ঐ কালো মেঘকে আমি সহ্য করতে পারি না। সত্যিই আমি বরদাস্ত করতে পারি না উষা।

অনিরুদ্ধ আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। উষার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে পুনশ্চ বললে, কেনই বা বরদাস্ত করতে যাব আমি।

উষা খিল খিল করে হেসে উঠল, তুমি পাগল…

অনিরুদ্ধ এ হাসিতে যোগ দিলে না বরং আরও গভীর কণ্ঠে বললে, পাগল বলেই আমার সুখের পথে, আমার আনন্দের পথে কোন অন্তরায়কে মন মেনে নিতে চায় না। পাগল না হলে কেউ বিভোর হতে পারে না উষা।

এ কথার কোন জবাব উষা দেয় না। স্পর্শের ভিতর দিয়ে আরও একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। আকাশের মেঘ ইতিমধ্যেই সরে গিয়েছে। অনিরুদ্ধ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে, উষার চোখের কোলে জল। কিন্তু কোন প্রকার প্রশ্ন আর সে ইদানীং করে না। প্রশ্ন করেছে। অনিরুদ্ধের উচ্ছ্বাস যখনই মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে, উষার চোখে দেখা দিয়েছে জল। অনিরুদ্ধ প্রশ্ন করেছে, উষা জবাব দিয়েছে, ও কিছু নয়—প্রকাশের রকমফের মাত্র।

কথাটা তার বোঝা উচিত ছিল—অনিরুদ্ধর হাসি আর উষার চোখের জল একই ভাবাবেগের ভিন্ন রূপ।…ওরা ভালই আছে। ওদের বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ তিনটি বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। ওদের চলায় বলায় কথাটা সব সময়ই মনে করিয়ে দেয়। উদ্ধত উদ্দাম ভালবাসার বেগ। আশেপাশে চোখ ফিরিয়ে দেখতে চায় না। অনিরুদ্ধর মতে দেখবে তারা—ওরা নয়। বস্তুতঃ এত বড় দম্ভ করবার একটা যুক্তি তার আছে এবং তার মতে এটা অকাট্য যুক্তি। অনিরুদ্ধর টাকা আছে, আর সেই সঙ্গে আছে রূপ এবং সে রূপকে প্রাণদান করেছে উষা। ওদের একটিকে বাদ দিলে আর একটি অসম্পূর্ণ।

বন্ধুবান্ধবকে অনিরুদ্ধ ছেড়েছে, কিন্তু তারা এখনও ছাড়তে পারে নি। মাঝে মাঝে খোঁজখবর করে। বন্ধুদের পরিত্যাগ করার জন্য অনুযোগ দেয়। শেষ পর্যন্ত উষার হাতের তৈরি চা খেয়ে কৃতার্থ হয়ে ফিরে যায়।

অনিরুদ্ধ মনে মনে হাসে। উষাকে কাছে ডেকে ঠাট্টার ছলে বলে, ওরা তোমার সান্নিধ্যলাভের জন্যই এখানে আসা-যাওয়া করে উষা…

উষা কৃত্রিম বিরক্তি দেখিয়ে বলে, এ তোমার অত্যন্ত অন্যায় কথা…

অনিরুদ্ধ জবাব দেয়, কিন্তু, মনে হচ্ছে যেন হাসি লুকোবার চেষ্টা করছ…

উষা হেসে ফেলে, বলে, ওরা কিন্তু তোমারই বন্ধু-বান্ধব। এক দিন তোমার আনন্দের সঙ্গী ছিল—ভাগীদার ছিল।

অনিরুদ্ধ বললে, অস্বীকার করছে কে সে কথা?

উষা সহসা গম্ভীর হয়ে উঠল। বললে, অস্বীকার না করলেও অনুদার হয়েছ এ কথাও ঠিক। আমার কিন্তু সত্যিই মাঝে মাঝে লজ্জা করে। নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়।

কিন্তু আমার করে না উষা, অনিরুদ্ধ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, বলে, তা ছাড়া কেনই বা অপরাধী মনে করতে যাব? বরং আমার মজা লাগে—প্রাণ ভরে উপভোগ করি।

উষা যেন কতকটা আপন মনে বললে, কিন্তু এই উপভোগ করা আর ভাল লাগাটা কত দিন অব্যাহত থাকবে সেইটেই বড় কথা।

উষার কথা বলার ধরণে অনিরুদ্ধর উচ্ছ্বাস গতিপথে হোঁচট খেল। তিল সামলে নিয়ে খানিক সে উষার মুখের পানে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে একটু হেসে বললে, তোমার বক্তব্যটা কি উষা?

উষা প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। সহসা অনিরুদ্ধর কাঁধের উপর মাথা রেখে ফিস ফিস করে বললে, দেখছ আকাশের রংটা আবার বদলে যাচ্ছে, কিন্তু এই নিয়ে রাগ করলে চলবে কেন? যে নিয়মে চাঁদের আলোর সাক্ষাৎ মেলে সেই একই নিয়মে কালো মেঘেরও আবির্ভাব ঘটে। এর দুটোই সত্য!

অনিরুদ্ধ রাগ করে জবাব দিলে, তুমি অবাস্তব কথা বলছ। সত্য হলেই সব সময় তা সুন্দর হয় না এবং সব সত্যকেই মানুষ মেনে নিতে পারে না।

অনিরুদ্ধর কাঁধের উপর থেকে তার মাথাটা সরিয়ে নিয়ে মৃদু গলায় উষা বললে, সেইখানেই ত আমার সবচেয়ে বেশী ভয়।

উষা থামলে। অনিরুদ্ধর চোখে একরাশ বিস্ময়। উষা পুনশ্চ বললে, তুমি যখন ভালবাসার কথা বল আমাকে তখন অঙ্ক কষতে হয়। কষতে আমি বাধ্য হই।

অনিরুদ্ধ উত্যক্ত কণ্ঠে জবাব দিলে, দুই আর দুইয়ে চার হয় এও কি তোমাকে অঙ্ক কষে বার করতে হয় নাকি ?

হয় বৈ কি—উষা একটুখানি হেসে জবাব দিলে, ছোট বলেই কি অবহেলা করতে হবে। তা ছাড়া ছোটর সমষ্টি নিয়েই—

তাকে থামিয়ে দিয়ে অনিরুদ্ধ বললে, জীবনটা ত অঙ্কশাস্ত্র না উষা—

উষা একটু হাসল, আমি বলি ঠিক তাই—যোগবিয়োগ নিয়েই ত জীবন।

অনিরুদ্ধ চঞ্চল হয়ে উঠল। বললে, তুমি দেখছি হঠাৎ দার্শনিক হয়ে উঠেছ।

উষা একটু হাসল, কোন জবাব দিলে না। অনিরুদ্ধ কিন্তু থামতে পারল না, তেমনি বলে চলল, কিন্তু আমার ধাতে ও-সব সয় না। আমি সোজা মানুষ, সোজা করেই সবকিছু ভেবে থাকি আমার মধ্যে ঈর্ষা, দ্বেষ, ভালবাসা সবই সমানভাবে বিদ্যমান। প্রয়োজনে ওর আবির্ভাব— প্রয়োজনে হয় অন্তর্ধান।—বলেই দু' হাত বাড়িয়ে উষাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলে অনিরুদ্ধ। বললে মৃদু চাপা কণ্ঠে, তাই ত এত বড় সত্যকে আমি অবহেলা করতে পারি না।

ধীরে ধীরে সে উষার মাথায় হাত বুলাতে থাকে। ওর চুলের স্নিগ্ধ সুবাস অনিরুদ্ধর বুকে ঢেউ তোলে। রাজ্যের কথা ওর কণ্ঠনালীতে এসে ঠেলাঠেলি করে, কিন্তু কথা সে বলে না। এই দুর্লভ মুহূর্তটিকে সে পরিপূর্ণভাবে অনুভব করতে চায়। শব্দের আঘাতে এই পরম ক্ষণটিকে হারাতে চায় না অনিরুদ্ধ।

এমনি নিঃশব্দে আরও কিছুক্ষণ কাটিয়ে অনিরুদ্ধই প্রথমে কথা কইলে, আমাদের এই বর্তমান জীবনের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম আমি কল্পনাও করতে পারি না।

উষা মৃদু হাসল, বললে, অথচ কল্পনার বাইরেও বহু ঘটনা মানুষের জীবনে ঘটে থাকে। মানুষ তাকে মেনেও নেয়।

অনিরুদ্ধ জবাব দেয় বাধ্য হয়ে।

উষা তেমনি হাসিমুখে বললে, বাধ্য হয়েই বটে! একটু থেমে পুনশ্চ সে বললে, আজ যদি আমার মৃত্যু হয় --

অনিরুদ্ধ রাগ করে উষাকে ঠেলে সরিয়ে দিলে।

উষা মৃদু কণ্ঠে বললে, একটা কথার আঘাতও সইতে পারলে না—তবু ত এখন আমি বেঁচে আছি। তুমি রাগ কর কেন। জীবজগতের ধর্মই হ'ল এইটে। আমার বর্তমানে যেটা অসম্ভব মনে হচ্ছে, অবর্তমানে—

অনিরুদ্ধ মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিলে, বললে, আশ্চর্য তোমাদের মন। যে কথা ভাবতেও আমাদের ভয় লাগে, কত অনায়াসে তা তোমরা বলে ফেল—একটু দ্বিধাও কি তোমাদের মনে আসে না!

উষা হাসতে থাকে—জবাব দেয় না।

. অনিরুদ্ধ বলে চলে, এখনও তুমি হাসতে পারছ!

উষা বলে, তোমার কোন সন্দেহ আছে নাকি ? কি জান··· সে মুহূর্তের জন্য থেমে পুনরায় বলতে থাকে, দুঃখের যে সত্য রূপ সেটা আমাদের জানা, তাই সামান্যতে আমরা বিচলিত হই না। কিন্তু তোমার মতলবটা কি শুনি, আজও সারারাত এখানেই কাটাবে নাকি ?

অনিরুদ্ধ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। উষার শেষ কথায় সহসা সে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে বললে, না তেমন আর উৎসাহ পাচ্ছি না।

উষা বলে, তুমি বুঝি রাগ করলে ?

অনিরুদ্ধ জবাব দিলে, তাতে কোন লাভ হলে বলতে পার ?

উষা সহসা ধুলোবালির মধ্যে শুয়ে পড়ল অনিরুদ্ধর কোলে মাথা রেখে। বললে ফিস ফিস করে, মাঝে মাঝে হয় বৈ কি। হয় না ? তুমিই বল না গো।

অনিরুদ্ধর মাথাটা সহসা ঝুঁকে পড়ে। কিছুক্ষণের জন্য বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে ওদের অস্তিত্বটাও একাকার হয়ে যায়। হৃদয়ের বেগ প্রাণের আবেগে গলে যায়। চাঁদের আলোর শ্বেতধারার সঙ্গে ঘটে পরিপূর্ণ মিলন। কিন্তু অনুভূতির এই পরম লগ্নটি বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। উষা দু'হাতে অনিরুদ্ধর মুখখানাকে একটু তুলে ধরে মৃদু হাস্যে প্রশ্ন করে, আচ্ছা আমাদের বিয়ে হয়েছে আজ ক'বছর হ'ল ?

অনিরুদ্ধর একটা নিশ্বাস পড়ল। সে বললে, তুমি বড্ড হিসেবী। জীবনটাকে সব সময় তুমি অঙ্কের ছকে ফেলতে চাও।

উষা হাসতে থাকে, বলে, তা ফেলি বৈ কি। কিন্তু সব সময় বিয়োগ করি না একথা তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে।

কিন্তু কোন সময়ই-বা করবে কেন ? অনিরুদ্ধ আহ্লাদের সুরে বললে।

উষা নির্বিকার ভাবে জবাব দিলে, যে কারণে তুমি শুধু যোগ করতে চাও ঠিক সেই কারণেই বিয়োগ এবং গুণ ভাগেরও প্রয়োজন দেখা দেয়।

অনিরুদ্ধ চঞ্চল হয়ে উঠল। বললে, তোমার এই হিসেবের আর এক নাম অপচয়—-

অপচয় ? উষা যেন খানিকটা বিস্মিত হ'ল।

নয় কেন ? অনিরুদ্ধ উত্তেজিত হয়ে উঠল। বললে, আজ হিসেব করতে গিয়ে যা হারাব, আগামী কাল পিছন ফিরে তারই জন্য হা-হুতাশ করাকে তুমি কি বলতে চাও শুনি ?

উষা বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, তুমি বলতে চাইছ কি ?

অনিরুদ্ধ জবাব দিলে, মুঠি আমার সবসময়ই ভরে রাখতে চাই।

উষা খিল খিল করে হেসে উঠল, তা যাই কেন থাক না সে মুঠিতে। সোনা কিংবা ছাই। কিন্তু ঠাট্টা থাক—উষা বেশ খানিকটা গম্ভীর হয়ে বললে, বড় বেশী স্বার্থপরের মত কথাটা বললে। তাছাড়া এর পরে জীবনটা বড় বেশী একঘেয়ে ঠেকবে না কি। উষা থামল। অনিরুদ্ধর একখানি হাত নিজের দুই

হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে গভীর কণ্ঠে পুনরায় বলতে লাগল, কথাটা যখন এই পথে এসে গেছে তখন শোন—তোমার ভালবাসার এই প্রচণ্ড বেগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে চলতে আমার বড় ভয় হয়। ভাল লাগে তাই গা ভাসিয়ে দিয়ে আছি, কিন্তু সব সময়ই আমার মনে হয় এই বুঝি কোন গুপ্ত পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা পেয়ে চূর্ণ হয়ে যাব।

অনিরুদ্ধ বিস্মিত হলেও কথা বলে না। শুধু নির্নিমেষ দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের পানে চেয়ে থাকে। তার দৃষ্টিতে যে প্রশ্ন ফুটে উঠেছে উষা তা অনায়াসে পড়ে ফেলল এবং হাসিমুখে বললে, আমি তোমাকে অঙ্কশাস্ত্রের কথাটাই মনে করিয়ে দিতে চাইছিলাম।

অনিরুদ্ধর মুখে হাসি ফুটে উঠে, বলে, তাই বল এ তোমার যুক্তিতর্ক। যে মেঘ ওর মনের কোণে জমে উঠেছিল, সামান্য একটু হাওয়া দেখা দিতেই তা উড়ে গেল, কিন্তু উষার অন্তর্লোকের হিসাবের খাতায় আর একবার বিয়োগচিহ্ন পড়ল। অত্যন্ত সঙ্গোপনে একটি নিশ্বাস চেপে গেল উষা। আর অনিরুদ্ধ যেন নূতন করে জেগে উঠল, বললে—এমনি করেই অনন্তকাল আমরা সংসারপথে চলব উষা। কোথাও কোন দিন এক বিন্দু নিরানন্দের ছায়াপাত ঘটতে দেব না।···অনিরুদ্ধ আর একবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

কিন্তু ভাঙাগড়া নিয়েই জীবন। তাই ত যে মনোরম প্রাসাদ অনিরুদ্ধ বহু জ্যোৎস্না-রজনীর সুখস্মৃতির উপর গড়ে তুলেছিল, তা হঠাৎ এক দিন গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল। অথচ এর পিছনে যে কোন বড় রকমের কারণ আছে তা নয়। অতি তুচ্ছ কারণেই অনিরুদ্ধ সরে গেল তার অভ্যস্ত চলার পথ থেকে। মুখ ফুটে কোন অনুযোগ দিতে সে পারলে না। কোন ছিদ্রপথ ধরে যে কালো মেঘ দেখা দিয়েছে তার সন্ধানও সে উষাকে দিলে না। অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে অনিরুদ্ধ সরে গেল তাদের প্রতিদিনের পরিচিত মুখর দিনগুলি থেকে। উষা বিস্মিত হ'ল, ব্যথিত হ'ল কিন্তু মুখ ফুটে কোন প্রশ্ন করলে না। মন তার গুমরে উঠে, কিন্তু তার কোন প্রকাশ নেই। চোখে মুখে তার জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠেই অভিমানের অথৈ জলে তা তলিয়ে যায়।

চাঁদের আলো আজও তাদের ঘরের সম্মুখে নির্দ্দিষ্ট দিনে ছড়িয়ে পড়ে। উষার ফুলগাছগুলিতে অজস্র ফুল ফোটে—সৌরভ ছড়ায় ···সে সৌরভ বাতাসে ভর করে ভেসে ভেসে বেড়ায়, কিন্তু ঐ চাঁদের আলো আর ফুলের সৌরভ আজ শুধু নিরর্থক নয়—পীড়াদায়ক।

উষা তার ঘরে নিঃশব্দে বসে আছে। আশপাশের কোনকিছুই আজ আর তার মনে কোন কৌতূহলের সৃষ্টি করে না। ভালমন্দ কোন চিন্তাকেই সে মনের মধ্যে আমল দিতে চায় না। কিন্তু মন না চাইলেও সহস্র রকমের এলোমেলো চিন্তা এসে তাকে ঘিরে ধরে। সুরু হয় নিজেকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করা। তাদের বিবাহিত জীবনে হঠাৎ কি এমন ঘটল যার জন্য এমন রহস্যময় ভাবে স্বামী দূরে সরে গেল। কি সে কারণটা যা জানবারও অধিকার তার নেই। তার বিবাহিত জীবনের পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, তার নীরব সেবা, গভীর ভালবাসা—এর কোনকিছুই কি এই সামান্য অধিকারটুকু অর্জ্জন করতে সক্ষম হ'ল না। অথচ ভালবাসার কত বড় বড় কথাই না তাকে প্রতিদিন শুনতে হয়েছে—আর উষা কত অনায়াসে তা বিশ্বাস করেছে।

বহুদিন পরে আয়নার সম্মুখে এসে উষা দাঁড়াল। নিজের প্রতিবিম্ব দেখে সে চমকে উঠল। বয়সটা তার এই ক'টা দিনের মধ্যে কয়েক বছর এগিয়ে গেছে। মাথায় চিরুণী চালাতে গিয়ে সে বিরক্ত হয়ে উঠল চুলগুলির দুর্দ্দশা দেখে। চিরুণী চলতে চাইছে না···শেষ পর্য্যন্ত যদিই-বা সচল হয় হাত আর চলতে চায় না। দূর ছাই, কি হবে কেশবিন্যাস করে! পূর্ব্বের অভ্যাসবশেই হয়ত অকারণে দেরি করে, কিন্তু অনিরুদ্ধ নিঃশব্দে এসে তার পশ্চাতে দাঁড়ায় না···নানা ছলে উষা নিজেকে নিজে শাসন করে। কিন্তু অবুঝ মন তবুও বারে বারে পিছন ফিরে তাকায়।···

ইদানীং গভীর রাত ছাড়া অনিরুদ্ধর সাক্ষাৎ মেলে না। সাক্ষাৎ মানে তার উপস্থিতি কপট নিদ্রার মাঝে অনুভব করা। নিঃশব্দে সে উষার পাশে এসে স্পর্শ বাঁচিয়ে শুয়ে পড়ে। উষা চোখ বুজে কাঠ হয়ে থাকে। দেয়ালঘড়িটা একের পর এক বেজে চলে। সে কান পেতে শোনে। ঘুম আজ তার সাধনার বস্তু। নিশ্বাসের শব্দে উষা বুঝতে পারে অনিরুদ্ধ ঘুমিয়েছে কিনা? এক সময় অবাধ্য চোখ দুটো অনিরুদ্ধর ঘুমন্ত মুখের পানে গিয়ে স্থির হয়ে থমকে দাঁড়ায়। জানালার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো এসে তার মুখময় ছড়িয়ে পড়েছে। আশ্চর্য্য! কেমন নিরুদ্বেগে ও ঘুমুচ্ছে। ওর কি মন বলে কোন পদার্থ নেই! নইলে এমন অকরুণ হয়ে উঠতে পারল সে কেমন করে। কিন্তু ঠিক তাই কি? উষা নিজেকে পাল্টা প্রশ্ন করলে, অনিরুদ্ধর অমন সদাপ্রফুল্ল মুখের হাসি, দেহের লালিত্য, জীবন্ত পাগলামি কোথায় গেল···চোখের কোলেই বা এমন সুস্পষ্ট কালো দাগ ফুটে উঠেছে কেন···এ কি নিতান্তই অকারণে? কিন্তু উষাকে কে বলে দেবে কোথায় রয়েছে রহস্য। প্রাণ গেলেও সে অনিরুদ্ধকে একটাও প্রশ্ন করবে না।

আর অনিরুদ্ধ?···সে নিজেই কি উষার সঙ্গে এমন ব্যবহার করে সুখী হতে পারছে? না এমনি এক জটিল পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল। অথচ ঘটনাচক্র এমন এক পঙ্কিল অবস্থার মধ্যে তাকে টেনে নিয়ে এল যে, অসঙ্কোচে সে না পারছে এগুতে না পারছে পিছিয়ে যেতে। আজ উষার চোখে চোখ রেখে তাকাতেও সে ভয় পায়। যেন সে নিজেই একটা অপরাধ করে বসেছে। অথচ···

উষাই-বা কেন এমন করে চুপ করে আছে। জিজ্ঞেস করতেও কি পারে না যে, কেন তার মধ্যে এ পরিবর্ত্তন···কিসের জন্য করছে এমন দুর্ব্ব্যবহার! মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে সে লুকিয়ে উষার মুখের পানে চেয়ে থাকে। যে প্রশ্ন অষ্টপ্রহর তার মনের মধ্যে তোলপাড় করছে তারই উত্তর খোঁজে। চেয়ে চেয়ে তার মনের মাঝের ক্ষ্যাপা

মানুষটা জেগে উঠে। ইচ্ছে করে ঊষাকে ঠিক তেমনি করে বুকের মধ্যে চেপে ধরে চুম্বনে চুম্বনে পাগল করে দিতে। কিন্তু পারে না। ঊষা ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরে শোয়। অনিরুদ্ধ আবার নূতন করে নিজের মনকে বিশ্লেষণ করতে থাকে। কি আশ্চর্য্য! এই সেদিনেও সে বড় গলায় তার বন্ধুবান্ধবের কাছে নিজের নিখুঁত ভালবাসার গভীরতার কথা প্রকাশ করেছে—যে অতলস্পর্শ ভালবাসার কথা ওরা কল্পনা করতেও অক্ষম বলে বক্রোক্তি করেছে। আজ সেদিনের সেসব কথা ভাবতে গিয়ে নিজের কাছেই সে লজ্জিত হয়ে পড়ল। আসলে মানুষ সব সময়ই মানুষ। তার বন্ধুরা হয়ত নিতান্ত মিথ্যে বলত না। ভালবাসার নাম করে সে শুধু মিথ্যা অহঙ্কারই এত দিন করেছে, নইলে কেন সে ভুলতে পারছে না সামান্য কয়েকটা কথা যা ঊষার অতীত জীবনের একটি অধ্যায়ের উপর··· অনিরুদ্ধ আর ভাবতে পারে না। তার মাথার মধ্যে সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়। বিশ্লেষণ করতে বসে আরও বেশী করে জট পাকিয়ে যায় তার বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারায়।

বিচিত্র মানুষের মন—নিজেকেও কি সঠিক বোঝবার উপায় আছে! ঊষার ফুলগাছে ফুল ফুটেছে। চমৎকার গন্ধ বাতাসে ভর করে স্থানটিকে আমোদিত করে তুলেছে, কিন্তু অনিরুদ্ধর মনে আজ আর সাড়া জাগে না। বরং একটা অপরিসীম ক্লান্তিতে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

ঊষা ঘুমিয়ে আছে। ওর মনের কথা বোঝবার উপায় নেই, শুধু একটি দিনের জন্য অনিরুদ্ধ ওর চোখে মুখে একটা আশ্চর্য্য রকম বেদনার ছায়াপাত ঘটতে দেখেছিল, কিন্তু মুখে সে আজ পর্যন্ত একটিও প্রশ্ন করলে না বরং অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে। একবারও এগিয়ে এল না তার অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদ জানাতে। অবশ্য প্রতিবাদ জানাবার মত অন্যায় যদি সে করে থাকে।

অনিরুদ্ধ ঘর ছেড়ে বাইরে ছাদে এসে উপস্থিত হ'ল। আজ কি পূর্ণিমা! গোটা ছাদটা জোৎস্নায় মাখামাখি হয়ে আছে। সে কি এখনও বেঁচে আছে! আজ তার পাশে ঊষা নেই। এই মোহময় ক্ষণটিকে জীবনরসে পূর্ণ করে তুলতে কেউ তার চোখে চোখ রেখে মুখ টিপে টিপে হাসছে না।···ঊষা নিঃশব্দে ঘুমুচ্ছে।···ভাবতে ভাবতে অনিরুদ্ধ পাগল হয়ে উঠে।

নানা অসম্ভব এবং অস্বাভাবিক চিন্তা তার মাথায় আসে। শেষে নিজের মনেই প্রশ্ন করে—ঊষার অপরাধ কতখানি তার কোন খোঁজ করেছে কি সে···কথাটা এই সাত দিনের মধ্যে একবারও তার মনে আসে নি। অনিরুদ্ধর বুকের ভিতরটা দুলে উঠল। একটা অজানা আতঙ্কে সে বার বার শিউরে উঠছিল। কথাটা তার বহু পূর্ব্বেই চিন্তা করা উচিত ছিল। কুণ্ঠিত পদে সে পুনরায় ঘরে ফিরে এল। একবার ঊষার সুপ্ত মুখের পানে চেয়ে দেখে নিঃশব্দে কুণ্ঠিত পদে পাশের কক্ষে চলে গেল।

একটি আরামকেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে অনিরুদ্ধ নিঃশব্দে পড়ে আছে। গত সাত দিনের বহু চিন্তার মধ্যে যে কথাটা তার সর্ব্বপ্রথম ভেবে দেখা উচিত ছিল সেই কথাটিই এক মুহূর্তের জন্য তার মনে উদয় হয় নি, অথচ কেমন করে যে এই সাতটা দিন তার কেটেছে তা অন্তর্যামীই জানেন। যে বন্ধুমণ্ডলকে সে বিবাহের পরে একপ্রকার ত্যাগ করেছিল তাদেরই সঙ্গে ওর হৃদ্যতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। গত কয়েক বছরের অসহযোগ এই ক'টা দিনের মধ্যে একরকম পুষিয়ে নিয়েছে। সিনেমা, থিয়েটার, পিকনিক্ একের পর এক চলেছে—মনের অপরিসীম ক্লান্তিকে সে এই ভাবেই ঢেকে রাখতে চেষ্টা করেছে। বন্ধুরা অলক্ষ্যে মুখ টিপে টিপে হেসেছে। আর প্রকাশ্যে দিয়েছে উৎসাহ। কিন্তু উৎসাহ অনিরুদ্ধর বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নি। প্রাণহীন হাসি হেসে সে বলেছে, বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে একথা আমি বুঝি, কিন্তু এরও সময় সময় প্রয়োজন হয়—নইলে জীবনটা নিতান্তই অঙ্কশাস্ত্র হয়ে পড়ে। মুখে অনিরুদ্ধ এমনি আরও বহু কথাই বলছে অথচ সব সময়ই আনন্দ কোলাহলের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে সে ব্যস্ত।

বন্ধুদের মধ্যে একটা গোপন পরামর্শ চলে। অনিরুদ্ধকে নিয়ে ওরাও যেন একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছে। এমন কি নাটের গুরু অনিলকে পর্যন্ত বলতে হ'ল, না হে দাওয়াইটা বড় কড়া হয়ে গেছে—শেষ পর্যন্ত না মহাপাতকী হতে হয়। গেরুয়াধারী মাধুরী বললে, কথাটা তোমাদের আগেই ভাবা উচিত ছিল।

অনিল রুষ্ট কণ্ঠে জবাব দিলে, কিন্তু মতলবটা কে দিয়েছিল শুনি বাবাজী। তুমি বিয়ে-থা কর নি, স্বামী-স্ত্রীর···সহসা অনিল অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হ'ল, কিন্তু আর একমুহূর্ত এখানে নয়। অনিরুদ্ধ আসছে··· হাঁ হাঁ ঐ পাশের দরজা দিয়ে সোজা অন্দর-মহলে সরে পড়।

অনিরুদ্ধ এসে ঘরে প্রবেশ করতেই উপস্থিত সকলে তাকে স্বাগত জানাল।

অনিল বললে, কিন্তু তোমার চেহারাটা ত তেমন ভাল মনে হচ্ছে না অনিরুদ্ধ। রাত্রে ঘুম হয়েছিল ত?

এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে অন্যমনস্কভাবে সে ফরাসের এক পাশে বসল।

অনিল পুনশ্চ একই প্রশ্ন করলে, বলি কথা বলছ না যে? অসহযোগ চলছে নাকি? আরে কি ছেলেমানুষ তুমি···দাম্পত্য-জীবন এ নইলে যে বড্ড একঘেয়ে হয়ে যায় হে।

অনিরুদ্ধ এসব কথার ধার দিয়েও গেল না। সে প্রশ্ন করলে, আচ্ছা অনিল, ঊষা সম্বন্ধে সেসব কথা তুমি বিশ্বাস কর?

অনিল ভিতরে ভিতরে একটা অস্বস্তি বোধ করলেও প্রকাশ্যে হো হো করে হেসে উঠল।

অনিরুদ্ধ গভীর কণ্ঠে বললে, আমার কাছে এটা হাসির কথা নয় অনিল।

তার কথার ধরনে অনিল মুহূর্তে সামলে নিলে। মৃদু শান্ত কণ্ঠে বললে, এর জবাব আমার কাছে আশা করা তোমার উচিত হচ্ছে না অনিরুদ্ধ।

অনিরুদ্ধ ক্লান্ত কণ্ঠে বললে, জবাব তোমার কাছে আমিও চাইছি না অনিল, শুধু তোমার মতামতের কথাটাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

অনিল সহসা মাত্রাতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে উঠল, বলল, ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়েছে দেখছি···কিন্তু আমার ধারণা ছিল তুমি তোমার স্ত্রীকে ভালবাস অর্থাৎ শ্রদ্ধা কর অথচ সাধারণ একটা লোকের দুটো কথায় তুমি এমন বেসামাল হয়ে পড়েছ অনি—

অনিরুদ্ধ কতকটা বোকার মত অনিলের কথাটার পুনরুক্তি করলে, সাধারণ দুটো কথা—

তাকে থামিয়ে দিয়ে অনিল বললে, তা ছাড়া আবার কি। যাকে চেন না, জান না সে কখন কি উদ্দেশ্য নিয়ে দুটো মন্দ কথা বললে সেইটেই এত বড় হ'ল যার কাছে তোমার এত দিনের জানা এতদিনের চেনা সব মিথ্যে হয়ে···

তাকে থামিয়ে দিয়ে অনিরুদ্ধ বললে, তোমাদের এই জানা-না-জানার গোলকধাঁধায় পড়ে আমি পথ ভুল করেছিলাম এবং তার মাশুল এই সাতটি দিনে আমাকে যা দিতে হয়েছে তা বোধ হয় সারাজীবনেও আর জমার খাতায় লেখা হবে না, কিন্তু তোমাকে এসব কথা বলা বৃথা, তার চেয়ে তোমাদের সেই মহাপুরুষটির সঙ্গেই আমাকে আর একবার সাক্ষাৎ করিয়ে দাও। তাকে আমার গোটাকয়েক প্রশ্ন করবার আছে।

অনিল বলল, প্রশ্ন যদি কিছু করতে হয় তা নিজেকেই কর। মহাপুরুষের দেখা আর কোন দিন পাবে না। তা ছাড়া···অনিলকে সহসা থামতে হ'ল অনিরুদ্ধর ভৃত্যের আকস্মিক আগমনে। মনিবের হাতে একখানি চিঠি দিয়ে সে একপাশে সরে দাঁড়াল।

অনিরুদ্ধ এক নিশ্বাসে চিঠিখানি পড়ে ফেলে অনিলের মুখের পানে চোখ তুলে যেন আর্তনাদ করে উঠল, উষা চলে গেল—ও অসহায়ভাবে একটু হাসলে। সে হাসি অনিলকে চাবুক মারলে, সে ব্যাকুলকণ্ঠে বললে,চলে গেল! কোথায় গেল···কেন গেল অনিরুদ্ধ?

অনিরুদ্ধ যেন কোন এক অদৃশ্য শক্তির প্রেরণায় বলে চলল, উষাকে আমি সন্দেহ করতে সুরু করেছিলাম···

বেশ করেছিলে···তাকে থামিয়ে দিয়ে সে ভৃত্যকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি কোথায় গেলেন তা জানিস তুই?

ভৃত্য জানালে, সে তা জানে না তবে হাওড়া ষ্টেশনের জন্য একটা ফিটন এনে দিয়ে নিজে সে ট্যাক্সি করে সোজা চলে এসেছে। বাবু এখানে আসবেন বলে এসেছিলেন কিনা—

ভৃত্যর পিঠ চাপড়ে দিয়ে অনিরুদ্ধর হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে অনিল বললে, কথা পরে হবে অনি···ছিঃ ছিঃ কত বড় অন্যায় হয়ে গেল···কত বড় একটা···কিন্তু এই তোর বড় বড় কথা···

তারা দ্রুত ঘর ছেড়ে রাস্তায় এল। ট্যাক্সি তখনও অপেক্ষা করছিল।

উষা হাওড়া ষ্টেশনে পৌছবার পূর্ব্বেই অনিল অনিরুদ্ধকে নিয়ে পৌছে গেছে। ব্রিজের উপর উষার গাড়ীর সাক্ষাৎ মিলেছে।

উষা গাড়ী থেকে নামতেই অনিল এগিয়ে গেল। দুই করতল একত্র করে নমস্কার জানিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললে, মালপত্র কিছুই আনেন নি দেখছি—ভালই হয়েছে, আপনার যাওয়া হবে না। আশা করি, বেশী কথা আপনাকে বলার প্রয়োজন নেই বৌদি। একটা মস্তবড় ভুল হয়ে গেছে। অনিরুদ্ধ আপনার জন্য ঐ ট্যাক্সিতে অপেক্ষা করছে।

একটা জবাব দেবার জন্য মুখ তুলেই উষা নিজেকে সামলে নিলে। ইতিমধ্যে দুই-একটি করে কৌতূহলী লোক জমা হচ্ছিল। অবস্থাটা এক মুহূর্ত্তে উপলব্ধি করে আর কালবিলম্ব না করে উষা অনিলের সঙ্গে এসে গাড়ীতে উঠল।

সারাটা পথ তিন জনের কারুর মুখে একটি কথাও ফুটল না। একটা অখণ্ড স্তব্ধতা থম থম করছিল গাড়ীর মধ্যে।

বাড়ী পৌছে অনিল এবং অনিরুদ্ধ বাইরের ঘরে প্রবেশ করল। উষা অন্দর-পথে পা বাড়াতেই অনিল দ্রুত তার সম্মুখে এসে বললে, আমার একটা আবেদন ছিল বৌদি—

উষা থামলে, শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিলে, বলুন—

অনিল একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, অতটা রূঢ় হলে যে বলতে ভরসা পাচ্ছি না।

উষা বললে, তা হলে না হয় আজ থাক অনিলবাবু। বিশ্বাস করুন আমি বড় শ্রান্ত।

অনিল লজ্জিত কণ্ঠে বললে, তার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে আমি জানি, কিন্তু আপনিও বিশ্বাস করুন যে ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে আর একটা মিনিটও অপচয় করি নি। আমরা দূরে ছিলাম আবার দূরেই সরে যাব। মাঝের এই ক'টা দিনকে আপনার ভুলে যেতে হবে। আমাদের অপরিণামদর্শিতার যথেষ্ট সাজা হয়েছে। অনিল থামলে। উষা কতকটা বিস্মিত কতকটা কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

অনিল পুনরায় বলতে লাগল, তবে একটা শিক্ষা আমাদের হয়েছে যে মানুষের জীবনের সকল দিক নিয়ে কৌতুক করা চলে না। তার পরিণাম সব সময় সুন্দর হয় না।

উষা তেমনি পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

অনিল বলে চলল, আপনি বিশ্বাস করুন আমাদের উদ্দেশ্য মোটেই খারাপ ছিল না। কিন্তু ঘটনাচক্রে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হ'ল যাতে ভবিষ্যতে অতিবড় প্রয়োজনেও হয়ত আর আপনাদের সম্মুখে আসতে পারব না।

উষা তথাপি নীরব। কিন্তু অনিল থামতে পারল না। বলে চলল, আমার সম্বন্ধী গেরুয়াধারী তার উপর একমুখ দাড়ি। তার প্রকাণ্ড দেহ, দাড়ি এবং ভুঁড়ি মিলিয়ে তাকে বাবাজীর পর্য্যায়ে ফেলা চলে—

অনিরুদ্ধ অত্যন্ত আকস্মিকভাবে লাফিয়ে উঠে পুনরায় হতাশ-ভাবে বসে পড়ল। অনিল মুহূর্ত্তের জন্য সেই দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে পুনরায় বলতে লাগল, তাকে কাছে পেয়ে আমাদের মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি উদয় হ'ল। আমরা ফাঁদ পাতলাম আর অনিরুদ্ধ সে ফাঁদে

ধরা দিল। টেরও পেলে না যে কত বড় ভুল সে করল। কিন্তু আমার সম্বন্ধী সকলের অজ্ঞাতে মাত্রাটা একটু বেশী দিয়ে ফেলেছে। অনিল মাথা নীচু করলে। আর উষার মুখের চেহারায় ফুটে উঠল—ঘৃণা, বিতৃষ্ণা এবং অনুকম্পার এক বিচিত্র ছবি। অনিরুদ্ধর মাথাটা নীচু হতে হতে প্রায় তার হাঁটুর কাছে নেমে গেছে। সেই দিকে আর এক বার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে উষা পুনরায় পা বাড়াতেই অনিল তার পথ রোধ করে দাঁড়াল, ব্যাকুল কণ্ঠে বললে, আপনাকে অন্দর-পর্য্যন্ত অনুসরণ করবার স্পর্দ্ধা আমার নেই কিন্তু আপনার ক্ষমা না পেলে ত পথ ছাড়তে পারি না। বৌদি—

ক্ষমা! উষার চোখ দুটো একবার জ্বলে উঠেই নিভে গেল। মনের ক্ষতস্থান থেকে একবিন্দু রক্তও তার মুখ পর্য্যন্ত ঠেলে উঠতে পারল না। উষা প্রাণপণে নিজের কণ্ঠনালি চেপে ধরেছে। ঠোঁট দুটি তার খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল। উষার মুখে হাসি দেখা দিয়েছে না? অনিলের তাই ত মনে হ'ল। ঐ ত সে কথা কইছে, এখনও বোধ হয় আপনাদের চা খাওয়া হয় নি – পথ ছাড়ুন আমি বরং সেই ব্যবস্থা করিগে—

অনিল নিঃশব্দে সরে দাঁড়াল।...

বৈদিক ঋষির পারিবারিক জীবন

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ

ঋগ্বেদের মন্ত্রমালা মুখ্যতঃ দেবস্তুতি হইলেও ঐ সকল মন্ত্রে স্থানে স্থানে যে সকল উক্তি রহিয়াছে, তাহা হইতে বৈদিক ঋষিদিগের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথা জানিতে পারা যায়। পারিবারিক জীবনে তাঁহাদের সাংসারিক কাজ কি ছিল, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ইঁহারা পরস্পরের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহাদের পারিবারিক পরিবেশ কি প্রকার ছিল তাহা কোনও কোনও মন্ত্রে অল্প কথায় এমন সজীব চিত্রে অঙ্কিত হইয়া আছে যে মনে হয় যেন অতীত যুগের সেই ঋষি পরিবারের গার্হস্থ্য জীবন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি।

ঋষিরা সরল জীবন যাপন করিতেন। তাঁহাদের জীবন-যাত্রা ছিল পল্লীবাসী গৃহস্থের ন্যায়। বর্ত্তমান সময়ের গ্রামে একদিকে যেমন শহরের প্রভাব বাড়িতেছে, আর এক দিকে তেমনি ইহার উপর ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্যের তমসা ঘনীভূত হইতেছে। এ কারণ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও পল্লী-গৃহস্থের রূপ কি ছিল তাহা এখন অনুমান ও কল্পনার বিষয়। আমাদের বাল্যকালে দেখা এই গ্রাম ও গৃহস্থ এবং পুরা-কালের সেই ঋষি-পরিবারের যে চিত্র ঋগ্বেদের মধ্যে পাওয়া যায়—এই উভয়ের মধ্যে বস্তুগত পার্থক্য নাই বলিলেই হয়। অর্থাৎ, বৈদিক ঋষিদিগের কেহ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের গ্রামাঞ্চলে উপস্থিত হইলে এই গ্রামকে তাঁহাদেরই বাস-করা গ্রামের উত্তরাধিকারী বলিয়া চিনিতে পারিতেন। গ্রামের সেই মূর্ত্তি অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে।

বেদের ঋষিরা গৃহস্থ ছিলেন। কায়িক পরিশ্রম করিয়া তাঁহাদিগকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। সমস্ত দিনের কর্ম্মক্লান্তি রাত্রির বিশ্রামে অপনোদন করিয়া প্রত্যূষে তাঁহারা জাগরিত হইতেন। উষাগমে তাঁহারা গাহিলেন—

উদীর্ধ্বং জীবো অসুর্ন আগা-
দপ প্রাগাৎ তম আ জ্যোতিরেতি। ১।১১৩।১৬

হে মনুষ্যগণ (শয্যা ত্যাগ করিয়া) উঠ। আমাদের দেহের পরিচালক (উষা) আসিয়াছেন।

রাত্রিশেষে শ্লথদেহে কেহ কেহ বক্র হইয়া শুইয়াছিলেন তাহাও ঋক্ মধ্যে পাইতেছি—

জিহ্মশ্যে চরিতবে মঘোনী
আভোগয় ইষ্টয়ে রায় উ ত্বম্। ১।১১৩।৫

যেসকল লোক বক্র হইয়া শুইয়াছিল (উষা) তাহার মধ্যে কাহাকেও ভোগের জন্য কাহাকেও যজ্ঞের জন্য কাহাকেও ধনের জন্য সকলকেই নিজ নিজ কর্মের জন্য জাগাইয়া দিলেন।

গৃহিণী সর্ব্বাগ্রে জাগরিত হইতেন। তাহার পর তিনি পরিবারস্থ অন্য সকলকে জাগাইয়া দিতেন। উষার স্তুতিতে একস্থানে আছে—

গৃহিণী জাগরিত হইয়া যেমন সকলকে জাগরিত করেন উষাও সেইরূপ পৃথিবীর সকলকে জাগাইলেন। ১।১২৪।৪

অশ্বিদ্বয়ের স্তবে পাই—

পুত্র যেরূপ পিতাকে জাগরিত করে (সূনুন পিতরা বিবক্মি), সেইরূপ এই রথ তোমাদের দূতের ন্যায় লোককে জাগরিত করে। ৭।৬৭।১

এই উক্তি হইতে অনুমিত হয়, পুত্রও পিতার পূর্ব্বে জাগরিত হইতেন। পরে তিনি পিতাকে জাগাইয়া দিতেন।

পারিবারিক জীবনে, সংসার পরিচালনা কার্য্যে, গৃহস্থ-পত্নীই ছিলেন প্রধানা—তিনি গৃহকর্ত্রী গৃহিণী। সকলকে তিনি সস্নেহে লালনপালন করেন। উষার স্তবে আছে—

উষা গৃহকার্য্যের নেত্রী গৃহিণীর ন্যায় সকলকে পালন করিয়া আগমন করেন। ১।৪৮।৫

অপর কয়েকটি ঋকে গৃহিণীকে পত্নীরূপে পাইতেছি—

পত্নী যেমন স্বামীর প্রথম আহ্বানে ত্বরান্বিত হইয়া আগমন করেন, সেইরূপ দিন ও রাত্রি নানা প্রকার স্তোত্রদ্বারা প্রকাশিত হইয়া আমাদিগের নিকট ত্বরান্বিত হইয়া আগমন করেন। ১।১২২।২

জায়েব পত্য উশতী সুবাসা
উষা হস্রেব নি রিণীতে অপ্‌সঃ। ১।১২৪।৭

জায়া যেরূপ পতি অভিলাষিণী হইয়া সুবস্ত্র পরিধান করিয়া হাস্যদ্বারা দন্ত প্রকাশ করে, উষাও সেইরূপ করেন।

পতি-পত্নীর মধ্যে প্রীতির উল্লেখ যেমন পাওয়া যাইতেছে, তেমনি পাওয়া যায় তাঁহাদিগের মধ্যে সাময়িকভাবে অবনিবনাও হইবার কথা। সেরূপ ক্ষেত্রে উভয়ের বন্ধুবর্গের মধ্যস্থতায় পুনরায় তাঁহাদের মিলন ঘটিত। একটি ঋকে আছে—

স্ত্রী-পুরুষের বন্ধুবর্গ যেমন পতিপত্নীর মিলন করাইয়া দেয় (জনে মিত্রো ন দম্পতি অনক্তি। ১০।৬৮।৩) বৃহস্পতি দেবতা সেইরূপ গাভীদিগকে লোকদিগের সহিত মিলিত করিয়া দিলেন।

গৃহিণীকে যেমন স্বামীর প্রণয়িণীরূপে পাই তেমনি তাঁহাকে স্নেহশীলা মাতারূপেও পাইতেছি। তিনি সযত্নে কন্যার দেহ মার্জ্জনা করিয়া দিতেছেন।

সুসংকাশা মাতৃমৃষ্টেব যোষা
বিস্তন্বং কৃণুষে দৃশে কম্। ১।১২৩।১১

মাতা দেহ মার্জনা করিয়া দিলে কন্যার শরীর যেমন উজ্জ্বল হয়, (হে উষা) তুমিও সেইরূপ হইয়া দর্শনার্থ আপন শরীর প্রকাশ কর।

মরুৎ দেবতাগণ সম্বন্ধে একটি উক্তিতে আছে—

তাহারা বৎসল মাতার শিশুদিগের ন্যায় ক্রীড়াশীল। ১০।৭৮।৬

মাতা স্নেহশালিনী হইলে তাঁহার সন্তানেরা কিরূপ হাস্য-কোলাহলে খেলাধুলা করিয়া বেড়ায় তাহার চিত্র উক্ত ঋকটিতে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। অগ্নির স্তুতিতে আছে—

হে অগ্নি, তুমি জননীর ন্যায় সকলকে পালন কর (মাতেব জনংজনং ধায়সে। ৫।১৫।৪)।

ঋষিদিগের কাহারও কাহারও একাধিক পত্নী থাকিত। মহাকবি কালিদাস তাঁহার শকুন্তলা চিত্রণে, শকুন্তলাকে সপত্নীদিগের প্রতি প্রিয়সখীর ন্যায় ব্যবহার করিতে (প্রিয়সখী-বৃত্তিং সপত্নীজনে) উপদেশ দিয়াছেন। ঋগ্বেদে সপত্নীদিগের মধ্যে প্রবল ঈর্ষার কথাই পাওয়া যায়। ঋষিদিগের পক্ষেও বহু পত্নী অশান্তির হেতু হইত।

ত্রিত ঋষি কূপমধ্যে পতিত হইয়া তাঁহার ক্লেশের বর্ণনায় বলিতেছেন—

সপত্নীদ্বয় স্বামীর উভয় পার্শ্ব [illegible] কিয়া (সপত্নীরিব পার্শ্বঃ) যেরূপ তাহাকে সন্তাপ দেয়, এই পার্শ্বস্থ [illegible] পর ভিত্তিসকল আমাকে সেইরূপ সন্তাপ দিতেছে। ১।১০৫।৮

১০ম মণ্ডলের ১৪৫ সূক্তটি সপত্নীদিগের উপর প্রভুত্ব লাভ করিবার ও স্বামীর প্রণয় লাভ করিবার মন্ত্র। বিদ্বেষ-ভাবাপন্না স্ত্রী জঙ্গল হইতে বিশেষ এক প্রকার লতা মূলসমেত তুলিয়া আনিয়া তাহা স্বামীর বালিশের নীচে রাখিয়া দিলেন।

অনেকের মতে সূক্তটি অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালের রচনা। তাহা হইলেও উহা সুপ্রাচীন। উহা হইতে সপত্নীদিগের মধ্যে দ্বন্দ্বের কথা পাওয়া যায়। সূক্তটি এইরূপ—

এই যে তীব্র শক্তিশালী লতা, ইহা ওষধি। আমি ইহা খনন করিয়া উঠাইতেছি। ইহা দ্বারা সপত্নীকে কষ্ট দেওয়া যায় ও স্বামীর প্রণয় লাভ করা যায়।১।

হে ওষধি, তোমার পাতা উপর-মুখো (উত্তানপর্ণা)। তুমি স্বামীর প্রিয় হইবার উপায়। দেবতারা তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমার তেজ অতি তীব্র। তুমি আমার সপত্নীকে দূর করিয়া দাও। স্বামীকে কেবল আমারই বশীভূত করিয়া দাও (পতিং মে কেবলং কৃধি)।২।

(হে ওষধি), তুমি প্রধান, আমি যেন প্রধান হই—প্রধানের উপর প্রধান হই। আমার সপত্নী যেন নীচের নীচে হইয়া থাকে।৩।

সেই সপত্নীর নাম পর্য্যন্ত আমি মুখে আনি না। সপত্নী সকলের অপ্রিয়। আমি সেই সপত্নীকে দূর অপেক্ষা আরও দূরে পাঠাইয়া দিই (পরামেব পরাবতং সপত্নীং গময়ামসি)।৪।

(হে ওষধি), তোমার প্রভূত শক্তি, আমারও শক্তি আছে। এস, আমরা উভয়ের শক্তিদ্বারা সপত্নীকে হীনবল করি।৫।

(হে পতি), এই শক্তিশালী ওষধি তোমার শিরোভাগে রাখিলাম। এই শক্তিশালী বালিশ তোমার মাথায় দিতে দিলাম। তোমার মন যেন আমার দিকে ধাবিত হয়, গাভী যেমন বৎসের দিকে ধাবিত হয়, জল যেমন নিম্নপথে ধাবিত হয় (মামনু প্র তে মনো বৎসং গৌরিব ধাবতু পথা বারিব ধাবতু)।৬।

সূক্তটির বিষয় যাহাই হউক, ইহার রচনা যেমন সজীব ও সবল তেমনি উপভোগ্য!

পিতা-পুত্রের মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ ছিল তাহা নিম্নোদ্ধৃত ঋকগুলিতে পাওয়া যাইতেছে:

পিতা যেরূপ পুত্রের কথা শ্রবণ করে, সেইরূপ (হে ইন্দ্র) আমাদিগের দ্বারা আহূত হইয়া আমাদের কথা শ্রবণ কর (পিতেব নঃ শৃণুহি হূয়মানঃ)। ১।১০৪।৯

পিতা যেরূপ অপথগামী পুত্রকে উপদেশ দান করেন (পিতেব কিতবং শশাস), সেইরূপ (হে বিশ্বদেবগণ), তোমরা আমাকে উপদেশ প্রদান কর। ২।২৯।৫

পিতা আশীর্বাদ করিবার সময় পুত্র যেমন তাঁহাকে নমস্কার করে (কুমারশ্চিৎ পিতরং বন্দমানং প্রতি ননাম), হে ইন্দ্র, তুমি আসিবার সময় আমরা তোমাকে সেইরূপ নমস্কার করিতেছি। ২।৩৩।১২

পুত্র যেমন মধুর বাক্যে পিতার বস্ত্রপ্রান্ত গ্রহণ করে, হে ইন্দ্র, আমি সেইরূপ সুন্দর স্তুতিদ্বারা তোমার বস্ত্রপ্রান্ত গ্রহণ করিতেছি (পিতুর্ন পুত্রঃ সিচমা রভে ত ইন্দ্র স্বাদিষ্ঠয়া গিরা শচীবঃ। ৩।৫৩।২

মণ্ডূক স্তুতিতে পিতার সহিত পুত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে একটি উপমা আছে—

অক্খলীকৃত্যা পিতরং ন পুত্রো
অন্যো অন্যমুপ বদন্তমেতি। ৭।১০৩।৩

পুত্র যেমন অক্খল শব্দ করিয়া পিতার নিকট গমন করে, (বর্ষাকাল আসিলে) সেইরূপ এক মণ্ডূক অন্য মণ্ডূকের নিকট গমন করে।

বাস্তোষ্পতির (গৃহের পালয়িতা দেবতার) স্তুতিতে আছে—

পিতা যেমন পুত্রদিগকে পালন করেন তুমি আমাদিগকে সেইরূপ পালন কর (পিতেব পুত্রান্ প্রতি নো জুষস্ব)। ৭।৫৪।২

পিতার আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁহার বিদ্বান্ পুত্রগণ পৈতৃক ধনের অধিকারী হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকুক। (পিতৃবিত্তস্য রায়ো বি সূরয়ঃ শত হিমা নো অশ্যুঃ)। ১।৭৩।৯

পিতা পুত্রকে যেরূপ দান করেন, সেইরূপ তুমি (ইন্দ্র) ধন দান কর। ৭।৩২।২৬

অগ্নির উদ্দেশ্যে একটি উক্তি আছে—

পিতা যেমন পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া পালন করেন (পিতেব পুত্রম-বিভরুপস্থে) ১০।৬৯।১০

পরিবার মধ্যে অতিথি ও বন্ধুব্যক্তির বিশেষ স্থান ছিল। এ সম্বন্ধে কয়েকটি উক্তি এইরূপ—

অগ্নি পৈতৃক ধনের ন্যায় অন্নদাতা; শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তির শাসনের ন্যায় তিনি নেতা; উপবিষ্ট অতিথির ন্যায় প্রীতিভাজন। ১।৭৩।১

অতিথি যেমন প্রীতিভাজন তেমনি তিনি পূজ্য। ৭।৩।৫

শিষ্য ও শিক্ষকের মধ্যে কি প্রকার সম্পর্ক ছিল তাহা এই উক্তিটি হইতে পাইতেছি—

শিষ্য যেমন শিক্ষকের কথা শোনে (হে অশ্বিদ্বয়) তোমরা সেইরূপ বধ্রিমতীর আহ্বান শুনিয়াছিলে। ১।১১৬।১৩

কোন রাজর্ষির বধ্রিমতী নামে একটি কন্যা ছিল। বধ্রিমতীর পুত্র না হওয়ায় তিনি অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করেন। অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে হিরণ্যহস্ত নামক পুত্র প্রদান করেন (শ্রুতং তচ্ছাস্যুরিব বধ্রিমত্যা হিরণ্যহস্তমশ্বিনাবদত্তম্)।

গৃহস্থ পরিবারে স্ত্রীলোকদিগের গৃহকার্য্যসমূহের মধ্যে সোমরস প্রস্তুত করিয়া উহা গো-চর্ম্মের কলসে সঞ্চিত করিয়া রাখা একটি প্রধান কাজ ছিল। সমগ্র ৯ম মণ্ডল সোমদেবতার স্তুতি। এই স্তুতির উক্তি হইতে সোমরস প্রস্তুত করিবার সমগ্র পদ্ধতি পাওয়া যায়। একটি ঋকে সোমরস প্রস্তুত সময়ের পরিবেশ এইরূপ—

চারিদিকে স্তোত্র পাঠ হইতেছে। সোমরস প্রস্তুত হইতেছে। চারিদিকে গাভীগণ দুগ্ধ দিবার জন্য আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সোমরসের সহিত মিশ্রিত হইয়া দুগ্ধের মধুরতা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। সোম প্রস্তুত হইয়া ক্ষরিত হইতেছেন। সেই সঙ্গে কবিতা পাঠ হইতেছে। সোম বুদ্ধিমান কবি, তাঁহার প্রভাবেই কবিতার স্ফূর্তি হয়। ৯।৮৪।৫

ঋষিরা দিনে চারি বার আহার করিতেন। পুরোডাশ এবং ভাজা যব ছিল তাঁহাদের প্রধান খাদ্য। ৩য় মণ্ডলের ২৮ সূক্তে অগ্নিকে প্রাতঃ সবনে পুরোডাশ মধ্যাহ্ন সবনে পুরোডাশ তৃতীয় সবনে পুরোডাশ ও দিনের শেষে পুরোডাশ আহুতি দিবার কথা আছে। পুরোডাশ আগুনে সেঁকিয়া প্রস্তুত করা হইত। ইহা ভিন্ন তাঁহারা ভাজা যবের ছাতু, কখনও কখনও ঐ ছাতু দধি মিশ্রিত করিয়া ও তাহা দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া খাইতেন (৩ মঃ, ৫২ সূঃ)।

যবভাজা স্ত্রীলোকদিগের অপর একটি প্রধান কাজ ছিল। কোন কোন স্ত্রীলোক অন্যের বাড়ীতে যব ভাজিয়া দিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেন।

কৃষিজাত যব এবং গো-পালন হইতে দুগ্ধ সংগ্রহ করিতে পারিলেই তাঁহাদের জীবিকার সমস্যা মোটামুটি ভাবেই মিটিয়া যাইত।

গোভির্দরেমামতিং দুরেবাং
যবেন ক্ষুধং পুরুহূত বিশ্বাম। ১০।৪২।১০

আমরা যেন গাভীর সাহায্যে কষ্টকর দারিদ্র দুঃখ উত্তীর্ণ হই। হে পুরুহূত (ইন্দ্র), আমরা যেন যবের দ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতে পারি।

স্ত্রীলোকদিগের আর একটি কাজ ছিল বস্ত্র বয়ন করা। এ সম্বন্ধে কয়েকটি উক্তি এইরূপ—

…উষাসানক্তা বয্যেব রণ্বিতে।
তন্তুং ততং সংবয়ন্তী সমীচী… ॥ ২।৩।৬

উষা ও রাত্রি বয়নকুশল রমণীদ্বয়ের ন্যায়। পরস্পরের সাহায্যার্থ গমন করেন।

সম্ভবতঃ দুই জন স্ত্রীলোক পরস্পরের সহায়তায় কাপড় বুনিতেন।

বস্ত্রবয়নকারিণী রমণীর ন্যায় রাত্রি পুনর্বার আলোককে সম্যকরূপে বেষ্টন করিতেছেন। ২।৩৮।৪

উপজীবিকা হিসাবে বস্ত্রবয়নকারী তন্তুবায়ও তৎকালে ছিল। ১০।১০৬।১

গৃহস্থের বাড়ীতে সূচের দ্বারা বস্ত্রের ছিদ্র মেরামত করা হইত। রাকা (পূর্ণিমা) দেবীর নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে। তিনি যেন নিজেই আমাদের অভিপ্রায় জানিয়া অচ্ছিদ্যমান সূচির দ্বারা আমাদের কর্ম্ম বয়ন করেন (সীব্যত্বপঃ সূচ্যাচ্ছিদ্যমানয়া)। ২।৩২।৪

ঋষিরা গো, অশ্ব, গর্দ্দভ ও মেষ পালন করিতেন (৮।৫২।৪)। গৃহপালিত ঘোটককে আহার ও পানীয় দেওয়ার কথা আছে। তাহার গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দিবার কথাও পাইতেছি। ৯।৮৬।৪

১০।১১।৫ মন্ত্রে গৃহপালিত পশুকে ঘাস দেওয়ার কথা আছে।

গাভী ঋষিদিগের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও প্রিয় পশু ছিল। বহু মন্ত্রে গাভী সম্বন্ধে নানা প্রকার উক্তি আছে।

১০ম মণ্ডলে ১৯ সূক্তে গাভী এবং গো চারণের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। দোহনদক্ষ লোকেরা অন্যের বাড়ীতে গো-দোহন করিয়া দিত। মনে হয় ইহাও অনেকের উপজীবিকা ছিল।

আমি দুগ্ধবতী এই ধেনুকে আহ্বান করি দোহন-কুশল গো-ধুক্ (সুহস্তো গোধুক্) উহাকে দোহন করে। ১।১৬৪।২৬

বৎসের সহিত গো-মাতার ব্যবহার তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন এবং বহু মন্ত্রের মধ্যে উহা প্রকাশ করিয়াছেন।

বৎসের জন্য ধেনু ব্যগ্র হইয়া হাম্বারব করিতে করিতে (হিঙ্কৃণ্বতী বৎস-

মিশ্চন্তী) আগমন করিতেছে। ধেনু নিমীলিতাক্ষ বৎসের জন্য হাম্বারব করিতেছে। উহার মস্তক অবলেহন করিবার জন্ত হাম্বারব করিতেছে। বৎসের ওষ্ঠপ্রান্তে কেন অবলোকন করিয়া হাম্বারব করিতেছে এবং প্রভূত দুগ্ধদানে উহাকে পুষ্ট করিতেছে।

বৎস ধেনুর চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া অব্যক্ত শব্দ করে এবং গো-চারণ স্থানে অবস্থিত গাভী হাম্বারব করে। ১।১৬৪।২৭-২৯

অশ্বিদ্বয়ের স্তবে আছে—

তোমরা রাত্রিশেষে, গো-দোহন সময়ে প্রত্যূষে সূর্যোদয়ে, মধ্যাহ্ন সময়ে কিম্বা দিবসে ও রাত্রিকালে, যখনই আমাদিগের নিকট আসিবে, সুখকর রক্ষা-সমভিব্যাহারে আগমন করিও। ৫।৭৬।৩

মন্ত্রটি হইতে মনে হয় শেষরাত্রি ও সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়েই সাধারণতঃ দুগ্ধ দোহন করা হইত।

গো-জননী যেরূপ বৎসের দিকে বারবার গমন করে, সেইরূপ আমাদিগের এই স্তুতি বার বার তোমার (ইন্দ্রের) দিকে গমন করিতেছে। ৬।৪৫।২৫

দুগ্ধবতী গাভীগণ যেমন বৎসের নিকট ধাবিত হয় সেইরূপ আমাদিগের এই স্তুতিসকল দ্রুতবেগে তোমার দিকে গমন করে। ৮।৪২।২৮

গো-মাতা সদ্যোজাত বৎসকে স্নেহভরে লেহন করে। ৯।১০০।৭

গো-দোহক যেমন দুগ্ধবতী গাভীকে আহ্বান করে, হে ইন্দ্র, আমরাও সেইরূপ তোমাকে আহ্বান করিতেছি। ৮।৫২।৭

নবপ্রসূত গাভীগণকে সোমরস পান করান হইত।৯।৯৭।৩৫

গৃহপ্রাঙ্গণে যবের মরাই থাকিত। ঐ যব তাঁহারা ঝাড়িয়া বাছিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতেন। ১০।৬৮।৩ ঋষিরা কেহ কেহ কামার ছুতার চিকিৎসক প্রভৃতি নানা বৃত্তি অবলম্বী হইলেও কৃষিই তাঁহাদের প্রধান জীবিকা ছিল। মানুষ বলিতে 'কৃষ্টয়ঃ' (অর্থাৎ কর্ষণকারী) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (১।৪।৬)। ১।১১৭।২১ ঋকে আছে—

হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা আমাদিগের জন্য লাঙ্গল দ্বারা চাষ করাইয়া, যব বপন করাইয়া ও অন্নের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া এবং বজ্রদ্বারা দস্যুদিগকে বাধা দিয়া তাহার প্রতি বিস্তীর্ণ জ্যোতি প্রকাশ করিয়াছিলে।

ঋগ্বেদে ধান্যের উল্লেখ নাই। কয়েক স্থানে 'ধানাঃ' শব্দটি পাওয়া যায়। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য উহার অর্থ দিয়াছেন 'ভৃষ্টযবান্' (ভাজা যব)। 'ধানা ভৃষ্ট যবে' (অমর সিংহ)।

ঋষিরা পরশুদ্বারা বৃক্ষ ছেদন করিয়া (৩।৫৩।২২) ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অগ্নির জন্ত ইন্ধন বহন করিয়া আনিতেন (৪।২।৬)। অগ্নি নিরুপদ্রব স্থানে থাকিত এবং তাহাতে ক্রমাগত ইন্ধন প্রদান করিয়া প্রজ্জলিত রাখা হইত।

তং ত্বা নরোদম আ নিত্যমিদ্ধ-
মগ্নে সচন্ত ক্ষিতিষু ধ্রুবাসু। ১।৭৩।৪

লোকে নিরুপদ্রব স্থানে স্বীয় গৃহে অনবরত কাষ্ঠদ্বারা প্রজ্বলিত করিয়া তোমার (অগ্নির) সেবা করে।

ঋষিরা পরিপক্ব ফলপূর্ণ বৃক্ষকে প্রকম্পিত করিয়া ফল পাড়িয়া আনিতেন। ৯।৯৭।৫৩

জীবিকা অর্জ্জনের জন্ত ঋষিদিগকে কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইত। এ কারণ রাত্রিকালে শান্তিতে নিদ্রা যাইবার জন্ত আগ্রহান্বিত হইতেন। রাত্রি-দেবতা তাঁহাদিগের নিকট পরম স্নিগ্ধ মূর্তি লইয়া সমাগত হইতেন। ঋগ্বেদ সংহিতার মন্ত্রমধ্যে উষার মন্ত্রগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা কবিত্ব-পূর্ণ। রাত্রির মন্ত্র সংখ্যা উষার মন্ত্রের ন্যায় প্রচুর না হইলেও কবিত্ব-মাধুর্য্যে সমধিক সমৃদ্ধ। পূর্ণিমা (রাকা) ও অমাবস্যা (সিনীবালী) উভয় প্রকার রাত্রির বর্ণনা তাঁহারা করিয়াছেন।

সন্ধ্যা সমাগম ও রাত্রিকালের পরিণতি যে ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে তাহা ঋষিমনের সৌন্দর্য্য-বোধের অপূর্ব্ব নিদর্শন। [১০ম মণ্ডল, ১২৭ সূক্ত]

'রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ। বিশ্বা অধিশ্রিয়োধিতা'—রাত্রি দেবী আসিয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছেন। তিনি নক্ষত্রসমূহের দ্বারা অশেষ প্রকার শোভা সম্পাদন করিয়াছেন। 'ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বতঃ। জ্যোতিষা বাধতে তমঃ। তিনি আরও বিস্তারলাভ করিলেন, নীচে যাহারা থাকেন, উর্দ্ধে যাহারা থাকেন, সকলকেই তিনি আচ্ছন্ন করিলেন। তিনি (গ্রহ নক্ষত্রাদির রূপ) আলোকের দ্বারা অন্ধকারকে নষ্ট করিয়াছেন।

ক্রমে রাত্রি গভীর হইল ; মানুষ, পশুপক্ষী সকলেই শয়ন করিল।

নি গ্রামাসো অবিক্ষত নি পদ্বন্তো নি পক্ষিণঃ।
নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ ॥

গ্রামসমূহ নিস্তব্ধ হইয়াছে, যাহারা পায়ে চলে তাহারা, পক্ষীরা, শীঘ্রগামী শ্যেনগণ সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া শয়ন করিয়াছে।

রাত্রিতে সকলে নিরুপদ্রবে নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইতে চাহেন। বাস্তোষ্পতির নিকট প্রার্থনা (৭ মঃ ৫৫ সূ) :

হে সারমেয়*, তুমি যে স্থান হইতে গমন কর, পুনরায় সেই স্থানে আগমন কর। তুমি চোর ও ডাকাতের প্রতি গমন কর। ইন্দ্রের স্তোতৃগণের নিকট কেন যাও ? আমাদিগকে কেন বাধা দাও ? সুখে নিদ্রা যাও।

তোমার মাতা নিদ্রা যাউন। তোমার পিতা নিদ্রা যাউন। কুকুর নিদ্রা যাক্। গৃহস্বামী নিদ্রা যাক্। বন্ধুগণ নিদ্রা যাক্। চারিদিকে এই জনগণও নিদ্রা যাক্।

যে স্ত্রীগণ প্রাঙ্গণে শয়ন করিয়া আছে, যাহারা বাহনে শয়ন করিয়া আছে, যাহারা তল্পে (বিছানাপত্রে) শয়ন করিয়া আছে, যাহারা পুণ্যগন্ধা তাহাদের সকলকে নিদ্রিত করিব।

এগুলি ঘুমপাড়ানী মন্ত্র।

রাত্রি-দেবতার নিকট শেষ প্রার্থনা:—

সা নো অদ্য যস্যা বয়ং
নি তে যামন্নবিক্ষ্মহি।

যাহার আগমনে আমরা শয়ন করিয়াছি সেই রাত্রি আমাদের শুভকরী হউন।

যাবয়া বৃক্যং বৃকং যবয় স্তেনমূর্ম্যে।
অথা নঃ সুতরা ভব।১০।১২৭।৬

হে রাত্রি, বৃকী ও বৃককে আমাদিগের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাও। চোরকে দূরে লইয়া যাও। আমাদের পক্ষে বিশিষ্ট রূপে শুভকরী হও।

* বাস্তোষ্পতি, গৃহের পালয়িতা দেবতা। ইনি সরমা কুলোদ্ভব, এ কারণ 'সারমেয়'।

সাহিত্যবিশারদ আবদুল করিম

(জন্ম : ১৮৬৯ ; মৃত্যু : ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩)

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

অবিভক্ত বাংলার অক্লান্ত পুথি-সংগ্রাহক, সাহিত্যিক, 'সাহিত্যবিশারদ' আবদুল করিম আর ইহজগতে নাই। বঙ্গজননীর এই শ্রেষ্ঠ সন্তানের তিরোভাবে বাংলা-সাহিত্যের যে অপূরণীয় ক্ষতি হ'ল, তা সহজে পূর্ণ হবার নয়। বঙ্গদেশের দুই প্রান্তে বীরভূমে ও চট্টগ্রামে একদা দুই দিক্‌পাল গবেষণার মূল খুঁটি আগলে ছিলেন; শিবরতন মিত্র মশায় বহুকাল আগেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে ৮৪ বৎসর বয়সে সাহিত্যবিশারদও আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবের, সাহিত্যিক ভ্রাতাদের মায়ামমতা কাটিয়ে পরম জননীর কোলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। পরিপক্ক বয়সে তিনি মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করেছেন; দুঃখ তাঁর জন্য নয়—দুঃখ আমাদের জন্য, যাঁরা তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর অনন্ত মানবপ্রেম, অপরিসীম পাণ্ডিত্য, অকাতর দেশসেবার পূর্ণ মূল্য দেওয়ার কথা দূরে থাকুক, তাঁর কাছে আমাদের অপরিসীম ঋণের কিছুমাত্র শোধ করতে পারলাম না।

সাহিত্যবিশারদ আবদুল করিম সুচক্রদণ্ডী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতির লীলানিকেতন শৈলকিরীটিনী সাগর-কুন্তলা নদীমেখলা চট্টলজননীর এ স্থান এককালে মহাপ্রভুর পার্ষদদ্বয়ের জন্ম পরিগ্রহে ধন্য হয়েছিল; এ গ্রামের মুকুন্দ দত্তের মৃদঙ্গের বোল ব্যতীত মহাপ্রভুর নৃত্যস্ফূর্ত্তি হ'ত না; তাঁর অগ্রজ বাসুদেব দত্তও মহাপ্রভুর বড়ই অন্তরঙ্গ ছিলেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এ গ্রাম মেখল গ্রামের সঙ্গে ধর্ম্মের বন্ধনে ছিল সুসংপৃক্ত; স্বনামধন্য মহাপুরুষ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—যাঁকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজে পিতা বলে সম্বোধন করতেন—মেখল গ্রাম থেকে নিরন্তর সুচক্রদণ্ডী গ্রামে কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, মুকুন্দ বাসুদেব পুণ্ডরীক অতুলনীয় ধর্ম্মাত্মা ছিলেন—ধর্ম্ম-সুহৃৎ ছিলেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে মগরাজ জয়চন্দ্র এ অঞ্চলে রাজত্ব করতেন—চক্রশালা থেকে রামু পর্য্যন্ত অঞ্চল চঞ্চলা লক্ষ্মীর অচঞ্চল কৃপাদৃষ্টি লাভে ছিল তখন বরণীয়। এ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গ্রামে পুঞ্জীভূত পুণ্যের ফলে অতুলনীয় গুণাবলীর আধার সাহিত্যবিশারদ জন্ম পরিগ্রহ করেছিলেন—এ অতি সুখাবহ ঘটনা।

কিন্তু জন্ম পরিগ্রহ থেকে নানা দুর্য্যোগের, বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে তাঁকে কর্ম্মপথে অগ্রসর হতে হয়েছিল। তাঁর জন্মের পূর্ব্বেই তাঁর পিতৃদেব ধরাধাম পরিত্যাগ করেন। তাঁর অষ্টাদশবর্ষ বয়সে পরমারাধ্যা জননীও তাঁর লালন-পালনের সমস্ত ভার তাঁর পিতামহ মহম্মদ নবী চৌধুরী ও পিতৃব্য মুন্সী আইনুদ্দীনের উপর ন্যস্ত করে ইহলীলা সংবরণ করেন।

১৮৯০ সালে তিনি সংস্কৃত সহ এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করেন। এটি জানা কথা যে চট্টগ্রামের সদর বি ও কক্সবাজার মহকুমায় তিনিই প্রথম এন্ট্রান্স পাস মুসলমান। অতঃপর এফ-এ পড়ার জন্য তিনি চট্টগ্রাম কলেজে ভর্ত্তি হন; কিন্তু সন্নিপাত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর পরীক্ষা দেওয়া হয় নি। পর পর নানা পারিবারিক দুর্য্যোগে তাঁকে পড়াশুনা ত্যাগ করে চাকরির সন্ধানে বের হতে হ'ল।

চাকুরি-জীবনে প্রথম তিনি সীতাকুণ্ড মধ্য ইংরেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁর খুল্লতাত আইনুদ্দীনের চেষ্টায় চট্টগ্রাম জজকোর্টে অস্থায়ী কেরাণীর পদ লাভ করেন। এ সময়ে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন চট্টগ্রামে বিভাগীয় কমিশনারের পার্সন্যাল এসিষ্ট্যাণ্টরূপে কাজ করছিলেন; তাঁর আনুকূল্যে সাহিত্যবিশারদ কমিশনারের আপিসে স্থায়ী কেরাণীপদ লাভ করেন। এ সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটে যা থেকে সাহিত্যবিশারদের ভাগ্য ভিন্ন পথে নিয়ন্ত্রিত হয় বটে, কিন্তু তাঁর সাহিত্য-নিষ্ঠা ও দেশপ্রীতির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

সাহিত্যবিশারদের পিতামহ মহম্মদ নবী চৌধুরী মহাশয়ও সাহিত্যরসপিপাসু সহৃদয় শিক্ষিত লোক ছিলেন; নিত্য তাঁর বাড়ীতে সন্ধ্যায় পুথিপাঠ ও সাহিত্যালোচনা হ'ত—বাল্য-বয়সে সাহিত্যবিশারদের সাহিত্য-প্রীতির মূল সূত্রপাত এখানেই। একথা তিনি তাঁর ঢাকায় প্রদত্ত ২৬।৬।৫২ তারিখের বক্তৃতায় স্বয়ং উল্লেখ করেছেন। এই সাহিত্যপ্রীতি—কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে এসে খরগতিতে বর্দ্ধিত হতে থাকে। তখনকার দিনে ব্রিটিশ সরকারের প্রচণ্ড প্রতাপ; স্বদেশীভাবাপন্ন লোকের সংস্পর্শে আসাও রাজকীয় শক্তির কাছে এক অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলে পরিগণিত হত। চট্টগ্রামের জ্যোতিঃ পত্রিকা ছিল স্বদেশী কাগজ এবং তার সম্পাদক কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী ছিলেন সর্ব্বতোভাবে বিদেশী শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের একেবারে চক্ষুঃশূল। প্রাণের আকুল আবেগে এবং সাহিত্যসেবায় অধিকতর সুযোগলাভের উদ্‌গ্রীব আকাঙ্ক্ষায় সাহিত্যবিশারদ সেই কালীশঙ্করের প্রকাশিত জ্যোতিঃ পত্রিকাতেই স্বনামে

বিজ্ঞাপন দিলেন—"যাঁরা আমাদের প্রাচীন হাতের লেখা পুঁথি সংগ্রহ করে দেবেন, তাঁদের এক বছর বিনা মূল্যে জ্যোতিঃ দেওয়া হবে।" এ বিজ্ঞাপন থেকে শাসন-কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করে নিলেন যে, আবদুল করিম জ্যোতিঃ পত্রিকার পক্ষীয় অন্তরঙ্গ লোক; এবং ফলে তাঁকে সরকারী চাকুরি থেকে বহিষ্কৃত করে দিলেন।

আপাতদৃষ্টিতে যা ক্ষতি, ভগবানের বিধানে তা অনেক সময়ে পরম আনন্দের হেতু হয়ে দাঁড়ায়। সাহিত্যবিশারদ এবার আনোয়ারা মধ্যে ইংরেজী স্কুলের হেড মাষ্টারের পদ গ্রহণ করলেন। বিধির বিধানে তিনি ভগবদ্‌বাঞ্ছিত কার্য্যে যোগ দিলেন; অচিরকালের মধ্যেই তাঁর অপরিসীম আগ্রহ উদ্যোগ এবং অমায়িক ব্যবহারের ফলে বহু মূল্যবান পুথি সংগৃহীত হতে লাগল। তাঁর জ্ঞানের প্রোজ্জ্বল দীপ্তিতে সমগ্র বঙ্গদেশ ভাস্বর হয়ে উঠতে লাগল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষারও পরীক্ষক নিযুক্ত হলেন। স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি স্বভাবতঃই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ'ল। বিভাগীয় স্কুল ইন্‌সপেক্টর আবদুল করিমকে পরম সন্তোষসহকারে স্বীয় আপিসের কেরাণীর পদে নিযুক্ত করেন। পূর্ব্ববঙ্গের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ খান বাহাদুর আবদুল আজিজও তাঁর প্রতি বিশেষ সুপ্রসন্ন ছিলেন। নবীনচন্দ্র সেন, শশাঙ্কমোহন সেন প্রভৃতির সাহচর্য্যে ও অনুপ্রেরণায় এবং স্বীয় শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের হিতৈষণায় সাহিত্যবিশারদ উত্তরোত্তর জ্ঞানের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, সাহিত্য-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ১৯৩৩ সনে তিনি সরকারী চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

সাহিত্যবিশারদের প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় আলো-পত্রিকায়, তাঁর ২২ বৎসর বয়সে। ১৮৯১ সনে তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধ অক্ষয় সরকার-সম্পাদিত হুগলী থেকে প্রকাশিত পূর্ণিমা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নবীনচন্দ্র এ প্রবন্ধের জন্য তাঁকে বিশেষ ভাবে অভিনন্দিত করেন। সে সময় থেকে জীবনের শেষভাগ পর্য্যন্ত নবীনচন্দ্র সাহিত্যবিশারদ আবদুল করিমের পরম অনুরাগী ছিলেন। সাহিত্যবিশারদ বিগত বৎসরে ঢাকায় প্রদত্ত রেডিও বক্তৃতায় বলে গেছেন—নবীনচন্দ্র তাঁর সাহিত্যিক জীবনে উৎসাহ ও প্রেরণার উৎস-স্বরূপ ছিলেন। অনন্তর তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নিরন্তর প্রবন্ধরচনা ও বিশিষ্ট বিশিষ্ট পুস্তক প্রকাশিত করে গেছেন; বঙ্গদর্শন, ভারতী, যমুনা, নারায়ণ, সাহিত্য, মানসী, ভারতবর্ষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, কোহিনূর, নবনূর, মুসলিম ভারত, আলাই সলাম, সওগাত, মোহম্মদী প্রভৃতি পত্রিকা তাঁর দানে সমৃদ্ধ হয়েছে। আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম ও শেষ পরিচয় হয় আমাদের স্বগ্রামে চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে—১৯৩৮ সনে; বদন-মণ্ডল তাঁর মিষ্টতম হাস্যে বিমণ্ডিত; ললাটদেশ প্রতিভার জ্যোতিতে ভাস্বর; পরম আশীর্ব্বাদ সহকারে তিনি দেশ-হিতৈষণার শ্রেষ্ঠ বাণী হিন্দু-মুসলমান-সম্প্রীতির উল্লেখপূর্ব্বক প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন যে তখনি তাঁর পাঁচ শতের অধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে গেছে। অতঃপর এ সুদীর্ঘ পনর বৎসরে তাঁর আরও শতধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ন্যূনকল্পে তিনি ছয় শত প্রবন্ধ জীবদ্দশায় প্রকাশিত করে গেছেন। তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধই গবেষণামূলক; অপূর্ব্ব, পণ্ডিতদের অপরিচিত পুথির মালমসলার সাহায্যে বিরচিত। এক-জীবনে এতগুলি প্রবন্ধ বিরচন অন্য কোনও গবেষণাকারের ভাগ্যে ঘটেছে কি না সন্দেহস্থল।

শুধু প্রবন্ধ বিরচন নয়, তিনি অনেক পুথি সংশোধিত এবং প্রকাশিত করে গেছেন। লালগোলার স্বনামধন্য মহারাজ যোগীন্দ্রনারায়ণের অর্থানুকূল্যে ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষণায় তিনি ফয়জুল্লার গোরক্ষবিজয়, রবিদেবের মৃগলব্ধ,...সারদামঙ্গল,...জ্ঞানসাগর,...গৌরাঙ্গসন্ন্যাস প্রভৃতি বহু মূল্যবান পুথি সম্পাদন করে গেছেন পরম পাণ্ডিত্য সহকারে। তাঁর পুথির বিবরণীরও কিয়দংশ সাহিত্য-পরিষদ্-কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর এসব কাজে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শশাঙ্কমোহন সেন প্রভৃতি বিশিষ্ট সহায়ক ছিলেন। ১৩২৪ থেকে ১৩২৭ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত তিনি চট্টগ্রাম থেকে সাধনা নামক এক উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করতেন।

এতদ্ব্যতীত সাহিত্যবিশারদ আলাওলের পদ্মাবতী সম্পাদন করে গেছেন। অর্থাভাব হেতু এ গ্রন্থ প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। এটি দেশের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। আনন্দের বিষয়, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ সাহিত্যবিশারদের জন্য অনুষ্ঠিত শোকসভায় তাঁর এ গ্রন্থপ্রকাশের নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আশা করি, তাঁর নিপুণ হাতের এই বরিষ্ঠ কাজ অচিরেই সুধী-সমাজে প্রভূত আনন্দপ্রদানে সমর্থ হবে—প্রকাশনের কাজে কোনও বাধা হবে না। সাহিত্যবিশারদ হিন্দু ও মুসলমান কবিদের প্রায় পনর শ' পুথির বিবরণী লিখে রেখে গেছেন; অর্থাভাবে প্রকাশ করে যেতে পারেন নি। এ পুথির বিবরণী অচিরে প্রকাশ একান্ত বাঞ্ছনীয়। অযত্নে এ দুর্মূল্য সম্পদ চিরতরে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, সারা জীবন কঠোর জীবিকার্জ্জনের শ্রম স্বীকার করেও সাহিত্যবিশারদ শুধু যে সাহিত্য-সাধনায় চির সজাগ ও কর্ম্মকুশল ছিলেন, তা নয়—বহু জন-

হিতকর কাজ, সভাসমিতির সঙ্গে তিনি সুসংশ্লিষ্ট ছিলেন। চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মেলনীর তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের "আজীবন সদস্য" ছিলেন এবং একবার পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সহ-সম্পাদকের পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন। তিনি জীবনে বহু সাংস্কৃতিক সম্মেলনে সভাপতি ও প্রধান অতিথির পদে বৃত হয়েছেন। ১৯৩৯ সনে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-মুসলিম সাহিত্য-সম্মেলনে এবং ১৯৫২ সনে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে তাঁর প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বঙ্গ-ভঙ্গের পরে ১৯৫২ সনে কুমিল্লায় প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেছেন, "আমার দেশের মৃত্যু নাই, আমার দেশের আত্মার—জনগণের মৃত্যু নাই, তেমনি অমর আমার এই বাংলা-ভাষা।···মানুষে মানুষে বিভেদ আছে সত্য। এই বিভেদকে জয় করাই সংস্কৃতির কাজ। সংস্কৃতি ঐক্যের বাহন, বিভেদের চামুণ্ডা নহে।" বঙ্গীয়-সংস্কৃতির এ মূর্ত্ত প্রতীকের দেশপ্রেম ছিল অপরিসীম; স্বয়ং অসাধারণ সাহিত্যিক হয়েও স্বীয় গ্রামের ঋণসালিশী বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতির সভাপতির কাজ তিনি পরম নিপুণতার সঙ্গে সম্পাদন করে গেছেন। বিগত বঙ্গ-ভঙ্গের দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময়ে তাঁর উপদেশের বলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা-হাঙ্গামা তাঁর অঞ্চলে প্রকট রূপ ধারণ করতে পারে নি। তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে মানবপ্রেমের উপাসনায় চরম সিদ্ধি লাভ করে গেছেন। তাঁর "সাহিত্যবিশারদ" উপাধি চট্টগ্রামের সুধীসমাজ-প্রদত্ত। নদীয়ার পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁকে "সাহিত্য-সাগর" উপাধিতে বিভূষিত করেন। অনুপম পাণ্ডিত্যে ও স্বকীয় অমায়িক ব্যবহারে, দেশহিতৈষণার অতুলনীয় মাহাত্ম্যে তিনি হিন্দু-মুসলমান সকলেরই হৃদয় সমানভাবে আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর উপাধি দুটিই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই সাহিত্য-সাধকের আজীবন সহধর্ম্মিণী ও মরজগতের লীলা-সঙ্গিনী বিগত ২৫শে মার্চ্চ মানবলীলা সংবরণ করেন। তারপর তিনি জীবনের প্রতি স্বভাবতঃই বিতৃষ্ণ হন। স্বল্প-কাল মধ্যেই তিনি বিধাতার আহ্বানে সহধর্ম্মিণীর সহগামী হলেন। দেশের এক উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক সাহিত্যাকাশ থেকে চিরতরে ভ্রষ্ট হ'ল।

সাহিত্যিকের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের, তাঁর পবিত্র স্মৃতি সংরক্ষণের শ্রেষ্ঠ উপায়—তাঁর বিরচিত গ্রন্থ, প্রবন্ধাদি প্রকাশিত করা। সাহিত্যবিশারদের অমূল্য প্রবন্ধরাজি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে। আজ তাঁর দেশবাসীর অবশ্যকর্ত্তব্য—ঐগুলি সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করা; অন্ততঃ শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগুলি সঙ্কলনপূর্ব্বক অচিরে প্রচারিত করা। বঙ্গীয় সুধীমণ্ডলী এ বিষয়ে বদ্ধপরিকর হউন—এই প্রার্থনা।

যাত্রী

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

পথ করিয়াছে সস্নেহ আহ্বান,
দিয়াছে খুলিয়া রহস্য-যবনিকা।
কত শিলালিপি, সৌধ, স্তূপের গান
পথযাত্রীর অন্তরে হ'ল লিখা।

বৃন্দাবনেতে ঐশ্বরী প্রেমলীলা,
মানবী-প্রেমের অমরা আগ্রা হেরি।
গোবর্দ্ধনেতে হেরিনু প্রোথিত শিলা
'লাল-কেল্লা'য় ধ্বনে স্বাধীনতা-ভেরী।

হিমবাত ভেদি তরিতে পতিত জনে,
সুরধুনী নামে 'হর কি পেয়ারি' ঘাটে
অলকানন্দা মন্দাকিনীর সনে
রুদ্র প্রয়াগে মিশিলেন গিরিবাটে।

পথ নিয়ে যায় পথিকে টানিয়া নিতি,
জীবন ভরিয়া জেগে থাকে সেই স্মৃতি।

মস্যাধারংলেখনীঞ্চ"। পঞ্চমীতে লক্ষ্মী এবং দোয়াত-কলমের পূজা করিবে। এইখানে কোন প্রতিমার উল্লেখ নাই। বরাহের বৃহৎসংহিতা নামক জ্যোতিষ-সংহিতায় প্রতিমার লক্ষণের মধ্যে সরস্বতীর উল্লেখ নাই।

চণ্ডীকাব্যে সরস্বতী—বাংলার চণ্ডী-কাব্যের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী সরস্বতীর বন্দনায় বলিয়াছেন যে, দেবীর শ্বেত কমলে অধিষ্ঠান, শ্বেত বস্ত্র পরিধান, মস্তকে শোভে চন্দ্রকলা, করে শোভে জপমালা, শুকশিশু শোভে বাম করে। তাঁর এক হস্তে পুস্তক, মসীপত্র তাঁর সাথী, ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী, বীণা, বেণু, বাদ্যযন্ত্র সকল সময় তাঁর সেবা করে। তিনি চন্দ্রমুখে বেদধ্বনি করেন।

বীণাপাণি বর্ণময়ী, তিনি বিষ্ণুমায়া চতুর্ভুজা। বিষ্ণুমায়াই প্রকৃতির আদ্যাশক্তি। মহামায়াই দুর্গাশক্তির একাংশ সরস্বতী। তিনি ছয় ঋতু ছয়টি দেবশিশু লইয়া সম্বৎসরের লীলা দ্বারা বিশ্বপ্রকৃতিকে রক্ষা করিতেছেন। বেদ, পুরাণ, তন্ত্রশাস্ত্র হইতে সরস্বতীর সাধারণ পরিচয় পাইলাম। বুঝিলাম যে, শক্তি একই, বিভিন্ন যুগে মানব ভিন্ন ভিন্ন প্রতিরূপকে শক্তির কল্পনা করিয়া, নিরাকার শক্তির ভাবপ্রতীক সাকার মৃত্তিকার প্রতিমায় অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী একই চিন্ময়ী নিরাকার শক্তির ভিন্ন ভিন্ন মৃন্ময়ী ভাব প্রতিমায় অর্চ্চনা হইয়া থাকে।

চিন্ময়ীভাব প্রতীকের, মৃন্ময়ী ভাব প্রতিমা জাতীয় কৃষ্টিকলার বিকাশ: চিন্ময়ীভাবপ্রতীক নিরাকার সরস্বতীর সাধনার ক্ষেত্র মানব-হৃদয়। মানব-চিত্তে এই নিরাকার শক্তি আবির্ভূতা হইয়া মৃন্ময়ী ভাব প্রতিমায় তার বিকাশ করা হয়। মানব-হৃদয়ের 'অঞ্জন' দুগ্ধশুভ্রা, হৃদয়ের সরসে ধৌত করিয়া নব নব জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রজ্ঞা বারিপূর্ণ সুধাকলস পূর্ণ করিয়া থাকেন। সাধারণ মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধিতে এই চিন্ময়ী নিরাকার জ্ঞানের দ্যুতি প্রবেশ করিতে পারে না; কলুষকালিমাপূর্ণ মানব-হৃদয়ে আত্মার স্নিগ্ধ ছায়া আশ্রয় লইতে পারে না। তাই তাঁহার হৃদয়ের জ্বালা চিরশরণের কাছে নিবেদন করিয়া আত্মার শান্তিলাভ করিতে কখনও পারে না। সেইজন্যই নিরাকার জ্ঞানশক্তির চিন্ময়ী ভাব প্রতীকের মৃন্ময়ী ভাব প্রতিমায় রূপ ও গুণ বিকাশ করিয়া সহজে সাধারণ মানবচক্ষে শক্তির গুণ, গুণের ধর্ম্ম প্রকাশ করিতে হয়। তারপর জাতীয় কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য জনসাধারণের মধ্যে বিকাশ করিয়া জাতীয় প্রাণকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় উদ্বোধন করিতে হইলে নিরাকার চিন্ময়ীশক্তির ভাবময় চাক্ষুষ প্রতীক, মৃন্ময়ী প্রতিমা গড়িয়া পূজার ভক্তির মধ্য হইতে জাতীয় কৃষ্টিকলার উন্নতি আবশ্যক হয়। কামনা-কলুষপূর্ণ ভোগময় অশান্ত মানব-হৃদয়ে চিরশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইলে চিন্ময়ীভাব মূর্ত্তি হইতে মৃন্ময়ী প্রতিমার অর্চ্চনা অধিক আবশ্যক। নিরাকার দেবশক্তির ভাব প্রতিমার সাধনার মধ্য হইতে ধীরে ধীরে মানব-হৃদয়ে চিন্ময়ী নিরাকার শক্তি সঞ্চারিত হইয়া চিরশরণের কাছে তাঁহার অশান্ত হৃদয়ের জ্বালা নিবেদন করিয়া দুঃখ মোচন করিতে পারে। মানবপ্রীতি হৃদয়ের ঐক্য প্রেম প্রীতির বন্ধনে বিশ্বমানবের সহিত একাত্মবোধ এবং দেবতার সহিত মানবের সম্পর্ক মধুর করিতে হইলে অষ্টমহাভুজা জ্ঞান-বিজ্ঞান শক্তি সরস্বতীর চিন্ময়ী ভাব মূর্ত্তির সাধনার চাক্ষুষ ব্যবহারিক শিল্প ও কাব্যকলায় বিকাশ করিয়া তারপরে প্রাণের আবেগে ষড়জ ও নিষাদের সুরধ্বনিতে ঐকতান করিয়া শক্তির মৃন্ময়ী প্রতিমায় চিন্ময়ীভাবের অনুপ্রবেশ করাইতে হয়।

প্রতীক সাধনায় ভারতীয় জাতীয় গুণের বিকাশে পাষাণ দেবতা—যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের দেবীশক্তির চিন্ময়ী ভাব মূর্ত্তি মৃত্তিকার প্রতিমায় গড়িয়া সর্জ্জন (সৃষ্টি), বিসর্জ্জনে জাতীয় কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া দেবতার সহিত মানবের মধুর সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়াছেন। সরস্বতীর অষ্টমহাভুজ শক্তিই বিশ্বকর্ম্মার আয়ুধ। এই আয়ুধ চালনা করিয়া তিনি পৃথিবীর মৃৎপিণ্ডে, নিশ্চল পাষাণে, দারুকাষ্ঠে নানাপ্রকার বিচিত্র শিল্প গড়িয়া শিল্পকল ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করিয়াছেন। মানব এই মহাশক্তির চিন্ময়ী ভাব মূর্ত্তির সাধনার ফলে বিভিন্ন কারুশিল্পে জড়দেহে পাষাণে চেতনার ভাবদীপ্তি সঞ্চারিত করিয়া তুলিয়াছেন। নিরাকার অদৃশ্যদ্যুতি শক্তির সাকার জড় পদার্থের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া পাষাণেও দৈবশক্তির আবির্ভাব করিয়াছেন। এই ভাবেই তাঁহারা দৈবশক্তির সহিত মানবীয় সম্পর্ক নিবিড় করিয়া লইয়াছেন।

সরস্বতী শক্তিবাক্যে বাঙ্ময়ী। কাজেই তিনি বিশ্বপ্রকৃতির আত্মা। বিশ্বপ্রকৃতি তাঁহার দেহ। তিনি প্রত্যেক দেহে বিদ্যমান আছেন। বিশ্বদেহই তাঁহার প্রতীক। আমরা দেবীর মূর্ত্তি বলি না, প্রতিমা বলি। মূর্ত্তি হৃদয়ের অনুভূতি নিরাকার; প্রতীক প্রতিমা সাকার। মূর্ত্তিকে অন্তরে সর্জ্জন করা হয়, তাহারই প্রতীক প্রতিমাকে বিসর্জ্জন করা হয়। প্রতিমাই দেবীর বাঙ্ময়ী ও চিন্ময়ীশক্তির গুণ। গুণের ধর্ম্ম ও কর্ম্মের প্রতীকই তাঁহার মানবদেহরূপী জড় প্রতিমা। আমাদের সাধনা হইল অন্তরে বাঙ্ময়ী ভরনের বৃত্তি ভারতীর চিন্ময়ী মূর্ত্তি, বাহিরে তাঁহার জড়দেহ প্রতিমায় সর্জ্জন, পূজান্তে তাঁহার বিসর্জ্জনই আমাদের জাতীয় সাধনা। এই ভাব প্রতিমার সাধনায় ভারতবর্ষের সাধকগণ দুর্ব্বলকে সবল করিয়াছেন, অত্যাচারীকে দমন করিয়া চিরশরণের আশ্রয়-পথ দেখাইয়াছেন। পতিত মানব-হৃদয়ে জ্ঞানের দ্যুতি অনুপ্রবেশ করাইয়া তাহার ভিতরে সত্য-শিব-সুন্দর করিয়াছেন।

জাতীয় ভাববর্জ্জনে বর্ত্তমান কৃষ্টির বিকল্প : বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে আমরা এই মহান্ জাতীয় আদর্শ বর্জ্জন করিয়া পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বর্জ্জনীয় অংশ গ্রহণে ধ্বংসের পথে চলিতেছি। ভরতের বৃত্তি 'জ্ঞানভারতী'র সর্জ্জন না করিয়াই বিসর্জ্জন করিতেছি। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান-সাধনায় আমাদের মস্তিষ্কের অতিবৃদ্ধি হইয়াছে ; কিন্তু সেই মস্তিষ্কের আশ্রয়, হৃদয় দুর্ব্বল হইয়া দিনে দিনে ক্ষীণ হইয়া আর সবল মস্তিষ্ককে বহন করিতে পারিতেছে না। বিজ্ঞানময় জড় মস্তিষ্ক যে অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে, ঠিক সেই অনুপাতে ইহার জ্ঞানময় অন্তরের আশ্রয় প্রাণময় জীবনীকোষ অতি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। হৃদয় শুকাইয়া মস্তিষ্ক বৃদ্ধি করিলে সেই মস্তিষ্কের ভার কোনরকমেই কৃশ দেহ বহন করিতে সক্ষম হইবে না—সাধারণ ভারেই মস্তক ভূলুণ্ঠিত হইবে। আমাদের জাতীয় শক্তিসাধনা এবং শিল্পকলার মধ্যে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা মিশ্রিত করিয়া শিল্পকলার নূতন বল্লালী কোলাজের গর্ব্বে জাতীয় জ্ঞান শক্তির সাধনাকে হারাইয়া ফেলিতেছি। জাতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানের শিল্পকলার মধ্যে এখন আর শাস্ত্রীয় চিন্ময়ী ভাবের প্রতীক প্রতিমার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সরস্বতী অর্চ্চনায় দেখিতেছি দেবীর মূর্ত্তিতে এক অদ্ভুত নিরাধার কল্পনার আস্ফালন। এইভাবে হৃদয় শুকাইয়া মস্তিষ্ক বৃদ্ধি করিলে আমাদের জাতীয় কৃষ্টির ক্ষীণ দেহ আর কত দিন অতিবর্দ্ধিত মস্তিষ্ককে বহন করিতে সক্ষম হইবে! হৃদয় বৃদ্ধি পাইলে মস্তিষ্ক আপনি বৃদ্ধি পাইবে—সেই মস্তিষ্কই জাতীয় শিল্পকলা, জ্ঞান বিজ্ঞানকে বহন করিতে সক্ষম হইবে। দেবী সরস্বতী জ্ঞান বিজ্ঞানের অষ্ট দশভুজ শক্তিই হৃদয় ও মস্তিষ্কের পুষ্টি করিবে। তেজস্বিনাবধীতমস্তু, তেজস্বি-জ্ঞানম্ অধীতম্ বর্দ্ধিতম্ অস্তু, এই আমাদের জ্ঞানের সাধনা হউক।

সেবাব্রত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন বসুরায়

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় একদা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, বাঙালী যুবক রাজনৈতিক কারণে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিতে শিখিয়াছে, কিন্তু সমাজসংস্কার-কার্য্যে বিধবা-বিবাহ করিতে লোক পাওয়া যায় না কেন? তদুত্তরে শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি—হুজুগের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেও ভীত হয় না, কিন্তু আজীবন সামাজিক নির্যাতন সহ্য করিতে অপরিসীম আত্মত্যাগ ও অবিচলিত সাহসের প্রয়োজন। মাতৃভূমির শৃঙ্খলমুক্তির জন্য যাঁহারা অম্লান বদনে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরিয়াছেন তাঁহারা জাতির নমস্য। কিন্তু যাঁহারা সমাজকে টানিয়া তুলিবার জন্য বিবেকবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া সমাজ-সংস্কার করিতে গিয়া জীবনভোর সমাজের অত্যাচার-অবিচার ও লাঞ্ছনা সহিয়াছেন, তাঁহাদের ত্যাগ নিষ্ঠা ও বীরত্ব অধিকতর প্রশংসনীয়। এই কার্য্যে দীর্ঘকাল একটি সত্য ও আদর্শকে একান্ত নিষ্ঠার সহিত বহন করিতে, চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে নিজের মত, বিশ্বাস ও সঙ্কল্পে অটল থাকিতে যে নৈতিক সাহস ও দৃঢ়তার আবশ্যক বাঙালীর চরিত্রে ক্রমশঃই যেন তাহা দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে।

অথচ সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে এই বাংলাদেশই শিক্ষা এবং সমাজ-সংস্কারে অগ্রণী হয়। রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও বিদ্যাসাগর এদেশে শিক্ষা ধর্ম্ম সমাজ-সংস্কারের পথিকৃৎ। সেবাব্রত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংস্কারক-প্রধানদেরই ঐতিহ্যবাহী প্রতিভাশালী সংস্কারকরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে পূর্ব্বগামীদের প্রদর্শিত পথে কেহ কেহ পদচারণা করিয়া থাকিলেও শশীপদবাবুর পরে আর কেহ সংস্কারকার্য্যে তাঁহার ন্যায় অনন্যসাধারণতা ও মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী কলিকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগরে এক কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকাল-প্রসিদ্ধ একজন দেশহিতৈষী ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। শৈশবে পিতৃহীন হইয়া অর্থাভাবে যদিও শশীপদকে প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্ব্বেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয় তথাপি আত্মচেষ্টার দ্বারা স্বগৃহে শিক্ষালাভ করিয়া অচিরে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করেন। সামান্য বেতনে শিক্ষকতার কর্ম্ম করিয়া প্রথম-জীবনে তাঁহাকে নিদারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে কালাতিপাত করিতে হয়। উত্তরকালে সরকারী উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত

থাকিয়া তিনি প্রভূত অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেন। সেকালের কুলীন ব্রাহ্মণ-সন্তানের পক্ষে অধিক বয়সে স্বয়ং কন্যানির্ব্বাচনপূর্ব্বক বিনাপণে বিবাহ করিয়া শশীপদ যৌবনারম্ভেই প্রচলিত সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে সেই যে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করিলেন, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তাহা দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিয়া ছিলেন- কোথাও অবনমিত হইতে দেন নাই। তাঁহার নিষ্কাম জনসেবার স্বীকৃতিস্বরূপ ভট্টপল্লীর পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে "সেবাব্রত" উপাধিতে ভূষিত করেন। স্বদেশে ও বিদেশে সম্মানিত হইয়া এই অক্লান্তকর্ম্মা জনহিতব্রতী মহাপুরুষ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

জনসেবায় উদ্বুদ্ধ হইয়া শশীপদ যে সকল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন তাহার অনেকগুলিই ভারতবর্ষে ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম। প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ আইনসিদ্ধ করিয়া গেলেন, তৎসত্ত্বেও সমাজে উহা আদৃত হইল না। বালবিধবার দুঃখে দয়ার-সাগর বিদ্যাসাগরের অন্তঃকরণ বিগলিত হইয়া করুণার যে নির্ঝরধারা প্রবাহিত হইল, হিন্দুসমাজের সংস্কারান্ধ গোঁড়ামির বালুচড়ায় রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রবাহ একরূপ শুষ্ক হইবারই উপক্রম হইল। এ অবস্থায় শশীপদ হিন্দু-বিধবার দুঃখ ও দুর্দ্দশামোচনে যে সংযত বুদ্ধি, দূরদর্শিতা ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিলেন আজ পর্য্যন্ত তাহাই বিধবার স্থায়ী কল্যাণের পথনির্দ্দেশক হইয়া আছে। বিধবাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিয়া ও তাহাদিগকে নানাবিধ শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা দিয়া আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তিনি "বিধবাশ্রম" স্থাপন করেন এবং প্রথমেই হিন্দু-সমাজের আচারনিষ্ঠা ও তথাকথিত ধর্ম্মবোধে আঘাত না করিয়া প্রাচীন হিন্দুপ্রথায় উহা পরিচালিত করিতে থাকেন। ভারতবর্ষে হিন্দু-বিধবাদের উন্নতিকল্পে উহাই সর্ব্বপ্রথম সাফল্যমণ্ডিত প্রচেষ্টা এবং পরবর্ত্তীকালে শশীপদর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়াই পশ্চিম-ভারতে পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের বিখ্যাত "সারদাসদন" প্রতিষ্ঠিত হয়। শশীপদকে তাঁহার সেবাকার্য্যে বিলাতের ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষে কুমারী কার্পেণ্টার এবং তাহার মৃত্যুর পর কুমারী ম্যানিং প্রভৃতি বিশেষ সাহায্য করেন।

ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত হইবার বহু পূর্ব্বেই শশীপদ শ্রমিক-কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, বিদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শ্রমিকেরা কেবল যে শোষিত হইতেছে তাহাই নহে, তাহাদের মধ্যে পানদোষ বিস্তারলাভ করিয়া দ্রুত নৈতিক অবনতি ঘটাইতেছে। তাই তিনি শ্রমিকগণের অর্থনৈতিক, চারিত্রিক, স্বাস্থ্যগত ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ উন্নতির ব্যবস্থা করিলেন। শ্রমিক-কল্যাণে তাঁহার ক্রিয়াকলাপ বর্ত্তমান ট্রেড ইউনিয়নগুলির ক্রিয়াকলাপ অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক ছিল এবং বর্ত্তমানের ন্যায় শ্রমিক আন্দোলনকে ব্যক্তি ও দলবিশেষের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির হাতিয়ারস্বরূপ ব্যবহার না করিয়া তিনি যথার্থ মানবসেবায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই তাঁহার বিপুল কর্ম্মক্ষমতা শ্রমজীবীদের কল্যাণে নিয়োজিত করেন। সেকালে একজন বাঙালী যুবক যে এইরূপ সুপরিকল্পিত উপায়ে শ্রমিকগণকে সংগঠিত করিয়াছিলেন ইহা গভীর বিস্ময়ের উদ্রেক করিবে।

এদেশে সরকারী ডাকবিভাগীয় সেভিংস্ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই শশীপদ শ্রমজীবীদের সঞ্চয়প্রবৃত্তি ও মিতব্যয়িতা শিক্ষা দিবার জন্য "আনা ব্যাঙ্ক" স্থাপন করেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের শ্রমিক সম্প্রদায়ের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ইংলণ্ডে গিয়া তিনি ভারতবর্ষে "ফ্যাক্টরী আইন" প্রবর্ত্তনের জন্য আন্দোলন করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "ভারত শ্রমজীবী" নামে ৮ পৃষ্ঠার একখানি সচিত্র শিক্ষামূলক মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে দাবি উপস্থিত করিবার চেষ্টা হইত। "ভারত শ্রমজীবী" প্রতি মাসে পনর সহস্র কপি মুদ্রিত হইয়া প্রতি সংখ্যা এক পয়সা মূল্যে বিক্রয় হইত। তখনকার দেশব্যাপী বিশেষতঃ অনুন্নত শ্রেণীর ব্যাপক নিরক্ষরতার মধ্যে, বাংলা ভাষায় মাসিকপত্র প্রচলনের সেই প্রথম যুগে "ভারত শ্রমজীবী"র প্রচারসংখ্যা হইতেই শ্রমিকগণের মধ্যে উহার জনপ্রিয়তা অনুমান করা যায়। "ভারত শ্রমজীবী" মাসিকপত্রে প্রকাশিত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর একটি কবিতা হইতে দুইটি স্তবক নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :

"ওঠ, জাগো, শ্রমজীবী ভাই
উপস্থিত যুগান্তর
চলোচল নারীনর
ঘুমাবার বেলা আর নাই
ওঠ, জাগো, ডাকিতেছি তাই।

* * *

সমাজের মূল তোরা ভাই
এ দেশেতে করা হলো
মূল দিয়া পর চলে
মাথা দিলে তাতে লাভ নাই
দেখা ছিল রহিবে কোথাই।"

শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ সংস্কারের প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল তিনি স্বয়ং দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া অপরকে শিক্ষা দিতেন। 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়'—এই মহাজন-

বাক্য তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। শশীপদ স্বয়ং বিধবা-বিবাহ করিলেন ও স্বীয় বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়া স্বগৃহে উহার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন। বয়স্কা কুলবধূ ও বিধবাদের জন্য যে বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন তাহার প্রথম ছাত্রীই হইলেন শশীপদর স্ত্রী ও তাঁহার বিধবা ভ্রাতৃ-জায়া। সমগ্র দেশের বিদ্রূপ ও রোষ-কষায়িত ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এদেশে সর্ব্বপ্রথম সস্ত্রীক বিলাত যাত্রা করেন। মাদকতা নিবারণী আন্দোলন করিতে হইবে তাই নিজে সমস্ত মাদকদ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ এইরূপ ভাবে পরিত্যাগ করিলেন যে, শেষজীবনে একবার রোগাক্রান্ত হইলে চিকিৎসক যখন তাঁহাকে ঔষধ হিসাবে কিঞ্চিৎ অহিফেন সেবনের পরামর্শ দিলেন তখনও তিনি তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "No, doctor, I cannot die an opium-eater." শ্রমিক-কল্যাণে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন তাই কখনও পীড়িত শ্রমিকের রোগশয্যায় বসিয়া অতন্দ্র রজনী যাপন করিতেছেন, আবার কখনও-বা কারখানায় কর্ম্মনিরত শ্রমিক শ্রেণীর পরিত্যক্ত ক্রন্দনরত শিশুপুত্রটিকে ক্রোড়ে তুলিয়া বসিয়া আছেন—যাহাদের সেবা করিতে হইবে প্রথমেই তাহাদের হৃদয় জয় করিতে হইবে।

জনসেবা শশীপদর জীবনব্রত ছিল। সমগ্র জীবনব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন ও নিরলস কর্ম্মশীলতার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আজিকার কর্ম্মবাহুল্যের দিনেও সুলভ নহে। হিন্দু বিধবার কল্যাণসাধনে তিনি যে হৃদয়বত্তা ও দূরদর্শিতা, মাদকতা নিবারণে যে পৌরুষ ও তেজস্বিতা, শ্রমজীবীদের সেবায় যে অপরিমেয় ত্যাগ ও শ্রমশীলতার পরিচয় দেন তাহার যে কোন একটির দ্বারাই শশীপদর 'সেবাব্রত' নাম সার্থক হইত, কিন্তু বহুমুখী কর্ম্ম-প্রযত্নের দ্বারা তিনি অনন্যসাধারণ কর্ম্মবীরের গৌরবমণ্ডিত উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। অনেক প্রতিষ্ঠানই পাশ্চাত্যের উন্নততর সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থার আদর্শে প্রভাবিত হইলেও তাঁহার কর্ম্মপ্রণালী পাশ্চাত্ত্য-পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণে কোথাও ক্লিষ্ট হয় নাই, কৃত্রিমতায় কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে নাই।

শশীপদর স্বার্থলেশশূন্য নিরাসক্ত কর্ম্মসাধনার উৎস ছিল ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধকের ভক্তিরসস্নিগ্ধ নিগূঢ় অধ্যাত্মজীবন। তাঁহার চরিত্রে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মবুদ্ধির সহিত পাশ্চাত্ত্যের বলিষ্ঠ কর্ম্ম-বুদ্ধির অভূতপূর্ব্ব সমাবেশ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। শশীপদর সমুদয় সদনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সর্ব্বজনীন প্রেম ও মানবহিতৈষণার যে সার্ব্বভৌম আদর্শ প্রকটিত হইয়াছে, সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষবিক্ষুব্ধ বিশ্বে মানবের আত্মিক কল্যাণে তাহা সমভাবে নিয়োজিত হইয়াছিল। যেকালে বরাহনগরের অনতিদূরে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির স্বপ্নাদিষ্ট ভবতারিণীর মন্দিরে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ লোকশিক্ষার জন্য সাধকভাবে "যত মত তত পথ" এর পরীক্ষা চালাইতেছিলেন তৎকালে শশীপদও মানবপ্রেমের উদার ভিত্তির উপর "সাধারণ ধর্ম্মসভা" স্থাপন করিয়া ধর্ম্মসমন্বয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে-ছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'সাধারণ ধর্ম্মসভা'য় যে মহতী সম্ভাবনার বীজ উপ্ত হইয়াছিল তাহাই ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে "দেবালয়ে" অঙ্কুরিত হইয়া বিরোধবিক্ষুব্ধ মানবকে মৈত্রী ও সৌভ্রাতৃত্বের এক মহাতীর্থে আহ্বান করিয়া লইল। সেদিন শশীপদর সর্ব্বতঃপ্রসারিত হৃদয় 'দেবালয়ে'র উদার প্রশস্ত অঙ্গনে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বিশ্বমানবের জন্য আসন পাতিয়া দিয়া

ভ্রম-সংশোধন

প্রবাসী, পৌষ ১৩৫০ :

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	ছবির নাম—হইবে না	ছবির নাম—হইবে
[illegible]	১	গুপ্তকাশীর সাধারণ দৃশ্য	অগস্ত্যমুনির দৃশ্য, গুপ্তকাশী
"	২	বিশ্বেশ্বর মন্দির, গুপ্তকাশী	সাধারণ দৃশ্য, গুপ্তকাশী
[illegible]	২	অগস্ত্যমুনির মন্দির	বিশ্বেশ্বরের মন্দির, গুপ্তকাশী

কুটীরশিল্পে যন্ত্রের স্থান

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

যন্ত্র ও কায়িক শ্রমের দ্বন্দ্ব লইয়া আলোচনা যন্ত্রের আবির্ভাবের কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; ইহার আজও মীমাংসা হয় নাই, কোনও কালে হইবে কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। যেভাবে যন্ত্রের প্রসার বাড়িয়া যাইতেছে, দিনে দিনে বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত মানুষের সৃষ্টিপ্রতিভা অপরূপ আকারে প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে ইহার শেষ কোথায় তাহার সীমা নির্দ্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নহে।

যন্ত্র চাই, কারণ বহুশতসহস্রাপেক্ষা বিপুল মনুষ্যশক্তির দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সহজ নয়, অথচ আধুনিক সভ্যযুগে ইহার অধিকাংশই না হইলে জীবনযাত্রা অচল। এতদবস্থায় যন্ত্র বর্জ্জন করিয়া আদিম মানব পর্য্যায়ে ফিরিয়া যাইবার কথা চিন্তা করা যায় না।

আবার এমন কতকগুলি কাজ আছে, যন্ত্রের সাহায্য অপেক্ষা মানুষের হাত-পা যাহা সম্পাদনে অধিক যোগ্যতা-সম্পন্ন। যন্ত্র তখন কেবল বাহুল্যমাত্র, অচল বলিলে অত্যুক্তি হয় না, সেখানে কায়িক শ্রম বাদ দিয়া যন্ত্রের প্রচলনের প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু যে দেশে লোকসংখ্যা কম, অথচ উপার্জ্জনের ক্ষেত্র অনেক, প্রচুর শ্রমের কাজে লোকের অভাব, সেখানে ক্রমেই যন্ত্রের আবির্ভাব হইতেছে এবং মানুষের শ্রমের উপর নির্ভরতা হ্রাস পাইতেছে।

সমস্ত দেশে যেখানে কায়িক শ্রমে বহু লোক জীবিকা অর্জ্জন করে, অথচ যন্ত্রসাহায্যে উৎপাদন তৎপরতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইয়া থাকে। সেই উৎপাদিত পণ্য আবার যদি দরিদ্রের মধ্যে বেশী ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে মূল্য হ্রাস পাওয়ায় বহু লোকের উপকার হয়। এখন একটা বড় প্রশ্ন, লোকের আহারের পথ নষ্ট করা ও তাহাদেরই মধ্যে সস্তায় মাল বিক্রয় দ্বারা ব্যয় হ্রাস করা, এই দুইটির মধ্যে কোনটি অধিক বাঞ্ছনীয়। অবশ্য একথা সহজেই অনুমান করা যায়, যত লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহা অপেক্ষা উপকার হইবে সংখ্যায় ঢের বেশী লোকের। তবে এক শ্রেণীর মুখের অন্ন নষ্ট হইতেছে, অপরের পক্ষে ঠিক তাহা নহে, সংসারযাত্রার ব্যয় কিছু বাড়িতেছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে এই বর্দ্ধিত ব্যয়ের স্বতন্ত্র হিসাব যোগ দিলে পরিমাণ বেশ মোটা হইয়া দাঁড়ায়।

ভারতবর্ষে এই দ্বন্দ্বের মীমাংসার বিরাট পরীক্ষা হইতেছে। কোনও দেশ এই নীতি অবলম্বন করে নাই বলা যায় না। তবে অধিকাংশ দেশেই বড় বা ছোট শিল্প স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হয়; আর না হয় ছোট শিল্প বৃহদাকার শিল্পের কতকগুলি উপাদান উৎপাদন করিয়া পরিপূরক হিসাবে কাজ করিতেছে। ভারতবর্ষে যেখানে ক্ষুদ্র-বৃহৎ শিল্পের দ্বন্দ্ব সেখানে বড় শিল্পের নিকট অর্থ আদায় করিয়া উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে ক্ষুদ্র শিল্পকে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

কাপড় ও তেলের কল, তাঁত ও ঘানি বাঁচাইবার জন্য নূতন করিয়া সেস্ দিতেছে। কি ভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করিলে ছোট বড় দুই শিল্পই বাঁচিতে পারে, ইহা তাহারই পরীক্ষা।

সম্প্রতি আবার এক নূতন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়া সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে। কেন্দ্রীয় শিল্প-বাণিজ্য-সচিব বলিয়াছেন, তিনি বিড়ি তৈয়ার করিবার জন্য কলের বিরোধিতা করিবেন। এদিকে বিড়ি তৈয়ারের কল নির্ম্মাণের কারখানা সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং কল তৈয়ার হইয়া শীঘ্রই আসরে নামিবে।

বিড়ি তৈয়ারীর মাত্র কয়েকটি বড় কারখানা আছে, ছোট আরও অনেকগুলি। বাকী সবই হাতে তৈয়ারী করা হয় এবং এই কারিগরদের মধ্যে স্ত্রীলোকের একটা বড় অংশ আছে। অন্ততঃ দুই লক্ষ লোক সারা বৎসর এবং তিন লক্ষ সাময়িকভাবে বিড়ির সাহায্যে উপজীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই ও মাদ্রাজে প্রত্যেকটিতে লক্ষাধিক, পশ্চিম বাংলায় ৭২,০০০, বিহারে ৪৮,০০০ ও ভারতের অপরাপর অঞ্চলে ১,২০,০০০; সমস্ত মিলিয়া ছয় লক্ষ কারিগর আছে। সঠিক সংবাদ জানা নাই, বৎসরে আন্দাজ ১২,৭০০ কোটি বিড়ি প্রস্তুত হয়, এবং ইহার মূল্য ৬৩ কোটি টাকা।

বোম্বাই ও বারাণসীতে একটি করিয়া বিড়ির কল তৈয়ারি হইয়াছে। ইহা বর্ত্তমান অবস্থায় প্রতি ঘণ্টায় ১৫ হইতে ২০ হাজার বিড়ি প্রস্তুত করিতে পারিবে। যন্ত্রের উন্নতির আরও সম্ভাবনা আছে; তাহা হইলে উৎপাদন পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইতে পারিবে।

এরূপ যন্ত্রের প্রসার হইতে দেওয়া উচিত কিনা, তাহাই বিবেচনার বিষয়। যদি যন্ত্র চালু হয়, বিশেষতঃ মানুষের কায়িক শ্রম চলে, তাহা হইলে ৭৫,০০০ হইতে ১,০০,০০০ লোক কাজ পাইতে পারে। বাকি সকলে অন্ততঃ নূতন পথ না পাওয়া পর্য্যন্ত অত্যন্ত কষ্টে পড়িবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এ শ্রেণীর যন্ত্র নির্ম্মাণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা যায় কিনা

তাহাও ভাবিয়া দেখা দরকার। লোকের ক্লেশ কমে, কার্য্য দ্রুত উদ্ধার হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস পায়, ইহাই যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিবার পক্ষে বড় যুক্তি। বিড়ি তৈয়ারিতে প্রত্যক্ষভাবে কারিগরের ক্লেশ খুব বেশী না হইলেও দিনের পর দিন একই অবস্থায় শ্রমের একটা ক্লান্তি আছে, বিরক্তি আছে। বিড়ির কল হাতে পায়ে অর্থাৎ কায়িক শ্রমে চালাইতেও ক্লেশ আছে, কিন্তু উপার্জন বেশী হওয়ার সম্ভাবনা। ফলে তৈয়ারি বিড়িতে যতটা দাম কমিবে, তাহাতে ক্রেতার মোট লাভ যদি উপেক্ষণীয় হয়, তাহা হইলে যন্ত্রের খুব বেশী সমর্থন পাওয়া যায় না। হাতে তৈয়ারি বিড়ি যদি সকল সময়েই বাজারে পাওয়া যায়, বাজারে কখনও অভাব না থাকে, তাহা হইলে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টায় বিশেষ লাভ নাই।

কাপাস বা তেল কলের সহিত বিড়ির কলের তুলনা করা যায় না। বিড়ির এই শ্রেণীর শিল্প স্বতন্ত্রভাবে বিবেচিত হইবার দাবি করিতে পারে। তবে ছোটখাট যন্ত্র চাই, জীবনে তাহাতে একটু স্বস্তি ও সময় লাভের সুযোগ ঘটিতে পারে, আর তাছাড়া যেখানে চাহিদা আছে, সেখানে যন্ত্র-সাহায্যে উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া উপজীবিকার সংস্থান হইবে। তবে এ কথাও ঠিক, যন্ত্র বহুর মধ্যে অভাব ও অশান্তি সৃষ্টির বীজ পোষণ করে।

বর্ত্তমানে আর সেলাইকলের বিপক্ষে কোনও মত আছে বলিয়া শোনা যায় না। যাহারা অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে, তাহারা একটা কল সংগ্রহ করিয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ইহা বিলাসের বস্তু; কিন্তু যে সকল বিভিন্নক্ষেত্রে সেলাইকল ব্যবহৃত হয়, তাহাতে মনে হয় যে, ইহা সাধারণের নিকট বিজ্ঞানের একটা বিশেষ দান।

এখন যদি নারিকেল-ছোবড়া হইতে দড়ি তৈয়ারির উপযোগী তন্তু উদ্ধার করিবার যন্ত্র পাওয়া যায়, তাহা সাদরে গ্রহণ করা উচিত। কারণ ইহাতে মানুষের অত্যধিক কায়িক পরিশ্রম হয় এবং যন্ত্রের সাহায্য পাইলে আয় বেশী হইবার সম্ভাবনা। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, প্রথমে কয়েক-শত শ্রমিকের উপার্জনের পথ রুদ্ধ হইবে।

প্রতিটি যন্ত্র সম্বন্ধে বিচার করিবার নানা দিক আছে। যে সকল ক্ষেত্রে যন্ত্রের সাহায্য না পাইলে শিল্প রক্ষা পায় না, এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দিনে দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অথবা কায়িক শ্রম, যন্ত্রের অপটুতার ফলে ব্যবহৃত কাঁচা মাল হইতে সমস্ত "শাঁস" উদ্ধার করা যায় না, অর্থাৎ, অনেকটা মূল্যবান বস্তু পরিত্যক্ত মালের সহিত থাকিয়া যায়, সেরূপ ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে উন্নততর যন্ত্রের প্রসার বৃদ্ধি না পাইলে কেবল যে উৎপাদন-ব্যয় বেশী পড়ে তাহা নহে, প্রতিনিয়ত বহুলপরিমাণ জাতীয় সম্পদের অপচয় হইয়া থাকে। বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশন ব্যাপারে প্রশ্নটা বড় করিয়া মনে পড়ে। ভারতবর্ষে প্রয়োজনের তুলনায় স্নেহপদার্থের অভাব আছে এবং সেই কারণেই তৈলবীজ রপ্তানি বন্ধ ছিল; এখন সামান্য পরিমাণ রপ্তানির অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে। যদি ঘানিতে তৈল নিষ্কাশিত হয়, তাহা হইলে খইলে শতকরা তিন হইতে পাঁচ ভাগ তৈল থাকিয়া যায়। অর্থাৎ, ভারতে উৎপাদনের মোট পরিমাণ অনেকখানি নষ্ট হয়। অবশ্য ইহা খইলে থাকিলে গবাদি পশুর অধিকতর পুষ্টিসাধনের কথা, এমনকি সার হিসাবেও অধিকতর মূল্যবান। কিন্তু যেখানে মানুষের প্রয়োজন বেশী এবং পশুখাদ্য ও জমির সারের অভাব অন্য পরিবর্ত্ত দ্রব্যাদির দ্বারা মিটাইতে পারা যাইতে পারে, সেখানে একটা বিরাট পরিমাণ তেল খইলে রাখিয়া দেওয়া হয়ত যুক্তি-যুক্ত নয়। তবে ইহার পিছনে ঘানিচালক কলুর উপজীবিকার কথা আছে, এবং তাহাই কলের ঘানির বিরুদ্ধে প্রথম সত্ত বলিয়া আলোচনা শুরু করা হইয়াছে। এখানে যে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিয়ন্ত্রণের কথা উঠিয়াছে তাহা সর্ব্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া কোন্ পন্থা গ্রহণ করা সমীচীন তাহার বিচার করা যাইতে পারে।

কোনও না-কোনও প্রকার যন্ত্র নিশ্চয়ই প্রয়োজন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। যে যুগে হাতের তকলি এবং পরে চরকা আবিষ্কৃত হয়, এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে তাহা সে যুগের অত্যন্ত কর্ম্মকুশল যন্ত্র; কেবল সে যুগের নয়, তাহা আজও বিস্ময় সৃষ্টি করে, এবং আবিষ্কর্ত্তার কৃতিত্ব স্মরণ করিলে স্বতঃই মস্তক নত হইয়া আসে। কায়িক শ্রম, সামান্য যন্ত্র ও আধুনিক যন্ত্র-পাতি, পরস্পরের সীমারেখা কোথায় নির্দ্ধারিত হইবে, তাহার মীমাংসা সহজ নহে, এবং সেই কারণেই ভারতবর্ষ হাতড়াইয়া পথ পাইতেছে না। হয়ত এখানকার সিদ্ধান্তের উপর জগতের কল্যাণ-অকল্যাণ বহুলাংশে নির্ভর করিবে।

যাহা লইয়া বিচার, তাহার মূল উদ্দেশ্য জনকল্যাণ স্বাস্থ্য, সুখ, শান্তি, বিশ্রাম, আনন্দ লইয়া প্রত্যেকটি মানুষ যাহাতে অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তি প্রকাশের পূর্ণ সুযোগ পায়, তাহাই এই যন্ত্রঘটিত বিচারের মীমাংসার পথ বলিয়া দিতে পারে। যে সকল কার্য্যে মানুষের কায়িক শ্রমই পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে হয় অথবা যন্ত্র যেখানে অচল, সেখানে মানুষই খাটিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, চারুশিল্পকলা সৃষ্টির আনন্দে তৃপ্তিলাভ করিবে, জগতে মানুষের অদ্ভুত সৃজনী-শক্তির পরিচয় রাখিবে। আর যেখানে মানুষের শক্তিদ্বারা কার্য্যোদ্ধার সম্ভব নহে, সেখানে দানবই হউক আর দেবতাই হউক, যন্ত্র ব্যবহার চলিতে থাকিবে।

যাহা মানুষের শ্রমে চলে, অথচ কেবল সেই কারণেই উৎপাদিত পণ্যের মূল্য অতিরিক্ত বৃদ্ধি করে না, সেখানে যন্ত্রের প্রসার হইতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। সেই হিসাবে বলিতে হয়, কেবল কায়িক শ্রমের সমর্থনে যদি উৎপাদিত পণ্যের মূল্য সর্ব্বকালে উপেক্ষা করিয়া চলিতে হয়, তাহাতে কায়িক শ্রমের উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করিয়া ক্রেতা-সাধারণের ক্ষতিসাধন করা হয় এবং তাহা সমাজের আর্থিক কল্যাণের পরিপন্থী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। যেখানে দরের পার্থক্য সামান্য সেখানে যন্ত্রে বেশী উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিলে অশুভ অপেক্ষা শুভই হইবে সন্দেহ নাই।

এ ব্যবস্থার নজির কেবল আমাদের দেশে নহে, শ্বেতকায় সভ্যজাতির মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ হইতে নারিকেল পেটাই ছোবড়া, নারিকেল দড়ি ও দড়িজাত পাপোষ, ম্যাটিং প্রভৃতি নানা দ্রব্য রপ্তানি হইয়া থাকে। ইউরোপের নানা দেশই এই সকল বিভিন্ন দ্রব্যের ক্রেতা; অবশ্য, প্রয়োজন ও রুচিভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেশ বিবিধ পণ্য ক্রয় করিয়া থাকে। হল্যাণ্ড দড়ি বা ম্যাটিং লয় না। শুল্ক চড়া বাখিয়া আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। কিন্তু তাহারা প্রচুর পেটাই ছোবড়া বস্তু ক্রয় করে। তাহারা বলে, বৃদ্ধা অথবা যুদ্ধে আহত সৈনিক দ্বারা দেশের প্রয়োজনীয় বস্তু তৈয়ারি করাইয়া লওয়া যায়। একেবারে প্রস্তুত মাল ভারতবর্ষ হইতে আমদানী করিলে দর কিছু সস্তা পড়ে, কিন্তু তাহা উপেক্ষা করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করা হয়।

অনুরূপ মান নির্ণয় করিয়া যন্ত্রের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা বাঞ্ছনীয়। যন্ত্র কায়িক শ্রমের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বলিয়াই উহার ব্যবহার বন্ধ করিতে হইবে অথবা চিরকাল উহার উপর কর ধার্য্য করিয়া কুটীরশিল্প বা মানুষের শ্রমের সহায়তা করিতে হইবে, এরূপ বিচার অত্যন্ত ভ্রমাত্মক এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহা দেশের অর্থনৈতিক সংস্থার উপর প্রচণ্ড আঘাত দেওয়ার সম্ভাবনা। সর্ব্বদাই যদি বেশী দরে নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হয়, তাহা হইলে সাধারণ দরিদ্র দেশে কুফল দেখা দেয়। বড় যন্ত্রের যখন প্রশ্ন নাই, তখন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র যন্ত্রের উপর সেস্ প্রভৃতি বসাইবার সময় সকল দিক বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। বৃহত্তের কল্যাণ বা স্বার্থ উপেক্ষা করিলে মোটের উপর দেশের ক্ষতি হইবে বলিয়া বিশ্বাস।

যেখানে লোকসংখ্যা কম, শ্রমিকের প্রতি ব্যয় অত্যধিক এবং প্রয়োজনের সময় তাহা দুষ্প্রাপ্য সে সকল দেশে যন্ত্রের যত প্রসার হওয়া বাঞ্ছনীয়, জনবহুল ও কর্ম্মহীন শ্রমিকের দেশে তাহা প্রযোজ্য নহে।

এ সকলের সহিত যাহাতে কুটীরশিল্পে পণ্য উৎপাদনে অধুনা প্রচলিত রীতি পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সাধন করা যায়, তাহা বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন। এখন যে চরকা চলে, তাহার অন্ততঃ দ্বিগুণ বা তিনগুণ সূত উৎপাদনকারী চরকা আবিষ্কৃত না হইলে কলের সূতার উপর দেশী তাঁতকে নির্ভর করিয়া চলিতেই হইবে। হাতে চালিত মাকু অপেক্ষা ঠকঠকি তাঁত অনেক বেশী কার্য্যকরী। কিন্তু ইহা অপেক্ষা স্বয়ংক্রিয় তাঁতের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ অবস্থায় যে কয়জন তাঁতি বেকার হইবে, তাহাদের অপর কর্ম্মক্ষেত্র দেখিয়া লইতে হইবে, অথবা নূতনতর তাঁত চালনায় জীবিকার্জ্জন করিতে পারিবে। দেশে তৈল ও স্নেহপদার্থের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে তেলকলের উপর কঠোরতর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা সমীচীন হইবে কিন্তু সেই সঙ্গে বর্ত্তমান ঘানির উন্নতিসাধন করিতে না পারিলে তাহাকে অস্বাভাবিকভাবে বাঁচাইবার চেষ্টা কিছুদিন সফল হইতে পারে, চিরকালের জন্য নহে। যন্ত্রমাত্রেই দেশের শত্রু মনে না করিয়া যেমন করিয়া রক্ষণশুল্ক প্রয়োগ করিবার সময় ট্যারিফ কমিশন কাজ করে, সেইভাবে প্রত্যেকটি শিল্প সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত সমাপনান্তে নূতন করিয়া সেস্ প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করা বিধেয়।

শেষ পাতা

ও' হেন্‌রী

অনুবাদক : শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়
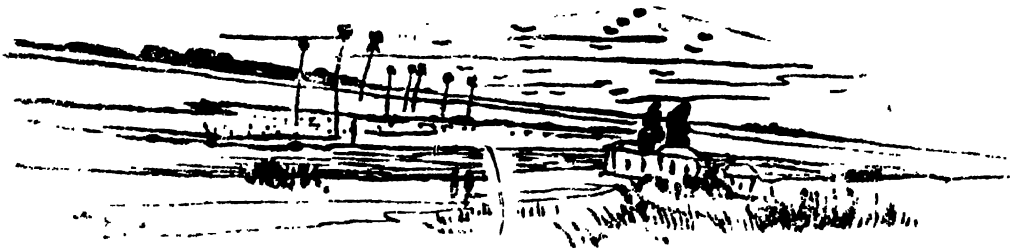
ওয়াশিংটন স্কোয়ারের পশ্চিমে এক জায়গায় এসে রাস্তাগুলো এলোমেলো ভাবে কতগুলো পাড়ায় ঢুকে গেছে। পল্লী-গুলোতেও অনেক বিচিত্র বাঁক, অনেক মোড়—একটি রাস্তাই হয়ত বারকয়েক করে পাক খেয়ে গেছে। এই রাস্তাতেই একজন চিত্রকর এক দিন অনেক লাভের সম্ভাবনা আবিষ্কার করেছিল। সে পেন্ট, কাগজ আর ক্যাম্বিসের দাম আদায় করতে গিয়ে পয়সা না পেয়ে এই রাস্তা দিয়েই ফিরে আসছিল।

তার পরেই প্রাচীন গ্রীনউইচ গ্রামখানিতে দলে দলে চিত্রকর এসে ভিড় করল—কেউ উত্তরমুখো জানলা, কেউ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর ত্রিভুজ চূড়াবিশিষ্ট বাড়ী কিংবা ওলন্দাজ চালের দালান আর সস্তা ভাড়ার লোভে। এর পর, তারা ষষ্ঠ এভেনিউ থেকে দু'একটা করে চুল্লী আর কলাইয়ের বাসন আমদানী করে স্থানটিকে একটি উপনিবেশে পরিণত করল।

নীচু তেতলা একটি ইটের বাড়ীর উপরতলায় সু আর জন্‌সীর চিত্রাগার ছিল। জন্‌সী আবার জোয়ান্না নামেই বেশী পরিচিত। একজন এসেছিল 'মেইন' থেকে, অন্য জনের বাড়ী ক্যালিফোর্ণিয়ায়। অষ্টম রাজপথের 'ডেলমোনিকো' হোটেলে দু'জনে দেখা হয়, আহারে, বসনে এবং চিত্রকলার রুচিতে দুজনেই পরস্পরের মধ্যে এতটা সাদৃশ্য দেখল যে তার ফলেই ওদের এই যৌথ চিত্রকেন্দ্রের সৃষ্টি হয়েছে।

এ গেল মে মাসের ঘটনা। নভেম্বর মাসে একটি অদৃশ্য শীতল আগন্তুক, ডাক্তারেরা যাকে নিউমোনিয়া বলে, এই উপনিবেশের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতে লাগল এবং এখানে সেখানে দু'এক জনকে তার আঙুলের হিমস্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে গেল। পূবদিকে ত এই সর্ব্বনাশা শত্রু বিপুল বিক্রমে এক সঙ্গে দশ-বিশ জনকে ঘায়েল করতে লাগল, কিন্তু পল্লীর দামভরা সরু অলিগলিতে তার গতি মন্থর হয়ে গেল।

নিউমোনিয়া মশায় বুড়ো হলেও তাকে বীরপুরুষ বলা যায় না। ক্যালিফোর্ণিয়ার পশ্চিমা হাওয়ায় যার রক্ত পাতলা হয়ে গেছে এমন একটি সামান্য নারীর প্রতি এই রক্তমুষ্টি, হেঁপো বুড়োর আঘাত মোটেই বীরোচিত নয়। কিন্তু তবু সে জন্‌সীকে আক্রমণ করল। বেচারি কি আর করে! রং-করা লোহার খাটে স্থির হয়ে শুয়ে থাকে আর ওলন্দাজ চালের ছোট জানলার ভেতর দিয়ে চেয়ে থাকে সামনের বাড়ীর ন্যাড়া দেয়ালের দিকে।

এক দিন সকালে ব্যস্ত ডাক্তারটি লোমবহুল পাকা ভ্রূ কুঁচকে সু-কে হলের দরজার কাছে ডাকলেন। তারপর থার্ম্মোমিটারের পারা নামাতে নামাতে বললেন, দশের মধ্যে ওর ওর একভাগ আশা আছে আর তাও নির্ভর করে ওর বাঁচবার ইচ্ছার উপর। লোকে যদি এভাবে আগে থেকেই গোরের দিকে পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে যায়, ভেষজশাস্ত্রের তা হলে আর কোন উপায়ই থাকে না। তোমার বন্ধুটি মনে মনে স্থির করে ফেলেছে সে আর ভাল হচ্ছে না। ওর মনের ভেতর আর কিছু নেই ত?

ও, ও একবার নেপলসের বাঁকা সমুদ্রতীর আঁকবার ইচ্ছা জানিয়েছিল—সু বললে।

ছবি? বাজে কথা। সত্যি চিন্তা করার মত আর কিছু আছে, ধর কোন পুরুষ?

পুরুষ!—কণ্ঠে তারের ঝঙ্কার তুলে সু বললে, কোন পুরুষ কি সত্যি চিন্তার যোগ্য,—না ডাক্তারবাবু, তেমন কিছু নেই ওর মনে।

'ভাল কথা, তা হলে দুর্ব্বলতাই হবে' ডাক্তার বললেন, 'আমার চেষ্টায় বিজ্ঞানের দ্বারা যতটা সম্ভব সবই করব। তবে যখনই আমার রোগী তার শবযাত্রায় গাড়ীর সংখ্যা গুনতে সুরু করে দেয়, তখনই আমি ওষুধের আরোগ্যকারিতার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বাদ দিয়ে রাখি। তুমি যদি ওকে ওভারকোটের শীতকালীন ষ্টাইলের একটি প্রশ্নও জিজ্ঞেস করতে পার, আমি তোমাকে দশের জায়গায় পাঁচের মধ্যে এক ভাগ আশার প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।'

ডাক্তার চলে গেলে, সু ভেতর ঘরে গিয়ে কেঁদে কেঁদে একটি জাপানী রুমাল ভিজিয়ে কাদা করে ফেলল। তার পর হাতে ছবির সরঞ্জাম নিয়ে এলোমেলো সুরে শিস্‌ দিতে দিতে সে জন্‌সীর ঘরে এসে ঢুকল।

জন্‌সী শুয়ে আছে—চাদরের তলায় তার দেহ স্পন্দনহীন, মুখ জানলার দিকে। সে ঘুমিয়ে আছে ভেবে শিস্‌ থামিয়ে কেবল কালি-কলমের সাহায্যে সু একটি পত্রিকার গল্পের জন্য ছবি আঁকতে লাগল। সাহিত্যের প্রবেশপথ সুগম করতে তরুণ লেখকেরা যেমন পত্রিকার মারফত হাতে-খড়ি করে; অঙ্কনের ব্যাপারে নবীন চিত্রকরদেরও তেমনি পত্রিকার গল্পের জন্য ছবি আঁকতেই হবে।

সু ইডাহো-দেশীয় একটি যুবককে ঘোড়সওয়ারের সুন্দর

পোশাকে সাজিয়ে তার এক চোখে একটি চশমা এঁকেছে, এমন সময় সে একটা চাপা শব্দ শুনল—শব্দটি উপর্য্যুপরি ক'বার শোনা গেল। সে তাড়াতাড়ি বিছানার কাছে সরে এল।

জন্সী বিস্ফারিত চোখে জানলার বাইরে তাকিয়ে শুনছে—গুনছে উল্টো দিক থেকে।

বারো—সে বললে, একটু পরেই এগারো; তার পরে দশ এবং নয়; আট এবং সাত, সে প্রায় একসঙ্গে গুনলে।

উৎসুক হয়ে সু জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল, গোনবার মত কিছুই দেখা গেল না। দেখা যায় কেবল একটি শূন্য, নিরানন্দ আঙিনা আর প্রায় বিশ ফুট দূরে একটি ইটের বাড়ীর বদ্ধ দিকটা। খুব পুরনো একটি আইভি-লতা সেই ইটের দেয়াল বেয়ে প্রায় মাঝপথ পর্য্যন্ত উঠে গেছে—লতার গোড়ার দিকটা জীর্ণ হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে।

হেমন্তের শীতল নিঃশ্বাসে লতার পাতা ঝরে গেছে, কেবল কঙ্কালসদৃশ ডালপালাগুলো ভাঙা ইটগুলোকে আঁকড়ে ধরে আছে প্রাণপণে।

কি গুনছ ভাই? সু জিজ্ঞেস করল।

ছয়—জন্সী প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বললে, এবার ওগুলো খুব তাড়াতাড়ি পড়ছে। তিন দিন আগেও প্রায় একশ' ছিল, গুনতে গুনতে আমার মাথা ধরে উঠত। এখন কিন্তু অনেক সহজ হয়ে এসেছে। ঐ—আর একটা গেল; আর মাত্র পাঁচটা রইল।

পাঁচটা কি ভাই—বল তোমার সুডিকে?

পাতা—ঐ আইভি লতার ওপর। শেষ পাতাটি ঝরে গেলে আমিও যাব। আমি তিন দিন থেকেই তা বুঝতে পারছি। ডাক্তারবাবু তোমায় বলেন নি?

'এমন কথাও শুনি নি কখনো'—ব্যঙ্গভরে সু অনুযোগ করলে—'তোমার ভাল হবার সঙ্গে শুকনো আইভি-পাতার কি যোগ আছে? তা ছাড়া আইভি-লতাকে তুমিও তো ভালবাসতে, দুষ্টু মেয়ে! কেন, ডাক্তার তো আজ সকালেই বললেন—তাঁর কথাতেই বলি—তোমার ভাল হবার আশা দশের মধ্যে এক ভাগ। তা এমন কিছু মন্দ নয়। নিউ-ইয়র্কে যখন কোন গাড়ীতে চাপি কিংবা নতুন বাড়ীর পাশ দিয়ে হাঁটি, আমাদের জীবনের আশাও বোধ হয় ওর চেয়ে বেশী থাকে না। নাও এখন একটু মাংসের 'ব্রথ' খেয়ে, তোমার সুডিকে ছবি আঁকতে ছাড়ো। ছবি হলে তবে তো সেটা সম্পাদককে বেচে সে তার পীড়িত সন্তানের জন্য 'পোর্ট' (বলকারক সুরা) আর নিজের লোভ মেটাতে শূকরমাংসের 'চপ' কিনবে?

'তোমার আর মদ কিনতে হবে না'—জানলার ওপর চোখ রেখেই জন্সী বললে—'আর একটা গেল। না, আমি 'ব্রথ' খাবো না,...ঠিক আর চারটে রইল। সন্ধ্যের আগেই আমি শেষ পাতাটার পড়া দেখতে চাই, তার পর আমিও চলে যাব।'

জন্সী ভাই—সু তার ওপর ঝুঁকে বললে, আমার যতক্ষণ আঁকা শেষ না হয়, তুমি চোখ বুজে রাখ; জানলার দিকেও তাকিও না, কেমন? আমার আলোর দরকার, নইলে পর্দ্দা নামিয়ে দিতাম।

পাশের ঘরে গিয়ে আঁকতে পার না?—রূঢ়ভাবে জন্সী বললে।

'আমি তোমার পাশেই থাকতে চাই', সু বললে—'তা ছাড়া আমি তোমাকে ঐ বাজে আইভি-পাতার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেব না।'

তোমার হলেই আমায় বলবে কিন্তু। বলে জন্সী চোখ বুজে শাদা, নিশ্চল পাষাণমূর্ত্তির মত শুয়ে রইল। কারণ আমি শেষ পাতাটার পড়া দেখতে চাই। অপেক্ষা করতে আর ভাল লাগে না, ভাবতেও না। সবকিছুর ওপর থেকে আমার বন্ধন শিথিল করে দিয়ে আমিও ধীরে ধীরে ভেসে যাব ঐ শুকনো ক্লান্ত পাতাগুলোর মত, দূরে—অনেক দূরে।

'একটু ঘুমোও বরং'—সু বললে, 'বুড়ো সাধু মাইনারের (যারা কয়লার খনিতে কাজ করে) ছবির মডেলের জন্য বাহারম্যানকে ডাকতে যাচ্ছি। এক মিনিটও লাগবে না; না ফেরা পর্য্যন্ত নড়বে না কিন্তু। বুড়ো বাহারম্যানও চিত্রকর; থাকত ওদেরই নীচের তলায়। বয়স ষাটের উর্দ্ধে, এবং মাইকেল এঞ্জেলোর 'মোজেস্'-এর ছবির মত একবুক কোঁকড়ানো দাড়ি। গ্রীক উপাখ্যান-বর্ণিত বনদৈত্য 'সাটিরে'র মত মাথাটা যেন একটি ক্ষুদে শয়তানের দেহে বসানো—এমনি তার চেহারা। চিত্রকর হিসাবে বাহারম্যান ব্যর্থ হয়েছে। চল্লিশ বছর ধরে তুলির কসরত করে আজও সে তার মানসসুন্দরীর বস্ত্রাঞ্চলের প্রান্তটুকুও স্পর্শ করতে পারল না। সে বরাবরই একটি 'মাষ্টারপিস্' আঁকবার চেষ্টায় আছে, কিন্তু আজও তা আরম্ভ করতে পারে নি। ক'বছর ধরে একটু-আধটু বিজ্ঞাপন চিত্র বা ব্যবসায়ী ছবি ছাড়া সে আদৌ কিছু আঁকে নি। কাজেই উপনিবেশের যেসব তরুণ চিত্রকর পেশাদার 'মডেল' ভাড়া করতে পারে না, বাহারম্যান তাদেরই প্রতিরূপের কাজ করে যৎসামান্য উপার্জ্জন করে। সে কিছু বেশীমাত্রায় সুরাপান করে এবং এখনও তার ভবিষ্যৎ 'মাষ্টারপিসের' কথা বলে।

বাদবাকি মানুষটির স্বভাব বড় উগ্র এবং কোন লোকের ভেতর দুর্বলতা দেখলেই তীব্র শ্লেষ করে। সে একরকম

স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই মেষরক্ষক ম্যাষ্টিফ্ কুকুরের মত উপর-তলার তরুণী চিত্রকর দুটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছে।

সু বাহারম্যানের স্বল্পান্ধকার কুঠরির মধ্যে ঢুকেই তার গায়ে সুরার গন্ধ পেল। ঘরের এক কোণে পঁচিশ বছর হ'ল ইজেলের ওপর এক খণ্ড সাদা ক্যাম্বিশ আঁটা আছে—এক দিন তাতে তার মাষ্টারপিসের প্রথম তুলির রেখা পড়বে এই আশায়।

সু তাকে জন্সীর খেয়ালের কথা জানিয়ে বললে—সত্যি, ও যেরকম পাতার মত হাল্কা ও ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে, পৃথিবীর ওপর থেকে এই ক্ষীণ বন্ধনটুকু কেটে গেলে ভয় হয়, সেও হয়ত ভেসে যাবে।

বৃদ্ধ বাহারম্যানের লাল চোখ দুটো এতক্ষণ স্থিরভাবে তাকিয়ে ছিল, এমন আজগুবি খেয়ালের কথা শুনে সে এবার শ্লেষের সুরে চেঁচিয়ে উঠল—ছ্যাঃ, দুনিয়ায় এমন বেকুবও আছে যে একটা মরা গাছের পাতা ঝরে যাচ্ছে বলে ভাবে সেও মরে যাবে? এমন কথা শুনি নি বাপু! নাঃ, যাও আমি সাধুর বেশে তোমার গাধার মডেল সাজতে পারব না। ওর মাথায় এসব মূর্খের খেয়াল ঢুকতে দাও কেন? কে ছেলেমানুষ মেয়েটা!

তার বড্ড অসুখ, দুর্ব্বলও হয়েছে খুব—সু বললে, জ্বরের তাড়সে মাথায় দোষ হয়েছে, তাই রাজ্যের খেয়াল এসে জোটে মাথায়। বেশ, আমার মডেল না হতে চান হবেন না, কিন্তু আমি বলব আপনার শরীরে দয়ামায়া বলে কিছু নেই।

'তুমিও দেখছি নিতান্তই মেয়েমানুষ'—বাহারম্যান চেঁচিয়ে উঠল—'কে বললে তোমার ছবিতে পোজ দেব না? চল যাচ্ছি। আধ ঘণ্টা ধরেই তো বোঝাতে চেষ্টা করছি পোজ দিতে রাজী আছি আমি।...তা তো বটেই, জন্সীর মত এমন ভাল মেয়ের অসুখ হয়ে পড়ে থাকার এ জায়গা নয়। আমার মাষ্টারপিস্টা একবার হলেই হয়, তার পর—সবাই এ জায়গা ছেড়ে চলে যাব, সত্যি বলছি।

দু'জনে উপরে এসে দেখল জন্সী ঘুমুচ্ছে। সু জানলার পর্দা নামিয়ে বাহারম্যানকে পাশের ঘরে যেতে ইশারা করল। সেখানে গিয়ে দু'জনেই ভয়ে ভয়ে জানলা দিয়ে আইভি-লতাটির দিকে তাকাল, মুহূর্ত্তের জন্য চোখাচোখি হ'ল, কিন্তু কেউ কারু সঙ্গে কথা বললে না। অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টির সঙ্গে তুষারপাত হচ্ছে—বাহারম্যান নীল কামিজ পরে একটি উল্টানো কেৎলীকে নকল পাহাড় বানিয়ে তার উপর সাধু 'মাইনার' সেজে বসল।

পরদিন সকালে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে উঠে সু দেখলে জন্সী নিষ্প্রভ বড় দুটি চোখ মেলে জানলার সবুজ পর্দার দিকে চেয়ে আছে।

ওটা তুলে দাও, আমি দেখব—সে ক্ষীণ কণ্ঠে আদেশ করল।

সু ক্লান্তভাবে আজ্ঞা পালন করল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সারা রাত্রিব্যাপী অবিশ্রান্ত বর্ষণ এবং দুরন্ত বায়ুর আঘাত সয়েও একটি আইভি-পাতা তখনো দেয়ালের গায়ে জেগে আছে, সেটাই লতার শেষ পাতা। বোঁটার কাছটা ঘন-সবুজ, খাজকাটা ধারগুলোতে ক্ষয় ও বিনাশের পীত আভা—পাতাটি তবু মাটি থেকে প্রায় বিশ ফুট উপরে একটি শাখা আশ্রয় করে নির্ভয়ে ঝুলছে।

'ওটাই শেষ'—জন্সী বললে—'আমি ভেবেছিলাম রাত্রে ওটা নিশ্চয় পড়ে গেছে; সে কি ঝড়, শুনেছি তো! কিন্তু আজ ওটা পড়বেই এবং সেই সঙ্গে আমারও মৃত্যু ঘটবে।'

'ছিঃ অমন কথা বলো না ভাই'—সু তার চিন্তাক্লিষ্ট মুখ-খানা প্রায় বালিশের কাছে নামিয়ে বললে, 'নিজের কথা না ভাব, আমার কথা চিন্তা কর ত, আমার কি হবে?'

জন্সী কোন উত্তর দিলে না।

যে আত্মা সুদূর রহস্যপথে যাত্রার আয়োজন করছে তার চেয়ে নিঃসঙ্গ বোধ হয় জগতে আর কেউ নেই। একটি একটি করে সখ্য ও পৃথিবীর বন্ধন যেমন যেমন শিথিল হয়ে পড়ছে, জন্সীর মনের খেয়ালও তেমনি বদ্ধমূল হচ্ছে।

দিন শেষ হয়ে গেল, প্রদোষের ক্ষীণ আলোতেও ওরা সেই একটি আইভি-পাতাকে দেয়ালের গায়ে ডালের সঙ্গে ঝুলতে দেখলে।

রাত্রি হবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরে বায়ু আবার প্রবল হ'ল, জানলার উপর পটপট শব্দে আঘাত করে বৃষ্টির জল নেমে যেতে লাগল ছাতের ওলন্দাজ কায়দার নীচু আলসে বেয়ে।

দিনের আলো ফুটলে নির্ম্মম জন্সী জানলার পর্দা সরাবার জন্য আবার হুকুম করলে।

আইভি-পাতাটি তখনো একই জায়গায় আছে।

জন্সী অনেকক্ষণ সেদিকে চেয়ে শুয়ে রইল; তারপর সুকে ডাকল—সু তখন গ্যাসের উনুনে চাপানো মুরগীর 'ব্রথ' নাড়াচ্ছে।

'আমি সত্যি অন্যায় করেছি সুডি', জন্সী বললে—'আমার অপরাধ দেখানোর জন্যই যেন কোন অদৃশ্য শক্তি পাতাটাকে একই জায়গায় ধরে রেখেছে। মৃত্যু-কামনা সত্যি পাপ। তুমি এবার আমাকে একটু সুরুয়া দাও আর পোর্ট মিশিয়ে দুধও আন একটু, আর—না; আমায় বরং আগে একটা হাত-আয়না দাও, তারপর আমার চারদিকে উঁচু করে বালিশ রাখ—আমি বসে বসে তোমার রান্না করা দেখব।

ঘণ্টাখানেক পরে সে বললে, সুডি এবার আমার আঁকা

হচ্ছে, এক দিন আমি নেপল্‌স্-এর সমুদ্রতীরের ছবি আঁকতে পারব।

বিকেলের দিকে ডাক্তার এলেন। তিনি চলে যাবার পরেই এক ছুতোয় সু-ও হলঘরের দরজায় এল।
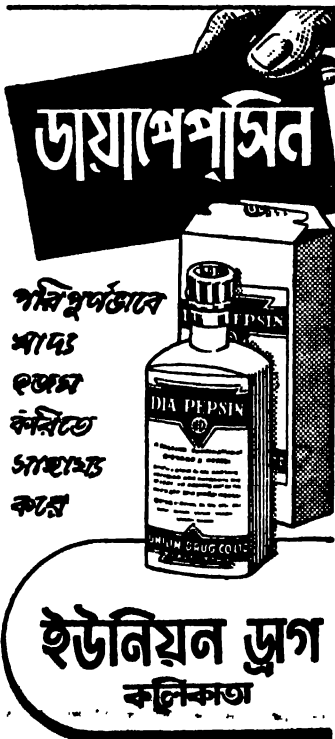
আর ভয় নেই, ডাক্তার সু-এর শীর্ণ করমর্দ্দনরত হাত ধরে বললেন, ভাল সেবা করলে তোমারই জিত হবে। আচ্ছা, আসি এবার—নীচের তলায় আর একটি রোগী দেখতে হবে। লোকটার নাম বাহারম্যান, মনে হয় ও চিত্রকর। তারও নিউমোনিয়া। লোকটা একেই বুড়ো, তায় দুর্ব্বল—রোগে ধরেছেও শক্ত করে। কোন আশা নেই, তবে হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে, সেখানে তবু একটু আরাম পাবে।

পরদিন ডাক্তার সুকে বললেন, 'এবার ওর ভয় পার হয়ে গেছে, তোমারই জয় হ'ল। এখন কেবল যত্ন আর পুষ্টি, ব্যস্।'

সেদিন বিকেলে সু জন্‌সীর বিছানার পাশে এল, সে তখন হৃষ্টমনে অতি নীল এবং একান্ত অকেজো একটি কাঁধে-রাখা উলের স্কার্ফ বুনছিল। এবার এক হাতে সে বালিশ-সুদ্ধ জন্‌সীকে জড়িয়ে ধরল।
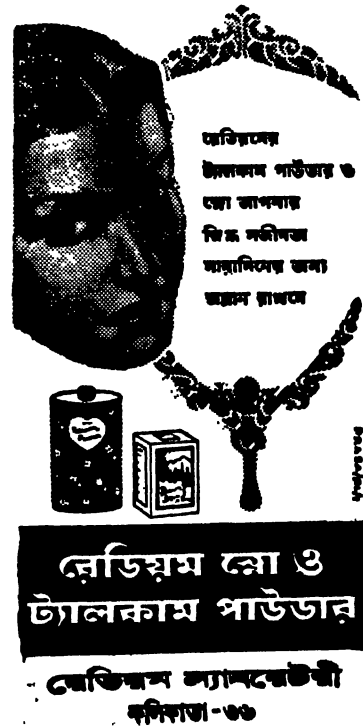
'সাদা ইঁদুর, তোমায় একটা খবর দেব আমি', সে বললে, 'মিষ্টার বাহারম্যান আজ হাসপাতালে নিউমোনিয়ায় মারা গেলেন, মাত্র দু'দিনের অসুখে। প্রথম দিন যখন তিনি নীচের ঘরে শুয়ে যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছিলেন, দরোয়ান দেখেছিল তাঁকে—জামাজুতো ভিজে একেবারে বরফের মত হিম হয়ে গিয়েছিল। ঐ দুর্যোগের রাতে তিনি যে কোথায় গিয়েছিলেন ভেবেই পেল না কেউ। পরে দেখা গেল একখানা মই টেনে সরিয়ে আনা হয়েছে, একটি লণ্ঠন তখনও জ্বলছে, আশেপাশে কতকগুলো বুরুশ পড়ে আছে আর রং-গোলা একটি তক্তায় সবুজ আর হলদে রং মাখানো। জানলা দিয়ে এবার ঐ আইভি-পাতাটা দেখ তো? পাতাটা হাওয়ায় একটুও কেন নড়ে না, সে কথা কি একবারও তোমার মনে খেয়াল হয় নি? বন্ধু, ওটাই বাহারম্যানের মাষ্টারপিস্—যেদিন শেষ পাতাটি ঝরে গেল, সেই রাতেই ওটা এঁকেছিলেন তিনি।

আখ্তার জাহান বলেন

LUX
TOILET SOAP

যতো সাদা, ততো বিশুদ্ধ, তেমনি সুগন্ধ

লাক্স টয়লেট্ সাবান

চিত্র-তারকাদের
সৌন্দর্য্য সাবান

LTS. 384-X33 BG

আলোচনা

তিব্বত-ভারতের ঐতিহাসিক যোগসূত্র—ভোটবাগান

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসীতে (অগ্রহায়ণ, ১৩৬০) প্রকাশিত শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর লিখিত উক্ত শীর্ষক মনোজ্ঞ প্রবন্ধটি পাঠ করিলাম। কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারত-তিব্বত ইতিহাসের এই লুপ্ত অধ্যায় সম্পর্কে ক্যালকাটা রিভিয়ুতে, আনন্দবাজার পত্রিকায়, এসিয়াটিক্ সোসাইটির সভায় এবং সরকারী মহাফেজখানার (National Archives) সহিত কিছু কিছু আলোচনা করিবার সুযোগ আমার হইয়াছে বলিয়া উক্ত প্রবন্ধের পরিপূরক হিসাবে সামান্য কিছু বক্তব্য নিবেদন করিতেছি।

তাঁহার প্রবন্ধের উপকরণ-স্বরূপ গ্রন্থপঞ্জীতে তিনি এসিয়াটিক্ সোসাইটির ১৮৯০ সালের জর্নালে প্রকাশিত গৌরদাস বসাকের প্রবন্ধ, শরৎ চন্দ্র দাসের *Indian Pandits in the Land of Snow* এবং মার্কহাম্ ও টার্ণারের বিবরণীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও ড্যালরিম্পলের (Dalrymple) ওরিয়েণ্টাল রিপার্টারীতে (১৭৯১) ও (১৮০৮) এবং ঐ সময়কার কাউন্সিলের রেকর্ড-দলিলদস্তাবেজেও তিব্বতে ওয়ারেন হেষ্টিংসের "মিশন" প্রেরণের কথা এবং আচার্য্য পুরাণগির বা পূর্ণগিরির নাম পাওয়া যায়। (*Calendar of Persian Correspondence 1781-85, Vol. vi*).-এও পুরাণগিরির কথা আছে। সম্প্রতি *Tirage A Part Du Tuong Pao* Vol. XXXIX, LIVR, 4-5 E. J. Brill—Leiden—"*The Missions of Bogle and Turner according to Tibetan texts,*" by L. Petech প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে তৃতীয় ও চতুর্থ তাসী লামার আত্মজীবনীর কিছু কিছু অংশ অনূদিত হইয়াছে। প্রভাসবাবু তাসী লামা কর্ত্তৃক পরমা ও পূরণগিরিকে ওয়ারেন হেষ্টিংসের দরবারে প্রেরণ করিবার কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু তৎসহ তাঁর বিখ্যাত চিঠিটির সম্পূর্ণ বিবরণ দিলে তাসী লামার চরিত্রমাধুর্য্য আরও ফুটিয়া উঠিত। লামা ওয়ারেন হেষ্টিংসকে লিখিতেছেন, "কাহাকেও আঘাত করা বা কাহারও বিরুদ্ধাচরণ করা আমাদের সমাজের রীতি ও নীতিবিরুদ্ধ। কোন সামান্য লোকেরও অনিষ্ট করার কল্পনাতে আমাদের সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয়···আমি নিজে একজন সন্ন্যাসী এবং আমাদের সন্ন্যাসের নিয়ম এই যে, জপমালা হাতে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণকামনাই আমাদের মন্ত্র, শান্তিই আমাদের কাম্য—এই রাজ্যে সর্ব্বশক্তিমানের উপাসনাই সকলের পেশা···।"

পত্রের এই সারাংশ থেকেই অনুমান করা যায় যে, তৎকালীন তাসী লামা সাধারণ সন্ন্যাসী বা রাজা ছিলেন না। তিব্বতীয় বিবরণীতে জানা যায়, তিনি এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গুণী লোক ছিলেন। চীন-সম্রাট তাঁকে গুরুর মত শ্রদ্ধা করিতেন।

"As the first and most holy living (being) of all those on earth who devoted their time to the service to the Almighty."

১৭৭৯-৮০ খ্রীঃ অব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস স্থির করেন যে, আচার্য্য পূরণগিরি তিব্বতে গিয়া তাসী লামার সঙ্গে মিলিত হইবেন এবং

তাঁহার সঙ্গে মহাচীনে যাইবেন, আর জলপথে বগোল সাহেব তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইবেন। পূরণগিরি লামার সঙ্গে চীনযাত্রায় যে চমৎকার বিবরণী দিয়াছিলেন তারই কিয়দংশ ড্যালরিম্পলের ওরিয়েণ্টাল রিপার্টারিতে অনূদিত হইয়া ১৭৯১ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল:

"It contains a 'Narrative of the Teshoo Lama's journey to Peking in 1779 and 1780 and of his death there: by Poorun Geer Gossain. From Dalrymple's introduction to this number it appears that this narrative (this very curious paper as he says) was received by Dalrymple from his friend Mr. Bradshaw of Portland Place through his very old and intimate friend Mr. Fitzhugh. We are further told that Mr. Bradshaw had received it from Mr. Auriol (Secretary to the Supreme Council at Fort William under Warren Hastings) who in his turn had received it from Warren Hastings while in India. Mr. Dalrymple secured Hastings' permission to get it printed through the good offices of Calliand."

তাসী লামার এই অপূর্ব্ব ভ্রমণকাহিনী আনন্দবাজার পত্রিকার এক বার্ষিক সংখ্যায় আমি সামান্য উল্লেখ করিয়াছি।

প্রভাসবাবুর প্রবন্ধে আর একটি বিষয়ের সবিশেষ উল্লেখ নাই যাহা আমরা তাসী লামার তিব্বতীয় আত্মজীবনী হইতে পাই, তাহা এই যে, ঐ সময়ে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চলিত উদাসী পরিব্রাজকদের মাধ্যমে। কাশীরাজ চৈৎসিং ছিলেন এ বিষয়ে অগ্রণী এবং তিনি লালা কাশ্মীরীমল, গোঁসাই কিষণপুরী, শোভারাম প্রভৃতিকে তিব্বতে পাঠাইয়াছিলেন। তাসী লামাও তিব্বতী শ্রমণদের নানা উপহার সমেত প্রয়াগ, বারাণসী, নৈরঞ্জনা প্রভৃতি তীর্থস্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধগয়া হইতে আনীত কৃষ্ণপ্রস্তরের শাক্যমুনি ও মৈত্রেয়ের দুটি মূর্ত্তি তিব্বতের মঠে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ঐ মূর্ত্তিদ্বয় প্রতিষ্ঠার সময় তাসী লামা স্বয়ং দুটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেন।

প্রভাসবাবু যে বগোলের 'মিশন' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন তৎসম্পর্কে তিব্বতীয় আত্মজীবনীতে এই মর্ম্মে উল্লেখ আছে যে দশম মাসের দ্বিতীয় দিবসে—

"Acarya Bho-gol (Bogle?) with his attendants offered presents of glass, bottles, etc., and took their appointed places for the distribution of ceremonial tea; they made conversation in the 'Nagara' language."

তাঁহাদের বিদায়ের কথা এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে—

"On the 7th day of the 3rd month during an interview after dinner with Bhogol Saheb, the Bengalis and their attendants, (the Tashi Lama) held a conversation in the language of the Magadha (Yul-dbus) and gave to the two men leave to depart with pleasing presents of garments, etc., and his reply (to the Governor-General) along with accompanying gifts."

এই সম্পর্কে *The Calcutta Review*তে প্রকাশিত (April 1952) আমার প্রবন্ধ "A Forgotten Chapter of Indo-Tibetan Contact" দ্রষ্টব্য। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মিশনে তিব্বতীরা পূরণগিরির বদলে 'সূর্য্যগিরি'র উল্লেখ করে।

এই পূরণগির কোন্ দেশীয় সন্ন্যাসী তাহা জানা নাই, তবে তিব্বতীয় আত্মজীবনীতে তাঁহাকে বাঙালীই বলা হইয়াছে। তাহা হয়ত তিনি ওয়ারেন হেষ্টিংসের দূত হইয়া বাংলাদেশ হইতে আসিয়াছেন বলিয়া। তবু এই পুণ্যশ্লোক সাধুর কীর্ত্তি বাংলার মর্ম্মদেশে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

দ্রুত-ফেনিল সানলাইট

না আছড়ে কাচলেও সাদা ও ঝকঝকে ক'রে দেয়

স্বামী হিসেবে সত্যিই আমি ভাগ্যবান কারণ আমার স্ত্রী আমার কাপড়-চোপড়ের বিশেষ যত্ন নেন—সানলাইট সাবানের সাহায্যে। সানলাইট সাবানের দ্রুত-উৎপাদিত ফেনা কাপড়ের সব ময়লা বার করে দেয়, কাপড় আছড়াবার দরকার হয় না। তার মানে আমার পয়সা বাঁচে, কারণ আমার কাপড়-চোপড় টেঁকে বেশী দিন।

সানলাইট সাবান দিয়ে সহজে ও তাড়াতাড়ি কাপড় কেচে আপনার আমোদ প্রমোদের অবসর বাড়ান। সানলাইট সাবানের কার্যকরী ফেনা কাপড়ের ময়লাকে ঘেঁটিয়ে বার করে দেয়, আর রঙীন কাপড়কে উজ্জ্বল ও ঝকঝকে করে তোলে।

S30-X46 BG

বিশাখাপত্তনে নিখিল-ভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলন

অন্ধ্র শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার সংস্কৃতি সংযোগ পরিষদ নামক সংস্থার উদ্যোগে গত ২৮শে ও ২৯শে ডিসেম্বর বিশাখাপত্তনে টাউন-হলে এক নিখিল-ভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। বাংলাদেশ হইতে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রবাসীর সহকারী-সম্পাদক শ্রীযুত নলিনীকুমার ভদ্র এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সম্মেলনের উদ্বোধন-প্রসঙ্গে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ বলেন যে, আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের সম্মুখে যে সকল সমস্যা উপস্থাপিত করিয়াছে সেগুলির সমাধান করিতে হইলে আমাদিগকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। নিজেদের ধর্ম্মীয় আদর্শের প্রতি অনুরাগের অভাবই আজিকার দিনে আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার পতাকায় পদ্মের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া ডঃ রাধাকৃষ্ণন্ বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতিতে পদ্মের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। পঙ্ক হইতে জন্ম হয় পঙ্কজের, তেমনি আমাদের সাংস্কৃতিক আদর্শ বলে যে, তথাকথিত নিম্নতম শ্রেণীর মানুষও সাধনা দ্বারা নিজের অধ্যাত্ম-জীবনের চরম বিকাশ সাধন করিতে পারে।

ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের উদ্বোধনী বক্তৃতার পর অন্ধ্র শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার সম্পাদক শ্রী আর. মণ্ডেশ্বর শর্ম্মা শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার আদর্শ বিশ্লেষণ করিয়া এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন। তারপর ওয়ার্কিং সেক্রেটরী শ্রীসর্ব্বেশ্বর শর্ম্মা কর্ত্তৃক ডক্টর কালিদাস নাগ, অধ্যাপক বি. এল. আত্রের, ভারতন কুমারাপ্পা, অন্ধ্রের প্রধান বিচার-পতি পি. রাজমান্নার প্রমুখ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রেরিত বাণী পঠিত হয়।

২৯শে ডিসেম্বর বেলা আড়াইটার সময় সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। ইণ্ডিয়ান রিপাবলিক পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক সি. ভি. এইচ. রাও কর্ত্তৃক প্রারম্ভিক বক্তৃতা প্রদত্ত হইবার পর

লাইফ্‌বয় সাবান

প্রতিদিনের ময়লার বীজাণুর হাত থেকে আপনাকে বাঁচায়

LIFEBUOY SOAP

L. 231-50 BG

লাল মেঘ—বুদ্ধদেব বসু।

প্রাচীর ও প্রান্তর—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ। ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য প্রত্যেকখানি তিন টাকা।

আলোচ্য উপন্যাস দুখানি পড়িতে পড়িতে বহুদিন আগেকার কথা মনে পড়িতেছে। তখনকার অতি-আধুনিক কয়েকজন লেখক সাহিত্য-জগতে কয়েকটি মনঃসমীক্ষণের তত্ত্বকে কথা-সাহিত্যের মাধ্যমে প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কাফে-পিঠের বস্তি এবং সেখানকার দুর্দশাগ্রস্ত মানুষগুলিকে বাছিয়া লইয়াছেন গল্পের বিষয়বস্তু রূপে, মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবন তাহাদের লেখনীতে ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু ইঁহাদের জীবনযাপনের দৈনন্দিন সমস্যাকে উদ্ঘাটিত করার চেয়ে মনোবিজ্ঞানী নির্দেশিত কামনার জগৎ রূপটি অবরুদ্ধ মনোবৃত্তির সঙ্গে প্রকাশ করিবার দিকেই তাঁহাদের আগ্রহ যেন বেশী ছিল। ফলে যাহা আসল ফুল হইতে পারিত তাহার অধিকাংশই হইল কাগজের ফুল এবং পাপড়ির বর্ণনা পরিচ্ছেদের বর্ণ-বিন্যাস ও বিন্যাস-ভঙ্গির দ্বারা পূরণ করিয়া লইবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই সাহিত্যের উপজীব্য ছিল প্রেম—ইহারই নাম সেদিন ছিল প্রগতিবাদ। সমাজগত কোন প্রথা ভাঙ্গার জন্য আন্দোলন অথবা অর্থনৈতিক পটভূমিতে ধনসাম্যের ভিত্তিতে কোন সমস্যা উপস্থাপন, পুরাতন আচারের [illegible] বিসর্জনের সাধনা অথবা জীবন-দর্শনের কোন গভীর বন্ধন সেই প্রগতিবাদের মধ্যে ছিল না। তথাপি তাহা সাহিত্য-জগতে সাড়া জাগাইয়াছিল একটি কারণে: বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য তাহাদের [illegible] হইতেও প্রকাশ-ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য ছিল অসাধারণ। এই বলিষ্ঠ প্রকাশ ভঙ্গীই হইয়াছিল প্রগতিবাদের বাহন।

এই দুখানি উপন্যাস সেই সময়ের লেখা। মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষরাই গল্পের নায়ক নায়িকা। গল্পের উপজীব্য অবশ্য প্রেম এবং তিন চরিত্রের মাধ্যমে সেই প্রেমের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশিত।

'লাল মেঘে' পাই শয্যাশায়ী রুগ্না স্ত্রী শোভা, সেবাব্রতা নারী মঞ্জু—সম্পর্কে শোভারই দূর সম্পর্কীয়া ভগিনী। এবং উচ্চশিক্ষিত [illegible] অবিনাশ। শোভা শয্যাশায়ী—মঞ্জু তাহার পরিচর্যা করে, সাহচর্য দেয় অবিনাশকে। প্রতিদিনের জীবনে এই সাহচর্য ক্রমে ঘনিষ্ঠতর হইয়া তিনটি জীবনে সংঘাতের সৃষ্টি করিল। ইহার মধ্যে গল্পাংশ কম, কিন্তু গল্প-বলার আশ্চর্য ভঙ্গীতে মনে হয় শুধু বিষয় বৈচিত্র্য হইতেই গল্প জমে না, পুরাতন কথা যিনি নূতন করিয়া বলিতে পারেন তাহার কথাটিই মনে দাগিয়া থাকে। সুতরাং গল্প-বুনন রীতিতে যে 'লাল মেঘের' গল্পটিকে সার্থক করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

'প্রাচীর ও প্রান্তর' উপন্যাসখানিতেও তিনটি চরিত্র: স্বামী পুরন্দর, স্ত্রী সীতা আর দূরসম্পর্কের দেবর দিলীপ। এই তিনটি প্রাণীর হৃদয়দ্বন্দ্ব-সমন্বিত প্রেমকে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন লেখক। ইঁহার গল্পটি গতিশীল—প্রকাশ-ভঙ্গিমা স্পষ্ট ও প্রখর। 'লাল মেঘে'র চিন্তাজগৎ বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত—ছাড়া ছাড়া; পড়িতে পড়িতে কেমন যেন অস্পষ্ট বোধ হয়, ক্লান্তি আসে। শুধু যাদুকরী বুনন-রীতি পাঠকচিত্তকে স্তিমিত হইতে দেয় না। 'প্রাচীর ও প্রান্তরে' হৃদয়দ্বন্দ্ব ও গল্প সমানতালে আগাইয়া চলিয়াছে—তিনটি চরিত্রের গতি-পরিণতি সম্বন্ধে পাঠকের কৌতূহল শেষ পর্যন্ত উদ্দীপ্ত থাকে। 'লাল মেঘে' নায়ক-নায়িকার চারি পাশের বস্তুজগৎ ততটা স্পষ্ট নয়, 'প্রাচীর ও প্রান্তরে' সেই জগতের সীমানা স্পষ্টতর। মধ্যবিত্ত জীবনযুদ্ধের কিছু আভাস অন্ততঃ পাওয়া যায়। পুরুষের উগ্র কামনার বেগ সহ্য করিতে পারে না নারী—সে চায় সংযত সহজ দাম্পত্যজীবন। পুরুষ চায় নিঃশেষে লুণ্ঠন করিতে—দ্বন্দ্বের সংঘাত এইখানে। তারপর দিলীপকে মাঝখানে রাখিয়া শুচিস্মিত এক সংসারের স্বপ্ন সীতার মনে জাগিয়া উঠে। এদিকে অবদমিত কামনার বেগকে পরজীবিনী কোন নারীর সম্ভোগে পরিতৃপ্ত করিতে চায় পুরন্দর। কাঁচা লেখনী হইলে এই অধঃপতন-পর্বের চিত্রটি [illegible]র পর্যায়ে পড়িত; তথাপি অনেকের মতে এটি [illegible]। কিন্তু নারীত্বের পূর্ণ বিকাশক্ষণে এই উগ্র কামনাই স্নিগ্ধ প্রেমে পরিণত হইয়াছে এবং তাহার ক্রমবিকাশের ধারাটি রক্ষা করিবার জন্য এমনই চড়া রঙের পটভূমিকার প্রয়োজন ছিল। ইহারই নগ্ন প্রকাশ উগ্র কামনাকে আঘাত করিয়া কল্যাণের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে; অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্রটি হইয়াছে সার্থক।

দিলীপ-চরিত্রের কল্পনায় লেখক অত্যন্ত সতর্কতার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। মাতৃত্বের [illegible] সীতাকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলীপকে কেন্দ্রচ্যুত হইতে দেন নাই। এ চরিত্রটি নষ্টনীড়ের অমল-চরিত্রের সমগোত্রীয়—যদিও অমল আর দিলীপের পার্থক্যও চোখে পড়ে। বাহিরের ঘটনার সঙ্গে অন্তরের দ্বন্দ্ব সুষ্ঠুভাবে মিলিয়াছে বলিয়া গল্পটি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি—আলোচ্য উপন্যাস দুখানির বৈশিষ্ট্য হইতেছে প্রকাশ-ভঙ্গিমায়। বলিষ্ঠ প্রকাশ-ভঙ্গীর দ্বারাই এই দুই জন লেখক সাহিত্য-জগতে যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

'লাল মেঘ' সম্বন্ধে একটি ত্রুটির উল্লেখ বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জিজ্ঞাসায় চলিত রূপ 'জিগ্যেস' না লিখিয়া জিগেস লেখায় ভাষা কেমন যেন প্রাদেশিকতা দোষদুষ্ট হইয়াছে—বিশেষ করিয়া চরিত্রের মুখে 'করলুম', 'গেলুম' প্রভৃতি রাজধানী-প্রচলিত বুলির প্রাচুর্যে।

দুখানি বইয়েরই প্রচ্ছদপট চমৎকার; মুদ্রণে যত্ন ও পারিপাট্যের পরিচয় আছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

চোরকাঁটা—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দীপনী। ২৩৫ বি. টি. রোড, কলিকাতা-৩৬। মূল্য দুই টাকা।

'চোরাকাঁটা' লোকান্তরিত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি সুপরিচিত উপন্যাস। সাধু নামে এক যুবক অবস্থার ফেরে পড়ে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়; তারপর তার সৎ আর অসৎ প্রবৃত্তির মধ্যে চলতে থাকে দ্বন্দ্ব এবং পরিণামে সৎ-প্রবৃত্তিই জয়ী হয়ে ওঠে। এই প্রতিপাদ্যকে লেখক নানা ঘটনা-সংঘাতের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্লটটি বেশ ঘোরালো, তবে পাকা হাতের মুন্সীয়ানার দরুন কোনওখানেই জট পাকিয়ে যায় নি, যার জন্যে পাঠকের মন মোটেই ক্লান্তি অনুভব করে না, বরাবরই একটি তীব্র কৌতূহলের মধ্য দিয়ে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে।

উপন্যাসের একটি মুখ্য চরিত্র মমতা, সাধুর ভ্রাতৃজায়া। এর তেজস্বিতা, অপরিসীম ধৈর্য আর অফুরন্ত স্নেহেই সাধু আবার কল্যাণের পথে ফিরে আসতে সমর্থ হল—এইজন্যে মনে হয় সমগ্র উপন্যাসটির মূল কেন্দ্র এই মহীয়সী নারীই। এর আত্মবিশ্বাস এক এক সময়ে শরৎ চন্দ্রের কোন কোন বিশিষ্ট নারীচরিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়।

চারুচন্দ্র এক জায়গাকালে বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্র-শরৎ যুগেও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণে বোঝা যায় রসপিপাসু পাঠকের কাছে এর সমাদর এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প—শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)। সাহিত্য চয়নিকা, ৫৯ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দুই টাকা।

ছেলেমেয়েদের আত্মীয় এক ছেলেমেয়েরা আর একেবারে বয়স পেরিয়ে যাওয়া বুড়োরা। 'স্বপনবুড়ো' অখিলবাবু এই অধিকারে ওদের একেবারে মাঝখানটিতে গিয়ে বসেছেন। গল্প বলতে হবে। ছোটরা আমাদের আশে-পাশে রয়েছে বটে, কিন্তু সেটা বাইরে; বাস্তবপক্ষে ওদের জগৎটা সুদূর একটা স্বপ্নময় কল্পনার জগৎ। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলা চলে যে, ওরা এই জগৎটাকেই ওদের মনের রঙে রসিয়ে আলাদা করে, আর খানিকটা সুদূর করেই দেখে। সেই মোহময় দৃষ্টি না থাকলে ওদের মনের নাগাল পাওয়া যায় না, সুতরাং ওদের আসরে জায়গা করে নিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা।

"স্বপনবুড়ো" এ রহস্যটা জানেন, তাই তাঁর গল্পের আসর জমে উঠেছে। শুধু ভূত, প্রেত, রাক্ষস, পরীদের কথাই নয়, এই জগতের নিত্যকার সুখ-দুঃখের কথাও তিনি যা বলেছেন, এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে বলেছেন যাতে ছেলেদের মনে গিয়ে পৌঁছাতে একেবারেই দেরি না হয়। কল্পনার জগৎ থেকে এই পৃথিবীতে যাদের এক সময় এসে পৌঁছাতে হবে, এই সুকঠোর বাস্তবের সামনে এসে হবে দাঁড়াতে তাদের উপদেশও দিতে হয়েছে মাঝে মাঝে; কিন্তু তা এমনভাবে যাতে গল্পের আসরটিতে প্রচ্ছন্ন স্কুলঘর বলে তাদের মনে আতঙ্ক জমে উঠতে না পারে।

বইয়ের ভাষাও সাধারণতঃ বেশ হাল্কা আর অল্প বয়স্কদের উপযোগী। বইখানি ছেলেদের হাতে তুলে দিলে তারাও আনন্দ পাবে, অভিভাবকও নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সব-হারাদের গান—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। নব-জীবন সঙ্ঘ, লোকসেবা-শিবির, পোঃ বড় আন্দুলিয়া, নদীয়া ও ৫এ, অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা-৩। মূল্য আড়াই টাকা।

বইখানি আটাশটি কবিতার সমষ্টি। চারণ-কবি বিজয়লালের এই কবিতাগুলি একদা বাংলার অনেক তরুণের প্রাণে প্রেরণা যোগাইয়াছিল। আটাশটি কবিতার মধ্যে অধিকাংশই মৌলিক গীতি-কবিতা, কয়েকটি অনূদিত গদ্য-কবিতাও আছে। প্রথম কবিতা 'তুমি চল'। এটি ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে অনুবাদ। ভূমিকায় লেখক বলিতেছেন, এইটিই কাব্যের মূল সুর। দ্বিতীয় কবিতায় কবি বলিতেছেন,

গাহি জীবনের গান,
রাতের আঁধারে জাগিতেছে ধীরে মহামানবের প্রাণ।

বলিতেছেন,

সব-হারা যারা দুনিয়ায় তারা সবের মালিক হবে,
যুগের শঙ্খে এই মহাগান বাজে ভৈরব রবে।
আসিতেছে ভগবান
মহামানবের হৃদয়পদ্মে— গাহে কবি তার গান।

'বুড়ী-বালামের তীরে' আছে,

বিজয়ী বীরের দল!
মরিয়া তোমরা শিখাইয়া গেলে বাঁচিবার কৌশল।
জ্বালালে যে হোমানল—
শত শিখা মেলি পরশিবে তাহা মহা-অম্বরতল:

'প্রভাতে' পাই,

ওই ডাকে প্রভাতের গর্জিত শঙ্খ,
আলোয় মিলালো কালো অতীতের রাত্রি,
মহাবীর, জাগো জাগো, রণিতেছে তূর্য,
তুমি যে বাঁধনহারা আলোকের যাত্রী।

'রক্ত-জবা' কবিতাটি চমৎকার,

তোমার চারণ-বেশে পথে পথে আমি গাব গান,
আমার সঙ্গীত তব ফুকারিবে প্রলয়-বিষাণ।

'বিজিতের গানে' আছে,

দাস আর নহে দাস, মানুষ সে স্বাধীন-সুন্দর।

কবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

দেখা কি দেবে না বাঁধারের পারে
ধন-সাম্যের নূতন তপন?
হবে না সত্য কবির স্বপন?

'শতাব্দীর আহ্বানে' আছে,

শুনিতে কি পাও পাতালপুরীর অন্ধকারের ভাষা,
মাটির গর্ভে ভূকম্পনের চমক সর্বনাশা?

'কবির প্রতি' কবিতায় পাই

আজি নহে, আজি নহে মুক্তকণ্ঠে মিলনের গীত;
আজি চাহি কণ্ঠে তব শুনিবারে ভৈরব সঙ্গীত;
আজি চাহি শুনিবারে সেই রুদ্র শঙ্খের আহ্বান
কুরুক্ষেত্রে পার্থ-হৃদে জাগালো যা উত্তাল তুফান।

শেষ কবিতার প্রশ্ন,

ঘুমের রাজ্যে কে গাহিবে বল ঘুম-ভাঙানোর গান?

কাব্যের মধ্য দিয়া স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের উপাসক কবি বিজয়লাল যুগের বার্তা ঘোষণা করিয়াছেন। এই চতুর্থ সংস্করণে গ্রন্থে কয়েকটি নূতন কবিতাও সংযোজিত হইয়াছে। অনুবাদগুলিও সুন্দর। দৃপ্ত ছন্দে ঝঙ্কৃত পৌরুষপূর্ণ "সব-হারাদের গান" আজও দেশবাসীর মনে সাড়া জাগাইবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ভূতের পাঁচালি—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী-রচিত, শ্রীমাধুরী দেবী এম্-এ-চিত্রিত। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, ৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৸০।

"পণ্ডিতের পুঁথিঝাড়া বড় বড় কথা
ভেবে ভেবে সারাদিন ঝাঁ ঝাঁ করে মাথা।"

তাই বালক, শিশু ও কিশোরদের ডাকিয়া লেখক ভূতের গল্প শুনাইতে বসিয়াছেন এবং কম নয়—এক ডজন ভূতের গল্প বলিয়া গিয়াছেন। যেখানে বিলাতী গল্পের ছায়া আছে, সেখানে লেখক তাহা উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন 'ভূতের নাচে' Tam O' Shanter'-এর। সহজ মনোরম পদ্যে মজাদার গল্প বলার কৌশল তাঁহার বেশ আয়ত্ত।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(১) জমজম ঝমঝম, (২) আলোর কুঁড়ি—শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৸৹ ও ২৲।

প্রথমটি গল্প, কবিতা ও ছড়ার বই। বড় বড় ঝরঝরে অক্ষরে ছাপা ও রঙীন ছবিতে ভরা বইটি উপহার পাইয়া ছোটরা খুশী হইবে। দ্বিতীয়টি কিশোর-কিশোরীদের জন্য নানা-ভাবোদ্দীপক সচিত্র কবিতার বই। কবিতাগুলি রচনানৈপুণ্যে ও পদলালিত্যে উপভোগ্য। তরুণ-তরুণীগণ বইটি পড়িয়া আনন্দিত হইবে।

ছবি ও পড়া (১ম ও ২য় ভাগ)—শ্রীসুনির্মল বসু ও শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৸৹ ও ১৲।

আধুনিক পদ্ধতিতে রচিত অ আ ক-খ শিখিবার বই। বিবর্ণরঞ্জিত ছবিতে ভরা এবং পাকাহাতের রচিত ছড়া ও পড়াগুলি শিশুরা দশবার করিয়া পড়িতে চাহিবে। বইদুটির ছবির বাহার নয়নরঞ্জন।

ছড়ার বই (১নং)—শ্রীসুনির্মল বসু। শিশুসাহিত্য সংসদ লিঃ, ৩২এ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ।

হিন্দী ছড়া অবলম্বনে রচিত ছড়াগুলি যেমন মজাদার, শিল্পী সমর দে অঙ্কিত রঙীন সাদা-কালো চিত্রগুলি তেমনই মনোহর। ছবিগুলি দেখিলে যেমন চোখ জুড়াইয়া যায়, মিঠা হাতের রচিত সুমিষ্ট ছড়াগুলি তেমনই মন মুগ্ধ করে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

শ্রীশ্রীনৃপেন্দ্রনাথের আত্মচরিত (২য় খণ্ড)—২।, কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন, কলিকাতা-২৬ হইতে ডাঃ শ্রীসন্তোষকুমার দে ও শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। পৃ. ॥০+১৪০। মূল্য দুই টাকা।

বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এই সাধু পুরুষের আত্মচরিতের প্রথম খণ্ডের আলোচনা ইতিপূর্বে 'প্রবাসী'তে করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় খণ্ডে চারিটি অধ্যায়ে প্রায় চৌষট্টিটি সম্পূর্ণ নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে নৃপেন্দ্রনাথের শেষজীবনের বহু ঘটনা অতীব হৃদয়গ্রাহীভাবে পরিবেশিত হইয়াছে ও নানা বিষয়ের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার নিজের জন্মান্তর-বৃত্তান্ত যেমন বিস্ময়কর তেমনি শিক্ষাপ্রদ। এই গ্রন্থপাঠে জীবনকে সার্থকতার দিকে অগ্রসর করার প্রেরণা পাওয়া যাইবে।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

ফাল্গুন

প্রবাসী

মীরা

সম্পাদক :

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৩শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৬০

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

শিক্ষকদিগের কর্ম্মবিরতি

বিগত ২৭শে মাঘ (১০ই ফেব্রুয়ারি) হইতে পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষকবৃন্দের কর্ম্মবিরতি আরম্ভ হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন।

আমরা এই পত্রিকায় দীর্ঘদিন হইতে বাংলার শিক্ষকবৃন্দের দুঃখ-দারিদ্র্য ও অভাব সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি এবং সাধ্যমত তাঁহাদের সাহায্যকল্পে তাঁহাদের সকল যুক্তি ও প্রস্তাব সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি। কেননা আমরা বিশ্বাস করি যে, জাতির জীবনে ও ভবিষ্যতে বালক-বালিকা এবং কিশোর-কিশোরীর শিক্ষকগণের ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং আজিকার পরিস্থিতিকে আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ মনে করি।

একদিকে ইহা স্বয়ংসিদ্ধ সত্য যে, শিক্ষক যতই স্বার্থহীন ও শিক্ষাব্রতে অনন্যমনাই হউন, তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের কঠোর সমস্যা তাঁহার কার্য্যক্রমকে প্রভাবিত করিবেই। দারিদ্র্যপীড়িত শিক্ষক পরিবার-পরিজনের দুঃখকষ্টকে নির্লিপ্তভাবে দেখিতে সমর্থ হইতেই পারেন না এবং ঐরূপ অবস্থায় তাঁহার শিক্ষাব্রত খিন্ন ও অসম্পূর্ণ থাকিতে বাধ্য। সুতরাং শিক্ষকের শিক্ষাকার্য্যে যোগ্যতা যেমন অত্যাবশ্যক তেমনিই তাঁহার সাংসারিক ব্যাপারে অন্ততঃ পক্ষে ন্যূনতম সাচ্ছল্য থাকা প্রয়োজন: শিক্ষকের সংসার অচল হইবে, তাঁহার পরিবারের ভদ্রস্থ থাকিবে না অথচ তাঁহার শিক্ষাকার্য্য অক্ষুণ্ণভাবে সম্পূর্ণ হইতে থাকিবে ইহা অসম্ভব।

শিক্ষকের কার্য্য শুধু বিদ্যালয়ের কক্ষে আবদ্ধ নহে। সংসারে ও সমাজে তাঁহার স্থান গুরুজনোচিত। জাতির শিক্ষা-দীক্ষা তাহার প্রগতির প্রধান সোপান এবং সেইজন্যই জগতের সকল সভ্য জাতিই শিক্ষক ও অধ্যাপককে সমাজে উচ্চ স্থান দিয়া থাকে। সুতরাং অভাব-প্রপীড়িত ও দৈন্যক্লিষ্ট শিক্ষকের সমাজে ও সংসারে অধঃপতন জাতির লজ্জার কারণ, ইহা নিঃসন্দেহ। শিক্ষকের সাংসারিক অবস্থার উন্নতি সেইজন্য শুধু কাম্য নহে, উহা জাতি ও সমাজের উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যক।

অন্য দিকে এই কর্ম্মবিরতির পথ শিক্ষকের সম্মান ও মর্য্যাদার বিষয়ে শঙ্কাপূর্ণ। এই পথে যাঁহারা আজ গুরু ও নেতা, তাঁহাদের কার্য্যক্রম অনেক ক্ষেত্রেই কুটিল ও কলুষপূর্ণ। এ কথা আজ কে না জানে যে এই কর্ম্মবিরতির পন্থা রাষ্ট্র-ধ্বংসকারীদিগের প্রধান অস্ত্র এবং সেই কারণে এই পিচ্ছিল রাজনৈতিক মার্গে চলিলে অধঃপতনের ভয় সর্ব্বদাই থাকে। এই পথে শিক্ষকের পক্ষে আরও এক ভয়ের কারণ তাঁহাদের সহকারীবর্গ। বাংলার শিক্ষকগণ অপেক্ষা তাঁহাদের ছাত্রগণ এই ক্ষেত্রে অধিকতর পটু। এ পথে চলার এই ভয়ও আছে যে গুরু ও শিষ্যের পদের পরিবর্ত্তন অসম্ভব নয় এবং ইহাও চিন্তার বিষয় যে, যে ছাত্র শিক্ষককে হাত ধরিয়া এই কুটনীতির গিরিসঙ্কটে একবার লইয়া গিয়াছে সে কি আর কোনও দিন সেই শিক্ষককে গুরুর পদমর্য্যাদা দিবে? এমনই ত বাংলার ছাত্রগণ ক্রমেই অবিনয়ী ও উদ্দাম হইয়া শিক্ষাদীক্ষা লাভকে গৌণ ব্যাপারে দাঁড় করাইয়াছে।

সর্ব্বশেষ সমস্যা আর্থিক। রাষ্ট্রের সকল ব্যাপারেই ত অর্থের অভাব। এক্ষেত্রে কতটা সরকারের কর্ত্তব্য এবং কতটা সাধারণের, তাহারও নির্ণয় প্রয়োজন। যদি শিক্ষার যথাযথ প্রসার হয় তবে যেখানে আজ ২২০০০ শিক্ষকের অভাব মোচনের প্রশ্ন রহিয়াছে সেখানে কাল ৮৮০০০ শিক্ষকের প্রশ্ন আসিবে। অবশ্য সে সকল সমস্যাই আমাদের সমাধান করিতে হইবে, কেননা শিক্ষকের সমস্যা ও শিক্ষার সমস্যা একই, এবং আমাদের মতে জাতির জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অন্নবস্ত্র অপেক্ষা কোন অংশে গৌণ নহে।

সুতরাং সকল দিক হইতে শিক্ষকদের এই কর্ম্মবিরতির ব্যাপারে উৎকণ্ঠার কারণ রহিয়াছে। বর্ত্তমান "ঘোলাটে" অবস্থায় এই বিষয়ে অধিক কিছু বলা কঠিন: কেননা আমরা কোন পক্ষের নিকটেই কোনও প্রশ্নের উত্তর পাইতেছি না। আর এই ব্যাপারে মধ্যস্থ হইবার জন্য কাহাকেও দেখিতেছি না।

সেই কারণে আমরা কোনও পক্ষের কোনও বিবৃতি ছাপিলাম না। এ ব্যাপার এতই সাংঘাতিক ও এতই জটিল যে দৈনিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় "সারকুলেশন"-দেবতার নৈবেদ্য রূপে যে রূপকথা এইমত পরিস্থিতিতে প্রকাশিত হয় তাহার অনুকরণও এখন উচিত নহে। আমরা আশা করি সত্বরই এই সমস্যার সমাধানের পথ দেখা যাইবে এবং তত দিন এই পরিস্থিতি শিক্ষকদিগের আয়ত্তের মধ্যে থাকিবে।

কল্যাণীর পরে ?

বিপুল জনসমাবেশ এবং অশেষ জাঁকজমকের মধ্যে কল্যাণীতে কংগ্রেসের উনষষ্টিতম অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। তবে এত যে লক্ষ লক্ষ টাকা ও হাজার হাজার লোকের পরিশ্রম উহাতে ঢালা হইল তাহার ফল কি হইল সে প্রশ্নের উত্তর এখনও আসে নাই।

প্রথম দিনের প্রকাশ্য মহাধিবেশনে শ্রীনেহরু সভাপতির ভাষণে পাকিস্থানে মার্কিন সামরিক সাহায্যদান সম্পর্কে বলেন :

"পাকিস্থানকে যে সামরিক সাহায্যদান সম্পর্কে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহার ফলে গুরুতর অবস্থা সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহার প্রতি আমাদের ঐকান্তিক মনোযোগ দান করা কর্ত্তব্য। ইহার ফলে আমাদের আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নাই। কিন্তু ইহাতে এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যাহার সম্বন্ধে আমরা চিন্তা না করিয়া পারি না। সর্ব্বোপরি যে বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইল জাতীয় সংহতি। আমাদের দীর্ঘ ইতিহাসে বহু বার বাহির হইতে আমাদের দেশের উপর আক্রমণের আশঙ্কা ঘটিয়াছে এবং আমরা আক্রান্তও হইয়াছি। যে ক্ষেত্রে আমরা এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়াছি এবং আমাদের দেশ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত অথবা পরাজিত হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে তাহা অস্ত্রশস্ত্র বা সাহসের অভাবের জন্য ঘটে নাই, পরন্তু আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতার কারণেই ঘটিয়াছে।"

ইহাই ত ভারতের ইতিহাসের সাক্ষ্য !

দ্বিতীয় দিনের মহাধিবেশনে সমাপ্তি ভাষণে পণ্ডিত নেহরু যাহা বলিয়াছিলেন তাহার চুম্বক "যুগান্তর" এইরূপে দিয়াছেন :

"ক্ষতি ও বিপদ আছে জানিয়াই এই জীবনের আনন্দ। যদি কোন বিপদের সম্ভাবনা সম্মুখে না থাকিত, জীবন যদি নিতান্তই নরম, সুখের জীবন হইত, তবে তাহার কি মূল্য ছিল? আজ তাঁহাদের এবং ভারতবাসীর সকলের সম্মুখে বিপদ এবং ক্ষতি এক গৌরবময় ঐতিহাসিক ও মহান্ কর্ত্তব্য পালনের আহ্বানরূপে দেখা দিয়াছে। সুখশায়িত নম্র জীবন নয়, দুর্গম, কঠিন, দুরারোহ পর্ব্বত বিজয়ের মত ভারতবর্ষের উন্নতিবিধানের এই আহ্বান যাঁহারা স্কন্ধে লইবেন, ইতিহাস তাঁহাদের ভাগ্যবান করিয়াছে।"

'জাতির প্রতি আহ্বান' এই প্রস্তাবটি উত্থাপনে তিনি বলেন, ৩৬ কোটি লোকের সমগ্র জীবনের উন্নতিবিধানের দায়িত্ব, এই দেশের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণের কর্ত্তব্য, হউক দুর্ব্বহ, হউক দুঃখকর, কিন্তু উহা কত বড় মহান্ গৌরব তাহা আজিকার দিনের ভারতবাসীকে উপলব্ধি করিতে হইবে। উহা একটা মহাপুরুষের কাজ। অবশ্য তাঁহারা কেহই মহাপুরুষ নহেন। যিনি ছিলেন, তিনি কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু এই ক্ষুদ্র এবং দীন হইতে দীন লোকদের উপরও এই মহাপুরুষের একটা আলো আসিয়া পড়িয়াছে এবং এই আলোর জোরে তাঁহারা পথ চলিতেছেন। সমস্ত দুর্য্যোগের মধ্যে তাঁহারা যে মশাল তুলিয়া ধরিয়াছেন, আজ সেই মশাল হাতে তাঁহারা জীবন-সায়াহ্নে উপনীত, বিকালের আলো জীবনে আসিয়া পড়িয়াছে। এই মশাল আরও উর্দ্ধে, আরও উজ্জ্বলতায় প্রদীপ্ত করিয়া তোলার জন্য তিনি যুবকদের নিকট—যাঁহারা আগামী দিনের মশালবাহক, তাঁহাদের নিকট আবেদন জানান। শ্রীনেহরু জাতীয় ঐক্য, আত্মনির্ভরশীলতা ও কৃচ্ছ্রসাধনের আহ্বান জানাইয়া যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাহা গৃহীত হওয়ার পরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উনষষ্টিতম অধিবেশন পরিসমাপ্ত হয়।

আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে এবং ভারতকে যে নূতন অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে উহার উল্লেখ প্রসঙ্গে শ্রীনেহরু জনগণকে তাঁহাদের ক্ষুদ্র সমস্যা ও অসুবিধা ভুলিয়া গিয়া নবভারত গঠনের বিরাট কর্ম্মপ্রয়াসে ব্রতী হইবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। শ্রীনেহরু বলেন, আমাদের সম্মুখে বিরাট কর্ত্তব্য পড়িয়া রহিয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে, ক্ষুদ্র বাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত থাকা সমীচীন নহে। কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য যে একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা থাকা আবশ্যক তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। অন্য দেশ ভারতকে দুর্ব্বল মনে করিতে পারে ; কেননা শক্তির অর্থে তাহারা অস্ত্রশস্ত্র, অর্থ, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি বুঝে। কিন্তু ভারত শক্তির অর্থে অন্য জিনিষ বুঝে এবং তাহাই ছিল ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদর্শ। স্বাধীনতা-সংগ্রামের পরিচালনা করিয়াছে যেমন পূর্ব্বে কংগ্রেস, তেমনি আজ ভারতের পূর্ণ সংহতি লাভের জন্যও সংগ্রাম করিবে কংগ্রেস। তিনি বলেন, "আমি, আপনারা ও অন্যান্য বহু লোক আসিবে আবার চলিয়া যাইবে, কিন্তু ভারত ও ভারতের জনগণ অমর হইয়া থাকিবে। বর্ত্তমান ভারত এবং আমরা যে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছি উহাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই হইবে বর্ত্তমান বংশধরদের প্রধান কর্ত্তব্য।"

মহাত্মাজীর অভাব আজ সমস্ত দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই নিদারুণভাবে অনুভব করিতেছেন। তাঁহার স্মৃতি-দিবস ত এই সেদিন গেল। আমরা কয়জন নিজের স্বার্থচিন্তা ছাড়িয়া তাঁহার আদর্শের কথা সেদিন ভাবিয়াছি ?

শ্রীনেহরুর ভাষণে ঐক্যের জন্য আহ্বান, এই জাতির জীবনে আজ যে সঙ্কিক্ষণ আগতপ্রায় তাহার জন্য প্রস্তুতির আবশ্যক এবং এই অবস্থায় কংগ্রেসের ও সকল জাতীয়তাবাদী দলের কর্ত্তব্য সম্পর্কে

যে সুস্পষ্ট আহ্বান ও ইঙ্গিত রহিয়াছে সে সম্বন্ধে অন্যমত হওয়ার অবকাশ নাই। বিগত ১৭ই মাঘ ঐ সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্ম বর্দ্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্মিলিত অধিবেশনে সভাপতি জনাব আবদুস সত্তার বলেন :

"গণতন্ত্রের যুগে সকল সময়ই যে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জ্জন করিতে পারিবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। অতএব কংগ্রেসকর্ম্মীদের গ্রামে গ্রামে ও জেলায় জেলায় গিয়া গঠনমূলক কার্য্যের মধ্যে জনসংযোগ বৃদ্ধি করিয়া সংগঠনের অস্তিত্বকে ভবিষ্যতের জন্ম রক্ষা করিতে হইবে।"

তিনি এই সম্পর্কে আরও বলেন, "প্রদেশ কংগ্রেসের শক্তিবল ও অর্থবল জেলা কংগ্রেসের অপেক্ষা অধিক। তাঁহারা যদি কেবলমাত্র 'চোগমলসান' আসবাবপত্রাদির দ্বারা আপিস সজ্জিত করেন, তবে জনসংযোগ রক্ষা হইবে না। আজ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির জেলা কংগ্রেস কমিটিকে নানাদিক হইতে সাহায্য করিতে হইবে। নচেৎ কংগ্রেসের জনসংযোগ কমিয়া যাইবে বলিয়া তিনি মনে করেন।"

ঐ অধিবেশনে জেলার লোকের অবস্থা বিচারের সম্পর্কে নানা কথায় ডাঃ কানাইলাল দাস, এম-এল-এ, একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন, উদ্বাস্তুদের জন্ম সরকার বর্দ্ধমান জেলার গুস্করা অঞ্চলের কয়েকটি গ্রামে যে ভাবে জমি দখল করিয়াছেন, তাহাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। ডাঃ দাস কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনের জন্ম পশ্চিমবঙ্গ সরকার হইতে জমি-জায়গা দখল লওয়া হইতেছে। বর্দ্ধমান জেলা কমিটির এই সাধারণ সভা উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে, উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনকল্পে জমি দখল এমন ভাবে করা হইতেছে যাহার ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের বিশেষ অসুবিধা ও কষ্ট হইতেছে। গুস্করা অঞ্চলের আলুটিয়া, কাটাটিকুরী, গোঁয়ারা প্রভৃতি গ্রামের জমি দখলের নোটিশ জারির ফলে গ্রামবাসিগণের মধ্যে চাঞ্চল্য ও অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। এই সভা আশা করে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিষয়টি পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া জমিগুলি ছাড়িয়া দিবেন।

পূর্ণকুম্ভ যোগে দুর্ঘটনা

প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ যোগ উপলক্ষে স্নানার্থী লোকের সংখ্যা চল্লিশ লক্ষেরও অধিক হয়। বুধবার, ২০শে মাঘ, সর্ব্বাপেক্ষা পুণ্যময় যোগে যখন স্নান চলিতে থাকে সেই সময় মেলার এক অংশে এক ভীষণ দুর্ঘটনায় তিন শতাধিক লোক হত এবং প্রায় দুই হাজার লোক আহত হয়। সেইদিন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু প্রমুখ বহু উচ্চ অধিকারী প্রয়াগে উপস্থিত ছিলেন।

ঐ শোচনীয় দুর্ঘটনার সংবাদ শুনিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু তীর্থযাত্রীরা কেনই-বা ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল এবং তাহাদের সাহায্যের জন্মই বা আর কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা মেলা-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জানিতে চাহেন।

দুর্ঘটনার সময় যেসব সাংবাদিক ঘটনাস্থলে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি তাঁহাদের নিকট ঘটনা-সম্পর্কিত তথ্য অবগত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সরকারী হিসাব অনুযায়ী আনুমানিক সাড়ে তিন শত লোক পিষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং এক হাজারের বেশী লোক আহত হইয়াছে।

সেই রাত্রে মেলা-কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে নিহতের সংখ্যা তিন শত হইতে সাড়ে তিন শত বলিয়া হিসাব দেওয়া হইয়াছিল। উহাতে বলা হইয়াছিল, "জনতার হুড়াহুড়ির কোন সঠিক কারণ জানা যায় নাই। কিন্তু সঠিক তথ্য এই যে, নাগা সন্ন্যাসী ও তীর্থযাত্রীরা একসঙ্গে অগ্রসর হইবার কালে শোভাযাত্রা যাইবার নির্দ্দিষ্ট পথে উপবিষ্ট একদল ভিক্ষুকের সহিত তীর্থযাত্রীরা ভীড়ের চাপে পিষ্ট হইয়া নিহত হয়; একজন নাগা সন্ন্যাসীও এই সময় মারা যায়। ইহা সুস্পষ্ট যে, নাগা সন্ন্যাসীরা সত্যই মারমুখী হইয়াছিল কিনা, তাহা বড় কথা নয়। তবে যেসব তীর্থযাত্রী তাহাদের খুব কাছাকাছি গিয়াছিল—তাহারা শ্রদ্ধাভরে বা অন্য যে কোন মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই যাউক—তাহাদের এই মর্ম্মে ধারণা জন্মে যে, নাগা সন্ন্যাসীরা মারমুখী হইয়া উঠিয়াছে। এই হেতু জনতা প্রাণভয়ে দিগ্বিদিকে ছুটাছুটি করিতে থাকে।

উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়—যাহারা জরাজীর্ণ ও বৃদ্ধ তাহারা অন্যের পদতলে পিষ্ট হয়। ভীড়ের বেগ এত প্রচণ্ড হয় যে, যেসব তীর্থযাত্রী ও ভিক্ষুক শোভাযাত্রা দেখিবার জন্ম মাটিতে বসিয়া ছিল, তাহারা পদতলে পিষ্ট হইয়া নিহত হয়।

অদ্যাবধি ঐ শোচনীয় ঘটনার সঠিক বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। তবে উহার পূর্ণ তথ্য নিরূপণের জন্ম একটি সরকারী তদন্তের ব্যবস্থা হইয়াছে। আশা করা যায়, উহাতে ঐ বিষয়ের সমস্ত তথ্য প্রকাশিত হইবে এবং সরকারী ভুল-ত্রুটি কি ছিল তাহাও নির্দ্ধারিত হইবে। ইতিমধ্যে নানা গুজব ও নানাপ্রকার অভিযোগ-অনুযোগ চলিতেছে।

সরকারী ভুল-ত্রুটি যাহাই হউক, এই মর্ম্মন্তুদ ঘটনার প্রধান কারণ আমাদের সকলের নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যাপারে দারুণ শৈথিল্য। যত দিন না দেশের লোক এ বিষয়ে শিক্ষিত ও অবহিত হইবে তত দিন এইরূপ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকিবেই।

বাঁধ এলাকা দিয়া নাগা সন্ন্যাসীদের এক শোভাযাত্রা অতিক্রম করিবার সময় অধিকতর বিভ্রান্তিকর অবস্থার উদ্ভব হয়। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী শোভাযাত্রাপথের দুই পার্শ্বে স্থান অধিকার করিতে চেষ্টা করে। পুলিস ও স্বেচ্ছাসেবকগণ শোভাযাত্রার জন্ম পথ করিতে গিয়া বিফলকাম হয়।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে প্রকাশ, বহু তীর্থযাত্রী শোভাযাত্রাপথে ভীড় জমায় এবং কিছু সংখ্যক সাধু তাহাদের ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের ত্রিশূল চালায়। ইহাতে বিষম হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায় এবং হাজার হাজার তীর্থযাত্রী কর্দ্দমাক্ত

ময়দানে পড়িয়া যায় এবং তাহাদের পার্শ্ববর্তী জনতার পদতলে পিষ্ট হয়।

মেলা কর্তৃপক্ষ তীর্থযাত্রীদিগকে সঙ্গম এলাকার দিকে অগ্রসর না হইতে অনুরোধ জানান; কিন্তু স্নানার্থীদের ভীড়ের চাপ অব্যাহত থাকে।

আনুমানিক দুই হাজার বর্গ গজ পরিমিত স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।"

ঘটনাটি ঘটে নিমেষের মধ্যে। সওয়া-বিঘা প্রমাণ জমিতে হাজার হাজার লোক উন্মত্তের ন্যায় ছুটাছুটি করায় এতগুলি নিরীহ নরনারী ও শিশুর প্রাণ গেল।

রাজ্যের সীমানা পুনর্গঠন কমিশন

কল্যাণী কংগ্রেসে এই কমিশন গঠন ও তাহার কার্য্যারম্ভের আভাস দেওয়া হয়। সম্প্রতি ঐ প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইতেছে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে:

"নয়াদিল্লী, ১০ই ফেব্রুয়ারী—আগামী কল্য নয়াদিল্লীতে রাজ্যের সীমানা পুনর্গঠন কমিশনের প্রথম আনুষ্ঠানিক অধিবেশন হইবে, এই অধিবেশনে নিছক কার্য্যবিধি ও প্রাথমিক বিষয়সমূহ আলোচনা হইবে বলিয়া মনে হয়। কমিশনের সভাপতি জনাব ফজল আলি গতকল্য দিল্লী পৌঁছিয়াছেন এবং কমিশনের অপর দুই সদস্য শ্রী কে. এম পানিকর এবং পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু পূর্ব্ব হইতেই দিল্লীতে আছেন। তথ্য ও বেতার দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রী পি. সি, চৌধুরীকে সেক্রেটারী নিয়োগ করা হইয়াছে।

কমিশনের সদর কার্য্যালয় দিল্লীতেই থাকিবে। তবে বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং হায়দরাবাদে কয়েকটি আঞ্চলিক কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে বলিয়া মনে হয়।"

পশ্চিমবঙ্গে আঞ্চলিক কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল না কেন জানি না। তবে কল্যাণী কংগ্রেসের অধিবেশনে বিহার ও বাংলার মধ্যে যেরূপ মনোমালিন্যের নিদর্শন পাওয়া যায় তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের দাবি সম্পর্কে আমাদের অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে।

মানভূমে যাহা চলিতেছে তাহার বিষয়ে অন্যত্র লেখা হইয়াছে। কিন্তু বিহারী "সাম্রাজ্যবাদ" অন্যস্থলেও কিভাবে চলিতেছে তাহার কিছু পরিচয় এখানে দেওয়া সমীচীন মনে করায় আমরা নিম্নের সংবাদটিও এই সঙ্গে দিলাম:

"কটক, ৯ই ফেব্রুয়ারী—রবিবার সেরাইকেল্লায় উৎকল সম্মিলনীর জনসভা গুণ্ডামি করিয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং উৎকলের অন্তর্ভুক্তি-কামী কর্ম্মী ও নেতাদের উপর অত্যাচারের সংবাদে বিহারের সরকারী কর্তৃপক্ষের আচরণের তীব্র নিন্দা করা হইতেছে। সেরাইকেল্লা ও খারসোয়ানের উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্তির দাবির বিরুদ্ধতা সর্ব্বত্র নিন্দিত হইতেছে। র‍্যাভেনশ' কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকদের সভায় এই উচ্ছৃঙ্খলতার তীব্র নিন্দা করা হইতেছে। সেরাইকেল্লায় উড়িষ্যার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অপমানে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। বাক্-স্বাধীনতা ও সভা-সমিতির স্বাধীনতা হরণের এই সংবাদে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ভারত-সরকারকে এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য বিচার-বিভাগীয় ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ করিতে অনুরোধ করা হয়। অধ্যাপক শ্রী বি. সি. দাস এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। অধ্যাপক জে. কে. মিশ্র, আর. কে. বি. এন. মিশ্র ও এ. কে. সেন উড়িষ্যার নেতৃবৃন্দের এই নির্যাতনের নিন্দা প্রসঙ্গে মানভূমে বাঙালী নেতৃবৃন্দের নির্যাতনের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, একটি প্রতিবেশী রাজ্য অপর দুইটি প্রতিবেশী রাজ্যের নেতৃবর্গের অপমান ও নির্যাতন করিয়া প্রতিবেশীসুলভ মনোবৃত্তির হানি করিয়া যে জঘন্য তিক্ততার সৃষ্টি করিতেছেন, তাহা কেবল পাকিস্থানের কার্য্যকলাপের সহিতই তুলনীয়। উৎকল সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীনবকৃষ্ণ দাস অপর একটি জনসভায় বিহার-সরকারের কার্য্যকলাপের নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করেন।"

কাশ্মীর, ভারত ও পাকিস্থান

সম্প্রতি কাশ্মীরের গণপরিষদ কাশ্মীরের সহিত ভারতের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করিয়া ভারতে যোগদান সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ফলে পাকিস্থানে কিছু আন্দোলন হইয়াছে মনে হয়।

"করাচী, ১০ই ফেব্রুয়ারী—কাশ্মীর গণপরিষদ ভারতে যোগদানের অনুকূলে সম্প্রতি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে তাহা নাকচ করিবার জন্য শ্রীনেহরুকে অনুরোধ জানাইয়া পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী তাঁহার নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।"

পাকিস্থানের পররাষ্ট্র-সচিব জাফরউল্লা খানও জানাইয়াছেন যে, কাশ্মীর গণপরিষদ অতি গর্হিত কাজ করিয়াছে এবং এই ব্যাপারে পণ্ডিত নেহরুর কর্তব্য কি তাহাও তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তবে দু'জনের কেহই মার্কিন রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধাস্ত্র সম্পর্কিত চুক্তি বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিতেছেন না। চুক্তি মত অস্ত্র সরবরাহ ও তাহার ব্যবহারের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে পরে আবার জেহাদের দামামা বাজিবে কিনা সে বিষয়ে দুই জনই "নিশ্চুপ"!

পূর্ব্ববঙ্গে নির্ব্বাচন

পূর্ব্ববঙ্গে নির্ব্বাচনের পর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে। মুস্লিম লীগ এবার শহীদ সুরাবর্দ্দি সাহেব এবং ফজলুল হক সাহেবের দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইয়াছে! বিরোধী পক্ষগুলি পরস্পরের বিরুদ্ধে জোর প্রচার করিতেছেন। তাহার কিছু পরিচয় নিম্নস্থ সংবাদে পাওয়া যায়:

"ঢাকা, ২রা ফেব্রুয়ারী—কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতা জনাব এ. কে. ফজলুল হক ফরিদপুরের এক নির্ব্বাচনী সভায় বলেন যে, পাকিস্থানের স্বার্থরক্ষার জন্য হিন্দুমন্ত্রী নিয়োগ প্রয়োজন হইলে তিনি তাঁহার মন্ত্রিসভায় হিন্দুমন্ত্রী নিয়োগ করিতে দ্বিধা করিবেন না।

সম্প্রতি মুস্লিম লীগ মিঃ হকের বিরুদ্ধে এই প্রচারকার্য্য আরম্ভ করে যে, নির্ব্বাচনে জয়ী হইলে তিনি হিন্দু মন্ত্রী নিয়োগ করিবেন।

তিনি জানিতে চাহেন যে, কায়েদে আজম কি তাঁহার মন্ত্রিসভায় শ্রীযোগেন মণ্ডলকে গ্রহণ করেন নাই এবং পূর্ব্ববঙ্গ মন্ত্রিসভায়ও কি শ্রীদ্বারিকানাথ বাড়োরী স্থান পান নাই ?

ভাষা সমস্যার উল্লেখ করিয়া মিঃ হক বলেন যে, মুস্লিম লীগ নির্ব্বাচনে জয়ী হইলে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা পাইবে না। তিনি বলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তাঁহারা গদী পাইলে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহারা এই সম্পর্কে কি করিয়াছেন ?

মিঃ হক পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে দারিদ্র্য ও অনশনের কবল হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিবেন।"

নির্ব্বাচনে পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দুর কিরূপ অবস্থা ও প্রতিষ্ঠা হইবে সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ রহিয়াছে। এ পর্য্যন্ত খবর যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহাতে ত ভরসা বিশেষ নাই। হিন্দু নেতারা দলাদলি পুরামাত্রায় করিতেছেন। ফলে নির্ব্বাচনের পরে তাঁহারা নানা দলে বিভক্ত হইয়া ক্রীড়াকন্দুকে পরিণত হইবেন।

বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক মহাসম্মেলন

গত ১৮ই মাঘ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—আশুতোষ হলে বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক মহাসম্মেলনের দশম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন নিজ অভিভাষণে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষাসম্বন্ধে এই তথ্যগুলি পরিবেশন করিয়াছেন :

"ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই আয়ুর্ব্বেদ চর্চা এখনও অব্যাহত আছে এবং প্রাদেশিক সরকারের সাহায্যও এখন পাওয়া যাইতেছে। আমরা দেখিতে পাই, আসামে দুইটি আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষালয় আছে। ইহার জন্য ১৯৫১-৫২ সনে ১৬,৮০০ টাকা সরকারের ব্যয়বরাদ্দ ছিল।

বিহারে চারিটি আয়ুর্ব্বেদ কলেজ এবং দুই শত আয়ুর্ব্বেদ চতুষ্পাঠী আছে। ইহার জন্য ১৯৫১-৫২ সনে ৫২,১৬৩ টাকা সরকারের ব্যয়বরাদ্দ ছিল।

বোম্বাইয়ে আটটি আয়ুর্ব্বেদ কলেজ আছে এবং ইহার জন্য ১৯৫১-৫২ সনে ৯৯,৬৫০ টাকা সরকারের ব্যয়বরাদ্দ ছিল।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে ৫৮টি আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষালয় আছে। রায়পুর আয়ুর্ব্বেদ স্কুলের জন্য ১৯৫১-৫২ সনে ৫১,৮০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ছিল। ইহা ভিন্ন পূর্ব্বে সরকার ৮৩টি আয়ুর্ব্বেদ ও ইউনানী দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্রের জন্য ৭৮ হাজার ২০ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। মাদ্রাজে ৬টি আয়ুর্ব্বেদ কলেজ আছে, ইহার মধ্যে একটি সরকারী আয়ুর্ব্বেদ কলেজ। ইহার জন্য ১৯৫১-৫২ সনে ১০,৪২,-৪০০ শত টাকা সরকারের ব্যয়বরাদ্দ ছিল।

উড়িষ্যায় দুইটি আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষালয় আছে, ইহার মধ্যে একটি সরকারী আয়ুর্ব্বেদ কলেজ। ১৯৫১-৫২ সনে ২,৪৩,৯১৭ টাকা সরকারের ব্যয় বরাদ্দ ছিল।

উত্তর প্রদেশে নয়টি আয়ুর্ব্বেদ কলেজ আছে। তন্মধ্যে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আয়ুর্ব্বেদ কলেজ ও ঝাঁসী আয়ুর্ব্বেদ বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম। ইহার মধ্যে পাঁচটি গবর্ণমেন্ট আয়ুর্ব্বেদ কলেজ। ১৯৫১-৫২ সনে ইহার জন্য সরকারের ২১,৮৯,৯৮০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ছিল। পশ্চিমবঙ্গে তিনটি আয়ুর্ব্বেদ কলেজ ও দুইটি আয়ুর্ব্বেদ চতুষ্পাঠী আছে। ১৯৫১-৫২ সনে কলিকাতার তিনটি আয়ুর্ব্বেদ কলেজ-সংলগ্ন হাসপাতালে ৩৫০০০ টাকা সরকার ব্যয় করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন আজমীর, দিল্লী, কোচিন, গোয়ালিয়র, হায়দ্রাবাদ, ইন্দোর, জয়পুর, পাতিয়ালা, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, ত্রিবান্দ্রাম, বাঙ্গালোর, দক্ষিণ মালাবার প্রভৃতিতে কোন স্থানে একটি, কোন কোন স্থানে একাধিক আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে। তন্মধ্যে জয়পুর, ত্রিবাঙ্কুর, ত্রিবান্দ্রাম, হায়দ্রাবাদ-ডেকান ও পাতিয়ালা প্রভৃতি স্থানের আয়ুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠানগুলি গবর্ণমেন্টের।

স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশে আয়ুর্ব্বেদ প্রসারের জন্য যে চেষ্টা হইতেছে তাহাও উল্লেখযোগ্য। মাদ্রাজে বর্ত্তমানে ৮৪১টি দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র আছে, তন্মধ্যে ৫২২টি দেশীয় চিকিৎসাকেন্দ্র। উত্তর প্রদেশের রাজ্য সরকারের গ্রামাঞ্চলে ৫২০টি দেশীয় চিকিৎসাকেন্দ্র আছে। হায়দ্রাবাদে ৫২টি আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাকেন্দ্র আছে।"

নরসিংদাস বাংলা পুরস্কার, ১৯৫২

সাহিত্য এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বাংলা পুস্তক ও থিসিসের লেখকদের উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস-এর ডিরেক্টর কলিকাতা নিবাসী নরসিংদাস আগরওয়ালা কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থ হইতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মাধ্যমে একটি পুরস্কার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এক হাজার টাকা মূল্যের এই পুরস্কার পর্য্যায়ক্রমে সাহিত্য এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়ের জন্য প্রদত্ত হইবে। ১৯৫২ সালের পুরস্কার সাহিত্যের জন্য দেওয়া হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। কোন বৎসরে নির্দ্ধারিত বিষয়ের জন্য যোগ্য প্রার্থীর অভাব হইলে উক্ত পুরস্কার সাহিত্যের বদলে বিজ্ঞান, অথবা বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তে সাহিত্যের জন্য প্রদত্ত হইতে পারে।

যে বৎসরের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হইবে, সেই বৎসরে প্রকাশিত পুস্তক এবং থিসিসসমূহের মধ্যে নির্ব্বাচনী সমিতি যেটিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত করিবেন তাহার রচয়িতাকেই পুরস্কার দেওয়া হইবে। ১৯৫২ সনের ৩০শে জুনের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত পুস্তকের লেখক, প্রকাশক এবং লেখকদের অনুরাগী ব্যক্তিদিগকে প্রত্যেক পুস্তকের আটখানি কপি, বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতির বিবেচনার্থে ১৯৫৪ সনের ২৭শে

ফেব্রুয়ারীর আগে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার টি. টি. এস আয়ারের নিকট (পোঃ দিল্লী) পাঠাইয়া দিবার জন্য আমন্ত্রণ জানান হইয়াছে।

খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ

মহাত্মা গান্ধীর মত ছিল যে, নিয়ন্ত্রণ প্রথাই দেশের বহু অনাচারের আকর। ইহা সত্য যে কালোবাজার ও নিয়ন্ত্রণ প্রথা পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। তবে দেশের লোক এখনও সমাজ বা দশের মঙ্গল অপেক্ষা নিজের স্বার্থকেই অধিক বুঝে, সেজন্য নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে দরিদ্রের সর্ব্বনাশ আরও দ্রুত ও নিশ্চিত হইত। তবে এখন দেবতা কিছু প্রসন্ন হওয়ায় খাদ্যের অভাব ততটা প্রবল নয়। সেইজন্য নিম্নের সংবাদটি আশাপ্রদ :

"বল্লভবিদ্যানগর, ৩১শে জানুয়ারী। আজ এখানে এক সাক্ষাৎকারে ভারত-সরকারের খাদ্য-সচিব শ্রীরফি আমেদ কিদোয়াই বলেন, 'সরকারের হাতে দশ লক্ষ টন চাউল মজুত হইবামাত্র চাউলের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ আদেশ তুলিয়া লওয়া হইবে।' তিনি ঘোষণা করেন যে, এক্ষণে দেশে খাদ্যশস্যের আর কিছুমাত্র ঘাটতি নাই।

চাউল বিনিয়ন্ত্রণের জন্য এক্ষণে বিদেশ হইতে সাত লক্ষ টন চাউল আমদানী করা প্রয়োজন। আর বৎসরখানেকের মধ্যেই ইহা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

দেশবাসীর মনে আস্থা সঞ্চার ও উহা বজায় রাখার জন্যই এক্ষণে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করা হইতেছে। বর্ত্তমানে বিশ্বে ৪০ লক্ষ টন চাউল বাড়তি আছে। ভারত এক্ষণে তাহার নিজের দরেই কেবল চাউল আমদানী করিবে।

ভারতে গমের অবস্থা অত্যন্ত সন্তোষজনক। এক লক্ষ টন গম লওয়া হইবে বলিয়া আন্তর্জাতিক গম বোর্ডকে কথা দেওয়া সত্ত্বেও ভারত এপর্য্যন্ত এক জাহাজের বেশী গম আমদানী করে নাই।"

শ্রীকিদোয়াই বলেন যে, শুধু চাউল বিনিয়ন্ত্রণই নয়, কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে খাদ্যদপ্তর তুলিয়া দেওয়াই ভারত-সরকারের লক্ষ্য।

খাদ্য-সচিব বলেন যে, বিভিন্ন রাজ্য-সরকার কর্ত্তৃক খাদ্যশস্য সংগ্রহ করায় খাদ্যশস্যের দর চড়া রহিয়াছে ; যথাসময়ে এই সংগ্রহ বন্ধ হইবে এবং তখন হইতেই দর নামিয়া যাইবে। তবে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, খাদ্যশস্যের দর যাহাতে এমন নামিয়া না যায় যে, উহার ফলে চাষীদের ক্ষতি হইতে পারে। চাষীদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে রাজ্য সরকারগুলির উচিত মূল্যে খাদ্যশস্য ক্রয় করা কর্ত্তব্য।

শ্রীকিদোয়াই ঘোষণা করেন যে, এক্ষণে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্যশস্যের উৎপাদন অবিভক্ত ভারতের উৎপাদন ছাড়াইয়া গিয়াছে। শুধু খাদ্যশস্যই নয়, অন্যান্য বহু পণ্যের—যেমন বস্ত্র-উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবিভক্ত ভারতে বার্ষিক প্রায় ৭০ কোটি গজ বস্ত্র আমদানী করিতে হইত, কিন্তু আজ ভারত বৎসরে ঐ পরিমাণ বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী করিতেছে।

সবই নির্ভর করিতেছে আগামী বর্ষা-ঋতুর উপর। দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে অন্নবস্ত্রের মূল্য হ্রাস না হইলে রক্ষা নাই। চাউল সম্পর্কে ত সরকারী অধিকারীবর্গ খুব ভরসা দিতেছেন। শুধু যা পশ্চিমবঙ্গের কপালে উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের ভেজাল ভরা জঘন্য কদন্ন ! চাউল নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে শেষ কথা এইরূপ :

"বোম্বাই, ১লা ফেব্রুয়ারী—আজ এখানে এক সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় খাদ্য-সচিব শ্রীরফি আমেদ কিদোয়াই বলেন যে, ভারতে এখন এত চাউল আছে যে, তাহার বর্ত্তমান চাহিদা মিটিয়াও কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে। '৫৩-'৫৪ সালে ভারতে '৫২-'৫৩ সালের অপেক্ষা অধিক এবং ৫১-৫২ সালের অপেক্ষা ৪০ লক্ষ টন অধিক চাউল উৎপন্ন হইবে। দেশে যে চাউল আছে তাহাতেই দেশের চাহিদা সম্পূর্ণরূপে মিটিয়া যাইবে। বস্তুতঃ দেশে এখন এত চাউল আছে যে, ভারত-সরকার চাউলের রেশন বৃদ্ধি করিবার জন্য কয়েকটি রাজ্যকে অধিকতর পরিমাণে চাউল সরবরাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন। দেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ চাউল মজুত হওয়া মাত্র তিনি চাউলের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইবেন।"

কেন্দ্রীয় রাজস্ব

ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় রাজস্ব সম্পর্কে নিম্নে উদ্ধৃত সংবাদটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

"৩রা ফেব্রুয়ারী—১৯৫৩-৫৪ সালের প্রথম নয় মাসে সংগৃহীত শুল্কের হিসাব হইতে মনে হয় যে, চলতি আর্থিক বৎসরে ভারতের স্থল ও সমুদ্র শুল্কের পরিমাণ অনেক কম হইবে।

গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট ১২৪ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা স্থল ও সমুদ্র শুল্ক সংগৃহীত হইয়াছে ; অথচ গত বৎসরে (১৯৫২-৫৩) ঐ সময়ে ১২৯ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। গত বৎসরে সংগৃহীত শুল্কের মোট পরিমাণ ছিল ১৬৭ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা।

সারা বৎসর স্থল ও সমুদ্র শুল্ক সংগ্রহের পরিমাণ অনেকটা একই রকম আছে। তাই মনে হয়, এই বৎসর সর্ব্বসাকুল্যে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা সংগৃহীত হইবে। বাজেটে স্থল ও সমুদ্র শুল্ক সংগ্রহ বাবদ ১৭০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছিল। সুতরাং ঘাটতির পরিমাণ অনেক হইবে।

কেন্দ্রীয় রাজস্বের তিনটি প্রধান উৎস হইতেছে—স্থল ও সমুদ্র শুল্ক, কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক ও আয়কর। চলতি বৎসরের ৯ মাসে এই তিনটি খাতে আয় হইয়াছে ২৭৭ কোটি টাকা ; গত বৎসরে ঐ সময়ে উহার পরিমাণ ছিল ৩০১ কোটি টাকা।

১৯৫২-৫৩ সালে উক্ত তিনটি খাতে মোট আয় হইয়াছিল ৪৩৬ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে আয়ের পরিমাণ কম করিয়া ৪২১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে ; কিন্তু এ টাকাও সংগৃহীত হইবে কিনা সন্দেহ।"

যেভাবে আয় কমিতেছে তাহাতে খরচের সঙ্কোচ বিশেষ প্রয়োজন এ কথা বলা বাহুল্য। অপব্যয়ও এখনও বহু দিকে হইতেছে তাহারও প্রতিকার আশু প্রয়োজন। কিন্তু সাধারণ ভাবে

যে সকল কথাবার্ত্তা—আয় ব্যয় সম্পর্কে শুনা যায় তাহাতে এক বিভাগের খাতের টাকা অর্দ্ধেক করিয়া অন্য বিভাগে চতুর্গুণ ব্যয়ের দাবিই শুনা যায়। আরও শুনা যায় যে, সর্ব্বোপরি আছে বিশল্যকরণী "ডেফিসিট ফাইনান্সিং।"

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গাত

প্ল্যানিং কমিশন সম্প্রতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অগ্রগতি সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৫৩-৫৪ সালের অর্থ নৈতিক বৎসর শেষ হওয়ার সঙ্গে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তিন বৎসর পূর্ণ হইবে। এই তিন বৎসরে মোট খরচ হইয়াছে ৯৯৮ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ১৯৫৩-৫৪ সালে ৪১৩ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে, ১৯৫২-৫৩ সালে খরচ হইয়াছে ৩২৩·৫ কোটি টাকা এবং ১৯৫১-৫২ সালে হইয়াছে ২৬১·৫ কোটি টাকা। পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত হিসাব অনুসারে আগামী বাকি দুই বৎসরে আরও ১০৬৯ কোটি টাকা খরচ হইবে। সম্প্রতি অতিরিক্ত ১৭৫ কোটি টাকা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য ধার্য্য করা হইয়াছে—এই অতিরিক্ত ব্যয়ও আগামী দুই বৎসরে হইবে।

রিপোর্টে পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে আশার কথা বলা হইয়াছে। ১৯৫২-৫৩ সালে ভারতবর্ষে খাদ্যশস্যের উৎপাদন অতিরিক্ত ৪৪ লক্ষ টন হইয়াছে। শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫১ সালে শিল্পজাত দব্যের সূচীসংখ্যা ছিল ১১৭; ১৯৫২ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ১২৯-এ এবং ১৯৫৩ সালের প্রথম আট মাসে ইহা ছিল ১৩৪-এ। ১৯৫১ সালের শেষে পাইকারী মূল্যমান ছিল ৪৩৩, ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে ইহা নামিয়া আসিয়া ৩৯৩-তে দাঁড়ায়। ১৯৫১-৫২ সালে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে ১৩৪ কোটি টাকা ঘাটতি ছিল। গত বৎসরের সমস্ত মাসের হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই; তবে ১৯৫৩ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত বহির্ব্বাণিজ্যে ভারতের ৬৪ কোটি টাকার মত উদ্বৃত্ত ছিল। সুতরাং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গত তিন বৎসরের তিনটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হইতেছে: (১) উৎপাদন বৃদ্ধি—কৃষি এবং শিল্পে; (২) মূল্যনিয়ন্ত্রণ ও স্থিতি, এবং (৩) আর্থিক স্থিতিশীলতার সূচনা।

কমিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, প্রাথমিক অসুবিধা সত্ত্বেও প্রতি বৎসরই খরচের পরিমাণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথম বৎসর খরচ হইতে রাজস্বের পরিমাণ কিছু উদ্বৃত্ত ছিল। দ্বিতীয় বৎসর ১২০ কোটি টাকার মত বাজেট ঘাটতি পড়ে। যদিও ঐ বৎসর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ভারত-সরকারের ঋণের পরিমাণ প্রায় ৪০ কোটি টাকার মত হ্রাস পায়। প্রথম দুই বৎসরে প্রায় ৪০।৪৫ কোটি টাকার মত ঘাটতি খরচ হয়।

প্রথম তিন বৎসরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রগুলি প্রায় ৩০ কোটি টাকার মত অতিরিক্ত কর বাবদ আদায় করিয়াছে। ১৯৫৩-৫৪ সাল হইতে পরিকল্পনার গতি দ্রুত করা হইয়াছে, সেইজন্য রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, প্রদেশগুলিকে অধিকতর পরিমাণে নূতন নূতন রাজস্বের সংস্থান করিতে হইবে। টাকার বাজারের অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইতেছে। ১৯৫১-৫২ সালে প্রদেশগুলি প্রায় ১২ কোটি টাকা ঋণ তুলিয়াছেন; ১৯৫২-৫৩ সালে ১৭ কোটি টাকা ঋণ তুলিয়াছেন এবং ১৯৫৩-৫৪ সালে ৩৯ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন।

স্বল্প জমার ক্ষেত্রে প্রথম দুই বৎসরে ১০৩ কোটি টাকা জমা পড়িয়াছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মতে পাঁচ বৎসরের শেষে স্বল্প জমার পরিমাণ ২৭০ কোটি টাকা হওয়া চাই। গত তিন বৎসরে প্রদেশগুলি ১৮৩ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সাহায্য পাইয়াছে; ইহার মধ্যে ১৬৩ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে এবং ২০ কোটি টাকা অনুদান হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

এই তিন বৎসরে ১৩৩ কোটি টাকা বিদেশী সাহায্য হিসাবে ভারতবর্ষ পাইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ফোর্ড প্রতিষ্ঠান এবং নরওয়ে হইতে ভারতবর্ষ সাহায্য পাইয়াছে। এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতেও অনেক টাকা ঋণ লইয়াছে। নিম্নে পরিকল্পনার কিছু কিছু হিসাব দেওয়া হইল।

কৃষি এবং লোকসমাজ পরিকল্পনা

১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় ১৯৫২-৫৩ সালে ৪৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাঁচ লক্ষ একর পতিত জমি চাষ-আবাদী করা হইয়াছে। প্রায় ৪৭,০০০ গ্রাম (অধিবাসীর সংখ্যা ৩·৭০ কোটি) জাতীয় বিস্তার-কার্য্যাবলী পরিকল্পনার আওতার মধ্যে আনা হইয়াছে। ছোট ছোট সেচ কার্য্যের সাহায্যে প্রায় ২৫ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সেচ এবং শক্তি—নদী-উন্নয়ন পরিকল্পনা আজ পর্য্যন্ত প্রায় ১৫ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করিয়াছে। নদী পরিকল্পনার দ্বারা প্রায় ৪.২৫ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

শিল্প—১৯৫০-৫১ সালে সূতা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১১৭ কোটি পাউণ্ড; ১৯৫২-৫৩ সালে উৎপন্ন সূতার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪৫ কোটি পাউণ্ড। গত বৎসর প্রায় ৪,৭০ কোটি গজ বস্ত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে। সিমেন্টের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে সিমেন্টের উৎপাদন ছিল ২৬ লক্ষ টন, আর ১৯৫২-৫৩ সালে হইয়াছে ৩৫ লক্ষ টন। গত বৎসর সিন্ত্রী সার কারখানায় ২·৫২ লক্ষ টন এমোনিয়া সালফেট উৎপন্ন হইয়াছে। চিত্তরঞ্জন-ইঞ্জিন কারখানায় আজ পর্য্যন্ত মোট এক শতটি ইঞ্জিন প্রস্তুত হইয়াছে। টেলিফোন কারখানায় ৪০,০০০ টেলিফোন গত বৎসর প্রস্তুত করা হইয়াছে। একটি নূতন লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য ভারত-সরকার জার্ম্মানীর বিখ্যাত ক্রাপ্‌ কোম্পানীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন। ২৪০ মাইল রাষ্ট্রীয় রাজপথ তৈয়ার করা হইয়াছে এবং আরও ৪৫০ মাইল রাস্তা তৈয়ারি করা হইতেছে। প্রদেশগুলিতে প্রায় ৭,২০০ মাইল রাস্তা তৈয়ারি করা হইয়াছে। উপকূল বহন ব্যবস্থায় জন্য বর্ত্তমানে ভারতীয়দের প্রায় ৭৭,০০০ হাজার

টন জাহাজ নিয়োজিত আছে। বর্তমানে উপকূল ব্যবসায় সমস্তটাই ভারতীয়দের কর্তৃত্বাধীন। বিশাখাপত্তনমের হিন্দুস্থান জাহাজ নির্মাণ কারখানায় পরিকল্পনার দুই বৎসরে ৮০০০ টনের ছয়টি জাহাজ নির্মিত হইয়াছে।

সমাজসেবা—পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আগত বাস্তুহারাদের ক্যাম্প প্রায় তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের প্রায় সকলকেই বিভিন্ন কার্যে নিয়োগ করা হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে বারো লক্ষ। ইহাদের মধ্যে ৩৬,০০০ জন এখনও ক্যাম্পে আছে। ইহারা প্রধানতঃ স্ত্রীলোক, শিশু ও বৃদ্ধ। পশ্চিম-পাকিস্থান হইতে আগত প্রায় ২৫ লক্ষ লোককে গ্রামে চাষবাসে বসতি করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আরও প্রায় ২৫ লক্ষ লোককে শহরে বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করা হইয়াছে। ইহাদের জন্য ভারত-সরকার প্রায় ১,৩৯,০০০ নূতন বাড়ী নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত যাহারা ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া পাকিস্থানে চলিয়া গিয়াছে তাহাদের প্রায় ১,৭৯,০০০ বাড়ী পাকিস্থান হইতে আগত বাস্তুহারাদের দেওয়া হইয়াছে। ১৪·৭ লক্ষ লোককে পুরানো বাড়ী দেওয়া হইয়াছে এবং ৯·১৭ লক্ষ লোককে নূতন বাড়ী দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের জীবিকানির্বাহক কার্যে নিয়োজিত হওয়ার জন্য ভারত-সরকার ১১ কোটি টাকা খরচ করিয়াছেন।

পূর্ব্ব-পাকিস্থান হইতে আগত প্রায় আড়াই লক্ষ পরিবারকে সরকার চাষবাসে পুনর্বসতি করাইয়া দিয়াছেন। ইহাদের গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য নয় কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে। চাষের যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার জন্যও ৮ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের পুনর্বসতির জন্য প্রায় ১২টি নূতন শহর গড়িয়া উঠিয়াছে।

বেকার-সমস্যা—প্ল্যানিং কমিশন বেকার-সমস্যা সমাধানকল্পে সচেষ্ট হইয়াছেন এবং ইহার জন্য পরিকল্পনার খরচ ১৭৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। নদী-পরিকল্পনা, লোকসমাজ-পরিকল্পনা, জাতীয় সম্প্রসারণ-কার্য্যাবলীতে বহু লোক নিয়োজিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার বেকার-সমস্যা সমাধানকল্পে পুনর্বসতির জন্য ৪৫ কোটি টাকা খরচ করিবেন, রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য দশ কোটি টাকা ব্যয় করিবেন, অফিস-ঘর ও বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য ২·৫ কোটি টাকা, স্বাস্থ্য পরিকল্পনায় ২ কোটি টাকা, কৃষি-উন্নয়ন খাতে ২·১৬ কোটি এবং অন্যান্য বিবিধ পরিকল্পনায় ৮·৩৪ কোটি টাকা ব্যয় করিবেন। পুনর্বসতির জন্য পাঁচ বৎসরে মোট ১৩০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার এক বৎসর

একটি সরকারী বিবৃতিতে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার এক বৎসরের কার্য্যের হিসাবনিকাশে বলা হইয়াছে যে, ২৩,৬৫০টি গ্রামের ২ কোটি ১৫ লক্ষ লোক সম্বলিত ২২০টি উন্নয়ন অঞ্চলে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে। ১৯৫২ সনে ভারত-সরকার সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত করেন এবং ঐ বৎসরই ২রা অক্টোবর ভারতের ৫৫টি উন্নয়ন-অঞ্চলে পরিকল্পনার উদ্বোধন করা হয়। ১৯৫৩ সনে ভারত-সরকার জাতীয় সম্প্রসারণ-পরিকল্পনা আরম্ভের যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহাতে পরিকল্পনাকালে ১ লক্ষ ২০ হাজার গ্রাম এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইবে। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে জাতীয় সম্প্রসারণ-পরিকল্পনা একত্র করিয়া কাজ চলে।

উক্ত বিবৃতি অনুযায়ী প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে পরিকল্পনা কমিশন ১৯৫৩-৫৪ সালে জাতীয় সম্প্রসারণ-পরিকল্পনার জন্য ২৩৭টি ব্লক বরাদ্দ করেন। এই দুইটি পরিকল্পনার দ্বারা নিম্নোক্ত সংখ্যক গ্রাম উপকৃত হইবে :

	পল্লী	লোকসংখ্যা
সমাজ-উন্নয়ন ব্লক ২২০	২৩,৬৫০	২ কোটি ১৫ লক্ষ
জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক ২৩৭	২৩,৭০০	১ কোটি ৫৬ লক্ষ
মোট ৪৫৭	৪৭,৩৫০	৩ কোটি ৭১ লক্ষ

সমাজ-উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ এই উভয় পরিকল্পনারই অন্যতম লক্ষ্য কৃষির উন্নয়ন—তবে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্ম্মসূচী আরও ব্যাপক।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সম্প্রসারণ পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ ১০১ কোটি টাকার মধ্যে প্রথম বৎসরের কাজের জন্য সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনায় ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, "জাতীয় পরিকল্পনা-কালে গড়ে যে টাকা ব্যয় হওয়ার কথা তাহার তুলনায় ইহা কমই।" প্রথম বৎসরে জনসাধারণ যে পরিমাণ কাজ দিয়াছে তাহার দাম অনুমান ৬৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার মত। ইহা ছাড়া, নগদে বা অন্যান্যভাবে তাহারা ৮২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দিয়াছে। তাহাদের মোট দানের পরিমাণ ১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। প্রথম বৎসরে অন্যান্য অসুবিধার মধ্যে উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

প্রথম বৎসরের কাজের অগ্রগতি নিম্নরূপ :

২রা অক্টোবর, ১৯৫২	৭৭টি ব্লক
জুন, ১৯৫৩	৬৭টি ব্লক
২রা অক্টোবর, ১৯৫৩	২৩টি ব্লক
৩১শে অক্টোবর, ১৯৫৩	৫৩টি ব্লক
	মোট ২২০টি ব্লক

প্রথম বৎসর কৃষির উন্নতির জন্য পতিত জমি আবাদ, সেচের ব্যবস্থা করা, সার সরবরাহ করা, গবাদি পশুর উন্নয়ন প্রভৃতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। আলোচ্য সময়ে পচাই সার উৎ-পাদনের জন্য দেড় লক্ষ গর্ত খনন করা হয়, সাড়ে ছয় লক্ষ মণ সার সরবরাহ করা হয়। ইহা ছাড়া ২ লক্ষ ১৫ হাজার মণ উন্নত বীজ

বিতরণ করা হইয়াছে। সমাজ-উন্নয়ন অঞ্চলে ৫৪,৯৬৮ একর পতিত জমিতে আবাদ করা হইয়াছে। ১,৩০,৩২৯ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ৩৭ হাজার একর জমিতে ফল ও তরিতরকারীর আবাদ করা হইয়াছে। ১৯টি মূল কেন্দ্র ও ১৫৫টি পশু চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ১১ লক্ষ গবাদি পশুকে বিভিন্ন রোগের টীকা দেওয়া হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ৯ হাজার কূপ সংস্কার এবং ১৩ শত নূতন কূপ এবং ১২টি নলকূপও স্থাপন করা হইয়াছে। এই সময়ে মোট ৩২৯১ মাইল কাঁচা রাস্তা ও ১৪৬ মাইল পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

আলোচ্য সময়ে ১৩৬৮টি নূতন বিদ্যালয় খোলা হয় এবং চলতি ২২৫টি বিদ্যালয়কে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়, প্রাপ্ত-বয়স্কদের জন্য ৩৫৫৬টি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয় এবং সেগুলিতে ৫৯,১৪২ জন শিক্ষালাভ করিতেছে। চিত্তবিনোদনের জন্য ২৮৬৮টি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব জাগরিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজ-উন্নয়ন অঞ্চলে ১০৪৬টি সমবায় সমিতি গঠন করা হইয়াছে। ১৫ হাজার গৃহ সংস্কার করা হইয়াছে এবং ১৬৬৯টি নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

প্রথম বৎসরে চার হাজার জন উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মী ও অন্যান্য শ্রেণীর কর্ম্মী নিয়োগ করা হইয়াছে। পরিকল্পনা পূর্ণ রূপ গ্রহণ করিলে অনুমান ৮০ হাজার দক্ষ কর্ম্মী ও ৩ লক্ষ অদক্ষ সাধারণ কর্ম্মীর প্রয়োজন পড়িবে। গ্রামসেবকদের শিক্ষাদানের জন্য ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিদপ্তর ৩৪টি শিক্ষা-কেন্দ্র খুলিয়াছেন। সেগুলিতে ২৫৯২ জন গ্রামসেবক শিক্ষালাভ করিয়াছে এবং ১৬৫৪ জন শিক্ষারত রহিয়াছে। ৩০৬ জন পরিদর্শন কর্ম্মীর শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে এবং আরও ২৬০ জন শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে। ১৯৫৩ সনে সমাজসেবা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নীলো-খেরী, হায়দ্রাবাদ, গান্ধীগ্রাম, শান্তিনিকেতন ও এলাহাবাদে পাঁচটি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এইসকল কেন্দ্রে ৬৪ জন প্রধান সমাজসেবা-সংগঠক ও ২৫২ জন সমাজসেবা-সংগঠককে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

দিল্লীতে গৃহ-নির্ম্মাণ সম্পর্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের আলোচনা-চক্র

জানুয়ারী মাসের চতুর্থ সপ্তাহে ভারত-সরকারের আমন্ত্রণক্রমে এবং এশিয়া ও দূরপ্রাচ্য অর্থনৈতিক কমিশনের সহযোগিতায় রাষ্ট্র-সঙ্ঘের কারিগরি সহযোগিতা সংস্থা নয়াদিল্লীতে গৃহ-নির্ম্মাণ ও সমাজ-উন্নয়ন সম্পর্কে এক আলোচনা-চক্রের আয়োজন করেন। এই সঙ্গে দিল্লীতে একটি স্বল্পমূল্যের গৃহ-প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হইয়াছে। আলোচনা-চক্রে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশগুলিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের গৃহ ও সমাজ-উন্নয়ন প্রচেষ্টা সম্প্রসারিত করিবার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হইবে। নিম্নোক্ত প্রধান তিনটি বিষয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকিবে—(১) গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য স্থানীয় মালমশলা ব্যবহার ও তাহার উৎপাদন, (২) গৃহ-নির্ম্মাণ ও সমাজ-উন্নয়ন কর্ম্মসূচী প্রণয়ন-পদ্ধতি এবং (৩) ভূমি-উন্নয়ন-নিয়ন্ত্রণ। প্রত্যেকটি বিষয় লইয়া অনুমান এক সপ্তাহকাল আলোচনা চলিবে এবং আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী প্রাথমিক সিদ্ধান্ত-গুলি প্রকাশ করা হইবে।

এই আলোচনা-চক্রে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে পাকিস্থান, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া ও মালয় প্রতিনিধি-দল প্রেরণ করিতেছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যসরকার, সমাজ-উন্নয়ন সংস্থা এবং গৃহ-নির্ম্মাণ সম্পর্কিত অন্যান্য সঙ্ঘ ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি-নিধিবর্গও যোগদান করিবেন। হংকং, ইরাণ, সিরিয়া, আফগানি স্থান ও মিশর পরিদর্শক প্রেরণ করিবে। ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রতিনিধি-দল আসিবেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের এশিয়া ও দূরপ্রাচ্য অর্থনৈতিক কমিশন, বিশ্বস্বাস্থ্য-সঙ্ঘ, আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা ও শিক্ষাবিজ্ঞান সংস্কৃতি সঙ্ঘ হইতেও প্রতিনিধি-দল এই আলোচনা চক্রে যোগদান করিবেন। প্রতিনিধিদের আলোচনার জন্য জাপান, ইন্দোনেশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, পুয়েটোরিকো, ইজরাইল ও ভারত হইতে পঞ্চাশটিরও অধিক প্রবন্ধ প্রেরিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই আলোচনা-চক্র স্বতন্ত্র ঘটনা নহে। ১৯৫০-৫১ সালে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার গৃহসমস্যা সম্পর্কে পর্য্য-বেক্ষণের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ হইতে একদল বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করা হইয়া-ছিল। ১৯৫২ সালে শিক্ষা-সংস্কৃতিসঙ্ঘ ও ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্যোগে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উপযোগী গৃহের নক্সা ও গৃহ-নির্ম্মাণ সম্পর্কে এক আলোচনা-চক্রের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। ১৯৫৩ সালে টোকিওতে আন্তর্জাতিক শ্রমদপ্তরের যে আঞ্চলিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে এশিয়ার দেশগুলির গৃহনির্ম্মাণ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার ফলে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয় সেই সকল প্রস্তাবই বর্ত্তমান আলোচনা-চক্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

ভারতে গৃহ-সমস্যার তীব্রতা

কেন্দ্রীয় পূর্ত্ত, গৃহ-নির্ম্মাণ ও সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রী এস. পি. শকসেনা ভারতের গৃহ-নির্ম্মাণশিল্প সম্পর্কে এক প্রবন্ধে লিখিতেছেন: "১৯৫১ সালের জনগণনা সংক্রান্ত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া প্ল্যানিং কমিশন যে হিসাব প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা হইতে এদেশে গৃহাভাবের তীব্রতা বুঝা যাইবে। এদেশে এখন ৪৩ লক্ষ গৃহের প্রয়োজন। যে সকল গৃহের পুনর্গঠন ও উন্নয়ন দরকার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যে সকল গৃহের দরকার সেগুলি ধরিলে প্রয়োজনের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যাইবে। প্রতি গৃহের জন্য গড়ে তিন হাজার টাকা ব্যয় ধরিলে গৃহ-সমস্যা ব্যাপারটা যে কি বিশাল তাহা ভালভাবে বুঝা যাইবে। মোট ব্যয় হইবে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা।"

এই বিরাট সমস্যার সমাধান করা সরকারের পক্ষে একক সম্ভব নহে। সরকার, মালিক, বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সকলের সহযোগিতার দ্বারাই ইহার সমাধান সম্ভব।

বর্ত্তমান গৃহ-নির্ম্মাণ শিল্পের সংগঠনের অভাব এবং ত্রুটির উল্লেখ করিয়া শ্রীশকসেনা লিখিতেছেন, এদেশে খুব কম সংগঠিত পাবলিক কোম্পানী আছে, যাহারা প্রচুর বাড়ী তৈয়ারী করিয়া ন্যায্য মূল্যে মধ্যবিত্তদিগকে বিক্রয় করিবে বলিয়া ভরসা করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে ছোটখাট কনট্রাক্টরের সাহায্যে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে বড় বড় কনট্রাক্টরেরা সাব-কনট্রাক্টর নিয়োগ করিয়া কাজ করায়। "সেজন্য আজকালকার গৃহ-নির্ম্মাণে শ্রমবিভাগের সুবিধাগুলি পাওয়া যায় না।"

"গৃহ নির্ম্মাণের বেশীর ভাগ কাজ একক ভাবেই সম্পন্ন হয়। ফলে উহার উপাদান, নক্সা প্রভৃতির একটা মান নির্দ্ধারণ প্রায়ই সম্ভব হয় না। উপাদানের আকার-প্রকারে খুব বেশী পার্থক্য থাকায়, সেগুলির ব্যাপক প্রস্তুতি হয় না। বিল্ডিং কনট্রাক্টরদের সম্পদ বেশী না থাকায় গৃহ-নির্ম্মাণ প্রণালীর উন্নয়নের গবেষণা চলিবার আশা করা যাইতে পারে না।"

ভারতের গৃহ-নির্ম্মাণ ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য প্রয়োজন গৃহ-নির্ম্মাণোপযোগী মৌলিক উপাদান, যথা ইট, বালুকা, পাথর ও চূণ প্রভৃতির অল্প ব্যয়ে উৎপাদনের উন্নত উপায় নির্দ্ধারণ। কতকগুলি দ্রব্যের মান নির্ণয় করাও একান্ত দরকার। ভারতে যে ধরণের সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয় তাহা সাবেকী—সেগুলির পরিবর্ত্তে উন্নত এবং আধুনিক সরঞ্জাম প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। সেজন্য আরও প্রয়োজন হইবে বর্ত্তমানের অদক্ষ শ্রমিকের পরিবর্ত্তে বিশেষ শিক্ষা-প্রাপ্ত নিপুণ শ্রমিক। বাড়ীর মালিকগণ সমবায় সমিতি গঠন করিয়া সহজে অর্থ পাইতে পারেন এবং তাহাতে নূতন গৃহ-নির্ম্মাণের অনেক সুবিধা হইতে পারে। তদ্ব্যতীত গৃহ-নির্ম্মাণ বিষয়ে গবেষণার ফলাফল জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ

সম্প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জের অর্থনৈতিক কমিশন এশিয়া এবং ইউরোপের মধ্যে বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে যে একটি তথ্যপূর্ণ রিপোর্ট লিখিয়াছেন তাহাতে পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক সুচিন্তিত মন্তব্য করা হইয়াছে। রিপোর্টে পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, কাগজ এবং অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত ব্যাগ পাটের চাহিদা বহুল পরিমাণে হ্রাস করিয়া দিয়াছে। যুদ্ধোত্তর কালে পাটের এবং পাটজাত দ্রব্যের স্বল্প সরবরাহ এবং বর্দ্ধিত মূল্য পাটের নিম্নতর চাহিদার জন্য দায়ী। এই সময়ে পাটের মূল্য ক্রমশঃ উচ্চতর হারে বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং ১৯৫০ ও ১৯৫১ সনে যুদ্ধপূর্ব্ব-যুগের তুলনায় ১২ হইতে ১৫ গুণ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। এই সময়ে ভারতে পাটের মূল্য বিনিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়া হয়। এমনকি ১৯৪৮-৪৯ সনে যখন পাটের মূল্য নিম্নমানে ছিল, তখনও গড়পড়তায় পাটের মূল্য যুদ্ধপূর্ব্ব-যুগের তুলনায় চার হইতে পাঁচ গুণ পরিমাণে অধিক ছিল। সাধারণ মূল্যমান হইতে পাটের মূল্য অধিক ছিল।

যুদ্ধোত্তর যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিল্পসংস্থার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হওয়ায় শিল্পদ্রব্য বহন করিবার উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় এবং তাহাতে পাটের থলিয়ার প্রয়োজন হ্রাস পায়। ইহা ব্যতীত কাগজের থলিয়ার বর্দ্ধিত ব্যবহার পাটের চাহিদা হ্রাস করিয়া দেয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৯ সনে থলিয়া প্রস্তুতের জন্য শতকরা ৩৩ ভাগ পাট ব্যবহার করা হইত, আর ১৯৫০ সনে এইজন্য মোটে ১৭ ভাগ পাট ব্যবহার করা হয়। ১৯৩৯ সনে থলিয়া প্রস্তুতের জন্য মোটে শতকরা ২৯ ভাগ কাগজ ব্যবহার করা হইত, কিন্তু ১৯৫০ সনে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় শতকরা ৬৭ ভাগে।

শুধু কাগজ-ব্যাগই পাটের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, কেনাফ এবং "কঙ্গো জুট" ইদানীং পাটের পরিবর্ত্তে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। বেলজিয়ান কঙ্গোতে, ফরাসী অধিকৃত মধ্য-আফ্রিকায় এবং ব্রিটিশ গায়নাপ্রদেশে "কঙ্গো জুট" বর্দ্ধিত হারে উৎপন্ন করা হইতেছে। বর্ত্তমানে ব্রেজিলে যথেষ্ট পরিমাণে পাটের উৎপাদন হইতেছে এবং ইহা পাট সরবরাহ ব্যাপারে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইয়াছে।

রিপোর্টে তাই সাবধান-বাণী করা হইয়াছে—অর্থাৎ, পাটের বাজারের যুদ্ধে জয় ভারত কিংবা পাকিস্থানের খুব বড় কাম্য হওয়া উচিত নয়। পাকিস্থানকে রিপোর্ট সাবধান করিয়া দিয়াছে যে, বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক পাট পরিস্থিতিতে পাকিস্থানের পক্ষে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করা উচিত নয়। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ যেন তাহার কাঁচা পাট উৎপাদন হ্রাস করিয়া দিয়া পাকিস্থান হইতে আমদানী করে। ইহা কিন্তু অত্যন্ত অযৌক্তিক কথা। ভারতবর্ষ যদি তাহার কাঁচা পাট সরবরাহের জন্য পাকিস্থানের উপর নির্ভরশীল থাকে তবে পাকিস্থান সর্ব্বদাই যথোপযুক্ত সরবরাহ না করিয়া ভারতবর্ষকে বিব্রত করিতে থাকিবে—যেমন সে এত দিন পর্য্যন্ত করিয়া আসিতেছে।

পাটের আন্তর্জ্জাতিক বাজার ক্রমশঃ প্রতিযোগিতামূলক হইয়া আসিতেছে। এ সম্বন্ধে ভারতের সজাগ থাকা উচিত। পাটের উপর উচ্চহারে রপ্তানী কর আরোপ করিয়া ভারত-সরকার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছেন—ইহাতে পৃথিবীর বাজারে ভারতীয় পাটের মূল্য অত্যধিক হওয়ায় ভারতের পাট-রপ্তানী হ্রাস পায়। বর্ত্তমানে পাটের রপ্তানী-কর কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ইহা একেবারে তুলিয়া দেওয়া উচিত। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ভারতের উৎপাদন-ব্যয় কম হওয়ায় আন্তর্জ্জাতিক বাজারে ভারতবর্ষ প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে, যদি অবশ্য তাহার রপ্তানী-কর যথেষ্ট পরিমাণে কম থাকে।

বিশ্বসভায় ভারতের ভূমিকা

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য এবং ট্রেজারির অর্থনৈতিক সেক্রেটারী আর. মডলিং গত শরৎকালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কলম্বো পরিকল্পনা পরামর্শ কমিটির অধিবেশনে ব্রিটিশ প্রতিনিধি-দলের নেতা হিসাবে ভারতে আগমন করেন। প্রজাতন্ত্র-দিবস উপলক্ষে এক বিশেষ প্রবন্ধে মিঃ মডলিং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিতেছেন যে, জাতিপুঞ্জে তাহার কাজের জন্য ভারত আজ বিশ্বের জাতিগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে। ভারতের মতামত "সকলের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে কারণ শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে সহযোগিতার জন্য সে আজ সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া আছে।"

মিঃ মডলিং লিখিতেছেন: "আজিকার এই দিনে যখন ভদ্রতা হিসাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন একটি রীতিমাত্র তখন উল্লেখ করা অবান্তর হইবে না যে জাতি হিসাবে ভারত কি বিরাট কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব পালন করিয়াছে। আজ বিশ্বের নানা দিক হইতে ভারত যে আন্তরিক অভিনন্দন লাভ করিবে সেই অভিনন্দনের আন্তরিকতার মূল কারণও হইল ইহাই।"

তিনি বিশেষ করিয়া কোরিয়াতে ভারতীয় বাহিনীর কাজ এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের সভানেত্রী হিসাবে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের কার্য্যের উল্লেখ করেন। কোরিয়ার যুদ্ধবন্দী প্রশ্ন মীমাংসার জন্য এবং তত্ত্বাবধায়ক বাহিনীর পরিচালকরূপে ভারতের কার্য্য সম্পর্কে মিঃ মডলিং লিখিতেছেন: "এই ধরণের রুচিবিগর্হিত এবং অবাঞ্ছিত কাজে জেনারেল থিমায়া এবং জেনারেল থোরাটের পরিচালনাধীন ভারতীয় সৈন্যদল যে অনন্যকরণীয় ধৈর্য্য এবং মানবতাবোধের পরিচয় দিয়াছেন তাহা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।"

ভারতকর্ত্তৃক প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহকে সাহায্য দানের উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিতেছেন: "কলম্বো পরিকল্পনাভুক্ত কারিগরি সাহায্য ব্যবস্থাধীনে আমরা দেখিতে পাইয়াছি ভারত কি ভাবে সিংহলকে সাহায্য করিয়াছে শিক্ষা, ইঞ্জিনিয়ারিং, শ্রমশিল্প এবং বাণিজ্য-বিশেষজ্ঞ দ্বারা এবং কি ভাবে সে গ্রহণ করিয়াছে নিজের তালিমি ব্যবস্থায় অন্য সকল প্রতিবেশী রাষ্ট্র, যথা পাকিস্থান, ফিলিপাইনস, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশের শিক্ষার্থী। এই সাহায্য পরিকল্পনাধীনে ভারত এই ভাবে তাহার কর্ত্তব্য পালন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।"

সোভিয়েট দেশের প্রাচ্যবিদ্যা পরিষদ

মস্কোতে অবস্থিত সোভিয়েট বিজ্ঞান মন্দির (একাডেমি অব সায়ান্সেস)-এর প্রাচ্যবিদ্যা পরিষদ সম্পর্কে এক প্রবন্ধে ডাঃ কে. আস্তানোভা লিখিতেছেন যে, এই পরিষদে প্রাচ্যভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, অর্থনীতি, ভাষা ও সাহিত্য লইয়া গবেষণা এবং পর্য্যালোচনা করা হয়।

পরিষদ হইতে মহাভারতের রুশ ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে। সম্প্রতি ভারতবর্ষের ইতিহাস ও অর্থনীতি সম্পর্কে চারিটি সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছে: এ. এম্. দিয়াকভ-লিখিত 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতের অর্থনীতি ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নীতি'; কে. এ. আস্তানোভা-লিখিত 'আকবরের আমলের মোগল-শাসিত ভারতের সামাজিক সম্পর্কাবলী ও রাজনৈতিক সংগঠন সম্পর্কিত প্রবন্ধরাজি'; এবং এল. আর. গর্ডন-লিখিত 'ভারতের ১৯১৪-১৯৪৭ সালের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশগুলির কৃষি-ব্যবস্থা'। প্রাচীনকাল হইতে আধুনিককাল পর্য্যন্ত তিন খণ্ডে সমাপ্ত ভারতবর্ষের একটি ইতিহাস প্রকাশেরও উদ্যোগ চলিতেছে।

ডাঃ আস্তানোভা লিখিতেছেন: পরিষদের প্রাচীন প্রাচ্যখণ্ড বিভাগ নিযুক্ত রহিয়াছে প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন চীনের ইতিহাস অনুশীলনের কাজে। প্রাচ্যভূখণ্ডের ইতিহাস লইয়া লিখিত অধ্যাপক ভি. আভাদিয়েফের পাঠ্য পুস্তকের অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া রহিয়াছে ভারতবর্ষ ও চীনদেশের ইতিহাস।

পরিষদ হইতে একটি উর্দ্দু-রুশ অভিধান প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৫৪ সালের প্রথম ভাগেই প্রথম হিন্দী-রুশ অভিধান প্রকাশিত হইবে। বহুদিন যাবৎ সেখানে হিন্দী, উর্দ্দু ও বাংলাভাষার চর্চ্চা চলিতেছে। বর্ত্তমানে সোভিয়েট ভাষাতত্ত্ববিদগণ তেলুগু, মরাঠি ও তামিল ভাষা লইয়াও গবেষণার কাজ আরম্ভ করিয়াছেন।

উক্ত প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে, "প্রাচ্যবিদ্যা পরিষদ তিনখানি বৃহৎ সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশের কাজে হাত দিয়াছেন। প্রথম সঙ্কলনের বিষয় হইতেছে প্রাচ্যদেশগুলির কৃষি-সমস্যার আলোচনা; দ্বিতীয় সঙ্কলন ঐসব দেশেরই শ্রমিকশ্রেণীর ইতিহাস সম্পর্কে এবং তৃতীয় সঙ্কলনখানির বিষয়বস্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে এতাবৎ ঐসব দেশের ইতিহাস। এই তিনখানি সঙ্কলনই ১৯৫৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত হইবে। এই তিন খণ্ডেই ভারতবর্ষকে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হইবে।" বর্ত্তমান বৎসরের প্রথমভাগে বিখ্যাত রুশ ভারতবিদ্যাবিদ্ আই. মিনায়েফের দুই বারের ভারত সফরের রোজ-নামচা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। উক্ত ডাইরী বা রোজ-নামচায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের ভারতীয় সমাজের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

প্রাচ্যবিদ্যা পরিষদের একটি বৃহৎ পুস্তকাগার আছে। তদ্ভিন্ন পরিষদের হাতে আছে প্রাচীন প্রাচ্যপাণ্ডুলিপির এক বিরাট ভাণ্ডার। হাজার হাজার পাণ্ডুলিপির এই ভাণ্ডারটি লেনিনগ্রাডে অবস্থিত। ডাঃ আস্তানোভার প্রবন্ধ অনুযায়ী "এই সুরক্ষিত সম্পদের মধ্যে সর্ব্বাধিক মূল্যবান হইতেছে সংস্কৃতভাষায় লিখিত বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপি ও প্রাচীন মঙ্গোলিয়ান পাণ্ডুলিপির অপূর্ব্ব সংগ্রহ। সংগৃহীত পাণ্ডু-লিপিগুলির মধ্যে আছে মধ্যযুগের ভারতের পাণ্ডুলিপি, ঔরঙ্গজেবের আমলের কবিতা, ষোড়শ সপ্তদশ শতকের সাধুসন্তদের দুর্লভ চরিত-কথা, দিবানী-বেদিল ও অন্যান্য গ্রন্থ।"

সোভিয়েট ইউনিয়নে ব্যালে নৃত্য

সম্প্রতি কলিকাতায় এক সোভিয়েট সংস্কৃতি-সংযোগ স্থাপক প্রতিনিধি-দল আসিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে নৃত্যগীতবিদ্ অনেকেই আছেন। অবশ্য ইঁহারা প্রায় সকলেই সাধারণ শ্রেণীর নৃত্যগীতে পটু। উচ্চাঙ্গের নৃত্যের পরিচয় নিম্নরূপ—

এ. এনিসিমফ লিখিতেছেন: "সোভিয়েট নৃত্যকলার মধ্যে দুইটি বিভিন্ন নৃত্যরীতির মিলন লক্ষিত হয়, একটি লোকনৃত্য, অপরটি উচ্চশ্রেণীর ব্যালে নৃত্য। ইহারা একটি অপরটিকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর রুশ ব্যালে নৃত্যের সূক্ষ্মতম কৌশল লোক-নৃত্যকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে এবং অন্যদিকে সোভিয়েট জনগণের লোকনৃত্যের সম্পদ ও প্রকাশভঙ্গীকে আপনার মধ্যে মিশাইয়া লইয়া সোভিয়েট ব্যালে নৃত্য নিজের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে।"

প্রাক্-বিপ্লবযুগে ব্যালে নৃত্য শুধু অভিজাতশ্রেণীর মনোরঞ্জন করিত। সাধারণের পক্ষে তাহার কোন রসাস্বাদ গ্রহণ খুবই কঠিন ছিল। তখন সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে মাত্র দুইটি অপেরা হাউসে ব্যালে নৃত্য প্রদর্শিত হইত। বিপ্লবের পর এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়। বর্ত্তমানে সোভিয়েট ইউনিয়নের ত্রিশটিরও অধিক অপেরা হাউসের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া ব্যালে নৃত্য সম্প্রদায় আছে।

ব্যালে নৃত্য রূপ ও যৌবনের কলা। ব্যালে নৃত্য কবিতার সমগোত্রীয়। ব্যালে নৃত্যের মধ্যে দর্শক দেখে সৎ ও অসতের, আলো ও আঁধারের দ্বন্দ্ব। ব্যালে নৃত্য মানুষের মহৎ ভাব ও আবেগকে এবং মহত্তম আদর্শকে প্রচলিত সাধারণ আঙ্গিকের মাধ্যমে ফুটাইয়া তুলিতে পারে। নৃত্যের মাধ্যমে সৃষ্ট ব্যালে নৃত্যের চরিত্রগুলি দর্শকের মনের উপর কোন কোন ক্ষেত্রে নাটক ও সাহিত্যের মাধ্যমে সৃষ্ট প্রভাব অপেক্ষাও বলিষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। উচ্চশ্রেণীর রুশ ব্যালে নৃত্যের মধ্যে সোয়ান লেক, স্লিপিং বিউটি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এনিসিমফ লিখিতেছেন: "ব্যালে নৃত্য এমনই একটি বিশেষ জাতের কলা যে ইহার মধ্যে নূতন আঙ্গিকের প্রবর্ত্তন ও ভাব প্রকাশের মাধ্যম আবিষ্কার খুবই কঠিন কাজ এবং দীর্ঘকালব্যাপী চর্চ্চা ও অভিজ্ঞতার ফলেই তাহা সম্ভব।" তবে সোভিয়েট ব্যালে থিয়েটার উচ্চাঙ্গের ব্যালে নৃত্যের সূক্ষ্মতম পারদর্শিতাকে নূতন বিষয়বস্তুর সহিত মিলাইয়া নূতন ব্যালে নৃত্য পরিকল্পনায় অনেকটা সফল হইয়াছে। এইরূপ আধুনিক সোভিয়েট ব্যালে নৃত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্লিয়েরের রেডপপি এবং ব্রোনজ অশ্বারোহী, প্রকোফিয়েভের সিনড্রেলা এবং রোমিও ও জুলিয়েট প্রভৃতি। পূর্ব্বে ব্যালে নৃত্যের বিষয়বস্তু ছিল রূপকথার কাহিনী। বর্ত্তমানে বলশয় থিয়েটার ব্যালে নৃত্যগুরু ডি. লাফরাভস্কির নির্দ্দেশে "পাথরের ফুল" নামক এক রূপকথার উপর ভিত্তি করিয়া একটি ব্যালে নৃত্য পরিকল্পনার কাজে রত আছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে নৃত্যশিল্পীদের শিক্ষাদানের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। সরকার-পরিচালিত মস্কো বলশয় থিয়েটার সংলগ্ন বিশেষ নাট্যকলা বিদ্যালয়, লেনিনগ্রাড কিরফ অপেরা, ব্যালে থিয়েটার ও অন্যান্য কেন্দ্রে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। আট বৎসরের উর্দ্ধে বালক-বালিকারা এই সকল বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে পারে—শিক্ষাকাল দশ বৎসর। এই সময় নৃত্যশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বালকবালিকারা সাধারণ দশসালা মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষাও পাইয়া থাকে। শিক্ষালাভের সময় তাহারা সাধারণের সম্মুখে তাহাদের নৃত্যপটুতা পরিদর্শনের সুযোগ পায়। প্রতিবৎসর এক বার অথবা দুই বার কনসার্টের আয়োজন করিলে সমগ্র ব্যালেটিকেই মঞ্চস্থ করা হয়।

এনিসিমফ লিখিতেছেন যে, সম্প্রতি ভারতীয় যুব প্রতিনিধি-দল যখন সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিভ্রমণে গমন করে তখনই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় নৃত্যকলার সহিত সোভিয়েট দর্শকদের পরিচয় ঘটে। তিনি লিখিতেছেন: "এই পরিচয়ে আমাদের বহু লাভ হইয়াছে এবং আমাদের অতিথিরাও সোভিয়েট লোকনৃত্য ও উচ্চ-শ্রেণীর ব্যালে নৃত্য দেখিয়া লাভবান হইয়াছেন।

"সোভিয়েট কলা ও সাহিত্যের প্রতিনিধিরা কয়েকবার ভারতে গিয়াছেন এবং সকল সময়েই ভারত হইতে বিবিধ এবং জীবন্ত ধারণা লইয়া ফিরিয়াছেন। এই সব ধারণা শিল্পীর সৃজনশীল কল্পনাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। আমরা আশা করি এবং বিশ্বাস করি, সোভিয়েট ও ভারতীয় শিল্পীদের সৃজনশীল অভিজ্ঞতার বিনিময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।"

নেপালে মার্কিন কারিগরি সাহায্য

যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক পরিচালনা দপ্তরের এক বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও নেপালের মধ্যে কারিগরি চুক্তি অনুসারে নেপালে কীটপতঙ্গাদি নিয়ন্ত্রণ, গবাদিপশুর উন্নয়ন, চাষ-আবাদের যন্ত্রপাতির উন্নয়ন, সেচ ও বয়স্কদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে গৃহীত পরিকল্পনার জন্য উক্ত দপ্তর ছয় লক্ষ ডলার বরাদ্দ করিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে উক্ত দপ্তর নয় জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী দ্বারা নেপালকে সাহায্য করিয়াছে। গত বৎসর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৪,৯৭,০০০ ডলার সাহায্য করিয়াছে এবং নেপাল পাঁচ লক্ষ টাকা এই সকল পরিকল্পনায় নিয়োগ করিয়াছে।

বিহারে বাংলা ভাষার প্রতি অবিচার

সম্প্রতি সাঁওতাল পরগণা পরিভ্রমণ কালে বিহারের রাজস্বমন্ত্রী কৃষ্ণবল্লভ সহায় বলেন যে, বাংলা ভাষার প্রতি কোন প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন অথবা বিদ্বেষ পোষণ বিহার-সরকারের অভিপ্রায় বা নীতি নহে। তিনি বলিয়াছিলেন,"রাজ্য গবর্মেণ্ট বাংলা ভাষা—বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভাষা দমন করিতে চাহিতেছেন একথা চিন্তা করা পাগলামি মাত্র।"

এই সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে 'নবজাগরণ' লিখিতেছেন,

"স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে বাউণ্ডারী কমিশন গঠিত হইবার পর বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলের জনসাধারণের বঙ্গভুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করিয়া বিচলিত রাজস্ব-সচিব মহাশয় বিহারের বঙ্গ-ভাষাভাষীদের প্রবোধ দিবার অভিযানে নির্গত হইয়াছেন। কিন্তু অঙ্গারং শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতে। এই সময়েও কৃষ্ণবল্লভ বাবু তাঁহার ও তাঁহার সরকারের অতীত দুষ্কৃতির কথা খোলাখুলি স্বীকার করিয়া যদি বিহারের বঙ্গভাষাভাষী জনসাধারণের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করিয়া তাহাদের দাবি পূর্ণ করিতেন, তাহা হইলে বিহার-সরকারের সদিচ্ছায় কথঞ্চিৎ আস্থা জন্মিবার সুযোগ হইত। কিন্তু এখনও তাঁহারা নির্জ্জলা মিথ্যা বলিয়া চলিতেছেন।"

পত্রিকাটি লিখিতেছেন, সিংভূমে বাংলা ও উড়িয়া-ভাষীদের উপর যে অন্যায় করা হইয়াছে তাহা কৃষ্ণবল্লভ বাবুর অজ্ঞাত থাকিবার কথা নহে। "এমনকি ইহাও আমরা জানি যে প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে ধলভূমের জনৈক নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস-কর্মীর কাছে তিনি এই কথা স্বীকার করেন যে দলীয় রাজনীতির জন্য তিনি ধলভূমের ভাষা সম্বন্ধীয় অভিযোগ দূর করিতে ও নিজ প্রতিশ্রুতি পালনে অসমর্থ। জনসাধারণের স্মৃতি ক্ষীণ, কিন্তু কৃষ্ণবল্লভ বাবু যত সহজে তাহাদের বিভ্রান্ত করিবেন ভাবিতেছেন, ব্যাপার তত সহজ নহে।

"আসলে সমস্যা কি? বিহারে বাংলা বা উড়িয়া-ভাষীরা কোন নূতন অধিকার বা বিশেষ দাবি জানায় নাই। ইংরেজ আমল হইতে প্রবেশিকা পর্যন্ত শিক্ষার ও পরীক্ষার মাধ্যম ছাত্রদের মাতৃ-ভাষা ছিল। জামসেদপুর ও পুরুলিয়া ইত্যাদির আদালতেও সরকারী কাজকর্মে বাংলা ভাষা চলিত। স্বরাজী বিহার-সরকার সেই অধিকার হইতে বাংলা ও উড়িয়া-ভাষীদের বঞ্চিত করাতে এই আন্দোলন দানা বাঁধিয়াছে। সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণে বাংলা ও উড়িষ্যার দাবি প্রবল হইয়া স্থানীয় জনসাধারণের মনে অন্য প্রদেশে যুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করিয়াছে।" উপরন্তু কৃষ্ণবল্লভ বাবুর এই জাতীয় মিথ্যাভাষণ এবং প্রাদেশিকতার বিষে জর্জ্জরিত কার্য্যকলাপে বাংলা ও উড়িয়া-ভাষাভাষী জনসাধারণ বুঝিতেছেন যে, কৃষ্ণবল্লভবাবু-প্রমুখ ব্যক্তিগণ যে-সরকারের কর্ণধার, তাহার নিকট ন্যায় বিচার পাইবার সম্ভাবনা নাই।

মানভূমের "টুসুপরব" ও বিহার-সরকার

"মুক্তি" পত্রিকায় এক প্রবন্ধে শ্রীঅশোক চৌধুরী লিখিতেছেন :

"'টুসু বা 'তুষু' পরব মানভূমের একটি বিশিষ্ট পর্ব্ব। গুণবান স্বামী ও ধন-ঐশ্বর্য্য লাভের উদ্দেশ্যে কুমারীরা টুসুদেবীর পূজা করে এই ব্রত পালন করে। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত এই ব্রত পালনের কাল। কিন্তু 'টুসু' পরবের জের সাধারণতঃ বসন্ত পঞ্চমী অর্থাৎ সিঝান পর্ব্ব পর্য্যন্ত চলতে থাকে। বাংলাদেশে প্রচলিত 'তুঁষ-তুঁষলি' বা 'তোষলা' ব্রতই মানভূমে 'টুসুপরব' নামে পরিচিত।"

"মানভূমের জনজীবনে 'টুসুপরব' একটি সামাজিক অনুষ্ঠানের রূপ ধারণ করেছে। তাই এই লৌকিক ব্রতের ছড়া ও গান অন্যতম লোকসঙ্গীত ঝুমুরের মতই লোকগ্রাহী হয়ে উঠেছে। এর ভাবসম্পদ এবং রচনাসম্ভার নির্দিষ্ট কোন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নেই। চলমান জীবনের নিত্যনূতন ঘাত-প্রতিঘাত ও বৈচিত্র্যময় ঘটনার অভিজ্ঞতা থেকে নূতন রূপ ও রস সংগ্রহ করে আত্মপ্রকাশ করে।"

বর্তমান বৎসরে 'টুসুপরব' উপলক্ষে রচিত কতকগুলি গানে বিহার-সরকারের ভাষাবৈষম্য-নীতির নিন্দা করা হয়। এই সকল গান "টুসুর গানে মানভূম" শীর্ষক একটি পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়া লোকসেবক সঙ্ঘ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন এবং বিহার-সরকারের বাংলাভাষা উচ্ছেদনীতির বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করিবার জন্য বিভিন্ন গ্রামে টুসু গানের দল প্রেরণ করেন। গত ৯ই জানুয়ারী রঘুনাথপুরে টুসুর গান করিবার সময় এরূপ এক দল কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই গ্রেপ্তারের নিন্দা করিয়া ১২ই জানুয়ারী এক বিবৃতিতে লোকসেবক সঙ্ঘের পরিচালক শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ বলেন যে, এই গ্রেপ্তারের ফলে জনসাধারণের সামাজিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। বিহার-সরকার "টুসুর গানে মানভূম" পুস্তিকাটি বাজেয়াপ্ত করেন নাই। সুতরাং গানের বিষয়বস্তুর জন্য নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার করা হয় নাই। এই গ্রেপ্তারের ফলে বিহার-সরকারের সাম্রাজ্যবাদসুলভ মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

পরদিন ১৩ই জানুয়ারী পুরুলিয়া শহরে শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষের পরিচালনায় একদল কর্মী যখন টুসু গান গাহিয়া যাইতেছিলেন তখন তাঁহাদিগকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। সঙ্ঘ-সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ এই সম্পর্কে থানা অফিসারের সহিত এক সাক্ষাৎ-কারে নিরাপত্তা আইন অনুসারে সরকারের নিকট বিনা নোটিশে যে কোন শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ এই সরকারী যুক্তি খণ্ডন করিয়া বলেন, "চিরাচরিত প্রথায় সমগ্র জেলার লক্ষ লক্ষ লোক শত শত ব্যক্তির দলে একত্রিত হইয়া গান গাহিয়া শোভাযাত্রা করিয়া টুসু-পর্ব্বে সমবেত হইয়া পর্ব্ব উদ্‌যাপন করেন। এই বিরাট জনসমষ্টির চিরপ্রচলিত প্রথার উপরে ত নিরাপত্তা আইন প্রযুক্ত করা যাইবে না। তাহা হইলে লোকসেবক সঙ্ঘের কর্মীদের টুসুর গানে আপত্তি কি জন্য—উহা কি গানের বিষয়বস্তুর জন্য? উত্তরে থানা অফিসার বলেন—না তজ্জন্য নহে, সরকারে না জানাইয়া যে-কোনও ভাবে হউক দলবদ্ধভাবে যাতায়াত নিরাপত্তা আইনে নিষিদ্ধ। সরকার নির্দেশ দিয়াছেন যে বিনা সংবাদে যে কেহ গান গাহিয়া দলবদ্ধ ভাবে চলিবে তাহাদের ধরা হইবে।" ("মুক্তি" ৪ঠা মাঘ, পৃঃ ৬।) উত্তরে অরুণবাবু বলেন যে, ১৬ই জানুয়ারী যখন লক্ষ লক্ষ নরনারী সহস্র সহস্র মেলায় ও স্নানঘাটে দলবদ্ধ হইয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিবে—সরকার কোনক্রমেই তাহাদের গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন না—করিবেনও না। কেবলমাত্র সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যই লোকসেবক সঙ্ঘের কর্মীদের উপর হামলা চালান হইতেছে।

ঐ তারিখেই (১৫ই জানুয়ারী) পুরুলিয়া আদালত-প্রাঙ্গণে

চৌকিদারী আপিসের সম্মুখস্থ রাস্তার উপর জনৈক কোর্ট ইনস্পেক্টর একটি টুসুর গানের দলের কয়েকজন কর্ম্মীকে ও লোকসেবক সঙ্ঘের সচিব অরুণচন্দ্র ঘোষকে প্রহার করে এবং পরে অরুণ বাবু ও বান্দোয়ানের ঋষি নিবারণচন্দ্র বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ শ্রীসুধীর বসু সহ ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করে—এই মর্ম্মে "মুক্তি"তে প্রকাশিত সংবাদে আরও জানা যায় যে, "অরুণ বাবু যখন ঘটনাস্থলে আসিয়া পৌঁছেন তখন তাঁহার সাইকেলটি বুচন মাহাত নামে একটি কর্ম্মীর নিকট রাখিয়া তিনি কোর্ট ইনস্পেক্টরের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, কোর্ট ইনস্পেক্টর সাইকেলটি বুচন মাহাতর হাত হইতে ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করে। বুচন মাহাত ছাড়ে না, তখন কোর্ট ইনস্পেক্টর বুচন মাহাতকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া চড়চাপড়, জুতাপায়ে ঠোক্কর ও লাথি মারিতে থাকে এবং সাইকেলটি ছিনাইয়া লইয়া যায়। এই সাইকেলটিতে অরুণবাবুর একটি ঝোলা বাঁধা ছিল, তাহাতে টাকা এবং বহু দরকারী ও মূল্যবান কাগজপত্র ছিল। ঝোলাসহ সাইকেলটি আপিসে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে পুলিস স্বেচ্ছামত কাগজপত্র বাহির করিয়া তাহা রাখে। পরে ঐ সমস্ত কাগজের একটি অসম্পূর্ণ সিজার লিষ্ট তৈরি করিয়া কেবল লিষ্টটি, টাকা ও সাইকেলটি ফিরাইয়া দেওয়া হয়।" ("মুক্তি" ৪ঠা মাঘ, পৃঃ ১১।) ঐ দিনই বুচন মাহাত কোর্ট ইনস্পেক্টরের বিরুদ্ধে এস. ডি. ও'র নিকট প্রহার, লাঞ্ছনা প্রভৃতির অভিযোগ করিয়া এক দরখাস্ত দাখিল করে।

পুলিস অরুণ বাবুদের বিরুদ্ধে আদেশ অমান্য করা, আসামী ছিনাইয়া লওয়া, সরকারী কার্য্যে বাধা দেওয়া ইত্যাদি অভিযোগ আনিয়াছে। উক্ত সংবাদে আরও প্রকাশ, "অরুণ বাবু প্রভৃতিকে পুলিস হাজত হইতে জেল, জেল হইতে পুলিস হাজত ও কোর্ট সর্ব্বত্রই হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া হয়। হীরু সিং প্রভৃতির দলটিকে বিচারের সময় এজলাসেও কোমরে দড়ি বাঁধিয়া রাখা হয়। তাহাদের পক্ষের উকীল প্রতিবাদ করিলে দড়ি খুলিয়া দেওয়া হয়।

"লোকসেবক কর্ম্মী যাহাদেরই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহাদের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া-আসা করা হইতেছে।

"১৭ই জানুয়ারী হইতে একটি নূতন সরকারী ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে। মানভূম জেলায় ও পুরুলিয়া শহরে সহস্র সহস্র লোক দল বাঁধিয়া টুসুর গান গাহিয়া শোভাযাত্রা করিলেও বাছিয়া বাছিয়া লোকসেবক সঙ্ঘের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নামে জন-নিরাপত্তা আইন (বিহার মেন্টেনেন্স অব পাবলিক অর্ডার) অনুযায়ী সমন জারী করা হইতেছে।"

সরকারী হামলা সত্ত্বেও টুসুর গান গাওয়া বন্ধ হয় নাই। ৯ই হইতে ১৩ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত তিনটি দলকে ধরিয়াই সরকারকে ক্ষান্ত হইতে হয়। এক বিবৃতিতে শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ বলিয়াছেন যে, সরকার সোজাপথে সত্যাগ্রহীদিগকে কিছু করিতে না পারায় তাহারা বাছিয়া বাছিয়া লোকসেবক সঙ্ঘের কয়েকজন কর্ম্মীর বিরুদ্ধে নিরাপত্তা আইনে মামলা রুজু করিয়াছেন। সেইজন্য "টুসু পর্ব্বের কার্য্যধারা উদ্‌যাপিত হইয়া আসিলেও স্বৈরাচারের অস্ত্র এই নিরাপত্তা আইনের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম স্থায়ীভাবে জাগ্রত ও অব্যাহত থাকিবে এবং গণশক্তি ও সত্যাগ্রহের বলে আমরা আমাদের কাজ নিয়ত উদ্‌যাপন করিয়া চলিব ইহাই আমাদের সঙ্কল্প।" ("মুক্তি" ১৮ই মাঘ)

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষের গ্রেপ্তারের নিন্দা করিয়া এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে "মুক্তি" লিখিতেছেন,"অতুল বাবুর বর্ত্তমান বয়স ৭৪ বৎসর। সংবাদপত্রে পি-টি-আই কর্ত্তৃক রিপোর্টে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর বলা হইয়াছে—ইহা ভুল। পি-টি-আই কর্ত্তৃক পরিবেশিত উক্ত সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, 'অননুমোদিত শোভাযাত্রা পরিচালনা কালে তিনি গ্রেপ্তার হইয়াছেন।' একটি দল টুসুর গান গাহিয়া শহর পরিভ্রমণ করে—তিনি তাহার নেতৃত্ব করেন। ইহা বাস্তবিকই আইন বিরুদ্ধ কিনা এবং তাহার সম্বন্ধে এইরূপ কোন প্রশ্ন আসে কিনা তাহা বিচারের বিষয়। এ সম্বন্ধে পি-টি-আই পূর্ব্বাহ্নেই সঠিক একটা মতামত দেওয়াতে ভুল ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি।"

কল্যাণী কংগ্রেসে সীমানা কমিশনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিহারের প্রতিনিধিরা যে আচরণ ও মনোভাব প্রকাশ করেন তাহা এরূপ নিন্দাহ ও গ্লানিজনক রূপ ধারণ করে যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশাগত প্রতিনিধিরা সমস্বরে তাহার ধিক্কার দিতে থাকে। প্রকাশ্য অধিবেশনে বাংলার প্রতিনিধি শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গুহরায় এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে গিয়া বাংলাতে বক্তৃতা করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতাতে মানভূমের টুসু সত্যাগ্রহের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বাংলাতে লক্ষ লক্ষ বিহারী রহিয়াছেন কিন্তু বাংলা গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ভাষা বা সংস্কৃতি সম্বন্ধে কোনদিনই হস্তক্ষেপ ত করেন নাই বরং তাহাদের বিকাশের জন্যই সমস্ত সুযোগ দিয়াছেন। বিহারের প্রতিনিধি বারংবার বলিতে থাকেন যে, তাঁহারা বাংলায় বক্তৃতা শুনিবেন না, হিন্দীতে বলিতে হইবে। তাহাদের অভদ্র আচরণে সভাপতি নেহরু বলিতে বাধ্য হন যে বাংলাতে যাঁহারা বক্তৃতা শুনিতে চান না তাঁহারা যেন সভাক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া যান এবং বাংলা শিখিয়া যেন কংগ্রেসে আসিয়া যোগ দেন।

এই সকল ঘটনার উল্লেখ করিয়া 'মুক্তি' লিখিতেছেন:

"আমরা বিহারের কতিপয় প্রতিনিধির আচরণের সামান্য নমুনা উদ্ধৃত করিলাম মাত্র। ইঁহাদের মুখপাত্ররূপে শাহ মহম্মদ ওমরের গরম বক্তৃতা ও শ্রীজগৎনারায়ণলাল প্রভৃতির অতি নিম্নস্তরের ভাষণ ও তাহাদের অনুচরদের আচরণ বিহারের সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ খানিকটা সমস্ত ভারতবর্ষের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে।

"এবারকার কল্যাণী কংগ্রেসের ইহাই অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।"

৪ঠা মাঘের সম্পাদকীয় মন্তব্যে আরও বলা হইয়াছে, "বিহার সরকারের দমনীতির দ্বারা মানভূমের জনসাধারণকে চ্যালেঞ্জ করা

হইয়াছে—ইহা ইহার একটি দিক। ইহার আরও দিকগুলি বিচার করিলে দেখা যায় যে, গান্ধীজীর আদর্শ, গান্ধীজীর কর্ম্মধারা তাঁহারই অভীপ্সিত স্বরাজ—জীবনের অধিকার, কর্ত্তব্য ও লক্ষ্যকে সংগ্রামে আহ্বান করা হইয়াছে। সর্ব্বোপরি ভারতীয় সংবিধানানুযায়ী স্বাধীন ভারতবাসীর মৌলিক অধিকারকেও এই মানভূমে চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছে। মানভূম এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়াছে।

"গডসে একটা অন্ধ সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততায় স্বাধীন ভারতের জনক মহাত্মা গান্ধীকে স্বাধীন ভারতেই হত্যা করিয়াছিল। কংগ্রেস গবর্ণমেন্ট তাহাকে বিচারে ফাঁসী দিয়াছেন। এই স্বাধীন ভারতবর্ষেই অন্ধ সাম্রাজ্যবাদী উন্মত্ততায় স্বাধীনতা ও গান্ধীজীর আদর্শের ধারক ও বাহক কর্ম্মীদের দমন করিবার জন্য যে বিহার কংগ্রেস গবর্ণমেন্ট 'জননিরাপত্তা' আইন ও অন্যান্য উপায় প্রয়োগ করিয়া গান্ধীবাদকে ও ভারতের স্বাধীনতাকে হত্যা করিতেছে তাহার বিচার হইবে না বলিয়া যদি কেহ আশ্বস্ত থাকেন তবে তাহা ভুল। গণ-নারায়ণের সুদর্শন চক্র অবিশ্রান্তই ঘুরিতেছে। ইহা কাহাকেও বাদ দেয় না, শুধু সময় পূর্ণ হইবার অপেক্ষা রাখে মাত্র।"

করিমগঞ্জে ষ্টীমার কোম্পানীর স্বেচ্ছাচার

কলিকাতা হইতে কাছাড়ে অধিকাংশ মাল আমদানী হয় ষ্টীমার মারফত; কারণ আসাম লিঙ্ক লাইনে মাল পাঠাইবার নানারূপ অসুবিধা। ১লা মাঘের "যুগশক্তি"র এক সংবাদে প্রকাশ, গত ১৩ই জানুয়ারী ষ্টীমার কোম্পানী করিমগঞ্জ ব্যবসায়ী সমিতিকে জানাইয়া দিয়াছে যে নদীর জল কমিয়া চড়া পড়ার দরুন কোম্পানী অতঃপর আর কোন মাল বহন করতে সক্ষম হইবে না।

"যুগশক্তি" এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে ষ্টীমার কোম্পানীর এই স্বেচ্ছাচারিতার নিন্দা করিয়া লিখিতেছেন, বহুদিন হইতে জলপথে ষ্টীমারে মালপত্র আমদানী রপ্তানী ব্যাপারে নানারূপ অসুবিধা জনসাধারণকে ভোগ করিতে হইতেছে এবং বারংবার আবেদন সত্ত্বেও তাহার কোন প্রতিকার করা ষ্টীমার কোম্পানী প্রয়োজন মনে করে নাই। আসাম লিঙ্ক লাইনের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকায় নিরুপায় জনসাধারণকে এই সকল অবিচার বাধ্য হইয়া সহ্য করিতে হইতেছে। সমগ্র কাছাড় ও লুসাই পাহাড় জেলা, ত্রিপুরার অধিকাংশ স্থান, মণিপুর ও আসামের কিয়দংশ বেশীর ভাগ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য করিমগঞ্জ বাজারের উপর নির্ভরশীল এবং করিমগঞ্জ বাজারের মালের একটি বিরাট অংশ পাকিস্থানের মধ্য দিয়া ষ্টীমারযোগে কলিকাতা হইতে আসে। ষ্টীমার কোম্পানীর অব্যবস্থার জন্য যথারীতি মালপত্রাদি না আসায় গত কয়েক সপ্তাহ হইতে করিমগঞ্জ বাজারে তৈল, চিনি প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ দুর্লভ ও দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠে। তৈলের মূল্য ৮০৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকায় যায়, কিন্তু তাহাও দুষ্প্রাপ্য হয়। চিনির দাম ৩৭।৩৮৲ টাকা এবং খুচরা ১৲ টাকায় উঠে। সংক্রান্তির বাজারে মফস্বলের পাইকাররা মাল না পাইয়া ফিরিয়া যান।

"যুগশক্তি" লিখিতেছেন, "অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে সংক্রান্তি উপলক্ষে ব্যবসায়ীদের প্রায় মাসখানেক আগেকার অর্ডারী বহু তৈল ষ্টীমার কোম্পানীর অব্যবস্থার দরুন আসে নাই।"

ষ্টীমার কোম্পানী নদীতে জল কমিয়া যাওয়ার যে যুক্তি দেখাইয়াছে সেই সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে নদীকে চালু রাখিবার জন্য ষ্টীমার কোম্পানীর পরিপূর্ণ নিশ্চেষ্টতার কথা উল্লেখ করিয়া "যুগশক্তি" লিখিতেছেন, "দেশ বিভাগের পূর্ব্বকালে ষ্টীমার কোম্পানী প্রতি বৎসর হেমন্তে স্ক্রু হুইলার আনিয়া নদী খোদাই করিতেন, ফলে জাহাজ বার মাস এই নদীতে চলিতে পারিত। কিন্তু পাকিস্থান সৃষ্টি হওয়ার পর ষ্টীমার কোং এই খাতে পাই পয়সাটা পর্যান্ত খরচ করেন নাই। স্থানে স্থানে নদীতে বেণ্ডেলিং দ্বারা নদীর স্রোত অব্যাহত রাখা হইত। কিন্তু তাহাও গত ৫।৬ বৎসর যাবৎ বন্ধ।" ষ্টীমার কোম্পানী এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি পুনঃপুনঃ এই দিকে আকৃষ্ট করা সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত অবস্থার উন্নতি বিধানের কোন চেষ্টা হয় নাই।"

ষ্টীমার কোম্পানীর যথেচ্ছাচারের ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব এবং দুর্ম্মূল্যতার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যগুলি রপ্তানী করা সম্ভব হইতেছে না—ফলে জনসাধারণ যে ব্যাপক অর্থ নৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছেন পত্রিকাটি সরকারকে অবিলম্বে সে সম্পর্কে অবহিত হইবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন।

বনগাঁতে নূতন মিউনিসিপ্যালিটি

১৯৩২ সনের বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল এক্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপালের এক সাম্প্রতিক নির্দ্দেশে বনগাঁতে ১৫ জন কমিশনার লইয়া একটি মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই সরকার বনগাঁ শহরে একটি মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন বর্ত্তমানে তাহা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিল।

মেদিনীপুরের পথ-ঘাটের অব্যবস্থা

মেদিনীপুরের রাস্তাঘাটের বিভিন্ন অসুবিধা এবং বর্ত্তমান দুরবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে "মেদিনীপুর পত্রিকা" লিখিতেছেন:

"মেদিনীপুর জেলার রাস্তাঘাট সম্বন্ধে বলতে গেলে কোন্‌টিকে বাদ দিয়ে কোন্‌টিকে বলব সেইটিই সমস্যা। ময়নার রাস্তাঘাট সম্পর্কে বহু দিন সচেষ্ট হওয়া উচিত ছিল। কাঁথি এবং তমলুক মহকুমায় যদিও-বা কিছু সংস্কার বা নূতন রাস্তা হয়েছে, সদর মহকুমা ও ঘাটাল মহকুমা যেন অভিভাবকহীন। ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর ও নয়াগ্রাম অঞ্চলের রাস্তাঘাট সম্বন্ধে যেখানে সর্ব্বাগ্রে নজর পড়া উচিত ছিল সেখানেই নজর পড়ছে না, ফলে প্রদেশ পুনর্ব্বণ্টনের ক্ষেত্রে এই অংশের একটা জনমত যদি বিরূপভাব পোষণ করে আমরা বলব তার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী জেলার সরকারী দল এবং সরকারী ব্যবস্থা।"

পাঁশকুড়া-ঘাটাল রাস্তা নির্ম্মাণ অনেক উদ্যোগ-আয়োজনের পর ধামাচাপা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। বহু লোকের জমি দখল করিবার পর এখন সরকারী উদ্যোগে ভাঁটা পড়িয়াছে।

"যেখানে আমরা আশা করিয়াছিলাম খড়্গপুর থেকে কলিকাতা

পর্য্যন্ত ইলেকট্রিক ট্রেন চালু হওয়া উচিত, মেচাদা থেকে দীঘা পর্য্যন্ত রেল-লাইন পাতার ব্যবস্থা হওয়া উচিত, কলিকাতা হইতে দীঘা পর্য্যন্ত সরাসরি মোটর চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা ও যোগাযোগ অবিলম্বে স্থাপন এবং ষ্টেট বাস রুট প্রবর্ত্তন করা উচিত সেখানে জেলাভ্যন্তরে সাধারণ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করা দূরে থাকুক, ব্যাহত বা বিলম্বিত করার পক্ষে নিশ্চয়ই কোন যুক্তি থাকিতে পারে না।"

পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্য অঞ্চলে অপরাধ-নিরোধ ব্যবস্থা

২৮শে জানুয়ারী "সাপ্তাহিক পশ্চিমবঙ্গ" পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ যে গ্রামাঞ্চলে অপরাধ-নিরোধের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ১৯৫৪ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে এই ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের মহা-আরক্ষা পরিদর্শক শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার বলেন যে, উপযুক্ত সংবাদ না পাইলে পুলিস ফলপ্রসূ কর্ম্মতৎপরতা দেখাইতে পারে না। যতদিন পর্য্যন্ত চৌকিদার এবং দফাদাররা প্রত্যক্ষভাবে পুলিসের অধীন ছিল ততদিন পর্য্যন্ত পুলিস যথারীতি গ্রামাঞ্চলের সমুহ সংবাদাদি পাইত। কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ড ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ফলে চৌকিদাররা মাসে মাত্র একবার থানায় হাজিরা দেয়। ফলে পুলিসের সংবাদ সংগ্রহে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় এবং গ্রামাঞ্চলে অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গ্রাম্য প্রতিরোধ বাহিনী গড়িয়া তুলিবার পর হইতে অপরাধের সংখ্যা অবশ্য হ্রাস পাইতে থাকে। ১৯৫০ সনে যেখানে ১৬৭৬টি ডাকাতি সংঘটিত হইয়াছিল ১৯৫১ সনে কমিয়া তাহার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪২৮ এবং ১৯৫২ সনে ১০৮৭। ১৯৫৩ সনের ১৪ই নবেম্বর পর্য্যন্ত হিসাবে দেখা যায় যে, ডাকাতির সংখ্যা আরও হ্রাস পাইয়া ৬৯৩টিতে দাঁড়ায়। আজ প্রায় প্রতিটি গ্রামেই একটি রক্ষী দল আছে।

নূতন ব্যবস্থায় প্রতিরোধী দলের কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং গ্রাম্য জনসাধারণ যাহাতে আরও বেশী উপকৃত হইতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক গ্রাম্য প্রতিরোধী দলে একজন করিয়া সংবাদ-সংগ্রহকারী অফিসার নিযুক্ত হইবেন। প্রতিরোধী দলের নেতা দলের মধ্য হইতে বাংলা লিখিতে ও পড়িতে জানেন এইরূপ একজন বিশ্বাসযোগ্য সভ্যকে সংবাদ-সংগ্রাহক নিযুক্ত করিবেন এবং এই নিয়োগের সংবাদ সকল গ্রামবাসীকে জানাইয়া দেওয়া হইবে। সংবাদ-সংগ্রাহক ডাকযোগে এবং চৌকিদার ও দফাদারদের থানায় হাজিরার দিন তাহাদের মারফত সন্দেহজনক লোকের গতিবিধি, নামজাদা দুষ্ট লোকদের সহিত অন্তরঙ্গ আগন্তুকের উপস্থিতি, নামজাদা দুষ্ট লোকদের অনুপস্থিতি বা অস্বাভাবিক আচরণ, ছোটখাট মারামারি, অনুষ্ঠিত বা অনুষ্ঠেয় সভা—সভার আলোচ্য বিষয়, সন্দেহজনক মৃত্যু, ব্যক্তিবিশেষের অন্তর্দ্ধান, অনুষ্ঠিত অপরাধের সংক্ষিপ্ত সংবাদ ইত্যাদি থানায় পাঠাইবেন। প্রয়োজন-বোধে টেলিগ্রাম বা বিশেষ দূত মারফতও সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে—এই সকল ব্যয় বহন করিবেন রাজ্য সরকার। কালক্রমে এই সংবাদ-সংগ্রাহকগণ গ্রামে সরকারের প্রতিনিধি হিসাবেও কাজ করিতে পারিবেন বলিয়া শ্রীহীরেন্দ্রনাথ আশা প্রকাশ করিয়াছেন।

পূর্ব্বেকার দিনে, ইংরেজের শাসনে বাঙালী নিরস্ত্র নির্বীর্য্য হইবার পূর্ব্বে, এই জাতীয় ব্যবস্থাই অনেক স্থলে ছিল। ইহাতে গ্রামবাসী শুধু যে অত্যাচার নিরোধ করিতে পারে তাহাই নহে, ইহার ফলে সে ক্রমে স্বাবলম্বী হইতে শিখে।

পশ্চিমবঙ্গে ভূদানযজ্ঞে প্রাপ্ত জমির পরিমাণ

সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, ভূদান যজ্ঞের মাধ্যমে সমগ্র ভারতে ২৯ লক্ষ একরেরও বেশী জমি সংগৃহীত হইয়াছে। ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে মোট ৪৫২ একর জমি সংগৃহীত হয়। ত্রিপুরা রাজ্য হইতে পাওয়া গিয়াছে ১৫২৬ একর জমি। ৩রা মাঘ নূতন বাংলা সাপ্তাহিক "ভূদানযজ্ঞ" এই সংবাদ পরিবেশন করিয়া লিখিতেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে সংগৃহীত জমির পরিমাণ নিম্নরূপ :

জেলা	৩১ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট প্রাপ্ত জমির পরিমাণ (একর)	দানপত্রের সংখ্যা
মেদিনীপুর	১৭৯'৬০	৩০১
নদীয়া	৭৩'৮১	—
মালদহ	৬৩'৫৬	২৯
২৪ পরগণা	৪৩'৪৭	৩১
বীরভূম	৩৯'৪২	২২
পশ্চিম দিনাজপুর	১৫'৬৩	৪
হুগলী	১৫'৫০	৩৩
বর্দ্ধমান	১২'৯৫	১
হাওড়া	৩'৮১	১৩
বাঁকুড়া	৩'১৫	৪
মুর্শিদাবাদ	১'৬৫	—

আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী এক সংখ্যায় সমগ্র ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে কি পরিমাণ জমি পাওয়া গিয়াছিল তাহার হিসাব প্রকাশ করিয়াছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

সংস্কৃত শিক্ষা

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

উপক্রমণিকা

আজকাল সংস্কৃতজ্ঞগণকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ফেলিতে পারা যায়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য। প্রাচ্যগণ জ্যেষ্ঠ, আর পাশ্চাত্ত্যগণ কনিষ্ঠ। কিন্তু ইহাতেই কোন দলকে উৎকৃষ্ট বা অপর দলকে নিকৃষ্ট বলা যাইতে পারে না। জ্যেষ্ঠরাও কখনো নিকৃষ্ট এবং কনিষ্ঠরাও কখনো উৎকৃষ্ট হইতে পারেন। যাহা চোখে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অপলাপ করা সম্ভব নহে। দ্বেষ করিয়া লাভ ত হয়ই না, বরং অনর্থই হয় বেশী। ইঁহাদের উভয়েরই যোগ আবশ্যক। ইহাতেই সংস্কৃতের অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা।

তত্ত্বনিষ্ঠা

এখানে একটা কথা অবশ্য বক্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে। আপনারা অনুগ্রহপূর্বক অনুধাবন করিবেন। ঈশ্বরও আদেশ করেন নাই বা ধর্মশাস্ত্রকারগণও পাঠ করেন নাই যে, প্রত্যেকেই একই পথে চলিবে। পূর্বে এইরূপ বিমান ছিল না বলিয়া এখনো কেহ তাহাতে চলিবে না, ইহা হয় না। যদি কেহ এইরূপই করেন, তবে তিনি অর্থভ্রষ্ট হইয়া অনর্থে পতিত হইবেন।

আরো একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। মনে হয়, আমাদের এমন কিছু অনেক আছে যাহা না করিলে হইত, অথবা যাহা অন্যপ্রকারে করিলে হইত, কিংবা একেবারেই বর্জন করিতে হইত। দৃশ্ ধাতু হইতে আমরা পশ্যতি, পশ্যতঃ ইত্যাদি পদ বাল্যকাল হইতে শিখিয়া আসিতেছি। আমাদিগকে বলা হইয়া থাকে, দৃশ্ ধাতু স্থানে পশ্য আদেশ হয়। কিন্তু ইহাতে তত্ত্বকথা বলা হয় না। আদেশ করিয়া ঈশ্বরও ঘটকে পট করিতে পারেন না। এখানে আসল কথাটা এই যে, দর্শন-অর্থে প্রচলিত স্পশ্[১] ধাতু হইতে পশ্যতি ইত্যাদি পদ হইয়া থাকে। লৌকিক সংস্কৃতে স্পষ্ট, আর 'চর' অর্থে স্পশ্ (তুলনীয় spy) শব্দ আমাদের সকলেরই জানা; আর পতঞ্জলির মহাভাষ্যের পস্পশা শব্দ বিশেষজ্ঞগণ জানেন। স্পশ্ ধাতু হইতে এই কয়টি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

অন্য একটি কথা ভাবিবার আছে। গত্যর্থক ই ধাতুর লুঙ্ লকারে অগাৎ পদ হয়, ইহাই আমরা সকলে সাধারণত পড়িয়া থাকি। কিন্তু কিরূপে ইহা হয়? কোন ঐন্দ্রজালিকের কথায় এইরূপ কিছু হইতে পারে, কিন্তু শব্দতত্ত্ব ইন্দ্রজাল নহে।

কেহ মনে করিবেন না ই ধাতুর বস্তুতই গা হইয়াছে। ব্যাকরণের আচার্য এখানে কেবল একটা সুগম উপায় মাত্র ("উপায়কৌশল্য") অবলম্বন করিয়াছেন। উপায়টা এই যে, ইহা এরূপ হইবে যাহাতে সহজে কিছু একটা বুঝা যায়। ইহাতে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই উপকার হয়। ভাষান্তরেও এইরূপ হইয়া থাকে।[২]

দৃশ্ ধাতুর স্থানে পশ্য আদেশ করিবার এই অভিপ্রায় নহে যে, দৃশ্ ধাতু সত্য-সত্যই পশ্য আকার ধারণ করে। ইহার তাৎপর্য এই যে, দৃশের স্থানে পশ্য পাঠ করিতে হইবে; সাধারণ পাঠকেরা ইহা বিচার না করিয়া ভ্রান্ত হইয়া থাকেন।

যদিও আচার্যের পক্ষের দোষ এইরূপে ক্ষালন করা যায়, তথাপি ইহাকে একেবারে দোষমুক্ত বলা যায় না। যেমন, আমাদের পা, ঘ্রা ও স্থা ধাতুর স্থানে যথাক্রমে পিব, জিঘ্র ও তিষ্ঠ আদেশ হয় বলা হইয়া থাকে। কিন্তু বস্তুত এ স্থলে ধাতু অভ্যস্ত হয় ইহাই বলিলে ঠিক বলা হয়। এইরূপ জক্ষ্, জাগৃ প্রভৃতি ধাতু বস্তুত অভ্যস্ত, আর কিছু নহে। এখানে ঘস্ ধাতুটি বস্তুত গ্রস্ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। কঠোর শ্বাসের অনুপ্রদানে রকারের যোগে অল্পপ্রাণ গকার মহাপ্রাণ ঘকার হইয়া গিয়াছে, আর কিছু নহে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক।

আদেশের সম্বন্ধে পূর্বে আমরা একটু আলোচনা করি-

১। ইহারই সহিত লাতিন spec শব্দ সংসৃষ্ট। ইংরেজী spectator প্রভৃতি শব্দ প্রসিদ্ধ।

২। যেমন ইংরেজীতে he goes, he went যথাক্রমে বর্তমান ও অতীতকালে প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু এই দুই ক্রিয়াপদ একই ক্রিয়া to go হইতে হয় নাই; একই to go হইতে goes ও went হয় না; went হইয়াছে গমনার্থক স্বতন্ত্র ক্রিয়া to wend হইতে। এইরূপ ফরাসীতে etre (to be) হইতে je suis (I am), আর অতীত কালে je fus (I went) এই উভয় ক্রিয়া পদ এক ধাতু হইতে নহে। এইরূপ জার্মান ভাষায় বর্তমানে Ich bin (I am) আর অতীত কালে Ich war (I was) এই উভয় ক্রিয়া পদ একই ক্রিয়া হইতে হয় নাই। কিন্তু সুবিধা হইবে ভাবিয়া এইরূপ করা হইয়াছে।

য়াছি। আরও একটু করিতে হইবে। বলা হইয়া থাকে অ স্থি শব্দের তৃতীয়া প্রভৃতি স্থানে অ স্থ্ না, দ ধ্না ইত্যাদি হয় (পাণিনি, ৭. ১. ৭৫)। কিন্তু এই সমস্ত পদে নকারের যোগ কোথা হইতে হইল? বহু অনুসন্ধান করিলেও ত ইহা পাওয়া যায় না। আসল কথা হইতেছে, এখানে একই অর্থে দুইটি পৃথক্ শব্দ, একটি ইকারান্ত অ স্থি শব্দ, আর অপরটি নকারান্ত অ স্থ ন্ শব্দ; অর্থ উভয়েরই 'হাড়'। বেদে ইহার বহু প্রয়োগ আছে। যথা "অস্থন্বন্তং কর্ণবন্তং" (ঋগ্বেদ ১. ১৬৪. ৪)। "ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুযাম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ", এখানে এই প্রসিদ্ধ (১-৮৯-৮) ঋঙ্মন্ত্রে অ ক্ষ ভিঃ শব্দটি অ ক্ষি হইতে নহে, অ ক্ষ ন্ হইতে। এইরূপ দ ধ্না পদটি দ ধি হইতে নহে, দ ধ ন্ হইতে। এইরূপ স ক্ থি শব্দের রূপেও বুঝিতে হইবে।

অনেক কিছু বলিবার আছে, অতএব বাহুল্য বর্জনীয়। এখানে ইহাই জানিতে ইচ্ছা হয় যে, কবে আমাদের সেই সময়টা উপস্থিত হইবে যখন আমরা কাল্পনিক সমাধান বর্জন করিয়া যাহা সত্য তাহাই গ্রহণ করিতে পারি।

আদেশবিধির কথা আমরা পূর্বে একটু আলোচনা করিয়াছি, আরো একটু করিতে হইবে। দ ম্প তি ও জ ম্প তি এই শব্দ দুইটি আমাদের সকলেরই জানা। ইহার মধ্যে প্রথমটিকে সর্বত্র প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়, কিন্তু দ্বিতীয়টিকে একমাত্র ব্যাকরণের গ্রন্থগুলির মধ্যে ঐ উদাহরণটিরই জন্য উদ্ধৃত করা হইয়া থাকে। হয় ত পূর্বে কোথাও প্রয়োগ ছিল, পরে তাহার লোপ হইয়া গিয়াছে। যাহাই হউক, এখন প্রশ্ন হইতেছে, ঐ শব্দ দুইটির ব্যুৎপত্তি কি? আসল অর্থ কি? আমরা শুনিয়া আসিতেছি, জা যা-প তি শব্দের জা য়া স্থানে নিপাতনে জম্ ও দম্ হয়, আর তাহার সহিত প তি শব্দ যুক্ত হইলে যথাক্রমে ঐ পদ দুইটি হইয়া থাকে। কেহ ইহা বলিতে গেলে লজ্জিত হওয়া উচিত। আর কিছু নহে, কেহ ঋগ্বেদের (২.১২৭.৮) সায়ণাচার্য-কৃত এই ভাষ্যপঙ্ক্তিটুকু একটু পড়িয়া দেখিবেন—"দম্পতিং গার্হপত্যাদিরূপেণ গৃহস্য পালকং। দম ইতি গৃহ নাম।..."অকারলোপশ্ছান্দসঃ" ইতি। বেদে 'গৃহ' অর্থে দ ম শব্দের বহু প্রয়োগ আছে,[৩] যেমন "মোদমানৌ স্বে গৃহে"। ঋগ্বেদে দ ম্প তি শব্দ অগ্নি, ইন্দ্র ও অশ্বিদ্বয়ের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়। দ ম শব্দের মুখ্য অর্থ 'গৃহ', অতএব যিনি গৃহপতি তিনিই দমপতি বা দম্পতি (দ্বিবচনে দম্পতী)। বেদে দম শব্দ আদ্যুদাত্ত। এই জন্য ঐ স্বরটি প্রবল ও তাহার পরবর্তী মকারস্থ অকার দুর্বল হয় আর লুপ্ত হইয়া থাকে (অর্থাৎ এখানে বর্ণলোপ, Syncope)। অতএব এই শব্দ সমাধানে কোন দোষ পাওয়া যায় না। অর্থের দিক দিয়াও কোন দোষ হয় না। দম্পতি শব্দের আক্ষরিক বা মুখ্য অর্থ গৃহপতি, আর যখন দ্বিবচনে প্রয়োগ করা হয় তখন গৌণ অর্থে একত্র জায়া ও পতিকে বুঝাইয়া থাকে। এখানে একশেষ দ্বন্দ্ব প্রভৃতি কল্পনা পরের যোজনা।

জম্পতি শব্দেরও ব্যুৎপত্তিতে কোন কষ্ট কল্পনা করিতে হয় না। নিঘণ্টুতে পৃথিবীর একুশটি নাম ধরা হইয়াছে। যাস্ক ইহাদের কতকগুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাদের অন্যতম নামটি হইতেছে জ্মা। এই জ্মা শব্দটি বিপ্রকর্ষে (Anaptyxis) জম হয়; ঠিক যেমন ধ্মা ধাতু হইতে ধ ম, আর ম্না ধাতু হইতে ম ন হইয়া থাকে (পাণিনি, ৭. ৩. ৭৮)। তাহার পর দ ম প তি শব্দের অকারের লোপের ন্যায় এখানেও অকারলোপে জ ম্প তি। ইহার মুখ্য অর্থ 'ভূপতি,' গৌণ অর্থ দ্বিবচনে 'জায়াপতী'।

প্রসঙ্গবশত এখানে আর একটা কথা বলা আবশ্যক: ব্যাকরণ আমরা পড়িয়া থাকি, কিন্তু সাধারণ নিরুক্তের (philology) জ্ঞান না থাকিলে ব্যাকরণের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। আচার্য যাস্ক নিজের নিরুক্তে এই কথাই বলিয়াছেন (১. ১৫)—"ইহা (অর্থাৎ নিরুক্ত) ছাড়া মন্ত্রের অর্থ বুঝা যায় না। অর্থ না জানিলে ভাল করিয়া স্বর জানা হয় না, বিষয়ও পরিষ্কার হয় না। ইহাই বিদ্যাস্থান, এবং ইহাই ব্যাকরণের সম্পূর্ণত্ব সাধন করেন।"

প্রাকৃত

এখানে কাহারও কাহারও অপ্রিয় হইলেও অনেকেরই ভাল হইবে ভাবিয়া একটি কথা বলিতে যাইতেছি। আজকাল এরূপ অনেক সংস্কৃতজ্ঞ আছেন, যাঁহারা প্রাকৃতকে যে কেবল ভালবাসেন না, তাহা নহে, বরং অত্যন্ত অবজ্ঞা করেন। ইহাতে পরের তেমন অপকার হয় না, যেমন নিজেরই প্রভূত অপকার হইয়া থাকে। অজ্ঞানবশত ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। কেহ কেহ ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, প্রাকৃত স্পর্শও না করিয়া কোন ব্যক্তি মীমাংসা বা বেদান্তে ধুরন্ধর হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি প্রাকৃত না জানেন তবে তিনি সংস্কৃতবিদ্ বলিয়া স্বপ্নেও গণ্য হইতে পারেন না।

স্পষ্টই দেখা যায়, প্রাচীনেরা সংস্কৃত ও প্রাকৃতকে সহপঠনীয় বলিয়া মনে করিতেন। সংস্কৃত দৃশ্য কাব্যগুলি সাধারণত সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষাতেই রচিত হইয়া থাকে। সাহিত্যদর্পণকার, "সাহিত্যার্ণবকর্ণধার" বিশ্বনাথ কবিরাজ অষ্টাদশ ভাষা জানিতেন। ইহার মধ্যে

৩। Greek, *domos*, Latin, *domus*, Eng. *dome*.

একটি সংস্কৃত, আর সতেরটি প্রাকৃত। এই কবি কবিজনোচিত ভাষায় এই বিষয়টি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন— "অষ্টাদশ ভাষাবারবিলাসিনীভুজঙ্গ" ইতি। তাঁহার পিতাও ছিলেন সমস্ত ভাষায় নিপুণ ("সব্বভাসাচউরো"), এবং ভাষার্ণব নামক একখানি গ্রন্থের রচয়িতা। পূর্বে এমন সব প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ছিলেন, যাঁহারা সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষাতেই ব্যাকরণ রচনা করেন। এসব এখন পাওয়া যায়, অনেক ছাপাও হইয়াছে। যেমন হেমচন্দ্র, ক্রমদীশ্বর ও পুরুষোত্তমের সংস্কৃত ও প্রাকৃত ব্যাকরণ। আলঙ্কারিকেরা জানেন যে, অলঙ্কার আলোচনার জন্য প্রাকৃত জ্ঞান প্রচুর থাকা আবশ্যক। পাঠকেরা এখানে ভোজরাজের সরস্বতীকণ্ঠাভরণের কথা মনে করিতে পারেন।

একটুও প্রাকৃতজ্ঞান না থাকিলে সংস্কৃত জানিলেও কেমন শোচনীয় অবস্থা হয়, শত-শতের মধ্যে তাহার দুই একটি মাত্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিটি কবিকুলগুরু কালিদাসের রঘুবংশে (২. ৩৯) আছে

"সক্তাঙ্গুলিঃ সায়কপুঙ্খ এব
চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাব তস্থে।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও (৬. ১০. ১৪) পাওয়া যায়—

"পুঙ্খানুপুঙ্খং পতিতৈর্জ্যোতীংষীব নভো ঘনৈঃ।"

এখানে পুঙ্খ শব্দের অর্থ কি? পাখীর পাখনা। সংস্কৃতে যাহা পক্ষ, প্রাকৃতে তাহাই পুঙ্খ এই আকার ধারণ করিয়াছে। শব্দের প্রয়োগকর্তা সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ভেদ অবধারণ করিতে না পারিয়া অনবধানে পক্ষ না লিখিয়া পুঙ্খ লিখিয়া ফেলিয়াছেন। এখানে প্রয়োগকর্তা স্বয়ং কালিদাস। সেই সময়ে প্রাকৃতের কি প্রভাব ছিল তাহা ইহাতেই বুঝা যাইবে।[৪] ইহা মোটেই বিচিত্র নহে, কারণ যখন বৈদিক ভাষাতেও বিকৃত স্থানে বিকট পদ পাওয়া যায়। ইহাতে ঈদৃশ পদ অনেক অনেক আছে এবং পণ্ডিতগণের ইহা সুবিদিত।

প্রকৃত স্থলে পক্ষ স্থানে পুঙ্খ হওয়ার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে পারা যায়। প্রাকৃতে ইহা সাধারণ নিয়ম যে, সংস্কৃত শব্দে স্বরের পরে ক্ষকার স্থানে বিকল্পে কখ্‌কার বা চ্ছকার হইয়া থাকে। তদনুসারে প্রথমে ক্ষ-স্থানে কখ হওয়ার পর, পকার ওষ্ঠ্য বর্ণ হওয়ায় তাহার প্রভাবে অকারটি উকার হইয়া যায়। ইহার পর স্বয়ঞ্জাত অনুনাসিক ভাবের (Spontaneous nasalization) জন্য পুকখ হইয়াছে পুঙ্খ।

শব্দের নির্বাচন করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে যুক্তি থাকা আবশ্যক। যাস্ক বলিয়াছেন, ব্যুৎপত্তি দেখাইতে হইলে অর্থের প্রতি নিষ্ঠা থাকা দরকার ("অর্থনিষ্ঠঃ পরীক্ষেত")। যা তা একটা ব্যুৎপত্তি দিলেই হয় না। কোন কোন স্থলে এমনও ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয় যাহা শুনিতে লজ্জা বোধ হয়। আপ্‌টের সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানে আছে—"পুমাংসং খনতি। খন্‌ ড" ইতি। এখানে কি বলিতে হইবে?

পাখীর পাখা বুঝাইতে সংস্কৃতে পিচ্ছ ও পিঞ্ছ শব্দও আছে। কিন্তু বস্তুত ইহাদের কোনটিই সংস্কৃত নহে, কিন্তু পরবর্তী সংস্কৃতে অনেক পাওয়া যায়। আসল কথা হইতেছে এই দুইটি শব্দই প্রাকৃত এবং সংস্কৃত পক্ষ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্বে বলা হইয়াছে সংস্কৃত শব্দে স্বরের পরবর্তী ক্ষকার প্রাকৃতে কখ অথবা চ্ছ হইয়া থাকে। যখন চ্ছ হয় তখন চ্ছ তালব্য বলিয়া তাহার প্রভাবে পকারস্থ অকারের স্থানে ইকার হইয়া যায়। আর পচ্ছ হইয়া যায় পিচ্ছ। পরে ইহাই স্বয়ংজাত অনুনাসিকভাবে পিঞ্ছ আকার ধারণ করে। ইহার একটি নির্বাচন এইরূপ পাওয়া যায়; ক্ষীরস্বামী অমরকোশে লিখিয়াছেন—"পিচ্ছতি পিচ্ছম্‌"। ভাণুজিদীক্ষিত ঐ স্থানেই লিখিয়াছেন "পিচ্ছয়তি পিচ্ছয়তে বা। কুট্টনে। অচ্‌ ধঞ্‌ বা।" এখানে কিছু বলিবার নাই। পণ্ডিতগণ জানিবেন যে, বহু বহু অসংস্কৃত পদ সংস্কৃত বলিয়া নির্বিচারে সংস্কৃতের পালি-প্রাকৃতের মধ্যে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সংস্কৃতে প্রাকৃতের প্রভাব এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্বে অনেক স্থানে এই প্রাকৃতভাবকে আর্ষ প্রয়োগ বা ছান্দস প্রয়োগ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাতে পদটির যথার্থ স্বরূপটি আবৃত হইয়া পড়িয়াছে।

এখানে অপর দিকে একটি বিষয় দেখিবার আছে। আমাদের মধ্যে বহু অনুপযুক্ত অধ্যাপক সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যগুলি পড়াইতে গিয়া বড় অনর্থ করেন। আমাদের এই বন্ধুগণ মূলের প্রাকৃত অংশগুলি নিজেও প্রাকৃতে পড়েন না বা ছাত্রগণকেও প্রাকৃতে পড়ান না, কিন্তু সংস্কৃতের ছায়া মাত্র পাঠ করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহারা কাব্যের সমগ্র মাধুর্য সংহার করিয়া থাকেন। ইঁহারা একটুও অনুভব করিতে পারেন না যে, দুধ যদি দধিরূপে পরিণত হয় তবে দধি খাইলে দুধের গুণ আস্বাদন করা হয় না। পাঠকগণ

৪। কালিদাস মেঘদূতে একটি নদীর নাম দিয়াছেন শিপ্রা। ইহা বস্তুত হইয়াছে ক্ষিপ্রা হইতে। ঐ কাব্যেরই অন্যত্র আছে ঢাপা। ইহা একটি দেশী প্রাকৃত শব্দ। ইহা এক রকম মদকে বুঝায়। গাল বুঝাইতে ভবভূতি মালতী মাধবে লিখিয়াছেন গল্ল। ইহা একটি প্রাকৃত শব্দ, সংস্কৃত গণ্ড হইতে হইয়াছে। ইঁহার উত্তর চরিতে আছে পুচ্ছ। ইহাও সংস্কৃত পশ্চ হইতে উৎপন্ন প্রাকৃত শব্দ। ইহার বৈদিক সাহিত্যেও প্রচুর প্রয়োগ আছে। মাঘ শিশুপাল বধে লিখিয়াছেন লাঞ্ছন ("মৃগ লাঞ্ছন" অর্থাৎ চন্দ্র), ইহা সংস্কৃত নহে, লক্ষণ হইতে উৎপন্ন প্রাকৃত। এইরূপ অনেক, অনেক।

নিজে একটু পরীক্ষা করিয়া দেখুন। নিম্নে বিদ্যাপতির একটা পদ উদ্ধৃত করিতেছি—

"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু পেখনু পিয় মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল মানয়ু দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানয়ু আজু মঝু দেহ ভেল দেহ।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল টুটল সব সন্দেহ॥"

ইহার সংস্কৃত ছায়াটি এই ঃ

অদ্য রজনীমহং ভাগেন প্রভাতামকারয়ং প্রৈক্ষে প্রিয়মুখচন্দ্রম্।
জীবনং যৌবনং সফলমমানয়ং দশ দিশো ভূতা নির্দ্বন্দ্বাঃ॥
অদ্য মম গেহং গেহমমানয়মদ্য মম দেহো ভূতো দেহঃ।
অদ্য বিধির্মেঽনুকূলোঽভূত্তন্ত্রুটিতঃ সবঃ সন্দেহঃ॥

এই উভয়ের মধ্যে কি মহৎ ব্যবধান, এবং কোনটি উৎকৃষ্টতর তাহা আর আমাকে বলিতে হইবে না, পাঠকগণ অনুভব করুন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা আলোচনা করিয়া দেখুন। সংস্কৃতের দুর্ভাগ্যবশতঃ নির্বিশেষে টোল ও কলেজসমূহে এইরূপে একটি শিক্ষক ও ছাত্রের পরম্পরা উৎপন্ন হইয়াছে যাহা না নিজের না অন্যের কল্যাণের জন্য হইল। অতএব সাবধান, এ বিষয়ে কেহ যেন স্বপ্নেও ভ্রান্ত না হন। এইরূপে আমাদের প্রাকৃতজ্ঞান ক্রমশ হীন হইতে হইতে সংস্কৃত-জ্ঞানকেও হীন করিতেছে, কিছুতেই উন্নত করিতেছে না।

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষৎ যেন প্রাকৃতের নামকেও অগ্রাহ্য মনে করেন। ইহাতে তাঁহার সুবিচারের পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

এখানে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা অবশ্য বক্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে।

ভারতের প্রাচীন ভূগোল

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫. ১১. ৫) আছে কেকয় দেশের রাজা অশ্বপতি বলিতেছেন ঃ

ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্যো ন মদ্যপঃ।
নানাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান্ ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতঃ॥"

অর্থাৎ আমার জনপদের মধ্যে চোর নাই, কদর্য (অর্থাৎ কৃপণ, অপর কথায়, যে থাকিতে দান করে না, এমন ব্যক্তি) নাই, মাতাল নাই, অগ্নি আধান করে না এমন লোক নাই। বিদ্বান্ নহে এমন কেহ নাই, ব্যভিচার করে এমন কেহ নাই, আর ব্যভিচারী কেহ না থাকিলে ব্যভিচারিণী কোথায় থাকিবে?

এই কেকয় দেশ কোথায়? অথবা উপনিষদের অধ্যাত্ম-বিদ্যায় নিবিষ্টচিত্ত ছাত্র ইহা নাই-ই জানিলেন। কিন্তু যাস্ক নিরুক্তে (২. ২.) বলিতেছেন "শবতির্গতিকর্মা কম্বোজেষ্বেব ভাষ্যতে" ইতি, অর্থাৎ শব্ ধাতু 'গতি' অর্থে কম্বোজ দেশে পাঠ করা হয়; আর পতঞ্জলি নিজের ব্যাকরণ-মহাভাষ্যে এখানে যোগ করিয়াছেন (১. ১. ১.) "বিকার এনমর্যা ভাষন্তে শব ইতি" অর্থাৎ আর্যেরা এই ধাতুটিকে কোন কৃদন্ত পদের আকারে প্রয়োগ করেন, যেমন শব। মহাভাষ্যে এই প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে—"হম্মতিঃ সুরাষ্ট্রেষু। রংহতিঃ প্রাচ্য মধ্যেষু। গমিমেব ত্বার্যাঃ প্রযুঞ্জতে," অর্থাৎ গতি অর্থে হম্ম্ ধাতু সুরাষ্ট্র দেশে প্রযুক্ত হয়, প্রাচ্য মধ্যদেশে ঐ স্থলে রংহ্ ধাতু প্রযুক্ত হয়। আর আর্যগণ এখানে গম্ ধাতু প্রয়োগ করেন। ভাল, কোথায় এই কম্বোজ ও সুরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ? কোথাকার লোককে আর্য বলা হয়?

রঘুবংশে (২০. ৬৭) রঘুর দিগ্বিজয়ে তাঁহার অশ্বগুলি সিন্ধুনদের তীরে গা নাড়িয়া স্কন্ধ নাড়িয়াছিল। কিন্তু কাশ্মীরে সিন্ধুনদ কোথা হইতে আসিল? যদিও মল্লিনাথ লিখিয়াছেন, "সিন্ধুর্নাম কাশ্মীরদেশেষু কশ্চিন্নদীবিশেষ" ইতি। বস্তুত এখানে সিন্ধু শব্দস্থানে বক্ষু বা বংক্ষু[৬] পাঠ ঠিক হইবে। এই নদ আজকাল Oxus নামে প্রসিদ্ধ। অতএব বন্ধুগণ এই বিষয়টি অনুধাবন করিয়া দেখিবেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত।

কিছুকাল পূর্বে প্রধানতঃ সংস্কৃতজ্ঞগণের কোন এক বৃহৎ সভায়, যাহাতে বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন, কোন এক সংস্কৃত পণ্ডিত এই মর্মে এক প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, যে কোন তীর্থপরীক্ষার্থীকে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত অবশ্যই পাঠ করিতে হইবে এই নিয়ম করা হউক। এক জন সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন পণ্ডিত এই সম্বন্ধে ঐ সভায় নিজের এক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "ওহে বিদ্যারত্ন, কালিদাস নিজের বাড়ীর কোন্ ঘাটে স্নান করিতেন ইহা জানিলে একটা কৌতুক নিবারণ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কালিদাসের কাব্য বুঝিবার কোন সুবিধা হয় কি?" সমস্ত সভা মৌন অবলম্বন করিলেন। সবই অরণ্যে রোদন হইল।

যাহাই হউক, ইহা ঠাট্টা-উপহাসের কথা নহে, আর উপেক্ষারও বিষয় নহে। নিশ্চয়ই সেই সভার ঐ সকল সদস্য উপযুক্ত ছিলেন না, তাঁহারা নিজের ও অন্যের কল্যাণ বুঝিতে পারেন নাই। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত বলিতে কি বুঝায়, নিশ্চয়ই তাঁহারা জানিতেন না। অতএব যাহা কর্তব্য তাহা করিতেই হইবে।

৫। আমাদের বাঙলায় ছোট ছোট ছেলেদের 'হামা' দেওয়ার সহিত ইহার যোগ মনে হয়।

৬। দ্বিতীয় পাঠ পরবর্তী মনে হয়।

বৈদিক সাহিত্য

ঐ সভারই অধিবেশনে ঐ ব্যক্তি এইরূপ আর একটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, তীর্থপরীক্ষার্থী ছাত্রকে বিবিধ বৈদিক সাহিত্যের একটি সংগ্রহকে অবশ্য পাঠ করিতে হইবে। ইহাতে ঐ পূর্বোক্ত অধ্যাপক মহাশয় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন, আর তাঁহার গর্জন শুনা গেল আমাদের ধর্ম নষ্ট হইবে! ধর্ম নষ্ট হইবে! তীর্থ-পরীক্ষায় অদ্বিজদেরও অধিকার আছে, তাহারাও পরীক্ষা দেয়। কিন্তু তাহারা বেদ পড়িবে কিরূপে?

এখানে কি করিতে হইবে? দুইটি মাত্র পথ আছে। হয় যাহা পাঠ্য পড়িতেই হইবে, অথবা পরীক্ষা একবারেই ছাড়িতে হইবে।

বিষয়ের ইতিহাস

এখানে একটি কথা আলোচনার আছে। ইহা বিশেষ কিছু নূতন নহে, পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহারই একটু বিবরণ। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ জানেন, এমন সব দুর্গম গ্রন্থ আছে যাহা অবশ্য অধ্যয়ন করা উচিত, এ সবের অধ্যয়ন-অধ্যাপন লুপ্ত হইলে ধীরে ধীরে শাস্ত্রই নষ্ট হইবে। অতএব অব্যাহত ভাবে ইহা চলিতে থাকুক। এখানে একটু বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। কতক দুর্গম গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলেও সেই সেই বিষয়ের জ্ঞানকে প্রশস্ত বলা যায় না যদি আলোচ্য বিষয়ের ইতিবৃত্ত না জানা যায়, অর্থাৎ, বিষয়টির উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও প্রসার প্রভৃতি ঠিক না জানা যায়। যদি কেহ আজকাল আমাদের এখানে ন্যায় অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা করে তাহাকে বলা হইবে যে, ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্র পড়। সে তাহা করিলে এবং তাহার পরিশ্রম সার্থক হইলে, তাহাকে প্রশংসা করা হয়, 'বেশ, তুমি ন্যায়ে প্রশংসনীয় হইয়াছ। কিন্তু তাহাকে যদি অতি সামান্যও কিছু জৈন বা বৌদ্ধ ন্যায় সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যায় তবে সে কিঞ্চিন্মাত্রও বলিতে পারিবে না, যদিও জৈন ও বৌদ্ধগণ ন্যায়বিদ্যার প্রভূত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহা দ্বারা ভারতেরই প্রচুর গৌরব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতের ছাত্র ভারতেরই ন্যায়বিদ্যা অধ্যয়ন করে, অথচ তাহার এক অংশের সংবাদ রাখে না। ইহা নিশ্চয়ই ঠিক নহে। অতএব আমাদের ন্যায়ের ছাত্রগণের তাহার ইতিবৃত্তকে কিছুতেই অবজ্ঞা করা উচিত নহে।

যেমন ন্যায়ের তেমনি বহু ভেদ-ভিন্ন বেদান্ত, মীমাংসা প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রেরও ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে।

বৃহত্তর ভারতের বিবরণ

ভারতের বহির্ভাগে নিকটে বা দূরে সংসৃষ্ট বহু দেশ আছে। ইহাদিগকে আজকাল বৃ হ ত্ত র ভা র ত বলা হইয়া থাকে। ইহাদের সহিত ভারতের পূর্বে নানাপ্রকারে বহু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, ইহা কিছুতেই অপলাপ করা যায় না। আমাদের বিদ্যার উৎকর্ষের উদ্দেশ্যে, দৃগ্‌গোচরের প্রসারের জন্য ও এইরূপ অন্যান্য উপকারের জন্য আমরা ভারত-সংসৃষ্ট এই ইতিবৃত্তকে অবজ্ঞা করিতে পারি না। সংস্কৃতের ছাত্রেরা ইহা নিজ নিজ মাতৃভাষাতেই অনায়াসে অধ্যয়ন করিতে পারে।

অবেস্তা

আমি যেন এখানে একটু বাড়াবাড়ি করিতে যাইতেছি, যেন একটু নূতন বা অদ্ভুত কিছু বলিতে যাইতেছি। আমাকে যেন কেহ অন্যরূপ মনে না করেন, আমি পণ্ডিতী করিতে যাইতেছি না। সংস্কৃত ছাত্রগণের ইহাতে বহু উপকার হইবে মনে হওয়ায় কিছু বলিতে যাইতেছি। তথাপি আমার চিত্ত শঙ্কিত হইতেছে। অথবা যখন ইহা অবশ্য বক্তব্য মনে হইতেছে তখন আর ইতস্তত করিয়া লাভ নাই। আপনারা ক্ষমা করিবেন।

আমাদের বেদভাষা আর পারসীদের ধর্মভাষা অবেস্তা সম্বন্ধে পরস্পর সহোদরা। ইহার মধ্যে প্রথমটি জ্যেষ্ঠা আর দ্বিতীয়টি কনিষ্ঠা। সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ সংস্কৃত ও অবেস্তার মধ্যে বহুস্থানে তাহা অপেক্ষা সম্বন্ধ। নূতন পাঠক ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন।

সংস্কৃত	অবেস্তা
সোম	হওম
অসুর	অহুর (প্রাণপ্রদ)
দেব	দএব (দৈত্য অর্থে)
যজ্ঞ (=যজন)	যশ্ন
গাথা	গাথা
সেনা	হএনা
হস্ত	জস্ত
সুমত	হুমত
সূক্ত	হুখ্ত
পুত্র	পুথ্র
মিত্র	মিথ্র
মৃগ	মেরেগ (পাখী)
গিরি	গইরি
মন্যু	মইন্যু
তনূ	তনূ

ভূরি	বুইরি
পতি	পইতি
বিশ্ব	বীস্প

কয়েকটি ক্রিয়াপদ উদ্ধৃত হইতেছে—ভবতি (ভূ ধাতু), বইতি; ভরতে (ভৃ ধাতু), বরইতে; হন্তি (হন্ ধাতু), জইন্তি; অস্মি (অস্ ধাতু), অহ্মি; গৃভ্ণামি (=গৃহ্ণামি, গ্রহ ধাতু, বৈদিকে গ্রভ্ ধাতু), গেরহ্নামি; প্রীণামি (প্রী ধাতু), ফ্রীনামি, দদাতি (দা ধাতু), দদাইতি ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সংস্কৃতের ন্যায় অবেস্তাতেও লিঙ্গ, বচন ও পুরুষ ত্রিবিধ; স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দ প্রকরণ, কারক প্রকরণ, সমাস প্রকরণ, দশ লকার বিশিষ্ট ক্রিয়াপ্রকরণ, কৃৎপ্রকরণ, তদ্ধিত প্রকরণ, ইত্যাদি নানাবিধ ব্যাকরণের বিষয় সংস্কৃতেরই মত ইহাতে রহিয়াছে। পাঠকগণ ইহা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিবেন।

অবেস্তার সম্বন্ধে এখানে একটি মনোজ্ঞ কথা আছে। এ ঐ ও ঔ এই চারিটি স্বর সন্ধ্যক্ষর নামে সংস্কৃত ব্যাকরণে সুপ্রসিদ্ধ; কারণ ইহারা প্রত্যেকেই দুই দুইটি স্বরের সন্ধিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ঐকার ও ঔকার যে সন্ধিতে উৎপন্ন তাহা স্পষ্টতই সকলে অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু অপর দুইটি সন্ধ্যক্ষর, অর্থাৎ একার ও ওকার, তাহা বুঝা যায় না; ইহারা আকার উকার প্রভৃতির ন্যায় এক-একটি অসংহিত স্বরের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্যের ভাষায়, ঠিক যেমন দুধ ও জলে মিশাইলে দুই এক হইয়া যায়, তেমনি অকারের সহিত ইকার, আর অকারের সহিত উকার মিশিয়া এক হইয়া যায়; ঠিক যেমন দুধ ও জল একত্র মিশাইলে হইয়া থাকে। ব্যাকরণের ভাষায় আজকাল একার ও ওকারের সন্ধ্যক্ষর ধর্ম প্রক্রিয়ায় প্রচলিত থাকিলেও প্রয়োগে একবারেই তিরোভূত হইয়াছে। অবেস্তায় কিন্তু এই দুই-ই এখনো প্রচলিত আছে। সম্প্রতি অবেস্তায় সংস্কৃত হইতে এই একটি বিশেষত্ব।

অবেস্তা প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। সংস্কৃতে এমন কয়েকটি শব্দ আছে যাহারা দুই দুইটি অর্থ বুঝায়। যেমন শরদ্ঃ শব্দ, ইহা প্রসিদ্ধ ঋতু, আর বৎসর উভয়কেই বুঝায় "জীবেম শরদঃ শতম্"। এইরূপ হিম শব্দ, ঋতু ও বৎসর ("শতং হিমাঃ")। বর্ষা ও বর্ষ শব্দের কেবল আকারগত ভেদ, ইহাদের প্রকৃতি অভিন্ন।

এক দিন কোন সময়ে আমার মনে একটা কথা উঠিয়াছিল। ভাল, গ্রীষ্মবাচক এমন কি কোন শব্দ নাই যাহা শরদাদি শব্দের ন্যায় ঋতু ও বৎসর উভয়কেই বুঝায়? যদি থাকে, তবে তাহা কি? দীর্ঘকালও আমি ইহার উত্তরের সন্ধান পাই নাই। কিন্তু আমার মনে হইয়াছিল যে, নিশ্চয়ই এইরূপ কোন শব্দ থাকিবে, কারণ ভারতবর্ষে গ্রীষ্ম ঋতু এমন নহে যে, সর্বত্র অবজ্ঞেয়।

যাহাই হউক, এক দিন আমি বিশ্রাম করিতেছিলাম, আর অবেস্তাকোশের পাতাগুলি যথেচ্ছভাবে উল্টাইতেছিলাম। হঠাৎ আমার চোখ অবেস্তাকোশের একটি শব্দের উপর পতিত হইল, আর আমি অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া উঠিলাম। আমি এতদিন ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়াও যে শব্দটিকে পাই নি, তাহা পাইলাম। ইহা হইতেছে হম। অবেস্তায় হম আর সংস্কৃতের সম একই। আমরা পূর্বেও দেখিয়া আসিয়াছি সংস্কৃতের সুমত, সুক্ত ও সোম প্রভৃতি শব্দ আর অবেস্তার যথাক্রমে হুমত, হুখ্ত ও হওম প্রভৃতি শব্দ বস্তুত একই। ধ্বনিতত্ত্বের নিয়মে কেবল সংস্কৃতের সকার স্থানে হকার হইয়া গিয়াছে। সম ও হম শব্দ একসঙ্গে পড়িয়াই ভগবান বাল্মীকির সেই কবিতাটি মনে পড়িয়া গেল:

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাংত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"

অবেস্তায় সংস্কৃতের সম অথবা সমান শব্দেরও অর্থে হম শব্দের প্রয়োগ আছে।

ভাল, সংস্কৃতে সমা শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? কেহ কেহ বলেন সমির্বৈকল্য ইতি। কেহ কেহ বলেন "অবৈকল্যে।" এখন বিকলতা কাহারো যেমন গরমে হয়, তেমনি শীত প্রভৃতিতেও হইতে পারে। অবেস্তার অর্থ এখানে বেশ স্পষ্ট। এই শব্দটি ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে ভাষান্তরেও পাওয়া যায়, (যেমন Germ. *Sommer*, Eng. Summer)। এ বিষয়ে আমরা এ স্থানে আর কিছু বলিব না।

অপর আবশ্যক ভাষা

এখানে আর একটা কথা অবশ্য আলোচ্য মনে হয়। তর্ক করিয়া লাভ নাই। সমগ্র পৃথিবীর সংস্কৃতির সহিত যোগ রক্ষার জন্য ইংরেজী তো জানিতেই হইবে। ফরাসী ও জর্মান জানাও উপকারের জন্য হইবে।

নিধিগোপ

আচার্য যাস্ক বলেন যিনি আমাদের বিদ্যা রক্ষা করেন তিনি আমাদের নিধিগোপ। বিদ্বদ্গণের আজ দেশের বিদ্যাকে বিশেষভাবে রক্ষা করিবার সময় আসিয়াছে। বহু পূর্বেই ইহাতে হাত দেওয়া উচিত ছিল, আর কিছুতেই বিলম্ব করা উচিত নহে। এ সম্বন্ধে বহু বক্তব্য থাকিলেও

অতি সংক্ষেপে অল্পকিঞ্চিৎ বলা হইতেছে। পূর্বকালে চীনে (১ম শতক) তিব্বতে (৭ম শতকে) বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করে। তাহার পর ঐ উভয় দেশে সহস্র সহস্র সংস্কৃত গ্রন্থ চীন ও তিব্বতের ভাষায় অনূদিত হয়, এবং অদ্যাবধি এই সমস্তের অধ্যয়ন অধ্যাপন হইয়া আসিতেছে। মঙ্গোলীয় ভাষাতেও অনুবাদ আছে। ঐ সমস্ত দেশে, বিশেষত তিব্বতে সেখানকার অধিবাসীরা সংস্কৃত শিখিবার উদ্দেশ্যে পাণিনি, চন্দ্রগোমী, শর্ববর্মা (কলাপকার), রামচন্দ্র (প্রক্রিয়া কৌমুদী কার) প্রভৃতির ব্যাকরণ অনুবাদ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া কাব্য, নাটক, অলঙ্কার ইত্যাদি নানা গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে কলিকাতায় একটি মঙ্গোলীয় ভিক্ষুকে অনুভূতিস্বরূপাচার্যের কৃত সারস্বত ব্যাকরণ (তিব্বতী) অধ্যয়ন করিতে শুনিয়াছিলাম। শাস্ত্রগ্রন্থের তো কথাই নাই বিশেষত বৌদ্ধ শাস্ত্রের।

বহু মূলগ্রন্থের লোপ হইয়াছে। তথাপি যেভাবে এখনও অবশিষ্ট আছে তাহাতে তাহার পুনরুদ্ধারের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সংস্কৃত হইতে যে পদ্ধতিতে তিব্বতী ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদ করা হইয়াছে, তাহা চমৎকার। বোধ হয় এমন প্রণালী আর কোথাও অনুসরণ করা হয় নাই। ইহা এত আক্ষরিক যে, যেন আমাদেরই উদ্দেশ্যে ইহা হইয়াছিল। যদি কেহ মনে করেন, এই সব অনুবাদ হইতে আবার মূল উদ্ধার করা সম্ভব নহে, তবে তাঁহার নিতান্তই ভুল করা হইবে। প্রত্যক্ষ দেখিলে বিশ্বাস না করিবার কিছু নাই। যাঁহারা নিজের ও অন্যের হিতকর এই সব কার্যে এখনো উদাসীন, তাঁহারা মনে করিয়া ইহা একটু ভাবিয়া দেখিবেন। তাঁহাদেরই ইহা ক্ষেত্র। তাঁহাদের ন্যায় অন্য কোন যোগ্যতর ব্যক্তি এ কার্যের জন্য নাই। একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। বিদেশের ন্যায় আমাদের দেশেও এই কাজ কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু যেভাবে আরম্ভ হওয়া উচিত তাহা হয় নাই।

নূতন বৌদ্ধ গ্রন্থ

তিব্বতের প্রসঙ্গে আমরা একটু অন্যত্র আসিয়া পড়িয়াছি। আমাদের শাস্ত্রের, বিশেষত বৌদ্ধশাস্ত্রের সংখ্যা এখানে অনেক। ইহাদের মধ্যে অনেক লুপ্ত অথবা অত্যন্ত দুর্গম। আজ আমরা মহাপণ্ডিত শ্রীরাহুল সাঙ্কৃত্যায়ন মহাশয়ের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, তাঁহারই অনুগ্রহে ও চেষ্টায় বহু গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তিনি দুর্গম তিব্বতে নানা মঠে ভ্রমণ করিয়া ও তাহাতে নিজ জীবনকেও বিপন্ন করিয়া কতক পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ছায়াচিত্র (ফটোগ্রাফ)। মোট অন্তত ৭৩খানা ছায়াচিত্র আছে। এগুলি এখন পাটনায় জয়শাল-গবেষণাভবনে আছে। সেখানকার অধ্যক্ষ মহাশয়কে নিবেদন করিলে তিনি ইহা দিতে পারেন। এই সমস্ত সংগৃহীত ছায়াচিত্রের যদি সত্বরে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা না যায় তবে তাহাদের লেখা ধীরে ধীরে মুছিয়া উঠিয়া যাইবে, আর মোটেই পড়া যাইবে না। অতএব লুপ্ত গ্রন্থ যদিও পাওয়া গেল, তথাপি রক্ষা করা হইল না বলিতে হইবে। অতএব যত শীঘ্র সম্ভব হয়, যে-কোন প্রকারে উৎকৃষ্টভাবে এইগুলির সংস্করণ করিয়া প্রকাশ করা একান্ত আবশ্যক। ইহাতে তিলমাত্র বিলম্ব করা ঠিক নয়। কয়েকখানি পুঁথি সংস্করণ করা হইয়াছে বা হইতেছে, কিন্তু তাহা পর্যাপ্ত নহে, প্রভূত প্রয়াস আবশ্যক। ইহার কি উপায় নাই? আমার মত লোকে কিরূপে বলিবে নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে আছে। দেখিতেছি, আমরা করিতেছি না। কিন্তু ইহা করিতেই হইবে, তা যেরূপেই হউক।

সংস্কৃত পণ্ডিতেরা কী করিবেন?

আমার কথা শেষ হইয়া আসিয়াছে, অল্পই বাকী। কিন্তু অতিগুরুতর বলিয়া অবশ্য বক্তব্য ও চিন্তনীয়, অন্যথা বিপদ অনিবার্য। সংস্কৃতকে ভারতের 'জীবাতু' অর্থাৎ জীবন-ঔষধি বলা হইয়া থাকে। ইহাকে যে-কোন অবস্থায় যাঁহারা একান্তভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রতিদিন সপরিবারে চারিটি চাউলের জন্য আজকাল কি কষ্ট পান তাহা কয় জন খবর রাখেন? এখানে কী কর্তব্য? তাঁহারা কী করিবেন? তাঁহারা ভিক্ষু নহেন। তাঁহাদের ভিক্ষু-ভাবকে কিছুতেই সহ্য করিতে পারা যায় না। যে-কোনরূপে হউক ইহা অপনয়ন করিতেই হইবে। কেহ যেন তাঁহাদিগকে কুকুরের মত গুটিকতক উচ্ছিষ্ট পিণ্ড দিয়া সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা না করেন। না, ইহা কিছুতেই সহ্য করা উচিতও নহে, পারাও যায় না। যাত্রামাত্র-নির্বাহ ধর্ম, অধিক আবশ্যক নাই। ইহাই ছিল তাঁহাদের জীবনের আদর্শ। এই সেদিন পর্যন্ত এরূপ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দেখা যাইত। আজ তাঁহারা যৎসামান্য মাত্রও পান না। ইহা তাঁহাকে অবশ্যই পাইতে হইবে, ইহা কে না স্বীকার করিবে? বঙ্গদেশে মুখ্য-সচিব, শিক্ষা-সচিব, অথবা শিক্ষার অধিষ্ঠাতা পুরুষ আছেন। সংস্কৃত-শিক্ষার প্রতি ইঁহাদের অনুরাগ আছে ইহা বাহিরে প্রকাশ পাইলেও বস্তুত তাহা আছে বলিয়া মনে হয় না। একজন অধিষ্ঠাতার এক বা একাধিক দরোয়ান থাকে। ইঁহাদের এক-একজনের মাসিক বেতন কত দিতে হয়? এক একটি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে প্রতি মাসে দয়া করিয়া যে বৃত্তি দেওয়া হয় তাহার পরিমাণ

দরোয়ানের বেতনের সমান হয় তো? এক-একটি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে যে বৃত্তি দেওয়া হয়, তাহা দ্বারা তাঁহাকে কয়টি ছাত্রকে আজকালকার দিনে ভোজন দিতে হয়? এ সব কী কাণ্ড! শিক্ষার অধিষ্ঠাতা মহাশয় নিজে জানিয়া-শুনিয়া কিরূপে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া লজ্জা অনুভব করেন না, ইহা নিতান্তই বিস্ময়ের বিষয়। সংস্কৃত শিক্ষাকে একবারে তুলিয়া দিলেই হয়, সরকারী ভাণ্ডারের কিছু আয় বেশী দেখাইতে পারা যাইবে।

বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা প্রত্যেক জীবেরই স্বাভাবিক। যেমন করিয়া হউক সে বাঁচিবার চেষ্টা করিবেই। ভিক্ষায় যে না বাঁচা যায় তাহা নহে। কিন্তু সে জীবন নিতান্তই কদর্য। অনেক সময় তাহাতে আবার নির্বাহও হয় না। তবে কি করিতে হইবে?

ঋষি বলিয়াছেন, নির্বিশেষে তিনি সকলকে এই উপদেশ দিয়াছেন—"কাজ করিয়াই শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবে।"

শ্রদ্ধার সহিত ইহা গ্রহণ করিয়া এই কর্মেই প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কর্মের অসাধ্য কিছু নাই। এমন কোন তপস্যা নাই, যাহা দ্বারা মানবের কল্যাণের সিদ্ধি না হয়।

আর একটা কথা আমাদিগকে মনে করিতে হইবে, যদিও ইহা আমাদের সকলেরই অতিপরিচিত। কথাটা এই যে, বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুও যদি একত্র মিলিত হয় তবে কার্যসিদ্ধি হয়—"অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্যসাধিকা।"

বেদের মধ্যে অনেক কর্ম আছে যাহাকে 'সাংমনস্য' বলা হয়, অর্থাৎ যাহাতে সকলে একত্র একমনে মিলিয়া কাজ করিতে পারে। আমরা যেন ইহাই করিতে পারি। "সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্"—এই মন্ত্রটি আমাদের কে না জানে? আমরা চারিদিকে অনেক আছি। ইহাদের মধ্যে একটি লোকও অযোগ্য নাই। নীতিবিদেরা বলেন, "অযোগ্যো নাস্তি বৈ কশ্চিদ্ যোজকস্তু সুদুর্লভঃ", অর্থাৎ, অযোগ্য কেহই নাই, যে কাজে লাগাইয়া দিতে পারে সেই লোকটি দুর্লভ। আমাদের মহামহোপাধ্যায়ের প্রয়োজন আছে, কাব্যতীর্থেরও প্রয়োজন আছে, অকাব্যতীর্থেরও প্রয়োজন আছে। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে সকলে মিলিত হইয়া কোন কার্যে নিযুক্ত হইলেই হয়। কিন্তু কাজ কোথায়? কি কাজ? এক জনেরই ত কাজ নাই? এত লোকের কাজ কোথায় পাওয়া যাইবে? না হয় কাজ হইল, কিন্তু টাকা কোথায় যাহা এতগুলি লোকের মধ্যে উপযুক্ত ভাবে ভাগ করিয়া দিতে পারা যায়? ইহাতে ত কোন সমাধানের সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সত্য কথা, সম্প্রতি কোন কাজ দেখা যাইতেছে না, কিন্তু অচিরেই নূতন নূতন কাজ উদ্ভাবন করিতে হইবে এবং ইহা এমন নহে যে, উদ্ভাবন করিতে পারা যায় না। সমাজের অন্যান্য বিভাগেও ত এইরূপ হইতেছে। এখানেই বা কেন তাহা না হইবে। বর্তমানকালই ইহার অনুকূল ইঙ্গিত প্রদান করিতেছে।

ভাল, আমি কি কাজের প্রস্তাব করিতেছি? অনেক, অনেক; গুটিকয়েক মাত্র উল্লেখ করিতেছি, প্রকাণ্ড তালিকা করিয়া লাভ নাই। প্রথমত একখানি সংস্কৃত কোশ বা অভিধান রচনার কথা ধরা যাক। আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজন নির্বাহ হইতে পারে এইরূপ একখানি অভিধানের দরকার। আদর্শ হিসাবে ইহা মনিয়র মনিয়র-উইলিয়মের সংস্কৃত-ইংরেজী কোশের (*A Sanskrit-English Dictionary* by Sir Monier Monier-Williams) সদৃশ হইবে। আর আকারে এক খণ্ডে অনধিক ১৩৫০ পৃষ্ঠার হইবে। উৎসাহী পাঠকেরা একবার ইহা দেখিলে ইহার উপযোগিতা বুঝিতে পারিবেন, বর্ণনা করা যায় না। এই নূতন অভিধান রচনার কথায় শ ব্দ ক ল্প-দ্রু ম অথবা বা চ স্প ত্যে র মহত্ত্ব বা গৌরব অপনয়ন করিবার চেষ্টা করা হইতেছে না। শেষোক্ত অভিধান দুইখানির বিষয় স্বতন্ত্র, আর বহু নূতন কথা তাহাতে যোগ করা আবশ্যক।

দ্বিতীয়ত অপর একখানি কোশ। ইহার নাম দেওয়া হইতে পারে ভারতীয় দর্শন মহাকোশ। প্রথমে ন্যায়কোশের ন্যায় এক-একটি ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের পৃথক পৃথক কোশ রচনা করিয়া এবং তাহাদের পৃথক পৃথক প্রচার করিয়া, ঐ সমস্ত কোশের উপকরণসমূহের দ্বারা স্বতন্ত্র একখানি সুবৃহৎ কোশ রচনা করিতে হইবে। ইহার নাম দেওয়া যায় ভারতীয় দ র্শ ন ম হা কো শ। এ সম্বন্ধে বঙ্গীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান দর্শনাধ্যাপক শ্রীরাধাকৃষ্ণন্ সেই সময়ে স্বর্গীয় শ্যামাপ্রসাদকে বলিয়াছিলেন, 'যদি ইহা সম্পূর্ণ হয় ত বিশ্ববিদ্যালয়কে অমর করিবে' ('If complete, it will immortalize the University') দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহা সম্পূর্ণও হয় নাই, আর কর্তৃপক্ষ তাহার সঙ্কল্পও সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতএব ইহাকে নূতন করিয়া আরম্ভ করিতে হইবে এবং পণ্ডিতগণ যতশীঘ্র ইহা করিতে পারেন ততই ভাল।

কা লি দা স কো শ নামে আর একখানি অভিধান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সঙ্কলন করা হইতেছিল, বিশেষত ছাত্রেরা ইহাতে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইহাও পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহাতেও হাত দিতে পারা যায়।

এইরূপ কত কত রচনার উপযুক্ত পুস্তকের নাম করিতে পারা যায়, ইহার ইয়ত্তা নাই। যেমন সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত

ইত্যাদি হইতে ভাষায় অনুবাদ এবং ঐ ঐ বিষয় উপযোগী গ্রন্থের রচনা ইত্যাদি।

প্রাচীন গ্রন্থের সংস্করণ

এখানে একটি অতি আবশ্যক কার্যের নাম করিতে পারা যায়। ইহা হইতেছে বর্তমান পদ্ধতি অনুসারে প্রাচীন গ্রন্থগুলির নব নব সংস্করণ। পুস্তকের প্রত্যেকটি পাঠকে বিচার করিয়া যাহা যুক্তিসমর্থিত তাহাকেই গ্রহণ এবং আর সকলকে বর্জন হইল ইহার বিশেষত্ব।

ইহার মধ্যে নিধিগোপ প্রসঙ্গে চীনা ও তিব্বতী হইতে সংস্কৃত গ্রন্থের উদ্ধারের যে কথা বলিয়াছি তাহা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে।

উপায়

এ কথা অনেকেই বলিতে পারেন যে, এ পরিকল্পনা অথবা ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পরিকল্পনা আরও বহু লোকে করিতে পারে। সব বুঝিলাম। কাজ করিবার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। কিন্তু টাকা কোথায়? আমরা ত যাত্রামাত্র নির্বাহ চাই, তাহাই ত নাই।

এ অভিযোগ সত্য। কিন্তু বলিয়াছি, ইহার প্রতীকার আছে। তা ছাড়া সেই গৌরী সেন এখনও আছেন। নিশ্চয়ই তিনি টাকা দিবেন। যদি তিনি না দিতে চান? যে-কোন রকমে হউক, দেওয়াইতেই হইবে। যে আজ না দেয়, সে কাল দেয়, বা দিতে বাধ্য হয়। সত্য কথা, আজ রাষ্ট্রকোষের মুখ আমাদের জন্য বন্ধ। কালও ইহা এইরূপ থাকিবে বলা যায় না। আমার ত মনে হয় যদি আমরা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করি তবে আমাদের কল্পনারও অতীত অর্থ দুর্লভ হইবে না। ...*

* সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক উৎসবের সভাপতির অভিভাষণ। ১৩৬০ (সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদ)

বিদায়

শ্রীমহাদেব রায়

ক্ষীণ পুণ্যে সেই মর্ত্যলোকে পুনরায়
মাগিতে হইল স্বর্গ হইতে বিদায়
শঙ্করে জানায়ে নতি। আটাশে প্রভাতে
স্বর্ণ চিনারের বন রাখিয়া পশ্চাতে
চলি দ্রুত রাজপথে। দীর্ঘ গিরি-পথ
শত ক্রোশ রূপে-রসে ভরি' মনোরথ
নব রক্তরাগে রাঙাইয়া ভারে-ভারে
বিলা'ল ঐশ্বর্য-রাশি; ইরাবতী-পারে
সমাপ্তি রচিল আসি। পুনঃ গৃহ-পথে
সাজিতেছে জনে-জনে সেই বাষ্পরথে
স্বর্গ বাস করি' শেষ। এখনও নিমেষ
পড়িতে চাহে না যেন স্মরি' সেই দেশ,
দশ দিন সমারোহ উপভোগে যার,
হয় নাই অবসান কৌতুক হিয়ার
একটি দিনের তরে। গৃহগত প্রাণ
তবু যে ছুটিতে চায় যেথায় অম্লান
স্বর্গের অধিক শোভা; হ'ল তাই ক্ষীণ
পুণ্য স্বল্পকালে, যেন অতি খিন্নদীন
প্রবেশিনু মহীলোকে স্বর্গবাস ছাড়ি,
ভূলোকে চলিল তীর্থে তীর্থে তাড়াতাড়ি
—আগ্রা, দিল্লী, মথুরা ও বৃন্দাবনধাম,
প্রয়াগ, কাশীর পুণ্যে পূর্ণমনস্কাম
স্বর্গাধিক গরীয়সী ভূমিরে যখন
হেরিনু, স্থগিত হ'ল এ দুটি নয়ন।

সরলার শাড়ি

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

ভোরবেলা কুলীদের হাঁকাহাঁকিতে ঘুম ভেঙে যায়, বেরিয়ে দেখি মোট মাথায় জনতিনেক কুলীর সঙ্গে রাম দাঁড়িয়ে। অবাক হয়ে প্রশ্ন করি—"ব্যাপার কি, হঠাৎ যে শ্রীরামচন্দ্র বনে আগমন করলেন?" এগিয়ে এসে মামাতো ভাই রাম প্রণাম করে বলে 'খবর সব ভালই, তবে খবর না দিয়ে হঠাৎ এসে পড়লাম।' খুশী হয়ে বলি, 'বেশ করেছ ভাই, এইবার কুলীদের মাথা থেকে মোটগুলো নামিয়ে নিয়ে ওদেরে বিদেয় কর।' মালপত্র নামিয়ে রেখে মজুরি ও বকশিশ আদায় করে কুলীরা চলে যায়, রাম মাথা চুলকে বলে, 'সঙ্গে সরলাদি এসেছেন।' সঙ্গে সরলাদি এসেছেন! আবার অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, 'সরলাদি কে রে? কোথায় তিনি?'

রাম একটু ইতস্ততঃ করে বলে, 'চেন না সরলাদিকে? আমার মাসতুত বোন—রমামাসীর মেয়ে।' সরলাকে না চিনতে পারলেও রামের রমামাসীকে চিনি—বলি, 'কিন্তু কোথায় সে, ষ্টেশনে রেখে এলি নাকি!' রাম পেছন দিকে তাকিয়ে ডাকে—'সরলাদি, ও সরলাদি এদিকে এস।' চামেলির ঝোপটার আড়াল থেকে একটি মেয়ে এগিয়ে আসে, সাদা চাদরে সারা গা ঢাকা, পরনে সাদা থান, হেঁট হয়ে প্রণাম করে সে দাঁড়ায়। চেয়ে দেখি রক্তহীন শীর্ণ একখানিমুখ। বলি, 'তোমাকে না দেখলেও তোমার মাকে দেখেছি—শরীরটা বুঝি ভাল নয়।' কথা না বলে মাথা নেড়ে জবাব দেয়—'শরীর ভাল না।' রামকে বলি, 'চল এইবার ভেতরে, জিনিষগুলো আমি চাকর দিয়ে ঘরে নিচ্ছি—এস সরলা।"

রামের পিছনে পিছনে সরলা নিঃশব্দে ঘরে চলে যায়।

সন্ধ্যার গাড়ীতে রাম কলকাতা ফিরে যায় সরলাকে রেখে। ব্যাপারটা খুবই সরল, বালবিধবা সরলা তার ভাইয়ের সংসারে বাস করত। গত বৎসর সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, কিছুতেই ভাল হয়ে উঠে না, শেষ পর্য্যন্ত বড় ডাক্তার রায় দেন—রোগটা খারাপ। ভাই আতঙ্কিত হয়ে উঠে, ছেলেপুলের সংসার, এমন রোগীকে আর

"চামেলির ঝোপটার আড়াল থেকে এগিয়ে আসে"

এক দণ্ডও রাখা চলে না। পরামর্শদাতার অভাব হয় না—বলে, মৃন্ময় অবিবাহিত লোক, সংসার বলতে আপনি আর কপনি, ছোটনাগপুরের স্বাস্থ্যকর জায়গায় বাস করে, সরলাকে দাও ওর ওখানে পাঠিয়ে। সম্মতি নেবার প্রয়োজনও কেউ বোধ করে না, রামের সঙ্গে সরলাকে আমার এখানে পাঠিয়ে দেয়।

এই ভাবে সরলা আমার সংসারে এসে জোটে। বয়স তিরিশের কাছাকাছি, আমার চেয়ে অনেক ছোট। দুর্ব্বল শীর্ণ শরীরটাকে কোনমতে টেনেটুনে নিয়ে নিজের রান্নাটুকু করে আর শুয়ে থাকে। রক্তহীন শীর্ণ মুখখানার দিকে তাকিয়ে আমার ভয় হয় মরে যাবে না ত! কিন্তু সরলা মরে না, জায়গার জলহাওয়ার গুণে ওর শরীর একটু একটু করে ভাল হয়ে উঠে। হাড়গুলোর উপর মাংস দেখা দেয়, বল ফিরে আসে। দেখে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি।

বহু মানুষের সংস্পর্শে আমি কোনদিনই আসি নি, তাই এই মানুষটির সংসর্গ প্রথম প্রথম প্রীতিকর না মনে হলেও শেষে ভালই লাগে। ক্রমে ক্রমে সে আমার নিঃসঙ্গ জীবনের অনেকটা অংশ জুড়ে বসে। কি খাব, কি পরব, কি করব সব বিষয়েই তার মতামত গ্রাহ্য হতে থাকে। আমার কর্ম্মহীন অবসর সময়ের একটা কাজও জুটে যায়—এই রুগ্ন বিধবা মেয়েটির রহস্যময় মনোজগতের পরিচয় পাবার চেষ্টা করি। আমি দেখতে পাই সরলার রসবর্ণ হতে বঞ্চিত অন্তর এতদিনের নিপীড়নেও মরে যায় নি, আমি ধীরে ধীরে বুঝতে পারি আর দশ জনের মত সেও কামনা করে, কল্পনা করে, অনাগত ভবিষ্যৎ তার কাছেও রঙীন। একদিন সে আমাকে বলে, 'দাদা, ওরা আমাকে বলেছিল আমি বাঁচব না, আমার নাকি খারাপ অসুখ, সারে না—কিন্তু সেরে ত উঠলাম।' বলে সে খুশীর আবেগে হাসতে থাকে, তারপরে মাথা নেড়ে বলে, 'আমি কিন্তু জানতাম আমি সেরে উঠব।' হঠাৎ সে আমাকে প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা দাদা, আমি একেবারে সেরে গেছি ত, আর ত কোন ভয় নেই।' বলি, 'না, আর ভয় নেই, সত্যিই তুমি একেবারে সেরে উঠেছ।' শুনে সরলার মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। মনে মনে ভাবি এ মিথ্যা সত্য বলার চেয়ে বড়।

প্রায়ই চোখে পড়ে সরলা আয়নার সামনে বসে অনেকক্ষণ ধরে চুল আঁচড়ায়। ওর ঘরে গেলে একটা সুগন্ধ পাই, হয়ত সেটা কেশতৈলের, অথবা আর কিছুর। বিষয়টা কিছুই নয়, তবু চিত্ত কৌতূহলী হয়ে উঠে। সেদিন বিকেলের দিকে ঘরে বসে লিখছি এমন সময় আস্তে আস্তে সরলা এসে অদূরে বসে। কিছুক্ষণ উসখুস করে, হঠাৎ সে প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা দাদা, মানুষ মনে প্রাণে যা হবে বলে বিশ্বাস করে তা কি হয়?' কঠিন প্রশ্ন, বুঝি লেখা আর হবে না, কলম রেখে ভাবতে সুরু করি, উত্তরের প্রতীক্ষায় সরলা উৎসুক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। অবশেষে বলি, 'অনেক কিছু হবে বলে বিশ্বাস করি, কিন্তু সব সময় তা হবার ত যুক্তি দেখি না।' শুনে সরলা মুখখানা নীচু করে বসে, কিছুক্ষণ কি ভাবে জানি না, তার পরে হঠাৎ মুখ তুলে বলে, 'আপনি যাই বলুন দাদা, আমি বলব আমরা যা হবে বলে বিশ্বাস করি তা হয়।' সরলার মুখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্ত্তে বুঝি সে কি শুনতে চায়, কি শুনলে খুশী হয়, বিচারবুদ্ধিকে বিদায় দিয়ে হেসে বলি, 'হয়ত তোমার কথাই ঠিক, যা বিশ্বাস করি তা সত্যিই হয়।' শুনে সরলার মুখ খুশীর আলোতে ভরে যায়, আবেগের সঙ্গে বলে, 'দাদা, আমি ছোটবেলা থেকে বিশ্বাস করি আমার জীবন এমন অর্থহীন ভাবে কাটবে না, কাটলও না, দেশগ্রামের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বুঝলেন দাদা, রোগটা নিমিত্তমাত্র।'

আবার সরলা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে, আমি বুঝি একটা ঢেউ আসছে,•সরলার অন্তরে কূল ছাপিয়ে সে ঢেউ বাইরে এসে প্রকাশ পাবে, আমি প্রস্তুত হয়ে বসি। হ'লও তাই, সরলা আমার দিকে তাকিয়ে বলে—'দাদা, আমি রাতদিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতাম আমার জীবনকে ব্যর্থ করো না, আমার জীবনকে সার্থক করে তোল। ভগবান এত দিনে আমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করতে চলেছেন, আমি ভাল হয়ে উঠেছি, আমি গণ্ডি থেকে বেরিয়ে পড়েছি এখন থেকে আমার নূতন জীবন আরম্ভ হবে।' সরলা থেমে যায়, ভাবাবেগে তার মুখখানা রাঙা হয়ে উঠে। আমি ওর মনের অবস্থাটা বুঝতে পারি, কিছু বলি না, চুপ করে বসে থাকি। একটু পরে সরলাই কথা কয়, বলে, 'আমি আর দেশে ফিরে যাব না।' প্রশ্ন করি, 'তা হলে কোথায় যাবে?' সরলা বলে, 'কাশী যাব, আমার এক দিদি আছেন সেখানে, তাঁরই কাছে আমি যাব।' আমি বলি, 'বেশ, বেশ তাই যেয়ো—কাশী ভাল জায়গা, ধর্ম্ম অর্থ ইত্যাদি সবই সেখানে পাওয়া যায়।'

ছোটনাগপুরের ভীষণ শীতের শেষে প্রথম গরম হাওয়া বইতে সুরু করে—ফাল্গুন মাস। আমার বাগানের দুটো পলাশগাছে গোছাগোছা লাল ফুল ফুটে উঠে। সরলার শরীর আজকাল ভালই আছে, অনেকটা চলাফেরা করতে পারে। বিকেলবেলা বাগানের করবী ফুলের দীর্ঘ পথ ধরে সে ঘোরে ফেরে, দমকা বাতাসে তার মাথার কাপড় খসে পড়ে, সেটা আবার তুলে দেবার চেষ্টা সে করে না, নিজের মনে ধীরে ধীরে চলে। আমার ঘরের জানালা দিয়ে আমি তাকে দেখতে পাই, এলো চুলের গোছা কাঁধের উপর ছড়িয়ে পড়েছে, আঁচল অসংবৃত, পায়ে একজোড়া হালকা স্যানডাল। স্বীকার করি সে সুন্দরী, কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যের উপর রোগের ছায়া গাঢ়ভাবেই পড়েছে।

বসন্তের আমেজ বোধ হয় আমার শুকনো মনেও লেগেছিল, তাই সেদিন অনেক রাত্রে রেডিওতে একটা মিঠে সুরের গান শুনে লেখা বন্ধ করে বসেছিলাম। পূর্ণিমার কাছাকাছি, বাইরে প্রচুর জ্যোৎস্না, মন আবিষ্ট হয়ে আসছিল এমন সময় পেছনে একটু আওয়াজ পেয়ে চেয়ে দেখি দরজার পাশে সরলা দাঁড়িয়ে। আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করি, 'কখন এলে, টেরও পাই নি।' হেসে সরলা বলে, 'অনেকক্ষণ।' আমি বলি, 'ভেতরে এসে বস।' সরলা এসে একখানা চেয়ার টেনে বসে। বুঝি এই মিঠে সুরটাই ওকে

বিছানা থেকে টেনে এনেছে। গান থেমে যায়, সরলা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে, তার পরে আস্তে আস্তে বলে, 'কি সুন্দর গান।' আমি বলি, 'গানের সুরে তোমার ঘুম ভেঙে যায়, তুমিই গানের সত্যিকার সমঝদার।' সরলা মৃদু কণ্ঠে বলে, 'এক সময়ে আমিও গান গাইতে পারতাম।' উৎসাহিত হয়ে বলি, 'তাই নাকি, এ খবরটা এতদিন আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিলে।' সরলা বলে, 'সে অনেকদিনের কথা, এখন গান গাইতে গেলে গলা দিয়ে কি বেরবে তা জানি নে।' আবার কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে সরলা, বুঝতে আমার দেরি হয় না—সে অতীতের মধ্যে ডুবে গেছে।

অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে যায়—উঠে বাইরে যাই। হলঘর দিয়ে যাবার সময় দেখি সরলার ঘরের দরজা খোলা। দু'পা এগিয়ে যেতেই অবাক হয়ে দাঁড়াই, বাইরে জ্যোৎস্নার বন্যা বইছে,

"সরলাকে দেখি না, দেখি তার ছায়া"

সরলার ঘরের খোলা জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে ভিতরে ছড়িয়ে পড়েছে, সরলাকে দেখতে পাই না, দেখতে পাই দরজা পর্যন্ত এসে পড়েছে তার ছায়া—জানালার ধারে চুপ করে সে বসে আছে।

দিন যায়, একটু একটু করে গরম বাড়তে থাকে, শ্যামল প্রান্তরে গেরুয়ার ছোপ লাগে। প্রায়ই দেখতে পাই—দুপুরের দিকে সরলা কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসে। ভাবি এত চিঠি সরলা লেখে কাকে? বলি একদিন রহস্য করে, 'কি লিখছ, চিঠি—না কবিতা?' অপ্রস্তুত ভাবে কাগজপত্র সরিয়ে রেখে সরলা বলে, 'না দাদা, কবিতা নয়, আমি মুখ্যু মানুষ কবিতা-টবিতা লিখতে জানি নে, লিখছিলাম চিঠি।' বলি, 'তা বেশ, তা বেশ, লেখ।' আমি ওর ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি এমন সময় সে ডেকে বলে, 'দাদা, একটা কথা বলব?' 'কি কথা?' ফিরে আসি আবার। সরলা ইতস্ততঃ করে বলে, 'কয়েক দিন থেকে একখানা চিঠি লিখবার চেষ্টা করছি, কিন্তু কিছুতেই গুছিয়ে লিখতে পারছি নে।' পাশের চৌকিতে বসে প্রশ্ন করি, 'এ হেন জরুরি চিঠি কাকে লিখছ?'

সরলা বলে, 'কাশীর দিদিকে।'

—কি লিখছ?

—আমি কাশী গিয়ে দিদির কাছে থাকতে চাই।

—বেশ ত, তাই লিখে দাও।

—শুধু ঐটুকু লিখলে কেমন করে হবে দাদা? অনেক কথা লিখতে হবে।

—তা হলে আমাকে দিয়ে হবে না—উকিল চাই।

সরলা হেসে বলে, 'আপনার সব বিষয়েই তামাশা। আপনি সাহিত্যিক কত কথা লেখেন, আমি দুটো কথাও গুছিয়ে লিখতে পারি নে, একটা লিখি ত আর একটা ভুলে যাই।' আমি বলি, 'কি কথা লিখতে হবে বল?' সরলা খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বলে, 'লিখতে হবে আমি আর দেশে ফিরে যাব না, আমি কাশী যাব, কাশীতেই থাকব। সেখানে একটা কাজকর্ম জুটিয়ে নেব—এই সব।' বলি, 'আচ্ছা, দাও কাগজ, তোমার চিঠি আমিই লিখে দিচ্ছি।' চিঠি লেখা শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় সরলা ব্যস্ত হয়ে বলে, 'লেখা শেষ হয়ে গেছে নাকি দাদা?'

—হ্যাঁ হয়ে গেছে।

—এই দেখুন, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।

—কি কথা বল।

—লিখুন আমি একেবারে ভাল হয়ে গেছি।

পুনশ্চ দিয়ে লিখি—সরলা একেবারে ভাল হয়ে গেছে।

বৈশাখ এসে পড়ে, সারাদিন ধুলো উড়িয়ে হু হু করে গরম হাওয়া বয়। বাইরে বেরুনো দুষ্কর, ঘরে বসেও স্বস্তি নেই। সরলার শরীরটা ভাল নেই। কিছুই আশ্চর্য্য নয়, ছায়াশীতল বাংলা-
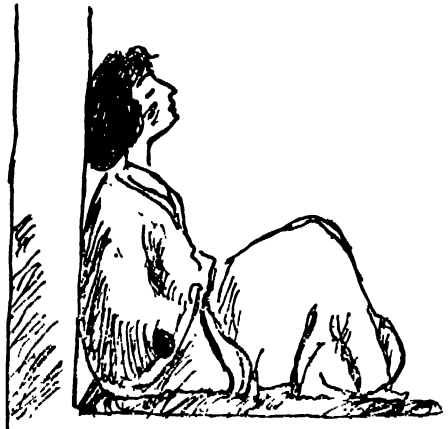
"সেদিন শরীরটা তার খুব খারাপ"

দেশের মেয়ে, ছোটনাগপুরের নির্মম গ্রীষ্ম সহ্য করে উঠতে পারবে কেন? আমি সাবধান করে বলি, 'সকাল সকাল রান্নাবান্না করে ঘরে চলে যাবে সরলা—তোমার শরীরটা ভাল দেখছি না।' শুনে সরলা চমকে উঠে, তাড়াতাড়ি বলে, 'শরীর ত আমার ভালই আছে দাদা।' বলি, 'এখানকার গরম তুমি সহ্য করতে পারছ না, তাই

তোমাকে কিছু কাবু দেখাচ্ছে।' এইবার হেসে সরলা বলে, 'হ্যাঁ দাদা, গরমে শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে।'

সেদিন সকালবেলা ঝি রুকিয়ার সঙ্গে সরলার একটা পরামর্শ চলে। পরামর্শটা কি বুঝতে পারি না, তবে দেখি রুকিয়া একবার ছুটে বাজারে যায়, আবার আসে, আবার যায়। রীতিমত কৌতূহলী হয়ে উঠি, সরাসরি একেবারে সরলার রান্নাঘরে গিয়ে উপস্থিত হই, প্রশ্ন করি, ব্যাপারটা কি বল ত সরলা?' সরলা বলে, 'ব্যাপার ত কিছু নয় দাদা।' আমি বলি, 'গোপন করবার চেষ্টা করো না, ধরা পড়ে গেছ—বল ত রুকিয়া সকাল থেকে অত ছুটোছুটি করছে কেন?' এইবার সরলা হেসে উঠে বলে, 'হয়েছে কি জানেন রুকিয়া বলেছে—গরমের দিনে 'দহি' খাও দিদি, তবে শরীর ভাল হবে।' বলি, 'তাই বুঝি রুকিয়া 'দহি'র সন্ধানে দৌড়াদৌড়ি করছে?' মাথা নেড়ে সরলা বলে, 'হাঁ, গরমে সত্যিই আমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে, রুকিয়া যখন বলেছে তখন খেয়ে দেখি দই!' উৎসাহ দিয়ে বলি, 'বেশ, বেশ, খুব ভাল পরামর্শ, দই খেলে উপকারই হবে, দই ভাল জিনিস।'

কিন্তু 'দহি' খেয়েও সরলার শরীর ভাল হ'ল না। পাশের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে আমার ঘরে ঢুকে সরলা ডাকে—'দাদা।' চেয়ে দেখি সরলার চোখমুখ খুশীর আলোয় ভরা, প্রশ্ন করি, 'ভারি খুশী যে, ব্যাপার কি?' হেসে সরলা বলে, 'এবার পেয়েছি।' বলি, 'কি পেয়েছ? মনে হচ্ছে খুব দামী জিনিস, আমাকেও ভাগ দিতে হবে কিন্তু।' সরলা বলে, 'নিশ্চয় দেব, কত নেবেন বলুন'। আশ্চর্য হয়ে বলি, 'বস্তুটা কি বল ত?' সরলা হেসে ফেটে পড়ে, বলে, 'জল।' জল! জল পেয়ে এত খুশী, বলি, 'তামাশা হচ্ছে আমার সঙ্গে।' হাসি থামিয়ে সরলা বলে, 'তামাশা নয় দাদা, সত্যিই এবার পেয়েছি। ও বাড়ীর বৌদি বললেন এদেশে গরমের সময় জল খেতে হয়, ঘড়া ঘড়া জল খেতে হয়, জলই নাকি শরীর ভাল করে। বললেন, আর কিছু খাও না খাও বাছা ঘড়ি ঘড়ি জল খাবে, দেখবে দু'দিনে মুটিয়ে যাবে।' শুনে আমিও উৎসাহিত হয়ে উঠি, বলি, 'এস দুজনে পাল্লা দিয়ে জল খাই—দেখি, কে আগে মুটিয়ে যায়।' আমি না খেলেও সরলা যখন তখন জল খেতে সুরু করে, রুকিয়াকে দিনে দশবার কুজো ভর্তি করতে হয়।

কিন্তু জল খেয়েও সরলার বিশেষ উপকার হ'ল না!

গরমে ঘরে শোয়া অসম্ভব, তাই বাহিরের বারান্দায় খাটিয়া ফেলে মশারি টানিয়ে শুয়েছি। স্বপ্ন দেখছি—ডাকপিয়নটা বাগানের কাঁকর দেওয়া পথ ধরে জুতোর খস খস আওয়াজ করে চলে আসছে, কিন্তু সে চলে আসার যেন শেষ হয় না, আসছেই, আসছেই—পথটুকুর যেন অন্ত নেই। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়—না—এ ত স্বপ্ন নয়, সত্যিই ত জুতোর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। তাড়াতাড়ি মশারিটা তুলে দেখি ভোর এখনও হয় নি, আবছায়া অন্ধকার, সেই অন্ধকারে জুতোর আওয়াজ বাগানের পথ ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে—আমারই দিকে এগিয়ে আসছে। এমন সময় পিয়ন আসবে কেন? তবে এ কি পিয়নের প্রেতাত্মা! ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছি, এমন সময় সাদা কাপড়ে গা ঢাকা একটা মূর্ত্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে আবার ফিরে যায়। সাহস সঞ্চয় করে শুকনো গলায় প্রশ্ন করি—'কে?' মূর্ত্তি থেমে গিয়ে জবাব দেয়, 'আমি সরলা।' সরলা! অবাক হয়ে উঠে বসি, বলি 'এত রাত্রে তুমি করছ কি?' সরলা ইতস্ততঃ করে বলে, 'ভোরবেলা উঠে বেড়াচ্ছি।' ভোর! বলি, 'ভোর হতে এখনও অনেক দেরি, মতলব কি বল ত আমাকে ভয় দেখানো!' সরলা অপ্রস্তুত হয়ে বলে, 'ভয় পেয়েছিলেন নাকি?' বলি, 'নিশ্চয়, আমি বলে মূর্চ্ছা যাই নি।' সরলা হেসে বলে, 'ও পাড়ার রমার মা বেড়াতে এসেছিলেন। আমার শরীর ভাল যাচ্ছে না শুনে বললেন—খুব ভোরে উঠে বেড়াবে, দেখবে শরীর ভাল হয়ে যাবে।' বলি, 'সকালে বেড়ানো ভাল, কিন্তু রাত্রে নয়।' সরলা বলে, 'আজ একটু বেশী আগে উঠে পড়েছি দাদা।'' সরলা বাগানের পথ ধরে চলে যায়, আমি শুয়ে শুয়ে কাঁকরের উপর ওর হালকা স্যান্ডেলের আওয়াজ শুনি।

কয়েক দিন পরে ভোরবেলা শুয়ে শুয়ে ভ্রমণরতা সরলার পায়ের আওয়াজ শুনছি—সে ধীরে ধীরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ মনে হয় ওর চলার মধ্যে যেন প্রাণ নেই, উৎসাহ নেই, একটা অপরিসীম ক্লান্তি যেন ওর পদক্ষেপকে ভারী করে তুলেছে। শুয়ে থাকতে পারি না, উঠে পড়ি, এগিয়ে যাই ওর দিকে। আমাকে দেখে সরলা দাঁড়ায়। পূবের আকাশ তখন লাল হয়ে উঠেছে, একটা স্বচ্ছ আলো করবীতলার অন্ধকারকে তরল করে দিয়েছে—সরলার মুখের দিকে তাকিয়ে আচমকা মনের মধ্যে একটা ব্যথা বোধ করি, গত রাত্রের শুকনো ফুলের মতই মুখ ওর শুষ্ক। বেড়াতে বেড়াতে জিজ্ঞাসা করি, 'ভোরে উঠে বেড়িয়ে তোমার কেমন লাগছে?' ক্ষণকাল চুপ করে থেকে সরলা বলে, 'কৈ আর ভাল লাগছে দাদা, বরং—' কথাটা শেষ করে না সরলা, মনে মনে কথাটা আমিই শেষ করি। চলতে চলতে সরলা বলে, 'দু'সপ্তাহ হয়ে গেল—শরীর ত ভাল হ'ল না দাদা।' কথাটার মধ্যে হতাশার সুর বেজে উঠে—ভয় পাই আমি। ওর মনটাকে হালকা করবার জন্যে সহজভাবে বলি, শরীরের দোষ দিও না সরলা—ঘুম নষ্ট করে অত ভোরে বেড়ালে ভাল শরীরও খারাপ হয়।' শুনে সরলা আশ্বস্ত হয়, বলে, 'ঠিক বলেছেন দাদা, ঘুম নষ্ট করেই আমার শরীর আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে—আপনাকে বলছি, ভোরে আর আমি বেড়াব না।'

বর্ষা আসে—শুকনো মাঠে আর তৃষিত শালের বনে ঝর ঝর করে বৃষ্টি পড়ে। গরম আর নেই, সজল পূবালি বাতাসে গায়ে কাপড় জড়াতে ইচ্ছা করে। সরলাকে বলি, 'গরমটা যখন কাটিয়ে দিতে পেরেছ তখন আর ভয় নেই—এইবার শরীর দেখতে দেখতে ভাল হয়ে যাবে।' সরলা ভারি খুশী—তার শরীরের খানিকটা পরিবর্ত্তনও দেখা যায়। চলাফেরার মধ্যে আবার সজীবতা ফিরে আসে। ইতিমধ্যে একদিন ওর কাশীর দিদির চিঠি আসে, লিখেছেন, 'তুমি আসবে এখানে জেনে সুখী হলাম, আমি তোমাকে যতটুকু

সাহায্য করতে পারি তা করব।' বাবার জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে সরলা।

কিন্তু ক'টা দিন পরেই আমি বুঝতে পারি—সরলার পরিবর্ত্তনটা সাময়িক। আমি ও বিষয়ে কিছু বলতে গেলে সরলা অসহিষ্ণু হয়ে উঠে। শরীর যে তার একটু একটু করে ক্রমেই খারাপ হচ্ছে এ-কথাটা আজকাল সে অস্বীকার করে। আমি সাবধান হয়ে যাই—কিছুই বলি না—মনে মনে অস্বস্তি বোধ করি।

বিকেলের দিকে সেদিন একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে—আকাশ মেঘে ঢাকা, হু-হু করে ভিজে বাতাস বইছে। সরলার ঘরে ঢুকে দেখি সে ঘরের সবকয়টা জানালা খুলে দিয়ে শুয়ে আছে। আতঙ্কিত হয়ে উঠি, বলি—'একি করেছ সরলা, বন্ধ কর, বন্ধ কর জানালা, হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগলে মহা মুশকিল হবে।' আমাকে দেখে সরলা উঠে বসে, বলে 'বড্ড গরম লাগছে দাদা, তাই জানালা খুলে রেখেছি, হাওয়া ভালই লাগছে আমার।' অবাক হয়ে বলি, 'গরম লাগছে! বল কি সরলা, আমার ত রীতিমত শীত করছে।' সরলা বলে, 'আমার কিন্তু গরম লাগছে, আজকাল বিকেলের দিকে এই রকম গরম বোধ করি।' হঠাৎ এগিয়ে এসে আমি তার কপালে হাত দিই, যা ভেবেছি তাই, সরলার গা বেশ গরম—জ্বর হয়েছে। কথাটা বলতে গিয়ে থেমে যাই। সরলা উদ্বেগের সঙ্গে প্রশ্ন করে, 'কি দেখলেন দাদা?' তাড়াতাড়ি বলি, 'কিছু না—দেখলাম তোমার গা'টা আমার চেয়ে গরম কিনা।' আশস্ত হয়ে সরলা বলে, 'বসুন দাদা।' ওর বিছানার প্রান্তটিতে বসি। সরলা বলে, 'আপনি কাশী গেছেন দাদা?' বলি, 'হাঁ, গেছি বৈকি—বেশ জায়গা।' সরলা উৎসাহিত হয়ে উঠে বলে, 'দিদিকে লিখেছি, আমি শিগ্‌গীরই যাব—সেখানে গিয়ে জীবনটাকে নূতন করে গড়ব।' কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে হঠাৎ সরলা প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা দাদা, আমার এই বয়সে কি আর লেখাপড়া শেখা সম্ভব নয়?' 'নিশ্চয় সম্ভব।' কথাটায় যথেষ্ট জোর দিয়ে বলি, 'নিশ্চয় সম্ভব, বয়সের সঙ্গে লেখাপড়ার কোন সম্বন্ধ নেই সরলা, তা ছাড়া, তোমার বয়সই বা কি?' শুনে সরলা খুশী হয়ে হাসতে থাকে।

শ্রাবণের মাঝামাঝি, সারাদিন রোদ আর বৃষ্টির খেলা চলে। সরলা স্বভাবতঃই নীরব প্রকৃতির, আজকাল সে আরও নীরব হয়ে পড়েছে, তাই আমার দীর্ঘ দিনগুলি দীর্ঘতর বলে মনে হয়। আমি স্পষ্ট দেখতে পাই দিন দিন তার শরীর খারাপ হচ্ছে। আজকাল বিকেলবেলা রক্তকরবীর পথটা সে সবখানি ঘুরতে পারে না, কিছুদূর গিয়েই ফিরে আসে, বারান্দার একটি কোণে চুপ করে বসে। কিন্তু সে কিছুতেই স্বীকার করে না যে, সে দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে। আমাকে কাছে পেলেই কাশীর কথা তোলে। বলে, 'এইবার চলে গেলেই হয় দাদা।' আমি বলি, 'যাবে বৈ কি, তবে আর ক'টা দিন থেকে যাও—বর্ষাটা পার হয়ে যাক।'

সেদিন বিকেলবেলা সরলার শরীর বিশেষ খারাপ হয়েছে, বারান্দার কোণটিতে বসে আছে। আকাশে মেঘ নেই, পড়ন্ত রোদ এসে পড়েছে ওর গায়ে। আমার ঘরের জানালা দিয়ে আমি ওকে দেখতে পাই, চোখ দুটি নিষ্প্রভ, মুখখানা পাণ্ডুর, শীর্ণ দুটি হাত কোলের উপর রাখা। ভিতরটা ব্যথিত হয়ে উঠে। ধীরে ধীরে বারান্দায় বেরিয়ে আসি। আমাকে দেখে ও যেন হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠে, ক্লান্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, 'আমার শরীর এত খারাপ হয়ে পড়ল কেন দাদা, আমি কি সত্যিই বাঁচব না?' এমন প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না, চমকে উঠি, তার পরে সামলে গিয়ে হেসে বলি, 'অসুখ করলেই মরার কথা মনে হয় কেন? কার অসুখ হয় না বলতে পার? শরীর থাকলেই মাঝে মাঝে অসুখ করবে।' আমার কথা শুনে সরলার শুকনো মুখখানা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, চোখ দুটি আলোয় ভরে যায়, বলে, 'দেখেছেন দাদা, কত ভীরু আমি। সত্যিই ত মাঝে মাঝে কার না অসুখ করে; দু'চার দিন পরে অসুখটা সেরে যাবে তার জন্যে এত ভাবছি কেন?' আমি সাহস দিয়ে বলি, 'সেরে যাবে বৈ কি—এটা তোমার সাময়িক।' আশ্বস্ত হয়ে সরলা বলে, 'দাদা, কাশীর দিদিকে চিঠি লিখেছি আমার জন্যে একখানা ঘর ঠিক করতে, ঘর ঠিক হয়েছে খবর পেলেই আমি কাশী যাব।' আমি বলি, 'খুব ভাল প্রস্তাব।'

এরই কয়েকদিন পরে সরলা বিছানা নেয়। রোজই আমাকে প্রশ্ন করে 'দাদা, কাশীর কোন চিঠি এল?' আমি বলি, 'আজও আসে নি—এলেই তোমাকে বলব।'

যে প্রশ্নটা এই ক'দিন সে সজ্ঞানে করেছে, আজ অজ্ঞান অবস্থায় সেই প্রশ্নটা বারে বারে করতে থাকে, আজ আমার উত্তরের প্রতীক্ষা নেই।...

তখন সবে ভোর হয়েছে, দরজার সামনে চামেলী ঝোপটার উপর কাঁচা রোদ এসে পড়েছে, মনে পড়ে এমনি আর এক প্রভাতে সরলা এখানে এসেছিল।

চিতোরের বসতির দৃশ্য

চিতোর দুর্গ

শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সমগ্র রাজপুতানার মধ্যে মেবারের প্রাক্তন রাজধানী চিতোর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাজপুতানার বর্ত্তমান নাম রাজস্থান।

আগ্রা থেকে একটি মিটার গেজ রেললাইন সোজা পশ্চিম দিকে রাজস্থানের বর্ত্তমান রাজধানী জয়পুরের ভিতর দিয়ে আজমীরে এসে পড়েছে এবং সেখান থেকে অপর একটি রেললাইন বরাবর দক্ষিণদিকে নেমে রাটলামে এসে মিশেছে। আজমীর ও রাটলাম লাইনের প্রায় মধ্যবর্ত্তী স্থানে চিতোরের অবস্থিতি। ষ্টেশনটির নাম চিতোরগড়। সমগ্র রাজস্থান আরাবল্লী পর্ব্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত।

ডিসেম্বরের শেষে এক দিন ভোর পাঁচটায় আব্‌ছা আলোয় চিতোরগড় ষ্টেশনে নামতে হ'ল। অন্ধকার তখনো দূরীভূত হয় নি। ষ্টেশনের দু'একটি কেরোসিনের বাতি নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে ওয়েটিং-রুমে আশ্রয় নিলাম। পথে নিরাপত্তার জন্য আমরা তিন বন্ধু স্থানীয় লোকেদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করে নিলাম। প্রাতরাশের পর্ব্ব ষ্টেশনেই সমাপ্ত করে বেলা আটটায় একটি টাঙ্গায় উঠলাম। এখান থেকে স্বতঃই দৃষ্টি গিয়ে নিবদ্ধ হয় প্রায় পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত, আনুমানিক পাঁচ মাইল দীর্ঘ আরাবল্লী পর্ব্বতশ্রেণীতে, এই পর্ব্বতমালার উচ্চতা প্রায় দু'হাজার ফুট। এই পর্ব্বতেই ইতিহাসবিখ্যাত বিরাট চিতোর দুর্গ অবস্থিত। ঐ পর্ব্বতের পানে তাকিয়ে আমরা তিন জনেই আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছিলাম। খানিক বাদে আমাদের যাত্রা সুরু হ'ল চিতোর দুর্গাভিমুখে। দুর্গের দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখে আবার এই ষ্টেশনেই ফিরে আসব—এই সর্ত্তে ভাড়া ঠিক হ'ল সাত টাকা। চিতোর দুর্গ লক্ষ্য করে ধূলিময়-বিশাল শূন্য প্রান্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললাম।

রাজপুত রাজাদের মধ্যে কেবলমাত্র রাজা সংগ্রামসিংহের পুত্র মেবারের রাণা উদয় সিংহই সম্রাট আকবরের সার্ব্বভৌমত্ব স্বেচ্ছায় স্বীকার করে মেবারের পূর্ণ স্বাধীনতার গৌরবকে ক্ষুণ্ন হতে দেন নি। স্বীয় মর্য্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবার উদ্দেশ্যে বাদশাহ আকবর ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে চিতোর আক্রমণ করেন। এক বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি চিতোর দুর্গ অধিকার করেন। চিতোর দুর্গ পুনরুদ্ধারের বাসনায় উদয় সিংহ আরাবল্লী পর্ব্বতমালার মধ্যে আত্মগোপন করে রইলেন। মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য বীর পুত্র রাণা প্রতাপসিংহ ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চিতোর পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই আশা পূরণ হবার পূর্ব্বেই তাঁকে ইহলোক ত্যাগ করতে হয়। রাণা প্রতাপের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মেবারের সূর্য্য অস্তমিত হ'ল।

দু-একটি কুঁড়েঘর ছাড়িয়ে আমরা চিতোর দুর্গের পাদদেশে লোকালয়ে উপস্থিত হলাম। চিতোর থেকে মেবারের রাজধানী উদয়পুরে স্থানান্তরিত হওয়ার পর চিতোরের জন-

সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বাজার থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য কিনে নিয়ে চড়াই অভিমুখে অগ্রসর হলাম। পর্ব্বত-আরোহণের

চিতোর দুর্গের একাংশ

মুখে প্রথমেই বিরাট তোরণদ্বারটি অতিক্রম করা গেল। তার পর প্রায় ২০ ফুট চওড়া ও সুরক্ষিত সর্পিলাকার পথটি ধরে অশ্বযুগল অনায়াসেই আমাদের টাঙ্গাকে উপরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। এক পাশে খাড়াই পর্ব্বতগাত্র, অপর পাশে খাদের দিকে প্রায় ২০ ফুট উচ্চ দুর্ভেদ্য পাথরের গাঁথুনি দ্বারা দুর্গটিকে সুরক্ষিত করা হয়েছে। সাতটি তোরণ অতিক্রম করে পর্ব্বতের সানুদেশে উপনীত হলাম। প্রত্যেকটি তোরণের আলাদা আলাদা নাম দেওয়া হয়েছে, যেমন: দ্বিতীয়টির নাম গিরিপোল, চতুর্থটির নাম লছমন-পোল এবং পঞ্চমটির নাম জোড়াপোল। সমগ্র পর্ব্বতটির মধ্যে কেবলমাত্র এই স্থানটির বিশ ফুট উঁচুতে গাঁথুনির পরিবর্ত্তে লোহার রেলিঙের ব্যবস্থা আছে। সম্মুখে দু-একটি জীর্ণ মন্দির ও গৃহের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। একটি গৃহে প্রাচীন আমলের অনেকগুলি তোপ। ভগ্ন গৃহটি ঝুল ও জঞ্জালে পূর্ণ।

মাঝে মাঝে পথ খানিকটা বন্ধুর হলেও চড়াই-উৎরাই নেই। মাঝে মাঝে টাঙ্গা থেকে নেমে ও পুনরায় টাঙ্গায় আরোহণ করতে করতে অনেকটা পথ অগ্রসর হলাম। পথের দু'পাশে অধিকাংশই ভগ্ন অট্টালিকা। অরক্ষিত ও অবহেলিত নির্জ্জন দুর্গের ভগ্ন অট্টালিকার বিভিন্ন অংশে গড়ে-উঠা লোকের নূতন বাসস্থান নজরে পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে স্থানীয় একজন অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক পেয়ে গেলাম।

বহুক্ষণ পরে আমরা এক বিরাট প্রাসাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলাম। প্রাচীন কালের পরিবেশের মধ্যে এই নূতন প্রাসাদটির অসামঞ্জস্য স্পষ্টই প্রতিভাত হয়। মেবারের রাণা ফতেসিংহের নামানুসারে তাঁর এই প্রাসাদটির নামকরণ করা হয় "ফতেপ্রকাশ"। ফতেপ্রকাশে প্রবেশের অনুমতির প্রয়োজন হয় না। নবনির্ম্মিত, শুভ্র এই বিরাট প্রাসাদটির
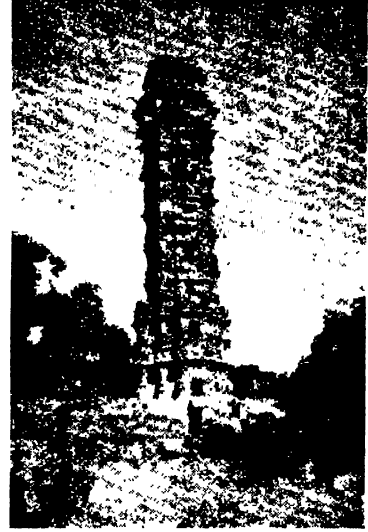
জয়স্তম্ভ

নিম্নের কয়েকটি কক্ষে জনকয়েক পুলিস কর্ম্মচারীর বাসস্থান —আর একটি কক্ষকে ডাকঘরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। অভ্যন্তরস্থ বিরাট অঙ্গনে শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত রাণা ফতে-সিংহের আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তি। ফতেপ্রকাশের সম্মুখে প্রশস্ত সমতল প্রাঙ্গণ এবং পিছনে নবনির্ম্মিত মন্দিরশ্রেণী। পিছনের দ্বিতল বারান্দা থেকে নিম্নের মন্দিরশ্রেণীর নয়নাভিরাম দৃশ্য সত্যই অপূর্ব্ব।

ফতেপ্রকাশ পর্য্যবেক্ষণ করে আবার সুরু হ'ল আমাদের পথচলা। এবার এসে উপস্থিত হলাম মীরাবাঈয়ের আরাধ্য দেবতা গিরিধারীলালজীর মন্দিরে। মন্দিরে প্রবেশান্তে ঘণ্টাধ্বনির পর সম্মুখেই বংশীধারী বিগ্রহের দর্শনলাভ করলাম।

নবপরিণীতা পত্নীকে খুশী করার নিমিত্ত রাণা কুম্ভ গিরিধারীলালজীর এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়ে দেন। রাণা কুম্ভ প্রথম প্রথম মীরাকে অষ্টপ্রহর হরিভজনে বিভোর হয়ে থাকবার সুযোগ দিয়েছিলেন। মীরার সে ভজনের সুর আজও আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হয়ে ভারতবাসীর মনে জাগিয়ে তোলে তাঁর একনিষ্ঠ প্রেম ও ভক্তির কথা। অষ্টপ্রহর হরিভজনে মত্ত থেকে শৈব শ্বশুরকুলের বিরাগভাজন হয়ে স্বীয় অশান্তি তিনি নিজেই ডেকে এনেছিলেন। শ্বশুরালয়ে লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে তাঁকে চিতোর ছেড়ে

চলে যেতে হয়েছিল। সকল লাঞ্ছনা অপমান সহ্য করেছিলেন তিনি গিরিধারীলালজীকে স্মরণ করে।

পথিপার্শ্বে আবরণহীন প্রাচীর-কোটরে নানা জাতীয় বৃক্ষের চারা ঊর্দ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কৌতূহলবশে

মীরার মন্দির

এর পরেই আমরা উপনীত হলাম আকাশস্পর্শী সুদৃশ্য ও সু-উচ্চ মিনারের পাদমূলে। মিনারের কারুকার্য্যে শিল্পীর সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এইটিই রাণা কুম্ভ-নির্ম্মিত বিখ্যাত জয়স্তম্ভ। ফতেপ্রকাশের অনতিদূরে এই স্থানটিতে দু'একজন লোকের মুখ দেখা যায়। নয় তলাবিশিষ্ট চতুষ্কোণ মিনারটির প্রত্যেক তলার শেষেই দুই পাশে বারান্দা ও অপর দুইটি পাশে গবাক্ষ। নবম স্তরে উপস্থিত হওয়ার পর সেখান থেকে চিতোর দুর্গের যে নয়নাভিরাম দৃশ্য নজরে পড়ল তা বিস্মৃত হবার নয়। এক দিকে দূরের বনরাজিতে ও অসমতল পথরেখায় দৃষ্টি ব্যাহত হয় এবং অপর দিকে দুর্গপ্রাকার অতিক্রম করে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় বহু নিম্নে চিতোর-প্রান্তরে।

তার পরেই আমরা দর্শন করলাম অনতিদূরে পবিত্র গোমুখী জলপ্রপাত। বিরাট গহ্বরের প্রায় ত্রিশ ফুট নিম্নে ক্ষুদ্র একটি স্নানাগারের অভ্যন্তরে পর্বতগাত্রে বাঁধানো গোমুখ থেকে প্রস্রবণের বারিধারা নিঃসৃত হচ্ছিল। সেই বারিধারা স্নানাগারের বাইরে প্রবাহিত হয়ে সেখানে ক্ষুদ্র একটি কুণ্ডে পরিণত হয়েছে। সেই কুণ্ডের চারদিক প্রস্তর দ্বারা বাঁধানো। নিম্নে চলাচলের সোপানশ্রেণীও প্রস্তর-নির্ম্মিত। তথাকার শৈব মন্দিরটি ভূতপূর্ব্ব রাজকুলের শৈব ধর্ম্মানুরক্তির পরিচায়ক। অবগুণ্ঠনবতী চার জন রাজপুত-মহিলা মস্তকোপরি কলসী নিয়ে গোমুখ জলাশয়ে স্নান করতে চলেছে।

ফতেপ্রকাশ ছাড়িয়ে আমরা বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়ে গেলাম। পথের উভয় পার্শ্বের বন্ধুর ভূমিতে কোন দুরান্ত থেকে প্রতিহত অশ্বযুগলের একঘেয়ে ক্ষুরধ্বনি কানে আসছে জানি না, কিন্তু বেশ তন্ময় হয়েই গিয়েছিলাম।

ভিতরে প্রবেশ করলাম। ভগ্ন স্তূপে ও আগাছায় অট্টালিকার ক্ষেত্রভূমি পরিপূর্ণ, ঊর্দ্ধপানে বিরাট আকাশের অসীম শূন্যতা। অতীতের এই প্রাসাদটির রাজৈশ্বর্য্যের কথা স্মরণে পড়ল। সেযুগে ভগ্নদশা থেকে রাজপ্রাসাদটিকে রক্ষা করেছিলেন রাণা কুম্ভ, কিন্তু এ যুগের কুম্ভকর্ণেরা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকায় এর শেষ চিহ্নটিও বিলুপ্ত হতে চলেছে। অতীতের কত দুর্জ্ঞেয় রহস্য বিজড়িত রয়েছে এই অট্টালিকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে। সে অতীত কাহিনীর অব্যক্ত বেদনায় হয়ত বাতাস হয়ে উঠেছে ভারাক্রান্ত।

সতীত্ব রক্ষায় জহরকুণ্ডে যিনি অনলদহনে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন, এবার আমরা উপস্থিত হলাম রাণা রতনসিংহের সেই অসামান্যা রূপলাবণ্যবতী মহিষী পদ্মিনীর শ্বেতবর্ণ প্রাসাদের সম্মুখে।

প্রাসাদটি দৈর্ঘ্য প্রস্থের প্রায় চার গুণ। পথের উপরেই প্রাসাদটি চওড়ায় প্রায় চল্লিশ ফুট এবং এই মধ্যবর্ত্তী স্থানে মহলটির প্রবেশপথ। প্রবেশপথের পাশেই প্রাচীরগাত্রে একটি প্রস্তরে উৎকীর্ণ রয়েছে "Padmini Mahal"। অবশিষ্ট লেখাগুলি অস্পষ্ট হয়ে এসেছে কালের প্রভাবে। বহুদিনের পরিত্যক্ত নির্জ্জন প্রাসাদে প্রবেশকালে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। প্রবেশপথ থেকে মহলটির শেষপ্রান্ত-স্থিত প্রাচীর পর্য্যন্ত প্রায় পনর ফুট চওড়া, সড়কের ন্যায় একটি আঙিনা বিদ্যমান। বামে উত্তরচ্ছদবিশিষ্ট, এর সমান্তরাল প্রায় চার ফুট উচ্চ একটি রোয়াক কিছুদূর পর্য্যন্ত গিয়েছে। তৎকালে পসারিণীদের স্থান ছিল এরই উপরে। ডাইনে পাশাপাশি অনেকগুলি রন্ধনশালায় তখনকার বিরাট চুল্লীগুলি চোখে পড়ে। বামে রোয়াক ও ডাইনে প্রকোষ্ঠের

শেষে দু'দিকে দুটি প্রাচীর বিদ্যমান। কিন্তু সড়কের মধ্যপথ উন্মুক্ত, তবে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। এ পর্য্যন্ত আমরা যে

ফতেপ্রকাশ

বাহির-মহল অতিক্রম করেছি পূর্ব্বে সেস্থানে মেলা বসত। সড়ক ধরে আরও খানিকটা পথ অগ্রসর হলাম। ডানদিকে উপরে রাণী পদ্মিনীর গম্বুজাকৃতি ক্ষুদ্র মনোরম প্রকোষ্ঠ—সম্মুখের সম্পূর্ণ অংশটি সুপ্রশস্ত আঙ্গিনা। বামে আঙ্গিনা-প্রান্তে বহির্গমনের রুদ্ধ দ্বার। দ্বারটির অপর প্রান্তেই সুবিখ্যাত জহরকুণ্ড। ভূগর্ভে মহলটির নিম্নের অংশ বিদ্যমান। ডাইনে নিম্নাবরোহণের সোপানশ্রেণীর মুখে দ্বারপাল্লায় তালা দোদুল্যমান, সুতরাং সেস্থানে যাওয়ার আশা ত্যাগ করে বহুদিনের ভগ্নপ্রায় কাষ্ঠনির্ম্মিত সিঁড়ি অবলম্বন করে সন্তর্পণে উপরে উঠলাম। পদ্মিনীর প্রকোষ্ঠের উন্মুক্ত গবাক্ষপথে বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করলাম। এ প্রান্তের গাঁথুনি একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ের ভিতর থেকে উঠেছে। মহলটির সম্মুখেই জলাশয়ের অপর প্রান্তে সুদৃশ্য ক্ষুদ্র গৃহটি আমাদের কৌতূহল অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত করল। এটি দেখবার উদ্দেশ্যে পদ্মিনীমহল হতে নিষ্ক্রান্ত হলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই জলাশয়বেষ্টিত গৃহটির উপর-তলায় উপস্থিত হলাম। দেয়াল হতে সুরু করে গম্বুজের অভ্যন্তরের প্রতিটি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যেই স্থাপত্যশিল্পের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পদ্মিনী-মহলের সম্মুখস্থিত এই ভগ্নপ্রায় গৃহটির উপরকার কারুকার্য্যখচিত ক্ষুদ্র অলিন্দ থেকে পদ্মিনীমহলকে বিরাট ও সৌন্দর্য্যের আকর বলে প্রতীয়মান হয়, এর অভ্যন্তরভাগ কিন্তু একেবারে ফাঁকা। উপরকার জলাশয়ের শান্ত জলে পদ্মিনী-মহলের প্রতিবিম্ব, মহলের সৌন্দর্য্যকে শতগুণে বর্দ্ধিত করেছে। এই পরিবেশের সঙ্গে যেন ওত-প্রোতভাবে বিজড়িত রয়েছে পদ্মিনীকে কেন্দ্র করে সেই কিংবদন্তী।

এখান থেকে আরও প্রায় আধ মাইল অগ্রসর হয়ে বাঁদিকে একটি বিরাট পুষ্করিণীর তীরে অবতরণ করলাম। নিরামিষভোজী রাজপুতের দেশে এই নির্জ্জন আবেষ্টনীতে মৎস্যকুল অতি নিরাপদেই পুষ্করিণীতে বংশবিস্তার করে চলেছে। মৎস্যশিকারীদের লোভনীয় স্থান বটে! মৎস্য-শিকারে চিতোরবাসীর বাধা দিবার সঙ্গত কারণ থাকলেও এমন নির্জন স্থানে সে ভয়ের কোন হেতু নাই। এর পর আরও অগ্রসর হবার উপায় থাকিলেও প্রাণ নিয়ে ফিরে আসার সন্দেহ আছে; কারণ সম্মুখেই হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমি।

ফিরতি-পথে গাড়ী থেকেই পরিচিত স্থানগুলির উপর পুনরায় দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে স্মরণের গাঁথুনিকে দৃঢ় করলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা পর উৎরাই সুরু হ'ল। দুর্গের সাতটি তোরণ পেরিয়ে নিম্নের লোকালয়ের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছি। যখন লোকালয় পিছনে ফেলে শূন্য প্রান্তরের পথ ধরেছি, তখন দেখি অনতিদূরে একটি নদীর শীর্ণ ধারাগুলি উপলপূর্ণ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এইখানে জলধারার উপরে প্রস্তরনির্মিত সুদৃঢ় সেতু বিদ্যমান। চিতোর দুর্গ আক্রমণের সুবিধার্থে এই সেতুটি সম্রাট আলাউদ্দীন ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করান।

সেদিন বৈকাল তিনটা চল্লিশ মিনিটের ট্রেনে মেবারের বর্ত্তমান রাজধানী উদয়পুরের পথে রওনা হলাম। চলন্ত ট্রেন থেকে চিতোর দুর্গকে শেষ বারের মত দেখে নিলাম।
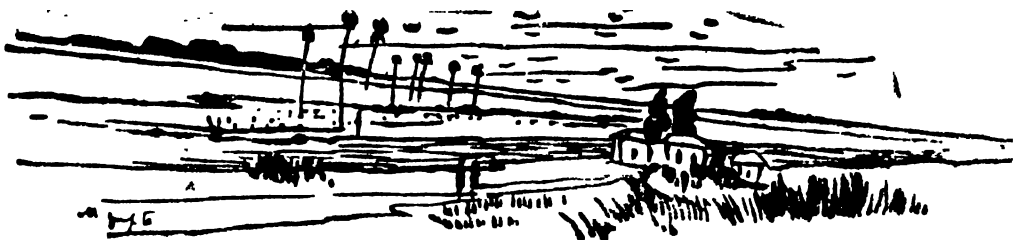
গীতা-প্রবচন

শ্রীবিনোবা ভাবে

অনুবাদক : শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

[গীতা-ব্যাখ্যানের সূচনা হয় বস্তুতঃ ১৯১৭ সালে। তখন বিনোবা পদব্রজে মহারাষ্ট্র পর্যটন করিতেছিলেন। যেখানেই যাইতেন গীতার উপর ব্যাখ্যান দিতেন। ১৯৩২ সালে ধুলিয়া জেলে বন্ধুদের অনুরোধে তিনি মাতৃভাষায় আঠার রবিবারে গীতার আঠারটি অধ্যায়ের মৌখিক ব্যাখ্যান দেন। তাহার অনুলিখন "গীতা-প্রবচন" পুস্তকে মারাঠী ভাষায় প্রকাশিত হয়। পরে হিন্দী, গুজরাটী, তামিল, কন্নড় ইত্যাদিতে তাহা অনূদিত হইয়াছে। হিন্দীর শেষ সংস্করণের মুদ্রণসংখ্যা ১,০১,০০০।

বিনোবা বলেন, "আমার জীবনের উপলব্ধি আমি 'গীতা-প্রবচনে' সহজবোধ্য ভাষায় লোকের কাছে ধরিয়াছি। ইহা নিত্য পঠনীয়।"

গীতার প্রথম অধ্যায় বিষাদ-যোগের বর্ণনা। অর্জুন বিষাদ-গ্রস্ত। কর্তব্যনির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। অবশেষে হৃদয়ের ছল-চাতুরী দূর করিয়া হরিশরণ লইতেছেন। তিনি বলিতেছেন, 'ভগবান, আমি তোমার শরণ লইতেছি। তুমি আমার অনন্যগুরু। তুমি আমায় পথ দেখাও। যে পথ তুমি দেখাইবে সে পথেই আমি চলিব।' পরবর্তী সপ্তদশ অধ্যায়ে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ সেই পথের নির্দেশ দিয়াছেন। বক্তা কৃষ্ণ। শ্রোতা 'কৃষ্ণ' আর ভগবান ও ভক্তের হৃদগত ভাব প্রকট করিতে গিয়া ব্যাসদেব এমনই এক রস হইলেন যে, লোকে তাঁহাকেও 'কৃষ্ণ' সংজ্ঞা দিয়াছে। বর্ণনাকারী কৃষ্ণ, শ্রোতা কৃষ্ণ, রচয়িতা কৃষ্ণ—তিনে যেন অদ্বৈতের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনই যেন সমাধিস্থ। গীতার পাঠে এরূপ একাগ্রতা চাই। শ্রেয়ঃ লাভ করিতে হইলে অর্জুনের মত ঋজুতা ও হরিশরণতা চাই। ইহাই প্রথম অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ নীচে দেওয়া যাইতেছে।

১

প্রিয় বন্ধুগণ,

প্রথম অধ্যায়ে আমরা অর্জুনের বিষাদ-যোগ দেখিয়াছি। যখন অর্জুনের মত ঋজুতা ও হরিশরণতা আসে তখন তাহাতে বিষাদেরও যোগ হয়। ইহাকে হৃদয়-মন্থন বলে। সঙ্কলকারেরা গীতার ভূমিকাকে অর্জুন-বিষাদ-যোগ রূপ বিশেষ নাম দিয়াছেন। আমি তাহাকে বিষাদ-যোগ রূপ সাধারণ নাম দিতেছি। কারণ গীতার পক্ষে অর্জুন এক নিমিত্ত মাত্র। পন্ঢরপুরের পাণ্ডুরঙ্গ কেবল পুণ্ডলীকের জন্য অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নহে। জড়জীব আমাদের উদ্ধারের নিমিত্ত আজ হাজার বৎসর ধরিয়া তিনি বিদ্যমান। তদ্রূপ গীতার কৃপা অর্জুনের নিমিত্ত হইলেও আমাদের সকলের জন্যই তাহা হইয়াছে। তাই গীতার প্রথম অধ্যায়কে বিষাদ-যোগ এই সাধারণ নাম দেওয়াই শোভন হইবে। গীতাবৃক্ষ এখান হইতে বাড়িতে বাড়িতে শেষ অধ্যায়ে প্রসাদযোগ রূপ ফলধারণ করিবে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় হইলে এই কারাবাসকালে আমরাও সে পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইব।

গীতার শিক্ষার সুরু দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে। আর আরম্ভেই ভগবান জীবনের মহাসিদ্ধান্ত বলিতেছেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, যে সব মুখ্য তত্ত্বের উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত হইবে, সুরুতেই তাহা যদি অন্তরে গাঁথিয়া যায় তবে পরবর্তী পথ সুগম হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাংখ্যবুদ্ধি শব্দের অর্থ আমার মতে জীবনের মূলীভূত সিদ্ধান্ত। এই সকল মূল সিদ্ধান্ত এখন আমাদের বিচার করিতে হইবে। তার আগে এই সাংখ্য শব্দের প্রসঙ্গে গীতার পারিভাষিক শব্দের অর্থ একটু পরিষ্কার করিয়া লওয়া ভাল।

প্রাচীন শাস্ত্রীয় শব্দসমূহকে গীতা হামেশা নূতন অর্থে ব্যবহার করিয়াছে। পুরাতন শব্দসমূহে নূতন অর্থের কলম বসানো বিচার বিপ্লবের অহিংস প্রক্রিয়া। ব্যাসদেব এই প্রক্রিয়ায় সিদ্ধহস্ত। তাই গীতার শব্দসমূহ ব্যাপক সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছে অথচ সরল ও চির সতেজ রহিয়া গিয়াছে। আর তাই জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ নিজ নিজ প্রয়োজন ও উপলব্ধি অনুসারে তাহাদের বিভিন্ন অর্থ করিতে পারিয়াছেন। নিজ নিজ দৃষ্টি হইতে ঐ সব অর্থই ঠিক হইতে পারে। আর আমি মনে করি, উহাদের বিরোধ না করিয়া স্বতন্ত্র অর্থও আমরা করিতে পারি।

এই প্রসঙ্গে উপনিষদে একটি সুন্দর গল্প আছে। এক সময়ে দেব, দানব ও মানব এই তিনে উপদেশের জন্য প্রজাপতির কাছে গিয়াছিল। প্রজাপতি সকলকে 'দ' অক্ষরটি দেন, দেবেরা বলিল, "দেবতা আমরা কামী, বিষয়-ভোগে আমাদের আসক্তি জন্মেছে। তাই ব্রহ্মা 'দ' অক্ষর দ্বারা দমন করার শিক্ষা আমাদের দিয়েছেন।" দানবেরা বলিল, "আমরা দানবেরা ক্রোধী, দয়াহীন হয়ে গিয়েছি। 'দ' অক্ষর দ্বারা 'দয়া কর' এই শিক্ষা প্রজাপতি আমাদের দিয়েছেন।" মানবেরা বলিল, "মানব আমরা লোভী, সঞ্চয়ের জন্য পাগল হয়েছি। 'দ' অক্ষর দ্বারা 'দান কর' এই শিক্ষা প্রজাপতি আমাদের দিয়েছেন।" প্রজাপতি বলিলেন, সকলের অর্থই ঠিক। কারণ সকলেই আত্মানুভূতি হইতে নিজের নিজের অর্থ পাইয়াছে। গীতার পরিভাষার অর্থ করার সময় উপনিষদের এই কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে।

২

দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবনের তিন মহা-সিদ্ধান্ত উপস্থিত করা হইয়াছে—(১) আত্মার অমরতা ও অখণ্ডতা, (২) দেহের ক্ষুদ্রতা, এবং (৩) স্বধর্মের অবাধ্যতা। উহার মধ্যে স্বধর্মের সিদ্ধান্ত কর্তব্যরূপ এবং অপর দুইটি জ্ঞাতব্য। পূর্ব অধ্যায়ে স্বধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। প্রকৃতি-ধর্মে এই স্বধর্ম আমরা পাইয়া থাকি। স্বধর্ম খুঁজিয়া লইতে হয় না। আকাশ হইতে পড়িয়া আমরা চলিতে-ফিরিতে থাকি, তাহা নয়। আমাদের জন্ম হইবার পূর্বেই এই সমাজ ছিল, মা-বাপ ছিলেন, পাড়াপ্রতিবেশী ছিলেন। এই প্রবাহে আমরা জন্ম গ্রহণ করি। যে মা-বাপের ঘরে আমাদের জন্ম, তাঁহাদের সেবা করার ধর্ম জন্ম হইতেই আমরা প্রাপ্ত হই। আর যে সমাজে জন্মিয়াছি তাহার সেবা করার ধর্মও ঐভাবেই আমাদের কাছে আসিয়া যায়। আমাদের জন্মের সঙ্গেই আমাদের স্বধর্মের জন্ম হইয়া থাকে। একথাও বলা যাইতে পারে যে, আমাদের জন্মের পূর্ব হইতেই তাহা আমাদের জন্য তৈরি ছিল। কারণ তাহাই আমাদের জন্মের হেতু। তাহা সম্পন্ন করার জন্যই আমাদের জন্ম। পত্নীর সহিত স্বধর্মের তুলনা করিয়া কেহ কেহ বলেন যে, পত্নীর সম্বন্ধ যেমন অচ্ছেদ্য স্বধর্মও তদ্রূপ অচ্ছেদ্য। কিন্তু এই উপমাও আমার কাছে গৌণ মনে হয়। আমি স্বধর্মের তুলনা করি মায়ের সহিত। আমার মা কে হইবেন সে নির্বাচন আমার অপেক্ষায় ছিল না। আগে হইতেই তাহা নির্দিষ্ট ছিল। যেরূপই হউক তাহা এখন আমার ফেলিবার উপায় নাই। স্বধর্ম সম্বন্ধেও সেই কথা, স্বধর্ম ছাড়া এ জগতে অপর কোন অবলম্বন আমাদের নাই। স্বধর্মকে অস্বীকার করা 'স্ব'-কে অস্বীকার করার মতই আত্মঘাতী। অগ্রসর হইতে চাই তো স্বধর্মের সহায়তায়ই অগ্রসর হইতে হইবে। অতএব এই স্বধর্মের আশ্রয় কখনও পরিত্যাগ করা উচিত নহে—জীবনের ইহা অন্যতম মূল সিদ্ধান্ত।

স্বধর্ম এরূপ সহজপ্রাপ্ত যে তার আচরণ অনায়াসসাধ্য হওয়া উচিত। কিন্তু নানা মোহের দরুন তাহা হয় না। অথবা অতি কষ্টে হয়। আর হইলেও তাহাতে নানা বিষ মিশিয়া যায়। স্বধর্মের পথে বিঘ্নসৃষ্টিকারী মোহের বাহ্যরূপ অনেক। সীমাসংখ্যা তার নাই। বিচার-বিশ্লেষণ করিলে ঐ সকলের মূলে একটি মুখ্য বস্তু দেখা যায়—সে হইতেছে সঙ্কীর্ণ ও হাল্কা দেহবুদ্ধি। আমি ও আমার শরীরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তি ও বস্তু, ব্যস্, এই পর্যন্তই আমার ব্যাপ্তি-প্রসারের সীমা। যাহারা এই গণ্ডির বাহিরে তাহারা সকলে পর, শত্রু—ভেদের এই প্রাচীর দেহ-বুদ্ধি খাড়া করিয়া দেয়। আর 'আমি' ও 'আমাদের' বলিয়া যাহাদের গণনা করি তাহাদের শরীরটাই মাত্র তাহা দেখে। দেহ-বুদ্ধির এই দ্বিবিধ প্যাঁচে পড়িয়া আমরা নানাবিধ ডোবা—বেষ্টনী সৃষ্টি করিতে থাকি। প্রায় সকলের পক্ষেই একথা খাটে। কাহারও ডোবা ছোট, কাহারও বা বড়, এই মাত্র। কিন্তু আসলে তাহা ডোবাই—গণ্ডি। উহার গভীরতা এই শরীরের চর্মের গভীরতারই সমান। কেহ সৃষ্টি করে আত্মীয়-স্বজনের গণ্ডি, কেহ বা দেশাভিমানের। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণেতর নামক এক ডোবা বা গণ্ডি, মুসলমান-অমুসলমান নামক আর এক ডোবা বা গণ্ডি, এরূপ দুই-একটি নহে অসংখ্য ডোবা-গণ্ডি রহিয়াছে। যেদিকে তাকান ডোবা আর ডোবা। আমাদের এই জেলেও রাজনৈতিক কয়েদী ও অন্যবিধ কয়েদী—এইরূপ ডোবা-গণ্ডি রহিয়াছে, তাহা ছাড়া আমাদের জীবন যেন চলে না। কিন্তু পরিণাম ইহার কি? পরিণাম একই। হীন বিকারের জীবাণুর প্রসার আর স্বধর্মরূপী স্বাস্থ্যের নাশ।

৩

এই অবস্থায় কেবল স্বধর্ম নিষ্ঠা পর্যাপ্ত নহে। তার জন্য অপর দুইটি সিদ্ধান্ত জাগ্রত রাখা চাই। এক—আমি মরণশীল দেহ নহি, দেহ উপরের ক্ষুদ্র পাপড়ি মাত্র। দুই—আমি মৃত্যুহীন অখণ্ড ব্যাপক আত্মা। এই দুই মিলিয়া এক পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান হয়।

এই তত্ত্বজ্ঞান গীতার দৃষ্টিতে এত আবশ্যক মনে হইয়াছে যে, গীতা তাহার আবাহন প্রথমে করিয়াছে, আর স্বধর্মের অবতারণা করিয়াছে পরে। কেহ কেহ বলেন, "প্রারম্ভেই এই সব তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক শ্লোকের অবতারণা কেন?" কিন্তু আমি মনে করি, গীতায় যদি এমন কোন শ্লোক থাকে যাহা মোটেই স্থানান্তরিত করা যায় না তবে তাহা হইতেছে এই সব শ্লোক।

এইটুকু তত্ত্বজ্ঞান মনে অঙ্কিত হইয়া গেলে স্বধর্ম আদৌ কঠিন মনে হইবে না। তাহাই নহে, স্বধর্মের বাহিরে অন্য কিছু করাই কঠিন মনে হইবে। আত্মতত্ত্বের অখণ্ডতা ও দেহের ক্ষুদ্রতার কথা বুঝা কঠিন নহে। কারণ এই দুই-ই সত্য বস্তু। কিন্তু তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। মনে তাহা বার বার মন্থন করিতে হইবে। এই চর্মের গুরুত্ব কমাইয়া আত্মাকে গুরুত্ব দেওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

পলে পলে এই দেহ বদলাইতেছে। বাল্যকাল, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা এই চক্রের অভিজ্ঞতা কাহার না আছে? আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌দের মতে সাত বৎসরে শরীর একেবারে বদলাইয়া যায়, পুরাতন রক্তের একবিন্দুও অবশিষ্ট থাকে না। আমাদের পূর্বজগণ মনে করিতেন যে, বার বৎসরে পুরাতন

শরীর মরিয়া যায়। তাই প্রায়শ্চিত্তের, তপশ্চর্যার, অধ্যয়ন আদির অবধি বার বার বৎসরের ছিল। বহু বৎসর ছাড়াছাড়ির পর ছেলের সহিত মায়ের মিলন হইয়াছে; মা ছেলেকে চিনিতে পারেন নাই এরূপ গল্প আমরা শুনিতে পাই। যে দেহ এইভাবে প্রতিক্ষণ বদলাইতেছে, প্রতিক্ষণ মরিতেছে তাহাই কি তোমার রূপ? দিন-রাত যেখানে মলমূত্রের প্রবাহ বহিতেছে, আর তোমার মত উত্তম সেবক তাহা ধৌত করিতে সদা প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও যাহার অপরিচ্ছন্নতার ব্রত ভঙ্গ হয় না, তুমিই কি সে? সে অপরিচ্ছন্ন, তুমি তাহার পরিচ্ছন্নতা-বিধানকারী; সে রোগী, তুমি তাহার শুশ্রূষাকারী, সে সাড়ে তিন হাত পরিমিত, তুমি ত্রিভুবনবিহারী, সে নিত্যপরিবর্তনশীল, তুমি তাহার পরিবর্তনের সাক্ষী, সে মরণশীল, আর তুমি তাহার মৃত্যুর ব্যবস্থাকারী। তোমার ও উহার পার্থক্য এমন সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তুমি এমন সঙ্কুচিত হইয়া থাক কেন? এই দেহের সহিত যত সম্বন্ধ তাহা আমারই এ কথা কেন মনে কর? আর এই দেহের মৃত্যুতে এত শোকই বা কেন? ভগবান বলেন—"আরে, দেহের বিনাশ কি শোক করার মত ব্যাপার?"

দেহ তো কাপড়ের মত। পুরাতন ছিঁড়িয়া যায়, তাই নূতন ধারণ করা হয়। একই শরীর যদি আত্মাকে সদা আঁকড়াইয়া থাকে তো আত্মার নিকৃষ্ট গতি হয়। সমস্ত বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়। আনন্দ অদৃশ্য হয়, আর জ্ঞানপ্রভা ম্লান হয়। অতএব দেহের বিনাশ পরিতাপের হইতে পারে না। হাঁ, আত্মার বিনাশ যদি সম্ভব হইত তবে তাহা অবশ্যই শোচনীয় হইত, কিন্তু আত্মা অবিনাশী—যেন অখণ্ড বহমানা ঝরণা। অনেক কলেবর তাহাতে আসে যায়, অতএব দেহ-সম্বন্ধের পাকে পড়িয়া শোক করা এবং ইহা আমার, উহা অপরের, এই ভেদবিভেদ করা একান্তই অনুচিত। মনে কর, এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যেন সুন্দর বোনা একখানি চাদর। ছোট শিশু হাতে কাঁচি লইয়া যেমন চাদর টুকরা করিয়া ফেলে, তেমনি এই দেহরূপ কাঁচি দ্বারা যদি এই বিশ্বাত্মাকে টুকরা করা হয় ত তাহা কতই না ছেলেমানুষি হইবে—হিংসা হইবে!

যে ভারতভূমে ব্রহ্মবিদ্যার জন্ম হইয়াছে, সেখানে এরূপ অগণিত ছোট বড় দল, সম্প্রদায় ও জাতি দেখা যায় ইহা সত্য সত্যই নেহাত দুঃখের কথা। আর আমাদের মনে মৃত্যুভয় এরূপ বাসা বাঁধিয়াছে যে, তেমনটা আর কোথাও বড় দেখা যায় না। ইহা দীর্ঘদিনের পরাধীনতার ফল, সন্দেহ নাই। কিন্তু আবার ইহাই যে পরাধীনতার অন্যতম কারণ একথা ভুলিলেও চলিবে না।

মৃত্যু শব্দটাই আমাদের কাছে অসহ্য। মৃত্যু এই নামটাই অমঙ্গলের মনে হয়। বড় দুঃখে জ্ঞানদেব বলিয়াছেন:

"মৃত্যু শব্দ নাহি সহে, মরে গেলে কাঁদে।" লোক মরিলে কান্নার মহা রোল পড়িয়া যায়। তাহা যেন এক কর্তব্য! ব্যাপার এতটা গড়াইয়াছে যে কাঁদার জন্য লোক ভাড়া করা হয়। মৃত্যু আসন্ন। তবু রোগীকে সেকথা বলা হয় না। রোগী বাঁচিবে না, একথা ডাক্তার বলিলেও মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়। ডাক্তার নিজেও স্পষ্ট করিয়া বলেন না। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মুখে ঔষধ ঢালিতে থাকে। তার পরিবর্তে সত্য বলিয়া সান্ত্বনা দিয়া ঈশ্বর-স্মরণের দিকে যদি তাহার মন ঘুরানো যায় তবে কতই না ভাল হয়। কিন্তু লোকের ভয় ঐ ধাক্কায় ভাণ্ড যদি আগেই ভাঙিয়া যায়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের আগে কি এই ভাণ্ড ভাঙিবার? আর যে ভাণ্ড দুই ঘণ্টা পরে ভাঙিবেই তাহা যদি দুই ঘণ্টা আগে ভাঙে ত কি আসে যায়। তার অর্থ এই নয় যে, আমরা কঠোর ও প্রেমহীন হইয়া গেলাম। দেহাসক্তি প্রেম নহে বরং দেহাসক্তি দূর না হইলে যথার্থ প্রেমের উদয়ই হয় না।

দেহাসক্তি চলিয়া গেলে বুঝা যাইবে যে দেহ সেবার সাধন হইয়াছে। আর তখন দেহ তার যোগ্য প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। কিন্তু আজ দেহপূজাকে আমরা সাধ্য মনে করিতেছি। স্বধর্মাচরণ যে সাধ্য সেকথা ভুলিয়াই গিয়াছি। দেহ ধারণ করা, তাকে পান-আহার দেওয়া সে ত স্বধর্ম-আচরণের নিমিত্তে। কেবল বাসনাতৃপ্তির জন্য তার দরকার নাই। চামচ দিয়া হালুয়া অথবা ভাত-ডাল পরিবেশন কর তাহাতে চামচের কোন সুখ-দুঃখ নাই। জিহ্বার অবস্থাও অনুরূপ হওয়া চাই—রসবোধ থাকিবে, সুখ-দুঃখ নহে। শরীরের খাজনা শরীরকে মিটাইয়া দিয়াছি; ভাল, আর কি চাই। সুতাকাটার জন্য চরকায় তৈল দিতে হয়। তেমনি শরীর হইতে কাজ আদায় করিতে হয় বলিয়া তাহাতে কয়লা দিতে হয়। এইভাবে যদি আমরা দেহের ব্যবহার করি তবে মূলতঃ ক্ষুদ্র হইলেও উহার মূল্য বাড়িয়া যাইতে পারে, আর তাহা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে।

কিন্তু সাধনরূপে ব্যবহার না করিয়া আমরা দেহে ডুবিয়া যাই, আত্ম-সঙ্কোচ করিয়া ফেলি। তার ফলে মূলেই যে দেহ ক্ষুদ্র তাহা আরও ক্ষুদ্র হইয়া যায়। তাই সাধুপুরুষেরা দৃঢ়ভাবে বলেন, "দেহ ও দেহ-সম্বন্ধ নিন্দ্য। কুকুর শূকর আদির বন্দ্য।" ওরে, দেহের ও দেহের সহিত যার সম্বন্ধ, দিনরাত তার পূজা তুই করিস নে। অপরকে চিনতে শেখ।" এইভাবে সাধুপুরুষেরা আমাদের আত্মপ্রসারের শিক্ষা দিয়া থাকেন। আপন আত্ম-ইষ্ট-মিত্র ব্যতীত অপরের কাছে নিজ আত্মা এতটুকুও আমরা লইয়া যাই কি? জীবে জীবের

সমাবেশ, আত্মায় আত্মার মিলন, এইরূপ আমরা করি কি? নিজ আত্ম-হংসকে এই পিঞ্জরের বাহিরের হাওয়া খাওয়াই কি? যাকে নিজ গণ্ডি বলিয়া জানি সেই গণ্ডি ভেদ করিয়া আগামী কাল নূতন দশ জন বন্ধু বানাইব এ কথা কখনও মনে হয় কি? আজ পনর, কাল পঁচিশ হইবে। আর পরিধি এরূপ বাড়িতে বাড়িতে সমস্ত বিশ্বই আমার ও আমি সমস্ত বিশ্বের এই অনুভব করিতে থাকিব। জেল হইতে আমরা আত্মীয়-স্বজনকে পত্র দিই, ইহাতে বিশেষত্ব কোথায়? জেল হইতে বাহির হইয়া কোন নূতন বন্ধুকে—রাজনৈতিক কয়েদী নহে, চোর কয়েদী-বন্ধুকে পত্র লিখিবেন কি?

আমাদের আত্মা ব্যাপক হওয়ার জন্য ছট্‌ফট্‌ করে। সমস্ত জগৎকে সে নিজ করিয়া লইতে চাহে, কিন্তু আমরা দিই তাহাকে কামরায় বদ্ধ করিয়া। আত্মাকে আমরা কয়েদী বানাইয়া ছাড়িয়াছি। আত্মার কথা মনেও হয় না। সকাল হইতে সন্ধ্যা দেহের সেবাতেই আমরা মত্ত—এই দেহ হৃষ্ট-পুষ্ট হইল কি দুর্বল হইল ইহাই অনুক্ষণের চিন্তা। যেন সংসারে অপর কোন আনন্দ নাই। ভোগের ও স্বাদের আনন্দ পশুরাও উপভোগ করিয়া থাকে। এখন ত্যাগ ও স্বাদ-ভঙ্গের আনন্দের খোঁজ করিবে কি করিবে না? নিজে ক্ষুধাপীড়িত হওয়া সত্ত্বেও বাড়া ভাত আর কোন ক্ষুধাতুরকে দেওয়ার আনন্দ যে কি তাহা অনুভব কর। সেই স্বাদ চাখ। মা যখন ছেলের জন্য কষ্টভোগ করেন তখন তিনি এই সুখের কিছু আস্বাদ পান। মানুষ নিজের বলিয়া যে সঙ্কীর্ণ গণ্ডি সৃষ্টি করে, অগোচরে সেখানেও আত্মবিকাশের মাধুর্য আস্বাদের বাসনা তাহার থাকে; কারণ দেহবদ্ধ আত্মা স্বল্পমাত্রায় আর খানিকের জন্য হইলেও উহার বাহিরে আসে, কিন্তু এই বাহিরে আসা কীদৃশ? কারা-প্রাচীরের মধ্যে কয়েদী যেমন ওয়ার্ডের বা কামরার বাহিরে আসে তাদৃশ। কিন্তু আত্মার কাজ ততটুকুতে চলে না। আত্মার চাই মুক্তানন্দ।

সারাংশ—(১) অধর্ম ও পরধর্মের বাঁকা রাস্তা ছাড়িয়া সাধকের স্বধর্মরূপ সহজ সরল রাস্তা ধরা চাই। স্বধর্মের আঁচল কখনও ছাড়িতে নাই। (২) দেহ ক্ষণভঙ্গুর একথা উপলব্ধি করিয়া স্বধর্মের নিমিত্ত উহার ব্যবহার করা চাই, আর দরকার হইলে স্বধর্মের নিমিত্ত উহার শেষ করা চাই, (৩) আত্মার অখণ্ডতা ও ব্যাপকতার বোধ সদা জাগ্রত রাখিয়া মন হইতে আত্মপর ভেদভাব দূর করা চাই। জীবনের এই সরল সিদ্ধান্ত ভগবান সামনে ধরিয়াছেন। যে মানুষ তদ্রূপ আচরণ করিবে, সে একদিন-না-একদিন নিঃসন্দেহে এই নরদেহ দ্বারাই 'সচ্চিদানন্দ পদধারা' অনুভব করিবে।

৪

ভগবান জীবনের সিদ্ধান্তসমূহের নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু কেবল সিদ্ধান্ত নির্দেশ করিলে কাজ পূর্ণ হয় না। গীতায় বর্ণিত এই সব সিদ্ধান্ত উপনিষদ ও স্মৃতিসমূহে পূর্ব হইতেই ছিল। গীতা এই সব পুনরায় উপস্থিত করিয়াছে,—এখানে গীতার অপূর্বতা নহে, এই সকল সিদ্ধান্ত কি ভাবে আচরণ করা যায় সেই পথ গীতা দেখাইয়াছেন, আর এই-খানেই গীতার অপূর্বতা। এই মহাপ্রশ্নের সমাধানেই গীতার নৈপুণ্য।

জীবনের সিদ্ধান্তসমূহকে আচরণ করার কলা বা উপায়কে যোগ কহে। সাংখ্যের অর্থ সিদ্ধান্ত বা শাস্ত্র। আর যোগ মানে কলা। তাই ত জ্ঞানদেব সাক্ষ্য দিতেছেন, "যোগীদের জীবনে রূপ পেয়েছে জীবনকলা।" সাংখ্য ও যোগ, শাস্ত্র ও কলা এই দুইয়ে গীতা পরিপূর্ণ। শাস্ত্র ও কলার মিলনে জীবন-সৌন্দর্য বিকশিত হয়। সঙ্গীতশাস্ত্রের জ্ঞান থাকিতে পারে, কিন্তু কণ্ঠ হইতে সঙ্গীত ব্যক্ত করার কলা যদি না সাধিয়া থাক ত নাদব্রহ্মের ব্যঞ্জনা হইবে না। তাই ভগবান সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বিনিয়োগ করার কলাও দেখাইয়াছেন। ভাল, সে কলা কিরূপ? দেহকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আত্মার অমরতা ও অখণ্ডতার উপর নজর রাখিয়া স্বধর্মাচরণের ঐ কলা কি প্রকার?

লোকে দ্বিবিধ ভাবনা হইতে কর্ম করে। এক—নিজ কর্মের ফল অবশ্য ভোগ করিব। তাহাতে আমার অধিকার, আর ইহার বিপরীত আর এক ভাব এই, ফল ভোগ করিতেই যদি না পাইলাম তবে কর্ম করিতে যাই কেন? এই দুইটি ছাড়া গীতা তৃতীয় এক ভাব বা বৃত্তির কথা বলিয়াছেন। গীতা বলেন—"কর্ম অবশ্যই করবে, কিন্তু ফলে তোমার অধিকার এ কথা মনে করো না। কর্ম যে করে ফলে অবশ্যই তার অধিকার আছে। কিন্তু স্বেচ্ছায় সেই অধিকার তুমি ছেড়ে দাও।" রজোগুণ বলে "নিতে হয় ত ফলসহিত নেব।" আর তমোগুণ বলে, "ছাড়তে হয় ত কর্মসহিত ছাড়ব।" এই দুই একে অন্যের সোদর। অতএব এই দুইয়ের ঊর্ধ্বে উঠিয়া তুমি শুদ্ধ সত্ত্বগুণী হও—অর্থাৎ কর্ম কর, কিন্তু ফল ছাড়। আর ফল ছাড়িয়া কর্ম কর। আগে বা পাছে ফলের আশা রাখিও না।

ফলের আশা করিও না—একথার সঙ্গে সঙ্গে গীতা এ-কথাও বলে যে, কর্ম উত্তমরূপে ও দক্ষতা সহকারে করিতে হইবে। সকাম পুরুষের কর্ম অপেক্ষা নিষ্কাম পুরুষের কর্ম অধিকতর ভাল হওয়া চাই। আর এই প্রত্যাশা উচিতও বটে; কারণ সকাম পুরুষ ফলাসক্ত। তাই ফলের স্বপ্ন-চিন্তায় তাহার সময় ও শক্তি অনাবশ্যক অপব্যয়ই ব্যয় হইয়া

যায়। পক্ষান্তরে ফলেচ্ছারহিত লোকের প্রতি মুহূর্ত্ত আর সমগ্র শক্তি কাজে নিয়োজিত হয়। নদীর ছুটি নাই, হাওয়া বিশ্রাম জানে না, সূর্য অনুক্ষণ জ্বলিতেছে। তদ্রূপ নিষ্কাম কর্মী নিরন্তর সেবাকর্ম ছাড়া আর কিছু জানে না। অতএব এরূপ নিরন্তর কর্মরত পুরুষের কর্ম যদি উৎকৃষ্ট না হয় তবে হইবে কাহার? তা ছাড়া চিত্তের সমতা এক বড় নিপুণ গুণ। নিষ্কাম পুরুষের তাহা পৈতৃক সম্পত্তি। যে-কোন বাহ্য হস্তশিল্প লক্ষ্য করুন। হস্তশিল্পের সহিত চিত্তের সমত্বের সংযোগ যদি হইয়া থাকে তবে পরিষ্কার দেখা যাইবে যে সে কর্ম আরও অধিক সুন্দর হইয়াছে। তাহা ছাড়া সকাম ও নিষ্কাম পুরুষের কর্ম-দৃষ্টিতে যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহাও নিষ্কাম পুরুষের কর্মের পক্ষে অধিকতর অনুকূল। সকাম পুরুষ কর্মের দিকে স্বার্থের দৃষ্টিতে দেখে। "আমার কাজ, আর ফল আমারই প্রাপ্য"—এই দৃষ্টির দরুন কর্ম হইতে তাহার মনঃসংযোগ কতকটা সরিয়া যায়। আর উহাতে সে কোন নৈতিক দোষও দেখিতে পায় না। খুব দেখে ত দেখে ব্যবহারদোষ মাত্র। কিন্তু নিষ্কাম পুরুষের নিজ কর্ম সম্বন্ধে নৈতিক কর্তব্যবুদ্ধি থাকে। তাই নিজ কার্যে ক্রটির লেশমাত্র যাহাতে না থাকে সেদিকে তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এই কারণেও তাহার কার্য অধিকতর নির্দোষ হইবে। যে দিক হইতেই দেখুন, ফলত্যাগ যে একান্ত নিপুণ ও ফলপ্রদ তত্ত্ব তাহা সপ্রমাণ হইবে। অতএব ফলত্যাগকে যোগ বা জীবনের কলা বলা উচিত হইবে।

নিষ্কাম কর্মের কথা ছাড়িয়া দিলেও, কাজের নিজেরই যে আনন্দ রহিয়াছে সে আনন্দ উহার ফলে নাই। নিজ কর্ম করিতে করিতে এক প্রকারের তন্ময়তা জন্মে। তাহা আনন্দেরই এক ধারা। চিত্রকরকে বলুন, "ছবি আঁকতে হবে না, কত পয়সা চাই নাও।" সে কথায় সে কান দিবে না। কৃষককে বলুন, "ক্ষেতে যেয়ো না, গাই চরাতে হবে না, সেচ দিয়ো না, ধান-চাল যতটা চাও দিব।" সত্যিকার চাষীর সে কথা ভাল লাগিবে না। ভোরে উঠিয়া চাষী ক্ষেতে যায়। সূর্যনারায়ণ তাহার অভ্যর্থনা করে, পক্ষী তাহার জন্য তান ধরে। গরু বলদ তাহার আশেপাশে চলাফেরা করে। প্রেমভরে সে তাহাদের পিঠে হাত বুলায়। যে ফসল বুনিয়াছে, অপলক নেত্রে সে তাহা দেখে। এই সকল কাজে এক প্রকারের সাত্ত্বিক আনন্দ রহিয়াছে। এই আনন্দই ঐ কার্যের মুখ্য ও খাঁটি ফল। সে তুলনায় উহার বাহ্য ফল নেহাতই তুচ্ছ।

কর্মফল হইতে গীতা যখন মানুষের দৃষ্টি সরাইয়া দেয় তখন গীতা ঐ উপায়ে তাহার কর্মতন্ময়তা শতগুণ বাড়াইয়া দেয়। ফল-নিরপেক্ষ লোকের কর্মবিষয়ক তন্ময়তা সমাধির তুল্য। এই হেতু তার আনন্দ অন্য আনন্দ হইতে শতগুণ অধিক। এ দিক হইতে দেখিলে বুঝা যাইবে যে, নিষ্কাম কর্ম নিজেই এক মহান ফল। জ্ঞানদেব ঠিকই বলিয়াছেন, "বৃক্ষে ধরেছে ফল, ফলে আর ধরবে কি ফল?" এই দেহরূপ বৃক্ষে নিষ্কাম স্বধর্মাচরণ-রূপ সুন্দর ফল ধরার পরে এখন আর কোন্ ফল চাই? কৃষক ক্ষেতে গম বোনে, গম বেচিয়া জোয়ারের রুটি কেন খায়? সুস্বাদু ফল সে ফলায়, তাহা বেচিয়া সে লঙ্কা খায় কেন? ওরে ভাই, কলাই খাও না? কিন্তু লোকের সেকথা রুচে না, কলা খাওয়ার ভাগ্য থাকিতেও লঙ্কার জন্য পাগল হয়। গীতা বলে, "এরূপ তুমি করো না, কর্মই খাও, কর্মই পান করো, আর কর্মই পরিপাক করো।" ব্যস্, সবকিছু কর্ম করাতে আসিয়া যায়। খেলার আনন্দে শিশু খেলে, তাহা হইতে আপনা-আপনি সে ব্যায়ামের ফল পাইয়া থাকে। কিন্তু সেই ফলের দিকে তার নজর থাকে না। তার সকল আনন্দ ঐ খেলাতে।

৫

সাধু লোকেরা নিজ নিজ জীবনদ্বারা একথা সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তুকারামের ভক্তিভাব দেখিয়া শিবাজী মহারাজের মনে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল। একবার তিনি তুকারামের বাড়ী পাল্‌কী পাঠাইলেন, তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন করিলেন। তুকারাম অতিশয় দুঃখিত হইলেন। মনে মনে বলিলেন, "এই কি আমার ভক্তির ফল? এই জন্যই কি আমার ভক্তি?" তাঁহার মনে হইল মান সম্মানের এই ফল তাঁহার হাতে দিয়া ভগবান তাঁহাকে দূরে ঠেলিয়া দিতেছেন। তিনি বলিলেন:

"জানিস অন্তর, তবু সৃষ্টি করিস সঙ্কট।
এই ত তোর দোষ, পাণ্ডুরঙ্গ মহা খোট।"

"ভগবান তোমার এই অভ্যাস ভাল নহে। এই ঘুঙ্গুর-দানা দিয়া তুমি আমায় ভুলাইতে চাও। ভাবিতেছ এই আপদকে দূর করিয়া দিই। কিন্তু আমিও কাঁচা গুরুর চেলা নহি। তোমার পা শক্ত করিয়া ধরিয়া বসিয়া যাইব। ভক্তি ভক্তের স্বধর্ম, আর ভক্তিতে ফলরূপ অবান্তর কণ্টক সৃষ্টি হইতে না দেওয়াই তাহার জীবনকলা।" ফলত্যাগের ইহা অপেক্ষা গভীর আদর্শ, পুণ্ডলীকের চরিত্র আমাদের সামনে ধরিতেছে। পুণ্ডলীক নিজ মা-বাপের সেবা করিতে-ছিলেন। তাঁহার সেবায় তুষ্ট হইয়া পাণ্ডুরঙ্গ তাঁহাকে দর্শন দিতে আসিলেন, কিন্তু পুণ্ডলীক পাণ্ডুরঙ্গের ফাঁদে পড়িলেন না। সেবাকার্য হইতে বিরত হইলেন না। নিজ মা-বাপের এই সেবা তাঁহার কাছে হৃদ্‌গত ঈশ্বরভক্তি ছিল। অপরকে লুঠপাট করিয়া কোন ছেলে যদি মা-বাপের সুখবিধান করে

বা অপর দেশকে দ্রোহ করিয়া কোন দেশসেবক যদি নিজ দেশের উৎকর্ষ চাহে ত এই দুই জনের এই দুই বস্তুকে ভক্তি বলা যাইবে না, তাহা আসক্তি মাত্র। পুণ্ডলীক এই আসক্তির ফাঁদে পা দিলেন না। তিনি বলিলেন, পরমাত্মা আমার সামনে যে মূর্তিতে দাঁড়াইয়াছেন, তিনি কি তাহাই মাত্র? এই রূপে দেখা দেওয়ার আগে কি সৃষ্টি প্রেতবৎ ছিল? ভগবানকে তিনি বলিলেন, "হে ভগবান, তুমি স্বয়ং আমাকে দর্শন দিতে এসেছ তা দেখছি। কিন্তু আমি 'ও-সিদ্ধান্ত' মান্যকারী—একলা তুমিই ভগবান একথা আমি মানি না। আমার কাছে তুমিও ভগবান, মা-বাপও ভগবান। তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত আছি বলে তোমার দিকে মন দিতে পারছি না। তার জন্য তুমি আমায় ক্ষমা করো।" এই বলিয়া দাঁড়াইয়া থাকার জন্য ভগবানকে একখানা ইট বাড়াইয়া দিলেন এবং স্বীয় সেবাকার্যে নিমগ্ন হইলেন। এই প্রসঙ্গে তুকারাম বড়ই কৌতুক পরিহাস করিয়া বলিয়াছেন:

"কেমন রে তুই পাগল প্রেমী। রেখেছিস্ দাঁড় করিয়ে বিঠ্‌ঠলকে। সাবাস্ তোর সাহসে, পেতে দিলি ইট বিঠ্‌ঠলকে।"

পুণ্ডলীক-আচরিত এই 'ও-সিদ্ধান্ত' ফলত্যাগ-যুক্তির (পথের) এক অঙ্গ। ফলত্যাগী পুরুষের কর্মসমাধি যেমন গভীর, তাহার বৃত্তিও তেমন ব্যাপক, উদার ও সমভাবাপন্ন। তাই সে বিবিধ তত্ত্বজ্ঞানের ঝামেলায় পড়ে না, আর নিজ সিদ্ধান্তও ছাড়ে না। 'নান্যদস্তীতি বাদিনঃ'—ইহাই, অপর কিছু নাই, এরূপ তর্ক সে তুলে না। ইহাও ঠিক আর উহাও ঠিক, কিন্তু আমার পক্ষে ত ইহাই ঠিক—এইরূপই তাহার বিনম্র দৃঢ় বৃত্তি। এক গৃহস্থ কোন এক সময়ে এক সাধুর কাছে গেল ও জিজ্ঞাসা করিল, "মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য ঘর-সংসার ছাড়া দরকার কি?" সাধু বলিলেন, "নয় ত, দেখ, জনকের মত ব্যক্তি রাজমহলে থেকেও মোক্ষলাভ করে গেছেন। তখন তোমার ঘর ছাড়ার আবশ্যকতা কোথায়?" পরে অপর একজন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "স্বামীজী, গৃহত্যাগ না করলেও মোক্ষলাভ হতে পারে কি?" সাধু বলিলেন, "কে বলেছে? ঘরদোর না ছেড়ে অমনি যদি মোক্ষ মিলত, তা হলে শুকের ন্যায় যাঁরা ঘর ছেড়েছিলেন তাঁরা কি মূর্খ ছিলেন?" পরে সেই দুই জনে দেখা হইলে মহা ঝগড়া বাধিয়া গেল। একজন বলিল, "সাধু ঘর-সংসার ছাড়তে বলেছেন।" অপর বলিল, "না, সাধু বলেছেন, ঘরদোর ছাড়ার দরকার নেই।" তাহারা তখন সাধুর কাছে গেল। সাধু বলিলেন—"দুইয়ের কথাই ঠিক। যার যেমন ভাব তার তেমন পথ। যার যেমন প্রশ্ন, উত্তরও তার তেমন। ঘর ছাড়া দরকার ইহা যেমন সত্য, আর ঘর ছাড়া নিষ্প্রয়োজন, ইহাও তেমন সত্য।" ইহাকেই বলে 'ও-সিদ্ধান্ত'।

পুণ্ডলীকের ফলত্যাগের উদাহরণ হইতে দেখা যায়, ফলত্যাগ কোন্ পর্যন্ত যাইতে পারে। ভগবান তুকারামকে যে প্রলোভনে ভুলাইতে চাহিয়াছিলেন, পুণ্ডলীকের কাছে উপস্থিত লোভ তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী আকর্ষণীয় ছিল। কিন্তু তাহাতেও তিনি মোহিত হইলেন না। হইতেন তো যাইতেন। অতএব সাধন একবার নিশ্চিত হইয়া গেলে শেষ পর্যন্ত তাহার আচরণ করা চাই। মাঝপথে ভগবৎ-দর্শনরূপ বাধা উপস্থিত হইলেও সাধন ছাড়িতে নাই। ভগবানের দর্শন আর যাইতেছে কোথায়? তাহা তো হাতের মুঠিতেই।

"সর্ব্বাত্মভাব মোর, আর কে নেবে কেড়ে!
তোমার ভক্তিরসে মন রাঙ্গিয়ে গেছে যবে।"

এই ভক্তিলাভের নিমিত্তই আমাদের জন্ম। 'মা তে সংগোঽস্ত্বকর্মণি' এই গীতাবচনের অর্থ নিষ্কাম কর্ম করিতে করিতে অকর্মের অর্থাৎ অন্তিম কর্মমুক্তির তথা মোক্ষের বাসনা পর্যন্ত ত্যাগ করা। এতদূরই ইহার অর্থ প্রসারিত। মোক্ষ মানে বাসনা হইতে মুক্তি। বাসনার কাছ হইতে মোক্ষের কি পাওয়ার আছে? ফলত্যাগ যখন এই স্তরে পৌঁছিয়া যায়, তখন জীবনকলা ষোল কলায় পূর্ণ হয়।

৬

শাস্ত্র পথ দেখাইয়াছে, কলা দিক নির্দেশ করিয়াছে। কিন্তু তাহাতেই গোটা চিত্র চোখের সামনে খাড়া হয় না। শাস্ত্র নির্গুণ। কলা সগুণ। কিন্তু সগুণও আকার ছাড়া ব্যক্ত হয় না। নিছক নির্গুণ যেমন শূন্যে থাকে, নিরাকার সগুণের অবস্থাও তদ্রূপ হইতে পারে। উপায় হইতেছে, যে গুণীতে গুণ মূর্তিমান হইয়াছে তাহার দর্শন। তাই তো অর্জুন বলিতেছেন, "হে ভগবান, আপনি মুখ্য মুখ্য সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন। সে সকল সিদ্ধান্ত কিরূপে আচরণ করতে হয় সেই কলার সন্ধানও দিয়েছেন, তথাপি এর সুস্পষ্ট চিত্র আমার কাছে ধরা পড়ছে না। অতএব এখন আমাকে এর উদাহরণ দিন। যাঁর বুদ্ধিতে সাংখ্যনিষ্ঠা স্থির হয়েছে এবং ফলত্যাগরূপ যোগ যাঁর প্রতি রোমকূপে পরিব্যাপ্ত, এরূপ পুরুষের লক্ষণ বলুন। যাঁদের স্থিতপ্রজ্ঞ বলে, ফলত্যাগের পূর্ণতা যাঁদের মধ্যে দৃষ্ট হয়, কর্ম-সমাধিতে যাঁরা মগ্ন এবং মহামেরুসদৃশ দৃঢ়নিশ্চয়, তাঁরা কি ভাবে বলেন, কি ভাবে বসেন, কি ভাবে চলেন সে সব আমাকে বলুন। তাঁর আকৃতি কিরূপ? তাঁকে

চেনার উপায় কি? ভগবন, সে সব বলুন।" তাই ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তিম অষ্টাদশ শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের গম্ভীর ও উদাত্ত চিত্র আঁকিয়াছেন। মনে হয় এই আঠার শ্লোকে গীতার আঠার অধ্যায়ের সারসংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। স্থিতপ্রজ্ঞ গীতার আদর্শ মূর্তি। এই শব্দটিও গীতার নিজস্ব। পরে পঞ্চম অধ্যায়ে জীবন্মুক্তের, দ্বাদশে ভক্তের, চতুর্দশে গুণাতীতের এবং অষ্টাদশে জ্ঞান-নিষ্ঠার এরূপ বর্ণনাই রহিয়াছে। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনা এসকল হইতে অধিক বিস্তৃত ও খোলাখুলিভাবে করা হইয়াছে। ইহাতে সিদ্ধ-লক্ষণের সহিত সাধক লক্ষণও বলা হইয়াছে। সহস্র সহস্র সত্যাগ্রহী, স্ত্রীপুরুষ সান্ধ্য প্রার্থনায় এই সব শ্লোক আবৃত্তি করিয়া থাকে। প্রতি গ্রামে, প্রতি ঘরে, ঐ সব যদি পৌঁছাইয়া দিতে পারা যাইত তবে তাহা কতই-না আনন্দের হইত! কিন্তু আগে তাহা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করা চাই। তখন আপনা-আপনি তাহা বাহিরে ছড়াইয়া পড়িবে। নিত্যপঠনায় যন্ত্রবৎ হইলে তাহা চিত্তে রেখাপাত তো করেই না, উল্টা লয় পায়। কিন্তু এই দোষ নিত্য পাঠের নহে, মনন না করার। নিত্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য-মনন ও নিত্য-আত্মনিরীক্ষণ দরকার।

স্থিতপ্রজ্ঞ বলিতে স্থিরবুদ্ধি লোক বুঝায়। নামেই তাহা সুস্পষ্ট। কিন্তু সংযম ব্যতীত বুদ্ধি স্থির হইবে কিরূপে? তাই স্থিতপ্রজ্ঞকে সংযমমূর্তি বলা হইয়াছে। বুদ্ধির তো আত্মনিষ্ঠ হইতেই হইবে, আর অন্তর ও বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলিকে বুদ্ধির অধীন হইতেই হইবে। ইহাই সংযমের অর্থ। ইন্দ্রিয়-সকলকে লাগাম দ্বারা বদ্ধ করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ কর্মযোগে জুড়িয়া দেন। ইন্দ্রিয়রূপী বলদ দ্বারা তিনি নিষ্কাম স্বধর্মাচরণের ক্ষেত সুন্দররূপে আবাদ করিয়া লন। প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস তিনি পরমার্থে ব্যয় করেন।

এই ইন্দ্রিয়-সংযম সহজ নহে। ইন্দ্রিয় হইতে একেবারে কাজ না লওয়া সহজ হইতে পারে। মৌন, নিরাহারাদি ব্যাপার কঠিন নহে। ইহার বিপরীত, ইন্দ্রিয়সমূহকে নিরঙ্কুশ ছাড়িয়া দেওয়া, সে তো যে কেহই পারে। কিন্তু কচ্ছপ যেমন ভয়ের ক্ষেত্রে নিজের সমস্ত অঙ্গ ভিতরে গুটাইয়া লয় এবং নিরাপদ স্থানে উহাদের কাছ হইতে কাজ আদায় করে, তদ্রূপ বিষয়ভোগ হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে গুটাইয়া লওয়া ও পরমার্থের কাজে উহাদের সমুচিত ব্যবহার করা—এই সংযম কঠিন। এই জন্য মহান্ প্রযত্ন আবশ্যক। জ্ঞানও চাই। তাহা হইলেও সব সময় যে উহা উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হইবে—তাহা নয়। তবে কি আশা ছাড়িব? হাল ছাড়িব? না, সাধকের কখনও নিরাশ হইতে নাই। সাধক নিজের সকল কর্মনৈপুণ্য কর্মে নিয়োগ করিবে। তাহা সত্ত্বেও যদি ত্রুটি থাকে তো ভক্তি জুড়িয়া দিবে। এই মহামূল্যবান নির্দেশ ভগবান স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে দিয়াছেন, দিয়াছেন তাহা অবশ্য গুটিকয়েক শব্দে। কিন্তু গাড়ীবোঝাই বক্তৃতা অপেক্ষা তাহা অধিক মূল্যবান। কারণ যেখানে ভক্তির অভ্রান্ত প্রয়োজন সেখানেই তাহা উপস্থিত করা হইয়াছে। স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণসমূহের বিস্তৃত বিবরণ আজ এখানে দেওয়ার নহে। কিন্তু আমাদের এই সাধনায় ভক্তির নিজস্ব স্থানের কথা পাছে আমরা ভুলিয়া যাই তাই তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেল। পূর্ণ স্থিতপ্রজ্ঞ এ জগতে কে হইয়াছিলেন তাহা এক ভগবানই জানেন। কিন্তু সেবাপরায়ণ স্থিতপ্রজ্ঞের দৃষ্টান্ত পুণ্ডলীকের মূর্তি সদা আমার চক্ষুর সামনে ভাসে, আর সে কথা আমি আপনাদের বলিয়াছিও।

এখানে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ পূর্ণ হইয়াছে। আর দ্বিতীয় অধ্যায়ও শেষ হইয়াছে।

রবিবার, ২৮।২।৩২

নীরব বিদায়

শ্রীদীনেশ চৌধুরী

যন্ত্রণাকাতর এক গোঙানিতে হঠাৎ আমার তন্দ্রার রেশ কেটে গেল। রোগীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করে সবে আয়েস করে হেলানো চেয়ারখানায় একটু গা এলিয়ে বসেছিলাম। মেজাজটাও তেমন ভাল ছিল না। সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় রোগীকে এটেণ্ড করার কর্তব্য অস্বীকার করবার নয় কিছুতেই। কিন্তু ডিসেম্বরের সেই হাড়-কাঁপানো শীতে, আর যে সে শীতে নয়, একেবারে খোদ আসামের পাহাড়িয়া চা-বাগান অঞ্চলের শীতের রাতে ঝাড়া দু'মাইল বাইক্ করে আসতে হলে কর্তব্যবোধটা একটু দোদুল্যমান হলে কর্তব্যেরই বা অপরাধ কোথায়!

কিন্তু দূত-বেটা কিছুতেই ছাড়বে না—পণ্ডিতবাবুর ব্যামার; দেবতার মত মানুষ, তাঁকে দেখতে যাবেন না—একি হতে পারে?

রাত তিনটের ঘুম-ভাঙানো মেজাজে, একটু তিক্ত গলায়ই বলেছিলাম—তোদের দেবতাকে নিয়ে তোরা থাকগে, দেবতা দেখবার আমার অত সখ নেই। রোগীর এমন কি বাড়াবাড়ি যে রাত দুপুরে এসে বাড়ী চড়াও করেছিস?

লোকটি হাত দুখানা জোড় করে মিনতিমাখা গলায় এবার বলে—দোহাই ডাক্তারসাব, বেশী বাড়াবাড়ি না হলে মাজি নিশ্চয় এ রাত-বেরাতে আমাকে পাঠাতেন না।

'মাজি'—কথাটার উল্লেখে মেজাজখানা কেমন যেন একটু নরম হয়ে এল। তবুও যথাসম্ভব বিরস গলায় বললাম—মাজি আমাকেই বা ডাকতে পাঠালেন কেন, সনৎবাবু ত আছেন, আর তিনি ত তোদের কাছেই থাকেন।

—কিন্তু, মাজি নিজে বললেন—ডাক্তারসাবকে নিয়ে আসবি।

মাজি নিজে বললেন—কথা ক'টি একটু স্বগতোক্তির মত উচ্চারণ করতে গিয়ে কি ভেবে যেন থেমে গেলাম।

লোকটি কাতর চোখে তখনও দাঁড়িয়ে। তাই অগত্যা বেরুতেই হ'ল।···

মাসখানেক হ'ল এ চা-বাগানে ডাক্তারি নিয়ে এসেছি। বছর দু'তিন কলকাতার হাসপাতালে স্বল্প মাহিনায় 'হাউস সার্জেনের' শিক্ষানবিশী করে হঠাৎ সৌভাগ্যলক্ষ্মীর এক ঝিলিক মুখের হাসি দেখে সত্যি আনন্দে ভরে উঠেছিল মন। আর যাই হোক, মাইনে ত মোটের উপর কম নয়! কিন্তু দিনকয়েকের মধ্যেই ঐ খবরটা বন্ধুমহলে ঘোষিত হতে না হতেই ব্যাপারটাকে একেবারে ভয়ঙ্কর করে তুলল তারা।

দ্বিধাহীন ভাবে তারা সবাই একমত হয়ে বলে—বাবা, কাছাড়ের জঙ্গল; যে-সে জায়গা নয়। ডাক্তারি আর তোমাকে করতে হবে না ওখানে। একবার ম্যালেরিয়ায় ধরলে তোমার নিজের ডাক্তারি বিদ্যে নিজের উপরই চালাতে হবে পুরোপুরি। তার পর যখন প্রাণটা গলা অবধি এসে···

আমি একটু বিরক্তির ভাব দেখিয়ে বাধা দিয়ে বলেছিলাম—

—যা যা, তোরা শুধু বাজে বকিস। নিজেরা ত হাসপাতালে বসে ভেরেণ্ডা ভাজছিস, তাই আমার একটু ভাল দেখে তোদের যত মাথাব্যাথা আর কি।

বুঝতে পেরে, কথা ক'টি বলে নিজের মনকেই প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেছিলাম। তাই কলকাতা ছেড়ে আসার সময় নিজের মনটাকে শঙ্কামুক্ত করে আসতে পারি নি।

তার পর দিনকয়েক কাটল চা-বাগানে নিরুপদ্রবেই। লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানলাম জায়গাটাতে ম্যালেরিয়া নেই। কিন্তু এই মাসখানেকের মধ্যেই প্রাণ প্রায় কণ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল আর এক কারণে।

কলকাতায় ট্রাম-বাস-ফুটপাতে জনারণ্য। আর এখানে শুধু সবুজ আর সবুজ—সবুজের প্রশান্তি। দৃষ্টি প্রসারিত করলেই চোখে পড়ে টিলার পর টিলা—মাঝারি উচ্চতার চা-গাছে স্তরে স্তরে সজ্জিত। তার মধ্যে অবিমিশ্র শ্যামল আভা, যেন সবুজের প্লাবন। প্রথম দেখায় প্রাণ মাতিয়ে তোলে। কলকাতায় অভ্যস্ত জীবনে মনে হয় এ যেন সবুজের সাগরে ঝাঁপ দেওয়া।

কিন্তু দিনকয়েকের মধ্যেই সে উচ্ছ্বাস হয়ে আসে মন্দীভূত। এখানে সবুজের শোভার গভীরতা যত বেশী, সামাজিকতার অভাবটা ততোধিক। চা-বাগানের কুলী-মজুরদের দেহের কুচকুচে কালো রঙও যেন দেখতে পাই সেই সবুজ—দীর্ঘ দিনের জীবন-যাত্রায় মিশে এক হয়ে গেছে তারা প্রকৃতির সঙ্গে।

তাই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছিল বিরাট একাকিত্বে—পাশাপাশি আকুলভাবে খুঁজছিল একটু সামাজিক শীতলতা, একটু মাধুর্য্য।

আঁকাবাঁকা অসমতল পথ দিয়ে বাইকে আসতে আসতে তাই ভাবছিলাম সেই অদেখা 'মাজি'র সম্বন্ধে। কি জানি দেখতে কেমন, বয়সই বা কত। চা-বাগানের অভ্যস্ত জীবনের একটু ব্যতিক্রমও হয়ত হতে পারে এক্ষেত্রে। ঘোমটার আড়ালে লুকিয়ে না থেকে সহজ ভাষায়, নিঃসঙ্কোচ ভঙ্গীতে হয়ত রোগীর সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কথা বলবেন আমার সঙ্গে, মিনতিমাখা চোখে চাইবেন আমার সাধ্যায়ত্ত সহায়তা।···

রোগী অস্ফুট গলায় গোঙিয়ে উঠল। এবার মাথাটা তুলে একটু সোজা হয়ে বসলাম চেয়ারে, তার পর চোখ ঘুরিয়ে তাকালাম রোগীর মুখের পানে। লণ্ঠনের অস্বচ্ছ আলো সেই কোটরগত চোখে খানিকটা অন্ধকার জমাট করে তুলেছে। তার

পাশেই ছোট বেতের চেয়ারখানার উপর চোখ পড়ল। মুহূর্ত্তকয়েক যেন আমি বিস্ময় স্তব্ধ হয়ে রইলাম। এ কি পটের চিত্রিত রূপ, না জীবিত মানবীয় সত্তা! একটু যেন সন্দেহ দোলা দিতে চায় মনকে।

ফুটন্ত পদ্ম-কোরকের মত উন্মুক্ত বাহুলতার উপর মাথা ঈষৎ ঢলে পড়েছে। সুডোল গ্রীবায় সরু সোনার চেন্ সেই স্বল্পালোকেও চক্ চক্ করছে। গুটি কয়েক চূর্ণকুন্তল এসে লীলায়িত ভঙ্গিমায় ভেঙে পড়েছে কপালে, চোখে, কানের উপর। বুকের বসন ঈষৎ অবিন্যস্ত। ফুটন্ত যৌবন-আভা সর্ব্বাঙ্গে, যেন রূপের তরঙ্গায়িত সত্তা। আমার ডাক্তারি চোখও বিস্ময়ে বিমোহিত হয়ে রইল মুহূর্ত্তকয়েক।

পরক্ষণেই সচকিত হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। কিন্তু কি করব ঠিক ভেবে উঠতে পারছিলাম না। রোগীর পাশেও যাবার কোন উপায় নেই, যদি হঠাৎ জেগে উঠেন মহিলাটি, লজ্জায় হয়ত আড়ষ্ট হয়ে উঠবেন সঙ্গে সঙ্গে। অথচ জাগিয়ে দেওয়াটাও ঠিক উচিত হবে না। সারারাতের শুশ্রূষার শ্রান্তিতে হয়ত আপনাতেই চোখ ঢলে পড়েছে। সেই অবস্থায়...

আমার চেয়ারের অনতিদূরেই মেঝের উপর দেয়ালের প্রায় গা-ঘেঁসে অঘোরে ঘুমুচ্ছে রঘুয়া। ভাবলাম তাকে ডাকি, কিন্তু সে সাড়ায়ও ত উনি জেগে উঠতে পারেন। মুহূর্ত্তখানেক ভেবে উঠে দাঁড়ালাম। তার পর ধীর পদে এগিয়ে গিয়ে সদর দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় পা দিলাম।

ভোর হয়ে এসেছে। কিন্তু চার দিক কেমন যেন প্রায়ান্ধকার হয়ে আছে কুয়াসার নিবিড় স্তরে। একটা সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করলাম বারকয়েক বারান্দার উপর।

'কনট্রাষ্ট' যে এত হৃদয়-বিদারক হতে পারে এর আগে আমি কল্পনাও করতে পারি নি। পৃথিবীর সকল রূপবানকে নির্ম্মম এক বিদ্রূপের কশাঘাত দেবার জন্তেই যেন এ অপূর্ব্ব মিলন ঘটিয়েছে কোন এক অদৃশ্য হাত। রঘুয়ার 'দেবতা'কে দেখে এক ঝলক বাঁকা হাসি আপনা থেকেই ফুটে উঠতে চেয়েছিল ঠোঁটের কোণে। কিন্তু অবস্থাবিশেষ করে দিয়েছিল সচেতন। দীর্ঘ দিন রোগে ভুগছে এমন অনেক রোগী দেখেছি এর আগে। কোটরগত চোখ, চোয়াল ছুটি বেরিয়ে আছে অতি প্রাধান্য নিয়ে; দেহে মাংসের লেশমাত্র নেই, শুধু চামড়াখানা হাড়ের উপর আবরণ তৈরি করে আছে কোনও উপায়ে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ ভাবে আলাদা। দীর্ঘ দিনের রোগাক্রান্ত রোগী এ নয়। তা ছাড়া দেহাবয়বেও তেমন বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন আসে নি। চোখ ছুটো শুধু খানিকটা কোটরে প্রবিষ্ট। দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, স্বাভাবিক অবস্থার একটু ব্যতিক্রম হয়েছে মাত্র, রোগ আক্রমণের হেতুস্বরূপ। কিন্তু এ মুখ-ছবি ক্ষণিকের জন্তে আমার কল্পনার চোখ ছুটোকে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল অন্ত এক জগতে—জনপদ, নদী-পর্ব্বত-উপত্যকার 'পরে বিচিত্র রূপে তার স্থিতি। সেখানে চলেছে ভাঙাগড়ার মহা-যজ্ঞ। গড়ে উঠছে নূতন মানুষ, নূতন পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব নিয়ে—পাশাপাশি তেমনি চলেছে ভাঙনের তীব্র স্রোত; পুরনো, জীর্ণ যা-সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, ভেঙে পড়ছে দুর্ব্বলেরা, হয় বিধাতাকে নয় ভাগ্যকে করুণ অভিযোগ জানিয়ে। সেই কলকাতা! বছর-আটেক আগেকার ট্রামের সেই বিশেষ ঘর্ঘর ধ্বনি আজ আবার কেন নূতন করে শুনতে পাচ্ছি?

—ডাক্তারসাব, মাজি আপনাকে একটু ভেতরে যেতে বলছেন—রঘুয়া চোখে হাত ঘষতে ঘষতে আমার অনতিদূরে এসে দাড়াল।

সচেতন হয়ে উঠলাম। লক্ষ্য করি নি, ততক্ষণে কুয়াশা সম্পূর্ণ-রূপে কেটে গিয়ে কয়েক ফালি অনুজ্জ্বল রোদ দেখা দিয়েছে বারান্দায়—পূর্বদিকের শিরিষ গাছটার নীচে, সবুজ ঘাসের উপর।

ধীর পদক্ষেপে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

এরই মধ্যে ঘরের সবক'টি জানালা খুলে দেওয়া হয়েছে। গত রাতের ঈষৎ আলোকিত ঘর যেন প্রাণবন্ত রূপে চোখে পড়ল আমার। রোগীর খাটের পাশে চেয়ারখানা তখনও আছে সে অবস্থায়, তবে একটু সরিয়ে নিয়ে শিয়রের কাছ ঘেঁষে বসেছেন এবার মহিলাটি। মাথার ঘোমটা কিঞ্চিৎ বিলম্বিত। এক পলক তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছা হ'ল—মুখে কোন সলজ্জ রক্তিম আভা ফুটে উঠেছে কিনা। তাপ দেখার জন্তে থার্ম্মোমিটার এরই মধ্যে দিয়ে রেখে ছিলেন তিনি। তুলে ভাল করে দেখে নিয়ে রঘুয়ার হাতে দিয়ে ইঙ্গিতে আমাকে দেখাতে বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, তার পর আস্তে আস্তে অনতিদূরে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

থার্ম্মোমিটার হাতে নিয়ে দেখলাম জ্বর কমেছে অনেকটা। তার পর কাছে গিয়ে যথারীতি রোগীকে পরীক্ষা করে ব্যবস্থাপত্র আবার লিখে দিয়ে রঘুয়াকে জানালাম ভয়ের কোন কারণ নেই, জ্বর কমেছে। বিকেলে আবার আমি আসব। তবে এরই মধ্যে তাপ তেমন বাড়লে আমাকে খবর পাঠালেই আমি আসব।

পা বাড়াবার আগে তাকিয়ে দেখি মহিলাটি তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে আছেন জানালার পাশে। তবে তার স্থির চোখের দৃষ্টি আমার পানে নয়, রোগীর মুখের উপর।

শীতের বিকাল। বেলা প্রায় পাঁচটা হবে। দিনের ঔজ্জ্বল্য কমে আসছে ক্রমে। আর দেরি করা উচিত নয় মনে করে বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রোগী দেখতে যাওয়ায় যে একটা আনন্দ-বোধ থাকতে পারে, আমার অবস্থায় পড়লে যে কেউ তা স্বীকার করবেন। পণ্ডিতবাবুর মত দেবতুল্য লোককে দেখতে যেতে আনন্দ হবে সে ত নিশ্চিতই!

সোনাছড়ার উপরকার ব্রীজটার কাছে এসে নামতে হ'ল বাইক থেকে। কল কল ছল ছল ধ্বনি করে বয়ে যাচ্ছে সোনাছড়ার স্বচ্ছ জলধারা। ডান পাশে একবার তাকিয়ে দেখলাম, জলধারার ছু'ধারের শুভ্র বালির উপর সূর্য্যের বিদায়ী আভা সত্যি চকচকে সোনালী রঙ ছড়িয়েছে। কেন জানি মনে হ'ল, সোনাছড়ার এ

সময়কার রূপ দেখেই হয়ত যোগ্য নামে বিভূষিত করা হয়েছে তাকে। আর এ নামের মর্য্যাদা দেবার জন্যেই বাগানের নামও দেওয়া হয়েছে 'সোনাছড়া'। সোনাছড়ার পণ্ডিতবাবু, মাজি; সৌন্দর্য্যে সত্তায় বহুগুণে মহনীয় হয়ে উঠেছে আমার কাছে এ ছোট্ট ফাঁড়ি বাগান। বাগানের বাবুরা বলেন, 'আউটগার্ডেন'; মাতুলীছড়ার ফাঁড়ি বাগান। কথার সুরে হয়ত বা থাকে কিছু অবহেলার আমেজ। কারণ এতে কলঘর নেই, নেই কলের ঘর্ঘর ধ্বনি, কর্ম্মরত শ্রমিকদের ব্যস্ততা, কোলাহল। কিন্তু তবুও সোনাছড়ার একটা বিশিষ্ট সত্তা আছে। চার-পাঁচটি বাগানের মধ্যে একমাত্র সোনাছড়াতেই আছে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ—'সোনাছড়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়', আর আছেন তার অন্যতম শিক্ষক পণ্ডিতবাবু।

ব্রীজটা পেরিয়ে এবার একটু দ্রুতগতিতে বাইক চালালাম।

আমাদের সদানন্দ আজ পণ্ডিতবাবু। একটু বিস্ময় ঠেকে বৈ কি। কিন্তু সদানন্দ আজ ভাগ্যবান। শ্রদ্ধায় ভালবাসায় তার জীবন আজ সার্থক। চা-বাগানের শ্রমিকদের কাছেও সে দেবতুল্য।

প্রথম দেখায়ই তার সে চেহারাখানা চকিতে উঁকি দিয়েছিল দীর্ঘদিনের সঞ্চিত স্মৃতির কুহেলী ভেদ করে। কিন্তু তখনও স্পষ্ট করে দেখতে পাই নি, খুঁজে বের করতে পারি নি তার প্রকৃত পরিচয়। তার অবকাশও হয় নি তখন, তা ছাড়া দীর্ঘ আট-নয় বছরের ব্যবধানের প্রাচীর। তারপর আজ খবর নিয়ে বুঝতে পারলাম আমার স্মৃতি-মন্থন ব্যর্থ হয় নি, আমাদের সদানন্দই।

দৃষ্টি আবার প্রসারিত হয়ে ছুটে চলে অদম্য গতিতে। হাঁ, কলকাতায়, যেন স্পষ্ট চোখে পড়ে সার্কুলার রোড থেকে একটা সরু গলি গিয়ে শেষ হয়েছে অপ্রশস্ত এক সবুজ মাঠে, ওরই পশ্চিম অংশে মাথা উঁচিয়ে আছে একখানা তেতলা বাড়ী। আমাদের হোষ্টেল, দীর্ঘ কলেজ জীবনের আবাসস্থল। দক্ষিণ কোণের সেই চার নম্বর ঘরে থাকত সদানন্দ। কিন্তু সদানন্দ বেশী দিন থাকে নি, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সে চলে যায় হোষ্টেল ছেড়ে, শুধু হোষ্টেল নয়, সেইসঙ্গে কলকাতাও। কিন্তু পিছনে রেখে যায় একটা করুণ স্মৃতি। আজ যেন আবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তার অশ্রুভারাক্রান্ত সে মুখখানা।...

রাস্তার মোড় ঘুরেই এক ফালি প্রশস্ত উঁচু জায়গা, তার উপর পণ্ডিতবাবুর বাড়ী। বাইক নিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি রঘুয়া বারান্দার উপর দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। আমাকে দেখতে পেয়েই সে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল।

বাইকখানা আমার হাত থেকে নিয়ে বারান্দায় তুলতে গিয়ে সে বলল, আপনার জন্যেই বসে আছি ডাক্তারসাব সেই বিকেলতক। মাজি আমাকে হেথা বসিয়ে রেখেছেন।

আমি মৃদু হেসে বললাম, তাই নাকি।

উৎসাহ পেয়ে রঘুয়া এবার যেন খুব একটা আনন্দের খবর জানাচ্ছে তেমন ভাব দেখিয়ে বলে, জানেন ডাক্তারসাব, মাজি আমাকে কি বলেছেন আজ সকালবেলা। আপনি চা-টা কিছু না খেয়ে চলে গেলেন সেই সকালে। কিন্তু আমার ত খেয়াল ছিল না কিনা মাজিকে মনে করিয়ে দিতে···

—রঘুয়া, রঘুয়া—নারীকণ্ঠের আহ্বান এল, একটু যেন তীব্র গলার। মুহূর্তে রঘুয়ার মুখের হাসিখুশী ঈষৎ ম্লান হয়ে এল।

—মাজি ডাকছেন ডাক্তারসাব, বলেই আমাকে ভেতরে নিয়ে যাবার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে সে ছুট দিল।

মিনিট দুয়েক পরেই আবার সে এল একেবারে হন্তদন্ত হয়ে—কি সর্ব্বনাশ, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন ডাক্তারসাব; আসুন, ভেতরে আসুন।

ভিতরে গেলাম। বসবার ঘরখানা পেরিয়ে একফালি সরু বারান্দা, বাঁ-পাশে শোবার ঘর। আলো জ্বালা হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে। দোরগোড়ায় যেতেই বিস্ময়ের সঙ্গে শুনলাম নারীকণ্ঠের আহ্বান—আসুন ডাক্তারবাবু, ভেতরে আসুন।

উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন সে মহিলাটি রঘুয়ার মাজি। আমার কানে যেন মধুর ঝঙ্কার গিয়ে প্রবেশ করল।

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি দোরের এক পাশে দাঁড়িয়ে। মাথার ঘোমটা আর তেমন বিলম্বিত নয়, চোখে মুখেও নেই সে শ্রান্তির ছাপ। লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল আলোতেও ফুটে উঠেছিল সে সুন্দর মুখের এক পরম দীপ্তি।

চোখ নামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছেন উনি?

সহজ গলায় তিনি বললেন, তাপ আর নেই এখন। আপনি 'ইনজেকশন' দেবার পর থেকেই জ্বর নেমে গিয়েছে।

আমি ততক্ষণে রোগীর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। রোগী তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে। তাই আলগোছে কপালে হাত দিয়ে তাপটা দেখলাম, তেমনি ভাবে 'পালস'টাও একটু দেখে নিলাম। সত্যি ডাক্তারবাবু, আপনাকে কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাব—আমি ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি এতটা কষ্ট স্বীকার না করলে কি যে হ'ত কে জানে।

তাকিয়ে দেখলাম, হাঁ কৃতজ্ঞতা বৈ কি, মুখে স্পষ্ট কৃতজ্ঞতার ছাপ।

আমিও ডাক্তারি কায়দায় বললাম, এ আপনি শুধু শুধু বলছেন। আমাদের কর্ত্তব্যই তো হচ্ছে রোগীর যন্ত্রণা লাঘব করে দেওয়া। বলার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে একটু হাসিও পেল। রঘুয়া প্রথম আমাকে ডাকতে যাবার সময়ে আমার কর্ত্তব্যবোধটা যদি একবার পরখ করে দেখার সুযোগ পেতেন মহিলাটি!

সদানন্দের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় এবারেও হয়ে উঠল না। গত রাত্রে জ্বরের ঘোরে বারকয়েকই তাকিয়েছে আমার মুখের পানে। কিন্তু সে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে মোটেই সম্ভব ছিল না দীর্ঘদিনের বিস্মৃতি ভেদ করা।

ভেবেছিলাম, আজ অতর্কিতে উন্মোচিত হয়ে উঠবে আমাদের

পুরনো দিনগুলি; একটা গোটা অধ্যায় এসে নিবিড়ভাবে দাঁড়াবে সদানন্দের সুদূরপ্রসারিত দৃষ্টির সামনে, রংস্বপন হয়ে উঠবে তার ছোট চোখ দুটি। আর রঘুয়ার মাজি···

—ওষুধ কি বদলে দেবেন ডাক্তারবাবু?

সহজভাবে জানালাম, না আগের মতই চলবে।

ক্ষণকাল কি ভেবে নিয়ে এবার বললেন তিনি আপনি একটু বসুন চেয়ারটায়, বলেই দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

মিনিটকয়েক পর রঘুয়া একটা রেকাবীতে করে কিছু খাবার আর এক কাপ চা নিয়ে এসে ছোট্ট টি-পয়ের উপর রেখে আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে বিনীত হাসি নিয়ে বলল আপনি খান ডাক্তারসাব, মাজি বলে দিলেন।

মিনিটকয়েকের মধ্যেই চা-টা খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু একটু বিস্মিত না হয়ে পারলাম না, উনি সেই যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, তারপর আর তাঁর দেখা নেই। একবার ভাবলাম রঘুয়াকে জিজ্ঞেস করি। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হ'ল, হয়ত যুক্তিযুক্ত হবে না। তাই রঘুয়াকে বললাম, আমি চলে যাচ্ছি এ খবরটা যেন তার মাজিকে জানায়।

সেদিন রবিবার।

হপ্তাতেক পর আবার সোনাছড়ায় আসতে হ'ল। তবে পণ্ডিতবাবুর বাড়ী নয়, বাগানের হেডক্লার্কের খবর পেয়ে তার ছোট ছেলের চিকিৎসা-ব্যাপারে। সকাল প্রায় সাড়ে আটটা হবে। বড়বাবুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছিলাম।

আসামের বাগান। ওখানকার বাবুদের প্রায় প্রত্যেকের বাড়ীই এক একটা টিলার উপর। প্রশস্ত উঁচু ঢিপি, ওখানকার লোকেরা বলে টিলা। বাংলো প্যাটার্নের ছোট আকারের খড়ের চাল দেওয়া বাড়ী। এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ী স্পষ্ট চোখে পড়লেও দূরত্ব একেবারে কম নয়, নিদেন পক্ষে দেড়'শ দু'শ গজ। টিলাগুলির নীচ দিয়ে সর্পিল গতিতে রাস্তা চলে গেছে মাদুলীছড়ার দিকে। আর প্রত্যেক টিলা থেকেই এক একটা অপ্রশস্ত রাস্তা ঢালু পথে একটু পাক খেয়ে গিয়ে মিশেছে সেই রাস্তায়।

বাইকখানা হাতে নেমে আসছিলাম। একটা প্রবল ইচ্ছা হচ্ছিল পণ্ডিতবাবুর বাড়ী থেকে একটু ঘুরে যাই। টাইফয়েড রোগী, সুস্থ হয়ে উঠলেও ত ডাক্তার হিসেবে আমার কর্তব্য একবার দেখে যাওয়া। তা ছাড়া সদানন্দের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত ভাবে পরিচিত হবার আকর্ষণ, সেও কম ছিল না। পরমুহূর্তেই মনে হ'ল—কিন্তু সেদিনের পর একবারও ত খবর পাঠানো হয় নি আমাকে। অথচ আমি প্রতিদিনই প্রত্যাশা করেছি, রঘুয়া হয়ত হঠাৎ গিয়ে দাঁড়াবে বিনীতভাবে—মাজি পাঠালেন ডাক্তারসাব। কিন্তু সে দূরের কথা, কোন খবরই এর পর থেকে পাই নি। দু'একদিন ভেবেছি, নিজে থেকেই যাই একবার; আবার তখনি মনে হয়েছে, অযাচিতভাবে গেলে তেমন কিছু যদি ভাবেন রঘুয়ার মাজি! একটু অন্যমনস্কভাবে মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম একবার। পণ্ডিতবাবুর বাড়ীর পূবদিকের দেয়ালটা রোদের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, জানালার নীল রঙের পর্দাগুলো ক্ষণে ক্ষণে দুলে উঠছে হাওয়ার পরশ পেয়ে। একটু অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি এবার জেগে উঠল, পর্দার ফাঁকে কোন কাজল-কালো চোখের এক ঝলক চাহনি যদি থেকে থাকে।

হঠাৎ চোখে পড়ল, একটা লোক পায়ে চলা পথটি ছেড়ে পণ্ডিতবাবুর বাড়ীর দিক থেকে টিলার ঢালু গা বেয়ে সোজা আমার দিকে ছুটে আসছে, আর হাত নেড়ে কি ইঙ্গিত করছে। একটু পরেই বুঝতে পারলাম, লোকটি আর কেউ নয় শ্রীমান রঘুয়া, হাতে একখানা সাদা কাগজের টুকরো, হয়ত চিঠি।

রঘুয়া হাঁপাতে হাঁপাতে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

চিঠি আছে ডাক্তারসাব, মাজি দিলেন। বলেই হাতের মুঠোতে কুঁচকে যাওয়া এক টুকরো কাগজ আমার হাতে দিলে।

চিঠিখানার উপর চোখ পড়তেই বিস্ময় ও আনন্দ দুইই অনুভব করলাম একসঙ্গে। রঘুয়ার মাজি লিখেছেন মাত্র দু'তিনটি কথা; রাবীন্দ্রিক ছাঁদের একটু মেয়েলি ধাঁচের সুন্দর হস্তাক্ষর:

ডাক্তারবাবু,

দয়া করে একবার আমাদের বাড়ী হয়ে যাবেন। ইতি

'মীরা'

নামের নীচে 'ব্র্যাকেটে' লিখে দেওয়া আছে মিসেস সদানন্দ দত্ত। কাগজখানার পানে তাকিয়ে রয়েছিলাম মুহূর্তকয়েক। রঘুয়ার কথায় সচকিত হয়ে উঠলাম।

—গাড়ীখানা দিন ডাক্তারসাব, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

সংক্ষেপে বললাম, আচ্ছা চল।

বাইরের বারান্দাটুকু পেরিয়ে আমি বসবার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। রঘুয়া বাইকখানা দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে এসে বললে—মাজি ভেতরে আছেন, চলুন।

ভেতরের বারান্দায় পা দিয়ে দেখলাম, মীরা দেবী অদূরে একখানা চেয়ারের পিছন দিকে হাত দু'খানা ন্যস্ত রেখে দোরের পানে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখেই স্মিত হেসে আপ্যায়ন করলেন, আসুন ডাক্তারবাবু, বসুন এসে চেয়ারটায়।—তারপর একটু সরে দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন, ডাক্তারদের না ডাকলে ভুলেও একবার এসে পা দেন না গরীবের বাড়ী।

আমি এ কথার কোন জবাব না দিয়ে মৃদু হেসে বললাম, তারপর, উনি কোথায়?

—যাবেন আর কোথায়, নিশ্চয়ই কোন শিষ্য-শিষ্যার বাড়ী। জানেন ত পণ্ডিতবাবু দেবতুল্য লোক। ঢের শিষ্য আছে তাঁর এ অঞ্চলে। শিষ্যাও আছেন দু'একজন।

আমি হেসে বললাম, বড় সুসংবাদ তো। আপনার তো তা

হলে মহা গৌরবের ব্যাপার !—আমার চেয়ারের অদূরেই একটা বেতের মোড়া নিয়ে ততক্ষণে বসেছেন মীরা দেবী।

আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে কি একটু ভেবে এবার আমার মুখের উপর চোখ রেখে বললেন, আপনি এখানে একা থাকেন, না ডাক্তারবাবু ?

সংক্ষেপে জানালাম, হাঁ।

তারপর কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে রইলেন বারান্দার নীচেকার প্রশস্ত উঠোনটার উপর।

—আচ্ছা ডাক্তারবাবু, বাড়ীতে আপনার কে কে আছেন ?

মুখ তুলে তাকালাম সে সপ্রশ্ন চোখের পানে ; ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না এ প্রশ্ন কেন। হয়ত নারীর স্বাভাবিক কৌতূহল, জানার একটু আগ্রহ, আমার এ একাকিত্বের হেতু কি। চোখ নামিয়ে স্বাভাবিক গলায় বললাম, দেশের বাড়ীতে ঠিক কেউ আছেন বলা যায় না। বাবা থাকেন কাশীতে ; পেন্সন নেবার পর থেকেই আছেন ওখানে। মাকে হারিয়েছি ছোটবেলায়। আর বোনটিরও বিয়ে হয়ে গেছে বছরতিনেক আগে। তাই থাকার মধ্যে আছেন শুধু বাবাই।

ব্যগ্র হয়ে শুনছিলেন মীরা দেবী। আমার কথা শেষ হতে না হতেই তিনি বলে উঠলেন, আর কেউ···

পরমুহূর্তেই কথাটা অসমাপ্ত রেখে থেমে গেলেন। তারপর ত্রস্তভাবে কথার মোড় ঘোরাতে গিয়ে বললেন, আপনি কলকাতায় পড়াশুনো করেছেন, না ?

আমি স্মিত হেসে জানালাম, হাঁ।

তারপর চকিতে হঠাৎ তিনি মোড়া থেকে উঠে দাঁড়ালেন, বসুন আপনি, পালাবেন না যেন—বলেই ত্বরিতপদে বারান্দা পেরিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

মিনিটকয়েক বসে রইলাম নীরবে। উঠানের উত্তর কোণের নিমগাছটার পাতার ফাঁক দিয়ে শীতের মিষ্টি রোদ এসে ছড়িয়ে পড়েছে সবুজ ঘাসের উপর। সে জায়গা থেকে বারান্দার দক্ষিণ-কোণ অবধি কয়েক সারি ফুলের গাছ। বেশীর ভাগই 'সিজনড্ ফ্লাওয়ার'। তার শিশির-ভেজা পাপড়ি থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে বিভিন্ন রঙের ছটা।

দোরগোড়ায় হঠাৎ চোখ পড়ল। আনন্দের সঙ্গে দেখলাম, হাঁ সদানন্দ। নিজের অজ্ঞাতেই একটু নড়ে-চড়ে বসলাম। সদানন্দ এগিয়ে এসে পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে তাকাল মুহূর্তকয়েক, তারপর চকিতে তার ছোট চোখ দুটিতে ঘনিয়ে এল অপার বিস্ময়, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না তার চোখ দুটিকে। অস্ফুটে দুটি কথা বেরিয়ে গেল তার মুখ থেকে।

—আমাদের তাপস না ?

আমি স্মিত হেসে মাথা নাড়লাম।

একটা আনন্দের ধারা খেলে গেল তার সারা মুখে-চোখে। আমার পাশেরই চেয়ারখানা একটু এগিয়ে এনে বসে বলল, তারপর খবর কি বল ত ? আমি ত চিনতেই পারি নি। কতদিন পর দেখা ; বছর সাত-আট হয়ে যাবে হয়ত। একটা যুগ প্রায় শেষ হতে চলেছে।

আমি হেসে বললাম, খবর আর কি, মাসদুয়েক হ'ল ডাক্তার হয়ে এসেছি এ অঞ্চলে।

—তাই নাকি, মাতুলীছড়ায় তা হলে ? বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকাল সদানন্দ ;—অথচ আমিই জানি না !

—জানবে কি করে, তুমি ত আছ তোমার বইপত্র আর ছাত্র-দের নিয়ে। তোমার চিকিৎসাটা কে করল সে খবরটা একবার জেনেছ ?

আমরা দু'জনেই মুখ ঘুরিয়ে তাকালাম। মীরা দেবী এক হাতে ধোঁয়াটে চায়ের কাপ, অন্য হাতে খাবারের প্লেট নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। সদানন্দ উঠে গিয়ে টি-পয়টা আমার সামনে এনে রাখল। তারপর নিজের আসনে বসে এবার স্ত্রীর মুখের পানে তাকিয়ে বলল, কিন্তু ডাক্তারটি কে সে খবরটা তুমি কিছু রাখ ? আমার অনেক দিনকার বন্ধু ডাঃ তাপস রায়।

তারপর হাসিমুখে আমার পানে তাকিয়ে সে বলল, পরের উপাধিগুলো আর লাগালাম না ভাই। জানি না ত ঠিক, বি-এসসির পর আর কি কি লাগিয়েছিস !

মীরা দেবী বললেন এবার, তোমার এ খবরটা কিন্তু অনেকটা আমি আন্দাজ করে নিয়েছিলাম।

—আন্দাজ, সে কি ? জলজ্যান্ত একটা অচেনা লোককে তুমি আন্দাজে ধরে নিলে ?

—বাঃ রে, তুমিই ত একদিন বলেছিলে, তোমার এক বন্ধু ডাক্তারি পড়তেন কলকাতায়, এদ্দিনে নিশ্চয় ডাক্তার হয়ে গেছেন। তারপর তাঁর চেহারার যে বর্ণনা দিলে তাতে সেদিন তাঁকে দেখে আন্দাজ করাটা কি আর অসম্ভব কাজ হয়েছে ! তা ছাড়া আমি আগেই শুনেছিলাম কলকাতা থেকে একজন নূতন ডাক্তার এসেছেন মাতুলীছড়ায়।

এবার সম্মতির-জন্য আমার পানে তাকিয়ে তিনি বললেন, আচ্ছা, আপনিই বলুন ডাক্তারবাবু, আন্দাজ করাটা কি অযৌক্তিক হয়েছে ?

আমি কৌতুকবোধ করছিলাম উভয়ের এ বাগ্‌বিতণ্ডায়। এবার মৃদু হেসে বললাম, না, অযৌক্তিক মোটেই হয় নি। তবে, এতে আপনার কৃতিত্ব আছে যথেষ্ট, এটা সদানন্দ কেন যে কেউ স্বীকার করবে।

হঠাৎ চায়ের কাপের পানে নজর পড়ল মীরা দেবীর—এই যা, চা-টা ঠাণ্ডা হতে চলেছে। আর কথা নয়, এবার চুপ করে হাত লাগান দিকি নি। আমি আর এক কাপ নিয়ে আসছি আপনার বন্ধুর জন্যে। ত্বরিতপদে এগিয়ে গেলেন মীরা দেবী।

দীর্ঘদিন পর অপ্রত্যাশিত দেখা। এতদিনকার সঞ্চিত কথার ধারায় হয়ত বান ডেকে উঠেছে। সদানন্দের মুখের ভাব

দেখে মনে হ'ল, অনেকগুলো কথা এসে জড়ো হয়ে উঠেছে তার ওষ্ঠাগ্রে। কিন্তু কাকে মুক্তি দেবে আগে ঠিক করে উঠতে পারছে না। তাই কথার খেই হারিয়ে শুধু মামুলি প্রশ্ন করে গেল গুটি-কয়েক—কলকাতা ছেড়েছি কবে, ডাক্তারি পাস করলাম কোন্ সালে, হোষ্টেলটা কেমন চলছে কি জানি; তারপর এখানকার জায়গাটা লাগছে কেমন, বাবার শরীর কেমন আছে; বিয়ে-থাই বা করছি না কেন এ বয়সেও···ইত্যাদি।

একে একে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে গেলাম। প্রায় প্রতি মুহূর্তেই তটস্থ হয়ে ছিলাম একটি প্রশ্নের আশঙ্কায়। কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে করে বসবে, সঙ্গে সঙ্গে এ সূর্যাকরোজ্জ্বল সকালটাও হয়ে উঠবে বিষাদঘন। সহসা ভিড় করে দাঁড়াবে এসে একটা গোটা অধ্যায়ের বিশেষ বিশেষ ক'টি দিনের ছবি, বেদনার তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিয়ে উঠবে সদানন্দের। এ পরিবেশের পক্ষে তা বাঞ্ছনীয় হবে না মোটেই।

যাক, মীরা দেবী এসে পরিত্রাণ করলেন, আমায় এ তটস্থ ভাব থেকে। হাতের কাপটা রাখতে গিয়ে তিনি বললেন, আপনার বন্ধুর চেয়ে আমি কিন্তু কম আপনার নই ডাক্তারবাবু। এবার থেকে সোনাছড়ায় এলে একবারটি যেন দেখা দিয়ে যাবেন।

সদানন্দ উচ্ছ্বসিতভাবে বলল, একশ' বার, আসবে না মানে। সোনাছড়ায় না এলেও তাকে আসতে হবে। আর না এসে যাবেই বা কোথায়—বলেই সদানন্দ আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে তাকাল আমার পানে।

এবার বিদায় নেবার পালা। উঠে দাঁড়ালাম। সদানন্দ বলল, আজ ত রববার, সন্ধ্যার দিকে একবার আসিস, আমি অপেক্ষা করব।

তাকিয়ে দেখলাম মীরা দেবীর মুখখানাও স্মিতহাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

সন্ধ্যা হতে-না-হতেই বাইক নিয়ে এসে দাঁড়ালাম পণ্ডিতবাবুর বাড়ীর সামনে। সদানন্দ বারান্দাতেই বসেছিল একখানা চেয়ার নিয়ে। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল।

—এসেছিস তুই; যাক, দেরি করিস নি মোটেই।

আমি বারান্দায় পা দিতেই সদানন্দ এবার বলল, আজ এখানে আর বসব না, চল একটু ঘুরে আসি এদিক ওদিক। দু'জনেই নামতে যাচ্ছিলাম। রঘুয়া এসে পেছন থেকে আমাকে ডাকল—ডাক্তারসাব, মাজি ডাকছেন আপনাকে।

সদানন্দ আমার পানে তাকিয়ে বলল—যা, শুনে আয় মহারাণীর কি হুকুম, দু'মিনিটের বেশী কিন্তু দেরি করিস না।

ভেতরে গেলাম। বারান্দা পেরিয়ে একেবারে রান্নাঘরের সামনে গিয়ে দাঁড় করাল আমাকে রঘুয়া। কি একটা কাজ করছিলেন, আমি দাঁড়াতেই মুখ তুলে চাইলেন মীরা দেবী, তার পর মৃদু হেসে বললেন—শুনলাম, খুব ঘুরে বেড়ানোর মতলব করেছেন আপনারা?

আমি স্মিত হেসে মাথা নাড়লাম—অনেকটা তাই।

ততক্ষণে আঁচলে হাত দুখানা মুছে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন মীরা দেবী। তার পর স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে তাকিয়ে বললেন এবার—আমার একটা অনুরোধ আছে কিন্তু, রাখবেন নিশ্চয়ই। মুহূর্তপরই আবার বললেন—দ্বিরুক্তি করলে অনুরোধ না বলে বলব আদেশ।

আমি হেসে ফেললাম—ভূমিকাই এত লম্বা, আদেশের বহরের কথা ভেবে ত আমি আঁৎকে উঠছি। এবার বলুন, কি আদেশ!

সহজ ভাবে বললেন মীরা দেবী—ফিরে এসে খেয়ে দেয়ে তবে যাবেন, বুঝলেন?

আমি বলতে যাচ্ছিলাম—রান্নাবান্না ত ঠাকুর করে রেখেছে ওখানে। কিন্তু বলার আগেই শুনলাম—এর ওপর কোন কথাই আমি শুনব না।

অবস্থা দেখে বাধ্য হয়ে নীরবেই ফিরে যেতে হ'ল।

সদানন্দ বলল—চল্ এগোই।

টিলার ঢালু রাস্তা দিয়ে নেমে চললাম দু'জনে। তার পর মাদুলীছড়ার অপেক্ষাকৃত বড় রাস্তা। সে রাস্তায় পা দিতেই সদানন্দ বলল—চল্, তোকে আজ একটা নতুন জায়গা দেখিয়ে নিয়ে আসি।

তার পর উভয়েই নীরব। পাশাপাশি চলেছি দু'জন। রাস্তাটা ঈষৎ আঁকাবাঁকা গতিতে এগিয়েছে। দু'পাশে কাঁটাতারের বেড়া, তার ভেতর উঁচুনীচু টিলা সারিবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। নবমীর চাঁদ উঁকি দিয়েছে পূবদিকের একটা উঁচু টিলার গা বেয়ে, সঙ্গে সঙ্গে তার রূপালী ধারা এসে বর্ষিত হচ্ছে সবুজ কচি চা-পাতার উপর। সবুজে রূপায় মিশে এক অপরূপ আলো বিকীর্ণ হচ্ছে সেই পাতা থেকে।

—সত্যি, চমৎকার! না বলে পারলাম না।

সদানন্দ তাকাল আমার মুখের পানে, একটু যেন সচকিত ভাব নিয়ে। তার পর মৃদু হেসে বলল—আরও চমৎকার দেখতে পাবি, চল।

আরও মিনিট চার-পাঁচ এগিয়ে যাবার পর দেখতে পেলাম আর একটা ব্রীজ। তারও নীচে পাহাড়ী জলধারা।

সদানন্দ বলল—এটা সোনাছড়ার দ্বিতীয় ব্রীজ, প্রায় সমস্ত বাগানটা বেষ্টন করে সোনাছড়ার জলধারা এ পাশ দিয়ে গিয়েছে, তার পর এ অঞ্চল ছাড়িয়ে বহু দূরে গিয়ে মিশেছে একটা পাহাড়িয়া নদীর সঙ্গে।

ব্রীজে আর পা দিলাম না আমরা। তার গা দিয়ে সোনাছড়ার ধারা বরাবর একটু সরু পায়ে-চলা পথ এগিয়ে গিয়েছে বড় রাস্তা থেকে। সে পথে এগোলাম দু'জনে। কয়েক পা এগোতেই চকিতে সদানন্দের কথাটা যেন ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল—সুরে, ছন্দে।

—সত্যি আরও চমৎকার।

অদূরে একটা ঈষৎ উঁচু ঢিবির নিম্নাঙ্গ ত্রিভুজাকার ধারণ করে

ছুঁয়েছে গিয়ে জলধারাকে। তার সবুজ গায়ে, নীচের সমতল অংশে ফুটে আছে অসংখ্য বনফুল। জ্যোৎস্নালোকে সবগুলোই রঙ ধরেছে তুষার-শুভ্র। জলের উপর ঝুয়ে আছে কয়েক গুচ্ছ কাশবন, তারও শীর্ষে ফুলের বিকাশ।

একটা ঝির-ঝির ধ্বনি শুনে তাকিয়ে দেখলাম বাঁ-পাশে। কাছেই একটা সরল গাছ দাঁড়িয়ে আছে আকাশ ছুঁয়ে। এই সবুজের রাজ্যে সে যেন প্রৌঢ়ত্বের মর্য্যাদায় মহীয়ান।

সেই টিবির ওপর গিয়ে বসলাম আমরা। চাঁদ কেঁপে কেঁপে উঠছে জলধারার উপর, হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে বনফুলের শাখাগুলো, ছন্দ রেখে মাথা দোলাচ্ছে কাশগুচ্ছ।

ক্ষণিকের দমকা হাওয়া। ঝির-ঝির-ঝির ধ্বনিতে মুখরিত করে তুলছে দীঘল সরল পাতাগুলি।

তাকালাম সদানন্দের মুখের পানে। চিন্তামগ্ন সে চোখ দুটি। একবারও হয়ত সে আজ তেমন ভাবে তাকিয়ে দেখে নি, এত যে সৌন্দর্য্যের প্লাবন।

পা-দুখানা একটু ছড়িয়ে বসে সামনের দিকে চোখ রেখে সদানন্দই এবার নীরবতা ভাঙে—একটা কথা তোকে জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম তাপস, সকালবেলাই বলতাম তোকে, কিন্তু স্থান-কাল বিবেচনা করে বলতে পারি নি।

জলধারার পানে আমি নীরবে তাকিয়ে ছিলাম, তেমনি ভাবেই তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু সে সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধতার উপর হঠাৎ যেন একটা কুয়াসার স্তর আবরণ রচনা করতে আরম্ভ করেছে বলে মনে হ'ল।

সদানন্দই আবার বলল—আজও তাকে ভুলতে পারি নি তাপস, দীর্ঘ আট বছর পেরিয়ে গেল, কিন্তু···

আমি একটু ভর্ৎসনার সুরে বাধা দিয়ে বললাম—এ তোদের 'সেন্টিমেন্টে'র কথা সদানন্দ। আজ তুই কোন্ দুঃখে মন খারাপ করতে যাচ্ছিস বল্ ত? মীরার মত মেয়েকে তোর জীবনে পেয়েছিস। এর বেশী কাম্য আর কি থাকতে পারে বল্? আমার ত মনে হয় তুই আজ পরম ভাগ্যবান।

নিজের কানেই বক্তৃতার মত শোনাল কথাগুলো। কিন্তু সদানন্দ নীরব, স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দূরের ঐ টিলার পানে।

কথার আবেগ গিয়েছে থেমে! ক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়ে যাচ্ছে পরিবেশ, চন্দ্রালোকিত জলধারা, শুভ্র বনফুল আড়ালে পড়ে গিয়েছে একে একে।

হাঁ, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, স্বল্পপরিসর মাঠ, তার উপর তেতলা বাড়ী। বাতাসে ভেসে আসছে ট্রামের ঘর্ঘর ধ্বনি, ফুটপাতের কোলাহল। এসে দাঁড়িয়েছে একটা বিরাট অধ্যায়, স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার দিনগুলো।

হোষ্টেলের নতুন 'সেসন্'। ভর্ত্তি হ'ল এসে সদানন্দ দত্ত, 'ফিফ্থ ইয়ার', অর্থনীতির ছাত্র। আমি তখন সবে বি-এসসি পাস করে ডাক্তারিতে 'এডমিশন' নিয়েছি। রুম-মেট সদানন্দ। দিনকয়েক কাটল। ভাব ত দূরের কথা, কথাই তেমন জমে উঠে না তার সঙ্গে। ভোরবেলা আমি বিছানায় থাকতেই সে বেরিয়ে যায় কোথায়, আসে একবার কলেজের আগে খেয়ে যেতে, মিনিটকয়েকের মধ্যেই স্নান-আহার শেষ করে আবার ছোটে কলেজে। তার পর ফিরে আসে রাত ন'টা সাড়ে ন'টায়। কথা বলার ফুরসতই আর হয়ে ওঠে না। নিশ্ছিদ্র রুটিনের মধ্যে যে বার-দু'তিন দেখা হয় তাতে মামুলি দু'চারটি কথার বেশী এগোয় না। তা ছাড়া হোষ্টেলের অন্য ছেলেদের মত আমিও তেমন আগ্রহ বোধ করি নি তার সঙ্গে ভাব জমাবার। কারণ তার মুখের উপর প্রথম দৃষ্টিতে আকর্ষণের বিপরীতটা হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। এমনকি দু'একটি ছেলে নীচু স্তরের রসিকতায় আনন্দ ফলাতে গিয়ে আড়ালে আবডালে বলত—আহা, কি নাক, কি চোখ। একেবারে কলিযুগের শ্রীকৃষ্ণ, বাঁশী হাতে দিলেই হয় আর কি!

সত্যি, বাঁশীর মত নাক, পাতলা ঠোঁট, রেখাঙ্কিত ভ্রূ—ছোট চোখ দুটো ছাড়া অতি রূপবানদের সমস্ত উপাদানই তার মুখাবয়বে কেন্দ্রীভূত। কিন্তু একটু তাকালেই চোখে পড়ে, মনে হয় যেন স্রষ্টা সমস্ত শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলো জড়ো করে এনে সময়াভাবে অতিমাত্রায় ত্রস্ত হাতে শেষ করেছেন তাঁর তখনকার সৃষ্টির কাজটি। তাই নাক আর মুখ-গহ্বরের দূরত্ব রয়ে গেছে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী, ভ্রূযুগল নিয়েছে কৌণিক অবস্থান।

কিন্তু হঠাৎ এক দিন সাড়া পড়ল হোষ্টেলের তেতলা অবধি। সকলে এসে খোঁজ করতে লাগল—কে ছেলেটি সদানন্দ দত্ত?

'দেয়াল' পত্রিকায় গল্প বেরিয়েছে সদানন্দের। চমৎকার, অপূর্ব্ব গল্প—সকলের মুখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। দু'এক জন পুরনো আবাসিক বললেন—হোষ্টেলের 'দেয়াল' পত্রিকার জীবনে এমন গল্প আর বেরোয় নি।

আমার মুখ ম্লান হয়ে এল। তবুও সকলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে হ'ল—চমৎকার। কারণ এর আগে অন্যতম গল্পলেখক ছিলাম আমি। কিন্তু···

কিন্তু ফল হ'ল অন্য রকমের। সূচনা হ'ল সদানন্দের সঙ্গে বন্ধুত্বের। অল্পদিনের মধ্যেই সে হয়ে উঠল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। মুগ্ধ করেছিল আমাকে তার সরলতা। তখন প্রশংসার বান বইছে হোষ্টেলে। আমি তাকে হেসে বললাম, আপনি যে খুব প্রশংসা লুটছেন মশায়।

সে হাসিমুখে তাকায় আমার পানে—ও কিন্তু আমার প্রাপ্য নয়; ফাঁকি দিয়ে বাজি মাৎ করেছি জানি, কিন্তু ওঁরা ত তা বুঝবেন না। গুছিয়ে-গাছিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা চালাই করেছি, এই ত মাত্র।

শেষে জানতে পেরেছিলাম, অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার তার সত্যি বিচিত্র সম্ভারে পূর্ণ। বালক-বয়স থেকেই আরম্ভ হয়েছে তাঁর জীবন-সংগ্রাম, জীবন-সংগ্রাম ঠিক না হলেও শিক্ষা-সংগ্রাম। যথা-সম্ভব স্বাবলম্বী হয়ে চালাতে হয়েছে তার স্কুল-জীবন। তার পর

কলেজ-জীবনে তাকে হতে হয়েছে পূর্ণ স্বাবলম্বী। তাই বিচিত্রতর ঘটনাপরিবেশের ভেতর দিয়ে কাটাতে হয়েছে তাকে দীর্ঘ কাল।

গরমের ছুটির পর পূজোর ছুটি ঘুরে এল; দেখতে দেখতে কেটে গেল কয়েক মাস। এরই মধ্যে সদানন্দ হয়ে উঠেছে আমার প্রধান বন্ধু। অল্প দিনের মধ্যেই সে 'তুমি'র স্তর ছাড়িয়ে 'তুই'-এর স্তরে এসে পৌঁছেছিল। আমার চেষ্টায় এবং উৎসাহে তার গুটিকয়েক গল্প আত্মপ্রকাশ করেছে বিভিন্ন সাময়িকীতে। কিন্তু সদানন্দের ভাবান্তর নেই কিছুই; স্মিত হেসে শুধু বলত—ও আর কি, এবার সম্পাদক মশায়দের ঠকাচ্ছি। আমাকে কিন্তু অনুপ্রেরণা দিত সেই ঠকানো বিদ্যায়। আমার যে-কোন লেখা দেখেই সে করে উঠত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, বলত, তোর ভাল হাত আছে রে লেখার, লিখে যা, দেখবি সম্পাদক ঠকানো কত সহজ।

পূজোর ছুটি প্রায় শেষ হতে চলেছে, নবেম্বরের গোড়ার দিক। বালিগঞ্জে গিয়েছি এক বান্ধবীর বাড়ী তার জন্মদিনের নিমন্ত্রণে। বান্ধব-বান্ধবী মিলে সমাবেশ হয়েছিল মোটের উপর একেবারে কম নয়। অল্পক্ষণের মধ্যে একটা জিনিস নজরে পড়ল, খানকয়েক একই জাতের মাসিক কাগজ নিয়ে তাদের মধ্যে প্রায় কাড়াকাড়ি লেগে গিয়েছে। ঘুরপাক খেয়ে বেশ কিছুক্ষণ পর আমার হাতেও এল একখানা। কাগজখানা খুলে বুঝতে পারলাম এই কাড়াকাড়ির হেতু। একটা গল্প লিখেছেন বান্ধবী সুনেত্রা রায়। নামের নীচে লেখা 'প্রথম পুরস্কার' এই কথাটি। বুঝতে বাকি রইল না ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন সুনেত্রা রায়। তাই একটু নিবিষ্ট মনে পড়ে যাচ্ছিলাম গল্পটি। পৃষ্ঠা দু'তিন পড়ার পর চকিতে আমার মনে পড়ে গেল আর একটি গল্পের কথা। হাঁ, সদানন্দের টেবিলেই ত কাগজ হাতড়াতে গিয়ে পেয়েছিলাম সেদিন একটা গল্পের পাণ্ডুলিপি। তাতে নাম-ধাম কিছু লেখা নেই, কিন্তু হস্তাক্ষর তারই এবং লেখাও তার নিজের। একটু যেন রহস্যময় ঠেকল ব্যাপারখানা। দ্রুতভাবে এবার পড়ে গেলাম বাকি পৃষ্ঠা-গুলো। রহস্য যেন আরও ঘনীভূত হয়ে উঠল। গল্প শেষ করলাম, ঠিক সেই গল্পটি। তা ছাড়া, এ ব্যাপারে কোন দক্ষতার পরিচয় সুনেত্রার মধ্যে কোন দিনই পাই নি এর আগে। তাই বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। বুঝে উঠতে পারলাম না, কি করে এ সম্ভব হ'ল!

জন্মদিনের আনন্দ-আসর। কথায়, হাসিতে, গানে মুখর হয়ে উঠেছে প্রশস্ত ড্রয়িং রুমখানা। তার দাপটে অল্পক্ষণের মধ্যেই তলিয়ে গেল সে রহস্য। কিন্তু ভুলতে পারি নি ব্যাপারটা। ফিরে আসার সময় কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম সুনেত্রাকে, সদানন্দের সঙ্গে তার পরিচয় আছে কিনা।

চকিতে লক্ষ্য করলাম, সুনেত্রার হাস্যোজ্জ্বল মুখ একটু ম্লান হয়ে গেল। কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্যেই, তারপরই যথাসম্ভব সপ্রতিভভাবে সে বলল, ও, সদানন্দবাবু। তাই বলুন, চেনা আছে বৈকি কিছুটা, আমাদের মিণ্টুকে পড়ান কিনা।

বিদায় নিয়ে চলে এলাম। সদানন্দকে বললাম না কিছুই।

ছুটির দিন; কিন্তু সদানন্দের সেই গ্রন্থিবাঁধা রুটীন। ব্যতিক্রম শুধু, দুপুরবেলাটা এখন অবকাশ। সে এটা ওটা বই পড়ে, আর আমি কাটাই সারা দুপুর নিদ্রাদেবীর সঙ্গে পরম সখ্যে। সেদিন দুপুরে আর তাকে দেখলাম না টেবিলে। খেয়ে দেয়ে আবার বেরিয়ে গেছে কোথায়, সকালবেলা থেকে একবারও তার দেখা পাই নি। বিকেলে একটু এদিক-ওদিক বেড়িয়ে সন্ধ্যায় ফিরলাম হোস্টেলে। ঘরে ঢুকতে যাব, সদানন্দের তক্তপোশের উপর চোখ পড়তেই আমি অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে গেলাম। বিছানাপত্র বাঁধা-ছাঁদা অবস্থায় পড়ে আছে, তার পাশে তার টিনের 'সুটকেস'টা। টেবিলখানাও খালি, বইয়ের বিশাল স্তূপ সরানো হয়ে গেছে ইতি-মধ্যে, পড়ে আছে শুধু খানকয়েক ছেঁড়া কাগজ, আর লেখা পোস্ট-কার্ড। কারণটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না; মনে হ'ল, কোন খারাপ খবর এসেছে হয়ত।

আধ ঘণ্টার মধ্যে এল সদানন্দ। তার মুখের পানে তাকিয়ে ত আমার চক্ষু স্থির! একি হয়েছে তার চেহারা। উষ্কখুষ্ক চুল, মুখে ফুটে উঠেছে একটা রুক্ষতার স্পষ্ট ছাপ।

জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে বল্ ত? কোন খারাপ খবর নাকি?

এগিয়ে এসে তক্তপোশের উপর সে বসল; তারপর ম্লান হেসে বলল, খবর খারাপই, তবে আর কারো কিছু হয় নি। হয়েছে আমার নিজেরই।

আমি একটু উদ্বিগ্নভাবে বললাম, বল্ না কি হয়েছে?

সদানন্দ তেমনিভাবে বলে, এখন নয় ভাই, বলব, তোকে সবই, তবে যাবার সময়, রাত ন'টা দশে আমার ট্রেন।

জিজ্ঞেস করলাম, আসছিস কবে?

উদাসীন গলায় এবার সে বলে, ঠিক নেই, হয়ত নাও আসতে পারি।

আমার বিস্ময় তখন পূর্ণমাত্রায়—সে কি, তুই বলছিস কি?

সদানন্দ এবার একটু করুণ চোখে তাকাল আমার মুখের পানে—এখন আর কিছু জিজ্ঞেস করিস না ভাই আমাকে, পরে সবই তুই বুঝতে পারবি।

কথা আর এগোয় নি।···

শিয়ালদা প্লাটফর্ম। মালপত্র সব রাখা হয়ে গিয়েছে কামরায়। মিনিট কুড়ি বাকি ট্রেনের। প্লাটফর্মের একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা দু'জন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে সদানন্দ এবার বলে, তুই জিজ্ঞেস করেছিলি কেন কলকাতা ছাড়ছি; বলছি তোকে সবই।

আবার কিছুক্ষণ নীরব থেকে ট্রেনের পানে উদ্দেশ্যবিহীন দৃষ্টি রেখে সদানন্দ বলে, একটা মস্ত ভুল মাসকয়েক ধরে করে আসছিলাম তাপস। আজ অতর্কিতে ভেঙে গেল সে ভুল; আর

সেই ভাঙাটা এত তীব্র, এত নির্মম যে আমি সহ্য করতে পারছি না কিছুতেই ; তাই ছুটে পালাচ্ছি।

বুঝতে পারলাম না কিছুই, তবুও নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইলাম সদানন্দের মুখের পানে।

আবার সে বলে, সুনেত্রা রায়কে তুই নিশ্চয়ই জানিস। শুনেছি তোরা একসঙ্গে বি-এসসি পড়েছিস।

আমি মাথা নাড়লাম।

—হোষ্টেলে আসার মাসখানেক পরই আমি ওদের বাড়ী টিউশনি নিই, পড়াতাম ওর ছোট ভাই মিণ্টুকে। আধুনিক ভাবধারার পরিবার, তাই অবাধ মেলামেশার ছিল সুযোগ। এর আগে আমি কোন তরুণীর সঙ্গেই সহজভাবে মেলামেশার সুযোগ পাই নি; পেলেও হয়ত তা গ্রহণ করতে পারতাম না। কিন্তু এক্ষেত্রে সুনেত্রার তরফ থেকেই এল বন্ধুত্বের নীরব আহ্বান। এখানেও বন্ধুত্বের মাধ্যম আমি নিজে নই, আমার লেখা। বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। কিন্তু তরুণ-তরুণীর বন্ধুত্বের স্বাভাবিক নিয়মে আমার অজ্ঞাতেই অল্প দিনের মধ্যে ফুটে উঠল তাতে গোলাপী আভা। একটা অননুভূত সাড়া জেগে উঠল মনে; এতেও অগ্রণী সুনেত্রা নিজে। কোন এক ইংরেজ লেখক বলেছেন, 'ভালবাসা মানুষকে পাগল করে তোলে।' সত্যি আমাকেও করে তুলেছিল উন্মাদ। তা না হলে একবারও কি সচেতন হয়ে ভাবতাম না আমার মুখশ্রীর কথা। সুনেত্রার চোখে লেগেছিল রঙের ঘোর। সে চোখকে মুগ্ধ করেছিল আমার কল্পনার জগৎ, আমার লেখক-সত্তা। কিন্তু সে ঘোর যখন কাটল, নির্মমভাবে দেখা দিল তার সামনে বাস্তব, স্পষ্টভাবে চোখে পড়ল আমার বাস্তব শ্রী। তাই তার মন হয়ে উঠেছে বিদ্রোহী। আমার সান্নিধ্য তাকে করে তুলেছে অতিষ্ঠ।

সদানন্দ থামল একটু। আমার সপ্রশ্ন চোখের পানে তাকিয়ে আবার সে বলে, এ আমার ধারণা নয় তাপস। আজ নিজের কানেই শুনতে পেলাম সুনেত্রার মুখে। পড়াতে গিয়েছিলাম আজ একটু দেরিতে। এত বেলা অবধি আমার থাকার কথা নয়। পাশের ঘরে সুনেত্রা কথা বলছিল এক বান্ধবীর সঙ্গে; জানত না আমি তার পাশের ঘরেই বসে কাগজ পড়ছিলাম। হঠাৎ আমার নাম শুনে একটু সচকিতভাবে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। সুনেত্রা বলছে—আর বলিস না ভাই, আমাকে একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলছে। সবচেয়ে অদ্ভুত হচ্ছে, নিজের সম্বন্ধে একটুও সচেতন নয় লোকটি। তাই বুঝতে পারে না গল্পের জগৎকে গায়ের জোরে করা যায় না সত্যিকারের।

তার বেশী আমি শুনতে চাই নি। অতর্কিতে যেন আমার পায়ের নীচের মাটি নড়ে উঠল সেই সঙ্গে। আর বসে থাকতে পারলাম না। যন্ত্রচালিতের মত বেরিয়ে এলাম নীরব পদক্ষেপে, হয়ত শেষবারের জন্য।

সদানন্দ থামল এবার। আমার গলা দিয়ে আর কথা বেরুল না। শুনছিলাম নীরবে, এবার মুহূর্তকয়েক তাকিয়ে রইলাম প্লাটফর্মের ব্যস্ত লোকদের দ্রুত গতিবিধির পানে। শুধু বারেকের জন্যে মনে পড়ল সেদিনকার জন্মদিনের আসরের কথা।

ট্রেনের সময় হয়ে এল। সদানন্দ কামরায় উঠে জানালার পাশে গিয়ে বসল। আমি জানালার কাছাকাছি প্লাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে রইলাম নীরবে।

ট্রেনের ঘণ্টা বেজে উঠল, নড়ে উঠল ট্রেন। এতক্ষণ স্থির-দৃষ্টিতে মুখের পানে তাকাতে পারি নি সদানন্দের। এবার তাকাতে গিয়ে মনটা অব্যক্ত বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠল। সদানন্দের চোখের কোণ প্লাটফর্মের অনুজ্জ্বল আলোকেও চক্ চক্ করে উঠছে। যা কোনদিন কল্পনাও করি নি তাই, সদানন্দের চোখে অশ্রু।

হোষ্টেলে ফিরলাম এক বিরাট শূন্যতা নিয়ে।...

ঝির-ঝির-ঝির...শোঁ-শোঁ গুঞ্জরিত হয়ে উঠল সরলের সবুজ পাতা। সে ধ্বনির ছন্দে তাল মিলিয়ে ডেকে উঠল একটি রাত-জাগা পাখী। সচকিত হয়ে উঠলাম। মিলিয়ে গেল উজ্জ্বল কলকাতা জ্যোৎস্নার প্লাবনে, শ্যামলিমার বিচ্ছুরণে। অতর্কিতে ফিরে এলাম সোনাছড়ার স্বচ্ছ জলধারার পাশে।

সদানন্দ তাকিয়ে আছে তেমনি দৃষ্টি প্রসারিত করে। তার শিল্পী-হৃদয়ে আজ জেগেছে স্মৃতির তরঙ্গ, তাই ভাষা হয়ে গেছে মূক।

আমিই ভাঙলাম সে নিস্তব্ধতা—তুই কি বুঝতে পেরেছিলি সুনেত্রাও ভালবাসত তোকে?

সদানন্দ মুখ না ঘুরিয়ে তেমনিভাবে থেকে বলল, বুঝতে আমি চেষ্টা করি নি, আর বুঝতে আমি চাইনিও। কিন্তু আমি তাকে দিয়েছিলাম হৃদয় উজাড় করে। তাতেই হয়ে রয়েছিলাম বিমোহিত।

আবার নীরবতা। মুহূর্তকয়েক পর সদানন্দ উঠে দাঁড়ায়—চল যাই এবার রাত হয়ে গেছে বেশ।

ফিরে এলাম দু'জনে। মীরা দেবী হয়ত জানালায় দাঁড়িয়েছিলেন, আমাদের দেখতে পেয়ে একেবারে সদর দরজায় এসে হাজির—যাক্ বাবা, বেড়ানো হ'ল তা হলে। এবার আর কোন কথা নয়, সোজা রান্নাঘরে চলুন; বলেই এগিয়ে গেলেন রান্নাঘরে।

খেতে বসেছি পাশাপাশি দুখানা পিঁড়িতে। মীরা দেবী থালার চারপাশে বাটিতে বাটিতে তরকারী সাজিয়ে রেখেছেন। আয়োজনের বহর আর পারিপাট্য দেখে ত আমার চক্ষু স্থির। বামুন-ঠাকুর গঙ্গারামের গঙ্গোদকসুলভ ঝোল তরকারি খেয়ে আমি অভ্যস্ত। মীরা দেবী কাছেই একখানা পিঁড়ি নিয়ে বসলেন। খাদ্যবস্তুগুলির উপযুক্ত সদ্ব্যবহার হয় কি না তার করলেন তদারক। আমাকে গোড়াতেই শাসিয়ে রাখলেন—এর একটুও যদি রেখে ওঠেন ত আমি দোর আগলে দাঁড়াব।

দোর আগলাতে আর হয় নি। মোটামুটি নিঃশেষেই শেষ করলাম সবকিছু। অবশ্য জিভের তাগিদটাই ছিল প্রধান। কথা

আর তেমন হ'ল না। সদানন্দ প্রায় নীরবেই খাওয়া শেষ করল।

চলে আসছিলাম, মীরা দেবী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—ওখানে ঠাকুর রান্না করে না ডাক্তারবাবু?

আমি মাথা নেড়ে জানালাম—হাঁ।

কি একটু ভেবে অনেকটা যেন স্বগতোক্তির মত তিনি বললেন, এই খেয়ে কি শরীর টেকে?

আমি হেসে বললাম, টিকে ত আছে দিব্যি।

কথা বলতে বলতে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা।

সদানন্দ বলল, আসছে রববার তুই নিশ্চয়ই আসছিস।

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মীরা দেবী বলে উঠলেন, তা ছাড়া এমনিতে সময় পেলে তো আসবেনই, কেমন ডাক্তারবাবু?

আমি উভয় কথার জবাবেই মাথা নাড়লাম। তারপর আবার বাইকে আরোহণ।

মাসখানেক কেটে গেল দেখতে দেখতে। শয্যা ছেড়ে জানালা দিয়ে তাকালেই চোখে পড়ে দূরের ঐ 'পাগলা টিলা'র কোল ঘেঁষে উঁকি মারছে প্রভাতী সূর্য্য, আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার চূড়া। সঙ্গে সঙ্গেই স্মৃতিতে জেগে উঠে একখানা কমনীয় দীপ্তিময় মুখচ্ছবি। এক সুমধুর অনুপ্রেরণা নিয়ে সুরু করি দিনের কাজ। দিনও সমাপ্তি জানায়, পূবের সূর্য্য ঢলে পড়ে পশ্চিমের আকাশে। তারই হয় দ্রুত পুনরাবৃত্তি। দিনগুলো হয়ে উঠে ছন্দোময়। সপ্তাহশেষে রবিবার আসে; শত বীণার ঝঙ্কারে যেন মুখরিত হয় সে দিনটি, সদানন্দ-মীরা দেবীর সান্নিধ্যে। বারেকের জন্যেও মনে হয় না, সমাজবিবর্জ্জিত এক জায়গায় বাস করছি শুষ্ক একাকিত্ব নিয়ে।

রবিবার দেরি করে যাবার উপায় নেই, অভিযোগ-অনুযোগ শুনতে হয়। তাই যথাসময়ে হাজিরা দিই। দু'একদিন গিয়ে দেখেছি সদানন্দ বাড়ী নেই। মীরা দেবী স্মিত হেসে বলেছেন—কোন ভয় নেই, ও আসছে এখখুনি। ততক্ষণ না হয় আমার সঙ্গে একটু গল্প করুন।

আমি চেয়ার নিতেই তিনি রান্নাঘরে পা বাড়ান। হাতে নিয়ে আসেন ধূমায়িত চায়ের কাপ। কাপটা আমাকে এগিয়ে দিয়ে মোড়া টেনে বসেন অদূরেই, এটা ওটা নিয়ে কথা বলেন। ক্ষণিক নীরব থেকে কখনও বা জিজ্ঞেস করেন—আপনার একা লাগে না ডাক্তারবাবু?

উত্তরে আমি বলি, না, এখন আর তেমন লাগে না।

সত্যি খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে তাঁর মুখমণ্ডল।

দিন-তিন চার ধরে ইনফ্লুয়েঞ্জার মত হয়েছে। তাই গত রবিবার আর যেতে পারি নি সোনাছড়ায়। বাইরের বারান্দায় হেলানো চেয়ারখানা নিয়ে বসেছিলাম, আর ভাবছিলাম আমার চলমান দিনগুলির কথা।

হঠাৎ দেখি রঘুয়া এসে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। আমার সামনে এসে একগাল হেসে বলল, ডাক্তারসাব, মাজি এসেছেন।

আমি যেন চমকে উঠলাম। ঠিক বিশ্বাস করতে পারলাম না, মনে হ'ল ভুল শুনছি। তাই জিজ্ঞেস করলাম—কি বললি, মাজি এসেছেন···

কথা শেষ হবার আগেই তাকিয়ে দেখি মীরা দেবী উঠে আসছেন সিঁড়ি দিয়ে। আমি সন্ত্রস্তভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। মীরা দেবী এগিয়ে আসতে আসতে একটু কৃত্রিম শাসনের সুরে বললেন, সে কি, উঠছেন কেন, বসুন দিকি নি আগের মত।

বসতেই হ'ল। বলতে গেলাম—আপনি এই দুপুর-রোদে···

বাধা দিয়ে তিনি বললেন, সে ভাবনা আপনাকে করতে হবে না আপাততঃ।

—এই দু' মাইল পথ?

এবার হেসে ফেললেন মীরা দেবী আমার সন্ত্রস্তভাব দেখে, কোন ভয় নেই, আমি ট্রলী করে এসেছি।

রঘুয়া একটা পুটলী হাতে বারান্দায়ই দাঁড়িয়েছিল। তাকে উদ্দেশ করে তিনি এবার বললেন, আয় দিকি রঘুয়া, ভিতরে দেখি গঙ্গারাম ওখানে কি করছেন; বলেই আমাকে বসতে বলে এগিয়ে গেলেন। দু'এক পা এগিয়েই আবার কি একটু ভেবে ফিরে এলেন। তারপর আমার খুব কাছে এগিয়ে এসে নিঃসঙ্কোচে কপালে হাত দিয়ে দেখলেন তাপ আছে কি না। স্পর্শের সে শীতলতায় আমার চোখ দুটি যেন বুজে আসছিল। কোন কথা আর তখন আমার মুখ দিয়ে বেরুতে চাইল না।

—না তাপ আর নেই এখন—বলেই তিনি ভিতরে চলে গেলেন।

বিস্ময়ের ধাক্কা তখনও আমি সামলে উঠি নি পুরোপুরি। মিনিট কুড়ি পর মীরা দেবী এবার এলেন, ডান হাতে একখানা বড় ডিসে করে কয়েক টুকরো নাসপাতি, আপেল, খোসাছাড়ানো একটা গোটা কমলালেবু, আধখানা বেদানা আর বাঁ হাতে গ্লাসে করে এক গ্লাস দুধ নিয়ে। রঘুয়া ছোট টুলখানা এনে আমার সামনে রেখে এক গ্লাস জল নিয়ে এল। মীরা দেবী টুলের উপর সেগুলো রেখে শান্ত কণ্ঠে বললেন, খেয়ে নিন দিকি নি এটুকু।

আমি চোখ তুলে তাকাতে পারলাম না। নীরবে ডিসে হাত দিতে হ'ল। মিনিট দু'তিন দাঁড়িয়ে থেকে মীরা দেবী আবার ভিতরে চলে গেলেন। বুঝতে বাকী রইল না, আমার ঘরখানা এবার ভদ্র হতে চলেছে।

ঘণ্টাখানেক পর যাবার জন্যে আবার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন মীরা দেবী। এ সময়টুকুর মধ্যে কথা বলার একটুও সুযোগ পাই নি আমি; আর পেলেও তেমন সহজভাবে বলতে

পারতাম না হয়ত। প্রায় সারাক্ষণই তিনি ছিলেন ভিতরে এটা ওটা কাজে, ঘর গোছানোয়। কেন জানি আমি নিজেও চেয়ার ছেড়ে উঠে যেতে পারলাম না। আমার মুখের পানে তাকিয়ে তিনি এবার বললেন, সেরে উঠেছেন এবার, কোন ভয় নেই। আসছে রবিবার কিন্তু যাওয়া চাই-ই।

সেই কপালে হাত দিয়ে তাপ দেখার পর থেকে আমি আর চোখ তুলে তাকাতে পারছিলাম না মীরা দেবীর পানে। কেমন যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেই স্নিগ্ধ পরশ। এবার অনেক কষ্টে মুখ তুলে তাকালাম। চোখে চোখ পড়তেই সরে এল আমার দৃষ্টি; মাথা নেড়ে বললাম, হাঁ, যাব।

দিনকয়েক পর হবে, সেদিন শনিবার। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে; একটা দরকারী কাজে হাসপাতালে যাব, সবে চেয়ার ছেড়ে উঠেছি, হঠাৎ দেখি রঘুয়া এসে দাঁড়িয়েছে সামনে, মুখে সেই হাসি। আমাকে দেখেই বলল, চিঠি আছে ডাক্তারসাব।

তার কথা শুনেই আমি উৎসাহিত হয়ে উঠলাম—মাজি পাঠিয়েছেন না রে?

উত্তরে বলল, না, ডাক্তারসাব, পণ্ডিতবাবু দিলেন।

পণ্ডিতবাবু? একটু বিস্ময় ঠেকল আমার, নূতনত্বও মনে হ'ল ব্যাপারটায়। এতদিন রঘুয়া যতবারই দৌত্য করতে এসেছে, সবকিছুতেই পাঠিয়েছেন মাজি। আজ এই প্রথম ব্যতিক্রম। হাত বাড়িয়ে নিলাম চিঠিখানা।

রঘুয়া বলল, আমি যাই ডাক্তারসাব, একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে। আমি অন্যমনস্ক ভাবে মাথা নাড়লাম—আচ্ছা যা।

খামের মুখ এঁটে দেওয়া চিঠিখানা। ওজন দেখে মনে হ'ল ভিতরে কাগজ আছে একাধিক। স্পষ্টভাবে আমার নাম ঠিকানা লেখা। ত্রস্ত হাতে খুললাম চিঠিখানা। দীর্ঘ এক চিঠি। চেয়ারখানা এগিয়ে নিয়ে বসলাম আবার। সদানন্দ লিখেছে—চিঠিখানা আর শেষ করতে পারছিলাম না, হঠাৎ মনে হ'ল আমার চারিদিক যেন এক অশুভ আঁধারে ছেয়ে ফেলছে, অক্ষরগুলো ক্রমে হয়ে আসছে অস্পষ্ট। অনেক কষ্টে তবুও শেষ করলাম সে দীর্ঘ চিঠি। তারপর নিশ্চল নিস্তব্ধের মত বসে রইলাম চেয়ারে। দূরে ঐ পাগলা টিলার চূড়া রাঙা হয়ে উঠেছে অস্তরবির বিদায়ী আভায়। কিন্তু মনে হ'ল সে রঙও হয়ে উঠেছে বিষণ্ণতায় করুণ।

সদানন্দ লিখেছে:

ভাই তাপস,

মনে গভীর এক দুঃখ নিয়ে তোকে আজ এ চিঠি লিখছি। তুই ত জানিস মীরার পরই তুই আমার একান্ত আপনার জন, যাকে বিনা দ্বিধায় সবকিছু খুলে বলতে পারি। তাই আজ তোকে লিখছি এই দীর্ঘ কাহিনী। কেন লিখছি তুই নিজেই বুঝতে পারবি সহজে।

সেদিন তুই বলেছিলি আমি 'পরম ভাগ্যবান,' মীরার মত মেয়েকে পেয়েছি আমার জীবনে। আমি নীরব ছিলাম, প্রত্যুত্তরে বলি নি তোকে কিছুই। আজ প্রয়োজন পড়েছে বলেই বলছি বাধ্য হয়ে।

মীরার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু সে স্বাভাবিক পথে নয়। এর পেছনে এক দীর্ঘ ইতিহাস। এত দিন ভেবেছিলাম তা অনুদ্ঘাটিতই থাকবে। কিন্তু আজ তার তাগিদ এসেছে উদ্ঘাটিত হবার।

কলকাতা ছাড়ার পর দীর্ঘ কয়েক মাস কোথায় ছিলাম, কি করেছি তা বলা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়, তাই বলছি না। মাস ছয়েক পর আমি 'আপার আসামে' তেজপুরে গিয়ে পৌঁছি আমার বাবার এক উকিল-বন্ধুর বাড়ী। আগেই লিখেছিলাম তাঁকে, সে অনুযায়ী গৃহ-শিক্ষক হিসেবে থাকতে পাই তাঁদের বাড়ী। তাঁরই মেয়ে মীরা। আমাকে তিনি জানতেন অনেক দিন থেকেই। তাই নিঃসঙ্কোচে মীরার লেখাপড়ার ভার ছেড়ে দেন আমার হাতে। কলকাতা ছেড়ে আসার কারণটা তখনও আমার মনে সম্পূর্ণ জাগরূক। তাই সচেতন ছিলাম পুরোপুরি, আগুনে হাত দিয়ে যাতে হাত না পোড়াতে হয় আবার। নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষকের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে পড়াতে লাগলাম মীরাকে। মীরা বুদ্ধিমতী, তাই অল্পদিনেই আশাতীত উন্নতিও হ'ল তার লেখাপড়ায়। তার বাবা অনাথবাবুও খুশী হলেন আমার উপর। ভাবলাম, ভাগ্য এবার আমার উপর সুপ্রসন্ন। তারপর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, আমার তপস্বী-সুলভ নিষ্ঠার প্রয়োজনও নেই তেমন। কারণ মীরার মন সম্পূর্ণ অধিকার করে আছে আর একজন। সে অশোক, মীরার বাবারই এক বন্ধুপুত্র। অশোক বি-এ ক্লাসের ছাত্র; সুশ্রী, গুণবান ছেলে, তার বাবারও টাকা-পয়সা মোটের উপর কম নয়। তাই ভাবী জামাতা হিসেবে তাকে আগেই নির্ব্বাচন করে রেখেছিলেন মীরার মা-বাবাই। সানন্দে আরও ভাবছিলাম, সৌভাগ্যটা তা হলে একেবারে ক্ষণস্থায়ীও নয়। অশোকের সঙ্গে আমার সম্পর্কটাও একেবারে সম্প্রীতিহীন ছিল না। তার একটা কারণ হয়ত আমার সংযম—নিষ্ঠা, আর অন্যটা আমার মুখের শ্রীহীনতা।

কাটছিল মন্দ নয়। এরই মধ্যে অশোক বি-এ পাস করল। মীরা পাস করল ম্যাট্রিক, কৃতিত্বের সঙ্গেই। বাড়ীতে আনন্দ-উৎসব চলল দিনকয়েক ধরে, লোকজনের আসা-যাওয়া; মিষ্টিমুখ, তারপর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-বর্ষণ।

মীরা কলেজে ভর্তি হ'ল। অশোক গেল এম-এ পড়তে কলকাতায়। এক দিকে মীরার কলেজে পড়ার আনন্দ, অন্য দিকে অশোকের অদর্শন; ক'দিন কাটল তার একটু আনন্দ-বিষাদময় পরিবেশে। তখনও আমি গৃহশিক্ষক।

দিনকয়েক পরই ফিরে এল স্বাভাবিক আবহাওয়া, সেই সঙ্গে আমার শিক্ষকতাও চলল ত্রুটিবিহীন ভাবে।

তারপর গরমের ছুটি এল। অশোক আর এল না সে ছুটিতে। ক'দিন লক্ষ্য করলাম আবার মীরার ভাবান্তর : এলোমেলো ভাব, রাত জেগে দীর্ঘ চিঠি লেখা···ইত্যাদি। তারপর আবার সবই ঠিক। মাসকয়েক কেটে গেল, এল পূজার ছুটি। অশোক এল এবার। তাকে দেখে সত্যি আমার চিনতে কষ্ট হচ্ছিল, এবার সে পুরো সাহেব। মীরার সে কি আনন্দ! সারা ছুটিই কাটল তাদের হৈ চৈ করে। প্রায় রোজই আছে তাদের এখানে-ওখানে-সেখানে বেড়াতে যাবার 'প্রোগ্রাম।' কোন কোন দিন ফিরতে রাতও হ'ত একটু। বাড়ীর কেউই তা গায়ে মাখতেন না। এত দিন পর দু'জনের দেখা হয়েছে, একটু বাড়াবাড়ি হবেই ত। ছুটিও এল ফুরিয়ে। তার দিন পনের পর অশোক গেল কলকাতায়।

এ ক'দিন মীরার পড়াশুনা প্রায় কিছুই হয় নি। তাই পরদিন সন্ধ্যায় একটু তাড়াতাড়ি গেলাম পড়াতে। ঘরে গিয়ে ঢুকে ত আমি একেবারে হতভম্ব। মীরা টেবিলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না ব্যাপারখানা কি। পরমুহূর্তেই মনে হ'ল অশোক চলে গেছে বলে হয়ত।

কাছে এগিয়ে গেলাম। টেবিলে ওর মাথার কাছে দুখানা খোলা চিঠি পড়ে আছে। আমার উপস্থিতিতে তার কান্না যেন আরও বেড়ে উঠল। তাকিয়ে দেখি টেবিলের এক কোণ সিক্ত হয়ে উঠেছে অশ্রুর দুর্বার ধারায়।

আমি শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে বল ত মীরা?

মীরা নিরুত্তর। এবার আরও কাছে এগিয়ে গেলাম। তারপর তার মাথায় আমার হাতখানা রেখে স্নেমনিভাবে বললাম, লক্ষীটি, বল তোমার কি হয়েছে?

মীরা এবারও নিরুত্তর। বুঝতে বাকি রইল না, আমি যা ভেবেছিলাম, কারণ তা নয়! অন্য কিছু হবে, তার চেয়ে গুরুতর। তাই এবার বললাম, যাই হয়ে থাক, এমনিভাবে কাঁদলে কি কোন ফল হবে? তোমার এত বুদ্ধি অথচ···

আমার কথা শেষ হবার আগেই মীরা মাথা তুলে তাকালে। বিস্মিত না হয়ে পারলাম না তার সে চেহারা দেখে। চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল হয়ে উঠেছে; মাথার চুল ছড়িয়ে পড়েছে বাধা-বন্ধহীনভাবে, চোখের কোণে পড়েছে কালি। আমার পানে সে ভাল করে তাকাতে পারল না। শুধু চিঠি দুখানা হাত দিয়ে দেখিয়ে অস্ফুটে বলল, পড়ে দেখুন।

কম্পিত হস্তে তুলে নিলাম একখানা। অশোকের চিঠি, অনাথ-বাবুকে লেখা। ছোট্ট চিঠি, কয়েক লাইন পড়েই আমার হাত দুখানা যেন কেঁপে উঠল, মাথা ঘুরে যেতে লাগল, তবুও পড়লাম। যতদূর মনে পড়ে এই ক'টি কথা ছিল চিঠিতে :

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে আজ লিখছি। আপনি জানেন আপনাকে আমি কত বেশী শ্রদ্ধা করি; তাই আপনাকে সবকিছু খোলাখুলিভাবে বলা উচিত মনে করলাম। আপনি একটা দুশ্চরিত্র ভণ্ড লোককে বাড়ীতে পুষে রেখেছেন। আমি এ ক'দিনে বুঝতে পারলাম তার কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করতে চলেছে নিরীহ মীরা। জানতে পারলে আরও আগেই আপনাকে সাবধান করতাম।

এখন আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন। আপনিই বিবেচনা করলে বুঝতে পারবেন, এ ক্ষেত্রে সরে দাঁড়ানো ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই। গভীর দুঃখ হচ্ছে মীরার জন্যে। কিন্তু আমি নিরুপায়। আশা করি, আপনার আশীর্ব্বাদ থেকে বঞ্চিত হব না। ইতি

অশোক

যন্ত্রচালিতের মত হাত বাড়িয়ে তুলে নিলাম অশোকের দ্বিতীয় চিঠিখানা, মীরাকে লেখা :

প্রিয় মীরা,

তুমি ত জান কত গভীরভাবে তোমাকে আমি ভালবাসি। আজ একটা কথা তোমাকে লিখতে গিয়ে কত যে দুঃখ হচ্ছে আর কি বলব। আমাদের ভালবাসা অক্ষয় হয়ে থাকবে চিরদিন। কিন্তু আমাদের মিলন হয়ত সম্ভব হবে না। কলকাতা গিয়ে আমি বুঝলাম, মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়াও একটা বৃহত্তর স্বার্থ আছে। সেই বৃহত্তর কাজে আমি আমার নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে চাই। কিন্তু অন্তরায় হবে আমাদের মিলন। একটা মহৎ আদর্শের জন্য এতটুকু আত্মত্যাগ কি আমরা করতে পারব না? আমার স্থির বিশ্বাস, সে মনের জোর তোমার আছে। কামনা করি, তোমার জীবন সুখী হয়ে উঠুক। আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জেনো।

ইতি

তোমারই অশোকদা

চিঠিখানা নামিয়ে রাখলাম। মীরা সেই একবার মাথা তুলে আবার টেবিলে মাথা এলিয়ে দিয়ে কাঁদছে তেমনধারা। ভাবলেশ-হীনভাবে তাকালাম তার পানে। মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না, হঠাৎ মীরা তীরের বেগে চেয়ার থেকে আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল মেঝের উপর। সেই সঙ্গে অস্ফুটে শুধু দু'তিনটি কথা বেরিয়ে গেল তার মুখ থেকে—মাষ্টারমশায়, বাঁচান আমাকে।

আমি একটু আগে অনেকটা ধারণা করেছিলাম তেমনকিছু। তবুও যেন চমকে উঠলাম। মীরা তখন উপুড় হয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। কান্নার উচ্ছ্বাসে তার তনুদেহ দুলে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে আহত কপোতের মত। আকাশের চাঁদ লুটিয়ে পড়েছে ধরার ধুলায়। সে যে কি করুণ দৃশ্য না দেখলে তা ভাষায় বোঝানো যায় না তাপস। আমি নিজেকে আর যেন সামলাতে পারছিলাম না। কিন্তু স্থির থাকতে হবে আমাকে। অনেক কষ্টে সে আবেগ রোধ করলাম। তারপর ধীর পদে এগিয়ে গিয়ে প্রথমে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। মীরা সেই একই অবস্থায়, যেন কান্নার তরঙ্গায়িত রূপ তার সর্ব্ব দেহে। তার কাছে গেলাম এবার; তারপর তার মাথার কাছে মেঝের উপর উবু হয়ে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম মুহূর্তকয়েক নীরবে। ঘরের আবহাওয়া যেন

নিস্তব্ধ কঠিন হয়ে উঠেছে; কোন কথা বেরুতে চাইছিল না গলা দিয়ে। তবুও বলতে হ'ল অনেক কষ্টে—ছিঃ, এমন ভেঙে পড়লে চলবে কেন মীরা, কোথায় স্থির হয়ে বসে এর উপায় একটা কিছু ভাববে, তা না করে এমনি ভাবে কেঁদে চললে কোন সমাধান ত হবে না। লক্ষীটি, উঠে বস।

দেখলাম আমার কথার অন্যথা করল না মীরা, চোখে আঁচল চেপে উঠে বসল। আমি বললাম—না, এখানে নয়, ওখানে চেয়ারের ওপর।—যন্ত্রচালিতের মত মীরা তাই করল।

—এবার চোখ দুটো মুছে নাও দিকিনি।

চোখ মুছে একটু সুস্থির হয়ে বসতেই আমিও অদূরে একখানা চেয়ার টেনে নিলাম। তার পর বললাম—এবার ঠাণ্ডা মাথায় বল ত কি করা যেতে পারে?

মীরা মাথা ঈষৎ নত রেখে তেমনি ভাবে মুখে আঁচল দিয়ে কান্নারুদ্ধ গলায় বলল—আমি যে আর বাবাকে মুখ দেখাতে পারব না মাষ্টার মশায়। আর একদণ্ডও আমি থাকতে পারছি না এ বাড়ীতে।

জানতাম ভাল করে, অনাথবাবু কিছুতেই ক্ষমা করবেন না মীরাকে। তাই একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম—কিন্তু যাবে কোথায়?

তেমনি রুদ্ধ কণ্ঠে মীরা বলল—যেখানেই হোক···

তার পর আবার সেই নিরুদ্ধ কান্না।

যেতেই হ'ল অনির্দিষ্ট ভাবে। রাত্রের অন্ধকারে গৃহশিক্ষক সদানন্দ রায় প্রভু-কন্যা মীরাকে নিয়ে বেরিয়ে এল বাড়ী থেকে, মাথা পেতে নিল চরিত্রহীনতার দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা।

মীরা চিঠি রেখে এসেছিল। তা ছাড়া জানতাম, অনাথবাবু নির্মম আঘাত পেয়েও কোন খোজ করবেন না মীরার। তাই হ'ল। গেলাম কলকাতায়, রেজেষ্ট্রী করে বিয়ে হ'ল আমাদের। কিন্তু এবার সমস্যা দাঁড়াল; কাজ জুটে না কিছুতেই সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি সারা কলকাতায় ঘুরেও। মাসদুয়েক পর, হঠাৎ দেখতে পেলাম সৌভাগ্যের মুখ, তখনও মীরার সমস্ত অলঙ্কার স্যাকরার দোকানে গিয়ে পৌঁছয় নি। এলাম এই সোনাছড়ায়। তার পর···

এই সেই মীরা। দীর্ঘ কয়েক বছর কেটেছে আমাদের দাম্পত্য জীবন। সত্য কথা বলতে কি তাপস, একটি দিনের জন্যেও ভালবাসতে পারে নি আমাকে মীরা। শিক্ষক হিসেবে আমাকে শ্রদ্ধা করত সে খুব। সেই শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতার বোঝাই শুধু পেলাম দিনের পর দিন, বছর ধরে। তার পর আজ যখন দেখছি তার ভাবান্তর তখন কি করে মন স্থির থাকে বল, আমিও ত রক্তমাংসের মানুষ! সুনেত্রা প্রত্যাখ্যান করেছিল, কিন্তু এক্ষেত্রে সে তা করছে না। তবুও আমি বঞ্চিত, তার ভালবাসা দানা বেঁধে উঠবে না আমার উপর। আবার সেই ঝড় উঠেছে তাপস, সারা মনকে আলোড়িত করে। কি করে যে এর গতিরোধ করব আমি ভেবে উঠতে পারছি না।

মীরা আমাকে ভালবাসে না, জানি। কিন্তু সেই আজ আমার একমাত্র অবলম্বন। তা না হলে আমি বাঁচব কি নিয়ে। তুই মনে দুঃখ পাবি, কিন্তু উপায় যে কিছুই নেই তাপস। আমাকে তুই ক্ষমা করিস। আমার শুভেচ্ছা তোর উপর থাকবে চিরদিন। ভালবাসা জানিস। ইতি তোর

সদানন্দ

নির্জীবের মত এলিয়ে পড়েছিলাম চেয়ারে। হঠাৎ কে যেন আমাকে চাবুকের তীব্র আঘাতে জর্জরিত করে তুলল—কে যেন কানে কানে বলল—না, কিছুতেই হতে পারে না এ অন্যায়, সদানন্দকে বঞ্চিত করা তোমার মহাপাপ হবে তাপস।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চকিতে উঠে দাঁড়ালাম। টলতে টলতে গিয়ে বসলাম টেবিলে। তার পর অনেক কষ্টে নিজেকে একটু প্রকৃতিস্থ করে একখানা 'নোট' লিখলাম ম্যানেজারকে: বিশেষ তার পেয়ে আমি দেশে যাচ্ছি।

অন্ধকার, কৃষ্ণপক্ষের রাত। বাইকের আলো জেলে বেরিয়ে পড়েছি রাস্তায়। রাত এগারটায় ট্রেন। মাইল ছয়েক দূরে ব্রাঞ্চ লাইনের ষ্টেশন। গঙ্গারাম ট্রলীতে করে আমার ট্রাঙ্ক বিছানা নিয়ে চলে গেছে ঘণ্টাখানেক আগে।

সোনাছড়া ব্রীজের পাশে এসে নামলাম এবার। বাইকের উজ্জ্বল আলো পড়েছে সোনাছড়ার জল-ধারার উপর। সেই কল কল, ছল ছল ছন্দে নিজের আনন্দ নিয়ে বয়ে চলেছে সোনাছড়া। পা যেন চলতে চাইল না কয়েক মুহূর্ত।

তার পর মিনিটকয়েক পরই এলাম রাস্তার সেই মোড়টায়, যেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় পণ্ডিতবাবুর গোটা বাড়ীখানা। কিন্তু রাতের গভীর অন্ধকার ঢেকে দিয়েছে সমস্ত সোনাছড়াকে। শুধু চোখে পড়ল খোলা জানালাগুলো, ভেতরের অনুজ্জ্বল আলো ম্লান হয়ে বেরিয়ে এসেছে গবাক্ষ-পথে।

একটা অব্যক্ত বেদনায় বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠল। বাইক থেকে নেমে মুহূর্তকয়েক নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইলাম সেদিকে।

তার পর, বাইকে আরোহণ করলাম ঠিক যেন যন্ত্র-চালিতের মত। কলকাতা ছাড়ার সময় সদানন্দের চোখে জল দেখেছিলাম। চোখ ফেটে জল বেরুলে আমি হয়ত বেঁচে যেতাম। কিন্তু চোখ দুটি তখন হয়ে উঠেছে শুষ্ক কঠিন মরুভূমি। এগিয়ে চললাম অন্ধকার পথ অতিক্রম করে। পিছনে পড়ে রইল সদানন্দ, মীরা, আর তার কাজলকালো চোখের দৃষ্টি।

পা দুখানা চলেছে অদম্য গতিতে। আর অন্য দিকে গোটা হৃৎপিণ্ডটা কে যেন সমূলে উপড়ে ফেলে নির্মম ভাবে পিষে ফেলছে জাঁতাকলের কঠিন পাষাণে।

আমাদের পরিচ্ছদ

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী গৃহস্থের সংসারে যত প্রকার পাপ প্রবেশ করিয়াছে, ভোজন-বিলাসিতা তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ। আমার এক এক সময় মনে হয় যে শুধু ভোজন-বিলাসিতা কেন, পরিচ্ছদ-বিলাসিতাও—বিশেষতঃ মহিলাসমাজে—বড় সামান্য পাপ নহে। আমি আমার এই সুদীর্ঘ জীবনকালে মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ-বিলাসিতার কথা চিন্তা করিয়া থাকি। আমাদের বাল্যকালে, সাধারণ বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা যেরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন তাহার সহিত তুলনা করিলে বর্ত্তমান কালের পরিচ্ছদে ভূষিত সেকালের সেই বাঙ্গালীকে অবাঙ্গালী বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য আমি কলিকাতা ও পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য শহরের অধিবাসী বাঙ্গালীর কথাই বলিতেছি। সুদূর মফস্বলে কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, দেখিলে মনে হয় তাঁহারা সেকালের সেই বাঙ্গালীই আছেন। পরিচ্ছদে তাঁহাদের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

আমি বাল্যকালে দেখিয়াছি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ছেলেরা দশ-এগার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাটীতে নগ্ন অবস্থায় থাকিত। তখন বালক-বালিকাদের জন্য প্যাণ্ট অথবা হাফ প্যাণ্ট এবং ইজার প্রচলিত ছিল না। হাফ প্যাণ্টের প্রচলন হয় এখন ইহতে পঞ্চাশ বা ষাট বৎসর পূর্ব্বে। লর্ড কিচেনার যখন ভারতের প্রধান সেনাপতি ছিলেন তখন তিনি সৈনিকদিগের জন্য এই হাফ প্যাণ্টের প্রচলন করেন। তিনি বোধ হয় মনে করিয়া থাকিবেন যে, গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে গ্রীষ্মকালে সুদীর্ঘ আগুল্‌ফলম্বিত প্যাণ্টের পরিবর্ত্তে হাফ প্যাণ্ট ব্যবহার করিলে সৈনিক বিভাগে হাজার হাজার টাকার অপব্যয় নিবারিত হইতে পারে। তৎপূর্ব্বে সকল ঋতুতেই কি ভারতীয় আর কি শ্বেতাঙ্গ উভয়বিধ সৈনিকেরাই ফুল প্যাণ্ট ব্যবহার করিত। সামরিক বিভাগ হইতে এই হাফ প্যাণ্টের ব্যবহার ক্রমশঃ শহরবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোকেদের মধ্যেও প্রবর্ত্তিত হয়। সেকালে বাঙ্গালী ধনবানেরা বিলাসিতা-প্রকাশের জন্য অতি সূক্ষ্ম—স্বচ্ছ বলিলেই হয়—বস্ত্র পরিধান করিতেন। প্রধানতঃ ঢাকা, শান্তিপুর ও চন্দননগর এবং তৎসন্নিহিত স্থানে তন্তুবায়েরা ঐ সকল বস্ত্র বয়ন করিত। আমি বাল্যকালে দেখিয়াছি, চন্দননগরে প্রায় দুই হাজার তাঁত ছিল। এখন সেস্থলে দুই শত তাঁত আছে কিনা সন্দেহ। আমার বিশ্বাস ঢাকা এবং শান্তিপুরেও ঐরূপ তাঁতের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। আজকাল কলিকাতায় বড় বড় বস্ত্রালয়ে ফরাসডাঙ্গার ধুতি বা শাড়ী নামে যে সকল ধুতি বা শাড়ী বিক্রয় হয় তাহার শতকরা আশী বা পঁচাশীখানা চন্দননগরের তাঁতিদের দ্বারা বয়ন করানো হয় না। চন্দননগরের সন্নিহিত খরসরাই, বেগমপুর ও ধনেখালি প্রভৃতি স্থানের তাঁতিরা তাহা বয়ন করে। চন্দননগরের ব্যাপারীরা ঐ সকল তাঁতিকে অগ্রিম দাদন দিয়া বস্ত্র বয়ন করান। কোরা বস্ত্র চন্দননগরে আনিয়া স্থানীয় রজকদিগের দ্বারা ধৌত করাইয়া কলিকাতার বস্ত্রবিক্রেতারা বিক্রয় করিয়া থাকেন।

নগরের বিলাসী "বাবু"রা সেকালে যেরূপ বস্ত্র ব্যবহার করিতেন তাহাতে তাঁহাদের শ্লীলতা সম্যক্ রক্ষিত হইত বলিয়া মনে হয় না। তাই বোধ হয় সেকালের সুরুচিসম্পন্ন 'বাবু'রা হাফ প্যাণ্ট বা জাঙ্গিয়া ব্যবহারের প্রয়োজন অনুভবপূর্ব্বক হাফ প্যাণ্ট ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের দেখাদেখি সুরুচিসম্পন্না ভদ্রমহিলারাও 'সেমিজ' এবং 'সায়া' ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। আমার মনে পড়ে ১৮৯১ বা ৯২ খ্রীষ্টাব্দে আমি কলিকাতায় আসিয়া প্রথম সেমিজ-পরিহিতা বাঙ্গালী মেয়েদিগকে দেখিতে পাই। তাহা দেখিয়া আমিও আমার স্ত্রীর জন্য এক জোড়া সেমিজ কিনিয়া বাড়ীতে লইয়া যাই। তখন আমার স্ত্রী কিশোরী মাত্র। যৌবনে পদার্পণ করেন নাই। আমার জননী সেই সেমিজ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এ ত বেশ জামা। এতে মেয়েদের আব্রু রক্ষে হয়।" তদবধি আমাদের বাটীতে সেমিজের ব্যবহার চলিতে লাগিল।

সেই সময় আমার জননী আমার পত্নীকে লইয়া কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে যান। আমি সঙ্গে ছিলাম। সেখানে আমার ঠাকুরমা সম্পর্কীয়া এক প্রৌঢ়া সেমিজ-পরিহিতা আমার স্ত্রীকে দেখিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "যোগীন, বৌকে ঘাগরা কিনে দিইছিস, এইবারে এক জোড়া জুতো কিনে দে, তা হলে পুরো মেমসাহেব হবে।" হায় রে, সেকালের প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধার দল! আজ যদি তাঁহারা জীবিত থাকিতেন তবে তাঁহারা স্কুল-কলেজের ছাত্রীদিগকে দেখিয়া কি ভাবিতেন?

বাঙ্গালী পুরুষের হাফ প্যাণ্ট এবং স্ত্রীলোকদিগের সেমিজ, সায়া যে তাঁহাদের রুচির উন্নতির পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। শিশু ও বালক-বালিকাদিগের হাফ প্যাণ্ট

অথবা ফ্রক ব্যবহারও সুরুচির পরিচায়ক। আমার জননীর মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহাদের বাল্যকালে অল্পবয়স্কা বালিকাদের জন্য এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র গামছার ন্যায় বস্ত্র পাওয়া যাইত। তাহাকে "ঠেঁটী" বলিত। তাহা দ্বারা কোমর একফের জড়ানো হইত এবং তাহা হাঁটুর নীচে নামিত না। এই ঠেঁটী বালিকারা ব্যবহার করিত, বালকেরা নহে। দশ-এগার বৎসর বয়সের বালকেরা কেবল স্কুলে যাইবার সময় পাঁচ হাত দীর্ঘ এবং সেই অনুপাতে প্রস্থ ধুতি ব্যবহার করিত। এখনকার বালকদিগের মধ্যে সেইরূপ ক্ষুদ্র ধুতির ব্যবহার নাই বলিলেই হয়। এখন শতকরা নিরানব্বই জন ছাত্র হাফ প্যাণ্ট পরিয়া বিদ্যালয়ে গমন করে। আজকাল কলিকাতায় ও মফস্বলে কলেজের ছাত্ররাও অনেকে হাফ প্যাণ্ট ও পুরা প্যাণ্ট পরিয়া কলেজে যায়।

আমরা বাল্যকালে যে স্কুলে পড়িতাম, সেই স্কুলে প্রধান শিক্ষক (হেড মাষ্টার) ব্যতীত অন্য কোন শিক্ষক প্যাণ্ট ও চোগা চোপকান ব্যবহার করিতেন না। হেড মাষ্টার মহাশয় প্যাণ্ট এবং চাপকান পড়িয়া স্কুলে আসিতেন। সেকালে চাপকান ব্যবহারকারীরা প্রায় সকলেই ধুতি পরিধান করিয়া তাহার উপর চাপকান পরিতেন এবং চাপকানের সঙ্গে উড়ানিও ব্যবহার করিতেন। সেই উড়ানি লম্বালম্বি পাক দিয়া দড়ির মত হইলে তাহাই বগলের নীচে দিয়া বুকের উপর ঢ্যারার মত করিয়া দুই কাঁধে ফেলিতেন। আমরা অনেককে ধুতি ও চাপকানের সঙ্গে চোগা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। আজকাল যেরূপ প্যাণ্টুলানের বহুল প্রচলন হইয়াছে, সেকালে সেরূপ ছিল না। যাত্রার দলে জুড়িরাই প্যাণ্টুলানের সঙ্গে চোগা চাপকান ব্যবহার করিত এবং মাথায় টুপি পরিত। বালক ও কিশোর গায়কেরা প্যাণ্ট পরিয়া আসরে নামিত। তাহাদের পোশাক জরিতে ঝলমল করিত।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে আমি আমাদের শহরের স্কুল ছাড়িয়া যখন হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হই তখন দেখিলাম যে, কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকেরা কেহ-বা প্যাণ্টুলানের সহিত আবার কেহ-বা ধুতির সহিত চাপকান পরিয়া স্কুলে আসিতেন। ইঁহারা সকলেই চাপকানের উপর ঢ্যারার আকারে চাদর ব্যবহার করিতেন, কেবল প্রধান শিক্ষক মহাশয় চোগার উপর চাপকান গায়ে দিয়া আসিতেন। আজকাল বোধ হয়, শহর অঞ্চলে কোন শিক্ষকই ধুতি পরিয়া স্কুলে যান না, হয়ত অতি অল্পসংখ্যক শিক্ষকই ধুতি ব্যবহার করেন। আমার মনে হয় দেশ স্বাধীন হইবার পর ধুতি-পরিহিত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল মাননীয় ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভা-সমিতি ও দরবারে বাঙালী ভদ্রলোকের পরিচ্ছদ ধুতি, জামা ও চাদর পরিধান করিয়া গমন করেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়েরাও দেখিতে পাই, খাঁটি বাঙালী পরিচ্ছদই ব্যবহার করেন। সেকালে বাঙালী চিকিৎসকগণের মধ্যে প্রায় সকলেই কোট-প্যাণ্ট ব্যবহার করিতেন। খ্যাতনামা চিকিৎসকগণের মধ্যে একমাত্র সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় ধুতি পরিয়া সর্ব্বত্র গমন করিতেন। তিনি ধুতির সহিত চটি জুতাও ব্যবহার করিতেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে আমি যখন প্রথম জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে যাই তখন দেখিলাম যে, ঠাকুর-পরিবারে বালক, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধনির্ব্বিশেষে সকলেই বাড়ীতে প্যাণ্ট বা পায়জামা পরিধান করিয়া থাকেন। আজকাল কলিকাতায় বোধ হয়, এইরূপ প্যাণ্ট বা পায়জামা ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। আমি এক এক সময়ে ভাবি, ইংরেজ আমাদের দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেও ইংরেজী পরিচ্ছদ এদেশে বাঙালী-পরিবারে পুরুষদের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছে। বাংলার মহিলাসমাজে গাউনের প্রচলন হয় নাই বটে, তবে ১৬।১৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছাত্রীদের মধ্যে অনেককে আজানুলম্বিত ফ্রক পরিধান করিয়া স্কুলে-কলেজে যাইতে দেখিতে পাই।

আমাদের সমাজে এই পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের দুইটি কারণ প্রধান বলিয়া মনে করি। প্রথম কারণ—আমাদের কাছা-কোঁচাযুক্ত ধুতি পরিধান ক্ষিপ্রতার অনুকূল নহে। হঠাৎ দৌড়াইতে হইলে বা দ্রুত পদে যাইতে হইলে আমরা শিথিল কাছাকোঁচা সামলাইবার জন্য মল্লকচ্ছ হই বা মালকোঁচা মারিয়া কাপড় আঁটিয়া পরি। প্যাণ্ট, হাফ-প্যাণ্ট বা ইজের-পায়জামা পরা থাকিলে আমাদিগকে আর মালকোঁচা মারিবার হাঙ্গামা পোহাইতে হয় না। প্যাণ্ট ব্যবহারের দ্বিতীয় কারণ ব্যয়সঙ্কোচ। আমরা বাঙালী ভদ্রলোকেরা সাধারণতঃ সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিতে ভালবাসি। কিন্তু সূক্ষ্মবস্ত্র দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। অপেক্ষাকৃত স্থূল বস্ত্রে প্যাণ্ট তৈয়ারি হয়। একবার প্যাণ্ট তৈয়ারি হইলে তাহা অনেকদিন ধরিয়া ব্যবহার করা চলে। সুতরাং উহার জন্য অল্প অর্থ ব্যয় হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আমাদের পরিচ্ছদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন :

> "আমাদের Dress টা হবে English কিংবা Greek
> তাহা আজও করতে পারিনে ঠিক।"

আমার তাই সময় সময় মনে হয় আমাদের সমাজে সকল বিষয়ে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে পরিচ্ছদ-বিপ্লবও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এজন্য আমাদের জাতীয়তাকে কোন-রূপেই ক্ষুণ্ণ করা উচিত নয়। আমাদের পরিচ্ছদ এইরূপ

হওয়া উচিত যাহাতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীরা কেবল আমাদের পরিচ্ছদ দেখিয়াই বুঝিতে পারে যে আমরা বাঙ্গালী, পঞ্জাবীরা পাগড়ি পরিয়া আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। পারসীকদিগেরও মস্তকাবরণ বা টুপি তাহাদের জাতীয়তার পরিচায়ক, কিন্তু আমাদের এমন কোন পোশাক নাই যাহা অন্য সমাজে পরিয়া গেলে লোকে আমাদিগকে বাঙ্গালী হিন্দু বলিয়া চিনিতে পারে। আমাদের সমাজে কোনরূপ মস্তকাবরণ প্রচলিত নাই। বহুকাল পূর্ব্বে কোনরূপ ছিল কিনা তাহা বলা কঠিন। এখন হইতে দেড় শত বা দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ভদ্র বাঙ্গালী হিন্দুরা ধুতি এবং উড়ানি বা চাদর মাত্র ব্যবহার করিতেন। কোনরূপ জামা ব্যবহার করা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন। ইহার অন্যতম প্রধান দৃষ্টান্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি শীতকাল ব্যতীত অন্য কোন ঋতুতে জামা গায়ে দিতেন না। আমি একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনি কি কখনও ধুতি চাদর ছাড়া অন্য পোশাক পরেন না?" হাসিয়া তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "ওরে সেকথা বলিস কেন? একবার যে বিপদে পড়েছিলাম সে বলবার কথা নয়। একবার ছোটলাটের দরবারে আমার নিমন্ত্রণ হয়েছিল। আমাকে সকলে পরামর্শ দিলেন দরবারে যেতে গেলে দরবারী পোশাক পরে যাওয়া উচিত, অর্থাৎ—ইজের চাপকান ও চোগা কিংবা সাহেবি পোশাক কোট-প্যান্ট পরে যেতে হয়। আমি ত মুশকিলে পড়লাম। সেই চোগা-চাপকান আর ইজের পরে দরবারে গেলাম, কিন্তু যতক্ষণ সেখানে ছিলাম ভয়ানক অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। দরবারের শেষে আমি ছোটলাটকে বললাম, 'আমাকে আর কখনও দরবারে ডাকবেন না। দরবারী পোশাক আমার সহ্য হয় না।' শুনে ছোটলাট বাহাদুর বললেন, 'তুমি তোমার ইচ্ছামত পোশাক পরেই এসো, তবে শরীরটা যেন আবৃত থাকে'।" যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে তিনি ধুতি ও চাদরে বার মাস কিরূপ শরীর আবৃত করিয়া রাখিতেন। তিনি বাহিরে কোথাও যাইতে হইলে চাদরে গা ঢাকিয়া যাইতেন, কিন্তু বাটীতে সর্ব্বদা (শীতকাল ব্যতীত কেবল ধুতি মাত্র পরিয়া থাকিতেন। চাদর গায়ে দিতেন না।

ইজের, চোগা, চাপকান আমরা মুসলমানদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তারপর ইংরেজদের নিকট হইতে কোট-প্যান্ট, নেকটাই, কলার প্রভৃতির ব্যবহার শিখিয়াছি আর ভুলিয়া গিয়াছি যে, এই বিদেশীয় পরিচ্ছদ আমাদের পরানুকরণের উৎকটমোহ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আজকাল কলিকাতা অঞ্চলে অনেক ভদ্র বাঙ্গালী হিন্দু বাটীতে 'লুঙ্গি' ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং ইদানীং অনেকেও লুঙ্গি পরিয়া পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে বাহির হইয়া থাকেন। এই লুঙ্গি ব্রহ্মদেশীয় পরিচ্ছদ। উহা বর্ম্মীদিগের জাতীয় পরিচ্ছদ। ব্রহ্মদেশ ইংরেজের অধীন হইবার পূর্ব্বে রাজা-মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া পথের মুটে-মজুর পর্য্যন্ত স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে সকলেরই উহা একমাত্র পরিধেয় ছিল। লর্ড ডাফরিন ব্রহ্মদেশকে ইংরেজের রাজ্যভুক্ত করিলে তদানীন্তন রাজকুমার মেহন গুইন ও বহু উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ সপরিবারে ফরাসী চন্দননগরে আসিয়া কিছুদিনের জন্য আশ্রয় লইয়াছিলেন। আমরা তখন দেখিয়াছি রাজকুমার স্বয়ং এবং তাঁহার অনুচরেরা বহুমূল্য রেশমী লুঙ্গি পরিধানপূর্ব্বক পথে বাহির হইতেন। এখনও কলিকাতায় যে সকল বর্ম্মী বাস করেন তাঁহারা পরিধানে লুঙ্গি এবং মাথায় রুমাল বাঁধিয়া থাকেন। এই লুঙ্গি ব্রহ্মদেশ হইতে আরাকানের ভিতর দিয়া পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান সমাজে প্রচলিত হয়।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, ইউরোপীয়, চীনা, আফগান প্রভৃতি অভারতীয় এবং ভারতের মধ্যে পঞ্জাবী, পারসীক, নেপালী, ভুটানী প্রভৃতি জাতিকে তাহাদের পোশাক দেখিলেই আমরা চিনিতে পারি, কিন্তু বাঙ্গালীর এমন কোন জাতীয় পরিচ্ছদ এখন নাই যাহা দেখিলে সকলে তাহাকে বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে পারে। ইহা কি আমাদের লজ্জার কথা, না গৌরবের কথা?

শিক্ষা-সঙ্কট

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

সেদিন গোবরডাঙ্গায় গিয়াছিলাম। নেতাজীর জন্মদিন-উৎসব। এই সুযোগে নানা লোকে নানা রকম প্রচারকার্য্য চালান। ঐখানকার সভায়ও কেহ কেহ এই সুযোগ লইতে ছাড়েন নাই। এক বক্তা তাঁহার সাম্প্রতিক চীন-ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছিলেন। সেখানকার সবই ভাল। অল্প সময়ে এত কাজ করিয়া ফেলিয়াছে সেখানকার রাষ্ট্র যে, তিনি এবং তাঁহার মত আরও অনেকে, মায় তাঁহার সঙ্গীরা অবাক্ বনিয়া গিয়াছেন! তবে উক্ত বক্তা নূতন চীনের শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা যাহা বলিলেন তাহা বাস্তবিকই মনে লাগিল। চীনে যে শাসনতন্ত্র চালু হইয়াছে তাহা ভাল কি মন্দ, কি মন্দের ভাল কিছুই বলিতেছি না, তাহা বলিবার অধিকারও হয়ত আমার নাই। কিন্তু সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ স্বল্পকালের ভিতর ছেলেমেয়েদের মধ্যেও নূতন যুগের নূতন বাণী হৃদ্‌গত করাইতে সক্ষম হইয়াছেন শুনিয়া খানিকটা ভূয়োদর্শন হইল। আমরা এখানে কি করিতেছি? আজ সাত বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল—জাতির ভবিষ্যৎ কিশোর ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষা তথা জাতীয় সংস্কৃতি-ঐতিহ্য এবং জীবনধারার উপযোগী শিক্ষাদানের কি ব্যবস্থা করা হইতেছে? প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে আজ এই প্রশ্ন। পিতা-মাতা, অভিভাবক-অভিভাবিকা আর কি করিবেন, তাঁহারা গড্ডলিকা প্রবাহে গা ঢালিয়া প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি মারফত ছেলেমেয়েদের কি ভ্রান্ত পথেই না চালনা করিতে বাধ্য হইতেছেন।

আধুনিক শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে কিছুকাল যাবৎ আলোচনা-গবেষণায় লিপ্ত থাকিতে হইয়াছে। এই চুঁচুড়াতেই নূতন শিক্ষার প্রবর্ত্তন, কলিকাতায় নয়। পাদ্রী রবার্ট মে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ধর্ম্মপ্রচার ছাড়িয়া নূতন ধরণের পাঠশালা স্থাপনে মন দিলেন—চুঁচুড়ায় ও তার আশেপাশে। এ সব পাঠশালা ছিল বাংলা শিক্ষার পাঠশালা। পরে কিছু কিছু ইংরেজী শিখাইবারও ব্যবস্থা হয় এখানে। সুষ্ঠু ইংরেজী শিক্ষা বিষয়ে কিন্তু কলিকাতাই অগ্রণী, এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যেই ইহার প্রথম স্থান। আজকাল এক শ্রেণীর লোক দেখা দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সাংবাদিকও আছেন, —বলিয়া থাকেন বাঙালী কোন বিষয়েই অগ্রণীত্বের দাবি করিতে পারে না—কি শিক্ষায়, কি সভাসমিতি প্রতিষ্ঠায়, কি রাজনৈতিক প্রচেষ্টায়। তাঁহারা এরূপ দাবির মধ্যে নাকি প্রাদেশিকতার গন্ধও পান! আমরা প্রাদেশিক-ভাবাপন্ন, প্রাদেশিকতা-দোষে দুষ্ট—কয়েক বৎসর যাবৎ এই কথা শুনিতে শুনিতে নিজেদের যেন এইরূপ ভাবিতেই ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইতেছি। অনবরত মিথ্যাপ্রচারের এমনই মাহাত্ম্য!

২

যাহা হউক, শিক্ষা-ব্যাপারে আমরা কখনই পশ্চাৎপদ ছিলাম না। শত শত বৎসর ধরিয়া বিদেশীর আক্রমণ, স্বার্থ ও ধর্ম্মান্ধদের অত্যাচার—নানা বিপদ-আপদের মধ্যেও ভারতবাসী শিক্ষার ধুনি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন। শিক্ষা বা জ্ঞানলাভের প্রতি ভারতবাসীর স্বাভাবিক প্রীতির কথা শত্রু-মিত্র অনেকেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আর একটি বিষয়ও এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। আমরা কখনও নূতনকে ভয় করি নাই। নূতনের আহ্বান সাগ্রহে শুনিয়াছি, দেশ-কাল-পাত্র অনুযায়ী যাচাই করিয়া যতটুকু লইবার লইয়াছি, যতটুকু বর্জ্জন করিবার, ছাড়িয়াছি। ভারতবর্ষের মাটিরই এই গুণ।

ইংরেজ আমলের প্রথম যুগেও এইরূপই ঘটিয়াছে দেখিতে পাই। তখন শিক্ষার—বিশেষতঃ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার দায় রাষ্ট্র গ্রহণ না করিলেও আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ নিজ নিজ সন্তানকে ইংরেজী শিক্ষাদানে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্যবস্থাও করিতেছিলেন। ইংরেজী শিখিলে রাজ-সরকারে চাকুরি পাইব—এ বোধ আমাদের মধ্যে জন্মে মোটামুটি ১৮৩৫ সনের পর হইতে। ১৮৪৪ সনে বড়লাট হার্ডিঞ্জের ঘোষণায় এই বোধ সম্পূর্ণ পাকা হয়। ইহার পূর্ব্বে নহে। হার্ডিঞ্জের ঘোষণার ত্রিশ বৎসর আগেই যে এখানে বাঙালীদের মধ্যে নব্যশিক্ষার আয়োজন হয় তাহার তাগিদ ছিল দুইটি—এক: ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজের সহ-যোগিতা করা; দুই: পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়লাভ। তখনকার সমাজ আমাদের নিকট যে রকম চিত্রিত, তাহাতে শেষোক্তটি সম্বন্ধে স্বতঃই মনে সন্দেহের উদয় হইতে পারে। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে—সে যুগের নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের বর্ণনা পাঠ করিলে একথা বুঝা আদৌ ক্লেশকর নয় যে, তখনও নব নব বিদ্যা বা জ্ঞান অর্জ্জন-স্পৃহা আমাদের মন হইতে লোপ পায় নাই। হিন্দু কলেজ স্থাপনোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম দিনকার সভার (১৪ মে, ১৮১৬) কথা স্মরণ করা যাক্। সভার প্রাক্কালে এক জন বিখ্যাত

পণ্ডিত সভা-আহ্বানকারী সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর এড্‌ওয়ার্ড হাইড ঈষ্টের হাতে একটি ফুল দিয়া বলিলেন —প্রাচ্য-বিদ্যার নিদর্শনস্বরূপ এটি গ্রহণ করুন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য-বিদ্যার সার্থক অনুশীলন ও বিনিময়ের জন্তই এই ফুলটি উপহার দেওয়া হইয়াছিল। সামান্ত ঘটনা। কিন্তু ইহার মধ্যেই ভারতবাসীর নূতন নূতন বিদ্যা বা জ্ঞান আহরণ-স্পৃহার পরিচয় মিলে।

সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আধিপত্য শুধু প্রসারিত নয়, ক্রমে একেবারে দৃঢ়মূল হইল। এরূপ বিরাট রাজ্য শাসনে বিস্তর লোক দরকার। আবার ইংরেজী-জানা লোক বেশী প্রয়োজন। কারণ ইংরেজের ভাষা না বুঝিলে তাহাদের মতানুবর্ত্তী হইয়া কাজ চালাইবে কিরূপে? ১৮৩৫ সনে ধার্য্য হইল শিক্ষার বাহন ইংরেজী, ১৮৪৪ সনে প্রচারিত হইল ইংরেজী-জানা লোকই সরকারে বেশী গৃহীত হইবে। সরকার বা রাষ্ট্র নিজ প্রয়োজন-সিদ্ধির তাগিদে শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণে অভিনিবিষ্ট হইলেন। এখানে বাংলাদেশের কথাই বিশেষ করিয়া জানা যাইবে। কারণ সমগ্র ভারতের রাজধানী ছিল এই কলিকাতা নগরী। এখান হইতেই সকল বিধি-বিধান প্রচারিত হইতেছিল। শিক্ষা-বিষয়েও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রধান জেলা-শহরগুলিতে কোন কোন স্থলে কলেজ, —যেমন হুগলী, ঢাকা, কৃষ্ণনগর, পাটনা প্রভৃতি, আবার বহু স্থলে ইংরেজী স্কুল সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইল। এখানে একটি কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক। ১৮৪২ সনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতের, মায় দিল্লীর শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হইত এই কলিকাতা নগরী হইতে। ইহার পর ১৮৫৭ সনে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রত্যেক প্রদেশে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেও—(আধুনিক পরিভাষায়) সরকারী শিক্ষা-অধিকর্ত্তা নিয়োগ দ্বারা প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতম শিক্ষা সাক্ষাৎ ভাবে নিয়ন্ত্রণে সরকার মনোযোগী হইলেন। কখনও প্রাথমিক শিক্ষা, কখনও মাধ্যমিক শিক্ষা, আবার কখনও উচ্চতম শিক্ষার উপর ঝোঁক দেওয়া হইল। কখনও-বা একটির প্রসারকল্পে অন্যটি সঙ্কুচিত করিতে সরকার প্রয়াস পান। কমিটি কমিশন কতই না বসানো হয়। শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তনও সাধিত হয় পাঠ্য বিষয় বদলাইয়া—প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করিয়া। এইরূপে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে বহুতর বাঁক ঘুরিয়া আমরা যা-হোক একটা মানে উপস্থিত হইলাম। ইহার মধ্যে আমাদের স্বাধীনতা লব্ধ হইল ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট।

৩

আমরা এখন সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশ, নূতন দায়িত্ব এবং নব নব কর্ত্তব্যের সম্মুখীন হইয়াছি। পরাধীন অবস্থায় বিদেশী রাষ্ট্র দ্বারা যে-যে উদ্দেশ্যে শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হইত তাহা মূলতঃ নিরাকৃত হইয়াছে। এখন আমাদের নূতন করিয়া যাত্রা সুরু করিতে হইবে। এই যাত্রাপথে সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপদ্ধতিই আমাদের জীবনে রস ও রসদ পরিবেশন করিবে। কিন্তু সেই সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপদ্ধতি—যাহা হইবে নূতন পরিবেশে নবজাতীয়তা তথা সত্যকার মনুষ্যত্ববোধ উন্মেষের সহায়ক তাহা কি বস্তু? এই বিষয়ে পথ-নির্দ্দেশের পক্ষে আবার একটু পুরনো ইতিহাসের পাতা উল্টানো আবশ্যক। ব্রিটিশ আমলে, আধুনিক যুগে 'জাতিভেদ' বা ইংরেজী 'caste system' কথাটির বড় চল। এই কথাটির দ্বারা ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার সত্যকার রূপ আমাদের চক্ষে ধরা পড়ে না, ইহা দ্বারা আমরা বুঝি—সমাজের শ্রেণী বা সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পার্থক্য, বিভিন্নতা, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্নতা। কিন্তু ভারতীয়—যাহাকে আমরা হিন্দুও বলিতে পারি, সমাজ-ব্যবস্থা বড়ই মৌলিক। এই ব্যবস্থায় যখন ঘুণ ধরিয়াছে তখন বিবর্ত্তনবাদী বা বিপ্লবী সংস্কারকের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে বেদাদির আবির্ভাব কালেও যে তাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সূত্র-শ্লোকাদিতে ধৃত বিষয়াদিসমূহ হইতে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। ঐতিহাসিক যুগে—বুদ্ধদেব হইতে আরম্ভ করিয়া রামমোহন রায় পর্য্যন্ত অনেকে সমাজ-ব্যবস্থার উন্নতি বা সংস্কারসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু মূল সমাজ-ব্যবস্থা যুগে যুগে সংস্কৃত ও পরিশুদ্ধ হইয়া বরাবরই অটুট ছিল, আর এইজন্তই বহু সহস্র বৎসরেও—যখন অন্যান্য দেশের বিভিন্ন সভ্যতা বিলুপ্ত হইয়া কতকগুলি নিদর্শন বা স্মৃতিতে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে তখনও—টিকিয়া রহিয়াছে। হিন্দুর ধর্ম্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের মূল ধারক ও বাহক এই সমাজ-ব্যবস্থা। এমন একটি ব্যবস্থাকে 'জাতিভেদ' বলিয়া অসম্মান করিবেন না, অমর্য্যাদা দেখাইবেন না।

কিন্তু ইংরেজ আমলে আমাদের এই সমাজ-ব্যবস্থার মূলে ভীষণ আঘাত লাগিয়াছে। ইংরেজ ইচ্ছা করিয়াই যে একার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা নহে। বিজ্ঞানের নিত্য নূতন আবিষ্কারের ফলে পাশ্চাত্ত্যে যে শিল্প-বিপ্লব দেখা দেয়, প্রথম যুগে তাহার দ্বারা প্রভূত লাভবান হইয়াছে ব্রিটিশ জাতি। বিজ্ঞানের সহায়ে তাহারা পররাজ্য জয় করিয়াছে, অধীন রাজ্য হইতে কাঁচা মাল আমদানী করিয়া যন্ত্র-সাহায্যে পণ্য উৎপন্ন করিয়াছে, এই পণ্য পুনরায় অধীন রাজ্যসমূহে বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ পাইয়াছে। ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশ শাসন ও শোষণের ফলেই যে তাহাদের এত সমৃদ্ধি

ও শ্রীবৃদ্ধি সে কথা সাক্ষ্যপ্রমাণ সহযোগে বহু বার বহু যোগ্য ব্যক্তি দর্শাইয়াছেন। ইংরেজ শিক্ষাব্যবস্থাকে তাহাদের এই শাসন ও শোষণকার্য্যের উপযোগী করিয়াই তৈরি করিয়া লয়। এদেশে যে শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন হয় তাহাতে শাশ্বত সংস্কৃতি ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি আদৌ লক্ষ্য রাখা হয় নাই।

তবে একটি কথা এখানে অবশ্যই বলিতে হয়। প্রাচীন সংস্কৃত-শিক্ষা এযাবৎ শুধু ব্রাহ্মণ এবং অংশবিশেষ শুধু বৈদ্য-শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। নূতন ব্যবস্থায়, বিশেষ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মারফত সংস্কৃত অন্যতম অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া ধার্য্য হওয়ায় তাহার দ্বার আপামরসাধারণের নিকট উন্মুক্ত হয়। সংস্কৃত-শিক্ষায় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটিল। নূতন ব্যবস্থায় এইটিই পরম লাভ। কিন্তু ক্ষতি যাহা হইয়াছে তাহা জাতির অন্তর্দেশে বিষম আঘাত হানিয়াছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চতম শিক্ষা একই ছাঁচে ঢালায় সমাজে একই রকম জীবের আবির্ভাব হইয়াছে—যাহাকে সোজা সাদা কথায় বলিতে পারি—ইংরেজের শাসন এবং শোষণযন্ত্রের সহায়ক 'চাকর' বা আধুনিক ভদ্রভাষায় 'কর্ম্মী'। শিক্ষা আদৌ বৃত্তিমুখী হয় নাই। যে বিজ্ঞান ইংরেজকে অত শক্তিমান্ ও বিত্তশালী করিয়াছে তাহা আমাদের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে মাত্র এই সেদিন। শিক্ষা বৃত্তি-অনুগ না হওয়ায় প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকেই সরকারি বা সওদাগরী আপিসের দুয়ারে ধর্না দিতে হইয়াছে। শিক্ষা যখন অল্প লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তখন চাকুরি জুটাইতে বেগ পাইতে হয় নাই। কিন্তু শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বেকারের সংখ্যাও বাড়িয়া চলিল।

গত শতাব্দীর শেষ দুই দশকেই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই বিষয়টি লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলেন। শিক্ষা—বিশেষতঃ ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া মৎস্যজীবী, তন্তুবায়, সূত্রধর, ঘরামি, মিস্ত্রী, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, কাঁসারি, শাঁখারি, রকমারি কারুশিল্পী, বণিক, কৃষক, বারুজীবী, গোয়ালা, মোদক নিজ নিজ বৃত্তি ত্যাগ করে এবং সুলভ ও সহজ অর্থাগমের উপায়স্বরূপ চাকুরির অন্বেষণে ছুটিতে থাকে। ফলে প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থায় প্রচণ্ড আঘাত লাগে। সমাজ কেন্দ্রচ্যুত হইবার উপক্রম হয়। আমরা স্ব স্ব বৃত্তি ভুলিলাম; কত শিল্প বিলুপ্ত, শিল্পীশ্রেণী মৃত, শিল্পকৌশলও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত। প্রাচীন সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের প্রতি অনাদর এবং জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধহীন ইংরেজীয়ানার প্রসার আধুনিক শিক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক কুফল। এই দুইটি কুফলের হাত হইতে উদ্ধার না পাইলে জাতির কল্যাণ নাই, স্বাধীনতাও ভুয়া প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে।

৪

জগতের সকল জিনিষই ভালয় মন্দয় মিশ্রিত, নিছক ভাল, নিছক মন্দ কিছুই নাই। ব্রিটিশ আমলের শিক্ষাব্যবস্থায় যে ভাল কিছুই হয় নাই, তাহা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। ভারতবর্ষের দূরদূরান্তের লোকের ভিতরে একটা শাশ্বত যোগ বরাবরই বিদ্যমান ছিল। রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে এই যোগকে একটি জাতীয় রূপ দিতে বিশেষ সহায়তা করে ইংরেজী শিক্ষা। দৃঢ় কেন্দ্রীয় শাসনও আমাদের জাতীয়তাবোধের উন্মেষে কম রসদ জোগায় নাই। এক আইন, একই সুবিধা, একই অসুবিধা, একই রকম অনাচার অত্যাচার শোষণ আমাদিগকে এক-জাতীয়তা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু যাহাতে এই একত্ববোধ বা এক-জাতীয়তা দেশের জলমাটিতে শিকড় গাড়িয়া একটি বিপুল শক্তিরূপ মহামহীরুহে পরিণত হইতে পারে সেই উপায়সমূহ নির্ণীত হইবার সম্ভাবনা ঘটে নাই। এই সকল উপায়ের প্রধানতম—শিক্ষা। সোভিয়েট রাশিয়ার নূতন যুগের নূতন শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কারণ সেখানকার কর্ত্তারা শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ গড়ার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করিয়াছিলেন। চীন পরিক্রমার পর কেহ কেহ যে সেখানকার নূতন শিক্ষা ব্যবস্থায় মুগ্ধ হইয়াছেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু আমাদের দেশে—স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রে এই মানুষ-গড়ার কাজ কি সুরু হইয়াছে? ইংরেজীতে একটি কথা আছে—'Putting new wine into old bottle', অর্থাৎ, পুরাতন বোতলে নূতন সুরা ভর্ত্তি করা। আর যে বিষয়েই ইহা সত্য হোক, শিক্ষা-ব্যাপারে যে এটি একেবারেই সত্য নয় তাহা নিশ্চিত। তাই স্বাধীনতা-লাভের সাত বৎসর পরেও আমরা আজ বিভ্রান্ত। অনেকের মুখে অনেক কথা শুনি। কেহ বলেন—তাঁহাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের জনৈক মন্ত্রীকেও একাধিক বার বলিতে শুনি-য়াছি, আমরা উপযুক্ত মূল্য দিয়া স্বাধীনতা লাভ করি নাই। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—যুক্তরাষ্ট্র যখন স্বাধীন হইয়াছিল তখন সেখানকার দশ লক্ষ লোক সকলেই কি অস্ত্র ধরিয়াছিল? এরকমটি কোন দেশে কখন কি সম্ভব হইয়াছে? অল্পসংখ্যক লোক লড়ে, সমগ্র জাতি বা জাতির অধিকাংশ লোক তাহাদের পিছনে থাকিয়া সাহায্য করে। ইহাকে ইংরেজীতে বলা যায়—'moral support' বা নৈতিক সমর্থন। শতাধিক বর্ষে দুর্ভিক্ষে মহামারীতে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে, বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে হাজারে হাজারে লোক শতবিধ অনাচার-অত্যাচার সহ্য করিয়াছে, ফাঁসি-কাষ্ঠেও অনেকে আত্মাহুতি দিয়াছেন। শত সহস্র

ভারতবাসী ছিন্নমূল হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে। শেষে যুগশ্রেষ্ঠ মহাত্মা গান্ধীকেও প্রাণ হারাইতে হয়। ইহার পরও কি বলিব—আমরা স্বাধীনতার মূল্য দিই নাই, সাধারণ লোককে ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয়তার অপবাদ দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা কি কর্ত্তব্য?

৫

আসল কথা, নূতন পরিবেশে নূতন লোক চাই, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী চাই। যাঁহারা রাষ্ট্রের কর্ণধার তাঁহাদের নূতনকে গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে। শিক্ষাকে নূতন ধাঁচে গড়িতে হইবে। কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতেছি পুরানো বোতল। যে বোতল আমাদের মাথা ভাঙিয়াছে, কারাগারে পাঠাইয়াছে, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়াছে, আমাদের উপর অশেষ অত্যাচার-উৎপীড়ন চালাইয়াছে, বিদেশী শাসকের দক্ষিণহস্তস্বরূপ শাসন ও শোষণে সহায়তা করিয়াছে, সেই বোতলেরই প্রতাপ এখনও দেখিতেছি রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বোতলের চেহারার পরিবর্ত্তন হয়ত কোথাও কোথাও ঘটিয়াছে, কিন্তু আদতে সেই পুরাতন প্রতিক্রিয়াশীল সামগ্রিক উন্নতির পরিপন্থী মনোভাবই লক্ষ্য করিতেছি। মনের পরিবর্ত্তন দরকার—মহাত্মা গান্ধী যাহাকে বলিতেন—'change of heart', হৃদয়ের পরিবর্ত্তন। শিক্ষাক্ষেত্রে এই পরিবর্ত্তন সবচেয়ে বেশী আবশ্যক। কারণ এখানেই তো মানুষ গড়া হইবে। স্বাধীন রাষ্ট্রের দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন অধিবাসী সৃষ্টি হইবে। আজ আপনাদের ভিতরে আসিয়াছি। 'দেশবন্ধু' নাম-পূত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবস। সাতাশ বৎসর বিদ্যালয়টির বয়স। কিন্তু স্বাধীনতার পূর্ব্বে যেরকমটি ছিল, আপনাদের শিক্ষাপদ্ধতি বা শিক্ষাদান প্রণালীর এখনও কি তাহার কোন পরিবর্ত্তন আপনাদের চোখে পড়িতেছে? এক-একটি বিদ্যালয় কি তখনকার মত এখনও বেকার এবং কেরাণী সৃষ্টির এক-একটি কল রূপে বিরাজ করিতেছে না? আমরা তো এখনও যেন পরহস্ত-চালিত যন্ত্রবৎ রহিয়াছি। দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টির আয়োজন কৈ? বেকারসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু কারু সৃষ্টি হইতেছে কৈ? প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার কঙ্কাল দেখিতেছি, ইহা রসপুষ্ট হইয়া সংহত ও শক্তিমান্ হইবে কিরূপে?

ইহার একমাত্র উত্তর—সন্তান সন্ততিদের, ভবিষ্যদ্‌বংশীয়-দের নিমিত্ত সুশিক্ষার আয়োজন ও প্রসার। এখন সুশিক্ষা কাহাকে বলিব? গণতন্ত্রের একটি প্রধান কথা—সকলের জন্য সমান সুযোগের ব্যবস্থা। যাহার যেমন ক্ষমতা বা শক্তি তদনুযায়ী যাহাতে স্বাভাবিকভাবে উন্নতি বা উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে তাহার সুষ্ঠু আয়োজন। এ কথার তাৎপর্য্য, মৎস্যজীবী, সূত্রধর বা তন্তুবায়-পুত্রও স্বীয় শক্তিবিকাশের সুযোগ পাইয়া রাষ্ট্রের কর্ণধার হইতে পারিবেন, বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক বা কবি অথবা সাহিত্যিক হইতে সক্ষম হইবেন। ধনসম্পদেও এক-একটা কার্ণেগী বা রথচাইল্ড-রকফেলার হইবার সুযোগ পাইবেন। সবই ঠিক, সকলই মানিয়া লই। কিন্তু সমাজের স্থিতি চাই, অর্থাৎ সমাজের জনসাধারণেরও কল্যাণ চাই। আমার কল্যাণকে তখনই সার্থক জ্ঞান করিব যখন ইহা অপর দশ জনের কল্যাণের পরিপন্থী না হইয়া সহায়ক হইবে। কি উপায়ে আমরা এই শিক্ষা পাইতে পারি? গণতন্ত্রের মূলনীতি সম্পূর্ণ মানিয়া লইয়া সমাজের—জাতির—দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করিতে হইবে। এখানে আবার একটু পুরানো কথায় যাই। তন্তুবায় কাপড় বুনিতেন, কুম্ভকার হাঁড়ি কলসী-মূর্ত্তি গড়িতেন, স্বর্ণকার-, কর্ম্মকার-শিল্পীকুল কত রকমারি অলঙ্করণ করিতেন। এসব কি তাঁহারা করিতেন শুধু নিজেদের জন্য? নিজ নিজ বৃত্তি—জীবিকা ছিল এই সব, কিন্তু তাঁহারা এ সকলে লিপ্ত হইতেন সমগ্র সমাজের জন্য, তাহার কল্যাণের নিমিত্ত। এই যে একই সঙ্গে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত কল্যাণবোধ ইহাই তাঁহাদিগকে—তাঁহাদের প্রত্যেক শ্রেণী বা সম্প্রদায়কে জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। যুগে যুগে নানা ঘাত-প্রতি-ঘাতের মধ্যেও সমাজ-সৌধ টিকিয়া গিয়াছিল। সমাজের এই স্থিতিস্থাপকতার প্রতি বহু মনীষীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে—গত যুগেও, এযুগেও। সমাজকে দৃঢ়বদ্ধ করিতে হইবে, আধুনিক উদ্‌ভ্রান্ত মানব-সমাজকে স্থিতধী হইতে হইবে। বেকার সংখ্যা আমরা আর বাড়াইব না, দায়িত্ব কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন 'শিক্ষিতের' দল আমরা আর যেন সৃষ্টি হইতে না দিই।

৬

আজ ইহার উপায় চিন্তা করিতে হইবে। এ বিষয়ে পূর্ব্ব-সূরিগণ অনেক চিন্তা করিয়াছেন। গত শতাব্দীতেই জাতীয় শিক্ষার আয়োজন হয়। শিক্ষার বাহন ইংরেজী হইবার পর তাহার প্রতিবাদেই যেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহর্ষি) তত্ত্ব-বোধিনী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন (১৮৪০)। এখানে বাংলার মাধ্যমে বাংলা ও সংস্কৃত এবং পরে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহার ত্রিশ বৎসর পরে নবগোপাল মিত্র হিন্দু-মেলার আনুকূল্যে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। বিজ্ঞানশিক্ষা ও শারীরচর্চ্চা এ বিদ্যালয়টির বিশেষত্ব হইল। অশ্বিনীকুমার দত্ত বরিশালে ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউশন (স্কুল ও কলেজ) প্রতিষ্ঠা করিলেন শুধু কায়িক মানসিক নয়, নৈতিক

শিক্ষারও উদ্দেশ্যে। সত্য-প্রেম-পবিত্রতা বিদ্যালয়ের মূলমন্ত্র। বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালিত উচ্চতম শিক্ষার সংশোধনকল্পে কোন কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়, নানা পত্র-পত্রিকায় আলোচনাও হইতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার হের ফের' এইরূপ একটি যুগান্তকারী আলোচনা। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথকে লিখিত একখানি পত্রে।

রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম খুলেন, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব সারস্বত-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া। স্বদেশী আন্দোলন-কালে ন্যাশনাল কলেজ ও ন্যাশনাল স্কুল স্থাপিত হয়, বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটও স্থাপিত হয়—একদিকে জাতীয় সাহিত্য-ইতিহাস ও জাতীয় ভাবধারা যুবমনে অনুপ্রবিষ্ট করাইবার জন্য এবং অন্যদিকে যুবকগণের কারিগরি বিদ্যা শিক্ষালাভের পর স্বাধীন ভাবে, কিয়দংশে নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানায় জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত। অসহযোগ আন্দোলনের সময়েও বহু জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এত সব আয়োজনেও মূল সমস্যার সমাধান হইল না। আবার রাষ্ট্র ছিল বিরূপ, ব্যক্তিগত বা সমবেত প্রচেষ্টায় আশানুরূপ সাফল্যলাভ সম্ভব নয় যতক্ষণ না রাষ্ট্র ইহার সহায় হয়। এই সময় মহাত্মা গান্ধী তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি একটি নূতন উপায় লইয়া আমাদের সম্মুখে উপনীত হইলেন।

৭

উপায়টি বুনিয়াদী শিক্ষা। আমাদের নিকট নূতন ঠেকিলেও মোটের উপর এটি নূতন নয়। প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ ইয়াংকি জন ডিউয়ি এই উপায়টি—অর্থাৎ বৃত্তিমুখী শিক্ষা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রয়াসী হন অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে। বাংলায় আসানসোলের নিকটে উষাগ্রামে খ্রীষ্টান মিশনরীরা এইরূপ একটি শিক্ষাকেন্দ্র আগেই স্থাপন করিয়াছিলেন। মহাত্মজীর চিন্তাধারায় এ সকলের প্রভাব কতখানি জানি না। তাঁহার বুনিয়াদী শিক্ষাও মূলতঃ এইরূপ। তবে ইহার টেকনিক বা কৌশলে কতকটা তফাৎও রহিয়াছে। বৃত্তি-মুখী শিক্ষা, আধুনিক বাঙালী বা ভারতবাসীর নিকট এটি নূতন ঠেকিলেও, আমাদের সমাজ-জীবনে ইহা মোটেই নূতন নয়। মহাত্মাজী এক একটি শিল্পের মাধ্যমে বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করিলেন। কোন গ্রাম তন্তুবায়-প্রধান, কোন পল্লী সূত্রধর-প্রধান, কোন পল্লী কুম্ভকার-প্রধান। এই এই বৃত্তির মাধ্যমেই তিনি ছেলেদের অক্ষর-জ্ঞান হইতে সাধারণ-জ্ঞান পর্য্যন্ত দিতে চাহিয়াছিলেন। তবে তিনি চরকায় সূতাকাটা এবং তাঁতবোনার উপরই বেশী ঝোঁক দিয়াছিলেন। কারণ আমাদের কাপড়ের প্রয়োজন মিটাইতে হইলে এই শিল্পে বহুতর ব্যক্তির নিয়োগ আবশ্যক। এক-একটি শিল্প বা বৃত্তির মাধ্যমে কিরূপে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা বুনিয়াদী শিক্ষাবিদ্‌রা ভাল বলিতে পারিবেন। কিন্তু ঠিক প্রয়োজন-কালে মহাত্মাজীর এই যে উদ্ভাবন—ইহাকে আবিষ্কারও বলা যায়—ঘন তমসার ভিতরে আলোকবর্ত্তিকা-সদৃশ। ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা ইহা দ্বারা দৃঢ় হইবে। সমষ্টির জন্য যে ব্যষ্টি (তাহা অবশ্য ব্যষ্টির ব্যক্তিত্বকে বিসর্জ্জন দিয়া নয়)—এই জ্ঞান পুনরায় মানুষের মনে বদ্ধমূল হইবে। বেকার-সমস্যা এবং তদ্ভূত নানা নিরর্থক আন্দোলন-আলোড়নও আর মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে না।

১৯৩৭ সন হইতে এ বিষয়ে পরীক্ষা সুরু হয়। মধ্যে, কিছুকাল বন্ধ থাকিলেও স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরে আবার ইহার পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ ঘটে। বিভিন্ন রাজ্যে এদিকে কাজও আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ইহার প্রচার বা প্রসারের সার্থক আয়োজন কোথায়? বাইগাছি (বর্ত্তমানে, বাণীপুর) কেন্দ্রে যাহা কাজ হইতেছে তাহা ত পরীক্ষার স্তর পার হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অথচ এখানে সরকার টাকাও ঢালিতেছেন প্রচুর। বলরামপুরে বেসরকারী প্রচেষ্টায় বুনিয়াদী শিক্ষাদানের একটি প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু তাহার কার্য্য সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞান অতি সামান্য। আজ জানিতে বড়ই ইচ্ছা হয়—সরকারী বা বেসরকারী প্রচেষ্টায় বুনিয়াদী শিক্ষা কতটা প্রসারলাভ করিতেছে। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। কেহ যেন মনে না করেন আমি পৈতৃক বৃত্তিকেই সর্ব্বদা আঁকড়াইয়া ধরিতে বলিতেছি। বুনিয়াদীর বৃত্তি-অনুগ শিক্ষা পাইয়া তন্তুবায় কুম্ভকারের বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন, স্বর্ণকার সূত্রধর হইতে পারেন। তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর লোকেরাও এরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন, যেমন এখনই কেহ কেহ করিতেছেন। এ ত সাধারণ ব্যবস্থা। আবার বুনিয়াদী শিক্ষার এরূপ সুযোগও থাকা চাই যাহাতে যে-কোন শিল্পী-সন্তান স্বশক্তি বলে রাষ্ট্রে উচ্চতম পদাধি-কারীও হইতে পারিবেন।

৮

বর্ত্তমান সমস্যা সমাধানে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রকৃষ্ট ও প্রধান উপায় বলিয়া মনে হয়। অন্য উপায়ও থাকিতে পারে। কেহ

কেহ হয়ত বলিবেন এই আণবিক বোমার যুগে বুনিয়াদী শিক্ষা কি আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান করিতে পারিবে? শিল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করিয়া সমগ্র দেশকে শিল্প-কারখানায় পরিণত না করিতে পারিলে আমরা ধনৈশ্বর্য্যে গরীয়ান্ হইব কিরূপে? আবার উচ্চতম বিজ্ঞান আয়ত্ত না করিতে পারিলে নবতম সমরোপকরণই বা আমরা প্রস্তুত করিব কেমন করিয়া? জগৎ পূর্ব্ব-পশ্চিম ব্লকে আবদ্ধ। ঘরের দোর-গোড়ায় পাক-মার্কিন চুক্তি, পাক-তুর্কি চুক্তি কতই-না শুনিতেছি? এ সকলের প্রতিষেধক তবে কি? এই প্রসঙ্গে জামসেদপুরের লৌহখনির আবিষ্কর্তা প্রমথনাথ বসু প্রণীত *Illussions of New India* বা 'নব্য ভারতের আলেয়া' শীর্ষক পুস্তকখানির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি বিশেষভাবে। তিনি আরও অনেকগুলি পুস্তকে বর্ত্তমান ভারতের সমস্যাসমূহের বিশদ আলোচনা করিয়া সমাধানেরও ইঙ্গিত দিয়াছেন। উক্ত পুস্তকখানিতে প্রমথনাথ প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, বিজ্ঞান বা কারিগরি শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, সামাজিক উন্নতি প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ইহাতে দেখাইয়াছেন, আমরা ইংরেজ-সংস্পর্শে আসিয়া নিজেদের কতকগুলি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছি। এ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত হইয়া তিনি পাঠকগণকে ঐসকল সংস্কার মন হইতে দূর করিতে বলিয়াছেন।

ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশের শিল্পায়নের পক্ষে যে মূলধন আবশ্যক তাহা নাই। বিদেশ হইতে আজিকার দিনে অর্থ ধার করা মানে প্রকারান্তরে বিদেশীর অধীনতা-শৃঙ্খল গলায় জড়ানো। আমাদের নিজ শক্তি অপরিসীম। দীর্ঘ দুই শত বৎসরের শাসন ও শোষণের পরেও ভারতবর্ষে এমন সম্পদ রহিয়াছে যাহার আরহণও যথোচিত বিনিয়োগ করিলে আমরা একটি শক্তিমান্ রাষ্ট্রে পরিণত হইতেপারি। প্রমথনাথ ভারতবাসীকে মিথ্যা আলেয়ার পিছনে না ছুটিয়া আত্মস্থ হইতে সেই ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দেই উপদেশ দিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীতে যে ভাবধারা পরিপূর্ত্তি লাভ করে তাহার পূর্ব্বাভাস পাই প্রমথনাথের এই চিন্তাধারায়। বিদেশী মূলধন, বিদেশী পণ্য, বিদেশী যন্ত্রের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বদেশী কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যকে রক্ষা করিতে পারিলে পরবর্ত্তী দশ বৎসরের মধ্যে আমরা একটি বিরাট শক্তিতে পরিণত হইতে পারিব। প্রয়োজনমত বিজ্ঞানের সাহায্যও যে লইতে হইবে তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। আমরা শক্তিমান্ যাহাতে না হইতে পারি তাহার জন্যই ত পশ্চিমের বন্ধুবর্গের এত তোড়-জোড়। আজ শিক্ষার মোড় এমন ভাবে ঘুরাইতে হইবে যাহাতে ব্যষ্টির ও সমষ্টির কল্যাণ একই সঙ্গে সাধিত হয়।*

* চুঁচুড়া দেশবন্ধু হাই স্কুলের অষ্টাবিংশতিতম প্রতিষ্ঠা-দিবসে সভাপতির বক্তৃতার সারমর্ম।

যে লিখন লয়ে ফাল্গুন এসেছে দ্বারে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ফুটেছে যে ফুল
ভোরের আলোক মেখে
সৌরভে অতুল,
সেও যাবে অশ্রু রেখে
তৃণে তৃণে চিহ্ন এঁকে।
মৌন সুষমায়
যেথা পত্র-অন্তরালে
পাপীয়া ঘুমায়,
জ্যোছনার ইন্দ্রজালে
ওঠে চাঁদ চক্রবালে,
নামিবে আঁধার:
সেথাও ঝটিকা এসে
দস্যুসম তার
দেখাবে স্বরূপ শেষে
মরণের রুদ্রবেশে?

কেহ কি জানে না
ম্রিয়মাণ সীমাহীন
এ বিশ্ব মানে না
কোনো বাধা? প্রতিদিন
কালস্রোতে হয় লীন!
হেথা পরবাসে
জেগে ওঠে কত বাণী
প্রাণ পরকাশে
সংশয়-বিরোধ আনি:
ব্যথায় বিধুর প্রাণী।
আর্ত্তমন কাঁদে
বিশ্বব্যাপ্ত সম্ভাসনে
মায়াচ্ছন্ন রাতে
জীবনের বিসর্জ্জনে
অরূপের প্রেমার্চ্চনে।

মৃতের সভাতে
অমৃতের মহোৎসব।
বসন্তের সাথে
কোকিলের কুহু রব
শীত যেথা হ'ল শব।
যে লিখন লয়ে
ফাল্গুন এসেছে দ্বারে,
সে কি স্মৃতি হয়ে
রবে সজল আষাঢ়ে
অনন্তের পারাবারে?
দুঃখ মৃত্যু সব
আনন্দ-সম্পদসম
সৃষ্টির বৈভব:
শাশ্বত সত্তারে মম
করে কি সুন্দরতম?

ত্রিবেণী-সঙ্গম

প্রয়াগ ও কুম্ভমেলা

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

প্রকৃষ্ট যজ্ঞস্থলী—প্রয়াগ

প্রয়াগ শব্দের অর্থ—প্র (=প্রকৃষ্ট) + যাগ (=যজ্ঞ) ; যে স্থানে বিশেষরূপে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই স্থানই 'প্রয়াগ'-নামে খ্যাত। বিভিন্ন পুরাণ-শাস্ত্রে প্রয়াগকে 'প্রজাপতি-ব্রহ্মার ক্ষেত্র' ও যজ্ঞবেদী' বলা হইয়াছে। বামন-পুরাণে (২২ অধ্যায়ে) উক্ত

দেবীর মূর্ত্তি

হইয়াছে, ব্রহ্মার যে-সকল যজ্ঞবেদী ভূতলে বিরাজমান, তন্মধ্যে প্রয়াগক্ষেত্রই 'মধ্য-বেদী'। মহাভারতেও প্রতিষ্ঠানপুরের (ঝুঁসীর) হইতে প্রয়াগতীর্থকে প্রজাপতি ব্রহ্মার বেদী বলা হইয়াছে[১]। মহাভারতের অন্যত্র[২]—"প্রজাপতের্যজ্ঞ আসীঃ প্রয়াগে" অর্থাৎ, প্রয়াগে ব্রহ্মার যজ্ঞ হইয়াছিল ইত্যাদি-বাক্য পাওয়া যায়।

কর্মার্পণরূপ ভাগবতধর্ম

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন,—

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥[৩]

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"যজ্ঞঃ বিষ্ণুঃ 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ' ইতি শ্রুতেঃ ; তদারাধনার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র তদেকং বিনা, লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ কর্মভির্বধ্যতে, ন ত্বীশ্বরারাধনার্থেন কর্মণা ; অতস্তদর্থং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং মুক্তসঙ্গো নিষ্কামঃ সন্ কর্ম সমাচর ॥" অর্থাৎ, যজ্ঞই বিষ্ণু, ইহা শ্রুতি (শতপথ-ব্রাহ্মণ)-প্রমাণে জানা যায়। একমাত্র সেই বিষ্ণুর আরাধনার নিমিত্ত কর্ম ব্যতীত অন্য কর্মদ্বারা এই মনুষ্যলোক আবদ্ধ হয় ; কিন্তু ঈশ্বরারাধনামূলক কর্মদ্বারা কাহারও বন্ধন হয় না। অতএব বিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশে মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ নিষ্কাম হইয়া সুষ্ঠুভাবে কর্ম আচরণ কর। প্রয়াগক্ষেত্রে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশে প্রকৃষ্টরূপে যজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণুর আরাধনা-রূপ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া জীব-জগৎকে বিষ্ণুর সন্তোষার্থ কর্মার্পণ-রূপ ভাগবতধর্মের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। এজন্য প্রয়াগক্ষেত্রে বিষ্ণুসন্তোষমূলক-স্নান-দানাদি কর্মের বহু ফলশ্রুতি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। সঙ্গমতীর্থে স্নান-ফলে স্বর্গ-প্রাপ্তি ও দেহত্যাগে মোক্ষপ্রাপ্তির কথা শ্রুতিমন্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

১। মহাভারত, বনপর্ব (তীর্থযাত্রা-পর্ব), ৮৩ অধ্যায়, ৭২ শ্লোক : Edited by V. S. Sukhtankar, Poona—Bhandarkar Oriental Research Institute,

২। ঐ আদিপর্ব, ৫০। ।

৩। গীতা ৩।৯

কুম্ভমেলার একাংশ, প্রয়াগ

সিতাসিতে সরিতে যত্র সঙ্গতে
তত্রাপ্লুতাসো দিবমুৎপতন্তি।
যে বৈ তন্বং বিসৃজন্তি ধীরাঃ
তে বৈ জনাসোঽমৃতত্বং ভজন্তে ॥

মনে হয়, উপরি-উক্ত শ্রুতি স্মরণ করিয়াই মহাকবি কালিদাস তাঁহার রঘুবংশে প্রয়াগ-সঙ্গমের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক নিম্নলিখিত শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন—

সমুদ্রপত্ন্যোর্জলসন্নিপাতে পূতাত্মনামত্র কিলাভিষেকাৎ।
তত্ত্বাববোধেন বিনাপি ভূয়স্তনুত্যজাং নাস্তি শরীরবন্ধঃ ॥১

যাঁহারা এই সমুদ্রপত্নী গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে অবগাহনপূর্বক দেহত্যাগ করেন, সেই পূতাত্মাদিগের তত্ত্বজ্ঞান-ব্যতীতই পুনর্জন্মের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

প্রয়াগে বিষ্ণুর সন্তোষমূলক কর্মার্পণের বিধান সর্বশাস্ত্রেই কীর্তিত হইয়াছে। ভগবানের সন্তোষের জন্য ধন, জন, এমন কি প্রাণ-পর্যন্ত অর্পণ করিবার বিধান শাস্ত্রে আছে। মহাভারত (৩।৮৫।৮৩), পদ্মপুরাণ (১।৪৪ ৪-১৯), মৎস্যপুরাণ (১০৮।২-৫), কূর্মপুরাণ (৩৬।২০ ; ৩৭।৮, ১৫ ; ৩৮।৩-১৩), বরাহপুরাণ (১৪৪।৮৯), অগ্নিপুরাণ (১১১।১৩) প্রভৃতি শাস্ত্রে, প্রাচীন শিলালেখে ও তাম্রশাসনে এবং বিভিন্ন প্রাচীন পর্যটকগণের বিবরণে প্রয়াগে আত্মবলির প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদিক-ধর্মে আত্মহত্যা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইলেও প্রয়াগে ঐরূপ আত্মদানের বিশেষ বিধি ছিল। এইজন্য কর্মমীমাংসকাচার্য কুমারিলভট্ট প্রয়াগে তুষানলে দেহ বিসর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। দেহসর্বস্ব কলি-মানবের পক্ষে এইরূপ বাধ্যতামূলক দেহত্যাগ অবৈধ। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কলিযুগে নাম-সংকীর্তনপর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বসাধ্য ভাগবতধর্ম আবিষ্কার করিবার পর ঐ সকল উৎকট বিধির অবসান হইয়াছে। তথাপি যাঁহারা কর্মকাণ্ডে রুচিযুক্ত তাঁহাদিগের মধ্যে সমগ্র-দেহত্যাগের পরিবর্তে অন্ততঃ দেহের সামান্য-অংশ ত্যাগ— অনুকল্প-বিধিরূপে স্বীকৃত হওয়ায় প্রয়াগে মস্তক-মুণ্ডনের প্রথা অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। এখনো বাংলায় একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে—

প্রয়াগে মুড়াইয়া মাথা।
মরগে পাপী যথা তথা ॥

স্মার্তবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্যও প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে প্রয়াগে মুণ্ডন-বিধি-মূলক প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন।

প্রকৃষ্ট বা সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ

শ্রীমদ্ভাগবতে কলিকালে শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তনকেই সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ (প্রকৃষ্ট যজ্ঞ) বলা হইয়াছে।—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥২

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণীতে পাওয়া যায়—

সংকীর্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥৩

১। রঘুবংশ ১৩।৫৮

২। ভাঃ ১১।৫।৩২

৩। চৈঃ চঃ অঃ ২০।৯

শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—
সেই ত সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার ॥১

নাম-সংকীর্তনরূপ শ্রীমদ্ভাগবতধর্মই প্রকৃষ্ট যজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞের পরাকাষ্ঠা। ইহা শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে।

গোকোটিদানং গ্রহণে খগস্য
প্রয়াগ গঙ্গোদক কল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরু সুবর্ণদানং
গোবিন্দকীর্তের্ন সমং শতাংশৈঃ ॥২

ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রম, প্রয়াগ

অর্থাৎ, সূর্যগ্রহণ সময়ে কোটি গোদান, প্রয়াগগঙ্গার জলে কল্পবাস, অযুত যজ্ঞ, সুমেরুসদৃশ সুবর্ণদান, কিছুই গোবিন্দনামকীর্তনের শতাংশের একাংশতুল্যও নহে।

প্রয়াগে ত্রিবেণীর তটে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বীয় অন্তরঙ্গ-পার্ষদ লীলাগর্ভ-নামরসাকৃষ্ট শ্রীরূপের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত-সিন্ধু হইতে যে অমৃতের ত্রিধারা প্রকট করিয়াছিলেন, তাহাই গৌড়ীয়-দর্শন, গৌড়ীয়-অলঙ্কার, গৌড়ীয়-রসসিদ্ধান্তের ত্রিবেণী সঙ্গমরূপে শ্রীভাগবতামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণির মধ্যে সম্প্রসারিত রহিয়াছে। ভক্তিরসামৃতের আবিষ্কারের পর প্রয়াগ সার্থকনামা অর্থাৎ, যজ্ঞের পরাকাষ্ঠা-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরসদ সঙ্কীর্তন-যজ্ঞের যথার্থ ক্ষেত্র হইয়াছে।

প্রয়াগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাল্মীকি-রামায়ণে১ লিখিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমের নিকট উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, "ঐ দেখ, প্রয়াগ। এই স্থান হইতে যজ্ঞের ধূম উত্থিত হইতেছে; মনে হয়, নিকটে কোন মুনির আশ্রম আছে। আমরা এখন নিশ্চয় গঙ্গা ও যমুনা-সঙ্গমের নিকট আসিয়া গিয়াছি। জাহ্নবী ও যমুনা-মিলনের কলকল নাদ শুনা যাইতেছে এবং ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রমস্থ বৃক্ষসকল

দারাগঞ্জে গঙ্গা ও গঙ্গাতটের দৃশ্য

দেখা যাইতেছে।" ইহার পর সঙ্গমের নিকটবর্তী ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া জানকী ও লক্ষ্মণ-সহ রামচন্দ্র তথায় বিশ্রাম করেন। ইহার পরে ভরতও চিত্রকূট যাইবার পথে বশিষ্ঠের সহিত প্রয়াগে ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রমে আসিয়াছিলেন২। বনবাসান্তে রামচন্দ্র পুষ্পক-বিমানে আরোহণ করিয়া পুনঃ প্রয়াগ হইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, ইহা যুদ্ধকাণ্ডে বর্ণিত আছে।

মহাভারতে৩ প্রয়াগ, প্রতিষ্ঠানপুর (ঝুঁসি), বাসুকী, হংস-প্রপতন ও দশাশ্বমেধের বর্ণনা পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণ, কূর্ম-পুরাণ, বামনপুরাণ, বরাহপুরাণ, পদ্মপুরাণাদি-শাস্ত্রে প্রয়াগের প্রচুর মাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ আছে। মনুসংহিতায় (২।১১ শ্লোক) প্রয়াগের নাম পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীহরির অর্চাশ্রিত বিষ্ণুবল্লভা-নদী-সেবিত পুণ্যতমক্ষেত্রের অন্যতমরূপে প্রয়াগতীর্থের নাম পাওয়া যায়। এই সকল তীর্থে অনায়াসে ব্রাহ্মণাদি সংপাত্রের দর্শন পাওয়া যায়। এই তীর্থে মাঘী শুক্লা সপ্তমী, মাঘী পূর্ণিমা প্রভৃতি পুণ্য তিথিতে স্নান, জপ, ব্রত, দেব-দ্বিজার্চন, শ্রাদ্ধ ও প্রাণি-গণকে যে দানাদি করা যায়, তাহা অক্ষয় হয়।৪ বলদেব তীর্থ-

১। চৈঃ চঃ আঃ ৩।৭৭ ২। শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১১শ বিলাস, ৩৮৫ শ্লোক (লঘুভাগবত-বাক্য)

১। অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৪।৫-৮ ২। ঐ ৯০ সর্গ ৩। বনপর্ব, ৮৫ অধ্যায়, ৬৫-৮২ শ্লোক ৪। ভাঃ ৭।১৪।২২-৩৩

পর্যটনচ্ছলে প্রয়াগে পদার্পণ করিয়া এই স্থানে স্নানাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ইহাও শ্রীমদ্ভাগবত১ হইতে জানা যায়। প্রয়াগ ও প্রতিষ্ঠানপুর পুরাকালে বৈবস্বতমনুর পুত্র সুদ্যুম্নের ও তৎপুত্র পুরুরবার রাজধানী ছিল।২

গবেষকগণ প্রয়াগের নিকটবর্তী গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডকে প্রাচীন 'বংসদেশ' বলিয়া মনে করেন। এই বংসদেশের রাজধানী 'কৌশাম্বী' নগরী। এই স্থান প্রয়াগ হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে, বর্তমান 'কোশামে'র নিকট যমুনার তীরে অবস্থিত। অতি প্রাচীনকালে প্রয়াগ কৌশাম্বী-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

গৌতম বুদ্ধ প্রায় ৪৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে প্রয়াগে আসিয়া তথায় ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। ৩১৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ প্রয়াগ মৌর্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। প্রয়াগের নিকটবর্তী স্থানসমূহে গুপ্তযুগের অনেক ঐতিহাসিক চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের সময় (৩০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে) গ্রীক-রাজদূত মেগাস্থিনিস গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে আসিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ২৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র সম্রাট অশোক কৌশাম্বীতে উপ-রাজধানী নির্মাণ এবং স্বীয় অনুশাসনাঙ্কিত শিলাস্তম্ভ স্থাপন করিয়া-ছিলেন। উক্ত স্তম্ভটি বর্তমানে প্রয়াগের দুর্গাভ্যন্তরে রহিয়াছে। ৩২৬ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তবংশীয় রাজা সমুদ্রগুপ্তের সময় প্রয়াগ তদীয় রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। প্রয়াগের নিকটবর্তী প্রাচীন ঝুঁসি নামক স্থানে উচ্চ টিলার উপর 'সমুদ্রকূপ' নামে, সমুদ্রগুপ্তের সময়ের একটি সুবৃহৎ কূপের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রায় ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়ান ভারতে আসেন। তাঁহার বিবরণে প্রয়াগের নাম স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না হইলেও তাঁহার বর্ণন-সঙ্কেত হইতে গবেষকগণ তাঁহার প্রয়াগে আগমনের বিষয় অনুমান করিয়াছেন। ৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগ কান্যকুব্জের অধিপতি যশোবর্ধনের হস্তগত হয়। ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হর্ষবর্ধন কান্যকুব্জে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। সেই সময় প্রয়াগ কান্যকুব্জ রাজ্যের অন্তর্গত হয়। হর্ষবর্ধন কান্যকুব্জের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবার পর 'শিলাদিত্য' নাম গ্রহণ করেন। তিনি 'শ্রীহর্ষ' নামেও খ্যাত। ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট হর্ষবর্ধনের সহিত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্-সাঙ কান্যকুব্জ হইতে প্রয়াগে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রয়াগের সঙ্গম, অক্ষয়বট প্রভৃতির বর্ণনা এবং শ্রীহর্ষের অনুষ্ঠিত দানসত্রের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট 'হর্ষচরিত' নামক গ্রন্থে সম্রাটের বিবিধ কীর্তিকলাপও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রায় ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগ গৌড়ের পাল-নরেশগণের হস্তগত হয়। খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে শঙ্করাচার্য প্রয়াগে শুভাগমন করিয়া-ছিলেন বলিয়া জানা যায়। খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে কান্যকুব্জের প্রতিহার-রাজগণ প্রয়াগ অধিকার করেন। ১০৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগ রাঠোররাজ চন্দ্রদেবের হস্তগত হয়। ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী চন্দ্রদেবের পৌত্র জয়চন্দ্রকে নিহত করিয়া প্রয়াগকে তুর্করাজের অন্তর্ভুক্ত করেন। সিকন্দর-লোদী (১৪৮৯-১৫১৭ খ্রীঃ) হুমায়ুনকে প্রয়াগ প্রদেশ জায়গীরস্বরূপে প্রদান করেন। মোগল সম্রাট আকবর ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নবেম্বর (আবুল ফজলের আকবর-নামার মতে) প্রয়াগের নাম 'ইলাহাবাস' রাখেন এবং গঙ্গা যমুনা-সঙ্গমে প্রয়াগ-দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করেন। আকবরের জীবদ্দশায় তৎপুত্র সেলিম (জাহাঙ্গীর) প্রয়াগে নিজের বাসস্থান মনোনীত করেন। জাহাঙ্গীর ইলাহাবাসে 'খসরুবাগ' নির্মাণ করিয়াছিলেন। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে শাজাহান 'ইলাহাবাস' নামের স্থানে 'ইলাহাবাদ' নাম রাখেন। ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী প্রয়াগে আসিয়াছিলেন। বুন্দেলা ও মহারাষ্ট্রীয়গণের আক্রমণের সময় এই স্থান কখনও মুসলমানগণের কখনও-বা মহারাষ্ট্রীয়দের অধিকারে আসে। সম্রাট শাহ আলমের সময় এই স্থানে কিছুদিন রাজধানী ছিল। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নবেম্বর অযোধ্যার নবাব সআদত-আলী খাঁ তাঁহার দেয় অর্থের পরিবর্তে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এলাহাবাদ ছাড়িয়া দেন।

নাগা-বাসুকির মন্দির, এলাহাবাদ

১। ভাঃ ১০।৭৯।১০ ২। ভাঃ ৯।১।৪২

হিউয়েন-সাঙের বিবরণ

প্রাচীন শাস্ত্রে বর্ণিত প্রয়াগ মোগলরাজত্বের সময় 'ইলাহাবাস'

ও 'ইলাহাবাদ' নাম ধারণ করে। আর চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-য়েন্-সাঙ প্রয়াগের নাম তাঁহার নিজ ভাষায় 'পো-লো-য়ে-ক' বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।১ হিউ-য়েন-সাঙ্-লিখিত প্রয়াগ-বিবরণের ইংরেজী তর্জমার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"On the east side of the capital and at the confluence of the rivers, was a sunny down about ten *li* wide covered with a white sand. This down was called in the popular language "The Grand Arena of Largesse." It was the place to which from ancient times princes, and other liberal benefactors had come to make their offerings and gifts. The king went in state from Kanauj to this place for his customary quinquennial great distribution of gifts, and alms, and offerings. He had come prepared, he gave away all the public money, and all his own valuables. Beginning with offerings to the Buddhist images on the first day, the king went on to bestow gifts on the resident Buddhist Brethren, next on the assembled congregation, next on those who were conspicuous for great abilities and extensive learning, next on retired scholars and recluses of other religions, and lastly on the kinless poor. This lavish distribution in a few (according to the Life in 75[2]) days exhausted all the public and private wealth of the country, but in ten days after the Treasury was emptied it was again filled. At the junction of the river and to the east of the Arena of Largesse, every day numbers of people arrived to die in the sacred water, hoping to be thereby reborn in Heaven."

প্রয়াগে হর্ষবর্ধনের দানসত্রের উক্ত বিবরণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থিগণও ভারতের ইতিহাসে পাঠ করিয়া থাকে। এই বিবরণ হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, হর্ষবর্ধন প্রতি অর্ধ-কুম্ভ বা পূর্ণ-কুম্ভ-পর্বের সময় প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া ঐরূপ দান-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। হিউয়েন্-সাঙ্ উক্ত বিবরণের কিঞ্চিৎ পূর্বে কনৌজরাজ হর্ষবর্ধনের গুণগ্রামের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন :

"He erected thousands of topes on the banks of the Ganges, established Travellers Rests through all his dominions, and erected Buddhist monasteries at sacred places of the Buddhists. *He regularly held the Quinquennial Convocation; and gave away in religious alms everything except the material of war.*"[3]

হর্ষের পঞ্চবার্ষিক মহাসভা ও কুম্ভমেলা

হর্ষবর্ধন নিয়মিতভাবে 'পঞ্চবার্ষিক-মহাসভা' আহ্বান করিতেন এবং সমরোপকরণ ব্যতীত সমস্তই ধর্মার্থে বিতরণ করিয়া দিতেন, ইহা উপরোক্ত বিবরণ হইতে জানা যায়। হর্ষের দূরবর্তী পূর্বপুরুষ শৈব, তাঁহার পিতা সৌর, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগ্নী বৌদ্ধ, আর হর্ষ স্বয়ং উক্ত ত্রিবিধ ধর্মের প্রতি সমভাবে আস্থাযুক্ত হইয়াও শেষ বয়সে বৌদ্ধধর্মের প্রতিই বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন।১ সুতরাং বুদ্ধের পদাঙ্কিত ধর্মপ্রচার-পীঠ ও প্রসিদ্ধ দানক্ষেত্র প্রয়াগে প্রতি পঞ্চম বৎসরে মহামোক্ষ-পরিষদ্ ও দানসত্রের উন্মোচন বৌদ্ধসম্রাটের পক্ষে অতি স্বাভাবিক। হর্ষবর্ধনের উক্ত পরিষদ বা দানসত্রের সহিত কুম্ভমেলার কতটা সম্বন্ধ আছে তাহা বিচার্য। হিউয়েন্-সাঙ্ ভারতের যে-যে স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে—ডঃ স্মিথ প্রমুখ গবেষক-গণের মতে তিনি প্রয়াগ ব্যতীত হরিদ্বার২, উজ্জয়িনী৩ ও নাসিকের৪ কিছু কিছু বিবরণ দিয়াছেন। ঐ স্থানগুলিরও কুম্ভ-পর্বের জন্য প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। হিউয়েন্-সাঙের বিবরণে যেরূপ প্রয়াগে কুম্ভপর্বের সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই, সেইরূপ হরিদ্বার উজ্জয়িনী এবং নাসিকের বিবরণের মধ্যেও উক্ত পর্ব সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না; অথচ প্রয়াগের বিবরণের মধ্যে অক্ষয়-বটের, সঙ্গমের এবং তথায় দেহ-বিসর্জনের জীবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায়।৫ চৈনিক পরিব্রাজকের উক্ত বর্ণনা প্রাচীন শাস্ত্রপ্রমাণের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে আলবেরুণী ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে রশীদ উদ্দীন প্রমুখ লেখকগণও প্রয়াগের ঐ সকল দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদের বর্ণনার মধ্যেও কুম্ভপর্বের কোন উল্লেখ আছে বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই। সম্রাট আকবরের সময়ের প্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক আব্দুল-কাদীর-বদায়ুনী 'মুন্তখবুল্-তবারীখ'-এ লিখিয়াছেন যে, সন ৯৮২ হিজরী (=১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দ) শফর-মাসের ২৩শে তারিখে (কার্তিক মাসের মধ্যভাগে) আকবর প্রয়াগে আসিয়া ত্রিবেণী-সঙ্গমে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, বিধর্মী ব্যক্তিগণ বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া দেহত্যাগ করিতেছেন। ইঁহার বিবরণেও ভাবী কুম্ভমেলার কোন উল্লেখ নাই।

মিঃ বিল *Life of Hiuen Tsang* নামক পুস্তকে৬ লিখিয়াছেন :

"The quinquennial assembly in the spring of A.D. 644 was the sixth held in the reign."

ভি. এ. স্মিথ তাঁহার *Early History of India* পুস্তকে লিখিয়াছেন :

"Harsha explained that it had been his practice for thirty years past, in accordance with the custom of his ancestors, to hold a great quinquennial assembly on the sands where the rivers meet, and there to distribute his accumulated treasures to the poor and needly, as well as to the religions of all denominations. The present occasion (A.D. 643) was the sixth of the series . . .

১. *On Yuan Chwang's Travels in India*—Vol. 1, p. 364, by Thomas Watters, London Royal Asiatic Society, 1904.

২। এ বিষয়ে মতভেদ আছে, কেহ কেহ ৪৯ দিবস বলিয়াছেন।

3. *On Yuan Chwang's Travels in India*—Vol. I, p. 344.

1. V. A. Smith's *Early History of India*, p. 345, Oxford, 1914; 2. On *Yuan Chwang's Travels in India*—Vol I, pp. 319, 329; 3. *Ibid*—Vol. II, p. 250; 4. *Ibid*—Vol. II, p. 336; 5. *Ibid*—Vol. I, pp. 362, 364; 6. *Ibid*, page 184; 7. Smith's *Early History of India*, p. 350.

The proceedings lasted for seventy-five days, terminating apparently about the end of April."

বিল সাহেবের মতে ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে ও ভি. এ. স্মিথের মতে ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত আড়াই মাসব্যাপী মহামোক্ষপরিষদের অধিবেশন প্রয়াগে হইয়াছিল। কোন কোন গবেষকের মতে উক্ত পরিষদ উনপঞ্চাশ দিন, ফাল্গুন মাস হইতে চৈত্র মাসের প্রায় অর্ধেক পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল।১ হর্ষবর্ধনের পূর্ব হইতেই প্রয়াগে কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতে থাকিলে ৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে (=৭০২ সংবতে) প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ এবং ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে (=৬৯৬ সংবতে) অর্ধকুম্ভযোগ হইবার কথা কোন কোন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত গণনা করিয়া লিখিয়াছেন।২ হর্ষবর্ধন ৬৪৩ বা ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগে যে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহা প্রয়াগের পূর্ণকুম্ভ বা অর্ধকুম্ভপর্বের যোগের মধ্যে পড়ে না। তিনি উহার ত্রিশ বৎসর পূর্বে প্রয়াগে যে প্রথম দানোৎসব করিয়াছিলেন, সেই সময়েও প্রয়াগে অর্ধ বা পূর্ণকুম্ভযোগের সমাবেশ দেখা যায় না; বিশেষতঃ প্রয়াগে অনুষ্ঠিত হর্ষবর্ধনের দানোৎসব প্রতি পঞ্চম বর্ষে অনুষ্ঠেয় পঞ্চবার্ষিক মহোৎসব বা মহাপরিষদ (Quinquennial Convocation) বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

এইসকল কারণে কোন কোন গবেষক হর্ষবর্ধনের মহামোক্ষ-পরিষদের সহিত প্রয়াগে কুম্ভমেলার কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।৩

আচার্যবৃন্দের চরিতগ্রন্থে কুম্ভপর্বের উল্লেখ

প্রয়াগ শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-প্রসিদ্ধ তীর্থরাজ। এই স্থানে কোন বিশেষ পর্ব, সভা বা সুপ্রাচীন প্রথা ও অনুষ্ঠানের কথা নিশ্চয়ই প্রসিদ্ধ আচার্যগণের চরিত-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকিবার কথা। 'শঙ্কর-বিজয়'-গ্রন্থে প্রয়াগে তুষানলে প্রাণত্যাগোন্মুখ কুমারিলভট্টের সহিত শঙ্করাচার্যের সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গ থাকিলেও কুম্ভপর্বের বা কুম্ভমেলার কোন উল্লেখ নাই।৪ 'প্রপন্নামৃতে' শ্রীরামানুজ-আচার্যের তীর্থ-ভ্রমণাদি-প্রসঙ্গে তাঁহার প্রয়াগ-বিজয়ের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। 'শ্রীমধ্ব-দিগ্বিজয়'-গ্রন্থেও শ্রীমধ্বাচার্য প্রয়াগে কুম্ভমেলায় যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া কোন উল্লেখ নাই। শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের স্বনামখ্যাত দিগ্বিজয়ী আচার্য শ্রীবাদিরাজ-তীর্থ (১৪৮০-১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ) ভারতের তীর্থস্থানসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া 'তীর্থ-প্রবন্ধ'-নামক একটি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতেও প্রয়াগের বা হরিদ্বারাদি স্থানের কুম্ভমেলার কোন কথাই নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে বলদেবের তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে৫ এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দপ্রভুর৬ পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর সহিত হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক, উজ্জয়িনী প্রভৃতি তীর্থে ভ্রমণ ও স্নানাদি-কৃত্যের উল্লেখ থাকিলেও ঐ সকল স্থানে কুম্ভপর্বের কোনই উল্লেখ নাই। শ্রীবল্লভাচার্য দিগ্বিজয় করিবার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষ তিন বার পর্যটন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বার পর্যটন করিবার পর তিনি গার্হস্থ্যাশ্রমী হইয়া প্রয়াগের অপর পারে আড়াইল-গ্রামে গিয়া বাসস্থান স্থাপন করেন। তিনি প্রয়াগ-সঙ্গমের সন্নিকটবর্তী স্থানে বাস করিতেন;
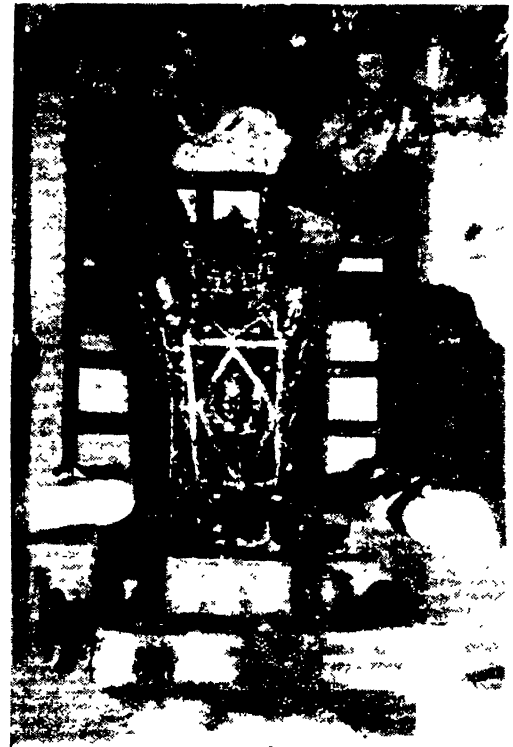
পাতালপুরীর আধুনিক অক্ষয়বট, এলাহাবাদ

অথচ তাঁহার সুবোধিনীটীকায় তীর্থরাজ প্রয়াগের কথা থাকিলেও কুম্ভমেলার উল্লেখ নাই, পরবর্তী কালের বল্লভদিগ্বিজয় গ্রন্থেও নাই। শ্রীল সনাতনগোস্বামিপাদ 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' ও 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে' প্রয়াগে মাঘস্নান, দান, কল্পবাস ও সম্পত্তিশালী ভক্তিমান্ ব্যক্তি-গণের দ্বারা অনুষ্ঠিত সাধুসেবা ও মহোৎসবাদির উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু কুম্ভযোগ ও কুম্ভমেলার কোন উল্লেখ করেন নাই।৭ শ্রীকৃষ্ণ-

১। 'ভারত'পত্রে রজতজয়ন্তী মহাকুম্ভ বিশেষাঙ্কে প্রকাশিত 'কুম্ভমেলা কা মনোবৈজ্ঞানিক ঔর ঐতিহাসিক আধার' শীর্ষক প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা ৫২ দ্রষ্টব্য।

২। [ক] দৈবজ্ঞভূষণ পণ্ডিত মাতৃপ্রসাদ পাণ্ডেয় (কাশীবাস)—'কুম্ভপর্ব-ব্যবস্থা' ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্রষ্টব্য।

[খ] 'ভারত'পত্রে মহাকুম্ভবিশেষাঙ্কে প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি-বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর ঈশ্বরীপ্রসাদ রচিত 'ইলাহাবাদ কা কিলা' প্রবন্ধ, ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩। 'ভারত'-পত্রে (মহাকুম্ভবিশেষাঙ্ক) শ্রীরূপনারায়ণ-শাস্ত্রীকৃত 'কুম্ভমেলা কা ঐতিহাসিক আধার'-প্রবন্ধ ৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪। মাধবাচার্য-কৃত 'শঙ্কর-বিজয়' ৭।৮৯, শ্রীনাথ মিশ্র কর্তৃক প্রকাশিত, বঙ্গাব্দ, ১২৯০ কলিকাতা।

৫। ভাঃ ১০।৭৯।১০ শ্লোক ৬। চৈঃ ভাঃ আঃ ৯।১০৯

৭। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ১।১।২৩-৩৬;

চৈতন্যমহাপ্রভু ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে মাঘমাসে প্রয়াগে ত্রিবেণীর উপরই আবাস স্থাপন করিয়া দশ দিন 'মকর-স্নান' করিয়াছিলেন।১ কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মকর-স্নান লীলার কথা, দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীরূপ-শিক্ষার কথা, আড়াইল গ্রামে বল্লভাচার্যের ভবনে পদার্পণের কথা বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছেন ; কিন্তু তৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কুম্ভমেলার কোন উল্লেখ করেন নাই। তুলসীদাস 'রামচরিতমানসে' প্রয়াগে সুপ্রাচীনকাল হইতে প্রতি বৎসর মাঘ-মকর-সংক্রান্তিতে মুনি-ঋষিগণ ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রমে সমবেত হইয়া ত্রিবেণী-স্নান, অক্ষয়বট-স্পর্শ, শ্রীমাধবের পাদপদ্মপূজা, হরিগুণগান, ধর্মবিধি-প্রণয়ন এবং জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত ভগবদ্ভক্তির আলোচনা করিতেন বলিয়া লিখিয়াছেন ; কিন্তু কুম্ভপর্বের কোন উল্লেখ করেন নাই।

পুষ্কর-যোগ

এই সকল কারণে অনেকে মনে করেন, প্রয়াগে স্নান, দান, দেহোৎসর্গ, কল্পবাস, সাধুসমাগম, শ্রীমাধবের আরাধনা, হরিগুণ-কীর্তন, শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতি ভক্তিমূলক অনুষ্ঠানসমূহ আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল ; হয়ত পরবর্তী কালে স্থলপুরাণ প্রকাশ করিয়া 'পুষ্করযোগে'র২ মাহাত্ম্য মাঘস্নানের সহিত সমাবিষ্ট করা হইয়াছে। জ্যোতিষসম্বন্ধীয় পারিভাষিক কোষসমূহে পুষ্করযোগকে 'কুম্ভ'ও বলা হইয়াছে। এইরূপ স্থল-পুরাণের দ্বারা পুণ্যস্থানসমূহের মাহাত্ম্য ও বিশেষ পর্বাদির প্রচার ভারতের বহু তীর্থস্থানে দৃষ্ট হয়।

কুম্ভকোণমে মহামাঘম্-মেলা

দক্ষিণ-ভারতের তাঞ্জোর জেলার কুম্ভকোণম্-নগরে 'মহামাঘম্' নামক একটি স্নানোৎসব প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বৃহস্পতি সিংহরাশিস্থ হইলে তৎকালে মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে ঐ স্নানযোগ উপস্থিত হয়। উত্তর-ভারতের 'কুম্ভমেলা' এবং অন্ধ্র-দেশের 'পুষ্করম উৎসব'—স্নান উপলক্ষ করিয়া পুণ্যতোয়া নদীতেই হইয়া থাকে ; কিন্তু কুম্ভকোণমে কুণ্ড (বিশাল সরোবর) মধ্যে স্নানোৎসব হয়— সেই উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ সাধুসন্ন্যাসী ও পুণ্যার্থীর সমাগম এবং মেলা হইয়া থাকে। উক্ত 'মহামাঘম' উৎসবটি স্থল-পুরাণের (স্থানমাহাত্ম্য প্রতিপাদক পুরাণ) দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে এবং উহাতেও কুম্ভের প্রসঙ্গ আছে। উক্ত স্থলপুরাণের মতে প্রলয়ের প্রাক্কালে বেদ ও সৃষ্টিবীজ সংরক্ষণার্থ ব্রহ্মা অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হইয়া মহাবিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলে ভগবান্ বিষ্ণু সমস্ত পুণ্যতীর্থ হইতে মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া ব্রহ্মাকে একটি কুম্ভ নির্মাণ এবং উহার মধ্যে অমৃতের সহিত বেদ ও সৃষ্টিবীজ রক্ষা করিয়া কুম্ভটিকে মহামেরুর দক্ষিণভাগে স্থাপন করিবার উপদেশ দেন। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সেই দিব্য কুম্ভটি প্রলয়পয়োধিজলে ভাসিতে ভাসিতে কোন একটি স্থানে সংলগ্ন হইয়া পড়ে। শিব তথায় আবির্ভূত হইয়া উক্ত কুম্ভের উপর বাণ নিক্ষেপ করেন। তাহাতে কুম্ভের 'ঘোণ', অর্থাৎ কানা ভাঙ্গিয়া অমৃত ক্ষরিত হইতে থাকে। শিব সেই অমৃত পান করিয়া তথায় 'অমৃত লিঙ্গ কুম্ভেশ্বর' নাম ধারণপূর্বক লিঙ্গরূপে অধিষ্ঠিত হন। ঐ স্থানে কুম্ভের ঘোণ বা কানা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল বলিয়া ঐ স্থানের নাম হয়—'কুম্ভঘোণম' বা 'কুম্ভকোণম'। পরে ব্রহ্মার প্রার্থনায় মহাদেব কুম্ভকোণমে 'মহামাঘকুলম' নামক কুণ্ডে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, নর্মদা, গোদাবরী, কাবেরী, মহানদী, পয়স্বিনী (পালার) ও সরযূ—এই নয়টি পুণ্য নদীর আবির্ভাব করাইয়াছিলেন। এই কুণ্ডের তটেই শ্রীকুম্ভেশ্বর শিব অধিষ্ঠিত আছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব উক্ত 'অমৃতলিঙ্গ' শিব দর্শনমানসে তথায় পদার্পণ করিয়াছিলেন।১

'মহামাঘম' উৎসবের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও প্রাচীনত্বের প্রমাণ-মূলক অনেকগুলি শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। চিংগলপুট জেলায় 'নাগলপুরম' নামক স্থানের একটি দেবালয়ের গোপুরের উত্তরভাগে গম্বুজের মধ্যে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায়, বিজয়নগরের স্বনাম-ধন্য রাজা কৃষ্ণদেব রায় কুম্ভকোণমের 'মহামাঘম' উৎসবে যোগদানার্থ গমনের পথে উক্ত গ্রামে আসিয়াছিলেন এবং একটি মন্দিরে বহু দান করিয়াছিলেন। গত ১৯৪৫ সনে মার্চ মাসে কুম্ভকোণমের দ্বাদশ বার্ষিক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

কুম্ভপর্বের প্রমাণ

কুম্ভপর্বের সুপ্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশে শাস্ত্রে বিভিন্ন অর্থে বা তাৎপর্যে ব্যবহৃত 'কুম্ভ' শব্দটি হইতে অনেক কাল্পনিক অর্থ ও তাৎপর্য আকর্ষণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। অনেক স্থলে কুম্ভযোগের প্রমাণরূপে প্রচারিত বহু শ্লোক যে সকল শাস্ত্রের নামোল্লেখপূর্বক নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতেও কোন্ পুথির, কোন্ সংস্করণের বা কোন্ পুথিশালায় রক্ষিত, কত সংখ্যক পুথিতে কোন্ অধ্যায়ে ঐ সকল শ্লোক আছে, তৎসমুদয়ের সঠিক নির্দেশ নাই। অনেক সময় অপরের প্রমাণসমূহ পরীক্ষা না করিয়াই গতানুগতিক ও আনুকরণিক পদ্ধতিতে প্রচার করা হইয়াছে। ইহাতে বর্তমান লেখকের ন্যায় সাধারণ ব্যক্তিগণ অনেক সময় বিভ্রান্ত হইয়া প্রকৃত সত্য নির্ধারণে অসমর্থ হইয়া পড়েন। পণ্ডিত শ্রীরামপ্রতাপ ত্রিপাঠী শাস্ত্রীজী তাঁহার রচিত 'কুম্ভপর্ব—এক পৌরাণিক বিবেচন' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকৃত সত্য স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন—"উপর্যুক্ত মন্ত্রোঁ মেঁ 'কুম্ভ' শব্দ কা কুম্ভপর্ব অর্থ সম্প্রদায়কে অনুরোধ সে কিয়া গয়া হৈ।"২ অর্থাৎ উদ্ধৃত বৈদিক মন্ত্রসমূহের মধ্যে 'কুম্ভ' শব্দ হইতে যে কুম্ভপর্ব অর্থ করা হইয়াছে, তাহা সম্প্রদায়ের অনুরোধেই করা হইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীউমেশ মিশ্র, এম-এ, ডি-লিট 'তীর্থরাজ প্রয়াগ ঔর কুম্ভপর্ব' নামক এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"পুরাণোঁ মে কুম্ভযোগ কী কহীঁ ভী চর্চা নহীঁ হৈ। মাঘ-মাহাত্ম্য

১। চৈঃ চঃ মঃ ১৮।২২২ ; ২। স্কন্দপুরাণ, পুষ্করখণ্ড—মকররাশিতে বৃহস্পতি ও সূর্যের মিলন এবং তৎকালে রবিবারে পূর্ণিমা-তিথির সংঘটন হইলে প্রয়াগে ও হরিদ্বারে গঙ্গা পুষ্কর-তুল্য হয়। ইহা কোটি-সূর্যগ্রহণের সমান।

১। চৈঃ চঃ মধ্য ৯।৭৬

২ হিন্দী 'ভারত' পত্রিকার রজতজয়ন্তী—মহাকুম্ভ-বিশেষাঙ্ক, ৫৫ পৃষ্ঠা।

মে যা প্রয়াগ-মাহাত্ম্য মে ভী কুম্ভ কা কহীঁ ভী উল্লেখ দেখনে মেঁ অভী তক নহীঁ আয়া হৈ। নিবন্ধোঁ মেঁ ভী চর্চা নহীঁ দেখ পড়তী হৈ।"১ অর্থাৎ, পুরাণে কোথাও কুম্ভযোগের আলোচনা নাই। মাঘ-মাহাত্ম্য ও প্রয়াগ-মাহাত্ম্যেও কোথাও এখন পর্যন্ত কুম্ভযোগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র-নিবন্ধসমূহেও কোনও আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় না।

জ্যোতিষাচার্য পণ্ডিত শ্রীবলরাম-শাস্ত্রীজী, এম-এ, সাহিত্যরত্নও লিখিয়াছেন—"ইসসে সিদ্ধ হোতা হৈ কি গ্রহোঁ কী স্থিতি মেঁ পরিবর্তন হোতে গয়ে ঔর পুরাণ বনতে গয়ে হৈঁ। অতঃ য়ে প্রমাণ পরস্পরবিরোধী সিদ্ধ হো রহে হৈঁ।"২ অর্থাৎ, এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, গ্রহসমূহের স্থিতির পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরাণও রচিত হইতেছিল। এইজন্যই প্রমাণ পরস্পর-বিরোধী হইয়াছে।
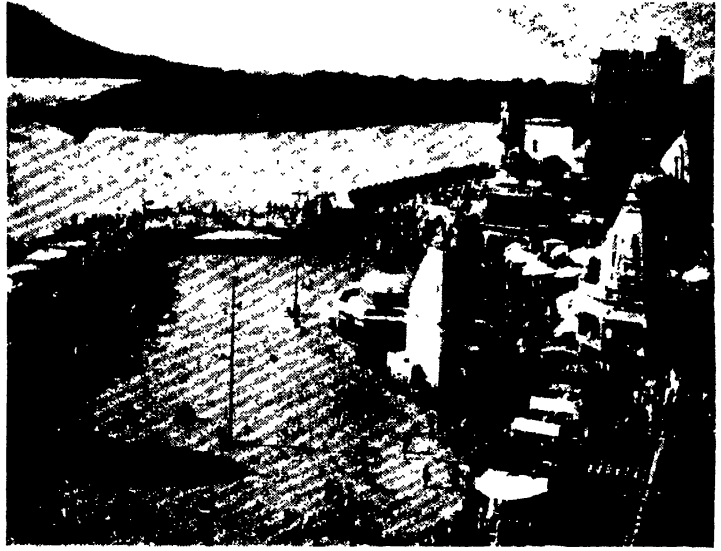
হরিদ্বার

কুম্ভপর্ব প্রকৃত কোন্ সময় হইতে সুরু হইল এবং কেই-বা ইহার প্রথম প্রবর্তন করিলেন, তৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার বিবদমান অনুমানমূলক মত প্রচারিত আছে। (১) কেহ কেহ বলেন, আদি-শ্রীশঙ্করাচার্য কুম্ভপর্বের প্রবর্তন করিয়াছেন; (২) কোন মতে চতুঃসন প্রত্যেক বার বৎসর অন্তর হরিদ্বার ও প্রয়াগাদি তীর্থে পর্যটন করিতেন, সেই স্মৃতি সংরক্ষণকল্পে কুম্ভপর্বের প্রবর্তন হইয়াছে; (৩) মতান্তরে—যোগিগণ এক যুগ অর্থাৎ বার বৎসর অন্তর তাঁহাদের যোগসাধনার একটি একটি পর্ব সমাপ্ত করিয়া প্রয়াগাদি তীর্থে মিলিত হইতেন, তাহা হইতে প্রতি বার বৎসর অন্তর কুম্ভপর্বের প্রচার হইয়াছে; (৪) কেহ কেহ মনে করেন, সমুদ্র-মন্থনের সময়ে উদ্ভূত অমৃত-কুম্ভ হইতে অমৃতবণ্টন প্রয়াগ-তীর্থেই হইয়াছিল, উহারই স্মারক-উৎসবরূপে প্রয়াগে কুম্ভমেলার প্রচার হইয়াছে; (৫) কেহ কেহ মনে করেন, যখন গরুড় অমৃতকুম্ভ লইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিতেছিলেন, তখন তিনি যে চারিটি বিষ্ণুতীর্থে অমৃতকুম্ভসহ বিশ্রাম করেন, সেই চারিটি স্থানেই কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে; (৬) কেহ-বা কুম্ভমেলাকে বৈদিক-যুগের সমন-মেলার৩ রূপান্তর বলিয়া অনুমান করেন; (৭) কেহ কেহ-বা ইহাকে বৌদ্ধধর্ম-পরিষদ বা মহামোক্ষপরিষদ প্রভৃতির রূপান্তর বলিয়া কল্পনা করেন; (৮) কেহ কেহ কুম্ভমেলাকে দশনামী-শঙ্কর-সন্ন্যাসিগণের, যোগিগণের এবং তদনুকরণে অন্যান্য সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিক-সম্মেলন-বিশেষ মনে করেন; (৯) আবার কেহ কেহ বলেন, হরিদ্বার ও প্রয়াগের পুষ্করযোগ কালক্রমে কুম্ভপর্বে রূপান্তরিত হইয়া চারিটি তীর্থস্থানে বিরক্ত সাধুগণের মধ্যে প্রচারিত হয় এবং এই সাধুবৃন্দের মধ্যে পরস্পর নানাপ্রকার উপদ্রবের সৃষ্টি হইলে শ্রীরামানন্দ স্বামীর শিষ্য সুরসুরানন্দের শাখায় বালানন্দজী (১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত) হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনীতে বর্তমান আকারের কুম্ভমেলার প্রবর্তন করেন; (১০) সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী এবং আচার্যগণ ইহাও বলেন যে, কুম্ভপর্ব স্থল-পুরাণের দ্বারা প্রচারিত হওয়ার পর ক্রমে ক্রমে কুম্ভমেলার নাম ও রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

অক্ষয়বট

প্রয়াগের অক্ষয়বট সম্বন্ধেও দুই-চারিটি কথা বলা আবশ্যক। পদ্মপুরাণে অক্ষয়বটকে তীর্থরাজ প্রয়াগের ছত্র-স্বরূপ 'আদিবট' বলা হইয়াছে। কূর্মপুরাণে ও মৎস্যপুরাণে উক্ত বটবৃক্ষের নিম্নে প্রাণত্যাগ করিলে রুদ্রলোকপ্রাপ্তির কথা উক্ত হইয়াছে। প্রলয়-কালেও এই বটের অস্তিত্ব থাকিবে এবং চন্দ্র সূর্য লুপ্ত হইলেও এই বট ভূতলে প্রকাশিত থাকিবেন, বলা হইয়াছে।

৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েন্-সাঙ প্রয়াগে এক প্রসিদ্ধ দেবমন্দিরের সম্মুখে সুদূরপ্রসারী বিস্তৃতশাখ এক বিশাল বৃক্ষ দেখিয়াছিলেন এবং প্রাচীন প্রথানুসারে সেই বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া পুণ্য-কামী লোক প্রাণ বিসর্জন করিতেছিলেন—এইরূপ বিবরণ দিয়া-ছেন। কেহ কেহ ঐ বিখ্যাত মন্দিরটিকে শূলটঙ্কেশ্বরের মন্দির বলিয়া অনুমান করেন। ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে আলবেরুণী যে ভ্রমণ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও গঙ্গা এবং যমুনার সঙ্গমের উপর এক বিশাল বটবৃক্ষের বর্ণনা আছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ এই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন করিতেন। ১৩১০

১। ঐ, ১০৩ পৃষ্ঠা ২। ঐ, ৫৬ পৃষ্ঠা

৩। ঋগ্বেদ ২।১৬।৭, ১।১২৪।৮; অথর্ববেদ ২।৩৬।১

প্রাচীন মায়াপুর (হরিদ্বার)

ভ্রমণ-বৃত্তান্তে (১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত) লিখিয়াছেন, ১৫ বৎসর পূর্বে তাঁহার কোন আত্মীয়কে পাণ্ডাগণ শুষ্ক শাখাদ্বয়যুক্ত এক বৃক্ষকে অক্ষয়বট বলিয়া প্রদর্শন করেন। কিন্তু চন্দ্র মহাশয় স্বয়ং অক্ষয়বট দর্শন করিতে পারেন নাই ; কারণ তখন ঐ পাতালপুরী বন্ধ ছিল।

বর্তমান দুর্গের মধ্যে পাতালপুরীতে যাত্রিগণকে যে অক্ষয়বট প্রদর্শিত হয়, উহা বাস্তবিকপক্ষে বহির্দেশ হইতে আনীত, সাময়িক ভাবে স্থাপিত কোন বটবৃক্ষের শাখা। চারি-পাঁচ বৎসর অন্তর এক একবার পরিবর্তন করা হয়। এই কার্য ব্যবসায়ী পাণ্ডাগণের দ্বারা সাধারণের অজ্ঞাতসারে রাত্রিতে অতি গোপনে সম্পাদিত হইয়া আসিতেছিল ; কিন্তু ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে যে পরিবর্তন-কার্য হইয়াছিল, তাহা সাধারণের মধ্যে কেহ কেহ জানিতে পারেন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে পুনরায় উক্ত শাখার পরিবর্তন-কালে পাতালপুরীর প্রধান পুরোহিত দুর্গের অধ্যক্ষের আদেশ লইয়া ছত্রিশ জন পাণ্ডা ও প্রায় কুড়ি জন মজুরদ্বারা রাত্রি আটটার সময় দুর্গের বহির্দেশ হইতে এক বৃক্ষের শাখা লইয়া পুরাতন শাখার স্থানে স্থাপন করেন। এই সংবাদ ২৪-৬-৫১ তারিখে এলাহাবাদের ইংরেজী দৈনিক 'লীডার' পত্রে প্রকাশিত হয়।

খ্রীষ্টাব্দে 'জামুত তবারীখ' লেখক মুসলমান ঐতিহাসিক রশীদ উদ্দীন প্রয়াগের গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের উপর বিশাল বটবৃক্ষের দুইটি মুখ্য শাখার কথা এবং উহার উপর উঠিয়া হিন্দুগণ গঙ্গাতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিতেন ইত্যাদি লিখিয়া গিয়াছেন। তুলসীদাসও স্বচক্ষে অক্ষয়বট দর্শন করিয়া তাঁহার 'শ্রীরামচরিতমানসে'১ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

সঙ্গম সিংহাসনু সুঠি সোহা।
ছত্রু অক্ষয়বট মুনি মন মোহা ॥
পুজহিঁ মাধবপদ জলজাতা।
পরসি অক্ষয়বট হরষহিঁ গাতা ॥১

সম্রাট আকবরের সমকালীন আবদুল কাদির বদায়ূনীও অক্ষয়বট হইতে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া হিন্দুগণের প্রাণত্যাগের কথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

আকবর প্রয়াগের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে দুর্গনির্মাণ কালে (১৫৮৩ খ্রীঃ) প্রাচীন অক্ষয়বটের একটিমাত্র শাখা রাখিয়া সমগ্র বৃক্ষটি ছেদন করিয়া দেন। তৎপর ঠিক কোন্ সময় হইতে দুর্গের মধ্যে পাতালপুরী ও কৃত্রিম অক্ষয়বটের প্রদর্শনী খোলা হয়, তাহার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। ১৭৬৫ সালে ওলন্দাজ মিশনরী টিফেন থালর প্রয়াগ-দুর্গের মধ্যে পাতালপুরী ও তথায় বিভিন্ন দেবমূর্তি, পত্রাদিবিহীন শাখাদ্বয়যুক্ত বৃক্ষের এক অংশ দেখিতে পান। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় শাহ আলম কর্তৃক প্রদত্ত এক সনন্দ হইতে জানা যায়, তৎকালে পাতালপুরীতে অক্ষয়বটের পুরোহিত অযোধ্যানাথ যোগী ছিলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয় তাঁহার

শ্রীশিবনাথ কাটজু এম-এস-এ মহাশয় গবেষণাদ্বারা নির্ণয় করিয়া জানাইয়াছেন যে, প্রয়াগ-দুর্গ নির্মাণকালে আকবর প্রকৃত প্রাচীন অক্ষয়বটের যে একটি শাখা ব্যতীত সমগ্র বৃক্ষটিকে কাটিয়া দিয়াছিলেন সেই অকর্তিত শাখা অদ্যাপি দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে যমুনার নিকট বর্তমান রহিয়াছে। উহার অগ্রভাগ যমুনার তীর হইতে দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু বাহির হইতে দেখিয়া উহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝা যায় না। ঐ স্থানের বহির্দেশে দুর্গের প্রাচীর-গাত্রে পদ্মচিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। প্রয়াগে প্রচারিত প্রাচীন কিংবদন্তীও ইহার সমর্থন করে।

কাটজু মহাশয়ের নির্দেশানুযায়ী প্রয়াগ-দুর্গের সেনাধ্যক্ষ প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ের বনস্পতি বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ শ্রীরঞ্জনকে উক্ত অক্ষয়বট পরীক্ষা করিতে নিযুক্ত করেন। ডক্টর রঞ্জন পরীক্ষা করিয়া বলেন, উক্ত বটবৃক্ষ পাঁচ শত বৎসরের অধিক পুরাতন। উহার মুখ্য বৃহৎ শাখাটিকে প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে ভূমি হইতে ছয় ফুট উচ্চে কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।

১। বালকাণ্ড ৪৮-৪৯

শ্রীশ্রীসারদামণি

মন্মথ রায়

প্রথম দৃশ্য

১২৬৬ সালের বৈশাখ মাস

[জয়রামবাটী। রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহ। বিবাহ-বাসর। পাত্র ও পাত্রী উভয় পক্ষের পুরোহিত বিবাহের মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন। অদূরে সানাই বাজিতেছে।]

রামচন্দ্র। ওহে ত্রৈলোক্য! এদিকে শোন ত।

ত্রৈলোক্য। কি দাদা?

রামচন্দ্র। আর দাদা! দাদার তোমরা যা মর্য্যাদা রাখছ। সারদামণি—নামেই আমার মেয়ে। কিন্তু কাকাদের কোলে-পিঠেই ও মানুষ। আজ তার বিয়ে—তা তোমার মুখে হাসি নেই, আর ছোট কাকা নীলমাধবের ত দেখাই নেই। একটা কথা জেনে রাখ ত্রৈলোক্য। আমি রামচন্দ্র মুখুজ্যে—আমি লোক চিনি। মেয়েকে আমি জলে ফেলে দিই নি—জলে ফেলে দিই নি—দেখো তোমরা।

ত্রৈলোক্য। কি জানি দাদা, আপনি মেয়ের বাপ—সংসারের কর্ত্তা। যখন যা বলবেন করব। কিন্তু নীলমাধব অবুঝ। দেখে এলুম ঠাকুরঘরে বসে সে কাঁদছে।

রামচন্দ্র। দেখ দেখি—কি সব কাণ্ড। তুমি এখানে বসে সব দেখাশোনা করো। আমি ওকে দেখছি।

(নীলমাধবের প্রবেশ)

হ্যাঁরে নীলমাধব, তুই পাগল না ক্ষ্যাপা? তোর আদরের সারু—আমাদের সকলের বুকের ধন সারদামণির বিয়ে হচ্ছে, আর তুই এই ঠাকুরঘরে একলাটি গোমড়া মুখে বসে রয়েছিস? চল্—

নীল। না দাদা, আমি যাব না। আগেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। তারপর বরযাত্রীরা নিজমুখেই সব বলছে।

রাম। কি—কি বলছে?

নীল। তিনশো টাকা পণের লোভে আমরা কচি মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিলাম।

রাম। বটে!

নীল। কি দরকার ছিল এত তাড়াহুড়ো করে এই বিয়ে দেবার? স্পষ্ট মনে আছে বারোশ' যাট সালের আটই পৌষ ওর জন্ম। আর এই ছেষট্টি সালের বোশেখে ছ'বছরে পড়তে না পড়তেই হয়ে গেল ওর বিয়ে। আর সেই বিয়ে কিনা একটা ক্ষ্যাপা পাগলার সঙ্গে।

রাম। মুখ সামলে কথা বলবি নীলমাধব। ঐ ত বর পিঁড়িতে বসে আছে। এসে দেখ্ ওর পাগলামিটা কোথায়। বিয়ের মন্ত্র উচ্চারণ করছে—কি স্পষ্ট, কি অর্থবোধ! তোরা কেউ এমনটি পারবি নে। কলকাতার সেরা ধনী রাণী রাসমণি—তিনি কি আর না দেখে শুনে চব্বিশ বছরের ছেলে ঐ গদাধর চাটুজ্যেকে তাঁর দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের পূজারী করেছেন?

নীল। জানি দাদা জানি। কিন্তু সেই ত হয়েছে কাল। বারো বছর ধরে কালীপুজো করতে করতে মাথাটি ওর একেবারে বিগড়ে গেছে। ও নাকি মা-কালীকে দেখে, তাঁর সঙ্গে কথা কয়। রাণী রাসমণি—যে রাসমণি তাঁকেও নাকি চড় মেরেছে। টাকাকে মাটি, মাটিকে টাকা, এই রকম হ'ল ওর ধারণা। এসব পাগলামি নয়?

রাম। এ সব জ্ঞাতি-শত্রুর রটনা। আমি ত কথাবার্ত্তা কয়ে দেখলুম। এ সব লক্ষণ ত কিছুই পেলুম না।

নীল। এখন ত কিছু পাবেন না। আমি যে সব শুনলুম। ছেলের এই পাগলামির খবর পেয়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে কামারপুকুরে ধরে এনে মা চন্দ্রমণি দেবী আর মেজ ভাই রামেশ্বর চাটুজ্যে অনেক শান্তিস্বস্ত্যয়ন, ঝাড়ফুক করে তবে কিছুটা সুস্থ করেছেন। অন্য-দিকে মন ফিরিয়ে সংসারে বাঁধবার জন্যে তাড়াতাড়ি এই বিয়ের ব্যবস্থা। কিন্তু জেনে রাখুন দাদা, এ পাত্রে মেয়েকে বলি দিতে কেউ রাজী হয় নি। রাজী হয়েছেন শুধু আপনি।

রাম। হ্যাঁ আমি। তবে তুইও জেনে রাখ নীলমাধব, এ বিয়ে আমরা কেউ ঠিক করি নি। এ বিয়ে ছেলে-মেয়ে নিজেরাই ঠিক করে নিয়েছে। জানিস ত নীলমাধব, দেব-ইচ্ছায় সারদার জন্ম। তোর বৌঠান শ্যামাসুন্দরী দেবী একদিন স্বপ্ন দেখেন, লাল চেলিপরা একটি পাঁচ-ছ' বছরের দেবীমূর্ত্তি ওঁর জঠরে প্রবেশ করেন। তার পরই হয় সারদার জন্ম।

নীল। জানি দাদা। আর তা জানি বলেই আজ আমাদের দুঃখ। এই মেয়ের ত্রিভুবনে তুমি আর বর পেলে না?

রাম। কিন্তু দেবী যে নিজেই তার বর নির্ব্বাচন করে বসে আছে। আমি তার কি করব? একদিন শিহড়ে হৃদয় মুখুজ্যের ঘরে ওকে কোলে নিয়ে আমি গান শুনতে যাই। গান ভাঙল। অত লোক দেখিয়ে রহস্য করে আমি বললুম—বল মা সারু, এদের মধ্যে তুই কাকে বিয়ে করবি? দু'হাত তুলে মা আমার যাকে দেখাল, সে হ'ল গিয়ে এই ছেলে—এই গদাধর। পরিচয় নিয়ে জানলুম হৃদয় মুখুজ্যেরই মামা।

নীল। কাছে ছিল দেখিয়েছে। গদাধর না থেকে হলধর থাকলে তাকেও দেখাত। কচি মেয়ের এই অর্থহীন খেলাটাই আজ আপনার কাছে এত বড় হয়ে দাঁড়াল দাদা?

রাম। অর্থহীন নয় ভাই, অর্থহীন নয়। সেদিনকার এই কথা আমাদের কারুরই মনে ছিল না নীলমাধব। কিন্তু ছেলেটি তা ভোলে নি। পাত্রী যখন কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না,

ঐ গদাধরই তখন বাড়ীর সবাইকে বলে দিলে—জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্যের মেয়েটি কুটো বেঁধে রাখা আছে, দেখগে যাও।

(হঠাৎ ত্রৈলোক্যের প্রবেশ)

ত্রৈলোক্য। দাদা—সর্ব্বনাশ! শীগগির এস।

রাম। কি হয়েছে ত্রৈলোক্য—কি হয়েছে?

ত্রৈলোক্য। ভীষণ অমঙ্গল। বিয়ের স্ত্রী-আচারে মেয়েরা সাতাশ কাঠি জ্বেলে যখন বরের চারপাশে ঘুরছিল, তখন জ্বালা কাঠির আগুনে বরের হাতে বাঁধা, গায়ে-হলুদের মাঙ্গলিক সুতো পুড়ে গেল।

নীলমাধব। আমি জানতুম—আমি জানতুম তিনশো টাকা পণ পেয়ে দুধের মেয়েটাকে আমরা বলি দিলুম—বলি দিলুম।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

১২৭৪ সনের জ্যৈষ্ঠ মাস

[জয়রামবাটী। সারদামণির পিত্রালয়। সারদামণির মা'তা শ্যামাসুন্দরী পূজা সারিয়া উঠিলেন।]

শ্যামা। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।

[এমন সময় গ্রামের সদ্‌গোপ-কন্যা ভানু দাসী আসিয়া দাঁড়াইল]

ভানু। আমার সারদামণি কোথায় বৌঠান?

শ্যামা। কে—ভানু? শ্বশুরবাড়ী থেকে কবে এলি তুই?

ভানু। এই ত আজ সকালে।

শ্যামা। জামাইও এসেছে নাকি রে?

ভানু। না বৌঠান, জান ত সদ্‌গোপের পো। আর এটা হ'ল গিয়ে বিয়ের মাস—দইয়ের বায়না পেয়ে মেতে আছেন। তা, সারু কোথায়?

শ্যামা। ধবলী গরুর নতুন বাছুর হয়েছে। খড়ের অভাব—নিজেই গেছে পুকুর থেকে দল-ঘাস কেটে আনতে। সংসারের কাজ নিয়েই মেতে আছে।

ভানু। এমন মেয়ে—বিয়ে হ'ল—তাও স্বামী নিয়ে ঘরকন্না করতে পারল না। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ী কি আর গিয়েছিল?

শ্যামা। তা তিন বার গেছে। কিন্তু জামাই ছিল না। বিয়ের পর কলকাতা গিয়ে সেই যে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ঠাঁই নিয়েছে, আর বাড়ীমুখো হবার নামটি নেই। মাকেও নিয়ে গেছে কিন্তু বৌকে নিল না। এদ্দিন না হয় ছোটই ছিল, কিন্তু—ষাট—এখন ত সারু আমার তেরো পেরিয়ে চৌদ্দয় পা দিয়েছে। মেয়েটার দিকে আর আমি তাকাতে পারি না—ভানু। আমার গঞ্জনাই কি কম? আমরা নাকি জেনে শুনে একটা পাগলের গলায় মুক্তোহার ঝুলিয়ে দিয়েছি।

ভানু। লোকে যা বলে বলুক। কিন্তু আমি বলছি, আমাদের ঐ ক্ষ্যাপা ঠাকুরটি হচ্ছেন সাক্ষাৎ ভোলানাথ শিব। লোক দেখেই বোঝা যায় বৌঠান। যাক্—চলি। সারু এলে আমার কথা বলো।

ভানুর প্রস্থান

শ্যামা। তুমি কে বাবা—ওখানে দাঁড়িয়ে?

ছিদাম। মা ঠাকরুণ, আমি ছিদাম—তোমাদের ক্ষেতের কাজ সেরে জলপানি নিতে এসেছি। তা সারু দিদিকে ত দেখছি না।

শ্যামা। ধবলীর জন্যে দল-ঘাস কেটে আনতে গেছে রে ছিদাম।

ছিদাম। ছাখ দেখি। অবলা গরুর জন্যেই কত দয়া—মানুষের ত কথাই নেই। তিন বছর আগে সেই যে দুর্ভিক্ষ হ'ল, হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি রেঁধে কত লোককেই না তোমরা খাইয়েছ। পেট ক্ষিধের জ্বলে যাচ্ছে, অথচ খিচুড়ি এত গরম—মুখে দিতে পারছি না দেখে দিদি ছুটে এসে খিচুড়ি শীগগির জুড়োবে বলে পাখা নিয়ে হাওয়া করতে বসে গেল। সে কথা আজও সবাই বলে থাকে মা।

শ্যামা। তুমি এখন একটু ঘুরে এস ত বাপু। এ সব কথা শুনতে আর আমার ভাল লাগে না। দয়ার শরীর—দয়ার শরীর—কিন্তু ওকে আর কে দয়া করছে?

ছিদাম। তা যা বলছ মা ঠাকরুণ। এমন সোনার পিতিমে! আচ্ছা আমি আসছি।

ছিদামের প্রস্থান

শ্যামা। এই কাদু, শুনে যা।

দ্বিতীয় কন্যা কাদম্বিনীর প্রবেশ।

কাদম্বিনী। তুমি মা আর আমাকে 'কাদু' 'কাদু' কর না। দিদিকে 'সারদা' বল, আমার ছোটটা—তাকেও 'প্রসন্ন' বল, আর আমায় কাদম্বিনী বলতে পার না?

শ্যামা। বেশ, না হয় কাদম্বিনীই বলছি। তা এত বেলা হ'ল—তোরা সব খাবি আয়।

কাদম্বিনী। দিদি ফিরে না এলে কি করে খাব?

শ্যামা। কেন? আমি খেতে দিচ্ছি।

কাদম্বিনী। দিদি ভাত খাইয়ে না দিলে পেটই ভরবে না কারুর। দিদি আসুক, খাব।

কাদম্বিনীর প্রস্থান।

শ্যামা। খালি দিদি আর দিদি। এই দিদি শ্বশুরবাড়ী গেলে তখন কি হয় দেখব।

(শ্যামাসুন্দরীও চলিয়া যাইতেছিলেন এমন সময় রামচন্দ্র ও নীলমাধবের প্রবেশ)

রাম। না, না গিন্নী যেও না—দাঁড়াও। শোন নীলমাধব কি বলছে। এই যে সারু তুইও এসে পড়েছিস। ভালই হ'ল। তুইও শোন।

সারদার প্রবেশ

সারদা। দল-ঘাসগুলো গোয়ালে রেখে আমি আসছি বাবা।

রাম। না, না, তোরও যে শোনা দরকার। ঘাসগুলো নামিয়ে রাখ।···কামারপুকুরে আমার ক্ষ্যাপা বাবা এদ্দিন পর হাজির হয়েছেন। এসেই জোর তলব—তোকে আজই যেতে হবে। লোক পাঠিয়েছেন। কিন্তু নীলমাধব বেঁকে বসেছে। তোকে যেতে দেবে না।

নীল। কোথায় যাবে? কার কাছে যাবে? লোকটা কে? শুনেছিস ত সব। দক্ষিণেশ্বর ত এমন কিছু দূর নয়—খবর সবই আসে। শ্মশানে-মশানে ন্যাংটা হয়ে বাঁশ কাঁধে করে বেড়ায়। কাঙালীদের এঁটো খায়। কখনও বসে থাকে স্থাবর-স্থির অসাড় হয়ে। কখনও সন্ন্যাসী—রামনাম জপছে। আবার কখনও ফকির—আল্লা আল্লা করছে। এখানেও যে এসেছে—সঙ্গে নাকি একটা ভৈরবী বামনী। এই লোকের কাছে মেয়ে পাঠাতে হবে? মেয়ে কি জলে পড়ে আছে?

শ্যামা। তবু ত স্বামীর ঘর। স্বামী যখন যেতে বলেছে—হ্যাঁ গা, তুমি কি বলো?

রাম। আমি আর কি বলব। এ সব ত শুধু আজই শুনছি না। শুনে শুনে আমার মাথা গুলিয়ে গেছে। তুই চুপ করে আছিস কেন সারু? বাপের সংসারে বসে বসে সারা জীবন কি শুধু ঘাসই কাটবি?

সারদা। আমি যাব বাবা। আমায় নিয়ে চল কাকামণি। পাগল হোক, আর যাই হোক—মা তুমিই বলেছ, তিনিই আমার দেবতা। তোমার কথা মিথ্যে হবে না মা। আমাকে যেতে দাও।

—

তৃতীয় দৃশ্য

কামারপুকুর। গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের গৃহ। কাল—সন্ধ্যা। গদাধর ও গ্রামের অনেক নরনারী উপস্থিত রহিয়াছেন। কালীকীর্তন হইতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। কোলাহল উঠিল।

—দেখ, দেখ, গদাধরের কি হ'ল?

—মূর্চ্ছা গেছে—মূর্চ্ছা গেছে।

—মূর্চ্ছা নয়—ভাবাবেশ হয়েছে।

—গদাধর, গদাধর, নাঃ কোন সাড়া নেই।

—শুনেছি, দক্ষিণেশ্বরে ওঁর এ রকম প্রায়ই হ'ত। ভয় কিছু নেই।

—কিন্তু কামারপুকুরে এসব এই প্রথম।

—ওহে বাড়ীর ভিতর খবর দাও—ওরা সব আসুক।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঠাকরুণকে আর হৃদয় ভাগ্নেকে ডেকে আন।

—ভৈরবী ব্রাহ্মণী! সে আবার কে?

—দেখ নি, দক্ষিণেশ্বর থেকে সঙ্গে এসেছে। ওঁর নাকি শিক্ষাগুরু।

—কি জানি বাপু, আমার ত ভীষণ ভয় করছে।

—বেঁচে আছে ত?

—হ্যাঁ হ্যাঁ বেঁচে আছে—শুধু জ্ঞানই নেই।

—এই যে হৃদয় ভাগ্নে এসে গেছে।

—সর, সর, বাড়ীর মেয়েরাও সব এসে গেছে।

হৃদয়। মামা ও মামা।

১ম লোক। কই সাড়া দিচ্ছে না ত। কব্‌রেজ ডাকবো?

হৃদয়। না, দরকার নেই। ও ভৈরবী ঠাকরুণ, আপনি আসুন।

ভৈরবী। সর ত বাবা, আমি ডাকছি।···ঠাকুর—ঠাকুর জাগ। তারা ব্রহ্মময়ী, তারা ব্রহ্মময়ী, তারা ব্রহ্মময়ী। এই ত বাবা আমার জেগেছে।

হৃদয়। মামা, আমায় চিনতে পারছ? আমি—আমি তোমার হৃদু···হ্যাঁ চিনেছে।

গয়াবিষ্ণু। আমাকে চিনতে পারছ ভাই? আমি গয়াবিষ্ণু। চিনছ না! আরে, আমি গয়াবিষ্ণু লাহা—তোমার ছোটবেলার খেলার সাথী।···চিনেছে। হ্যাঁ ঐ হাসছে। বল ত ইনি কে? চিনলে না? শ্রীনিবাস শাঁখারী। তোমাকে কত ভালবাসেন।··· এই ত চিনেছেন।

ধনী। আমাকে চিনছ বাবা? আমি ধনী কামারণী।

গদাধর। তুমি ভিক্ষা-মা।

হৃদয়। আর বল ত ইনি কে?

গদাধর। তোদের সারদামণি, আমার চোখের মণি [সকলের হাস্য]

হৃদয়। হ্যাঁ এই ত মামা আমার মামা হয়েছে। মামা এখন একটু একলা থাক।

সকলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই ভাল।

—চল হে চল।

—কাল আসব।

—হ্যাঁ কাল আবার আসব।

সকলের প্রস্থান।

ভৈরবী। আমি পূজায় চললুম হৃদু।

ভৈরবীর প্রস্থান

হৃদয়। আমিও খেতে বসে উঠে এসেছি। চল ত মামা, ঘরে চল। ওঠ। মেজ মামী, ছোট মামী, তোমরাও ধর। ওরে লক্ষ্মী, তুই ছুটে গিয়ে মামার বিছানাটা ঠিক করে রাখ।—বুঝলে মেজ মামী, বুঝলে ছোট মামী, দক্ষিণেশ্বরে এসব আমাদের হামেশাই ভুগতে হয়। ভয়ের কিছু নেই।

—

চতুর্থ দৃশ্য

গদাধরের শয়নকক্ষ। কাল—রাত্রি। গদাধর ও সারদামণি কথোপকথনে রত।

গদাধর। কি গো? আমার অমন দশা দেখে তুমি বুঝি খুব ভয় পেয়েছিলে?

সারদা। প্রথমটায় ভয় পেয়েছিলাম বৈকি, তারপর সবাই যখন বললে—দক্ষিণেশ্বরে তোমার এমন হয়ে থাকে, তখন ভয় গেল। ভৈরবী ঠাকরুণ কাছে আছে দেখে মনে সাহস হ'ল।

গদাধর। হাঁা আমার এমন হয়। জ্ঞান থাকে না—বুঝলে? আমি যে কোথায় চলে যাই—মনে থাকে না। তখন শুধু দেখি, আমি আর মা, মা আর আমি।

সারদা। কোন্ মা? আমার শাশুড়ীর কথা বলছ? তাঁকে ত দক্ষিণেশ্বরে রেখে এসেছ।

গদাধর। (হাসিয়া) হাঁা, হাঁা, আমার সে মা, আমার সে মায়ের মা—তার মায়ের মা—জগতের মা। শুধু দক্ষিণেশ্বরে কেন, তিনি আছেন সর্ব্বত্র। হাঁা গো, ঐ যে জানলা দিয়ে আকাশে চাঁদ উঠেছে দেখছ। ঐ চাঁদামামা সবার মামা ত? জগজ্জননীও তেমনি। সবারই আপনার জন। সবাইকেই তিনি ভালবাসেন। তুমি ডাক, তুমিও দেখবে—সাড়া পাবে। আমাকে কিছু খেতে দিলে না যে?

সারদা। ওমা, সে কি গো! তুমি যে এই খেলে।

গদাধর। কৈ খেলুম? আমি ত এই দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি, কৈ খাওয়ালে?

সারদা। বা রে!

গদাধর। ও হাঁা, হাঁা, মুড়ি আর মেঠাই খেয়েছি। এই দেখ আমি সব ভুলে যাই।

সারদা। তা তুমি যাও। বিয়ে করে আমাকে দেশে রেখে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে আমাকে ভুলে গেলে। একদিন নয়, দু'দিন নয়—বছরের পর বছর—আটটি বছর আমি একলা আছি।

গদাধর। একলা কি গো? আমি যদি এ ঘর থেকে ও ঘরে যাই, তার মানে কি—আমি নাই?

সারদা। তা কেন হবে?

গদাধর। এ-ও ত তাই। আর আমি ও ঘরে গেলেই কি তুমি আমার ভুলে যাবে?

সারদা। ভুলে যাব কিগো? ছাড়াছাড়ি হলে আরও বেশী মনে হয়, আরও বেশী মনে পড়ে।

গদাধর। তবে? সারদামণি—তবে? এই—এই দেখ, তোমার পিদিমটা বুঝি নিভে যাচ্ছে।

সারদা। না নিভবে না। আমি উসকে দিচ্ছি।

গদাধর। এ সলতে কে পাকিয়েছে? তুমি?

সারদা। হাঁা গো। কেন?

গদাধর। হয় নি। এই দেখ—আমি পাকাচ্ছি। সলতে পাকাতে হয় এমনি করে। শিখে রাখ।

সারদা। হাঁাগো, তুমি এত জান! শুধু জান না বৌ নিয়ে ঘরকন্না করতে।

গদাধর। (হাসিতে হাসিতে) হাঁা, হাঁা, জানি কিনা দেখবে এখন।

সারদা। তবে আমায় সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ এবার?

গদাধর। না গো না, এবার নয়। সময় হলেই নেব।

সারদা। বেশ, তাই হবে। কিন্তু গিয়ে খবর-টবর দিও। কোন খবর না পেলে আমি টিকতে পারি না।

গদাধর। টিকতে পারবে না কি গো? তেমন ব্যাকুলতা এলে তোমাকে ধরে রাখবে কে? যেও। তবে হাঁা, পথ চলতে সাবধান—খুব সাবধান। গাড়ীতে বা নৌকোয় যাবার সময় আগে গিয়ে উঠবে, আর নামবার সময় কোনও জিনিসটা নিতে ভুল হয়েছে কিনা দেখে-শুনে সকলের শেষে নামবে। তা ছাড়া কলকাতা শহর—ওরে বাপরে। পেল্লায় ব্যাপার। সেখানে কিভাবে চলতে হয়—লোকজনের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হয়—সেসব শেখাতে গেলে গোটা রাতই কেটে যাবে সারদামণি।

সারদা। যাক্—তুমি বল।

—

পঞ্চম দৃশ্য

১২৭৮ সালের চৈত্র মাস।

[জয়রামবাটি। সারদামণির পিত্রালয়। শ্যামাসুন্দরী পৈতা কাটিতেছিলেন, ভানুপিসী আসিয়া প্রবেশ করিল]

ভানু। আচ্ছা বৌদি, যখনই আসি, তখনই দেখি—তুমি পৈতে কাটছ, হাত ব্যথা করে না?

শ্যামা। আয়, আয় ভানু—বোস্। একপাল ছেলেমেয়ে হয়েছে—আর বোঝার উপর শাকের আঁটি হয়েছে ঐ সারদা—উপরি রোজগার না হলে কি করে চলে বল্?

ভানু। কিন্তু বৌদি, তাই বলে আমার সারু বোঝা বলতে পার না। তিনটে মানুষের কাজ ঐ একটা মেয়ে করছে।

শ্যামা। দশটা লোকের কাজ করলেও বোঝাই বলব। কেন বলব না? স্বামীর সংসারে আজ যার হেসে খেলে বেড়াবার কথা, কেন সে আজ খেটে মরবে আমার ঘরে? আমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে লোকটা আজ চার বছর হ'ল কলকাতা চলে গেছে। জিজ্ঞেস নেই, পত্তর নেই—লোকনিন্দের কান ঝালাপালা হয়ে গেল। মেয়েটা মরলে আমি এখন বাঁচি।

(শ্যামাসুন্দরীর প্রস্থান, সারদার প্রবেশ)

সারদা। ব্যাপার কি পিসী, মা অমন চোখে কাপড় দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল কেন?

ভানু। আর কেন? তোর ক্ষ্যাপা বর তোকে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারুক আর না পারুক, তোর মাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে।

গোটা জয়রামবাটি গাঁ'টাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। হাঁা, তোর দুঃখে পাড়াপড়শীর ঘুম নেই।

সারদা। কিন্তু জান তো পিসী, দুঃখ আর আমি করি না। দুঃখ সে দিয়েছে সত্যি, কিন্তু দুঃখ সইবার শক্তিও সে-ই দিয়ে গেছে। তোমায় বলেছি তো পিসী, যে আনন্দের পূর্ণঘট তিনি আমাকে দিয়ে গেছেন, এই চার বছরেও তার এতটুকু ক্ষয় হয় নি।

ভানু। দেখ দেখি, আর এই লোকটাকেই কিনা সবাই বলছে—ক্ষ্যাপা দিগম্বর। তা আমি তো বলি সারু, জামাই আমার দিগম্বর, শঙ্করও তো। তুই ত নিজের চোখেই দেখেছিস সেই শিবের চোখমুখ। দেখিস নি?

সারদা। দেখে আশ মেটে না—আশ মেটে না ভানুপিসী। (ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল)।

ভানু। "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু।
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

তা কাঁদছিস কেন সারু? সামনের এই ফাল্গুন পূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মতিথিতে এখান থেকে কত লোক যাবে গঙ্গাস্নান করতে কলকাতায়। তুইও তোর বাবাকে নিয়ে যা না। রথ দেখাও হবে, কলা বেচাও হবে। তুই ভাবিস নে। দাদাকে বলে আমি সব ব্যবস্থা করছি।

—

ষষ্ঠ দৃশ্য

[দক্ষিণেশ্বরে গদাধরের (ঠাকুর রামকৃষ্ণের) বাস-কক্ষ। ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয় ছুটিয়া আসিল]।

হৃদয়। ও মামা, আছ কোথায়? এদিকে যে জয়রামবাটি থেকে ছোটমামী এসে উপস্থিত।

রামকৃষ্ণ। কোথায় রে হৃদু?

হৃদয়। কোথায় আবার—এই দক্ষিণেশ্বরে। ঐ তো ঘাটে নৌকো ভিড়েছে। বাপের সঙ্গে এসেছে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় গঙ্গা-নাইতে। ঘাটে আমি মুখ ধুতে গিয়েছি। গিয়ে দেখি অবাক কাণ্ড।

রামকৃষ্ণ। তা বেশ, তা বেশ। কিন্তু ও হৃদু, বারবেলা নেই তো? প্রথম বার আসছে।

হৃদয়। সেকথা আমার সঙ্গে হয়ে গেছে! তা দেখলাম ছোটমামীর জ্ঞান টনটনে। বলে কিনা—আমি গঙ্গার উপরেই নৌকোয় বারবেলা কাটিয়ে এসেছি। বুঝলে মামা, না-ছোড়-বান্দা।

রামকৃষ্ণ। আরে মলো! লোকটা কোথায় না বলে বক্তিমে সুরু করে দিয়েছে।

হৃদয়। আরে, লোকটা তো তোমার দরজায় দাঁড়িয়ে। চোখের মাথা না খেতে তো এতক্ষণ দেখতে। এসো মামী—এসো। আমি ধাই মুখুজ্যে মশায়ের আদর-আপ্যায়ন করে আসি।

হৃদয়ের প্রস্থান

রামকৃষ্ণ। কি গো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এসেছ বেশ করেছ। দু'দিন আগে এলে না কেন? আর কি আমার সেজবাবু আছে, যে তোমার যত্ন হবে? আরে, সেই যে মথুর বাবুগো—রাণী রাসমণির জামাই। কি ভালই না আমায় বাসত। তা এই পরলা শ্রাবণ সজ্ঞানে দিব্যধামে চলে গেল।

সারদা ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

রামকৃষ্ণ। আমায় তো প্রণাম করছ। মন্দিরে গিয়ে ভবতারিণী মাকে প্রণাম করেছ? নহবতখানায় গিয়ে আমার চন্দ্রমণি মাকে প্রণাম করেছ?

সারদা। এইবার যাব।

রামকৃষ্ণ। আরে, তোমার কপালটা আগুনের মত গরম। জ্বর হয়েছে নাকি?

সারদা। পথে জ্বরে একেবারে বেহুঁস হয়ে পড়েছিলাম। আর দেখা হবে ভাবি নি। কিন্তু স্বপ্নে দেখলাম একটি কালো মেয়ে—কি তার রূপ—আমার মাথায় হাত বুলিয়ে গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে দিল। আমায় বললে—"ভয় কি? দক্ষিণেশ্বরে যাবে বৈকি। সেখানে যাবে, তাকে দেখবে। তোমার জন্যই তো তাকে সেখানে আটকে রেখেছি।" বুঝলে গো, তাই আসতে পেরেছি। নইলে পথেই আমার শেষ হ'ত।

রামকৃষ্ণ। বটে! তা ঐ বেটিই তোমাকে টেনে এনেছে। কিন্তু এখন ঠ্যালা সামলায় কে?

হৃদয়ের পুনঃ প্রবেশ।

হৃদয়। কি আবার ঠ্যালা?

রামকৃষ্ণ। ও হৃদু! ছাখ দেখি—গায়ে জ্বর। ঠাণ্ডা লেগে এখনি হু হু করে বেড়ে যাবে। আমার এই ঘরেই আর একটা বিছানা করে দে। কোবরেজকেও ডাকতে হবে। আর ছাখ একটু সাগু-বার্লি—তাও ভুলিস নি।

সারদা। না, না, আমার জন্য তুমি এত উতলা হচ্ছ কেন?

রামকৃষ্ণ। কেন গো? তুমি কি আমার পর, তুমি কি আমার ফেলনা? না, না—যা' হৃদু, যা—

হৃদয়। ওরে বাবা। যাচ্ছি—

—

সপ্তম দৃশ্য

[দক্ষিণেশ্বরে নহবতখানা। চন্দ্রমণি দেবী গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন]।

চন্দ্রমণি। বৌমা—বৌমা—ও বৌমা—

সারদা। (নেপথ্য হইতে) ভাতের হাঁড়িটা চাপিয়ে আসছি মা।

চন্দ্রমণি। এই যে গদাধর, আয় বাবা—আয়।

রামকৃষ্ণের প্রবেশ

চন্দ্রমণি। ছাখ এসে—নহবতখানার উপরের এইটুকু ঘরে এক দিনের ভিতর বৌমা আমার কেমন সোনার সংসার সাজিয়েছে।

যত বলি, জ্বর থেকে উঠেছ—ও শরীরে সইবে না। তা শুনছে কে?

রামকৃষ্ণ। কিন্তু তার আগে বল দেখি মা নহবতখানার এই ঘরে ঢুকতে চৌকাঠে ওর ক'বার মাথা ঠুকেছে?

চন্দ্রমণি। (হাসিয়া) সে ঠুকবে তোর। বৌমা আমার হিসেবী আছে। দ্যাখ না একদিনেই কেমন গোছগাছ করেছে। আমাকে রাঁধতেও দিলে না।

রামকৃষ্ণ। ইঃ, বৌর হাতে সেবাযত্ন পেয়ে তোমার মুখখানি চিক্‌মিক্ করছে যে! আনন্দ আর ধরে না দেখছি।

চন্দ্রমণি। মন তো এসব চায়ই। কিন্তু হবে কি? তুই বোস।

সারদার প্রবেশ।

চন্দ্রমণি। এই যে বৌমা। ওকে কিছু খেতে দাও। আমি গঙ্গায় ডুব দিয়ে আসছি। চন্দ্রমণির প্রস্থান।

রামকৃষ্ণ। কি গো! এ যে একেবারে জাঁকিয়ে বসেছ দেখছি।

সারদা। জান তো, বসতে পেলেই শুতে চায়।

রামকৃষ্ণ। (চমকিয়া উঠিয়া) য়্যাঁ! বল কি গো! তুমি কি আমায় সংসার-পথে টেনে নিতে এসেছ?

সারদা। না। আমি তোমাকে সংসার-পথে কেন টানতে যাব? আমি যখন তোমার সহধর্ম্মিণী, তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি। থাকবো আমি?

রামকৃষ্ণ। (উৎফুল্ল হইয়া) সহধর্ম্মিণী! বাঃ, বেশ কথা বলেছ। সহধর্ম্মিণী যখন, কেন থাকবে না? একশো বার থাকবে—লাখোবার থাকবে। আমি গিয়ে এখনি শ্বশুরমশায়কে বলে দিচ্ছি—আপনি মশায় আসুন, উনি যাবেন না।

—

অষ্টম দৃশ্য

[দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শয়নকক্ষ। কাল—রাত্রি। ভাব-সমাধিতে মগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণ। ভীতা সারদামণি কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চৈতন্যসম্পাদনে নিযুক্তা।]

সারদা। ওগো—শুনছ, শুনছ—কথা বল—কথা বল। নাঃ, কই জ্ঞান তো ফিরে এল না। এত রাতে একা আমি এখন কি করি—(ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) মা ভবতারিণী—দয়া কর মা—দয়া কর—কালী কৃপাহি কেবলম্—কালী কৃপাহি কেবলম—কালী কৃপাহি কেবলম।

শ্রীরামকৃষ্ণের চেতনা ফিরিয়া আসিল।

রামকৃষ্ণ। মা—মাগো! তুই কোথায় মা?···একি তুমি!

সারদা। আমি সারদা—আমি তোমার সারদা।

রামকৃষ্ণ। হ্যাঁ সারদা—আমার সারদামণি। এই শেষ রাতেও তুমি বসে আছ? শোও নি?···একি! তোমার চোখে জল কেন? কাঁদছিলে বুঝি?

সারদা। রোজ রাতে শুতে এসে তোমার ভাব-সমাধি হয়। এক এক দিন অল্পতেই জ্ঞান ফিরে আসে, কিন্তু এক এক দিন এমন হয় যে, আমি ভারি ভয় পাই। ভয়ে রাতে আমার ঘুম হয় না।

রামকৃষ্ণ। বটে, তাই তো; এই ক'মাস তুমি সারা রাত জেগে কাটিয়েছ? দ্যাখ সারদামণি, তুমি যদি এইভাবে সারা রাত জেগে বসে থাক, তবে নহবতখানায় মার কাছে তোমার শোবার ব্যবস্থা করব কি বল?

সারদা। আমি কি বলব, তোমার যা ইচ্ছা।

রামকৃষ্ণ। আমার ইচ্ছা তো সারদামণি, এখন তুমি আমার গায়ে পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দাও।

সারদা। দিচ্ছি।···(ক্ষণপরে) ওগো, একটা কথা বলব?

রামকৃষ্ণ। আরে, ঘুমের দফা তো গয়া! কেন বলবে না?

সারদা। কেউ কেউ বলছে—তাই তো! ছেলেপুলে একটা হবে নি? সংসারধর্ম্ম বজায় থাকবে কিসে?

রামকৃষ্ণ। একটা ছেলে কি খুঁজছ গো? তোমার এত ছেলে হবে যে, তুমি 'মা' ডাকে তিষ্ঠাতে পারবে নি।

সারদা। (ক্ষুব্ধ হইয়া) বটে! আমাকে তোমার কি মনে হয়?

রামকৃষ্ণ। হাঃ হাঃ হাঃ! কি মনে হয়? যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরে জন্ম নিয়েছেন—সম্প্রতি নহবতে বাস করছেন—আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। হাঃ হাঃ হাঃ—

—

নবম দৃশ্য

১২৮০ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ।

[দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের বাস-কক্ষ। কাল—রাত্রি। শ্রীরামকৃষ্ণ ও হৃদয় কথোপকথনে রত।

রামকৃষ্ণ। আর এক দিনের কথা শোন্ হৃদু। তোর মামী আমার পাশে ঘুমিয়ে আছে। আমার কিছুতেই ঘুম আসছে না। সারদাকে একমনে দেখতে লাগলাম। বিচার করে মনকে বললাম, মন, এরই নাম স্ত্রী-শরীর। লোকে একেই পরম উপাদেয় ভোগ্য-বস্তু বলে জানে এবং ভোগ করবার জন্ত সর্ব্বক্ষণ লালায়িত হয়। কিন্তু এটা গ্রহণ করলে দেহেই আবদ্ধ থাকতে হয়। সচ্চিদানন্দঘন ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। মন, ভাবের ঘরে চুরি করো না। পেটে একখানা, মুখে একখানা রেখ না। সত্য বল, তুমি একে চাও, না ঈশ্বরকে চাও—যদি এ চাও, তবে এই তো তোমার সম্মুখে রয়েছে—নাও, বলেই সারদার দেহ স্পর্শ করতে গেছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মন চলে গেল সমাধি-পথে। সে রাতে আর চেতনা হ'ল না হৃদু। বহু কষ্টে তোরা পরের দিন আমার চেতনা আনলি।

হৃদয়। জানি মামা, জানি। ধন্য মামা তুমি।

রামকৃষ্ণ। আমি আর কি ধন্য রে—ধন্য তোর ছোটমামী। ও যদি এত ভাল না হ'ত—আত্মহারা হয়ে তখন আমাকে যদি আক্রমণ করত তা হলে সংযমের বাঁধ ভেঙে দেহবুদ্ধি আসত কিনা কে বলতে পারে হৃদু? তাই আজ এই অমাবস্যায়—ফলাহারিণী কালিকাপূজার এই পুণ্য রাতে আমি ঐ সারদারূপিণী জগদম্বার অংশকে পূজা করব রে হৃদু, পূজা করব।

হৃদয়। তোমার সব কথাই মানছি মামা—বিশ্বাসও করছি। কিন্তু তাই বলে নিজের স্ত্রীকে মায়ের আসনে পূজা করা—পৃথিবীতে এ কেউ কখনও করেছে, না করে? না না মামা, এসব পাগলামি করো না।

রামকৃষ্ণ। যে আমার স্ত্রী, সে যদি মা হয়ে আমার এই পূজা নিতে রাজী হয়—তবে তোর আপত্তি কিরে হৃদু? রাত ন'টা বাজে—পূজার সময় হয়েছে—

হৃদয়। তোমার পেটে এত! তাই আমায় দিয়ে এঘরে পূজার আয়োজন করিয়েছ। কিন্তু মামা এখনও ভেবে দ্যাখ।

রামকৃষ্ণ। ভাবা আমার শেষ। আমার দেবী এসে গেছেন। এসো সারদামণি।

সারদার প্রবেশ।

রামকৃষ্ণ। হৃদু করবে মন্দিরে আজ ফলাহারিণী কালিকা-পূজা—আমি করব এখানে ষোড়শোপচারে ষোড়শীপূজা। যা হৃদু, যা—

হৃদয়। যাচ্ছি।

হৃদয়ের প্রস্থান।

রামকৃষ্ণ। ঐ আলপনা-কাটা পিঁড়িতে বস সারদা। হাঁ, হাঁ।...এই অ-সার সংসারে সারদান করতে এসেছ তুমি, তাই তোমার নাম সারদা দেবী। হে কালি, হে সর্ব্বশক্তির অধীশ্বরি মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইহার শরীর-মনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্ব্বকল্যাণ সাধন কর।

হে সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্ব্বকর্ম্মনিষ্পন্নকারিণি, হে শরণদায়িনি ত্রিনয়নি, শিবগেহিনি গৌরি, হে নারায়ণি. তোমাকে প্রণাম—তোমাকে প্রণাম করি।

—

দশম দৃশ্য

১২৮৩ সালের মাঘ মাস

[জয়রামবাটী। ভানুপিসীর বাড়ী। ভানুপিসী ও সারদা দেবী কথোপকথনে রত।]

সারদা। আজ কেমন আছ ভানুপিসী?

ভানু। এসেছ আমার সারদা মা। বস—বস। সেই যে সেদিন সন্ধ্যার সময় ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে আমার মুখে চরণামৃতের মত কিছু দিয়ে বললে—"পিসী খাও—খাও।" সেই খেয়েই ত অসুখ গেল—ভাল হয়ে উঠলুম। আজ কেবলই আফশোশ, আমার কর্ত্তার অসুখের সময় তোমায় পাই নি কেন? তবে ত সে আর অকালে মরত না। তাকে ত আমি ধরে রাখতে পারি নি;—তুমি আমায় কেন বাঁচালে মা?

সারদা। আমি কি আর তোমাকে বাঁচিয়েছি? ওসব ঠাকুরের ইচ্ছা।

ভানু। ও ঠাকুরকেও চিনি—তোমাকেও চিনি। এই অসুখে শুয়ে সত্যি বলছি মা, একদিন সাদা চোখে তোমাকে চতুর্ভুজা দেখেছি। যখন সম্মুখ দিকে মুখ করে, তখন দেখছিলুম ঠিক এমনি মা—দ্বিভুজা। আর যখন আমার দিকে পিছন ফিরলে, তখন চতুর্ভুজা। সাধে কি আর ঠাকুর তোমাকে ষোড়শী পূজো করেছিল মা? আচ্ছা মা তোমার ত এত লজ্জা—তা সেই ষোড়শী পূজোর সময় ঠাকুর তোমায় কাপড় পরিয়ে দিলে এতেও তোমার হুঁস হ'ল না।

সারদা। কি জানি পিসী! কোন হুঁসই তখন আমার ছিল না। সেদিন নাকি প্রসাদী মাংস পর্য্যন্ত খাইয়েছেন, অথচ কখনো ত মাংস খাই না আমি।

ভানু। তখন যে তুমি সাক্ষাৎ জগদম্বা। তখনও—এখনও।

সারদা। দেখ পিসী, ওসব কথা বলতে নেই। আমি সংসারের দশ জনের মতই এক জন। দেখলে না, আমাশয় রোগে কি ভোগটাই না ভুগলাম। আমাদের গাঁয়ের সিংহবাহিনী মায়ের দয়ায় তবেই না বেঁচে উঠেছি। সব ভোগই আছে পিসী। এই ত ঠাকুরের ষোড়শী পূজোর পরই কামারপুকুরে মেজ ভাসুর দেহ রাখলেন। এই সালেই আমার অমন বাপ তিনিও দেহ রাখলেন। দু'বছর যেতে না যেতেই দক্ষিণেশ্বরে শাশুড়ী ঠাকরুণ গঙ্গা পেলেন। সেই থেকে ঠাকুরেরও আর কোন খবর পাচ্ছি না। আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে পিসী। আমি দক্ষিণেশ্বরে আবার যাব।

ভানু। কেবল যাচ্ছ আর আসছ! এখন ত ওখানেই থাকতে পার মা।

সারদা। বুড়ী মা'টা যে এখনও এখানে বেঁচে আছে পিসী। তোমরাও ত রয়েছ। মায়ার বাঁধন কে কাটবে বল? খবর পেয়েছি, ভূষণ মণ্ডল দলবল নিয়ে কামারপুকুর থেকে কলকাতা যাবে গঙ্গা-স্নানে। ভাবছি, আমিও সেই সঙ্গে যাই। না, না, পিসী আবার আসব।

—

একাদশ দৃশ্য

[আরামবাগ হইতে তারকেশ্বর হইয়া কলিকাতা আসিবার পথ।

লক্ষ্মী, শিবরাম, ভূষণ মণ্ডল ও তাহার মাতা পথে দাঁড়াইয়া সারদামণির জন্য অপেক্ষা করিতেছে।]

ভূষণ। আচ্ছা শিবরাম ঠাকুর, বলি তোমাদের আক্কেলটা কি?

শিবরাম। খুড়ীমা পথে একলা কোথায় পড়ে রইলেন, তাঁকে সঙ্গে না নিয়ে আমরা এগুব না ভূষণ জ্যাঠা।

ভূষণ। আরে কি বিপদ! কতবার বলব যে, সামনের এই তেলোভেলো—কৈকলার মাঠ খুব কম করেও চার কোশ। এই চার কোশ পথ আজ সন্ধ্যের আগে যেমন করেই হোক পার হতে হবে। নৈলে ডাকাতের হাতে আমাদের একটি প্রাণীরও মাথা থাকবে না। বলতেই বলে এ হ'ল ডাকাতে-মাঠ।

লক্ষ্মী। তা আমরা জানি। আর সেই জন্যই খুড়ীমাকে ফেলে যাব না।

ভূষণের মা। দেখ বাবা ভূষণ, ও লক্ষ্মী ঠাকরুণ ঠিক কথাই বলছে। সারদা মাকে পিছে একা ফেলে কি করে আমরা যাই?

ভূষণ। না, দেখছি তোমাদের সবারই মরণ ঘনিয়ে এসেছে।

নেপথ্য কণ্ঠ। এ—ভূষণ—আমরা আর দাঁড়াতে পারব না—আসবে ত শীগগির আসবে—

ভূষণ। ঐ দেখ, অত বড় দলটা চলে যায়। কি করি এখন! আরে বাপু, সারদা মা তো বলেই দিলে, তোমরা এগোও—আমি পিছে পিছে যাচ্ছি। তা যখন এল না, বুঝতে হবে, শরীরটা খুবই খারাপ হয়েছে। নয়ত আর কোন বড় দলের সাথ ধরেছে। আজ রাতে আরামবাগে আরাম করে কাল প্রাতে রওনা হবে।

শিবরাম। এটা কিন্তু হতে পারে লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী। বেশ, তবে তারকেশ্বরে পৌঁছে খুড়ীমার জন্যে আমরা চটিতে বসে থাকব; তিনি এলে তবেই আমরা কলকাতা যাব।

ভূষণ। আরে তা নয়ত কি! সারদা মা'ই আমাদের দক্ষিণেশ্বরে নেবে, গঙ্গাস্নান করাবে বলেছে। সেই ভরসাতেই যাওয়া। তা সে যদি না আসে আমরা যেতে পারি? চল—চল—

সকলের প্রস্থান।

[মুহূর্ত্ত পর সেখানে বাগ্দী ডাকাত-দম্পতীর আত্মপ্রকাশ]

পুরুষ। না এ শিকারও দেখছি ফসকালো বৌ। তুই আমার সঙ্গে বেরুলেই অযাত্রা।

স্ত্রী। দেখ মুখপোড়া, অযাত্রা-অযাত্রা করিস নি। কানের মাথা খেয়েছিস? শুনলি না? ঝোপের আড়ালে বসে তবে কি ঘুমোচ্ছিলি?

পুরুষ। কি আবার তুই শুনলি?

স্ত্রী। কেন? ঐ যে বললে খুড়ী আছে পিছনে একা।

পুরুষ। সাধে কি আর মেয়েলোকের দশ হাত কাপড়েও কাছা হয় না? এই বুদ্ধি নিয়ে তুই ডাকাতের বৌ হয়েছিস? একা আসছে মানে? শুনলি না? ব্যারামে পড়েছে, না হয় দলবল নিয়ে কাল ভোরে আসছে।

[নেপথ্য হইতে সারদার শ্রান্ত কণ্ঠ ভাসিয়া আসিল।]

সারদা। (নেপথ্য হইতে শ্রান্ত কণ্ঠে) কালী কৃপাহি কেবলম্—কালী কৃপাহি কেবলম্—কালী কৃপাহি কেবলম্।

পুরুষ। নারে বৌ, তোর কথাই ঠিক। আসছে—ঐ দেখ একাই আসছে।

স্ত্রী। ওরে, তা হলে আমি একটু সরেই দাঁড়াই। আমি রক্ত-টক্ত দেখতে পারি না।

স্ত্রীর অন্তরালে গমন। সারদার প্রবেশ।

সারদা। কালী কৃপাহি কেবলম্—

পুরুষ। (বজ্রনির্ঘোষে) এই—কে যায়? দাঁড়াও।

সারদা। এই যে বাবা, তুমি এখানে আছ। বাঁচলুম।

পুরুষ। (কর্কশ কণ্ঠে) বাঁচলুম মানে?

সারদা। হাঁা বাবা, আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গেছে। আমিও পথ বোধ হয় ভুলেছি। সামনেই নাকি ডাকাতে-মাঠ। এদিকে সন্ধ্যেও হয়ে এলো। তুমি আমাকে সঙ্গে করে যদি আমার সঙ্গীদের কাছে তারকেশ্বরে পৌঁছে দাও—

পুরুষ। তাই তো! আমি পৌঁছে দোব? আরে—ও বৌ, বেরিয়ে আয়। দেখ দেখি, মেয়েলোকটা কি বলছে।

স্ত্রীর আত্মপ্রকাশ

স্ত্রী। কে রে?

সারদা। এই যে মা, আমি তোমার মেয়ে—সারদা। সঙ্গীরা ফেলে যাওয়ায় একা আমি বিষম বিপদে পড়েছিলাম। ভাগ্যে বাবা ও তুমি এসে পড়লে, নইলে এই ডাকাতে-মাঠে কি করতুম—বলতে পারি না। (পুরুষকে) আমার এই পায়ের মল-জোড়া খুলে দিচ্ছি। তোমার কাছে রাখো বাবা। নইলে ডাকাতে দেখলে আমাকে কেটে ফেলবে।

পুরুষ। (স্ত্রীকে) ওরে সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল।

সারদা। না বাবা, তোমাদের যখন পেয়েছি, আর ভয় কি? তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে থাকেন। আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি। তুমি যদি সেখান পর্য্যন্ত আমাকে নিয়ে যাও; তা হলে তিনি তোমার খুব আদরযত্ন করবেন।

পুরুষ। নে, হ'ল তো! ছেলেমেয়ে নেই বলে দুখখু করতিস। বাঁজা বলে তুই ছিলি অযাত্রা। নে এবার মেয়ে পেলি—নিখরচায় জামাই পেলি। জয় বাবা তারকেশ্বর। চল মা—আমরা থাকতে তোমার কোন ভয় নেই।

সারদা। (ক্লান্তভাবে) আমি জানি—আমি জানি। চল বাবা—চল—

পুরুষ। কিন্তু তোর মুখে যে আর কথা সরছে না মা। ও বৌ, মেয়েকে নিয়ে চল ঐ তেলোভেলো গাঁয়ে।

স্ত্রী। হাঁা, মুদীর দোকানে নিয়ে চল। কিছু মুড়ি-মুড়কি কিনে না খাওয়ালে ও আর দাঁড়াতে পারবে না। এস মা চটিতে আজ রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে তোমাকে তারকেশ্বরে পৌঁছে দিয়ে আসব। ওঠ মা, আমার কোলে ওঠ। না, না এটুকু পথ তোমাকে আমি খুব নিয়ে যেতে পারব—আমরা বাগ্দীর মেয়ে। জয় বাবা তারকেশ্বর।

সকলে। জয় বাবা তারকেশ্বর।

—

দ্বাদশ দৃশ্য

১২৯১ সালের ফাল্গুন মাস

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের বাস-কক্ষ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও যোগীন-মা আলোচনারত।

রামকৃষ্ণ। বুঝলে যোগীন-মা, এইবার নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে সারদামণির সাত বার আসা হল। শরীরটা ওর ভাল নয়। তার উপর এই যাতায়াত। এক সময়ে হৃদুকে বলেছিলুম, 'তাই ত হৃদে, ও কেবল আসবে আর যাবে, মনুষ্যজন্মের কিছুই করা হবে না'। তা এখন দেখছি, ও অনেক এগিয়ে গেছে। যায় নি যোগীন-মা ?

যোগীন-মা। সে বাপু তুমি জান। আমি তবে একদিন নহবতে এসে দেখি, মা খুব হাসছেন, এই হাসছেন, এই কাঁদছেন। ক্রমে স্থির, একেবারে সমাধি।

রামকৃষ্ণ। সে আর কি বলছ ? একদিন রাত্তিরে কে বাঁশী বাজাচ্ছিল। বাঁশীর স্বরেই ওর ভাব হয়ে গেল।

যোগীন-মা। তা হলে আর একদিনের কথা শোন বাবা। সেদিন ভাবসমাধি হয়েছে। অনেকক্ষণ পরে হুঁস এলে মা বলতে লাগল ; 'ও যোগেন আমার হাত কই, পা কই ?' আমরা মার হাত-পা টিপে দেখাতে লাগলুম। তবে জ্ঞান ফিরে এল।

রামকৃষ্ণ। জানি না যোগীনের মা, ও কে ? রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অমঙ্গল হয় তাই এবার রূপ ঢেকে আসা। ও সারদা, সরস্বতী, জ্ঞানদায়িনী। জ্ঞান দিতে এসেছে।

(সারদার প্রবেশ)

সারদা। এই যে যোগীন-মা—তুমি এখানে। আরও কিছু পান সাজতে হবে। এলাচ-মশলা ফুরিয়ে গেছে। এনে দাও না।

যোগীন-মা। এতক্ষণ ত চুণ-সুপুরি দিয়ে কতগুলো সাজলে গো ! এলাচ-মশলা আবার কার জন্যে ?

সারদা। এলাচ-মশলা দেওয়া গুলো হবে ভক্তদের জন্যে।

রামকৃষ্ণ। (হাসিয়া) আর খালি চুণ-সুপুরি দেওয়া গুলো বুঝি আমার জন্যে।

সারদা। তা হোক। তুমি ত আপনজন। যাও গো যোগীন-মা—

যোগীন-মা। হ্যাঁ যাচ্ছি।

যোগীন-মার প্রস্থান

সারদা। এই নাও গো তোমার পান।

রামকৃষ্ণ। আপনজন হাতে করে দিলে যা দেয়, তাই মিষ্টি। কিন্তু শোন গো, পেনেটি-মচ্ছবে আমাকে জোর করে ওরা ধরে নিয়ে গেল। গিয়ে আমার গলার বেদনা বেড়ে গেল। একমাস ধরে ঘটা করে খুব চিকিচ্ছে ত করলে গো, কিন্তু কমল না ত। পেটেও এখন কষ্ট হয়।

সারদা। তোমার জন্য দুধ-ভাত আর সুজির পায়েস করছি। এখন থেকে এই কিছুদিন খেয়ে দেখ।···সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ছেলেদের আসবার সময় হ'ল। রুটি হবে। তিন সের সাড়ে তিন সের আটা এখনি করে রাখি গিয়ে।

রামকৃষ্ণ। কি গো, আরও সন্তান চাই নাকি ?

সারদা। কেন চাইব না ? এমনি সব সন্তানে মায়ের সংসার ভরে উঠুক।

রামকৃষ্ণ। কিন্তু সবাইকে তুমি চিনতে পার ?

সারদা। কেন পারব না ? তোমার কাছে ওরা যখন বসে সব আনন্দ করে, আমি যে ওদের দেখি। কান খাড়া রেখে তোমাদের কথাবার্ত্তাও কিছু কিছু শুনতে পাই।

রামকৃষ্ণ। বটে ! কি করে বল ত ? তুমি ত ওদের সামনে বড় একটা বের হও না।

সারদা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার বারান্দার বেড়াতে একটা ফুটো করে রেখেছি। সেই পথে দেখ, তুমি রঙ্গরসের তুফান তোল, নাচ, গাও—আর তোমার চার পাশে চাঁদের হাট। কখনও রাখাল, শরৎ, লাটু—কখনও রাম, বলরাম, গিরিশ, কেশব—আবার কখনও বা মাষ্টার, যোগীন, পূর্ণ—আর নরেন ত আছেই।

রামকৃষ্ণ। হুঁ, সবাইকেই চেন দেখছি। তুমি রত্নগর্ভা গো রত্নাগর্ভা ! আর ঐ নরেন—ও যেন সহস্রদল কমল। ওর তুলনা নাই।

সারদা। নাই-ই ত। নইলে যখন টাকার এত ঠেকা—তুমি বলে দিলে, যা ভবতারিণীর কাছে চাইলেই পাবি—তা কি না তিন বারের একবারও টাকা চাইতে পারল না। চাইল শুদ্ধা ভক্তি।

রামকৃষ্ণ। তা আমি ত বলে দিয়েছি, ও না চাইলেও ওর মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে না। তা সংসারে টাকার দরকারও হয় বৈকি। হ্যাঁ গা শোন, মাড়োয়াড়ী ভক্ত লছমীনারায়ণ দশ হাজার টাকা দিতে চাইছে। আমি নিতে পারব নি বলায় তোমার নামে দিতে চাইছে। তুমি নাও না কেন --কি বল ?

সারদা। তা কেমন করে হবে ? আমি নিলে ও টাকা তোমারই নেওয়া হবে। না, ও টাকা কিছুতেই নেওয়া হবে না।

রামকৃষ্ণ। বাঁচালে---আমায় বাঁচালে···দেখেছ, কি সুন্দর জোছনা উঠেছে—জানলায় গিয়ে দেখ। আমি মন্দিরে চললুম।

রামকৃষ্ণের প্রস্থান

সারদা। ঠাকুর ! তোমার ঐ জোছনার মত আমার অন্তর নির্ম্মল করে দাও। চাঁদেও কলঙ্ক আছে, আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে।

—

ত্রয়োদশ দৃশ্য

১২৯২ সালের ভাদ্র মাস

দক্ষিণেশ্বর। ঠাকুর রামকৃষ্ণের শয়নকক্ষ। কাল—সন্ধ্যারাত্রি। ঠাকুর চোখ বুজিয়া শুইয়া রহিয়াছেন, বোধ করি ঘুমাইতেছেন। সারদামণি পা টিপিয়া ঘরে

আসিয়া তাঁহাকে তদ্রূপ অবস্থায় দেখিয়া দুধের বাটিটি জলচৌকির উপর নামাইয়া রাখিতেই শব্দ হইল।

রামকৃষ্ণ। কে, লক্ষ্মী? তুই দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যা।

সারদা। হ্যাঁ, যাব। দুধ এনেছিলাম। তুমি যখন জেগে উঠেছ, দুধটা খেয়ে নাও।

রামকৃষ্ণ। আহা তুমি! তোমাকে 'তুই' বলে ফেলেছি—তোমাকে তুই বলে ফেলেছি। আমি মনে করেছিলুম—লক্ষ্মী। ছাখ গো, কিছু মনে করো নি।

সারদা। সে কি! তুমি ত আর দেখে বল নি। নাও ওঠ, এই দুধটুকু খেয়ে ফেল।

রামকৃষ্ণ। হ্যাঁ, এখন ত দুধই ভরসা। কোবরেজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন এসে জল খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে গেল। বলে গেল, জল না বন্ধ করলে সারবে না অসুখ। হ্যাঁগা, জল না খেয়ে কি পারব? সবাই ত বলছে পারব। হ্যাঁগা, তুমি বল—পারব জল না খেয়ে?

সারদা। পারবে বৈকি।

রামকৃষ্ণ। বেদানা পর্যন্ত জল পুঁছে দিতে হবে। দেখ যদি পার।

সারদা। তা মা কালী যেমন করবেন, যথাসাধ্য তাঁর ইচ্ছায় হবে। নাও দুধের বাটিটা ধর।

রামকৃষ্ণ। এতটা দুধ?

সারদা। কত আর। একসের পাঁচ পো হবে।

রামকৃষ্ণ। উহুঁ, এ অনেক বেশী। এই যে পুরু সর দেখা যাচ্ছে।

গোলাপ-মার প্রবেশ

গোলাপ-মা। আজ কেমন আছ গো ঠাকুর?

রামকৃষ্ণ। এই যে গোলাপ-মা, এস এস। হ্যাঁগা, ছাখ ত আমার হাতে কত দুধ হবে বলত।

গোলাপ। তা পাঁচ-ছ'সের হবে বৈকি। জান না, গয়লা যে সেধে তোমার জন্ম বেশী করে দুধ দিয়ে যায়। আগে দিত তিন-চার সের, এখন দেয় পাঁচ-ছ' সের। বলে, মন্দিরে দিলে কালীর ভোগ বলে ব্যাটারা বাড়ী নিয়ে যাবে—পাঁচভূতে লুটেপুটে খাবে। এখানে দিলে ঠাকুর খাবেন। সেই দুধ জাল দিয়ে কমিয়ে এইটুকু করে দিয়েছে সারদা-মা।

রামকৃষ্ণ। কি গো, সারদামণি?

সারদা। গোলাপ জানে না। এখানকার মাপ গোলাপ জানবে কি! এখানকার বাটিতে কত দুধ ধরে সে জানবে কি করে?

গোলাপ-মা। তা বটে! তা বটে!

রামকৃষ্ণ। হ্যাঁ গা, এ বাটিতে কত ধরে? ক' ছটাক, ক'পো।

সারদা। ক'ছটাক, ক'পো অত জানি নে। দুধ খাবে, তা ক'ছটাকের ঘটি—ক'পো অত কেন? অত হিসেবে দরকার কি?

রামকৃষ্ণ। মতলবটা বুঝি বেশী দুধ খাইয়ে টেনে তোলা। তা হজম করতে পারব কি? দিয়েছ—খাচ্ছি। (দুধ পান করিয়া) নাও গো, হ'ল ত?

সারদা। আচ্ছা, আমি আসি। নরেনরা আসবে। ওদের খাবারটা করে রাখি।

সারদার প্রস্থান।

গোলাপ-মা। তোমার হজম হয় না, আমি কি অত জানি, তবে কি আর পাঁচ-ছ' সের বলি আমি। ভাবলাম, সত্যি কথাই বলাটা হয়ত ঠিক হবে।

রামকৃষ্ণ। শরীরটা সেরে উঠবে বলে ও ভুলিয়ে-টুলিয়ে খাওয়ায়—বুঝলে গোলাপ-মা? তা আমার ভালই লাগে। তবে আজ জানতে পারলুম কিনা। এ দুধটা আমার হজম হবে নি। নৈলে ভুলিয়ে-টুলিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে বেশ চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছে। জান গোলাপ-মা, ভাত বেশী দেখলে আমি আঁৎকে উঠি। (গুপ্ত-কথা বলার ভঙ্গীতে) তাই ভাত টিপে টিপে সরু করে দেয় সারদা। ও ভাবে, আমি বুঝি না। কিন্তু বুঝি আমি সবই। কিন্তু তবু খাই—ওর অন্তরের ক্ষুধাটা মেটাতে।

সারদার পুনঃ প্রবেশ

সারদা। হ্যাঁ গা, দেখ—আমার কি ভুল। দুধ খাইয়ে চলে গেলুম। কিন্তু ওষুধটা খাইয়ে যেতে ভুলে গেলুম।

গোলাপ-মা। সে মা ভুলে গেলে আমার ওপর রাগ ক'রে। আমি চলি, তা না হলে ওষুধের মাত্রায় আবার ভুল হয়ে যাবে।

রামকৃষ্ণ। হাঃ হাঃ হাঃ।

গোলাপ-মার প্রস্থান।

রামকৃষ্ণ। কই গো, দাও ওষুধ।

সারদা। দাঁড়াও। মধু দিয়ে ওষুধটা খলে মেড়ে দি।

সারদা খলে ওষুধ মাড়িতে লাগিলেন।

রামকৃষ্ণ। হ্যাঁ গা, তুমি ত রোজ দুপুরে ভাতের থালা নিজে নিয়ে এসে আমাকে খাইয়ে যাও। আজ সেই মেয়েটাকে দিয়ে পাঠালে কেন? তুমি কি ও মেয়েটাকে জান না?

সারদা। জানি—মেয়েটি ভাল নয়। কিন্তু কি করব বল? থালা হাতে আমি আসছি। কোত্থেকে সেই মেয়েটি এসে বললে—"আমায় দাও না মা, আমি নিয়ে যাচ্ছি।" ওর মিনতি দেখে আমি 'না' বলতে পারলুম না।

রামকৃষ্ণ। সারা দিনের ভিতর ঐ একটি বার তুমি আস। ঘরোয়া দুটো কথা কইবার ঐটুকু সময়।

সারদা। সে কি আমি জানি না?

রামকৃষ্ণ। তবে আমার খাবার আর কোন দিন কারও হাতে দেবে না বল?

সারদা। আমি কি তা চাই না? এত বোঝ, এটুকু বোঝ না। তবে এও তোমাকে বলে রাখছি, কেউ আমার কাছে মা

বলে চাইবে আর আমি তা দেব না—এমনটি হবে নি কখনও। তুমি ত খালি আমার একলার ঠাকুর নও, তুমি সকলের।

রামকৃষ্ণ। তা ঠিক, তা ঠিক। মা কিনা—আকুল হয়ে কেউ কিছু চাইলে, 'না' বলতে পার না।

সারদা। হ্যাঁ গা, কি অসুখ হ'ল—এ কি আর তোমার সারবে না? কি কষ্ট পাচ্ছ বল ত? মা ভবতারিণীর কাছে একবারটি বল—"আমায় ভাল করে দাও।" তুমি চাইলে মা কি আর 'না' বলতে পারবে?

রামকৃষ্ণ। ঐ দেখ। এত বুঝে এটুকু বোঝ না—যে মন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি, তা কি আবার ফিরিয়ে হাড়-মাসের খাঁচায় দেওয়া যায়? মাকে বলতে হয়, তুমি বল।

সারদা। না গো, আমিও তা পারব না। তুমি যা ভাল মনে কর না আমি তা করব না—করব না।

—

চতুর্দ্দশ দৃশ্য

১২৯৩ সালের ১লা ভাদ্র।

[কাশীপুর উদ্যানবাটিকার সদর। বাবুরাম, রাখাল ও নরেন।]

নরেন। তোমরা দু'জনে দাঁড়িয়ে যে?···ও বুঝেছি। মা গেছেন তারকেশ্বরে হত্যা দিতে—পথ চেয়ে আছ?

বাবুরাম। মিথ্যা বল নি নরেন। মা যদি তারকেশ্বরে গিয়ে এখন কিছু করতে পারেন, নইলে আমি ত আর কোন ভরসা দেখছি না।

রাখাল। আমাদের যতদূর সাধ্য, তা ত করে দেখলাম বাবুরাম। চিকিৎসার সুবিধার জন্যে দক্ষিণেশ্বর থেকে নিয়ে যাওয়া হ'ল শ্যামপুকুর। সে বাড়ীতে আলো-হাওয়া নেই। নিয়ে আসা হ'ল গঙ্গাতীরে কাশীপুরে এই বাগানবাড়ীতে। মহেন্দ্রলাল সরকারের মত সেরা ডাক্তার কত যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করলেন। কিন্তু কি হ'ল? উন্নতি ত দূরের কথা, আজ যা দেখছি তাতে ত আর আশাই হয় না। তুমি কি বুঝছ নরেন?

নরেন। ঠাকুর ত আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বসে আছেন রাখাল। গেল ১লা জানুয়ারী এই বাগানে বেড়াতে বেড়াতে গৃহী ভক্তদের কাছে কল্পতরু হয়ে সকলকে চৈতন্য দিয়েছেন। তখনই মনে হয়েছিল সময় হয়ে গেছে। সেটা আরও স্পষ্ট বুঝলাম সেদিন—যখন আমাকে একলা ডেকে পাঠালেন নিজের ঘরে। অনেক কিছু হ'ল। শেষে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'তোকে আমার সর্ব্বস্ব দিয়ে আজ আমি ফকির হলুম। জগতের কল্যাণে এই শক্তি ঢেলে দে।' আমি জানি, বিদায় তিনি সেই দিনই নিয়েছেন।···ঐ যে মা এসে গেছেন। আমি জানি উনিও খালিহাতেই ফিরেছেন।

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা। সারদামণির প্রবেশ।

রাখাল। মা, ঠাকুর আমাকে তাঁর মানসপুত্র বলেন। তুমি কথা বল মা।

সারদা। তারকেশ্বরে বাবার কাছে হত্যা দিতে গেলুম। এক দিন যায়, দু'দিন যায়, পড়েই আছি। রাত্তিরে একটা শব্দ পেয়ে চমকে উঠলুম। যেন অনেকগুলি হাঁড়ি সাজান থাকলে তার উপর ঘা মেরে যদি কেউ একটা হাঁড়ি ভেঙে দেয়, সেই রকম শব্দ। জেগেই হঠাৎ আমার মনে এমন ভাব এল—এ জগতে কে কার স্বামী? এ সংসারে কে কার? কার জন্যে আমি এখানে প্রাণ হত্যা করতে এসেছি। একেবারে সব মায়া কাটিয়ে এমনি বৈরাগ্য এনে দিলে। আমি চলে এলুম।

বাবুরাম। মা!

রাখাল। কি হবে মা।

[দু'জনেই ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।]

সারদা। তোমরা কাঁদছ কেন? ঠাকুরের মুখে শোন নি? কেউ কি কখনও মরে? শুধু যায়—এ ঘর থেকে ও ঘরে।

—

পঞ্চদশ দৃশ্য

[কাশীপুর উদ্যানবাটিকা। সারদামণি সকাশে ভক্তবৃন্দ]

নরেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস গেলেন—আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরাণী গেলে সর্ব্বনাশ। মা, তুমি আমাদের ছেড়ে যেও না মা।

সারদা। আমায় তিনি বলে গেছেন বাবা নরেন—আমার শরীরটা চলে গেলে তুমিও যেন শরীর ছেড়ে চলে যেও না। আমার বাকী কাজ তুমি পূর্ণ করো। বাবা, জান ত—ঠাকুর সকলের ভিতরই মাকে দেখতেন। সেই মাতৃভাব জগৎকে শেখাবার জন্যে এবার আমাকে রেখে গেছেন।

যবনিকা
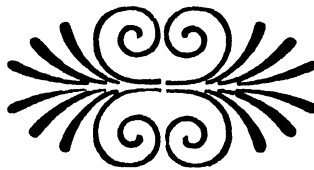
বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে ত্রিপুরার দান

শ্রীঅনিলকুমার আচার্য্য

১

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সম্পূর্ণ ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই। কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এ বিষয়ে এখনও যথেষ্ট গবেষণা এবং সংগ্রহের অবকাশ রহিয়াছে। বঙ্গদেশে এবং বঙ্গের বাহিরে মফস্বলের বিভিন্ন শহরে ও পল্লীগ্রামে নীরবে যাঁহারা সাহিত্য-সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নহে, তাঁহাদের দানের পরিমাণও অকিঞ্চিৎকর নহে। বস্তুতঃ এই সকল সাহিত্য-সাধকের দানে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সমুদয় জেলার সাহিত্য-প্রচেষ্টার প্রণালীবদ্ধ বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিলে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহরূপ দুরূহ কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া রাখা দরকার। ত্রিপুরা বলিতে আমরা ত্রিপুরা রাজ্য বা বর্ত্তমানে পাকিস্থানভুক্ত ত্রিপুরা জেলাকেই বুঝি না—এই দুইয়ের সংযোগে যে "বৃহত্তর ত্রিপুরা" তাহাকেই বুঝি। কারণ ত্রিপুরার এই দুই অংশ সুদীর্ঘকাল পরস্পর এমন অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত ছিল যে, একটিকে বাদ দিয়া অপরটিকে বুঝা কষ্টসাধ্য। অতি প্রাচীন কাল হইতে ব্রিটিশ অধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বর্ত্তমান পাকিস্থানভুক্ত ত্রিপুরা ত্রিপুর-রাজগণের অধিকারেই ছিল—ত্রিপুরারাজ্যের সুবৃহৎ জমিদারী "নূর-নগর পরগণা" ব্রিটিশ ও বর্ত্তমানে পাকিস্থান-ভুক্ত ত্রিপুরা জেলার এক বৃহৎ অঞ্চল জুড়িয়া বিস্তৃত।

সাহিত্যক্ষেত্রে ত্রিপুরার সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য দান ত্রিপুরার ইতিহাস "রাজাবলী"। শুক্রেশ্বর-বাণেশ্বর রচিত ত্রিপুরার দ্বিতীয় ইতিহাস-গ্রন্থ "রাজমালা" বহু শতাব্দী পূর্ব্বে রচিত হয়। এই পুস্তক সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন, তদানীন্তন "বঙ্গদেশের ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও উপাদেয় ইতিহাস। যদিও ত্রিপুরা রাজ্যের কথাই এই পুস্তকের মুখ্য বিষয়, তথাপি ইহাতে প্রাসঙ্গিক ভাবে আর্য্যাবর্ত্তের বহুদেশের, বিশেষ বঙ্গদেশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা প্রাচীন হিন্দুরাজ্যের রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি নানা ঐতিহাসিক তথ্যের পনিবিশেষ।" অনেকের অভিমত এই দুই পুস্তক বাংলা ভাষায় ইতিহাসমূলক আদি গ্রন্থসমূহের পর্য্যায়ভুক্ত।

এই দুই গ্রন্থ ব্যতীত সেখ সহদি রচিত 'চম্পকবিজয়কাহিনী' [১৬৮৫-১৭১০ খৃঃ] বনমালি সিদ্ধান্ত রচিত 'কৃষ্ণমালা' [১৭৬০-১৭৮৩], শ্রেণীমালা, দ্বিজ বঙ্গচন্দ্র কৃত 'ত্রিপুর বংশাবলী', 'সমশের গাজীনামা' প্রভৃতি বহু মূল্যবান্ ইতিহাস-গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য দান। তন্মধ্যে 'চম্পকবিজয় কাহিনী' বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক রচনা হিসাবে উক্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

ত্রিপুরারই অন্তর্গত (ত্রিপুরা-ময়মনসিংহ জেলাদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত) যোয়ানশয়ী গ্রামের কবি নারায়ণ দেব পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে "পদ্মাপুরাণ" রচনা করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। উক্ত পদ্মাপুরাণ ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জেলায় এখনও বিশেষ ভাবে প্রচলিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য মহাভারতের বাংলা পদ্যানুবাদ করাইয়াছিলেন।

বঙ্গসাহিত্যে ত্রিপুরার আর একটি শ্রেষ্ঠ দান—আরও প্রাচীন কালে, একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত ভবানী দাসের 'ময়নামতীর গান'। বৌদ্ধ রাজা মাণিকচন্দ্রের রাণী ও শিবযোগী গোবিন্দচন্দ্রের মাতা ময়নামতীর কাহিনী অবলম্বনে এই কাব্য রচিত হইয়াছিল। কথিত আছে, এই রাণীর নামানুসারেই কুমিল্লার দক্ষিণ-পশ্চিমে "ময়নামতী পাহাড়ে"র নামকরণ হইয়াছিল। যদিও ময়নামতী এবং গোপীচাঁদের গানের নানা সংস্করণ নানা গ্রন্থকারের নামে ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের—বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে, তথাপি অনেকের অভিমত, এই ভবানী দাসও 'ময়নামতীর গানের অন্যতম রচয়িতা। উক্ত মতের সমর্থনে স্থানীয় ময়নামতী পাহাড় ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে। 'লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয় বা রামাভিষেক' ও 'সরযূ' নামক ২টি কাব্যগ্রন্থও এই ভবানী দাসের লিখিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

নানা কারণে 'ময়নামতীর গান' পুস্তকটি বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এই পুস্তক সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" আলোচনা করিয়াছেন। ময়নামতীর গান বঙ্গসাহিত্যের হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে লেখা। এই কাব্যের নায়ক রাজা গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার মাতা রাণী ময়নামতী কর্ত্তৃক অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। রাজার সন্ন্যাসগ্রহণ উপলক্ষ্যে গোবিন্দচন্দ্রের স্ত্রী রাণী "অদুনার" বিলাপকাহিনী বড়ই করুণ। "প্রাচীন গ্রাম্য ভাষার কর্কশ উপলখণ্ডের মধ্য দিয়া যে মর্ম্মান্তিক কষ্টের ঝরণা বহিয়া" গিয়াছে, সেই বিলাপকাহিনী বড়ই মর্ম্মস্পর্শী।

পরবর্ত্তীকালে রচিত বরদা খাতের (ত্রিপুরার পরগণাবিশেষ) মির্জ্জা হোসেন আলীর 'শ্যামাসঙ্গীত' বুড়িচঙের কবি রামরত্ন পালের 'শ্রীরামচন্দ্রজীর দিগ্বিজয়' (১৮০২) 'মুনিহরণ', 'লক্ষ্মণের দিগ্বিজয় ও চন্দ্রকলার বিবাহ' প্রভৃতি কাব্য, রোয়াচালা গ্রামনিবাসী নন্দকিশোর দেবশর্ম্মার ঐতিহাসিক গ্রন্থ বরদামঙ্গল (১৮১৯), দেওয়ান রামদুলাল রায়ের "ভক্তি সঙ্গীত" প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

মির্জ্জা হোসেন আলী ও দেওয়ান রামদুলাল রায়ের কতিপয় সঙ্গীত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে।

২

সঙ্গীত-রচয়িতাদের মধ্যে কালীসাধক ভুবন রায় ('সঙ্গীত' নামক গ্রন্থ প্রণেতা) এবং মনোমোহন দত্ত বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। মনোমোহন দত্তের 'মলয়া'র গানগুলি ত্রিপুরা ও তৎপার্শ্ববর্তী জেলাসমূহে বিশেষ ভাবে প্রচলিত। তাঁহার রচিত সঙ্গীতসমূহ শব্দসম্ভারে এবং ভাবসম্পদে এতই সমৃদ্ধ ও মনোহারী যে রামপ্রসাদী সঙ্গীতের সহিত এগুলি তুলনীয়। অবশ্য রামপ্রসাদের সঙ্গীতের মত মনোমোহনের সঙ্গীতসমূহ সমস্ত বঙ্গদেশে প্রচারলাভ করে নাই।

উপরে আলোচিত এই সব সঙ্গীতপুস্তক ব্যতীত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ছেঁওড়াগ্রামনিবাসী রত্নাকর ভট্টাচার্য্য [সঙ্গীত-সার ৩ খণ্ড : ১৮৮০-৯০ খ্রীঃ], তদীয় কন্যা স্বর্ণময়ী দেবী [সঙ্গীত-মালা—১৮৯৯), চুণ্টানিবাসী ভারতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী [ভারত সঙ্গীত ১৮৯৭-৯৮], রামকানাই দত্ত ['স্বদেশ সঙ্গীত', 'সেবক সঙ্গীত'] প্রভৃতি লেখকের সঙ্গীতসমূহ বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছিল।

রামকানাই দত্ত পূর্ব্বোক্ত সঙ্গীতপুস্তক ব্যতীত "দানব-নন্দিনী", "বিরাটে পাণ্ডব", "চৈতন্যলীলা", "মণিপুর-বিভ্রাট", "বিল্বমঙ্গল" প্রভৃতি নাটিকা (১৮৯১-১৯০০) এবং "কবিতা-বিংশতি", "কবিতাশতক", "জীবনগীতা", "লিপি দর্পণ", "মাতৃপূজা", "নব ব্রহ্মোপাসনা", "সিদ্ধার্থ", "বিদুর", "হাসানহোসেন," প্রভৃতি কাব্য এবং "সন্তান-শিক্ষা", "বড়লোক" প্রভৃতি পুস্তিকার রচয়িতা। ইহা ছাড়া তিনি ১৮৯০ ও ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে "উষা" মাসিক পত্র ও "সন্তান" পাক্ষিক পত্র বাহির করিয়া বহুদিন সুনামের সহিত পরিচালনা করিয়াছিলেন।

রামকানাই দত্তের কিছু পূর্ব্বে, চুণ্টার হরিশ্চন্দ্র সেন "মূর্খের প্রয়াস" কাব্য (১৮৭০-৭৫ খ্রীঃ), রচনা করিয়া এবং পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ও ত্রিপুরার দেওয়ান রাধারমণ ঘোষ শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ করিয়া সুনাম অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথের অল্পবয়সে তাঁহার "ভগ্নহৃদয়" কাব্য প্রকাশিত হইলে উক্ত রাধারমণ ঘোষ ত্রিপুরার মহারাজের বিশেষ দূত হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে মহারাজের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে ত্রিপুরার এক বিখ্যাত লেখক ছিলেন ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়। যদিও নূতন নূতন গবেষণার আলোকে তাঁহার অনেক মতবাদ অধুনা খণ্ডিত হইয়াছে, তথাপি অনুসন্ধিৎসা, পাণ্ডিত্য এবং ঐতিহাসিক সাহিত্যরচনার অন্যতম পুরোধা হিসাবে তাঁহার নাম বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্থায়ী আসন লাভ করিবে। তিনি ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত, বাংলা রাজমালা, বাংলার ইতিহাসের উপক্রমণিকা, সেনরাজগণ—বাংলা ইতিহাসের একটি অধ্যায়, যোয়ানের জীবনচরিত। [বাংলা ভাষায় যোয়ান অব আর্কের সর্ব্বপ্রথম জীবনচরিত] সাধক-সঙ্গীত, মোহমুদ্গর, হস্তামলক, দারুব্রহ্ম, ভারত পুরাতত্ত্বকলাপ-প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা এবং পরাশরসংহিতা ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা প্রভৃতি সম্পাদনা করেন।

কৈলাসচন্দ্র সিংহ

দ্বিজদাস দত্ত

এই প্রসঙ্গে শীতলচন্দ্র বিদ্যানিধি, দ্বিজদাস দত্ত ও মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মা প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদ্যানিধি মহাশয় "আদি আর্য্যভূমি," 'হিন্দুর ভূগোলবিদ্যা,' 'আর্য্যেতর ও অনার্য্য জাতির ইতিহাসের রহস্য,' 'ঐতিহাসিক কৌতুকপ্রসঙ্গ', 'ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস,' ও 'ধর্ম্মষোড়শ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। দ্বিজদাস দত্ত বৈদিক প্রবন্ধাবলী এবং মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মা দেশীয় রাজ্য-

বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিয়া খ্যাতিলাভ করেন। প্রায় ইঁহাদেরই সমসাময়িক কতিপয় লেখকের নামও এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। জয়কুমার বর্দ্ধন "অদৃষ্টচক্র" ও "একেই কি বলে মানুষ ?" নামক দুখানি নাটক এবং বেগম ফয়জন্নেছা "রূপ জালাল" নামক নাটক লিখিয়াছিলেন।

৩

বঙ্গসাহিত্যে ত্রিপুর রাজবংশের দান—তা প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক আর পরোক্ষভাবেই হউক, নিতান্ত সামান্য নহে। তাহা ছাড়া সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসে কয়েক জন নৃপতির নাম যে কারণে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, সেই বিদ্যোৎসাহিতার জন্য ত্রিপুর-রাজগণের নামও বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে।

শীতলচন্দ্র বিদ্যানিধি

"ইংরেজি শিক্ষার প্রথম উচ্ছ্বাসে নব্যবঙ্গের শিক্ষিত-সমাজের অনাদর ও উপেক্ষায় বাঙালীর মাতৃভাষা বাংলা যখন বাংলা দেশে অচলপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল, সেই বিপদকালে উপেক্ষিতা বঙ্গ-ভাষাকে রাজভাষার সম্মানদানে" ত্রিপুররাজগণ মাতৃভাষার প্রতি যে প্রগাঢ় অনুরাগ দেখাইয়াছিলেন তাহা অতুলনীয়। এই ত্রিপুরাই বোধ হয় একমাত্র দেশীয় রাজ্য যেখানে মাতৃভাষা রাজভাষার সম্মান লাভ করিয়াছিল।

বিগত শতাব্দীর শেষপাদে মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার "অনতিব্যক্ত খ্যাতির মুহূর্ত্তে" স্বেচ্ছায় বন্ধুত্বের সম্মানদানে বঙ্গবাণীর মহা উপকারসাধন করিয়াছিলেন। সেদিনের বন্ধুত্ব যে রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়াছিল, একথা তিনি স্বয়ং উল্লেখ করিয়াছেন। রাজর্ষি, মুকুট, বিসর্জ্জন প্রভৃতি সেই বন্ধুত্বেরই ফল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "তখন একখানিমাত্র কাব্য প্রকাশিত হয়েছে (ভগ্নহৃদয়)···সেই সময়ে আমার লেখা সম্বন্ধে খুব অল্পলোকেই জানতেন। আমার পরিচয় তখন কেবল আমার আত্মীয়স্বজন ও নিকটতম বন্ধুজনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। একদিন এই সময়ে ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের দূত আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। বালক আমি, সসঙ্কোচে আমি তাঁকে অভ্যর্থনা করলাম।···মহারাজ তাঁকে সুদূর ত্রিপুরা হতে বিশেষ ভাবে পাঠিয়েছিলেন কেবল জানাতে যে আমাকে তিনি কবিরূপে অভিনন্দিত করতে ইচ্ছা করেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বালক কবির বিস্ময়ের সীমা রইল না। এর পর থেকে নানা সময়ে নানা উপদেশ এবং বিশেষ করে রাজর্ষি লিখবার সময়ে "রাজমালা" থেকে সংস্কৃত বিষয়গুলি ছাপিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তার থেকে আমি গোবিন্দমাণিক্যের প্রকৃত ইতিবৃত্ত জানতে পেরেছিলুম।···

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য

"জীবনে যে যশ আজ আমি পাচ্ছি, পৃথিবীর মধ্যে তিনিই তার প্রথম সূচনা করে দিয়েছিলেন তাঁর অভিনন্দনের দ্বারা।"

সঙ্গীতশাস্ত্রে মহারাজ বীরচন্দ্রের অসামান্য অধিকার ছিল। তিনি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একজন অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক মাত্রই ছিলেন না—তিনি ছিলেন একজন উচ্চশ্রেণীর ভক্তকবি। "তাঁহার স্বরচিত বৈষ্ণব কবিতা ও গানের দাস্যভাব ও আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতা অতিমাত্রায় প্রাণস্পর্শী।"

মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরও পিতার ন্যায় বঙ্গ-সাহিত্যের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ও সেবক ছিলেন। শুধু সাহিত্য-ক্ষেত্রেই তাঁহার বদান্যতা সীমাবদ্ধ ছিল না; যেখানেই প্রতিভা দারিদ্র্যের কবলে নিপীড়িত, সেখানেই তিনি অকাতরে দান করিতে

কুণ্ঠিত হইতেন না। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় রাধাকিশোরের বিদ্যোৎসাহিতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

মহারাজ রাধাকিশোরের সাহিত্যানুরাগ এতই প্রবল ছিল যে, তাঁহার চেষ্টায় ও একান্ত আগ্রহে আগরতলায় একটি সাহিত্য-সমাজ গঠিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রথম অধিবেশনে সভাপতি হন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'রবীন্দ্রজীবনী'তে তাহার বিশদ বর্ণনা আছে। তাহা ছাড়া মহারাজ রাধাকিশোরের চেষ্টায় আগরতলা হইতে পর পর 'বার্ষিক', 'বঙ্গভাষা' ও 'অরুণ' নামক তিনখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বার্ষিক' পত্রিকায় মহারাজ রাধাকিশোরের কিশোর-বয়সের রচনা প্রকাশিত হইত। দুর্ভাগ্যক্রমে সে সব রচনা অধুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 'বঙ্গভাষা' রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি মনীষিগণের রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইত। সুপ্রসিদ্ধ "হিতবাদী" সম্পাদক চন্দ্রোদয় বিদ্যা-

মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য

বিনোদের সম্পাদনায় 'অরুণ' পত্রিকা বেশ কিছুকাল সগৌরবে চলিয়াছিল।

মহারাজ রাধাকিশোরের সুযোগ্য পুত্র মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরও পিতার ন্যায় বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাহা ছাড়া নিপুণ চিত্রকর হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহার চেষ্টায় ত্রিপুরারাজ্যে 'কিশোর সাহিত্য সমাজ' নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। এই সমাজের উদ্যোগে 'রবি' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা দীর্ঘকাল সুষ্ঠু ভাবে চলিয়াছিল। দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশে মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরের অর্থানুকূল্যও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য।

স্বয়ং মহারাজ ছাড়া বহু রাজকুমার-রাজকুমারীও সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বহু পুস্তক, প্রবন্ধ ও কবিতা সাহিত্য-সেবার নিদর্শন-স্বরূপ বিদ্যমান আছে। রাজকুমারগণের মধ্যে সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মার 'ভারতীয় স্মৃতি' (১৩৩৩), 'আগ্রার চিঠি' ১৩৩৫, 'জেবুন্নিসা' (১৩০৬), 'ত্রিপুরার স্মৃতি' প্রভৃতি পুস্তক উল্লেখ-

মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য

যোগ্য। রাজ-পরিবারের মহিলাগণের মধ্যে মহারাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী সুকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত কবিতাবলীর ('কণিকা'
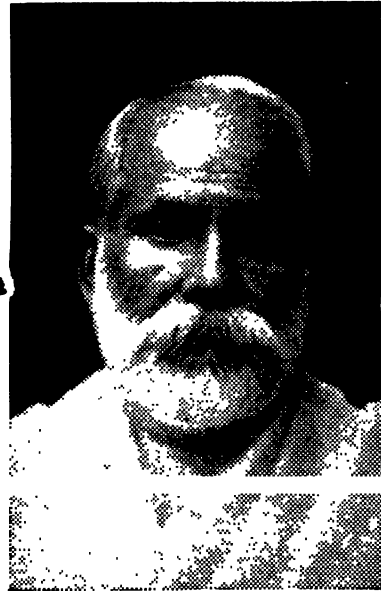
শ্রীশচন্দ্র রায়

—১৩০৮, 'শোকগাথা'—১৩১০, 'প্রীতি'—১৩১৪) একটা করুণ সুর প্রাণে বেদনার ঝঙ্কার জাগাইয়া তোলে।'

বলা বাহুল্য, বঙ্গভারতীর প্রতি এই একান্ত অনুরাগ ও নিষ্ঠা ত্রিপুরা-রাজবংশকে এক বিপুল গৌরবের অধিকারী করিয়াছে। মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরের পুত্র মহারাজ বীরবিক্রমের শান্তিনিকেতনে অভ্যর্থনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনমুকরণীয় ভাষায় তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

বনলতা দেবী

৪

স্বদেশী যুগে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার কবি কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের রচিত জাতীয় সঙ্গীত ঘরে ঘরে গীত হইয়া সকলকে দেশাত্মবোধে অনুপ্রেরিত করিত। তাঁহার সঙ্গীতসমূহ "সুপদা" নামে সঙ্কলিত হইয়া তৎকালে বাহির হইয়াছিল। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ারই অন্তর্গত বিত্যাকুট গ্রামের স্বর্গত শশিভূষণ বিত্যালঙ্কার মহাশয় দীর্ঘকাল কঠোর ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে 'জীবনীকোষ' নামে এক সুবৃহৎ কোষগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই বিরাট গ্রন্থ চারি অংশে বিভক্ত। ইহাতে প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কালেরও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই বিরাট কার্য্য যে একার পক্ষে কিরূপ দুঃসাধ্য, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রাচ্যবিত্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত বাংলায় বোধ হয় আর কেহ একক প্রয়াসে এরূপ বিপুলাকার মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়নে সমর্থ হন নাই। বাস্তবিক বসু মহাশয়ের বিশ্বকোষের ন্যায় এই গ্রন্থও আমাদের জাতীয় সম্পদ। ত্রিপুরার গবেষকদের মধ্যে প্রাচ্যবিত্যায় সুপণ্ডিত এলাহাবাদ বিশ্ববিত্যালয়ের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ডঃ শ্রীপ্রসন্নকুমার আচার্য্য মহোদয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রচিত অধিকাংশ পুস্তক ইংরেজীতে রচিত হইলেও কতিপয় পুস্তক বঙ্গভাষায়ও রচিত হইয়াছে। তিনি একবার প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

এই স্থলে শ্রীশচন্দ্র রায় বেদান্তভূষণের নামও স্মরণীয়। উনবিংশ শতাব্দীর চরিত্রসাধনার যে মহান্ রূপ আমরা শিবনাথ শাস্ত্রীর ভিতর দেখিতে পাই, আচার্য্য শ্রীশচন্দ্র তাহারই উত্তরসাধক। তিনি একাধারে ছিলেন আদর্শ শিক্ষক, কবি ও দার্শনিক। তাঁহার কবিতাসমূহের সহজ অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্য মনকে সহজেই হরণ করে। কাব্যগ্রন্থ "প্রণতি" ব্যতীত তিনি "বাসন্তীগীতা", "ধ্যানযোগ", "বৈষ্ণব দর্শনে জীববাদ", 'উদীয়মানদের প্রতি" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সটীক ভাষ্য ও ইংরেজী অনুবাদসহ সম্পাদনা করেন। আচার্য্য শ্রীশচন্দ্রের স্বগ্রাম কালীকচ্ছনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের 'দ্বীপান্তরের কথা', 'কারাকাহিনী' (১৯২২-২৩) প্রভৃতি পুস্তক এক সময়ে আগ্রহের সহিত পঠিত হইত। এই প্রসঙ্গে ডক্টর শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'রণসজ্জায় জার্ম্মেনী' পুস্তকটির (১৯২২) নামও উল্লেখ করিতে হয়। উক্ত পুস্তক ব্যতীত তিনি 'স্বরাজ-সাধনা' (১৯০৭), 'মুক্তি-সাধনা' (১৯০৮) এবং 'জার্ম্মেনী প্রবাসীর পত্র' প্রভৃতি পুস্তকও প্রণয়ন করেন। তাহা ছাড়া ১৯২৭ সন হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত 'চুণ্টা প্রকাশ' পত্রিকা তিনি যোগ্যতার সহিত সম্পাদনা করেন।

ত্রিপুরার দুই জন লেখিকার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বর্গতা বনলতা দেবী 'অন্তঃপুর' নামক সাময়িক পত্র পরিচালনা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহার প্রায়

সমসাময়িক ছিলেন কুমিল্লার ঊর্ম্মিলা সিংহ। তিনি 'ত্রিপুরা-হিতৈষী' পত্রিকা দীর্ঘকাল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিয়া সুনাম অর্জ্জন করেন। পরবর্ত্তী কালে কুমিল্লার শ্রীমতী সরোজিনী দেবী 'সুরের বীণ' নামক কাব্য রচনা করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। এই কবিতা-পুস্তকের অধিকাংশ কবিতাই গীতিপ্রধান এবং ইহাদের সরল মাধুর্য্য ও সুরের ঝঙ্কার অতীব চিত্তাকর্ষী। বর্ত্তমান কালে অক্লান্ত সাহিত্য-সাধনা ও গবেষণা দ্বারা যাঁহারা খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। দীনেশ-বাবু 'গুণাইগড়ের পাটা'র আবিষ্কারক এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তিনি গভীর নিষ্ঠার সহিত বঙ্গ-সাহিত্যের গবেষণায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন এবং বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। সম্প্রতি "বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান" নামক পুস্তক লিখিয়া তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

উপরে যেসব লেখক সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল, তাঁহারা ছাড়াও বহু গ্রন্থকার এবং সাংবাদিক বিগত ও বর্ত্তমান শতাব্দীতে বঙ্গভাষার সেবা করিয়া গিয়াছেন। এখনও অনেকে এতাদৃশ সেবাকার্য্যে নিয়োজিত রহিয়াছেন।

শশীভূষণ বিদ্যালঙ্কার
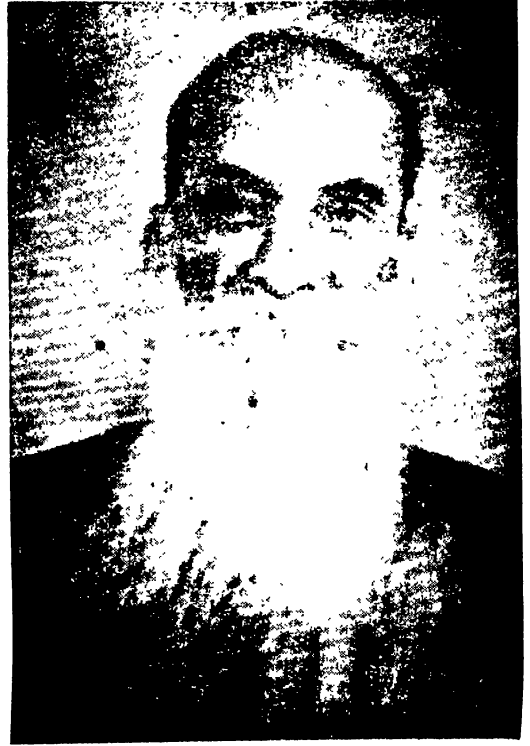
ফাল্গুনে

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

১

বহু দিন খুঁজিয়াছি, তবু আমি পাই নি সন্ধান।
শীতের রাত্রির মত দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘতর পথ,
অতীত হারায়ে গেছে, কে-জানে আছে কি ভবিষ্যৎ?
দিগন্তে কুহেলি, আর আকাশের আলো হ'ল ম্লান।
শীতের শিশিরে বুঝি প্রভাতের সারা হ'ল স্নান,
অশ্রুর আভাস পাই দিবসের নয়নে ঈষৎ;
একদা কি হেসেছিল স্বর্ণালোকে সুন্দর শরৎ?
তরুগুলি রিক্তপত্র, থেমে গেছে মর্ম্মরিত তান।

অকস্মাৎ বয়ে গেল উচ্ছ্বসিত দক্ষিণের হাওয়া,
নৃত্যের কৌতুকে মাতি মুকুলের মুখ গেল চুমি'।
শিহরিয়া ওঠে শাখা, সুরু হ'ল কোন্ গান গাওয়া?
ঝরা পাতা উড়ে যায়, মর্ম্মরিয়া ওঠে বনভূমি।
ঘুমন্ত ফুলেরা জাগে, মনে হ'ল গেল বুঝি পাওয়া,
ফাল্গুন এসেছে ফিরে, এলে বুঝি, এলে বুঝি তুমি?

২

দণ্ডে পলে মুহূর্ত্তে কি বিচক্ষণ সময়ের মাপ?
দ্রুত তালে কভু চলে, কখনো সে নিতান্ত মন্থর,
কখনো তাহার সঙ্গে তরঙ্গিয়া ওঠে যে অন্তর,
কখনো তাহার ছন্দে স্পন্দমান সুরের আলাপ।
বসন্তে শুনেছি আমি কলধ্বনি কালের প্রলাপ,
কালের আবেগ লাগে শীতশ্রান্ত জীবনের 'পর,
সে আবেগে জেগে ওঠে হৃদয়ের নিরুদ্ধ নির্ঝর,
সে আবেগে লেগে থাকে অফুরন্ত প্রাণের উত্তাপ।

কোকিল কুহরি ওঠে, কণ্ঠে আনে কুহক ফাল্গুন,
কুহেলি কাটিয়া যায়, জাগে আলো অম্লান উজ্জ্বল,
অন্তরে সঞ্চয় করে বসুন্ধরা সূর্য্যের আগুন,
সবুজের সমারোহে পরিপূর্ণ তাই ধরাতল।
পুষ্পে পুষ্পে ভরা ওই অতনুর অপরূপ তূণ।
তুমি এলে? জীবনের স্বপ্ন আজ হবে কি সফল?

'নামডাকে এখন থেকেই লোভ?' নিত্য সুর করে বলে।

'যত হাড়-জ্বালানো কথা! দশ জন সমবয়সীর মাঝখানে মাইনের কথাটা বললে বেচারীর মনটা কেমন হয়?'

'তাও ত ঠিক।' বলে ঠাণ্ডা হয়ে আসা গেলাসের তলানিটুকু এক চুমুকে নিঃশেষ করে একটা বিড়ি ধরাল নিত্য।

'তোমার ব্যথাটা কেমন আজ?' নিত্য হঠাৎ বলল।

'এক কথা বার বার জিজ্ঞেস করা কেন? ব্যথা নিজের মনে নিজে আছে—আজ আর কাল কি?'

কথা বাড়াতে সাহস হয় না। নিজের ঘরের সুইচ নিবিয়ে নিত্য সোজা শুয়ে পড়ে। মাধবী চায়ের গেলাস খাটের নীচে রেখে, বারান্দার দোর দিয়ে নিজের মশারিতে গিয়ে ঢোকে।

"হ্যাট—হ্যাট—হ্যাট" ভোরের আবছা আলো কাঁপিয়ে পাড়াময় আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল ভুতুর কম্যাণ্ডারি হাঁক্। পাঁচটা সাদায় কালোয় কিল্‌বিলে কুকুরছানা সার বেঁধে বেরিয়ে এল খোলা দরজা দিয়ে। ভুতুর পেছনে সব চলল সদর রাস্তার দিকে। একটা ঠোঙার পাঁউরুটির গুঁড়ো আর ছাতু এক সঙ্গে মেশানো—তার মধ্যে হাত পুরে একবার এক মুঠো বার করে আর তা বার বার ছড়ায় দু'ধারে। আর বাচ্চাগুলো মাথা নেড়ে নেড়ে চেটে পুটে সব খেয়ে ফেলে। রাস্তায় জল দেওয়ার আগে একবার 'ভুতুর' সঙ্গে টহল দিয়ে আসা চাই এই ক্ষুদে পল্টনের।

বেড়িয়ে এসে, বাপির ক্যাম্পখাটে বই খাতা ছড়িয়ে স্কুলের পড়া তৈরি করতে বসে ভুতু। পাশে এনামেলের টোলখাওয়া বাটিতে মুড়ি মাখা। দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করে। পেন্টীটা কোন ফাঁকে খাটে উঠবার চেষ্টায় দাদার খাতায় মারে এক টান। আর হয় ত বা "কর্ত্তব্য"-র রেফে আগের লাইনের সব লেখা খোঁচা খেয়ে কাটা পড়ে গেল। ভুতু চেঁচিয়ে ওঠে, 'ধর না মা একে, সব নষ্ট করছে, রাক্ষুসী।' মাধবী বঁটি ছেড়ে উঠে এল। নাক মুছিয়ে পেন্টীকে কোলে নিয়ে বারান্দায় চলে এল।

'দাদা বকেছে, না, না, খাতায় হাত দেয় না, মাস্তার মারবে'—পেন্টী শুধু অবাক্ হয়ে কথাগুলা শুনে যায় মায় মুখের দিকে তাকিয়ে। তার পর একটা শুক্‌না কুমড়ো শাকের ডাঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খেলতে থাকে।

রোগে ভুগে বড় জব্দ হয়ে গেছে এই পেন্টীটা। এখনও মুখে ভাল করে কথা ফুটল না, পায়ের দিকে কম জোর। নইলে তিন বছরের মেয়ে, এত দিনে কি তার দস্যিপনার অন্ত থাকত? টলতে টলতে গিয়েই তাকের উপরকার শিশিতে টান মারে, খবরের কাগজের ছবি ছিঁড়ে দেয়। মাধবী জানালায় দাঁড় করিয়ে দেয়, আর কাঠের গরাদ ধরে 'ও মা', 'ও মা' 'ঐ যে' 'দু' নানা সুর করে ডাকে পেন্টী। বছর দুই আগে কত কষ্ট করে চোখ সারানো হ'ল—আবার ক'দিন থেকে সেই পিঁচুটি জমে যাওয়া আরম্ভ হয়েছে, মাঝে মাঝে একেবারে চোখ জুড়ে যায়।

অন্য সব ছেলেমেয়েরা চার ধারে খেলে বেড়ায়, ছুটোছুটি করে। আর পেন্টীও তার মনের মতন একটা খেলা বেছে নিয়েছে। সেটা হ'ল কুকুরছানাদের ভোজ। খাঁ খাঁ দুপুর। পাড়া নিঝুম। শুধু বাড়ীর সামনেকার সরু কাঁচা রাস্তাটায় আগুন-তাতা ধুলোর উপর পা ছড়িয়ে বসে পেন্টী। পাঁচটা কুকুরছানা ওকে গোল করে ঘিরে ধরে। একটা পোড়া রুটি নিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে রাখছে ধুলোয়, আর বাচ্চারা কাড়াকাড়ি করে খেয়ে নিচ্ছে। বসে বসেই ঘুরছে পেন্টী ধুলোর উপর, কোন বাচ্চা যেন বাদ না পড়ে। দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মাধবী, হলুদের ছোপলাগা কাপড়খানাই পরনে। দেখে আর হাসে। খাওয়ানো শেষ হলে এক ছুটে গিয়ে মেয়েকে কোলে তুলে নেয়, বলে—'নেমন্তন্ন খেয়েছে আউ-বাচ্চা?'

'হা-হা' করে ভাঙা ভাঙা খুশির আওয়াজ তুলে হেসে ওঠে পেন্টী। মার কোলে চড়ে ঘরে ফিরে আসে। আউ-বাচ্চা খাটের তলায় ঢুকে পড়ে। আর মশারিটা ফেলতেই অয়েল-ক্লথের উপর অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে মেয়েটা।

তার বিকেলবেলার আব্দারটাও মাধবীর রাখা চাই। সেটা হ'ল, গোলাপী ফ্রক্ পরে, কাজল চোখে দিয়ে মাঠের বাড়ীতে বেড়াতে যাওয়া। দুটো বাড়ী পরে মাঠের বাড়ীটা নূতন উঠেছে। ওভারসিয়ারের বউ মনোরমা ভারি ভালমানুষ। আর বড় মায়া পড়ে গেছে তার ক'দিনে এই বাচ্চা দুটোর ওপর। মনোরমা রেডিও খুলতেই পেন্টী খিল খিল করে হাসে মার গলা জড়িয়ে ধরে।

'গানের নামে পাগল'—মাধবী বলে।

'মায়ের ধারা পেয়েছে। আমি শুনেছি দিদি আপনি খুব ভাল গাইতে পারেন,'—মনোরমা জবাব দেয়।

'মায়ের গান সব চাপা পড়ে গেছে। এই পেন্টীটা ছাড়ে না, যখন তখন কাঁদে, আর গুন্ গুন্ করে সুর ধরতেই থেমে যায়।'

'এমন সুন্দর কচি কচি মুখ দু' ভাই বোনের—অমন যা-তা বলে ডাকেন কেন দিদি?'

'পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষে মরে এসে জুটেছে কিনা,'—মাধবী জোরে হেসে ওঠে।

'অমন কথা বলবেন না ভাই,'—বাধা দেওয়ার ভাবে মনোরমা বলে, 'ভারি চটপটে ছেলেটি আপনার। আমাদের সন্তুর বলছিল এবার ওদের স্কুলের রবীন্দ্র-উৎসবে কি সুন্দর আবৃত্তি করেছে মৃণাল।'

'ঐ ত কাঠি চেহারা, ওর বলা কেউ শুনল?'

'বড় হলে দেখবেন, সোনাছেলে হবে।'

"তার আগেই যে রেশন-ব্যাগ ধরতেই বাবু কাৎ"—আবার সেই জোয়ালো হাসিতে ওদের আলাপ শেষ হয়।

ভুতুর খেলা সবই সর্দ্দারি চালের। সন্ধ্যাবেলা পা কেটে বাড়ী এল।

"পা কাটলি কি করে?"

"বাঃ বলে গেলাম না, ম্যাচ আজ। আমাদের ক্লাস থ্রি, ওয়ান্ ফিলে হারিয়ে দিল কোরকে।"

"বেঁধে দিলে কে?"

"খেলা ওভার হলে চিন্ময়ের বাবার ডাক্তারখানায় নিয়ে গেল। টিংচার বেন্জিন্ দিয়ে বেঁধে দিলে।" মুখের দিকে চেয়ে থাকে মাধবী। একত্র থেমেই ভুতু বলে চলে: "পেন্টুটা বড় হলে মা ওকে যা খেলা শেখাব না, আমার শটে কি জোর! দেখবে?"

"আজ থাক বাবা—বড় ব্যথাটা বেড়েছে, গোলমাল বাড়াস না এর উপর।"

"কেন সেই পাঁচ ফোঁটা ওষুধ?"

"ও ফোঁটায় কমে না রে। তার চেয়ে শুয়ে থাকি। তুই বরং পেন্টুটাকে ঘুম পাড়া একটু।"

পেন্টু দাদার হাত ধরে বারান্দায় পাতা মাদুরের উপর গিয়ে বসে। তারপর একটা বালিশ পেতে বোনটিকে শুইয়ে ছড়া কাটতে থাকে ভুতু—

"বাঘের মুখে উঠন্ত যদি রামছাগলের দাড়ি"

এ পাড়ায় ভুতুর সবচেয়ে বড় বন্ধু সঞ্জয়। সুতরাং তার জন্মদিনে ভুতুর ডাক পড়ল প্রথম। ইস্কুল থেকে ফিরেই খবরটা মাকে জানানো হ'ল জন্মদিনের খাওয়া আছে সঞ্জয়ের বাড়ী।

"কি দিবি ওকে?"

"কি আবার? নেমন্তন্ন ত!"

"বারে, বন্ধুর জন্মদিন, তাকে কিছু দিবি না?"

"তবে তুমি বলে দাও।"

"আচ্ছা, যা তুই খেলে আয়। এসেই দেখবি কি মজার জিনিস পাবি।"

মাথার কাছে জড়ো করা একগাদা খালি সিগারেটের বাক্স। কাত হয়ে শুয়ে একটা একটা করে বাক্স নিয়ে বরফি কেটে কেটে জোড়া দিয়ে সুন্দর আসন বানায় মাধবী। মনের সব ব্যথা যেন মিলিয়ে যায়। জোরে হাত চালিয়ে সন্ধ্যার মুখে আসন শেষ করল।

ভুতু ফিরে এসে সেই আসন দেখে লাফিয়ে উঠল।

"মা তুমি শুড বয় হয়েছ"—এক টানে আসনটা নিয়ে এক বার ভাল করে দেখে।

"আমার একটা দিয়ো কিন্তু।" চটপট হাত-পা ধুয়ে তৈরি হ'ল ভুতু।

"উ-উঁ" হাত বাড়াল পেন্টু।

"ধর মা।"

"নিয়ে যা না বাবা, একটু পড়ে থাকি।"...

ওদের দু' ভাইবোনকে পেয়ে সঞ্জয় মহাখুশি। চারদিকে প্রচুর ফুল, আলো, লোকজন, ঘরের মাঝখানে ফুলতোলা আসনের সামনে প্রদীপ জ্বলছে। বোন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। মনোরমা ওকে কোলে তুলে নিল। আদর করে কত কি খাওয়াল। খুব ফুর্ত্তি-আমোদ করে কাটাল ওরা। একটা চকচকে পাঞ্জাবী আর কোঁচানো ধুতি পরে সঞ্জয় ভুতুকে নিয়ে সব দেখাচ্ছিল। একটা সবুজ রিবনে বাঁধা অয়েলপেপার মোড়া মলাটের কত মোটা মোটা গল্পের বই গোল টেবিলে সাজানো। "এ সব কাকারা দিয়েছে",—সঞ্জয় সব বুঝিয়ে দেয়, "আর ঐ তাকে যে এয়ার-গান আর মাউথ-অর্গ্যান দেখছিস ও দুটো বাবার কাছ থেকে নিয়েছি।" ভুতুর মায়ের তৈরি, সিগারেটের বাক্সের আসন সঞ্জয় সবাইকে সগর্ব্বে দেখাতে লাগল। "এটাই সবচেয়ে চমৎকার রে, মাসীমা করেছেন নিশ্চয়ই।" "হ্যাঁ"—ভুতু আনন্দে ও বিস্ময়ে হতবাক্। মাকে আজ তার সবচেয়ে বেশী ভালবাসতে ইচ্ছে হ'ল। বোনটার লক্ষ্য রয়েছে কাঁচের আলমারির মাথায় কাপড়ের গাদার উপর বসানো একটা মস্ত লাল রবারের বলের উপর। বার বার সেদিকে "ঐ যে" বলে সে হাত বাড়াতে লাগল। ভুতু কিছুতেই শান্ত করতে পারে না। কেবল ভোলাবার চেষ্টা করতে লাগল। শেষে চুপি চুপি বলল, "বাপি দেবে তোকে, বাড়ী চল।" ভুতুর কথায় তার মনে আশার সঞ্চার হ'ল। সঞ্জয় ভাবান্তরের হেতু কিছুই বুঝতে পারল না, ভুতুও তাকে কিছু খুলে বলল না।

জন্মদিনের উৎসব শেষ হলে ভাইবোনে বাড়ী ফিরল একটু রাতে। শুয়ে ছিল মাধবী। বোনকে ছেড়ে দিতেই মার বুকে গিয়ে ধপ করে শুয়ে পড়ল।

"ওকে আদর করো না আজ মা, বড্ড অসভ্যতা করেছে।"

"কেন রে, বোনটির উপর রাগ কেন বাবা?"

"ওদের বাড়ী গিয়ে যা দেখে নিতে চায়।"

মেয়ের এসব কথায় ভ্রূক্ষেপ নেই। সে কেবল মার গলা জড়িয়ে "মা, বঃ" "মা, বঃ" করতে থাকে। সেটার খেই ধরিয়ে দিয়ে ভুতু বলে উঠে রাগের মাথায়:

"ঐ শোন না, একটা লাল বল দেখে এসেছে, তাই কেবল 'ব', 'ব' করে তোমায় শোনাচ্ছে।"

"ওর বোধ হয় একটু জন্মদিনের সখ হয়েছে রে"—মাধবীর শুকনো মুখে হাসি দেখা দিল। মেয়েকে বুক থেকে নামিয়ে পাশে পাতা বিছানায় শুইয়ে দিল। ততক্ষণে তার ঘুম এসে গেছে। পাশ বালিশে একটা পা তুলে দিয়ে দিব্যি ঘুমুতে লাগল। আলোটা মুখে পড়ে কেমন যেন করুণ দেখাচ্ছে।

নিমেষ মধ্যে চিন্তিত হয়ে ভুতু বলল:

"বোনের জন্মদিন কবে মা?"

"শ্রাবণ মাসে, দেরি আছে।"

"কত দেরি তাই বল?"

"এটা যে সবে বৈশাখ মাস। আরও দু' মাস যাবে তবে..."

"না, না, বড্ড দেরি হয়ে যাবে মা। তুমি এই রোববারেই একটু ওর জন্মদিন কর না।" ভুতু ঘুমন্ত বোনটির মুখের দিকে চেয়ে বড়ের মত বলে গেল।

"বেশ"-মাধবী হেসে উঠল, তার মনে পড়ল রবিবারই মেয়ের জন্মবার।

"কৈ, তুমি ত এদ্দিন বল নি", ভুতু রাগের ভান করে মাথা নীচু করে মাদুরের কাঠি খুঁটতে লাগল।

রবিবার এল। কাল রাত থেকে ভুতুর ঘুম নেই। খুব সকালে উঠে প্রথমেই ক্যালেণ্ডারের পাতা ছিঁড়ে উল্টোদিকে বড় বড় অক্ষরে লাল কালিতে লিখল :

"আজ ললিতার জন্মদিন"

লেখাটা টাঙিয়ে দিল শোবার ঘরে ঢুকবার দরজার গায়ে। সঞ্জয়কে বলে এল তার পরেই। বোনটি উঠলে তাকে কোলে করে লেখাটার কাছে গিয়ে দেখাতে লাগল। ওদিকে নাওয়া খাওয়ার বেলা গড়িয়ে যায়! ভুতু কেবল মাকে বলে চলেছে কেমন করে বোনটিকে সাজাবে, বল কিনে দেবে, মোটেই বকবে না। ছেলের ফরমায়েসে মাধবী বসে বসে ঘাড় ব্যথা করে মুড়ির মোয়া তৈরি করল, পুরনো ন্যাকড়া পাড় সব জড়ো করে পুতুল সেলাই করল সারাদিন। তারপরে কালি দিয়ে চোখ নাক ঠোঁট আঁকা হ'ল। সেই পুতুলটাকে একটা পুরনো জুতার বাক্সের মধ্যে রেখে উপরে কালি দিয়ে লিখে দিল : পেত্নীকে জন্মদিনের উপহার।" ভুতু আনন্দে লাফাতে লাগল। বোনের কোলে পুতুলটাকে শুইয়ে দিল। ছড়া কাটতে লাগল। 'হা-হা' করে করে পেত্নী হেসে গড়াগড়ি।

সন্ধ্যাবেলা সঞ্জয় এল। একটা কাঠের রেলগাড়ী এনেছে। প্রথমেই ভুতু তাকে মার হাতে তৈরি সেই পুতুলটা দেখাল। রেলগাড়ীটা গড়িয়ে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে হাসতে লাগল পেত্নী। আলো-জ্বালানো ঘরে পিঁড়ি পাতা হ'ল। মাধবী একটা লবঙ্গ নিয়ে একটা একটা করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কপালে মুখে চন্দনের টিপ পরিয়ে সাজিয়ে দিল পেত্নীকে। সঞ্জয় সেই সাজানো দেখে অবাক হয়ে একবার মাসীমার দিকে চায় আর একবার ঘাড় ফিরিয়ে বন্ধুকে দেখে।

মুড়ির মোয়া আর বাদামভাজা খুব হৈ হৈ করে খেল ওরা।

পাশের ঘরে নিত্য ক্যাম্পখাটে শুয়ে। বিড়ি টানছিল। তার জরুরি চিঠির জবাব, টিউশানির টাকা সবই কেন দেরিতে পৌঁছয় এই ভাবনায় কেমন যেন বিমনা হয়ে ছিল। ভুতু এসে আচমকা ঠেলা দিয়ে তুলল :

"চল বাপি, বোনটির জন্মদিন দেখবে না?"

"ও, চল চল"—ঝটপট উঠে পাশের ঘরে চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল নিত্য। তারপর আস্তে আস্তে পিঁড়ির কাছে গিয়ে মেয়ের কোলে মাথাটা রেখে জোর জোরে মাথা দুলিয়ে তার লম্বা লম্বা চুলগুলোকে দোলাতে লাগল। বাপির এই আদরটা ভালই বোঝে সে। 'তা, তা' করে মাথা চাপড়াতে লাগল বাপির।

ভুতুর কি যেন মনে হ'ল। বাপিকে হাত ধরে পাশের ঘরে টেনে আনল। তারপর আলনায় ঝোলানো জামাটা ধরে নাড়া দিল। একগোছা চাবির রিং ঝন্‌ঝন্ করে উঠল।

যাও না বাপি কিছু মিষ্টি আনবে না!" ভুতু আবদার করে বসল।

"আচ্ছা, তুই জামাটা টানিস না বাবা, ছিঁড়ে যাবে"—নিত্য সন্তর্পণে শার্টটা গলিয়ে নেয়। খাটের তলা থেকে চটি বার করে পায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বেরুবার আগে একবার ক্ষীণ আলোতে চন্দনপরা মেয়ে মুখখানা ভালো করে দেখে নিল। বাইরে কেমন ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েছে। মেঘ জমেছে একটু একটু। হয়ত বা জল নামবে। ভুতুকে ছলনা করে বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু পকেট যে একেবারে গড়ের মাঠ! কোথায় বা যাবে সময় কাটাতে। বাচ্চা-দুটোর ঘুমুতে ত আজ ঢের দেরি। নিত্য সোজা ষ্টেশনের পথ ধরল।

রায়বাবুদের দালানের পাশে উঁচু জমিটায় দাঁড়িয়ে সেই ন্যাড়া গাছটা। খড়কুটো দিয়ে বাসা বেঁধেছে একটা কাক। বাজারের পথে কত দিন চোখে পড়েছে নিত্যর—লাল লাল ঠোঁটওয়ালা বাচ্চারা হাঁ করে বড় কাকটার মুখ থেকে খাবার নিচ্ছে।

নিত্য কি ভেবে সেই জায়গাটায় একটু দাঁড়াল। বাসাটা ঝোড়ো হাওয়ায় দোল খাচ্ছে।

পল্লীশিল্প রক্ষায় নূতন প্রচেষ্টা

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রা ক্রমশঃই কঠোরতর হইয়া পড়িতেছে এবং ইহার পরিণতি কোথায় তাহা লইয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই বিব্রত করিয়া ফেলিতেছে। অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াইয়া পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টায় গভীরতর অন্ধকারের মধ্যে পড়িবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইতেছে। রোগের পরিচয় সংগ্রহ করিবার আর বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। এখন উপযুক্ত চিকিৎসক সাহায্যে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

এখানেও নিষ্কৃতি নাই। "নাসৌ মুনির্যস্য মতম্ ন ভিন্নম্," বহু ব্যবস্থাপত্র আসিয়া জমা হইতেছে। কাহাকে অবলম্বন করিলে নিষ্কৃতি, রোগ হইতে নিষ্কৃতি—ভবযন্ত্রণা হইতে নয়—লাভ করা যায় তাহাই বিচার্য বিষয়। এখানেও বিচারের কাল এত দীর্ঘ যে মীমাংসায় পৌঁছিবার মধ্যে রোগীর অবস্থা হীনতর হইয়া পড়িবে এমনকি রোগমুক্তির সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়া যাইতে পারে।

মাঝারি ও কুটীরশিল্প লোকের আয়ের পথ অধিকমাত্রায় উন্মুক্ত করিবার সুযোগ দান করিতে সমর্থ; সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কাহাকে অবলম্বন করা যায় এবং কোথায় ও কিভাবে কার্য্যারম্ভ হয়, তাহা লইয়া সমস্যা বাড়িয়া চলিতেছে। কুটীরশিল্প রক্ষাকল্পে যে সকল ব্যবস্থা দেওয়া হয়, তাহার কতগুলি পালন করা যাইতে পারে তাহা লইয়া সর্ব্বদা মতবিরোধ রহিয়াছে। সাধারণ লোকে মনে করেন, কেবলমাত্র প্রচার দ্বারা ইহাকে রক্ষা করা সম্ভব নয়; এমনকি আইন সাহায্যেও যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে তাহাতেও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

বিচারপূর্ব্বক আইন প্রয়োগ এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের বাঁচিয়া থাকিবার শক্তি সঞ্জীবিত করা প্রয়োজন। প্রচলিত কুটীরশিল্পের সহিত যন্ত্রচালিত শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিচার করিবার সময় কুটীরশিল্পের বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে নূতনতর বিপদ সমষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিলে ফল শুভ হইবার সম্ভাবনা।

কয়েকটি শিল্প সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমেই মৃৎশিল্পের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা চলিতে পারে। ইহা সারা ভারতের অত্যন্ত ব্যাপক কুটীরশিল্প এবং উৎপাদনকারী কুম্ভকার হইতে বিক্রয়কারী দোকানদার, মালবহনকারী গো-শকট এবং পল্লীর নৌকার চালক মাঝিমাল্লা সকলের অন্নসংস্থানে সহায়তা করিয়া থাকে। মৃৎশিল্পের ব্যাপক ক্রেতা প্রত্যেক বাড়ী এবং ব্যবহৃত দ্রব্যের মধ্যে নানাপ্রকার হাঁড়ি, সরা, মালসা, কুঁজো, কলসী, গামলা, গেলাস, ডিস বা রেকাব প্রভৃতি বিশেষ প্রচলিত। বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল পাত্র নিত্য ব্যবহারেও বহুদিন অটুট অবস্থায় থাকিয়া যাইত, সুতরাং যত্নের তৈজসাদি শুভাশুভ অশৌচ, অরন্ধন, গ্রহণ, স্পর্শদোষ, উচ্ছিষ্ট প্রভৃতি এক-একটা উপলক্ষ্যে করিয়া পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। যদি চীনামাটির বাসন উচ্ছিষ্ট হইলে পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন না থাকে দগ্ধ মৃত্তিকার পাত্র সামান্য উচ্ছিষ্ট হইলে ফেলিয়া দিবার যথেষ্ট কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আকাশে সূর্য্য-চন্দ্র গ্রহণে রন্ধনের মৃৎপাত্রে কোনও দোষস্পর্শ করে না, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কাঠের জ্বালে বা উত্তাপে এক একটি পাত্র বহুকাল চলিয়া যাইত। কিন্তু ইহাতে কুম্ভকারের মাল বিক্রয় হয় না; তাহার অন্নাভাব ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং সমাজপতি ব্রাহ্মণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অর্থনীতিজ্ঞের মত যে ব্যবস্থা দান করেন তাহাতে নানা অজুহাতে এই সকল তৈজসের পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। এক পয়সায় দুটা মালসা, চারখানা সরা, চার-ছয়খানা রেকাব, দশ হইতে বিশটা গেলাস, দুই পয়সা হইতে ছয় পয়সার বড় বড় হাঁড়ি, তিজেল বিক্রীত হইত আর তাহাই যদি মাসের পর মাস ব্যবহার করা হয়, তাহাতে সাধারণ মৃৎশিল্প বিপন্ন হইবার কথা। তাহাকে রক্ষা করিবার যে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা প্রত্যেকে আনন্দে মানিয়া লইয়াছে এবং তাহাই শিল্পের রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করিয়াছে। কোনও শাসন, শুল্ক প্রভৃতি লোকের আপত্তিকর ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় নাই।

আজ সে ব্যবস্থা অন্তর্হিত হইয়াছে; তাহার নানা কারণও বর্ত্তমান। কাঠের পরিবর্ত্তে "পাথুরে" কয়লা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে মৃৎ-তৈজস ব্যবহার বিষয়ে বিচিত্র পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়া গেল। সাধারণ মাটীর হাঁড়ি এ তাপের সম্পূর্ণ অনুপযোগী, সুতরাং শীঘ্র ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িতে লাগিল। নানারূপ অর্থ-নৈতিক কারণে দ্রব্যাদির দর বাড়িয়াছে এবং লোকের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে। সুতরাং দুইটি প্রধান কারণে মাটীর তৈজস আঘাত পাইয়াছে। সেই হিসাবে কুঁজো ও কলসীর প্রচলন তত হ্রাস পায় নাই, কারণ তাহাদের প্রয়োজনীয়তা এখনও আছে এবং এই একই কারণে দুই শ্রেণীর মৃৎপাত্রের চাহিদায় যে তারতম্য ঘটিয়াছে, তাহা স্বল্প বিচারেই ধরা পড়ে। আবার এই মান প্রয়োগ করিয়া কুটীর শিল্পজাত দ্রব্যের পুনঃ প্রচলনের সম্ভাব্যতা বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে।

বিপদ অপর দিক হইতে আসিয়া দেখা দিয়াছে। ইহা অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী, সুদর্শন, ব্যবহারে সুবিধাজনক এবং প্রথম বিচারে অধিক-তর মূল্যবান হইলেও মোট ব্যবহারের কাল বিচারে স্বল্পমূল্য দ্রব্যাদি আসিয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বপ্রকার গৃহস্থালীর কাজে মৃৎপাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। বেশী পরিমাণ জল ও চাউল প্রভৃতির আধার হিসাবে জালা, গামলা; চাটনি, কাসুন্দি, পুরাতন তেঁতুল প্রভৃতির জন্য হাঁড়ি; স্নেহ পদার্থ, অর্থাৎ তৈল-ঘৃতজাতীয় দ্রব্যাদির আধার

হিসাবে নানা আকৃতি ও মাপের বিশিষ্ট পাত্রাদির প্রচলন ছিল। ধীরে ধীরে সে স্থান অপরে গ্রহণ করিয়াছে। প্রদীপ, কালির দোয়াত, সবই মাটির ছিল। দীপাবলীর ব্যবস্থায় প্রচুর প্রদীপ বিক্রয় হইত। চীনা মাটীর পাত্র, কাচ, এনামেল আসিয়া অধিকাংশ স্থান দখল করিয়া বসিল। যখন ইহারা রান্না ভাঁড়ার ঘর দখল করিতে আরম্ভ করিল, তখন মৃৎপাত্র সকল স্থান বিনা বাধায় পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হইতে লাগিল। কিন্তু কাচ, এনামেল বা কলাই ও চীনা মাটীর পাত্র অগ্নিসংস্পর্শে বিশেষ সুযোগ করিয়া উঠিতে পারে নাই, সেখানে ধান, ভাত, কাপড় প্রভৃতি সিদ্ধ করিবার জন্য মাটীর পাত্রের একটা স্থান ছিল। কিন্তু যখন সস্তায় এ্যালুমিনিয়ম আসিয়া আবির্ভূত হইল, তখন সহর ও সহরতলী ত বটেই, দূর পল্লীর মধ্যেও প্রবেশ করিয়া সে অনর্থের সৃষ্টি করিল।

এলুমিনিয়ম ও অপরাপর উপকরণে প্রস্তুত দ্রব্যাদি কেবল মৃৎপাত্রের নয়, ভারতের বিশেষতঃ বাংলার এক প্রধান শিল্প পিতল ও কাঁসার পাত্র নির্ম্মাণ শিল্পেরও সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইল। ইহারা মৃতপ্রায়, এখনও যে কয় ঘর শিল্পী এধারে-ওধারে ছড়াইয়া আছে, তাহাদের শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, বাঁচিবার সম্ভাবনা হ্রাস পাইতেছে এবং একবার অদৃশ্য হইয়া গেলে তাহাদের আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

মৃৎ ও কাংস্য-পিত্তল শিল্পের একটু বিশদ আলোচনা করিলাম কারণ ইহাদের সহিত বহু লোকের অন্নসংস্থান জড়িত রহিয়াছে এবং সাধারণ লোকের নিকট সমস্যার গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি হইবে। ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্রের মধ্যেও এই ভাব ও অভাব প্রবেশ করিতেছে। পল্লীশিল্প সাহায্যে তাহা পূরণ করা সম্ভব হইতেছে না। এই টানে পড়িয়া যাহা বাঁচাইয়া রাখার নিতান্ত প্রয়োজন, জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনে যাহা বহু সাশ্রয় দান করিতে পারে তাহাও নষ্ট হইতে বসিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ঢেঁকি ও গরুর গাড়ীর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, কারণ নিতান্ত সংক্ষেপে তাহা শেষ করা সম্ভব নয়।

"কুটীরশিল্প এমন কি মধ্যমাকার শিল্প না বাঁচিলে বা তাহার উন্নতিসাধন না করিলে দেশের সমূহ বিপদ" এই কথাই এখন সকলের মুখে শোনা যাইতেছে। কিন্তু কি করিলে তাহা বাঁচিতে পারে সে সম্বন্ধে মাত্র সম্প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। কেহ জানিতেন না তাহা বলা যায় না, কারণ "প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিয়ু" পত্রিকাদ্বয়ের নিয়মিত পাঠকবর্গ কয়েক বৎসর ধরিয়া এ বিষয় অবগত আছেন। যে সকল বিষয়ের অবতারণা এতকাল করা হইয়াছে, মাত্র কয়েক মাস হইতে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

দেশী-শিল্পের আক্রমণ হইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য বিদেশী ত বটেই দেশীয় শিল্পের উপর নানাবিধ সেস, ট্যাক্স প্রভৃতি ধার্য্য হইতেছে। সে কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

কুটীরশিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রাদির উৎকর্ষের বিষয় এতাবৎ যথাযোগ্য মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হয় নাই। মহাত্মা গান্ধী যখন উন্নত চরকা আবিষ্কর্ত্তাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দিবার কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন হইতেই সামান্য যন্ত্রপাতিতে উন্নতিসাধনের কথা বড় করিয়া দেখা দেয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা সদিচ্ছামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। কোথাও কোনও উন্নত যন্ত্র এ শ্রেণীর শিল্পে প্রয়োগের বার্ত্তা পাওয়া যায় না। সম্প্রতি অখিল-ভারত খাদি ও পল্লীশিল্পোন্নতি সংস্থা (অল্-ইণ্ডিয়া খাদি এ্যাণ্ড ভিলেজ ইন্ডাষ্ট্রীজ্ বোর্ড) এ বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিতেছে। ইহা ছাড়া "নান্যোব গতিরন্যথা" বুঝিয়া পল্লীশিল্পপণ্য উৎপাদনে বড় কারখানার উন্নত প্রণালীর পরিবর্ত্তিত সংস্করণ প্রয়োগ (for utilising and adopting current technology to village industries) করিবার জন্য এক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গঠিত হইতেছে। এই প্রথায় পল্লীশিল্পপণ্যের উৎকর্ষ সাধিত হইবে এবং তাহারা নিজের গুণে সমাদর লাভ করিবে বলিয়া বিশ্বাস।

বিদেশী প্রথা লক্ষ্য করিবার জন্য এবং সম্ভব হইলে তাহা দেশে প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে বহু অর্থব্যয়ে অনেকে বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে যে বিশেষ কোনও ফল হয় নাই, তাহা এখন আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। দেশের প্রয়োজন দেশীয় কারিগরের বুদ্ধি, রুচি ও সাধ্য বুঝিয়া যদি যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সুফল পাওয়া যাইবে। অপর দেশ হইতে অকস্মাৎ একটা ভাল গাছ আনিয়া দিলে যেমন এ দেশের মাটিতে শিকড় বিস্তার নাও করিতে পারে শিল্পের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক।

এই সম্পর্কে অপর যে নীতি গৃহীত হইতেছে তাহা বড় শিল্পের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া ক্ষুদ্র শিল্প রক্ষা প্রচেষ্টার পরবর্ত্তী অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। মাদ্রাজ রাজ্য-সরকার তাঁত রক্ষা করিবার জন্য একটা প্রকাণ্ড অঞ্চলে মিলবস্ত্রের "আমদানী" বন্ধ করিয়া রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। ইহার "সু" ও "কু" দুই দিকই আছে এবং ইহা বাঞ্ছনীয় কি না তাহা এখানে বিচার করার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। যদি পল্লীশিল্প নিজের শক্তিতে দাঁড়াইতে না পারে বা সেরূপ ব্যবস্থা দ্রুত সম্পাদিত না হয়, তাহা হইলে রক্ষিত অঞ্চল সৃষ্টি করিয়া শুভ-দিনের অপেক্ষায় বসিয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই। একই অঞ্চলে মিল ও কুটীরশিল্পজাত পণ্য বিক্রীত হইলে নানা কারণে মিলজাত দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। যদি অনবরত কৃত্রিম ভাবে মিল-দ্রব্যের দর বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে মিল ক্রমে দর সস্তা করিতে চেষ্টা করিবে আর ক্রেতা ক্রমে উৎকৃষ্টতর মূল্যে মাল ক্রয়ে অভ্যস্ত হইলে কুটীরশিল্পের দুর্দ্দশা ঘুচিবার সম্ভাবনা ঘটিবে না। তাহা ছাড়া, "স্বদেশী" দ্রব্য অধিক মূল্যে

সদাসর্ব্বদা ক্রয় করিতে গেলে প্রতিনিয়ত যে ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে কুটীরশিল্পজাত পণ্যের উপর একটা বিদ্বেষ ভাব জন্মিতে পারে। তদপেক্ষা একই রকম মাল পাওয়া যায় এবং অপর কাহারও সহিত গুণ ও দর তুলনা করিবার সুযোগ থাকে না, এইরূপ একটা অবস্থা লইয়া পরীক্ষা করা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। তবে এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে, কেবল তাঁত-বস্ত্র নয়, বা কেবল মাদ্রাজ রাজ্য নয়, অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে কারখানাজাত মাল বর্জ্জন করিয়া যদি চলা সম্ভব হয়, তাহার পরীক্ষা করাই সমীচীন। গান্ধীজীর ভক্তসংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন; তাঁহারাই এখন অধিকাংশ রাজ্যের কর্ণধার। এখন যদি দুই তিনটি প্রতিবেশী রাজ্য মিলিয়া এ পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত হন, রাজ্য-সরকারের আয়, নাগরিক সাধারণের অসুবিধা ও ক্ষতি উপেক্ষা করিয়া কুটীরশিল্প ও সহজ সরল জীবনযাপনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তবে কেবল ভারতবর্ষের নয়, সারা জগতের একটা মহদুপকার সাধন করা হইবে। আমরা আশান্বিত চিত্তে এই সুদিনের অপেক্ষা করিয়া জীবনাতিপাত করিব, তাহাতে সংশয় নাই।

কণ্ঠস্বর

শ্রীউমা দেবী

এমন সুন্দর হয়ে চাঁদ কোনোদিন আগে ওঠে নি আকাশে,
এমন সৌরভ-ঢালা ছিল না-তো কোনোদিন দক্ষিণ বাতাসে,
হৃদয়ে লাবণ্য এত কোথা থেকে এল এক নিটোল আশ্বাসে—
ভালোবাসে—সে আমায় কত ভালোবাসে!
এখন তো ধরে ধরে সন্ধ্যামণি ফুলগুলি ফুটে উঠে সুখভরে হাসে,
চাঁপার সোনালি শাখা—
চাঁদ সোনাগুঁড়া মাখা—
মেঘে মেঘে কাঁচা সোনা ভাসে
—বাসনার তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে,
হৃদয় উঠেছে জেগে এই অবকাশে।
যদিও—যদিও আছে দু'জনার মাঝখানে বেদনার তরঙ্গ দুস্তর
তবু—তবু যদি বায়ুস্রোতে একবার ভেসে আসে তার কণ্ঠস্বর!
সে কণ্ঠে কি যাদু আছে জানি না সে কথা
সে সুখের স্মৃতি শুধু স্বপ্নময় ব্যথা।
আহা, মনোহর তার নবনীত-সুকুমার মোহময় তনু,
কচিৎ ভ্রূভঙ্গে তবু ভেঙে হ'ত খান্ খান্ মন্মথের ধনু।
আহা—সুধাময় তার পরশের পারাবার শীতল গভীর—
সে শীতল আলিঙ্গনে প্রাণ হ'ত মরণের রহস্যে অধীর।
আহা—দেহগন্ধে তার
মুক্ত সৌভাগ্যের দ্বার—
উন্মাদনা বহু নিশীথের—
তুলনা—তুলনা শুধু কস্তুরী মৃগের।
মধুর মধুর তার সব
দেহ মন প্রাণের বিভব,
যদিও—যদিও আজ দু'জনার মাঝখানে বেদনার তরঙ্গ দুস্তর
তবু—তবু যদি বায়ুস্রোতে একবার ভেসে আসে তার কণ্ঠস্বর!
সে কণ্ঠে কি যাদু আছে জানি না সে কথা
সে সুখের স্মৃতি শুধু স্বপ্নময় ব্যথা।
কবে সে বলেছে কথা গুন্ গুন্ ভুলে যাওয়া আধ আধ স্মৃতির মতন
সে অনুসন্ধান আজো শেষ তো হয় নি তাই রহস্যের এত আলাপন
—পৃথিবীর ফুল আর আকাশের তারায় তারায়,
সে কথা শোনার আগে—
সে কথা বলার আগে—
সে কথা বোঝার আগে—অকস্মাৎ শেষ হয়ে যায়।
কবে সে গেয়েছে গান সুরের আগুন তার জ্বলে প্রাণে প্রাণে—
নভ থেকে সূর্য্যালোক তাই বারে বারে আসে ধরিত্রীর টানে
কে জানে কি গুণ আছে, কি আগুন আছে তার গানে।
ভুলে যেতে পারি না সে কথা—
সে সুখের স্মৃতি শুধু স্বপ্নময় ব্যথা।
আজো তো প্রত্যেক রাতে
কুসুমের পাতে পাতে—শিশির যখন
ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে অশ্রুর মতন,
বনে বনে বায়ু বয়ে যায়—
যেন এক দীর্ঘশ্বাস গাঢ় হতাশায়,
ভাঙা ভাঙা ওঠে রাঙা চাঁদ,
মূর্চ্ছিত আকাশে যেন স্বপ্নের প্রমাদ;
ধরণী ঘুমায় এক গর্ভভার-অবসন্না নারীর মতন
ঘুমায় তবুও দেখে স্পন্দমান সৃষ্টির স্বপন
হৃদয়ের সমুদ্রের পার থেকে আসবে সে কবে বল কবে—
ধরণীর সোনাভাঙা হিম বালুতটে,
একান্তই আমার নিকটে—
আহা—নবনীত তার তনুতটে থাকবে কি রাতের শিশির—
আঁখিপটে জাগবে কি ভোরের মিহির?
এই তো—এই তো রাত—আজ রাত উজ্জ্বল কেমন
বাতাসেও সৌরভ তেমন!
দেখি নি তো এর আগে কোনো রাত সুন্দর এমন!
এমন সুন্দর হয়ে চাঁদ কোনোদিন আগে ওঠে নি আকাশে,
এমন সৌরভঢালা ছিল না তো কোনোদিন দক্ষিণ বাতাসে!
আনন্দের এমন উচ্ছ্বাসে—
আর এতটুকু পেলে এ আকাশ এ বাতাস হ'ত জানি সুনিশ্চিত
অমৃত-মন্থর
সে শুধু—সে শুধু আহা তার কণ্ঠস্বর।

সিংহল-নরপতি প্রথম পরাক্রমবাহু

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা

রাজা কীর্ত্তিশ্রীমেঘের মৃত্যুর পর প্রথম পরাক্রমবাহু খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে সিংহলের রাজা হন। কথিত আছে, তিনি সিংহপুরে জন্মগ্রহণ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন তাঁহার জন্মভূমি ছিল পুঞ্জগ্রামে। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের ৩টি তারিখ পাওয়া যায়—যথা: খ্রীঃ ১১৫৩; খ্রীঃ ১১৫৯ এবং খ্রীঃ ১১৬১। তিনি রাজ্যশাসনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং তিনি তাঁহার চেষ্টায় লঙ্কাদ্বীপে শান্তি আনয়ন করেন। সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, মঠ, মন্দির, স্তূপ, উদ্যান, পুষ্করিণী, খাল, রাজপথ, বিপণি, স্নানাগার প্রভৃতি নিমাণ করিয়া তিনি লঙ্কাদ্বীপের শোভাবর্দ্ধন করেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং চিকিৎসাবিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

রাজ্য ও ধর্মের উন্নতি বিষয়ে পরাক্রমবাহু সচেষ্ট ছিলেন। সিংহলের নৃপতিগণের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান ছিলেন। সম্রাট অশোকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তিনি ধর্ম, কৃষিকর্ম্ম ও অন্যান্য কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি পুলস্তিপুর নগরে বাস করিতেন। বহু প্রাসাদ ও উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া এই নগরটি সুরক্ষিত ও শ্রীমণ্ডিত করেন। তিনি পোলনারুবা নগরটি পুনর্নির্ম্মাণ করেন। এখানে বিহারগুলির সংস্কার ও নূতন ধর্ম্মমন্দির স্থাপনা করেন। ইহাদের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি পোলনারুবাতে দৃষ্ট হয়। রোহণ প্রদেশের গ্রামে ও নগরে তিনি অনেকগুলি গৃহ নির্ম্মাণ করেন। সুবিস্তৃত ও সুন্দর পুলস্তি নগরটি তাঁহার সময়ে পুনর্নির্ম্মিত হয়। ইহার চৌদ্দটি দরজা ছিল। সেগুলি এই: (১) বিশেষ রাজদ্বার, (২) সুন্দর সিংহদ্বার, (৩) সুবিস্তৃত হস্তীদ্বার, (৪) ইন্দ্রদ্বার,(৫) হনুমানদ্বার, (৬) সুউচ্চ কুবের দ্বার (৭) সুসজ্জিত চণ্ডীদ্বার, (৮) রাক্ষসদ্বার, (৯) উচ্চ সর্পদ্বার, (১০) সুন্দর জলদ্বার, (১১) উদ্যান দ্বার, (১২) (বুদ্ধের মাতার নামানুসারে) মায়া-দ্বার, (১৩) মহাতীর্থ-দ্বার এবং (১৪) সুন্দর গন্ধর্ব্ব-দ্বার। এই নগরটির মধ্য ভাগে ভগবান বুদ্ধের দন্তধাতুর রক্ষার জন্য মন্দির নির্ম্মিত হয়। এই উপলক্ষে তিনি উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। পুলস্তী নগরীর চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মিত হওয়াতে নগরটি সুরক্ষিত হয়। তিনি বহু পথঘাট নির্ম্মাণ করেন। বহু স্তম্ভশোভিত নানাবর্ণে চিত্রিত অনেকগুলি কক্ষযুক্ত একটি সপ্ততল প্রাসাদ নিম্মাণ করেন। এই নগর বহুশত কূটাগার দ্বারা শোভিত ছিল। ইহার সুবর্ণমণ্ডিত দরজা, জানালা, উত্তম দেওয়াল ও সোপান ছিল। নৃপতির শয়নকক্ষটি সুবর্ণমণ্ডিত দীপাবলীর মাল্য ধারণ করিয়া সৌন্দর্য্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। এই রমণীয় প্রাসাদটির নাম পরাক্রম রাখিয়াছিলেন—বৈজয়ন্ত অর্থাৎ দেবপুরী। পরাক্রমপুর নগরটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ ছিল। ইহা দ্বার, চূড়া, প্রাচীর, উদ্যান, প্রাসাদ ও বিপণি দ্বারা সুশোভিত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ জেতবন বিহারে স্থবিরগণের নিমিত্ত তিনি আটটি ত্রিতল মহামূল্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। স্থবির সারিপুত্তের জন্য বহু কক্ষ ও বহু প্রাঙ্গণযুক্ত একটি সুবৃহৎ সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। ভিক্ষুগণের ১৫টি বাসগৃহের জন্য সুবৃহৎ, সুচিত্রিত প্রাসাদ, ১৭৮টি ক্ষুদ্র প্রাসাদ এবং ৩৪টি দ্বার-তোরণ নির্ম্মাণ করেন। শিক্ষার-বিমান নামে একটি চারিতল প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়।

রাজবেশিভুজঙ্গ, রাজকুলন্তক, ও বিজিত নামে তিনটি উপনগরের ভিত্তি তিনি স্থাপন করেন। এইগুলিতে সুরম্য ত্রিতল প্রাসাদ ছিল এবং বেলুবন, ইসিপতন ও কুশীনগর নামে যথাক্রমে তিনটি বিহার ছিল। পরাক্রমবাহু নগরের মধ্যস্থলে একটি চতুষ্কোণ শালা নির্ম্মাণ করেন। ইহাতে চারিটি দ্বার ও অনেকগুলি ঘর ছিল। মনোহর উদ্যান-শোভিত চারিটি ভিক্ষাগৃহ নির্ম্মিত হয়। যাহারা শীল রক্ষা করিত তাহাদের নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি দিয়া সাহায্য করা হইত। তিনি অনেকগুলি ভাণ্ডার নির্ম্মাণ করেন। ইহাতে নিত্যব্যবহার্য্য সকল বস্তু পাওয়া যাইত। শত শত রুগ্ন ব্যক্তিদের জন্য একটি বৃহৎ গৃহ নির্ম্মিত হয়। এখানে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীরা দিবারাত্র রোগীদিগকে সেবা করিত। অনেকগুলি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এখানে বহুপ্রকার ঔষধ সংগৃহীত হয়। পরাক্রমের সুব্যবস্থায় সুদক্ষ, সুপণ্ডিত চিকিৎসকগণ উত্তমরূপে চিকিৎসাকার্য্য চালাইতেন। রাজা চিকিৎসকগণের দক্ষতার পরীক্ষা লইতেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেন এবং তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য হেমমন্দির (সুবর্ণ গৃহ) নির্ম্মাণ করেন। ইহা ব্যতীত মন্ত্র উচ্চারণের জন্য ধারণীঘর, বুদ্ধের জন্মকথা শুনিবার জন্য মণ্ডল মন্দির এবং পীতবস্ত্রধারী ভিক্ষু-প্রদত্ত যাদুবিদ্যাপূত জল ও সূত্রগ্রহণের জন্য পঞ্চসত্ততী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে পবিত্র উৎসবসমূহ পালিত হইত। এই উৎসবসমূহে জল ও সূত্রের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইত। ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা ও প্রচারকার্য্যের জন্য তিনি বহুবর্ণশোভিত উত্তম চন্দ্রাতপমণ্ডিত, আলোকমালায় উজ্জ্বল, গন্ধদ্রব্যে সুরভিত একটি ধর্মাগার নির্মাণ করেন।

গায়কগণের সুমধুর সঙ্গীত ও নৃত্য উপভোগ করিবার জন্ত প্রাসাদের অনতিদূরে সরস্বতী মণ্ডপ নির্মিত হয়। ইহার স্তম্ভগুলি সুবর্ণমণ্ডিত ছিল। এখানে রাজার কার্য্যাবলী বহু চিত্রে অঙ্কিত ছিল। রাজবেশিভুজঙ্গ নামে একটি সুন্দর মণ্ডপ নির্মিত হয়। ইহা মণ্ডপসদৃশ ছিল বলিয়া ইহাকে মণ্ডপ বলা হইত। ইহা ঠিক দেবসভার স্থায় ছিল। নানা চিত্রশোভিত এই ত্রিতল প্রাসাদটি সুন্দর বেদিকায় বেষ্টিত ছিল। পরাক্রম একস্তম্ভ প্রাসাদ নির্মাণ করেন, ইহাতে একটি সুরম্য সুবর্ণমণ্ডিত কক্ষ ছিল। ত্রিবঙ্কমূর্ত্তির জন্ত তিনি ত্রিবঙ্কগৃহ নির্মাণ করেন। রাজা পরাক্রমবাহু তিনটি ধর্মাগার, একটি চৈত্য, আটটি সুবৃহৎ বিহার, এবং ইষ্টকনির্মিত অনেকগুলি অগ্নিগৃহ নির্মাণ করেন। ইহা ব্যতীত পাঁচটি নাট্যশালা নির্মিত হইয়াছিল। শহরবাসীরা যাহাতে সহজে খাদ্যদ্রব্য পাইতে পারে সেইহেতু রাজা পরাক্রম সিংহলের বিভিন্ন স্থানে উদ্যান স্থাপন করেন। প্রাসাদের সন্নিকটে রাজার একটি নিজস্ব উদ্যান ছিল। এখানে বহু-প্রকার ফুল-ফলের গাছ ছিল। এগুলি দর্শকগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিত। অশোক, চম্পক, তিলক, নাগ, পুন্নাগ, কেতক, পাটলি, নীপ, জম্বু, কদম্ব, বকুল, কুটজ, বিম্বিজালক ও তমালবৃক্ষ এবং নবমল্লিকা লতা এখানে দৃষ্ট হইত। মধুকরদিগের গুঞ্জনে ও ময়ূরের কেকারবে উদ্যানটি মুখরিত হইত। এই উদ্যানে অনেকগুলি পুষ্করিণী ও স্নানাগার ছিল। শিলাপুষ্করিণী ও মঙ্গলপুষ্করিণী নামে দুইটি সুন্দর পুষ্করিণী এই উদ্যানে ছিল। এই উদ্যানে চন্দনকাষ্ঠ-নির্মিত স্তম্ভশোভিত একটি সুবৃহৎ প্রাসাদ ছিল। স্নানাগারযুক্ত দীপ-উদ্যান নামে আর একটি বাগান রাজা পরাক্রমবাহু স্থাপন করেন। তাল, হিন্তাল, নাগ, পুন্নাগ, কর্ণিকার প্রভৃতি বৃক্ষ দীপ উদ্যানের শোভা বর্দ্ধন করিত। দীপ-উদ্যানে শনিমণ্ডপ (শনিগ্রহের আবাস), মোরামণ্ডপ (ময়ূর-মণ্ডপ), আদাস মণ্ডপ (আয়নাগৃহ) অবস্থিত ছিল। অনন্ত পুষ্করিণী নামে একটি স্নানের পুষ্করিণী ছিল। ধবলাগার নামে একটি শ্বেতগৃহ এখানে ছিল। এই উদ্যানে বিদ্যা-মণ্ডপ নামে একটি দিব্যভবনে নানা বিদ্যার চর্চা চলিত। এখানে সুবিস্তৃত দোলামণ্ডপ (দোলনাগৃহ) ছিল। এখানে কিরামণ্ডপে (ক্রীড়াগৃহে) অবস্থিত হইয়া রাজা আনন্দ উপভোগ করিতেন। নন্দন উদ্যানে বহুপ্রকার পুষ্পফল-শোভিত বৃক্ষ দেখা যাইত। লক্ষ-উদ্যান নামে একটি বড় বাগানে রাজা আম্র ও নানা বৃক্ষ রোপণ করেন। ইহা ব্যতীত চিত্তলতাবন ও মহামেঘ-বন উদ্যানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বন্তা ও দুর্ভিক্ষের কবল হইতে যাহাতে প্রজাগণ রক্ষা পায় তজ্জন্ত তিনি বিভিন্ন স্থানে খাল ও পুষ্করিণী খনন করেন। ভারতীয় নদীর নামের অনুকরণে তিনি কতকগুলি খালের নাম দেন। কথিত আছে, বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের জন্ত তিনি ২১৬টি পুষ্করিণী খনন করেন, তন্মধ্যে উরুবেল নামক সুবৃহৎ পুষ্করিণী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরাক্রমসমুদ্র নামক বৃহৎ জলাশয়টি সর্বদা জলে পূর্ণ থাকিত। পরাক্রম-তড়াগ নামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী ছিল। গম্ভীরা, নীল-বাহিনী, বেত্রবতী, তুঙ্গভদ্রা, মঙ্গলগঙ্গা, চম্পা নামক খাল-গুলিও খনন করা হয়। সরস্বতী খাল তোয়বাপী হইতে বহির্গত হইয়া পুণ্যবর্দ্ধন বাপীর দিকে প্রবাহিত। যমুনা খাল পুণ্যবর্দ্ধন হইতে বহির্গত হইয়াছে এবং সরভূ খাল উত্তর দিকে প্রবাহিত। লোক-উদ্যানের মধ্য দিয়া চন্দ্রভাগা এবং জেতবন বিহারের মধ্য দিয়া নর্মদা খাল প্রবাহিত হইয়াছে। নৈরঞ্জনা খাল উত্তরবাহিনী এবং অনবতপ্ত জলাশয় হইতে ভাগীরথীর উৎপত্তি ঘটে। কালিন্দী স্রোতধারা দক্ষিণমুখী হইল এবং কাবেরী জলধারা গিরিতড়াগ হইতে বহির্গত হইল। রাজা গোদাবরী খাল খনন করেন এবং ইহার জলধারা পরাক্রমসাগরে পতিত হয়। তাঁহার চেষ্টায় উরুবেল, পাণ্ডুকলম্ব প্রভৃতি পুষ্করিণীর সংস্কার হয়।

পরনবিতান ঠিকই বলিয়াছেন যে, ১১৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পরাক্রমের সিংহাসনে আরোহণ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইঁহার ৩৩ বৎসর কাল রাজত্ব সিংহলের ইতিহাসে স্থাপত্য-শিল্পের দিক দিয়া একটি গৌরবময় যুগ। এই যুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি পোলনারুবাতে দৃষ্ট হয়। পরাক্রমের সিংহাসনের আরোহণের পূর্বে অনেকগুলি স্তূপ নষ্ট হইয়াছিল। রাজা হইয়া পরাক্রম সেগুলির সংস্কার করেন। সিংহলদেশীয় বৌদ্ধগণ বৃহৎ স্তূপ নির্মাণরীতি বহু যুগ ধরিয়া ত্যাগ করিয়া-ছিল—রাজা পরাক্রম ঐ রীতির পুনঃপ্রবর্তন করেন। পরাক্রমের পত্নী ভদ্রবতী পোলনারুবাতে কিরিবিহার নামে একটি চৈত্য নির্মাণ করেন। সিংহলে ইহা একটি পুরাতন সুরক্ষিত স্তূপ। রাজা পরাক্রমের রূপবতী নাম্নী অপর মহিষী একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমানে ইহা পবলু-বিহার নামে পরিচিত একটি ধ্বংসস্তূপ। পরাক্রমের জন্ম-ভূমিতে ও যেখানে তাঁহার মাতার সৎকার হয় সেই স্থানের স্তূপগুলি আজও অজানা রহিয়াছে। পরাক্রম একটি সুবৃহৎ স্তূপ অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান। এই অসম্পূর্ণ স্তূপটি পোলনারুবার উনগলবিহার নামে পরিচিত।

রাজা পরাক্রম ভিক্ষুদিগের বাসোপযোগী সুবৃহৎ বিহার নির্মাণে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি সুবৃহৎ জেতবন বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাতে ৫২০টি অট্টালিকা ছিল, আটটি প্রস্তরময় স্নানাগার নির্মিত হয়—এ গুলিতে স্তম্ভ, সোপান

ও বেদিকা ছিল। রাজা সুন্দর আড়াহণপরিবেণ নির্মাণ করেন। সম্ভবতঃ নগরের বহির্ভাগে কতকগুলি অট্টালিকা ছিল। বর্ত্তমানে এই অট্টালিকাশ্রেণী সাধারণের নিকট জেতবনারাম নামে পরিচিত। এখানে সুভদ্রা চৈত্য ও রূপবতী চৈত্য নির্মিত হয়। রাজার জন্মভূমি পুষ্পগ্রামে সুতিন্দ্র চৈত্য স্থাপিত হয়। এই চৈত্য ১৮০ ফুট উচ্চ ছিল। রাজা পরাক্রম ধীরগ্রামে নিজ মাতার সমাধিস্থানে ১৮০ ফুট উচ্চ রত্নাবলী চৈত্য নির্মাণ করেন। ১৬টি চৈত্য, বোধিবৃক্ষ, বোধিমন্দির, বোধিতোরণ, নির্মিত হয়। বৌদ্ধ-ধর্মের জীবন্ত চিহ্নস্বরূপ বিশাল অশ্বত্থবৃক্ষ সিংহলে অবস্থিত।

রাজা পরাক্রম বুদ্ধসীমা প্রাসাদ নামে একখানি দ্বাদশতল গৃহ নির্ম্মাণ করেন। এই গৃহ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ২৬২½ ফুট ছিল। তিনি পশ্চিমারামের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই বিহারে ভিক্ষুকদের বাসের জন্য ২২টি কক্ষ ছিল। অনেক-গুলি দ্বিতল সুদীর্ঘ প্রাসাদ, কুড়িটি অগ্নিগৃহ, একটি ভজনাগার, দশটি তোরণ এবং ৪১টি স্নানাগারসমেত দ্বিতল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাসাদ এখানে নির্ম্মিত হয়। এই পশ্চিমারাম ভিক্ষুদিগের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। রাজা উত্তরারাম এবং মহাস্তূপ নির্মাণ করেন। মহাস্তূপ ও দমিড়স্তূপ অভিন্ন। ইহা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ স্তূপ। ইহার পরিধি ছিল ১৩০০ হাত। রাজবেশিভুজঙ্গ এবং সিংহপুর উপনগরে যথাক্রমে ঈসিপতন বিহার এবং কুশীনারা বিহার নির্ম্মিত হয়। প্রথমটি ভিক্ষুদিগের নিকট অতি মনোরম স্থান ছিল। বিজিত উপনগরে গ্রামের উপকণ্ঠে বেলুবন বিহার স্থাপিত হয়। কপিল মুনির সম্মানার্থে কপিল বিহারে একটি মূল্যবান দ্বিতল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করা হয়। চোড়গণ লৌহপ্রাসাদ ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল। রাজা পরাক্রম পুনরায় ইহাতে ১৬০০ স্তম্ভ বসাইয়া ইহার সংস্কার সাধন করেন। দমিড় (তামিল) কর্ত্তৃক বিনষ্ট তিনটি স্তূপ পুনরায় নির্মিত হয়। ইহা ব্যতীত রত্নবালুকাস্তূপ, জেতবনস্তূপ, অভয়গিরিস্তূপ এবং মরিচবট্টিস্তূপের সংস্কার সাধিত হয়। চেতিয়গিরিতে (অর্থাৎ মিহিন্তাল পর্ব্বতে) ৬৪টি স্তূপ পুনর্নির্মিত হয়। কাহারও কাহারও মতে এগুলির কেবল সংস্কার হইয়াছিল।[১]

১। এই প্রবন্ধ রচনাকালে আমরা যে যে পুস্তক হইতে সাহায্য পাইয়াছি তাহাদের মধ্যে কতকগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :

Epigraphia Zeylanica, I, II; *Archaeological Survey of Ceylon*, 1901, 1905, 1906; A. M. Hocart—*The Topography of Polonnaruva (Archaeological Survey of Ceylon Memoir*, II, 1926); *J.R.A.S.C.B.*, Vol. XXX; Bode—*Pali Literature of Burma*; *Culavamsa* (Pt. I); *Culavamsa*, Tr. II (P.T.S.); Law—*History of Pali Literature*; Law—*Rivers of India*; *Mahavamsa Commy* (P.T.S.); Paranavitana—*The Stupa in Ceylon*; Barua—*Ceylon Lectures*; Law—*Geographical Essays*; Smither—*Architectural Remains of Anuradhapura*; P. M. Burrows—*The Buried Cities of Ceylon*.

দিবস-দয়িতে ভুলি'

শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত

ধূসর সন্ধ্যার কোলে অঘোরে ঘুমাতে দাও, রৌদ্রদীপ্ত দিবসের সাধ
প্রখর-প্রাচুর্য্য হাতে শতাব্দীর গর্ব্ব নিয়ে মুছে নিক্ সকল আহ্লাদ,
নিয়ে যাক মধুমাস, অফুরন্ত কুতূহল, আর নিতে সর্ব্বনাশা আশা—
কালের কামনা-মনে দাগ কেটে রেখে যেতে দূরে থাক প্রেম ভালবাসা।

দিবস দয়িত সূর্য্য অঞ্জলি ভরিয়া যদি অশ্রুসনে করিতে তর্পণ—
আবার আমার সেই ঘুমন্ত আত্মারে ডেকে নিজেরেই ক'রে সমর্পণ,
তখনো যেন গো সেই অনাদি কালের আমি ফেলে যাই এই উপহার
আমার স্ব প্নরে স্মরি' নরম সন্ধ্যার কোলে মুছে ফেলি হৃদয়ের ভার।

প্রবল-পাবক-প্রেমে আমারে জড়ায়ে ধরে' তেজোদীপ্ত দিবসের চোখ
আমারে প্রত্যক্ষ করি' আমার পৌরুষ সনে ঢেলে দিল উজ্জ্বল আলোক,
সে আলোকে ভুলে গেছি—তিমির-তপস্যা-তলে রচা কত শান্তি সুনিবিড়
সেখানে একাকী রব, আমার আমিরে লয়ে, সে নির্জ্জনে রহিবে না ভিড়।

দিবসে পেয়েছি জ্বালা—অভিশাপ মর্ম্মে বহি, পদে পদে মিথ্যা অঙ্গীকার
এখন সন্ধ্যার কোলে গাঁথিব একটি মালা—যাতে নাই কারো অধিকার।

কাদম্বরী

(কাব্য-সমালোচনা)

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

সংস্কৃত গদ্য-সাহিত্যের উজ্জ্বলতম ত্রি-রত্ন দণ্ডী-রচিত "দশকুমারচরিত", সুবন্ধু-রচিত "বাসবদত্তা" এবং বাণ-রচিত "কাদম্বরী"। পুনরায়, এই তিনটির মধ্যে, "কাদম্বরীই" সংস্কৃত গদ্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ ও চরম উৎকর্ষরূপে প্রসিদ্ধতম। মহাকবি বাণ তাঁর অপর সুবিখ্যাত গদ্যগ্রন্থ "হর্ষচরিতের" প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমার্ধে নিজের যে জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন, তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি চিত্রভানু ও রাজ্যদেবীর পুত্র, এবং রাজা শ্রীহর্ষের বিশেষ প্রিয় সভাপণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং বাণ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ এবং সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে ভারতভূমি অলঙ্কৃত করেন।

"কাদম্বরী" একটি সুবৃহৎ গদ্যগ্রন্থ, এবং আলঙ্কারিকদের মতে, বাণরচিত "হর্ষ-চরিত" ও "কাদম্বরী" যথাক্রমে "আখ্যায়িকা" ও "কথা" শ্রেণীর গদ্যরচনার আদর্শ বা প্রতীকস্বরূপ। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাণ "কাদম্বরীর" অর্ধাংশ মাত্র রচনা করে মহাপ্রয়াণ করেন, এবং অবশিষ্ট অংশ তাঁর সুযোগ্য পুত্র ভূষণভট্ট বা ভট্টপুলিন সমাপ্ত করেন। যে অর্ধাংশ বাণভট্টের স্ব-রচিত, তাও আয়তনে অতি বিপুল। এই সুবৃহৎ গ্রন্থের আখ্যানাংশও অতীব দুরূহ ও জটিল। তার কারণ এই যে, এতে নায়ক-নায়িকা ও উপনায়ক-উপনায়িকার দুই বা তিন জন্মের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে, এবং বর্ণনা-প্রণালীও জটিল। এক জনের দ্বারা কথিত গল্পের মধ্যেই দ্বিতীয় এক জন কর্তৃক অপর একটি বৃত্তান্ত, পুনরায় তার মধ্যেই তৃতীয় এক জন কর্তৃক তৃতীয় একটি বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে বলে গ্রন্থটির মূল কথাবস্তু কিয়দংশে কঠিন হয়ে উঠেছে। যথা—গ্রন্থের প্রারম্ভে, মূল গল্পটির শুক রাজা শূদ্রককে বলছে, পুনরায় সেই গল্পটি মহামুনি জাবালি শুককে বলছেন, পুনরায় জাবালি ঋষির গল্পের মধ্যে উপনায়িকা মহাশ্বেতা নায়ক চন্দ্রাপীড়কে স্বীয় করুণ বৃত্তান্ত বলছেন, পুনরায় মহাশ্বেতার আখ্যানের মধ্যে কপিঞ্জল তাঁকে উপনায়ক পুণ্ডরীকের বৃত্তান্ত বলছেন—এই ভাবে আখ্যান, উপ-আখ্যান, তার মধ্যে পুনরায় আখ্যান—এই প্রণালীতে সমগ্র গ্রন্থটি রচিত।

পিতা-কর্তৃক প্রারব্ধ এবং পুত্রকর্তৃক সমাপ্ত সুবিশাল "কাদম্বরী" গ্রন্থের গল্পাংশ অতি সংক্ষেপে এইরূপ :

বেত্রবতী নদীকূলস্থিত বিদিশা নগরীর রাজা শূদ্রক জনৈকা চণ্ডালকন্যা কর্তৃক আনীত একটি শুকের মুখে সমগ্র আখ্যান শ্রবণ করেন, এবং শুক সেটি জাবালি মুনির মুখে শ্রবণ করে। আখ্যানটি নিম্নলিখিতরূপ—

উজ্জয়িনী নগরীর রাজা তারাপীড়ের পুত্র চন্দ্রাপীড় এবং মন্ত্রী শুকনাসের পুত্র বৈশম্পায়ন নিবিড় বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। দিগ্বিজয়ী চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গে নিবিড় বনে অপ্সরাকুমারী, তপস্বিনী মহাশ্বেতার পরিচয় হয় এবং মৃত ঋষিপুত্র পুণ্ডরীকের সঙ্গে পুনর্মিলনের আশায় যে তিনি এইরূপে তপস্যারতা আছেন, সে কথা চন্দ্রাপীড় জানতে পারেন। এই সূত্রে, মহাশ্বেতার প্রিয়তম বন্ধু গন্ধর্বরাজকুমারী কাদম্বরী ও চন্দ্রাপীড়ের মধ্যে প্রণয়সঞ্চার হয়। কিন্তু পিতার আদেশে চন্দ্রাপীড়কে সত্বর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করতে হয় ; এবং স্থির হয় যে, বৈশম্পায়ন সৈন্যদল সহ ধীরে ধীরে তাঁকে অনুসরণ করবেন। বৈশম্পায়ন নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যাবর্তন না করাতে উদ্বিগ্ন চন্দ্রাপীড় বনে গমন করে রোরুদ্যমানা মহাশ্বেতার মুখে সংবাদ পান যে, বৈশম্পায়ন মহাশ্বেতার নিকট প্রেম নিবেদন করাতে, তিনি বৈশম্পায়ন যে চন্দ্রাপীড়ের বন্ধু তা না জেনে, তাঁকে অভিশাপ দিয়ে একটি শুকে পরিণত করেছেন। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণে চন্দ্রাপীড় প্রাণত্যাগ করেন। পরে দৈববাণী দ্বারা সমস্ত ব্যাপারটি সকলের নিকট সুপরিস্ফুট হয়। অর্থাৎ, মহাশ্বেতার প্রেমপাত্র পুণ্ডরীক ঋষিই মৃত্যুর পরে মন্ত্রিপুত্র বৈশম্পায়নরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, এবং মহাশ্বেতার শাপে শুকরূপ ধারণ করে তিনিই এখন রাজা শূদ্রককে সব গল্পটি বলছেন। অপর পক্ষে, চন্দ্রাপীড়ই মৃত্যুর পরে রাজা শূদ্রকরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। পুনরায় পুণ্ডরীকের বন্ধু কপিঞ্জল চন্দ্রাপীড়ের প্রিয় অশ্ব ইন্দ্রায়ুধ রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রাপীড় চন্দ্রের অংশ, এবং তাঁর সহচরী পত্রলেখা চন্দ্রপত্নী রোহিণী। এরূপে জন্মজন্মান্তরের লীলাখেলায় নায়ক-নায়িকা চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরী এবং উপনায়ক-নায়িকা পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতার মিলন হয়।

উপরের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণী থেকেই "কাদম্বরী" কথাগ্রন্থের বিষয়বস্তু বিন্যাস প্রণালীর অকারণ জটিলতা ও অস্পষ্টতার আভাস পাওয়া যাবে। "কাদম্বরী" কাব্য সমালোচনা কালে এই দোষটিই আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। আখ্যানের মধ্যে উপ-আখ্যান প্রথায় সমগ্র গল্পটিকে এরূপ সুদীর্ঘ ও জটিল করে তোলা হয়েছে যে, পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হওয়া আশ্চর্য নয়। আখ্যায়িকা ও উপ-আখ্যায়িকার সাহায্যে মূল বিষয়বস্তুর সম্প্রসারণ অবশ্য প্রাচীন ভারতীয় রীতি, এবং "কাদম্বরী" যে এই রীতির উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত তা নিঃসন্দেহ। কারণ এই সুবৃহৎ গ্রন্থের অসংখ্য আখ্যায়িকা, উপ-আখ্যায়িকাকে পরিশেষে নিপুণভাবে একই সূত্রে আবদ্ধ করে মূল গল্পের সঙ্গে গ্রথিত করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও, গল্পটি পাঠকালে যে এই প্রণালী স্থলে স্থলে বিরক্তি ও বিভ্রমকর, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয়তঃ, কেবল বিষয়বস্তু-বিন্যাস-প্রণালীই নয়, মূল বিষয়বস্তু বা গল্পটিও সেরূপ সার্বজনীন সমাদরের দাবি করতে পারে না। অলৌকিক ঘটনাবলী অবশ্য একপ্রকারের বিস্ময় ও উত্তেজনামিশ্রিত

আনন্দের সঞ্চার করে। কিন্তু যা রূপকথায় শোভন ও সঙ্গত, তা কাব্যে সর্বত্র নয়। বিশেষ করে জন্মজন্মান্তরের গল্প সবকালে ও সর্বদেশে সমান চিত্তাকর্ষক হতে পারে না। সেজন্য নবীনকালের পাঠক এবং অভারতীয় রসপিপাসুগণ গ্রন্থের মূল আধার বা ভাবের সম্পূর্ণ রসাস্বাদনে সেরূপ সমর্থ হন না।

তৃতীয়তঃ, "কাদম্বরীর" যে অপর একটি ত্রুটির কথাও সমালোচকগণ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, তা হলে এর ভাষার কাঠিন্য, অত্যধিক সমাস ও অলঙ্কারবাহুল্য, এবং স্থলবিশেষে তজ্জনিত অস্পষ্টতা ও দুবোধ্যতা। একটি মাত্র শব্দের সঙ্গে অসংখ্য বিশেষণ যোগ করার ফলে স্থলে স্থলে দু'তিন পংক্তি ব্যাপী এক একটি সমাস, এবং পাঁচ-ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী এক একটি বাক্যের সৃষ্টি হয়েছে। উপরন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে শব্দের ঝঙ্কারের খাতিরে অর্থকে বাদ দেওয়া হয়েছে, শব্দের সাধারণ সুপরিচিত অর্থকে পরিবর্জনপূর্বক জটিল অজ্ঞাত অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে, অকারণে দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এবং অজ্ঞাত পৌরাণিক ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। পুনরায় ভাষার মাধুর্য ও ঝঙ্কার বৃদ্ধি করবার উদ্দেশ্যে বাণ এরূপ অত্যধিকভাবে অলঙ্কারাদি প্রয়োগ করেছেন যে, স্থলে স্থলে বাহ্যিক ভূষণ-বাহুল্যে আন্তর সৌন্দর্য হয়ে গেছে অবলুপ্ত, ভাষার অকারণ উচ্চ সৌধতলে ভাবের ঘটেছে অপমৃত্যু। সেজন্য বিখ্যাত জার্মান প্রাচ্যতত্ত্ববিং Weber বাণের রচনাকে নিবিড় ভারতীয় বনানীর সঙ্গে তুলনা করেছেন, যে স্থলে আগাছা ও গুল্মাদির প্রকোপে গতিবেগ বাধাপ্রাপ্ত হয় পদে পদে। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, ভাষা সম্বন্ধে স্থলে স্থলে বাণের কৃত্রিমতা ও মাত্রাজ্ঞানহীনতা কাব্যরস ব্যাহত করেছে।

চতুর্থতঃ, বাণের মাত্রাজ্ঞানহীনতার অপর একটি প্রমাণ অকারণ দীর্ঘ বর্ণনার প্রতি তাঁর অত্যধিক আসক্তি। মূল গল্পটি বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি যা কিছু হাতের কাছে পেয়েছেন, তাই নির্বিচারে পাতার পর পাতা ধরে বর্ণনা করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন, মূল বিষয়বস্তু বিকাশের জন্য তার প্রয়োজন থাকুক, আর নাই থাকুক। যথা, গল্পের প্রারম্ভেই শুককর্তৃক বিন্ধ্যাটবী, অগস্ত্যাশ্রম, পঞ্চবটীবন, পম্পাসরোবর, শাল্মলীবৃক্ষ, শবরমৃগয়া, শবরসৈন্য, হারীত মুনি, জাবালি-আশ্রম, জাবালি মুনি প্রভৃতি বিষয়ক সুদীর্ঘ বর্ণনার পর প্রকৃত গল্পটি আরম্ভ হয়েছে। মহাশ্বেতার রূপ ও চণ্ডিকামন্দিরের সৌন্দর্যবর্ণন প্রভৃতিও অকারণ দীর্ঘ, এবং বহু ক্ষেত্রেই এরূপ বর্ণনা-বাহুল্য দৃষ্ট হয়। সুতরাং, বর্ণনা প্রসঙ্গেও যে "কাদম্বরী" স্থলে স্থলে মাত্রাধিক্যদোষে দুষ্ট, তা স্বীকার করতে হয়।

কিন্তু সমালোচকবৃন্দের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উপরি-উক্ত দোষত্রুটি ধরা পড়লেও, সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যের উজ্জ্বলতম রত্নরূপেই "কাদম্বরী" জগতের সাহিত্যে সমাদৃত হয়েছে। তার কারণ এই যে, এই সকল দোষত্রুটি মহাকবি বাণের অজ্ঞতা বা অক্ষমতা থেকে উদ্ভূত নয়—উপরন্তু তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দেরই দুর্বার প্রকাশ মাত্র। দুকূলপ্লাবিনী স্রোতস্বতীর ন্যায় তাঁর নিগূঢ় উপলব্ধির দুর্দমনীয় উচ্ছ্বাস ও গতি প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর অকারণ দীর্ঘ বর্ণনায়, তাঁর অত্যধিক অলঙ্কারবহুল ভাষায়। কাব্যানন্দে বিভোর আমাদের মহাকবি দু'হাতে, অকৃপণ ভাবে বিলিয়ে দিতে চেয়েছেন সেই অমৃত, কিন্তু পরিবেশন-প্রণালীর সঙ্গত উপায় চিন্তা করে দেখবার তাঁর অবকাশ হয় নি। এরূপে "কাদম্বরী"র ভাব ও ভাষার মাত্রাধিক্য কবির প্রাণের অদম্য প্রাচুর্য, পরিপূর্ণতা, ব্যাপকতা ও গভীরতারই অভিব্যক্তি বলে, সমগ্র গ্রন্থটিতে আমরা একটি অপরূপ সজীবত্ব ও সতেজত্বের আভাস পাই, স্বতঃই আমাদের আকৃষ্ট ও বিমুগ্ধ করে। একটি বিপুল জলপ্রপাতের যা সৌন্দর্য, "কাদম্বরীর" সৌন্দর্যও ঠিক তাই। সেজন্য সত্যই বলা হয়েছে: "বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্"—সমগ্র জগৎই বাণ-কর্তৃক স্পৃষ্ট—অর্থাৎ পৃথিবীতে এমন কোনও বিষয় নেই যা' বাণ বর্ণনা করেন নি।

"কাদম্বরী" পাঠকালে, ভাবের দিক্ থেকে যা' প্রথমেই আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করে তা হ'ল এর অতি-বাস্তব, জলন্ত, প্রাণবন্ত বিবিধবিষয়ক চিত্র বা বর্ণনা। সমগ্র গ্রন্থের দিক্ থেকে এই সকল অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ বর্ণনা মাত্রাধিক্য ও নিষ্প্রয়োজনীয়তা দোষে দুষ্ট হলেও, স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি স্ব-মহিমায় উদ্ভাসিত। সত্যই, পৃথিবীর সকল বিষয়ই যেন কবির মরমী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ, নারীর সৌন্দর্য, বিবিধ প্রকারের মনুষ্য, নগর, প্রাসাদ, আশ্রম, মন্দির, হ্রদ প্রভৃতি অসংখ্য বিষয় তাঁর নিপুণ তুলিকায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কবির নিগূঢ় অন্তর্দৃষ্টি, বিচিত্র অভিজ্ঞতা, গভীর জ্ঞান ও অতুলনীয় কল্পনা-শক্তির যে প্রত্যক্ষ পরিচয় আমরা এই সব বর্ণনার মাধ্যমে পাই, তা নিঃসন্দেহে তাঁকে কাব্য-জগতে শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী করেছে।

চরিত্র-চিত্রাঙ্কনেও বাণের অপূর্ব নৈপুণ্য আমাদের চমৎকৃত করে। বহু চরিত্র-সম্বলিত এই বিপুল মহাগ্রন্থের চরিত্রগুলি সবই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। সংস্কৃত-কাব্যে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমই সাধারণতঃ প্রধান বিষয়বস্তু হয়। অবশ্য "কাদম্বরী"তেও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। কিন্তু এই গ্রন্থের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে প্রেমের পার্শ্বে বন্ধুত্বের মধুর মহিমাও সমান জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে—যা অন্যান্য গ্রন্থে সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না। এরূপে পুরুষে পুরুষে (চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়ন, এবং পুণ্ডরীক ও কপিঞ্জল), নারীতে নারীতে (কাদম্বরী ও মহাশ্বেতা), এবং পুরুষে নারীতে (চন্দ্রাপীড় ও পত্র-লেখা) সুপবিত্র বন্ধুত্বের যে সুমহৎ চিত্র কবি অঙ্কিত করেছেন, তা সত্যই অনবদ্য। বিশেষ করে, পুরুষ ও নারীর এরূপ পবিত্র, নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত অন্যত্র বিরল।

স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের চিত্রাঙ্কনেও বাণ যে শুচি, স্নিগ্ধ প্রেমের আলেখ্য আমাদের সম্মুখে ধরেছেন, তার অনুপম মাধুর্য ও মাহাত্ম্য আমাদের মুগ্ধ করে। ভারতীয় কবিগণ যুগে যুগে যে বিশ্বজয়ী, কাল-জয়ী, দেহজয়ী, জন্মজন্মান্তরব্যাপী প্রেমের মহিমা কীর্তন করে গেছেন, কবিচূড়ামণি বাণের "কাদম্বরী"তে তারই প্রকৃষ্টতম প্রকাশ দৃষ্ট হয়।

ভাষার দিক্ থেকেও "কাদম্বরী" একটি অপূর্ব সৃষ্টি, কারণ এই দিক্ থেকে বাণের দোষত্রুটি থাকলেও নিছক গদ্যের মাধ্যমেও কিরূপে কবিতার শব্দমাধুর্য ও ছন্দোঝঙ্কার প্রকাশ করা সম্ভব, তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ এই "কাদম্বরী" গদ্য কাব্য। নিপুণ শিল্পী বাণের হাতে সাধারণ গদ্যও হয়ে উঠেছে অপূর্ব সৌন্দর্য-মাধুর্য-মণ্ডিত, চিত্তোন্মাদী কবিতা-বিশেষ। বাণের অত্যাশ্চর্য ভাষা ও অলঙ্কার-জ্ঞান আমাদের বিস্ময়ান্বিত করে। এই সুবিপুল গ্রন্থের সর্বত্র এরূপ শব্দের পর শব্দ, অলঙ্কারের পর অলঙ্কার সজ্জিত করে অনুপম কাব্য-রস সৃষ্টি করা অল্প কৃতিত্বের কথা নয়। বাণ "পাঞ্চালী" রীতিতে গ্রন্থ রচনা করেন—অর্থাৎ, যে রীতিতে শব্দ ও অর্থের সমপরিমাণ মাধুর্যরক্ষার চেষ্টা করা হয়। স্থলে স্থলে, শব্দের প্রতি অত্যধিক মনোযোগদানে অর্থকে কথঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ করলেও, বাণ যে এই রীতিতে পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছেন, তা নিঃসন্দেহ। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, "কাদম্বরী"র অসংখ্য সুন্দর সুন্দর অংশ থেকে এখানে একটি মাত্র উদ্ধৃত করছি—

"অস্তি পূর্বাপর-জলনিধি-বেলাবলগ্না মধ্যদেশালংকারভূতা মেখলেব ভুবঃ, বনকরি-কুল-মদজল-সেক-সংবর্ধিতৈঃ, অতিবিকচ-ধবল-কুসুমনিকরমতুচ্ছতয়া তারাগণমিব শিখরদেশলগ্নমুদ্বহদ্ভিঃ পাদপৈরুপ-শোভিতা, মদকলকুরর-কুল-দশ্যমান-মরিচপল্লবা, করিকলভকরমৃদিত-তমাল-কিসলয়ামোদিনী, মধুমদোপরক্ত-কেরলী-কপোল-কোমল-চ্ছবিনা সংচরদ্বনদেবতা চরণালক্তক-রসরঞ্জিতেনেব পল্লব-প্রায়েণ সংচ্ছাদিতা···বিন্ধ্যাটবী নাম।"

এটি "কাদম্বরী"র প্রারম্ভে বিন্ধ্যাটবীর সুবিখ্যাত বর্ণনা। চৌত্রিশ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি বাক্য দ্বারা বিন্ধ্যবনের যে বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করা হয়েছে, তা সত্যই অপূর্ব।

মহাকবি বাণ যুগে যুগে কবিশ্রেষ্ঠ রূপে পূজিত হয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে বহু স্তুতিবাদ বিভিন্ন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। যথা—

"হৃদয়বসতিঃ পঞ্চবাণস্তু বাণঃ।"

"পঞ্চবাণধারী মন্মথের ন্যায়ই বাণ হৃদয়ে বাস করেন।"

"যুক্তং কাদম্বরীং শ্রুত্বা কবয়ো মৌনমাশ্রিতাঃ।
বাণধ্বনাবনধ্যায়ো ভবতীতি স্মৃতির্যতঃ।"

"কাদম্বরী শ্রবণ করে কবিগণের মৌনভাব অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত। বাণ বা শরের ধ্বনি শ্রবণে যেরূপ ছাত্রদের পাঠে বিরতি স্মৃতিশাস্ত্রসম্মত, সেরূপ বাণের ধ্বনি শ্রবণে বা কাব্য পাঠের পরেও অন্য কোনও কিছু পাঠ নিষ্প্রয়োজন।"

"শ্লেষে কেচন শব্দগুম্ফবিষয়ে কেচিদ্রসে চাপরেঽ-
লংকারে কতিচিৎ সদর্থবিষয়ে চান্যে কথাবর্ণনে।
আ-সর্বত্র গভীরধীরকবিতাবিন্ধ্যাটবীচাতুরী
সঞ্চারী কবিকুম্ভিকুম্ভভিদুরো বাণস্তু পঞ্চাননঃ।"

"কেহ কেহ শ্লেষ অথবা ভিন্নার্থক পদ প্রয়োগে, কেহ কেহ বহু শব্দের একত্র বিন্যাসে, কেহ কেহ রসসৃষ্টিতে, কেহ কেহ অলঙ্কার-সমাবেশে, এবং কেহ কেহ সদর্থ-বিষয়ক কথাবর্ণনে পটু। কিন্তু কবিশ্রেষ্ঠ পঞ্চানন-সদৃশ বাণ এই পঞ্চ-বিষয়েই সমান নিপুণ।"

সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্যকাব্য-রচয়িতা, বহুমুখী প্রতিভা-বান্ মহাকবি বাণের সম্বন্ধে সত্যই এই প্রশংসাবাণী বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নয়।

শেষ নাচ

যোহন ফল্ক্‌বার্জেট

অনুবাদক—শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

[নরওয়েবাসী যোহন্ ফল্ক্‌বার্জেট (১৮৭৯) তাঁর জন্মস্থান রোরস শহরে সাহিত্যসৃষ্টির বহু নতুন উপাদান পেয়েছেন। খনির মজুরের ঘরে তাঁর জন্ম, ন' বছর বয়স থেকে তাঁকে খনির কাজে ঢুকতে হয়, স্বেদসিক্ত সেই কঠিন জীবনের আভাস তিনি কোন কোন রচনায় দিয়েছেন। তথাকথিত শিক্ষা তিনি অল্পই পেয়েছেন, নিজের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁকে গড়ে তুলতে হয়েছে নিজের জীবন। তাঁর রচনায় হয় ত লালিত্যের অভাব আছে, কিন্তু তেমনি আছে শক্তিমান্ লেখকের দ্বিধাহীন প্রবলতা। 'লিব্-রেট ফ্রম্ য়ান্ ফিয়েজ' তাঁর প্রসিদ্ধতম উপন্যাস।]

বড়দিনের পর ছ' দিন কেটে গেছে। সন্ধ্যেবেলা। বড়-দিনের ভোর থেকে সুরু করে যখন 'আলেন্'য়ের কাঠের গীর্জ্জার ঘণ্টাগুলো দিনরাত ধরে বেজে চলেছিল উত্তরের পাহাড়ের মাথায় বাতাসকে মন্দ্রিত করে তুলে আবার 'হেসেডেলয়ের' ঘন বর্চবনের ওপারে মিলিয়ে যেতে যেতে, সারা পাহাড়তলীর মধ্যে কেবল একটি জায়গায় কামান গর্জ্জে উঠেছিল তার উত্তর রূপে। 'আস্‌বেলয়ে' সুরু হয়েছিল উৎসব—প্রাচীন গাথার যুগ থেকে যেখানে পাহাড়তলীর

পালোয়ানেরা সম্পন্ন করে আসছে তাদের শীতোৎসর্গ—প্রাচীন প্রথানুসারে যাত্রা করেছে দক্ষিণের দিকে। বড় দিনের ছ' দিন পরে 'গ্রন্‌আসেন'য়ের পাহাড়গুলির পিছনে বিশাল প্রান্তরে সে যাত্রার শেষ।

দেয়ালের ধারে ছোট্ট বাতিগুলি নিবুনিবু হয়ে এসেছিল, খোলা উনুনে পাইনকাঠের রাঙা আগুন উঠছিল দপদপ করে।

অগ্নিশিখায় উজ্জ্বল জায়গাটিতে বসে বুড়ো 'হেগেলি', তন্দ্রাতুর। ছুঁচোল টুপি একপাশে কাত করে পরা একটি কান ঢেকে, কঠিন চিবুক ভরে সাদার ছোপধরা দাড়ি। নীরবে সে তামাক চিবোচ্ছিল।

তারই পাশে খালিমাথায় দাঁড়িয়েছিল জোয়ান একটি ছেলে, ঘামে ভিজা তার চুল, পায়জামার পকেটে হাতদুটি বেশ ক'রে ঢোকানো। শ্রান্ত, নত দৃষ্টি তার। সে 'বোর আস্‌বেল'।

বুড়ো হেগেলি একটু খাড়া হয়ে বসে তার দিকে স্তিমিত তাকিয়ে প্রশ্ন করল তন্দ্রালু, কর্কশ কণ্ঠে—"তুমি নাচবে না হে ছোক্‌রা ?" পুরানো অভ্যাসবশেই ছোরা-গোঁজা কোমর-বন্ধটায় লাগাল টান।

ব্যের আসবেল নিরুত্তর।

হেগেলি আবার কাঠের উপর উবু হয়ে রাঙা শিখার দিকে ঝুঁকে ঝিমোতে লাগল।

চিৎকার আর বরফের মেঝের উপর জুতোর খটাখট শব্দ ছাপিয়ে উঠল। 'পোল্‌কা' নাচের উন্মাদনাময় সুর। দেয়াল বয়ে গলে পড়তে লাগল বরফে জমানো মাংসের টুকরো, কড়িবরগায় পুরু হয়ে জমেছিল ঝুল। জ্যোৎস্নারাতে অন্ধকার জানালা দিয়ে, তুহিন-প্রান্তরের উপর দিয়ে ভিতরে এসে পড়েছিল কয়েক ফালি চাঁদের আলো। কন্‌কনে শীত। ঘরের কাঠগুলো মচ্‌মচ্‌ শব্দ করতে লাগল, বাইরে শুনা যেতে লাগল ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে বুনো জন্তুদের পায়ের সর্‌সর্‌ আওয়াজ।

হেনিং হেগেলি অতীত দিনের স্বপ্ন দেখছিল বসে বসে। মনেও পড়ে না, কতদিন ধরে সে এই পাহাড়তলীর উৎসবে যোগ দিয়ে আসছে প্রতি বড়দিনে। আর তখন কি আনন্দই না ছিল! এখনকার চেয়ে ঢের বেশী। আজকালকার ছোকরারা সব বুড়িয়ে গেছে, পায়ে সে রকম জোরও কারও নেই। 'পোলকা' নাচ—তাতেও সব যেন পা টেনে টেনে চলে; আর পা তুলে ছাত ছোঁয়া—সেকথা না বললেই ভাল। আর লড়াই-ই কি এরা করতে পারে সেকালের ছেলেদের মত!

হেনিং হেগেলির ভাবনাগুলো জড়িয়ে যেতে লাগল। গত দুইপুরুষ ধরে বহু নাচে সে যোগ দিয়েছে, তবে একটিই কেবল তার বিশেষভাবে মনে আছে। অতীতের স্মৃতিতে ফিরে আসে বুড়ো হেগেলি।

যৌবনের জোয়ার তখন তার প্রাণে। ঠিক এমনি এক ষষ্ঠ সন্ধ্যায় 'গ্রন্‌আসেন্‌য়ে' অভিযাত্রা শেষ হয়েছিল পুরানো নিয়মে। রাত্রির দুই প্রহর অতীত। বুড়ো 'নেফস' বসে বসে 'য়োটুন্‌ পোল্‌কা'র সুর বাজাচ্ছিল। হঠাৎ নাচের মাঝখানে যুবা হেগেলি দরজা দিয়ে তীরবেগে বেরিয়ে পড়েছিল 'রান্‌হিল্ড বোরেন্‌'য়ের হাত ধরে, গায়ে তার কেবল কামিজ।

বাইরে পাথরের মেঝের উপর বোরেন্‌য়ের কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে টেনে নিল উঁচু দরজাটার দিকে। ভয়ে ভয়ে সে বাধা দিল অল্প।

"মাথা খারাপ হ'ল না কি তোমার ?" বোরেন্‌ নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করল।

"মাথা ত খারাপ হয়েছেই," হেগেলি উত্তর দিল। "তুমি আমার সঙ্গে গাঁয়ে ফিরে যাবে রান্‌হিল্ড !"

মেয়েটি ঈষৎ ইতস্ততঃ করল। "কিন্তু এ নিয়ে কথা উঠবে হেনিং!"

সে তাকে কাছে টেনে আনল, প্রচণ্ড জোরে বলল, "তাই ত আমি চাই।"

মেয়েটি অন্ধকারে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পক্ষে এ ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত।

অতিকষ্টে কান্না চেপে সে বলল, "তুমি সবকিছুকেই তুচ্ছ করে দেখ।"

আবার তাকে টেনে নিয়ে গম্ভীরভাবে হেগেলি বলল, "কেবল তোমায় নয়। আমি তোমায় ভালবাসি রান্‌হিল্ড।"

মেয়েটি চাপা গলায় বলল, "না, না।" নিজেকে মুক্ত করে নিল, "না, না।"

ছুটে পালাল সে, কিন্তু এক বোঝা কাঠের সামনে থমকে দাঁড়াতে হ'ল। হেগেলি দাঁড়িয়েছিল সেই হিমেল শীতের রাতে, যৌবনের তেজে তপ্ত তার দেহের প্রতিটি পেশী কাঁপছিল। সারা পাহাড়তলীতে দুর্জ্জয় সে, রক্ত তার এখন গরম। এ মেয়েটিকে সে নেবেই, যে বাধা দেবে তার কপালে নির্ঘাত দুঃখ। ছুটে গিয়ে মেয়েটিকে সে জড়িয়ে ধরল, কাঠের বোঝার গায়ে গড়িয়ে পড়ল দু'জনে, গাছের শাখার তুষার ঝরে পড়ল তাদের দেহে।

"আমার সঙ্গে আসবে না রান্‌হিল্ড ?"

আবার সে ইতস্ততঃ করতে লাগল, কাঠের বোঝা আর হেগেলির বিশাল বুকের মধ্যে যেন ছোট্ট একটি পাখী।

তার ভয় হচ্ছিল, পাছে কেউ এসে পড়ে। শেষে হঠাৎ দুই হাতে হেগেলির গলা জড়িয়ে ধরে স্নেহভরা কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ হেনিং, আমি যাব।"

আনন্দে উন্মত্ত হয়ে হেগেলি তার কোমর জড়িয়ে ধরে 'পোল্‌কা' নাচের ঘূর্ণিপাক লাগিয়ে দিলে চারদিকে বরফ উড়িয়ে।

"পাগল!" রান্‌হিল্ড হেসে কাঁধের থেকে শালটা নামিয়ে নিল। আবার সেটা বাঁধবার আগেই আর এক মস্ত ঘূর্ণিপাক সুরু হ'ল। নিজের টুপিটা খুলে ফেলে বরফের ঢিবির উপর হেগেলি উঠে দাঁড়াল, এক লাথিতে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলে বরফের গুঁড়ো।

"তুমি বোধ হয় সত্যিই পাগল হয়েছ, হেনিং" আবার হেসে শালে হাত দিল মেয়েটি।

হেনিংও মাথায় টুপিটা পরল, তারপর দু'জনেই গম্ভীর-ভাবে কথাবার্ত্তা বলতে আরম্ভ করল। মেয়েটি তার পর ঘরে চুপি চুপি ঢুকে গায়ে জামাকাপড় জড়িয়ে নিল. হেনিং গেল বুড়ো ঘোড়াটাকে গাড়ীতে জুততে।

একটু পরে সেই তারায় ভরা রাতে পাহাড়ের গা ঘেঁষে তারা ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছিল। পায়ের তলায় বরফ মচ্ মচ্ করতে লাগল, লোহার ডাণ্ডায় বাজতে লাগল ঘটাং ঘটাং আওয়াজ, পথের উপর খুরের শব্দের প্রতিধ্বনি ভাসতে লাগল হাওয়ায়। হেনিঙের কোলে নিবিড়ভাবে বসেছিল রান্‌হিল্ড, দু'জনকে ঘিরে ভেড়ার চামড়াখানা। উষর গিরি-মালার ওপার থেকে শিস্ দিয়ে আসতে লাগল কন্‌কনে হাওয়া।

বুড়ো ঘোড়া ডবিন্ ধীর মন্দ গতিতে বিশাল প্রান্তর পার হয়ে উপত্যকা দিয়ে নেমে চলেছিল। সে রাতে তাড়াহুড়ো করার ত কোন কারণ ছিল না। মোটেই না! গাঁ তাদের এর চেয়ে দু'গুণ দূরে হলেও, রাত অন্ধকার—সীমাহীন হলেও কিছুই ক্ষতি নেই তাদের। কি মধুর ছিল সে রাত্রিটি! এখন থেকে চিরকালের মত তারা একে অন্যের।

রান্‌হিল্ড আরও কাছ ঘেঁষে চোখ দুটি বুঁজল।...এ যাত্রার যদি শেষ না থাকত। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ, তার মনে হতে লাগল—যেন 'পোল্‌কা' নাচের লঘুপদক্ষেপ। পথের ধারের থামগুলি সব পার হয়ে আসতে আসতে সেগুলিকে তার মনে হতে লাগল যেন প্রেতের দল চলেছে লম্বা লম্বা পা ফেলে। তার জীবনে এ রকম অদ্ভুত রাত আর কখনও আসে নি। এ শীত যেন অনন্ত হয়। আকাশের তারারা টিপটিপ করে জ্বলতে লাগল, হিমেল হাওয়া তরুপত্রহীন পাহাড়ের ওপার থেকে গেয়ে গেল গান।

হেসেডেলয়ের মোড়, যেখানে ঘুটঘুটে অন্ধকার, পথের দু'ধারে পাথরের প্রাচীর আর বরফের তলায় গর্জ্জন করে চলেছে দুরন্ত জলপ্রপাত, সেইখানে হেগেলি ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল। বড় বেশী জোরে ছুটছিল তার ঘোড়া।

আনন্দে আত্মহারা হেগেলি। কি সুন্দর মেয়েকে সে পেয়েছে! সারা দেশে এমন ভাগ্য আর কারও হয় নি... তাকে নিজের কাছে টেনে নিল সে। হৃদয়ের গভীর অন্তস্তল তার উদ্বেল করে তুলেছিল একটানা হাসির বান। সারা উপত্যকায় সেই হবে সব চেয়ে জোয়ান। আর রানহিল্ডেরও গর্ব্ব হবে এমন স্বামী পেয়ে। আর দু'জনে মিলে তারা কত কি?...

"সামলে, ডাবিন, সামলে!"...

এত ছুটবার দরকার নেই। তাড়াতাড়ির ত নেই কিছু। বুড়ো ডাবিন্ থমকে দাঁড়িয়ে মাথাটা একবার এদিকে একবার ওদিকে দোলাল, পিছনে গাড়ীর মধ্যে কি হচ্ছে, তাই ভেবে বিস্ময় বোধ করতে লাগল।

বেহালার তার ছিঁড়ে গেল ঝন্ করে। বুড়ো হেগেলি ফিরে এল বর্ত্তমানে। ব্যের আস্‌বেন তখনও পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে তার সামনে।

"ঘুমিয়ে পড়েছিলাম" বুড়ো হেগেলি বলল। আস্‌বেন তার দিকে তাকাল।

"তোমাকে 'পোল্‌কা' নাচতে হবে।" ভিজে চুলের উপর জামার হাতাটা বুলিয়ে সে বলল।

হেগেলি ইতস্ততঃ করে বলল, "বড্ড বুড়ো হয়ে গেছি। জানই ত আশী বছর বয়েস হয়ে গেলে কারও—

আগুনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আস্‌বেন বলল, "ও সব বাজে। তা হলে 'পোলকা' সুরু হোক। এই মেয়েরা, বুড়ো হেগেলি এবার আমাদের সঙ্গে নাচবে।"

দেয়ালের ধারে মেয়েদের মধ্যে আনন্দের গুঞ্জন উঠল। তার সঙ্গে নাচতে সবাই রাজী। সারা তল্লাটে এমন নাচিয়ে আর হয় নি।

'বড্ড বুড়ো হয়ে পড়েছি যে ব্যের্!' ভালমানুষের মত হেগেলি মুখ তুলে বলল।

ব্যের্ তার কাঁধ ধরে তাকে তুলে দিয়ে বলল, 'ও তুমি ঠিক করে নিতে পারবে দাদা।'

—'বড্ড বুড়ো যে!' বাধা দিল হেগেলি। কিন্তু কেউ শুনল না, 'পোল্‌কা'র সুর বেজে উঠল বেহালায়, টুপিটা মাথায় দিয়ে বুড় হেগেলি তামাকপাতা ফেলে দিলে মুখ থেকে। একটু দ্বিধা করল সে, তার পর ভাল্‌বর্গ বোরেন্সের কাছে গেল। তার বৌয়ের সম্পর্কে সে তার ভাইঝি।

—'ভাল্‌বর্গ, আমাদের একবার চেষ্টা করে দেখতেই হবে দেখছি। তোমার মত মেয়েদের সঙ্গেই আমার নাচা অভ্যেস।'

ভাল্‌বর্গ হেসে তার হাত ধরল, মাটির দিকে নম্রভাবে তাকাল, তার পর সুরু হ'ল নাচ। তাকে ঘুরিয়ে দিলে হেগেলি, চীৎকার করে কাঁপিয়ে তুলল দেয়াল, আবার সুরু হ'ল ঘূর্ণিপাক। খাপেভরা ছুরিখানা তালে তালে উঠতে পড়তে লাগল।

'মোটেও খারাপ হচ্ছে না, দাদা।' আসবেল্‌ হাঁকল।

হেনিং গেয়ে চলেছে 'ফাডেরুঙেন্‌—ও-হো!' লাফিয়ে চেষ্টা করল কড়িকাঠ ছোঁবার, প্রথমবারে ঠিক পারল না, দ্বিতীয়বার তার জুতোর ডগা লাগল কড়িকাঠে··· 'হো হো···!' উদ্দাম হয়ে উঠল তার পদক্ষেপ, নাচটা হয়ে উঠল মত্ত ঝড়ের মত, স্রোতগর্জ্জনের মত, উত্তাল তরুশাখার মত।

তার মনে হতে লাগল, বাইরে অন্ধকার হেমন্ত-রাতে পাহাড়চূড়ায় বুনো গাছগুলোকে যেন ধ্বংস করবে এই অবিরাম তুষারধারা।

'ও-হো! ডিব্‌রুলাম্‌টি ডুডলি ডু! ডিব্‌রুলাম্‌টি ডুডলি ডু!···'

পাহাড়ের শাণিত শিখরে রক্তমাখা হাতিয়ার হাতে তার সেই মত্ত যৌবনের দিনগুলি যেন ফিরে এসেছে আবার। 'হো-হো!' ভগবান্‌ ক্ষমা করুন তাকে। হেগেলির নাচের দিন ফুরিয়ে এসেছে। বিষাদে ভরে উঠল তার মন।

পঞ্চম সুরে একটি কম্পন দিয়ে শেষ হ'ল নাচ। দুর্ব্বল ভাবে আসনে বসে পড়ল বুড়ো হেগেলি। কিসের একটা বোতল তার সামনে ধরে দাঁড়িয়েছিল বোধ্‌ আসবেল্‌।

'সত্যি, এবারে এই পানীয়টুকু তোমার প্রাপ্য,' সে বলল।

হেগেলি হাত বাড়িয়ে মুখের উপর থেকে দাড়ি সরিয়ে নিতে নিতে বলল, বলেছিলাম ত আমি একেবারে অকেজো হয়ে পড়েছি।

—'না দাদা, তুমি এখনও তেমনি মরদই আছ।'

—'হ্যাঁ, বুড়ো মরদ।' হেগেলি চুমুক দিল, কঠিন মুখে তার দেখা দিল কোমলতার আভাস।

সেই রাতেই বুড়ো হেগেলি উপত্যকা দিয়ে চলল হেসে-ডেলের উদ্দেশ্যে। সরু গলিটার মধ্যে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল সে।

'সামলে ডাবিন্‌, সামলে!'

কষ্টেসৃষ্টে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে সে ভাবতে থাকে। লোমের কোটে ঢাকা হাঁটুদুটা তার নুয়ে পড়েছে।

হ্যাঁ—এই ত, এখানেই। এই পাহাড়ের দেয়ালের নীচে পঞ্চাশ বছর আগে সেই রাতে তারা ছুটিতে ঘুরে বেড়িয়েছিল। আজ রান্‌হিল্ড মাটির তলায় অনন্ত সুপ্তিতে মগ্ন, আর সে এ পথে চলেছে একলা। রান্‌হিল্ড চলে যাবার পরে তার জীবনে আর সুখ নেই। কিন্তু আবার ত তার কাছে ফিরে যাবার দিন ঘনিয়ে এসেছে। তাকে বড়ই উতলা করেছে আজকের রাত।

আবার গাড়ির মধ্যে গিয়ে বসল হেগেলি, লোমের কোট তার অশান্ত শীতের হাওয়ায় উড়তে লাগল, ঘোড়ার কেশরে হাত বুলিয়ে দিলে সে।

হ্যাঁ—এখানেই···সে রাত্রিও ছিল আজকেরই মত। সেই কন্‌কনে শীত, সেই তারায় ভরা আকাশ। আজও সব ঠিক সেদিনেরই মত। কেবল রান্‌হিল্ড চলে গেছে, আর সে আজ জরাজীর্ণ।

বহুক্ষণ ধরে সেই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল সে, লাগামে হাত দিয়ে, আঁধার রাত এগিয়ে চলল হু-হু করে। অন্ধকারে মনে হতে লাগল মানুষ আর ঘোড়া যেন নিকষ পাথরে খোদাই করা।*

* ওস্কে হেগেলিঙ 'লাস্‌ট্‌ 'পোল্‌কা' হইতে।

দারজিলিং কালিম্পঙের লামাদের ধর্ম

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

দারজিলিং হ'ল "দোরজিলিং" বা "দোরজিস্থান" "দোরজি" তিব্বতী কথা, মানে—বজ্র, আর "লিং"—দ্বীপ বা স্থান —যেমন জম্বুদ্বীপ বা ভারতবর্ষ ওদের ভাষায় "জম্বোলিং"। দারজিলিঙে মহাকালের মন্দিরের কাছে দোরজিলামার সমাধিস্থান। তাঁরই নামে বুঝি এই দোরজিস্থান বা বজ্রস্থান। লামার নামের সঙ্গে "দোরজি" বা বজ্র যুক্ত কেন, সে বিষয়ে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক এবং সে জিজ্ঞাসা মিটতে পারে দারজিলিং কালিম্পঙের লামাধর্ম সম্বন্ধে একটু সন্ধান নিলে।

দারজিলিঙের যা যা দ্রষ্টব্য, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এখানকার বৌদ্ধমন্দিরগুলিও। কিন্তু শুধুমাত্র নিসর্গ-সৌন্দর্য-রসিকের চোখ দিয়ে এই সব দ্রষ্টব্য দেখা বার্থ হবে। নৈসর্গিক সৌন্দর্যভোগের সে চোখ, সে চিত্ত না থাকলে যেমন টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয়-দর্শন সার্থক হয় না, তেমনই এই সব বৌদ্ধমন্দির দেখতে হলে লামাদের দেবদেবী এবং তাদের বিশ্বাস—পূজা-অর্চনা ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান ও জিজ্ঞাসা না থাকলে চলে না।

দারজিলিঙের কাছে "ঘুমে" আছে একটা তিব্বতী গুম্ফা, ভুটিয়া বস্তিতে আছে ভুটিয়াদের একটা, দারজিলিঙের মাঝখানেই নেপালী বৌদ্ধদের তামং মন্দির একটা আর আলুবাড়ী বলে একটি জায়গায় আর এক গুম্ফা। কালিম্পঙে একটিই বড় গুম্ফা, সেটি তিব্বতীদের।

গুম্ফার বাইরে খোলা চত্বরে উড়ছে খুব লম্বা ফালির নিশান—তা দূর থেকেই অনেক সময়ে গুম্ফা চিনিয়ে দেয়। একটা ফটক থাকে প্রায়ই। মন্দিরের বাইরে আর ভিতরে নানা রকম ছবি আঁকা। সে চিত্রণে আমাদের ভারতীয় কলার সঙ্গে চৈনিক কলার যেন মিশ্রণ দেখা যায়। ভিতরে সারি সারি বসবার জায়গা, বৌদ্ধ লামা ও ভক্তদের মর্যাদা অনুসারে তাদের আসনের উচ্চতা ঠিক করা আছে। পাশে খোপে খোপে "তেঙ্গুর" আর "কেঙ্গুর" ধর্মগ্রন্থ হলদে রেশমী কাপড়ে সযত্নে মোড়া। আর সামনে সারি সারি মূর্তি, সে শুধু বুদ্ধের মূর্তিই নয়; ওদের দেবদেবীর ধারণা অত্যন্ত বিস্তৃত, এমনকি বড় বড় লামারাও ঐ দেবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন।

হিন্দু দর্শনে ব্রহ্ম যেমন, তেমনি এক আদি বুদ্ধকে ওরা মেনে থাকে—তাঁর দেহ নেই, তিনি সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান্। ওখানকার লামারা তাঁর নাম বলেছে "সমন্ত ভদ্র।" এঁর চার দিকে চার লোকে চার দিকপাল, আমাদের বায়ু কুবের ইন্দ্র বরুণের মত। বীণা হস্তে শুভ্রকায় "বজ্র সত্ত্ব" (তি-দোরজি সেম্পা) পূর্ব-দিকপাল। "অমিতাভ" বা "পদ্মা" নামে একটি স্তম্ভ ও একটি ভাণ্ড হাতে লাল রঙের নাগরাজ পশ্চিম দিকপাল। তরোয়াল হাতে সবুজ রঙের "রত্ন" হলেন দক্ষিণ দিকের দিকপাল। আর উত্তর দিকের হলেন পীতকায় যক্ষরাজ "কর্ম"। "সমন্ত ভদ্রে"র সঙ্গে এই চার জন হলেন, "গ্যাল্‌ওয়ারিঙ" বা পঞ্চ-দেবতা। চার দিকপালের ছবি আঁকা থাকে সাধারণতঃ মন্দিরের বাইরের দেয়ালে।

এদের দেবগোষ্ঠীর মধ্যে ভারতীয় বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব দেবতা গুরু সবাই স্থান পেয়েছেন। ভুটিয়ারা বজ্রসত্ত্ব বা "দোরজি সেম্পাকে ঠিক সমন্ত ভদ্রের পরেই স্থান দেয়। তারপর "আর্যবজ্র" বা "গরব দোরজি", তার পর পদ্মসম্ভব বা "গুরুরিন্ পোচে", তার পরে "অবলোকিসরি" বা অবলোকিতেশ্বর—যাঁর এগারোটি মাথা, আর এক হাজার হাত এবং প্রত্যেক হাতে একটি করে চোখ। নেপালী বৌদ্ধমন্দিরের দোতলায় দেখা যাবে দীপঙ্কর বুদ্ধ, গৌতম বুদ্ধ আর মৈত্রেয় বুদ্ধ এই তিন বুদ্ধমূর্তি পাশাপাশি। এঁরা হলেন অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎকালের বুদ্ধ। নীচের তলায় পদ্মসম্ভবের মূর্তি মাঝখানে, দুই দিকে দুই তারামূর্তি, এক তারা মূর্তির পাশে অবলোকিতেশ্বর, আর একটির পাশে অমিতাভ বুদ্ধ। অমিতাভকে এরা বোধিসত্ত্ব বলে মানে। আর মঞ্জুশ্রীকে খুব প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্রণামমন্ত্র তাই "নমো বুদ্ধায় নমো ধর্মায় নমো সংঘায় নমো মঞ্জুসৃসিরি বোধিসত্তায়"। এই লামাধর্মের বিশেষত্বই হ'ল এদের দেবগোষ্ঠীর সর্বগ্রাসিতা। তাই বোধিসত্ত্বের সঙ্গে শিব গণেশ কালীর পূজা করতেও এদের আপত্তি নেই, ভুটিয়া বস্তির পথে পাহাড়ের গায়ে সব-রকম মূর্তিই পাশাপাশি আঁকা দেখা গেল। মহাকালের মন্দিরে শিবের পূজা করছেন হিন্দু নেপালী, সঙ্গে তিব্বতী বৌদ্ধেরও অর্চনা চলছে। শিবের সঙ্গে গৌরী গণেশের মূর্তি আঁকা, আর এক জায়গায় কালী মূর্তিও আছে একটি। লাম-ধর্মে এঁরা সকলেই স্বীকৃত। কালিম্পঙে এক ভুটিয়া দোকানদারের বাড়ীতে আবার দেখা গেল নানক থেকে আরম্ভ করে যত সব শিখগুরুর মূর্তি ও ছবি।

তিব্বতীদের আগে যে ধর্ম ছিল তার নাম "বোন্‌পা" তাতে এই রকম বিশ্বাস করা হ'ত যে, সব প্রাণীরই মধ্যে, সব জিনিসেরই মধ্যে এমন আত্মা আছে যার দ্বারা ভাল বা মন্দ হওয়া সম্ভব। অষ্টম শতকে রাজা "তিস্রোনদেচান" ভারতবর্ষ থেকে দু'জন বড় ভিক্ষুকে আমন্ত্রণ করে আনেন, —এক জন শান্তরক্ষিত, আর অন্য জন হলেন পদ্মসম্ভব। পদ্মসম্ভব "ব্যোন্‌পা" ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের একটা চমৎকার

সমন্বয় করে দিলেন এবং তাঁর যোগাচারে সবাইকে চমৎকৃত করে তিনি খুবই জনপ্রিয় গুরু হয়েছিলেন। তিনি ওখানকার লোকেদের দুটি ভাগে বিভক্ত করলেন—যাঁরা বৌদ্ধ তাঁরা "নান্‌পা" বা ভিতরের লোক, আর যাঁরা বৌদ্ধ নন তাঁরা "চিপা" বা বাইরের লোক। তাঁর প্রবর্তিত এই সমন্বিত মন্ত্রযান বৌদ্ধধর্ম "নিং মা পা" বলে পরিচিত—এরই নানা শাখাধর্ম আজও তিব্বতে, নেপালে ভোটানে বিস্তৃত ভাবে চলছে এবং পদ্মসম্ভব "গুরু রিন্ পোচে" নামে আরাধ্যতমদের একজন বলে খুব বড় স্থান লাভ করেছেন। ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ থেকে অতীশ দীপঙ্কর এসেছিলেন তিব্বতে; তিনি এই ধর্মের একটা সংস্কার করেন। তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম ও তার শাখার নাম "কদম্ পা", "করম্‌পা", "দুগপা", "দিকুংপা"—এই সব। দারজিলিং, কালিম্পঙে এই সব ধর্মসম্প্রদায় না থাকলেও গুরু বলে অতীশ দীপঙ্কর আরাধ্যের স্থান পেয়ে আছেন—অনেক মন্দিরে এঁর মূর্তি আছে। সর্বশেষ সংস্কার করেছিলেন "চোং খা পা"। তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম "গেলুগপা" বা হলদে টুপি সম্প্রদায় তিব্বতেই প্রধান, নেপাল ভোটান বা দারজিলিঙে বেশী নেই। কালিম্পঙে এই সম্প্রদায় বিদ্যমান। এরা দালাই লামাকে এত উচ্চ স্থান দেয় যে, তাঁর জন্য নির্দিষ্ট যে অতি উচ্চ আসনে তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ রাখা আছে, তা বুদ্ধমূর্তিকে পর্যন্ত সম্পূর্ণ আড়াল করে আছে। দালাই লামা, পান্‌চেন্ লামা প্রভৃতি অনেক লামারও মূর্তি দেখা যায় এই সব বৌদ্ধমন্দিরে।

মহাযান বৌদ্ধধর্মের নানা সম্প্রদায় ভারতেই ছিল—মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি। তিব্বতী লামাধর্মেও তাই বজ্রের স্থান। বজ্রের প্রতীক একটি উপকরণ মন্ত্রতন্ত্র পাঠের সময়ে অপরিহার্য। এক হাতে এই "দোরজি", অন্য হাতে "বিরপো" বা ঘণ্টা নাড়তে নাড়তে লামরা পাঠ করেন তাঁদের পবিত্র গ্রন্থ। "ড্রা" বা ঢাকের উপর "নারজাপ" নামে একটা বাঁকানো কাঠি দিয়ে আঘাত করে বাদ্যধ্বনি পূজা-অর্চনার একটি বিশেষ অঙ্গ। আর একটি উপকরণ লামদের ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত। সেটি একটি ধর্মচক্র—দু'দিক মোড়া একটি চোঙা, মধ্যে আছে একটি কাগজে লেখা পবিত্র মন্ত্র—একটি হাতল ধরে চোঙাটি ঘোরানো হয়। ছোট ছোট এই ধর্মচক্র প্রত্যেক লামার সঙ্গে থাকে, বাড়ীতে থাকে, ধর্মমন্দিরে বসানো থাকে—সাধারণতঃ তলায় আগুন জ্বালানো থাকে এমন ভাবে যাতে করে চক্র আপনা হতে ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে। ভুটিয়া বস্তির গুম্ভায় আছে প্রকাণ্ড পিপের মত একটি চক্র। একটি ঘণ্টা তার সঙ্গে এমন জায়গায় লাগানো আছে যে একবার পূর্ণ আবর্তনে ঘণ্টা বেজে উঠে। চক্র ঘোরে, আর বলতে হয় "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ"। এই মন্ত্রের দার্শনিক অর্থ অনেক লামারই জানা নেই। কিন্তু এর একটা চমৎকার ব্যাখ্যা শোনা যায় অশিক্ষিত লামাদের কাছে।

লামাদের দেবলোক হ'ল "খাম্‌সুম্" বা তিনটি লোকের সমষ্টি—"দোখাম্", "জুখাম্" ও "জুমেখাম্"। তার নীচে আছে অসুরলোক, নরলোক, পশুলোক, প্রেতলোক, নরক। এই সব লোকেই আছে দুঃখ। যেমন, দেবলোকের দুঃখ হ'ল অবতাররূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ। অসুরলোকের দুঃখ যে, দেবতাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব তাদের চিরন্তন। আর নরলোকের দুঃখ—জন্ম, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু। পশুলোকের দুঃখ—তারা কথা বলতে পারে না। প্রেতলোকের দুঃখ তাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা অনির্বাণ। আর নরকের ত দুঃখের অন্ত নেই। "ওঁ" কথাটি ঐ ত্রিলোক বুঝায়—অ, উ, ম্, হ'ল "দোখাম্", "জুখাম্" ও "জুমেখাম্"। তার পরে ম, ণি, পদ্, মে এবং হুঁ এই পাঁচটি অক্ষর দাঁড়াল যথাক্রমে—অসুরলোক, নরলোক, পশুলোক, প্রেতলোক ও নরকের পরিবর্তে। ধর্মচক্র ঘুরিয়ে "ওঁ মণি পদ্মে হুঁ" বলার উদ্দেশ্য হ'ল এই ছয় লোকের দুঃখ দূর হোক্। এ যেন অনেকটা আমাদের শান্তিবচনের মত।

মহাকালের মন্দিরে আছে অসংখ্য ত্রিশূল। শুধু ওখানেই নয়, অন্যত্রও এই ত্রিশূল বা "খড়ম্" দেখতে পাওয়া যায়। যেমন তামং মন্দিরে একটি ত্রিশূলে গাঁথা তিনটি মাটির মুণ্ড। এর তাৎপর্য—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এই ত্রিকালের দুষ্কৃতকারীদের এই দিয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে। লম্বা সরু কাপড়ের যে নিশানের কথা বলা হয়েছে তার উপরে ছাপানো আছে অনেক মন্ত্র আর মাঝে মাঝে এক একটা ছবির ছাপ, সে ছবিতে একটা ঘোড়া আর তার পিঠে রত্ন এবং পদ্ম রয়েছে। আর এক রকম ধ্বজা দেখা যায় মহাকালের মন্দিরে—গোল গোল কোঁচ দেওয়া কাপড় ঝুলিয়ে যেন অশোকস্তম্ভের অনুকরণ হয়েছে। এই সব নিশান বা স্তম্ভ-ধ্বজা লোকে উঠিয়ে দিয়ে যায় কোন রোগ বা বিপদ থেকে রক্ষা পাবার মানত করে, আবার অনেক সময়ে নিজেদের বাড়ীতেও এগুলি উঠানো হয়।

দারজিলিং কালিম্পঙের এই সব গুম্ভায় নানা পার্থক্যের মধ্যেও যে লামা-ধর্মের মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায় তার ঔদার্যে বিস্মিত হতে হয়।*

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকমণ্ডলীর তরফ থেকে গত মে মাসে যে পাঁচ জন গবেষক দারজিলিং কালিম্পঙে শিক্ষাসফরে গিয়েছিলেন বর্তমান লেখক তাঁদেরই একজন। ওখানকার বৌদ্ধ ধর্মমন্দিরের লামাদের কাছ থেকে যে সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে—তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে "ওয়াডেলের" প্রামাণ্য বইয়ের সঙ্গে সেগুলির মিল আছে।

"রবীন্দ্রনাথের চিত্রলিপি"

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

কবির চিত্রশিল্প লইয়া আমাদের দেশে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। কেহ ইহাতে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের বিকাশ দেখিতে পান, কেহ ইহাতে কোন আরোপিত অর্থ খুঁজিতে যাইয়া নিরাশ হন। মনে হয়, দুই পক্ষই ভুল করেন; কারণ তাঁহার চিত্রে কোন আধ্যাত্মিকতা বা কোন আরোপিত অর্থ তিনি প্রয়োগ করিতে চান নাই। তাঁহার ছবির সৌন্দর্য্য খুঁজিতে হইবে তাঁহার ব্যক্তিত্বের ভিতর, তাঁহার চিত্রের আঙ্গিকের ভিতর। আমার মনে হয়, তাঁহার চিত্রের আঙ্গিক বিশেষভাবে অনুধাবন তাঁহার চিত্র বুঝিবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

কবির সৃষ্টি সকল প্রকার সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রতিফলিত করিয়াছে এবং এই শিল্পসৃষ্টি কবি-প্রতিভার আর এক বিকাশ—ইহা তিনি জীবনের শেষ দিকে সুরু করিয়াছেন। তাঁহার এই শিল্প-প্রতিভার মূলে একটি শিশু-সুলভ প্রকৃতি বিদ্যমান। পাণ্ডুলিপি সংশোধন করার সময়ে, শুধু একটি লাইন টানিয়া তাহা কাটিয়া দেন নাই, কাটাকুটি অংশ সংযোজিত করিয়া তাহা ছন্দোবদ্ধ করিয়াছেন [চিত্র নং ১]; ইহার অলঙ্করণ কোন সময় গোলকধাঁধা সৃষ্টি করিয়াছে, কোন সময় ইহা কাল্পনিক কিম্ভুত কিমাকার পাখী ও জন্তু সৃষ্টি করিয়াছে—এই সব পাখী ও জন্তু শুধু শিশু এবং আদিম মানবের কল্পজগৎ-বিহারী। তাঁহার প্রয়োজনীয় সাহিত্যচর্চা রাখিয়া যখন তিনি শুধু চিত্তবিনোদনের জন্য এসব কাজ করিয়াছেন, তখন ভাবেন নাই—এক দিন তিনি খাঁটি চিত্র অঙ্কন করিবেন এবং চিত্রকর বলিয়া পরিচিত হইবেন। ইহা হইল তাঁহার চিত্রচর্চার প্রথম ধাপ। ইহা হইতে দ্বিতীয় ধাপের উৎপত্তি হইল, এখন আর পাণ্ডুলিপি কাটাকুটি নহে—খাঁটি ছবি আঁকার চেষ্টা—ইহা কাল্পনিক পাখী, জন্তু এবং মুখোশের অলঙ্করণ; তৃতীয় পর্য্যায়ে আঁকিলেন 'ফিগার'—মনুষ্যমূর্ত্তি, পুষ্পগুচ্ছ, মানচিত্র ইত্যাদি। কিন্তু যাহাই আঁকুন না কেন, সব কাজেই তাঁহার মূলসূত্র রহিয়া গিয়াছে,—রেখার সমন্বয়ে ছন্দের সৃষ্টি; কাজেই তাঁহার চিত্র কোন বস্তুর বাস্তব প্রকাশ নহে, ইহা শুধু ছন্দের এক অনুভূতি, ইহা রেখার গতি অনুসরণ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। রেখা বস্তুর 'কন্টুর' বা বহিঃরেখা অনুসরণ না করিয়া শুধু গতি-শীল রেখারই মিল খুঁজিয়াছে; কাজেই তাঁহার চিত্রকে বলা যায় গতিশীল ছন্দ। শিশুসুলভ খেলা হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার চিত্রের পরিণতি 'অ্যাবষ্ট্রাক্ট আর্টে' অথবা 'এক্সপ্রেসনিজম' নামধেয় অতি আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পরীতিতে।

কবির নিজের কথাই উল্লেখ করা যাক (পুস্তকের ভূমিকা), ইহা তাঁহার চিত্ররীতির উদ্দেশ্য এবং অঙ্কনরীতির উপর আলোকপাত করিবে:

"ছন্দের নীতি সকল শিল্পেরই মূল ভিত্তি, ইহা অচেতন পদার্থকে সজীব সৃষ্টিতে পরিণত করে। আমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং ইহার ব্যবহারের জন্য শিক্ষা আমাকে এই তত্ত্বেই প্রণোদিত করিয়াছে যে, রেখা ও বর্ণ কোন তথ্য পরিবেশন করে না; তাহারা ছবিতে ছন্দোবদ্ধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। বাহিরের কোন সমাচার অথবা অন্তর্জগতের কোন দৃষ্টির চিত্রাঙ্কন বা অনু-করণ করা তাহার চরম উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু তাহার চরম উদ্দেশ্য হইল একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পূর্ণতা উদ্ঘাটন করা, ইহা আমাদের দৃষ্টিশক্তির ভিতর দিয়া কল্পনাতে পথ খুঁজিয়া পায়। ইহা অর্থের জন্য আমাদের মনকে প্রশ্ন করে না, অথবা ইহা অনর্থদ্বারা ভারাক্রান্ত হয় না, কারণ সর্ব্বোপরি ইহাই অর্থ।"

কবি যখন এই সকল ছবি আঁকিয়াছিলেন এবং নিজের চিত্রের আদর্শ স্থিরীকৃত করিয়াছিলেন, তখন হয়ত ইউরোপের বিংশ শতাব্দীর অতি-আধুনিক শিল্পের কোন জ্ঞান তাঁহার ছিল না; কিন্তু সম্ভবতঃ অজ্ঞাতসারেই তিনি তাঁহাদের চিন্তাধারার সহিত সম্পৃক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ১৯৩০ সনে যখন ইউরোপে কবির চিত্রপ্রদর্শনী হইয়াছিল, তখন তথাকার—বিশেষভাবে জার্ম্মানীর, শিল্পরসিকেরা—তাঁহার কাজ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, কারণ তাঁহার কাজের মধ্যে এমন কিছু তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যাহার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার কাজের মধ্যে নব, ইউরোপের কোন "ইজম" যদি খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তাহা হইল "এক্সপ্রেসনিজম"—ইহাই তাঁহার কাজের মূল সুর। এই কারণে তাঁহার কাজকে ওয়াসিলি ক্যান্ডিনস্কি, পল ক্লী এবং এমিল নোল্ডের ছবির সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে—এই চিত্রকরগণ সকলেই এক্সপ্রেসনিষ্ট গোষ্ঠীর শিল্পী।

চিত্রাঙ্কনরত রবীন্দ্রনাথ

ইহা আশ্চর্য্য যে, সমসাময়িক নব্যবঙ্গীয় বা নব্যভারতীয় শিল্পের জনক অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁহার উপর বর্ত্তায় নাই। আমরা জানি, ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথকে কবি তাঁহার শিল্পসৃষ্টিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে যখন চিত্র আঁকিলেন, তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইল। কবি অবনীন্দ্রনাথের মত চিত্রবিদ্যায়—অর্থাৎ অঙ্কন, আলোছায়া, পরিপ্রেক্ষিত প্রভৃতিতে শিক্ষা পান নাই, কিন্তু অঙ্কনবিদ্যা অথবা টেকনিকের সকল বাধা অতিক্রম করিয়া তাঁহার অসামান্য সৃষ্টি প্রতিভা এক কাল্পনিক জগৎকে প্রকাশ করিল। অবনীন্দ্রনাথের চিত্র প্রকটিত করিল নিও-রোমান্টিসিজম, কবির চিত্র প্রকাশ করিল একটা ফ্যান্টাসি বা খামখেয়ালী জগৎ। তিনি

চেষ্টা করিয়াছেন ছন্দোবদ্ধ "সিগনিফিক্যাণ্ট ফর্ম্মের" রূপ প্রদান করিতে। তিনি বাস্তবধর্ম্মী নহেন—পাখী, জন্তু, মুখোশ তাঁহার চিত্রনীতিতে রূপায়িত হইয়াছে (চিত্র নং ৪, ৮, ১১); অথবা তাঁহার রেখাচিত্রের পরিণতি হইয়াছে নিছক অ্যাবষ্ট্রাক্ট অলঙ্করণে (চিত্র নং ২, ৩)।

উর্ব্বশীর রচয়িতা অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনাবৃত একটি নারীর মুখ আঁকিয়াছেন [চিত্র নং ৭], তাহা লিওনার্দোর "মোনালিসা" চিত্র স্মরণ না করাইলেও তাহার অর্দ্ধেক বোজা চক্ষু একটা রহস্যের আভাস দেয়। এক চিন্তান্বিতা নারীর চিত্র [চিত্র নং ৫] সাদা-কালোতে আঁকা, এক হাত গালের উপর ন্যস্ত, শাড়ীর বহু ভাঁজ বক্র রেখায় পায়ের নীচে পড়িয়া আছে। মুখে চক্ষু নাসিকাদির কোন চিহ্ন নাই, শুধু মুখমণ্ডল চিন্তান্বিষ্টের ভাব প্রকাশ করে। আলিঙ্গনবদ্ধা দুইটি নারীর চিত্র আছে (চিত্র নং ৬), সম্ভবতঃ শোকসন্তপ্ত, একজন অপরকে সান্ত্বনা দিতেছে।

যদিও কবির চিত্রে ছন্দ এবং গঠন প্রধান উপজীব্য, তবু তিনি যে কম বর্ণকুশলী নহেন, চারিটি চিত্র তাহার প্রমাণ দিবে (চিত্র নং ১০, ১২, ১৪, ১৫)। একটি নারী কলস কাঁধে এক বিরাট ঝাঁকড়া গাছের সামনে দাঁড়াইয়া আছে (চিত্র নং ১০), তাহার দীর্ঘ বাহু একটা সম্ভ্রমের ভাব প্রকাশ করে। ইহা রাত্রির দৃশ্য, আকাশের আর্টমেরিন চিত্রের উজ্জ্বল হলুদ এবং বাদামির সম্মিলনে একটা বর্ণস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে। বহুবর্ণরঞ্জিত পুষ্পগুচ্ছের এক চিত্র (চিত্র নং ১২) বিখ্যাত ওলন্দাজ শিল্পী ভ্যানগখকে স্মরণ করাইয়া দিবে। ভ্যানগখের টেকনিকের জোরালো রেখাপাত এবং বিন্দু-প্রয়োগ এই চিত্রে লক্ষণীয়। একটি দীর্ঘাকৃতি সম্ভ্রান্ত মুখমণ্ডল—ইহা সম্ভবতঃ কবির নিজেরই প্রতিকৃতি (চিত্র নং ১৪)—মনে হয় যেন সুনিবিড় পল্লবভগ্ন হইতে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে; মুখমণ্ডলের হলুদবর্ণ যেন সবুজ ও বাদামি রঙের পাথরের ফাটল দিয়া সজোরে গলিত লাভার মত ছুটিয়া চলিয়াছে।

শেষ চিত্র (চিত্র নং ১৫) একেবারে ভিন্ন রীতির; ইহার সঙ্গে কবির অঙ্কনাদর্শের বা শিল্পতত্ত্বের কোন সামঞ্জস্য নাই, কেননা ইহা পুরাপুরি বাস্তবধর্ম্মী; ইহা একটি নিসর্গচিত্র—সন্ধ্যার দৃশ্য। বৃক্ষরাজি, প্রান্তর, বর্ণানুলেপন স্বাভাবিকতার ব্যঞ্জনা দেয়।*

* *Chitralipi* রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত পনেরখানি রঙিন চিত্র সম্বলিত এবং রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ভূমিকা-সহ। বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা। মূল্য দশ টাকা, বোর্ড বাধাই আঠার টাকা।
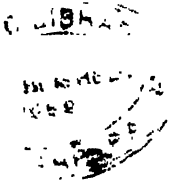
পল্লী-অঞ্চলে জুয়া

শ্রীঅজিতকুমার ভট্টাচার্য্য

গ্রাম-জীবনে যে-সব দুর্নীতি আজ প্রবল আকারে দেখা দিয়াছে তাহাদের মধ্যে জুয়া একটি। পূর্ব্বে পল্লী-অঞ্চলে জুয়ার সহিত লোকের অতি অল্প পরিচয়ই ছিল। শহর-কেন্দ্রিক সভ্যতা শহরেই ইহার জন্ম দিয়াছিল। পরে এই সর্ব্বনাশা নেশা শহরের সীমারেখা পার হইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে এবং এমনি করিয়া বাংলার সমগ্র পল্লী-অঞ্চলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আজ এমনই ইহার প্রভাব যে, গ্রামাঞ্চলে যে-কোন মেলা, যাত্রাগান ও সামাজিক উৎসবে জুয়া অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। নিঃসন্দেহে ইহা গ্রাম-জীবনের নৈতিক অধঃপতন সূচিত করিতেছে।

পূর্ব্বে গ্রামের নৈতিক মান ও সভ্যতা এতটা কলুষিত ছিল না। গ্রামের যে সমস্ত প্রাচীন ব্যক্তি আজও বাঁচিয়া আছেন, তাঁহাদের মুখে শোনা যায়—পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে আজিকার অপেক্ষা বহুগুণ বেশী সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যাত্রা, কবির লড়াই, তরজা, রামায়ণগান পল্লীর মানুষ প্রাণ ভরিয়া শুনিয়াছে; কিন্তু ইহার ব্যয় মিটাইতে তাহারা জুয়াড়ীর শরণাপন্ন হয় নাই। এই সব সামাজিক অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিল সমগ্র গ্রাম্য সমাজ, এই আনন্দ উপভোগ করিত সমাজেরই সকল মানুষ; তাই অনুষ্ঠানের পরিপূর্ণ দায়িত্ব নিঃসন্দেহে তাহারাই পালন করিবে, এ নীতিবোধ প্রত্যেকের ছিল। পৃথক করিয়া কাহারও ভাবিবার মনোবৃত্তি কিংবা অবকাশ ছিল না—সবাইকার ভাবনা গোটা সমাজের সহিত একাত্ম হইয়া অগ্রসর হইত। কিন্তু এই গ্রাম্য সমাজব্যবস্থা কালের আঘাতে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে ব্যক্তির প্রশ্ন; যত-কিছু গ্রাম্য অনুষ্ঠান সবই আজ মুষ্টিমেয় প্রভাবশালী লোকের হাতে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহারাই আজ সমাজ ও গ্রামের 'কর্ত্তা' হইয়া বসিয়াছেন। যে সমাজ-ব্যবস্থার নৈতিক বাঁধনে গ্রামের ছোটবড় সকল মানুষ আবদ্ধ ছিল, সেই বন্ধন শিথিল হইয়া যাওয়ার ফলে সার্ব্বজনীন অনুষ্ঠানের কোনরূপ অংশ লইবার দায়িত্ববোধ অথবা আগ্রহের মনোবৃত্তি প্রায় সবারই মাঝে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এই নীতিবোধকে জাগাইবার জন্য এতদিন ধরিয়া মানুষের শুভ-বুদ্ধির নিকট আবেদন লইয়া আগাইয়া আসা হয় নাই; সবাই ফাঁকির পথ বাছিয়া লইয়াছে। তাই গ্রামের উৎসব, আমোদ-প্রমোদ, মেলা, অভিনয়, কবিগান—যাহা কিছুই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, সেখানেই সমাজ-জীবনে ফাঁকির পথ বাহিয়া জুয়ার আকারে এই দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটিতেছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্রামের প্রতিটি মানুষ ইহার জন্য দায়ী।—গ্রামের যে-কোন সামাজিক উৎসব

অথবা আনন্দ-অনুষ্ঠানের রসাস্বাদ প্রতিটি মানুষ পরিপূর্ণ-ভাবে উপভোগ করিবে, অথচ তাহার উদ্যোগ ও ব্যয়ভারের ন্যূনতম দায়িত্ব গ্রহণের বেলায় পিছাইয়া যাইবে, ইহা সমাজ-জীবনের নীতিবিরোধী। কিন্তু তাহাই ঘটিয়া চলিয়াছে। তাই বর্তমান সমাজের তথাকথিত 'কর্তা'দের একতরফা দোষ দিয়া লাভ নাই। তাঁহাদের কেহ কেহ ইহারই জন্য গ্রামের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সামান্য অর্থ অথবা কায়িক সাহায্যদানের ভয়ে মানুষ এই উৎসব-অনুষ্ঠানে সক্রিয় সহযোগিতা হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। উদ্যোক্তারা অবশেষে জুয়াড়ীর শরণাপন্ন হইয়া আপনাদের কর্তব্য করিবার পথ খুঁজিয়াছে। এই-ভাবেই গ্রামে গ্রামে জুয়ার প্রচলন বাড়িয়া চলিতেছে। যে-কোন অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোক্তারা জুয়াড়ীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হয় এবং সে প্রতি রাত্রের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট অঙ্কের টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হয়; এই টাকাতেই অনুষ্ঠানের অধিকাংশ ব্যয় কুলাইয়া যায়। উৎসব-আসরের বহিঃপ্রান্তে জুয়ার ছকের চারিপাশে পেশাদার 'খেলোয়াড়' ও কৌতূহলী জনতার ভিড় জমিয়া উঠে; উৎসব হয়, আনন্দ হয়—কাহারও নিকট হইতে বিন্দুমাত্র সাহায্য না লইয়াও এই বিরাট যাত্রা-মেলা-তরজা-কবিগানের সাফল্যে উদ্যোক্তারা স্ফীত হইয়া উঠে; দর্শক এবং শ্রোতারাও ফাঁকির পয়সায় আনন্দ উপভোগ করিয়া গৃহে ফেরে। কিন্তু এই ফাঁকির রন্ধ্রপথ বাহিয়া যে জঘন্য নীতিহীনতা ও মর্মান্তিক অভিশাপ জীবনের স্তরে স্তরে বাসা বাঁধিতেছে, তাহা যে-কোন চিন্তা-শীল ব্যক্তির নিকট ভয়াবহ বলিয়া গণ্য হইবে। সমাজের আজও যাহা-কিছু অবশিষ্ট আছে, যাহাকে ভিত্তি করিয়া নূতন সাধনায় নবভারতের গ্রামীণ সমাজ-রচনার চেষ্টা চলিতেছে, এই সর্ব্বনাশা নেশার প্রচণ্ড ব্যাপ্তিতে তাহাও ধ্বংসের গহ্বরে ধ্বসিয়া পড়িতেছে।

কিন্তু এখানেই শেষ নহে। গ্রামে গ্রামে জুয়ার বৃদ্ধি হওয়ায় ইহার নেশা সংক্রামক ব্যাধির মত সব স্তরের মানুষের মধ্যে একটু একটু করিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। যাহারা নির্বিরোধী ভালমানুষ, তাহারাও এই অপরিমিত অথচ অনিশ্চিত লাভের লোভে ধীরে ধীরে এই পথে চলিয়া আসে এবং একদিন যখন তাহার মোহ ভাঙিয়া যায় তখন সে চাহিয়া দেখে—অর্থ, সম্পত্তি ও সম্মান হারাইয়া তাহার জীবন, রিক্ততায় ভরিয়া গিয়াছে। দেশের তরুণ-সমাজ, এমন কি ছাত্রসমাজেরও একটা বিরাট অংশ এই দুর্নীতির কবলে পড়িয়াছে। গ্রামের কিশোর-বালকেরাও জুয়ার ছকের আশেপাশে ভিড় বাড়াইয়া তোলে এবং শুধু ইহারই নেশায় তাহারা নিজেদের ঘরের গোপন তহবিল শূন্য করিতে শিখে। জানিয়া-শুনিয়াও আজিকার মানুষ মানসিক আলস্য-ভরে ইহাকে প্রশ্রয় দিয়া চলিয়াছে; ইহার সর্ব্বনাশা পরিণতি কোথায় গিয়া ঠেকিতে পারে, তাহার চিন্তাও একান্ত অবহেলায় মন হইতে সরাইয়া দিয়াছে। থাকুক সামাজিক দলাদলি, থাকুক ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা; কিন্তু গ্রামীণ সভ্যতা এমনিধারা দুর্নীতির স্বপ্ন কোন দিন দেখে নাই, এমনি করিয়া আপনার বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিবার জন্য কোন দিন কাহাকেও আমন্ত্রণ করে নাই। দীর্ঘদিনের পরাধীনতা যে পাপকে আপন পক্ষপুটে রাখিয়া পুষ্ট করিয়া-ছিল, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরও তাহা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে!

ইহার উপর দুর্নীতিনিরোধ কার্য্যে নিযুক্ত সরকারী কর্ম্ম-চারীদের ফাইল-দুরস্ত কার্য্যকলাপের যে পরিচয় অহরহ মিলিতেছে, তাহাও প্রহসন ছাড়া আর কিছু নহে। দিনের পর দিন পুলিস কর্ম্মচারীদের চোখের উপর এই যে জুয়ার অবাধ প্রসার ঘটিতেছে ইহাও এক মর্ম্মন্তুদ অভিশাপ! তাহাদের নিকট আস্কারা পাইয়া জুয়াড়ীরা বেপরোয়া হইয়া উঠে। ইহা আজ হয়ত কাহারও নিকট গোপন নাই যে, জুয়াড়ীদের লাভের টাকার একটা মোটা অংশ ব্যয় করিয়া নানাপ্রকার উপঢৌকন যথাস্থানে নিয়মিতভাবে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয় এবং বিনিময়ে জুয়াড়ীরা তাহাদের ব্যবসা নির্ভয়ে পূর্ণমাত্রায় চালাইতে থাকে। জুয়া বন্ধ করিবার আবেদন লইয়া থানায় আসিলে সময়াভাবের অজুহাত দেখাইয়া কর্তৃপক্ষ প্রায়ই অক্ষমতাপ্রকাশ করেন এবং গ্রামের শিক্ষিত সমাজকে ইহার বিরুদ্ধে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিবার সৎপরামর্শ দান করিয়া আপনাদের কর্তব্য শেষ করেন। ইহার পরও মহকুমা অথবা জেলা পুলিস কর্তৃ-পক্ষের কাছে বার বার আবেদন করিলে তাঁহারা একান্ত বিরক্তির সহিত রীতিমত নোটিশ দিয়া সংশ্লিষ্ট থানায় তদন্ত করিতে আসেন। কিন্তু—যথাপূর্ব্বং তথাপরং! জুয়াড়ীর দল ইতিমধ্যেই সংবাদ পাইয়া সাবধান হইয়া যায়। উপরিতন কর্ম্মচারীরাও তদন্ত শেষ করিয়া কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া যান। মদ-তাড়ি-জুয়া-বাহিত উৎসবের আসরে অপাংক্তেয় শুভ-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হতাশ হইয়া পড়ে; নূতন সমাজ-গঠনের উজ্জল স্বপ্ন ম্লান হইয়া আসে।

জেলিভজা ছাত্রবৃত্তি বা অভিযানের ছাড়পত্র

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

জিন্ ওয়ালটার নামে একজন তরুণ ফরাসী স্থপতি ১৯২৫ সনে মরক্কো দেশে সীসা, দস্তা এবং রৌপ্যের এক খনি আবিষ্কার করেন। এই খনি বর্তমানে জেলিডজা খনি নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই আবিষ্কারের দ্বারা মরক্কো দেশের যেরূপ সমৃদ্ধি বাড়িয়াছে, তেমনই ওয়ালটার নিজেও বিপুল বিত্তের মালিক হইয়াছেন। কিন্তু তরুণ বয়সের এই আবিষ্কারের দুঃখকষ্ট ওয়ালটার ভোলেন নাই। এই জন্যই তিনি স্থির করিলেন যে, এরূপ দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়াই যুবকগণকে জীবনের যাত্রারম্ভের শুভ সুযোগ করিয়া দিতে হইবে।

উক্ত আবিষ্কারের চৌদ্দ বৎসর পরে (এখন হইতে চৌদ্দ বৎসর আগে) ওয়ালটার জেলিডজা ছাত্রবৃত্তি নামে একটি তহবিল প্রতিষ্ঠা করেন। এই তহবিলের সাহায্যে ২৫০ জন তরুণ ফরাসী প্রতি বৎসর নানাদেশে অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের জন্য বাহির হইয়া পড়ে। এই সকল যুবক এক হিসাবে 'গৃহ হইতে পলাতক', তবে এই পলায়ন পিতামাতা এবং কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে ও জ্ঞাতসারে হইয়া থাকে।

যে ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয় তাহার পরিমাণ খুবই কম এবং ইচ্ছা করিয়াই বৃত্তির পরিমাণ কম করা হইয়াছে। ১৯৫৩ সনে প্রত্যেকটি বৃত্তির পরিমাণ ছিল ২০,০০০ ফরাসী ফ্রাঙ্ক, অর্থাৎ ২০ পাউণ্ড বা ৫৮ ডলারেরও কম। ভ্রমণের পরিকল্পনা যত বড়ই হউক না, ছেলেদের এই অর্থেই ব্যয়সঙ্কুলান করিতে হয়, আর সর্বাপেক্ষা মেধাবী ছেলেকেই যে উক্ত ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয় তাহাও নহে—সহপাঠিগণ অভিযানের জন্য যাহাকে সর্বাপেক্ষা যোগ্য মনে করে, সে-ই বৃত্তি পাইয়া থাকে।

প্রতি বৎসর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ফরাসী দেশ ও উত্তর আফ্রিকায় ১০৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১৫,০৫০ শিক্ষার্থী গোপন ব্যালট দ্বারা প্রত্যেক শ্রেণী (form) হইতে দুই জন হিসাবে, মোট ১০০০ প্রার্থী বাছাই করে। দুই মাসের মধ্যে এই বাছাই-করা ১০০০ ছাত্রকে তাহাদের নিজ নিজ ভ্রমণ-পরিকল্পনা—শিক্ষার বিষয়, পথঘাট এবং একখানি খসড়া মানচিত্রের সহিত দাখিল করিতে হয়। বিদ্যালয় পরিচালন পরিষদ ও জেলিডজা পরিচালন বোর্ড (এই বোর্ডে শিক্ষাবিভাগের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ থাকেন) কর্তৃক এই সকল পরিকল্পনা বিবেচিত হয়। মোট ১০০০ প্রার্থীর মধ্য হইতে শেষ পর্যন্ত ২৫০ জনকে বাছাই করিয়া বৃত্তি দেওয়া হয়।

এইরূপে প্রত্যেক বৎসর পরীক্ষা শেষ হইলে ২৫০ জন স্কুলের ছেলের অভিযান আরম্ভ হয়। মাত্র ২০,০০০ ফ্রাঙ্ক পকেটে লইয়া ছেলেরা "ফরাসী গায়েনায় কদলী উৎপাদন", "পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্লোরেন্সের কলাবিদ্যা", "ব্রেজিলের কফি উৎপাদন", "গেবুনের তিমি শিকার" অথবা "আধুনিক ল্যাপল্যাণ্ড এবং তথাকার লৌহপ্রস্তর-খনি", "কানাডার অরণ্য" প্রভৃতি বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানে বাহির হইয়া যায়।

প্রত্যেক ছেলেকে চারিটি ভাষায় অনূদিত একখানি ডিপ্লোমা দেওয়া হয় এবং ইহাই পরিচয়-পত্র বা সুপারিশ-পত্রের কাজ করে। ইহাতে লেখা থাকে---

"বুদ্ধি এবং উৎসাহ প্রভৃতি গুণাবলী লক্ষ্য করিয়া এই পত্র-বাহককে তাহার সহপাঠিগণ নির্বাচন করিয়াছে এবং শিক্ষকগণ উহা অনুমোদন করিয়াছেন। এই ছাত্র শিক্ষার উদ্দেশ্যে একাই দূরদেশ পরিভ্রমণ করিবে, এজন্য খুব অল্প অর্থই ব্যয় করিবে এবং অভিযানের জন্য সকল প্রকার শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক কৃচ্ছ্রতা সহ্য করিবে। এই তরুণ মনুষ্যত্বের দায়িত্বগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।"

এই বৃত্তি তহবিলের সহকারী সভাপতি মঁশিয়ে লুই ফ্রাঙ্কয়েসের ভাষায়—পৃথিবী এবং ফরাসীদেশের রাজপথে কয়েকজন তরুণকে ছাড়িয়া দেওয়াই কেবল জেলিডজা বৃত্তির উদ্দেশ্য নহে। শিক্ষার পরিকল্পনা যাহাতে বাস্তব জগৎ ও সহযাত্রী মানুষের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত ও সার্থক হয় বৃত্তিদানের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহাই।

বালকেরা পায়ে হাঁটিয়া, সাইকেলে, ডোঙ্গায়, রেলে, বিমানে বা নৌকায় যে-কোন উপায়ে ফরাসীদেশের বাহিরে ভ্রমণ করিতে পারে এবং তাহারা সেই ভাবে নিজেদের পছন্দমত চলার কার্যসূচী তৈরি করে—তবে ভ্রমণকাল এক মাসের কম হইলে চলিবে না। পড়া-শুনার পরিকল্পনা সম্বন্ধে তাহাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ অনেকটা এইরূপ : আধুনিক কৃষিপদ্ধতি, শিল্প-সংগঠন, স্থানীয় আচারব্যবহার এবং জীবনযাত্রা, শিল্প ও মানসিক উৎকর্ষ, শিক্ষা-ব্যবস্থা, খেলা-ধুলা ইত্যাদি।

এই ভ্রমণের সময়ে বালকেরা রোজগার করিতে পারে—অনেককে করিতেও হয় এবং এ বিষয়ে উৎসাহও দেওয়া হয়। ইতি-মধ্যেই দুই হাজারের অধিক বৃত্তিভোগী শস্যসংগ্রহের সময় ক্ষেতের এবং মাছ ধরিবার ঋতুতে জেলে স্টীমারে কেবিন বয়ের, জাহাজের রং করার, জানালা পরিষ্কারের, এমন কি বাসন ধোয়ার কাজ করিয়াছে। অনেকে খবরের কাগজ ও ছবি বেচিয়াছে, কাগজে লিখিয়া এবং রেডিওতে বক্তৃতা করিয়া রোজগার করিয়াছে। বৃত্তির সাহায্যে এবং কঠোর পরিশ্রম ও নিজেদের চেষ্টায় অনেকে ইউ-রোপের প্রায় সকল দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছে—অনেকে উত্তর আমে-রিকা, আফ্রিকা এবং উত্তর মেরুপ্রদেশ পর্যন্ত অভিযান চালাইয়াছে।
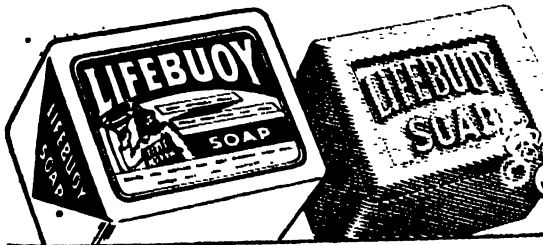
নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদন এবং জীবনধারণের জন্য উপার্জন ছাড়াও বৃত্তির কঠোর সর্তগুলি প্রত্যেক ছাত্রের পক্ষে অবশ্যপ্রতিপাল্য। প্রত্যেককেই একখানি দিনলিপি রাখিতে এবং যথাযথ আয় ব্যয়ের হিসাব ও রিপোর্ট দাখিল করিতে হয়—ইহা সংবাদ মানচিত্র, চিত্র, ছক এবং ফটো দ্বারা পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে। আর এই সমস্তই নিজ হাতে করিতে হইবে—বাজারের কেনা পোষ্টকার্ড বা ফটো দাখিল করিলে চলিবে না।

২৪৫ জন বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রের মধ্য হইতে তাহাদের রিপোর্ট বিচার করিয়া ১৫ জনকে দ্বিতীয় বার ভ্রমণের সুবিধার জন্য আর একবার বৃত্তি মঞ্জুর করা হয়। দ্বিতীয় বার ভ্রমণের পর উহাদের মধ্য হইতে পাঁচ জনকে পাঁচটি পুরস্কার দেওয়া হয়—ইহার একটি পুরস্কার ফরাসী গণতন্ত্রের সভাপতি নিজে দিয়া থাকেন।

তৃতীয় দফার পুরস্কারপ্রাপ্ত তিন জন তরুণের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল—দ্বিতীয় রিপোর্টের বিচারে ইহারা এই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাইয়াছিল।

প্রথম দৃষ্টান্ত—জিয়াঁ দুচেন নামক একজন পুরস্কারপ্রাপ্ত যুবক, সে কলাবিদ্যায় খুবই উৎসাহী। প্রথম যাত্রায় যুবকটি সিসিলিতে গ্রীক ভাস্কর্য পর্যবেক্ষণ করিতে যায়, তখন সে স্কুলের ছাত্র। গত বৎসর স্পেনে মুরদের ভাস্কর্য সম্বন্ধে সে গবেষণা করে। এই যাত্রায় তাহার বিপদ উপস্থিত হয়। মাদ্রিদের এক হোটেলে তাহার সমস্ত অর্থ এবং দুইটি ফটোর ক্যামেরা খোয়া যায়। এই লোকসানের চোট সামলাইবার জন্য সে আলহাম্ব্রার ভ্রমণকারীদের নিকট তাহার হাতে আঁকা ছবি বিক্রয় এবং গাইডের কাজ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে। এই সময়ের কঠিন পরিশ্রমে তাহার শরীরের ওজন ত্রিশ পাউণ্ড কমিয়া যায়, কিন্তু সে কর্তব্যভ্রষ্ট হয় নাই এবং এজন্যই তৃতীয় বার পুরস্কার লাভ করিতে সমর্থ হয়। সে এ বৎসর মোটর সাইকেল ও সিনেমার ক্যামেরা লইয়া গ্রীসদেশে রঙীন ছবি তুলিতে গিয়াছে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—উনিশ বৎসর বয়সের জিয়াঁ দেভেজ। সে রসায়ন-ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য পড়িতেছিল। এ ছেলেটি বিচিত্র ধরণের। জোয়ান ছেলে, এলোমেলো চুল, কিন্তু সে যেন তেজ ও উৎসাহের প্রতীক। প্রথম বার সে ইটালীতে যায়—কিন্তু সেবারকার সম্বন্ধে কিছু বলিতে রাজী হয় নাই, বলে সে ত ছেলেখেলা। কিন্তু ফরাসী সুদানের নিগার জলসেচের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় সে মুখর হইয়া উঠে। তার বিবরণীর সহিত সংশ্লিষ্ট মানচিত্রে দেখা যায়, ডাকার বামাকো রেলপথে সে ৭৭৫ মাইল ভ্রমণ করে, পরে বামাকো সেগউ এয়ার-ফ্রান্সের এরোপ্লেনে যায়—ইহার মধ্যে অবশ্য ১৫৫ মাইল তাহার ভাড়া লাগে নাই। তার পর এক ফরাসী-আফ্রিকান কোম্পানীর প্যাডল্ ষ্টীমারে সেগউ-মোবর্তী যায়। ২০,০০০ ফ্রাঙ্ক পকেটে করিয়া তাহাকে এই দীর্ঘ ভ্রমণ সম্পন্ন করিতে হয়।

আফ্রিকায় যাওয়া-আসা, সুদান ভ্রমণ, পাওয়া-থাকার খরচ সবই ইহার মধ্যে কুলাইয়া লইতে হয়।

দেভেক্কের অভিজ্ঞতার বিবরণ বেশ চিত্তাকর্ষক : তাহার মানচিত্র, চার্ট, ফটো, ঐতিহাসিক ছিটেফোঁটা হইতে সহস্র সহস্র একর জমির ব্যাপক জলসেচ-ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়—এই বিরাট দেশই ভবিষ্যতে ধান ও তুলা উৎপাদনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত—দানিয়েল ভার্নি। ইনি ইস্রাইলে কিবুৎজিম, অর্থাৎ—সমবায় কৃষি-সমাজ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে গিয়াছিলেন। ইঁহার আসা-যাওয়ার টিকিট কিনিতেই বৃত্তির টাকা শেষ হয়। কিন্তু একেবারে খালি হাতে বিদেশে নামা ঠিক নহে মনে করিয়া নিজের অর্থ হইতে ৫,০০০ ফ্রাঙ্ক সঙ্গে লন। কিন্তু বৃত্তির সর্ত্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবার জন্য এই অর্থ ভ্রমণকালে ব্যক্তিগত ব্যয়নির্ব্বাহার্থে তিনি খরচ করেন নাই। তবে প্রত্যাবর্তনের দিন পিতা মাতা ও বন্ধুদের জন্য বিদেশ ভ্রমণের স্মারক চিহ্নস্বরূপ দ্রব্যাদি কিনিবার জন্য ক্রয়ে এই টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

পেট চালাইবার জন্য ইনি কিবুৎজিমে মজুর খাটিয়াছিলেন। ইঁহার বর্ণনা হইতে এই ইহুদী সমাজের পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায় এবং ইঁহাদের আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা বিষয়ে ভার্নি যে গভীর গবেষণা করিয়াছেন তাহার আভাস মেলে।

পূর্ব্বে যে সকল কথা বলা হইল তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, জেলিয়ো পরিকল্পনা দ্বারা তরুণ ফরাসীরা সাধারণ ভ্রমণকারীর মত ভাসা ভাসা দেশভ্রমণ করে না, সদাজাগ্রত উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে দেশ এবং দেশের মানুষের সঙ্গে মিশিবারও জানিবার সুযোগ লাভ করে। তরুণদের মানুষ করিবার, পরবর্তী জীবনে দায়িত্ব প্রতিপালনের উপযোগী করিয়া তাহাদিগকে তৈরি করিবার পক্ষে ইহা যে প্রকৃষ্ট পন্থা তাহাতে সন্দেহ নাই

—(ইউনেস্কো)

পদাবলী পরিচয়—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় পদাবলীর একজন 'সূক্ষ্ম বিচারক' এবং প্রবীণ সমালোচক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। তিনি বহু বৎসর পূর্ব্বে জয়দেব গোস্বামীর শ্রীগীতগোবিন্দের একটি সংস্করণ বাংলায় প্রকাশ করেন। তাহাতে দেখিয়াছি তাঁহার অসামান্য বিচারবুদ্ধি ও অনন্যসাধারণ গবেষণা। পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায়ের শ্রীগীতগোবিন্দের একটি বাংলা পদ্যে অনুবাদ ছিল, কিন্তু এক্ষণে উহা আর পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তীকালে ডঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সহ-সম্পাদকতায় তিনি যে "চণ্ডীদাসের পদাবলী" প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার ধীশক্তির অসামান্য পরিচয় রহিয়াছে। চণ্ডীদাসের পদাবলীর পাঠভেদ নির্ণয় এবং সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা তাঁহার রূপ নির্দ্ধারণ সাহিত্যে তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

পদাবলী পরিচয় গ্রন্থে পদাবলী সাহিত্যের প্রতি গ্রন্থকারের যে অপরিমেয় শ্রদ্ধা আছে, শুধু তাহারই পরিচয় পাওয়া যায় না, বাংলার কীর্ত্তনগানের প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ গ্রন্থের প্রতি ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পদাবলী পরিচয়ে তিনি বৈষ্ণবদিগের অলঙ্কারশাস্ত্র হইতে অনেক প্রমাণ-প্রয়োগ উদ্ধার করিয়া পদাবলী বুঝিবার পক্ষে প্রকৃষ্ট সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। আশা করি এই একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া পদাবলীর রসধারা পাঠকগণ আস্বাদন করিতে পারিবেন। তিনি সত্যই বলিয়াছেন—"বিশ্বসাহিত্যে পদাবলী বাঙ্গালীর অন্যতম অবদান।" আজ কয়েক শতাব্দী হইতে পদাবলীর ধারা বাংলাদেশ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন আর পদাবলী রচিত হইবার বিশেষ কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না। বাঙ্গালী তবুও পদাবলীর মোহ কাটাইতে পারে নাই, সময়ে সময়ে তাই পদাবলীর আভাস লইয়া কোন কোন কবি কিছু উচ্ছ্বাস দেখাইয়াছেন। পদাবলী আর রচিত না হইলেও ইহার মধ্যে যে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বিকশিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। 'উজ্জ্বল নীলমণি,' 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু,' 'উজ্জ্বল চন্দ্রিমা' ইত্যাদি হইতে পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন যে উপাদেয় গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে অশেষ সাধুবাদ প্রদান করিতেছি।
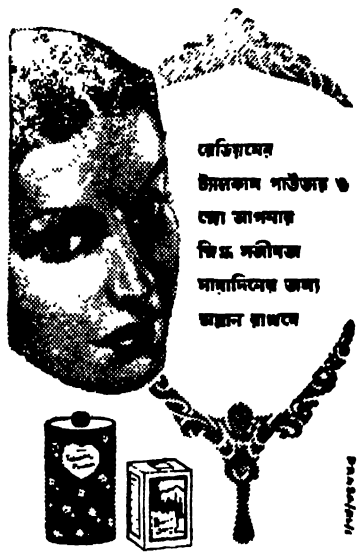
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

দ্রুত-ফেনিল সানলাইট

না আছড়ে কাচলেও সাদা ও ঝকঝকে ক'রে দেয়

"শিক্ষয়িত্রী বলেন আমি বেশ ফিটফাট থাকি। তার কারণ মা সানলাইট সাবান দিয়ে আমার ফ্রক ধপধপে সাদা ক'রে কেচে দেন। সানলাইটের স্তূপাকার সরের মত ফেনা শীঘ্র ও সহজেই কাপড়-চোপড় থেকে ময়লা বার করে দেয় — আছড়াতেও হয় না।"

"আমার ক্লাসের মধ্যে আমাকেই সব চেয়ে চমৎকার দেখায়। সানলাইট দিয়ে কাচার জন্য আমার রঙিন ফ্রক কেমন ঝকঝকে থাকে দেখুন। মা বলেন সানলাইট দিয়ে কাচলে কাপড়-চোপড় নষ্ট হয় না আর তা টেঁকেও বেশী দিন। এতে খুব খুসী হবার কথা — নয় কি?"

ভারতে প্রস্তুত

সানলাইট সাবান

কাপড় বাঁচায়, পরিশ্রম বাঁচায়, খরচ বাঁচায়

S. 210-X52 BG

কৃষি-বিজ্ঞান (দ্বিতীয় খণ্ড)—রাজেশ্বর দাশগুপ্ত। রমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত ও পরিবর্দ্ধিত; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৬০৫। মূল্য দশ টাকা।

এই পুস্তকে ডাল জাতীয়, ধান্যাদি জাতীয়, তৈল ভেষজ ও মাদক এবং মশলা জাতীয় ফসল, তন্তুপ্রদ ফসল, কন্দ ফসল, পশুখাদ্য ফসল, শর্করা ফসল প্রভৃতির চাষবাসের বর্ণনা আছে। ইহা ছাড়া গ্রীষ্ম-বর্ষাকালের ও শীতকালের যাবতীয় শাকসব্জীর এবং নানাবিধ ফলের চাষের বিবরণ বর্ত্তমান পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। রেশমের চাষ, তসর, কীটপালন, এণ্ডির চাষ এবং লাক্ষার চাষের কথাও এই পুস্তকে আছে। পুস্তকের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে কতকগুলি কৃষি-বচনও দেওয়া হইয়াছে। পরিশিষ্টে ফসল, সব্জী ও ফলচাষের আয়-ব্যয়ের তালিকাও সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

রাজেশ্বর দাশগুপ্ত মহাশয় কৃষিবিভাগের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কর্ম্মচারী ছিলেন এবং কৃষিবিভাগের প্রথম অবস্থায় বহু কার্য্যকরী পরিকল্পনার ভিত্তি তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা প্রচুর ছিল এবং কর্ম্মদক্ষতার জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এক কথায় বলা যায়, কৃষিবিভাগের গোড়া যাঁহারা পত্তন করেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

বাংলা ভাষায় কৃষি-বিষয়ের পুস্তকের এখনও পর্য্যন্ত খুবই অভাব। বর্ত্তমান পুস্তকখানি সেই অভাব কতকটা পূরণ করিবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে স্থানীয় মাটি, আবহাওয়া এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর কৃষির সফলতা নির্ভর করে। সুতরাং কৃষিবিষয়ক পুস্তকে সন্নিবেশিত উপদেশাবলী সকল স্থানে সমানভাবে কার্য্যকরী হয় না। সেই কারণে বর্ত্তমান পুস্তকে বিভিন্ন জাতীয় ফসলের চাষবাস সম্পর্কে যে সকল কথা বলা হইয়াছে তাহা পুস্তকে সাধারণ প্রণালী সন্নিবেশিত থাকে। স্থানীয় আবহাওয়া, মাটি প্রভৃতির তারতম্যে সকল প্রণালীর তারতম্য হইবে। যাঁহারা কৃষিকার্য্যে লিপ্ত আছেন কিংবা যাঁহারা কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, নিজেদের অভিজ্ঞতার মূল্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কেবলমাত্র কোন কৃষি-পুস্তকের উপদেশাবলী অনুসরণ করিয়া তাঁহারা কৃষিকার্য্যে সম্যক লাভবান হইতে পারিবেন না। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে বিভিন্ন স্থানে বহু ব্যক্তি কৃষিকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু এক রাজেশ্বর সিংহ ছাড়া অনেকেই তাঁহাদের অভিজ্ঞতাপুষ্ট কোন কৃষি-গ্রন্থ রচনা করেন নাই। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা কৃষিবিভাগে দীর্ঘকাল কার্য্য করিয়া কৃষি সম্পর্কীয় বিভিন্ন দিকে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের অভিজ্ঞতা কোন পুস্তকের মাধ্যমে দেশকে প্রদান

করেন নাই। এই প্রসঙ্গে কেবল স্বর্গত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়েরই নাম মনে পড়ে। তিনি *Handbook of Indian Agriculture* নামক পুস্তক রচনা করিয়া দেশের মধ্যে কৃষি-জ্ঞান বিস্তার করিয়াছিলেন। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, কৃষিবিভাগের বিদেশীয় অধিনায়কগণ সেই পুস্তক পাঠ করিয়া এই দেশের চাষ-সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিতেন। রাজেশ্বর দাশগুপ্ত মহাশয় নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বাংলা ভাষায় কৃষি-পুস্তক রচনা করিয়া এবং তদীয় পুত্র রমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত উহা সম্পাদন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া দেশের কৃষি-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ—শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব। 'কত কথা', ৬৭।১ মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ৪৲।

বাংলার কবি, জারি, কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতি লোকসঙ্গীত আজ বিলোপের পথে। অথচ শুধু দেশী সঙ্গীতের নহে, সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাস-সঙ্কলনের পক্ষেও এগুলি মূল্যবান উপকরণ। লেখক এই সম্পদ-সংগ্রহে অগ্রসর হইয়াছেন, এজন্য তিনি দেশানুরাগী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন। একসময়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং দীনেশচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যরথিগণ এই কার্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, বর্তমানে এ বিষয়ে উৎসাহী লোক নিতান্ত কম।

আলোচ্য গ্রন্থের তিনটি অংশ বা খণ্ড: বারমেসে, সাময়িকী আর অকস্মাৎ। প্রথম খণ্ডের সাতটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার বিভিন্ন ঋতুর নানাপ্রকার সঙ্গীত লইয়া আলোচনা করিয়াছেন — নীল-উৎসব, শোলক, বেদে-বেদেনীদের গান, মা-ওগার গান, বৈরাগী ও বাউলদের গান, মাঘমণ্ডল, বিবাহ এবং রূপকথার গান। দ্বিতীয় খণ্ডের পরিচ্ছেদ-সংখ্যা ছয়: আলোচ্য বিষয়—কবি, ঢপ, কৃষ্ণযাত্রা, নিমাইসন্ন্যাস, রামযাত্রা, মনসার ভাসান, সত্যনারায়ণ, পাঁচালী, মেঠোগান। তৃতীয় খণ্ডে আছে পাঁচটি পরিচ্ছেদ, তাহাতে আলোচিত হইয়াছে স্বদেশী আন্দোলন, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, বঙ্গবিভাগ প্রভৃতি নানা সমসাময়িক ঘটনা লইয়া রচিত গান।

সরল চলিত ভাষায় সাধারণ পাঠকের উপযোগী করিয়া গ্রন্থকার এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন, গভীর গবেষণা অথবা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভঙ্গীতে লেখেন নাই। উদ্ধৃত ছত্রগুলি হইতে পল্লীকবিদের প্রতিভার পরিচয় পাই। একটি কথা — এত চিত্তাকর্ষক গ্রন্থখানির সৌন্দর্যহানি করিয়াছে—রাশি রাশি মারাত্মক ছাপার ভুল। নোড়া (নোরা) দেড়াই (দেরাই), কুলবধূ (কুলবধ), অম্বুদচন্দ (অম্বুদচন্দ), নাকরা (নাকড়া) পিপাস (পিপাস), [illegible] (সবাক), [illegible] (সরাসিত), সপত্নী (সপত্নী), শান্তনা (সান্ত্বনা), সহস্র (সহস), নপুংশক (নপুংসক), mearly (merely), Shakespior (Shakespeare)—কত আর উল্লেখ করিব? একটি সংশোধনী বা বিষয়নির্দেশ থাকিলে ভাল হইত।

বিংশ শতাব্দীর শেষ ডিটেকটিভ উপন্যাস—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য দেড় টাকা।

অনেক ডিটেকটিভ উপন্যাসেই গ্রন্থকার 'উদ্ভট কল্পনা'র সাহায্য নিয়ে 'উৎকট হত্যাকাণ্ড' সম্পন্ন করে যান এবং "ডিটেকটিভকে প্রতি পদে নাজেহাল করে…এমন জায়গায় পাঠককে হাজির করেন যেখানে ডিগবাজি খেয়ে ঝোড়াতালি দিয়ে বইটি শেষ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।" লেখক মুখবন্ধে জানিয়েছেন, তিনি সে পথের পথিক হতে চান না। তাঁর উপন্যাসের আরম্ভেই ডিটেকটিভের মৃত্যু। তারপর চুরি ডাকাতি রাহাজানি আছে, সেগুলি নিতান্ত আজগুবি নয়। রেশন, কাপড়ের ব্যবসা, আবগারী বিভাগ এ সবের মধ্য দিয়ে যে কত লুকোচুরি চলছে তার দিকে তিনি ইঙ্গিত করেছেন। এ গল্প অংশতঃ প্রচলিত গোয়েন্দা-কাহিনীর প্রতি বিদ্রূপ। রঙ্গব্যঙ্গ রহস্যে বইখানা মোটের উপর উপভোগ্য।

নারী—শ্রীমনোজমোহন রায়, এম্‌-এ, বি-এল। ১৩০, কাসুন্দিয়া রোড, হাওড়া। মূল্য এক টাকা।

ঠিক গল্প নয়, একটি নারীর জীবনের রেখাচিত্র। সামাজিক আবেষ্টনে

... জীবনের উপর তাহার প্রভাব সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। মনে হয় অভিজ্ঞতা হইতে লেখা, তাই বিশিষ্ট সাহিত্যিক গুণ না থাকিলেও পড়িতে ভাল লাগে এবং পল্লীর দুর্গতির বিষয় জানা যায়।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ছোটদের কবিকঙ্কণ চণ্ডী—শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ। চ্যাটার্জ্জি পাবলিশার্স, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য বোর্ড বাঁধাই ১৸০, শোভন সংস্করণ ...

মঙ্গল-কাব্য প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ, তন্মধ্যে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সমধিক প্রসিদ্ধ। কবিকঙ্কণ চণ্ডী নামে খ্যাত এই কাব্যে চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য-বিষয়ক দুইটি মনোহর কাহিনী স্থান পাইয়াছে, প্রথমটি কালকেতু ও ফুল্লরার, দ্বিতীয়টি ধনপতি ও শ্রীমন্তের উপাখ্যান। গ্রন্থকার কিশোরদের উপযোগী করিয়া এই গল্পদুটি বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের ভাষা মার্জ্জিত ও বর্ণনাভঙ্গী কৌতূহলোদ্দীপক। বইটি সচিত্র, মলাটের পরিকল্পনা অভিনব।

পুরাণের আলো—শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ। বুক কর্পোরেশন লিমিটেড, ৫এ ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা-৭। মূল্য—১৲।

আমাদের পুরাণগুলি রত্নাকর-বিশেষ, কত মণিমাণিক্য ও রত্নরাজি যে এই অশেষ জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে তাহা বলা যায় না। বিবিধ পুরাণ হইতে গ্রন্থকার কয়েকটি গল্প নির্ব্বাচিত করিয়া কিশোরদের উপযোগী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। গল্পগুলি সুনির্ব্বাচিত, সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক। এই সচিত্র বইখানির প্রচার বাঞ্ছনীয়।

কলিকা—শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ। এম্, কে, পালিত এণ্ড কোং, ৮ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৷৷০।

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সদ্ভাবশতকের আদর্শে রচিত, সদ্ভাব ও কল্পনার উদ্দীপক এবং নীতিশিক্ষার সহায়ক এই কবিতাকণিকাগুলি সরস ও সুখপাঠ্য।

(১) হিতোপদেশের গল্প—শ্রীরাজশেখর বসু। (২) বেড়াল ঠাকুরঝি—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৫২ ও ৮২। মূল্য বোর্ড বাঁধাই ১৸০ ও ২৸০, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০ ও ২৲।

পঞ্চতন্ত্র হইতে পৃথক্কৃত হিতোপদেশ নামে আর একখানি গ্রন্থ বিষ্ণুশর্ম্মা প্রণীত বলিয়া প্রচলিত আছে। পঞ্চতন্ত্রের মূল গল্পগুলি শাখা-প্রশাখায় বিস্তারিত, শেষেরটি হইতে কয়েকটি গল্প বাছিয়া লইয়া স্বনামখ্যাত গ্রন্থকার শিশুদের জন্য সহজ সরল ভাষায় 'হিতোপদেশের গল্প' লিখিয়াছেন। গ্রন্থকার প্রবীণদের জন্য ব্যঙ্গরচনায় সিদ্ধহস্ত, ছোটদের জন্যও তিনি কেমন সরস নিপুণ হাতে লিখিতে পারেন, বইখানি তাহার পরিচয় দিতেছে।

'বেড়াল ঠাকুরঝি' রূপকথার বই। রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 'রূপকথা মেয়েদের মুখে যেমন শোনা যায় ঠিক তেমনি লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। এগুলি পড়িলেই বুঝা যাইবে, এ সমস্তই অন্তঃপুরবাসিনী মেয়েদের রচনা, তাহাদেরই প্রতিদিনের ঘরকরনার হাঁড়িকুঁড়ির অন্তরের কথা। তা ছাড়া ইহার মধ্যে মানবমনের যে প্রকৃতি-পরিচয় পাওয়া যায় তাহারও আধার এই বাংলাদেশের অন্তঃপুরে। অবশ্য মানবপ্রকৃতি সকল জায়গাতেই সমান, কিন্তু তাহার বাহিরের চেহারাটা অবস্থাভেদে ভিন্ন।' ছেলেমেয়েরা চিরকালই ঠাকুরমা ও দিদিমাদের মুখে রূপকথা শুনিতে ভালবাসে, লেখক ঠিক তাঁহাদেরই ভাষায় ও ভঙ্গীতে গল্পগুলি বলিয়াছেন।

বই দুখানি বহু চিত্রে অলঙ্কৃত, ছবিতেও কথা কয়, সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, বই দুখানি ছোটদের মনোরঞ্জন করিবে।

আমার ছড়া—শ্রীসুনির্ম্মল বসু। শিল্পী—শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশু সাহিত্য সংসদ লিঃ, ৩২এ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য ১৷৷০।

অপরূপ অঙ্গসজ্জায় বইখানি ঝলমল করিতেছে। যেমন ছড়া তেমনি ছবি। একদিকে শিল্পীর কোমল তুলিকা-সম্পাতে আঁকা জলরঙা ছবিগুলি যেমন একটি মোহন ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়াছে, অন্যদিকে লেখকের মিষ্টমধুর ছড়াগুলি যেন ছন্দ ও সুরের ঝুমঝুমি বাজাইতেছে। পূর্ণ পৃষ্ঠাব্যাপী ছবি, বড় বড় টাইপে ছাপা বইখানি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

ছুটির দিনে মেঘের গল্প—শ্রীশশীভূষণ দাশগুপ্ত। শিল্পী—শ্রীসূর্য্য সেন। শিশু সাহিত্য সংসদ লিঃ, ৩২এ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য ১৷০

প্রভৃতি। লেখকের গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, মৌলিক গবেষণা ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে রচিত এই পুস্তকখানি সামুদ্রিক শাস্ত্রালোচকদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

সাধনাগীতি (২য় খণ্ড)—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী। 'দামোদর আশ্রম' পোঃ রঘুদেবপুর, জেলা হাওড়া হইতে শ্রীঋষীকেশ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। ১১৪ পৃ., মূল্য [illegible] টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থের এই দ্বিতীয় খণ্ডে মোট এক শত সাধন-সঙ্গীত গ্রন্থকারের প্রাণের ভক্তিরসধারায় অভিষিক্ত হইয়া পরিবেশিত হইয়াছে। গানের সুর ও তাল উল্লিখিত থাকিলে ভাল হইত। গানের ভাব এবং ছন্দের মাধুর্য প্রশংসনীয়। গ্রন্থের মূল্য অপেক্ষাকৃত সুলভ হওয়া উচিত ছিল।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

আঁখিতে রহ গো—শ্রীআশিস গুপ্ত। বারেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য—৩৷৷০।

গল্পসঙ্কলন। নন্দদুলাল, সহধর্ম্মিণী, আমাদের যুগের সুনন্দ এবং হে ঈশ্বর—এই চারিটি গল্প পুস্তকখানিতে স্থানলাভ করিয়াছে। গল্পের বিষয়বস্তু অতি সাধারণ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আশেপাশে এমনি ধরণের ঘটনা প্রায়ই চোখে পড়ে, আমরা চাহিয়া দেখি—পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাই। কিন্তু, লেখক শুধু ঘটনা-প্রবাহের নির্বিকার দর্শক নহেন। তিনি হৃদয় দিয়া সৃষ্ট চরিত্রগুলির দুঃখবেদনা অনুভব করিয়াছেন এবং তার অনুভূতিকে সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করিয়াছেন। প্রত্যেকটি গল্প সুলিখিত। শেষ করিবার পরেও যেন মনের মধ্যে রেশ থাকিয়া যায়।

হে অতীত—শ্রীভূপতিনাথ দাস। ২০এ, [illegible] ষ্ট্রীট, টালা, কলিকাতা। মূল্য [illegible]।

হে অতীত এবং [illegible] এই দুইটি গল্প পুস্তকখানিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথম গল্পটি উপভোগ্য—চরিত্রসৃষ্টির কৌশলে এবং সুন্দর বর্ণনাভঙ্গীর জন্য সুখপাঠ্য। দ্বিতীয় গল্পটি অতি সাধারণ শ্রেণীর।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

দ্রষ্টব্য শ্রীযুক্ত অনিলকুমার আচার্য্যের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে ত্রিপুরার দান' প্রবন্ধের অধিকাংশ ছবি [illegible] প্রকাশের সৌজন্যে প্রাপ্ত।
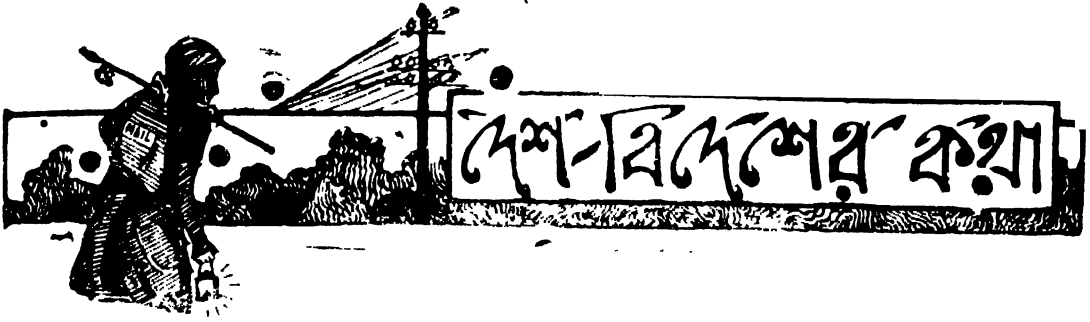
শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর সম্মান

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

ইউনেস্কোর ডেপুটি ডাইরেক্টর মিঃ পি কৃপালের ঘোষণা হইতে জানা গিয়াছে যে, ইউনেস্কোর উদ্যোগে সাধারণ শিক্ষা এবং সমাজ-উন্নয়ন ক্ষেত্রে চারু ও কারুশিল্পের স্থান সম্পর্কে বর্তমান বৎসরে টোকিওতে একটি 'এশীয় আঞ্চলিক সেমিনার' (Asian Regional Seminar) অনুষ্ঠিত হইবে।

মিঃ কৃপাল পি-টি-আইয়ের নিকট বলেন যে, মাদ্রাজ আর্ট কলেজের "শ্রেষ্ঠ ভারতীয় শিল্পী এবং শিল্পশিক্ষক" ডি. পি. রায় চৌধুরীর পরিচালনাধীনে উক্ত সেমিনার অনুষ্ঠিত হইবে।

এই সেমিনার সমগ্র জাপানে বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়াছে। সেখানকার শিল্পী এবং শিল্পানুরাগী সাধারণ লোকেরা আশা করেন যে, এই অনুষ্ঠান তাহাদিগকে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের শিল্পী এবং শিল্পশিক্ষকদের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ দান করিবে। এই উপলক্ষে একটি আন্তর্জাতিক শিশু-শিল্প-প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হইবে।

১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনের সময় সেক্রেটারিয়েট অভিযানকারী সাত জন শহীদের স্মৃতিরক্ষার্থে বিহার গবর্ণমেণ্ট পাটনা সেক্রেটারিয়েটের সম্মুখে একটি শহীদ-স্মরণী (Martyrs' Memorial) প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহার উচ্চতা হইবে সাড়ে সাত ফুট, নির্ম্মাণব্যয় পড়িবে দুই লক্ষ টাকা এবং ইহা শেষ হইতে দুই বৎসর লাগিবে। ইহার পরিকল্পনা ও নির্ম্মাণের জন্য বিহার রাজ্য-সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া ভাস্কর শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী পাটনায় গেলে পর "পাটনা শিল্পকলা পরিষদের" উদ্যোগে সিংহ লাইব্রেরী হলে ৮ই জানুয়ারী তাঁহাকে সংবর্দ্ধিত করা হয়।

স্থানীয় শিল্পীদের সহিত আলোচনা-প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ বলেন যে, "আর্ট ফর আর্টস সেক" এই নীতিতে তাঁর অল্পই আস্থা আছে। শিল্পী যদি শুধু নিজের শিল্পের রূপায়ণ লইয়া অতিমাত্রায় ব্যাপৃত থাকেন তাহা হইলে সমাজের সেবা করিবার পক্ষে তিনি অনুপযুক্ত হইয়া পড়েন।

১৯শে জানুয়ারী সুহৃদ পরিষদ লাইব্রেরীতে এক আলোচনা-সভার আয়োজন হয়। বিচারপতি এস. কে. দাস আই-সি-এস-এর অনুরোধে খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। অতঃপর দেবীপ্রসাদ শিল্পকলার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

'ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরে'ও দেবীপ্রসাদকে সংবর্দ্ধিত করা হয়। এতদুপলক্ষে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীগণ কর্তৃক 'কথাকলি' এবং মণিপুরী নৃত্য প্রদর্শিত হয়।

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়ের সম্মান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বৎসরের জগত্তারিণী স্বর্ণপদক কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়কে প্রদান করিয়াছেন। প্রবীণ সাহিত্য-সেবীর এই সম্মানলাভে সাহিত্যানুরাগী মাত্রেই আনন্দিত হইবেন।

অমরনাথ রায়

শ্রীহট্ট সুনামগঞ্জের খ্যাতনামা জমিদার ও প্রত্নতাত্ত্বিক অমরনাথ রায় গত ২রা মাঘ পঁচাত্তর বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন। অমরনাথ ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত শ্রীবাড়ীর প্রসিদ্ধ দত্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রপিতামহ হরগোবিন্দ রায় নানা স্থানে ভূসম্পত্তি সংগ্রহ করিয়া প্রচুর বৈভব ও প্রতিপত্তির অধিকারী হন। তবে লক্ষ্মীর কৃপা তাঁহাকে সরস্বতীর আরাধনায় পরাঙ্মুখ করে নাই। তিনি নানা গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছিলেন এবং নিজে গ্রন্থরচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় হরগোবিন্দের বিশাল গ্রন্থ পঞ্চম বেদসার নির্ণয়ের বিস্তৃত পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। হরগোবিন্দের সুযোগ্য বংশধর অমরনাথ প্রপিতামহের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। প্রথম জীবনে একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী হিসাবে নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি আসাম ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, সুনামগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি ও লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্য ছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি মধ্যপন্থী ছিলেন। বাগ্মিতা, সততা ও তীক্ষ্ণ ধীশক্তির জন্য তিনি সহকর্ম্মীদের ও পরিচিত সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন। রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি বিদ্যাচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই পণ্ডিত-সমাজে প্রতিষ্ঠা

অমরনাথ রায়

অর্জ্জন করেন। প্রাচীন ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁহার লেখা অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ দেশ-বিদেশের বহু প্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। একাধিক প্রবন্ধ পণ্ডিতসম্প্রদায়ের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ফলে তদানীন্তন ভারত-সরকার এক দিকে যেমন তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন—অন্য দিকে তেমনি ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশন নামক পণ্ডিত প্রতিষ্ঠানের সদস্য নিযুক্ত করেন।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

চৈত্র

প্রবাসী

Chowringhee

A WEEKLY NEWSPAPER DEFENDING CIVILIZATION AND PROGRESS

12 Netaji Subhas Road (2nd floor), Calcutta-1

Civilization means communities living in peace and harmony with no interference with the individuals forming the communities in their free expression of personal ideas and developing along lines freely chosen by them. Civilized communities work freely for better living conditions and are not hampered in their activities so long as these do not hamper others to follow their own vocations. Civilized men are free and their lives are full and devoid of shackles. True democracy is the political expression of the morality inherent in civilization.

Progress is advancement towards greater benefits in the way of the material and cultural equipment of life. All movements towards a less complete life are contrary to progress. Better and more food, clothing, housing, education, medical aid, recreation and the intellectual and cultural supports of human life constitute progress. Those useless fads and fancies which are often paraded as ideals may have no connection whatsoever with true progress.

Economy of a civilized community means that proper and effective setting of a complicated pattern of production, distribution and consumption, which enables all members of the community to live freely, honourably and fully.

This weekly is no apparatus for mud-slinging or idle and malicious criticism. Whatever is published in it will have a purpose which is in keeping with Freedom, Honour and Progress. We may have to open a few malignant tumours here and there in what may appear to be a surgical manner, but that will be only for the good of the body politic.

Politics, Economics, Science, Art, the Trades and Industries, Cultural Institutions and even the Bazar will have a place in these pages.

Price : Annas Six

TO BE PUBLISHED EVERY MONDAY

WATCH FOR THE DATE !

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীধীরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে কানাডার প্রধান মন্ত্রী লুই সেংকান সেণ্ট লারেণ্টকে 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রি প্রদান। উৎসব-ক্ষেত্রে গমনশীল পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু, কানাডার প্রধান মন্ত্রী এবং ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে দেখা যাইতেছে
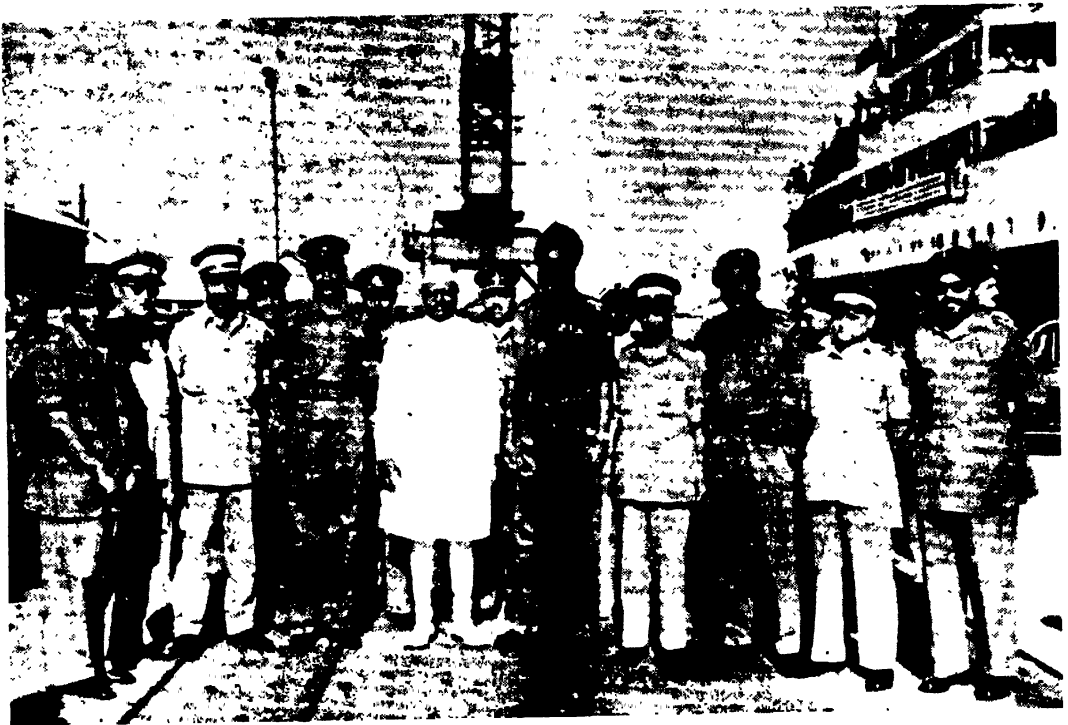
মাদ্রাজের রাজ্যপাল শ্রীশ্রীপ্রকাশ সহ ভারতীয় 'কাষ্টডিয়ান ফোর্সে'র প্রথম সৈন্যদল

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৩শ ভাগ
২য় খণ্ড } চৈত্র, ১৩৬০ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

অপরং বা কিং ভবিষ্যতি

এই বৎসর কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক বিভাগের (Administration) পরীক্ষায় বাংলা দেশের পরীক্ষার্থী একজনও সফলকাম হয় নাই। বাংলার বাহিরের দুই জন বাঙালী—তাহার মধ্যে একজন মহিলা—সাফল্যলাভ করিয়াছেন, একজন দিল্লী হইতে, অন্যজন এলাহাবাদ হইতে। বাংলার ছাত্রদের এই শোচনীয় বিফলতার ইঙ্গিত কি তাহা আমাদের বুঝা প্রয়োজন।

লক্ষ্মীলাভের যে তিনটি পথ প্রাচীন প্রবাদে উক্ত আছে তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাহা অর্থাৎ বাণিজ্য, তাহার দ্বার বাঙালীর সম্মুখে রুদ্ধ। ইহার মূলে আছে বাঙালীর বিলাসপ্রবণতা, অসহিষ্ণুতা এবং অদূরদর্শিতা। দীর্ঘকালের প্রয়াস ও কৃচ্ছ্র সাধন ভিন্ন বাণিজ্যে সফলকাম হওয়া যায় না। ফাঁকির পথে অর্থাগম ক্ষণিক হয়, আবার ক্ষণকালেই চলিয়া যায়। সুতরাং বাঙালী সে কষ্টসাধ্য পথ ছাড়িয়া দিয়াছে এবং ভিন্ন প্রদেশীয় ও ভিন্ন জাতীয় ব্যবসায়িগণ তাহা অধিকার করিয়াছেন। সেখানে এখন আমাদেরই দোষে আমাদের সন্তানদের প্রবেশ নিষেধ! নিজেদের সান্ত্বনা দিবার জন্য আমরা এই দুরদৃষ্টের নানা কারণ দর্শাই, কিন্তু সকল কারণের মূল ঐ এক, শ্রমকাতরতা এবং ফাঁকি দেওয়ার প্রবৃত্তি।

"তদর্দ্ধ" লক্ষ্মীলাভের পথ কৃষি—বাঙালী অভদ্রজনোচিত বলিয়া অশিক্ষিত, দরিদ্র ও ঋণভারক্লিষ্ট চাষীর স্কন্ধে চাপাইয়াছে। চাষীর সন্তান যদি ঐ ফাঁকিজনিত সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত হয়, তবে সেও ঐ পথ হইতে বিমুখ হইয়া পড়ে। ফলে বাঙালী এতদিন অন্নের কাঙাল হইয়া বিদেশীর দ্বারে ঘুরিয়াছে। এখনও সেই পথে বাঙালীর সন্তানের প্রবেশের অধিকার আছে বটে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে দায়ও কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন এবং ফাঁকির অবকাশ নাই। সুতরাং সেখানেও বাঙালী অগ্রসর হইতে চাহে না।

বাকী ছিল চাকুরীর পথ, বুদ্ধিজীবীর পথ। প্রবাদে বলে, রাজকার্য্যে লক্ষ্মীলাভের পথ বাণিজ্যের তুলনায় এক-চতুর্থাংশ মাত্র প্রশস্ত। কিন্তু বাঙালী বুদ্ধিমান, ফাঁকিতে এবং 'উপরি'তে উহার প্রসার এককালে বৰ্দ্ধিত করিয়াছিল এবং সেই কারণে প্রায় এক শতাব্দীকাল ঐ পথেই বাঙালী লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ঐ বুদ্ধির ক্ষেত্রে বাঙালীর অধিকার এবং বাঙালীর প্রভাব দেশব্যাপী হয় এবং কালে ঐ পথে সজ্জন ও মহাজনগণ শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার করায় বাঙালী যশেরও অধিকারী হয়। এইভাবে যে বাঙালী ধন, প্রতিপত্তি ও যশের অধিকারী হয় সে শুধু বুদ্ধিমান ছিল না, সে ছিল সুশিক্ষিত ও সংযমী, বিনয়-গুণপ্রাপ্ত (disciplined)।

আজ সংযমের অভাবে, সুশিক্ষার অভাবে, উদ্দামভাবে জীবনযাত্রা আরম্ভ করার ফলে, বাঙালী সেপথেও ব্যর্থকাম হইতে চলিয়াছে। বাকী রহিল ভিক্ষার পথ।

দোষ কাহার? দৈনিক সংবাদপত্র পড়িলে বা দ্রাক্ষাফললুব্ধ জীববিশেষের মত নেতৃবর্গের চটুল ভাষণ শুনিলে লোকে বুঝিবে সকল দোষের আকর শাসনতন্ত্রের অধিকারী "সরকার"।

কিন্তু এই অবনতির চূড়ান্ত পরিণাম যে দুর্দ্দশা, তাহার ফল ভোগ করিবে কে? সে কথা কেহই বলে না বা ভাবে না, কেননা সে বিচার করিতে গেলে অপ্রিয় ও কঠোর সত্য প্রকাশ পায় এবং তাহাতে "সারকুলেশন" দেবতা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন।

ফল ভোগ করিবে আমাদের ভবিষ্যতের অধিকারী ঐ অপরিণতমস্তিষ্ক, অবোধ, দুর্বিনীত সন্তানেরা। আজ যাহারা উদ্দাম গতিতে রাজপথে লম্ফ দিয়া "আমাদের দাবী মান্‌তে হবে" বলিয়া চলিতেছে, কল্য তাহাদেরই ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া ভিখারীর ঘৃণিত জীবন যাপন করিতে হইবে এবং আরও দুঃখের কথা, ঐ অল্পসংখ্যক হঠকারীদিগের দোষে, এখনও যে শত সহস্র সুবুদ্ধি বালক-বালিকা সংপথে চলিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহাদেরও ভবিষ্যতের পথে কাঁটা পড়িবে।

ইহা এখন সর্ব্বজনবিদিত যে বাংলার সন্তানগণের এই শনিগ্রস্ত বিপরীত বুদ্ধির ফলে দেশে যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার স্রোত বহিতেছে তাহাতে ত্রস্ত হইয়া অনেক সুবৃহৎ কাজ-কারবার ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান অন্যত্র যাইবার চেষ্টা করিতেছে। সম্প্রতি একটি অতি বৃহৎ যন্ত্রনির্ম্মাণ (Machine Tool) প্রতিষ্ঠান বাংলায় জমি পর্য্যন্ত লইয়া পরে বর্ত্তমান অবস্থার বিচার করিয়া দক্ষিণদেশে চলিয়া গিয়াছে। অন্য একটি সুবৃহৎ বল-বিয়ারিং নির্ম্মাণ প্রতিষ্ঠানও

স্থানান্তরে গিয়াছে। এমনকি জাতীয় সরকারের নূতন বিরাট লৌহ ইস্পাত কারখানা যে শত সুবিধা সত্ত্বেও বাংলা ছাড়িয়া উড়িষ্যায় গেল, তাহারও একটি প্রধান কারণ বাঙালী সন্তানের এই বুদ্ধিহীন ও অসংযত বিশৃঙ্খলাপ্রবণতা। উহা ভিন্ন একটি প্রকাণ্ড বৈদ্যুতিক কারখানা ও কয়েকটি সাধারণের উপভোগ্য বস্তু সম্পর্কিত শিল্পায়তন বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মহীশূরে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ঐ সকল প্রতিষ্ঠান লক্ষাধিক বঙ্গসন্তানের জীবিকানির্ব্বাহে সহায়ক হইত। সে পথ রুদ্ধ হইল কাহার দোষে এবং দোষ যাহারই হউক ফলভোগ করিবে কে?

তবে দোষ কাহার এ প্রশ্নেরও উত্তর প্রয়োজন। দোষ সর্ব্বাগ্রে আমাদের—অর্থাৎ পিতামাতার। পিতামাতার বুদ্ধি বিবেচনার অভাব না হইলে সন্তান এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে না। তৎপরে দোষ শিক্ষকের। শিক্ষক ফাঁকিবাজ ও অযোগ্য না হইলে ছাত্র এরূপ অবাধ্য হয় না। তৎপরে দোষ সরকারের। সকল দিকের অনাচার অত্যাচার ও দুর্নীতির সম্মুখে দাঁড়াইবার সাহস এবং যোগ্যতা যাহাদের নাই শাসনতন্ত্র তাহাদের অধিকারে থাকা উচিত নয়, এবং দোষের বিশেষ অংশ বাংলার সংবাদপত্রের। স্বার্থপরতা ও কাপুরুষত্ব ত্যাগ করিয়া দেশের লোককে পথনির্দ্দেশনের দায়িত্ব তাহাদের।

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষাকেন্দ্রে গুণ্ডামীর নিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীধরণী-মোহন মুখোপাধ্যায় সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে ৯ই মার্চ্চ উত্তর ও মধ্য কলিকাতার কয়েকটি পরীক্ষাকেন্দ্রে যে কদর্য্য ঘটনা ঘটে তাহার কতিপয় বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, ঐদিন বেলা ২টার পর এক দল ক্ষুব্ধ ছাত্র চীৎপুরের দিগু মহেশ্বরী বিদ্যালয় কেন্দ্র হইতে বাহির হইয়া আসে। তাহাদের মধ্যে অনেক প্রাইভেট পরীক্ষার্থী ছিল। ক্রমে অন্যান্য ছাত্র এবং বহিরাগতদের সংমিশ্রণে তাহাদের দল ভারী হইতে থাকে। তাহারা উত্তর এবং মধ্য কলিকাতার তিন মাইল ব্যাপী স্থানে বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রায় তিন ঘণ্টা যাবৎ হামলা চালায়।

শ্রীমুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, ইহা বুঝা শক্ত যে শহরে ১৪৪ ধারা জারী থাকা সত্ত্বেও পুলিস প্রায় চার শতাধিক লোকের এই জনতাকে কেন বাধা দেয় নাই। তাহারা সহজেই লালবাজার-স্থিত সদর দপ্তরে সংবাদ পাঠাইতে পারিত যাহাতে এই উন্মত্ত শোভাযাত্রাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া যায়। তাহার পরেই যে ব্যাপারের গুরুত্ব অনুধাবন করা প্রয়োজন তাহা হইতেছে ছাত্রী-দিগের প্রতি আপত্তিজনক ব্যবহার। ছাত্রীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রের হলে গুণ্ডারা প্রবেশ করে, প্রশ্ন এবং উত্তরের খাতা ছিনাইয়া লয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বালিকাদিগের শরীরে হস্তক্ষেপ করা হয় এবং তাহাদের হাত মোচড়াইয়া ফাউণ্টেন পেন প্রভৃতি কাড়িয়া লওয়া হয়। প্রধানা শিক্ষয়িত্রী এবং অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীগণ বাধা দিতে যাইলে তাঁহারাও প্রহৃত হন।

কয়েকটি কেন্দ্রে ঐ সময় প্রকৃতপক্ষে ত্রাসের রাজত্ব চলিতে থাকে এবং কয়েকটি বালিকা অজ্ঞান হইয়া পড়ে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সুবিখ্যাত জননেতা অথবা প্রতিষ্ঠান কেহই এখনও পর্য্যন্ত এই গুণ্ডামীর নিন্দা করিতে অগ্রসর হন নাই। স্কুলগুলির সম্পত্তির যে বিপুল ক্ষতি হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। যে সকল শিক্ষক এবং ছাত্র সাহসের সহিত এই দাঙ্গাকারীদের বাধা দিয়াছেন তাঁহাদের প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। দাঙ্গাকারীদের কয়েকজনের নিকট ছুরিকাও ছিল।

শ্রীমুখোপাধ্যায় বলিতেছেন, "এই প্রসঙ্গে আমরা মনে করি যে বোর্ড সিলেবাসের বহির্ভূত এবং অত্যধিক কঠিন প্রশ্নপত্র রচনা করার জন্যই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। ইতিহাসের প্রশ্নপত্র পাইয়া ছেলেরা বাহির হইয়া আসে। এই প্রশ্নপত্রের ধরণ অন্যান্য বৎসরের প্রশ্নপত্রের ধরণ অপেক্ষা বহুলাংশে পৃথক। এইরূপ প্রশ্নের উত্তরের জন্য ইতিহাসের পাঠ্য বিষয়ের সবিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আমরা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রচলিত নিয়ম আছে যে কোন বৎসরের প্রশ্নপত্রের ধরণ পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের প্রশ্নপত্রের ধরণ অপেক্ষা বহুলাংশে পৃথক হইতে পারিবে না। কোন শিক্ষককে প্রশ্নকর্ত্তা অথবা মডারেটর নিযুক্ত না করার জন্যই এইরূপ ঘটিয়াছে। আমরা আশা করি, এই ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে না। আমরা আরও মনে করি যে, ছাত্রদের স্বার্থে শীঘ্রই বোর্ডের উচিত যথাশীঘ্র পরীক্ষা গ্রহণের বন্দোবস্ত করা।" ("হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড," ১৩ই মার্চ্চ, ১৯৫৪)

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবৃতি সময়োপযোগী হইয়াছে। পরি-স্থিতি উদ্ভবের কারণ যাহা তিনি দর্শাইয়াছেন তাহা বিচারযোগ্য।

শুধু কলিকাতার একাংশে দুই তিনটি কেন্দ্রের কয়েক শত ছাত্র এই প্রশ্নগুলিতে বিচলিত হয়। বাকী ৫৫,০০০ ছাত্র-ছাত্রী উহার উত্তর দিতেছিল। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ কারণ সম্পূর্ণ সমীচীন মনে হয় না।

সংবাদপত্রে এই ঘটনার প্রথম সংবাদ এইরূপে প্রকাশিত হয়:

"মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড পরিচালিত ১৯৫৪ সনের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে ইতিহাস প্রশ্নপত্র অত্যন্ত কঠিন, দুর্ব্বোধ্য এবং কয়েকটি প্রশ্ন পাঠ্যসূচী-বহির্ভূত, এই কারণ দেখাইয়া মঙ্গল-বার এক ছাত্র-বিক্ষোভ দেখা দেওয়ার ফলে কলিকাতা শহরের বিভিন্ন কেন্দ্রে ইতিহাস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই। এই হাঙ্গামার ফলে যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কথা বিবেচনা করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ আজ (বুধবার) ১০ই মার্চ্চ হইতে পুনরাদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত কেন্দ্রে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা স্থগিত রাখার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

পরীক্ষা চলিতে থাকার কালে পরীক্ষা স্থগিত রাখার নির্দ্দেশ বাংলাদেশে পরীক্ষা গ্রহণের ইতিহাসে ইহাই প্রথম।

উত্তর ও মধ্য কলিকাতার বহু কেন্দ্রে ক্রুদ্ধ বিক্ষোভকারীর দল পরীক্ষার গার্ডদের আক্রমণ করে; যে কয়েকখানি উত্তরের খাতা

পরীক্ষার্থীরা পেশ করিয়াছিল, সেগুলি তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়; পরীক্ষার্থীদের অনেককে জোর করিয়া পরীক্ষা হল হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনা হয়; পরীক্ষা হলের দরজা-জানালা ভাঙিয়া দেওয়া হয়। এই হাঙ্গামাকালে কয়েকজন পরীক্ষার্থীনী জ্ঞান হারাইয়া ফেলেন।

কয়েকটি উপদ্রুত কেন্দ্র হইতে পুলিসকে হাঙ্গামার কথা জানান হইলে পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় পনর জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করে বলিয়া জানা গিয়াছে।

নিম্নলিখিত পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হইতে হাঙ্গামার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে: আপার চিৎপুর রোডের দিদু মহেশ্বরী পাঠশালা, সারদাচরণ এরিয়ান ইনষ্টিটিউট, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী, আদি মহাকালী পাঠশালা, শ্যামবাজার এ-ভি-স্কুল, বেথুন কলেজিয়েট স্কুল, টাউন স্কুল, শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়, স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুল, কমলা হাইচ-ই স্কুল, আর্য্যকন্যা মহাবিদ্যালয়, মেট্রোপোলিটান মেন, বালিকা শিক্ষাসদন, ভারতী বিদ্যালয়, সেণ্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল, প্যারীচরণ গার্লস এইচ-ই স্কুল, সরস্বতী বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি।

ইহা দ্রষ্টব্য যে আক্রান্ত ১৭টি কেন্দ্রের মধ্যে ৯টিতে বালিকারা পরীক্ষা দিতেছিল। ইহাতে হাঙ্গামাকারীদিগের মনোবৃত্তির পরিচয় যথেষ্টই পাওয়া যায়।"

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ডের সেক্রেটারী মঙ্গলবার রাত্রে নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন:

"কয়েকজন পরীক্ষার্থী সমেত একদল লোক উত্তর কলিকাতার পরীক্ষা-কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটির পর একটিতে জোর করিয়া ঢুকিয়া গার্ড, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও পরীক্ষার্থীদের মারধর করিয়াছে। এই মারধর হইতে পরীক্ষার্থীনী দল, প্রধানা শিক্ষয়িত্রী এবং অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীরাও রেহাই পান নাই। উত্তরের খাতা নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোনও কোনও পরীক্ষার্থীকে ছোরা লইয়া ভীতি প্রদর্শনও করা হইয়াছে। এই সমস্ত কেন্দ্রে অধিকাংশ পরীক্ষার্থী আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অধিকাংশ কেন্দ্রেই ডেস্ক, বেঞ্চ প্রভৃতি নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে। অতএব আর পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব নহে এবং বুধবার হইতে কোনও কেন্দ্রেই আর পরীক্ষা হইবে না। ইংরেজী ও ইতিহাস সমেত সমস্ত বিষয়েরই পরীক্ষা পরে পুনর্ব্বার গ্রহণ করা হইবে এবং তাহার দিনও পরে ঘোষণা করা হইবে।"

কলিকাতায় অরাজক

বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ২৯শে ফাল্গুনের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীরাজশেখর বসুর প্রবন্ধ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আমরা তাহার এক অংশ নীচে দিলাম।

"হুজুগে মেতে বা দেশদ্রোহীর প্ররোচনায় গুণ্ডামি করা আর দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা এক নয়। মাতৃভূমি রক্ষার জন্য শুধু সাহস নয়, শিক্ষাও আবশ্যক। দেশরক্ষার জন্য যে সৈন্যবাহিনী গঠিত হচ্ছে তাতে যদি দলে দলে বাঙালীর ছেলে সাগ্রহে যোগ দেয়, তবেই তাদের এবং তাদের পিতামাতার সাহস আর দেশপ্রেম প্রমাণিত হবে। এককালে ইংরেজ আমাদের রক্ষা করত এখন অবাঙালী ভারতবাসী রক্ষা করবে—একথা ভাবতেও লজ্জা হওয়া উচিত।

"দেশের উপর একটা প্রচ্ছন্ন আতঙ্কের জাল ছড়িয়ে আছে, প্রজা বা শাসক কেউ তা থেকে মুক্ত নয়। শিক্ষকরা ছাত্রদের ভয় করেন, পরীক্ষার সময় যারা নকল করে তাদের বাধা দিলে প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে। পিতামাতা সন্তানকে শাসন করতে সাহস করেন না, পাছে সে আত্মহত্যা করে অথবা তার সঙ্গীরা সদলে এসে শোধ নেয়। ব্রিটিশ আমলে পুলিস বেপরোয়া ছিল, তার এই ভরসা ছিল যে প্রবলপ্রতাপ মনিব পিছনে আছেন। কিন্তু এখন পুলিস দ্বিধায় পড়েছে, কোন ক্ষেত্রে কতটা বলপ্রয়োগ চলবে তা তার বর্ত্তমান মনিবরা স্থির করতে পারেন না। চোর ডাকাত প্রভৃতি মামুলী অপরাধীদের বেলায় ঝঞ্চাট নেই, কিন্তু আজকাল যে সব নূতন নূতন বেআইনী ব্যাপার হচ্ছে তার বেলায় নির্ভয়ে কর্ত্তব্য পালন অসম্ভব। লোকে দলে দলে বিনা অধিকারে জমি দখল করে, আপিস আর কারখানার কর্ম্মীরা মনিবদের আটকে রাখে, ধর্ম্মঘটীরা রাজপথে লোকের যাতায়াত বাধা দেয়, স্কুল-কলেজ বা আপিস প্রভৃতি কর্ম্মস্থান অবরোধ করে, গুণ্ডারা ট্রাম-বাস পোড়ায়। এ সব ক্ষেত্রে পুলিস উভয় সঙ্কটে পড়ে। নিষ্ক্রিয় থাকলে তাকে অকর্ম্মণ্য বলা হবে, কর্ত্তব্য পালন করলে নিষ্ঠুর অত্যাচারী বলা হবে। অধিকাংশ খবরের কাগজ অপক্ষপাতে কিছু লিখতে সাহস করে না, পাছে কোনও দল চটে। তারা দুই দিক বজায় রাখার চেষ্টা করে, পাঠকরা বিভ্রান্ত হয়। দশ-বারো বছরের ছেলে যখন বলে, নেমে যান মশাইরা, এ গাড়ী পোড়ান হবে, তখন যাত্রীরা সুবোধ শিশুর মতন আজ্ঞা পালন করে। নাগরিক কর্তব্যবুদ্ধি এবং অন্যায় কর্ম্মে বাধা দেবার বিন্দুমাত্র সাহস কারও নেই। ঝঞ্চাটে দরকার কি বাপু—এই হচ্ছে জনসাধারণের নীতি। পাশ্চাত্ত্য পানদোষ আর ইন্দ্রিয়দোষের তুলনায় এই ক্লীবতা আর কর্ত্তব্যবিমুখতা অনেক বড় অপরাধ।

"লোকে শান্তি চায়, অধিকাংশ লোকের এ বুদ্ধিও আছে যে দুষ্টদমনের জন্য বলপ্রয়োগ আবশ্যক এবং মাঝে মাঝে তা মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারে, তার ফলে নির্দ্দোষেরও অপঘাত হতে পারে, যেমন যুদ্ধকালে অনেক অযোদ্ধাও মারা যায়। আমাদের শাসকবর্গ এবং তাঁদের সমর্থকগণও তা বোঝেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য পালনে ভয় পান। বোধ হয় ভবিষ্যৎ নির্ব্বাচনের কথা ভেবেই তাঁরা মতি স্থির করতে পারেন না। জনসাধারণের যদি ধারণা হয় যে কংগ্রেসী সরকার অত্যাচারী, তবে তাঁদের ভোট দেবে কে? যে ছোকরার দল আজ হই হই করে উপদ্রব করছে, নির্ব্বাচনের সময় তাদেরই তো সাহায্য নিতে হবে, তারাই তো 'ভোট ফর অমুক' বলে চেঁচাবে।

অতএব তাদের চটানো ঠিক নহে। খবরের কাগজকেও উপেক্ষা করা চলবে না, তারা জনসাধারণকে খেপিয়ে দিতে পারে। শাসকবর্গ এবং তাঁদের সমর্থকগণ যদি নিজ দলের লাভ-অলাভ জয়-পরাজয় সমজ্ঞান করে নির্ভয়ে কর্ত্তব্য পালন করেন, তবেই বর্ত্তমান অবস্থার প্রতিকার হবে। জনকতক নেতা না হয় নির্ব্বাচনে পরাস্ত হবেন, কিন্তু জনসাধারণ যদি সুশাসনের ফল উপলব্ধি করে, তবে ভবিষ্যতে তারা উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ভুল করবে না।"

এই সকল "গণবিক্ষোভ" নগরীর শান্তিশৃঙ্খলাকে কিরূপ অবস্থায় আনিয়াছে তাহা ২৮শে ফাল্গুনের যুগান্তরে প্রকাশিত নিম্নস্থ সংবাদে বুঝা যায় :

"উত্তর এবং মধ্য কলিকাতার কয়েকটি এলাকায় গুণ্ডা ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকজনের উৎপাতে স্থানীয় জনসাধারণের নিরাপত্তা সম্পর্কে বিপজ্জনক পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে বলিয়া বিভিন্ন সূত্রে অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি জোড়াসাঁকো, চিৎপুর, শ্যামপুকুর প্রভৃতি থানা এলাকায় দুর্বৃত্তদলের সশস্ত্র আক্রমণ, বোমা-সোডার বোতল নিক্ষেপ, রাস্তার উপর মাস্তানামি, জুয়াখেলা, মহিলাদের প্রতি অশ্লীল ইঙ্গিত, চুরি ও রাহাজানির ঘটনা সম্পর্কে নানাবিধ অভিযোগ করা হইয়াছে। এই সমস্ত দুষ্কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুর্বৃত্তদের দমনে এবং শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের দুর্বৃত্তদের কবল হইতে রক্ষার ব্যাপারে কলিকাতা পুলিসের নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কেও স্থানীয় জনসাধারণ অভিযোগ করিয়াছেন।

গত সপ্তাহে জোড়াসাঁকো থানার অন্তর্গত বলরাম দে ষ্ট্রীটে দুর্বৃত্তদল কর্ত্তৃক সশস্ত্র আক্রমণের তিনটি ঘটনা ঘটে। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে শ্যামপুকুর থানার কাঁটাপুকুর লেনে দুর্বৃত্ত দল কর্ত্তৃক আক্রমণ ও ছুরিকাঘাতে জনৈক যুবকের মৃত্যু ঘটে। ইহা ছাড়া, উত্তর ও মধ্য কলিকাতার বিভিন্নাংশে বিশেষতঃ বলরাম দে ষ্ট্রীটে, শেঠবাগান, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, ঘোষবাগান, গ্রে ষ্ট্রীট, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন প্রভৃতি অঞ্চলে বোমানিক্ষেপ, সোডার বোতল ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার, রাহাজানি, জুয়ারী ও মাতালদের হৈ-হল্লা ও মারামারি প্রভৃতি ঘটিয়াছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

জোড়াসাঁকো থানার অন্তর্গত বলরাম দে ষ্ট্রীটের অধিবাসীদের পক্ষ হইতে সম্প্রতি কলিকাতা পুলিস কমিশনারের নিকট এক আবেদনে কঠোরভাবে গুণ্ডা-বদমায়েস শ্রেণীর লোকের উৎপাত বন্ধের জন্য আবেদন জানান হইয়াছে। এই আবেদনপত্রে বলা হইয়াছে : গত এক বৎসর যাবৎ 'রামবাগানের' কুখ্যাত দুর্বৃত্ত দল বলরাম দে ষ্ট্রীটে আড্ডা গাড়িয়াছে। এই সমস্ত দুর্বৃত্ত লোকজন বিভিন্ন ধরণের উচ্ছৃঙ্খল ঘটনা যথা মূল্যবান জিনিষ কাড়িয়া লওয়া, বোমা নিক্ষেপ, লুঠপাট, বলরাম দে ষ্ট্রীটের বিভিন্ন স্থানে জুয়াখেলা এবং মহিলাদের প্রতি অভদ্র আচরণ করিয়া চলিয়াছে। এই লোকজন সর্ব্বদা মারাত্মক অস্ত্রসজ্জিত থাকায় বারবার চেষ্টা করিয়াও হাতেনাতে দুর্বৃত্তদের ধরা সম্ভব হয় নাই। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকজন আত্মরক্ষা করিতে গিয়া আহত হইয়াছেন।

এই সমস্ত ঘটনার বিষয়ে স্থানীয় থানায় বারবার অভিযোগ পেশ করা হইয়াছে। কিন্তু অভিযোগ পেশের পর পুলিশের লোকজনের কয়েকবার আসা-যাওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। মার্চ্চ মাসে মাত্র দুই দিনের মধ্যে এই এলাকায় তিনটি সশস্ত্র আক্রমণ ঘটে। গত ৫ই মার্চ্চ তারিখে দুপুর রাত্রে এবং ৬ই ও ৭ই মার্চ্চ প্রকাশ্য দিবালোকে মোট তিনটি সশস্ত্র আক্রমণ হয়।

গত ৫ই মার্চ্চ গভীর রাত্রে রামবাগানের দুর্বৃত্তগণ ১৪৪ ধারা আদেশ থাকা সত্ত্বেও বলরাম দে ষ্ট্রীট দিয়া কি করিয়া তাসা শোভাযাত্রা বাহির করা সম্ভব হইল তাহাতে আবেদনে বিস্ময় প্রকাশ করা হইয়াছে। ঐদিন শোভাযাত্রীরা বোমা নিক্ষেপ করিয়া নিরপরাধ বালকদের আহত করে।

বর্ত্তমানে দিনে কি রাত্রে শুধু মহিলা ও শিশুদের পক্ষেই নহে, সমস্ত নরনারীর পক্ষেই ঘরের বাহিরে আসা প্রকৃতপক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে।

বহরমপুরে সরস্বতীপূজা

১৮ই ফাল্গুন সংখ্যা "মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকায় উহার বিশেষ প্রতিনিধি এই বৎসর বহরমপুর শহরে সরস্বতী পূজা সম্পর্কে একটি বিশেষ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটির তাৎপর্য্য অল্পবিস্তর সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের পক্ষেই প্রযোজ্য।

সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করিয়া বাঙালী সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট দিক গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বাণীবন্দনার প্রধান পূজারী বাংলার তরুণ-সম্প্রদায়। বহরমপুর শহরেও অন্যান্য স্থানের ন্যায় এ বৎসর বিরাট ধূমধামের সহিত বাণী-অর্চনা হয়। শহরের সর্ব্বত্রই পূজার বিস্তৃতিলাভ ঘটিয়াছে এবং পূজার সংখ্যাও অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু লেখক বলিতেছেন, পূজার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও যে শুভবুদ্ধির প্রেরণায় পূর্ব্বে এই পূজা হইত তাহা বৃদ্ধি পাইয়াছে সেকথা বলা চলে না। "উপরন্তু আমরা এই কথা বলিতে কখনই ইতস্ততঃ করিব না যে, অধুনা সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল আনন্দানুষ্ঠান হইয়া থাকে তাহা কৃষ্টি ও সংস্কৃতির আদৌ পরিপোষক নহে, পরন্তু তাহা কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে তিলে তিলে হত্যা করিতেছে। ইহা অনাচার ও কদাচারের নামান্তর মাত্র।"

এই অভিযোগের কারণ বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধকার লিখিতেছেন, পূজাতে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর জাঁকজমকের প্রাধান্য থাকিলেও তাহাতে সুরুচির যথেষ্ট অভাব ছিল। লেখকের কথায় "দুঃখের বিষয় অধিকাংশ পূজাপ্রাঙ্গণেই বা প্রতিমা নিরঞ্জনের মিছিলে সুস্থ, সুন্দর ও শালীনতাপূর্ণ অনুষ্ঠানের প্রমাণ না পাইয়া আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতীক বাগ্‌দেবীর আরাধনায় পূজারী ও উদ্যোক্তাদের এই শোচনীয় ব্যর্থতায় আমরা অত্যন্ত হতাশ হইয়াছি। নির্ম্মল আনন্দের নামে, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির নামে তাঁহারা যে সকল অনুষ্ঠান আয়োজন করিয়াছিলেন তাহা অতি নিম্ন স্তরের ইয়ার্কি ছাড়া অন্য কিছু ভাবে আখ্যাত হইতে পারে না। সরস্বতী প্রতিমা নিরঞ্জনের মিছিলের পুরোভাগে বোতল হস্তে মত্তলোকের অভিনয় করিতে যাওয়া যে কি কুরুচির পরিচয় দান করে, তাহা আমরা যুবসম্প্রদায়কে সুস্থ এবং স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।"

অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শহরের ভদ্রমহোদয়গণই এই সকল কুরুচিপূর্ণ সঙ ও মিছিলের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই হয় কলেজ বা বিদ্যালয়ের ছাত্র। তদুপরি পাড়ায় পাড়ায় মিছিল লইয়া যে কুরুচিপূর্ণ প্রতিযোগিতা চলে তাহা আরও উৎকট। প্রবন্ধকার লিখিতেছেন, "এই বৎসর এই প্রতিযোগিতার ফলে একটি পাড়ায় প্রতিমা নিরঞ্জন উৎসব সমাধা হইয়া যাইলেও নিছক প্রতিযোগিতা ও জেদের বশবর্ত্তী হইয়া সেই পাড়ার লোকেরা সরস্বতী পূজার বহুদিন পরে পুনরায় প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া নিরঞ্জন উৎসব সমাধা করেন। উদ্দেশ্য হইল নিরঞ্জন উৎসবকে অপরাপর প্রতিবেশী পাড়ার নিরঞ্জন উৎসব অপেক্ষা অধিকতর জাঁকজমকপূর্ণ করিয়া তোলা।"

লেখক এই কুৎসিত অবস্থার আশু প্রতিকারের দাবী করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহা সহজসাধ্য। পূজার উদ্যোক্তা যুবকদের ইহার কুফল বুঝাইতে হইবে। সহজে তাহারা না বুঝিলে চাঁদাদাতারা চাঁদাদান বন্ধ করিয়া দিবেন। যাহারা চাঁদা দেন তাঁহারা সহজেই দাবী করিতে পারেন যে, চাঁদালব্ধ অর্থের দ্বারা কোন কুরুচিপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা চলিবে না। পুলিসও এই ব্যাপারে অনেকখানি সাহায্য করিতে পারে। প্রতিমা নিরঞ্জনের মিছিলের অনুমতি দিবার সময় তাঁহারা উদ্যোক্তাদের নিকট হইতে এই অঙ্গীকার আদায় করিয়া লইতে পারেন যে মিছিলে কোন প্রকারের কুৎসিত আচরণ করা হইবে না।

আমরা কয়েক ক্ষেত্রে বলিয়াছিলাম যে, সরস্বতী পূজার চাঁদার অন্ততঃ ছয় আনা অংশ যাহারা দুঃস্থ ছাত্রদিগের সাহায্যে কোনও ফণ্ডে দিতে প্রতিশ্রুত হইবেন, শুধু তাঁহাদেরই চাঁদা দেওয়া উচিত। বর্ত্তমানে যেভাবে এই চাঁদার খরচ হয়, তাহাতে উহার দশ আনা অপব্যয় হয় বলিয়া মনে হয়। কোন কোনও ক্ষেত্রে আরও অধিক।

বোম্বাই রাজ্যে শিক্ষাব্যবস্থা

৬ই মার্চ্চ এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে "বোম্বে ক্রনিকল্" বোম্বাই রাজ্যের শিক্ষাসমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীদীনকররাও দেশাই সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, বোম্বাই রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এই বৎসর অধিকতর পরিমাণে সাহায্য দেওয়া হইবে। যদিও এই সাহায্য সর্ত্তাধীন তবুও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সরকারের এই ঘোষণায় আনন্দিত হইবেন বলিয়া "বোম্বে ক্রনিকল" মনে করেন। ইহার দ্বারা রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দীর্ঘকালস্থায়ী অর্থাভাবের প্রতিকার হইবার আশা দেখা দিয়াছে। অন্যান্য উপায়েও সরকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এই সবই আনন্দের কথা, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে পৃথিবীর অপরাপর অংশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যে পরিমাণ সরকারী সাহায্য পায় ভারতে শিক্ষায়তনগুলিতে সরকারী সাহায্য এখনও সে পর্য্যায়ে পৌঁছায় নাই। উদাহরণস্বরূপ, ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সরকারের নিকট হইতে তাহাদের আয়ের শতকরা ষাট ভাগ পায়। এই সরকারী সাহায্যের পরিমাণও ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্পাদকীয় মন্তব্যে অবশ্য বলা হইয়াছে যে, ব্রিটেনের সহিত ভারতের ঠিক তুলনা চলে না, কারণ দুই দেশের পটভূমিকা বিভিন্ন।

সরকারী সাহায্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পক্ষে অবিমিশ্র হিতকারী কিনা তাহা নির্ভর করে রাষ্ট্রের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর উপর এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির যোগ্যতার উপর। পত্রিকাটির অভিমতে শিক্ষাক্ষেত্রে সাহায্যদাতার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে যে সকল কথা বলা হয় তাহার পিছনে অনেক যুক্তি আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নতিসাধনের আসন্ন প্রয়োজনীয়তার কথাও অস্বীকার করা যায় না। চতুর্দ্দিক হইতেই আজ বারংবার অভিযোগ উঠিতেছে যে, ভারতের উচ্চশিক্ষার মান অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছে। সরকার আগামী বৎসর হইতে সরকারী কলেজসমূহের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষাদানের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এই পরিপ্রেক্ষিতেই তাহা বিচার করিতে হইবে।

পত্রিকাটি স্বীকার করেন যে, ইংরেজীর পরিবর্ত্তে হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়া কাম্য। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বে উত্তমরূপে ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হইলে পাঠ্য পুস্তক এবং শিক্ষকদের কথা ভাবিতে হইবে। হয়ত সেই সকল কথা বিবেচনা করিয়াই সরকার কেবলমাত্র সরকারী কলেজসমূহে এই নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও পরিস্থিতির অধোগতি হইতে পারে যদি সরকারী কলেজের শিক্ষকগণ এই ব্যবস্থায় মনে মনে অসন্তুষ্ট হন। কারণ তাঁহারা হয়ত প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারিবেন না। হয়ত এই সকল কথা চিন্তা করিয়াই রাজ্য সরকার এই ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষকদের মতামত জানিবার উদ্দেশ্যে একটি সম্মেলন আহ্বানের জন্য বিচারপতি গজেন্দ্রগদকার যে পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহা মানিয়া লইয়াছেন। পত্রিকাটির মতে এই ব্যাপারে শিক্ষকদের মতামতের প্রতি সর্ব্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা কর্ত্তব্য ; এবং কেবলমাত্র এই উপায়েই এই জটিল সমস্যা সম্পর্কে সরকার সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছিতে সক্ষম হইবেন।

শিক্ষকদের মতামতের যথাযথ মূল্য দেওয়া যে অবশ্যপ্রয়োজন—আমরা "বোম্বে ক্রনিকল্"-এর এই অভিমত পরিপূর্ণরূপে সমর্থন করি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই কথা না বলিয়া পারি না যে এই ব্যাপারে সরকার অগ্রণী না হইলে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের আশা কবে বাস্তবে রূপায়িত হইবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। স্বাধীনতালাভের পর সাত বৎসর কাটিতে চলিল, অথচ মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠ্য পুস্তক অথবা শিক্ষক-শিক্ষণ কোন কিছুই করা হইল না। এই অবস্থা নিরসনের জন্য বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রয়োজন এবং প্রত্যেক রাজ্যসরকারের উচিত এই সম্পর্কে মনোযোগী হওয়া।

অন্যদিকে যে সকল রাষ্ট্রের মাতৃভাষা হিন্দী নহে তাহাদের

অবস্থাও বিবেচনার প্রয়োজন। শিক্ষক অভিজ্ঞ কিন্তু রাষ্ট্রভাষায় অজ্ঞ এইরূপ অবস্থা বহুক্ষেত্রেই আছে। ইহার প্রতিকার কি?

বোম্বাই রাজ্যে পাঠ্য পুস্তকের অভাব

পাঠ্য পুস্তকের অভাবে বোম্বাই রাজ্যের ছাত্রদের বিশেষ অসুবিধার কথা আলোচনা করিয়া ৫ই মার্চের "বোম্বে ক্রনিকল" পত্রিকায় "টুইনষ্টার" একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ছাত্ররা যে সকল পাঠ্য পুস্তক পায় নাই তাহাদের মধ্যে কয়েকটি হইল : ভারত সরকারের তথ্য এবং বেতার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন বিধিবদ্ধ আইনের বই, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত অর্থনৈতিক সংগঠন সম্পর্কিত একটি পুস্তক এবং বি. কম্. ছাত্রদের ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক।

প্রবন্ধকার লিখিতেছেন যে, যদিও সম্প্রতি এই পুস্তকগুলি বাজারে আসিয়াছে তথাপি এই বৎসরের ছাত্রদের তাহাতে খুব বেশী সুবিধা হইবে না।

সরকারী আইনের বই সরকারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী দপ্তর ব্যতীত অপর কেহ প্রকাশের অধিকারী নহে। লেখক এই ব্যাপারে সরকারের অবহেলার নিন্দা করিয়াছেন।

নির্দ্ধারিত পাঠ্য পুস্তক বাজারে না পাইয়া স্বভাবতঃই ছাত্রগণ অপ্রামাণ্য এবং অপেক্ষাকৃত হীনমানের পুস্তক ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং পুস্তক-বিক্রেতারাও সুযোগ বুঝিয়া ঐ সকল বইয়ের মূল্য চড়াইয়া দিয়াছে।

কেবলমাত্র যে কলেজের বই-ই দুর্লভ তাহা নহে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্দ্ধারিত পুস্তকগুলিও বাজারে সহজপ্রাপ্য নয়। প্রবন্ধকার লিখিতেছেন, কেন যে কর্তৃপক্ষ কোন পুস্তক মনোনয়নের পূর্ব্বে উহা বাজারে পাওয়া যায় কিনা তাহা বিচার করেন না, তাহা বুদ্ধির অগম্য। যদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে অধিকতর দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় না দেন তবে পাঠ্য পুস্তকের দুর্ভিক্ষের কোন সমাধান হওয়া শক্ত।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও অনুরূপ। প্রতি বৎসরই স্কুল ফাইন্যাল হইতে শুরু করিয়া এম-এ পর্য্যন্ত যে সকল পাঠ্য পুস্তক মনোনীত হয় তাহাদের অধিকাংশই কলিকাতার বাজারে সহজপ্রাপ্য থাকে না। বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রায়ই এ সম্পর্কে বিভিন্ন পাঠকের চিঠি দেখা যায়, কিন্তু ব্যবস্থার কোন উৎকর্ষ আজিও দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস শিক্ষা

মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে নয়াদিল্লীতে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের সভাপতিত্বে ইতিহাসের অধ্যাপকবৃন্দের এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে আঞ্চলিক ভাষা অথবা রাষ্ট্রভাষার প্রবর্ত্তনের সুপারিশ করেন। কনফারেন্সে বলা হইয়াছে যে, সাহায্য এবং বিভিন্ন পুরস্কারের দ্বারা ইতিহাস শিক্ষকদিগকে ঐ সকল ভাষায় পুস্তক রচনায় উৎসাহ দিতে হইবে।

সম্মেলনে অন্যান্য কয়েকটি সুপারিশও করা হয়। তন্মধ্যে একটিতে ইতিহাস শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তনের সুপারিশ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শ্রেষ্ঠ মনীষীদিগের জীবনচরিতের সাহায্যে ইতিহাস শিক্ষা দিতে হইবে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যতালিকায় সাংস্কৃতিকদিগের উপর জোর দেওয়া হইবে এবং সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে রাজনৈতিকদিকের উপর জোর দেওয়া হইবে। কারিগরি বিদ্যালয়গুলিতে ভারতসহ পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশগুলিতে অর্থনৈতিক এবং শিল্পবিকাশের ইতিহাসের উপর জোর দেওয়া হইবে। ভবিষ্যৎ কূটনীতিবিদ্ এবং রাষ্ট্রশাসকগণকে যে সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে তথায় ভারতের রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক ইতিহাস বিশদরূপে পড়ান হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অপরাপর প্রধান দেশগুলির শাসনতান্ত্রিক এবং সাংগঠনিক ইতিহাস শেখান হইবে।

কলেজে যাহাতে অন্য বিষয়ের ছাত্ররাও ইতিহাস পড়ে এবং ইতিহাসের ছাত্ররাও যাহাতে অন্যান্য বিষয় পড়ে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত কনফারেন্স সুপারিশ করিয়াছেন। সকল সরকারী পরীক্ষাতেই ভারতের ইতিহাস অবশ্য পঠিতব্য বিষয় হিসাবে রাখিতে হইবে।

ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তকগুলিতে আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার উপর জোর দিতে হইবে। ভারত-সরকার যাহাতে ইউরোপীয়, এশীয়-আফ্রিকান এবং আমেরিকান ইতিহাস পঠনপাঠনের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন তজ্জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষকের আদান-প্রদান এবং ভারত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে শিক্ষক বিনিময়ের জন্যও সম্মেলনে সুপারিশ করা হইয়াছে।

রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি

২৩শে ফেব্রুয়ারী রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশনের এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, কমিশনের উপর ন্যস্ত কার্য্য দ্রুত সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে কমিশন প্রশ্নাবলী প্রচার করিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা জনসাধারণ এবং রাজ্য-পুনর্গঠন সম্পর্কে আগ্রহান্বিত সমিতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাঁহাদের মতামত ও পরামর্শ লিখিতভাবে পেশ করিবার আবেদন জানাইয়াছেন। সকল সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাবই ঐতিহাসিক ও পরিসংখ্যান তথ্যের দ্বারা সমর্থন করিয়া পাঠান উচিত। কোন নূতন রাজ্য গঠনের প্রস্তাব করা হইলে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে এক বা একাধিক মানচিত্র পেশ করিতে হইবে। ১৯৫৪ সনের ২৪শে এপ্রিলের পূর্ব্বে নয়াদিল্লীতে কমিশনের নিকট প্রত্যেক স্মারকলিপির ছয় কপি করিয়া পাঠাইতে হইবে।

রাজ্য পুনর্গঠন সম্পর্কে পুরুলিয়ার "মুক্তি" পত্রিকার ২৪শে ফাল্গুনের সম্পাদকীয়ের যে অংশ আমরা নিম্নে দিলাম তাহা প্রণিধান যোগ্য। আশ্চর্য্যের বিষয়, এ সম্পর্কে বাঙালী সাধারণ কিরূপ অস্বাভাবিক ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেছে!

"সম্প্রতি পাটনার (উড়িষ্যার) মহারাজা দিল্লীতে লোক সভার

অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "আমি এই অভিযোগ করিতেছি যে—মানভূম, সিংভূম ও সেরাইকেলায় কোনরূপ সভা সরকারের অস্তিত্ব নাই।" সেরাইকেলায় তিনি একদিন মাত্র যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাই তাহাকে এইরূপ তীব্র মন্তব্য করিতে বাধ্য করিয়াছে। ইহা উপেক্ষার নহে।

অথচ এইসব অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ লোককে এইরূপ একটি শাসনের অধীনে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া দৈনন্দিন জীবন কাটাইতে হইতেছে। ইহা যে কিরূপ মর্ম্মন্তুদ তাহা একমাত্র ভুক্ত-ভোগীদেরই উপলব্ধির বিষয়, অন্য কাহারও নহে। মানভূম জিলায় কয়েক বৎসর ধরিয়াই যে সমস্ত ঘটনা বিহার সরকার কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে তাহাতে মানভূমবাসী বহু পূর্ব্বেই উপলব্ধি করিয়াছে যে এখানে কোন সভ্য গবর্ণ্মেণ্টের অস্তিত্ব নাই। সেই জন্যই জীবের জীবনের জন্য নিঃশ্বাস বায়ু যেমন প্রয়োজন, মান-ভূমবাসীদের মানুষের জীবনের জন্য বিহার কংগ্রেস গবর্ণ্মেণ্টের শাসনাধীন হইতে মুক্তি তেমনিই অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমানে যে ঘটনাবলী অনুষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে তাহা পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনাকেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ইংরেজ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে ভারতবর্ষ ছাড়িয়াছে, কিন্তু বিহার গবর্ণ্মেণ্ট মানভূমকে অবৈধভাবে বিহারে রাখিতে উন্মত্ত ও নৃশংস হইয়া উঠিয়াছে। কমিশনের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং এই রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশনের কার্য্য যতই অগ্রসর হইতেছে ততই তাহাদের উন্মত্ততা ও নৃশংসতা বাড়িয়া চলিতেছে। তাহাদের প্রশ্রয়ে রাজ-কর্ম্মচারীরাও সর্ব্বক্ষেত্রেই আরও উন্মত্ত ও নৃশংস হইয়া উঠিয়াছে। ইহার জন্য বিশেষ করিয়া ঘটনাবলী উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ ইহা এরূপ অবিরাম গতিতে চলিয়াছে যে ইহা সাধারণ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্যই বলিতে হইতেছে যে, বিহার গবর্ণ্মেণ্টের এইরূপ আচরণ তাহাদের চরিত্রের সাময়িক প্রকাশ নয় ইহা তাহাদের মূলগত বলিয়া ইহাদের নিকট হইতে কোনক্রমেই, কোন সময়ের জন্যই কোন প্রকার আশা করিবার সামান্যতম সুযোগও ইহারা রাখে নাই। দেশবাসীর স্বরাজ জীবনে ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার হইলেও ইহা এমন নিষ্ঠুর বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে যে ইহাদের হাত হইতে মুক্ত না হইলে আর বাঁচোয়া নাই।

স্বাধীন ভারতবর্ষে যদি কোন স্থান বা ভারতবর্ষের কোন অংশ সম্বন্ধে বলিতে হয় যে, সেখানে কোন সভ্য গবর্ণ্মেণ্টের অস্তিত্ব নাই তবে তাহা অপেক্ষা অধিকতর লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয় ভারত-বর্ষের—বিশেষ করিয়া কংগ্রেস গবর্ণ্মেণ্টের—পক্ষে আর কিছু হইতে পারে কিনা জানি না। ভারতবাসীর স্বরাজ-জীবনের প্রাথমিক ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য্য ভাষার ভিত্তিতে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির পুনর্বিন্যাসের জন্য ভারত গবর্ণ্মেণ্ট কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন—কমিশনের নিকট সকলেরই এ বিষয়ে নিজেদের অভিমত পেশ করিবার দ্বার উন্মুক্ত; তোমাদের যদি কিছু বলিবার থাকে তোমরা বল, কিন্তু এ কি? সরকারী শক্তির আড়ম্বর দেখাইয়া অমানুষিক সন্ত্রাসবাদের বিভীষিকা দ্বারা তোমরা জনগণকে আতঙ্কিত করিয়া রাখিতে চাহিতেছ; জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা, তাহাদের সম্মান, তাহাদের মর্য্যাদা তাহাদের নারীর মর্য্যাদা, গৃহস্থ জীবনের পবিত্রতা, নিরাপত্তা আজ উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মত্ত কর্ম্মচারীদের পদতলে দলিত ও মথিত।"

কেন্দ্রীয় বাজেট

১৯৫৪-৫৫ সনের কেন্দ্রীয় বাজেট বৈচিত্র্যবিহীন—জনসাধারণের মনে আশার বাণী কিছু বহন করিয়া আনে নাই, উপরন্তু তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের খরচ কিছু পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। ১৯৪৭-৪৮ সনে কেন্দ্রীয় কর-রাজস্বের মোট আয় ছিল ১৭৭.৫০ কোটি টাকা, ১৯৫১-৫২ সনে কর-রাজস্বের আয় ছিল ৪৫৯.৯৯ কোটি টাকা, ১৯৫৩-৫৪ সনে কর-রাজস্বের আয় হইয়াছে ৩৬৩.৫১ কোটি টাকা আর আগামী বৎসরের নূতন বাজেটে কর-রাজস্বের আয় ধরা হইয়াছে ৩৭৯ কোটি টাকা। নূতন বাজেট অনুসারে মোট রাজস্ব আয় হইবে ৪৪১ কোটি টাকা এবং আরও অতিরিক্ত আয় হইবে ১১.৮৫ কোটি টাকা।

ইদানীং প্রত্যক্ষ কর হইতে অপ্রত্যক্ষ করের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যবহার-শুল্ক হার ক্রমবর্দ্ধমান, এবং নূতন বাজেট অনুসারে ব্যবহার-শুল্ক আরও বৃদ্ধি পাইবে, যেমন গুপারী, সাবান ইত্যাদির উপর। ব্যবহার-শুল্কভার গ্রামের চেয়ে শহরের লোকের উপর বেশী। শহরে মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ২০ ভাগ বাস করে এবং ইহারাই প্রধানতঃ ব্যবহার-শুল্কের শতকরা ৯০ হইতে ৯৫ ভাগ অংশ প্রদান করে। তাই অনেকে মনে করেন যে, গ্রামেও যাতে এই শুল্কের ভার ন্যায্যতঃ বণ্টিত হয় তাহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

১৯৫১ সনে মাসিক গড়পড়তায় শিল্পোৎপাদনের সূচী ছিল ১১৭, ১৯৫২ সনে ছিল ১২৯ এবং ১৯৫৩ সনে ছিল ১৩৪। অধিকন্তু, অনেক নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে, সুতরাং সেই অনুপাতে আয়কর বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৫২-৫৩ সনে নিগম কর (Corporation tax) এবং আয়করের মোট পরিমাণ ছিল ১৮৫ কোটি টাকা, ১৯৫৪-৫৫ সনে ইহার পরিমাণ ধরা হইয়াছে প্রায় ১০৮ কোটি টাকা।

কর অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট দাখিল না করা পর্য্যন্ত নূতন কোন প্রধান কর আরোপ করা হয় নাই। এই কারণে প্রদেশগুলিও গতানুগতিক ভাবে বাজেট তৈয়ার করিয়াছে, ফলে কেন্দ্রের নিকট তাহাদের অধিকতর পরিমাণে ঋণ লইতে হইয়াছে। রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করার কোন প্রচেষ্টা করা হয় নাই। কংগ্রেসের নীতির চৌকিদারী করার দরুন, প্রতিষেধ ব্যাপারে (prohibition) বৎসরে বহু কোটি টাকার আয় হইতে রাষ্ট্র বঞ্চিত হইতেছে। প্রতিষেধ মাত্র কয়েকটি

প্রদেশে আছে, তাহাতেই ক্ষতির পরিমাণ এইরূপ। প্রতিষেধের দরুন ঐ সকল প্রদেশের নৈতিক চরিত্র যে খুব উন্নত হইয়াছে তাহার প্রমাণ হয় না। সুরাপান নিবৃত্ত হয় নাই—কেবলমাত্র রাষ্ট্র তাহার আয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। প্রতিষেধের দরুন ঘাটতি মিটানোর জন্য ঘাটতি খরচার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

কেন্দ্রীয় বাজেটের আয়ের হিসাবে বেশ দু'একটি গোঁজামিল আছে। যেমন, পাকিস্থানের ঋণ শোধ বাবদ ১৮ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। ইহা সর্বজনবিদিত যে, পাকিস্থান তাহার ভারতীয় ঋণ শোধ করিবে না, তবু যে কেন ইহা হিসাবের মধ্যে ধরা হয় তাহা বলা কঠিন। গত বৎসরের বাজেটে পাকিস্থানের দেয় ঋণ আয়ের মধ্যে ধরা হইয়াছিল। পাকিস্থান এক পয়সাও ঋণ শোধ করে নাই, ফলে ১৮ কোটি টাকার ঘাটতি হইয়াছে।

নূতন বাজেটে রাজস্ব আয়ের হিসাবে দেখা যায় যে, শুল্ক আয় হইবে ১৭৫ কোটি টাকা, কেন্দ্রীয় ব্যবহার শুল্ক পাওয়া যাইবে ৯২ কোটি টাকা, আয়কর ও নিগমকর মিলিয়া আয় হইবে ১০৯ কোটি টাকা, সম্পদা শুল্ক আয় হবে ২৫ লক্ষ টাকা, আফিং হইতে আবগারী কর উঠিবে ১'৮৫ কোটি টাকা, ইত্যাদি। খরচের মধ্যে দেশরক্ষা কার্যের জন্য খরচা হইবে ২০৫ কোটি টাকা, প্রশাসনের (Civil Administration) জন্য ৮৬ কোটি টাকা, ঋণ শোধ বাবদ ৪০ কোটি টাকা, প্রদেশগুলিকে অনুপূরক সাহায্য বাবদ ৩২ কোটি টাকা, ইত্যাদি।

কেন্দ্রীয় বাজেটের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে ২৫০ কোটি টাকার ঘাটতি খরচ—সোজা কথায়, এই টাকাটা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধার লওয়া হইবে। রাষ্ট্রের খরচ সাধারণতঃ কর-রাজস্ব দ্বারা কিংবা জনসাধারণের কাছ হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া মিটান হয়। কিন্তু পরিকল্পিত অর্থনীতি অতিরিক্ত খরচের চাহিদা করে—যাহা সাধারণ আয় দ্বারা কুলান যায় না। তাই পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য কিছু পরিমাণ ঘাটতি খরচের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কর-রাজস্ব সবরকম ভাবে আদায় করার চেষ্টা করা উচিত। অতিরিক্ত ঘাটতি খরচের টাকার মূল্য হ্রাস পাইলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইবে। আর ঘাটতি খরচের পরিমাণে যদি ব্যবহারী দ্রব্য (consumer goods) বৃদ্ধি না পায়, তাহা হইলে দ্রব্যমূল্য অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে। প্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধির কোন প্রচেষ্টাই করা হয় নাই, শিল্পপতিরা চীৎকার করিয়া করিয়া তাঁহাদের দাবী আদায় করিয়া লইয়াছেন মনে হয়।

আর অপ্রত্যক্ষ করবৃদ্ধি এমন এলোমেলোভাবে করা হইয়াছে যে, তাহাতে সুচিন্তিত পরিকল্পনার অভাব প্রতীয়মান হয়। সুপারী, কাপড়কাচা সাবান, গায়েমাখা সাবান, জুতা ইত্যাদির উপর ব্যবহার শুল্ক বসান হইয়াছে। কাঁচা তুলার আমদানীর উপর যে শুল্ক ছিল তাহা রহিত করিয়া দিয়া মিহি সুতার কাপড়ের উপর কর বসান হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে সকল প্রকার কাপড়েরই মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। তুলার উপর হইতে আমদানী শুল্ক রহিত করিয়া দেওয়ার ফলে কাপড়ের মূল্য কিছু পরিমাণ হ্রাস পাওয়া উচিত ছিল।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কমিশন তাহাদের রিপোর্টে ভারতের ঘাটতি খরচ সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে কিছু পরিমাণ ঘাটতি খরচ প্রয়োজন, কিন্তু ঘাটতি খরচের মুদ্রামূল্য হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধেও তাঁহারা সাবধান করিয়া দিয়াছেন। বেকার-সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব বর্ত্তমানে প্রধানতঃ রাষ্ট্রের এবং ব্যাপকভাবে কার্যসৃষ্টির জন্য ঘাটতি খরচের প্রয়োজন। কিন্তু ঘাটতি খরচ যেন উৎপাদনশীল হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট

১৯৫৪-৫৫ সালের নূতন বাজেটে ১৩'৩৮ কোটি টাকার মত ঘাটতি পড়িবে। গত ১৯৫২ হইতে পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ হঠাৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫২-৫৩ সালে ৩২ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত ছিল, ১৯৫৩-৫৪ সালে ৬ কোটি টাকা ঘাটতি পড়ে। শুধু রাজস্ব খরচের ব্যাপারে এই ঘাটতি হইতেছে, উন্নয়নখাতে ক্যাপিটাল একাউণ্টে অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। ১৯৫২-৫৩ সালে রাজস্ব আয় ছিল ৩৭। কোটি টাকা, ১৯৫৩-৫৪ সালে রাজস্ব আয় ছিল ৩৮'৮ কোটি টাকা, এবং আগামী বৎসরে নূতন বাজেটে হইবে ৩৯'৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ গত তিন বৎসরে মোট আড়াই কোটি টাকার রাজস্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং খরচ বৃদ্ধির তুলনায় ইহা কিছুই নয়। ১৯৫২-৫৩ সালে খরচের পরিমাণ ছিল ৩৮'৯ কোটি টাকা, ১৯৫৩-৫৪ সালে ছিল ৫০'৫৭ কোটি টাকা, এবং নূতন বাজেটে খরচের হিসাব ধরা হইয়াছে ৫৩'৩১ কোটি টাকা, অর্থাৎ গত বৎসরের তুলনায় ২'৭৪ কোটি টাকা বেশী।

দেখা যাইতেছে, ঘাটতির পরিমাণ দিন দিন বাড়তির পথে। অবশ্য রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, কিন্তু ক্রমাগত ঘাটতি অবাঞ্ছনীয়। শাসনব্যয় অতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদিও ধরিয়া লওয়া যায় যে, নূতন পরিপ্রেক্ষিতে বর্দ্ধিত পুলিসবাহিনীর প্রয়োজন আছে, তথাপি পূর্ব্বেকার বাংলার এক-তৃতীয়াংশের জন্য এত বড় মন্ত্রীপরিষদের প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না এবং ইহাতে সুশাসনও যে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কার্য্যতঃ সমস্ত ভার দুই জন মন্ত্রীর স্কন্ধে আছে।

উন্নয়ন খাতের খরচ নির্দ্দিষ্ট ধারা অনুসারেই চলিতেছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মোট ৬৯ কোটি টাকা ব্যয় করিবার কথা, এবং ইহার মধ্যে প্রায় ৫৪ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে, ১৫ কোটি টাকা বাকী আছে। দামোদর পরিকল্পনার খাতে পশ্চিমবঙ্গ ৩৬ কোটি টাকা দিয়াছে। অধিকন্তু ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা ও সমাজসেবা পরিকল্পনার জন্য বহু টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের ১৪টি ব্যবসায়িক সংস্থার মধ্যে ১১টি ঘাটতি দিতেছে। এই ক্ষতির পরিমাণের প্রধান কারণ হইতেছে, খাদ্যশস্য

অল্পমূল্যে বিক্রয়, অবশ্য সাধারণের সুবিধার্থে। সামুদ্রিক মৎস্য ধরিবার ব্যাপারটি প্রথম হইতেই প্রহসন ছিল, সেইজন্য ইহাতে ঘাটতি হওয়ায় আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু ষ্টেট ট্রান্সপোর্টের ব্যাপারটি অন্যভাবে দেখিতে হইবে। বর্ত্তমানের রাষ্ট্র কল্যাণকামী, তাহাকে নূতন নূতন কার্য্য সৃষ্টি করিয়া বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। কল্যাণকামী রাষ্ট্রের অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্য মুনাফা লাভ ইহার উদ্দেশ্য নহে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মুনাফার স্থান নাই—এই কথাটি তথাকথিত সমাজতান্ত্রিকরা ভুলিয়া যান। ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট যদি কয়েক হাজার লোকের চাকরীর সংস্থান করিয়া দিয়া থাকে, এবং লক্ষ লক্ষ লোকের যাতায়াত সুগম করিয়া থাকে তবে তাহাই যথেষ্ট। মুনাফা লাভ হয় অপরের শ্রমের শোষণ দ্বারা, রাষ্ট্র কাহাকেও শোষণ করে না। সেইজন্য রাষ্ট্রের ব্যবসায়ে মুনাফার স্থান না থাকাই উচিত। তবে লোকসান হওয়া উচিত নহে।

পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসাদারদের নিকট হইতে ঠিকভাবে বিক্রয়কর আদায় করা হয় বলিয়া মনে হয় না, যদিও ক্রেতারা যথোচিতভাবে কর দিয়া থাকে। বোম্বাই ও অন্যান্য প্রদেশে বিক্রয়করের মোট পরিমাণ অনেক বেশী, কিন্তু বাংলায় এত অল্প পরিমাণে কেন বিক্রয়কর আদায় হয়? মাদ্রাজে সবচেয়ে বেশী বিক্রয়কর, কারণ সেখানে বহুমুখী বিক্রয়কর (multipoint sales tax)। বাংলার বিক্রয়কর আদায়ের ব্যবস্থা আরও কড়াকড়ি হওয়া উচিত।

পশ্চিমবঙ্গের বাজারে ঋণ আছে ৭'৩৫ কোটি টাকা। এ বৎসর আরও চার কোটি টাকার ঋণ তোলা হইবে। কেন্দ্রের নিকট পশ্চিমবঙ্গের ৭৬ কোটি টাকার মত ঋণ আছে, নূতন বাজেটে ইহার পরিমাণ ১৩৮ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইবে।

বাজেটের আলোচনা এখনও চলিতেছে। কি ভাবে চলিতেছে তাহার নমুনা নিম্নস্থ সংবাদে পাওয়া যায়:

"শুক্রবার, ১২ই মার্চ্চ—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় রাজ্য সরকারের পুলিস বাজেটের আলোচনাকালে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং পুলিসের জন্য অর্থ বরাদ্দের যৌক্তিকতার প্রশ্নে সরকার ও সরকার-বিরোধী—উভয়পক্ষে উত্তেজনাপূর্ণ অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগে প্রায় পাঁচ ঘণ্টাকাল সভাকক্ষ সরগরম হইয়া উঠে। দর্শক গ্যালারীগুলি এই দিন পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

বিরোধীপক্ষ হইতে সদস্যের পর সদস্য বক্তৃতা করিতে উঠিয়া পুলিসের, বিশেষ করিয়া কলিকাতা পুলিসের বিরুদ্ধে বিভিন্নপ্রকার অপরাধ ও গুণ্ডামি দমনে নিষ্ক্রিয়তা, অকর্ম্মণ্যতা এবং দুর্নীতির নানা অভিযোগ উত্থাপন করেন। তাঁহারা আরও অভিযোগ করেন যে, কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট পুলিসকে অপরাধসমূহের আস্কারা ও দুর্বৃত্ত দমন অপেক্ষা বিরোধীপক্ষের রাজনৈতিক দলগুলির এবং জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের ও স্বাধীনতা খর্ব্ব করার কাজেই অধিকতর নিয়োজিত করিতেছেন। তাঁহারা পুলিস খাতে ব্যয়-বৃদ্ধির বিরোধিতা করেন।

পক্ষান্তরে সরকার-সমর্থক কংগ্রেস দলের সদস্যগণ বক্তৃতাকালে সমান তীব্রতার সহিত বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রত্যভিযোগ করিয়া বলেন যে, যাহারা বিপ্লবের নামে নানারূপ আন্দোলনের মাধ্যমে দেশে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করিতে উস্কানি দেয়, রাজ্যের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য তাহাদের কার্য্যকলাপ দমনের নিমিত্ত পুলিশের অবশ্যই প্রয়োজন আছে।

বিতর্কের উত্তরে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কংগ্রেস পক্ষের প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে বলেন, "যে গবর্ণমেণ্ট আইনের বিধান প্রয়োগ করিবার পদ্ধতি জানে না, সে গবর্ণমেণ্ট গবর্ণমেণ্ট নামেরই যোগ্য নহে। আমাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা খর্ব্ব করার অভিযোগ করা হইয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায়? সেই স্বাধীনতা কি ট্রাম-বাস পোড়াইবার স্বাধীনতা? সেই স্বাধীনতা কি নরহত্যা, লুটপাট ও জনসাধারণকে সন্ত্রস্ত করিবার স্বাধীনতা? এই গবর্ণমেণ্ট যদি কাহারও বিরুদ্ধে পুলিসী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন, তবে যাহারা ঐ ধরণের কার্য্যকলাপ করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধেই সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।"

ভারতের জাতীয় আয়

১৯৪৯ সনের আগষ্ট মাসে জাতীয় আয় কমিটি গঠিত হয়। ১৯৫১ সনের ১৫ই এপ্রিল কমিটি তাহাদের প্রথম রিপোর্ট দাখিল করেন। কমিটি সরকারের নিকট সম্প্রতি তাঁহাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, ১৯৫০-৫১ সনে ভারতের জাতীয় আয় ছিল ৯,৫৩০ কোটি টাকা। ১৯৪৮-৪৯ সনে এবং ১৯৪৯-৫০ সনে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮,৬৫০ কোটি টাকা এবং ৯,০১০ কোটি টাকা। ঐ তিন বৎসরে ভারতে মাথাপিছু বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ছিল ১৯৪৮-৪৯ সনে ২৪৬'৯ টাকা, ১৯৪৯-৫০ সনে ২৫৩'৯ টাকা এবং ১৯৫০-৫১ সনে ২৬৫'২ টাকা। রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে ১৯৪৮-৪৯, ১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৫০-৫১ সনে সরকারী কার্য্যে অথবা গবর্ণমেণ্ট-নিয়ন্ত্রিত কলকারখানায় নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে; অপরদিকে শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আয় কমিয়াছে। নিম্নে প্রদত্ত তালিকা হইতে একটি মোটামুটি তুলনামূলক ধারণা পাওয়া যাইবে।

বিষয়	১৯৫০-৫১	১৯৪৯-৫০	১৯৪৮-৪৯
জনসংখ্যা (কোটিতে)	৩৫.৯৫৩	৩৫.৪৮২	৩৫.০৩৮
জাতীয় আয় (কোটি টাকায়)	৯৫৩০	৯০১০	৮৬৫০
জনপ্রতি বাৎসরিক আয় (টাকায়)	২৬৫'২	২৫৩'৯	২৪৬'৯
গৃহে উৎপন্ন দ্রব্যাদির মূল্য (কোটি টাকায়)	৯৫৫০	৯০৩০	৮৬৭০
জাতীয় দ্রব্যাদির বাজার মূল্য (কোটি টাকায়)	১০০৩০	৯৪৬০	৯০৬০
সরকারী কলকারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যাদির মূল্য (কোটি টাকায়)	২৯০	২৭০	২৪০

সরকারী পরিচালনার আয় (কোটি টাকার)	৪৩০	৪১০	৪০০
বেসরকারী আয় (কোটি টাকার)	৮৮৩০	৮৩৫০	৮০৩০
জাতীয় ব্যয়ে সরকারী অংশ (,, ,,)	৮২০	৮১০	৮৫০
বেসরকারী আয়ে সরকারী অংশ (,, ,,)	৭৭০	৭১০	৬৯০

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার হিসাব অনুসারে ১৯৫৬ সালে ভারতের জাতীয় আয় ১০,০০০ কোটি টাকা হইবে, অর্থাৎ পরিকল্পনার এই পাঁচ বৎসরে (১৯৫০-৫১—১৯৫৫-৫৬) জাতীয় আয় শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির গতি নির্দিষ্ট হিসাব মতই চলিয়াছে, বরং কিছু পরিমাণ আগাইয়া আছে।

কমিটির প্রাথমিক রিপোর্ট অনুসারে ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছিল ৮৭১০ কোটি টাকা, এখন সংশোধন করিয়া ধরা হইয়াছে ৮৬৫০ কোটি টাকা। ১৯৫০-৫১ সালের মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে কৃষি কার্য্য হইতে আসে ৪৮৯০ কোটি টাকা, শিল্প ও খনিজ উৎপাদন হইতে আসে ১৫৩০ কোটি টাকা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যানবাহন হইতে আসে ১৬৯০ কোটি টাকা, অন্যান্য কার্য্যাবলী হইতে আসে ১৪৪০ কোটি টাকা। মোট ৯৫৩০ কোটি টাকা।

চূড়ান্ত রিপোর্টের একটি পরিচ্ছেদে জাতীয় আয় কমিটি সংগৃহীত তথ্যাদির বিশ্লেষণ করিয়া তথ্যাদির সংগ্রহের উন্নততর ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করেন। কৃষি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য কমিশন দেশের প্রত্যেক গ্রামে প্রতি বৎসর পাঁচ বার তথ্য সংগ্রাহক প্রেরণের পরামর্শ দিয়াছেন। বেতন ও নিয়োগ বিষয়ে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য কমিশন কেন্দ্রীয় শ্রম সংস্থাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দানের সুপারিশ করিয়াছেন। বিক্রয় কর সম্পর্কে তথ্যাবলী প্রকাশে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য কমিশন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। কমিশন কৃষি, পশুপালন-ব্যবস্থা, পরিবহন, কুটীরশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণাগার ও শিক্ষায়তনগুলিতে গবেষণা চালাইবার সুপারিশ করিয়াছেন। কুটিরশিল্প সম্পর্কে গবেষণা চালাইবার ভার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ও রাজ্যগবর্ণমেণ্টসমূহকে লইতে হইবে।

সংগঠনী সুপারিশে কমিশন ভারত সরকারের জাতীয় আয় শাখাকে বিলাতের জাতীয় আয় সম্পর্কিত শ্বেতপত্রের মত ভারতের জাতীয় আয় সম্পর্কে বাৎসরিক বিবরণী প্রকাশের অনুরোধ জানাইয়াছেন। কমিটি এই উদ্দেশ্যে উক্ত শাখাকে স্থায়ী করার প্রস্তাব করিয়াছেন। জাতীয় আয় সম্পর্কে গবেষণার জন্য কমিটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারকে সরকারী সাহায্য প্রদানের সুপারিশ করিয়াছেন।

কমিটির মতে জাতীয় আয় সম্পর্কে একটি অন্তর্বর্ত্তীকালীন উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা আবশ্যক। প্রস্তাবিত উপদেষ্টা কমিটি জাতীয় আয় সম্পর্কিত চলতি কার্য্যাদির পর্য্যালোচনা করিয়া সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন। পরে সরকারী ও বেসরকারী জাতীয় আয় সম্মেলন গঠিত হইলে অন্তর্বর্ত্তীকালীন উপদেষ্টা কমিটি উহার হস্তে সকল দায়িত্ব অর্পণ করিবেন। জাতীয় আয় সম্মেলনের সকল ব্যয় সরকারকে বহন করিতে হইবে।

চূড়ান্ত রিপোর্টের হিসাবে প্রায় শতকরা ১০ ভাগ বা কিঞ্চিদধিক ভুলভ্রান্তি থাকিতে পারে বলিয়া জাতীয় আয় কমিটি স্বীকার করিয়াছেন।

ভারতের কার্য্যরত জনসমষ্টি

জাতীয় আয় কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্টে ভারতে ১৯৪৮-৪৯, ১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৫০-৫১ এই তিন বৎসরে কার্য্যরত ব্যক্তিদের একটি হিসাব দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সনে মোট কার্য্যরত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল ১৩ কোটি ৮৮ লক্ষ, ১৯৫০-৫১ সনে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ১৪ কোটি ৩২ লক্ষ। তিন বৎসরের হিসাব হইতেই দেখা যায়, মোট কার্য্যরত ব্যক্তিদের শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশী নিযুক্ত ছিল কৃষি ও পশুপালনে। নিম্নের তালিকা হইতে তাহা স্পষ্ট হইবে :

কার্য্যরতদের সংখ্যা (হাজারে)

কার্য্যের নাম	১৯৫০-৫১	১৯৪৯-৫০	১৯৪৮-৪৯
কৃষি ও পশুপালন	১০,২৭,১১	১০,১১,৩৫	৯,৯৫,৯১
বন	৩,৫০	৩,৪৯	৩,৪৮
মৎস্য	৫৭৯	৫৭৮	৫৭৭
খনি	৭৮০	৭৭৮	৭৭৭
কলকারখানা	২৯৬৯	৩০৭০	৩০৬৫
ক্ষুদ্র শিল্প	১১৫২১	১১৩২০	১১২৩০
যোগাযোগ	১৯৫	১৭৫	১৬৯
রেলওয়ে	১১৭৮	১১৮১	১১৯২
ব্যাঙ্ক ও বীমা	১৪৭	১৪৭	১৪৭
অন্যান্য বাণিজ্য ও পরিবহন	৯৫৩০	৯৪৩৭	৯৩৪৩
পেশা ও কলাবিদ্যা	৬৪২৫	৬১৯১	৬০১৬
সরকারী শাসন	৩৮৮৬	৩৭৬৫	৩৫৯৭
বাসগৃহের কাজ	২৯৪৭	২৮৪৭	২৭৫১
মোট কার্য্যরত ব্যক্তি	১৪৩২২১ (০০০)	১৪০৯৭৬(০০০)	১৩৮৮০ (০০০)

বোম্বাই রাষ্ট্রীয় পরিবহন বিভাগের ক্রয়নীতি

"বোম্বে ক্রনিকল" পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ যে, বোম্বাইয়ের রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্পোরেশন অতীতে যে ক্রয়নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখার জন্য বোম্বাই বিধান-সভা কর্ত্তৃক নিযুক্ত প্রাক্কলন (estimate) কমিটি এক সুপারিশ করিয়াছেন। যন্ত্রাদির অতিরিক্ত অংশ এবং অন্যান্য কয়েকপ্রকার সরঞ্জাম ক্রয়ে যথেচ্ছা চারিতার জন্য দায়ী কে অনুসন্ধানে তাহা স্থির করিতে হইবে।

৯ই ফেব্রুয়ারী রাজ্য বিধান-সভায় রাজস্ব মন্ত্রী ডাঃ জীবরাজ

মেহ্‌টা সভায় প্রাক্‌কলন কমিটির একাদশ রিপোর্ট উপস্থিত করেন। রিপোর্টে অন্যান্য কথার মধ্যে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্পোরেশনের গুদামে কয়েকটি যন্ত্রাংশ এবং বিভিন্ন প্রকারের সরঞ্জাম প্রভূত পরিমাণে উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। মোট প্রায় এক কোটি টাকা মূল্যের মালের মধ্যে প্রায় ৪৩ লক্ষ টাকা মূল্যের মাল আগামী দুই বৎসরের মধ্যে কর্পোরেশনের কোন কাজেই আসিবে না।

কমিটির নিকট সাক্ষ্যে কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার বলেন যে, যন্ত্রাদির অতিরিক্ত অংশ ক্রয়ের কোন শতকরা হার নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই। কর্পোরেশনের নীতি ছিল ছয় মাসের প্রয়োজনীয় মাল ক্রয় করা এবং ঐ পরিমাণ মাল মজুত রাখা। কিন্তু কোরিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় অন্যান্য সকলের মত কর্পোরেশনও মাল গুদামজাত করা আরম্ভ করে। ডিজেলের অতিরিক্ত যন্ত্রাংশগুলি দুই বৎসরের মত এবং পেট্রোলের দ্বারা চালিত যন্ত্রের অতিরিক্ত অংশ এক বৎসরের মত প্রয়োজনীয় পরিমাণ মজুত করা হয়। জেনারেল ম্যানেজার আরও জানান যে, এই উদ্বৃত্ত মালের পরিমাণ লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন সৈন্য-বাহিনী এবং অপরাপর রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থানগুলির সহিত আলোচনা চালাইতেছে।

প্রাক্‌কলন কমিটি পরামর্শ দিয়াছেন যেন অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ ক্রয়ের নীতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করা হয়। ক্রীত মালের যথাযথ হিসাবরক্ষা এবং প্রতি ছয়মাস অন্তর কেন্দ্রীয় অপিসে গুদামজাত মালের ব্যালান্স সীট যাহাতে পাঠান হয় কমিটি তজ্জন্য সুপারিশ করিয়াছেন।

পরিবহন সংস্থা কর্তৃক বার্ষিক কার্যাবিবরণী এবং অডিট রিপোর্ট প্রকাশে বিলম্বের প্রতি কমিটি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রতি বৎসর বিধান-সভায় এই সকল রিপোর্ট যাহাতে উপস্থিত করা হয় কমিটি সেই মর্ম্মে পরামর্শ দিয়াছেন। অপর এক সুপারিশে কমিটি কর্পোরেশনের ক্ষতির হ্রাসের উপায় অনুসন্ধান করিয়া দেখার কথা বলিয়াছেন। বিজ্ঞাপনের মারফত যাহাতে আয়ের পথ সুগম হয় তজ্জন্য প্রয়োজন হইলে আঞ্চলিক বিজ্ঞাপন সংগ্রাহক সংস্থাগুলির সাহায্য লইবার জন্যও কমিটি পরামর্শ দিয়াছেন। কমিটি আরও বলিয়াছেন যে, রাজ্যের যে সকল অংশে যানবাহনের বিশেষ বন্দোবস্ত নাই সেই সকল ক্ষেত্রে নূতন রুট খুলিতে হইবে। তাহাতে লাভা-লাভের বিচার করা চলিবে না, কারণ জনসাধারণের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখাই রাষ্ট্রীয় সংস্থার প্রাথমিক কর্ত্তব্য।

ডাঃ জীবরাজ মেহ্‌টার নেতৃত্বে পনর জন সদস্য লইয়া গঠিত প্রাক্‌কলন কমিটিতে বিরোধী পক্ষের তিন জন সদস্য আছেন।

কেনিয়া সম্পর্কে "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান"

"ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন যে, কেনিয়া-প্রত্যাগত ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদল যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। "ইহাতে যে সকল তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে তাহা আমাদের মধ্যে অনেকেরই মোটামুটি জানা থাকিলেও ইহাতে যেরূপ সুস্পষ্টভাবে প্রধান সমস্যাগুলি আলোচিত হইয়াছে এবং ছয় জন প্রতিনিধি যেভাবে আলোচনাপ্রসঙ্গে মতৈক্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না—সমগ্র রিপোর্টটির গুরুত্ব এইখানেই।"

পত্রিকা বলেন, রিপোর্টের সহিত কাহারও কাহারও মতানৈক্য থাকিলেও থাকিতে পারে কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনের "রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বিরাট জনসাধারণ যে রিপোর্টটিকে সমর্থন করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। রিপোর্টটি মাউ মাউ আন্দোলন এবং তৎসংক্রান্ত সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে আপোষহীন মনোভাব দেখাইয়াছে। ইহা স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছে যে, পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিয়াছে এবং এই বিপদ সংক্রামিত হইতে পারে কিকিউ এলাকার বাহিরেও। ইহা আরও বলিয়াছে যে পুলিসবাহিনীর কাজকর্ম্মে যথেষ্ট ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় এবং পুলিসবাহিনীকে নূতন করিয়া সংগঠিত করার প্রয়োজন হইবে।"

রিপোর্টের যে অংশে মাউ মাউ দলের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের শপথ গ্রহণের এবং তৎসংক্রান্ত পদ্ধতির বর্ণনা রহিয়াছে তাহা প্রকাশ না করার যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে পত্রিকাটি সেই সিদ্ধান্তে সমালোচনা করিয়া লিখিতেছেন যে, এইভাবে এই অংশটি বাদ দেওয়া ভুল, কারণ জনসাধারণকে সমগ্র চিত্রটি জানিতে দেওয়া কর্ত্তব্য "যাহাতে মাউ মাউ চরিত্রের ভীষণতা সম্পর্কে কাহারও আর কোন ভুল ধারণা না থাকে।"

"আমরা জানিয়া বিস্মিত হইয়াছি যে পুলিসের বিরুদ্ধে অমানুষিক অত্যাচারের জন্য ১৩০ জনকে অভিযুক্ত করা হয় এবং ৭৩ জনকে শাস্তি দেওয়া হয়, বাকী ৪০ জনের বিচারকার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। রিপোর্টে বলা হয়—ইহাতে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার শক্তি সম্বন্ধে জনসাধারণের বিশ্বাস শিথিল হইয়াছে এবং এমন কি মাউ মাউ-এর বিরুদ্ধে যাঁহারা দৃঢ়তার সহিত দাঁড়াইতে পারিতেন তাঁহারাও দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু অপরপক্ষে এই অত্যাচারের অপবাদ নিরাপত্তাবাহিনী সম্পর্কে যাঁহারা দিয়াছেন তাঁহারা ভুল করিয়াছেন সন্দেহ নাই।"

"ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে নিরাপত্তাবাহিনীর শৃঙ্খলা এবং চরিত্রগত সংযমের সত্যতা জনসাধারণ কি পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারে তাহারই উপর নির্ভর করিবে তাহাদের সাফল্য।

ইঙ্গ-মিশর সম্পর্ক

মিশরের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে "অবজার্ভার" পত্রিকা ৭ই মার্চ লিখিতেছেন : মিশরে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা মুখ্যতঃ নির্ভর করে ব্রিটেনের সহিত একটি আপোষরফার উপর। কায়রোতে যে সরকারই অধিষ্ঠিত থাকুক না কেন সকলের পক্ষেই ইহা প্রযোজ্য। বর্ত্তমান শাসকগণ তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ অপেক্ষা এবং সম্ভবতঃ তাঁহাদের পরবর্ত্তিগণ যেরূপ করিতে পারিবেন, তাহা

অপেক্ষাও সুরেন্দ্রপাল সম্পর্কে একটি বাস্তবমুখী চুক্তি করিতে এবং চরম জাতীয়তাবাদীদিগকে দমন করিতে অধিকতর তৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন।

সুদান সম্পর্কে "অবজার্ভার" মন্তব্য করেন যে, মিশর সরকারের বুঝা উচিত, সুদানে স্থায়ী এবং সুশাসক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্রিটেন এবং মিশর উভয়েরই স্বার্থ রক্ষিত হইবে। সুদানের বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থার পরিণতি যাহাতে রাজনৈতিক গণ্ডগোল এবং শাসনতান্ত্রিক অযোগ্যতায় পর্য্যবসিত না হয়, যাহাতে ব্রিটেন অপেক্ষা মিশরের অধিকতর ক্ষতির সম্ভাবনা তাহাই যদি কাম্য হয় তবে কায়রো সরকারের বুঝা উচিত যে সুদানের আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসম্বাদ বাড়াইলে তাঁহাদের স্বার্থ সুরক্ষিত হইবে না, সেই বিবাদের নিরসনেই তাঁহাদের প্রকৃত স্বার্থ। মিশর সরকারের কর্ত্তব্য ব্রিটেনের সহযোগিতায় সুদানবাসিগণ তাঁহাদের নূতন দায়িত্ব বহন করিতে পারেন সেইভাবে তাঁহাদিগকে প্রস্তুত করা।

পূর্ব্ব-পাকিস্থানে নির্ব্বাচন

"ঢাকা, ১২ই মার্চ—প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পূর্ব্ব পাকিস্থানের ৩০৯টি আসনযুক্ত নূতন আইনসভার জন্য পাঁচদিবস-ব্যাপী প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচন আজ শেষ হইল। শেষ দিনের ভোট গ্রহণ দ্বিতীয় বৌদ্ধ নির্ব্বাচন কেন্দ্র ও কতিপয় বর্ণহিন্দুর নির্ব্বাচন কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ ছিল।

ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর কেন্দ্রে কতিপয় রীতিবিরুদ্ধ ঘটনার দরুন আগামী ২৭শে মার্চ পুনরায় নির্ব্বাচন হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গের এই সাধারণ নির্ব্বাচনে ভোটদাতার সংখ্যা ছিল দুই কোটি নরনারী। নির্ব্বাচনকার্য্য শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অনুমান করা যাইতেছে যে, নির্ব্বাচনে শতকরা ৫০ জন ভোটদাতাই অংশগ্রহণ করেন (ইঁহাদের মধ্যে অর্দ্ধেকের কিছু কমসংখ্যক ছিল মহিলা ভোটদাতা)। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ৬ হাজার। এই সব কেন্দ্রের অনেকগুলিই ছিল দুরতিক্রম্য স্থানে অবস্থিত। উত্তর অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা এবং দক্ষিণ অঞ্চলের নদীপ্রধান এলাকায় যোগাযোগ রক্ষা করিয়া ভোট গ্রহণের কাজ সম্পাদন কঠিন হইলেও, নির্ব্বাচনী অফিসারদের মতে সেই সব অঞ্চলে নির্ব্বাচনের কাজ খুব ভালভাবে সম্পাদিত হইয়াছে।

আগামী ১৪ই মার্চ ভোট গণনার কাজ আরম্ভ হইবে এবং ৩০শে মার্চ পর্য্যন্ত গণনার কাজ চলিবে। ১৫ই মার্চ কিছু ফলাফল জানা যাইতে পারে এবং ১৮ই মার্চ হইতে ২০শে মার্চের মধ্যে অধিকাংশ ফলাফল জানা যাইবে।"

লিখিবার সময় পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া যায় তাহাতে মুসলীম লীগের জয় অনিশ্চিত। ইতিমধ্যেই সর্দ্দার ইব্রাহিম করাচীতে ফিরিয়া পরাজয়ের লজ্জা ধোঁয়ায় ঢাকিবার জন্য "ভারতের চক্রান্তে এবং বিপুল অর্থ সাহায্যে এইরূপে মুসলীম লীগের অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে" ইত্যাদি বুলি ছাড়িতেছেন। অবশ্য উঁহার কঠোর প্রতিবাদ সঙ্গে সঙ্গেই সুরাবর্দ্দীর দল করিয়াছেন।

বর্দ্ধমান সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হইতেছে বর্দ্ধমান সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কটির পরিচালনা-ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া বর্দ্ধমানের সাপ্তাহিক পত্রিকা "বর্দ্ধমান বাণী" পর পর দুই সপ্তাহে দুইটি সম্পাদকীয় মন্তব্য করিয়াছেন। "বর্দ্ধমান বাণী" লিখিতেছেন যে, ব্যাঙ্কের ১৮জন ডিরেক্টর—ছয় জন সরকার-মনোনীত, ছয় জন গ্রামাসমিতিগুলি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত এবং ছয় জন বিশিষ্ট অংশীদারদের প্রতিনিধি। গ্রাম্যসমিতিগুলির সংখ্যা ছয় শতের বেশী এবং তাহারা লক্ষাধিক টাকার শেয়ার ক্রয় করিয়াছে। বিশিষ্ট অংশীদারেরা সংখ্যায় দুই শতেরও কম এবং তাহারা মাত্র তের হাজার টাকার শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন। পত্রিকার মতে "যে ভাবে এবং যে কোন দিক হইতেই বিচার করা হোক না কেন বিশিষ্ট অংশীদারগণ সাধারণ অংশীদারদের সহিত সমপ্রতি-নিধিত্বের দাবী করিতে পারেন না, কিন্তু না পারিলেও এই সম-প্রতিনিধিত্ব তাহারা পাইয়া আসিতেছে।" প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী তিনটি পরিবারের মধ্যেই এই বিশিষ্ট শেয়ারগুলি সীমাবদ্ধ।

সম্প্রতি ব্যাঙ্কটির পক্ষ হইতে ৫০ হাজার টাকার বিশিষ্ট অংশ বিক্রয় ঘোষণার পর প্রায় নয় হাজার টাকার শেয়ার ক্রয়ের আবেদন পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ ৫০ হাজার টাকার শেয়ার ক্রয়ের আবেদন পাওয়া যায় নাই এই অজুহাতে কোন শেয়ার বিক্রয় করা হইবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কারণ পরিচালকসভায় বিশেষ গোষ্ঠী বিশিষ্ট অংশীদারদের সংখ্যা বাড়াইবার পক্ষপাতী নহেন। পত্রিকার ভাষায় "পরিচালকসভায় নিজ গোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য বজায় রাখিতে হইলে বিশিষ্ট অংশীদারদের সংখ্যা বাড়ানো চলিবে না এবং এই কারণেই প্রস্তাবের অপব্যাখ্যা করিয়া অংশ বরাদ্দ করেন নাই।"

"বর্দ্ধমান বাণী" লিখিতেছেন, "এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় সমবায় ব্যাঙ্কটি একটি কোটারীতে পরিণত হইয়াছে।

"সমবায় ব্যাঙ্কের এই কোটারীর কথা সমবায় বিভাগের অজ্ঞাত নহে। ব্যাঙ্কের উপবিধির দোহাই দিয়া বিভাগ চলিবে, তাহারা নিরুপায়। সমবায় বিভাগ নিরুপায় বলিয়া আমরা মনে করি না। তাঁহারা ব্যাঙ্ককে নিশ্চয় বলিতে পারেন যে, যে টাকার আবেদন পাওয়া গিয়াছে সেই পরিমাণই বিশিষ্ট অংশ বিক্রয় করিতে হইবে। ব্যাঙ্ক সমবায় বিভাগের উপদেশ অমান্য করিলে কম প্রতিনিধিত্বের পরিবর্ত্তে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করিতে পারেন।"

মুর্শিদাবাদে রেশম সমবায় সমিতি

"মুর্শিদাবাদ সমাচার" ১৮ই ফাল্গুন এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে মুর্শিদাবাদে রেশম শিল্প সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিতেছেন যে, গত বৎসর মুর্শিদাবাদে একটি জেলা রেশম শিল্প সমবায় সমিতি

প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতি প্রতিষ্ঠার পিছনে সরকারের বিভিন্ন প্রতিনিধি বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্তমানে সরকার সমবায় সমিতিকে কোনরূপ আর্থিক সাহায্যদানে অস্বীকৃত হইয়াছেন, ফলে বিপন্ন রেশম শিল্প পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা ব্যাহত হইতে বসিয়াছে। পত্রিকাটি লিখিতেছেন :

"পশ্চিমবঙ্গ সিল্ক কমিটির গত বৎসর জুন মাসে বহরমপুরে যে সভা হয়, তাহাতে শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার মিশ্র, ডাঃ নবগোপাল দাস, শিল্প বিভাগের অধিকর্তা, সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার প্রভৃতির উপস্থিতিতেই রেশম সমবায় সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। সরকারী সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। তাহার ফলে সমিতি রেজিষ্টার্ড করা হয় এবং শেয়ার বিক্রয় আরম্ভ হয়। রেশম শিল্পীবৃন্দ নিজেদের সম্পত্তি বন্ধক দিয়াও রেশম সমবায় সমিতির শেয়ার ক্রয় করিয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। এই ভাবে দশ হাজার টাকা শেয়ারের প্রথম 'কল' সিকি টাকা উঠিয়াছে। রেশম শিল্পীদের আশ্বাস দেওয়া হয় যে পূজার পর রেশম সমবায় সমিতির কার্য্য আরম্ভ হইবে। কিন্তু সে আশ্বাস ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। রেশম সমবায় সমিতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট যে ঋণ চাহিয়াছিল, সে সম্বন্ধে আজ পাঁচ মাস পরে জানা গিয়াছে যে, রেশম সমবায় সমিতিকে সরকার কোন ঋণ এখন দিবেন না। সুতরাং নবজাত মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ সিল্ক ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সোসাইটি যে পরিকল্পনা লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন, আপাততঃ তাহা ধামাচাপা পড়িল বলিয়াই মনে হইতেছে।"

কিন্তু মুর্শিদাবাদে রেশম শিল্প সমবায় সমিতির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ রেশম শিল্প আজ দুর্গতির সম্মুখীন হইলেও এখনও বহু পরিবার রেশমের কাজে গ্রাসাচ্ছাদন করে। তাহারা রেশম সমবায় সমিতি গঠনে বিশেষ আগ্রহান্বিত। উপরন্তু রেশম শিল্পীদের তিনটি পৃথক সম্প্রদায় বসনি, কাটনি ও তন্তুবায়ের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে আজ পর্যন্ত কোন কাজ হয় নাই। সমবায় সমিতি এই দিকে সবিশেষ সাহায্য করিতে সক্ষম হইবে। বসনি সম্প্রদায়কে ভাল বীজ সরবরাহ করা, তুঁতের জমিতে জলসেচের জন্য পাওয়ার পাম্পের ব্যবস্থা করা এবং উপযুক্ত সার সরবরাহ করা নিতান্ত দরকার এবং সমবায় সমিতি সহজেই তাহা করিতে পারে। অনুরূপ ভাবে কাটনি সম্প্রদায়ের জন্য ষ্টীম ফিলেচারের ব্যবস্থা করিলে চরকায় কাটা সুতা অপেক্ষা উন্নততর সুতা পাওয়া যাইতে পারে। যুদ্ধের সময় কাঁচা রেশমের দর থাকায় পশ্চিমবঙ্গে মোট ১১৫টি ফিলেচার সরকারী অর্থসাহায্যে চলিত। বর্তমানে সে স্থলে ২০টিও আছে কি না সন্দেহ। তাহার পর আসে তন্তুবায় সম্প্রদায়ের কথা। ১৯৫০ সালে প্রদত্ত সরকারী হিসাব অনুযায়ী সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে রেশমের বয়ন সংস্থা ছিল ৩৯০০ ; রেশমের তাঁত—৫৮০৫, এবং পাওয়ার লুম ৭৭৫। তন্মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার অংশ—রেশম বয়ন সংস্থা—১৬৭২ ; রেশমের তাঁত ২৬৮৯ এবং পাওয়ার লুম ২৫।

উপসংহারে পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "কাজেই মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্প পুনরুজ্জীবিত করার জন্য রেশম সমবায় সমিতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নাই। বড়ই দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ সম্বন্ধে এ যাবৎ কোনই ব্যবস্থা করিলেন না। নানা ব্যাপারে টাকা মিলিতেছে, মুর্শিদাবাদের মৃতপ্রায় রেশম শিল্পের কথা বলিলেই টাকার অভাবের কথা বলা হইয়া থাকে।"

ডাক ও তার বিভাগের বাঙালীবৈষম্যনীতি

কেন্দ্রীয় ডাক ও তার বিভাগ আসাম সার্কেলে কেরাণী গ্রহণ ব্যাপারে যে ভাষাগত নীতি গ্রহণ করেন তাহার ফলে হিন্দী অথবা অসমীয়া-ভাষী ভিন্ন আর কাহারও পক্ষে তথায় চাকুরী গ্রহণ সম্ভব ছিল না। স্বভাবতই বিভিন্ন স্থান হইতে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাহাতে নির্বিকার থাকেন এবং জানাইয়া দেন যে, যদিও আসাম রাজ্য-সরকার কোনও ভাষাকে রাজভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার মর্য্যাদা দেন নাই তথাপি কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের নীতি পরিবর্তন করিবেন না।

কিছুদিন পরে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রীজগজীবনরাম আসাম পরিভ্রমণে গেলে সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁহার নিকট অভিযোগ করেন। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহাদের আদেশ সংশোধন করিয়াছেন, তবে তাহাতে বাঙালীদের প্রতি বিশেষ অবিচার করা হইয়াছে। সংশোধিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডাক ও তার বিভাগের আসাম সার্কেলকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন বিভাগের আঞ্চলিক ভাষা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যথা :

(১) কামরূপ, গোয়ালপাড়া, গারোপাহাড় এবং খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড় জেলাগুলি লইয়া গঠিত নিম্ন আসাম বিভাগ। এই বিভাগের আঞ্চলিক ভাষা রূপে স্বীকৃত হইয়াছে অসমীয়া, খাসী, গারো এবং হিন্দী।

(২) দারাং এবং নওগাঁ জেলা লইয়া গঠিত মধ্য-আসাম বিভাগ—তথায় আঞ্চলিক ভাষা অসমীয়া এবং হিন্দী।

(৩) লক্ষীমপুর, শিবসাগর এবং নাগা পাহাড় জেলা লইয়া গঠিত উচ্চ-আসাম বিভাগ—আঞ্চলিক ভাষা অসমীয়া এবং হিন্দী।

(৪) কাছাড়, লুসাই পাহাড়, উত্তর-কাছাড় ও মিকির পাহাড় এবং মণিপুর ও ত্রিপুরা রাজ্য লইয়া গঠিত কাছাড় বিভাগ—তথায় আঞ্চলিক ভাষা অসমীয়া, মণিপুরী, লুসাই, হিন্দী এবং বাংলা।

(৫) ডাক-তার বিভাগের আসাম সার্কেলের গৌহাটি আপিস—স্বীকৃত ভাষা অসমীয়া ও হিন্দী।

এই প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে "যুগশক্তি" লিখিতেছেন : "উচ্চ-আসাম, নিম্ন-আসাম ও মধ্য-আসামে বহুসংখ্যক বাঙালী রহিয়াছেন ; তবুও বাংলা ভাষাকে সেখানে বাদ দেওয়া হইয়াছে। আসামে বাঙালীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ন্যূনাধিক এক তৃতীয়াংশ। তবু দেখা যায়, ডাকবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বাঙালীদের প্রতি উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন। উপরি-উক্ত

এলাকায় আসাম সরকার ও গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ডাক ও তার বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ এখানে বাঙ্গালীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না।"

"যুগশক্তি" আরও লিখিতেছেন, "ডাক ও তার বিভাগের কেরাণীর বিজ্ঞাপ্ত পদসমূহে বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের প্রোমোশন ব্যাপারে ডি-পি-টির সার্কুলারে বাংলা ভাষাকে নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ আসামের অন্যতম ভাষা বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বাহিরের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে তাহা স্বীকার করা হইতেছে না—ইহা অদ্ভুত ঠেকিতেছে না কি?

সরকারী নির্দ্দেশের কঠোর সমালোচনা করিয়া ২৭শে মাঘ "সুরমা" সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিয়াছেন, "আমরা এতদিন আসাম সরকারের সঙ্কীর্ণ নীতির সমালোচনাই করিয়াছি। কেন্দ্রীয় সরকারের কোন বিভাগ সম্পর্কে আমাদের তীব্র সমালোচনার আবশ্যক হয় নাই। একদা রেল কর্ত্তৃপক্ষ সম্ভবতঃ পাণ্ডুর চাপে পড়িয়া কাছাড় জেলায় রেলের সাইনবোর্ডগুলিতে অসমীয়া লিপি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। ইহার প্রতিবাদ জানাইবা মাত্র রেল কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের ত্রুটি সংশোধন করেন। কিন্তু ডাকবিভাগ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় দপ্তরের এই ব্যবস্থা কেন?

"এই 'কেন'র জবাব খুঁজিতে গিয়া আমাদের দৃষ্টিপথে মানভূমের চিত্র ভাসিয়া উঠিয়াছে। আসামের চেয়ে হীন এবং সঙ্কীর্ণতর নীতির পোষক বিহার সরকার তথায় তুসু গান গাহিবার অপরাধে অতুল ঘোষ ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণকে দীর্ঘমেয়াদ কারাবাসে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের অপরাধ মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের মমত্ব। যে ভাষায় শিশু প্রথম মাকে ডাকে সে ভাষা রক্ষা করার জন্য অতুল ঘোষের নেতৃত্বে যে আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে পশুশক্তি প্রয়োগে বিহার সরকার তাহা রুখিতে উদ্যত। যে রক্ত এই সঙ্কীর্ণতা শিক্ষা দিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকারের বর্ত্তমান যোগাযোগ মন্ত্রী বিহারবাসী শ্রীজগজীবন রামের ধমনীতে কি একই রক্ত প্রবাহিত হইতেছে—তাহা আমরা আকুল বিস্ময়ে ভাবিতেছি।"

প্রকাশ যে, প্রায় পনর হাজারেরও বেশী বাঙালী প্রার্থী চাকুরীর আবেদন করিয়াছে; কিন্তু সরকারী নির্দ্দেশমত কেবলমাত্র কাছাড় বিভাগের ১০ হইতে ২২টি পর্য্যন্ত শূন্যপদের জন্য ইহাদের দরখাস্ত বিবেচিত হইবে। ফলে বাঙালী যুবকদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, ১৯শে ফেব্রুয়ারীর ইংরেজী সাপ্তাহিক "ক্রনিকল"-এর সংবাদে জানা যায়, যদিও কেন্দ্রীয় ডাক ও তার বিভাগ হিন্দীর বিকল্প হিসাবে সংস্কৃত ভাষাকে আঞ্চলিক ভাষারূপে গণনা করিবেন তথাপি বাংলাভাষার ন্যায়সঙ্গত দাবী তাঁহারা মানিতে সম্মত নহেন।

আসামের বাঙালীদের উচিত এ বিষয়ে সংযুক্তভাবে কেন্দ্রীয় সরকারে তাঁহাদের দাবী প্রেরণ করা। তাহাতেও যদি না হয় তবে সুপ্রীম কোর্টে মৌলিক অধিকার লইয়া আসাম সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করা। বাঙালী সর্ব্বত্রই মরিতেছে সঙ্ঘবদ্ধ না হওয়ার কারণে।

আসাম সরকারের বৈষম্যনীতি

বিভিন্ন সূত্রে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আসাম সরকারের বহুবিধ বৈষম্যমূলক আচরণের সংবাদ আসে। সাপ্তাহিক "যুগশক্তি" এবং "ক্রনিকল্"-এর সংবাদ হইতে দেখা যায় এই আচরণ শিক্ষাক্ষেত্রে কি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ১৫ই মার্চের "যুগশক্তি"র এক সংবাদে প্রকাশ শ্রীরঞ্জনপ্রসাদ সেনগুপ্ত নামক একটি বাঙালী ছাত্র গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় দশম স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও কেবলমাত্র বাঙালী হওয়ার অপরাধে তাহাকে সরকারী বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। ছাত্রটির পিতা আসামের এক জন রেলকর্ম্মচারী। নওগাঁ জেলার উত্তর লামডিঙে তাঁহার পৈতৃক আবাস ও ত্রিশ বিঘা পরিমিত জমি রহিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

উক্ত পত্রিকার ৫ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত আর একটি সংবাদে প্রকাশ যে, শিলচরে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্বাস্তু ছাত্রী শ্রীমতী সবিতা সিংহ, চিত্রা ঘোষ ও বেলা চৌধুরী গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সমগ্র আসামের মধ্যে যথাক্রমে ৭ম, ১১শ ও ১৪শ স্থান এবং কাছাড় জেলায় যথাক্রমে ২য়, ৪র্থ ও ৫ম স্থান অধিকার করে। পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী—"কিন্তু দেখা যায় আসাম সরকার তাহাদিগকে বৃত্তি না দিয়া তাহাদের চেয়ে যাহারা নীচে স্থান পাইয়াছে তাহাদিগকে বৃত্তি দিয়াছেন।

"ইতিপূর্ব্বে মধ্যস্কুল পরীক্ষায় শ্রীমতী দীপ্তি ভট্টাচার্য্য আসামে প্রথম স্থান ও শিলচরের চুনীলাল রায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় আসামে সপ্তম স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও তাহাদিগকে আসাম সরকারের বৃত্তিপ্রদান করা হয় নাই।"

২৬শে ফেব্রুয়ারীর "ক্রনিকল্" পত্রিকায় প্রকাশিত আর এক সংবাদে দেখা যায় যে, "সিলেট ক্রনিকল্"-এর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীকালীকৃষ্ণ দেব ক্রোরীর পুত্র শ্রীবিমলেন্দু দেব ক্রোরী গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এসসি পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও কেবলমাত্র আসামে ডোমিসাইল্ড নহে এই "অপরাধে" তাহাকে গৌহাটি কটন কলেজে ভর্ত্তি হইবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। অনেক ঝড় ঝঞ্ঝা পার হইয়া এই বৎসর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে চতুর্থ স্থান লাভ করিয়া এম-এস্‌সি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ভোলানাথ কলেজ লটারী ও আসাম সরকার

কিন্তু আসাম সরকারের এই বৈষম্যনীতি কেবলমাত্র শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—শিক্ষায়তনগুলির বিরুদ্ধে তাহা সমান উদ্যমের সহিত প্রযুক্ত হইতেছে। ২রা ফাল্গুন

এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে "বাতায়ন" পত্রিকা ধুবড়ী ভোলানাথ কলেজের বিরুদ্ধে এই বৈষম্যমূলক আচরণের নিন্দা করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে ধুবড়ীর একমাত্র কলেজ ভোলানাথ কলেজে এতদিন কেবলমাত্র কলা বিভাগই ছিল, সম্প্রতি বিজ্ঞান বিভাগ খুলিবার পর প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগে ৬০টি ছাত্রছাত্রী প্রবেশলাভ করিয়াছে।

কলেজের পক্ষে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় সংকুলান অসম্ভব। তাই কলেজ কর্তৃপক্ষ জেলাশাসকের নিকট কলেজ লটারীর প্রস্তাব করেন। কিন্তু জেলাশাসক সেই প্রস্তাবে অসম্মত হন।

"বাতায়ন" লিখিতেছেন, "আসাম উপত্যকায় অধিকাংশ বেসরকারী কলেজ গড়িয়া উঠিয়াছে লটারীলব্ধ আয়ের উপর। আসাম উপত্যকায় যে-সব বেসরকারী কলেজে যতবার লটারী অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :

(১) হনুমান বক্স কানৈ কলেজ, ডিব্রুগড়—২ বার।

(২) শিবসাগর কলেজ—৪ বার।

(৩) জগন্নাথ বড়ুয়া কলেজ, জোরহাট—অন্ততঃ ২ বার।

(৪) দরং কলেজ—২ বার

(৫) নওগাঁ কলেজ—২ বার

(৬) রাধাকান্ত সন্দিকৈ মহিলা কলেজ, গৌহাটি—২ বার।"

পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "গোয়ালপাড়া জেলার উপায়ুক্তের বিরুদ্ধে আমরা প্রকাণ্ড অভিযোগ আনিতেছি, তিনি জেলার উপায়ুক্ত হইয়াও দলের উর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। ধুবড়ী কলেজের ছাত্র সংখ্যা বেশি নহে। জেলায় একটি কলেজই চলা দায়। এমতাবস্থায় ধুবড়ীর মাত্র ছয় মাইল মধ্যে গৌরীপুরে তিনি একটি নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য অল্প পূর্ব্বেই একটা ব্যর্থ প্রয়াস করিয়াছিলেন। ভোলানাথ কলেজ সম্পর্কে তাঁহার মনোভাব ইহাতেই সুপরিস্ফুট হইয়াছে।...

"আমাদেরই জেলায় আগমনীতে, বালাজানে, গোকাখাতায় ও বোজাই গাঁওতে প্রকাশ্য ভাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া লটারীর অনুষ্ঠান হইয়াছে। তখন উপায়ুক্তকে আমরা সক্রিয় দেখি নাই।..."

আসামের রাজ্যভাষা

৫ই মার্চ "যুগশক্তি"র সংবাদে প্রকাশ যে আসাম সমতল হইতে নির্ব্বাচিত আসাম ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী সদস্য শ্রীধরণীধর বসুমাতারি অসমীয়া ভাষাকে রাজ্যভাষা রূপে গ্রহণ করার সুপারিশ করিয়া পরিষদের বাজেট অধিবেশনে একটি প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী শিলচরের প্রবীণ আইনজীবী শ্রীরুক্মিণীকুমার দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিলচর বার এসোসিয়েশনের এক বিশেষ সাধারণ সভায় আসাম সরকারের ভাষানীতির তীব্র প্রতিবাদ জানান হয় এবং উক্ত সদস্যের প্রস্তাবের নোটীশের সংবাদে শঙ্কা প্রকাশ করা হয়।

অপর এক প্রস্তাবে সভা কাছাড়ে পাট্টা, নোটিশ ইত্যাদি যাবতীয় সরকারী কাগজপত্রে ক্রমবর্দ্ধমান অসমীয়া ভাষা ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া ইহার প্রতিবিধানার্থ কাছাড়ের পরিষদ-সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মিজো ইউনিয়নের (লুসাই জনগণের একটি সংগঠন) কার্য্যকরী সমিতি উপজাতীয়দের উপর বলপূর্ব্বক অসমীয়া ভাষা চাপাইবার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন ("ক্রনিকল", ১৯শে ফেব্রুয়ারী)।

এই প্রসঙ্গে আসামের একমাত্র ইংরেজী দৈনিক "আসাম ট্রিবিউন" কলিকাতার বাঙালী পরিচালিত পত্রিকাসমূহ এবং শিলচর বার এসোসিয়েশন প্রভৃতিকে যে অসঙ্গত ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন "যুগশক্তি" তাহার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন।

আসামে কারা-সংস্কার

আসাম সরকার সম্প্রতি দীর্ঘমেয়াদী কয়েদীদিগকে বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষাদানের জন্য এক পরিকল্পনা করিয়াছেন। "যুগশক্তি" এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সরকারের এই উদ্যমের প্রশংসা করিয়া এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, "আসাম গবর্মেণ্টের এই পরিকল্পনা শুধু কাগজপত্রে লিপিবদ্ধ না থাকিয়া বাস্তবে পরিণত হইবে।"

কারা-সংস্কারের আসন্ন প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়া পত্রিকাটি লিখিতেছেন : "আমাদের দেশের কারাগারগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। যে-সব অপরাধী এক বার কোন দুষ্কর্ম্মের জন্য কারাকক্ষে প্রবেশ করে সারা জীবনের জন্য তাহাদের ললাটে অপরাধের পঙ্ক-তিলক চিহ্নিত হইয়া থাকে। কারাগারের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আবেষ্টনী ও অন্যান্য দুর্বৃত্তদের সাহায্যে তাহাকে অপরাধপ্রবণতায় আরও প্ররোচিত ও দক্ষ করিয়া তোলে। কারামুক্তির পর বাহিরের সামাজিক পরিবেশও অপরাধীকে সংপথে চলিতে বিশেষ সাহায্য করে না। সজ্জন সমাজ তাহাকে বর্জ্জন করে—নানা কারণে তাহার জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠে।" এই সকল বিভিন্ন অবস্থার সমন্বয়ে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদী বাধ্য হইয়া পুনরায় সেই পঙ্কিল আবর্ত্তে নামিয়া পড়ে।

মনস্তাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা সহানুভূতি লইয়া যদি অপরাধীদের বিচার করা হয় তবে অধিকাংশক্ষেত্রেই অপরাধের উৎস প্রচলিত সমাজব্যবস্থার নানাবিধ ত্রুটির মধ্যে নিহিত দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই কথা স্মরণ রাখিলে কারাগারগুলিকে শুধু শাস্তিপ্রদানের কেন্দ্রস্বরূপ না ভাবিয়া সংশোধনাগাররূপে পরিচালিত করা প্রয়োজন। এবং এই উপায়েই অপরাধীদিগকে পুনরায় সৎ নাগরিক রূপে ফিরিয়া পাওয়া সম্ভব।

অপরাধের অন্যতম প্রধান কারণ দারিদ্র্য ও অশিক্ষা। তাই "যুগশক্তি" লিখিতেছেন : "কারাগারে চরিত্র সংশোধনের জন্য উপযুক্ত নৈতিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার্জ্জনের জন্য কতকগুলি

অর্থকরী বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইহাতে বন্দীরা আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিতে পারে। যেমন—তাঁতের কাজ, সূতা রং ও ধোলাই, কাপড় ছাপাইবার কাজ, সেলাই, জুতা তৈরী, চামড়ার সুটকেশ তৈয়ারী, সূত্রধরের কাজ, ছাপাখানার কাজ, বই বাঁধার কাজ, কাপড় কাচার কাজ, সাবান তৈরী, প্লাষ্টিকের জিনিষপত্র তৈরী ইত্যাদি।" বন্দীদিগকে রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষিত করা হইবে যাহাতে কারাগারের বাহিরে জীবিকার্জনের সহজ পথ তাহারা খুঁজিয়া পাইতে পারে।

অজন্তার চিত্রাবলী সম্পর্কে গ্রন্থ

"মার্কিনবার্ত্তা"র সংবাদে প্রকাশ রাষ্ট্রসঙ্ঘ শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সংস্থা বিশ্বের বিশিষ্ট দুষ্প্রাপ্য শিল্পকলার সহিত জনগণের পরিচয় করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে নূতন বিশ্বশিল্প গ্রন্থমালা প্রকাশের আয়োজন করিয়াছেন। এই গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ হইবে ভারতের অজন্তাগুহার চিত্রাবলীর একটি সংগ্রহ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ভূমিকা-সম্বলিত এই পুস্তকে ৩২টি রঙীন চিত্র থাকিবে। গ্রন্থটির নাম "ভারত অজন্তাগুহার চিত্রাবলী।" ইংরেজী, ফরাসী, ইটালীয়, স্পেনীয় ও জার্ম্মান ভাষায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সংস্থার মাসিক মুখপত্র "কুরিয়ার" পত্রিকায় এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া আরও বলা হইয়াছে যে, অজন্তাগুহার ফ্রেস্কোগুলি চারুকলার ইতিহাসে অদ্বিতীয়। উক্ত পত্রিকার অভিমতে এশিয়ার শিল্পকলার ইতিহাসে অজন্তার চিত্রাবলীর স্থান সর্ব্বোচ্চে। ইউরোপীয় শিল্পকলার ইতিহাসে ইটালীয় ফ্রেস্কো যেমন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, এশিয়ার চিত্রকলার ইতিহাসে অজন্তার স্থানও সেইরূপ।

অজন্তা গুহা চিত্রাবলী সম্পর্কে আমাদের সরকারী বিভাগের কর্ত্তব্য অনেক আছে। এগুলি যথাযথভাবে রক্ষিত হইতেছে না। এই সময়ে বিদেশী বিশেষজ্ঞ ডাকাইয়া উহার রক্ষণ ও সংস্কারের ব্যবস্থা করা উচিত।

পরমাণবিক তথ্য সংক্রান্ত বিধিনিষেধ

"মার্কিনবার্ত্তা"র সংবাদে আরও প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার "যুক্তরাষ্ট্র ও স্বাধীন বিশ্বের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে" যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণবিক সংক্রান্ত আইনসমূহ সংশোধন করিবার জন্য কংগ্রেসের নিকট আবেদন করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তিনটি ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সুপারিশ করেন, যথা:

"প্রথমতঃ পরমাণবিক শক্তি সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়ে মিত্ররাষ্ট্রবর্গের সঙ্গে আরও ব্যাপক সহযোগিতা।

"দ্বিতীয়তঃ পরমাণবিক তথ্য পরিবেশন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আরও উন্নততর ব্যবস্থা।

"তৃতীয়তঃ যুক্তরাষ্ট্রে পরমাণবিক শক্তির শান্তিকালীন ব্যবহার বৃদ্ধির কার্য্যে অধিকসংখ্যক ব্যক্তির যোগদানে উৎসাহদান।"

এই প্রসঙ্গে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার মন্তব্য করেন যে পরমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নূতন ভিত্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের বক্তৃতায় যে প্রস্তাব তিনি গত ডিসেম্বর মাসে উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহার সহিত উল্লিখিত সুপারিশসমূহের কোন সম্পর্ক নাই।

শততম মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার

"মার্কিনবার্ত্তা"র অপর এক সংবাদে প্রকাশ, কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিকগণ শততম মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন। ইউরেনিয়াম আবিষ্কারের পর এই অষ্টম মৌল আবিষ্কৃত হইল। মাত্র দুই মাস পূর্ব্বে ৯৯তম মৌলটির আবিষ্কারের কথা ঘোষিত হয়। দুইটি মৌলের কোনটিরই এখন পর্য্যন্ত নামকরণ হয় নাই। শততম মৌলটির ওজন অন্যান্য মৌলের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহা অত্যন্ত তেজস্ক্রিয় এবং অতি দ্রুত ক্ষয় পাইয়া যায়। এই পদার্থটির অস্তিত্ব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকগণ বহু পূর্ব্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

ইউরেনিয়ামের পর যতগুলি মৌল আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের সবগুলিই কৃত্রিমভাবে সাইক্লোট্রন যন্ত্র অথবা অণুবিভাজনের সাহায্যে প্রস্তুত হইয়াছে। শততম মৌলিক পদার্থটিও অনুরূপ ভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

রক্ত বিক্রয় করিয়া জীবনধারণ

১০ই মার্চের "হিতবাদ" পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ যে, জব্বলপুরে আগত কতিপয় মাদ্রাজী এবং অন্যত্র স্থানীয় হাসপাতালগুলিতে রক্ত বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। "হিন্দুস্থান সমাচার" পত্রিকার সংবাদদাতার নিকট তাহারা বলে যে, অন্য কোনরূপ কর্ম্মের সংস্থান না হওয়াতেই তাহারা এই বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাদের প্রতিবার তিন আউন্স করিয়া রক্ত দিতে হয় এবং পরিবর্ত্তে তাহারা ২৫ টাকা করিয়া পায়। এই সকল বেকার ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষিত লোকও আছে এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৈদ্যুতিক এবং অন্যান্য যন্ত্র পরিচালনেও সক্ষম। কিন্তু তাহারা কোন কাজ সংগ্রহ করিতে পারে নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

লেখকগণের লেখা ফেরত লইতে হইলে লেখার সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকা আবশ্যক। কোন-কিছুর উত্তর পাইতে হইলে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক রিপ্লাই-কার্ডে চিঠি লিখিবেন। কবিতা যাঁহারা পাঠান তাঁহাদের প্রতিও এই অনুরোধ। তবে তাঁহারা দয়া করিয়া কবিতার নকল রাখিয়া পাঠাইলে ভাল হয়। বুকপোষ্টে প্রেরিত লেখা সব সময় আপিসে নাও পৌঁছাইতে পারে।

পত্রিকার গ্রাহক, বিজ্ঞাপন, কাগজ-অপ্রাপ্তি, ঠিকানা পরিবর্ত্তন, টাকাকড়ি প্রেরণ সংক্রান্ত চিঠিপত্র 'ম্যানেজার, প্রবাসী'র নিকট প্রেরিতব্য।

রবীন্দ্রনাথের 'ধর্ম্মচিন্তা' ও 'ধর্ম্মবোধ'

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

আমাদের দেশে বঙ্গভাষায় সমালোচনা-সাহিত্য আজিও তাহার শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে নাই বলা যায়। তথাপি ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য যে রাজেন্দ্রলাল, বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত এবং তাঁহার পরও কোনও কোনও লেখক প্রবন্ধাদিতে যথার্থ সমালোচনাজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত সমালোচনাজ্ঞানের অভাবেই হউক বা সমালোচনা প্রবন্ধ-প্রদর্শিত রীতি উপেক্ষা করিয়াই হউক, অধুনা অনেক লেখক কোনও কবি, কথাশিল্পী কিংবা নাট্যকার সম্পর্কে তাঁহাদের রচনাবলী ভিত্তি করিয়া তাঁহাদের ব্যক্তিগত মত শিল্পিগণেরই ব্যক্তিগত মত বলিয়া প্রচার করেন ও তাহা পাঠ করিয়া অনবহিত সাধারণ পাঠকবর্গ ভ্রান্ত পথে চালিত হন। সাহিত্যশিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের নানা বিষয় জানিবার কৌতূহল সকল দেশেরই সাধারণ পাঠকবর্গের মনে উদয় হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্যরসিক সমালোচকগণ এই প্রকার কৌতূহলকে ব্যঙ্গ করিতে ছাড়েন নাই; কারণ এই প্রকার কৌতূহল শুধু যে অর্থহীন তাহাই নহে, অনেক স্থলেই উহা পাঠকের পক্ষে শিল্পী-প্রদর্শিত উন্নততর জীবনাদর্শের পথে আকৃষ্ট হওয়ার পরিপন্থী। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরেজী ভাষায় ব্যঙ্গ গদ্যরচনার জন্মদাতা এডিসন (Steele-এর সহযোগিতায়) যে সুপ্রসিদ্ধ স্পেক্‌টেটর পত্রিকা প্রকাশ করেন, তাহার প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভিক বাক্যেই সমসাময়িক সাহিত্যজগতে প্রচলিত এই প্রকার কৌতূহলকেই ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছিলেন:

"I have observed, that reader seldom peruses a book with pleasure, till he knows whether the writer of it be a black or a fair man, of a mild or choleric disposition, married or a bachelor, with other particulars of the like nature, that conduce very much to the right understanding of an author."

তৎকালে এডিসন যাহাকে সাহিত্যরস-সম্ভোগ শিক্ষার ক, খ বা গোড়ার কথা মনে করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত বাক্যটির শেষাংশেই বক্রভাবে বলিয়াছেন—"that··· author", অর্থাৎ (সোজা কথায়) 'যাহা গ্রন্থকারের রচনার মর্ম্মোপলব্ধির পক্ষে একেবারেই আবশ্যক নহে'। ইহার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সেক্সপীয়রের নাটকাবলী ও তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন। এই মহাশিল্পীর ভক্তগণ দুই শতাব্দীরও অধিককাল পরিশ্রম এবং গবেষণা করা সত্ত্বেও তাঁহার জীবনের জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কিত অনেক তথ্যই সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু এই জ্ঞানের অভাবে উক্ত বিশ্ববিশ্রুত মহাশিল্পীর নাটকাবলী হইতে তদীয় অসাধারণ সৃজনীপ্রতিভা, মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণক্ষমতা প্রভৃতি নানা গুণাবলীর সম্যক পরিচয়লাভের পক্ষে কোনও অন্তরায় উপস্থিত হয় নাই। তদীয় অখ্যাত ব্যক্তিজীবনের তথ্যাদি সংগ্রহ সম্বন্ধে পরবর্ত্তীকালের গবেষণা ও অনুসন্ধান লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্ত্য মনীষী এমার্সন লিখিয়াছেন:

"But whatever scraps of information concerning his condition these researches may have rescued, they can shed no light upon that infinite invention which is the concealed magnet of his attraction for us. Shakespeare is the only biographer of Shakespeare:...Yet with Shakespeare for biographer we have really the information which is material, that which would most import us to know."

সেক্সপীয়র বা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মহাশিল্পীর নাটকাবলী অথবা উপন্যাসাদি পাঠান্তে, উহাদের কোনও কোনও চরিত্র অবলম্বনে শিল্পী তাঁহার ব্যক্তিগত মনোভাব, জীবনের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি ব্যক্ত করিয়াছেন—এইরূপ ধারণা সাধারণ পাঠকের মনে জাগ্রত হওয়া অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক নয়; কারণ যে শিল্পী শতাধিক বিভিন্ন চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তন্মধ্যে কোন কোনওটির রচনাকালে তাঁহার তৎকালীন কোন কোন মনোভাব, ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, ব্যক্ত করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু ইহা ধারণা মাত্র বুঝিতে হইবে। এই অনুমান সত্য কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে শিল্পীর জীবনের প্রমাণিত ঘটনাবলী হইতে অথবা তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধাদিতে সুব্যক্ত মত সাহায্যে (যাহাকে External evidence বলা যায়) পাঠকের ধারণাকে সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিতে হইবে। বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক এ. সি. ব্রাডলি বলিতেছেন:

"..For we may lay down at once the canon that impressions derived from the works must supplement and not contradict this evidence, so far as it appears trustworthy.'

ইহার কারণ এই যে, শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন বা মতামত সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ধারণার উদয় হয় তাহা অনেক সময় আমাদের ব্যক্তিগত মনোভাব বা ইচ্ছাপ্রসূত— ইহার অনেক প্রমাণ সাহিত্যক্ষেত্রে অতীতে পাওয়া গিয়াছে এবং এখনও যাহা পাওয়া যায় তাহার নিদর্শন ভিত্তি করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। আমাদের অপেক্ষা বহুপরিমাণে সমালোচনা-শাস্ত্রে অগ্রসর ইংরেজী সাহিত্যের অধুনাতম শ্রেষ্ঠ সমালোচকদিগের প্রদর্শিত পথ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বাংলা সমালোচনায় অনুসৃত হইতে দেখি না। এমনকি সাহিত্য-

সমালোচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজের মত যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাও অনেক প্রবন্ধ লেখক মানিয়া চলেন বলিয়া মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত যে বিশ্বভারতীকে আমরা সাহিত্যচর্চ্চা-ক্ষেত্রে আদর্শস্থানীয় রূপে দেখিয়া আসিয়াছি ও এখনও দেখিতে চাই; অতি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে তাহা হইতে সম্প্রতি-প্রকাশিত "রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মচিন্তা" নামক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিত একটি প্রবন্ধে* ও তৎপ্রকাশিত মতাদির সমর্থনকল্পে উক্ত লেখক কর্তৃক উদ্ধৃত শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত "রবীন্দ্র জীবনী"র অনেক স্থানে প্রকৃত সমালোচনারীতির ব্যতিক্রম দেখিতে পাই।

রবীন্দ্রনাথ উচ্চস্তরের ধর্ম্মসাধক ছিলেন ইহা পূর্ব্বোক্ত লেখকদ্বয় ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরাও এই মত পোষণ করি। কিন্তু কোন্ নির্দিষ্ট সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া তিনি "সত্যস্য সত্যম্"কে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনপ্রণালীর সহিত তাহার কতটা মিল ছিল, কতটা ছিল না‡ তাহার তত্ত্ব "নিহিতং গুহায়াং" : উহা রবীন্দ্রনাথের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত অনেক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিও তাঁহার জীবিতকালের মধ্যে জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া আমরা মনে করি না। তবে ধর্ম্মের আদর্শ, ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ-লাভের উপায়, ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ, ব্রাহ্মধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য, ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার লিখিত মত ও উপদেশ বর্ত্তমান এবং অনাগত কালের জন্ম তাঁহার অমূল্য প্রবন্ধাবলীর মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন; ইহা ছাড়া তাঁহার ধর্ম্মসঙ্গীতমালা ত আছেই। এইগুলি হইতেই কবির "ধর্ম্মচিন্তা"র ধারাগুলি আমাদিগকে জানিতে হইবে। কারণ গুরুত্বপূর্ণ অর্থ সমন্বিত প্রবন্ধেই শিল্পী তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তব্য বা মতাদি প্রকাশ করিয়া থাকেন, স্বরচিত উপন্যাসে কিংবা নাটকে নয়; একথা কবি নিজেই বলিয়াছেন, "তর্ক ও উপদেশের বিষয় সাময়িক পত্রের প্রবন্ধের উপকরণ।"‡ কিন্তু জীবনচরিত-লেখক প্রভাতবাবু "গোরা" উপন্যাসের শিল্পী কর্ত্তৃক গোরার মুখে প্রদত্ত বাক্য, ও উপন্যাসের অন্যান্য অংশ হইতে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম কি ছিল তাহার সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিনব তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় প্রভাত-বাবুরই নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া "রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মচিন্তার" এক অভিনব রূপ দান করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধের ছয়টি ভাগ। তন্মধ্যে প্রথমটি ব্যতীত অবশিষ্ট পাঁচটি ভাগেই লেখক রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মের আদর্শ যে এক অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রবন্ধ হইতে বাক্যাবলী সংগ্রহ দ্বারা বিবৃত করিয়াছেন। ইহা লেখকের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও প্রবন্ধের প্রথম ভাগেই যে তত্ত্বকথাটির অবতারণা করিয়াছেন তাহা এই—রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক পরি-বেশের মধ্যে বর্দ্ধিত হইলেও তাহার গণ্ডি কাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন ব্রাহ্মধর্ম্মের বাহিরে এক অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে। লেখকের স্বীয় মনোভাবপ্রসূত এই কথাটি প্রতিপন্ন করিবার জন্যই প্রথম ভাগটির অবতারণা এবং এই মনোগত ভাবেরই প্রেরণায় যে লেখক প্রবন্ধের অবশিষ্ট পাঁচটি ভাগে একাধিক লেখক কর্ত্তৃক আলোচিত ও রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক স্পষ্ট ভাষায় প্রথমাবধি প্রচারিত বিষয়টির পুনরবতারণা করিয়াছেন ইহা সুস্পষ্ট। প্রবোধবাবু লিখিতেছেন :

সব মানুষেরই একটি জন্মগত ধর্ম্ম থাকে। তার আধ্যাত্মিক বিশ্বাস স্বাধীন বিচার-বুদ্ধির অনুযায়ী নয়, জন্মলব্ধ ধর্ম্মেরই অনুযায়ী। সে ধর্ম্ম আবার গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়গত…রবীন্দ্রনাথের জন্মলব্ধ ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম; আদি ব্রাহ্মসমাজের পরিবেশে তাঁর শিক্ষা দীক্ষা। কিন্তু কোন বিশেষ ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে চিরকাল আবদ্ধ থাকবার মত মন নিয়ে তিনি জন্মান নি।…তাঁর মুক্তিকামী চিত্ত যে দীর্ঘকাল সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার সীমায় বন্দী থাকতে পারে না, সে কথা বলাই বাহুল্য। (ক) তাঁর ব্রাহ্মধর্ম্মের গণ্ডি কেটে বেরিয়ে আসার প্রথম সুস্পষ্ট প্রমাণ পাই "গোরা" উপন্যাসে (১৩১৩)। (খ) এই গ্রন্থের মূল কথাটি অতি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে তার একেবারে শেষ অধ্যায়ে গোরার দু-একটি উক্তিতে—(গ) "আজ আমি ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান কোন সমাজের কোন বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত।…আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই,…যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষেরই দেবতা।" দেখা যাচ্ছে 'গোরা' রচনার কালেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্ম্মবোধকে বিশেষ সম্প্র-দায়ের সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত করে সর্ব্বসম্প্রদায়ের উদার ও বিশ্বজনীন ভূমিকার উপরে স্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবন-চরিতকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি উক্তি উদ্ধৃতি-যোগ্য।—

"রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেও ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডি ধীরে ধীরে কাটিয়া ফেলিতেছিলেন। (ঘ) তাঁহার কাছে স্বাদেশিকতার উগ্রতা যেমন ব্যর্থ, ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডিকাটা ধর্ম্মও তেমনি নিরর্থক। গণ্ডিমাত্রই তাঁর কাছে অসত্য এবং এই গণ্ডি ভাঙাই হইতেছে তাঁর জীবনের আদর্শ ও সাহিত্যের বাণী। গণ্ডি

* বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৯

† দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র জীবনী, ২য় খণ্ড—"রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মসাধনা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজস্ব", পৃ, ৭ ; ১৮৪ পৃ,

‡ রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, গ্রন্থপরিচয়, "চার অধ্যায়" ৫৪৫পৃঃ

যতই মোহন নামে মানুষের কাছে আসুক, দেশের নামে, ধর্ম্মের নামে—কবির মনে তাহা সায় পায় না। তিনি সেই গণ্ডির মধ্যে বাস করিয়া এককালে তাহার জয়গান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝিয়াছেন খাঁচা যতই সুন্দর হোক, আকাশ সুন্দরতর।··· রবীন্দ্রনাথ গোরা সুচরিতা ও পরেশ বাবুকে যেখানে বাহির করিয়া আনিলেন, তাহা মানুষের ধর্ম্মের উদার ক্ষেত্র—সেখানে তাহারা হিন্দুও নহে, ব্রাহ্মও নহে, খৃষ্টানও নহে—তাহারা মানুষ।"

প্রবোধবাবুর মন্তব্যের প্রথম বাক্যটিই আপত্তিজনক মনে হয়; কেননা উহার অর্থ এই প্রকার দাঁড়ায়—মানুষের 'জন্মলব্ধ ধর্ম্মে' যাদের বিশ্বাস স্থায়ী হয়, তাদের সেই বিশ্বাস 'স্বাধীন বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী' হইতে পারে না—এই প্রকার মন্তব্য কি সকলের পক্ষেই সাধারণ ভাবে খাটে? ইহার পর বিচার করা যাউক তাঁর (ক) ও (খ) চিহ্নিত পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্য দুটির। উচ্চাঙ্গ সাহিত্য-সমালোচনা রীতির কষ্টিপাথরে এই প্রকার **"সুস্পষ্ট প্রমাণ"** যে মেকি বা ভ্রান্তিমূলক বিবেচিত হয় তাহা সাহিত্যিক মাত্রেরই জানা আছে। বিশেষতঃ বর্ত্তমানক্ষেত্রে লেখক যখন উপন্যাসোক্ত বাক্যের ভিত্তিতে গঠিত তাঁহার মতের সমর্থনকল্পে কোনও বাহ্য প্রমাণ—ব্রাডলির মতে যাহা সাহিত্য সমালোচনার একটি 'canon', উপস্থিত করেন নাই তখন আমরা তাঁহার 'সুস্পষ্ট প্রমাণ'-যুক্ত সিদ্ধান্তকে পূর্ব্বকথিত স্বীয় মনোভাবপ্রসূত অনুমানমাত্র বলিব। তবে সাহিত্যের ইতিহাসে এরূপ অনুমিতি পোষণ বিরল নহে; এ যাবৎ সেক্সপীয়রের সম্পর্কে এইরূপ বহু ভিত্তিহীন অনুমান করা হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে পাঠক-পাঠিকাদিগের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁরা সাহিত্য-শিল্পের শুধু সৌন্দর্য্য-সম্ভোগে পরিতৃপ্ত থাকিতে পারেন না, শিল্পীর ব্যক্তিগত মত সম্পর্কে তাঁহারা যে নিজস্ব মত পোষণ করেন তাহার সমর্থনে তাঁরা চান শিল্পীসৃষ্ট চরিত্রমুখে নিজ নিজ মতানুযায়ী কথা শুনিতে:

"Who challenge a poet to deliver a short statement of his doctrine or creed. To positive and rigid natures the roundness of the world is bewildering; and when they meet with anything that does not fit into their scheme, they do not "as a stranger give it welcome." (Raleigh)

এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইয়াছে। গোরার মুখনিঃসৃত একটি কথা হইতেই প্রবোধবাবু তাঁহার অনুমান সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় মনে করিয়া তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু 'গোরা' উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রের (বিশেষতঃ আদর্শ ব্রাহ্মচরিত্র পরেশবাবুর) যে সকল বাক্য তাঁহার অনুমানের বিপক্ষে যায় সেগুলি বর্জ্জন করিয়াছেন। সকলেই এ কথা জানেন যে, শিল্পী যখন একটি চরিত্রকে ক্রমে ক্রমে তাহার বাক্য ও কার্য্য দ্বারা বিকশিত করিতে থাকেন, তখন তাহার মুখে উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত বাক্য দেন এবং এই সকল বাক্যের মধ্যে অনেক সময় আমরা শিল্পীর গভীর চিন্তা বা ইনটুইশন লব্ধ সত্যের প্রকাশ দেখিতে পাই। কিন্তু এই সকল সত্য শিল্পীর জীবনের ব্যক্তিগত ঘটনার অভিজ্ঞতালব্ধ মনে করিলে ভুল করা হইবে:

"His brilliant general statements of truth are sudden divinations...sparks thrown out into the darkness from the luminous centre of his own self knowledge..But if we attempt to argue backwards and to recreate his personal history from a study of his cosmic wisdom, we fall into a trap.

এই সমালোচনা-বাক্যের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথেরই একটি মন্তব্যে।—"সোনার তরী" কবিতার কল্পনাকাল শ্রাবণ ও রচনাকাল ফাল্গুন, এ সম্বন্ধে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'তুমি পঞ্জিকা মিলিয়ে যদি কবিতার তাৎপর্য্য নির্ণয় করতে চাও ত বিপন্ন হবে।'* কোনও প্রকৃত শিল্পীর কাব্য, নাটক বা উপন্যাস হইতে আমরা যদি স্বীয় ধারণার সমর্থনসূচক বাক্য সংগ্রহপূর্ব্বক তাহার সহিত শিল্পীর জীবনের ঘটনার যোগস্থাপনের চেষ্টা করি তাহা হইলে অনিশ্চিত বা বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সম্ভাবনায় পতিত হই। সার্দ্ধ তিন শতাব্দী পূর্ব্বে সেক্সপীয়র যে সকল উক্তি তদীয় নাটকের বিভিন্ন চরিত্রমুখে দিয়া গিয়াছেন তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই সার্ব্বজনীন সত্য হিসাবে, প্রবাদবাক্য রূপে শিক্ষিত-সমাজে উপযুক্ত ক্ষেত্রে উচ্চারিত হইয়া থাকে। যেমন *Hamlet* নাটকে হ্যামলেট-এর মুখে প্রদত্ত "There are more things in heaven and earth···philosophy"—এই বাক্য হইতে কোনও সাহিত্যরসজ্ঞ ব্যক্তি কি এই সিদ্ধান্ত করিবেন যে নাট্যকার অনুরূপ কোনও অতি-প্রাকৃতিক ঘটনা নাটকটি রচনার পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন? অথবা যখন *As you Like It* নাটকে নাট্যকার বৃদ্ধ ভৃত্য এডামের মুখনিঃসৃত বাক্যে সকল বৃদ্ধ লোকের অভিজ্ঞতালব্ধ মর্ম্মকথা শুনাইলেন—"unregarded age in corners thrown" যাহার মধ্যে এমন একটা "personal note" (ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সুর) আছে যাহা হইতে মনে হয় এ কথা কেবল ভুক্তভোগী বৃদ্ধ লোকই বলিতে পারেন—তখন ঐ বাক্য হইতে যদি কোনও পাঠক সিদ্ধান্ত করেন, নাট্যকার উক্ত বাক্য রচনার সময়ে বা তৎপূর্ব্বে নিশ্চয়ই বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা কি মারাত্মক ভুল হইবে না, যেহেতু তাঁহার বয়ঃক্রম তখন ন্যূনাধিক পঁয়ত্রিশ বৎসর মাত্র? এডামের মুখে প্রদত্ত বাক্যের

* 'রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ড, গ্রন্থ পরিচয়

পশ্চাতে নাট্যকারের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল মনে করা শুধু যে গুরুতর ভ্রম তাহাই নহে, উহা দ্বারা শিল্পীর সৃজনীপ্রতিভা ও গভীর অনুভূতি-শক্তিকে খর্ব্ব করিয়া দেখা হয়। সেইরূপ, গোরা, পরেশ, বরদাসুন্দরী ইত্যাদি চরিত্র সৃষ্টি এবং তাহাদের বাক্যের পশ্চাতে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ত্তমান ছিল মনে করা একই প্রকার ভুল অনুমান; অধিকন্তু ইহাদ্বারা রবীন্দ্রনাথের সৃজনী প্রতিভাকে খর্ব্ব করিয়া দেখা হয়। কারণ, কবি ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ-এর ভাষায়ঃ

"He (the poet) has acquired a greater readiness and power in expressing those thoughts and feelings which arise in him without immediate external excitement."

জনৈক শেক্সপীয়র সমালোচক এই প্রকার ভ্রান্ত পথ চালিত সমালোচনা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,

"Hamlet, the perplexed and brooding Shakespeare? Prosperous, the calm and royal Shakespeare? It might seem so were Shakespeare less myriad-minded than Coleridge called him, but that Shakespeare, feeling in his own heart and brain the passions of his creatures, should have portrayed them is almost incredible."

রবীন্দ্রনাথও তদীয় উপন্যাস "চার অধ্যায়" সম্পর্কে প্রবোধবাবুর মন্তব্যের অনুরূপ সিদ্ধান্তের ঠিক উক্ত প্রকার উত্তর নিজেই দিয়াছেন; কিন্তু কে বা তাহা মনোযোগের সহিত পড়েন, অথবা পড়িলেও, গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচনাকালে তৎসম্বন্ধে অবহিত হইয়া সংযতভাবে চিন্তা করিয়া লেখনী চালনা করেন:—"ধরে নিতে হবে যারা বলছে, তাদেরই চরিত্রে সমর্থনের জন্য এই সব মত। যদি কেউ সন্দেহ করেন এ সকল মতের কোন কোনটা আমার মতের সঙ্গে মেলে তবে বলব "এহ বাহ্য।" এ কথাটা মিথ্যে হলেও গল্পের মধ্যে তার যে মূল্য, সত্য হলেও তাই।* কোন মত প্রকাশের দ্বারা পাত্রদের চরিত্রের যদি ব্যত্যয় ঘটে থাকে তা হলেই সেটা হবে অপরাধ। যদি কোন অধ্যাপক কোন দিন নিঃসংশয়ে প্রমাণ করতে পারেন যে হ্যামলেটের মুখের অনেক কথা এবং তার ভাবভঙ্গী কবির নিজের, সেটা সত্য হউক আর মিথ্যে হউক তাতে নাটকের নাট্যত্বের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। তাঁর নাটকে কোথাও তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব কোনও ইঙ্গিতে প্রকাশ পায় নি এমনতর অবিশ্বাস্য কথাও যদি কেউ বলেন তবে তার দ্বারাও তাঁর নাটক সম্বন্ধে কিছু বলা হয় না। তর্ক ও উপদেশ সাময়িক প্রবন্ধের উপকরণ।"† "গোরা", তথা অন্যান্য উপন্যাস এবং নাটকাদির কোনও চরিত্রসৃষ্টির মূলে শিল্পীর নিজ মত ব্যক্ত হয় এরূপ উদ্দেশ্য ছিল না, যাহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, চরিত্রগুলি শিল্পীর জীবনের রচনাকালীন কোনও বিশিষ্ট মনোভাব বা মতকে একটা সুনির্দ্দিষ্ট সময়ের চিহ্ন দিয়া তাহাকে শিল্পী-জীবনের একটা 'ল্যাণ্ডমার্ক' করিয়া রাখিয়াছেন।* এইরূপ মতপ্রকাশ দ্বারা বিকৃত সমালোচনা করা হয়। আবার ইহাদের মধ্যে শিল্পীর "নিজের ব্যক্তিত্ব কোনও ইঙ্গিতে প্রকাশ পায় নি" এ কথা যেমন রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন না (উদ্ধৃত উক্তি দ্রষ্টব্য), কোনও ইংরেজ সমালোচকও এ কথা বলেন নাই। কিন্তু সেই সঙ্গেই তাঁহারা ইহা বলেন যে মানসিক মনোভাবের এই সম্ভাবনীয় ছায়াপাত শিল্পীর জীবন স্মৃতি হইতে অচিরেই মুছিয়া যায় ও গিয়াছে।

"But the generative moments between experience and his soul have passed away beyond recovery, as they were many of them lost to his own remembrance long before he died. What remains is the child of his passion, and the child is immortal." (Raleigh)

যাহারা মনে করেন "গোরা" রচনাকালে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের ছায়াপাত উপন্যাসের স্থান বা চরিত্রবিশেষে হইয়া থাকিবে তাঁহাদের এই উদ্ধৃত বাক্যটি সম্বন্ধে অবহিত হইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। গোরা চরিত্র শিল্পীর "immortal child of passion", কিন্তু গোরার বাক্য শিল্পী-জীবনের কোনও অভিজ্ঞতার 'ল্যাণ্ডমার্ক' নহে।

২

এইবার আমরা প্রবোধবাবুর প্রবন্ধের অন্যান্য বিষয়বস্তুর বিচারে আসিব। গোরার যে উক্তিটিতে 'এই গ্রন্থের মূল কথাটি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে' বলিয়া প্রবন্ধ-লেখক মনে করেন ('গ' চিহ্নিত "আমাকে আজ...ভারতবর্ষেরই দেবতা") তাহা ঠিক গোরার মনোভাবেরই উপযুক্ত, এজন্য তাহার মুখে দেওয়া হইয়াছে;† কারণ গোরা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজকে অ-হিন্দুর সমাজ বলিয়াই বুঝিয়াছে; সে জানিয়াছে ব্রাহ্মের দেবতা ও হিন্দুর দেবতা পৃথক, "ব্রাহ্মধর্ম্ম একটা খাপছাড়া ধর্ম্ম"; সেইজন্য 'ব্রাহ্ম' শব্দকে 'হিন্দু' শব্দ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ চিরকাল ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজের অন্তর্গত বলিয়া আসিয়াছেন; "গোরা" প্রকাশিত হইবার দুই বৎসর পরে তিনি ১৩১৯ সনে প্রকাশিত "আত্ম-

* "He wrote his plays."—Raleigh (*Shakespeare*)

† [illegible]

* যেমন, "তাঁর ব্রাহ্মধর্ম্মের গণ্ডি কেটে বেরিয়ে আসার সুস্পষ্ট প্রমাণের" সময় ১৯১০।

† 'ধরে নিতে হবে যারা বলছে, তাদেরই চরিত্র সমর্থনের জন্যে এই সব মত'—ত্রয়োদশ খণ্ড, 'গ্রন্থ পরিচয়'

পরিচয়" প্রবন্ধেও তাহার বিষয়বস্তু লইয়া যে প্রতিবাদ হয় তাহার প্রত্যুত্তরে এ সম্পর্কে তাঁহার মত চূড়ান্ত ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—'ব্রাহ্মসমাজকে আমি হিন্দু সমাজের ইতিহাসের একটা স্বাভাবিক বিকাশ বলিয়া দেখি"; "হিন্দু ব্রাহ্মরা হিন্দুই" ইত্যাদি বহু বাক্য আছে, উহাদের উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং গোরার উল্লিখিত উক্তি রবীন্দ্রনাথের স্বীয় মনোভাব-প্রকাশক হইতে পারে না; গোরার এই উক্তির মধ্যে শিল্পীচিত্রিত গোরা-চরিত্রের ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিভেদাত্মক মনোভাব শেষ সময়েও উঁকি দিতেছে, বিচারশীল পাঠক উহা ধরিতে পারিবে। এইজন্যই দুই বৎসর পরে লিখিত জাতীয় সঙ্গীতে দেখি—"হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পারসীক, মুসলমান, খৃষ্টানী"—ব্রাহ্ম শব্দের উল্লেখ নাই। তারপর, 'যিনি ভারতবর্ষেরই দেবতা' ইহাও গোরার উপযুক্ত কথা, রবীন্দ্রনাথের হইতে পারে না। ব্রাহ্মরা "সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ;" কিন্তু তাঁহারা রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ও আজ পর্য্যন্ত সকলেই যে দেবতার পূজা করিয়া আসিতেছেন তাঁহাকে 'বিশ্বদেবতা', 'বিশ্বপতি', 'অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি', 'ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং' ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত করিয়া থাকেন; আর প্রবোধবাবু ব্রাহ্মদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বহির্ভূত উদার বিশ্বজনীন ধর্ম্মের বাস্তু শুনিলেন গোরার মুখে প্রদত্ত যে দেবতার নাম তাহা হইল 'ভারতবর্ষের দেবতা'; সুতরাং কি প্রমাণ হইল?—a part is greater than the whole or the Infinite!

এই প্রসঙ্গে প্রকৃত কথা এই যে, প্রবোধবাবু কর্ত্তৃক উদ্ধৃত প্রভাতবাবু লিখিত সমালোচনায়ই আছে—"তাঁহার কাছে স্বাদেশিকতার উগ্রতা যেমন বার্থ..." ('ঘ' চিহ্নিত বাক্য)। গোরা চরিত্রের এই 'উগ্র স্বাদেশিকতা'র মোহ সে তখনও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই—পারা সম্ভবও নয়, এখানে শিল্পীর চরিত্রাঙ্কনের স্বাভাবিকত্ব (natural touch) দেখিতে হইবে। সুচরিতার প্রতি প্রেমের আকর্ষণ গোরাকে তাহার হিন্দুয়ানীর শুচিতারক্ষার অর্গলটি ভাঙিয়া দিয়া হিন্দু ও ব্রাহ্মকে এক ভারতধর্ম্মী জাতির অন্তর্গত বলিয়া 'ভারতবর্ষের দেবতা'র চরণে মিলিত হইতে প্রবৃদ্ধ করিয়াছে সত্য, কিন্তু সমগ্র মানবজাতিকে এক বিশ্বপিতার সন্তানরূপে দেখিবার মত সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি আজিও এই একান্ত সাজাত্যাভিমানী দেশপ্রেমিকের খোলে নাই। সে দৃষ্টি আছে আদর্শ ব্রাহ্ম পরেশবাবুর। এজন্য রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসখানির শেষ কথাটি এই ভাবে লিখিয়াছেন, "তখন গোরা সুচরিতাকে লইয়া পরেশকে প্রণাম করিল"। এ প্রণাম শুধু দম্পতিরূপে মিলনাকাঙ্ক্ষীর গুরুজনের আশীর্ব্বাদলাভের জন্য প্রণাম নয়; পরেশের উদার সার্ব্বজনীন ধর্ম্মভাবের নিকট অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির নতিস্বীকার। এই জন্যই শেষ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ গোরা-চরিত্রের নাটকীয় ব্যর্থতা (dramatic foil) দেখাইয়া পরেশবাবুর চরিত্রের শ্রেষ্ঠতা উজ্জ্বলতর রূপে ফুটাইয়াছেন। গোরার উল্লিখিত কথায় রবীন্দ্রনাথের মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে বলিলে রবীন্দ্রনাথের সার্ব্বভৌমিক আদর্শকেই খর্ব্ব করা হইবে। দুই বৎসর পরে তিনি জাতীয় সঙ্গীত রচনাকালে অবশ্য "ভারত ভাগ্য বিধাতা" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু জাতীয় সঙ্গীতে এই প্রকার ব্যবহার সুষ্ঠু; উহা ধর্ম্মের আদর্শবোধক নয়। ইহার প্রমাণ, উক্ত সঙ্গীত রচনার এক মাস কালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ "ধর্ম্মের নবযুগ" নামে যে প্রবন্ধ লেখেন তাহার শেষে নিজ মনের প্রকৃত ভাবপ্রকাশক বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন, "জয় জয় জয় হে, জয় বিশ্বেশ্বর, মানবভাগ্যবিধাতা"!

এইবার আমরা প্রবোধবাবু লিখিত "ব্রাহ্মধর্ম্মের গণ্ডি কেটে বেরিয়ে আসার..." ('ক' দ্রঃ), এবং প্রভাতবাবুর "ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডিকাটা ধর্ম্ম" ('ঘ', দ্রঃ) এই দুই উক্তির বিষয়বস্তুর আলোচনা করিব। "ব্রাহ্মধর্ম্মের গণ্ডি"টা কি ও কোথায় এবং কে বা কাহারা কাটিল তাহা ব্রাহ্মসমাজের ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া ও আশৈশব ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষা এবং সংস্কারের (tradition) মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াও আমরা ও আমাদের অনেক বন্ধু বুঝিতে সক্ষম হই নাই এবং হন নাই। ইংরেজীতে অবশ্য একটি কথা আছে, "Onlookers see best of the game"—হইতে পারে, এজন্যই প্রবোধবাবুরা বাহির হইতে ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডিটা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছেন এবং আমরা গণ্ডির ভিতরে আছি বলিয়া উহা দেখি না। যাহা হউক, অনেক অনুসন্ধানের পর প্রভাতবাবুর "রবীন্দ্র জীবনী" হইতে উক্ত বাক্যটির মূল খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করি। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ধর্ম্ম' নামক গ্রন্থের 'ধর্ম্মপ্রচার' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন:

(ঙ) "ধর্ম্মকে যাহারা সম্পূর্ণরূপে না উপলব্ধি করিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করে তাহারা ক্রমশঃ ধর্ম্মকে জীবন হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতে থাকে। (চ) ইহারা ধর্ম্মকে বিশেষ গণ্ডি আঁকিয়া একটা বিশেষ সীমানার মধ্যে বদ্ধ করে। বিষয়ী নিজের জমীর সীমানা এত সতর্কতার সহিত বাচাইতে চেষ্টা করে না, (ছ) ধর্ম্ম ব্যবসায়ী যেমন প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত ধর্ম্মের স্বরচিত গণ্ডি রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে থাকে। এই গণ্ডিরক্ষাকেই তাহারা ধর্ম্মরক্ষা বলিয়া জ্ঞান করে। (জ) বিজ্ঞানের কোন মূল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে তাহারা প্রথমে ইহাই দেখে যে, সে-তত্ত্ব তাহাদের গণ্ডীর সীমানায় হস্তক্ষেপ করিতেছে কিনা, যদি করে তবে ধর্ম্ম গেল বলিয়া তাহারা ভীত হইয়া উঠে। ধর্ম্মকে তাহারা সংসার হইতে

বহু দূরে স্থাপিত করে···সপ্তাহের এক দিনের এক অংশকে, গৃহের এক কোণকে বা নগরের একটি মন্দিরকে ধর্ম্মের জন্য উৎসর্গ করা হয়।··· (ঝ) কিন্তু ভারতবর্ষের এ আদর্শ সনাতন নহে। আমাদের ধর্ম্ম রিলিজন্ নহে—তাহা মনুষ্যত্বের একাংশ নহে—(ঞ) তাহা পলিটিক্স হইতে তিরস্কৃত, যুদ্ধ হইতে বহিষ্কৃত, ব্যবসায় হইতে নির্ব্বাসিত, প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে দূরবর্তী নহে। সমাজের কোন বিশেষ অংশে তাহাকে প্রাচীরবদ্ধ করিয়া মানুষের আরাম আমোদ হইতে কাব্য কলা হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞান হইতে তাহার সীমানা রক্ষার জন্য সর্ব্বদা পাহারা দাঁড়াইয়া নাই।"···

'ধর্ম্মপ্রচার' প্রবন্ধের এই উদ্ধৃতাংশ হইতেই প্রভাতবাবু কোনও অজ্ঞাত কারণে এক ভ্রান্তিপূর্ণ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ উক্ত মন্তব্যগুলি ব্রাহ্মধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছেন। কারণ তিনি উহার (ণ) চিহ্নিত অংশের ভাষ্য করিতে গিয়া বলিতেছেন,* "রবীন্দ্রনাথের মতে ধর্ম্ম প্রতি মুহূর্ত্তে মানবের জীবনে প্রকাশ পায়। (ট) ইহাই ছিল ভারতের আদর্শ, সেই আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়া ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মকে রিলিজন করিতে চান, জীবনের সঙ্গী নহে; সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ এমন ভাবে এই প্রবন্ধে উক্ত সমাজকে আঘাত করিলেন"—ইহা একেবারে তর্কশাস্ত্রসম্মত (!) চমকপ্রদ একটি সিদ্ধান্ত। রবীন্দ্রনাথ নঞর্থক বাক্যে রিলিজনের যে সংজ্ঞা দিলেন (ঞ) "তাহা পলিটিক্স্ হইতে তিরস্কৃত" ইত্যাদি, তাহা কি ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষে প্রযোজ্য? রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া রাজনারায়ণ বসু, দ্বারিকানাথ গাঙ্গুলি, আনন্দমোহন বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ও অনেক অজ্ঞাতনামা ব্রাহ্ম সকলেই পলিটিক্স, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি নানা জনহিতকর আন্দোলনে ব্যাপৃত থাকিয়াও ব্রাহ্মধর্ম্ম নিষ্ঠার সহিত সাধন করিয়াছেন এবং জীবিকা অর্জ্জনের জন্য স্ব-স্ব ব্যবসায়ে লিপ্ত রহিয়াছেন। সুতরাং ইঁহাদের দৃষ্টান্ত হইতে কি প্রমাণ হয় যে "ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মকে রিলিজন করিতে চান" এবং "সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ এমন ভাবে এই প্রবন্ধে উক্ত সমাজকে আঘাত করিলেন"? এই সঙ্গে বিচার্য্য, "ভারতবর্ষের এ আদর্শ সনাতন নহে"—ইহা দ্বারাও রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের আদর্শকেই ইঙ্গিত করিতেছেন বুঝিতে হইবে কি, যেহেতু প্রভাতবাবু তাঁহার ভাষ্যে এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন: "ইহাই ছিল ভারতের আদর্শ, সেই আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়া ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মকে···" ইত্যাদি? বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুষ্টিমেয় লোক অবলম্বিত ব্রাহ্মধর্ম্মকে কি কোন শিক্ষিত লোক পূর্ব্বপ্রদর্শিত সূত্রে 'ভারতবর্ষের এ আদর্শ' বলিবেন? রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বের বাক্যগুলি সূত্র স্বরূপ পাঠ করিলে কি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না, তিনি 'এ আদর্শ' বলিতে ভারতবর্ষের কোন্ ধর্ম্মাদর্শের কথা বলিতেছেন? বলিতেছেন, "বিজ্ঞানের কোন মূলতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে···উঠে" ('জ' চিহ্নিত অংশ দ্রঃ)।

এই সকল মন্তব্য লিখিবার সময় (১৯০৪) রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্তর বৎসর মাত্র অতিক্রম করিয়াছে। ইহার মধ্যে বিজ্ঞানের কোন্ কোন্ মূলতত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে ব্রাহ্মধর্ম্ম কত বার যায় যায় হইয়াছে বা ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্যবসায়ীরা 'ধর্ম্ম গেল বলিয়া ভীত হইয়া' উঠিয়াছেন তাহা আমরা অদ্যাপি আবিষ্কার করিতে পারি নাই। হয়ত ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা কোন সাময়িক প্রবন্ধ হইতে উহা বাহির করিবেন এবং "ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মকে রিলিজন করিতে চান" ইত্যাদি মন্তব্য প্রামাণ্য বলিয়া ছাপার অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলে ইহাও প্রমাণিত হইতে পারে যে, এ যাবৎ ব্রাহ্ম বলিয়া বিদিত আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ডঃ হীরালাল হালদার, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রভৃতি দার্শনিকগণ যেহেতু জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রভূত মূল্যবান আলোচনা লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত করিয়াছেন এবং যাঁহারা "পাশ্চাত্ত্য দর্শনলব্ধ আলোকে দেশীয় বেদান্তশাস্ত্রের সত্যতা দেখিতে পাইয়াছেন"* —তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রভাতবাবু রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়' গ্রন্থের স্থান-বিশেষ সম্পর্কে রবীন্দ্রমতের সমালোচনাকালে নিজেই বলিয়াছেন, "জ্ঞান নিত্য অগ্রসর হইতেছে; ফলে জ্ঞানবিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। এই অবস্থায় হিন্দুধর্ম্ম ও জ্ঞানবিজ্ঞানের মধ্যে সাম্য রক্ষা করা কঠিন" (রবীন্দ্র জীবনী, ২য় খণ্ড, তত্ত্ববোধিনী পর্ব্ব, ২৬৬ পৃ.)। যদি জ্ঞানবিজ্ঞানের সহিত হিন্দুধর্ম্মের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া ২৬৬ পৃষ্ঠায় উহা লিখিয়া থাকেন, তবে 'ধর্ম্মপ্রচার' প্রবন্ধে অনির্দ্দিষ্ট 'ধর্ম্মব্যবসায়ী'দের সহিত 'জ্ঞানবিজ্ঞানে'র বিরোধের কথা ('জ' চিহ্নিত বাক্য দ্রষ্টব্য) পাঠ করিয়া উহা ও তৎপরবর্ত্তী বাক্যগুলি রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজকে 'আঘাত' করিবার জন্য লিখিত—এ কথা ঐ পুস্তকেরই ১০৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন কেন বলিবেন কি? 'ধর্ম্মপ্রচার' প্রবন্ধে ব্রাহ্মসমাজকে আঘাত করিবার মত যতগুলি বাক্য আছে তাহার অনেকগুলিই উদ্ধৃত করিয়া দেখানো হইল, কোনটিই ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে প্রযুক্ত হইতে

* রবীন্দ্র জীবনী; বিচিত্র গদ্য-রচনা

† রবীন্দ্রনাথের 'ধর্ম্মপ্রচার' প্রবন্ধের রচনাকাল ১৩১০, ১২ই মাঘ (১৯০৪)

* পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ—'ব্রহ্মতত্ত্ব' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকা, ১ম ভাগ (১৩০৩)

পারে না ; তথাপি কি বলিতে হইবে রবীন্দ্রনাথ উক্ত প্রবন্ধে ব্রাহ্মসমাজকে আঘাত করিলেন ?

Yet Brutus says he was ambitions.
And Brutus is an honourable man!

রবীন্দ্রনাথ উক্ত প্রবন্ধে সাধারণভাবে নানা সম্প্রদায়মধ্যে ধর্ম্ম কিরূপ বিকৃত রূপ ধারণ করে তাহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ঠিক ঐ প্রকার বর্ণনা-সম্বলিত উপদেশ উহার দশ বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে প্রদত্ত ও পরে প্রকাশিত হয় তখন তদ্দ্বারা ব্রাহ্মসমাজকে আঘাত করা হইয়াছিল ইহা ত কেহই বুঝেন নাই ? তুলনা করুন—"অনেক সম্প্রদায়ের সংস্কার এই যে, ভাবের চরিতার্থই ধর্ম্ম।...যদি হৃদয় ভাবে গদগদ হয়, উচ্ছ্বাসে অধীর হয়, মানুষ নৃত্য করে ও গড়াগড়ি দেয়, তবে ইঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া মনে করেন যে, ধর্ম্মে অনেকটা অগ্রসর হওয়া যাইতেছে। এই ভাবুকতাপ্রধান ধর্ম্মে এক প্রকার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দুর্ব্বলতা উৎপন্ন করে..." (শিবনাথ 'ধর্ম্মজীবন' ঃ 'ধর্ম্ম কি ও ধার্ম্মিক কে') এবং— "অনুভূতিরও একটা অভ্যাস আছে। আমরা বিশেষ স্থানে বিশেষ ভাষাবিন্যাসে একপ্রকার ভাবাবেগ মাদকতার ন্যায় অভ্যাস করিয়া ফেলিতে পারি। সেই অভ্যস্ত আবেগকে আমরা আধ্যাত্মিক সফলতা বলিয়া ভ্রম করি কিন্তু তাহা একপ্রকার সম্মোহন মাত্র" (রবীন্দ্রনাথ ঃ 'ধর্ম্মপ্রচার')। আবার—"ধর্ম্ম মানবজীবনের এক অঙ্গের বস্তু নহে, এক দিনের কাজ নহে। একজন দুই ঘণ্টাকাল কোন বিশেষ স্থানে বদ্ধ হইয়া কোন বিশেষ নাম জপ করিল সেইটুকু তাহার ধর্ম্ম হইল, তৎপরে সে বিষয়কার্য্যে গেল, সেটুকু তাহার বিষয়কার্য্য, সেখানে ধর্ম্মের কিছু নাই—এরূপ নহে। বরং এই কথা বলিলেই প্রকৃত সত্য বলা হয় যে, সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বাবস্থাতে জ্ঞান প্রীতি ও ইচ্ছাযোগে ঈশ্বরের সহিত নিত্য-যুক্ত থাকিতে পারাই ধর্ম্ম" (শিবনাথ, ঐ) এবং "আমাদের ধর্ম্ম...রিলিজন নহে...ধর্ম্ম সংসারের আংশিক প্রয়োজন সাধনার জন্য নহে, সমগ্র সংসারই ধর্ম্মসাধনের জন্য" (রবীন্দ্রনাথ,"ধর্ম্মপ্রচার')। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, আচার্য্য শিবনাথের উপদেশের ন্যায় একই ভাবপ্রকাশক রবীন্দ্রনাথের বাক্যগুলি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উক্তির দোহাই দিয়া "ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মকে রিলিজন করিতে চান" এইপ্রকার সিদ্ধান্ত-প্রচার রবীন্দ্রনাথের মতের অপব্যাখ্যা ও অপপ্রচার।

এইবার আমরা 'ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডি' ও রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক 'ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডি কেটে বেরিয়ে আসা' এই বাক্য দুইটির মূলে কোনও সত্য আছে কিনা—আলোচনা করিব। কোনও ধর্ম্মের 'গণ্ডি'র সৃষ্টি কে করে তাহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলিয়াছেন, "ইহারা (ধর্ম্মের উপলব্ধিহীন প্রচারকগণ) ধর্ম্মকে বিশেষ গণ্ডি আঁকিয়া একটা সীমানার মধ্যে বদ্ধ করে", "ধর্ম্মব্যবসায়ী যেমন প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত ধর্ম্মের স্বরচিত গণ্ডি রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে থাকে" ('চ' চিহ্নিত বাক্য) ;—এই দুই বাক্য দ্বারা যে-কোন ধর্ম্মব্যবসায়ীকেই যে 'গণ্ডি'র সৃষ্টিকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা বলা হইতেছে ইহা সুস্পষ্ট, তবে বিশেষ করিয়া যে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে creed বা dogma প্রাধান্য আছে, বিধিনিষেধের প্রাবল্য আছে এবং যাহাদের ধর্ম্মযাজকেরা এই সকলের উপর জোর দিয়া চলার জন্য অন্য সম্প্রদায়ের লোকদিগকে এগুলি না মানিলে পৃথক থাকিতে বাধ্য করেন তাঁহারাই লক্ষ্যীকৃত, ইহাও সুস্পষ্ট। ব্রাহ্মধর্ম্মের কোনও বিশিষ্ট dogma নাই যাহা উক্ত ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের পক্ষে অবশ্যপালনীয়* ; সুতরাং যিনি বা যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের কোনও প্রকার গণ্ডি সৃষ্টি করিবেন, উক্ত রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট বাক্যানুসারে তাঁহাদের 'স্বরচিত গণ্ডি' হইবে। ব্রাহ্মসমাজ-রচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন গণ্ডি ছিল না, হইতেও পারে না ; ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং (বা তদীয় পিতৃদেব) ব্রাহ্মধর্ম্মের কোনও গণ্ডি রচনা করেন নাই, সুতরাং তাহা কাটিয়া বাহির হইবার প্রয়োজনও তাঁহার হয় নাই।

ইহা গেল আমাদের কথা, কিন্তু সাধারণ ভাবে উল্লিখিত 'ধর্ম্মের গণ্ডি' ছাড়াও বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের তথাকথিত 'গণ্ডি' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত স্মরণীয় বাক্যগুলি কি সমালোচকগণের চক্ষে পড়ে নাই বুঝিতে হইবে ?— "ব্রাহ্মসমাজে মানুষের মনকে নানা দিক হইতে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ধরিবার বাঁধা পদ্ধতি নাই...সাম্প্রদায়িক অতি নির্দিষ্টতার যে সাংঘাতিক অকল্যাণ তাহা স্বীকার করা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে প্রকৃতিবিরুদ্ধ তাহার মধ্যে এই একটি রহস্য আছে যে, সে যেমনটি সে তাহার চেয়ে অনেক বড়ো। এই রহস্যকে যদি অনির্দ্দিষ্টতা বলিয়া নিন্দা কর, তবে ইহাকে জাঁতায় ফেলিয়া পেষ—ইহার জীবধর্ম্মকে নষ্ট করিয়া ফেল"। ('সঞ্চয়', 'ধর্ম্মশিক্ষা')—"আমাদের ধর্ম্মের কোনো 'ডগমা' নেই শুনে তিনি (স্টপফোর্ড ব্রুক) ভারি খুশী হলেন, বললেন 'তোমরা খুব বেঁচে গেছ'" ('শান্তিনিকেতন', ২য় খণ্ড, 'অগ্রসর হওয়ার আহ্বান')। 'আমাদের ধর্ম্ম' বলিতে রবীন্দ্রনাথ কি 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' ছাড়া অন্য কোনও ধর্ম্ম বুঝাইয়াছেন ? ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ যে সঙ্কীর্ণ নয়, সার্ব্বভৌমিক বা বিশ্বজনীন ইহা বুঝাইতে গিয়া বলিতেছেন, "চিরকালের

---

* ব্রাহ্মধর্ম্মের 'বীজমন্ত্র' বা মূল সত্য কয়েকটি ভিন্ন পরবর্ত্তী অংশ দ্রষ্টব্য।

ভারতবর্ষকে ব্রাহ্মসমাজ নবীনকালের বিশ্বপৃথিবীর সভায় আহ্বান করেছে। বিশ্বপৃথিবীর পক্ষে এখনও এই ভারতবর্ষকে প্রয়োজন আছে...” (ঐ, ‘ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা’ সমস্ত প্রবন্ধটি পঠিতব্য)। কিন্তু প্রবোধবাবু তদীয় পাঠকবর্গকে বুঝাইবেনই “ব্রাহ্মধর্ম্ম যেখানে সঙ্কীর্ণ রবীন্দ্রনাথ সেখানে তাকে মানেন নি”। প্রবোধবাবু গবেষক, সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম (ব্রাহ্মসমাজ নয়) বলিতে কি বুঝায় তাহা ভাল করিয়াই জানেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্ত্ব বা আদর্শ সম্বন্ধে যথেষ্ট চর্চ্চা না করিয়াও নিজেকে (ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্পর্কে) একজন বিশেষজ্ঞ মনে করিয়া উঁহাকে ‘সঙ্কীর্ণ’ বলিবার অধিকার তাঁর হয়ত আছে এরূপ মনে করিতে পারেন; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের সেই সঙ্কীর্ণতা কোথায় তাহা দেখাইয়া দিলে ব্রাহ্মসমাজ তাহা সংশোধনের চেষ্টা করিয়া উপকৃত হইতেন। আপাততঃ রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তিগুলির পর এ সম্বন্ধে আমাদের বাক্যব্যয় করার প্রয়োজন নাই; যাঁহাদের ইচ্ছা হইবে তাঁহারা নীরবকণ্ঠ রবীন্দ্রনাথের লিখিত মত অগ্রাহ্য করিয়াই এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মকে ‘সঙ্কীর্ণ’ বলিতে পারেন।

ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধ সমালোচকগণ হয়ত বলিবেন,“ইহা ত আদর্শের কথা, বা ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কথা, ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ লোক যে মতানুসারে, যে ভাবে চলেন তাহা দ্বারাই আমরা ব্রাহ্মসমাজকে বিচার করিব”। —ইহারও সমুচিত উত্তর রবীন্দ্রনাথই দিয়াছেন, অন্যেও দিয়াছেন :

“কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মকে কয়েক জন মানুষের জীবনের মধ্য দিয়া দেখিতে গেলেও তাহাকে ছোট করিয়া দেখা হইবে। বস্তুত ইহা মানব ইতিহাসের সামগ্রী।” (ধর্ম্মশিক্ষা)

আবার বলিতেছেন :

“যদি কখনও দেখিতে পাই ব্রাহ্ম সমাজে বিলাসিতার প্রচার ও ধনের পূজা অত্যন্ত বেশী চলিতেছে, যদি দেখি সেখানে ধর্ম্মনিষ্ঠা হ্রাস হইয়া আসিতেছে তবে একথা কখনই বলি না যে যাহারা ধনের উপাসক ও ধর্ম্মে উদাসীন তাহারাই প্রকৃত ব্রাহ্ম, কারণ সংখ্যায় তাহারাই অধিক, অতএব আমাকে অন্য নাম লইয়া অন্য আর একটা সমাজ স্থাপন করিতে হইবে। তখন এই কথাই আমরা বলি এবং ইহা বলাই সাজে যে, যাঁহারা সত্যধর্ম্ম বাক্যে ও ব্যবহারে পালন করিয়া থাকেন তাঁহারাই যথার্থ আমাদের সমাজের লোক ;—তাঁহাদের যদি কর্ত্তৃত্ব না-ও থাকে, ভোটসংখ্যা গণনায় তাঁহারা যদি নগণ্য হন তথাপি তাঁহাদের উপদেশে ও দৃষ্টান্তে এই সমাজের উদ্ধার হইবে।—“আত্মপরিচয়”

সংখ্যাগণনা দ্বারা যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বা ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত রূপ নিরূপণ করা অযৌক্তিক এ সম্পর্কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট নেতা ও দার্শনিক পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ লিখিয়াছেন* :

“যে সকল মত এইরূপে (ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য বলিয়া) গৃহীত হয় নাই, অথচ আনুমানিক গণনায় যাহা হয় ত অধিকাংশ সভ্যের মত, সে মত কেবল অধিকাংশের মত বলিয়াই বিশেষ সম্মানের বস্তু নহে এবং তৎবিরুদ্ধ মত কেবল অপেক্ষাকৃত অল্পাংশের মত বলিয়া অসম্মানের বস্তু নয়। যে মত প্রকাশ্য রূপে বিচারিত, পরীক্ষিত, গৃহীত বা বর্জ্জিত হয় নাই, যে মত হয়ত আজ আছে কাল থাকিবে না, যে মত আজ অধিকাংশের, কাল অল্পাংশের এবং পরশ্ব অল্পাংশের মত হইয়া দাঁড়াইতে পারে, সে মত অধিকাংশের হউক আর অল্পাংশেরই হউক, তাহাকে সমাজের মত মনে না করিয়া ব্যক্তিগত মত বলিয়াই মনে করা উচিত এবং এইরূপ মতবিরোধী ব্যক্তি উপযুক্ত ও শ্রদ্ধেয় হইলে তাঁহার নিকট সমাজের বেদী, বক্তৃতামঞ্চ, পত্রিকার স্তম্ভ প্রভৃতি সমুদায়ই অবারিতদ্বার থাকা উচিত।”† “উপনিষদে জন্মান্তরবাদ আছে। জন্মান্তরবাদ ইদানীন্তন অধিকাংশ ব্রাহ্মের মতবিরুদ্ধ বটে, কিন্তু অধিকাংশ ব্রাহ্মের মতবিরুদ্ধ হওয়া আর ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ হওয়া এক কথা নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, আত্মা অমর ও অনন্ত উন্নতিশীল। আত্মা অশরীরী হইয়া অমর হইবে কি শরীরান্তর গ্রহণ করিবে, এই বিষয়ের মতামত ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যের অন্তর্গত নহে। জন্মান্তরবাদ অমরত্ব ও অনন্ত উন্নতির বিরোধী নহে, সুতরাং ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধীও নহে। (দ্রঃ রবীন্দ্রনাথের মত -“পথের-সঞ্চয়,” ইপ্‌-ফোডক্রক্)।”

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানি, নিষ্ঠাবান আমরণ ব্রাহ্মসমাজসেবী কোন কোনও ব্রাহ্ম শরীরান্তরে পুনর্জন্ম সম্ভব বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু তজ্জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন বা ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হন নাই।

“ফলতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যসমূহ—ঈশ্বরের একত্ব ও অনন্তত্ব, তাঁহার আধ্যাত্মিক উপাসনা, আত্মার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ যোগ, আত্মার অমরত্ব ও ক্রমোন্নতি, এই সমস্তই উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে। অবান্তর বিষয়ে উপনিষৎ-প্রতিপাদিত ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রভেদ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু অবান্তর বিষয়ে সকল ধর্ম্মেরই প্রাচীন ও আধুনিক আকারে প্রভেদ হয় এবং অবান্তর বিষয়ে আধুনিক ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও অনেক প্রভেদ আছে। অবান্তর

* “ব্রহ্মতত্ত্ব” : “সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—ইহার মতবৈচিত্র্য ও ও উদারতা,” ১৩০৩

† কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোনও কোনও ব্রাহ্মদের সহিত সর্ব্বপ্রকার অবান্তর বিষয়ে একমত না হইলেও রবীন্দ্রনাথ উক্ত সমাজমন্দিরে বক্তৃতাদান ও বেদী গ্রহণ করিয়া উপাসনা করিয়াছেন (দ্রঃ ‘রবীন্দ্র-জীবনী’ ২য় খণ্ড, ৩৪০ পৃ.)। তাঁহাকে উক্ত সমাজের Hon. memberও করা হয়।

প্রভেদে প্রাচীন ও আধুনিকের, পূর্ব্ব-পুরুষ ও পর-পুরুষের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।...উপনিষদের যে সকল মত আধুনিক মতের বিরুদ্ধে ও আধুনিকগণের অপ্রীতিকর, সেই সকল মত (ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের) মূল সত্যসমূহের বিরুদ্ধ ও বিনাশক নহে" (ব্রহ্মতত্ত্ব; বেদান্ত-প্রতিপাদিত ব্রাহ্মধর্ম্ম—তত্ত্বভূষণ)।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, দুই-এক জনের মত বা অধিকাংশের মত দ্বারা যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বা ব্রাহ্মসমাজের বিচার করা চলে না এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও পণ্ডিত তত্ত্বভূষণ উভয়েই একই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই ঐক-মত্যের উপর ভিত্তি করিয়া আমরা এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে প্রভাতবাবুর একটি টিপ্পনীর বিচার করিব। রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' উপন্যাসের বরদাসুন্দরীর কতকটা অতিরঞ্জিত* চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "পৃথিবীতে কোন্ জিনিসটা ব্রাহ্ম এবং কোন্ জিনিসটা অব্রাহ্ম তাহারই ভেদ লইয়া তিনি সর্ব্বদাই অত্যন্ত সতর্ক হইয়া থাকেন।" উপন্যাসের এই চরিত্রবর্ণনের বাক্য ভিত্তি করিয়াই প্রভাত বাবু "গোরা" সমালোচনাকালে লিখিলেন, "ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কোন্‌টা ব্রাহ্ম, কোন্‌টা অব্রাহ্ম লইয়া যে খুঁতখুঁতানি দেখা যায়, তাহা কবির মতে উদারতার পরিচায়ক নহে।" বরদাসুন্দরীর মতন, বা 'গোরার' হারাণবাবুর মতন ব্যক্তির অস্তিত্ব ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কোন এক সময়ে অসম্ভব বা অস্বাভাবিক ছিল না, যেরূপ 'গোরায়' চিত্রিত কয়েকটি স্ত্রী ও পুরুষ চরিত্র তৎকালে হিন্দু সমাজের মধ্যেও অসম্ভব ছিল না; কিন্তু প্রত্যেকেই দুইটি সমাজের অন্তর্গত এক এক রকম চরিত্রের টাইপ হইতে পারে, অথচ ইহারা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট চরিত্র। কেহই সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় নয়। কিন্তু উপন্যাস-বর্ণিত একটি চরিত্রের বর্ণনাবাক্যের ভিত্তিতে সাধারণ ভাবে "ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কোন্‌টা ব্রাহ্ম, কোন্‌টা অব্রাহ্ম তাহা লইয়া খুঁতখুঁতানি দেখা যায়"—এরূপ সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য মন্তব্য করা সমালোচনার বিকার। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। পূর্ব্বকালে শুনিয়াছি, দুই-এক জন ব্রাহ্ম ঈশ্বরকে 'হরি' সম্বোধন করিতে আপত্তি করিতেন; কিন্তু এই প্রকার ব্যক্তিগত গোঁড়ামির স্থান সাধারণ ভাবে ব্রাহ্মসমাজে কোনও কালে হয় নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত উপাসনা-পদ্ধতির শান্তিবাচনের অন্তে "হরি ওঁ" উচ্চারিত হয়; 'হরি' নামযুক্ত সচরাচর মন্দিরে গীত বহু ব্রহ্মসঙ্গীতের গণনা নিষ্প্রয়োজন। প্রভাতবাবুর এই প্রকার ভিত্তিহীন মন্তব্য* অনুসরণ করিয়া প্রবোধবাবু ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা দেখিতে পাইয়াছেন ও পুনঃ পুনঃ উহা অসঙ্কোচে ঢক্কানিনাদে পাঠকবর্গের নিকট প্রচার করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকত্ব ও জাতীয়ত্ব এই উভয় দিকই যে সত্য, এ কথা রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকল ব্রাহ্মধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিই ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে ও 'হিন্দু ব্রাহ্ম' বিতর্কে 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকায় (১লা বৈশাখ, ১৩১৯) যাহা লিখিয়াছেন, তাহার প্রতি সমালোচকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি; স্থানাভাবে উহার অল্পাংশমাত্র উদ্ধৃত করিতেছি— "(ব্রাহ্মসমাজ) বিশ্বের সামগ্রী নয় ত কী? কিন্তু বিশ্বের সামগ্রী ত কাল্পনিক আকাশ-কুসুমের মত শূন্যে ফুটিয়া থাকে না; তাহা ত দেশ কালকে আশ্রয় করে, তাহার ত বিশেষ নামরূপ আছে।" "যদি সকল প্রকার গণ্ডিকে, সকল প্রকার বিশিষ্টতাকে একেবারে অস্বীকার করাকেই সর্ব্বজনীনতা বলে তবে সর্ব্বজনীনতা বস্তুতই আকাশ কুসুম সন্দেহ নাই। ভাইকে মানি না, কিন্তু ভ্রাতৃভাবকে মানি, এ কথাও যেমন তেমনি সর্ব্বজনকে বিশেষ বলিয়া মানি না, একটা নির্ব্বিশেষ সর্ব্বজনীনতা মানি, ইহাও সেইরূপ মাথা নেই তার মাথা ব্যথা। প্রত্যেকের বিশিষ্টতা আছে...।" ইহার পর আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লিখিত "Rammohan the Universal Man" নামক যে ভাষণ প্রকাশিত হয়

* "কেবল সাহিত্য কেন, কোনও কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে। যেমনটি ঠিক, তেমনি লিপিবদ্ধ করা সাহিত্য নহে ...দূর হইতে যে জিনিষটা দেখাইতে হয়, তাহা কতকটা বড় করিয়াই দেখানো আবশ্যক; সুতরাং এখানেই বাড়াবাড়ি হইবার সম্ভাবনা" (রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য সমালোচনা)।

"Art begins where the artist departs from strict imitation of nature imposing upon her a rhythm of his own creation."—Encyc. Britt.

প্রভাতবাবু নিজেও বলিয়াছেন, "গোরায় মধ্যে ব্রাহ্মদের যতদূর সম্ভব বিকৃত করিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন।"

‡ প্রভাতবাবু রবীন্দ্রনাথ "'গোরায়' ব্রাহ্মদের যতদূর সম্ভব বিকৃত করিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন," বলিয়াও বরদাসুন্দরী চরিত্রের 'বিকৃত' বর্ণনা সমগ্র 'ব্রাহ্মসমাজের' হুবহু প্রতিচ্ছবিজ্ঞাপক বাক্য ব্যবহার করিলেন কেন? 'গোরা' কি ব্রাহ্মসমাজের chronicle না creation of art? ১৩১০ সনে 'সাহিত্য সমালোচনায়' 'বাড়া-বাড়ির' কারণ সমর্থন ও প্রদর্শন করিয়া রবীন্দ্রনাথ ১৩১৪ সনে 'গোরা' উপন্যাসে ব্রাহ্মসমাজের একটি প্রতিচ্ছবি বা ফটোগ্রাফ দিয়াছেন? উপন্যাসটিকে কোনও বুদ্ধিমান পাঠকের ব্রাহ্মসমাজের ফটোগ্রাফ মনে করিবার কারণ থাকিলে কি দুই বৎসর ধরিয়া (১৩১৪-১৬) "প্রবাসী"তে ছাপিবার জন্য 'গোরার' পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রনাথ রামানন্দবাবুর নিকট প্রেরণ করিতেন?

(১৯২৪) উহার 'The Ideals of Universal Religion' শীর্ষক অংশকে এ সম্পর্কে চরম উক্তি বলা যাইতে পারে। এই সকল মনীষী-লিখিত মত প্রকাশিত হইবার প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে লিখিত রবীন্দ্র জীবনীর সমালোচনায় প্রভাত-বাবুর নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথের সুব্যক্ত মতের ভিত্তিতেই ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকত্ব বিষয়ের ব্যাখ্যা পাঠ করিবার আশা করিয়াছিলাম। তিনি "ধর্ম্মের নবযুগ" প্রবন্ধের বিষয়সূচী মধ্যে লিখিয়াছেন, "ধর্ম্ম বিশেষ হইয়াও সার্ব্বজনীন হইতে পারে—হিন্দু ধর্ম্মও বিশ্বজনীন ধর্ম্ম", ইহা রবীন্দ্র-মতের correct synopsis; কিন্তু "ব্রাহ্মধর্ম্মের গণ্ডি"র কথা বলিতে গিয়া যে নিজ ভাবাবেগানুযায়ী বলিলেন, "খাঁচা যতই সুন্দর হউক, আকাশ সুন্দরতর" (দ্রষ্টব্য 'খ') ইহা রবীন্দ্রমত তথা সকল মতবিরোধী অন্তঃসারশূন্য ভাবের উক্তি—"কাল্পনিক আকাশ কুসুমের মত।" কবি-কল্পনার দিক দিয়া ইহা সুন্দর হইতে পারে কিন্তু তত্ত্বের স্থানে ফাঁকা; সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম যেন শেলীর "Skylark"-এর মত সুন্দর আকাশে নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ 'unbodied joy' "drinking in illimitable sweetness"; কিন্তু এই পক্ষীকে বাস্তব-রাজ্যের সাধনীয় ধর্ম্ম করিতে হইলে তাহার, 'খাঁচায়' না হইলেও, রক্ষনীড় রূপ স্থির ভূমিতে অবতরণ করা দরকার। নির্ব্বিশেষ সার্ব্বজনীনতার প্রতিবাদে কথিত রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "এই যে আমাদের ভাবাবেগ, এই যে আমাদের আইডিয়াল, কবন্ধের মতো ইহার মুণ্ড নাই কেবল দেহ আছে, ইহার বিশেষত্ব নাই কেবল বিশ্বত্ব আছে।" আচার্য্য শীলের ভাষণ একাধিক বার মুদ্রিত হইয়াছে, সম্প্রতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত ভাষণ প্রদত্ত হইবার পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আচার্য্য শীলের মতানুরূপ ভাব অনেকাংশে ব্যক্ত হওয়ায় এবং বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য বলিয়া উহা হইতে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি—"যে কোনও বস্তু হউক না কেন, তাহা আদর্শে সার্ব্বভৌমিক কিন্তু প্রকাশে বিশেষ, জাতীয়। নতুবা প্রকাশ অসম্ভব। সার্ব্বভৌমিক সার্ব্বভৌমিক রূপেই প্রকাশিত হইতে পারে না।...জাতিসকল আপনাদের বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াই এক সাধারণ আদর্শ ও উদ্দেশ্যের নিয়ে একত্রিত হইবে (দ্রষ্টব্য আচার্য্য শীলের The Ideal of Universal religion)। এই একত্ব আমাদের উদ্দেশ্য, প্রথম হইতেই আমরা তাহা পাইতে পারি না। সুতরাং যে পরিমাণে আদর্শ আয়ত্তীকৃত হইবে সেই পরিমাণে আমাদের একত্ব প্রস্ফুটিত হইবে।" (ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বেদান্তবাগীশ, ব্রহ্মতত্ত্ব ৪র্থ ভাগ, ১৩০৬)। "জাতীয়তায় সার্ব্বভৌমিকত্ব নষ্ট হয় না, জাতিগত সঙ্কীর্ণতায়ই সার্ব্বভৌমিকত্ব নষ্ট হয়"। (তত্ত্বভূষণ) এতৎসম্পর্কে প্রবোধবাবু লিখিত বাক্যা-বলীর প্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজন; উহাদের পশ্চাতে এ বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাব প্রতীয়মান হয়। তাঁহার একটিমাত্র বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি—"রবীন্দ্রনাথের উপাসিত ধর্ম্মও এ সবের (আচার, পদ্ধতি ও আনুষ্ঠানিকতার) বিরোধী। ঈশ্বরের বিশেষ নামহীনতাও উক্ত ধর্ম্মের একটি লক্ষণ।" রবীন্দ্রনাথ ধর্ম্মানুষ্ঠানে "আচার, পদ্ধতি, আনুষ্ঠানিকতার বিরোধী" কখনই ছিলেন না; রবীন্দ্রনাথের শেষোক্ত প্রবন্ধ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠযোগ্য। ঈশ্বরের নাম সম্পর্কে তিনি উপনিষদের "ব্রহ্ম" শব্দই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহার করিয়াছেন; 'অপ্রচলিত সংগ্রহ' ২য় খণ্ড মধ্যে 'ব্রহ্ম মন্ত্র' 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' নামক প্রবন্ধদ্বয় ও ধর্ম্মবিষয়ক সমস্ত প্রবন্ধগুলি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

রবীন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আবদ্ধ' ছিলেন না এই অনুমানের সমর্থনে প্রবোধবাবু কোনও বাহ্য প্রমাণ দিতে পারেন নাই; তিনি যে ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মই পালন করিয়া গিয়াছেন তাহার বাহ্য প্রমাণ আমরা দিব। (১) তিনি মহর্ষির দীক্ষার দিন ৭ই পৌষের অনুষ্ঠান চিরাচরিত ব্রাহ্ম-পদ্ধতি অনুসারে বরাবর সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন [প্রবোধ বাবুর "আচার পদ্ধতি···" বাক্য অপ্রমাণিত হইল]; (২) ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান 'মাঘোৎসব' যথারীতি শেষ বয়স পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিয়াছেন। (৩) "আত্মপরিচয়" প্রবন্ধ; "ধর্ম্মশিক্ষা" ও "শান্তিনিকেতন" যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যসমূহ ভিত্তি করিয়া ধর্ম্মব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (৪) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনারারী সভাপদ শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যাখ্যান করেন নাই।

ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে সমা-লোচকগণ অনেক কথাই বলিয়াছেন। এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ, "মতবৈশিষ্ট্য ও তাহার উদারতা" সম্বন্ধে আমাদের গভীর শ্রদ্ধাভাজন ও প্রভাতবাবুর পরম পূজনীয় আত্মীয় পরলোকগত তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের যেসকল বাক্য প্রভাত বাবুর পাঠ করিবার সুযোগ সম্ভবতঃ ঘটে নাই তাহার কয়েকটিমাত্র উদ্ধৃত করিব। এগুলি লিখিত হয় ১৩০৩ বঙ্গাব্দে, রবীন্দ্রনাথের "সঞ্চয়" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পনর বৎসর পূর্ব্বে। উদারতা ও অন্যান্য বিষয়ে উভয়ের মত-সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার মত: "বিশেষ বিশেষ শাস্ত্র ও ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতে পারেন···এরূপ বিশেষ দেশ, শাস্ত্র বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব ও জাতীয়তা উৎপন্ন হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক হইলেও ইহা এদেশের জাতীয় ধর্ম্ম···" "ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যসমূহ—ঈশ্বরের একত্ব ও অনন্তত্ব, তাঁহার আধ্যাত্মিক উপাসনা, আত্মার

সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ যোগ, আত্মার অমরত্ব ও ক্রমোন্নতি।" "ব্রাহ্মধর্ম এ দেশের পক্ষে নূতন ধর্ম নহে, ইহা উপনিষদাদি ব্রহ্মবাদ-প্রতিপাদক হিন্দুশাস্ত্রসম্মত ধর্ম। ব্রাহ্মসমাজও হিন্দু-সমাজ হইতে স্বতন্ত্র একটি সমাজ নহে, ইহা সুসংস্কৃত হিন্দু সমাজমাত্র।" (ইহার সহিত তুলনীয় পনর বৎসর পরে লিখিত "আত্মপরিচয়" প্রবন্ধ)। "কোন বিশেষ শাস্ত্র বা গুরুর উপর ব্রাহ্মধর্ম নির্ভর করে না; সত্যমাত্রই ব্রাহ্মধর্মের শাস্ত্র, সত্যের শিক্ষক মাত্রই ব্রাহ্মধর্মের গুরু।* কোন জাতি, সম্প্রদায় বা ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্মের একমাত্র অধিকারী নহে, উপযুক্ত সাধনসম্পন্ন প্রত্যেক জাতি, সম্প্রদায় ও ব্যক্তিই ব্রাহ্মধর্মের অধিকারী। ইহাই ব্রাহ্মধর্মের সাধারণত্ব ও সার্বভৌমিকত্ব" ("ব্রহ্মতত্ত্ব" ১ম ভাগ)। প্রভাতবাবু পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদযোগ্য কয়েকটি কথা বলিয়াছেন; "রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজস্ব...এজন্য কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে শেষ পর্যন্ত আবদ্ধ থাকেন নাই—(পুরাতন ও নূতন শতাব্দী)। "রবীন্দ্রনাথ এমন কি ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ মতবাদের মধ্যেও শেষ পর্যন্ত আবদ্ধ থাকিতে পারেন নাই" (ঐ); "শান্তিনিকেতনের" ধর্মতত্ত্বের সহিত সনাতনী ব্রাহ্মধর্মের মিল নাই" (১৮৮ পৃ)। 'সনাতনী ব্রাহ্মধর্ম' বলিয়া কোনও কথা হইতে পারে না; আমাদের পরিচিত কোন ব্রাহ্ম ইহার অর্থ বা উৎপত্তি বলিতে পারেন নাই; কারণ ব্রাহ্মধর্মের কোনও বাঁধাধরা মতবাদ নাই। ব্রাহ্মধর্ম কালের ক্ষেত্রে ধাবিত নদী—তাহার রূপ প্রবহমাণ রূপ" ইত্যাদি (দ্রঃ 'ধর্মশিক্ষা')। "রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা তাঁহার নিজস্ব" হইবারই কথা। সাধনপথে অগ্রসর প্রত্যেক সাধকের ব্যক্তিগত সাধনপন্থা—তিনি যে ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত হউন না কেন, সামাজিক বা সমষ্টিগত ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র হইবেই। এই সাধনপ্রণালীর বিশিষ্ট পথ সাধক নিজ আধ্যাত্মিক জীবনের অভাব-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অবলম্বন করেন। আমাদের পরিচিত অনেক হিন্দু সমাজ-ভুক্ত ভক্ত সাধক বিভিন্ন সাধনপ্রণালীর পথে অগ্রসর হইতেছেন, তথাপি তাঁহারা হিন্দুই; অনেক ব্রাহ্ম সাধক ব্রাহ্মসমাজের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাকিয়া স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যহ ব্যক্তিগত সাধনপ্রণালী অবলম্বনে সাধন করিয়াছেন, কিছু পরে প্রয়োজন হইলে সামাজিক উপাসনা করিয়াছেন—ইহাতে তাঁহাদের ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত ধর্মের সহিত যোগসূত্র ছিন্ন হয় নাই এবং হইতে পারে না। কোনও ব্যক্তি ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত থাকিয়া পরে উক্ত সমাজ ত্যাগ করিলেন কি না তাহা তিনিই বলিতে পারেন, কারণ ব্রাহ্মধর্মের নিকট তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের ঋণবোধ ও তজ্জনিত তাঁহার আনুগত্যস্বীকার করা বা না করার উপর তাহা নির্ভর করে; সেই ঋণবোধ তাঁহার নিজস্ব, এ সম্বন্ধে অন্যের মত প্রকাশ বলপূর্বক করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন,

"He never forgot that his own lonigng to consider the problems of his country and his religion on the grand scale had found its first fulfilment in his youthful membership of th S. B. Samaj. And he was so far from repudiating this membership, that he one day exclaimed--"It is for them to say whether I belong to them or not! Unless they have removed it, my name stands on their books to this day!"

—*The Master as I saw Him*, Ch. XVII.

প্রকৃত ধর্ম যাহা তাহার সাধন ও তৎসম্পর্কিত ব্যাখ্যান অসাম্প্রদায়িক। রবীন্দ্রনাথ ধর্মের যে আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা ব্রাহ্মধর্মেরই আদর্শ এবং তাঁহার বাণী যে আজ সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মার্জিতরুচি লোকের নিকট আদৃত ইহা মানব-সমাজের পক্ষে কল্যাণের কথা। কিন্তু তাঁহার বাণীর সহিত তদীয় জীবনের ঘটনা বা কার্য্যকে জড়িত করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলে অনেক স্থলে জীবনের অথবা সমাজের অপূর্ণতার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়; তাহা এই কল্যাণ-পন্থানুসরণের পরিপন্থী। রবীন্দ্র-বাণীই রবীন্দ্র জীবন।

---

* 'গুরু' সম্পর্কে এই আদর্শ ব্রাহ্মসমাজে শুধু পুস্তকেই লিখিত থাকে নাই। একটি বিশেষ গুরুবন্দনা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সাধনের অঙ্গ হয়, উহা তিনি প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া আবৃত্তি করিতেন এবং তাহা তাঁহার নিষ্ঠাবান হিন্দুপিতার পিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া এইরূপ ছিল—

... ...

সিদ্ধঃ শাক্তো রামজয়ো মগ্নোধর্মস্য সাধনে।
আনন্দ মোহনো বন্ধুব্রহ্মার্পিত তনুঃ সুহৃৎ।
রামকৃষ্ণ শক্তিসিদ্ধো মাতৃভাব সমন্বিতঃ।

ইহার পর আছে—"প্রেমিকা ফ্রান্সেস কব, তত্ত্বদর্শী ঋষি মার্টিনো ..."ইহারা সকলে আমার গুরু, ইহাদের স্মরণ করিয়া আমি ধর্ম-সাধনে মহাশক্তি লাভ করি।"—হেমলতা দেবী রচিত জীবনচরিত ২৮৯ পৃ.।

ব্রাহ্মসমাজের আরও একাধিক ব্রহ্মসাধকের বিষয় জানি যাঁহারা ভিন্ন সম্প্রদায়ের গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্ম-সমাজেই জীবন কাটান।

গ্রাম্য পুজারি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

গ্রাম-দেবতার সেবক সে ছিল—
রাধামাধবের পূজারী,
ভকতি, নিষ্ঠা, আশ-আকাঙ্ক্ষা
তাঁরি পদে দিল উজাড়ি'।
প্রাণ ভরি শুধু তাঁহারে সাজায়,
বদন ভরিয়া তাঁরি গান গায়,
নয়ন ভরিয়া নেহারি সে রূপ
জীবন দিল যে গুজারি'।

২

ক্ষুদ্র তাহার গ্রামের গণ্ডী—
তাহার নিকটে ত্রিভুবন,
তিল ও তুলসী দিয়া সে সঁপেছে
হরি-পদে তার দেহ মন।
ধন, মান, জয়, যশে বীতরাগ,
শুধু দেবতার মাগে সে সোহাগ,
পরিতৃপ্তিতে পূর্ণ হৃদয়—
গণে না অভাব অনটন।

৩

দেশের শ্রেষ্ঠ পূজারীবৃন্দে
ডাক দিয়াছেন মহারাজ,
পাবে শত ভরি স্বর্ণের হার
গুণী পূজারীরা সবে আজ
রাজসভা গেছে ভক্তেতে ভরি',
এসেছে সকলে কত আশা করি'
গ্রাম্য-পূজারী দেখিতে এসেছে
অনাহুত তবু নাহি লাজ

৪

দেখে রাজসূয় সম সমারোহ
পূজ্য-পূজার সে আসর,
যুধিষ্ঠিরের কি বিনীত বেশ—
দীনতা এত কি মনোহর।
অবর্ণনীয় সে সভার শোভা,
সমাগত জন-গণ-মনোলোভা,
ভ্রমিছেন হাসি' পাণ্ডব-সখা

৫

রত্নের হার গলে—ফিরিছেন
পূজারীর দল গৃহে সব।
করিছে তাঁদের জয়ধ্বনি যে
লক্ষ লোকের কলরব।
অনিমন্ত্রিত পূজারীকে হায়,
দেখে নাকো কেহ, কিছু না শুধায়।
পরের সুযশে পরমানন্দ
নিজে সে করিছে অনুভব।

৬

শ্রীকৃষ্ণ তারে সহসা হেরিয়া
ভুজবন্ধনে বাঁধি' হায়,
কহেন—বন্ধু কখন এসেছ?
কোথায় চলেছ অবেলায়?
পূজারী কাঁপর—সরে না বচন,
চাহে মুখপানে, ঝরে দুনয়ন,
বলে, "হেন দীনে হে মহামহিম!
বন্ধু বলা কি শোভা পায়?"

৭

গোপনে শুধান হৃষীকেশ তাঁরে
'কই শত ভরি হেমহার?
ইন্দ্রপ্রস্থ জানে নাকো বুঝি
সখা পরিচয় হে তোমার?
এসো লয়ে যাই নৃপতির কাছে।'
দ্বিজ কয় 'তাতে কিবা লাভ আছে?
পরশমণির হার লভিয়াছি
বাকি কি রহিল পেতে আর?

৮

যাঁহারে পাইলে সব পাওয়া হয়
পেয়েছি তাঁহার পরশন,
যাঁহারে দেখিলে সব দেখা হয়
পেয়েছি তাহার দরশন,
আলিঙ্গনের বুকজোড়া হার,
সকল দৈন্য ঘুচালো আমার,
অমৃতময় করেছ আমারে
আর কিছু নাহি প্রয়োজন।

নদীতে যখন বান আসে অতর্কিতেই আসে। কোথাও কিছু নাই, সহসা কোথা হইতে রাশি রাশি জল আসিয়া দুই কূল ভাসাইয়া একেবারে তছনছ করিয়া যায়—জল সরিয়া গেলে শীর্ণতোয়া, শান্ত নদীটির পানে চাহিয়া লোকে ভাবে ইহার এত তেজ।

ক্ষিতীশ তাহাই ভাবিতেছিল, কিন্তু তাহার দোষ নাই। শনিবার আপিস-ফেরত আড়াই গজ লংক্লথ স্ত্রীর জন্য কিনিবে; তাহারই কাপড় দেখিতেছিল, সহসা একটি প্রৌঢ়ার সহিত দুইটি তরুণী আসিয়া দোকানে দাঁড়াইল।

ক্ষীণাঙ্গী প্রৌঢ়ার দুই হাতে মোটা শাঁখা, সীমন্তে চওড়া সিঁদুর, তরুণীদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ঈষৎ দীর্ঘ, বর্ণ গৌর, আচরণ এবং পরিচ্ছদ সংযত। কনিষ্ঠা শ্যামা, বয়স আঠার-উনিশ, দেহভঙ্গী ও বেশ-বাস তাহার বয়সের মতই উদ্ধত এবং বিশৃঙ্খল,—সাড়ী পরিয়াছে পশ্চিমাদের মত ডান কাঁধ ঢাকিয়া।

কনিষ্ঠা হাসিতে হাসিতে দোকানে ঢুকিয়াছিল, ক্ষিতীশের দিকে বারেক তির্য্যক দৃষ্টি হানিয়া, হাস্যসংবরণ করিয়া মায়ের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল কিন্তু হাসির সে লহর তখনও তাহার সুঠাম দেহ বেষ্টন করিয়া ফিরিতেছে।

তাহার শ্লথ বেশ ও চপল ভঙ্গী দেখিয়া ক্ষিতীশের ভ্রূ সামান্য কুঞ্চিত হইল। জ্যেষ্ঠা বোধ হয় সে ইঙ্গিত বুঝিয়াছিল, তাড়াতাড়ি বসনপ্রান্ত টানিয়া আরও কণ্ঠসংলগ্ন করিল। কিন্তু কনিষ্ঠার ঔদ্ধত্যে তাহার কোন প্রভাব লক্ষিত হইল না।

ক্ষিতীশ দাম দিয়া কাপড়ের টুকরা হাতে তুলিয়া লইয়াছে, কিন্তু ভাঙ্গানির জন্য তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইল। ততক্ষণে তরুণীদ্বয় প্রৌঢ়ার সহিত অপর ফুটপাতে চলিয়া গিয়াছে। যাইবার কালে (ক্ষিতীশের মনোভাব বুঝিয়াই বোধ হয়) তরুণী আরও তীব্র একটি ভ্রূকুটি করিয়া গেল। এই পাল্টা-শাসনে ক্ষিতীশ সত্যই আহত হইল। অন্যমনস্কভাবে দোকান ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া ভাবিতে লাগিল, ইহাদের শাসন করিবার কি কেহই নাই? ইহাদের জন্যই বিদেশে বাঙালীর দুর্নাম রটিয়াছে; পশ্চিমাদের মত কাপড় পরিলে স্থানীয় লোকের মনে যে অশ্রদ্ধা জাগিবে তাহা ভাবিয়া ক্ষিতীশ রীতিমত রুষ্ট হইল। সুযোগ পাইলে সে তরুণীটিকে মুখের উপর দু'চার কথা শুনাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু এমন সামান্য ছুতায় যে সাহস পাওয়া যায় না!

অন্যমনস্কভাবে ক্ষিতীশও যে কখন অপর ফুটপাতে চলিয়া আসিয়াছে বুঝিতে পারে নাই। সহসা তাহার খেয়াল হইল তরুণী দুইটি সামনের দোকানেই দাঁড়াইয়া আছে। অপ্রতিভ হইয়া রুমাল কিনিবার ছলে সেও দোকানে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, সুযোগ উপস্থিত হইলে সে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে কুণ্ঠাবোধ করিবে না, বাঙালী হিসাবে তাহার সেটুকু অধিকার আছে বৈকি। কি ভাবিয়া তরুণী অকস্মাৎ তাহার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল, মুখ দেখিয়া মনে হইল যেন বলিতেছে—রণং দেহি।

অজ্ঞাত আশঙ্কায় সহসা ক্ষিতীশের বুকখানা কেমন তোলপাড় করিয়া উঠিল, যে সঙ্কল্প লইয়া আসিয়াছিল, মুখে তাহার উপযুক্ত ভাষা জোগাইল না। বাধ্য হইয়া ক্ষিতীশকে

দুইখানি রুমাল কিনিতে হইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে সরিয়াও যাইতে পারিল না।

ইতিমধ্যে প্রৌঢ়া মেয়েদের লইয়া দোকানের ভিতর গিয়া ঢুকিলেন। ক্ষিতীশ ঊর্দ্ধমুখ হইয়া দাঁড়াইয়াই রহিল,—তাহার দৃষ্টি দরজায় টাঙ্গানো সাড়ীগুলির দিকে।

সহসা দোকানের ভৃত্য উঠিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল: কি চাই বাবু, ভিতরে আসুন না?

কি ভাবিয়া তরুণী অকস্মাৎ তাহার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল, মুখ দেখিয়া মনে হইল যেন বলিতেছে—ধ্বণং দেহি

ক্ষিতীশের ভিতরে যাইবার কোনই উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু ভৃত্যের সম্বোধনে সকলে এমন সন্দিগ্ধভাবে তাহার দিকে চাহিল যে কেবল আত্মসম্মান রক্ষার জন্যই তাহাকে ভিতরে ঢুকিতে হইল।

তরুণী দুইটি কোরা সাড়ী ও সস্তার 'চিকেন' দেখিতেছিল, ক্ষিতীশকে ঢুকিতে দেখিয়া তাহার দিকে তির্য্যক দৃষ্টি হানিয়া আবার কাপড়ে মন দিল। কনিষ্ঠার দৃষ্টি যেন একেবারে মর্মভেদী।

দোকানী বলিতেছে, বাংলা মিলের সাড়ী ছাড়া কি আপনাদের পছন্দ হবে?—দেখুন কেমন পাড়, কি সুন্দর জোল।

কনিষ্ঠা প্রৌঢ়ার আগেই বলিয়া ফেলিল, কিন্তু বাংলার বলেই ত আর আড়াই টাকা বেশী দেব না।

তবে বোম্বে-ই নিন, এর পাড় আরও ভাল, এই দেখুন।—দোকানী খরিদ্দারের মন বুঝিয়া কথা ঘুরাইল।

তরুণীর কথাগুলি যেন ক্ষিতীশকে কশাঘাত করিল। সে হয় ত এই সুযোগে কিছু বলিয়া ফেলিতে পারিত, কিন্তু মুখরাকে ঘাঁটাইতে তাহার সাহসে কুলাইল না। বলিল, আমায় তাঁতের শাড়ী দেখাও ত, ধনেখালি, শান্তিপুরী যা হয়।

দোকানী তাহার সামনে একরাশ সাড়ী রাখিয়া গেল, সে একখানি করিয়া সাড়ী তুলিয়া, খুলিয়া, ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল।

ক্ষিতীশ অনেকগুলি সাড়ী বাছিয়া একটি ফিরোজা রঙের সাড়ী হাতে তুলিয়াছে, এমন সময় কনিষ্ঠার সহিত সহসা তাহার দৃষ্টিবিনিময় হইয়া গেল।

ক্ষিতীশ তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল, কেমন হবে বলুন ত?…তত্ত্ব পাঠাতে আছে কিনা—

কনিষ্ঠা যেন শুনে নাই এভাবে প্রথমে মুখ ঘুরাইয়া লইল, কিন্তু পরক্ষণেই মুখখানি লাস্যময় করিয়া তুলিয়া উত্তর দিল, বেশ ত রং নিন না।

সহসা তরুণীর দৃষ্টি যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; কাঁধের কাপড়ে হেঁচকা টান মারিয়া সে এবার সোজা হইয়া বসিল। বিজয়িনীর সে আকর্ষণে ভীরু বস্ত্রাঞ্চল যেন আরও নীচে সরিয়া গেল।

কন্যার কথায় চকিত হইয়া প্রৌঢ়া ঘাড় ফিরাইলেন, তার পর পুরু চশমার ভিতর দিয়া ক্ষিতীশের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, মেয়ে সুন্দর হয় ত এটা নাও বাবা।

প্রৌঢ়া একখানি জাম রঙের ডুরে-সাড়ী তুলিয়া ক্ষিতীশের হাতে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তরুণী মৃদু প্রতিবাদ জানাইল, মার যেমন পছন্দ।

ক্ষিতীশ বিপদে পড়িল।

যাহার জন্য সে সাড়ীখানি লইতেছে সে মোটেই সুন্দরী

নয়, অথচ সকলের সামনে সে কথা স্বীকার করিতেও বাধিল। নিতান্ত দৃষ্টিকটুতা এড়াইবার জন্যই সে 'ডুরে' খানি কিনিল, কিন্তু মনের গোপনে কোথায় একটি কাঁটা বিঁধিতে লাগিল।

সে একবার তরুণীর দিকে চাহিল, কিন্তু সেখানেও আর আগের দৃষ্টি খুঁজিয়া পাইল না। হয়ত বা সে আহত হইয়াছে এবং মনে মনে তাহার অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিনীর কথাই চিন্তা করিতেছে। ক্ষিতীশ ব্যাগ খুলিয়া খানিক কি ভাবিয়া লইল. তার পর যেই সে ব্যাগ উজাড় করিয়া সাড়ে উনিশ টাকা গুনিয়া দিল, অমনি তাহার মনে বিবেকের প্রতিক্রিয়া আসিল।

সে বিবাহিত, দুইটি সন্তানের পিতা সে, তাহার পক্ষে এরূপ চপলতা নিতান্তই অশোভন। তা ছাড়া মাসের মাঝামাঝি, আর্থিক অনটন আছেই।

ক্ষিতীশ সাড়ীখানি বগলে চাপিয়া নিতান্ত অপরাধীর মত বাহির হইয়া আসিল, তরুণীর দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না।...

বাড়ীর পথে সে যথাসম্ভব মন হালুকা করিয়া চলিতে লাগিল, কিন্তু যে পরিমাণে সে মনকে প্রবোধ দিল, ততটা কৃতকার্য হইতে পারিল না।

বাড়ীতে ঢুকিয়া তাহার মন আরও দমিয়া গেল। দেখিল, কপালে পাড়ের ফিতা বাঁধিয়া স্ত্রী শুইয়া আছে, জ্বরের উত্তাপে চোখ-মুখ রক্তাভ। পাশেই রুগ্ন সন্তান।

তথাপি বিবেকাহত মনকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সে অরুণার পাশে বসিয়া কতক্ষণ তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিল। তাহার পর এক সময়ে সাড়ীখানি তাহার সামনে ধরিয়া বলিল কেমন হয়েছে বল ত?

অরুণা সাড়ী দেখিয়া খুশী হইয়াছে মনে হইল না। উদাস ভাবে একবার সেদিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, খোকার বালি এনেছ?

ক্ষিতীশের উপর যেন একটি চাবুক আসিয়া পড়িল। অপ্রতিভ হইয়া বলিল, বড় ভুল হয়ে গেছে, আবার গিয়ে এনে দিচ্ছি। ..

এখন থাক। আগে জল খেয়ে নাও গে। এই টানাটানির মধ্যে সাড়ী কেনার কি দরকার ছিল?—জ্বরের বেগে অরুণা হাঁপাইতেছে।

ক্ষিতীশ তাও বুঝাইবার চেষ্টা করে, তোমায় তো ভাল কিছুই দিতে পারি না, ভাবলুম...

তাই বলে বুড়ো মাগী ঐ জামরঙের ডুরে পরব? তুমিও কি দিন দিন ছেলেমানুষ হচ্ছ। অরুণার কণ্ঠে মৃদু তিরস্কার।

সে তিরস্কার তাহার প্রাপ্য। কাজেই সে আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া খাটের রেলিঙের সঙ্গে সাড়ীখানি ঝুলাইয়া হাত-মুখ ধুইতে ভিতরে চলিয়া গেল।

সেই মুহূর্তে অরুণার একজোড়া ভ্রুকুটিকুটিল চক্ষু দেখিয়া তাহার দেহ যেন হিম হইয়া গেল

রান্নাঘরে আসিয়াছে, দেখিল মা মুখভার করিয়া গজ গজ করিতেছেন।

ব্যাপার কি মা, এই অসময়ে রান্না?

আত্মাস্তর আর কাকে বলে, বৌয়ের মেসো এসেছেন। ত্রিবেণীতে স্নান করতে গেছেন, ফিরলেই যোগাতে হবে ত? বৌ ত তিন দিন অস্তর কাত হয়েই আছেন।

ক্ষিতীশ কোন কথা বলিল না। নীরবে আহার সারিয়া অরুণার কাছে ফিরিয়া যাইতেছে, এমন সময় তাহার মেসোশ্বশুর হাতে ভিজা কাপড়ের বড় পুঁটুলি লইয়া ঢুকিলেন।

ক্ষিতীশের দশ বৎসর বিবাহ হইয়াছে। মেসোশ্বশুর মাঝে মাঝে সরকারী কাজে দিল্লী হইতে এলাহাবাদে আসিতেন,

কাজেই সে তাঁহাকে চিনিত, কিন্তু তাঁহার আর কাহাকেও সে এ পর্য্যন্ত দেখে নাই।

ক্ষিতীশ হেঁট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মাথা তুলিয়াছে, মাসীমা দুই মেয়েকে লইয়া ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহাদের মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন।

আমাদের জামাই গো, ক্ষিতীশ!—মেসোমশায় পরিচয় করাইলেন।

মাসীমা তাঁহাকেও বিস্মিত করিয়া জানাইলেন—আ কপাল, একসঙ্গে বসে এখখুনি যে দোকানে কাপড় কিনলাম।

পরিস্থিতি বুঝিয়া ক্ষিতীশ হতবাক; দুই শ্যালিকা মুখ টিপিয়া হাসিতেছে।

ক্ষিতীশ এবার তাঁহাদের লইয়া তাড়াতাড়ি অরুণার ঘরে ঢুকিল। মাসীমা অরুণার পাশে বসিয়া কহিলেন, কেমন আছিস মা? বড় বিব্রত করলাম তোদের···এঃ, গা যে পুড়ে যাচ্ছে।

কনিষ্ঠা শ্যালিকার নাম লতা। সহসা খাটে ঝুলানো সাড়ীর উপর নজর পড়িতেই সে হাসিয়া উঠিল—কি জামাইবাবু কাকে তত্ত্ব পাঠাচ্ছেন? সাড়ীটা ত দিব্যি দিদির খাটে ঝুলছে।

মৃদু কণ্ঠে ক্ষিতীশও এবার রসিকতা করিল—কেন, তোমারও ত বিয়ে হচ্ছে শুনলাম, তোমাকেই দেব।

ঈস্!—বলিয়া লতা শেষ বারের মত বিজয়ের হাসি হাসিল, নয়নে আবার মর্ম্মভেদী দৃষ্টি।

মাসীমা উঠিয়া ভিতরে গিয়াছেন। দুর্লভ রত্নকে ঘরের মধ্যে পাইয়া এবং তাহার চটুল চাহনি দেখিয়া সহসা ক্ষিতীশ যেন বিহ্বল হইয়া পড়িল। সে এবার আরও কিছু রসিকতা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে অরুণার একজোড়া ভ্রুকুটিকুটিল চক্ষু দেখিয়া তাহার দেহ যেন হিম হইয়া গেল।

অরুণার রূপ ছিল না, কিন্তু দেহলাবণ্য ছিল, স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্যও ছিল, এমন কম মেয়েরই থাকে। কিন্তু গত বৎসরে ছেলেটি হইবার পর হইতে তাহার যে কি হইল, সে যেন দিন দিন শয্যায় মিশিয়া যাইতেছে। তাহার নিজের দেহের হাল দেখিয়া এখন তাহারই কান্না আসে, আর সেই সঙ্গে আসে স্বামীর আচরণের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি।

নারী নারীকে বিশ্বাস করে না, আর সবচেয়ে কম করে নিজের স্বামীকে।

তাই আজ ক্ষিতীশের বিহ্বলতা দেখিয়া তাহার রোষ-ক্ষুব্ধ চক্ষু যেন বলিতে চাহিল, আমারও এক দিন ছিল, সেদিন আমিও তোমার হৃদয় হরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু এত শীঘ্র আমায় ভুলিবে?

আহত বিবেক তখন ক্ষিতীশের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছে। সহসা তাহার রাগ গিয়া পড়িল লতার উপর, যেন দোষ তাহারই।

তুমি অমন করে কাপড় পরেছ কেন? ওতেও কি কোন বাহাদুরি আছে।

লতা তাড়াতাড়ি দেহের উদ্ধত অংশে আঁচল টানিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

ক্ষিতীশের মনে তখন ভাঁটার টান।

সঙ্গম-পথে স্নানার্থীদের জন্য নির্মিত [illegible] মঞ্চ

কুম্ভমেলায় সাধু-সম্প্রদায়

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

প্রয়াগের কুম্ভমেলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়গত প্রাতিষ্ঠানের সাধুগণ সম্মিলিত হন। প্রধান প্রধান সাধু-সম্প্রদায়ের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :

সাধুগণের মুখ্য চারিটি সম্প্রদায় ও বহু উপসম্প্রদায় আছে। চারিটি মুখ্য সম্প্রদায় এই : (১) সন্ন্যাসী, (২) বৈষ্ণব, (৩) উদাসীন ও (৪) যোগী। উপসম্প্রদায় যথা—রামসনেহী, জয়কৃষ্ণী, চরণ দাসী, পায়রদাসী, গুলাবদাসী, নির্মলে, নিতঙ্গ, নিবৃত্তনাথী, একনাথী, গুলালসাহবী, কবন্তা, নিরাকারী, প্রেমপ্রকাশী, কবীরপন্থী, দাদূপন্থী, সাধুরেশাহী, রাধাস্বামী ইত্যাদি।

(১) সন্ন্যাসী—শঙ্করাচার্যের প্রবর্তিত মায়াবাদী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ই সাধারণতঃ 'সন্ন্যাসী' নামে ইঁহারা পরিচিত। (ক) 'দণ্ডী' ও (খ) 'অদণ্ডী' ভেদে দ্বিবিধ। একমাত্র ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত সাধুগণ 'দণ্ডী' হইতে পারেন। (ক) ইহারা তীর্থ, আশ্রম, সরস্বতী, পুরী, ভারতী, গিরি, সাগর, পর্বত,

প্রয়াগের কুম্ভমেলায় স্নানার্থী যাত্রিসমাবেশ
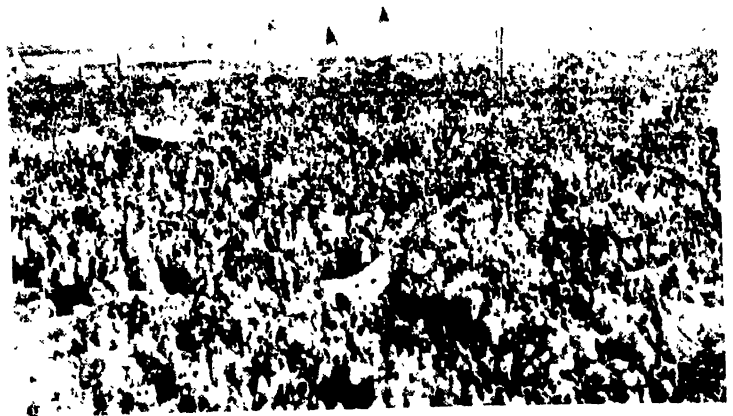
কুম্ভমেলার একটি দৃশ্য, এলাহাবাদ

বন ও অরণ্য—এই দশ প্রকার সন্ন্যাস-নাম ধারণ করেন বলিয়া 'দশনামী সন্ন্যাসী' রূপে খ্যাত। (খ) শঙ্কর-সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণেতর সাধুগণ 'অদণ্ডী'—অর্থাৎ, ইঁহারা দণ্ড ধারণ করেন না। উভয় প্রকার সন্ন্যাসীই গৈরিক বস্ত্র পরিধান করেন।

অদণ্ডী সাধুগণ অনেক প্রকার। ইঁহারা 'পঞ্চায়তী অখাড়া' নামেও পরিচিত। সাধুগণের সাম্প্রদায়িক মণ্ডলীকে 'অখাড়া' বলে। অদণ্ডী সাধুগণের সাতটি মুখ্য অখাড়া, যথা—(অ) মহানির্বাণী, (আ) নিরঞ্জনী, (ই) জুনা (ভৈরব), (ঈ) অটল, (উ) আবাহন, (ঊ) আনন্দ ও (ঋ) অগ্নি। তন্মধ্যে মহানির্বাণী ও নিরঞ্জনী সম্পত্তি এবং সংগঠন বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ।

মণ্ডলেশ্বর—সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের অখাড়া ব্যতীত 'মণ্ডলেশ্বর' প্রথাও আছে। যাঁহারা এক একটি মণ্ডলী গঠনপূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি 'মণ্ডলেশ্বর' নামে খ্যাত হন। এক এক মণ্ডলেশ্বরের অধীনে দুই শত পর্যন্ত সাধু থাকেন। মণ্ডলেশ্বরগণের সর্বপ্রধানকে 'মহামণ্ডলেশ্বর' বলে। মহামণ্ডলেশ্বর মণ্ডলেশ্বরগণকে নিযুক্ত করেন।

জমাত—আট জন মহন্ত ও আট জন কারবারী এবং তাঁহাদের সহিত পর্যটক বহু সন্ন্যাসী লইয়া যে দল গঠিত হয়, তাহাকে 'জমাত' বা 'পঞ্চ' বলা হয়। এই পঞ্চের সহিত প্রায় আট শত সন্ন্যাসী এবং ইহার প্রশাসন পরিষৎ (Governing Body) থাকেন। প্রত্যেক স্থানে আট জন 'থানাপতি' থাকেন। জমাত বা পঞ্চই উক্ত থানাপতি ও সম্পাদক নিয়োগ করেন। সগরবংশধ্বংসকারী কপিলই ইঁহাদের ইষ্টদেব। ইঁহারা মায়াবাদী।

(অ) মহানির্বাণী পঞ্চায়তী অখাড়া—প্রয়াগে দারাগঞ্জে ইঁহাদের প্রধান কার্যালয়। ইহার শাখা—হরিদ্বার, কনখল, নাসিক, বেরার, বরোদা, উদয়পুর, ওঙ্কারেশ্বর প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত। এই অখাড়ায় সম্পাদকের পদই সর্বোচ্চ। ইনি সকল প্রকার কার্য নির্বাহ করেন। ইঁহারা নাগা-শৈব ও জটাধারণ করেন।

(আ) নিরঞ্জনী পঞ্চায়তী অখাড়া—এই অখাড়ার বিধানও পূর্বোক্ত মহানির্বাণী অখাড়ার ন্যায় এবং ইঁহাদের মধ্যে সম্পাদকের পদই সর্বোচ্চ পদ। সম্পাদক অখাড়াদ্বারাই নিযুক্ত হন। প্রয়াগের 'মোরীগেটে' ইঁহাদের অখাড়া আছে। অন্যান্য প্রধান শাখা—কাশী-শিবালয়ঘাট, হরিদ্বার, ওঙ্কারেশ্বর, বরোদা, নাসিক, ত্র্যম্বকেশ্বর প্রভৃতি স্থানে আছে। ইঁহাদের উপাস্য—কার্ত্তিক। ইঁহারাও নাগা-শৈব ও জটাধারী।

নির্বাণী ও নিরঞ্জনী অখাড়ায় পরস্পর গুরুশিষ্য বা সতীর্থ ভ্রাতৃসম্বন্ধ নাই। যে-কোন গুরুর নিকট হইতে যে-কোনরূপ দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কেবল অখাড়ার নিয়মকানুন মানিয়া চলিলেই একত্রে বাস করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকুলোদ্ভূত ব্যক্তি নির্বাণী ও নিরঞ্জনী অখাড়ার সদস্য হইতে পারেন। শারীরিক ও মানসিক বলই ইঁহাদের প্রধান যোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হয়। এই অখাড়ায় প্রবেশের পূর্বে ইষ্টদেবের সম্মুখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সদস্য হইতে হয়। তৎপরে 'বস্ত্রধারী', তৎপর 'নাগা' অর্থাৎ 'নগ্ন' বা 'দিগম্বর' পদ ক্রমে ক্রমে লাভ হয়। প্রায় বার বৎসর গুরুর নিকট অবস্থান করিয়া বস্ত্রধারী গুরুসেবা করেন; তৎপরে 'নাগা'-পদ প্রাপ্ত হন। প্রত্যেক কুম্ভপর্বের সময় বস্ত্রধারীকে নাগার দীক্ষায় দীক্ষিত করা হয়।

(ই) পঞ্চায়তী-অখাড়া জুনা—ইঁহাদের প্রধান স্থান কাশী। হরিদ্বার ও ওঙ্কারেশ্বরে ইঁহাদের শাখা আছে। মহানির্বাণী পঞ্চায়তী অখাড়ার অধিকাংশ রীতিনীতি ইঁহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। ইঁহারা দত্তাত্রেয়ের উপাসক।

(ঈ) পঞ্চায়তী অখাড়া অটল—ইঁহাদেরও প্রধান স্থান কাশী। ইঁহারা গণেশের উপাসনা করেন।

(উ) পঞ্চায়তী অখাড়া আবাহন—ইঁহাদের প্রধান কেন্দ্র

কাশী দশাশ্বমেধঘাট। ইঁহারাও গণেশের উপাসক।

(ঙ) পঞ্চায়তী অখাড়া আনন্দ—ইঁহাদের প্রধান কেন্দ্র কাশীতে 'পঞ্চকোশী কপিলধারা' নামক স্থানে অবস্থিত। ইঁহারা সূর্যের উপাসনা করেন।

(চ) পঞ্চায়তী অখাড়া অগ্নি—এই অখাড়ায় দশনামী নাগা-সন্ন্যাসীদিগের ব্রহ্মচারিগণ থাকেন। ইঁহাদের মূল স্থান কাশী। এই অখাড়ায় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণ সম্মিলিত হইতে পারে না। ব্রহ্মচারিগণ গায়ত্রীর উপাসনা করেন। ইঁহাদের কোন মণ্ডলেশ্বর নাই; কেবল কার্যনির্বাহের জন্য অধিকারী থাকে।

প্রয়াগে সঙ্গমের স্নানঘাটে পাণ্ডাগণের ছাতা ও স্নানার্থিগণ

সাধুগণের শোভাযাত্রা গঙ্গার পশ্চিম পারে যাইতেছে

দশনামী নাগা-সন্ন্যাসীদের উক্ত সাত অখাড়া আছে। ইঁহাদের ইষ্টদেব পৃথক্ পৃথক্ হইলেও সকলেই মায়াবাদী। কথিত আছে, মুঘল-সম্রাট আহম্মদ শাহের শাসনকালে রাজেন্দ্রগিরি (অভ্যুদয়কাল ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ) সন্ন্যাসিগণের অখাড়ার পত্তন করেন এবং সৈনিক-সন্ন্যাসীদল গঠন করেন।
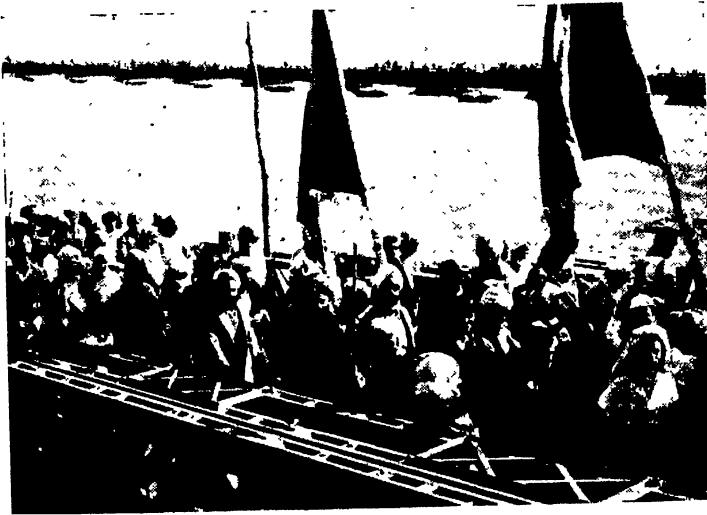
(২) বৈষ্ণব—বিষ্ণুর উপাসকমণ্ডলী 'বৈষ্ণব-সম্প্রদায়' নামে খ্যাত এবং সাধারণতঃ চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত বলিয়া কথিত। শ্রীরামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক ও বিষ্ণুস্বামীর অধস্তন-গণ এবং রামানুজ-শাখার রামানন্দ-স্বামী ও মতবিশেষে বিষ্ণুস্বামী-শাখার বল্লভাচার্যের অধস্তন বৈষ্ণবগণ উক্ত চারি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তাঁহারা আবার দুই ভাগে বিভক্ত—(১) অখাড়া ও (২) খালসা। এই দুই শ্রেণী সাধু-সন্তকে 'বৈরাগী' বলা হয়। এই প্রকার বৈরাগী-সাধুর তিন অখাড়া আছে, যাহা অনী—অর্থাৎ সেনা নামে প্রসিদ্ধ। হিন্দুধর্ম ও সাধু-সম্প্রদায়ের রক্ষার জন্য ইঁহারা সেনারূপে রহিয়াছেন। জনশ্রুতি এই যে, লক্ষ্মণগিরি ও ভৈরবগিরি নামক দুই জন সন্ন্যাসী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উপর উপদ্রব এবং তদানীন্তন মুসলমান শাসকগণ হিন্দুগণের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার ও পীড়ন আরম্ভ করিলে রামানন্দীশাখার বালানন্দজী রাজস্থানের জয়পুর-নরেশের সমস্ত সেনাকে বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া উক্ত উপদ্রব দমন করিবার জন্য এক বিরাট সেনাদল গঠন করেন। এই সাধু-সেনাবাহিনী প্রধানতঃ তিনটি—(ক) নির্বাণী অনী, (খ) নির্মোহী অনী ও (গ) দিগম্বর অনী; এতদ্ব্যতীত আরও চারিটি—মহানির্বাণী, সন্তোষী, খাকী ও নিরালম্বী। এই সাতটি অখাড়াই বালানন্দজী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই অখাড়ার সাধুগণ অখাড়মল্ল, নাগা, অতীত ইত্যাদি নামে খ্যাত। ইহারা সমগ্র ভারতবর্ষে ভ্রমণ করেন।

প্রত্যেক অখাড়ার ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নযুক্ত পতাকা আছে। প্রধান তিনটি এই ভাবে গঠিত হইয়াছে :

(ক) নির্বাণী অনী অখাড়ায়—খাকী অখাড়া, নিরালম্বী অখাড়া, টাটাম্বরী অখাড়া, বলভদ্রী অখাড়া, হরিব্যাসী নির্বাণী, হরিব্যাসী খাকী প্রভৃতি সকলেই সম্মিলিত হয়।

(খ) নির্মোহী অনী অখাড়ায়—গোড়িয়া অখাড়া, মালধারী অখাড়া, হরিব্যাসী, সন্তোষী ও হরব্যাসী মহানির্বাণী আদি সম্মিলিত হইয়া থাকে।

(গ) দিগম্বর-অনী অখাড়ায়—শ্যাম-দিগম্বর ও রাম-দিগম্বর সম্মিলিত হয়।

প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীবড়াঙ্গজী, এলাহাবাদ
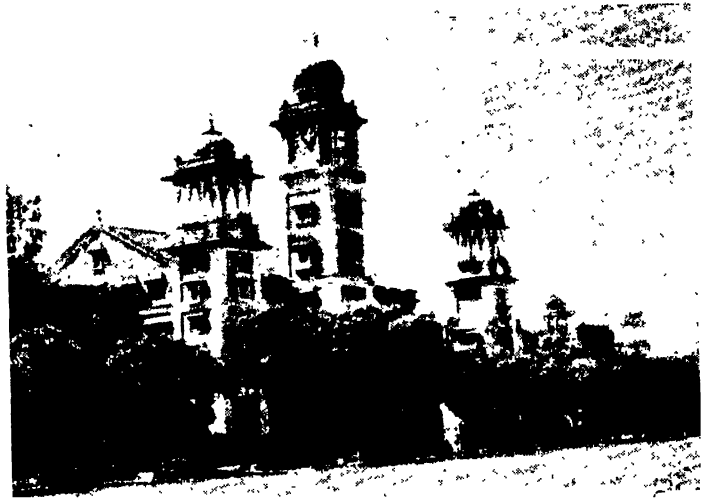
এই তিন প্রকার অখাড়া ব্যতীত অতিরিক্ত সাধুগণ খালসার সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকেন। খালসার সাত শ্রেণীতে বিভক্ত এবং প্রত্যেকের পৃথক পৃথক মোহন্ত আছে। ইহাদের নাম, যথা—(১) চারি সম্প্রদায়ের [(ক) মধ্ব সম্প্রদায়, (খ) নিম্বার্ক সম্প্রদায়, (গ) বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়, (ঘ) রামানন্দী সম্প্রদায়)] খালসা, (২) ডাকোর খালসা, (৩) ডাণ্ডিয়া খালসা, (৪) ত্যাগী খালসা, (৫) নন্দরাম দাসের খালসা, (৬) মহাত্যাগী খালসা ও (৭) সপ্তর্ষি খালসা।

রামানুজশাখার রামানন্দী-সম্প্রদায়েই উক্ত অখাড়া ও খালসা রহিয়াছে। সম্ভবতঃ রামানন্দীশাখার বালানন্দজী বর্তমান আকারে কুম্ভমেলার প্রবর্তন করায় রামানন্দীশাখার বৈষ্ণবগণ কুম্ভমেলায় অধিক সংখ্যায় সমবেত হন। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈরাগী সাধুগণও ক্রমশঃ অধিকতর সংখ্যায় কুম্ভ-মেলায় যোগদান করিতেছেন। মধ্ব-সম্প্রদায়ের অনুগত বলিয়া পরিচয়প্রদানকারী গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ এই মেলায় যোগদান করিলেও পুরোপুরি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মুমুক্ষু সাধুসম্প্রদায়ের পঞ্চায়তী মেলায় যোগদান করেন না।

(৩) উদাসীন-সম্প্রদায়—বিধর্মীদের অত্যাচার হইতে হিন্দুগণকে রক্ষা করিবার জন্য নানকের পুত্র শ্রীচন্দ্রজী (জন্ম ১৫৫১ বিক্রমসংবৎ = ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) এই সম্প্রদায় সংগঠন করেন। ঠট্‌ঠা নগর, বারহট, শ্রীনগর (কাশ্মীর), কন্‌হার ও পেশাবর—এই পাঁচটি স্থানে পূর্বে ইঁহাদের প্রধান আবাস-স্থল ছিল। পরবর্তীকালে এই সম্প্রদায়ের নির্বাণ শ্রীপ্রীতম-দাসজী ১৮৪৪ বিক্রম সংবতে (= ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে) প্রয়াগে সকল উদাসীন-সম্প্রদায়কে একত্রিত করিয়া 'পঞ্চায়তী উদাসীন অখড়া' স্থাপন করেন। প্রয়াগের কীটগঞ্জে 'পঞ্চায়তী অখাড়া বড়া উদাসীন' নামক অখড়াই ইঁহাদের প্রধান প্রতিষ্ঠান। এতদ্ব্যতীত ভদৈনী (বেনারস), কনখল (সাহারাণপুর), সাহেবগঞ্জ, মুলতানগঞ্জ (ভাগলপুর), অসুরগঞ্জ

(মুঙ্গের), প্রতাপটাণ্ডা (মজঃফরপুর), গোপীগঞ্জ (বারাণসী), বালিয়া, বৃন্দাবন, সুখারস (পাতিয়ালা), কুরুক্ষেত্র, উজ্জয়িনী, ত্র্যম্বক, নির্বাণ অখাড়া (দক্ষিণ হায়দরাবাদ), লাল তালাব (গুণ্টুর), শিবকাঞ্চী, রামধুনি (নেপাল), দয়ালপুর (পঞ্জাব), পণ্ডৌলা (হরদোই) প্রভৃতি স্থানে রহিয়াছে। ইঁহারা নিরাকারবাদী ও চরমে নির্বিশেষবাদী পঞ্চোপাসক।

এই উদাসীন সম্প্রদায়ের বিধান দুই প্রকার:—(১) স্বতন্ত্র মঠ—ইহাতে গুরুপরম্পরাক্রমে যোগ্য শিষ্য মোহন্ত হন। (২) অখাড়া—ইহাতে ভোটদ্বারা মোহন্ত নির্বাচিত হয়। চার জন প্রধান মোহন্ত ও প্রায় এক শত জন সাধুর 'জমাত' ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া স্ব-সম্প্রদায়ের মঠ-পরিদর্শন, মোহন্ত-স্থাপন, স্ব-সম্প্রদায়ের মতবাদ প্রচার, তীর্থ ভ্রমণ ও কুম্ভপর্বে সদাব্রতাদির পরিচালনা করেন।

উদাসীন পঞ্চায়তী নয়া অখাড়া—১৯০২ সংবতে উদাসীন সঙ্গত সাহেবজীর সময় ইঁহার অনুগত সম্প্রদায় উদাসীন বড়া অখাড়া হইতে পৃথক হইয়া প্রয়াগের মুঠিগঞ্জে নয়া অখাড়া স্থাপন করেন। হরিদ্বার, গয়া, কাশী, কুরুক্ষেত্র, উজ্জয়িনী, অমৃতসর প্রভৃতি স্থানেও ইঁহাদের শাখা বর্তমান। ইহাতে কেবল সঙ্গত সাহেবের অনুগত ব্যক্তিগণই সম্মিলিত হন।

নির্মল পঞ্চায়তী অখাড়া—ইহা শিখ-সম্প্রদায়ের দশম গুরু গোবিন্দসিংহের প্রতিষ্ঠিত উদাসিগণের অখাড়া। উক্ত সম্প্রদায়ের সাধু মহতাবসিংহের শিষ্য পাতিয়ালা-নরেশ স্বীয় গুরুর মত প্রচারার্থ এই নির্মল সম্প্রদায়ের প্রায় সকল সাধুকে একত্রিত করিয়া ১৯১৮ সংবতে (=১৮৬১ খ্রীঃ) হরিদ্বারের কনখলে প্রধান অখাড়া স্থাপন করেন। কাশী, প্রয়াগ, ত্র্যম্বক, উজ্জয়িনী, হৃষীকেশ, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানেও ইঁহাদের প্রতিষ্ঠান আছে।

(৪) যোগী বা নাথ-সম্প্রদায়—ইঁহারা হঠযোগ সাধন করেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ এই সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ যোগী ছিলেন। ঔঘড় ও দর্শনীভেদে নাথ সম্প্রদায় দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। দর্শনী নাথ-সম্প্রদায় কানফট নামে পরিচিত। ইঁহাদের প্রধান গাদী (বর্তমানে পাকিস্থানের মধ্যে) যেহ্লম্ জিলায় টীলা নামক স্থানে অবস্থিত। ভারতবর্ষে গোরখপুরে গোরক্ষনাথের মন্দির এবং নেপালে মৎস্যেন্দ্রনাথের মন্দির নাথ সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান। রোহতক জেলার অবোহর নামক স্থানে ইঁহাদের একটি সম্পত্তিশালী মঠ আছে।

এতদ্ব্যতীত এই বৎসর প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভমেলায় বিভিন্ন শ্রেণীর দণ্ডী ও বিভিন্ন জাতীয় সাধুর সমাবেশ হইয়াছিল।

হিমালয় হইতে গঙ্গার অবতরণ

উত্তরপ্রদেশস্থ বিভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক ও নীতিধর্মমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহও তাঁহাদের মত এবং শিক্ষাদি প্রচারার্থ কুম্ভমেলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেও বিভিন্ন প্রকার সাধু-সন্ন্যাসীর কথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে বর্ণিত আছে।* চৈতন্যদেব প্রয়াগে রূপকে বলিয়াছিলেন :

কৃতাঃ সিদ্ধিব্রজ-বিজয়িতা সত্যধর্মা সমাধি
ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ।
যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপু-বশীকার-সিদ্ধৌষধীনাং
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণ-সরণী-পান্থতাং ন প্রয়াতি॥†

শ্রীকৃষ্ণের বশীকরণ বিষয়ে সিদ্ধ ঔষধি-স্বরূপ দাস্যাদি প্রেমসমূহের লেশমাত্রও যে-পর্যন্ত চিত্তপথের পথিক না হয়, সেই পর্যন্তই সমৃদ্ধিশালিনী অণিমাদি সিদ্ধিসমূহের উৎকর্ষ, সত্য, শৌচ, দানতপস্যাদি যাহার সাধন সেইরূপ সত্যধর্ম-যুক্ত সমাধি এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মানুভবজনিত মহা-আনন্দও সাধকের চিত্তের চমৎকারিতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়।

* শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ২।৭

† শ্রীললিতমাধব নাটক ।২

শহরপত্তনের মূল নীতি

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

আজ কয়েক মাস ধরিয়া এক কথা চলিয়াছে, "কল্যাণী, কল্যাণী, কল্যাণী"। বলা বাহুল্য, শেষের দিকে কংগ্রেসের অধিবেশন ও প্রদর্শনী উপলক্ষ্য করিয়া প্রতিনিয়ত কল্যাণীর কথা উঠিয়াছে। কিন্তু তাহারও কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে রাজ্য-সরকারের প্রচারের ফলে লোকে কল্যাণী শহরের নামের সহিত পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কল্যাণী একটি নূতন "শহর" বা উপশহর হইবে বলিয়া বিবিধ প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। কয়েকটি বড় শহর আর অধিক লোকের ভার বহনে অক্ষম, বাংলার অজস্র গ্রাম আর লোক ধরিয়া রাখিতে পারে না। শহরের অভিমুখে লোক চলিতে আরম্ভ করিয়া নিত্য নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতেই কল্যাণী-জাতীয় শহরের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধ হইতেছে।

পল্লী আর শহর, আর নূতন নাম শহরতলী বলিলে লোকের মনে প্রত্যেকটির রূপের একটি ছবি জাগিয়া উঠে। গ্রাম বলিতে একটি ক্ষুদ্র স্থান, সরকারী খাতাপত্রে স্বনামে পরিচিত এবং তাহার মধ্যে কতকগুলি কুটীর, হয়ত মাঝে মাঝে কয়েকটি পাকা কোঠা (বাড়ী) বা 'দালানে'র অধিকারে গর্ব্বিত। এই সকল গ্রাম সরকারী নথিপত্রে নির্দ্দিষ্ট সীমানা দ্বারা বেষ্টিত এবং সাধারণতঃ আয়তনে অর্দ্ধ হইতে দেড় বর্গমাইল স্থান জুড়িয়া অবস্থিত। গ্রামবাসীর সংখ্যার কোনও স্থিরতা নাই, সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণী বা ক্ষুদ্র গ্রামের অধিবাসী সংখ্যা অনূর্দ্ধ পাঁচ শত, দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঁচ শত হইতে দুই হাজার, তৃতীয় শ্রেণীতে দুই হইতে পাঁচ হাজার এবং তদূর্দ্ধে পাঁচ হাজারের অধিক। এই অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিলে ইহাকে নগর-পর্য্যায়ে উন্নীত করা যাইতে পারে।

চলতি কথায় বলা যায়—গ্রামের বিড়াল জঙ্গলে প্রবেশ করিলে বনবিড়াল আখ্যা লাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকে। যাহারা দিন আনে দিন খায়, মাঝে মাঝে যাহাদের ভাগ্যে অনাহার জুটিয়া থাকে, তাহারা দরিদ্র। যাহাদের সংসার চলিয়া শত মুদ্রার সংস্থান থাকে, তাহারা গরীব গৃহস্থ; শত মুদ্রা সহস্রে পরিণত হইলে সচ্ছল অবস্থা; সহস্র লক্ষে পৌঁছিলে লক্ষপতি, ক্রোড়পতি ধনী, "রাজা" বলিয়া পরিচিত হয়। গ্রাম-সম্বন্ধে সেইরূপ একটা অবস্থা মনে করিলে নিতান্ত ভুল হয় না। তবে লোকসংখ্যা ছাড়াও নগর বা [illegible]

লোকসংখ্যা ছাড়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত সকল অঞ্চলই শহর নামে পরিচয়লাভ করিয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটি না থাকিলেও যাহা "শহর" তাহার লোকসংখ্যা ন্যূনপক্ষে পাঁচ হাজার—প্রতি বর্গমাইলে অন্ততঃ এক হাজার লোকের বসতি। ঐরূপ স্থানে শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা শাসনবিভাগীয় গুরুত্ব এবং অধিবাসীর তিন-চতুর্থাংশ পুরুষ কৃষি ভিন্ন অপর উপায়ে উপজীবিকা অর্জ্জন করিতে বাধ্য হইলে শহর বা "টাউন" বলা হয়। "মহানগরী" বলিতে গেলে উপরন্তু লক্ষাধিক বসতি থাকা একান্ত প্রয়োজন।

পশ্চিম বাংলায় পাঁচ শত অধিবাসীর গ্রাম ও গ্রামবাসীর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে এবং বসতিযুক্ত গ্রামের সংখ্যাও বিশেষ কমিতেছে, উপরন্তু নূতন শহর গজাইয়া উঠিতেছে অথবা কল্যাণীর ন্যায় শহরসৃষ্টির বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। ১৯০১ হইতে ১৯৫১ সন পর্য্যন্ত পশ্চিম বাংলায় বসতিপূর্ণ গ্রামের সংখ্যায় বিশেষ অবনতি লক্ষিত হইয়া থাকে। ১৯০১ সনে ৪৩,৩৯০, দশ বৎসর বাদে ১৯১১ সনে তাহা ৪১,০২৫ হয়। প্রতি দশ বৎসর অন্তর সময়ের হিসাবে ইহা যথাক্রমে, ৩৫,৬০৪; ৩৫,৬২৫; ৩৫,৬০৩ ও ৩৫,০৬৩ সংখ্যায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ৫১৮টি পল্লী শহর বলিয়া পরিচিতির গৌরবলাভে সমর্থ হইয়াছে। তবে এ কথাও সত্য যে এখনও অনূর্দ্ধ পাঁচ শত লোকের বসতিযুক্ত গ্রামে বাংলার অধিকাংশ লোকই বাস করিতেছে। গ্রাম ও শহরের অধিবাসী-সংখ্যা বিচার করিলে দেখা যায়:

অধিবাসীসংখ্যা	শতকরা লোকের বাস
অনূর্দ্ধ ৫০০	২০.২৯
৫০০-১,০০০	১৯.৫৭
১,০০০-২,০০০	১৮.০২
২,০০০-৫,০০০	২৩.৬১
৫,০০০-১০,০০০	৩.৪৬
১০,০০০-২০,০০০	৩.০১
২০,০০০-৫০,০০০	৩.৮৩
৫০,০০০-১,০০,০০০	৩.৬৬
১,০০,০০০-তদূর্দ্ধ	১৪.৫৫

এই হিসাব হইতে বুঝিতে পারা যায় ৫,০০০—১,০০,০০০ পর্য্যন্ত অধিবাসী-সংখ্যা লইয়া যে সকল শহর আছে, একমাত্র ১,০০,০০০ ও তদূর্দ্ধ অধিবাসী-সংখ্যার শহরে তদপেক্ষা বেশী লোক বসতি স্থাপন করিয়াছে।

এই শহরের মোহ মানুষকে টানিতেছে। গ্রামের লোক অধিকাংশই কৃষির উপর নির্ভর করিয়া আছে; শহরে শিল্প, বাণিজ্য, বৃত্তি ও সেবাই প্রধান উপজীবিকা। গ্রামবাসী অধিকমাত্রায় নির্ভর করে প্রকৃতির কৃপার উপর এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গ্রামের মধ্যেই উৎপাদনে রত থাকে। শহর চায় প্রকৃতিকে বশে আনিয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিশিষ্ট শ্রেণীর পণ্য উৎপাদন করিয়া তাহা অন্যত্র বিক্রয়দ্বারা লব্ধ অর্থে নিজ অভাব দূর করিতে। গ্রামে যদি লোক একান্নবর্তী পরিবারে বাস করিয়া, ভগবানের উপর সমস্ত দায় চাপাইয়া কায়ক্লেশে দিনযাপন করিতে চায় বা বাধ্যই হয়, শহর চাহিবে বিচারের কষ্টিপাথরে ফেলিয়া, জীবনের ঘটনা বিচার করিয়া স্বতন্ত্রভাবে পত্নী, পুত্রকন্যা ও অন্তরঙ্গদের লইয়া বাস করিতে। গ্রামে জীবনের গতি মন্থর, সকল কাজের মধ্যে শিল্পপ্রীতি ও ভালমন্দ শিল্প-প্রতিভাকে রূপদানের চেষ্টা বিদ্যমান। শহর চায়—দ্রুতগতি এবং অর্থাগমের জন্য মুখর চঞ্চল জীবন। যাহা নাই তাহা লইয়া পল্লীর ক্ষোভ নাই, পাইলে তাহা উপভোগে আপত্তি নাই, অনাড়ম্বর জীবনে সাধ-আহ্লাদের আয়োজন ও সুযোগ কম। কিন্তু শহর চাহিবে বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, শহরবাসী বহুমুখী আনন্দ উপভোগের জন্য সর্ব্বদাই লালায়িত। এখানে চাই দ্রুতগতি যানবাহন, সিনেমা, থিয়েটার, খেলার মাঠ, মনোহারী দ্রব্যের সমাবেশ, আলোকমালায় সজ্জিত বিপণি, প্রশস্ত রাজপথ, "পাইপের কান মলিয়া জল," আর দেয়ালে আঙ্গুল টিপিয়া বিজলীবাতি। শহরে আছে শিক্ষা, চিকিৎসা, নিত্যনূতন অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ, বহুর সহিত পরিচয়, লোকচরিত্র পাঠ করিবার প্রচুর সুযোগ; আর সর্ব্বোপরি আছে উপার্জ্জনের উন্মুক্ত পথ। সৎ বা অসৎ উপায়ে অপরিসীম অর্থলাভ ও অপচয়ের যে অবারিত প্রান্তর পড়িয়া আছে তাহাতে বুদ্ধিপূর্ব্বক শ্রম নিয়োগ করিলে সুফলের আশা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান।

পরিবাহন ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা সহজ হওয়ায় শহরের পরিচয়লাভ সহজসাধ্য হইয়াছে; এখন পল্লীবাসীর মন চঞ্চল হইয়াছে। উপার্জ্জনের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া আসায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কঠিনতর হইতেছে। মানুষ শহরে আসিতে চায়, আর শহরে ক্রমে ভিড় হইয়া উঠিলে বহুবিধ সমস্যার উদ্ভব হইয়া পড়া স্বাভাবিক। তাই আজ কল্যাণী শহরপত্তনে রাজ্যসরকারের এত প্রচেষ্টা। আরও নূতন শহর গড়িয়া উঠিতেছে, কোনটি উঠিবার পথেই বিলুপ্ত হইয়াছে। কত লোকের কত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে, অর্থের অপচয় ঘটিয়া অনর্থের সৃষ্টি করিতেছে।

ইচ্ছা করিলেই কি একটা শহর পত্তন করিয়া দেওয়া যায়? ইহাতে সম্মতিসূচক উত্তর দেওয়ায় বিপদ আছে। নগরের সুখভোগে অভিলাষী পল্লীবাসীকে গ্রামে থাকিতে বলিলেই আর সে থাকিতে চায় না, সুতরাং প্রাণ যাহা চায়, দাবি যদি নিতান্ত উৎকট না হয়; তাহা পূরণ করিতে না পারিলে সে আর গ্রামে থাকিতে উৎসাহ পাইবে না। উপযুক্ত বাসস্থান বা বাসের উপযোগী জমি, পথঘাট, যথোপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠাগার, স্বাস্থ্যকর-পরিবেশ, ডাকব্যবস্থা, আবর্জ্জনা অপসারণের উপায়, রোগে চিকিৎসা, জীবনের বৈচিত্র্য উপভোগ, অবসরবিনোদনের যথারীতি ব্যবস্থা না থাকিলে গ্রামে আর মন স্থির থাকে না। কিন্তু এখানেও বড় রকমের একটা বিষয়ের অভাব রহিয়া গেল, তাহা দূর না হইলে প্রাণের স্পন্দন লক্ষ্য করা যাইবে না, সবই নির্জ্জীব বলিয়া মনে হইবে।

কৈশোরে পড়িয়াছিলাম, যে স্থানে ধনী, শ্রোত্রিয় বা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, রাজা, নদী আর বৈদ্য নাই, "তত্র বাসং ন কারয়েৎ" অর্থাৎ তথায় বাস করিবে না। ধনী—দরদী ধনী হইলে গ্রামের অভাব অভিযোগ দূর করিবার পক্ষে উপযুক্ত লোকের অসুবিধা রহিল না, তাঁহারা দুঃসময়ে দুর্দ্দিনে অর্থসাহায্য করিয়া গ্রামবাসীদের রক্ষা করিতে পারেন, গ্রামে আনন্দ-উচ্ছল জীবন, শারদীয়া (সার্ব্বজনীন নয়) পূজা, অপরাপর 'পালপার্ব্বণ' তাঁহারা যথারীতি পালন করিবেন; শিক্ষালাভের অসুবিধা হইবে না—বিদ্বান ব্রাহ্মণশ্রেণী সে অভাব দূর করিবেন। নিরুপদ্রবে জীবনযাপনের সহায়তা করিবার জন্য রাজা বা রাজপ্রতিনিধি বা রাজশক্তি সর্ব্বদা জাগরূক থাকিবেন। গ্রামের ময়লা-আবর্জ্জনা দূর করিবার সুযোগ করিয়া দিলেই নদীর কাজ শেষ হয় না, ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ হিসাবে সে যুগে নদীই প্রধান জীবিকা অর্জ্জনের উপায় থাকায় লোকে বসতিস্থাপনে চিন্তিত হইবে না, আর দেহ ধারণ করিয়া নীরোগ অবস্থায় চিরকাল থাকা সম্ভব নয়, সুতরাং বৈদ্যেরও প্রয়োজন। ইহা বহুদিন আগেকার কথা, তখন মানুষ এত "সভ্য" হয় নাই, তাহার এত বিচিত্র "অভাব" ছিল না, কিন্তু লোকবসতির পক্ষে যাহা অত্যাবশ্যক মনে হইয়াছে, চাণক্যপণ্ডিতের নাম দিয়া তাঁহার রচিত "শ্লোক" বলিয়া অপর কোনও পণ্ডিত তাহা প্রবচনের মধ্যে দাঁড় করাইয়াছেন।

কল্যাণী বা অপর শহর বাঁচিতে পারে, যদি তাহারা প্রাণশক্তি অর্জ্জনে সক্ষম হয়। সব সুখ থাকিলেও যদি মানুষ উপজীবিকার পথ খুঁজিয়া না পায়, তাহা হইলে তাহাকে স্থানান্তরে গমন করিতেই হইবে। অপর সকল অভাব অর্থসাহায্যে সরকারী প্রচেষ্টায় দূর হইতে পারে, নগরসৃষ্টি হইতে পারে কিন্তু নাগরিক যদি আত্মশক্তিতে

তাহা রক্ষা করিতে সক্ষম না হন, ত শত সরকারী সাহায্য তাহাকে বাঁচাইতে পারে না। কল্যাণী শহর গড়িতে মোট সাড়ে এগার কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তাহা কত টাকায় দাঁড়াইবে সেকথা জানা নাই, দুই কোটি টাকা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান উন্নত ধরণের শহরের যাবতীয় সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা হইতেছে, এমনকি ময়লা অপসারণের জন্য আধুনিকতম শহরের মত মাটির নীচে ড্রেন পাতিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবনযাপনের প্রাকৃতিক সুযোগ থাকিলে মানুষের চেষ্টায় সেই স্থান শহরে পরিণত হইতে পারে—অজ্ঞাত কালিমাটি সাকৃচি আজ টাটানগর হইয়াছে। কল্যাণীতে প্রস্তাবিত সকল সুখ-সুবিধা বিদ্যমান নাই, উপরন্তু অপরিচ্ছন্ন অঞ্চল বলিয়া পরিচিত—কাশীপুর, গার্ডেনরীচ, কসবা, ঢাকুরিয়া ভাটপাড়া, খড়্গপুর প্রভৃতি স্থান ক্রমেই বসতিপরিপূর্ণ হইয়া বড় শহরে পরিণত হইয়া উঠিতেছে। কেবল কলিকাতার সহিত যোগাযোগ সহজ বলিয়া নয়, এই সকল অঞ্চলে জীবিকা অর্জ্জনের সুযোগ সুবিধা হইবে বলিয়া এইগুলি শহর হইতেছে। শহরপত্তনের সময় শিল্প ও শিল্পী নির্ব্বাচন করাই অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য এবং সম্ভব হইলে তৎসংলগ্ন অঞ্চলে জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় উদ্ভিজ্জ পণ্য-লাভের সুযোগের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। যাহা মানুষের নিত্যব্যবহার্য্য তাহার অধিকাংশই যদি সরবরাহ করা সম্ভব হয় তবেই সেখানে লোকে স্বেচ্ছায় বাস করিবে। শিল্পের উপযোগী উদ্ভিজ্জ, খনিজ বা জীবজ কাঁচামালের সুযোগ থাকিলে স্বীয় বুদ্ধি ও প্রয়োজনবশে মানুষ উপজীবিকার পথ খুঁজিয়া বাহির করে।

বড় শিল্প স্থাপন করা সম্ভব কিনা, তাহা বিশেষজ্ঞ বলিতে পারেন, কিন্তু যাহা নিত্যপ্রয়োজনীয়—কাপড়, পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল, তেল, লোহা, মাটির তৈজসপত্র ও অপর ধাতুর তৈজসাদি, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পের জন্য প্রথম হইতেই সুব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। জমিনির্ব্বাচন ও বিক্রয় ব্যবস্থাই এ কাজের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়। যে সকল দ্রব্যের বহুল ব্যবহারহেতু ছোট শিল্প পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল অথচ তাহার পরিবর্ত্ত দ্রব্যাদি আসিয়া তাহা সরাইয়া দিয়াছে, শিল্প-নির্ব্বাচনে এই নূতন অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাইতে হইবে : কাচ, এনামেল, পোর্সিলেন তৈজসাদি, টর্চ্চ, টিপবোতাম (ধাতব), ধাতব কৌটা ও অপর আধার, ঘরবাড়ী নির্ম্মাণের ধাতব কড়া, কব্জা, ছিটকানি ইত্যাদি, এবং নূতনতর কৃষি সরঞ্জাম প্রস্তুতবিষয়ক অপরাপর শিল্পের সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ না দিলে কোনও নূতন উপজীবিকার পথ পাওয়া যাইবে না। এই সঙ্গে পরিমিত ব্যয়ে শিল্পের কাঁচামালের যোগান কত দূর হইতে নিয়মিত ভাবে চলে তাহাকেই তথ্য অনুসন্ধানের পথে সর্ব্বপ্রধান স্থান দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। উৎপাদিত পণ্য কেন্দ্র হইতে কত দূরে বিক্রীত হইবে এবং অপরাপর অঞ্চল হইতে আগত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে কিনা, তাহাই বিচার্য্য বিষয়। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে ইট, কাঠ, চূণ, সিমেন্ট, বালি, পাইপ লোহা, পাথর, পিচ ঢালিয়া ও পুঁতিয়া শহর নির্ম্মাণ সহজ, কিন্তু তাহা রক্ষা করিবার জন্য যে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার একান্ত প্রয়োজন, তাহা না হইলে নবজাত শিশু সূতিকাগারেই পঞ্চত্ব লাভ করিবে, সন্দেহ নাই।

চাঁদের ব্যথা

শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্ম্মকার

চৈতালী-চাঁদ কি কথা জানায়
ঝরে পড়া ফুলে ফুলে,
মনের কামনা মনেতে শুকায়
বেদনায় দুলে দুলে।
গোধূলি লগনে কানে ভেসে আসে
ঝরানো পাতার বাণী
নিশি-ভোরে তায় উষার আলোকে
নীরবে যেও তা ভুলে।

জীবনের যত গোপন বাসনা
হৃদয়ে বেঁধেছে বাসা,
বেদনার ধূপে জ্বলে যায় ধীরে
মিলনের যত আশা।
আঁধারের মাঝে থেকো না লুকায়ে
যাও যদি দূরে সরে
চাঁদ হয়ে তুমি জাগিও হিয়ায়
মেঘের দুয়ার খুলে।

কবির প্রেম

শ্রীঅনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাল চেহারা নিয়ে আসে নি কেষ্টপদ। অবশ্য আজ বয়েস হয়েছে। টাক পড়েছে মাথায়, দুটো কান আর ঘাড়ের চার-পাশে খোচা খোঁচা কালো চুলের বিরলতায় পাকাদেরই উঁকিঝুঁকি বেশী। কপালে আর শুকনো গাল দুটোয় অনেক ভাঁজ পড়েছে সময়ের আনাগোনায়। ঠোঁটের আড়াল দেওয়া দাঁতগুলোতে আজ ভাঙ্গা-চোরাদের ভিড়ই বেশী। তবু এসব দেখে ও যে যৌবনে সুপুরুষ ছিল, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে।

ভাল চেহারা নিয়ে আসে নি কেষ্টপদ, কিন্তু ভাল মন নিয়ে এসেছে। এ বিষয়ে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। আরও একটু কঠোর সমালোচক হলে বলা যেতে পারে, চেহারাটা ভয় পাওয়ার মতই; অন্ততঃ ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে। কাঁটার মত ছুঁচলো খাড়া খাড়া কাঁচা-পাকা গোঁফের উপরে নাকটাকে কে যেন বেয়াড়াভাবে চেপে দিয়েছে, যাতে বাড়তে না পারে। বেঁটে মোটা শরীরটা বনমানুষের মত কালো বড় বড় লোমে ঢাকা। চেহারার সঙ্গে মিল করেছে কথা বলার রুক্ষ ভঙ্গি আর চড়া মেজাজ।

কিন্তু ছেলেমেয়েদের এই দল আর যা পাক না পাক, ভয় অন্ততঃ পায় না কেষ্টপদকে। নইলে সকাল-সন্ধ্যে কেষ্টপদর দোকান 'কৃষ্ণ স্টোর্সে' একগাদা কুদে পা আর কুদে চোখের ভিড় হবার ত কোনও কারণ নেই। বড় বড় কাঁচের জারে সারি সারি সাজানো নানা রঙের লেবেঞ্চুস ওদের একমাত্র আকর্ষণ। ছোট দুষ্টুমি-জড়ানো নীল তারার দল সকাল-সন্ধ্যে ওখানকার পুরু কাঁচে ঠিকরে ঠিকরে ফেরে। দু'চারটি ছেলেমেয়ে হাত বুলিয়ে দেয় কাঁচগুলোতে। ভাবি, এদের লোলুপ চাওয়া কোন দিন যদি জারের মোটা কাঁচ ফাটিয়ে দেয়?

'বেরো, বেরো সব। এখানে কি? গেট-আউট।'

দাঁত মুখ খিঁচানো এই ধরণের অসম্মানজনক বাক্যবাণই রোজ অভ্যর্থনা করে 'কৃষ্ণ স্টোর্সে'র অভিযাত্রী দলকে। ওরা পেছিয়ে যায় দু'পা; কিন্তু একটু পরে আবার ডবল পা এগিয়ে আসাতে দেরি করে না। কারুর হাতে একটা একটা ফুটো পয়সা, কোথাও বড়-জোর একটা আনি। কিন্তু খালি হাতের নম্বরই দলে রোজ ভারী।

'ডোবালো, ডোবালো, এরা আমার সর্বনাশ করল। বুঝলেন অনুপমবাবু, এরা আমার লাটে না উঠিয়ে ছাড়বে না। দোকান খুলে বসেছি দু' পয়সা রোজগার করব বলে, বিলোবার জন্তে দান-ছত্তর খুলে ত বসি নি। আপনিই বলুন?'—গজ গজ করে উঠে 'কৃষ্ণ স্টোর্সে'র কেষ্ট হাজরা। ফোকলা দাঁতগুলোর ফাঁক দিয়ে থুথু ছিটকে আসে। কিন্তু তাই বলে বাচ্চাদের ভিড় কমে না। বরং কমে আসে সারি সারি কাঁচের জারগুলোতে লেবু লেবেঞ্চুস আর রাংতা-মোড়া চকোলেটের ভিড়।'

'লুটুক, লুটুক, কত আর লুটবে এরা, কি বলেন? লোটাকে কেষ্ট হাজরা ভয় খায় না। নইলে পাকিস্থানে ঘরবাড়ী, জমিজমা অত কিছু সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে এখানে এসে বুড়ো বয়েসে দোকান খুলে বসতে হয়? দেশ যখন ছাড়তে হয়েছে দাদা, তখনই লোটার চূড়ান্ত হয়ে গেছে।'

কৃষ্ণ স্টোর্সে'র কেষ্ট হাজরার নরম মনটা বাইরের চেহারার রুক্ষ আবরণ ঠেলে এক এক সময় বেরিয়ে পড়ে হঠাৎ।

'না না, খ্রিকৃট হতে হবে মশাই। ব্যবসা করতে বসেছি, ধর্মশালা খুলে বসি নি। ওসব দয়া করা ওন্ট ডু। ফেল কড়ি, মাখ তেল। শহরে ত এত দোকান রয়েছে, কোন্ শালা কত দান-ধ্যান করে শুনি? পেয়েছে কি এরা কেষ্ট হাজরাকে?'

চেনে এরা কেষ্ট হাজরাকে। ওই অসুন্দর রুক্ষ চেহারা, খিটখিটে স্বভাব আর নরম-গরম মেজাজের মুখোশে একটা যে শান্ত, সহজ, নরম মন লুকিয়ে আছে, জানে তা এই ছেলের দল। তাই ত ওরা এই দোকানেই ভিড় জমায়। সাহস করে সহজ মনে হাত পাতে, আবদার করে।

জানতে আমিও পারি। এ শহরে আসা আমার খুবই নূতন। এ পাড়াতেও তাই। দিনক'টাকে এখনও হাতের আঙুলের মধ্যেই গোনা যায়। নূতন জায়গার অচেনা পরিবেশে আলাপ হ'ল সবার আগে কেষ্ট হাজরার সঙ্গে, এই দোকানেই। প্রথম দিনের নূতন আলাপ মুখুই শুধু করল না, রোজ এই দোকানে আড্ডা জমাবার একটা ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত ছড়িয়ে গেল।

'বুঝলেন দাদা, এরা কুঁড়ি। কুঁড়িদের বাঁচিয়ে রাখবার ভার নিতে হবে আজ আমার, আপনার, সকলের। যার যেটুকু সামর্থ্য। ভাবছেন বুঝি সবগুলোরই বাপ-মা আছে? ক্ষেপেছেন! কারুর এটা আছে ত ওটা নেই, ওটা আছে ত এটা নেই। কারুর আবার দুটোই নেই। হতভাগার দল মশাই। আর থাকবেই বা কোত্থেকে? পালাতে গিয়ে হুড়োহুড়িতে কত যে কত দিকে ছিটকে পড়ল, আর কত যে কচাকচ কচু-কাটা হ'ল, তার কি কোনও হিসেব আছে? কিন্তু কুঁড়িগুলোকে ত বাঁচাতে হবে। যদি শুকিয়েই গেল, তা হলে ফুল হবে কারা? যদি না পেলে ভালবাসা, স্নেহ, মমতা, তবে কি আর এই কুঁড়িগুলোও গোলাপ হয়ে ফুটবে মনে করেন? ঘণ্টা, ঘেঁটুফুল হবে। আপনি ত এডুকেটেড, লোক, আপনিই বলুন না?'

মুখ লুকিয়ে মুচকি মুচকি হাসে কুদের দল। কেষ্ট হাজরার দোকানে ওরই পাশে বসে লক্ষ্য করি। ওর কথা বলার বেয়াড়া

ঢং, বিচিত্র মুখভঙ্গী আর সেই সঙ্গে মোটা কালো দেহটাকে নানা ভাবে বাঁকানো ঝোঁকানো কৌতুকের যথেষ্ট খোরাক জোগায়। কিন্তু আমি হাসিটাকে চেপে রাখারই চেষ্টা করি এই সব সঙ্গীন পরিস্থিতিগুলোতে।

একটা ফুটো পয়সা বার করে এক দল দাড়ায়।

এক পয়সা দিয়ে গোষ্ঠীশুদ্ধ তোরা লেবেঞ্চুস চুষবি? মামার বাড়ীর মজা পেয়েছিস? বেরো, বেরো। গেট-আউট। এক পয়সার ক'টা লেবেঞ্চুস হয় জানিস? তিনটে তিনটে।

ডান হাতের তিনটে আঙ্গুল বড় করে ছড়িয়ে ওদের সারি সারি তুষ্ট মিষ্টি চোখগুলোর সামনে ঘুরিয়ে দেয়।

যোগ হয় আর একটা পয়সা। বড়জোর একটা আনা।

নিবি ত, তেমনিই নে। ঝকরা করিস নে। এক আনায় গাঁজার পয়সা মিলবে চাস? বলি তোদের বাপ-ঠাকুরদা কখনও এক আনায় কুড়ি-তিরিশটার বেশী কিনেছে লেবেঞ্চুস? বুঝলেন অনুপমবাবু, এই হতোমগুলোগুলো মেজাজ চটমট না করে কিছুতেই ছাড়বে না।

নড়বড়ে দাতগুলোর ভাঙা ফাঁক দিয়ে ছিটকে পড়ে থুথু।

মন্দ লাগে না দোকানটা। মন্দ লাগে না সকাল-সন্ধ্যে এখানে সময় কাটানো। অনেক ঘা-খাওয়া জীবন কেষ্ট হাজরার। অনেক-কিছুর অভিজ্ঞতা। তাই ভালই লাগে গল্প করতে। তার উপর দোকানের এই জীবন। এখানকারও এক বিচিত্র স্বাদ। এখানে শিশুদের এই ভিড়, ওদের কলরব, দুষ্টুমি আর দস্যিপনা আশ্চর্য্য-রকম নেশা ধরানো ভাল লাগায়। আমার ভাগ্য ভাল, এই নূতন জায়গায় এত তাড়াতাড়ি আলাপ হয়ে গেল কেষ্ট হাজরার মত এক-জন সত্যিকারের ভালমানুষের সঙ্গে। সত্যিকারের ভাল লোক সেই-ই, ছোটরা যাকে ভালবাসে। মানুষ ভাল কি খারাপ যাচাই করবার কষ্টিপাথর ওরাই নয় কি? দোকানের দিনের পর দিন কেনা-বেচার একঘেয়ে জীবনযাত্রায় যে ক্লান্তি আছে, তাকে ভরিয়েছে মাধুর্য্যে শিশুদের এই মহোৎসব। কোন দোকানে কখনও ত চোখে পড়ে নি ছোট ছেলেমেয়েদের এত আনাগোনা, এমন অসঙ্কোচ আবদার। এই কুঁড়িদের মাঝে নিজেকে হারিয়ে দিয়ে এক ঝরা-ফুল ভুলতে চায় হয়ত শেষ-জীবনের সব হারাবার দুঃসহ বেদনাকে।

বলি, বেশ আছেন আপনি।

ক্ষেপেছেন দাদা! একে বলে বেশ থাকা? দেখছেন ত নিজের চোখেই এই রাক্ষসদের দল রোজ ছিঁড়ে খাচ্ছে আমায় কেমন? দোকানটাকে লাটে না উঠিয়ে ওরা কি ক্ষান্ত হবে ভেবেছেন?

আপনাকে ভালবাসে ওরা, তাই আসে। আপনি স্নেহ করেন ওদের, তাই আসে। তাই আবদার করে।

দরকার নেই আমার মশাই ওসব ভালবাসা-টালবাসার।

দোকান খুলে বসেছি, আমার সম্পর্ক দাদা টাকার সঙ্গে। ফেলো কড়ি, মাখো তেল। আপনি ত মশাই এজুকেটেড লোক, আপনিই বলুন না?

সায় দিই, সে ত ঠিক।

না না, এবার থেকে স্ট্রিক্‌ট হতে হবে। নইলে কৃষ্ণ ষ্টোর্সের পরমায়ু আর কদ্দিন ভেবেছেন? এখনই খাবি খাচ্ছে।

এবার আর আসবে কবে? কোন দিনই আসবে বলে মনে হয় না।

সময়ে-অসময়ে এখানে আড্ডার আসর জমিয়ে, কেষ্ট হাজরার এই সুন্দর, স্বচ্ছ জীবনের সঙ্গে পরিচয়ের যোগসূত্র বেঁধে, ভিড় করা ক্ষুদে দস্যুদের হাসি-কান্না, ঝগড়া-মারামারি, আদর-আবদারে ভরা অনাবিল জীবনের নিত্যনূতন বৈচিত্র্যের অনাস্বাদিত পরশ নিতে নিতে এক দিন আবিষ্কার করলাম নূতন একজনকে। নূতন সে নয় কেষ্ট হাজরার কাছে, নয় নূতন কৃষ্ণ ষ্টোর্সের সামনে ছড়ানো লাল ধুলোর রাস্তায়। নূতন আমারই কাছে শুধু। রোজকার দেখা, রোজকার ভিড়-করা কুঁড়ির দলে সে নয়। কুঁড়ির বাঁধন সে ছাড়িয়ে এসেছে।

আয়রে, আয়। কি চাই?

সাদা সাড়ী। পরিষ্কার নয়। অনেক ভাঁজ পেয়েছে। মাথার থোকা থোকা কালো চুল এলোমেলো। অনেক ভাঁজ সেখানেও।

গায়ে মাখার সাবান আছে কেষ্টকাকা?

আছে বৈকি। কত রকমের আছে। সাবান নেই বলিস কি! তবে ত দোকান বন্ধ করে দিলেই হয়। কে মাখবে রে, তুই বুঝি?

না, ছোট মাসী।

তুই মাখিস না?

না।

'স্না।' ভেংচে উঠল কেষ্ট হাজরার ছোপ-লাগা নড়বড়ে দাঁত-গুলো। তা কেন মাখবি? জমুক ময়লা সারা গায়ে, তা হলেই যে মা দুগ্‌গার মত রূপের ছিরি খুলবে। হতভাগা মেয়ে কোথাকার। গায়ে সাবান মাখলে শরীরটা পরিষ্কার হয় আর সেই সঙ্গে রংটাও যে ফর্সা হয়। একটুও যদি যত্ন থাকে মেয়েটার শরীরের ওপর। আপনি ত এজুকেটেড্‌ লোক অনুপমবাবু, আপনিই বলুন না?

মেয়েটাকে আজই প্রথম দেখা আমার। দু'পক্ষের কেউ এখনও আলাপের বর্ণপরিচয়েও নামে নি। তা ছাড়া রোজকার ভিড়-করা কুঁড়িদের দলে ও নয়। ফুল যে ও। রোগা ছিপছিপে দেহের শ্যামলিমায়, এলোমেলো সাজ-পোশাকের উদাসীনতায় ছুঁয়ে বেড়াচ্ছে যৌবনের তাজা ইসারা। বয়সটা এখন ওর এমন পর্য্যায়ে, যাকে নীতিবোধের অভিধানে স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে সাংঘাতিক। বয়েসের এই সীমান্ত আমিও পেরোয় নি। সুতরাং ওরই সম্বন্ধে আমাকে উদ্দেশ্য করে এই ধরণের প্রশ্ন অস্বস্তিই শুধু

আনল না, অপ্রস্তুতেও ফেলল যথেষ্ট। যত সহজে প্রশ্নটা এল, জবাবটা তত সহজে বেরুতে পারল না, কিন্তু কেষ্ট হাজরার মত শান্ত, সরল মানুষের এসব দিক ভাববার খেয়াল কোথায়? ওদের জাতই যে আলাদা।

কিন্তু দরকার হ'ল না জবাবটা দেবার। আমার সঙ্গে আলাপ জমবার পর থেকে সব ব্যাপারেই আমার মতামতের জন্যে প্রশ্ন করা স্বভাবে দাঁড়িয়েছে কেষ্ট হাজরার। আমি 'এজুকেটেড' বলেই হয়ত এই সম্মান। কিন্তু মতামত চাওয়াটা নেহাতই একটা সৌজন্য। কি মতামত দেব না দেব তা শুনবার জন্যে অপেক্ষার প্রয়োজন মনে করে না কেষ্ট হাজরা। করল না এর বেলাতেও। বেঁচে গেলাম হাঁফ ছেড়ে।

'এই নে সাবান। এইটে তোর ছোট মাসীকে দিবি, আর এইটে তোর।'

দু' রকমের দুটো সাবান হাতড়ে বার করল কেষ্ট হাজরা।

'আমার কি হবে আবার? একটাই দাও।'

'হবে আবার কি? লোকে সাবান দিয়ে করে কি ঘোড়ার ডিম? মাখবি, গায়ে মাখবি। খুব ভাল সাবান রে। চমৎকার গন্ধ। পাচ্ছিস না?'

'হুঁ।' নরম কালো ঠোঁটের পাতলা কাঁপনে একটু সাদা আকাশ ঝিলিক দিয়ে গেল।

'এইটেই তোকে দিলাম। খাসা জিনিষ।'

'দাম কত কাকা?'

'দু' আনা।'

দামটা শুনে ওর চেয়ে বেশী আমিই অবাক হলাম। এই কালকেও দেখেছি এই সাবান বার আনায় বেচতে কেষ্ট হাজরাকে।

'বা রে, এত সস্তা!'

'এ কি আর অন্য দোকানদার পেয়েছিস যে খদ্দের এলেই ঘ্যাচাং করে গলাটা কাটব! ন্যায্য লাভের বেশী এক পাইও নেবে না কেষ্ট হাজরা, বুঝলি?'

বুঝল কতদূর সে কে জানে, কিন্তু লক্ষ্য করলাম পাশে মুখটা একটুখানি ফিরল; সাড়ীর আঁচলে উদ্গত হাসিটাকে লুকোবারই জন্যে।

'এখন কিন্তু দাম দিতে পারব না কেষ্টকাকা। জমানো পয়সা আমার সব শেষ হয়ে গেছে।'

'শোন কথা, এখখুনি দিতে বলছে কে? এ কি আর অন্য দোকানদার পেয়েছিস, যে পয়সার জন্যে খদ্দেরের পেছনে জোঁকের মত এঁটে থাকব? দিস, যখন হয়। আগে মেখে ত ছাখ, কি ভুরভুরে গন্ধ! বলিস তখন কেষ্ট হাজরার পছন্দ কি রকম!'

চলে গেল মেয়েটা। মেয়ে নয়, ভোরের আকাশ এক টুকরো।

'বুঝলেন দাদা, ভারি ভাল মেয়ে।' বড় কৈঁচুলগাছটার আড়ালে বিসর্পিল দেহের চঞ্চল গতিবেগ আড়াল না হওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে থেকে, চোখ ফিরিয়ে আনল কেষ্টপদ। 'যেমন মিষ্টি স্বভাব, তেমনই মিষ্টি কথাবার্তা। আপনি ত মশাই এজুকেটেড লোক, দেখলেন এতক্ষণ আপনিই বলুন? ভাল নয় মেয়েটা?'

'খারাপের কিছু অন্ততঃ এখন পেলাম না।' মতামতটা অনেক সাবধানতার সঙ্গে দিতে হ'ল।

'পাবেন কোত্থেকে শুনি? পেলেই হ'ল? খারাপদের সঙ্গে কেষ্ট হাজরা ভাব রাখতে যায় না।'

সেই প্রথম দেখলাম সীতাকে। দেখা নয়, বিস্মিত আবিষ্কার। কিন্তু এই দেখাই শেষ নয়। শ্যামলী মেয়ের যৌবন-জাগানো দেহের উচ্ছল ঢেউ নূপুর বাজাল আরও অনেকবার কৃষ্ণ ষ্টোর্সের দোরগোড়ায়। ও এসে দাঁড়ালেই লক্ষ্য করি, কেমন যেন অস্বাস্থ্যর এলোমেলো ছোঁয়াচ লাগে কেষ্ট হাজরার বেঁটে মোটা শরীরটায়। কারণে অকারণে চঞ্চলতার ঢেউ জাগে বার বার। কিন্তু এসব যে খুশী আর আনন্দেরই অসংযত প্রকাশ, তা বুঝতে দেরি লাগে না।

'খুব পয়মন্ত মেয়ে দাদা। দেখেন না, যেদিনই ও আসে, সেদিন বিক্রি কেমন হু হু করে বেড়ে যায়।'

'তাই বুঝি ওকে সব জিনিষে এত কন্‌সেশান দেন?' তুলে ফেললাম প্রশ্নটা।

'কন্‌সেশান আবার কিসের মশাই? ন্যায্য লাভের এক পাইও বেশী নোব না, কমও না। দোকান খুলে বসেছি দাদা, গলা কাটবার ব্যবসা ফেঁদে ত বসি নি। আর লোকসান দেবার জন্যেও দোকান খুলি নি। ফেলো কড়ি, মাখো তেল। আপনি ত এজুকেটেড লোক মশাই, আপনিই বলুন?'

মতামতটা দিয়েই দিলাম। 'সে ত একশ বার। কিন্তু এই ত সেদিন বার আনার সাবানটার দাম বললেন ওকে মাত্তর দু' আনা।'

'বলব না? বার আনা দাম দিয়ে সাবান কেনবার সাধ্যি কি ওর আছে? কিন্তু তাই-বলে কি সাবান মাখবে না? স্নো, পাউডার ঘষবে না? সেজে গুজে বেড়াবার এই ত সময়। ভাল দেখাবে, ভাল মানাবে। তা নইলে আর করবে কবে দাদা? বয়েস বুড়িয়ে গেলে? পয়সা নেই বলে কি সাধ-আহ্লাদ করবে না? বাকি দশটা মেয়ের মত সেজে গুজে হেসে খেলে বেড়াতে ইচ্ছে করে না? আপনি তো এজুকেটেড লোক মশাই, আপনিই বলুন?'

বলবার বিশেষ কিছু ছিল না এর পর। শোনবার কানটাই পেতে দিলাম।

'কিন্তু সখ ওর আছে কিছুতে? মুখ ফুটে বলবে কখনো কিছু? হাত পাতবে? সে রকম মেয়েই ও নয়। তাই তো দিই। দান নয়, দয়াও নয়। দাম যা-হয় একটা কিছু বলতে হয় ভোলাবার জন্যে। নইলে কি নেবে ভেবেছেন? আর কম দামে না দিলে উপায় বা কি? কোত্থেকে দেবে দাম? আছে কি কিছু সঙ্গে? সবই তো সেখানে ছেড়ে ছুড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে এসেছে। কিন্তু তাই বলে কি সাধ-আহ্লাদ করবে না? সেজে-গুজে হেসে-খেলে বেড়াবে না?

খুবই ভালবাসেন আপনি ওকে, না ?

বাসব না ? ভালকে কে না ভালবাসে মশাই ! যাক না দু'চার দিন, আপনিও যদি ভাল না বেসে ফেলেন তো কি বলেছি !

কথাটায় কি ইসারা ছিল পুলক-জাগানো শিহরণের ? দোলা কি ছিল শুকনো বালুচরে হঠাৎ ছলকে পড়া একটু ঢেউয়ের ? নইলে কেন জড়িয়ে পড়বে এর পরের সব মুখরতা একটা সাময়িক নীরবতার জালে ?

রোজকার ভিড় জমানো কুঁড়িদের মাঝে একটা ফুল। পাপড়ি খুলেছে অনেকগুলো ভীরু আত্মপ্রকাশে। ওদের মত সকাল সন্ধ্যে আসে না সে। রোজ ঘন ঘনও নেই তার আনাগোনা। আবদার করে না, দস্যিপনাও করে না। কিন্তু আসে যেদিন, আসে যখন, ভারি সুন্দর একটা মিষ্টি গন্ধ কৃষ্ণ চৌধুরীর দোরগোড়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

ভালই লাগে সীতাকে। শুধু ভালই লাগা। ভাল লাগার বেড়া পেরিয়ে আরো কিছু যে আসে নি, ভেতরটা হাতড়ে মনের কোণকে রোজ একবার পরীক্ষা করে নিই।

সীতা এলে খুশী হয় কেষ্ট হাজরা। ওর আসার দিনগুলোর ব্যবধান অস্বাভাবিক বড় হয়ে উঠলে সাড়া পাই উৎকণ্ঠা জড়ানো অস্থিরতার। কেষ্ট হাজরার দোকানের এই বিচিত্র জীবনের সঙ্গে এতগুলো দিন পরিচিত হবার পর, অজানা তো আর কিছুই থাকতে পারে না। কিন্তু অজানা লাগতে থাকে নিজেরই নিজেকে। কেষ্ট হাজরার খুশী-অখুশীর সঙ্গে নিজের খুশী-অখুশীগুলোও কি করে কখন যে সন্তর্পণে মিশে গেছে, জানতে পারলাম না। কিন্তু বুঝতে পারি যখন সীতা এসে দোকানের সামনে দাঁড়ালে ভাল লাগে আমারও। অদর্শনের দীর্ঘতায় আমার মনটাও যখন হয়ে উঠে ব্যাকুল। তার পর ভাবি, এ তো শুধু ভাল লাগা। তার বেশী আর তো কিছু নয়। ভালকে ভাল তো লাগবেই।

মাঝে অনেক দিন এল না সীতা। কৃষ্ণ চৌধুরীর উঠোনে অনেক দিন ফুটল না কোন ফুল। ওই মেয়ের দোকানে আনাগোনার হিসেব রাখি না আমি। রাখবার দরকারও নেই। সে সব রাখবে কেষ্ট হাজরা। তবু এবার দেখা হবার ব্যবধানটা যে অস্বাভাবিক লম্বা হচ্ছে অনেকখানি, এ জানতে হিসেব বা গবেষণার দরকার হয় না।

ক'দিন থেকেই উসখুস করছে কেষ্ট হাজরা এই কারণেই। চশমাটা চোখে পরে মোটা খাতায় পেনসিলের দাগ টেনে কেনা-কাটার হিসেব করতে করতে ডাকল এক দিন—অনুপমবাবু ?

বলুন।

অনেক দিন হ'ল মেয়েটা আসে নি, না ?

এই ধরণেরই একটা কিছুর আঁচ ছিল। বললাম, তাই তো মনে হচ্ছে।

মনে হওয়া-টওয়ার মধ্যে আমি নেই মশাই। আমি ব্যবসাদার মানুষ কাগজে-কলমে হিসেব করে আমার কাজ। আচ্ছা কেন আসছে না বলুন তো ? এতদিন গায়েব কখন তো হয় না। অসুখ-বিসুখ করে নি তো, কি বলেন ?

এ প্রসঙ্গে সঙ্গ দেওয়া আমার পক্ষে অবান্তর। চিনি না ওকে, আলাপও হয় নি এখনো। জানি না ওর ইতিহাসও। ক'দিন দেখেছি শুধু দোকানের সামনে কিছুক্ষণ। তবু বললাম, না না, অসুখ করবে কেন ? হয়ত খুব কাজ পড়েছে বাড়ীতে।

কাজ ? তাই হবে ! কিন্তু কি এত কাজ মশাই ? খাটিয়ে খাটিয়ে কি মেরে ফেলতে চায় মেয়েটাকে ওর মামা-মামী ? চলুন তো, খোঁজটা নিয়েই আসি। ভারি ভাল মেয়েটা মশাই, যেমনি মিষ্টি কথাবার্তা, তেমনি মিষ্টি স্বভাব। চলুন।

একটু ইতস্ততঃ করলাম, আমি যাব ?

হাঁ, এইতো কাছেই বাড়ী মশাই, দুটো গলি পেরুলেই।

আপনিই যান। আমার যাওয়াটা কি ঠিক হবে ?

এতে ঠিক-বেঠিকের কি আছে মশাই ? ও এলে আমাদের ভাল লাগে, ওকে আমরা ভালবাসি, তাই খোঁজখবর নিতে যাচ্ছি আসে নি কেন অনেকদিন—এতে গণ্ডগোলের কি আছে ? আপনি তো এডুকেটেড লোক, আপনিই বলুন ?

হয়ত কিছুই নেই। কিন্তু পৃথিবীতে এক জাতের মানুষ আছে যাদের মধ্যে সত্যকারের মানুষের সবকিছুই থাকে, শুধু থাকে না পৃথিবীকে অনুভব করবার শক্তি। নিজের মন দিয়ে পৃথিবীর মনকে তারা যাচাই করে ; কিন্তু খবর রাখে না পৃথিবী কত বদলে যাচ্ছে। এই দলেরই মানুষ কেষ্ট হাজরা। আর এই জাতের মানুষদের বোঝানো যায় না, এতে ঠিক-বেঠিকের কি আছে।

ঠিক এমনি সময়েই ফুটে উঠল হঠাৎ ফুল। এই অস্বস্তির হাত থেকে আমায় রেহাই দেবার জন্যেই যেন।

কি রে কি ব্যাপার বল দিকি তোর ? আসিস না যে আজ-কাল ? আমরা যাচ্ছিলাম এখখুনি খোঁজ নিতে।

বড় মামীমা যে আসতে দেয় না কেষ্টকাকা। বলে, 'এখন বড় হয়েছিস, যখন-তখন 'একা একা রাস্তায় যাওয়া ঠিক নয়।'

'বড় হয়েছিস ত আমার কাছে ভয় কি আসতে ? আর বড় হয়েছিস ত একলা বেরুতে বেঠিকটা কোনখানটায় শুনি ? কে কি করবে দেখি ত একবার ? দেব না পিটিয়ে লম্বা করে। কি বলেন অনুপমবাবু ?'

'নিশ্চয়ই।' একটু উৎসাহের সঙ্গেই সায়টা বেরিয়ে এল।

'কিন্তু তুই বড় হয়েছিস না হাতী। বড় হলেই মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি হয় জানি। তোর ত কিছুই হ'ল না।'

'কেন কাকা ?'

'আবার জিজ্ঞেস করে কেন। দেখিস কোনদিন আয়নায় নিজেকে ? মাথার চুলগুলো সন্ন্যাসীর জটার মত না করে ভাল ভাবে বাঁধতে পারিস না ? একটু ভাল সাজগোজ করতে ইচ্ছে করে না ? নিজেকে ভাল দেখাক, চাস না বুঝি ? যত বড় হচ্ছে, চেহারা হচ্ছে দেখ না ভূতের মত !'

তাকালাম সীতার দিকে। পাশে মুখ ফেরাল সে, আচমকা উছলে ওঠা অবিবেচক হাসিটাকে চাপবার জন্যে। গলাটা আটকে গিয়ে খানিকটা কাসিই ছড়িয়ে পড়ল।

'ঠাণ্ডা লাগিয়েছিস বুঝি? লাগবে না ঠাণ্ডা? শরীরের ওপর অযত্ন করলে রোগভোগ একটা হবেই ত।'

সীতার জবাব এল, 'সাজতে আমার ভাল লাগে না।'

'ভাল লাগে না! তা কেন ভাল লগেবে! সাজলে যে ভাল দেখায়, ভাল মানায় হতভাগা মেয়ে। এই ত বয়েস সাজবার, এই ত সময় রং লাগাবার। নইলে সাজবি আর কবে শুনি? চুল পাকলে? বুড়ী হয়ে গেলে? শুনছেন অনুপমবাবু? আপনি ত এজুকেটেড লোক, আপনিই বলুন?'

প্রসঙ্গটা এমন পর্য্যায়ের যে আমার মত একজন অবিবাহিত যুবকের পক্ষে বিনা দ্বিধায় কোন মতামত দেওয়া সম্ভব নয়। তাই নীরব থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, সীতার ঘন কালো চোখ দুটোর চঞ্চল তারা আমার উপর একটুখানি ছোঁয়া বুলিয়ে গেল। মনে হ'ল ওখানেও যেন জিজ্ঞাসার ছায়া। তবু জবাব দিলাম না কোনকিছুই।

কি জবাব পেয়েছিল সীতা, জানি না। কিন্তু এর পর যখন আবার সে এল, দেখি সেজেছে। রোজকার দেখা এলোমেলো অসংযত কালো চুলের গুচ্ছে এসেছে বাঁধনের ঢেউ। চুলের অত বন্যা—দুটো বিনুনী সাপের মত পিঠে ছোবল মারছে। ভোরাকাটা তাঁতের সাড়ীটায় নূতন ধোপের গন্ধ। নরম কালো গাল দুটোয় মাজাঘষার অনেক আঁচড়। একটু অবাক চোখেই তাকালাম।

কেষ্ট হাজরা দোকানে নেই। কেনাকাটার কাজে বাজারে গেছে। দোকান সামলাবার ভার আপাততঃ আমারই উপর। কিন্তু ফুল যে এই ফাঁকেই ফুটে উঠবে, তা কে জানে। কারুর আনাগোনা বাধা খাতার হিসেব করা পথে চলতে পারে না। বিশেষ করে এ মেয়ের ত নয়ই। ওর এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব বিব্রত করল আমায়। কিন্তু খুশী যে মনকে কানায় কানায় হঠাৎ ভরিয়ে দেয় নি, এ মিথ্যেটাই বা কতক্ষণ লুকিয়ে রাখতে পারব?

'কেষ্ট কাকা, অ কেষ্ট কাকা, কি করছ ভেতরে?'

জবাব দিতে হ'ল কেষ্ট হাজরার বদলে আমাকেই। এই প্রথম কথা ওর সঙ্গে। 'কেষ্টদা নেই বাজারে গেছে।'

'ও।' ফেরার পথে পা বাড়াল সীতা সঙ্গে সঙ্গেই।

'ইয়ে, কিছু কেনবার ছিল কি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কেষ্টকাকা ত নেই।'

'না থাক, দোকানটা খোলা ত রয়েছে। আর দোকানের ভার এখন আমার ওপর। কেষ্টদা ফিরে এসে যদি শোনে যে তুমি এসেছিলে কিছু কেনবার জন্যে, আর কিছু না কিনেই চলে গেছ, তবে কি আমার আস্ত রাখবে ভেবেছ?'

থামল সে, স্নো আছে?

নিশ্চয়ই। খুব ভাল কোয়ালিটির আছে। মাখলে চামড়া দু'দিনেই নরম তুলতুলে আর মোলায়েম হয়ে উঠবে। আর চকমক করবে শরীর। কে মাখবে, তুমি?

না, ছোট মামীমা।

তুমি মাখ না?

ওসব আমার ভাল লাগে না।

তোমার তো কিছুই ভাল লাগে না! কিন্তু ভাল না লাগলে ভাল হবে কি করে বল তো? সব ব্যাপারে অত উদাসীন হলে কি চলে? সাজতে যে হয় মাঝে মাঝে। সাজতে হয় এক এক সময়। দেখ না, পৃথিবীও তো সাজে কখনো কখনো। ভাল লাগে না বললেই তো ভাবনা শেষ হয়ে যায় না। কোন্ দিন বলবে ভাত খাব না, কেননা খেতেও আমার ভাল লাগে না।

কথাগুলো বলে অবাক লাগল নিজেরই। এতখানি মুখর হবার দুরন্ত দুঃসাহস কে যে দিল ভেবেই পেলাম না।

কেষ্টকাকার সঙ্গে দিন-রাত্তির থেকে আপনারও দেখছি ওর রোগ লেগেছে!—ফোটা ফুলের পাপড়িতে ধরা পড়ল সাদা আকাশের মত এক ঝলক হাসি একটুখানির জন্যে।—দিন স্নোটা, যাই।

দিলাম। ওর জন্যেও দিলাম একটা। কেষ্ট হাজরা থাকলে ঠিক যে রকমটি করত, তাই করলাম।

দুটো কেন একটাই চাই।

ওটা তোমার জন্যে।

বুদ্বুদ কাটল খানিকটা মিষ্টি হাসি। 'কত দাম?'

দাম কত, জানি। কিন্তু এ মেয়ের কাছে সব জিনিষেরই দাম আলাদা। যে দাম সকলের কাছে, তা ওর জন্যে নয়। এ সব কেষ্ট হাজরার কাছেই শেখা। তবু ইচ্ছে হ'ল বলি, 'তোমাকে এমনিই দিলাম।' হঠাৎ এই দুর্ব্বলতাকে ঠিক সময়েই চেপে ধরল ঝিমিয়ে-পড়া বিবেক।

'দাম ত কত জানি না। কেষ্টদা এলে জেনে যেও। কিন্তু নিয়ে যাও তুমি। দেখ না মেখে, ভারি ভাল লাগবে।'

'কিন্তু যদি খুব দামী হয়?'

'না না, সস্তাই হবে। ভয় পেয়ো না।'

ভয় পেল না। সস্তা শুনে নির্ভয়ই হয়ত হ'ল। স্নোর শিশি দুটো হাতে নিয়ে এগোতে গিয়ে থামল আবার।

'তখন যে অত বক্তৃতা করলেন সাজা নিয়ে, আপনি নিশ্চয়ই আমার দিকে তাকান নি ভাল করে?'

'এ কথা কেন?'

'নইলে দেখতে পেতেন, আজ আমি সেজেছি। রোজ কেষ্ট কাকা বক্ বক্ করে, আজ তাই জোর করেই সাজলাম।'

'দেখেছি। ভালই করেছ।'

'কিন্তু কৈ কেমন দেখাচ্ছে, একবারও ত বললেন না?'

কোন লাবণ্য-জড়ানো যৌবন-ছোঁয়ানো মেয়ের এমন প্রশ্নের

উত্তরে কি জবাব দেওয়া যায়? 'বলতে পারা যায়, সুন্দর। বলা যায়, দেখাচ্ছে তোমায় রাণীর মত। বনের মধ্যে নানা গাছের জঙ্গলে হঠাৎ উঁকি-দেওয়া সূর্য্যমুখীর মত। বলা যায় কত কিছু। আরও আবেগ দিয়ে, আরও কাব্য করে, বলা যায় অজস্র ভাষায়। অনেক কথায় সুরের ঝঙ্কার ছড়িয়ে। রঙীন তুলির অনেক আবির বুলিয়ে। কিন্তু বলতে পারলাম না কিছুই। হঠাৎ যেন বোবা হয়ে গেল ভাষা। সীতার ভীরু দুটো কালো চোখের দিকে তাকিয়ে সময়টা ফুরিয়ে গেল। ও চোখে আজ কাজলের ছোপ দেখছি অনেক দিনের পর।

ভাল কি বেসে ফেলেছি এই মেয়েটাকে? প্রশ্ন করি নিজেই নিজেকে। জবাবের জন্যে কান পেতে থাকি। শুনতে কিছুই পাই না। শুধু একটা অস্পষ্ট সুরের বুদ্বুদ এলোমেলো ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহের আনাচে-কানাচে ছোট ছোট ঢেউ তুলে। এই ভাল লাগা কি ভালবাসায় নেমেছে ধীরে ধীরে আমার অজান্তে? এক দুর্বল মুহূর্তে পথ পেয়ে গেছে ওদের দল?

কেষ্ট হাজরার জীবনের পড়ন্ত বেলায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে এই কৃষ্ণ ষ্টোর্স। এখানকার এই ছোট্ট ঘরে, নানান জিনিষের অসাবধান এলোমেলো সাজানোর মাঝে দোকানের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা হয় ত থাকে না, কিন্তু এখানে খদ্দেরদের আনাগোনায় বেচাকেনায় এক বিচিত্র জগৎ পড়ে রয়েছে। আসে ছোট্ট দুষ্ট ছেলেমেয়েদের দুরন্ত দল হৈ হল্লা আর আবদার করতে। আসে বড়রাও। কাঁচাপাকা মাথারা আড্ডা দিতে আসে। কথা হয় সুখদুঃখের, দরদ দেওয়া নেওয়ার। তরুণের দল আসে। বাদ যায় না বুড়োসাড়ীদেরও আনাগোনা। কার সঙ্গে ভাব নেই কেষ্ট হাজরার? কাকে সে চেনে না? যে যায় এ রাস্তায়, কৃষ্ণ ষ্টোর্সের দোরগোড়ায় একবার ঢুঁ দিয়ে যাবেই। এ শুধু দোকানই নয়, মিলনমন্দির—সব বয়সের, সব জাতের। কেষ্টকাকা, কেষ্টদা, কেষ্টপদ। নানান ডাক সারা দিনে। এখানে আসবার পর থেকেই ওর এই দোকানের পৃথিবীতে আমার আসন পাকা হয়ে গেছে। সেই সূত্রে অনেকের সঙ্গেই হয় চেনা-জানা।

এখানে নূতন পরিচয়ের নানা মুখের ভিড়ে ভাল লাগে আর একজনকে বিশেষ করে। সে বিজয়। বিজয় মাষ্টার! সবাই ঐ বলেই ডাকে। রোগা ছিপছিপে চেহারাটা। বেশী কথা বলে না, বেশী দেখাও দেয় না। মনে হয় ওকে বড্ড লাজুক। একটা মিষ্টি হাসির ছোঁয়া সব সময় মুখে লেগেই রয়েছে। ওর অল্প কথা বলা আর অল্প দেখা দেওয়ার ভেতরেও কেমন একটা মাধুর্য্য আছে। তাই সবার থেকে আলাদা হয়েই আসন নিতে পেরেছে বিজয় মাষ্টার।

এক দিন কেষ্ট হাজরা ওর সামনেই জানাল, 'বুঝলেন অনুপম বাবু, মাষ্টার আমাদের মস্ত কবি। কত কবিতা লেখে।'

[illegible] দিকে।

'না না, ও কিছু নয়। কিছু নয়।' তাড়াতাড়ি বলে উঠল বিজয় মাষ্টার। মুখে জড়িয়ে-থাকা হাসিটায় অস্বস্তি-জড়ানো লজ্জার ছায়া পড়ল।

'হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ। লেখে বৈকি। কত শুনিয়েছে আমায়। আমার ত ভালই লাগে শুনতে। তবে আমরা দাদা পড়াশুনো বেশী ত করি নি, কাব্যের ভাল মন্দ বোঝবার ক্ষমতা কতটুকু বলুন? আপনি এডুকেটেড্ লোক, আপনিই এ সবের ঠিক বিচার করতে পারবেন। ওহে মাষ্টার, শুনিয়ো না এক দিন আমাদের অনুপমবাবুকে।'

এমনিতেই বিজয় মাষ্টার স্বল্পভাষী, তার উপর এত প্রশংসা। সুতরাং মনের অবস্থাটা কি রকম হয়েছে, অনুমান করতে পারছি।

'একটু-আধটু লিখি। আজেবাজে। ও কি আর শোনাবার মত নাকি! কেষ্টদার তিলকে তাল করাটাই স্বভাব।'

'ফের ঘ্যান ঘ্যান সুরু করেছ।' ধমকে উঠল কেষ্ট হাজরা। 'ঐ ত তোমার এক বদ্ অভ্যেস মাষ্টার।'

'কবিতা লেখার অভ্যেস ত ভাল গুণই মশাই। এতে লজ্জা পাবার ত কিছু নেই। নিশ্চয়ই শোনাবেন এক দিন।'

ঐ একটা দিনই সেজেছিল সীতা। আর নয়। এর মধ্যে আরও বারকয়েক দোকানে হয়ে গেছে তার আনাগোনা। কিন্তু সেই এলোমেলো সুর আবার। সেই অসাবধানী ঢেউ। সেই উদাসীন ফোটা। যে মেয়ে সাজতে চায় না, যার ভাল লাগে না সাজতে—হঠাৎ তারই সুন্দর হবার সখ, হোক তা একটা দিনের জন্যে—একটা মুহূর্তের জন্যে—এ দৃশ্য দেখতে পাওয়া দুর্লভ সৌভাগ্য বৈকি! কিসের রং ধরেছিল ঐ মনে, কিসের আবেগ-ঝরানো খুশী উৎসাহ দিয়েছিল প্রসাধনের, জানি না। জানি না ঐ কালো দুটো চোখের ভীরু তারায় নেমেছিল কোন ইসারা কিনা। তবু কালো চুলের রুক্ষ জটায় হঠাৎ বিনুনীর আলিঙ্গন, কপালের মাঝখানে ছোট্ট টিপের উঁকি, হঠাৎ কাজলের ছোপ কালো চোখের কানায় কানায় —এরা কিছুই কি বলে না?

হঠাৎ এক দিন বলে উঠল কেষ্ট হাজরা, 'বিয়ে করুন না আপনি সীতাকে, অনুপমবাবু।'

অনুরোধটা এমনিই অতর্কিত আর অকস্মাৎ যে, ভাবতে আর অনুভব করতেই অনেকটা সময় চলে গেল। সত্যি বলতে কি, অনুরোধের ধারাটা যে এই পথ দিয়েই নামবে, কল্পনা করতে পারি নি।

'আপনি ইয়ং ম্যান, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সমঝদার, ভাল চাকরি করেন, উদার মন, স্বভাব-চরিত্র ভাল—আপনাদের মত ছেলেরা যদি এমন মেয়েকে নিয়ে ঘর না বাঁধে, তবে বাঁধবে কারা বলতে পারেন? বুড়োহাবড়ারা? মরচে-পড়া মন, বদমাইসরা? না মিনমিনে মেনিমুখোর দল?—তবু চুপ করেই থাকি। বলবার কিছু নেই বলে নয়; বলতে কিছু পারছি না বলেই। কেমন

এক অস্বস্তির কুয়াশা চারপাশ থেকে চেপে ধরেছে আমায়। জানি এ জড়তা বেদনার নয়, আনন্দের। আঘাতের নয়, পরশের। জানি এ বিমূঢ়তা পিছনে খুশীই এনেছে, দুঃখ নয়। তবু কুয়াশার কালো ধোঁয়া কাটিয়ে উঠতে পারছি কৈ?

'সত্যিই ভাল মেয়েটা। মিষ্টি স্বভাব, মিষ্টি মন, মিষ্টি হাসি—একটা মেয়ের মধ্যে আর কত চান মশাই? এ মেয়ে যদি ভাল না হয়, তবে পৃথিবীতে ভাল মেয়ে একটাও নেই, এই সাফ্ বলে দিলাম। আপনি তো দেখছেন দাদা, ওকে এদ্দিন ধরে, আপনিই বলুন? অবিশ্যি বলতে পারেন গায়ের রং দুধে-আলতায় গোলা নয়। অমন রং নিয়ে ক'টা মেয়ে জন্মায় দাদা শুনি একবার? কিন্তু তাই বলে গোলাপকেই সবাই চাইবে, কৃষ্ণকলির দাম নেই কোন? আপনি তো এজুকেটেড্ লোক, আপনিই বলুন? কৃষ্ণকলিকে ভালবাসার, তারিফ করার চোখ যদি আপনাদের মত ইয়ংম্যানদের না থাকে, তবে কাদের থাকবে বলতে পারেন? বিয়ে যদি না করেন আপনি, মেয়েটা এক দিন দেখবেন কোন বুড়োহাবড়া বা মাতাল জুয়াড়ীর হাতে পড়ে ছটফটিয়ে মরছে।'

সে কি?—নিজের গলার স্বর নিজের কাছেই কেমন অস্বাভাবিক শোনাল। না না, তা কেন হবে?

'কেন হবে না মশাই? বাপ মা নেই মামার ঘরে পড়ে রয়েছে। এ বোঝা কোনরকমে ঘাড় থেকে সরাতে পারলেই তারা বেঁচে যায়। পাত্র খুঁজবে ভাল পাত্তর? তাতে বেশী পয়সা খরচ হবে না? এ যুগের দুনিয়ায় কে কার জন্যে ভাবে মশাই? মা-বাপ ভাইবোনেরাই কেউ কাউকে পোঁছে না, তা মামা তো ঢের দূরের সম্পর্ক। আপনি তো এজুকেটেড্ লোক, আপনিই বলুন?'

ভালবেসে ফেলেছি সীতাকে। মনের মধ্যে অনেক হাতড়েও কিছু খুঁজে পাচ্ছি না স্বীকারের পথকে রুখে দেবার। সুন্দরী নয় সীতা। গায়ের রঙে গোলাপ-পাপড়ির ছায়া নেই, নেই টানা চোখ, আঁকা ভুরু। আঙুলে নেই আংটির ঝকমকানো হীরে, কব্জিতে আওয়াজ জানে না নূতন ডিজাইনের সোনার চুড়িগুলো। ঝাঁঝালো সেন্টের পাগল-করা গন্ধ আশেপাশের হাওয়াকে মাতাল করে তোলে না। এ মেয়ে কালো। কালোও যে এত কিছু ভাল নিয়ে থাকতে পারে, একে না দেখলে হয়ত জানতেই পারতাম না কোনদিন। সাধারণ সাদা সাড়ী দেহে জড়ানো। অনেক ভাঁজ খাওয়া, ময়লা। পিঠে লুটিয়ে-পড়া অফুরন্ত অলকগুচ্ছে কবরীর বন্ধন নেই। কিন্তু কালো চোখ দুটোর স্নিগ্ধ তারায় আশ্চর্য মায়া জাগানো রয়েছে। সেখানে তাকালেই পরশ লাগে প্রশান্তির। অবিন্যস্ত বেশভূষা, উদাসীন সাজসজ্জায় ফুটে উঠছে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ফোটা ফুলের মত, উদার আকাশের অফুরন্ততার মত যা শান্ত, যা সরল, সহজ, যা ভাল লাগে—দেখতে ইচ্ছে করে পলকহারা চোখে, তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে অনেকক্ষণ। ওখানে যৌবনের ঢেউয়ের সুরু হয়েছে তাজা মাতামাতি। সাগরের ঢেউ নয়, নদীর ঢেউ নয়, নীল আকাশের ছায়াপড়া পদ্মপুকুরের। এখানে চোখ ঝলসে যায় না, কে যেন নরম হাতের কোমল পরশ বুলিয়ে দিয়ে যায় চোখে। নিরাভরণ শ্যামল মেয়ের এলোমেলো সাজ, এলোমেলো হাসি আর চকিত চাহনি, দিনের পর দিন আমার সবকিছু করে দিয়ে যায় এলোমেলো।

কিন্তু আমার সঙ্গে ওরা বিয়ে দেবেন কেন? হঠাৎ এই জিজ্ঞাসাটা বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। তবু দ্বিধা আর সঙ্কোচে জড়ানো এই প্রশ্নটা অনেকক্ষণ থেকেই ঠোঁটের কাছে আনাগোনা করেছে বাইরে আসবার ব্যর্থ চেষ্টায়, তা অস্বীকার করব কেমন করে?

দেবে না মানে? একশ বার দেবে। হাজার বার দেবে। ওদের বাপ দেবে। ওদের চৌদ্দপুরুষ দেবে। আপনি রাজী শুধু হোন এক বার, তার পর দেখি ওরা কেমন না দিয়ে পারে! দেখি তো কোন্ শালা আপত্তি করে? দেবে না মানে?

গেলাম এক দিন ওর আস্তানায়। ছোট্ট একটা ঘর। কিন্তু সেখানকার জীবন ছোট নয়। খাট রয়েছে দড়ির। জানলা ঘেঁষে টেবিল একটা। সেখানে খানকতক বই, কাঁচের ফুলদানীও একটা। ভোরের দেওয়া ফুল বিকেলে অনেকটা নেতিয়ে পড়েছে। একলা এখানে থাকে মাষ্টার! ছোট্ট ঘরে রোজকার নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচে থাকার জীবন এক জনের। ঘরটার রূপ অগোছালো, উদাসীন। তবু ভালই লাগল। যেমন ভাল লাগে এলোমেলো ওই মেয়েটাকে।

কবিতা শোনাবার সময় আর আপনার হয়ে উঠল না দেখছি, তাই নিজেই হাজির এলাম সময় করে।

আমার এই অপ্রত্যাশিত আগমনে ওখানে খুশী বা অবাক হওয়ার চেয়ে বিব্রত ভাবটাই বেশী করে চোখে পড়ল।

কৈ, শোনান।

আপনিও যেমন, কেষ্টদার কথা সত্যি বলেই ভেবে নিয়েছেন? একটু-আধটু লিখি নিজের খেয়ালে, তা কি শোনাবার না শোনবার।

বেশ তো, আমিও শোনার খেয়ালেই শুনতে এসেছি, সমালোচনার মন নিয়ে আসি নি। এখানে তো ভাল খারাপের বিচার নেই।

সেদিন শোনায় নি মাষ্টার। কিন্তু শুনলাম এক দিন এই ছোট্ট ঘরে বসেই। ভালই লাগল। বিরাট কিছু নয়। কবিতাগুলো মহাকাব্যের পর্য্যায়ভুক্ত দুঃসাহসিক হবার স্পর্দ্ধাও রাখে না। তবু বেশ সুন্দর, সরল, শান্ত। এক সত্যিকারের স্বচ্ছ মনের দরদে আর মমতার ভেজানো।

বললাম, বেশ ভালই তো হয়েছে।

লাজুক মাষ্টারের সব সময় হাসিখুশীতে ভরা মুখে লজ্জার ছায়া পড়ল। বললে, আপনি বিনয় করছেন। একটুও ভাল হয় নি।

ইচ্ছে করেই কোন জবাব না দিয়ে, সন্দেহটা ওরই উপর ছেড়ে দিলাম।

আচ্ছা, আপনি তো অনেক পড়াশুনো করেছেন, বাংলা ইংরেজী অনেক বড় বড় কবির ভাল ভাল কবিতা পড়েছেন, আপনার যখন

ভাল লেগেছে, তা হলে খুব খারাপ হয় নি কি বলেন? একটু বাদে সন্দেহ আর সঙ্কোচ কাটিয়ে এই প্রশ্নটা উঠে এল।

না। খুবই ছোট্ট জবাব দিলাম।

আচ্ছা, তা হলে কাগজের সম্পাদকেরা ফেরত পাঠায় কেন?

কাগজে পাঠিয়েছিলেন বুঝি?

হাাঁ। চার-পাঁচটা পাঠিয়েছিলাম। সব ক'টাই ফেরত এসেছে। আর পাঠাই না।

সবাইকার সবকিছুই ভাল লাগে কি?—বললাম।

আচ্ছা, কলকাতার কোন কাগজওয়ালার সঙ্গে আপনার চেনা আছে কি? ছাপিয়ে দেবেন আমার দু'চারটে পদ্য?

চেনা নেই কারুর সঙ্গে ও জগতের। থাকলেও এ নিয়ে অনুনয়-বিনয় আমাদ্বারা হয়ে উঠত না। লিখে যান মন দিয়ে, আপনাকে যেতে হবে না, ওরাই এক দিন আসবে এখানে।

সত্যি? বড় বড় কবিদের কাছে সম্পাদকেরা নিজের থেকেই আসে বুঝি?

নিশ্চয়ই।

চুপ করে কি যেন ভাবতে থাকে লাজুক মাষ্টার।

মাষ্টার বিজয় লাজুক; কিন্তু কবি বিজয় লাজুক নয়। সেখানে অসংখ্য কথা সাজানো রয়েছে সুন্দর সুরের মত। ওরা সহজে খোলে না মুখ, কিন্তু একবার মুখর হলে ছড়িয়ে পড়ে আকুল ঝরণাধারার মত। মাষ্টারের সঙ্গে আলাপের নিবিড়তা এই সত্যটা জানিয়ে দিল। এই জানাই শেষ নয় ওখানকার সব জানার। হঠাৎ এক দিন আবিষ্কার করলাম আর এক জনকে। সে মাষ্টার নয়, কবিও নয়। সে তবু এক অপ্রত্যাশায়-জড়ানো বিস্ময়-মেশানো আবিষ্কার।

'আপনি আমার লেখার তারিফ করলেন। এখানে আর দু'জন শুধু ভাল বলে আমার কবিতাকে। আপনি নাম্বার থ্রি।'

কৌতূহলী হয়েই শুধালাম, 'আর দু'জন কে শুনি?'

'কেন, কেষ্টদা আর সীতা।'

সীতা! ওই নামটা শোনবার জন্যে কান একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। বিস্ময় ছড়িয়ে পড়ল চার-পাশে।

'চেনেন না ওকে? দেখেন নি কোন দিন? কেষ্টদার দোকানে আসে ত মাঝে মাঝে কিছু কেনবার হলে।'

হ্যাঁ বা না, বললাম না কিছুই।

'ভারি ভাল মেয়ে। গায়ের রং কালো। তা হোক। কালো হলেই কি কেউ খারাপ হয়? পৃথিবীর ভাল ভাল জিনিষের কত কিই ত কালো। নয় কি?'

'তা বটে।' সায় দিলাম।

'ভারি ভাল মেয়ে। যেমন মিষ্টি স্বভাব, তেমনই মিষ্টি হাসি আর কথা। দেখাব এক দিন আপনাকে। আপনারও ভাল লাগবে।'

'কোথায় দেখাবে?'

'এই ঘরেই। এখানে ও প্রায়ই ত আসে। কাউকে বলবেন না যেন তবে। বাড়ীর কেউ জানে না। লুকিয়ে আসে।' পরের কথাগুলোতে মাষ্টারের স্বর আপনা থেকেই নীচু হয়ে এল।

'ওকে তুমি ভালবাস মাষ্টার?'

এ প্রশ্নের জবাব হয়ত সহজে আসবার পথ খুঁজে পেত না, আমার সামনে আগেকার মত বসে থাকলে লাজুক মাষ্টার। এখন দেখছি মাষ্টারের ভিন্ন এক সত্তা, কিন্তু এ বিজয় এখন অনেক উপরে, আকাশের কাছাকাছি।

'ভালবাসা কিনা জানি না। তবে ভাল লাগে। খুব ভাল লাগে।' একটু চুপ করে থেকে বললে মাষ্টার।

'ওই ভাল লাগাকেই বলে ভালবাসা।'—জবাব দিলাম।

'তাই কি?'

'তাই।' মৃদু হাসলাম। তারপর প্রশ্ন করলাম, 'এই সীতাই তোমার কবিতার ইনস্‌পিরেশন্‌, কি বল?'

'না না, তা নয়।' একটা রক্তিম আভা মাষ্টারের হাসি-আঁকা মুখের শান্ত সরলতায় ছড়িয়ে পড়ল। 'তবে ওকে দেখলেই কেমন যেন হয়ে ওঠে মনটা। ওর কথা মনে পড়লেই কবিতার লাইনগুলোতে আপনা থেকেই মিল এসে যায়। কিন্তু মজা কি জানেন, সীতা পদ্যগুলো পড়ে আর হেসে মরে। আমি যেখানেই লুকিয়ে রাখি, ও ঠিক খুঁজে খুঁজে টেনে বার করবেই। আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে হেসে লুটোপুটি খাবে।'

'হাসে কেন?'

'কি জানি!'

'জিজ্ঞেস কর না কেন?'

'ভারি ভাল লাগে ওর হাসি। তাই অবাক হয়ে হাসিই দেখি। জিজ্ঞেস করবার কথা মনেই থাকে না।'

ভালবাসে বিজয় মাষ্টার সীতাকে। আমার কাছে এ এক হঠাৎ আবিষ্কার। তবু এ সত্যি। লাজুক মাষ্টারের মনের গহন কোণে লুকিয়ে থাকা ভালবাসাকে খুঁজে পেলাম। এর জন্যে তৈরি ছিল না মন, প্রত্যাশার একটুও আভাসও পাই নি আগে। তবু অস্বীকার করবার উপায় ত নেই ওদের এই ভাল লাগাকে।

সীতার কথায় মুখর হয়ে উঠে মাষ্টার কথার উদ্দাম কলকাকলিতে। দ্বিধা আর সঙ্কোচের বাঁধ বন্যার মত ভেসে যায়।

'জানেন ভারি একগুঁয়ে মেয়েটা। ভাল করে কিছুতেই সাজতে চায় না। আমি সেণ্ট, স্নো, পাউডার কত কি দিতে চাই, তা কি নিতে চায়? বলে কি জানেন, কি হবে সেজে? এই ত ভাল। বলে, যতই রং মাখ, কালো কি কখনও ফর্সা হয়? ও সত্যি কথাই বলে। কিন্তু ও না সাজুক, ভগবানই ওকে সাজিয়ে পাঠিয়েছেন। নইলে অত কালো চুলের ঢেউ, অমন মিষ্টি হাসি, ওই মায়া-বুলানো দুটো চোখ, যতই সাজুক কেউ কি আনতে পারবে?'

'জানেন সীতা নামটার সঙ্গে সব সময় দুঃখ জড়ানো থাকে। রামায়ণের সীতাকে মনে পড়লেই মনে পড়ে কান্নাকে। এ সীতাও তাই। এ মেয়েও দুঃখের। ওর কেউ নেই, কিছু নেই। তাই ত
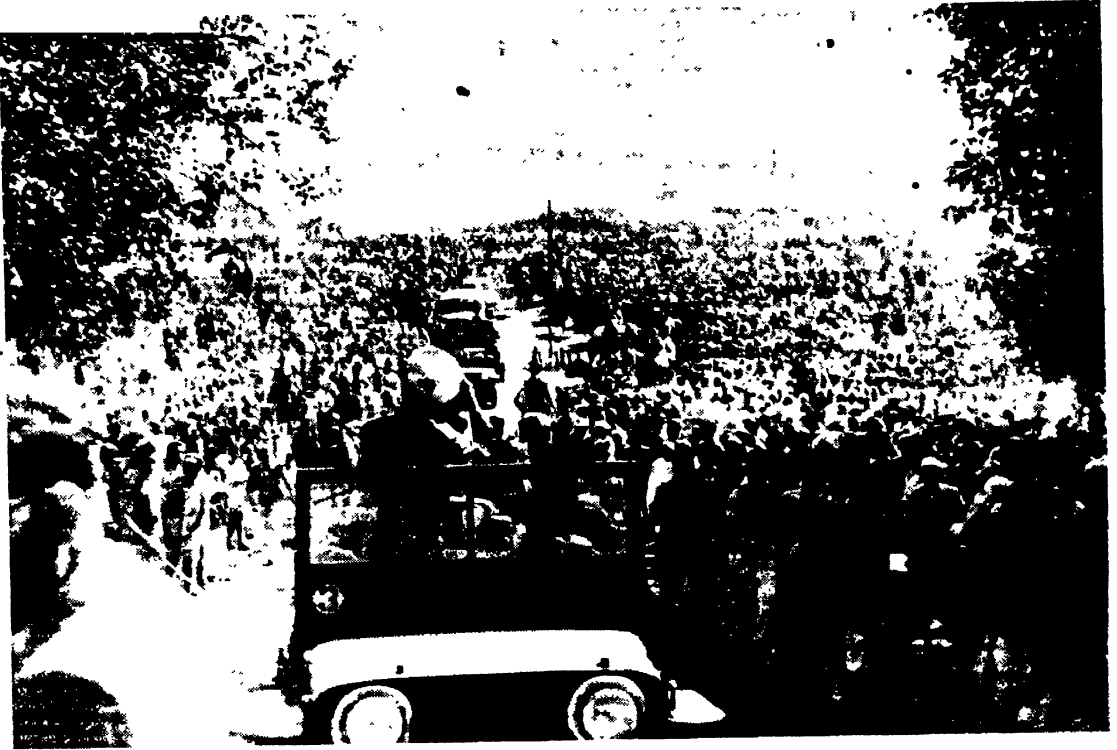
গঙ্গার চড়ায় যাত্রী-সমাবেশের ভিতর দিয়া পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরুর ত্রিবেণী সঙ্গমাভিমুখে গমন

সাধুগণের শোভাযাত্রা কর্তৃক গঙ্গার সেতু অতিক্রমণ
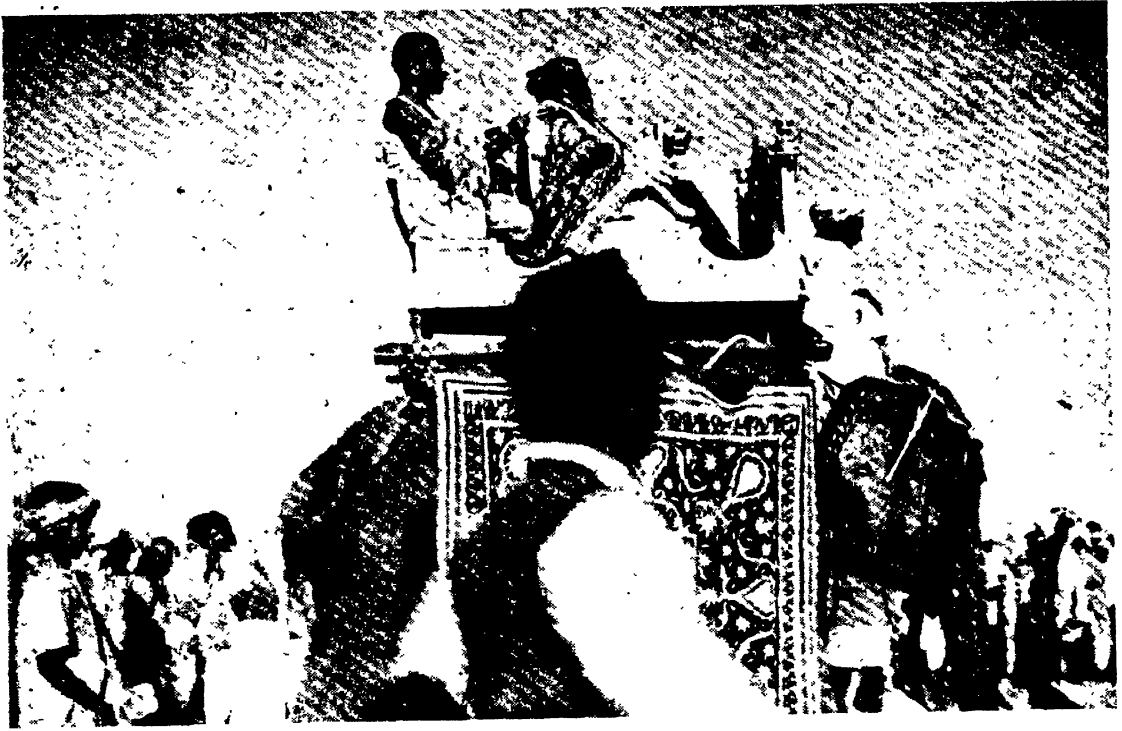
কুম্ভমেলার শোভাযাত্রায় হস্তীপৃষ্ঠে জনৈক মোহন্ত

সাধুগণের শোভাযাত্রার একটি দৃশ্য

এত ভাল লাগে। ওর জীবন কান্নাকে নিয়ে বলেই ত এত সুন্দর সে হাসতে পারে। কান্নাতেই ত মুক্তো ঝরে, হাসিতে ত নয়। ত্যুই না?'

শুনে যাই চুপ করে। ভালই লাগে শুনতে।

এক দিন বললাম, 'সীতাকে তুমি বিয়ে কর মাষ্টার।'

'বিয়ে?' মাষ্টারের চোখে ছায়া পড়ল এলোমেলো ঢেউ।

'হ্যাঁ। ভালবাসাই ত বিয়ের ভিত্তি কবি।'

ভাল লাগল হয়ত কথাটা। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মাষ্টার। তারপর প্রশ্ন তুলল, 'কিন্তু ওর বাড়ীর লোকেরা যদি রাজী না হয়?'

কৃষ্ণ চৌর্সে বসে কেষ্ট হাজরাকে যে প্রশ্ন করেছিলাম, তারই অবিকল প্রতিধ্বনি এ জিজ্ঞাসা। জবাব দিলাম, কিন্তু যে জবাব সেদিন শুনেছিলাম, তার পুনরাবৃত্তি করতে পারলাম না।

'কেন হবে না রাজী?'

'ক্ষেপেছেন? পাত্র হিসেবে ওদের কাছে আমি একটুও ভাল নই। গরীব মাষ্টার, ঘর-বাড়ী চালচুলো কিছু নেই। নিজে কি পাব, ওদের মেয়েকে কি খাওয়াব, তাই ভাববে ওরা।'

বললাম, 'এগুলো কারণ নয় মোটেই, এ তোমার দুর্ব্বলতা মাষ্টার। ভালবাসতে নেমে ভয় পেতে নেই।'

'না না ভয় নয়। ভয় ত আমি পাই না।' হঠাৎ দৃঢ় প্রতিবাদ মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। এ কণ্ঠ কি সত্যিকারের ভালবাসার নয়?

সেদিন জবাব দিই নি কেষ্ট হাজরার সেই প্রশ্নের। দিতে পারতাম। ছিল জবাব—একটাই জবাব। ছোট্ট একটা শব্দ। দিই নি। কেন, কে জানে। হয়ত ভয়, হয়ত লজ্জা, হয়ত সঙ্কোচ। কিংবা কিছুই নয় এসবের। ভাবতে থাকি আত্মগত হয়ে। তবু যে কারণেই হউক, এখন মনে হচ্ছে, ভালই করেছি জবাব সেদিন কিছুই না দিয়ে। দিলে আজ অনুতাপের অন্ত থাকত না। অপরাধী হতে হ'ত এই লাজুক মাষ্টারের কাছে। তা সে অজ্ঞাতেই হোক। সত্যিই ভালবাসে সে আমার ভাললাগা ওই মেয়েটাকে। দোষ ওর নয়। দোষ নয় ওর ভালবাসার। ওই কৃষ্ণকলিকে জানে কবি, চেনে কবি আমার দেখবার, আমার চেনবার অনেক আগে থেকেই। এই ভালবাসায় কোন সংশয়ের ছোঁয়াচ নেই। কোন স্বার্থপরতার দাগ নেই। নেই কোন নগ্নতা। এ সহজ, শান্ত, অনাবিল। এক সুন্দর সরল চাওয়ার নির্ভর প্রকাশ। আমার ভালবাসা কি এত উঁচুতে উঠতে পারবে?

অনেক দিনের পর আকাশে চাঁদ উঠেছে। আমার খোলা জানলায় ওরা ছড়িয়েছে আলোর ঢেউ। হয়তো চাঁদ রোজই উঠে এমনি করে, এমনিই আলো ছড়িয়ে বেড়ায় খুশীর পাগলামিতে। খেয়াল করবার অবসর হয় না। চাঁদের খোঁজই রাখি নি এতদিন। আজ অনেক দিনের পর ঘরে অন্ধকারে বসে একলা আবার চোখে পড়ল চাঁদ।

মাটির চাঁদকে ভুলতেই হবে, আকাশের চাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে সেই কথাই ভাবছিলাম। হঠাৎ দরজায় ঠেলা পড়ল।

অনুপমবাবু আছেন নাকি? চাপা গলা মাষ্টারের।

আমার ঘরে মাষ্টারের আগমন কতকটা অবাক হবার কারণ বৈ কি। আলোর সুইচটা টেনে দিয়ে অভ্যর্থনায় নামলাম।

এসো মাষ্টার, এসো, বস। খবর কি?

খবর ভাল ই। এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দেখা করে যাই একটু আপনার সঙ্গে।

বললাম, বেশ করেছ। কিন্তু নিছক দেখা করাটাই যে এভাবে দেখা দেওয়ার একমাত্র কারণ বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হ'ল না।

ঘর অন্ধকার করে বসেছিলেন, চাঁদের আলো উপভোগ করছিলেন বুঝি?

জবাবে কিছু বলবার বদলে হাসলাম একটু।

তার পর মাষ্টার যেকথা শোনাবার জন্যে আমার ঘরে হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে আগমন করেছে, তাই শুনিয়ে দিল এক ফাঁকে। বেশী দেরি সইল না। খুশীর উপচে-ওঠা ঢেউকে কতক্ষণ চেপে রাখতে পারে?

জানেন, বলে ফেলেছি কাল সীতাকে, বলে ফেলেছি বিয়ের কথা।

কি জবাব পেলে?

কিছুই বললে না।

রাগ করেছে বুঝি খুব?

না না, রাগ তো নয়। চুপ করে রইল। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে একটা বই টেনে ছবিগুলোর ওপর চোখ বুলোতে লাগল। লজ্জা পেয়েছে, কি বলেন?

লজ্জাই তো পাবে কবি।

আমি তো তবে ঠিকই ধরেছি। মুখ ফুটে এমন প্রশ্নের জবাব কি মেয়েরা দিতে পারে? কিন্তু জবাব দেয় হঠাৎ ওদের চুপ করে যাওয়া, মুখ ফিরিয়ে ও প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া; নয় কি?

সবই তো তুমি জান দেখছি মাষ্টার।

হাসি ছিটোনো মুখটা ওর হঠাৎ বক্তিম হয়ে উঠল।

জানেন, অন্যদিন আমার কবিতা পড়ে ও হাসে শুধু, কাল কিন্তু সব সময়েই গম্ভীর হয়ে রইল। নতুন লেখা একটা পড়ে শোনালাম। শুনে গেল চুপ করে। জিজ্ঞেস করলাম, কেমন হয়েছে? তাতে ধমকে উঠল, আমি তার কি জানি! তার পর কি বললে জানেন?

কি?

আপনার নাম করে বললে, আপনার কাছে যেতে। বললে, আপনি অনেক লেখাপড়া করেছেন, অনেক কিছু জানেন, কবিতার ভাল-খারাপের বিচার করবার আপনিই যোগ্য লোক। আপনার ওপর ওর খুব শ্রদ্ধা। দেখলেন তো, সীতাকে আপনি না দেখলেও ও আপনাকে দেখেছে। কেষ্টদার দোকানেই দেখে থাকবে হয় তো। আর জেনেছেও আপনার সম্বন্ধে অনেককিছু।

এ কথাগুলো কিছুদিন আগে কানে এলে মন খুশীতে ঝলমলিয়ে উঠত। কিন্তু শেষ হয়ে গেছে আজ আমার কাছে এই স্তুতিবাদের মাঝে গুঞ্জরণের মেয়াদ। কালো নরম পাতলা ঠোঁটের ফাঁকে সাদা আকাশের ছোঁয়া-নেওয়া এই বর্ষণ আজ ফুরিয়ে গেছে আমার কাছে।

তাই বলতে পারলাম শুধু ছোট্ট সাড়ায়, হবে।

কিন্তু লাজুক মাষ্টারের জড়তার সব বাঁধভাঙা প্রেমিক মন, উচ্ছলিত আনন্দ-বিহ্বলতায় আমার মনের খোঁজ কি করে পাবে? খোঁজ নেবার সময়ই বা তার কৈ? কারই বা থাকে? এ অবস্থায় থাকত কি আমারই?

শুনবেন কবিতাটা?

শোনাও। শোনবার মন নেই। তবু না বলতে পারলাম না।

পড়ে গেল মাষ্টার।

কেমন হয়েছে?

কিচ্ছুই কানে যায় নি। যাবেও না জানতাম। বললাম, ভালই।

একটু বাদে একটা প্রশ্ন তুলল মাষ্টার, আচ্ছা অনুপমবাবু, একটা কথার জবাব দেবেন?

কি?

'বিয়েতে সবাই টাকার দিকেই দেখে, মনের খোঁজ খুব কম লোকই নেয়, কেন বলতে পারেন? সত্যিকারের একটা ভাল মন ক লাখ টাকা দিয়েও কেনা যায়? বলুন না?'

'নয়ই ত। তাই ত কবি, মালাবিনিময় সব বিয়েতেই হয়, মনের বিনিময় হয় খুবই কম।'

'এই আমি বলছি অনুপমবাবু, যার সঙ্গেই বিয়ে হোক সীতার, আমার মত ভালবাসতে কেউ পারবে না। কেউ না।'

এই কি সেই লাজুক মাষ্টার? ভীরু কবি? এত জোরের সঙ্গে এতখানি আত্মবিশ্বাস কোথা থেকে সে পেল? কে দিল তাকে এই সাহস, এমন উদাত্ত কণ্ঠে জানাতে ওর প্রেমের গভীরতা?

চাঁদকে ভুলে কবিরই দিকে তাকাই অবাক হয়ে। তবু চাঁদ ত প্রেমিকেরই।

কেষ্ট হাজরার সেই প্রশ্নের জবাব দিলাম এতদিনের পর। সেই প্রসঙ্গ ও আর তোলে নি তার পর থেকে। হয়ত ইচ্ছে করেই, হয়ত জবাব কিছুই না পেয়ে। আমিই টেনে আনলাম সেই মেয়ের প্রসঙ্গকে আবার।

'আপনার সেদিনের অনুরোধ রাখতে পারলে খুশীই হতাম, কিন্তু পারব না রাখতে।'

চশমাটা চোখে লাগিয়ে হিসেবের মোটা খাতায় মেতে ছিল কেষ্টপদ, আমার কথার কোন সাড়া দিল না। ইচ্ছে করেই হয় ত। কানে যে যায় নি, এ আমি মানতে রাজী নয়।

'বিয়ে করব না ওকে, তার কারণ এই নয়, যে ভাল লাগে না মেয়েটাকে বা ভালবাসি না। কারণ শুধু এইটুকুই, ও সত্যিকারের সুখী হোক। ভালবাসি বলেই ওর ভাল চাই। 'সত্যিই' ও ভাল মেয়ে।'

'ভাল ত আমিও চাই মশাই।' খাতার হিসেব ছেড়ে কেষ্ট হাজরার এবার সাড়া জাগল। 'তাই ত আপনাকে বলছি বিয়ে করতে। তা আপনি কি বলতে চান আপনার সঙ্গে বিয়ে হলে মেয়েটা সুখী হবে না?'

'হয়ত হবে। কিন্তু আমার চেয়েও ভাল ছেলে ত আছে।'

'তা হয় ত আছে। কিন্তু ক'টা? তাদের পাবই বা কোথায়, কোথায় খুঁজে বেড়াব ওদের? আছে বললেই ত আর হ'ল না। আছে যে তা ত জানে সকলেই দাদা। কিন্তু তাদের খুঁজবে কে? কে রাজী করাবে? আপনি ত এজুকেটেড্ লোক, আপনিই বলুন? বরাতজোরে আপনার মত একটা ছেলে হাতের কাছে পেয়ে গেছি তাই ধরে বসলাম।'

অভয় দিলাম। 'সে ভার আমার। আমি দেব খুঁজে। আমাকে যদি ভাল লেগে থাকে, আমার পছন্দের ওপর স্বচ্ছন্দে নির্ভর করতে পারেন।'

এবার খুশী হয়ে উঠল কেষ্টপদ। অনেক দিনের পর ছোপ-লাগা কোকলা দাঁতগুলোর আশেপাশে হাসি ছিটিয়ে উঠল।

'তা হলে ত কোন ভাবনাই নেই। আর আপনি দাদা অনেক পড়াশুনো করেছেন, অনেক ভাল ছেলের সঙ্গে আলাপসালাপ আছে, আপনি এ কাজ ঠিকই পারবেন।'

ভাল লাগল না এই প্রথম কেষ্ট হাজরার খুশীকে। অবশ্য জানি দোষ ওর নয়, আমারই।

খোঁজবার দরকার ছিল না। কাছেই রয়েছে। আমার পছন্দ করা পাত্রটির নাম ইচ্ছে করেই জানালাম না তখন কেষ্ট হাজরাকে পরেই জানাব।

কিন্তু পরের দিনই হঠাৎ কলকাতায় যেতে হ'ল আপিসের কাজে জরুরি তার পেয়ে। খুব সকালেই গাড়ী। এত তাড়াতাড়ি সব বন্দোবস্ত করতে হ'ল যে, কাউকে জানাবার সময় অবধি পাওয়া গেল না।

ভেবেছিলাম ওখানকার কাজ দু'চার দিনেই শেষ হবে। কিন্তু দিনের সংখ্যা কাজের অভাবনীয় চাপে অনেক বেড়ে গেল। এ দেরি হবে কে জানত!

ফিরে আসতেই মাষ্টারের সঙ্গে দেখা। 'এই যে অনুপমবাবু কোথায় গিয়েছিলেন এদ্দিন। আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে আমি ত হয়রান হয়ে গেলাম।'

'কেন, কি হয়েছে? ব্যাপার কি?' আমাকে ওর এভাবে খোঁজার কথায় কৌতূহলী হলাম নূতন খবরের আঁচ পেয়ে।

'ইয়ে, কবিতা লেখবার অর্ডার হয়েছে একটা। বিয়ের কবিতা খুব সুন্দর কাগজে লাল কালিতে ছাপবে, কত লোক পড়বে। যা-ত

ত আর লিখলে চলবে না, ভাল করে গুছিয়ে লিখতে হবে। যাতে বিয়ের খুশী আর আনন্দ-উৎসবের উপযুক্ত হয়। কি বলেন?'

'সে ত নিশ্চয়ই।'

'তাই খুঁজছিলাম আপনাকে। একটু দেখে দেবার জন্তে। যাই হোক, চলে গেছে ছাপতে কলকাতায়। খুব খারাপ হয় নি। ছেপে এলে দেখবেন।'

এখনও তবু পরিষ্কার হ'ল না পুরো খবরটা। প্রশ্ন করলাম, 'বিয়েটা কার?'

'ও হরি, তাও জানেন না বুঝি? আর কি করেই বা জানবেন, আপনি ত এখানে ছিলেনই না ক'দিন। সীতার বিয়ে।'

হেসে শুধালাম, 'তোমারই বিয়ে তা হলে, তাই বল। তুমিই বর, আর তুমিই কবিতা লিখছ তোমার বিয়েতে! বেশ মজা ত।'

'না না, আমার সঙ্গে বিয়ে ত নয়।' তাড়াতাড়ি জানিয়ে দিল মাষ্টার।

'মানে?' অবাক হয়ে তাকাতে হ'ল।

'শুনলাম ওরা নাকি খুব ভাল একটি ছেলে পেয়েছে।' কৈফিয়তের সুরে জানায় মাষ্টার।

'তাতে কি?'

আমার প্রশ্নটায় গলার সাধারণ স্বরের চেয়ে অনেকখানি কাঠিন্যের পরশ ছিল।

'না না, তাতে আর কি, তাতে কিছু নয়।' কেমন যেন অসংযত হয়ে উঠল কবির এতক্ষণের স্বাভাবিকতা। 'ভাল ছেলে পাক না। মেয়ের জন্তে ভাল ছেলে সকলেই ত খোঁজে। তবে সীতা কিন্তু রাজী হয় নি। ও মুখ ফুটে সাহস করে আমার নামই করেছিল। তা আমি জানি।'

'আর তুমি? তুমি বুঝি বেইমানি করতে একটুও দেরি করলে না?'

'না না, আমিও ত রাজী হই নি প্রথমে। সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন। তারপর এক দিন হঠাৎ ওর বড়মামা আমার ঘরে এসে হাজির। এসে বললে, 'ছাপার অক্ষরে কখনও দেখেছ নিজের কবিতা কবি?' জানালাম, না। বললে, 'দেখতে চাও?'—চাই বৈ কি, চাই, লাফিয়ে উঠলাম। জানাল, সীতার বিয়েতে কবিতা লেখ, খুব ভাল একটা। ছাপিয়ে দেব হাজার হাজার—ভাল কাগজে, ভাল কালিতে। কত লোকে পড়বে।'

'ওই লোভেই ছেড়ে দিলে সীতাকে? ভুলে গেলে মুহূর্তে মেয়েটাকে? ফুল্, ইডিয়ট, ননসেন্স। ডাহা ঠকিয়েছে ওরা তোমায় মাষ্টার।'

আগুনের চোখ নিয়ে তাকালাম ভুলে যাবার এই মমতাহীন ইতিহাসে। এত খারাপ কখনও কোন দিন লাগে নি মাষ্টারকে। ঘৃণার ক্লেদাক্ত সমুদ্রে এভাবে কলুষ-স্নান করবার জন্তে কে ওকে ঠেলে দিল ফেলে?

'না, ঠকায় নি। ধাপ্পা দেয় নি। সত্যিই। এই ত সেদিন নিয়ে গেল কবিতাটা। ছাপাতেও গেছে কলকাতায়, শুনলাম। দেখবেন, যখন বিয়ের রাতে বিলোবে।'

'কি দেখব? কি দেখাবে তুমি? ও ত বিয়ের কবিতা নয়, ও তোমার অধঃপাতের কাহিনী। জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা আর বেইমানির গান। ওরা তোমায় ঠকায় নি মাষ্টার, তুমিই ঠকিয়েছ নিজেকে। ছাপার অক্ষরের কি দাম আছে পৃথিবীতে? পয়সা থাকলেই যা খুশী ছাপানো যায়। আমায় বললেই পারতে, ছাপিয়ে দিতাম বিনা পয়সায় ওই রকম হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ! সামান্য ছেলেভুলানো লোভে বোকার মত ভুলে গেলে! নিজের কবিতা ছাপার অক্ষরে দেখতে পাবার খুশীতে এক কথায় ছেড়ে দিলে সবকিছু? মনে পড়ল না একবারও কি এত দিনের ভাল-লাগা মেয়েটার কথা? এত দিনের চাওয়া-পাওয়ার, হাসি-গানের স্মৃতি? তুমি বেইমানি করেছ মাষ্টার ভালবাসার সঙ্গে, জোচ্চুরি করছ হৃদয়ের সঙ্গে। কয়েক লাইন ছাপার অক্ষরের লোভে স্বচ্ছন্দে বেচে দিলে একটা মনকে।'

এ কি করে এসেছে মাষ্টার? শান্ত, সরল, লাজুক, হাসি-ভরা-মুখ যে বিজয় মাষ্টারকে দেখে এসেছি এত দিন, দেখেছি যার মধ্যে সত্যিকারের ভালবাসার অনাবিল ছবি—সেই কোমলতা, উদারতা হঠাৎ এমন কঠিন পাথর করে দিল কে? কালো মেয়ের নিরুপম কাজল-কালো রূপকে আমার ভাল-লাগা, লাজুক মাষ্টারের যে ভাল-বাসার কাছে হার মেনে নিয়েছিল বিনা প্রতিবাদে, শ্রদ্ধায় আর সহানুভূতিতে, কোথায় গেল সেই উদার আকাশ?

তাকালাম মাষ্টারের দিকে আবার অবাক বিস্ময়ে। কাঁপছে ও দারুণ অস্বস্তিতে। আমার এত উত্তেজনা কখনও দেখে নি। কখনও শোনে নি এমন কথার কশাঘাত। ক্ষোভে আর অনুশোচনায় সংযমের বাঁধ-ভাঙা আমার এমন অস্বাভাবিক চেহারা ওর কাছে নূতন। তাই হয় ত⋯

কিন্তু আবার মনে পড়ল, মনে পড়ল মাষ্টারের কুণ্ঠায় জড়সড় চেহারার দিকে তাকিয়ে, কালো চোখের ভীরু তারায় বিশ্বাসের ছায়া দেখে। ওরা ঠিক পথই ধরেছে, লোভ দেখিয়েছে লোভীকে। লোভী লাজুক মাষ্টার নয়, নয় ওর সত্যিকারের ভালবাসা। ওর কবি-মনই লোভী। সেই কবিকেই ওরা দেখিয়েছে লোভ। ঠিক বার করেছে খুঁজে ঐ দুর্বলতাকে। ওদের আছে সংসারীর চোখ। যে চোখ এক চাওয়াতেই মানুষ চিনতে পারে। যে চোখ সাংসারিক অভিজ্ঞতায় বিচারের ভুল বেশী করে না। তাই ভুল ওরা করে নি। ভুল করেছি আমিই।

কিন্তু লোভী কবিই কি একমাত্র বেঁচে থাকবে ওখানে?

•

ঘুম ভেঙে গেল ভোরে। ঘুম ভাঙাল মিষ্টি সুর। সানাই বাজছে। মনে পড়ে গেল আজ সীতার বিয়ে। সেই কৃষ্ণকলির বিয়ে। বিয়ে সেই অদ্ভুত মায়া-জড়ানো মেয়েটির—ভোরের ভেজা শিশিরের মতই যে অমলিন। জোর করে ভুলে-যাওয়া,

ভাল-লাগা মেয়েটার জন্যে অনেক দিনের পর মন আজকের ভোরে হঠাৎ কেমন যেন করে উঠল, সানাইয়ের সুরে ভূপালির কান্নায়।

আবার ভরেছে রাতের আকাশ। খুশীর আনন্দ-উৎসবে নব সাজে নি বাড়ীটা। অনেক চঞ্চল ভিড় উচ্ছল হয়ে উঠেছে। নিমন্ত্রিত হলেও নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত দর্শকের মত এক কোণে আত্ম-গোপন করে ছিলাম। বিয়ের অনেক খুশীর ভরা আসরে পা দিয়েছি, পাত্রটিকেই দেখবার জন্যে শুধু।

দেখলাম। ভিড়ের পাশ কাটিয়ে আস্তে আস্তে নেমে এলাম রাস্তায়। ফটকের কাছে হঠাৎ ধরে ফেলল মাষ্টার।

এই যে অনুপমবাবু, কতক্ষণ এসেছেন?

এই তো এলাম।

এরই মধ্যে চললেন?

হ্যা, আর কি।

বা রে, বিয়ে দেখবেন না? খাওয়া-দাওয়া করবেন না?

নাঃ।

না বললে কি চলে? তা কি করে হবে? সকলকে অভ্যর্থনা আর দেখাশুনা করবার ভার যে আমার ওপর। সীতা শুনলে ভয়ানক রাগ করবে। চলুন।

রাগ কেন করবে? কৌতূহল হ'ল।

বারে, ও আজ অনেকবার আপনার খোঁজ করেছে। আপনি কলকাতা থেকে ফিরেছেন কিনা, আপনাকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে কিনা। আমি বললাম, নেমন্তন্ন করা হয়েছে, আর উনি ঠিকই আসবেন।' তার পর ও বলল ভুমি ওঁর যত্নআত্তি করো ঠিকমত। উনি এখানকার নতুন লোক, কাউকেই তো চেনেন না। ওঁর দিকে লক্ষ্য রেখো একটু। যাই বলুন, আপনাকে ও খুব শ্রদ্ধা করে।

শ্রদ্ধা ছাড়া এর মধ্যে আর কিছুই কি খুঁজে পেলে না মাষ্টার? না খুঁজতে চাইল না?

বললাম, শরীরটা আমার ভাল নেই। তাই যেতে হচ্ছে। রাগ করতে মানা করো সীতাকে।

শরীর ভাল নেই? তবে তো থাকা ঠিক নয়।

ছাড়া পেয়ে এগোলাম।

অনুপমবাবু। আবার ডাকল মাষ্টার।

দাঁড়াতে হ'ল। বিয়ের পদ্যটা দেখেছেন?

হ্যা। মিথ্যেই বললাম।

কৈ, আপনার হাতে দেখছি না তো?

ছিল তো এতক্ষণ। পকেটে রেখেছি বোধ হয়।

ও নিয়ে আর মাথা ঘামাল না মাষ্টার। 'কেমন হয়েছে?'

'ভালই।'

'আর বেশ চমৎকার ছেপেওছে, কি বলেন?'

'হ্যা।'

'সীতা আজ আমায় কি বলেছে জানেন? বলেছে, তোমার বিয়ে কবি কবিতার সঙ্গেই হবে, মানুষের সঙ্গে নয়। কেমন কেমন যে কথা বলে মেয়েটা! আজ কিন্তু ও খুব সেজেছে। মাথায় ফুলের ভিড়, কপালে চন্দনের। চোখে কাজল টেনেছে! খুব জমজমাট একটা সাড়ী পরেছে। এত ভাল লাগছিল। আর আজ ও কি বলেছে জানেন?'

'কি?'

গলার স্বর অনেকটা খাদে নামিয়ে জানাল মাষ্টার, বলেছে, 'এমন সেজেছি যে তোমাদের বিদ্বান বুদ্ধিমান অনুপমবাবু ও দেখলে কাত।' ভারি ফাজিল হয়েছে মেয়েটা! দোহাই, এসব ওকে আবার বলবেন না যেন।'

তাড়াতাড়ি পা চালালাম। আর দাঁড়ানো যায় না। আরও অনেককিছুই হয় ত থাকতে পারে মাষ্টারের, বলবার। শুনতে চাই না। চাই না। শোনা অন্যায়, শোনা পাপ। পাপ। বলেছে সীতা মাষ্টারকে, আমাকে নয়। মাষ্টারই শুনুক, মনে রাখুক। আমার শোনার আর অধিকার নেই।

ইচ্ছে করে ঘুরেই ফিরলাম কৃষ্ণ ষ্টোর্সের সামনে দিয়ে। বিয়ে-বাড়ীতে দেখতে পেলাম না কেষ্ট হাজরাকে। হয় ত আসে নি। হয় ত লুকিয়ে এসেছে, লুকিয়েই পালিয়ে গেছে। হয় ত—

আলো জলছে কৃষ্ণ ষ্টোর্সে এত রাত্তিরেও। থমকে দাঁড়ালাম। পা দুটো এগোবার স্বচ্ছন্দ গতি পাচ্ছে না। কলকাতা থেকে ফিরে আর দেখা করি নি কেষ্ট হাজরার সঙ্গে। মাষ্টারের এই বেইমানির ইতিহাস শোনবার পর থেকে সাহস হয় নি ওখানে মুখোমুখি দাঁড়াবার। মনে হয়েছে, এর জন্যে দায়ী একমাত্র আমিই। ভরসা আমিই দিয়েছিলাম কেষ্ট হাজরাকে: আশা দিয়েছিলাম। তাই অপরাধী হয়ে সেখানে যাবার মত মনের জোর খুঁজে পাচ্ছিলাম না কিছুতেই। তবু আজ এত কাছে এসেও, ফিরে যেতে পারলাম না। এগিয়ে গেলাম আস্তে আস্তে।

'কে অনুপমবাবু, আসুন।' মোটা খাতার হিসেবের পাতা থেকে চোখ তুলল কেষ্ট হাজরা পায়ের আওয়াজ পেয়ে।

'এখনও দোকান খুলে রেখেছেন যে?'

'শেষ হিসেবনিকেশ করে রাখছি। কাল থেকে কৃষ্ণ ষ্টোর্স বন্ধ।'

'সে কি!' অবাক হলাম।

'আমার পয়মন্ত মেয়েই নেই, কার জন্যে খুলে রাখব বলতে পারেন? আর বিক্রিই বা হবে কি ঘোড়ার ডিম!'

দোকানে রোজ ভিড়-করা দস্যিদলের কথা মনে করিয়ে দিলাম। বললাম, 'ওরা ত রয়েছে। এই কুঁড়িরা একদিন-না-একদিন বড় হবে। আপনার ছোট্ট উঠোন ফুলে ফুলে ভরে যাবে।'

'ক্ষেপেছেন, আর নয়! ওসব মায়া-টায়ার মধ্যে আর আমি নেই মশাই। আমার কি আর কাজকর্ম নেই বুড়া বয়েসে। যত সব বাজে কাজ।···তার পর, বিয়ে কেমন দেখলেন?'

'বিয়ে দেখি নি। আগেই চলে এসেছি।'

'কেমন খাওয়াল?'

'খাই নি।'

কেষ্ট হাজরা আবার মন দিল মোটা খাতায়।

'বর দেখলেন?' হিসেব করার ফাঁকেই আবার প্রশ্ন হ'ল।

'হ্যাঁ।'

'কেমন লাগল?'

একটু ইতস্ততঃ করে জানালাম, 'ভালই ত।'

'ভাল না হাতী! এর চেয়ে ভাল কি হতে পারত না? ওদের খোঁজা আর কত ভাল হবে? আপনি ত মশাই ভাল ছেলে দেব বলে কিছুই করলেন না। নিজেও এগিয়ে এলেন না। আপনি যদি মেয়েটাকে বিয়ে করতেন!'

চুপ করে রইলাম। এ ছাড়া আর কিই বা করতে পারি। বলব কি চেঁচিয়ে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এক লাজুক মাষ্টার, এক ভীরু প্রেমিক, এক লোভী কবি—বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমার সঙ্গে, উদার আকাশের সরলতার সঙ্গে, সমস্ত পৃথিবীর ভালবাসার সঙ্গে! বলব কি চেঁচিয়ে, আমি নয়, এক হৃদয়হীন কবি নিষ্ঠুর হাতে উপড়েছে আধফোটা কৃষ্ণকলির নরম পাপড়িগুলো। বলব কি?

উদ্বোধন

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

জাগো জাগো হে বধির ঈশ্বর আমার,—
অসহায় আর্ত্ত কণ্ঠে বিশ্বলোক ডাকিছে তোমায় বারবার।
হায় প্রভু, তবু
তব মূক মুখে কভু
কোনো দিন ফুটিবে না কথা?
জাগিবে না আঁখি মেলি' ওগো তন্দ্রাতুর?
তবে কি সত্যই তুমি অস্তিত্ববিহীন?
নিষ্করুণ অন্ধ শক্তি তুমি কি গো চির উদাসীন
সংসারের দুঃখে সুখে, ব্যথা-বেদনায়?
তুমি মোর স্রষ্টা বলে চিরদিন করেছি অর্চনা
ধূপদীপে, স্তবস্তোত্রে, বিকচ কুসুমে—
সে কি মোর ভ্রান্তি?—সে কি কল্পনাবিলাস?
তুমি স্রষ্টা—সৃষ্ট আমি—
মিথ্যা এ কি মোহান্ধ সংস্কার
রয়েছি আঁকড়ি বুকে সৃষ্টির প্রথম উষা হতে?
কে তোমারে প্রচারিল এ বিশ্বসংসারে?
কণ্ঠে কণ্ঠে কে বণ্টিল তব সুধানাম
ছন্দোগীতে গাঁথি?
মন্দিরে মন্দিরে প্রভু, কে প্রথম পূজিল তোমায়?
জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে ভূধর-গহনে—
কার নেত্রে দিল ধরা বিভূতি তোমার অপরূপ?
হেরিয়া গগনপথে দীপ্ত ইরম্মদ—
তব রুদ্র রোষ বলি কে চিনিল তারে?
বহ্নি জ্বলে তব ভয়ে, সূর্য্য দেয় তাপ;
তব ভৃত্যসম নিত্য বহে প্রভঞ্জন,
মৃত্যু আসে ধেয়ে সদা ইঙ্গিতে তোমার,
উদ্ভাসিত এ ভুবন তোমারি প্রভায়—
কে প্রথম এই বাণী ঘোষিল ধরায়?
কল্পনার সপ্ত বর্ণে করিয়া যতন—
আমি তোমা গড়িয়াছি আপনার মনের মতন!
অপার মহিমা তব—সে যে হায়, আমারি সৃজন—
অণু হতে অণীয়ান্,—এই গর্ব্ব মোর!
হে মহতো মহীয়ান্,
সত্য যদি হও প্রভু, সর্ব্বশক্তিমান—
পারো কি করিতে কভু ত্রাণ
আজ এই ধরিত্রীরে জরামৃত্যুনাগপাশ হতে?
যে ক্রন্দন উঠে ভেদি' স্তব্ধ অভ্রতল
লক্ষ দগ্ধ বক্ষ হতে চির রাত্রিদিন—
পারো তাহা নিবারিতে?
জগতের যত দুঃখভার—
নীরব সাক্ষীর মত দেখ যদি চাহি',—
পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি কোন্ মন্ত্রবলে!
পারো কি নূতন করি গড়িবারে আর একবার—
জীর্ণ এ সংসার?
থাকো যদি—অস্তিত্বের দাও পরিচয়
জীবনের সর্ব্ব দিক হতে!—
অশরীরী আত্মাসম রহিও না বসি'
তিমির-গুণ্ঠিত ধ্যানলোকে!
হায় স্বামী,
একবার এসো তুমি নামি
তব সুখস্বর্গ-ধাম হতে—
জঠর যন্ত্রণাক্লিষ্ট মাটির জগতে!

নবাবী ও দেওয়ানী আমলে মুদ্রা

শ্রীযামিনীমোহন ঘোষ

নবাবীর শেষ আমলে এবং কোম্পানীর প্রথম আমলের যেসব মুদ্রা[1] বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল, এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব। সে সময়ে রূপার সিক্কা টাকার সর্ব্বোচ্চ মান ছিল। দিল্লীর বাদশাহকে নজর পাঠাইবার জন্ম এবং অন্যান্য টাঁকশালে নমুনা পাঠাইবার জন্ম মুর্শিদাবাদ টাঁকশালে অল্প পরিমাণে সিক্কা টাকা প্রথমতঃ তৈয়ার হইত। তাহার পর অন্যান্য ধনী, বণিক, মহাজন ইত্যাদি নবাব নাজিমের পরওয়ানা লইয়া রূপা বা পুরাতন টাকা দাখিল করিলে তাহা হইতে নূতন সিক্কা টাকা তৈয়ার করিয়া দেওয়া হইত। অবশ্য যার যার চাহিদামত টাকা তৈয়ার করা হইত, তাহার নিমিত্ত রীতিমত ফিস বা দস্তুরী দিতে হইত। ইহাদের মধ্যে জগৎশেঠের কুঠীর জন্য সর্ব্বাগ্রে টাকা তৈয়ার হইত; কারণ তাঁহারাই নবাব-সরকারের বংশানুক্রমিক কোষাধ্যক্ষ ও মহাজন। তাঁহাদের দস্তুরীও অন্যান্য হইতে কম ছিল, শতকরা আট আনা। জগৎশেঠের কুঠীর অন্তর্বাণিজ্য-শুল্কের হারও অন্যান্য ব্যবসায়ী হইতে অনেক কম ছিল। অপরাপর বিষয়েও সুযোগ-সুবিধা অনেক ছিল।

এ প্রসঙ্গে জগৎশেঠদের সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার, কারণ তাঁহাদের সঙ্গে এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মুঘল বাদশাহদের শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রত্যেক সুবায় সিপাহ সলার বা সুবেদার যদিও দৃষ্টতঃ সর্ব্বোপরি ছিলেন, কিন্তু রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান, কানুনগো, পোদ্দার অথবা নিজামত বিভাগের কাজী উল-কুজ্জত (প্রধান কাজী), ওয়াকিনগার (সংবাদদাতা), হরকরা (গোয়েন্দা) ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগের প্রধান ব্যক্তিগণ দিল্লী হইতে নিযুক্ত হইতেন অথবা ইঁহাদের নিয়োগের সনদ দিল্লী হইতে মঞ্জুর করিয়া আনাইতে হইত। ইঁহাদের প্রত্যেককে সুবার বিভিন্ন স্থান হইতে স্ববিভাগীয় অধীন কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করিয়া স্বাধীন ভাবে সরাসরি দিল্লী-দরবারের ঐ সব বিভাগীয় মন্ত্রীদের নিকট পাঠাইতে হইত। ক্ষমতার সমতা রক্ষার্থে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল না। দেওয়ানের প্রস্তুতি হিসাব কানুনগোদের মোহরযুক্ত করিতে হইত। কোন জমিদারী বিক্রয়ের কোবালায় কাজীর ও কানুনগোর শিল-মোহর যুক্ত হইত। সিরাজউদ্দৌল্লার সঙ্গে ইংরেজের সন্ধিপত্রে কানুনগোদের দস্তখৎ ও শীলমোহর যুক্ত ছিল, কারণ তাঁহারাই সমস্ত দলিল-পত্রের একাধারে মহাফেজ (Record-keeper) ও সত্যতা-যুক্ত করার কর্ম্মচারী (Registrar) ছিলেন। এইজন্য কোষাধ্যক্ষ জগৎশেঠদের বহালী সনদ দিল্লী হইতে আসিত। কোষাগারের তিনটি চাবি ছিল—একটি সুবেদার, দ্বিতীয়টি দেওয়ান ও তৃতীয়টি কোষাধ্যক্ষ বা পোদ্দারের জিম্মায় থাকিত। পরে অবশ্য কেন্দ্রীয় শক্তির বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে এই শাসনপ্রণালীরও বিলোপ হইল।

জগৎশেঠ কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে—রাজা, নবাব, মহারাজা ইত্যাদির ন্যায় বাদশাহপ্রদত্ত উপাধি মাত্র। জৈন বণিক মাণিকচাদ মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে ঢাকায় ও পরে মুর্শিদাবাদে আসিয়া ব্যবসা আরম্ভ করেন। ইঁহার অন্যান্য ভ্রাতার আগ্রা বারাণসী ইত্যাদি স্থানে গদী থাকাতে তিনি বাংলার রাজস্ব হুণ্ডী করিয়া দিল্লীর বাদশাহের নিকট সহজেই পাঠাইতে পারিতেন। তিনি একবার এইরূপে এক হুণ্ডীতে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব পাঠান। তাঁহাকে দিল্লীর সম্রাট 'শেঠ' উপাধি দেন। মাণিকচাদের পর তাঁহার ভগ্নীপুত্র ফতেচাদ বাংলার রাজস্বের পোদ্দার নিযুক্ত হন। তাঁহার সনদ সম্রাট ফারুকসায়ারের প্রদত্ত। এই সময় তাঁহাকে 'জগৎশেঠ' উপাধি দেওয়া হয় ও বাংলার রাজস্বের পোদ্দার নিযুক্ত করা হয়। পরে মহম্মদ শাহের নিকট হইতে ১৭২৪ খ্রীঃ জগৎশেঠ উপাধি ও খেলাত ইত্যাদি প্রাপ্ত হন। জগৎশেঠ ফতেচাদ, প্রধান মন্ত্রী হাজী আহমদ ও খালসার রায়রায়ান আলমচাদের পরামর্শ অনুসারে নবাব সুজাউদ্দিন রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার সময় ফতেচাদ এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার রাজস্ব দিল্লীতে পাঠান। মুতাক্ষরিণে লিখিত আছে:

"তাঁহাদের ধন-সম্পত্তি এত অধিক ছিল যে সেরূপ ধনবান কোন মহাজন হিন্দুস্থান বা দাক্ষিণাত্যে দেখা যাইত না, অথবা সমগ্র ভারতবর্ষে এমন কোন মহাজন বা বণিক ছিল না যাহাদিগকে তাঁহাদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তৎকালে সকল মহাজনই তাঁহাদের কাছে ঋণী ছিল।...মরাঠারা তাঁহাদের দুই কোটি আর্কট টাকা লুঠ করিয়াছিল, তা তাঁহাদের কাছে দুই বোঝা খড়ের অতিরিক্ত কিছুই মনে হয় নাই। মহাজন ও অন্যান্য ব্যবসায়ীরা সকলেই অর্থের জন্য জগৎশেঠদের কুঠীতে উপস্থিত হইতেন। ইংরেজ, ফরাসী, আরমানী, ওলন্দাজ প্রভৃতি বণিকগণ শেঠদের নিকট টাকা কর্জ্জ করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা বাট্টা দিয়া বাংলার চলতি মুদ্রা সংগ্রহ করিতেন।"

১৭৪২ খ্রীঃ ঢাকার কুঠীয়ালের জগৎশেঠ মহাতপচাদের ঢাকার গদী হইতে ঋণ লওয়ার কথা উল্লেখ আছে। আবার ১৭৬০ খ্রীঃ ঢাকার কুঠীয়াল লিখিলেন যে কুঠীতে অর্থের নিতান্ত অভাব, কাজ চালাইতে হইলে জগৎশেঠের গদী হইতে ঋণ লইতে হইবে। কিন্তু তাহা দরকার হইল না—পরে দেখা যাইবে। সিরাজউদ্দৌল্লার সময় জগৎশেঠের নিকট ফরাসীদের পনর লক্ষ টাকা ঋণ ছিল। ১৭৪৪ খ্রীঃ ফতেচাদের মৃত্যু হয়। তাঁহার জীবিতকালেই তাঁহার দুই পুত্র আনন্দচাদ ও দয়াচাদের মৃত্যু হয়। সেইজন্য তাঁহাদের দুই জনের দুই পুত্র মহারাজা স্বরূপচাদ ও জগৎশেঠ মহাতপচাদকে ফতেচাদ উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিয়া যান। সিরাজউদ্দৌল্লার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে

জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ প্রধান নেতা ছিলেন। ইংরেজের নিকট জগৎশেঠদের এত প্রতিপত্তি ছিল যে, মীরজাফর ১৭৫৮ খ্রীঃ ক্লাইভের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য কলিকাতায় গেলে তাঁহার সহিত জগৎশেঠও গিয়াছিলেন। "ইংরেজের এই উপলক্ষে মোট ৮০,০০০ টাকা ব্যয় হয়, তন্মধ্যে ১৮ হাজার আর্কট টাকা জগৎশেঠকে হিন্দুমতে সম্বর্দ্ধনার্থ ব্যয় হয়। ১৭৬৩ খ্রীঃ বিফলমনোরথ হইয়া যখন মীরকাশিম বিহারের দিকে চলিয়া যান, তখন মুঙ্গেরে ইঁহাদিগকে গঙ্গায় ডুবাইয়া মারেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয় ১৭৬৬ খ্রীঃ বাদশাহ শাহ আলম হইতে জগৎশেঠ খোশালচাঁদ ও মহারাজা উদায়ৎচাঁদ উপাধি প্রাপ্ত হন। দেওয়ানী প্রাপ্তিকালে (১৭৬৫ খ্রীঃ) ক্লাইভের এক চিঠিতে নবাবের তিন মন্ত্রীর উল্লেখ আছে। যথা—নবাব রেজা খাঁ, জগৎশেঠ ও দুর্লভরাম। ১৭৬৫ খ্রীঃ জগৎশেঠ গোপালচাঁদকে কোম্পানীর সরফ নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতেই জগৎশেঠদের পতন আরম্ভ হয়। ১৭৭২ খ্রীঃ খালসা মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। তৎপরে মুর্শিদাবাদের টাঁকশাল বন্ধ হয়। মুর্শিদাবাদ টাঁকশালে সিক্কা তৈয়ারের পর তাহার নমুনা ও ছাঁচ ঢাকা এবং পাটনার টাঁকশালে পাঠানো হইত। ইহার পরে ঐ সব টাঁকশালে সিক্কা টাকা তৈয়ার হইত। কলিকাতায় টাঁকশাল হইলে সেখানেও ছাঁচ এবং নমুনা পাঠানো হইত। সিক্কা টাকায় বাদশাহের নাম, রাজত্বের বৎসর খোদিত থাকিত। সিক্কা টাকায় দশ মাসা পরিমাণ রূপা থাকিত ও তৎসঙ্গে সামান্য খাদ থাকিত। সিক্কা টাকার ওজনই পণ্যের ওজনের মাপকাঠি ছিল। বিরাশী সিক্কার সেরে কোম্পানী মলঙ্গীদের নিকট হইতে লবণ কিনিত, আবার আশী সিক্কার ওজনে বিক্রয় করিত। বেশী ওজনের বলিয়াই চলতি কথায় "বিরাশী সিক্কা" প্রচলন হইয়াছে। সিলেট চুণের মাপ ছিল নব্বই সিক্কায় সের।

সিক্কা টাকা ব্যতীত স্থানীয় টাকারও প্রচলন ছিল। চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, ভুলুয়া (নোয়াখালি) ইত্যাদি অঞ্চলে দশ মাসা ও ঢাকাই টাকা চলিত। রাজস্বের হিসাবপত্রে, মেদিনীপুরে আল্লাসিক্কা নামে এক কাল্পনিক টাকার উল্লেখ দেখা যায়, ইহার মান সিক্কাটাকা হইতেও বেশী ছিল। ইহা ছাড়া নোকরাসিক্কার চলতি ছিল। কোচবিহার, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি (তখন রঙ্গপুর জেলাভুক্ত), গোয়ালপাড়া, রাঙ্গামাটি ও ভুটানের অধিকৃত এলাকায় কোচবিহারের নারায়ণী টাকার প্রচলন ছিল। কোচবিহারের টাঁকশালে প্রসিদ্ধ রাজা নরনারায়ণের আমলে এই টাকা প্রথম তৈয়ার হয়। রাজা নরনারায়ণ বিশেষ পরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহার সময়ে আসামের বহু অংশ কোচবিহাররাজ্যভুক্ত ছিল। সেইজন্যই আসামের ঐ সব অঞ্চলে নারায়ণী টাকার প্রচলন ছিল। আবার, ভুটানে কোন টাঁকশাল না থাকাতে এবং ইহার বাণিজ্যকেন্দ্র কোচবিহার ও রঙ্গপুর থাকায় ভুটিয়ারা নারায়ণী টাকা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইত। ভুটিয়ারা বাংলায় আসিয়া প্রথমতঃ পণ্যবিনিময় করিত। কোচবিহার হইতে খাদ্যশস্য ও শুকনো মাছ এবং রঙ্গপুর হইতে লবণ, তৈল, গুড় ইত্যাদি কিনিত, কিন্তু তাহাদের পণ্যের মধ্যে স্বর্ণ, কস্তুরী, সাবর, বাদাম, কমলালেবু, চামর, ভুটিয়া ঘোড়া ইত্যাদি মূল্যবান বস্তু থাকাতে তাহাদের প্রাপ্য বেশী হইত: সেইজন্য মূল্য বাবদ তাহাদের নারায়ণী টাকা লইতে হইত। পুরাতন নারায়ণী টাকা পাইলে তাহারা তাহা কোচবিহারের টাঁকশালে দাখিল করিয়া নূতন নারায়ণী মুদ্রা তৈয়ার করাইয়া লইয়া দেশে ফিরিত, কারণ পুরাতন টাকা তাহাদের দেশে বা তিব্বতে চলিত না। ভুটানের দেবরাজাও কোচবিহারে রূপা পাঠাইয়া নারায়ণী টাকা তৈরি করাইতেন। বাংলায় প্রচলিত সিক্কা, আর্কট টাকা কোচবিহারের টাঁকশালে নারায়ণী টাকায় রূপান্তরিত করায় টাকাপ্রতি ওজনে দুই মাসা এবং এক মাসা খাদে মোট শতকরা ৩০৲ টাকা লাভ হইত। ইহার দশ হইতে পনর ভাগ বাট্টা বাবদ যে ব্যবসায়ী টাকা রূপান্তরিত করিবার জন্য আসিত তাহাকে দিতে হইত। বাকি অংশ টাঁকশালের কর্ম্মচারী ও কোচবিহারের রাজার লাভ হইত। ১৭৭৩ খ্রীঃ সন্ধির পূর্ব্বে কোচবিহারের টাঁকশাল বন্ধ করার প্রস্তাব হয়, কিন্তু ঐ সব কারণে টাঁকশাল বন্ধ করার প্রস্তাব সন্ধিপত্রে সর্ত্ত করা হয় না। ১৭৭৭ সালে কোচবিহারের টাঁকশাল বন্ধ হয়, কেবল দশহরার দিন টাঁকশালে এক হাজার নারায়ণী টাকা তৈয়ার করার অনুমতি দেওয়া হয়। ১৭৭৯ খ্রীঃ ভুটানের রাজা—কোচবিহারের টাঁকশাল বন্ধ করায় বিশেষ অসুবিধার কারণ হইয়াছে বলিয়া জানান এবং ঐ টাঁকশাল পুনরায় স্থাপনের নিমিত্ত অনুরোধ করেন। তাঁহাকে রঙ্গপুরের খাজাঞ্চীখানার মজুত নারায়ণী টাকা দেওয়ার আদেশ হয়।

ত্রিপুরার রোশনাবাদ পরগণা মুঘলরাজ্যভুক্ত হওয়ার পরে ত্রিপুরার টাকশালে রোশনাবাদী টাকা বশ্যতাস্বীকার জ্ঞাপনার্থ মাত্র ২২১৲ টাকা তৈয়ার হইয়া তাহা নজর বাবদ দেওয়া হইত। এই টাকা চালু মুদ্রা ছিল না। দিনাজপুর, মালদহ, পূর্ণিয়া ও রাজমহল (শেষোক্ত অঞ্চলদ্বয় তৎকালে বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল) জেলায় বিহারের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্বন্ধ ছিল, সেইজন্য ঐ সব জেলায় পাটনাই বা আজিমাবাদী সিক্কার প্রচলন ছিল। বহু দিন হইতেই তাহাদের কুঠি-মধ্যে টাঁকশাল বসাইবার অধিকার পাওয়ার জন্য কোম্পানীর চেষ্টা ছিল। ১৭৫৩ খ্রীঃ ডিরেক্টরগণ লিখিলেন—এ চেষ্টা অতি গোপনে করিতে হইবে, কারণ নবাবের নিকট দরখাস্ত করিলে তিনি জগৎশেঠের সঙ্গে পরামর্শ করিবেন। আমরা যতই অর্থব্যয় করি না কেন, জগৎশেঠ রাজী হইবে না। টাকা তৈয়ারের যেসব ধাতু আমদানী হয় তৎসমুদয়ই কেবলমাত্র জগৎশেঠগণ ক্রয় করিয়া থাকেন এবং তাহাতে তাঁহাদের যথেষ্ট লাভ হয়। এই প্রস্তাবে তাঁহাদের লাভের ব্যাঘাত হইবে, সেজন্য তাঁহাদের রাজী হওয়ার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে দিল্লী হইতে যদি অনুমতি পাওয়ার চেষ্টা করা যায় তবে সফল হওয়ার সম্ভাবনা। ইহাতে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইতে পারে। তবে জগৎশেঠ জানিতে পারিলে সেখানেও বাধা পাওয়ার সম্ভাবনা, কারণ দিল্লীর দরবারেও

তাঁহাদের যথেষ্ট প্রভাব। ইহার পর সিরাজউদ্দৌল্লার সঙ্গে ১৭৫৭ খ্রীঃ সন্ধিসূত্রে কোম্পানী টাঁকশাল করার অধিকার পায়। তারপর পলাশীর বিপ্লব। ১৭৫৮ সনে কলিকাতার টাঁকশালে প্রথম টাকা তৈয়ার হয়। কলিকাতায় কোম্পানী যে টাঁকশাল বসাইয়াছিল, তাহাতে কারেণ্ট টাকা বলিয়া মুদ্রা তৈয়ার হইত। কিন্তু সে টাকার মান খুব কম ছিল। কারেণ্ট টাকা চলিত না, কোম্পানীর হিসাবপত্রে ও কর্ম্মচারীদের মাহিনার হিসাবে ব্যবহার হইত। ১৭৫৮ খ্রীঃ ডগলাস নামে এক বণিক প্রাপ্য বাবদ কলিকাতার টাকা লইতে অস্বীকার করিয়া বলেন যে, কলিকাতার টাকা লইলে তাঁহাকে শতকরা পাঁচ টাকা হইতে দশ টাকা বাট্টা দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। ঘাটশিলা প্রভৃতি পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে রাজস্ব আসিত আদত টাকা। শ্রীহট্ট, কাছাড় ইত্যাদি অঞ্চলে কড়ির প্রচলন ছিল। কড়িই ছিল সর্ব্বত্র প্রচলিত প্রাচীন ও সর্ব্বনিম্ন মুদ্রা।

"কড়ি ফটকা চিঁড়ে দই,
কড়ি বিনা বন্ধু কই।"—ভারতচন্দ্র

কড়ি হইতেই এক কড়ি দু'কড়ি ইত্যাদি নামের সৃষ্টি। শ্রীহট্ট হইতে বড় বড় পালোয়ার নৌকা বোঝাই হইয়া কড়ি ঢাকার কোষাগারে আমদানী হইত।

এ সব গেল সুবেদারের এলাকার মুদ্রা। কিন্তু বাংলায় তখন বহির্বাণিজ্যের বহুল প্রসার ছিল। ভারতের পশ্চিম উপকূলের সুরাট বন্দর তখন পারস্য, আরব, মিশর, আফ্রিকা ও ইউরোপের দেশসমূহের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। এই সুরাটের ইংরেজের কুঠি হইতে ১৬৬৪ খ্রীঃ ছত্রপতি শিবাজী এক কোটি টাকা আদায় করিয়াছিলেন। বাংলার ব্যবসায়ীরা দেশীয় জাহাজে ঐ বন্দরে বাংলার মসলিন, মলমল, পাগড়ির কাপড়, সোরা, রেশম ইত্যাদি চালান দিত। সেই জন্য বোম্বাই টাকার আমদানী বাংলায় হইত। রাজা দ্বিতীয় চার্লসের অনুমতি পাইয়া ইংরেজ কোম্পানী রাজার যৌতুকপ্রাপ্ত বোম্বাই বন্দরে টাঁকশাল বসাইয়া বোম্বাই টাকা তৈয়ার করিত। সুরাটী টাকাও বহু পূর্ব্ব হইতেই বাংলায় আমদানী হইত। চট্টগ্রামের বন্দোবস্তী কাগজে দেখা যায় যে, সুজা খাঁর সময়েই সুরাটী টাকা সেখানে প্রচলিত ছিল। ইউরোপের কোন মুদ্রা বাংলায় চলিত না। ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী, দিনেমারগণ পরে পশ্চিম উপকূল হইতে পূর্ব্ব উপকূলে ব্যবসা আরম্ভ করিল। তখন তাহারা দেশ হইতে রূপা ও রৌপ্যমুদ্রা আনিয়া মুর্শিদাবাদের টাঁকশালে সিক্কা টাকা তৈয়ার করাইয়া লইত, অথবা বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতের পূর্ব্ব বা পশ্চিম উপকূলের যে টাকা তাহাদের হাতে আসিত তাহা বাংলায় লইয়া আসিত। আর্কটের নবাবদের তৈয়ারী আর্কট টাকার মান উচ্চ ছিল, কারণ তাহাতে রৌপ্যের পরিমাণ বেশী ছিল। ক্রমে আর্কট ফরাসীদের হস্তগত হইল। তখন ফরাসীরা পণ্ডিচেরীর টাঁকশালে টাকা তৈয়ার করাইয়া লইয়া ফরাসী আর্কট নামে বাংলায় চালাইত। পরে আর্কট যখন ইংরেজের অধিকৃত হইল তখন ইংরেজেরাও আর্কট হইতে টাকা তৈয়ার করাইত। ফরাসী আর্কট বাংলায় পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত থাকায় ইংরেজদের তৈয়ারী আর্কটও ফরাসী আর্কট নামে চলিত। তবে এই আর্কট টাকার মান বাংলার সিক্কা টাকা হইতে অনেক কম ছিল। কোম্পানী সেইজন্য আর্কট টাকায় দাদন ও ব্যবসা করিয়া বিশেষ লাভবান হইত। মরাঠারা জগৎশেঠের কুঠী লুঠ করিয়া দুই কোটি আর্কট টাকা লইয়া যায়।

দাদনী প্রথায় কুফল ও অত্যাচারের উল্লেখ এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। নীলের যুগ পর্য্যন্ত যে দাদনী প্রথা চালু ছিল, তাহা বাংলার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। দাদন দিয়া চাষী বা তাঁতীকে নাগপাশে বদ্ধ করা হইত। পণ্যের যে মূল্য ধার্য্য করিয়া দাদন দেওয়া হইত, পারিশ্রমিক ও আদত মূল্য হিসাবে তাহা নিতান্ত অপ্রচুর ছিল। বোল্টের মতে দাদন লইতে অস্বীকার করায় কোম্পানীর ঢাকার কুঠিয়ালরা বাজিতপুর (ময়মনসিংহ) অঞ্চলের সাত শত তাঁতীর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া দিয়াছিল, যেন আর তাঁত বুনিতে না পারে। বোল্ট নিজেও তিন বৎসর কোম্পানীর চাকুরি করিয়া নব্বই হাজার পাউণ্ড সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আবার, কোম্পানীর কুঠীতে দৈনিক মজুরের পারিশ্রমিকও নিতান্ত কম ছিল। রেশমের কুঠীতে যাহারা রেশম-সুতা জড়াইত তাহাদের মজুরী ছিল মাসিক আট আনা মাত্র। এইরূপ অপ্রচুর মূল্য ও মজুরী এবং অল্প মানের টাকা দিয়া কোম্পানী ও তাহার কর্ম্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ করিত। অপর পক্ষে চাষী ও শিল্পীর আর্থিক অবস্থার ক্রমে ক্রমে অবনতি হইতে লাগিল। কিন্তু বিলাসিতাহীন মিতাচারী বাঙালীর জন্য কোন পণ্য আমদানীর দরকার ছিল না। বাংলা হইতে রপ্তানী হইত বস্ত্র, গালা, সোরা, চাউল, চিনি, রেশম, আফিম ইত্যাদি; আর বাংলায় আমদানী হইত সোনা, রূপা, মদ (মেদিরা দ্বীপ হইতে মদিরা), শঙ্খ, মশলা (বাটাভিয়া হইতে), বন্দুক ইত্যাদি। এ সব পণ্যই আসিত, ধনী বিলাসীদের জন্য সামান্য পরিমাণে; মূল্যও কম। এইজন্য বাণিজ্য-মান (Balance of Trade) সর্ব্বদাই বাংলার অনুকূলে ছিল। দেখা যায়, বাহির হইতে কোন পণ্যের আমদানী মেদিনীপুরের দরকার ছিল না। অথচ মেদিনীপুর হইতে বহু প্রকার সুতী বস্ত্র, রেশমী বস্ত্র ইংরেজ ও ফরাসী কুঠী হইতে রপ্তানী হইত। ইহা ছাড়া আন্তর্বাণিজ্যে মেদিনীপুর হইতে বহু লক্ষ টাকার লবণ বাংলার বিভিন্ন বন্দরে এবং বাংলার বাহিরে পাটনা, গোয়ালপাড়া ইত্যাদি স্থানে রপ্তানী হইত। ঢাকায় একমাত্র কয়েক সহস্র টাকার শঙ্খ ভারতের পূর্ব্ব উপকূল হইতে আমদানী হইত, তাহাও আবার বহু সহস্র টাকা মূল্যের শাঁখা তৈয়ার হইয়া বাংলা ও বাংলার বাহিরে রপ্তানী হইত। অথচ এক ইংরেজ কোম্পানীই এক কোটি টাকার মসলিন, মলমল, শিরস্ত্রাণ-বস্ত্র ইত্যাদি রপ্তানী করিত।

এইজন্য ক্রমে ফরাসী আর্কটে দেশ ছাইয়া গেল। অথচ বাংলার রাজস্ব ধার্য্য ছিল সিক্কা টাকায়, তাহাও আবার সেই সনের

সিক্কা টাকায়। তাহার উপর হুণ্ডিয়ান অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ খালসা কাছারীতে পাঠাইবার বাবদ হুণ্ডীখরচ। নবাবী আমলের এক রাজস্ব-কাগজে হুণ্ডিয়ান শব্দকে 'হস্তিয়ান' পড়িয়া আমি বড়ই সমস্যায় পড়িয়াছিলাম। আমার হস্তিয়ান পড়িবার কারণ ছিল, যে পরগণা সম্বন্ধে কাগজ তাহার পার্শ্ববর্তী পরগণাসমূহ হইতে রাজস্ব হিসাবে হস্তী আদায় হইত। যাহা হউক ইহা অবান্তর।

তখন ফলে এই দাঁড়াইল যে জমিদারকে খাজনা দিতে হইত সিক্কা টাকায়, আবার জমিদারকে তাঁহার প্রজারা দিত বিভিন্ন প্রকার টাকা। এই সব বিভিন্ন টাকার মান সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মুর্শিদাবাদের সিক্কা টাকার মান সর্ব্বোচ্চ ছিল, কিন্তু তাহা নূতন সিক্কা, সিক্কার অর্থ ই নূতন তৈয়ারী। সিক্কা টাকা যত পুরাতন হইত, ততই তাহার মান বা মূল্য কমিয়া যাইত। কারণ প্রথমতঃ যতটা রূপা থাকে, ব্যবহারে ও চারিদিকে চাচিয়া ফেলার দরুন টাকার ওজন তাহা হইতে কম হইত, সঙ্গে সঙ্গে দামও কমিত। নবাব মীরকাশিম এই সমস্যার সমাধানের জন্য ধার্য্য রাজস্বের উপর বাট্টা বাবদ টাকাপ্রতি দেড় আনা চাপাইয়া দিলেন। ১৭৬০ সনে কোম্পানী মীরকাশিমের নিকট হইতে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী স্বত্ব পাইয়া এই সমস্যার সম্মুখীন হইল। কারণ এখন দেওয়ার পালা নয়, আদায়ের পালা। কোম্পানী বণিক, সূক্ষ্ম হিসাব জানে। তাহারা মীরকাশিমের বাট্টা সহ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আদায়ী টাকার উপর ভিন্ন ভিন্ন বাট্টার হার ধার্য্য করিয়া দিল। মেদিনীপুরে আল্লা সিক্কায় খাজনা ধার্য্য বলিয়া চলতি সিক্কার উপর শতকরা ছয় টাকা বাট্টার হার ধার্য্য হইল। অর্থাৎ, যেখানে একশত টাকা জমা ধার্য্য আছে সেখানে নূতন সিক্কা টাকা আদায় দিলেও ১০৬৲ টাকা দিতে হইত। ঢাকাই সিক্কার মান কড়াক্রান্তি হিসাবে টাকা প্রতি ৲৭।=ক্রান্তি চলতি সিক্কা হইতে কম ধার্য্য হইল। নারায়ণী টাকার দাম টাকাপ্রতি।১৬ গণ্ডা কম ধার্য্য করা হইল। আবার, বাহিরের নানা প্রকারের টাকা বাংলায় প্রচলিত হওয়ায় তাহার ওজন ও খাদ অনুসারে মূল্য ধার্য্য করা হইল। যে সব টাকায় এক পয়সা হইতে এক আনা পরিমাণে খাদ থাকিত তাহাকে "বাজে রকম" বলা হইত। ইহাতে বারাণসী, লক্ষ্ণৌ, আর্কট এবং অন্যান্য প্রকার টাকা থাকিত। যেসব টাকায় এক আনা হইতে দুই আনা পরিমাণ খাদ থাকিত বা ওজনে কম থাকিত তাহাকে "গড়শাল" বলা হইত। ইহাতে বোম্বাই, পাটনাই, ঢাকাই, মুর্শিদাবাদী সিক্কা ফরাসী ও ইংরেজী আর্কট থাকিত। "পাঁচমেল" বলা হইত পাঁচ রকম টাকার মিশালকে। ইহার মূল্য আর্কট হইতে শতকরা তিন টাকা বেশী ধার্য্য করা হইত। পোদ্দারেরা মুদ্রার ওজন-খাদ পরীক্ষা করিয়া যে মূল্য-তালিকা প্রস্তুত করিত তাহাকে 'পরখাই' বলিত।

আর্কটের কোম্পানীর ধার্য্য বাট্টা ছিল শতকরা ৯৷৶০, কিন্তু ইহা অন্যায্য ছিল। কোম্পানী লাভের জন্য এইরূপ করিয়াছিল। এই টাকা কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসা দ্বারা সর্ব্বত্র চালু হইয়া ছিল, তজ্জন্য চাহিদাও বেশী ছিল। চাহিদার উপরেই মান নির্ভর করে। জমিদারগণ যখন এই টাকা প্রজাদের নিকট পাইয়া রাজস্ব দাখিল করিতে আসিতেন তখন সিক্কা বাট্টা বলিয়া ৯৷৶০ আনা বেশী আদায় করা হইত। অথচ বাজারে ইহার বাট্টা ছিল শতকরা পাঁচ টাকা। দিনাজপুরের কালেক্টর লিখিলেন যে, কিস্তির সময় জমিদাররা আর্কট টাকার উপর ৫৲।৬৲ টাকা বাট্টা দিয়া সিক্কা টাকা সংগ্রহ করিতেন। কিন্তু গোল বাধিল অন্য রূপে—দিনাজপুরের কালেক্টর রেশমকুঠীতে সিক্কা টাকা পাঠাইলে কুঠীয়াল সিক্কা লইতে অস্বীকার করিলেন, কারণ তাঁহাকে কুঠীর হিসাবপত্রে একশত সিক্কা টাকা ১০৯৷৶০ আনা আর্কট টাকা রূপে জমা করিতে হইবে অথচ দাদনকালে ১০০ সিক্কা টাকা ভাঙ্গাইয়া তিনি মাত্র ১০৫ আর্কট টাকা পাইবেন। টাকার মান ধার্য্য করিলেও তাহা চাহিদা অনুসারে মূল্যসমতা হইবেই।

১১৭৬ সালে বাংলার কয়েকটি জেলায় অজন্মা হইল—বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বিভাগের (বিস্তৃত মেদিনীপুর জেলা বাদে) এবং মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায়। ইহাই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অথবা মনুষ্যকৃত দুর্ভিক্ষ। অনেকে হয়ত মনে করিবেন গত পঞ্চাশের মন্বন্তরের পর "মনুষ্যকৃত দুর্ভিক্ষ" একটা বুলি হইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্য নহে। দিনাজপুর, রঙ্গপুর, রাজসাহী হইতে মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতায় এবং ঢাকা (তখন ঢাকার অন্তর্গত বাখরগঞ্জ) চট্টগ্রাম, যশোহর (তখন খুলনা যশোহরের অন্তর্গত), এমনকি সুদূর শ্রীহট্ট হইতে কলিকাতার বেলেঘাটায় বহু চাউল আমদানী হইল। কিন্তু আমদানী করিল কাহারা। কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারী, দেওয়ান, গোমস্তা, এবং তাহাদের মজুদী ও ধনী বেনিয়াগণ। তাহারা যে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিল তাহা জনসাধারণের ক্রয়শক্তির বাহিরে। এদিকে যেসব অঞ্চল হইতে চাউল আমদানী হইল সেখানেও অভাব দেখা গেল। সেসব অঞ্চলের লোকেরা কিন্তু অতিরিক্ত মূল্যেও চাউল পাইল না। যুদ্ধের সময় 'সিজ' করা চাউলের ন্যায় সরকারী পরওয়ানা লইয়া চাউল জোর করিয়া আনা হইল। ফলে দুর্ভিক্ষ বাংলার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক কাহারও হিসাবে—যথা রাজমহলের (মালদহ তখন রাজমহলভুক্ত ছিল) কালেক্টরের হিসাবে, অর্দ্ধেক লোক মরিল, কোম্পানীর ব্যবসা চলিবে কিসে? ইংরেজ আর যাহাই হউক বোকা নহে, চারি মাসের পথ দূরে থাকিয়াও কোম্পানীর ডিরেক্টররা খবর পাইলেন ও কতক অনুমান করিলেন। ১৭৭০ সনেই তাঁহারা জ্বালাময়ী ভাষায় লিখিলেন:

"We are not free from the apprehension that even amidst the distress to which a kingdom was reduced and the depopulation which was in prospect there may have been others in company's service or under its protection so far influenced by averice as to monopolise the chief article of the support of the poor."

সারার্থ :—

"আমরা এই আশঙ্কা হইতে মুক্ত নই যে এই যে দুর্দ্দশা যাহাতে একটা রাজ্য ধ্বংস হইল এবং এই যে সম্মুখে লোকক্ষয়ের আশঙ্কা তাহার মূলে কোম্পানীর কর্ম্মচারী ও তাহাদের আশ্রিত লোক আছে যাহারা দুর্লোভের বশবর্ত্তী হইয়া দরিদ্রের প্রধান খাদ্য একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল।"

পরেও আবার ১৭৭২ সনে লিখিলেন যে, দুর্ভিক্ষের সময় একচেটিয়াকারী কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারী ও গোমস্তা এবং অন্যান্য ধনিগণ এত বেশী দরে বিক্রয় করিয়াছে যে তাহা দরিদ্রদের ক্রয়শক্তির বাহিরে। তাহার খবর তাঁহারা পাইয়াছেন। এবার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের হুকুম আসিল, কিন্তু যাহা সব যুগে হয় তাহাই হইল। অপরাধীরা তদন্ত ধামাচাপা দিল। কেবলমাত্র পূর্ণিয়ার দেওয়ান দেবীসিংহকে সরাইয়া দেওয়া হইল। যাহা হউক, এ প্রসঙ্গে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বিস্তৃত বিবরণ পাঠকগণ অবান্তর মনে করিবেন। পর বৎসর হইল পর্য্যাপ্ত ফসল। ফসলের মূল্য একেবারে কমিয়া গেল. কোন স্থানে রবিশস্য কলাইয়ের দর হইল টাকায় ৭।৮ মণ, কৃষক আর তাহা কাটিল না। মোট কথা, চাষীর হাতে টাকা আসিল না। রাজস্ব অনাদায়ের সম্ভাবনায় জেলায় জেলায় চারি মাসের জন্য অবাধ রপ্তানীর আদেশ দেওয়া হইল।

ডিরেক্টরদের হুকুমে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের ব্যবসা বন্ধ হইল। তাহাদের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য দেওয়ানীপ্রাপ্তির পর ক্লাইভ লবণ, তামাক ও সুপারির অন্তর্বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া লইয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের হাতে সেই ব্যবসা সমর্পণ করিলেন। তাহাদের পোষণ করা চাই। যাহা লইয়া মীরকাশিমের সঙ্গে বিরোধ হইয়াছিল তাহা এবার কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা পাইল। কিন্তু প্রকৃত ব্যবসা এক, আর শোষণ অন্য এ ব্যবসা টিকিল না। মলঙ্গীদের নিকট হইতে যে দরে লবণ কেনা হইত সে দরে তাহাদের পারিশ্রমিক পোষাইত না, ফলে অনেক ব্যবসা ছাড়িয়া দিল। মেদিনীপুরের অনেকে উড়িষ্যার মরাঠা এলাকায় দাদন লইয়া চলিয়া গেল। আবার যে চড়া দরে লবণ মহাজনদের নিকট বিক্রী করা হইত, তাহা জনসাধারণের ক্রয়শক্তির বাহিরে। এক শত মণ লবণ ৮৩৲ টাকায় বিরাশী সিক্কার ওজনে কিনিয়া ২০০৲ দরে বিক্রয় করিলে কি লাভ হয় তাহা হিসাব করিয়া দেখুন। চাউলের দর টাকায় ৩৫ সের আর লবণের দাম টাকায় ২০ সের। মরাঠা এলাকা হইতে চোরাই লবণ সস্তায় আসিত, চোরাবাজারে বিক্রয় হইত। কথায় বলে "নুন ভাত"—তাহা ত যে প্রকারেই হয় জোটাইতে হইবে।

তামাক বাঙালীর একমাত্র ব্যসন। এই সেদিনও তামাকের উপর ট্যাক্স বসাইতে গিয়া অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রীসভা টলমল হইয়াছিল। ঔপন্যাসিক থ্যাকারের পিতা শ্রীহট্ট হইতে লিখিলেন—কোম্পানীর গোমস্তারা ব্যবসায়ীদের দুয়ারে তামাক ফেলিয়া আসে, পরে গিয়া অধিক পরিমাণে তামাকের মূল্য দাবি করে, আবার বাজার হইতে চড়া দর দাবি করে। খাওয়ার পর পান খাওয়া

পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে পান খেতে পাই।
লক্ষ্মীছাড়া বাসিমড়া যার পানের কড়ি নাই॥

সেই পানের সুপারির চড়া দাম হইল। জনসাধারণ এই সব নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ কিনিতে সর্ব্বস্বান্ত হইল। চোরাকারবার পুরাদমে চলিল। জনসাধারণ যেমন অর্থশূন্য হইল, তেমনি কোম্পানীর কারবারও গেল।

এদিকে ওলন্দাজ, ফরাসী, দিনেমারগণ তাহাদের ব্যবসা গুটাইতে লাগিল ইংরেজ কোম্পানী ব্যবসা একচেটিয়া করাতে। চীনে ওলন্দাজগণের আফিমের ব্যবসা—যাহা তাহাদের প্রায় একচেটিয়া ছিল, লোপ পাইল। অন্যান্য বিদেশীর মারফত বাংলায় যে টাকা আসিত তাহা বন্ধ হইল। মীরকাশিমের নিকট হইতে চট্টগ্রাম, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের জমিদারী স্বত্ব পাইয়াই কোম্পানী ঐ সব স্থানের আদায়ী রাজস্ব হইতে তাহাদের কুঠীতে ও আরঙ্গে ব্যবসায়ের মূলধনরূপে ব্যবহার করিত। ১৭৬১ সনে কার্য্যভার লইয়া চট্টগ্রামে পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গে ভেরেলেষ্টকে ঢাকার কুঠীতে দুই লক্ষ ও লক্ষ্মীপুরের (নোয়াখালি জেলা) আরঙ্গে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠাইবার আদেশ হইল। মেদিনীপুরের রেসিডেণ্টই একাধারে ব্যবসায় ও জমিদারীর রাজস্ব আদায়ের কার্য্য করিতেন। ব্যবসায়ের সমস্ত টাকা রাজস্ব হইতে জোগাইতে হইত। অতিরিক্ত টাকা গেঁওখালী দিয়া নৌকাযোগে কলিকাতায় চালান হইত। বর্দ্ধমানে কুঠী না থাকায় বর্দ্ধমানের রাজস্ব কলিকাতায় আসিত।

দেওয়ানী পাইবার পর কোম্পানীর আরও সুবিধা হইল। এখন কোম্পানী "মাছের তেলে মাছ ভাজা" আরম্ভ করিল। বাংলায় আর ব্যবসায়ের মূলধন হিসাবে সোনা, রূপা আমদানী না করিয়া বাংলার আদায়ী রাজস্ব হইতেই ব্যবসায় চালাইতে আরম্ভ করিল। বরং দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধবিগ্রহের টাকাও বাংলা হইতে যাইত। কর্ণেল ফোর্ডের সঙ্গে চারি হাজার মোহর ও বহু টাকা দাক্ষিণাত্যের অভিযানে পাঠানো হইয়াছিল। আবার বোম্বাই সুরাট ইত্যাদি ব্যবসাকেন্দ্রেও বাংলা হইতে টাকা পাঠানো হইত। বাংলার মুদ্রা বাহিরে রপ্তানী হইয়া গেল। দেশীয় বণিকগণ সুরাট ইত্যাদি স্থানের ব্যবসায় গুটাইতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে এরূপ ছিল যে, মুর্শিদাবাদী ৯৫ টাকা দিয়া সুরাট বন্দরে ১০০৲ টাকা পাইত। হুণ্ডিয়ান ত লাগিতই না। ১৭৭২ সনের মধ্যে তাহাদের পশ্চিম উপকূল-বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গেল। সে সময়ে কোম্পানীর আড়াই লক্ষ টাকা সুরাটে পাঠাইবার দরকার হইল। কিন্তু তখন বণিকগণ বলিল—আমাদের এখন আর সুরাটের সঙ্গে ব্যবসা নাই। এখন কেবল হুণ্ডির কারবার হিসাবে মহাজনগণ—যথা জগৎশেঠের কুঠী ইত্যাদি হইতে টাকা পাঠানো যায়। তখন বাংলার মহাজনগণের সুরাটের মহাজনদের সঙ্গে কারবার ছিল না, হুণ্ডি করিতে হইলে মুর্শিদাবাদ হইতে বারাণসীর মহাজনের নিকট হুণ্ডি কাটিতে হইত। বারাণসীর মহাজন আবার বুন্দেলখণ্ডের মহাজনের নিকট হুণ্ডি দিত। বুন্দেলখণ্ড হইতে সুরাটে হুণ্ডি করিত। এইরূপে বারবার

হুণ্ডি কাটিতে (re-drafting) অনেক ব্যয় হইত। তৎকালীন সর্ব্বশক্তিমান নায়েব দেওয়ান মহামান্য নবাব মহম্মদ রেজা খাঁ মোজাফর জঙ্গ বহু স্তুতি-মিনতি করিয়া মহাজনদিগকে শতকরা দুই টাকা বাট্টায় টাকা পাঠাইতে পারিলেন। কিন্তু তাহার পর আর কেহ রেজা খাঁর অনুরোধেও হুণ্ডি করিতে রাজী হইল না। (কোচ-বিহারের টাঁকশাল বহু পূর্ব্বেই উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল)। এদিকে মুর্শিদাবাদের, ঢাকার এবং পাটনারও টাঁকশাল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কোম্পানীও নূতন টাকা বেশী তৈয়ার করিত না। নূতন টাকা তৈয়ার করা না করা তাহাদের আয়ত্তে। পুরাতন টাকার মূল্য কম, তাহা দিয়া এবং আর্কট মুদ্রা দিয়া ব্যবসা করা লাভজনক। ইংলণ্ডে রেশমী কাপড় ও পরে বস্ত্রাদি পাঠানোও নিষিদ্ধ হইল। এমন কি মিসেস হেষ্টিংসের মণিমুক্তাখচিত রেশমী গাউনও শুল্কবিভাগ আটক করিয়াছিল। ইহার পর এমন হইল যে, যে ক্ষেত্রে বাংলা হইতে জাহাজভর্ত্তি মাল রপ্তানী হইত সেখানে বারুদ তৈয়ারের জন্য সোরাভার (ব্যালাষ্ট) হিসাবে বাংলা হইতে চালান হইত। সোরা কলিকাতা, মাদ্রাজ ইত্যাদি বন্দরে গুদামভর্ত্তি করিয়া রাখা হইত। রপ্তানী মাল কম হইলেই সোরা বোঝাই হইত। তবে চাউলের মূল্য কেরোলিনা চাউলের হইতে অনেক কম হওয়ায় বহু পরিমাণ চাউল রপ্তানীর জন্য গোপন হুকুম আসিল। এইরূপে বাংলার অনুকূল বাণিজ্য-মান নষ্ট হইল।

দেওয়ানী পাওয়ার পর ক্লাইভ বিভিন্ন সনের সিক্কা টাকার মূল্য ধার্য্য করিলেন। যথা সাতসন সিক্কা ৯৩৵০, ছয়সন সিক্কা ৯২ ৮, আটসন সিক্কা ৯২॥৵০, ইহা হইতে পুরাতন টাকার সনায়েত সিক্কার দাম ধার্য্য হইল ৯০৲ টাকা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সিক্কা টাকায় তৈয়ারী হওয়ার বৎসর, (যাহা দিল্লীর বাদশাহের রাজত্বের বৎসর হিসাবে ধরা হইত) মুদ্রিত থাকিত। সনায়েত অর্থ বহু দিনের যেমন এখনও জরিপী বা সেটেলমেণ্টের খসড়ায় "সনায়েত পতিত" বলিয়া জমির শ্রেণীবিভাগ করা হয়। বাট্টা ধার্য্য করাতে চাষী, শিল্পীরা তাহাদের পণ্যের বা পরিশ্রমের মূল্য বাবদ কম মানের টাকা পাইত, কিন্তু জমিদারকে খাজনা দিবার সময় এই সব বাট্টার হারে বেশী পরিমাণ কম মূল্যের টাকা দিতে হইত। এইরূপে তাহারা অর্থহীন হইয়া ক্রয়শক্তিহীন হইল। কোম্পানী দেখিল দেশে রূপার অভাব, এবার ধনীদের সঞ্চিত স্বর্ণের উপর দৃষ্টি পড়িল। ক্লাইভ হাউস অফ কমন্সে জবানবন্দীতে বলিয়াছিলেন, "জন-বহুলতায়, বিস্তৃতিতে এবং অর্থসমৃদ্ধিতে লণ্ডন ও মুর্শিদাবাদ শহর সমতুল। কিন্তু শেষোক্ত নগরে কোন কোন ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব এরূপ ধন আছে যাহার তুল্য একজন ধনশালী ব্যক্তি লণ্ডনে নাই।"

ঐ সব ধন সাধারণতঃ সোনায় রূপান্তরিত হইয়া থাকিত। আমি আমার এক বিশিষ্ট বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি যে তিনি কোন এক সুবর্ণবণিকের বাড়ীর লোহার সিন্দুকভর্ত্তি একতাল সোনা দেখিয়াছিলেন, তাহা-নাকি পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত, দারুণ অর্থসঙ্কটে পড়িয়াও তাহা কেহ ব্যয় করিতে সাহস করে নাই।

অবশেষে বঙ্কের ধনের উপর ইংরেজের দৃষ্টি পড়িল। কোম্পানী মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতার টাঁকশালে মোহর তৈয়ারের আদেশ দিলেন। পূর্ব্বে দিল্লীর বাদশাহের টাঁকশাল ব্যতীত অন্য কোন স্থানে মোহর তৈয়ার হইত না। মোহরের মান ধার্য্য করা হইল সিক্কার ষোল টাকা। সুপ্রীম কোর্টে ব্যারিষ্টার এটর্নীদের ফিস দেওয়া হইত বা ফিস বাবদ আদালতের খরচ ডিক্রী দেওয়া হইত স্বর্ণ-মোহরে। এখনও তাহা হাইকোর্টে চলতি আছে। সমসাময়িক চিঠিপত্রে দেখা যায় যে, এই সময় আট সিক্কা টাকা এক পাউণ্ড বা সভারেণের তুল্য ছিল।

মোটামুটি হিসাবে এক তোলা সোনার দাম হয় এগার সিক্কা টাকা। আমরা দেখিয়াছি, ১৭৫৯ সনে এক তোলা সোনার দাম ছিল সাত টাকা, মোহর তৈয়ার করিয়া সোনার দাম রেগুলেশন বলে ষোল টাকা সিক্কা করা হইল। রেগুলেশনে বলা হইল- যদি কেহ মোহর লইতে অস্বীকার করে তবে সে দণ্ডনীয় হইবে। ইহাতে 'ডিভ্যালুয়েশনে'র কোন সম্পর্ক আছে কিনা তাহা অর্থনীতিবিশারদ-গণ বলিতে পারেন। ধনীরা সিক্কা টাকার অভাবে সঞ্চিত স্বর্ণ বাহির করিয়া আপাততঃ লাভবান হইলেন, যেমন গত যুদ্ধের সময় অভাবে বা লাভের আশায় সঞ্চিত স্বর্ণের বেশী দাম দেখিয়া অনেকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু সিক্কা টাকার মান কমিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের ব্যবহার্য্য জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া গেল, কড়ি দিয়া আর বাজার করা চলে না। সেই জন্য তামার পয়সা, রূপার আধুলি সিকি, দুয়ানী টাঁকশালে তৈয়ার হইতে আরম্ভ হইল।

কোম্পানী প্রথমতঃ ১৭৭৮ সনে কর্জ্জ লইবার জন্য বণ্ড বাহির করিলেন প্রথমে ৪৫ লক্ষ টাকার। পরে এই বণ্ড চলিতে লাগিল মেয়াদী হুণ্ডি এখনকার কালের ট্রেজারী বিলের ন্যায় ছিল।

বাংলার কারবারে জগৎশেঠ সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। ফতে-চাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার নামেই কারবার চলিত। জগৎশেঠেরা নবাবের কোষাধ্যক্ষ ও মহাজন ছিলেন। ফতেচাঁদের পৌত্র জগৎ-শেঠ স্বরূপচাঁদ কুসুম-ই-নেজাবতের খাজাঞ্চী ছিলেন। তাঁহাদের কুঠী প্রধান প্রধান স্থানে, বিশেষতঃ খাজনা-আদায়-কেন্দ্রে ও বন্দরে ছিল। রাজস্ব বিষয়ে ইঁহারা বর্ত্তমান ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের ন্যায় কার্য্য করিতেন। সে সব স্থান হইতে হুণ্ডী করিয়া মুর্শিদাবাদ খালসায় রাজস্ব পাঠানো হইত। আবার দিল্লীর সম্রাটের প্রাপ্যও তাঁহারা হুণ্ডী করিয়া দিল্লীতে পাঠাইতেন। মারাঠাদের লুঠের পরও তাঁহারা এক কোটি টাকার একখানা দর্শনী হুণ্ডী কাটিতে দ্বিধা করিতেন না। তাঁহাদের কেবল হুণ্ডীর কারবার ছিল না, জমিদার-গণ রাজস্ব দিতে অক্ষম হইলে তাঁহারা কর্জ্জ দিতেন। কোম্পানীও তাঁহাদের উপর হুণ্ডী করিয়া তাঁহাদের বাণিজ্যকেন্দ্রে টাকা পাঠাইতেন। সৈন্য ও কর্ম্মচারীদের বেতন তাঁহাদের উপর বরাত দেওয়া হইত, পরে হিসাবনিকাশ হইত। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন জগৎশেঠের সঙ্গে হিসাবনিকাশ হয় তখন দেখা যায় যে জগৎ-

শেঠদের ৫১ লক্ষ টাকা পাওনা—তন্মধ্যে ৩০ লক্ষ জমিদারদের বাবদ আর ২১ লক্ষ টাকা সৈন্যদের বেতন বাবদ ইংরেজ ও নবাবের নিকট। আবার নগদ টাকা দিবার জন্য জগৎশেঠের কুঠী হইতে "টিপ" লিখিয়া দেওয়া হইত। ইহা চেকের বা বর্ত্তমান কালের নোটের ন্যায়। ইহা দিলে যে-কোন মহাজন টাকা দিয়া দিতেন—জগৎশেঠের সুনাম ও প্রতিপত্তি এত বিস্তৃত ছিল। দিনাজপুর, রঙ্গপুর, ঢাকা, পূর্ণিয়া, রাজসাহী ইত্যাদি সর্ব্বস্থানেই ইঁহাদের কুঠী ছিল। ইঁহারা ব্যতীত গণেশ দাস, রাজা হুজুরীমল, রাজা দয়ালচাঁদ ইত্যাদির কুঠী হইতেও হুণ্ডী হইত। কলিকাতায় খালসা উঠিয়া আসিলে খালসার খাজাঞ্চীর কাজ রাজা হুজুরীমল, রাজা দয়ালচাঁদের কুঠীতে হইত। ইংরেজ ইঁহাদিগকে জেনারেল ব্যাঙ্কার বলিত। বস্তুতঃ হুজুরীমল হেষ্টিংসের সঙ্গে অংশীদাররূপে ব্যবসা করিতেন। ঢাকার ফতেচাঁদের পৌত্র মহাতাপ রায়ের সঙ্গে ১৭৫২ সনে কোম্পানী কারবার করিতেন দেখা যায়। এই মহাতাপ রায়ই সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। চট্টগ্রামের রাজস্ব প্রথমতঃ বরাবর মুর্শিদাবাদে পাঠানো হইত। কিন্তু তাহার মধ্যে বহু টাকা খারাপ ও কম ওজনের বাহির হওয়ায় খালসার হুকুম হইল যে, চট্টগ্রাম হইতে রাজস্ব ঢাকায় পাঠাইয়া সেখান হইতে হুণ্ডী করিয়া মুর্শিদাবাদে পাঠাইতে হইবে। চট্টগ্রাম হইতে পরবর্ত্তী কালে রূপচাঁদ রঘুনাথ দাসের কুঠীর মারফত টাকা কলিকাতার খালসায় পাঠানো হইত। রূপচাঁদের পিতা নিত্যানন্দ ঢাকায় খাজাঞ্চী ছিলেন। লবণ-ব্যবসার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারা চট্টগ্রাম ও কলিকাতায় কুঠী স্থাপন করেন। হিজলী আসিয়াও লবণের কারবার করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জগৎশেঠের কুঠীর কাজ অনেকটা বর্ত্তমান কালের ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের ন্যায় ছিল। কোম্পানীও তাহাদের উপর হুণ্ডী কাটিতেন, যেমন কলিকাতায় টাকা দাখিল করিলে বিনা হুণ্ডীয়ানে রঙ্গপুরের কালেক্টরের উপর হুণ্ডী কাটিতেন। আবার কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারীরা যে কারবার করিতেন তাহার মূলধন জোগাইত দেশীয় ধনীরা। যেমন হেষ্টিংসের বেনিয়ান ছিলেন কান্তবাবু। সকলেরই দেশী বেনিয়ান ছিল। বেনিয়ানরা কারবার করিয়া কোম্পানীর দৌলতে প্রসিদ্ধ ধনী হইয়াছিলেন। রিক্ত হস্তে কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারীরা এদেশে আসিতেন, বেনিয়ান ছাড়া কারবারের মূলধন যোগাইবে কে? জগৎশেঠের কুঠীর প্রতিপত্তি ও লাভ খর্ব্ব করার জন্য দেওয়ানীপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই কোম্পানী একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। ইহার নাম হইল জেনারেল ব্যাঙ্ক—ইহার অংশীদার কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ। এই ব্যাঙ্কের শাখা জেলায় জেলায় স্থাপন করা হয়। এই ব্যাঙ্কে কোম্পানীর আদায়ী রাজস্ব জমা হইত। এই ব্যাঙ্ককে টাঁকশালে টাকা তৈয়ার করার, হুণ্ডি কাটার ইত্যাদি সুবিধা জগৎশেঠের ন্যায় দেওয়া হইল। কিন্তু ইহার অতিরিক্ত মূলধন কোথায়? মূলধন একমাত্র আদায়ী রাজস্ব, ইহা জমিদারদের কিস্তির টাকা চালাইয়া লইতে পারিত না। ফলে জমিদারেরা অন্য কুঠীতে বন্দোবস্ত করিতেন। কোন কোন কালেক্টর অন্য কুঠির মারফত খালসাতে হুণ্ডী কাটিতেন। কড়া হুকুম আসিল, অন্য কুঠীর হুণ্ডী গ্রাহ্য হইবে না। কিন্তু এত করিয়াও ব্যাঙ্ক টিকিল না। ১৭৭৬ সনে ব্যাঙ্ক বন্ধ হইল। জমিদারদের মাসিক কিস্তিতে রাজস্ব দিতে হইত, ইহা কেহই সংগ্রহ করিতে পারিতেন না, কারণ প্রজাদের নিকট হইতে শস্যের মরশুম অনুসারে টাকা আদায় হইত। সেইজন্য এই সব কুঠীর এত বিস্তৃত ব্যবসায় ছিল। যে সব স্থানে এ সমুদয় কুঠী ছিল না, সে সকল স্থানে জমিদারদের অন্য ব্যবস্থা করিতে হইত। অনেক জমিদার এই জন্য মুর্শিদাবাদের খালসায় রাজস্ব দিতেন, যদিও জমিদারী সুদূরে অবস্থিত। ময়মনসিংহ ও ঢাকায় রাজস্বদের তালুক আছে, যাহা মুর্শিদাবাদ কালেক্টারীর তৌজীভুক্ত। ময়মনসিংহ জেলার বিশেষতঃ আলাপসিংহ, ময়মনসিংহ ও সেরপুর পরগণার জমিদারগণ সন্ন্যাসীদের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ লইতেন। ইহারা গৃহী-সন্ন্যাসী যেমন জাত বৈরাগী। ইহারা 'কাবুলীদের' ন্যায় জোর জুলুম করিয়া প্রাপ্য টাকা আদায় করিত। অনেক সময় খাতক জমিদারকে আটকাইয়া রাখিত, অথবা পুত্রকে ধরিয়া লইয়া যাইয়া পিতৃঋণের জামিনস্বরূপ আটকাইয়া রাখিত। কোন কোন সময় দলবলে জমিদারদের কাছারী চড়াও করিত। অনেক স্থলে জমিদারের কতক মহালের খাজনা আদায়ের ভার লইয়া প্রাপ্য আদায় করিয়া লইত। বকসারী বরকন্দাজেরাও কুসীদজীবী হইয়াছিল।

রঙ্গপুরের কালেক্টরীর পোদ্দারেরাও এক অভিনব উপায়ে মহাজনের কাজ করিত। এই প্রথা নাকি স্মরণাতীত কাল হইতে সেখানে প্রচলিত ছিল। কোন জমিদার রাজস্ব সম্পূর্ণ না দিতে পারিলে ইহাদের শরণাপন্ন হইতেন। ইহারা কতক টাকা পাইয়া বাকী টাকা সুদসুদ্ধ আদায়ের জন্য জমিদারের নামে একটি 'পাট' তৈয়ার করিত। তার পর কয়েকটা থলিয়ায় কিছু কিছু টাকা ভরিয়া থলিয়ার মুখ শীলমোহর করিয়া দিয়া সম্পূর্ণ দেয় টাকায় একটা লেবেল লাগাইয়া রাখিত যেন সব টাকা দেওয়া হইয়া গিয়াছে। সেই অনুসারে জমিদারের বাকীয়াত রাজস্ব সব আদায় হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইত। তাহার পর জমিদার পাঁটের টাকা সুদসহ পরিশোধ করিলে সে টাকা ট্রেজারীতে রাখিয়া শীলমোহর করা থলিয়া বাহির করিয়া ফেলিত। শীলমোহর করা বলিয়া কাহারও খুলিয়া দেখিবার নিয়ম ছিল না। পরবর্ত্তীকালে যখন এই প্রথা তুলিয়া দিয়া হিসাবনিকাশ করা হয়, তখন হিসাবনিকাশে বহু টাকার ঘাটতি দেখা গেল। কারণ শীলমোহর করা থলিয়ায় যে কেবল কম টাকা পাওয়া গেল তাহা নয়, যে টাকা পাওয়া গেল তাহার মধ্যে অধিকাংশই কম মূল্যের নারায়ণী বা অনেক জাল টাকা। পোদ্দারদের মাতব্বরীর উপরেই বিনা মূলধনে এই লগ্নী কারবার চলিত। কয়েকজন খাজাঞ্চীকে জেলে দিয়া ইহার যবনিকাপাত হইল।

রৌপ্যমুদ্রা এখন উঠিয়া গিয়াছে। অতএব তৎকালীন প্রচলিত মুদ্রার সহিত বর্ত্তমান মুদ্রার তুলনা করা এস্থলে অবান্তর।

গুপ্তিপাড়া

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

গুপ্তিপাড়া হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম ; ইহা কলিকাতা হইতে সাতচল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত। এই গ্রাম একদা সংস্কৃত-শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতেও এই স্থানে ন্যায়শাস্ত্র-শিক্ষার পনরটি টোল ছিল বলিয়া জানা যায়।

ভাগীরথী গুপ্তিপাড়ার উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা বলয়াকারে বেষ্টন করিয়া আছে। 'মহাপুরুষচরিতম' নামক গ্রন্থে এই গ্রাম সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কথাগুলি লিখিত আছে :

> তস্মিন্ হুগলি প্রথিত বিষয়ে গুপ্তপল্লীতি নাম
> পল্লী রম্যা কুসুমদশনা নূত্নদূর্ব্বাম্বরী চ।
> গঙ্গা যস্যা রজতসলিলা হার-শোভাং বিধত্তে
> ত্যক্ত্বা বৃন্দাবিপিন বসতিং বর্ত্ততে যত্র কৃষ্ণঃ।

গুপ্তিপাড়ার রথ

অর্থাৎ, হুগলীতে গুপ্তপল্লী নামক পল্লী আছে ; ইহা সুন্দরী কুসুমদশনা ও নূতন দূর্ব্বাবসনা। রজত-সলিলা ভাগীরথী তাহার হারের ন্যায় বর্ত্তমান। বৃন্দাবনবাস পরিত্যাগ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে বসবাস করিতেছেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে গুপ্তিপাড়ার ব্যবধান মাত্র পনর মাইল ; মধ্যে দেবালয়-শোভিত কালনা নামক প্রসিদ্ধ স্থানটি অবস্থিত। কালনা হইতে পূর্ব্বদিকে দেখিলে গুপ্তিপাড়ার শ্যামল শষ্প-শোভিত রমণীয় ভূমি ভূ-স্বর্গ বলিয়া মনে হয়। এই নয়নাভিরাম দৃশ্য দর্শকের হৃদয় উদ্বেলিত করে। ইহার উত্তরে গঙ্গার অপর পারে শান্তিপুর অবস্থিত।

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ট্রেভোরিনামের মানচিত্রে গুপ্তিপাড়া গঙ্গার পূর্ব্বদিকে ছিল বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কোন সময়ে এই স্থানটিও নবদ্বীপের ন্যায় গঙ্গার পশ্চিম দিকে আসিয়াছে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার চণ্ডীকাব্যেও এই গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন :

> বাহ বাহ বলা ঘন ঘন পড়ে গেল সাড়া।
> বামভাগে শান্তিপুর ডাহিনে গুপ্তিপাড়া॥

দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-রচিত 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' কাব্যের মধ্যে গুপ্তিপাড়া সম্বন্ধে এই পঙক্তিগুলি দেখিতে পাওয়া যায় :

রামচন্দ্রের মন্দির, গুপ্তিপাড়া

> অম্বিকা পশ্চিম পাড়ে শান্তিপুর পূর্ব্ব ধারে
> রাখিল দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া ;
> উল্লাসে উলয়ে গতি বটমূলে ভগবতী
> চণ্ডিকা নহেন যথা ছাড়া।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের জন্য এই স্থান পূর্ব্বে প্রখ্যাত ছিল। এখানকার চোর-ডাকাত ও বাঁদরের উপদ্রবের কথাও চারিদিকে প্রচারিত ছিল। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য দর্শন-শাস্ত্রের উচ্চাঙ্গের পুস্তক "বিদ্যোন্মাদতরঙ্গিণী" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। পূর্ব্বে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সংস্কৃত শিক্ষার্থিগণ গুপ্তিপাড়ার চতুষ্পাঠীগুলিতে অধ্যয়ন করিতে আসিত এবং দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় তখন এই স্থানের যথেষ্ট সুনাম ছিল।

"শ্যামাকল্পলতা"-প্রণেতা শোভাকরবংশীয় সিদ্ধ মহাপুরুষ ভক্ত-কবি মধুরেশ গুপ্তিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পণ্ডিতসভার শিরোমণি গুপ্তিপাড়ানিবাসী শ্রুতিধর পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের প্রতিভা ও বাকপটুতা তৎকালে বঙ্গসমাজে বিশেষভাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তাঁহার বাকপটুতার নিদর্শন-স্বরূপ একটি ঘটনা ২৮শে অগ্রহায়ণ ১২২৫ সালের 'সমাচার দর্পণ' পত্র হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।—গুপ্তিপাড়ানিবাসী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মোং কৃষ্ণনগরে রাজবাটীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন তথাকার এই ধারা ছিল যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নিমন্ত্রণে আসিতেন তাহারা গমনকালে নিমন্ত্রণের বিদায়ি টাকা ও গাড় ও শাল প্রভৃতি ও যাইবার কারণ নৌকাও পাইতেন

সেন-বংশের জোড়া শিবমন্দির, গুপ্তিপাড়া

তাহাতে এক সময় বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার বিদায়ি পাইতে বিলম্ব হইলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকটে সঙ্কেত দ্বারা এই কহিয়া পাঠাইলেন যে মহারাজ আমি বিদায়ি পাইলেও নাই না পাইলেও নাই। মহারাজও তাহার সদুত্তর করিলেন যে ভট্টাচার্য্যকে কহ যে বিদায়ি না দেওয়া যাইতেছে। ইহাতে ঐ বিদ্যালঙ্কার রাজার উপযুক্ত উত্তর শুনিয়া ও আপনার ইষ্টসিদ্ধি হওয়াতে পরম হৃষ্ট হইলেন ও ক্ষণেক পরে তাহার বিদায়ি টাকা, ঘড়া ও শাল প্রভৃতি ও আরোহণার্থ নৌকা পাইয়া আপন বাটীতে আইলেন।"

গুপ্তিপাড়ার টোলগুলি সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের *Calcutta Monthly Register* নামক কাগজে প্রকাশিত হয়। এই বিবরণী হইতে সে যুগে নদীয়া, শান্তিপুর ও গুপ্তিপাড়া কিরূপ সংস্কৃতশিক্ষার কেন্দ্র ছিল তাহা জানা যায়। সেযুগে এক জন সাহেব নদীয়ার বিশ্ববিদ্যালয়কে "হিন্দু অক্সফোর্ড" বলিয়া অভিহিত করেন।

গুপ্তিপাড়ার সাধারণ ব্যক্তিও তৎকালে পণ্ডিতগণের সান্নিধ্যে থাকিয়া সঙ্গগুণে বহু শাস্ত্রীয় সমস্যার সমাধান করিতে পারিত। আজও গুপ্তিপাড়ার বালকগণ খেলার ছলে যে সকল প্রবাদবাক্য উচ্চারণ করে তাহা এইরূপ :

১। "গুপ্তিপাড়ার মাটির গুণে
দেবের ভাষা মানুষ জানে।"

২। "বিসর্গ ও অনুস্বার মুখে অবিরত
আর্কফলার লম্বা-বোঁটা নেড়া মাথা যত"।

বঙ্গদেশে আর একটি প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে ; তাহা এই "উলোর পাগল, গুপ্তিপাড়ার বাঁদর ও হালিশহরের ভেঁদড়"।

ভোলানাথ চন্দ্র তাঁহার *Travels of a Hindoo* নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্তিপাড়া হইতে বানর-

গুপ্তিপাড়ায় শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরে ইটের কারুকার্য্য
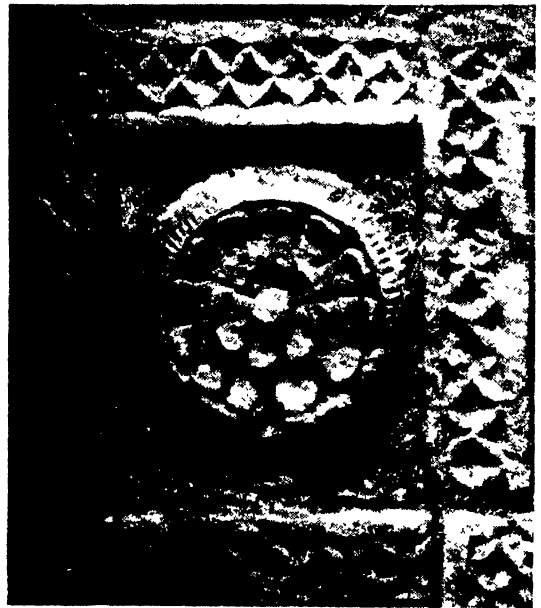
বানরী আনাইয়া অর্দ্ধ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তাহাদের বিবাহ দেন এবং তদুপলক্ষে বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আনাইয়া তাঁহাদিগকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করেন।

গুপ্তিপাড়ায় বহু দেবালয় আছে, তন্মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির ও শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত 'জোড়া-বাংলা' বা নিতাই-গৌরের মন্দির এবং সেন-বংশের জোড়া শিবমন্দিরও বহু প্রাচীন।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির 'গুপ্তিপাড়ার মঠ' বলিয়া খ্যাত। সপ্তদশ শতাব্দীতে শ্রীমৎ সত্যদেব সরস্বতী শান্তিপুরের এক ভক্ত গৃহস্থের বাড়ী হইতে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রকে আনিয়া গুপ্তিপাড়ার নিকট কৃষ্ণবাটী নামক বিজন অরণ্যমধ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার শিষ্য রাজা বিশ্বেশ্বর রায় ঠাকুরের জন্য যাবতীয় সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া যান। যে স্থানটিতে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বিরাজ করেন—স্বভাব-সৌন্দর্য্যে

সেই স্থানটিকে বৃন্দাবন বলিয়া মনে হয় এবং এজন্ত উহা "গুপ্ত-বৃন্দাবন" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই মন্দিরের ছাদ চালা-ঘরের ধরণে নির্ম্মিত—সেই চালার উপরে আবার একটি ছোট থাক আছে; তদুপরি তিনটি কলসী স্থাপিত। মন্দিরের অত্যুচ্চ চূড়াগুলি গঙ্গার অপর পারে অবস্থিত শান্তিপুর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন মন্দির ভগ্ন হইয়া গেলে বাগবাজারনিবাসী গঙ্গানারায়ণ সরকার ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। শ্রীরাধিকার মূর্ত্তি পরে মোহান্ত রামানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সম্বন্ধে 'পাট-পর্য্যটনে' নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত আছে :

বেলুনে অনন্তপুরী মহিমা প্রচুর।
বগনপাড়াবাসী শ্রী রামাঞি ঠাকুর॥
গোপত্তিপাড়াতে সত্যানন্দ* সরস্বতী।
বৃন্দাবনচন্দ্র দেবেন করিয়া পিরীতি॥

গুপ্তিপাড়ার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির। এইরূপ কারুকার্য্যখচিত মন্দির বঙ্গদেশে খুব অল্পই আছে। দিনাজপুরের কান্তজীউর মন্দির ও বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেবের মন্দিরের ন্যায় এই মন্দিরের গড়ন। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের উত্তরে গঙ্গার দিকে এই মন্দির অবস্থিত এবং মন্দিরের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী লক্ষ্মণ ও মহাবীরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৮২২ সনে এই মন্দির নির্ম্মিত হয়।

এই মন্দির লাল ইট দিয়া নির্ম্মিত এবং মন্দিরগাত্রে কারুকার্য্যখচিত ইটের মধ্যে বহু চিত্রাদি গ্রথিত আছে। বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ মূর্ত্তির মধ্যে রামায়ণ, মহাভারতের বিবিধ বিষয় ও মহাপ্রভুর জীবনের ঘটনাবলীর দৃশ্যগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শুনা যায়, সেওড়াফুলির রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরটি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের দক্ষিণ দিকে আর একটি জোড়ামন্দির আছে। ইহা 'জোড়-বাংলা' বলিয়া কথিত। ইহার মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র ভারতে একমাত্র গুপ্তিপাড়া ব্যতীত দণ্ডীস্বামীদিগের সেবায় মহাপ্রভুর পূজা আর কোথাও হয় না। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হয়।

এতদ্ব্যতীত সেন-পরিবারের জোড়াশিবমন্দিরও গুপ্তিপাড়ার দেবালয়গুলির মধ্যে অন্যতম। এই মন্দির উনবিংশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছে। রামধন সেন ইহার নির্ম্মাতা।

বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথদেবের রথযাত্রা গুপ্তিপাড়ার অন্যতম প্রধান পর্ব্ব; এইরূপ অত্যুচ্চ রথ বাংলাদেশে আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। একমাত্র পুরী ব্যতীত আর কোন রথ নাকি এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে না। রথযাত্রা উপলক্ষে এই স্থানে এক বৃহৎ মেলা হয়। তখন গুপ্তিপাড়া একটি ক্ষুদ্র শহরে পরিণত হয়। রেভারেণ্ড লং 'কলিকাতা রিভিয়ু' পত্রে এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন যে, ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তিপাড়ার রথযাত্রা উপলক্ষে লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয় এবং উক্ত স্থানের মেলা দেখিতে যাইবার সময় একখানি নৌকা উল্টাইয়া যাওয়ায় পঁয়তাল্লিশ জন লোকের জীবননাশ হয়।
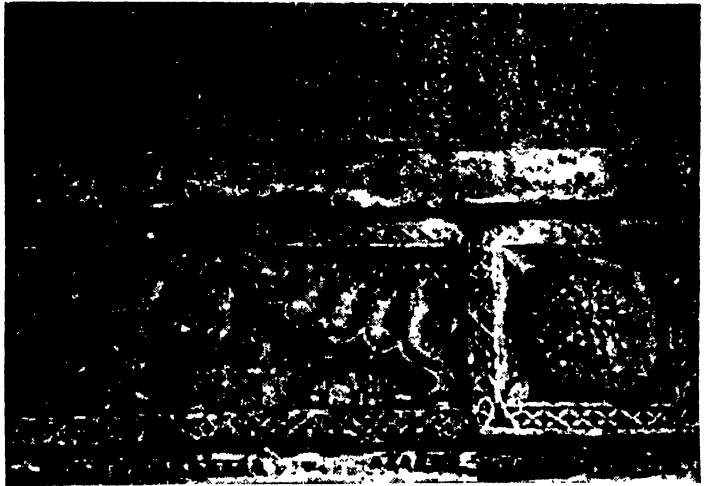
সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থে এই স্থানে "শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দির" নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৩৫৭ সালের ৫ই মাঘ এই মন্দির-প্রতিষ্ঠা হয় এবং ১৩৫৭ সালের ৬ই ফাল্গুন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। এই মন্দিরে প্রত্যহ হরিনামসঙ্কীর্ত্তন, শাস্ত্রানুশীলন, নীতিশিক্ষা, চতুষ্পাঠী প্রভৃতি স্বামীজীর প্রিয় বিষয়সমূহের ধারা বজায় রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যে স্বামীজীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ও মন্দিরগাত্রে প্রস্তরফলক গ্রথিত আছে।

শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরে কারুকার্য্যখচিত ইটের উপর রামায়ণের একটি দৃশ্য

অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তা ও প্রচারক শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ স্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থে হরিমন্দির প্রতিষ্ঠা বিশেষ আনন্দের বিষয়। উক্ত হরিমন্দিরে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও পরবর্তীকালে সন্ন্যাসীসতীর্থ স্বামী পূর্ণানন্দ-স্বরূপ মহাশয়ের মূর্ত্তি তাঁহার অগ্রজের পার্শ্বে রক্ষিত হইলে অধিকতর আনন্দের বিষয় হইত। এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চুয়াল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; পরে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীকে সর্ব্বতোভাবে সকল কার্য্যে সহায়তা

* বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতার নাম কোথাও সত্যানন্দ, কোথাও বা সত্যদেব বলিয়া উল্লিখিত আছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী প্রতিষ্ঠাতার নাম সত্যদেব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা উক্ত নামটি গ্রহণ করিয়াছি।

করেন এবং বেদান্তবিজ্ঞান, দেবী-জীবন, জীবনযজ্ঞ, সাধনশিক্ষা সোপান, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নীলাচল লীলা, উপনিষদ পঞ্চক প্রভৃতি বহু ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে।
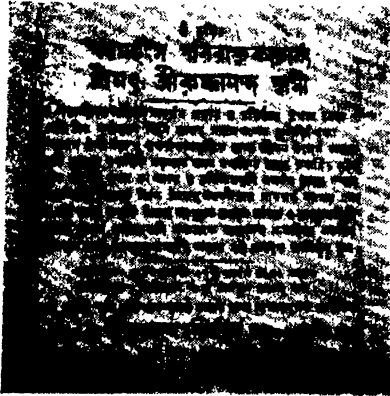
শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দিরে গ্রথিত প্রস্তর ফলক

গুপ্তিপাড়ায় বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে পণ্ডিত শোভাকর, পণ্ডিত দেবীবর, পণ্ডিত বাণেশ্বর, পণ্ডিত রামধন বিদ্যালঙ্কার, পণ্ডিত মধুরেশ প্রভৃতির নামও স্মরণীয়। সেকালে এবং একালেও বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে নবাব সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি মোহনলাল, সুবিখ্যাত মন্ত্রী রাজা মাণিকচন্দ্র, রাজা বিশ্বেশ্বর

শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দিরের স্বামীজীর প্রস্তরমূর্ত্তি

রায়, প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা ভোলা ময়রা, ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, মহিলা-দার্শনিক ও বিদুষী কুলকুমারী গুপ্তা, সতীশচন্দ্র সেন ও তদীয় পুত্র সুশীলচন্দ্র সেন, প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

গোপাল ভাঁড় ও আশানন্দ ঢেঁকি এই স্থানে বিবাহ করেন বলিয়া প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই স্থানের গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণি দেবীকে এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের কন্যা যোগমায়া দেবীকে বিবাহ করেন।

'তীর্থমঙ্গলে' বিজয়রাম সেন লিখিয়াছেন :

"গুপ্তিপাড়ায় ব্রাহ্মণের কি কহিব নীত।
মহাতেজ ধরে তারা বিচারে পণ্ডিত।"

বর্ত্তমানে গুপ্তিপাড়ার জীবিত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রেমানন্দ কুষ্ঠ-চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রেভারেণ্ড প্রেমানন্দ অনাথনাথ সেন এবং ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদারের নামও উল্লেখযোগ্য।

বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির, গুপ্তিপাড়া

সার্ব্বজনীন পূজা ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তিপাড়ায় প্রথম আরম্ভ হয় এবং এই স্থান হইতে ইহা ক্রমশঃ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। (*The Friend of India*, May 1820.)

গুপ্তিপাড়া সম্বন্ধে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারির তালিকায় লিখিত বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

Guptopara—A large village in thana Balagar of the Hooghly subdivision, in the extreme north-east of the district, situated about 1½ miles west of the right bank of the Hooghly. The houses extend along a wide road for about a mile and half, and include some of modern fine buildings belonging to the Sen family.

Guptipara was a well-known place in the eighteenth century. "Guptipara" is shown in the map of Stavorinus (circa 1770 A.D.), but on the left bank of the river.

This, if correct, indicates an older site; for in the Bengali poems of the eighteenth century, the village is distinctly mentioned as being on the right bank.

The village is a mile to the east of Guptipara Station which is 22 miles from Bandel. The chief object of interest is a group of four temples at the eastern end of the village. Ranged round a quadrangle and enclosed within a rather high wall are four shrines known as the temples of Chaitanya Dev, Brindabanchandra, Ramendra and Krishnachandra, all in the Bengal thatched hut model; the whole group being often called Brindabanchandra's Math.

(a) The oldest is that of Chaitanya Dev which faces east and has a door on the west; there three cusped arches on the east, but they have been walled up, leaving a small door. Reputed, according to local records, to have been built by Bisweswar Rai in the reign of Akbar, and therefore, apparently in the beginning of the 17th century. Its roof is of Jor-Bangla type with two iron rods to represent spires. It contains the images of Chaitanya and Nityananda.

(b) The shrine of Brindabanchandra, the biggest of the four, is a brick temple of the double thatch roof model. The entrance door and the inside of the sanctum are painted with figures of Krishna, Radha and Gopis, of trees, foliage, etc. In the sanctum are Wooden images of Krishna, Radha, Garud Jagannath and Balaram.

(c) The temple of Ramchandra is made of red-coloured brick and has a curved roof; over the roof is a towerlike structure, to which access is had by a staircase. The front walls of the verandah and also, to some extent, of the sanctum, is covered with brick panels finely curved in the best style of Bengali art, with figures of gods and goddesses and scenes from epics. The temple is said to have been built by Harischandra Rai of Sheoraphuli at the end of the 18th century. It contains painted wooden images of Ramchandra, Lakshman (to the right) and Sita (to the left).

(d) Just opposite the Ramchandra temple, on the other side of the quadrangle, stands the fourth temple of Krishnachandra, with small images of Krishna and Radha, said to have been built by Dandi Madhusudan in the time of Nawab Ali Vardi Khan.*

জোড়-বাংলা (নিতাই-গৌর মন্দির)

গুপ্তিপাড়ায় বহু প্রাসাদ আছে, তন্মধ্যে সুশীলচন্দ্র সেন ও 'চার্টার্ড ব্যাঙ্কের' কেশিয়ার স্বর্গীয় শ্যামাচরণ সেনের সুরম্য ভবন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রামে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় ও গ্রন্থাগার আছে। লোকসংখ্যা ১৮৫২ জন এবং শতকরা ২৬ জন লিখনপঠনক্ষম।

* Census 1951. West Bengal: Hooghly (District Handbooks) by A Mitra.

বাস্তু ও উদ্বাস্তু

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

শেষবেলায় নিজেদের বাড়ী এসে পৌঁছলাম। আমাদের তিন শরিকের বাড়ী। বছরত্রিনেক আগে মোট পঁচিশ-ত্রিশ জন লোক বাস করতাম এ বাড়ীতে। আজ একমাত্র নীরদ কাকা আর তাঁর এক বিধবা মেয়ে এ বাড়ীতে বাস করেন। সদর আঙিনা রীতিমত জঙ্গল হয়ে উঠেছে—বৈঠকখানার সিঁড়ির ফাটলের ভিতর দিয়ে কয়েকটি ভাঁটফুলের গাছ দিব্যি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আঙিনাময় হাতখানেক করে উলুখড় গজিয়ে উঠে একেবারে দুষ্প্রবেশ্য করে রেখেছে। অগত্যা সদর রাস্তা ছেড়ে অন্দরের দিক দিয়ে বাড়ীর ভেতরে ঢুকলাম। নীরদ কাকা এক পাশে এক টুকরো জায়গা সাফ করে একখানা ঘরে কোনক্রমে বাস করছেন। আমার সঙ্গে দেখা হতেই তিনি যেন হাতে স্বর্গ পেলেন—বললেন, শৈলেন এসেছিস, বেশ করেছিস। তার পর ঘণ্টাখানেক ধরে কত কথা! কত আন্তরিকতার সুর তাঁর কথায়। নীরদ কাকার এ রূপটি কিন্তু জীবনে কোন দিন লক্ষ্য করি নি। কথা তিনি কম বলতেন—কারও সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতেন না। বিষয়-সম্পত্তির সামান্য সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত স্বার্থপরের মত ব্যবহার করতেন যে, একবার অতিষ্ঠ হয়ে আমরা পৈতৃক ভিটা থেকে কিছুদূরে গিয়ে নূতন বাড়ী করব বলে মনে করেছিলাম। সেই নীরদ কাকা আজ এত বাচাল হলেন কেমন করে? শেষে বললেন, শৈলেন, তোরা আবার ফিরে আয়—দেশে রোজগারও হবে এখন প্রচুর—আশে-পাশের কোন গ্রামেই তো আর ডাক্তার নেই। তুই এলে আমাদের কত বল-ভরসা বল তো?

যে কয়দিন এখানে থাকি বাবার দোতলা টিনের ঘরখানিতেই থাকব স্থির করলাম। দুই বৎসর পরে প্রথম গিয়ে আমি ঘরের তালা খুললাম। একে একে সমস্তগুলো জানালা খুলে দিয়ে ঘরখানার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালাম। চেয়ে দেখি বাবার "অয়েল পেন্টিং" ছবিখানা ঠিক তেমনিই টাঙানো আছে। বাবার ব্যবহারের কোন জিনিষপত্র কোনদিন মা এ ঘর থেকে সরাতে দেন নি। কত সাধের ঘরখানি বাবার! ভাল মিস্ত্রী দিয়ে নিজের তত্ত্বাবধানে ঘরখানি শেষ বয়সে তৈরি করেছিলেন। বাড়ী ছেড়ে যাবার সময় ছবিখানা পেড়ে আনতে গিয়েছিলাম। মা নিষেধ করে বলেছিলেন—না শৈলেন ও ছবি তুই আনিস নে—তাঁর ঘরেই তাঁকে থাকতে দে, ভগবান রক্ষে করবেন।

আমি কোন প্রতিবাদ না করে সেদিন ফিরে গিয়েছিলাম। বাবার ছবিখানার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিলাম। দুই চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে জল গড়িয়ে এল। মনে মনে বললাম, মা সেদিন তুমি এখান থেকে বাবার ছবিখানা সরাতে দাও নি, আজ আমি এসেছি বাবার এত সাধের ঘরখানা বিক্রি করে দিতে—আর সেও তোমারই হুকুমে। যে ঘরখানা আমার মার কাছে ছিল পবিত্র তীর্থের মত, সেই ঘর বিক্রি করে দিতে যে কত দুঃখে মা আমাকে আদেশ করেছিলেন—সে ত আমি বুঝি। আমার ছেলে-মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছিলেন—তুই যা শৈলেন, ঘরখানা বিক্রি করে আয়। যে ঘর তুলতে হাজারচারেক টাকা খরচ হয়েছিল, বেচে যদি হাজারখানেক টাকাও পাস ত তাই দিয়ে একটা ডিসপেন্সারী খুলে বসে পড়—এমনি করে গোনা নয়টি টাকা নিয়ে আর পরের দোরে তোকে খেটে মরতে হবে না। আমার বাছারাই যদি এমন করে শুকিয়ে মরে ত ঘর দিয়ে কি হবে। তাঁর ছবিখানা যত্ন করে সঙ্গে আনিস। কথা বলতে বলতে মার দু'চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল। তবু যত দিন পেরেছিলাম, মার কথায় কান দিই নি—অবশেষে আর সহ্য হ'ল না। আগে থাকতেই আমাদের এক বর্দ্ধিষ্ণু মুসলমান প্রজা মফেজ সেখকে পত্র দিয়েছিলাম—সে আমাকে পত্রপাঠ চলে আসতে লিখেছে।

অনেকক্ষণ এমনি চুপ করে বাবার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কাঠের সিঁড়ি ভেঙে দুমদাম্ শব্দ করে কে যেন উপরে উঠে এল—চমক ভেঙে চেয়ে দেখি—রাঙাপিসী। প্রণাম করতেই রাঙাপিসী আমার চিবুক স্পর্শ করে আশীর্ব্বাদ করলেন। আমার গায়ে মাথায় বারে বারে হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন—ইস! একেবারে রোগা হয়ে গিয়েছিস শৈলেন—এমন কাঁচা সোনার রঙ তোর কালি হয়ে গিয়েছে!—আমি এবং আমার আত্মীয়স্বজনের কাছে কিন্তু এ কথাটি আজও ধরা পড়ে নি। শরীর একটু ভাল বা মন্দ হওয়া নিয়ে মাথা ঘামাবার মত মনের অবস্থা আজ আর আমাদের কারও নেই—বেঁচে থাকাটাই হ'ল যথেষ্ট। রাঙাপিসী পুনরায় বলতে লাগলেন—হবে না—সে দেশে আছে কি? না আছে এক ফোঁটা দুধ, না পাওয়া যায় এক টুকরো মাছ। বনমালীর কাছে শুনলাম—তুই এসেছিস, শুনেই একেবারে ছুটে এসেছি। এবার দেশ ঠাণ্ডা হয়েছে—তোরা বাড়ী ফিরে আয় শৈলেন। একা তুই যদি বাড়ী ফিরে আসিস, আমি আর কোন ভয় করি নে।

রাঙাপিসীর কোন কথার জবাব দেওয়া ত দূরের কথা—ক্রমে ক্রমে নিজেকে অত্যন্ত অসহায়—একান্ত অপরাধী মনে করছিলাম। রাঙাপিসী চলে গেলে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে বসে ভাবতে লাগলাম। দেশবিভাগের পূর্ব্বে যে গ্রামে হাজার হাজার হিন্দু ছিল—সেখানে আজ বড়জোর খুঁজলে জন পঞ্চাশেক লোক মিলবে। দিনের বেলায় নিজের নিজের বাড়ী-ঘরে যে যার কাজ কর্ম্ম করে, রাতের বেলায় আমাদের পাড়ায় এসে সকলে রাত্রিবাস করে! মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যে-কয়জনের সঙ্গে দেখা হ'ল—দেখলাম কারও মুখে হাসি নেই—চোখে নেই জ্যোতি—একটা নিষ্প্রাণ দেহ

আর মন যেন কোনক্রমে এরা টেনে বেড়াচ্ছে। রাঙাপিসীর কথায়—'আমার কাঁচা সোনার রঙ কালি হয়ে গিয়েছে' এও যেমন সত্য—আবার যারা গ্রাম ত্যাগ করে নি তাদেরও যে মানসিক মৃত্যু হয়েছে—এও অস্বীকার করবার উপায় নেই। সমস্ত ব্যাপার এমনই একটা উৎকট দৈবাধীন হয়ে পড়েছে যে, এর প্রতিকার হয় ত আজ একান্ত ভাবে মানুষের সামর্থ্যের বাইরে চলে গেছে। যারা গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে তারা এবং যারা গ্রামে রয়েছে—সকলেই যেন একটা আশা-ভরসাহীন নিষ্করুণ দৈবের হাতে আপনাদের সমর্পণ করে দিয়ে চলেছে।

২

রাতে শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ পরে তন্দ্রার ভাব এসেছিল। হঠাৎ জেগে বিছানার উপরে উঠে বসলাম। মনে হ'ল এই মাত্র কে যেন আমার নাম ধরে বারে বারে ডাক দিয়ে গেল। ঘরের জানালা-গুলো সব ছিল খোলা। পূর্ণিমার কাছাকাছি একটা তিথি। জ্যোৎস্নার আলো একেবারে ঘরখানির ভিতরে এসে পড়েছে। কিছুতেই আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। উঠে এসে দোতলার বারান্দায় দাঁড়ালাম। আচ্ছন্নের মত কতক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম—কখন ধীরে ধীরে নীচে নেমে এসেছিলাম কিছুই জানি না। নীচের তলার বৈঠকখানা, চণ্ডীমণ্ডপ, বাইরের আঙিনা, পুকুর-পাড়ের নারকেল আর সুপারির বাগানের ভেতর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ঘাটের কাছে এসে দাঁড়ালাম। প্রত্যেকটি তরুলতা, আম, কাঁঠাল, আর নারকেল গাছ যেন আমাকে একান্ত পরিচিতের মত সস্নেহ আহ্বান জানাচ্ছিল। আমিও যেন এক অব্যক্ত ভাষায় তাদের সঙ্গে ভাববিনিময় করছিলাম—একেবারে সমস্ত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে তাদেরই দলে মিশে গিয়েছিলাম। এবার আমার চমক ভাঙল। তাই ত এতক্ষণ ধরে নিশিতে পাওয়া মানুষের মত এই বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালাম কেমন করে? কিন্তু মন আমার তখন এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরে উঠেছে—দেহ ও মন আমার যেন সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে আকাশ-বাতাসে মিশে আমারই বাড়ীময় সারাটা স্থানে একেবারে ব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকটি তরুলতার পত্রস্পন্দনে যেন নিজের দেহে স্পন্দন অনুভব করছি। সে এক বিচিত্র অনুভূতি, ভাষায় প্রকাশ করি এমন সাধ্য আজ আর নেই। নিস্তব্ধ প্রকৃতির সেই স্নেহময় রূপের মাঝে আমি আমাকে যেন একেবারে নিঃশেষে হারিয়ে ফেলেছিলাম। স্থূল দেহের কোন অনুভূতিই যেন আর ছিল না।

হঠাৎ কিছুদূরে কে যেন চীৎকার করে কেঁদে উঠল—নিস্তব্ধ প্রকৃতির বুকে যেন একটি তীক্ষ্ণধার তীর এসে বিঁধল। আমি আবার আমার নিজের সত্তা ফিরে পেলাম। এত রাত্রে কে কাঁদে? শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে চললাম। সামনের রাস্তাটার চারধারে ঘন আম কাঁঠালের বাগান—সেখানে চাঁদের আলো ভাল করে ঢুকতে পারে নি—সেই পথ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একট উজ্জ্বল আলো এসে আমার মুখের উপরে পড়ল। চেঁচিয়ে উঠলাম—কে?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল—তুমি কে? সন্দেহ হ'ল—তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলাম—'রাঙাপিসী?'

রাঙাপিসী বললেন—কে রে শৈলেন? তুই এত রাত্রে?

আমি বললাম—কিন্তু আপনি এখানে কেন?

ততক্ষণে আরও এগিয়ে রাঙাপিসীর একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। চেয়ে দেখি রাঙাপিসীর ডান হাতে পুরো পাঁচ হাত একখানা লাঠি আর বাঁ হাতে একটি টর্চ।

পুনরায় বললাম—এত রাত্রে আপনি কোথায় যাচ্ছেন পিসীমা।

তিনি বললেন—কোথাও ত যাচ্ছিনে বাবা। রোজ রাত্রেই আমি এমনি করে ঘুরে বেড়াই। জানিস ত রাত্রের বেলা যে যার কাজকর্ম সেরে আমাদের পাড়ায় এসে আশ্রয় নেয়—সকলের যা কিছু সম্বল তাও এখানে এনেই রেখেছে। এদিকে ভীষণ চোরের উপদ্রব—রোজ রাত্রেই মানুষের সাড়া পাই। সারা রাত ত আমার অমনি ঘুম হয় না—তাই পাড়াটার ওপর দিয়ে বারে বারে ঘুরে বেড়াই।

—ভয় করে না আপনার?

—ভয়? না রে শৈলেন ভয় আমার কোন দিন করে না। আমার চোখের সামনে দশ-বারটা মানুষ টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে দেখেছি—কিন্তু তবু আমি গ্রাম ছেড়ে যাই নি। যাবও না, মরি এখানেই মরব। কিন্তু এখানে আজ আর যাদের দেখছিস—তারা সবাই মরে রয়েছে—দেহে প্রাণ আছে কি নেই, এমনই অবস্থা।

গাছের পাতাটি পড়লে ওরা ভয় পায়।

সেই শব্দটি এখনও মাঝে মাঝে ভেসে আসছিল। আমি প্রশ্ন করলাম—ও কাঁদে কে।

পিসীমা ম্লান হেসে বললেন—কাঁদছে না যে গান গাচ্ছে।

—গান?

—"হ্যাঁ রে, ও নটবর মণ্ডল—আয় দেখবি আয়।"—বলে পিসীমা সস্নেহে আমার একখানা হাত নিজের মুঠোর ভেতরে ধরে ধরে অগ্রসর হয়ে চললেন। কিছুদূর গিয়ে দেখি কে একজন নটবর মণ্ডলের আঙিনায় বসে গান গাইছে—

"ডাক পারি গো ডাক পারি
আমাদের চাঁদ গিয়েছে কোন বাড়ী"।

লোকটি নটবর। আমাদের দেখে সে একটুও থামল না—তেমনি চীৎকার করেই চলল। পিসীমা বললেন—'পাগল হয়ে গিয়েছে। দাঙ্গার সময় ওর একমাত্র নাতিটিকে ও হারিয়ে ফেলেছে। রোজ রাত্রেই এমনি চীৎকার করে।" আমি বললাম—"গান কোথায় পিসীমা—ও যে কাঁদছে।" পিসীমা জবাব দিলেন না—চেয়ে দেখি দু'চোখ বেয়ে তাঁর জল গড়িয়ে পড়ছে—তিনি কাঁদছেন। ফেরবার পথে পিসীমা একবার বলে উঠলেন—আমরা আর জন্মে সবাই

মিলে এমন কি মহাপাপ করেছিলাম শৈলেন, যার ফল এমনি করেই ভুগতে হচ্ছে।" নিজের ঘরে ফিরে এসে সারাটা রাত্রি ধরে শুধু রাঙাপিসীমার কথাই ভাবছিলাম। মানুষ চিনতে পারা কত শক্ত। এককালে এই রাঙাপিসীকে আমরা দূরে দূরে রাখতাম। নিতান্ত ঝগড়াটে বলে গাঁয়ের আবর্জনার মত যাকে মনে করতাম তাঁকেই আজ সারা গ্রামের পরম হিতৈষিণী বলে মনে হচ্ছে। বার বার রাঙাপিসীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতে লাগলাম।

৩

মফেজ সেখের অবস্থা এককালে ভাল ছিল না। সে আমাদের প্রজাও বটে, বরগাদারও বটে। বর্তমানে সে বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। চারটি ছেলে—তিন জন চাষবাসের কাজ করে। সবার ছোটটি স্কুলে কিছুদূর অবধি পড়েছিল—তারপর দুই-এক বছর কমলপুরের মৌলবীর কাছে উর্দু-আরবী পড়ে মস্ত বড় মৌলবী হয়েছে। মফেজ সেখ নয় শ' পঁচাত্তর টাকা আমার হাতে তুলে দিয়ে বললে—"ঐ পুরোপুরি হাজার টাকাই ঘরের দাম ডাক্তারবাবু—তবে পঁচিশটা টাকা আমি মাপ চেয়ে নেলাম।"

আমি আর কথাটি না বলে টাকাগুলো পকেটে রাখলাম। তা এক হিসাবে আমি খুব খারাপ পাই নি—চার হাজার টাকার ঘর বিক্রি করে তবু ত এক হাজার টাকা পেলাম। কত জন যে জলের দামে যথাসর্কস্ব বিক্রি করে দিয়ে যাচ্ছে। নয় শ' পঁচাত্তর টাকার নোট বুকপকেটে ফুলে ফুলে উঠছিল।

দেশে ভাল ডাক্তার বলে আমার বেশ নাম ছিল। দেশ ছেড়ে নানা জায়গা ঘুরে কোথায় বসব স্থির করতেই হাতের টাকা কয়টি একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে সামান্য বেতনে একটি ওষুধের কারখানায় কাজ নিয়েছি। সারাটা দিন সেখানে পরিশ্রম করে কোনপ্রকারে ডাল-ভাতের সংস্থানও হয় না। কলকাতার পাশে একটি উদ্বাস্তু-উপনিবেশে বাস করি। সেখানে ডাক্তারী করলে বেশ দু'পয়সা হতে পারে, কিন্তু আমার ওষুধ নেই—আসবাবপত্র নেই, কি নিয়ে বসব, ভাবলাম এইবার হয়ত একটু নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারব।

মফেজ সেখের বাড়ী থেকে ফিরে দেখি, আমাদের আঙিনার সামনে সাত-আট জন লোক বসে রয়েছে। কাছে এসে বুঝলাম, এরা সকলেই রোগী—আমি বাড়ী এসেছি শুনে দেখাতে এসেছে। মনের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল। সে একদিন ছিল—প্রতিদিন এমনি দলে দলে রোগী এসে উপস্থিত হ'ত আমার "ডিসপেন্সারী" ঘরে। রোগী দেখা চিকিৎসকের পেশা—কিন্তু একটা কঠিন রোগী ভাল করে তুলতে পারলে যে কতখানি আনন্দ তা অপরে বুঝবে না। রোগী দেখে এক এক খণ্ড কাগজে ওষুধের ব্যবস্থা লিখে দিলাম। অন্য সকলে চলে গেলেও দেখি পাশের গ্রামের আবদুল সেখ আর শ্রীনাথ মাঝো বসেই আছে। আর কি চায় জিজ্ঞাসা করতেই শ্রীনাথ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে বলল—হাতে একটা পয়সা নেই, কি দিয়ে ওষুধ কিনব!

আবদুল বলল—আপনি হাতে করে যা দেবেন তাতেই আমি ভাল হয়ে উঠব ডাক্তারবাবু। ওষুধ কেনবার সামর্থ্যের অভাবই যে এত বড় বিশ্বাসের কারণ তা বুঝতে অবশ্য আমার একটুও বিলম্ব হ'ল না। কিন্তু কি করব—আমি সম্পূর্ণ নিরুপায়। অগত্যা ক্ষুণ্ণ মনে তারা দুই জনও বিদায় নিল। প্রত্যেকটি রোগীই বারে বারে বলেছিল—আপনি আবার ফিরে আসুন ডাক্তারবাবু, আপনি গরীবের মা-বাপ—আমরা আর কার কাছে যাব।

ইচ্ছে হচ্ছিল ভবিষ্যতের সমস্ত চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়ে আবার গ্রামেই ফিরে এসে এদের সেবায় আত্মনিয়োগ করি। কিন্তু এ সৎ চিন্তার বিলাস আমার বেশীক্ষণ রইল না—সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল আমার স্ত্রী-পুত্র, পরিবারবর্গের কথা। আমার বাড়ীঘরের মোহ, গ্রামের মোহ বড়, না যারা আমার অস্থিপঞ্জরের মত তারা বড়? বুকপকেট থেকে মফেজ সেখের দেওয়া টাকাগুলো বের করে সন্তর্পণে বিছানার নীচে রেখে দিলাম।

৪

—বাবা তাঁর খাটে বসে সেই ছাই রঙের চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে গড়গড়া টানছিলেন—অম্বুরী তামাকের গন্ধে ঘরখানা ভুরভুর করছিল। পাশে তাঁর অতি প্রিয় রামায়ণখানা খোলা পড়ে ছিল—এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তিনি হয়ত পাঠ করছিলেন। কতক্ষণ পরে নলটি এক পাশে সরিয়ে রেখে পুনরায় পাঠ করতে লাগলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত এক পাশে চুপ করে বসে ছিলাম। মনে আমার সঙ্কোচের শেষ ছিল না—বাবাকে যেন বলতে হবে—'এই ঘরখানা মফেজ সেখের নিকট বেচে দিয়েছি'। কতক্ষণ পরে বাবা আমার দিকে মুখ তুলে বললেন, 'কি শৈল কিছু বলবি আমায়?' আমি যেন কি বললাম। বাবা গুম হয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। পরে ধীরে ধীরে বলে উঠলেন—"আমার এত সাধের ঘরখানা তুই বেচে ফেললি শৈল—আমি তা হলে থাকব কোথায় বলত?" দেখলাম তাঁর দুই চোখের কোণ বেয়ে জল ঝরছে।—ঘুম ভেঙে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে বিছানায় পড়ে রইলাম—আর ঘুম এল না। স্তিমিত হারিকেনের আলোটি বাড়িয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বাবার ফটোখানার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সকালবেলাতেই মফেজ সেখ লোকজন নিয়ে ঘর ভাঙতে আসবে—সুতরাং বাবার ফটোখানা এবার নামিয়ে এনে, যত্ন করে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। পেরেক থেকে তারের বাঁধন খুলতে গিয়ে হঠাৎ হাত ফসকে ফটোখানা কাঠের মেঝের উপরে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি ফটোখানা তুলে নিয়ে সন্তর্পণে ভাঙা কাচের টুকরোগুলো সরিয়ে ফেললাম, দেখি কাচের টুকরোয় ফটোখানার অনেক জায়গা কেটে নষ্ট হয়ে গেছে। কেন যেন আমার হাত পা সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল—মন একেবারে অবসন্ন হয়ে গেল।

ঘর বিক্রির কথা এ পর্য্যন্ত কাউকে জানাই নি। সকালবেলাতেই দশ-বার জন মজুর আর মিস্ত্রি নিয়ে মফেজ সেখ আর ছোট

ছেলে ঘর ভাঙতে এল। খবর পেয়ে নীরদ কাকা এসে বললেন, তুই শেষ হলে দাদার ঘরখানা বিক্রি করে দেবার জন্তেই এসেছিস? আমি ভেবেছিলাম আবার হয়ত তুই··· নীরদ কাকা কথা শেষ করতে পারলেন না—ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন।

মিস্ত্রিরা ঘরের চালে উঠে হাতুড়ি পিটতে লাগল—টিনের চালের উপরে হাতুড়ির ঘা পড়ে সারাটা পাড়া একেবারে মুখরিত হয়ে উঠল। মনের ভিতরে কি যে অস্বস্তি হচ্ছিল আমার! মনে হচ্ছিল এখনই ছুটে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাই। প্রত্যেকটি হাতুড়ির ঘা যেন আমার বুকের উপরে এসে পড়ছে! হঠাৎ রাঙাপিসী ছুটে এসে ডাকলেন, শৈলেন! আমি মুখ তুলে তাঁর দিকে চাইতেও পারলাম না! তিনি চীৎকার করে বললেন, ও, তা হলে তুইও এই দলে। আমি ভেবেছিলাম, শৈলেন আমাদের গ্রামে ফিরে আসবে বুঝি। বাপের ঘর বিক্রি করতে এসেছ—নিজের রোজগারের টাকায় ত আর তোলা নয়—বাপের টাকায় তোলা ঘর। এ গাঁয়ের কেউ আর আপনার নেই রে—সবাই শত্রুর সবাই শত্রুর। বলতে বলতে রাঙাপিসী তেমনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন। পাড়ার অনেকেই এসে উঁকিঝুঁকি মারছিলেন। নিজের ধৈর্যের বাধ এইবার ভেঙে গেল। স্ত্রী-পুত্রের শুষ্ক মুখ, অভাব-অনটন সমস্ত ভুলে গেলাম। ঘরের চালের মিস্ত্রিদের উদ্দেশ্য করে বললাম, চাল থেকে নেমে এস।

মফেজ সেখ জিজ্ঞাসা করল—কি হ'ল ডাক্তারবাবু। মফেজ সেখের হাতে তার সেই নয় শ' পঁচাশের টাকা ফেরত দিয়ে বললাম—আমার ঘর বিক্রি করা হ'ল না—অযথা কষ্ট দিলাম, মনে কিছু করো না।

মফেজ সেখ প্রশ্ন করল—কেন, বেচবেন না কেন? দাম ত আমি কম দিই নাই।

আমি বললাম, না সেজন্য নয়—পৈতৃক ভিটে থেকে আর কিছুই আমি বিক্রি করব না—হয়ত একদিন বাড়ীতেই আবার ফিরে আসতে পারি।

মফেজ সেখ বলল, ফিরে আসবেন নাকি—সে ত খুব ভাল কথা ডাক্তারবাবু। চাই নে আমার ঘর। আপনি আলি আমরা যে বাঁচে যাই।"

মফেজ সেখের ছোট ছেলেটি কিন্তু বিরক্ত মুখে বলে উঠল—বেচপেন না যদি তা হলি মিছেমিছি কেন হয়রানি করালেন বলেন ত?

—সেটা সত্যি, আমার ভুল হয়েছে ভাই, সেজন্য ক্ষমা চাচ্ছি।

মফেজ সেখ বলল, তা হউক গে। তুমি চুপ কর মোকসেদ। কিন্তু মোকসেদ পুনরায় বললে, মিস্ত্রির রোজ, কামলার রোজ—সব-শুদ্ধ যে পনর ষোলটি টাকা লোকসান হ'ল—তা দেয় কেডা।

আমি পকেটে হাত দিয়ে পনরটি টাকা মোকসেদের হাতে দিয়ে বললাম—সেটাও আমিই দিচ্ছি। মফেজ সেখ সবাইকে নিয়ে বিদায় হয়ে গেল।

হিসেব করে দেখলাম, পকেটে যা আছে তাতে কোন রকমে শেয়ালদা পর্যন্ত পৌঁছানো যেতে পারে। সুটকেসটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তাড়াতাড়ি গেলে কুষ্টিয়ার গহনার নৌকা ধরতে পারব। পথে নেমে নিজের বাসার অভাব-অনটনের কথা বিশেষ করে মনকে চেপে ধরল। মনে মনে ভাবছিলাম—কাল কলকাতা পৌঁছেই, কোন্ বন্ধুর কাছ থেকে অন্ততঃ গোটা কুড়ি টাকা ধার করতে পারব।

আজ বোধ হয় জন্মের মত এ গ্রাম ছেড়ে চললাম। আবার কোন দিন যে এখানে ফিরে আসব এ সম্ভাবনা হয় ত আর নাই। সন্তানসন্ততির ভবিষ্যৎ আছে—আরও কত প্রশ্ন আছে—এক প্রশ্ন শাখা-প্রশাখা মেলে শত প্রশ্নে গিয়ে দাঁড়ায়, সুতরাং আজ আমার জন্মভূমির উপর দিয়ে এই হয়ত আমার শেষ পরিক্রমা। ব্যথা-বেদনায় মন জমে পাথর হয়ে গিয়েছে। মধুমতীর চরের উপরে এসে গেছি—আধ মাইলের উপর চর। সমস্তটা চর মটর আর খেসারি গাছে ভরে উঠেছে। তারই মাঝখান দিয়ে আলপথ। বারে বারে মটর গাছের গুচ্ছ দুপায়ে জড়িয়ে ধরে যেন বলছে—যেয়ো না, থাক। রাইফুলের গন্ধ ভেসে এসে সমস্ত প্রান্তরটি ভরে ফেলেছে। আচ্ছন্নের মত কোন ক্রমে পথ চলছিলাম। মাঠটুকু পার হয়ে একটা ছোট দহের নিকট এসে পৌঁছলাম। হঠাৎ মনে পড়ল গত বৎসর দাঙ্গার সময় ঠিক এই জায়গাটিতেই ঘটেছিল শোচনীয় দুর্ঘটনা। মনে মনে শিউরে উঠলাম। কাছেই গহনার নৌকা, সেখান থেকে যাত্রীদের কলরব ভেসে আসছিল। তাড়াতাড়ি নৌকায় চেপে বসলাম।
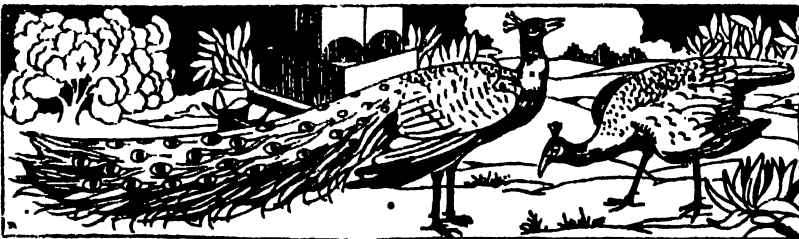
বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসন

ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

বাংলার ইতিহাসের ছাত্রগণের নিকট সেন-বংশীয় সুপ্রসিদ্ধ লক্ষ্মণসেনের পুত্র রাজা বিশ্বরূপসেনের দুইখানি তাম্রশাসন সুপরিচিত। ইহার একখানি ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে (কেহ কেহ বলেন, মধ্যপাড়া গ্রামে) আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাম্রশাসনটি বর্ত্তমানে কলিকাতার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংরক্ষিত আছে। প্রথমে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় *Indian Historical Quarterly* পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ডে এই লিপির পাঠ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রকাশিত পাঠ ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ; অধিকন্তু তিনি শাসনের ভূমিদান সম্বন্ধীয় অংশের ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। কয়েক বৎসর পরে পরলোকগত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় তাঁহার *Inscriptions of Bengal* (vol. III) সংজ্ঞক গ্রন্থে লিপিটি পুনঃসম্পাদন করেন। তাঁহার প্রকাশিত পাঠ অনেকটা নির্ভুল; তৎকর্ত্তৃক সমগ্র শাসনের অনুবাদও প্রশংসার্হ। কিন্তু দলিলের দুরূহ ভূমিদান সম্পর্কিত অংশের পাঠ এবং ব্যাখ্যাতে মজুমদার মহাশয়েরও অনেক ত্রুটি দেখা যায়। সুদীর্ঘ কালের ক্রমাগত চেষ্টার ফলে সম্প্রতি আমি সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনের ঐ কঠিন অংশটি পাঠ এবং ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইয়াছি এবং তাহা শুদ্ধ বলিয়া মনে করি। কিন্তু উহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে।

বিশ্বরূপসেনের অপর একখানি তাম্রশাসন ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড় পরগণার অন্তর্গত মদনপাড়া গ্রামে আবিষ্কৃত হয়। তাম্রপট্টখানি বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল; কিন্তু পরে উহা সেখান হইতে হারাইয়া যায়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লিপিখানি নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকাশিত পাঠ নির্ভুল হয় নাই; তিনি শাসনের যে প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও মূলানুগত নহে। ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থে লিপিটি পুনঃসম্পাদনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মূল শাসন এবং উহার যথাযথ প্রতিলিপির অভাবে তিনিও ইহার ভূমিদান অংশের নির্ভুল পাঠ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতে পারেন নাই; বরং বলিয়াছেন যে, লিপিকরপ্রমাদের জন্য এই অংশের অনেক স্থানের পাঠ দুর্ব্বোধ্য। এই অভিযোগ সত্য নহে। মদনপাড়া তাম্রশাসনখানি সম্প্রতি ঢাকা মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে। কিছুকাল পূর্ব্বে ঢাকা মিউজিয়ম কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহে আমি ঐ লিপিখানি পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাই। তাহার ফলে মদনপাড়া শাসনেরও ভূমিদান অংশের শুদ্ধ পাঠ এবং ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি এই বিষয়টিও আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। মদনপাড়া তাম্রশাসন পরীক্ষা করিয়া আমি বাংলার সেন-বংশীয় রাজগণের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি অভাবিতপূর্ব্ব তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি; উহাই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু সেই প্রসঙ্গ উত্থাপনের পূর্ব্বে সেন-বংশের অপর একখানি তাম্রশাসনেরও উল্লেখ করা প্রয়োজন।

এই লিপিটিকে লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসন বলা হইয়া থাকে। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্সেপ সাহেব জনৈক পণ্ডিতের সাহায্যে এই শাসনের পাঠ এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, প্রত্নলিপিচর্চ্চার প্রথম যুগে প্রকাশিত এই পাঠে ভ্রম প্রমাদের সংখ্যা অগণিত। মূল শাসনটি হারাইয়া গিয়াছে। জেমস্ প্রিন্সেপ শাসনের যে প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও সর্ব্বাংশে মূলানুগত নহে। তিনি বলিয়াছেন যে, লিপির ছন্দোবদ্ধ ভূমিকায় এবং ভূমিদানাংশে যে দুই স্থলে 'কেশব' নামটি দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ উভয় স্থান হইতেই পূর্ব্বখোদিত একটি নাম ঘষিয়া তুলিয়া উল্লিখিত তিনটি অক্ষর পুনরুৎকীর্ণ হইয়াছে। প্রিন্সেপ কল্পনা করিয়াছিলেন যে, কেশবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাধবের রাজত্বকালে শাসনটি উৎকীর্ণ হয়; অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু ঘটায় তাঁহার নামের স্থলে 'কেশব' লিখিত হইয়াছে। প্রিন্সেপ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ইদিলপুর শাসনের প্রতিলিপি যথাযথ না হইলেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, উহার অনেক স্থানেই পূর্ব্বখোদিত অক্ষর ঘষিয়া তুলিয়া নূতন অক্ষর উৎকীর্ণ করা হইয়াছে। মদনপাড়া শাসনে ঠিক অনুরূপ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া প্রথমে আমি অবাক হইয়াছিলাম। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মূল মদনপাড়া শাসন পরীক্ষা করিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, প্রিন্সেপ-নিযুক্ত পণ্ডিত ইদিলপুর লিপিতে যাহা 'কেশব' পড়িয়াছেন তাহা 'বিশ্বরূপ' নামের ভ্রান্ত পাঠ মাত্র। কিন্তু পরবর্ত্তী কালের লেখকেরা কেহই বসু মহাশয়ের এই মত গ্রহণ করেন নাই। ইহার কারণ এই যে, বসু মহাশয় ঐ মতের পক্ষে কোন অকাট্য যুক্তি দেখাইতে পারেন নাই;

এমন কি, তাঁহার প্রবন্ধে তাম্রপট্টখানির সম্যক্ পরিচয়ও পাওয়া যায় না। মূল ইদিলপুর ও মদনপাড়া লিপি এবং উহাদের অবিকল প্রতিলিপির অভাবে এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করাও সহজ ছিল না। কিন্তু যিনি মদনপাড়া শাসনের মূল কিংবা অবিকল প্রতিলিপি পরীক্ষার সুযোগ পাইবেন, তিনি যদি উহার সহিত ইদিলপুর শাসনের প্রিন্সেপ-প্রকাশিত প্রতিলিপির তুলনা করেন, তাহা হইলে দুইখানি শাসন যে একই নরপতি-প্রদত্ত সে বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ থাকা সম্ভব বলিয়া মনে করি না।

সাহিত্য-পরিষদ, মদনপাড়া এবং ইদিলপুর শাসনের ছন্দোবদ্ধ ভূমিকাংশ মোটামুটি এক। এই অংশের নিম্নোদ্ধৃত তিনটি শ্লোক অত্যন্ত মূল্যবান :

১। পূর্ব্বং জন্মশতেষু ভূমিপতিনা সন্তোষ্য মুক্তিগ্রহ·
নূনং তেন সুতার্থিনা সুরধুনীতীরে হরঃ শ্রীশিবঃ।
এতস্মাৎ কথমন্যথা রিপুবধূ বৈধব্যবদ্ধব্রতো
বিখ্যাতক্ষিতিপালমৌলিরভবচ্ছ্রীবিশ্বরূপো নৃপঃ॥

ইহা মদনপাড়া লিপির দশম এবং ইদিলপুর ও সাহিত্য পরিষদ শাসনদ্বয়ের একাদশ শ্লোক। ইহাতে লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপসেনের প্রথম উল্লেখ দেখা যায়।

২। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি মদনপাড়া শাসনে ত্রয়োদশ, ইদিলপুর লিপিতে চতুর্দ্দশ এবং সাহিত্য-পরিষদ শাসনে পঞ্চদশ স্থান অধিকার করিয়া আছে। শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদ লিপি সম্পাদনকালে শ্লোকটির এইরূপ পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন :

যাং নির্ম্মায় পবিত্রপানিরভবদ্বেধাঃ সতীনাং শিখা-
রত্নং সা কিমপি স্বরূপচরিতৈর্ব্বিশ্বং যয়ালঙ্কৃতম্।
লক্ষ্মীভূর্য্যপি বাঞ্ছিতানি বিদধে যস্যাঃ সপত্ন্যোর্দ্বয়ং
শ্রীমৎটট্রণদেব্যমুষ্য মহিষী সাভূন্নিবর্গোচিতা॥

এই শ্লোকে রাজা বিশ্বরূপসেনের মাতার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। মজুমদার মহাশয় শাস্ত্রীর 'শ্রীমৎটট্রণদেব্যমুষ্য" স্থলে "শ্রীমত্তাষ্টণদেব্যমুষ্য" পাঠ করিয়াছেন। সুতরাং শাস্ত্রীর মতে বিশ্বরূপ সেনের মাতার নাম টট্রণদেবী এবং মজুমদারের মতে তাষ্টণ দেবী। তিন অক্ষরের এই নামটির তৃতীয় অক্ষর 'ণ' তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু অপর দুইটি অক্ষর সম্বন্ধে শাস্ত্রী এবং মজুমদার উভয়ের মতই ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। 'ৎট' কোন সংযুক্ত বর্ণ হইতে পারে না, শাস্ত্রী নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি যাহা 'ৎট' পড়িয়াছেন, উহার আকার ঋ-মাত্রা এবং আ-মাত্রাযুক্ত 'ত'-এর ন্যায়। ঋকারসদৃশ অংশটিকে তিনি 'ট' পড়িয়াছেন; কিন্তু তাহা হইলে আকারসদৃশ অংশটি লইয়া সমস্ত অক্ষরটিকে 'ৎটা' পাঠ করা উচিত ছিল। মজুমদার মহাশয় ঐ ঋ-মাত্রা এবং আ-মাত্রাসদৃশ অংশদ্বয়কে সংযুক্ত করিয়া য-ফলা পাঠ করিয়াছেন। ইহা ঠিকই হইয়াছে; কিন্তু তাহা হইলে সমস্ত অক্ষরটিকে 'ত্য' পড়া উচিত ছিল, 'ত্ত্য' নহে। কারণ অক্ষরটিতে 'ত'-এর দ্বিত্বের কোনই চিহ্ন দেখা যায় না। আমাদের বিবেচনায় এই অক্ষরটি 'ত্য'; সুতরাং বিশ্বরূপসেনের মাতার নামের প্রথম অক্ষর 'অ' এবং নামটি শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী 'শ্রীমতী' শব্দের সহিত সন্ধি-বদ্ধ। নামের দ্বিতীয় অক্ষরটির শাস্ত্রীধৃত পাঠ 'ট্র' এবং মজুমদারধৃত পাঠ 'ষ্ট'। লিপিটিতে বহুস্থানে 'ট্র' এবং 'ষ্ট' ব্যবহৃত হইয়াছে। ৩৮, ৪১, ৫০, ৫২, ৫৫ ও ৬০ সংখ্যক পংক্তিতে আট বার 'ট্র' এবং ২৬, ৪৫, ৫২ ও ৬৫ সংখ্যক পংক্তিতে চার বার 'ষ্ট' এর ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু আলোচ্য অক্ষরটির সহিত ঐ সকল 'ট্র' এবং 'ষ্ট' এর কিছু-মাত্র সাদৃশ্য নাই। আমাদের বিবেচনায় এই অক্ষরটি 'হ্ব' ব্যতীত অপর কিছু নহে এবং বিশ্বরূপসেনের মাতার প্রকৃত নাম ছিল 'অহ্বণদেবী'।

আশ্চর্য্যের বিষয়, ইদিলপুর এবং মদনপাড়া শাসনে এই শ্লোকের স্বতন্ত্র পাঠ দেখা যায়। ইদিলপুর লিপিতে "স্বয়ং শ্রীমত্যহ্বণদেব্যমুষ্য" স্থলে "মহারাজ্ঞী শ্রীচন্দ্রাদেবী স্বস্ত" পাঠ করা হইয়াছে, যদিও আমাদের মনে হয়, ইহার শেষ চারিটি অক্ষরের বাঞ্ছনীয় পাঠ "দেব্যমুষ্য"। এই স্থলে মদনপাড়া শাসনে পড়া হইয়াছে "মহারাজ্ঞী শ্রীতাড়া দেবি (অথবা, তান্দ্রাদেবি) তদস্ত"। স্পষ্টই বুঝা যায়, যে কবি মূলতঃ শ্লোকটি লিখিয়াছিলেন তিনি ছন্দোভঙ্গ করিয়া "শ্রীচান্দ্রাদেবী স্বস্ত" কিংবা "শ্রীতাড়াদেবি (অথবা তান্দ্রা-দেবি) তদস্ত" লিখিতে যান নাই। বিশেষতঃ মদনপাড়া লিপিতে সুস্পষ্ট দেখা যায় যে, পূর্ব্বখোদিত তিন অক্ষরের একটি নাম ঘসিয়া তুলিয়া আলোচ্য নামের চারিটি অক্ষর (যাহা 'তাড়াদেবি' বা 'তান্দ্রাদেবি' পড়া হইয়াছে) পুনরুৎকীর্ণ হইয়াছে। মূলতঃ এই লিপিতে যে তিন অক্ষরের নামটি উৎকীর্ণ ছিল, ছন্দোবিধান অনুসারে তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় অক্ষর লঘু এবং তৃতীয় অক্ষরটি গুরু ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের মনে হয়, ঐ নামটির স্থলে পরবর্ত্তী লিপিকারের "শ্রাহ্বণদেবি তস্য" (ইদিলপুর শাসনে "শ্রাহ্বণ-দেব্যমুষ্য") লেখা উদ্দেশ্য ছিল, যদিও তিনি "তদস্য"কে "তস্য"রূপে পরিবর্ত্তিত করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে ছন্দোরক্ষা হয়, সাহিত্য-পরিষদ্ শাসনের পাঠের সহিত সামঞ্জস্যও রক্ষিত হয়। যে দুইটি অক্ষর 'তাড়া' বা 'তান্দ্রা' পাঠ করা হইয়াছে, পূর্ব্বোৎকীর্ণ অক্ষর দুইটি উত্তমরূপে ঘসিয়া না তুলিয়া ঐ দুইটি উৎকীর্ণ করায় উহাদের আকার অদ্ভুত দেখা যায়। ইদিলপুর শাসনের অবস্থাও এই নামটির বিষয়ে মদনপাড়া লিপির ন্যায়। আরও একটি কথা আছে।

'দেবী' স্থলে 'দেবি' অশুদ্ধ, যদিও অনেক সময়ে কবিগণকে ছন্দের অনুরোধে স্ত্রীলোকের নামের শেষে 'দেবি' লিখিতে দেখা যায়। মদনপাড়া লিপিতে যে কবি বিশ্বরূপসেনের মাতৃ-নামের শেষে 'দেবি' লিখিয়াছিলেন, তিনি অবশ্যই ছন্দোবিধান সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। এই শাসনের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ভূমিদানাংশে পর পর কতকগুলি পংক্তি ঘষিয়া তুলিয়া নূতন অক্ষর উৎকীর্ণ করা হইয়াছে। যিনি ইহা করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকটিতে কয়েকটি অক্ষর ঘষিয়া মহারাজ্ঞীর নামটি ছন্দোবিধানানুযায়ী সংযোজিত করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন কেন? সামান্য সামান্য বিষয়ে তাঁহার ত্রুটি ঘটিতে পারে; কিন্তু একটি নামের স্থলে অন্য একটি নাম বসাইতে গিয়া তিনি ছন্দোভঙ্গ করিবেন, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন।

৩। এতাভ্যাং শশিশেখরগিরিজাভ্যামিব বভূব শক্তিধরঃ।
শ্রীবিশ্বরূপসেনঃ প্রতিভটভূপালমুকুটমণিঃ॥

এই শ্লোকটি পূর্ব্বোদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকের অব্যবহিত পরবর্ত্তী। উপরি-উদ্ধৃত পাঠ সাহিত্য-পরিষদ তাম্রশাসন হইতে গৃহীত। আশ্চর্য্যের বিষয়, মদনপাড়া লিপিতে "শ্রীবিশ্বরূপসেনঃ" স্থলে "শ্রীবিশ্বরূপসেনদেবঃ" লিখিয়া ছন্দের ব্যতিক্রম ঘটানো হইয়াছে। অধিকন্তু ইহাতে "বিশ্বরূপ" এই চারিটি অক্ষর পূর্ব্বোৎকীর্ণ দুই অক্ষরের একটি নাম ঘষিয়া তুলিয়া নূতন খোদিত দেখা যায়। দুই অক্ষরের এই মূল নামের দ্বিতীয় অক্ষরের উপর যে রেফচিহ্ন ছিল, তাম্রপট্টে এখনও উহা অবিকৃত রহিয়াছে। এই নামটি যে সূর্য্য, সর্ব্ব, দর্প, গর্ব্ব প্রভৃতির ন্যায় কিছু ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শাসনের ভূমিদানাংশে যে স্থলে ভূমিদাতা নৃপতির নাম পুনরায় উল্লিখিত হইয়াছে, সেখানেও এই পূর্ব্বখোদিত নামটি ঘষিয়া তৎস্থলে "বিশ্বরূপ" নাম পুনরুৎকীর্ণ দেখা যায়। চারিটি অক্ষর দুই অক্ষরের পরিসরে লিখিত হওয়ায় "বিশ্বরূপ" নামটি তাম্রপট্টে "বিশ্বর" বলিয়া বোধ হয়। ইদিলপুর লিপিতে ইহাই যে ভ্রমবশতঃ "কেশব" পড়া হইয়াছিল, তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রিন্সেপ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ঐ শাসনের প্রতিলিপি মূলানুগত না হইলেও উহাতে যাহা "কেশব" পড়া হইয়াছে, তাহার প্রথম অক্ষরে 'ই'মাত্রা দেখা যায়। ভূমিদানাংশে নামটি "কিশ্বপ" বলিয়া বোধ হয়। অত্যন্ত স্বল্পপরিসরে যাহা "বিশ্বরূপ" ছিল তাহাকে কিঞ্চিৎ স্পষ্ট করিতে গিয়া এই ফল দাঁড়াইয়াছে।

আমরা দেখিয়াছি, দুই অক্ষরে লিখিত যে নামটির স্থলে "বিশ্বরূপ" পুনরুৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা সূর্য্য, সর্ব্ব, দর্প, গর্ব্ব প্রভৃতির ন্যায় একটা কিছু ছিল। শাসনের ভূমিদানাংশে নামটির পূর্ব্বে "শ্রীমৎ" সংযুক্ত আছে। এই অংশে রাজার পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহের নামের সহিত উক্ত শব্দটি সন্ধিবদ্ধ দেখা যায়। ইহাতে বুঝা যায়, মদনপাড়া-লিপির মূল শাসনদাতার নামের প্রথম বর্ণ 'ৎ'-এর সহিত সন্ধিতে ঘনবদ্ধ হইবার মত নহে। সুতরাং নামটি সূর্য্যসেন বা সর্ব্বসেন হওয়া সম্ভব; কিন্তু দর্পসেন বা গর্ব্বসেন হওয়া সম্ভব নহে। শাসনের ভূমিকাংশ হইতে যে তিনটি শ্লোক উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেগুলি একযোগে পাঠ করিলে স্পষ্টই মনে হয়, দলিলের মূল দাতা ছিলেন রাজা বিশ্বরূপসেনের জনৈক পুত্র। মদনপাড়া লিপির ভূমি-দানাংশে এই অনুমানের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ রহিয়াছে। কারণ এই অংশে অরিরাজ-নিঃশঙ্কশঙ্কর শ্রীমদ্বল্লালসেনদেবের প্রপৌত্র অরিরাজমদনশঙ্কর শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবের পৌত্র অরিরাজবৃষভশঙ্কর শ্রীমদ্বিশ্বরূপসেনদেবের পুত্র অরিরাজ-নিঃশঙ্কশঙ্কর শ্রীমৎ * * সেনদেবের নামাদি হইতে কতকগুলি অক্ষর পরিবর্ত্তিত করিয়া অরিরাজ বৃষভশঙ্কর শ্রীমদ্বিজয়সেন-দেবের প্রপৌত্র অরিরাজ নিঃশঙ্কশঙ্কর শ্রীমদ্বল্লালসেনদেবের পৌত্র অরিরাজমদনশঙ্কর শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবের পুত্র অরিরাজ-বৃষভাঙ্কশঙ্কর শ্রীমৎ বিশ্বরূপসেনদেব ইত্যাদি পুনর্লিখিত হইয়াছে। ইহার সুস্পষ্ট চিহ্ন তাম্রপট্টে বর্ত্তমান. এই সকল পরিবর্ত্তনবিষয়ক খুঁটিনাটির আলোচনায় সাধারণ পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা। তাই আমরা মাত্র দুই-একটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। যেখানে এখন "শ্রীমল্লক্ষ্মণ-সেন" দেখা যায়, উহার "ল্লক্ষ্মণ" অক্ষরত্রয় একটি চার অক্ষরের নামের স্থানে পুনরুৎকীর্ণ হইয়াছে। এই স্থানে পূর্ব্বে "শ্রীমদ্বিশ্বরূপসেন" খোদিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ একে ত বিশ্বরূপ ব্যতীত সেন-বংশে অপর কাহারও চারি অক্ষরের নাম দেখা যায় না; তদুপরি 'দ্বি' বর্ণটির 'ই'মাত্রার চিহ্ন এখনও তাম্রপট্টে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। আবার এখানে লক্ষ্মণসেনকে "পরমসৌর" বলা হইয়াছে, যদিও তিনি "পরম বৈষ্ণব" ছিলেন এবং তৎপুত্র বিশ্বরূপসেনই সেনবংশের সর্ব্বপ্রথম সৌর নরপতি। স্পষ্টই বুঝা যায়, বিশ্বরূপসেনের নামের স্থলে লক্ষ্মণসেনের নাম পুনরুৎকীর্ণ করিবার পর পরবর্ত্তী লিপিকার "পরম-সৌর"কে "পরমবৈষ্ণবে" রূপান্তরিত করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে, মদনপাড়া তাম্রশাসন অবশ্য এবং ইদিলপুর শাসন খুব সম্ভব মূলে বিশ্বরূপসেনের জনৈক পুত্রকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল এবং এই সেনবংশীয় নরপতির সূর্য্যসেন বা সর্ব্বসেন এইরূপ কোন একটা নাম ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, বিশ্বরূপসেনের পরবর্ত্তী

কালীন সাহিত্য-পরিষদ্ শাসনে কুমার সূর্য্যসেনের নামোল্লেখ আছে এবং অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তিনি বিশ্বরূপের পুত্র ছিলেন। সুতরাং বিশ্বরূপসেনের যে পুত্র মদনপাড়া ও ইদিলপুরশাসনের মূল দাতা, তাঁহার নাম সূর্য্যসেন হওয়া খুবই সম্ভবপর।

অপর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, মদনপাড়া-লিপি মূলতঃ সূর্য্যসেনের দ্বিতীয় রাজ্যবর্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল; কিন্তু "দ্বিতীয়াব্দীয়" কথাটির প্রথম দুইটি অক্ষরের স্থলে পরে "চতুর্দ্দশ" পুনরুৎকীর্ণ হইয়াছে, অথচ 'য়' অক্ষরটি অবিকৃত রহিয়াছে এবং 'দ্ব'-এর 'ই'মাত্রা ও 'ত'-এর 'ঈ'মাত্রার চিহ্নও সুস্পষ্ট দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে, শাসনটি সূর্য্যসেনের দ্বিতীয় রাজ্যসংবৎসরে প্রদত্ত এবং বিশ্বরূপ সেনের চতুর্দ্দশ রাজ্যবর্ষে সংশোধিত হইয়াছিল। এই সংশোধনের কারণ আমি অন্যত্র আলোচনা করিতেছি। এখানে সংক্ষেপে ইহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সূর্য্যসেন জনৈক ব্রাহ্মণকে পিঞ্জোকাষ্ঠীগ্রাম নিষ্কর দান করিয়াছিলেন। উহার বার্ষিক আয় ছিল ৬৩২ পুরাণ বা চূর্ণী। কিন্তু পরে দেখা যায়, ঐ গ্রামের ১৩২ পুরাণ আয়ের একটি অংশে কন্দর্প-শঙ্করাশ্রমের নিষ্কর স্বত্ব রহিয়াছে। তাই ঐ অংশটি বাদ দিয়া উহার পরিবর্ত্তে নারগুপ গ্রামের ১২৭ পুরাণ বার্ষিক আয়ের একটি অংশ শাসনগ্রহীতা ব্রাহ্মণকে ক্ষতিপূরণ দিবার প্রয়োজন অনুভূত হয়। তদনুসারে পূর্ব্বখোদিত শাসনের কতকাংশ ঘষিয়া তুলিয়া কতকগুলি নূতন কথা পুনরুৎকীর্ণ করিতে হইয়াছিল।

বিশ্বরূপসেনের পুত্র সূর্য্যসেন তদীয় পিতার রাজত্বের আরম্ভ এবং শেষের মধ্যবর্ত্তী সময়ে কয়েক বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বরূপকে নরপতিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ইদিলপুর শাসনের "বৃহন্নৃপতিচরণৈঃ" সূর্য্যসেন কর্ত্তৃক জীবিত পিতার সসম্ভ্রম উল্লেখ সূচিত করে। আবার, বিশ্বরূপসেনের চতুর্দ্দশ রাজ্যবর্ষের আশ্বিন মাসে মদনপাড়া লিপি হইতে সূর্য্যসেনের নাম কাটিয়া তাঁহার পিতার নাম সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল। ইহার কয়েক মাস পরবর্ত্তী, সাহিত্য-পরিষদ্ শাসনে বিশ্বরূপ কুমার সূর্য্যসেনের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, সূর্য্যসেন পিতৃদ্রোহী হইয়া রাজ্যাধিকার করেন নাই। বোধ হয়, বিশ্বরূপসেন শত্রু-হস্তে বন্দী কিংবা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হওয়ায় মন্ত্রিগণ তাঁহার সম্পর্কে নিরাশ হইয়া সূর্য্যসেনকে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতা কারামুক্ত বা রোগমুক্ত হইবার পরই সূর্য্যসেন তাঁহাকে সিংহাসন ছাড়িয়া দেন।

সূর্য্যসেনের শাসনের ভূমিকাংশ বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসন হইতে গৃহীত হইয়াছিল। তিনি কেবল উহাতে পিতার নামের স্থলে নিজ নাম এবং পিতামহীর নামের স্থলে মাতার নাম সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপের শাসনে লক্ষ্মণসেনের বর্ণনায় তাঁহার নিজের নামোল্লেখ থাকাতে সূর্য্যসেনের পক্ষে এই পরিবর্ত্তনসাধন কিছুই কঠিন হয় নাই। তবে ইহার ফলে বিশ্বরূপসেনের শাসনে উদ্ধৃত তৎপিতা লক্ষ্মণসেনের বর্ণনামূলক কয়েকটি শ্লোক সূর্য্যসেন নিজ পিতার বর্ণনায় ব্যবহার করিয়াছিলেন দেখা যায়।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস—ইদিলপুর তাম্রশাসনও মূলতঃ সূর্য্যসেন কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল; পরে বিশ্বরূপসেনের রাজত্বের দ্বিতীয় ভাগে ইহা সংশোধিত হয়। মূল শাসন এবং উহার অবিকল প্রতিলিপির অভাবে এই সংশোধন ও পরিবর্ত্তনের কারণ নির্ণয় করা কঠিন। তবে প্রিন্সেপ কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রতিলিপি হইতে মনে হয়, মূলে শাসনখানি মদনপাড়া তাম্রশাসনের গ্রহীতা বিশ্বরূপ দেবশর্ম্মাকে দান করা হইয়াছিল; পরে তাঁহার নাম কাটিয়া তৎস্থলে তদীয় ভ্রাতা ঈশ্বর দেবশর্ম্মার নাম বসানো হয়।

পরিবারের গঠন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

আজকাল শুনিতে পাওয়া যায় যে, হিন্দুর একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা উঠিয়া গিয়াছে বা উঠিয়া যাইতেছে। এককালে—শত বৎসর পূর্ব্বে, প্রত্যেক হিন্দুই যৌথ পরিবারভুক্ত ছিলেন ও থাকিতে ভালবাসিতেন। এখন নানা কারণে—কতকটা আর্থিক অনটনের জন্য, কতকটা আমি রোজগার করি, ভাল খাইব, ভাল পরিব, অপরকে তা সে আমার ভাই-ই হউক বা কাকা জেঠাই হউন, কেন আমার সমান ভাল খাইতে বা ভাল পরিতে দিব—এইরূপ সঙ্কীর্ণ মনোভাবের জন্য। আবার কতকটা ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে। কতকটা আমি কলিকাতায় চাকুরী করি, আমার কাকা বিদেশে জব্বলপুরে চাকুরি করেন, দেশে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা থাকেন এই মনোভাব বশতঃ—ঘটনার চাপে পড়িয়া যৌথ পরিবারপ্রথা লোপ পাইয়াছে বা পাইতে বসিয়াছে। মাতামহের মুখে প্রায়ই শুনিতাম, দীনবন্ধু মিত্রের বাড়ীতে সকালে ৭২ খানি পাতা ও সন্ধ্যায় ৭২ খানি পাতা নিত্য পড়িত, ইহার উপর 'এসো' জন, 'বসো' জন থাকিত। ঠাকুরমার মুখে শুনিয়াছি যে, যখন কলিকাতায় প্রথম লোকগণনা হয় (অর্থাৎ ১৮৭২ সনে) তখন হাটখোলার দত্ত বাড়ীতে ৩৫০ জন লোক ছিল। দশ সের সন্দেশ জলখাবার খাইতে লাগিত। এখন এ সব কথা গল্পের সামিল।

এখন দেখা যাউক, বর্ত্তমানে অবস্থা কিরূপ। গত আদমশুমারির সময়ে (ইং ১৯৫১ সনে) এ বিষয়ে কিছু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। সেন্সাসে বাড়ী আর "হাঁড়ি" সমার্থবোধক। একটি বাড়ীর যদি দুইটি পরিবার আলাদা আলাদা রান্না করেন, অর্থাৎ "তাঁহাদের হাঁড়ি যদি আলাদা হয়" তাহা হইলে তাঁহাদের দুইটি বাড়ী ধরা হয়। এক জন লোক যদি একলা রাঁধিয়া খান তাহা হইলে তাহাকেও একটি "বাড়ী" ধরা হয়। এইরূপে গড়ে পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র লোকসংখ্যাকে সমগ্র বাড়ীর সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে গড়ে বাড়ীপ্রতি কতজন লোক হইবে তাহার হিসাব পাওয়া যায়। ইং ১৯৫১ সনে এইরূপ বাড়ীপ্রতি জনসংখ্যা হইতেছে ৪·৬৩। পল্লী অঞ্চলে বাড়ী বা হাঁড়িপ্রতি জনসংখ্যা হইতেছে ৪·৭০; আর শহর অঞ্চলে হইতেছে ৪·৪৩ জন। কলিকাতায় এইরূপ সংখ্যা হইতেছে ৪·২১ জন। কিন্তু এই সংখ্যা হইতে বুঝা যায় না যে, একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা কতটা কমিয়াছে বা লোপ পাইয়াছে। পূর্ব্বতন সেন্সাসের গড়ের সহিত তুলনা করিলে দুইটি ভ্রম হইবে। এক—পূর্ব্বতন সেন্সাসের বাড়ী বর্ত্তমান সেন্সাসের বাড়ীর সহিত পুরাপুরি সমার্থবোধক নহে। দুই—কখনও লোকসংখ্যা কমিয়াছে আবার কখনও লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে এমতাবস্থায় বাড়ীপ্রতি জনসংখ্যার সামান্য তারতম্য হইতে কোনও সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। যেমন, বর্দ্ধমান জেলায় ১৯১১, ১৯২১, ১৯৩১, ও ১৯৪১ সনে বাড়ীপ্রতি জনসংখ্যা যথাক্রমে ৪·৩; ৪·০; ৪·১ ও ৪·৯ জন। ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর ফলে ১৯২১ সনে বাড়ীপ্রতি জনসংখ্যা কমিয়াছে। আবার জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির জন্য ১৯৪১ সনে গড় বাড়িয়াছে।

একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙিবার প্রধান কারণ পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদের মধ্যে ঝগড়া বা মনোমালিন্য। পূর্ব্বে শ্বশুর-শাশুড়ী, দাদাশ্বশুর-দিদিশাশুড়ী লইয়া একত্রে থাকা মেয়েদের গৌরবের বিষয় ছিল। এখন কিন্তু মেয়েরা ননদ-জা লইয়া থাকিতে তাদৃশ ইচ্ছুক নহেন। সুতরাং এক বাড়ীতে বা এক হাঁড়িতে কয়জন বিবাহিত স্ত্রীলোক আছেন তাহার সংখ্যা জানিতে পারিলে বুঝা যায় যে, একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা কতদূর টিকিয়া আছে।

এ বিষয়ে গত আদমশুমারির সময় পশ্চিমবঙ্গে একটি নমুনা-স্বরূপ Sample survey তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল। ছয়টি জেলার প্রত্যেক থানা হইতে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল। তথ্যগুলি জেলাওয়ারি সাজাইলে এইরূপ দাঁড়ায়। যথা:

পরিবারের সংখ্যা—যেখানে বিবাহিত স্ত্রীলোক আছেন

জেলা	বাড়ীর সংখ্যা	১ জন	২ জন	৩ জন	৪ জন	৫ জন	৫-এর অধিক
বীরভূম	২,৭৩৫	১৯১৫	৫৫৩	১৮৫	৫৬	২১	৫
বাঁকুড়া	৪,৬৭৯	৩,২৮০	৯৩২	৩৩৩	৯৭	২৭	১০
হাবড়া	৪,২০৭	৩,০৫৬	৭৩৯	২৮০	১০৫	২০	৭
চব্বিশ পরগণা	৯,৭৪৫	৭,০৩১	১,৮৬১	৫২৯	২৪১	৬৭	১৬
মালদহ	৩,০২৫	২,১১৪	৫৯৪	২০৭	৭১	২৯	১০
পঃ দিনাজপুর	২.৭১৪	১,৯৯৫	৫২০	১৪৯	৩৫	১০	৫
	২৭,১০৫	১৯,৩৯১	৫,১৯৯	১,৬৮৩	৬০৫	১৭৪	৫৩

এই তথ্যগুলিকে যদি আমরা পশ্চিমবঙ্গের একান্নবর্ত্তী প্রথার ব্যাপকতার বা ইহার বিলুপ্তির পরিচায়ক বলিয়া ধারনা লই তাহা হইলে অন্যায় হইবে না। তথ্যটিকে বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া আমরা হাজারকরা (১০০০) হিসাবে সাজাইয়া দিলাম।

প্রতি ১,000 হাজার বাড়ীর মধ্যে যেখানে
বিবাহিত স্ত্রীলোকের সংখ্যা

১ জন	২ জন	৩ জন	৪ জন	৫ জন	৫-এর অধিক
৭১৪	১৯২	৬২	২২	৬˙৪	২

এক পরিবারে ২ জন বিবাহিত স্ত্রীলোক থাকা একান্নবর্ত্তী পরিবারপ্রথা থাকার দরুনও হইতে পারে (যেমন শাশুড়ী বৌ একত্রে আছেন বা বিবাহিতা ননদ এখনও শ্বশুরবাড়ী যান নাই) কিম্বা একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া যাওয়া সত্বেও আকস্মিক হইতে পারে (যেমন চিকিৎসার জন্য দূর হইতে আগত আত্মীয়া ইত্যাদি)। যেখানে ৩ বা ততোধিক বিবাহিত স্ত্রীলোক একত্রে আছেন সেগুলিকে আমরা একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথার পরিচায়ক বলিয়া সহজেই ধরিয়া লইতে পারি। এমতে শতকরা ৯˙২টি পরিবার একান্নবর্ত্তী পরিবার একথা কতকটা জোর করিয়া বলিতে পারা যায়। আর যদি ২টি বিবাহিতা স্ত্রীলোক যেখানে আছেন এইরূপ পরিবারের অর্দ্ধেক একান্নবর্ত্তী পরিবার বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে একান্নবর্ত্তী পরিবারের সংখ্যা শতকরা ১৮˙৮-এ দাঁড়ায়।

এইবার আমরা পশ্চিমবঙ্গের সমতল ক্ষেত্রের (অর্থাৎ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি বাদ দিয়া) পরিবারের গঠন সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরিবেশন করিব। নমুনাস্বরূপ কিছু বিশেষ তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল। যথা :

	বাড়ীর সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	প্রতি ১,000 পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা	বাড়ীপ্রতি জনসংখ্যা
পল্লী অঞ্চলে	৩,৬৫৮	৯,৪৫৯	৯,০১৪	৯৫৩	৫˙০৫
সহর ,,	১,১৫৩	৩,৫৯৭	৩,১৬৪	৮৭৯	৫˙৮৬
মোট	৪,৮১১	১৩,০৫৬	১২,১৭৮	৯৩৭	৫˙২৪

শতকরা হিসাবে উপরোক্ত তথ্যগুলিকে সাজাইলে এইরূপ দাঁড়ায়। যথা :

মোট পরিবারের সংখ্যা ১০০ (গড় জনসংখ্যা ব্রাকেটে দেওয়া হইল)

	ছোট	মাঝারি	বড়	খুব বড়
পল্লী অঞ্চলে	৩০˙০ (২˙৪)	৪৬˙৯ (৪˙৯)	১৭˙৬ (৭˙৭)	৫˙৫ (১২˙১)
শহর ,,	১৯˙১ (২˙৭)	৫১˙০ (৪˙৯)	২০˙০ (৭˙৮)	১০˙০(১২˙৮)

শহর অঞ্চলে পরিবারস্থ ব্যক্তির সংখ্যা পল্লী-অঞ্চলের অপেক্ষা কিছু বেশী। কিন্তু এত সামান্য বেশী যে ইহা হইতে কোনওরূপ মতামত প্রকাশ করা সমীচীন নহে। শহর অঞ্চলে বহু ধনীর বাস হেতু বড় বড় পরিবারের সংখ্যার অনুপাত বেশী। তেমনি ছোট পরিবারের অনুপাতও কম। বড়লোক চাকর-বাকর লইয়া বাস করেন, গরীব স্ত্রী-পুত্র লইয়া কোনওরূপে দিন কাটায়।

বাড়ীর "কর্ত্তা" পুরুষ কি স্ত্রী সে সম্বন্ধেও তথ্যগুলি চিন্তার খোরাক জোগাইয়া দেয়। যথা :

	বাড়ীর কর্ত্তা		প্রতি ১,000 বাড়ীতে	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ কর্ত্তা	স্ত্রী কর্ত্তা
পল্লী অঞ্চলে	৩,৪০৩	২৩৩	৯৩৬	৬৪
শহর ,,	১,১১৫	৪৮	৯৫৯	৪১

পল্লী অঞ্চলে স্ত্রী-কর্ত্তার সংখ্যাধিক্য হইতে বুঝা যায় যে, সেখানে যৌথ পরিবার-প্রথা শহর অপেক্ষা প্রবল। এক কথায় দেড়গুণ প্রবল বলিলে খুব অন্যায় হইবে না।

এখন কাহাদের লইয়া পরিবার গঠিত? সাধারণতঃ আমি, আমার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও ভাইবোন লইয়া পরিবার গঠিত হয়। এইবার সংগৃহীত তথ্যগুলি নিয়ে দিলাম। যথা :

	কর্ত্তার— স্ত্রী	পুত্র	কন্যা	অন্যান্য পুরুষ আত্মীয়	অন্যান্য স্ত্রীলোক আত্মীয়া
পল্লী অঞ্চলে	২,৯২২	৪,১০০	২,৮২৪	১,৮৪৪	৩,০০২
শহর ,,	৯৮৫	১,৪৩৯	১,১৪৭	৯৩১	৯৩৭

দেখা যায়, যাঁহারা মেসে বা অন্যত্র থাকেন না, পরিবারবর্গ লইয়া বাস করেন শহর অঞ্চলে এইরূপ পরিবারস্থ ব্যক্তির সংখ্যা পল্লী অঞ্চলের অপেক্ষা কিছু বেশী। কিন্তু গড় ধরিলে সবটা বুঝা যায় না—এজন্য এইরূপ পরিবারের লোকসংখ্যার তারতম্য নিম্নে দেওয়া গেল। যথা :

পরিবারস্থ ব্যক্তির সংখ্যা

	ছোট (৩ জন বা তাহার কম)		মাঝারি (৪ থেকে ৬ জন)		বড় (৭ থেকে ৯ জন)		খুব বড় পরিবার (১০ বা ততোধিক)	
	পরিবারের সংখ্যা	লোক-সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	লোক-সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	লোক-সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	লোক-সংখ্যা
পল্লী অঞ্চলে	১,০৯৯	২,৫৯৯	১,৭১৫	৮,৪৫৭	৬৪৩	৪,৯৭৬	২০১	২,৪৪১
শহর ,,	২২০	৫৮৭	৫৮৭	২,৮৯৬	২৩২	১,৮২৩	১১৪	১,৪৫৫
মোট	১৩১৯	৩,১৮৬	২,৩০২	১১,৩৫৩	৮৭৫	৬,৭৯৯	৩১৫	৩,৮৯৬

উপরিউক্ত তথ্যগুলি তুলনামূলকভাবে বুঝিবার সুবিধার জন্য নিম্নে আমরা প্রতি ১০০ "কর্তার স্ত্রী" হিসাবে সাজাইয়া দিলাম। যথা:

	কর্তার—				
	স্ত্রী	পুত্র	কন্যা	পুরুষ আত্মীয়	স্ত্রীলোক আত্মীয়া
পল্লী অঞ্চলে	১০০	১৪০'৩	৯৬'৬	৬৩'১	১০২'৭
শহর ,,	১০০	১৪৬'১	১১৬'৪	৯৪'৫	৯৫'১

পুত্র-কন্যার সংখ্যা সমান, তথাপি একই পরিবারভুক্ত একই ব্যক্তির পুত্র-কন্যার সংখ্যার তারতম্য কেন? কন্যাদের বিবাহ হইয়া যায়, তাঁহারা নিজ নিজ শ্বশুরবাড়ীতে চলিয়া যান; এজন্য কন্যার সংখ্যা পুত্রদের অপেক্ষা ঢের কম। পল্লী-অঞ্চলে কন্যার বিবাহ অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে হয়, লেখা-পড়ার সুযোগ কম। এজন্য পল্লী-অঞ্চলে কন্যার সংখ্যা শহর অঞ্চল অপেক্ষা কম। মেয়ে বিবাহের পর স্বামীগৃহে যায় বা লেখাপড়া শিখিবার জন্য শহর অঞ্চলে যায়। পল্লী-অঞ্চলে পুরুষ আত্মীয়ের সংখ্যাল্পতা হেতু তাঁহাদের নিজ নিজ জীবিকার চেষ্টায় শহর বা অন্যত্র গমন। শহর অঞ্চলে পুরুষ আত্মীয় ও স্ত্রীলোক আত্মীয়ার যেরূপ নিকট সংখ্যা-সাম্য দৃষ্ট হয় তাহাতে মনে হয় যে, উভয় পক্ষই বিবাহিত। এ সম্বন্ধে বেশী আলোচনা করিবার পূর্ব্বে পরিবারস্থ ব্যক্তি-বর্গের বিবাহিত অবিবাহিত প্রভৃতি সামাজিক অবস্থা কিরূপ তাহা বিচার করা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হইল। যথা:

	অবিবাহিত		বিবাহিত		বিধবা		তাল্লাকী (Divorced)	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
পল্লী অঞ্চলে	৪,৮৭৩	৩,৩০৮	৪,৩০১	৪,৪৫৮	২৭৪	১,২২৭	১১	২১
শহর ,,	১,৯৮০	১,৩৭৯	১,৫৪৭	১,৪২৮	৬৯	৩৫৪	১	৩

হিন্দুদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ প্রথা নাই। সুতরাং এই তাল্লাকীরা হিন্দু নহেন ধরিয়া লইতে পারি। যদি কেহ কেহ কোন হিন্দু আইনের ফাঁকে তাল্লাকের সুযোগ গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে তাঁহারা এত 'প্রগতিশীল' যে তাঁহাদের নামে মাত্র হিন্দু বলিয়া ধরিলে অন্যায় হইবে না। আর তাঁহারা সংখ্যায় খুব অল্প। এজন্য তাল্লাকীদের বাদ দিয়া আলোচনা করিলে আমাদের সিদ্ধান্তের কোনও গুরুতর পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে না। কিন্তু পরিসংখ্যানে তাল্লাকীদের বিদ্যমানতায় মনে হয় যে অনেকগুলি মুসলমান-পরিবারের তথ্য এই নমুনা বা sample-এর মধ্যে আছে। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানের অনুপাত শতকরা ১৯'৮ জন। বীরভূম, বাঁকুড়া, হাবড়া, ২৪ পরগণা, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরে যথাক্রমে শতকরা ২৬'৯; ৪'৪; ১৬'২; ২৫'৩; ৩৭'০ ও ৩০। সুতরাং এই নমুনার মধ্যে অনেকগুলি মুসলমান পরিবার আছে বলিয়া সন্দেহ হয় বা হওয়া যুক্তিযুক্ত।

পক্ষান্তরে বিধবাদের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া মনে হয় ইঁহারা সকলেই বা অধিকাংশ হিন্দু। মুসলমানদের মধ্যে কেহ বড় একটা বিশেষ করিয়া বিবাহের বয়স থাকিলে বিধবা থাকিতে চাহে না। এ বিষয়ে যাঁহারা বিশদ ভাবে জানিতে চাহেন তাঁহাদের টমসন সাহেব কৃত ১৯২১ সালের অখণ্ড বঙ্গের সেন্সাস রিপোর্ট পাঠ করিতে অনুরোধ করি। মোট বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা ৫,৮৪৮ জন; আর মোট বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৫,৮৮৬ জন। বিবাহিত পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা মাত্র ৫৮৮৬—৫৮৪৮=৩৮ জন বেশী। এই বেশী ৩৮ জন আকস্মিকও হইতে পারে।

বহু-বিবাহ প্রথা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে। পল্লী-অঞ্চলে বিবাহিতা নারীর যে সংখ্যাধিক্য দৃষ্ট হয় তাহার কারণ অনেকের স্বামী অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় শহর অঞ্চলে থাকেন। শহর অঞ্চলে তদ্রূপ বিবাহিত পুরুষের সংখ্যাধিক্য দৃষ্ট হয়; ইহার অর্থ অনেকে নানা কারণে স্ত্রী লইয়া সংসার করেন না বা অর্থাভাবে দেশ হইতে স্ত্রীকে আনিতে পারেন না।

অবিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রীদের মোট সংখ্যার শতকরা হিসাব সাজাইলে দেখা যায় যে:

	পুরুষ	স্ত্রী
পল্লী অঞ্চলে	৫১'৫	৩৬'৭
শহর "	৫৫'০	৪৩'৬

ইহা হইতে মনে হয় যে শহর অঞ্চলে পল্লী-অঞ্চল অপেক্ষা স্ত্রী বা পুরুষ উভয়েই অধিকতর বয়সে বিবাহ করেন। পুরুষদের বেলায় পার্থক্য ৫৫'০- ৫১'৫=৪'৫ জন; স্ত্রী-লোকের বেলায় পার্থক্য ৪৩'৬—৩৬'৭=৬'৯ জন। ইহাতে মনে হয় শহর অঞ্চলে স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স পুরুষদের তুলনায় বেশী বাড়িয়াছে। আমরা একথা বলিতেছি না যে, পুরুষ যদি গড়ে ৩০ বৎসরে বিবাহ করে তো স্ত্রীলোকেরা ৩৫ বৎসরে বিবাহ করে। পুরুষদের বিবাহের বয়স যদি ২৪ থেকে ৩০এ দাঁড়ায় অর্থাৎ ৬ বৎসর বাড়িয়া থাকে; স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স ১৪ হইতে ২৪এ দাঁড়াইয়াছে অর্থাৎ ১০ বৎসর বাড়িয়াছে। উপরি-উক্ত তথ্য হইতে আমরা এই কথা বলিতেছি না। অন্য হিসাব হইতে এইরূপ আন্দাজ করিতেছি।

এইবার আমরা বাড়ীর পরিবারবর্গের বয়সের হিসাব নিয়ে দিলাম। যথা:

	বাটির সংখ্যা	শিশু ১ বৎসরের কম		নাবালক ১-২০ বৎসর		সাবালক ২১-এর উপর	
		পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
পল্লী অঞ্চলে	৩,৬৫৮	১৮৮	১৭৭	৪,৬১২	৪,৪৯৫	৪,৬৫৯	৪,৩৪২
শহর ,,	১১৫৩	৬২	৭৩	১,৭১২	১,৬২৪	১,৮২৩	১,৪৬৭

তুলনার সুবিধার জন্য উপরি-উক্ত তথ্যগুলি প্রতি ১০০০ বাড়ী হিসাবে নিয়ে দেওয়া গেল। যথা:

	শিশু		নাবালক		সাবালক	
	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
পল্লী অঞ্চলে	৫১·৪	৪৮·৪	১২৬০·৮	১২২৮·৮	১২৭৩·৯	১১৮৬·৯
শহর ,,	৫৪·৬	৬৩·৩	১৪৮০·৫	১৪০৪·১	১৫৮১·১	১২৭২·৩

শহরে সাবালকের সংখ্যাধিক্যের কারণ শহরে রোজগারের জন্য অনেকে আসেন। ১-২০ বৎসরের নাবালকদের মধ্যেও সংখ্যাধিক্যের কতকটা কারণ লেখাপড়ার সুবিধা ও মেয়েদের বিবাহের সুবিধা। পক্ষান্তরে সাবালিকা স্ত্রীলোকের অনুপাত সাবালক পুরুষদের তুলনায় কম। ইহার কতকটা কারণ স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীর বয়স কম; আর কতকটা পল্লী-অঞ্চলে বিধবাদের সংখ্যাধিক্য।

আমাদের সমাজ এখন দ্রুত পরিবর্ত্তনের মুখে। পরিবারের সামাজিক গঠন, অর্থ নৈতিক অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে আরও বহু তথ্য সঙ্কলিত হওয়া প্রয়োজন।

প্রবাহ

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল

এ প্রবাহ শাশ্বত চঞ্চল
অবিরল
বয়ে চলে লহরে লহরে
সৃষ্টির সে আদি হ'তে—যুগে, যুগান্তরে!
সুদূরের অনাগত, সর্ব্বরিক্ত প্রলয়ের কূলে
বয়ে চলে, লাস্যে, হাস্যে চলে দুলে দুলে!
এ আনন্দ-মন্দাকিনী ধারা
বয়ে চলে—বাধাবন্ধহারা—
আদি কবি বাল্মীকির করুণার উৎসমুখ হ'তে
নিত্য—নবস্রোতে!
সে স্রোতে, যমুনা কত রঙ্গে ভঙ্গে বহে যে উজান,
মিলনে, বিরহে কত মান, অভিমান
ভেসে যায়, যায় ভেসে জাতি, মান, কুল!
কত ফুল—
স্রোতে স্রোতে ভেসে ভেসে যায় কত দেশে
শোভা করি কত কেশে, বেশে!
বেত্রবতী, শিপ্রা, রেবা, নির্ব্বিন্ধ্যার তীরে
কল্লোল গাথার গান গায় ফিরে ফিরে!
প্রবাহ বহিয়া যায়
জীবন-ধারায়—
লোক হ'তে লোকাতীত কালে!
যোগসূত্র স্মৃতিজালে
অতীত ও ভবিষ্যের চিন্তার ধারায়
মিলনের বাণী দিয়া যায়!
বয়ে যায় সুরে সুরে বাঁশরীর সঙ্গীতের তানে
প্রাণে প্রাণে
জাগাইয়া আনন্দরাগিণী—
প্রবাহ বহিয়া যায় দিবস-যামিনী!
পথ-রেখা দুর্গম বন্ধুর—
চলে যায় দৃষ্টিপারে—দূর—কত দূর!
কত কালবৈশাখীর ঝড়—
ঈশানের বজ্র কড় কড়
চকিত চিকুর হানি
পথে পথে দেয় হাতছানি!
শ্রাবণের কত কৃষ্ণ মেঘ—
অবিশ্রান্ত ধারাজলে মত্ত করে তার গতিবেগ!
শরতের হেম জ্যোৎস্না, দীপ্ত ছায়াপথ
অন্ধকারে আলো করে পথ!
অগ্নিশিখা চাপি রাখি হিমানী সে হসন্তিকায়
মঙ্গল-আরতি করে কুহেলির ধূপের ধোঁয়ায়!
বসন্ত, সাজায় তার দুটি কূল নব পত্র, ফুলে—
প্রবাহ বহিয়া যায়, মুক্তস্রোতে যায় দুলে দুলে!
জানি না এ প্রবাহের কোথা শেষ—কোথা কতদূর
মোরা শুধু তীরে বসে শুনি তার কল্লোল মধুর!

মংপুতে

ডক্টর শ্রীসুধীর নন্দী

সেদিন ২৯শে আগষ্ট—সান্ধ্য মজলিস বসেছে দার্জ্জিলিং শৈলের হ্যাভলক-ভিলায়। এই ছোট্ট পার্ব্বত্য শহরের গণ্যমান্য অনেকেই এসেছেন। এখানকার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীমণিকান্ত গুহ ঠিক আমার পাশেই সমাসীন। আগামী কাল মংপু যাবার জন্য যে অভিযাত্রীদল তৈরি হচ্ছেন মনে মনে আজ ক'দিন থেকে, ইনি হলেন তার অধিনায়ক। সঙ্গে যাবেন আরও কয়েক জন।

জলে ধোয়া চক্‌চকে পিচের রাস্তা। টায়ারগুলো গড়িয়ে চলেছে হু-হু শব্দে। নূতন গাড়ী—চলেছে ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে। অদ্ভুত এই নেপালী ড্রাইভারগুলো। প্রায়ই এরা মদ খেয়ে গাড়ী চালায়। কিন্তু কৈ, তেমন দুর্ঘটনা ত ঘটে না। দার্জ্জিলিং অঞ্চলের পার্ব্বত্য পথে এদের মোটর চালনা-কৌশল বিস্ময়কর—বোধ হয় চোখ বেঁধে দিলেও এরা ঠিকমত গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

পাহাড়ের উপর হইতে বহু নিম্নস্থ স্রোতস্বিনীর দৃশ্য

তিস্তা নদী
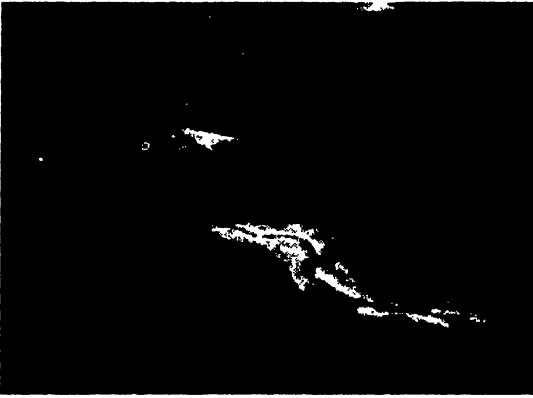
সে রাতটা ভাল করে ঘুম হ'ল না। ভোর পাঁচটার সময় উঠে দার্জ্জিলিঙের ঐ প্রচণ্ড শীতে দুর্গানাম জপতে জপতে স্নানটা ত কোন রকমে সেরে ফেললাম। তারপর চা-পান এবং দলের অন্যান্যদের আগমনের জন্য প্রতীক্ষার পালা। আকাশে তখন মেঘের ঘনঘটা। বিদ্যুদ্দামদীপ্ত আকাশ নয়—মন কালো করা গুমোটে ঢাকা আকাশ। আবার জল নামল। দার্জ্জিলিঙের বর্ষা—তার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। সাবধানী মন বললে যে, এই বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে মংপুর বিপজ্জনক পথে যাওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। বসে বসে সাত-পাঁচ ভাবছি, এমন সময় দলের অন্যান্য রথীরা এসে পড়লেন।

ঢং ঢং করে সাতটা বাজল। আমরা ছাতা ও বর্ষাতি আশ্রয় করে এসে মোটরে উঠলাম। গাড়ী ছাড়ল। আমাদের যাত্রা হ'ল সুরু। মোটর ছুটল হু-হু শব্দে। ড্রাইভার নরবাহাদুরকে অনুনয়ের সুরে বললাম, 'দেখ বাবা, এই জল-বাদলের মধ্যে অত জোরে না-ই বা চালালে।' নরবাহাদুর আমার অবস্থা দেখে নিরুত্তরে একটু হাসল। পিছন থেকে গর্জ্জন উঠল, 'ঠিক ছ, ছিটো মাসু পড়ছ।' জনৈক সঙ্গী নেপালীতে হুকুম করেছেন, আর রক্ষে নেই। ঐ বাহাদুরপুঙ্গব কি আর আমার কথা শুনবে!

এই বিশ্বাস আছে বলেই না এই বর্ষণমুখর প্রত্যূষে নরবাহাদুরের হাতে প্রাণটিকে সঁপে দিতে পেরেছি। মনটিকে বিছিয়ে দিয়েছি অনন্তসুন্দর ধরণীর অপূর্ব্ব রূপমাধুর্য্যের প্রতিটি কণায়, তার অণুতে পরমাণুতে—নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছি সেই রসধারায়। রসো বৈ সঃ—সেই রসস্বরূপেরই প্রকাশ বুঝি ঘটেছে ব্যাপ্ত চরাচরে। সকালবেলায় বৃষ্টি-ধোয়া পাহাড়ী আলো মহুয়াবনের মাদকতা আনে। তন্ময় হয়ে দেখি। বৃক্ষময় প্রকৃতি ধারাবর্ষণকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করছে—সেখানে উৎসবের সমারোহ। সে শোভা স্বর্গীয়, সে নিসর্গ-সম্পদ অনির্ব্বচনীয়। একে ব্যাখ্যা করা যায় না; এ হ'ল একান্ত ভাবে অনুভবের বস্তু।

আমরা পেশক রোডে এসে পড়েছি—এ পথটি একটু বিপজ্জনক। এখানেই কিছুদিন আগে রাজ্যপালের একান্ত-সচিবের গাড়ী নীচে নেমে গিয়েছিল—জখম হয়েছিলেন অনেকে। সে স্মৃতিটা তখনও তাজা আছে আমাদের মনে। গাড়ী চলেছে। কে একজন বললেন, 'ও মশায়, চেয়ে দেখুন, এইখানেই রাজ্যপালের সেক্রেটারির গাড়ী নীচে নেমে গিয়েছিল।' চকিত হয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। পাহাড়ের গায়ে একটা মস্ত খাদ বিরাট হাঁ করে আছে—হাজার ফুটেরও বেশী গভীর। মাথাটা ঘুরে গেল, আমাদের ড্রাইভার

হুঁসিয়ার হয়ে চালাচ্ছে। পিচ্ছিল পথ। রাস্তা এখানটায় অত্যন্ত সরু। কোন রকমে একখানা গাড়ী যেতে পারে। আমরা চলেছি অত্যন্ত-সন্তর্পণে। সর্ব্বনাশ! গাড়ীখানা ঢালু রাস্তা বেয়ে হু-হু করে নামছে—ব্রেক কষেছে ড্রাইভার। গাড়ী গড়িয়ে চলেছে—

তিস্তা ব্রিজ

ব্রেক কাজ করছে না। ড্রাইভারের হাত আর ষ্টীয়ারিং হুইল—এরাই এখন ভরসা। গাড়ী বিদ্যুদ্গতিতে আরও খানিকটা নেমে গিয়ে ধাক্কা খেল পাহাড়ি পাথরের দেয়ালে। ড্রাইভার অনন্যোপায় হয়ে হুইল ঘুরিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে পাহাড়ের গায়ে। ভুল করে বাঁ দিকে হুইল ঘোরালেই এতগুলি প্রাণীর মোক্ষলাভ হয়ে যেত সে-দিন। একটা ঝাঁকানি—তারপর গাড়ী থামল। আমরা নেমে দেখি গাড়ীর মাডগার্ড, বনেট, এগুলো তুবড়ে বিশ্রী হয়ে গেছে। ইঞ্জিনীয়ার দুর্ঘটনার কারণ খুঁজতে গেলেন। আমি একটা পাথরের উপর বসে করুণ নেত্রে ভগবানের লীলাকে প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করতে লাগলাম তাঁর এই রুদ্রতাণ্ডবের মধ্যে। দর্শনশাস্ত্রের অম্লরসে জারিত মন তখন গলতে সুরু করে দিয়েছে—বাঁচবার ইচ্ছেটা হয়ে উঠছে প্রবল। সপ্ত স্বর্গের ওপার থেকে ব্রাউনিঙের কথাগুলো ভেসে এল যেন:

"Grow old along with me
The best is yet to be"

মণিকান্ত বাবু ফিরে এলেন—চটকা ভেঙ্গে গেল। উৎস সন্ধান করে ফিরেছেন তিনি। অশিক্ষিত কুলির দল নাকি এঁটেল জাতীয় মাটি কেটে পিচের রাস্তার উপর বিছিয়ে দিয়েছিল। তার উপর বৃষ্টি পড়ায় সেই মাটির আস্তরণ ভয়াবহ ভাবে পিছল হয়ে উঠেছিল। তাই এই দুর্ঘটনা।

এখনও পরীক্ষার শেষ হয় নি। গাড়ী কাত হয়ে আছে। পাশের অল্পপরিসর নালা থেকে এখন তাকে ঠেলেঠুলে তুলতে হবে। আমার উপর হুকুম এল 'হাত লাগাও।' অগত্যা হাত লাগাতে হ'ল। তারপর আবার চলা। এ চলা পায়ে পায়ে এগিয়ে চলা নয়, বিদ্যুদ্গতিতে গড়িয়ে চলা। এর একটা মাদকতা আছে—নেশা আছে। এগিয়ে চলার নেশা লাগছে মনে, ঘোর লাগছে চোখে, তবু যেন নেশাটা জমছে না। কি জানি কিসের অভাব? আমরা নামছি তিস্তা নদীর গর্ভে। তারপর আবার উঠতে হবে ৪৫০০ ফুট উঁচুতে। এবার ড্রাইভার হুঁসিয়ার। ঘণ্টাদুয়েকের

তিস্তা ব্রিজের উপর রংপু অভিযাত্রী দল

ভিতর তিস্তার ব্রিজের উপর এসে আমাদের গাড়ী থামল। কালিম্পং শহরের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার শ্রীদেবপ্রসাদ সেন এসেছেন মণিকান্ত-বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করতে। ওদিকের রাস্তা বুঝি কতকগুলো ভেঙ্গে গেছে। আধ ঘণ্টা আগে দেখে গেছেন চকচকে রাস্তা, আধ-ঘণ্টা পরে এসে দেখলেন ধ্বস নেমেছে। রাস্তা দুরতিক্রম্য হয়ে উঠেছে। তাই এই অঞ্চলের ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোকদের অশেষ দুর্গতি। শুনলাম সেন মহাশয় নাকি কোন একটা জরুরি ব্যাপার সম্বন্ধে পরামর্শ করার জন্য কালিম্পং থেকে নেমে এসেছেন ভোর পাঁচটায় সময়। তারপর থেকে তাঁর উৎকণ্ঠাব্যাকুল প্রতীক্ষা চলেছে। যাক, এতক্ষণে তার শেষ হ'ল। ওঁরা গাড়ীর আলোচনায় মগ্ন হলেন আর আমরা তিস্তা ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে নদীর শোভা দেখে নিলাম দু'চোখ ভরে। বিশীর্ণা তিস্তা আবার যৌবন ফিরে পেয়েছে। নটীর মত নেচে চলেছে তার বিস্তীর্ণ জলের ধারা। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলায় বাজছে কল কলধ্বনির নূপুর। ছবি তোলা হ'ল। নদীর ছবি, ব্রিজের ছবি, আর আমাদের কয়েকজনের ছবি। তার পর আবার যাত্রা। দার্জ্জিলিং থেকে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার ফুট নীচে নেমেছি, এবার আরোহণের পালা। ষ্টার্টার গর্জ্জে উঠল। আমরা তিস্তার পাশে পাশে চললাম জলের মধ্যে দু'চোখ ডুবিয়ে। পার্ব্বত্য নদীর সে কি প্রাণময় উন্মাদনা! সেদিকে তাকিয়ে মনপ্রাণ ভরে উঠল শক্তির ঐশ্বর্য্যে। শক্তিমত্ত প্রাণের সে কি দুর্ব্বার গতি! কান পেতে শুনলাম তার সেই এগিয়ে চলার দুরন্ত রাগিণী:

আমি যাবো আমি যাবো কোথায় সে কোন দেশ,
জগতে ঢালিব প্রাণ গাহিব করুণাগান,
উদ্বেগ অধীর হিয়া সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব আর সে গান করিব শেষ।'

তন্ময় হয়ে আমি ঐ নদীর কলগান শুনেছি। বড় ভাল লেগেছে সেদিনের সেই গান শোনা। এমনটি আর শুনি নি।
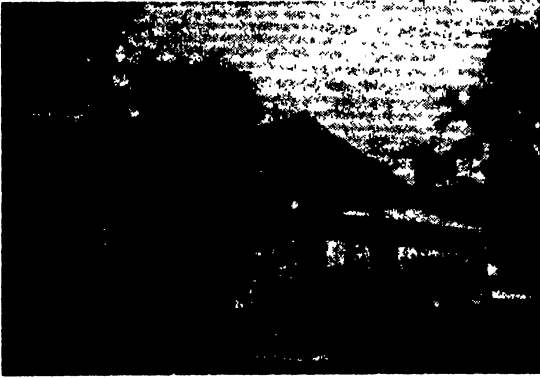
রবীন্দ্র জনকল্যাণ কেন্দ্র, মংপু

পথ ঘুরে গেল। নদী হারিয়ে গেল পাথরের আড়ালে। আমাদের বাষ্পশকট উর্দ্ধমুখী হয়ে ছুটে চলেছে। সবুজ পাথরে প্রাক্‌মধ্যাহ্নের রৌদ্রদাহ। তার একটা বিশেষ প্রাণমাতানো আকর্ষণ আছে। সেদিকে তাকিয়ে বসে আছি! গাছে গাছে ধূসর পাথর রসময় হয়েছে, প্রাণময় হয়েছে। সেখানে আলোছায়ার ঝিকিমিকি খেলা। ধুবি গাছের জঙ্গল—নীচে কালো ছায়া, উপরে আলোর মাতামাতি। প্রায় মংপুর কুইনিন এলাকায় এসে পড়েছি। 'হাওয়াটা একটু তেঁতো তেঁতো লাগছে যে হে!'—মন্তব্য করলেন এক জন। আর এক জন বললেন, 'তা লাগুক, গাঁয়ের ছেলে তুমি, ম্যালেরিয়ার ডিপো। এবার তোমার ম্যালেরিয়া প্রভু পালাবেন—মা ভৈবী।' এই অভয় বাণী বিশেষ ফলপ্রসূ হ'ল না। বিপদ এল আর এক দিক থেকে। পথের বাঁক ঘুরে আমরা দেখি যে পথ জুড়ে একটা গাছ পড়ে আছে, আর একটি পাহাড়ী মেয়ে কুড়ুল দিয়ে সেই গাছটাকে কাটছে। কি কাণ্ড! এখন মোটর যায় কোন্ পথে? তীরে এসে বুঝি-বা তরী ডোবে! কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মুশকিল আসান হ'ল। ড্রাইভার নরবাহাদুরের আদেশে মেয়েটি অবলীলাক্রমে গাছটি সরিয়ে ফেলল রাস্তার এক পাশে। ওটা মহীরুহ না হলেও নিতান্ত ছোট গাছ নয়। সমতলের চার-পাঁচ জন মরদের মেহনত লাগত ওটিকে সরাতে।

গাড়ী চলেছে পাহাড়ী পথ ধরে। নানান ধরণের গাছ—ফুল ফোটানোরও বিরাম নেই। সে শোভা দেখার জন্য কোন মানুষের চোখ সেখানে নেই—কোন মানুষের মনও সেখানে নেই তাদের 'সুন্দর' বলতে। সঙ্গে বোটানির ছাত্র ছিল। তার কাছে নামগুলো শিখে নিলাম—অরোকেরিয়া, জ্যাবরেণ্ডী, ইপিকাক, চেরী, এজেলিয়া এবং আরও কত নাম এদেরই গোত্রের।

শ্রীসুধাময় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাংলোতে গিয়ে আমরা আতিথ্য গ্রহণ করলাম। ইনি পশ্চিমবঙ্গের ম্যালেরিয়াত্রাণ কুইনিন বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা। বড় যত্ন করেছিলেন ভদ্রলোক, ওঁর আতিথ্য ভোলবার নয়। গিয়ে শুনলাম ওঁর ছোট মেয়ে মীনুর

মংপুতে আমরা

জন্মদিন। দলে আমাদের কবি ছিলেন। তাঁর নিকট গৃহকর্ত্তার অনুরোধ জানালেন এসে—কবিতা রচনা করতে হবে। অমনি কবি মুখে মুখে কবিতা বানালেন। তার আরম্ভটা এইরূপ:

"মীনু,
ছন্দোময়ী ছোট্ট মেয়ে তুমি,
নদীর জলে হারিয়ে যাওয়া শ্যামল তটভূমি।
ভুবন ভরা ভালোবাসার মোহ
দুটি চোখে কাজল এ কে এলে।..." ইত্যাদি

কবি কবিতা রচনা করলেন, পুরস্কার মিলল ইতর জনের ভূরি-ভোজনে। তারপর ঘুরে ঘুরে দেখা। কবিগুরুর স্পর্শপূত পাহাড়ী গ্রাম মংপু সেন-দম্পতির কল্যাণে সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে রইল। মংপুর সিঙ্কোনা-চাষের পরিচয়টা ঢেকে গেছে এই মহত্তর পরিচয়ে। এখানে ওখানে সিঙ্কোনা গাছের ছাড়িয়ে নেওয়া ছাল শুকোচ্ছে। সেগুলো থেকে কুইনিন প্রস্তুত হয়। যন্ত্রপাতি সবই আছে সেখানে। কারখানা চলছে—দেশ থেকে ম্যালেরিয়া দূর করার জন্য তার অঙ্গীকার নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে। ভাল লাগল মানুষের এই অক্লান্ত প্রয়াস—রোগকে জয় করবার এই দুরূহ সাধনা। ওখান থেকে চললাম মংপুর জলসরবরাহের বন্দোবস্ত দেখতে। দুটি বড় বড় চৌবাচ্চাতে জল সংগৃহীত হচ্ছে পাহাড়ী ঝরণা থেকে। তাকে পরিশ্রুত করা হয় নামমাত্র—তার পর সেই জল ব্যবহার করা হয়। আবার দেখি পানীয় জলের সেই চৌবাচ্চায় নেপালী ছেলেদের যথেচ্ছ সন্তরণক্রীড়া। ওরা নাকি স্বাস্থ্যরক্ষার এ সব আইন-কানুন মানে না। ভগবানের দেওয়া স্বাস্থ্যসম্পদ ওদের এত বেশী যে আইনের বেড়া দিয়ে তাকে কৃপণের ধনের মত সঞ্চয় করা ওদের ধাতে নেই।

সারা দিন ঘুরলাম মংপুর পথে পথে। রবীন্দ্রনাথের পাদস্পর্শধন্য মংপু—সেই তীর্থে আমাদের পরিক্রমা চলল। ঘুরতে ঘুরতে এলাম

রবীন্দ্রনাথের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত জনকল্যাণকেন্দ্রে—'রবীন্দ্র ওয়েলফেয়ার সেণ্টারে'। কবির নানান্ টুকরো স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল এই ছোট আবাসগৃহে এসে ধন্য হ'লাম। কবির ব্যবহৃত শূন্য চৌকিখানি দেখে মনে পড়ে গেল ওঁর শূন্য চৌকি কবিতাটির কথা। কর্ত্তাদের বললাম ঐ কবিতাটি একটি বড় কাগজে সুন্দর করে লিখে কবির ব্যবহৃত ঐ চৌকিটির ওপর স্থাপনা করতে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করছে—নানা ধরণের খেলা। 'শিশু ভোলানাথের' কবির স্পর্শপূত পুণ্যতীর্থে ছেলেরা খেলা করছে—বড় ভাল লাগল। বাইরে কবির আমলের বৃক্ষবন্ধুরা আনমনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন বাউলের একতারা বাজাচ্ছে। মন উদাস হয়ে যায়। সযত্নে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে যুক্তকরে নিবেদন করি :

'হে মানব তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি—'

তখন সান্ধ্য-গগনের প্রত্যন্তসীমায় হয়ত নিশীথের অভিসার সুরু হয়েছে। ধ্যানাশ্রিত আমি, মহাকবির বিরাট ব্যক্তিত্বের অশরীরী ছায়ায় প্রচ্ছন্ন। বন্ধুদের কোলাহলে ধ্যান ভাঙ্গল। এখুনি নাকি যাত্রা করতে হবে—তারই ঘোষণা। এসে মোটরে উঠলাম। গাড়ী ছাড়ল। এবার ফেরবার পালা।

গাড়ী নামছে। চোখ ধাঁধানো আলো পড়ছে পাহাড়ী পথ আর বনজঙ্গলকে আলোকিত করে। উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি সুরু করলাম। বাধা পড়ল—আবৃত্তি থামাবার জন্য নির্দ্দেশ এল। শুনলাম যে মনুষ্যকণ্ঠের কোলাহল শুনলে বন্য জন্তুদের আবির্ভাব হবে না। আমরা কথা না বললে ওরা দর্শন দিলেও দিতে পারে। অগত্যা চুপ করলাম। গাড়ী চলছে—যন্ত্রের সঙ্গীত-মুখরিত বনপথ আলোর বন্যায় প্লাবিত। হঠাৎ দেখি একটা সাদা খরগোশ চলেছে গাড়ীর সামনে সামনে। মোটরের হেডলাইটের আলো তার গায়ে পড়েছে। ওরা নাকি এইভাবে আলোর পথ ধরে চলে। কি ভাগ্য! আমার শিকারী বন্ধুরা সঙ্গে করে দু'একটি মারণাস্ত্র আনেন নি—তাই সেদিন মানুষের কুৎসিত লোভ আর আত্মপ্রকাশ করতে পারল না। মিনিটকয়েক খরগোশটা চলল আমাদের আগে আগে, তারপরে পাশের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। আমরা নিঃশব্দে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে পরস্পরের দিকে তাকালাম। আমাদের বক্তব্য—যেন এমনটি ত আর দেখি নি। গাড়ী তখন নামছে তিস্তা নদীর গর্ভের দিকে। পথের দুধার বনজঙ্গলে সমাকীর্ণ। একটু পরেই এল একটা ছোট হরিণ—অভাবনীয়ের 'কচিৎ কিরণে দীপ্ত।' আলোর পথ ধরে কিছুক্ষণ চলল সে। তারপর ঘুরে দাঁড়াল মোটরের দিকে। বড় বড় চোখে আলো পড়ল—সরল বিশ্বাস জ্বলে উঠল মোটরের ঝাঁঝালো আলোয়। রণে ভঙ্গ দিল হরিণশিশু, পালিয়ে গেল জঙ্গলে। আবার দুর্গম পথে আমাদের নিঃশব্দ অভিযান। তখন তারায় তারায় নিদ্রাবিহীন গগনতলে আলোর মাতামাতি চলেছে। কয়েকজন আমরা শুধু অতন্দ্র সাক্ষী সেদিনের বহ্ন্যুৎসবের, প্রকৃতি ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। স্থবির বনভূমির চেতনা তন্দ্রাচ্ছন্ন। আমরা নিঃশব্দে চলেছি, কারও মুখে কথা নেই। বাইরে বনবাণী নিরুদ্ধ; কার যেন আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করছে বনভূমি। একটা অশরীরী সত্তার উপস্থিতি যেন অনুভূতি দিয়ে পাচ্ছি। নিস্তব্ধ গাছগুলো শির আন্দোলিত করছে, নিশির ডাক ইসারায় এসে পৌঁছচ্ছে হিম হয়ে যাওয়া মনের মর্ম্মস্থলে। চেতনা ক্রমেই নিঃসাড় হয়ে পড়ছে। অসাড় হয়ে আসছে অনুভূতি-কেন্দ্রগুলো একটা অতীন্দ্রিয় সচেতনতার প্রভাবে। আর পারলাম না—মুখ খুললাম। সবাই নড়ে চড়ে বসল। সকলেই যেন এটা চাচ্ছিল। সবাই কথা বলতে উৎসুক। কলরব উঠল। কোলাহল-চকিত করে তুলল স্বপ্নময় বনপথ। কিছুক্ষণ অকারণ পুলকে সবাই মুখর হয়ে উঠল। তারপর এল গানের পালা। ঈথারতরঙ্গে সুর-তরঙ্গ উচ্ছল হয়ে উঠল :

"হিমের রাতে ঐ গগনের দীপগুলিরে
হেমন্তিকা করল গোপন আঁচল ঘিরে।"

একটার পর একটা গান। সুরের বন্যা বয়ে চলেছে। গাড়ীটাও হু হু করে ছুটে চলেছে। দার্জিলিং আর বেশী দূরে নেই। মংপু ছেড়ে এসেছি অনেকক্ষণ।*

* এই প্রবন্ধের ছবিগুলি শ্রীকৃষ্ণা সেনগুপ্তা কর্ত্তৃক গৃহীত

বসন্তে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আজি এলো মধুমাস। পলাশে, শিমুলে,
পুষ্পিত কাঞ্চনে আর সজিনার ফুলে
দিক হতে দিগন্তরে আসিল ফাল্গুন।
পুষ্পে পুষ্পে সারাবেলা শুনি গুন্ গুন্
মধুমক্ষিকার। ভাসে দখিনা পবনে
বাতাবী ফুলের গন্ধ। বসন্তের বনে
এলো পিক গন্ধহীন শিমুপার হতে
আম্রমুকুলের লোভে। প্রভাত-আলোতে
নানা রঙা ডানা মেলি উড়ে প্রজাপতি।
পাখীদের কাকলির নাহিকো বিরতি।
কিশলয়ে কিশলয়ে প্রাণের স্পন্দন—
যে-প্রাণ মৃত্যুর ঊর্দ্ধে জাগে চিরন্তন।
হে বসন্ত! করিও না বঞ্চিত আমারে!
প্রাণের ভিখারী হয়ে এসেছি দুয়ারে।

বিজ্ঞানাচার্য্য ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

"সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন—"

অর্দ্ধ শতাব্দী কাটিয়া গেল, ১৯০৪ অব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী—১৩১০ সালের ১১ই ফাল্গুন তারিখে স্বনামধন্য বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এম্-ডি, ডি-এল্, সি-আই-ই, দেহত্যাগ করেন। কিন্তু আজিও বাংলার সেই বরেণ্য সন্তানের স্মৃতি জাতির অন্তরে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমানে বিংশ-শতাব্দীর মধ্যভাগে উপনীত হইয়া আমরা সকল ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব প্রভাব উপলব্ধি করিতেছি। কিন্তু ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা মনীষী মহেন্দ্রলাল পঁচাশী বৎসর পূর্ব্বেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞানের সহায়তা ব্যতীত এই অধঃ-পতিত দুঃখ ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট ভারতের উন্নতির কোন আশা নাই।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৬৯ অব্দের "ক্যালকাটা জার্ণেল অব মেডিসিন" নামক স্বসম্পাদিত পত্রিকায় 'বিজ্ঞান-চর্চ্চার একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনার আবশ্যকতা' বিষয়ে এক সুচিন্তিত ও যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটি বহু শিক্ষিত দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার পর ছয় বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত চেষ্টার দ্বারা, ধনী ও রাজন্যবর্গের এবং সহানুভূতিসম্পন্ন সুধী বন্ধু-বান্ধবের সহায়তায় ডাঃ সরকার তাঁহার একান্ত আকাঙ্ক্ষিত "ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা" (Indian Association for the Cultivation of Science) স্থাপনে কৃতকার্য্য হন। তখন ইউরোপের সকল দেশেও এইরূপ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় নাই। "বিজ্ঞান-সভা" স্থাপনার পর প্রায় আশী বৎসর অতীত হইয়া গেল। এখন এই প্রতিষ্ঠানের ও প্রতিষ্ঠাতার নাম বিজ্ঞান-জগতের সর্ব্বত্র বিদিত। "ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা"র গবেষণাগারেই স্বীয় পরীক্ষালব্ধ সাফল্যে বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার সি. ভি. রমণ এফ্-আর-এস সম্মান এবং নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনিই সমগ্র এশিয়ার মধ্যে প্রথম নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক।

বর্ত্তমানে ডাঃ সরকার-প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-সভাকে কলিকাতার কেন্দ্রস্থল হইতে শহরতলি যাদবপুরে অতি বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর স্থাপিত নবনির্ম্মিত এক বিরাট ভবনে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। দেশবিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদ্বয় স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডি.এসসি, ও অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, এফ-আর-এস, ইহার কর্ণধার এবং বহু কৃত-বিদ্য বৈজ্ঞানিক ও উৎসাহী ছাত্র বিভিন্ন বিভাগের গবেষণাগারে কর্ম্মে নিরত রহিয়াছেন।

মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নবেম্বর তারিখে হাওড়া শহরের নয় ক্রোশ পশ্চিমস্থ পাইকপাড়া গ্রামে কৃষিজীবী সদ্‌গোপ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাতাপিতার প্রথম সন্তান। মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে মহেন্দ্রলালের পিতৃবিয়োগ হয় এবং নয় বৎসর বয়সে তাঁহার মাতাকেও হারাইতে হয়। কলিকাতার নেবুতলায় মাতুলদের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি পল্লীস্থ এক পাঠশালায় শিক্ষারম্ভ করেন, পরে হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হন। তখন ঐ স্কুল অবৈতনিক ছিল। মহেন্দ্রলাল ১৮৪৯ পর্য্যন্ত হেয়ার স্কুলের ছাত্র ছিলেন, তৎপরে জুনিয়ার বৃত্তি লাভ করিয়া হিন্দু কলেজে (পরে, প্রেসিডেন্সী কলেজ) প্রবেশ করেন। মহেন্দ্রলাল হিন্দু কলেজে অধ্যাপকদের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন এবং সিনিয়র বৃত্তিও লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ফলিত বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি একান্ত আগ্রহ হওয়ায় তিনি উক্ত কলেজ ত্যাগ করিয়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন।

মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশলাভের পর ১৮৫৫ অব্দে মহেন্দ্রলাল বিবাহ করেন। ১৮৬০ অব্দে তাঁহার একমাত্র পুত্র অমৃতলালের জন্ম হয়। মহেন্দ্রলাল ১৮৬০ সনে কৃতিত্বের সহিত এল-এম-এস পাস করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি বহু পদক, পুরস্কার ও বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক ডাঃ ফেরার জেদ করায়, মহেন্দ্রলাল ১৮৬৩ সনে এম-ডি পরীক্ষা দেন এবং সাফল্যমণ্ডিত হইয়া এম-ডি উপাধি লাভ করেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় এম-ডি। তাঁহার পূর্ব্বে মাত্র আর একজন ঐ উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

উক্ত বৎসরেই কলিকাতায় 'ব্রিটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েসন'-এর বঙ্গ-শাখা স্থাপিত হয় এবং তাহার উদ্বোধন সভাতে ডাঃ সরকার হোমিওপ্যাথির নিন্দা করিয়া একটি বক্তৃতা করেন। তিনি প্রথমে এই শাখা-সভার সম্পাদক এবং তিন বৎসর পরে সহ-সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

উদ্বোধন সভায় হোমিওপ্যাথির বিশেষ অনুরাগী এক জন বিশিষ্ট নাগরিক রাজেন্দ্র দত্ত উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, যদি ডাঃ সরকারের মত পরিবর্ত্তন করাইতে পারা যায় তবে তাঁহার দ্বারাই এদেশে হোমিওপ্যাথির আদর-বৃদ্ধি সম্ভবপর হইবে। রাজেন্দ্রবাবুর যুক্তিতর্কে কিন্তু কোন ফল হইল না। ডাঃ সরকার রাজেন্দ্রবাবুকে বলিলেন, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার দ্বারা তিনি যে সকল রোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন, তাহা পথ্যাপথ্যের কঠোর নিয়মের বলেই সফল হইয়া থাকিবে।

এই সময় কোন পত্রিকার পক্ষ হইতে এক জন বন্ধু ডাঃ সরকারকে "মর্গানস্ ফিলোজফি অব হোমিওপ্যাথি" নামক পুস্তক-খানির সমালোচনা করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তিনি সহজেই ইহাতে সম্মত হন। ডাঃ সরকার মনে করিয়াছিলেন যে, এইবার তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রথার অযৌক্তিকতা উদ্‌ঘাটিত করার

একটা সুযোগ পাইলেন। কিন্তু পুস্তকখানি প্রথমবার পাঠ করিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, হোমিওপ্যাথি প্রথা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ না করিলে, উহার ঠিকমত সমালোচনা করা চলিবে না। তিনি রাজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে সঙ্গে রোগীদের বাড়ী যাইয়া তাঁহার চিকিৎসা-পদ্ধতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই ডাঃ সরকার বুঝিলেন যে, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রথায় সত্য রহিয়াছে এবং এলোপ্যাথি চিকিৎসকেরা যে এতকাল ধরিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রথা অবলম্বনকারীদের একরূপ সমাজচ্যুত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা একান্ত গর্হিত কার্য্য।

মত পরিবর্ত্তিত হওয়ার পর, ডাঃ সরকার 'ভেষজ সম্বন্ধে 'চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অনিশ্চয়তা' শীর্ষক একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ইহার ফলে এলোপ্যাথিক চিকিৎসক সমাজ হইতে তাঁহাকে সমাজচ্যুত হইতে হয়।

১৮৬৮ অব্দের জানুয়ারী মাস হইতে ডাঃ সরকার 'ক্যালকাটা জর্ন্যাল অফ মেডিসিন' নামক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি ইহার পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন।

১৮৭০ সনের ডিসেম্বর মাসে ডাঃ সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদস্য মনোনীত হন এবং তাঁহাকে 'ফ্যাকাল্টি অফ আর্টসে' স্থান দেওয়া হয়। ইহার আট বৎসর পরে, ১৮৭৮ সনে সিনেটের বার্ষিক মিটিং-এ একটি প্রস্তাবের বলে তাঁহাকে 'ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিনে'র সদস্য করা হয়। কিন্তু এলোপ্যাথিক চিকিৎসক সদস্যগণ ইহাতে ঘোরতর আপত্তি করেন। এই আপত্তির উত্তর দিয়া ডাঃ সরকার অতি যুক্তি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে দুইখানি পত্র লিখেন তাহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। ১৮৮৩ অব্দে ডাঃ সরকারকে সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১৮৮৭, জানুয়ারীতে ডাঃ সরকার বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন। ১৮৯৩ সনে চতুর্থ বারের জন্য পুনর্নির্ব্বাচিত হওয়ার অল্পকালের মধ্যেই তিনি উক্ত পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

১৮৮৭ সনের ডিসেম্বর মাসে ডাঃ সরকারকে কলিকাতার সেরিফ নিযুক্ত করা হয়। সেরিফ থাকা-কালে তিনি যে তেজস্বিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তখনকার দিনে একরূপ কল্পনাতীত ছিল। ডাঃ সরকার একজন রাজভক্ত প্রজা ও শান্তি-শৃঙ্খলার সবিশেষ পক্ষপাতী হইলেও সেরিফ হিসাবে ভারতের বড়লাট লর্ড ডাফরিনকে অভিনন্দন দিতে অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "বর্ম্মার ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ডের জন্যে কি তাঁকে অভিনন্দিত করতে হবে?" বর্ম্মাযুদ্ধ জয়কে তিনি ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ড বলিতে দ্বিধা-বোধ করেন নাই।

ডাঃ সরকার ১৮৯৮ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনারারি ডি-এল উপাধি প্রাপ্ত হন।

চার বৎসরকাল (১৮৯৩-৯৭) ডাঃ সরকার 'ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস'-এর সভাপতি ছিলেন। দশ বৎসর ধরিয়া সিণ্ডিকেটের সদস্য থাকার সময় ভাইস-চ্যান্সেলারের অনুপস্থিতিতে সাধারণতঃ তিনিই সভাপতিত্ব করিতেন। সে সময় প্রথম দেশীয় ভাইস-চ্যান্সেলার নিয়োগের কথা উঠিলে অনেকেই আশা করেন যে, ডাঃ সরকারই উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হইবেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট একজন বেসরকারী ব্যক্তিকে উক্ত পদ না দিয়া হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ভাইস-চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত করেন।
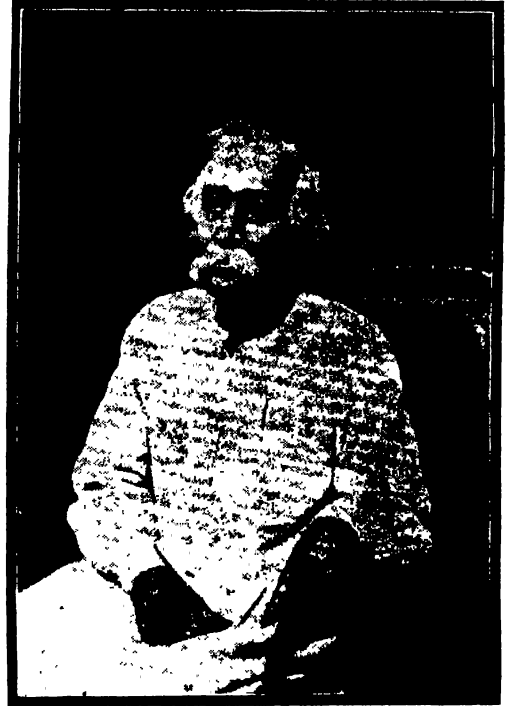
ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার
[মৃত্যুর চারি মাস পূর্ব্বে গৃহীত ফটো হইতে

ডাঃ সরকার বহু বৎসর ধরিয়া 'এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল'-এর কাউন্সিলের সদস্য এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সোসাইটির প্রতিনিধি হিসাবে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের একজন ট্রাষ্টি ছিলেন।

ডাঃ সরকার 'ব্রিটিশ এসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স'-এর আজীবন সদস্য এবং 'আমেরিকান ইনষ্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথি' ও 'ব্রিটিশ হোমিওপ্যাথিক সোসাইটি'র করেসপণ্ডিং সদস্য ছিলেন।

ডাঃ সরকার চার বার কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। যখন তিনি মেডিক্যাল কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, তখন শব-ব্যবচ্ছেদকালে প্রাপ্ত ক্ষত হইতে উৎপন্ন সেপ্‌টিক্ জ্বরে দুই মাস-কাল ভুগিয়াছিলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে তাহা হইতে আরোগ্য লাভ করেন। দ্বিতীয় বার হুগলী জেলায় ডুমুরদহ-বলাগড়ের মধ্যস্থিত একটি

গ্রামে জ্বররোগীর চিকিৎসা করিতে গিয়া নিজেই জ্বরাক্রান্ত হন এবং ইহার ফলে তাঁহাকে চার বৎসর কাল কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

১৮৭৪ সন পর্যন্ত ডাঃ সরকারের স্বাস্থ্য একরূপ ভালই ছিল। কিন্তু ঐ সময় সদ্যক্রীত একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা অনবরত নভঃস্থল পরিদর্শনে ব্যাপৃত থাকায় তিনি হাঁপানী (Asthma) রোগে আক্রান্ত হন। এই রোগ হইতে তিনি কখনও একেবারে মুক্তি পান নাই।

১৮৭৫ সনে পাণ্ডুয়ায় একটি রোগীর চিকিৎসা করিতে গিয়া তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন। এবার তাঁহার রোগ এত প্রবল হয় যে, তাহার জীবন সংশয় হইয়া উঠে। তিন বৎসর কাল ধরিয়া তিনি এই জ্বরে ভুগিয়াছিলেন।

দুই বার ম্যালেরিয়া জ্বরের তীব্র আক্রমণের ফলে এবং হাঁপানীর জন্য ডাঃ সরকারকে আহার গ্রহণের মাত্রা বিশেষ ভাবে কমাইতে হইয়াছিল।

একজন বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে ১৮৯৬ সনের নভেম্বর মাসে ডাঃ সরকারকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রিন্স ফেরোকসাহকে চিকিৎসা করার জন্য টালিগঞ্জে যাইতে হয়। টালিগঞ্জ অঞ্চল সে সময় বিশেষ ভাবে ম্যালেরিয়া-দুষ্ট ছিল। চতুর্থ দিন সেখানে যাওয়ার পর তিনি আবার ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন। এই শেষ বারের আক্রমণ হইতে তিনি আর কখনও একবারে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই।

ডাঃ সরকার এম-ডি পাস করার পর তাঁহার ফি ৪৲ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১০৲ টাকা করেন। ১৮৭৪ অব্দের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে উহা ১০৲ টাকা হইতে ১৬৲ টাকা এবং ১৮৯৭ অব্দে হাঁপানীতে আক্রান্ত হওয়ার পর ১৬৲ টাকা হইতে ৩২৲ টাকা করিয়াছিলেন। ১৯০১, জানুয়ারী হইতে অসুস্থতাহেতু ডাঃ সরকার বাহিরে যাইয়া রোগী দেখিতে অক্ষম হন। তখন হইতে রোগীরা তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া ৫০৲ টাকা, এমন কি ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ফি দিয়া ব্যবস্থা লইতেন। সর্ব্বশেষে এত ফি লইয়া ব্যবস্থা দেওয়াও তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করিতে হইয়াছিল।

ডাঃ সরকারের ৭০ বর্ষ পূর্ণ হওয়ায়, তাঁহার ৭১ বর্ষে পদার্পণ (২রা নভেম্বর ১৯০৩) উপলক্ষে, রবিবার ৮ই নভেম্বর তারিখে একটি উৎসবের আয়োজন করা হয়। তাঁহার পরিবারবর্গ এবং প্রিয় ছাত্রবৃন্দ বাংলা ও ইংরেজী কবিতা পাঠ করিয়া, উৎসবের জন্য বিশেষ ভাবে রচিত গান গাহিয়া ডাঃ সরকারের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। সেদিন সকলে তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়াছিলেন।

বিধির অমোঘ বিধানে, উক্ত জন্মোৎসবের চারি মাসের মধ্যে, ১৯০৪ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারী (১১ই ফাল্গুন ১৩১০ সাল) মঙ্গলবার প্রত্যুষে পুরুষসিংহ ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার নশ্বর দেহত্যাগ করিয়া, জন্মভূমিকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অমরধামে চলিয়া যান।

ডাঃ সরকারের মূর্ত্তি ছিল সৌম্য, কতকটা ভীমকান্ত। মুখ প্রতিভা ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক, তাহাতে অসাধারণত্বের ছাপ ছিল। দেখিলেই মনে হইত তিনি সাধারণ লোক নহেন। তিনি ছিলেন তেজস্বী, তেজ ও সৌন্দর্য্য মেঘ ও রৌদ্রের ন্যায় তাঁহার দেহশ্রীতে যেন খেলিয়া বেড়াইত।

একাধারে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যসেবী চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ডাঃ মহেন্দ্রলালের মত খুব কমই দৃষ্ট হয়। বাইবেল ছিল তাঁহার প্রিয় পাঠ্য। সাহিত্য হিসাবে সেক্সপীয়র হইতে কিপলিং পর্য্যন্ত সকলের লেখাই তিনি সাহিত্যিকের ন্যায় অতি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতেন। বাংলা সাহিত্যের ভাল নূতন বই বাহির হইলেই তিনি তাহা আনাইয়া পাঠ করিতেন।

ডাঃ সরকার ছিলেন নিষ্ঠাবান্ ও সত্যানুরাগী। তিনি জানিতেন, ভগবান সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সত্য সকলের অপেক্ষা শক্তিশালী এবং সত্যেরই শেষ জয় অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রসঙ্গে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের নাম প্রায়ই শুনা যায়। এক সময় তিনি ভক্তদের গান শুনিয়া কোনরূপ উচ্ছাস প্রকাশ না করায়, ভক্তগণ পরমহংসদেবকে বলেন —"ডাক্তারটি বড় কঠোর লোক, এমন পাষাণ-গলান গান ও উপদেশ শুনে চুপ করে থাকে।" ইহা শুনিয়া পরমহংসদেব উত্তর দিয়াছিলেন—"ডোবায় হাতী নামলে জল তোলপাড় করে। কিন্তু সাগরে হাতী নামলে সাগর জানতেই পারে না। ডাক্তারের হৃদয়টা সাগরের মত বিশাল যে!"

এই অমূল্য বাণীর উপর আর কোনরূপ মন্তব্য অনাবশ্যক।
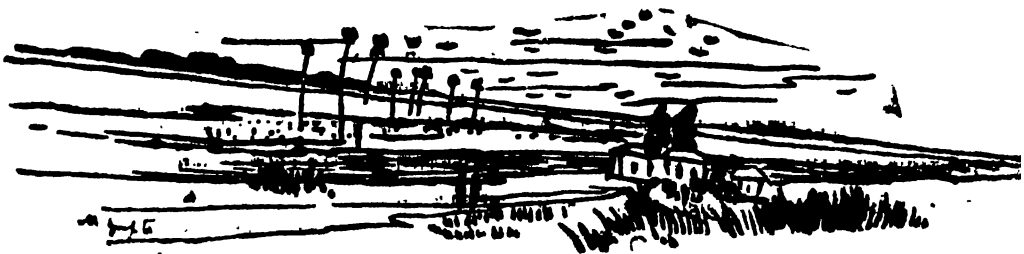
প্রভাত-সূর্য্য

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

বিহারের আকাশে সূর্য্য উঠল।

গাড়ীটা এসে পৌঁছল অনেক দেরিতে। শুনলাম—ছ' ঘণ্টা লেট। প্লাটফরম ছাড়িয়ে কাঁচা ঘাসের বুকে পা দিয়ে একবার যুক্ত কর কপালে স্পর্শ করে উচ্চারণ করলাম, 'ওঁ জবাকুসুম-সঙ্কাশং—'

বরেন ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছে।

পাশেই ষ্টেশনের সদরে ঢুকবার গেট। সোজা পথে ঘুরে না এসে 'সর্ট কাট' করেছি আমরা ছোট একটা তারের বেড়া ডিঙিয়ে। সদর গেটের সামনেই প্রকাণ্ড একটা গোলাকৃতি কাঠের প্লাভের গায়ে মোটা মোটা লাল হরফে লেখা—'কশন্', অর্থাৎ—সাবধান।

বরেন বলল, 'পা চালা, বড্ড চা-তেষ্টা পেয়েছে।'

বললাম, 'আর কত চালাব, এই কি কম?'

কিন্তু বেশী-কম বুঝবার মানুষ নয় বরেন। সমস্ত দেহটাকে নানাভাবের পরিচ্ছদে আবৃত করে নিয়েছে সে। শীতের কুয়াশায় চারদিক আচ্ছন্ন। মেঘের মত স্তরে স্তরে কুয়াশা জমে আছে কাছাকাছি ছোট ছোট পাহাড়গুলির গায়ে। চোখ ফেরে না সে-দিকে তাকালে। কিন্তু বরেনের তাগিদটা একটু কড়া। শীতবস্ত্র বলতে মোজা ত দূরের কথা, সামান্য একটা মাফলারও সঙ্গে নিয়ে আসি নি। হয়ত একটু জড়তাই এসে থাকবে! অবস্থাটা আমার ঠিক বরেনের বিপরীত। কিন্তু সারা রাত ট্রেনে যাত্রীদের অসম্ভব ভিড়ে শম্বুকের মত যেভাবে সঙ্কুচিত হয়ে ছিলাম, কাঁচা ঘাসের বুকে পা দিয়ে এতক্ষণে যেন আবার একটু জীবন ফিরে পেয়েছি বলে মনে হ'ল। একটু একটু করে সূর্য্য উঠে রোদের টুকরো ছড়িয়ে পড়ছে পথে। চারদিকে মাথা উঁচিয়ে আছে ছোট ছোট পাহাড়। রোদ পড়ে চিক্‌চিক্ করছে পাহাড়ের চূড়াগুলো। সত্যিই কি চোখ ফিরতে চায়?

শিশিরসিক্ত কাঁচা ঘাসের বুকে পায়ের দাগ কেটে কেটে এগিয়ে চললাম দু'জনে।

আধাপথে হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বরেন।—'এই সেরেছে!'

—'কেন, কি ব্যাপার?'

গম্ভীর গলায় বরেন বলল, 'টর্চটা ট্রেনে ফেলে এসেছি।'

মনের উপর কেন যেন কথাটা বড় বেশী রেখাপাত করল না। বললাম, 'খুট পথে সব সময় ছটপুট করলে এই অবস্থাই হয়। দুঃখ কি, বড়লোক আছিস, পুরনো গেছে, এবারে আবার নূতন একটা হবে।'

স্পষ্ট বুঝতে পারলাম—কথা শুনে চটে গেছে বরেন। ঐসব মুহূর্তে বন্ধুবাৎসল্য তার একেবারেই কম। বারকয়েক তাকাল সে প্লাটফরমের দিকে। কিন্তু ততক্ষণে প্লাটফরম ছাড়িয়ে ট্রেন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। শুধু ইঞ্জিনের একরাশ ধোঁয়া বায়ুমণ্ডলে উড়ে বেড়াচ্ছে।

সূর্য্য উঠছে একটু একটু করে। খানিকবাদেই কুয়াশা কেটে যাবে। পরিষ্কার দিনের আলোয় বিহারের এই খণ্ড খণ্ড কাঁকড় বিছানো মাটি একটু একটু করে গরম হয়ে উঠবে। এই ঝুমরী-তিলাইয়ার মত কত পথ মুখরিত হয়ে উঠবে বাইসিকেল, গো-শকট আর পণ্যজীবীদের অবিরাম গতিতে!

সুষুপ্ত ঝুমরীতিলাইয়া একটু একটু করে জাগছে। নামটা কবে কে রেখেছিল, কি জানি! কার ঝুমরী কবে এপথে এসে হারিয়ে গেছে, কত তিলে তর্পণ হয়েছে একদিন এখানে—সে সব কথা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। আজ আর ইতিহাস তার সাক্ষী দেয় না। ঝুমরীতিলাইয়ার ইতিহাস রচনা আজ হয়ত আবার নূতন করে সুরু হচ্ছে!

রাস্তায় উঠে খানিকটা ডান পাশে মোড় ঘুরতেই কলোনী পেলাম। বরেনের বোন বাণীর শ্বশুরবাড়ী এই দিকটাতেই। বাণীর বরের সঙ্গে প্রথম আলাপ আমার মেটিয়াবুরুজে। শঙ্কর ঘোষ: মাথার সামনের দিকে কিছু টাক, পিছনের চুলগুলো অনেকটা আমার মতই খাড়া-খাড়া; কিন্তু লোকটি একেবারে সাদা-সিধে। চমৎকার হাসিখুশী মানুষটি। এক বছরে ম্যাট্রিক দিয়ে এক বছরেই কলেজে ভর্ত্তি হই আমরা। দু'জনেই অধুনাতন পূর্ব্ব-পাকিস্থানের উপদ্রুত মানুষ। মেটিয়াবুরুজে বসেই এ সব কথা একদিন আলোচনা-প্রসঙ্গে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল আমাদের মধ্যে।

বাসায় ঢুকেই প্রথম সম্ভাষণে হাঁক দিয়ে উঠল বরেন, 'খুব কড়া করে ডবলকাপ চা চাই আগে, তারপর কথা।'

গলার আওয়াজ শুনেই স্তম্ভিত সকলে। একেবারে বাঘ-ভালুক পড়ে নি বাড়ীতে, রীতিমত চেনা-জানা মানুষটা। আমি এই প্রথম এলেও বরেন এর আগে এসে গেছে এখানে বহুবার। ঠাট্টার সূত্র থেকে গাম্ভীর্য্যের মাত্রা পর্য্যন্ত তাল-লয় সবটুকু তার ঠিক আছে এখানে।

সুন্দর বাংলো প্যাটার্ন বাড়ী। ছাড়দেয়ালের উপরে টালির শেড। প্রশস্ত বারান্দা। ছোট একটা টেবিলের দু'পাশে দুখানি চেয়ারে মুখোমুখি বসে ইতিমধ্যেই পড়ায় মন দিয়েছিল জিতু আর মিনু। শঙ্করেরই ছোট ভাই জিতু; মিনু হচ্ছে ওদের ভাইঝি, অর্থাৎ, বড় ভাই শিবদাসের মেজ মেয়ে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে অনেক দিন। আমাদের জানা ছিল যে, এত ভোরে শঙ্করের ঘুম ভাঙবার নয় এবং ভাঙেও নি। কিন্তু তাই বলে বাণীর বিরাম

নেই। সেই কোন সাত-সকালে উঠেই বড় জায়ের সঙ্গে একাজে-সেকাজে হাত চালাতে হয় তাকে।

বরেনের আওয়াজ পেয়ে সমস্ত বাড়ীটা যেন অল্পক্ষণের মধ্যেই মুখর হয়ে উঠল। জিতু আর মিন্টু হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে অভিবাদন করল আমাদের। বাণী এসে বলল, 'এমন না জানিয়ে যখন চা-পিত্রেশ নিয়ে এসেছ, তখন ও-পাঠটা দোকান থেকে শেষ করে এলেই পারতে!'

—'যেমন তোদের জায়গা, তেমন ত দোকানপাট সব!' ঠাট্টার ছলে অতি বড় সত্য কথাটা হঠাৎ গাম্ভীর্য্যের চালে চালিয়ে দিল বরেন, 'চা দিতে না পারিস, কিছু আদা আর গরম জেলাই এনে দে, নইলে ঠাণ্ডায় এদিকে যে জমে যাবার অবস্থা!'

বাণী কিন্তু এবারে আর কোন প্রত্যুত্তর করল না। হঠাৎ চিপ করে আমাকে এক প্রণাম। বাধা দেব যে, তারও অবসরটুকু দিল না। বলল, 'মনে করেছেন, আপনাকে আমি চিনি না, তাই না? আপনি আমাদের কনকদা ত?'

অর্থাৎ, কনক চাটুজ্জে। সশরীরে উপস্থিত হয়েছি, অস্বীকার করবার উপায় নেই। বললাম, 'কিন্তু কনক ব্যক্তিটি যে আমি, তাই বা বুঝলে কি করে?'

—'ও আমরা বেশ বুঝতে পারি।' মৃদু এক টুকরো হাসি খেলে গেল বাণীর দুই ঠোঁটে।—'শুনেছিলাম, বরেনদার সঙ্গে আপনিই আসবেন। এত বেশী আপনার নাম শুনেছি যে, ইচ্ছে হচ্ছিল আপনাকে দেখতে।'

বললাম, 'সেটাকে তবে বাস্তবে রূপ দিলেই ত পারতে। মাথা গুঁজবার মত যখন সামান্য একটা ডেরা আছে কলকাতায়, উদ্যোগ করে গিয়েই ত একবার উঠতে পারতে।'

হেসে বাণী বলল, 'বোনেরা আর বড়-একটা কে কোথায় যায়, দাদারাই চিরকাল বোনদের দেখতে আসে।'

—'তাই নাকি?' দেখলাম—বাণী বেশ সপ্রতিভ। থেমে বললাম, 'বাড়ীটাতে কে যেন নেই-নেই বলে মনে হচ্ছে?'

অবুঝ নয় বাণী, সঙ্গে সঙ্গেই বলল, 'যাই, ওঁকে তুলে দিই গে।'

কিন্তু গিয়ে আর তুলে দিতে হ'ল না। ইতিমধ্যে বরেনই গিয়ে সে কাজ করে এসেছে। শঙ্করের সঙ্গে আপনি থেকে তুমিতে এসে পৌঁছেছিলাম অনেক আগেই। চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে উঠে এসে হঠাৎ আমার দুই কাঁধের উপর দিয়ে দু'হাত প্রসারিত করে গদ গদ হয়ে উঠল শঙ্কর।—'এ আমার ভাবনার অতীত, ভেরী গ্লিয়ার্ড্ ফুল, এ নাইস মর্ণিং টু-ডে।'

বললাম, 'শব্দগুলো বাংলা করে বল। দেশ এখন ইংরেজ-শাসনমুক্ত। প্রাদেশিক ভাষার উপরেই আজকাল জোর পড়ছে বেশী। অন্ততঃ মহাফেজখানার ব্যবস্থায় ত সে রকমটাই মনে হয়!'

—'বাব্বাঃ, একেই বলে সাহিত্যরসিক। কথায় কি এঁটে উঠবার জো আছে!' বলে, টেবিলের উপরেই একটা পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল শঙ্কর।

বললাম, 'বাড়ীর কর্ম্মতৎপরতা দেখে ত মনে হচ্ছে বেলা একেবারে কম হয় নি! তা—হঠাৎ এই উপদ্রবটা না সইলে ঘুমটা আর কতক্ষণ হ'ত?'

লজ্জা পেল এবারে শঙ্কর।

পাশ থেকে মিন্টু যেন একবার কি বলতে গেল, কিন্তু শঙ্করের তা কানে গেল বলে মনে হ'ল না। অনেকটা ফিলজফির ছাত্রের মত স্বভাব শঙ্করের। মাঝে মাঝে কথার মাঝখানে খেই হারিয়ে ফেলে, মাঝে মাঝে আবার বড় বেশী প্রগল্‌ভ হয়ে উঠে। অথচ ফিলজফির সামান্যতম ভূমিকার পৃষ্ঠার পর্য্যন্ত নজর পড়ে নি কোন দিন। ফরেষ্ট মাইন্‌স আর বাজারে বিজনেস আছে বড় ভাই শিবদাসের, তারই দেখাশোনা তদারক করে। ক্ষণকাল থেমে বলল, 'হাতমুখ ধুয়ে ভাল হয়ে বসলে হ'ত না এবারে?'

প্রস্তুতই ছিলাম, অতএব অরাজী হবার কিছু নেই। মনে মনে ঠিকই জানতাম—বাকী কাজগুলো গুছিয়ে নেবার জন্য বরেনের একার গলাই এখানে যথেষ্ট।

অল্পক্ষণের মধ্যেই টেবিলটা লুচির থালায় আর চায়ের কাপে পূর্ণ হয়ে উঠল। প্রথমটা আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম এ বাড়ীর এই দ্রুত ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করে। ঠিক যেন ইলেকট্রিকে কাজগুলো হয়ে যাচ্ছে! অথচ এই একটু আগেই বাণীর সঙ্গে চা নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছে বরেনের।

অলক্ষ্যে থেকে যিনি এত কিছু ব্যবস্থা করছেন, তাঁকে দেখবার লোভটুকু কিছুতেই সম্বরণ করতে পারছিলাম না। তিনি আর কেউ নন, বাণীরই বড় জা, শিবদাসের বউ শিবানী। বাণীর সম্পর্কে বরেনও তাকে দিদি বলেই ডাকে; অতএব বরেনের বন্ধু হিসেবে আমিই বা নই কেন?

দেখা পেলাম তাঁর দুপুরে খেতে বসে। পরিপাটী করে অন্ন-ব্যঞ্জনে বাটি সাজিয়ে এনে ভাতের থালা আসনের সামনে এগিয়ে ধরলেন শিবানী। পরিমাণ দেখে বললাম, 'এত কিছু ত কোন দিন খাবার অভ্যাস নেই দিদি! জানেন ত, থাকি বাংলা-মুলুকে—কলকাতার রেশন-এরিয়ায়, খাওয়া-দাওয়া আপনা থেকেই কমে গেছে। অবস্থাটাও এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, কিছুতেই আর দু'মুঠো বেশী খেতে পারি না। কিছু কিছু কমিয়ে না নিলে শেষ পর্য্যন্ত এঁটো পাতে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ব'।

মুখের ঘোমটা কতকটা কপালের দিকে তুলে নিয়ে মৃদু হাসলেন শিবানী। বললেন, 'আমরাও বাংলা দেশেরই মানুষ। বাঙালী সব অবস্থাতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। এমন বেশী কিছু দিই নি যে, হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন।'

কথাটা সাজ্যাতিক। এ শুধু আমার কথা নয়, সমস্ত বাঙালীর কথা। অথচ বাঙালী নারীর এ অচল বিশ্বাসকে যে ভাঙব, তেমন শক্তি নেই। বাণী দেখলাম মুচকি হেসে অলক্ষ্যে কোথায় একদিকে চলে গেল। ততক্ষণে বরেন প্রায় অর্দ্ধেক ভাত শেষ করে এনেছে। খাওয়া সম্পর্কে ও চিরকালই অনেকটা দুর্ভিক্ষের দেশের লোক।

এ সব ব্যাপারে বাংলা বিহার উড়িষ্যায় জ্ঞান নেই বরেনের। খেতেও পারে প্রচুর, খাটতেও পারে যথেষ্ট। করে বীমার কাজ, অর্গানাইজার হবার ইচ্ছে অনেক দিন থেকে। বলল, 'নে, বাজে না বকে এবারে আরম্ভ কর দিকি!'

যেন গাড়ী ফেল করব আর কি! ষ্টেশন থেকে সকালে পা চালাবার মতই অবস্থা অনেকটা। পথ হলে তর্ক করা যেত, এখানে এই নূতন পরিবেশে সে তর্ক প্রথম আলাপের লজ্জায় স্তব্ধ।

খাওয়া শেষ করে উঠলাম।

ঘড়িতে একেবারে কম বাজে নি। শীতের বেলা, পাহাড়ের তুষার গলানো কনকনে শীত। দেখতে দেখতে বেলা পড়ে আসবে। শঙ্করের উৎসাহেই এক সময় জায়গাটা ঘুরে দেখবার জন্ত বেরিয়ে পড়লাম। ঘুরে ঘুরে দেখা ভিন্ন বড় একটা কাজ ছিল না আর এ পথে। ঘুরে বেড়াতেই যে ঘর ছেড়েছি। পথে বেরিয়ে বরেনকে তাই এক সময় আবৃত্তি করে বলেছিলাম—

'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দু'জন চলতি হাওয়ার পন্থি।'

কিন্তু এইটুকুই ভুল করেছিলাম যে, বরেন ঠিক চলতি হাওয়ার গাড়ী নয়, অনেকটা ঘরমুখো। বীমাসংক্রান্ত কাজে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় যেন হঠাৎ কোন এক বামাসুন্দরীর প্রেমে পড়েছে, অথচ এমন মুখচোরা যে, মুখ ফুটে কিছু বলবে না! মনের সুপ্ত রোমান্স নিয়ে কেমন থিতিয়ে পড়েছে ইদানিং। ঠেলে চালালে তবে চলে। শঙ্করদের আত্মীয়তার সূত্রে ঝুমরীতিলাইয়ার পথের সঙ্গে বরেনের পরিচয় আছে আগে থেকেই।

কিন্তু আমার নিজের দিক দিয়ে পরিচয়টা এই প্রথম। চোখে পড়ল—রাস্তার এপাশে ওপাশে ছোট-বড় কাঁচা-পাকা বাড়ী। দেয়ালের গায়ে আর সাইনবোর্ডে কতকগুলো সাঙ্কেতিক অক্ষর জ্বল্ জ্বল্ করছে: এম এল ৩৬, ডি, এল ২২, এম এল ৮৪…।

জিজ্ঞেস করলাম—'এগুলো কি?'

হেসে শঙ্কর বলল, 'মাইকা লাইসেন্স নাম্বার আর ডিলার লাইসেন্স নাম্বার। এদের হাত দিয়ে ম্যানুফ্যাক্চারিং হয়ে সেল-বিজনেসে যায় মাইকা।'

দেখলাম—রাশি রাশি অভ্রের স্তূপের পাহাড় জমে আছে এখানে ওখানে। তারই উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে লোকেরা, ছোট ছোট বিহারী ছেলেরা এসে খেলা করছে অভ্র দিয়ে পুতুল-ঘর বানিয়ে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'এতে নষ্ট হয় না মাইকা?'

শুনলাম—এগুলো মাইকার খোসামাত্র, পরিত্যক্ত চাঁচ। ভালগুলো ম্যানুফ্যাক্চারিং হয়ে প্যাকিঙে যায়, বাজেগুলো এই ভাবে খেলার সামগ্রীতে পরিণত হয়।

বড় ভাই শিবদাস ছাড়া শঙ্করের নিজেরও কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত মাইকা মাইন ছিল কাছাকাছি এক জায়গায়। কোন এক আপকান্ট্রির সঙ্গে তাদের বিজনেস ছিল, কিন্তু টিকল না; আপকান্ট্রি গ্রাস করে নিল সমস্ত বিজনেসটাকে। মাঝপথে একটা সিগারেট ধরিয়ে শঙ্কর বলল, 'এই ভাবেই আমরা মার খাচ্ছি। টাকার জোরে আজ ওরা প্রায় সমস্ত বিজনেসই গ্রাস করছে। নিজেরা যে যৌথভাবে কিছু করব, উপায় নেই; প্রায় ক্ষেত্রেই বাঙালীদের সরে পড়বার মতলব।'

বললাম, 'কেন, এখানে যাঁরা বাঙালী আছেন, তাঁরা কি লোক সুবিধের নন নাকি? প্রবাসী বাঙালী, মিলেমিশে যৌথভাবে থাকাটাই ত উচিত!'

শঙ্কর যেন অকস্মাৎ একটা দুঃস্বপ্ন-জগৎ থেকে নেমে এল এবারে। বলল, 'যৌথ ভাবটা শুধু বাইরে থেকে মার খাবার ভয়ে, অর্থের পথটা সবার ব্যক্তিগত।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে বাঙালী ক্লাব নেই কোন?'

—'আছে বৈ কি! চল, যাবার পথে দেখিয়ে নেব।'

যেখানে যাই, স্বজাতি স্বজনকেই আগে খুঁজি। শঙ্করের কথায় তাই খানিকটা আশ্বস্ত হলাম এবারে।

ঝুমরীতিলাইয়ার লাল কাঁকরের পথ, কোথাও কোথাও পিচ বাঁধান সরু গলি। ধুলো জমে মাটি আর সুরকির রূপ নিয়েছে। মাথার উপরে সূর্য্য জ্বলছে, কিন্তু তেমন তাপ নেই। শীতের ঝির-ঝিরে হাওয়ায় সে তাপে বরং আরামবোধই করলাম।

খানিকটা এগিয়ে আসতেই প্রকাণ্ড একটা চকমেলান লাল বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালাম। হাল-আমলের নতুন ফ্যাসানের বাড়ী, পাতলা গাঁথুনীর উপর কোন কোন অংশে জাফ্রানী রঙের প্রলেপ। রুচি আছে গৃহকর্ত্তার। এমন বাড়ী দক্ষিণ কলকাতার কোন বিশেষ অঞ্চলেও কখনও চোখে পড়ে না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন বড় অফিসার টফিসার কেউ থাকেন বুঝি এখানে?'

শুনলাম—অফিসার নয়, বিহারের কোন্ এক ধনী মাইকা মার্চেন্টের কীর্ত্তি এটা। বাবুরাম ভোজরাজ। তাঁরই প্রাসাদ। দেখলাম—বাড়ীটা শুধু তার প্রাচীর-বেষ্টিত পরিবেশেই শেষ নয়, পূব-দক্ষিণ মুখে প্রায় সিকি মাইল অবধি চলে গেছে তার সীমা। ডায়নামোর আওয়াজ এসে কানে বিঁধছে, ইলেকট্রিকের তার চলে গেছে এ দেয়াল থেকে ও দেয়ালে, রৌদ্রকিরণে মিটমিট করে জ্বলছে বাল্বগুলো। অথচ সারা ঝুমরীতিলাইয়া রাত্রির অন্ধকারে প্রেতাত্মার মত কাঁদে। আলোর জন্তে দু'একটা কেরোসিন লাইটপোষ্টই যথেষ্ট এখানে।

হঠাৎ প্রশ্ন করল শঙ্কর, 'কেমন লাগল?'

বলতে যাচ্ছিলাম—'ভাল'। কিন্তু তার আগে স্বতোৎসারিত কণ্ঠে বরেন হঠাৎ বলে উঠল, 'ভারতবর্ষে এ পরিবেশ এমন নতুন কিছু নয় যে, কেমন লাগবার প্রশ্ন আসছে।'

স্বাভাবিক কণ্ঠেই এবারে শঙ্কর বলল, 'পাশাপাশি আরও একটা চিত্র আছে, আর এক ভারতবর্ষ, যাবার আগে সেটাও বরং দেখে যাও।'

শুনে স্বভাবতঃই কৌতূহল হ'ল। বছরের তিনশ' পঁয়ষট্টি দিন ধরে যে ভারতবর্ষকে কলকাতায় পাই, তা মহাসাগরে এক খণ্ড দ্বীপ ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাকে এমন একটা পরিবেশে তার আপন স্বরূপে বড় করে পাবার লোভটা তাই কম কি! কিন্তু না পেলেই ভাল ছিল।

পাশেই দু'একখানি বাড়ীর পরে একটা গহ্বরের মত বহুকালের নোনাধরা ছোট্ট একখানি ঘরের মধ্যে গিয়ে হঠাৎ প্রবেশ করল শঙ্কর। বলল, 'এগিয়ে এস।'

সংশয়ে দোল খাচ্ছি আর একটু একটু করে পা বাড়াচ্ছি। ভিতরে যেতেই নজরে পড়ল—মৃত কঙ্কালের মত একটি লোক শুয়ে আছে ময়লা বিছানায়। তেল ফুরিয়ে এসেছে, বাতি নিভবার আর বড় দেরী নেই। মাঝে মাঝেই ককিয়ে উঠছে লোকটি, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরচ্ছে না। জীবনীশক্তির অভাবে কণ্ঠশক্তি নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। মাথার কাছে বুড়ী মত একটি মহিলা ম্লানমুখে বসে ভগবানের নাম জপ করছেন। ভাবলাম —এই কি আমার এতক্ষণের বাঞ্ছিত ভারতবর্ষ?

মুমূর্ষুর দেহ-সংলগ্ন হয়ে বসে মৃদুকণ্ঠে শঙ্কর জিজ্ঞেস করল, 'আজ ডাক্তার এসেছিল?'

জবাব দিলেন বৃদ্ধা, 'এসেছিল, কিন্তু কই, কিছু বলল না ত?'

সান্ত্বনা দিল শঙ্কর, 'ক্রমে ভালর দিকে যাচ্ছে, বলবে আবার কি?'

শঙ্করকে প্রায় মুখের কাছে টেনে নিয়ে মুমূর্ষুটি বারকয়েক ফিস ফিস করল, 'আমার যাবার দিন আর বড় বেশী দূরে নয়। বহু দিন আগে দু'হাজার টাকার একটা ইন্‌সিওরেন্স করেছিলাম, পলিসিটা পেইড-আপ হয়ে আছে। আমার অবর্তমানে মার যেন কোন কষ্ট না হয়, দেখিস।'

'দেখব।'—বলে কিছুক্ষণের জন্য মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বসল শঙ্কর, তার পর কথাটাকে এক রকম চাপা দেবার জন্যই নতুন কথা পাড়ল: 'তোর সঙ্গে আমাদের কনক চাটুজ্জের পরিচয় করিয়ে দিই অমিয়; বিশেষ সাহিত্যরসিক, লেখাটেখারও অভ্যাস আছে কিছু-কিছু। আর যা পরিচয়—তা তুই ভাল হয়ে উঠে নিজেই কখনও ধীরে ধীরে পাবি।'

দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে একবার নমস্কার জানাতে চেষ্টা করল আমাকে অমিয়, কিন্তু পারল না। অতিরিক্ত দুর্বলতায় হাত দুখানি তার থর্‌ থর্‌ করে কাঁপছে। কিছু একটা বলে যে রোগীকে সান্ত্বনা দেব, এমন ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অথচ গল্প-কাহিনীতে কোন নায়কের চরিত্র আঁকতে গেলে কত ভাষাই না জোটাই! দু'চোখে আজ যা দেখলাম, সেই কি বড় কম কাহিনী! অথচ কৈ, একটি কথাও ত মনে আসছে না!'

নীরবেই আবার এক সময় এসে পথে দাঁড়ালাম। আগে পরিচয় পাই নি, এবারে শুনলাম—রোগীর পুরো নাম অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য্য। শঙ্করের দীর্ঘকালের বন্ধু। কাটা কাপড় আর হোসিয়ারীর ছোটখাট একটা দোকান ছিল বাজারে। এখন ব্যবসাটা প্রায় নষ্ট হতেই বসেছে। কি রোগে যে পেয়েছে, এখানকার ডাক্তাররা পর্যন্ত ধরতে পারছে না। অথচ পয়সা ব্যয় করে যে কলকাতায় এসে কোন বড় ডাক্তার দেখাবে, এমন সঙ্গতি নেই।

শঙ্কর জিজ্ঞেস করল, 'কেমন দেখলে?'

জবাব দিতে পারলাম না। বল্লেনও দেখলাম চুপ করেই গেল। অলক্ষ্যে মনটা শুধু কেমন একবার আর্তনাদ করে উঠল, হায় রে. দুর্ভাগা বাঙালী, কোথাও আজ আর সে নিজের অদৃষ্ট নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারছে না। দুপুরে খেতে বসে শিবানী যে কত বড় দম্ভের কথাটা উচ্চারণ করেছিলেন, শুধু সেই কথাটা কিছুক্ষণ মনের মধ্যে ঘুরতে. লাগল। কি স্ব-বাসে কি প্রবাসে বাঙালীর অদৃষ্ট-চক্রের বিঘূর্ণন আজ একই রকমের সর্বত্র। একই বিবর্তন-ধারায় বিমুখীর রেখা ছায়াপাত করে চলেছে তার জীবনে।

এগিয়ে চলেছি লাল কাঁকর আর পিচঢালা গলি পথে। সূর্য্য ক্রমশঃ অস্তাচলের পথে হেলে পড়ে পশ্চিম দিগন্ত ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠছে, আর তারই রং এসে ঠিকরে পড়ছে পাহাড়গুলোর চূড়ায়। সকালের রূপের সঙ্গে এ রূপের আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

সামনেই চোখে পড়ল কতকটা ফাঁকা মাঠের মত যায়গা। শেষ প্রান্ত ঘেঁষে ছোট ছোট দুখানি টালির ঘর, আর তারই সামনে ছোট একখানি বাগান: শত বেলি, সহস্র বেলি আর যুঁই ও কনক চাঁপার ডালগুলোয় সবে নতুন পাতা গজিয়েছে।

বাড়ীটার সামনে এসেই হাঁক দিল শঙ্কর: 'বিনয়-দা বাড়ী আছেন?'

গৃহকর্ত্তা বিনয় ব্যক্তিটি বাড়ীতেই ছিলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই সবিনয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করে নিলেন ভিতরে। ভিতর অর্থে এক পাশে মাদুর পাতা একখানি চওড়া তক্তপোষ; দু' তিন জন অল্পবয়সী বাঙালী আগে থেকেই সিগারেটের ধোঁয়ায় আর একতারার সুরে আসর জমিয়ে আছেন; আর এক পাশে খান দু-তিন কুশন-আঁটা চেয়ার ও একটা টেবিলে সাজান কিছু বই ও ইন্‌সিওরেন্স প্রসপেক্টাস। গৃহকর্ত্তা বিনয় লাহিড়ী কোন্‌ একটা মাড়োয়াড়ী কোম্পানীর অর্গানাইজিং এজেন্ট এখানে। খুব স্ফূর্তিবাজ লোক, বরিশালের ওদিকে কোথায় বাড়ী। একতারা বাজিয়ে বাউল-ভাটিয়ালী গাইবার খুব সখ। শিষ্যও জুটিয়েছেন ইতিমধ্যে কয়েকটি। এখানকার প্রবাসী বাঙালী যাঁরা, তাদের মধ্যে অধিকাংশ পরিবারের অল্পজন তরুণেরাই এই 'বিনয়-বিদ্যালয়ের' ছাত্র। যাদু আছে বিনয় লাহিড়ীর।

শঙ্কর একে একে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে পরে কানের কাছে মুখ এনে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'এই হচ্ছে আমাদের বাঙালী ক্লাব। বিনয়-দার ঐ একতারার মধ্যেই আমাদের এখানকার বাঙালী সম্প্রদায়ের জীবন বাঁধা পড়ে আছে। পার ত তুমিও একবার হাতেখড়ি নিয়ে যাও।'

বিনয়-দা ব্যক্তিটি দেখলাম বাস্তবিকই অদ্ভুত। আলাপ জমিয়ে

আপন করে নিতে সময় লাগে না। একেবারে পূর্ব্ব জন্মের পরিচয় যেন, এই ভাবেই আলাপ করতে সুরু করে দিলেন। এসে অবধি বোধ করি মনে মনে এমনি একটা বাঙালী পরিবেশই খুঁজছিলাম। পেয়ে আপ্যায়িত হলাম। বলতে হ'ল না যে, 'বিনয়-দা, একখানা হয়ে যাক।' তার আগেই একতারার তারে আওয়াজ তুলে সুর ধরলেন তিনি—

'এমন ভাবের নদীতে সই ডুব দিলাম না।
আমি ডুবি ডুবি মনে করি,
মরণভয়ে ডুবলাম না।
জলের নীচে প্রাণপদ্ম,
তাতে আছে মধু কত,
কালো ভ্রমর জানে মধুর মর্ম্ম,
অন্যে জানে না।—ডুব দিলাম না।'

বাংলার মর্ম্মের বাউল। কথাচ্ছলে বললাম, 'শুধু এই ঝুমরী-তিলাইয়া নয়, বাংলার বাইরে এমনি করে আজ আপনাকেই দরকার বিনয়-দা। এমন করে বাঙালীকে বাংলার কথা শোনাতে সম্ভবতঃ প্রবাসে আপনার মত দরদী আর একটিও নেই!'

বিনয় লাহিড়ী গলে এবারে রীতিমত জল হয়ে গেলেন। বললেন, 'আমাদের এই বাঙালী সঙ্ঘে কিছু দক্ষিণা দিয়ে যাবেন ত?'

কতকটা ইতস্ততঃ করে বললাম, 'তা দিলেই হ'ল, এতে আর আপত্তির কি আছে?'

কিন্তু পরে জানলাম—দক্ষিণাটা ক্লাবসংক্রান্ত কিছু নয়, ওটা বিনয় লাহিড়ীর একান্ত নিজস্ব। এই ভাবে বাউল, ভাটিয়ালী আর দেহতত্ত্ব গেয়ে জীবনের অনিশ্চয়তা প্রতিপন্ন করে ইনসিওরেন্সের প্রোপোজাল ফর্মে সই করিয়ে নেন তিনি। ব্যবসায়ে নেমে বিষয়-বুদ্ধিকে তিনি কারুর পায়ে অঞ্জলি দিতে রাজি নন।

ঘরে ফিরে বরেনকে বললাম, 'বীমার কাজে নেমেছিস, অথচ আঁটঘাট এখনও শিখলি নে। লাহিড়ীর কাছে থেকে হাতেকলমে কিছুকাল শিখে বা।'

শুনে একেবারে হো-হো করে হেসে উঠল সকলে।

বাণী কাছেই ছিল, বলল, 'এখানে থাকলে দাদারও দীক্ষা নিতে দেরী হ'ত না।'

বললাম, 'কেন, তোমার কর্ত্তাটি তবে ইতিমধ্যেই পাকা নাম লিখিয়ে বসেছে নাকি?'

চোখ দুটো ঈষৎ কপালে তুলে বাণী বলল, 'লিখিয়েছে মানে, ঐ ত ধ্যান জ্ঞান; একবেলাও ওখানে গিয়ে তাসপাশা না পিটিয়ে এলে পেটের ভাত হজম হয় না।'

বললাম, 'ও, তা হলে শুধুই তাসপাশা! আমি ভেবেছিলাম মাত্রাধিক্য কিছু।'

শুনে ঠোঁট দুটো উল্টে নিল বাণী, 'কিছু কিনা, তাই বা কি করে বলি!'

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কি একটা করছিল শঙ্কর, কথাটা কানে যেতেই বলল, 'তবে সম্ভবতঃ পতিদেবতাটিকে একটি বেলাও আর বরদাস্ত করতে না তুমি।'

দাম্পত্য কলহের আশু একটা সূচনা। শঙ্করের কথা শুনে বাণী কতকটা গম্ভীর হতে চেষ্টা করল এবারে! বলল, 'কেন, এই নিয়ে কোনদিন কিছু বলেছি তোমাকে? দিদি কতদিন কত রাত অবধি ভাত নিয়ে বসে থাকেন, তাতেও কি লজ্জা হয় না যে, বড় গলা করতে এসেছ?'

অবস্থা বেগতিক। বাধ্য হয়েই এবারে ছোটগলা করতে হ'ল শঙ্করকে।

বললাম, 'এ ব্যাপারে একমাত্র রায় দিতে পারেন দিদি। অতএব হেঁসেল থেকে জজ সাহেবকে খবর দেওয়া হউক।'

কিন্তু ডেকে আর আনতে হ'ল না, কাছেই ছিলেন শিবানী, এসে শঙ্করকে সস্নেহে আকর্ষণ করে হাসতে হাসতে বললেন, 'বিচারের ক্ষেত্রে জজসাহেবও যে সব সময় সুপটু হয়, এমন ইতিহাস সম্ভবতঃ খুঁজে পাওয়া যাবে না। অতএব এ যাত্রা এ কেস আমি ডিসমিসই করলাম।'

অমিয় ভটচাযের রোগপাণ্ডুর মুখখানি মন থেকে কখন যে মুছে গিয়েছিল, টের পাই নি। শিবানীর 'ডিসমিসাল নোটিশে' এবারে হাসি চেপে রাখতে পারলাম না।

মিনু সম্ভবতঃ বসে বসে এতক্ষণ কি একটা এমব্রয়ডারী তুলছিল, এবারে চোখ তুলে বলল, 'পরোক্ষে তুমিই কিন্তু হেরে গেলে মা-মণি।'

কিন্তু এ হারায় বীণার যে কত সুখ, তা সম্ভবতঃ মিনু বুঝতে পারল না। তা না পারলেও আমার উপর তার একটা ক্ষোভ ছিল। এসে অবধি মিনুকে নিয়ে বেশীক্ষণ কাটাতে পারি নি। সকালটা গেল পরিচয়ের প্রথম পাঠে। দুপুরে খাবার পরে মিনু একবার কাছে এসেছিল পানের বাটি নিয়ে। সেই যা সামান্য দু'চারটে কথা। এবারে সস্নেহে কাছে আকর্ষণ করে বললাম, 'আচ্ছা মিনু, বাংলা দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না তোমার? ধর এই কলকাতার কিংবা নিজেদের গ্রামে?'

কথা শুনে একটুও কিন্তু কৌতূহল প্রকাশ করল না মিনু। চোখ দুটো বার কয়েক পিটপিট করে বলল, 'যেমন সব ঘটনা শুনতে পাই, তাতে ত এখানেই বেশ আছি। এখানে অত সমস্যা নেই।'

—'কিন্তু তবু ত তোমার নিজের দেশ সেটা!'

—'হলে কি হবে! সুখের চাইতে স্বস্তি ভাল।' থেমে মিনু বলল, 'কোন হাঙ্গামা-হুজ্জৎ নেই, ভিসা পাসপোর্টের ঝামেলা নেই, দিব্বি সহজ সরল জীবন এখানে। ক'দিন থাকলে দেখবেন, আপনারও আর ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হবে না এ জায়গা।'

বললাম, 'ছিঃ ছিঃ, প্রবাসী বাঙালীরা চিরকাল প্রবাসে থেকে শুধু কাগজে পত্রে তাদের বাংলাকে দেখবে, দেখে সন্ত্রস্ত হবে, এই বা কোন্ নীতি মিনু?'

সম্ভবতঃ মিনু এবারে মনে মনে কিছু একটা বড় জবাবেরই তর্জ্জমা করছিল, ইতিমধ্যে খাবারের আসনে ডাক পড়ায় কথা থেমে গেল।

রাত্রে শুধু শোবার আগে একবার প্রয়োজনীয় কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে বললাম, 'শুনেছি, সারা বাড়ীতে তুমিই সকলের আগে ওঠ মিনু! ছ'টার আগে ত নিশ্চয়ই! উঠেই আমাকে ডেকে দিও, কেমন?'

—'কেন, আপনাদের ঐ বিনয়-বিদ্যালয়ে কিছু ফাংসন আছে নাকি?'

এসে অবধি যে কথাটার আদৌ জানান দিই নি, এবারে সে কথাটা আর না বলে পারা গেল না; বললাম, 'না, সকালের ডাউন বম্বে মেলেই আবার আমাকে কলকাতায় ফিরতে হবে।'

শুনে মুখখানি যেন কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল মিনুর। অভিমানের কণ্ঠে বলল, 'এমনি করে একটা দিনের জন্যে তবে না এলেই পারতেন।'

বললাম, 'একটা দিনই কি কিছু কম! এর পর তুমি গেলে তবে আবার আসব।'

মিনু এবারে নির্ব্বাক। মুখ গম্ভীর করে এক সময় কোথায় এক দিকে নীরবে উঠে গেল। লক্ষ্য করে দেখলাম—সারা বাড়ীটাতেই সেই গাম্ভীর্য্যের ছাপ। বরেন কাছে থাকলে তাকে একবার শেষরক্ষা করতে বলতাম, কিন্তু ডেকে ডেকেও কোথাও তার সাড়া পাওয়া গেল না।

দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়ে শিবানী বললেন, 'লেখকেরা একটু খেয়ালী ধরণের হয় জানতাম, কিন্তু তাই বলে আপনার মত এমন পাগলামি কেউ কখনও করে? তখন রায় দিই নি, এবারে যদি তার প্রয়োগ করে বলি, কালই যাওয়া হতে পারে না, তবে?'

বিনীত কণ্ঠে বললাম, 'তবে শুধু আমার উপর নয়, সংসারে এমন অনেক নিরীহ ব্যক্তি আছে, যাদের উপর একই সঙ্গে অবিচার করা হবে। বহু জনের সঙ্গে বহু ভাবে জড়িয়ে আছি, তা ছাড়া সময় এবং তারিখ দিয়ে এন্‌গেজমেণ্টও রয়েছে অনেকের সঙ্গে, কথার খেলাপ হলে নিজেরই কিছু সম্মান রক্ষা পাবে? একটা দিনের এই যে আনন্দ লুটে নিয়ে গেলাম, এই কি কিছু কম?'

—'সারা দিনটা ত বাইরে বাইরেই কাটিয়ে এলেন, আনন্দ আর পেতে দিলেন কোথায়?' বলে শিবানী আর এক মিনিটও দাঁড়ালেন না, দরজার আড়ালেই এক সময় আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বাণী এসে এক সময় নীরবে মশারিটা গুঁজে দিয়ে গেল বিছানার চারপাশে। মুখের দিকে তাকিয়ে ম্লান একবার হাসল; বলল, 'যান, কথা বলবেন না আমার সঙ্গে।'

সত্যিই এত বড় অপরাধের বুঝি ক্ষমা নেই কারুর কাছে। বললাম, 'কথা না বল, কিন্তু চিঠি দিও এবার থেকে, খুব বড় চিঠি।'

কি ভেবে হঠাৎ যেন মিনিট দু'তিনের জন্য একবার আমার চোখের দিকে কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়াল বাণী, তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মনেই হ'ল না যে বাংলার দুর্ব্বা-শীতল মাটিকে ছেড়ে দূর প্রান্তরে কোথাও এসে নোঙর করেছি। বাংলার শ্যামল প্রাণ আর বাংলার নারীর হৃদয়-নিঙড়ানো স্নেহ খণ্ড খণ্ড তীর্থশিলার মত ছড়িয়ে আছে এই ঝুমরীতিলাইয়ার প্রকৃতিপুঞ্জে। ঐতিহাসিক তাই বুঝি যুগে যুগে বাংলার আপন সহোদরা বলে বার বার স্বাগত জানিয়েছে বিহারকে।

মিনু না ডাকতেই ভোরে ভোরে ঘুম ভাঙল। আবার সেই 'জবাকুসুম সঙ্কাশং—।' একটু একটু করে সূর্য্য উঠল ঝুমরী-তিলাইয়ার আকাশে, সূর্য্য উঠল বিহারের সপ্তদিগন্তে। একটা দিনের শুধু পরিবর্ত্তন।···কত কাহিনীর উপরেই ত লেখনী সঞ্চালন করে চলেছি জীবনে। কিন্তু চিরদিনের এই আসা-যাওয়ার পথের পাশে পাশে যত আভিজাত্য, যত দুঃখ আর যত স্নেহ এই পোড়া দু'চোখ মেলে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে গেলাম—তা কি সত্যিই কোন দিন ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে পারব?

সূর্য্যের আলোয় ঘাসের বুকে শিশিরবিন্দুগুলি মুক্তার মত চক্‌চক্ করছে।···

বরেনকে ওরা কিছুতেই ছুটি দিল না, জোর করে আটকে রেখে দিল।

শঙ্কর শুধু একবার ছোট করে বলল, 'আবার খুব তাড়াতাড়ি করে এস।'

বললাম, 'চেষ্টা করব।'

ষ্টেশনে এসে পৌঁছতেই গাড়ী ছেড়ে দিল। চেয়ে দেখলাম—পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় লাল সূর্য্যরশ্মি পড়ে উজ্জ্বল মণির মত জ্বলছে। রোদে ছেয়ে গেছে দিকপ্রান্তর।—অতর্কিতে হঠাৎ একবার কেন যেন মনে পড়ে গেল অমিয়কান্তির কথা—অমিয়কান্তি ভটচায। তার ঐ ব্যর্থ রোগক্লিষ্ট জীবনে আজকের মত এই সূর্য্য ওঠা আবার নতুন করে সফল হবে ত?

'শিক্ষা-সঙ্কট' সম্পর্কে দু-চারটি কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

ফাল্গুন মাসের "প্রবাসী"তে প্রকাশিত শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের 'শিক্ষা-সঙ্কট' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়িলাম। আমি শিক্ষাবিদ্ নহি; সুতরাং যোগেশবাবুর প্রবন্ধের সকল বিষয় আলোচনা করিবার মত আমার বিদ্যা ও জ্ঞান নাই। তবে অতি সাধারণভাবে বলিতে পারি যে, যোগেশবাবুর চিন্তাধারার সঙ্গে আমার মত সাধারণ বহু ব্যক্তির চিন্তাধারা প্রায় মিলিয়া যাইবে। যোগেশবাবু আমাদের অতীত শিক্ষাপ্রণালী কি ছিল ও ভবিষ্যৎ শিক্ষাপ্রণালী কি হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা খুবই সময়োপযোগী হইয়াছে; এবং আশা করি তাঁহার প্রবন্ধ শিক্ষাবিদ্গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। বহু শিক্ষাবিদ্, বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, বহু কমিটি, কমিশন প্রভৃতিও বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ক্রটি দেখাইয়াছেন এবং ভবিষ্যতের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন, সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালীরও নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কমিটি-কমিশনের শেষ নাই; এখনও কমিটি-কমিশন বসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও বসিবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত দেশোপযোগী কোন সুনির্দিষ্ট প্রণালীতে শিক্ষার ব্যবস্থা হইল না। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ স্থাপিত হইয়াছে, নূতন বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হইয়াছে, আরও কত কি শিক্ষা উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে, অর্থের শ্রাদ্ধও হইতেছে; কিন্তু যোগেশবাবুর কথায় বলিতে হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই "Putting new wine into old bottle"-এর কাজই চলিতেছে।

যাহা হউক, যোগেশবাবুর প্রবন্ধের শিরোনামার 'সঙ্কট' কথাটি আমরা পল্লীগ্রামবাসী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হাড়ে হাড়ে হৃদয়ঙ্গম করিতেছি; দু'একটি উদাহরণ দিলেই আমাদের সঙ্কটের কথা বুঝা যাইবে। কৃষির প্রতি অনুরাগী পল্লীবাসী একটি যুবককে ঝাড়গ্রাম কৃষি কলেজে 'আই-এসসি ইন এগ্রিকালচার' অধ্যয়ন করিবার জন্য আমি উৎসাহিত করিয়াছিলাম। যুবকটি নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়-ভুক্ত, আর্থিক অবস্থা অতি অসচ্ছল। তাহার অভিভাবকদের অতি কষ্টে যুবকটির কৃষি কলেজে অধ্যয়নের ব্যয় বহন করিতে হইত। তখন ঝাড়গ্রাম কৃষিকলেজে 'বি-এসসি ইন এগ্রিকালচার' অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল। যুবকটির নিজের ও তাহার অভিভাবকদের এবং আমারও ধারণা ছিল যে, যুবকটি ঝাড়গ্রামেই বি-এসসি ইন এগ্রিকালচার অধ্যয়ন করিতে পারিবে। কিন্তু যুবকটি যখন আই-এসসি ইন এগ্রিকালচার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, তখন ঝাড়গ্রাম কৃষিকলেজে বি-এসসি ইন এগ্রিকালচার অধ্যয়নের ব্যবস্থা আর রহিল না। ইহার পর যুবকটিকে যদি বি-এসসি ইন এগ্রিকাল-চার পড়িতে হয় তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার উপকণ্ঠে টালিগঞ্জে কৃষিকলেজে পড়িতে হইবে। তাহাকে কলেজ-সংলগ্ন হোষ্টেলে থাকিতেই হইবে। সে কাহারও বাড়িতে থাকিয়া কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারিবে না। তাহার শিক্ষা সম্পর্কে এইখানেই সঙ্কট উপস্থিত হইল। হোষ্টেলে থাকিয়া কৃষিকলেজে অধ্যয়ন করিবার জন্য মাসিক প্রায় ৮০।৯০ টাকা খরচ হইবে। তাহার অভিভাবকদের পক্ষে এত অধিক অর্থ সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব ছিল; ঝাড়গ্রামে যাহা খরচ হইত তাহার চতুর্গুণ খরচ হইবে টালিগঞ্জে। সুতরাং যুবকটিকে তাহার উচ্চতর কৃষিশিক্ষার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে হইল। এবং সে বর্ত্তমানে কলিকাতায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে অবস্থান করিয়া কোন কলেজে অর্দ্ধ বেতনে বি-কম্ পড়িতেছে; আর দিনে চাকুরী করিতেছে। অথচ উচ্চতর কৃষিশিক্ষার জন্য পল্লীগ্রামবাসী দৈনন্দিন জীবনে কৃষির সহিত জড়িত যুবকগণকেই অধিকতর সুবিধাপ্রদান করা আবশ্যক। পল্লীগ্রামবাসী বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত বহু যুবককে নিজ নিজ বৃত্তি সম্পর্কীয় উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য এইরূপ সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হয়। সুতরাং বৃত্তিজীবীসম্প্রদায়ভুক্ত যুবকগণকে ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার পর কিংবা আই-এ, আই-এসসি পরীক্ষার পর চাকুরীর জন্য ছুটাছুটি করিতে হয়; যাহারা চাকুরী পায় তাহারা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করে এবং যাহারা চাকুরী পায় না তাহারা বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, নিজেদের বৃত্তিতে ফিরিয়া যায় না। আমার বক্তব্য আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। পল্লী অঞ্চলে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহে কৃষির সহিত সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছাত্রগণের সংখ্যাই অধিক; কিন্তু বিদ্যালয়সমূহে তাহাদের বৃত্তির সহিত শিক্ষার কোন সম্পর্ক নাই। ইহার ফলে তাহারা নিজেদের অভিভাবকগণের বৃত্তিকে অসম্মানজনক মনে করে এবং উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পর তাহারা নিজেদের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জনের পথ পরিত্যাগ করে। ইহার ফলে তাহাদের অভিভাবক-গণকে অতি জটিল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। কৃষিকাজে তাহারা তাহাদের 'শিক্ষিত' সন্তানদের কোন সাহায্য পায় না, কৃষিও অবনতিপ্রাপ্ত হয়। পল্লীগ্রামের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়-সমূহে এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার, যাহার সহিত কৃষির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। ইহা ছাড়া পল্লী অঞ্চলের এক-এক স্থানে এক-এক বৃত্তিজীবীর সংখ্যা অধিক। এই সংখ্যা অনুসারে স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বৃত্তিজীবীর বৃত্তি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকাও দরকার। উদাহরণস্বরূপ বলিতেছি, আমার অঞ্চলে তন্তুবায় সম্প্রদায়ের সংখ্যা অধিক; কিন্তু স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নত বয়ন শিক্ষালাভের কোন সুযোগ নাই। দুঃখের কথা আর কত বলিব? গত চারি বৎসর আমার অঞ্চলে পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইতেছে; সরকারী শিল্প-বিভাগ এই প্রদর্শনীতে নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য প্রদর্শন করেন, কিন্তু উন্নত

তাঁদের সাহায্যে উন্নত বয়নপ্রণালী হাতেকলমে দেখান না; তাঁহাদিগকে বহু অনুনয় করিয়াছি, কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

ইহা ব্যতীত পল্লী অঞ্চলের বহু যুবকের এক-একটি বৃত্তির প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে। উদাহরণস্বরূপ একটি যুবকের কথা বলিতেছি: যুবকটি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় সে খুবই পটু; তাহার চিত্রাঙ্কন দেখিয়া বহু শিল্পী আশ্চর্য্য হইয়াছেন এবং তাহাকে কলিকাতায় আর্ট স্কুলে অধ্যয়ন করিবার জন্ম পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু সে মার্টিন এণ্ড কোম্পানীর রেলের টিকিট কালেক্টারের পদ পাইবার জন্ত দরখাস্ত করিয়াছে, এমন কি সে দরখাস্তের সঙ্গে তাহার অঙ্কিত একখানি চিত্রও পাঠাইয়াছে। বলিতে পারি না, তাহার এই অঙ্কন-বিদ্যা টিকিট কালেক্টারের কাজে সাহায্য করিবে কিনা। নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এইরূপ বহু উদাহরণ দিতে পারি। সুযোগ, সুবিধা, শিক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রধানতঃ অর্থের অভাবে এইরূপ কত যুবকের স্বাভাবিক প্রতিভা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইতেছে। জাতির পক্ষে এই অপচয় কম নহে।

শিক্ষার সঙ্কট পদে পদে রহিয়াছে, অভিভাবকগণের অভিযোগের অন্ত নাই: বিদ্যালয়ে ছাত্রদের বেতন, পুস্তকের প্রাচুর্য্য ও মূল্য, প্রতি বৎসর পুস্তকের পরিবর্ত্তন, খাতা পেন্সিলের প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষাদানকার্য্যে শিক্ষকগণের অবহেলা ও অনুপযুক্ততা, বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি সম্বন্ধে কত রকম যে অভিযোগ আছে তাহা বলা যায় না। শিক্ষকগণের কর্ম্মবিরতি আন্দোলন সম্পর্কে বহু অভিযোগও উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এই সকল অভিযোগের মধ্যে অভিভাবকগণের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে বিশেষ কোন অভিযোগ শুনা যায় নাই। শিক্ষকগণের বেতন যে কম, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে এবং বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে প্রাইভেট টিউশনের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন না করিলে তাহাদের যে সংসার চলিতে পারে না, একথাও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বহু অভিভাবকের অভিযোগ এই যে, শিক্ষকগণ প্রাইভেট টিউশনের দিকেই অধিকতর মনোযোগ দেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কার্য্যে তাঁহাদের মনোযোগ কম; বিদ্যালয়ে তাঁহারা 'দিনগত পাপক্ষয়' করেন। জানি না, শহরে ও পল্লী অঞ্চলের মোট শিক্ষকগণের মধ্যে শতকরা কত জন প্রাইভেট টিউশনের সুযোগ ও সুবিধা পান।

এই সকল অভিযোগের মধ্যে হয়ত কতকটা সত্য আছে; কিন্তু শিক্ষকদের অর্থকষ্ট মোচন করিবার উপায় কি? সরকার বলিবেন, তাঁহাদের তহবিলে এত অর্থ নাই যে শিক্ষকসম্প্রদায়ের বেতনের হার বর্দ্ধিত করিয়া তাঁহাদের অর্থকষ্ট দূর করিতে পারেন। অভিভাবকগণ বলিবেন আমরা দুঃখ-দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছি। ছাত্রদের বেতন বাড়াইয়া বর্দ্ধিত হারে শিক্ষকগণকে বেতন দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। উভয় পক্ষের কথাই হয় ত ঠিক। এই প্রসঙ্গে অভিভাবকগণের উদ্দেশ্যে দুই-একটি কথা বলিতে চাই: সন্তান-সন্ততিগণের গ্রাসাচ্ছাদনের, চিকিৎসা প্রভৃতির ভারও যেমন সাধ্যমত বহন করিতে হইবে শিক্ষার ভারও তেমনি বহন করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে জাতির জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অন্নবস্ত্র অপেক্ষা কোন অংশে গৌণ নহে। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেতন মাথাপিছু চারি আনা বা আট আনা বাড়াইলেই অভিভাবকগণের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইবে, কিন্তু খাদ্য, বস্ত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য যে কত বাড়িয়াছে, সে সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিযোগ আছে, কিন্তু আন্দোলন নাই। অথচ ছাত্রগণের মাথাপিছু বেতনের হার চারি আনা বা আট আনা বাড়িলে শিক্ষকগণের আর্থিক সচ্ছলতা কিছু বাড়ে এবং তাঁহারা বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানে অধিকতর মনোযোগ দিতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে আরও দুই-একটি কথা বলিব এবং তাহা নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতেছি; এই সম্পর্কে নিজেরও ত্রুটি আছে। এমন বহু মধ্যবিত্ত পরিবারে দেখিয়াছি যে, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি সিনেমায় যাইতেছেন, প্রসাধন দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতেছেন, উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছেন, লোক-লৌকিকতারও বিরাম নাই, তত্ত্ব-তল্লাসেরও কসুর নাই। কিন্তু পুত্র-কন্যাগণের পুস্তক ক্রয় করিবার সময় অর্থের অভাব দেখা দেয়, এবং মাসের পর মাস পুত্র-কন্যাগণ পুস্তকের অভাবে নিয়মিত পাঠাভ্যাস করিতে পারে না। এমন দৃষ্টান্তও অনেক আছে—যে ক্ষেত্রে কন্যার বিবাহে চার-পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিলাম, কিন্তু পুত্র-কন্যার শিক্ষার জন্য এক জন গৃহশিক্ষক রাখিতে পারিলাম না। আমাকে কেহ ভুল বুঝিবেন না, আমার বক্তব্য হইতেছে, যে-সকল কাজকে আমরা অবশ্যকরণীয় বলিয়া মনে করি তাহা সম্পাদনের জন্য কষ্টেসৃষ্টেও আমরা অর্থ সংগ্রহ করি ও ব্যয় করি। কিন্তু পুত্র-কন্যাগণের শিক্ষার বেলায় আমরা রীতিমত কার্পণ্য করি। অনেক ক্ষেত্রেই সেই দিকে তত মনোযোগ দিই না। আমার এই মন্তব্য যে সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তাহা নহে। সুতরাং শিক্ষার পথে বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন সঙ্কট আছে।

এতক্ষণ ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিলাম। হয়ত অবান্তর অনেক কথাই বলিয়াছি। আসল কথা হইতেছে, শিক্ষার জন্য সরকারের যেমন দায়িত্ব আছে, অভিভাবকগণেরও সেইরূপ দায়িত্ব আছে। অধিকাংশ স্থলেই অভিভাবকগণ পুত্র-কন্যাগণের শিক্ষার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের উপরেই ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন।

শিক্ষার মোড় ঘুরাইতেই হইবে। বিভিন্ন বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের জন্য পল্লী অঞ্চলেই বিভিন্ন উন্নত বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেই শিক্ষাব্যবস্থা এমন হইবে, যাহাতে পল্লী অঞ্চলের যুবকগণ সেই শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া নিজ নিজ বৃত্তিতে ফিরিয়া যাইতে পারে এবং তাহাকে উন্নত করিতে পারে। তবেই সমাজের স্থিতি হইবে এবং ব্যষ্টির ও সমষ্টির কল্যাণ একই সঙ্গে সাধিত হইবে। এই সম্বন্ধে যোগেশবাবুর বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। পল্লী-অঞ্চলবাসী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত যুবকগণ কলিকাতা ও অন্যান্য শহরে অধ্যয়নের জন্য আসিলে তাহারা এক নূতন পরিবেশের মধ্যে পতিত হয়। ক্রমশঃ নূতন পরিবেশের সুখ, সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য তাহাদের আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, গ্রামের পরিবেশে তাহারা আর ফিরিয়া যাইতে চাহে না। শিক্ষা সম্পর্কে এই দিকেও দৃষ্টি দেওয়া দরকার। ইহাও একটি সঙ্কট।

জৈন কবিদিগের উপরে মেঘদূতের প্রভাব

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত ভারতীয় সর্বসম্প্রদায়ের কবিমণ্ডলীর চিত্তের উপর কমবেশী প্রভাব বিস্তার করেছে, ফলতঃ মহাকবির মেঘদূত যে প্রকার প্রভাব সকল সহৃদয় ব্যক্তির মনের উপরে বিস্তার করেছে, এমন কি তাঁর রচিত অন্য কোন গ্রন্থ তাদৃশ প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে বলে মনে হয় না। মেঘদূতের প্রত্যেক শব্দ, পাদ, পাদার্ধ প্রভৃতি অবলম্বনে শত শত গ্রন্থ বিরচিত হয়েছে, মেঘদূতের রচনা-পদ্ধতিও দার্শনিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, ব্যক্তিগত প্রভৃতি সর্ববিধ বিষয়কে অবলম্বনপূর্বক পরবর্তী ভারতীয় কবিগণ প্রয়োগ করেছেন, জৈন কবিগণও মেঘদূতের প্রভাবে হয়েছেন বিশেষ প্রভাবান্বিত। জিনসেন-বিরচিত পার্শ্বাভ্যুদয় বৃহৎ-তপাগচ্ছীয় চারিত্রসুন্দরগণি-বিরচিত শীলদূত (সংবৎ ১৪৮৪), খরতরগচ্ছীয়, কবি বিমল কৃতি-বিরচিত চন্দ্রদূত (সংবৎ ১৬৮১), মেঘবিজয়-বিরচিত মেঘদূতসমস্যা, লেখ, চেতোদূত, নাথুরাম বিরচিত হংসপদাঙ্কদূত, নিত্যানন্দ-বিরচিত হনুমদ্দূত প্রভৃতি জৈন কবি-বিরচিত দূতকাব্য এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আজ আমরা এই প্রবন্ধে অবধূত রামযোগি-বিরচিত সিদ্ধদূত কাব্য এবং মন্ত্রী শ্রীবিক্রম-প্রণীত শ্রীনেমিদূত কাব্য এই বিশিষ্ট জৈন দূত কাব্যদ্বয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করছি।

১। অবধূত-রামযোগি-বিরচিত সিদ্ধদূত কাব্য

এই দূত কাব্যখানি মেঘদূতের চতুর্থ চরণের সমস্যাপূর্তিরূপে লিখিত, প্রতি শ্লোকের প্রথমাদি তিন চরণ কবির স্বয়ং-কৃত আর চতুর্থ চরণ মেঘদূতের—ইহাই কাব্যশরীর। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় এরূপ :—কোন এক যোগী যোগসিদ্ধির জন্য রমণীয় পর্বতাশ্রমে বাস করছিলেন। তৎকালে আকাশে বদ্ধদৃষ্টি তিনি দূরে এক শুভ্রবর্ণ পুরুষকে দেখে ধর্মজ্ঞানি প্রভৃতি নামে প্রখ্যাত তাঁহাকে সম্ভাষণপূর্বক নিজ প্রিয়া 'বিদ্যা'র নিকট পাঠাতে মনস্থ করলেন। ঐ বিদ্যা হিমালয়ে মহাদেবের পুরীতে বাস করেন, তাই দূতরূপী সিদ্ধপুরুষকে হিমালয়ে যেতে হবে—এটিই সংক্ষেপে প্রতিপাদ্য বিষয়।

যোগী বিদ্যালাভ কামনায় এক সিদ্ধপুরুষকে মহাযোগী মহেশ্বরের কাছে পাঠাচ্ছেন, অতএব গ্রন্থখানি যে যোগবিষয়ক তা বলাই বাহুল্য। মেঘদূতকে শান্তরসপ্রধান যোগমার্গে পূর্ণভাবে পরিচালিত করা খুব সহজ ব্যাপার নয়; এ প্রচেষ্টায় আমাদের কবি কিন্তু পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেছেন। কবি এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

> প্রায়োঽধ্যাত্মং জগতি বিরসং তেন কেষাং জনানাং
> নাত্যন্তং স্যাচ্ছ তিসুখকরং চেতসীবাপ্রবিষ্টম্।
> যেষাং বোধো বসতি হৃদয়েষ্বগ্রহাং সদ্গুরূণাং
> তেষামেতন্ন ভবতি পৃথগ্ বস্তুতত্ত্বাথমেব ॥১২৫॥

ভাবার্থ এই যে, আধ্যাত্মিক ব্যাপার নীরস বলে কতকগুলি লোকের কাছে তা সুখকর হয় না, কিন্তু যাঁদের জ্ঞানোদয় হয়েছে, তাঁরা আর অধ্যাত্ম সাধনাকে (জাগতিক বিষয় হইতে) আলাদা মনে করেন না।

অতঃপর কবি এরূপ ব্যক্তিত্রয়াত্মক (সন্দেশপ্রেরক, সন্দেশহারক ও সন্দেশপ্রাপক) কাব্যরচনাও যে বুদ্ধিভ্রমমূলক তাও স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন :

> মত্তো যোগী ন ভবতি পৃথক্ সোঽপি সিদ্ধোঽপি চাহং
> বিদ্যাঽপ্যাজ্ঞা ন ভবতি যথা বস্তুতো বাস্তবীয়া।
> একং ব্রহ্ম স্ফুরতি জগতি ব্যাপকং যদ্যপীত্থং
> বুদ্ধিভ্রান্ত্যা পৃথগিব সদা দৃশ্যতে কথ্যতে বা ॥১২৬

দূতপ্রেরক যোগী আমি অস্মৎপদপ্রতিপাদ্য বস্তু হতে ভিন্ন নই, যে সিদ্ধকে আমি দূত করে পাঠাচ্ছি সেও আমি এবং যে বিদ্যার কাছে পাঠাচ্ছি তাও আমা।ভিন্ন নয়; সকলই এক ব্রহ্ম, বুদ্ধিভ্রমে পৃথক বলে দৃষ্ট বা কথিত হয়।

মূল কাব্য সম্বন্ধে দু'এক কথায় বলতে গেলে এ বলতে হয় যে, যোগ-বিষয়ক বলে কাব্যখানি স্বভাবতঃই কঠিন হতে বাধ্য, তদুপরি পরকৃত কাব্যের অনুবর্তন তাও আবার মেঘদূতের মত অতি বিশিষ্ট কাব্যের। নিজ কাব্যের উপযোগী

করার জন্ত কবি কোন কোন স্থলে মেঘদূতের অর্থান্তর কল্পনা করেছেন এবং এরূপ অর্থান্তরীকরণ স্থলেই কবিতাগুলি একটু জটিল হয়ে পড়েছে। কোন কোন স্থলে আবার কাকু প্রভৃতি স্বরের সাহায্যে বিধিমূলক অর্থকে নিষেধমূলক করা হয়েছে। যেমন—

বক্ষস্ত্রীণাং ললিতবচনৈঃ প্রেমপিণ্ডীকৃতানাং
সদ্যঃ পুংসাং হৃদয়হরণোদ্দামমায়াবিনীনাম্।
অন্তর্দৃষ্ট্যা বিষয়বিরহাদ্দৃষ্টশম্ভুস্তদা কিং
"লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি ।২।৩০

অর্থাৎ, [বাহ্য] বিষয়শূন্য অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা যে সময়ে তুমি মহাদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করবে, তখন যদি মনুষ্যের হৃদয়-হারিণী উদ্দাম মায়াবিনী প্রেমময়ী যক্ষ রমণীগণের লোলাপাঙ্গ নেত্রপংক্তি দ্বারা আকৃষ্ট না হও তা হলে কি তুমি বঞ্চিত হবে? [কখনই না]। কালিদাসের সমস্ত ভাব অনুকরণ করেও কবি স্থানে স্থানে কালিদাসের বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করেছেন। কালিদাস বলেছেন—লোলাপাঙ্গ লোচনের সহিত ক্রীড়া না করা আত্মবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়, কিন্তু যোগী বলেন যে, তা সাংসারিক অবস্থায় হলেও যোগাবস্থায় নয়।

"রিক্তঃ সর্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায়" (২২)

সমস্যাটিকে প্রাণায়ামের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে। কবি বলছেন, যেহেতু রিক্ততা লাঘব উৎপাদন করে থাকে এবং পূর্ণতা গৌরবের নিদান হয়, তুমি প্রাণায়াম করার সময় কেবল রেচন করেই বিরত হবে না, পূরণও করো।

"জ্ঞাতাস্বাদো বিপুলজঘনাং কো বিহাতুং সমর্থঃ" (৪৬)

এর পূরণকল্পে বলা হয়েছে যে, হনুমান্ শুক প্রভৃতিই ধন্য, কারণ তাঁরা যৌবনেও কামোন্মত্তাদের হাবভাবে বিচলিত হন নি। অন্যান্যের সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া একান্তই ক্লেশকর; যেহেতু আস্বাদপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে বিপুলজঘনাকে পরিত্যাগ করা অসাধ্য। সিদ্ধপুরুষের গমন-পথে যে সকল অসাধু ব্যক্তি থাকবে, মেঘদূতের শরভগণের ন্যায় কবি তাদের তিরস্কার করতে উপদেশ দিচ্ছেন—

শ্রদ্ধাহীনা বিকলমতয়ো গর্বিণঃ ক্রূরভাবা
বিদ্যাভ্যাসে বিগতবিনয়া জ্ঞানতো নষ্টবৃত্তাঃ।
সংজল্পন্তো যদপি তদপি স্বেচ্ছয়া ভর্ৎসয়েস্তান্
"কে বা ন স্যুঃ পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ" ।৫৮।

উপরি-উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত কয়টি থেকেই প্রমাণিত হবে যে, কবি বেশ নিপুণতার সঙ্গে, বেশ সফল ভাবেই, তাঁর আরব্ধ কার্য—সমস্যাপূর্তি রূপ দূতকাব্য নির্মাণ সমাধা করেছেন।

বলা বাহুল্য, যেহেতু আলোচ্য গ্রন্থ মেঘদূতের সমস্যাপূর্তি, সেজন্য উক্ত গ্রন্থ মন্দাক্রান্তা ছন্দেই লিখিত হয়েছে। এ গ্রন্থে মেঘদূতের ১২৩টি কবিতা ছিল, এ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সর্বসমেত ১৩৮টি শ্লোকে গ্রন্থ সমাপ্ত। এই ১৩৮টি শ্লোকের মধ্যে গ্রন্থরচনার কালসম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। পরন্তু অতঃপর আরও দুইটি শ্লোক দেখা যায়। এর প্রথমটিতে এরূপ লিখিত আছে:

শ্রীবিক্রমার্কনৃপপট্টনিবদ্ধকালাৎ
কালে গতেঽগ্নিনয়নাম্বুধিচন্দ্র (১৪২৩) সংখ্যে
বর্ষে বৃত্তে তপসি মাসি দিনৈকশেষে
শেষেণ শম্ভুবচনাদতিশম্ রামঃ (?) ॥

এর থেকে ১৪২৩ সংবৎ বা ১৩৬৭ খ্রীষ্টাব্দ গ্রন্থরচনার কাল প্রমাণিত হয়। সর্বশেষ চূর্ণকেও এরূপ লিখিত আছে —"সংবৎ ১৪২৩ বর্ষে মাঘবদি ১৪ (?) শুক্রে জাতমিদম্। পাণ্ডুলিপির কাল এরূপ লিখিত—সংবৎ ১৭০০ বর্ষে আশ্বিনি সুদি দশরাহা (দশম্যাং) বুধে লিখিতমিদম্ পণ্ডিত খেমজী-লিখিতম্।

২। মন্ত্রিবর্য শ্রীবিক্রম-প্রণীত শ্রীনেমিদূত

এ দূতকাব্যখানিও মেঘদূতের চতুর্থপাদের সমস্যাপূর্তি। এ গ্রন্থের কর্তা সাঙ্গণপুত্র মন্ত্রী শ্রীবিক্রম। জৈনসম্প্রদায়ের দ্বাবিংশ তীর্থগুরু নেমিনাথের চরিত্র অবলম্বনে এ গ্রন্থ লিখিত। নাম দেখে মনে হয় যেন নেমিকেই দূত করে পাঠান হয়েছে, বস্তুতঃ কিন্তু তা নয়, নেমিকে দূত করে পাঠান হয় নি, নেমির কাছেই অন্য এক দূত পাঠান হয়েছিল।*

কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয় এরূপ—নেমিনাথ সমস্ত সুখ-ভোগ পরিত্যাগ করে এমনকি (স্বীয় পত্নীরূপে নির্দিষ্ট) রাজা উগ্রসেনের (কংসের পিতা) কন্যা রাজীমতীকে† পর্যন্ত পরিত্যাগ করে মোক্ষ কামনায় রৈবতক পর্বতের শিখরে যোগসাধনায় ব্যাপৃত হয়েছিলেন। তখন তৎপত্নী রাজীমতী এক ব্রাহ্মণকে দূত করে তাঁর কাছে পাঠান (১০৭) পরে নিজেই পিতার অনুমতি নিয়ে একজন সখীর সঙ্গে রৈবতকে

---

* প্রকৃত অর্থের অনুরোধে নেমিদূত শব্দের যোগার্থ এরূপ করতে হবে—নেমির নিকট প্রেরিত দূত—নেমিদূত, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়, লক্ষণাদ্বারা গ্রন্থ বুঝতে হবে।

† ইতিবৃত্তাংশ এরূপ—কৃষ্ণের পিতা বসুদেবের সমুদ্রবিজয় নামে এক ভ্রাতা ছিলেন, নেমি তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ উগ্রসেনের কন্যা রাজীমতীর সঙ্গে নেমির বিবাহ স্থির করেন। নেমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও অগত্যা স্বীকৃত হলেন। কিন্তু পরে যখন তিনি দেখলেন যে বরযাত্রদের ভোজনের জন্য শত শত ছাগ বলি দেওয়া হচ্ছে, তখন তিনি দৃঢ়চিত্তে সমস্ত পরিত্যাগ করে রৈবতক পর্বতে তপস্যা আরম্ভ করেন।

গমন করেন। রাজীমতী নেমিকে রৈবতকের উচ্চশৃঙ্গে ধ্যানমগ্ন দেখে অতিদুঃখে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন :

সা শোকার্তা ক্ষিতিতলমগাং স্রাম্য দুঃখং হি নার্যাঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূর সংস্থে ?।।

তখন ঐ রৈবতক পর্বত স্বয়ং—

তাং দুঃখার্তাং শিশিরসলিলাসারসারৈঃ সমীরৈ-
রাশ্বাস্যেব স্ফুটিতকুটজামোদমত্তালিনাদৈঃ।
সাধ্বীমদ্রিঃ পতিমনুগতাং তৎপদন্যাসপূতঃ
প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার ।।৪।।

পর্বতের স্বাগত সম্ভাষণে আশ্বস্ত হয়ে রাজীমতী তখন তাকেই দূত করে নেমির কাছে পাঠালেন। অবশেষে নেমি সদয় হয়ে রাজীমতীকে নিজ যোগসহচরী করে মোক্ষ-সুখের অধিকারিণী করেছিলেন। এটাই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

এই কাব্যে মোট ১২৬টি শ্লোক। গ্রন্থপরিচয়াত্মক অন্তিম শ্লোক বাদে ১২৫টি সমস্যাপূর্তি। এর মধ্যে আবার প্রথম ছয়টি শ্লোক, ৮৮তম শ্লোক ও শেষের দুইটি মোট নয়টি কবির নিজ বাক্য ; ৮৯তম শ্লোক হইতে ১২৩ শ্লোক পর্যন্ত ৩৫টি শ্লোক রাজীমতীর সখীর বাক্য. অবশিষ্ট ৮১টি শ্লোক রাজীমতীর নিজ বাক্য। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, উপসংহার শ্লোকসহ (যাহা সমস্যাপূর্তির অন্তর্গত নহে) মোট দশটি শ্লোক কবিবাক্য। উপসংহার শ্লোকটি এইরূপ :

সম্ভূতার্থং প্রবরকবিনা কালিদাসেন কাব্যা-
দন্ত্যং পাদং সুপদরচিতাদ্ মেঘদূতাদ গৃহীত্বা।
শ্রীমন্নেমেশ্চরিতবিশদং সাঙ্গণস্যাঙ্গজন্মা
চক্রে কাব্যং বুধজনমনঃপ্রীতয়ে বিক্রমাখ্যঃ ।।

এর থেকে কবির নাম বিক্রম এবং তিনি সাঙ্গণের পুত্র এই পর্যন্ত অবগত হওয়া যায়। কবির কাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। খুব সম্ভবতঃ ইনি খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতকের মধ্য-ভাগে জীবিত ছিলেন।

সমালোচনা-প্রসঙ্গে এ গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য এই যে, সমস্যাপূর্তির নাগপাশে আবদ্ধ থেকেও কবি যেরূপ সহজ ভাবে ও সরল ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন তাতে তিনি উত্তম কবির পদ পাবার অধিকারী। পূর্বে দুটি সমস্যাপূর্তির উল্লেখ করেছি, তা থেকেই কবির রচনাশক্তির পরিচয় সুপ্রকট। আরও দু'একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ২৩ শ্লোকে রাজীমতী বলছেন তুমি এই পর্বতশৃঙ্গ ত্যাগ কর, নিজ রাজ্যে চল এবং সেখানে সুখসম্ভোগ কর :

এতত্তুঙ্গং ত্যজ শিখরিণঃ শৃঙ্গমঙ্গীকুরু স্বং
রাজ্যং প্রাজ্যং প্রণয়মখিলং পালয়ন্ বন্ধুবর্গান্।
রম্যে হর্ম্যে চিরমনুভব প্রাপ্য ভোগানখণ্ডান্
"সোৎকণ্ঠানি প্রিয়সহচরীসম্ভ্রমালিঙ্গিতানি" ।।২৩।।

অন্যত্র পথিপ্রসঙ্গে বামন অবতার ভগবানের পুরীবর্ণন-প্রসঙ্গে বলছেন :

যত্র ভ্রান্তান্ মরকতময়ান্ দেহলীঃ বিক্রমাণাং
প্রাসাদাগ্রং বিবিধমণিভির্নির্মিতং বামনস্য।
ভূমিং মুক্তাপ্রকররচিতস্বস্তিকাং চাপি দৃষ্ট্বা
"সংলক্ষ্যন্তে সলিলনিধয়স্তোয়মাত্রাবশেষাঃ" ।।৩৪।।

এর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। একস্থানে রাজীমতীর সখী নেমিকে উদ্দেশ করে বলছেন—সখী রাজীমতী পিতৃগৃহে একদিন রাত্রে হে স্বামিন্, আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?—এ বলে সহসা জাগ্রত হলে আমরা তাঁকে বলেছিলাম, হে রসিকে, যে তোমাকে চোখ দিয়েও দেখলে না তাকে কি তুমি প্রিয়তম বলেই স্মরণ করছ ?

শাব্যোৎসঙ্গে নিশি পিতৃগৃহে প্রাপ্য নিদ্রাং পুরাসৌ
ত্বং ক স্বামিন্ প্রজসি সহসেতি ব্রুবাণা প্রবুদ্ধা।
উচেস্মাভির্ খলু নয়নেনাপি যেনেক্ষিতাসীঃ
"কচ্চিদ্ভর্তুঃস্মরসি রসিকে ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি" ।।৯২।।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। কবি মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতের সমস্যাপূরণ করতে গিয়ে তাঁর কুমারসম্ভবের চমৎকারিত্বও স্বীকার করে নিয়েছেন স্বীয় রচনায়। ফলে তাঁর দূতকাব্যের নায়ক হিমালয়ের পরিবর্তে রৈবতকশৃঙ্গে যোগসাধনায় নিরত। তাঁর নায়িকা এক সখীর সঙ্গে গিয়ে নায়ককে অনুনয় করছেন এবং নিজে যাহা বলতে লজ্জাবোধ করেছেন, তা সখীমুখে বলেছেন—সমস্তই কুমারসম্ভবের সম্ভার। সর্বশেষে এই শ্লোক। এর দ্বারা "ক নীলকণ্ঠ ব্রজসি" এই প্রসিদ্ধ বাক্য অনায়াসেই মনে পড়ে যায়। কবি বিক্রম কালিদাসের একান্ত ভক্ত ছিলেন, সন্দেহ নাই। আর দুটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করে এই প্রসঙ্গের উপসংহার করব। সখী বলছেন যে, তুমি শীঘ্র নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করে বন্ধু বান্ধবের ও পিতামাতার আশা পূর্ণ কর ; বর্ষাকালে বিদ্যুতের সঙ্গে মেঘের ন্যায় রাজীমতীর সহিত তোমার যেন ক্ষণকালও আর এরূপ বিরহ না হয়। (এখানে উপমার মাধ্যমে সমস্যা পূরণ করা হয়েছে)।

গত্বা শীঘ্রং স্বপুরমতুলং প্রাপ্য রাজ্যং ত্রিলোক্যাং
কীর্তিং শুভ্রাং বিতনু সুহৃদাং পূরয়াশাং চ পিত্রোঃ।
রাজীমত্যা সহ নবঘনস্যেব বর্ষাসু ভূয়ো
"মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ" ।।১২৩।।

অতঃপর উপসংহারে কবি বলছেন—রাজীমতীর সখীর এই সকল বাক্য শ্রবণ করে নেমি সদয় হলেন এবং মোক্ষসুখ লাভ করাবার জন্য রাজীমতীকে নিজ সহচরী করলেন :

তৎসখ্যোক্তে বচনি সদয়ন্তাং সতীমেকচিত্তাং
সম্বোধ্যোশঃ স ভববিরতো রম্যধর্মোপদেশৈঃ।
চক্রে যোগান্নিজসহচরীং মোক্ষসৌখ্যাপ্তিহেতোঃ
"কেষাং ন স্যাদভিমতফলা প্রার্থনা হ্যুত্তমেষু" ॥১২৪॥

অতঃপর নেমি যোগসাধনা দ্বারা নিজেও মুক্ত হলেন এবং সংসারীজনোচিত অভীষ্ট ভোগ পরিত্যাগ করিয়ে রাজীমতীকে মোক্ষসুখের অধিকারিণী করলেন।

শ্রীমান্ যোগাদচলশিখরে কেবলজ্ঞানমস্মিন্
নেমির্দেবোরগনরগণৈঃ স্তূয়মানোঽধিগম্য।
তামানন্দং শিবপুরি পরিত্যাজ্য সংসারভাজাং
"ভোগানিষ্টানভিমতসুখং ভোজয়ামাস শশ্বৎ" ॥১২৫॥

(অন্তিম শ্লোক দুটি অবশ্য মল্লিনাথ মেঘদূতের টীকায় ধরেন নাই)। এর দ্বারা কবি যে কিরূপ নিপুণতার সহিত তাঁর কাব্যরচনা কার্য সম্পন্ন করেছেন, তা পাঠকগণ অনায়াসে বুঝতে পারবেন।

এই কাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, দূতকে উদ্দেশ করে কিছু না বলা। সমস্ত কথাই সন্দেশপ্রাপককে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। এ কাব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে ছয় শত বৎসর পূর্ব্বেও কালিদাসের মেঘদূতে ১২৬টি শ্লোক ছিল।

জৈন সাহিত্যের উপরে মেঘদূতের অপূর্ব প্রভাবের আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ—দূতকাব্যের আকারে জৈন কবিগণের চাতুর্মাস্য সময়ে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে সন্দেশপ্রেরণ। এ সাহিত্য অতুলনীয় ও অতি বিশাল।

জৈন ও বৌদ্ধসাহিত্য ভারতীয় সাহিত্যের অতি প্রাণবন্ত অঙ্গ। এ উভয় সাহিত্য বিশেষ করে মহাকবি কালিদাসের, আরও বিশেষতঃ—মেঘদূতের প্রভাবে বিশেষ প্রভাবান্বিত ভারতীয় প্রাদেশিক সাহিত্য, অর্ধমাগধী ও অন্যান্য সাহিত্য মেঘদূতের প্রভাবে কীদৃশ প্রভাবিত, তা সহজে বর্ণনা করা চলে না। কালিদাসের মেঘদূতের প্রভাব অপরিসীম অনন্নুমেয়।

তাজ

শ্রীকালীপদ ঘটক

চোখের জলে ডুবিয়ে দিয়ে
একটি যুগের স্বপনস্মৃতি,
আজকে তোমায় দেখতে এলাম, তাজ!
নীল যমুনার দু'কূল ছেপে
উথলে উঠে প্রিয়ার প্রীতি,
বিচ্ছেদে যার হানছে বুকে বাজ।

শ্বেত পাথরে দেউল গেঁথে
হায় বিরহী শাহানশাহা,
কি প্রেমগাথা রচিয়া গেলে, কবি!
হাজার হীরামতির বুকে
রূপ পেলো কি অরূপ যাহা,
স্বপনভাঙা মরণরাঙা ছবি!

তাজবেগমে দিয়েছে মাটি
এ নাকি তারি কবরখানা,
এ কথা খাঁটি সত্য কভু নয়।
যে প্রেম রূপে দেয় নি ধরা
জীবনে যারে যায় নি জানা,
মরণে সেথা তাহারি পরিচয়।

কামনা সেথা কুসুম হয়ে
অর্ঘ্য যাচে প্রেমাস্পদে,
খুঁজিয়া ফিরে পরশ-অতীতাকে।
অতনু প্রেম পদ্মরাগে
বিকশে হৃদি অমিয় হ্রদে,
মানস পটে ধ্যানের ছবি আঁকে।

বাহারে স্মরি আজিকে তাজ,
ব্যথা বারিধি মথন করি'
ঢেউ উঠে গো হৃদয়-যমুনায়;
তারি সে স্মৃতি তর্পণেতে
কয়েক ফোঁটা অশ্রুবারি
রাখিয়া গেনু তোমার আঙিনায়।

হোলী

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

বসন্তে, নবপত্রেপুষ্পে বিকশিত হয়ে প্রকৃতিরাণী অপূর্ব্ব রূপের ছটায় ধরিত্রী আলো করে তুলেছে, আর সেই রূপের নেশা এসে লেগেছে মানুষের মনে। নরনারী আনন্দে উচ্ছ্সিত হয়ে উঠেছে। বসন্তের কিংশুক ফুলের রঙের ছোপ লেগেছে সবার মনে, তাই রংখেলার আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠেছে নরনারী। ফাগুন এসেছে ফাগ নিয়ে, চারদিকে সুরু হয়েছে নাচগান আর রংখেলার ধুম। কত শতবর্ষ পূর্ব্বে কৃষ্ণকানাইয়া রঙে রঙে রাঙিয়ে তুলেছিলেন তাঁর আদরিণী শ্রীরাধার অঙ্গ, ফাগখেলার আনন্দে মশগুল হয়েছিলেন গোপিনীদের নিয়ে, সুন্দরী তরুণী গোপবালাদের হাস্যে-লাস্যে, নৃত্যে মুখরিত হয়েছিল নিকুঞ্জ, রঙের আবিরে রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল বৃন্দাবন। আজ এত যুগযুগ ধরে সেই রংখেলার উৎসব চলেছে গৃহে গৃহে, হোলীর দিনে অযোধ্যা-বাসিনীরা গাইছে :

"ধুম মোচে বৃন্দাবন, যাহা হরি খেলত হোরী
কেহিন হাত চিঠি লিখ ভেজো, কেহিন হাত সন্দেশ
যাহা হরি খেলতো হোরী।
পনছি হাত চিঠিয়া লিখ ভেজো, কাগন হাত সন্দেশ
যাহা হরি খেলতো হোরী
কাহে তোরে রংবনা আয়, কাহে কি পিচকারী ?
কেশর ঘোরকে রং বনায়া, সোনে কি পিচকারী
যাহা হরি খেলতো হোরী।"

বৃন্দাবনে হরি হোলী খেলছেন। কার হাতে চিঠি লিখে পাঠাব, কার হাতে খবর পাঠাব। রাধা ব্যাকুল হয়ে বলছেন। সখী উত্তর দিচ্ছে—পাখীর হাতে চিঠি লিখে পাঠাও। কাকের মুখে খবর পাঠাও যেখানে হরি হোলী খেলছেন। তোমার রঙ কি দিয়ে তৈরি করেছ, পিচকারী কি দিয়ে বানিয়েছ ?

কৃষ্ণকানাইয়া,

ভর পিচকারী সন্‌মুখ মারে ভিজ গয়ি রাধা পিয়ারী
ভরি পিচকারী, তনপর মারি, ভিজ গয়ি গুল শাড়ী।
ঝিলমিল ফাগ ডগর বিচ খেলে,
উড়ত গুলাল, লাল ভই বাদল, শোভা বরণন ন যায়।
কাওয়া বিন যানে ন পাই হো
করিহো কোন উপায়।
হারা কুসুম চোলী লেহ, আওলগ কি শাড়ী,
যাহা হরি খেলতো হোরী।"

কৃষ্ণকানাইয়া সোনার পিচকারী হাতে তুলে সামনে ছুঁড়ে মারলেন। রাধাপিয়ারী ভিজে গেলেন। আবার পিচকারী ভরে শরীরের উপর রঙ ছুঁড়ে রাধার সুন্দর শাড়ী ভিজিয়ে দিলেন। রাস্তায় খুব ফাগের উৎসব চলেছে, গুলাল উড়ে উড়ে আকাশ লাল করে দিয়েছে। শোভা বর্ণনা করতে পারি না। রাধা বলছেন, "রঙ না খেলে ত যেতে পারব না, কি উপায় করি। আমার জন্য সবুজ আর হলদে রঙের চোলী আর রেশমী অতি লাল শাড়ী নিয়ে এস, যেখানে হরি হোলী খেলছেন।"

এক নন্দকা লাল খেলে হোরী
পহেলী হোরী অঙ্গন মে খেলে
কিচর মার করে গোরী (নারী)
দোসরী হোরী বাগিয়ামে খেলে
বওরন মার করে গোরী
এক নন্দলাল খেলে হোরী।
তিসরি হোলী কুয়নপর খেলে
পাণি মার করে গোরী।
চৌথি হোরী মহলিয়ামে
রংগুলাল করে গোরী।

"নন্দদুলাল হোলী খেলছেন, প্রথম হোলী উঠানে খেলে সব নারীদের কাদা-মাটি দিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয় হোলী বাগিচাতে খেলছেন, আমের মুকুল নারীদের ছুঁড়ে মারছেন। তৃতীয় হোলী কুয়ার পাড়ে খেলে জল ছিটিয়ে নারীদের ভিজাচ্ছেন। চতুর্থ হোলী অন্দরমহলে খেলে রঙ দিয়ে নারীদের রাঙিয়ে দিচ্ছেন।"

আরি পিয়াজী কি চোরি,
লাল, মুঝ সে খেলো না হোরী।
যো শুন পায় শাস হামারি, দেহে লাখন গারি
লাল, মুঝ সে খেলো না হোরী।
যো শুন পায় ননন্দ হামারি,
আপনা বিরণকে (ভাই) কহিএ যায়
লাল, মুঝ সে খেলো না হোলী।
যব শুন পায় স্বামী হামারি, ঘরসে দেহে নিকাল
লাল, মুঝসে খেলো না হোলী।
ছিন্ ঝটক, মোরি গাগর ফোড়ে
ধর বহিয়া ফাগ ফোড়ি, লাল মুঝসে খেলো না হোরী।"

"আমার স্বামীকে না দেখিয়ে পালিয়ে এসেছি। লাল, তুমি আমার সঙ্গে হোলী খেল না, রাধা শ্রীকৃষ্ণকে মিনতি করে বলছেন। আমার শাশুড়ী যদি শুনে তোমার সঙ্গে হোলী খেলছি তবে আমাকে লাখ গালি দেবে। যদি আমার ননদ শুনে তবে তার ভাইকে বলে দেবে। আমার স্বামী যখন একথা শুনবে তখন আমাকে ঘর থেকে বের করে দেবে। লাল তুমি আমার সঙ্গে হোলী খেলতে এস

মা। কিন্তু লাল সেকথা মা শুনে আমার দু' হাত ধরে ঝাঁকি মেরে আমার কলসী কেড়ে নিয়ে ভেঙে ফেলেছে।"

"যায় দে পাণিয়া যোশমতওয়ালে,
ভারী ঘড়া শির সমরত নাহি
গহেরী যমুনা, পাও পয়জনিয়া,
যোশমতওয়ালে।
ছোড় ডগর, যানে দেও মোহন
ঘর দারুণ মোরে, শাশু ননন্দীয়া, যোশমতওয়ালে।
একটা কাকে ওড়ে কালী কম্বলিয়া
বাত করে যেইসা ছল চিকনিয়া
যোশমতওয়ালে।
যায় দে পাণিয়া, যোশমতওয়ালে,
সুরদাস রসবস, ভই গোয়ালিন
তোমারি চরণকে ভই দাসী, যশোমতওয়ালে।

(পয়জনিয়া—পায়ের অলঙ্কার, চিকনিয়া—গুণ্ডা, টাকা—দু'পয়সা)

রাধা বলছেন, ও যশোমতীনন্দন, আমাকে জল আনতে যেতে দাও। ভারী কলসী মাথায় রাখতে পারছি না, যমুনা গভীর, পায়ে পয়জনিয়া, রাস্তা ছেড়ে আমাকে চলতে দাও মোহন, ঘরে আমার শাশুড়ী ননদ সবাই রাগ করে।

শ্রীকৃষ্ণ রাধার এই কাকুতিতে কান দিলেন না, তাঁর উৎপাত সমান ভাবেই চলল। তখন রাধা কপট রাগ করে বলছেন, যশোমতওয়ালা, কাঁধে ত তোমার দু'পয়সার কালো কম্বল, আর কথাবার্তা আচরণ ঠিক গুণ্ডার মত।

শ্রীরাধিকার কৃত্রিম রাগেও যখন কোন ফল হ'ল না, তখন রাধা আত্মসমর্পণ করে বললেন, যশোমতওয়ালা আমি গোয়ালিনী তোমার রূপেগুণে মুগ্ধ হয়ে গেছি, তোমার চরণের দাসী বনেছি। হে যশোমতীনন্দন, পথ ছেড়ে আমাকে জল আনতে যেতে দাও।"

বিরজমে কানাইয়া হোলী খেলারে
ইতসে আওয়থ সুন্দরী রাধিকা
উতসে কুমর কানাইয়া
ঝিলমিল ফাগ, বরসপর খেলে,
উড়ত লালগুলাল, লাল ভই বাদল
শোভা বরণন ন যায়।
রাধানে সৈন দিয়া সখিয়ান কো,
ঝণঝুও উঠি ধায়ি
ছিনলি মুখ মুরলী পীতাম্বর,
শিরসে চুনর ওড়াইহি,
বিন্দী ভাল, নয়ন বীচ কাজল
নথ বেশর পহে নাই।
কাঁহা গয়ে তোর নন্দ বাবাজী
কাঁহা যশোমত মায়ি?
শুকত মুখ মোড়, মোড়কে
কাঁহা গয়ি চতুরাই
নরসে নারী বনাই
বিরজমে কানাইয়া হোলী খেলাই।"

"ব্রজে কানাইয়া হোলী খেলছেন, এমন সময় সুন্দরী রাধিকা এলেন এদিকে, আর ওদিকে কুমার কানাই চারদিকে ফাগের উৎসব চলেছে—রাস্তায় ঘাটে ময়দানে, লাল গুলাল উড়ে আকাশ লাল করে তুলেছে, যার শোভা বর্ণনা করা যায় না। রাধা সখীদের নয়ন দিয়ে ঈশারা করলেন সখীরা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পীতাম্বর আর মুখের বাঁশী কেড়ে নিল। মাথায় নিজেদের গায়ের চুনরি খুলে ঘোমটা দিয়ে দিল। কপালে বিন্দী পরিয়ে দিল, আর দি নয়নে কাজল, নাকে বেশর পরিয়ে দিল। সখীরা হেসে ভেঙে পড়ে বলল, ও কানাইয়া কোথায় তোমার নন্দ বাবাজী আর যশোমত মায়ি। শুকনো মুখ ফিরিয়ে রাখছ কেন তোমার চতুরালী কোথায় গেল? নরকে নারী বানিয়েছি ব্রজে কানাইয়া হোলী খেলছেন।"

পিয়া পরদেশ ন যাও, নয়নলোর জানাওয়ে
কুন্তন ঘোড়া, মোতিন লরি, চাবুক মার মার হারি,
পিয়া পরদেশ ন যাও, নয়নলোর জানাওয়ে॥
মকুনা কি হাতী, জরদে অনাড়ি
আঙ্কুশ মার মার হারি
পিয়া পরদেশ ন যাও ·····
—গোরী গোরী বঁহিয়া, হারিপিলি চুড়িয়া,
ছলদি সে বন্ধ লগাই
পিয়া পরদেশ ন যাও ·· ··
নাকচুনী নথ বেশর শো হে
বিন্দিকি ছব নেয়ারি
পিয়া পরদেশ ন যাও, নয়নলোর জানাওয়ে।

হোলীখেলা সাঙ্গ হয়েছে, এখন বিচ্ছেদের পালা। আসন্ন বিচ্ছেদ-আশঙ্কায় কাতরা রাধা মিনতি করে নয়নজলে জানাচ্ছেন প্রিয় পরদেশে যেও না, মোতির মালা-পরা তেজী ঘোড়াকে চাবুক দিয়ে দিয়ে হয়রাণ হয়েছি। মানে তোমার প্রেমে মুগ্ধ আমার মনকে শাসনে সংযত রাখতে পারছি না। আনাড়ী মাহুত যেমন হাতীকে অঙ্কুশ দিয়ে মেরে মেরেও আপন বশে রাখতে পারে না, তেমনি আমিও আমার হৃদয়কে বশীভূত করতে পারছি না, হে প্রিয় তুমি আমাকে ছেড়ে পরদেশে যেও না। রাধার গৌরবর্ণ মণিবন্ধে সবুজ হলুদ চুড়ি, দু'পাশে দুই ছুরি শোভা পাচ্ছে, কপালে বিন্দি, আর নাকে চুনীর নথ আর বেশর। রাধার কি সুন্দর রূপ ফুটে উঠেছে। সুন্দরী রাধা কাতরভাবে অনুনয় করছেন প্রিয় পরদেশে যেও না।

গ্রাম্য আঁওধী ভাষায় এরকম বহু সুন্দর গান আছে, যা থেকে আমরা সেকেলে গ্রাম্য নারীদের মনোভাবের পরিচয় পাই। তারা যদিও অশিক্ষিত আনাড়ী ছিল ত তাদের গানগুলির ভিতর দিয়ে বড় সুন্দর সহজ কবিত্ব ফু

উঠেছে। তাদের সাজসজ্জা, অলঙ্কারের প্রতি আসক্তি, তাদের হাসি-পরিহাস, প্রেম-বিরহের উচ্ছ্বাস তাদের প্রাণবন্ত সজীব হৃদয়ের পরিচয় দেয়। তারা শ্রীরাধিকাকে উপলক্ষ্য করে নিজেদের রসিক মধুর হৃদয়ের ভাব ফুটিয়ে তুলেছে হোলীর গানগুলির ভিতর দিয়ে। "পিয়া পরদেশ ন যাও, নয়নলোর জানাওয়ে", এই সহজ সাধারণ একটি পঙ্‌ক্তিতেই চোখের সামনে মূর্তিমতী হয়ে উঠে বিরহবিধুরা প্রেমিকা, যে সজল-নয়নে প্রিয়কে মিনতি জানাচ্ছে, "প্রিয় পরদেশ ন যাও।"

নিঃস্ব

শ্রীসত্যব্রত রায় চৌধুরী

পুরো দু'দিন উপোস থেকে অবশেষে সর্ব্বশেষ অবলম্বন আইনের বই কয়খানির উপরই হাত দিতে হ'ল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কয়টা ধাপ সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে যখন সর্ব্বশেষ পরীক্ষাটা অর্থাভাবে বন্ধ হবার উপক্রম হয় তখন বই বিক্রী করা ছাড়া আর উপায়ই বা কি? তাই বই কয়েকখানি কাঁধে ফেলে কলেজ ষ্ট্রীটের এ দোকান থেকে ও দোকান পর্য্যন্ত দর যাচাই করে ঘুরতে থাকে শুভেন্দু। তৈলহীন রুক্ষ চুলগুলি বাতাসে উড়ে এসে কপালের উপর পড়ে। চশমার কাঁচে ঢাকা বড় বড় চোখ দুটো বেদনায় ম্লান, করুণ দেখায়। ক্লান্ত গম্ভীর মুখময় কালচে রক্তের ছাপ। কপালের কাছে শিরাটা ফুলে উঠে যেন দপ দপ করে।

অবশেষে ন'টা টাকাই পাওয়া গেল। অধিকন্তু দোকানী একটু কৃপা করেই যেন আরও আট আনা হাতে তুলে দিলে। মনে মনে ভদ্রলোকের সহৃদয়তার প্রশংসা করতে করতে শুভেন্দু পঞ্চাশ টাকার বইয়ের বিনিময়ে ন'টাকা মূল্যের নূতন কয়েকখানা নোট পকেটে পুরে গোলদীঘির দিকে এগোতে লাগল। আজ এই টাকা কয়টা না পেলে ইউনিভার্সিটির দরজা চিরদিনের মত তার কাছে রুদ্ধ হয়ে যেত। উপরন্তু কয়েক দিনের অবশ্যম্ভাবী উপবাস। পরশু দিনই একচোট ঝগড়া হয়ে গেছে কলেজের প্রিন্সিপালের সঙ্গে! বাকী-পড়া চার মাসের বেতনের মধ্যে অন্ততঃ এক মাসের না মিটিয়ে আর সে কলেজে ঢুকবে না এই প্রতিজ্ঞাই সে সেদিন করে এসেছে। মেসেও দু'মাসের বিল পড়ে আছে, কিছু না মেটালে সেখান থেকে উৎখাতের সম্ভাবনাও প্রচুর। শেষ পর্য্যন্ত তার প্রতিজ্ঞা বোধ হয় রক্ষা হ'ল—এই ভেবে একটা আত্মপ্রসাদে সমস্ত উপবাসী মনটা ভরে উঠল শুভেন্দুর।

গরমের বেলা, বিকেল প্রায় চারটার কাছাকাছি। সমস্ত পথ জুড়ে তপ্ত রোদের ঝলক। ট্রাম-বাসগুলো অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। খানিকক্ষণ ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে থেকে ট্রামে উঠবে কি বাসে উঠবে ভাবছে শুভেন্দু এমন সময় ফুটপাথের ওপারে চোখ পড়ল। ছোট্ট একটি ভেলভেটের ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে ট্রাম ষ্টপে দাঁড়িয়েছিল একটি মেয়ে। এতক্ষণে শ্রীমতী অরুন্ধতীও দেখতে পেয়েছে শুভেন্দুকে।

হাঁা, অরুন্ধতীই বটে: চিনতে ভুল হয় নি শুভেন্দুর! তিন বছর আগেকার মতই তন্বী, তরুণী। চোখে শান্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি। বুদ্ধি-দীপ্ত মুখ। গলায় একছড়া মুক্তোর হার, হাতে সোনার দুটি বালা, বাঁ হাতে রিষ্টওয়াচ। পরিধানে সরু পাড়ের সাদা সিল্কের শাড়ী। সাদা আদ্দির জামা। হাতে বেঁটে রঙীন ছাতা।

শুভেন্দু রাস্তাটুকু পেরিয়ে আসতেই অরুন্ধতী বললে, "কে, শুভেন্দু না?"

—"বোধ হয়। কেন, চিনতে কি খুব অসুবিধে হচ্ছে?"

—"খানিকটা তাই বটে। সিদ্ধার্থকে গৌতম বুদ্ধের রূপে দেখে চিনতে একটু বেগ পেতে হচ্ছে বৈকি?" বলে হাসতে লাগল অরুন্ধতী।

—"সে থাক, অনেক দিন পর দেখা, আছ কেমন?"

—"ঠিক আগে যেমনটি ছিলাম, তেমনি ভাল। তুমি? তোমার খবর বল!"

—"আমিও বেশ ভাল।" একটু যেন জোর দিয়েই বলল শুভেন্দু; "ভবে হাঁা, ভাল আর কোথায়? বাবা মারা গেলেন দু' বছর আগে, কিন্তু রেখে গিয়েছিলেন প্রচুর ঋণ। দেনার দায়ে বাড়ী গাড়ী সব বিক্রী হয়ে গেছে। এখন নিজের উপর নির্ভর করেই পড়তে হচ্ছে ল'টা। থাকছি ভবানীপুরের একটা মেসে।"

অরুন্ধতীর অতলান্ত দৃষ্টিতে একটা সমবেদনার আভাস ফুটে উঠল। বললে, "ওর কিছু কিছু আমি আগেই শুনেছিলাম দিল্লীতে থাকতে।"

হালকা হেসে শুভেন্দু জিজ্ঞাসা করল, "এদিকে কোথায় এসে-ছিলে?"

—"এই ত এখানেই। দুটো বই কিনলাম। রোঁল্যাঁর জাঁ ক্রিস্তফ আর প্রমোটার্স অব নিউ ইণ্ডিয়া। তুমি?"

—"একটু দরকার ছিল এদিকেই।"

খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপ। তারপর হঠাৎ অরুন্ধতী বলে, "কতদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা। অবশ্য, তোমার খবর পেয়েছি কাগজে। এম-এতে প্রথম হয়েছ, সেজন্য তোমায় কনগ্র্যাচুলেশন জানাচ্ছি শুভেন্দু।"

ম্লান হেসে শুভেন্দু বললে, "তোমার খবরও অবশ্য জেনেছি আমি। তবে একটু দেরিতে। বিয়েতে বড্ড ব্যস্ত ছিলে বলেই বোধ হয় খবর দিতে পার নি। এম-এ পড়তে পড়তেই কলেজ ছেড়ে দিল্লী চলে গেলে।"

সলজ্জ হেসে অরুন্ধতী বললে, "এত দিন ত বাংলার বাইরে বাইরেই কাটিয়ে এলাম। এখানে এসেছি এই কয়েক মাস হ'ল। উনি এখানে বদলি হয়েছেন কি না? একদিন আমাদের বাসায় এস। আসবে ত?"

—"যাব। নিশ্চয়ই যাব। একদিন দেখে আসব তোমার সংসার।"

কথার স্বর টেনে অরুন্ধতী বললে, "রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলার কোন মানেই হয় না। তুমি কি এখন ব্যস্ত শুভেন্দু?"

—"ব্যস্ত? না, ব্যস্ত কেন?"

—"তা হলে এস না কফি-হাউসেই গিয়ে না হয় একটু বসা যাক।" যেচেই যখন বলল অরুন্ধতী তখন ওর পয়সায় অন্ততঃ এক কাপ কফি মিলবে, সঙ্গে নিশ্চয় কিছু খাবার। দু'দিন উপবাসের পর খুবই লোভনীয় আমন্ত্রণ। ভেবে দেখল শুভেন্দু। তারপর বলল, "বেশ, তাই চল।"

পথ চলতে চলতে অরুন্ধতী বললে, "তুমি কিন্তু অনেক বদলেছ শুভেন্দু। আগেকার দিনের মত আর তোমার ষ্টাইল নেই। গাড়ী ছাড়া আগে তুমি কলেজে আসতে পারতে না, এখন তোমাকেও ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। চেহারারও সেই অবস্থা। মুখভর্ত্তি খোচা খোচা দাড়ি। চশমাটা ভাঙা। চুল উস্কো-খুস্কো। তোমাকে দেখলে দার্শনিক বলে মনে হয় শুভেন্দু।" বলে অরুন্ধতী হাসলে।

শুভেন্দুও হাসল; বললে, "তখন ত আর এখনকার মত বাঁধাধরা হিসেব করা পয়সা ছিল না! তবে তুমি কিন্তু ঠিক তেমনি আছ, অরুন্ধতী। সেই কলেজে পড়া দিনগুলির মত। একটুও বদলে যাও নি কোথাও।" সারাদিনের অভুক্ত, অস্নাত শুভেন্দু ঝাপসা দৃষ্টি মেলে সামনে গোলদীঘির দিকে তাকাল; তারপর বলল, "অবশ্য একদম আগের মত আছ, এ কথা বললে ঠিক হবে না। কারণ তখন ছিলে বিদ্যার্থিনী, এখন হয়েছ গৃহিণী। সব চেয়ে বড় আনন্দের মুহূর্ত্তেই সব চেয়ে সুলক্ষণের সূচনা হয়, তাই তখনকার সঙ্গে তোমার এখনকার রূপের কিছু পার্থক্য আছে বৈকি, অরুন্ধতী।"

মুহূর্ত্তে অরুন্ধতীর মুখ রাঙা হ'ল, নিবিড় লজ্জায় মাথাটা অবনত হ'ল। আস্তে আস্তে বললে, "এতদিন পরে তোমাকে ঠিক এমনি ভাবে দেখতে হবে এ সত্যিই কোনদিন ভাবতে পারি নি। এত আগোছালো হয়ে গেছ তুমি! এত পরিবর্ত্তন হয়েছে তোমার চেহারায়, বেশভূষায়! আশ্চর্য্য! তুমি আমার দিকে না তাকিয়ে থাকলে হয় ত চিনতেই পারতাম না তোমায়।"

—"এমনি হয় অরুন্ধতী, আজ যেটাকে কল্পনায়ও ভাবতে পারছ না, কাল সেটাকেই বড় স্বাভাবিক বলে মনে হবে।"

আতঙ্ককণ্ঠে অরুন্ধতী বললে, "সত্যি শুভো!"

শুভো! অনেকদিনের একটা পুরনো ব্যথা যেন শুভেন্দুর সমস্ত বুকটা জুড়ে মোচড় দিয়ে উঠল। অনেক দিনের পুরনো স্মৃতি যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইল। অরুন্ধতীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল, যে সময়ে জীবনের সবুজ পত্রপুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে রুপালী জ্যোৎস্নায় ভরা উদ্দাম বাতাস জীবনটাকে উজ্জ্বল করে তুলত, এ যেন সে দিনেরই অরুন্ধতী।

সে আজ থেকে ক'বছর আগেকার কথা। শুভেন্দু আর অরুন্ধতী দু'জনেই তখন পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সেটা ছিল সেই সময়, যখন বাস্তবের উপর কল্পনার তুলি বুলিয়েই সবাই জীবনকে দেখতে পায়। সেই সময় উভয়ের মনে বিকশিত হয়েছিল অন্তর্লোকের এক অপূর্ব্ব অন্তরঙ্গতা। সেটাই জীবনের সবচেয়ে মর্ম্মান্তিক মহানন্দ। কিন্তু সে আজ শুধুমাত্র স্মৃতি।

কিন্তু তবুও কল্পনায় সেদিনের ছবিটা শুভেন্দুর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। চার বছর পূর্ব্বে এমনি এক অপরাহ্নে কলেজ ছুটির পর গাড়ীতে করে যাচ্ছিল শুভেন্দু আর অরুন্ধতী। তখন শরৎকাল, রুপালী রোদ জরির চাঁদোয়ার মত সমস্ত মহানগরীকে জড়িয়ে ছিল।

রেড রোডের সামনে ষ্টিয়ারিংটা বাঁ দিকে ঘুরিয়ে শুভেন্দু বলেছিল, "আজ কিন্তু আমার শাসন না মানার পালা অরু। তোমার কোন মানা আজ আর শুনব না। আমার যতক্ষণ খুশী আমি গাড়ী চালাব। কিছুতেই তুমি বারণ করতে পারবে না।"

—"তা হবে না, শুভো। তোমাকে আমার ভয় করে। স্বাধীনতা পেলে সবকিছুতেই তুমি মাত্রা ছাড়িয়ে যাও। আজ আবার তোমার মাথায় কি খেয়াল চেপেছে কে জানে?"

শুভেন্দু বললে, "বড় বড় কথার ফুলঝুরি দিয়ে আজ আর তোমার সঙ্গে তর্ক করব না অরু। সত্যি, ভারি ইচ্ছে করছে আজকে দু'জনে পাশাপাশি বসে যতক্ষণ খুশী পথ চলি। অনেকক্ষণ ধরে প্রাণ ভরে গল্প করি। তোমার সঙ্গে কথা বলা অবশ্য শেষ হবে না কোন দিনই। কারণ এই ধর, তুমি হলে বিঠোফেনের একরাশ অমর-গীতি। এ জগতে বিঠোফেনের কি শেষ হবে কোন দিন? বিঠোফেন আর তাঁর বিনম্র কাব্যগীতি, এ দুটো ধারা চিরদিন পাশাপাশি চলবে যুগ-যুগান্তর ধরে।"

অরুন্ধতী জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। শুধু বলল, "বিঠোফেনের সঙ্গে তাঁর অমর প্রিয়ার কোন দিন মিলন হয় নি, শুভো।"

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার সেদিকে তাকাল শুভেন্দু। তারপর এক হাতে ষ্টিয়ারিং ধরে ব্যাকুল আগ্রহে অন্য হাতের আকর্ষণে অরুন্ধতীকে কাছে টেনে নিল। বলল, "প্রেমের শক্তি মৃত্যুর চেয়েও প্রবল

অরু। মরণের ওপারেও তাদের ধারায় ছেদ পড়বে না কোনদিন।"

—"আঃ, ছাড়। তুমি এতও পাগলামি করতে পার। একটা এক্সিডেন্ট ঘটাবে নাকি শেষকালে?"

শুভেন্দু ছাড়ল না। বললে, "অরু শোন। আমার সব কথা আজকে তোমাকে শুনতেই হবে।"

—"শুনছি ত! দু'বছর ধরে তোমার মুখে শুধু বিঠোফেন আর বিঠোফেন শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেল, শুভো।" পদ্মাভ গালে কুঙ্কুমের রঙ ছড়িয়ে অরুন্ধতী বলল।

—"শুনছ না, ছাতা।" শুভেন্দু রাগ করে মুখ ফেরাল।

খানিকক্ষণ চুপ। তার পর শুভেন্দুর কাঁধে হাত রেখে ছোট্ট করে অরুন্ধতী ডাকল, "শুভো!"

—"বল।"

—"চল না কোথাও বসি।"

—"ঈস! কি একটা বসবার জায়গা।"

মৃদু হেসে অরুন্ধতী বললে, "কেন, মাথার উপর অনন্ত নীল আকাশ, সবুজ ঘাসে ভরা এত বড় গড়ের মাঠ, সামনে ভিক্টোরিয়ার বাগানে রাশি রাশি ফুলের বিছানা। নির্জনও খুব। এস না বসি কোথাও।"

—"না। তোমাকে ত বলেছি অরু, আজ আমার শাসন ভাঙার পালা।"

—"বেশ ত, তবে চল আউটরামের কফি হাউসে।"

—"তা মন্দ নয়।" বলেই আচমকা পথ ঘুরে দ্বিগুণ বেগে গাড়ী চালাতে লাগল শুভেন্দু। বললে, "মনে কর, এখন যদি একটা দুর্ঘটনা হয় অরু। আমি যদি মরে যাই। তোমার গায়ে অবশ্য আঁচড়টিও লাগবে না। তা হলে কেমন হয়?"

অরুন্ধতীর দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে মিটিমিটি হাসতে লাগল শুভেন্দু। অরুন্ধতী কথা বললে না। মুখ ভার করে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। এর পরে আর কিছু বলার কথা ভেবে পেলে না শুভেন্দু। অনেকক্ষণ পরে অরুন্ধতীর নিকষকালো বিমুনীটা বাঁ হাতে জড়িয়ে শুভেন্দু বললে, "রাগ করলে?"

—"রাগ? বা-রে, রাগ করব কেন?"

"তবে চুপ করে আছ?"

—"কি আর বলব, আমি ত আর তোমার মত বানিয়ে বানিয়ে রোমান্স কথা বলতে শিখি নি।"

—"ওঃ! তা হলে দেখছি সত্যিই ভীষণ রাগ করেছ!" বলে হা হো করে হাসল।

আউটরাম ঘাটের রেষ্টুরেন্টে মুখোমুখি বসে অরুন্ধতী বললে, এখন কি করা যায়?"

—"আমি কি জানি!"

—"তবু বলই না!" আবদারের সুরে অরুন্ধতী বলল, আপাততঃ গঙ্গার ঢেউ গোনা কিংবা জাহাজের মাস্তুলগুলির একটা হিসেব নেওয়া!"

সেখান থেকে যখন ওরা বেড়িয়ে এল, তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। গড়ের মাঠের উপর এখানে সেখানে ছড়ানো বটগাছের ছায়া বিলম্বিত হয়ে পড়েছে। দূরে চারিদিকে অসংখ্য আলোকের মালা। জনবিরল প্রান্তর। মাঝে মাঝে গঙ্গার উতলা হাওয়ার ঝাপটা ময়দানের বুকে। শুভেন্দু আর অরুন্ধতী মাঠে বসল।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ শুভেন্দু বললে, "এভাবে আর ক'দিন কাটাবে, অরু?"

হঠাৎ যেন চমকে উঠল অরুন্ধতী। বললে, "কেন? কি হয়েছে?"

—"তা কি জান না তুমি?"

—"লক্ষ্মী শুভো, আর ক'টা দিন অপেক্ষা কর।"

—"কেন, অরু?" অরুন্ধতীর হাতে হাত রেখে শুভেন্দু বললে, "আমাদের পরীক্ষাটা হয়ে যাক। আর তা ছাড়াও···"

—"তা ছাড়া আর কি অরুন্ধতী?"

—"মা-বাবার মতামতটাও কি জেনে নেওয়া উচিত নয়, শুভো?"

—"তা উচিত বটে, কিন্তু ধর, ওঁরা যদি অমত করেন!"

ব্যাকুল হয়ে অরুন্ধতী বলল, "সেকথা এখন কেন, শুভো?"

"তাও কি তুমি জান না, অরু? তুমি কি জান না জগতে সব যাতনা সহ্য হয়, কিন্তু প্রিয়-বিরহের যন্ত্রণা একেবারেই অসহনীয়।"

অরুন্ধতী চুপ করে রইল। একটু অপেক্ষা করে শুভেন্দু বললে, "কেউ মত না দিলেও সবার অমতেই আমি তোমাকে চাই, অরুন্ধতী।"

"না, না, ছি, তা কেমন করে হয়! এ বড় বিশ্রী, বড় অশোভন, শুভো।"

হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে শুভেন্দু বললে, "তা হলে তুমি কি করতে চাও অরুন্ধতী?"

অরুন্ধতী চুপ করে রইল। মুখ লুকাল হাঁটুতে।

"ওঃ এই?" তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থির করে শুভেন্দু তাকাল অরুন্ধতীর দিকে। "সত্যি ত, তোমার মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন সবার উপরে। তাঁদের মতামতের উপর তোমার মতামত, আমার ভালবাসার কোন দাম নেই। তাঁরা তোমায় স্নেহ করেন, তোমার ভাল চান। সন্তানের জন্য বাপ-মার এই স্নেহ খুব স্বাভাবিক জানি। কিন্তু আমি! আমি তোমার কে? দিনের পর দিন তোমার জন্য নিজেকে উন্মুখ করে রেখেছি, স্বপ্ন গড়েছি, তার দাম কে দেবে, অরুন্ধতী? তোমার মা-বাবার এক কথাতেই কি সব ভেসে যাবে? এতদিনের এত আকাঙ্ক্ষা সব ব্যর্থ হয়ে যাবে? এ কথা তোমার আগে বলা উচিত ছিল অরুন্ধতী।" হঠাৎ শুভেন্দু উঠে দাঁড়াল। "তবে কেন এতদিন প্রবঞ্চনা করেছ আমার সঙ্গে? কেন খুলে বল নি তোমার মনোভাব? অরুন্ধতী, আজ থেকেই তবে আমাদের সব সম্পর্কের শেষ হোক্। সত্যি ত, কিসের জোরে সবার ওপরে স্থান পেতে চাই? শুধু ভালবাসি, এই ত।"

অসহায়ভাবে শুভেন্দুর জামাটা আঁকড়ে ধরল অরুন্ধতী, "শুভো, লক্ষীটি। রাগ করো না, বস।'

"না, না, কি দরকার অভিনয় করার? কেন আত্মপ্রবঞ্চনা কর? আমাকে ফাঁকি দাও?"

"শোন, শোন, শুভো!"

"না, এ ভাবে এ পরিবেশে তোমার সঙ্গে বসে থাকা অত্যন্ত অন্যায়, অত্যন্ত দৃষ্টিকটু অরুন্ধতী। এ বড় অশোভন।"

"না, না, শুভো! শোন, তোমাকে শুনতেই হবে।" ব্যাকুল ভাবে শুভেন্দুর হাত দুটি ধরে বলল অরুন্ধতী। "ছেলে-মানুষি করো না। ভেবে দেখ, শান্ত হও, শান্ত হয়ে ভেবে দেখ। আমাকে ভুল বোঝ না।"

ওরা বসল। আস্তে আস্তে শুভেন্দুর পাতলা চুলে হাত বুলিয়ে বলতে লাগল অরুন্ধতী, "আমি তোমারই। চির দিন আমি তোমারই থাকব।...ঝরণার মত তার গাল বেয়ে, বুক বেয়ে অশ্রুকণা ঝরে পড়তে লাগল।...

কিন্তু সে আজ থেকে চার বছর আগেকার কথা। এ শুধু চার বছর আগেকার একটা কাহিনী। অতীতের একটা সামান্য হৃদয়াবেগের ক্ষণিক উচ্ছ্বাস। এর সঙ্গে বর্তমানের কোনপ্রকার সম্পর্ক খুঁজে পাবে না শুভেন্দু।

ইণ্ডিয়া কফি হাউস। খাবারের প্লেটে ছুরি চালাতে চালাতে শুভেন্দু প্রশ্ন করলে, "পড়াশুনো ছেড়ে দিলে কেন অরুন্ধতী? ও কাজটা না হয় সেরেই নিতে।"

কফির কাপ থেকে মুখ তুলে অরুন্ধতী বললে, "খুবই ইচ্ছে ছিল অন্ততঃ এম-এ পরীক্ষাটা দেবার। কিন্তু দশটা ঝামেলায় আর হয়ে উঠল না। দু'দিন পর পরই ওঁকে এখানে ওখানে বদলি হতে হয়, তাই আর গুছিয়ে উঠতে পারলাম না।"

"ও।"

অনেকক্ষণ পর অরুন্ধতী আবার বলে, "তোমার পরীক্ষা ত প্রায় এগিয়ে এল, শুভেন্দু। পরীক্ষা কোন দিন খারাপ কর নি, এবারও নিশ্চয়ই করবে না। কি করবে এর পর?"

"কেন, আমার অবস্থায় আর পাঁচ জনে যা করে তাই করব। ব্যবসা করতে চেষ্টা করব। বিয়ে করব, সংসারী হব।"

চোখ নামিয়ে ঠাট্টা করলে অরুন্ধতী, "তোমার কথায় কিন্তু রোমান্সের গন্ধ পাচ্ছি, শুভেন্দু। ভাবী বৌয়ের সঙ্গে দাও না একদিন আলাপ করিয়ে।"

হঠাৎ চমকে উঠল শুভেন্দু। এ রকম প্রশ্নের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না সে। কাপে মুখ রেখে খানিকক্ষণ কি যেন ভাবল শুভেন্দু। তার পর বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথাই বলতে আরম্ভ করলে।

"ওঃ, সে কথাটাই বুঝি এতক্ষণেও বলা হয় নি তোমায়? অনুপমার নাম তুমি শোন নি, না অরুন্ধতী? গেল বছর এলাহাবাদ থেকে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি-এতে প্রথম হয়েছে অনু। ওর বাবা সেখানকারই প্রিন্সিপাল। ভারি চমৎকার মেয়ে অনুপমা। তার লেখা তুমি নিশ্চয়ই পড়েছ। পড় নি? অপূর্ব্ব কবিতা লেখে অনুপমা। ছোটবেলায় শান্তিনিকেতনেই ছিল কিনা। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য অরুন্ধতী। এখানে যা গরম, তাই কয়েক দিন হ'ল হাওয়া বদল করতে সিমলে গিয়েছে অনু। এলে তাকে নিয়ে নিশ্চয়ই একদিন তোমাদের বাসায় যাব অরুন্ধতী। দেখবে কি আশ্চর্য্য মেয়ে! তুমি দেখো, তার গান শুনে তুমি মুগ্ধ হবেই।"

একটু থামল শুভেন্দু; দেখল অরুন্ধতীর চোখের পাতা দুটো ক্রমশঃ ভারী হয়ে আসছে। দাঁতে দাঁত চেপে তীব্র বেদনায় আস্বাদন করছে শুভেন্দুর কথাগুলো। শুভেন্দু খুসী হ'ল। উৎসাহিত হয়ে বলল, "তুমি এখানে ক'দিন আছ, অরুন্ধতী? অনুকে আসতে লিখে দেব এখানে? দেব?"

রুমাল দিয়ে সানগ্লাসের কাঁচটা মুছতে মুছতে অরুন্ধতী বললে, "না না। কাজ কি মিছিমিছি বেচারীকে কষ্ট দিয়ে? সত্যি, যা গরম পড়েছে এখানে! ভাবছি আমিও দিনকতক ঘুরে আসব দার্জ্জিলিং থেকে।"

—"খুব ত ভাল কথা, অরুন্ধতী। ক'দিন ভাল জায়গায় থাকলে স্বাস্থ্যেরও খুব উন্নতি হবে।" তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করে শুভেন্দু বললে, "আচ্ছা, বল ত ক'দিন পরে আবার আমরা এই কফি হাউসে এলাম?"

কি বলতে যাচ্ছিল অরুন্ধতী। কিন্তু এমন সময় বেয়ারা বিল নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে রইল। ব্যাগ খুলে হঠাৎ একটু অস্ফুট কণ্ঠেই উচ্চারণ করল অরুন্ধতী, "মাই গড।"

—"কি, কি হ'ল?"

—"টাকা হারিয়েছি; নিশ্চয়ই ফেলে এসেছি বইয়ের দোকানে।"

—"থাক।" হেসে বলল শুভেন্দু। "আগের অভ্যাসটা এখনও তোমার রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। তবে আগে আমার টাকা ফেলে আসতে, আজকাল নিজের টাকা ফেলে এস। এই যা তফাৎ।" বলে পকেট থেকে টাকা বের করে বিল মিটিয়ে দিলে শুভেন্দু।

বাইরে এসে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে অরুন্ধতী বললে, "তোমার কাছে চাইতে পারি তাই চাইছি, শুভো। আমায় টাকা দাও ক'টা, তা না হলে বড্ড অসুবিধে হবে বাড়ী ফিরতে।"

—"ওঃ এই?" বলে হাসতে হাসতে পকেট হাতড়ে যা পেল সবই অরুন্ধতীর হাতে তুলে দিল শুভেন্দু। একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়ল অরুন্ধতী। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে, "একদিন আমাদের বাসায় এস শুভো।"

শুভেন্দু হাত নেড়ে বললে, "যাব।" ট্যাক্সিটা চোখের আড়াল হতে হঠাৎ মনে পড়ল শুভেন্দুর—অরুন্ধতী তার বাড়ীর ঠিকানা

দিয়ে যায় নি। পকেট হাতড়ে দেখল সে একেবারে নিঃস্ব। এখান থেকে ভবানীপুর পর্য্যন্ত হেঁটেই যেতে হবে। ক্লান্ত শুভেন্দু গোলদীঘির রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়াল। একসঙ্গে প্রিন্সিপালের ও হোটেল ম্যানেজারের মুখটা মনে ভেসে উঠতেই মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। ভাবল, যাকে জীবনের সবকিছু দিয়েও একদিন মনের কোণে আরও দেবার অতৃপ্ত বাসনা জেগে থাকত, তাকে আজ মাত্র সামান্য ক'টা টাকা দিয়ে কেন এত নিঃস্ব বোধ করছে সে?

আমাদের নামরহস্য

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমরা বাংলাদেশের অধিবাসী। সেইজন্য আমরা "বাঙালী" নামে অভিহিত। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান নির্ব্বিশেষে সকলেই আমরা বাঙালী। যাঁহারা হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণপূর্ব্বক অন্য সমাজভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নিজ বংশগত পদবী পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু যাঁহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই সম্পূর্ণ মুসলমানী নাম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম শুনিলে বুঝিতে পারা যায় না যে, তাঁহারা বাঙালী, বিহারী, উড়িয়া, মাদ্রাজী বা অন্য কোন প্রদেশের লোক। তাঁহাদের নামগুলি তাঁহাদের ধর্ম্মের পরিচয় দেয়। কিন্তু তাঁহাদের জাতীয়তার (Nationality) পরিচয় পাওয়া যায় না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে বাঙালী খ্রীষ্টান তাহা তাঁহার নাম শুনিলেই বুঝিতে পারা যায়। আমাদের বর্ত্তমান রাজ্যপাল মাননীয় ড. হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইলেও বাঙালী নাম বা বাঙালী আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহাকে দেখিলে কেহই বলিতে পারিবেন না যে, তিনি বাঙালী নহেন। কি পরিচ্ছদে, কি নামে বা আচার-ব্যবহারে তিনি ষোল-আনা বাঙালী। সেকালের খ্যাতনামা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (K. M Banerjea), কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চানন ঘোষ (গণিতজ্ঞ P. Ghosh), ডাকবিভাগের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হেমনাথ বোস ইঁহারা সকলেই খ্রীষ্টান ছিলেন। কিন্তু কেহই পিতৃদত্ত পুরাতন নাম পরিত্যাগ বা পরিবর্ত্তন করেন নাই। সেকালের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W: C, Bonerjee) খ্রীষ্টান ছিলেন না। তিনি তাঁহার পদবীর সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া Bonerjee হইয়াছিলেন। আমার জানা দুই-এক জন লোক আচার-ব্যবহারে বা পরিচ্ছদে সম্পূর্ণ বাঙালী হিন্দু হইলেও ইংরেজী নাম গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও দেখিয়াছি। সেকালের লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী রামগোপাল বিদ্যান্ত মহাশয়ের পৌত্র ভিক্টরনারায়ণ বিদ্যান্ত। এই ভিক্টরনারায়ণ খ্রীষ্টান নহেন। তিনি পুরা হিন্দু এবং লক্ষ্ণৌয়ের খ্যাতনামা উকীল ছিলেন।

বাঙালীর পদবী ইংরেজীতে লিখিবার সময় অনেকে একটু বিকৃত করিয়া ব্যবহার করেন। যেমন বাঁড়ুজ্জ্যে Banerjee, চাটুজ্জ্যে Chatterjee, মুখুজ্জ্যে Mukherjee, দত্ত Dutt, বসু Vasu, সিংহ Sinha প্রভৃতি। যাঁহারা এইরূপ পদবী পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাঁহাদের পুত্র বা পৌত্রগণের অনেকেই এইরূপ পরিবর্ত্তিত উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন। বীরভূম জেলার রায়পুর গ্রামের বিখ্যাত জমিদারবংশীয় খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ এস্. পি. সিন্‌হা হইয়াছিলেন। পরে ইনি লর্ড উপাধি পাইয়া লর্ড সিন্‌হা নামে পরিচিত হন। ইংরেজের আমলে বিহার বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত হইলে এই লর্ড সিন্‌হাই বিহারের অন্যতম গভর্ণর বা রাজ্যপাল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে কোন ভারতবাসীকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বা গভর্ণর করেন নাই। এখানে বলা আবশ্যক যে, ভারতবাসীদিগের মধ্যে একমাত্র লর্ড সিন্‌হাই ইংলণ্ডে লর্ডশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে কোন ভারতবাসী এই উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। ইদানীং সিংহ উপাধিধারী অনেক লোক আপনাদিগকে সিন্‌হা উপাধিতে পরিচয় দিয়া থাকেন।

যে সকল বাঙালী হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণের সময় পূর্ব্ব নাম সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া খাঁটি মুসলমানী নাম গ্রহণ করাতে তাঁহাদের বংশধরগণকে এখন বাঙালী বলিয়া চিনিবার কোন উপায় নাই। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত "মোহম্মদী" নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক মৌলানা আক্রাম খাঁ যে বাঙালী ব্রাহ্মণের বংশধর তাহা কেহ মনে করিতে পারেন

কি? মৌলানা সাহেবের প্রপিতামহ গাঙ্গুলী পদবীধারী বাঙালী ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই মৌলানা সাহেব বঙ্গব্যবচ্ছেদের পর পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়া পূর্ব্ববঙ্গে অর্থাৎ পাকিস্থানে গিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে গিয়া তিনি পূর্ব্ব-পাকিস্থান মুসলিম লীগের সভাপতি হইয়াছিলেন। ইঁহার সহোদর কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার হিন্দু নাম হইয়াছে শশীভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়। এইরূপ কত চাটুজ্জ্যে, মুখুজ্জ্যে, গাঙ্গুলী, সান্যাল, ভাদুড়ী, লাহিড়ী, চক্রবর্ত্তী, আচার্য্য, ঘোষ, বোস, মিত্র যে মুসলমান হইয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। মুসলমান সমাজে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী যে সকল ব্যক্তি প্রবেশ করিয়া মুসলমান সমাজের সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়াছেন তাঁহাদের এক জনকে আমি দেখিয়াছি এবং তাঁহার সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ করিলে বোধ হয় অবান্তর হইবে না। ঢাকানিবাসী ব্রাহ্মণ যুবক মনোরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় এই ঘটনার নায়ক। আমি যখন "হিতবাদী"তে কাজ করিতাম তখন ইনি মধ্যে মধ্যে আমাদের সম্পাদকীয় বিভাগে আসিতেন। তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার নাম দীন মহম্মদ। আমি তাঁহাকে মুসলমানের বংশধর বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম। কিছুদিন পরে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় ঘটনাক্রমে আমার গোচর হইল। একদিন জনাব দীন মহম্মদ আমাদের কার্য্যালয়ে আসিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় আমার পরিচিত এক জন ভদ্রলোক আমাদের কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে দেখিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, "নমস্কার গাঙ্গুলী সাহেব।" তখন দীন মহম্মদও বলিলেন, "নমস্কার, নমস্কার।"

ইহার কয়েক বৎসর পরে আমি চুঁচুড়ায় সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বাটীতে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম। কথায় কথায় এই দীন মহম্মদের কথা উঠিল। দীন মহম্মদের নাম শুনিবামাত্র অক্ষয়বাবু বলিলেন, "যোগীন, তুমি দীন মহম্মদকে জান নাকি?" আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, তিনি আমার পরিচিত।" অক্ষয়বাবুর বৈঠকখানায় চুঁচুড়ার সুবিখ্যাত দীননাথ ধর মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি দীন মহম্মদের নাম শুনিয়াই বলিলেন, "ঢাকার সেই মনোরঞ্জন গাঙ্গুলী? আরে তাকে নিয়ে এক বার যে বড় মজা হয়েছিল।" কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করাতে দীনবাবু বলিলেন, আমি যখন ঢাকাতে গভর্ণমেণ্ট প্লীডার বা উকীল-সরকার ছিলাম, তখন একদিন এই মনোরঞ্জন গাঙ্গুলী—তখন আর মনোরঞ্জন নহে, দীন মহম্মদ একটা মোকদ্দমায় আমাকে উকীল নিযুক্ত করিবার জন্ত আমার কাছে আসিয়াছিল। আমি তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে বলিলাম, "আমি বিনা পারিশ্রমিকে তোমার মোকদ্দমা চালাইতে সম্মত আছি। কিন্তু তোমাকে দীন মহম্মদ নামের পরিবর্ত্তে ইব্রাহিম নাম গ্রহণ করিতে হইবে।" আমার কথা শুনিয়া দীন মহম্মদ চলিয়া গেল। অক্ষয়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইব্রাহিম নাম ধারণ করিতে বলিলে কেন?" দীনবাবু বলিলেন, "ওর ইতিহাস যে আমি জানি। মনোরঞ্জন ব্রাহ্মণের ছেলে, কেশব সেনের সংস্পর্শে আসিয়া পৈতা ফেলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। কিছুদিন পরে শুনিলাম সে খ্রীষ্টান হইয়াছে এবং শেষে কোরাণ পড়িয়া মুসলমান হইয়াছিল। আমি তাই তাহার নাম ইব্রাহিম রাখিয়াছিলাম। ই অর্থাৎ ইশ, ব্রা অর্থাৎ ব্রাহ্ম, হি অর্থাৎ হিন্দু, এবং ম অর্থাৎ মোসলেম। একাধারে এইরূপ চারটি ধর্ম্মের সমাবেশ আর কোন নামে পাওয়া যায় কি?"

কালসহকারে লোকের রুচির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন হয়, নামেরও সেই রকম পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে ইহা বলা অনাবশ্যক। এই নামের পরিবর্ত্তন পুরুষ সমাজের ন্যায় মহিলা সমাজেও ঘটিয়া থাকে। বঙ্গদেশে ঘটক মহাশয়দিগের নিকট যে সকল পাজি-পুঁথিতে বংশ-তালিকা আছে তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক নামের কোন অর্থ হয় না। ঘটকেরা প্রধানতঃ ব্রাহ্মণদিগের বংশতালিকাই রাখিতেন। কদাচিৎ অব্রাহ্মণ, রাজা বা ভূস্বামীর বংশতালিকাও তাঁহাদের পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ আমাদের নাম তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, ডাক নাম, মধ্যনাম ও পদবী। ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাসাগর), রামমোহন রায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নামের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ ঐ সকল নামধারীর আত্মীয়স্বজন প্রদত্ত নাম। আর শেষ অংশ বংশগত পদবী অথবা শিক্ষাগুরু প্রদত্ত নাম। অনেক স্থলেই নামের মধ্য অংশের বিশেষ কোন সার্থকতা থাকে না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি নামের মধ্যাংশ 'চন্দ্র' 'মোহন' 'নাথ' প্রভৃতিরও সার্থকতা কিছুই নাই। অতি অল্পসংখ্যক নামই আছে যাহার প্রথম অংশ হইতে দ্বিতীয় অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া কেবল প্রথম অংশ বজায় রাখিলে নামের বিশেষ কোন অর্থ হয় না। 'ভূদেব', 'ভূপতি', 'ধরানাথ', 'ধরণীধর' প্রভৃতি নাম প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ এক সঙ্গে জড়িত। অনেকে ভূদেববাবুর নাম লেখেন 'ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়'। ভূ অর্থে পৃথিবী, দেব অর্থে দেবতা। সাধারণতঃ ভূদেব শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ। ভূদেববাবুর সময়ে শিক্ষা বিভাগে যে সকল রিপোর্ট বা বিবরণ প্রকাশিত হইত তাহাতে তাঁহার নাম সংক্ষেপে তিনি লিখিতেন B. D. M. অর্থাৎ ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

নামের মধ্যভাগটা নিরর্থক বা অনাবশ্যক বলিয়া অনেকে নামের ঐ মধ্যাংশটা ব্যবহার করিতেন না। 'সাহিত্য' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক আমার বন্ধু ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সাধারণতঃ 'সুরেশ সমাজপতি' নামে খ্যাত ছিলেন, যদিও তাঁহার নামের মধ্যাংশটা তাঁহার কাগজে লিখিত হইত। ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্র 'মৃগেন মিত্র' নামেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু মৃগেন শব্দের কোন অর্থ হয় না। সিংহের নাম মৃগেন্দ্র। এইরূপ 'দেবেন', 'যোগেন', 'হীরেন' 'রমেন' প্রভৃতি নামের 'ন্দ্র'-র পরিবর্তে কেবল 'ন' ব্যবহার করা সমীচীন নহে। কিন্তু সাধারণতঃ 'ন্দ্র' ব্যবহৃত হয় না। তাহার পর 'নাথ', 'চন্দ্র' প্রভৃতি মধ্যনামের সহিত প্রথম নামের কোন সম্পর্ক নাই। 'দেবেন্দ্র' বলিলে দেবশ্রেষ্ঠ বুঝায়। 'ইন্দ্র' শব্দ শ্রেষ্ঠার্থে ব্যবহৃত হয়। 'নাথ' শব্দও শ্রেষ্ঠার্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং একই নামে 'ইন্দ্র' ও 'নাথ' ব্যবহারের সার্থকতা কি?

আমরা বাঙালী, সাধারণতঃ অনুপ্রাস-ভক্ত। আমরা পুত্রকন্যার নাম রাখিবার সময় অনুপ্রাসের দিকে দৃষ্টি রাখি। এমনকি, অনেক সময় অনুপ্রাস বজায় রাখিবার জন্য অর্থহীন শব্দেও আমাদের অরুচি হয় না। আমার আত্মীয় ও পরিচিতগণের মধ্য হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমরা পাঁচ সহোদর ছিলাম। আমাদের নাম যথাক্রমে সত্যেন্দ্র-কুমার, দেবেন্দ্রকুমার, যোগেন্দ্রকুমার, উপেন্দ্রকুমার এবং নগেন্দ্রকুমার। আমার পুত্রগণের নাম যথাক্রমে ধীরেন্দ্র-কুমার, বীরেন্দ্রকুমার, হীরেন্দ্রকুমার, নৃপেন্দ্রকুমার, মণীন্দ্র-কুমার, শৈলেন্দ্রকুমার, সুরেন্দ্রকুমার। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকের নামেও এইরূপ অনুপ্রাসের বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যা স্বর্ণকুমারী ও বর্ণকুমারী। এই শেষোক্ত নামের অর্থই বা কি সার্থকতাই বা কি?

আমরা সেকালে দেখিয়াছি বাঙালী মহিলাদের নাম চার-পাঁচটা অক্ষরযুক্ত হইত। সেকালে 'জগত্তারিণী' 'দয়াময়ী', 'মহামায়া', 'হরমোহিনী' প্রভৃতি নাম অনেক ছিল। সময়ের পরিবর্তনে আজকাল নাম সঙ্কুচিত হইয়াছে। আজকাল নীরা, ইরা, ধীরা, মীরা, মায়া, শোভা, ঊষা, সন্ধ্যা প্রভৃতি নামের ছড়াছড়ি। আমার অনেক সময় মনে হয় হয়ত আর কিছুদিন পরে বাঙালী মেয়েদের নাম এক অক্ষরে পরিণত হইবে। বঙ্কিমবাবু তাহার ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। দেবী-চৌধুরাণীর নাম প্রফুল্ল। তাঁহার জননী তাঁহাকে ডাকিতে-ছেন,"—ও পি"। 'চন্দ্রশেখরে' প্রতাপ শৈবালনীকে ডাকিতেছেন, "—শৈ"। সুতরাং মনে হয় আর কিছুদিন পরে বাঙালী সংসারে বাঙালীদের নাম একাক্ষরে পরিণত হইবে।

আজকাল অনেক ইংরেজী নাম বাঙালী মেয়েদের দেখিতে পাই—'Opala', 'Happy', 'Dolly', 'Lucy', 'Dora', 'Baby', 'Mary' প্রভৃতি নাম বাঙালী মেয়েদের আছে। পুরুষদের নামে যাবনিক নামেরও অভাব নাই। 'জহরলাল', 'মতিলাল', 'চুনীলাল', 'ফকির' প্রভৃতি নাম সংস্কৃত ভাষা হইতে আসে নাই। উহা আরবী, ফারসী হইতে আসিয়াছে। 'জহর' শব্দের অর্থ রত্ন। উহাতে 'লাল' শব্দ যোগ করিয়া বাঙালী নাম হইয়াছে 'জহরলাল' আর 'মল' শব্দ যোগ করিয়া হইয়াছে 'জহরমল' মারোয়াড়ীর নাম। এই সকল রত্নজ্ঞাপক নাম অর্থাৎ হীরা, মতি, চুণী, পান্না প্রভৃতির ব্যবহার সুবর্ণবণিক সমাজেই বোধ হয় সমধিক।

আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী অনেক সময় কাহারও নাম শুনিলে বুঝিতে পারি যে, সেই নামধারী ব্যক্তি পূর্ব্ববঙ্গবাসী। সজনীকান্ত, চপলাকান্ত, প্রাণবল্লভ প্রভৃতি নাম পশ্চিমবঙ্গে বড় দেখিতে পাই না। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে আমি কলিকাতায় আসিয়া আমার এক মাতুলের পাটের ব্যবসায়ে কিছুদিন লিপ্ত ছিলাম। সে সময় এক ভদ্রলোক পাটের দালালী করিতেন। শুনিয়াছিলাম তাঁহার বাড়ী চট্টগ্রাম জেলায়। শুনিলাম তাঁহার নাম প্রাণনাথ সাহা। তাঁহার নিবাস নাগরপুর গ্রামে। তাঁহার নাম ও গ্রামের নাম শুনিয়া ভাবিলাম নাগরপুরের প্রাণনাথ। নামের সহিত বাসগ্রামের বেশ সামঞ্জস্য আছে।

নামে অনুপ্রাস বা মধ্যনামের একতা কোন কোন পরিবারে পাঁচ-ছয় পুরুষ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর নাম করিতে পারা যায়। দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের সময় হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত 'নাথ' শব্দ ঐ পরিবারের মধ্যনামে ব্যবহৃত হইতেছে। দ্বারকানাথের পর হইতে ঐ পরিবারের সকল পুরুষের নামে 'ন্দ্র' আছে। ঐ পরিবারের আর একটা বিশেষত্ব দেখি যে, নামের ইংরেজী আদ্যক্ষর জ্যেষ্ঠ পুত্রক্রমে একই প্রকার। দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ। মহর্ষির তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথের পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্র-নাথ। ক্ষিতীন্দ্রনাথের পুত্র ক্ষেমেন্দ্রনাথ এইরূপ চলিয়া আসিতেছে। আরও কয় পুরুষ এইরূপ চলিবে তাহা অনুমান করা কঠিন। কারণ আদ্যক্ষরের সমতা রক্ষার জন্য অবশেষে হয়ত অভিধানের সাহায্য লইতে হইবে।

আমাদের নামের সহিত উৎকলবাসীদের নামের বিশেষ পার্থক্য নাই। তবে অনেক সময় উচ্চারণের পার্থক্য হেতু উঁহাদের নাম আমাদের নাম হইতে পৃথক বলিয়া মনে হয়।

আমরা স্বরবর্ণ 'ঋ' অক্ষরকে উচ্চারণ করি 'রি'। আমরা উচ্চারণ করি 'ব্রিন্দাবন' উড়িয়ারা উচ্চারণ করেন 'ব্রুন্দাবন'। এই ব্রুন্দা ডাক নাম বরুণদা হইয়া যায়। তবে উড়িয়াদের পদবী আমাদের পদবীর সহিত এক নয়। বিহারবাসীদের নামের সহিত আমাদের অর্থাৎ বাঙালীদের নামের পার্থক্য বেশ সুস্পষ্ট। আমাদের নাম তিন অংশে বিভক্ত, তৃতীয় অংশ পদবী; বিহারীদের বোধ হয় আমাদের মত বংশগত উপাধি প্রচলিত নাই। উঁহাদের অনেকের নামই দুই ভাগে বিভক্ত। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিহারী, কিন্তু তাঁহার পদবী কি? আর একটা কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করি। আজকাল আমাদের দেশে পার্থ-সারথি নামটার একটু বাহুল্য দেখিতেছি। আমার পরিচিত চার জন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পৌত্রের নাম শুনিলাম পার্থসারথি। এই নামটা বাংলায় বড় ব্যবহার হইত না। মাদ্রাজ অঞ্চলেই উহার ব্যবহার অধিক ছিল। সম্ভবতঃ মাদ্রাজ হইতেই ঐ নামটা আমরা লইয়াছি।

জীবন থামে না

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

হাসপাতালের সিঁড়িতে দাঁড়াই। হঠাৎ ভাবি: একি!
জীবনের সবটাই মেকি?
বহু দূর গ্রাম থেকে এসেছে বিধবা
(আধবুড়ো জীর্ণ-শীর্ণ মলিন অথবা)
—চারটে বাজার জন্য সবাই অস্থির
মা কিম্বা বাবা কিম্বা স্ত্রী বা স্বামীর
জন্য আকুল ব্যাকুল তারা।
কিছু নেই করবার—কুচক্রী মন্থরা
ফিরে ফিরে আসে যেন
হাসপাতালের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ভাবি: কেন?

এরা ত উধাও হতে পারে
গঙ্গাসাগরের দ্বীপে কিম্বা এক গানের নিবিড়ে
যেখানে সবাই মিলে হাসে
তাড়ি কিম্বা বৈদান্তিক কল্পনা-বিলাসে।
কেন তারা কষ্ট পায়, কেন তারা নিজে যেচে চায়
সেই সব ক্ষণগুলি যারা শুধু জন্মাসক্ততায়
নিজেদের ছিঁড়ে কুটে বারবার উচ্চতর হাসে
—হৃদয়, নিবিড় রঙ, ভয়-ত্রাস কিম্বা ভালোবাসে।

তুমি তো বোঝো নি তবু তোমাকেই আমি
বলেছি, সেদিন ছিল মাঘের নবমী
একখানি পরিপূর্ণ চাঁদ—প্রায় পরিপূর্ণ
আমার সত্তাকে দীর্ণ
করেছিল। ঘাস আর শিশিরের জীর্ণ স্বচ্ছতায়
যে-সব মুহূর্তগুলি ফিরে এসে চলে চলে যায়—
তখন ভেবেছি আমি এই পৃথিবীর
একেশ্বরী হয়ে আছ। সূর্যাস্ত আবির
থেকে প্রাগুষার পাণ্ডু রঙগুলি
—গান আর গান আর গানের আঙুলই
আমাদের হৃদয়ের সুনিবিড় রঙে
স্পর্শ করবে শ্বেত পোষ মাঘ হিমে।

তোমাকেই বলি তাই আমি
জীবন থামে না, থামি আমি।

অসামান্য

শ্রীনির্ম্মলকান্তি মজুমদার

দেওঘর। কার্ত্তিকের মাঝামাঝি। হাট করে ফিরছি শিবগঙ্গার ধার দিয়ে। হঠাৎ চেনা মুখ দেখে থমকে দাঁড়াই। ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি। জিজ্ঞাসা করি—তুমি কি গোলাপীর মা ?

একটা চোখ বড় করে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়েই সে বলে—অ্যাঁ, ছোড়দাদাবাবু! আপনি এখানে ?

—দেওঘরের জলহাওয়া ভাল, তাই বেড়াতে এসেছি। তুমি ত ঠিক চিনেছ আমাকে।

—তা আর পারব না। আপনারা দেশের লোক, আপনার লোক। তার ওপর আবার মনিব। আপনাদের চিনতে কখনও ভুল করব না।

—তুমি এখানে কত দিন আছ ?

—বছরসাতেক হবে। দেশে ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে শরীর ভেঙে পড়ে। মামাত ভাইয়ের সঙ্গে কলকাতায় চলে আসি। বেশ কিছুদিন হাসপাতালে চিকিৎসার পর শরীর ভাল হলে হাতিবাগানে এক বাবুর বাড়ী কাজে লাগি। হাতিবাগান বাজারে বোমা পড়ার পর বাবু সপরিবারে এখানে চলে আসেন। প্রায় বছরখানেক থেকে ফিরে যান কলকাতায়। আমি যাই নে। সেই থেকে বাবা বদ্যিনাথের চরণে পড়ে আছি। যেখানে লোকে আসে তীর্থ করতে সে জায়গা কি ছাড়তে আছে ?

—না, মন যেখানে বসে সেখানে থাকাই ভাল। বেলা বাড়ছে। রোদের তেজ খুব। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলা কষ্টকর। আমাদের বাড়ী এক দিন যেয়ো। ভারী খুসী হয়েছি তোমাকে দেখে।

—কোথায় উঠেছেন আপনি ?

—বিলাসীতে। বাড়ীর নাম 'কৃষ্ণকালীধাম।' উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা গেটওয়ালা বড় দোতলা বাড়ী।

দেওঘরে দশ বছর পরে গোলাপীর মার সঙ্গে দেখা হবে কল্পনাও করতে পারি নি। গোলাপীর মা আমাদের গ্রামের জগন্নাথ ঘোষের বউ। সে একমাত্র কন্যা গোলাপীকে নিয়ে বিধবা হয়। গোলাপী মারা গেলে সে কয়েক মাস পাগলের মত হয়ে যায়। তার পর প্রকৃতিস্থ হয়ে আমাদের বাড়ী কাজ নেয় ও কিছুকাল আমার ভাইঝি শিউলিকে মানুষ করে। সংসার বড় মজার জায়গা। জনারণ্যে হারিয়ে যায় যে পরিচিত মানুষ সে আবার অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা দেয় অপরিচিত স্থানে। বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে বলি গোলাপীর মার কথা।

দু'দিন বাদে দুপুর বেলা গোলাপীর মা আসে কৃষ্ণকালীধামে। ছেলেদের কাছে ডেকে মাথায় হাত দিয়ে বলে—সোনার চাঁদ ছেলে। একশ' বছর পরমায়ু হোক। বাপ-ঠাকুরদার মুখ উজ্জ্বল কর।

জগন্নাথ ঘোষ যাত্রার দলে অভিনয় করত। দেবগ্রামের মাইনর স্কুলে খানিক দুর পড়েছিল। তার প্রভাবে গোলাপীর মার কথা-বার্ত্তাও হয়েছিল মার্জ্জিত। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে বেশ আসর জমিয়ে ফেলে। ছেলেমানুষের মত নানা প্রশ্ন করে আমাকে গ্রাম সম্বন্ধে।

—ছোড়দাদাবাবু, হাটতলার সেই বটগাছটা এখনও আছে ?

—না, আর বছর আশ্বিনের ঝড়ে ওর শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলেছে।

—আহা, অত দিনের গাছটা আর নেই! শ্রাবণ সংক্রান্তিতে ব্রহ্মাণী তলায় মেলা বসে ?

—কই আর বসে ? বেচাকেনা নেই। লোকজন সব মরে-হেজে গিয়েছে। পুরনো উৎসবের প্রতি তেমন আকর্ষণও দেখি নে।

—আমাদের ছেলেবেলায় ব্রহ্মাণী তলায় কত অনিন্দই না হয়েছে। শিবের গাজন হয় ত ?

—কি করে হবে ? সন্ন্যাসী পাওয়া যায় না।

—ওমা সে কি কথা! সন্ন্যাসীর অভাবে গাজন হয় না। দেশের ত ভারী দুর্দ্দশা দেখছি। হাটের খবর কি ? শিব-মন্দির তলা থেকে নরেন ঠাকুরের গোলাবাড়ী পর্য্যন্ত সারি সারি দোকান বসে ?

—হাট একদম জমে না—প্রায় উঠে যাবার দাখিল। লোকে জিনিষ কিনে পয়সা দেয় না। ধারে আর কত দিন চলে ? অন্য গাঁয়ের হাটুরেরা রাগ করে আসা বন্ধ করেছে।

—ছি, ছি, লজ্জার কথা। অবস্থায় কুলোয় না বলে কি অধর্ম্ম করতে হবে ? একেই বলে, 'অভাবে স্বভাব নষ্ট।' আচ্ছা, অগ্রদ্বীপের বাবুরা হাতী চড়ে আমাদের গাঁয়ে বেড়াতে আসেন এখনও ?

—গোলাপীর মা, সেদিন গিয়েছে। সে বাবুরাও নেই, সে হাতীও নেই। অগ্রদ্বীপ এখন ধ্বংসের মুখে।

গোলাপীর মা চুপ করে থাকে। হয়ত কল্পনা করতে চেষ্টা করে দেশের পরিবর্ত্তন। হয়ত তুলনা করে একাল ও সেকাল। হঠাৎ কি যেন তার মনে পড়ে। বলে, আসল কথাই আমার এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করা হয় নি। আমার যেমন ভোলা মন! ভীমরতি ধরবার বয়েস না হলে কি হবে, শোকে-তাপে সেই দশাই দাঁড়িয়েছে। আমার শিউলি কেমন আছে ? তাকে পেয়েই ত আমি গোলাপীর শোক ভুলেছিলাম। 'গোলাপীর মা' বলতে পারত না, আমাকে 'গো-মা' বলে ডাকত।

—শিউলির যে বিয়ে।

—সেই একরত্তি মেয়ের বিয়ে! তা হবে বৈকি, অনেক কাল আমি যে দেশছাড়া। কত বড় হয়েছে, কেমন দেখতে হয়েছে—বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে। বিয়ে কবে ?

—অগ্রাণ মাসের প্রথমেই।

—তা বেশ। বেঁচে থাক, সুখে থাক, হাতের নোয়া, মাথার সিঁদুর অক্ষয় হউক। তোমরা কবে যাচ্ছ?

—সামনের রবিবারের পরের রবিবার।

গোলাপীর মা নীরবে কি যেন ভাবে। তারপর আবার সুরু হয় প্রশ্নের পর প্রশ্ন। স্মৃতির জোয়ার যখন আসে তখন এমনি ভাবেই কূলহারা হয় মানুষ।

—বিশ্বম্ভর ভট চাজ্জি—বুড়ো কথক-ঠাকুর গো—তিনি এখনও বেঁচে আছেন?

—এই সেদিন মারা গিয়েছেন নব্বই বছর বয়সে।

—খুব গুণী লোক ছিলেন। গায়ে তাঁর জোড়া মেলা ভার। নিত্যদাস বাবাজীর আখড়ায় মচ্ছব কেমন হয়?

—মচ্ছব হয়—তবে বোষ্টমের নয়, শেয়ালের। নিত্যদাস দেহরক্ষা করেন আর আখড়াও ভাঙে, এখন সেখানে সিদ্ধির বন।

—বলেন কি! আখড়ার চিহ্নই নেই! আমাদের সময় ও জায়গার আসর গমগম করত। নায়েব মশায়ের বাড়ি দুর্গাপূজার ভোজ কেমন চলছে?

—নায়েব মশাই কাশীতে গঙ্গালাভ করেছেন। সে আজ পাঁচ বছরের কথা। ছেলেরা জমিদারী সেরেস্তায় চাকরি করে। বছর বছর পূজার সময় বাড়ি আসে কিন্তু কোন রকমে কাজ সেরে চলে যায়। খাওয়ানো-দাওয়ানোর পাট উঠে গিয়েছে।

—গাঁয়ের কোন সুখই ত নেই। কি নিয়ে আছেন আপনারা?

—আমরা গ্রামের বাস তুলে দিয়েছি বললেই চলে। কৃষ্ণনগরে থাকি। আম-কাঁঠালের সময় মাস দুই কাটিয়ে আসি গাঁয়ে। শীতকালেও হপ্তাখানেকের জন্য যাই। খেজুর গুড় আর ছাঁচি পানের লোভ সামলাতে পারি নে। তা ছাড়া দেশের মায়া কি সহজে কাটানো যায়?

—তাই কখনও যায়? আমারও মাঝে মাঝে মন কেমন করে। মাটির টান আর নাড়ীর টান একই রকমের। ঠাকুর-দেবতাকেও ভুলিয়ে দেয়। এক এক সময় প্রাণটা এমন ছটফট করে যে ইচ্ছে হয় দু'চার দিন ঘুরে আসি। কিন্তু গাঁয়ে গিয়ে পরের বাড়ী উঠতে ভাল লাগে না। ঘরদোর কবে চুরমার হয়ে গিয়েছে—বাপ-পিতামহের ভিটেয় পিদিম জ্বলে না। সে কি চোখে দেখা যায়, না প্রাণে সয়?

অফুরন্ত গোলাপীর মার প্রশ্ন। অতীত ইতিহাসের টুকরো কথার মধ্যে সে যেন শুনতে পায় বৈকুণ্ঠের বাঁশী। হারান দিনের হাতছানির আকর্ষণী শক্তি যে কতখানি তা মরমী ছাড়া আর কে বোঝে?

বেলা শেষ হয়ে আসে। সূর্য্য ঢলে পড়ে অস্তাচলে। নীলকণ্ঠপুরের মুক্ত মাঠে ভ্রমণবিলাসীর ভিড়। পশ্চিম আকাশের রঙীন রঙ্গমঞ্চে মেঘশিশুদের 'মেকানো' খেলা। আমি বলি—গোলাপীর মা, আর দেরি করো না। অন্ধকারে যেতে কষ্ট হবে। একটা চোখে ত দেখতে পাও না। আজকের মত এস।

ফিরবার দিন বিকেলে জিনিসপত্র গোছান হচ্ছে। গোলাপীর মা এসে হাজির। এক হাতে প্যাঁড়ার হাঁড়ি আর এক হাতে বৃন্দাবনী শাড়ি। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি—গোলাপীর মা, ওসব কি?

—শিউলির বিয়েতে তার গো-মার আশীর্ব্বাদ। আপনি নিয়ে গিয়ে তাকে দেবেন। আজ আর বসব না। আপনারা ব্যস্ত। রাতের গাড়ী ধরতে হবে ত!

ছেলেদের চিবুক স্পর্শ করে গোলাপীর মা বলে, সোনামণিরা আবার দেওঘরে বেড়াতে আসবে, কেমন?

ছলছল চোখে বিদায় নেয় গোলাপীর মা। আমার অন্তরে জাগে গভীর শ্রদ্ধা। মহৎ প্রাণ যে কোথায় লুকিয়ে আছে কিছুই জানি নে আমরা। সীমার মাঝে যেমন অসীমকে পাওয়া যায় তেমনি সাধারণের মাঝেই মেলে অসাধারণ।

কৃষ্ণনগরে ফিরে আসি। শিউলির বিয়ে দাদার প্রথম কাজ। শহরসুদ্ধ লোকের নিমন্ত্রণ। বিয়ের রাত্রে দামী উপহারে ঘর ভরতি। সেদিকে লক্ষ্য নেই শিউলির। তার মন জুড়ে থাকে ক্ষীরের মিষ্টি আর ছাপা শাড়ি। তার পাশে ম্লান হয়ে আসে মূল্যবান যৌতুকের চাকচিক্য। সে যে সরল প্রাণের স্নেহের দান। তাতে নেই সামাজিকতার বাধ্যবাধকতা, আভিজাত্যের অহঙ্কার প্রচারের প্রচ্ছন্ন আয়োজন। তার কি তুলনা আছে? গো-মার চোখের জলে দেওয়া জিনিস চোখের জলে গ্রহণ করে শিউলি।

চোখের জলে সামান্য জিনিস অসামান্য হয়ে ওঠে।
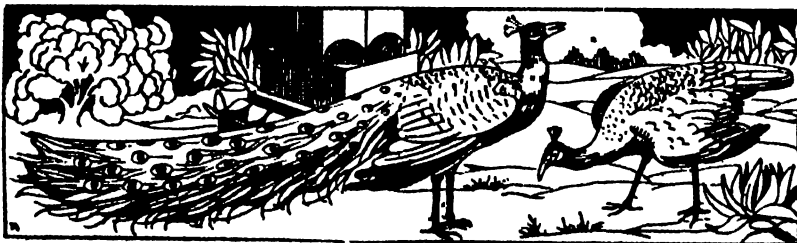
ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস— হায়দরাবাদ অধিবেশন

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস, এম-এসসি

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৪১শ অধিবেশন বসিয়াছিল ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী এই কংগ্রেসের উদ্বোধন-কার্য্য সম্পন্ন করেন। সভাস্থলে হায়দরাবাদের নিজাম, রাজপ্রমুখ, মন্ত্রিবর্গ, ভারতীয় এবং বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকগণ উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত নেহরু দেশের বিভিন্ন গবেষণাগারসমূহে মনোযোগসহকারে গবেষণাকার্য্য চালাইবার জন্ম বৈজ্ঞানিকগণকে উৎসাহিত করেন। তিনি বিজ্ঞানের সৃজনী-শক্তি ও ধ্বংসকারী শক্তির উল্লেখ করিয়া বৈজ্ঞানিকগণকে কেবলমাত্র মানবকল্যাণের জন্যই গবেষণাকার্য্য চালাইবার অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন, দেশের সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিবিদ্ পরস্পর সহযোগিতা করিয়া কার্য্য করিলে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সহজ হইবে।

মূল সভাপতি ডক্টর সুন্দরলাল হোরা তাঁর অভিভাষণে প্রথমতঃ বিজ্ঞান-কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতিগণের অভিভাষণসমূহের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি প্রধানতঃ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার পি. সি. রায় এবং স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়ার অভিভাষণসমূহ হইতে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়া ঐ সকল মনীষীর নির্দ্দেশসমূহ ব্যাখ্যা করেন। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের মাধ্যমে তাঁহারা বিজ্ঞানের জনকল্যাণকামী প্রচেষ্টার উপরেই বেশী জোর দেন। তাঁর মতে মূল সভাপতির অভিভাষণের মধ্যে একটি জনকল্যাণকর নির্দ্দেশ থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। ডক্টর হোরা ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিবার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেন। তিনি সকল বৈজ্ঞানিকের জন্ম এক জাতীয় চাকুরির ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন এরূপ মন্তব্য করেন। যখন দেশগঠনের জন্ম বিজ্ঞানীদের উপর গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে তখন জাতীয় সরকারের কর্ত্তব্য সমস্ত বৈজ্ঞানিককেই সমান মর্য্যাদা প্রদান করা যাহাতে বৈজ্ঞানিকগণ নিবিষ্টমনে গবেষণাকার্য্য করিয়া যাইতে পারেন এবং অধিকতর উন্নতির জন্ম স্থানত্যাগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করেন। তিনি বিজ্ঞানীদের ব্যবহারের জন্ম উন্নত ধরণের একটি ইনষ্টিটিউট নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। সেখানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের কিছুকালের জন্ম গবেষণা করিতে দেওয়া হইবে এবং তাঁহাদের কোন রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে না। ডক্টর হোরা বৈজ্ঞানিকগণের পরম বন্ধুর মত তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্ম যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, জাতীয় সরকারের তৎপ্রতি অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের সম্পূর্ণ অবসরগ্রহণকে জাতীয় অপচয় হিসাবে বর্ণনা করেন। তাঁহাদের অবসরগ্রহণের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচালনাধীন যুবকগণের গবেষণাকার্য্যও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। তাঁর মতে এই সমস্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার যোগ্য মূল্য দিয়া তাঁহাদিগকে অবৈতনিকভাবে একটি পেনসন দিয়া স্ব-স্ব গবেষণাকার্য্যে ব্রতী রাখা দরকার।

মূল সভাপতির অভিভাষণের পর বিজ্ঞান-কংগ্রেসের কার্য্য আরম্ভ হইল। বিভিন্ন শাখার সভাপতিগণের ভাষণ শেষ হইবার পর মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি পঠিত ও সমালোচিত হইল।

রসায়ন শাখার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন ডক্টর ভি. সুব্রহ্মণ্যম্। তিনি মহীশূরের সেণ্ট্রাল ফুড টেকনোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর। তিনি ভারতীয় রাসায়নিকদিগকে অধিকতর শৃঙ্খলার সহিত কর্ম্মে নিয়োগ করিবার জন্ম অনুরোধ জানান। বহু বিশিষ্ট রাসায়নিক বিদেশে শিক্ষালাভ করিয়া আসা সত্ত্বেও যথাযথভাবে কর্ম্মে নিযুক্ত হন না এবং ইহার জন্ম রাসায়নিক বৃত্তির অপচয় ঘটিতেছে। কলেজে ভর্ত্তির সময় যোগ্যতা বিচার না করাকে তিনি শিক্ষার মান নিম্নাভিমুখী হওয়ার কারণস্বরূপ মনে করেন। রাসায়নিকগণের ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যা আতঙ্কের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইহার ফলে যথেষ্টসংখ্যক লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যথেষ্টসংখ্যক শিল্পের অভাবই ইহার মূল কারণ যদিও এদেশে প্রচুর পরিমাণ কাঁচা মালের অভাব নাই। রাসায়নিক-গবেষণা ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণ কাজ হইলেও ঐ সমস্ত গবেষণার মান অনেক সময় বেশ উচ্চশ্রেণীর হয় না। ইহার কারণ ঠিক প্রতিভার অভাব নহে। বিশেষজ্ঞের দ্বারা শিক্ষাদানের অভাবই হইল ইহার মূল কারণ।

তিনি খাদ্য-সমস্যার বিষয় সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, সম্প্রতি ভারতবর্ষে প্রায় ৪০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি দেখা যায়। আমাদের জনসংখ্যা প্রতি বৎসর প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ হারে বাড়িয়া যাইতেছে। ইহার ফলে প্রতি বৎসর প্রায় পাঁচ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হইবে। বর্ত্তমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইহা প্রায় দ্বিগুণ হইবে। সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যাও দ্রুত বাড়িয়া চলিতেছে। সকল দিক বিচার করিতে গেলে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের চেষ্টা হওয়া একান্ত দরকার।

ডক্টর সুব্রহ্মণ্যম্ তাঁর মহীশূরস্থ ফুড-রিসার্চ-ইনষ্টিটিউটের গবেষণালব্ধ ফলস্বরূপ ট্যাপিওকার শ্বেতসার চাউল এবং গমের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতে নির্দ্দেশ দেন। উক্ত ট্যাপিওকার সহিত তৈলবর্জ্জিত বাদামচূর্ণ কিয়ৎপরিমাণে মিশাইয়া উহা হইতে একপ্রকার কৃত্রিম চাউল প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই চাউল রন্ধন করা সহজ এবং ইহার পুষ্টিমানও মন্দ নয়। অন্যান্য দেশে বিশেষতঃ জাপানে এইরূপ চাউলের ব্যবহার দেখা যায়। ট্যাপিওকার শ্বেতসার যখন চাউল হিসাবে ব্যবহার হইবে না তখন উহা হইতে বিশুদ্ধ শ্বেতসার, তরল গ্লুকোজ প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারিবে। তাঁহার মতে বেশী পরিমাণ ট্যাপিওকার চাষ করিয়া এই কৃত্রিম চাউল-শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিলে দেশের খাদ্যসমস্যা বহুলাংশে মিটিয়া যাইবে। শ্বেতসারজাতীয়

খাদ্যের সহিত শরীররক্ষার্থ প্রয়োজনীয় দুগ্ধ প্রভৃতি খাদ্যের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। দরিদ্র জনসাধারণ বাদাম হইতে উৎপন্ন দুগ্ধ ও দধি ব্যবহার করিতে পারেন। এ দেশে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টন বাদাম উৎপন্ন হয় এবং প্রতি পাউণ্ডে আট পাউণ্ড দুগ্ধ প্রস্তুত হইতে পারে। ডক্টর সুব্রহ্মণ্যমের গবেষণাগারে এই দুগ্ধের সহিত অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন মিশ্রিত করিয়া ইহার পুষ্টি-মান বাড়ানো সম্ভব হইয়াছে। দক্ষিণ-ভারতে একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান এই দুগ্ধ শীঘ্রই বাজারে সরবরাহ করিতে পারিবে আশা করা যায়। তিনি কয়েকটি খাদ্যসংরক্ষণের কথা বলেন। বিভিন্ন ঋতুতে উৎপন্ন ফলসমূহ কিয়ৎ পরিমাণে সংরক্ষণ করা যাইতে পারে। উপযুক্ত ঠাণ্ডা ঘরের ব্যবস্থা করিতে পারিলে পাকা ফল, আলু, শাক-সব্জী, ডিম, আপেল, মাছ প্রভৃতি বহু নিত্যব্যবহার্য খাদ্যসমূহ সংরক্ষণ করা সম্ভব হইবে। পরিশেষে ডক্টর সুব্রহ্মণ্যম্ খাদ্যসমস্যার জন্য ভবিষ্যতের উপর নির্ভর না করিয়া এখন হইতেই সর্বতোভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আত্মনির্ভরশীল হইবার চেষ্টা করিতে বলেন।

পদার্থবিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন ডক্টর পি. এস. গিল। বর্তমানে তিনি গুলমার্গ রিসার্চ অবজার্ভেটরীর ডিরেক্টর। তিনি মহাজাগতিক রশ্মিসমূহের উৎপত্তি এবং শক্তি সম্বন্ধে একটি সুন্দর ভাষণ দান করেন। ডক্টর গিল বলেন, বিশেষ শক্তিসম্পন্ন এক শ্রেণীর তড়িৎকণাসমূহ পৃথিবীস্থ বায়ুমণ্ডলের উপর সর্বদা এবং সর্বত্র প্রতিঘাত হইয়া এই মহাজাগতিক রশ্মিসমূহ সৃষ্টি করে। আজ পর্য্যন্ত ল্যাবরেটরিতে যে সমস্ত শক্তিশালী তড়িৎকণা উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদের অপেক্ষা বহু লক্ষ গুণ অধিক শক্তিসম্পন্ন এই মহাজাগতিক রশ্মিকণাসমূহ। পদার্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা এই সকল রশ্মিকণার অদ্ভুত। সমুদ্র-পার্শ্বস্থ বায়ুমণ্ডলে যে সকল মহাজাগতিক রশ্মি পাওয়া যায় তাহাদের অধিকাংশই এইরূপ শক্তিসম্পন্ন। ডক্টর গিল বলেন, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান মহাজাগতিক রশ্মি সম্বন্ধীয় গবেষণার অনুকূলে এবং ইতি-মধ্যে বহু মূল্যবান তথ্যসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

চিকিৎসা ও পশুচিকিৎসা বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করিয়া-ছিলেন ডক্টর আর. এন. চৌধুরী। তিনি বর্তমানে কলিকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ডিরেক্টর। তিনি ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলির রোগসমূহ এবং তাহা-দের আরোগ্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দান করেন। ডক্টর চৌধুরী বলেন, বর্তমান শতাব্দীতে বহু আশ্চর্য্যজনক ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং দুরারোগ্য সংক্রামক রোগসমূহ সারিয়া যাইতেছে। ডি-ডি-টির আবিষ্কারের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার বীজাণু-বহনকারী মশকসমূহ বহুলাংশে বিনষ্ট হইতেছে এবং তৎসহ রোগের বিস্তারও ঢের কমিয়া আসিতেছে। ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইন প্রভৃতি ঔষধ, কালাজ্বরে এন্টিমনি ঘটিত ঔষধ, কুষ্ঠ রোগে সালফোন এবং মাইক্রো-ফাইলেরিয়ার ক্ষেত্রে 'হেট্রজান' আশ্চর্য্যজনক ফল দান করিতেছে। ডক্টর চৌধুরী পুষ্টির অভাব এবং সরিষার তৈলে শিয়াল-কাঁটা, খনিজ তৈল প্রভৃতি দ্বারা ভেজালের দরুন দেশের যে ক্ষতি হইতেছে তাহার বিষয় বর্ণনা করেন। পরিশেষে তিনি বলেন, গ্রীষ্মদেশীয় রোগসমূহ বিস্তারের জন্য জলহাওয়া যতটা দায়ী তাহার চেয়ে দেশের লোকের অজ্ঞতা আরও বেশী দায়ী।

কৃষিবিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন ডক্টর বি, পি, পাল। তিনি বলেন খাদ্য হিসাবে চাউলেরই মত গমেরও আদর হওয়া উচিত। যদিও ভারতবর্ষে প্রায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ একর জমিতে গমের চাষ হইয়া থাকে তথাপি একরপ্রতি গমের উৎপাদন-হার খুব কম। তিনি বিজ্ঞানের সাহায্যে উৎপাদনহারবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে বলেন। ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল ইনষ্টিটিউট যে বিখ্যাত 'পুসা গম' উৎপাদন করিতে পারিয়াছে তিনি তাহার উল্লেখ করেন। তিনি গমের কয়েকটি রোগের নাম করেন এবং তাহাদের প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করিতে বলেন। তিনি এরূপ শক্ত জাতের গম উৎপাদন করিতে বলেন যাহা স্বভাবতঃ রোগের আক্রমণ সহ্য করিতে পারে।

প্রাণীবিজ্ঞান ও কীটতত্ত্ব শাখার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন বোম্বাইয়ের ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের প্রাণীবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডক্টর ডি. ভি. বল। তিনি ভারতবর্ষে মৎস্য-চাষ সম্পর্কে গবেষণা-ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় এবং মৎস্য বিভাগগুলির মধ্যে অধিকতর সহ-যোগিতার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন। ডক্টর বল মৎস্য-চাষের উন্নতির জন্য অনেক মূল্যবান উপদেশ দেন।

উদ্ভিদবিদ্যা শাখার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন ব্যারাকপুরের জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ডক্টর বি. সি. কুণ্ডু। তিনি তাঁহার ভাষণে কয়েকটি উদ্ভিদতন্তুর উৎপত্তি এবং গঠন-প্রকৃতি বর্ণনা করেন এবং তন্তুর স্থায়িত্ব প্রভৃতি বিচার করিতে গেলে তিসি ও পাটের তন্তুই উৎকৃষ্ট এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। ডক্টর কুণ্ডু পাটের তন্তু সম্বন্ধে আরও অনেক মূল্যবান তথ্যের কথা বলেন।

এ বৎসর ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশসমূহ হইতে অনেক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাসমূহে কার্য্যকরী অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের সহিত মিলিত হইয়া স্ব স্ব গবেষণালব্ধ ফলসমূহ অকপট ভাবে আলোচনা করেন। ডক্টর ই. বি. চেইন এন্টিবায়োটিকস সম্বন্ধে একটি জ্ঞান-গর্ভ বক্তৃতা করেন। ইউ,এস,এ'র প্রফেসর এ. এম. বেটম্যান পৃথিবীস্থ খনিজ সম্পদের বিবরণ দেন। তিনি বলেন, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোম, এসবেসটজ এবং টিন সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রও স্বাবলম্বী নহে এবং ভারতবর্ষ, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের উপর নির্ভর করে। ইংলণ্ডের প্রফেসর এফ, সি, বাওডেন উদ্ভিদের ভাইরস রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। একাডেমিসিয়ান ইংগেলহার্ড, একাডেমিসিয়ান নাজারোভ প্রমুখ রাশিয়ান বৈজ্ঞানিকগণও বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন।

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাহার বিশাল অট্টালিকাসমূহ হায়দরাবাদ সহরের ক্রমোন্নতিরই পরিচায়ক। হায়দরাবাদস্থ গোলকুণ্ডা দুর্গ, সালারজঙ্গ মিউজিয়াম এবং চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমন্বিত ইলোরা এবং অজন্তার বিখ্যাত ও বিশাল গুহাসমূহ বিজ্ঞানীদের বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছিল।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসকে বর্ত্তমানে কেবলমাত্র এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন বলিলেই চলিবে না। ইহা জাতীয় সরকারকে প্রতি বৎসর গবেষণালব্ধ নূতন নূতন তথ্যসমূহ সরবরাহ করিতেছে। রাষ্ট্র এই সকল তথ্য গ্রহণ করিয়া দেশের সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করুক ইহাই আমাদের কাম্য।

'ক্ষয় রোগ কথা'

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

আজকাল বিজ্ঞানের মহলে রোগ এবং চিকিৎসার বিষয়ে মতামতের মধ্যে প্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। ক্ষয়রোগ বা ম্যালেরিয়ার মত রোগের আশু কারণ অবশ্য কয়েক প্রকারের বিশেষ ধরণের বীজাণু। পূর্ব্বে চিকিৎসকগণ এই বীজাণুকে সহজে এবং দ্রুত ধ্বংস করিয়া রোগীকে নিরাময় করিবার দিকেই বেশি ঝোঁক দিতেন। এখন যে তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে তাহা নয়। কিন্তু চিকিৎসকগণের দৃষ্টি উত্তরোত্তর অন্য এক নূতন দিকে নিবিষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। রোগীর অথবা সাধারণ মানুষের শরীর নানা কারণে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বীজাণু সর্ব্বত্র থাকিলেও তাহার শরীর যদি ভাল থাকে, খাওয়া-পরা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস প্রভৃতি যদি ভাল হয় তাহা হইলে মানুষের দেহে বীজাণুর আক্রমণকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি এই দিকে নিবদ্ধ হওয়ায় তাঁহারা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছেন যে, রোগের চিকিৎসা অপেক্ষা রোগের প্রতিরোধের বিষয়ে আমাদের বেশি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা উচিত।

বহুকাল পূর্ব্বে লিখিত রামায়ণেও আমরা দেখিতে পাই, এক ব্রাহ্মণপুত্রের অকালমৃত্যু ঘটিলে সেই শিশুর পিতা রাজা রামচন্দ্রের নিকটে আসিয়া বলিলেন, রাজার পাপেই, অর্থাৎ সমাজদেহে কোনও পাপ উপস্থিত হওয়ার কারণে অকালমৃত্যু ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি রাজাকে দায়ী করিলেন। রাজা রামচন্দ্র অবশ্য খুঁজিয়া বাহির করিলেন যে, শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের একাধিপত্যে হস্তক্ষেপ করার ফলেই রাজ্যের বর্ত্তমান দুরবস্থা ঘটিয়াছে।

সে কথা যাক। বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু এ কথা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন যে, রোগের জন্ম যেমন বীজাণু আংশিক ভাবে দায়ী, তেমনই যে পরিবেশের মধ্যে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হয় তাহাকেও তদনুরূপ দায়ী বলিয়া ধরা যায়। অতএব রোগের চিকিৎসার যেমন প্রয়োজন, যে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার বশে রোগীর পক্ষে বীজাণুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সম্ভব হইয়াছে সেগুলিরও প্রতিকার তেমনই বা ততোধিক প্রয়োজন।

বাংলা দেশে আজ ঘরে ঘরে ক্ষয়রোগ প্রায় ম্যালেরিয়ার মতই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহার মূলে দারিদ্র্য ও অশিক্ষা বর্ত্তমান, শুধু এইটুকু বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না। ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারী বাংলা দেশের যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। তিনি চিকিৎসার আধুনিকতম প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞান সংগ্রহ করিবার জন্য যেমন প্রায় বিদেশে তীর্থ করিয়া থাকেন, তেমনই ভাবে বহুসংখ্যক দেশী রোগীর চিকিৎসার দায়িত্ব তাঁহার উপরে ন্যস্ত থাকায় কোন্ কোন্ সামাজিক কারণে রোগের দ্রুত প্রসার ঘটিতেছে সে সম্বন্ধেও বিচারশীল মন লইয়া সর্ব্বদা অবহিত আছেন। উপরন্তু অধিকারী মহাশয় সাহিত্যানুরাগী হওয়ায় তিনি তাঁহার রসসমৃদ্ধ ভাষার দ্বারা বাঙালী সমাজের দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে আলোচ্য গ্রন্থখানি* অতি সুপাঠ্য হইয়াছে।

বাংলা দেশের জীবন আজ নানাদিক দিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত ভারতের মধ্যে পশ্চিম বাংলার জমির উপরে জনসংখ্যার চাপ সর্ব্বাধিক। এদিকে কয়েক পুরুষ হইতে গ্রামের বুদ্ধিমান ব্যক্তি পল্লী-জীবনের অসহনীয় অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার আশায় শহরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। গ্রামে এবং শহরে জন্ম-মৃত্যুর হার এমন ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে যে, জাতির প্রাণশক্তি যেন নির্ব্বাপণের পূর্ব্বে দীপশিখার মত কখনও দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে, কখনও ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া প্রায় নির্ব্বাপিত হইয়া আসিতেছে।

একথা অবশ্য সহজেই বলা চলে যে, সমাজের এবং রাষ্ট্রের মধ্যে আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিলে তবেই বাঙালীর পক্ষে সুস্থ সবল দেহ মন লইয়া জীবন ধারণ করা সম্ভব। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, অতএব মানুষের স্বাস্থ্যের দিকে অত নজর না দিয়া কি ভাবে দ্রুত বিপ্লব সাধন করা যায় তাহাই আমাদের সকলের চেষ্টা হওয়া উচিত। কিন্তু ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারী সে দায়িত্বকে চিকিৎসকের প্রধান দায়িত্ব বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি সাধারণ মানুষকে সামাজিক পরিবেশ এবং রোগের সম্পর্ক সম্বন্ধে শিক্ষিত করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন যতই মৌলিক হউক না কেন, শেষ পর্য্যন্ত সাধারণ নাগরিক যদি শিক্ষিত না হইয়া উঠে তাহা হইলে শুধু শাসনের দ্বারাই কেন্দ্র হইতে নিয়ন্ত্রণের সহায়তায় যথার্থ সুস্থদেহ ও মনবিশিষ্ট নাগরিক তৈরী করা সম্ভব নয়। অতএব বিজ্ঞানের শিক্ষা শুধু বিপ্লবের পরের অবস্থার জন্য নয়, সকল সময়েই তাহার প্রয়োজনীয়তা আছে। ব্যক্তি একান্তে এবং সমষ্টিগতভাবে সামাজিক পরিবেশকে পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইলে তখনই বিপ্লব মূল পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে বলিয়া ধরা যায়।

সেকথা আলোচনা করার প্রয়োজন এখন নাই। পুস্তকখানির বক্তব্য লইয়াই আমাদের ভাবিতে হইবে। অধিকারী মহাশয় সূচনাতেই নিবেদন করিয়াছেন যে, বইখানি ঠিক প্রবন্ধাকারে লিখিত হয় নাই। তিনি কতকটা বৈঠকী গল্পের ভাষা ব্যবহার করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার বক্তব্যকে সুপরিস্ফুট করিয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠ করিবার সময়ে বহু বাক্যের রচনারীতিতে আমরা চলতি নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। অনেকস্থলে মনে হয়, গ্রন্থকার যেন কথা বলিতেছেন এবং সেই বলার মধ্যেও ভাবগুলি ব্যাকরণের নিয়ম-শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করিয়া একটির পর একটি ভিড় করিয়া অগ্রসর হইতেছে। ভাষার এইটুকু ত্রুটি সত্ত্বেও গ্রন্থকারের বক্তব্য এত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিচার এমন স্বচ্ছ যে সেই সকল সামান্য ত্রুটি অতিক্রম করিয়াও তাঁহার শিক্ষা অতি সহজে পাঠকের মনকে অধিকার করিয়া বসে। ইহা যে-কোন লেখকের পক্ষে অতিশয় গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

গ্রন্থকারের বক্তব্যের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, তিনি পাঠককে রোগের চিকিৎসা এবং নিবৃত্তি, তাহার আশু কারণ এবং নিদান সম্বন্ধে ও সর্ব্বোপরি বাংলা দেশে ক্ষয়রোগের বর্ত্তমান ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিয়াছেন। শহর ও গ্রামে আমরা জীবনধারণের জন্য যে ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছি তাহারও সত্য রূপ তিনি প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার কতকটা আমাদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক আয়ত্তের মধ্যে, কতকটা আবার তাহার বাহিরে। আমাদের দেশে নারীজাতির প্রকৃত অবস্থা কি, কোন্ কোন্ কারণে মাতৃজাতির মধ্যে রোগের প্রসার সহজে

ক্ষয়রোগ কথা—পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উপক্রমণিকা—ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী। নিউ গাইড, ১২ কৃষ্ণরাম বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৪। ১৩৬০। দাম তিন টাকা।

হয়, শিশুরা অকালমৃত্যুর কবলে পতিত হয়, তাহার কতগুলি অজ্ঞান বা কুসংস্কারপ্রসূত, গ্রন্থকার নির্মম অথচ সহানুভূতিসম্পন্ন মনোভাব লইয়া আমাদের সে বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছেন। জগতের অপরাপর দেশে রাষ্ট্রের অধীনে খাদ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়া এবং বিজ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগের দ্বারা কি আশ্চর্য্য উপায়ে শুধু শিশু এবং মাতৃজাতি নয়, সকল নাগরিকের স্বাস্থ্যকে উন্নত করা সম্ভব হইয়াছে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি আমাদের চোখের সম্মুখে ধরিয়াছেন। ইহার জন্য অর্থবলই যে প্রধানতঃ প্রয়োজন, এই ভ্রান্ত ধারণার মূলে তিনি কুঠারাঘাত করিয়াছেন। ধনের প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তদপেক্ষা প্রয়োজন হইল জ্ঞানের এবং তৎসহ সেই জ্ঞানকে প্রয়োগ করিবার জন্য পুরুষকারের।

ইহার পরে তিনি বাংলা দেশে ক্ষয়রোগের অনুকূল অবস্থাগুলির বিশ্লেষণকল্পে আমাদের খাদ্যসমস্যা, বাসস্থানের অকুলানের সমস্যা প্রভৃতি বিষয় একে একে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই সকল বিশ্লেষণ পাঠ করিলে বুঝা যায়, কি ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যেই না আমরা বাস করিতেছি।

সর্ব্বশেষে ক্ষয়রোগ সম্পর্কে এবং চিকিৎসার পর রোগীর পুনর্ব্বাসন সম্বন্ধে অধিকারী মহাশয় স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে অতি মূল্যবান কয়েকটি বিষয় জ্ঞাপন করিয়া পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছেন।

বইখানি জ্ঞানীর দ্বারা লিখিত এবং আমাদিগকে জ্ঞান বিতরণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রকাশিত। যে চিত্র বইখানি পড়িলে ক্রমশঃ আমাদের মনে ফুটিয়া উঠে তাহা একদিক দিয়া যেমন ভয়াবহ, অপরদিক দিয়া আবার তেমনই আশাপ্রদ। কেবলই মনে হয়, আমরা বাঙালীরা জীবনধারণের জন্য, নিজেদের অজ্ঞানতা, আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তার সহায়তায় কি তামসিক অবস্থাই না সৃষ্টি করিয়াছি। ক্রিমিকীট যেমন নিজের চতুষ্পার্শে নানাবিধ আবর্জ্জনা সংগ্রহ করিয়া তাহার মধ্যেই মলিন জীবন যাপন করে, বাঙালী তেমনই ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত তামসিকতার গুণে প্রত্যেক মানুষের জীবনকে স্বল্পস্থায়ী, রোগাকীর্ণ করিয়া টানিয়া টানিয়া বাঁচিয়া আছে। অথচ অধিকারী মহাশয়ের পুস্তকে সকলের চেয়ে আশার কথা হইল এই যে, এ অবস্থা অনিবার্য নহে। পুরুষকারের একান্ত এবং সমষ্টিগত প্রয়োগের দ্বারা, বিজ্ঞানের যথাযথ ব্যবহারের দ্বারা আমরা বর্ত্তমানের সর্ব্বগ্রাসী তমোভাবকে বিতাড়িত করিতে পারি। বিজ্ঞান স্বীয় তত্ত্ব পরিবেশনের দ্বারা আমাদিগকে প্রয়োজনীয় শক্তি দিতে পারে। উপরন্তু অপরাপর দেশ এ পথে অগ্রসর হইয়া শারীরিক কল্যাণের মধ্যে সকলের জীবনকে সহজ ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমরাই বা পারিব না কেন?

বইখানির মধ্যে এই আশার সুর, সর্ব্বোপরি তমোভাবের পরিবর্ত্তে একটি বলিষ্ঠ সাত্ত্বিক ভাব আমাদের আকর্ষণ করে। যদি প্রত্যেক বাঙালী পাঠক এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া হতাশার পরিবর্ত্তে আশায় এবং শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হন, পরিবেশকে পরিবর্তন করিবার সাহস তাঁহার মধ্যে সঞ্চারিত হয়, ক্ষয়রোগ সম্বন্ধে ভয় বা সঙ্কোচের পরিবর্ত্তে তাহার সহিত সমবেতভাবে সংগ্রাম করিবার উদ্যমের দীপশিখা তাঁহার অন্তরে প্রজ্বলিত হয় তবেই তিনি ধন্য হইবেন, লেখকের নিকটেও আমাদের কৃতজ্ঞতার ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া উঠিবে।
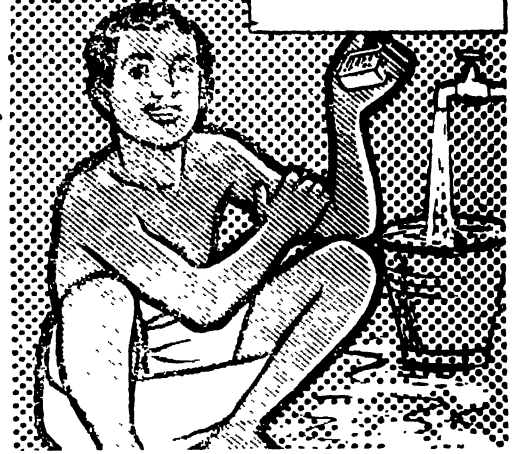
লাইফবয় সাবান

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে

L. 245-X52 BG
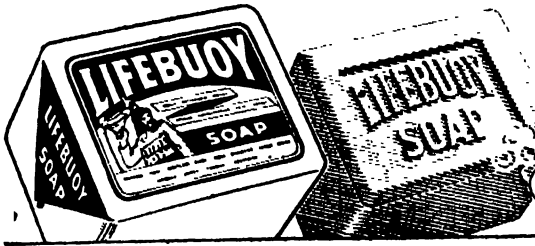
প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—শ্রীতমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম্. এ., পিএইচ. ডি.। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার টাকা মাত্র।

বাংলা সাহিত্যের বিধিবদ্ধ ইতিহাস আলোচনার প্রথম দিক এই আলোচনার অন্যতম নায়ক পরলোকগত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় রচিত এই সাহিত্যের বিস্তৃত ইতিহাস ও ইহার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে লিখিত নানা গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হয় এবং এগুলি পণ্ডিতসমাজে আদরলাভ করে। তাহার পর ক্রমশঃ অনেক নূতন উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে—অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে—অনেকে অনেক নূতন গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছেন। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস' বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। দীর্ঘ দিন পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্যের আর একখানি বড় ইতিহাস-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এখানি বাংলায় লেখা। ইহাতে বাংলা সাহিত্যকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—আদিযুগ বা হিন্দু-বৌদ্ধযুগ এবং মধ্যযুগ। গ্রন্থকারের মতে ডাকার্ণব, চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, দোহাকোষ, খনার বচন, শূন্যপুরাণ, গোপীচন্দ্রের গান, গোরক্ষবিজয় এবং ব্রতকথা আদিযুগের অন্তর্ভুক্ত। '১৩শ হইতে ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত' মধ্যযুগে লৌকিক সাহিত্য (মঙ্গলকাব্য), অনুবাদসাহিত্য, বৈষ্ণবসাহিত্য ও জনসাহিত্য বিকাশলাভ করে। এই যুগবিভাগের কল্পনায় তথা গ্রন্থের অন্যত্র আলোচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যথাযথ অনুসরণ করা হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। গ্রন্থকার মূলতঃ প্রাচীন মতবাদের অনুবর্তন করিয়াছেন। তাই তিনি স্পষ্টভাবেই স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি 'এই গ্রন্থরচনার উপাদান ও উদাহরণ সংগ্রহে প্রধানতঃ ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের গ্রন্থগুলির উপর অধিক নির্ভর করিতে বাধ্য' হইয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে বহু গ্রন্থকারের ও গ্রন্থের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং প্রসঙ্গক্রমে অনেক গ্রন্থ হইতে রচনার নিদর্শন উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই—বিশেষ করিয়া অপ্রকাশিত গ্রন্থের ক্ষেত্রে নিদর্শনগুলির আকর যথানিয়মে উল্লিখিত না হওয়ায় অনুসন্ধিৎসু পাঠককে বড়ই অসুবিধায় পড়িতে হয়। পক্ষান্তরে প্রকাশিত গ্রন্থের রচনার নমুনা উদ্ধৃত করা বাহুল্য মাত্র। বর্ণাশুদ্ধি ও ভাষার ত্রুটি গ্রন্থমধ্যে বহুত্র পরিলক্ষিত হয়। মোটের উপর, গ্রন্থখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব যথোচিত রক্ষা করিতে পারিয়াছে মনে হয় না।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

মন্দাকিনী—শ্রীরবি গুপ্ত। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। ৮ বি ব্রজেন্দ্র ঘোষ লেন, কলিকাতা-১০। মূল্য তিন টাকা।

বইখানি বাসট্টিটি গীতিকবিতার সমষ্টি। তরুণ কবি রবি গুপ্তের ইহা তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। ইহার মধ্যেই আরো দুইখানি কবিতা-পুস্তক প্রকাশ করিয়া লেখক যশোলাভ করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের অধিবাসী বলিয়া তরুণ বয়সেই লেখক মরমী ভাবের প্রেরণা পাইয়াছেন। প্রথম কবিতা 'মন্দাকিনী'।

অমরার মন্থ হতে মন্দাকিনী আসে বয়ে আসে
তরঙ্গ-উল্লাসে।

'উদয়', 'বহ্নিরথ', 'তৃষা' প্রভৃতি কবিতায় আশার বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। 'নিহিত' কবিতায় তরুণ কবি বলিতেছেন,

হায় রজনী, তোমার বাণী যায় না কিছুই বোঝা!
আমার প্রাণে বাধলে বাসা চিরদিনের খোঁজা।

'নেয়ে' কবিতায় পাই,

নিকষকালো চন্দ্রাতপে
রাতের তারার জাগার সময় হ'ল;
পাণ্ডু-চাঁদের আভাস লাগে—
তরী বেয়ে কার ইশারায় চলো?

'আহ্বান' আসিয়াছে,

আমি দেখিতেছি মহান্ ঋষির
সৃজন-সরণী বহিয়া সূর্য্য,
জড়-জগতের অন্ধ-আঁধারে
নামিয়া ধ্বনিছে কিরণ-তূর্য্য।

'জননী' কবিতায় আছে,

বিশ্ব-বেদনার অভ্র-বিসারিত তুঙ্গ-তুষারিকা অচলে
জ্বালো কে হেমময়ী জননী কল্যাণী শান্তি-সুখ-দীপ অনলে!

দিনে দিনে আরও নির্ম্মল, আরও
লাবণ্যময় ত্বক্
ক্যাডিল*যুক্ত রেক্সোনাকে
আপনার জন্যে এই যাদুটি
ক'রতে দিন
রেক্সোনার ক্যাডিলযুক্ত ফেনা আপনার গায়ে আস্তে আস্তে ঘ'ষে নিন ও পরে ধুয়ে ফেলুন। আপনি দেখবেন দিনে দিনে আপনার ত্বক্ আরও কতো মসৃণ, কতো কোমল হচ্ছে-- আপনি কতো লাবণ্যময় হ'য়ে উঠছেন।
Rexona
Rexona
রেক্সোনা
ক্যাডিল*যুক্ত একমাত্র সাবান
* ত্বক্‌পোষক ও কোমলতাপ্রদ কতকগুলি তৈলের বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম
RP. 117-50 BG
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারি লিঃএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত

'শ্রীঅরবিন্দ' কবিতায় পাই,

জাগে এ ধরায় চির-আরাধ্য অমরার অরবিন্দ।

'নীল-বিহঙ্গ' শ্রীঅরবিন্দের কবিতার অনুবাদ,

আমি দেব-বিহঙ্গম স্বর্গ-নীলাকাশে

চির-স্বচ্ছ রাজি ঊর্দ্ধে মালিনের।

বইখানিতে কবিতার সঙ্গে অনেকগুলি গানও আছে।

হঠাৎ শুনি স্বপ্ন-সম

তোমার বাণী, নিরুপম।

'চকোরে' পাই,

তোমার নয়নে দেখেছি আমার একটি আকাশ উজ্জলতর,

স্বর্ণ-শিখায় প্রাচীন জাগে।

অনেকগুলি কবিতাই ভাবে ও ভাষায় সুন্দর। তরুণ কবির ছন্দ ও শব্দের উপর আধিপত্য আছে। "মন্দাকিনী"র অনুভূতিময় কবিতাগুলি রসজ্ঞ পাঠকের অন্তরে সাড়া জাগাইবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

পশ্চিমবঙ্গ জনগণের প্রতি নিবেদন—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত। ২০ পৃষ্ঠা।

দেশবিভাগের পর হইতে পশ্চিমবঙ্গ নানা বিপর্যয়ের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। সরকার গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা রচনা করিয়া কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় রাজ্যসরকারের যাবতীয় জনকল্যাণ-প্রচেষ্টার বিবরণ সহজ ভাষায় সাধারণ পাঠকের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে। রাজনৈতিক অবস্থা, আর্থিক দুরবস্থা, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা, কল্যাণী নগরী, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প, মাছের ব্যবসা, খাদ্য, দুর্গতত্রাণ, সেচ পরিকল্পনা, পথঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, আইন প্রণয়ন, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, শ্রমিক-কল্যাণ, উপজাতি-কল্যাণ, মাদক-নিবারণ, কারা সংস্কার, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' এবং সর্ব্বশেষে ১৯৫৩ সালের কর্ম্মসূচী এই পুস্তিকায় স্থান পাইয়াছে। রুশদেশ, চীনদেশ কিংবা আমেরিকা সম্বন্ধে এদেশে যথেষ্ট প্রচার চলিতেছে। কিন্তু রাজ্যসরকার দেশবাসীর জন্য কি করিতেছেন সে সম্বন্ধে প্রচারকার্য খুব কমই হইতেছে। জনসাধারণের মধ্যে এরূপ পুস্তকাদি ব্যাপকভাবে প্রচার করিয়া একাধারে দেশের লোকের কৌতূহল-নিবৃত্তি ও সকলের মধ্যে নাগরিকের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করিবার জন্য সরকারের বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া সরকার একটি বিশেষ প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন।

পরাভূত দেবতা—শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত। প্রাচী প্রকাশন, ১২ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১। মূল্য ২৲।

এখানি "দি গড দ্যাট ফেইলড" নামক ইংরেজী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। বিভিন্ন দেশের ছয় জন মনীষী—যাঁহারা কোন এক সময়ে নিজেরা কমিউনিষ্ট কিংবা কমিউনিজমে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁহাদের প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইঁহারা হইতেছেন লুই ফিসার (আমেরিকান), ষ্টিফেন স্পেনডার (ইংরেজ), আঁদ্রে জীদ্ (ফরাসী), ইগনাসিয়ো সিলোন (ইটালিয়ান), আর্থার কোয়েসলার (হাঙ্গেরিয়ান) এবং রিচার্ড রাইট (আমেরিকান নিগ্রো)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রুশদেশে সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং তৎকর্তৃক মানবজাতিকে নূতন আশার আলোক প্রদর্শন ও নব আদর্শের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করা বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান ঘটনা। এই ত্রিশ বৎসরের কিঞ্চিদূর্দ্ধকালের মধ্যে সোভিয়েটের আদর্শেরও রূপান্তর ঘটিয়াছে এবং উহা নূতন ধরণের সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হইয়াছে। সোভিয়েটের বর্তমান নীতি স্বাধীন চিন্তা ও মানুষের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরেজ সমাজতন্ত্রী লর্ড প্যাসফিল্ড বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সোভিয়েট অভ্যুত্থানকে মানবের নূতন সভ্যতার সূচনা বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যে এই নূতন সভ্যতার ফাটলগুলি এতই সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, ইহার বন্ধুরাও ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। ভবিষ্যতে সম্ভাব্য ভয়াবহ সংগ্রামের কথা চিন্তা করিয়া আজ সভ্যজগৎ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। সোভিয়েটের তথাকথিত সাম্যবাদের আদর্শকে অন্ধভাবে অনুসরণ করিবার পূর্ব্বে এই পুস্তক পাঠ করিলে তরুণদের লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশ সমর-প্রস্তুতি-শিবিরে পরিণত হইতে চলিয়াছে ও মানবসভ্যতার বিনষ্টির আশঙ্কায় আজ বিশ্বের মনীষীগণ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। কমিউনিজমের 'অপর দিক' সম্বন্ধে যাহাতে দেশের তরুণেরা জ্ঞানলাভ করিতে পারে এজন্য এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার কাম্য। কথা-সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

মাটির পুতুল—শ্রীদেবব্রত পাল। নির্ভীক কার্যালয়, ঝাড়গ্রাম (মেদিনীপুর)। মূল্য ১৲।

বইখানিতে দশটি কবিতা আছে: পদ্মা, মহুয়া, কালনাগিনী, গ্যালিফ ষ্ট্রীটের মোড়, কলম্বাস, শহীদ, কবির কামনা, চিঠি, প্রশ্ন, হৃৎপিণ্ড।

গতানুগতিক নিরানন্দ জীবনের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে 'পদ্মা'য়।

"হে পদ্মা, আমারে সিক্ত করো আঘাতে আঘাতে
জীর্ণ করো ক্লীবত্বের অনড় প্রাচীর।"

কবির দৃষ্টি এবং অনুভূতি আছে, কিন্তু ভাষা ও ছন্দ সর্বত্র কাব্যশ্রীমণ্ডিত হয় নি। স্থানে স্থানে ছাপার ভুলও রয়ে গিয়েছে।

স্বাধীনতার সংকট—শ্রীধীরেন্দ্র মজুমদার। অনুবাদক: শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৸০।

"অখিলভারত চরখাসঙ্ঘের সভাপতি ধীরেন্দ্র মজুমদারের জন্ম হয় ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই সেপ্টেম্বর গোরক্ষপুরে।" ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বেনারস ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়বার সময়ে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং গান্ধীজীর সঙ্গে থেকে খাদি-উৎপাদন ও গ্রাম-সংগঠনের শিক্ষা লাভ করেন। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে একাধিক গান্ধী-আশ্রম তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। সমাজসেবা সম্বন্ধে হিন্দীতে তিনি অনেক বই লিখেছেন। এখানি তাঁর 'আজাদী কী খাতরা'র বঙ্গানুবাদ। আকারে বড় নয়, কিন্তু বইখানিতে অনেক ভাববার কথা আছে। তাঁর বক্তব্য: "গান্ধীজী-বর্ণিত আর্থিক বিপ্লবকে যদি আমরা কার্যে পরিণত করতে না পারি তবে ভারতে শুধু আমেরিকারই আবির্ভাব হবে না, বরং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এক অমিতবলশালী স্বৈরতন্ত্র কায়েম হবে।...পুঁজিপতিদের হাতে যখন শিল্পীকরণের ভার দেব, তখন তারা তাদের পুরানো বন্ধু বিদেশী পুঁজিপতিদের সাথে গাটছড়া বাঁধবে।... কেন্দ্রীভূত শিল্পব্যবস্থা যাদের হাতে স্বভাবতঃই তারা সিংহাসনের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। এই জন্যই আমরা জনসাধারণের মন থেকে সোনার ভরসা দূর করে শ্রমের ভরসায় তাদের নিজ জীবনযাত্রা পরিচালন করার জন্য তৈরি করতে চাইছি। আমরা চাই, যাতে শাসনদণ্ডের উপর প্রভাব বিস্তার করবার ক্ষমতা পুঁজিপতিদের বদলে শ্রমিকদের হাতে যায়।"

জীবনশিল্পী—শ্রীঅজিতকুমার নাগ। আগমনী প্রকাশনা-ভবন, ৮এ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ৷৷৹।

জীবন কি, জীবনের উদ্দেশ্য কি—এই চিন্তাস্রোতে মনকে ছেড়ে দিয়ে লেখক তার পথরেখাটুকু এঁকে রাখতে চেয়েছেন ২৯ পৃষ্ঠার পুস্তিকাখানিতে। প্রথম পৃষ্ঠাতেই চোখে পড়ল 'এসে পড়েছে', 'স্থিরমান জীবন'। লেখকের কল্পনা আছে, কিন্তু প্রকাশক্ষমতা ভালভাবে আয়ত্ত হয় নি।

জড়বাদ বনাম মানবজগৎ—শ্রীশিবানন্দ কাঙালী। আসানসোল, রাহা লেন থেকে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲।

পাশ্চাত্ত্য জড়বাদ আমাদের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে অশান্তির পথে নিয়ে চলেছে, বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে লেখক তাই দেখিয়েছেন। ছোট্ট বইখানিতে চিন্তাশীলতার পরিচয় আছে।

শাখে গাছে পাখী—শ্রীঅমূল্যকুমার চক্রবর্তী। সুপ্রকাশন, ৩ সার্কাস রেঞ্জ, কলিকাতা-১৯। মূল্য ১৲।

উদার সহানুভূতি এবং সাবলীল ভাব ও ছন্দের গুণে কবিতাগুলি মনকে স্পর্শ করে। দুটি কাব্যগন্ধী গদ্যরচনাও এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আলো-ছায়া—শ্রীপবিত্রকুমার মিত্র। গ্রন্থালয়, ১১০বি দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড, তালতলা, কলিকাতা। মূল্য ১।০।

"ঝটিকার বুকে নাহি থাকো,
পশ্চাতে তাণ্ডব নাহি রাখো,
তারকাখচিত নীল নভে
তুমি মনোরমা।"

কাব্যলক্ষ্মীকেও কবি বোধ হয় এই রূপেই দেখতে ভালবাসেন। কবিতাগুলিতে প্রবল আবেগ নেই, কোমল মাধুর্য আছে। দু'এক জায়গায় সামান্য ছন্দের ত্রুটি চোখে পড়ল।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলার লেখক (১ম খণ্ড)—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১১৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ৪৲।

যে সকল মনস্বী লেখককে বর্তমান সাহিত্যের পাঠক ভুলিতে বসিয়াছে অথবা মুষ্টিমেয় বিদগ্ধসমাজ ও সাহিত্যরসিক কর্তৃক যাঁহাদের লেখা পঠিত ও আদৃত হয়, তাঁহাদের ও বর্তমানকালের সাত জন দিকপাল সাহিত্যিকের কথা এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে, যথা: শিবনাথ শাস্ত্রী, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রমথ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইঁহাদের প্রত্যেকের লেখা, রচনাশৈলী, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, চরিত্র-চিত্র, নিসর্গ-বর্ণন প্রভৃতি স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে অনন্যসাধারণ ও অনবদ্য। ব্যঙ্গরচনায় ও রসসাহিত্যে, কথাসাহিত্যে ও প্রবন্ধগৌরবে, লিপিচাতুর্যে এবং লিখনভঙ্গীতে ইঁহাদের প্রত্যেকের লেখাই স্ব স্ব মহিমায় সমুজ্জ্বল ও দ্যুতিমান। আজিকার পাঠকগণ ইঁহাদের রচনা সম্বন্ধে অবহিত হইলে অনেককিছু শিখিতে পারিবেন এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক নূতন আলোকের সন্ধান পাইবেন। উল্লিখিত সাত জনের রচনার বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য সম্বন্ধে গ্রন্থকারের সুনিপুণ বিশ্লেষণ ও সম্যক্ আলোচনা সাহিত্যানুসন্ধিৎসু ও রসপিপাসুগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবে এবং ইঁহাদের লেখা সম্বন্ধে গ্রন্থকারের সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী ও অভিনব আলোকসম্পাত পাঠকসমাজের সাহিত্যচেতনাকে প্রবুদ্ধ ও পরিতৃপ্ত করিবে। আলোচ্য লেখকগণের প্রতিকৃতি এই গ্রন্থের একটি মূল্যবান সম্পদ্ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

নিয়ন্ত্রণী—গুরুদাস। শ্রীগিরীন্দ্রকুমার দে। যোগদা সৎসঙ্গ ক্ষীরোদাময়ী বিদ্যাপীঠ। লক্ষ্মণপুর (মানভূম)। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৩২। মূল্য ৪৲।

এখানি উপন্যাস। বর্তমানে আমাদের দেশে ছাত্রদের শিক্ষা-পদ্ধতি লইয়া এমন একটা গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়াছে যাহা আমাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তিমূলকে পর্যন্ত নাড়া দিয়াছে। প্রকৃত শিক্ষা কিভাবে এবং কোন্ পদ্ধতিতে হওয়া উচিত, ছাত্র এবং

শিক্ষকদের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিলে প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, কয়েকটি ছাত্র ও একটি আদর্শ শিক্ষক-চরিত্রের মাধ্যমে লেখক তাহা পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন এবং এতৎসম্পর্কিত নানা সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত করিয়াছেন। ছাত্র-চরিত্রে দুর্বলতা, চপলতা, ঈর্ষা, দ্বেষ, কোমলতা কঠোরতা সবকিছুই আছে, কিন্তু শাস্তিদানের পরিবর্তে ভালবাসার শাসন দ্বারা কিভাবে ইহাদের নৈতিক উন্নতিবিধান সম্ভব তাহা বহু ঘটনার মধ্য দিয়া দেখানো হইয়াছে এবং এই দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে লেখকের প্রয়াস একেবারে ব্যর্থ হয় নাই।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

ব্যবহারিক শব্দকোষ—কাজী আবদুল ওদুদ। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য সাড়ে আট টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১০৩০।

নামেই প্রকাশ, এ অভিধানখানি নিয়ত ব্যবহারযোগ্য। বাংলা ভাষায় অভিধান সঙ্কলিত হইতেছে আজ কিঞ্চিদধিক দেড় শত বৎসর ধরিয়া। বাংলা এই সময়ের মধ্যে একদিকে যেমন ঐশ্বর্যশালিনী হইয়া উঠিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি বাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত শব্দসম্ভারের প্রয়োগের দিকেও ক্রমশঃ আমাদের দৃষ্টি ফিরিতেছে। প্রাচীন, এমন কি গত সোয়া শ দেড় শ' বৎসরের পুস্তকাদির ব্যবহৃত বহু শব্দ এখন অচল। আবার বিস্তর শব্দের মানে ক্রমশঃ বদলাইয়া গিয়া নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে ও করিতেছে। ভাষায় নূতন নূতন শব্দও প্রবেশ করিতেছে বিস্তর। অভিধানে নূতন-পুরাতন সকল শব্দ ধৃত থাকে, ভাষার সম্পদ সম্বন্ধে সতত আমরা সজাগ হই। এ কারণ ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ইতিহাসে অভিধান একটি প্রকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

বাংলা ভাষায় ছোট বড় অভিধান এযাবৎ সঙ্কলিত হইয়াছে অনেক। তথাপি অভিধানের প্রয়োজনীয়তা ভাষার দ্রুতগতিশীলতার সঙ্গে ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। আলোচ্য অভিধানখানি এ অভাব অনেকটা বিদূরিত করিবে নিঃসন্দেহ। অভিধান সঙ্কলনে সঙ্কলয়িতা যেসব পূর্বসূরীর নিকট হইতে সহায়তা পাইয়াছেন তাহা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করিয়াছেন। তবে তাঁহার অভিধানখানির দুইটি বিশেষত্বের কথা তিনি 'নিবেদনে' উল্লেখ করিয়াছেন। এখানি ব্যবহারকালে এই বিশেষত্বগুলি প্রত্যেকেরই নজরে পড়িবে। সঙ্কলয়িতা শুধু শব্দের মানে বা প্রতিশব্দ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রায় প্রতিটি শব্দের প্রয়োগও প্রাচীন বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বা নূতন বাক্য সংযোগে দর্শাইয়াছেন। তাঁহার পূর্বেও বড় বড় অভিধানে এ রীতি অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ সচরাচর ব্যবহারযোগ্য স্বল্পপরিসর অভিধানে ইহা অভিনব বটে। বাংলা সাহিত্যে নূতন প্রবেশক এবং সাহিত্য-সেবী মাত্রের এখানি এজন্য বড়ই কাজের হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশেষত্ব, এই অভিধানখানিতে মুসলমান-সমাজে প্রচলিত অথচ বাংলা অভিধানে সাধারণতঃ অচলিত শব্দসমূহও সঙ্কলিত হইয়াছে। আমরা এই অভাব ইতিপূর্বে বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছি। এই অভাব নিরাকরণের প্রয়াস করিয়া সঙ্কলয়িতা বাংলাভাষীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহার মতে "মুসলমান-সমাজের চিত্র বাংলা সাহিত্যে ব্যাপকভাবে অঙ্কিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ সবের প্রয়োজনীয়তা সহজেই বৃদ্ধি পাবে।" আমরা অভিধানখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

সন্ধানীর চোখে পশ্চিম—শ্রীশেফালি নন্দী। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা ১৭৯। মূল্য দুই টাকা বার আনা।

লেখিকা শিশু-শিক্ষণ বিদ্যা আয়ত্ত করার জন্য কিছুকাল পূর্বে বিলাত যান। সেখানে এক বৎসর ছিলেন। এই সময় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁহার ভ্রমণেরও সুযোগ ঘটে। এই পুস্তকখানিতে তিনি সন্ধানীর দৃষ্টিতে যেসব বিষয় দেখিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহারই কথা যথাযথ বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এখানে আলোচ্য কোন কোন বিষয় ইতিপূর্বেই প্রবাসীতে ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতেই লেখিকার অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী এবং অভিজ্ঞতা পরিবেশন-কৌশল পাঠক-পাঠিকা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। পুস্তকে কি কি বিষয় কিভাবে আলোচিত হইয়াছে তাহার আঁচ পাওয়া যাইবে বিষয়গুলির নামকরণ হইতে, যেমন—বিলাত দেশটা মাটির: বিলাতের পথেঘাটে, কাজ ও ছুটি, বিলাতের রান্নাঘর, বিলাতের নূতন সমাজ, ছেলে কি করে 'মানুষ' হয়, ইংরেজ চাষী পরিবার; আয়ার্ল্যাণ্ড—সাদা চোখে; প্যারিস; পথিক-সঙ্গী—সুইজারল্যাণ্ড; সুন্দরী ভেনিস; ভিয়েনা—আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলন প্রভৃতি।

নরনারীর সঙ্গে আলাপনে, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের রীতিপদ্ধতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে, পথেঘাটে নরনারীর চাল-চলনে, আধুনিক ও প্রাচীন নানা বিষয়ে তাহাদের অকুণ্ঠ মনোভাব প্রকাশে যে নূতন সমাজের পরিচয় পাইয়াছেন, লেখিকা অতি সহজ ভাষায় সুনিপুণভাবে তাহা বিবৃত করিয়াছেন। স্বাধীন হইলেও আয়ার্ল্যাণ্ড এখনও অর্থনৈতিক দিক হইতে কত পশ্চাৎপদ ও দুর্দশাগ্রস্ত তাহার পরিচয় মিলে এই সম্পর্কীয় অধ্যায়ে। ইউরোপ মহাদেশে লেখিকা গিয়াছেন। কিন্তু ইউরোপের মধ্যেও তাহার শিল্পীমন নূতন জিনিষের আস্বাদ লইতে ক্ষান্ত হয় নাই। শিশু-শিক্ষণ বিদ্যা আহরণে, এ সবের মধ্যেও, তিনি অতিশয় তৎপর ছিলেন। ভিয়েনার আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলনও

…ল তাঁহার নিকট একটি বিশেষ আকর্ষণ। এখানকার বিবরণ অত্যন্ত …ক্ত হইয়াছে। পুস্তকখানি বাংলাভাষীর নিকট আদরণীয় হইবে …সন্দেহ।

মনীষী জীবন কথা (১ম ও ২য় খণ্ড)—শ্রীসুশীল রায়। রিজেন্ট বুক কোম্পানী, ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য …ত্যেকখানি দুই টাকা।

প্রতি খণ্ডে দশ জন করিয়া কুড়ি জন বঙ্গমনীষীর জীবন ও কর্ম্ম সম্বন্ধে …খক আলোচনা করিয়াছেন আলোচনায় অভিনবত্ব এই যে, তিনি প্রত্যেকের …ঙ্গে দেখা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রমুখাৎ যে জীবন-কথা শ্রবণ …রিয়াছেন, তাহাই স্পষ্টভাবে পুস্তকদ্বয়ে তিনি সন্নিবেশিত করিয়াছেন। …খক শুধু দুই জনের—বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের …ঙ্গে স্বয়ং সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই; সাক্ষাৎকারের নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বেই তাঁহারা লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। পুস্তকের প্রথম খণ্ডে আছে—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য্য, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য, রাজশেখর বসু, ক্ষিতিমোহন সেন, সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, গোপীনাথ কবিরাজ ও যোগেন্দ্রনাথ বাগচীর জীবন-কথা। তিনি দ্বিতীয় খণ্ডে এই ক'টি জীবন-কথা আলোচনা করিয়াছেন: যদুনাথ সরকার, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, নন্দলাল বসু, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ সেন, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, নীলরতন ধর, মেঘনাদ সাহা এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

পুস্তক দুই খণ্ডে গ্রন্থকার নূতন ও পুরাতনের মিলন ঘটাইয়াছেন। প্রায় এক শতাব্দী যাবৎ বাংলাদেশে যে প্রাচীন ও নবীন বিদ্যার চর্চ্চা চলিতেছে তাহার একটি সুন্দর পরিচয় মিলে এই জীবন-কথাগুলির মধ্যে। সংস্কৃত-সাহিত্যের অনুশীলন যে কত সময়সাপেক্ষ ও আয়াসসাধ্য তাহা এযুগে হয়ত আমাদের ধারণার মধ্যেই আসিবে না। কত বৎসর ধরিয়া কিরূপ নিষ্ঠার সঙ্গে কাব্য, স্মৃতি, ন্যায় দর্শনাদি অধ্যয়ন ও মনন করিয়া সে সমুদয়ে ব্যুৎপন্ন হইতে হয়। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষা ও সভ্যতা-সংঘাতে ভারতবর্ষের বিদ্যাক্ষেত্রে যে বিপুল উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা আমরা কখনও স্বীকার না করিয়া পারিব না। গত শতাব্দীর রেনেসাঁসের যুগে আমাদের বিলুপ্তপ্রায় সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য পুনরুজ্জীবিত এবং সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার অঙ্গ হইবার সুযোগ পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন টোল-চতুষ্পাঠীর শিক্ষা-ব্যবস্থারও সংস্কার সাধিত হইয়াছে। লেখক পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে এমন কয়েক-জনের জীবন-কথা আলোচনা করিয়াছেন যাঁহারা এই প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণপূর্ব্বক প্রাচ্য-বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছেন। আবার এমন কয়েকজনের জীবন-কথা উভয় খণ্ডেই আছে যাঁহারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় বিদ্যাতেই বিশেষ পারঙ্গম হইয়াছেন এবং তাঁহাদের অর্জ্জিত জ্ঞান গৌড়জনকে পরিবেশন করিতে নিয়ত রত রহিয়াছেন। নব্য পদ্ধতিতে ইতিহাস এবং বিজ্ঞান-চর্চ্চা আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত নূতন। এই দুইটি বিভাগেও বাঙালীজাতির বিশেষ গর্ব্বের কারণ রহিয়াছে। আচার্য্য যদুনাথ সরকার ইতিহাস-চর্চ্চায় যে নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা বিজ্ঞান-সম্মত, এবং বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনায় বিভিন্ন গবেষক তাহাই অনুসরণ করিতেছেন। বিজ্ঞানক্ষেত্রে নীলরতন ধর, সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং মেঘনাদ সাহার নাম আজ কে না জানেন? আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিজ্ঞানানুশীলনে জীবনব্যাপী সাধনা দ্বারা যে রীতি-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ইঁহারা অনুসরণ করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। সুশীলবাবু এইসব মনীষীর জীবন-কথা—স্বল্প পরিসর হইলেও গৌড়জনকে শুনাইয়া একটি বিশেষ হিতসাধন করিয়াছেন এবং তাহাদের আকাঙ্ক্ষা বাড়াইয়া দিয়াছেন। বিপিনবিহারী গুপ্তের পুরাতন প্রসঙ্গের মত এই সকল মনীষীর নিকট হইতে জীবনাদর্শ ও জীবন-সাধনার কথা আরও কিছু জানিয়া আমাদের পরিবেশন করুন এই কামনা।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

সংস্কৃত মহাসম্মেলন

বিগত ১৭ই মাঘ হইতে ২৪শে মাঘ পর্য্যন্ত আট দিন ব্যাপিয়া চুঁচুড়া বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী ভবন-প্রাঙ্গণে হুগলী সংস্কৃত পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে বিপুল সমারোহে "সারস্বত সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ১৭ই মাঘ অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী মহারাজ। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য। ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ দিন প্রধান অতিথিরূপে সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন।

১৮ই মাঘ সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় পণ্ডিত শ্রীহেরম্বনাথ তর্কতীর্থের সভাপতিত্বে ন্যায়দর্শন সম্পর্কে শাস্ত্রালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্বোধন করেন অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ। উক্ত দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পণ্ডিত শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, এম-এ। ডক্টর শ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী, এম-এ, পি-এইচ-ডি একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৯শে মাঘ সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী মহারাজের সভাপতিত্বে বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে শাস্ত্রালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিনের সভায় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার নন্দীর বক্তৃতা বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দিনের অনুষ্ঠানেও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণ করেন। ২৩শে তারিখে সংস্কৃত পরিষদের সদস্যগণ কর্ত্তৃক অধ্যাপক শ্রীঅমিয়নাথ চক্রবর্ত্তী, এম-এ, কাব্যতীর্থ-বিরচিত সংস্কৃত নাটক অভিনীত হয়। সভায় প্রতিদিনই অভাবনীয় লোক-সমাগম হইয়াছিল। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যালোচনামূলক এরূপ বিরাট অনুষ্ঠান একটি অভিনব ঘটনা। সভার শেষ দিনে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, মহাত্মা ভূদেবের সাধনভূমি চুঁচুড়াতেই সরকার-প্রতিশ্রুত সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক।

প্রাক্তন সৈনিকদের সমবায় প্রতিষ্ঠান

প্রাক্তন সৈনিকদের আর্থিক উন্নতি এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে রিজিওন্যাল এমপ্লয়মেণ্ট অফিসার, ক্যাপ্টেন এস. কে. মুখার্জ্জী মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রাক্তন সৈনিকদের লইয়া ১৯৫০ সনে 'বেঙ্গল এক্স সার্ভিসমেন্ বিকিউজিস এণ্ড সিটিজেন্স মালটিপারপাস' সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমবায়-সমিতি বর্ত্তমানে কলিকাতা হইতে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে (গ্রাম—পাথরঘাটা, পোঃ—চাকলা, জেলা—২৪ পরগণা) একটি সমবায় মৎস্য-চাষ কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। এই সমিতি আরও অন্যান্য কুটীর-শিল্প ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আছেন। ইঁহারা বর্ত্তমানে মৎস্যচাষ ও কৃষি-উন্নয়ন পরিকল্পনার দিকে অধিক দৃষ্টি দিয়াছেন। বিগত মে মাসে সরকার কর্ত্তৃক আর্থিক সাহায্য পাওয়ায় ক্যাপ্টেন মুখার্জ্জী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে তাঁহাদের পরিকল্পনা দ্রুত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। আশা করা যায়, দুই-এক বৎসরের মধ্যে বহু দুঃস্থ প্রাক্তন সৈনিক তাঁহাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন। সম্প্রতি রাজ্যপাল মহাশয়, বিগ্রেডিয়ার গুরু কৃপাল সিং ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ মৎস্যচাষ কেন্দ্র পরিদর্শন

করিয়া বিশেষ সন্তোষলাভ করেন। রাজ্যপাল মহাশয় প্রাক্তন সৈনিকদের এই কথাই বলেন যে, সরকার দুঃস্থ সৈনিকদের সর্ব্বদাই আর্থিক সাহায্য করিতে প্রস্তুত যদি প্রাক্তন সৈনিকেরা নিজেরা উদ্যমশীল হন ও এইরূপ সমবায়-সমিতি গঠন করিয়া দেশ-উন্নয়ন কার্য্যে ব্রতী হন। তিনি আশা করেন যে, এইরূপ আরও বিভিন্ন সমবায়-সমিতি দেশে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীর শতবার্ষিকী উৎসব

উত্তরপাড়ার সারস্বত সম্মিলনের উদ্যোগে গত ৮১শে ফেব্রুয়ারী উত্তরপাড়ায় শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীর শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে অনুষ্ঠিত সভায় শ্রীসত্যজীবন মুখোপাধ্যায় একটি চিত্তাকর্ষক ভাষণ দেন। তিনি বলেন, "আমার পিতৃশ্বশ্রের স্বর্গত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় নিজমুখে শ্রীশ্রীমার করুণার কথা যাহা আমাকে বলিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করিতেছি। প্রথমে ললিতমোহনের একটু পরিচয় আবশ্যক, তিনি প্রসিদ্ধ কাগজবিক্রেতা মেসার্স জন ডিকিন্‌সন এণ্ড কোং লিঃ নামধেয় ইংরেজ আপিসের চিফ সেলসম্যান পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের গৃহী-শিষ্য কলিকাতা শ্যামপুকুরনিবাসী স্বর্গত কালীপদ ঘোষ মহাশয়ের আনুকূল্যে ললিতবাবু ঐ পদ লাভ করিয়াছিলেন, কালীবাবু জন ডিকিন্‌সনকে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, এ কথা শ্যামপুকুরনিবাসী প্রাচীন ব্যক্তিমাত্রেই জানেন।

ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে নিজমুখে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এইরূপ: 'একবার জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার চরণ দর্শন করিতে যাই। শ্রীশ্রীমা যত্ন সহকারে মধ্যাহ্ন-ভোজন করাইয়া বিদায় দিবার কালে বলিলেন যে এ প্রচণ্ড রৌদ্রে কলিকাতায় ফিরিবার সময় মাঠ পার হইতে তোমার বড় কষ্ট হইবে। ললিতমোহন উত্তরে জানাইলেন মাতৃ-আশীর্ব্বাদ আমার অক্ষয় কবচ। শ্রীশ্রীমা নীরবে সজল চক্ষুতে চাহিয়া রহিলেন। একখানি চলমান কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সারা পথটি ধরিয়া ললিতমোহনের মাথায় আতপত্রের কাজ করিয়াছিল। এমনি মায়ের অমোঘ আশীর্ব্বাদ।'

এখন শ্রীশ্রীমার জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া আমি যে শিক্ষালাভ করিয়াছি সে সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলিতেছি। চিকের আড়ালে অবগুণ্ঠনবতী বধূরূপিণী শ্রীশ্রীমা যেরূপে শ্বশ্রূসেবা করিয়া গিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধায় হৃদয় ভরিয়া উঠে। পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ষোড়শী পূজা দ্বারা মাতৃত্বের সর্ব্বজনীনতার আসনে সারদাদেবীকে যেরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে তাহা অভূতপূর্ব্ব ঘটনা।

প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গত ১৯শে জানুয়ারী প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬৪ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। নদীয়া জেলার পালপাড়া গ্রামে তাঁহার আদি নিবাস ছিল। মেদিনীপুর জেলার দাঁতনে তাঁহার পৈতৃক ভূ-সম্পত্তি ছিল। সাবোর কৃষি কলেজে সাড়ে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিবার পর তিনি স্মীথ ষ্ট্যানি ষ্ট্রীট, ডি. ওয়াল্ডি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে রসায়ন-বিভাগে কাজ করেন; পরে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের রসায়ন-বিভাগে কিছুদিন কাজ করিয়াছিলেন। এই স্থানে কাজ করিবার সময় একজন শ্বেতাঙ্গ উপরিওয়ালার সহিত তাঁহার মতদ্বৈধ হওয়ায় তিনি উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করেন। ইহার পর হইতে তিনি আর কোন চাকুরি গ্রহণ করেন নাই।

প্রকাশবাবু নামজাদা লোক ছিলেন না; তিনি যাহা ভাল বুঝিতেন তাহা নীরবে করিয়া যাইতেন। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহারা প্রথম পরিচয়েই তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে, সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। তাঁহার আত্ম-সম্মানজ্ঞান খুব প্রখর ছিল। নীচতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কাহারও সহিত মতভেদ হইলেও তিনি তাহার প্রতি কোন বিরুদ্ধভাব পোষণ করিতেন না। তিনি ক্রোধকে জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় বন্ধু-বৎসল ব্যক্তি খুবই বিরল। সকলের প্রতিই তিনি প্রীতির ভাব পোষণ করিতেন। ঈশ্বরের উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। ক্যান্‌সার রোগের অসহ্য যন্ত্রণায় যখন তিনি কষ্ট পাইতেছিলেন তখনও তিনি বিচলিত হন নাই। সকলের সঙ্গে হাসিমুখে কথা কহিয়াছেন এবং মৃত্যুর একদিন পূর্ব্বে বন্ধুরা যখন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন তখন তাঁহাদের প্রতি তিনি আদর আপ্যায়নের কোন ত্রুটি করেন নাই। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি তাঁর এক বন্ধুকে চার পৃষ্ঠাব্যাপী যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা পড়িলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সেই চিঠিতে বন্ধুর কথাই ছিল, নিজের কোন কথাই ছিল না।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্পর্কে তাঁহার অগাধ জ্ঞান ছিল। তাঁহার নিপুণ চিকিৎসার কথা বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। বিনা পারিশ্রমিকে তিনি চিকিৎসা করিতেন। বহু দরিদ্র রোগী তাঁহার চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করিয়াছেন।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা